চিত্রসূচী

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা



শয়নের পূর্বে

রূপদক্ষ [illegible] হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের শ্রেষ্ঠ অবদান
ওটীন কোম্পানীর সৌজন্যে

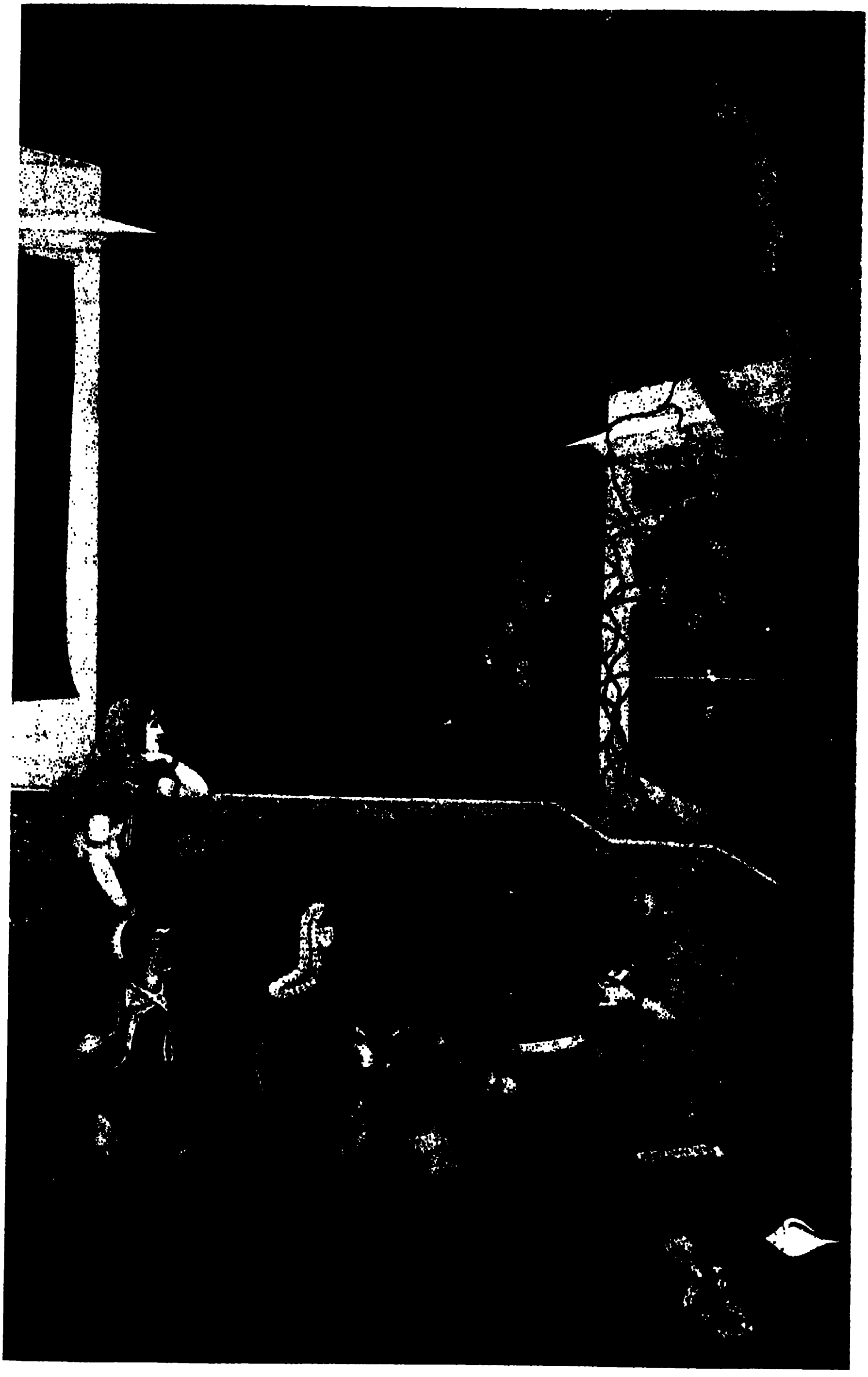
BEFORE RETIRING

This masterpiece by Mr. H. Mazumder is presented with Otine Co's compliments



পূজা—বরণে

প্রসাধন—কে-শ-র-ঞ্জ-নে



প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩২শ ভাগ, ২য় খণ্ড — কার্ত্তিক, ১৩৩৯ — ১ম সংখ্যা

সাধারণ মেয়ে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি অন্তঃপুরের মেয়ে
চিন্‌বে না আমাকে।
তোমার শেষ গল্পের বইটি পড়েচি, শরৎবাবু,
"বাসিফুলের মালা"—
তোমার নায়িকা এলোকেশীর মরণদশা ধরেছিল
পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে।
পঁচিশ বছর বয়সের সঙ্গে ছিল তার রেশারেশি,
দেখ্‌লেম, তুমি মহদাশয় বটে,
জিতিয়ে দিলে তাকে।

নিজের কথা বলি।
বয়স আমার অল্প।
একজনের মন ছুঁয়েছিল
আমার এই কাঁচা বয়সের মায়া
তাই জেনে পুলক লাগ্‌ত আমার দেহে,—
ভুলে গিয়েছিলুম, অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে আমি
আমার মতো এমন আছে হাজার হাজার মেয়ে
অল্প বয়সের মন্ত্র তাদের যৌবনে

তোমাকে দোহাই দিই
একটি সাধারণ মেয়ের গল্প লেখো তুমি।
বড়ো দুঃখ তার,
তারো স্বভাবের গভীরে
অসাধারণ যদি কিছু তলিয়ে থাকে কোথাও,
কেমন করে প্রমাণ করবে সে,
এমন ক-জন মেলে, যারা তা ধরতে পারে।
কাঁচা বয়সের ইন্দ্রজাল লাগে ওদের চোখে,
মন যায় না সত্যের খোঁজে,
আমরা বিকিয়ে যাই মরীচিকার দামে।

কথাটা কেন উঠ্‌ল তা বলি ;
মনে করো তার নাম নরেশ।
সে বলেছিল কেউ তার চোখে পড়েনি আমার মতো।
এত বড়ো কথাটা বিশ্বাস করব-যে সাহস হয় না,—
না করব-যে এমন জোর কই।
একদিন সে গেল বিলেতে,
চিঠিপত্র পাই কখনো বা,
মনে মনে ভাবি, রাম রাম, এত মেয়েও আছে সে দেশে,
এত তাদের ঠেলাঠেলি ভিড়।
আর তারা কি সবাই অসামান্য,
এত বুদ্ধি, এত উজ্জ্বলতা।
আর তারা সবাই কি আবিষ্কার করেচে এক নরেশ সেনকে
স্বদেশে যার পরিচয় চাপা ছিল দশের মধ্যে।

গেল মেল-এর চিঠিতে লিখেচে
লিজির সঙ্গে গিয়েছিল সমুদ্র নাইতে।
বাঙালী কবির কবিতা ক-লাইন দিয়েচে তুলে,
সেই যেখানে উর্ব্বশী উঠচে সমুদ্র থেকে।
তারপরে বালির উপর বসল পাশাপাশি,—
সামনে দুল্‌চে নীল সমুদ্রের ঢেউ,
আকাশে ছড়ানো নির্ম্মল সূর্য্যালোক।

লিজি তাকে খুব আস্তে আস্তে বল্‌লে,
"এই সেদিন তুমি এসেচ, ছুদিন পরে যাবে চলে,
ঝিনুকের ছুটি খোলা,
মাঝখানটুকু ভরা থাক্‌
একটি নিরেট অশ্রুবিন্দু দিয়ে,—
ছুর্লভ মূল্যহীন।"
কথা বলবার কী অসামান্য ভঙ্গী।
সেই সঙ্গে নরেশ লিখেচে
"কথাগুলি যদি বা বানানো হয় দোষ কী,
কিন্তু চমৎকার,—
হীরে-বসানো সোনার ফুল কি সত্য?"
বুঝতেই পারচ,
একটা তুলনার সঙ্কেত ওর চিঠিতে অদৃশ্য কাঁটার মতো
আমার বুকের কাছে বিঁধিয়ে দিয়ে জানায়—
আমি অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে।
মূল্যবানকে পুরো মূল্য চুকিয়ে দিই
এমন ধন নেই আমার হাতে।
ওগো না হয় তাই হোলো,
না হয় ঋণী রইলেম চিরজীবন।

পায়ে পড়ি তোমার, একটা গল্প লেখো তুমি, শরৎবাবু,
নিতান্তই সাধারণ মেয়ের গল্প,—
যে ছুর্ভাগিনীকে দূরের থেকে পাল্লা দিতে হয়
অন্তত পাঁচ সাতজন অসামান্যার সঙ্গে,—
অর্থাৎ সপ্তরথিনীর মার।
বুঝে নিয়েচি, আমার কপাল ভেঙেচে,—
হার হয়েচে আমার।
কিন্তু তুমি যার কথা লিখবে,
তাকে জিতিয়ে দিও আমার হয়ে,
পড়তে পড়তে বুক যেন ওঠে ফুলে।
ফুল চন্দন পড়ুক্‌ তোমার কলমের মুখে।

তাকে নাম দিয়ো মালতী।
ঐ নামটাই আমার।
ধরা পড়বার ভয় নেই;
এমন অনেক মালতী আছে বাংলা দেশে,
তারা সবাই সামান্য মেয়ে,
তারা ফরাসী জর্ম্মান জানে না,
কাঁদতে জানে।

কী করে জিতিয়ে দেবে।
উচ্চ তোমার মন, তোমার লেখনী মহীয়সী।
তুমি হয়তো ওকে নিয়ে যাবে ত্যাগের পথে।
দুঃখের চরমে, শকুন্তলার মতো।
দয়া কোরো আমাকে।
নেমে এসো আমার সমতলে।
বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাত্রির অন্ধকারে
দেবতার কাছে যে অসম্ভব বর মাগি—
সে বর আমি পাব না,
কিন্তু পায় যেন তোমার নায়িকা।
রাখো না কেন নরেশকে সাত বছর লণ্ডনে,
বারে বারে ফেল করুক তার পরীক্ষায়,
আদরে থাক্ আপন উপাসিকা মণ্ডলীতে।
ইতিমধ্যে মালতী পাস করুক এম, এ,
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে,
গণিতে হোক্ প্রথম তোমার কলমের এক আঁচড়ে।

কিন্তু এইখানেই যদি থামো
তোমার সাহিত্য-সম্রাট নামে পড়বে কলঙ্ক।
আমার দশা যাই হোক্
খাটো কোরো না তোমার কল্পনা।
তুমি তো কৃপণ নও বিধাতার মতো।
মেয়েটাকে দাও পাঠিয়ে য়ুরোপে।
সেখানে যারা জ্ঞানী যারা বিদ্বান যারা বীর,

যারা কবি যারা শিল্পী যারা রাজা,
দল বেঁধে আসুক ওর চারদিকে।
জ্যোতির্ব্বিদের মতো আবিষ্কার করুক ওকে,
শুধু বিদুষী বলে নয়, নারী বলে।
ওর মধ্যে যে বিশ্ববিজয়ী জাদু আছে
ধরা পড়ুক তার রহস্য, মূঢ়ের দেশে নয়,
যে দেশে আছে সমজদার, আছে দরদী,
আছে ইংরেজ, জর্ম্মান, ফরাসী।
মালতীর সম্মানের জন্যে সভা ডাকা হোক্ না,—
বড়ো বড়ো নামজাদার সভা।
মনে করা যাক্ সেখানে বর্ষণ হচ্চে মুষলধারে চাটুবাক্য,
মাঝখান দিয়ে সে চলেচে অবহেলায়—
ঢেউয়ের উপর দিয়ে যেন পালের নৌকা।
ওর চোখ দেখে ওরা করচে কানাকানি,
বলচে, ভারতবর্ষের সজল মেঘ আর উজ্জ্বল রৌদ্র
মিলেচে ওর মোহিনী দৃষ্টিতে।
(এইখানে জনান্তিকে বলে রাখি,—
সৃষ্টিকর্ত্তার প্রসাদ সত্যই আছে আমার চোখে।
বল্‌তে হোলো নিজের মুখেই,
এখনো কোনো য়ুরোপীয় রসজ্ঞের
সাক্ষাৎ ঘটেনি কপালে।)
নরেশ এসে দাঁড়াক্ সেই কোণে,
আর তার সেই অসামান্য মেয়ের দল।

আর তার পরে ?
তার পরে আমার নটে শাকটি মুড়োলো,
স্বপ্ন আমার ফুরোলো।
হায়রে সামান্য মেয়ে,
হায়রে বিধাতার শক্তির অপব্যয়।

দুর্গোৎসব

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

বাঙালী হিন্দু দুর্গোৎসব না করিয়া থাকিতে পারে না। পঞ্চাশ বৎসর আগে দেখিয়াছি, গ্রামের যে-গৃহস্থ ভালরকম উপায় করিতে আরম্ভ করিল, খরচ-খরচা বাদে দুই পয়সা জমাইতে পারিল, সে-ই দুর্গোৎসব আরম্ভ করিল। বুনিয়াদী ঘরে ত দুর্গোৎসব পুরুষানুক্রমে চলিত ছিল। এখন আর সে দিন নাই। গ্রামের অধিকাংশ বুনিয়াদী গৃহস্থই এখন শহরে আসিয়া বুনিয়াদ গাড়িয়াছে। শহরে অনেকেই বার্ষিক দুর্গোৎসব ছাড়িয়াছে; এখন শহরে নূতন করিয়া কেহ দুর্গোৎসব আরম্ভ করিতেছেন না। তাহার এক কারণ, নানা রকমে গৃহস্থের নিত্যনৈমিত্তিক খরচ বাড়িয়াছে; আর এক কারণ, খরচ-বৃদ্ধির অনুপাতে বিশ্বাসও কমিয়াছে। কিন্তু তা হইলে কি হয়, বাঙালী হিন্দু দুর্গোৎসব না করিয়া থাকিতে পারে না। তাই সে সার্ব্বজনীন বা বারোয়ারী দুর্গোৎসব আরম্ভ করিয়াছে। সার্ব্বজনীন উৎসবের উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসও যেন একটু একটু ফিরিয়া আসিতেছে। ফিরিয়া আসিবেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে শিক্ষিত হিন্দু ইউরোপীয়-গণের অনুকরণে যুক্তিতন্ত্রী (rational) হইতে উৎসুক হইয়াছিল। শিক্ষার বিভ্রাটে তথাকথিত শিক্ষিতের পক্ষে যুক্তিতন্ত্র (rationalism) পূরা মাত্রায় গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং যেখানে ইউরোপীয় ধরণের কোন ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা ছিল, এখন সে-খানে মঠ বা আশ্রম উঠিতেছে। সাধু-সন্ন্যাসী, ফকীর-ফাকরা কবচ মাদুলী জলপড়া লইয়া শিক্ষিত সমাজেও ডাক্তার কবিরাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছে। জ্যোতিষীর পসার দিন-দিন বাড়িতেছে। সুতরাং জগন্মাতায় বিশ্বাসও যে ফিরিয়া আসিবে ইহাতে আর বিস্মিত হইবার কি আছে। কিন্তু বাঙালী হিন্দু গৃহস্থের নিত্য ব্যয় এখন অনেক বাড়িয়াছে। সেই ব্যয় কমাইয়া তাহার পক্ষে নিজের বাড়িতে দুর্গোৎসব আরম্ভ করা আর সহজ নহে। তাই সে যৌথ দুর্গোৎসব আরম্ভ করিয়াছে। দুর্গোৎসবে অনুরাগ বাঙালী হিন্দুর অস্থি-মজ্জাগত বলিয়াই সে দুর্গোৎসব না করিয়া পারে না। বাঙালীর সভ্যতার ইতিহাস দুর্গোৎসবের সহিত জড়িত। বাঙালী যদি নিজেকে ভাল করিয়া জানিতে চায় তবে তাহার দুর্গোৎসবের ইতিহাস অনুশীলন করা উচিত।

দুর্গা কে? দুর্গার পূজা কি প্রকারে প্রচলিত হইল? এই সকল প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মনে পড়ে দুর্গোৎসবের বেদ-স্বরূপ মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত "দেবী-মাহাত্ম্য" (৮১ হইতে ৯৩ অধ্যায়)। এই "দেবীমাহাত্ম্য" "চণ্ডী" এবং "দুর্গাসপ্তসতী" নামেও পরিচিত। "দেবী-মাহাত্ম্যের" বিনিয়োগ সম্বন্ধে দেবী বলিতেছেন (৯২।১১-১২)—

> শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
> তস্যাং মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তিসমন্বিতঃ॥
> সর্ব্বাবাধাবিনির্মুক্তো ধনধান্যসুতান্বিতঃ।
> মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥

শরৎকালে (আমার) যে বার্ষিক মহাপূজা করা হয় সেই পূজার সময়ে যে-লোক আমার এই মাহাত্ম্য ভক্তিসহকারে শ্রবণ করে সে আমার প্রসাদে নিশ্চয়ই সকল বিপদ অতিক্রম করে এবং ধন, ধান্য এবং পুত্র লাভ করে।

দেবীমাহাত্ম্য পাঠ বার্ষিকী দুর্গাপূজার অঙ্গ। কিন্তু এই অংশ পাঠ করিলে মনে হয়, দেবীমাহাত্ম্য রচিত হইবার পূর্ব্বাবধিই বার্ষিকী দুর্গাপূজা চলিত ছিল। অতি প্রাচীন কালে এক সময়ে লোকে মহিষমর্দ্দিনী প্রভৃতি বহু দেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত এবং বহু দেবীর উপাসক ছিল। দেবীমাহাত্ম্যের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়, এই সকল দেবীই একমেবাদ্বিতীয়া পরমেশ্বরীর বিভিন্ন আকৃতি মাত্র। দেবীমাহাত্ম্যের সূচনায় মেধস্ ঋষি বলিতেছেন, যিনি ভগবতী মহামায়া, যিনি চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি মুক্তিদায়িনী পরমা বিদ্যা, তিনিই জগৎকে মুগ্ধ করিতেছেন। সুরথ রাজা ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দেবী মহামায়া কে? ঋষি উত্তরে বলিলেন (৮১।৩৭-৩৮)

নিত্যৈব সা জগন্মূর্তি স্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎ সমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥

জগন্মূর্তি মহামায়া নিত্যা অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশরহিতা, এবং তাঁহার দ্বারা এই সমস্ত (জগৎ) ব্যাপ্ত। তিনি নিত্যা হইলেও দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য যখন আবির্ভূতা হন, লোকে তখন বলে তিনি উৎপন্ন হইয়াছেন।

এই কথা বলিয়া ঋষি এক এক করিয়া বিভিন্ন দেবীর বা পর পর বিভিন্ন আকারে আবির্ভূতা একই দেবীর উৎপত্তির বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। দেবীর প্রথম আবির্ভাব বিষ্ণুর যোগনিদ্রারূপে মধুকৈটভ-বধের সহায়তার জন্য। তারপর মহিষাসুর বধের জন্য দেবী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি দেবতার শরীর হইতে নির্গত তেজ লইয়া গঠিত অম্বিকা, ভদ্রকালী বা চণ্ডিকা রূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন এবং মহিষাসুর বধ করিয়াছিলেন। দেবীর মূর্তিনিচয়ের মধ্যে মহিষমর্দ্দিনী মূর্তিই সর্ব্বপ্রধান।

মহিষাসুর বধ করিয়া দেবতাগণের স্তুতিবাক্য শুনিয়া চণ্ডিকা অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন। অন্তর্ধানের পূর্ব্বে দেবগণকে বলিয়া গিয়াছিলেন, "যখন তোমাদের বিপদ উপস্থিত হইবে, তখন আমাকে স্মরণ করিও, আমি আসিয়া তোমাদিগকে উদ্ধার করিব।" তার পর শুম্ভ-নিশুম্ভ নামক দুই অসুর আসিয়া আবার দেবতাগণকে স্বর্গ হইতে বাহির করিয়া দিয়া স্বর্গরাজ্য দখল করিয়া বসিল দেবতারা হিমালয়ে গিয়া চণ্ডিকার স্তব আরম্ভ করিলেন স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া পর্ব্বতবাসিনী পার্ব্বতী চণ্ডিকা পুনরায় দেবতাগণকে দেখা দিলেন। তখন পার্ব্বতীর শরীরকোষ হইতে দেবী নূতন রূপ ধারণ করিয়া নির্গত হইলেন। নবকলেবরধারিণী অম্বিকা শরীরকোষ হইতে উৎপন্ন বলিয়া "কৌষিকী" নামে পরিচিতা হইলেন। শরীরকোষ হইতে কৌষিকী নিষ্ক্রান্ত হইবার পর পার্ব্বতী কৃষ্ণবর্ণ এবং কালিকা নাম ধারণ করিয়া হিমালয়ে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে কৌষিকী অম্বিকা মনোহর রূপ ধারণ করিয়া দৈত্যরাজ শুম্ভকে বলিয়া পাঠাইলেন, "যে আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিবে, আমি তাহাকে বিবাহ করিব।" তার পর বিরাট অসুর-সেনার সহিত অপরূপরূপা অম্বিকার ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। দেবী যখন যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন তখন তাঁহার ভ্রুকুটিকুটিল ললাট-ফলক হইতে বিচিত্র খট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা দ্বীপি-চর্ম্মপরিধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা অতিবিস্তারবদনা জিহ্বা-ললনভীষণা কালী নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কালী চণ্ডের এবং মুণ্ডের ছিন্ন শিরদ্বয় লইয়া চণ্ডিকাকে উপহার দিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইল চামুণ্ডা। শুম্ভের সেনা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে চণ্ডিকাকে এবং চামুণ্ডাকে ঘিরিয়া ফেলিল তখন তাঁহাদের সহায়তার জন্য ব্রহ্মা, মহেশ্বর, ইন্দ্র, কুমার (কার্ত্তিকেয়) এবং বিষ্ণুর বিভিন্ন শরীর হইতে তাঁহাদের নিজ নিজ শক্তি ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, ঐন্দ্রী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী এই সপ্ত মাতৃকার আকার ধারণ করিয়া নির্গত হইয়া যুদ্ধে যোগদান করিল। তাহার পর আবার দেবীর শরীর হইতে অতিভীষণা আর এক শক্তি নিষ্ক্রান্ত হইয়া মহেশ্বরকে বলিলেন, "তুমি দূত হইয়া শুম্ভ নিশুম্ভের নিকট গমন করিয়া তাহাদিগকে বল তাঁহারা স্বর্গ ছাড়িয়া পাতালে গমন করুক।" যেহেতু চণ্ডিকার এই শক্তি শিবকে দূতরূপে পাঠাইয়াছিলেন এই জন্য তাঁহার নাম হইল শিবদূতী। এই সকল দেবীর এবং অসুরগণের মধ্যে যে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল তাহাতে যখন শুম্ভ ব্যতীত আর সকল অসুর এবং নিশুম্ভ নিহত হইল তখন শুম্ভ বলিলেন (১০।২-৩)

বলাবলেপদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্ব্বমাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুদ্ধসে যাতিমানিনী॥

হে বলগর্ব্বদুষ্টে দুর্গে! তুমি গর্ব্ব করিও না। তুমি অন্যের সহায়তায় যুদ্ধ করিয়া অভিমানিনী হইয়াছ।"

দেবী উত্তর করিলেন—

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ॥

এই জগতে একা আমিই আছি; আমা ছাড়া অপর দ্বিতীয় কেহ নাই। দেখ, এই সকল শক্তিস্বরূপা আমার বিভূতি, আমাতেই প্রবেশ করিতেছে।

তখন ব্রহ্মাণী প্রমুখ দেবীগণ চণ্ডিকার শরীরে বিলীন হইয়া গেলেন। এই পৌরাণিক আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য, এক সময়ে লোকসমাজে নানা দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। তার পর জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লোকের ধারণা হইল, জগন্মাতা দেবী একজনই আছেন, সাধকগণের কল্পিত অন্যান্য সকল দেবী তাঁহারই রূপভেদ মাত্র। "দেবী-

মাহাত্ম্যে” এই দেবতত্ত্বই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আদিম সময়ে লোকে যে-সকল দেবীর আরাধনা করিত তাঁহাদের মধ্যে সিংহবাহিনী মহিষমর্দ্দিনী পার্ব্বতী প্রধানা ছিলেন। এই নিমিত্ত, “দেবীমাহাত্ম্য” অনুসারে শুম্ভ-নিশুম্ভ-নাশিনীর মধ্যে অন্যান্য সকল দেবী বিলীন হইলেও কার্য্যতঃ মহিষমর্দ্দিনীই পরমেশ্বরীর স্থান অধিকার করিয়াছেন। এখন দেখা যাক, মহিষমর্দ্দিনীর মূল কি? প্রকৃতির কোন্ শক্তি কোন্ দেশে কোন্ সমাজে মহিষমর্দ্দিনীর আকার লাভ করিয়াছিল?

শুম্ভ-নিশুম্ভ নিহত হইলে দেবতারা আবার দেবীর স্তব করিলেন। দেবী তাঁহাদিগকে বর দান করিয়া বলিতে লাগিলেন, ভবিষ্যতে কবে তিনি কোন্ রূপে অবতীর্ণা হইবেন। দেবী বলিলেন, অষ্টম মন্বন্তরে আবার যখন শুম্ভ-নিশুম্ভ উৎপন্ন হইবে, তখন তিনি নন্দগোপের গৃহে, যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া বিন্ধ্যাচলবাসিনী হইবেন এবং ঐ অসুরদ্বয়কে বধ করিবেন। পুনরায় (৯২।৪২-৪৬)

ভূয়শ্চ শতবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যামনম্ভসি।
মুনিভিঃ সংস্তুতা ভূমৌ সম্ভবিষ্যাম্যযোনিজা॥

*　　*　　*

ততোঽহমখিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ।
ভরিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ॥
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি।
তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্॥
দুর্গা দেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।

পুনরায় শতবার্ষিকী অনাবৃষ্টি এবং (পৃথিবীতে) জলাভাব হইলে মুনিগণের স্তুতি শুনিয়া জন্মরহিত আমি পৃথিবীতে জন্মলাভ করিব।... হে সুরগণ! তৎপর যতদিন বৃষ্টি না হইবে ততদিন নিজের শরীর হইতে উৎপন্ন প্রাণধারক শাকের দ্বারা সমুদয় লোক পোষণ করিব। তখন আমি পৃথিবীতে শাকম্ভরী নামে পরিচিত হইব। সেইখানে আমি দুর্গম নামক মহাসুরকে বধ করিয়া দুর্গাদেবী নাম লাভ করিব।

মহাভারতের বনপর্ব্বে (৮৪ অধ্যায়ে) দেবীস্থান শাকম্ভরী তীর্থের প্রসঙ্গে শাকম্ভরী নামের কতকটা অন্যরূপ অর্থ দেওয়া হইয়াছে। যথা (১৪-১৬)—

দিব্যং বর্ষসহস্রং হি শাকেন কিল সুব্রতা।
আহারং সা কৃতবতী মাসি মাসি নরাধিপ॥
ঋষয়োঽভ্যাগতা যত্র দেব্যা ভক্ত্যা তপোধনাঃ।
আতিথ্যঞ্চ কৃতং তেষাং শাকেন কিল ভারত॥
ততঃ শাকম্ভরীত্যেব নাম তস্যাঃ প্রতিষ্ঠিতম্।

হে নরাধিপ, (এই স্থানে দেবী) ব্রত গ্রহণ করিয়া দেবপরিমিত এক হাজার বৎসর কাল মাসে মাসে শাক আহার করিয়াছিলেন। হে ভারত, ভক্তিপরায়ণ তপোধন ঋষিগণ অতিথি হইলে, (দেবী) শাকের দ্বারা অতিথি-সৎকার করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত দেবীর নামকরণ হইয়াছিল শাকম্ভরী।

নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন দেব দেবীর কল্পনা ক্ষেত্রে শাক-প্রসবিনীর (Corn-mother) বা শাক-ভিমানিনী দেবতার (vegetation spirit) কল্পনা অতি প্রাচীন। এই হিসাবে মনে হয়, দুর্গা আদৌ শাকম্ভরী রূপে কল্পিত হইয়াছিলেন। দুর্গোৎসবের সময়ও এইরূপ অনুমানই সমর্থন করে। দুর্গোৎসব একবার হয় বসন্ত কালে, চৈতালি শস্য কাটার সময়ে। দুর্গোৎসবের প্রশস্ত কাল শরৎ ঋতু, বাংলা দেশে ধান কাটার সূচনায়। যখন শস্য পাকে এবং কাটিয়া আনিবার অবকাশ হয়, সেই সময়ই অবশ্য মানুষের মন শাকম্ভরীর প্রতি ভক্তিতে, অথবা শস্য ভাল না ফলিলে ভয়ে, পূর্ণ হয়; সেই সময়ই দেবীর পূজার উপযুক্ত সময়। দুর্গা পূজার সহিত উদ্ভিদের সম্বন্ধসূচক আরও উপযুক্ত প্রমাণ আছে। যথা, “দুর্গোৎসবতত্ত্বে” রঘুনন্দনের ধৃত ভবিষ্য পুরাণের বচন—

“ষষ্ঠ্যাংবিল্বতরৌ বোধং সায়ং সন্ধ্যাসু কারয়েৎ।”

ষষ্ঠী তিথিতে সায়ংসন্ধ্যার সময় বিল্বতরুতে (দেবীর) বোধন (জাগান কার্য্য) করিবে।

সপ্তমী তিথিতে পূর্ব্বাহ্নেই নবপত্রিকা পূজার ব্যবস্থা আছে। এই কয়টি নবপত্রিকা—

“কদলী দাড়িমী ধান্যং হরিদ্রা মানকং কচুঃ।
বিল্বাশোকৌ জয়ন্তী চ বিজ্ঞেয়া নবপত্রিকা॥”

কলা, ডালিম, ধান, হলুদ, মান (কচু), কচু, বেল, অশোক, জয়ন্তী—এই সকল গাছের পাতা নবপত্রিকা।

খিল হরিবংশের আর্য্যা স্তবের (৫৮।৩২৮১) এই পংক্তিটি দুর্গার সহিত কৃষিকার্য্যের সম্বন্ধ সূচিত করে—

কর্ষকাণাঞ্চ সীতেতি ভূতানাং ধরণীতি চ।

“(তুমি) কৃষকগণের পক্ষে মাটিতে লাঙ্গলের দ্বারা অঙ্কিত রেখা, এবং প্রাণিগণের পক্ষে পৃথিবী।”

সুতরাং দুর্গা যদি মূলতঃ শাক বা শস্য প্রসবিনী দেবী হন তবে মহিষাসুরকে শস্যনাশক বন্য পশুর এবং অনাবৃষ্টির বিগ্রহ মনে করা যাইতে পারে। সুতরাং মহিষাসুর-মর্দ্দিনীর পূজার মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে শস্য উৎপাদনের এবং রক্ষার জন্য বসন্তে এবং শরতে শাকম্ভরীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং আনন্দ-উৎসব। যে-দেবী শস্য-নাশক পশু এবং অনাবৃষ্টি নষ্ট করিয়া মনুষ্য জাতি রক্ষা

করেন তিনি অবশ্য সমরে সর্ব্বাগ্রগণ্যা, সুতরাং তিনিই রণদেবী। মহাভারতের বিরাট পর্ব্বে (৬ষ্ঠ অধ্যায়) রাজ্য-ভ্রষ্ট অজ্ঞাতবাসী যুধিষ্ঠির বিরাট নগরে পৌঁছিয়া দুর্গার স্তব করিলে দেবী যুধিষ্ঠিরের নিকট আবির্ভূতা হইয়া বলিতেছেন—

ভবিষ্যত্যচিরাদেব সংগ্রামে বিজয়স্তব।

শীঘ্রই তুমি যুদ্ধে জয়লাভ করিবে।

এই স্তবে যুধিষ্ঠির দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

ত্রৈলোক্যরক্ষণার্থায় মহিষাসুরনাশিনি

স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল রক্ষার জন্য তুমি মহিষাসুরকে নাশ করিয়াছ।

আবার—

"বিন্ধ্যে চৈবনগশ্রেষ্ঠে তব স্থানং হি শাশ্বতম্।"

পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্য তোমার চিরবাসস্থান।

মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে যুদ্ধ আরম্ভের পূর্ব্বে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "শত্রুকে পরাজিত করিবার জন্য দুর্গাস্তোত্র পাঠ কর" (২৩।২)। অর্জ্জুন দুর্গার স্তব করিলেন। দুর্গাও তাঁহাকে বরদান করিলেন, "তুমি শীঘ্রই শত্রু জয় করিবে।" যে-দেবী আদৌ শাকম্ভরী ছিলেন তিনি মহিষাসুর বধ করিয়া যুদ্ধে জয়-পরাজয়-বিধায়িনী রণদেবী হইলেন, এবং নদনদী, পর্ব্বত, বন ও পর্ব্বতগুহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণের সহিত মিলিত হইয়া জগন্মাতার জগন্মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। দেবীর এই জগন্মূর্ত্তিতে সভ্যাসভ্য সকল জাতির পূজিতা দেবীগণ মিলিত হইল। হরিবংশের আর্য্যা স্তবে (৫৯।৩২৭৩-৩২৮৪) আছে—

পর্ব্বতাগ্রেষু ঘোরেষু নদীষু চ গুহাসু চ।
বসসি ত্বং মহাদেবি বনেষূপবনেষু চ॥
শবরৈ র্ব্বর্ব্বরৈশ্চৈব পুলিন্দৈশ্চ সুপূজিতা।

হে মহাদেবি! শবর, বর্ব্বর, পুলিন্দগণের দ্বারা পূজিতা হইয়া তুমি দুর্গম পর্ব্বতের শিরোদেশে, নদীতে, গুহাতে, বনে, উপবনে বাস কর।

সংস্কৃত সাহিত্যে (বাসবদত্তা, হর্ষচরিত, কথাসরিৎসাগর, প্রভৃতি গ্রন্থে) বিন্ধ্য-পর্ব্বতবাসী অসভ্য জাতিনিচয়কে শবর, পুলিন্দ, কিরাত নাম দেওয়া হইয়াছে। দুর্গার সহিত শবরাদি পূজিতা বনদেবীগণ মিলিত হওয়ায় দুর্গার পূজাপদ্ধতিতেও শবরাদির আচার মিশিবার অবকাশ পাইয়াছে। এই নিমিত্ত শাস্ত্রকারগণ দুর্গাপূজা সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক এই তিন প্রকারে বিভাগ করিয়াছেন। রঘুনন্দন "দুর্গোৎসবতত্ত্বে" স্কন্দ-পুরাণ এবং ভবিষ্য-পুরাণ হইতে এই কয়টি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

শারদী চণ্ডিকাপূজা ত্রিবিধা পরিগীয়তে।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু।
সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।
মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিষু কীর্ত্তিতং॥
পাঠস্তস্য জপঃ প্রোক্তঃ পঠেদ্দেবীমনা তথা।
রাজসী বলিদানেন নৈবেদ্যৈঃ সামিষৈ স্তথা॥
সুরামাংসাদ্যুপহারৈ র্জপযজ্ঞৈ বিনা তু যা।
বিনা মন্ত্রৈ স্তামসী স্যাৎ কিরাতানাঞ্চ সম্মতা॥

শারদীয় চণ্ডিকা পূজা তিন প্রকার,—সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী; ইহাদের বিবরণ শ্রবণ কর। নিরামিষ নৈবেদ্য দিয়া এবং জপ ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সাত্ত্বিকী পূজা করা হয়। পুরাণাদিতে ভগবতীর যে মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে তাহার পাঠকে জপ বলে; দেবীতে মনঃস্থির করিয়া ঐ মাহাত্ম্য পাঠ করিতে হইবে। বলিদান করিয়া এবং আমিষসহ নৈবেদ্য দিয়া রাজসী পূজা করিতে হয়। বিনা জপ, বিনা যজ্ঞ, বিনা মন্ত্র, মদ্য মাংস প্রভৃতি উপহার দিয়া তামসী পূজা করা হয়; এইরূপ পূজা কিরাতগণের সম্মত।

সভ্যতার তিন স্তরের লোকেরা এই তিন প্রকার পূজা করিতেন। সভ্য লোকেরা করিতেন সাত্ত্বিকী পূজা, অর্দ্ধ-সভ্যেরা রাজসী পূজা, এবং অসভ্যেরা তামসী পূজা। রঘুনন্দনধৃত কালিকাপুরাণের বচনে সকলের জন্যই দশমী দিনে শাবরোৎসব বিহিত হইয়াছে। ধূলি কাদা ছিটাছিটি এবং অশ্লীল গান এই শাবরোৎসবের অঙ্গ। শাবরোৎসব অবশ্যই শবরগণের আচার মূলক।

দুর্গার স্বরূপ-কল্পনায় এবং দুর্গাপূজা-পদ্ধতিতে নানা-প্রকার উপাদানের মিশ্রণ দেখিয়া অনুমান হয়—দুর্গোৎসব অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান। সম্ভবতঃ তামসী পূজায় এই উৎসবের সূত্রপাত, এবং সাত্ত্বিকী পূজায় ইহার চরম পরিণতি। একদিকে শাবরোৎসব, এবং আর একদিকে দেবীমাহাত্ম্যের উন্নত ভাব, পাশাপাশি রাখিয়া বিচার করিলে এই দুর্গোৎসবে মানবের সভ্যতার ইতিহাসের প্রায় আগাগোড়ার নিদর্শন একত্র দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্গোৎসবের অতি প্রাচীনতা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোন বাহ্য প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। বেদের সংহিতাভাগে এবং ব্রাহ্মণভাগে দুর্গার বা কাত্যায়নীর নাম নাই। সিন্ধুদেশের অন্তর্গত মহেঞ্জো-ডেরোতে প্রায় ৫০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার যে-সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে জগন্মাতার পূজার কোন নিদর্শন

এপর্য্যন্ত ধরা পড়ে নাই। কিন্তু অন্যান্য দেশের প্রাচীন ধর্ম্মের সহিত তুলনা করিলে দুর্গাপূজার প্রাচীনতা কতক পরিমাণে অনুমান করা যাইতে পারে। অন্যূন চার হাজার বৎসর পূর্ব্বাবধি আশিয়া-মাইনরের অন্তর্গত আনাটোলিয়া প্রদেশে এবং ক্রীট দ্বীপে সিংহবাহিনী রণজয়বিধায়িনী জগন্মাতার পূজা প্রচলিত ছিল। তাহারও অন্ততঃ হাজার বৎসর পূর্ব্বাবধি সুমেরিয়ায় জগন্মাতা নিন্-খুর্সাগের পূজা প্রচলিত ছিল। নিন্-খুর্সাগ নামের অর্থ পার্ব্বতী (Lady of the Mountain)। ইরাকের অন্তর্গত আল্-উবেদ নামক স্থানের একটি ভগ্নস্তূপ খননের ফলে একখানি শিলাফলক পাওয়া গিয়াছে যাহাতে লেখা আছে মেস্-অন্নি-পদ্দের পুত্র অ-অন্নি-পদ্দ নিন্-খুর্সাগের মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রাজা অ-অন্নি-পদ্দ আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের ৩১০০ সালে বিদ্যমান ছিলেন। এই সময়কার সুমের দেশের সহিত ভারতবর্ষের অন্তর্গত সিন্ধুদেশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। সুতরাং তৎপূর্ব্বে ভারতবর্ষে জগন্মাতার পূজা প্রচলিত না থাকিলেও সুমেরীয় সভ্যতার সংসর্গের ফলে তাহার উদ্ভব অসম্ভব নহে।

জগন্মাতা দুর্গার কল্পনা যত প্রাচীনই হউক না কেন, এ যাবৎ যত প্রাচীন মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার কোনখানিই খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর অপেক্ষা প্রাচীনতর নহে। ইহার মধ্যেও এত প্রাচীন মাত্র একখানি, ভিলসার (প্রাচীন বিদিশার) নিকটবর্ত্তী উদয়গিরির একটি গুহামন্দিরে অঙ্কিত দশভুজা মহিষ-মর্দ্দিনী। বাঘেলখণ্ডের নাগোদ-রাজ্যের অন্তর্গত ভূমারার ভগ্ন শিবমন্দিরের একখানি গবাক্ষের চূড়ার মধ্যে অঙ্কিত চতুর্ভুজা মহিষমর্দ্দিনী ইহার কিছু পরবর্ত্তী কালের, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর হইবে।* বাদামীর ১নং গিরি-গুহা মন্দিরে চতুর্ভুজা মহিষমর্দ্দিনীও ঐ শতাব্দীতেই খোদিত হইয়াছিল।† বিহার প্রদেশের গয়া জেলার অন্তর্গত নাগার্জ্জুনী পাহাড়ে মৌর্য্য-সম্রাট অশোকের পৌত্র সম্রাট দশরথের করান তিনটি গুহা-গৃহ আছে। ইহার একটির মধ্যে আনুমানিক খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে খোদিত একটি সংস্কৃত লিপির প্রথম শ্লোকে আশীর্ব্বাদ করা হইয়াছে, মহিষাসুরের শিরে ন্যস্ত দেবীর পদ তোমাদের সম্পদের পথ দেখাইয়া দিক; এবং আর একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে, মৌখরী রাজা অনন্তবর্ম্মা বিন্ধ্যপর্ব্বতের এই গুহায় কাত্যায়নীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।‡ সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে, অনন্তবর্ম্মা এই গুহা-গৃহে নিত্যপূজার জন্য দুর্গামূর্ত্তিই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শরৎকালে মৃণ্ময়ী দুর্গামূর্ত্তির পূজা যে কত প্রাচীন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। মার্কণ্ডেয় পুরাণে (৯৩ অধ্যায়ে) কথিত হইয়াছে, সুরথ রাজা এবং সমাধি বৈশ্য মেধস ঋষির নিকট দেবীমাহাত্ম্য শুনিয়া নদীতীরে গিয়া দেবীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং নিজ নিজ দেহের রক্তযুক্ত বলি প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপে অবিরত তিন বৎসর পূজিতা হওয়ার পর চণ্ডিকা সুরথের এবং সমাধির নিকট আবির্ভূতা হইয়া বাঞ্ছিত বর প্রদান করিয়াছিলেন।

সুরথ রাজা এবং সমাধি বৈশ্য তিন বৎসরব্যাপী দুর্গা পূজা করিয়া এই পূজা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। আশ্বিন মাসে তিন দিন ব্যাপী দুর্গাপূজার বিধি পাওয়া যায় কালিকা-পুরাণে। যথা (৬০।২৬)

রামস্যানুগ্রহার্থায় রাবণস্য বধায় চ।
রাত্রাবেব মহাদেবী ব্রহ্মণা বোধিতা পুরা।

রামকে অনুগ্রহ করিবার জন্য এবং রাবণকে বধ করিবার জন্য রাত্রি-কালে মহাদেবীকে (দুর্গাকে) ব্রহ্মা বোধিত (জাগরিত) করিয়াছিলেন।

রঘুনন্দন দুর্গোৎসবতত্ত্বে লিঙ্গপুরাণ হইতে এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

ঐঁ রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।
অকালে ব্রহ্মণাবোধো দেব্যাস্থয়ি কৃতঃ পুরা।

হে দেবী! রাবণকে বধ করিবার জন্য এবং রামকে অনুগ্রহ করিবার জন্য, তোমাকে ব্রহ্মা অকালে বোধিত করিয়াছিল।"

কালিকাপুরাণের বচনের "রাত্রি" এবং এই বচনের "অকাল" এই দুই কথারই অর্থ, দেবতাদিগের নিদ্রা

* R. D. Banerji, *The Temple of Siva at Bhumara, Memoirs of the Archaeological Survey of India*, No. 16, Plate XIV (*b*)

† R. D. Banerji, *Bas-reliefs of Badami, Memoirs of the Archaeological Survey of India*, No. 25, Pl. II (*b*)

‡ Fleet, *Gupta Inscriptions*, p. 227.

যাইবার সময় দক্ষিণায়ন। রামের অনুরোধে রাবণের বধের জন্য যে স্বয়ং ব্রহ্মা শরৎকালে দুর্গাকে বোধিত করিয়াছিলেন একথা একালে প্রচলিত বাল্মিকীর রামায়ণে নাই। দেবীমাহাত্ম্যের সুরথ রাজা খুব প্রসিদ্ধ নহেন বলিয়া, দুর্গাপূজার মহিমা বাড়াইবার জন্য পরবর্ত্তী পুরাণকারেরা বোধ হয় রাম-রাবণের যুদ্ধের সহিত এই পূজা জড়াইয়াছিলেন।

কোন্ মাসে কোন্ তিথিতে চণ্ডিকা প্রাদুর্ভূতা হইয়া ঠিক কোন্ তিথিতে মহিষাসুরকে বধ করিয়াছিলেন একথা দেবীমাহাত্ম্যে নাই; এবং মহিষাসুরের বধের পর দেবতাগণ দেবীকে যে স্তব করিয়াছিলেন, দেবী-মাহাত্ম্যে সেই স্তব থাকিলেও, দেবতারা যুদ্ধের সময়েও যে দেবীকে পূজা করিতেছিলেন এমন কোন বৃত্তান্ত দেবী-মাহাত্ম্যে নাই। কালিকা-পুরাণে এই অভাব পূরণ করা হইয়াছে, এবং দুর্গাপূজা যে মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধে রতা রণদেবীর পূজা তাহাও পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে। যথা (৬০। ৭৯—৮২)

যদা স্তুতা মহাদেবী বোধিতা চাশ্বিনস্ত চ।
চতুর্দ্দশী কৃষ্ণপক্ষে প্রাদুর্ভূতা জগন্ময়ী।
দেবানাং তেজসাং মূর্ত্তিঃ শুক্লপক্ষে সুশোভনে।
সপ্তম্যাং সাকরোদ্দেবী অষ্টম্যাং তৈরলঙ্কৃতা।
নবম্যামুপহারৈস্তু পূজিতা মহিষাসুরম্।
নিজঘান দশম্যান্তু বিসৃষ্টান্তর্হিতা শিবা।

যখন মহাদেবী স্তুত এবং বোধিত হইয়াছিলেন (তখন) আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী দিনে জগন্ময়ী প্রাদুর্ভূতা হইয়াছিলেন। সুশোভন শুক্লপক্ষের সপ্তমী দিনে সেই দেবী দেবগণের তেজোময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। অষ্টমী দিনে দেবতারা তাঁহাকে অলঙ্কার পরাইয়াছিলেন; নবমী দিনে নানা উপহারের দ্বারা দেবী পূজিতা হইয়াছিলেন; এবং দশমী দিনে মহিষাসুর-বধের পর দেবতাগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে তিনি অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন।

প্রাচীন অপ্রাচীন যত দুর্গামূর্ত্তি পাওয়া যায় তাহাতে দেবীকে মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধ করিতে এবং পদাঘাতে বা অস্ত্রাঘাতে মহিষাসুরকে নিধন করিতে দেখা যায়। কিন্তু প্রাচীন এবং আধুনিক দুর্গামূর্ত্তির মধ্যে একটা মস্ত-বড় তফাৎও আছে। প্রাচীন মূর্ত্তির দুর্গার সঙ্গে আছেন কেবল বাহন সিংহ এবং নিহতপ্রায় মহিষাসুর; কিন্তু আধুনিক মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধে নিরতা দুর্গার সহিত কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী বিদ্যমান। ইহার তাৎপর্য্য কি? দেবী যখন মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিলেন তখন যে কার্ত্তিক বা গণেশ সেখানে উপস্থিত ছিলেন এমন কথা কোন পুরাণে বা উপপুরাণে নাই। প্রকৃতপ্রস্তাবে বাংলা দেশে এখন দুর্গার যে মূর্ত্তি পূজিত হয় তাহা মহিষাসুর-নিধনে-নিরতা রণচণ্ডিকার মূর্ত্তি নহে, বৎসরান্তে মাতা মেনকার এবং পিতা হিমালয়ের গৃহে পুত্রকন্যাসহ আগতা উমার পূজা। সংস্কৃত পুরাণে বা উপপুরাণে এই পূজার বিধি নাই। বাংলা ভাষায় রচিত দুর্গামঙ্গল কাব্যগুলি এই পূজার শাস্ত্র। এইরূপ একখানি পুস্তক, জন্মান্ধ কবি ভবানী-প্রসাদ রায়ের বিরচিত 'দুর্গামঙ্গল', বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি ৯৩ বৎসর পূর্ব্বে (১২৪৬) লিখিত একখানি আদর্শ পুস্তক হইতে মুদ্রিত। মূল পুস্তক আরও অনেক পূর্ব্বে, শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে রচিত হওয়া সম্ভব। দুর্গামঙ্গলের আখ্যানভাগ এই—

রামচন্দ্র বানর-সেনা লইয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু কি প্রকারে যে সসৈন্য সমুদ্র পার হইবেন তাহা স্থির করিতে পারিতেছেন না। এমন সময় জাম্বুবান প্রস্তাব করিলেন, অগস্ত্য মুনিকে ডাকা হউক। রামচন্দ্র স্মরণ করা মাত্র অগস্ত্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্র বলিলেন, "মুনিবর, আবার সমুদ্রের জল পান করিয়া আমাকে লঙ্কায় পৌছিবার পথ করিয়া দিন।" অগস্ত্য উত্তর করিলেন—

পুনঃ পুনঃ নীর পান উচিত না হয়।
অপরাধ বিনে কিছু পুণ্য নাশ হয়।

এবং রামচন্দ্রকে দুর্গা পূজা করিবার পরামর্শ দিলেন। রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—

কিরূপে করিব পূজা কোন্ ব্যবহার।

অগস্ত্য উত্তর করিলেন—

বসন্তে করিল পূজা সুরথ রাজনে।
সেইরূপে পূজা কর অকাল আশ্বিনে।

তারপর রামচন্দ্র মুনির নিকট দেবীর মাহাত্ম্য শুনিতে চাহিলেন। তখন অগস্ত্য নূতন রকমের দেবীমাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন—

দক্ষ অপমানে দেবী ছাড়ি নিজকায়া।
হিমালয়-ঘরেতে জন্মিলা মহামায়া।

দিনে দিনে বাড়ে দেবী উদয় যৌবন।
শিবকে করিল গিরি কন্তা সমর্পণ ॥
বিবাহ করিয়া শিব চলিলা কৈলাস।
তদবধি আছে দেবী শিবের নিবাস ॥

একদিন মেনকা স্বপ্ন দেখিলেন, গৌরী শিয়রে বসিয়া বলিতেছেন, দেখ মা, আমি এখানে কত কষ্ট পাইতেছি। এই স্বপ্ন-দর্শনের পর মেনকা গৌরীর কথা স্মরণ করিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন এবং গিরিরাজকে অনুরোধ করিয়া গৌরীকে হিমালয়ে আনিবার জন্ত শেষে পুত্র মৈনাককে কৈলাসে পাঠাইলেন। মৈনাক কৈলাসে গিয়া যখন ভগ্নীকে লইয়া যাইবার জন্ত শিবের অনুমতি চাহিলেন, শিব প্রথম কিছু বলিলেন না। তারপর দেবী স্বয়ং গিয়া শিবকে বলিলেন—

আজ্ঞা কর যাই নাথ বাপের ভবন।
তিন দিবসের পরে হবে দরশন ॥

দক্ষ-অপমানের কথা স্মরণ করিয়া শিব অসম্মত হইলেন। তখন

দেবী বোলে শুন প্রভু করি নিবেদন।
পূজা লইবারে যাই পিতার ভুবন ॥
*   *   *
ষষ্ঠী আদি কল্প করি নবমীর দিনে।
কৈলাসে আসিব পুন দশমী বিহানে ॥

পূজার কথা শুনিয়া শিব আর কোন আপত্তি করিলেন না। সিংহ-রথে চড়িয়া দেবী হিমালয়ে চলিলেন। তাঁহার সঙ্গে "শিখি পৃষ্ঠে কার্ত্তিক, মূষিকে গজানন"ও চলিলেন। পিতার গৃহে উপস্থিত হইলে

সুগন্ধি চন্দনে কৈল গৌরী অধিবাস ॥
পূজা প্রকাশিতে ইচ্ছা করিলা পার্ব্বতী।
কত কত দশভুজা হইলা পার্ব্বতী ॥
হিমালয় পর্ব্বতে বসিয়া দশভুজা।
তথা বসি লইলেন ত্রলক্ষের [ত্রিলোকের] পূজা ॥

সুতরাং বাঙালীর আধুনিক দুর্গ-পূজা মহিষাসুর-বধরতা দেবীর পূজা নহে, পিতার আলয়ে আগতা কন্যা-রূপিণী জগন্মাতার পূজা; যে-ঘটনা এখনকার দুর্গা-পূজার মূল তাহা মহিষাসুরবধ নয়, আগমনী। পুরাণ-উপপুরাণে আগমনীর কাহিনী নাই, উহা আধুনিক বাঙালীর কল্পনার সৃষ্টি। বাংলায় লোকমুখে, লৌকিক গানে বা কাব্যে প্রচলিত সকল আগমনীসংবাদ এক রকম নহে। কলিকাতার পথে পথে গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় এমন একজন বৈষ্ণব সেদিন আমাকে এই গানটি শুনাইয়া গেলেন—

আয় মা গৌরী কেন দাঁড়িয়ে অভিমান ক'রে।
মায়ে ঝিয়ে কই মা কথা দিস্‌নে ব্যথা অন্তরে ॥
মান ক'রেছো কার উপর,
কে তোমারে আন্‌তে যাবে ক'রে সমাদর ;
ছিল মৈনাক নামে এক সহোদর সে ডুবেছে সাগরে ॥
দুটি আঁখি ছল ছল,
বিধুমুখ তোর মলিন কেন বল মা উমা বল ;
তোরে কেউ কিছু ব'লেছে নাকি ব্যথা পেলাম অন্তরে ॥
আমি মা তোর পাষাণী,
সংবৎসরের পরে দেখা দিবি ঈষাণী ;
তোর মাতা অচল, পিতা অচল, কৈলাসে যেতে নারে ॥

যে-জাতির হৃদয়ে বীররসের সঞ্চার সহজ, দেবী-মাহাত্ম্যের মহিষমর্দ্দিনীর পূজা সেই জাতির পক্ষে সম্ভব-পর। নন্দ যশোদার গোপালের মত আগমনীর দুর্গা বাৎসল্য রসের সৃষ্টি। কোন এক যুগে বাঙালীর জাতীয় হৃদয়ের এমন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল যে, সে আর রণচণ্ডীকে মা বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছিল না; তাই অসুরনাশিনীকে পুত্রকন্যাসহ বৎসরান্তে পিতৃগৃহে আগতা দুহিতার বেশে সাজাইয়া বাঙালী দুর্গাপূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

এখন জিজ্ঞাস্য, বাঙালীর জাতীয় হৃদয়ের এই গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল কখন এবং কি কারণে? দুর্গামঙ্গল-সাহিত্য এবং লোকমুখে প্রচলিত আগমনী গান তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা না করিলে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে।

দেবীপূজার ক্ষেত্রে জাতীয় হৃদয়ের পরিবর্ত্তনজনিত এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপূজার ক্ষেত্রেও অনুরূপ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। এখন যে-আসনে আমরা শ্রীরাধাসহ দ্বিভুজ বংশীধারী গোপালমূর্ত্তি দেখিতে পাই, সেই আসনে এক সময় চক্র-গদাধারী চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রাচীন বৈষ্ণব মূর্ত্তির মধ্যে প্রায় সমস্তই চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, দ্বিভুজ বংশীধারী গোপাল মূর্ত্তি দুর্লভ। প্রাচীন গোপাল মূর্ত্তি যাহা পাওয়া যায় তাহাও বোধ হয় মন্দিরের ভিতরে প্রতিষ্ঠার জন্ত নহে, দর্শককে গোপাল-কৃষ্ণের

লীলা স্মরণ করাইবার এবং মন্দির অলঙ্কৃত করিবার জন্য। উড়িষ্যায় যে বিষ্ণুপূজার ক্ষেত্রে এই পরিবর্ত্তন কখন ঘটিয়াছিল তাহা কতক পরিমাণে অনুমান করা যাইতে পারে। আলালনাথে চতুর্ভুজ নারায়ণ প্রতিষ্ঠিত। রেমুনার ক্ষীরচোরা গোপীনাথও চতুর্ভুজ; কিন্তু উপরের দুই ভুজে শঙ্খ চক্র, এবং নীচের দুই ভুজে বংশী। অর্থাৎ চতুর্ভুজ নারায়ণ এখনও পূরাপূরি বংশীধারী ব্রজের রাখালবেশ ধারণ করেন নাই; তিনি এখন আধা-বিষ্ণু, আধা-গোপাল। তারপর সত্যবাদীর সাক্ষীগোপাল দ্বিভুজ মুরলী-ধারী। বিষ্ণু-উপাসনার ক্ষেত্রে এই যে ঘোর পরিবর্ত্তন ইহার জন্য চৈতন্যকে দায়ী করা যায় না, কেন-না, ক্ষীরচোরা গোপীনাথ এবং সাক্ষীগোপাল চৈতন্যের পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই ধর্ম্মবিপ্লবের জন্য মুসলমান-বিজয়ও দায়ী নহে। কেন-না, চৈতন্য যখন উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন তখনও উড়িষ্যা মুসলমানের পদানত হয় নাই; প্রবলপরাক্রান্ত প্রতাপরুদ্র তখন উড়িষ্যার রাজা। ভক্তেরা যাহাই মনে করুন, যাহারা মহিষমর্দ্দিনীকে আগমনীর গৌরীতে পরিণত করিয়াছিলেন এবং বিষ্ণুর বিগ্রহকে চক্র এবং গদা ছাড়াইয়া ব্রজের রাখালের মুরলী ধরাইয়াছিলেন তাঁহাদের চিত্ত এমন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাঁহাদের পক্ষে মহিষমর্দ্দিনী রণচণ্ডীর এবং গদা-চক্রধারী মধুকৈটভারি রণদেবতার ধারণা অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুচরিত্রের এইরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ কি? আমি এখানে বাংলার এবং উড়িষ্যার হিন্দুর ইতিহাসের একটি অতি জটিল প্রশ্ন উত্থাপন মাত্র করিলাম। ভরসা করি চিন্তাশীল পাঠক-পাঠিকাগণ এই প্রশ্নটি বিচারাধীনে গ্রহণ করিবেন। বাঙালী হিন্দুর অতীতে অবনতির কারণ এবং ভবিষ্যতে উন্নতির পথ স্থির করিতে হইলে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া লওয়া আবশ্যক।

উপসংহারে দুর্গামূর্ত্তির আর একটি লক্ষণের কথা তুলিব। এখনকার মা-দুর্গা হইতেছেন আগমনীর কন্যা-রূপিণী। কিন্তু তাঁহার নিজের যে মূর্ত্তি গঠিত হয় তাহা পুত্রকন্যাগণ লইয়া পিতৃগৃহে আগতা দুহিতার মূর্ত্তি নহে, মহিষের বধোদ্যতা রণচণ্ডীর মূর্ত্তি। দেবী মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে বাপের বাড়ি আসিয়া সেইখানে শেষ আঘাত প্রদান করিয়া মহিষকে বধ করিয়াছিলেন, এমন কথা প্রাচীন বা লৌকিক কোন শাস্ত্রে নাই। অথচ মূর্ত্তি তাহাই দেখায়। এই বিভ্রাটের কারণ, শাস্ত্রসম্মত পূজাপদ্ধতিতে মহিষমর্দ্দিনীর ধ্যানই আছে, কিন্তু আগমনীর দুর্গার পূজার কোন ব্যবস্থা নাই। সুতরাং ধ্যানানুসারেই মূল মূর্ত্তি গঠিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক এবং গণেশের সহিত বাপের বাড়িতে আসিয়া মহিষাসুর বধ-ব্যাপারটা অভিনয়ের মত দেখায়। ইহাতে ধ্যানের মহিষমর্দ্দিনীর অবমাননা করা হয়। কিন্তু এ কথা এদেশে কেহই লক্ষ্য করেন না। আমরা পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট হইতে যে-সকল অনুষ্ঠান উত্তরাধিকারী সূত্রে পাইয়াছি শুধু তাহা লইয়া যে বিভ্রাট বাধাইয়াছি তাহা নয়, ইউরোপীয়গণের অনুগ্রহে বা অনুকরণে যে-সকল অনুষ্ঠান হাতে পাইতেছি বা গড়িতেছি তাহা লইয়াও কাজ না করিয়া অভিনয় করিতেছি। যে যাহাই বলুক, বিশ্বপতিকে মাতৃরূপে ধারণার প্রবৃত্তি বাঙালীর মজ্জাগত; সুতরাং বাঙালী দুর্গোৎসব না করিয়া কখনই পারিবে না। কিন্তু সে যদি দেবীমাহাত্ম্যের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া মহিষমর্দ্দিনীকে মহিষমর্দ্দিনীর মত পূজা করিতে পারে তবে হয়ত দেবীর প্রসাদে সে লুপ্ত চিত্তবল এবং চরিত্রবল ফিরিয়া পাইতে পারে; এবং তবে হয়ত আর সকল গুরুতর বিষয় লইয়া নিত্য অভিনয়ের রঙ্গমঞ্চ বাংলা দেশকে সে কর্ম্মক্ষেত্রে এবং ধর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত করিতে পারে।

স্বাগতা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

সাক্ষাৎকার

যাহাদের বাড়িতে শ্যামাচরণ মোটরচালক নিযুক্ত হইয়াছিল তাহারা সাহেবীধরণের লোক। বাড়ির কর্ত্তা বারিষ্টার, বেশ পসার আছে, তাঁহার স্ত্রী খুব আমুদে, অনেক বন্ধু, সদাসর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়ান, সকল রকম পার্টিতে যাওয়া আছে, তাঁহার বাড়িতেও একটা-না-একটা কিছু লাগিয়াই আছে, কখন চা পার্টি, কখন আহারের নিমন্ত্রণ, রাত্রে ব্রিজ খেলা। মোটর সর্ব্বদা ঘুরিত। বেশী কাজ বলিয়া শ্যামাচরণের সময়ে সময়ে বিরক্ত বোধ হইত, কিন্তু মাহিয়ানা ভাল, কর্ত্তা গৃহিণীর মেজাজ ভাল, এই কারণে শ্যামাচরণ টিকিয়াছিল।

এক দিন অপরাহ্নের সময় বেলা থাকিতে কর্ত্তা গৃহিণী বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। খানিক ঘুরিয়া তাঁহারা গঙ্গার ধারে মোটর দাঁড় করাইয়া গঙ্গার শোভা দেখিতে লাগিলেন। গঙ্গায় জোয়ার আসিয়াছে। ডিঙ্গী পান্সী উত্তরমুখী হইয়া দাঁড় টানিয়া চলিয়াছে, ছোট ছোট মোটর বোট জল মন্থন করিয়া, শুভ্র ফেনা তুলিয়া যেদিকে ইচ্ছা তীরের মতন চলিয়াছে, জোয়ার ভাঁটায় তাহাদের আসিয়া যায় না। জাহাজের নোঙর ফেলা, কোনটায় মাল বোঝাই করিতেছে, কোন জাহাজ হইতে মাল নামাইতেছে। নানা দেশের জাহাজ, কোনটা বিলাতী, কোনটা জাপানী, কোনটা চীন-দেশীয়। নাবিকেরা জাহাজের রেলিঙে হাত দিয়া ডাঙার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। রাস্তা দিয়া অনবরত মোটর চলিতেছে, ছেলেমেয়েরা খেলা করিতেছে। স্নিগ্ধ, শীতল, মধুর দক্ষিণ বাতাস বহিতেছে।

মোটর চালাইবার চাকায় হাত দিয়া শ্যামাচরণ বসিয়া ছিল। একটা জাহাজে দুইজন চীনদেশীয় নাবিক তামাশা করিয়া হাত-কাড়াকাড়ি করিতেছিল সে একদৃষ্টে তাহাই দেখিতেছিল। এমন সময় আর একখানা মোটর আসিয়া তাহাদের পাশে দাঁড়াইল। শোফরের পাশে একজন বলিষ্ঠ দরোয়ান। ভিতরে বসিয়া দুইটি স্ত্রীলোক। স্বাগতা ও সুলোচনা। স্বাগতার পরিধানে কালাপেড়ে শাড়ী, গায়ে ফিকে বাদামী রঙের জ্যাকেট, পায়ে পাঞ্জাবী জুতা। মাথার একরাশ চুল এলো খোঁপায় বাঁধা, বাতাসে কয়েকগাছি চুল চক্ষের পাশে পড়িয়াছে। সুলোচনার সাধারণ বিধবার বেশ, কিন্তু সাদা শেমিজ ও জ্যাকেট পরিয়াছেন।

বারিষ্টারের স্ত্রী ইংরেজীতে মৃদুস্বরে বলিলেন,—দেখ কি রকম সুন্দরী।

স্বামী-স্ত্রীতে ইংরেজীতে কথা হইতে লাগিল। তাঁহারা স্বাগতার অসামান্য রূপের প্রশংসা করিতেছিলেন। স্বাগতা সকল কথাই বুঝিতে পারিতেছিল, লজ্জিত হইয়া সুলোচনার দিকে চাহিল। সুলোচনা একটু হাসিলেন। বারিষ্টার দেখিয়া তাঁহার পত্নীর কানে কানে বলিলেন,—ওরা ইংরেজী বোঝে।

অমনি দুইজনে অন্য কথা পাড়িলেন।

শ্যামাচরণের দিকে তাঁহারা কেহ চাহিয়া দেখেন নাই। দেখিলে তাঁহারা অতিমাত্র বিস্মিত হইতেন। শ্যামাচরণ প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় নিস্পন্দ, কিন্তু তাহার চক্ষে এরূপ ভয়ের লক্ষণ যে আর কেহ দেখিলে চমকিয়া উঠিত। সে ভয় শুধু আশঙ্কার নয়, একটা ঘোর আতঙ্ক। দিন-দুপুরে মানুষে ভূত দেখিলে যেমন ভয় পায় সেই রকম। অন্ধকারের দোহাই দিবার উপায় নাই, অন্ধকারে চক্ষের ভুল হয়, অনেকে ভূত দেখে। কিন্তু দিনের বেলা এ কি এ। মানুষ মরিয়া ভূত হইয়া কি দিনের বেলা মোটরে চড়িয়া বেড়ায়? শ্যামাচরণ চীৎকার করিয়া উঠিত কিন্তু তাহার জিহ্বা, ওষ্ঠ, কণ্ঠ, ঘষিয়া শুকাইয়া দিয়াছে, মুখে শব্দ বাহির হয়।

হইতে লাফাইয়া ঝাঁপ দিয়া গঙ্গাজলে লাফাইয়া পড়িত কিন্তু কে যেন তাহার হাড়ের ভিতর দশ মণ সীসা গালাইয়া ঢালিয়া দিয়াছিল, একটি অঙ্গুলি নাড়িবার তাহার সাধ্য ছিল না। নির্ণিমেষ নয়নে, ভাস্কর-খোদিত পাষাণ প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় শ্যামাচরণ স্বাগতাকে দেখিতেছিল। স্বাগতাও তাহাকে একবার দেখিল, তাহার চক্ষের দৃষ্টি দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল। শ্যামাচরণ ভাবিল এইবার সেই রমণী চীৎকার করিয়া তাহাকে ধরাইয়া দিবে, কিন্তু স্বাগতা যে তাহাকে ইতিপূর্ব্বে কখন কোথাও দেখিয়াছে তাহার চক্ষের চাহনিতে তাহার কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। যেমন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোককে মানুষ দেখে স্বাগতা ঠিক সেইভাবে শ্যামাচরণকে দেখিল। তাহার পর অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

খুব জোরে গুণ টানিলে যেমন ধনুকের দণ্ড ভাঙিয়া যায় সেই রকম শ্যামাচরণের দারুণ ভয় ভাঙিয়া গেল। সে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। হস্তপদের অবশতা গেল, মুখের শুষ্কতা দূর হইল। শ্যামাচরণ যাহাকে মনে করিয়াছিল সে স্ত্রীলোক হইলে যে তাহাকে চিনিতে পারিবে না, ইহা একেবারে অসম্ভব। তবে এই রমণী কে? এক জনের মুখের সহিত এরূপ অবিকল সাদৃশ্য কি কখন দেখিতে পাওয়া যায়? না, দুইজন যমজ ভগিনীর এই এক জন, শ্যামাচরণ যাহাকে দেখিয়াছিল সে আর এক ভগিনী? শ্যামাচরণের ভয় ভাঙিল বটে, কিন্তু তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

সুলোচনা স্বাগতাকে বলিলেন,—এইবার বাড়ি ফিরে চল, কেমন?

স্বাগতা ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

তাহাদের মোটর ফিরিয়া যায় দেখিয়া ব্যারিষ্টারের স্ত্রী শ্যামাচরণকে আদেশ করিলেন, ঐ মোটরের পিছনে চল।

ব্যারিষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেন?

—[illegible] কোথায় থাকে।

[illegible]কে বাড়িতে প্রবেশ করিতে

[illegible]—আমাদের বাড়ি থেকে ত

[illegible]মারের বাড়ি।

—তিনি কে?

—সে একজন জমিদার। এও তার নিজের বাড়ি।

শ্যামাচরণও সে বাড়ি উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

মন্ত্রণা

পুত্রের বিবাহের জন্য রমাসুন্দরী কিছু চঞ্চল হইয়াছিলেন। কন্যা নয় যে একটু ডাগর হইলেই অরক্ষণীয়া হইয়া পড়ে, কিন্তু কার্ত্তিকের বিবাহের যেরূপ প্রস্তাব হইয়াছিল তাহাতে একটু ব্যস্ত হইবার কথা। সুবালার সহিত কার্ত্তিকের বিবাহের কল্পনা রমাসুন্দরী নিজে করেন নাই, ত্রিলোচনই তাহার সূত্রপাত করেন, কিন্তু সেই হইতে তাঁহার পত্নীর ঐ এক ভাবনা লাগিয়া ছিল। সুবালা সুন্দরী হউক আর নাই হউক, তাহার বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে কতক্ষণ? টাকা থাকিলে মেয়ে বিকাইবার কি ভাবনা? আর শৈলবালার জামাই ত কালে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবে। রমাসুন্দরীর কাছে সুরবালার আদর দিন-দিন বাড়িতে লাগিল, সুবালা সকল সময় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। আবার যখন-তখন রমা ত্রিলোচনকে বিবাহের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেন। ঐ এক কথাই যে সর্ব্বদা ত্রিলোচনের মনে জাগিত তাহা তিনি জানিতেন না। ত্রিলোচন জানিতেন যে, এই বিবাহ হইয়া গেলে তিনি নিশ্চিন্ত হইবেন, তিনিও সেই সুযোগ দেখিতেছিলেন।

রমাকে আশ্বস্ত করিয়া ত্রিলোচন এক দিন শৈলবালার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। শৈলবালার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, ত্রিলোচনের ন্যায় তাঁহার হিতকারী জগতে আর নাই, ত্রিলোচন তাঁহার কুশল ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করেন না। ত্রিলোচন তাঁহাকে বলিলেন,—সুবালা রাণীর বিয়ের কথা আপনাকে বলতে এসেছি।

শৈলবালা আগ্রহের সহিত বলিলেন,—কোন ভাল সম্বন্ধ এসেচে? ছেলে কোথায় থাকে?

—আপনাকে বলেছিলাম বিয়ের কথা আপনার বোন আমাকে বলেছিলেন?

—তা ত আমার মনে আছে। সে কি বলেছিল ?

—দেখুন, আপনার এক মেয়ে। বিদেশে বিয়ে হলে আপনি সকল সময় দেখতে পাবেন না।

—তার আর কি করব ? মেয়ে ত পরের ঘরেই যায়।

—আপনার বোনের ইচ্ছে ছিল বেশী দূরে বিয়ে না হয়।

—বিয়ে দিয়ে কি ঘরজামাই হবে ?

—ঠিক তা নয়, অথচ ঘরের কাছেও থাকবে।

—আপনার জানিত এমন কোন পাত্র আছে ?

—সেই কথা আমিও ভাবছিলাম।

কথাটা ত্রিলোচন তখন আর খুলিলেন না। ঠিক এই সময় ত্রিলোচনের মাথায় বজ্রপাত হইল।

অতি ধূর্ত্তের যে-দশা বনবিহারীরও সেই দশা। যে-কথা গোপন করিবার প্রয়োজন নাই তাহা সে লুকাইত না। হরিনাথ ও গঙ্গাধরের কাছে নিজের নাম বলিয়াছিল। যে দুর্ঘটনার উল্লেখ হইয়াছিল তাহাতে দুইজন লোক মোটরে পুড়িয়াই মরুক আর জলে ডুবিয়াই মরুক হত্যার সংশয় কিছুতেই হইতে পারে না। হইলেও বনবিহারী একেবারে নির্লিপ্ত, তাহাকে কে জড়াইতে পারে ? শ্যামাচরণের নামটা বলা হয়ত বুদ্ধির কাজ হয় নাই, কিন্তু আর কেহ তাহার বিষয় কি জানিতে পারে ? এই যে দুইটা লোক চালের দর জানিয়া বেড়াইতেছে ইহারা কি শ্যামাচরণকে চেনে ? শ্যামাচরণ যে মোটর হাঁকায় ইহারা কেমন করিয়া জানিল ?

বনবিহারী অবিলম্বে গিয়া সকল কথা ত্রিলোচনকে বলিল। ত্রিলোচনের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। হতবুদ্ধির ন্যায় বলিলেন,—এখন উপায় ?

বনবিহারী বলিল,—ভাবনার কারণ কিছু নেই। শ্যামাচরণকে এরা জানতে পারে, নাও জানতে পারে। এদের কাছে কিছু কাগজপত্র আছে কি-না, এরা আর কোন চেষ্টায় ফিরচে কি না সেইটে জানা দরকার।

—কেমন ক'রে জানা যাবে ?

—এদের মালপত্র খুঁজে দেখতে হবে। যেন এদের সব কেড়েকুড়ে নিচ্ছে এই ভাবে।

—এখানে কিছু করা হবে না। এখান থেকে বেরিয়ে গেলে পর। তবে যদি এখনই কিছু করা আবশ্যক সে আলাদা কথা।

তাহার পর কিছুক্ষণ দুইজনে চুপি চুপি পরামর্শ হইল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ডাকাতি

বনবিহারী চলিয়া গেলে পর হরিনাথ আবেগের সহিত বলিল,—শুনলে, নামটা বললে শ্যামাচরণ ? আমারও মনে ঐ রকম একটা নাম নিয়েছিল।

গঙ্গাধর বলিল,—এখনও আমরা ঠিক কিছু জানিনে, শুধু সন্দেহ করচি। যার নাম শুনলাম সেই লোকটা কি-না, আর এই শ্যামাচরণই যে সেই মোটর চালাচ্ছিল তার কোন প্রমাণ নেই। বনবিহারীর মনে একটা খট্‌কা লেগেছে সেটা বুঝতে পারা গেল।

গঙ্গাধর রুমালখানা বাহির করিয়া দুইজনে আবার ভাল করিয়া দেখিল "শ" অক্ষর যে সেলাই করিয়াছে সে হয় সেলাইয়ের কাজ ভাল জানে না, না-হয় ভাল লিখিতে জানে না, কারণ অক্ষরটা বাঁকা।

হরিনাথ বলিল,—এই শ্যামাচরণকে খুঁজে বের করতে হবে।

গঙ্গাধর বলিল,—আর আমাদেরও এখন থেকে খুব সাবধান হ'তে হবে। শ্যামাচরণের পিছনে কারা আছে বলা যায় না, আর এ পর্য্যন্ত আমরা ঠিক কিছু জানতে পারি নি।

—গোড়া থেকেই বনবিহারীর উপর আমার সন্দেহ। প্রকৃত ঘটনা সে জানে।

—তা হ'লে আমাদের উপরও সন্দেহ তার হয়েচে। আজ রাত্রে আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে।

—কিসের ভয় ?

—তা বলা যায় না।

রাত্রে শয়নের সময় দরজা বন্ধ

দুইটা ভাল করিয়া দেখিল।

পরিষ্কার করিয়া আবার

বালিশের তলায় আর একটা নিজের বালিশের তলায় রাখিল। তাহাদের সঙ্গে দুইটা বিদ্যুতের মশাল ছিল, তাহাও হাতের গোড়ায় রাখিল।

হরিনাথ ও গঙ্গাধর দুই জনেই বলবান ও নির্ভীক। হরিনাথ জমিদার হইলেও তাকিয়া ঠেসান দিয়া খোশগল্প করিয়া কাল কাটাইত না। বিলাসিতা তাহার কোন কালে ছিল না, ঘোড়ায় চড়িতে, শিকার করিতে খুব মজবুত, পদব্রজে বনে গিয়া কয়েক বার চিতাবাঘ মারিয়াছিল। বন্দুকে পিস্তলে অভ্রান্ত লক্ষ্য। গঙ্গাধর লেখাপড়ায় যেমন পারদর্শী সেইরূপ ব্যায়ামপটু।

ভারি রাত্রে তাহাদের দরজায় ঘা পড়িল। হরিনাথ ও গঙ্গাধর উঠিয়া বসিল। হরিনাথ বলিল,—এত রাত্রে কে দরজা ঠেলে?

বাহির হইতে গুরুগম্ভীর স্বরে কে কহিল,—দরজা খোল, নইলে ভেঙে ফেলব।

এ সিঁদকাটা কি ছিঁচকে চোরের সরু গলা নয়, ডাকাতের বাজখেঁয়ে কণ্ঠ। হরিনাথ গঙ্গাধরের কানে কানে গোটাকতক কথা বলিয়া জোরে বলিল,—আমাদের কাছে কি আছে? আমরা ত পথিক।

—তোমাদের কাছে চোরাই মাল আছে। ওরে, দরজা না খোলে ত ভেঙে ফ্যাল!

হরিনাথ হাসিয়া কহিল,—চোরের উপর বাটপাড়ি!

দ্বারে প্রচণ্ড পদাঘাত হইল। জীর্ণ দ্বার খড় খড় ঝন ঝন করিয়া উঠিল, ঘর কাঁপিয়া উঠিল।

হরিনাথ বলিল,—দোর খুলচি, ভাঙতে হবে না।

গঙ্গাধর দরজার খিল খুলিয়া দিয়া দরজার পাশে দাঁড়াইল। হরিনাথ দরজার দিকে মুখ করিয়া ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া।

দরজা খুলিতেই তিন চারিজন লোক হুড়মুড় করিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। হরিনাথের বাঁ-হাতে ছিল মশাল, কল টিপিতেই ঘরে, দরজায়, দরজার বাহিরে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে দিনের মতন হইয়া উঠিল। হরিনাথের দক্ষিণ হাতে পিস্তল, লক্ষ্য যে-ব্যক্তি প্রথমে ঘরে ঢুকিয়াছিল তাহার মাথার দিকে।

যাহারা ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল তাহারা তীব্র আলোকে চক্ষু পিট্ পিট্ করিতে লাগিল। গঙ্গাধর দরজার পাশ হইতে হাত বাড়াইয়া যে প্রথমে ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল পিত্তলের বাঁট দিয়া তাহার মাথায় মারিল। সে মুখে কোন শব্দ না করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। আর এক জন ফিরিয়া দেখিতেই গঙ্গাধর তাহার উরুতে লাথি মারিল। সে 'ওরে আমার পা ভেঙে দিলে!' বলিয়া চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল। গঙ্গাধর গিয়া হরিনাথের পাশে দাঁড়াইল। দুই পিস্তলের নল দরজার দিকে।

হরিনাথ স্পষ্ট কঠিন স্বরে কহিল,—এবার কেউ এলে আমরা গুলি করব।

দরজার বাহির হইতে এক জন লাঠি হাতে ঘরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। হরিনাথ তৎক্ষণাৎ পিস্তল ছুঁড়িল, গুলি সে লোকটার কানের পাশ দিয়া চলিয়া গেল।

হরিনাথ বলিল,—আমি ইচ্ছে ক'রে এবার মারিনি। যদি প্রাণের মায়া থাকে তা হ'লে সব প্রাণ নিয়ে পালাও।

পিস্তলের আওয়াজ শুনিয়া আর কেহ দাঁড়াইল না। যে দুই জন পড়িয়া গিয়াছিল তাহাদিগকে তুলিয়া লইয়া ডাকাতেরা পলায়ন করিল।

হরিনাথ ও গঙ্গাধর অবশিষ্ট রাত্রি বসিয়া কাটাইল। সকালবেলা হাত মুখ ধুইয়া গঙ্গাধর হরিনাথকে বলিল,—তুমি এইখানে থাক, আমি একবার দেওয়ান-মশায়ের সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।

ত্রিলোচনের বাড়ির দরোয়ানরা প্রথমে গঙ্গাধরকে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিতে দেয় না। ত্রিলোচন ঘরে বসিয়াছিলেন। গঙ্গাধর তাহাকে শুনাইয়া বলিল,—কাল আমাদের ঘরে ডাকাত পড়েছিল তাই বলতে এসেছি।

ত্রিলোচন ঘরের বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কে? কি হয়েছে?

গঙ্গাধর ত্রিলোচনকে উত্তমরূপে দেখিল। বুঝিল, লোকটা দেখিতে যেমন হাঁদা যথার্থ তেমন বোকা নয়। বলিল,—আমি আর একজন কলকেতা থেকে এসেচি। কালরাত্রে কতকগুলা লোক আমাদের দরজা ভেঙে, আমাদের সব কেড়ে নিতে এসেছিল।

ত্রিলোচন অত্যন্ত বিস্ময়ের উত্তম অভিনয় করিলেন, কহিলেন,—বল কি! এ গ্রামে কস্মিন্‌কালে ডাকাতি শুনি নি।

গদাধর হাসিয়া কহিল—নতুন খবর বলেই আপনাকে শোনাতে এলাম।

—আচ্ছা, আমি খোঁজ নিচ্ছি। তোমার সঙ্গী জখম হয়নি ত?

—জখম হয়েচে তাদের ক'জন। ল্যাজ গুটিয়ে না পালালে আরও জখম হ'ত। বনবিহারী কোথায় গেল?

—তাকে তোমরা চেন না কি? সে ত কালই চলে গিয়েচে। সে এখানে চাকরির চেষ্টায় এসেচে, সে ত আর ডাকাত নয়।

—রাম, সে অতি সাধু ব্যক্তি। আর একজন সাধু শ্যামাচরণ, সেও এখানে থাকে না।

—তার কথা কেন? সে কোথাকার লোক তাও আমরা জানি নে। কাল রাত্রে কাউকে চিনতে পেরেছিলে?

—বাতি ধ'রে তাদের মুখ দেখেছিলাম, কিন্তু তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হয় নি।

—আমার লোক সঙ্গে দিচ্ছি, গ্রামে দেখ যদি কাউকে চিনতে পার।

গদাধর জানিত গ্রামে কাহাকেও পাওয়া যাইবে না। সে বলিল,—আমরা নিজের কাজে ব্যস্ত, ঠক বাছবার সময় নেই। আপনাকে শুধু বলতে এসেছিলাম।

হরিনাথ ও গদাধর সেই দিনই চলিয়া গেল। রাত্রে কি হইয়াছিল ত্রিলোচন তাহা উত্তমরূপে অবগত ছিলেন। এই দুই ব্যক্তি কে, কি অভিপ্রায়ে সুবর্ণপুরে আসিয়াছিল তাহা তিনি জানিতেন না, কিন্তু শত্রু হইলে ভয়ানক!

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

জল্পনা

হরিনাথের গ্রামের ভিটা বাড়িতে গৃহিণী তাহার খুড়ীমা। সম্পর্ক তেমন নিকট নয়, কিন্তু অল্প বয়সে বিধবা হইয়া তিনি সেই পর্য্যন্ত বরাবর হরিনাথের বাড়িতে থাকিতেন। কলিকাতার বাড়িতে হরিনাথ ও গদাধর স্বাগতাকে যখন প্রথম লইয়া যায় সেই সময় খুড়ীমাকে দেশ হইতে আনা হয়। তাহার কিছু দিন পরে খুড়ীমা আবার দেশে ফিরিয়া গেলেন, স্বাগতা কলিকাতাতেই রহিল। আবার সংবাদ আসিল হরিনাথ ও গদাধর কোথায় বেড়াইতে গিয়াছে, কিন্তু স্বাগতা যেমন কলিকাতায় ছিল সেইরূপ রহিল।

এইরূপে এক মাস অতিবাহিত হইলে হরিনাথের খুড়ীমা গদাধরের মাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। সেই সঙ্গে প্রভাবতীও আসিল।

খুড়ীমা গদাধরের মাকে বলিলেন,—হরিনাথেরা যে দেশ বেড়াতে গেল তা সে মেয়েটির ত কোন উপায় ক'রে গেল না।

গদাধরের মা বলিলেন,—কি উপায় করবে?

—কেন, তাকে বাপের বাড়ি কি শ্বশুরবাড়ি যেখানে হয় পাঠিয়ে দিয়ে যেত।

প্রভাবতী বলিল,—তা হ'লে আর ভাবনা কি ছিল, খুড়ীমা। তাই যদি জানা থাকবে তা হ'লে ওঁরা কলকেতায় নিয়ে আসবেন কেন?

খুড়ীমা একটু সন্দিগ্ধ ভাবে কহিলেন,—সেই বা কি রকম কথা? অমন সোমত্ত সুন্দরী মেয়ে, বাপের বাড়ি শ্বশুরবাড়ি ভু'লে গিয়েছে সে কোন্‌ দেশী কথা?

গদাধরের মা বলিলেন,—ও কথা বললে চলবে কেন? আমরা ত স্বচক্ষে দেখে এসেছি তার আগের কোন কথা মনে নেই। কত ডাক্তার কবিরাজ দেখান হ'ল কেউ কিছু করতে পারলে না। তা না হ'লে সাধ ক'রে কে আবার পরের বাড়ি পড়ে থাকে?

—ও রকম রোগ সাতজন্মে কখন শুনিনি। দিব্যি খাচ্চে-দাচ্চে, হাসিগল্প করচে, আর আগের কোন কথা মনে নেই! হয় নেকামি, না হয় কিছুতে ওকে পেয়েচে।

প্রভাবতী রাগিয়া গেল, কহিল,—অমন কথা ব'লো না, খুড়ীমা। হরিনাথবাবু শুনলে সুখে থাকবে না। স্বাগতা যে মনের খুব কষ্টে আছে তা আমি বেশ জানি। সে কে, কোথায় বাড়ি, বাপ কি, স্বামী কই, তার কিছুই মনে নেই, সব যেন মুছে-মুছে গিয়েছে। কি যে ভাববে তা খুঁজে পায় না, মনে করতে গে' কিছুই মনে পড়ে না।

আর তুমি যে ভূতপ্রেতের কথা বলচ সে এখন কেউ বিশ্বাস করে না। মোটর থেকে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল সেই অবধি এমন হয়েচে। তুমি নেকামি কেমন ক'রে বলচ?

খুড়ীমা একটু জড়সড় হইয়া গেলেন। আমৃতা-আমৃতা করিয়া বলিলেন,—নেকামি বলাটা ঠিক হয় নি। তা কলকেতার বাড়িতে যখন কেউ নেই তখন স্বাগতাকে এখানে রেখে গেলেই হ'ত।

—সে আলাদা কথা। ওঁরা যেমন ভাল বুঝেছেন সেই রকম করেচেন। যিনি স্বাগতাকে পড়ান তিনি বাড়িতে রয়েচেন, পড়াশুনা বেশ হচ্চে। আর তার যে অবস্থা তার পক্ষে নিরিবিলি থাকাই ভাল। এখানে এলে গ্রামসুদ্ধ মেয়ে তাকে ছাঁকাবাঁকা ক'রে ধরত, যার যা মুখে আসত বলত, একে ত ওর মনের অসুখ তার উপর ওকে পাগল ক'রে তুলত। না বুঝে-সুঝেই কি হরিনাথবাবু ওকে কলকেতায় রেখে গিয়েচেন?

খুড়ীমার অনেক কথা বলাই হইল না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল একটু ঘোঁট করা, ঠারে-ঠোরে ইসারায়, চাপা-ঢাকা কথায় একটু চর্চ্চা, একটু নিন্দার সূত্রপাত করা, কিন্তু প্রভাবতীর ভাবগতিক দেখিয়া তাঁহার আর কিছু বলিতে সাহস হইল না। তিনি কথা ফিরাইয়া গ্রামের অন্য সকল কথা পাড়িলেন।

বাড়িতে ফিরিয়া প্রভাবতী শাশুড়ীকে বলিল,—হাঁ মা, আমি কি অন্যায় কথা বলেছিলাম?

—না, বউমা, তুমি ঠিক কথা বলেছিলে। ও-বাড়ির গিন্নীর মন ভাল নয়। তা ওঁর মনে যাই থাকুক আমরা কিছু শুনতে চাইনে।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গৃহসংবাদ

ভয় যদি ভাঙিয়া গেল ত শ্যামাচরণের সাহস বাড়িল। এক দিন তাহার মনিবকে আদালতে পৌঁছাইয়া দিয়া বাড়ি ফিরিবার পথে হরিনাথের বাড়ির সম্মুখে মোটর রাখিয়া তাহার মোটরচালকের সহিত শ্যামাচরণ আলাপ করিল। হরিনাথের মোটরচালকের নাম রামনাথ। শ্যামাচরণ পকেট হইতে পান ও সিগারেট বাহির করিয়া তাহাকে খাইতে দিল।

রামনাথ বলিল,—সে দিন তোমাকে গঙ্গার ধারে দেখেছিলাম, না?

শ্যামাচরণ বলিল,—হাঁ, আমার সাহেবের বাড়ি এখান থেকে বেশী দূর নয়।

—সাহেব? তুমি কি সাহেববাড়ি চাকরি কর? তোমার গাড়ীতে ত সাহেব দেখি নি।

—আরে, কালা সাহেব! বারিষ্টার ঘোষ সাহেবের নাম শোন নি?

—বুঝতে পেরেচি। আমি ভেবেছিলাম বুঝি সত্যিকার সাহেব। কেমন মনিব?

—তা মন্দ নয়, তবে বড় খাটুনি। যেমন আজকালকার সাহেব-মেম হয়, কেবল ঘুরে বেড়ায়।

রামনাথ পান চিবাইতে চিবাইতে বলিল,—ও-সব বালাই আমাদের এখানে নেই। হয়ত দশ দিন বসেই থাকি, গাড়ী বাড়িতেই থাকে।

শ্যামাচরণ যেন একটু হিংসার ভাবে বলিল,—তোমার বেশ আরামের চাকরি। তোমার বাবু কি করে?

—জমিদার, দেশে মস্ত বাড়ি। এও তার নিজের বাড়ি, কখন কখন আসেন। এখন এখানে নেই, কোন দেশে বেড়াতে গিয়েচেন।

—সেদিন যিনি গাড়ীতে ছিলেন তাঁর বউ বুঝি?

—গাড়ীতে ছিলেন ত দু-জন। যাঁর বয়স অল্প আর দেখতে ভাল তুমি বুঝি তাঁর কথা বলচ? বাবুর বউ নেই, উনি বাবুর আপনার লোক। আর একজন ওঁকে পড়ান।

শ্যামাচরণ জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি এখানে কত দিন কাজ করচ?

—তা অনেক দিন হ'ল। এ বাড়িতে লোকজনদের তাড়িয়ে দেওয়া নেই।

—যাঁকে সেদিন দেখলাম উনি কি এখানে অনেক দিন আছেন?

—না, এই মাস-কতক এসেচেন।

—ওঁর কি আর এক বোন আছেন ঠিক ঐ রকম দেখতে?

—কই আমরা কিছু শুনি নি। ওঁর কি অসুখের জন্য এখানে আনা হয়েচে।

শ্যামাচরণ মোটর হাঁকাইয়া চলিয়া গেল। তাহার নিজের আশঙ্কার কোন কারণ নাই এ বিশ্বাস তাহার দৃঢ় হইল। যে স্ত্রীলোকের কথা তাহার মনে হইয়াছিল সে ত মরিয়াছে, কিন্তু তাহার সহিত এই নারীর সাদৃশ্যে শ্যামাচরণের কি কোন লাভ হয় না? ত্রিলোচন তাহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র কতকগুলা দুর্বৃত্ত যুবকের সহিত মিলিয়া তাহাকে শেয়াল-কুকুরের মত ঢিল মারিয়া খেদাইয়া দিয়াছিল। এখন যদি শ্যামাচরণ ত্রিলোচনকে জানায় যে যাহার মরিবার কথা সে বাঁচিয়া আছে? ত্রিলোচন বিশ্বাস করিবেন না, কারণ এ কথা সত্য হইলে এত দিনে তিনি মহা বিপদগ্রস্ত হইতেন, কিন্তু তবু তাঁহাকে ভয় দেখান যাইতে পারে। সেই সঙ্গে বনবিহারীকে কোনরূপ শাস্তি দিতে পারা যায় না? তাহার কাছে শ্যামাচরণ যে মার খাইয়াছিল তাহা কখনও ভুলিবার নয়, তাহাকে কোন রকমে জড়াইতে পারিলে তাহার সমুচিত শাস্তি হইতে পারে। মুস্কিলের কথা এই যে, শ্যামাচরণ নিজেও তাহাদের সহিত জড়িত; তাহাদের কান টানিলে তাহার নিজের মাথায় টান পড়ে। তথাপি স্বাগতাকে দেখিয়া প্রথমে তাহার যেমন ভয় হইয়াছিল, পরে সেইরূপ একটা আশা হইল যে কোন কৌশলে এই অবয়ব ও মুখের সাদৃশ্যে সে ত্রিলোচন ও বনবিহারীকে শাস্তি দিতে পারিবে।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দুই আশায়

দুইয়ের সংখ্যা অনেক বিপত্তির মূল। দুই আশায় মানুষ বিপদে পড়ে, দুই নৌকায় পা দিলে ডুবিয়া মরে। বনবিহারীর অনেকটা সেই অবস্থা। ত্রিলোচন তাহার হাতের মধ্যে, তাঁহার নিকট হইতে সে অনেক টাকা আদায় করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে তাহার আশা মিটিল না। গঙ্গাধর ও হরিনাথ যে ইঙ্গিত করিয়াছিল সংবাদ পাইলে অপর এক ব্যক্তি টাকা দিতে পারে সেই কথা বনবিহারীর মনে লাগিয়াছিল। এদিকে সে ত্রিলোচনের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিল যে, ক্ষেত্রনাথ ও কিশোরীমোহন কে, কি অভিপ্রায়ে তাহারা দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে জানিয়া সংবাদ দিবে। শুধু চালের দর জানা যে তাহাদের এক মাত্র উদ্দেশ্য নয় এরূপ সন্দেহের কারণ ছিল। তাহারা যে কাহাকেও ভয় করে না, এক দল দস্যুকে মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল সে কথাও বনবিহারীর জানিতে বাকি ছিল না। যদি বনবিহারী নিজে ইহাদের পিছনে থাকে আর সে কথা ইহারা জানিতে পায় তাহা হইলে সব পণ্ড হইয়া যাইবে। তাহাদিগকে হাতে রাখাই বনবিহারীর কর্ত্তব্য, তাহাদের মনে কোন সন্দেহ হইলে গোল বাধিবে।

শ্যামাচরণ মোটর চালায় কি-না এ কথা তাহারা হঠাৎ কেন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল? শ্যামাচরণকে কি ইহারা জানে? তাহাকে ইহারা কোথায় দেখিয়াছিল? আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া মোটরের কথা জিজ্ঞাসা করিল কেন? ইহারা কি ভিতরের খবর কিছু জানে? তাহাদের ত কিছু জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই। কিছু তাহারা শুনিয়া থাকিবে। সেই যে একটা গ্রামের নাম করিয়াছিল তাহাতে বনবিহারীর সন্দেহ হইয়াছিল, কিন্তু সে গ্রামে শ্যামাচরণের নাম-নিশানা ত কিছুই জানিবার সম্ভাবনা নাই। এই দুইটা লোক সে গ্রামে গিয়াছিল, সুবর্ণপুরেও আসিয়াছিল। শ্যামাচরণ যে মোটর চালায় সুবর্ণপুরে তাহা কেহ জানিত না, দেওয়ান ত্রিলোচন ছাড়া তাহাকে কেহ চিনিতই না। বনবিহারী জানিত না যে, এই দুই ব্যক্তিকে সুবর্ণপুরের পথ সে-ই দেখাইয়াছিল। সুবর্ণপুরে জানিবার কিছুই নাই। এই দুই জন শুনিয়াছিল মোটরের দুর্ঘটনার কথা। তাহার সহিত নৌকাডুবির কি সম্বন্ধ? প্রকৃত আশঙ্কার কথা যদি দুই জনের মধ্যে এক জন বাঁচিয়া থাকে। বনবিহারী যাহা জানিতে পারিয়াছিল তাহাতে তাহার সেইরূপ ধারণা হইয়াছিল, কিন্তু এ কথা সত্য হইলে এত দিন প্রকাশ হয় নাই কেন? যদি এক জন রক্ষা পাইয়া থাকে এবং এ পর্য্যন্ত জীবিত থাকে তাহা হইলে সে কোথায় গেল? তাহার ত পলায়ন করিবার অথবা প্রচ্ছন্ন ভাবে অজ্ঞাতবাস করিবার কোন কারণ নাই, বরং একটা বিশেষ গোলযোগ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

যাহাই হউক, বনবিহারীর দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই। তাহার লাভ লইয়া কাজ, যে-কোন উপায়ে সহজে টাকা পাওয়া যায় সেই দিকে তাহার দৃষ্টি। বনবিহারীর চর-অনুচর কয়েক জন ছিল। তাহাদের মধ্যে কেহই তাহার সকল কথা জানিত না, যাহাকে যে-কাজে নিযুক্ত করিত সে সেইটুকু জানিত। এই রকম এক জন লোক হরিনাথ ও গঙ্গাধরের সন্ধানে লাগাইল। তাহারা কোথায় কোথায় যায়, কি করে, কাহার সহিত সাক্ষাৎ করে এই সকল সংবাদ লইতে আদেশ করিল। তাহাকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিল যেন সেই দুই ব্যক্তি কিছু জানিতে না পারে। তাহাকে কহিল,—ওরা যদি টের পায় তুই ওদের পিছনে পিছনে ঘুরছিস তা হ'লে তোর হাড় ভেঙে দেবে, আর আমার নাম যদি প্রকাশ হয় তা হ'লে আমি তোকে আস্ত রাখব না বুঝলি কি-না?

কাজটা খুব সুবিধার বটে। সে লোকটা ভাবিল, ডাঙায় বাঘের ভয়, জলে কুমীরের ভয়, কিন্তু টাকার লোভ ত ছাড়া যায় না। সে স্বীকৃত হইল।

কলিকাতায় গঙ্গাধর যে ঠিকানা বলিয়া দিয়াছিল বনবিহারী সেইখানে উপস্থিত হইল। সচরাচর গৃহস্থের মতন বাড়ি, বাহিরের ঘরে তীক্ষ্ণ চক্ষু, ত্রিশ বৎসর বয়স্ক একজন পুরুষ বসিয়া ছিল।

বনবিহারী বলিল,—আমি আসচি ক্ষেত্রনাথবাবুর কাছ থেকে, বুঝলেন কি-না? আমার নাম বনবিহারী। আপনি কি কানাইবাবু?

—হাঁ, বসুন।

বনবিহারী বসিল। কানাইবাবুর তীব্রোজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাহার কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল। চক্ষু নত করিয়া কহিল,—আপনারা একটা খবর চান, আমি ক্ষেত্রনাথবাবুর কাছে শুনেছি। সেই কথা বলতে এসেচি, বুঝলেন কি-না?

—কি বলবার আছে, বলুন।

—খবর দিলে কিছু টাকা পাওয়া যাবে? অমনি কেউ বলবে না, বুঝলেন কি-না?

—খবর ঠিক পেলে আমরা টাকা দিতে রাজি আছি।

—কত টাকা? সেটা জানা দরকার, বুঝলেন কি-না?

—এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত দিতে পারি।

থোক একেবারে অত টাকার উল্লেখ শুনিয়া বনবিহারী অত্যন্ত লুব্ধ হইল। তথাপি সকল কথা খুলিয়া বলা অসম্ভব। ভিতরকার কথা কিছু না জানিতে পারিলে সব কথা বলা যায় না।

বনবিহারী বলিল,—যাদের পাওয়া যাচ্চে না তারা কি আপনাদের কেউ হয়? খবর পেলে আপনারা টাকা দিতে চাইচেন কেন, বুঝলেন কি-না?

কানাইবাবু হাসিল, বলিল,—আমাদের টাকা দেবারই কথা, অন্য কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে কিছু ফল নেই।

—কিছু না জানলে আমিই বা কেমন ক'রে বলব, বুঝলেন কি-না?

—সে আপনার ইচ্ছা। তা হ'লে আমাদের আর কোন কথা হয় না। বনবিহারী দেখিল সব ফাঁসিয়া যায়। তাড়াতাড়ি বলিল,—ওটা শুধু কথার কথা, বুঝলেন কি-না? আপনারা কি জানতে চান?

—তা ত ক্ষেত্রনাথবাবু বলেই দিয়েচেন, আর কোন নূতন কথা নেই।

—মোটরে আগুন লেগে দু-জন লোক পুড়ে মরেছিল। সে দু-জন কে তাই জানতে চান? এটা জিজ্ঞাস্য করতে হয়, বুঝলেন কি-না?

—ঠিক কথা। সে দু-জন কে, কোথায় বাড়ি, যদি আমরা ঠিক জানতে পারি তা হলেই আমরা টাকা দেব।

—তাদের নিজের লোকেরা খোঁজ করচে না কেন? এ একটু আশ্চর্য্য কথা বুঝলেন কি-না?

—আমরাই যদি নিজের লোক হই? নিজের লোকেরা যে খোঁজ করচে না তাই-বা আপনি কেমন ক'রে জানলেন?

—আমার ভুল হ'তে পারে। পাকা খবর পেলেই আপনারা টাকা দেবেন? জেনে রাখা ভাল, বুঝলেন কি-না?

—তখনই। টাকা আমার কাছে রয়েচে।

বনবিহারী বিদায় হইল। দেখিল টাকাটা বাহির করা নিতান্ত সহজ হইবে না। বরং এই কথাটা প্রকারান্তরে দেওয়ান ত্রিলোচনকে বলিলে কিছু টাকা পাওয়া যাইবে।

ক্রমশঃ

নিয়মে অর্জন বা তার ত্রুটি দূর করতে হয়—সেই সব অমোঘ নিয়ম বিজ্ঞানশাস্ত্র আবিষ্কার করচে—এ সম্বন্ধে যতই আমাদের অজ্ঞান দূর হয় ততই আমরা সফলতা লাভ করি। তুমি বোধ হয় বইয়ে পড়েচ, যে, আমেরিকার কটিদেশ ছিন্ন করে যে খাল কাটা হয়েচে সেই খাল কাটবার চেষ্টা প্রথমে ব্যর্থ করে দিয়েছিল সেখানকার নিদারুণ ম্যালেরিয়া। তারপরে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও উদ্যমের সাহায্যে সেখান থেকে ম্যালেরিয়া সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেছে। তার কারণ এ নয় যে সেখানে যত অধিবাসী আছে তাদের কুষ্ঠী থেকে ম্যালেরিয়াবিধায়ক কুটিল গ্রহ সরে দাঁড়িয়েচে। তার কারণ এই যে, বুদ্ধি বলে মানুষের যে শক্তি আছে, তাকে ঠিক মতো স্বীকার করার দ্বারাই পানামা প্রদেশের ব্যাধি দূর হয়ে গেছে। অথচ আমাদের দেশে আমরা বুদ্ধিকে মানিনে, আমাদের আয়ত্তের অতীত গ্রহকে মানি, ম্যালেরিয়াও নড়তে চায় না। যদি কখনো তুমি পাশ্চাত্য মহাদেশে যেতে তাহলে সেখানকার লোকদের দৈহিক মানসিক শক্তি স্বাস্থ্য সম্পদ দেখলে বিস্মিত হতে। তার প্রধান কারণ অন্ন বস্ত্র আরোগ্য সমস্তই তারা নিজের বুদ্ধির দ্বারা উদ্ভাবন করচে, তারা গ্রহামুখাপেক্ষীদের উপরে জয়ী হচ্চে। বসন্ত প্রভৃতি অনেক মারীকেই তারা তাড়িয়েচে। এখনো ক্যান্সার ও যক্ষ্মার উপরে জোর খাটচে না—কিন্তু তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, বিজ্ঞান-নির্দিষ্ট আত্ম-বুদ্ধির পথে অধ্যবসায় চালনা করলে এক দিন তারা ও দুটি রোগকেও আয়ত্তে আনতে পারবে। ইতিমধ্যে আমরা যে কেবল মঙ্গল গ্রহের দিকেই সভয়ে তাকিয়ে আছি তা নয়, শীতলা আছেন, ওলাবিবি আছেন আরও কত কী আমার জানা নেই। নিজের বুদ্ধিকে যারা অবিশ্বাস করে তাদের ভয়ের আর অন্ত নেই। তারা মা শীতলাকেও ছাড়বে না, ডাক্তারকেও না, গ্রহকেও মানবে এদিকে আপিসের বড় বাবুরও পায়ে তেল দেবে। এমন দেশে বুদ্ধিটাই কি যত অপরাধ করলে! সে ছাড়া আর সব কিছুর জন্যেই পূজো মিলবে! এই তো গেল বাহ্যিক, ভৌতিক—মানুষের আর একটা দিক যেটা তার আন্তরিক তার আত্মিক—সেইখানে তার পাপপুণ্য। সেই সব রিপুকেই আমরা পাপ বলি যাতে করে বিশ্বাত্মার সঙ্গে আমাদের জীবাত্মার সম্বন্ধ বিকৃত হয়। কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি রিপুর দ্বারা আমরা নিজের অহং সীমার মধ্যে বদ্ধ হই। আত্মা তাতে আপন ধর্ম্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়। কেন-না, আত্মার ধর্ম্মই হচ্চে নিজের সত্যকে সকলের মধ্যে উপলব্ধি করা। ভৌতিক জগতে আমাদের শক্তিকে ভৌতিক শক্তির সঙ্গে যোগ যুক্ত করে, বিশ্ব-নিয়মের দ্বারা আমাদের সকল কর্ম্মকে নিয়মিত করে, খেয়ালের দ্বারা নয়, অন্ধ সংস্কারের দ্বারা নয়—তেমনি আমাদের অন্তরাত্মায় যে কল্যাণ-বুদ্ধি আছে সে করুণার দ্বারা মৈত্রীর দ্বারা বিশুদ্ধ জ্ঞানসম্মত লোক-হিতৈষিতার দ্বারা আপনাকে সকলের মধ্যে উপলব্ধি করে। স্বার্থ তখন পরমার্থে উত্তীর্ণ হয়—অর্থাৎ তখন সকলের হিতে নিজের হিত জানি। যে শুভ বুদ্ধির দ্বারা বিশ্বাত্মার সঙ্গে যোগ-সাধন হয়, উপনিষদে তারই জন্যে প্রার্থনা আছে—বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ—বিশ্বের আদিতে ও অন্তে যিনি পরিব্যাপ্ত তিনিই দেবতা,—সনো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু—তিনি আমাদেরকে শুভবুদ্ধির দ্বারা যোগযুক্ত করুন। অশুভ বুদ্ধি আমাদের অহংকে আশ্রয় করে—সে যে সমস্ত পাপ ঘটায় সে তো গায়ে লেগে থাকে না, বাইরের অনুষ্ঠানে তাকে তাড়াবার কথা যখন মনে করি তখন গ্রহ মানি, পাণ্ডা মানি, পুরুৎ মানি, অন্তর্যামীকে মানিনে, মানিনে তাঁকে যিনি "বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ," যিনি বিশ্বকর্ম্মা, যিনি "মহাত্মা" যিনি সর্ব্বজনের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট। যে-সাধনায় পাপের মূল ক্ষয় হয়, সে আত্মিক সত্যের সাধনা। সেই সাধনায় আত্মাকে মানি এবং সেই আত্মার আশ্রয় বিশ্বাত্মাকে মানি। সেই মানা থেকে ভ্রষ্ট করে এমন যে কোনো স্থূল পদার্থকে মানতে বলো তাকে আমি ধর্ম্ম বলিনে। তুমি যখন দেবতাকে ভক্তির কথা—ভালোবাসার কথা বলো তখন সেটা বুঝতে পারি, কিন্তু যখন তুমি বিচারের চেয়ে আচারকে, বুদ্ধির চেয়ে সংস্কারকে, পুরুষকারের চেয়ে গ্রহকে প্রাধান্য দিতে চাও, এবং দিয়ে বলো সেইটেই হিন্দুধর্ম্ম তখন মন অত্যন্ত পীড়িত হয় একা তোমার জন্যে নয় এই শক্তিহীন বুদ্ধিহীন মোহাচ্ছন্ন দেশের জন্যে। ৮ নবেম্বর, ১৯৩১

সত্যের পরীক্ষা

শ্রীসরলা দেবী

প্রস্তাবনা

আকাশে গন্ধর্ব্ব, দেবতা ও শিবানুচরগণের একে একে আবির্ভাব ও তিরোভাব। পরে, বীণার স্বরের সহিত মৃদুল গানের গুঞ্জরণ

হে সত্য!
গহন গম্ভীর তুমি, রুদ্র মধুর,
প্রণমি কমল চরণ!
অনন্ত জ্ঞান তুমি, শিবসুন্দর,
আজি এসেছি শরণ!
প্রণমি কমল চরণ!

আকাশে সখাগণপরিবৃতা নানা বরণের নানা ঝলকের বেশভূষায় ভূষিতা মায়াদেবীর আবির্ভাব

মায়াদেবী—সত্যের স্তব!

১মা সখী—হাঁ, দেবি বিচলিত হয়ো না, এ শুধু দেবলোকে!

মায়াদেবী—মর্ত্ত্যলোকে এ সুর পৌঁছয় না কি?

২য়া সখী—কিছুতেই না, সেখানে শুধু তোমার জয়ধ্বনি!

৩য়া সখী—মর্ত্ত্যবাসীর হৃদয়ে তোমার অখণ্ড রাজত্ব।

১মা সখী—মর্ত্ত্যে ঘোর মোহের প্রতাপ!

মায়াদেবী—চল্ গিয়ে দেখি।

সকলের মর্ত্ত্যে, রঙ্গমঞ্চে—অবতরণ। আকাশে সেইরূপ গানের শব্দ।

হে সত্য!
নিখিল প্রকাশ!
চিত্তকমলে মম হও হে বিকাশ,
জ্বালাও তোমারি কিরণ!
সে কিরণে উঠো ফুটি বচনেতে মম,
আচরণ হোক্ তায় সরল সুষম!
সে কিরণে নিও হরি অজ্ঞান ভ্রান্তি,
সে কিরণে দিও ভরি কল্যাণ কান্তি!
আজি এসেছি শরণ,
প্রণমি কমল চরণ!

মায়াদেবী—ঐ ত এখানেও সেই গান!

১মা সখী—এ কেবল দেবীর দিব্যকানে শ্রুত হচ্ছে, মর্ত্ত্যবাসীর কানে এর রেশ পৌঁছয় না।

একজন বাউলের প্রবেশ ও খঞ্জনী বাজাইয়া গান। সখীগণসহ মায়াদেবীর অন্তরালে অবস্থান।

হে সত্য!
দুর্লভ ধন!
ভক্তের সুলভ হয়ো, কুশলসাধন,
কৃপা করি বিকীরণ!
মঙ্গল সুন্দরে কষা সোনার বরণ
সত্য হও নিত্য সখা কলুষহরণ!
সত্যকামী, সত্যব্রত, সত্য-চিন্তন
লাভে জয়ে, লাভে ক্ষয়ে রেখো চিরন্তন!
আজি এসেছি শরণ,
প্রণমি কমল চরণ!

(বাউলের গান গাহিতে গাহিতে নিষ্ক্রমণ)

[মায়াদেবী ও সখীদের রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে আগমন]

মায়াদেবী—(ক্রুদ্ধ হইয়া) তোরা মিথ্যে ব'লে আমায়ও ভুলিয়ে রাখতে চাস্? এই সামান্য মর্ত্ত্যের মানুষ—এ কি গান গাইলে?

১মা সখী—ও সামান্য নয় দেবি, বড়ই অসামান্য। মর্ত্ত্যলোকে সত্যঠাকুরের একটি পোষা চর বা অনুচর। ওর দ্বারা অনেক সময় অনেক কার্য্য সাধন করে নেন।

২য়া সখী—ও আবার কি মানুষের মধ্যে? ও ত একটা সংসারত্যাগী পাগল।

৩য়া সখী—সংসারের বাসনাবহ্নিতে প্রজ্বলিত মানুষ কলিতে সত্যের দিক দিয়েও যায় না।

শুভ্রবসন, শুভ্রকিরীট, প্রসন্ন-আনন ষোড়শবর্ষীয় সুখাঙ্গী সত্যদেবতার আবির্ভাব।

১মা সখী—এই যে ঠাকুর স্বয়ং হাজির।

২য়া সখী—দেবি! আমরা একটু আড়াল হই—আপনি ওঁকে সাম্‌লান্।

(সখীদের অন্তর্ধান)

মায়াদেবী—কি মনে করে? সংসারে তোমার অন্ন মারা গেছে শুনছি, বেকার বসে আছ! অন্নের প্রার্থী না কি?

সত্যদেব—বরাননে! কর্মের আমার অভাব নেই! জানেন না কি কলিতে আপনার অস্ত্রাঘাতে ধর্মের ত্রিপাদ ভগ্ন হয়েছে, শুধু এক পায়ের উপর—সত্যের উপর—মাত্র তাঁর নির্ভর, সেইজন্তে আমার মুহূর্তমাত্র বিরাম নেই!

মায়াদেবী—হা! হা! হা! তোমার দুরাশা শুনে হাসি পায়, বিধাতার বিধানের উপর আমার হাত চলে না, নয়ত আমার আদেশে ধর্মের ঐ শেষ পাখানাও কবে কাটা যেত! কিন্তু তিন পায়ে খোঁড়া ধর্মকে তুমি এক পায়ে খাড়া রাখবে ভাবছ? দুঃসাহসিক!

সত্য—বিধির নিয়ত কর্তব্যসাধনে ত্রুটি করব না।

মায়া—বৃথা অহঙ্কার! সংসারে ধর্ম কোথাও নেই, সত্য কোথাও নেই, আমার মোহে সব আচ্ছন্ন। বনে-জঙ্গলে, কর্মহীনতার মধ্যে তোমার আসন পাতা থাকতে পারে, কিন্তু কর্মজগতে সাংসারিকের হৃদয়ে শুধু আমারি সিংহাসন!

সত্য—তাকি সম্ভব! তাতে বিধাতার বিধান বিপর্য্যস্ত হবে যে; সৃষ্টি উচ্ছন্ন যাবে।

মায়া—তর্ক নিষ্প্রয়োজন। পরীক্ষা নেওয়া যাক।

সত্য—দেবি তথাস্তু! ঐ যে প্রণয়িনীর প্রেমে মুগ্ধ নবীন যুবক ঘুমিয়ে রয়েছে ওরি উপর আর ওর বন্ধুর উপর দিয়ে পরীক্ষা হোক্।

মায়া—তাই হোক্।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শঙ্করের কক্ষ। কক্ষের দেওয়ালে নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র ঝুলান। শঙ্কর নিদ্রিত

শঙ্কর—(জাগিয়া উঠিয়া) এ কি দুঃস্বপ্ন দেখলেম। আবছায়া আবছায়া মনে পড়ছে—আবার পড়ছে না। যেন একটা কি ভারি বিপদ ঘনিয়ে আসছে। রাজকুমারীর ছবি যেন সেই বিভীষিকার কালো রঙে মিশ্রিত। তার সঙ্গে মিলনের আশা যেন চিরদিনের জন্ত অন্তর্হিত হচ্ছে, আমায় কোন পরীক্ষায় ফেলছে যেন কেউ! একদিকে সত্য আর একদিকে তার বাহু দুটির মায়া—দু-ই ডাকছে আমায়। যেন সেই বাহু দুটিরই জয় হল, আমি সত্যভ্রষ্ট হলেম! আম্বিক—সেইখানে তার পাপপুণ্য। সেহ পবিত্রিমু...

একটা সামান্ত স্বপ্নে তা বেরিয়ে পড়ল। ছি! ছি! যদি সত্য হত কি লজ্জারই হত! হে অভয়ে! অভয় দাও! যেন সত্যচ্যুত না হই কখনো!

দূর নেপথ্য হইতে বাউলের গানের ক্ষীণস্বর বহিয়া আসিল

সত্যব্রত, সত্যকামী, সত্যচিন্তন
লাভেজয়ে লাজেক্ষয়ে রেখো চিরন্তন!

শঙ্কর—এখনও কি স্বপ্ন দেখছি? স্বপ্নে শোনা গানের প্রতিধ্বনি যেন এখনও কানে বাজছে। আর না, এ জল্পনা-কল্পনা দূর হোক। কে আছিস্?

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভাস্করকে বলো তাঁর দল বল সহ এলে চরিতার্থ হব।

ভৃত্য—যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান)

অল্পক্ষণ পরে সদলে ভাস্করের প্রবেশ। দলের সকলে একটু পিছনে রহিল, ভাস্কর অগ্রসর হইলেন।

ভাস্কর—বন্ধু, ডেকেছ? কোন কাজ আছে?

শঙ্কর—না বন্ধু, কাজ কিছু নেই। শুধু শেষ রাতে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে মন কি রকম চঞ্চল হয়েছে, তাকে স্থির করতে হবে। এস বালসেনাদের কুচকাওয়াজ করান যাক, আন তাদের সামনে, আমি প্রস্তুত হয়ে আসছি।

প্রস্থানান্তর অল্পক্ষণ পরে পরিবর্তিত বেশে পুনরাগমন। বালসেনাদের নানাপ্রকারের কসরৎ, তরবারি খেলা ও গানের সঙ্গে সঙ্গে কুচ

গান

দ্বিকণ্ঠে—রণরঙ্গিনী নাচে, নাচেরে, নাচে!
ঐ নাচে!
রুন্ রুন্ ঠুন্ ঠুন্ নাচেরে নাচে
রণমাঝে!
ঝাঁঝর ঝম ঝম বাজেরে বাজে,
শুন বাজে,
ডম্ ডম্ ডমরু আওয়াজে রে বাজে
শুন বাজে!
বহু কণ্ঠে—গরজে তোপ কামান মাঝে
জগজ্জননী সমর সাজে রে
নাচে, ঐ নাচে, আজি, নাচে,
রণমাঝে।

দ্বিকণ্ঠে—অভয়ার ডঙ্কা বাজে রে বাজে
রণমাঝে,
রক্ত তপ্তকর হুঙ্কারে শঙ্খনিনাদে,
জয় নাদে।

পায়ে পায়ে, তালে তালে, চল্ রে চল্
সবে চল্, আগে চল্
মারিতে মরিতে চল্, চল্ রে মরিতে
দলে দল, দলে দল
বহু কণ্ঠে—গরজে তোপ কামান মারে—ইত্যাদি

দ্বিকণ্ঠে—মাভৈ মাভৈ রবে, চল্ ছুটে সবে
আহবে,
আগে কে হবে!
বিজয় বা মরণের স্বাদ কেবা লবে
আহবে
আগে কে হবে!
আমি সে, আমি সে, আমি! আমি! আমি!
যেতে দে, আগে হতে দে!
রণরঙ্গে মার সঙ্গে যেতে দে,
আগে হতে দে!
বহু কণ্ঠে—গরজে তোপ কামান—ইত্যাদি

দ্বিতীয় দৃশ্য

মণিপুরের রাজা বিক্রমাদিত্যের মন্ত্রণাকক্ষ। রাজা ও মন্ত্রী যশোধর।

রাজা—রাজ্যের সব শত্রু দমন হয়েছে, কেবল হেরম্ব-দেশের চন্দ্রসেন কিছুতেই বশ মানছে না। কোন না কোন ছুতোয় সীমান্তে একটা গোলমাল বাধিয়েই রেখেছে।

মন্ত্রী—মহারাজ-চিরঞ্জীব শঙ্করের মত এমন নবীন সেনানায়ক থাকতে এই একটি মাত্র শত্রু দমনের ভাবনা কি? আমার কাজ যতটুকু বাকী আছে সেই সম্পূর্ণ করবে।

রাজা—নবীন বলেই ত ভাবনা—জরাগ্রস্ত হলেও তুমি যদি আজও সেনাপতি থাকতে, স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে পারতে—আমার কি কোন ভাবনা থাকত?

মন্ত্রী—বিশ্বাস করুন মহারাজ, নবীনকে বিশ্বাস করুন। যুগে যুগে নবীনেরাই জয়শ্রীকে রাজদ্বারে শৃঙ্খলিত করে এনেছে। জয়শ্রী নবীনেরই বশ।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী—(অভিবাদন করিয়া) মহারাজের জয় হোক, একজন দূত এই পত্র এনেছে।

(পত্র দিয়া প্রস্থান)

রাজা—তোমার ঐ বিশ্বাসই স্বাভাবিক, সর্ব্বত্র বিজয়-মিচ্ছেৎ পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ং।

(পত্র পড়িতে পড়িতে)

এই দেখ গণ্ডগোল পেকে উঠল! এই পড়।

মন্ত্রী—(পত্র গ্রহণ করিয়া পড়িয়া) কি দুর্বিনয়! এদিকে রাজকন্যার হস্তপ্রার্থী, ওদিকে না দিলে যুদ্ধের ভয় দেখান। মহারাজ, এই দুর্ব্বিনীতের স্পর্দ্ধাপূরণের অবসর দেওয়া হোক্। হয় এ রাজকন্যাকে যুদ্ধে জয় করুক, নয় যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী হয়ে আপনার পদলুণ্ঠিত হোক্।

রাজা—ঠিক কথা। আর যে-বীর একে বন্দী করে আনবে সে-ই রাজকুমারীর পাণিগ্রহণের অধিকারী হবে। এ সম্বাদ সর্ব্বত্র ঘোষণা করে দাও।

মন্ত্রী—যথাদেশ!

(প্রস্থানোদ্যম)

রাজা—দাঁড়াও, আরও একটা কথা আছে। আজ থেকে শঙ্কর আর সামান্য সেনানায়ক নয়, এই যুদ্ধে তাকে সেনাপতিপদে বরণ করলেম।

মন্ত্রী (গদ্‌গদভাবে) ধন্য মহারাজ!

তৃতীয় দৃশ্য

কমলদীঘির পথে আম্রবীথিকা। কলসীকক্ষে পুরাঙ্গনাগণ ও বালিকাগণ

১মা পুরাঙ্গনা—আর শুনেছিস্? যশোধর মন্ত্রীর ছেলে শঙ্করকে রাজকন্তে দান করবেন!

২য়—না, তা ত শুনিনি ভাই; শঙ্কর সেনাপতি হয়েছে, যুদ্ধে যাবে এই জানি।

১মা—তারি মানে তাই লো, তারি মানে তাই!

একটি বালিকা—ওমা, তাই নাকি মাসি?

১মা—তা নয়ত কি? তোরা ত এক একটা বুদ্ধির ঢাঁই। এ কথাটুকু বুঝলিনে, এই শঙ্করকে সেনাপতি করে যুদ্ধে পাঠান, আর সেই সঙ্গে ঢাক পিটিয়ে দেওয়া যে, যুদ্ধে জয়ী হয়ে চন্দ্রসেনকে বন্দী করে আনবে যে তারই সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হবে এ কথা দুটো একই হল না? (বয়স্কাদের প্রতি চাহিয়া) হ্যাঁ গা, সেনাপতি ছাড়া আর কে বন্দী করবে? একি তোর আমার ছেলের সাধ্যি?

৩য়া—তা কার কপালে কে নাচচে কে বলতে পারে বোন? আমার নাড়ুর হাত দেখে জ্যোতিষীঠাকুর বলেছিলেন—বৌ আসবে বড়ঘরের মেয়ে। তা রাজ-

কন্তে যদি বরাতে থাকে তবে আমার নাড়ুই চন্দ্রসেনকে বন্দী করবে।

৪র্থা—তোর নাড়ু! আহা মরে যাই! বরাৎ ত, বেছে বেছে রাজকন্তার জন্তে আর পাত্র পেলে না। কেন, আমার ছেলে গবু কি দোষ করলে? সে না হয় ঢাল সড়কি ধরতেই জানে না—

বালিকা—আর খোলা তরোয়াল দেখলে দুহাত তফাতে সরে যায়—

৪র্থা—মর্ ছুঁড়ি তবু তাকে বলে-কয়ে যদি একবার লড়াইয়ে পাঠাতে পারি তবে চন্দ্রসেনকে কি আর বেঁধে আনতে পারবে না। শুধু ধরা আর বাঁধা বৈ ত নয়।

৩য়া—(মুখ সরাইয়া) ঘেন্নায় বাঁচিনে! (ফিরিয়া) তাই ত লো! গাছে চড়ে পাখীর ছানা ত রোজ ধরে ধরে আনে, তা এক আধটা রাজা-রাজড়াকে আর ধরতে কতক্ষণ?

১মা—হ্যাঁ লো হ্যাঁ থাম—তোদের ছেলেদের জন্তেই রাজকন্তে হাপিত্তেশ করে রয়েছে। জানিসনে কি, সে শঙ্কর ছাড়া আর কারুর গলায় মালা দেবে না? তা সে যুদ্ধে জয়ী হোক্ আর না হোক্।

(চুপি-চুপি এদিক-ওদিক চাহিয়া)

রাজকন্তে পুষ্পমঞ্জরীর সখি মালতী আমার মনের কথা কি-না, তারই কাছে সব শুনেছি। যাকে-তাকে কি সে বলতে যায়? আমার পেটের থেকে ত আর কোন কথা বেরুবার যো নেই। বলি শোন্—ছেলেবেলায় এক সঙ্গে খেলেছে তারা, রাণী মা বেঁচে থাকতেই মালা বদল হয়ে গেছে। এখন বড় হয়ে আর দুজনের দেখাশুনা নেই, কিন্তু প্রাণের টান তেমনি আছে। বলিস্‌নি কাউকে।

সকলেই—ওমা তাই বুঝি?

৪র্থা—তাহলে দিদি গবুকে আর লড়াইয়ে পাঠাব না?

১মা—না পাঠালেই বুদ্ধিমতীর কাজ হবে।

৩য়া—তবে জ্যোতিষী ঠাকুরের গণনাটা কি মিথ্যে হবে বোন?

১মা—তাঁর গণনাটা রাজকন্তার উপর দিয়ে ফলাবার আশা ত্যাগ করো।

আর সকলে—সূর্যি পাটে নামল, কথায় কথায় দেরী হয়ে গেল, আর নয়—চল্ ভাই—জলকে চল্।

বালিকাগণ কলসী মাথায় রাখিয়া নাচিতে নাচিতে গাহিতে লাগিল

চল্ জলকে চল্ রে চল্।
সে যে নূপুরের ধ্বনি শুনিলে মোদের
গাহিবে ছলাৎ-ছল!
হাঁ হাঁ গাগরি যখন ভরিব আমরা
হাসিবে সে কলকল!

আহা পথচেয়ে সে যে থাকে গো সদাই
দরশন-চঞ্চল,
মরি আমাদের সাথে মিতালির তরে
জানে সে কতই ছল!

তোর কবরী সাজাতে ফুটায়ে রাখে সে
রক্ত শ্বেত কমল,
মোর কণ্ঠে পরাতে গোপনে গড়ে সে
শুক্তি, শাঁখ অমল!

সে যে ঝুলনতিথিতে ঢেউয়ের দোলা
রচে প্রেমে ঢল ঢল,
সই এমন বঁধুয়া পাবি কোথা আর
চল্ রে জলকে চল্।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রাতঃকাল। হেরম্বদেশের পথে সৈন্ত ও প্রহরীবেষ্টিত মণিপুরের যুদ্ধশিবির। শিবিরসম্মুখে চন্দ্রসেনের দূত।

প্রহরী—কে আসে? দাঁড়াও।

দূত—মিত্র!

প্রহরী—কি কাজ?

দূত—রাজা চন্দ্রসেনের অনুজ ও সেনাপতি বীরসেন তোমাদের সেনাপতির সঙ্গে দেখা করতে চান।

প্রহরী—অপেক্ষা কর, খবর পাঠাই।

একজন সৈনিককে ডাকিয়া সংবাদ জ্ঞাপন, সৈনিকের শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ ও ক্ষণপরে প্রত্যাবর্তন

সৈনিক—(দূতের প্রতি) তাঁকে নিয়ে এসো।

(দূতের নিষ্ক্রমণ ও কিছুক্ষণ পরে বীরসেনের সহিত পুনঃপ্রবেশ)

সৈনিক কর্তৃক শিবিরের দ্বারোদ্ঘাটন। শিবিরে একটি পালঙ্ক, একটি মেজ ও দুইখানি কুর্সি দৃষ্ট হইল। শঙ্কর মেজের সামনে কুর্সিতে বসিয়া আছেন। মেজের উপর একখানি ফুলট কাগজে দুই তিনটি ব্যূহ চিত্রিত রহিয়াছে, শঙ্কর সেগুলি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছেন।

শঙ্কর—(স্বগত) কোথায় ছিদ্র রয়ে গিয়েছিল ? কোথায় ভুল হল আমাদের ? আজ ত সে ত্রুটি পূরণ করতেই হবে।

বীরসেন শিবিরে প্রবেশ করিলে শঙ্কর কাগজখানি সরাইয়া রাখিলেন। বীরসেনকে বসিতে সঙ্কেত করিলেন, বীরসেন বসিলেন না।

শঙ্কর—বক্তব্য ?

বীরসেন—বক্তব্য অতি সামান্য। বিনাযুদ্ধে আজ যদি তুমি হার মান ভাল কথা—নয়ত প্রমাণই পেয়েছ কাল, আর একটা সম্মুখসমরে আমার বিপুলবাহিনীর পায়ের তলায় পিঁপড়ের মত দলে যাবে।

শঙ্কর—অতি দয়া আপনার ! শুধু এই কথাটুকু জানাতে এত কষ্ট স্বীকার করে এসেছেন ! পণ্ডশ্রম করেছেন।

বীরসেন (স্বগত) কাল আমার সৈন্তেরা এদের পরাস্ত করেছে, কিন্তু আজ আর সে আশা নেই। অর্দ্ধেকের বেশী হত, বাকী আহত, তাদের হাতে অস্ত্রধারণের শক্তিও নেই। এখনো যদি ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করতে পারি তবেই রক্ষা।

(প্রকাশ্যে) মূঢ় যুবক ! এখনো ভেবে দেখ, এখনো সাবধান হও ! পুষ্পমঞ্জরীর পাণিগ্রহণ অত সুলভ মনে করো না।

শঙ্কর (দাঁড়াইয়া উঠিয়া) প্রহরি ! (প্রহরীর প্রবেশ) হেরম্বদেশের সেনাপতিকে নিরাপদে নিজ শিবিরে ফিরে যেতে দাও।

বীরসেন—এই তোমার শেষ জবাব ?

শঙ্কর—না, শেষ জবাব সমরাঙ্গনে পাবেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সন্ধ্যা। হেরম্বদেশের রাজা চন্দ্রসেনের শিবিরাভ্যন্তর। সুসজ্জিত শিবিরে চন্দ্রসেন একা বসিয়া।

চন্দ্রসেন—মণিপুরের সৈন্ত কাল যে-হার হেরেছে আজ আর মাথা তুলতে পারবে না। বিজয়লক্ষ্মী আমার করতলগত, সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্তা পুষ্পমঞ্জরী। আজ রাত ভোর হলে ঐ সামনের গ্রামখানা ধ্বংস করে পৌছব একেবারে মণিপুরের রাজধানীতে।

(নেপথ্যে তোপের শব্দ ও হাহাকারধ্বনি)

এত কাছে তোপের শব্দ ? কাদের তোপ ? শত্রুসৈন্ত এতদূর এগিয়ে এল ?—প্রহরি ? কেউ কোথাও নেই, কিছুই খবর জানতে পারছিনে।

(উঠিয়া পাদচারণ)

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি]

ঐ যে জয়ধ্বনি। বীরসেনের মত এমন বিচক্ষণ ভাই যার সেনাপতি তার জয় ত সুনিশ্চিত। কৌশলে শত্রুদের নিজ সেনা ব্যূহমধ্যে ঢুকিয়ে, সিংহের কবলে মৃগযূথের মত তাদের বিধ্বস্ত করছে।

চন্দ্রসেন—কি হয়েছে ? শীঘ্র বল।

প্রহরীর হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ ও আত্মসংবরণে অক্ষম হইয়া পতন।

প্রহরী—পালান মহারাজা, পালান। মণিপুরের সৈন্ত চারদিক থেকে ঘিরে আপনাকে বন্দী করতে আসছে। বীরসেন নিহত। পালান ! পালান !

চন্দ্রসেনের একদিক দিয়া পলায়নের উপক্রম। সেদিকে একদল সৈন্ত লইয়া ভাস্কর আসিয়া পড়িলে অপরদিকে পলায়নপর। অপরদিকে শঙ্করচালিত আর একদল সৈন্তের আগমন ও তাঁহাকে অবরোধ।

তৃতীয় দৃশ্য

মণিপুরের রাজপথ। নাগরিকগণ

১ম নাগরিক—হেরম্বদেশের সেনাপতি নাকি শঙ্করকে নিকেশ করে দিয়েছিল, ভাস্করের বুদ্ধির জোরে বেঁচে এল।

২য় নাগরিক—ভাস্করের বুদ্ধি না নিজের বীরত্ব ?

১ম নাগরিক—তার বীরত্ব ত কেউ অস্বীকার করছে না। তবে ভাস্করের সাহায্য আর ভাগ্যির জোরও ত মানতেই হবে !

৩য়—যা বল্লে খুড়ো ! ভাগ্যির জোর নয় ত কি ? এই দেখ না গিন্নী আমার ছেলেটার ভাগ্যি পরীক্ষা করতে করতে রয়ে গেল। প্রথমে মৎলব এঁটেছিল ঠিক—তারপরে ও-পাড়ার খাণ্ডব ঘোষের বৌ যে কি মন্ত্র পড়লে কানে—আর সব বুদ্ধি-সুদ্ধি ঘুলিয়ে গেল।

৪র্থ—তা দাদা আমিই কি তোর ভাজবৌকে কম বুঝিয়েছি—ওগো ভালমানুষের মেয়ে, রাজার বেয়ান হবি ত এই সুযোগ,—ছেলেকে সাজা বুদ্ধির সাজে। বলে কি-না—অমন কথা মুখে এনো না, রাজকন্যে আমার ছেলের দিকে ফিরেও তাকাবে না। রতনদিদি আমায় চুপে চুপে বলেছে রাজকন্তের মালা বদল হয়ে গেছে

শঙ্করের সঙ্গে, রাজাও তাকে জামাই করতে মত দিয়েছেন, তাই সেনাপতি করে যুদ্ধে পাঠিয়েছেন।

২য় নাগরিক—তা ঠিক।

১ম নাগরিক—যত ঠিক ভাবছ তত ঠিক নয়। কার গলার মালা কে কেড়ে নেয়, দেখে নিও তখন।

সকলে—সে কেমন ?

১ম নাগরিক—যে চন্দ্রসেনকে বন্দী করবে সে-ই ত রাজার জামাই হবে ? শোননি কি আসলে ভাস্করই চন্দ্রসেনকে বন্দী করে ? এতক্ষণ বলিনি তোমাদের—ভাস্কর হল আমার সম্বন্ধীর খুড়তুতো পিস্‌শ্বশুর।

২য়—তা একশোবার করে হোক্‌গে—তবু মিথ্যে কথা ! আমাদের রণবীরই চন্দ্রসেনকে বন্দী করেছে। আমি আর জানিনে ? আমি হলুম তার সাক্ষাৎ মাস্‌তুতো ভাই !

১ম—তা না হয় হলেই, তাতে ত আর কেউ বাদ সাধছে না। ঝগড়া কিসের ভাই ? তুমিও আছ আমিও আছি। দেখা যাবে কোথাকার জল কোথায় গড়ায়, কার গলায় কে মালা পরায়।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজদরবার। মণিপুররাজ, মন্ত্রী, দরবারীগণ ও সেনানায়কেরা উপবিষ্ট

রাজা—আমার প্রতিজ্ঞানুযায়ী নবীন সেনাপতি শঙ্কর রায়কে পুরস্কার বিধান করতে হবে। রাজকুমারীর বিবাহোৎসবের আয়োজন হোক্ !

১ম দরবারী—মহারাজ, ভয়ে কব কি নির্ভয়ে ?

রাজা—নির্ভয়ে বল, কি হয়েছে ?

১ম দরবারী—নাগরিকদের মধ্যে এই বিষয় নিয়ে একটু চর্চা চলেছে।

রাজা—কেন ?

১ম দরবারী—অনেকের বিশ্বাস ভাস্কর রায়ের হাতে হেরম্বদেশের রাজা বন্দী হন, রাজকন্যা তাঁরই প্রাপ্য।

রাজা—ভাস্কর রায় নিজে সে দাবি করেছেন ?

২য় দরবারী—না মহারাজ, তিনি শঙ্করের সখা, অভিন্নহৃদয়, শঙ্করের স্বার্থের বিরুদ্ধে তিনি এরকম কোন দাবি আনতে পারেন না।

রাজা—শঙ্করকে এর সত্যাসত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয়েছে ?

১ম দরবারী—না মহারাজ, কারণ এ সম্বন্ধে তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করাই তাঁর প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করা হবে। যে-সেনাপতি সদ্যরণজয়ী হয়ে মহারাজের কীর্ত্তি বৃদ্ধি করেছে, তাকে কোন রকম সন্দেহাত্মক জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা অপমানিত করার অশিষ্টতা এ দরবারের কারো নেই। শুধু কর্ত্তব্যবোধে প্রজাদের সন্দেহ মহারাজের গোচরে এনেছি।

রাজা—তাহলে সত্যনির্ণয়ের উপায় ?

একজন সেনানায়ক—উপায় রাজা চন্দ্রসেন স্বয়ং। তিনিই বলতে পারেন, কে তাঁকে বন্দী করেছে। অনুমতি করেন ত তাঁকে দরবারে উপস্থিত করা যায়।

রাজা—সেই ভাল। (তুষ্টীভূত মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রি ! তাঁকে আন্‌তে পাঠাও।

মন্ত্রীর একজন প্রহরীকে সঙ্কেত। প্রহরীর নিষ্ক্রমণ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ চন্দ্রসেনকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ।

রাজা—তোমার পত্রের ক্ষত্রিয়োচিত উত্তর পেয়েছ ?

চন্দ্রসেন—পেয়েছি।

রাজা—আর কিছু বলবার আছে ?

চন্দ্রসেন—শুধু এই—আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ সত্বর দিন, বিলম্ব করে আর কেন আমায় পীড়ন করেন ?

রাজা—তোমার নির্দ্ধারিত দণ্ড অচিরেই পাবে। তার আগে তোমায় একটা প্রশ্ন করতে চাই, আশা করি যথাযথ উত্তর দেবে।

চন্দ্রসেন—কি প্রশ্ন ?

রাজা—তোমায় কে বন্দী করেন, ভাস্কর না শঙ্কর ?

চন্দ্রসেন—দুইদল সৈন্য নিয়ে দুদিক থেকে দুজনে আমায় ঘেরেন, প্রথম দলের নায়ক ছিলেন ভাস্কর রায়, তিনি আগে আসেন, কিন্তু আমায় ধরতে পারেন নি। দ্বিতীয় দলের নায়ক শঙ্কর রায় আমার পথরোধ করে আমায় ধরে ফেলেন।

রাজা—ভাস্কর ইচ্ছে করলে ধরতে পারতেন কি ?

চন্দ্রসেন—সে কথা ভাবিনি, ধরেন নি এই জানি।

রাজা—তাহলে তোমায় বন্দী করার যশ ও পুরস্কার শঙ্করেরই প্রাপ্য!

চন্দ্রসেন—নিঃসন্দেহ।

রাজা—মন্ত্রি! এঁর শৃঙ্খল খুলে দিতে বল, আর এঁকে সসম্মানে হেরম্বদেশে নিয়ে গিয়ে এঁর রাজ্য এঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক্।

চন্দ্রসেন—মহারাজ, এবার আমি সত্যই পরাভূত হলেম!

মুখ ফিরাইয়া এক ফোঁটা অশ্রু মছিতে মুছিতে মন্ত্রী ও প্রহরীর সহিত নিষ্ক্রমণ।

রাজা—সভাসদগণ, এবার নগরে রটনা করে দাও নবীন সেনাপতি শঙ্কর রায় বিজয়ী বীর এবং কাল গোধূলিলগ্নে রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ।

পঞ্চম দৃশ্য

সন্ধ্যা। রাজার আরামকক্ষ রাজা আসীন।

রাজা—(চিন্তাপরায়ণ) কে আছিস? প্রহরি!

প্রহরীর প্রবেশ ও অভিবাদন।

মন্ত্রী যশোধরকে ডেকে আন!

প্রহরীর নিষ্ক্রমণ ও ক্ষণপরে মন্ত্রীর প্রবেশ।

রাজা—মন্ত্রি! আমি বড়ই কৌতূহলাক্রান্ত হয়েছি। চন্দ্রসেনের কথাগুলো মনের ভিতর ওলটপালট করছে। ভাস্কর যেন তাঁকে ধরলেও ধরতে পারত মনে হচ্ছে, ইচ্ছে করেই যেন শঙ্করের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায় নি। আমার এ সন্দেহের কোন মূল আছে কি? যা সত্য জান তাই বল।

মন্ত্রী—মহারাজ, আপনার সন্দেহ অমূলক নয়। হলেও হতে পারে, ভাস্কর জেনে-শুনেই শঙ্করকে সুযোগ ছেড়ে দিয়েছিল।

রাজা—কে এ ভাস্কর? কেন সে শঙ্করের জন্য এত ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত?

মন্ত্রী—ভাস্কর ভিন্ গাঁয়ের যুবক। দু-বছর আগে পার্ব্বতীপুরের মেলায় শঙ্করের সঙ্গে দেখা হয়। শঙ্করের অস্ত্রখেলা দেখে সে মুগ্ধ হয়। সেই পর্য্যন্ত দু-জনের অত্যন্ত প্রণয়, একজনের জন্যে আর একজন প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে। এক দণ্ড ওদের ছাড়াছাড়ি নেই। হয় ভাস্করের গৃহে শঙ্কর মাসকতক কাটিয়ে আসে, কিংবা আমাদের গৃহে ভাস্কর মাসাবধি যাপন করে যায়। নূতন নূতন অস্ত্রচালনা-ব্যূহরচনা এই সব চর্চ্চা নিয়ে দুজনে মগ্ন থাকে।

রাজা—এত প্রণয়! একজনের জন্যে আর একজন যশ, কীর্ত্তি, এমন কি, রাজকন্যার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে রাজসিংহাসনের লোভ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিলে! বড় আশ্চর্য্য লাগছে। শঙ্করও কি এই ছাঁচে গড়া! বন্ধুর জন্যে সেও কি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে পারে!

মন্ত্রী—পারে মহারাজ! হীরাই হীরাকে টানে।

রাজা—কিন্তু এ-যে কাচেতে হীরাতে মিলন হয়নি তার প্রমাণ দিতে পার?

মন্ত্রী—(চিন্তা করিয়া) পারি। কিন্তু তাহলে মহারাজাকে কিছুদিন আমার পরামর্শে চলতে হবে।

রাজা—বেশ, তাই হবে।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বাসরগৃহ। মসনদের উপর বরবেশে শঙ্কর ও বধূবেশে রাজকন্যা পুষ্পমঞ্জরী। আশেপাশে সখীগণ।
একদল সখি বর-বধূকে কড়ি খেলাইতেছেন, আর একদল রঙ্গমঞ্চের উপর হইতে আলম্বিত সাতবর্ণের সূতায় রাসের নাচের তালে তালে পাক দেওয়া ও পাক খোলার সঙ্গে সঙ্গে গান করিতেছেন।

হে সুন্দর বসন্ত বারেক ফিরাও
আজি মধুর অতীত কাল।
অতীত-উৎসব আন এ ভারতে
আন হে, আন হে
মধুমাসে আজি মধুর ইন্দ্রজাল!

কোকিল-কূজন-মুখরিত উপবন
মাঝে, আন হে
মঞ্জুল চরণ-বিতাড়ন, মঞ্জু অশোক লাল!
চম্পক পেলব চূতমুকুল নব
আন হে, আন হে
পূর্ণদোহদ বকুল পুষ্পজাল!

রুণু রুণু ঝন ঝন বলয় শিঞ্জন
সাথে, আন হে,
চকিতলোচন, মোহন বাহু মৃণাল!
দোলারোহণ, কলভাষণ সহ
আন হে, আন হে
বারিসিঞ্চন লোল আলবাল!

যূথি-সুবাসিত উত্তরী পীত
সাথে আন হে
বীণাবাদিত ললিত গীততাল !
প্রিয়-আলেখন পুষ্প বিরচন
আনহে, আনহে
কাল পুরাতন নিখিল মোহজাল !

ইহাদের নৃত্যগীত সমাপনান্তে আর একদলের ঠুংরি নাচ ও গান।

আঁখি খুলিল কলি
অলিগুঞ্জন যবে
ও সখি আঁখি খুলিল রে !
ভর ভরিয়ে থরথরিয়ে
নেহারে কালো ভ্রমরে,
সে নাহি জানে নটবর হৃদিনন্দন রে !

আঁখি তুলিল ফুল
প্রেম-অঞ্জন মাখি
যৌবনে যবে তুলিল রে !
লাজে মরিয়ে সুধা ঝরিয়ে
নেহারে শ্যাম ভ্রমরে,
সে জানে জানে নটবর হৃদি নন্দন রে !

১ম সখী—দাও নটবর, এবার সখির মুখে মিষ্টি তুলে দাও।

শঙ্করের হাতে সন্দেশ দেওয়া, শঙ্কর রাজকন্তাকে তার অর্দ্ধেকটা খাওয়াইলেন।

২য়া সখী—এবার তুইও বরের মুখে দে সখি !

রাজকন্তা আড়নয়নে সলজ্জে শঙ্করের দিকে চাহিলেন, সখি তাঁহার সন্দেশধৃত হাত শঙ্করের মুখের দিকে তুলিলেন। সহসা শঙ্করের ভৃত্য প্রবেশ করিল, তার হাতে ঢালের উপর বহির্ব্বেশ ও যুদ্ধাস্ত্র। রাজকন্তার হাত হইতে সন্দেশ পড়িয়া গেল।

সখীরা— এ কি অলক্ষণ !

শঙ্কর (ভৃত্যের প্রতি) ব্যাপার কি, কি হয়েছে ?

ভৃত্য—সমূহ বিপদ। ভাস্কর রায়কে রাজপ্রহরীরা বন্দী করেছে।

শঙ্কর—বন্দী ? কার হুকুমে ? কি দোষে ?

ভৃত্য—জানি না। আপনি গিয়ে তাকে মুক্ত করুন, আর কারো সাধ্য নয়।

শঙ্কর উঠিয়া বরবেশের উপর অঙ্গরক্ষা পরিতে পরিতে চিন্তাগ্রস্ত।

১মা সখী—এখনি যাবেন আপনি ? এখনও সব স্ত্রী-আচার সম্পূর্ণ হয় নি।

শঙ্কর—যেতেই হবে। (রাজকন্তার প্রতি) প্রিয়তমে অনুমতি দেবে ?

রাজকন্তা—(উঠিয়া, একবার চোখে চোখে চাহিয়া ফের চক্ষু নত করিয়া) হাঁ যাও, এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব উচিত নয়।

ভৃত্য সহ রণবীরের নিষ্ক্রমণ।

১মা সখী—একি হল ভাই—হরিষে বিষাদ !

অন্ত সখীরা—তাই ত এ কেমন নাগর ! বাসরের কনে ছেড়ে চলে যায় !

রাজকন্তা—চুপ কর্ তোরা। এমন বন্ধুর বিপদে যে ছুটে না যায়, সে কি আমার মালা গলায় পরার যোগ্য ? উৎসব বন্ধ কর্, চল্ আমরাও যাই, যদি আড়াল থেকে কিছু দেখতে পাই।

সকলের অলক্ষিতে একজন বৃদ্ধের প্রবেশ।

বৃদ্ধ—কোথা যাবে মা ?

রাজকন্তা—কে তুমি অপরিচিত এমন সময় রাজ-অন্তঃপুরে ?

বৃদ্ধ—মন্ত্রীর আদেশে এসেছি। এই দেখ তার সাঙ্কেতিক অঙ্গুরী।

রাজকন্তা—এ ত রাজার অঙ্গুরী।

বৃদ্ধ—মন্ত্রীই এখন রাজা বা রাজপ্রতিনিধি। মহারাজ বিক্রমজিৎ ভাস্কর রায়ের হাতে নিহত হয়েছেন। তোমার স্বামীর বন্ধু তোমার পিতৃহন্তা।

রাজকন্তার মূর্চ্ছা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপ্রাসাদের সম্মুখে অঙ্গন। সৈন্তেরা ভাস্করকে চারিদিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। রাজপারিষদগণসহ মন্ত্রী প্রাসাদ-সোপানের উপর দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। শঙ্কর হঠাৎ প্রবেশ করিয়া সৈন্তদের হটাইয়া ভাস্করকে ছাড়াইবার চেষ্টা করিলেন। সৈন্তগণ প্রতিরোধ করিতে লাগিল।

মন্ত্রী—শঙ্কর, কি চাও ?

শঙ্কর—ভাস্করকে এদের হাত থেকে ছাড়াতে চাই। ভাস্কর বন্দী কেন ? কি অপরাধ করেছে ?

মন্ত্রী—রাজহত্যার অপরাধে অপরাধী। একে আমরা এতদিন চিনতে পারি নি। তোমার সঙ্গে বন্ধুতার ছল করে এ রাজ্যে প্রবেশ করেছে। সকলের পূর্ণ বিশ্বাস জমিয়ে আজ রাজকন্তার বিবাহ-উৎসবের রাত্রে যখন

সকলে অন্যমনস্ক সেই সময় একদল সেনা হাত করে সিংহাসন অধিকারের জন্য রাজাকে হত্যা করেছে!

শঙ্কর—মিথ্যা!

পারিষদগণ—চুপ্ রও!

শঙ্কর—সাবধানে কথা কও! (মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে) পিতা! যদি সমস্ত জগৎ একদিকে সাক্ষ্য দেয়, আর ভাস্কর একলা এক কথা বলে, তবে ভাস্করের কথাই সত্য বলে জানব, জগতকে মিথ্যা মানব। নিজের চোখকে অবিশ্বাস করব, কিন্তু ভাস্করকে অবিশ্বাস করব না। ভাস্কর, ভাই, বল কি হয়েছিল?

ভাস্কর—এমন সর্ব্বৈব অলীক কাহিনী কখনও শুনিনি। তোমাকে রাজবাড়িতে ছেড়ে বাড়ি এসে আমি ঘুমিয়ে ছিলেম। আমায় ঘুমন্ত অবস্থায় রাজার কক্ষে বেঁধে এনেছে। কি হয়েছে তা কিছুই জানি নে।

মন্ত্রী—বেশী বাক্যব্যয় নিষ্ফল। রাজার শরীর পর্য্যন্ত লুকিয়ে ফেলেছে। তাঁর শয়নকক্ষের সামনে রাজপ্রহরীরা কেহ আহত, কেহ হাত পা-বাঁধা পড়েছিল। একজন মাত্র পালিয়ে এসে আমায় সংবাদ দিতে পেরেছিল। আমি সসৈন্যে উপস্থিত হয়ে ভাস্করকে রাজার আরামকক্ষে ধরেছি। ভাস্কর! কাল তোমার প্রাণদণ্ড স্থির। তোমায় একদিনের সময় দেওয়া যাচ্ছে। যদি নিজগৃহে কারো কাছে বিদায় নিতে যেতে চাও ত এই রাত্রেই যেতে পার। কিন্তু তোমার স্থানে কাউকে প্রতিনিধি রেখে যেতে হবে। যদি কাল সূর্য্যাস্তের মধ্যে তুমি না ফের, তবে তোমার হয়ে তোমার প্রতিনিধির প্রাণদণ্ড হবে।

শঙ্কর—আমি ভাস্করের প্রতিনিধি হলেম। আমাকে বন্দী করা হোক্। কাল সূর্য্যাস্তের মধ্যে যদি ভাস্কর ফিরে না আসে আমার প্রাণ গ্রহণ করবেন। ভাস্কর, ভাই, যাও!

বৃদ্ধ (হঠাৎ প্রবেশ করিয়া কানে কানে)—ভাস্কর, এই তোমার সুযোগ, পালাও, আর ফিরো না, যায় যাবে বন্ধুর প্রাণ!

ভাস্কর—(বৃদ্ধকে ঠেলিয়া) ধিক! (শঙ্করকে আলিঙ্গন করিয়া) তবে শীঘ্র হয়ে আসি। কাল সূর্য্যাস্তের আগেই দেখা হবে।

মন্ত্রীর নির্দ্দেশে সৈন্যগণ শঙ্করকে বন্দী করিল।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রাতঃকাল। ভাস্করের গৃহউদ্যান। উদ্যানের এক কোণে শিবালয়। ভাস্করপত্নী ভদ্রাবতী ও শিশুপুত্র নাগেশ।

নাগেশ—মা, আমার এই গাছে কেমন সুন্দর ফুল ফুটেছে দেখ। বাবা এলে তাঁকে দেখাব।

ভদ্রা—(ঝারি দিয়া গাছে জল ঢালিতে ঢালিতে) আচ্ছা মাণিক।

নাগেশ—বাবা অনেকদিন আসেন নি মা, কবে আসবেন? আমার মন কেমন করছে তাঁর জন্যে। বল মা, কবে আসবেন?

বাহিরে পদশব্দ। ভাস্করের প্রবেশ।

এই যে, এই যে, বলতে বলতেই বাবা এসেছেন, কেমন মজা!

ছুটিয়া গিয়া তাঁকে জড়াইল, ভাস্কর তাকে কোলে তুলিয়া মুখ চুম্বন করিয়া নামাইলেন।

ভদ্রা (ঝারি রাখিয়া)—আজ কেমন করে এলে? তুমি ... বলে গিয়েছিলে যুদ্ধশেষ হলেও এখন অনেক মাস লাগবে আসতে?

(চরণধূলি গ্রহণ)

ভাস্কর (বুকের কাছে টানিয়া)—সে অনেক কথা; বেশীক্ষণ থাকতে পারব না, শীগগির মাকে ডাক।

নাগেশ—আমি ডেকে আনছি, আমি ডেকে আনছি।

(প্রস্থান)

ভদ্রা—কেন দুদণ্ডের জন্যে আসা? সে হবে না, আমি তোমায় আর যেতে দেব না। এতটা পথ আসতে মুখ একেবারে শুকিয়ে গেছে। এরি মধ্যে ফের চলে যাবে? তা কি হয়!

ভৃত্য তোলার সহিত বিধবা মাতা দুর্গাবতীর প্রবেশ।

দুর্গা—বাছা যশস্বী হও, চিরজীব হও। তোমরা যুদ্ধে জয়ী হয়েছ খবর পেয়েছি। শঙ্কর এল না কেন?

ভাস্কর (মায়ের চরণস্পর্শ করিয়া)—মা, তুমি বীরপত্নী। আজীবন অনেক দুঃখ সয়েছ, আরও কিছু সইতে হবে। বুক বাঁধো। দুঃসহ সম্বাদ আছে।

দুর্গা—কি সম্বাদ ভাস্কর? এমন কি সম্বাদ যা সহ্য করবার শক্তি দেবেন না মা ভগবতী।

ভাস্কর—রাজহত্যার মিথ্যা অভিযোগ এসেছে আমার

উপর। আজ সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রাণদণ্ড হবে। আমার স্থানে শঙ্করকে রেখে এসেছি। সে বিবাহবাসর থেকে কারাগারে গেছে। সময় আর নেই। মা আশীর্ব্বাদ কর। আমি যাই!

দুর্গা—এ কি প্রহেলিকা শুনাচ্ছিস্? মহামায়ার এ কি মায়া?

ভদ্রা—না, তুমি যেতে পারবে না।

(হাত ধরিয়া ক্রন্দন)

ভাস্কর—সে কি হয়? (ধীরে ধীরে হাত ছাড়াইয়া) আমায় এমন করে মায়ায় বেঁধো না!

(ভোলার নিঃশব্দে নিষ্ক্রমণ)

দুর্গা—বৌমা, যেতে দাও মা! ক্ষত্রিয়কে সত্যচ্যুত কোরো না। ধর্ম্ম এখনও জাগ্রত আছেন, তোমার স্বামীকে বাঁচিয়ে আনবেন। যাও, পুত্র যাও, বিলম্ব করো না।

মা শিরোত্রাণ লইলে ভাস্কর নিক্রান্ত হইলেন। দুর্গাবতী মন্দিরের সম্মুখে জপে বসিলেন। ভদ্রা ভূলুণ্ঠিতা হইলেন।

নাগেশ (দৌড়িয়া আসিয়া)—বাবা আমার ফুল দেখেছ? (থমকিয়া দাঁড়াইয়া) কোথায় বাবা? আইমা জপ করছেন। মা কই? (ভূলুণ্ঠিতা মাতাকে দেখিয়া তার পাশে শুইয়া পড়িয়া গলা জড়াইয়া) মা! মা! কি হয়েছে?

দুর্গাবতী—

(মৃদুমৃদু গুঞ্জনে গাহিতে লাগিলেন)

দুখের নাঙল বুকের ক্ষেতে
চালাও হলধর!
ঝরুক রক্ত ঝর ঝর!
বুকে হল চালাও, চালাও হল,
ধরাও হে ফসল!

উপর উপর নয় ক নয়
গভীর কাটো খাত,
আমায় আরও দাও আঘাত!
বুকে হল চালাও, চালাও হল
ধরাও হে ফসল!

কঠিন মাটির দলায় কর
গুঁড়িয়ে সমতল!
আমার কাঁকর হোক্ কোমল!
বুকে হল চালাও, চালাও হল
ধরাও হে ফসল!

নয়নকূপের উছল জলে
রাখো তারে সিক্ত,
করি সকল সুখরিক্ত!
বুকে হল চালাও, চালাও হল
ধরাও হে ফসল!

দ্বিতীয় দৃশ্য

ভাস্করের গৃহের বাহিরে ঘোড়াবাঁধা। ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য—হায় কি শুনলেম? আজ প্রভুর প্রাণ যাবে? সে হবে না, ভোলা তাঁকে বাঁচাবে। এই ঘোড়াটা যদি সরিয়ে ফেলি তাহলে আর সূর্য্যাস্তের আগে মণিপুরে পৌছতে পারবেন না। প্রাণ বেঁচে যাবে। ঐ যে আসছেন বুঝি! এই বেলা পালাই।

ঘোড়ায় চড়িয়া পলায়ন।

ভাস্করের প্রবেশ।

ভাস্কর—এখানে ঘোড়া বেঁধে রেখেছিলেম, কোথা গেল? এ আবার কি বিপদ! ঐ যে ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে না! কে বুঝি আমার ঘোড়া চুরি ক'রে পালাল? দেখি দৌড়ে গিয়ে যদি ধরতে পারি। নয়ত সর্ব্বনাশ!

তৃতীয় দৃশ্য

মধ্যাহ্ন। জঙ্গলের পথে অশ্বপৃষ্ঠে ভোলা। ভাস্কর উহার অনেক পিছনে পিছনে জঙ্গলে ঘুরিতেছেন। জঙ্গলের ঝোপে-ঝাপে দস্যুদল লুকায়িত। ভোলা একটা বৃক্ষের নীচে আসিয়া দাঁড়াইলে দস্যুরা হঠাৎ আবির্ভূত হইয়া তাহাকে অশ্বসহ ধরিল। একজন দস্যু তার হাত-পা বাঁধিয়া লাথি মারিয়া এক পাশে ঠেলিয়া দিল। আর একজন ঘোড়া বাঁধিয়া ঘোড়ার পেটিতে টাকাকড়ির অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ভাস্কর শ্রান্তক্লান্ত পদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ভাস্কর—ঘোড়ার পায়ের শব্দ অনুসরণ করে করে এই জঙ্গলে ঢুকেছি। ঐ না আমার ঘোড়া? এরা সব কারা?

দস্যুপতি—এই যে, আর একটা শিকার জুটে গেছে। ধর্ ওকে,

কয়েকজন দস্যু ভাস্করকে ধরিল।

ভাস্কর—আমাকে কেন ধরছ ভাই! কে তোমরা?

দস্যুপতি—তোমার টাকাকড়ি যা-কিছু আছে বের ক'র।

ভাস্কর—নাও নাও, যথাসর্ব্বস্ব নাও, খালি প্রাণ নিও না। এ প্রাণ দিতেই যাচ্ছি, আর এক জায়গায় সত্যে বাঁধা আছে। তোমরা দস্যু, কিন্তু তোমরা

সত্যবচনের মহত্ব জানো, পরস্পরের সঙ্গে সত্যরক্ষা কর শুনেছি। আমাকেও সত্যরক্ষার সাহায্য কর। সূর্য্যাস্তের মধ্যে আমায় পৌছতে হবে—এখনও অনেক পথ বাকী। আমি যদি ঠিক সময়ে না পৌছতে পারি তাহলে আমার হয়ে আমার বন্ধুর প্রাণ যাবে। দস্যুপতি দয়া ক'র, আমার সঙ্গে পাথেয় যা-কিছু আছে এই নাও, কিন্তু প্রাণ দাও—আর ঘোড়াটি দাও, নয়ত প্রাণদানও নিষ্ফল হবে।

দস্যুপতি—(জনান্তিকে) লোকটার কথা খাঁটি মনে হচ্ছে। (প্রকাশ্যে) মানুষের সমাজে থেকেও সত্যের প্রতি এত টান। মজার লোক ত হে তুমি! (দলবলের প্রতি) ছেড়ে দে ওকে!

ভাস্কর—ঘোড়া?

দস্যুপতি—আচ্ছা, ঘোড়াও দেওয়া গেল। এখন চম্পট দাও!

ভাস্কর—ধন্য হলেম!

ভাস্করের ঘোড়ায় চড়িয়া নিষ্ক্রমণের উপক্রম।

ভোলা—প্রভু, আমি ভোলা, তোমার ভৃত্য, তোমায় বাঁচাবার জন্যে ঘোড়া নিয়ে পালিয়েছিলুম। সেই ঘোড়াই আবার তোমায় মৃত্যুমুখে নিয়ে চলল, দস্যুরও দয়া হল! অদৃষ্টলিপি কে খণ্ডাবে!

ভাস্কর (ভোলার প্রতি কৃপাদৃষ্টিতে) হায়, তোর প্রভুভক্তিই বুঝি প্রভুর সর্ব্বনাশ সাধন করবে। মানহীন প্রাণ নিয়ে সে বেঁচে কি করবে?

ঘোড়া ছুটাইয়া নিষ্ক্রমণ।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কারাগারের বাহিরে দাঁড়াইয়া বাউল গাহিতেছে।

দোল্‌রে দোল্ তরঙ্গে দোল্
হইয়ে বিগত ভয়!
বল্ অভয়! অভয়! অভয়!

তোর শিয়রে নাবিক অতি জ্ঞানময়!
রও শান্তচিত্ত অকুতোভয়!
হও অভয়! অভয়! অভয়!

রাস্তায় লোক জুটিল। বালক বৃদ্ধ তরুণ একে একে সকলে বাউলের গানে যোগ দিয়া মত্ত হইল।

ভবজলধির ঢেউয়ের নাচন
ইঙ্গিতে যার হয়
সে চির-মঙ্গল-ময়!
রও তাহারি বুকেতে লয়!
হও অভয়! অভয়! অভয়!

যে তমসের পারে দেয় পরিচয়
পুরুষ জ্যোতির্ম্ময়!
সে চিরমঙ্গলময়!
রও তাহারি প্রেমে অজয়!
হও অভয়! অভয়! অভয়!

কারারক্ষীর গায়কের সামনে দাঁড়াইয়া গানে যোগদান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কারাগার। শৃঙ্খলায়িত শঙ্কর ভূমিশয্যায় আসীন। কক্ষের বাহিরে কারারক্ষী পদচারণা করিতেছেন।

শঙ্কর—সূর্য্যাস্তের আর দেরী নেই। সেদিনকার সেই স্বপ্ন মনে পড়ছে। এতদিনে স্বপ্ন সত্য হল। ভাস্কর যদি সময়মত ফিরতে না পারে তাহলে আমার প্রাণদণ্ড সুনিশ্চিত। কিন্তু তাতে ভাস্করের প্রাণ বেঁচে যাবে। আমার প্রাণ দিয়ে বন্ধুর প্রাণ বাঁচাতে কি আমি কাতর? না-না। সেই যে একদিন তাদের বাড়ির কাছে ভীমা নদীতে সাঁতার দিতে দিতে আমি স্রোতের বেগে ভেসে গিয়েছিলেম, মৃত্যু থেকে উদ্ধারের আর কোন আশা ছিল না; সেদিন নিজের প্রাণকে উপেক্ষা করে ভাস্কর আমায় মৃত্যুর গ্রাস থেকে ফিরিয়ে এনেছিল। সেদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেম আমার প্রাণের বিনিময়ে যদি কোনদিন তার প্রাণ বাঁচাতে পারি পশ্চাৎপদ হব না। আজ সেই প্রতিজ্ঞাপূরণের দিন উপস্থিত, আজ আমার নিজের কাছে নিজের সেই সত্যরক্ষার দিন এসেছে। বন্ধুর হয়ে মৃত্যুবরণ আমার পক্ষে অমৃতের সমান—কিন্তু পুষ্পা? সে কি আমার মৃত্যু সহ্য করতে পারবে? আহা শৈশবসঙ্গিনী আমার—বাসরের উৎসব শেষ হতে-না-হতে তাকে ছেড়ে চলে এসেছি। সেই সজল চোখদুটিতে কি ব্যাকুলতা, কি প্রেম ভরা দেখে এসেছি। নাঃ, তার কথা আর ভাবব না—তাহলেই আমার অমৃতে বিষ ঘুলিয়ে যাবে। যিনি বিশ্বের পতি তিনিই তার রক্ষা করবেন।

শঙ্করের কারাগৃহের বাহিরে কারারক্ষীর আপন মনে গান।

ভবজলধির ঢেউয়ের নাচন
ইঙ্গিতে যার হয়,
সে চিরমঙ্গলময়,
রও তাহারি বুকেতে লয়!
হও অভয়! অভয়! অভয়!

শঙ্কর—কে গাইছে? এ-যে শৈশবে আমার মায়ের শেখান গান। তাঁর কোলে চড়ে আধ আধ ভাষে গাইতুম। মা, আজ তুমি স্বর্গ থেকে আমাকে এ গান আবার শোনাচ্ছ?

জানু পাতিয়া বসিয়া গান।

যে তমসের পারে দেয় পরিচয়
পুরুষ জ্যোতির্ময়
সে চির মঙ্গলময়!
রও তাঁহারি প্রেমে অজয়!
হও অভয়! অভয়! অভয়!
বল অভয়! অভয়! অভয়!

কারাগারের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া একজন সৈনিকের প্রবেশ। শঙ্করের গান শেষ হওয়া পর্য্যন্ত সে নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিল। গান সমাপনান্তে—

সৈনিক—সময় হয়ে এসেছে। মন্ত্রী ও সভাসদেরা সকলে সেদিকে গেছেন, আপনাকে নিতে এসেছি।

শঙ্কর—(দীপ্ত প্রফুল্লাননে)—চল যাই!

তৃতীয় দৃশ্য

বধ্যস্থান। জল্লাদ দাঁড়াইয়া আছে। সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ।

জল্লাদ—অনেককে সাবাড় করেছি। কোন দিন কোন কিন্তু হয়নি মনে। আজই শুধু রাজার এই সরল জামাইটাকে তার বেইমান বন্ধুর হয়ে প্রাণে মারতে আমার বুকখানা কেমন করছে। আজ নিজেকে সত্যিই জল্লাদ মনে হচ্ছে। ঐ যে মন্ত্রী আসছেন। ধন্যি বাপ! কষাইয়ের চেয়েও কঠোর!

একদিক দিয়া সপারিষদে মন্ত্রীর প্রবেশ, অপর দিক দিয়া বিপুল জনতার সহিত প্রহরীবেষ্টিত, শৃঙ্খলায়িত, প্রশান্ত হাস্যবদন শঙ্করের প্রবেশ।

মন্ত্রী—ওকে হাড়িকাঠের নীচে নিয়ে যাও।

জনতা হইতে একজন—মন্ত্রীমহারাজ! আপনার বুকে কি স্নেহমমতা, দয়ামায়া কিছুই নেই? নিরপরাধ পুত্রকে এমনি করে বলি দিচ্ছেন?

মন্ত্রী—এখন আমি পিতার আসনে নই, ধর্ম্মাধিকরণের আসনে। রাজহত্যার অপরাধে অপরাধী বা তার প্রতিনিধিকে দণ্ড দেওয়া আমার ধর্ম্ম, পুত্রস্নেহে বিচলিত হওয়া আমার ধর্ম্ম নয় এখন। জল্লাদ নিজের কাজ আরম্ভ কর।

শঙ্করের শৃঙ্খল খুলিয়া তার চক্ষু একখানা কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রে আবৃত করা হইল। তার মাথা হাড়িকাঠের উপর রক্ষিত হইল। জল্লাদ খাঁড়াহাতে প্রস্তুত রহিল। সকলে সূর্য্যের দিকে দেখিতে থাকিল। যখন শেষরশ্মি বাকী রহিল, জল্লাদ কোপ উঠাইবার জন্য খাঁড়া তুলিল। মন্ত্রীর সঙ্কেত অঙ্গুরী দেখাইয়া একজন সৈনিক জল্লাদের কানে কানে কিছু বলিল। জল্লাদের মুখে আনন্দের ভাব প্রকাশিত হইল।

জল্লাদ—আর সময় নেই। শঙ্কর ইষ্টদেবতা স্মরণ কর, এই কোপ তুললুম।

নেপথ্যে কোলাহল।

জনতার মিলিত কণ্ঠে—থাম, থাম, থাম, এসেছে, এসেছে। ভাস্কর এসেছে!

ভাস্করের দ্রুত প্রবেশ ও হাড়িকাঠের দিকে অগ্রসর হওন।

ভাস্কর—জল্লাদ, এখনও সূর্য্য অস্ত হয় নি, দেখ এখনও একটি রশ্মি রয়েছে। আমি এসেছি—আমার গলায় কোপ মার—শঙ্করকে মুক্তি দাও।

জল্লাদ—মহারাজ, কি হুকুম?

মন্ত্রী—যে আসল অপরাধী সেই নিজের স্থান নিক।

শঙ্করকে সরান হইল। ভাস্কর মাথা পাতিল। জনতার ভিতর হইতে বৃদ্ধ অগ্রসর হইলেন। নিজের ছদ্মবেশ খুলিয়া ফেলিয়া রাজার বেশে শঙ্কর ও ভাস্কর দুইজনকে দুই হাতে জড়াইয়া আলিঙ্গন করিলেন।

রাজা—দুই বন্ধুর পরীক্ষা হল!

দর্শকদের মধ্য হইতে দুইজন নিজেদের আবরণবস্ত্র খুলিয়া মায়া ও সত্যরূপে দর্শন দিলেন।

মায়া—দুই শক্তির পরীক্ষা হ'ল। মায়ার পরাজয়, সত্যের জয় হল।

সকলে—জয় সত্যের জয়!

মায়া—(জানু পাতিয়া) সত্যং শিবং সুন্দরং তোমাকে নমস্কার!

আকাশে প্রতিধ্বনি—সত্যং শিবং সুন্দরং তোমাকে নমস্কার।
আকাশে পূর্ব্ববৎ গন্ধর্ব্বদেবতাগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব।

মর্ত্ত্যে নিনাদ—জয় সত্যের জয়!

পটক্ষেপ

সাহিত্য ও সুনীতি

শ্রীকামিনী রায়

বর্ত্তমানে স্থানে স্থানে নীতি-শৈথিল্যের কথা শুনিয়া আমার যাহা মনে হইয়াছে আজ তাহাই তরুণ-তরুণীগণের নিকটে প্রকাশ করিতেছি। আমার মনে হয় নির্ব্বিচারে পাশ্চাত্য রীতিনীতির ও সাহিত্যের অনুকরণের আত্যন্তিক চেষ্টা এই শৈথিল্যের জন্য কিয়ৎপরিমাণে দায়ী। আমি বলিতে চাহি না যে যাহা-কিছু ভারতীয় তাহাই পাশ্চাত্য জগতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কোনও দেশের বা কোনও যুগের সভ্যতা অন্য দেশের এবং অন্য যুগের সভ্যতা হইতে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ এবং হিতকর, একথা স্বীকার করি না। এদেশে যে-সকল দুর্নীতি এবং কুরীতি আছে সে-সকল যেমন অবশ্য-বর্জ্জনীয় সেইরূপ পাশ্চাত্য দেশেরও যাহা অভদ্র, অশোভন এবং মানবচরিত্রের হীন দিকের প্রকাশ তাহাও বর্জ্জনীয়; যাহা ধর্ম্মভাব ও নীতিজ্ঞানকে সুদৃঢ় করে, রুচিকে নির্ম্মল করে, আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে উন্নত করে, সম্বন্ধের পবিত্রতা স্মরণপূর্ব্বক গৃহ পরিবার ও সমাজের হাওয়া বিশুদ্ধ রাখে, এক কথায় যাহা আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ করে তাহাই সকল দেশের সভ্যতা হইতে গ্রহণীয়।

একটা কথা আছে "ঘ্রাণেন অর্দ্ধ ভোজনং"। দর্শন ও পঠন দ্বারা জীবনের অর্দ্ধ গঠন হয়, বলা বোধ হয় অত্যুক্তি নয়। সিনেমায় দেখা চোরডাকাতের অসমসাহসিকতা এবং অদ্ভুত কৌশল, চুরিডাকাতির দূষণীয়তা ভুলাইয়া অনেক তরুণ মনকে সেই সাহসিকতা ও কৌশল-কলার মোহে অভিভূত করে এবং চুরিডাকাতিতে লিপ্ত করে। যাহা বার-বার চক্ষে দেখা যায় তাহার সম্বন্ধে মানুষের ঘৃণা কমিয়া আসে, বিশেষ হাস্যরস যদি তাহাতে প্রচুর পরিমাণে উৎসারিত হয়। তখন কতকগুলি অশ্লীল হাবভাব এবং দুষ্কার্য্য যেন একটা ঠাট্টা-তামাশার ব্যাপার হয়।

রাস্তা ঘাটে গৃহে পরিবারে যাহা চক্ষে পড়ে তদপেক্ষা রঙ্গভূমিতে যাহা অভিনীত দেখা যায়, তার ছবি মনে দৃঢ় অঙ্কিত থাকে, মনের চিন্তা এবং প্রবৃত্তির উপর তাহার প্রভাব বিস্তৃত হয় এবং অবস্থাবিশেষে কার্য্যেও তাহার প্রভাব প্রকাশ পায়। সাহিত্য সম্বন্ধেও সেই কথা। শক্তিশালী লেখকের দ্বারা চিত্রিত চরিত্র মনের মধ্যে স্থায়ী ছাপ রাখিয়া যায়। আমরা নিজের অজ্ঞাতসারে তাহাদের সঙ্গে লইয়া বেড়াই এবং সঙ্গগুণে যাহা ঘটিতে পারে, সাধু-অসাধু ভেদে তাহা ঘটিয়া থাকে। এ-দেশে নারীর সতীত্ব অর্থাৎ স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম এবং শারীরিক সংযম ও শুচিতা চিরকাল নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত এবং আদৃত হইয়া আসিয়াছে। সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তী প্রভৃতি নারীর কথা পড়িয়া এবং মুখে মুখে শুনিয়া ভারতে নারীর উচ্চ আদর্শ সেই ভাবেই গঠিত হইয়াছে। কিন্তু যে-আদর্শ নারীকে দুশ্চরিত্র স্বামীর সেবাদাসী ও খেলার জিনিষ করিয়া রাখে,-যাহা নারীকে আত্মমর্য্যাদা হইতে ভ্রষ্ট করে, এরূপ আদর্শও এ-দেশে আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু বর্ত্তমানে ইউরোপের মহাদেশের উপন্যাসগুলির তর্জ্জমা এবং তাহাদের একান্ত অনুকরণে লিখিত গল্প উপন্যাস একদল তরুণ-তরুণীর প্রেম ও নীতির যে-আদর্শ নূতন করিয়া গড়িয়া দিতেছে তাহা আরও বহু গুণে শোচনীয়। আমার মনে হয়, অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের হাতে এই সব বই দেওয়া বিধেয় নহে।

সাহিত্যের সমালোচক হইতে আমি ভয় পাই। অনেকের মত যে, সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্প-কলার সম্বন্ধে—অর্থাৎ আর্ট সম্বন্ধে—নীতিবাদ খাটে না। অভিপ্রায়-মূলক সাহিত্য, অর্থাৎ কোনও নীতির প্রচারের অভিপ্রায়ে, মানুষকে ভাল হইবার জন্য স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়া যাহা লিখিত তাহা আর্ট নয়। যাহা সুন্দর এবং আনন্দ দেয় তাহাই আর্ট। এ কথা মানিয়াও কিন্তু বলিতে হয় যে,

এক জিনিষই সকলের কাছে সমান সুন্দর এবং মধুর না-ও লাগিতে পারে। ফুলের নির্ম্মলতা, সৌন্দর্য্য এবং সৌরভ সকল মানুষকে সমান আনন্দ দেয় না। মানুষের সৌন্দর্য্যবোধ ও আনন্দানুভূতির মূলে থাকে তাহার রুচি। এই রুচিকেই সর্ব্বাগ্রে সুগঠিত এবং বিশুদ্ধ রাখা আবশ্যক। কু-সাহিত্য, কু-দৃশ্য মানুষের রুচিকে বিকৃত করে। যে-রকম সমাজনৈতিক ধারণা এবং তদনুরূপ আচরণ এ-দেশে ছিল না অথবা কেবল কদাচিৎ দেখা যাইত, তর্জ্জমা-করা উপন্যাসের অনুকরণে সেই ধারণা সেই আচরণ এবং নারীপুরুষের অবৈধ সম্বন্ধের কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা দেশের নূতন সাহিত্য-ব্যবসায়ীদের পুস্তককে কলঙ্কিত করিতেছে। সাহিত্য যখন ভবিষ্যৎ সমাজের জীবনকে গঠন করে তখন এরূপ সাহিত্যকে উৎসাহ না দেওয়াই উচিত। আর্ট নাম দিয়া অনেকে অনেক কিছু ক্ষমা করিতে প্রস্তুত। আমাদের দেশেই প্রাচীন অনেক ভাস্কর্য্যে অনেক কিছু আছে যাহা সাধারণ লোকের রুচিকে আঘাত করে। বর্ত্তমান শিল্পীরা তাহা অনুকরণ করেন না। আমাদের দেশের কাব্যে অনেক স্থানে অশ্লীল উপমার বর্ণনা আছে, এখন তাহা সুরুচিসঙ্গত মনে হয় না। সে-কালের আদিরসঘটিত রচনা এবং বর্ত্তমানের রবীন্দ্রনাথের প্রেমসঙ্গীতে আকাশপাতাল পার্থক্য। আমরা কোন্‌টাকে এখন উচ্চাসন দিই? আমাদের তরুণ সাহিত্যিকগণ তাঁহাদের সাহিত্যসাধনা দ্বারা দেশের চিন্তা ও চরিত্রকে উন্নত করুন এই প্রার্থনা।

একটা প্রশ্ন ওঠে "যাহা সত্য অর্থাৎ মানবজীবনে এবং সমাজে যাহা ঘটে, সাহিত্যে তাহা কেন স্থান পাইবে না?" অনেক তরুণ-তরুণীই আমাকে এই প্রশ্ন করিয়াছেন। তাহার উত্তরে আমি বলি "সাহিত্য আর্ট" এই জন্য। যাহা সুন্দর, যাহা আনন্দদায়ক, যাহা মনকে উর্দ্ধমুখ করে তাহাই আর্ট। চিত্রকর নদী, পর্ব্বত, বৃক্ষলতা, পুষ্পাদি অঙ্কিত করেন, কিন্তু নর্দ্দমা ইত্যাদি অপবিত্র এবং কুদৃশ্য স্থান আঁকেন না। ঐ স্থানগুলিও সত্য এবং মানুষের পক্ষে আবশ্যক।

তরুণদিগের চালচলন এবং নৃত্য-অভিনয়াদি সম্বন্ধে আমি বলিতে চাই যে, নৃত্য মাত্রই দূষণীয় নয়। স্বাধীনভাবে চলাফেরা স্বাভাবিক এবং আবশ্যক, কিন্তু তাঁরা যেন সর্ব্বপ্রযত্নে বিদেশীয় বেশ-বিন্যাসের এবং নৃত্যাদির নির্লজ্জতাটুকু পরিহার করেন। আপনার শরীরকে সকলে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখুন, উহা সকলের চক্ষের সম্মুখে অর্দ্ধাবৃত ও লোভনীয় করিয়া দেখাইবার যে উৎকট আকাঙ্ক্ষা পশ্চিমের বর্ত্তমান যুগের নারীদের পাইয়া বসিয়াছে, তাহা তাহাদের দেশেও সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে না। দেহের সৌন্দর্য্যই নারীর চরম সৌন্দর্য্য নহে।

বিদেশ হইতে আনীত একটা কচুরি-পানা আজ বঙ্গদেশের নদী, বিল, খাল, পুষ্করিণী ছাইয়া ফেলিয়া মহা অনিষ্ট সাধন করিতেছে। কে জানে বিদেশী সাহিত্যের দুই-একটা আবর্জ্জনা ও বিদেশী নৃত্যের কুরুচির দ্বারা কত গৃহপরিবারে দুর্নীতি প্রবেশ করিবে।

সুরুচির পথে সুনীতি এবং সুনীতির সহিত যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, এবং যাহা শুভ তাহাই আমাদের তরুণ সমাজকে গৌরবান্বিত করুক।

ভাটিয়ালী

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

আমি ও আমার প্রিয়ার মাঝারে
যে ছোট নদীটি বহে,
কত ছলে সে যে তাহার কথাটি
কানে কানে মোর কহে !
কলকলি আসে, খলখলি হাসে,
ছলছলি যায় চলি ;
কেহ না বুঝুক, আমি যে বুঝি না—
সে কথা কেমনে বলি ?

এপারে নদীর খরবেগখানি
কূলের কোলটি ঘেঁসে,
ও পারের জল অতল শীতল
তটের প্রান্তদেশে ;
এ-দিকের চর তৃষিত উষর
তৃণহীন বালুময়,
লতাপাতাফুলে ভরা আন কূলে
অসীমের বিস্ময় !

নদীর ওপারে খানিক ওধারে
উজানে প্রিয়ার বাস,
ভাটি মুখে তাই সংবাদ পাই
নিতি নিতি বারোমাস ;
রঙীন সাড়ীটি কবেই-বা কাচে
মাথাটি ঘষে বা কবে—
সাথে সাথে তার বারতাটি আসে
বর্ণে ও সৌরভে।

ভেসে-আসা তার চুলের ফুলটি
কভু-বা ধরিয়া রাখি,
ধরিতে পারি না জলতরঙ্গে
সঙ্গের কথাটা কি !
ইঙ্গিতে আর ভঙ্গীতে ভরি'
যত ভাবি সেই কথা,
চঞ্চল জলে তত ছলছলে
পারের মন্থরতা !

সন্ধ্যাবেলায় সহজ লীলায়
যে ঘট সেথা সে ভরে,
ঢেউখানি তার কেঁপে-কেঁপে লাগে
এপারের বালুচরে ;
সেথায় বাগানে কোকিল ডাকিলে
হেথায় হেনার ঝাড়ে
ফুটে উঠে ফুল গন্ধে আকুল
রাতের অন্ধকারে।

চখাচখী যারা চরে এই চরে,
সন্ধ্যার কিনারায়,
চরণচিহ্ন রাখিয়া এ পারে
ও পারে উড়িয়া যায় ;
জানি না সেথা কি সুধার সায়র
আছে ওপারের কোলে,
দিনের পাখীরে রাতে যা ভুলায়ে
উন্মনা ক'রে তোলে !

জলের কিনারে সারারাত ধরে
পেতে বসে থাকি জাল,
রাতের আঁধার মুছে দিয়ে যায়
মনের অন্তরাল ;

চোখের বালাই কিছু রবে নাই,—
ঘুচে যায় দূরে কাছে,
নিশার মশারি-তলে ভাবি প্রিয়া
মোরই পাশে শুয়ে আছে।

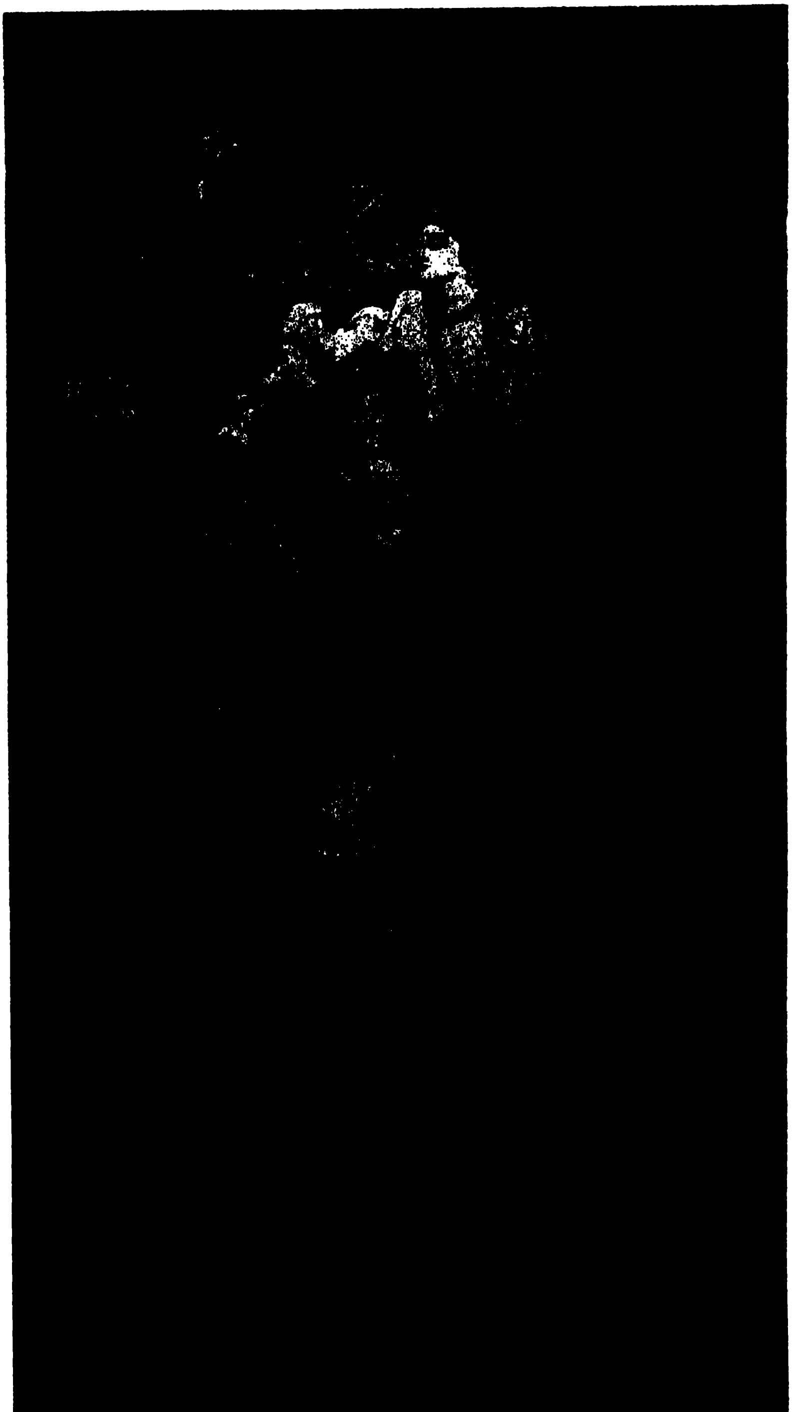
পায়ের তলায় দোল দিয়ে যায়
চিরপরিচিত ঢেউ,
থম্‌থমে রাত, লুকায়ে কোথাও
দেখিবার নাহি কেউ;
ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে সেই ফাঁকে তারে
ব'লে নিই যত কথা,
দিনে বড় বাধা—রাতের আঁধারে
জানাই প্রাণের ব্যথা।

মাছের আওয়াজে মোহ ভেঙে যায়,
চোখ মেলে দেখি চেয়ে,—
কোলের নদীটি কালেরই মতন
চুপি চুপি চলে বেয়ে;
গাঙ-চিলেদের কলরব উঠে
ওপারের ঝাউ বনে,
বাঁশের মাচায় রাত কেটে যায়
তন্দ্রায়-জাগরণে।

উষা-বধূ আসি সোনার ঝাঁটায়
করে সংমার্জ্জনা
গগনাঙ্গনে জমে-উঠা কালো—
রাতের আবর্জ্জনা;
ফুটে উঠে যত পরিচিত রূপ—
নদী, নদীপরপার,
তারি সাথে সেই চিরমোহময়ী
মূর্ত্তিটি কামনার!

তরীখানি মোর নদী কোলে-কোলে
বৃথায় ঘুরিয়া মরে,
ছোট বুকে তার ঠাঁই হওয়া ভার,
দুজন নাহিক ধরে;
চির-নিরুপায় একা বাহি তাই
একক প্রাণের বোঝা—
লবণসাগরে এ যেন হয়েছে
তৃষ্ণার বারি খোঁজা!

তাই যদি হয়, মনে ভাবি, আরও
উজানে বাঁধিব ঘর,
নদীমুখে তারে তবু ত জানাতে
পারিব এ অন্তর;
যতদিন এই খরবেগখানি
বহিবে নদীর জলে,
ভাটিয়ালী সুর ধ্বনিবে বিধুর
পারের অতলতলে!



"সিদ্ধদ্বন্দ্বৈর্ জলকণভয়াদ্ বীণিভির্ মুক্তমার্গঃ"

শ্রীরামগোপাল বিজয়বর্গীয়

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের চিত্র সংগ্রহ হইতে

মাতৃ-ঋণ

শ্রীসীতা দেবী

১৮

প্রতাপের দিন কাটিতে লাগিল যেন ঘূর্ণীঝড়ের মধ্য দিয়া। দু-মিনিট নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া যামিনীর কথা ভাবিবার অবকাশ পর্য্যন্ত সে নিজেকে দিত না। স্কুলের কাজ ও মিহিরকে পড়ানোর কাজ বাদে যেটুকু সময় হাতে পাইত, তাহাও কলিকাতা শহরময় টো-টো করিয়া ঘুরিয়া কাটাইয়া দিত।

কোথায় স্কলারশিপের জোগাড় হয়, কাহার সঙ্গে দেখা করিলে পাথেয় সম্বন্ধে কিছু সাহায্য পাওয়া যায়, সর্ব্বাপেক্ষা সস্তায় থাকিয়া পড়ার সুবিধা কোন্‌খানে, তাহার খবরই-বা কে জানে, এই সকলের সন্ধানেই তাহার দিনরাত কাটিয়া যাইত। একবার আমেরিকায় গিয়া পড়িলে, সে যে কৃতবিদ্য হইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিবে, এ বিষয়ে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। যত জায়গায় গিয়া দেখা করিত, সর্ব্বত্রই যে উৎসাহ পাইত তাহা নয়, এমন কি অপমানজনক ব্যবহারও কোথাও কোথাও পাইত, কিন্তু এ সকল গায়ে মাখিবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিল না। যেমন করিয়া হোক, সে এখন ভাসিয়া পড়িতে চায়।

বাড়িতে মায়ের কাছে এবং ভাইয়ের কাছে সে চিঠি লিখিয়াছিল। যামিনীর কথা অবশ্য কিছু উল্লেখ করে নাই। অবস্থার উন্নতি করিতে বিদেশে যাইয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে চায়, ইহাই লিখিয়াছিল। ভাই সানন্দেই সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিল, দু-এক বৎসর সে যেমন করিয়া হোক, কষ্টেসৃষ্টে চালাইয়া লইবে। মা অবশ্য অনেক কান্নাকাটি করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলেন, কিন্তু যাইতে নিষেধ তিনিও করেন নাই।

মিহিরকে পড়াইতে যাইবার সময় আজকাল সে দশ-পনর মিনিট আগেই সর্ব্বদা গিয়া হাজির হইত। এই সময়টুকুমাত্র সে বিশ্রামের জন্ম রাখিয়াছিল। যেদিন যামিনীর দেখা পাইত সেদিন ত মুহূর্ত্তেই সকল ক্লান্তি অবসাদ তাহার কোথায় যে ভাসিয়া যাইত তাহার ঠিকানা থাকিত না, যেদিন তাহার দেখা না পাইত সেদিনও তাহার ধ্যানের পুলকে নিজের শ্রান্ত চিত্তকে সরস ও সঞ্জীবিত করিয়া তুলিত।

যামিনী রোজই নীচে আসিয়া দেখা করিতে ভরসা পাইত না। বাড়িতে লোক যদিও বিশেষ কেহই নাই, তবু মিহির আছে, চাকর-বাকররা আছে। তাহাদের দৃষ্টি যে কাহারও চেয়ে কম প্রখর নয়, তাহা যামিনীর জানা ছিল। মাষ্টারবাবুর সঙ্গে দিদিমণির অতিরিক্ত ভাবের কথা লইয়া রান্নাঘরে হয়ত ইহারই ভিতর আলোচনা সুরু হইয়াছে। তবু ভাগ্য ভাল যে আয়াটি এখানে নাই। সে ত বাড়ির খবর লইয়াই শুধু সন্তুষ্ট ছিল না, সারা পাড়ায় কোথায় কে কি করিতেছে, তাহার সংবাদ লইয়া বেড়াইত এবং জানদার নিকট সরবরাহ করিত। যামিনীর মন অতিশয় কোমল বলিয়া অতি সহজেই সে আঘাত পাইত, কেহ তাহার নামে নিন্দাসূচক কিছু বলিয়াছে শুনিলেই তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িত, ঠোঁট কাঁপিতে থাকিত। কিন্তু এহেন মেয়েও এখন কিছু পরিমাণে শক্ত হইয়াছিল। সে জানিত এই ভালবাসার খাতিরে তাহাকে অনেক সহ্য করিতে হইবে, তাহার জন্ম নিজেকে প্রস্তুত করিবার চেষ্টা সে ভিতরে ভিতরে করিতেছিল। কিন্তু সংসার যে কি জিনিষ তাহার সে জ্ঞান অতি অল্পই ছিল। ইহার ভিতর সংগ্রাম-সংঘাত যে কি ভীষণ, কি নিষ্ঠুর তাহা সে কল্পনাও করিতে পারিত না, সুতরাং তাহার দিন স্বপ্নলোকেই কাটিতেছিল। প্রেম কি তাহা সে সবে অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, আর কোন অনুভূতির স্থান তাহার অন্তরে ছিল না।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে। সাড়ে তিনটায় মিহির বাড়ি ফিরিবে। চা খাইয়া কোনোদিন বা সে বাহিরে দৌড়

দেয়, একটুখানি হাত-পা মেলিবার জন্য, কোনোদিন বা আপিস-ঘরে বসিয়াই প্রতাপের অপেক্ষা করে। যেদিন সে বাহির হয়, সেদিন যামিনী প্রতাপের সাড়া পাইলেই নামিয়া আসে। যেদিন মিহির বসিয়া থাকে সেদিন ভাল কোনো উপলক্ষ্য না থাকিলে নামে না। মিহিরকেও আজকাল সে ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যামিনী সুন্দরী তাহা সে নিজে জানে। শৈশবকাল হইতে ঘরে-বাহিরে নিজের রূপ-লাবণ্যের আলোচনা সে শুনিয়া আসিতেছে। মনে মনে নিজের সৌন্দর্য্যের অহঙ্কার তাহার খানিকটা অবশ্যই ছিল, কিন্তু ইহার সম্বন্ধে খুব বেশী সচেতনতা ছিল না। সাজগোজ করা ছিল মায়ের অন্যান্য নিয়মের মতই একটা নিয়ম। না করিলে অন্যায় হয় বোকামী হয়, এই ভাবটাই এতদিন বেশী ছিল। কিন্তু এই প্রথম নিজের সৌন্দর্য্যে সে নিজে আনন্দ বোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার সৌন্দর্য্য হইয়াছিল তাহার অর্ঘ্য। প্রসাধনের ভিতর নিজের সুন্দর দেহকে সুন্দরতর করার চেষ্টায় সে এক নূতন রস খুঁজিয়া পাইতেছিল। আনন্দ দিয়া এত আনন্দ যে পাওয়া যায়, তাহা যামিনী এতদিন বুঝিত না। কিন্তু প্রতাপের মুগ্ধ দৃষ্টির ভিতর দিয়া এখন সে তাহা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

বিকাল বেলা সে সযত্নে সাজিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিত, যদিই প্রতাপের সঙ্গে দেখা করার সুবিধা হয়। দেখা করিতে না পারুক, জানলায় দাঁড়াইয়া দেখা রোজই দিত। প্রতাপের দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলিত হইবামাত্র তাহার সমস্ত দেহের ভিতর দিয়া পুলক-শিহরণ বহিয়া যাইত। জীবনে অনুভূতির এমন তীব্রতা তাহার এই প্রথম। যামিনী প্রথম জাগিয়া উঠিয়া, নিজেকে চিনিতে-ছিল। এতদিন সে বাস করিয়াছে অবাস্তব স্বপ্নলোকে মনুষ্যসমাজে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা নিদ্রাভিভূতের মত।

যামিনী আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চুল বাঁধিবার জোগাড় করিতে লাগিল। আয়নার সামনের টেবিলটি প্রসাধনের উপকরণে পরিপূর্ণ। সেগুলির যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে অনেক সময় কাটিয়া যায়। সবগুলির অবশ্য রোজ সে ব্যবহার করে না। ঘড়ির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া চলে।

খোঁপা বাঁধা শেষ করিয়া যামিনী মুখ হাত ধুইয়া আসিল। আলমারী খুলিয়া, থাকে থাকে সজ্জিত শাড়ী, ব্লাউজগুলির দিকে চাহিয়া, কোন্‌টি পরিবে মনে মনে স্থির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইন্দ্রনীল মণির মত রং একখানি রেশমী শাড়ী তাহার বড়ই মনে ধরিল, কিন্তু ঘরে বসিয়া এত সাজ করিলে লোকে মনে করিবে কি? কোথাও যাইবারও ত উপায় নাই। মা তাহাকে প্রায় সর্ব্বত্রই যাইতে বারণ করিয়া দিয়াছেন। বাবার সঙ্গে যাওয়া যায় অবশ্য, কিন্তু ততক্ষণ ত প্রতাপ তাহার জন্য বসিয়া থাকিতে পারিবে না? সে ই যদি না দেখিল ত সাজ করিয়া হইবে কি? কিন্তু সময় বহিয়া যায় যে? যামিনী সব ভাবনা-চিন্তা দূরে ঠেলিয়া শাড়ীখানি টানিয়া বাহির করিয়া, আলমারী বন্ধ করিয়া দিল।

কাপড় পরা শেষ করিয়া, গলায় একটি বিলাতী মুক্তার মালা ঝুলাইয়া, সে আবার বড় আয়নার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। নিজের সৌন্দর্য্যের জ্যোতিতে তাহার নিজের চোখেই যেন ধাঁধা লাগিয়া গেল। সে কি আগেও এতটা সুন্দর ছিল, না এই কয়েক দিনেই তাহার রূপ এতখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে? আগে কি নিজের দিকে কখনও সে ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখে নাই? প্রতাপ আজ তাহাকে দেখিয়া মনে করিবে কি? কি একটা কথা ভাবিয়া যামিনীর সুন্দর মুখে রক্তোচ্ছ্বাস ঘনাইয়া উঠিল।

নীচে মিহিরের পায়ের শব্দ শোনা গেল। যামিনীর অত্যন্ত লজ্জা করিতে লাগিল, ভাইয়ের কাছে সে কি কৈফিয়ৎ দিবে? মিহির জিজ্ঞাসা করিবে নিশ্চয়ই। কিছু একটা বানাইয়া তাহাকে বলিতে হইবেই।

কি বলিবে স্থির করিবার আগেই মিহির একলাফে তাহার ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। ঘরে পা দিয়াই সে চেঁচাইয়া উঠিল, "কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি?"

যামিনী থতমত খাইয়াই বলিল, "কোথাও না।"

মিহির বলিল, "হ্যাঁ, কোথাও না বই কি? আমাকে ফেলে একলা যাবে তাই বল দোতলার ঘরে হাঁ ক'রে বসে থাকবার জন্যে নিশ্চয়ই এত সাজনি?"

যামিনী আর বলিবার কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল, "আমার সঙ্গে আজ এক জন দেখা করতে আসবে ভাই।"

মিহির বলিল, "কে? তোমার সেই মেমসাহেব বুঝি? সেই ঢিপ্‌সী মোটা?"

যামিনী একটু আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "আঃ! কোথায় আবার ঢিপ্‌সী মোটা।"

মিহির বলিল, "না মোটা কি আর! মায়ের দেড়গুণ মোটা। একলা এক পাউণ্ড কেকই মেরে দিল। বাবা, আমি চা-টা খেয়ে আসি আগে, নইলে মেমসাহেবের জন্যে অপেক্ষা করলে কিছুর গুঁড়োও মিলবে না," বলিয়া সে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

যামিনী একলা ঘরে দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল। কোথায় প্রতাপ আর কোথায় সেই পুরাতন পিয়ানো-শিক্ষয়িত্রী মোটা মেমসাহেব। কিন্তু একবার কেক খাইতে না পাওয়ায় মিহির সে ভদ্রমহিলাকে আর জীবনে ভুলিতে পারে নাই। আজও ঘরে চায়ের জন্য কিছু কেকের আয়োজন ছিল, সুবিধা হইলে প্রতাপকেও চা খাইতে বলিবে বলিয়া যামিনী জোগাড়টা একটু বেশীই রাখিয়াছিল। মেমসাহেবের ভয়ে মিহির সব একলাই শেষ করিল কি-না দেখিবার জন্য যামিনী তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিল। ঠিক সেই সময়ে প্রতাপও আসিয়া উপস্থিত হইল।

যামিনী সিঁড়ির মুখেই দাঁড়াইয়া গেল। প্রতাপ স্মিতমুখে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "কোথাও বেরুচ্ছেন নাকি?"

যামিনী মাথা নাড়িয়া জানাইল যে, সে কোথাও যাইতেছে না। খাইবার ঘর হইতে মিহির একমুখ কেক লইয়া চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, কেক ছাড়া আজ আর কিছু নেই নাকি?"

যামিনী প্রতাপকে বলিল, "চলুন না, আপনিও একটু চা খেয়ে নেবেন। খোকার খাওয়া শেষ হ'তে এখনও ঢের দেরি।" খোকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আম ত অনেক রয়েছে, ছোট্‌কে বল দুটো ভাল দেখে কাট্‌তে।"

প্রতাপ যামিনীর সঙ্গে সঙ্গে খাইবার ঘরে গিয়া ঢুকিল। মিহির তাহাকে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইল বটে, তবে মুখে কিছু বলিল না। যামিনী প্রতাপের জন্য চা করিতে লাগিল। প্রতাপ একদৃষ্টে তাহাই দেখিতে লাগিল। অনেক কথা তাহার মুখের কাছে ভীড় করিয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু বলিবার কোন সুযোগ খুঁজিয়া পাইল না।

খাওয়া শেষ করিয়া মিহির বলিল, "আমি জুতো-মোজাটা ছেড়ে এখনই আস্‌ছি।"

প্রতাপ সম্মতিসূচক মাথা নাড়িতেই সে অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন প্রতাপ যামিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "নিজে কিছু খেলেন না যে?"

প্রতাপের সামনে খাইতে যামিনীর বড় লজ্জা করে। খাওয়া জিনিষটা বড়ই যেন স্থূল, তাহা কি যেখানে সেখানে চলে? সে শুধু এক পেয়ালা চা ঢালিয়া লইয়া বসিয়া নাড়িতেছিল। বলিল, "এ সময় আমি বড় একটা কিছু খাই না।"

প্রতাপ জিজ্ঞাসা করিল, "কারও আসবার কথা আছে নাকি?"

যামিনী হঠাৎ একটু হাসিয়া বলিল, "না, আর কারও আসবার কথা নেই।"

এইটুকু কথায় এবং হাসিতে প্রতাপ একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। তাহারই জন্য যামিনী এত যত্ন করিয়া সাজিয়া বসিয়া আছে? বিস্মিত হইবার কথা নয়, কারণ প্রেমাস্পদের জন্যই নারী চিরকাল সাজিয়া থাকে, তাহারই চক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হইতে চায়, তবু প্রতাপ বিস্মিত হইল। নিজের অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যকে সে এখনও ভাল করিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। মুখের কথায় নিজের হৃদয়ের ভাব বুঝাইবার ক্ষমতা তাহার ছিল না, সে শুধু দুই চোখের দৃষ্টি দিয়া সমস্ত অন্তরের পূজা নিবেদন করিতে লাগিল। যামিনী আরক্তমুখে মাথাটা একটু অন্য দিকে হেলাইয়া বসিয়া রহিল।

খানিক পরে প্রতাপ বলিল, "অনেক জায়গায় ঘোরা-ঘুরি ক'রে সম্প্রতি একটু সুবিধার আশা হচ্ছে।"

যামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "স্কলারশিপের কিছু জোগাড় হয়েছে নাকি?"

প্রতাপ বলিল, "ঠিক স্কলারশিপ নয়, তবে 'প্যাসেজ'টা পাবার আশাস পেয়েছি। 'ষ্টিয়ারেজে' গেলে, হাতে কিছু পয়সা থেকেও যেতে পারে। নইলে ত আবার নামতে দেবে না। যাবার আগের যা খরচ তা নিজেই জোগাড় করতে হবে।"

যামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার বাড়ির থেকে একেবারেই কি কিছু 'হেল্প' পাবেন না?"

প্রতাপ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "বাড়ির থেকে আবার 'হেল্প' পাব! তারা নিজেদের খরচ যদি চালিয়ে নিতে পারে তা হ'লেই আমার ঢের 'হেল্প' হবে। আমার বাড়ির অবস্থা যে কি রকম, তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।"

যামিনীর মুখটা একটু বিষণ্ণ দেখাইতে লাগিল। প্রতাপের দারিদ্র্য জিনিষটা তাহার মনে প্রায়ই কাঁটার মত বিঁধিয়া থাকিত। সে জানিত তাহার সুখের পথে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় বাধা। প্রতাপ ধনী হইলে তাহার আর কোনো খুঁৎ কাহারও চোখেই পড়িত না। আর সত্য কথা বলিতে গেলে খুঁৎ এমন কি-ই বা আছে?

প্রতাপ যামিনীর মুখের ভাবটা লক্ষ্য করিল। তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরাইবার জন্য বলিল, "সারাটা দিন কি ক'রে কাটান?"

যামিনী বলিল, "বাড়ির কাজ থাকে, পড়াশুনোও ত অনেক আছে।"

প্রতাপ বলিল, "এই সামনের বছর আপনার পরীক্ষা না?"

যামিনী বলিল, "হ্যাঁ, তাই ত দেবার কথা, কিন্তু কিছুই 'প্রিপেয়ার' করতে পারি নি।"

সাধারণ কথাবার্ত্তা, যে-কেহ যে-কোনো লোকের সহিত এ সব কথা বলে। কিন্তু ইহারই ভিতর এই দুইটি তরুণ চিত্ত কি আশ্চর্য্য রস যে পাইতে লাগিল, তাহা তাহারাই জানে। মিহিরের সাড়া পাইয়া প্রতাপ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল।

পড়াইতে পড়াইতে কত কথাই যে প্রতাপ ভাবিয়া লইল তাহার ঠিকঠিকানা নাই। যামিনীর পড়া ভাল হইতেছে না, না হইবারই কথা। সে যদি পিতাকে বলিয়া কহিয়া একজন প্রাইভেট টিউটারের ব্যবস্থা করে তাহা হইলে কেমন হয়? কিন্তু প্রতাপের কাছে মেয়েকে পড়িতে দিতে তাঁহারা কি রাজী হইবেন? জ্ঞানদার মত যে এসব বিষয়ে ভয়ানক কড়া? যে-কোনো অপরিচিত মানুষ, যদি বিবাহিত হয়, তাহা হইলেই সে যামিনীকে পড়াইবার উপযুক্ত, তাহার স্বভাব-চরিত্রের আর কোনো সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই। প্রতাপ যেহেতু কুমার, তাহার সে অধিকার নাই।

আচ্ছা, সব কথা সোজাসুজি নৃপেন্দ্রবাবুকে খুলিয়া বলিলে কেমন হয়? তাঁহাকে ত জ্ঞানদার মত আভিজাত্য-গর্ব্বিত এবং সঙ্কীর্ণমনা বলিয়া বোধ হয় না। তিনি কি ব্যাপারটাকে সহজভাবে করুণার এবং স্নেহের চক্ষে দেখিবেন না? হয়ত প্রতাপের বিলাত যাওয়ায় কিছু সাহায্যও করিতে পারেন। এমন ত অনেক লোকেই করে। তাহা যদি করেন, তাহা হইলে অল্পদিনের ভিতরেই সে কৃতবিদ্য হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিতে পারে। নিজে খরচ চালাইয়া, পড়াশুনা করিতে হইলে তাহার কতদিন লাগিবে তাহা কে জানে?

"এ অঙ্কটা পারছি না স্তর," মিহিরের কথায় চমকিয়া প্রতাপ কল্পলোক হইতে বাস্তব লোকে ফিরিয়া আসিল। আকাশকুসুমের উদ্যান তাহার শূন্যেই মিলাইয়া গেল। নৃপেন্দ্রবাবু যেমন মানুষই হউন, স্ত্রীর বিরুদ্ধে কোনো কাজ করিতে নিশ্চয়ই ভরসা পাইবেন না। আর জ্ঞানদা বাঁচিয়া থাকিতে কখনই প্রতাপের সঙ্গে কন্যার বিবাহে মত দিবেন না। অবশ্য প্রতাপ বিলাত-ফেরৎ বিদ্বান হইয়া ফিরিয়া আসিলে তাঁহারও মতের পরিবর্ত্তন হইতে পারে, কিন্তু তাহার আগে এ প্রস্তাব তোলাই চলিবে না। যামিনীর যন্ত্রণার পথ উন্মুক্ত করা হইবে মাত্র। যাক, প্রতাপকে এখন অনন্তকর্ম্মা হইয়া অবস্থার উন্নতি করিতে লাগিতে হইবে।

১৯

প্রতাপ সকালেই নিউ মার্কেটে বাজার করিতে আসিয়াছিল। গজুর এক পরমবন্ধু বিদেশ হইতে আসিয়াছেন, আজ রাত্রে গজু তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। রবিবারে বলিলে সকল দিক হইতে সুবিধা হইত, কিন্তু ভদ্রলোক মাত্র একদিনই থাকিয়া চলিয়া যাইবেন। ঠিকা ঝিটার

বাজার করার উপর পিসীমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নাই, দেবী-চৌধুরাণীর ঝি গোবরার মার মত পয়সাকড়ি তাহাকে যা দেওয়া হয়, সবই সে খরচ করিয়া আসে বটে, পিসিমা বলিতে পান না যে, এই খরচটা তাঁহার হইল না, কিন্তু খরচের পরিবর্ত্তে বিশেষ কিছু লাভ করেন না। গজু বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছে, রাজু শাক-মাছ কিনিয়া আনিতে একান্তই নারাজ, অগত্যা পিসিমা প্রতাপেরই শরণ লইলেন। তাড়াতাড়ি করিয়া আসিতে হইবে, নইলে আবার স্কুলের দেরি হইতে পারে ভাবিয়া প্রতাপ টাকা হাতে লইয়া আর এক মুহূর্ত্ত না দাঁড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

পিসীমা যাহা কিছু কিনিতে বলিয়া দিয়াছিলেন, সব ত ভাল দেখিয়া কিনিল, কিন্তু নিজেও কিছু একটা কিনিবার জন্য তাহার মনটা উস্‌খুস্‌ করিতে লাগিল। চারিদিকে নয়নরঞ্জন পণ্যসম্ভারের ছড়াছড়ি। যাহা দেখে তাহাই প্রতাপের কিনিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কিনিয়াই বা লাভ কি? যে-বাসনা মনে উদয় হয়, তাহা ত পূর্ণ হইবার কোনোই সম্ভাবনা নাই। যাহার সুকোমল করকমল দুইটিতে নিজের প্রেমের অর্ঘ্য সে বহন করিয়া লইয়া যাইতে চায়, সেখানে তাহার অধিকার নাই, অন্ততঃ লোকের চক্ষে এখন পর্য্যন্ত নাই। আর সব দিক হইতে চোখ জোর করিয়া ফিরাইয়া লইয়া ফুলের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রতাপ ভাবিতে লাগিল, কিছু ফুল কি যামিনীকে দেওয়া যায় না? তাহাও কি খুব বেশী করিয়া লোকের চোখে পড়িবে? কে কাহাকে কি দিতে পারে বা না-পারে সে-সম্বন্ধে প্রতাপের জ্ঞান অত্যন্তই কম ছিল। শেষে সামান্য বিষয়ে একটুখানি সংযমের অভাবে তাহার ইহজীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা পণ্ড হইয়া যাইবে, এই ভয়ে সে নিজেকে নিরস্ত করিল। দুইটি আধফোটা শ্বেত গোলাপের কুঁড়ি কিনিয়া রুমালটা জলে ভিজাইয়া তাহাতে জড়াইয়া, পকেটে পুরিয়া রাখিল। তাহার পর পিসীমার বাজারের ঝুড়ি লইয়া গাড়ী করিয়া বাড়ি ফিরিয়া চলিল।

বাড়িতে সবাই ব্যস্ত। পিসীমা আর বৌদিদি রান্না-ঘরে ব্যস্ত, গজু বাড়ি নাই, রাজু স্নান করিতে ব্যস্ত, কাহু টের পাইয়াছে বাড়িতে আজ নানারকম খাদ্যদ্রব্যের আবির্ভাব হইয়াছে। মা এবং ঠাকুমাকে লুকাইয়া একটা কিছু মুখে পুরিয়া ফেলা যায় কি-না, সেই চেষ্টাতেই সে ব্যস্ত। প্রতাপ বাজারের ঝুড়ি রান্নাঘরের দরজার সামনে নামাইয়া দিয়া নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

জামাটা খুলিয়া আল্‌নায় রাখিতে গিয়া সে একেবারে চমকিয়া উঠিল। তাহার বাক্সের উপর বই চাপা দেওয়া ও কার চিঠি? সেই নীলাভ খাম, সেই মুক্তার মত হস্তাক্ষর! প্রতাপ চিঠিখানি তুলিয়া লইয়া উল্টাইয়া পোষ্টমার্ক এবং তারিখ দেখিতে লাগিল। কালই পোষ্ট করা। কাল ত যামিনীর সঙ্গে দেখা হইয়াছে, আবার কালই সে চিঠি লিখিয়াছে কেন? প্রয়োজনীয় কথা কিছু থাকিলে সে ত তখনই বলিতে পারিত। চিঠিখানা কেই-বা এখানে রাখিয়া গিয়াছে? রাজু হইলে ত আর রক্ষা নাই, হাড় জ্বালাইয়া মারিবে। কাহু হইতে পারে, কিন্তু সে কি আর অত গুছাইয়া বই চাপা দিয়া রাখিয়া যাইবে?

যাহা হউক, চিঠিতে কি আছে, সেইটাই আগে দেখা দরকার; বারান্দায় বাহির হইয়া একবার নীচের স্নানের ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিল। ঘটী করিয়া জল ঢালার ঝপাঝপ শব্দ হইতেছে এবং রাজু সপ্তমে গান গাহিতেছে, "সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি।" স্নান যতক্ষণ পূর্ণমাত্রায় চলিতে থাকে, ততক্ষণ রাজুর গানের কামাই হয় না। সুতরাং চিঠি পড়িয়া লইবার মত ফুরসৎ হয়ত পাওয়া যাইতে পারে।

সাবধানে খামখানি ছিঁড়িয়া প্রতাপ চিঠি বাহির করিল। এ চিঠিখানিও ছোট, মাত্র দেড় পৃষ্ঠা। যামিনী অনেক কুণ্ঠা, অনেক সঙ্কোচের সহিত প্রস্তাব করিয়াছে, সে প্রতাপকে একটু সাহায্য করিতে চায়। জন্মদিন, উৎসবাদিতে সে প্রায়ই পিতামাতার নিকট অর্থ উপহার পায়, তাহা হইতে কোনোদিনই সে কিছু খরচ করে নাই। টাকা যে খুব বেশী কিছু জমিয়াছে তাহা নয়, ৫০০৲ টাকা মাত্র। উহা তাহারই নিকটে আছে; প্রতাপকে সে তাহা দিতে চায়, সামান্য কিছু সাহায্য হয়ত তাহা হইতে হইবে।

চিঠি পড়িয়া প্রতাপের বুকের ভিতরটা হঠাৎ যেন কালো হইয়া উঠিল। যামিনী তাহাকে ভালবাসে, ইহা

তাহার একটা অকাট্য প্রমাণ বটে, এবং ইহাতে হয়ত তাহার খুশীই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু খুশীর কোনো ভাব তাহার মনের ধার দিয়াও ঘেঁষিল না। সে এমনই অপদার্থ বটে। যামিনীর মত মেয়ে, মর্ত্ত্যের ধূলি-কণামাত্রও যাহার নির্ম্মল মনকে এতদিন স্পর্শ করে নাই, প্রতাপের সংশ্রবে আসিবামাত্র সেও টাকাকড়ির ভাবনা ভাবিতে বসিয়াছে। পিতামাতার সচ্ছলতার সংসারে অর্থের কথা তাহাকে স্বপ্নেও ভাবিতে হয় নাই। মনে মনে প্রতাপকে সে ভাবিতেছে কি? ইহার সহিত নিজের জীবনকে জড়িত করিলে, ভবিষ্যতে কত সংগ্রাম, কত দুঃখকষ্ট তাহাকে সহ্য করিতে হইবে, সে কথা কি সে একবারও ভাবে নাই? না, জীবন থাকিতে প্রতাপ যামিনীর নিকট অর্থভিক্ষা কোনোদিনই করিবে না। তাহার পিতার নিকট হইতেও অর্থসাহায্য পাইবার আকাঙ্ক্ষা যে সে করিয়াছিল, সেজন্যও নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিল।

নীচে রাজুর গান থামিয়া গিয়াছে, স্নানের ঘরের দরজা খোলারও শব্দ হইল। ঘড়ির দিকে চাহিয়া প্রতাপ দেখিল স্কুলের সময়ও প্রায় হইয়া আসিয়াছে। এখন আর চিঠির উত্তর দিতে বসিবার সুবিধা হইবে না। স্কুলে একটা ঘণ্টা ছুটি আছে, সেই সময় লিখিবে। বিকালে হয়ত যামিনীর সঙ্গে দেখা হইবে, সুতরাং চিঠি লিখিবার খুব যে প্রয়োজন আছে তাহা নয়, কিন্তু এ সুযোগ প্রতাপ ছাড়িবে না। যামিনীর সঙ্গে দেখা হওয়া মানে শুধু তাহাকে দুই চোখ ভরিয়া দেখাই হয়, একটা কাজের কথা বলিবার অবসর সেখানে নাই। মিহির সর্ব্বদা ত দরোয়ানের মত হাজির থাকে, সে যদি-বা দু-চার মিনিট সরিয়া যায় ত বাড়ির চাকর-বাকর আছে। এ চিঠির উত্তরে প্রতাপকে অনেক কথা বলিতে হইবে, সে-সব একমাত্র চিঠিতেই বলা যায়।

রাজু উপরে উঠিয়া আসিতেছে। তাড়াতাড়ি চিঠিখানা বাক্সে বন্ধ করিয়া, সে গামছা হাতে করিয়া স্নান করিবার উদ্দেশ্যে নামিয়া গেল। চিঠি যে কে বাক্সের উপর রাখিয়া গিয়াছিল, সে খোঁজ আর তাহার করা হইল না।

বিকালে রান্নার অনেক ঘটা করিতে হইবে বলিয়া পিসীমা এবং বৌদিদি এ-বেলা সংক্ষেপে কাজ সারিয়াছেন। খালি ডাল এবং মাছভাজা দিয়া খাইয়াই প্রতাপ স্কুলে যাত্রা করিল। পিসীমা, ভাল করিয়া ছেলেদের খাওয়া হইল না বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রতাপের হাসি পাইল। গুণিতে গেলে কয়টা দিনই বা, ইহারই ভিতর তাহার জীবনযাত্রার প্রণালী কতখানি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এখানে সে চারবেলা মনুষ্যোচিত আহার করিতেছে, মানুষের উপযুক্ত ঘরে বাস করিতেছে। একবেলা খাওয়া কম হইলে আবার আক্ষেপ করিবারও লোক জুটিয়াছে। মনের দিকে ত পরিবর্ত্তন যাহা হইয়াছে তাহা আরও অদ্ভুত। ধূলিশয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া প্রতাপ আজ অমরাবতীর স্বপ্ন দেখিতেছে।

স্কুলে প্রথম একঘণ্টা পড়াইয়াই, দ্বিতীয় ঘণ্টাটা তাহার ফাঁক যায়। চিঠি লিখিবার সময় তাহার হইবে বটে, কিন্তু কোথায় বসিয়া যে লিখিবে, সেই ভাবনাতেই পড়িয়া গেল। লাইব্রেরীর ঘরটি সারাক্ষণ জনসমাগমে মুখরিত। গোলমাল উপেক্ষা করিয়াও যদি লিখিবার চেষ্টা করে, নিরুপদ্রবে লিখিতে পাইবে না। কাঁধের উপর দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিবার লোকের অভাব হইবে না। এটা যে একান্ত ভদ্রতাবিগর্হিত ব্যাপার, এ জ্ঞানটুকুও প্রতাপের সহকর্ম্মীদের অনেকেরই নাই। সুতরাং লাইব্রেরীতে বসিবার আশা ত্যাগ করিয়া প্রতাপ স্কুলের কেরাণীবাবু কৃষ্ণধনের ভাঙা টেবিলের এক পাশেই আশ্রয় গ্রহণ করিল। এখানে কেহই কখনও আসে না, এবং কৃষ্ণধন বেচারাও কাজের চাপে এমন ব্যস্ত যে অন্য কোনো দিকে তাকাইবার সময়ও তাহার হয় না।

যামিনী পাছে তাহার টাকা প্রত্যাখ্যান করায় মনে ব্যথা পায়, এজন্য অনেক বুঝাইয়া, অনেক ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া প্রতাপকে তাহার চিঠি লিখিতে হইল। মনের আবেগ অনেকখানিই ইহাতে প্রকাশ পাইল, যদিও নিজেকে সংযত রাখিবার চেষ্টার ত্রুটি প্রতাপ করে নাই। যামিনীর ভালবাসা লাভ করিয়াই প্রতাপ আজ অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালী, তুচ্ছ অর্থের সংস্পর্শে ফেলিয়া এই মহাদানের মহিমাকে সে ক্ষুণ্ণ করিতে চায় না, এই কথাই সে বুঝাইতে চেষ্টা করিল।

খামে লাগাইবার জন্ম একটা টিকিট সে পকেটে করিয়া আনিয়াছিল। তাহার নিয়ম ছিল যথাসর্ব্বস্ব পাঞ্জাবীর পকেটে জমা করিয়া রাখা। যখন একটা জামা ছাড়িয়া আর একটা জামা পরিত, তখন এক পকেটের সঞ্চিত সম্পত্তি, নির্ব্বিচারে অন্য জামার পকেটে চালান করিয়া দিত। সুতরাং টিকিট বাহির করিতে গিয়া ভিজা রুমালে জড়ানো ফুলের কুঁড়ি দুটই সর্ব্বাগ্রে তাহার হাতে ঠেকিল।

প্রতাপের সৌভাগ্যক্রমে ঠিক এই সময়েই হেড মাষ্টারের কাছে কৃষ্ণধনের ডাক পড়িল। প্রতাপ রুমাল খুলিয়া দেখিল ফুলের কুঁড়ি দুটি তেমনই তাজা আছে। ইচ্ছা করিতে লাগিল, দুইটিই খামের ভিতর পুরিয়া যামিনীর কাছে পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু দুইটির স্থান খামের মধ্যে ছিল না। বাছিয়া যেটিকে রূপে ও সৌরভে শ্রেষ্ঠ বোধ হইল, সেইটিকে প্রতাপ খামের চিঠির ভিতর ঢুকাইয়া দিয়া খাম বন্ধ করিয়া ফেলিল। চিঠিখানা অপেক্ষাকৃত খালি পকেটে ঢুকাইয়া সে আবার ক্লাস পড়াইতে চলিল।

স্কুলের ছুটি হইলে পর, বাড়ি যাইবার পথেই সে চিঠি পোষ্ট করিয়া দিল। যামিনী কালই পাইবে। বাড়ি পৌছিয়া দেখিল, রান্নাঘরে মহাধুম। বৌদিদির ত নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর নাই। পাশের বাড়ির কিশোরী একটি মেয়ে আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে বসিয়া গিয়াছে। প্রতিদিন বৌদিদিই চা জল খাবার লইয়া আসেন, আজ পিসীমা আসিয়া হাজির। খাবার আজ বাড়িতে কিছু প্রস্তুত হয় নাই, পিসীমা কাঁসার রেকাবীতে দুইটি রসগোল্লা ও একটি সন্দেশ অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিলেন, "আজ এই খেতে হবে বাছা, বৌমার আজ আর নিশ্বেস ফেলবার সময় নেই, চা-সুদ্ধ করতে পারেনি।"

প্রতাপ মিষ্টি এবং এক গেলাস জল খাইয়া বলিল, "তাতে কি, আমার রাজুর মত অত চায়ের নেশা নেই।" মুখ হাত ধুইয়া কাপড় চুল সব একটু ফিটফাট করিয়া সে ছাত্রকে পড়াইতে চলিয়া গেল।

বাড়ির নিকটে পৌছিয়াই একবার উপরের জানলার দিকে তাকাইয়া দেখিল। আজ সেখানে যামিনী নাই। প্রতাপ অত্যন্ত ক্ষুণ্ন হইল, একটু বিস্মিতও হইল। এখানে কোনদিনই সে যামিনীকে অনুপস্থিত দেখে নাই। অসুখ-বিসুখ কিছু করিল নাকি? প্রতাপ কি আজ বেশী আগে আসিয়া পড়িয়াছে? তাহা ত মনে হয় না। তাহার নিজের কাছে ঘড়ি যদিও নাই, তবু আন্দাজ ত আছে? স্কুলের নিশ্চয়ই অন্য দিনের চেয়ে আজ আগে ছুটি হয় নাই, এবং স্কুলের পর প্রতাপ কোথাও বিন্দুমাত্র দেরি করে নাই। থাক কিছুই হয়ত হয় নাই, প্রতাপ অকারণে ভাবিয়া মরিতেছে।

আপিস-ঘরে গিয়া ঘড়িতে দেখিল, কিছু আগে আসে নাই, যেমন সময় রোজ আসে, তেমনই আসিয়াছে। বাহির হইয়া আসিয়া একবার সিঁড়ির দিকে তাকাইল, যামিনীর কোনো চিহ্ন নাই। উপরে যেন মিহিরের সাড়া পাওয়া গেল।

কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া প্রতাপ ছোট্টকে ডাক দিল। সে বাহির হইয়া আসিতেই জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাবাবু আসেন নি?"

ছোট্ট কিছু উত্তর দিবার আগেই মিহির লাফাইতে লাফাইতে নামিয়া আসিল, বলিল, "আমার চা খাওয়াটা এখনও হয়নি। পাঁচ মিনিটে হয়ে যাবে।"

প্রতাপ বলিল, "আচ্ছা, আমি বস্‌ছি।" আজ তাহাকে একলাই বসিয়া থাকিতে হইল। খানিক পরে মিহির আসিয়া পড়িতে বসিল।

শত বৎসর পূর্ব্বেকার বাঙ্গালী জীবনের ছবি

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

খ্রীষ্টাব্দ ১৮৩২ সালে লণ্ডন হইতে Mrs. S. C. Belnos 'বেল্‌নস্‌-গৃহিণী নামে একজন মহিলা (খুব সম্ভব পোর্ত্তুগীস-জাতীয়া) একখানি বই প্রকাশিত করেন, বইখানির নাম—*Twenty-four Plates Illustrative of Hindoo and European Manners in Bengal.* বইখানি বেশ বড়ো আকারের, দৈর্ঘ্যে প্রায় ২০ ইঞ্চি, প্রস্থে ১১ ইঞ্চি। পাথরে-আঁকা ২৪+১=২৫ খানি এক-রঙ্গা ছবির প্রতিলিপি ইহাতে আছে, ছবিগুলির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় তাহাদের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, এক পৃষ্ঠায় ইংরেজী, অন্য পৃষ্ঠায় ফরাসী। ছবিগুলি বেল্‌নস্‌-গৃহিণীর অঙ্কিত, এবং A. Colin কলিন্‌ (কলাঁ ?) নামক ইংরেজ (অথবা ফরাসী ?) কারিগর কর্ত্তৃক মুদ্রণের জন্য পাথরের উপরে অনুলিখিত।

বইখানির ইংরেজী ভূমিকায় বেল্‌নস্‌-গৃহিণী নিজেকে a native of the Country 'এতদ্দেশবাসী' অর্থাৎ ভারতবর্ষের অধিবাসী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা-দ্বারা অনুমিত হয় যে তিনি এই দেশে ভূমিষ্ঠ হন, ও এই দেশেই বাস করিতেন। অতি শিশুকাল হইতেই তিনি দেশবাসিগণের জীবন-যাত্রার বহিরঙ্গ খুঁটিনাটির সঙ্গে দেখিতেন, এদেশের উৎসব যাত্রা ও দৈনন্দিন জীবন তাঁহার নিকট পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনার বস্তু ছিল। কলিকাতার বাহিরেও তিনি বাঙ্গালা দেশের নানা স্থানে ঘুরিয়াছিলেন, এবং নানা দিক্‌ দিয়া এদেশের জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা তাঁহার ছিল।

বইখানি বিলাতের রয়াল-এশিয়াটিক-সোসাইটি কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল ; সোসাইটির তরফ হইতে Graves C. Haughton হটন সাহেব একখানি অনুমোদন-পত্র দিয়াছিলেন, সেই পত্রখানি, ও রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক লিখিত নিম্নে উদ্ধৃত পত্রখানি বেল্‌নস্‌-গৃহিণী স্বীয় পুস্তকে প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

48 Bedford Square.
March 5th, 1832.

Madam,

I have with great pleasure looked over your drawings, and read your descriptions of them, and I now have the satisfaction to inform you, that they are true representations of nature, so much so, that they have served to bring to my recollection the real scenes alluded to of that unhappy country.

The drawings are so expressive in themselves, that the descriptions however excellent; are scarcely necessary to any one acquainted with India.

I have retained the copy handed over to me, and wishing, you every success in your present undertaking.

I remain,
Madam,
Mrs. Belnos. Your most obedient servant,
Rammohun Roy.

আজ হইতে শত বৎসর পূর্ব্বে আঁকা বাঙ্গালী জীবনের ছবি, বাঙ্গালীর পক্ষে এই ছবিগুলির যথেষ্ট মূল্য আছে। ছবিগুলির রূপকার এ-দেশেরই মেয়ে, যদিও তিনি ফিরাঙ্গীবংশজাতা ; তিনি যাহা আঁকিয়াছেন, তাহা একটু দরদ দিয়াই আঁকিয়াছেন, বাঙ্গালী মেয়ে ও পুরুষের ছবিতে একটু স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তা আনিয়াছেন—এই গুণগুলি সেকালের বাঙ্গালীর চেহারায় দুর্লভ ছিল না, বহু ইউরোপীয় লেখকের বই হইতে আমরা এ কথা জানিতে পারি। তখনকার দিনে ইংরেজ জাতি এ দেশে মুখ্যতঃ টাকা করিবার উদ্দেশ্যেই আসিলেও, তাহাদের মধ্যে একটু romance, একটু ভাবুকতা একটু সহৃদয়তা ছিল, ভারতবর্ষের সমস্ত জিনিসকে তাহারা একটু অদ্ভুত দর্শনের একটু প্রাচীন ও অতি প্রবীণের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব মিশাইয়া দেখিত। ভারতবর্ষের জনসাধারণের দারিদ্র্য ও দুর্দ্দশা তখন আজকালকার মতন এতটা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে নাই ; ভারতীয়েরা নিজেদের চিরাচরিত



১। কালীঘাট হইতে প্রত্যাগমন

দেশোপযোগী জীবনচর্য্যাও ভুলে নাই, তাই তাহাদের চলাফেরায় দৈনন্দিন জীবনে কথাবার্ত্তায় একটা স্বাভাবিক সৌষম্য ছিল, শিল্পীর চোখে সেটা ধরা পড়িত। এই কারণে এখন হইতে এক শত বা আশী বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপীয় শিল্পীর হাতে আঁকা ভারতীয় জনগণের চিত্রে আমরা সাধারণতঃ অখুশী হইবার কিছু বড়ো একটা পাই না। আমাদের দেশের লোকের মুখ চোখ প্রভৃতির ভাবটা তাহারা হয় তো ঠিক ধরিতে



২। চড়ক-পূজা (ক)

পারিত না, আমাদের যথার্থ রূপটি হয় তো হুবহু তাহাদের তুলিতে ধরা দিত না,—তাহাদের ছবিতে এই সব নানা খুঁটিনাটি বিষয়ে অজ্ঞতা এবং অক্ষমতাও যথেষ্ট দেখা যায়; কিন্তু সাধারণতঃ এ দেশের মানুষের



৩। চড়কপূজা (খ)

প্রতি অবজ্ঞা দেখা যায় না। আজকালকার অনেক ইংরেজ চিত্রকরের আঁকা ভারতীয় সাধারণ স্ত্রীপুরুষের ছবি দেখিলে এই কথার সত্যতা বুঝা যাইবে; যেমন ভারতীয় রেলওয়ে বোর্ডের দ্বারা ইংরেজ চিত্রকরের হাত দিয়া আঁকানো কতকগুলি বিজ্ঞাপনের চিত্র—এগুলিতে ভারতীয়দের মূর্ত্তি অতি কুৎসিত ভাবে কদাকার করিয়া আঁকা হইয়াছে, ও আঁকনের ভঙ্গীতে ভারতীয়দের সম্বন্ধে একটা বিশেষ ঘৃণার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

আলোচ্য বেল্‌নস্‌-গৃহিণীর ছবিগুলির মধ্যেও তখনকার দিনের ইউরোপীয়দের অঙ্কিত চিত্রের গুণ ও অবগুণ



৪। পল্লী-নারী

দুই-ই আছে। পোষাক-পরিচ্ছদে কতকগুলি জিনিস তিনি ঠিক ধরিতে পারেন নাই, এইখানে তাঁহার অজ্ঞতা; আর, ইংরেজী চিত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত বলিয়া, তাঁহার আঁকা ভারতীয়দের মুখে, বিশেষ মেয়েদের মুখে, বিলাতী ভাব বহুল পরিমাণে আসিয়া গিয়াছে—সর্ব্বত্র খাঁটি দেশী ভাবটি তিনি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই—এইখানেই তাঁহার মার্জ্জনীয় অক্ষমতা। সন ১৩৩৬ সালের কার্ত্তিক মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত বর্ত্তমান লেখকের 'পরিচ্ছদের



১২। ইংরেজ সিভিলিয়ান সন্দর্শনে আগত বাঙ্গালী মুৎসুদ্দী

'ইতিহাস আলোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধের সঙ্গে মুদ্রিত Mrs. Fanny Parkes পার্কস্‌-গৃহিণী নামক ইংরেজ মহিলা কর্ত্তৃক ১৮২৫ সালে অঙ্কিত বাঙ্গালী পুরুষ ও মেয়ে এবং বাঙ্গালী পাইকের যে তিনখানি ছবি মুদ্রিত হইয়াছিল, সেই ছবি তিনখানি এই প্রসঙ্গে দেখা যাইতে পারে।

বেল্‌নস্‌-গৃহিণীর পুস্তকখানি এখন বিরল ও দুষ্প্রাপ্য। কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি অভ্‌ বেঙ্গল সভার পুস্তকাগারে এই বইয়ের একটা জীর্ণ প্রতি আছে। তাহা হইতে এই বইয়ের ২৫ খানি ছবির মধ্যে কতকগুলির আলোকচিত্রময় প্রতিলিপি লওয়া হয়, সেই প্রতিলিপিগুলি এই সংখ্যার 'প্রবাসী'তে প্রদর্শিত হইল। প্রত্যেক ছবিটির নীচে ফরাসী ও ইংরেজীতে তাহার বর্ণনা দেওয়া আছে, এবং ফরাসীতে লেখা আছে—'মাদাম্‌ বেল্‌নস্‌-এর চিত্রানুসারে A. Colin কর্ত্তৃক অঙ্কিত' ও 'J. J. Belnos কর্ত্তৃক পাথরে খোদাই করা ও মুদ্রিত'। ছবিগুলির নাম, ও যে ছবিগুলি মুদ্রিত হইল সেগুলির বিষয়-বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হইল।—

মলাটের উপরে ও বইয়ের ভিতরে আলাদা করিয়া একখানি ছবি আছে—নদীতীরে বৃক্ষতলে একজন ব্রাহ্মণ বসিয়া। এই ছবিখানি R. W. Frazer কর্ত্তৃক লিখিত Literary History of India গ্রন্থের গোড়ায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

প্রথম ছবিখানির বর্ণনা তলায় এই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে—A Hindoo returning from Callee Ghaut (সঙ্গে সঙ্গে ফরাসীতেও আছে)। গ্রন্থকার বলিতেছেন যে কালীঘাটে বলিদানের পরে অনেক সময়ে ছাগদেহ লইয়া যাত্রীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। চিত্রে এইরূপ একজন যাত্রী, গলায় ও হাতে ফুলের মালা পরিয়া মুণ্ডহীন ছাগদেহ স্কন্ধে লইয়া গৃহে যাইতেছে; পথে



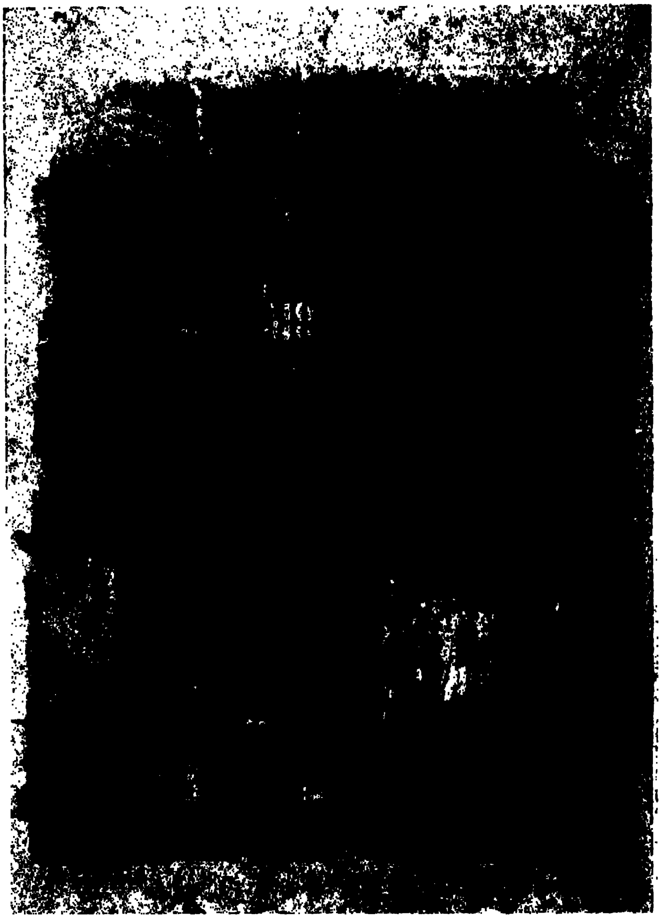
৫। কাপড়ওয়ালা

বাঁধিয়া ঝুলাইয়াই চড়কের সন্ন্যাসীকে ঘোরানো হইয়া থাকে। বাণ ফোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেহপীড়াদায়ক ভীষণ অনুষ্ঠানও হইত—জিভ ফুঁড়িয়া শিক বা বাঁশের শলা পূরিয়া দেওয়া, গা বিঁধিয়া চামড়ার মধ্য দিয়া নারিকেল দড়ি চালানো, ইত্যাদি। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম পেঁচার নকৃশা'-তে বাণ-ফোঁড়ার উল্লেখ পাওয়া যায়—১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের দিকেও ইহা রীতিমত প্রচলিত ছিল ; চৈত্রে ঢাকের বাদ্য শুনিলেই চড়কীর পিঠ সড়-সড় করে, তখন তাহাকে পিঠ ফুঁড়িতেই হয়—এই অর্থে একটা প্রবচন-ও প্রযুক্ত হইত। প্রায় ষাট বৎসর হইল চড়কের এই প্রকার বাণ-ফোঁড়া প্রভৃতি ব্যাপার উঠিয়া গিয়াছে ;—সমাজ হইতে স্বাভাবিক ভাবেই লোপ পাইয়াছে—বাঙ্গালী

নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে শক্তি ও উৎসাহের ক্রমিক বিলোপ এবং তাহাদের সংখ্যা হ্রাস হওয়াই ইহার মুখ্য কারণ। বেল্‌নস্‌-গৃহিণী এই ব্যাপার স্বচক্ষে যেমনটী দেখিয়াছেন তেমনি আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ইহার বর্ণনাও দিয়াছেন। লাল, বেগুনে ও সবুজ চেলীর কাপড় ও সোনার গহনা পরিয়া এবং গলায় ফুলের মালা এবং পায়ে নুপূর ও ঘুঙ্গুর দিয়া, ঢাকের বাদ্যের সহিত দলে দলে বাণ-ফোঁড়ার সন্ন্যাসীর দল বাহির হইত। সঙ্গে সঙ্গে সঙ সাজিয়া কতকগুলি সন্ন্যাসী যাইত। বেল্‌নস্‌-জায়ার চিত্রে পুরুষগুলির সুডৌল দেহ, এবং মাথায় বাবরী চুল, অথবা সব মাথা কামাইয়া একটু ঝুঁটা রাখিবার রীতি লক্ষণীয়। [চিত্র ২]-এ একজন সন্ন্যাসী চেলী ও গহনা পরিয়া হাতে পাখা লইয়া নাচিতেছে, আর এক জনের দুই কাঁধের চামড়া ফুঁড়িয়া নারিকেল দড়ি চালানো হইয়াছে, সে এই অবস্থায় নাচিতেছে, ও সামনে ও পিছনে দুই জন লোক এই দড়ি ধরিয়া আছে ও তাহার সঙ্গে তাল রাখিতেছে। [চিত্র ৩]-এর মধ্যেকার লোকটী বীভৎস কৃচ্ছ্রতা করিতেছে, জিভ ফুঁড়িয়া তাহার ভিতর দিয়া একটী জীবন্ত ঢোঁড়া সাপ চালাইয়া দিয়াছে; আর এক জন জিভের মধ্য দিয়া একটী তিন ইঞ্চি বেড়ের বাঁশ ফুঁড়িয়া সেটাকে এপাশ ওপাশ করিয়া চালাইতেছে; এবং তৃতীয় ব্যক্তি কাঁধের চামড়া ফুঁড়িয়া রন্ধন কার্য্যে ব্যবহৃত বড় খন্তার মত যন্ত্রের ডাঁটি চালাইয়া দিয়া, খন্তার উপরে ধুনা জ্বালাইতেছে। ছবিটীর বাঁ দিকে ঢাকী ও লোহার শিক হাতে একটি বালক, ডান দিকে দুইজন সঙ, তাহাদের মধ্যে একজন স্ত্রী-বেশে।

অষ্টম চিত্রে দাসীগণ পরিবৃতা উচ্চবংশের মহিলার গঙ্গা স্নানের দৃশ্য।

নবম চিত্রে একটি অধুনা-লুপ্ত নিষ্ঠুর প্রথার দৃশ্য। গ্রন্থকর্ত্রীর মতে, উত্তর-বঙ্গে এই প্রথা ছিল। শিশু যদি



৬। গৃহ-কাজ (কুটীরাভ্যন্তর)

মাতৃস্তন্য পান না করিত, তাহা হইলে তাহাকে ভূতে পাইয়াছে মনে করিয়া শিশুর পিতামাতা একটা ঝুড়িতে রাখিয়া একটি গাছের ডালে টাঙ্গাইয়া দিয়া আসিত, এবং তিন দিন পরে গিয়া এইরূপে পরিত্যক্ত শিশুর খোঁজ করিত। শিশু সাধারণতঃ অনাহারে বা হিংস্র পশু পক্ষীর আক্রমণে মারা যাইত; কিন্তু যদি দৈবযোগে বাঁচিয়া থাকিত, তাহা হইলে, অপদেবতা ছাড়িয়া গিয়াছে মনে করিয়া শিশুকে ঘরে লইয়া যাওয়া হইত। এই ছবিতে

মাতা শিশুকে গাছের ডালে ঝুলাইয়া দিতেছে, পিতা নিকটে বসিয়া আছে এই দৃশ্য অঙ্কিত আছে।

দশম চিত্র—পল্লীগ্রামের কৃষক-শ্রেণীর দুইজন ব্যক্তি, পোঁটলা-পুঁটুলি বাঁধিয়া দূর প্রবাসে যাইবার পূর্ব্বে গ্রামের ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইতেছে।



১। বানরওয়ালা

একাদশ চিত্র—ইহাতে কলিকাতার রাস্তায় হোলি বা দোল-যাত্রা উপলক্ষ্যে পশ্চিমা বেহারারা যন্ত্রযোগে নাচ-গান করিতেছে।

দ্বাদশ চিত্রে পল্লীরমণীগণের মজলিসের দৃশ্য। নানা শ্রেণীর পল্লীস্ত্রী পল্লী-জীবনোচিত কার্য্যে ও গল্প-গুজবে নিযুক্ত। এই চিত্রে, ছোটো খাটিয়ার উপরে একটী পশ্চিমা মুসলমান স্ত্রীলোক বসিয়া; একজন চরখায় সুতা কাটিতেছে, আর একজন লাটাইয়ে কাটা সুতা গুটাইয়া লইতেছে; একদিকে এক জন বাটনা বাটিতেছে। দুই একটী মূর্ত্তির ভঙ্গী বেশ সুন্দর হইয়াছে। [চিত্র ৪]

ত্রয়োদশ চিত্র—এদেশের ইংরেজদের জীবনের এক দিক। সাহেব সকালবেলায় তাঁহার বিশাল হাতাওয়ালা স্তম্ভমালা-ভূষিত প্রাসাদোপম বাড়ীতে বসিয়া সওদা করিতেছেন—বড়-বাজারের দুইজন পশ্চিমা দোকানদার ঢাকাই ও শান্তিপুরিয়া মলমল, কাশীর কিংখাব প্রভৃতি উৎকৃষ্ট দেশী বস্ত্র আনিয়াছে, মেম-সাহেব দুই-এক থান কাপড় বাছিয়া লইয়াছেন, সাহেব দর কষাকষি করিয়া দুই-তিনটী সোনার মোহর দিয়া দাম দিতেছেন। সাহেবের গড়গড়া ও পিছনে আড়ানী পাখা বা বড়ো হাত-পাখা লইয়া খালি-গায়ে দাঁড়াইয়া বেহারা লক্ষণীয়। [চিত্র ৫]।

চতুর্দ্দশ চিত্রটীতে বাঙ্গালার (কলিকাতাস্থ) একটী কুটীরের আভ্যন্তর দৃশ্য [চিত্র ৬]। বাখারীর উপর মাটির লেপ দেওয়া দেওয়াল, দেওয়ালের মাথায় একটী গোল-পাতার ছাতি। উপরের কাঠের বাতায় একখানি চাদর। দেওয়ালে কাগজের উপরে হাতে আঁকা রাম-রাজার ছবি আঁটিয়া দেওয়া। তৈজস-পত্রের মধ্যে একটী কাঠের সিন্দুক, একটী খাটিয়া ও তৎসংশ্লিষ্ট বিছানা, একটী চরখা, শিকায় টাঙ্গানো হাঁড়ী-কলসী, কতকগুলি ঝোলাঝুলি; একটী পাখা, ও দড়ি দিয়া টাঙ্গানো এক ছড়া কলাও দেখা যাইতেছে। সম্মুখে গৃহস্থ-বধূ রন্ধন-নিরতা, দুইটী শিশু চাউলের ধামায় হাত দিয়া ক্রীড়ায় ব্যস্ত। চাউল মাপার পালি ও কুনিকা এবং চাউল ঝাড়িবার কুলাও রহিয়াছে। চিত্রটী গরীব শ্রেণীর গৃহস্থের; সাধারণ ঘরের

ভতরের ছবিটী বেশ দরদ দিয়া আঁকা হইয়াছে—সব ানিসটাতে বেশ একটী শান্তি শৃঙ্খলা ও আনন্দের ভাব ান ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশ, এই চারিখানি ছবি সে যুগের ধান আমোদ, বাই-নাচের ছবি। গুলির মধ্যে দুইখানি পুনর্মুদ্রিত ল [চিত্র ৭ ও চিত্র ৮]। কালে রাজা রাধাকান্ত দেবের গৃহে জা-উপলক্ষ্যে যে নাচ-গান ও অন্যান্য ামোদ-প্রমোদের আয়োজন হইত, াহাতে কলিকাতার তাবৎ সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ ইংরেজ নিমন্ত্রিত হইতেন, হারা সকলে আসিয়া এই নাচ খিতেন। শোভাবাজার রাজবাটীর ই অনুষ্ঠান বহু দিন ধরিয়া ইংরেজ মাজের দর্শনীয় বস্তু ছিল, সে যুগের ংবাদপত্রে ও চিঠি প্রভৃতিতে এই থা বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট। [চিত্র]-এ গৃহকর্ত্তা কোনও উচ্চপদস্থ ংরেজ সামরিক কর্ম্মচারীকে স্বাগত রিতেছেন। গৃহকর্ত্তার পরিধানে াথায় মোগলাই পাগড়ী, গায়ে পা-র্য্যন্ত ঝোলা জোড়া, তদুপরি শাল, ায়ে শুঁড়ওয়ালা নাগরা। পেশোয়াজ-রা পশ্চিমা নর্ত্তকী, সঙ্গে বাদ্যকর—ইহাদের মুখ চোখ বেশ সুন্দর হইয়াছে। উপরে বেলোয়ারী াড়ে বাতীর আলো। [চিত্র ৮]—এখানে নিমন্ত্রিত উরোপীয়দের সঙ্গে দুই জন মহিলা আসিয়াছেন, র্ত্তকী পেলা আদায়ের জন্য তাহাদের নিকটে গিয়া সিয়া গান ধরিয়াছে, একজন ইউরোপীয় জামার কেট হইতে দানের টাকা বাহির করিতেছেন। মেম-াহেবেরা বাইজীর এই আক্রমণে যেন একটু সন্ত্রস্ত। পিছনে গৃহকর্ত্তা দণ্ডায়মান; তাঁহার সঙ্গে লোম-বাহির-করা ভেড়ার চামড়ার ইরানী টুপী মাথায় কোনও নিমন্ত্রিত আরমানী বণিক কথা কহিতেছেন।

উনবিংশ চিত্রটী বীভৎস ভাবের—জলে স্ত্রীলোকের মৃত-দেহ ভাসিতেছে, এবং প্রসারিত-পক্ষ একটা হাড়গিলা পাখী সেই দেহের উপরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। চিত্রকর মৃতার দেহ সৌষ্ঠবময় করিয়া আঁকিয়াছেন, এবং এই বিষয়ে



১০। ফেরীওয়ালা মণিহার

তাঁহার অঙ্কন-নৈপুণ্য প্রদর্শনের প্রয়াস করিয়াছেন।

বিংশ চিত্র—বাঁদরওয়ালার ছবি। চাকর ও আয়ার সহিত ভ্রমণার্থ নির্গত ইংরেজ বালকবালিকার চিত্ত-বিনোদনের জন্য পশ্চিমা বাঁদরওয়ালা বাঁদর-নাচ দেখাইতেছে। বানর ভিন্ন ইহাদের সঙ্গে শিক্ষিত রাম-ছাগলও থাকে, সেই রাম-ছাগল উপর উপর রাখা সাতটা কাঠের পায়ার উপরে চড়িয়া কসরৎ দেখাইতেছে। [চিত্র ৯]

একবিংশ চিত্র ত্রয়োদশ চিত্রেরই অনুরূপ—পাগড়ী মাথায় দুইজন বাঙ্গালী ফেরীওয়ালা, মেম-সাহেবের নিকটে মুটিয়ার মাথায় বড়ো সিন্দুকে করিয়া নানা বিদেশী মণিহারী

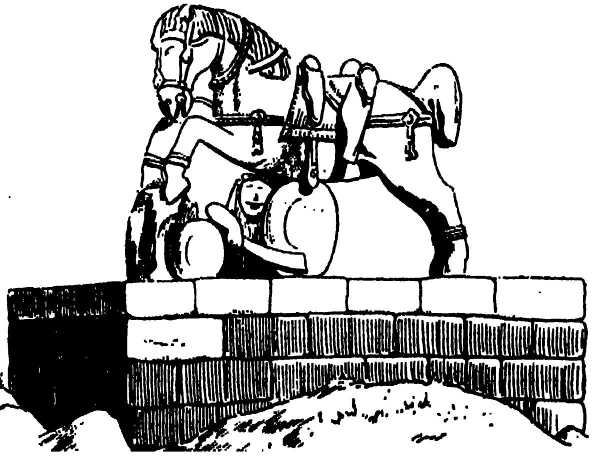
দ্রব্য—ইংরেজী ও ফরাসী সাটিন, ফিতা ও নানা প্রকার কাপড় ঘড়ী ও জহরত প্রভৃতি, বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। মেম-সাহেব পোষাক তৈয়ারী করাইবার জন্ত কিছু বিদেশী কাপড় খরিদ করিতে চাহেন, ফেরীওয়ালার সহিত দর-দস্তর চলিতেছে; দুই হাত যোড় করিয়া ফেরিওয়ালা দাম কমাইতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিতেছে। দস্তরীর প্রত্যাশায় পাশে আয়া ও দরজী দাঁড়াইয়া। শ্রান্ত মুটিয়া বেচারী বাহিরের বারান্দায় বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে। [চিত্র ১০]

দ্বাবিংশ চিত্রে কলিকাতার রাস্তায় যে-সব ভিখারী ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত, তাহাদের ছবি। [চিত্র ১১] যোগী, বৈরাগী, ও মুসলমান ফকীর। 'যোগী' নামধারী ভিখারীরা আজকালকার গুজরাটী ভিখারীদের মত, পশ্চিম হইতে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে দলে দলে বাঙ্গালা-দেশে আসিত, খুব সম্ভব এখনকার মত গুজরাট হইতেই। ইহারা অত্যন্ত কম কাপড় পরিত, সঙ্গে একতারা লইয়া গান করিত। বৈরাগীটা বাঙ্গালী, মাথার টুপী, মুখে চাঁপদাড়ী, গায়ে নানা রঙ্গীন কাপড়ের টুকরা সেলাই করিয়া তৈয়ারী জামা। বৃদ্ধ মুসলমান ফকীরের সম্বন্ধে বক্তব্য কিছু নাই।

ত্রয়োবিংশ চিত্রের বিষয়, উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারী পালকী করিয়া বাহিরে যাইবার জন্ত প্রস্তুত, এমন সময়ে বিষয়-কর্ম্ম আলোচনার জন্ত বাঙ্গালী মুৎসুদ্দী বা 'বেনিয়ান' তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত। [চিত্র ১২] সাহেব হিসাব দেখিতেছেন। সাহেবের পালকীখানি গায়ে জামা, মাথায় লাল সালুর পাগড়ী পরা, ও কোমরে সালুর চাদর জড়ানো পশ্চিমা কাহার-জাতীয় বেহারার কাঁধে; পালকীখানিতে কাঁচের কয়টী ভালো লণ্ঠন লাগানো আছে। মাথায় বড়ো কাপড়ের ছাতি ধরিয়া ছাতি-বরদার; সামনে চোবদার বা চাপরাসী; দুইজন খানসামা পিছন দিকে। 'বেনিয়ান' বাবু খিড়কীদার পাগড়ী, চাপকান, শাল ও নাগরা জুতা পরিয়া আসিয়াছেন—তাঁহার পালকী সাধারণ, এবং খালি গায়ে উড়িয়া বেহারার দ্বারা বাহিত। ইহারা 'পিকা' বা চুরুট টানিতেছে। বাবুর সঙ্গে যে ছাতা আসিয়াছে সেটা বাঁশের ও গোল-পাতার। চোবদারের সামনে বাবুর সরকার দাঁড়াইয়া—মাথায় পাগড়া, গায়ে মেরজাই, ও চাদর। পরণে ধুতী, পায়ে নাগরা। একশত বৎসরে ইংরেজ ও বাঙ্গালী জীবনে যানে বাহনে পোষাক-পরিচ্ছদে আর্থিক অবস্থায়, সব বিষয়ে কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা এই চিত্র দর্শনেই বুঝা যায়।

এই বইয়ের শেষ চিত্রখানি একটা বীভৎস ব্যাপার লইয়া—কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর লোক নদীর চড়ায় মরা গোরুর ছাল ছাড়াইবার উদ্যোগ করিতেছে।

মোটের উপর, বইখানির ছবিগুলি বিশেষ কৌতুককর। শত বৎসর পূর্ব্বেকার বাঙ্গালী জীবনের চিত্র সংবলিত এইরূপ আরও কতকগুলি বই আছে, সেগুলির ছবি ও লিখিত বর্ণনা বাঙ্গালী পাঠক সমাজে পুনঃপ্রকাশের উপযোগী।



বেমানান

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

দশ টাকা মাসিক ভাড়ার ঘরখানি—রমেশের চক্ষে বড়ই অসুন্দর ঠেকিল।

দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে ঘরখানি এত বড় যে, পাঁচ-ছয়টি পুত্রকন্যা লইয়া অনায়াসে তার মধ্যে মাথা গুঁজিয়া থাকা যায়। একতলা এবং স্যাঁতসেঁতে! তা পঞ্চাশ টাকা মাহিনার কেরাণীর পক্ষে ও-দুইটা অসুবিধাই নহে। উত্তর-খোলা নাতিবৃহৎ জানালা দিয়া একটু যে হাওয়া না আসে তাহা নহে, আলোও চোরের মত উঁকি মারে। চুনবালি দিয়া গৃহস্থ এককালে ঘরের শ্রীবর্দ্ধন করিয়াছিলেন হয়ত, কিন্তু রমেশ পনের বৎসরের মধ্যে এ বাড়িতে মিস্ত্রিকে প্রবেশ করিতে দেখে নাই।

যে বড় বড় ইঁদুরের উৎপাত কলিকাতায়—মেঝের উপর যেন লাঙল চষিয়াছে। ছেলেমেয়েরা সেই কর্ষিত মেঝে হইতে ছোট ছোট ইটের টুকরা বাছিয়া লইয়া কখনও টক্কা-ফক্কা, কখনও বা জোড়বিজোড় খেলিয়া নিজেদের ক্রীড়াপটুতা দেখায়। এ বিষয়ে তারা উৎসাহশীল। বাপের প্রহার বা মায়ের তাড়না কিছুই গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। সামনে ছোট ফালি বারান্দা। দরজা ঘেরিয়া রান্নাঘর তৈয়ারী হইয়াছে। রাত্রিতে তোলা-উনানটি ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া রান্না চাপান হয়। সকালের রাঁধা ডাল তরকারী সবই থাকে—শুধু ভাত ফুটাইয়া লইলেই হইল। সুশীলা হিসাবী গৃহিণী—কয়লা বেশী খরচ হইতে পারে না। ভাত নামিলেই বাসি ডাল তরকারী গরম করিয়া লয়।

উনানের ধোঁয়ায় বারান্দার কড়িকাঠ ত দেখাই যায় না, ঘরের কড়িকাঠেও ঝুল প্রচুরতর জন্মিয়াছে। কোণে কোণে মাকড়সার বাসা; ঘরের বাসিন্দাদের মত তাহাদেরও আশ্রয়চ্যুতির ভয় নাই। মাঝে মাঝে একটা চড়াই পাখী কিচ-কিচ করিয়া উঠে। কড়িকাঠের ফাঁকে সে রাত্রি যাপন করিতে ভালবাসে।

ঘরের এক পাশে ভাঁড়ারের জিনিষপত্র—জালায় চাল, হাঁড়িতে বা বিস্কুটের টিনে ডাল এবং সিগারেটের ছোট ছোট কৌটাগুলিতে মশলা, চিনি, সুজি ইত্যাদি। পেচে-ভর্ত্তি আনাজপাতিও তার এককোণে জড়ো করা। অন্য কোণে একখানা তক্তা পাতিয়া কেরোসিন ও নারিকেল তৈলের বোতল এবং আধভাঙা হ্যারিকেন লণ্ঠন গোটা-দুই সাজান রহিয়াছে। ঘরখানিতে গোটা-দুই দরজাহীন গা-আলমারী আছে। উপর নীচে তার অনেক জিনিষ। কোনটায় বাসনগুলি মাজিয়া রাখা হয়, কোনটায় ময়দা, তেঁতুল ইত্যাদির হাঁড়ি—কিংবা খোকাখুকুদের খেলনা, পড়িবার বই খাতা, ঔষধের শিশি—কোন থাকে অগোছালো ভাবেই রহিয়াছে।

আলমারীর পাশে বিছানা গুটানো, তার একটু উপরে দেওয়ালে পেরেকে টাঙানো আরসী একখানা। আরসীখানা ভাল। শীর্ণমুখগুলিকে পুষ্ট দেখায়। রং-ওঠা ট্রাঙ্ক, বেতের সুটকেস—বিছানার পাশেই।

কড়িকাঠ হইতে পাঁচটি শিকা ঝুলিতেছে। বিড়ালের ভয়ে হেঁসেল-পাট উহারই উপর ঝুলিতে থাকে। বারান্দার এক কোণের দেওয়ালে পেরেক পোঁতা। তাহার উপর ছোটবড় অনেকগুলি জুতা টাঙানো।

মানুষের বুদ্ধির অপ্রতুলতা না থাকিলে এক ফালি জায়গার মধ্যে প্রকাণ্ড সংসারটাকে অনায়াসে ভরিয়া রাখা যায়।

এক জানালায় জলের কুঁজা, অন্যটায় পানের ডাবর। চুনে-চুনে সেখানকার দেওয়ালটা চিত্র-বিচিত্র হইয়াছে। দড়ির আলনায় কাপড় জামাগুলি ঝুলিতেছে। গরিব হইলেও গৃহস্থের রুচি আছে। কালী, দুর্গা, গান্ধী ও সি-আর দাসের ছোট ছোট ছবিগুলিও দেওয়াল-গাত্রে বিলম্বিত রহিয়া ধর্ম্ম ও রাজনীতিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এই বড় ঘরখানির মধ্যে কোন রূপ অশোভনতা রমেশ

কোনদিন দেখে নাই বা অসুবিধাও ভোগ করে নাই। আজ কিন্তু মনে হইল এ সমস্তই বিড়ম্বনা। কারণ গতকল্য সে একটা গার্ডেন পার্টিতে যোগদান করিয়া ছিল।

আপিসের কোন পদস্থ কর্ম্মচারীর বিদায় অভিনন্দন উপলক্ষ্যে শহরের উপকণ্ঠে একখানি সুন্দর বাগান-বাড়িতে সকলে সম্মিলিত হইয়াছিল।

শনিবার। বেলা দুটায় আপিস বন্ধ হইবামাত্র শততালিযুক্ত ছাতাটি মাথায় দিয়া রমেশ গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে পথ অতিবাহন করিতেছিল।

ফুটপাথের যে-ধারটায় ছায়া পড়িয়াছে, সেদিকে একজন মুসলমান বালক ময়লা কাপড় বিছাইয়া একরাশ কেড্স্ জুতা স্তূপীকৃত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাঁকিতেছিল,—সস্তামাল—লেও বাবু, আট আট আনা জোড়া—আট আট আনা।—

নিজের পায়ের জুতার পানে চাহিয়া রমেশ একবার থমকিয়া দাঁড়াইল।

নাঃ, কালি মাখাইলেও এই জুতা পায়ে দিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষাই করা যায় না—তায় গার্ডেন পার্টি। তলার কাঁচা চামড়ার বোঝায় হাফ্‌সুলটা ভারী হইয়াছে পাঁচ সের। গার্ডেন পার্টিতে কেহ আর জুতার তলাটা বিশেষ করিয়া দেখিবে না, কিন্তু উপরের তালিগুলি! ব্রাউন চামড়া মিলে নাই বলিয়া একখানি তালি ত কালো চামড়ারও দেওয়া হইয়াছে।

পকেটে হাত দিয়া দেখিল কয়েকটা টাকা আছে। কাল মাসকাবার হইয়াছে—মাহিনা মিলিয়াছে। এখনও মুদী ও গোয়ালার হিসাব মিটানো হয় নাই। বাড়ি-ভাড়াও বাকী। সমস্ত দেনা পরিশোধ করিলে যাহা হাতে থাকে তাহাতে আরও কর্জ্জের গোটাপাঁচেক টাকা যোগ করিলে তবে সংসার কোন রকমে চলে। পূরা মাহিনা কখন সে পায় না। বাঁচিয়া থাকুক কো-অপারেটিভ্ ক্রেডিট সোসাইটি। দেনা শোধ হইতে-না-হইতে নূতন দেনার জন্য দরখাস্ত দিতেই হয়।

তবু গার্ডেন পার্টিতে যাইবার জন্য জুতা কিনিবার ইচ্ছাটা তাকে কেমন যেন পাইয়া বসিল। দুঃখ-কষ্ট ত আছেই। পাঁচজনের সামনে একটু ফিট্‌ফাট্ হইয়া না গেলে ভদ্রলোকের প্রাপ্য সম্মানটুকুও সে পাইবে কি-না সন্দেহ!

বহু দরদস্তুর করিয়া আট আনার জুতা হইতে সে দুইটি পয়সা বাঁচাইল। কাগজে জুতা মুড়িয়া চলিবে এমন সময় সহকর্ম্মী বিমল পিছন হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি হে, কতয় কিন্‌লে?—

রমেশ এক গাল হাসিয়া বলিল,—আট আনার কম কিছুতে কি দেয়! কত ভুজুং-ভাজুং দিয়ে সাড়ে সাত আনায় বাগিয়েছি।

বিমল বলিল,—যাই হোক, গার্ডেন পার্টির মান ওতে বজায় থাক্‌বে। আমার ভাই—যা করেন এই স্যাণ্ডাল।

রমেশ বিমলের দুঃখে সহানুভূতি দেখাইয়া কহিল,—তা ওই বা মন্দ কি!

পরে গর্ব্বিত অপাঙ্গে নিজের কাগজমোড়া জুতার পানে চাহিয়া মনে মনে বলিল,—কেড্স্ পায়ে দিলে বোধ হয় বেশ একটু আভিজাত্যের গন্ধ পাওয়া যায়।

বিমল জিজ্ঞাসা করিল,—ক'টায় যাচ্চ?

একটু ভাবিয়া রমেশ বলিল,—পাঁচটায়।

বিমল বলিল,—আমিও তাই। এই টুইল শার্টটাই বাড়ি গিয়ে কাচ্‌বো। রোদে শুকিয়ে গরম জলের ঘটী বসিয়ে ইস্ত্রি করব, তবে ত!

রমেশ মনে মনে বলিল—আমারও ওই দশা।

কিন্তু হাতে কেড্স্ ছিল বলিয়া সে অল্প একটু পা চালাইয়া দিল। সবে দুটা বাজিয়া ২০ মিনিট হইয়াছে।

সূর্য্যের তেজ প্রখর, জামা দিব্য শুকাইয়া যাইবে।

পাঁচটার মধ্যেই জামা শুকাইল এবং ইস্ত্রি করা হইল।

সুশীলা জামাগুলা কাচে ভাল। দিব্য ফরসা হয়। ফরসা যেন বেশীই হইয়াছে! কাপড়খানার সঙ্গে বে-মানান্ হইবে নাকি? না, ও একটু ইতরবিশেষ কাহারও চোখে পড়িবে না। খানিকটা ত ফরসা জামায় ঢাকিয়া গেল, বাকী অংশে কে আর নজর দিতে যাইবে।

চুলগুলা আঁচড়াইয়া পিছন দিকে ঠেলিয়া দিল। কি বলে ভাল, আমেরিকান ফ্যাশান। চেহারা এককালে রমেশের ভালই ছিল। এখনও প্রসাধন করিলে ছোক্‌রা

া হউক, নবযুবকের মত দেখায়। যদিও আসলে তার বয়স বত্রিশ !

চোয়ালের হাড় উঠিয়াছে, চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, ও কপালে কয়েকটি শিরা দেখা দিয়াছে। তবুও জামা কাপড় ও কেশের পারিপাট্যে একটা শ্রী ফুটিয়া উঠে।

সুশীলা বুদ্ধি করিয়া তাড়াতাড়ি ট্রাঙ্কের কাপড় ও জামা ওলটপালট করিয়া বহু পুরাতন একটি এসেন্সের শিশি বাহির করিল। বিবাহের সময় এই শিশি গায়ে হলুদের তত্ত্বে গিয়াছিল—সে আজ বার-তের বছরের কথা। গোছালো বলিয়া শিশিটি সুশীলা তুলিয়া রাখিয়াছে। পূজার সময় ছেলেমেয়েদের গায়ে বিন্দুকয়েক খরচ হয়। এসেন্সের রং ফ্যাকাসে হইয়াছে, গন্ধ ত নাই-ই, আছে একটা ঝাঁঝ।

রমেশ আনন্দিত হইয়া বলিল,—আর সিল্কের সেই রুমালখানা ?

সুশীলা ভাঁজ-করা রুমালখানি সন্তর্পণে রমেশের বুক-পকেটে গুঁজিয়া দিয়া কহিল,—আস্তে আস্তে বার ক'রে মুখ মুছো। খবরদার খুলো না যেন।

রমেশ কহিল,—আরশিখানা একবার দাও ত।

আরশির সামনে নানা ভাবে ঘাড় কাৎ করিয়া চেহারা দেখিয়া রমেশ খুশীই হইল।

ছোট ছেলেটি আসিয়া বলিল,—হুঁ বাবা, আমার জন্যে লুচি সন্দেশ আনবে ত ?

রমেশ তাহাকে অল্প একটু ধমক দিয়া বলিল, হাঁ—নেমন্তন্ন খেতে যাচ্চি কি-না! যত সব হ্যাংলা!

সুশীলা তাড়াতাড়ি তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল,—ছাদে যাবি ? চ উড়োজাহাজ দেখাব। ঠোঁট ফুলাইয়া বালক বলিল,—জাহাজ, না ছাই! সন্দেশ আনবে না—তাই।

সুশীলা মৃদু কুণ্ঠিত স্বরে রমেশকে বলিল,—কালো রুমালখানা দেব! যদি পার ত—

রমেশ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল,—হ্যাংলার গুষ্টি। এই জামা-কাপড় প'রে সন্দেশের চাঁদা আনলে মুখখানা বুঝি পুড়ে যাবে না ?

সুশীলা আর কোনো কথা কহিল না।—রমেশ চলিয়া গেল।

মনটায় একটু যে দাগ না ধরিল তাহা নহে। একটি টাকা চাঁদা দিতে হইয়াছে। টাকাটা থাকিলে আধ সের ভাল মাছ ও দুটি করিয়া সন্দেশ বা রসগোল্লা ছেলেদের পাতে দেওয়া যাইত। খাইতে পায় না বলিয়া ছেলে-গুলা বড় হ্যাংলা হইতেছে! কিন্তু না,—টাকাটা থাকিলে কি আর সন্দেশ মাছ আসিত ? দেনা শোধ করিতেই কোথায় কর্পূরের মত উবিয়া যাইত।

কিছুতেই মন শান্ত হয় না দেখিয়া অবশেষে রমেশ মনে মনে ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল, আগামী মাসের মাহিনা হইতে একটি টাকা সে পৃথক করিয়া রাখিবেই। হয় সন্দেশ নতুবা বড় একটা ইলিশ মাছ।

ট্রেনের যে কামরায় দুইজন সহকর্মী বসিয়াছিল রমেশ অনেকখানি খালি জায়গা দেখিয়া তাহাদের পাশে গিয়া বসিল। বিমল এখনও আসে নাই।

প্ল্যাটফরমে ফেরিওয়ালার চীৎকার ও যাত্রীদলের ব্যস্ত-ভাবে যাতায়াতের দৃশ্য নিশ্চিন্তে বসিয়া উপভোগ করা যায়। মাঝে মাঝে সঙ্গীদের দিকে মুখ ফিরাইয়া গল্প ও রুমালখানি বাহির করিয়া মুখ মুছিতেও বেশ ভাল লাগে। রিষ্টওয়াচ থাকিলে ট্রেন ছাড়িবার সময় উত্তমরূপে জানা সত্ত্বেও পাশের ভদ্রলোককে ট্রেনের সময় জিজ্ঞাসা করা ও নিজের ঘড়িটি পুনঃ পুনঃ দেখায় খানিকটা গর্ব্ব ফুটিয়া উঠে।

ভদ্রলোকের ছেলেরা সব পাস করিয়া ক্যান্‌ভাসার হইয়াছে। চাকরি জুটিলে কি আর এই লাইনে কেহ আসিত ? যে পরিশ্রম! কানে তুলা গুঁজিয়া বড় ঝুলি বা ভারী সুটকেস বহিয়া বেড়াইতে হয়। মুখে চুরুট গুঁজিয়া দিব্য বেঞ্চের উপর পা তুলিয়া দিয়া ত্রিশ টাকা মাহিনার কেরানীবাবু তাহাদের নিকট হইতে কখনও-বা কোনো জিনিষ কেনে, কখনও-বা বিদ্রূপের হাসি হাসে।

ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা পড়িল। ট্রেন ছাড়িতে পাঁচ মিনিট বিলম্ব আছে। কুলীরা ছুটাছুটি করিতেছে।—গার্ড ব্যস্ত হইয়া নোট বুকে কি টুকিয়া লইতেছে। ষ্টেশন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছড়ি-হাতে প্ল্যাটফরমের এধার-ওধার

ঘুমিতেছেন। আহা! বেচারীরা নাকি রবিবারেও ছুটি পায় না।

অকস্মাৎ দরজার কাছে মহা কোলাহল হইল।

হ্যাণ্ডেলটা ঘুরাইয়া কে দুয়ার খুলিয়া ফেলিল ও এক পাল কুলীমজুর শ্রেণীর লোক কিছু বলিবার পূর্ব্বেই পিল-পিল করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

রমেশ মুখ বাঁকাইয়া সঙ্কুচিত হইয়া বসিল। পাছে বা জামাটায় দাগ লাগে!

রমেশের একজন সহকর্ম্মী বলিলেন,—না উঠতেই হ'ল। এই সব ছোটলোকের সঙ্গে যাওয়া মানে—

মানে যাহাই হউক, তিন জনেই উঠিয়া অন্য কামরায় চলিল।

অন্য দিনের কথা স্বতন্ত্র—কিন্তু আজ বিশেষ রকমের বেশভূষা করিয়া উৎসবক্ষেত্রে যোগদান করিতে চলিয়াছে, ছোটলোকের গাড়ী হইতে নামিতে দেখিলে অন্যেরাই বা কি বলিবে?

বাগানের পথে ত্রিশ জন সঙ্গী জুটিয়া গেল। এক সঙ্গে মিলিয়া কলরব করিতে করিতে সকলে হাঁটিতে লাগিল।

বাগানের দুয়ারে দুই জন অভ্যর্থনাকারী দাঁড়াইয়া ছিলেন। একজন পিচকারী করিয়া গোলাপ-জল ছিটাইয়া নব আগন্তুকদের আধভেজা করিয়া দিলেন, অপর ব্যক্তি ঝুড়ি হইতে লাল গোলাপ ফুল ও একখানি করিয়া প্রোগ্রাম সকলের হাতে বিতরণ করিতে লাগিলেন। বটন্ হোলে ফুল গুঁজিয়া অনেকে ভিতরে গট্ গট্ করিয়া চলিয়া গেল। অনেকে শার্টের বুক-পকেটে গুঁজল—অধিকাংশই হাতে লইয়া শুঁকিতে লাগিল।

রমেশ ফুল লইয়া প্রথমটা বুক-পকেটেই গুঁজিল, কিন্তু সেটি পকেটের মধ্যে ডুবিয়া যাওয়ায় হাতেই রহিল। তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া অবশেষে শার্টের একটা বোতাম খুলিয়া তাহার মধ্যে ফুলের বোঁটাটা গলাইয়া বোতামটি আঁটিয়া দিতে গেল; বোতাম আঁটিল না। ঈষৎ জোর করিতেই পলকা ঝিনুকের বোতাম পুট করিয়া ভাঙিয়া গেল। রমেশ অপ্রতিভ হইয়া চারিদিকে চাহিল—কেহ এই লজ্জাকর ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছে কি-না! না, কেহই দেখে নাই। তাড়াতাড়ি পকেট হাতড়াইয়া একটা পিন বাহির করিয়া ফুলটাকে দিব্য আটকাইয়া রাখিল। ছেঁড়া বোতাম বা পিন্ ফুলের নীচেই ঢাকা রহিল।

কার্ডে লেখা রহিয়াছে—প্রথম আইটেম চা ও সামান্য জলযোগ।

বাগানের কোণের ঘরটায় লোকের হুড়াহুড়ি লাগিয়া গিয়াছে। ওখানে নাকি চা তৈয়ারী হইতেছে! একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী চা বিতরণের ভার লইয়াছেন। তিনি সকলকে উদ্দেশ করিয়া হাসিমুখে বলিতেছেন,—তাড়াতাড়ি করবেন না। তাড়াতাড়ি করলে আপনাদেরই কষ্ট।

কিন্তু কে শোনে সে কথা? শীঘ্র না হইলে চা যেন উঠিয়া যাইবে!

ঠেলাঠেলি করিয়া রমেশ এক কাপ পাইল। প্লেটে আটখানি করিয়া লাঠি বিস্কুট।

ট্রেনে আসিয়া বেশ ক্ষুধা পাইয়াছে। বিস্কুট কখানি চিবাইয়া চোঁ-চোঁ করিয়া সে চা'র পেয়ালাটি নিঃশেষ করিল এবং আর এক কাপ পাইবার প্রত্যাশায় হাত বাড়াইল। এমন অনেকেই করিতেছে।

দ্বিতীয় কাপ শেষ করিয়া সে জলখাবারের ঘরের দিকে চলিল।

জলখাবার সামান্যই বটে!—

রমেশ মাটির রেকাব হাতে লইয়া হিসাব করিতে বসিল:—

ধর—

চপ ৵০ আনা

কাট্‌লেট্ ৵০ আনা

সিঙ্গাড়া ও কচুরি ৵০ আনা

নিম্‌কি ‹১০ পয়সা

পান্তুয়াটা ৵০ আনার কম নহে।

সন্দেশ আধপোয়া

নির্য্যাস ৵১০ পয়সা

ল্যাংড়া আমটাই কোন্ ৵০ আনার কমে মিলিবে

এই গেল ৷৷০ আনা।—চা দু-কাপ ৵০ আনা ও বিস্কুটও ৵০ আনা। এক টাকা চাঁদার বাকী রহিল

ছ-আনা। ওদিকে মাংস পোলাও চিংড়ীর মালাইকারি, লুচি, ছানার পায়েস, ভাল দই, আইস্‌ক্রীম্ সন্দেশ—দুটা টাকা অনায়াসে উশুল করা যাইবে। পান ও সোডা লেমনেড ত ফাউ। সোডা গোটা-দুই খাইয়া রাখিলে, হজম হইবে—ক্ষুধাও পাইবে। চাই কি ।৵০ টাকার জিনিসও…

লোভাতুর চোখ দুইটা তাহার জল্ জল্ করিয়া উঠিল। বাড়ির নিকটে হইলে মন্দ হইত না। কিংবা যদি কালো রুমালখানা সে আনিত।

ওধারে ঘাসবিছানো জমিটায় গোল করিয়া চেয়ার পাতা হইয়াছে। পদমর্য্যাদাশালীরা বসিয়া বসিয়া চুরুট ফুঁকিতেছেন ও প্রোফেসার চিত্তরঞ্জনের কৌতুকাভিনয় দেখিয়া ঘন ঘন করতালি দিতেছেন। উর্দ্দিপরা চাপরাশী-গুলি ট্রেতে করিয়া পান, সিগারেট ও লেমনেড লইয়া ঘুরিতেছে। ভলানটিয়ার ছোকরারা ডিসে খাবার সাজাইয়া তাঁহাদের খাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। কেহ এক টুকরা সিঙাড়া মুখে দিয়া ডিসখানি ঠেলিয়া দিতেছেন, কেহ-বা একটা সন্দেশের খানিকটা ভাঙিয়া মুখে দিয়া বলিতেছেন,—বাঃ সুন্দর জিনিষ! নাগের দোকানের নাকি?

এবং পরিপূর্ণ ডিসগুলি নামাইয়া রাখিয়া চরুট টানিতে টানিতে সঙ্গীর সঙ্গে পূর্ব্ববৎ গল্প করিতেছেন। ডিস-ভরা খাবার যে সবই নষ্ট হইল সেদিকে খেয়াল নাই।

রমেশের ভারি রাগ হইল। এত খাবার যে নষ্ট হইল, ভলানটিয়ারেরা ডিস ধুইবার সময় সব পুকুরের জলে ভাসাইয়া দিল—সে ক্ষতিটা কেহ দেখিতেছে না। দু-চার জন ছেলেপুলে সঙ্গে আনিলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হইত! না, হিসাবজ্ঞান কাহারও নাই।

রমেশ দেখিল ঘড়িতে প্রায় সাতটা বাজে। কলিকাতায় ফিরিবার ট্রেন সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাইবে। চাই কি, এক ঘণ্টার মধ্যে খানকয়েক সরা লইয়া সেই নাতিবৃহৎ …খানিতে নামাইয়া দিয়া অনায়াসে ফিরিয়া আসিয়া এ সব ভোজে যোগদান করিতে পারে। কিন্তু সরা লইয়া চুপি চুপি সরিয়া পড়িবার সুবিধা কই? দুয়ারে অভ্যর্থনা-কারীরা দাঁড়াইয়া অতিথিদের আপ্যায়িত করিতেছেন!

কেন রে বাপু! অভ্যর্থনা করিবার এত কি মাথা-ব্যথা? কেহ কাহারও বাড়ি নিমন্ত্রিত নহে যখন!—

তারপর, ধরা পড়িলে লজ্জার আর অবধি থাকিবে না। সকল লোকই হাসিয়া আঙুল দেখাইয়া বলিবে,—ওই দেখ, লোকটা এমনও হ্যাংলা!

হ্যাংলা কে নয়? দু-বার চা খাইয়া তৃতীয় বারের জন্য যাহারা হাত পাতে, দু-ডিস খাবার খাইয়াও যাহাদের তৃপ্তি হয় না, অজস্র পান সিগারেট খাইয়া চোখ-মুখ লাল করিয়াছে, সোডা লেমনেডের রাশি গিলিয়া পেটের মধ্যে জল গড়াইবার মত টক্ টক্ শব্দ হইতেছে—তাহারা বুঝি সাধু? মনে মনে সকলেরই তৃতীয় রিপুর আধিক্য। সকলেই হয়ত খাবার খাইবার সময় বাড়ির ছেলেমেয়েদের কথা একবার-না-একবার ভাবিতেছে। অথচ, যদি কেহ চোখের সামনে কিছু সংগ্রহের চেষ্টা করে ত ব্যঙ্গবিদ্রূপে তাহাকে জর্জ্জরিত না করিয়া উহাদের শান্তি নাই। নিজের অক্ষম ইচ্ছাকে পরের মধ্যে পরিস্ফুট হইতে দেখিলে নীতিরক্ষার অছিলায় অমনই লোকে গর্জ্জন করিয়া উঠে। যেন সৃষ্টি রসাতলে গেল আর কি!

বড় বড় অফিসাররা কেন সন্দেশ চাখিবেন না? নিত্য প্রাচুর্য্যের প্রাণরসে তাঁহারা সজীব। বাজারে ভাল মাছটি দেখিয়া না-কিনিবার বেদনা বহিয়া কোনো দিন তাঁহাদের বাড়ি ফিরিতে হয় না কিংবা দোকানে সাজানো নাম-না-জানা হরেক রকমের খাবার জিনিষের পানে চাহিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাসও তাঁহারা কোনো দিন ফেলেন না। গাড়ি বল, পোসাক-পরিচ্ছদ বল, দেশভ্রমণ, সিনেমা, থিয়েটার, কোন্ সখটা তাঁহাদের পূর্ণ না হইতেছে? ফরসা কাপড় জামা বাবুয়ানা উহাদেরই মানায়।

এই বাগান—সবুজ ঘাসে ছাওয়া, মরসুমী ফুলের সৌন্দর্য্যে ঝলমল, ঝিলের বুকে সবুজ বোট,—ক্রোটনের ঝোপে ঝোপে কুঞ্জ রচনা, অতিথির অভ্যর্থনায় ফুল ও গোলাপ-জল বিতরণ,—খাবারের রকম, কোনটাই রমেশদের মত প্রাণীর পক্ষে নহে। এমন কি, এই অবারিত একটানা মুক্ত বাতাস ও অজস্র আলোর বন্যা গুরুপাকের মতই বোধ হইতেছে।

উহারা হাসিতেছেন কেমন প্রাণখোলা হাসি।

খাবারের দিকে চাহিয়া দুশ্চিন্তা নাই, লাভক্ষতির হিসাব নাই, পুত্রকন্যাদের জন্য এক তিলও ভাবনা নাই।

খাইতে বসিয়া যেন হাস্য-কলরব বাড়িয়া উঠিল। রমেশ এক কোণে বসিয়া প্রাণ ভরিয়া আহার করিতেছিল। কি সব তরকারীর নামও জানে না—খাইতে চমৎকার।

ভাল লাগিতেই বলিতেছে,—ও মশাই, একবার এই দিকে আসবেন ত। না, না, লুচি নয়—পোলাও চাই না, হাঁ, ওই থেকে একটু মাছ বেছে। মুড়ো নেই? দইয়ের মাথাটা ভেঙে দেবেন ত! রসগোল্লা থাক, বরং আপনার আইসক্রীম সন্দেশটা একবার—আহাহা! একেবারে অতগুলো দিলেন!

পেট ভরিয়া খাইয়াও দশ-বারটি সন্দেশ পাতে পড়িয়া রহিল। রমেশ ভাবিতে ভাবিতে প্রায় যেন ক্ষেপিয়া উঠিল। এগুলি ফেলিয়া দিবে? অপচয় করা কি ভাল? কিন্তু উপায়ই বা কি।

এদিকে-ওদিকে চাহিয়া দেখিল,—পান লইবার ব্যস্ততায় সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, কাহারও নজর এদিকে নাই। ভাবিয়া-চিন্তিয়া রমেশ এক দুঃসাহসিকের কাজ করিল। টপাটপ সন্দেশগুলি পকেটে পুরিয়া সেই দিকটায় চাদর ঝুলাইয়া দিল। পকেট উঁচু হইলেও চাদরে ঢাকিয়াছে বেশ, কাহারও সন্দেহ হইবে না। ট্রেনে বসিবার সময় একটু সাবধানতা অবলম্বন করিলেই, ব্যস্! যে-দিকে কোণ সেই দিকে পকেট রাখিলে মিষ্টগুলি চ্যাপ্টাইয়া যাইবে না। দিব্য নিরাপদে এবং সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই বাড়ি পর্য্যন্ত পৌছান যাইবে। চাদর ঢাকিয়া রাবড়িটাও লওয়া যায়, কিন্তু অসুবিধা অনেক। একহাত জোড়া করিয়া পথ চলা—কেহ দেখিয়া ফেলিতে পারে, চলকাইয়া চাদর নষ্টও হইতে পারে। না, থাক। ওদিকে চাহিয়া চক্ষুকে মিছাই সকরুণ করা।

সন্দেশ লুকাইয়া এদিক-ওদিক চাহিতেই নজরে পড়িল, আরও জনকয়েক রমেশের মত সন্ত্রস্ত ভাবে এদিক-ওদিক চাহিতেছে। উহারাও হয়ত এই পথের পথিক। রমেশ মনে মনে হাসিয়া হাত মুখ ধুইল। পান লওয়া আর হইল না।

মান-সম্ভ্রম প্রায় বাঁচিয়া গিয়াছিল; কিন্তু রাসকেল হরিশটার জন্য সব ফাঁসিয়া গেল। এত সতর্কতা সত্ত্বেও সে খপ করিয়া তাহার পকেটে হাত পুরিয়া দিয়া কহিল,—মেলাই পান নিয়েচ যে, দাদা! দেখি দুটো। বলিয়া হাত টানিতেই একমুঠা সন্দেশ বাহির হইল। হরিশ চীৎকার করিয়া কহিল,—আরে ছোঃ, এ যে সন্দেশ! ক্যায়সা ভানুমতীর খেল্ দেখ—পান হয়ে গেল সন্দেশ!

—সমবেত জনতার উচ্চ হাস্যধ্বনিতে রমেশ মূর্চ্ছিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল,—কেন যে জ্ঞান হারাইয়া সেইখানে পড়িয়া গেল না—সেইটাই আশ্চর্য্য! শতকণ্ঠের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ তীরের মত শাণিত।

এমন কৌতুক অনেক দিন কেহ ভোগ করেন নাই যেন! প্রীতিভোজনের এই হাসির ব্যাপারটাও উৎসবের সুচারু-অঙ্গ!

হুম্-হুম্ শব্দে ট্রেন আসিল। রমেশ কিছুই শুনিতে পাইল না। না গাড়ির গর্জ্জন, না উহাদের হাসির তীক্ষ্ণ ধ্বনি।

হরিশই অভিভূত রমেশকে ঠেলিয়া গাড়িতে তুলিয়া দিল। নির্ব্বিঘ্ন একটি কোণ রমেশের ভাগ্যে মিলিল এবং সেই দিকে সন্দেশ-মাখা পকেট লইয়া সে বসিতেও পাইল। না পাইলেই বা কি ক্ষতি হইত! বরং আসিবার কালে এক পাল কুলী যেমন গাড়ীতে উঠিয়াছিল, তেমনই কুলীর ভিড়ে সে যদি ঢাকিয়া যাইত! বেশ হইত।

হরিশ পকেট হইতে তিন প্যাকেট সিগারেট বাহির করিয়া কহিল,—এই দেখ এখন দশ দিনের দায় নিশ্চিন্ত। ব্যোমকেশটা চালাক খুব। আটটা প্যাকেট ও গোটা পঁচিশেক বর্ম্মা বাগিয়েচে। ননী, পান আছে তোমার কাছে!

একগাল হাসিয়া ননী পকেট হইতে মুঠাভর্ত্তি পান বাহির করিয়া সকলকে এক একটা দিল। সকলেই খুশী হইয়া সিগারেট ধরাইল।

হরিশ কহিল,—নাও না হে রমেশ,—পান খাও। আঃ ছোঃ—সন্দেশ মাখিয়ে পকেটটাকে নষ্ট করেছ। পরে গোটা-দুই পান ও একটা সিগারেট তার মুখে গুঁজিয়া দিয়া কহিল,—দুটো পান আনলে যে কাজ দেখতো নাও ধর—আগুনটা নইলে নিবে যাবে।

বিড়ি, সিগারেট বা পান সংগ্রহে যথেষ্ট বীরত্ব আছে সন্দেহ নাই। মান-সম্মানের বেড়ার বাহিরে বলিয়া ও-গুলি কোনকালে অভ্যাগতকে অপদস্থ করে না। অথচ সন্দেশ? মান নষ্ট ত হয়ই, পকেটও। সংসারের উপর তার ভারি রাগ হইল। যত সব হ্যাংলা ছেলে-মেয়ে কি তার ঘরে? - মায় সুশীলা পর্য্যন্ত! আসিবার সময় কালো রুমালখানা দিবার কথা না বলিলেই কি তার হইত না? লোভকে উস্কাইয়া দেওয়া বইত না! আসিয়া অবধি সে কালো রুমালখানার কথা অনবরত ভাবিয়াছে। অভাবগ্রস্ত সংসার, হ্যাংলা ছেলেমেয়েগুলার বায়না, আগামী মাসের খরচের হিসাব—যত ছাই আর ভস্ম। ম্যাজিক, গান, কৌতুকাভিনয় কোনো কিছুই তাহাকে আকর্ষণ করে নাই। কেবল শততালি দেওয়া সংসার ও তার চারিদিকে কুৎসিত কালো ছায়া। ঐ সব ভাবনা যেন ঝাঁঝওয়ালা বড় পিঁয়াজ—চোখের জল টানিয়া বাহির করিতে উহাদের ক্ষমতা অদ্ভুত।

পান চিবাইতে চিবাইতে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া কোণের দিক হইতে পকেটটা টানিয়া উল্টাইয়া অবশিষ্ট সন্দেশ ফেলিয়া দিতে দিতে কহিল,—ওই বিমলটা বসেছিল আমার পাশে—এ-সব তারই কাজ। আহাম্মক! চার আনা দামের স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে গার্ডেন পার্টিতে এসেচে—লজ্জাও নেই! এ কথায় ট্রেনের কেহ হাসিল না।

এবং সেই স্তব্ধতার দুঃসহ লজ্জায়, সত্য বলিতে কি, সেই মুহূর্ত্তে দশ টাকা মাসিক ভাড়ার ঘরখানি রমেশের চক্ষে বড়ই অসুন্দর ঠেকিল।

সীমা

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

সীমা—সীমা—সারা বিশ্ব কাঁদিল কাতরে,
কোটী কোটী পণ্ডিতের ভাষা নিরুত্তর;
ক্ষুদ্র প্রাণ দিশাহীন না পায় সন্ধান,
সীমা খুঁজিবারে গিয়া ব্যাকুল কাতর।
অনন্ত জীবন-পথে চাহিনু বিস্ময়ে,
হেরিনু তাহার দূর সুদূরের পানে;
অন্ত কোথা? কি যেন কি হেঁয়ালীর মত
জটিলতা বেড়ে যায় হৃদি-মাঝখানে।

দর্শন কাঁদিয়া ফিরে সীমার লাগিয়া,
বিজ্ঞান সে সীমা লাগি ফিরে নিশিদিন;
রূপ অরূপের পিছে ফিরিছে কাঁদিয়া,
সীমারে ঘিরিয়া বাজে অসীমের বীণ্।
নীল ঘিরে ঘিরে নাচে অনন্ত নীলিমা,
অসীম সে বিশ্ব ঘিরে রচিয়াছে সীমা।

গীতা

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

১৩

পঞ্চম অধ্যায়

৫।১—অর্জ্জুন বলিলেন, "হে কৃষ্ণ তোমার কথার ভাবে বোধ হইতেছে তুমি কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মের আচরণ দুই-ই করিতে বলিতেছ; এই দুইয়ের মধ্যে কোনটি শ্রেয় ঠিক করিয়া আমাকে বল।" এই শ্লোকে 'শংসসি' কথা আছে, ইহার অর্থ 'ইঙ্গিত করিতেছ' অর্থাৎ কৃষ্ণ এরূপ কথা স্পষ্ট বলেন নাই, তাঁহার কথার ভাবে ইহা মনে হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রশ্ন ছিল ক্রুর কর্ম্ম কেন করিব ও পঞ্চম অধ্যায়ের প্রশ্ন ভালমন্দ-নির্ব্বিশেষে সমস্ত কর্ম্মই কেন পরিত্যাগ করিব না। এই প্রশ্ন অর্জ্জুনের মনে কেন উঠিল ৩।১ শ্লোকের ব্যাখ্যায় তাহা দেখাইয়াছি। গীতায় উল্লিখিত বিভিন্ন সাধন-প্রণালীর বিচারকালে বলিয়াছি যে তখনকার দিনে এখনকার মতই অনেক ধার্ম্মিক ব্যক্তি সংন্যাস অবলম্বন করিতেন। এই সংন্যাস-মার্গ সাংখ্য মার্গের অন্তর্গত। গীতাকার প্রশ্নোত্তর-ছলে অতি নিপুণভাবে তৎকাল-প্রচলিত সকল প্রকার নিষ্ঠার আলোচনা করিয়াছেন। এই অধ্যায়ে সংন্যাস-মার্গ আলোচিত হইয়াছে। অর্জ্জুন প্রশ্ন করিতেছেন, সংসারে থাকিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মাদি সম্পাদন করা ভাল, না, গৃহত্যাগী হইয়া ও সর্ব্ব কর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া সংন্যাসী হওয়া ভাল।

৫।২—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "সংন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মঙ্গলপ্রদ কিন্তু ইহাদের মধ্যে কর্ম্মসংন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই উৎকৃষ্টতর।" শ্রীকৃষ্ণ সংন্যাস-মার্গের পক্ষপাতী নহেন। সংন্যাসমার্গী ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ এই শ্লোকের শ্রীকৃষ্ণের স্পষ্ট উক্তির নানা প্রকার বিকৃত অর্থ করিয়াছেন। সংন্যাসই একমাত্র সাংখ্য মার্গ এই ধারণা অনেককে ভ্রান্ত করিয়াছে; শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানের নিন্দা করিবেন তাহা হইতে পারে না, কাজেই তাঁহাদের এই শ্লোকের অর্থ বদলাইতে হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের বিশেষত্ব এই যে, তিনি কোন মার্গকেই সম্পূর্ণ দুষ্ট বলেন নাই। সংন্যাস-মার্গের যাহা কিছু ভাল শ্রীকৃষ্ণ তাহার সমস্তই গ্রহণ করিয়াছেন ও কর্ম্ম-মার্গে থাকিয়াও কি করিয়া সংন্যাসীর মত শ্রেয় লাভ হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি সংন্যাসের এক অভিনব নির্ব্বচন দিয়াছেন। গৃহত্যাগ করিলেই সংন্যাসী হয় না, কর্ম্মত্যাগ করিলেই সংন্যাসী হয় না। নিত্যকর্ম্মশীল গৃহীও সংন্যাসী পদবাচ্য হইতে পারে। পরের শ্লোকগুলিতে ইহার আলোচনা আছে।

৫।৩—"যিনি কোন বস্তু বা বিষয়ে দ্বেষও করেন না আকাঙ্ক্ষাও করেন না তিনি নিত্যসংন্যাসী বলিয়াই জ্ঞাত হন; কারণ রাগদ্বেষ-দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত পুরুষ অনায়াসে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন।" সংন্যাসীকে যে গৃহত্যাগী হইতে হইবে এখানে তাহা বলা হইল না। সংসারে থাকিয়া দ্বন্দ্বহীন হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম করিলেও মনুষ্য সংন্যাসী পদবাচ্যই হইয়া থাকে। ইহাই কৃষ্ণের অনুমোদিত সংন্যাস।

৫।৪-৫—"বালবুদ্ধি ব্যক্তি সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানমার্গ ও যোগ অর্থাৎ কর্ম্মমার্গকে পৃথক বলে, কিন্তু পণ্ডিতেরা তাহা বলেন না। এই দুইয়ের যে-কোনটিকে সম্যক আশ্রয় করিলে উভয়ের ফললাভ হয়। জ্ঞানযোগলভ্য স্থানে কর্ম্মযোগ দ্বারাও যাওয়া যায়। যিনি সাংখ্য ও যোগ

অর্জ্জুন উবাচ—

সংন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ—

সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥ ২
জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥ ৩

এক দেখেন তিনিই যথার্থ দেখেন।" এই দুই শ্লোকে সাংখ্য শব্দে সাধারণ ভাবে জ্ঞানমার্গই বুঝাইতেছে। সাংখ্যান্তরগত সংন্যাস নিষ্ঠার কথা বিশেষ করিয়া পরের শ্লোকে বলা হইয়াছে।

৫।৬—"কিন্তু হে মহাবাহো, কর্ম্মযোগ বিনা সংন্যাস-লাভ কষ্টকর। কর্ম্মযোগপরায়ণ সাধক অচিরে ব্রহ্মলাভ করেন।" কর্ম্মত্যাগে ধাতু অপ্রসন্ন থাকে বলিয়া বুদ্ধিস্থির হয় না ও ব্রহ্মলাভ কঠিন হয়। এই শ্লোকেও বুঝা যায় সংন্যাসমার্গ বলিলে সাধারণে যাহা মনে করে অর্থাৎ সংসারত্যাগ শ্রীকৃষ্ণ তাহা অনুমোদন করেন না। গৃহত্যাগ কখনই আচরণীয় নহে এমন কথা শ্রীকৃষ্ণ বলেন নাই। কারণ প্রবৃত্তিভেদে কাহারও কাহারও সংসারত্যাগ বাঞ্ছনীয় হইতে পারে।

৫।৭—সংসারে থাকিলেই বন্ধন হইবে এমন কথা ভাবিও না। "যোগযুক্ত, বিশুদ্ধাত্মা, বিজিতচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বভূত যাঁহার আত্মাতে উপলব্ধ হইয়াছে এমন ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়াও লিপ্ত হন না।" কেবল যে সংন্যাস-মার্গেই সংসার বন্ধন কাটান যায় তাহা নহে, যোগযুক্ত সংসারীরও বন্ধন হয় না ইহাই বলা উদ্দেশ্য।

৫।৮-৯—"তত্ত্ববিৎ যোগযুক্ত হইয়া বুঝিবেন যে, তিনি অর্থাৎ তাঁহার আত্মা কিছুই করিতেছেন না। স্বভাববশে ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হইতেছে ও তাহার বশেই তিনি দেখিতেছেন, শুনিতেছেন, স্পর্শ করিতেছেন, ঘ্রাণ করিতেছেন, আহার করিতেছেন, গমন করিতেছেন, ঘুমাইতেছেন, শ্বাস ফেলিতেছেন, কথা বলিতেছেন, মলমূত্রাদি ত্যাগ করিতেছেন, গ্রহণ করিতেছেন, চক্ষু উন্মীলিত নিমীলিত করিতেছেন এবং এই সকল করিয়াও তিনি নিষ্ক্রিয় আছেন।" এখানে তাবৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কাজের কথা বলা হইয়াছে; উদ্দেশ্য এই যে, সংন্যাসী হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক সকল কর্ত্তব্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও এই সকল কর্ম্ম ত্যাগ হয় না। অতএব সংসারত্যাগী সংন্যাসী নিজেকে নিষ্ক্রিয় বলিলেও তিনি নিষ্ক্রিয় নহেন। যে ব্যক্তি তত্ত্ববিৎ ও যোগযুক্ত কেবল তিনিই নিষ্ক্রিয়। কারণ তিনি বুঝিতে পারেন সকল কার্য্যে তাঁহার আত্মা নির্লিপ্তই রহিয়াছে; কর্ম্মবন্ধন এড়াইবার জন্য সংসারত্যাগ বৃথা। তত্ত্ববিদের সংসার-ত্যাগের কোনই প্রয়োজন নাই। নিজ স্বভাবজাত প্রবৃত্তি যদি তাঁহাকে সংসারী করে তাহাতে তিনি ক্ষুণ্ণ হন না।

৫।১০—"যিনি আসক্তি ত্যাগ করিয়া ও ব্রহ্মে অর্পণ করিয়া কর্ম্মসকল করেন, পদ্মপত্র জলদ্বারা যেরূপ লিপ্ত হয় না তিনি সেইরূপ পাপদ্বারা লিপ্ত হন না।" ব্রহ্মে কর্ম্ম-সমর্পণ কাহাকে বলে তাহা বিচার্য্য। তৃতীয় অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে আছে কর্ম্মের উদ্ভব ব্রহ্মা হইতে এবং ব্রহ্মা অক্ষরপুরুষ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছেন অতএব ব্রহ্ম সর্ব্ব-বিষয়ে পরিব্যাপ্ত। যাঁহার আত্মোপলব্ধি হইয়াছে, তিনি প্রকৃতিই কাজ করিতেছেন, এই জ্ঞানে প্রকৃতিতেই কর্ম্ম-সমর্পণ করেন ও কর্ত্তৃত্বাভিমান রাখেন না। প্রকৃতি ব্রহ্মেরই মায়া শক্তি অতএব প্রকৃতি কর্ম্ম করিতেছে বুঝিলে ব্রহ্মে কর্ম্মসমর্পণ করা হইল। পরের শ্লোকে এই কথাই বলা হইয়াছে।

৫।১১—"যোগীরা অর্থাৎ যাঁহারা কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়াছেন আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত কেবল শরীর, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারাই আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্ম করেন" অর্থাৎ তাঁহাদের আত্মা নির্লিপ্ত থাকে।

৫।১২—"যোগযুক্ত ব্যক্তি কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া নৈষ্ঠিক শান্তি অর্থাৎ সংন্যাস-নিষ্ঠা-লভ্য শান্তি প্রাপ্ত

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতেস্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫
সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্‌গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ন্ উন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯
ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১

হন, কিন্তু অযুক্ত পুরুষ কামের প্রেরণায় ফলে আসক্ত হইয়া বন্ধনপ্রাপ্ত হয়।" 'নৈষ্ঠিক' শব্দের অর্থ অবিচলিত কিংবা নিষ্ঠাজনিত। ৫।৫ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে স্থান সাংখ্য দ্বারা পাওয়া যায় অর্থাৎ যে পদ জ্ঞান-লভ্য তাহাতে কর্ম্মযোগ দ্বারাও যাওয়া যায়; এখানে বলিতেছেন সেই জ্ঞাননৈষ্ঠিক শান্তি অর্থাৎ মোক্ষ কর্ম্মযোগীও প্রাপ্ত হন। কামনাযুক্ত কর্ম্মেই বন্ধন। কামনা পরিত্যাগ করিলে সংসার পরিত্যাগ করিয়া সংন্যাসী হইবার কোন আবশ্যকতা নাই।

৫।১৩-২৪—"বশী" অর্থাৎ বিজিতেন্দ্রিয় দেহধারী পুরুষ সর্ব্বকর্ম্ম মনের দ্বারা সংযমিত করিয়া অর্থাৎ আত্মাকে নির্লিপ্ত রাখিয়া স্বয়ং কিছু করিতেছেন না এবং কিছু করাইতেছেন না এই বোধযুক্ত হইয়া নবদ্বারবিশিষ্ট দেহ-রূপ পুরে সুখে অবস্থান করেন। প্রভু আত্মা লোকের কর্ত্তৃত্বাভিমান সৃষ্টি করেন নাই, তিনি কর্ম্মও সৃষ্টি করেন নাই এবং তাহাতে ফল সংযোগও করেন নাই; প্রকৃতিজাত স্বভাবের দ্বারাই এই সমস্ত প্রবর্ত্তিত হইতেছে। বিভু আত্মা অর্থাৎ আত্মা সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্ববিষয়ে অন্তঃপ্রবিষ্ট থাকিলেও কর্ম্ম-জনিত পাপ-পুণ্যে লিপ্ত হন না; এই জ্ঞান অজ্ঞান-দ্বারা আবৃত থাকায় জীবের উপলব্ধি হয় না এবং তাহাতেই জীব মোহপ্রাপ্ত হইয়া কষ্ট পায়। আত্মজ্ঞান দ্বারা যাহাদের এই অজ্ঞান নাশিত হইয়াছে তাঁহাদের জ্ঞান মেঘনির্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় পরমতত্ত্বকে প্রকাশিত করে। আত্মাতেই যাঁহাদের বুদ্ধি সন্নিবিষ্ট, আত্মার সহিত যাঁহারা নিজ ঐক্য বুঝিয়াছেন, আত্মার প্রতিই যাঁহাদের নিষ্ঠা, আত্মাই যাঁহাদের চরম গতি তাঁহাদের জ্ঞানের দ্বারা সকল পাপ বিনষ্ট হয় এবং পুনরাবর্ত্তন হয় না। এই প্রকার জ্ঞানী পুরুষ বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, গরুতে হস্তিতে, কুকুরে এবং শ্বপাকে (কুকুরভোজী, চণ্ডাল) সমদর্শী হন। এই প্রকার সাম্য যাঁহাদের আয়ত্ত হইয়াছে তাঁহারা ইহলোকে থাকিয়াই সংসার জয় করিয়াছেন; তাঁহাদের মন ব্রহ্মবৎ পক্ষপাতহীন ও সমদৃষ্টিযুক্ত হওয়ায় তাঁহারা ব্রহ্মেই অবস্থিত। এইরূপ স্থিরবুদ্ধি, মোহশূন্য ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মে স্থিত হইয়া প্রিয়বস্তুলাভে হৃষ্ট হন না এবং অপ্রিয় বস্তুতেও উদ্বিগ্ন হন না। বহির্বিষয়ে অনাসক্ত, ব্রহ্মযোগে অবস্থিত ব্যক্তি আত্মাতেই যে সুখ বিদ্যমান আছে তাহা অক্ষয়ভাবে ভোগ করেন। ইন্দ্রিয় সহিত বহির্বিষয়-সংযোগজাত যে সুখ তাহা আদি-অন্তবিশিষ্ট অর্থাৎ তাহা ক্ষণস্থায়ী এবং তাহা পরিণামে দুঃখের কারণ-স্বরূপ হইয়া থাকে; জ্ঞানী তাহাতে রত হন না। তিনি শরীর ধারণ করিয়া জীবিতাবস্থাতেই ইহলোকে ইচ্ছা ও ক্রোধজনিত বেগ সহ্য করিতে বা শান্ত করিতে পারেন অর্থাৎ ইহাদের দ্বারা যিনি বিচলিত হন না তিনিই যোগযুক্ত, তিনিই সুখী। আত্মাতেই যাঁহার সুখ, আত্মাতেই যাঁহার রতি এবং আত্মাকেই যিনি জ্যোতিঃস্বরূপে উপলব্ধি করেন সেই যোগী ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।"

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥ ১২

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্॥ ১৩

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফল সংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ ১৪

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ ১৫

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥ ১৬

তদ্ বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎ পরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূত কল্মষাঃ॥ ১৭

বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ১৮
ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥ ১৯
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ংপ্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥ ২০
বাহ্যস্পর্শেষসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগ যুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥ ২১
যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥ ২২
শক্নোতীহৈব যঃসোঢ়ুং প্রাক্শরীর বিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ ২৩
যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেবযঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥ ২৪

এখানে যোগী শব্দে কর্ম্মযোগী বুঝাইতেছে। পাতঞ্জল-যোগের কথা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আছে। এই শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য—অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে এবং আত্মার প্রতি মনোনিবেশ করিলে সংসারে থাকিয়াও সংসারত্যাগী সংন্যাসীর লভ্য সুখ-দুঃখে অবিচলিত ভাব, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি ও ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সংন্যাস মার্গের অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগের কোনও বিশেষ আবশ্যকতা নাই ইহা দেখাইবার জন্য পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে বলা হইয়াছে যে সর্ব্বভূত হিতে রত থাকিয়াও ঋষিরা ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন, প্রাণায়াম-ক্রিয়াপরায়ণ যতি, মুনিরাও ব্রহ্মলাভ করেন। যিনি আমাকেই যজ্ঞ তপস্যা ইত্যাদির ভোক্তা, সর্ব্বলোকের ঈশ্বর ও সর্ব্বভূতের হিত-সাধক বলিয়া জানেন তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন" অর্থাৎ যজ্ঞ, তপস্যা, সর্ব্বভূতের হিতসাধনে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি মুক্ত হন। যজ্ঞ, তপস্যা, লোকহিতকর কর্ম্মে নিযুক্ত থাকা সংন্যাসীরা অকর্ত্তব্য মনে করেন—সে জন্যই এই সকল শ্লোকের অবতারণা।

৫।১৩ শ্লোকে দেহকে নবদ্বার-পুর বলা হইয়াছে। দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসারন্ধ্র, মুখ, পায়ু ও উপস্থ এই নয়টি দেহ-রূপ পুরের দ্বার। কঠোপনিষদে ৫।১ শ্লোকে দেহকে একাদশ দ্বার পুর বলা হইয়াছে। পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়-দ্বার মনুষ্যের বহির্জগতের সহিত আদান-প্রদানের পথ। দেহকে নগর বা গৃহের সহিত তুলনা অতি প্রাচীন। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, স্বপ্নে গৃহ বা নগর দেহের প্রতীক রূপেই দেখা দেয়।

৫।১৮ শ্লোকে সমদৃষ্টির উদাহরণে একদিকে বিদ্যাবিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও অপর দিকে ঘৃণিত চণ্ডাল ও কুক্কুরের কথা বলা হইয়াছে। বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানার্হ ব্যক্তি। কেবল ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মিয়া যজ্ঞোপবীতধারী হইলেই ব্রাহ্মণ হয় না। গুণকর্ম্মদ্বারাই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদিত হয়। যে ব্রাহ্মণ বিদ্যাসম্পন্ন ও বিনয়সম্পন্ন তিনিই শ্রেষ্ঠ। 'বিনয়' শব্দের অর্থ বিদ্যালব্ধ আচারনিষ্ঠা (discipline)।

৫।২৫—"যাঁহাদের কালুষ্য ক্ষয় হইয়াছে অর্থাৎ যাঁহাদের পাপাদি দোষ নষ্ট হইয়াছে, যাঁহাদের মন সংশয়-শূন্য হইয়াছে যাঁহারা আত্মসংযমশীল এরূপ ঋষিগণও সর্ব্বভূত হিতে রত থাকিয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন।" 'সর্ব্বভূত হিতে রত' কথার অর্থ শঙ্কর 'অহিংসাপরায়ণ' করিয়াছেন। জীবের অনিষ্ট না করাই একমাত্র হিত কর্ম্ম নহে। সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলসাধন 'হিত' শব্দের অন্তর্গত। ঋষিরা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা সৃষ্টিচক্র প্রবর্ত্তিত রাখিতে সাহায্য করেন এ জন্যই তাঁহাদের সর্ব্বভূত হিতে রত বলা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে যজ্ঞের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৫।২৬-২৭—"কামনা ও ক্রোধ শূন্য সংযতচিত্ত আত্মজ্ঞানী যতিগণ উভয়তঃ অর্থাৎ ইহলোকে ও পরলোকে ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন।" ইহলোকেই কি করিয়া ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ হয় তাহা বলিতেছেন "বাহ্যবিষয়ের অনুভূতি রোধ করিয়া ভ্রূযুগলের মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নাসার অভ্যন্তরে বিচরণশীল প্রাণ ও অপান বায়ুকে 'সম' করিয়া অর্থাৎ সংযত করিয়া" অর্থাৎ সমাধি অবস্থায় ইহলোকেই ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ হয়। প্রায় সকল ভাষ্যকারই ২৭ শ্লোকের অন্বয় ২৮ শ্লোকের সহিত করিয়াছেন। ২৮ শ্লোকে মুনিদের কথা আছে এবং ২৬ শ্লোকে যতিদের কথা আছে। ২৭ শ্লোকে বর্ণিত প্রাণায়াম সাধনা যতিদেরই সাধনা। ৪।২৯ শ্লোকেও প্রাণায়ামের কথা আছে এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকেই যতিদের কথা বলা হইয়াছে। প্রাণায়াম যতিদেরই বিশিষ্ট সাধনা-পদ্ধতি ছিল বলিয়া মনে হয়। চতুর্থ অধ্যায়ে প্রাণায়ম সম্পর্কে মুনিদের কোন উল্লেখ নাই। পূর্ব্ব-প্রকাশিত প্রাণায়ামের আলোচনা দ্রষ্টব্য (প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯)। 'মুনি' শব্দের ধাতুগত অং

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ ২৫

কামক্রোধ বিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্॥ ২৬
স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রূবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥ ২৭

মননশীল ব্যক্তি। মানসিক সাধনাই মুনিদের সাধনা। পরের শ্লোকেও তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

৫।২৮—"যে মুনি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সংযত করিয়াছেন, যিনি মোক্ষপরায়ণ, যাঁহার কামনা, ভয় ও ক্রোধ বিগত হইয়াছে তিনি সর্ব্বদা মুক্ত অবস্থাতেই আছেন।"

৫।২৫-২৮ শ্লোকের তাৎপর্য্য কেবল যে কর্ম্মত্যাগী সংন্যাসী মোক্ষলাভের অধিকারী তাহা নহে। মুনি, ঋষি ও যতিগণ কর্ম্মযুক্ত সাধনার দ্বারাই ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন। ৬ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে পাতঞ্জল যোগীও কর্ম্মময় সাধনায় মুক্ত হন।

৫।২৯—"আমাকেই যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তারূপে, সর্ব্বলোকের মহেশ্বররূপে অর্থাৎ সর্ব্বলোককে আমিই প্রবর্ত্তিত করিতেছি, এবং সর্ব্বভূতের সুহৃদরূপে অর্থাৎ সর্ব্বভূতের আমি হিতসাধনে রত আছি জানিলে সাধক শান্তিলাভ করেন।" এই শ্লোকের উদ্দেশ্য এই যে যজ্ঞাদি কর্ম্মের ভোক্তা হইয়াও লোকসমূহের কর্ত্তৃত্ব ও হিতসাধন করিয়াও ভগবান নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাবই থাকেন অতএব সাধকও ইহা বুঝিয়া যজ্ঞাদি কর্ম্মের বন্ধনে পতিত হয় না; তাহাকে সংন্যাসী হইয়া নিষ্ক্রিয় অবস্থা প্রাপ্তির চেষ্টায় সর্ব্বভূতের মঙ্গল-জনক উত্তম কর্ম্মসমূহ হইতেও বিরত হইতে হয় না। পরের অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—যিনি নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন তিনিই প্রকৃত সংন্যাসী ও যোগী। যজ্ঞাদি ক্রিয়া বর্জ্জন করিলেই বা নিষ্ক্রিয় থাকিলেই সংন্যাসী বা যোগী হয় না। সামাজিক আদর্শ গীতায় সর্ব্বত্র উচ্চস্থান পাইয়াছে। ইতি সংন্যাস যোগ নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

যতেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষ পরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছা ভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোক মহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯

অচল

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

এক মাস আগে বিবাহ হইয়াছে, যামিনী এই প্রথম স্বামীর ঘর করিতে আসিল। কলিকাতার একটি একান্নবর্ত্তী পরিবারে তাহার শ্বশুরবাড়ি। শ্বশুর-মহাশয় পরলোকে।

যামিনীর পরিচয়ের বৈশিষ্ট্য কিছু নাই। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সামান্য কেরানী, নিতান্ত মধ্যবিত্তের মধ্যে সে মানুষ, যৎসামান্য শিক্ষা এবং নিরানব্বইটি বাঙালীর মেয়ের মতই তাহার চরিত্র। যামিনী বেশ ঘরজোড়া বউ।

হেরম্ব স্ত্রীকে পাইয়া খুব খুশী হইল। বিবাহের রাত্রি হইতেই স্ত্রীকে সে সোনার চক্ষে দেখিয়াছে। যামিনীও আসিয়া হাসিয়া তাহার হাত ধরিল। স্বামী তাহার রূপে-গুণে সুন্দর।

আমার কথা? আমার কথা আর ব'লো না, দেখছ ত ঘরদোরের অবস্থা? তোমার আসার আশাতেই ছিলাম। আঃ বাঁচলাম, বাঁচলাম যামিনী, তুমি এলে।

যামিনী কহিল,—বাড়িতে এত লোক, তোমার ঘরের দিকে কেউ তাকাত না? কি হয়ে আছে এসব?

হেরম্ব হাসিয়া বলিল,—এমনই বরাবর, আর কি জান জঞ্জাল জমে মানুষের চোখের আড়ালে, চুপি চুপি?

যামিনী ঘরের ভিতর এদিক-ওদিক তাকাইয়া খানিকক্ষণ পায়চারি করিতে লাগিল। এই ঘরে তাহাকে থাকিতে হইবে, এই তাহার ঘর।

হেরম্ব বলিল,—শুধু জঞ্জাল নয় যামিনী, আমি অত্যন্ত অগোছালো। ঘর ত নয় যেন বারোয়ারীতলা; জিনিষপত্রগুলো যে কেমন ক'রে ঘরের মধ্যে মারকুট্টি

করে বেড়ায় বুঝলে, এ ওর ঘাড়ে চড়ে, ওটা তার পায়ের তলায়, ওদের জন্যে আমার চরিত্র হয়ে ওঠে সুস্পষ্ট।

যামিনী তাহার স্বামীর-দিকে তাকাইয়া হাসিল। এই মানুষটির পেটে যদি কিছু কথা থাকে! এই এক মাসে খানদশেক চিঠি সে পাইয়াছে। সুন্দর প্রেমপত্র, কিন্তু অত্যন্ত হাস্যকর, সামঞ্জস্যহীন, চিঠির মধ্যে কেবল দুরন্তপনা, ছেলেমানুষী আর পাগলামি। ভালবাসা জানাইতে গিয়া তাহার যত আজগুবী কল্পনা।

যামিনী, তোমার যেন কষ্ট না হয়, এ ঘরে হাওয়া খুব, কাগজপত্র উড়ে যায় ব'লে জানালা খুলিনে, তুমি দক্ষিণের ওই জানালা খুলে রেখ। তুমি এলে, এবার এদের চেহারা ফিরবে, দেখছ মশারিটা কি কালো হয়ে আছে? ছবিগুলো অন্ধকার হয়ে গেছে, আর দেখা যায় না। আশ্চর্য্য, তুমি না এসে আমি কেমন করে ছিলাম?

আলতাপরা পা দুইখানি গুটাইয়া যামিনী এক জায়গায় বসিল। সে যেন বিদেশে আসিয়াছে, হাত-পা ছড়াইয়া এখনও এই ঘরখানির সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিতেছে না।

বই, খাতা, মাসিকপত্র, খবরের কাগজ, পুরানো চিঠি ইত্যাদির ভিড়ে ঘরের মেঝেতে পা বাড়াইবার উপায় নাই। তাহাদেরই ফাঁকে ফাঁকে খালি দেশলাইয়ের খোল, ভাঙা চায়ের পেয়ালা, দাঁত মাজিবার ও দাড়ি কামাইবার অকর্ম্মণ্য সরঞ্জাম, ঘষা আয়না, দাড়াভাঙা চিরুণী, সমস্তগুলি মুখ বাড়াইয়া এই লোকটির বিশৃঙ্খল জীবনের আভাস দিতেছে। আসবাবপত্র বলিতে ঘরের মধ্যে কিছুই নাই। কলকব্জাহীন একটা ছোট তোরঙ্গ, উপরের মত সম্ভবতঃ ভিতরেও তাহার দৈন্য, একপাশে একটা কাচভাঙা শিশু-আলমারি, তাহার মধ্যে ছোট একটি পুরাতন পুস্তকের দোকান, এক কোণে একটা কেরোসিনের টেবল-ল্যাম্প—তাহার চিমনীটায় কালি পড়িয়া কালো হইয়া উঠিয়াছে—ইহাদেরই মাঝখানে থাকিয়া তাহার স্বামী, এই সরল লোকটি, কেমন করিয়া যে দিনের পর দিন নির্ব্বাহ করে তাহা বুঝা কঠিন।

ওটা কি ঝুলচে গো দেয়েলে আটকান?

যামিনীর দৃষ্টিকে অনুসরণ করিয়া হেরম্ব দেওয়ালের দিকে চাহিল। বলিল, ওটা? বলিয়া হাসিয়া একটা ঢোক গিলিল। মনে হইল, সে যেন একটা ভয়ানক কৌতুককর কথা বলিবে।

যামিনী বলিল, কি ওটা? বলে?

হ্যাঁ, বলে, ওটার নাম ঝুলি। ওটা কাঁধে চড়িয়ে আমি দেশ ঘুরতে বেরোই, যামিনী। বলিয়া হেরম্ব হাসিতে লাগিল।

যামিনী বলিল, এত বই-কাগজ, এ যেন হরিঘোষের গোয়াল, রাতে তুমি শোও কোথায়?

—শুই কোথায়? রাতে এলে দেখতে পেতে, যামিনী। যেদিন ক্লান্ত হই সেদিন বিছানাও নয় বালিশও নয়, ছড়ানো খবরের কাগজের ওপরেই…বই মাথার তলায় রেখে—ব্যস, লম্বা।

এমনি করিয়া তাহাদের আলাপ চলিতে লাগিল।

যৌথ-পরিবারের পরিজনবর্গে বাড়িখানা ঠাসা। ভাসুর ননদ পিসি দেবর ইত্যাদি বাড়ির প্রায় সকল ঘরগুলিতেই ছড়ানো। ইহাদের অভাবও নাই, ইহারা অবস্থাপন্নও নয়। শাশুড়ী আছেন, কিন্তু শান্ত ও শিষ্ট বলিয়া তিনি ইহাদের মধ্যে কোথায় হারাইয়া গিয়াছেন।

দুই দিন ধরিয়া যামিনী ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইয়া সব দেখিয়া লইল। স্বামীর ঘরের সহিত ইহাদের ঘরগুলির তুলনা করিয়া এই দীর্ঘ দুই দিন তাহার ভিতরে কোথায় যেন একটা অস্বস্তি বিঁধিতেছিল। এ অস্বস্তির স্পষ্ট কৈফিয়ৎ তাহার নাই। নাই তাহার কারণ, ইহাদের চরিত্রের সঙ্গে তাহার স্বামীর কোথাও মিলে না, সে যেন অন্য দেশের মানুষ, অন্য রুচির। একই সংসারের ভিতর থাকিয়া সে যেন একটি বিচিত্র নক্ষত্রলোকে বাস করে।

একদিন রাত্রে সে কহিল, কোথায় ছিলে বল ত সারাদিন?

অত্যন্ত স্পষ্ট প্রশ্ন। হেরম্ব একটু থতমত খাইয়া বলিল, বড় মুস্কিল তোমার কথার উত্তর দেওয়া। কত জায়গায় ছিলাম!

—বন্ধু-বান্ধব বুঝি অনেক?

—বন্ধু-বান্ধব? নাঃ, বন্ধু আমার কেউ নেই, যামিনী,

এমনি লোকের সঙ্গে পরিচয়! যাদের সঙ্গে আলাপ তাদের কাছ থেকে ছাড়াছাড়ি হলেই আর কেউ কাউকে মনে রাখিনে। এই ত নিয়ম!

এই নিয়মটির সহিত যামিনীর যথেষ্টই মতভেদ আছে। সে অন্য কথা পাড়িয়া বলিল, তিনটে চারটে পাস করেছ শুনলাম, কাজকর্ম্ম কিছু কর না?

—পাস করলেই কাজ করা যায় না, যামিনী। তা ছাড়া, কি হবে?

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর হেরম্ব নিজেই কথা সুরু করিল। বলিল, আমার কিছুই হয়ে ওঠে না, যামিনী তুমি সব ক্ষমা ক'রে নিও। জীবনে কত-কি ভেবেছিলাম, ভেবেই এলাম চিরদিন, কিন্তু কিছুই হ'ল না। এই ঘরখানার বিশৃঙ্খলার মধ্যে আমার অসংখ্য স্বপ্ন চুরমার হয়ে আছে, অগণন নিশ্বাস। কিছুই আমার হয়ে উঠল না।

যামিনী চুপ করিয়া রহিল।

হেরম্ব তাহার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া কহিল, আচ্ছা যামিনী, তোমার এখনও মন বসেনি, না? মেয়েদের মন বোধ হয় সহজে বসে না, কিন্তু একবার বসলেই তুমি একেবারে ঘোর সংসারী হয়ে যাবে। ওই যা, তোমার জন্যে একটা ফুলের তোড়া আনব ভাবলাম, ভুলেই গেছি।

—ফুলের তোড়া কি হবে?—যামিনী বলিল।

—কেন, বেশ ত। ফুল তুমি ভালবাস না, যামিনী?

—ফুল এনে আর কি হবে?

তা বটে। হেরম্ব চুপ করিয়া রহিল। সম্ভবতঃ কেবল-মাত্র ফুল পাইলে এখনকার মেয়েরা আর খুশী হয় না।

কিন্তু যামিনীর পক্ষেও কিছু কথা ছিল। যেটুকু আশা করিয়া সে আসিয়াছিল, সেটুকু তাহার উচ্চাশা নয়। শুধু মাত্র স্বামী পাইয়াই যাহারা আত্মবিস্মৃত হয়, ভালবাসা পাইয়াই যাহারা বিহ্বল হইয়া পড়ে যামিনী সে দলের মেয়ে নয়। নারী হইয়া, গৃহবধূ হইয়া যে-দাবিটুকু তাহার করিবার অধিকার, তাহার সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সচেতন। অভাবের মধ্যে যে সদ্ভাব ক্ষুণ্ণ হয় এ কথাটা বুঝিবার শিক্ষা সে সঞ্চয় করিয়া আনিয়াছিল।

অথচ মেয়েটি ভাল। তেজ এবং দর্পের লেশমাত্র তাহার ভাবভঙ্গীতে নাই। শান্ত, ভদ্র এবং সংযত প্রকৃতি। ইহার আগে চিঠি-পত্রে ও অল্প কথালাপে সে এমন একটি আত্ম-পরিচয় দিয়াছে যে, যে-কোনো স্বামী তাহাতে খুশী হইতে পারিত। একটি সহজ প্রেমের কমনীয়তায় ও কোমল কারুণ্যে হৃদয়খানি তাহার পরিপূর্ণ। সেখানে কোথাও ভুল বুঝিবার অবকাশ নাই।

—যামিনী?

যামিনী কহিল, কি?

—তুমি ত ভাল করে কথা বলচ না?

—তুমিই বল না, আমি ত শুনচি।

হেরম্ব কহিল, আমার কথা অতি সামান্য, অত্যন্ত ব্যক্তিগত তাই অতিরিক্ত নীরস। কিন্তু তোমার তা নয়, চিঠিতে তোমার যে মুখরতা দেখেছি, যে উচ্ছ্বসিত মনের কথা তোমার শুনেছি, যামিনী, এমনি স্নেহ দিয়েই তুমি আমায় সারাজীবন আড়াল করে রেখো।

যামিনী এই কয়দিন ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছে, এই লোকটির সমস্ত কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়া কেমন যেন একটি দৈন্য-দারিদ্র্য ফুটিয়া উঠিতেছিল। কথা বলিতে আসিলেই তাহার কুণ্ঠা, তাহার লজ্জা, মুখের ভিতর হইতে তাহার যেন একজন নিঃসম্বল কাঙাল কথা বলিয়া ওঠে।

—সামান্য স্নেহও আমি পাই নি, যামিনী, ভালবাসা ত দূরের কথা। আমার এই আত্মীয়স্বজনদের দেখছ ত? নিশ্চয় ভাল করেই এদের তুমি দেখেছ! এদের আশ্চর্য্য জীবনযাপন,—নির্ব্বিঘ্ন, নিরাপদ, নিশ্চিন্ত। মানুষের মৃত্যু কখন হয় জান যামিনী, যখন তারা কায়ক্লেশে বাঁচে।

যামিনী বলিল, তুমি বুঝি এইসব কথা ভাবো?

—ভাবিনে, মাঝে মাঝে মনে হয়।

যামিনী চুপ করিয়া রহিল। এমনি একদল লোকের কথা সে যেন কবে শুনিয়াছিল। সংসার ইহারা রচনা করিতে পারে না, অথচ বিশ্বসংসার লইয়া ইহারা ব্যস্ত। ছন্নছাড়া জীবন লইয়া ইহাদের আনন্দ, সুশৃঙ্খল ও সহজ জীবনকে ইহারা বন্ধন বলিয়া এড়াইয়া চলে। নিজের

দুঃখ ঘুচাইতে না পারিয়া অন্যের দুঃখে যাহারা অশ্রুত্যাগ করে মনে হইল, হেরম্ব সেই জাতের মানুষ। অন্তরের রিক্ততা যাহাদের অপরিমিত, তত্ত্বে এবং তর্কে তাহারা আপনাদিগকে ভরিয়া তুলিতে চায়। তাহাদের সহিত যামিনীর সহানুভূতি নাই।

হেরম্ব কহিল, আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে তুমি ছেলেমানুষ নও যামিনী, চোখ বুলিয়েই তুমি আমার সমস্তটা বুঝতে পেরেছ। আমি চিরদিন নিজের ধ্যান-ধারণা নিয়েই আছি, নিজের দিকে চেয়েই আমার দিন কেটেছে, অথচ তুমি যে আমার ঘরে আসবে, তোমার জন্যে আমার কোনো সংগ্রহই নেই।

তাহার হাতের ভিতর যামিনীর হাতখানি স্থির হইয়া ছিল। মনে হইল সে-হাতে উত্তাপ আছে, কিন্তু উত্তেজনা নাই। যামিনী কহিল, ওঁদের নিন্দে করার এমন কিছু ত নেই, ঘরদোর সংসার ওঁদের বেশ ফিটফাট, সোজা লোক; ধারও করেন না, দানও করেন না, খুব সাধারণ, এমনিই আমার ভাল লাগে।

হেরম্ব নির্ব্বাক হইয়া কিয়ৎক্ষণ পড়িয়া রহিল। ঘরে আজ আলো জালিবার প্রয়োজন হয় নাই। শ্রাবণ মাসের রাত্রি হইলেও শুক্লা চতুর্দ্দশীর চন্দ্রালোক দক্ষিণ দিকের জানালার ভিতর দিয়া বিছানার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। এমন সুন্দর রাত্রে নিভৃত শয্যায় শুইয়া তাহাদের কেবলই মনে হইতে লাগিল, পাশাপাশি থাকিলেও তাহারা পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে বহু দূরে। কেহ কাহারও নাগাল পাইতেছে না।

—যামিনী ?

যামিনী সাড়া দিয়া কহিল, ঘুমোও নি এখনও? ভাবলাম বুঝি—

হেরম্ব কহিল, পিঠের তলায় কি ফুটচে, বোধ হয় কাঁকর।

—সে কি, বিছানা খুব পরিষ্কার করে ঝেড়েছিলাম ত!

হেরম্ব তাহার গায়ের উপর ডান হাতখানা প্রসারিত করিয়া দিয়া কহিল, 'যামিনী?' বলিয়া তাহার গলার কাছে সে মুখ আনিল।

যামিনী হাসিয়া কহিল, তাহলে কাঁকর নয়, কেমন ত?

—না কাঁকর নয়। আচ্ছা যামিনী, আজকের রাত্রে আমাদের এই আনন্দ, কিন্তু তাদের কথা ভাবলে কি এ তুই প্রলাপের মতই শোনাবে ?

যামিনী বিস্মিত হইয়া কহিল, কাদের কথা গো?

—এই দর এখন আশ্রয়হীন হয়ে যারা পথে-পথে ঘুরচে, কিংবা এই মহূর্ত্তে যাদের জীবন চিরকালের জন্য ব্যর্থ হয়ে গেল, কিংবা—

—তোমার যত আজগুবী ভাবনা। যাদের দুঃখ পাবার কথা, সে তারা পাবেই, আমরা কি করব?

হেরম্ব একটু হাসিল, কিন্তু সে-হাসি তাহার কেমন, তাহা দেখিবার উপায় ছিল না। বলিল, যামিনী, ভাতের গ্রাস যারা মুখে তোলে, তারা তাদের জন্যে দায়ী যাদের অন্ন জোটেনি।

—তা ব'লে তাদের জন্যে উপোস ক'রে থাক্‌তে হবে?

—তা বললে যামিনী, আমার উৎসবের আনন্দ তখনি একেবারে চলে যায় যখন দেখি বাসর-ঘরের দরজায় জড়িত সঙ্কোচে দাঁড়িয়ে রয়েছে উদাসীন বিধবা মেয়ে। যামিনী, বিধাতার এই বিপুল বিশ্বসৃষ্টির ভিতরে কোথায় যেন একটা ভয়ানক ভুল-চুক রয়ে গেছে, নয়?

—হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে। এবার ঘুমোও।—বলিয়া যামিনী পাশ ফিরিয়া হাসিয়া চোখ বুজিল। বেশ লোকটির সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে যা হোক!

দিন এবং রাত্রি এমনি করিয়াই তাহাদের কাটে। নূতন বউ একটু একটু করিয়া পুরাতন হইয়া আসে। উচ্ছ্বাস আবেগ এবং বক্তৃতা হেরম্বর কমিয়া যায়। যামিনী এখন রীতিমত সংসারী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সাংসারিক আলাপ করিবার কোনো ইঙ্গিত পাইলেই হেরম্বর দুইটা চোখ উদাসীন হইয়া ওঠে। যত বিচিত্র চিন্তা লইয়া তাহার কারবার। কোথায় হইল যুদ্ধ-বিগ্রহ, মানুষের নীচতা, শাঠ্য ও লোভ কোথায় উদ্ধত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, পৃথিবীর কোন্ কোণে ঈশ্বর ও ধর্ম্মের নামে মনুষ্যত্ব ধূল্যবলুণ্ঠিত হইল, মহত্তর প্রেম কোথায় হইয়াছে

এমনি লোকের সঙ্গে পরিচয়! যাদের সঙ্গে আলাপ তাদের কাছ থেকে ছাড়াছাড়ি হলেই আর কেউ কাউকে মনে রাখিনে। এই ত নিয়ম!

এই নিয়মটির সহিত যামিনীর যথেষ্টই মতভেদ আছে। সে অন্য কথা পাড়িয়া বলিল, তিনটে চারটে পাস করেছ শুনলাম, কাজকর্ম কিছু কর না?

—পাস করলেই কাজ করা যায় না, যামিনী। তা ছাড়া, কি হবে?

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর হেরম্ব নিজেই কথা সুরু করিল। বলিল, আমার কিছুই হয়ে ওঠে না, যামিনী তুমি সব ক্ষমা ক'রে নিও। জীবনে কত-কি ভেবেছিলাম, ভেবেই এলাম চিরদিন, কিন্তু কিছুই হ'ল না। এই ঘরখানার বিশৃঙ্খলার মধ্যে আমার অসংখ্য স্বপ্ন চুরমার হয়ে আছে, অগণন নিশ্বাস। কিছুই আমার হয়ে উঠল না।

যামিনী চুপ করিয়া রহিল।

হেরম্ব তাহার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া কহিল, আচ্ছা যামিনী, তোমার এখনও মন বসেনি, না? মেয়েদের মন বোধ হয় সহজে বসে না, কিন্তু একবার বসলেই তুমি একেবারে ঘোর সংসারী হয়ে যাবে। ওই যা, তোমার জন্যে একটা ফুলের তোড়া আনব ভাবলাম, ভুলেই গেছি।

—ফুলের তোড়া কি হবে?—যামিনী বলিল।

—কেন, বেশ ত। ফুল তুমি ভালবাস না, যামিনী?

—ফুল এনে আর কি হবে?

তা বটে। হেরম্ব চুপ করিয়া রহিল। সম্ভবতঃ কেবলমাত্র ফুল পাইলে এখনকার মেয়েরা আর খুশী হয় না।

কিন্তু যামিনীর পক্ষেও কিছু কথা ছিল। যেটুকু আশা করিয়া সে আসিয়াছিল, সেটুকু তাহার উচ্চাশা নয়। শুধু মাত্র স্বামী পাইয়াই যাহারা আত্মবিস্মৃত হয়, ভালবাসা পাইয়াই যাহারা বিহ্বল হইয়া পড়ে যামিনী সে দলের মেয়ে নয়। নারী হইয়া, গৃহবধূ হইয়া যে-দাবিটুকু তাহার করিবার অধিকার, তাহার সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সচেতন। অভাবের মধ্যে যে সদ্ভাব ক্ষুণ্ণ হয় এ কথাটা বুঝিবার শিক্ষা সে সঞ্চয় করিয়া আনিয়াছিল।

অথচ মেয়েটি ভাল। তেজ এবং দর্পের লেশমাত্র তাহার ভাবভঙ্গীতে নাই। শান্ত, ভদ্র এবং সংযত প্রকৃতি। ইহার আগে চিঠি-পত্রে ও অল্প কথালাপে সে এমন একটি আত্ম-পরিচয় দিয়াছে যে, যে-কোনো স্বামী তাহাতে খুশী হইতে পারিত। একটি সহজ প্রেমের কমনীয়তায় ও কোমল কারুণ্যে হৃদয়খানি তাহার পরিপূর্ণ। সেখানে কোথাও ভুল বুঝিবার অবকাশ নাই।

—যামিনী?

যামিনী কহিল, কি?

—তুমি ত ভাল করে কথা বলচ না?

—তুমিই বল না, আমি ত শুনচি।

হেরম্ব কহিল, আমার কথা অতি সামান্য, অত্যন্ত ব্যক্তিগত তাই অতিরিক্ত নীরস। কিন্তু তোমার তা নয়, চিঠিতে তোমার যে মুখরতা দেখেছি, যে উচ্ছ্বসিত মনের কথা তোমার শুনেছি, যামিনী, এমনি স্নেহ দিয়েই তুমি আমায় সারাজীবন আড়াল করে রেখো।

যামিনী এই কয়দিন ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছে, এই লোকটির সমস্ত কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়া কেমন যেন একটি দৈন্য-দারিদ্র্য ফুটিয়া উঠিতেছিল। কথা বলিতে আসিলেই তাহার কুণ্ঠা, তাহার লজ্জা, মুখের ভিতর হইতে তাহার যেন একজন নিঃসম্বল কাঙাল কথা বলিয়া ওঠে।

—সামান্য স্নেহও আমি পাই নি, যামিনী, ভালবাসা ত দূরের কথা। আমার এই আত্মীয়স্বজনদের দেখছ ত? নিশ্চয় ভাল করেই এদের তুমি দেখেছ! এদের আশ্চর্য্য জীবনযাপন,—নির্ব্বিঘ্ন, নিরাপদ, নিশ্চিন্ত। মানুষের মৃত্যু কখন হয় জান যামিনী, যখন তারা কায়ক্লেশে বাঁচে।

যামিনী বলিল, তুমি বুঝি এইসব কথা ভাবো?

—ভাবিনে, মাঝে মাঝে মনে হয়।

যামিনী চুপ করিয়া রহিল। এমনি একদল লোকের কথা সে যেন কবে শুনিয়াছিল। সংসার ইহারা রচনা করিতে পারে না, অথচ বিশ্বসংসার লইয়া ইহারা ব্যস্ত। ছন্নছাড়া জীবন লইয়া ইহাদের আনন্দ, সুশৃঙ্খল ও সহজ জীবনকে ইহারা বন্ধন বলিয়া এড়াইয়া চলে। নিজের

দুঃখ ঘুচাইতে না পারিয়া অন্যের দুঃখে যাহারা অশ্রুত্যাগ করে মনে হইল, হেরম্ব সেই জাতের মানুষ। অন্তরের রিক্ততা যাহাদের অপরিমিত, তত্ত্বে এবং তর্কে তাহারা আপনাদিগকে ভরিয়া তুলিতে চায়। তাহাদের সহিত যামিনীর সহানুভূতি নাই।

হেরম্ব কহিল, আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে তুমি ছেলেমানুষ নও যামিনী, চোখ বুলিয়েই তুমি আমার সমস্তটা বুঝতে পেরেছ। আমি চিরদিন নিজের ধ্যান-ধারণা নিয়েই আছি, নিজের দিকে চেয়েই আমার দিন কেটেছে, অথচ তুমি যে আমার ঘরে আসবে, তোমার জন্যে আমার কোনো সংগ্রহই নেই।

তাহার হাতের ভিতর যামিনীর হাতখানি স্থির হইয়া ছিল। মনে হইল সে-হাতে উত্তাপ আছে, কিন্তু উত্তেজনা নাই। যামিনী কহিল, ওঁদের নিন্দে করার এমন কিছু ত নেই, ঘরদোর সংসার ওঁদের বেশ ফিটফাট, সোজা লোক; ধারও করেন না, দানও করেন না, খুব সাধারণ, এমনিই আমার ভাল লাগে।

হেরম্ব নির্ব্বাক হইয়া কিয়ৎক্ষণ পড়িয়া রহিল। ঘরে আজ আলো জ্বালিবার প্রয়োজন হয় নাই। শ্রাবণ মাসের রাত্রি হইলেও শুক্লা চতুর্দ্দশীর চন্দ্রালোক দক্ষিণ দিকের জানালার ভিতর দিয়া বিছানার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। এমন সুন্দর রাত্রে নিভৃত শয্যায় শুইয়া তাহাদের কেবলই মনে হইতে লাগিল, পাশাপাশি থাকিলেও তাহারা পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে বহু দূরে। কেহ কাহারও নাগাল পাইতেছে না।

—যামিনী ?

যামিনী সাড়া দিয়া কহিল, ঘুমোও নি এখনও? ভাবলাম বুঝি—

হেরম্ব কহিল, পিঠের তলায় কি ফুটচে, বোধ হয় কাঁকর।

—সে কি, বিছানা খুব পরিষ্কার করে ঝেড়েছিলাম ত!

হেরম্ব তাহার গায়ের উপর ডান হাতখানা প্রসারিত করিয়া দিয়া কহিল, 'যামিনী?' বলিয়া তাহার গলার কাছে সে মুখ আনিল।

যামিনী হাসিয়া কহিল, তাহলে কাঁকর নয়, কেমন ত?

—না কাঁকর নয়। আচ্ছা যামিনী, আজকের রাত্রে আমাদের এই আনন্দ, কিন্তু তাদের কথা ভাবলে কি একেই প্রলাপের মতই শোনাবে?

যামিনী বিস্মিত হইয়া কহিল, কাদের কথা গো?

—এই যারা এখন আশ্রয়হীন হয়ে যারা পথে-পথে ঘুরচে, কিংবা এই মুহূর্ত্তে যাদের জীবন চিরকালের জন্য ব্যর্থ হয়ে গেল, কিংবা—

—তোমার যত আজগুবী ভাবনা। যাদের দুঃখ পাবার কথা, সে তারা পাবেই, আমরা কি করব?

হেরম্ব একটু হাসিল, কিন্তু সে-হাসি তাহার কেমন, তাহা দেখিবার উপায় ছিল না। বলিল, যামিনী, ভাতের গ্রাস যারা মুখে তোলে, তারা তাদের জন্যে দায়ী যাদের অন্ন জোটেনি।

—তা ব'লে তাদের জন্যে উপোস ক'রে থাকতে হবে?

—তা বললে যামিনী, আমার উৎসবের আনন্দ তখনি একেবারে চলে যায় যখন দেখি বাসর-ঘরের দরজায় জড়িত সঙ্কোচে দাঁড়িয়ে রয়েছে উদাসীন বিধবা মেয়ে। যামিনী, বিধাতার এই বিপুল বিশ্বসৃষ্টির ভিতরে কোথায় যেন একটা ভয়ানক ভুল-চুক রয়ে গেছে, নয়?

—হাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে। এবার ঘুমোও।—বলিয়া যামিনী পাশ ফিরিয়া হাসিয়া চোখ বুজিল। বেশ লোকটির সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে যা হোক!

দিন এবং রাত্রি এমনি করিয়াই তাহাদের কাটে। নূতন বউ একটু একটু করিয়া পুরাতন হইয়া আসে। উচ্ছ্বাস আবেগ এবং বক্তৃতা হেরম্বর কমিয়া যায়। যামিনী এখন রীতিমত সংসারী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সাংসারিক আলাপ করিবার কোনো ইঙ্গিত পাইলেই হেরম্বর দুইটা চোখ উদাসীন হইয়া ওঠে। যত বিচিত্র চিন্তা লইয়া তাহার কারবার। কোথায় হইল যুদ্ধ-বিগ্রহ, মানুষের নীচতা, শাঠ্য ও লোভ কোথায় উদ্ধত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, পৃথিবীর কোন্ কোণে ঈশ্বর ও ধর্ম্মের নামে মনুষ্যত্ব দস্যুবলুণ্ঠিত হইল, মহত্তর প্রেম কোথায় হইয়াছে

অসম্মানিত, ইহারাই তাহার সমস্ত মন ছাইয়া থাকে। রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিলে সে অকারণে পথ ভাঙিয়া বেড়ায় বৃষ্টির দিনে গঙ্গার ধারে দাঁড়াইয়া জলে ভিজে, রাজপথের জনসমারোহের একান্তে বসিয়া সে নিবিষ্ট চিত্তে সংবাদপত্র পড়ে, তারপর যখন ফিরিয়া আসে তখন তাহার ক্লিষ্ট দেহ, অবসন্ন মন, অপরিছন্ন পরিচ্ছদ। তাহাকে দেখিলে বুঝিবার উপায় নাই যে, সে বাঁচিবার মত করিয়া বাঁচিয়া আছে। কাহারও সহিত তাহার সংঘাত নাই, প্রতিযোগিতা নাই, গা ঘেঁসাঘেঁসি নাই। উগ্রতা, ঔদ্ধত্য এবং আত্মপ্রচার, ইহারা তাহার জীবনে স্বপ্নের মত।

তবু সংসার তাহাকে ছাড়িয়া কথা কহিল না। উপার্জ্জন এবং সংস্থান ইহাদের এড়াইয়া সে যাইবে কোথায়? মা একদিন একটি সুখবর লইয়া তাহার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, পয়মন্ত আমার ছোটবৌমা, স্ত্রী-ভাগ্যে ধন। এইটিই আমি চেয়েছিলাম হেরম্ব।

হেরম্ব কহিল, কি মা?

মা বলিলেন, বে-থা ক'রে আর ক'দিন ফাঁকি দিয়ে বেড়াবি বাবা, তাই বৌমাকেই আমি বলতে বলছিলাম—

হেরম্ব তাঁহার মুখের দিকে তাকাইল। তিনি কহিলেন, দেবেন যাচ্ছে বিলেত, দেবেন তোর পিসতুতো ভাই রে?

—ও, হ্যাঁ।

—সে যাচ্ছে তার কারবার বেচে দিয়ে। বাইরের লোক আর কেন কিনবে, তোমার বড়ভাইকে দিয়ে আমি আজ টাকা পাঠিয়ে সব ব্যবস্থা করলাম বাবা, তুমি তার জায়গায় বসোগে।

—তারপর?

—তারপর আর কি? তোমারই কারবার। টাকাও তোমার ভাগের।

হেরম্বের মনে হইল, একটা সামুদ্রিক অষ্টভুজ যেন প্রবল শক্তিতে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া কঠিন আলিঙ্গনে বাঁধিতেছে। ভয়ে তাহার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। জীবন-সংগ্রাম? উপার্জ্জন? মৃত্যু তবে আর কত দূরে? মাথা হেঁট করিয়া ক্লিষ্ট কণ্ঠে সে শুধু কহিল, আচ্ছা মা।

মা আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন, এবং সেই আশীর্ব্বাদের সূত্র ধরিয়া যামিনী কাছে আসিয়া বসিল। খুশী মুখে তাহার হাত ধরিয়া কহিল, যাক্, আমি বাঁচলাম এতদিনে, সকলের মাঝখানে মুখ দেখানো দিন-দিন আমার কঠিন হয়ে উঠছিল, কত বিদ্রূপ, কত কটাক্ষ, এতদিন পর আজ রাতে আমার ঘুম হবে। তোমার যে এত সহজে সুমতি হবে আমার তা মনে হয়নি, লক্ষ্মী আমার।—বলিয়া সে আনন্দে ও ভালবাসায় হেরম্বর একখানা হাতের উপর জোরে একটা চাপ দিল।

হেরম্ব কথা বলিল না, শুধু অদ্ভুত হাসি হাসিল। তাহার মুখের দিকে হঠাৎ একবার চাহিয়া একটু একটু করিয়া যামিনীর মুখের হাসি নিবিয়া আসিল। কহিল, 'এখন হয়ত তোমার খুব কষ্ট হবে, প্রথম-প্রথম কি-না, মন লাগবে না কাজে, কিন্তু একবার অভ্যেস হয়ে গেলে অমন ক'রে তাকিয়ে আছ কেন বল ত?' বলিয়া যামিনী সস্নেহ ও মমতাময় তাহার সুকোমল হাতখানি তুলিয়া হেরম্বর চোখ ও মুখের উপর বুলাইয়া দিল। পুনরায় কহিল, অমন ক'রে চেয়ো না তুমি, আমার ভেতরে কেমন ক'রে ওঠে। তুমি চুপ ক'রে থেকো, কিন্তু অমন ক'রে হেসো না।

হেরম্বর হাতের তলায় মুখ দিয়া যামিনী চুপ করিয়া স্থির হইয়া রহিল।

কিন্তু হেরম্ব অকর্ম্মণ্য নয়। তাহার হাতে পড়িয়া কেমন করিয়া যে মোটর-কারখানাটা ফাঁপিয়া উঠিল, তাহা সে নিজেও বুঝিতে পারিল না। এমনি করিয়া দুই মাস কাটিল। স্নানাহার ত্যাগ করিয়া এই দুই মাস সে চূড়ান্ত ব্যবসায় করিয়া লইল। তারপরে একদা হিসাব-নিকাশ করিবার সময় দেখা গেল, কারবার তাহার যে-পরিমাণে ফুলিয়া উঠিয়াছে ঠিক সেই পরিমাণেই তাহার ভিতরটা হইয়াছে ফোঁপ্‌রা। সমস্ত খাতাটা খরচে ভরিয়া গিয়াছে, জমার দিকটায় শূন্য। শূন্যই তাহার পুঁজি।

সবাই বিস্মিত হইল, হইল না কেবল হেরম্ব নিজে।

ইহা তাহার ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয়, এ অপরাধ তাহার চরিত্রের। তাই সে শুধু শুষ্ক হাসি হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কারবার তুলিয়া দিয়া দেনা করিয়া যেদিন তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল, দাদারা গম্ভীর হইয়া সরিয়া গেলেন, মা অদৃষ্টের উপর দোষারোপ করিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও ইসারা-ইঙ্গিত অবারিত কয়েক দিন ধরিয়া চলিতে লাগিল। ছাগলকে দিয়া যব মাড়াইতে গিয়া গৃহস্থের হইল আর্থিক ক্ষতি।

তা ত হইলই, কিন্তু ইহার আড়ালে যে-কথাটা স্পষ্ট হইয়া উঠিল, তাহা কাহারও চোখ এড়াইল না। পৃথিবীতে সে যে কাজ করিতে আসে নাই, সংগ্রাম কোলাহল এবং জীবনের যে-দিকটায় মানুষের একটা বৈষয়িক সমারোহ দেখা যায়, সে-দিকটা যে তাহার ফাঁকা, এ কথাটাও যামিনী আজ হৃদয়ঙ্গম করিল। তাহার মনে হইল, হেরম্ব স্বামী হইতে জানে, কিন্তু দায়িত্ব লইতে জানে না। ইহাকে লইয়া সে কি করিবে? অবহেলায় ইহাকে দূরে সরানো যায় না, কারণ হৃদয়ের দিক হইতে সে যথেষ্টই ঐশ্বর্য্যবান, অথচ সানন্দে এই লোকটিকে লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করাও চলে না, ইহার মত অকৃতী, অনভিজ্ঞ, দুনিয়ার-বা'র পুরুষও সে কখনও দেখে নাই। যামিনী উদাসীন হইয়া চুপ করিয়া থাকে।

ঘরে আবার জঞ্জাল জমিয়াছে। বিছানাগুলি অপরিষ্কার ও অবিন্যস্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ছেঁড়া কাগজ, দেশলাইয়ের কাঠি চারিদিকে ছড়ানো। ছাবগুলি ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া পরিচ্ছন্ন করিবার কথা ছিল, কিন্তু তাহা আর হইয়া উঠিতেছে না। ঘরের কয়েকটা আসবাব,—গোটা-দুই আলমারি, সুটকেস, টিপয়, খান-দুই চেয়ার, একটা ড্রেসিং টেবল্ ইত্যাদি কিনিবার কথা ছিল, কিন্তু তাহাও আর আসিল না। কে আনিবে? দেওয়ালের পেরেকে যে ঝুলিটা টাঙান ছিল, তাহা তেমনই রহিয়াছে, কেবল তাহার ভিতর হইতে একখানা গেরুয়া কাপড়ের কিয়দংশ বাহির হইয়া সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিতেছিল। এই কয়দিন ধরিয়া সে যেন ভিতরে ভিতরে একটা যন্ত্রণা অনুভব করিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিক, গ্রহ-তারকার ঘূর্ণীপাকে এ সে কাহার হাতে আসিয়া পড়িল? জীবনে তাহার মত উচ্চ আশা আর যে তাহার পরিচিত কোনো মেয়েরই ছিল না! স্বামীর ভালবাসা নারীর সম্পদ্ কিন্তু আরও একটা দিক্ সে যে মনে মনে কামনা করিয়াছে! সেখানে অবারিত মরুভূমির মধ্যে সে কি চিরজীবন ধরিয়া তৃষ্ণায় হা হা করিতে থাকিবে? বর্ণের ঔজ্জ্বল্য, আড়ম্বর, গৃহ-বিলাস, আরাম, স্নিগ্ধছায়া—এগুলিকে সে কি শুধু ভালবাসা পাইয়াই ভুলিয়া থাকিতে পারিবে? প্রেম সে ত আনন্দের কথা, কিন্তু বাহিরের পরিচয়টা?

দিন চলিয়া যায়, রাত্রি নামিয়া আসে। দুইটি নর-নারীর মধ্যে মনোমালিন্য নাই, বিচ্ছেদ নাই অথচ কোথায় যেন একটি অভাব রি-রি করিতে থাকে। সে অভাব প্রতিমুহূর্ত্তের, প্রতি পদক্ষেপের।

হেরম্ব একদিন কহিল, যামিনী, গঙ্গার ধারে যাবে?

যামিনী কহিল, গঙ্গার ধারে? কেন বল ত?

—এমনি, বেড়াতে। নদী আজকাল ছাপাছাপি, এখন শরৎকাল নীল আকাশ,—চল না, তীর ধরে ধরে অনেকদূরে যাব।

—কি হবে গিয়ে?—যামিনী জানালার বাহিরে তাহার দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া পুনরায় বলিল, কোন লাভ নেই।

হেরম্ব কহিল, সব চেয়ে সুস্থ থাকা উচিত মন, হৃদয়। এই মন আর এই হৃদয় ছাড়া পায় নদীর ধারে, মাঠে, আকাশের দিগন্তজোড়া অবকাশে। যামিনী, আমার মনে হয় তুমি সেখানে গেলে আনন্দ পাবে।

নারীর আবহমান কালের প্রশ্নের কৈফিয়ৎ দিয়া যামিনী কহিল, না, ভেতরে যার কিছু নেই, বাইরে গিয়ে তার পক্ষে আনন্দ পাওয়া কঠিন। আমার অভাব আর আনন্দ দুই-ই ঘরের মধ্যে।

হেরম্ব তাহার প্রশান্ত দুইটি চক্ষু তুলিয়া একবার তাকাইতেই যামিনী কহিল, তুমি একটা কাজ করতে পার? একটা সেলাইয়ের কল আর একটা চরকা আমায় এনে দেবে?

—সেলাইয়ের কল? চরকা? কেন যামিনী?

ইহাও আবার বুঝাইয়া বলিতে হইবে। যামিনী একটুখানি ম্লান হাসি হাসিল, তারপর সে-হাসি থামাইয়া বলিল, কাজ কিছু করা দরকার।

তুমি কেন কাজ করতে যাবে, যামিনী?

উত্তর দিতে গিয়া যামিনীর গলা কাঁপিয়া উঠিল। বলিল, কেন তা সে তুমি বুঝবে না। তোমার কি আছে বল ত? স্বপ্ন? আদর্শ? আমি যে এমন ক'রে থাকতে পারিনে, আমার যে সব চাই; কি আমার আছে, কি পেলাম?

ঘর ছাড়িয়া সে উঠিয়া বাহির হইয়া গেল।

আলোচনা

মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা ভাষা

গত ভাদ্র মাসের 'প্রবাসী'তে বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ "মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা ভাষা" প্রবন্ধের এক স্থানে বলিয়াছেন—"হিন্দু বাঙালীর সূর্য্যই সূর্য্য আর মুসলমান বাঙালীর সূর্য্য তাম্বু" ইত্যাদি। আমার কাছে "মক্তব বাল্যশিক্ষা" নামক একখানি পুরাতন পুস্তক আছে। এই প্রসঙ্গে তাহার কয়েকটি বিষয় উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই পুস্তকে "দিক্-নির্ণয়" নামক একটি পাঠ আছে। সকলেই পূর্ব্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া দিক্-নির্ণয় করেন, ইহাই জানিতাম। প্যারীচরণ সরকার ও লেথব্রিজ সাহেবের বইয়ে উদীয়মান সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া একটি বালক দুই হাত মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, এই চিত্র বাল্যকালে দেখিয়াছি, এখনও মনে পড়ে। "ফার্ষ্ট বুক" হিন্দু মুসলমান উভয়ের জন্যই লেখা হইয়াছিল। কিন্তু "মক্তব বাল্যশিক্ষা"র দিক্-নির্ণয় পশ্চিম দিক হইতে আরম্ভ। যথা:—(গল্পের প্রথমেই)

> "ওস্তাদ—পশ্চিম কোন্ দিক তুমি জান?
>
> সাগরেদ—হাঁ সাহেব, আমি জানি, যেদিকে আফতাব গুরুব হয় এবং আমরা সেইদিকে মুখ করিয়া নমাজ পড়ি।
>
> ও—আচ্ছা তুমি পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া খাড়া হও, তোমার ডাইন হাত বিস্তার কর, বল, তোমার ডাইন হাত কোন্ দিকে" ... ... ইত্যাদি।

আবার—"ও—শাবাশ! এখন বল তোমার পিঠ কোন্ দিকে?

> সা—পূর্ব্বদিকে, যে দিক হইতে আফ্তাব উঠে।"

সমস্ত গল্পের কোন জায়গায় ভ্রমেও "সূর্য্য" কথা ব্যবহার করা হয় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কেহ "তাম্বু", কেহ "আফ্তাব" লিখিয়া সূর্য্যের জাত বাঁচাইতেছেন।

এই পুস্তকখানিতে অক্ষর পরিচয় হইতে সংযুক্তবর্ণ পর্য্যন্ত লিখান হইয়াছে। যে পুস্তকখানি আমার কাছে আছে, তাহার মলাটের উপর "চতুর্দ্দশ সংস্করণ পরিমার্জ্জিত" লেখা আছে। ১৯২২ সালে সরকারী পাঠ্যপুস্তক সমিতি দ্বারা উহা অনুমোদিত, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ঢাকা হইতে প্রকাশিত ও হাজি আবদুর রহিম কর্ত্তৃক প্রণীত। ইহার নাকি খুব আদর হইয়াছিল, এরূপ শেষের মলাটে লেখা আছে। এই পুস্তক এখনও প্রচলিত কি-না জানি না, কিন্তু ইহার ভাব-প্রকৃতি যে অন্য পুস্তক সকলেও প্রচলিত, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

আকার উকার আদি স্বরের বানান করিয়া শিশুরা পড়িতে আরম্ভ করিল:—

"এখন জাড়া পড়িল।	(জাড়া=শীত)
সরদ হাওয়া বহিতেছে।	(সরদ=ঠাণ্ডা)
আফ্তাব ডুবিল।	(আফ্তাব=সূর্য্য)
ওস (সাবনাস্) পড়িতেছে।	(ওস=শিশির)
ফজরের সময় জাড়া থাকে।	
পানি বরফের মত সরদ।"	

এই বালকেরা— "ফজরে রাজাই ছাড়িয়া" উঠে, এবং "লেহাফ গায়ে দিয়া" নমাজ পড়ে।

একটি গল্পে আছে—"দুনিয়াতে মা বাপের দরজা সকল হইতে বড়" এ কথার অর্থ বাঙ্গালী পাঠক বুঝিতে পারিবেন ত? অতুবা—"তোমরা মনে রাখিও যে ওস্তাদের দরজা মা বাপ হইতে কম নহে।" ইহাও বুঝিবেন না। সাধারণ বাঙ্গালী কাঠের দরজা ব্যবহার করে। উক্ত দরজা বঙ্গদেশীয় কোন কাঠের, না আর-বদেশীয় কোন কাঠের, হাজি সাহেব তাহা বলেন নাই। (দরজা=মর্য্যাদা) এই পুস্তকে "কুটুম্বদের নাম"—"বাবাজান, আম্মাজান, খালু, খালা, ফুফা, ফুফী," ইত্যাদি এবং "মুসলমানী বারের নাম" "মুসলমানী বারমাসের নাম" 'কাবুলী দেশের মেওয়ার নাম" ও "পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা অনেক বেশী" এই সবও আছে।

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শৃঙ্খল

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

(৭)

অর্থহীনতার ভারে মন্থর কয়েকটা দিন। আনন্দের ভাগে কম পড়িতেছে না, কিন্তু সে এমন আনন্দ যাহাকে নির্ব্বিচারে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতে হয়। জীবনের ভিত্তি একেবারে মৃত্তিকার নীচে হইতে খসিয়া গিয়াছে, নূতন ভিত্তি গড়া হয় নাই, এই অবস্থার একটি আশ্চর্য্য শান্তিময় মোহ আছে। অতীতে যাহা সুখের বস্তু ছিল তাহা লইয়া আর সুখী হওয়া সম্ভবপর নহে, যাহা দুঃখের ছিল তাহা লইয়া দুঃখ করিতেও হাসি পাইতেছে, মনের এমনই নিরবলম্ব অবস্থায় নিত্যকার অপরিহার্য্য চৈতন্যরাশির উপর অজয় কর্ণধারহীন তরণীর মত তরঙ্গবাহিত হইয়া এই কয়দিন ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

কলেজে ইহার মধ্যে কয়েকদিন সে গিয়াছে, কয়েকদিন যায় নাই। পুঁথির পাতায় কোনও চরিতার্থতার পথের সন্ধান নূতন করিয়া সে পায় নাই। তবু বই লইয়া রোজই বসিতেছে, ঐ পর্য্যন্ত। আর-কিছু তাহার করিবার নাই। সুভদ্রের সঙ্গে থাকিয়া যাওয়াও কতকটা অনুরূপ কারণ বশতঃই ঘটিয়াছে। এবিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে যৎসামান্য একটা প্রতিশ্রুতির আদান-প্রদানও হয় নাই। কোথায়ই বা সে যাইবে, পৃথিবীতে বিশেষ করিয়া তাহারই স্থান বলিয়া ত কিছু নাই। মাথার উপরে একটা আশ্রয়, দুইবেলা চারিটি করিয়া রাঁধাভাত, ইহার বেশী আর-কিছু কোথাও যাহার আশা করিবার নাই তাহার কাছে বৌবাজার আর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে তফাৎ আর কতটুকু?

চিরকাল নিজেকে লইয়া থাকিতে ভালবাসিত বলিয়া সম বা অসম বয়সীদের মধ্যে বন্ধু বলিতেও তাহার কেহ ছিল না। তাহার চতুর্দ্দিক্ ঘিরিয়া নিরুপায় প্রতিভার এমন একটা জ্বালা ছিল যাহা অনিচ্ছিত অবজ্ঞায় অন্যদের বিমুখ করিত, কদাচ আকর্ষণ করিত না। যাহারা তাহা সত্ত্বেও আকৃষ্ট হইয়া তাহার কাছে আসিত তাহারা শেষ পর্য্যন্ত তাহার স্বভাবের নিদারুণ অক্ষমা এবং ক্রোধ পরায়ণতার তাপ সহিতে না পারিয়া সঙ্গভঙ্গ দিত। এতদিন সে কলিকাতায় আসিয়াছে, তাহার পূর্ব্বেকার পরিচিত পৃথিবী হইতে একটিও মানুষ একদিন আসিয়া তাহার সংবাদ লইয়া যায় নাই।

নিশ্চিন্ত, নিরুদ্যম, অলস দিনগুলির সঙ্গে বাহিরের কোনও কিছুর কোথাও বিরোধ বাধিতেছে না। বিংশ শতাব্দীর কলিকাতা। ধূলিধূম-কলুষ কোলাহল। বৈভব এবং জীর্ণতার ভাগ লইয়া সমান কাড়াকাড়ি। ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের বিরামহীন সংঘাত। কিন্তু ইহার সমষ্টিজীবনে কি অদ্ভুত নিশ্চিন্ত নিরুদ্যম অর্থহীনতা। নিজেকে লইয়া কত সহজে এবং পরিপূর্ণভাবে এখানে একাকী হইয়া থাকিয়া যায়, কোনও দিক্ হইতে কোনও আকর্ষণের রজ্জুতে এতটুকু টান পড়ে না। সমষ্টিগতভাবে এই মহানগরীর মানুষগুলির কোনও ইতিহাস নাই, দিন হইতে দিনের অগ্রসর হইয়া চলার মধ্যে কোনও ছন্দ নাই, ভবিষ্যতের মধ্যে নিজেদের কোনও সমষ্টিগত সার্থকতার সন্ধানও ইহারা জানে না। এই মহামানবের যজ্ঞ, ইহার কেহ পুরোহিত নাই, মন্ত্র নাই, এ যজ্ঞের দেবতাও কেহ নাই। আছে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির অতি-সান্নিধ্যের ফলে অফুরান বিরোধ আর ব্যাধি, ব্যাধি, ব্যাধি। চতুর্দ্দিককার এই বিরাট্ ব্যাধিগ্রস্ত উদ্দেশ্যহীনতার মধ্যে নিজের ক্ষুদ্র একক জীবনের উদ্দেশ্যহীনতা মানুষকে বেশীদিন পীড়িত করে না, অজয়কেও করিতেছে না।

কিন্তু সুভদ্রের সঙ্গে থাকিয়া যাওয়ার আসল কারণটা যাহাই হউক, এই কয়দিনে সুভদ্রকে তাহার আরও একটু ভাল লাগিয়াছে।

সুভদ্রের গৌরবর্ণ দীর্ঘ ঋজু দেহ, প্রশস্ত ললাট,

সকরুণ সহাস্য চক্ষু, সহজেই সকলের মনোহরণ করে, অজয়েরও করিয়াছিল। মুখটি খুব সুন্দর নয়, চোখদুইটির রং কটা, মুখ ছাপিয়া কোনও এক সময়ে ব্রণ হইয়াছিল, সেগুলির অবশেষ-চিহ্ন চোখের নীচে গালের উপরিভাগকে লোহিতাভ করিয়া রাখিয়াছে, উপর-পাটির মাঝখানকার দুইটি দাঁত অল্প একটু উঁচু। কিন্তু এসমস্তই তাহার সমস্ত মুখশ্রীর সঙ্গে আশ্চর্য্যরূপে মানাইয়া যাওয়াতে তাহাকে দেখিতে বেশ ভালই লাগে। অন্ততঃ অজয় মনে করে, তাহার দাঁতদুইটি ঐটুকু উঁচু না হইলে, চোখের নীচে গালের কাছটায় ঐটুকু লালের আভাস না থাকিলে তাহাকে মোটেই ভাল দেখিতে হইত না। স্বভাবের দিক্ দিয়া বিধাতা সুভদ্রকে এমন করিয়া গড়িয়াছিলেন, যে, অজয়ের মত তুষ্টিহীন মানুষও তাহার মধ্যে বিরক্ত হইবার মত কিছু খুঁজিয়া পায় না। সুভদ্র সম্পূর্ণভাবেই নিরহঙ্কার বলিয়া অজয়ের অহঙ্কারী স্বভাব তাহার মধ্যে এমন একটা আশ্রয় পাইয়াছে যাহা আর কোথাও এতদিন পায় নাই।

পৃথিবীতে ঠিক বন্ধু বলিতে সুভদ্রেরও এতদিন কেহ ছিল না। এপরের জন্য প্রয়োজন হইলেই সে যদিও প্রাণপণ করিত, সে-প্রয়োজন ফুরাইয়া গেলে অথবা চোখের আড়াল হইলেই কাহারও কথা তাহার আর মনে থাকিত না। যাহারা সম্মুখে থাকিত তাহাদের সেবার দাবি মিটাইয়া তাহার সময় এবং সামর্থ্যের কিছুমাত্র আর অবশিষ্ট থাকিত না, এবং সেবা করিয়া ছাড়া মানুষের সঙ্গে আর যে কিরূপে সম্বন্ধ স্থাপন এবং রক্ষা করিতে হয় তাহাও সে জানিত না। দেহ-মনে যে একটা চূড়ান্ত নির্ভরের প্রয়োজনকে অজয় অলক্ষ্যে নিজের চতুর্দ্দিকে সারাক্ষণ বহন করিত, হইতে পারে কোনও অচিন্তিত উপায়ে সুভদ্র প্রথম-দৃষ্টিতেই তাহার পরিচয় পাইয়াছিল, কিন্তু কেন যে প্রথম হইতেই অজয়কে তাহার এত বেশী ভাল লাগিতেছে তাহা নিজে জানে না।

মন্দিরের নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে অজয় আজও যায় নাই বটে, তবু এই ক'দিনেই আরও একটি মানুষের মধ্যে তাহার মনের একটা আশ্রয় গড়িয়া উঠিতেছিল, সে বীণা। কিন্তু বীণাকে তাহার ভাল লাগিতেছে ইহার বেশী তাহার সম্বন্ধে আর-কিছু সে একদিনও ভাবে নাই। এই মেয়েটি এমনই যে ইহাকে লইয়া ভাবিতে পারা যায় না, অলক্ষ্যে সে সমস্ত ভাবনার নিবৃত্তি করিয়া দেয়। সমস্ত ভাবনা-চিন্তার চূড়ান্ত-নিবৃত্তিই অজয়ের এখনকার মনের অবস্থায় তাহার সর্ব্বাপেক্ষা কাম্য।

দ্বিতীয়বার ক্লাবে যাওয়া লইয়া সে সুভদ্রের সঙ্গে যথারীতি তর্ক করিয়াছিল, বলিয়াছিল, "তুমি যেটাকে ক্লাব বল্‌ছ সুভদ্র, আমি বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি সেটা প্রিয়গোপালবাবুদের বাড়ির বৈঠকখানা। অকারণে এক অপরিচিত ভদ্রলোকের বাড়িতে হঠাৎ কেন আমি যাতায়াত সুরু কর্‌ব বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।"

সুভদ্র বলিয়াছিল, "আমরা যে ক্লাবের জন্যে আলাদা বাড়ি ভাড়া করিনি, প্রিয়দার বাড়িতে জায়গা চেয়ে নিয়েছি, সেটা আমার ইচ্ছাক্রমেই ঘটেছে।"

অজয় বলিয়াছিল, "তা জানি। তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছাটাই এক্ষেত্রে যদি একমাত্র ভাববার কথা হ'ত তাহ'লে আমার কিছুই বল্‌বার থাক্‌ত না।"

সুভদ্র বলিয়াছিল, "প্রিয়দাদের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও আমি তাঁদের ওপর চড়াও হয়ে অত্যাচার সুরু করেছি, এই ধারণা কি তোমার জন্মেছে?"

অজয় বলিয়াছিল, "তা আমি বল্‌তে চাইনি। হয়ত এই ক্লাব সম্বন্ধে তোমার যতখানি উৎসাহ, তোমার প্রিয়দাদের উৎসাহ তার চেয়ে কিছু কম নয়। কিন্তু ভুলে যেও না, উৎসাহের অভাব যদি তাঁদের দিকে কোনোদিন ঘটেও, তোমাকে সেটা জানতে দেওয়া তাঁদের পক্ষে সহজ হবে না। তুমি সংসারী নও, সমাজের কাছে তোমার কোনো বিষয়ে কোনো দাবি-দাওয়া নেই, যদি এই ক্লাব থেকে কখন কোনো অনর্থের সূত্রপাত হয়, তোমার কাছে তা নিয়ে কেউ জবাবদিহি দাবি কর্‌বে না, তোমার প্রিয়দা এবং তাঁর স্ত্রীর কাছেই কর্‌বে। তাঁরা বুদ্ধিমান্ মানুষ, এ আশঙ্কার কখন যে তাঁদের মনে উদয় হয়নি এ হ'তেই পারে না। এমনও ত হওয়া সম্ভব যে, অত্যন্ত সহৃদয় এবং অমায়িক



ব'লেই নিজেদের কোনও কথায় বা ব্যবহারে এ আশঙ্কাকে তাঁরা প্রকাশ হতে দিচ্ছেন না? তুমি বল্‌বে, ক্লাবের যারা মেম্বার তারা সকলেই তাঁদের পরিচিত ও বন্ধু। কিন্তু পরিচিত মানুষগুলিও ত মানুষ, ভুল তারাও ত কর্‌তে পারে?"

বিমান এককোণে বসিয়া একটা পেন্সিল স্কেচের উপর রবার ঘষিতেছিল, ময়লা কাগজের গুঁড়াগুলিকে ফুঁ দিয়া ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিয়াছিল, "ভুল করবারও তারা একটা ক্ষেত্র পাক্‌। হয়ত একশবার ভুল কর্‌বে, একবার কর্‌বে না, সেই একবারকে নিয়েই সুভদ্রের ক্লাব করা সার্থক হবে।"

অজয় বলিয়াছিল, "সুভদ্রের ক্লাব করা সার্থক হবে না এমন কথা আমি বলিনি, কিন্তু দেখতে হবে সেজন্যে এমন কোনো মূল্য তাকে দিতে হবে কিনা যা সেই সার্থকতার তুলনায়ও অত্যন্ত বেশী। তারপর এও দেখতে হবে সে-মূল্য সুভদ্রের হয়ে আর কাউকে দিতে হবে কিনা।"

সুভদ্র বলিয়াছিল, "তুমি ভয়ের কথাগুলি খুব বেশী বাড়িয়ে ভাবছ অজয়। আমি যদি বলি, সব বিষয়ে ঠিক এইরকম অতিভয়ই আমাদের দেশকে, সমাজকে, এমনকি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ব্যক্তিত্বকে পর্য্যন্ত দেহমনে পঙ্গু ক'রে রেখেছে, তাহলে তুমি রাগ কর্‌বে। কিন্তু আসলে যে-ধরণের কুৎসিত ভয় থেকে পৃথিবীতে অবরোধ-প্রথার সৃষ্টি, তার সঙ্গে তোমার এই-সমস্ত ভয়ের বিশেষ কিছু তফাৎই নেই।"

অজয় মনে মনে হারিয়া গিয়া খুশীই হইতেছিল, তথাপি তর্ক না থামাইয়া বলিয়াছিল, "বেশ, তাই যদি হয়, একেবারে নির্ভয় হয়েই কাজের আসরে নামো। গৃহ, অন্তঃপুর, এসমস্ত সঙ্কীর্ণতাকে ভুলে গিয়ে একেবারে বাইরের পৃথিবীতে, মুক্ত আকাশের নীচে, পরিপূর্ণ বন্ধনহীনতার মধ্যে মেয়েদের ডাক দাও। সেখানে অঘটন যদি কিছু ঘটে, তার জবাবদিহি একমাত্র বিধাতার কাছে কর্‌লেই চল্‌বে, যিনি এই পৃথিবীটাকে আবরণহীন ক'রে সৃষ্টি করেছেন।"

সুভদ্র বলিয়াছিল, "গৃহ মানেই বন্ধন নয়। অন্তঃপুরে আমার কোনো আপত্তি নেই, যদি তার উদারতার মধ্যে সমস্ত বিশ্বের স্থান ক'রে দিতে পারো।"

"সেটা কি ভাবাবেগের বিশ্ব? কেবলমাত্র কল্পনার?"

"না, সত্যিকারের। যা-কিছু নিয়ে আমাদের এই বাইরেকার সংসার তার সব। এমন কি, রাজনৈতিক সভা এবং ফুটবল খেলার মাঠ পর্য্যন্ত।"

"ধর্‌বে?"

"ধর্‌বে না, এইটেই আমাদের কল্পনা। তার কারণ, আমরা ঘরে এবং বাইরে একটা ঐকান্তিক বিরোধ চিন্তা করি এবং সেটা আগাগোড়া আমাদের কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়।"

অজয়ের ইহার পর আর তর্ক করিতে ভাল লাগিতেছিল না। একটুক্ষণ নীরবে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া সুভদ্র আবার বলিয়াছিল, "দেখ অজয়, তোমার মনটা নিশ্চয় আজ খুব স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। তুমি আজ কেবলই জবাবদিহির কথা ভাবছ, যেন কে সেটা কর্‌বে, আর কা'র কাছে কর্‌বে সেইটেই আসল কথা, অঘটন যেটা ঘট্‌ল সেটা কিছু নয়। আমি এই ক'টি কথা জানি, বাংলার ছেলেমেয়েদের মিল্‌তে হবে, যতটা সম্ভব তাদের পরিচিত অভ্যস্ত জগতের মধ্যে এই মিলনকে ঘটাতে চেষ্টা কর্‌তে হবে, সতর্কতার সঙ্গে সব অঘটন-সম্ভাবনাকে বাঁচিয়ে চল্‌তে হবে। আমি জানি, প্রিয়দাদের অসুবিধা ও দায়িত্ব খুব বেশী। আমার সব-চেয়ে সঙ্কোচ বোধ হয়, যখন দেখতে পাই, নিজেদের অন্য-সমস্ত প্রয়োজনকে অগ্রাহ্য করেও ক্লাবের দিনে ঠিক সময়টিতে তাঁদের এসে বস্‌তে হয়। আর, সকলের ক্লাবে আসা-না-আসাটা তাদের নিজ নিজ খুশীর ওপর নির্ভর করে, একমাত্র এঁদের করে না। তা বেশ ত, না-হয় করেই না। তাঁদের কাছ থেকে এই স্বার্থত্যাগের মূল্য আমি নিয়েইছি। আমি যেটা বল্‌তে চাচ্ছি সেটাকে একটুও ছোট কাজ ব'লে আমি মনে করি না, কাজেই এটা বিশ্বাসই করি যে, এজন্যে অন্ততঃ কতকগুলি মানুষের স্বার্থত্যাগ প্রথমে প্রয়োজনই হবে। প্রিয়দাদের কাছ থেকে এ স্বার্থত্যাগের মূল্য আমি যদি না নেব তবে কার কাছ থেকে নেব? আর, পাবই

বা কার কাছ থেকে? সে মূল্য দেবার শক্তি আছে ক'জনের?"

বাহিরে হেমন্ত অপরাহ্নের নির্ম্মল রৌদ্রে শুভ্র মেঘখণ্ডগুলিকে কে যেন সেদিন ধৌতবস্ত্রের মত করিয়া মেলিয়া দিয়াছিল। অজয়ের ঘরের সম্মুখে যে ছোট বারান্দাটিতে বিমান ফুলের টব সাজাইয়া বাগান করিয়াছিল, সেখানে চড়ুই-দম্পতির প্রণয়বিহার অধীর হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে। একসারি বক পাখা ঝাপটাইয়া অজয়ের জানালার নীল অতিবাহিত করিয়া চলিয়া গেল, কাহার নীলাম্বরীর ভাঁজে ভাঁজে যেন আলো পড়িয়া ঝলকিয়া উঠিল। এতক্ষণ ক্লাব বসিবার আয়োজন হইতেছে। একটি জরীপাড়-বসানো গরদের জামা এবং জরীপাড় অমল শুভ্র শাড়ী অজয়ের মনে পড়িল। দুটি নিটোল বাহুমৃণাল ঘেরিয়া লোহিতাভ পাথরের কঙ্কণ ঝলমল করিয়া উঠিল। সম্মুখের খোলা পুঁথির পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সে ভাবিতে লাগিল, আজ হয়ত সে মভ পরিয়া আসিবে, কিম্বা পার্প্‌ল্, কিম্বা ময়ূরকণ্ঠী। হাত-দুটি মুক্তার ব্রেস্‌লেটে জড়াইলে কেমন দেখাইবে। সেদিন সে কি কপালে সিঁদুরের টিপ পরিয়া আসিয়াছিল, হয়ত আসে নাই, কিছুতেই কেন মনে পড়িতেছে না? কিন্তু সিঁদুর পরিলে তাহার টলটলে সুন্দর কপালটিতে নিশ্চয় বেশ মানায়। ক্রমে তাহার পরিশ্রান্ত চৈতন্যকে ঘিরিয়া এস্রাজের সুর জমিয়া উঠিল, পাখোয়াজে গুরু-গম্ভীর ঘা পড়িতে লাগিল, আর সমস্ত ধ্বনিকে আবৃত করিয়া, সমাচ্ছন্ন করিয়া, অলক্ষ্য সূত্রে জটিলতর সমন্বয়ে কোন সঙ্গীতের সঙ্গতিতে সেগুলিকে গাঁথিয়া গাঁথিয়া কাহার কলহাস্য তাহার দেহের শিরায় শিরায় ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল, মুখরিত হইতে লাগিল।

অজয় সেদিন প্রথম ক্লাবে গান গাহিয়াছিল,

"বন্ধু, তোমার হাসির ছোঁয়াচ লাগে মনে,
সকল ব্যথা পাশরণে।"

বিমান শুনিয়া বলিয়াছিল, "এ ত ব্রহ্মসঙ্গীত নয়, বন্ধুটি যদি দেবতা হন ত নিতান্তই নীট্‌শের দেবতা, হাসতে যখন পারেন, নাচতে গাইতেও পারেন মনে হচ্ছে।"

অজয় স্বভাবতঃ লাজুক, কিন্তু একবার কোনওরূপে বাঁধ ভাঙিতে পারিলে তাহার চিত্তবেগ প্লাবনের মত প্রখর গতিতে সমস্ত সঙ্কোচ-কুণ্ঠাকে ডুবাইয়া ভাসাইয়া বহিয়া চলে। হাসি-পরিহাস, বিশ্রম্ভালাপ, কপট কলহ, মান অভিমানে বীণার সঙ্গে এমন ব্যবহার সেই হইতে সে করিয়া চলিয়াছে যেন আশৈশব তাহাকে সে জানে। লাজুক বলিয়াই ক্লাবের অপর কাহারও সঙ্গে সে মিশে না, কথা বলে না, অখণ্ড মনোযোগ দিয়া এই একটি মানুষকে সারাক্ষণ ঘিরিয়া রাখা সেইজন্যই তাহার সহজ হয়। যখন বীণার সঙ্গে বলিবার কথা ফুরাইয়া যায় তখন মন্দিরাকে জুটাইয়া আনে, তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া আবার কথার স্রোত এবং কলহাস্যের বান ডাকিতে থাকে। নিজের উপর আরোপিত মাতৃত্বের এমন-সদম্ভ অধিকারকে মন্দিরা অকুণ্ঠিত-চিত্তে সারাক্ষণ প্রচার করে, যাহা অতি বড় লজ্জাহীনেরও কর্ণমূল আতপ্ত করিয়া তুলিবার পক্ষে যথেষ্ট। সেইগুলিকে আশ্রয় করিয়া নিভৃত সন্ধ্যা ভরিয়া কত সলজ্জ দৃষ্টি-বিনিময়, কত অস্ফুট হাসির আদান-প্রদানের লুকোচুরি খেলা চলিতে থাকে।

পথসঙ্গিনী সেই অপরিচিতা, কবরীভার-পীড়িতা গৌরীর মুখখানি অজয় প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছে। চকিতে কোনও গৃহবাতায়নে অস্পষ্ট একটি মুখের আভাস নূতন করিয়া তাহার বুকের রক্তে দোলা লাগায়। রক্তস্রোতের সেই দ্রুত চাঞ্চল্য বড় বেদনার মত হইয়া তাহার বুকে বাজে বলিয়া স্বেচ্ছায় সেই তরুণীর চিন্তাকে বেশীক্ষণ সে ধরিয়া রাখে না।

কিন্তু নিজেকে লইয়া এই পলাইয়া বেড়ান বেশীদিন চলিল না।

সেদিন আর কিছু করিবার ছিল না বলিয়া নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই তিন বন্ধুতে বার বার দেখা ছবিগুলিকে আরও একবার দেখিবার সঙ্কল্প করিয়া বিমানদের ইস্কুলের প্রদর্শনীতে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুভদ্রের জন-দুই চেলা জুটিয়া গেল, শ্যামবাজারে তাহারা একটা কুস্তির আখ্‌ড়া খুলিতে চায়, সুভদ্রকে সে-কাজের গোড়ার দিক্‌কার ভারটা লইতে বলিতেছে। সুভদ্র তাহাদের লইয়া রাস্তার দিক্‌কার বারান্দায় বাহির হইয়া গেলে ছবির ক্যাটালগ কিনিয়া ফিরিয়া আসিয়া অজয়

দেখিল, হলের মাঝখানে ভক্তমণ্ডলী-পরিবৃত বিমান মহা উৎসাহে শিল্পকলার উপর সমষ্টি-মনের প্রভাব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছে। তাহার ঠিক পশ্চাতেই একটা থামের আড়ালে বসিয়া একটি তরুণী একমনে কতকগুলি উডকাটের প্রিণ্ট উল্টাইতেছিল; স্পষ্ট বোঝা গেল, বক্তৃতা তাহার শ্রুতিগোচর করাটাই বিমানের আসল উদ্দেশ্য। সযত্নে তাহাকে পরিহার করিয়া অজয় ছবি দেখাতে মন দিল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে হলের বহুদূর কোণ হইতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, বিমানের বক্তৃতা থামিয়া গিয়াছে, সুভদ্রকে লইয়া তাহার পশ্চাৎবর্ত্তিনী সেই তরুণীর সঙ্গে সে পরিচয় করিয়া দিতেছে। থামের আড়াল হইতে শাড়ীর অঞ্চল-প্রান্ত মাত্র দেখিয়াছিল, এবার দেখিল, তরুণী তাহার পথপ্রবাস-সঙ্গিনী জ্যোতির্ম্ময়ী সেই গৌরী। তাহার প্রথমেই মনে হইল, নামিয়া বাহির হইয়া যায়, নতুবা বুকের মধ্যে রক্তস্রোতের প্রখর গভীর আলোড়ন এখনই যেন তাহার চেতনাকে বিকল করিয়া দিবে। কিন্তু সুভদ্রের দৃষ্টি এড়াইয়া পলায়ন সম্ভব হইবে না, কেন না সুভদ্ররা যেখানে দাঁড়াইয়াছে, তাহার খুব কাছের জায়গা দিয়াই বাহিরে যাইবার পথ। তখন কতকটা নিরুপায় হইয়া এবং কতকটা তাহাকে উহারা কেহ লক্ষ্য করিতেছে না বুঝিতে পারিয়া স্বপ্নাবিষ্টের মত অজয় তাহার জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া যাহাকে বিশ্বাস করিত, তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখকান্তি অপলক চোখের ক্ষুধিত দৃষ্টি ভরিয়া দেখিতে লাগিল।

কি আশ্চর্য্য, ঐ মুখখানিকে দেখিলেও দেখা হয় না, মনে হয় সমস্তটা দেখা হইল না, মুখের মধ্যে সবচেয়ে যে-সৌন্দর্য্যটুকু আসল দেখিবার মত ক্রমাগত সেইটুকু দেখিতে ভুল হইয়া যাইতেছে। কোন্ আনন্দ-বেদনাময় নিবিড় বিস্মৃতির আবরণ অদৃশ্য অশ্রুজলের মত বারম্বার চোখের সম্মুখে নামিয়া আসিয়া সেই অবশেষ সৌন্দর্য্যটুকুকে আর দেখিতে দিতেছে না। পায়ে লাল রঙের পাঞ্জাবী জুতা, তাহার দেহলতা ঘিরিয়া নবকিশলয়ের মত অস্ফুট সবুজ রঙের শাড়ী অস্ফুটতর হইয়া অজয়ের চোখে পড়িল। সুন্দর বাহুটির স্পর্শকুণ্ঠ কোমলতাকে পীড়িত করিয়া তরুণী একটি বাজু পরিয়াছে, কঙ্কণে হীরা জ্বলিতেছে, কিন্তু তাহার দেহাতিরিক্ত কোন্ জ্যোতিঃ সে-সমস্তকেই আবৃত করিয়া ম্লান করিয়া অজয়ের সমস্ত চিত্তকে অধিকার করিয়া রহিল। ক্রমে সে অনুভব করিল, তাহার শিরা-উপশিরায় রক্তস্রোতের তাণ্ডব নর্ত্তন থামিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার বুকের কাছে কি-একটা যেন সূচীবিদ্ধবৎ বিঁধিতেছে। তরুণীকে সে যত দেখিতেছে, তাহার বুক দমিয়া যাইতেছে। কে একটা ভীরু, কে একটা লোভী তাহার মনের মধ্যে লুকাইয়া ক্রমাগত বলিতেছে, তুমি অপূর্ব্ব, পৃথিবীতে তোমার তুলনা নাই, তুমি কোনওদিন আমার হইবে না, এতবড় ঐশ্বর্য্য বিধাতা আমার জন্য রাখেন নাই।

সহসা সম্বিৎ পাইয়া বুঝিল, সুভদ্ররা তিনজনেই কথা থামাইয়া তাহার দিকে ফিরিয়া দেখিতেছে। তরুণীর দৃষ্টির বিদ্যুৎ তাহার রক্তস্রোতের মধ্যে কি তীব্র বেদনা জাগাইয়া বহিয়া গেল। চকিতে ফিরিয়া সম্মুখে যে ছবি দেখিল তাহাই লইয়া সে অতিশয় বিব্রত হইয়া পড়িল।

বিমান পশ্চাৎ হইতে তাহাকে স্পর্শ করিল, কহিল, "যাঁর ছবি এত মন দিয়ে দেখছ তিনি নিজে তোমাকে দেখতে চান, চিত্রের চেয়ে চিত্রকারিণীকে দেখে কিছু কম ভাল লাগবে না তোমার। এস তুমি আমার সঙ্গে।"

অজয় অত্যন্ত অদ্ভুত ব্যবহার করিল। এক ঝট্‌কায় বিমানের হাতটা সরাইয়া দিয়া বলিল, "না, বিমান, না। আমি পারব না। আমায় মাপ কর তুমি।"

বিমান হতবুদ্ধি হইয়া এমন ভাব দেখাইল, যেন প্রয়োজন হইলে বলপ্রয়োগেও তাহার আপত্তি নাই। কিন্তু বলপ্রয়োগ অজয়ই করিল। বিমানকে টানিয়া একটু আড়ালে লইয়া গিয়া কহিল, "তুমি ত আর্টিষ্ট মানুষ, নিশ্চয় এখানে কুৎসিত রকমের একটা 'সিন্' হতে দেবে না। আজ আমি কিছুতেই ওঁর সামনে যেতে পারব না, খুব অভদ্রতা হচ্ছে কিন্তু কি করব? তোমায় পরে সব বলব, তুমি এখন যা-হোক কিছু একটা বানিয়ে বলগে।"

বিমান দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া অজয়কে দেখিতে-ছিল, আজ কিও দাড়ি কামায় নাই, না যথেষ্ট ফিট্‌ফাট

হইয়া সাজিতে ভুলিয়াছে? কহিল, "তুমি কি পাগল...?" ইহার পর তাহার আর বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না।

অজয় কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু আড়াল হইতে সবুজ আলোর ঝলক আসিল। পলাইবার সঙ্কল্প ভাল করিয়া মনে জাগিবার পূর্ব্বেই সুভদ্র আসিয়া একেবারে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল, তারপর স্মিতহাস্যে মুখ ভরিয়া বলিল, "ইনি আমার বন্ধু অজয় রায়।...অজয়, ইনি শ্রীমতী ঐন্দ্রিলা দেবী, আমাদের বীণা দেবীর 'কাজিন্‌' এঁর আঁকা ছবি তুমি অনেক দেখেছ, এখানেও অনেক দেখতে পাবে, কিন্তু নিতে লোভ কর যদি, ভয়ানক জব্দ হবে। পাছে কেউ লভ্য মনে ক'রে দাম হাঁকে, সেই ভয়ে আগে থেকেই সেগুলিকে তিনি বিতরণ ক'রে রেখেছেন।"

অজয় কহিল, "সেই ত ঠিক ব্যবস্থা হয়েছে। টাকার মূল্য দিয়ে কি ওগুলোর মূল্য হত? সৌন্দর্য্যের মূল্য ঐরকম ক'রেই পেতে হয়।" কিন্তু কথাগুলি যেন অজয় বলিল না, তাহার হইয়া আর-কেহ বলিয়া দিল। ঐন্দ্রিলা বীণার ভগিনী, সেই সূত্রে কোনও একদিন অজয় তাহার কাছাকাছি আসিবে এই ব্যবস্থা স্বতঃই পূর্ব্ব হইতে হইয়া আছে, ইহার মধ্যে বিধাতার কোন্‌ ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন আছে ভাবিয়া তাহার দেহ শিহরিত হইল।

ঐন্দ্রিলার দিকে চোখ তুলিয়া সে চাহিতে পারিল না, তাহাকে সে ভয় করিল। একটু পাশ ফিরিয়া পশ্চাতের দেওয়ালে বিলম্বিত ছবিগুলির দিকেই দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া রহিল। ঐন্দ্রিলার আঁকা প্রায় দশ-বারটি ছবি। সেগুলি সুন্দর নয়, সেগুলিকে সে ভয় করিল না, সুন্দর নয় বলিয়াই সেগুলিকে সে ভালবাসিল। তাহার মনে হইল, চতুষ্পার্শ্বের প্রতিভার দীপ্তি-সমুজ্জ্বল অগণিত মণিরাজির মধ্যে এই ছবিগুলির দীনতাই তাহাদিগকে যেন একটি শুচি-স্নিগ্ধ বিশিষ্টতা দান করিয়াছে, যেন শাহদারায় মল্লিকা ফুটিয়াছে। বড় করুণ মর্ম্মস্পর্শী মনে হইল।

বিমান কহিল, "ছবিগুলো ত পালিয়ে যাচ্ছে না। সম্প্রতি ও-গুলিকে না-হয় না-ই দেখলে?"

সে বলিল, "ভাল লাগছে।"

ঐন্দ্রিলা অল্প একটু হাসিয়া বলিল, "ওগুলোকে ভাল লাগা ত সহজ নয়?"

অজয়ের গলার স্বরে কোথা হইতে জোর আসিল, কহিল, "কত বেশী ভাল যে লাগছে সেইটেই বলা সহজ নয়।"

ঐন্দ্রিলা আবার একটু হাসিল। এ-রকম করিয়া কাহারও ছবির প্রশংসা সচরাচর কেহ করে না, বিশেষতঃ ঐন্দ্রিলা তাহার নিজের ছবির মূল্য জানিত। তাহার কর্ণমূল আতপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু অজয়ের দিকে চাহিয়া, তাহার গলার স্বর শুনিয়া মনে হইতেছে না ত যে সে শুদ্ধমাত্র ঐন্দ্রিলাকে খুশী করিবার উদ্দেশ্যে চাটুবাদের আশ্রয় লইতেছে? নিজের পরিচিত পৃথিবীতে অল্প-সংখ্যক যে-কয়টি যুবকের সঙ্গে নানা উপলক্ষ্যে সে মিশিতে পাইয়াছিল, তাহাদের একই ধরণের অতিমার্জ্জিত কপট স্তুতিবাদ শুনিয়া শুনিয়া ঐন্দ্রিলার প্রায় মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। এই যুবকটির ব্যবহারে একটি সহজ সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া মুহূর্ত্তে ঐন্দ্রিলার মন তাহার প্রতি অনুকূল হইয়া উঠিল।

তাহারা চারজনে কেহই আসন গ্রহণ করিল না। যে যেখানে যে-অবস্থায় ছিল তেমনই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। যেন সেই বিশেষ অবস্থানটির মধ্যে তাহারা প্রত্যেকে এমন একটি কৃতার্থতার সন্ধান পাইয়াছে, একটু কোথাও কিছুর ব্যতিক্রম হইলেই যাহা হারাইয়া যাইবে। অজয় চেষ্টা করিয়াও ঐন্দ্রিলার দিকে চাহিতে পারিতে-ছিল না, অথচ প্রতিটি মুহূর্ত্ত কি অসীম সম্পদ্‌ লইয়াই না বহিয়া যাইতেছে! কি যে ইহার পর সে বলিবে তাহাও ভাবিয়া পাইতেছিল না; যে-কথাই মনে পড়ে, মনে হয় তাহা তুচ্ছ, তাহা বলিবার মত নয়। সুভদ্রই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া তাহাকে পরিত্রাণ করিল, কহিল, "আচ্ছা বিমান, তোমাদের আধুনিক শিল্পকলার মধ্যে বৌদ্ধযুগ আত্মপ্রকাশ করছে, এটা কোন্‌ মনোভাব থেকে হয়েছে?"

বিমান কহিল, "শৈবযুগ বল। সব জড়িয়ে শিবের ছবি কতগুলি 'এক্‌জিবিটেড্‌' হচ্ছে গুনে দেখেছ? ঐন্দ্রিলা

দেবী একটিও শিব আঁকেননি, এজন্যে তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। আর এজন্যে তাঁর যদি বিশেষ একটা পার্থিব ফললাভ না-ই হয়, আমি তাতে অন্ততঃ দুঃখিত হব না। তবু তিনি শিব আঁকলে তার একটা মানে বোঝা যেত, দেশশুদ্ধ আর্টিষ্ট ছেলে হঠাৎ কি কাম্যফল আশা ক'রে যে দল বেঁধে শিব-গড়াতে মন দিল এটা ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয় নয়। যদি হত, অজয়কে সে-কাজে লাগিয়ে দেওয়া যেত।"

সুভদ্র কহিল, "শিবই হোন আর বুদ্ধই হোন, আসলে ব্যাপারটা একই। যারা আঁকছে তারা শৈবও নয়, বৌদ্ধও নয়, অথচ তারা শিব আর বুদ্ধ ছাড়া আর-কিছু আঁকছে না, এই জিনিষটাকে আমি বুঝতে চাচ্ছি। আমার মনে হয়, আমাদের জাতের শারীরিক অস্বাস্থ্য অনেকটাই এই মনোভাবের মূলে। যতখানি উদ্বৃত্ত উদ্যম মানুষের থাকলে তার পক্ষে সত্যকারের শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হয়, আমাদের তা নেই। নিতান্ত জীবনধারণের জন্যে যতটুকু মেহনৎ দরকার তা ক'রেই আমরা হাঁপিয়ে যাই। সেজন্যে দেখতে পাই বাংলাদেশের ঘরবাড়ী নিতান্তই ঘরবাড়ী, সেগুলি কোনো হিসেবেই 'আর্কিটেকচার' নয়। যারা বাড়ী তৈরি করে, কোনোরকমে চারটে দেয়ালের ওপর একটা ছাত চাপিয়েই তাদের দম ফুরিয়ে যায়। আমাদের নৌকোগুলো কেবলমাত্র নৌকোই, তাতে ক'রে এপার-ওপার করাই চলে, কোনো রসতীর্থের সন্ধানে সেগুলোকে নিয়ে বেরিয়ে পড়া যায় না। বৌদ্ধযুগের যে শিল্পসম্পদকে উত্তরাধিকার-সূত্রে আমরা পেয়েছি, সম্প্রতি তাই নাড়াচাড়া ক'রেই আমাদের চলছে, আর চলবেও ততদিন যতদিন আমাদের জাতের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য প্রচুর হয়ে না ফিরে আসছে। রুগ্ন মানুষকে দিয়ে আর্ট হয় না, আর রুগ্ন মানুষের জন্যেও আর্টের চেয়ে কুইনিনের প্রয়োজন বেশী, এ ত আমরা সকলেই ভাল ক'রে জানি।"

অজয় সচরাচর বিমান এবং সুভদ্রের এই-ধরণের তর্কযুদ্ধে যোগ দিত না। কিন্তু ঐন্দ্রিলা তাহাদের প্রত্যেকটি কথা অবহিত হইয়া শুনিতেছে দেখিয়া আজ চুপ করিয়া থাকিতে তাহার ভাল লাগিল না। কহিল, "বৌদ্ধযুগের মধ্যে আমাদের দেশের কাল্চারের আত্মা রিপ-ভ্যান্-উইঙ্কলের মত ঘুমিয়ে পড়েছিল, দেড়হাজার বৎসরের ঘুমভেঙে সেইখানেই আবার জেগে উঠছে।—আমি এতে ত দোষের কিছু দেখতে পাই না। বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে অস্বীকার ক'রে একদিন যে পাপ আমরা করেছিলাম, দেড়হাজার বৎসর পরে এইরকম ক'রে হয়ত তার একটু প্রায়শ্চিত্ত করছি, মন্দ কি?"

সুভদ্র তর্ক তুলিয়া বলিল, "কিন্তু তুমি নিজেই কোথাও একজায়গায় বলেছ, বৌদ্ধধর্ম্ম অনভিপ্রেতকে অতিক্রম করবার উপায় বলেছে, মানুষকে তার পরম অভিপ্রেত যা তার সন্ধান দিতে পারেনি। রোগমুক্তির ওষুধ দিয়েছে, সুস্থ শরীরের পথ্য-নির্দ্দেশ করতে পারেনি।"

কথার স্রোত ইহারপর প্রখর-ধারায় বহিতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত্ত আগে কুণ্ঠিত সঙ্কোচের আতিশয্যে যে পলাই-বার উপক্রম করিতেছিল, সেই অজয় এখন কেবল যে, ঐন্দ্রিলাকেই আর লক্ষ্য করিল না তাহা নহে, তাহার চতুষ্পার্শ্বকেও সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা করিল। অন্তরের এমন-সমস্ত গভীর অনুভূতিকে ব্যক্ত করিল যেগুলিকে ইতি-পূর্ব্বে নিজেও নিজের কাছে স্পষ্ট করিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠা বোধ করিয়াছে। এমন-সমস্ত অপূর্ব্ব আশার কথা তাহার মুখ দিয়া উচ্চারিত হইল যাহা তাহার নিজেরই মনের কথা বলিয়া নিজে সে এতদিন জানিত না। এমন উদ্দীপনা প্রকাশ করিল যাহা তাহার স্বভাবে অসম্ভব বলিয়াই নিজে এতকাল সে বিশ্বাস করিত।

অজয়ের সঙ্গে নন্দিতার পিতার চেহারার সাদৃশ্যের কথাটা ঐন্দ্রিলা ইতিমধ্যে কোনও একদিন শুনিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, সাদৃশ্যটা সত্যই যে কোনখানে তাহা ত জানি না। ও হাসিলে হয়ত কতকটা সেইরকম দেখাইতে পারে কিন্তু সহজে যে হাসিবে তাহা ত মনে হয় না। এই ত বয়স কিন্তু, বাবা, কি গম্ভীর!

অজয় তখন বলিতে চাহিতেছিল, বুদ্ধদেব এটা বুঝিয়া-ছিলেন যে সুস্থ শরীরের পথ্য নির্দ্দেশ করিয়া না দিলেও ক্ষতি নাই, সেটা নিজের প্রয়োজনে এবং শক্তিতে নিজেই মানুষ সংগ্রহ করিয়া থাকে। চিকিৎসার প্রয়োজন একমাত্র অসুস্থের জন্যই। দেশের চিন্তায় কর্ম্মে ব্যবহারে তখনকার

দিনে যে অসুস্থতা দেখা দিয়াছিল, নিজের বুদ্ধির দর্পে তিনি তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধ বলিয়াই বুঝিয়াছিলেন, বাহির হইতে ধর্ম্ম দেওয়া যায় না, সেটা প্রতি-মানুষের নিজস্ব জিনিষ। একমাত্র অধর্ম্মকে আঘাত করাই যায়, ধর্ম্ম তারপর নিজেকে নিজে প্রকাশ করে।

ঐন্দ্রিলা ভাবিতেছিল, বাংলাদেশের তরুণরা তরুণীদের শোনাইতে বৌদ্ধধর্ম্ম আলোচনা করিয়া সত্যই কি কিছু সুখ পায়? পায় হয়ত, কে জানে? ক্রমে সে কৌতূহলী হইয়া অজয়ের কথায় মন দিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এত উৎসাহ করিয়া বলিতেছে, প্রত্যেকটি কথা অন্তরের সত্যকার উপলব্ধি হইতে বলিতেছে বলিয়াই মনে হয়, না-শোনাটা নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার হইবে।

অজয় এই বলিয়া শেষ করিল, "অসত্যের বন্ধন থেকে দেশের মনকে বুদ্ধদেব আন্তরিকতার যে-ক্ষেত্রে মুক্ত ক'রে দিয়ে গিয়েছিলেন তাহারই উপর ধর্ম্মাশোকের সাম্রাজ্য, তাম্রলিপ্তির বৈভব, অজন্তার শিল্পের উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল। তারপর দেশের মহাপুরুষেরা তাঁদের বিধি-বিধান নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করলেন সেই মুক্ত আত্মার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে। শাস্ত্রপঞ্জিকা তৈরি হল, মঠ-মন্দির গড়ল, মানুষের মনের জায়গায় পুরোহিতেরা বসলেন। সেদিন যে আত্মপ্রবঞ্চনায় দেশের মন অভ্যস্ত হল, আজও অবধি তার জের টেনেই আমরা চলেছি। আসল মানুষটাকে কোথায় ফে'লে এসেছি কেউ জানি না, জীবনের প্রতিক্ষেত্রে নকল মানুষটার হারমানার আর শেষ নেই।"

ইহার পর কিছুক্ষণ আর কেহই কোনও কথা কহিল না। সুভদ্র বৌদ্ধ ধর্ম্ম বা ইতিহাস সম্বন্ধে কখনও গভীর করিয়া কিছু ভাবে নাই, ভাবিবার প্রয়োজনও অনুভব করে নাই। বিমানের বক্তৃতা দিবার প্রয়োজন যাহা ছিল তাহা সে আগেই সমাধা করিয়া লইয়াছে। কিন্তু তাহারা কেহই জানিত না যে, অজয়ের কথার মধ্যেকার আবেগ অকস্মাৎ একটি নারীচিত্তে গিয়া প্রহত হইয়াছে এবং তাহার অত্যন্ত নিবিড় সজাগ চৈতন্যে যে-দোলা লাগিয়াছে তাহা কিছুতেই আর থামিতে চাহিতেছে না। দেশের বিষয়ে ঐন্দ্রিলা কখনও যে, কিছু চিন্তা করে নাই তাহা নহে। কিন্তু যখনই ভাবিতে বসিয়াছে, দেশের বহুমুখী সমস্যার বিপুল জটিলতায় তাহার হৃদয় অবসন্ন হইয়া আসিয়াছে। তখন ইহাই মনে করিয়া নিজেকে সে সান্ত্বনা দিয়াছে, যে, ভারতবর্ষে আন্তরিকতা, বুদ্ধি এবং শক্তি সম্পন্ন মানুষের ত অভাব নাই, তাঁহারা নিশ্চয় এই-সমস্ত সমস্যার কথা ভাবিতেছেন, সমাধান তাঁহাদেরই দ্বারা কোনও-না-কোনও দিন হইবেই। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যের সূত্র যে এত দূর-অতীতকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়া থাকিতে পারে, এই সম্ভাবনা মাত্রেই তাহার কল্পনা উন্মুখ হইয়া উঠিল। অজয়ের দিকে দুই চোখের গভীর দৃষ্টি তুলিয়া সে বলিল, "আপনি কি তাহলে বলতে চান, বৌদ্ধধর্ম্মকে যে জায়গায় আমরা অস্বীকার করেছিলাম আবার সেই-খানেই তাকে স্বীকার ক'রে আমাদের আরম্ভ করতে হবে?"

অজয় কিছুক্ষণ অবনত মস্তকে চুপ করিয়া রহিল। ঐন্দ্রিলার প্রশ্নের উত্তর ভাবিবার তাহার প্রয়োজন ছিল না, উত্তর তাহার জানাই ছিল। কিন্তু যুক্তিকে কেবল যুক্তির ক্ষেত্রেই একান্ত করিয়া না দেখিয়া, বাস্তব-জীবনে তাহাকে প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা করিবার নারীচিত্তের এই যে প্রয়াস, ইহার অত্যন্ত কঠোর কিন্তু মর্ম্মস্পর্শী সরলতা তাহার মনকে অভিভূত করিল। এতক্ষণ নির্ব্বিচার আবেগ হইতে কথা বলিতে-ছিল, এবারে প্রত্যেকটি কথাকে তৌল করিয়া সাবধানে কহিল, "আমি ঠিক তা বলতে চাইনি। বৌদ্ধধর্ম্ম নিজেই একটা অস্বীকৃতি, তাকে নূতন ক'রে স্বীকার করবার কোনও অর্থ হয়ত নেই। নিজের ওপর, নিজের কর্ম্মফলের ওপর মানুষের যে চূড়ান্ত নির্ভর তা বৌদ্ধধর্ম্মে বিদ্রোহের রূপ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল, সেই বিদ্রোহকে আমাদের দেশের মনে আবার জেগে উঠ্‌তে দেখ্‌লে আমি খুশী হই। সত্যকে অনাবৃত রূপে দেখবার যে ক্ষমতা, সমস্ত বিধি-বিধান নিয়ম-কানুনের ওপর নিজের মনুষ্যত্বকে দর্পের সঙ্গে স্থাপিত করবার যে সাহস তাই আমার কাছে চিরকালের বৌদ্ধধর্ম্ম।"

ঐন্দ্রিলা বিশেষ-কিছু বুঝিল না, কিন্তু তাহার গায়ে কাঁটা দিল। সে এইটুকু মাত্র অনুভব করিল যে, দেশের

মনে আত্ম-প্রবঞ্চনা সর্ব্বত্র নিবিড় এবং জটিল হইয়া জমিয়া আছে, একটা প্রচণ্ড অগ্নিদাহ ভিন্ন সে জটিলতার সমাপ্তি হইবে না। অজয়ের গলার স্বরে সেই অগ্নিদাহের আঁচ যেন আসিয়া তাহার গায়ে লাগিল। কোন্ একটা সর্ব্বনাশ-আশঙ্কায় অজয়কেও একমুহূর্ত্তের জন্ম সে ভয় করিল।

অকস্মাৎ বিমান বলিয়া উঠিল, "নাঃ, আসল কথাটার কোনো মীমাংসাই তোমাদের কাউকে দিয়ে হল না। সুভদ্র যদি দেশের লোকের হারানো স্বাস্থ্য তাঁর কোনও টোট্‌কার সাহায্যে তাদের ফিরিয়ে দিতে পারেন তবে তাতে দেশের শিল্পকলার শ্রীবৃদ্ধি হোক আর না-ই হোক, সেটা এমনিতেই একটা খুব বড় কাজ হবে। আর অজয় যে দর্পের কথা বল্‌ছেন, আজকের এই প্রদর্শনীর কোনো বুদ্ধ বা শিবের মধ্যে তার প্রকাশ নেই। সম্প্রতি আমি অত্যন্ত দর্পের সঙ্গেই বল্‌ছি, এক-পেয়ালা চা না হলে আমি আর কিছুতেই পেরে উঠব না।"

সুভদ্র কহিল, "চেঁচাল ত অজয়, গলা শুকিয়ে উঠল কি তোমার ?"

বিমান কহিল, "কার্য্য-কারণটাকে উল্টো করে দেখছ। গলা শুকিয়ে আছে ব'লেই চুপ ক'রে আছি, নয়ত অজয়ের সবক'টা কথার জবাব ছিল। এক পেয়ালার ব্যবস্থা ক'রে দাও ত সেটা এখনই প্রমাণ ক'রে দিতে পারি।"

সুভদ্র কহিল, "রক্ষা কর, চা-টা তাহলে থাক। এরপর তোমার বক্তৃতা সুরু হলে আমি একরকম করে টিঁকে যাব কিন্তু এঁর দশা কি হবে ?"

পশ্চাৎ হইতে বীণার তন্ত্রীতে ঝঙ্কার উঠিল। বীণা কখন অলক্ষ্যে আসিয়া একপাশে দাঁড়াইয়াছিল, ইহারা কেহই তাহা টের পায় নাই, মৃদুহাস্যের মিশাল দিয়া কহিল, "ঐন্দ্রিলাও খুব টিঁকে থাকবে, কিন্তু বিমানবাবুর যে-রকম অবস্থা দেখছি, চা না পেলে সত্যিই বেশীক্ষণ টিঁকতে না পারেন। একটা উপায় ভাবুন না, সুভদ্রবাবু।"

বিমান কহিল, "আঃ, আপনি এসেছেন, বাঁচলাম। উপায় ভাববার ভার আপনার ওপর। জীবনের মরুভূমিতে তৃষ্ণা জাগাবার ভার আমাদের, তার ওয়েসিসের সন্ধান একমাত্র আপনাদেরই জানা আছে।" সুভদ্র পাশ হইতে লুকাইয়া তাহাকে বিষম একটা টিপুনি দিল।

বীণা হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "আচ্ছা, উপায় আমিই না-হয় ভাবছি। বেশী ভাবতে হবে না, ওয়েসিস না-ই আছে, হোটেল, তবে সেটা আমার বা আমার স্বজাতীয়া কারুর সম্পত্তি নয়।"

সেইখানেই একটা চৌকি টানিয়া লইয়া সে বসিয়া পড়িল, বলিল, "ইলু বোস্ না"। তাহার দিকে চাহিয়া, তাহার কলকণ্ঠের বাধাহীন সুধাস্রোতে দুই কানকে ডুবাইয়া দিয়া সকলে ভাবিতে লাগিল, এই মেয়েটি যেন মূর্ত্তিমতী বাস্তবতা। ইহার চতুর্দ্দিকে কোথাও আত্মপ্রবঞ্চনার কোনও আড়াল নাই। জীবনকে সহজভাবে ধরিবার এবং নিজেকে জীবনের কাছে সহজভাবে ধরা দিবার জন্ম এ যেন সারাক্ষণ প্রস্তুত হইয়াই আছে। অতীতকে সে জানে না, জানিবার তাহার প্রয়োজন নাই। ভবিষ্যৎ তাহাকে প্রলুব্ধ করে না। অতীতের অস্পষ্টতা এবং ভবিষ্যতের অন্ধকার হইতে এই কয়টি মানুষের মনকে এক মুহূর্ত্তে ফিরাইয়া লইয়া সে তাহার চতুর্দ্দিকে প্রবহমান জীবনের জ্যোতির্ম্ময় আবর্ত্তের মধ্যে সবলে নিক্ষেপ করিল। কোন্ অদৃশ্য তরঙ্গাঘাতে সহসা প্রত্যেকটি চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহারা নিজেদের অজ্ঞাতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস লইয়া বাঁচিল।

আবার গল্প জমিয়া উঠিতেছিল, বীণাই বাধা দিয়া কহিল. "চা খেতে কে কে যাবেন শুনি ?"

সকলে উৎসাহ করিয়া প্রস্তুত হইল, কেবল ঐন্দ্রিলা বীণার কানে কানে কহিল, "আমি ভাই যাব না, তোমরা যাও. আমায় এখুনি বাড়ী ফিরতে হবে।"

বীণা ঐন্দ্রিলার স্বভাব জানিত, তাহাকে পীড়াপীড়ি করিল না। ডাকিল, "রাহু !"

রাহু অনতিদূরে দাঁড়াইয়া কপট অভিনিবেশ সহকারে মহাপরিনির্ব্বাণ বিষয়ক একটি ছবি দেখিতেছিল, হোটেলে যাইবার প্রস্তাবটা সম্পূর্ণই তাহার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল, সোৎসাহে কহিল, "কি ?"

বীণা বলিল, "একটু আয় এদিকে।" রাহু তাড়াতাড়ি কাছ ঘেঁসিয়া আসিলে কহিল, "রাহু-সর্দ্দার, তোমার

… দেখতে পেলাম।

ইলুদিকে সঙ্গে ক'রে বাড়ী যাও। মেয়েদের সঙ্গে পুরুষমানুষ একজন পাহারা থাকা চাই কিনা ?"

রাহু বীণার সঙ্গে মাত্র কয়েকমুহূর্ত্ত আগেই আসিয়াছিল, মাটিতে পা ঠুকিয়া বলিল, "বা-রে, আমি একটাও ছবি দেখ্‌লাম না !"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "আচ্ছা, এস, এস, তোমাকে আমি ছবি দেখিয়ে আন্‌ছি।"

অত্যন্ত কাতর মুখ করিয়া রাহু তাহার সঙ্গে চলিয়া গেল।

আর-একজন মানুষের মুখে কাতরতা বেশ স্পষ্ট হইয়াই প্রকাশ পাইল, সে অজয়। ঐন্দ্রিলা যে সকলের সঙ্গে মিলিয়া চা খাইতে নীচে আসিল না, এ জিনিষটা তাহার অসহ্য অহঙ্কারের মত হইয়া অজয়ের চোখে লাগিল। তাহার অহঙ্কার দিয়া অজয়ের আত্মাভিমানকে সে যেন আঘাত করিল। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে অজয়ের মনে হইতে লাগিল, কোন্ পরাজয়ের অপমান শিরে বহিয়া সে যেন তাহার ঈপ্সিত স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া ফিরিতেছে। দেশের অগ্রসর বা অনগ্রসর কোনও সমাজেরই স্ত্রীজাতি-সম্পর্কিত সামাজিক রীতিনীতিতে সে আদৌ অভ্যস্ত ছিল না তাই বীণার অদ্যকার ব্যবহারের মধ্যে যে একটি দারুণ দুঃসাহসের পরিচয় ছিল তাহা তাহার চোখে পড়িল না। মনে মনে অকারণেই ঐন্দ্রিলাকে সে অপরাধী করিতে লাগিল। এমন কি, কি-উপায়ে অদ্যকার অপমানের যথাযোগ্য প্রতিশোধ সে লইতে পারে, সে-সম্বন্ধেও নানাপ্রকার সম্ভব-অসম্ভব কল্পনা করিতে সে ত্রুটি করিল না।

পেয়ালাতে ধূমায়িত চা ঢালিতে ঢালিতে বীণা কহিল, "কি নিয়ে এত গল্প হচ্ছিল ?"

সুভদ্র কহিল, "বৌদ্ধধর্ম্ম।"

বীণা তাহার টলটলে সুন্দর ঠোঁটটিকে একটু উল্টাইল, তারপর চিনির পাত্র হইতে চিমটায় করিয়া ডেলা চিনি উঠাইতে উঠাইতে কহিল, "অজয়বাবু, আশা করি বুদ্ধদেবের পন্থা অনুসরণ করবেন না ?"

বিমান কহিল, "তার আশু সম্ভাবনা ত কিছু দেখা যাচ্ছে না। বিপরীত লক্ষণগুলোই আজকাল বরং প্রবল।"

অজয় কহিল, বুদ্ধদেবের পন্থা অনুসরণ "করলেই বা ক্ষতি কি ?"

বীণা কহিল, "আপনার আছে, বুদ্ধদেবের ছিল না। জীবনের মধ্যে মজা যেটুকু সেটুকুকে উপভোগ ক'রে নিয়ে, তারপর যখন সবদিক্ দিয়ে ঠেলা সামলাবার সময় তখন ছেলেপিলে ঘরসংসার স্ত্রীর কাঁধে ফে'লে দিয়ে পিঠটান দেওয়া, এতে আর মুস্কিলটা কোনখানে ? বুদ্ধদেব চালাক লোক ছিলেন তা বলতে হবে।"

সে-রাত্রে অজয় বাড়ী ফিরিয়া বহুক্ষণ ছাতে গিয়া একাকী বসিয়া রহিল। ভাবিতে লাগিল, মর্ম্মান্তিক আনন্দ-বেদনা-ভরা এমন পরিপূর্ণ সন্ধ্যা একটিও আর তাহার জীবনে আসিয়াছে কিনা, স্থির করিল আসে নাই। কিন্তু ক্রমে তাহার চিন্তাতে আনন্দকে ছাপাইয়া বেদনা বড় হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমতঃ যাহাকে অত্যন্ত অভাবিত ভাবে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য কাছে পাইয়াছিল, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত ভরিয়া তাহাকে কাছে না পাইবার বেদনা তাহার মনকে জুড়িয়া রহিল। কাল সকালে ঘুম ভাঙিয়া রাত্রিতে ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িবার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত কি উপায়ে নয়নের জ্যোতিঃস্বরূপিণীকে আর-একবার এক মুহূর্ত্তের জন্য দুনয়ন ভরিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাই ভাবিয়া তাহাকে অস্থির হইয়া থাকিতে হইবে। অতঃপর, যাহা অস্তিত্বের সমস্ত শক্তি দিয়া চাহিয়াও সে পাইবে না জানে, তাহা পাওয়ার অধিকার তাহার নাই, তাহাতে লোভ করা তাহার ধৃষ্টতা, নিজেকে এই নিদারুণ আঘাত দিয়া বেদনা পাইয়া অপর বেদনাকে সে ভুলিতে লাগিল। সে যে অযোগ্য, সে যে অকিঞ্চিৎকর তাহার জীবনে যে ঐশ্বর্য্য সে পাইতে লোভ করে তাহার বিনিময়ে কিছু যে তাহার দেওয়ার সাধ্য নাই, নিজের এই দীনতার অভিমানকে সারাক্ষণ সে মনের সম্মুখে ধরিয়া রহিল।

মনে পড়িল, ঐন্দ্রিলাকে যে-কয়টি মূল্যবান মুহূর্ত্ত সে আজ কাছে পাইয়াছিল, একবারও দুই চোখ ভরিয়া তাহাকে সে দেখিয়া লয় নাই। তাহার কণ্ঠস্বরকে দুই কানে শুনিয়াছে, অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করে নাই। নিজের বিমুগ্ধ অন্তরের প্রীতি-নিবেদনকে নিজের দুই

চোখের দৃষ্টি ভরিয়া একবারও তাহার দিকে সে তুলিয়া ধরে নাই। অথচ এই আকস্মিক সাক্ষাতের পূর্ব্বে প্রথম পরিচয়ের ক্ষণটিকে, কত রঙীন কল্পনার তন্তুজাল বুনিয়া সে রচনা করিয়াছে, চেতনা-নিবিড় কি পরম অনুভূতির মধ্যে এই ক্ষণটিকে বরণ করিয়া লইবে বলিয়া তাহার অন্তঃকরণকে সে প্রস্তুত করিয়াছে।···সে কত গল্প-উপন্যাস পড়িয়াছে, নাটকের অভিনয়, বায়স্কোপের ছবি দেখিয়াছে, প্রেমিক-প্রেমিকা প্রথম সাক্ষাতে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে, এরূপ কখনও দেখে নাই। কি অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া সে!

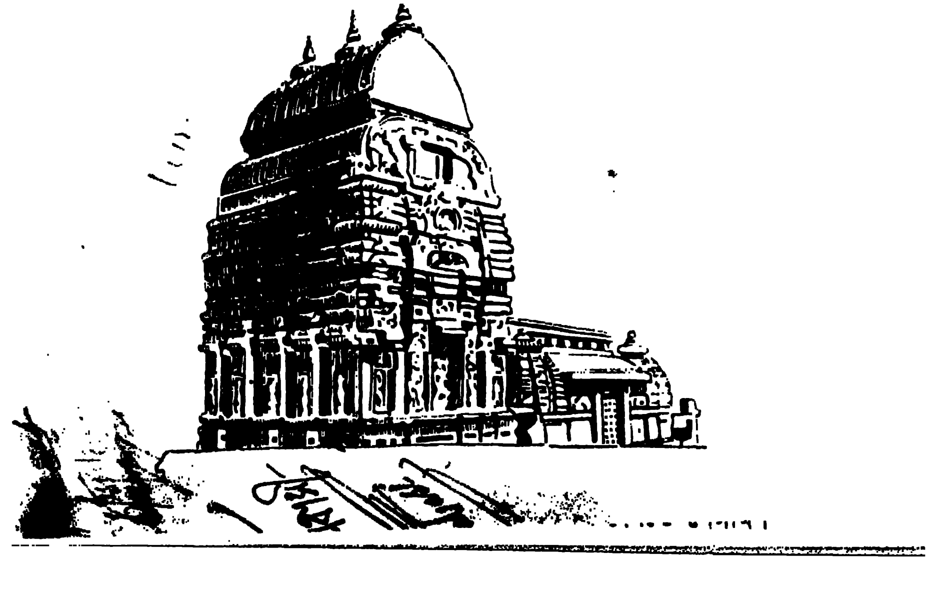
সন্ধ্যায় যে কয়টি কথা আজ সে বলিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিকে নিজের মনে সাবধানে বারম্বার সে আবৃত্তি করিতে লাগিল, প্রতিবারেই প্রায় প্রত্যেকটি কথাকে তাহার বেশী করিয়া অর্থহীন এবং উপহাসযোগ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ক্রমে সব-কিছু লইয়া সে বেদনা পাইতে লাগিল, নিজের উপর দুর্দ্দমনীয় ক্রোধে তাহার দাঁতে দাঁত বসিয়া যাইতে লাগিল, নিজের অক্ষমতা অযোগ্যতা লইয়া নিজেকে নিদারুণ পরিহাসে সে জর্জ্জরিত করিতে লাগিল।

অকস্মাৎ রাত্রির স্তব্ধ অন্ধকার ভরিয়া প্রশ্ন হইল, তোমার মধ্যে এই যে নিরুপায়, এই যে অকিঞ্চিৎকর, এই যে উপহাস্য, এই কি তুমি? তবে তুমি কে, তুমি কি?

অজয়ের গা ছমছম করিয়া উঠিল। পড়িতে পড়িতে সিঁড়ি ভাঙিয়া সে নীচে আসিল। রাত্রি অনেক হইয়াছে, বন্ধুদের কেহই জাগিয়া নাই। নন্দ ছেলেটি এবাড়ীতে আসিয়াছে অবধি অজয় সব জড়াইয়া তাহার সঙ্গে তিনটির বেশী কথা বলে নাই, পার্টিশান-দেওয়া বারান্দার একধারে দুইটা টেবিল জুড়িয়া সেও অকাতরে ঘুমাইতেছে। একটু ইতস্ততঃ করিয়া অজয় তাহাকে ঠেলা দিয়া জাগাইল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়াই নন্দ লাফাইয়া তাহার শয্যা হইতে নামিয়া পড়িল, এমন মুখ করিয়া অজয়ের দিকে চাহিল যেন না জানিয়া কি-একটা ভয়ানক গুরুতর অপরাধ সে করিয়াছে। অজয় কহিল, "বেশ ঠাণ্ডা প'ড়ে গিয়েছে, খোলা বারান্দায় রাত কাটানো তোমার একটুও উচিত নয়। টেবিল-দুটোকে আমার ঘরে দিব্যি ধরবে, সেইখানেই শোবে চল।"

নন্দের ভাব দেখিয়া মনে হইল, পারিলে সেই মুহূর্ত্তে মাটির সঙ্গে সে মিশিয়া যায়, কিন্তু অজয়ের কোনও কথা প্রতিবাদ করিতে পারে সে সাধ্য তাহার ছিল না। টানাটানি করিয়া টেবিল-দুইটাকে অজয়ের ঘরে লইয়া গিয়া সেইখানেই বাকী রাত্রিটুকু আড়ষ্ট হইয়া সে জাগিয়া কাটাইল।

(ক্রমশঃ)



লণ্ডনে ইণ্ডিয়া হাউসের দেওয়াল-চিত্র

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মা

লণ্ডনে ভারত-গৃহ বা ইণ্ডিয়া হাউসের সংবাদ অনেকেই খবরের কাগজে পড়েছেন। সেই ইণ্ডিয়া হাউসের দেওয়ালে ছবি আঁকবার জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে ভারত-গবর্মেণ্ট যে চারজন শিল্পীকে মনোনীত ক'রে লণ্ডনে পাঠিয়েছিলেন, সেই বিষয়েই কিছু লিখব।

স্যর অতুল চাটার্জ্জি ছিলেন হাই কমিশনার ফর ইণ্ডিয়া যখন বিখ্যাত স্থপতি সার হারবার্ট বেকারের পরিকল্পনায় লণ্ডনে ইণ্ডিয়া হাউস প্রস্তুত হচ্ছিল। শুধু ইণ্ডিয়া হাউস নাম দিয়ে বিলাতি কায়দায় যদি বাড়িখানা গড়ে ওঠে, তাহ'লে নামের ঠিক সার্থকতা হবে না। তাই কর্ত্তারা ঠিক করলেন যদিও চার পাশের অন্য সব বাড়ির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখবার জন্যে বাইরের চেহারায় একটু বিলাতি স্থাপত্য আনতে হবে, তবু ভেতরে সম্পূর্ণ ভারতীয় ধরণের গম্বুজ, মার্ব্বেল ও লাল পাথরের জালি, জাফ্‌রী কাজের দ্বারা অনেকটা ভারতীয় স্থাপত্যের নমুনা আনবার চেষ্টা করতে হবে। স্যর অতুল আরও ভাবলেন যদি গম্বুজ ও অন্যসব জায়গায় ভারতীয় শিল্পীদের দিয়ে প্রাচীরগাত্র মণ্ডন করান যায় তাহ'লে আরও সুন্দর দেখাবে। তাই স্যর অতুল ভারত-গবর্মেণ্টকে একটা 'স্কীম' পাঠালেন যাতে এই দেশ থেকে চার জন শিল্পীকে লণ্ডনে পাঠিয়ে কিছুদিনের জন্য রয়েল আর্ট কলেজে রেখে আধুনিক ও উন্নত প্রণালীতে দেওয়াল-চিত্র আঁকান শিক্ষা দিয়ে ঐ কাজে লাগান যেতে পারে। তখন ভারত-গবর্মেণ্ট চার জন শিল্পী বাছাই করবার জন্যে শিল্পী-মহলে খবর পাঠালেন। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশ থেকেই শিল্পীরা প্রতিযোগিতায় যোগদান করলেন। তাতে আমরা যে চার জন শিল্পী মনোনীত হলাম সকলেই বাঙালী।

আমাদের চার জনের মধ্যে রণদা উকিল হচ্ছেন শিল্পী সারদা উকিলের ছোট ভাই। তাঁরা দিল্লীতে থাকেন। ললিত সেন লক্ষ্ণৌ আর্ট স্কুলের একজন শিক্ষক। তিনি ইতিপূর্ব্বে একবার বিলাত গিয়ে রয়েল আর্ট কলেজে শিক্ষা লাভ ক'রে এ. আর. সি. এ. হয়ে আসেন। সুধাংশু চৌধুরী কলিকাতায় ইণ্ডিয়া সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্ট স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন এবং আমি শান্তিনিকেতনে পূজনীয় নন্দলাল বসু মহাশয়ের নিকট শিক্ষা লাভ করেছিলাম।

ভারত-গবর্মেণ্টের আদেশমত দেশ ছেড়ে আমরা বিলেত পৌঁছাই ১৯২৯ সনের ২৩এ সেপ্টেম্বর তারিখে। তারপর আমরা চার জনে মিলে একদিন রয়েল আর্ট কলেজের প্রিন্সিপাল স্যর উইলিয়ম রথেন-ষ্টাইনের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ঐ কলেজে গেলাম। আমরা ঘরে ঢুকতেই তিনি বেশ ভদ্রতা ও উৎসাহের সঙ্গে আমাদের ডেকে বসালেন এবং আলাপ সুরু করলেন। তিনি আমাদের খুব উৎসাহ দিলেন যাতে আমরা এই ইণ্ডিয়া হাউসে যা-আঁকবো তা যেন ভাবের দিক দিয়ে, অঙ্কন-পদ্ধতিতে, সব দিক থেকেই সম্পূর্ণ ভারতীয় বিশেষত্বকে ফুটিয়ে তুলতে পারি। তিনি আরও বললেন, তাঁর কাছে এর পূর্ব্বে ভারত থেকে ছেলেরা গেছে ছাত্র হিসেবে ঐ দেশীয় শিল্প শিখবে ব'লে আর আমরা গেছি ভারতের শিল্পকে প্রচার করবার জন্যে। সেদিনকার আলাপের শেষে তিনি বললেন যে, এই কলেজে আমাদের শুধু কিছু কালের জন্য আধুনিক দেওয়াল-চিত্র পদ্ধতি আয়ত্ত করতে হবে, আর কিছুই নয়।

রয়েল আর্ট কলেজে গিয়ে প্রথম প্রথম কতকগুলো জিনিষ বড় চোখে নূতন লেগেছিল। শান্তিনিকেতনে বরাবর শিল্প-সাধনা করেছি প্রকৃতির সঙ্গে তাল রেখে, তাকে গভীর ভাবে উপলব্ধি ক'রে। নিজেদের আঁকবার জায়গা ঠিক পূজাগৃহের মতই



বড় ডোমে আঁকা
সম্রাট অশোক তাঁর কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে সিংহল দ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারে প্রেরণ করিতেছেন
শিল্পী—শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বর্ম্মণ

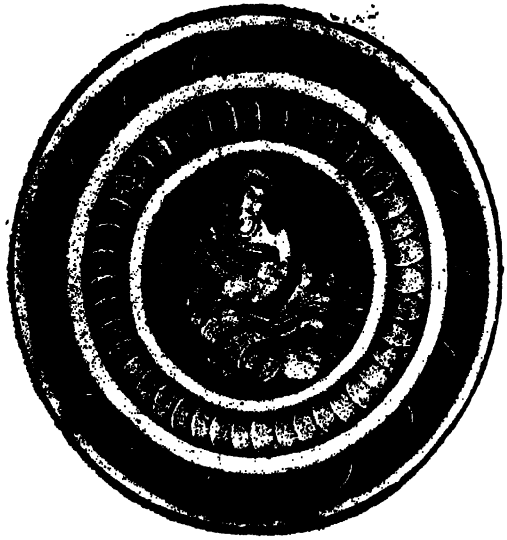
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখাটাই শিক্ষা পেয়েছি, কিন্তু ঐ শিল্পসাধনাই যে আবার একটা বিরাট জমকাল কলেজ-রূপ বাড়িতে ৫০০।৬০০ ছাত্রছাত্রী নিয়ে একসঙ্গে ভীষণ উৎসাহে সাধনার ক্ষেত্র হ'তে পারে তা কখনও ভাবিনি। আমরা যে-ক্লাসঘরে বসে কাজ করবার জন্য গেলাম সেটা যেন একটা কারখানা ঘরেরই অংশ। দেওয়ালে শিল্পী-ছাত্রদের রং ছিটান, এখানে সেখানে রঙের তুলির আঁচড় লেগে যেন কাজ-করা খেয়ালীর ছবির মত হয়ে আছে। মাঝে মাঝে ফ্রেমে পেরেক ঠোকবার খটাখট আওয়াজ, সিরিস আঠা পাক করবার বিশ্রী গন্ধ, হরেক রকম রঙের আস্তর লাগান চেয়ার টেবিল এলোমেলো ছড়ান। কিন্তু এরই মধ্যে ছাত্রেরা নিবিড় ভাবে কলা-সাধনায় ব্যস্ত রয়েছে। রথেনষ্টাইন আধুনিক পদ্ধতিতে দেওয়াল-চিত্র আঁকবার একজন বিশেষজ্ঞকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং তিনিই বরাবর আমাদের সঙ্গে কলেজে ও ইণ্ডিয়া হাউসে ছবি আঁকবার সময় পদ্ধতি (technique) সম্বন্ধে অনেক সহায়তা করেছেন।



অঙ্কনকার্য্যে মাচার উপর শিল্পী শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বর্ম্মণ

... শিখতে গেলাম।

কলেজে আমাদের কাজ ছিল খুব বড় বড় ক'রে ডিজাইন করা। আর ইণ্ডিয়া হাউস থেকে ঐখানে যে-সব দেওয়ালে বিশেষ ভাবে ফ্রেস্কো আঁকবার মশলার আস্তর লাগান হয়েছিল তেমনি মশলায় তৈরি কতকগুলো ছোট



বড় ডোমের নীচে ত্রিকোণ জায়গায় শিল্পী শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বর্ম্মণ কর্ত্তৃক অঙ্কিত 'মানব জীবনের অষ্ট ধাপ' সূচক আটখানি চিত্রের প্রথম—মা ও ছেলে

ছোট পাটা (concrete slab) কলেজে পাঠিয়েছিল, তারই উপর রং লাগিয়ে পরীক্ষা করা।

এমনি ভাবে কলেজে আমরা প্রায় ন-দশ মাস ছিলাম। ইতিমধ্যে সম্রাজ্ঞী একদিন কলেজ পরিদর্শন করতে এসে আমাদের কাজে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন এবং বলেন, তিনি উৎসুক হয়ে আছেন আমাদের কাজ ইণ্ডিয়া হাউসের দেওয়াল-চিত্রে দেখবার জন্যে। ললিত-বাবুর একখানা ছবিও কিনেছিলেন। বাকিংহাম রাজপ্রাসাদের উদ্যানে প্রতি গ্রীষ্মে যে বিরাট গার্ডেন-পার্টি হয় তাতে সম্রাজ্ঞী প্রতিবারেই আমাদের আমন্ত্রণ-পত্র পাঠাবার আদেশ দিয়েছিলেন। পার্টিতে আমরা ধুতি-চাদরেই উপস্থিত হয়েছিলাম। ভারতীয় কোন এক উচ্চ কর্ম্মচারী আমাদের দেখে বলেছিলেন—"মশায়, আপনাদের ত কম সাহস নয়। এই রাজ-প্রাসাদে দেশী ধুতি-চাদরে এসেছেন!" অথচ তারপর দিন সকল খবরের কাগজে বের হ'ল যে, ভারতীয় চার জন যুবক শিল্পীদের পোষাক, বিশেষ ক'রে তাদের আলুলিত শাল, গার্ডেন-পার্টির শোভা বর্দ্ধন ক'রেছিল।

তারপর ইউরোপ-ভ্রমণে বের হলাম। ভ্রমণের



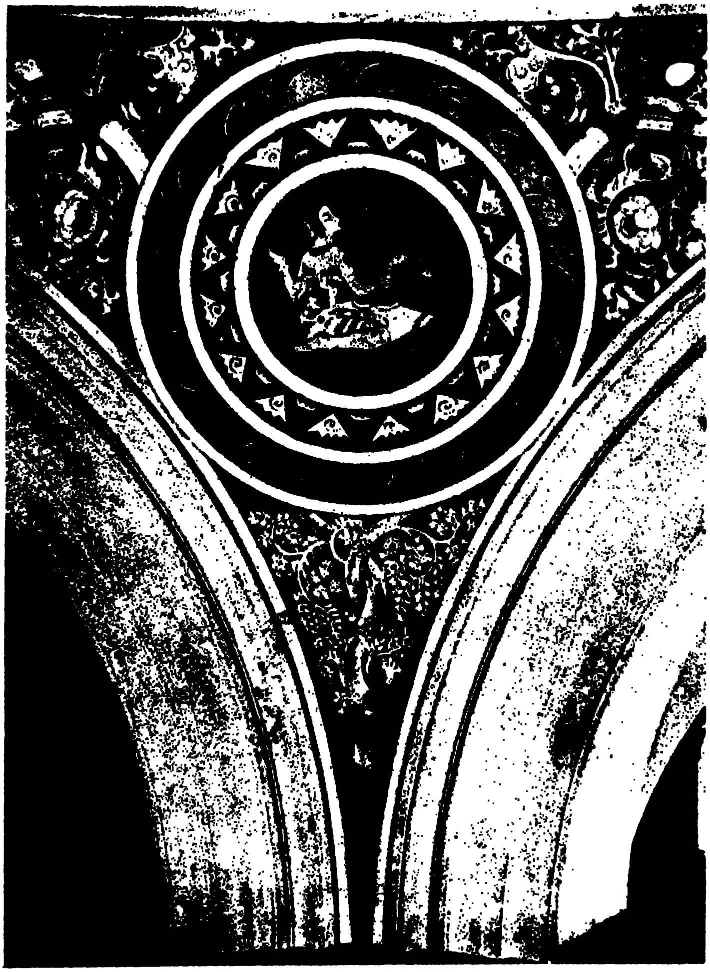
২। ছোট ছেলের মাটির পুতুল লইয়া খেলা

উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য আর্টের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হওয়া ও বিশেষ ক'রে কিছু দিনের জন্যে ইটালীতে থেকে ওখানকার পুরানো দেওয়াল-চিত্র, কাঠের পাটায়



৩। পাঠ্যাবস্থা

উপর 'এগ্‌টেম্পারা' ইত্যাদি বিশেষ ভাবে অনুশীলন করা। প্রায় সমস্ত ইউরোপ পরিভ্রমণ ক'রে এবং বিখ্যাত বিখ্যাত মিউজিয়ম দেখে ও আর্টিষ্টদের সঙ্গে আলাপ ক'রে অনেক নূতন জিনিষ জানতে ও শিখতে পেরেছি। বিশেষ ক'রে যখন ইটালীর ফ্লোরেন্স নগরে ছিলাম তখন অনেক পুরানো শিল্পীর সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। ফ্লোরেন্সের একটা রাতের কথা এখনও বেশ মনে আছে। সে রাতটা বেজায় গরম; কিছুতেই হোটেলে ফিরতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। তাই এক কফিখানায় বসে কফির সদ্ব্যবহার করা যাচ্ছিল। আমরা চার জন ছাড়া সঙ্গে ছিল মিঃ ডিক্সিল, যিনি রয়েল আর্ট কলেজে আমাদের দেওয়াল-চিত্র সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন। আর ছিলেন সুকুমার দেউস্কর, শিল্পী শশী হেসের ভাগ্নে। ইনি শান্তিনিকেতনের কলাভবনে পূজনীয় নন্দবাবুর কাছে চিত্রবিদ্যা শিখছিলেন। এখন ফ্লোরেন্সে ইটালীয় শিল্পীর কাছে ঐ দেশীয় আর্ট শিক্ষালাভ করছেন। কফিখানা ছিল একেবারে উন্মুক্ত আকাশের নীচে। তাই চাঁদের আলোও বেশ উপভোগ করছিলাম। কফি খেতে খেতে হঠাৎ সুকুমার দেউস্কর আমাদের পাশের টেবিলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেখুন, ওঁরা বোধ হয় আমাদের ছবি আঁকছেন।" আমরাও পাশের টেবিলের দিকে তাকাতেই দেখি চার-পাঁচটি ভদ্রলোক বসে সামনে কফির পেয়ালা আর কাগজ ধরে কি যেন আঁকছেন। দেউস্কর বললেন যে, এঁরা এখানকার বড় বড় আর্টিষ্ট। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ব্যঙ্গ-চিত্র আঁকিয়ে। তিনি আমাদের চার জনের ব্যঙ্গ-চিত্র এঁকে বেশ একটু ভদ্রতা অথচ হাসির সঙ্গে ধীরে ধীরে সেখানা আমাদের সামনে এনে দিলেন। দেউস্করের সঙ্গে ওঁদের সকলেরই পরিচয় ছিল, তাঁরা আমাদের পরিচয় জানতে চাইলেন। দেউস্কর ইটালীয় ভাষায় পরিচয় দিলেন। শুনে সকলেই বেশ আগ্রহের সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে আমাদের টেবিলে এসে বসলেন।



৪। যৌবনে প্রেম

কফিখানায় শিল্পীতে শিল্পীতে আলাপ-পরিচয়ের প্রথা সেই বিখ্যাত শিল্পী বত্তিচেলি লেওনার্দো দা ভিঞ্চির যুগ থেকে এখনও তেমনি ভাবে চলে আসছে। ফ্লোরেন্স শব্দের অর্থ হ'ল 'দি ফ্লাওয়ার অফ ইটালী,' ইটালীর ফুল। এমন একদিন ছিল যখন সমস্ত জগৎ মুগ্ধ

হয়েছিল এই ইটালীয় শিল্পের সৌন্দর্য্যে আর সাহিত্য রসে। তখন এই ফ্লোরেন্স নগরই সেই শিল্পী ও সাহিত্যিক মহলের কেন্দ্র ছিল। কত দূর-দূরান্ত দেশ থেকে রসিক, গুণীরা আসত ভ্রমরের মধু আহরণের মত



৫। দাম্পত্য জীবন

এই নগরে শুধু পিপাসা মিটাবে ব'লে। তাই আজও চলা-ফেরায় তারই স্মৃতি-বোধ উপলব্ধি করছি। নগরের প্রাচীর থেকে আরম্ভ ক'রে আকাশভেদী ধর্ম্মমন্দিরে, সাধারণের সভাগৃহে, কাঠের পাটায়, ক্যানভাসে শিল্পীদের সৌন্দর্য্য-বোধ বসন্তে কার্পণ্যহীন অপর্য্যাপ্ত মঞ্জরীর মতই ফুটে উঠেছিল। বতিচেলি, রাফায়েল ও অন্য রূপকারেরা একদিন যে-সুন্দরীদের সৌন্দর্য্য দেখে রং-রেখায় তা ছবিতে ফুটাবার চেষ্টা করেছিল, আবার তাদেরই প্রেরণায় দান্তেকে প্রেমের কবি করে তুলেছিল—সেই সুন্দরীরা এখনও যেন ছবির ক্যানভাস ছেড়ে ফ্লোরেন্সের রাস্তাঘাটে চলে বেড়াচ্ছে। তাই ত বতিচেলির ভেনাসের, রাফায়েলের মাতৃমূর্ত্তির আর কবি দান্তের আরাধ্য সুন্দরীর সলজ্জভাব আজও চলার পথে মেয়েদের মুখে দেখতে পেয়ে চমকে উঠতে হয়। এমনই চাঁদিনী রাতে এই ফ্লোরেন্স নগরেই বিদেশী শিল্পীরা কফিখানায় ব'সে তাদের ইটালীয় স্বপন্থীদের সঙ্গে ঠিক আমাদের মতই হয়ত আলাপের সুযোগ পেত।

ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে আমরা ইণ্ডিয়া হাউসের কাজে রীতিমত লেগে গেলাম। আমাদের কাজের সুবিধার জন্য ইণ্ডিয়া হাউসে সব চাইতে উঁচু একটা কাচের ছাদওয়ালা ঘর ষ্টুডিওতে পরিণত করা হ'ল। দেওয়ালের গায়ে একটু কাৎ ক'রে বড় বড় কাঠের পাতলা তক্তা লাগিয়ে ড্রইং বোর্ড করা হ'ল। যে-সব দেওয়ালে ছবি আঁকা হবে তার ঠিক মাপে বড় বড় পাতলা কাগজ কেটে যে-সব বিষয় আঁকব তার ডিজাইন সুরু করলাম। ইণ্ডিয়া হাউসে ট্রেড কমিশনারের বিভাগ আছে। সেই বিভাগ থেকে যে-ঘরে ভারতের সকল প্রদেশের নানা রকম শিল্পবস্তু প্রদর্শিত হয় তার নাম প্রদর্শনী-গৃহ। ঐ ঘরের চার দিককার দেওয়ালে চারখানা অর্দ্ধ গোলাকৃতি আকারের ছবি আঁকবার ভার নিলেন রণদা উকিল ও সুধাংশু চৌধুরী প্রত্যেকে দু-খানা ক'রে। রণদা উকিলের আঁকবার বিষয় ছিল টোরী রাগিণী ও ঈদের চাঁদ। সুধাংশু চৌধুরীর



৬। কর্ম্মজীবন

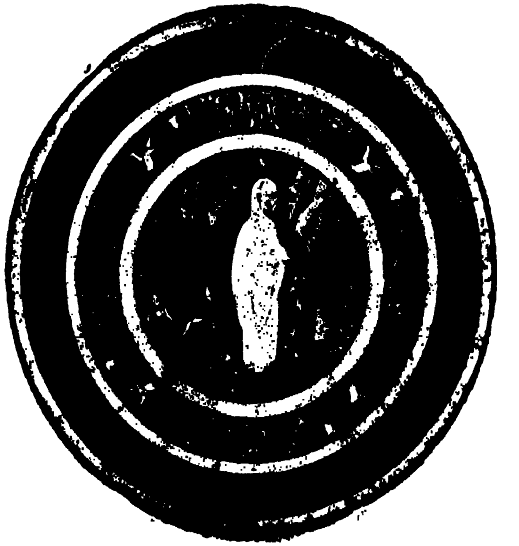
আঁকবার বিষয় ছিল আনারকলী ও ষষ্ঠীপূজা। লাইব্রেরী রুমের ও একটা দেওয়ালে অর্দ্ধ গোলাকৃতি বড় ছবি আঁকবার ভার নিলেন ললিত সেন এবং বিষয় নির্ব্বাচন করলেন—বুদ্ধ তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দ ও অন্যদের সঙ্গে তাঁর পরে কে এই ধর্ম্মের ভার গ্রহণ করবেন তাই জিজ্ঞাসা করছেন। আমাকে আঁকতে হয়েছে বড় গম্বুজ বা

ডোমের নীচেকার আটটি ত্রিকোণওয়ালা জায়গায়। বিষয় ছিল "মানব-জীবনের অষ্ট ধাপ"।

মূল বড় ডোমের সজ্জা আমাদের চার জনকেই একসঙ্গে করতে হয়েছিল; যদিও প্রত্যেকেরই আঁকবার বিষয় ছিল স্বতন্ত্র। রণদা উকিল এঁকেছেন পরাজিত পুরুরাজের সহিত বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের আলাপন। সুধাংশু চৌধুরীর আঁকবার বিষয় ছিল সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মহিলা সৈনিকদের কাছ থেকে অভিবাদন গ্রহণ। আমাকে আঁকতে হয়েছে সম্রাট অশোকের কন্যা সঙ্ঘমিত্রা'কে সিংহলদ্বীপে বৌদ্ধধর্মপ্রচারে প্রেরণ; সঙ্গে বোধিবৃক্ষ ও অন্যান্য বৌদ্ধশাস্ত্রপুস্তকাদি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। ললিত সেন এঁকেছেন সম্রাট আকবর দরবারে বসে আছেন ও স্থপতি ফতেপুরসিক্রির পরিকল্পনা বাদশাহকে দেখাচ্ছে। আমরা ষ্টুডিওতে পাতলা বড় বড় কাগজ ড্রইং বোর্ডে আটকে ডিজাইন বা পরিকল্পনা সুরু করলাম। এক একটা ছবির মাপ ছিল ৩০ স্কোয়ার ফুট থেকে আরম্ভ ক'রে ১৩০।১৬০ স্কোয়ার ফুট। ছবির ফিগারগুলো সত্যিকারের সাধারণ লোকের চেয়েও বড়। পাতলা কাগজে প্রথম ডিজাইন করতে আমাদের সকলেরই প্রায় ন-দশ মাস লেগেছিল।

ষ্টুডিওতে মাঝে মাঝে আমরা শিল্পীদের চায়ের নিমন্ত্রণ করতাম, এতে পরিচয় হবার সুযোগ হ'ত। রয়েল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা প্রায়ই এসে আমাদের কাজ দেখত। পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ যখন ১৯৩১ সালে লণ্ডনে ছিলেন তখন তাঁকে ও তাঁর পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবীকে আমাদের ষ্টুডিওতে চায়ের নিমন্ত্রণ ক'রে আমাদের ডিজাইন দেখাই। আমাদের কাজগুলো দেখে তাঁদের খুবই ভাল লেগেছিল।

গবর্ন্মেণ্টের সঙ্গে আমাদের ব্যবস্থা ছিল যত রং, তুলি, কাগজ, কাঠের মাচা ও আনুষঙ্গিক ব্যয় সবই গবর্ন্মেণ্ট দেবেন। আর আমরা দেওয়ালে আঁকবার জন্যে এক পাউণ্ড বা ১৩৷৷০ টাকা হিসাবে পাব। অবশ্য কাজের হিসেবে প্রতি স্কোয়ার ফুটে আরও বেশী টাকা দেওয়া উচিত ছিল। লোহার নল জুড়ে জুড়ে ফ্রেম ক'রে তার উপর কাঠের লম্বা লম্বা তক্তা পরস্পর বসিয়ে মাচা বাঁধা হ'ল। আঁকবার দেওয়ালে তেলের একটা আস্তর লাগান হয়েছিল কারণ প্রথমে তৈলচিত্র-পদ্ধতিতে আঁকবার কথা ছিল। কলেজে যে-সব পাটা পাঠিয়েছিল তার মধ্যে কতকগুলোতে তেলের আস্তর লাগান ছিল। আমরা



৭। দানপ্রস্থ

তৈলচিত্র-পদ্ধতিতে এবং এগ্‌টেম্পারাতে এঁকে পরীক্ষা ক'রে দেখতে পেলাম এগটেম্পারাতেই ভাল কাজ হবে, বিশেষ ক'রে আমরা যে-ধরণে ও যে-ভাবের ছবি এঁকে থাকি। ভারতীয় অঙ্কন-পদ্ধতির রেখাই হ'ল একটা বিশেষত্ব। তৈলচিত্র-পদ্ধতিতে সেই রেখার গতি রাখা বড় কঠিন। আঁকবার সব দেওয়াল থেকে সেইজন্য শিরিস কাগজ দিয়ে ঘসে তেল উঠাতে হয়েছিল। ৯ই এপ্রিল ১৯৩১ সালে দেওয়ালে ছবি আঁকতে আরম্ভ করি। প্রথমে পাতলা কাগজে ডিজাইনের উল্টো দিকে ভাল ক'রে গুঁড়ো লাল রং লাগিয়ে সেটাকে আঁকবার দেওয়ালে ছবির দিকটা উপরে রেখে বেশ টান ক'রে ধরে আঠা দিয়ে লাগাতে হয়েছিল। তারপর শক্ত পেন্সিল দিয়ে ছবির লাইনের উপর চাপ দিয়ে দেগে দেওয়ালের গায়ে দাগ ফেলেছিলাম। সব ছবিটা দাগা হয়ে গেলে ধীরে ধীরে ধারের আঠা খুলে পাতলা কাগজখানা সরিয়ে ফেলতেই দেওয়ালের উপর লাল রঙের লাইনে সব ছবিটাকে বেশ দেখতে পেলাম।

ডিম দিয়ে ছবি আঁকতে হ'লে সব রঙই গুঁড়ো হওয়া চাই। ডিমের হল্‌দে অংশটুকু নিয়ে তাতে আধাআধি জল দিয়ে বেশ ক'রে মিশিয়ে গুঁড়ো রঙের সঙ্গে মেড়ে ছবি আঁকতে হয়। দেওয়াল-চিত্র আঁকবার সময়ে সর্ব্বদা



৮। নির্ব্বাণ

যতখানি রং গোলা দরকার তার চেয়ে একটু বেশী পরিমাণে গোলা উচিত। তা না হ'লে একটু রং কম হ'লে পরে ঠিক ঐ রং তৈরি করলেও সহজে এক ভাবে মিশ পেতে চায় না, হয়ত একটু গাঢ় বা পাতলা হয়ে যায়। প্রথম ছবিটাতেই আমাদের প্রত্যেককে নানা দিক দিয়ে একটু বেগ পেতে হয়েছিল। ডোমের মধ্যে চার জনে এক সঙ্গেই কাজ সুরু করি। কাজের সময় সর্ব্বদা ৩০০ মোমবাতি জোরের চারটি বৈদ্যুতিক আলোকে কাজ করতে হ'ত। বাইরে কখন রোদ ওঠে, বৃষ্টি হয় তার কিছুই জানতে পারতাম না। ডোমের দেওয়াল লম্বায় ও খাড়ায় বাঁকা ব'লে আঁকবার ভয়ানক অসুবিধা হ'ত। দেওয়ালের উপরকার দিকটা একেবারে মাথার উপর উবু হয়ে থাকায় উপরে তাকিয়ে তাকিয়ে ঘাড়ে ভীষণ ব্যথা হ'ত। ছবির ব্যাকগ্রাউণ্ড ২৪ ক্যারাট সোনার পাত্‌লা পাতায় করা হয়েছিল ব'লে ছবিগুলো বেশ জমকাল দেখতে হয়েছিল। শুধু ডোমের ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডে প্রায় হাজার টাকার সোনার পাত লেগেছিল। আমাদের এই বৃহদায়তন কাজ দেখে ঐ দেশীয় অনেক শিল্পী জিজ্ঞাসা করতেন এর পূর্ব্বে আমরা কখনও এতবড় ছবি আঁকবার চেষ্টা করেছি কি-না। ভারতীয় শিল্পীরা ত চিরদিনই ছোট ছোট বইয়ের পাতায় বা ঐ সব ধরণের ছবি এঁকেছে। উত্তরে আমাদের বলতে হ'ত, অজন্তা বা বাঘগুহার প্রাচীরগাত্র প্রসাধনে ভারতীয় চিত্রকলায় বড় ছবি আঁকবার প্রমাণ দিচ্ছে। আমরা বড় ছবি আঁকবার সুযোগ পেলেই আঁকতে পারি এটা সুস্পষ্ট হয়েছে। বিলাতের কতকগুলি দল যারা ভারতের শিল্পকে বিশেষ ভাবে আলোচনা করে তারা ভিন্ন সাধারণের মধ্যে ইণ্ডিয়ান আর্ট বল্‌লেই ভাবে সেই পুরানো মোগল বা কাংড়া স্কুল; কিন্তু আধুনিক নিউ বেঙ্গল স্কুল বা পূজনীয় অবনীন্দ্রনাথের স্কুলের কথা কেউ জানেই না। বোম্বে স্কুলের নাম বরং কেউ কেউ জানে কারণ একটু বিলাতী ঘেঁষা ও কিছু প্রপাগাণ্ডার জন্যে।

আমার মনে হয় আজকাল আমাদের দেশে যাঁরা শিল্প-সমালোচক তাঁরা শুধু প্রাচীন শিল্প নিয়েই বেশী আলোচনা করলেন, আর বই লিখলেন, কিন্তু আধুনিক শিল্পেরও যে তেমনি একটা আলোচনা হওয়া দরকার তা কেউ ভাবলেন না। এই শিল্পবস্তুই আবার ৩০০।৪০০ বছর পরে যখন ধ্বংসাবশেষ অবস্থায় পাওয়া যাবে তখন তার ইতিহাস খোঁজবার জন্যে এলোমেলো হাতড়াতে হবে। এই ধরণের উদাহরণ আমাদের দেশে বিরল নয়। অজন্তা বা বাঘগুহার চিত্রের পর থেকে রাজপুত, কাংড়া স্কুল পর্য্যন্ত মধ্যে কি ভাবে ভারতীয় আর্টের ধারা চলে এসেছে তার সঠিক খবর আজও আমরা ভাল ক'রে জানিনে। যদি সাময়িক শিল্পের ইতিহাস লিখবার একটা প্রথা থাকত, তাহ'লে আজ আমরা আমাদের দেশের অনেক লুপ্ত শিল্পের খবর ও অঙ্কন-পদ্ধতি জানতে পারতাম। আমাদের যাওয়ার পর এবং শিল্পী সারদা উকিলের ছবির প্রদর্শনী হওয়াতে এখন নিউ বেঙ্গল স্কুলের খবর কেউ কেউ জানতে পেরেছে। তবে পূজনীয় অবনীন্দ্রনাথের, নন্দলাল বসুর এবং অসিত হালদার ও অন্য ভাল ভাল শিল্পীদের কাজও ঐখানে প্রদর্শনী ভাবে দেখান একান্ত

প্রয়োজন, তাহ'লে আধুনিক স্কুলের সর্বাদিককার কাজ সকলে দেখতে পেত।

দেওয়ালের কাজ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্যর অতুল বদলী হলেন এবং স্যর বি. এন. মিত্র হাই কমিশনার হলেন। পূর্ব্বে আমরা আভাস পেয়েছিলাম, অনেক কাজ করতে হবে এবং আঁকবার দেওয়ালও অনেক ছিল। ভারত-গবর্ন্মেণ্ট দিল্লী হ'তে স্যর বি. এনকে হঠাৎ একখানা তার করলে যে, এই দফায় আর বেশী কাজ করান হবে না, তাই চার জন আর্টিষ্টকে ডোম আঁকা শেষ হলেই দেশে পাঠাতে হবে। সেই জন্য ডোম আঁকা হলেই আমাদের কাজ শেষ ক'রে দেশে ফিরতে হ'ল। প্রত্যেকের নিজ নিজ অংশের ছবি শেষ করতে প্রায় দশ মাস লেগেছিল, অবশ্য কারো একটু আগে ও পরে। ছবি শেষ হ'লে অফিশিয়াল কায়দায় ছবির উন্মোচন হয়েছিল। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী বিশেষ ক'রে ঐ সব কাজ দেখবার জন্যে ইণ্ডিয়া হাউসে এসেছিলেন। কাজ সব দেখে খুব সুখ্যাতি করেছেন এবং এখানেই যাতে এই কাজ সমাপ্ত না হয় ও ক্রমে আরও সব দেওয়াল পরে আঁকা হয় তার জন্যে ব'লে গেছেন। স্যর উইলিয়াম রথেনষ্টাইনের চিঠিতে আমরা চার জনে তাঁদের এই অভিমত ও সুখ্যাতি জানতে পেরেছি।

আজকাল বিলাতে দেওয়াল-চিত্রকে জনসাধারণের সভাগৃহে বা অন্য সব ঐ ধরণের বাড়িতে প্রচলন করবার একটা আন্দোলন চলছে। কিছু দিন পূর্ব্বে স্যর উইলিয়াম রথেনষ্টাইন আলোকচিত্র সহযোগে রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউট অফ ব্রিটিস আর্কিটেক্টে এক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাতে তিনি দেখিয়েছেন, আজকাল যে-সব সভাগৃহ, সিনেমা হাউস, বিশ্ববিদ্যালয় ও ধর্ম্মমন্দির ইত্যাদির বড় বড় বাড়ি হচ্ছে, তাতে প্রথম থেকেই যেমন বসবার ঘর, লাইব্রেরী, বক্তৃতা-ঘর নির্ব্বাচন করা হয় ঠিক তেমনি কতকগুলো দেওয়ালেও দেওয়াল-চিত্র আঁকবার উপযোগী ক'রে দেওয়াল প্রস্তুত করা উচিত। স্থাপত্য-শিল্পের যেমন একটা প্রয়োজন আছে বাড়িটাকে সুন্দর ভাবে গড়ে তোলার তেমনই দেওয়াল-চিত্রেরও একটা প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশেও পুরাকালের মত আবার রাজপ্রাসাদ থেকে আরম্ভ করে সামান্য কুটীরেও ভারতীয় অভিরুচিতে শিল্পীর রং আর রেখার টানে যাতে সুন্দর হয়ে উঠতে পারে তারই চেষ্টা করতে হবে।

"বাই ইণ্ডিয়ান"

শ্রীচারুচন্দ্র রায়

সকল দেশেই অনুরূপ ধুয়া উঠিয়াছে—'বাই ব্রিটিশ,' 'বাই ফ্রেঞ্চ' ইত্যাদি। সুতরাং ভারতবর্ষে 'বাই ইণ্ডিয়ান' ধুয়া না উঠিবে কেন? ভারতবর্ষ চিরদিন—অন্ততঃ একালে—পরের মুখেই ঝাল খাইয়া আসিয়াছে।

আমাদের এ কথাগুলো হয়ত অনেকের ভাল লাগিবে না। ভারতবাসী ভারতীয় জিনিষ ছাড়া কিনিবে না, দেশের টাকা দেশে থাকিবে, এতে আবার কাহার কি আপত্তি হইতে পারে!

'ব্রিটিশ' বলিতে যাহা বুঝায়, 'ফ্রেঞ্চ' বলিতে যাহা বুঝায়, 'ইণ্ডিয়ান' বলিতে যদি তাহাই বুঝাই ত তাহা হইলে 'বাই ব্রিটিশ,' 'বাই ফ্রেঞ্চ,' 'বাই ইণ্ডিয়ান' একই কথা হইত—এবং ফলও অনুরূপ হইত।

প্রকৃতপক্ষে ইউরোপের কোন জাতি—ইংরেজ, ফরাসী, জর্ম্মান, ইতালীয় ইত্যাদি যদি 'বাই ইউরোপীয়ান' বলিত তাহা হইলে 'বাই ইণ্ডিয়ান' বলিতে তাহারই অনুরূপ অর্থ সূচিত হইত। ফরাসী মনীষী মঃ ব্রিয়াঁ কথিত ইউরোপীয় ফেডরেশ্যান যদি কার্য্যে পরিণত হইত, তাহা হইলে আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বী এক ফেডরেশ্যান গড়িয়া উঠিত এবং 'বাই ইউরোপীয়ান' বলিয়া ধুয়া তুলিলে অর্থনৈতিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে একটা প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি গড়িয়া উঠিবার সহায়তা হইত। সুতরাং তখন 'বাই ইউরোপীয়ান'-এর একটা প্রয়োজন হইত। বর্ত্তমান অবস্থায় কোন ইউরোপীয় জাতি 'বাই ইউরোপীয়ান' বলিবে না; পরন্তু ইউরোপ যে একসূত্রে বদ্ধ নহে, তাহারই প্রমাণ-

স্বরূপ সকলে যথাক্রমে 'বাই ব্রিটিশ', 'বাই ফ্রেঞ্চ' ইত্যাদি বলিতেছে।

আমরা বর্ত্তমান সময়ে ফেডারেটেড ইণ্ডিয়ার যে মীমাংসা সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে গ্রহণ করিয়াছি, বলা বাহুল্য সে ফেডরেশ্যন্ সুইট্জারল্যাণ্ডের বা আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ফেডারেশ্যনের অনুরূপ নহে। কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্টের পরিকল্পনা কল্পনারাজ্যের মধ্যে রাখিয়া দিয়া বিভিন্ন প্রদেশকে যে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার ব্যবস্থা হইতে চলিয়াছে, তাহাতে অর্থনীতি ও শাসন অর্থাৎ রাজনীতির দিক দিয়া,এক ইংরেজ রাজশক্তির চক্রবর্ত্তিত্ব ব্যতীত ভারতবর্ষকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যস্থিতিতে পরিণত করিবারই ব্যবস্থা হইয়াছে। এ বিচ্ছিন্ন ভাব, বিভিন্ন প্রদেশের ইতিহাস, ভাষা, চিন্তাধারা, আচার-ব্যবহার ও স্বার্থের সম্পূর্ণ অনুকূল। সুতরাং ফেডারেশ্যনের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কাহাকেও একটি কথা বলিতে শুনা যায় নাই। ভারত জাতির যে পরিকল্পনা বহুদিন যাবৎ মনীষিগণের চিন্তা ও কার্য্যের মধ্যে নিহিত ছিল, তাহা অতিসহজে অপসারিত হইয়া গিয়াছে। এবং এত সহজে অপসারিত হইয়া যাইবার অন্যতম কারণই এই যে, সমগ্র ভারতে এক জাতির প্রতিষ্ঠা ইতিহাস সমর্থন করে না; বিভিন্ন প্রদেশের লোকের ভাষা, চিন্তাধারা, আচার-ব্যবহার এবং তাহাদের ধারণার অনুযায়ী আপন আপন স্বার্থ ইত্যাদিও সেই ভারত জাতি প্রতিষ্ঠার অনুকূল নহে।

রাজনীতিক্ষেত্রে যদি এই অবস্থা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও অনুরূপ অবস্থা অবশ্যম্ভাবী—অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ যদি স্বায়ত্তশাসন পাইয়া আপন আপন ইষ্টানিষ্ট লইয়া গড়িয়া উঠে, সেখানে অর্থনৈতিক প্রশ্নেরও সেই ইষ্টানিষ্ট লইয়াই মীমাংসা হইবে—সেখানে প্রত্যেক প্রদেশ আপনার আমদানী-রপ্তানি আপনার অর্থাগমের দিক চাহিয়াই নিয়ন্ত্রিত করিবে। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রদেশই ধুয়া তুলিবে 'বাই ইণ্ডিয়ান' নহে—'বাই বেঙ্গলী' 'বাই বেহারী, 'বাই উড়িয়া' 'বাই মাদ্রাজী,' 'বাই পঞ্জাবী' ইত্যাদি।

যেটা অবশ্যম্ভাবী, যেটা শেষে নিশ্চয়রূপে ঘটিতে বাধ্য, তাহারই প্রতি লক্ষ্য করিয়া আজই আমাদের সর্ব্ব কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করা উচিত। যাহা হইবেই তাহাকে উপেক্ষা করিয়া আজ আমরা যাহা করিব,তাহাকে একদিন সংশোধন করিতে হইবে এবং সংশোধন করা অর্থে অনর্থক বলক্ষয়, অর্থনষ্ট এবং মনঃকষ্ট এক সঙ্গে।

আমার বক্তব্য 'বাই ইণ্ডিয়ান' একটা ভ্রান্ত ধুয়া, যে ধুয়ার মধ্যে সুচিন্তিত বস্তুজ্ঞান নাই। প্রকৃত অবস্থার সহিত পরিচয়ের প্রমাণ নাই, এবং ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির প্রতি সম্যক্ সজাগ দৃষ্টি নাই। এ ধুয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমি আজ শুধু বাংলার কথাই বলিব।

আমরা বাঙালী, চিরদিন ভারতবর্ষের "একঘরে" বা "ঠেকা।" অতীতকালে উত্তর-ভারতের লোক বাংলায় আসিলে প্রায়শ্চিত্ত করিত। মুসলমান যুগ হইতে সে ধারণার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হয়—যে দেশে গাছে গাছে খোদা একখণ্ড রুটী ও এক পিয়ালা শরবৎ রাখিয়া দিয়াছেন, সেই রুটী ও শরবতের লোভে আজ পর্য্যন্ত, রাজপুতানার মরুভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া তমসাচ্ছন্ন মাদ্রাজ পর্য্যন্ত, পঞ্চনদ হইতে আরম্ভ করিয়া মেক্রান পর্য্যন্ত, কুলী হইতে আরম্ভ করিয়া কোবিদ পর্য্যন্ত সকলেই সেই রুটী ও শরবতের দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি ও পিপাসা নিবারণ করিতে দলে দলে আসিয়া থাকে। কিন্তু বাঙালী এই আগন্তুক জাতি সকলের মনের ভিতর সেই "ঠেকো" হইয়াই আছে। বৈতরণীর পাড়ে দাঁড়াইয়া উড়িয়া বলে Orissa for the Uriyas, ব্রহ্মপুত্র নদের ধারে আসামী দাঁড়াইয়া বলে Assam for the Assamese; বরাকর নদীর তীরে দাঁড়াইয়া বেহারী বলে Behar for the Beharis ইত্যাদি

বাংলা "ঠেকো" হইয়া তাহার তেজ ও বুদ্ধির বলে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় করিয়াই চলিয়া আসিয়াছে, অথচ বুভুক্ষিতকে রুটী ও শরবতের ভাগ দিতে বিরত থাকে নাই;—অর্থাৎ আজ পর্য্যন্ত Bengal for the Bengalis এর ধুয়া তোলে নাই। স্বাতন্ত্র্য রাখিয়াছে ধর্ম্মে, সমাজস্থিতিতে, শাস্ত্রের অনুশাসনে—তাহার পরিচয় তন্ত্রে, তাহার পরিচয় দায়ভাগে, তাহার পরিচয় শঙ্করার্য্যের পাণ্ডিত্যের উপেক্ষায়। আরও কত দিকে, তাহার কথা এখানে

বন্দী চলে না। বাংলা আপনার জীবন-প্রবাহ সর্ব্বতোভাবে আপনারই খনিত খাতে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে।

বাংলার এই স্বাতন্ত্র্য আজ বজায় রাখিয়া চলাই বাংলার জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করিবার একমাত্র উপায়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সেই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা বাংলার একমাত্র জীবনোপায়।

অতএব মালবীয়জীর "বাই ইণ্ডিয়ান" ধুয়া আমাদের গ্রাহ্য নহে। মালবীয়জী যখন বাঙালীকে স্বদেশী ব্রত গ্রহণ করাইবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন তখন আমার মনে হইয়াছিল, He was carrying coal to Newcastle, আরও মনে হইয়াছিল, সে-দিনের কথা যেদিন কলিকাতা কংগ্রেসের মঞ্চে দাঁড়াইয়া একমাত্র বাঙালী একজন—স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল—উদাত্তস্বরে ঘোষণা করেন—Swadeshi movement is a movement. It will move from district to district, from province to province (আমি আমার স্মৃতি হইতে কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করিলাম, কিন্তু বক্তার বক্তব্য সম্বন্ধে কোন তফাৎ হয় নাই) তখন গোখলে প্রমুখ সকল অবাঙালী নেতা বাঙালী বক্তা বিপিনচন্দ্রকে থাবাড়ি দিয়া বলেন, যে, বাংলার movement বাংলায় নিবদ্ধ থাকুক—অন্যান্য প্রদেশ বাংলার প্রদর্শিত পথ এ-বিষয়ে অনুসরণ করিতে বাধ্য থাকিবে না। বাস্তবিক বাংলা সেদিন যে-পথে চিন্তা করিয়াছিল আজ সমগ্র ভারত সেই পথে চিন্তা করিতেছে, এবং সেই চিন্তার প্রতিধ্বনি মাত্র লইয়া মালবীয়জী কলিকাতায় বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু মালবীয়জীর 'বাই ইণ্ডিয়ান' ধুয়ার মধ্যে আমি আরও নিগূঢ় অভিসন্ধির ইঙ্গিত পাইতেছি—তাহাতে 'অটোনোমাস' বাংলার ক্ষতি ভিন্ন বৃদ্ধি নাই। বাংলা কিনিবে মাড়ওয়াড়ীর হাত দিয়া আমেদাবাদের কাপড়, বাংলা কিনিবে ভাটিয়ার হাত দিয়া ঝরিয়া ও বরাকরের কয়লা, বাংলা কিনিবে মাদ্রাজীর, পাঞ্জাবীর, পার্শীর বেহারীর মস্তিষ্ক। মাল ও মাথা যেন গ্রহণ করিয়া অবাংলার মাল ও মাথা আমদানী করিতে হইবে।

আমার প্রস্তাব 'বাই বেঙ্গলী'—বাংলার কাঁচা মাল ও পাকা বুদ্ধি বাংলার সকল কাজে সকল উদ্যমে নিয়োজিত হউক, এই আমার বক্তব্য।

বাঙালীকে যে খদ্দর পরিতেই হইবে তাহার কোন অর্থ নাই; বাংলায় যে-বস্ত্র প্রস্তুত হয়—বাংলার সুতার কাপড়, তাঁতের বা কলের, বাংলায় যে-রেশমের বা পশমের দ্রব্য প্রস্তুত হয়, শীতে গ্রীষ্মে বাঙালী তাহাই পরিবে। বাংলার বাহিরের এক খণ্ড সুতাও ব্যবহার করিবে না। বাংলার নরনারী যে-পরিমাণ পরিধেয় ব্যবহার করে ভারতবর্ষের কোন দেশের লোক সে পরিমাণ কাপড় ব্যবহার করে না। নেংটী-পরা বাঙালী কে কোথায় দেখিয়াছে, ল্যাঙোটী-ধারী বেহারী, উড়িয়া, মাদ্রাজী, উত্তর-পশ্চিমবাসী শতকরা ৩০ জনের বেশী। সুতরাং বাঙালী বাঙালীর তৈরি জিনিষ বাঙালী ব্যবসায়ীর দোকান থেকে কিনিয়া পরিধান করিবে, এই হইবে লক্ষ্য। যে-জিনিষ বিদেশে নহিলে জন্মায় না, তাহা যদি কিনিতে হয় তবে বাঙালীর হাত দিয়া ভিন্ন কিনিবে না।

যেখানে মস্তিষ্কের প্রয়োজন, 'অটোনোমাস' বাঙালী সেখানে বাঙালীকেই নিযুক্ত করিবে। রুটী ও শরবতের লোভে সমাগত অভ্যাগতদের নির্ম্মম হইয়া বিদায় দিবে, তা সে রেলে হউক, ইঞ্জিনিয়ারিঙে হউক, ডাক্তারীতে হউক, খাতা রাখা বা খাতা লেখায় হউক, শিক্ষকতায় হউক বা শিক্ষা-বিতরণে হউক। মাল ও মাথা কিনিবার বেলায় সকল সময়ে 'বাই বেঙ্গলী'।

যদি কেহ বলে বাংলাকে যদি অমনি করিয়া সব দিক দিয়া ঠেকো করে অন্য প্রদেশের লোক, তাহা হইলে বাংলা কি বাঁচিবে? বাংলার মাথা সব দেশেই ঠেকো হইয়া আছে। বাংলার যে-মাল অন্য দেশ কেনে সেটা বাংলাকে অনুগ্রহ করবার জন্য নয়—নাস্তি গতিরন্যথা বলিয়াই কেনে—আমরা যেখানে গতি নাই সেখানে তাই করিব—তাহাতে আদান-প্রদানের ব্যাঘাত ঘটান কাহারও

শাস্তি

শ্রীমনোজ বসু

পেট-কাটা ঘরের পাশে ডুমুরতলা। তার ওদিকে উঠানে বিস্তর মানুষ জমায়েৎ হইয়াছে, অতএব আর আগাইয়া আসা চলে না। ঐ ডুমুরতলায় দাঁড়াইয়া নানারূপ নির্ব্বাক ভঙ্গি করিয়া হাত নাড়িয়া নাড়িয়া কমলা ভাইটিকে ডাকিতেছিল।

কিন্তু পান্নালালের যাইবার উপায় নাই।

দিদির সঙ্গে ইতিমধ্যে দু-একবার চোখোচোখি হইয়াছেও। কিন্তু এদিকে যে এক মহা আশ্চর্য্য কাণ্ড। একটা লোক গুটি-খেলা দেখাইতেছে। এই দেখা গেল লোকটার হাতের মধ্যে একটিমাত্র গুটি; মন্ত্র পড়িয়া আত্মারামের হাড় ঠেকাইয়া বার-দুই ফুঁ দিতেই সেটা দুই তিন-চারটা হইয়া যায়। একবার গোটা দুই তিন গালে ফেলিয়া দিল; সঙ্গে সঙ্গে নাক দিয়া, কান দিয়া, পেট-গলা-হাত-পা যে যে-অঙ্গের নাম করিতেছে সেইখান হইতে গুটি বাহির করিতে লাগিল। চারিপাশে বিস্তর ছেলেবুড়োর ভিড়। লোকটার বুজরুকী ধরিয়া ফেলিতে কাহারও চেষ্টার কসুর নাই, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না।

কমলা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শেষে ফিরিবার জন্য পা বাড়াইয়াছে এমন সময় কোন্ দিক দিয়া হারাণ পালিত আসিয়া উপস্থিত। বুড়া চেঁচাইয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন—কি গো বড়মানুষের গিন্নি, এমন চুপচাপ যে! তোমার দলের সমস্ত মেয়ে ওখানে আর তুমি একলাটি··· আনন্দময়ীর মুখ এ-রকম শুকনো কেন গা—কি হয়েছে?

এই বুড়াটি বড় সহজ পাত্র নয়। এতটুকু কাল হইতে কমলাকে ধা জ্বালাইয়া আসিতেছেন। তখন বুঝিত না, কাঁদিয়া ভাসাইত;—এখন পলাইয়া বেড়ায়। ইদানীং আবার বুড়ার ভাণ্ডারে তাহার সম্বন্ধে নূতন বিশেষণ জুটিয়াছে—বড়মানুষের গিন্নি। সলজ্জ হাসিয়া কমলা

পরম গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে হারাণ বলিলেন,—তা বটে, এখন পাখ্‌না যে কাটা! নাতজামাই মানা করেছে, না? তখনই বললাম—দিদি, বিদেশীরে মন দিও না, বুড়োর সঙ্গে স্বয়ম্বরা হও—

দায় পড়িয়াছে নাতজামায়ের মানা করিতে! আর করিলেই বা কে শোনে? কমলা যাইবে না—তাহার খুশী তাই যাইবে না। শেষে ওখানে দশজনের মধ্যে তুমি বুড়া এই রকম ফের সুরু করিয়া দাও!

হারাণ হাসিতে হাসিতে উঠানে ঢুকিলেন। কমলা কহিল—দাদামশায়, পানুকে একবার পাঠিয়ে দেবেন। একবার এসে শুনে যাক্, মোটে একটা কথা—তারপর আবার গিয়ে দেখবে ঐ সব···

একটু পরেই খেলা ভাঙিল। পান্নালাল লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া দিদির হাত ধরিয়া উৎসাহভরে কি বলিবার উপক্রম করিতেছিল, কমলা অমনি ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—আচ্ছা ছেলে ত তুমি···সেই কখন এসেছ আর ফিরবার নামটি নেই। যা বলেছিলাম, মনে আছে?

পানু খুব সপ্রতিভভাবে ঘাড় নোয়াইয়া বলিল,—হ্যাঁ—

—কি বল্ দিকি?

—তুই মার হাঁড়ি থেকে চুরি ক'রে আমসত্ব দিবি—

—তা দেব। আর, আসল কথাটা?

আমসত্বের কথার উপরেও আসল কথা যে আর কোনটা হইতে পারে তাহা পান্নালাল ভাবিয়া পাইল না। অবাক হইয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কমলা কহিল—আমসত্ব দেব না কচু দেব তোমাকে। বললাম, পোষ্টাপিসে গিয়ে চিঠি দেখে এস—

পান্নালাল চমকিয়া দাঁড়াইল। কহিল—দিদি, চিঠি এসেছিল।

—তাই এতক্ষণ নিয়ে বসে আছিস্ তুই? এক দৌড়ে দিয়ে আসতে বলি নি? কার চিঠি, দেখি।

পানু কুণ্ঠিত ভাবে কহিল—উঠোনে বুঝি ফেলে এসেছি, তুই দাঁড়া—আমি এক্ষুণি নিয়ে আসি—। বলিয়া সে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠানের দিকে দৌড়িল।

কমলা দাঁড়াইয়াই রহিল। অনেকক্ষণ পরে দেখা গেল, পানু ফিরিতেছে। খালি হাত, কাঁচুমাচু মুখ দেখিয়া ব্যাপার বুঝিতে বাকী রহিল না।

মুখ ঘুরাইয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে কমলা কহিল—বেশ, লক্ষ্মী ছেলে?—খুইয়েছ ত? যেখানে পাস সেখান থেকে এনে দিতে হবে তোকে, নইলে আজ কেটে দু-খানা করব—তখন দেখবি ছেলে।

পানু নিরুত্তর।

কমলা বলিতে লাগিল—পই পই করে ব'লে দিলাম, একছুটে আমায় দিয়ে যাবি, পাজি ছেলে—

পানু ভয়ে ভয়ে মৃদুস্বরে জবাব দিল—আস্‌ছিলাম ত। এমন সময় ডুগডুগি বাজাতে বাজাতে খেলা দেখাতে এল যে—

—যাও, আবার দেখে এসগে—আমি দাঁড়াচ্ছি এখানে।—যাও।

আরও একবার খোঁজাখুঁজি করিয়া অনেক পরে সে ফিরিয়া আসিল। চিঠি পাওয়া গেল না।

ভাইবোনে নির্ব্বাক হইয়া পথ চলিতে লাগিল। খানিক পরে কমলা জিজ্ঞাসা করিল—কার চিঠি? কি রকমধারা চিঠি রে?

—খাম—

—সবজে খাম?

—সাদা।

—গন্ধমাখা?

—তা, আমি শুঁকে দেখিনি। খেলা দেখাতে এল, আমি তারপর চিঠি হাতে নিয়ে বসেছিলাম।

অবশ্য সাদা এবং নির্গন্ধ খাম হইলেই যে নীরেনের চিঠি হইতে পারে না, এমন নয়। এমনি উন্মনাভাবে খানিকটা চলিতে চলিতে কমলা কহিল—কোথায় ফেল্‌লি বল দিকি পানু, কার হাতে পড়বে···ছি ছি, এক বিন্দু কাণ্ডজ্ঞান নেই তোর—

দিদির নরম সুরে পানু সাহস পাইল। ঝড়টা বুঝি এইবার কাটিয়া গিয়াছে। আগাইয়া আসিয়া কমলার কোমর জড়াইয়া ধরিয়া আবদারের সুরে বলিল—আমসত্ত্ব এখন দিবি ত? ওদিদি, গিয়েছি—?

—দিচ্ছি—বলিয়া কমলা তাহার গালে কষাইয়া দিল এক চড়। তার পর আর একটা। আর পানু অমনি বাঘের মত তাহার উপর পড়িয়া মারিয়া আঁচড়াইয়া চুল টানিয়া কাপড় ছিঁড়িয়া একাকার করিয়া তুলিল। কমলা আর সামলাইতে পারে না।

—রও ছেলে, গুরুজন না! আমি···মাকে ব'লে তোমার মজা দেখাচ্ছি—চল বাড়ি—

কিন্তু তাহার আগেই 'ও মাগো' বলিয়া গগনভেদী চীৎকার তুলিয়া পানু গৃহাভিমুখে ছুটিল। এবার কমলার ভয় হইল। মায়ের বকুনী—সে যা হয় এক রকম হইবে, কিন্তু হতভাগা ছেলে পত্রঘটিত সব কথা যদি বলিয়া দেয় কেলেঙ্কারীর কিছু বাকী থাকিবে না।

জোর পায়ে আগাইয়া কাছে গিয়া ডাকিল—পানু!

পানুও গতিবেগ বাড়াইল এবং কান্না আরও একপর্দ্দা উঁচুতে উঠাইল।

পিছন হইতে কমলা কাতরভাবে ডাকিতে লাগিল—ও পানু, দাঁড়া একটু ভাই—লক্ষ্মিটি, দাঁড়া—এক্ষুণি বাড়ি গিয়ে আমসত্ত্ব দেব।

পানু এক মুহূর্ত্ত পিছনে তাকাইল। কথাটা প্রত্যয় করিতে পারিল না। কান্নাজড়িত কণ্ঠে টানিয়া টানিয়া কহিতে লাগিল—পোষ্টাপিসে আমি ত গিইছি, তবু কেন তুই মারলি? শুধু শুধু কেন মারবি তুই আমায়? আমি মাকে ব'লে দেব—

কাছে আসিয়া ভাইয়ের চোখ মুছাইবার চেষ্টা করিতে করিতে কমলা বলিতে লাগিল—চুপ, চুপ···চুপ! কাউকে কিচ্ছু বলতে নেই—

পানু জো পাইয়া গেল।—এক্ষুণি গিয়ে সব বলব—

—না বলে না, ছিঃ—

—এক্ষুণি—

এভাবে হয় না দেখিয়া কমলা ধমক দিয়া উঠিল—কি হয়েছে? কি বলবি তুই? পান্নুর রাগ একটু যা শান্ত হইয়া আসিতেছিল, পুনরায় তাহা মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। বলিল—বলে দেব আমি—বলে দেবই—তুই মার হাঁড়ি থেকে আমসত্ত চুরি করে দিস্, কতদিন দিয়েছিস্, সব আমি ব'লে দেব—

—এই কথা, তা বলগে যা—বলিয়া কমলা হাসিয়া ফেলিল। নির্ভাবনায় পাশে কুন্তীদের বাড়ি ঢুকিয়া পড়িল।

পান্নু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিল, কি করা যায়। নানারূপ ইতস্ততঃ করিয়া সেও দিদির পিছু ধরিল।

মেটে ঘরের অন্ধকার কোণে দুই সখী মহানন্দে গল্প করিতেছিল। পান্নু সেখানে গিয়া দাঁড়াইল, কেহই মনোযোগ করিল না।

কেহ কিছু বলে না দেখিয়া সব শেষে পান্নুই কথা বলিল। আস্তে আস্তে বলিল—আমি বলে দেব না দিদি—

—আচ্ছা—বলিয়া কমলা কুন্তীর সহিত যে-প্রসঙ্গ হইতেছিল, তাহারই কি একটা জবাব দিল। দু-জনে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

পান্নু দাঁড়াইয়া আছে।

ক্ষণ পরে কহিল—ও দিদি, চল্—

সাড়া না পাইয়া পুনরায় কহিল—বেলা যে পড়ে গেল, কখন যাবি?

—কোথা?

হাসিয়া কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া পান্নু বলিল—সেই যে বল্‌লি বাড়ি গিয়ে আমসত্ত দিবি—যাবিনে?

হাসিমুখে কুন্তী জিজ্ঞাসা করিল—কি বলে?

রসভঙ্গে কমলা বিরক্ত হইয়াছিল। বলিল—কোথাও একদণ্ড থির হয়ে বসবার জো আছে? রাক্ষস ছেলের কেবল খাবার ভাবনা। বলছে, আমসত্ত দাও।

এখুনি এনে দিচ্ছি। কত খাবে খেও—বলিতে বলিতে কুন্তী আমসত্ত আনিতে বাহির হইয়া গেল, কমলাও সেই সঙ্গে। ফিরিয়া আসিয়া দেখা গেল, পান্নু নাই, চলিয়া গিয়াছে।

কমলা কহিল—বাড়ি চলে গিয়েছে। ঐ যে তোর সামনে রাক্ষস বললাম—ভায়ের আমার মান গিয়েছে। সত্যি কুন্তী, আমি ভাবি অনেক সময়, অনেক দিন ত ওরা নেবো নেবো করছে, গিয়ে সেখানে থাকব কেমন করে? পান্নুকে সঙ্গে নিয়ে যাব—।

কুন্তী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।—পারবি লো, পারবি—একবার বরের ঘর ক'রে দেখ, শেষে আর ভাই-টাই কিছু মনেও থাকবে না—

কমলা আপনার মনেই বলিয়া চলিল—তার উপরে আজ আবার খামকা মেরে বসলাম। মুখখানা একেবারে রাঙা হয়ে গেছে—পাচটা আঙুলের দাগ পড়ে গেছে··· আজ একখানা চিঠি হারিয়ে ফেলেছে—

—চিঠি? কবে এল রে? কি লিখেছে, দেখালি নে আমায়?

কমলা বিমর্ষমুখে বলিতে লাগিল—আমিই বড় দেখতে পেলাম তার—। বড্ড ভাবনা হয়েছে ভাই, এখন একটু ইয়ে চলেছে—মানে সেই চিঠির পর থেকে। আমার অপরাধ, একবার দিন-দুই দেরি হয়েছিল চিঠি দিতে—তাই হেনো-তেনো কত কি লিখ্‌ল। আমিও তেমনি কড়া কড়া জবাব দিয়েছি।

কুন্তী বলিল—বেশ করেছিস্, খুব করেছিস। ওদের ঐ কেবল লম্বা লম্বা কথা—মুরোদ ত ভারি। আবার দেখিস, সামনে এসে কি রকম করবে—

কিন্তু কমলা ইহাতে বিশেষ ভরসা পাইল না। বলিতে লাগিল—কি যে মতিগতি হ'ল, কেন যে লিখলাম—বড্ড ভয় হচ্ছে ভাই, যদি রাগের মাথায় দেশান্তরী হয়ে যায়। পান্নু হতভাগা চিঠি হারিয়ে এল, আজকে আবার কি লিখেছে কে জানে?—বলিয়া ক্ষণকাল চিন্তাকুল মুখে চুপ করিয়া থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—বাড়ি যাই—কেউ যদি চিঠি কুড়িয়ে পেয়ে বাড়ি

অবমানিত পানু বাড়ির কাছাকাছি গিয়া আবার সশব্দে কান্না জুড়িয়া দিল। মা ঘরের বাহির হইয়া আসিলেন—কি হ'ল রে? কে মেরেছে?

—দিদি—বলিয়া পান্নালাল রোয়াকের উপর আছড়াইয়া পড়িল, যেন একদম খুন হইয়া গিয়াছে এই রকম ভাব।

মা বলিলেন—আসুক আগে হতচ্ছাড়া মেয়ে। তুমি লক্ষ্মীমাণিক, কেঁদ না। জামাইবাবু এসেছে, ঐ বৈঠকখানায় রয়েছে, কি মনে ভাববে, কাঁদতে নেই।

পানু চমকিয়া চুপ করিল।

তারপর মা কাজকর্ম করিতে লাগিলেন, পানু পিছনে পিছনে ঘুরিতে লাগিল এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দিদির অপরাধের বিবরণ দিতে লাগিল। এক একবার জিজ্ঞাসা করে—ওমা শুন্‌ছিস?

কর্ম্মব্যস্ত মা উত্তর করেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ—আসুক আগে আজ—

কিছু পরেই কমলা বাড়ি ঢুকিল। পানু তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। এইবার একবার মায়ের সামনে পড়িলে হয়। দিদি ত জানে না, কি নিদারুণ অস্ত্র ইতিমধ্যে তার জন্য শানাইয়া রাখা হইয়াছে। এক একবার ভাবে, অত করিয়া নালিশ না করিলেও হইত। একটা থামের আড়ালে সে চুপ করিয়া দাঁড়াইল, ভয়ে বুক ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল।

মা মহাক্রুদ্ধভাবে চাপাগলায় তর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—সন্ধ্যে হয়ে যায়, ধিঙ্গীমেয়ের বাড়ির কথা মনে থাকে না। জামাই এসেছেন—নিয়ে যাক্ এইবার চুলের মুঠি ধ'রে।...এমন কথার অবাধ্য তুমি!

সন্ধ্যার আবছা আলোয় ভাল করিয়া ঠাহর হয় না, তবু পান্নালালের কেমন মনে হইল এই রকম গালাগালি খাইয়া দিদির মুখভাব যেরূপ হইবার কথা ঠিক তেমনটি হইল না।

মা পুনশ্চ বকিয়া উঠিলেন—হাত-পা কোলে ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে, গা-ধোয়া চুলটুল বাঁধা হবে না? বাক্স খুলে ঢাকাই শাড়ীটা বের করে নাও—। বলিয়া ঝনাৎ করিয়া চাবির গোছা ফেলিয়া মা চলিয়া গেলেন।

পানু ত অবাক! শাস্তির পালা শেষ হইয়া গেল না কি? কমলা কহিল—চল্ পানু, খিড়কীর পুকুরে আমায় একটু দাঁড়াবি—

পানু জোরে ঘাড় নাড়িল।

কমলা কাছে আসিয়া ভাইকে আদর করিয়া মান ভাঙাইয়া চুপি চুপি কহিল—শুন্‌লি ত, আমার চুলের মুঠি ধরে নিয়ে যাবে—নিয়ে গেলে তার পরে আর বলব না। চল্ ভাই—

অতঃপর নিরাপত্তিতে পানু পিছে পিছে চলিল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা দিদি, জামাইবাবু বড্ড খারাপ লোক, না?

কমলা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল—হ্যাঁ। মনে মনে ভাবিল, মিথ্যাও বড় নয়; সামান্য খুঁটিনাটি লইয়া যে রকম রাগারাগি করে। বলিল—আমি চলে গেলে তুই বাঁচিস, না রে পানু?

পানু সে কথার জবাব না দিয়া বলিল—সত্যি কি জামাইবাবু তোর চুল ধরে টেনে নিয়ে যাবে?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া যেন কত দুঃখে কত ভাবনায় কমলা কহিল—নিয়ে গেলেই বা করছি কি ভাই বল্, তুই ত ওদের সঙ্গে গায়ের জোরে পারবিনে—

পানুও ইহার উপর কিছু ভরসা দেখিতে পাইল না।

কমলা আপন মনে গা ধুইতেছে এবং আসন্ন রাত্রির জন্য মনে মনে নানা রকম মুশাবিদা করিতেছে এমন সময়ে পিছনে অঘাটার দিকে ঝপ করিয়া কি পড়িল। তাকাইয়া দেখে, পান্নালাল কাপড় খুলিয়া রাখিয়া জলে নামিয়াছে এবং সর্ব্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া কলমী দামের মধ্যে খুব উৎসাহের সহিত ছুটাছুটি লাগাইয়াছে।

—ও কি হচ্ছে রে?

—দিদি, মাছ...মাছ—। উৎসাহের প্রাবল্যে সে ভাল করিয়া উত্তরই দিতে পারিল না। অনতিদূরে নলবনের দিকে জল ভাঙিয়া চলিতে লাগিল।

—যাস্ নে পানু, ওদিকে সাপ থাকে—লক্ষ্মী সোনা, কথা শোন্—কিন্তু কে কার কথা শোনে? অবশেষে কমলা গিয়া হাত ধরিয়া ফেলিল।

—উঠে আয় লক্ষীছাড়া, উঠে আয় শীগগির—

বেগতিক দেখিয়া পান্নু দিল দিদির হাত কামড়াইয়া। তখন কান ধরিয়া পিঠে আর একটা কিল দিয়া কমলা ডাঙায় তুলিয়া দিল। পান্নু ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তখনই মনে পড়িল, বাড়িতে জামাইবাবু—কাঁদিতে নাই। পাড়ের উপর গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

গা ধোয়া সারিয়া কমলা ভাইয়ের হাত ধরিয়া টানিল—বাড়ি চল্। বারুদে আগুন লাগার মত পান্নু একেবারে ছিটকাইয়া উঠিল।

—মুখপুড়ি, তুই মর্—এক্ষুণি মর্—বাড়ি গিয়ে আমি সব বলে দেব।

কমলা হাসিয়া কহিল—বলিস্—খুব বলিস্, আমার ব'য়ে গেছে। আর তুমি এতক্ষণ কিছু না বলে ছেড়েছ তেমনি লক্ষীধন কি না?

পান্নু বলিল—তোর চুলের মুঠো ধ'রে নিয়ে যাবে জামাইবাবু, খুব হবে—আমি মজা দেখব—

কিন্তু মনে মনে মায়ের বিচার-পদ্ধতির উপর পান্নালালের সত্যসত্যই অত্যন্ত অনাস্থা জন্মিয়া গিয়াছিল। এবারে দিদির সঙ্গে সঙ্গে সে আর খিড়কীতে ঢুকিল না, সোজা বৈঠকখানায় উঠিল। ঘরে আলো দিয়া গিয়াছে, নীরেন একাকী পড়িয়া পড়িয়া চুরুট টানিতেছিল।

—এই যে এস এস বড়বাবু, এতক্ষণ দেখিনি—বলিতে বলিতে নীরেন উঠিয়া বসিল। বলিল—কান্না শুনছিলাম কার?

কান্নার কথায় পান্নু খুব লজ্জিত হইল, কিন্তু নীরেনের প্রতি শ্রদ্ধাও হইল। জিমনাষ্টিক করা দিব্য লম্বা চওড়া গোঁফপাকানো প্রকাণ্ড চেহারা। হাঁ, নালিশ করিতে হয়ত এই লোকের কাছেই। নির্ঘাৎ শাস্তি।

পান্নু বলিল—জামাইবাবু, দিদি আমাকে মেরেছে—

—বটে? ভারী অন্যায় ত!

উৎসাহিত হইয়া পান্নালাল কহিল—দু-দু-বার মেরেছে। আপনি ওকে আচ্ছা ক'রে মেরে দেবেন।

—নিশ্চয়, কোথায় তোমার দিদি?

—উপরের ঘরে আছে ঠিক।

নীরেন উঠিয়া দাঁড়াইল। এত বড় নালিশের পর বিচারকের পক্ষে অবহেলায় সময় কাটান চলে না। কহিল—আর কে কে আছেন সেখানে?

—কেউ নেই। মা রান্নাঘরে আছে।

—আচ্ছা! বলিয়া নীরেন বীরবিক্রমে অগ্রসর হইল। আয়োজন দেখিয়া পান্নুও একটু ঘাবড়াইয়া গেল। কিন্তু দুই-দুইবার মার খাইয়া প্রতিহিংসায় মন জ্বলিতেছিল, সে আর কিছু বলিল না। নীরেন বাহির হইয়া গেল।

কমলার প্রসাধন তখনও শেষ হয় নাই, পদশব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া একটু ঘোম্টা টানিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল নীরেন মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

তারপর কহিল—এক-শ মাইল দূর থেকে এলাম। ভদ্রলোককে একবার বসতেও বলছ না। খুব ভদ্রতা শিখেছ।

কমলার জবাব নাই, ঘোমটাও কমে না।

—আমায় দেখে তোমার রাগ হয়েছে কমলা, আচ্ছা, এই যাচ্ছি চলে—বলিয়া চলিয়া যাইবার ভাব দেখাইতে কমলা কথা কহিল। মৃদুস্বরে কহিল—তাই বলেছি বুঝি আমি?

—একটা কথা বলছ না, মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইলে—অবশ্য তোমাকে আমি দোষ দিতে পারিনে—। নীরেনের কণ্ঠস্বর অতিশয় কাতর হইয়া উঠিল, বলিতে লাগিল—এতে আমি তোমাকে এক বিন্দু দোষ দিইনে কমলা, মহাপাষণ্ড আমি—তাই ঐ রকম মর্ম্মঘাতী চিঠি লিখতে পেরেছি। তুমি আমায় ক্ষমা কর—। বলিতে বলিতে —যে কথা জনসমাজে খুলিয়া বলা উচিত নয়—সেই মহা বলবান জিম্‌নাষ্টিক-করা যুবক তার সাত ফিট লম্বা দেহ লইয়া একেবারে কমলার সামনে হাঁটু গাড়িয়া বসিল। বলিতে লাগিল—রাগের মাথায় চিঠি ডাকে ফেলে দিয়ে তারপরেই বুকে যেন মুগুর মারতে লাগল। ভাবলাম, এ চিঠি পেয়ে অভিমানিনী আমার আত্মহত্যা ক'রে বসবে। তাই কাউকে কিছু না ব'লে সকালের ট্রেনেই ব্যাগ হাতে ক'রে উঠে বসলাম—।

হঠাৎ উঠিয়া নীরেন একটানে কমলার ঘোমটা খুলিয়া ফেলিল। তার সন্দেহ হইয়াছিল, কমলা

কাঁদিতেছে বুঝি। ঘোমটা খুলিয়া দেখে, হাসিমুখ। দেখিয়া তৃপ্তি পাইল। বলিল—আমার চিঠিটা পড়ে তোমার বড্ড কষ্ট হয়েছে—না?

কমলা মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—কি লিখেছিলে তুমি?

—জান ত আমার যত পাগলামি···তুমি চিঠি পড়নি?

—না, পান্নু সে চিঠি হারিয়ে ফেলেছে—

—বাঁচা গেছে—বলিয়া নীরেন সশব্দে একচোট হাসিতে যাইতেছিল; কমলা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া উঠিল—আঃ, আস্তে গো আস্তে—নীচে মা রয়েছেন যে—

হাসি সামলাইয়া নীরেন কহিল—তবে ত পান্নুবাবু খুব বাঁচিয়ে দিয়েছে—আর সেই পান্নুকে তুমি মেরেছ? শোন—তোমার নামে মস্ত বড় নালিশ—দু দু-বার মেরেছ তুমি—

কমলা বলিল—ঐ চিঠি হারিয়েছে ব'লে একবার, আর একবার—

কথা শেষ করিতে না দিয়া নীরেন বলিয়া উঠিল—হারিয়েছে ত বেশ করেছে। সেইজন্যে মারবে তুমি? পান্নু বলেছে তোমায় খুব করে শাস্তি দিতে—কোন কৈফিয়ৎ শুনছিনে আর—যাও—

না। অত বড় উপকারী যে তার কথা ফেলব আমি? শাস্তি আমি দেবই—কিছুতে ছাড়ব না। না—না—না—বলিয়া প্রবলপরাক্রমে শাস্তি দিবার উপক্রম করিতেই পান্নালাল কোথা হইতে মাঝখানে কাঁদিয়া আসিয়া পড়িল।

—ও জামাইবাবু, আমার দিদিকে তুমি মের না—আমি আর নালিশ করব না—

সন্ত্রস্তভাবে কমলা বলিতে লাগিল—পান্নু, চুপ—চুপ—চুপ—। পান্নু কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিল—শীগগির তুই পালিয়ে আয় দিদি, আমি কোনদিন আর কাউকে কিছু বলব না—

মোহেন-জো-দাড়ো ও প্রাচীন সিন্ধুতীরের সভ্যতা

মিসেস্ ডেরোথি ম্যাকাই

সিন্ধুতীরবাসীদের ধর্ম্মবিষয়ে নিশ্চয় করিয়া বলিবার মত অনেকটা ভরসা পাওয়া যায়। কারণ পাথরের মূর্ত্তির মস্তক সংখ্যায় অতি অল্প হইলেও, পোড়া-মাটির যে অনেকগুলি স্ত্রীমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে সেগুলি দেখিয়া মনে হয় কোনো দেবী-মাতার পূজা চলিত ছিল। এই ছোট ছোট মূর্ত্তিগুলি অধিকাংশই ছেলেভুলান পুতুলের অপেক্ষা যথেষ্ট ভাল করিয়া তৈয়ারী এবং ইহাদের পোষাক ও শিরোভূষণ একই রকমের। হয়ত প্রতিগৃহেই ক্ষুদ্র পূজাপ্রকোষ্ঠে তাহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দেবী-মাতা সর্ব্বত্রই সুবিস্তৃত মেখলা ও অনেকগুলি কণ্ঠমালা ধারণ করিয়া থাকেন। পুতুলটি পোড়াইবার আগে তাহার গায়ে ছোট ছোট গোল মাটির পুঁথি মালা ও মেখলার আকারে বসাইয়া দেওয়া হইত। উরের রাণী শুব-আদের সোনার ফিতা, মালা, উঁচু চিরুণী ইত্যাদি শোভিত শিরোভূষণের মতই মহেন-জো-দাড়োর দেবী-মাতার শিরোভূষণ আশ্চর্য্য ও বিচিত্রভাবে অলঙ্কৃত। কপালের উপর দিয়া চওড়া ফিতা জড়াইয়া মাথার দুইপাশে দুইটি ঝুড়ির মত পাত্র ঝুলিতেছে, মাথার উপর পাখার মত করিয়া একটি অলঙ্কার সাজান, তাছাড়া দুই কানের সামনে দুইটি ছুঁচালো শিঙের মত জিনিষ ঝোলান। এই দেবী-মাতা সুমারের নিনখারসাগ, বাবিলনের ইস্তার, আস্তার্তে, অথবা পরবর্ত্তীকালের প্রাচীন প্রাচ্যদেশ, গ্রীস এবং রোমে আইসিস, আফ্রোদিতে এবং ভিনস্ নামে পরিচিতা দেবীদেরই কুটুম্বিনী হইতে পারেন।

কিন্তু প্রাচীন সিন্ধুবাসীদের ধর্ম্মে পরবর্ত্তী যুগের খাঁটি ভারতীয় অঙ্গ ও অনুষ্ঠানাদিরও উপকরণ পাওয়া যায়। একটি প্রাচীনতম শীলে ধ্যানীর মত যোগাসনে

করিতে হয়। মিঃ ম্যাকাই প্রাপ্ত কিশের শীল (যাহা সিন্ধুর সভ্যতা ২৭৫০ খৃঃ পূঃ অব্দ বলিয়া স্থির করে) ছাড়া মিঃ উলি উর নগরে দুইটি ভারতীয় শীল পাইয়াছেন। প্রথমটি কোনো সুচতুর সিন্ধু বণিকেরা, বোধ হয় সে সুমারে



মোহেন-জো-দাড়োর একটি খিলান-যুক্ত নর্দামা

গিয়া দেখিয়াছিল যে, খরিদ্দারেরা তাহার স্বভাষায় লিখিত লিপি পড়িতে পারে না, তাই সে নিজ নামটি প্রাচীন এসিরীয় কীলক অক্ষরে খোদাই করাইয়া লয়। এই অক্ষরগুলি নিশ্চিত খৃঃ পূঃ ৩০০০ অব্দের। বণিকের খরিদ্দারদের মত তাহার ৫০০০ বৎসর পরের প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণেরও আজ তাহার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

ভূগর্ভে আবিষ্কৃত সৌধমালার ভিতর বৌদ্ধস্তূপ এবং তাহার বিহারগুলিই সকলের আগে চোখে পড়ে। ইহার সমৃদ্ধির দিনে স্তূপটি এই সুবিস্তীর্ণ পলিমাটির দেশের সমতল হইতে বহু উচ্চ শোভন ভূচিহ্নরূপে শোভা পাইত। এখন ছত্র ইত্যাদি ভাঙিয়া পড়িবার পরও কাঁচা ইটের ধ্বংসস্তূপটি অনেক মাইল দূর হইতে দেখা যায়।

প্রাচীন অধিবাসীদের ইটের দ্বারা নির্ম্মিত হইলেও এই বৌদ্ধসৌধগুলি মাত্র ১৭০০ বৎসর পূর্ব্বের, কারণ ভিক্ষু বিহারের একটি কুঠরীতে কুশান-বংশের রাজা বাসুদেবের এক পাত্র মুদ্রা (১৮৫-২২০ খৃঃ) খুঁড়িয়া পাওয়া গিয়াছে। আদি শহরের নগর সৌধগুলির মধ্যে বিরাট এক কুণ্ডের চারিধারে নির্ম্মিত মস্ত অট্টালিকাটি বিস্ময় উৎপাদন করে। প্রাচ্যের অন্যান্য ভূপ্রোথিত প্রাচীন মন্দির প্রাসাদ ইত্যাদি হইতে ইহা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। কারিগরেরা যেভাবে প্রাচীরের ও কুণ্ডের গর্ভে ইট জোড়া দিয়াছে ও পালিশ করিয়াছে তাহা আধুনিক রাজ-মিস্ত্রীর পক্ষেও বিশেষ গর্ব্বের বিষয় হইতে পারে। কুণ্ডটি ৩৯ ফিট লম্বা ২৩ ফিট চওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে জলে নামিবার জন্য সিঁড়ির ধাপ আছে। ধাপগুলি বোধ হয় কাঠ দিয়া ঢাকা ছিল, কারণ তাহার দুই প্রান্তে তক্তা ঢুকাইবার মত খাঁজকাটা আছে। কুণ্ডটির দুই থাক্ প্রাচীরের ভিতর পুরু কাদার প্রলেপ দিয়া ইহার আর্দ্রতা বাহিরে যাওয়া নিবারণ করা হইত, ইহা ছাড়া এক পুরু 'বিটুমেনে'র প্রলেপও যে ছিল, তাহার চিহ্ন এখনও দেখা যায়। এই জিনিষটি সেই প্রাচীন সভ্যতার উন্নত অবস্থার প্রকাণ্ড সাক্ষ্য।

কুণ্ডের চারি পাশ ঘিরিয়া চওড়া দালান ছিল, তাহার পিছনে দরজা পার হইয়া অনেকগুলি ছোটবড় নানা মাপ ও আকারের ঘর। এগুলির প্রয়োজন আন্দাজ করা



একটি কুয়া

যাইতে পারে। এই সৌধটির বাহিরের দিকের প্রধান প্রাচীরগুলি যেরূপ আশ্চর্য্য পুরু এবং ইহাদের বাহিরের পিঠগুলি যে-ভাবে ভিতরের দিকে ঢালু হইয়া আসিয়াছে

(মিশরের মন্দির প্রাচীরের মত) তাহাতে মনে হয় খুব সম্ভব ইহার উপর আরও ঘর ছিল, কুণ্ডের চারি পাশ ঘিরিয়া একটা দুইতলা দালানের দিকে সেই সব ঘরের মুখ ছিল। কুণ্ডের উপর হয়ত ছাদ ছিল না; অথবা সম্ভবত পুরু কোনো চন্দ্রাতপ দিয়া ইহা ঢাকা থাকিত।

এই অদ্ভুত বাড়িটি সম্ভবত ধর্ম্ম-কার্য্যে ব্যবহৃত হইত, এখনকারই মত তখনও ভারতে দেব-মন্দিরে প্রবেশের পূর্ব্বে স্নানাদি করা হয়ত রীতি ছিল। এই কুণ্ডযুক্ত সৌধটি স্তূপধ্বংসাবলীর পাশেই, হয়ত নগরে এই সর্ব্বোচ্চ ধ্বংসাবলীটি পুরাকালে দেব-মন্দিরই ছিল; তাহারই উপর পরে বৌদ্ধদের স্তূপ নির্ম্মাণ করা কিছুই বিচিত্র নয়। কারণ জগতের ইতিহাসে সর্ব্বত্রই পবিত্র স্থানগুলি বংশপরম্পরায় তাহাদের পবিত্রতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছে।



মোহেন-জো-দাড়োর রাস্তার নর্দ্দামা

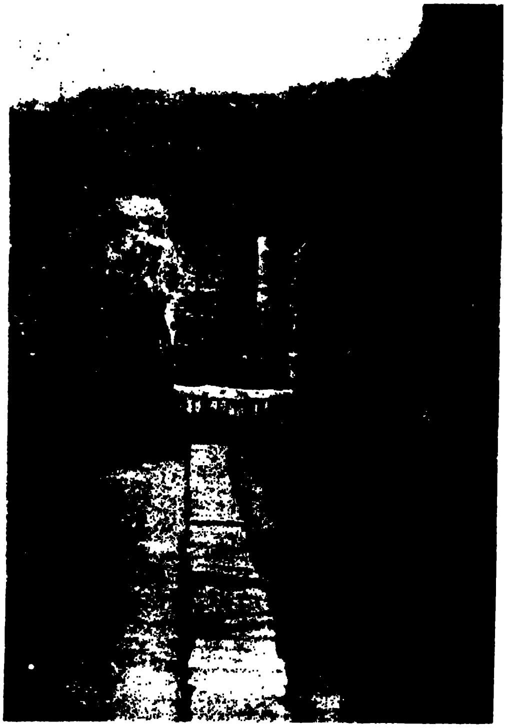
সেকালের সিন্ধুর দেবমন্দিরের বিশেষত্ব জানা থাকিলে কতকগুলি গৃহকে ঐ আখ্যা দেওয়া চলিত। দেবমূর্ত্তি হইতে পারে এমন সম্পূর্ণ একটি মূর্ত্তিও পাওয়া যায় নাই।

মহেন-জো-দাড়োর অধিবাসীদের দেবপূজার মত শারীরিক পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা একটা মস্ত বিশেষত্ব ছিল। কয়েকটি গৃহ ছাড়া প্রত্যেক গৃহেই শরীর প্রক্ষালনের জন্য বাঁধানো সান, সুন্দর করিয়া মেজেতে ইট জুড়িয়া তৈয়ারী, তাহা আবার ঘরের একটা কোণের দিকে ঢালু; সেইখান হইতে দেয়াল ফুটা করিয়া নর্দ্দামা বাড়ির বাহিরে রাস্তার নর্দ্দামায় জল লইয়া ফেলে। দরিদ্র পল্লীতে ঘরের জল বাহিরে একটা বড় মাটির পাত্রে গিয়া পড়িত, এবং তাহা হইতে ধীরে জমিতে মিশিয়া যাইত; শক্ত কোনো জিনিষ পড়িয়া থাকিলে মেথর তাহা পরিষ্কার করিয়া লইত।

বড় বড় রাজপথের জল-নিষ্কাশনপ্রণালী চমৎকার ও উন্নত সভ্যতার পরিচায়ক। বড় রাস্তাগুলির দুইপাশে ইট বাঁধান বড় বড় জলপথ, ছোট ছোট গলির এবং পাশের বাড়ির নর্দ্দামাগুলি সিধা সমকোণভাবে ইহাতে আসিয়া পড়িয়াছে। এগুলি খোলা পড়িয়া থাকিত না। শোওয়ান, খাড়া, হেলান ইত্যাদি নানাভাবে ইট দিয়া সেগুলি ঢাকা। বৃহৎ কুণ্ডের নিকটস্থ পথের বড় বড় গভীর নর্দ্দামাগুলি (সম্ভবত) সুক্কুর হইতে নদীপথে আনীত পাথর দিয়া ঢাকা, কারণ ৫৬ মাইল দূরস্থ এই স্থানটিই পাথর পাইবার নিকটতম খনি। মাটির তলার ড্রেন মেরামত ও পরিষ্কার করিবার জন্য এই সব পথগুলি খোলা হইত কল্পনা করা যায়। ঠিকাদারেরা মেরামতি ড্রেনের দামী পাথরগুলি খুলিয়া লইয়া মাঝে মাঝে ইট ঢাকা দিয়া আবার রাস্তা চাপা দিয়া দিত দেখিলে, মনুষ্য ধর্ম্ম যে চিরকালই এক রকম না বলিয়া পারা যায় না।

তিন জায়গায় আজ পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য বড় নর্দ্দামা পাওয়া গিয়াছে। সিন্ধুদেশের লোকেরা খিলান গাঁথিতে বোধ হয় জানিত না, তাই এই গভীর নর্দ্দামাগুলি দুই ধার দিয়া পাথর ক্রমে অগ্রসর করিয়া ঢাকা দেওয়া। কিন্তু কুয়া বাঁধাইবার সময় খিলানের মত করিয়া কুঠারাকৃতি ইট ব্যবহার করিতে ইহাদের দেখা গিয়াছে। এই নর্দ্দামার

তলা দিয়া নীচু হইয়া মানুষ বেশ হাঁটিয়া যাইতে পারে। এইরূপ একটি জলপথ বৃহৎ কুণ্ডটির জল-নিষ্কাশন করিত, কিন্তু কুণ্ডের যে-মুখ দিয়া জল এই গহ্বরে পড়িত সেটি চওড়ায় ও উচ্চতায় মাত্র এক এক ফুট, এবং বড় নর্দ্দামা-



জলনিঃসরণের পথ

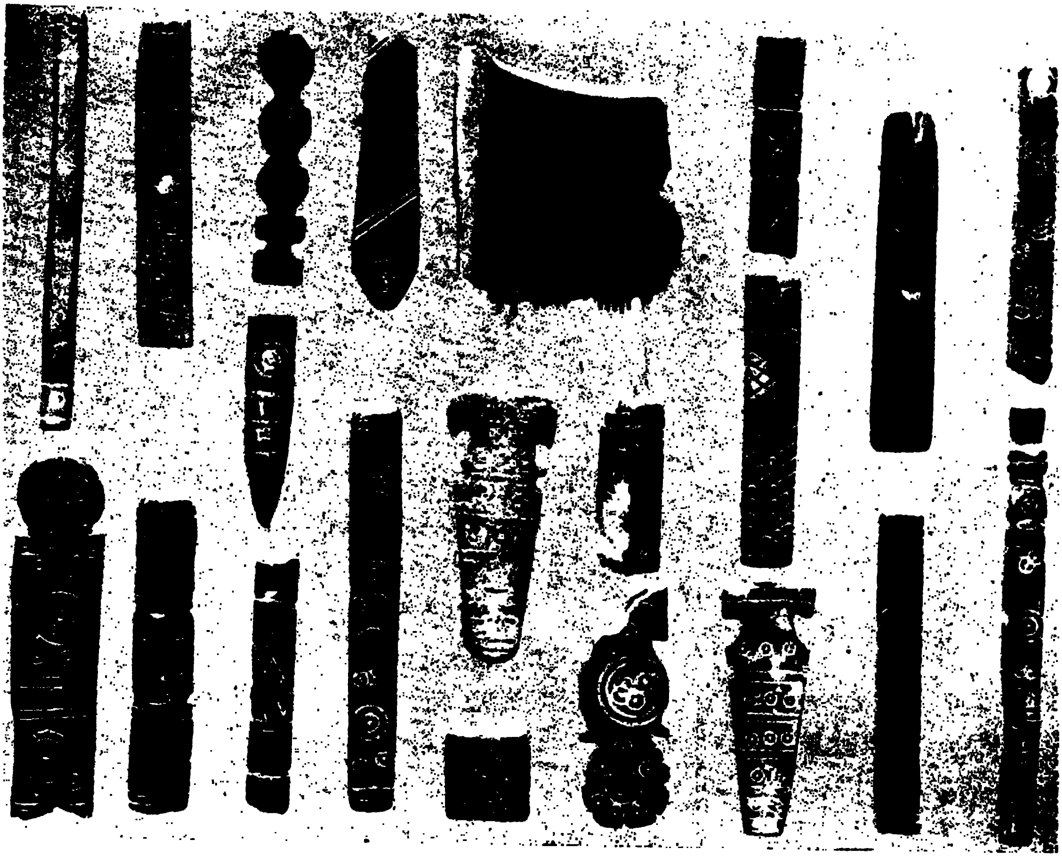
গুলির মেজেতে এইরূপ ছোট ছোট নালি কাটা আছে; সুতরাং কুণ্ডের জল ঐ মেজের নালি দিয়াই অনায়াসে বহিয়া যাইতে পারিত বোঝা যায়। তবে এত বড় গহ্বরাকৃতি ঢাকা-দেওয়া জলপথের এবং উপর হইতে পরিষ্কার করিবার জন্য মানুষ নামিবার গর্ত্ত রাখার যে কি প্রয়োজন ছিল এই প্রশ্ন মনে আসে।

কুণ্ডে জল বোঝাই কি করিয়া হইত তাহাও আর এক প্রশ্ন। এই বাড়িটার একটি পূর্ব্বদিকের ঘরে মস্ত একটি কূয়া আছে, কিন্তু তাহা হইতে কুণ্ডে জল আসিবার কোনো পথ নাই; জল এখান হইতে তুলিয়া ঢালিবারও কোনো কলকজার প্রমাণ নাই। কেহ কেহ বলেন যে, কুণ্ডের জল বাহির করিয়া দিবার পর, গর্ত্ত দিয়া মানুষ নামিয়া বড় ড্রেনটি পরিষ্কার করিত; তাহার পর সেই ড্রেনের অপর প্রান্তের জল বাহির হইয়া যাইবার মুখটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত; তাহার পর কোনো খাল হইতে পারস্য দেশীয় জল-চক্রের সাহায্যে জলপ্রণালীটির উচ্চ মাথা পর্য্যন্ত জলে বোঝাই করা হইত। নিকটতম নদীশাখা কি খাল পর্য্যন্ত এই নর্দ্দামাটির মাথা অবধি জল বোঝাই করিলে, উল্টা পথে যে-জল আবার কুণ্ডে গিয়া ঢুকিত, তাহা আন্দাজ পাঁচ ফুট গভীর হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় নর্দ্দামাটির বহিঃপ্রান্তের মুখ কতক ইট-সন্ধানী বৌদ্ধভিক্ষুর এবং কতক সময়ের অত্যাচারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে, সুতরাং মানব-ইতিহাসের এই উষাকালে এই নগরবাসীদের যে, এতখানি আশ্চর্য্য কল্পনাশক্তি ও দক্ষতা ছিল তাহার স্পষ্ট প্রমাণ দেওয়া যায় না। পথের নর্দ্দামার বেশীর ভাগের তলা কাঁচা থাকিত, তাহাতে জলটা ক্রমে মাটির ভিতর মিলাইয়া যাইতে পারিত। কাদাটা মেথরে পরিষ্কার করিয়া লইত; তাহাদের নর্দ্দামায় নামিবার জন্য দুইধারে পা-রাখিবার যে স্থান ছিল তাহা এখনও কোনো কোনো গর্ত্তে দেখা যায়। আর এক রকম নর্দ্দামার তলা ইট দিয়া বাঁধান থাকিত, তাহার বাড়তি জল উপরের একটা ফুটা দিয়া বাহির হইয়া যাইত, নীচে



স্নানাগারের এক অংশ

শক্ত জিনিষ পড়িয়া থাকিত। কালপ্রবাহে ধ্বংসস্তূপ-গুলির বাহিরের ঢাল নষ্ট ও ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়াতে রাজ-



হাতীর দাঁতের চিরুণী ও অন্যান্য জিনিষ

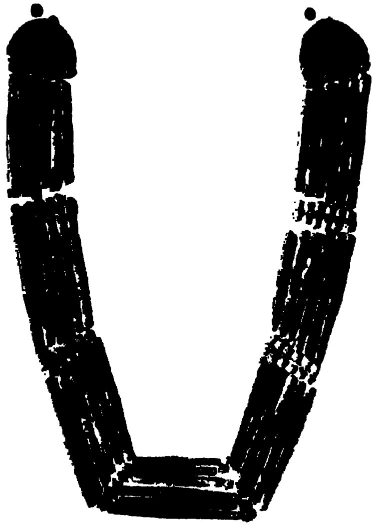
পথের নর্দ্দামার জল কোথায় যে গিয়া শেষে পড়িত তাহা আর এখন খোঁজ করিয়া পাওয়া যায় না।

সম্ভবতঃ এই বিরাট জলনিষ্কাশন-প্রণালী কেবল স্নানের ঘরের জল এবং ছাদের গড়ান জল বাহির করিবার জন্যই চলিত ছিল, কিন্তু নগরের কোনো কোনো, বিশেষত আধুনিকতর স্থানে পায়খানা ইত্যাদির নোংরা জলাদি উপরতলার দেওয়াল ফুটা করিয়া অথবা ছাদ দিয়া এই বড় নর্দ্দামায় আসিয়া পড়িত ইহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। প্রত্যেক ভাল বাড়িতেই নিজস্ব কূয়া ছিল বলিয়া মনে হয়; কাঁচা নর্দ্দামা এবং দরিদ্র-পল্লীর জলফেলা পাত্র হইতে ময়লা জল মাটির তলা দিয়া কূয়ায় গিয়া মিশিত; এবং বড় বড় বাড়ি ও রাজপথের ড্রেন যতই ভাল হউক জল-মেশার ফলে মাঝে মাঝে মহামারী নগরে ছড়াইয়া পড়িত এ সিদ্ধান্ত না করিয়া গতি নাই।

সাধারণ গৃহে মানুষ কেমন ভাবে বাস করিত দেখা যাউক। নগর-সৌধগুলি ছাড়া কোনো বাড়িরই প্রায় রাজপথে মুখ ছিল না বলিয়া বড় রাস্তা দিয়া প্রথমেই একটা গলিতে ঢুকিতে হয়। আধুনিক প্রাচ্যের মতই তখনও মানুষ নিজের ধন-দৌলত দেখাইতে কিছুমাত্র ব্যস্ত ছিল না, সুতরাং একতলার বাড়ির সামনে লোকের চোখের উপর অনেক দরজা জানালার ঘটা ছিল না। ভিতরে বাড়ির একপাশে অধিকাংশ স্থলেই একটি ছোট উঠান ছিল, তাহাতে একটি কূয়া থাকিত। মাঝে মাঝে গৃহস্বামী প্রতিবাসীদের কূয়া ব্যবহার করিতে দিতেন বলিয়া কোনো কোনো কূয়া উঠানের প্রান্তে

আলাদা দেওয়াল দিয়া ঘেরা থাকিত। কুয়ার পাশে বাঁধান রোয়াক এবং মেজেতে জলপাত্র বসাইবার গভীর চিহ্ন দেখিয়া মনে হয় এইখানে শহরের হাল খবরের খুব গরম আলোচনা চলিত।

বাড়িতে বোধ হয় একটি উপরতলা থাকিত, কারণ



কোমরের গহনা

বাসভবনগুলির দেওয়াল খুব পুরু এবং বাহিরের দেওয়াল-গুলি মজবুত করিবার জন্য একটু ভিতর-মুখে ঢালু করিয়া গাঁথা, তাছাড়া এখনও দুই-একটা সোপান-পথ ও উপর-তলায় আসিয়া দাঁড়াইবার স্থান দেখা যায়; সেগুলি নিশ্চয় কেবল মাত্র ছাদে যাইবার পথ ছিল না। বাহির দিকের সিঁড়ির অনেক যা নমুনা আছে তাহাতে মনে হয় একই বাড়ির বিভিন্ন তলায় স্বতন্ত্র পরিবার বাস করিত। একতলা হইতে একটি নর্দ্দামা এবং দুতলার দেওয়াল হইতে আর একটি নর্দ্দামা নামিয়া পাশাপাশি পড়িয়াছে দেখিয়া এইরূপ ভিন্ন পরিবারের একগৃহে বাস আরও সম্ভব মনে হয়।

বাড়িগুলিতে ভাল আলো নিশ্চয় আসিত না, কারণ যা দুই-চারিটা জানালা আছে তাহা দেওয়ালের মাথার হাওয়া-পথের অপেক্ষা বেশী কিছু নয়। বাড়ি সাজাইবার কোনো চিহ্ন নাই, তবে যদি প্রাচীন অন্য জাতিদের কার্য্যখচিত বস্ত্রাদি টাঙাইত ত বলা যায় না। সে-সব জিনিষ কার্পাস কি চামড়ার যাহারই হউক না কেন, এতদিনে নিশ্চয় লোপ পাইয়াছে। অলঙ্কৃত বাক্স কি অন্যান্য কাঠের আসবাব যে ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় কাঠের ভিতর বসাইবার নানারঙের ছোট ছোট টুকরাগুলিতে, কিন্তু আসবাবের আসল কাঠগুলি বহুকাল লোপ পাইয়াছে। একটি রূপার পাত্রের গায়ে জড়ান এক টুকরা কাপড় কালের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া গিয়াছে; সেটিকে অণুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া খাঁটি কার্পাস বলিয়াই বোঝা গিয়াছে। জগতের ইতিহাসে জ্ঞাত ইহাই আদি কার্পাস-বস্ত্র।

দুই দিকে ইট দিয়া উনুন পাতিয়া তাহার উপর রন্ধন-পাত্র বসাইয়া কাঠ-কুটা জ্বালিয়া রান্না করা তখনও চলিত। পুরাকালীন তাম্র ও মাটির অনেকগুলি রন্ধন-পাত্র পাওয়া গিয়াছে। যাঁতা, হামান-দিস্তা ও চালুনি অনেক পাওয়া গিয়াছে। ছোট ছোট একরকম থালা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার ভিতর চারিটি খোপ-কাটা দেখিয়া মনে হয় ইহাতে মশলা ইত্যাদি থাকিত। শাঁখ হইতে কাটা একপেশে নানা মাপের চামচও তৈয়ার হইত। রান্নাঘরের আঁস্তাকুড় ও আবর্জ্জনা ফেলা পাত্র পরীক্ষা করিয়া সেকালে গরু, ভেড়া ও শূকরের মাংস এবং মাছ কচ্ছপ এমন কি মেছো কুমীর ভোজনের অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বড় বড় গৃহস্থালীতে তামার ছুরির চলন সুরু হইয়াছিল, অন্যান্য সংসারে দরকার-মত পাথরের ছুরিতে কাটিয়া লওয়া হইত।

আলিবাবার গল্পের বিরাট মৃৎপাত্রের মত জালায় শস্য ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য রাখা হইত; জালাগুলির কোনোটিরই মাটিতে খাড়া করিয়া রাখিবার মত তলা নয়, কতকগুলি ত একেবারে ছুঁচালো। সেগুলি সম্ভবতঃ কাঠের এবং অনেক সময় ইটের খোপ তৈয়ারী করিয়া বসান হইত। এখনকার সিন্দুর মত তখনও বোধ হয় এদেশে ইঁদুর ও পোকার হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য কাপড়-চোপড় এই জালার মধ্যেই সঞ্চিত থাকিত।

যাইলেও তাহারা যে প্রসাধনে যত্নবতী ছিল এবিষয়ে কোনোই সন্দেহ নাই। কারণ পুঁথি, তামা, রূপা, সোনা, স্ফটিক ইত্যাদির কণ্ঠমালা, কর্ণ-ভূষণ, বালা, আংটি এমন কি, নাক-ছাবি আবার অঙ্গরাগের পাত্রও অনেক উদ্ধার পাইয়াছে। এই পাত্রগুলি ছোট ছোট কিন্তু নানা বিভিন্ন আকারের, ভিতরের মূল্যবান্ অঙ্গরাগ যাহাতে অপরিষ্কার হইয়া কি শুকাইয়া না যায় তাহার জন্য মুখে ঢাকা দেওয়া আছে। পুরুষরা বোধ হয় হাঁটু পর্য্যন্ত লুঙ্গি ও ফুল-কাটা শাল পরিত (একটি মূর্ত্তির গায়ের শাল এই রূপ প্রমাণ দেয়)। বাম কাঁধের উপর হইতে ডান হাতের তলা দিয়া শালটি ঘুরাইয়া পরিত।

ইহারা যে আমাদেরই সমধর্ম্মী মানুষ, ইহাদের জীবন-যাত্রায় দুইটি জিনিষ বিশেষ করিয়া তাহা আমাদের মনে পড়াইয়া দেয়। প্রথম ইহাদের শিশু-বৎসলতা, দ্বিতীয় ভাগ্যপরীক্ষা-খেলার দুর্ব্বলতা। পথে ও গৃহে যে খেলনার রাশি পাওয়া গিয়াছে তাহা সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে বিস্ময় জাগায়। জানোয়ারের মূর্ত্তি, মাথা-নাড়া জন্তু, মাটির গোল ঝুমঝুমি ও হাতী ঝুমঝুমি, মাটির পাখী-বাঁশী, চাকাওয়ালা গরু-টানা গাড়ী প্রচুর আছে। ছোট ছেলেরা বোধ হয় মার্ব্বেলও খেলিত। পাথর ও শাঁখের বড়ে, ঘুঁটি এবং হাতীর দাঁতের 'ডাইস্' অনেক আছে। পাশার উপর সংখ্যা আধুনিক ভাবে সাজান নহে, কিন্তু তাহাতে খেলার কিছু অঙ্গহানি হইত না।

এখনও অনেক প্রশ্নের সমাধান হয় নাই এবং গোড়া-পত্তনের কাজ আরও অনেক করিতে হইবে। কিন্তু হরপ্পা মহেন-জো-দাড়ো এবং এই মানব-জাতির অন্যান্য বাসভূমির ভবিষ্যৎ আবিষ্কার এবং ইরাক প্রভৃতি দেশে নব নব আবিষ্ক্রিয়া যে, এই রহস্যময় জাতির ভাষা ও ইতিহাস-পথে একদিন উজ্জ্বল আলোকপাত করিবে সে-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নাই।*

* এই বিষয়ে আমেরিকার 'এশিয়া' পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখি। এখানে তাহারই বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইল।

পরলোকগত ডাক্তার মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

দেশবিখ্যাত, স্বদেশপ্রেমিক, পরোপকারী কর্ম্মী ব্রাহ্ম-সাধক ডাক্তার মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী ২৫শে আষাঢ়, ১৩৩৯ অপরাহ্ণ প্রায় ছয় ঘটিকার সময় দেহত্যাগ করিয়াছেন।

১২৬০ সনে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৭১ সনের ডিসেম্বর মাসে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দুই বৎসর ঢাকা কলেজে এবং প্রায় পাঁচ বৎসর কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা শ্রীমদাচার্য্য আনন্দচন্দ্র নন্দী (আনন্দ স্বামী) সাংসারিক কর্ম্মে একেবারেই বিরত এবং সর্ব্বদা ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকেন, এই সংবাদ পাইয়া তিনি ১২৮৩ সালে বাড়ি চলিয়া আসেন; পরে তিনি তিন বৎসর ঢাকা হানিম্যান মেডিক্যাল স্কুলে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি বাড়ি ফিরিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং অল্প কাল মধ্যেই একজন বিখ্যাত চিকিৎসক বলিয়া গণ্য হন। তিনি মাসে সাত-আট শত টাকা উপার্জ্জন করিতেন, কিন্তু সমস্তই পরোপকার ও লোক-সেবায় ব্যয়িত হইত।

কলিকাতা অবস্থানকালে যখন স্বদেশীর নামগন্ধও লোকে জানিত না, তখন (১৮৭২-১৮৭৬) তিনিই লিখিবার কালি, ছাপাখানার কালি, কাপড়ের কল, দিয়াশলাইয়ের কল নির্ম্মাণে মনোনিবেশ করেন।

নবগোপাল মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক হিন্দুমেলা স্থাপিত হইলে, তাহাতে তিনি তাঁহার কলে প্রস্তুত একখানা কাপড়, লিখিবার কালি ও দিয়াশলাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার কলে প্রস্তুত করা কাপড়খানা দেখিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে, তিনি সেই সামান্য কাপড়খানা মাথায় বাঁধিয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্তুত লিখিবার কালি কলিকাতার বাজারে 'রায় ব্রাদার্স ইঙ্ক' নামে বিক্রয় হইত।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কালীকচ্ছ গ্রামের মধ্যস্থলে প্রায় আট বিঘা জমির জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া তথায় গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া তিনি এক লোহার কারখানা স্থাপন করেন। ইহাতে উৎকৃষ্ট ছুরি, কাঁচি, চা-গাছ ছাঁটিবার চাকু ইত্যাদি প্রস্তুত হইত। অর্থাভাবে কারখানা উঠিয়া যাওয়ার পর তিনি যন্ত্রাদি নিজ বাড়িতে আনিয়া কাজ চালাইয়াছিলেন। তিনি দিয়াশলাইয়ের কাঠি ও বাক্স প্রস্তুত করিবার কল আবিষ্কার করিয়া দিয়াশলাই প্রস্তুত করিবার একটি কারখানা স্থাপন করেন। ইহাতে উৎকৃষ্ট দিয়াশলাই প্রস্তুত হইত। বঙ্গদেশের নানা স্থান হইতে এই কল সরবরাহ করিবার অর্ডার আসিলে, তিনি তাঁহার লোহার কারখানায় অনেকগুলি দিয়াশলাইয়ের কল প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাঁহার এই কলের সংবাদ পাইয়া ইহা দেখিবার জন্য রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বার মিঃ মোনাহান এবং মিঃ বীটসন্ বেল তাঁহার বাড়িতে আসেন এবং এই কলের প্রশংসা করিয়া ইহা পেটেণ্ট করিবার জন্য তাঁহাকে পরামর্শ দেন।

জুগীদিগকে তিনি সহজে কাপড় বুনিবার প্রণালী শিক্ষা দেন। তাঁহার বাড়িতে সাত-আটখানা তাঁতে দেশী কাপড় বুনা হইত; চরকায় সূতা কাটাও হইত। ইহা স্বদেশী যুগের বহু পূর্ব্বের কথা। স্বদেশী আন্দোলনের সময় মহেন্দ্রবাবুর প্রতিষ্ঠানসমূহ দেখিবার জন্য ও স্বদেশী প্রচার করিবার জন্য শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ স্বদেশী নেতাগণ তাঁহার বাড়িতে আসিয়াছিলেন। ডাক্তার মহেন্দ্রচন্দ্রের তপস্বীজীবন ও তাঁহার কার্য্যাদি দেখিয়া অরবিন্দবাবু ও বিপিনবাবু অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতীক ও বঙ্গের টলষ্টয় বলিয়া অভিহিত করেন।

গত পঞ্চাশ বৎসরের উর্দ্ধকাল তিনি দেশী মোটা কাপড় পরিধান করিয়া গিয়াছেন; অন্য কোন কাপড় পরিতে তাঁহাকে দেখা যায় নাই। এইরূপ দৃষ্টান্ত সমস্ত ভারতবর্ষে বিরল।

তিনি তাঁহার পিতামাতার সমাধিস্থিত কুটীরে এবং তৎপরে নির্ম্মিত বৃহৎ মন্দিরের এক কোণে বাস করিয়া ধর্ম্ম-সাধন করিতেন। প্রতিদিন প্রাতে আরতি, কীর্ত্তন ও ব্রহ্মধ্যান না করিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। তিনি শোক, দুঃখ, ইত্যাদি কিছুতেই বিচলিত হইতেন না—পর্ব্বতের ন্যায় অটল স্থির থাকিতেন।

সাম্যভাব তাঁহার জীবনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন তিনি অতি পূর্ব্বেই করিয়াছিলেন। তাঁহার অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন মাত্র এক গ্লাস জল পানে পর্য্যবসিত হয় নাই। উৎসব-আদি উপলক্ষ্যে আগত নানা নিম্নজাতীয় লোককেও তাঁহার সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করিতে দেখা গিয়াছে—এখানে



পরলোকগত মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন বিচার ছিল না, অতি ঘৃণিত ব্যক্তিও তাঁহার নিকট আশ্রয়লাভ করিত।

তাঁহার একটি মহৎ কাজ—নির্য্যাতিতা পীড়িতা পরিত্যক্তা বহু নারী আসিয়া তাঁহার নিকট আশ্রয়লাভ করিয়াছেন ও শান্তি পাইয়াছেন—সমাজ ও আত্মীয়স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা বহু নারী তাঁহার আশ্রয়ে আসিয়া উচ্চতর আদর্শে জীবনযাপন করিয়াছেন। এই প্রকার নারীদের অনেককে তিনি ধর্ম্মানুষ্ঠান-অনুযায়ী বিবাহ দিয়াছেন এবং তাঁহারা সাধুজীবন যাপন করিতেছেন। অধুনা এইরূপ নারীদের জন্য আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহাদের জন্য কোন আশ্রম ছিল না।

তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁহার বাড়ির সংলগ্ন একস্থানে "মহেন্দ্রচন্দ্র অনাথ আশ্রম" নামক একটি প্রতিষ্ঠান শীঘ্রই স্থাপিত হইবে।



বাংলা

বঙ্গে নারী-হরণ—

নারী-হরণ সমাজের একটি কলঙ্ক। ইহা দূর করিতে হইলে এই ব্যাধি কতটা আমাদের আক্রান্ত করিয়াছে তাহার সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নোত্তরে সরকার পক্ষ হইতে হিন্দু নারী-হরণের এইরূপ ফিরিস্তি দেওয়া হইয়াছে,—

বর্দ্ধমানে ১৯২৯ সনে ৬টি, ৩০ সনে ৭টি ও ৩১ সনে ৬টি; বীরভূমে যথাক্রমে ৫, ৯ ও ২টি; বাঁকুড়ায় ০, ৫ ও ৫টি; মেদিনীপুরে ২০, ১৭ ও ১১টি; হুগলীতে ৩১, ১৯ ও ১৪টি; হাওড়া ৮, ২৩, ১৪টি; ২৪ পরগণা ৪৬, ৪৩, ৩৮টি; নদীয়া ৮, ৮, ৭টি; মুর্শিদাবাদ ০, ৬, ৮টি; যশোহর ৪, ১১, ৯টি; খুলনা ১০, ৯, ১৩টি; ঢাকা ৪, ৪, ১টি; ময়মনসিংহ ৪৩, ২৮, ৪৪টি; ফরিদপুর ১৩, ৯, ৭টি; বাখরগঞ্জ ১৯, ২৫, ১৫টি; রাজসাহী ১, ২, ২টি; দিনাজপুর ৮, ৯, ১৩টি; জলপাইগুড়ি ১৪, ১২, ১৪টি; দার্জ্জিলিং ৩, ৯, ৪টি; রংপুর ২৩, ২৩, ২৮টি; পাবনা ৯, ৫, ৬টি; বগুড়া ৩, ৮, ৫টি; মালদহ ১৬, ৬, ৬টি; চট্টগ্রাম ১০, ৮, ৪টি; নোয়াখালী ০, ০, ০; ত্রিপুরা ৪, ৪, ৬টি; পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ০, ০, ১টি ও কলিকাতায় ৫৯, ৫৩, ৫৫টি হিন্দু নারী অপহরণের মামলা হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত সংখ্যকরূপ মামলায় আসামীদের সাজা হইয়াছে:—

বর্দ্ধমানে ১৯২৯ সনে ০, ৩০ সনে ১ ও ৩১ সনে ১টি মামলায়; বীরভূমে ৩১ সনে ২টি মামলায়; বাঁকুড়ায় ৩০ সনে ১টি; ৩১ সনে ২টি মামলায়, মেদিনীপুরে যথাক্রমে ২, ৩, ২টি; হুগলীতে ২, ৪, ০টি; হাওড়াতে ৩, ৫, ১টি, ২৪ পরগণায় ১০, ১০, ৬টি, নদীয়ায় ১, ৪, ৪টি, মুর্শিদাবাদে ০, ৫, ৫টি; যশোহরে ২, ২, ৪টি; খুলনায় ১, ৩, ৩টি; ঢাকায় ৩, ১, ১টি; ময়মনসিংহে ১৬, ৮, ১৫টি; ফরিদপুর ০, ১, ১টি; বাখরগঞ্জে ৬, ৫, ২টি; রাজসাহীতে ০, ০, ১টি, দিনাজপুরে ১, ৫, ৩টি, জলপাইগুড়ি ১, ৩, ২টি, দার্জ্জিলিং ০, ৩, ২টি, রংপুর ৮, ৩, ২টি, পাবনা ৪, ২, ৪টি, বগুড়া ০, ১, ০টি, মালদহ ৪, ৩, ০টি, চট্টগ্রাম ১, ০, ০টি, নোয়াখালি ০, ০, ০টি, ত্রিপুরা ১, ৩, ০টি, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ০, ০, ০টি, কলিকাতা ৯, ৮, ৫টি মামলায় আসামীর সাজা হয়।

স্পেশাল জেল ও সত্যাগ্রহীদের সংখ্যা—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র জানান যে (১) দমদম স্পেশাল জেল (২) দমদম অতিরিক্ত স্পেশাল জেল, (৩) দমদম ২য় অতিরিক্ত স্পেশাল জেল, (৪) হিজলী অতিরিক্ত স্পেশাল জেল—আইন অমান্য আন্দোলনের ও সাধারণ বন্দীদের রাখিবার জন্য এই ৪টি জেল খোলা হইয়াছে। ১৯৩২ সনের ২৩এ জুলাই ঐ ৪টি স্পেশাল জেলে যথাক্রমে ৭৮৫, ৬৫৭, ৭২৩ ও ১,৯৮৭ জন বন্দী ছিল। ঐ ৪টি জেলে সর্ব্বোচ্চ বন্দী সংখ্যা যথাক্রমে ৯৬০, ১,১৫৪, ৯১৫ ও ২,০৫১ জনে দাঁড়াইয়াছিল, তন্মধ্যে যথাক্রমে ৭৬৪, ৮০, ১৮৮ ও ১,৭২৪ জন জেল-বিধি ভঙ্গের অভিযোগে দণ্ডিত হইয়াছিল।

বাংলায় বিদেশী জিনিষের কাট্‌তি—

জিনিস	১৯৩০-৩১		১৯৩১-৩২	
	কোটি	লক্ষ টাকা	কোটি	লক্ষ টাকা
বস্ত্র শিল্প	৷	৬৫	৫,	২৩
তৈল	২	৪১	২,	৩৯
কলকব্জা	৫	৩১	৩,	১১
ধাতু	৫	১০	২,	৭০
চিনি	৲	৯২	১,	৯১
রাসায়নিক	১	০৪		১৯
মসলা	১	৩৩		৯৫
খাদ্যদ্রব্য	১	০৩		৮৬
কাগজ				
মদ্য ও স্পিরিট				
মোটরগাড়ী	১			
ভৈষজ এবং ঔষধ				
লবণ		৮২		৫৮
খাদ্য শস্য	১	১		৫১
তামাক		৫৩		৩৯
কৃত্রিম রেশম		৩৮		৩৭
কাচ ও কাচের জিনিষ		৪৯		৩৪
চা		৪৩		৩৩
বুট ও জুতা		৩৯		৩১
পশমী জিনিষ		৫৬		৩০
জীবজন্তু		৭		৩
রেশমী জিনিষ		২৭		২২
রং ও কষ		৩০		২১
পোষাক		২৫		১৯
ছাতা		১৬		১৯
প্রসাধন		১৬		১৩
সাবান		১৭		১৩
বেল্টিং		৩০		২৭
পশম		৯		১২
পুতুল ও খেলার জিনিষ		১৫		১২
চর্ম্ম		১৯		১০
ফিতা ও লেস প্রভৃতি		১৯		১০
তুলা		১৭		১০
অন্যান্য জিনিস	১,	৭৭	১,	২৬

মানভূমে শিক্ষার অবস্থা—

শ্রীযুত রামানুজ কর লিখিয়াছেন—মানভূম জেলার ডেপুটী কমিশনার রায় চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর গত ১০ই শ্রাবণ পুরুলিয়ার শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই উপলক্ষ্যে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক সভা আহূত হয়, তাহাতে পুরুলিয়া শহরের সকলশ্রেণীর লোক উপস্থিত ছিলেন। সহযোগী অসহযোগী সকলেই এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। শহরের অতি নিকটে প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর এই বিদ্যালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের চারিদিকে উন্মুক্ত স্থান, হাতা প্রাচীর দিয়া ঘেরা। পুরুলিয়ার শ্রীযুক্ত হরিপদ দাঁ দশ হাজার টাকা ব্যয়ে এই বিদ্যালয়-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। বিদ্যালয়টি তাঁহার মাতৃদেবীর নামে উৎসর্গ হইয়াছে। তাঁহার জননী বর্ত্তমান। বিদ্যালয়ে ৫ জন মহিলা শিক্ষয়িত্রী আছেন তন্মধ্যে একজন কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণা। বর্ত্তমানে ছাত্রী সংখ্যা ১৫০, শীঘ্রই ইহা মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইবে। ছাত্রীদিগকে বাটী হইতে আনিবার জন্ত একটা বাস আছে। পুরুলিয়া মিউনিসিপালিটি এই বিদ্যালয়ে মাসিক ১৬০৲ টাকা সাহায্য করেন।

শিক্ষয়িত্রীদিগকে ভাড়াটীয়া বাটীতে থাকিতে হয়। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শিক্ষয়িত্রীদের আবাসগৃহ নির্ম্মিত হইবে এজন্ত সভাপতি চারু-বাবু সকলকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে অনুরোধ করিলে সভাস্থলে ৪৪৫৲ টাকা প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। সভায় অনেক উকিল মোক্তার উপস্থিত ছিলেন কিন্তু কেহই এক পয়সাও সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত না হওয়ায় সভাপতি চারু-বাবু অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন যে, দেশের রাজনীতি, শিক্ষাপ্রভৃতি সকল কাজেই উকিলসম্প্রদায় অগ্রণী হন কিন্তু এখানে তাহার ব্যতিক্রম দেখিতেছি। পরে সরকারী উকিল রায় অম্বুজাক্ষ সরকার বাহাদুর উকীল সম্প্রদায়ের দোষস্খালনের জন্ত ২৫৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় চারু-বাবু তাহা সভায় ঘোষণা করিলে প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত ললিতকিশোর মিত্র বলিলেন যে অম্বুজাক্ষ বাবু উকিল নহেন, তিনি সরকারি উকিল !!

শহরে মিশনরীদের পরিচালিত একটি বালিকা বিদ্যালয় আছে কিন্তু তাহাতে কোন হিন্দু বালিকা পড়ে না। এ জেলার বাঙালী বালিকাদের জন্ত কোথাও মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় নাই।

মানভূম জেলার পরিমাণ ৪১৪৭ বর্গমাইল। ১৯৩১ সনে এ জেলার লোক সংখ্যা ১৮,১০৮৯০ জন গত দশ বৎসরে ২৬২১১৩ জন বৃদ্ধি হইয়াছে। বর্ত্তমান বাংলা প্রেসিডেন্সির বাহিরে কিন্তু প্রকৃত বঙ্গদেশের অন্তর্গত শ্রীহট্ট ব্যতীত আর কোন জেলায় এত বাঙালী নাই। ১৮৭২ সনে এ জেলার লোক সংখ্যা ৮২০৫২১ ছিল। লোক গণনার প্রত্যেক বারেই এ জেলায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৯১১-২১ সালে কেবল মাত্র ১২০১ জন বৃদ্ধি হইয়াছিল। প্রতিবেশী বাঁকুড়া জেলার তুলনায় এ-জেলা সমৃদ্ধিশালী। বাঁকুড়া জেলায় যে আবাদী জমি আছে তাহাতে ভালরূপ ফসল জন্মিলেও এ-জেলার অধিবাসীদের শতকরা ৪৮ জনের মাত্র দুই বেলা অন্নের সংস্থান হয়। ইহার উপর আবার এ-জেলা হইতে বৎসরে ৬।৭ লক্ষ মন চাউল বাহিরে রপ্তানী হয়। জেলায় সুচারু রূপে আবাদ হইলেও সকল লোক দুই বেলা খাইতে পায় না। বাঁকুড়া জেলার লোক সংখ্যা ১১১১৭২১ জন। এ-জেলায় ১৭টি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে। মানভূম জেলায় মোট ৯টি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে। জেলাটি ৩১টি থানায় বিভক্ত, প্রত্যেক থানায় একটা করিয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হইলে ৩১টি বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হয়। মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩২ ; তন্মধ্যে ৬টি জেলাবোর্ডের দ্বারা পরিচালিত। ২৩টি জেলাবোর্ডের সাহায্য-প্রাপ্ত, তিনটি কোন সাহায্য পায় না। গভর্মেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় একটি নাই। সিংহভূম জেলায় মোট ১২টি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের মধ্যে ১টি গভর্মেণ্টের পরিচালিত ও ৯টি গভর্মেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত। জামশেদপুরে বালিকাদের জন্ত একটি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় আছে। চাইবাশায় মাড়োয়ারীরা একটি মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। মানভূম জেলায় বাঙালীরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ১। এ-জেলার স্থায়ী বাসিন্দা ২। প্রবাসী বাঙালী। আদালতের আমলা উকিল মোক্তার ডাক্তার ব্যবসায়ী প্রভৃতির অধিকাংশ ভিন্ন জেলার লোক। ইহাদের সকলেই অবস্থাপন্ন। মাড়োয়ারী ও গুজরাটিরা যে-ভাবে এ-জেলায় বাস করিতেছে, ইহারাও সেই ভাবে এ-জেলায় বাস করিতেছেন। এ-জেলার উন্নতিতে ইহাদিগকে উদাসীন বলিলেও হয়। প্রবাসী বাঙ্গালীরা যদি এজেলাকে স্বদেশ মনে করিয়া এজেলার শিক্ষা-বিস্তারে মনোযোগী হইতেন তবে এ-জেলায় একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ ও একটি মেডিক্যাল স্কুল এবং বালিকাদের জন্ত একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় চলিত। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পূর্ব্বে মানভূম জেলার অধিকাংশ ছাত্র বাঁকুড়া কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। এখন ডাক্তারী পড়িতে হইলে পাটনা ও কটক যাইতে হয়। কলেজে পড়িতে হইলে হাজারীবাগ, রাঁচী ও কটক যাইতে হয়। বাঁকুড়া জেলায় ১৭টি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৫টি সাধারণের চেষ্টায় চলিতেছে। বাঁকুড়া জেলাবোর্ডের যাহা আয় মানভূম জেলাবোর্ডের আয় তাহার দ্বিগুণ। বাঁকুড়া জেলার পাঠশালার দরিদ্র শিক্ষকগণ জেলাবোর্ড ও গভর্মেণ্ট হইতে যে সাহায্য পান মানভূম জেলায় তদপেক্ষা বেশী সাহায্য দেওয়া হয়। পুরুলিয়ায় প্রাচীন উকিলদের আরও অনেক বেশী। ইচ্ছা থাকিলে তাহাদের একজনই একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ স্থাপন করিতে পারেন।

পুরুলিয়া উন্নতিশীল শহর। ১৮৭২ সালে এই শহরে লোক সংখ্যা ৫৬৯৬ ছিল। ১৯৩১ সনে ২৫৯৭৪ হইয়াছে। শহরে ২টি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে। তন্মধ্যে একটি সরকারী ; ছাত্রসংখ্যা ৩০০ বেসরকারী স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ৬০০। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভাটিয়াদের চেষ্টায় ঝরিয়া সহরে বালিকাদের জন্ত একটি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী ইহার দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন। মানভূম জেলায় উচ্চশিক্ষা বিস্তার করিতে হইলে বাঙালীদিগকেই চেষ্টা করিতে হইবে। এ-জেলার জমিদারদের অবস্থা স্বচ্ছল। ঝরিয়া ও কাতরাসগড়ের রাজা এক একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। পঞ্চকোটের রাজা এ জেলায় প্রধান জমিদার কিন্তু তাঁহার রাজধানীতে জেলাবোর্ডের সাহায্যপ্রাপ্ত মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় আছে। মানভূমের ডেপুটি কমিশনার বাঙালী ; গত চারি বৎসর তিনি এ জেলায় আছেন। তিনিও এ বিষয়ে উদ্যোগী হইলে ভাল হয়। হরিপদ-বাবু পুরুলিয়া সহরে হরিপদ সাহিত্যমন্দির ও একটি শিল্পাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। প্রবীণ উকিল বাঙালী ও জমিদারগণ তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে এ-জেলায় শিক্ষাবিস্তারে গভর্মেণ্টের সাহায্যের ভরসা করিতে হয় না।

চক্ষু-চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান—

শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এস্‌সি পরীক্ষা পাস করিয়া বিলাত যান। সেখানে বৎসর দেড়েক পড়িয়া চশমার ডিপ্লোমা লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং লিন্‌ডসে ষ্ট্রীটে চসমার দোকান করেন। তিনি চার বৎসর যাবৎ বেশ কৃতিত্বের সহিত উহা পরিচালনা করিতেছেন। সম্প্রতি কয়েক জন চক্ষুচিকিৎসকের সহিত মিলিত

হইয়া তিনি একটি অপ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউট অর্থাৎ চক্ষুচিকিৎসার প্রতিষ্ঠান খুলিয়াছেন। ইহার দ্বারা দেশের যুবকদের আয়ের একটা পথ খুলিয়া যাইবে, যদ্দারা তাহারা জীবিকা অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকেরও কিছু উপকার করিতে পারিবে এবং সাহেব কোম্পানীদের অতিরিক্ত দাবি হইতে দরিদ্র চক্ষুরোগীদিগকে মুক্তি দিতে পারিবে।

পরলোকে নগেন্দ্রবালা—

ধান্যকুড়িয়ার প্রাতঃস্মরণীয় দানবীর স্বর্গীয় শ্যামাচরণ বল্লভ মহোদয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ, এম, এল, সি মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী নগেন্দ্রবালা দাসী গত ১৩ই ভাদ্র সোমবার ৪১ বৎসর বয়সে



স্বর্গীয়া নগেন্দ্রবালা দাসী

হৃদ্‌রোগে অকস্মাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি একদিকে যেমন পরোপকারপরায়ণা ছিলেন, অন্যদিকে তেমনই সৌজন্য, বিনয় ও মিষ্টালাপাদি দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করিতেন। অন্নবস্ত্রাদি দ্বারা বিধবার প্রতিপালন, নানারূপ সাহায্যদ্বারা কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তির দায়-মোচন, দরিদ্র-নারায়ণগণকে অন্নপ্রদান, ভিখারীর অভাব-মোচন, ঔষধ, পথ্য ও পরিচর্য্যাদি দ্বারা রোগীর রোগ-মোচন, বিদ্যাশিক্ষার্থে ছাত্রগণকে সাহায্যপ্রদান, বালিকাগণকে হিন্দুধর্ম্মোচিত সুশিক্ষা প্রদান প্রভৃতি হিতকর কার্য্যসমূহই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু-আচারের প্রতি তিনি বিশেষ অনুরাগিণী ছিলেন—পল্লীস্থ রমণীগণকে লইয়া ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও ধর্ম্মকথার আলোচনা করিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন। বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী লোকের পত্নী হইয়াও তিনি নিতান্ত নিরহঙ্কার ও নিরভিমান ছিলেন। তাঁহার নিজের সন্তানাদি না থাকিলেও, তিনি অনেকেরই জননী ছিলেন—তাঁহার বিয়োগে অনেকেই আজ মাতৃহারা হইল। ধান্যকুড়িয়া গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করাইয়া সকলের ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রবাবু নিজ গ্রামে ইহার স্মরণার্থ স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য ১০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

সন্তরণবীর রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—

শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গত ১০ই সেপ্টেম্বর প্রাতে ৭টার সময় এলাহাবাদের আকাল ট্যাঙ্কে সন্তরণ আরম্ভ করিয়া ১৩ই সেপ্টেম্বর প্রাতে ৮টার সময় সন্তরণ শেষ করেন। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী সময় যাঁহারা সন্তরণ করিয়াছেন তাঁহাদের অপেক্ষা তিনি ২৪ মিনিট বেশী সাঁতার কাটিয়াছেন। বহু সহস্র দর্শক ও জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জেনস্ এবং অপরাপর কর্ম্মচারিগণ সন্তরণকালে উপস্থিত ছিলেন।

মোটর-বিদ্যায় শ্রীযুত নিরঞ্জন সরকার—

শ্রীযুত নিরঞ্জন সরকার পাঁচ বৎসর কাল বিলাতে থাকিয়া মোটরের যন্ত্র সম্পর্কীয় যাবতীয় বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া সম্প্রতি দেশে



শ্রীযুত নিরঞ্জন সরকার

ফিরিয়া আসিয়াছেন। আজকাল দেশে মোটরের যেরূপ অত্যধিক চলন হইয়াছে তাহাতে ইহা শিক্ষা করিলে অনেক বেকার লোকের অর্থ সংস্থান হইতে পারে। সরকার মহাশয় তাঁহার কার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন আশা করি।

কৃতী মুসলমান বাঙালী—

মৌলবী আব্দুর রহিম, এম-এ, বি-টি মহাশয় পাবনা হইতে বিগত

১৯৩০ সনের আগষ্ট মাসে সরকারী বৃত্তি লইয়া 'শিক্ষা' সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্ত বিলাত গমন করেন। সেখানে তিনি লীড্‌স্‌ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষা সম্বন্ধীয় ডিপ্লোমা ও অকস্‌ফোর্ড



মৌলবী আবদুর রহিম, এম-এ, বি-টি,

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সার্টিফিকেট লাভ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, প্যারিস, বার্লিন প্রভৃতি স্থানে গিয়া সেখানকার শিক্ষা সম্বন্ধেও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার উন্নতি কামনা করি।

পরলোকে হিন্দু নারী—

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুত বাহাদুর সিং সিংঘি মহাশয়ার স্ত্রী সংপ্রতি কলিকাতার বাটীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৭ বৎসর হইয়াছিল। তিনি ধর্ম্মপরায়ণা ও অমায়িক নারী ছিলেন। বিপন্নকে সাহায্য করা তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তিনি সাধারণের উপকারার্থ দশ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

—

ভারতবর্ষ

স্বদেশী শিল্পপ্রচেষ্টা—

ভারত কার্ব্বন ও রিবন ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোম্পানী নামে করাচীতে একটি স্বদেশী 'কার্ব্বন' ও 'রিবন' তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদেশী 'কার্ব্বন' ও 'রিবন' দীর্ঘকাল যাবৎ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। তাহার তুলনায় এই দেশী কার্ব্বন ও রিবন ততটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও কাজ চালাইবার পক্ষে ইহা যথেষ্ট ভাল হইয়াছে। মূল্যও বিদেশী কার্ব্বন ও রিবন অপেক্ষা বেশী নহে। স্বদেশী শিল্পসংরক্ষণের দিনে এইরূপ প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা অনেক এবং যাহাতে এই প্রতিষ্ঠানটি উত্তরোত্তর সর্ব্বাঙ্গীন পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে সে বিষয়ে দেশবাসী সকলের সমবেত চেষ্টা ও আগ্রহ আবশ্যক।



স্বর্গীয় চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

গত ভাদ্র সংখ্যায় (পৃঃ ৭১৯) স্বর্গীয় চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

বিদেশ

স্যর রোনাল্ড রস্‌—

ম্যালেরিয়া বিশেষজ্ঞ স্যর রোনাল্ড রস গত ১৬ই সেপ্টেম্বর বিলাতে পরলোকগমন করিয়াছেন।

কর্নেল স্যর রোনাল্ড রস্‌ ১৮৫৭ সনের ১৩ই মে ভারতবর্ষে আলমোড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সরকারী ডাক্তারী বিভাগে প্রবেশ করিয়া ১৮৮১ সনে মাদ্রাজ যান। ১৮৯০ সনে বাঙ্গালোর অবস্থানকালেই ম্যালেরিয়া রোগের বীজ-অনুসন্ধানের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং গবেষণা করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৯৭—৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ম্যালেরিয়া জীবাণুর সন্ধান পান এবং ইহাদের 'জীবন-ইতিহাস' আবিষ্কার করেন। ১৯০২ সালে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে গবেষণার জন্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানজনক 'নোবেল প্রাইজ' লাভ করেন। ১৯২৩ সনে তাঁহাকে এলবার্ট মেডেল দেওয়া হয়। তৎপরে স্যর রোণাল্ড রসের সম্মানার্থ লণ্ডনে 'রস্‌ ইনষ্টিটিউট' নামক চিকিৎসা ও গবেষণার জন্ত একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ম্যালেরিয়া-সংক্রান্ত গবেষণা ও চিকিৎসার জন্ত তিনি ভারতবর্ষ, যাভা এবং প্রাচ্যের অনেক দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং তাঁহার পরিশ্রম ও ব্যবস্থার গুণে বহুস্থান ম্যালেরিয়াশূন্ত হইয়াছে।

পুস্তক পরিচয়

রাশিয়ার দুর্গেশনন্দিনী—(পুস্কিন্) অনুবাদক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বাগচী, এম্-এ, মডার্ণ বুক এজেন্সি, ১০ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

দুর্গেশনন্দিনীর সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় আজ সত্তর বৎসরেরও অধিক। সেই পরিচয় রাশিয়ার দুর্গেশনন্দিনীতে আরও নিবিড় হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মত এখানেও গড়ের ভিতর দেখা, দুর্গেশনন্দিনী ও তরুণ যোদ্ধার মধ্যে প্রেমানুরাগসঞ্চার, দুর্গাধিপতির প্রাণদণ্ড ইত্যাদি ঘটনা-পরম্পরার সূত্রপাত সবই আছে। মূল ঘটনা অষ্টাদশ শতাব্দীর, ১৭৭৩ খ্রীঃ পুগাচেফের বিদ্রোহ; পুস্কিনের রচনাবলীর মধ্যে এই উপন্যাসখানাই ১৮৫৯ খ্রীঃ ইংরেজী ভাষায় সর্ব্বপ্রথমে পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। 'রাশিয়া' নাম দেখিয়াই বাঙালী পাঠক যেন অন্যরূপ না মনে করেন। বইখানি নিতান্তই উপন্যাস। ইহাতে রাশিয়ার জনজাগরণের কোনও ছায়া নাই, যেটুকু আছে তাহা দূরাগত ধ্বনির ন্যায় অস্পষ্ট। কিন্তু গল্প হিসাবে ইহা বড়ই উপভোগ্য। মনস্তত্ত্বের জটিল তর্ক কি কোনও সমাজ-সমস্যা আসিয়া ইহার স্বচ্ছন্দ-প্রবাহ কোথাও এতটুকু ব্যাহত করে নাই। ইংরেজী শিক্ষিত পাঠক ইহাতে স্কটের Heart of Midlothian-এর প্রভাব দেখিতে পাইবেন, স্কটের উপন্যাসের মত রাশিয়ার দুর্গেশনন্দিনীও দেশের রাণীর নিকটে গিয়া অসঙ্কোচে নির্দ্দোষী প্রণয়ীর জন্য রাজদণ্ড হইতে মুক্তি প্রার্থনা করিতেছেন।

অনুবাদ অতি সুন্দর হইয়াছে; ভাষার কোথাও জড়তা নাই, তাহা আপনার পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। অনুবাদ পড়িতেছি বলিয়া মনে হয় না। প্রতি পরিচ্ছেদের উপরের পদ্যানুবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিদেশী শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের এইরূপ অনুবাদে বঙ্গভাষার উন্নতি হইবে। ছাপা, প্রচ্ছদপট, বাঁধাই—মুদ্রাকরের কৃতিত্বের পরিচয়।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

অন্ধপ্রেম—শ্রীশরচ্চন্দ্র মজুমদার। বরেন্দ্র লাইব্রেরী। ২০৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্। পৃঃ সং ১০৭। দাম পাঁচ সিকা।

এখানি উপন্যাস। একটি ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী। বিশেষ কোনো নূতনত্ব নাই। লেখকের চরিত্র-চিত্রণের ক্ষমতা আছে। কুমুদিনীর চরিত্রে লেখক সে অঙ্কন-পটুতার পরিচয় দিয়াছেন।

পুস্তকের ভাষা ঝরঝরে, স্থানে স্থানে লিপিকৌশলের পরিচয় আছে। কাগজ ও ছাপা সুন্দর। বাঁধাইয়ের দিকে প্রকাশক আর একটু দৃষ্টি দিলে ভাল করিতেন।

লোকারণ্য—শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং। ১১ নং কলেজ স্কোয়ার। পৃঃ সং ২৭৮। দাম আড়াই টাকা।

লেখকের নাম উপন্যাস-পাঠকের নিকট অপরিচিত নহে। ইঁহার 'বিদ্যুৎ লেখা' সমালোচনার সময়ে আমরা যে-কথা বলিয়াছিলাম, বর্ত্তমান উপন্যাসখানি সম্বন্ধেও সে-কথাগুলি খাটে। লেখকের উপন্যাসগুলির মূলে একটা উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন থাকে—প্রচ্ছন্ন বলিলে ভুল হইবে, অনেক সময়ে সে উদ্দেশ্যটি এত পরিস্ফুট যে, দুই-তিনটা পরিচ্ছেদ পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই সেটা ধরা যায়। ইহাতে পুস্তকের শিল্পগৌরব ক্ষুণ্ণ না হইয়া পারে না। তা ছাড়া, লেখক মানুষ সৃষ্টি করেন না; করেন কতকগুলি 'টাইপে'র সৃষ্টি। তাহারা সুনির্দ্দিষ্ট পথ বাহিয়া দিব্য নির্ব্বিবাদে চলে, তাদের সম্বন্ধে পাঠকের মনে বিশেষ কোনো কৌতূহলের উদ্রেক হয় না। একমাত্র সুপ্রভার চরিত্র ছাড়া পুস্তকখানির অন্যান্য চরিত্রগুলির সম্বন্ধে এই কথাই বলা যায়। লেখকের ভাষা সুন্দর, সংযমও প্রশংসনীয়, situation গঠনেও তিনি পটু। কি করিয়া ঘটনাকে ঘোরালো করিয়া তোলা যাইতে পারে তাহা তিনি জানেন। কিন্তু অনেক সময়ে তাহা আবার বাস্তবের সীমা ছাড়াইয়া যায় বলিয়া পাঠকের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া উঠে—যেমন এই উপন্যাসের শেষের দিকে শান্তির আত্মবিসর্জ্জনের ঘটনাটি। বইয়ের ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ খুব ভাল। সে অনুপাতে মূল্য বেশী বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অজয়কুমার—শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু প্রণীত। প্রকাশক এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স; দাম এক টাকা।

অজয়কুমার ছেলেদের জন্য লেখা নূতন ধরণের একখানি উপন্যাস। এই লেখাটি কিছুদিন আগে মাসের পর মাস ধরে মৌচাকে যখন বেরুতো আমরা কি আগ্রহেই না পড়তুম। সহায়-সম্পদহীন চোদ্দ বছরের একটি ছেলে কি ক'রে জাহাজে পালিয়ে ইউরোপে গেল, তারপর নানা ঘটনায় নিজের ধৈর্য্য, সাহস ও বীরপনা দেখিয়ে কতকগুলি বিশিষ্ট লোকের কি ক'রে সে একেবারে আপন-জন হয়ে গেল,—তার সে-সব বাহাদুরীর কথা পড়তে পড়তে যে-কোন বাঙালীর মন আনন্দে ও গর্ব্বে ভরে উঠবে। বইখানি পড়ে ছেলেরা ও-দেশের অনেক বিষয় জানবে—অজয়কুমারের ভেতর এমন-সব জিনিষ তারা পাবে, যা তারা সচরাচর আর কারও মধ্যে পায় না। এতে একটি বড় কথা এই পাই যে, সহায়-সম্পদ না থাকলেও কিছু আসে যায় না; যার সাহস আছে, আত্মমর্য্যাদাবোধ আছে—তার সকল দেশে, সকলের মাঝে, একটি বিশিষ্ট স্থানও আছে। সাহসে ও বীরত্বে আমাদের প্রত্যেক ছেলে যেন অজয়কুমারের মতই হয়।

ছন্দ-ঝুমঝুমি—শ্রীসুনির্ম্মল বসু প্রণীত। প্রকাশক—এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স; দাম আট আনা।

ছন্দ-ঝুমঝুমিতে আছে ছোটদের জন্য লেখা অনেকগুলি ছোট ছোট কবিতা,—যা পড়ে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা খুবই আনন্দ পাবে, আর হয়ত বা সেই সঙ্গে তাদের মনে কবিতা রচনার একটি সহজ প্রেরণাও আসবে। সুনির্ম্মলবাবু একজন ওস্তাদ শিল্পী। ছোটদের জন্য নূতন নূতন পরিকল্পনা এনে কি ক'রে তাদের মনোরঞ্জন করতে হয়, আর সেই সঙ্গে কি ক'রে তাদের শিক্ষাবিধান করতে হয়, তা তিনি ভাল

ক'রেই জানেন। ছন্দ-ঝুমঝুমিতে ছোটরা আমোদও পাবে প্রচুর আর শিখবেও অনেক।

বইখানির প্রচ্ছদপটটি সুন্দর। ভেতরেও অনেকগুলি ছবি আছে। ছাপা ও বাঁধাই পরিষ্কার।

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

সীঁথি-মৌর—শ্রীরাধারাণী দেবী প্রণীত এবং ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে ইহার বাঁধাই। সত্যিকার সীঁথি-মৌর দিয়া বইখানি বাঁধান। ছাপা, কাগজ ভাল। এক পৃষ্ঠায় লাল কালিতে ছাপা কবিতা, আর-এক পৃষ্ঠায় রূপালি কালিতে মুদ্রিত আল্পনা। চৌত্রিশটি চতুর্দ্দশপদী কবিতার সমষ্টি।

শ্রেয় যাহা বুঝিয়াছি আপনার মনে,
নির্ভয়ে নিয়েছি তুলি নিষিদ্ধ সে দান।

কবিতাগুলির ভিতর আন্তরিকতা আছে।

আমারে দিয়েছ তুমি বহু দুঃখ রাশি,
নিঠুর! তোমারে আমি তবু ভালবাসি।

অথবা—

যে ছিল পাতালপুরে চিরনিদ্রালীনা,
সে আজি আলোকরাজ্যে সিংহাসনাসীনা।

অথবা—

শুধায়োনা কোনো প্রশ্ন,—শুধু তব হিয়া
রাখি মোর হিয়া 'পরে লহো তা পড়িয়া।

—প্রাণের সাড়া আছে।

কবিতাগুলি সাহিত্যরসিকের উপভোগ্য হইবে।

বিপ্লবী নায়িকা—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত এবং ৩০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, যুগান্তর বাণী ভবন হইতে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ সিকা।

ইহাতে কুড়িটি কবিতা আছে। ছাপা, বাঁধাই, কাগজ ভাল। প্রচ্ছদপটে শৃঙ্খলিতা তরুণীমূর্ত্তি। অন্ধকারের ভিতর দিয়া সন্ধানী আলোর ছটা আসিয়া তাহাকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। এই শক্তিশালী লেখকের লেখা পড়িয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি। রচনায় মৌলিকতা আছে।

কোথায়—বাসক রাতি
রক্ত অধরে চুম্বন কই?—মিলন-শয্যা-সাথী?
আজ নেমেছে অন্ধকার,
মানসী আমার বন্দিনী হোলো, হাতে শৃঙ্খলভার!

যাঁহারা গীতিকবিতা বলিতে একমাত্র প্রীতি-কবিতাই বুঝেন, তাঁহাদের জানা উচিত—জীবন বৈচিত্র্যহীন নয়, ভাব অসংখ্য, অনুভূতি অনন্ত।

মানবমনের সিন্ধুশিয়রে ক্রন্দন শুনি কার?
বহুদূর হ'তে কে ডাকিছে আজ দীপান্তরের পার?
না ফুটিতে ওগো সন্ধ্যার যুঁই;
ঘরের প্রেয়সী, ঘুমালি কি তুই,
কমলের চোখে ঘনালো কি ছায়া, মেঘের অন্ধকার?

চমৎকার।

প্রেয়সী, আজিকে ভালো নাহি লাগে অশ্রুসজল গান,
প্রেমক্রন্দনে বাহুবন্ধনে হাঁপায়ে উঠিছে প্রাণ।
... ...
বীর্য্যবিহীন এই কোমলতা ভালো আর নাহি লাগে!

কবি সম্ভবত নবীন। স্থানে স্থানে অসংযম আছে। কিন্তু ক্লিন্ন কামনা এবং স্নেহ মোহের আতিশয্য নাই। অসংযত উচ্ছ্বাসের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে পৌরুষপূর্ণ কবি-প্রতিভার সহসা সাক্ষাতে মন মুগ্ধ হয়।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

আমিষ ও নিরামিষ আহার—আমিষ বিভাগ। তৃতীয় খণ্ড। নূতন সংস্করণ। শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী প্রণীত ও প্রকাশিত এবং কলিকাতার গুরুদাস চাটার্জ্জি এণ্ড সন্সের দোকানে প্রাপ্তব্য। ডবল ক্রাউন ষোল-পেজি, ৭০১ পৃষ্ঠা। বোর্ড বাঁধাই, মূল্য ৩৲ টাকা।

"আমিষ ও নিরামিষ আহার" প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। বাংলা দেশে ইহার আদর হইয়াছে, নূতন সংস্করণ প্রকাশেই তাহার প্রমাণ। রন্ধন বিদ্যার প্রতি লেখিকার গভীর অনুরাগ ও বিপুল অধ্যবসায়ের ফলে এই গ্রন্থের উদ্ভব।

আলোচ্য গ্রন্থে ৮১৮ প্রকার খাদ্যপ্রস্তুত-প্রণালী স্থান পাইয়াছে। যেমন, নানাবিধ সুপ, মাছ, সস্ এবং গ্রেভি, শাকসব্জী, ষ্টু, চপ্, কাটলেট, কোপ্তা, কাবাব, কারী, পোলাও, পুডিং, পানীয় ও ঠাণ্ডা ক্রিম, জেলী, চা, কেক, স্যাণ্ডউইচ ইত্যাদি। ভূমিকায় লেখিকা বলিয়াছেন—"আমাদের দেশের লোকেরা প্রধানতঃ নিরামিষাশী এবং য়ুরোপীয়েরা প্রধানতঃ আমিষাশী। আমিষ-খণ্ডে সেই কারণে বেশীর ভাগ য়ুরোপীয়দিগের খাদ্যপ্রস্তুত-প্রণালী তাহাদের বিভাগানুসারে দিতে বাধ্য হইয়াছি। অবশ্য ইহাতে অনেক দেশীয় খাদ্যও স্থান পাইয়াছে। এমন অনেক খাবার ইহাতে আছে, যাহারা মূলে দেশীয়, কার্য্যতঃ বিদেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

সকল দেশের মেয়েদের মধ্যেই রন্ধনবিদ্যার আদর। ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি উন্নত দেশে মেয়েদের বিদ্যালয়ে রন্ধন শিক্ষার উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত আছে, আমাদের দেশে তেমন কিছু নাই। এখানে মেয়েরা গৃহে প্রাচীনাদের কাছে অথবা নিজের চেষ্টায় কাজ-চালান-গোছ রান্না শিখিয়া থাকেন। এরূপ একখানি বই হাতের কাছে পাইলে বঙ্গবালার বিশেষ সুবিধা। রন্ধনে যাঁহারা পটু এবং যাঁহারা শিক্ষার্থী সকলেই এই পুস্তকের সাহায্যে উপকৃত হইবেন।

বইখানির ভাষা সহজ, সরল, অক্লেশে বোধগম্য। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই উৎকৃষ্ট। বাঙালীর ঘরে ঘরে এই গ্রন্থ সমাদৃত হইবে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যৌবনের সাধনা—ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্-এ, পি-এইচ-ডি প্রণীত এবং 'যুগান্তর বাণী ভবন' কর্তৃক প্রকাশিত। ১০৮ পৃঃ, মূল্য এক টাকা।

ভারতকে একটা জাতিতে পরিণত করিতে হইলে আমাদের কি করা উচিত, সে-সম্বন্ধে এই গ্রন্থে অনেক নূতন কথা আছে। ভারতের—বিশেষতঃ বাংলার তরুণ-সমাজের ইহা অনুধাবন করা উচিত। ডাঃ দত্ত মনে করেন যে, এ দেশে এখন যে-সকল পরস্পর-বিদ্বেষ এবং অনৈক্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার একমাত্র মীমাংসা আমাদিগের জাতিকে



চেষ্টা করিয়া একটা 'ইনডাস্ট্রিয়াল' জাতিতে পরিণত করা। আমরা যে এখনও ধর্ম্মে। প্রভেদে বিভক্ত হইয়া আছি এবং রাষ্ট্রেও সে প্রভেদ কায়েম করিতে চাহিতেছি, এটা অত্যন্ত মধ্য-যুগীয় ভাব এবং ইহাতে আধুনিকতার একান্ত অভাব। নূতন আদর্শে রাষ্ট্রগঠন করিতে হইলে একমাত্র রাষ্ট্রীয় আদর্শ (political ideals) এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ (economic interests) ছাড়া আর কিছুর দ্বারা রাষ্ট্রের শ্রেণী-বিভাগ করা উচিত নয়। ইহাতেও শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংগ্রাম (class-war) ঘটিবে; কিন্তু ধর্ম্ম-গোষ্ঠীর সংগ্রামের (communal war) চেয়ে ইহা বরং ভাল; এবং ইহার ভিতর দিয়া অচিরে উচ্চতর আদর্শে উপনীত হওয়া যায়।

যুবক-আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপ কি এবং এদেশে তাহা আছে কি না এবং না থাকিলে কিরূপে তাহা আসিতে পারে, এই প্রশ্নও এই গ্রন্থের অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

গ্রন্থকারের সোসিওলিজমের দিকে ঝোঁক স্পষ্ট। এইখানে সকলে তাঁহার সহিত একমত হইবেন কি না সন্দেহ। কিন্তু তাহা না হইলেও বইখানা সকলেরই পড়িয়া দেখা উচিত; ইহাতে যে গভীর জ্ঞান, প্রগাঢ় চিন্তাশীলতা, একনিষ্ঠ স্বদেশপ্রেম এবং মানবের প্রতি বিরাট সহানুভূতি রহিয়াছে, তাহা সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে।

বইখানা ছাত্র ও তরুণদের জন্যই বিশেষ করিয়া উদ্দিষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা ইহা পড়িয়া লাভবান্ হইবেন, সন্দেহ নাই। আমরাও ইহা পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি।

মধ্যে মধ্যে মুদ্রাকর-প্রমাদে বইখানার সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়াছে। মোটের উপর ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভাল।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কাব্যরেণু—শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীহরিদাস দত্ত, ১নং শিকদারপাড়া লেন, কলিকাতা। মূল্য চারি আনা।

সেকেলে ছন্দে কবিতাগুলি রচিত। কবিতা না বলিয়া পদ্য বলা চলে। বর্ত্তমান সাহিত্যক্ষেত্রে এই শ্রেণীর গ্রন্থের আদর না হইলেও প্রাচীন যুগের পদ্যের প্রতি যাঁহাদের প্রীতি আছে, তাঁহাদের নিকট এই গ্রন্থ অনাদৃত হইবে না।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

সুরহারা—শ্রীঅজিতকুমার সেন, এম-এ রচিত কবিতার বই; কবিতাগুলি বিভিন্ন ছন্দে লেখা। ইংরেজ কবি কোলরীজের একটি কবিতা অজিতবাবু বাংলা ছন্দে গাঁথিয়াছেন—ভালই হইয়াছে। অন্যান্য কবিতা চলনসই।

রাজ্যশ্রী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রণীত। দাম আট আনা। বঙ্কিমবাবু বাংলা-সাহিত্যে সুপরিচিত। তিনি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর একটি প্রাচীন গাথা অবলম্বনে বালকবালিকাদের পাঠোপযোগী করিয়া এই বইখানি লিখিয়াছেন। ভাষা সুমধুর। ছাপাও ভাল। প্রচ্ছদপট পুস্তকের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে।

কৃতদাসের আত্মকাহিনী—শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং হইতে প্রকাশিত। মূল্য দশ আনা। নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর বুকার, টি, ওয়াশিংটনের আত্মজীবনী 'Up from Slavery'র বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ কষ্টনিষ্ঠ নহে—বেশ প্রাঞ্জল। কর্ম্মবিমুখ বাঙালী সমাজে ইহার বহুলপ্রচার কামনা করি।

চন্দ্রেশ্বর

অন্তরাগ—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীঅজিত শ্রীমানী। আর, এইচ, শ্রীমানী এণ্ড সন্স, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লেখক বাংলা-সাহিত্যে সুপরিচিত। একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের শক্তিসম্ভার প্রায় সবই তাঁর আয়ত্ত; তাই নিছক আর্টের দিক দিয়া দেখিলে বইখানিকে উচ্চ অঙ্গের সৃষ্টি বলা চলে। রচনার দিক দিয়া যদি অল্প কিছু দোষ থাকে ত এক-এক বিষয়ে তাঁহার শক্তির প্রাচুর্য্যের জন্যই সেটুকু দাঁড়াইয়াছে, দীনতার জন্য নহে।

এক কথায় বইখানির দোষগুণের পরিচয় দিতে গেলে বলা চলে —তথাকথিত culture কিংবা sentimentality (কৃষ্টি বা নিছক ভাবপ্রবণতা) যদি কোনদিন ভ্রাতাভগ্নীর পবিত্র সম্বন্ধও শিথিলতা আনিতে পারে ত সেদিন "অন্তরাগ" একখানি প্রায় নিখুঁত বই বলিয়া গণ্য হইবে।

ছাপা, বাঁধাই, কাগজ সবই ভাল। মূল্য আড়াই টাকা।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহপদ্ধতি—আসামপর্য্যটক শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য আড়াই টাকা। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইতঃপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বিজয়বাবু বাংলায় আসামের সত্র প্রভৃতির বিষয়ে লিখিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি আসামের বিভিন্ন অংশের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের (বিশেষতঃ তথাকথিত নীচ জাতীয়) হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত বিবাহের স্ত্রী-আচার বা লৌকিক আচারের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়া অনুসন্ধিৎসু বাঙালী পাঠকের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। এই সকল আচারের কোন নির্দ্দেশ হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থে নাই—আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার প্রসারের ফলে এই সকল আচার ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, অথচ ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি সামাজিক ইতিহাসের দিক্ হইতে খুবই মূল্যবান্। তুলনামূলক আলোচনার সুবিধার জন্য বঙ্গীয় আচারের উল্লেখ করায় পুস্তকের গৌরববৃদ্ধি হইয়াছে। লেখকের রচনা একটু 'কেনান' এবং ভাষা স্থানে স্থানে দোষদুষ্ট। এই বিষয়ে তাঁহাকে ভবিষ্যতে সতর্ক হইতে অনুরোধ করি।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

পারস্য-ভ্রমণ

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

২২শে এপ্রিল দুইদল বেঁধে আমরা সিরাজ থেকে রওয়ানা হলাম। এবার সঙ্গে লোকজন চল্‌ল। কেননা একটানে এখান থেকে ইস্ফাহান যাওয়া শক্ত। পথের ব্যবস্থা করবার জন্য শিরাজের একজন রাজকর্ম্মচারী লোকজন সঙ্গে করে চল্‌লেন। আমি তাঁর গাড়ীতেই উঠলাম। এই ভদ্রলোকের নীল চোখ, কাঁচা পাটের মত চুল এবং কবির অভ্যর্থনার জন্য এসেছিলেন; আরবাব কৈখসরু শাহ্‌রোখ (ইরাণমেজলিসের—অর্থাৎ পার্লামেণ্ট—তত্ত্বাবধায়ক এবং বর্ত্তমান শাহের অতি বিশ্বস্ত রাজ-কর্ম্মচারী, ধর্ম্মে জরথুষ্ট্রী) সঙ্গে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শাহ্‌বেরাম ও শ্রীযুক্ত ফুরুখি। এঁরা তিনজন, বোম্বাইয়ের পার্সী-সম্প্রদায় ইরাণে কারবার ইত্যাদির সুযোগ অনুসন্ধান



পার্সিপোলিস। সম্মুখ হইতে সাধারণ দৃশ্য। পিছনের পাহাড়ে সমাধি-গুহা

লম্বা লালমুখ আমার টির্নথি গ্রীন নামে এক আইরিশ বন্ধুর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। মনে পড়ল আইরিশদের মধ্যে কিম্বদন্তী আছে যে, তারা বহুপূর্ব্বে ইরাণ বলে দেশে পাহাড়ের কোলে বাস করত। সেই ইরাণ থেকে ওদের দেশের নাম এরিণ হয়েছে এবং একথাও শুনেছিলাম যে, ওদের আদি ভাষায় (গেলিক) অনেক শব্দ আছে যা ইরাণে এখনও চল্‌তি। এ সকল প্রবাদের সত্য-মিথ্যা ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ বলবেন।

শহরের বাইরে একবার দাঁড়ান হ'ল। অনেক গণ্যমান্য লোক এসে বিদায় নিলেন। এবার আমাদের দল বেশ ভারী। টেহেরাণ থেকে দুজন সম্ভ্রান্তলোক করতে কয়েকজন পার্সীকে পাঠিয়েছিলেন তার একজন, শ্রীযুক্ত মাসানি—আমাদের আগের দল ত আছেই!

এদেশের পথঘাটের গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে অনেক উন্নতি হয়েছে। চার পাঁচ হাজার মাইল রাস্তা তৈরী হয়েছে, সেপাই পাহারায় যাতায়াতও নিরাপদ হয়েছে। কিন্তু এখনও বিদেশীর পক্ষে (অন্ততঃ এ অঞ্চলে) পথচলা অতি দুরূহ ব্যাপার। রাস্তা প্রায় সবই কাঁচা এবং গাড়ি ভেঙ্গে-চুরে গেলে সাহায্য পাওয়াও মুস্কিল। উপরন্তু খাওয়া শোওয়া এবং অন্য সব ব্যাপারের ব্যবস্থা সরাই বা চটিতে ছাড়া অন্য কোথাও সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব এবং সে-সব জায়গায় সমস্ত বন্দোবস্তই একটু মধ্যযুগের মত।

এই সকলের বিহিত করতে টেহেরাণের ঐ দুই ভদ্রলোকের, আমাদের কর্ণধার আকা কৈহানের, স্থানীয় রাজ-কর্মচারীদের এবং শ্রীযুক্ত ইরাণীর সঙ্গী মেহেরবাণ নামের এক পার্সী যুবকের (সে আগেই এদেশে বছর নয়-দশ কাটিয়ে গিয়েছে) প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল। তাতে মেয়েদের এবং দলনেতাদের মোটামুটি ব্যবস্থা ভালই হয়েছিল। অন্যদের অবস্থা না বলাই ভাল!



পার্সিপোলিস। পিছনের পাহাড় থেকে দৃশ্য

* * *

শিরাজ ছেড়ে ইস্ফাহানের দিকে গাড়ী চল্‌ল। এবার ঐতিহাসিক ভূমির উপর দিয়ে আমরা যাচ্ছি;—এক সময়ে এইখানেই জগতের সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র ছিল। দুঃখের বিষয় আধুনিক ইরাণ এখনও সেই অতীত গৌরবের পরিমাণ এবং বিস্তৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানে না। যা জানে তার অধিকাংশই ফিরদৌসির কিম্বদন্তী, পুরাণ ও কাহিনী-সংগ্রহ (শাহ্‌নামা) থেকে, যার অর্দ্ধেকেরও বেশীর ভাগ কল্পনার সমষ্টি মাত্র। ইয়োরোপীয় সাহিত্যে অনভিজ্ঞ লোকের কাছে কুরুশ কম্বুজের সমাধি ও প্রাসাদ "মেশেদ মুর্ঘাব", পার্সিপোলিস, "তখত-ই জম্‌শিদ" (জাম্‌শিদের সিংহাসন), দারয়বহুষের (ডেরিয়স) সমাধি-স্থলের শাশানিয় প্রস্তরখোদিত চিত্রাবলী "নক্‌স-ই-রুস্তম" (রুস্তমের চিত্রাবলী) নামে খ্যাত। উদয়পুরের রাজপুত হল্‌দিঘাট সম্বন্ধে যেমন অজ্ঞ, ইরাণের জনসাধারণ হখামনিষ্য, পার্থব ও শাশানিয় রাজকুলের কীর্ত্তিচিহ্ন সকল সম্বন্ধেও প্রায় তাই।

তবে নূতন শাহ এবং তাঁর সভাসদ সকলের কাছে প্রাচীন পারস্যের জগৎবরেণ্য সভ্যতার কথা খুবই পৌছেছে। রেজাশাহের "পাহ্‌লবী" উপাধি তাঁর আর্য্য-পারস্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরিচায়ক। এঁদের দেখাদেখি শিক্ষিত ইরাণি মাত্রেই "আর্য্য-ইরাণ",

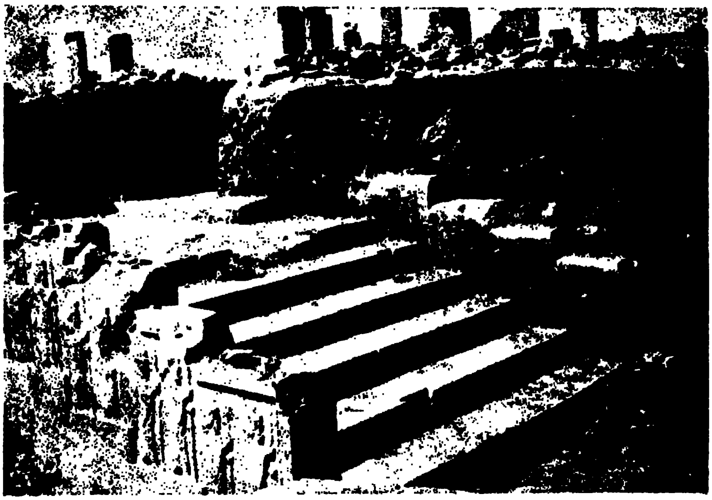


বাম হইতে দক্ষিণে ; ফুরুঘি, শাহ্‌বেরাম শাহ্‌রোখ, হের্জফেল্ড ও আরবাব কৈখস্রু মহাশয়গণ



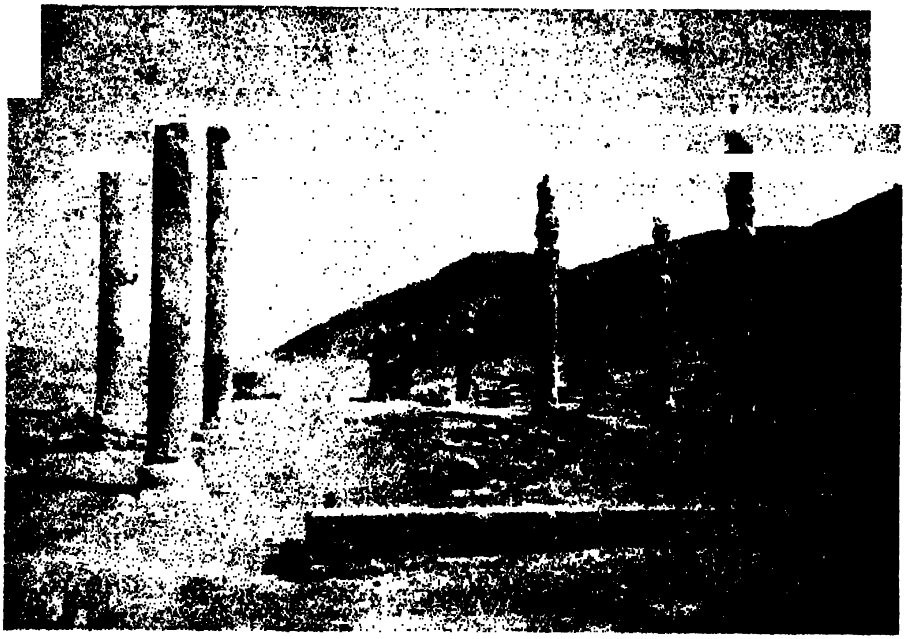
পার্সিপোলিসে (নরবৃষ তোরণের কাছে) রবীন্দ্রনাথ

"আর্য্য-ইস্‌লাম ধর্ম্ম" ইত্যাদি সম্বন্ধে শ্লাঘার সহিত বল্‌তে আরম্ভ করেছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে "সেমিটিক ইস্‌লাম" সম্বন্ধে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষও দেখা যায়, যার প্রথম চিহ্ন ইরাণি মুস্লেমদের আরব ও মেসোপোটামিয়া ভূমিখণ্ডের তীর্থদর্শন বন্ধ করবার চেষ্টা এবং মোল্লাদের ক্ষমতা হ্রাস কর্‌বার ব্যবস্থা। শিক্ষিত ইরাণিদের মতে পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ ইরাণি দার্শনিক এবং ইরাণি আর্য্য সভ্যতার পরিপন্থী মহাপুরুষদের (ইমাম) দ্বারাই হয়। ঐ সকল মহাপুরুষদের অধিকাংশেরই সমাধি-ক্ষেত্র এ দেশেই ; সুতরাং তীর্থ বা ধর্ম্ম শিক্ষাদীক্ষার জন্য ইরাণিদের বিদেশে যাওয়া দেশের পয়সা বিদেশে দেওয়া মাত্র।



পার্সিপোলিস—দারয়বহুষের প্রাসাদের নিকট সিঁড়ি

এই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্য-ভারতের প্রতি আত্মীয়তারও কিছু কিছু লক্ষণ দেখা দিয়েছে। ফলে জরথুস্ত্রী ইরাণিদের প্রতি অত্যাচার, অবিচার বন্ধ এবং ভারতমাতার আশ্রিত ইরাণিদের (পার্সী) প্রতিও কিছু কিছু টান দেখা যাচ্ছে। বিদেশীরা বলেন, সেটা এ দেশের ব্যবসাবাণিজ্যে পার্সী-ধনীদের অর্থ সাহায্য



পার্সিপোলিস। শতস্তম্ভ প্রাসাদের অবশিষ্ট

পাইবার জন্য, কিন্তু আন্তরিক টানও কিছু আছে সন্দেহ নাই!

* * *

পারস্যদেশের আর্য্য-সভ্যতার কথা এর আগেই লিখেছি। আর্য্য-সভ্যতার মূলে কি অর্থাৎ আর্য্যদের সভ্যতা লাভ হ'ল কোথা থেকে সে কথার উত্তর এখনও সম্পূর্ণ পাওয়া যায়নি, তবে একথা বোধ হয় ঠিক যে, সে-সভ্যতার বিকাশ এশিয়া ভূমিখণ্ডেই হয়েছিল। যাই হোক, ইতিহাসে আমরা পাই যে, ৬০৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে অসুর-দেশের পতন এবং নিনেভার ধ্বংস বাবিল-দেশীয় রাজা নবু-পাল-উসুর এবং মিডিয়া বা মাদ-দেশীয় রাজা হুবখশত্র এ দুই জনে করেন। মাদ-রাজ হুবখশত্র ইরাণদেশের উত্তরে আর্য্য-মাদজাতির অধিপতি ছিলেন। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ দ্য মর্গানের মতে এই মাদ-জাতি খৃঃ পূঃ ২০০০ বৎসরের কাছাকাছি উত্তরপারস্যে প্রবেশ করে। তারপর অসুর-দেশের ইতিহাসে ১১০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে টিগলথ পিলেসর, ৮৪৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে দ্বিতীয় শল্মানেসের ৮১০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তৃতীয় আদাদ নিরারি ৭৪৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে চতুর্থ টিগলথ পিলেসর, ৭২২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে দ্বিতীয় সারগণ ইত্যাদি অসুররাজগণের মাদজাতির বিরুদ্ধে অভিযানের কথা পাওয়া যায়। কিন্তু মাদজাতির অভ্যুত্থান বা রাজ্যস্থাপন এই হুবখশত্রের সময়ই হয়। ইহার মৃত্যুর পর (৫৮৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে) ইহার পুত্র ইষ্টবেগু রাজত্ব বজায় রাখতে পারেন নাই।

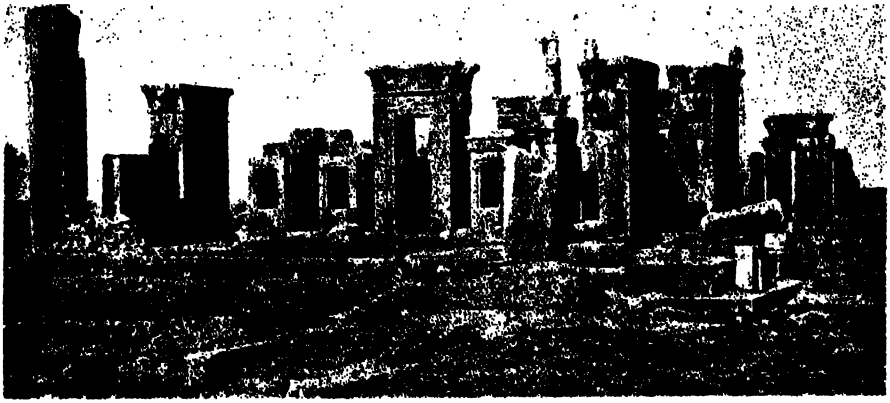
ইতিমধ্যে ইরাণের অন্তর্গত আনশান দেশের হখামনিষ্য বংশীয় আর্য্যরাজগণ প্রবল হয়ে উঠেছিলেন। সেই বংশেরই পঞ্চম নৃপতি (মহান) কুরুশ ইষ্টবেগুকে পরাজিত করে ইরাণের অধিপতি হ'ন। এই হখামনিষ্য বংশের রাজত্বকালেই ইরাণের গৌরব পৃথিবীবিস্তৃত হয়। এই বংশেরই কম্বুজ, (Cyrus) কুরুশ, দারয়বহুষ, খষায়র্ষ (Xerxes), অর্ত্তখোহ্মর্ষ (Artaxeraxes) ইত্যাদি প্রবল প্রতাপ নৃপতির রাজত্বকালে পারস্যের আর্য্যজাতি এবং পারস্যদেশ প্রাচীন সভ্যজগতের শীর্ষে স্থান পায়।

গ্রীক বিজেতা আলেকজাণ্ডারের অভিযানে হখামনিষ্য-রাজকুলের পতন, তারপর যবন সেলিউকিডদের রাজত্ব, তারপর পার্থব-বংশের উত্থান ও পতন, পার্থবদের ধ্বংস-কারি আর্য্য শাশানিয় রাজকুলের বিকাশ, চরম উৎকর্ষ

লাভ এবং বিরাট সাম্রাজ্যস্থাপন, ইহাই পারস্যের প্রাচীন গৌরবের ইতিহাস। ইস্‌লামের তরবারী দ্বারা শাশানিয়-দের নিপাতের সঙ্গে সঙ্গে সে অধ্যায়ের শেষ।

* * *

মের্ভদাস্ত উপত্যকায় অনেকগুলি ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। ছিল। উঠবার পথ অতি প্রশস্ত সিঁড়ি, তারপরই নৃপতি খ্‌ষয়র্ষের রাজ-তোরণ। তোরণের গায়ে অতিবৃহৎ নরবৃষ মূর্ত্তি—অসুর বাবিল দেশের ঐরূপ মূর্ত্তির মত দেখতে অন্তদিকে (পর্ব্বতমালার দিকে মুখ করে) আর দু'টি নরবৃষমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ রয়েছে। এইটাই খ্‌ষয়র্ষের প্রাসাদ-



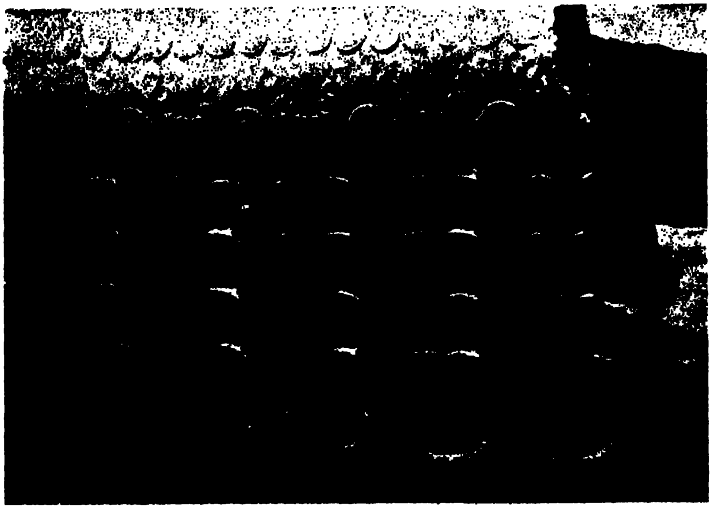
পার্সিপোলিস। দারয়বহুষের প্রাসাদ

বহুদিন ধরে এখানে ধ্বংস এবং আধুনিক কালে পুনরুদ্ধারের নামে লুঠ্‌—যা নূতন আইন অনুসারে এবার আমাদের দেশে খুব ভাল করে চল্‌বে, ব্যবস্থাপক-সভার অধিংকাংশ অসভ্য ও অশিক্ষিত চাটুকারদের দৌলতে—চলেছিল, এতদিনে বোধ হয় সত্যকার পুনরুদ্ধার (এবং অল্প লুঠ) কিছু হবে। কেননা হার্জফেল্ড নামে এক প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ প্রত্নতত্ত্ববিদ সম্প্রতি কিছুদিন যাবৎ এক আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থসাহায্যে এখানে কাজ করতে আরম্ভ করেছেন।

এখানের প্রধান ধ্বংসাবশেষ হখামনিষ্য-রাজকুলের রাজপুরী "পার্সি-পোলিস" (ঠিক নাম এখনও জানা যায় নাই)। পাঁচশ' গজ লম্বা এবং তিনশ' গজ চওড়া, চল্লিশ ফুট উঁচু প্রস্তর নির্ম্মিত এক বিরাট চত্বরের উপর রাজপ্রাসাদের প্রধান অংশ স্থাপিত

তোরণ। কেননা এখানেই তাঁর নামাঙ্কিত তিনভাষায় কীলকলিপি রয়েছে।

"আমি খ্‌ষয়র্ষ মহারাজ, মহারাজাধিরাজ, বহু (প্রকার)



পার্সিপোলিস। প্রস্তর আলেখ্যে অলঙ্কারের নিদর্শন

জনাকীর্ণ দেশের নৃপতি, এই বিশাল ধরণীর অধিপতি, হখামনিষ্য নৃপতি দরায়বহুষের পুত্র: কহেন নৃপতি

খষয়; অহুরমজদার প্রসাদে আমি সকল দেশের (প্রতিনিধিদিগের) জন্ত এই colonnade স্থাপন করি; ইহাভিন্ন পারস্যদেশে অনেক সুন্দর কীর্ত্তি আছে, যাহা আমার ও আমার পিতার কৃত; যাহা কিছু সুন্দর কার্য্য সে সকলই আমরা অহুরমজদার প্রসাদে করিয়াছি।"

ইহা ভিন্ন পার্সিপোলিসে এবং এদেশে আরও অনেক স্থলে এইরকম শিলালিপি আছে। সকলেরই ভাব ও ভাষা আর্য্যভাবপূর্ণ। আগেই বলেছি* ইরাণের যে আর্য্য-ভারতীয় আর্য্যের আত্মীয় এবং একই প্রকার ভাষাবাদী। উদাহরণ স্বরূপে বেহ্‌সেতুনের দরায়বহুষের প্রসিদ্ধ অনুশাসন থেকে কিছু উদ্ধৃত করা গেল। শব্দের রূপান্তর ও সংজ্ঞার সাধারণ প্রভেদ মনে রেখে দেখলে এর ভাষা ও ভাবের সহিত সাদৃশ্য সহজেই দেখা যায়।



পার্সিপোলিস। দারয়বহুষের প্রাসাদের ভিতরের দৃশ্য



পার্সিপোলিস। অর্ত্তখোহয়র্ষের গুহা-সমাধি দ্বার

"অদম দারয়বহুষ্‌ খ্‌ষায়থিয় বজ্‌রক (,) খ্‌ষায়থিয় খ্‌ষায়-থিয়ানাম্‌ (,) খ্‌ষায়থিয় পার্সৈ (,) খ্‌ষায়থিয় দহ্যুনাম্‌ (,) বিশ্‌তাস্পহ্যা পুত্র(,) অর্ষামহ্যা নপা (,) হখামনিষিয় (।)

থাতী দারয়বহুষ্‌ খ্‌ষায়থিয়(;) মনা পিতা বিশ্‌তাস্প(;) বিশ্‌তাস্পহ্যা পিতা অর্ষাম (;) অর্ষামহ্যা পিতা অরিয়ারম্ন (;) অরিয়ারম্নহ্যা পিতা চিশ্‌পিশ্‌ (;) চিশ্‌পাইশ্‌ পিতা পিতা হখামনিশ্‌ (।)

থাতী দারয়বহুষ খ্‌ষায়থিয় (;) অবহ্যরাদী বয়ম্‌ হখা-মনিষিয়া অহ্যামহ(;) হচা পরুবিয়ত আমাতা অমহী (;) হচা পরুবিয়ত হ্যা অমাখম তেউমা খ্‌ষায়থিয়া আহ (।)

*আহম ধারয়বসুঃ * *ক্ষায়ত্যঃ (ক্ষিতি শব্দের মূল ক্ষি ধাতু হইতে জাত = রাজা; প্রাচীন পারসীক খ্‌ষায়থিয় হইতে পহ্লাবী বা মধ্য-যুগের পারসীকে খাহি, তাহা হইতে আধুনিক পারসিক বা ফারসী শাহ) বর্হকঃ (বৃহন্‌, বৃহৎ।

* প্রবাসী আশ্বিন, ১৩৩৯।

* শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সংস্কৃত ভাষান্তর।

*ক্ষায়ত্য *ক্ষায়্মানাম *ক্ষায়ত্যঃ পর্শৌ (=পর্ত্ত বা পারস্যদেশে) *ক্ষায়ত্যঃ দহ্যানাম্ (দহ্যু অর্থে দেশ) বিষ্টাশ্বস্য পুত্র, *খ্ষমেস্ত নপাৎ (=নপ্তা) *সখামনিষ্যঃ। শংসতি ধারয়বহুঃ *ক্ষায়ত্যঃ মম পিতা বিষ্টাশ্বঃ ; বিষ্টাশ্বস্য পিতা



পার্সিপোলিস। খষয়র্ষের প্রাসাদের ভিতর ছত্রপতি সম্রাটের চিত্র

খ্ষমঃ খ্ষামস্য পিতা আর্য্যরম্ন আর্য্যরম্নদা পিতা চিষ্পিঃ ; চিষ্পেঃ পিতা সখামনিঃ। শংসতি ধারয়বহু *ক্ষায়ত্যঃ অস্য রাধি (অস্মাৎ কারণাৎ) বয়ং অখামনিষ্যা শস্যামহে সচা পূর্ব্বত্যঃ*আমাতা (=জাতা) অস্মাসি (স্মঃ) সচা অস্মাকম তোমা (বংশঃ) ক্ষায়ত্য আস। "আমি দারয়বহুষ বৃহৎ (মহান) রাজ রাজাধিরাজ, পর্শু (বা পারস্য) রাজ, প্রদেশ রাজ, বিশতাস্পের পুত্র, হখামনিষ্য অর্ষ্যামের পৌত্র।"

"কহেন নৃপতি দারয়বহুষ ; আমার পিতা বিশতাস্প ; বিশতাস্পের পিতা অর্ষাম, অর্ষামের পিতা অরিয়ারম্ন ; অরিয়ারম্নের পিতা চিশপিশ ; চিশপিশের পিতা হখামনিষ।"



পার্সিপোলিস। নৃপতি এবং সিংহমূর্ত্তি অপদেবতার যুদ্ধ

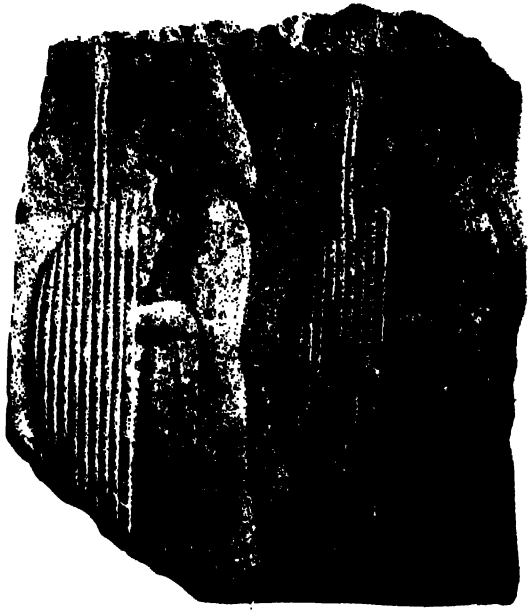
"কহেন নৃপতি দারয়বহুষ ; এই কারণে আমরা হখামনিষ্য নামে খ্যাত, পুরাকাল হইতে আমরা জাত ; পুরাকাল হইতে আমাদের বংশ রাজপদে (অভিষিক্ত) আছে।"

ইহাই দারয়বহুষের বংশ-পরিচয়। এই পরিচয়

বিসেতুন (বেহিষ্টন) গিরিগাত্রে ঐ মহারাজাধিরাজের তিন ভাষায় লিখিত কীলকলিপি অনুশাসনের প্রারম্ভেই আছে।

দারয়বহুষের বিরাট সাম্রাজ্য পূর্ব্বদিকে গান্ধার, (কেহ কেহ বলেন, সিন্ধু-প্রদেশের মাক্রানও) শকস্থান হইতে হারাবতি (হিরাট) শত্তগৌস্ (সাট্টাগৌডিয়া) সুগুড (সোঘাডিয়ানা), বাখত্রিস (ব্যাক্ট্রিয়া), খোরাস্মিয়া হরইব (এরিয়া), জরঙ্ক (ড্রাঞ্জিয়ানা), পার্থব (পার্থিয়া) বর্কান (হির্কানিয়া) মাদ (মিডিয়া), উবজ (সুসিয়ানা), বাবিরুষ (বাবিলন), অসুর (আসিরিয়া), অরবায় (আরবদেশ; সিরিয়া এবং পালেষ্টাইন) মুদ্রায় (ইজিপ্ট) যউনা (যবনদেশ, গ্রীক-উপনিবেশ সহিত) স্পার্দ্ধা আমন (আর্মেনিয়া) কটপটুক (কাপাডোসিয়া) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এই সম্রাটের সেনাবাহিনী গ্রীসের অধিকাংশ জয় করিয়া ডানিয়ুব নদী হইতে ভল্‌গা (রুশিয়া) নদীর তীর পর্য্যন্ত আভযান করে আসে। যে ম্যারাথন যুদ্ধের কথা পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা এতদিন আমাদের মহা ঘটা করে গ্রীকদের (অর্থাৎ ইয়োরোপিয়দের) শ্রেষ্ঠতার দৃষ্টান্ত হিসাবে শুনিয়ে আস্‌ছিলেন, এখন প্রমাণ হচ্ছে যে, সেটা



পার্সিপোলিস। শক-সৈন্য (বার্লিন মুজিয়ম)



পার্সিপোলিস। খ্‌ষয়র্ষের নরবৃষ তোরণ

দরায়বহুষের এক প্রাদেশিক শাসনবিভাগের উত্তরদেশস্থ বর্ব্বরদেশের বিরুদ্ধে এক ক্ষুদ্র অভিযানের খণ্ড-যুদ্ধ মাত্র। সে-সময়ের গ্রীসের এমন কিছু ঐশ্বর্য্য বা খ্যাতি ছিল না যাতে দরায়বহুষ সে-দেশ আক্রমণ করতে ইচ্ছুক হতে পারতেন।

পার্সিপোলিসে এবং তার কাছে নক্স-ই রুস্তমের পর্ব্বতমালায় দরায়-বহুষের অনেক স্মৃতি চিহ্ন রয়েছে। পার্সিপোলিসে তাঁর রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, শিলালিপি এবং (বোধ হয়) প্রতিমূর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান। নক্স-ই-রুস্তমের শেষে পর্ব্বতগুহায় তাঁর সমাধিমন্দির এখনও পারস্যের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

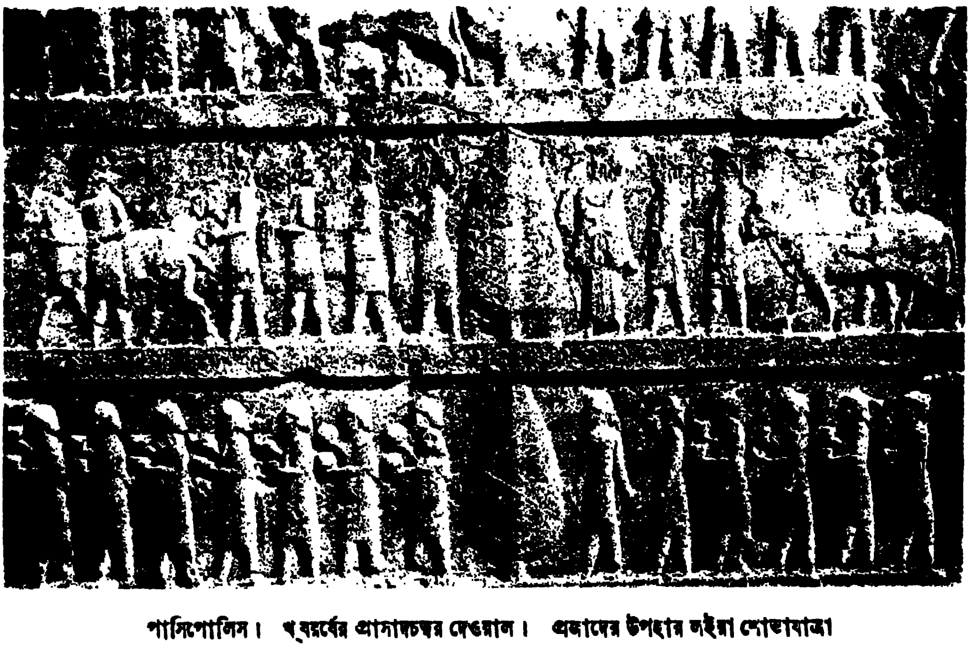
এই জায়গাতেই আরও কয়েকজন হখামনিষ্য সম্রাটের স্মৃতিচিহ্ন আছে। খ্‌ষায়র্ষ (Xerxes) অর্ত্তখোহষর্ষ এই দুজনের রাজপ্রাসাদ এবং (অন্ততঃ পক্ষে এক জনের) গুহা-সমাধি এখানেই বিরাজ করছে। বর্ব্বর গ্রীক দস্যুরাজ আলেকজাণ্ডার সসৈন্য মদ্যপানে উন্মত্ত হয়ে প্রথমে পার্সিপোলিসের অমূল্য গ্রন্থাগারে আগুন লাগায়,



পার্সিপোলিস। খ্‌ষয়র্ষের প্রাসাদচত্বরের দেওয়ালের খোদিত সিংহ ও বৃষের যুদ্ধ-চিত্র

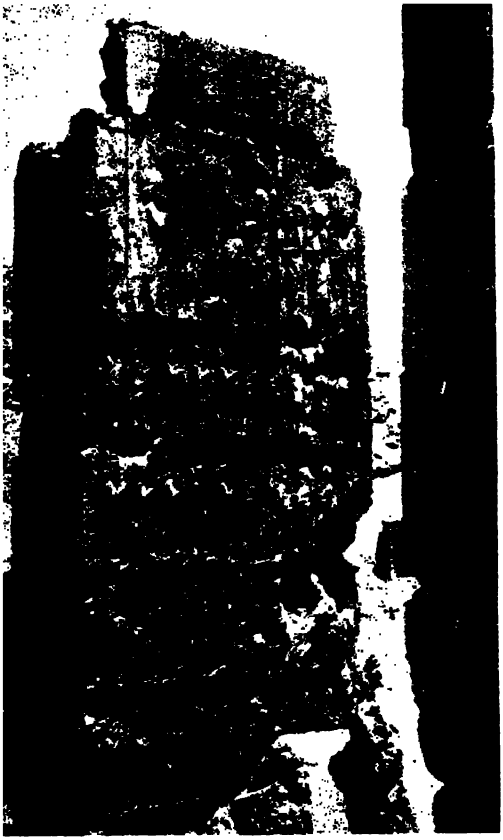
পরে অসভ্য তাণ্ডবলীলা আরম্ভ করে সমস্ত পার্সি-পোলিস ধ্বংস করে।

আলেকজাণ্ডারের বহু অপকীর্ত্তি ইয়োরোপীয়েরা মহা-



পার্সিপোলিস। খ্‌ষয়র্ষের প্রাসাদচত্বর দেওয়াল। প্রজাদের উপহার লইয়া শোভাযাত্রা

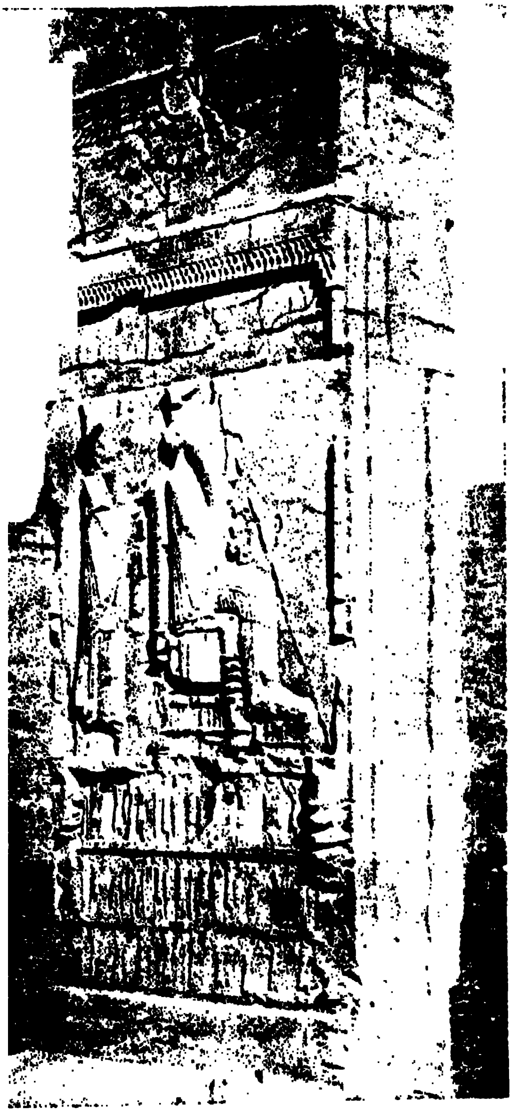
গৌরবের ব্যাপার বলে এতদিন চালিয়ে আসছেন। এখন দিনে দিনে প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে যে, কে ছিল অসভ্য, হিংস্র-বর্ব্বর এবং কে ছিল জগতের গৌরব এবং সভ্যতার আদর্শ।



পার্সিপোলিস। প্রজাশক্তি সিংহাসনের ভিত্তি, ইহার রূপক চিত্র

এই পার্সিপোলিসের বিশাল চত্বরে উঠবার একশত ছয়টি সিঁড়ির দুইধারে যোদ্ধা, রাজন্যবর্গ এবং অনুচরদের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত ছিল—মনে হত যেন তারাও ধাপে ধাপে উঠে চলেছে—এবং পার্শ্বে ছিল খষয়র্ষের বিরাট নরবৃষ-তোরণ। তারপর ক্রমে খষয়র্ষের দ্বিসপ্ততিস্তম্ভযুক্ত (প্রত্যেকটি ৮০ ফুটের বেশী উঁচু) সভামণ্ডপ পরে দারয়বহুষের প্রাসাদ (অপেক্ষাকৃত ছোট), তারপর খষয়র্ষের এবং অর্তখাষয়র্ষের বিরাট প্রাসাদদ্বয়। এই সকলের পিছনে—উত্তর-পূর্ব্বে-আরও দশ ফুট উঁচু চত্বরে ছিল শতস্তম্ভের আয়তন (বোধ হয় দারয়বহুষের)।

খষয়র্ষের দ্বিসপ্ততিস্তম্ভ প্রাসাদের মাত্র নয় দশটি স্তম্ভ দাঁড়িয়েছিল; কিন্তু সম্প্রতি হার্জফেল্ডের তত্ত্বাবধানে

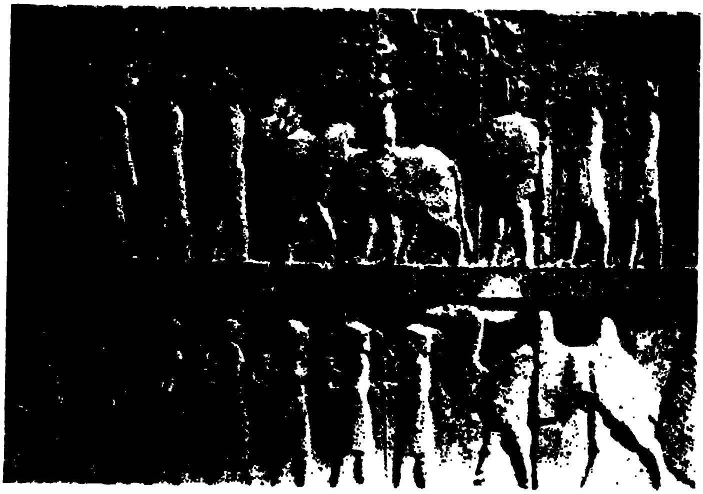


পার্সিপোলিস। নৃপতি দারয়বহুষ

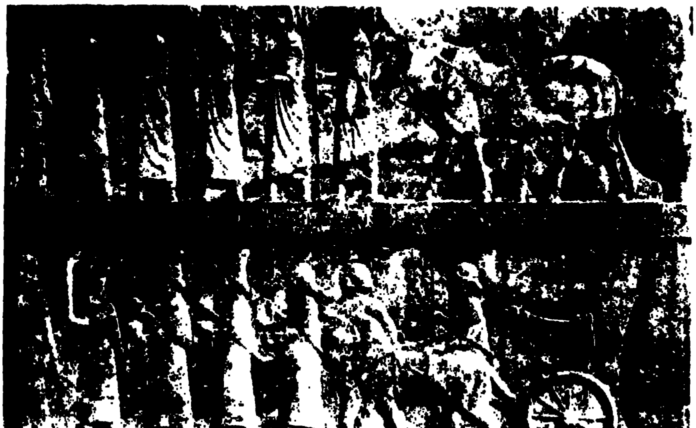
অন্যগুলির টুকরা জুড়ে একে একে অনেকগুলি দাঁড় করান হচ্ছে। হার্জফেল্ড বললেন যে, তিনি আশা করেন প্রায় সবগুলিই এইরূপে দাঁড় করান যাবে। এই সভাগৃহ প্রধান চত্বর থেকে প্রায় দোতলা সমান উঁচুতে দ্বিতীয় চত্বরে স্থাপিত এবং এই চত্বরের গায়ে তিন সারি সুন্দর প্রস্তর-খোদিত চিত্র আছে। বামের সারিগুলিতে

মহারাজের রক্ষী, সৈন্যসামন্ত, রথী এবং অশ্বারোহীদের শোভাযাত্রা (বাজনা বাজিয়ে) এবং দক্ষিণে সাম্রাজ্যের নানা দেশের লোকের কর এবং উপহার নিয়ে শোভাযাত্রার চিত্র খোদিত রয়েছে। এই ছবিগুলি চত্বরের দেওয়ালের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরগুলিতে খোদাই করা। হার্জ-ফেল্ড সযত্নে ভূপতিত পাথরগুলি যথাস্থানে বসিয়ে চিত্রাবলী সম্পূর্ণ করেছেন। কেবলমাত্র ১৮২০ খৃঃ যে-কয়টি বৃটিশ মিউজিয়মে আনা হয়েছিল সেগুলির জায়গা খালি রয়েছে। এই প্রাসাদের মাটি খুঁড়ে স্তম্ভের টুকরা ইত্যাদি বার করার সময় ক্রমাগত ছাই বেরিয়েছে এবং এখনও বেরোচ্ছে। দেওয়ালের এবং থামের পাথরেও (প্রধানতঃ সাধারণ মর্ম্মর) আগুনের চিহ্ন যথেষ্ট রয়েছে। হার্জফেল্ডকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন যে পার্সিপোলিসের সমস্ত প্রাসাদাবলী যে আলেকজাণ্ডার ধ্বংস করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—প্রথমে আগুন লাগিয়ে তারপর ভেঙে-চূরে। প্রাসাদটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে পঞ্চাশ গজ। ডাঃ হার্জফেল্ডের মতে এই সকল প্রাসাদের কারুকার্য্যখচিত কাঠের ছাদ এবং কাঁচা ইটের দেওয়াল ছিল।

দারয়বহুষের প্রাসাদের অনেকগুলি দ্বার এবং পিছনে প্রসিদ্ধ শতস্তম্ভ আয়াতনের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।



পার্সিপোলিস। খ্ষয়র্ষের প্রাসাদ-চত্বর দেওয়াল। প্রজাদের উপহার লইয়া শোভাযাত্রা



পার্সিপোলিস। খ্ষয়র্ষের প্রাসাদচত্বরের দেওয়ালে প্রজাদের শোভাযাত্রার চিত্র

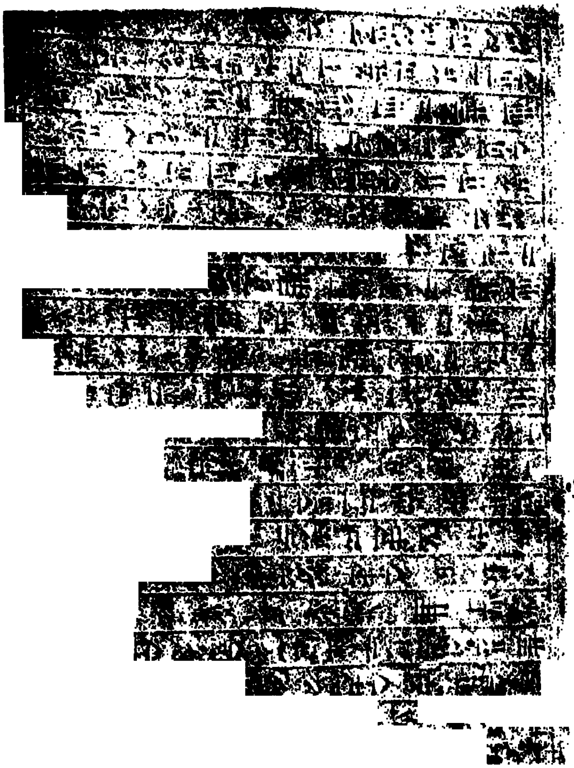
সিংহাসনের বেদীর ও মঞ্চের দেওয়ালের গায়ে অসংখ্য সুন্দর প্রস্তর-আলেখ্য খোদিত রয়েছে। সকলের চেয়ে সুন্দর, যেটিতে সম্রাট সিংহাসনে আরূঢ় নীচে তাঁর প্রজাবৃন্দ এবং উপরে ভগবান অহুর-মজদার মূর্ত্তি।

হখামনিষ্যদের ভাস্কর্য্য এবং স্থপতিবিদ্যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায় পার্সিপোলিসে। অতিদীর্ঘ "পলকাটা" বৃষ বা অশ্ব শীর্ষ স্তম্ভ, সুন্দর প্রস্তর-আলেখ্য এবং বিরাট আয়াতন, তোরণ, সিংহাসন, বেদী ইত্যাদি সেকালের সভ্যতার উৎকর্ষের নিদর্শন হিসাবে এখনও রয়েছে। ঐ সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের কালে কারুকার্য্যখচিত ছাদ, বহুবর্ণে রঞ্জিত বস্ত্রাবরণ এবং প্রাসাদের রক্ষী অনুচর, প্রজা-সামন্ত ইত্যাদির উজ্জ্বল বেশভূষায় এই স্থলের কি শোভা ছিল, তা যেন কল্পনারও অতীত। অনেকের

মতে এই সময়ের পারসীক ললিতকলার প্রভাব আমাদের মৌর্য্য ও পরবর্ত্তী সময়ের কলাশিল্পে খুব বেশী আছে। এই মতের সপক্ষে যুক্তি অনেক আছে। বিশেষ



পার্সিপোলিস। হথামনিয় যুগের পদাতিক সৈন্য



পার্সিপোলিস। কীলকলিপি অনুশাসন

স্তম্ভপাদের গঠনে ও আকৃতিতে। অনেক বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে যে মত দিয়েছেন, তা ললিতকলাবিদ্যার্থী মাত্রেই জানেন। আমার স্থূল চক্ষেও সাদৃশ্য অনেক কিছুই দেখা গেল।

কিন্তু কতকগুলি বিষয় এই মতের বিরোধী ব'লে, অল্পক্ষণের পরীক্ষায় আমার মনে হয়েছিল, জানি না সেগুলির দাম কতটা।

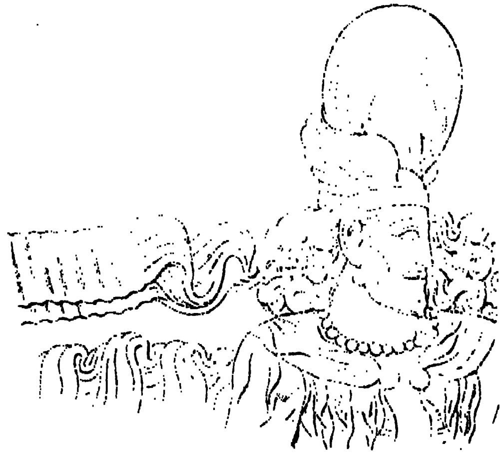
প্রথম—ঐ সকল ভাস্কর্য্যে মৌর্য্যযুগের অদ্ভুত পালিশের (বজ্রলেপ ?) অভাব। দ্বিতীয়—প্রস্তর আলেখ্যমালায় অলঙ্কারের বিশেষ অভাব (এদেশে তার বাহুল্যই আছে)। অলঙ্কার যা আছে তারও উপকরণ এদেশের মত নয়, (অন্ততঃপক্ষে আমি দেখেছি বলে মনে হয় না) তৃতীয়—প্রস্তর আলেখ্যমালা রচনায় ও সংস্থাননৈপুণ্যে (আসুর ও গ্রীক ফ্রীজের মত) যদিও এদেশের চেয়ে উৎকৃষ্ট কিন্তু তা এদেশের শিল্পের মত গভীর খোদিত (high-relief) বা সূক্ষ্ম কারুকার্য্যভূষিত নয়। চতুর্থ—এখানের প্রস্তর আলেখ্য যদিও ভারতীয় আলেখ্য অপেক্ষা কোন কোন অংশে শ্রেষ্ঠ তবুও স্তম্ভশীর্ষ যেগুলি আছে, তাদের কোনটিই গঠননৈপুণ্যে, সৌন্দর্য্যে কারুকৌশলে সারনাথের সিংহচূড়ার কাছেও দাঁড়ায় কি



পার্সিপোলিস। শতস্তম্ভ আয়তন। সিংহাসনে আসীন মূর্তি
ঊর্দ্ধে ভগবান অহুরমজ্দা (উপরার্দ্ধ ভগ্ন)

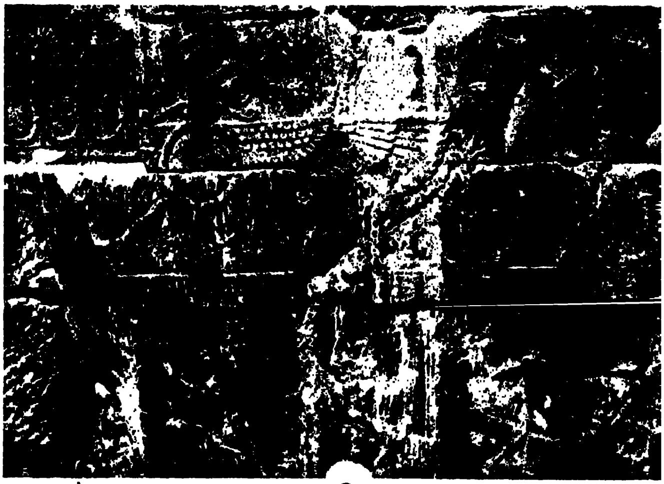
প্রভাব? ষষ্ঠ চিত্রিত মানুষের—মূর্তিগুলোর প্রায় সবই এক পার্শ্ব দেখান (profile view), ভারতীয় রচনায় পূর্ণমুখ চিত্র অনেক আছে, ইত্যাদি।

তবে এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে হস্তপাদ ও শীর্ষের একই বিচিত্র পরিকল্পনার মধ্যে নিশ্চয় কোন

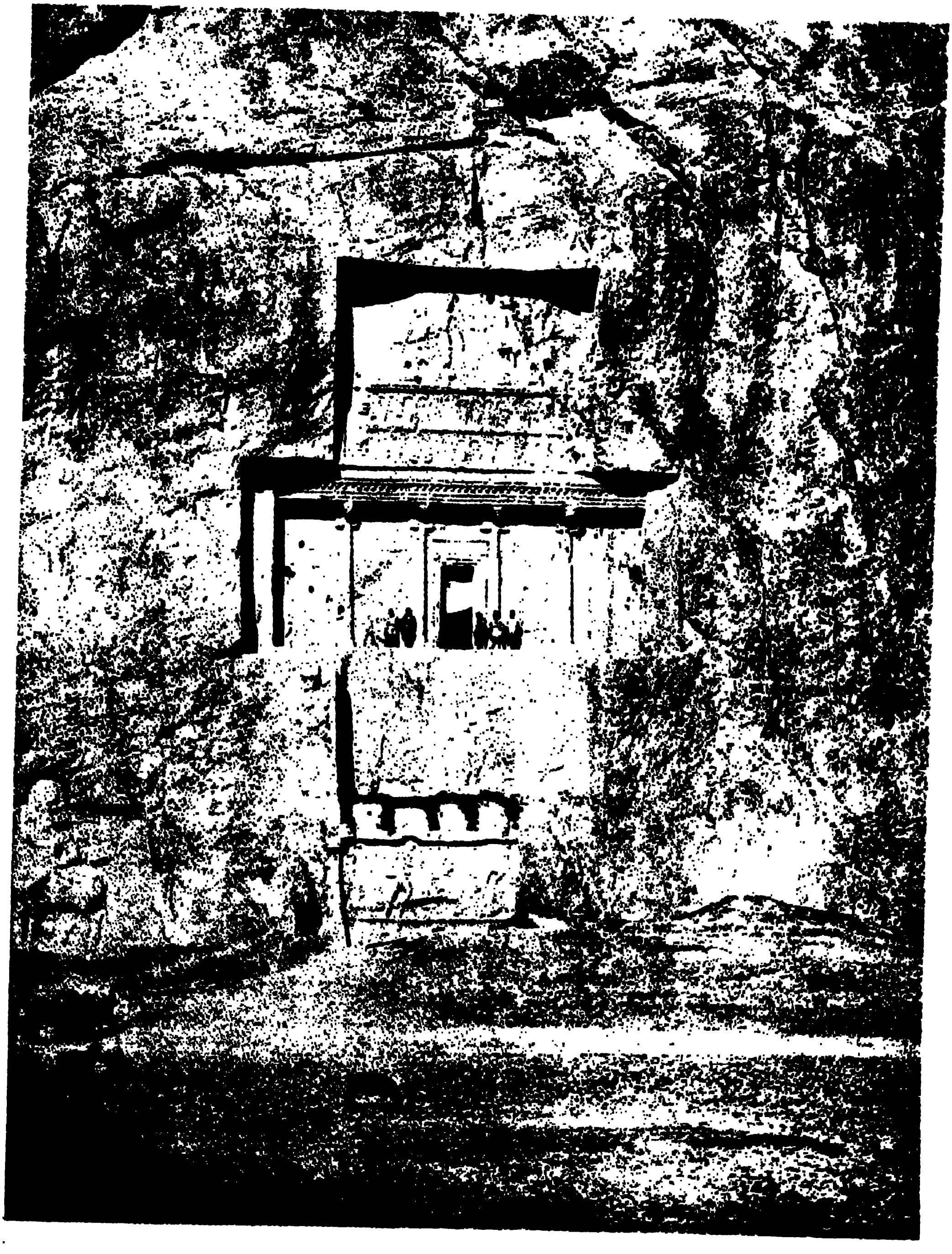


পারসিক প্রস্তর আলেখ্যের অঙ্কন-পদ্ধতির নিদর্শন

সন্দেহ। পঞ্চম—(এবং এইটি বিশেষ আশ্চর্য্য) আলেখ্য মালায় নারীমূর্ত্তির একান্ত অভাব (হার্জফেল্ড আমাদের বলেছিলেন যে, এটা আশ্চর্য্য এবং বোধ হয় ঐ সময়ে এদেশে পর্দ্দা ছিল, তারই প্রমাণ) অথচ আমাদের দেশের আলেখ্যমালার প্রধান অঙ্গই নারীমূর্ত্তি অন্যদিকে ভারতীয় প্রস্তরআলেখ্যে পারস্যের মত সৈনিক বা যোদ্ধৃপুরুষের বাহুল্য নেই, যদিও সে সময়ে ভারতে সৈন্য বা যোদ্ধার বিশেষ অভাব ছিল না। এটা কি বৌদ্ধ অহিংসার



পার্সিপোলিস। ~~মজ দার চিত্র



নক্স্-ই-রুস্তম্। দারয়বহুষের সমাধি



নক্স্-ই-রুস্তম্। শাশানির রাজকুলের আদিমপুরুষ ও অহুরমজ্দা



কার্য্যকারণ সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু প্রস্তর আলেখ্যের ক্ষেত্রে দুই দেশের রচনা-পদ্ধতি, উপকরণ, গঠন, কারুকার্য্য ও কৌশল ইত্যাদিতে বিশেষ পার্থক্য যে ছিল, সে কথাও কি স্বীকার্য্য নয়?

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে ভাস্কর্য্যবিদ্যায় পারস্যদেশ অসুরদেশের ছাত্র, যদিও নিজস্ব আর্য্যসভ্যতার গুণে পারস্য সে-বিদ্যার অনেক সংস্কার এবং উন্নতি করতে সমর্থ হয়েছিল। অসুরদেশের বিরাট নরসিংহ বা নরবৃষ মূর্ত্তির প্রচণ্ড রূঢ়ভাব পারসীদের হাতে দূর হয়ে তার একটা সৌম্য ও সুদর্শন রূপান্তর হয়। অসুর ভাস্কর্য্যে পৌরুষ, শক্তি ও উদ্দাম গতির প্রকাশ খুবই বেশী, পারস্যে তার মধ্যে একটা স্থির সংযত ভাব আসায় ললিতকলার আদর্শে তার উন্নতি হয়েছিল সন্দেহ নাই।

* *

পার্সিপালিসে শ্রীযুক্ত হার্জফেল্ড আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এই বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ (ও বহুভাষাবিদ) নানাস্থানে অনেক আবিষ্কার করে এখন পার্সিপোলিস অঞ্চলেই খনন পুনর্গঠন ইত্যাদি করছেন। ইনি সারা বছরই এখানে থাকেন, সঙ্গে আর একজন জার্মান যুবক। এঁকে দেখাও বিশেষ সৌভাগ্য।

প্রথমেই শুনলাম যে, পার্সিপোলিসের কাছে কয়েকটি পর্ব্বতগুহায় অনেকগুলি প্রাচীন সমাধি পাওয়া গিয়েছে; সেগুলি সেকালের সাধারণ জরথুষ্ট্রী ধনীলোকের (অর্থাৎ রাজরাজড়ার নয়) এবং এর থেকে তিনি মনে করেন যে, সে-সময়ে শকুনিদ্বারা শবভক্ষণ-প্রথা (ভারতীয় পার্সীদের মত) যে একমাত্র অন্তিমকার্য্য প্রথা ছিল তা নয়। হার্জফেল্ড এই কথাপ্রসঙ্গে বললেন যে, ভারতবর্ষ থেকে কোন বিশেষজ্ঞ এলে ভাল হয়। আমি বুঝিনি যে, সেটা আমাদের পার্সী সহযাত্রীদের লক্ষ্য ক'রে বলা, সুতরাং আমি আমার এক নৃতত্ত্ববিৎ বিশেষ বন্ধুর নাম করে বললাম যে, তাঁকে জানালে তিনি নিশ্চয়ই আসবেন। হার্জফেল্ড তাতে একটু বিরক্ত হয়েই বললেন যে, তিনি কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের সাহায্য প্রয়োজন মনে করেন না। বুঝলাম যে, ব্যবসাদারের হিংসা পণ্ডিতদের মধ্যেও আছে। সুতরাং বললাম যে, বন্ধুবর প্রত্নতত্ত্ববিৎ নহেন, নৃতত্ত্ববিৎ।

কবি এসে উপস্থিত হলেন, হার্জফেল্ড তাঁকে অভ্যর্থনা করতে ছুটলেন। অনেকদূর যেতে হবে সুতরাং পাছে তিনি শ্রান্ত হয়ে পড়েন, এই জন্য দু-চারটি দ্রষ্টব্য জিনিষ দেখিয়ে তাঁকে পুনর্গঠিত অর্ত্তখোহর্ষের পুস্তকাগারে নিয়ে যাওয়া হ'ল। অন্যদের সঙ্গে আমিও চললাম, যদিও চারিদিক দেখবার জন্যে মন তখন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। পুস্তকাগারে বসে হার্জফেল্ড পার্সিপোলিসের কাছে নবাবিষ্কৃত নূতন প্রস্তর-যুগের লুপ্তাবশেষ থেকে প্রাপ্ত কতকগুলি ভাঙা মৃণ্ময় ঘট দেখালেন। একটি সম্পূর্ণ মেরামত করা হয়েছে এবং তার উপরের নক্সা স্যর অরেল ষ্টাইনের আবিষ্কৃত হিন্দুকুশ, পামীর ও বেলুচিস্তান অঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিক যুগের মৃণ্ময় ঘটের মত। শুনলাম স্যর অরেল ষ্টাইন কয়েকদিন পরেই এখানে আসবেন এই নূতন আবিষ্কার দেখতে।

কবির সঙ্গে ওঁর আলাপ চলল। পার্সিপোলিসের নারীমূর্ত্তির অভাব প্রসঙ্গে প্রাচীন পারস্যে মেয়েদের অবরোধ-প্রথার কথা তুলে হার্জফেল্ড এক পার্থব রাজপুত্রের কথা বললেন। এই রাজপুত্র রোমকদের কাছে রাজ্যাভিষেক (সনদ) নিতে রোমে যান। জরথুষ্ট্রি মতে সমুদ্রগমন নিষিদ্ধ, সুতরাং তিনি সস্ত্রীক স্থলপথে যান। রাজপুত্রের স্ত্রী সমস্ত পথ মুখে ঘোমটা দিয়ে, অশ্বারোহণে গিয়েছিলেন।*

সঙ্গীরা সবাই এই সব কথা শুনতে লাগলেন। ইতিমধ্যে শ্রীযুত ইরাণীও পূর্ব্বপুরুষদের উদ্দেশে পার্সী মতে প্রার্থনা ক'রে ফিরে এলেন। আমি সুযোগ বুঝে মেহেরবান ভাইকে (শ্রীযুক্ত ইরাণীর সাহায্যকারী) নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সমস্ত দেখতে এবং কিছু ফোটো তুলতে অনেক সময় গেল। এদিকে দূরে পাহাড়ের গায়ে ক্রশ আকৃতি চারটি সমাধি-গুহা দেখা যাচ্ছিল, সেগুলি দেখতেই হবে

* বোধ হয় এটি ৬৬ খৃষ্টাব্দে রোম-সম্রাট নিরো কর্ত্তৃক পার্থব রাজপুত্র টিরিডেটিসের আর্মেনিয়ার রাজত্বে অভিষেকের কথা।

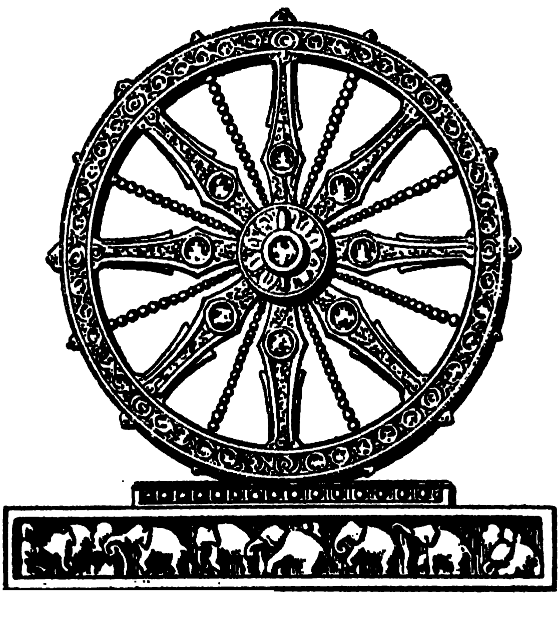
যদিও সময় আর মাত্র তখন এক ঘণ্টার কিছু বেশী আছে।

তার দুটি মাত্র উর্দ্ধশ্বাসে দেখা গেল, অন্তগুলি দেখা আর হ'ল না। যেগুলি দেখলাম তার মধ্যে দূরেরটি দারয়বহুষের সমাধি, অন্যটি অর্ত্তখোহয়র্ষের। সমাধি-দ্বারের উপরে নৃপতির মূর্ত্তি, এক হাতে ধনুক অন্য হাত তুলে তিনি উর্দ্ধেস্থিত অহুরমজদাকে নমস্কার করছেন, সম্মুখে প্রস্তরের বেদীতে প্রজ্জলিত অগ্নি।

দে-পাহাড়ের গুহায় এই সমাধিগুলি রয়েছে তারই গায়ে শাশানিয় নৃপতিদের কীর্ত্তি খোদিতচিত্রে (প্রস্তর আলেখ্য) অঙ্কিত রয়েছে। সেগুলি ভাল ক'রে দেখা হ'ল না। তবে একটি বিরাট চিত্রে নৃপতি শাপুরের সঙ্গে ফের দেখা হ'ল। বিজয়ী শাপুরের সুদর্শন অশ্বারোহী মূর্ত্তির সামনে পরাজিত রোমসম্রাট ভ্যালেরিয়ান হাঁটু গেড়ে প্রাণভিক্ষা করছেন। পাশে এন্টিয়োখের বিতাড়িত সিরিয়াডিস।

এই চিত্রাবলী (এবং ঐ থেকে এই জায়গারও) নাম নক্স্-ই-রুস্তম্। এ দেশের বাসিন্দারা ঐ সকল বিরাট অশ্বারোহী মূর্ত্তিতে তাদের কথাকাহিনীর অজেয় বীর রুস্তমের প্রতিমূর্ত্তিই দেখেছে। রুস্তমের কাল্পনিক যুদ্ধ-বিজয় ও পরাক্রমের কথা দেশের প্রত্যেক লোকের মুখে, কিন্তু শাপুরের মহাপরাক্রান্ত রোম-সেনাবাহিনী বিজয়ের কথা প্রায় কেউই জানে না!

হয়ত এবার ইরাণের নূতন জীবনের সঙ্গে কোন নূতন ফিরদৌসি সুললিত ছন্দে প্রকৃত শাহনামা রচনা ক'রে প্রাচীন পারস্তের যশোগাথা নূতন পারস্তে প্রচার করবেন। ছন্দ যদি ভাল হয় ত প্রচার নিঃসন্দেহ। কেননা এদেশে স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলেই কাব্যামোদী। শিরাজে গভর্ণরের বৈঠকে এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, ওখানে বেশ নামজাদা কবি এখন কজন আছেন। তাতে তিনি উত্তর দেন যে, ইরাণী মাত্রেই, বিশেষে ফার্স অঞ্চলে—এমন কি নিরক্ষর হলেও—সকলেই কবি! এবং এটা আমি নিজে লক্ষ্য করেছিলাম যে, পথে ঘাটে, বৈঠকে, যেখানেই হোক, কোন ভাল কবিতা যদি কেউ উচ্চারণ করল তবে তার চারিদিকে, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, আবালবৃদ্ধবনিতা, রসগ্রাহী শ্রোতার দল, মাথা দুলিয়ে সেই কবিতা আওড়াবার চেষ্টা করত।



মহাত্মাজীর শেষ ব্রত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যুগে যুগে দৈবাৎ এই সংসারে মহাপুরুষের আগমন হয়। সব সময় তাঁদের দেখা পাইনে। যখন পাই সে আমাদের সৌভাগ্য। আজকের দিনে দুঃখের অন্ত নেই, কত পীড়ন, কত দৈন্য, কত রোগ শোক তাপ আমরা নিত্য ভোগ করছি, দুঃখ জমে উঠেচে রাশি রাশি। তবু সব দুঃখকে ছাড়িয়ে গেছে আজ এক আনন্দ। যে-মাটিতে আমরা বেঁচে আছি, সঞ্চরণ করচি, সেই মাটিতেই একজন মহাপুরুষ, যাঁর তুলনা নেই, তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন।

যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা যখন আসেন, আমরা ভালো করে চিনতে পারিনে তাঁদের। কেন-না, আমাদের মন ভীরু, অস্বচ্ছ, স্বভাব শিথিল, অভ্যাস দুর্বল। মনেতে সেই সহজ শক্তি নেই যাতে করে মহৎকে সম্পূর্ণ বুঝতে পারি, গ্রহণ করতে পারি। বারে বারে এমন ঘটেচে, যাঁরা সকলের বড়ো, তাঁদেরই সকলের চেয়ে দূরে ফেলে রেখেচি।

যাঁরা জ্ঞানী, গুণী, কঠোর তপস্বী, তাঁদের বোঝা সহজ নয়, কেন-না আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি সংস্কার তাঁদের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু একটা জিনিষ বুঝতে কঠিন লাগে না, সেটি ভালোবাসা। যে মহাপুরুষ ভালোবাসা দিয়ে নিজের পরিচয় দেন, তাঁকে আমাদের ভালোবাসায় আমরা এক রকম করে বুঝতে পারি। সেই জন্য ভারতবর্ষে এই এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটল, যে, এবার বুঝেচি। এমনটি সচরাচর ঘটে না। যিনি আমাদের মধ্যে এসেচেন তিনি অত্যন্ত উচ্চ, অত্যন্ত মহৎ। তবু তাঁকে স্বীকার করেচি, তাঁকে জেনেচি। সকলে বুঝেচে তিনি আমাদের। তাঁর ভালোবাসায় উচ্চ-নীচের ভেদ নেই, মূর্খ-বিদ্বানের ভেদ নেই, ধনী-দরিদ্রের ভেদ নেই। তিনি বিতরণ করেচেন সকলের মধ্যে সমান ভাবে তাঁর ভালোবাসা। তিনি বলেচেন সকলের কল্যাণ হোক, সকলের মঙ্গল হোক। যা বলেচেন শুধু কথায় নয়, বলেচেন দুঃখের বেদনায়। কত পীড়া, কত অপমান তিনি সয়েচেন। তাঁর জীবনের ইতিহাস দুঃখের ইতিহাস। দুঃখ অপমান ভোগ করেচেন কেবল ভারতবর্ষে নয়, দক্ষিণ-আফ্রিকায় কত মার তাঁকে মৃত্যুর ধারে এনে ফেলেচে। তাঁর দুঃখ নিজের বিষয়-সুখের জন্য নয়, স্বার্থের জন্য নয়, সকলের ভালোর জন্যে। এই যে এত মার খেয়েচেন, উল্টে কিছু বলেন নি কখনো, রাগ করেন নি। সমস্ত আঘাত মাথা পেতে নিয়েচেন। শত্রুরা আশ্চর্য্য হয়ে গেছে ধৈর্য্য দেখে, মহত্ত্ব দেখে। তাঁর সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়, কিন্তু জোর জবরদস্তিতে নয়; ত্যাগের দ্বারা দুঃখের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা তিনি জয়ী হয়েচেন। সেই তিনি আজ ভারতবর্ষের দুঃখের বোঝা নিজের দুঃখের বেগে ঠেলবার জন্যে দেখা দিয়েচেন।

তোমরা সকলে তাঁকে দেখেচ কি-না জানি না। কারো কারো হয়ত তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য ঘটেচে। কিন্তু তাঁকে জানো সকলেই, সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁকে জানে। সবাই জানো সমস্ত ভারতবর্ষ কি রকম করে তাঁকে ভক্তি দিয়েচে, একটি নাম দিয়েছে—মহাত্মা। আশ্চর্য্য, কেমন করে চিনলে। মহাত্মা অনেককেই বলা হয়, তার কোনো মানে নেই। কিন্তু এই মহাপুরুষকে যে মহাত্মা বলা হয়েচে, তার মানে আছে। যাঁর আত্মা বড়ো, তিনিই মহাত্মা। যাদের আত্মা ছোটো, বিষয়ে বদ্ধ, টাকাকড়ি, ঘর-সংসারের চিন্তায় যাদের মন আচ্ছন্ন, তারা দীনাত্মা। মহাত্মা তিনিই, সকলের সুখ দুঃখ যিনি আপনার করে নিয়েচেন, সকলের ভালোকে যিনি আপনার ভালো বলে জানেন। কেন-না, সকলের হৃদয়ে তাঁর স্থান, তাঁর হৃদয়ে সকলের স্থান। আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরকে বলে মহাত্মা, মর্ত্ত্যলোকে সেই দিব্য ভালোবাসা, সেই প্রেমের ঐশ্বর্য্য দৈবাৎ মেলে। সেই প্রেম যার মধ্যে প্রকাশ পেয়েচে

তাঁকে আমরা মোটের উপর এই বলে বুঝেচি যে তিনি হৃদয় দিয়ে সকলকে ভালো বেসেচেন। কিন্তু সম্পূর্ণ বুঝতে পারি না, ভালো করে চিন্‌তে একটু বাধা লাগে। বাঁকা হয়ে গেছে আমাদের মন। সত্যকে স্বীকার করতে ভীরুতা দ্বিধা সংশয় আমাদের জাগে। বিনা ক্লেশে যা মানতে পারি, তাই মানি, কঠিনটাকে সরিয়ে রেখে দিই একপাশে। তাঁর সকলের চেয়ে বড়ো সত্যটাকে নিতে পারলুম না। এইখানেই তাঁকে মারলুম। তিনি এসেচেন, ফিরে গেলেন, শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে নিতে পারলুম না।

খৃষ্টান শাস্ত্রে পড়েচি, আচারনিষ্ঠ য়িহুদিরা যীশুখৃষ্টকে শত্রু বলে মেরেছিল। কিন্তু মার কি শুধু দেহের? যিনি প্রাণ দিয়ে কল্যাণের পথ খুলে দিতে আসেন সেই পথকে বাধাগ্রস্ত করা সেও কি মার নয়? সকলের চেয়ে বড়ো মার সে-ই। কী অসহ্য বেদনা অনুভব করে তিনি আজকের দিনে মৃত্যু-ব্রত গ্রহণ করেচেন। সেই ব্রতকে যদি আমরা স্বীকার করে না নিই, তবে কি তাঁকে আমরা মারলুম না? আমাদের ছোটো মনের সঙ্কোচ ভীরুতা আজ লজ্জা পাবে না? আমরা কি তাঁর সেই বেদনাকে মর্ম্মের মধ্যে ঠিক জায়গায় অনুভব করতে পারব না? গ্রহণ করতে পারব না তাঁর দান? এত সঙ্কোচ এত ভীরুতা আমাদের? সে ভীরুতার দৃষ্টান্ত তো তাঁর মধ্যে কোথাও নেই। সাহসের অন্ত নেই তাঁর; মৃত্যুকে তিনি তুচ্ছ করেচেন। কঠিন কারাগার তার সমস্ত লোহার শিকল নিয়ে তাঁর ইচ্ছাকে ঠেকাতে পারে নি। সেই তিনি এসেচেন আজ আমাদের মাঝখানে। আমরা যদি ভয়ে পিছিয়ে পড়ি, তবে লজ্জা রাখবার ঠাঁই থাকবে না। তিনি আজ মৃত্যু-ব্রত গ্রহণ করেচেন, ছোটো-বড়োকে এক করবার জন্যে। তাঁর সেই সাহস, তাঁর সেই শক্তি আসুক আমাদের বুদ্ধিতে, আমাদের কাজে। আমরা যেন আজ গলা ছেড়ে বলতে পারি, তুমি যেয়ো না, আমরা গ্রহণ করলাম তোমার ব্রত। তা যদি না পারি, এত বড়ো জীবনকে যদি ব্যর্থ হতে দিই, তবে তার চেয়ে বড়ো সর্ব্বনাশ আর কী হতে পারে?

আমরা এই কথাই বলে থাকি, যে, বিদেশীরা আমাদের শত্রুতা করচে। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো শত্রু আছে আমাদের মজ্জার মধ্যে, সে আমাদের ভীরুতা। সেই ভীরুতাকে জয় করার জন্যে বিধাতা আমাদের জন্যে শক্তি পাঠিয়ে দিয়েচেন তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে, তিনি আপন অভয় দিয়ে আমাদের ভয় হরণ করতে এসেচেন। সেই তাঁর দান-সুদ্ধ তাঁকে আজ কি আমরা ফিরিয়ে দেব? এই কৌপীনধারী আমাদের দ্বারে দ্বারে আঘাত করে ফিরেচেন, তিনি আমাদের সাবধান করেচেন কোন্‌খানে আমাদের বিপদ। মানুষ যেখানে মানুষের অপমান করে মানুষের ভগবান সেইখানেই বিমুখ। শত শত বছর ধরে মানুষের প্রতি অপমানের বিষ আমরা বইয়ে দিয়েচি ভারতবর্ষের নাড়ীতে নাড়ীতে। হীনতার অসহ্য বোঝা চাপিয়ে দিয়েচি শত শত মস্তকের উপরে, তারই ভারে সমস্ত দেশ আজ ক্লান্ত, দুর্ব্বল। সেই পাপে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারচিনে। আমাদের চলবার রাস্তায় পদে পদে পঙ্ককুণ্ড তৈরি করে রেখেচি,—আমাদের সৌভাগ্যের অনেকখানি তলিয়ে যাচ্চে তারই মধ্যে। এক ভাই আর এক ভাইয়ের কপালে স্বহস্তে কলঙ্ক লেপে দিয়েচে; মহাত্মা সইতে পারেন নি এই পাপ।

সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে শোনো তাঁর বাণী। অনুভব করো কী প্রচণ্ড তাঁর সঙ্কল্পের জোর। আজ তপস্বী উপবাস আরম্ভ করেচেন, দিনের পর দিন তিনি অন্ন নেবেন না। তোমরা দেবে না তাঁকে অন্ন? তাঁর বাণীকে গ্রহণ করাই তাঁর অন্ন, তাই দিয়ে তাঁকে বাঁচাতে হবে। অপরাধ অনেক করেচি, পাপ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেচে। ভাইয়ের সঙ্গে ব্যবহার করেচি দাসের মতো, পশুর মতো। সেই অপমানে সমস্ত পৃথিবীর কাছে ছোটো করে রেখেচে আমাদের। যদি তাদের প্রাপ্য সম্মান দিতাম তা হলে আজ এত দুর্গতি হত না আমাদের। পৃথিবীর অন্য সব সমাজকে লোকে সম্মান করে, ভয় করে, কেন-না তাঁরা পরস্পর ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ। আমাদের এই হিন্দু সমাজকে আঘাত করতে, অপমান করতে কারো মনে ভয় নেই বার-বার তার প্রমাণ পাই। কিসের জোরে তাদের এই স্পর্দ্ধা সে কথাটি যেন এক মুহূর্ত্ত না ভুলি।

যে সম্মান মহাত্মাজী সবাইকে দিতে চেয়েছেন, সে সম্মান আমরা সকলকে দেব। যে পারবে না দিতে ধিক্ তাকে। ভাইকে ভাই বলে গ্রহণ করতে বাধা দেয় যে-সমাজ, ধিক্ সেই জীর্ণ সমাজকে। সব চেয়ে বড়ো ভীরুতা তখনই প্রকাশ পায় যখন সত্যকে চিন্‌তে পেরেও মানতে পারিনে। সে ভীরুতার ক্ষমা নেই।

অভিশাপ অনেক দিন থেকে আছে দেশের উপর। সেই জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে বসেচেন একজন। সেই প্রায়শ্চিত্তে সকলকে মিলতে হবে, সেই মিলনেই আমাদের চির-মিলন সুরু হবে। মৃত্যুর বৃহৎ পাত্রে তাঁর প্রায়শ্চিত্ত তিনি আমাদের সকলের সামনে ধরলেন, এগিয়ে দিলেন আমাদের হাতের কাছে। গ্রহণ করো সকলে, ক্ষালন করো পাপ। মঙ্গল হবে। তাঁর শেষ কথা আজ আমি তোমাদের শোনাতে এসেচি। তিনি দূরে আছেন, কিন্তু তিনি দূরে নেই। তিনি আমাদের অন্তরেই আছেন। যদি জীবন দিতে হয় তাঁকে আমাদের জন্যে, তবে অন্ত থাকবে না পরিতাপের।

মাথা হেঁট হয়ে যাবে আমাদের। তিনি আমাদের কাছে যা চেয়েচেন, তা দুরূহ, দুঃসাধ্য ব্রত। কিন্তু তার চেয়ে দুঃসাধ্য কাজ তিনি করেচেন, তার চেয়ে কঠিন ব্রত তাঁর। সাহসের সঙ্গে যেন গ্রহণ করতে পারি তাঁর দেওয়া ব্রত। যাকে আমরা ভয় করচি, সে কিছুই নয়। সে মায়া, মিথ্যা। সে সত্য নয়; মান্‌ব না আমরা তাকে। বলো আজ সবাই মিলে, আমরা মানব না সেই মিথ্যাকে। বলো, আজ সমস্ত হৃদয় দিয়ে বলো, ভয় কিসের? তিনি সমস্ত ভয় হরণ করে বসে আছেন। মৃত্যু-ভয়কে জয় করেচেন। কোনো ভয় যেন আজ থাকে না আমাদের। লোক-ভয়, রাজ-ভয়, সমাজ-ভয় কিছুতেই যেন সঙ্কুচিত না হই আমরা। তাঁর পথে তাঁরই অনুবর্ত্তী হয়ে চল্‌ব, পরাভব ঘট্‌তে দেব না তাঁর। সমস্ত পৃথিবী আজ তাকিয়ে আছে, যাদের মনে দরদ নেই তারা উপহাস করচে। এত বড়ো ব্যাপারটা সত্যই উপহাসের বিষয় হবে যদি আমাদের উপরে কোনো ফল না হয়। সমস্ত পৃথিবী আজ বিস্মিত হবে যদি তাঁর শক্তির আগুন আমাদের সকলের মনের মধ্যে জ্বলে ওঠে, যদি সবাই বলতে পারি, জয় হোক্ তপস্বী, তোমার তপস্যা সার্থক হোক্। এই জয়ধ্বনি সমুদ্রের এক পার থেকে পৌঁছবে আর এক পারে, সকলে বলবে সত্যের বাণী অমোঘ, ধন্য হবে ভারতবর্ষ। আজকের দিনেও এত বড়ো সার্থকতায় যে বাধা দেবে সে অত্যন্ত হেয়, তাকে তোমরা ভয়ে যদি মানো তবে তার চেয়ে হেয় হবে তোমরা।

জয় হোক্ সেই তপস্বীর যিনি এই মুহূর্ত্তে বসে আছেন মৃত্যুকে সামনে নিয়ে, ভগবানকে অন্তরে বসিয়ে, সমস্ত হৃদয়ের প্রেমকে উজ্জ্বল করে জ্বালিয়ে। তোমরা জয়ধ্বনি করো তাঁর, তোমাদের কণ্ঠস্বর পৌঁছুক তাঁর আসনের কাছে, বলো তোমাকে গ্রহণ করলেম, তোমার সত্যকে স্বীকার করলেম।

আমি কীইবা বলতে পারি। আমার ভাষায় জোর কোথায়? তিনি যে ভাষায় বলচেন যে কানে শোনবার নয়, যে প্রাণে শোনবার, মানুষের সেই চরম ভাষা, নিশ্চয়ই তোমাদের অন্তরে পৌঁচেছে।

আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো সৌভাগ্য, পর যখন আপন হয়। সকলের চেয়ে বড়ো বিপদ, আপন যখন পর হয়। ইচ্ছে করেই যাদের আমরা হারিয়েচি ইচ্ছে করেই আজ তাদের ফিরে ডাকো,—অপরাধের অপমান হোক, অমঙ্গল দূর হয়ে যাক্। মানুষকে গৌরব দান করে মনুষ্যত্বের স্বগৌরব অধিকার লাভ করি।

শান্তিনিকেতন
৫ই আশ্বিন, ১৩৩৯

নিরুদ্দেশের পথে

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

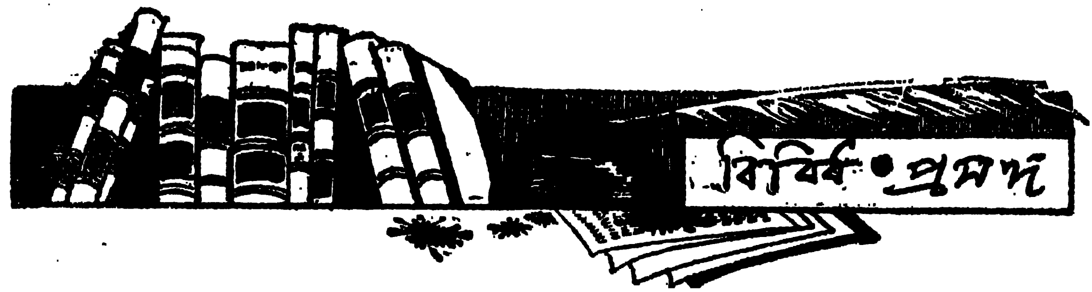
বালিকা গেল কোথা চলিয়া,
খেলিতে এসে খেলা ফেলিয়া!
খেলার ঘর-বাটী
সাজানো পরিপাটি
ভ'রেছে কুটি-মাটি পড়িয়া,
খেলানা ভাঁড় পড়ি
যেতেছে গড়াগড়ি,
ধূলার চিনি যায় উড়িয়া।
সেদিকে কেহ আর
চাহে না একবার,
চাহিলে আঁখি যায় ধাঁধিয়া,
পিপিড়া সারি দিয়ে
সেখানে শুধু গিয়ে
ফিরিয়া আসে বুঝি কাঁদিয়া।

প্রভাতে পাখী গায়—যেন বা ডাকে তারে,
আকাশে উঠে চাঁদ—সে যেন খোঁজে কা'রে,
সাঁঝের তারা ছুটি
ভাবিছে বুঝি উঠি
আকাশ-পারাবার অকূলে,
কোথা সে গেল চলে—
'দেখেছি আগে' ব'লে
গণিত যে গো কচি আঙুলে।
নিখিল চরাচর,
এখানে কেহ পর
ছিল না এতটুকু বুকে তার,
চোখেতে যখনি যা
পড়িত, তখনি তা
করিয়া নিত সে যে আপনার।

তাহারি চারাগাছে
মালতী ফুটিয়াছে,
সোহাগ যেন সে গো কার চায়,
লুঠিতে ফুল-বাস
পবন আসি শ্বাস
ফেলিয়া করে যেন হায় হায়।
পাখীটি খায়-দায়,
নহে সে সুখী তায়,
বিষাদে থাকে দাঁড়ে বসিয়া,
একটি বুলি আর
শুনি নে মুখে তার,
রেখেছে বুকে শোক পুষিয়া!
সে যে গো কোন্ পুরে,
গিয়াছে কত দূরে,
কাহারে কিছু নাহি বলিয়া,
সকলে তাই তারা
খুঁজিয়া হয় সারা
কোথা সে গেল সবে ছলিয়া।

এ যে গো ভাঙা ঘরে
বরষা-বারি ঝরে,
ঝটিকা বহে হু হু করিয়া,
গ্রাসিতে গৃহপাট,
ডুবায়ে পথঘাট
গরজি আসে যেন দরিয়া।

ভুলিতে যত চাই, ভুলিতে নাহি পারি,
মনে যে নিশিদিন জাগে গো কথা তারি;
সে কি যোদের কথা
ভাবিয়ে পায় ব্যথা,
যে গেছে এ হৃদয় দলিয়া—
বালিকা গেল কোথা চলিয়া!



মহাত্মা গান্ধীর অনশন-ব্রত

গত ১লা আশ্বিন মালদহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনের সভাপতি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতায় মহাত্মা গান্ধীর অনশন-ব্রত সম্বন্ধে বলা হইয়াছিল :—

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাদ্বারা হিন্দুসমাজের জীবন্তে ব্যবচ্ছেদ বা ভিভিসেক্‌শন যাহাতে না-হইতে পারে, তাহার জন্য মহাত্মা গান্ধী প্রাণ পণ করিয়াছেন, ইহা সকলেই অবগত আছেন। হিন্দুসমাজের অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষণ ও সাধনের জন্য হিন্দুশিরোমণির প্রাণপাতের প্রতিজ্ঞা কি আমাদের সকলকে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ও অবহিত করিবে না?

কেহ কেহ বলিতেছেন, হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে সরকারী ভাগ-বাঁটোয়ারাতে যে ব্যবস্থা আছে, তাহা ব্যর্থ করিবার জন্য—অন্ততঃ তাহাতে বাধা দিবার চেষ্টায়, মহাত্মাজীর মত মূল্যবান্ জীবন বলিদান অনাবশ্যক। অন্য সকলের মত আমিও মহাত্মাজীর জীবন সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে ও ভারতবর্ষের পক্ষে অতি মূল্যবান মনে করি। তাঁহার স্বেচ্ছামরণ ঘটিলে তাহা যে সাতিশয় শোকাবহ ঘটনা হইবে, তাহাও আমরা সবাই জানি ও মনে করি। তাঁহার তিরোভাব হইলে তাঁহার স্থানে অধিষ্ঠিত হইবার যোগ্য নেতা কেহ থাকিবেন না, তাহাও জানি। কিন্তু মহাত্মাজীর প্রতিজ্ঞার কারণ ও স্বরূপ ধীরতার সহিত বুঝিয়া, তাহার পর, তাঁহার ঐ প্রতিজ্ঞা ঠিক্ হইয়াছে কিনা, স্থির করা আবশ্যক।

তিনি বহু বৎসর হইতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, ভারতীয় মহাজাতির একতা ও সংহতি, এবং তাহারই অন্তর্গত হিন্দুসমাজের একতা ও সংহতির জন্য ব্রতী হইয়াছেন। এই ব্রত-সাধনকল্পে, আবশ্যক হইলে, তিনি যে-কোন সময়ে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত বরাবরই হইয়া আছেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত তর্কবিতর্ক তিনি অনেক করিয়াছেন। তাঁহার মতে, এবং আমাদেরও মতে, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। তাঁহার মতে তর্কবিতর্কের সময় আর নাই। এই জন্য তিনি গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থার প্রতিরোধকল্পে প্রাণপণ করিয়াছেন। প্রাণপণ কেন করিলেন, তাহা বুঝিতে হইলে, ঐতিহাসিক একটি প্রথা স্মরণ করা আবশ্যক।

পৃথিবীতে স্বদেশের স্বাধীনতা লাভ বা রক্ষা এবং তাহার দ্বারা স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের রক্ষার নিমিত্ত সশস্ত্র বিদ্রোহ অনেক বার অনেক দেশে হইয়াছে। এরূপ বিদ্রোহের নেতারা কখন কখন নিজেদের মৃত্যু অবধারিত জানিয়াও এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা নিজেরা কখন এরূপ ভাবেন নাই, "আমাদের প্রাণটা বড় মূল্যবান্, বিদ্রোহ করিয়া তাহা হারান উচিত নয়"; তাঁহাদের বন্ধুরাও তাঁহাদিগকে তাহা বলিয়া নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন নাই, এবং কেহ তাহা করিয়া থাকিলেও তাঁহারা তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। তাঁহাদের প্রাণের মূল্যই ছিল এইখানে, যে, উহা স্বাধীনতা, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। উৎসর্গেই যদি বাধা পড়িত, তাহা হইলে তাহার মূল্য থাকিত কোথায়? তাঁহারা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নন্দলালের মত আত্মরক্ষাতে নিশ্চয়ই রাজী হইতেন না। মহাত্মা গান্ধী সম্পূর্ণ অহিংসাবাদী। সশস্ত্র বিদ্রোহ তাঁহার পন্থা নহে, উহা আমাদেরও অনুমোদিত পন্থা নহে। কিন্তু তিনি যে নিরুপদ্রব অবাধ্যতার প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহাও এক প্রকার বিদ্রোহ। গবর্ণমেণ্টও তাহা বিদ্রোহ মনে করিয়াই দমন করিতেছেন। কিন্তু সশস্ত্র বিদ্রোহ এবং মহাত্মা গান্ধীর সঙ্কল্পিত প্রাণপণ অবাধ্যতায় একটি মৌলিক প্রভেদ আছে। সশস্ত্র বিদ্রোহে বিদ্রোহীদের প্রাণ যেমন বিপন্ন হয়, যাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হয় তাহাদেরও অনেকের প্রাণ সেইরূপ বিপন্ন হয়। মহাত্মা গান্ধীর বিদ্রোহে কেবল তাঁহারই প্রাণ যাইবে, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। তিনি বিরুদ্ধ পক্ষের প্রাণনাশ ত দূরের কথা, তাহাদের গায়ে একটু আঁচড় লাগে, এমনও চান না। সুতরাং তাঁহার এই স্বয়ং-দুঃখবরণ-ও-আত্মবলিদান-মূলক অবাধ্যতা সশস্ত্র বিদ্রোহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব, নৈতিক বিচারে, তাঁহার এই পথ অবলম্বন গর্হিত বিবেচিত হইতে পারে মনে করি না। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নন্দলালের মত আত্মপ্রাণরক্ষার নীতি তিনি অবলম্বন করিতে রাজী হইবেন, মনে হয় না।

তাঁহার প্রতিজ্ঞার ফলদায়কতা সম্বন্ধে অবশ্যই আলোচনা হইতে পারে। মহাত্মা গান্ধীর এই প্রতিজ্ঞায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর নৈতিক ও আত্মিক বল প্রযুক্ত হইবে, মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ জাতি ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় কোন ব্যাপারে ভারতীয়দের দুঃখবরণ ও আত্মবলিদানের প্রভাব অনুভব করিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। মহাত্মা গান্ধীকে জগদ্বাসীর চক্ষে হেয় করিবার যথাসাধ্য চেষ্টায় ব্রিটিশ অর্থ ও ব্রিটিশ মস্তিষ্ক নিযুক্ত হইয়াছে। এমন কি ভারতবর্ষের লোকদের উপরও যে তাঁহার প্রভাব অতি সামান্য, তাহা প্রমাণ করিবার জন্যও প্রভূত চেষ্টা হইয়াছে। সুতরাং, তাঁহাকে মহাপুরুষ মনে করিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নিজেদের নির্দ্ধারণ বদলাইবেন, এরূপ আশা করা যায় না। কিন্তু যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এরূপ মনে হয়, যে, মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু হইলে দেশব্যাপী এবং হয়ত পৃথিবীব্যাপী এমন সংক্ষোভ হইবে যাহা সামলান কঠিন হইবে, তাহা হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। কারণ, জগতের অন্যান্য দেশের পলিটিক্সের মত, ব্রিটিশ পলিটিক্সেও সেট্‌ল্‌ড্ ফ্যাক্ট বা অচল অটল অনড় কোন নির্দ্ধারণ নাই—ব্রিটিশ মন্ত্রীরা তাহা যত কেন অস্বীকার করুন না।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কি করিবেন, তাহা ছাড়িয়া দিয়া আমরা কি করিতে পারি, তাহার আলোচনাতে ফললাভের সম্ভাবনা আছে। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য হইলে গবর্ণমেণ্টকে নিজের জেদ বজায় রাখিতে বেগ পাইতে হইবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বরাবরই হিন্দু-মুসলমানের মিলনের

বিরোধী লোকদিগকেই সমগ্র মুসলমান সমাজের একমাত্র ও সর্ব্ববাদিসম্মত মুখপাত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। সেরূপ পার্থক্যবাদী অমিলনসর্ব্বস্ব লোকের হঠাৎ একান্ত অভাব হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। গবর্মেণ্টও যে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সিদ্ধান্তের জন্মের আশায় সোৎসুক হৃদয়ে বসিয়া আছেন, কিংবা বাস্তবিক মিলিত সিদ্ধান্ত হইলেও তাহা মানিয়া লইবেন, আমার ধারণা এরূপ নয়। কিন্তু তথাপি ভারতবর্ষের সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বুঝাপড়ার এবং সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা কোন অবস্থাতেই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়। গবর্মেণ্ট যাহাই ভাবুন করুন না কেন, এরূপ চেষ্টার একটি স্বতন্ত্র শুভ ফল ও মূল্য আছে।

হিন্দুসমাজের নিজের দ্বারা যে চেষ্টা হইতে পারে, তাহা আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা সাধ্যায়ত্ত। আমাদিগকে মুখের কথায় নয়, কেবল দু-এক বার ঘটা করিয়া সকল জাতির হাতের জল খাইয়া নয়, সকল জাতির সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিয়া নহে (যদিও এই সকলেরও কিছু কার্য্যকারিতা আছে), কিন্তু হৃদয়ের শুদ্ধি ও পরিবর্ত্তন হইতে উৎপন্ন প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহার দ্বারা গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক অস্পৃশ্য ও অবনত বলিয়া গণিত জাতিদের লোকদিগকে বুঝাইতে হইবে, যে, তাঁহারা আমাদের বিবেচনায় অস্পৃশ্য অবনত অনাচরণীয় নহেন; বুঝাইতে হইবে, যে, হিন্দুদের মধ্যেই তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা হিতাকাঙ্ক্ষী ও হিতকারী বন্ধুবর্গ আছেন। এই সকল শ্রেণীর অনেকেই ইহা বুঝেন; কিন্তু কতকগুলি স্বার্থান্বেষী ও সরকারী-অনুগ্রহ-লাভ-প্রয়াসী লোকে ও তাহাদের দ্বারা বিপথচালিত কতকগুলি লোকে তাহা বুঝেন না। আমি হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক তথাকথিত অস্পৃশ্য ও অবনত লোকদের প্রতি অতি গর্হিত আচরণ অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু ইহাই বলিতেছি, যে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত হিন্দু সমাজের অনেকে—প্রধানতঃ হিন্দুশিরোমণি মহাত্মা গান্ধী, করিতেছেন, এবং তথাকথিত অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয়গণ হিন্দুসমাজভুক্ত থাকিলেই তাঁহাদের ও অন্য সকলের মঙ্গল হইবে।

মহাত্মা গান্ধী যে উপবাস-ব্রত গ্রহণ করিবেন বলিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে হইলে তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী অন্য কোন উপায় তাঁহাকে জানাইতে হইবে।

হিন্দুসমাজকে এই বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করাইবার জন্য যদি মহাত্মা গান্ধীকে প্রাণ দিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে তাহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে?

সরকার পক্ষের লোকেরা বলিবেন—ইতিমধ্যেই কেহ কেহ বলিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধী কোয়ার্শ্যন বা জবরদস্তীর দ্বারা গবর্মেণ্টকে প্রতিজ্ঞাচ্যুত করিতে চান। বিনা-বিচারে নির্ব্বাসন, "বিশেষ" আইন ও অর্ডিন্যান্স অনুসারে বিচারান্তে জেলে প্রেরণ, গুলি সঙ্গীন ও লাঠি প্রয়োগ, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ প্রভৃতিকে জবরদস্তী বলিলে তাহাতে সরকারপক্ষীয় লোকে আপত্তি করিয়া থাকেন। অথচ কেহ অন্য কাহারও অনিষ্ট না করিয়া পরার্থে প্রাণপণ করিলে তাহাকে জবরদস্তী বলা হয়, ইহা অন্য দেশে আশ্চর্য্যের বিষয় হইত, কিন্তু ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে নহে।

ইংরেজদিগকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক। কোন দেশের গবর্মেণ্টকে কোন কাজ করাইতে হইলে কয়েকটি উপায় অবলম্বিত হইতে পারে। যথা—(১) আবেদন ও প্রার্থনা, (২) প্রতিবাদ ও তর্কযুক্তি, (৩) সশস্ত্র বিদ্রোহ, এবং (৪) কাহারও অনিষ্ট না করিয়া স্বয়ং দুঃখবরণ ও পূর্ণ আত্মোৎসর্গ। ভারতবর্ষের প্রথম দুটিতে কোন ফল হয় নাই। তৃতীয়টি ভারতবর্ষের লোকেরা বর্ত্তমান অবস্থায় করিতে হয় অসমর্থ, নয় অসম্মত। কাজেই বাকী থাকে চতুর্থটি। তাহা মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃক অবলম্বিত হইয়াছে। ইংরেজরা এমন আশা কেন করেন, যে, আমরা চিরকাল বৃথা আবেদন নিবেদন প্রতিবাদ ও তর্ক-যুক্তি করিতে থাকিব? ইহাও তাঁহাদের ভাবা উচিত নয়, যে, আমরা অভিনয়বৎ সশস্ত্র বিদ্রোহ করিয়া গুলি খাইয়া মরিতে রাজী হইব।

অবশ্য মহাত্মার অহিংসপন্থা তাঁহাদের বুঝিবার কথা নয়, কেন-না তাঁহারা স্বয়ং হিংসাবাদী। মহাত্মাজীর আত্মোৎসর্গের উপলব্ধি করাও অসাত্ত্বিক লোকদের সাধ্যাতীত।

গবর্মেণ্ট যে-সকল হিন্দুকে অস্পৃশ্য ও অবনত শ্রেণীর মধ্যে ফেলিয়াছেন, তাঁহারা যাহাতে অস্পৃশ্য ও অবনত না থাকিয়া অন্য সকল হিন্দুর মত সসম্মানে হিন্দুসমাজভুক্ত থাকিতে পারেন, তাহার জন্য, আবশ্যক হইলে, মহাত্মা গান্ধী প্রাণপাত করিতেও সঙ্কল্প করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা প্রতি এই সকল হিন্দুর একটি কর্ত্তব্য আছে। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের এই হিন্দুরা বলুন, "আমরা অস্পৃশ্য ও অবনত বলিয়া গণিত হইতে অসম্মত, অস্পৃশ্য ও অবনত বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া সেই অপমানের বিনিময়ে ও মূল্যে আমরা গবর্মেণ্টপ্রদত্ত তথাকথিত সুবিধা লইতে অসম্মত, এবং ব্যবস্থাপক সভাসমূহে আমাদের প্রতিনিধিদের জন্য মহাত্মা গান্ধী আমাদের সহিত পরামর্শ করিয়া যে বন্দোবস্ত করিবেন, আমরা তাহাতে সম্মত আছি।"

বস্তুতঃ এই সকল হিন্দুদের প্রধান নেতা শ্রীযুক্ত এম্ সি রাজা হিন্দুমহাসভার কর্ম্মকর্ত্তা সভাপতি ডাক্তার মুঞ্জের সহিত পরামর্শ করিয়া একটি চুক্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু গবর্মেণ্ট তাহা গ্রহণ করেন নাই। মহাত্মা গান্ধী জেলের বাহিরে থাকিলে এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার সহিতও পরামর্শ করা চলিত, কিন্তু সরকার বাহাদুর তাঁহাকে কারারুদ্ধ করায় সে উপায় ছিল না।

—

"হিন্দু" শব্দটির অর্থ

"হিন্দু" শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে মালদহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনের সভাপতি বলেন:—

হিন্দু শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমেরিকায় ইহা ভারতীয় মানুষ অর্থাৎ ভারতবর্ষের স্থায়ী বাসিন্দা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এইজন্য সেখানে ভারতবর্ষের পার্সী, খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান প্রভৃতিকেও হিন্দু বলে।

হিন্দুমহাসভা 'হিন্দু' শব্দটির যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। মহাসভার মতে, যে-কোন

ভারতবর্ষজাত কোন ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, তিনিই হিন্দু। এই সংজ্ঞা অনুসারে ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী সাঁওতাল কোল ভীল ইত্যাদি এবং জৈন বৌদ্ধ শিখ ব্রাহ্ম আর্য্যসমাজী প্রভৃতি সকলেই হিন্দু। কিন্তু কেহ যদি মনে করেন, যে, প্রচলিত সাধারণ অর্থে যাঁহারা হিন্দু তাঁহারাই হিন্দু, আদিম নিবাসীরা ও জৈন বৌদ্ধ শিখ ব্রাহ্ম আর্য্যসমাজী প্রভৃতি হিন্দু নহেন, তাহা হইলেও হিন্দুর একটি সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা সহজ হইবে না। "হিন্দু কে?" এই প্রশ্নের উত্তর একবার বহু বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের অনেক বিখ্যাত লোকের নিকট হইতে ইংরেজীতে লওয়া লইয়াছিল এবং উত্তরগুলি একটি পুস্তকের আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তক হয়ত এখনও এলাহাবাদের দৈনিক সংবাদপত্র লীডারের কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রাদেশিক হিন্দু সভা নিখিলভারতীয় হিন্দু মহাসভার শাখা। এইজন্য আমরা হিন্দুর অর্থ মহাসভার সংজ্ঞা অনুসারে বুঝিয়া থাকি। কেহ কেহ বলেন, এই সংজ্ঞা রাষ্ট্রনৈতিক বা রাজনৈতিক, ধার্ম্মিক ও সামাজিক নহে। এই মন্তব্যের সমালোচনা করিবার আমার এখন প্রয়োজন নাই। মহাসভা যাঁহাদিগকে হিন্দু বলেন, তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস ও সমাজনীতিতে মূলগত অন্তর্নিহিত যে সাদৃশ্য আছে, তাহার আলোচনাও এখন করিব না। কিন্তু ইহা যদি মানিয়া লওয়া যায়, যে, হিন্দু মহাসভার সংজ্ঞা রাষ্ট্রনৈতিক বা রাজনৈতিক, তাহা হইলেও বলি, তাহাতে দোষ কি? তাহাতে লজ্জার কারণ কি থাকিতে পারে? কূটরাজনীতিবিশারদগণের দোষে রাজনীতি কলঙ্কিত হয় বটে, কিন্তু মূলে রাষ্ট্রনীতি বা রাজনীতি মন্দ জিনিষ নয়। আমরা রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতি ইংরেজী 'পলিটিক্স' শব্দের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করি। মহাভারতে কতকটা ঐ অর্থে "দণ্ডনীতি" এবং "রাজধর্ম্ম" শব্দ দুটির প্রয়োগ দেখিতে পাই। শান্তি পর্ব্বের তেষট্টি অধ্যায়ে আছে :—

"মজ্জেৎ ত্রয়ী দণ্ডনীতৌ হতায়াং সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ প্রক্ষয়েয়ুর্বিবৃদ্ধাঃ।
সর্ব্বে ধর্ম্মাশ্চাশ্রমাণাং হতাঃ স্যুঃ ক্ষাত্রে ত্যক্তে রাজধর্ম্মে পুরাণে॥
সর্ব্বে ত্যাগা রাজধর্ম্মেষু দৃষ্টা সর্ব্বাঃ দীক্ষা রাজধর্ম্মেষু যুক্তাঃ।
সর্ব্বা বিদ্যা রাজধর্ম্মেষু চোক্তাঃ সর্ব্বে লোকা রাজধর্ম্মে প্রবিষ্টাঃ॥"

আধুনিক চিন্তার অনুযায়ী ভাষায় ইহার তাৎপর্য্য এই :—

"দণ্ডনীতি অর্থাৎ পলিটিক্স প্রাণহীন হইলে বেদত্রয় অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্র মজ্জিত হয়; সমুদয় ধর্ম্ম অর্থাৎ সভ্যতার সকল ভিত্তি যত বিবৃদ্ধ হউক না কেন তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। প্রাচীনকালাগত ক্ষাত্র রাজধর্ম্ম না থাকিলে মানুষের জীবনের ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমের ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ত্তব্য বিনষ্ট হয়। সকল ত্যাগ রাজধর্ম্মেই দৃষ্ট হয়, সকল দীক্ষা রাজধর্ম্মের সহিত যুক্ত। উক্ত হইয়াছে, যে, সকল বিদ্যা রাজধর্ম্মের অন্তর্ভূত, এবং সর্ব্বলোক রাজধর্ম্মে অনুপ্রবিষ্ট।"

অতএব মহাসভার নির্দ্দিষ্ট হিন্দুর সংজ্ঞা যদি রাষ্ট্রনৈতিক বা রাজনৈতিক হয়, তাহা হইলেও তাহাতে উহার কোন অগৌরব হয় না।

এই সংজ্ঞার মধ্যে আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য আবশ্যক একটি মহৎ ভাব নিহিত আছে। তাহা ভারতবর্ষের প্রতি ভক্তি ও অনুরাগ। ইহা আমরা সকলেই দেখিতেছি, ভারতবর্ষের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যাঁহারা হিন্দু নহেন, তাঁহারাও ভারতবর্ষের মাটী ভারতবর্ষের জলবাতাস হইতে দৈহিক জীবনের উপাদান সকল সংগ্রহ করেন, এবং বাসও করেন ভারতবর্ষের ভূমির উপর নির্ম্মিত গৃহে। হিন্দুরাও তাহাই করেন। যাঁহারা প্রকৃত হিন্দু, অর্থাৎ যাঁহারা আত্মার অন্ন ও পানীয় ভারতবর্ষজাত কোন ধর্ম্ম হইতে সংগ্রহ করেন, তাঁহাদের অধিকন্তু এই বিশেষত্ব আছে, যে, তাঁহাদের দেহ যেমন ভারতবর্ষে বাস করিয়া তাহার মাটীজলবাতাসে পুষ্ট হয়, তাঁহাদের আত্মাও তেমনই ভারতবর্ষীয় উচ্চতম চিন্তা ভাব ও সাত্ত্বিকতার পুষ্ট হইয়া ভারতীয় আধ্যাত্মিক লোকে বাস করে। তাঁহাদিগকে ধর্ম্মবিষয়ক এবং সামাজিক চিন্তা আদর্শ প্রভৃতির জন্য একমাত্র বা প্রধানতঃ কোন বিদেশের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। এই জন্য ভারতবর্ষের সহিত হিন্দুর বাহিরের ও ভিতরের যত যোগ, অন্য ভারতীয়দের ততটা নহে।

যাঁহারা ভারতবর্ষের প্রতি আধ্যাত্মিক অনুরক্তি, আনুগত্য ও ভক্তি অনুভব না করিয়া, বা কম পরিমাণে তাহা অনুভব করিয়া, কেবলমাত্র বা প্রধানতঃ অন্য কোন দেশের প্রতি তাহা অনুভব করেন, আমরা তাঁহাদিগকে নিকৃষ্ট মানুষ বলিতেছি না, মনেও করি না। আমরা কেবল ইহাই বলিতেছি, আমরা বাহিরে ও ভিতরে উভয়তঃ ভারতবর্ষীয়—ইহাই আমাদের বিশেষত্ব। ইহাও বলিতেছি না, যে, ভারতবর্ষের বাহিরের কোন চিন্তা ভাব আদর্শ সাত্ত্বিকতা আমরা গ্রহণ করি না, বা তাহার প্রভাব অনুভব করি না। বস্তুত তাহা করি। কিন্তু আমাদের হৃদয় মন মূলতঃ ভারতবর্ষীয় ছাঁচে গড়া এবং আমাদের ধাতটা ভারতবর্ষীয়।

কোন বিদেশের প্রতি যাঁহাদের টান ও ভক্তি বেশী, তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কোন ঝগড়া নাই। নিজের মাকে যে আমরা ভক্তি করি ও ভালবাসি, তার মানে এ নয়, যে, অন্যদের মাকে আমরা অবজ্ঞা করি এবং বিদ্বেষের চক্ষে দেখি।

আমরা যে ভারতবর্ষকে অন্য সকল দেশের উপর স্থান দি, তার মানে এ নয়, যে, অন্য সেই সেই দেশগুলি নিকৃষ্ট। যাঁহাদের দেহ সেই সেই দেশের অন্নজলবাতাসে পুষ্ট এবং হৃদয় মন আত্মাও সেখানকার চিন্তা ভাব আদর্শ আধ্যাত্মিকতা হইতে শক্তি ও আনন্দ লাভ করে, সেই সেই দেশ তাঁহাদের অনুরাগ আনুগত্য ও ভক্তির পাত্র।

যিনি যে পরিবারের মানুষ, তাহার প্রতি তাঁহার অনুরাগ স্বাভাবিক। তাহার পর ক্রমশঃ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর মানবসমষ্টির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ঘটে, এবং তাহাদের প্রতি তিনি অনুরাগও অনুভব করেন। ইহার পরিণতি বিশ্বমানবের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধায়। সেই জন্য হিন্দুরা পূর্ণমাত্রায় ভারতীয় হইলেও বিশ্বমানবের প্রতি প্রীতিমান ও ভক্তিমান হইতে তাঁহাদের কোন দুর্লঙ্ঘ্য বাধা নাই। কিন্তু ভারতবর্ষকে বাদ দিয়া পৃথিবীর বাকী সব অংশের বা অন্য কোন অংশের প্রতি আনুগত্য ও অনুরাগ হিন্দুদের অর্থাৎ পূর্ণভারতীয়দের লক্ষণ নহে।

আমি আদর্শের কথাই বলিতেছি। কার্য্যতঃ আমরা অন্তরে বাহিরে কতটা ভারতীয়, তাহা প্রত্যেকে নিজেকে পরীক্ষা করিয়া স্থির করিতে পারিবেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন :—

ইহা কৌতুকাবহ, যে, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট সম্প্রতি যে সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারা করিয়াছেন, তাহাতে অজ্ঞাতসারে মহাসভার হিন্দুর সংজ্ঞার অনুসরণ করিয়াছেন। বাংলা দেশের ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলি সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকার কিরূপ ভাগবাঁটোয়ারা করিয়াছেন দেখুন। তাঁহারা বিদেশী খ্রীষ্টিয়ান, দেশী খ্রীষ্টিয়ান, এবং ফিরিঙ্গী খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় কতকগুলি আলাদা আলাদা আসন রাখিয়াছেন। মুসলমানদের জন্যও ঐ প্রকার অনেকগুলি পৃথক আসন নির্দ্দিষ্ট

করিয়াছেন। বাকী সব ধর্ম্মের লোকদের জন্য "জেনায়্যাল" অর্থাৎ "সাধারণ" নাম দিয়া কতকগুলি আসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। হিন্দু কুলবধূরা যেমন ভাসুরের নাম করেন না, ব্রিটিশ গবর্মে´ণ্টও তেমনই ভাগবাঁটোয়ারার ব্যবস্থায় কোথাও হিন্দু শব্দটি ব্যবহার করেন নাই—আমাদিগকে "সাধারণ" বলিয়াছেন। এই "সাধারণ" নির্ব্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে বঙ্গের আদিমনিবাসীরা আছেন এবং হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, ব্রাহ্ম ও আর্য্যসমাজী আছেন। অর্থাৎ হিন্দু মহাসভা যাঁহাদিগকে হিন্দু বলেন, ব্রিটিশ মন্ত্রীরাও তাঁহাদিগকে একপর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে "সাধারণ" নাম দিয়া সরকার বাহাদুর তাঁহাদের সম্মান বা অসম্মান করিতে চাহিয়াছেন, জানি না—হয়ত কিছুই করিতে চান নাই; কিন্তু "সাধারণ" শব্দের ব্যবহারে অনভিপ্রেত ভাবে একটা সত্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। সরকারী "জেনায়্যাল" শব্দটিরই বাংলা আমরা করিয়াছি "সাধারণ"। এই "জেনায়্যাল" কথাটির ব্যাখ্যা ইংরেজী অভিধানে এই প্রকার আছে—"Completely or approximately universal, including or affecting all or nearly all parts: not partial, particular, local, or sectional": অর্থাৎ "যাহা সর্ব্বসম্বন্ধীয় বা প্রায় সর্ব্বসম্বন্ধীয়; সমুদয় অংশ বা প্রায় সমুদয় অংশ যাহার অন্তর্ভূ´ত বা যাহার প্রভাবান্বিত; যাহা আংশিক, বিশেষ, স্থানীয় বা বিভাগীয় নহে।" আর যাঁহাদের ইচ্ছা হয়, তাঁহারা অ-সাধারণ হউন, আমরা সাধারণ বটে এবং সাধারণই থাকিব, এবং ইংরেজ গবর্মে´ণ্ট স্বীকার করুন বা না করুন, হিন্দুরা রাষ্ট্রীয় বিষয়ে যাহা কিছু চাহিয়াছে করিয়াছে, তাহা সংকীর্ণ ভাবে নিজেদের জন্য করে নাই চাহে নাই, সর্ব্বসাধারণের জন্যই করিয়াছে চাহিয়াছে। এই কারণে "সাধারণ" বিশেষণটি আমরা গৌরবজনক মনে করি।

—

বঙ্গীয় হিন্দু সম্মেলনের বাঞ্ছিত রাষ্ট্রবিধি

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনের পক্ষ হইতে সভাপতি বলেন :—

গবর্মে´ণ্ট যে সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারা করিয়াছেন, তাহার সমালোচনা করিয়াছি। কিন্তু আমরা কিরূপ ব্যবস্থা চাই, তাহা বলি নাই। হিন্দুমহাসভা বরাবর পূর্ণ গণতান্ত্রিক ও স্বাজাতিক (democratic and nationalistic) ব্যবস্থা চাহিয়া আসিয়াছেন। ইহা লীগ অব্ নেশুন্সের ব্যবস্থার অনুযায়ী। লীগ সংখ্যালঘিষ্ঠদের আলাদা ভাষা, আলাদা ধর্ম্ম, আলাদা কৃষ্টি (কালচার), আলাদা সামাজিক রীতিনীতি থাকিলে, তাহার রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠদিগকে কোথাও স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন, ব্যবস্থাপক সভার স্বতন্ত্র কতকগুলি আসন প্রভৃতি বিশেষ রাজনৈতিক অধিকার দিয়া রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র সৃষ্টি-পূর্ব্বক জাতীয় একতা ভঙ্গের উপায় করিয়া দেন নাই। মহাসভা সংখ্যালঘিষ্ঠদিগকে লীগের অনুমোদিত ধর্ম্ম আদি বিষয়ে রক্ষণোপায় দিতে প্রস্তুত, কিন্তু ভারতবর্ষে মহাজাতিগঠনের অন্তরায় কোন ব্যবস্থায় রাজী নহেন। ব্রিটিশ পক্ষ হইতে লীগে হেণ্ডার্স´ন সাহেব লীগের সংখ্যালঘিষ্ঠ সন্ধিগুলিকে জগতের অন্তর্জাতিক আইনের অন্তর্গত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই সন্ধিগুলি লীগের সভ্যরূপে গ্রেট ব্রিটেন ও ভারতবর্ষ অন্য রাষ্ট্র-সভ্যদের সহযোগে রচনা ও র‍্যাটিফাই (দৃঢ়) করেন। কিন্তু ভারতবর্ষের নিজের বেলায় এসব ব্যবস্থা খাটিল না—ভারতবর্ষ পৃথিবীর বাহিরে, অন্তর্জাতিক আইনের বাহিরে। গণতান্ত্রিকতার ও স্বাজাতিকতার বিরুদ্ধ যাহা, এখানে তাহাই বৈধ। কিন্তু ইহা আমরা কখনই মানিয়া লইব না। বাধা দিব। তাহার সমীচীন উপায় নির্দ্ধারণ আপনারা করুন।

—

সার্ব্বজনীন উপাসনা

শীঘ্রই বাংলা দেশে হিন্দু বাঙালীদের দুর্গোৎসব আরম্ভ হইবে; বঙ্গের বাহিরে যেখানে যেখানে কতকগুলি হিন্দু বাঙালী আছেন, অনেক স্থলে সেখানেও হইবে। কিছু দিন হইতে কোথাও কোথাও সকল জাতির হিন্দুদের জন্য "সার্ব্বজনীন" দুর্গাপূজা হইতেছে। তাহাতে পুরোহিত, ভোগপাচক এবং পরিবেষক ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির লোকেও হইয়া থাকেন এবং সকলের একত্র পংক্তিভোজনও হয়। এইরূপ "সার্ব্বজনীন" সরস্বতী পূজা প্রভৃতিও হয়। এই প্রকার পূজা হিন্দুসমাজের মধ্যে সামাজিক ও ধার্ম্মিক অধিকারসাম্য স্থাপনের একটি ধাপ, এবং সেইরূপ সাম্য ইহার দ্বারা আংশিক ভাবে স্থাপিত হইতেছে। কিন্তু ইহাকে বিনা বিশেষণে ঠিক সার্ব্বজনীন বলা চলে না। কারণ ইহাতে জৈন, বৌদ্ধ, ইহুদী, পার্সী, খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান, শিখ, ব্রাহ্ম ও আর্য্যসমাজীরা যোগ দিতে পারেন না ও দেন না। ইহাকে হিন্দু পৌরাণিক সার্ব্বজনীন পূজা বলা যাইতে পারে। অবশ্য, আগে হিন্দু সমাজে শাক্ত ও বৈষ্ণবদিগের মধ্যে ধর্ম্মমত, ধর্ম্মবিশ্বাস এবং পূজাবিধিতে যে পার্থক্য ছিল, বর্ত্তমানে তাহা থাকিলে ইহাকে হিন্দু সার্ব্বজনীন পূজাও বলা চলিত না।

যে-সকল ধর্ম্মের লোক আস্তিক এবং এক পরমাত্মায় বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের সম্মিলিত উপাসনার স্থান স্বরূপ রামমোহন রায় ব্রহ্মমন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আদি ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টডীডে তিনি ইহাকে বলিয়াছিলেন, "a place of public meeting of all sorts and descriptions of people without distinction as shall behave and conduct themselves in an orderly, sober, religious and dovout manner for the worship and adoration of the Eternal, Unsearchable and Immutable Being who is the author and preserver of the universe but not under or by any other

name, designation or title peculiarly used for or applied to any Being or Beings by any man or set of men whatsoever," অর্থাৎ যিনি অনাদি অনন্ত অনন্যুসন্ধেয় ও অপরিবর্ত্তনীয় বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বপাতা, নির্বিশেষে সকল প্রকারের ও শ্রেণীর সমুদয় লোকের সুশৃঙ্খল, সংযত, ধর্ম্মসঙ্গত ও সশ্রদ্ধ ভাবে তাঁহার উপাসনা ও আরাধনার নিমিত্ত সমবেত হইবার ইহা প্রকাশ্য স্থান, যেখানে অন্য বিশেষ কোন জীব বা সত্তাকে বুঝাইবার জন্য কোন মানুষ বা মনুষ্যসমষ্টির দ্বারা ব্যবহৃত অন্য কোন নামে তিনি পূজিত হইবেন না।"

যখন হইতে রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন, তদবধি সমুদয় ব্রহ্মমন্দিরে সকল দেশের, জাতির, ধর্ম্মের ও জা'তের পুরুষ ও নারী ভগবদারাধনার জন্য মিলিত হইতে পারেন। কোথাও না কোথাও ব্রহ্মমন্দিরে সকল ভারতীয় ও অভারতীয় ধর্ম্মের লোকেরা উপাসনার জন্য মিলিত হইয়া আসিতেছেন। ইহা সার্ব্বজনীন উপাসনা। ধর্ম্মের দিক দিয়া মহাজাতিগঠনেরও ইহা শ্রেষ্ঠ উপায়। আধুনিক যুগের সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় স্বাজাতিক নেতা রামমোহন জাতিবর্ণধর্ম্মনির্বিশেষে পরব্রহ্মের সম্মিলিত উপাসনার এই রাষ্ট্রনৈতিক কার্য্যকারিতা অবগত ছিলেন।

—

মহাত্মাজীর প্রায়োপবেশন উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা

৪ঠা আশ্বিন তারিখে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র অগণিত দেবমন্দির প্রভৃতিতে যেমন পূজা প্রার্থনা আদি হইয়াছিল সেইরূপ কলিকাতার আলবার্ট-হলে ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে, মহাত্মা গান্ধীর প্রায়োপবেশন উপলক্ষ্যে যে সার্ব্বজনীন উপাসনা হয়, "আনন্দবাজার পত্রিকা"য় তাহার নিম্নমুদ্রিত বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে।

এলবার্ট হলে সার্ব্বজনীন প্রার্থনা

গতকল্য সন্ধ্যা ৬টার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে এলবার্ট হলে সার্ব্বজনীন প্রার্থনা-সভা হয়। মহাত্মা গান্ধীর প্রায়োপবেশন উপলক্ষ্যে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করাই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। সভায় বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল। তিলধারণের পর্য্যন্ত স্থান ছিল না। সর্ব্বশ্রেণীর লোক এই প্রার্থনায় যোগ দিয়াছিলেন। বহু মহিলাও সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাস্থল নীরব, গম্ভীর ও নিস্তব্ধ ছিল। সঙ্গীতের পর আচার্য্য সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় উপাসনা আরম্ভ করেন। মহাত্মা গান্ধীর মহান জীবন, জাতির জন্য তাঁহার অপূর্ব্ব প্রেম ও ত্যাগ, তাঁহার আত্মদানের সঙ্কল্প, এই সমস্ত কথা ওজস্বিনী ভাষায় তিনি বর্ণনা করেন এবং শ্রীভগবানের নিকট জগতের কল্যাণের জন্য মহাত্মাজীর জীবনরক্ষার জন্য প্রার্থনা করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের উপদেশ হইতে কিয়দংশ পাঠ করেন। অবশেষে অধ্যাপক বিমলচন্দ্র ঘোষ ওজস্বিনী ভাষায় মহাত্মার ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের মহিমা কীর্ত্তন করেন। রবীন্দ্রনাথের "জনগণমনঅধিনায়ক জয় হে" সঙ্গীত সকলে সমস্বরে গান করিবার পর অনুষ্ঠান শেষ হয়।

"বঙ্গবাণী" লিখিয়াছেন :—

মহাত্মাজীর দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া গতকল্য এলবার্ট হলে এক ব্রাহ্ম উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। সভায় বহুজন-সমাগম হইয়াছিল। শত শত মহিলা এই প্রার্থনায় যোগদান করিয়াছিলেন। এলবার্ট হলে এরূপ জনতা সহসা পরিলক্ষিত হয় নাই। সভায় তিলমাত্র ধারণের স্থান ছিল না। গবাক্ষ অলিন্দ বাতায়ন সর্ব্বত্রই নরমুণ্ড দেখা গিয়াছিল। প্রথমেই "মরণে তোমার হবে জয়" এই সঙ্গীতটি দ্বারা সভার উদ্বোধন-কার্য্য আরম্ভ হয়।

প্রথমেই শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী বলেন, জাতির সঙ্কট সময়ে আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। এই সময় নূতন শক্তি ও দৃষ্টির জন্য আমাদের ভগবানের কাছে ভিক্ষা করিতে হইবে। আজকের কাজের গুরুত্ব বুঝিয়া সকলেরই নিবিষ্ট চিত্তে উপাসনায় যোগদান করা উচিত।

আচার্য্য সতীশ চক্রবর্ত্তী এই প্রার্থনা করেন যে, আজ সকলের হৃদয় ও মন যেভাবে আলোড়িত হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত; এই ব্যাপার মহাপ্রাণের আত্মবলিদানের ব্যাপার। এই জন্য সমগ্র ভারত আজ আন্দোলিত ও আলোড়িত। প্রায়োপবেশন সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রায়শ্চিত্ত। ইহার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তিনি যে আজ মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতেছেন, ইহা আমাদের অপরাধের শাস্তি। তিনি একলাই উহা মাথা পাতিয়া লইতেছেন। অস্পৃশ্যতা জাতির বড় কলঙ্ক, এই কলুষই জাতিকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। ইহার জন্য মহাত্মাজী জীবন দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এখন উচিত আমাদের হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করা। যেখানে ভেদ আছে সেখানেই এই ব্যাপারের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহা দূর করা আমাদের প্রয়োজন। শিখ ও মুসলমানগণের মধ্যেও কোন ভেদ থাকিলে আজ এই পুণ্য দিব্যালোকের স্পর্শে তাহা দূর হইয়া যাউক। আমরা সকলে এক হইয়া যাই। ইহার পর "জনগণমনঅধিনায়ক জয় হে" সঙ্গীত দ্বারা উপাসনা শেষ হয়।

—

একেশ্বরবাদ ও জাতীয় অভ্যুদয়

বহুদেববাদ ও একেশ্বরবাদের সহিত জাতীয় অভ্যুদয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রবন্ধলেখক ও সাংবাদিক ওয়াল্টার ব্যাজট্ (Walter Bagehot) তাঁহার "ফিজিক্স এণ্ড পলিটিক্স" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"Those kinds of morals and that kind of religion which tend to make the firmest and most effectual character are sure to prevail, all else being the same; and creeds and systems that conduce to a soft limp mind tend to perish, except some hard extrinsic force keep them alive.....Strong beliefs win strong men, and then make them stronger. Such is no doubt one cause why Monotheism tends to prevail over Polytheism: it produces a higher, steadier character, calmed and concentrated by a great single object; it is not confused by competing rites, or distracted by miscellaneous deities. Polytheism is religion *in commission*, and it is weak accordingly. But it will be said the Jews, who were monotheist, were conquered by the Romans, who were polytheist. Yes, it must be answered, because the Romans had other gifts; they had a capacity for politics, a habit of discipline, and of these the Jews had not the least. The religious advantage was an advantage, but it was counter-weighed."

—যে নৈতিক আদর্শ ও যে ধর্ম্ম দৃঢ় চরিত্র ও কার্য্যক্ষম মানুষ সৃষ্টি করে, আর সব অবস্থা সমান হইলে, তাহাই জয়ী কিংবা প্রভাবশালী হয়। কোন কঠিন বাহ্য শক্তি বাঁচাইয়া না রাখিলে, যে সকল ধর্ম্ম দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দেয় তাহারা লুপ্ত হয়।...সবল ধর্ম্মবিশ্বাসই সবল মানুষকে জয় করিতে পারে, এবং তাহাদিগকে সবলতর করিতে পারে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে এই কারণেই একেশ্বরবাদ বহুদেবতাবাদকে পরাজিত করে। একেশ্বরবাদের দ্বারা উন্নততর ও দৃঢ়তর চরিত্রের সৃষ্টি হয়, এবং একটি বিরাট উদ্দেশ্য থাকায় এই সবল চরিত্র অধিকতর শান্ত ও একাগ্র হয়। বিচিত্র অনুষ্ঠান দ্বারা উহা বিভ্রান্ত হয় না, নানা দেবদেবী দ্বারা উহা বিক্ষিপ্তচিত্ত হয় না। বহুদেবতাবাদ ধর্ম্মের বহু প্রভুর অধীন রূপ। সেই জন্য উহা দুর্ব্বল। কিন্তু এ আপত্তি হয়ত উঠিবে, যে, ইহুদীরা ত একেশ্বরবাদী ছিল, তবু তাহারা বহুদেবতাবাদী রোমানদের দ্বারা বিজিত হয়। ইহার উত্তর এই যে, রোমানরা তাহা করিয়াছিল সত্য, কিন্তু সে তাহাদের অন্য গুণ ছিল বলিয়া। তাহাদের রাজনৈতিক দক্ষতা ছিল, নিয়মানুবর্ত্তী ও সংহত হইবার অভ্যাস ছিল। ইহুদীদের এ-সকল গুণের কোনটিই ছিল না। ধর্ম্ম হইতে যে সুবিধা পাওয়া যায় তাহা ইহুদীদের ছিল। কিন্তু রোমানদের অন্য গুণের দ্বারা ইহুদীদের এই সুবিধা নষ্ট হয়।

হিন্দু সমাজের অনেক বিখ্যাত ও সাধারণ লোক একেশ্বরবাদী বলিয়া পরিচিত কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অন্তর্গত না হইলেও বস্তুতঃ একেশ্বরবাদী ছিলেন ও আছেন। অন্যদিকে, একেশ্বরবাদী বলিয়া গৃহীত ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহের অনেক লোক বস্তুতঃ জীবনে এক ঈশ্বরের অনুবর্ত্তী নহেন, নিকৃষ্ট অন্য কিছুর দাসত্বই করেন।

—

রামমোহন ও বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন, যে, তিনটি প্রধান বিষয়ে তিনি রামমোহনের স্বনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম, বেদান্তকে স্বীকার; দ্বিতীয়, দেশভক্তি ও দেশহিতৈষণা প্রচার; তৃতীয়, সেই মানব প্রীতি যাহা সমভাবে হিন্দু ও মুসলমানের প্রতি অনুভূত হইয়াছিল।

ভগিনী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের সহিত ভ্রমণের যে বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন, তাহার দ্বিতীয় অধ্যায়ে, নৈনিতালের কথোপকথন প্রসঙ্গে, এই বিষয়টি বিবৃত হইয়াছে। যথা—

"It was here, too, that we heard a long talk on Ram Mohun Roy, in which he pointed out three things as the dominant notes of this teacher's message, his acceptance of the Vedanta, his preaching of patriotism, and the love that embraced the Mussalman equally with the Hindu. In all these things, he claimed himself to have taken up the task that the breadth and foresight of Ram Mohun Roy had mapped out."—*Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda*. By Sister Nivedita. Edited by the Swami Saradananda. Authorized Edition. 1913. Page 19.

—এইখানেই [নৈনিতালে] রামমোহন রায় সম্বন্ধে তাঁহার নিকট হইতে আমরা একটি দীর্ঘ আলোচনা শুনি। এই আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, তিনটি জিনিষ রামমোহনের বাণীর প্রধান বিশেষত্ব; উহার প্রথমটি বেদান্তকে স্বীকার, দ্বিতীয় তাঁহার দেশপ্রেম প্রচার, তৃতীয়টি হিন্দু-মুসলমানে সমভাব ও প্রীতি। রামমোহনের উদারতা ও দূরদৃষ্টি যে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছিল, এই তিনটি বিষয়েই সেই কার্য্যপ্রণালী তিনি [বিবেকানন্দ] অনুসরণ করিতেছেন এই দাবি তিনি করেন।

রামমোহন বেদান্তের ব্যাখ্যায় শাঙ্কর ভাষ্য বা অন্য কোন ভাষ্যের একান্ত অনুসরণ করেন নাই, নিজ স্বাধীন বিচারশক্তির ব্যবহার করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দও তাহাই করিয়াছিলেন।

—

মালদহে সভাপতির অভিভাষণে আলোচিত অন্যান্য বিষয়

মালদহে বঙ্গীয় হিন্দু সম্মেলনের সভাপতির বক্তৃতায় অন্য আরও অনেক বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি। প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকদের ব্যক্তিগত সাধনা ছাড়া সম্মিলিত উপাসনা ও উৎসবের প্রয়োজন ও উপকারিতার আলোচনা আছে। বক্তা ধর্ম্মবিষয়ে সকল জা'তের লোকদের অধিকারসাম্য সমর্থন করিয়াছেন। "সার্ব্বজনীন" দুর্গোৎসব, অনেক দেবমন্দিরে সকল জা'তের লোকদের প্রবেশ ও পূজার

অধিকার, হিন্দু সমাজকে এই সাম্যের দিকে লইয়া যাইতেছে। এই পরিবর্ত্তন আরও দ্রুত হওয়া আবশ্যক।

বক্তৃতাটিতে সরকারী সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারার দোষ ও নিগূঢ় উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হইয়াছে। হিন্দুরা কি কি গুণে ও দোষে এই সরকারী নির্দ্ধারণ দ্বারা সকলের চেয়ে অধিক অপমানিত ও অপকৃত হইয়াছে, বক্তৃতায় তাহা বর্ণিত হইয়াছে। গুণ সংক্ষেপতঃ এই, যে, "প্রধানতঃ হিন্দুদের চেষ্টা, স্বার্থত্যাগ, দুঃখভোগ ও বুদ্ধিমত্তার জন্যই ইংরেজদিগকে ভারতবর্ষে স্বশাসন প্রবর্ত্তিত করিবার অভিনয়কল্পে অল্পস্বল্প অধিকার ভারতীয়দিগকে দিয়া আসিতে হইতেছে।" দোষ "অস্পৃশ্যতা" এবং "উচ্চনীচজাতিভেদ" রূপ "রন্ধ্রগত শনি।" অস্পৃশ্যতা এবং উচ্চনীচজাতিভেদের অযৌক্তিকতা ও অনিষ্টকারিতা ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। কোন একটা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকদিগকে ব্যবস্থাপক সভাসমূহে অধিকাংশ সভ্য-পদ দিলে এবং সেই সকল সভ্যের নির্ব্বাচনের অধিকার সেই সম্প্রদায়েরই নির্ব্বাচকদিগকে দিলে তাহাতে দেশে যে সাম্প্রদায়িক শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহার সহিত দাসত্ব প্রথার সৌসাদৃশ্য বক্তৃতাটিতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইহা গণতান্ত্রিকতা নহে, স্বরাজও নহে। বস্তুতঃ এরূপ ব্যবস্থা দ্বারা কোন সম্প্রদায়ের লোককেই প্রভুত্ব দেওয়া হইবে না, প্রভুত্ব ইংরেজেরই থাকিবে।

গণতান্ত্রিক প্রথার উৎকর্ষ ও সুবিধা বক্তৃতাটিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

সমগ্র ভারতীয় মহাজাতির এবং সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দুদের যে অনিষ্ট সরকারী নির্দ্ধারণটার দ্বারা হইবে তাহা অভিভাষণটিতে দেখাইয়া সভাপতি বঙ্গীয় হিন্দুদের প্রতি অবিচার এবং তাহাদের অনিষ্টেরও বর্ণনা করিয়াছেন। পশ্চিম-বঙ্গে লোকসংখ্যা যথেষ্ট না বাড়িবার কারণগুলি উল্লিখিত এবং তজ্জন্য হিন্দুদের ও গবর্ন্মেণ্টের দায়িত্ব নির্দ্দেশিত হইয়াছে। অভিভাষণটিতে অতঃপর বলা হইয়াছে,

এই সমস্ত কারণে হিন্দুপ্রধান পশ্চিম-বঙ্গে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি যথেষ্ট না হইলেও, যদি বাংলাভাষী সব জেলাগুলিকে আগেকার মত বাংলাপ্রদেশভুক্ত রাখা হইত, তাহা হইলে সেই স্বাভাবিক-বঙ্গে মুসলমানেরা এখনও অমুসলমানদের চেয়ে সংখ্যায় কম থাকিত। কিন্তু হিন্দু বাঙালীদের শক্তি কমাইবার জন্য বাঙালীর অধ্যুষিত কয়েকটি জেলা ও মহকুমাকে আসাম ও বিহারের সহিত জুড়িয়া দিয়া এই কৃত্রিম উপায়ে বঙ্গের অমুসলমানদিগকে মুসলমানদের চেয়ে সংখ্যায় কম করা হইয়াছে এবং তাহার পর তাহাদিগকে বলা হইতেছে, তোমরা সংখ্যায় কম, অতএব ব্যবস্থাপক সভায় তোমাদের আসন কমই হইবে ও থাকিবে!

কিন্তু সংখ্যাই কি একমাত্র বিবেচ্য বিষয়? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পঞ্চাশ কোটি লোকের মধ্যে ভারতবর্ষেই ৩৫ কোটি লোকের বাস। কিন্তু তাহার জন্য ভারতীয়দিগকে ত ব্রিটিশ মন্ত্রীমণ্ডল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া দেন নাই?

হিন্দু বাঙালীদের প্রতি কিরূপ অবিচার হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে,

জ্ঞানে ও শিক্ষায়, সাহিত্যে বিজ্ঞানে শিল্পে কৃষ্টিতে উন্নত বলিয়া বঙ্গের যে খ্যাতি আছে, তাহা প্রধানতঃ হিন্দু বাঙালীদের কৃতিত্বের জন্য। বঙ্গের অধিকাংশ বিদ্যালয় কলেজ ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান হিন্দুদের জনহিতৈষণায়, অর্থে, কর্ম্মিষ্ঠতায় এবং বুদ্ধিতে চলিতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সমস্ত পদক, পুরস্কার, বৃত্তি ও অধ্যাপকতার মূলধন হিন্দুদের দেওয়া। দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন প্রভৃতিতে বিপন্ন লোকদের সাহায্য প্রধানতঃ হিন্দুদের টাকায় হিন্দুকর্ম্মীদের দ্বারা হয়। বাংলা দেশের ব্যবসা বাণিজ্য কারখানা যতটা দেশী লোকদের হাতে আছে তাহার অধিকাংশ হিন্দুদের। বঙ্গের সরকারী রাজস্বের অধিকাংশ টাকা হিন্দুরা যোগায়। গবন্মে'ণ্ট যে-দেশকে উন্নততর শাসন-প্রণালী দিবার কথা বলিতেছেন, তাহা প্রধানতঃ হিন্দুদের দীর্ঘকাল-ব্যাপী চেষ্টার ফল। কিন্তু এখন যে-ব্যবস্থা হইতে যাইতেছে, তাহার দ্বারা অমুসলমান বাঙালীদিগকে, হিন্দুদিগকে, শক্তিহীন করা হইতেছে। ভবিষ্যতের বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ২৫০টি আসনের মধ্যে কেবল ৮০টি হিন্দু প্রভৃতি "সাধারণ" লোককে দেওয়া হইয়াছে। তাহার দশটি "অবনত" হিন্দুরা পাইবে। ধরিয়া লওয়া হউক, যে, এই "অবনত"-প্রতিনিধিরা অন্য হিন্দু প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভোট দিবেন, যদিও সব সময়ে তাহা হইবে না। শ্রমিক, জমিদার, দেশী বণিক, ও বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়কে মোট ২০টি আসন দেওয়া হইয়াছে। ধরা যাক্, যে, এই ২০টিই "সাধারণ" বা হিন্দুরা দখল করিতে পারিবে—যদিও তাহা সম্ভব নহে। তাহা হইলেও ২৫০ জন প্রতিনিধির মধ্যে মোট ১০০ জন হিন্দু বা "সাধারণ" হইবে; তাহারা সর্ব্বদাই সংখ্যায় কম থাকিবে, কখনও নিজেদের ন্যায়সঙ্গত মতকে নিজেদের শক্তিতে জয়যুক্ত করিতে পারিবে না, কিংবা অনিষ্টকর বা অন্যায় কোন আইন বা ট্যাক্স প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। ফল এই দাঁড়াইবে, যে, অধিকাংশ রাজস্ব দিবে হিন্দুরা কিন্তু খরচ করিবে "অ-সাধারণেরা"; নূতন ট্যাক্স স্থাপিত হইলে বা পুরাতন ট্যাক্স বৃদ্ধি পাইলে তাহা হিন্দুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইতে পারিবে, কিন্তু তাহাদিগকে তাহা দিতে হইবে; নূতন আইন হিন্দুদের অমতে হইতে পারিবে, কিন্তু তাহাদিগকে তাহা মানিতে হইবে!

এই প্রকার অদ্ভুত স্বরাজ আমরা চাই না। ইহা যাহাতে স্থাপিত না হয়, তাহার জন্য আমাদের পূর্ণ শক্তি আমাদিগকে প্রয়োগ করিতে হইবে, এবং তাহা সত্ত্বেও উহা স্থাপিত হইলে তাহার অনিষ্টকারিতাতে বাধা দিবার জন্য আমাদের সমুদয় শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। তাহা কিরূপে করিতে হইবে, ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী হিন্দুরা

একত্র পরামর্শ করিয়া তাহা স্থির করুন। সব হিন্দুই এপ্রকার অদ্ভুত স্বরাজের বিরোধী। বিরুদ্ধাচরণের উপায় সকলে মিলিয়া স্থির করুন।

অতঃপর অভিভাষণে যে-সব বিষয়ের উল্লেখ ও আলোচনা আছে তাহার তালিকা দিতেছি। বরপণ ও কন্যাপণ প্রথার অনিষ্টকারিতা, বিধবা-বিবাহের আবশ্যকতা; সমুদয় পুরুষের মত সমুদয় নারীকে শিক্ষা দেওয়ার আবশ্যকতা; বিশেষতঃ বিধবাদিগের সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিশিক্ষার প্রয়োজন; সবর্ণ বিবাহের মত, অসবর্ণ বিবাহও কেন হওয়া উচিত, সংযত ও পবিত্র জীবনযাপন সম্বন্ধে কৈশোর হইতে বালক-বালিকাদিগকে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ শিক্ষাদান; নারীদেহের পাপব্যবসার উচ্ছেদকল্পে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসুর বিল; উদ্ধারাশ্রম এবং তথাকার বালিকাদের শিক্ষা, স্বাধীন জীবিকা ও বিবাহের আবশ্যকতা; বঙ্গে নারীর উপর অত্যাচার, জনহিতকর নানা প্রচেষ্টায় সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদের সহযোগিতা; সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদের পরস্পরের ধর্ম্মসাহিত্য ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ সাহিত্য অধ্যয়ন, প্রাচীন ভারতের ও বৃহত্তর ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা ও ইতিহাস রচনা; প্রাচীন মুদ্রা আদি প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিষ সহজে বিদেশে স্থানান্তরিত করিবার আইনের বিরোধিতার আবশ্যকতা; বঙ্গে, ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের অন্য সকল প্রদেশে এবং দেশী রাজ্যসমূহে হিন্দু বাঙালীদের চাকরি পাইবার ও অন্যান্য কাজ করিবার অসুবিধা, স্বাধীন বৃত্তি শিক্ষা ও অবলম্বন, হিন্দু বাঙালীদের মধ্যে কৃষকের সংখ্যা হ্রাস; রাজমিস্ত্রী তন্তুবায় সূত্রধর প্রভৃতির সংখ্যা হ্রাস; বিদেশের এবং ভারতবর্ষের বঙ্গের প্রদেশসমূহের প্রতিযোগিতায় বাঙালী শিল্পী শ্রেণীর লোকদের কাজ গেলে তাহাদের জন্য অন্য ব্যবসা বা বৃত্তি নির্দ্ধারণের চেষ্টা; হিন্দু বাঙালীদের মাল্লা মাঝি সারেং খালাসী প্রভৃতির এবং জাহাজের নানাবিধ কাজ পাইবার চেষ্টা করার আবশ্যকতা; হিন্দু বাঙালীর ছেলেদের সমুদ্রচারী হইবার উপকারিতা ও প্রয়োজন, দরজির কাজ, চামড়ার কাজ, দপ্তরীর কাজ, ছাপাখানার কাজ, ইত্যাদি।

একটি একটি বৃত্তি ধরিয়া সবগুলির উল্লেখ করিতে চাই না। আমি যে-বার সুরাটে সমগ্রভারতীয় হিন্দু মহাসভার সভাপতির কাজ করিয়াছিলাম, সেই অধিবেশনে এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হয়, যে, যত রকম বৃত্তি, পেশা ব্যবসা, কারিগরী আছে সমস্তই হিন্দুর করণীয় (অবশ্য যাহাতে কোন নৈতিক দোষ নাই) এবং কোনটিতেই পাতিত্য বা অনাচরণীয়ত্ব ঘটে না। প্রস্তাবটির দ্বিতীয় অংশে এই আশা ও ইচ্ছা প্রকাশ করা হইয়াছিল, যে, হিন্দুরা এরূপ যে-কোন বৃত্তি অবলম্বন করিবেন, তাহাতে তাঁহারা যেন অন্য হিন্দুদের সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা পান।

পৃথিবীতে কত বড় বড় রকমের যান্ত্রিক কাজ, কত উদ্ভাবনের কাজ হইতেছে। সবদিকেই হিন্দু ছেলেদের যাওয়া উচিত। মোটর গাড়ী নির্ম্মাণ (যাহার সূত্রপাত বাংলা দেশে হইয়াছে) এইরূপ একটি কাজ। এরোপ্লেন চালাইতে শিক্ষা করা এবং এরোপ্লেন নির্ম্মাণ শিক্ষাও বাঙালীর ছেলের সাধ্যায়ত্ত। বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া ও উদ্ভাবনে বাঙালী ছেলেদের কৃতিত্ব আশাপ্রদ।

বাংলা দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতাটিতে লিখিত হইয়াছে,

বাংলা দেশে আধুনিক ধরণের শিক্ষাপ্রবর্ত্তনের জন্য হিন্দু বাঙালীরা কোন কালেই গবন্মেণ্টের মুখাপেক্ষী ছিল না, এখনও নাই। প্রধানতঃ তাহাদের নিজেদের অর্থে এবং নিজেদের বুদ্ধির সাহায্যে তাহা আরব্ধ হইয়াছিল এবং এখনও চলিতেছে। গবন্মেণ্ট সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদের জন্য সরকারী স্কুল কলেজ স্থাপন করিয়াছেন, এবং যে-সব স্কুল-কলেজে গবন্মেণ্ট অর্থসাহায্য করেন, তাহাতেও সকল ধর্ম্মাবলম্বী ছাত্রদের প্রবেশাধিকার আছে। তা ছাড়া, বিশেষ করিয়া মুসলমানদের ও হিন্দুদের জন্য পৃথক্ পৃথক্ সরকারী শিক্ষালয় আছে। কেবল মুসলমানদের জন্য গবন্মেণ্ট যত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান চালান এবং যত টাকা খরচ করেন, তাহার তুলনায় কেবলমাত্র হিন্দুদের জন্য পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও তজ্জন্য অর্থব্যয় অতি সামান্য। মুসলমানরা শিক্ষায় অনগ্রসর এই নিমিত্ত তাহাদের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়ে আমরা আপত্তি করি না। কিন্তু মক্তব-মাদ্রাসায় যে-শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা এপ্রকারের, যে, তাহার দ্বারা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে উৎপাদিত পার্থক্য ও অসদ্ভাবকে স্থায়ী ও দৃঢ় করা হয়। মক্তব-মাদ্রাসার জন্য লিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাসে হিন্দু-যুগের কোন বৃত্তান্ত নাই বলিয়া একজন লেখক মডার্ণ রিভিউ কাগজে লিখিয়াছেন। তাহার কোন প্রতিবাদ হয় নাই। মক্তব মাদ্রাসার জন্য লিখিত বাংলা পাঠ্যপুস্তকসমূহের দ্বারা বাংলা ভাষাকে পর্য্যন্ত বিকৃত করা হইতেছে। ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। ভাষার মধ্যে অকারণ ও বিনা-প্রয়োজনে কতকগুলি বিদেশী শব্দ ঢুকাইলে ভাষার ঐশ্বর্য্য বাড়ে না, সৌন্দর্য্য এবং লালিত্যও বৃদ্ধি পায় না। বাংলা ভাষায় সূর্য্যবাচক রবি, ভানু, মিহির, ভাস্কর, প্রভাকর, প্রভৃতি কত শব্দ প্রচলিত আছে। তাহার উপর মক্তব-মাদ্রাসার বহিতে সূর্য্যকে তাম্বু এবং আফতাব বলিবার কি প্রয়োজন ছিল? বাংলা শিশির সবাই বুঝে। শব্দটি সুশ্রাব্যও বটে। তথাপি মক্তব-মাদ্রাসার বহিতে শিশিরকে সাবনাম্ এবং ওস্ বলিতে হইবে। বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া এখন উচ্চ হইতে উচ্চতর শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। সেই শিক্ষা হিন্দু মুসলমান উভয়কেই পাইতে হইবে। তাহাদের সাহিত্যের একত্ব, ভাষার একত্ব এবং শিক্ষার একত্ব বাঞ্ছনীয়।

অভিভাষণটির শেষে লিখিত হইয়াছে,

কি ধার্ম্মিক, কি সামাজিক, কি অর্থনৈতিক, সকল বিষয়ে সিদ্ধি লাভের জন্য সেই প্রাচীন আশীর্ব্বাদ-মন্ত্র আমরা স্মরণ করি—

"সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাং।
সমানো মন্ত্রঃ, সমিতিঃ সমানী, সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাং।

সমানী ব আকূতিঃ, সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।"

"তোমরা মিলিত হও; মিলিত হইয়া বাক্য বল; মিলিত হইয়া কে অন্যের মন জান। তোমাদের মন্ত্র এক হউক, সিদ্ধি এক হউক; তোমাদের চিত্ত (বিচার, মীমাংসা) ও মন এক হউক। তোমাদের অধ্যবসায় এক হউক, হৃদয় এক হউক। তোমাদের মন এমন সমান হউক, যাহাতে তোমাদের মিলন সুন্দর হয়।"

—

শ্রীজ্যোতির্ম্মোহন মিশ্রের অভিভাষণ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনের মালদহ অধিবেশনে তথাকার অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্মোহন মিশ্র মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত অভিভাষণটিতে তিনি বরেন্দ্রভূমির, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের ও গৌড়ের প্রাচীন ইতিহাসের কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। তাহার পর বলেন—

পাঠান ও মোগল যুগে বিরোধী রাজশক্তির বাধা সত্ত্বেও বাঙ্গালী হিন্দু যে পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিল, যে ভাবে তাহার সমাজকে পুনরায় সাজাইবার গুছাইবার চেষ্টা করিয়াছিল—ব্রিটিশ যুগে তাহা সম্ভব হয় নাই। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা এইরূপই ছিল। আজ যে ছত্রভঙ্গ বিক্ষিপ্ত সমাজ অসংখ্য উপজাতি ও শাখাপ্রশাখা লইয়া দুর্ব্বল, ক্ষয়গ্রস্ত অস্তিত্ব কোনমতে বহন করিয়া চলিয়াছে—ইহা কোন্ পাপের ফল? কি পাপে—এই পুণ্যভূমির কপাল পুড়িয়া গেল—আপনারা তাহা অনুসন্ধান করুন, প্রতীকারোপায় নির্দ্দেশ করুন।

প্রাচীন গৌরব ঘোষণা ও স্মরণের দ্বারা আমরা কি প্রাচীনগণের ন্যায় বল বীর্য্য লাভ করিতে পারিব? বর্ত্তমান সামাজিক দুরবস্থা ও অধঃপতনের জন্য অনেকে প্রাচীনগণের ব্যবস্থাকে দোষ দিয়া থাকেন। কিন্তু প্রাচীনেরা সমসাময়িক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে যে-সকল বিধি ব্যবস্থা অবলম্বন ও প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন—তখন তাঁহারা একথা ভাবিতে পারেন নাই যে, তাঁহাদের বংশে আমাদের মত নির্ব্বোধগণ জন্মগ্রহণ করিবে, যাহারা সময়োচিত ও প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তনকে আত্মরক্ষার জন্য গ্রহণ করিতে পারিবে না। মনুষ্য-সমাজে—এমন কি হিন্দু সমাজেও কোন সামাজিক বিধি-নিষেধই শাশ্বত নহে। যুগে যুগে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে,—বিভিন্ন স্মৃতিগ্রন্থ তাহার প্রমাণ। যে রঘুনন্দনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া, বাঙ্গালী সমাজকে ষোড়শ শতাব্দীতে ফিরাইয়া লইবার জন্য এক শ্রেণীর লোক তারস্বরে চীৎকার করিতেছেন—অপর দল তাঁহাকে গালি দিতে গিয়া পঞ্চমুখ, তাঁহারা সকলেই ভুলিয়া যান যে, রঘুনন্দনও সংস্কারপন্থী ছিলেন—সেদিনের বাঙ্গালায় তিনিই ছিলেন সংস্কার আন্দোলনের নেতা।

আজিকার বাঙ্গালায়ও একজন রঘুনন্দনের আবশ্যক। যদি ব্যক্তি দ্বারা না হয়, তাহা হইলে সমষ্টি-শক্তি দ্বারা সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। আমাদের আশা ও দুরাশা—হিন্দুসভা সেই স্থান গ্রহণ করিবে—এ যুগে বাঙ্গালীকে একটা পথের সন্ধান দিবে, যাহাতে বাঙ্গালী আবার ঐক্যবদ্ধ সমাজ গড়িয়া তুলিতে পারে। সমাজের স্তরে স্তরে যে পরিবর্ত্তন, যে সংস্কার সাধন একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে—তাহার প্রতি আমরা আর অধিক দিন উদাসীন হইয়া থাকিতে পারি না।

প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও মিশ্র মহাশয় নিরাশাবাদী নহেন। তিনি বলেন—

কি সামাজিক ক্ষেত্রে, কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, ঘটনার পর ঘটনায় যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে নৈরাশ্যে হৃদয় ভরিয়া উঠে সত্য—কিন্তু আমি নিরাশাবাদী নহি। কেবলমাত্র বর্ত্তমানের কয়েকটি চিহ্নিত ঘটনায় মধ্যে আমাদের দৃষ্টির সীমাকে সঙ্কুচিত রাখিলে আমরা অবসন্ন নৈরাশ্যে এলাইয়া পড়িব। অতীত ও ভবিষ্যতের প্রতি দূরপ্রসারী দৃষ্টি লইয়া বর্ত্তমানের সমস্যা মীমাংসা করিতে হইবে। রামমোহন হইতে বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত এবং বিবেকানন্দ হইতে গান্ধী পর্য্যন্ত—ব্রিটিশ-যুগে হিন্দুর এই পুনরুত্থানের বিপুল প্রয়াস এবং মহিমান্বিত ইতিহাস, ইহাকে ব্যর্থ করিয়া দিতে পারে এমন কোন শক্তি কাহারও আছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। এই বাঙ্গালী হিন্দু,—বাঙ্গালার সমাজকে যথাযথরূপে বিন্যাস করিয়া, পুনরায় শক্তিমান ও সবল হইয়া উঠিবে—ইহা আমি বিশ্বাস করি। এই বিশ্বাসের বলেই আজ সাহসের সহিত সরলভাবে আপনাদের সম্মুখে দুটি কথা কহিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছি। হিন্দুজাতির সমস্ত সমস্যা আজ হিন্দুকেই সমাধান করিয়া লইতে হইবে। যে-ভাবে আমাদের সমাজ চলিয়া আসিয়াছে, তাহা আর চলিতে পারে না। কারণ বাহিরের নানা প্রবল ও বিরুদ্ধ শক্তি, প্রত্যহ আমাদের সমাজকে আত্মসাৎ করিতেছে। আমাদের এই বিরুদ্ধ শক্তি ঐক্যবদ্ধ—আমাদের বিদ্যালয় হইতে প্রতিদিনের হাটবাজার সমস্তই দখল করিয়া সর্ব্বত্র নানা আকারে তাহারা আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। এই গ্রাসের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে সমাজকে জাগ্রত করিতে হইবে, একটা কেন্দ্রে সংহত করিতে হইবে। সে কেন্দ্র হইবে হিন্দুমহাসভা আর সেই মহৎ কাজের দায়িত্ব লইবেন হিন্দুসভার সদস্য ও কর্ম্মীরা। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যে কারণেই হউক সমগ্র জাতিকে নানা অংশে বিভক্ত করিবার যে সকল করিয়াছেন তাহাতে আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িব সন্দেহ নাই। ইহার প্রতিকার অথবা ভবিষ্যতের অমঙ্গল প্রতিরোধ করিবার জন্য কোন ব্যবস্থা যদি নির্ণয় না করিতে পারি, কোন শক্তির যদি উদ্বোধন না করিতে পারি, তাহা হইলে এই সম্মিলনীতে আমরা আত্মাবমাননার লজ্জাই বৃদ্ধি করিব।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের অধিক সময় নষ্ট করিব না। অপমান ও ক্ষয় নানা মূর্ত্তিতে আসিয়া আজ হিন্দুসমাজে দেখা দিয়াছে—এই দুর্দ্দিনে একটা মাভৈঃ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আপনারা জাতিকে আশা দিন, ভরসা দিন।

আজ যিনি আমাদের সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার দৃঢ়সঙ্কল্পব্যঞ্জক প্রশান্ত মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া আমরা যেন বল লাভ করি। বাঙ্গালার গণ্যমান্য বাঙ্গালী প্রধানদের অধিকাংশই স্বজাতির কল্যাণে উদাসীন হইয়া যখন আরামে আয়াসে কালহরণ করিতেছেন, সেই দুর্দ্দিনে প্রবীণ মনীষী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যুবকের উৎসাহ লইয়া সমাজ ও জাতিকে ধ্বংস হইতে রক্ষার ব্রত নিষ্ঠার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। এই শুক্লকেশ ও গুরুকর্ম্মা জননায়কের

আদর্শে বাজালী প্রধানগণ অনুপ্রাণিত হউন। সংশয়াত্মিকা বুদ্ধির জড়ত্ব হইতে তাঁহারা মুক্ত হউন। বাজালী হিন্দু আজ হিন্দু প্রধানগণের সম্মুখে যুক্তপাণি হইয়া একটা আদর্শ ভিক্ষা করিতেছে। যে আদর্শ লইয়া সে পুনরায় বিশ্ববরেণ্য হইতে পারে সেই আদর্শের কথা তাঁহাদিগকে আপনারা শুনান। ক্ষয়িষ্ণু ও পতিত হিন্দুর অপযশ অপগত হউক।

—

মালদহের রেশমশিল্প

এক সময়ে মালদহে রেশমের গুটি, সুতা ও নানাবিধ কাপড়ের কারবার বিস্তৃত ও লাভজনক ছিল। তাহাতে বহুসংখ্যক লোকের স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহিত হইত। এই ব্যবসা ক্রমশঃ ধ্বংসমুখে উপনীত হয়। এখন ইহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে। মালদহ শহরের নিকট পিয়াসবাড়ীতে একটি গুটিপোকা-লালনের স্থান ও সুতা-কাটিবার ছোট কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন মালদহের বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সিল্ক ইউনিয়ন দ্বারা এই ব্যবসার উন্নতির চেষ্টা হইতেছে।

তাঁতি, বসনি, কাটানি ও অন্যান্য যাঁহারা রেশমশিল্পের সহিত যে কোন প্রকারে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন তাঁহাদেরকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করাই এই ইউনিয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য। সম্প্রতি ইউনিয়ন উক্ত সম্প্রদায়-গুলিকে স্বল্প সুদে টাকা কর্জ্জ দিয়া থাকেন ও তাঁহাদের উৎপন্নজাত দ্রব্য চলতি বাজার-দরে ক্রয় করিয়া ভারতের নানা স্থানে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন ও উৎপন্নজাত দ্রব্যাদির যথা কাপড় ও সুতার ত্রুটি সংশোধনার্থ নানাবিধ হিতকর পদ্ধতি শিক্ষা ও উপদেশ দান করেন। যাহাতে দেশীয় রেশম, কাপড় ও সুতা বিদেশীয় দ্রব্যাদির সমকক্ষ হইতে পারে ও মূল্যের সমতা রাখা হয় তজ্জন্য নানাবিধ উপায় ও আলোচনা চলিতেছে ও যাহাতে দরিদ্র কুটীরশিল্পীরা অল্পায়াসে নিখুঁত ও সুন্দর পছন্দসই দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে পারেন তজ্জন্য মহীশূর গবর্ণমেণ্টের অনুকরণে কুটীরশিল্পীদের উপযোগী ছোট ছোট কল আনাইবার ব্যবস্থা চলিতেছে। আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত জ্ঞাত আছেন যে, মালদহ জেলায় প্রচুর পরিমাণে রেশম কোয়া উৎপন্ন হয়, কিন্তু দেশীয় কাট-থাইএ প্রস্তুত সুতা উত্তমরূপে ব্যবহারোপযোগী না হওয়ায় আশানুরূপ মূল্যে বিক্রয় হয় না; উক্ত কল আনাইয়া যদি তাহাদেরকে যথারীতি শিক্ষা দিবার ও প্রত্যেক সমবায় সমিতিগুলি যাহাতে একটি করিয়া উক্ত কল রাখিয়া কার্য্যাদি চালাইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা যায় তবে তাহাদের দুঃখ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইবে বলিয়া মনে হয়।

আমরা এই ইউনিয়নের নানাবিধ কাপড় দেখিয়া আসিয়াছি। জিনিষগুলি সমস্তই খাঁটি।

—

বাল্যবিবাহ পুনঃপ্রবর্ত্তনের ব্যর্থ চেষ্টা

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাল্যবিবাহ-নিরোধ আইনের একটি সংশোধক বিল উপস্থাপিত করিয়া ও তাহাকে আইনে পরিণত করিয়া বাল্যবিবাহকে পুনর্ব্বার আইনসঙ্গত করিবার একটি চেষ্টা সম্প্রতি হইয়াছিল। ঐ বিলটি ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সভ্যের মত অনুসারে পরিত্যক্ত হইয়াছে, সুতরাং বাল্যবিবাহ-নিরোধ আইন যেমন কায়েম ছিল, তেমনই রহিল। কিন্তু বাল্য-বিবাহ অনিষ্টকর ও আইনবিরুদ্ধ হইলেও উহা কতকটা গোপনে এখনও চলিতেছে, এবং যাহারা এরূপ বিবাহ দিতেছে, তাহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকদের নামে মোকদ্দমা হইতেছে। মোকদ্দমায় যে শাস্তি হয়, তাহাও এরূপ নহে, যে, তাহার ভয়ে লোকে বালক-বালিকাদের বিবাহ দিতে নিবৃত্ত থাকিবে। এই জন্য বাল্যবিবাহের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে, বিশেষতঃ অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে, লোকমত প্রবল করিবার প্রবল চেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে। মালদহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনে এই মর্ম্মের একটি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। বস্তুতঃ বাঙালী হিন্দুদের এই সম্মেলনে সমাজসংস্কার সম্বন্ধে যতগুলি প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেকটি এক জনেরও আপত্তি ব্যতিরেকে গৃহীত হইয়াছিল। সম্মেলনে তিন চারি হাজার লোক যোগ দিয়াছিলেন। অনেক শত অন্তঃপুরিকা মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

—

অস্ত্র-ব্যবহার দ্বারা সতীত্ব রক্ষা

মালদহ বঙ্গীয় হিন্দু সম্মেলনে নারীদের উপর অত্যাচার নিবারণ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, তাহাতে সভাপতি একটি অংশ যোগ করিয়া দেন এবং তাহাও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। তিনি বলেন, নারীদের উপর অত্যাচারের যে শত শত ঘটনা খবরের কাগজে বাহির হয়, তাহাতে দেখা যায়, যে, প্রায় সকল স্থলেই দুরাত্মারা নারীদিগকে হরণ করিতে ও তাহাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করিতে সমর্থ হয়। ইহাতে এইরূপ নৈরাশ্য-জনক ধারণা জন্মিতে পারে, যে, অত্যাচারচেষ্টা ব্যর্থ করিবার যেন কোন উপায় নাই—যেন অত্যাচার হইয়া

যাইবার পর অত্যাচরিতাদিগের উদ্ধারসাধন এবং মোকদ্দমা করিয়া দুরাত্মাদের শাস্তিবিধান ভিন্ন আর কোন প্রতিকার নাই। কিন্তু সম্প্রতি এবং আগে আগেও এরূপ ঘটনা মধ্যে মধ্যে ঘটিয়াছে, যে, অত্যাচরিতা নারী স্বয়ং কিংবা তাঁহার কোন আত্মীয়া বা আত্মীয় দুর্বৃত্ত অত্যাচারীকে সাংঘাতিক আঘাত করিয়া তাঁহার সতীত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অতএব অত্যাচারচেষ্টা ব্যর্থ করা অসম্ভব বা অতি দুঃসাধ্য নহে। সভাপতি বলেন, আততায়ীকে আঘাত করিয়া, তাহার প্রাণবধ পর্য্যন্ত করিয়া সতীত্ব রক্ষা করিবার অধিকার ধর্ম্মসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত বলিয়া সকলেরই এই উপায়ে নারীর সতীত্ব ও সম্মান রক্ষা করা উচিত। অধিকন্তু ইহা আইনসঙ্গতও বটে। সুতরাং অস্ত্রব্যবহার দ্বারা দুরাত্মাদের চেষ্টা ব্যর্থ করিতে কাহারও ইতস্ততঃ করা উচিত নয়। নারীর সতীত্ব ও সম্মানের তুলনায় প্রাণ অতি তুচ্ছ বস্তু।

সভাপতির এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, যে, এ পর্য্যন্ত যত ঘটনায় দুরাত্মাদিগকে গুরুতর বা সাংঘাতিক আঘাত করিয়া নারীর সতীত্ব রক্ষিত হইয়াছে, তাহা একত্র করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে হইবে। বীরাঙ্গনাদের ফোটোগ্রাফ যত পাওয়া যাইবে, তাহাও মুদ্রিত হইবে, ঘটনা অনেক বৎসর আগেকার হইলেও তাহাও মুদ্রিত হইবে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসভা এই বহি প্রকাশ করিবেন। সমুদয় খবরের কাগজের সম্পাদক ও কার্য্যাধ্যক্ষদিগকে ও অন্য সমুদয় বাঙালীকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা এই কাজটিতে সর্ব্বপ্রকারে হিন্দুসভার সাহায্য করুন। অত্যাচরিতা বীরনারী যে-কোন ধর্ম্মেরই হউন, এবং আততায়ী দুরাত্মারা যে-কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই হউক, যে-যে স্থলে অত্যাচারচেষ্টা সাহস ও বলপ্রয়োগ দ্বারা ব্যর্থ হইয়াছে তাহার বৃত্তান্ত এই পুস্তকে নিবদ্ধ হইবে। অত্যাচারচেষ্টা যে ব্যর্থ করা যায়, এই পুস্তক তাহার নিত্য স্মারক হইবে।

ঘটনার বৃত্তান্ত যে-সব কাগজের যে-যে সংখ্যায় আছে তাহার সংবাদ বা সেই সংখ্যাগুলি এবং ফোটোগ্রাফ, কলিকাতার ৫৭ নং হারিসন রোড্ ঠিকানায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসভার সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে প্রেরিত সংবাদপত্র ও ফোটোগ্রাফ ব্যবহারান্তে ফেরত দেওয়া হইবে।

—

দীর্ঘতমকাল-সন্তরণকারী বাঙালী

এলাহাবাদের রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি আলীগড়ে ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট এবং অন্য কোন কোন সরকারী কর্ম্মচারী ও বিস্তর বেসরকারী ভদ্রলোকদের সমক্ষে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময় সন্তরণ করিয়াছেন। তাহার পর তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য যে সভা হয়, তাহাতে চল্লিশ হাজার লোক উপস্থিত ছিল। এলাহাবাদের ইংরেজী দৈনিক 'লীডারে এই সব ঘটনার নিম্নমুদ্রিত বৃত্তান্ত বাহির হইয়াছে।

Scenes of unique and unprecedented enthusiasm were witnessed last evening when Robin Chatterji, who has emerged as the world's champion in endurance swimming, was honoured *en masse*. Robin Chatterji was taken in a grand procession along with Mr. James, acting District Magistrate, Dr. P. C. Roy, who attended him, and his mother. At the head of the procession was the police band followed by rows of scouts and their bands. The procession started from the Lyall Library, and passing through the main bazaars, which were throughout tastefully decorated, terminated at Edward Park, where a seething mass of people waited patiently, defying heat and discomfort for a sight of the champion, and swelled into a mammoth meeting of about 40,000.

Mr. James, who has won great popularity by his sympathetic attitude, was voted to the chair. Robin Chatterji was warmly congratulated on his wonderful success in swimming. Tributes were also paid to the district authorities the police, the scouts and the public for their hearty co-operation.

Robin Chatterjee thanked the public of Aligarh for the honour they conferred upon him. An 'at home' is being arranged this evening by the public on the Lyall Library lawn, where several valuable medals and cups will be presented to Robin Chatterji.

—

বঙ্গের প্রতি আর্থিক সুবিচারের দাবি

পাঠকেরা অবগত আছেন, যে, যদিও সরকারী রাজস্ব অন্য সকল প্রদেশের চেয়ে বাংলা দেশ হইতেই অধিক সংগৃহীত হয়, এবং যদিও বাংলা দেশের লোকসংখ্যা অন্য সব প্রদেশের চেয়ে বেশী, তথাপি বাংলার গবর্মেণ্টকে ভারত-গবর্মেণ্ট মান্দ্রাজ, বোম্বাই, আগ্রা-অযোধ্যা এবং পঞ্জাব এই প্রদেশগুলির প্রত্যেকটির চেয়ে অনেক কম টাকা বঙ্গের প্রাদেশিক সরকারী কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য রাখিতে দেন। ইহাতে বাংলা দেশের সরকারী সব রকম কাজ—বিশেষতঃ শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি-বিষয়ক কাজ—সুনির্ব্বাহিত হয় না, হওয়া অসম্ভব। এই সকলের জন্য অত্যন্ত কম খরচ করিলেও বাংলা গবর্মেণ্টের ঋণ হয়। বঙ্গের প্রতি এই অবিচারের কথা খবরের কাগজে ও সভাসমিতিতে বার-বার বলা হইয়াছে। বঙ্গের একাধিক লাটও একথা বলিয়াছেন, বর্ত্তমান লাটও বলিয়াছেন; কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন ফল হয় নাই।

কিছু দিন হইল কলিকাতায় ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের একটি কন্‌ফারেন্সে এ বিষয়ে যে আবেদন গবর্মেণ্টের নিকট পাঠাইবার প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হয় তাহা এখন প্রেরিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দেখান হইয়াছে, যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে ১৯২৮–২৯ সালে নিম্নলিখিত রূপ ভারত-গবর্মেণ্টের প্রাপ্য কেন্দ্রীয় মোট রাজস্ব আদায় হইয়াছিল। মান্দ্রাজ ৭১৪ লক্ষ, বোম্বাই ৫৮৪ লক্ষ, বাংলা ১৬৫৯ লক্ষ, আগ্রা-অযোধ্যা ৭১৭ লক্ষ, পঞ্জাব ৩৪৬ লক্ষ, বিহার ৫৭৬ লক্ষ, মধ্যপ্রদেশ ২২৫ লক্ষ, আসাম ১২৭ লক্ষ।

পাটের শুল্ক হইতে বঙ্গে ঐ বৎসর ৩৯৯ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছিল। পাট বঙ্গের একচেটিয়া ফসল। উহার শুল্কটি পর্য্যন্ত বাংলা দেশকে দেওয়া হয় না।

আবেদনটিতে বঙ্গের ভারতীয় ও ইউরোপীয় প্রধান প্রধান সভাসমিতি ও প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বা সম্পাদকের স্বাক্ষর আছে। যথা—নিখিলবঙ্গ মুস্লিম কন্‌ফারেন্স, পূর্ব্ব-বঙ্গের জমিদার সভা, ভারতসভার সভাপতি এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার পীপলস পার্টির নেতা, মাড়োয়ারী সভার সভাপতি, ইউরোপীয় সভার বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখার সভাপতি, ইউরোপীয়দের কলিকাতা ট্রেডস্ এসোসিয়েশ্যনের এক্টিং মাষ্টার, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্সের সভাপতি, বঙ্গীয় জমিদার সভার সভাপতি, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ইউরোপীয় দলের দুই জন প্রতিনিধি, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশ্যনের তিন জন প্রতিনিধি, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দলের প্রতিনিধি, গত বৎসরের বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনের সভাপতি, বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্সের সভাপতি এবং বঙ্গে প্রজা পার্টির নেতা ও বঙ্গে রায়ত সভার সভাপতি।

বঙ্গের ভারতীয় ও ইউরোপীয় সব দলের এই আবেদনের কি ফল হয় দেখা যাক। বাংলার বর্ত্তমান গবর্ণর বাংলা গবর্মেণ্টকে যথেষ্ট টাকা দেওয়ার পক্ষে। যদি সম্মিলিত সরকারী ও বেসরকারী চেষ্টার ফলে বাংলা গবর্মেণ্ট যথেষ্ট রাজস্ব পান, তাহা হইলেই যে বাংলার উন্নতির জন্য যথেষ্ট সব্যয় হইবে, তদ্বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া চলিবে না। ব্যয়ের ব্যবস্থা করা সম্বন্ধে দেশের লোকদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। নতুবা, স্বরাজলাভেচ্ছাকে নির্মূল করিবার জন্য পুলিসের ব্যয় দু-কোটি আড়াই কোটি হইতে পাঁচ কোটি করা যাইতে পারিবে এবং নূতন জেল নির্ম্মাণের জন্য ও জেলে বহুসংখ্যক কয়েদী রাখিবার নিমিত্ত লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইতে পারিবে। তাহার উপর, একটা অতিরিক্ত অপব্যয়ের ব্যবস্থা ত হইয়াই আছে। তাহা বাংলা দেশের ছয়টি জেলায় গোরা-সৈনিক ও দেশী সিপাই রাখা। বঙ্গের সরকার বাহাদুরের হাতে যথেষ্ট টাকা আসিলে তৎকৃপায় প্রত্যেক জেলা ও মহকুমায় পল্টনের শিবির নির্ম্মিত ও সেখানে পল্টন রক্ষিত হইতে পারিবে।

অতএব, পূর্ণস্বরাজ না-পাইলে বঙ্গের সরকারী খাজাঞ্চিখানায় যথেষ্ট টাকা থাকা আমাদের হিতের কারণ না হইয়া অনিষ্টেরই কারণ হইতে পারিবে। পূর্ণস্বরাজই সর্ব্বাগ্রে চাই, ইহা আমরা যেন ভুলিয়া না যাই।

—

বঙ্গের কৃষি-মন্ত্রীর দ্রষ্টব্য

বঙ্গের কৃষি-মন্ত্রী হয়ত জানেন, যে, ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যিক কৃষি-গবেষণা-কৌন্সিলের কর্ত্তৃত্বে ভিন্ন-ভিন্ন

দশে ও দেশী রাজ্যে চিনি উৎপাদনের ব্যয়সম্বন্ধে শীঘ্র ıটি সরকারী অনুসন্ধান হইবে। তাহাতে সমগ্র-রতবর্ষের উনিশটি জেলায় এই অনুসন্ধান হইবে। ান কোন প্রদেশের ও দেশী রাজ্যের দুটি বা একটি রিয়া জেলায় এই অনুসন্ধান হইবে। অনুসন্ধানে ভ এই হইবে, যে, ভারতবর্ষে কোথায় কত কম বা শী খরচে চিনি উৎপন্ন হইতে পারে তাহা জানা বে। বঙ্গে খরচ যদি কম হয়, তাহা হইলে এখানে কের চাষ ও চিনির কারখানা স্থাপন লাভজনক হইবে; ঙ্গ খরচ বেশী হইলেও তাহা কমাইবার উপায় বাহির রিয়া আকের চাষ ও চিনি উৎপাদন করিতে হইবে। গে বাংলা দেশ গুড় ও চিনি উৎপাদনে দ্বিতীয়স্থানীয় ল, এখন চতুর্থস্থানীয় হইয়া পড়িয়াছে। বঙ্গের কদের অবস্থার উন্নতি একান্ত দরকার। পাটের দর তাহার বিক্রীর আয় সাতিশয় পরিবর্ত্তনশীল। অতএব ক ও চিনি উৎপাদন তার চেয়ে নিশ্চিত আয়ের উপায় ট কিনা, তাহা নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক। বিদেশী নির উপর শুল্ক বসায় এখন আকের চাষ ও চিনির রখানার সুবিধা হইতে পারে। মোটামুটি চারি হাজার কা খরচ করিলেই বাংলা দেশে নির্ব্বাচিত দুটা জেলায় ক ও চিনি সম্বন্ধে সাম্রাজ্যিক সরকারী অনুসন্ধান হইতে রে। বাংলা সরকার যদি একান্তই টাকা দিতে না রেন, তাহা হইলেও এই প্রদেশে সাম্রাজ্যিক এই রকারী অনুসন্ধান হইতে পারে। দরকার কেবল ংলা সরকারের কৃষি-বিভাগের এই বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা বং ভারত-সাম্রাজ্যিক কৌন্সিলের চিঠিপত্রের জবাব ওয়া। কৃষি-মন্ত্রী তাহা না করিলে বাংলা দেশ এই বিধা হইতে বঞ্চিত হইবে। তাহার জন্য দায়ী হইবেন ষি-মন্ত্রী। অগণিত মুসলমান ও হিন্দু কৃষকের লাভালাভ াহার মনোযোগ বা অবহেলার উপর নির্ভর করিতেছে।

—

"অবনত" হিন্দুদের জন্য নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক আসন

সকল ধর্ম্মের ও শ্রেণীর লোকদের দ্বারা ব্যবস্থাপক ভায় যোগ্যতম প্রতিনিধিদিগের সম্মিলিত নির্ব্বাচনই শ্রেষ্ঠ পন্থা। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের ও শ্রেণীর লোকদের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক আসন রক্ষা ও তাহার জন্য স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন নিকৃষ্ট ব্যবস্থা। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় ও শ্রেণীর জন্য নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক আসন রাখিয়া তাহার জন্য সম্মিলিত নির্ব্বাচন মন্দের ভাল।

ইহা বুঝা খুব সহজ। এই জন্য মহাত্মা গান্ধী "অস্পৃশ্য" ও "অবনত" হিন্দুদের জন্য স্বতন্ত্র আসন নির্দ্দেশ পছন্দ করেন না। তবে তাঁহারা যদি স্বতন্ত্র আসন নির্দ্দেশ ভিন্ন সন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে মহাত্মা গান্ধী আসন নির্দ্দেশ ও সম্মিলিত নির্ব্বাচনের সর্ত্তে উপবাস ভঙ্গ করিতে রাজী হইবেন, খবরের কাগজে এই সংবাদ বাহির হইয়াছে।

"অবনত" শ্রেণীর জন্য কতকগুলি আসন নির্দ্দেশের দোষ দুটি। প্রথমতঃ, যাঁহারা এই আসনে বসিবার অধিকারী প্রতিনিধি হইতে চান, তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে, যে, তাঁহারা অস্পৃশ্য অনাচরণীয় ও অবনত এবং তাঁহাদের জা'তভাইয়েরাও অস্পৃশ্য অনাচরণীয় ও অবনত। এরূপ স্বীকৃতি কেবল যে অসম্মানকর তাহা নহে; ইহাতে এই সব জা'তের লোকদের অন্য সব জা'তের সহিত সমান সামাজিক পদমর্য্যাদা ও সম্মান লাভে বাধা জন্মিবে। সুতরাং সমগ্র হিন্দুসমাজের একীভবন ইহার দ্বারা বিলম্বিত হইবে। সামাজিক অসম্মানের বিনিময়ে ও মূল্যে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যের পদ লাভ অবাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলি আসন "অবনত" শ্রেণীর লোকদের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিলে, তাঁহারা কেবল নিজ নিজ যোগ্যতার দ্বারা সভ্যপদ লাভে অসমর্থ থাকিয়া যাইবেন। যাহাকে লাঠিতে ভর দিয়া বা খোঁড়ার আশ্রয়-নড়ি অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইতে চলিতে হয়, তাহাকে সমর্থ মানুষ বলা চলে না। স্বতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক আসন রূপ নড়ির উপর নির্ভর "অবনত" শ্রেণীর লোকেরা যতদিন করিবেন, ততদিন তাঁহারা অন্যান্য জা'তের লোকদের ঠিক সমান ও সমকক্ষ হইতে পারিবেন না।

যাহা হউক, "অবনত" শ্রেণীর লোকদের মনে কোন সন্দেহ থাকিলে তাহা ভঞ্জনের জন্য তাঁহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট-

সংখ্যক আসন দেওয়াই ভাল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু-সম্মেলন তাহাতে রাজী আছেন। ডাক্তার মুঞ্জে, প্রয়োজন হইলে, তাঁহাদিগকে হিন্দুদের শতকরা এক শত আসনই ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত।

অবশ্য, "অবনত" শ্রেণীর লোকদিগকে সন্তুষ্ট করা হিন্দুসমাজের কল্যাণের জন্য আবশ্যক। কিন্তু তাঁহাদের সহিত অন্য জা'তের হিন্দুদের বুঝাপড়া হইয়া গেলেই, সরকারী ভাগবাঁটোয়ারার অন্য সব অংশ অনুমোদন করা চলিবে, কেহ যেন এরূপ মনে না-করেন। সমগ্র সরকারী নিষ্পত্তিটার দোষ আমরা আগে দেখাইয়াছি। মহাত্মা গান্ধীও ব্রিটিশ মন্ত্রীদের সহিত পত্রব্যবহারে তাহা দেখাইয়াছেন।

—

"৪ঠা আশ্বিন"

মহাত্মা গান্ধীর অনশন-ব্রত গ্রহণ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে যাহা বলিয়াছেন, তাহা **"৪ঠা আশ্বিন"** নাম দিয়া পুস্তিকার আকারে মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবাসীতে প্রকাশের জন্য তাহা প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা নীচে মুদ্রিত করিতেছি।

"সূর্য্যের পূর্ণগ্রাসের লগ্নে অন্ধকার যেমন ক্রমে ক্রমে দিনকে আচ্ছন্ন করে তেমনি আজ মৃত্যুর ছায়া সমস্ত দেশকে আবৃত করচে। এমন সর্ব্বদেশব্যাপী উৎকণ্ঠা ভারতের ইতিহাসে ঘটেনি, পরমশোকে এই আমাদের মহৎ সান্ত্বনা। দেশের আপামর সাধারণকে আজকের দিনের বেদনা স্পর্শ করেচে। যিনি সুদীর্ঘকাল দুঃখের তপস্যার মধ্য দিয়ে সমস্ত দেশকে যথার্থভাবে গভীরভাবে আপন করে নিয়েচেন সেই মহাত্মা আজ আমাদের সকলের হয়ে মৃত্যুব্রত গ্রহণ করলেন।

"দেশকে অস্ত্রশস্ত্র সৈন্যসামন্ত নিয়ে যারা বাহুবলে অধিকার করে, যত বড়ো হোক্ না তাদের প্রতাপ, যেখানে দেশের প্রাণবান সত্তা সেখানে তাদের প্রবেশ অবরুদ্ধ। দেশের অন্তরে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি জয় করবে এমন শক্তি নেই তাদের। অস্ত্রের জোরে ভারতবর্ষকে অধিকার করেচে কত বিদেশী কত বার। মাটিতে রোপণ করেচে তাদের পতাকা, আবার সে পতাকা মাটিতে পড়ে ধূলো হয়ে গেছে।

"অস্ত্রশস্ত্রের কাঁটা-বেড়া দিয়ে যারা বিদেশে আপন স্বত্বকে স্থায়ী করবার দুরাশা মনে লালন করে একদিন কালের আহ্বানে যে মুহূর্ত্তে তারা নেপথ্যে সরে দাঁড়ায় তখনই ইট কাঠের ভগ্নস্তূপে পুঞ্জীভূত হয় তাদের কীর্ত্তির আবর্জ্জনা। আর যাঁরা সত্যের বলে বিজয়ী তাঁদের আধিপত্য তাঁদের আয়ুকে অতিক্রম ক'রে দেশের মর্ম্মস্থানে বিরাজ করে।

"দেশের সমগ্র চিত্তে যাঁর এই অধিকার তিনি সমস্ত দেশের হয়ে আজ আরো একটি জয়যাত্রায় প্রবৃত্ত হয়েচেন চরম আত্মোৎসর্গের পথে। কোন্ দুরূহ বাধা তিনি দূর করতে চান, যার জন্যে তিনি এত বড়ো মূল্য দিতে কুণ্ঠিত হলেন না সেই কথাটি আজ আমাদের স্তব্ধ হয়ে চিন্তা করবার দিন।

"আমাদের দেশে একটি ভয়ের কারণ আছে। যে পদার্থ মানসিক তাকে আমরা বাহ্যিক দক্ষিণা দিয়ে সুলভ সম্মানে বিদায় করি। চিহ্নকে বড়ো করে তুলে সত্যকে খর্ব্ব করে থাকি। আজ দেশনেতারা স্থির করেচেন যে, দেশের লোকেরা উপবাস করবে। আমি বলি এতে দোষ নেই, কিন্তু ভয় হয় মহাত্মাজী যে প্রাণপণ মূল্যের বিনিময়ে সত্যকে লাভ করবার চেষ্টা ক'রচেন তার তুলনায় আমাদের কৃত্য নিতান্ত লঘু এবং বাহ্যিক হয়ে পাছে লজ্জা বাড়িয়ে তোলে। হৃদয়ের আবেগকে কোনো একটা অস্থায়ী দিনের সামান্য দুঃখের লক্ষণে ক্ষীণ রেখায় চিহ্নিত করে কর্ত্তব্য মিটিয়ে দেবার মতো দুর্ঘটনা যেন না ঘটে।

"আমরা উপবাসের অনুষ্ঠান করব, কেননা মহাত্মাজী উপবাস করতে বসেচেন, এই দুটোকে কোনো অংশেই যেন একত্রে তুলনা করবার মূঢ়তা কারো মনে না আসে। এ দুটো একেবারেই এক জিনিষ নয়। তাঁর উপবাস সে তো অনুষ্ঠান নয়, সে একটি বাণী, চরম ভাষার বাণী। মৃত্যু তাঁর সেই বাণীকে সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে, বিশ্বের কাছে ঘোষণা করবে, চিরকালের মতো। সেই বাণীকেই যদি গ্রহণ করা আমাদের কর্ত্তব্য হয় তবে তা যথোচিতভাবে

করতে হবে। তপস্যার সত্যকে তপস্যার দ্বারাই অন্তরে গ্রহণ করা চাই।

"আজ তিনি কী বলচেন সেটা চিন্তা করে দেখো। পৃথিবীময় মানব ইতিহাসের আরম্ভকাল থেকে দেখি একদল মানুষ আরেক দলকে নীচে ফেলে তার উপর দাঁড়িয়ে নিজের উন্নতি প্রচার করে। আপন দলের প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করে অন্য দলের দাসত্বের উপরে। মানুষ দীর্ঘকাল ধরে এই কাজ করে এসেচে কিন্তু তবু বলব এটা অমানুষিক। তাই দাসনির্ভরতার ভিত্তির উপরে মানুষের ঐশ্বর্য্য স্থায়ী হতে পারে না। এতে কেবল যে দাসেদের দুর্গতি হয় তা নয় প্রভুদেরও এতে বিনাশ ঘটায়। যাদের আমরা অপমানিত করে পায়ের তলায় ফেলি তারাই আমাদের সম্মুখ পথে পদক্ষেপের বাধা। তারা গুরুভারে আমাদের নীচের দিকে টেনে রাখে। যাদের আমরা হীন করি তারা ক্রমশই আমাদের হেয় করে। মানুষখেগো সভ্যতা রোগে জীর্ণ হবে, মরবে। মানুষের দেবতার এই বিধান। ভারতবর্ষে মানুষোচিত সম্মান থেকে যাদের আমরা বঞ্চিত করেচি তাদের অগৌরবে আমরা সমস্ত ভারতবর্ষের অগৌরব ঘটিয়েচি।

"আজ ভারতে কত সহস্র লোক কারাগারে রুদ্ধ বন্দী। মানুষ হয়ে পশুর মতো তারা পীড়িত অবমানিত। মানুষের এই পুঞ্জীভূত অবমাননা সমস্ত রাজ্যশাসনতন্ত্রকে অপমানিত করচে, তাকে গুরুভারে দুরূহ করচে। তেমনি আমরাও অসম্মানের বেড়ার মধ্যে বন্দী করে রেখেচি সমাজের বৃহৎ একদলকে। তাদের হীনতার ভার বহন করে আমরা এগোতে পারচিনে। বন্দীদশা শুধু তো কারাপ্রাচীরের মধ্যে নয়। মনুষ্যের অধিকার সংক্ষেপ করাই তো বন্ধন। সম্মানের খর্ব্বতার মতো কারাগার তো নেই। ভারতবর্ষে সেই সামাজিক কারাগারকে আমরা খণ্ডে খণ্ডে বড়ো করেচি। এই বন্দীর দেশে আমরা মুক্তি পাব কী করে? যারা মুক্তি দেয় তারাই তো মুক্ত হয়।

"এতদিন এইভাবে চলছিল—ভালো করে বুঝিনি আমরা কোথায় তলিয়ে ছিলাম। সহসা ভারতবর্ষ আজ মুক্তির সাধনায় জেগে উঠল। পণ করলাম চিরদিন বিদেশী শাসনে মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করে রাখার এ ব্যবস্থা আর স্বীকার করব না। বিধাতা ঠিক সেই সময়ে দেখিয়ে দিলেন কোথায় আমাদের পরাভবের অন্ধকার গহ্বরগুলো। আজ ভারতে যাঁরা মুক্তিসাধনার তাপস তাঁদের সাধনা বাধা পেল তাদেরই কাছ থেকে যাদের আমরা অকিঞ্চিৎকর করে রেখেচি। যারা ছোট হয়ে ছিল তারাই আজ বড়োকে করেচে অকৃতার্থ। তুচ্ছ বলে যাদের আমরা মেরেচি তারাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মার মারচে।

"এক ব্যক্তির সঙ্গে আর এক ব্যক্তির শক্তির স্বাভাবিক উচ্চনীচতা আছে। জাতিবিশেষের মধ্যেও তেমন দেখা যায়। উন্নতির পথে সকলে সমান দূর এগোতে পারেনি। সেইটেকে উপলক্ষ্য করে সেই পশ্চাদ্বর্ত্তীদেরকে অপমানের দুর্লঙ্ঘ্য বেড়া তুলে দিয়ে স্থায়ীভাবে যখনি পিছিয়ে রাখা যায় তখনি পাপ জমা হয়ে ওঠে। তখনি অপমান-বিষ দেশের এক অঙ্গ থেকে সর্ব্ব অঙ্গে সঞ্চারিত হতে থাকে। এমনি করে মানুষের সম্মান থেকে যাদের নির্ব্বাসিত করে দিলুম তাদের আমরা হারালুম। আমাদের দুর্ব্বলতা ঘটল সেইখানেই, সেইখানেই শনির রন্ধ্র। এই রন্ধ্র দিয়েই ভারতবর্ষের পরাভব তাকে বারে বারে নত করে দিয়েচে। তার ভিতের গাঁথুনি আল্‌গা, আঘাত পাবামাত্র ভেঙে ভেঙে পড়েচে। কালক্রমে যে-ভেদ দূর হতে পারত তাকে আমরা চেষ্টা করে সমাজরীতির দোহাই দিয়ে স্থায়ী করে তুলেচি। আমাদের রাষ্ট্রিক মুক্তিসাধনা কেবলি ব্যর্থ হচ্চে এই ভেদবুদ্ধির অভিশাপে।

"যেখানেই একদলের অসম্মানের উপর আর-এক দলের সম্মানকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় সেইখানেই ভার-সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে বিপদ ঘটে। এর থেকেই বোঝা যায় সাম্যই মানুষের মূলগত ধর্ম্ম। য়ুরোপে এক রাষ্ট্রজাতির মধ্যে অন্য ভেদ যদি-বা না থাকে, শ্রেণীভেদ আছে। শ্রেণীভেদে সম্মান ও সম্পদের পরিবেষণ সমান হয় না। সেখানে তাই ধনিকের সঙ্গে কর্ম্মিকের অবস্থা যতই অসমান হয়ে উঠচে ততই সমাজ টলমল করচে। এই অসাম্যের ভারে সেখানকার সমাজ-ব্যবস্থা প্রত্যহই

পীড়িত হচ্চে। যদি সহজে সাম্য স্থাপন হয় তবেই রক্ষা, নইলে নিষ্কৃতি নেই। মানুষ যেখানেই মানুষকে পীড়িত করবে সেখানেই তার সমগ্র মনুষ্যত্ব আহত হবেই, সেই আঘাত মৃত্যুর দিকেই নিয়ে যায়।

"সমাজের মধ্যেকার এই অসাম্য এই অসম্মানের দিকে মহাত্মাজী অনেক দিন থেকে আমাদের লক্ষ্য নির্দ্দেশ করেচেন। তবুও তেমন একান্ত চেষ্টায় এই দিকে আমাদের সংস্কারকার্য্য প্রবর্ত্তিত হয়নি। চরখা ও খদ্দরের দিকে আমরা মন দিয়েচি, আর্থিক দুর্গতির দিকে দৃষ্টি পড়েচে কিন্তু সামাজিক পাপের দিকে নয়। সেইজন্যেই আজ এই দুঃখের দিন এল। আর্থিক দুঃখ অনেকটা এসেচে বাইরে থেকে, তাকে ঠেকানো একান্ত কঠিন না হতে পারে। কিন্তু যে সামাজিক পাপের উপর আমাদের সকল শত্রুর আশ্রয়, তাকে উৎপাটন করতে আমাদের বাজে, কেননা তার উপরে আমাদের মমত্ব। সেই প্রশ্রয়প্রাপ্ত পাপের বিরুদ্ধে আজ মহাত্মা চরম যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এই রণক্ষেত্রে তাঁর দেহের অবসান ঘটতেও পারে, কিন্তু সেই লড়াইয়ের ভার তিনি আমাদের প্রত্যেককে দান করে যাবেন। যদি তাঁর হাত থেকে আজ আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সেই দান গ্রহণ করতে পারি তবেই আজকের দিন সার্থক হবে। এত বড়ো আহ্বানের পরেও যারা একদিন উপবাস ক'রে তার পরদিন হতে উদাসীন থাকবে, তারা দুঃখ থেকে যাবে দুঃখে, দুর্ভিক্ষ থেকে দুর্ভিক্ষে। সামান্য কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা সত্য সাধনার অবমাননা যেন না করি।

"মহাত্মাজীর এই ব্রত আমাদের শাসনকর্ত্তাদের সঙ্কল্পকে কী পরিমাণে ও কী ভাবে আঘাত করবে জানিনে, আজ সেই পোলিটিকাল তর্ক অবতারণার দিন নয়। কেবল একটা কথা বলা উচিত বলে বলব। দেখতে পাচ্চি মহাত্মাজীর এই চরম উপায় অবলম্বনের অর্থ অধিকাংশ ইংরেজ বুঝতে পারচেন না। না পারবার একটা কারণ এই যে, মহাত্মাজীর ভাষা তাঁদের ভাষা নয়। আমাদের সমাজের মধ্যে সাংঘাতিক বিচ্ছেদ ঘটাবার বিরুদ্ধে মহাত্মাজীর এই প্রাণপণ প্রয়াস তাঁদের প্রয়াসের প্রচলিত পদ্ধতির সঙ্গে মেলে না বলেই এটাকে এত অদ্ভুত বলে মনে হচ্চে। একটা কথা তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে পারি—আয়র্লণ্ডও যখন ব্রিটিশ ঐক্যবন্ধন থেকে স্বতন্ত্র হবার চেষ্টা করেছিল তখন কী বীভৎস ব্যাপার ঘটেছিল। কত রক্তপাত, কত অমানুষিক নিষ্ঠুরতা। পলিটিক্সে এই হিংস্র পদ্ধতিই পশ্চিম মহাদেশে অভ্যস্ত। সেই কারণে আয়র্লণ্ডে রাষ্ট্রিক প্রয়াসের এই রক্তাক্ত মূর্ত্তি তো কারো কাছে, অন্তত অধিকাংশ লোকের কাছে, আর যাই হোক অদ্ভুত বলে মনে হয় নি। কিন্তু অদ্ভুত মনে হচ্চে মহাত্মাজীর অহিংস্র আত্মত্যাগী প্রয়াসের শান্তমূর্ত্তি। ভারতবর্ষের অবমানিত জাতির প্রতি মহাত্মাজীর মমতা নেই এত বড়ো অমূলক কথা মনে স্থান দেওয়া সম্ভব হয়েচে তার কারণ এই যে, এই ব্যাপারে তিনি আমাদের রাজসিংহাসনের উপর সঙ্কটের ঝড় বইয়ে দিয়েচেন। রাজপুরুষদের মন বিকল হয়েচে বলেই এমন কথা তাঁরা কল্পনা করতে পেরেচেন। এ কথা বুঝতে পারেন নি রাষ্ট্রিক অস্ত্রাঘাতে হিন্দুসমাজকে দ্বিখণ্ডিত হতে দেখা হিন্দুর পক্ষে মৃত্যুর চেয়ে কম বিপদের নয়। একদা বাহির থেকে কোনো তৃতীয় পক্ষ এসে যদি ইংলণ্ডে প্রটেষ্টাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিকদের এই ভাবে সম্পূর্ণ বিভক্ত করে দিত তাহলে সেখানে একটা নরহত্যার ব্যাপার ঘটা অসম্ভব ছিল না। এখানে হিন্দুসমাজের পরম সঙ্কটের সময় মহাত্মাজীর দ্বারা সেই বহু প্রাণঘাতক যুদ্ধের ভাষান্তর ঘটেছে মাত্র। প্রটেষ্টাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিক-দের মধ্যে বহুদীর্ঘকাল যে অধিকারভেদ চলে এসেছিল সমাজই আজ স্বয়ং তার সমাধান করেচে, সেজন্যে তুর্কির বাদশাকে ডাকে নি। আমাদের দেশের সামাজিক সমস্যা সমাধানের ভার আমাদের পরেই থাকার প্রয়োজন ছিল।

"রাষ্ট্রব্যাপারে মহাত্মাজী যে অহিংস্রনীতি এতকাল প্রচার করেচেন, আজ তিনি সেই নীতি নিজের প্রাণ দিয়ে সমর্থন করতে উদ্যত এ কথা বোঝা অত্যন্ত কঠিন বলে আমি মনে করিনে।

শান্তিনিকেতন
৪ঠা আশ্বিন, ১৩৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিবস

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর ব্রিষ্টল নগরে রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়। প্রতি বৎসর তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের জন্য ঐদিন ভারতবর্ষের নানা স্থানে সভার অধিবেশন, এবং উপাসনা প্রার্থনা হইয়া থাকে। এ বৎসরও ২৭শে সেপ্টেম্বর ১১ই আশ্বিন ঐ দিবস ভারতবর্ষে রামমোহন রায় স্মৃতিসভা হইবে। ইংলণ্ডপ্রবাসী অনেক ভারতীয় ঐদিন ব্রিষ্টলে তীর্থযাত্রা করিয়া থাকেন। এবারও ভারতবর্ষের হাই-কমিশনার স্যর ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ ভারতীয়গণ ২৭শে সেপ্টেম্বর ব্রিষ্টল গিয়া রামমোহনের সমাধি-মন্দির পার্শ্বে প্রার্থনা বক্তৃতাদি করিবেন।

—

কৃষকদের ঋণ

কয়েক দিন পূর্ব্বে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার কৃষকদের ঋণ সম্বন্ধে সুচিন্তিত ও বহুতথ্যপূর্ণ একটি বাংলা প্রবন্ধ পাঠ করেন। সমগ্র ভারতের কৃষিঋণের কথা প্রথমে বলিয়া তিনি বাংলার কৃষকদের ঋণ ও তাহা শোধ করিবার উপায় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। তাঁহার প্রস্তাবিত উপায়গুলি বিবেচনার যোগ্য। তাঁহার প্রবন্ধটি কয়েক কিস্তীতে কয়েকটি দৈনিকে বাহির হইয়াছে। পুস্তিকার আকারে বাহির হইলে সমস্ত জিনিষটি আলোচনা করিবার অধিকতর সুবিধা হয়। আশা করি নলিনীরঞ্জন বাবু পুস্তিকার আকারে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন বা করিবেন।

কৃষকদের ঋণ কেবল আমাদের দেশেই আছে, অন্য কোথাও নাই বা ছিল না, এমন নয়। কোন কোন স্বাধীন ও স্বশাসক দেশে ইহার প্রতিকার করিবার জন্য কি করা হইয়াছে, তাহা নলিনীরঞ্জন বাবুর প্রবন্ধে উল্লিখিত আছে। আমরা স্বশাসক নহি বলিয়া আমাদের কৃষকদিগকে অঋণী করা সহজ নয়; কারণ রাজশক্তি বা রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োগ ও সাহায্য ব্যতিরেকে এত বড় একটি সমস্যার পূর্ণ সমাধান সম্ভবপর নহে। এবং এদেশে রাজশক্তি আপনাকে নিরঙ্কুশ করিতে যত ব্যস্ত, জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য তত ব্যস্ত নহে। তথাপি এদেশেও গবর্ন্মেণ্ট কৃষিঋণ সম্বন্ধে অন্ততঃ কমিশন কমিটি মধ্যে মধ্যে বসাইতে বাধ্য হন। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে গত জানুয়ারী মাসে উহার গবর্ন্মেণ্ট যে কৃষিঋণ কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার রিপোর্ট গত ১০ই সেপ্টেম্বরের আগ্রা-অযোধ্যা সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। এলাহাবাদের প্রধান দৈনিক লীডার তাহার সম্বন্ধে যে-সব মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, যে, ঐ রিপোর্ট সন্তোষজনক হয় নাই। তথাপি বাংলা দেশে যদি কিছু করিতে বা গবর্ন্মেণ্টকে করাইতে হয়, তাহা হইলে ঐ রিপোর্ট দেখিতে হইবে।

কৃষিঋণ ব্যাপারটি যে তুচ্ছ নয়, তাহার প্রমাণ অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবে এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর রুশীয় রাষ্ট্রবিপ্লবে পাওয়া যায়। সময় থাকিতে আমাদেরও সাবধান হওয়া ও প্রতিকার করা উচিত।

—

মহাত্মা গান্ধীর উপবাসের ফল

মহাত্মা গান্ধী "অস্পৃশ্যতা"রূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত প্রাণপণ করায় হিন্দুজাতি ভারতের সর্ব্বত্র নিজ সমাজকে এই কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত নানা উপায় অবলম্বন করিতেছে। "অস্পৃশ্য" ও "অনাচরণীয়" জাতিরা মানুষের যে-সকল স্বাভাবিক অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল, তৎসমুদয় তাহাদিগকে দিবার জন্য সর্ব্বত্র চেষ্টা হইতেছে। একজন মহাপুরুষের পুনঃআত্মোৎসর্গে কিরূপ মহা সুফল ফলে, হিন্দুজাতির বর্ত্তমান জাগরণ হইতে তাহা বুঝা যায়।

—

"অবনত" হিন্দুদের সন্তোষ উৎপাদন

নানা রাজনৈতিক মতের হিন্দু নেতারা বোম্বাইয়ে সম্মিলিত হইয়া যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে আশা হয়, যে, আজ ৬ই আশ্বিন হইতে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ব্যবস্থাপক সভাসমূহে "অবনত" শ্রেণীর হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধে এরূপ কোন ব্যবস্থা নেতৃবর্গ করিতে পারিবেন, যাহাতে ঐ শ্রেণীর লোকদের বিশ্বাস ও সন্তোষ উৎপন্ন হয়। হিন্দু নেতারা যখন ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দুদের সব আসনই "অবনত"দিগকে ছাড়িয়া দিতে

প্রস্তুত, তখন হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে কোন বাধার আশঙ্কা নাই। তবে ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় নেতাদের পক্ষ হইতে ভারতীয়দের কৃত যে-কোন ব্যবস্থারই খুঁৎ আবিষ্কৃত হইতে পারে। কারণ,শক্তির দর্প হেতু যখন মিঃ ম্যাকডন্ডাল্ড মহাত্মা গান্ধীর সুমহান্ আত্মোৎসর্গকে "অবনত" হিন্দুদের শত্রুতাসাধন বলিয়া কুব্যাখ্যা করিতে পারিয়াছেন, তখন অন্য কোন প্রকার ধৃষ্টতাই যে স্বার্থান্ধ কূটরাজনীতি-বিশারদদের অসাধ্য নহে, তাহা বুঝা কঠিন নয়।

কিন্তু ব্রিটিশ জাতি ও ব্রিটিশ পলিটিশিয়ানরা যাহাই বলুন করুন, হিন্দু সমাজ আত্মশুদ্ধি দ্বারা সুসংহত হইলেই আমরা সন্তুষ্ট হইব। এরূপ সমাজের অসাধ্য ও অনধিগম্য কিছু থাকিবে না।

—

বঙ্গের সেন্সাসে ভুল

প্রতিবারের সেন্সসেই কোন-না-কোন কারণে ভুল থাকিতে পারে। গত বৎসর যে সেন্সস লওয়া হয়, তাহাতে, রাজনৈতিক কারণে, সাম্প্রদায়িক রেষারেষিতে এবং কোথাও কোথাও কংগ্রেসওয়ালা হিন্দুদের সেন্সসের বিরোধিতায়, অনেক ভুল থাকিবার সম্ভাবনা। ১৮ই সেপ্টেম্বরের লিবার্টি কাগজে শ্রীযুক্ত বি সি লাহিড়ী নামক একজন পত্রলেখক নেত্রকোণার সেন্সসে এইরূপ কিছু ভুল দেখাইয়াছেন। গত ৭ই জুলাইয়ের কলিকাতা গেজেটে নেত্রকোণার মুসলমান ও হিন্দুদের মোট সংখ্যা ও লিখনপঠনক্ষমদের সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ দেওয়া হয়।

	পুরুষ।	স্ত্রীলোক।
মুসলমান	২৬২৯	১৭১৬
হিন্দু	৪২১৬	২৪১৫
লিখনপঠনক্ষম মুসলমান	১৭৫১	৬৪৬
" হিন্দু	১১৪৮	৩০২

ইহাতে দেখা যাইতেছে, যে, নেত্রকোণার মুসলমান পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের মোট সংখ্যা হিন্দু পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের মোট সংখ্যা অপেক্ষা অনেক কম হইলেও, লিখনপঠনক্ষ মুসলমান পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের মোট সংখ্যা লিখনপঠনক্ষ হিন্দু পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের চেয়ে অনেক বেশী। মুসলম পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা সকলেই লেখাপড়া জানিলে তা সুখেরই বিষয় হইবে। কিন্তু নেত্রকোণার হিন্দুরা শি বিষয়ে এতটা অনগ্রসর, বিশ্বাস হয় না। পত্রলেখ বলিতেছেন, সেখানে কম করিয়া ২০০ জন হিন্দু উকি মোক্তার এবং তাঁহাদের প্রায় ৩০০ জন হিন্দু কেরানী মুহু আছেন। গবর্মেণ্ট ও জমিদারদের অধীনে এক শত উপর হিন্দু কর্ম্মচারী আছেন। সমনজারী প্রভৃতি করিব জন্য দুই শতের অধিক হিন্দু পিয়াদা আছেন। পঞ্চাশে উপর হিন্দু ডাক্তার কবিরাজ আছেন। হিন্দু ব্যবসাদারে সংখ্যা হাজারের কম নয়। তাঁহারা সবাই কিছু বি লেখাপড়া জানেন। স্কুলগুলিতে হিন্দু ছাত্রদের সংখ্যা হাজারের কম হইবে না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে, লিখনপঠনক্ষম হিন্দুে সংখ্যা অত্যন্ত কম করিয়া লেখা হইয়াছে। পত্রলেখ বলিতেছেন, এই হাস্যকর অশুদ্ধ সংখ্যার প্রতি স্থানী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা সম্ভবতঃ কোন ফল হয় নাই। এই বিষয়ে গবর্মেণ্টে অনুসন্ধান করা উচিত। কাহার কর্তৃত্বে কাহা নেত্রকোণায় লোকসংখ্যা ও লিখনপঠনক্ষমের সং ইত্যাদি গণনা করিয়াছিল?

—

বিশেষ দ্রষ্টব্য

পূজার ছুটি :—আগামী ১৭ই আশ্বিন (৩রা অক্টোব সোমবার হইতে ৩০শে আশ্বিন (১৬ই অক্টোব রবিবার পর্য্যন্ত প্রবাসী-কার্য্যালয় ও প্রবাসী প্রেস থাকিবে। ছুটির ভিতর অত্যন্ত জরুরী ভিন্ন যে-সব চিঠি ও অর্ডারাদি আসিবে তাহা কার্য্যালয় খুলিবার যথোচিত সম্পাদিত হইবে।

বিচিত্র সংগ্রহ

বর্ষের বাহিরে নাসিকার গহনার ব্যবহার—

বৎসর আগের প্রবাসীতে গহনা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের লেখক লন যে প্রাচীনকালে গহনা হিন্দুদের মধ্যে ব্যবহৃত হইত না। মান যুগের এদেশে আসিয়াছিল এবং সেই জন্য বোধ হয় নী গহনা। নীচের কয়েকটি চিত্রে ভারতবর্ষের বাহিরের রমণীদের মধ্যে উহার ব্যবহারে নিদর্শন দেখান হইয়াছে।



মুসলমান তাতার রমণী



রুশ তুর্কোমান সুন্দরী। ইনি একসময়ে রুশ গণতন্ত্রের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যা ছিলেন



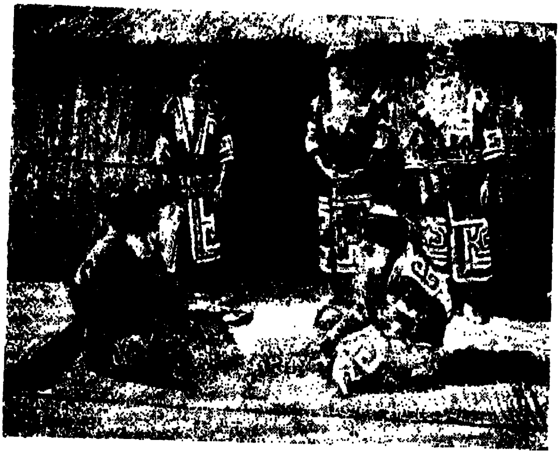
মেসোপোটামিয়ার আরব রমণী

...পানের আইনু জাতি—

নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, জাপানের আইনু জাতির শরীরে মঙ্গোলীয় রক্ত ...মান। আইনুগণই এখন জাপানের আদিম অধিবাসী বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত। বস্তুতঃ তাহারা জাপানের সন্নিকট ...য়েজো দ্বীপ হইতে আসিয়া দক্ষিণ জাপানে বসবাস আরম্ভ করে।



ম আধুনিক জাপানীরা সেখানে আসিয়া আইনুদিগকে উত্তরদিকে ...াইয়া দেয়। ইহারা প্রথম দিকে যুদ্ধ বিষয়ে পারদর্শী ছিল, এখন কিন্তু আর যুদ্ধ করে না—শান্তিপ্রিয় হইয়াছে। অন্যান্য আদিম জাতির মত আইনুগণ হিংস্রও নহে। ইহারা বড়ই অতিথি-পরায়ণ। অপরিচিতদের সর্ব্বদা আদর-আপ্যায়ন করিয়া থাকে। আইনুরা সংখ্যায় এখন ষোল কি সতর হাজার মাত্র।



আইনু পুরুষরা কানে মাকড়ি প্রভৃতি গহনা পরিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা দুল্‌ পরে। ইদানীং ইহারা কাপড় পরিতে আরম্ভ করিয়াছে, পূর্ব্বে গাছের বাকল পরিত। ইহারা চালাঘরে বাস করে। ঘরের মধ্যস্থলে আগুনের কুণ্ড রাখে। ইহারা মোটেই পরিচ্ছন্ন নয়। দৈনন্দিন ব্যবহৃত বাসন কোনন মাসে একবারও ধোত করে না। ইহারা রান্না করিয়া খায়। এবং বড়ই মাংসপ্রিয়। শিয়ালের মাংস পর্য্যন্ত ইহারা খাইয়া থাকে।



আইনুদের মধ্যে এতকাল কোনরূপ শিক্ষার প্রচলন ছিল না কাজেই তাহাদের কোন সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। সাধারণের ধারণা তাহারা বুদ্ধিহীন জীব। এখন কিন্তু এ ধারণা আস্তে আস্তে দূরীভূত হইতেছে। জাপানী-সরকার তাহাদের জন্য স্কুল-পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাহারা লেখাপড়া শিখিয়া জ্ঞানবুদ্ধির বেশ পরিচয় দিতেছে।

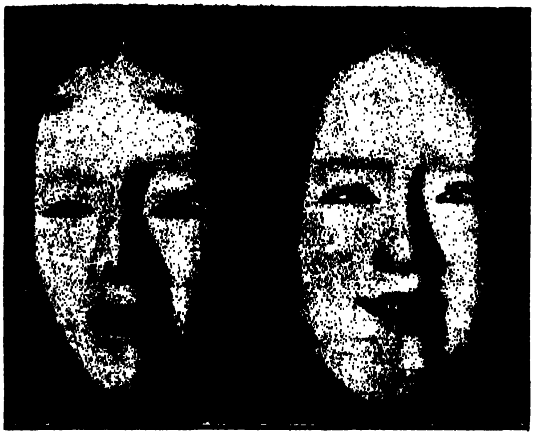
এতদসঙ্গে আইনুদের যে তিনখানি চিত্র দেওয়া হইল, তাহাতে ইহাদের আকৃতি, বেশভূষা প্রভৃতির কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে।



শ্যামদেশের মন্ত্রীমণ্ডল—

শ্যামদেশ একটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য। সম্প্রতি শ্যামের মহারাজা সেখানে গণতন্ত্রমূলক শাসন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। অন্যান্য প্রজাতন্ত্র দেশের মত শ্যামকেও এখন সর্ব্বপ্রকার স্বাধীন দেশ বলা যাইতে পারে। ইংরেজরা কথায় কথায় বলিয়া থাকেন হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজ গণতন্ত্র বিরোধী। পণ্ডিতগণের মত কিন্তু অন্যরূপ। তাঁহারা বলেন, প্রাচীনকালে হিন্দুরাজত্বে ভারতবর্ষে [illegible] মত বহু ছোট ছোট রাজ্যে গণতন্ত্রমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ যুগেও যে হিন্দু মন গণতন্ত্র বিরোধী নহে, ভারতবাসীর স্বাধীনতা প্রচেষ্টা ও শ্যাম সম্রাটের গণতন্ত্রমূলক শাসনের প্রবর্ত্তন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই চিত্রখানি শ্যাম রাষ্ট্রের মন্ত্রিমণ্ডলের জনগণের উৎসবে যোগদানের নিদর্শন।

নানাদেশের সংএর মুখোস-



জাপানি। সম্ভ্রান্ত বিলাসিনী এবং দাসী



জাপানি। অপদেবতা



প্রাচীন গ্রীক। বামে ভক্তের মুখোশ দক্ষিণে অপদেবতা



আধুনিক জার্মান। ভাঁড়ামো করার মুখোশ।
কার্নিভালের সময় ব্যবহৃত হয়

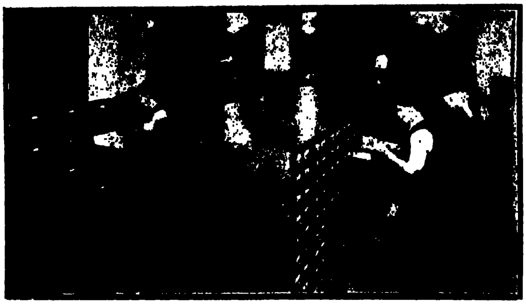


আধুনিক জার্মান। ভাঁড়ামো করার মুখোশ।
কার্নিভালের সময় ব্যবহৃত হয়

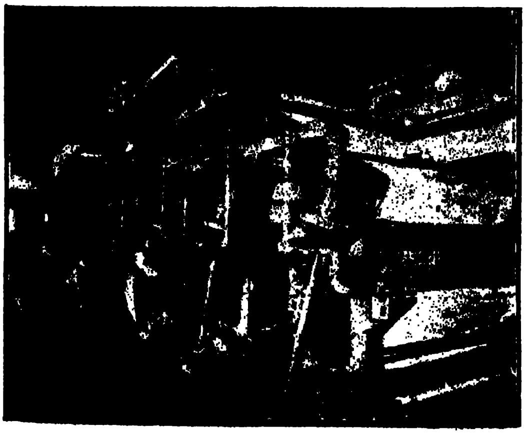
ি দেশে খবরের কাগজ প্রকাশ—



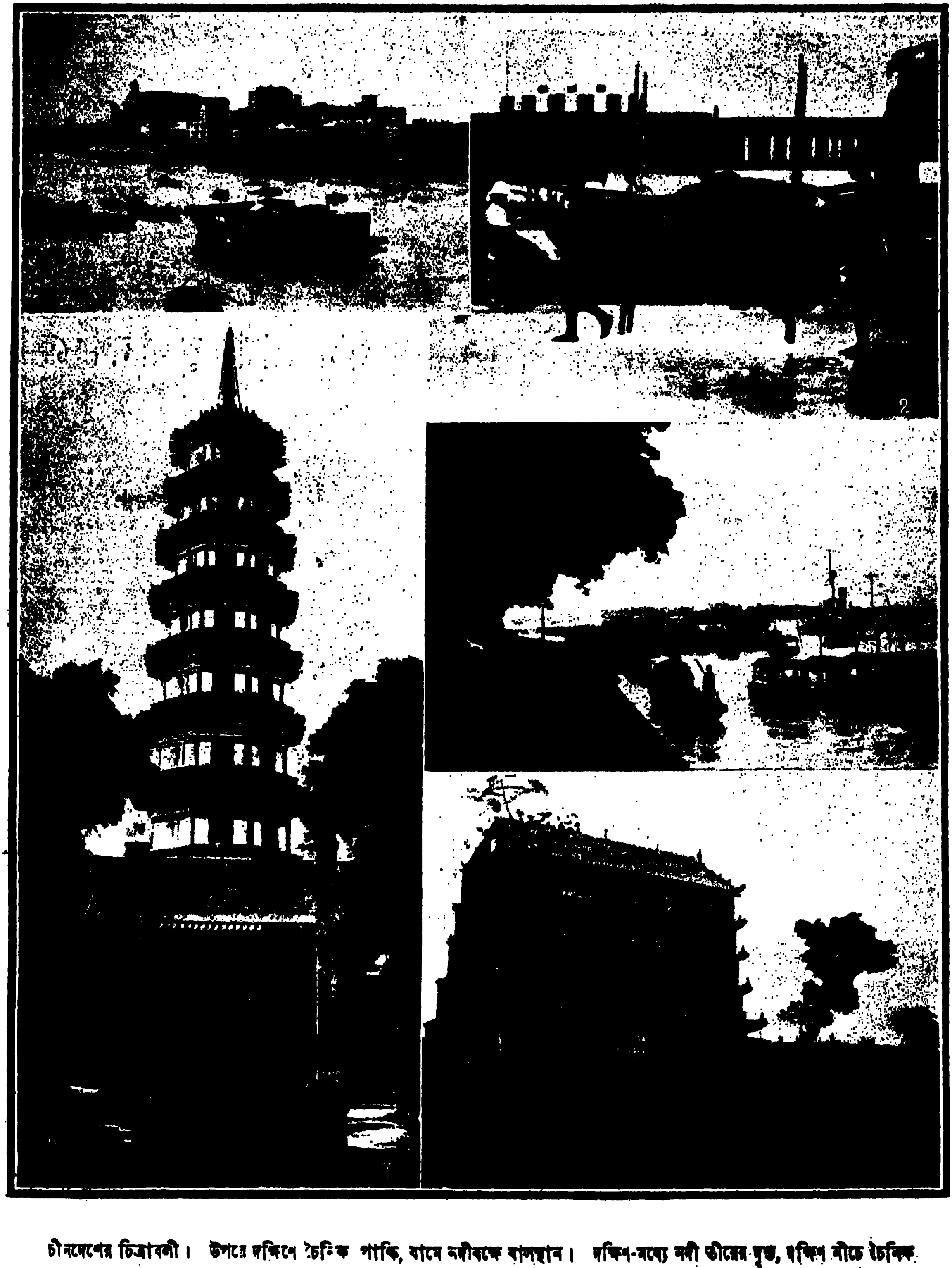
রাত্রে সম্পাদকের ঘরে সংক্ষিপ্ত খবর এসেছে



সংবাদপত্রের বিশ্বকোষ। দুনিয়ার খবর এই আলমারীগুলিতে থাকে। যে খবরটা যাবে তার বিষয় কি তথ্য পাওয়া যায় তাহার সন্ধান



সবশেষে বিরাট ঘূর্ণায়মান প্রেসে ছাপা



চীনদেশের চিত্রাবলী। উপরে দক্ষিণে চৈনিক পাল্কি, বামে নদীবক্ষে জলযান। দক্ষিণ-মধ্যে নদী তীরের দৃশ্য, দক্ষিণ নীচে চৈনিক 'স্কাই স্কেপার"। বামে মন্দিরের তোরণ ও চূড়া।



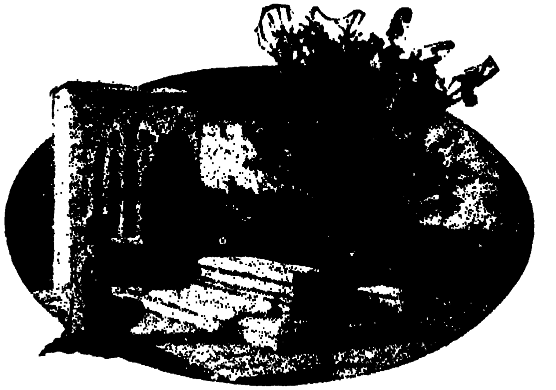
চৈনীক ব্যঙ্গচিত্র। বিলাসী





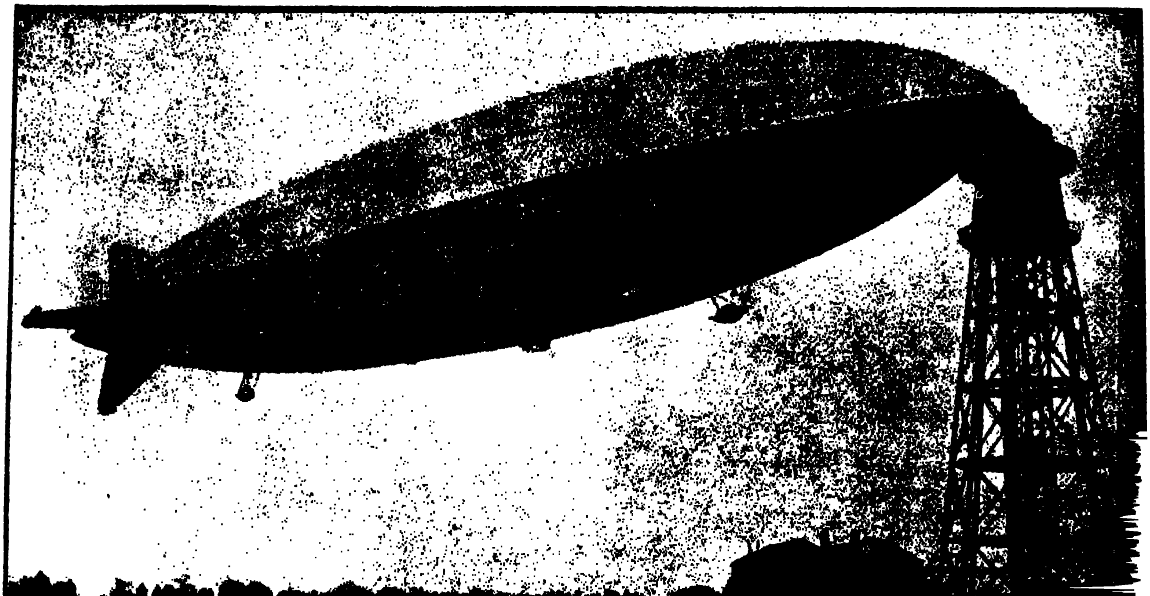


চৈনীক ব্যঙ্গচিত্র। বকধার্ম্মিক



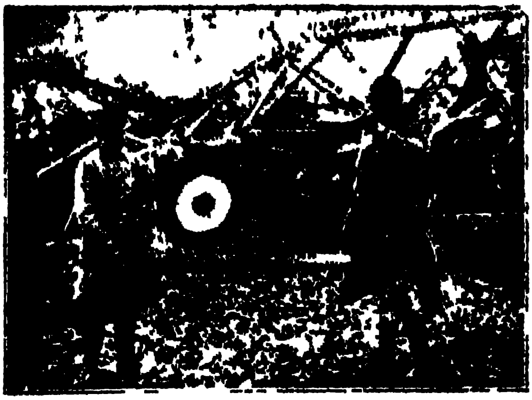
কাবুলে বাবরের সমাধি

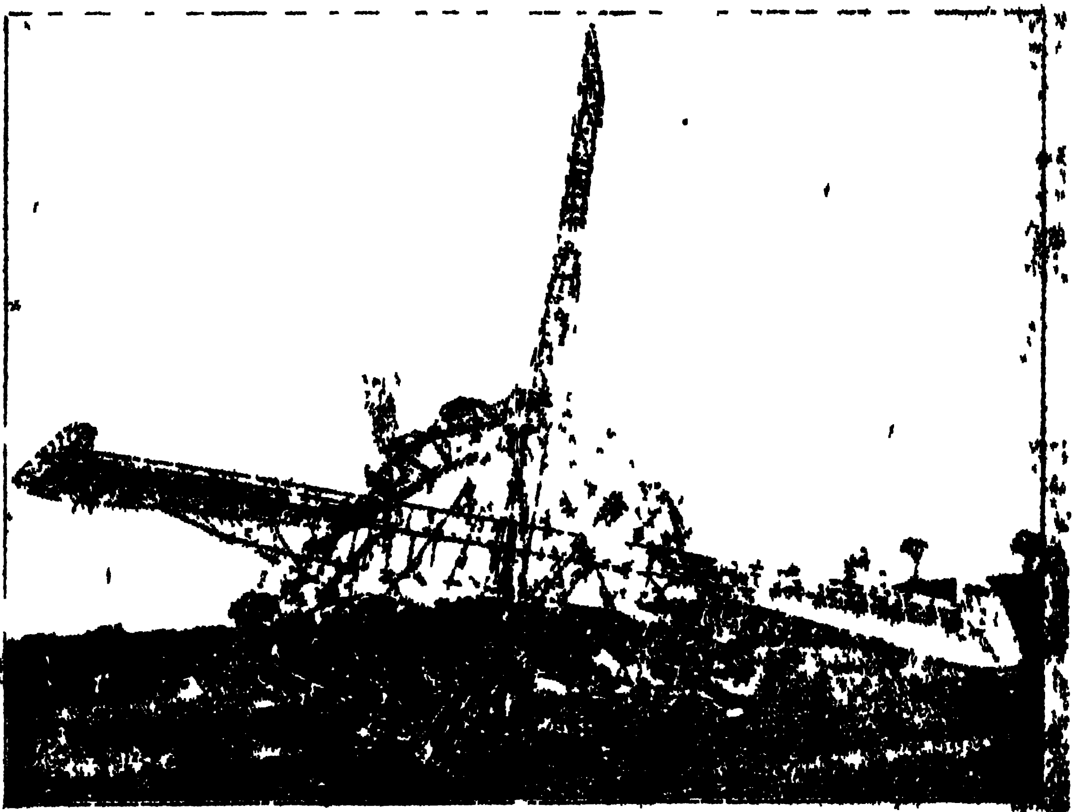
বিমানজয়ের বিপদ—



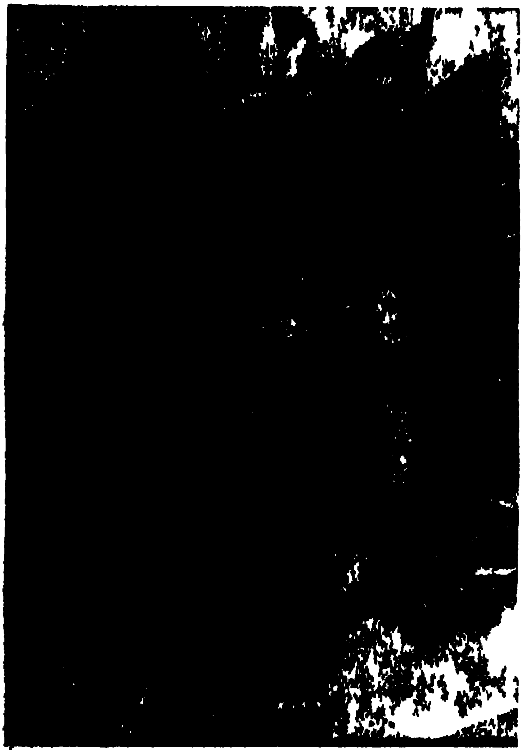
ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ "আর ১০১" জেপেলিন ধরণের বিমান পোত। ভারত যাত্রার পূর্ব্বে মাস্তলে বাঁধা

পরপৃষ্ঠায়। ঐ বিমান পোতের ভারত গমনের পথে ধ্বংসের চিত্র। নীচে, বামে-বিমান পোতের যাত্রীদের মৃতদেহ ইত্যাদি







ম্যাডোনার নূতন মূর্তি

চেকোস্লোভাকিয়ার শিল্পের নিদর্শন। এই মূর্তিটির চারিদিকে ভারতের নটরাজের মূর্ত্তির মেখলাতে যেমন অগ্নিশিখা থাকে সেরূপ অগ্নিশিখা রহিয়াছে।

৺পূজার বস্ত্রাদি এবং পোষাক ও পরিচ্ছদ

যে দোকানে মনের মতন দ্রব্যাদি সঠিক মূল্যে পাইবেন সেইখানেই কেনা উচিৎ নয় কি ?

[redacted]

আমাদের নিবেদন

বিগত ষাট বৎসরের অধিক আমাদের এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত। এই সুদীর্ঘ কালে আমরা যে সমস্ত সম্ভ্রান্ত ক্রেতাগণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছি আমাদের অস্তিত্বই তাহার নিশ্চিত প্রমাণ।

এ বৎসরেও আমরা ৺পূজার জন্য বিশেষ চেষ্টা দ্বারা অভিনব আয়োজন করিয়াছি একবার পদধূলি দিলেই বুঝিতে পারিবেন। দেশের আর্থিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিভিন্ন মূল্যের সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়াছি। কাহাকেও মূল্যের আধিক্যহেতু অন্যত্র যাইতে হইবে না।

মফঃস্বলবাসিগণ কত দামের কিরূপ দ্রব্য এবং কাহার জন্য জানাইলে আমরা পছন্দ করিয়া যত্নের সহিত পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের বিশেষত্ব

খাটি দেশী নিজ কারখানায় বিশেষজ্ঞ ও বহুদর্শী কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে তাঁতে প্রস্তুত

রাধানগরী সিল্ক ও জরী পাড় ধুতি ও সাড়ী
স্বদেশী সিল্কের ফ্যান্সী ও ছাপা সাড়ী
বেনারসী, গরদ, মটকা, এণ্ডি ইত্যাদি।
সর্ব্বপ্রকার মিলের ও তাঁতের ধুতি ও সাড়ী এবং
সূতা ও রেশমী তৈয়ারী পোষাক ও পরিচ্ছদ

= চন্দ্রকুমার =
বৈকুণ্ঠনাথ গুঁই

ব্রাঞ্চ	৩৬ নং খেংরাপটী, বড়বাজার	ব্রাঞ্চ
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট	কলিকাতা	১৩৩ নং লেক রোড



নটরাজ

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩২শ ভাগ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯

২য় সংখ্যা

আশীর্ব্বাদ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অভাগা যখন বেঁধেছিল তার বাসা
কোণে কোণে তারি পুঞ্জিত হোলো জীবনের ভাঙা আশা।
ঘরের মধ্যে বুকের কাঁদনগুলা
উড়িয়ে বেড়ায় ধূলা।
দূষিয়া রুষিয়া উঠে নিরুদ্ধ বায়ু,
শোষণ করিছে আয়ু।
যেখানে সেখানে মলিনের লাগে ছোঁওয়া,
দীপ নিবে যায়, তীব্রগন্ধ ধোঁওয়া

রোধ করে নিঃশ্বাস,
কঠোর ভাগ্য হানে নিষ্ঠুর ভাষ॥
ওরে দরিদ্র, চেয়ে দেখ্ তোর ভাঙা ভিত্তির ধারে,
অসীম আকাশ, কে তারে রোধিতে পারে।
সেথা নেই বন্ধন,
প্রভাত-আলোকে প্রতিদিন আসে তব অভিনন্দন।

সন্ধ্যার তারা তোমারি মুখেতে চাহে,
তোমারি মুক্তি গাহে।
তব সত্তার মহিমা ঘোষিছে সব সত্তার মাঝে,
হে মানব, তুমি কোথায় লুকাও লাজে।
যেখানে ক্ষুদ্র যেখানে পীড়িত তুমি,
কর্কশ হাসি হাসিছে যেথায় দৈন্যের মরুভূমি,
তাহার বাহিরে তোমার উদার স্থান,
বিশ্ব তোমারে বক্ষ মেলিয়া করিতেছে আহ্বান॥

১৮ আশ্বিন
শুক্লপঞ্চমী
১৩৩৯

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে জন্মদিনের আশীর্ব্বাদ।



কুমারী রাণী দে কর্ত্তৃক খোদিত

কবি মনোমোহন বসু

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, এম-এ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, বিশেষতঃ বিংশ শতাব্দীর প্রথমটায়, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র বাংলার এতখানি জায়গা জুড়িয়া ছিলেন যে আমরা, তাঁহার পাশে যে-সব রথী-মহারথী দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করি নাই। নাটক-রচনাকৌশলে, স্বয়ং অভিনয়পটুতায় এবং অন্যান্য অভিনেতার শিক্ষাবিধানে, বাংলার রঙ্গমঞ্চ তিনি যেমন নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার সমসাময়িক আর সকলের কথা আমাদের ভুলিয়া যাইতে হয়। কিন্তু কাল সর্ব্বগ্রাসী, লোকক্ষয়কারী; কালপ্রভাবে প্রতিভার ভাস্বর জ্যোতিও ম্লান হয়; কালচক্রের গতিমাহাত্ম্যে একদিকে যেমনই গিরিশচন্দ্রের মূর্ত্তি আমাদের স্মৃতিপটে ম্লান হইয়া পড়িবে অন্যদিকে তেমনই আবার তাঁহার সঙ্গী ও সহকর্ম্মী বহু কৃতী নাট্যকারের ছবি আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হইবে; তাঁহাদের একজনের কথা আজ আলোচনা করিতে চাই; তাঁহার নাম ছিল মনোমোহন বসু।

বঙ্গাব্দ ১২৩৪ সালের আষাঢ় মাসে চব্বিশ-পরগণার ছোটজাগুলিয়া গ্রামে মনোমোহনের জন্ম। যশোহর জেলার নিশ্চিন্তপুর গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁহার শৈশব অতিবাহিত হয়; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা তাঁহার এই সময়ে সহজসাধ্য ছিল। নিশ্চিন্তপুর পাঠশালায় পড়িয়া তিনি জন্মস্থানে ফিরিয়া আসেন। মনোমোহন পিতার তৃতীয় পুত্র; অল্পবয়সেই তিনি পিতৃহীন হন; তাঁহার খুল্লতাত চন্দ্রশেখর বসু তাঁহার অভিভাবক ছিলেন। যখন কলিকাতায় পড়িতে আসেন, তখন তিনি ডেভিড্ হেয়ার ও রিচার্ডসন সাহেবের নিকট বিদ্যাশিক্ষার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি জেনারেল অ্যাসেম্বলী ইন্‌ষ্টিটিউশনে,—এখন যাহা স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ নামে পরিচিত,—পড়িতেন এবং উচ্চশ্রেণীতে পড়িবার সময় বাংলা প্রবন্ধ লিখিয়া শিক্ষকমহলে প্রতিপত্তি লাভ করেন, অনাবশ্যক শব্দবর্জ্জন ও প্রাঞ্জল রচনার জন্য মূল্যবান্ স্বর্ণপদক ও ইংরেজী পুস্তক পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। তখনকার পত্রিকামহলেও বাংলা রচনার জন্য তরুণ লেখক মনোমোহনের আদর হয়, 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় তাঁহার লেখা বাহির হইতে লাগিল, পরে কবিবর নিজেই 'বিভাকর' নামে এক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন।

এই সময়ে কবির জীবনে এক ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। কবি ঈশ্বর গুপ্ত তখন কাশীধামে ছিলেন; মনোমোহনকে তখন গুপ্ত-কবির শিক্ষানবীশ বলা চলে, তিনিও কর্ম্মোপলক্ষে কাশীতে আসিয়াছিলেন। কাশীবাসী সাধারণ ঈশ্বর গুপ্তের কবিপ্রতিভার সাক্ষাৎ পরিচয় পাইবার জন্য ব্যস্ত হইল, কবিকে তাহারা নিজেদের প্রার্থনা জানাইল। কিন্তু প্রতিপক্ষ না পাইলে সঙ্গীত জমিবে না বলিয়া তিনি তাহাদিগকে মনোমোহনকে ধরিবার কথা বলিলেন। গুরুশিষ্যে কবিত্বের পরীক্ষা হইল, গুরুর অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ লইয়া শিষ্য সংগ্রামে লিপ্ত হইলেন, গুরু হার মানিয়া শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ করেন,—"সঙ্গীত-সংগ্রামে বিজয়ী হও।" এই ঘটনার মধ্যে শিষ্যের কৃতিত্বের সঙ্গে গুরুর প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়,—সেই পুরাতন কথা মনে করাইয়া দেয়,—"সর্ব্বতঃ জয়মন্বিচ্ছেৎ শিষ্যাদিচ্ছেৎ পরাজয়ম্।"

তখনকার দিনে ছোটজাগুলিয়ায় উন্নতির হাওয়া বহিতেছিল; 'সভ্যতা' তখনও নগরে সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ হয় নাই, পল্লীজীবনে একটা চঞ্চলতা ছিল, লীলায়িত গতি ছিল। স্থানীয় অবৈতনিক নাট্যসমাজ সাধারণের নাট্যরস-পিপাসা দূর করিত। অনুকূল বাতাসে মনোমোহনের নাট্যপ্রতিভা স্ফূর্ত্তি পাইল, বাঙালী পাঠক নাট্যশালার উন্নতির যুগে নূতন নূতন আহার পাইয়া তৃপ্তি

লাভ করিল। আমরা তাঁহার নাটকগুলির একে একে আলোচনা করিব।

রামাভিষেক নাটকের উল্লেখ সর্ব্বপ্রথমে করণীয়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৪ সালে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রভাকর, সোমপ্রকাশ, এডুকেশন গেজেট, ভারতরঞ্জন, ঢাকা প্রকাশ ইত্যাদি পত্রে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহা ছোটজাগুলিয়ায় অভিনীত হওয়ার ব্যবস্থা হয় নাই; যে টাকা উঠিয়াছিল তাহা দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকদের সাহায্যার্থেই গেল। কিন্তু অন্যত্র অভিনয় চলিতে লাগিল; সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অভিনয় হয়, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বৌবাজার নাট্যাভিনয় সমাজে।* অল্পদিনের মধ্যে সব বই নিঃশেষ হইয়া গেল। পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন হইল। চার বৎসর পরে যখন পুনর্মুদ্রণ হয় তখন সংবাদপত্রে "করুণরসপরিপূর্ণ উৎকৃষ্ট দৃশ্যকাব্য" বলিয়া ইহার প্রশংসা বাহির হয়। নাটকটির তৃতীয় মুদ্রাঙ্কণ হয় ১২৮০ সালে। ইহাতে সবস্থদ্ধ পাঁচটি অঙ্ক আছে। রামাভিষেকে পূর্ব্ব-পশ্চিম একত্র মিলিয়াছে, রীতিমত নটনটী প্রস্তাবনা আছে। নটের আবির্ভাব হইতে বোঝা যায় যে, কবির উপর সংস্কৃত নাট্যরীতির ছায়া কতদূর আসিয়া পড়িয়াছে।

নট। (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপূর্ব্বক) আহা! সভার কি অপূর্ব্ব শোভা হয়েছে! ধনী, মানী, জ্ঞানী এবং ভাবগ্রাহী, রসগ্রাহী ও গুণগ্রাহী মহাশয়েরা সভাস্থ হ'য়ে এই আলোকমালার দীপ্তিকে লজ্জা দিয়ে, সভামণ্ডপের অসামান্য শ্রী সম্পাদন ক'চ্ছেন! বিশেষতঃ আমার ন্যায় ক্ষুদ্রজনের দ্বারা প্রকাশিত, অথচ নাটকের অনুরূপ মাত্র যৎসামান্য অভিনয় দর্শন জন্যও যে এঁরা ঘৃণা না ক'রে, ধৈর্য্য ধ'রে আছেন, একি সামান্য মহত্ব? অথবা মহতের স্বভাবই এই।—যা হ'ক্, তবে আর বিলম্ব করা উচিত নয়। এঁদের সঙ্গীতলালসার সঙ্গে অধৈর্য্যের দেখা না হ'তে হ'তে, এই বেলা প্রেয়সীকে ডেকে উদ্দিষ্ট বিষয় আরম্ভ করা যাক্। (নেপথ্যাভিমুখে আহ্বান) অয়ি গজেন্দ্রগামিনি, গজেন্দ্রগমনে এদিকে যে একবার আস্‌তে হবে।—কৈ! এখনও যে দেখা নেই! প্রিয়ে, কি লজ্জা! তোমার কি এখনও সজ্জা হয় নি?"

শুধু এই অনুপ্রাস-বিজড়িত প্রস্তাবনার মধ্যে নয়, নাটকের অন্যত্রও মনোমোহনের রচনায় দেশী রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। যথাশাস্ত্র ঋতুবর্ণনা আছে; দ্বিতীয় অঙ্কে রাম-সীতা উভয়ে গদ্য বলিতে বলিতে হঠাৎ পদ্য বলিয়া ফেলিলেন; তৃতীয় অঙ্কে ছড়াও আছে যথেষ্ট; মন্থরার ভাষায়,—

"ঢেঁকিকে বোঝাব কত নিত্যি ধান ভানে।
অবোধকে বোঝাব কত বোধ নাহি মানে।"
"আগে না বুঝ্‌লে বাছা, যৌবনের ভরে;
পশ্চাতে কাঁদ্‌তে হবে অঝ্‌ঝোর ঝোরে!"
"খিড়্‌কী সদর লাগিয়ে ঘাঁটি,
ভবে গিয়ে দোর কাটি।"
"আমার বেলা মুখের মধু,
আকাশে তোর পরাণ বঁধু।"

কৈকেয়ী-মন্থরা-সংবাদ তখনকার দিনে বহুবিবাহ-বিরোধ আন্দোলনকে জোর দিত, তাই কবি মন্থরার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন,—

"সতিনের হাত সাপের ছোঁ;
চিনি দিলে ভুলে খো।
সতিনের রা নিশির ডাক্;
তিন ডাকে চুপ মেরে থাক্!"

একহিসাবে কিন্তু রামাভিষেক মোটেই প্রাচ্যরীতি অনুসারী নয়;—ইহা বিয়োগান্ত নাটক, ইহার অবসান সঙ্গীতও বিষাদময়। যে-যুগে বিয়োগান্ত নাটকের তেমন প্রচলন ছিল না, সে-যুগে এতাদৃশ রচনার মূল্য কম নয়।

কবিকে একদা কার্য্যানুরোধে ঢাকায় যাইতে হয়, তথায় অবস্থিতিকালে প্রণয়পরীক্ষা রচনা করেন। ১২৭৬ সালের ভাদ্র মাসে ইহা প্রকাশিত হয়; ষ্টার থিয়েটারে ইহার বহুবার অভিনয় হইয়াছিল। পাঁচ বৎসর পরে অর্থাৎ ১২৮১ সালে ইহার যে দ্বিতীয় সংস্করণ হয় তাহাতে দীর্ঘ বাক্যগুলি অনেকটা সংক্ষিপ্ত হইয়া দাঁড়ায়। প্রস্তাবনা দিয়া এই নাটকেরও আরম্ভ; নট রঙ্গমঞ্চে আসিয়া মঙ্গলাচরণ গীত গায় এবং সে গান সত্যরূপী সনাতনের বন্দনা, কোনও বিশেষ দেবদেবীর নহে।

ভাব নিত্য নিরঞ্জন, সত্যরূপী সনাতন।
অরূপ অনুপ স্বস্বরূপ নিখিল অখিল কারণ॥
অব্যয় অক্ষয় অভ্রান্ত, অজরামর অশ্রান্ত,
অনাদি পূর্ণ অনন্ত,
পরমাত্মা পুরঞ্জন॥
মানস কমল দলে, পবিত্র ভকতি জলে,
অপদ শ্রীপদতলে, কর রে অর্পণ॥

* "বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়ে'র বিবরণ জন্য 'মাসিক বসুমতী'র (১৩৩৯) শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

প্রণয়-পীযূষ-পূরিত, সধর্ম্ম-সাধু-চরিত,
উদ্দেশে কর অর্পিত,
মঙ্গল হবে সাধন॥

নট অমিত্রাক্ষর ছন্দে তাহার বক্তব্য আরম্ভ করে, কিন্তু তাহা চালাইতে না পারিয়াই বোধ হয় নিছক গদ্যের আশ্রয় লয়। আরম্ভ ভাগ এইরূপ :—

এ সভা উজ্জ্বল বটে! ওহে সহৃদয়,
সদয় বুধ মণ্ডলি! সদয় হৃদয়ে,
প্রসন্ন নয়নে, আর করুণ শ্রবণে,
করুণ শ্রবণ দরশন—হংস সম,
নীর-ত্যাগী ক্ষীর-ভোগী হ'য়ে -বক্ষ্যমান
"প্রণয়-পরীক্ষা নাটকে"র অভিনয়।

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য—"বহুবিবাহের যত বিষময় ফল।" মহামায়া ও সরলা, দুই সতীন; মহামায়া ঔষধ খাওয়াইয়া স্বামীকে বশ করিতে চায়, আর সরলা কলাকুশলা, কবিতা লিখিতে, সেলাই করিতে জানে; তাহারই রচিত কবিতা ননদিনী সুশীলা আবৃত্তি করিতেছে। স্ত্রীশিক্ষায় যে কত সুখ, মদনিবারণের যে কতদূর প্রয়োজন, তাহা সবিস্তর বর্ণনা করা হইয়াছে, সুতরাং প্রণয়পরীক্ষা ভয়ানক উদ্দেশ্যমূলক। কিন্তু অন্যদিকে আবার কবিওয়ালাদের সরস কথার প্রতিধ্বনিও নাটকে পাওয়া যায়;—রাম বসুর "আমার একটি যে মন, দুজনকে তা দিব কেমনে?" এ-নাটকে খুবই খাটিয়াছে; আর গোবিন্দ অধিকারীর "বল বল আবার বল, ভাল কথার নিছেও ভাল"—তখনকার দিনে যাহারা থিয়েটার দেখিতে আসিত তাহাদের ভালই জানা ছিল। প্রণয়পরীক্ষার পর মনোমোহন পদ্যমালা রচনা করেন; ইহা স্কুলের বালক-বালিকাদের জন্য রচিত এবং তিন ভাগে সম্পূর্ণ। ইহার সরল, সুমিষ্ট, নীতিগর্ভ কবিতা এককালে বালক-বালিকাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। সতী ও হরিশ্চন্দ্র নাটক বৌবাজার নাট্যসমাজের প্রতি উৎসর্গীকৃত, তাহার জন্যই রচিত। উৎসর্গপত্র হইতে খানিকটা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল :—

"পরম প্রেমাস্পদ বহুবাজারস্থ বঙ্গ-নাট্যসমাজ সম্পাদক
শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়
তথা উক্ত সমাজের সভ্য
শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল ধর প্রভৃতি মহাশয়গণ
সমীপেষু।

সহৃদয় প্রিয়সুহৃদগণ!

পুরাণে বলে, বিষ্ণু পাদোদ্ভবা পতিতপাবনী গঙ্গা নাকি ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে কৃতাবরুদ্ধা ছিলেন। জনকত শাস্ত্রজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যতীত আর কেহই জানিত না, ... বাল্মীকি-করকমল-নিঃসৃত সুবিমল সুধারূপী "রামের অধিবাস ও বনবাস" আখ্যানটী মৎকৃত "রামাভিষেক" নামা নাটকের কয়েকটী ক্ষুদ্রায়ত মুদ্রাপত্র মধ্যে আবদ্ধ ছিল। জনকত গ্রন্থভুক্ পাঠক ব্যতীত অপরে তাহা জানিত কিনা সন্দেহ। আপনারা বহ্বায়াসে তাহাকে রঙ্গভূমিতে অবতরণ করাইয়া সেই এক কার্য্যে আপনাদিগের পুরুষার্থ, রামসীতার মাহাত্ম্য এবং লোকের দৃশ্যকাব্যানুরাগকে চরিতার্থ করিয়া দিয়াছেন।...এ তরঙ্গও আপনাদের উত্তেজনা ও উৎসাহবায়ুতে উত্থিত হইয়াছে!...যখন ঢেউ তুলিয়াছেন, তখন রঙ্গভূমিরূপ প্রণালীদ্বারা সমাজ-ক্ষেত্রে বিকীর্ণ করিবেন বলিয়াই "সতী-নাটক" নামা সতী মাহাত্ম্য-ঊর্ম্মি আপনাদের স্নেহরূপ বেলাভূমির উপর গিয়া প্লাবিত হইয়া পড়িতেছে" ইত্যাদি

এই উৎসর্গ-পত্রিকার শেষে এক "কৃতজ্ঞতা স্বীকার আছে," তাহাতে গ্রন্থকার বাবু দ্বারকানাথ পাঠকের নিকট ঋণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তিনি রামাভিষেক, প্রণয়পরীক্ষা ও সতী নাটকের মধ্যে যে-সব গান আছে হিন্দী গানের ছাঁচে তাহাদের সুর ঠিক করিয়া দিয়াছেন। এই গানের বিষয়ে কৃতজ্ঞতাস্বীকারের কিছু বিশেষ অর্থ আছে, মনোমোহন ভাবিতেন যে গানই বাংলা নাটকের বিশেষত্ব বজায় রাখিয়াছে। তিনি বলিতেন, "ইউরোপে নাটককাব্যে গান অল্পই থাকে, আমাদের তথাবিধ গ্রন্থে গীতাধিক্যের প্রয়োজন। ইটা জাতীয় রুচিভেদে স্বাভাবিক।...অনুকরণভক্ত কতকগুলি ভাক্ত উন্নতির শিষ্য ইউরোপের আদর্শ দেখিয়া বলিয়া থাকেন 'নাটকে গান কেন?' তাঁহারা বাহির দেখেন, স্বীয় সমাজের অভ্যন্তর দেখেন না!"

সতী নাটকের প্রথম সংস্করণের ভূমিকার তারিখ, ১৭ই মাঘ, ১২৭৯ সাল; ১২৮০ সালের ১০ই ফাল্গুন শনিবার, বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়ে ইহার অভিনয় হয়, ঐ বৎসরের ১১ই চৈত্রের 'সোমপ্রকাশে' সে-বিষয়ে মন্তব্য আছে,—ইহা নিশ্চয় প্রথম অভিনয় নয়, ঐ বৎসরের ১৭ই জানুয়ারী প্রথম অভিনয় হয়। ১৮ই চৈত্রের 'সোমপ্রকাশে' সতীনাটকাভিনয় সম্বন্ধে আরও উল্লেখ আছে। ১২৮৪ সালে দ্বিতীয়, ও ১২৮৭ সালে তৃতীয় সংস্করণ হয়। বহুবাজার নাট্যসমাজের নির্দ্দেশমত মনোমোহন সতী নাটক রচনা করেন, ও উক্ত সমাজের অর্থসাহায্যে তাহা মুদ্রিত করেন।

সতী নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণের সময় মনোমোহন

সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদনে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন, দীর্ঘ উক্তি প্রায়ই খর্ব্ব করিয়াছিলেন, এবং প্রথম সংস্করণের সতী বিয়োগান্ত ছিল বলিয়া বিস্তর লোকের অনুরোধে উপসংহারে হরপার্ব্বতী মিলন দেখাইতে হয়, এই নূতন দৃশ্যের ২০ কপি ছাপাইতেও হয়। এ বিষয়ে তাঁহার মন্তব্য, তাঁহার মতবাদের কিছু পরিবর্ত্তন জন্য উপভোগ্য :—

"ইহা আধুনিক রুচির অনুমোদিত না হইলেও. প্রাচীন রুচির বিশেষ অনুরোধে নাটক প্রচারের কিয়দ্দিন পরে রচিত, অভিনীত ও সম্ভ্রান্ত অভিনেতাদের সুবিধার্থে কেবল কুড়িখানিমাত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। তৎকালে জানিয়াছিলাম, ইহার আর প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু বহু রঙ্গভূমির অধিনায়ক ও সাধারণ পাঠকগণ ক্রমশঃ চাহিয়া পাঠান, মুদ্রিত না থাকাতে প্রাপ্ত হয়েন না—তবে যাঁহাদের বিশেষ প্রয়োজন, তাঁহারা হস্তে লিখিয়া লইয়া যান। অধুনা তদভাব নিবারণার্থে নাটকের এই পুনর্মুদ্রাঙ্কণ সুযোগে তাহাও প্রচারিত হইল। বিয়োগান্ত-নাটক প্রিয় মহাশয়েরা সে অংশটা বর্জ্জন এবং পুনর্মিলনানুরাগী মহাশয়েরা গ্রহণপূর্ব্বক অভিনয় করিতে পারেন।"

মঙ্গলাচরণ গীত দিয়া নাটকের আরম্ভ, তাহার পর প্রস্তাবনা—"এত যত্নে যে সঙ্গীত অভ্যাস করেছ, এমন মহতী সভার মনোরঞ্জন কর্ত্তে না পার্লে তবে আর তার ফল কি?" বিষয়-নির্ব্বাচনের কথায়ও সেকালের বাক্যবন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়—"এমন কোনো অনুপম পতিপ্রাণার মাহাত্ম্য চাই, যা শুনলে বিদেশীর আশ্চর্য্য, স্বদেশীর ভক্তি, বালিকার শিক্ষা, যুবতীর চৈতন্য, বৃদ্ধার অনুতাপ হবে!"

সতী নাটকের আখ্যানভাগ সম্পূর্ণ পৌরাণিক, দক্ষ-যজ্ঞের কথা লইয়া রচিত। কিন্তু ইহাতে শান্তিরামের কথায় প্রতিক্ষণে যে একটি স্বাভাবিক, সহজ ছন্দ ফুটিয়াছে তাহা প্রকৃতই অভিনব। রামাভিষেকের মন্থরার কথা বলিবার ধারা এখানেও চলিয়াছে। এই শান্তিরামের কথা আমাদের শৈশবে অন্তঃপুরিকাগণের নিকটও শুনিয়াছি, তাঁহারা শান্তিরামের ছড়া শুনাইয়া শিশুদের চিত্তবিনোদন করিতেন। যেমন,—

'শান্তিরাম, তুই বগল বাজা,
গোলোকে তোর ভিজল গাঁজা।'

'আর কি চাব আর কি পাব? চাবার পাবার কিছুই নাই
একটি কেবল চাইতে আছে, সেইটী সেইটী সেইটী চাই!'

'বাপের কাছে চেয়ে পাই;
না চাইতে মা দিলেন ঠাঁই!'
'তিস্তাধিনা পাকা নোনা—
যুচ্ জোরে তোর আনাগোনা!'

নাট্যকারের মনে সঙ্গীত-পিপাসা এতই জাগরূক ছিল যে তিনি গদ্য লিখিবার সময়েও ধ্বনিসাম্যের দ্বারা সঙ্গীত-তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া যাইতেন :—

"ওগো মা! বিদ্যাবতী, গুণবতী, অচঞ্চলা, সুশীলা, গুণশীলা যতই কেন হ'ক্ না, অবলা হ'লেই কি লঘুবুদ্ধি যায় না?...তোমার জনকজননী ভগ্নীগণ জনে জনে সপরিজনে স্বচ্ছন্দে আছেন, কোনো পক্ষে কোনো অসুখ নাই!"

সতী নাটকের পরে হরিশ্চন্দ্র; ইহাও বহুবাজার অবৈতনিক নাট্যসমাজের সভ্যদিগের বিশেষ অনুরোধে রচিত। কৃতজ্ঞ গ্রন্থকার ঋণস্বীকার বিষয়ে বিশেষ সতর্ক ছিলেন, নিম্নলিখিত উৎসর্গপত্র হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

প্রণয়াস্পদ মান্যতম

শ্রীযুক্ত বহুবাজার-নাট্য-সমাজ-সভ্য মহোদয়গণ

সমীপেষু

প্রিয় সুহৃদ-মণ্ডলি!

প্রণয়োৎসৃষ্ট উপহার নিকৃষ্ট হইলেও প্রেমার্দ্র হৃদয় গৌরবে গ্রহণ করিয়া থাকে। সুদ্ধ সেই ভরসাতেই এই যৎসামান্য নাটকখানি আপনাদের করকমলে অর্পণ করিতে সাহসী হইতেছি।

বিশুদ্ধরুচি ও সমাজ-শুদ্ধির প্রবৃত্তি বশতঃই যে আপনারা অভিনয় কার্য্যে লিপ্ত, বঙ্গীয় সমাজের সহৃদয় মাত্রেই ইহা স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। নচেৎ এতাধিক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক এমন চিত্তবিনোদন অবৈতনিক নাট্যশালা স্থাপনের প্রয়োজন কি ছিল? সেই বঙ্গোজ্জ্বল রঙ্গভূমিতে নাটক নামের অযোগ্য মদীয় "রামাভিষেক" ও "সতীনাটকে"র প্রদর্শনও আপনাদের যোগ্যতাগুণে উচ্চপদবী লাভে সমর্থ হইয়াছিল।...আপনাদের বদন হইতে আবার একখানি নাটক প্রণয়নের অনুরোধ হইবা মাত্র সেই হস্তের লেখনী যে ধাবিত হইবে... তাহা বিচিত্র নহে!

নাটকখানি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইয়া থাকিবে, কিন্তু তাহাতে কি? যদি বিনোদনের গুণ না থাকে, তবে হ্রস্ব দীর্ঘ সবই সমান! আর যদি সৌভাগ্যক্রমে অল্পভাগেও মনোরঞ্জক হইতে পারে, তবে দুই এক দণ্ড সময় দানে কি অভিনেতৃ, কি শ্রোতৃ, সদামোদী মাত্রেই কদাচ কাতর হইবেন না।

কলিকাতা।
২০২ নং করন্‌ওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।
পৌষ, ১২৮১ সাল।

চিরবাধ্য
শ্রীমনোমোহন বসু।

হরিশ্চন্দ্রও নানাগুণে লোকপ্রিয় হইয়াছিল; ইং ১৮৮৫ সালে চতুর্থ মুদ্রাঙ্কণ হয়। নাট্যকারের 'ছড়া'কাটার যে প্রবৃত্তি আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী নাটক দুইখানিতে দেখিয়াছি ইহাতেও তাহার পরিচয় আছে। খগা পাগ্‌লার কথা :—

হায়্ মরি কি প্রাণের সখা—
সাম্‌নে চরণ্ ধূলি মাখা—
সাম্‌নে বচন "তোমার আমি—
"ম'র্‌লো আমি, ম'লে তুমি!"
পেছন ফির্‌লেই ছোবল মারা—
চোরা বিষের বিষে পোরা!
দুধ কলা হায়! যত খাওয়া,
বিষ্ দাঁত তত বেড়ে যাওয়া!
নষ্ট নাগের দুষ্ট ধারা—
যার খাওয়া তার প্রাণে মারা!

শৈব্যা বর্ত্তমানে তুঙ্গরাজ-কন্যা কমলার সহিত হরিশ্চন্দ্রের বিবাহ হইল, কল্পকথার মত পালাও ফুরাইল। ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ অঙ্কে কোনও গর্ভাঙ্ক নাই।

হরিশ্চন্দ্রের মধ্যে গ্রন্থকার ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার প্রতি যে-ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহার প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করি। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও মনোমোহন মনে প্রাণে 'স্বদেশী' ছিলেন, ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের বিনাশ তাঁহার হৃদয়ে ব্যথা জাগাইয়াছিল।

"ভারতের তন্তুগাত কৌষেয় আর সূত্র-বসনেই সমস্ত সভ্যজাতি সজ্জিত হ'তো; কিন্তু হায়! আজকাল্ ভারতের সেই অসংখ্য তন্তু নিস্তব্ধ" ইত্যাদি।

সেই সঙ্গীতের কয়েকটি পদ এ-স্থানে উদ্ধৃত করিলাম; অনেকেই হয়ত জানেন না যে উহা নাট্যকার মনোমোহনের রচনা।

ছুঁই, সুতা পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে,
দিয়াশলাই কাটি, তাও আসে পোতে—
প্রদীপটী জ্বালিতে, খেতে শুতে যেতে
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন।

তাহার পর পার্থপরাজয়ের কথা। বভ্রুবাহনের যুদ্ধে অর্জ্জুনের পরাজয় লইয়া এই নাটক রচিত হয়। ১২৯৩ সালের ফাল্গুনে ইহার দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কণ। 'দৃশ্য' পরিবর্ত্তে নাট্যকার "সংযোগস্থল" কথাটা প্রয়োগ করিয়াছেন। কবির ভাষাগত বিশেষত্ব কিছু কিছু আছে,—যেমন, 'বেটাদ্দের', 'চুপ্‌মার,' 'পুরুষ মুস্‌লোন্দে নেই,' 'ব'লতি না 'ব'ল্‌তি,' 'তাদ্দের' ইত্যাদি। পার্থপরাজয়ে গানের বাহুল্য আছে; প্রমীলার মুখেও গান আছে, মদনের শর-ত্যাগকালে মদনের মুখেও গান। যেখানে গান নাই, সেখানে আছে অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি,—যেমন, 'বিজয় নামের মান বাঁচলো,—পরাজয় নিশ্চয়, এমন সময় জয় হ'লো—কুগ্রহময় বিগ্রহ কেটে আগ্রহময় শুভ সন্ধি হ'তে চল্লো।' চিত্রাঙ্গদার সহিত অর্জ্জুনের সাক্ষাৎ নাট্যকার মহেন্দ্রপর্ব্বতে ঘটাইয়াছেন, মণিপুরে নয়। বভ্রুবাহনের মুখে তিনি এত দীর্ঘ এবং এত ছন্দোবদ্ধ বক্তৃতা দিয়াছেন যে তাহাতে সংস্কৃত কাদম্বরী দশকুমারাদি গ্রন্থের ছায়া আসে, অথবা মনে হয় যাত্রাই শুনিতেছি; যেমন—

"তবে আর বচনের পরিচয় কেন? বাণমুখেই পরিচিত হব! এমন পরিচয় নয়—সেই বাণাগ্নিতে খাণ্ডবদাহনের পরিচয় আ'জ নিষ্প্রভ; সুভদ্রাহরণের দর্প আজ চূর্ণীকৃত; মৎস্যলক্ষভেদ আর লক্ষভূপালের জয়জনিত গর্ব্ব আজ খর্ব্ব; উত্তর গোগৃহের অদ্ভুত কীর্ত্তি আ'জ বিপর্য্যস্ত; কুরুক্ষেত্রসমরে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণঘাতনের অহঙ্কার আ'জ বিদূরিত; অজয় তূণকে আ'জ শূন্য; বিজয় গাণ্ডীবকে আ'জ ছিন্ন; অগ্নিদত্ত কপিধ্বজকে তুলার ন্যায় উড্ডীয়মান—অধিক কি, পাণ্ডব-গৌরবাভিমান আ'জ সম্পূর্ণ নির্ব্বাণ ক'রে অর্জ্জুন-শুবনে আমার জন্ম কি না, ত্রিলোক সমক্ষে ভালরূপেই দেখাব!"

এইরূপ ভাষার জন্যই বুঝি সমসাময়িক কোনও সংবাদ-পত্র বলিয়াছিলেন,—

"Our author has observed a golden mean between Sanskrit and Anglicized Bengali."

পার্থপরাজয়ের উপসংহারের গানটি নাটকের অন্যান্য গান হইতে সুন্দর।

কি মনোলোভা, নিরখি নবশোভা!
এক মেঘে চারিদিগে, চারি সৌদামিনী-আভা!
চারিটী কনক-লতা, তমালে যেন জড়িতা,
বিভিন্ন বিকাশে ধন্য—কিবা রূপ গুণ নিভা!
যেন, চৌদিগে হেম-বল্লরী, মধ্যেতে নীলকান্তমণি,
নীলগিরি ঘেরি যেন চারু চারি প্রবাহিণী;
পার্থ পাণ্ডুকুল-রবি, যেন মেঘ-মুক্ত ছবি,
ছটা রূপে চারিদিগে, চারি সীমন্তিনী-প্রভা।

পার্থপরাজয়ের পরে আনন্দময় নাটক, ইহার প্রকাশ-কাল আষাঢ়, ১২৯৭। ইহাতে প্রস্তাবনা ইত্যাদি নাই। ইহার ভাষাগত কিছু বিশেষত্বের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

'দ্যান-দরবার'—'উনি এত দ্যান্-দরবার করেন, তাও কি বোঝেন না?'

'পুষ্যি পুত্র নেওয়া—না, না, সে নামে কে যেন আমার গায় আলকুশি দেয়! পরগাছা কি গাছ? পরচুলো কি চুল?' (১৬ পৃঃ, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক)

'এরা আট্‌কোলে দেখলে...'

'কোদালখান হতুফেলে দৌড়ে আয়।' (১ পৃঃ)

'কালেজ-আউট ছোকরা—আধাখ্যাঁ গোরা'। (১৮ পৃঃ)

'এখন সব চিরে বুঝলেম ! তবে স্বধু টাকার লোভে প'ড়েই চণ্ডী ছেলে চুরি করে নি—তার নিজেরও দা'দ্ তোলা ছিল।' (১৯ পৃঃ)

'এক্স্লাইয়ের সময় পাঁচ শ টাকা পায় ঢেলে পূজো ক'রেছিলেন, শেষটা কেবল জালে ধরা পড়েই পুলিপ্লাং যায়।' (৪৩ পৃঃ)

আনন্দময় ঘটনাবহুল নাটক, সমসাময়িক বাংলার চিত্র, অর্থগৃধ্র কর্ম্মচারী। আপনাভোলা প্রভুর বংশনাশ করিয়া সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে চায়, কিন্তু সহজানন্দের দ্বারা চক্রীর চক্রান্ত ব্যর্থ হইল। ইহাতেও অনেক গান আছে। গানের আকার দেখিলে মনে সন্দেহ হয়, ইংরেজী duet কি দেশী অন্তরা হইতে কতটুকু লইয়াছেন ? একটি গানে লালজী ও বাণীকণ্ঠ ২ কলি গাহিলেন, ভৈরবী গাহিলেন ৩, তাহার পর লালজী ও বাণীকণ্ঠ আবার ধরিল, এইরূপ চলিতেছে। আনন্দময়ের মধ্যে যাহা সবচেয়ে ভাল গান বলিয়া মনে হইয়াছে তাহা নীচে দিলাম :—

(মিছে) ভব-ঘোরে ঘুরে ঘুরে ভবঘুরে হ'য়েছি।
ও যার, তত্ত্ব করে বেড়াই ঘুরে খেই আমি তার হারিয়েছি।
তোমরা কি কেউ বল্‌তে পারো কোথায় গে পাই তত্ত্ব তারো,
পেলেম পেলেম কত বারো, ক'রে শেষে ঠকেছি।
(যদি বল) ধরণ ধারণ চলন চালন রকম সকম কেমন তার ?
সে সব কিছু কৈতে নারি, জেনেও হায় জানিনে সার।
(কেবল) একটি গুণ তার চমৎকার, জানা আছে বেশ আমার,
যে ডাকে সে হয় গো তার, সার বুঝে তা রেখেছি।

আনন্দময়ের মধ্যে বিপরীত চরিত্রের যুগল সৃষ্টি আছে ; রঘু নায়েব ও কান্তবাবু, বিশু মুহুরী ও রাধু সরকার, সৎ ও অসৎ প্রকৃতির প্রভেদ ও ক্রিয়া দেখাইবার জন্যই যেন ইহাদের সৃষ্টি।

আনন্দময়ের পর মনোমোহন 'রাসলীলা' নাটক লেখেন ; রাসলীলাকে তিনি melo-drama বলিতেন। এই নাটকের মধ্যেই অন্য অভিনয়ের ব্যবস্থা আছে, সখীরা অভিনয় প্রদর্শন করিতেছেন। শান্তিরামের কথা বলিবার ধারা এখানে কালিন্দীর মুখে যেন লাগিয়া আছে।

বঁধুর সনে মধুর খেলা, মধুর লীলা হায় !
ভাবুকের ভাব্ কদম কলি, ফুটিয়ে দিচ্ছে তায় !
সে মাধুরী, বারেক হেরি, পাসরি কি আর্ ?
তার্ বুঝে তার্, ভর্ হ'য়েছে এক্‌তারা আমার !

কালিন্দীর হাতে একতারা, মুখে ভাবময়ী বাণী, কালিন্দী নিজেও রহস্যময়ী ! রাস কোনও ঘরের মধ্যে বা আবরণের ভিতরে হইবার নয়, সেই কথাই কালিন্দীর মুখে :—

তা হবে না, তা হবে না, রাস ঢাকা হবে না !
চাঁদোয়াতে আঁধার হবে, চাঁদের আলো ঢাকা রবে,
সোনার রাসে সোনার চাঁদ্‌কে না দেখ্‌লে প্রাণ বাঁচবে না !
তা হবে না, তা হবে না, রাস ঢাকা হবে না।
চাঁদ্‌মুখী সব্ রাস ক'র্ব্বে, না দেখে চাঁদ কেঁদে মর্ব্বে,
রাই চাঁদের পায় দশ্‌টা হ'য়ে কিরণ দিতে পাবে না !
তা হবে না, তা হবে না, রাস ঢাকা হবে না !

ভগবান্‌কে কেমন করিয়া দেখা যায় ?

চর্ম্ম চ'কে, রূপ্ পানকে, চেয়ে কি হায় যায় থাকা ?
আড়াল থেকে, ধ্যানের চ'কে, যা দেখি, তায় সুপ পাকা !
সামনে গেলে, চ'কের্ জলে, ভেসে যে সই হই বোকা !
একতারা তাই তারা মুদে দেখ্‌তে চায় হৃদয়-সখা !
(বলে) প্রাণের চ'কে ধ্যানের চ'কে দেখাইতো পাকা দেখা !

উপরিলিখিত নাটক সপ্তক ছাড়া মনোমোহন বিস্তর কবিতা লিখিয়াছেন, তাঁহার পদ্যমালা বালক-বালিকাদের জন্য ; 'নাগাশ্রমে'র কথা তিনি 'কেঁড়েল' কবি নামে ব্যঙ্গ কবিতায় প্রকাশ করিয়াছিলেন ; আর বহু যাত্রা অভিনয়ে তিনি গান বাঁধিয়া দিতেন। তখনকার দিনে তাঁহার গানের খ্যাতি ছিল ; বৌবাজার নাট্যসমাজে তাঁহার রচিত গান শুনিয়া 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদক মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন, "আহা ! কি মনোহর গানই শুনিলাম—যেমন ভাব, তেমনি রচনা, তেমনি সুর" ; আর একবার তাঁহার লেখা সখীসম্বাদ শুনিয়া কবি ও ভাবুক ভোলানাথ মল্লিক মহাশয় অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই ; প্রকাশ্য সভায় স্বনামধন্য পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় কবিকে প্রেমালিঙ্গন-দানে সমাদর করিয়াছিলেন। ইহাই ছিল সেকালের কবি-সম্বর্দ্ধনার রীতি। 'মনোমোহন গীতাবলী' কবির লেখা হাফ্-আখ্‌ড়ায়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসসমৃদ্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

সংবাদপত্রসেবী হিসাবেও তখনকার দিনে মনোমোহনের নাম নিতান্ত নগণ্য ছিল না। 'বিভাকরে'র কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি ; 'মধ্যস্থ' নামক পত্রও তাঁহার কীর্ত্তি। ইহা ১২৭৯ সনের ২রা বৈশাখ, তাহার পর প্রতি শনিবার প্রকাশ হইত। মধ্যস্থ সভা ইহার পিছনে থাকিত ; সে সভা ছিল 'সপ্তরত্ন সমাজ', অর্থাৎ সাত জন সভ্য, সভার

সম্পাদকের নামও রাখা হইয়াছিল 'মধ্যস্থ'; ইহা কল্পনার কথা না বাস্তবিক, তাহা বলা কঠিন। সাধারণ সংস্করণ ভিন্ন অতিরেক মধ্যস্থও বাহির হইতে থাকে, ২রা আষাঢ় হইতে। প্রতি সংখ্যায় বিদেশ হইতে মূল্যের প্রাপ্তি-স্বীকার থাকিত, তাহা হইতে জানা যায় যে প্রথমাবধি গ্রাহক-সংখ্যা ভালই ছিল; বহরমপুরের রামদাস সেন মহাশয় প্রথম হইতেই গ্রাহক ছিলেন, তিনি আবার নাম রাখিয়াছিলেন, 'মিডিয়েটার' (Mediator)। ঢাকার মিঃ সেমুয়েল লংডে, ইন্দোরের সূর্য্যকুমার বসু, আসাম সদিয়ার কোরকান আলি প্রভৃতি হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান নির্ব্বিশেষে মধ্যস্থের গ্রাহকসংখ্যাভুক্ত ছিলেন। গ্রাহক ভিন্ন দেশহিতৈষী অনেকে 'মধ্যস্থ'কে পত্রসম্পাদনে ও গ্রন্থ-প্রকাশে সাহায্য করিতেন। পত্র দুই মাস চলিতে-না-চলিতেই শোভাবাজার রাজবাড়ীর মহারাজ কমলকৃষ্ণ দেব একটি উত্তম লৌহযন্ত্র, একটি কাষ্ঠযন্ত্র, কয়েক প্রকার নূতন ও পুরাতন অক্ষর ও বিবিধ সরঞ্জাম মধ্যস্থকে উপহার দেন; মহারাণী স্বর্ণময়ী মধ্যস্থের জন্য পঞ্চাশ টাকা অতিরেক দান করেন; রাণী শরৎসুন্দরী মধ্যস্থের জন্য বিশ টাকা আনুকূল্য করেন এবং রামাভিষেক নাটকপাঠে খুশী হইয়া গ্রন্থকারকে দশ টাকা পারিতোষিক দেন; কাকিনার কুমার মহিমারঞ্জন বার্ষিক মূল্য ছাড়া এককালীন ত্রিশ টাকা দান করেন এবং পুস্তকগুলি পড়িয়া আরও দশ টাকা পাঠান; তুষভাণ্ডারের জমিদার রমণী-মোহন মধ্যস্থের জন্য বিশ টাকা দেন ও রামাভিষেকের জন্য পাঁচ টাকা পারিতোষিক দেন, মনোমোহন বাবুর বক্তৃতা ও বিজয়ার কোলাকুলি সম্বন্ধে কবিতা পড়িয়া আরও দশ টাকা পুরস্কার পাঠাইয়া দেন; দিনাজপুরের রাণী শ্যামমোহিনী মধ্যস্থের জন্য পঁচিশ টাকা এবং প্রণয়পরীক্ষাদি লেখার জন্য পুরস্কারস্বরূপ গ্রন্থকারকে দশ টাকা পাঠাইয়া দেন। সেকালে সাহিত্যিকের আদর এইভাবেই করা হইত। দক্ষিণার পরিমাণের উপর নয়, দক্ষিণা-দানের উপরই সমাদর নির্ভর করিত। বহু সম্ভ্রান্ত লোকের আনুকূল্য হইতে বুঝা যায় মধ্যস্থের গুণ কত অধিক ছিল।

প্রথম ছয় মাস মধ্যস্থের রয়েল আটপেজী দুই ফর্ম্মা বা ১৬ পৃষ্ঠায় কুলাইত না, অতিরেক পৃষ্ঠার দরকার হইত। ছয় মাস পূর্ণ হইলে এই ষোল পৃষ্ঠা বাড়াইয়া বিশ পৃষ্ঠা হইল। ইহাতেও কুলায় না, ১২৮২ আষাঢ় শ্রাবণে ক্রোড়পত্র ছাপা হয়। মধ্যস্থ নামেই পত্রের মধ্যপথ গ্রহণ সূচিত করিতেছে,—

"নবীনভাবাঙ্কপলান্নবাম্নবে
নবীয়সোঽপীহ চিরাগত প্রিয়ান্।
নিরীক্ষ্য ভিন্নপ্রকৃতীনমূনতঃ
মধ্যস্থ ইত্থং যততে সমন্বয়ে॥"

মধ্যস্থের প্রবন্ধগৌরব মন্দ ছিল না। প্রকৃতি পর্য্যালোচনা, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সবই বাহির হইত। "কেঁড়েলের জীবন" নাম দিয়া সম্পাদক নিজের জীবনের কথা বলিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে তাঁহার সমালোচনা যে বিশেষ তীব্র ছিল তাহা "নাগাশ্রমের অভিনয়" পড়িলেই বোঝা যায়, নাটকেও মাঝে মাঝে স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রতি কটাক্ষপাত আছে।

"দৃষ্টান্ত দেখিবে যদি, এস মোর সহ,
ভারত-আশ্রম নামা নাগাশ্রমে এস,
স্বইরূপ স্বাধীন স্বাধীনা ভ্রাতা ভগ্নী
দেখিয়া জুড়াবে আঁখি—হইবে অবাক্।"

শুধু ব্রাহ্মসমাজের স্ত্রী-স্বাধীনতার নয়, ব্রিটিশ রাজ-নীতিরও তীব্র স্পষ্ট নির্ভীক সমালোচনা করিতে মনো-মোহন কোনও দিন কুণ্ঠিত হন নাই। ১২৮১ সালের প্রথমেই প্রশ্ন,—"ইংলণ্ড কি যথার্থই প্রজাহিতৈষী?" নেপিয়ারের সিন্ধুজয় লইয়া ১২৮২-এর ভাদ্র সংখ্যায় এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়,—"সিন্ধু জয়, না হরণ?" তাহার পূর্ব্বে আষাঢ় শ্রাবণ সংখ্যায় "মুখোয্যার বরদা পুস্তক" এই সঙ্গে পঠিতব্য; কেঁড়েলের ববম্বম্-জর্জ্জাষ্টকম্"ও এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে। তাহার প্রথম দুই লাইন এই :—

ববম্বম্ ক্যাম্বেলিবংশ-অবতংশ জর্জ্জবম্—
কি বিচিত্র চারুচিত্র চরিত্রস্ত মাহাত্ম্যম্।

১২৮২ সালের পূর্ব্বেই মনোমোহনের স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িতেছিল। পত্রসম্পাদনেও যথেষ্ট ত্রুটি হইতেছিল। জ্যৈষ্ঠের মধ্যস্থে সম্পাদক এইজন্য দোষ স্বীকার করিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে ১২৮২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত মধ্যস্থ আছে। তাহার পর উহা আর বাহির হইত কি-না জানার উপায় নাই।

আশ্বিন খণ্ডের শেষ পৃষ্ঠায় "শ্রীমধ্যস্থ" জানাইতেছেন যে, বৎসরাবধি বার বার পীড়াক্রান্ত হওয়ায় (বিশেষতঃ শিরঃপীড়া বিশেষ) তিনি নিয়মিত মধ্যস্থ প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না, এবং চিকিৎসক ও বান্ধবগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—মানসিক শ্রমকার্য্যে কিছুদিন নিবৃত্ত থাকা। "যদি শীঘ্র স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারি তবে পরম ভাগ্য। নচেৎ এই অপ্রতিবিধেয় কারণে মধ্যস্থ প্রকাশে যদি কিছু বিলম্ব ঘটে, তবে অনুগ্রাহক গ্রাহক মহাশয়েরা স্ব স্ব ঔদার্য্যগুণে ক্ষমাপরায়ণ হইবেন।"

মনোমোহনবাবু হিন্দুমেলার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার যথেষ্ট বক্তৃতা-শক্তি ছিল। ১২৮০ সালের পৌষ সংখ্যা মধ্যস্থ হইতে জাতীয় নাট্যসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করি :—

"যেমন মধুর অভাবে ফুল ধোওয়া, নাটকের অভাবে যাত্রা ঠিক সেইরূপ! আমি জানি, বঙ্গদেশে যাত্রাওয়ালারা সামান্য আমোদ দান করে নাই। আমি জানি, তাহারা প্রত্যহ প্রায় প্রতি গ্রামে—প্রতি পল্লীতে সহস্র সহস্র লোকের চিত্ত রঞ্জন করিয়াছে। আমি জানি, তাহাদের মধ্যেও একপ্রকারের গুণীলোক পাওয়া যাইত, সুরের জমাট বাঁধাইয়া তাহারা বহুচিত্তকে মোহিত করিত। কিন্তু হায়! তাহাতে অপকার যত, উপকার তত ছিল না! তাহাদের সুস্বর গুণের প্রশংসা অবশ্য করিব, তাহাদের গানগুলির মধ্যে এমন গানও আছে, যাহাতে কখনো কখনো যথার্থ কবিত্ব, সুতরাং উপাদেয়ত্ব ও নীতিতত্ত্বের সদ্ভাব দেখা যাইত—কিন্তু সে সব সর্ব্বদা নয়।"

এইভাবে তিনি যাত্রা অপেক্ষা নাটকের প্রাধান্য দেখাইয়া বঙ্গদেশে নাট্যাভিনয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। ঈশ্বর গুপ্তের প্রবোধচন্দ্রোদয়, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর, তারাচরণের ভদ্রার্জুন, কোনটিই সমাজে তেমন আদৃত হয় নাই। কারণ উহাদের অধিকাংশই পয়ারে লিখিত; তারপর পাইকপাড়া, জোড়াসাঁকোর কথা বলিয়া দীনবন্ধু ও মাইকেলের নাম করিয়াছেন, দীনবন্ধুকেই "আমাদের মাতৃভাষার দৃশ্যকাব্যের প্রথম জন্মদাতা" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রামাভিষেক ও নব নাটক প্রভৃতি রচনার পর "দুঃখশেষ (tragedy), সুখশেষ (comedy) ও প্রহসনাদি ভালমন্দ বহু বহু দৃশ্যকাব্যের স্রোতে বঙ্গদেশ এককালে প্লাবিত হইয়া পড়িল! দুঃখের বিষয়, ঐ সব নাটকের অধিকাংশ না-টক না-মিঠে!" মনোমোহন বাবুর দুইটি মত এস্থলে উল্লেখযোগ্য; তিনি নাট্যরচনায় গীতের বহুল প্রয়োগ সমর্থন করিয়াছিলেন এবং আমাদের জাতীয় সম্পদ যাত্রার আমূল উচ্ছেদ না করিয়া তাহাকেই নাটকের আকার দেওয়া।

"আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে নাট্যাভিনয়ে গানের বড় আবশ্যক করে না, ইউরোপীয় রঙ্গভূমিতে নাটকাভিনয় কালে গানের অভাব দেখিয়াই তাঁহারা এই সংস্কারের বশতাপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ যে ইউরোপ নয়; ইউরোপীয় সমাজ আর স্বদেশীয় সমাজ যে বিস্তর বিভিন্ন, ইউরোপীয় রুচি ও দেশীয় রুচি যে সম্যক্ স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না।...আমরা মধ্যস্থ মানুষ; আমরা চাই, দেশে পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহার ধ্বংস না করিয়া তাহাকে সংশোধিত করিয়া লও। আমরা চাই, সেই যাত্রার গান সংখ্যায় কমাইয়া ও গাইবার প্রণালীকে শোধিত করিয়া নাটকের স্বভাবানুযায়ী কথোপকথনাদি বিবৃত হউক!"

আর এক বিষয়ে মনোমোহন বাবুর মত অত্যন্ত দৃঢ় ছিল; স্ত্রীলোকের ভূমিকায় অভিনেত্রী-নিয়োগের তিনি অনুমোদন করেন নাই, ওরূপ ব্যবস্থায় দেশের দুষ্প্রবৃত্তি বাড়িবে ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল।

"শতবর্ষ নাটক না দেখিতে হয়, যুগ-যুগান্তরে এদেশে নাটকাভিনয়রূপ সুখ-দৃশ্য না ঘটে, চিরকাল স্বভাবের বিরোধী যাত্রাওয়ালারা জঘন্য অভিনয় প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত থাকে, সেও ভাল, তবু যেন এমন দুষ্প্রবৃত্তিসাধক ধর্ম্মনীতিঘাতক ঘোরলজ্জাজনক প্রথাকে আমাদিগের এই জাতীয় নাট্যসমাজ অথবা অন্যান্য অভিনেতৃসমাজ অবলম্বন না করেন!"

মধ্যস্থ অবসানের পর হইতে মনোমোহনের প্রতিভা-জ্যোতি ম্লান হইতে থাকে; সম্ভবতঃ অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁহার শরীর-মন দুই-ই ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। তিনি বইয়ের দোকান করিয়াছিলেন, মনোমোহন লাইব্রেরীতে নিজের হাতে বই বিক্রী করিতেন, ইহাতে বহু সময় ও শক্তি ব্যয় হইত। রঙ্গভূমিতে অভিনেত্রীর সমাবেশও তাঁহার মত লোকের পক্ষে সুখকর হয় নাই। নিপুণ নট ও অভিনয়-শিক্ষায় সিদ্ধহস্ত গিরিশচন্দ্রের ক্রমবর্দ্ধমান খ্যাতি-প্রতিপত্তিও ইহার কারণ হইতে পারে। যে কারণেই হউক, তিনি ক্রমশঃ জাতীয় সাহিত্য ও নাট্যাভিনয়

হইতে দূরে সরিয়া পড়েন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এমারেল্ড থিয়েটারে 'রাসলীলা'র অভিনয় হয়, ১২৯৬ জ্যৈষ্ঠের 'অনুসন্ধানে' তাঁহাকে বঙ্গের প্রধান নাটককার বলা হইয়াছে। "কর্ণধারে" রাসলীলার অভিনয়ের প্রতিকূল সমালোচনার জন্য হারাণচন্দ্র রক্ষিতের অসম্মান করা হয়; তারপর রঙ্গালয়ের ডাইরেক্টার "মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসু মহাশয়ে"র চেষ্টায় হারাণবাবুর সম্মান রক্ষা হয়। 'অনুসন্ধানে'র বিশিষ্ট লেখকগণের মধ্যে তাঁহারও নাম ছিল। ১৩১৮ সালের ২১শে মাঘ রবিবার ৮৪ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়; চার দিন পরেই অর্থাৎ ২৫শে মাঘ, বৃহস্পতিবার গিরিশচন্দ্রের মৃত্যু হয়; জীবনের মত মরণেও গিরিশচন্দ্রের মূর্ত্তিতে মনোমোহন ঢাকা পড়িয়া গেলেন।

তখনকার যুগে মনোমোহন বহু বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। নাট্য-সাহিত্যে, নূতন ধরণের উপন্যাসের পরিকল্পনায়, কবিতা-রচনায়, সংবাদপত্র-পরিচালনে, চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ রচনায়,—বহুক্ষেত্রে তাঁহার অধিকারের পরিচয় আছে। তাঁহার দেহ যেমন বিশাল ছিল, চিন্তাজগৎ, সাধনার ক্ষেত্রও ছিল তেমনি বিরাট। আমরা অবশ্য নিত্যনূতন ঘটনার আবর্ত্তে চলিয়াছি. কাল যাঁহাকে সমাদর করিয়াছি আজ তাঁহাকে একেবারে ভুলিয়া যাওয়াও কিছু বিচিত্র নয়, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধে বাংলা সাহিত্য ও সমাজের কথা যাঁহারা আলোচনা করিবেন তাঁহাদের পক্ষে কবি, নাট্যকার, সাংবাদিক ও চিন্তাশীল সাহিত্যিক মনোমোহনের কথা স্মরণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

পল্লীবর্ষা

শ্রীকর্ম্মযোগী রায়

সারা নিখিলের বিরহী বুকের বেদনার রূপ ধরি
আজি আকাশের জলদ-নয়নে জল ওঠে ভরি ভরি!
ওঠে বিষাদের রোল
সবুজ ধানের দুলে-ওঠা শীষে বেদনার কল্লোল!
ব্যথিয়ে উঠেছে ব্যাকুলা পৃথ্বী শ্রাবণ-মেঘের ডাকে
সজল তৃণেরা অশ্রুর জলে আকাশের ছবি আঁকে!
ভাবমন্থর জল ভর-ভর চলে নদী বিরহিণী
সাগর-প্রিয়ের প্রেমে বাজে তার বিরহের শিঞ্জিনী!

অসহ দুঃখে কাঁটা দিয়ে ওঠে কেতকী বধূর হিয়া,
অজানা বন্ধু আসেনি, বাদল কাটাবে সে কারে নিয়া!
অনাদি বিরহী কান্না মিলায় দুঃখী পল্লী সাথে
সারা আকাশেরে করে সে আবিল বেদনার বরষাতে!
আজ শুধু আঁখিজল
মানুষের সাথে ভগবান কাঁদে একসাথে অবিরল!
পূবালী বাতাস বহিয়া চলেছে দীর্ঘনিশাস সম
আকাশ ধরণী ও ডাকে উহারে প্রিয়া আর প্রিয়তম!

স্বাগতা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ত্রিলোচনের আশঙ্কা

শ্যামাচরণ বনবিহারীর আগমনবার্ত্তা জানিত না, কিন্তু সেও একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া ছিল না। ত্রিলোচনের মনে ভয় উৎপাদন করিতে পারিলে কতকটা অপমানের প্রতিশোধ আর অন্য দিকেও কিছু লাভ হইতে পারে। যদি শ্যামাচরণকে স্বীকার করিতে হয় সে যে কাজে নিযুক্ত হইয়াছিল তাহা পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয় নাই তাহা হইলে তাহারও আশঙ্কা, কিন্তু তাহাতে তাহার বিশেষ ভয় হইল না। বনবিহারীকে কোনরূপে জড়াইতে পারিলে ত্রিলোচন তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন।

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া শ্যামাচরণ ত্রিলোচনকে একখানা পত্র লিখিল। কোন কথা স্পষ্ট করিয়া লিখিল না, যদি চিঠি আর কাহারও হাতে পড়ে। সে শুধু লিখিল, যে কাজ করিবার কথা ছিল তাহার কিছু বাকি আছে। অনুমতি হইলে সাক্ষাতে নিবেদন করিবে।

ত্রিলোচন একে ত বনবিহারীর সঙ্কেত-কথায় অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছিলেন তাহার উপর শ্যামাচরণের চিঠি পাইয়া তাঁহার ভাবনার সীমা রহিল না। তিনি নিজের নাম না দিয়া শ্যামাচরণকে পত্রদ্বারা ডাকাইয়া পাঠাইলেন। এদিকে শৈলবালাকে সুবালার বিবাহের জন্য চাপিয়া ধরিলেন। বিলম্ব করিবার সময় ছিল না।

শৈলবালাকে বলিলেন, আপনার ভগিনীর ইচ্ছামত এইবার সুবালা রাণীর বিয়ে দিন।

শৈলবালা বলিলেন, বেশ ত, পাত্র কোথায়?

ফোলা গাল কাঁপাইয়া ত্রিলোচন খানিক হাসিলেন, কহিলেন, পাত্র হাতের গোড়ায়। কার্ত্তিকের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দিন।

প্রস্তাব শৈলবালার ভাল লাগিল না। কিছু নীরস স্বরে কহিলেন, কার্ত্তিক ত বাড়ীর ছেলের মতন; তাকে কিছুতেই জামাই মনে হবে না।

—বাইরে থেকে জামাই আনলে কেমন হবে কে জানে? বড়মানুষের ছেলে হ'লে স্বভাবে কত রকম দোষ হ'তে পারে। আর যেই হোক বিষয় হাতে পেলে ফুটকড়াই করবে। কার্ত্তিক আমার ছেলে ব'লে বলচি নে, ওর স্বভাব-চরিত্র আপনি জানেন, কাজকর্ম্ম শিখেচে, বিষয় সামলাতে পারবে, আর আপনাকে দেখবে। আমার যা-কিছু আছে আর এই সম্পত্তি একসঙ্গে থাকবে, আপনার ভগিনী কি না বুঝে-সুঝে এ বিয়ে ঠিক করেছিলেন?

—তাহ'লে তাঁর পুষ্যিপুত্র নেবার কথা হচ্ছিল কেন?

—ও-সব বাজে কথা। তিনি কখন কাউকে বঞ্চিত করতেন না।

—এ বিয়ে আমার মনে নিচ্চে না।

ত্রিলোচন কথা ফিরাইয়া আর এক দিক দিয়া ধরিলেন, বলিলেন, আপনার ভাবনা হবে ব'লে আর একটা কথা বলি নি। আর কেউ হয়ত এ বিষয়ের দাবি করতে পারে।

—আর কে করবে? তাহ'লে এত দিন করে নি কেন?

—বোধ হয় কাগজপত্র সাক্ষী সাবুদ তৈরি করচে। পাকাপাকি বন্দোবস্ত ক'রে নালিশ করবে।

—তা ন্যায্যমত যদি তার হয় ত নেবে।

শৈলবালা বিশেষ ভয় পাইলেন না দেখিয়া ত্রিলোচন কহিলেন, এখনও বিষয় আপনার হাতে। এখন যত টাকা পাওয়া যায় আপনি মেয়ে-জামাইয়ের নামে লিখে দিতে পারেন, তাতে কেউ হাত দিতে পারবে না। তবু ত আপনি ওদের একটা উপায় করতে পারবেন।

শৈলবালা আইন-কানুনের কি জানেন, ত্রিলোচন

যেমন বুঝান সেই রকম বুঝেন। তিনি বলিলেন, আমি একটু ভেবে আপনাকে বলব।

এই অবসরে শ্যামাচরণ আসিয়া হাজির। ছুটির দরুণ বারিষ্টার-দম্পতী এক সপ্তাহের মতন পাহাড়ে গিয়াছিলেন, শ্যামাচরণও বাড়ি যাইবে বলিয়া ছুটি লইয়াছিল।

কার্ত্তিক অবাক হইয়া দেখিল, শ্যামাচরণের হাতে গুপ্তি নাই, দরোয়ানেরাও তাহার পথ রোধ করিল না। ইহার ভিতর একটা কিছু রহস্য না থাকিয়া যায় না।

ত্রিলোচন শ্যামাচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমাকে যে চিঠি লিখেচ তার মানে কি?

—আপনি আমাদের যা করতে হুকুম করেছিলেন তা ঠিক হয়েচে কি-না আমার সন্দেহ হয়।

—তাহ'লে কি এতগুলা টাকা আমাকে ফাঁকি দিয়ে নিয়েচ?

—আমি জানতাম দু-জনই মরেচে কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে দেখি নি। আর একটা মোটরের শব্দ শুনে আমি তাড়াতাড়ি একটা গাছে উঠি। সেখান থেকে কিছু দেখতে পাই নি। লাফিয়ে পড়তে আমার মাথায় লেগেছিল, মাথার তেমন ঠিক ছিল না। আর একখানা মোটর চলে গেলে পর আমি এসে দেখলাম আমাদের মোটর দাউ দাউ ক'রে জ্বলচে। দেখে আমি চলে গেলাম।

ত্রিলোচনের হৃৎকম্প হইল, শুষ্ক মুখে কহিলেন, তা হ'লে আর কেউ দেখে থাকবে। এ কথা এর আগে আমাকে বল নি কেন?

—আমি ভেবেছিলাম তারা কিছু বুঝতে পারে নি তাই আপনাকে কিছু বলি নি। বনবিহারীর কথার ভাবে বোধ হয় দু-জন মরে নি, এক জন বেঁচে গিয়েচে।

—অ্যাঁ, বনবিহারী? সে ত আমাকে কিছুই বলে নি। সে বললে, আর কারা খোঁজ করচে, তাদের সন্ধান নেবার জন্য আমার কাছ থেকে পাঁচ শো টাকা নিয়েচে।

—আপনি আমার উপর রাগ করছিলেন, কিন্তু বনবিহারীকে চিনতে পারলেন না। অত বড় ধূর্ত্ত আর নেই। টাকার লোভে আপনার নামেও যা-তা বলতে পারে।

—তার নিজের প্রাণের ভয় নেই?

—সেই এক কথা, নইলে তাকে কোন বিশ্বাস নেই।

—বনবিহারী যাদের সন্ধানে গিয়েচে তাদের জান?

—না, তবে আর একটা আশ্চর্য্য কথা জানি।

—কি?

—বনবিহারীকে আপনি টাকা দিচ্ছেন, সেই সব করবে। আমাকে ত অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, আমি কিছু বলব কেন?

—সেও বনবিহারীর পরামর্শে। এই ধর পঞ্চাশ টাকা, তুমি কি জান ঠিক ক'রে বল।

নোট কয়খানা পকেটে পরিয়া শ্যামাচরণ বলিল, মোটরে আমি দু-জনকে নিয়ে যাই, একজন পুরুষ আর একজন মেয়েমানুষ। কলকেতায় সেই মেয়েমানুষের মতন দেখতে ঠিক একজনকে দেখেচি।

ত্রিলোচনের বাক্‌রোধ হইল। তাঁহার ভাঁটার মতন চক্ষু ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিল, ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিল, হস্তদ্বয় থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। শ্যামাচরণ যে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে তাহাও তিনি লক্ষ্য করিলেন না।

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ত্রিলোচন কহিলেন, তোমার দেখতে ভুল হয়ে থাকবে।

—তাই হবে, কিন্তু যমক না হ'লে যে দুজন মানুষ এ রকম অবিকল এক দেখতে হয় তা আমি জানতাম না। আর কেউ হ'তে পারে, কেন-না, তিনি আমার দিকে চেয়ে দেখেও আমাকে চিনতে পারেন নি। তিনি একটা মোটরে ছিলেন, আমার গাড়ী তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল।

ত্রিলোচনের প্রশ্নের উত্তরে শ্যামাচরণ আনুপূর্ব্বিক সকল বৃত্তান্ত বলিল। কোথায় বাড়ি, কাহার বাড়ি, শ্যামাচরণ কি কি জানিতে পারিয়াছিল সব বলিল। শেষে যে কথা বলিল তাহা শুনিয়া ত্রিলোচনের আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল। শ্যামাচরণ কহিল, মোটরে যিনি মারা যান তাঁর হাতে আমি আংটি দেখেছিলাম। কলকেতায় যাকে দেখেচি তিনি বাতাসে মাথার কাপড় সরে গিয়েছিল

ব'লে একবার টেনে দিয়েছিলেন। তাঁর হাতেও দেখলাম সেই আংটী। দু-পাশে দু-খানা হীরা, মাঝখানে একখানা বড় লাল টকটকে চুনি।

গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া ত্রিলোচন অন্ধকার দেখিলেন। অনেক কষ্টে একটু সামলাইয়া কহিলেন, তুমি এখন যাও। আমি দু-চার দিনের মধ্যে কলকেতায় যাচ্ছি, সেখানে গিয়ে তোমাকে ডাকিয়ে পাঠাব।

শ্যামাচরণ চলিয়া গেল। ত্রিলোচন কোঁচার আগা দিয়া মাথার গায়ের ঘাম মুছিতে লাগিলেন।

কার্ত্তিক প্রচ্ছন্ন থাকিয়া দেখিল, শ্যামাচরণ বুক ফুলাইয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল। এবার শ্যামাচরণের সঙ্গ লইতে তাহার সাহস হইল না।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ফোটোগ্রাফ

সুবর্ণপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গঙ্গাধর ও হরিনাথ রাত্রিকালের ঘটনা বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইল। যাহারা বলপূর্ব্বক তাহাদের ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল তাহারা যে সাধারণ ডাকাত নয় সে-সম্বন্ধে তাহাদের কোন সংশয় ছিল না। ডাকাত লুট করিবার লোভে আসে। দুই জন পথিকের কাছে কি এমন অর্থ থাকিতে পারে যাহা গ্রহণ করিবার জন্য এক দল দস্যু আসিবে? তবে তাহারা কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছিল? হরিনাথ ও গঙ্গাধরকে হত্যা করিবার জন্য? দুই জন নিরপরাধী পথিককে হত্যা করিয়া তাহাদের কি লাভ? তাহাদের পিছনে কে আছে? একবার গঙ্গাধরের মনে হইল দেওয়ান ত্রিলোচন এই ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে পারেন, কিন্তু এরূপ সন্দেহ করিবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাইল না। স্বাগতা ও তাহার মৃত সঙ্গীর সঙ্গে সুবর্ণপুরের কোন সম্বন্ধ আছে এরূপ কল্পনা হরিনাথ কিংবা গঙ্গাধরের মনে স্থান পায় নাই। বাকি রহিল বনবিহারী। সে-ই বা কেন কতকগুলা লোক দিয়া হরিনাথ ও গঙ্গাধরকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিবে? বরং তাহাদের সহায়তায় সে কিছু লাভের আশা করে। দুই বন্ধু কিছুই স্থির করিতে পারিল না, কিন্তু কয়েকটা লোক যে তাহাদিগকে বিনা কারণে আক্রমণ করিয়াছিল এ সম্ভাবনা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

ইহার পরেই আর এক গ্রামে ক্ষেত্রনাথ অর্থাৎ গঙ্গাধরের নামে একখানা টেলিগ্রাম আসিল। তাহাতে চালের ও পাটের কথা লেখা থাকিলেও গঙ্গাধর বুঝিতে পারিল বনবিহারী কানাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে। কিছুক্ষণ বিবেচনা করিয়া গঙ্গাধর বলিল, আমাকে একবার কলকেতায় যেতে হবে।

হরিনাথ সাগ্রহে বলিল, বেশ ত, আমরা দুজনেই যাব।

গঙ্গাধর বলিল, না, এবার আমি একাই যাই। দেশে যাব না, কলকেতায় তোমার বাড়িতেও যাব না। কানাইয়ের বাড়ি বনবিহারীর সঙ্গে দেখা ক'রে ফিরে আসব। তারপর তুমি না-হয় দু-চার দিনের জন্য যেও।

হরিনাথ বলিল, স্বাগতাকে একখানা চিঠি দেব নিয়ে যেও আর জবাব নিয়ে এস।

—তা দিও, আমি কানাইকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব।

বনবিহারী যে ঠিকানায় লিখিতে বলিয়াছিল গঙ্গাধর সেখানে একখানা পত্র লিখিল। হরিনাথের সহিত স্থির হইল সে নবাবগঞ্জে গঙ্গাধরের অপেক্ষা করিবে। তিন দিন পরে গঙ্গাধর চলিয়া গেল।

হরিনাথ সেই গ্রামেই আরও তিন চার দিন কাটাইল। কাজের মধ্যে এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায় আর ঘরে বসিয়া স্বাগতার ছবি দেখে। হরিনাথ ইচ্ছা করিলেই গঙ্গাধরের সঙ্গে কলিকাতায় যাইতে পারিত, কিন্তু সে স্থির করিয়াছিল গঙ্গাধরের অমতে কিছু করিবে না। চিত্তকে দমন করিতেই হইবে। যদি স্বাগতার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারা যায়, যদি তাহাকে বিবাহ করিতে কোন বাধা না থাকে তবেই হরিনাথ তাহাকে বিবাহ করিতে পারে। আর এখন স্বাগতার যে অবস্থা তাহাতে বিবাহের মর্ম্ম সে কি বুঝিবে? স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়ের অনুভূতি গিয়াছে, প্রেমের অতৃপ্তি, প্রেমের আকাঙ্ক্ষা সে কেমন করিয়া জানিবে? অনুরাগের আদান-প্রদান না হইলে প্রেম বদ্ধমূল হয় না, স্বাগতার হৃদয়ে সুপ্তির অবস্থা, তাহাতে কি প্রেম জাগরিত হইবে?

স্বাগতা সুন্দরী, কিন্তু সে অসম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ স্মৃতি ও সম্পূর্ণ হৃদয় বিকশিত না হইলে তাহাকে বিবাহ করিয়াও কোন সুখ নাই।

কয়েক দিনের পর হরিনাথ রেলে করিয়া নবাবগঞ্জে চলিল। প্রথম প্রথম তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে চড়িতে তাহার মন সরিত না, তাহার পর গঙ্গাধরের শিক্ষায় আর কোন দ্বিধা হইত না। তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে চড়িল।

সেই গাড়ীতে দেওয়ান ত্রিলোচন জমিদারীর কোন জরুরী কাজে কোথাও যাইতেছিলেন। তিনি ছিলেন সেকেণ্ড ক্লাসে, কার্ত্তিকও তাঁহার সঙ্গে ছিল। গাড়ীতে উঠিবার সময় হরিনাথ তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় নাই।

কার্ত্তিকের তামাক সিগারেট খাওয়া অভ্যাস। বাপের সঙ্গে এক গাড়ীতে থাকিলে সেটা চলে না। একটা ষ্টেশনে নামিয়া কার্ত্তিক তাহার পিতাকে বলিল, আমি একবার পাশের গাড়ীতে যাচ্ছি, এর পরের ষ্টেশনে আসব।

ত্রিলোচন ছেলের বিদ্যা জানিতেন, তিনি আর কিছু বলিলেন না। পাশের একখানা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিতে গিয়া কার্ত্তিক দেখে হরিনাথ বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া কার্ত্তিক বলিল, এই যে, আপনি কোথায় যাচ্চেন?

হরিনাথ বলিল, আমি একবার নবাবগঞ্জে যাচ্চি। তুমি কি এইখানে উঠলে?

—না, না, আমরা সোনাপুর থেকে নদী পার হয়ে গাড়ী ধরেচি। বাবা আছে সেকেণ্ড ক্লাসে, তা সেখানে ত সিগারেট চলবে না, তাই একবার এ গাড়ীতে এলাম।

কার্ত্তিক একটা সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইল। সিগারেট টানিতে টানিতে বলিল, আপনার সঙ্গে সেই যে আর একজন ছিলেন তিনি কোথায়?

—সে আর একটা জায়গায় একটা কাজে গিয়েচে।

হরিনাথ কলিকাতার উল্লেখ করিল না। কার্ত্তিকের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে তাহার চক্ষে কয়লার গুঁড়া পড়িল। হরিনাথ তাড়াতাড়ি পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া চোক মুছিতে লাগিল।

রুমাল টানিয়া বাহির করিতে গিয়া হরিনাথের পকেট হইতে একখানা কাগজ পড়িয়া গিয়াছিল সে তাহা দেখিতে পায় নাই। কার্ত্তিক সেখানা দেখিতে পাইয়া, হরিনাথকে দিবার জন্য তুলিয়া লইল। কাগজের দিকে একবার চাহিয়াই কার্ত্তিক অতিমাত্র বিস্মিত হইল। আবার ভাল করিয়া দেখিল। কাগজখানা স্বাগতার ফোটোগ্রাফ। কার্ত্তিক বিস্ময় গোপন করিবার চেষ্টা না করিয়া কহিল, এ আপনি কোথায় পেলেন?

হরিনাথ রুমাল দিয়া দুই চক্ষু রগড়াইতেছিল, রুমাল সরাইয়া দেখিল কার্ত্তিকের হাতে স্বাগতার ফোটোগ্রাফ! তখন তাহার মনে পড়িল ফোটোগ্রাফখানা ব্যাগে না রাখিয়া পকেটে রাখিয়াছিল। গঙ্গাধর বার-বার সাবধান করিয়া দিলেও সে সাবধান হইতে পারে নাই। কার্ত্তিকের প্রশ্ন শুনিয়া হরিনাথের মনে হইল হয়ত তাহার অসাবধানতা হইতেই কিছু সুফল হইতে পারে। সে বলিল, কেন, একখানা ফোটোগ্রাফ পাওয়া কি বড় শক্ত?

কার্ত্তিক কিছু বেগের সহিত কহিল, সে কথা হচ্চে না। ফোটোগ্রাফ তো যার তার কাছে থাকে। এঁর ফোটোগ্রাফ আপনার কাছে এল কেমন করে?

যে সূতার খেই একবার গঙ্গাধরের হাতে ঠেকিয়াছিল সেটা যেন সড় সড় করিয়া হরিনাথের হাতে চলিয়া আসিতে আরম্ভ হইল। সেবারে শ্যামাচরণের নাম শুনিয়াছিল কার্ত্তিকের প্রসাদে, এবার হয়ত তাহারই মুখ দিয়া আগাগোড়া সব কথাই বাহির হইয়া পড়িবে। হরিনাথ মনের ব্যগ্রতা চাপিয়া, সাবধানে, সহজভাবে জিজ্ঞাসা করিল, ওঁকে কি তুমি চেন?

—চিনিনে? কি বলেন, মশায়? আমাদের দেশে ওঁকে আবার কে না চেনে?

—তুমি কার কথা ভাবচ?

—এতে আবার ভাববার কি কথা আছে? এ ত চৌধুরাণী ঠাকরুণের ছবি। আসুন না, বাবাকে দেখাবেন, তা হলেই বুঝতে পারবেন উনি কে।

—সে পরে হবে, এখন তুমিই সব কথা বল না শুনি। ওঁর নাম কি, আর উনি কে?

—ওর নাম করুণাময়ী চৌধুরাণী, ওঁরই জমিদারী, বাবা ওঁর দেওয়ান ছিল। কিন্তু উনি ত নেই।

—কেন, কি হয়েচে?

—আপনার মনে নেই, আপনাকে সোনাপুরে বলেছিলাম উনি আর ওঁর জ্যাঠামশায় ডুবে মারা যান?

—হাঁ, এখন মনে পড়চে বটে। ওঁর স্বামী আছেন ত?

—কেউ নেই। ছোট মেয়ে বিয়ে হয়েছিল তার পরেই বিধবা। ওঁর জ্যাঠামশায় ওঁকে থান কাপড় পরতে দিতেন না, একেবারে শুধু হাতেও থাকতে দিতেন না।

হরিনাথের ইচ্ছা হইল কার্ত্তিকের সঙ্গে কোলাকুলি করে। মনের আনন্দ কোনমতে চাপিয়া বলিল, অনেক গয়না পরতেন?

—শুধু দু-গাছি চুড়ি আর হাতে একটা আংটী।

—কি রকম আংটী?

—দু-পাশে দু-খানা হীরার মাঝখানে একটা চুনি।

হরিনাথ কষ্টে হৃদয়ের আনন্দ সংবরণ করিল। কার্ত্তিক ফড় ফড় করিয়া সকল কথা বলিয়া ফেলিতেছে, তাহার নিকট হইতে সমস্ত কথা বাহির করা আবশ্যক।

হরিনাথ বলিল, আচ্ছা, কার্ত্তিক বাবু, ওঁরা যে ডুবে মারা যান তা কি ক'রে স্থির হ'ল?

—চিঠি এল, বাবা লোকজন নিয়ে কত খোঁজ করলে, কিছুই পাওয়া গেল না।

—ওঁদের সঙ্গে কি মোটর ছিল?

—না, বাড়ির মোটর নিয়ে যেতে বাবা বারণ করেছিল, দরকার হ'লে তাঁরা ভাড়া করতেন।

—এখন বিষয় কার?

কার্ত্তিক ফোটোগ্রাফের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, এঁর এক বোন আছেন তাঁর।

—তাঁর কে আছে?

—এক মেয়ে।

—বিয়ে হয়েচে?

—না, কথা হচ্চে।

—কোথায়?

কার্ত্তিক এক গাল হাসিয়া কহিল, আমার মা বলেচে আমার সঙ্গে বিয়ে হবে।

হরিনাথ বলিল, বেশ, বেশ, খাসা সুপাত্রে পড়বে।

ফোটোগ্রাফখানি হরিনাথ কার্ত্তিকের হাত হইতে লইল। বলিল, আমার বলতে সাহস হচ্চে না, কিছু টাকা হ'লে তোমার কাজে লাগে?

—টাকা আবার কার কাজে লাগে না?

হরিনাথ পকেট হইতে ছোট থলি বাহির করিয়া একখানা একশো টাকার নোট কার্ত্তিকের হাতে দিল। কার্ত্তিক মনে করিয়াছিল বড়-জোর সন্দেশ খাইবার জন্য দুইটা টাকা দিবে, একশো টাকার নোট দেখিয়া হতভম্ব হইয়া গেল। কহিল, আপনি ত গরিব মানুষ। এত টাকা দিচ্চেন কেন?

—আমি যার কাজ করি সে ত আর গরিব নয়। তোমার হাজার টাকা পাবার কথা, তাও এর পর পাবে।

—বলেন কি, হাজার টাকা? আমি কি করেচি?

—তাও এর পর জানতে পারবে। এখন একটা সিগারেট খাও।

হরিনাথ ব্যাগ খুলিয়া এক টিন উৎকৃষ্ট সিগারেট কার্ত্তিককে দিল। কার্ত্তিক উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিল, এ সিগারেট যে খায় সে আবার গরিব? আপনি কিছু একটা মনে ক'রে এই রকম ক'রে বেড়াচ্চেন।

—তাই হবে। আমি বর্ণচোরা আম। দেখ কার্ত্তিক, তোমাকে একটা কথা বলি। আমাদের এতক্ষণ যে কথা হ'ল সব বাজে।

—তা হ'লে এ নোটখানা আর সিগারেটের টিনও বাজে?

—ওগুলো না হয় কাজের হ'ল। এই ফোটোগ্রাফের কথা বলচি। তুমি যাঁর কথা বলছিলে এটা তাঁর ফোটো নয় তা ত বুঝতেই পারচ।

কার্ত্তিক মাথা চুলকাইতে লাগিল, বলিল, কিন্তু দেখতে ঠিক এক রকম।

—আমারও তাই আশ্চর্য্য মনে হচ্চে। তুমি যাঁর নাম করলে তাঁকে আমি কেমন ক'রে চিনব? আর তিনি ত মারা গেছেন। এ যাঁর ছবি তিনি বেঁচে

আছেন। তুমি যা দেখলে ফশ ক'রে যেন যাকে-তাকে ব'লে বসো না। তুমি দেখে ফেললে ব'লে ত সবাইকে এ ফোটো দেখাতে পারি নে।

—আপনার কেউ হবেন বুঝি? আপনার বউ বুঝি?

হরিনাথের অঙ্গ পুলকাঙ্কিত হইল। মৃদুস্বরে কহিল, হবেন হয়ত। এইবার গাড়ী থেমেচে, তুমি নেমে যাও।

কার্ত্তিক নামিয়া গেল। কোথায় তাহার পা পড়িতেছে তাহা বুঝিতে পারিল না। সব যেন স্বপ্ন, সব যেন মিথ্যা। সে কাহার ছবি দেখিয়াছিল? দুইজন মানুষে কি এমন অদ্ভুত সাদৃশ্য হইতে পারে? এ কি কুহকের মায়া? পকেটে হাত দিয়া দেখিল নোট আর টিন ঠিক আছে। এই দুইটা সত্য আর সব কি মিথ্যা?

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিপদের সূচনা

নবাবগঞ্জে পঁহুছিয়া হরিনাথ প্রথমে ভাবিল তখনই কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবে, আবার বিবেচনা করিল উতলা হইবার কারণ নাই, ধীরেসুস্থে কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে। যে-কারণে গঙ্গাধর আর সে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল সে-উদ্দেশ্য ত সফল হইয়াছে, কিন্তু গঙ্গাধর এ পর্য্যন্ত কিছু জানে না। কার্ত্তিক অকপটে যাহা বলিয়াছিল তাহাতে সমস্ত রহস্য স্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল। স্বাগতা ও করুণাময়ী এক, তাহাকে ষড়যন্ত্র করিয়া দুর্ঘটনার ব্যাপদেশে হত্যা করাইয়া ত্রিলোচন সম্পত্তি হস্তগত করিতে চায়। মোটরের কাণ্ড চাপা দিয়া নৌকাডুবি হইবার অলীক কথা রটাইয়াছে। শ্যামাচরণ ও বনবিহারী হত্যার ব্যাপারে লিপ্ত আছে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গঙ্গাধর যদি বনবিহারীর নিকট হইতে কিছু জানিতে পারে তাহা হইলে ক্ষতি কি? বনবিহারী সত্য কথা বলিবে না, কিন্তু মিথ্যার ভিতর হইতেও কোন সঙ্কেত পাওয়া যাইতে পারে।

কানাইয়ের ঠিকানায় হরিনাথ গঙ্গাধরকে পত্র লিখিল। সে-পত্র আর কাহারও হাতে পড়িলে কিছুই বুঝিতে পারিত না। হরিনাথ খুলিয়া কোন কথা লিখিল না, তথাপি তাহার লেখার ভাবে গঙ্গাধর অনেক কথা অনুমান করিতে পারিল। কেবল স্বাগতার পূর্ব্বপরিচয় সম্বন্ধে হরিনাথ কোন কথা লিখে নাই। সাক্ষাতে গঙ্গাধরকে কোন বিশেষ সংবাদ জানাইবে এইমাত্র ইঙ্গিত ছিল।

গঙ্গাধরের পত্র পাইয়া কলিকাতায় যাইবার পূর্ব্বে বনবিহারী একবার ত্রিলোচনের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল। শ্যামাচরণের সঙ্গে দেখা হইয়া পর্য্যন্ত ত্রিলোচনের মহা আতঙ্ক হইয়াছিল। তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস হইয়াছিল বনবিহারী কোন কথা তাঁহার নিকট হইতে গোপন করিতেছে। বনবিহারী আসিতেই তিনি যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিয়া তাহাকে ভৎর্সনা করিলেন। বনবিহারী তখন রাগ সামলাইল। সে বুঝিল শ্যামাচরণ কোনমতে ত্রিলোচনের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে কিছু বলিয়া থাকিবে। ত্রিলোচন বলিলেন, তুমি আমার কাছ থেকে কাঁড়িকাঁড়ি টাকা নাও আর আমার কাছ থেকে কথা লুকোও?

—কি কথা লুকিয়েচি?

—তুমি বলেচ দুজনের একজন বেঁচে আছে।

—বেঁচে থাকলে কি সে এতদিন চুপ ক'রে থাকত, না আপনি কিছু জানতে পারতেন না?

কথাটা সঙ্গত হইলেও ত্রিলোচন কানে তুলিলেন না। রাগিয়া বলিলেন, তুমি যা পেয়েচ পেয়েচ, আমার কাছ থেকে আর কিছু পাবে না।

—এই আপনার শেষ কথা?

—আবার কি? সেদিন যে পাঁচ শো টাকা নিয়ে গেলে কি হ'ল?

—খবর আপনি শীঘ্র পাবেন। তাদের বাড়ির ঠিকানা পেয়েচি।

—যখন খবর নিয়ে আসবে তখনকার কথা।

কানাইয়ের বাড়িতে গিয়া বনবিহারী দেখিল গঙ্গাধর বসিয়া আছে। কৌতুক করিয়া বলিল, ক্ষেত্রনাথ যে খোদ ব'সে! আদার ব্যাপারী জাহাজেরও খবর রাখে বুঝলে কি-না?

গঙ্গাধর বলিল, আজকাল যে সময় পড়েচে তা রাখতে হয় বইকি!

—চালের কারবার উঠে গেল? আমি তাই ভাবচি, বুঝলে কি-না?

—কে বললে? খুব জোর চলচে। এখন তোমার সঙ্গে যে কথাটা আছে তাই হোক।

কানাই কথায় যোগ দিল না। সে তীব্র নয়নে মাঝে মাঝে বনবিহারীকে দেখিতেছিল।

গঙ্গাধর বলিল, তুমি আমাদের কিছু বল নি, কানাই-বাবুকেও কিছু বল নি।

—শুধু হাতে কি বলতে আছে, বুঝলে কি-না?

গঙ্গাধরের বেশ এখন অন্য রকম। কোটের উপর বুকে চাদর আঁটা। বুকের ভিতরকার পকেট হইতে পকেট-বুক বাহির করিয়া দু-খানা পাঁচ শো টাকার নোট বনবিহারীর সম্মুখে রাখিল।—আমরা যা জানতে চাই বলতে পারলে এ টাকা তুমি এখনই নিয়ে যেতে পার।

কানাই দেখিল বনবিহারীর ছোট চক্ষু লোভে জ্বলিয়া উঠিল, ক্ষুধার সময় বন্য পশু যেমন শুকনো লেহন করে জিহ্বার অগ্রভাগ দিয়া সেইরূপ ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন করিল। বলিল, কারা মোটরে পুড়ে গিয়েছিল তাই জানতে চাও?

—আরও অনেক কথা। এক কথায় কি হাজার টাকা পাওয়া যায়? তোমার মনে পড়ে আমাকে আর আমার সঙ্গীকে বলেছিলে মোটরে এক জন স্ত্রীলোক ছিল?

—তা হ'তে পারে। সব কথা কি মনে থাকে, বুঝলে কি-না?

—ক'জন লোক ছিল?

—তা আমি ঠিক বলতে পারি নে। সে স্ত্রীলোকটি নাকি রক্ষে পায়। আমার কতক শোনা কথা, বুঝলে কি-না?

—সে স্ত্রীলোককে তুমি দেখেচ?

—দু-একবার অমনি দেখে থাকব। বড়ঘরের মেয়ে, ভাল ক'রে কেমন ক'রে দেখব, বুঝলে কি-না?

—কোন্ ঘরের মেয়ে? কোন্ গ্রামে বাড়ি?

বনবিহারী মুস্কিলে পড়িল। যদি সত্য কথা বলিয়া ফেলে তাহা হইলে ত্রিলোচনকে হাতছাড়া করিতে হয়, আবার নৌকা ডুবিয়া যাওয়া যে মিথ্যা কথা তাহাই বা সে কেমন করিয়া প্রমাণ করিবে? অপর পক্ষে, এই যে হাজার টাকা বনবিহারীর সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে ইহাও যে সহজে পাওয়া যাইবে তাহার কোন আশা নাই। পূরা প্রমাণ না পাইলে ইহারা টাকা দিবে না। বনবিহারী একটু ইতস্তত: করিয়া বলিল, বসীরহাটে এক ঘর জমিদার আছে তাদের বউ।

—সে ত সহজেই জানতে পারা যাবে। যদি রক্ষে পেয়ে থাকে তাহ'লে সে স্ত্রীলোকটি কোথায় আছে বলতে পার?

—নিজের বাড়ি ফিরে গিয়ে থাকবে। বুঝলে কি-না?

—তাহ'লে আর খোঁজ করবার আবশ্যক কি? আমরাই বা কাউকে টাকা দিতে গেলাম কেন?

—কোথায় আছে তা আমি বলতে পারলাম না। সে যে বেঁচে আছে ওটা আমার শোনা কথা, বুঝলে কি-না?

—আচ্ছা, শ্যামাচরণকে তুমি ত চেন, একবার তাকে বিলক্ষণ প্রহারও দিয়েছিলে। যে মোটরখানা পুড়ে যায় সেটা কি শ্যামাচরণ চালাচ্ছিল?

—কে বললে? তাহ'লে সে সব কথা বলত। যে মোটর চালাচ্ছিল সেও বোধ হয় পুড়ে মরেচে। বুঝলে কি-না?

—তা ত মনে হয় না। এখানা চিনতে পার?

গঙ্গাধর সেই ময়লা মোটা রুমালখানা বাহির করিয়া বনবিহারীকে দেখাইল। রুমালের কোণে চিহ্ন দেখাইল। বলিল, যে মোটর চালাচ্ছিল তার এই রুমাল। সে পুড়ে মরে নি, মোটর থেকে পালিয়েছিল, তাড়াতাড়িতে এই রুমালখানা ফেলে গিয়েছিল।

বনবিহারীর মনে বড় ভয় হইল। ইহারা বড় সহজ লোক নয়, সন্ধান করিয়া নিশ্চয় কিছু জানিতে পারিয়াছে। টাকার লোভে শেষে কি বনবিহারী নিজের পা ফাঁদে দিবে? তাহার এখানে আসাই ভুল হইয়াছিল। সে বলিল, শ্যামাচরণের কথা আমি কিছু জানি নে। আমি এখন চললাম।

—অত ব্যস্ত কেন? আর একটা কথা আছে। সোনাপুরে রাত্রে কতকগুলা লোক আমাদের দরজা ভেঙে আমাদের ঘরে ঢুকেছিল, জান?

বনবিহারী যেন আকাশ হইতে পড়িল। অত্যন্ত বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিল, আমি কেমন ক'রে জানব? তোমাদের সঙ্গে দেখা হবার পরেই ত আমি চলে গেলাম, তার পর আর আমি সোনাপুর যাই নি। সত্যি বলচি, বুঝলে কি-না?

গঙ্গাধর বলিল, জন-দশ বার লোক ছিল তাদের দু-তিন জনের একটু লেগেছিল, না পালালে আরও লাগত। যে কাজে আমরা হাত দিয়েচি তাতে কিছু ভয় আছে আমরা জানি। কিন্তু যারা আমাদের সঙ্গে লাগবে তাদেরও ভয় আছে সেই কথাটা তোমাকে জানিয়ে রাখচি।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কামিনী

গ্রামের রাত্রি শহরের অপেক্ষা অধিক অন্ধকার, কারণ পথে আলোক নাই, বেশী দোকান-পসার নাই, থিয়েটার সিনেমা নাই, চৌরাস্তায় লোকের জনতা নাই। সন্ধ্যা হইলেই যে যাহার গৃহে প্রবেশ করে, চারিদিকে সাড়াশব্দ থাকে না, অল্প রাত্রেই নিশুতি হয়। জাগিয়া থাকে নিশাচর পশুপক্ষী, থাকিয়া থাকিয়া শৃগালের কোলাহল, বৃক্ষপত্রে বাদুড়ের পক্ষধুনন, গৃহের প্রাচীরে অথবা বৃক্ষশাখায় পেচকের কর্কশ রব, কখন কখন গ্রামের কুক্কুরের ডাক। কোথাও বাঁশবন, চারিদিকে নিসিন্দা, বাগভেরেণ্ডা, আশস্যাওড়ার জঙ্গল, আর স্থানে স্থানে উন্নতশীর্ষ, ছায়াবহুল অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি তরুরাজ।

স্বর্ণপুরের এক পাশে একখানি ছোট, মেটে, খটখটে বাড়ি। দিনের বেলা হইলে দেখা যাইত ঘরের বাহিরে দেয়ালে গৈরিক ও সিন্দূর দিয়া ঠাকুর-দেবতার দু-চারখানা ছবি আঁকা আছে। বাড়ির সম্মুখে ছোট বাগান, তাহাতে ফুলগাছ, লাউ কুমড়া লতা। রাত্রি প্রায় দশটা হইবে এমন সময় বাহির হইতে কে সাবধানে দরজার শিকল নাড়িল। ভিতর হইতে নারীকণ্ঠে অমনি কে বলিল কেও?

যে শিকল নাড়িয়াছিল সে চাপা গলায় উত্তর দিল, দোর খুললেই চিনতে পারবে।

ভিতর হইতে উত্তর আসিল, রোসো, পিদ্দীম জ্বালি।

প্রদীপ জ্বালিয়া রমণী দরজার হুড়কা খুলিল। দরজা ঠেলিয়া ত্রিলোচন ঘরে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিলেন। স্ত্রীলোকের বয়স চল্লিশ বৎসর হইবে, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মুখ সুশ্রী, আয়ত আকৃতি। প্রথম যৌবনে হয়ত তন্বঙ্গী ছিল, কিন্তু এখন দেহ কিছু স্থূল। ত্রিলোচনকে দেখিয়া বলিল, কি ভাগ্যি! আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম! এদিকে আজ যে বড় পথ ভুলে এসেচ?

ঘরে তক্তপোষে বিছানা পাতা ছিল, ত্রিলোচন তাহার উপর উপবেশন করিয়া কহিলেন, একটা কাজে এসেচি। তোমাকে ত ভুলি নি, কিন্তু এখন বয়স হ'তে চলল, ছেলেমেয়ে বড় হয়েচে, গ্রামেও একটু মানসম্ভ্রম হয়েছে, কাজেই একটু সাবধানে থাকতে হয়।

রমণী চোক ঘুরাইয়া বলিল, অত কথা না ব'লে পষ্ট ক'রে কেন বল না আমি বুড়ো হয়েচি তাই আর মনে ধরে না।

—বুড়ো আবার কোন্ খানটা হ'লে? দেখ, কামিনী, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে, সে কাজ আর কাউকে দিয়ে হবে না, আর তোমাকে আমি যতটা বিশ্বাস করি আর কাউকে তত করি নে।

কামিনী বলিল, সে আমার ভাগ্যি! আমাকে দিয়ে আবার কি কাজ হবে, আমি কি তোমাদের জমিদারীর কিছু বুঝি?

—সে কাজের জন্য অনেক লোক আছে, আর সে মেয়েমানুষের কাজ নয়। এ কাজ তোমাকে ছাড়া আর কাউকে দিয়ে হবে না, আর তোমাকে দিয়ে কোন কথা প্রকাশ হবে না তাও আমি জানি।

কামিনীর কৌতূহল হইল, বলিল, কাজটা কি শুনি।

—আমার কাছে বসো, বলচি।

কামিনী ত্রিলোচনের পাশে বসিল। ত্রিলোচন

তাহার হাতের উপর হাত রাখিয়া বলিলেন, তোমাকে একবার কলকেতায় যেতে হবে।

কামিনী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, কলকেতায় আমি কি করতে যাব? সেখানে আমি কোথায় থাকব?

—সে ব্যবস্থা আমি করব। আমিও যাব।

তাহার পর ত্রিলোচন মৃদুস্বরে কামিনীর কানে কানে অনেক কথা বলিলেন। সকল কথা শুনিয়া কামিনী কহিল, বেশ ত, আমি কালই যাব।

—আমিও সেই গাড়ীতে যাব। কলকেতায় তোমার জন্য বাসা ঠিক করা আছে, আমি আর এক জায়গায় থাকব, কিন্তু তোমার সঙ্গে সর্ব্বদা দেখা হবে। এখন এই পথখরচের ত্রিশ টাকা নাও, কলকেতায় আরও টাকা দেব।

ত্রিলোচন উঠিলেন, কামিনী তাঁহার হাত ধরিয়া বলিল, আর একটু বসবে না?

—না, এখন যাই, রাত হয়েচে। আমায় না দেখতে পেলে বাড়িতে খোঁজ করবে।

কামিনী মুখ বাঁকা করিয়া, লোল কটাক্ষ হানিয়া কহিল, এর আগে ত খোঁজ পড়ত না। এখন যে দেওয়ানজী!

ক্রমশঃ

পথহারা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন দে

উচ্ছল যৌবন-সিন্ধু কোন্‌পথে ডাকিছে আমারে
দিয়ে হাতছানি,
কা'র তরে যাত্রা মম কেন সে গো ডাকে বারে বারে
নাহি তাহা জানি।
কালবৈশাখীর রাতে যৌবনের জয়ধ্বজা তুলি
দুরূহ দুর্গম পথে যাত্রা মম ঝঞ্ঝাবাত ভুলি
সম্মুখে দুস্তর সিন্ধু পশ্চাতে ভীষণ অরণ্যানী
শ্বসিছে কেবল—
অগ্নিপরীক্ষার মাঝে কে তুমি একাকী মোরে আনি
কেড়ে নিলে বল!

চারিদিকে কুজ্ঝটিকা চক্ষে লাগে প্রহেলিকা সম
নিস্পন্দ তিমির,
ভৈরবের নৃত্যছন্দে কি পুলকে নাচে প্রাণ মম
অশ্রান্ত অস্থির।
পরিপূর্ণ জীবনের আস্বাদন পেতে চাও আজ
নিঃশেষে শুষিয়া লবে যৌবনের বর্ণ-গন্ধ-সাজ
প্রণয়ের শতদল না ফুটিতে ছিন্নভিন্ন করি
লুটাবে ধরায়?—
অগ্নিদেব সাক্ষী করি তব মন্ত্র লইয়াছি বরি
জীবন-উষায়!

যে পথে চলিতেছিনু সেই পথ ভুলায়েছ মোরে
পরীক্ষার তরে,
বরণ করেছ মোরে অমারাতে রক্তজবা ডোরে
অর্ঘ্যডালা ভরে।
নিমেষে উত্তাল হয়ে যেই সিন্ধু পদতলে লোটে
তাহারি আবর্ত্তমাঝে মৃত্যু মম পুষ্প হয়ে ফোটে
নিমেষে আমার চক্ষে অসুন্দর সুন্দরের বেশে
রূপ ধরে আসে,
অশিব সে শিব হয়ে উন্মাদিনী রূপে এলোকেশে
সিন্ধুমাঝে ভাসে।

রক্তচন্দনের ফোঁটা পরায়েছ তুমি মোর ভালে
মুছেছ ম্লানিমা,
দিয়েছ যে জয়টীকা মুছিবে না তাহা কোনোকালে
নব-অরুণিমা।
পথভ্রান্ত করি মোরে সন্ন্যাসীর বেশ দিলে ধরি
অনিমেষ নেত্রে আমি তব দান লইনু যে বরি
দুর্য্যোগ করেছি সাথী—কালরাত্রে যাই অভিসারে
প্রণয়িনী-কাছে—
পথভ্রান্ত যাত্রী আমি চলিয়াছি কোন্‌ পারাবারে
উদার আকাশে।

গীতা

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

১৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, সংসারত্যাগ না করিয়াও সংন্যাসীর লভ্য সর্ব্বভূতে সমবুদ্ধি, শান্তি ও ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করা যায়; সর্ব্বভূতহিতে রত থাকিয়াও ঋষিরা ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন, যতি ও মুনিগণ নিজ নিজ সাধনার দ্বারাই ব্রহ্মপদ লাভ করেন। ব্রহ্মলাভের জন্য সংন্যাসই একমাত্র উপায় নহে এবং কর্ম্মত্যাগে বিশেষ কোনও সার্থকতা নাই। ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ পাতঞ্জল যোগের অবতারণা করিয়া বলিতেছেন যে, এই উপায়েও ব্রহ্মলাভ হয়।

৬।১-২—শ্রীভগবান বলিলেন, "যিনি কর্ম্মফলের উপর নির্ভর না করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন তিনিই সংন্যাসী, তিনিই যোগী। অগ্নিহোত্রাদি বর্জ্জন করিলেই এবং নিষ্ক্রিয় থাকিলেই সংন্যাসী বা যোগী হয় না। হে পাণ্ডব, সংন্যাস ও যোগকে এক বলিয়াই জানিবে, কারণ যাঁহার কর্ম্মে ফলপ্রাপ্তির আশা ত্যাগ হয় নাই তাঁহাকে কখনও যোগী বলা যায় না।"

'নিরগ্নি' কথার অর্থ যিনি অগ্নি রক্ষা করেন না। পূর্ব্বকালে গৃহস্থের পক্ষে অগ্নিরক্ষা করা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। সংসারত্যাগী সংন্যাসীরা অগ্নি রাখিতেন না।

এই দুই শ্লোকে যোগী কথায় পাতঞ্জলযোগী বুঝাইতেছে। পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহ বিচার করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, এই অধ্যায়ে পাতঞ্জল যোগ বিবৃত হইয়াছে। পাতঞ্জলযোগ কর্ম্মযোগেরই অন্তর্গত।

৬।৩—"পাতঞ্জল যোগমার্গ অবলম্বনে ইচ্ছুক মননশীল ব্যক্তির 'আরুরুক্ষু' অবস্থায় কর্ম্মই সাধনা এবং 'যোগারূঢ়' অবস্থায় শম অর্থাৎ মননিগ্রহই সাধনার উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে।"

শঙ্করাচার্য্য এই শ্লোকে শম কথার অর্থ 'উপশম' অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার মতে 'যোগারূঢ়' সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন। তিলক বলেন, "পূর্ব্বার্দ্ধে 'শম' এর কারণ কর্ম্ম কখন হয় তাহা বলিয়া উত্তরার্দ্ধে ইহার বিপরীত বর্ণিত হইয়াছে যে, কর্ম্মের কারণ 'শম' কখন হয়। ভগবান বলিতেছেন যে, প্রথম সাধনাবস্থাতে 'কর্ম্মই' শমের অর্থাৎ যোগসিদ্ধির কারণ। ভাব এই যে যথাশক্তি নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতেই চিত্ত শান্ত হইয়া উহা দ্বারাই শেষে পূর্ণ যোগ সিদ্ধি হয়। কিন্তু যোগী যোগারূঢ় হইয়া সিদ্ধাবস্থাতে পৌছিলে পর কর্ম্ম ও শমের উক্ত কার্য্যকারণ ভাব বদলাইয়া যায় অর্থাৎ কর্ম্ম শমের কারণ হয় না, কিন্তু শমই কর্ম্মের কারণ হইয়া যায়, অর্থাৎ যোগারূঢ় পুরুষ নিজের সমস্ত কার্য্য এক্ষণে কর্ত্তব্য বুঝিয়া ফলের আশা না রাখিয়া, শান্তচিত্তে করিয়া যান। সার কথা, এই শ্লোকের ভাবার্থ ইহা নহে যে, সিদ্ধাবস্থায় কর্ম্ম দূর হয়। গীতায় কোথাও উক্ত হয় নাই, যে কর্ম্মযোগীর শেষে কর্ম্ম ছাড়িয়া দিতে হইবে, এবং এরূপ বলিবার উদ্দেশ্যও নাই। অতএব অবসর পাইয়া কোন প্রকারে গীতার মধ্যস্থিত কোনও শ্লোকেরই সংন্যাসমূলক অর্থ লাগানো উচিত নহে।"

এই শ্লোকের 'শম' ও যোগারূঢ় কথা দুইটির অর্থ লইয়াই যত মতভেদ। 'শম' কথার অর্থ শঙ্কর-মতে

শ্রীভগবানুবাচ—

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নি র্নচাক্রিয়ঃ॥ ১

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
নহ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥ ২

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥ ৩

'উপশম' বা কর্ম্মনিবৃত্তি, তিলকের মতে 'যোগসিদ্ধি'। শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ে পাতঞ্জল যোগের অবতারণা করিয়াছেন, অতএব পাতঞ্জল যোগ শাস্ত্রেই এই দুই শব্দের যথার্থ অর্থ পাওয়া যাইবে। পাতঞ্জল সূত্রের ভাষ্যকার ও টীকাকারদের মতে যোগসিদ্ধিকামী সাধকদিগকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—(১) আরুরুক্ষু, (২) যুঞ্জান এবং (৩) যোগারূঢ়। 'আরুরুক্ষু' সাধক যোগমার্গ অবলম্বনে ইচ্ছুক হইয়া সাধনার নিম্নস্তরে আছেন; ধ্যান ও সমাধির জন্য তিনি চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু এ সকল তাঁহার আয়ত্তে এখনও আসে নাই। 'যুঞ্জান' সাধক মধ্যমাধিকারী; তিনি মোক্ষকামী হইয়া যোগসাধনার দ্বারা ভগবানে মনোনিবেশের চেষ্টা করিতেছেন। 'যোগারূঢ়' সাধকেরা উচ্চাধিকারী। পূর্ব্বজন্মেই তাঁহাদের যৌগিক সাধনাগুলি আয়ত্ত থাকায় তাঁহারা একেবারেই সর্ব্বোচ্চ সাধনায় রত হইতে পারেন। (মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গঙ্গানাথ ঝা প্রণীত ইংরেজী যোগদর্শনের উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য।) গীতায় যোগ মার্গের সাধকদিগকে উচ্চ ও নিম্ন অধিকার হিসাবে মাত্র দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। গীতোক্ত 'আরুরুক্ষু', 'যোগারূঢ়' এই দুইটি শব্দ পারিভাষিক শব্দ এবং যথাক্রমে নিম্ন ও উচ্চাধিকারী সাধক বুঝাইতেছে। 'যোগারূঢ়' মানে যোগসিদ্ধ নহে। যোগারূঢ়ের সিদ্ধাবস্থাপ্রাপ্তির চেষ্টা আছে কিন্তু তিনি পূর্ণ সাফল্য লাভ করেন নাই সে জন্য এখনও তাঁহার সাধনার আবশ্যকতা আছে। গীতায় যোগসিদ্ধকে 'যুক্ত' বলা হইয়াছে (৬।৮)। পাতঞ্জল শাস্ত্রে অধিকারভেদে তিন প্রকার সাধকের ভিন্ন ভিন্ন সাধনার উল্লেখ আছে। নিম্নাধিকারী অর্থাৎ আরুরুক্ষুর সাধনা পাতঞ্জল সূত্রের দ্বিতীয় পাদের ২৯ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। যথা—(১) যম, (২) নিয়ম, (৩) আসন, (৪) প্রাণায়াম, (৫) প্রত্যাহার, (৬) ধারণা, (৭) ধ্যান ও (৮) সমাধি। প্রথমাবস্থার মূল সাধনাগুলি প্রধানত কর্ম্মময়, এই জন্যই গীতায় বলা হইল 'আরুরুক্ষুর' কর্ম্মই সাধনা। পাতঞ্জল সূত্রের দ্বিতীয় পাদের প্রথম সূত্রে 'যুঞ্জান' সাধকের অর্থাৎ মধ্যমাধিকারীর সাধনা উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ অর্থাৎ তপ, অধ্যয়ন ও ঈশ্বরপ্রণিধানরূপ ক্রিয়াই মধ্যমাধিকারী যোগাবলম্বীর সাধনা। অতএব যোগশাস্ত্রেও নিম্ন ও মধ্যমাধিকারীর সাধনাকে কর্ম্মপ্রধান বলা হইয়াছে। গীতায় আরুরুক্ষু শব্দে এই দুই প্রকার সাধকই বুঝাইতেছে। ব্রহ্মজ্ঞানকে দূরস্থ গন্তব্যস্থান ও পাতঞ্জলযোগকে অশ্বের সহিত তুলনা করিলে বলা যায় যে, 'আরুরুক্ষু' সাধক ব্রহ্মপুরে যাইবার অভিলাষে অশ্বারোহণে ইচ্ছুক হইয়াছেন মাত্র, এখনও তিনি অশ্ব সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই; 'যুঞ্জান' সাধক অশ্ব সংগ্রহ করিয়াছেন অর্থাৎ অশ্বযুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু এখনও অশ্বারোহণে সক্ষম হন নাই, 'যোগারূঢ়' সাধক অশ্বে আরোহণ করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু এখনও তিনি ব্রহ্মপুরে পৌছান নাই। 'যুক্ত' সাধক ব্রহ্মপুরে পৌছিয়া ব্রহ্মের সহিত যুক্ত বা মিলিত হইয়াছেন। যোগারূঢ়ের সাধনা পাতঞ্জলসূত্রের প্রথম পাদে ১২ হইতে ১৬ সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা সমুদয় চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। চিত্তস্থৈর্য্যের জন্য যত্নের নাম 'অভ্যাস', বহুকাল শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত হইলে এই অভ্যাস দৃঢ় হয়। দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ে নিস্পৃহতার নাম বশীকার বৈরাগ্য; ইহা হইতে পর-বৈরাগ্য বা প্রকৃতির গুণত্রয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা আসে; ইহাই যোগের অসাধারণ উপকরণ। পাতঞ্জল শাস্ত্রে ১।৩৩ হইতে ৩৯ সূত্রে চিত্তস্থৈর্য্যের জন্য উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা অর্থাৎ পরের সুখ, দুঃখ, পুণ্য ও পাপে যথাক্রমে সুখী, দয়ালু, আনন্দিত ও উদাসীন হইবার চেষ্টা, প্রাণায়াম, শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে ধারণা ও ধ্যান দ্বারা অতীন্দ্রিয় বিষয়ানুভূতির চেষ্টা, ধ্যান দ্বারা বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী নামক শান্তিপূর্ণ আনন্দময় অবস্থা প্রাপ্তির চেষ্টা, অপর বৈরাগ্যযুক্ত ব্যক্তির মানসিক অবস্থা কল্পনা ও ধ্যান, স্বপ্নাবস্থা বা নিদ্রাবস্থার ধ্যান অথবা যে-কোন প্রিয়বস্তুর ধ্যান। এই সমস্ত উপায় দ্বারা চিত্তস্থৈর্য্য আয়ত্ত হয়। চিত্তস্থৈর্য্যই যোগারূঢ়ের সাধনা, এজন্য গীতায় 'শম' অর্থাৎ মনের স্থিরতাকে যোগারূঢ়ের সাধনা বলা হইয়াছে। 'শম' মানে উপশম বা কর্ম্মনিবৃত্তি বা যোগসিদ্ধি নহে। গীতায় ৬।৩ শ্লোক ব্যতীত ১০।৪, ১১।২৪ ও ১৮।৪২ শ্লোকে শম কথার উল্লেখ আছে; শঙ্করও এই সকল শ্লোকে

শমের অর্থ অন্তরিন্দ্রিয়ের উপশম বা মনের স্থিরতা বলিয়াছেন।

৬।৪—"যখন সাধকের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহে আসক্তি থাকে না অর্থাৎ যখন জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়ই সংযমিত হইয়াছে তখন সেই সর্ব্বসঙ্কল্প পরিত্যাগী ব্যক্তিকে যোগারূঢ় বলা যায়।" যোগারূঢ় অবস্থা সিদ্ধাবস্থায় বা মুক্তাবস্থায় পৌঁছিবার সোপানমাত্র; এইঅবস্থায় পৌছিয়াও সাধনার আবশ্যক। এইজন্যই পরবর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ের অবতারণা।

৬।৫-৬—"আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু অতএব আত্মার দ্বারা আত্মাকে উন্নত করিবে, আত্মাকে পতিত হইতে দিবে না। আত্মাকর্তৃক আত্মা জিত হইলে সেই আত্মা আত্মার বন্ধু হয়। অনাত্মের আত্মা অর্থাৎ অজিত আত্মা শত্রুবৎ ব্যবহার করে।" এই দুই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, যোগারূঢ় ব্যক্তি শমাদি সাধনার দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিবেন অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক সুখ-দুঃখে এবং সর্ব্ববিধ সংসারকর্ম্মে আত্মা নির্লিপ্ত আছেন এই অনুভূতি ও তত্ত্বজ্ঞান লাভের চেষ্টা করিবেন। আত্মজ্ঞান জন্মিলে সিদ্ধাবস্থা বা মুক্তি হয়। পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে।

৬।৭-৯—"জিতাত্মা অর্থাৎ যিনি আত্মাকে বিষয় বন্ধন হইতে মুক্ত বা নির্লিপ্ত করিয়াছেন, প্রশান্তচিত্ত অর্থাৎ যাঁহার মনোবৃত্তি নিরুদ্ধ বা স্থির হইয়াছে, এইরূপ ব্যক্তির আত্মাই পরমাত্মারূপে প্রকাশ পায় এবং সেই পরমাত্মা শীত-গ্রীষ্মাদিরূপ শারীরিক দ্বন্দ্ব ও মান-অপমান রূপ মানসিক দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও সমাহিত বা নির্ব্বিকার থাকে। এই প্রকার অনুভূতি ও তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যাঁহার আত্মা তৃপ্ত হইয়াছে এবং যিনি কূটস্থ, বিজিতেন্দ্রিয়, লোষ্ট্র প্রস্তর কাঞ্চনে সমদর্শী সেইরূপ যোগীকে যুক্ত বলা যায়। তিনি সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, অপ্রিয় ব্যক্তি, প্রিয় ব্যক্তি, সাধু ও পাপীতে সমবুদ্ধি বা সমদর্শী বলিয়া খ্যাত হন।" সংসারত্যাগী সংন্যাসীরাই সাধারণত সমবুদ্ধিযুক্ত বা সমদর্শী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন; সংন্যাস লাভের পরই সমদৃষ্টির কথা পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে সংন্যাস মার্গের আলোচনায় ৫।১৮ শ্লোকে ও পরে ৫।২৮-২৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চম অধ্যায়ে বলিয়াছেন, কর্ম্মীরও সমবুদ্ধি লাভ হয়, এখানে বলিতেছেন, পাতঞ্জল যোগীও ভগবানে যুক্ত হইলে সমবুদ্ধি প্রাপ্ত হন। সুহৃৎ, মিত্র ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা মনুষ্যসমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত যত প্রকার সম্পর্ক হইতে পারে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। সুহৃৎ অর্থে অন্তরঙ্গ সখা, যিনি হিতৈষী তাঁহাকে মিত্র বলা হয়। যাঁহার সহিত শত্রুতা বা মিত্রতা কোন সম্বন্ধই নাই তিনি উদাসীন, যিনি স্বপক্ষ বিপক্ষ উভয়ের কল্যাণকামী তিনি মধ্যস্থ, যাঁহাকে ভাল লাগে না তিনি দ্বেষ্য ও প্রিয়ব্যক্তি বন্ধু নামে অভিহিত হন। ৬।৮ শ্লোকের বিজিতেন্দ্রিয় শব্দের অর্থ যিনি ইন্দ্রিয় সংযম করিয়াছেন অর্থাৎ যাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয় প্রতি ধাবিত হয় না। এই শ্লোকের কূটস্থ শব্দের অর্থ লইয়া মতভেদ আছে। "কূট শব্দের আভিধানিক অর্থ গিরিশৃঙ্গ, নিশ্চল লৌহকীলক বা 'ধুর' যাহা আবর্ত্তিত হয় না; গুপ্ত। কূটস্থ (১) উচ্চে অবস্থিত, অতএব অন্যের সহিত নিঃসম্পর্ক, isolated, উচ্চ স্থান হইতে সর্ব্বদিক যুগপৎ অবলোকনশীল-'সর্ব্বসাধারণ জ্ঞানৈকাকারাত্মনিস্থিতঃ; (রামানুজ) (২) স্থাণু, অপ্রকম্প (শঙ্কর)। (৩) নির্ব্বিকার (শ্রীধর) (৪) লুক্কায়িত, গুহাহিত, সাধারণের অবোধ্য, mysterious।" (রাজশেখর) কূট শব্দের আরও অর্থ আছে, যথা—ছল ও গৃহ। কূট শব্দ হইতে কূটী, যথা—

যদাহি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥ ৪
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মান মবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈবরিপুরাত্মনঃ॥ ৫
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥ ৬

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥ ৭
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ॥ ৮
সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীন মধ্যস্থ দ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপিচ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে॥ ৯

মূলগন্ধকুটী বিহার, কূটস্থ যিনি মায়ার দ্বারা বা ছলনার দ্বারা বদ্ধ, অথবা যিনি গৃহে বা দেহে অবস্থিত অর্থাৎ জীবাত্মা। গীতার ১৫।১৬ শ্লোকে অক্ষর বা অবিনাশী আত্মাকে কূটস্থ বলা হইয়াছে। পরমাত্মার যে অবিকারী অংশ জীবত্মাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে পঞ্চদশী নামক পরবর্ত্তী বেদান্তশাস্ত্রে তাহাকেও কূটস্থ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। গীতার ৬।৮ শ্লোকে কূটস্থ শব্দ যোগীর বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় অবিচলিত, অপ্রকম্প, নির্লিপ্ত ইত্যাদি অর্থই সঙ্গত। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা শব্দের অর্থ যাঁহার আত্মা অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ যুক্তিবিচারসিদ্ধ জ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত হইয়া সংসার প্রতি ধাবমান হয় না। তৃতীয় অধ্যায়ের ৪১ শ্লোকে জ্ঞান বিজ্ঞান শব্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

রামমোহন রায় বলেন, "যোগারূঢ় তিন প্রকার হয়েন। প্রথম (যদাহি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ইত্যাদি ৬।৪) যেকালে সকল সঙ্কল্পকে মনুষ্য ত্যাগ করে, অতএব ইন্দ্রিয়বিষয়-সকলে ও কর্ম্মে আসক্ত না হয় সেকালে তাহাকে যোগারূঢ় কহা যায়। এ প্রকার ব্যক্তি কনিষ্ঠ যোগারূঢ় হয়েন।··· পরে গীতাতে পূর্ব্ব হইতে শ্রেষ্ঠ যোগারূঢ়ের লক্ষণ কহিতেছেন। (জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা ইত্যাদি ৬।৮) অর্থাৎ গুরূপদেশ জ্ঞান ও পরোক্ষানুভব ইহার দ্বারা তাঁহার অন্তঃকরণ তৃপ্ত হইয়াছে, অতএব নির্ব্বিকার ও বিশেষরূপে ইন্দ্রিয়জয় বিশিষ্ট হয়েন এবং মৃত্তিকা পাষাণ ও স্বর্ণ ইহাতে সমান দৃষ্টি তাঁহার হয়, তাঁহাকে যুক্ত যোগারূঢ় কহি। যুক্ত যোগারূঢ়কে পূর্ব্বোক্ত যোগারূঢ় হইতে উত্তম কহিলেন যেহেতু আত্মজ্ঞানে সম্পূর্ণ তৃপ্তি ও নির্ব্বিকার ভাব ও বিশেষরূপে ইন্দ্রিয় জয় ও পাষাণ ও সুবর্ণে সমভাব এ সকল বিশেষণ কনিষ্ঠ যোগারূঢ়ে নাই, এ নিমিত্ত তেঁহো যুক্ত যোগারূঢ়ের তুল্য গণিত হয়েন না। পরে মধ্যম যোগারূঢ় হইতেও শ্রেষ্ঠের লক্ষণ কহিতেছেন (সুহৃন্মিত্রা ইত্যাদি ৬।৯) অর্থাৎ স্বভাবত যিনি হিতাকাঙ্ক্ষী ও স্নেহবশে যিনি উপকারী হয়েন ও বৈরী ও উদাসীন এবং মধ্যস্থ ও দ্বেষের পাত্র ও সম্পর্কীয় ও সদাচার ব্যক্তি ও পাপী এ সকলে সমান বুদ্ধি যাঁহার তিনি সর্ব্বোত্তম যোগারূঢ় হয়েন। যেহেতু এ সকল লক্ষণ না মধ্যমে না কনিষ্ঠ যোগারূঢ়ে প্রাপ্ত হয়।" (রামমোহন রায় গ্রন্থাবলী ২৯৩-২৯৪)। শঙ্কর-প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ তিন প্রকার যোগারূঢ়ের উল্লেখ না করিলেও ৬।৯ শ্লোকের বিশিষ্যতে শব্দের সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম এই অর্থ ধরিয়া যোগারূঢ়ের শ্রেণিবিভাগ স্বীকার করিয়াছেন। রামমোহন রায় ৬।১ শ্লোকে যুক্ত শব্দকে মধ্যম যোগারূঢ়ের বিশেষণ করিয়াছেন। পাতঞ্জল যোগ সূত্রের ভাষ্যকারগণ যোগমার্গী সাধকদিগের মধ্যে উচ্চাধিকারী সাধককে যোগারূঢ় বলেন। 'যোগারূঢ়ের' তাঁহারা কোন শ্রেণিবিভাগ করেন নাই। ৭, ৮ এবং ৯ শ্লোকে যে-সকল লক্ষণ বলা হইয়াছে তাহা মুক্ত পুরুষের অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থার লক্ষণ অতএব তাহা 'যোগারূঢ়' অবস্থার প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। এই জন্যই ৬।৮ শ্লোকে সিদ্ধাবস্থায় 'যোগী'র বিশেষণ রূপে যুক্ত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। 'যুক্ত' শব্দ যোগারূঢ়ের বিশেষণ নহে। ৬।৪ শ্লোকে যোগারূঢ়ের নির্ব্বচন দেওয়া হইয়াছে এবং তৎপরেই ৬।৫-৬ শ্লোকে যোগারূঢ়ের প্রতি আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টার উপদেশ আছে। যোগারূঢ়ের শ্রেণিবিভাগ দেখাইতে হইলে মধ্যে এই দুই শ্লোক আসিত না। পুনশ্চ যাহার শীত-গ্রীষ্ম, মান-অপমান সমান হইয়া মৃত্তিকাকাঞ্চনে সমবুদ্ধি হইয়াছে ও যিনি কূটস্থ, বিজিতেন্দ্রিয় ও জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন তাঁহার যে সমাজের বিভিন্ন মনুষ্যের প্রতি সমবুদ্ধির উদয় হয় নাই একথা মনে করিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। ৮ ও ৯ উভয় শ্লোকেই সমবুদ্ধির কথা আছে, অতএব এই দুই শ্লোকে বিভিন্ন অধিকারীর কথা বলা হইতেছে মনে হয় না। শঙ্কর ৬।৯ শ্লোকে 'বিশিষ্যতে' স্থানে 'বিমুচ্যতে' এইরূপ পাঠান্তরের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতেও যোগারূঢ়ের শ্রেণিবিভাগ সমর্থিত হয় না। ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'যোগী' 'যোগারূঢ়' ও 'যুক্ত' এই কয়টি শব্দের পার্থক্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। যিনি পাতঞ্জল যোগের সাধনা করেন তিনি যোগী; নিম্ন উচ্চাধিকার ভেদে যোগী আরুরুক্ষু ও যোগারূঢ় নামে অভিহিত হন। চিত্তবৃত্তি নিরোধে সফল হইলে সাধক যোগযুক্ত হন অর্থাৎ যোগরূপ উপায় তাঁহার আয়ত্ত হয়;

এরূপ ব্যক্তিকেও শ্রেষ্ঠ যোগী বলা যায় না, কারণ উপায় তাঁহার জানা থাকিলেও তিনি এখনও আত্মোপলব্ধি করেন নাই ; তিনি এখনও সিদ্ধ বা মুক্ত নহেন। আত্মার উপলব্ধির জন্য যোগ প্রযুক্ত হইলে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। ৬।১৮ শ্লোকে আছে যখন চিত্ত বহির্বস্তু হইতে নিরুদ্ধ হইয়া আত্মাতেই অবস্থান করে এবং যখন সমস্ত কামনা নিবৃত্ত হয় তখনই 'যুক্ত' অবস্থা বলা যায়। যুক্ত যোগীর সর্ব্বত্র সমদর্শন হয়। সর্ব্বত্র অর্থে মৃত্তিকা প্রস্তরাদি হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্যাদি সমুদয় পদার্থ। ৬।২৯ শ্লোকে এই অবস্থার বর্ণনা আছে। যোগযুক্ত ও 'যুক্ত' যোগীতে পার্থক্য আছে। যুক্ত অবস্থাই মুক্ত অবস্থা, কারণ এই অবস্থায় সাধক সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মের সহিত 'যুক্ত' বা মিলিত হইয়া যান। বিভূতি লাভের জন্য ব্যগ্র না হইয়া যে যোগী আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হন তাঁহাকে ৬।৩২ শ্লোকে 'পরমযোগী' বলা হইয়াছে।

৬।৪৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে ব্রহ্মপরায়ণ যোগী যখন ভগবানের ভজনায় রত থাকেন অর্থাৎ ভগবানের সহিত যুক্ত থাকেন তখন তাঁহাকে যুক্ততম বলা হয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যোগ সাধনার উপদেশ আছে। ২।১৪ শ্লোকে বলা হইয়াছে একমাত্র আত্মতত্ত্বদ্রষ্টা দেহী কৃতার্থ ও বিগতশোক হন। ২।১৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে 'যুক্ত' সাধক যখন দীপতুল্য আত্মতত্ত্ব দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব দর্শন করেন তখন তিনি অজ, ধ্রুব, বিশুদ্ধ দেবকে জানিয়া সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হন। শ্বেতাশ্বতরও যুক্ত যোগীকে মুক্তপুরুষ বলিতেছেন। অতএব যুক্তাবস্থা যোগারূঢ়ের কাম্য ; তাহা রামমোহন কথিত যোগারূঢ়ের মধ্যমাবস্থা নহে।

৬।১০—শমগুণসম্পন্ন যোগারূঢ় সাধক কি করিয়া আত্মোপলব্ধির চেষ্টা করিবেন তাহার উপদেশ দিতেছেন। "যোগী সতত নির্জ্জন স্থানে একাকী অবস্থান করিয়া দেহ ও মন সংযত করিয়া ফলাশাশূন্য ও বিষয়ভোগে উদাসীন হইয়া নিজেকে যোগসাধনে নিয়োজিত করিবেন।"

নির্জ্জনস্থানে একাকী থাকিবার উপদেশের অর্থ এই যে, চিত্ত বিক্ষেপের কারণ থাকিবে না। যোগাভ্যাসের জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া একাকী পর্ব্বতগুহায় যাইতে হইবে এমন উদ্দেশ্য নহে। সতত অর্থাৎ "সর্ব্বদা, ঘন ঘন ; নিরবচ্ছিন্ন এমন তাৎপর্য্য নয়" (রাজশেখর)। 'যতচিত্তাত্মা'র আত্মা শব্দের অর্থ দেহ, কারণ পরবর্ত্তী শ্লোকে চিত্ত ব্যতীত দেহকেও সংযত করিবার উপদেশ আছে। অথবা যতচিত্তাত্মা শব্দ ধর্ম্মাত্মা শব্দের অনুরূপ ও ইহার অর্থ যিনি সংযতচিত্ত।

৬।১১-১৫—"তিনি নির্ম্মল স্থানে স্থির, অনতিউচ্চ, অনতিনীচ, কুশ, পশুচর্ম্ম ও বস্ত্র উপরি উপরি বিছাইয়া আপনার আসন স্থাপন করিবেন ; সেই আসনে উপবেশন করিয়া দেহ, মস্তক ও গ্রীবা ঋজু ও নিশ্চল রাখিয়া চতুর্দ্দিকে অবলোকন না করিয়া স্বীয় নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযমিত করিয়া একাগ্রমনে আত্মবিশুদ্ধির জন্য যোগযুক্ত হইবেন। প্রশান্তমনা, বিগতভয় অর্থাৎ সিদ্ধি সম্বন্ধে নির্ভয়, ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী যোগী মনঃসংযম করিয়া মদ্গতচিত্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া অর্থাৎ আত্মা বা ব্রহ্মে চিত্তনিবিষ্ট করিয়া ব্রহ্মপরায়ণ হইলে 'যুক্ত' হইবেন। এই প্রকার সংযত চিত্ত যোগী সর্ব্বদা আপনাকে যুক্ত রাখিলে নির্ব্বাণপরমা ব্রহ্মাশ্রিতা শান্তি প্রাপ্ত হন।" পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে বলা হইয়াছে যে, নিষ্কাম আত্মরতিসম্পন্ন কর্ম্মী, সর্ব্বভূতহিতে রত ঋষি কামক্রোধ বিযুক্ত প্রাণায়াম সাধক যতি, সংযত মনোবুদ্ধি মুনি সকলেই ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। এখানে বলা হইল

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসন মাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতি নীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারি ব্রতে স্থিতঃ
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫

আত্মাপ্রতি মননিবদ্ধ যোগীও ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন। যোগাসন সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অতি সরল। এই উপদেশ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ অনুমোদিত। শ্বেতাশ্বতরের দ্বিতীয় অধ্যায় ৮ হইতে ১০ শ্লোক পর্য্যন্ত যোগাসনের উপদেশ আছে। যথা—

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য।
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্ স্রোতাংসিসর্ব্বাণি ভয়াবহানি॥
প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্বসীত।
দুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং বিদ্বানমনো ধারয়েতাপ্রমত্তঃ॥
সমে শুচৌ শর্করা বহ্নি বালুকা বিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোঽনুকূলে নতু চক্ষুপীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রয়োজয়েৎ॥

ত্রিরুন্নত শরীরকে সমভাবে স্থাপনা করিয়া অর্থাৎ বক্ষ, গ্রীবা ও মস্তককে ঋজু ভাবে রাখিয়া মনদ্বারা ইন্দ্রিয়দিগকে হৃদয়ে সন্নিবেশিত করিয়া ব্রহ্মরূপ ভেলার দ্বারা বিদ্বান সর্ব্বপ্রকার ভয়াবহ স্রোত সমূহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ব্যাপারসমূহ উত্তীর্ণ হন; সচেষ্ট হইয়া সমস্ত প্রাণকে নিয়মিত করিবে অর্থাৎ অঙ্গ স্থির রাখিবে এবং প্রাণ ক্ষীণ হইলে অর্থাৎ শরীর স্থির ও নিশ্চল হইলে নাসিকাদ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস লইবে। এইরূপে বিদ্বান অবিচলিত হইয়া দুষ্টাশ্বযুক্ত রথের ন্যায় মনকে ধারণ করিবেন। সমতল, নির্ম্মল, উপলখণ্ড, বহ্নি ও বালুকাবর্জ্জিত, মনের অনুকূল দৃশ্য, শব্দ, জল ও আশ্রয়াদি সম্পন্ন স্থানে অর্থাৎ আতপাদিরহিত নিরাপদ ও মনোরম স্থানে, বায়ুর উচ্ছাসশূন্য গুহা বা অন্য আশ্রয়ে সাধক নিজেকে প্রযোজিত করিবেন অর্থাৎ যোগ অভ্যাস করিবেন।

পাতঞ্জলসূত্রে যোগাসনের উপদেশ আরও সরল, যথা:—'স্থির সুখমাসনম্ (২।৪৬) অর্থাৎ যে আসনে শরীর নিশ্চল থাকে ও যাহা সুখকর তাহাই উপযুক্ত আসন। পরবর্ত্তীকালে যোগিগণের মধ্যে নানারূপ কষ্টসাধ্য আসনের প্রচলন হইয়াছে। এ সকল কৃচ্ছ্রসাধন শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদিত নহে। পরের শ্লোকে তাহাই বলিতেছেন।

৬।১৬-১৭—"হে অর্জ্জুন, যে অত্যধিক আহার করে, যে অত্যল্প আহার করে, যে অত্যধিক নিদ্রা যায় এবং যে অত্যধিক জাগরণশীল সে যোগ প্রাপ্ত হয় না। উপযুক্ত আহার বিহারশীল এবং কর্ম্মে উপযুক্ত চেষ্টাশীল অর্থাৎ যে কোনপ্রকার উৎকট আয়াস করে না বা আলস্যের অধীন নহে এবং যে উপযুক্তকাল নিদ্রা যায় এবং জাগরিত থাকে তাহারই যোগ দুঃখনাশক হয়।" এই দুই শ্লোকে স্বপ্ন অর্থে নিদ্রা এবং চেষ্টা অর্থে আয়াস। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের মর্ম্ম এই যে, যোগ অভ্যাস করিতে গিয়া কোন প্রকার বাড়াবাড়ি করিও না।

৬।১৮-১৯—'যখন চিত্ত নিয়ন্ত্রিত হইয়া বা নিরুদ্ধ হইয়া আত্মাতেই অভিনিবিষ্ট হয় এবং সর্ব্বপ্রকার কামনার নিবৃত্তি হয় তখন যোগীকে যুক্ত বলা যায়। যোগদ্বারা আত্মার সহিত যুক্ত সংযতচিত্ত যোগীর নিবাত-নিকম্প প্রদীপের সহিত উপমা কথিত হইয়াছে।" যোগীর আত্মোপলব্ধি হইলে যুক্তাবস্থা হয় এই নির্ব্বচন দেওয়া হইল। ২০-২২ শ্লোকে এই অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হইতেছে।

৬।২০-২২—"এই অবস্থায় যোগ সেবার দ্বারা যোগীর চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া বিষয় হইতে উপরতি বা নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয় এবং আত্মার দ্বারা আত্মোপলব্ধ হইয়া আত্মাতেই তৃপ্তি জন্মে অর্থাৎ আত্মরতি জন্মে। তখন অতীন্দ্রিয় বুদ্ধিগ্রাহ্য আত্যন্তিক সুখ অনুভূত হয় এবং যোগী ইহা অনুভব করিয়া তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান হইতে আর বিচলিত হন না। এই অবস্থা লাভ করিলে অপর কোন লাভই অধিক বলিয়া মনে হয় না এবং গুরু দুঃখও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না।" আত্মনা আত্মানং পশ্যন্ আত্মনি তুষ্যতি অর্থাৎ আত্মার দ্বারা আত্মাকে দেখিয়া আত্মাতেই তৃপ্তি জন্মে—এই কথার অর্থ এই যে, আত্মাই সর্ব্ববিষয়ের চরম দ্রষ্টা। দ্রষ্টাকে দেখিবার অপর দ্রষ্টা থাকিলে সেই অবস্থায় প্রথম দ্রষ্টা দৃশ্যবিষয় হইয়া পড়েন, অতএব তখন তাঁহাকে আর চরম বলা যায় না।

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতি স্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥ ১৬
যুক্তাহার বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥ ১৭
যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥ ১৮

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥ ১৯
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥ ২০
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র নচৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥ ২১
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥ ২২

অতএব কেবলমাত্র আত্মার দ্বারাই আত্মাকে দেখা যায়। আত্মা আনন্দস্বরূপ এজন্য আত্মোপলব্ধিতে আত্যন্তিক সুখ অনুভূত হয় অথবা সুখ অনুভূত হয় বলা ঠিক নহে, কারণ আত্মাই সুখ ইহা অনুভবের জন্য কোন ইন্দ্রিয়ের আবশ্যকতা নাই এজন্য ইহাকে অতীন্দ্রিয় বলা হইয়াছে। অপরে এই সুখের ধারণা কেবল বুদ্ধিদ্বারাই করিতে পারেন এজন্য ইহাকে বুদ্ধিগ্রাহ্য বলা হইয়াছে। আত্মজ্ঞানের উদয়ে বুদ্ধিরূপ পৃথক সত্তাও থাকে না অতএব বুদ্ধিগ্রাহ্য অর্থে আত্মজ্ঞানীর বুদ্ধিগ্রাহ্য নহে। এই আত্যন্তিক সুখ অর্থাৎ আত্মা কেবল আত্মার দ্বারাই উপভোগ্য। বুদ্ধি প্রভৃতি কোন সত্তা তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না।

৬।২৩—"পূর্ব্বশ্লোক বর্ণিত সেই দুঃখসংযোগ বিয়োগকে অর্থাৎ যে অবস্থায় দুঃখসংযোগ হইতে মুক্তি হয় সেই অবস্থাকে যোগ বলিয়া জানিবে। এই যোগ নির্ব্বেদশূন্য চিত্তে অর্থাৎ নৈরাশ্যশূন্য হইয়া বা ঔৎসুক্যসহকারে নিশ্চয় আচরণীয়।" পূর্ব্বশ্লোকসমূহে যোগাচরণের ও যুক্তাবস্থার বিবরণ আছে ও এই শ্লোকে যোগ আচরণীয় বলিয়া পুনরায় ৬। ২৪-২৬ শ্লোকে যোগের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই পুনরুক্তির কারণ কি? শঙ্কর বলেন, যোগের ফলকথন প্রস্তাব শেষপূর্ব্বক আবার তাহার আরম্ভ করিয়া, যোগের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেছেন, নিশ্চয় ও নির্ব্বেদাভাব এই দুইটি বস্তুতে যোগের সাধনতা আছে ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য এই পুনরারম্ভ করা হইয়াছে (প্রমথনাথ তর্কভূষণ)। এই যুক্তির সার্থকতা দেখা যায় না, কারণ কেবল যে যোগসাধনার কথার পুনরুক্তি আছে তাহা নহে, ৬।২৭-২৯ শ্লোকে পুনরায় যুক্তাবস্থার বর্ণনা আছে ও যুক্তের আত্যন্তিক সুখ ও সমদর্শন লাভ হয় ইহাও পুনরায় বলা হইয়াছে। আমার মতে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে যোগসাধনার এক প্রকার উপায় বলিয়া পুনরায় অন্য প্রকার উপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন। এই উপায়ে আসন ইত্যাদি কোন শারীরিক প্রক্রিয়ার আবশ্যকতা নাই। প্রথমোক্ত সাধনাকে শারীরিক যোগ বলিলে দ্বিতীয় উপায়কে মানসিক যোগ বলা যায়। এই মানসিক যোগের ফলও শারীরিক যোগের অনুরূপ এজন্য ফল নির্দ্দেশে পুনরুক্তি আসিয়াছে।

৬।২৪-২৯—"ফলাশাসম্ভূত সমস্ত কামনা নিঃশেষে বর্জ্জন করিয়া মনের দ্বারা সর্ব্ববিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গ্রামকে নিবৃত্ত করিয়া ধৈর্য্যসহকারে বুদ্ধিদ্বারা ক্রমে ক্রমে উপরতি অবলম্বন করিবে এবং মনকে আত্মায় নিরুদ্ধ করিয়া কোন বহির্বিষয়ের চিন্তা করিবে না। চঞ্চল ও অস্থির মন যে-যে বিষয়ে ধাবিত হইবার চেষ্টা করিবে তাহাকে সেই-সেই বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া আপনার বশে আনিবে। এইরূপে যাঁহার রজোগুণ (অর্থাৎ প্রকৃতির যে গুণের দ্বারা মন বহির্বিষয়ে ধাবমান হইয়া ক্রিয়াশীল হয়) প্রশমিত হইয়াছে ও যাঁহার চিত্ত শান্ত হইয়াছে ও যিনি ব্রহ্মভূত অর্থাৎ ব্রহ্মেস্থিত হইয়া পাপশূন্য হইয়াছেন তাঁহার উত্তম বা শ্রেষ্ঠ সুখ লাভ হয়। এই প্রকারে সর্ব্বদা আত্মাতে যুক্ত হইয়া যোগী বিগতপাপ হইয়া অনায়াসে ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ আত্যন্তিক সুখ উপভোগ করেন। তিনি যোগদ্বারা আত্মার সহিত যুক্ত হওয়ায় সর্ব্বভূতে আপনাকে এবং আপনাতে সর্ব্বভূতকে দেখিয়া সমদর্শী হন।" শারীরিক যোগের সহিত মানসিক যোগের পার্থক্য এই যে, ইহাতে কোন আসন করিতে হয় না এবং নাসাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধও করিতে হয় না এবং প্রাণায়ামেরও আবশ্যকতা নাই, যত্র তত্র এই যোগ প্রযোজ্য। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, মানসিক যোগ দ্বারাও ব্রহ্মনির্ব্বাণ, আত্যন্তিক সুখ ও সমদর্শন লাভ হয়।

তং বিদ্যাদ্দুঃখ সংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ ।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা ॥ ২৩
সংকল্প প্রভবান্ কামাং স্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫
যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬

প্রশান্ত মনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯

৬।৩০—"যিনি আমাকে সর্ব্বত্র দর্শন করেন এবং সমস্ত আমাতেই দেখেন আমি তাঁহার কাছে নষ্ট হই না অর্থাৎ লুপ্ত হই না এবং তিনি আমার কাছে নষ্ট হন না বা লুপ্ত হন না ”

৬।৩১—"যিনি একত্বে স্থিত হইয়া অর্থাৎ সমস্তই এক এই অনুভব করিয়া সর্ব্বভূতস্থিত আমাকে ভজনা করেন অর্থাৎ সর্ব্বত্রই একমাত্র ব্রহ্মদর্শন করেন তিনি যে অবস্থাতে থাকুন না কেন আমাতেই বর্ত্তমান থাকেন।"

৬।৩২—"হে অর্জ্জুন, যিনি আত্মাকে উপমা মানিয়া অর্থাৎ আত্মার নির্লিপ্ততা মনে রাখিয়া সুখ বা দুঃখকে সর্ব্বত্র সমজ্ঞান করেন তিনি পরমযোগী বলিয়া বিবেচিত হন।" শঙ্কর এই শ্লোকের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করেন, যথা :—'যিনি সকলের সুখ-দুঃখ আপনার বলিয়া গণ্য করেন এবং কাহারও প্রতিকূলতাচরণ করেন না তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী।' পরের সুখে সুখী হইলে এবং পরের দুঃখ আপনার দুঃখ মনে করিলে যোগীর নির্লিপ্ততা থাকে না। সর্ব্বভূতে যোগী আপনাকে দেখেন বলিয়া তাহাদের সুখ-দুঃখ ভোগ করেন এমন নহে, তিনি ব্রহ্মবৎ নির্লিপ্তই থাকেন।

৬।৩৩-৩৪—অর্জ্জুন বলিলেন—"হে কৃষ্ণ, এই যে সাম্যবুদ্ধি দ্বারা যোগপ্রাপ্তির উপায় তুমি বলিলে এই অবস্থা চঞ্চল সেজন্য ইহার স্থির স্থিতির সম্ভাবনা দেখিতেছি না। হে কৃষ্ণ, মন স্বতঃই চঞ্চল, বিক্ষোভকর প্রবল ও দৃঢ় অর্থাৎ অ-নমনীয়। আমি সেই মনের নিগ্রহ বা নিরোধ বায়ুকে নিরোধ করার ন্যায় সুদুষ্কর মনে করি।" অর্জ্জুনের প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই যে, সমাধি অবস্থায় মনের সংযম সম্ভব হইলেও সাধারণ কার্য্যকালে তাহা স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই অতএব কৃষ্ণ পূর্ব্বে যে বলিলেন সর্ব্বাবস্থায় যোগী ব্রহ্মে অবস্থান করেন তাহা কিরূপে হইতে পারে।

৬।৩৫-৩৬—শ্রীভগবান বলিলেন—"হে মহাবাহো, মন যে চঞ্চল ও দুর্দ্দমনীয় তাহা নিঃসন্দেহ, কিন্তু হে কৌন্তেয়, অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা মনকে বশে আনা যায়। অসংযত চিত্ত ব্যক্তির যোগ দুষ্প্রাপ্য ইহা আমার মত, কিন্তু যথাবিধানে যত্নশীল আত্মজয়ী পুরুষের ইহা লভ্য।" অভ্যাস ও বৈরাগ্য এই দুইটি পাতঞ্জল সূত্রোক্ত (১। ২) পারিভাষিক শব্দ। চিত্তস্থৈর্য্যের জন্য যত্নের নাম অভ্যাস। প্রকৃতির গুণত্রয়ের প্রতি বিতৃষ্ণাই প্রকৃত বৈরাগ্য। ৬।৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৬।৩৭-৩৯—অর্জ্জুন বলিলেন—"হে কৃষ্ণ, শ্রদ্ধাসহকারে যোগাভ্যাস আরম্ভ করিয়া যোগ হইতে বিচলিত মানস অযতি অর্থাৎ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি যোগসিদ্ধিতে বঞ্চিত হইয়া কোন্ গতি প্রাপ্ত হয়? হে মহাবাহো, উভয় বিভ্রষ্ট অর্থাৎ ইহলোক ও পরোলোকে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায় প্রতিষ্ঠাহীন অর্থাৎ আশ্রয়-হীন সেই বিমূঢ় ব্যক্তি কি ব্রহ্মলাভের মধ্যপথেই নষ্ট হয় না? হে কৃষ্ণ, তুমিই আমার এই সংশয় নিঃশেষে দূর করিয়া দাও, কারণ তুমি ভিন্ন এই সংশয় নিরাকরণের উপযুক্ত অপর ব্যক্তি দেখিতেছি না।" সাধারণের মনে

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ ৩০
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥ ৩১
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং সযোগী পরমো মতঃ॥ ৩২

অর্জ্জুন উবাচ—

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্॥ ৩৩
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ ৩৪

শ্রীভগবানুবাচ—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ ৩৫
অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥ ৩৬

অর্জ্জুন উবাচ—

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিত মানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাংগতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥ ৩৭
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃপথি॥ ৩৮
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে॥ ৩৯

ধারণা আছে যোগমার্গ সম্যক্ অনুষ্ঠিত না হইলে শারীরিক অনিষ্ট হয়। যোগমার্গ হইতে চ্যুত হইলে উভয়ভ্রষ্ট হইতে হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মলাভও হয় না এবং ইহলোকেও কষ্ট পাইতে হয়। এই আশঙ্কা নিরাকরণের জন্যই অর্জ্জুনের প্রশ্ন। 'উভয়ভ্রষ্ট' শব্দের অর্থ শঙ্কর 'জ্ঞান ও কর্ম্মমার্গ উভয় মার্গ হইতে ভ্রষ্ট' করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার পূর্ব্বজন্মের সমস্ত কথা জানা আছে এজন্য অর্জ্জুনের ধারণা যে পরলোকে যোগভ্রষ্টের কি দশা হয় সে-সম্বন্ধে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই নিঃসংশয়রূপে বলিতে পারিবেন।

৬।৪০-৪৫—শ্রীভগবান বলিলেন—"হে পার্থ, ইহলোক বা পরলোকে তাহার বিনাশ বা ব্যর্থতা হয় না কারণ হে বৎস, কল্যাণ কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারীর কোন দুর্গতি হইতে পারে না। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুর পর পুণ্যাত্মাদিগের প্রাপ্য লোকে গমন করিয়া বহুকাল অবস্থানের পর পৃথিবীতে শুচিস্বভাব ও লক্ষ্মীমন্ত ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন; অথবা ধীমান যোগীদের বংশে তিনি জন্মলাভ করিয়া থাকেন; এরূপ জন্ম মনুষ্য-লোকে দুর্লভতর অর্থাৎ সাধারণের এই সৌভাগ্য হয় না। হে কুরুনন্দন, তখন তিনি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বুদ্ধি সংযোগ লাভ করেন এবং পুনরায় সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করেন। সেই পূর্ব্বাভ্যাসের দ্বারা অবশের ন্যায় চালিত হইয়া যোগের জিজ্ঞাসু হন এবং বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপকে অতিক্রম করেন অর্থাৎ এ সকলে আসক্ত হন না এইরূপ যত্নপূর্ব্বক যোগাভ্যাস করিতে করিতে পাপক্ষয় হইলে অনেক জন্ম পরে যোগী যোগসিদ্ধ হন ও তাহার পর পরাগতি প্রাপ্ত হন।" শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ববিধ কৃচ্ছ্র সাধন পরিত্যাগ করিয়া যোগাভ্যাসের যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইলেও কোন অনিষ্ট হয় না বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিলেন যে যোগমার্গে "অভিক্রমনাশ' দোষ নাই অর্থাৎ কর্ম্ম সম্যক্ সম্পাদিত না হইলেও যেটুকু করা হইয়াছে তাহা নষ্ট হয় না এবং পুনরায় প্রথম হইতে আরম্ভ করিতে হয় না।

৬।৪৬—"হে অর্জ্জুন, যোগীকে তপস্বী, জ্ঞানী বা কর্ম্মী হইতে শ্রেষ্ঠ জানিবে অতএব তুমি যোগী হও।" তপস্বী অর্থাৎ কৃচ্ছ্রসাধক, জ্ঞানী অর্থাৎ যিনি কর্ম্মবর্জ্জন করিয়া কেবল জ্ঞান সাধনা করেন এবং কর্ম্মী অর্থে যাঁহারা সঙ্কল্প করিয়া যজ্ঞাদি বা অপর কর্ম্ম করেন।

৬।৪৭—"যে যোগী শ্রদ্ধাবান হইয়া আমাতে অর্থাৎ ব্রহ্মে চিত্তসমর্পণ করিয়া আমাকেই ভজনা করেন অর্থাৎ অন্য বিভূতির কামনা না করিয়া আত্মাতেই যুক্ত হন তিনিই যুক্ততম ইহাই আমার মত।" ইতি ধ্যানযোগ নামক ষষ্ঠাধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীভগবানুবাচ—
পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৪
প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধ কিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫
তপস্বিভ্যো ঽধিকোযোগী জ্ঞানিভ্যোঽপিমতোঽধিকঃ
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদযোগী ভবার্জ্জুন ॥ ৪৬
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭

পঞ্চায়তের বিচার

শ্রীব্রহ্মানন্দ সেন

বাড়িতে সকলের কাছেই আমার দুর্নাম—আমাকে কোন কাজে পাঠাইলে আমি আধ ঘণ্টার কাজে তিন ঘণ্টা ব্যয় করিয়া তবে বাড়ি ফিরি। সেজন্য আমাকে অনেক গালাগালিও সহ্য করিতে হয়। তা হউক। কিন্তু বাড়ির বাহির হইলে এক-এক সময়ে পথেঘাটে এমন এক-একটি কৌতুকপ্রদ দৃশ্য চোখে পড়ে যে, তাহা উপভোগের পর বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া সমবেত সকলের গালাগালিও আমার তখনকার মনের আনন্দ ছাপাইয়া মনের পাতে কোন আঁচড় কাটিতে পারে না। এমনি একটি কৌতুককর ঘটনার কথাই আজ বলিব।

তখন বিকাল বেলা। একটা কাজ সারিয়া ভিন্ন গ্রাম হইতে ফিরিতেছি। কিছু দূর আসিয়া দেখি রাস্তা হইতে খানিকটা দূরে একটা খালি জায়গাতে একখানা ছেঁড়া সামিয়ানা টাঙান। তাহার নীচে দুই-চারিজন গ্রামবৃদ্ধ বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া সকল বয়সেরই অনেক লোক। এক পাশে একটু তফাতে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ও সাত বৎসরের ছোট একটি মেয়ে বসিয়া। আর এক পাশে একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা একটি ছাগল। স্বাভাবিক কৌতূহলবশত আমি রাস্তা ছাড়িয়া সেখানে গিয়া হাজির হইলাম। দেখিলাম গ্রাম্য পঞ্চায়ৎ বসিয়াছে এক ছাগল-চুরির মামলার বিচার করিতে। আমার বরাত ভাল। মামলার গোড়া হইতেই শুনিবার সুযোগ হইল। ঠিক তখনই বিচার আরম্ভ হইল। একটা সুবিধামত জায়গা লইয়া চাপিয়া বসিলাম।

এ মামলায় বাদী জীবন সূত্রধর এবং বিবাদী অনাথ কুণ্ডু।

পঞ্চায়তের মোড়ল বা প্রধান বিচারকর্ত্তা বাদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ওহে জীবন, এ ছাগল যে তোমার তার প্রমাণ কি? সাক্ষী-সাবুদ কিছু আছে?

জীবন বলিল—আজ্ঞে কর্ত্তা, সাক্ষী-সাবুদ থাক্‌বে কি ক'রে? তার ফুরসৎ দিল কোথায়? সবে জামতলীর হাট থেকে কিনে এনেছিলাম। ফিরতে সন্ধ্যা হ'ল। বাইরের আঙিনায় বেশ বড় বড় তাজা দূর্ব্বা আছে, চরে খাবে—এই ভেবে সেখানটায় একটা খুঁটি পুঁতে বেঁধে দিলাম। সকালবেলায় উঠে দেখি ছাগল নেই। খুঁজতে খুঁজতে এদিকে এসে দেখি অনাথের বাড়ির সামনে আমার ছাগল বাঁধা আছে।

মোড়ল। কি ক'রে চিন্‌লে এ ছাগল তোমার?

জীবন। আজ্ঞে ঐ কান দুটো দিয়ে। আমার ছাগল ঐ রকমই ছিল। গোটা শরীরটা কালো আর কান দুটো সাদা।

মোড়ল। তোমার ছাগলের যে এই রং ছিল তার প্রমাণ?

জীবন। আজ্ঞে কর্ত্তা, এখানে আর প্রমাণ কোথায় পাব? যার কাছ থেকে কিনেছি সে হয়ত বলতে পারত। কিন্তু তাকে আর এখানে কোত্থেকে পাব? আর তার মুখও তো চিনে রাখিনি। যদি আগে জানা থাক্‌ত যে অনাথ আমার ছাগল চুরি করবে তবে না হয় তার নামধাম জিজ্ঞেস করে রাখতাম।

বাদীর বসিবার অনুমতি হইল। এবারে বিবাদীর পালা। মোড়ল বলিলেন—কিহে অনাথ, জীবনের কথা তো শুনলে? এখন তোমার বক্তব্য কি বল।

অনাথ বলিল—আজ্ঞে দেবতা, ওর ছাগল সম্বন্ধে আমি কিছুই জানিনে। এ ছাগল আমার।

মোড়ল। এ ছাগল তুমি কোথায় পেলে?

অনাথ। আজ্ঞে কিনেছিলাম।

মোড়ল। কতদিন আগে?

অনাথ। এই দু-মাস আগে।

মোড়ল। কার কাছ থেকে?

অনাথ। আজ্ঞে দেবতা, শ্যামবিহারীর কাছ থেকে।

মোড়ল শ্যামবিহারীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন—কিহে শ্যামবিহারী, তুমি অনাথের কাছে ছাগল বেচেছিলে?

শ্যামবিহারী। হ্যাঁ কর্ত্তা।

মোড়ল। কতদিন আগে?

শ্যামবিহারী। অনুমান ছ-মাস আগে।

মোড়ল। এই ছাগলই তুমি বেচেছিলে?

শ্যামবিহারী। আজ্ঞে কর্ত্তা, তার সবটাই কাল রং ছিল। কানের কাছে ও রকম সাদা ছিল না।

উপস্থিত সকলেই ভাবিল, গেল বুঝি মামলা এইখানে ফাঁসিয়া। আসামীর নিজের সাক্ষীই বুঝি আসামীকে ফাঁসায়।

মোড়ল বলিলেন—কিহে অনাথ, এবারে তোমার কি বলবার আছে?

অনাথ। আজ্ঞে দেবতা, আমার ছোট ছেলেটা রাত-দিন ওটার পেছনে লেগেই আছে। সর্ব্বদাই কান দুটো ধরে টেনে হেঁচড়ে সারা বাড়িময় ঘুরিয়ে বেড়ায়। তাইতে ঘসা লেগে লেগে কান দুটো ও রকম সাদা হয়ে গেছে।

এ অদ্ভুত কথা শুনিয়া সভাময় একটা হাসির গব্‌রা উঠিল। মোড়ল হাসিয়া বলিলেন—ওহে অনাথ, তুমি কি আমাদের বোকা বোঝাচ্ছ? কালো রং কি কখনও সাদা হয়? বলে 'অঙ্গারং শত ধৌতেনাপি মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।' অর্থাৎ কিনা, অঙ্গার তুমি যতই কেন ধোও না, ও কালোই থাকবে।

অনাথ জিভ কাটিয়া বলিল—আজ্ঞে দেবতা, আমি আপনাদিগকে বোকা বোঝাব! আমার ঘাড়ে ক'টা মাথা? ঐ যে শাস্ত্রের কথা বললেন অঙ্গার ধুলেও সাদা হয় না সে তো ঠিক কথা। দেবতাদের তৈরি শাস্ত্র-বাক্যি কি মিথ্যে হবার জো আছে? তবে কি-না দেবতা, এটা তো অঙ্গারের কথা হচ্ছে না। এ হচ্ছে ছাগলের গায়ের লোমের কথা। আর এ যে শুধু আমার ছাগলের বেলায় হয় তা নয়। সিমলের যে সব কালো ভেড়ার লোমে গরম কাপড় তৈরি হয় তার অবধি রং সাদা হয়ে যায়। আমাদের ছোটলোকদের কথায় বিশ্বাস না হয় দেবতা, ঐ অনিল মুখুজ্জ্যে মশায়কে জিজ্ঞেস করুন, ওঁর গায়ে ঐ যে সাদা মত গরম জামা দেখছেন ওটা আগে কালো ছিল কিনা।

কথাটায় সকলেই একটু বিস্মিত হইল। পশমের তৈয়ারি গরম কাপড়ের রং ওঠে এটা সকলের কাছেই নূতন কথা।

মোড়ল জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হে মুখুজ্জ্যের পো, ব্যাপারটা কি বল দেখি?

অনিল মুখুজ্জ্যা বলিল—আজ্ঞে, অনাথ ঠিক কথাই বলেছে। তিন বছর আগে যখন আমার এ জামাটা তৈরি করাই তখন কাপড়টার রং কালোই ছিল। যে দেখত সে-ই একবার ক'রে ঐ কাপড়টার তারিফ করত। কিন্তু এখন রং উঠে গিয়ে এই তো জামার অবস্থা দাঁড়িয়েছে।

অনাথ বলিল—দেবতা, শুধু যে ছাগল-ভেড়ারই গায়ের রং বদলায় তা নয়। মানুষেরও গায়ের কালো রং ফরসা হয়।

মোড়ল হাসিয়া বলিলেন—হ্যাঁ, তা হয় বইকি! লোকে যখন রোগে ভুগে ভুগে শিটে হয় তখন গায়ে রক্ত না থাকাতে তাকে অনেকটা ফরসা দেখায় বটে।

অনাথ বলিল—আজ্ঞে দেবতা, আমি সে রকম ফরসার কথা বল্‌ছি না। সুস্থ শরীরেই প্রক্রিয়া দ্বারা কালো রং ফরসা হয় সে কথাই বলছি।

মোড়ল এই অদ্ভুত ধরণের কথা শুনিয়া অত্যন্ত উৎসুক চিত্তে প্রশ্ন করিলেন—সে কি হে অনাথ? প্রক্রিয়া দ্বারা মানুষের গায়ের রং ফরসা হয় তার প্রমাণ দিতে পার?

শুনিলাম মোড়লের একটি বিবাহযোগ্য মেয়ে আছে। অনেক বরপক্ষ মেয়ে দেখিতে আসিয়া প্রধানত গায়ের রঙের জন্যই অপছন্দ করিয়া যাইত। তাই তাঁহার এই ঐকান্তিক ঔৎসুক্য।

অনাথ বলিল—আজ্ঞে দেবতা, পারি বইকি? এর প্রমাণ জলজ্যান্ত আপনার সামনেই উপস্থিত। ঐ যে ঐ কোণে অমূল্যের মা বসে আছে তাকেই জিজ্ঞাসা করুন তার পাশের ঐ ফরসা মেয়েটির কথা, কি রকম কালো ছিল ঐ মেয়েটি ওর জন্মের সময়ে। আর দেখুন এখন কি রকম ফরসা হয়েছে।

বিধবা অমূল্যর মায়ের দিকে তাকাইয়া মোড়ল বলিলেন—কিগো মা? অনাথের কথা কি ঠিক?

অমূল্যর মা বলিল—হ্যাঁ বাবাঠাকুর। আমার এই বোনঝিটি শিশুবয়সে বেশ কালো ছিল। এখন আপনাদের আশীর্ব্বাদে ওর এই রং দাঁড়িয়েছে।

মোড়ল। কি ক'রে কালো রং এতটা ফর্সা হ'ল মা?

অমূল্যর মা। কে একজন আমার বোনকে বলেছিল, শ্বেত সর্ষে ভেজে কাঁচা দুধের সঙ্গে বেটে নিয়ে সেটা সমস্ত গায়ে মাখিয়ে বেশ খানিকক্ষণ রাখতে হয় এবং তারপর স্নানের সময়ে ধুয়ে ফেলতে হয়। এ রকম কিছুদিন মাখলেই গায়ের রং আস্তে-আস্তে ফরসা হয়। আমার বোন তো প্রথমে এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস করেনি। শেষে একদিন ভাবল, দিয়েই দেখি না কি হয়। না-হয় ফরসা না-ই বা হ'ল। ক্ষতি তো আর কিছু হবে না এতে। তারপর দিনকতক এই রকম মাখিয়ে মাখিয়েই না-কি এই রং হয়েছে।

এই সহজ প্রক্রিয়াতে যে দেহের কালো রং ফরসা হইতে পারে ইহা সকলেরই ধারণার অতীত ছিল। এখন চোখের সামনে প্রমাণ পর্য্যন্ত উপস্থিত দেখিয়া সকলেরই বিস্ময়ের সীমা রহিল না.

অনাথ কিন্তু এখানেই ক্ষান্ত রহিল না। বলিল—এ তো সামান্য পশু ও মানুষ। স্বর্গের যে দেবতা তাদেরও অবধি গায়ের রং বদলায়। স্বয়ং নারায়ণ যে কেষ্ট ঠাকুর, তাঁকেও চেষ্টা-চরিত্তির ক'রে তাঁর কালো অঙ্গ সাদা করতে হয়েছিল।

মোড়ল। সে আবার কি হে অনাথ? তুমি যে রূপ-কথা ফেঁদে বসলে?

অনাথ আবার জিভ কাটিল। বলিল—আজ্ঞে দেবতা, কি যে বলেন! আপনারা হচ্ছেন শাস্ত্রের মালিক! আপনাদিগকে রূপকথা শোনাব আমি? কেষ্ট ঠাকুর কালো ছিলেন ব'লে রাধা তাঁকে দেখতে পারতেন না; এমন কি তাঁকে কুঞ্জে যেতেও বারণ ক'রে দিয়েছিলেন। তাই কেষ্ট ঠাকুরকে উঠে-পড়ে লাগতে হয়েছিল তাঁর কালো অঙ্গকে সাদা করবার জন্য। তাইতেই না তাঁকে সেই জীবনের অন্ত ক'রে গৌররূপে নূতন জন্ম নিতে হ'ল। এ তো আপনাদের শাস্ত্রেই লেখা আছে। আমি আর এ বিষয়ে কি বলব? স্বয়ং কথক-ঠাকুর মহাশয় এখানে উপস্থিত আছেন। তিনিই এ বিষয়ে বলতে পারবেন। আহা! সেবারে যে ঠাকুর-মশায় গানখানা গেয়েছিলেন তা এখনও আমার কানে লেগে আছে।—সেই যে 'রাই কালো ভালবাসে না।' তারপর কথক-ঠাকুরকে জোড়হাতে অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিল—ঠাকুর-মশায়, যদি আর একবার দয়া ক'রে সে গানখানা গা'ন তবে এখানে সকলেই কৃতার্থ হয়ে যায়।

এই কথক-ঠাকুরের কথকতায় না কি নাম আছে। এ গ্রামে তিনি এর আগেও একবার আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার সাত্ত্বিক ব্যবহারে এবং সুমিষ্ট কণ্ঠের কথকতায় সকলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এবারে তিন দিন হইল তিনি এখানে আসিয়াছেন। কোন কু লোক সভায় বসিয়া গোপনে রটাইতেছিল, অনাথ না-কি আজ সকাল-বেলা উঠিয়া দুইটি টাকা চাদরের কোণে বাঁধিয়া লইয়া একেবারে কথক-ঠাকুরের আস্তানায় গিয়া হাজির হইয়াছিল এবং টাকা দুইটি ঠাকুরের পায়ের উপর রাখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইয়াছিল। ঠাকুর-মহাশয় খুশী হইয়া বলিয়াছিলেন—'আরে কর কি, কর কি?' অনাথ তাহার উত্তরে বলিয়াছিল—'আজ্ঞে দেবতা, আপনাদের মত সাধু-সন্ন্যাসীর পায়েই যদি প্রণাম করতে না পারলাম তবে আমাদের রোজগার কিসের জন্য।' তারপর এ-কথা সে-কথায় শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে নানা কথা জানিতে চাহিয়া এবং বার-বার উদ্দেশে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কথক-ঠাকুরকে পটাইয়া ফেলিয়াছিল। তারপর সে কৌশলে পঞ্চায়তের কথা পাড়িয়া তাঁহাকে সেখানে উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিল এবং প্রয়োজন হইলে পঞ্চায়তের সমক্ষে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের কালো রং পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে জন্ম লইবার কথা বলিবার জন্যও রাজী করিয়াছিল। কিন্তু বিবাদী যে সে নিজেই তাহা বলে নাই।

কথক-ঠাকুরও বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন, এ এক রকম

মন্দ নয়। এভাবে যদি এ গ্রামে তাঁহার খ্যাতির প্রচার হয় এবং ফলে তাঁহার পসার বাড়ে তাহাতে আপত্তি কি? হয়ত এই উদ্দেশ্যেই তিনি এই পঞ্চায়তে উপস্থিত ছিলেন।

অনাথ অনুরোধ করিবামাত্র কথক-ঠাকুর মোড়ল-মহাশয়ের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই তাঁহার স্বাভাবিক সুকণ্ঠে ভাবগদ্‌গদস্বরে গান ধরিলেন—

কাল অঙ্গ যাবে আমার, রাই তুয়া রূপে গৌর হব।
রাধে তোমার হেম কান্তি সর্ব্বাঙ্গে মাখিব॥
আর এক কথা শোন প্রিয়া, রুক্মিণী মোর বিষ্ণুপ্রিয়া,
ঘরে রবে একাকিনী আমি চলে যাব॥
যুগধর্ম্ম হরিনাম কলিযুগে প্রচারিব,
রাধা রাধা রাধা ব'লে প্রেমধন আস্বাদিব,
আপনি কাঁদিয়ে কলির জীবে কাঁদাব॥

ভক্তলোকের মুখে এ গান শুনিয়া সকলেরই মন ভক্তিতে পূর্ণ হইল। কাহারও বা চোখ ছল্‌ছল্ করিয়া উঠিল। সবাই কথক-ঠাকুরের মুখের দিকে তাকাইয়া আবিষ্ট চিত্তে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। মোড়লেরও মন ভাবাপ্লুত হইয়াছিল। কিন্তু এ সভায় তিনি বিচারক। তাই তাঁহাকে জেরা করিতে হইল। বলিলেন, এ গানে তো শ্রীকৃষ্ণ রাইয়ের রূপ নিয়ে গৌর হবেন বলা হয়েছে। কিন্তু তিনিই যে গৌর হয়েছিলেন তার প্রমাণ কোথায়, ভাগবতরত্ন-মশায়?

কথক-ঠাকুর বলিলেন - সে কথা শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিজের মুখেই ব'লে গেছেন। এই বলিয়া তিনি আবার গান ধরিলেন—

রাই কালো ভালবাসে না।
(আমায়) কালো দেখে বলেছিল কুঞ্জে যেন এস না॥
রূপের বড় গরব করে রাই,
দেখ্‌ব এবার মন যদি তার পাই,
এবার গৌর হয়ে ধরব পায়ে আর তো কালো রইব না॥
বড় অভিমানী রাই,
বাঁশী ছেড়ে কেঁদে ফিরি তাই,
যোগী-বেশে ফিরব দেশে ঘরে তো মন বসে না॥

গান শেষ হইল। শ্রোতৃমণ্ডলী নীরব। কথক-ঠাকুর বলিলেন,—শুধু তাই নয়। যে-সব ভক্তের কাছে তিনি তাঁর স্বরূপ প্রকটিত করেছেন তাঁরাও এ বিষয়ে ব'লে গেছেন।—বলিয়া তিনি তৃতীয় বার গান ধরিলেন।

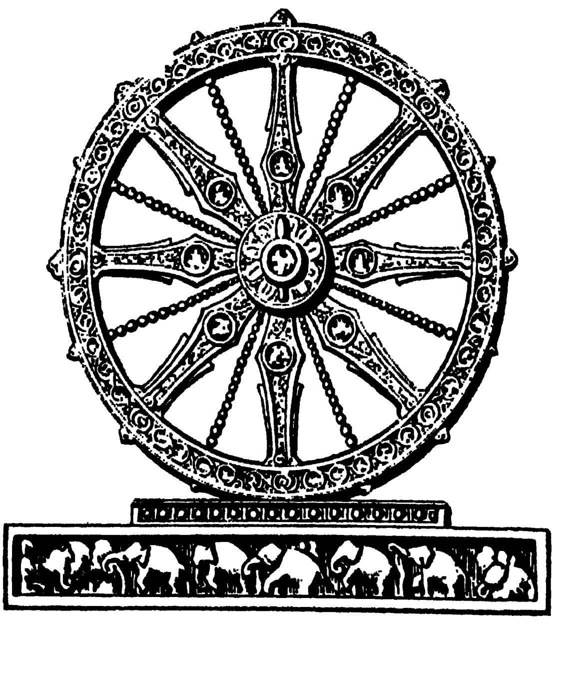
এসেছে ব্রজের বাঁকা কাল সখা দেখবি আয়
তোদের এই নদীয়ায়।
তাঁর রং ফিরেছে ঢং ফিরেছে কালো এখন চেনা দায়॥
তাঁর কাল অঙ্গ নাই
রাই অঙ্গ সঙ্গ পেয়ে গৌর হয়েছে ভাই
সেথাকার ব্রজের খেলা খেলতে এসেছে হেথায়॥
প্রেমে ঋণী হয়েছে,
(তারা তাই) হাতের বাঁশী কেড়ে নিয়ে বিদায় দিয়েছে,
রাধানাম সাধবে কিসে (বাঁশী নাই সাধবে কিসে)
তাইতে মুখে গুণ গায়॥
ব্রজের কুল-ললনা,
বাঁশী শুনে ভুলত কুলের গৌরব রাখত না,
সেই রাধার সাধের নাগর (সে রাধার প্রেমের সাগর)
(সে রাধার রসের সাগর) এখন গৌর নাম ধরায়॥
কাঙাল বিশ্বরূপে কয়,
শুধু রাই-অঙ্গ সঙ্গ পেয়ে গৌর হলে নয়,
ত্রিভুবন উদ্ধারিলে, (জনে জনে উদ্ধারিলে)
(আচণ্ডালে উদ্ধারিলে) তবেই খালাস ঋণের দায়॥

যতক্ষণ গান হইল ততক্ষণ পঞ্চায়ত বিচারসভার পরিবর্ত্তে হরিসভায় পরিণত হইল। চারিদিকে ভক্তমণ্ডলীর হরিবোল-ধ্বনির মধ্যে গান শেষ হইল। তারপর অনেকক্ষণ ধরিয়া সভা নীরব। মোড়ল-মহাশয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। তাই কথক-ঠাকুরের গান তাঁহাকে বেশী করিয়াই অভিভূত করিয়াছিল। খানিকক্ষণ পরে ভাবের ঘোর কাটিয়া গেলে তিনি পঞ্চায়তের অন্য চারিজন বিচারকের দিকে চাহিয়া বলিলেন—বাদী-বিবাদীর সওয়াল-জবাব শেষ হইল। এবারে আমাদের রায় দিবার পালা। আপনারা সবাই শুনলেন, বাদী এই ছাগলকে নিজের ব'লে প্রমাণ করবার মত কোন সাক্ষী-সাবুদই উপস্থিত করতে পারেনি। পক্ষান্তরে বিবাদী এই ছাগল নিজের ব'লে প্রমাণ করবার জন্য যথেষ্ট সাক্ষী উপস্থিত করেছে। শ্যামবিহারী, অনিল

মুখুজ্জ্যে, অমূল্যর মা, এমন কি, ভাগবতরত্ন-মশায় পর্য্যন্ত তার পক্ষের সাক্ষী। ভাগবতরত্ন-মশায়কে তো সাক্ষী শিরোমণি বললেই চলে। তিনি আজ সাক্ষ্য দিতে এসে যা শোনালেন তা অমূল্য। এই সব সাক্ষীর সাক্ষ্যতে এই প্রমাণিত হয় যে, ছাগলের গায়ের লোমের রং বদলাতে পারে। বিশেষত ছাগলের কানের কালো লোম আগে সাদা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এর কারণও সুস্পষ্ট। আমাদের মানুষদের বেলায় মস্তিষ্কের অর্থাৎ মাথার ওপর দিয়েই বেশী চোট যায়। তাই গায়ের লোম আগে না পেকে মাথার চুলই আগে পাকে। কিন্তু ছাগজাতির মস্তিষ্কের বালাই নেই। তাদের বেলায় কানের ওপর দিয়েই বেশী চোট যায়। তাই তাদের বেলায় কানের লোম প্রথমে সাদা হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষত এই ছাগলের কানের উপর দিয়ে যথেষ্টই চোট গেছে, তা বিবাদীর সাক্ষ্যতেই প্রকাশ। অতএব আমার মতে অনাথই ছাগলের প্রকৃত মালিক—জীবন নয়। আর জীবন অনাথের নামে মিথ্যা মামলা এনেছে ব'লে তার পাঁচ টাকা জরিমানা হওয়া উচিত এবং এই টাকা ভাগবতরত্ন-মশায় যে এতক্ষণ অবধি কষ্ট স্বীকার ক'রে আমাদিগকে এমন মধুমাখা নামগান শোনালেন তজ্জন্য তাঁকে পারিশ্রমিকস্বরূপ দেওয়া উচিত।

মোড়লের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত চারিজন বিচারক এমন ভাবে কণ্ঠ মিলাইয়া 'আমারও সেই মত' বাক্যটি উচ্চারণ করিলেন যে, কোনও পেশাদার যাত্রাদলে রাজ-দরবারের সভাসদবর্গের অভিনয়কারী ব্যক্তিগণও বহুস্থানে বহুবার অভিনয় করিবার পরও এমন ঐকতানে বাক্যটি উচ্চারণ করিতে পারে না।

পঞ্চায়ৎ ভাঙিয়া গেল। অনাথের মুখখানা জয়লাভের খুশীতে ভরিয়া গেল। সে মোড়ল-মশায় ও অন্য চারিজন বিচারককে এবং কথক-ঠাকুরকে গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। এদিকে জীবনের মুখখানা শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। তাহার পক্ষে এ যে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। ছাগল তো গেলই উপরন্তু পাঁচ টাকা জরিমানা। কিন্তু এদিকে কাহারও দৃষ্টি ছিল না। ভাগবতরত্ন-মহাশয়ের পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা হইল দেখিয়া দর্শকের দল মোড়লকে সাধুবাদ দিতে দিতে যে যার ঘরে ফিরিল। আমিও এই অদ্ভুত বিচারের কথা ভাবিতে ভাবিতে বাড়ির দিকে চলিলাম।



ধবলগিরি

নিখিলনাথ রায়

হিমালয়ের শুভ্র তুষারাবৃত ধবলগিরি শৃঙ্গের কথা অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু আমরা যে ধবলগিরির কথা বলিতেছি, তাহা উড়িষ্যার একটি নাত্যুচ্চ পর্ব্বত। এই ধবলগিরি সাধারণতঃ ধৌলি পাহাড় নামেই প্রসিদ্ধ। উড়িষ্যার অন্যতম প্রধান তীর্থ ভুবনেশ্বর যে পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত, তাহা চারিটি প্রধান নামে অভিহিত হইয়া থাকে; উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, নীলগিরি ও ধবলগিরি এই চারি নামে তাহাদিগকে নির্দ্দেশ করা হয়। ইহাদের মধ্যে উদয়গিরি, খণ্ডগিরি এবং ধবলগিরি নানা প্রকার প্রাচীন তথ্যে পরিপূর্ণ, নীলগিরি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা ধবলগিরি বা ধৌলীর কতক পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতেছি।

ভুবনেশ্বর তীর্থ এককালে খণ্ডগিরি হইতে আরম্ভ করিয়া ধৌলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল—

"খণ্ডাচলং সমাসাদ্য যত্রান্তে কুণ্ডলেশ্বরঃ।
আসাদ্য বলহা দেবীঃ বহিরঙ্গেশ্বরাবধি।"

এই বহিরঙ্গেশ্বর ধৌলি পর্ব্বতেই অবস্থিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সুতরাং ধৌলি এককালে ভুবনেশ্বর তীর্থের অন্তর্গতই ছিল। কিন্তু ভুবনেশ্বর তীর্থ প্রসিদ্ধিলাভ করিবার বহু পূর্ব্ব হইতে ধৌলি যে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল সে-কথা জানা যায়। মহাভারতের বনপর্ব্বে পাণ্ডবদিগের তীর্থযাত্রায় কলিঙ্গ দেশে বৈতরণী পার হইয়া স্বয়ম্ভুবন ও সাগরোত্থিতা বিষ্ণুবেদীতে গমনের কথা আছে। এই স্বয়ম্ভুবন ভুবনেশ্বর ও সাগরোত্থিতা বেদী পুরীক্ষেত্র বলিয়া অনেকে মনে করেন। কোন্ সময় হইতে ভুবনেশ্বর প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন, কিন্তু কোন্ সময়ে ধৌলি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায়। মৌর্য্য-সম্রাট্ প্রিয়দর্শী অশোক ধৌলিকে প্রসিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ধৌলি পর্ব্বতগাত্রে খোদিত তাঁহার অনুশাসন তাহাই জানাইয়া দিতেছে। আমরা ধৌলির অবস্থানের ও তাহার বর্ত্তমান অবস্থার কথা বলিয়া তাহার পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনার চেষ্টা করিব।

ধবলগিরি বা ধৌলি পাহাড় উড়িষ্যার পুরী জেলার ভুবনেশ্বর হইতে ন্যূনাধিক তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে দয়া নদীর তীরে অবস্থিত। এই দয়া নদীর সহিত ভার্গবী নদী আসিয়া মিশিয়াছে। ভুবনেশ্বর হইতে পুরী রোড ধরিয়া পূর্ব্বমুখে আসিয়া দয়া নদী পার হইয়া ধৌলি যাইতে হয়। পুরী রোড দয়া নদী অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। উক্ত রোড হইতে দক্ষিণ দিকে নামিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ধৌলি গ্রাম হইয়া পাহাড়ে যাওয়া যায়। ধৌলি পাহাড়ের উত্তর-পূর্ব্বে ধৌলি গ্রাম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে কৌশল্যাপুর। ধৌলি পাহাড় তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত, উত্তর দিকের শ্রেণীই সর্ব্বোচ্চ। পাহাড়ে উঠিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে বেত-বন, সেই বেত-বনের মধ্য দিয়া পাহাড়ের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে গুহাগাত্রে অশোকের খোদিত লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। গুহাগাত্র মসৃণ করিয়া গিরিলিপি তিনটি সারিতে লিখিত হইয়াছে। পর্ব্বতের যে-ভাগে অশোক-লিপি খোদিত, তাহাকে অশ্বত্থামা পর্ব্বত বলে বলিয়া মিষ্টার কিট্টো উল্লেখ করিয়াছেন। এই কিট্টোই প্রথমে ধৌলির অশোক-লিপির আবিষ্কার করেন। ১৮৩৭ ও ৩৮ খৃঃ অব্দে তিনি দুই বার ধৌলিতে গমন করিয়াছিলেন, ধৌলি পাহাড়ে তখন ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তু বাস করিত। প্রথমবার তিনি একটি ভল্লুকী শিকার করেন, সে-বার তাহার দুইটি শাবক পলাইয়া যায়; দ্বিতীয় বারে তিনি সেই শাবক দুইটিকে বেশ বড় দেখিয়াছিলেন। এক্ষণে ধৌলি পাহাড়ে সেরূপ ভাবে কোন হিংস্র জন্তু বাস করে বলিয়া মনে হয় না, সময়ে সময়ে তাহাদের আগমন হইতে পারে। যে-গুহাগাত্রে অশোক-লিপি খোদিত, তাহার মাথা ভাঙিয়া যাওয়ায় এক্ষণে থাম দিয়া ছাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গুহার উপরে একটি হস্তীর অর্দ্ধাঙ্গ

খোদাই করিয়া নির্ম্মিত। এই হস্তিমূর্ত্তি বুদ্ধদেবের প্রতিরূপ বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। বুদ্ধদেব হস্তিরূপে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া যে একটি কথা প্রচলিত আছে, তাহাই স্মরণ করিয়া এই হস্তিমূর্ত্তি নির্ম্মিত হয় বলিয়া কাহারও কাহারও মত। মূর্ত্তির চারি পাশে নালা কাটা দেখিয়া বোধ হয় যে, পূর্ব্বে ইহার মাথার উপর কাষ্ঠনির্ম্মিত চাঁদোয়া দেওয়া হইত। এই হস্তিমূর্ত্তি কাহারও উপাস্য নহে, তবে বৎসরে একদিন গজানন দেবের প্রীত্যর্থে ইহার মস্তকে জল সেক ও সিন্দুর লেপন করা হইয়া থাকে। হস্তিমূর্ত্তির দক্ষিণে পাঁচটি গুহাকে পঞ্চ পাণ্ডব বা পঞ্চ গোস্বামী বলা হয়, তদ্ভিন্ন অসংখ্য গুহা পর্ব্বতগাত্রে বিদ্যমান। তাহার অনেকগুলি ধ্বংসমুখে পতিত। কোন কোন স্থানে গৃহভিত্তির চিহ্নও আছে। হস্তিমূর্ত্তি হইতে পশ্চিম দিকে কিছুদূর গমন করিলে মহাদেবের একটি ক্ষুদ্র মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। মহাদেবের চতুষ্কোণ গৌরী পীঠটি ভাঙিয়া গিয়াছে, তথাপি মহাদেবের পূজা হইয়া থাকে। নিকটে একটি কুণ্ড পাথর দিয়া বন্ধ। এইখান হইতে উত্তর দিকে পাহাড়ে উঠিলে পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ স্থানে একটি ভগ্ন মন্দিরের নিকট যাওয়া যায়। এই সর্ব্বোচ্চ স্থানটি পাহাড়ের উত্তর ভাগেই অবস্থিত। এই ভগ্ন মন্দির মধ্যে গৌরীপীঠহীন শিবলিঙ্গ। একটি দেবীমূর্ত্তিও আছে, তাহা মহিষমর্দ্দিনী বলিয়াই বোধ হয়। লোকে তাহাতে চন্দন, সিন্দুর, ফুল, বিল্বপত্র দিয়া থাকে। এই উচ্চ পাহাড়ের পশ্চিম দিকে গণেশের মন্দির, গণেশের রীতিমত পূজা হয়, যাত্রীসমাগমও হইয়া থাকে। গণেশের মন্দিরের নিকট দিয়া দয়া নদী বহিয়া যাইতেছে। পর্ব্বতে দুইটি প্রকাণ্ড গহ্বর আছে, একটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, অপরটির কতক দূর যাওয়া যায়, কিন্তু তাহার পথ এত সঙ্কীর্ণ ও চামচিকার মলে পরিপূর্ণ যে তাহার মধ্যে প্রবেশ করাই কঠিন। পর্ব্বতে কোন বৃক্ষ নাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেত ও অন্যান্য কাঁটা গাছ মধ্যে মধ্যে জন্মিয়াছে। পাহাড়ের নিকটস্থ ধৌলিগ্রামে অনেক ভগ্ন গৃহাদির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে বোধ হয় যে ধৌলি এককালে একটি সমৃদ্ধ নগর ছিল। এই ভগ্নস্তূপগুলি খনন করিলে অনেক পুরাতত্ত্বের আবিষ্কার হইতে পারে।

ধৌলি পাহাড়ের নিকট একটি প্রকাণ্ড দীঘি অবস্থিত, তাহাকে কৌশল্যা-গাঙ্গ বলে, এক্ষণে ইহা জঙ্গলে আবৃত। এই দীঘি এককালে দয়া নদীর সহিত খাল দ্বারা যুক্ত ছিল, এবং তাহা জলে পরিপূর্ণ হইত। খাল এক্ষণে পূরিয়া উঠিয়াছে, খালের উপর কতকগুলি পাথরের সাঁকো ছিল। দীঘির মধ্যে একটি দ্বীপ আছে, তাহাতে প্রাসাদাদির চিহ্ন দেখা যায়। গঙ্গেশ্বরদেব ও তাঁহার কন্যা কৌশল্যার নামে এই কৌশল্যা-গাঙ্গ খনিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কি সূত্রে এই দীঘি খনিত হয়, সে-সম্বন্ধে এক কুৎসিত গল্প প্রচলিত আছে, রাজা ও তাঁহার কন্যার অবৈধ সম্বন্ধ সেই গল্পের মূল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে গঙ্গেশ্বরদেব কর্তৃক কৌশল্যা-গাঙ্গের খনন হয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথ বসু তাহাকে চোড়গঙ্গ গঙ্গেশ্বর বলেন। কিন্তু কোন্ গঙ্গেশ্বরদেবের সময় ইহা খনিত হয় তাহা স্থির করিয়া বলা কঠিন।

এইবার আমরা ধৌলি-অনুশাসন ও ধৌলির পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনার চেষ্টা করিতেছি। মৌর্য্য-সম্রাট প্রিয়দর্শী অশোক তাঁহার প্রজাবর্গ ও তাঁহার রাজ্যের সন্নিহিত রাজাদের প্রজাগণের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য পর্ব্বতগাত্রে কতকগুলি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র অনুশাসন এবং স্তম্ভগাত্রে ও গুহামধ্যে কতকগুলি অনুশাসন খোদিত করিয়াছিলেন। পর্ব্বতগাত্রে খোদিত বৃহত্তর অনুশাসনগুলি চৌদ্দ দফায় লিখিত, এইজন্য ইহাদিগকে চতুর্দ্দশ গিরিলিপি বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই চতুর্দ্দশ গিরিলিপি প্রধানতঃ ছয়টি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়,—যথা (১) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পেশোয়ার জেলার য়ুসুফজাই মহকুমার শাহবাজগড়িতে, (২) উক্ত সীমান্ত প্রদেশের হাজরা জেলার মনসেরায়, (৩) যুক্ত-প্রদেশের দেরাদুন জেলার কলসীতে, (৪) কাঠিয়াবাড়ের জুনাগড় নগরের নিকটস্থ গির্ণার পর্ব্বতে, (৫) ধৌলিতে এবং (৬) মান্দ্রাজের গঞ্জাম জেলার জৌগড়ে। এই ছয়টি ব্যতীত কয়েক বৎসর হইল বোম্বাই প্রদেশের ঠানা

জেলার সোপারা নামক স্থানে অষ্টম গিরিলিপির কতকাংশ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। এই চতুর্দ্দশ গিরিলিপির মধ্যে ধৌলি ও জৌগড়ে একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অনুশাসন নাই, কিন্তু দুইটি স্বতন্ত্র অনুশাসন তাহাদের পরিবর্ত্তে খোদিত হইয়াছে। এই দুইটি পৃথক্ অনুশাসন স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগকে লক্ষ্য করিয়াই লিখিত। যে তিন সারিতে অশোকের অনুশাসনগুলি খোদিত, তাহার মধ্য সারির সমস্ত অংশে, দক্ষিণ সারির অর্দ্ধাংশে চতুর্দ্দশ গিরিলিপির একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ লিপি ব্যতীত অবশিষ্ট কয়েকটি অর্থাৎ প্রথম হইতে দশম ও চতুর্দ্দশ গিরিলিপি খোদিত আছে। পৃথক্ অনুশাসন দুইটির মধ্যে প্রথমটি দক্ষিণ সারির অবশিষ্ট অংশ এবং দ্বিতীয়টি বাম সারি ব্যাপিয়া স্থানলাভ করিয়াছে। চতুর্দ্দশ গিরিলিপির ত্রয়োদশ অনুশাসনে অশোকের কলিঙ্গ-বিজয়ের কথা আছে। ধৌলি ও জৌগড় কলিঙ্গ-রাজ্যমধ্যে অবস্থিত হওয়ায় সে-দেশের লোকের মনে তাহার স্মৃতি উদয় না করার জন্য বোধ হয় উক্ত অনুশাসনটি এই দুই স্থানে খোদিত হয় নাই, কিন্তু একাদশ ও দ্বাদশ অনুশাসন খোদিত না হওয়ার কারণ বুঝা যায় না।

ধৌলির অনুশাসনগুলি ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত। অশোকের সময় ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী, দুই প্রকার অক্ষর প্রচলিত ছিল। শাহবাজগড়ি ও মনসেরা লিপির অক্ষর খরোষ্ঠী, অন্যান্য স্থানের অক্ষর ব্রাহ্মী। ব্রাহ্মী বাম হইতে দক্ষিণ দিকে ও খরোষ্ঠী দক্ষিণ হইতে বাম দিকে লিখিত হইত। ব্রাহ্মী ভারতবর্ষেই আবিষ্কৃত হয়। খরোষ্ঠী ভারতের বাহির হইতে আসিয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, ব্রাহ্মীই এদেশের সকল অক্ষরের প্রসূতি। ধৌলি-অনুশাসনের ভাষা মধ্যদেশীয় প্রাকৃত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অশোকের সময় তাঁহার রাজ্যমধ্যে উত্তরাপথ, দক্ষিণাপথ ও মধ্যদেশের প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। ধৌলি ও জৌগড় গিরিলিপিতে সম্পূর্ণভাবে এবং কলসীতে প্রায়ই সম্পূর্ণভাবে মধ্যদেশীয় প্রাকৃত দেখা যায়। শাহবাজগড়ি ও মনসেরায় কতক কতক উত্তরাপথের এবং গির্ণারে কতক কতক দক্ষিণাপথের ভাষা মিশ্রিত বলিয়া মনে হয়। অনুশাসনগুলি প্রথমে মধ্যদেশের ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। মৌর্য্য-রাজধানী পাটলীপুত্র মধ্যদেশের মধ্যেই অবস্থিত ছিল। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনুশাসনগুলি উৎকীর্ণ হওয়ার সময় সেই সেই স্থানের কতক কতক ভাষা তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। অশোকের মৃত্যুর পর এই অনুশাসনের ভাষার আদর্শে একটি সাধারণ ভাষা সৃষ্টির চেষ্টা হইয়াছিল। আমরা উপরে যাহা উল্লেখ করিলাম, দেবদত্ত ভাণ্ডারকর উহাই বলেন। কিন্তু তাঁহার কথিত মধ্যদেশের সহিত মনুসংহিতায় উক্ত মধ্যদেশের ঐক্য হয় না। মনুসংহিতার মতে, হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যে বিনশন অর্থাৎ সরস্বতীর অন্তর্দ্ধান প্রদেশের পূর্ব্বে ও প্রয়াগের পশ্চিমে মধ্যদেশ। তাহা হইলে মনুসংহিতার মতে মগধ মধ্যদেশের মধ্যে পড়ে না। অবশ্য সময়ে সময়ে প্রদেশ-বিভাগে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। মৎস্য-পুরাণে কুরু পাঞ্চাল, মথুরা, মৎস্য, কিরাত, কাশী, কোশল, আবন্ত্য, কলিঙ্গ প্রভৃতি মধ্যদেশের অন্তর্গত দেখা যায়। আমরা প্রথমে ধৌলির প্রথম দশটি অনুশাসন ও চতুর্দ্দশ অনুশাসনের মর্ম্ম দিয়া তাহার পৃথক্ অনুশাসন দুইটির কথা উল্লেখ করিতেছি। ধৌলি-অনুশাসন স্থানে স্থানে নষ্ট হইয়া যাওয়ায় অন্যান্য স্থানের সহিত মিলাইয়া মর্ম্ম প্রদত্ত হইল।

প্রথম অনুশাসন

দেবতাদের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী (অশ্বত্থামা) পর্ব্বতে এই ধর্ম্মলিপি উৎকীর্ণ করাইলেন। এখানে কোন জীব বলি বা যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত হইবে না। অথবা কোনরূপ সমাজের অনুষ্ঠান হইবে না। রাজা প্রিয়দর্শী সমাজের অনুষ্ঠানে অনেক দোষ দেখিয়া থাকেন, তবে একটি সমাজকে তিনি ভাল মনে করেন। পূর্ব্বে রাজা প্রিয়দর্শীর পাকশালায় প্রত্যহ বহু শত সহস্র জীব ব্যঞ্জনের জন্য নিহত হইত। কিন্তু এই ধর্ম্মলিপি লিখিত হওয়ার সময় তিনটি জন্তু দুইটি ময়ূর ও একটি মৃগ হত হইতেছিল, মৃগটি

নিশ্চয়রূপে হত হয় না। পশ্চাৎ এ তিনটি প্রাণীও হত হইবে না।*

* যে পর্ব্বতে ধৌলিলিপি খোদিত হয় তাহার অক্ষর নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ঐ পর্ব্বতকে অশ্বথামা বলায় আমরা লিপিতে তাহাই ছিল বলিয়া মনে করি। অশোক যে প্রিয়দর্শী তাহা সিংহলের দ্বীপবংশ বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে। নিজাম-রাজ্যের মাস্কি নামক স্থানে ক্ষুদ্র গিরিলিপিতে অশোকের স্পষ্ট নামই আছে। 'প্রিয়দর্শী' উপাধি বলিয়াই বোধ হয়। অশোকের পৌত্র দশরথও আপনাকে প্রিয়দর্শী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত প্রিয়দর্শন বা প্রিয়দর্শী নামে অভিহিত হইতেন।

এখানে কোন জীব বলি বা যজ্ঞে উৎসর্গ হইবে না—'এখানে' অর্থে পাটলীপুত্রে বুঝাইতেছে। কেহ কেহ এ জগৎও অর্থ করিয়া থাকেন, কিন্তু পাটলীপুত্র হওয়াই সম্ভব। মূল লিপিতে 'হিদ' (সংস্কৃত 'ইহ') আছে।

সমাজ দুই প্রকার ছিল। এক, ভোজনোৎসব, তাহাতে মাংসই প্রধান খাদ্য ছিল। দ্বিতীয় নৃত্য, গীত, বাদ্য, আমোদোৎসব। একটি মাত্র সমাজ অর্থাৎ ধর্ম্মের জন্য অনুষ্ঠিত সমাজকেই অশোক ভাল মনে করিতেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজাদের সমাজ, উৎসব ও বিহার অনুষ্ঠানের কথা আছে।

ব্যঞ্জনের জন্য শত সহস্র প্রাণীর হত্যা সাধারণের মধ্যে মাংস বিতরণের জন্যই হইত।

অশোক 'এখানে' সকলপ্রকার প্রাণিহিংসা নিবারণের কথা বলিতেছেন। ইহা তাঁহার পাটলীপুত্রে পরিবারবর্গের জন্য ব্যবস্থা বলিয়া মনে হয়। কারণ তাঁহার পঞ্চম স্তম্ভলিপিতে দেখা যায় যে, তিনি তাঁহার রাজত্বের ষড়্‌বিংশ বর্ষে কতকগুলি জন্তুকেই অবধ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। যথা—শুক, শারিকা, অরুণচক্রবাক্‌, হংস, নন্দীমুখ, গিলাট, চামচিকা, পিপীলিকা, কূর্ম্ম, অস্থিহীন মৎস্য, বেদবাক, গঙ্গাপুপুটক, শঙ্করমৎস্য, কচ্ছপ, শজারু, শশকের মত কাঠবিড়ালী, সৃমরমৃগ, ষণ্ড, গৃহস্থিত কৃমিকীট, গণ্ডার, শ্বেতকপোত, গ্রামকপোত এবং যে সকল চতুষ্পদ প্রাণী কোন ব্যবহারে আসে না বা ভক্ষিত হয় না,ছাগী, ভেড়ী, শূকরী গর্ভিণী বা দুগ্ধবতী হইলে অবধ্য। ছয় বৎসরের অনধিক বৎসও অবধ্য। এই সকল প্রাণীর মধ্যে এক্ষণে কতকগুলিকে বুঝিতে পারা যায় না। বিশেষ বিশেষ প্রাণিহত্যা নিষিদ্ধ হওয়ায় সাধারণের মধ্যে যে একেবারে প্রাণিহত্যা নিষিদ্ধ হয় নাই ইহা হইতে তাহা বুঝা যাইতেছে।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও এইরূপ কতকগুলি প্রাণিহত্যা নিষিদ্ধ আছে। যথা—"সামুদ্রহস্ত্যশ্বপুরুষবৃষগর্দ্দভাকৃতয়ো মৎস্যাঃ সারসা নাদেয়াস্তটাককুল্যোদ্ভবা বা। ক্রৌঞ্চোৎক্রোশকদাত্যূহহংসচক্রবাক-জীবঞ্জীবক ভৃঙ্গরাজচকোরমত্তকোকিলময়ূরশুকমদনশারিকা বিহারপক্ষিণো মঙ্গল্যাশ্চান্যেপি প্রাণিনঃ পক্ষিমৃগাহিংসাবাধেভ্যো রক্ষ্যাঃ।" অর্থশাস্ত্র, ২ অধি, ২৬ অ, ৪৩ প্রক।

মনুসংহিতাতে অভক্ষ্য প্রাণীর মধ্যে এইরূপ কতকগুলি প্রাণীর কথা বলা হইয়াছে—

"ক্রব্যাদান্ শকুনীন্ সর্ব্বাংস্তথা গ্রামনিবাসিনঃ।
অনির্দ্দিষ্টাংশ্চৈকশফাংষ্টিট্টিভঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
কলবিঙ্কং প্লবং হংসং চক্রাঙ্গং গ্রামকুক্কুটম্।
সারসং রজ্জুবালঞ্চ দাত্যূহং শুকসারিকে।

দ্বিতীয় অনুশাসন

দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা তাঁহার রাজ্যের সর্ব্বত্র ও প্রত্যন্তবাসীদের রাজ্যমধ্যে যেমন চোড়, পাণ্ড্য, সতিয়পুত্র, কেরলপুত্র এমন কি তাম্রপর্ণী পর্য্যন্ত এবং অন্তিয়োক নামা যবনরাজের এবং তাঁহার সমীপবর্ত্তী রাজগণের রাজ্যে দুই প্রকার চিকিৎসার—মনুষ্য-চিকিৎসা ও পশু-চিকিৎসার—ব্যবস্থা করিয়াছেন। যেখানে যেখানে মনুষ্য-পশুর উপকারক ঔষধ ও ফলমূল নাই, সেই সেই স্থানে ঐ সকল আনাইয়া রোপিত করা হইয়াছে। পথিপার্শ্বে মনুষ্য ও পশুদিগের উপভোগের জন্য কূপ খনন ও বৃক্ষ রোপিতও হইয়াছে। *

তৃতীয় অনুশাসন

দেবতাদিগের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী তাঁহার রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে আদেশ দিয়াছিলেন যে, তাঁহার রাজ্যের সর্ব্বত্র যুক্ত, রজ্জুক ও প্রাদেশিকগণ ধর্ম্মোপদেশ প্রচার ও অন্যান্য কর্ম্মের জন্য প্রতি পঞ্চম বৎসরে পরিদর্শনে বাহির হইবেন।

তাঁহারা প্রচার করিবেন যে মাতাপিতার শুশ্রূষা, মিত্র, পরিচিত, জ্ঞাতি, ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণদিগকে দান, প্রাণি-হিংসা হইতে বিরতি সাধু কার্য্য। মিতব্যয়িতা ও

প্রতুদান্ জালপাদাংশ্চ কোয়ষ্টিনখবিষ্কিরান্।
নিমজ্জতশ্চ মৎস্যাদান্ সৌনং বল্লূরমেব চ।
বকঞ্চৈব বলাকঞ্চ কাকোলং খঞ্জরীটকম্।
মৎস্যাদান্ বিড়বরাহাংশ্চ মৎস্যানেব চ সর্ব্বশঃ।
৫ম অধ্যায় ১১ - ১৪

আবার একাদশ অধ্যায়ে প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে অভক্ষ্য মাংস ভক্ষণের ও অন্যান্য প্রাণিবধের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অন্যান্য স্মৃতিতেও প্রাণিবধ সম্বন্ধে ঐরূপ ব্যবস্থা আছে। তবে স্মৃতিতে কোন কোন প্রাণিভক্ষণের ব্যবস্থা থাকিলেও অশোক তাহাদের কোন কোনটি নিষেধ করিয়াছেন। ফলতঃ অশোকের পূর্ব্ব হইতে এইরূপ প্রাণিবধ নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিতেছে। আর অশোক সাধারণের মধ্যে একেবারে প্রাণিবধ নিষেধ করেন নাই।

* এই অনুশাসনে যে-সকল প্রত্যন্ত রাজ্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে চোড়, পাণ্ড্য, সতিয়পুত্র, কেরলপুত্র দাক্ষিণাত্যে, তাম্রপর্ণী সিংহল এবং অন্তিয়োক (Antiochus) নামক গ্রীকরাজ ও তাঁহার সমীপবর্ত্তী রাজাদের রাজ্য উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ছিল।

মিতসঞ্চয় প্রশংসনীয়। অমাত্য পরিষদ্ যুক্তদিগকে ব্যয় ও সঞ্চয়ের হিসাব রাখিতে বলিবেন।*

চতুর্থ অনুশাসন

বহুদিন—শত শত বৎসর—অতীত হইল প্রাণিহিংসা, জীবগণের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার, জ্ঞাতি, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের প্রতি অসাধু ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছিল। কিন্তু এক্ষণে দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার ধর্ম্মাচরণে ভেরীনিনাদ ধর্ম্মঘোষণায় পরিণত হইয়াছে। বিমান-দর্শনে, হস্তিদর্শনে অগ্নিস্কন্ধ ও অন্যান্য দিব্যরূপ দেখাইয়া প্রজাগণের ধর্ম্মপ্রাণতা বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে। প্রিয়দর্শী রাজার ধর্ম্মানুশাসনে প্রাণিহত্যা, জীবগণের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণ, জ্ঞাতি, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের প্রতি সাধু ব্যবহার, মাতাপিতার শুশ্রূষা, বয়োবৃদ্ধের সেবা প্রভৃতি বহুপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান বর্দ্ধিত হইবে এবং রাজা প্রিয়দর্শী ইহা প্রসারিত করাইবেন। তাঁহার পুত্র প্রপৌত্রগণ ইহা কল্পান্ত পর্য্যন্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সৎস্বভাব হইয়া বর্দ্ধিত ও প্রচার করিবেন। ধর্ম্মদান শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। দুঃশীলের পক্ষে ধর্ম্মদান ও ধর্ম্মাচরণ সম্ভব নয়। ধর্ম্মাচরণের বৃদ্ধি প্রার্থনীয়। এই উদ্দেশ্যের প্রসার হউক। ইহার হীনতা মনোযোগ সহকারে আলোচ্য। রাজ্যাভিষেকের দ্বাদশ বর্ষে এই লিপি লিখিত হইল।†

পঞ্চম অনুশাসন

রাজা প্রিয়দর্শী এইরূপ বলিতেছেন—কল্যাণসাধন দুষ্কর, কল্যাণসাধন করিতে গেলে কষ্টকরই হইয়া থাকে। আমি অনেক কল্যাণসাধন করিলাম। আমার পুত্র পৌত্র ও কল্পান্ত পর্য্যন্ত যে-সকল বংশধর জন্মিবে, তাহারা আমাকে অনুসরণ করিয়া সাধু কার্য্য করিবে। কিন্তু কেহ ইহার একাংশ পরিত্যাগ করিলেও অন্যায় করিবে। কারণ, পাপ সহজেই করা হয়। পূর্ব্বে অনেক দিন কোন ধর্ম্মমহামাত্র ছিল না। আমার অভিষেকের ত্রয়োদশ বৎসরে আমি ধর্ম্মমহামাত্র নিযুক্ত করিয়াছি। তাঁহারা সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মপালন ও ধর্ম্মোন্নতির এবং ধার্ম্মিকগণের হিতসুখের জন্য নিযুক্ত। যবন, কাম্বোজ, গান্ধার, রাষ্টিক পিটনিক প্রভৃতি আমার রাজ্যের নিকটবর্ত্তী জাতিদিগেরও হিতসুখের জন্য ব্যাপৃত। তাঁহারা সৈনিক (ক্ষত্রিয়) ব্রাহ্মণ, বণিক্ (বৈশ্য), অনাথ বৃদ্ধদিগের হিতসুখের জন্য এবং ধার্ম্মিক প্রজাদের বাধা দূর করিবার জন্য নিযুক্ত। যাহারা দণ্ডিত হইয়া বদ্ধ, বহু সন্তানের জনক, অত্যাচার-প্রপীড়িত এবং বৃদ্ধ তাঁহারা তাহাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করিবেন। তাহারা এই পাটলীপুত্রে এবং অন্যান্য নগরে আমার ভ্রাতা, ভগিনী ও জ্ঞাতিদিগের অন্তঃপুরেও নিযুক্ত আছেন। সেই ধর্ম্মমহামাত্রগণ আমার রাজ্যের সর্ব্বত্র ধর্ম্মসংক্রান্ত সকল বিষয়ে ধর্ম্ম পরিদর্শনে এবং ধর্ম্মদানে ব্যাপৃত আছেন। এই ধর্ম্মলিপির উদ্দেশ্য এই যে, ইহা চিরস্থায়ী হউক এবং আমার প্রজাবর্গ এইমত কার্য্য করিতে থাকুক *

ষষ্ঠ অনুশাসন

দেবতাদের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী এইরূপ বলিতেছেন যে, পূর্ব্বে সব সময়ে সংবাদ প্রেরণ বা সকল কার্য্যের সংবাদ প্রদত্ত হইত না। এখন আমি নিয়ম করিয়াছি যে, সকল সময়ে, সকল স্থানে, কি ভোজন সময়ে, কি অন্তঃপুরে অবস্থিতি সময়ে, কি নিভৃত কক্ষে, কি রাজকীয় অশ্বশালায়, কি অশ্বপৃষ্ঠে, প্রমোদকাননে সর্ব্বত্রই বার্ত্তাহরগণ প্রজাদিগের

* যুক্ত=রাজস্বকর্ম্মচারী, প্রাদেশিক=পুলিস ও জজ, রজ্জুক=জমিবন্দোবস্তকারী (settlement officer)।

† সাধারণ লোককে কোন কিছু শোভাযাত্রা না দেখাইলে তাহাদের মন আকৃষ্ট হয় না। এই জন্য ধর্ম্মাচরণের পর তাহাদের স্বর্গে গতি হইলে তাহারা যে-সকল দ্রব্য লাভ করিতে পারে, তাহাই তাহাদিগকে দেখাইবার ব্যবস্থা করা হয়। বিমান, হস্তী এ সকল স্বর্গে গমন করিলে লাভ হয়। অগ্নিস্কন্ধ বা জ্যোতিস্কন্ধ প্রদর্শনের অর্থ স্বর্গে ঐরূপ জ্যোতি বা তেজোযুক্ত শরীর লাভ হয়।

* এই ধর্ম্মমহামাত্র নিযুক্ত করা অশোকের ধর্ম্মপ্রচারের এক প্রধান কার্য্য। যাহাতে সকল সম্প্রদায় স্ব স্ব ধর্ম্মমতানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারে, ধর্ম্মমহামাত্র নিযুক্ত করিয়া অশোক তাহার পরিদর্শনের ব্যবস্থা করেন। তাঁহার যে ধর্ম্ম বিষয়ে সাম্প্রদায়িকতা ছিল না ইহা হইতে তাহা বুঝা যায়। তাঁহার দ্বাদশ অনুশাসনে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রদর্শনের কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

কথা জানাইবে। আমি ঘোষণার জন্য যে-কোন মৌখিক আদেশ প্রদান করিয়া থাকি বা মহামাত্রদিগের প্রতি শীঘ্র সম্পাদ্য আদেশ দিয়া থাকি, তাহা অমাত্য পরিষদে কতকের বা সকলের মতবিরুদ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ আমাকে জানাইতে হইবে। আমার কৃত পরিশ্রম ও রাজকার্য্য আমি পর্য্যাপ্ত বলিয়া সন্তুষ্ট নহি। সকল প্রজার কল্যাণ-সাধনই আমি আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। অধ্যবসায় ও কর্ম্ম সম্পাদনই তাহার মূল। জগতের হিত-সাধন ভিন্ন মহত্তর কার্য্য আর কিছু নাই। আমি সকল প্রাণীর ঋণপরিশোধের জন্য তাহাদিগের সুখ ও পরজগতে তাহাদের স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য সামান্য চেষ্টা করিয়াছি। এই ধর্ম্মলিপি এই উদ্দেশ্যে লিখিত হইল যে, ইহা চিরকাল অবস্থিতি করুক। আমার পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রগণ সকল লোকের হিতের জন্য ব্যাপৃত থাকুক। উদ্যমের পরাকাষ্ঠা ব্যতীত ইহা সুসম্পন্ন করা কঠিন।*

সপ্তম অনুশাসন

রাজা প্রিয়দর্শী ইচ্ছা করেন যে, সর্ব্বত্র সকল সম্প্রদায় বাস করুক। তাহারা সকলেই সংযম ও ভাবশুদ্ধি লাভে ইচ্ছা করে। লোকেরা নানারূপ রুচি ও অনুরাগসম্পন্ন, তাহারা সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে ধর্ম্মপালন করে। যাহার সংযম, ভাবশুদ্ধি, কৃতজ্ঞতা বা দৃঢ় ভক্তি নাই সে বিপুল দান করিলেও নীচ।†

অষ্টম অনুশাসন

বহুদিন হইতে রাজারা বিহার যাত্রা করিতেন, তাহাতে মৃগয়া ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ হইত। দেবতাদের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শীর রাজ্যাভিষেকের দশম বর্ষে তিনি সম্বোধি (বোধিতরু) দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। তদবধি এই ধর্ম্মযাত্রার ব্যবস্থা। ইহাতে এই সব হয়—ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের দর্শন ও দান, স্থবির-দিগের দর্শন, স্বর্ণ বিতরণ, জনপদবাসীদের দর্শন, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্মজিজ্ঞাসা। অন্যান্য আমোদের স্থানে ইহাই দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শীর পুনঃপুনঃ আনন্দের কারণ হইয়াছে।

নবম অনুশাসন

দেবতাদের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী এইরূপ বলিতেছেন—আপৎকালে, পুত্র কন্যার বিবাহে, পুত্রজন্মে, প্রবাস যাত্রাকালে বা অন্যান্য কার্য্যে নানাপ্রকার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। মহিলারাও বহুল পরিমাণে অনেক প্রকার সামান্য ও নিরর্থক মাঙ্গলিক কার্য্য করেন। মঙ্গলানুষ্ঠান কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু ঐরূপ মঙ্গলানুষ্ঠান প্রায়ই নিষ্ফল হয়, ধর্ম্মমঙ্গল মহাফলপ্রদ। দাস ভৃত্যদের প্রতি সদয় ব্যবহার, গুরুজনের পূজা, প্রাণিদের প্রতি অহিংসা, ব্রাহ্মণ শ্রমণদিগকে দান প্রভৃতি সাধুকার্য্য। এইরূপ অন্যান্য কার্য্যকে ধর্ম্মমঙ্গল বলে। পিতা পুত্র ভ্রাতা ও প্রভুর বলা উচিত যে, এই সকল কার্য্য সাধু। অভীষ্টসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত এ সকল কার্য্য করা উচিত। আরও বলা উচিত যে, দান করা সাধুকার্য্য। কিন্তু ধর্ম্মদান ও ধর্ম্মানুগ্রহের সহিত কোন দান ও অনুগ্রহের তুলনা হয় না। সেই জন্য মিত্র সুহৃদ জ্ঞাতি সহায় সকলের বলা উচিত যে, ইহা কর্ত্তব্য, ইহা সাধু। ইহার দ্বারা স্বর্গের আরাধনা হয়। ইহার দ্বারা স্বর্গলাভ হয় বলিয়া ইহা অপেক্ষা আর কোন শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য নাই।

দশম অনুশাসন

দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা যশ বা কীর্ত্তিকে মহাফলপ্রদ মনে করেন না। তাঁহার প্রজারা ধর্ম্ম শ্রবণ ও ধর্ম্মাচরণ করুক এই উদ্দেশ্যপ্রসূত যশ ও কীর্ত্তিরই তিনি ইচ্ছা করেন। প্রিয়দর্শী রাজা যাহা-কিছু অনুষ্ঠান করেন পরজগতেরই জন্য। কিরূপ? সকলে অল্প পরিশ্রমযুক্ত ও বিপদশূন্য হউক। পাপই একমাত্র বিপদ। ক্ষুদ্র ও মহৎ সকলেরই পক্ষে একান্ত চেষ্টা ও সর্ব্বত্যাগ ব্যতীত নিষ্পাপত্ব লাভ দুষ্কর।

---

* কেহ কেহ রাজকীয় অশ্বশালার স্থানে শৌচাগার ও অশ্বপৃষ্ঠের স্থানে শিবিকারোহণে বলিয়া থাকেন। মূলে 'বচসি' ও 'বিনিতসি' আছে। ভাণ্ডারকর ইহাদের অর্থ অশ্বশালা ও অশ্বপৃষ্ঠ করিয়াছেন।

† এই অনুশাসন হইতেও অশোকের সকল ধর্ম্মের প্রতি সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়।



চতুর্দ্দশ অনুশাসন

এই ধর্ম্মলিপি দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা লিখাইয়াছেন। এই লিপি কোথাও সংক্ষিপ্ত, কোথাও মধ্যমাকারে, কোথাও বা বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। সর্ব্বত্র সকল সম্ভবপর নহে, আমার রাজ্যও বহু বিস্তৃত। আমি অনেক লিখাইয়াছি ও অনেক লিখাইব। স্থানে স্থানে পুনঃপুনঃ বলা হইয়াছে, কেবল ঐ সকল অর্থের মধুরতার জন্য। কি উদ্দেশ্যে? প্রজারা ঐরূপ করুক। কোথাও কোথাও অসম্পূর্ণ লেখা হইয়াছে, উহা সে দেশের জন্য হউক, কিংবা বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক হউক, অথবা লিপিকর-প্রমাদই হউক।

পৃথক্ অনুশাসন

প্রথম

দেবতাদের প্রিয়ের বাক্যানুসারে তোসলির মহামাত্র ও নগরব্যবহারককে এইরূপ বলিবে—আমি ইচ্ছা করি আমার মত প্রচারিত হউক ও সকলে সেইমত কার্য্য করুক। তোমাদের প্রতি উপদেশ আমার উদ্দেশ্য-সাধনের মুখ্য উপায়। তোমরা বহু সহস্র জীবের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত আছ। তোমরা সজ্জনদিগের প্রীতি আকর্ষণের চেষ্টা করিবে। সকল মনুষ্যই আমার সন্তান-তুল্য, আমার সন্তানগণের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল ও সুখেচ্ছার ন্যায় আমি সকল মনুষ্যের জন্যই তাহা প্রার্থনা করি। তোমরা হয়ত সম্যক্‌রূপে আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পার নাই, কেহ কেহ হয়ত আংশিকভাবে বুঝিয়াছ। যাহাতে আমার অভিপ্রেত-নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে। কোন লোকের বন্ধন বা অন্য প্রকার দৈহিক দণ্ড ঘটিলে, অথবা বন্ধনদশায় কাহারও মৃত্যু হইলে অনেক লোকে দুঃখপ্রাপ্ত হয়। দণ্ডদান সম্বন্ধে তোমরা মধ্যপথ অবলম্বন করিবে। এই সকল কারণে সফলতা লাভের বিঘ্ন ঘটে, যথা—ঈর্ষা, অধ্যবসায়হীনতা, নিষ্ঠুরতা, লঘুতা, অনুৎসাহ, আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা। যাহাতে তোমাদের এ সকল দোষ না থাকে সেইরূপ চেষ্টা করিবে। আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধি করিতে হইলে অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন। অলস ব্যক্তি কখনও উৎসাহযুক্ত হয় না, সকলের অগ্রসর হইবার চেষ্টা করা উচিত। তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। তোমাদিগকে বলা যাইতেছে যে, তোমরা মনে রাখিবে, এই সকল উপদেশ দেবতাদের প্রিয়ের অনুশাসন। ইহার পালনে বিশেষ ফললাভ, ব্যতিক্রমে বিশেষ অশুভ। যাহারা আদেশপালনে অকৃতকার্য্য হয় তাহাদের স্বর্গারাধনা ও রাজারাধনা উভয়ই হয় না। সম্যক্‌রূপে ইহা পালন না করিলে আমার সন্তোষ লাভ করিতে পারিবে না, বিশেষরূপে পালন করিলে স্বর্গলাভ করিবে ও আমার নিকট অঋণী হইবে। প্রতি তিষ্য (পুষ্যা) দিবসে এই লিপি শ্রবণ করাইবে, অবসরমত অন্ততঃ একজনকেও শুনাইবে। এইরূপে আমার অভিপ্রায়সিদ্ধির চেষ্টা করিবে। এই উদ্দেশ্যে ইহা লিখিত হইল যে, নগরব্যবহারক সর্ব্বদাই দেখিবে যে, নগরবাসীদিগের অকারণে অবরোধ বা কায়িক দণ্ডভোগ না ঘটে। এই উদ্দেশ্যে আমি প্রতি পঞ্চম বৎসরে ধীর, ক্রোধশূন্য, হিংসাবিরত প্রচারক-গণকে চারিদিকে আমার আদেশ প্রচারের জন্য পাঠাইব, তাঁহারা আমার উদ্দেশ্য জ্ঞাত হইয়া আমার উপদেশানুসারে কার্য্য করিবেন। উজ্জয়িনী হইতে প্রতি তিন বৎসরে কুমার এইরূপ প্রচারক পাঠাইবে, তক্ষশিলা হইতেও এইরূপ হইবে। প্রচারকগণ চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া কর্ত্তব্যপালনের চেষ্টা করিবেন। রাজাদেশে তাঁহারা কার্য্য করিতেছেন ইহাই তাঁহারা স্মরণ রাখিবেন।

দ্বিতীয়

দেবতাদের প্রিয়ের বচনানুসারে তোসলির কুমার এবং মহামাত্রদিগের প্রতি বক্তব্য যে, আমার মত প্রচারিত হউক, এবং সকলে তদনুসারে কার্য্য করুক। তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ আমার উদ্দেশ্যসাধনের মুখ্য উপায়। সকল মনুষ্যই আমার সন্তানতুল্য। আমার সন্তানগণের মঙ্গল ও সুখলাভের ন্যায় আমি সকল মনুষ্যেরই ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকার সুখেরই ইচ্ছা করি। তোমরা যদি জানিতে চাহ যে, অবিজিত প্রত্যন্ত-

বাসীদের প্রতি তোমাদের রাজার কি আদেশ? এ বিষয়ে আমার অভিপ্রায় জানিবে যে, আমি ইচ্ছা করি, তাহারা নিরুদ্বেগে থাকুক, আমার প্রতি আশ্বস্ত হউক। তাহারা আমার নিকট হইতে সুখভোগ করিবে, কখনও দুঃখ প্রাপ্ত হইবে না। রাজা তাহাদের প্রতি ক্ষমাশীলই হইবেন। একথা তাহারা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করুক। তাহারা অন্ততঃ আমার জন্য ধর্ম্মাচরণ করুক, ইহার দ্বারা তাহাদের ইহ-পরকালের আরাধনা হইবে। এই উদ্দেশ্যে তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি, তোমরা আমার উপদেশ বুঝিয়া আমার অভিপ্রায় জ্ঞাত হও। আমার যাহা ধারণা ও অচল প্রতিজ্ঞা তাহাও অবগত হও। তোমরা এইরূপ কার্য্য করিয়া প্রত্যন্তবাসীদিগকে আশ্বস্ত করিতে থাক। তাহারা যেন বুঝিতে পারে রাজা তাহাদের পিতৃতুল্য। তোমাদিগকে এই উপদেশ দিয়া আমার অভিপ্রায় জানাইলাম। নিম্নতন কর্ম্মচারীরাও এইরূপ উপদেশ লাভ করিবে। ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল ও সুখের জন্য সকল জাতিকে আমার উপর নির্ভর করাইতে তোমরা চেষ্টা করিবে। ঐরূপ করিলে তোমরা স্বর্গলাভ করিবে এবং আমার নিকট তোমাদের কর্ত্তব্য পালন করাও হইবে। এই উদ্দেশ্যে এই লিপি লিখিত হইল যে, প্রত্যন্ত জাতিগণকে আশ্বস্ত করিবার জন্য ও তাহাদিগের ধর্ম্মাচরণের জন্য মহামাত্রগণ চিরদিন একযোগে কার্য্য করিতে থাকুন। প্রতি চতুর্ম্মাসে এই লিপি সকলকে শ্রবণ করাইবে, অবসরমত অন্ততঃ এক জনকেও শুনাইবে। তোমরা এইরূপে তোমাদের কার্য্য সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিতে থাক।*

এইবার ধৌলির পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনার চেষ্টা করা যাইতেছে। আমরা বলিয়াছি যে, অশোকের সময় হইতেই ধৌলির বিষয় বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায়, কিন্তু তাহার পূর্ব্ব হইতে যে ধৌলির প্রসিদ্ধি ছিল, ধৌলিতে তাঁহার অনুশাসন খোদিত করাই তাহার প্রমাণ। ধৌলি কোথায় অবস্থিত ছিল, প্রথমে তাহাই বলা যাইতেছে। ধৌলি কলিঙ্গ-রাজ্যের মধ্যেই অবস্থিত ছিল, এই কলিঙ্গ অশোকের বিজিত রাজ্য। অশোক তাঁহার রাজত্বের অষ্টম বর্ষে কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ত্রয়োদশ বৃহত্তর গিরিলিপি হইতে জানা যায়। কলিঙ্গ-জয়ে অনেক রক্তপাত হইয়াছিল, দেড় লক্ষ লোক বন্দী, এক লক্ষ লোক নিহত, ও তাহার অনেকগুণ প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। কলিঙ্গ-জয়ের পর অশোকের মনে অনুতাপ-সঞ্চার ঘটে। সম্ভবতঃ তিনি তখন হইতে বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরাগী হন। আমরা বলিয়াছি অশোকের রাজত্বের অষ্টম বর্ষে কলিঙ্গ বিজিত হয়। কোন্ অব্দে অশোকের রাজ্যাভিষেক হয়, তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। দেবদত্ত ভাণ্ডারকর মোটামুটিরূপে ২৭৯ খৃঃ পূঃ অব্দে অশোকের অভিষেককাল নির্ণয় করিয়াছেন। তাহা হইলে ২৭১ খৃঃ পূঃ অব্দে অশোক কর্ত্তৃক কলিঙ্গজয় হইয়া থাকিবে। কিন্তু হুলজ্ ২৬৪ খ্রীঃ পূঃ এবং নলিনীকান্ত ভট্টশালী ২৬০ খ্রীঃ পূঃ অশোকের অভিষেকাব্দ বলেন। অশোকের পূর্ব্বে আর একবার মগধরাজ কর্ত্তৃক কলিঙ্গজয়ের কথা জানা যায়। উদয়গিরির হাতীগুম্ফায় খোদিত কলিঙ্গরাজ খারবেলের গিরিলিপি হইতে জানা যায় যে, নন্দরাজ কলিঙ্গ জয় করিয়া জিনাসন লইয়া গিয়াছিলেন। কলিঙ্গে সে-সময়ে নন্দরাজ কর্ত্তৃক একটি খাল খনিত হইতেও আরম্ভ হয়। খারবেল মগধ আক্রমণ করিয়া সেই জিনাসন লইয়া আসেন ও উক্ত খাল সম্পূর্ণ করেন। এই নন্দরাজকে কেহ কেহ মহাপদ্মনন্দ বলিয়াই মনে করেন। অশোক তাঁহার বিজিত কলিঙ্গ-রাজ্যের তোসলি ও সমাপায়

---

* এই অনুশাসনে মার ও মহামাত্রদিগকে উদ্দেশ করায় তোসলি-ধৌলিতে একজন কুমার অবস্থান করিতেন বলিয়া বুঝা যাইতেছে। চারিটি প্রদেশ কুমারদের দ্বারা শাসিত হইত বলিয়া অশোক-অনুশাসন হইতে জানা যায়। (১) গান্ধার, প্রধান স্থান তক্ষশিলা, (২) অজ্ঞাত প্রদেশ, প্রধান স্থান সুবর্ণগিরি। কেহ কেহ নিজাম-রাজ্যের রাইপুর জেলার কনকগিরিকে সুবর্ণগিরি মনে করেন। (৩) কলিঙ্গ, প্রধান স্থান তোসলি-ধৌলি, (৪) মালব, রাজধানী উজ্জয়িনী। কলিঙ্গ জয় করিয়া এই নববিজিত রাজ্য একজন কুমারের দ্বারা শাসিত হওয়ার ব্যবস্থা হয়। এই চারি কুমার অশোকেরই পুত্র বলিয়া অনুমান হয়।

কলিঙ্গে প্রত্যন্তবাসিগণের প্রতি অশোকের আশ্বাসপ্রদানে তাহাদের রাজ্য আর অধিকার করা হইবে না ইহাও বুঝায়। কলিঙ্গ-জয়ে অশোকের অত্যন্ত অনুতাপ হওয়ায় তিনি আর কোন রাজ্য জয়ের ইচ্ছা করেন নাই। তবে সর্ব্বত্র তাঁহার ধর্ম্মবিজয়েরই ইচ্ছা ছিল। এই সকল প্রত্যন্তবাসিগণ বোধ হয় গণতন্ত্রাবলম্বী ছিল। তাহাদের রাজার কোন উল্লেখ না থাকায় এবং তাহাদিগকেই উদ্দেশ করিয়া এই ধর্ম্মলিপি লিখিত হওয়ায় তাহাই মনে হইয়া থাকে।

(ধৌলি ও জৌগড়ে) তাঁহার ধর্ম্মানুশাসন খোদিত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সে-সময়ে তোসলি বা ধৌলিই কলিঙ্গের রাজধানী বা প্রধান স্থান ছিল। কারণ, ধৌলির দ্বিতীয় পৃথক্ অনুশাসনে তোসলিতে কোন কুমারের অবস্থানের কথাই আছে। দেবদত্ত ভাণ্ডারকর মনে করেন যে, বৃহত্তর গিরিলিপিগুলি অশোকের রাজ্যাভিষেকের সপ্তবিংশ বর্ষ অতীত হইলে উৎকীর্ণ হয়। প্রথমে স্তম্ভলিপি, তাহার পর ক্ষুদ্র গিরিলিপি, অবশেষে বৃহত্তর গিরিলিপিগুলি খোদিত হইয়াছিল।

ধৌলির কথা বলিতে হইলে, প্রথমে কলিঙ্গের কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। অতি প্রাচীনকাল হইতে কলিঙ্গের কথা জানা যায়। বৈদিকগ্রন্থেও কলিঙ্গের উল্লেখ আছে, কিন্তু মহাভারতে সুস্পষ্টরূপে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। মহাভারতের বনপর্ব্বে লোমশ ঋষির সহিত পাণ্ডবেরা কলিঙ্গে তীর্থযাত্রায় আসিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। লোমশঋষি যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী"

তাহার পর স্বয়ম্ভুবন বা ভুবনেশ্বর এবং সাগরোত্থিতা বেদী বা পুরীক্ষেত্রের কথা বলা হইয়াছে। পুরাণাদিতেও কলিঙ্গের কথা আছে। পৌরাণিক মতে চন্দ্র-বংশীয় বলিরাজার অন্যতম পুত্র কলিঙ্গের নামানুসারে তাঁহার রাজ্যের নাম কলিঙ্গ হইয়াছিল। কিন্তু এই কলিঙ্গ-রাজ্যের সীমার মধ্যে উৎকল বা ওড্রদেশের অবস্থিতির কথাও জানা যায়। মহাভারতে কলিঙ্গের সহিত উৎকল ও ওড্রের কথাও আছে। সুদ্যুম্ন রাজার এক পুত্র উৎকল হইতে উৎকল-রাজ্যের উৎপত্তি বলিয়া হরিবংশে লিখিত আছে। আর ওড্র সম্ভবতঃ ওড্রজাতি হইতে হইয়াছে। এই ওড্র বা ওড়জাতি চাষা নামে আজিও কটক ও পুরী জেলায় এবং গড়জাত মহলে বাস করিতেছে। ওড্র হইতেই উড়িষ্যার উৎপত্তি। কলিঙ্গ এককালে ত্রিকলিঙ্গ নামে অভিহিত হইত। সেই জন্য ইহার উত্তর ভাগকে কেহ কেহ উৎকলিঙ্গ বা উৎকল বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। অশোকের কলিঙ্গ-বিজয়ের সময় কিন্তু উৎকলের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা জানা যায় না, তখন তাহা কলিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়াই বোধ হয়। বৌদ্ধগ্রন্থেও কলিঙ্গের কথা আছে, কলিঙ্গের দন্তপুরে বুদ্ধদেবের দন্ত নীত হইয়াছিল বলিয়া বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে। কালিদাসের সময় উৎকল ও কলিঙ্গ পৃথক্ ছিল। গ্রীক-বিবরণ হইতে কলিঙ্গ বা ত্রিকলিঙ্গের কথা অবগত হওয়া যায়। চীন-পরিব্রাজক য়ুয়ান-চুয়াং ওড্র বা উড়িষ্যাকে কলিঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মেদিনীপুর, বালেশ্বর লইয়া ব্রহ্মণী বৈতরিণীর উত্তর পর্য্যন্ত কলিঙ্গের উত্তর ভাগ, কটক, পুরী, গঞ্জাম জেলার উত্তরাংশ ও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য লইয়া মধ্যভাগ বা তোসল বলেন। এই তোসল দুই ভাগে বিভক্ত ছিল, চিল্কা-হ্রদের উত্তরে উত্তর-তোসল ও তাহার দক্ষিণে দক্ষিণ-তোসল বা কোঙ্গদ। গঞ্জামের দক্ষিণাংশ হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত কলিঙ্গের তৃতীয় ভাগ, ইহাই সাধারণতঃ কলিঙ্গ নামে অভিহিত হইত।

এই নির্দ্দেশানুসারে ধৌলি উত্তর-তোসলেই অবস্থিত ছিল। তাহার থক্ অনুশাসন তোসলির কুমার ও মহামাত্রদিগকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত হওয়ায় ধৌলি যে তোসলের মধ্যে অবস্থিত ছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। এমন কি, ধৌলির ভগ্নাবশেষ দেখিয়া ইহাকে তোসল বা তোসলি নগরী বলিয়াই অনুমান হয়। ধৌলির অনুশাসনে তোসলির নগরব্যবহারকদিগের কথাও আছে। কোন কুমারের অবস্থিতিতে ইহাকেই তৎকালে কলিঙ্গের প্রধান স্থান বা রাজধানী বলিয়াই মনে হইয়া থাকে। অশোকের কলিঙ্গ-জয়ের সময় রাজধানী কোথায় ছিল স্থির করিতে না পারিলেও তাঁহার সময় তোসলি বা ধৌলি যে রাজধানী হইয়া উঠিয়াছিল ইহা তাঁহার অনুশাসন হইতে বুঝা যাইতেছে। খারবেলের গিরিলিপি হইতে জানা যায় যে, তাঁহার সময় 'তনসুলিয় বাটা' (তনসুলিপথ) হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছিল। এই 'তনসুলি' তোসলি হওয়াই সম্ভব। তাহা হইলে অশোকের সময় তোসলি যে রাজধানী ছিল ইহাই মনে হইয়া থাকে।

* *History of Orissa*, Vol. I.

তোসল যে প্রসিদ্ধ স্থান ছিল তাহা নানাদিক্ হইতে জানা যায়। পুরাণাদিতে তোসল জনপদ ও তাহার অধিবাসিগণের উল্লেখ আছে। মৎস্যপুরাণের ভুবনকোষে তোসল বিন্ধ্যপৃষ্ঠস্থিত জনপদসমূহের মধ্যে উক্ত হইয়াছে—

তোসলাঃ কোসলাশ্চৈব ত্রৈপুরা বৈদিশা তথা।
এতে জনপদাঃ খ্যাতা বিন্ধ্যপৃষ্ঠনিবাসিনঃ।"

ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে তোসলকে কলিঙ্গের একটি বিভাগ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে—

"কোসলাঃ তোসলাশ্চৈব কলিঙ্গা যাচ মোসলাঃ।"

পরবর্ত্তীকালেও তোসলের কথা জানা যায়। ২৮৩ গুপ্তাব্দে শিবরাজের একখানি তাম্রশাসনে দক্ষিণ-তোসলির কোন গ্রাম দানের কথা আছে। রাখালদাস ইহাকে অশোকের মৃত্যুর ৮৯৬ বৎসর পরে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে গুপ্তাব্দ বিক্রম-সংবতের সহিত ঐক্য করার চেষ্টা হইতেছে; তাহা হইলে উহা আরও পূর্ব্বের বলিয়া মনে করিতে হয়। তোসলির দ্বিতীয়বার উল্লেখের কথা রাখালদাস বলেন যে, শুভাকরের তাম্রশাসনে উত্তর-তোসলির দুইখানি গ্রাম দান উপলক্ষে জানা যায়। ইহার সময় তাঁহার মতে অশোকের মৃত্যুর ১০৫০ বৎসর পরে।* বেণীমাধব বড়ুয়া বলেন যে, গৌড়ব্যূহ নামক কাব্যে একজন বৌদ্ধ তত্ত্বান্বেষীর দক্ষিণ দেশ পরিভ্রমণের বিবরণে তোসলের সর্ব্বগ্রাম নামক স্থানের উল্লেখ আছে। বড়ুয়া মহাশয় এই তোসলকে অশোকের তোসলিনগরী বলিয়া অমিত তোসলের অন্তর্গত বলেন।†

অশোকের পূর্ব্বেও তোসলির প্রসিদ্ধি থাকায় তিনি এইখানেই তাঁহার অনুশাসন উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন, এইখানে তাঁহার কোন কুমারও অবস্থিতি করিতেন। কাজেই তখন এই তোসলিই কলিঙ্গের রাজধানী ছিল বলিয়াই মনে হয়। এ কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অশোকের সময়ে ধৌলি বা তোসলির পর সমাপা নামে কলিঙ্গের আর একটি প্রধান নগর ছিল। জৌগড়-লিপি এই সমাপার মহামাত্রদিগকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত। কিন্তু তোসলিতে কুমার অবস্থান করায় সমাপাপেক্ষা তাহার গুরুত্ব যে অধিক ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই তাহাকেই তৎকালীন কলিঙ্গের রাজধানী বলিয়াই মনে করিতে হয়। আর এই তোসলির নিকটস্থ অশ্বত্থামা পর্ব্বতে অশোক তাঁহার অনুশাসন উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। ধৌলির অনুশাসনে পর্ব্বতের নামটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেবল তাহার সপ্তমী বিভক্তি 'সি' মাত্র আছে। জৌগড়ে উহা 'খপিংগলসি' বলিয়া লিখিত থাকায় কেহ কেহ ধৌলির পর্ব্বতকেও খপিঙ্গল বলিয়া পাঠ করিতে চাহেন। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া মহাশয় ঐ নষ্ট স্থানটিতে চারিটি শব্দাংশ (syllable) ছিল বলিয়া উহাকেও খপিংগলই মনে করেন। তাঁহার মতে জৌগড় হইতে এই খপিংগল পর্ব্বতশ্রেণী ধৌলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহা যে তাঁহার কষ্টকল্পনা তাহাতে সন্দেহ নাই। ধৌলি পাহাড়ের নাম যখন অশ্বত্থামা বলিয়া জানা যাইতেছে, তখন তাহার প্রাকৃত আকার চারি শব্দাংশে হওয়া অসম্ভব হইবে কেন? সুতরাং ধৌলির অশ্বত্থামা নাম স্বীকার না করিয়া তাহাকে খপিংগল বলিয়া অভিহিত করা যুক্তিযুক্ত নহে। ভাণ্ডারকর এই অশ্বত্থামাকে অশ্বষ্টমা (Aswastama) বলিতেছেন, কিন্তু কিট্টো ইহাকে অশ্বতামা (Aswatama) বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। ধৌলি পর্ব্বতের প্রকৃত নাম যে অশ্বত্থামা ইহাই স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত। আর ধৌলি নামের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল তাহাও বিবেচনার বিষয়। সাধারণতঃ ধবলগিরি হইতে ধৌলি কথার উৎপত্তি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ধবলগিরি হইতে ধৌলি, কি ধৌলি হইতে ধবলগিরি ইহাও ভাবিয়া দেখিবার কথা। তোসলি হইতে ধৌলি হইতে পারে কি না ভাষাতত্ত্ববিদ্গণ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

* History of Orissa, Vol. I
† Udayagiri-Khandagiri Cave Inscriptions.

যূথিকা

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

দেরাদুনে এসে মোটরগাড়ীর ইঞ্জিন গেল বিগ্‌ড়ে। প্রবীরের অশান্ত চঞ্চল অন্তরের সঙ্গে ক্রাইস্‌লার মোটরকারখানা এক মাসের মধ্যে ঘুরেছে অনেক ; কলিকাতা হতে কটক, সেখান হতে রাঁচি, তারপর এলাহাবাদ, খাজুরাহো, রাঁচি, আগ্রা, দিল্লী হয়ে দেরাদুনে এসে মোটরগাড়ী আর চলতে চাইল না। প্রবীরের প্ল্যান ছিল একটা লম্বা পাড়ি দেবে, অন্ততঃ পেশোয়ার পর্য্যন্ত ; তারপর যদি ছাড়পত্র পাওয়া যায় আফগানিস্থান পার হয়ে তুর্কিস্থানে গিয়ে পৌঁছালে মন্দ হবে না, সেখান থেকে মঙ্গোলিয়ায়, গোবি মরুভূমির পাশ দিয়ে। চীনপরিব্রাজকরা এক দিন যে-পথ দিয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন সত্যধর্ম্মের সন্ধানে, অথবা যে-পথ দিয়ে নাদির তার বিদ্যুদ্‌গামী অশ্বারোহী সৈন্যদল নিয়ে বাহির হয়েছিলেন দিগ্‌বিজয় করতে, নর-মুণ্ডের পাহাড় তুলে, রক্তের বন্যা প্রবাহিত ক'রে—সে-পথগুলির সন্ধান যদি পাওয়া যায়।

মিনিটে মাইল বেগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিগন্তের রঙীন হাতছানিতে ভুলে নিরুদ্দেশে ছোটা, পথের পর নবপথে দেশের পর দেশ পরিক্রমা—এই গতি অনুভবের তৃষ্ণা মাঝে মাঝে প্রবীর তার রক্তে অনুভব করত, তখন সে বার হয়ে পড়ত তার ক্রাইসলার কার-খানি নিয়ে।

কিন্তু দেরাদুনে এসে মোটরগাড়ীর ইঞ্জিনটা গেল বিগড়ে। শোফার জানালে, এ ইঞ্জিন সারাবার মত কারখানা দেরাদুনে নেই। শোফার ও মোটরকার রেলে কলিকাতাতে পাঠিয়ে দিয়ে মুসৌরীর কোন হোটেলে আশ্রয় নিয়ে তার অসমাপ্ত কাব্যখানা শেষ করবে, না, দিল্লীতে নেমে আর একটা মোটরগাড়ী কিনে পেশোয়ারের দিকে পাড়ি দেবে, তুর্কিস্থানে পৌঁছোতে না পারলেও ইরানে হয়ত যেতে পারবে, সেখানে সিরাজের কোন দ্রাক্ষাকুঞ্জে বসে আবার হাফেজ পাঠ করা যেতে পারে—এম্‌নি ভাবতে ভাব্‌তে প্রবীর তার হোটেল হতে বার হচ্ছে, পথে সুরথের সঙ্গে দেখা। সুরথ হচ্ছে তার আবাল্য বন্ধু, স্কুল কলেজের সহপাঠী।—হ্যালো প্রবীর! তুমি এখানে? কলিকাতায় তোমায় খুঁজেছিলুম। শুনলুম, তুমি হঠাৎ কোথায় বাইরে গেছ, ব্যাঙ্ক ছাড়া তোমার ঠিকানা কেউ জানে না।

—হ্যাঁ, দেখ না, মোটরকারটা গেল খারাপ হয়ে। আর তুমি এখানে?

—ছোট মেয়েটা রিকেটে ভুগে বড় দুর্ব্বল, তাই চেঞ্জে এসেছি। এখানে এসে "সন্‌-কিওর" করে বেশ উপকার হচ্ছে। কিন্তু কালই বোধ হয় চ'লে যেতে হবে, শ্বশুর-মশাইয়ের বড় অসুখ। আজ টেলিগ্রাম এল। গিন্নি ত কান্নাকাটি আরম্ভ করেছেন। বাড়িটা পেয়েছিলুম ভাল, আর এমন সুন্দর ওয়েদার—

—কোথায় বাড়িটা?

—ডালানওয়ালাতে, চল, দেখে আসবে, ওঠ টাঙ্গাতে, গিন্নি তোমায় দেখলে খুব খুশী হবে।

দু-বন্ধু টাঙ্গাতে উঠলে টাঙ্গা ডালানওয়ালার দিকে চলল।

—তুমি কিছু দিন এখানে আছ, প্রবীর?

কিছু ঠিক করতে পারছি না, মোটরকারটা গেল খারাপ হয়ে।

—ওই মোটরকারের ভূত তোমার ঘাড় থেকে কবে যে নামবে! শোন, আর টো টো না করে কিছুদিন এখানে বিশ্রাম কর, শরীর ত তেমন ভাল দেখাচ্ছে না। আমার বাড়িটা সেই ডিসেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত ভাড়া নিয়েছি, এখন ত অক্টোবর মাসও শেষ হয় নি, দু-মাস এখানে তুমি বেশ থাকতে পারবে, সুন্দর ওয়েদার, আমার বাড়িতে এসে থাক কিছু দিন—

হ্যাঁ হে, তোমার মেয়েটি কত বড় হল? অনেকদিন দেখিনি।

—আমার মেয়ে ছ' বছরের হ'ল, আর তুমি এখনও বিয়ে করলে না। শোন, আমার একটি শ্যালিকা, অষ্টাদশী, সুন্দরী—

—সেই জন্যেই বুঝি কলিকাতায় আমার খোঁজ হয়েছিল।

—কথাটা ঠিকই বলেছ, গিন্নি বড় ধরেছিলেন, তাঁর মনের সাধ তোমার সঙ্গে হয়, তোমাকে বড় পছন্দ—

—হুঁ!

—আর শ্যালিকাটি, বুঝলে, সত্যি সুন্দরী। তারপর গানে, সেলাইতে, গল্পে, রান্নায়, সবেতে নিপুণা, বড় মিঠে চোখ—

—দেখ, শ্যালিকার যা গুণগান আমার কাছে করলে গিন্নির কাছে ভুলে করো না।

—সে আর বলতে, সে-সব আমার জানা আছে, সংসারে সুখী হবার আর্টই হচ্ছে লোক বুঝে ঠিকসময়ে ঠিকমত কথা বলা।

—হুঁ! ডালানওয়ালা ত বেশ দেখছি। এত নির্জ্জন, এত সুন্দর, আমার ধারণা ছিল না।

—আর আমাদের বাড়ী একেবারে নদীর ধারে, এই এসে পড়েছি।

বন্ধুমহলে প্রবীর ছিল এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। বেঁটে কালো রোগা শান্ত যুবকটিকে দেখে মনে হত না সে মোটর চালাতে বা কবিতা লিখতে পারে। মুখখানি শ্যামল, উজ্জল; দীর্ঘ কপোল একটু শীর্ণ, ক্লান্তির ছায়াঘন; চোখ দু'টি বসা, কালো, তার ওপর চশমার কাচ দু'টি ঝকমক করে; শান্তপ্রকৃতির এ যুবকের হৃদয়ে অন্তঃসলিলা যে নিদারুণ চাঞ্চল্য ছিল, তা মাঝে মাঝে প্রকাশ পেত যখন সে হঠাৎ মোটরগাড়ী নিয়ে বার হয়ে পড়ত। কিন্তু এ চঞ্চলতা তার অন্তর-প্রকৃতির সত্যরূপ ছিল না। সে ছিল প্রেমসৌন্দর্য্যময় চিরস্নিগ্ধ এক শান্তিলোকের জন্য তৃষিত। তার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের মধ্যে, বাস্তব সংসারে জীবনের কদর্য্যতা, সৌন্দর্য্যের অনিত্যতা, প্রেমের বিকৃতি, চারিদিকের অশান্ত বীভৎস সংগ্রাম তাকে বেদনা দিত। তাই কল্পনায় সে শান্তির স্বপ্ন-ছবি আঁকত, নব নব সৌন্দর্য্যপ্রকাশিনী প্রকৃতিরূপে মধুর নিত্যনব মাধুর্য্যদায়িনী প্রিয়ার প্রেমে স্নিগ্ধ—

দিগন্তভরা সবুজ প্রান্তর, ফুলে ছাওয়া, পাখীর গানে আকুল; তার মাঝ দিয়ে নদী বয়ে চলেছে, নৃত্যময়ী, রঙ্গিণী; শ্যামল পুষ্পিত তীরে প্রিয়ার ভালবাসা-ঘেরা শান্তির ঘর; দিকচক্রবাল রাঙিয়ে মেঘস্তূপের মধ্যে সূর্য্য অস্ত যায়, নদীর জলে চাঁদ ঝিকিমিকি করে; দূর বন হতে পিয়ালমুকুলের গন্ধে আকুল বাতাস এসে ওড়ায় প্রিয়ার রঙীন অঞ্চল, যখন তারা তমাল গাছের তলায় পা ছড়িয়ে বসে পাশাপাশি—

অথবা, নির্জ্জন নিস্তরঙ্গ সুবৃহৎ হ্রদ, সুগভীর নীল; কে যেন কাপড় ছোপাবার জন্য নীল রং গুলেছে; নীল হ্রদের জলে সবুজ বনের ছায়া, তুষারঢাকা পর্ব্বতমালার ছায়া, যেন তারা হ্রদের নীল চোখের দিকে মুগ্ধ হয়ে অনিমেষে চেয়ে আছে. উজ্জল আলোভরা নীলাকাশ; শুভ্র মেঘের পুঞ্জ। এই আকাশ, আলো পাহাড়ের রজতকান্তি, পাইনবনের সবুজ, হ্রদের নীল, জলস্থলের মায়া মূর্ত্তিমতী হয়ে বসেছে তার ধীরগামী তরীতে, নীল শাড়ী-পরা নারী তার সবুজ রঙের তরীতে, ছোট তরী, মুখোমুখি দু-জনে বসে; সুন্দরী তার ঘনকালো কেশ এলিয়ে দিয়েছে; তার হাতের ভঙ্গীর চাঞ্চল্যে তরী দুলে ওঠে; দুলে কেঁপে তরী ধীরে চলে; নীল জল সূর্য্যালোকে ঝক্‌মক্ করে—

অথবা, নারিকেলবৃক্ষবনবেষ্টিত ক্ষুদ্র দ্বীপ, শুভ্রফেনতরঙ্গময় সমুদ্র,—তার মধ্যে—

এমনি শান্তির কত স্বপ্ন-ছবি।

সুরথ চলে যাওয়ার পর প্রবীর সুরথের বাড়ীতে এসে উঠল। বারান্দায় ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে মুসৌরীর পাহাড় ও নীলাকাশ দেখে তার দু-দিন কেটে গেল, কোথাও বার হল না।

তৃতীয় দিন সে তার অসমাপ্ত কাব্যের মোটা খাতাখানি বার করলে। এ কাব্যটি সে আরম্ভ করেছিল সাত বছর আগে, তার প্রথম প্রেমের বেদনার প্রেরণায়। তারপর প্রতিবৎসর তার প্রেমানুভূতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের কাটাকুটি চলছে, কাব্য আর শেষ হ'তে চায় না। বন্ধুরা বলত, ওরকম করে তোমার ও কাব্য

জীবনে কোন দিন শেষ হবে না, তুমি লিরিক লেখ। লিরিক লিখতে সে চায় না, সে চায় প্রেমের চির সত্যকে এক অখণ্ড কাব্যে পরিপূর্ণ সুন্দর রূপ দিতে। মাঝে মাঝে তার মনে হত সে বুঝি সত্যকে পেল, এবার ছন্দময় ভাষা দিলেই হবে ; কিন্তু কাল যা সত্য ছিল আজ তা মায়া হয়ে যায় ; যাকে জ্যোৎস্নারাতে সুন্দর দেখেছে, ভোরের আলোয় সে মলিন, শুষ্ক, সে ছিল চাঁদের মায়া দখিন বাতাসে ; কিন্তু চিরদিন এই প্রেমতৃষ্ণা নিয়ে কি চলে যেতে হবে তাকে সংসার থেকে !

সমস্ত দিন সে নিজের কাব্য পড়লে, কোন কোন জায়গা মনে হল লিখেছে ভাল, কোন কোন জায়গা মনে হল মিথ্যে কথা, এ মেকী চলবে না, মোটা মোটা লাইন দিয়ে সে জায়গাগুলি কাটলে। কিন্তু এমনি পুরান লেখা কেটে নতুন লেখা লিখে কোথায় গিয়ে সে পৌঁছাবে ? আজ যা নতুন, কাল তা পুরাতন হয়ে যায়, তার অলীকতা, তার ক্ষণিক মায়া ধরা পড়ে।

সেইজন্যেই ত সে তরুণীদের সঙ্গে প্রেমের আরম্ভের খেলা সুরু করেই পালিয়ে আসে, নেশা কাট্‌বার আগেই উৎসবক্ষেত্র হতে চলে যায়। বন্ধুরা তাকে বলেছে, ভীরু ! তার এই ভীরুতা তার প্রেমস্বপ্নকে না ভাঙার প্রয়াস। প্রতিদিনের ব্যবহারে প্রেম কি বিকৃত হয়, সংসারের বাস্তবতায় তাকে কি কৃত্রিম মুখোস পরে থাকতে হয় রঙ্গশালার অভিনেত্রীদের মত, তা সে দেখেছে ; তার ভীরুতার জন্য সে লজ্জিত নয়।

চতুর্থ দিন সারাদুপুর নিজের লেখা কাব্যপাঠ করে বিকেলের শেষে প্রবীর একটু বেড়াতে বার হল, নদীর তীরে বেড়াবে এই ইচ্ছা। নদীটি প্রায় জলহীন, নুড়ি-পাথরের গাদার ধারে শুষ্ক বালুচর। একটু গিয়ে সে চমকে দাঁড়াল। রাজপথ নদীর ধারে যেখানে শেষ হয়েছে তারই একদিকে গাছের তলায়, বেতের চেয়ারে পেছনে চাঁদের মত গোল বালিশ ঠেসান-দিয়ে এক তরুণী বসে, দিগন্তে পাহাড়ের সারির দিকে চেয়ে চুপ করে এলিয়ে বসে ; হাল্কা নীল শাড়ি-পরা ; চুলগুলি জড়িয়ে তাল করে খোঁপা বাঁধা, মাথায় কাপড় নেই ; শীর্ণহাতে কয়েকগাছি চুড়ি ঝিক্‌মিক্ করছে। অত্যাশ্চর্য্যকর তার মুখের রং ; বহুপ্রাচীন চীনে মাটির বাসন যেমন হলদে হয়ে যায়, তেমনি হলদে প্রাণহীন, কিন্তু সুন্দর শিল্প ; অথবা মুখখানি যেন পুরাতন গজদন্তে গড়া ; তার সঙ্গে সন্ধ্যার আলোর রঙীনতা মিশেছে। অনতিপক্ক নাস্‌পাতির মত তরুণীর মুখের ডৌলটি, কমনীয় শীর্ণ চোয়াল হতে লম্বা চিবুক পর্য্যন্ত রেখার ছন্দ বড় উদাসতায় ভরা ; গভীর কালো চোখ, গাছের ছায়াভরা দীঘির মত ঝক্‌মক্ করছে। লম্বা টানা ভুরু, যেন চীনে কালীতে আঁকা সাদা পটের ওপর। মুখখানির শীর্ণতার সঙ্গে সুদূরে চেয়ে বসে থাকার ধ্যান-মগ্নতা, প্রতীক্ষার ভঙ্গী এই নদীপাহাড়জোড়া বিজন স্তব্ধ সন্ধ্যার পটে প্রবীরের বড় করুণসুন্দর লাগল। একটি ছবি ! রসেটির আঁকা "Annunciation" চিত্রের তরুণীর মত মুখ ! কিন্তু রসেটির তরুণীর আননে যে মুগ্ধবিস্ময় ও আনন্দময় ভীতি আছে, আশাভরা প্রাণের লাবণ্য আছে, এ অজানা তরুণীর মুখে তা নেই ; এর স্বপ্ন সুরু না হতে শেষ হয়েছে, শুধু উদাস প্রতীক্ষায় বসে থাকা। বড় করুণসুন্দর মুখখানি।

মুখের দিকে বিমুগ্ধভাবে চেয়ে প্রবীর মেয়েটির কাছাকাছি চলে এসেছিল ; এমনিভাবে চেয়ে এগিয়ে আসা যে কি অভদ্রতা তা তার খেয়াল ছিল না। প্রবীরের পায়ের শব্দে মেয়েটি চম্‌কে চাইল, ভীতা হরিণীর মত। প্রবীর বড় লজ্জিত বোধ করলে ; মুখে কোন কথা এল না ; নতমস্তকে নমস্কার ক'রে যে-পথ দিয়ে এসেছিল সে-পথ দিয়ে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় রইল না। তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে সে দেখ্‌তে পায়নি এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক তার দিকে আসছেন, সে প্রায় তাঁর ঘাড়ে গিয়ে পড়েছিল। ক্ষমা কর্‌বেন, বলে সে চলে যেতে চাইলে। কিন্তু প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি তার পথরোধ ক'রে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনি প্রবীরবাবু ?

প্রবীর কোন উত্তর না দিয়ে বিস্মিতমুখে তাঁর দিকে চাইল।

—আপনি সুরথবাবুর বাড়ীতে আছেন ?

—হাঁ !

—সুরথবাবু যাবার সময় বলে গেছলেন বটে, আপনি এসে তাঁর বাড়ীতে থাকবেন।

—হাঁ, আমি ওই বাড়ীতে আছি।

—আমরা আপনার পাশের বাড়ীতেই আছি। আমার কল্ করা উচিত ছিল, আপনি নতুন এসেছেন। কিন্তু আমার মেয়ে এ দু-দিন তেমন ভাল ছিল না, আজ একটু ভাল আছে, তাই বললে, বাবা, নদীর ধারে একটু বস্‌ব—

—ও, খুব অসুস্থ ?

—হাঁ, দেড় বছর ভুগ্‌ছে, ডাক্তারেরা আশা দিচ্ছে, বুড়ো মানুষ, সবই বুঝ্‌তে পারি, তবু আশা—সন্ধ্যে হয়ে এল, যূথির আর বাইরে থাকা ঠিক নয়, দেখিগে—আলাপ হয়ে গেল, একদিন আস্‌বেন।

—নিশ্চয়।

প্রবীর বাড়ীতে ফিরে পথের দিকে বারান্দার এক-কোণে বস্‌ল ; মেয়েটি ধীরে বাবার সঙ্গে বাড়ী ফির্‌ল, সন্ধ্যার অন্ধকারে বসে দেখলে। তারপর যখন পাহাড়ের পাশ দিয়ে শুক্লা একাদশীর চাঁদ উঠল, জলশূন্য নদীবক্ষের অন্ধকারে বাতাস হা হা করে বইতে লাগ্‌ল, সে নদীর তীরে গাছের তলায় গিয়ে বস্‌ল। সে রাতে বহুদিন পরে সে একটি লিরিক লিখ্‌লে।

পরদিন প্রভাতে প্রবীর তার রিফ্লেক্স ক্যামেরাটা নিয়ে বার হল। দু-চারটে প্রাকৃতিক দৃশ্যের ফটো তোলবার ইচ্ছা। কিন্তু ফটো নেবার মত সুন্দর দৃশ্য সে খুঁজে পেলে না। অকারণে পথে কিছুক্ষণ ঘুরে সে পাশের বাড়ীতে প্রবেশ কর্‌লে। মহেন্দ্রবাবু সামনের ঘরেই বসেছিলেন, সাদরে অভ্যর্থনা করে প্রবীরকে বারান্দায় বসালেন।

—ভাবছিলুম আপনার ওখানে যাব, তা এলেন, ভালই হল। যূথি আজ বেশ ভালই আছে, জ্বর নেই বললেই হয়, ৯৮. ডিগ্রী, ও আর জ্বর নয়, তবে কাল সকালে টেম্‌পারেচার উঠেছিল ৯৯ ডিগ্রী।···ফটোর সখ আছে বুঝি ?

—হাঁ, বহুদিনের সখ।

—তা বেশ, ভালই হল। ভাবছিলুম যূথির একটা ফটো তুলিয়ে রাখ্‌ব—ফার্ষ্ট ইয়ারে ওদের কি পার্টি হয়েছিল তার এক ফটো আছে তারপর আর ফটো নেই—

—যখন সুবিধা হবে বল্‌বেন, আমি আনন্দের সঙ্গে তুলে দেব।

এত শীঘ্র যে মনস্কামনা পূর্ণ হবে, প্রবীর তা ভাবেনি।

—আজ থাক্, আপনার সঙ্গে দু'একদিন আলাপ হোক, বড় লাজুক মেয়ে। যূথির খাওয়া হল—দেখি, একটু বসুন, একবার জিজ্ঞেস করে আসি, আজ ভালই আছে, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে পার্‌বে।

মহেন্দ্রবাবু একটু পরে এসে প্রবীরকে পূবদিকের বারান্দায় নিয়ে গেলেন। বেতের এক সেজলঙ্‌তে বালিসে হেলান দিয়ে যূথিকা বসেছিল, মৃদুহেসে নমস্কার করে প্রবীরকে অভ্যর্থনা করলে।

প্রবীর ধীরে বললে, কাল সন্ধ্যায় আপনাকে চমকে দিয়েছিলুম।

মেয়েটি হেসে উঠল, তার গজদন্তপীত কপোলে রক্তের লালিমা লাগল। সে বললে, সেইজন্যেই ত আজ সকালে আপনার দেখা পেলুম। তার কণ্ঠস্বর যেন কোন মানবকণ্ঠের নয়, যেন কোন তারের বাদ্যযন্ত্রের মিহিসুর ; সেই সুরটি প্রবীরের অনির্ব্বচনীয় মনে হল। চেয়ারে বসে সে বললে, আপনাদের খোঁজ নেওয়া অনেক আগেই আমার উচিত ছিল, সুরথ আমায় কিছুই বলে যায়নি।

বৃষ্টিশেষে উজ্জ্বল নির্ম্মল শুভ্রমেঘসুন্দর শরতের আকাশের মত ঝল্‌মল্ করে উঠল মেয়েটির মুখ, কিন্তু সে ঝলমলানি ক্ষণিক মায়া, তার অস্বাভাবিক দীপ্তি প্রবীরকে মুগ্ধ কর্‌লে।

—সুন্দর সকালবেলা, কি ছবি তুললেন ?

—ছবি তোলার মত বিশেষ কিছু পেলুম না।

—কেন মুসৌরী পাহাড় কি সুন্দর দেখাচ্ছে !

—হাঁ, ওটা তুললে হয় বটে, আর আপনার একখানি ছবি, আপনার বাবা বল্‌ছিলেন—

—আমার ? আচ্ছা তুল্‌বেন'খন, এখন নয় কিন্তু।

প্রবীর চুপ করে যূথিকার মুখের দিকে চেয়ে রইল ; শরতে কাশবনের উপর রৌদ্রছায়ার লীলার মত তার মুখে আলোছায়ার খেলা, করুণ সুন্দর।

—আপনি নাকি মোটরে পেশোয়ার যাচ্ছিলেন, তারপর মোটর ভেঙে এখানে আটকে পড়ে আছেন ?

—হাঁ, শুধু পেশোয়ার নয়, পারস্তে যাবার ইচ্ছা ছিল।

—সত্যি ! আমার ভারি ইচ্ছে করে ! আচ্ছা, এরোপ্লেনে চড়েছেন ?

—হাঁ, আমার এক বন্ধুর এরোপ্লেন আছে, তিনি খুব ভাল পাইলট।

যূথিকা কোন কথা কইল না, তার চোখ আরও কালো হয়ে এল, সে প্রবীরের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে পাহাড়গুলির দিকে তাকাল।

—কিন্তু আপনাকে ত ডাক্তার এরোপ্লেনে চড়তে দেবে না, মোটরকার চড়াও বোধ হয় বারণ।

—হাঁ, শুধু সকালে আধঘণ্টা আর বিকালে আধঘণ্টা সমতল ভূমিতে আস্তে বেড়ান; আর বাকী সময় বিছানাতে বা ইজিচেয়ারে। জীবনটা বড় মজার, নয় ?

পাশের টেবিল হতে একটা মোটা বই টেনে প্রবীর আনমনে খুললে, পাতার ওপর লেখা,—Triassic System; মলাটটায় লেখা দেখলে, A Text Book of Geology.

প্রবীরের বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে যূথিকা বললে, আশ্চর্য্য লাগছে ? অসুখে এ সব বই পড়ছি ? বি-এস্-সিতে আমার জিয়লজি ছিল, অসুখ না হলে এ বছর এম-এস্-সি পাস করতুম—পুরাণো বইগুলি মাঝে মাঝে ঘাঁটি—আচ্ছা, আপনার কাছে ম্যাট্রনমির কোন বই আছে ?

—কলিকাতাতে আছে, পাঠাতে লিখব।

মহেন্দ্রবাবু ধীরে এসে বললেন, ভাল বোধ হচ্ছে, মা ? অনেকক্ষণ কথা কয়েচ—মিনিট পনের হবে—ক্লান্ত মনে হচ্ছে না ত ?

—না, বাবা, আমি বেশ ভালই বোধ করছি।

প্রবীর চেয়ার থেকে উঠলে, ম্লান হেসে বললে, আচ্ছা, আজ আসি।

যূথিকা ক্লান্তই বোধ করছিল, প্রবীর চলে যাবার পর সে চোখ বুজে চুপ করে শুয়ে রইল, মুসৌরীর পাহাড় আর দেখতে ভাল লাগল না।

বাড়ীর গেটের কাছে বিদায়ের সময় মহেন্দ্রবাবু বললেন, আসবেন মাঝে মাঝে, যূথি বড় একা বোধ করে, আমার সঙ্গে আর কি কথা কইবে সারাক্ষণ,—ওই কলেজের পুরাণো বইগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করে—

ক্যামেরাটা ভুলে ফেলে প্রবীর বার হয়ে গেল; হাঁটতে হাঁটতে একেবারে রাজপুর পর্য্যন্ত গিয়ে পৌছল। হৃদয়ের একটি তার অনাহত ছিল, কোন তরুণীর চম্পক অঙ্গুলির স্পর্শ তাতে পড়েনি, আজ সে তারে ঝঙ্কার উঠল।

পরদিন হতে প্রবীর সকাল-বিকাল যূথিকার দেখাশোনা আরম্ভ করে দিলে হৃদয়াবেগের সঙ্গে। তার বেড়ানর সঙ্গী, গল্প করার কথক, তাস খেলার সাথী হয়ে উঠল। মহেন্দ্রবাবু অবাক্ হলেন, কিন্তু যূথিকা হ'ল না; এ যেন তার প্রাপ্য, এরই জন্য সে প্রতীক্ষা করছিল। গল্প করার দীর্ঘ কাল সম্বন্ধে মহেন্দ্রবাবু মাঝে মাঝে মন্তব্য করতেন, কিন্তু যূথিকার আর সকালে জ্বর মোটেই আসত না ও সন্ধ্যাবেলায় টেম্পারেচার দিন দিন কমতে লাগল; আর তিনি প্রবীরের মেলামেশায় কোন আপত্তি করতেন না।

গ্রামোফোন ও রেকর্ড, রেডিও ও কতকগুলি কৌতুকপ্রদ ইংরেজী উপন্যাস পাঠিয়ে দেবার জন্য প্রবীর কলিকাতাতে টেলিগ্রাম করলে। যূথিকার সঙ্গে বেড়ান ও গল্প করায়, তার মনকে প্রফুল্ল রাখা, তার দেহকে সারিয়ে তোলার প্রয়াসে সে এক অনাস্বাদিত আনন্দ পাচ্ছিল। যূথিকাকে সে বেশী কথা কইতে দিত না, নিজেই সারাক্ষণ গল্প করত। নানা মোটরগাড়ী-য়্যাডভেনচারের কথা বলত, যূথিকা শুনত ছোটমেয়েরা যেমন রূপকথা শোনে, মাঝে মাঝে খিল খিল করে হেসে উঠত। বহুদিন পরে যূথিকার এই প্রাণখোলা হাসি শুনে মহেন্দ্রবাবু খুশী হতেন।

এমনিভাবে কাটল দিন দশেক।

দুপুরবেলা। এই সময় যূথিকার সম্পূর্ণ বিশ্রামের সময়; গল্প করা, পড়া বা কোন কাজ করার হুকুম নেই ডাক্তারের। কিন্তু সে দুপুরে প্রবীরের মন কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল, তার বার বার ইচ্ছা হল, যে যূথিকার [illegible]

প্রবীর ধীরে বাড়ী থেকে বার হয়ে এল; পথে কিছুক্ষণ আনমনে ঘুরলে, তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল যূথিকার ঘরের দিকে। ঘরের দরজা জানালা সব সময়ই খোলা থাকে। প্রবীর দেখলে পিঠে বালিস দিয়ে অর্দ্ধ-শায়িতভাবে যূথিকা পাশের টেবিল থেকে একটি বড় খাম তুলে নিলে,খামটি খুলে এক ফটো বার করে স্থিরনয়নে দেখলে। যূথিকার এক মাসতুতো বোনের নতুন বিয়ে হয়েছে। যূথিকা লিখেছিল, বিয়ের পর যুগল-ফটো যেন নিশ্চয় পাঠায়। যুগল ফটোখানি কিছুক্ষণ দেখে যূথিকা সেটি আবার খামে পুরে রেখে দিলে। তারপর একখানি চিঠি হতে আর একটি ফটো বার করলে, ছোট ফটো, স্ন্যাপশট্, তরুণী মায়ের কোলে সুন্দর একটি খোকা, যেন ননীর পুতুল, তুলতুলে গাল, টুকটুকে হাত পা,—যূথিকার এক সহপাঠিনী তার ছেলের ছবি পাঠিয়েছে। ছবিটির দিকে যূথিকা চেয়ে রইল অনিমেষে অনেকক্ষণ, তার চোখ জলজল করে উঠল, তারপর সেই জলজলে কালো চোখ হতে মুক্তার মত বড় বড় অশ্রুবিন্দু ঝরঝর করে ঝরে পড়ল, হাতির দাঁতের গড়া পাণ্ডুর শীর্ণ কপোল দিয়ে গড়িয়ে গেল, কান্নার কোন শব্দ নেই, শুধু নীরব অশ্রুধারা!

যূথিকার মাথার পেছনে অলক্ষ্যে প্রবীর দাঁড়িয়েছিল, তার মাথা ঘুরে গেল, সে বুঝি টলে পড়ে যাবে; সে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নীরবে চলে গেল।

কোনো মেয়ে বেদনায় কাঁদছে, এ দৃশ্য দেখা তার পক্ষে অসহনীয়। এমন ভাবে কাউকে সে কোনদিন কাঁদতে দেখেনি। এ তরুণী মৃত্যুপথযাত্রিণীর জীবনের কোন সাধ পূর্ণ হল না, নারীর যা চরম সাধ, স্বামীর ভালবাসা পাওয়া, ছেলেমেয়ের মা হওয়া।

বিকেলে প্রবীর যূথিকার কাছে যেতে পারল না, সে ডাক্তারের বাড়ী গেল।

—ডাক্তারবাবু, সত্যি বলুন দেখি, যূথিকার বাঁচবার আশা আছে?

—দেখুন, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, সত্যি বলতে কি, কিছুই বলা যায় না, এর চেয়ে খারাপ যক্ষ্মা রোগী আমি সেরে উঠতে দেখেছি। শরীরের মধ্যে যে-প্রাণশক্তি রয়েছে তা রহস্যময়, প্রাণ যে কি আমরা জানি নে, ডাক্তারীশাস্ত্র তার কতটুকু রহস্য জানে—সেরে উঠবে আশা করা যায়, অন্ততঃ এখন ত ভালই আছে।

—আচ্ছা, নিউমোথোরাক্স করলে কেমন হয়?

—দেখুন, দুই ফুসফুসেই প্যাচ হয়েছে, তবে নিরাশ হতে বলি না, সেরে উঠবে আশা হয়।

সে-রাতে প্রবীর ঘুমোতে পারল না। ডাক্তার বাবুর কাছ থেকে যক্ষ্মা সম্বন্ধে একটি বই এনেছিল, বইখানি অনেক রাত পর্য্যন্ত পড়লে। তারপর বারান্দায় চেয়ার নিয়ে বসল, তারাভরা অন্ধকারের দিকে চেয়ে।

যূথিকাকে সে প্রথম দেখেছিল সৌন্দর্য্যানুভূতির উৎস, কবিচিত্তাবেগের উপকরণ,—যেমন সে দেখেছে ইউরোপের কোন প্রিমিটিভ চিত্রশিল্পীর শতাব্দীমলিন বর্ণের ছবি, যূথিকাকে সে যত্ন করেছে যেমন সে যত্ন করে চীনের মিং-রাজবংশকালীন প্রাচীন মহার্ঘ্য কোন চায়নার। যূথিকার রোগপাণ্ডুর অস্বাভাবিক সৌন্দর্য্য, তার বিশীর্য্যমান দেহের ভঙ্গুরতা, জীবনের ক্ষণিকতা, এই ঝলমল উদাস অনিত্য রূপ প্রবীরকে আকৃষ্ট মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু কখন যে যূথিকা মানবী হয়ে তার হৃদয়ে প্রবেশ করেছে তা সে জানেনি, সে শুধু সন্ধ্যার রক্তিম মায়া বা গজদন্তপীত রোগভঙ্গুর পুত্তলিকা নয়, সে তরুণী নারী, তার দুই ফুসফুসে যে যক্ষ্মাবীজাণুরা বাসা করেছে, প্রতি সেকেণ্ডে প্রতি মিনিটে ঘণ্টায় ঘণ্টায় দিনে দিনে তাদের সঙ্গে সংগ্রাম চলছে তরুণীর আশা আকাঙ্ক্ষা আনন্দ স্বপ্নভরা প্রাণশক্তির—প্রিয়া হবার, মা হবার কামনা, ভালবাসা পাবার, ভালবাসা দেবার সাধ মরতে চায় না।

যূথিকা কি বোঝেনি প্রবীর তাকে ভালবাসে? তা না হলে এত যত্নসেবার অর্থ কি? সে হয়ত ভাবে প্রবীর যে এক রোগিণীর সেবা করছে, সে প্রবীরের করুণা, হৃদয়ের সমবেদনা, বা হয়ত খামখেয়ালি।

প্রভাতের আলোয় আকাশ যখন রাঙা হয়ে উঠল প্রবীর তার সমস্যার সমাধান করলে, তার অন্তরের ভীরুতা রাত্রির অন্ধকারের মত দূর হয়ে গেল। সে অনুভব করলে প্রভাত অরুণের সপ্তাশ্বচালিত রথচক্রের

দ্যুতি যেমন পর্ব্বতের শিখরে শিখরে তেমনি তার অন্তরে কোন জ্যোতির্ম্ময়ের আবির্ভাব হল।

প্রস্তাবটা শুনে মহেন্দ্রবাবুর মুখে কোন কথা ফুটল না, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে প্রবীরের দিকে চাইলেন।

প্রবীর ধীরে বললে, আপনি ভাবছেন আমি পাগল, আমার মাথা খারাপ হয়েছে। অনেক ভেবে আমি আপনাকে এ কথা বলছি। কাল ডাক্তারবাবুর কাছে গেছলুম, তিনি বললেন, আশা খুব আছে, সেরে তো উঠছে। আমিও বলি উনি সেরে উঠবেন। সেরে উঠবেন কি উঠবেন না আমি তা ভাবছি না। আপনি তো বুঝতে পারেন প্রতি নারীর মধ্যে ভালবাসা পাবার যে ক্ষুধা রয়েছে রোগিণীর পক্ষে সে ক্ষুধা আরও প্রবল হয়—আমি যদি ওঁকে বিবাহ করি—

প্রবীর আর বলতে পারলে না, মহেন্দ্রবাবুর চোখ ছলছল করে উঠল। তিনি বললেন, আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু যূথিকাকে একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার, আপনি কি বলেছেন?

—সে আপনাকে ভাবতে হবে না, সে ভার আমার।

—আর ডাক্তারের মতামতটা নেওয়া দরকার।

—দেখুন, আমার বাবা কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন,—

—খুব জানি, খুব জানি।

—আমি তাঁর অযোগ্য পুত্র, ডাক্তারী পাশ করেছি বটে, কিন্তু কোনদিন ডাক্তারী করি নি। চিকিৎসা করতে জ্ঞান দরকার, আর সেবায় চাই প্রেম—চিকিৎসা করবার জ্ঞান না থাকতে পারে, কিন্তু সেবা করতে পারব—

—আচ্ছা, আমায় একটু ভাবতে দিন, ওর পিসিকে একবার বলি।

যূথিকার বিধবা পিসি এসেছিলেন তার শুশ্রূষা করতে। বাড়ীর বামুনঠাকুরের রান্নার নিন্দা ও পিসিমার চচ্চড়ি, বড়ির অম্বল, পায়েসের প্রশংসা করে প্রবীর পিসিমার এত স্নেহভাজন হয়েছিল যে, প্রতিদিন পিসিমা তাকে দু-তিনটে তরকারি করে পাঠাতেন। সেদিক থেকে কোন আপত্তি হবে না সে জানত।

খুব শান্তভাবে নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ হয়ে গেল।

নিমন্ত্রিতের মধ্যে শুধু ডাক্তারবাবু। গোধূলিলগ্নে বিবাহ হল। লালশাড়ী পরে গোলাপ-ক্রিসেন্থেমামের মালা গলায় দিয়ে যূথিকা যখন আলপনা-আঁকা পিঁড়িতে বসল, তার ভাঙন-ধরা তনুর সাজে, তার মুক্তার মত সজলশুভ্র মুখে প্রবীর কোন্ অলৌকিক সৌন্দর্য্যালোক দেখতে পেলে। সে বিমুগ্ধ ভীত হয়ে গেল, এ-রূপের সামনে সে তার সমস্ত জীবন উজাড় করে দিতে পারে। যূথিকা যখন তার দীর্ঘ শীর্ণ রক্তহীন আঙলগুলি দিয়ে ফুলের ভারী মালাটি তুলে প্রবীরের গলায় পরালে, মুক্তার মত সাদা তার মুখখানি রক্তপ্রবালের মত রাঙা হয়ে উঠল ক্ষণিকের জন্ম। তারপর সে মুখ মোমের মত ফ্যাকাসে, কপালে নীলশিরা দপ্‌দপ্ করতে লাগল।

দিনের পর দিন দু-জনের স্বপ্নজীবন সুরু হল।

যূথিকা অনুভব করত চারিদিকে অলৌকিক মায়া, অবাস্তব ছায়া; পথ বাড়ি পাহাড় বন সব সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হয়ে গেছে, বস্তুপুঞ্জ অলীক; সে-ও একটি ছায়া। সে ইজিচেয়ারে চুপ করে শুয়ে আছে, দ্রষ্টা; আর তার মধ্যে আর একজন কে জীবনভোগপ্রয়াসিনী খায়, বেড়ায়, হাসে, গল্প করে, মাঝে মাঝে গান গেয়ে উঠে। তার সত্যিকার সত্তা চুপ করে শুয়ে দেখছে এই নবজাগ্রতা প্রেমসুখ-বিহারিণীর রঙ্গ, আর মৃদু হাসছে; সে-হাসিতে যে তার জীবন-তৃষিতার চোখে জল ভরে আসে।

সকাল সাতটায় বিছানা থেকে ওঠা; আটটার সময় খাওয়া; সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে ন'টা বাগানে বেড়ান; সাড়ে ন'টা থেকে সাড়ে এগারটা গল্প, বই পড়া শোনা; বারটায় খাওয়া; একটা থেকে তিনটে পূর্ণ বিশ্রাম, এ সময় প্রবীরের আসাও নিষেধ; চারটের সময় চা; সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটা নদীর ধারে বেড়ান; সাড়ে পাঁচ হতে সাড়ে সাত গল্প, গ্রামোফোন, রেডিও শোনা; আটটায় খাওয়া; ন'টা থেকে দশটা প্রবীর গল্প বলে, শুধু শোনা; তারপর আবার বিছানাতে ঘুমের চেষ্টা, ঘুম। দিনের পর রাত প্রতিদিন একই ছন্দে বাঁধা জীবন, তবু প্রতিদিন নব নব বিচিত্র সুর বাজে।

প্রবীরের মনে হত, এ স্বপ্ন-জীবন; এই সেবা করার,

ভালবাসার আনন্দ, এই শান্তি, এই অবাস্তব সৌন্দর্য্য সন্ধ্যার রঙীন মায়ার মত ক্ষণিক মিলিয়ে যাবে, তার মিলিয়ে যাবে।

কিন্তু মাঝে মাঝে কোন্ অপূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তারা অনুভব করত তারা পরস্পর নিবিড়ভাবে যুক্ত, জগতের কোন রহস্যময় প্রাণশক্তির সহিত তাদের সম্মিলিত সত্তা একই সুরে ছন্দিত।

রৌদ্রোজ্জ্বল শান্ত প্রভাত। গোলাপফুলের কুঞ্জে মৌমাছিরা গুন গুন করে, রক্তকরবীর শীর্ণ ঝাড় হতে বাতাস সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে মৃদুগন্ধ ছড়ায়, গাছের পাতাগুলি আলোয় ঝিকিমিকি করে; খোলা মাঠে গরুর পাল নিঃশব্দে চরে; একটা খালি টাঙ্গা রাজপথ দিয়ে ধূলি উড়িয়ে চলে যায়; রুক্ষকঠিন মাটির ঢেউয়ের পর ঢেউ শুক্‌নো নদীর ওপারে, তার ধারে সবুজ বন, নীলপাহাড়ের সারি; শূন্যমাঠভরা রোদ জলজল করে প্রদীপ্ত প্রদীপের মত; পাশের বাড়ীর বাগানে এক সাহেবের ছোট ছেলে-মেয়ে লাল বল নিয়ে খেলে; বারান্দায় সেজলঙ্‌তে শায়িতা যূথিকার শীর্ণ হাতখানি প্রবীর তার হাতে টেনে নিয়ে বসে—দুজনে অনুভব করে, আছি, আমরা আছি, এই আকাশভরা আলোয়, দিগন্তজোড়া পাহাড় বনের নীল মাথায়, পাতার কাঁপন, ফুল ফোটার সঙ্গে পাখীর চিকিমিকি, ছেলেমেয়েদের হাসি খেলার মধ্যে আমরা যুক্ত, বেঁচে আছি।

প্রবীর অনুভব করে, এই যে রাত্রি প্রভাত হল, যূথিকা জাগল, তার হাত ধরে তার পাশে বসলুম, এর চেয়ে আনন্দময় বিস্ময়, এর চেয়ে অনির্ব্বচনীয় রহস্য আর কি আছে!

যূথিকা ভাবে কত কোটি বৎসর ধরে অসীম অন্ধকারে ঘুরেছে এই পৃথিবী, এক বিরাট অগ্নিপিণ্ড; তারপর, অগ্নি নিব্‌ল, সে হল সুজলা, শস্যশ্যামলা; প্রাণের জন্ম হল, সে হল জীবধাত্রী, সুন্দরী; এই অনন্তকালের বিবর্ত্তনে যে-প্রাণ আপনাকে প্রকাশিত করেছে সেই প্রাণ তার মধ্যে রূপ নিল, সেই প্রাণের ধুক্‌ধুকানি তার বক্ষে; এ মানবজীবনের অন্তিমতটে হয়ত সে এসে পৌঁছেচে, কিন্তু তার সত্তার অসীমতা সে অনুভব করেছে কালের সব কোলাহলের স্তব্ধতায়, আর একটি ক্ষুদ্র মানবসত্তার প্রেমের স্পর্শে।

রাত্রে প্রবীরের ভাল ঘুম হয় না; মাঝে মাঝে সে বিছানা ছেড়ে ওঠে, পাশের ঘরে গিয়ে দেখে, যূথিকা কেমন ঘুমাচ্ছে, মা যেমন তার রুগ্ন ঘুমন্ত শিশুর দিকে চেয়ে থাকেন তেমনিভাবে সে চেয়ে থাকে।

চাঁদের ম্লান আলো বারান্দা দিয়ে ঘরের দরজা পর্য্যন্ত আসে; দূরে গাছগুলির কালোছায়া ঠাণ্ডা বাতাসে দোলে; প্রবীর যূথিকার কম্বলটা বিছানাতে ভাল করে গুঁজে দেয়।

যূথিকা ডাকে, ওগো!

সে বলে, চুপ, ঘুমাও!

যূথিকার গালে একটু হাত বুলিয়ে তার হাত টেনে নেয় নিজের হাতে; আকাশভরা তারাগুলি দপদপ করে নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের শিখার মত, প্রবীর ও যূথিকা অনুভব করে, আছি, আমরা যুক্ত আছি।

তিন সপ্তাহ কাটল। ধীরে যূথিকার মধ্যে কি পরিবর্ত্তন সুরু হল। সে চঞ্চলা হয়ে উঠল; যা-তা খাবার জন্যে আবদার সুরু করে; বহুদূরে হেঁটে যেতে চায়; একদিন মোটরগাড়ী করে রাজপুর গিয়ে ছাড়লে; দুপুর বেলা চুপচাপ শুয়ে থাকতে চায় না, প্রবীরকে গল্প বলতে হয়। জ্বর আছে, কিন্তু সে যেন দেহে নবশক্তি পেয়েছে, মোমের মত কোমল সাদা মুখ গোলাপের মত রাঙা হয়ে ওঠে।

প্রবীর ভাবে যূথিকা সেরে উঠছে। যূথিকাও ভাবে, হাঁ, জ্বরটুকু কিছু নয়, তার দেহের দুর্ব্বলতা কমে গেছে; কি চাঞ্চল্য রক্তে ঝিল্‌মিল্ করে।

বস্তুতঃ তার জীবনীশক্তি মিটিমিটি প্রদীপের মত ছিল নিষ্প্রভ, হঠাৎ দাউ দাউ করে জলে উঠেছে তারি দীপ্তি তার চোখে মুখে, তারি জ্বালা তার দেহমনে।

কিন্তু, এ অগ্নিশিখার ইন্ধন যে তার ক্ষীয়মান দেহ।

তারপর?

এ কথা ভাবতে ভাল লাগে। তারপর যূথিকা বেশ সেরে উঠল, অবশ্য দু-তিন মাসে নয়, দু-তিন বছরে।

তারপর তারা সুখে ঘর-সংসার বাঁধলে; যূথিকার একটি খোকা হ'ল, নাদুসনুদুস্ সুন্দর খোকা, তুলতুলে গাল, টুকটুকে হাত-পা। তাদের নিয়ে প্রবীর একবার পেশোয়ার পর্য্যন্ত বেড়িয়ে এল; অবশ্য মোটর গাড়ীতে নয়, কারণ অসুখ সারলেও মোটরগাড়ীতে এত দীর্ঘ পাড়ি দেওয়া যূথিকার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নাও হতে পারে; তারা ট্রেনেই গেল। তবে তার য়্যাভিয়েটার-বন্ধু একবার যূথিকাকে এরোপ্লেনে চড়িয়ে ঘুরিয়ে আনলে পুরী; প্রবীরের কোন বারণ শুনল না।

হাঁ, এসব কথা ভাবতে ভাল লাগে। কিন্তু আমরা যা ভাবি, যা স্বপ্ন দেখি বাস্তব সংসারে আমাদের মনের মতন করে ঘটনা ত ঘটে না।

যূথিকার মৃত্যুর পর প্রবীর এই কথাগুলিই ভাবছিল। মুসৌরীর পাহাড় বরফে সাদা হয়ে গেছে, আকাশ নিকষ-কৃষ্ণ মেঘাবৃত, পত্রহীন গাছগুলিতে শীতের ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। প্রবীরের অন্তরও ওই মুসৌরীর পাহাড়ের মত শীতল, আকাশের মত বর্ণহীন। মোটরকারটা কলিকাতা হতে সেরে এসেছে, কিন্তু মোটরকার চালিয়ে কোথাও যাবার মত উৎসাহ সে অনুভব করল না, যে হাত দিয়ে সে ষ্টিয়ারিং হুইল ঘুরাবে সে হাত কে যেন ভেঙে দিয়েছে।

শীতকালটা সে দেরাদুনে থাকবে ঠিক করলে। ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা, বরফ পড়বার আশঙ্কা আছে। সে কিছু মানলে না। এই আলোহীন আকাশের দিকে চেয়ে সে তার কাব্যটা শেষ করবে—সে বুঝেছে সত্যিকার প্রেম শুধু রূপের সৌন্দর্য্যানুভূতি, শুধু হৃদয়ের আবেগ, মনের রঙীন খেলা নয়, প্রেম হচ্ছে ত্যাগে সেবায় আপনাকে উজাড় করে দেওয়া, কোন ভীরুতা না রেখে আপনাকে বিলিয়ে দিতে না পারলে সত্যিকার আনন্দ নেই।

সন্ধ্যাতারা

শ্রীবিশ্বেশ্বর দাশ

রক্ত-রাঙা সন্ধ্যাকাশে নেহারি নিয়ত
বিনম্র সলজ্জ নব-বধূটির মত
কে গো তুমি? দিবসের কর্ম্ম-কোলাহল
মৌনমূক; শ্রান্ত ক্লান্ত যবে জীবদল,
যেমতি ভাবনাকুল থাকে আয়ুষ্মতী
দয়িতের পথ চাহি; তুমিও তেমতি
আছ বুঝি কারো প্রতীক্ষায়! কে সে জন?
তুমি কার জীবনের নিবিড় স্পন্দন?

আরও যে রয়েছে কত রহস্য না-জানি
বিশ্বে এই;—নিশীথিনী ধীরে দেয় টানি
দিশি দিশি তমো-যবনিকা। শূন্য গায়
চুপি কা'রা মত্ত যেন গূঢ় মন্ত্রণায়।
অতর্কিতে লক্ষ তারা ঘিরিল আকাশ;
সবারে প্রকাশি তুমি হ'লে অপ্রকাশ।

দুইটি মহাভারতীয় প্রশ্ন

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

[গত বৎসর পৌষ মাসে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর-মহাশয় আমায় মহাভারত হইতে দুইটি উদ্ভট প্রশ্ন করিয়াছিলেন। কারণ, কে না জানে, পাণ্ডবেরা দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বর্ষ অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন? কে না জানে, কুরু পিতামহ ভীষ্ম ৫৮ দিন শরশয্যায় শয়ান থাকিয়া স্বর্গারোহণ করেন? তথাপি প্রশ্ন। এখানে আমার যথামতি উত্তর লিখিত হইতেছে।]

প্রথম প্রশ্ন

অজ্ঞাতবাস পূর্ণ হইবার কতকাল পরে পঞ্চপাণ্ডব আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন? নীলকণ্ঠের মতে কতদিন? অর্জুনমিশ্রের মতেই বা কতদিন?"

উত্তর।—কৌরবেরা বিরাট রাজার গোধন-হরণ-কালে বৃহন্নলাকে দেখিয়া বিতর্ক করিতে লাগিলেন। লোকটি দেখিতে অর্জুন, অথচ ক্লীব! দুর্যোধন বলিলেন, "পাণ্ডবদিগের প্রতিজ্ঞাত সময় অতিক্রান্ত হয় নাই। তথাপি অর্জুন যদি সমাগত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে পুনর্বার দ্বাদশ বর্ষ বনবাস করিতে হইবে। পাণ্ডবেরা লোভবশতঃ সময় ভঙ্গ করিল, কি আমারই ভ্রান্তি হইতেছে, তাহা বলিতে পারি না। প্রতিজ্ঞাত সময় অবশিষ্ট আছে, কি অতিক্রান্ত হইয়াছে, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ হয় পিতামহ বিশেষ অবগত আছেন।" (বিরাট।৪৭ অঃ)

ভীষ্ম উত্তর করিলেন,

> পঞ্চমে পঞ্চমে বর্ষে দ্বৌ মাসাবুপচীয়তঃ।৩।
> এষামভ্যধিকামাসাঃ পঞ্চ চ দ্বাদশক্ষপাঃ।
> ত্রয়োদশানাং বর্ষাণামিতি মে বর্ত্ততে মতিঃ।৪।
> বিরাট। ৫২ অঃ।

অর্থ,—পঞ্চম পঞ্চম বর্ষে [প্রতি পঞ্চবর্ষাত্মক যুগে] দুই [চান্দ্র] মাস বৃদ্ধি হয়। ইঁহাদেরও [পাণ্ডবদেরও] ত্রয়োদশ বর্ষের অধিক পাঁচ মাস বার রাত্রি হইয়াছে। ইহাই আমার মত।

অত্র নীলকণ্ঠ।—নীলকণ্ঠ সাবন, চান্দ্র, সৌর, এই ত্রিবিধ বর্ষের উল্লেখ করিয়া পরিমাণ দিয়াছেন। ৩৬০ দিনে সাবন, ৩৫৪ দিনে চান্দ্র, ৩৬৫।১৫।৩১।৩০ দিন-দণ্ডাদিতে সৌর বর্ষ। প্রতিজ্ঞাত বর্ষ সাবন হইতে পারে না। কারণ, সাবন হইলে প্রতিবর্ষে ৬ দিন বাড়িয়া ১৩ বর্ষে ৭৮ দিন বা ২ মাস ১৮ দিন বাড়িত। মূলে ৫ মাসের অধিক বলা হইয়াছে। নীলকণ্ঠ ত্রয়োদশ বর্ষ সৌর ধরিয়া লিখিয়াছেন, ৫ মাস ৩ দিন বৃদ্ধি হইয়াছিল। অতএব ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হইবার পর ৯ দিন অধিক হইয়াছিল। [এখানে নীলকণ্ঠ নিজের বাক্যের সঙ্গতি রাখেন নাই। তিনি নিজেই চান্দ্রবর্ষ ও সৌরবর্ষের পরিমাণ দিয়াছেন। তদনুসারে বর্ষপ্রতি ৩৬৫·২৫৬৮ — ৩৫৪ = ১১·২৬ দিন বৃদ্ধি পাই। ১৩ বর্ষে ১৪৬·৩৮ দিন বা ৪ মাস ২৭ দিন হয়। তিনি ১১·৭৪ দিন বৃদ্ধি ধরিয়াছেন। কেন ধরিয়াছেন, তাহা লেখেন নাই।]

কিন্তু তিনি এই ব্যাখ্যায় তুষ্ট হন নাই, 'অর্দ্ধমাস' [পক্ষ] ও 'মাস' [চান্দ্র মাস] দেখিয়া মনে করিয়াছেন, ত্রয়োদশ বর্ষ চান্দ্র বর্ষ, এবং ১৩ × ১২ = ১৫৬ চান্দ্র মাস গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "লোকে বিজয়া-দশমীতে দ্যূতকাল প্রায়ই ধরিয়া থাকে। সে তিথিতে পাণ্ডবেরা দ্যূতে পরাজিত হইয়াছিলেন। কৌরবেরা ভাবিয়াছিলেন বিজয়া-দশমীতে ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হইবে। কিন্তু পাণ্ডবেরা ত্রয়োদশ চান্দ্রবর্ষ অতিবাহিত করিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছিলেন। তদনুসারে বিজয়া-দশমীর ৫ মাস ১২ দিন পূর্বে গ্রীষ্মকালে চৈত্র মাসের কৃষ্ণ-সপ্তমীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।" [এই ব্যাখ্যায় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রবঞ্চক হইয়া পড়িয়াছেন। কৌরবেরা বুঝিলেন সৌরবর্ষ, পাণ্ডবেরা ধরিলেন চান্দ্রবর্ষ, লোক-ব্যবহারে এরূপ হয় না। দুই পক্ষই হয় চান্দ্র, না-হয় সৌরবর্ষ বুঝিয়াছিলেন। গণিতকর্মে চান্দ্রবর্ষ-গণনায় প্রয়োজন হয়, লোক-ব্যবহারে সৌরবর্ষ। ভীষ্মের গণনাক্রম দেখিলেও সন্দেহ থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, নীলকণ্ঠের গণনাও

ঠিক হয় নাই। আশ্বিন শুক্লদশমী বিজয়া-দশমী। ইহার ৫ মাস ১২ দিন পূর্বে চৈত্রের কৃষ্ণ-ত্রয়োদশী হয়, চৈত্রের কৃষ্ণ-সপ্তমী হয় না। এই কারণে নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবার দিন কয়েক পরে পাণ্ডবেরা আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

অত্র অর্জুন মিশ্র।—ইনিও ত্রয়োদশ চান্দ্রবর্ষ মনে করিয়াছেন এবং ত্রয়োদশ সৌরবর্ষ হইতে ৫ মাস ১২ দিন কাটিয়া সৌর ১২ বৎসর ৬ মাস ১৮ দিনে প্রতিজ্ঞাপূর্ণ করিয়াছেন। ইনি শব্দব্যাখ্যা করিয়াছেন, বস্তু ব্যাখ্যা করেন নাই।

অত্র কাশীরাম দাস।—বিরাটরাজসভায় আত্মপ্রকাশ-কালে সহদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,

সহদেব কহিলেন অজ্ঞাত নাহি শেষ।
চতুর্দ্দশ বৎসরের বিংশতি প্রবেশ।

অর্থাৎ, অজ্ঞাতবাসের অবশেষ নাই, আজি চতুর্দ্দশ বৎসরের ২০শে। কাশীরাম এই অর্থ অর্জুনমিশ্র হইতে লইয়াছেন। কার্তিক শুক্ল প্রতিপৎ, দ্যূতপ্রতিপৎ নামে খ্যাত। এই তিথি সৌর ১লা কার্তিক হইতে পারে। ইহার ৫ মাস ১২ দিন পূর্বে বৈশাখের ১৮ই। ইহার তৃতীয় দিবসে, অর্থাৎ ২০শে আত্ম-প্রকাশ। কাশীরাম চান্দ্র ত্রয়োদশ বর্ষ অঙ্গীকার করিয়া সৌরে আসিয়া পড়িয়াছেন। তিনি সৌর মাস দিন গণিতেন, চান্দ্র গণিতেন না।

অত্র কালীপ্রসন্ন সিংহকৃত বঙ্গানুবাদ।—"প্রতি পঞ্চম বর্ষে ২ মাস করিয়া বৃদ্ধি হয়। এই রূপে তাহাদিগের [পাণ্ডবদিগের] ত্রয়োদশ বর্ষ সম্পূর্ণ হইয়া পাঁচ মাস ও ছয় দিবস অধিক হইয়াছে।" [কিন্তু পাণ্ডবেরা এত সুখে ছিলেন না যে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া আরও ৫ মাস ৬ দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। দ্বাদশ রাত্রির অপর ৬ দিনই বা কোথায় গেল?]

অত্র মম মতি।—মহাভারতের কবি কেবল ভীষ্মের দ্বারা ত্রয়োদশ বর্ষ গণনা করান নাই। কোন্ তিথিতে ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হইয়াছিল, তাহাও বলিয়াছেন। বিরাট পর্বে (১৫ অঃ) পাই, বিরাট-রাজমহিষী এক পর্ব উপলক্ষে দ্রৌপদীকে কীচকের গৃহ হইতে সুরা আনিতে পাঠাইয়াছিলেন। কীচক দ্রৌপদীকে অপমানিত করে। পরদিন প্রদোষকালে কীচক-বধ হয়। পরদিন ভীত বিরাট-রাজার কথায় মহিষী দ্রৌপদীকে অন্যত্র চলিয়া যাইতে বলেন। দ্রৌপদী আর ত্রয়োদশ দিবস থাকিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন, তদন্তে তাঁহার গন্ধর্বপতি তাঁহাকে লইয়া যাইবেন। কৌরবেরা পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাতবাস অনুসন্ধান করিতে-ছিলেন, কিন্তু জানিতে পারেন নাই। প্রেরিত দূত কীচক-নিধন-বার্তা শুনাইল, দুর্যোধন কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "এই পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাতবাসের বৎসর। ইহার "ভূয়িষ্ঠ" কাল অতীত হইয়াছে, "অল্প অবশিষ্ট" আছে (২৬ অঃ)। পুনশ্চ দূত প্রেরণের ব্যবস্থা হইতেছিল, ইত্যবসরে কর্ণের পরামর্শে বিরাট-রাজ্য-লুণ্ঠন ও গোধন-হরণ কৌরবগণের অভিপ্রেত হইল। ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীর অপরাহ্ণে সসৈন্যে লুণ্ঠন করিতে যাত্রা করিলেন (৩০ অঃ), পরদিন অষ্টমীর প্রাতে কৌরবেরা সদলবলে গোধন-হরণ করিতে গেলেন (৩১ অঃ)। দুর্যোধন ভাবিয়াছিলেন, ত্রয়োদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হয় নাই, অল্প অবশিষ্ট আছে। অর্জুনকে দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হইতে লাগিল, ত্রয়োদশ বর্ষ হয়ত অতিক্রান্ত হইয়াছে, পিতামহ ভীষ্ম সবিশেষ অবগত আছেন (৪৭ অঃ)। তখন ভীষ্ম গণিয়া বলিলেন, ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হইয়া ছয় দিন গত হইয়াছে (৫২ অঃ)। তদনন্তর অর্জুনের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কৌরবেরা পলায়ন করিলেন। ইহার তৃতীয় দিবসে (কৃষ্ণ-দশমীতে) যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবেরা বিরাট-সভায় আত্মপ্রকাশ করিলেন (৭০ অঃ)।

প্রথমে ভীষ্মের গণনাক্রম বুঝা যাউক। এক উদাহরণ দিলে সুবোধ্য হইবে। এক ভবিষ্যৎ-বক্তা বলিয়াছিলেন, অদ্য হইতে তিন বর্ষ পরে স্বরাজ-লাভ হইবে। এক ব্যক্তি জানিয়া লইল ৩৬৫ দিনে বর্ষ, এবং এক স্থালীতে প্রত্যহ এক গুটিকা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। যখন ৩×৩৬৫ = ১০৯৫ গুটিকা হইল, তখন বুঝিল তিন বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। আর এক ব্যক্তি এত কষ্টে না গিয়া সে দিনের মাস ও তিথি গণিতে লাগিল। সে জানিত সে তিথি পুনর্ব্বার আসিতে ৩৫৪ দিন লাগে। সুতরাং বর্ষে বর্ষে ১১ তিথি কমিতে থাকে। সে সে-তিথি ৩ বার গণিয়া

৩×৩৫৪=১০৬২ পাইল, এবং তাহাতে ৩×১১=৩৩ তিথি যোগ করিয়া ঠিক সেই ফল পাইল। কারণ ১০৬২+৩৩=১০৯৫।

ভীষ্ম এই রূপ গণিয়াছিলেন। তিনি ৩৫৪ দিনে ১২টি পূর্ণিমা অর্থাৎ এক চান্দ্র বৎসর, এবং ৩৬৬ দিনে সৌর বৎসর ধরিয়াছিলেন। সে কালের এক পাঁজিতে ৩৬৬ দিনে সৌরবর্ষ ধরা হইত। অতএব, এক সৌরবর্ষ পাইতে হইলে এক চান্দ্রবর্ষে ১২ তিথি যোগ করিতে হইত। এই রূপে ৫ সৌরবর্ষে ৫×১২=৬০ তিথি অর্থৎ ২ চান্দ্র মাস অধিক গণিতে হইত। অতএব ১৩ সৌরবর্ষে ১৩ চান্দ্রবর্ষ এবং $\frac{১৩\times২}{৫}$ = ৫ চান্দ্র মাস ৬ তিথি হইবে। ভীষ্ম দেখিলেন, ৫ চান্দ্র মাস ১২ তিথি অধিক হইয়াছে। অতএব অর্জুনের দর্শন দিবসে ১৩ সৌরবর্ষ পূর্ণ হইয়া ৬ তিথি অধিক হইয়াছিল।

অর্জুন এক কৃষ্ণ-অষ্টমীতে বিরাট-গোগৃহে কৌরবদিগের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। সেই দিবস ৬ তিথি অধিক হইয়াছিল। অতএব তৎপূর্ব কৃষ্ণ-দ্বিতীয়াতে প্রতিজ্ঞাত ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হইয়াছিল। দ্রৌপদী এই তিথি জানিতেন। তিনি বিরাট-রাজ-মহিষীর নিকট ১৩ দিন সময় চাহিয়াছিলেন। অতএব শুক্ল-পঞ্চমীতে চাহিয়াছিলেন। শুক্ল-চতুর্থীতে কীচকবধ হইয়াছিল, এবং শুক্ল-তৃতীয়ায় এক পর্ব পড়িয়াছিল।

কি হেতু এই পর্ব? কোন্ মাসে? এই দুই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করিতে হইলে ভীষ্মের অবলম্বিত পঞ্জিকা দেখিতে হইবে। বৈদিক যজ্ঞ-কর্মের তিথি নির্ণয় নিমিত্ত এক বৈদিক পঞ্জিকা ব্যবহৃত হইত। তাহার আধার "বেদাঙ্গ জ্যোতিষ" নামক এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ। ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে ৩৫৪ দিনে চান্দ্রবর্ষ এবং ৩৬৬ দিনে সৌরবর্ষ স্বীকৃত হইয়াছে। এইরূপ ৫ সৌর-বর্ষে এক "যুগ" ধরা হইয়াছে। সে পাঁচ বর্ষের পাঁচ নাম ছিল। মহাভারতে ও কোন কোন পুরাণে এই যুগের ও পঞ্চবর্ষের উল্লেখ আছে। কোন্ বর্ষে কোন্ তিথিতে বিষুব, অয়ন, ঋতু আরম্ভ, তাহা গণিত ও বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। এক যুগ গতে অন্য যুগ আসিত, কিন্তু এক পাঁজিই চলিত। উত্তরায়ণের পর দিন নববর্ষ আরম্ভ হইত। এখানে পঞ্চবর্ষের নাম ও আমাদের প্রয়োজনীয় তিথি উদ্ধৃত হইতেছে।

বর্ষ	উত্তরায়ণ	মহাবিষুব
সংবৎসর	পৌষ অমাবস্যা	বৈশাখ শুক্ল-তৃতীয়া
পরিবৎসর	মাঘ শুক্ল দ্বাদশী	" পূর্ণিমা
ইদাবৎসর	" কৃষ্ণ-নবমী	" কৃষ্ণ-দ্বাদশী
অনুবৎসর	" শুক্ল-ষষ্ঠী	" শুক্ল-নবমী
ইদ্বৎসর	" কৃষ্ণ-তৃতীয়া	" কৃষ্ণ-ষষ্ঠী

বস্তুতঃ "সংবৎসরে"র তিথি জানিলেই তাহাতে ১২ তিথি যোগ ও মলমাস ত্যাগ করিলে পর পর বৎসরের জানা যাইত। পাঁজি সহজ করিবার নিমিত্ত ১২ তিথি ধরা হইত। বস্তুতঃ ১১ তিথি। এই হেতু বর্ষে বর্ষে ১ তিথি অধিক হইয়া ৩০ বর্ষে ১ মাস প্রভেদ ঘটিত। বোধ হয় সে অধিক মাস ত্যাগ করা হইত। সে যাহা হউক, পাণ্ডব-দিগের প্রতিজ্ঞাত ১৩ বর্ষে ১৩ দিন অধিক ধরিতে হইয়াছিল। নতুবা পর্ব দিবসেই তাঁহারা প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হইতেন। দেখা যাইতেছে, পর্বটি "সংবৎসর" বর্ষের বৈশাখ শুক্ল-তৃতীয়া ও মহাবিষুব দিবস।

ইহা হইতে কোন্ বর্ষের কবে বনবাস আরম্ভ এবং কোন্ বর্ষের কবে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ আরম্ভ, তাহাও গণিতে পারা যায়। মহাবিষুব হইতে মহাবিষুব এক সৌরবর্ষ। "সংবৎসরে"র মহাবিষুব দিনে ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ। ইহার ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্বে মহাবিষুব দিনে দ্যূতক্রীড়া হইয়াছিল। দেখা যাইতেছে, সে বৎসর ইদাবৎসর ছিল, এবং বৈশাখ কৃষ্ণ-দ্বাদশীতে মহাবিষুব পড়িয়াছিল। বোধ হয় সে বর্ষের বৈশাখ-পূর্ণিমায় রাজসূয় যজ্ঞ হইয়াছিল, এবং এগার দিন গতে কৃষ্ণ দ্বাদশীতে কি ত্রয়োদশীতে দ্যূত-ক্রীড়া। দুর্যোধন এই তিথি স্মরণ রাখিয়া মনে করিয়া-ছিলেন, এই তিথিতে অথবা ইহারও তের তিথি পরে ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হইবে। তিনি কৃষ্ণ-অষ্টমীতে অর্জুনকে দেখিয়া আবার দ্বাদশ বর্ষ বনবাস-প্রেরণের আশা করিতে-ছিলেন। ভীষ্ম তাঁহার ভ্রম দেখাইয়া দেন।

বৈশাখ কৃষ্ণাষ্টমীর তৃতীয় দিবসে কৃষ্ণদশমীতে বিরাট-সভায় পাণ্ডবগণের আত্মপ্রকাশ। অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ

হইবার পর নবম দিবসে। তদনন্তর অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহ, রাজ্যলাভের মন্ত্রণা, সন্ধির নিমিত্ত দূত গমনাগমন চলিতে লাগিল। দুই পক্ষে সেনা-সংগ্রহও হইতে লাগিল। হেমন্ত ও বসন্ত, এই দুই ঋতুতে যুদ্ধ-যাত্রা করা হইত। "সংবৎসরে" কার্তিক শুক্ল-নবমীতে জল-বিষুব, তদনন্তর মার্গশীর্ষ শুক্ল-একাদশীতে হেমন্ত আরম্ভ। অতএব বিরাট পর্বের কবির মতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ একাদশীর পূর্বে আরম্ভ হয় নাই। আরও জানিতেছি, বিরাট পর্বের যে যে স্থানে বৈদিক পঞ্জিকা স্মৃত হইয়াছে, সে সে স্থান "বেদাঙ্গ জ্যোতিষ" প্রণয়নের পরে লিখিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৫৪ অব্দে এই জ্যোতিষ প্রণীত হইয়াছিল। এ-সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। ইহার কত বৎসর পরে বিরাট পর্বের সে সে স্থান লিখিত হইয়াছে, তাহা বলিবার উপায় নাই। সে পঞ্জিকা কিঞ্চিৎ সংশোধিত হইয়া বহুকাল চলিয়াছিল, কিন্তু এখানে সংশোধনের চিহ্ন পাই না। ইহাতে মনে হয়, খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৫৪ অব্দের বহুকাল পরে নয়।

বৈদিক পঞ্জিকাগত ফল পরিপাটি করিলে,

পরিবৎসর	কার্তিক …	জরাসন্ধ বধ
„	অগ্রহায়ণ পৌষ…	দিগ্‌বিজয়
ইদাবৎসর	মাঘ কৃষ্ণনবমী…	উত্তরায়ণ, পরদিন নববর্ষ
„	বৈশাখ পূর্ণিমা…	রাজসূয়
„	„ কৃষ্ণ-দ্বাদশী…	দ্যূত ও বনবাস আরম্ভ
সংবৎসর	বৈশাখ কৃষ্ণদ্বিতীয়া…	ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ
„	„ কৃষ্ণ-দশমী…	রাজসভায় পাণ্ডবদিগের আত্মপ্রকাশ
„	অগ্রহায়ণ শুক্ল-একাদশীগতে ·	কুরুপাণ্ডব যুদ্ধ
পরিবৎসর	মাঘ শুক্ল দ্বাদশী…	উত্তরায়ণ

দ্বিতীয় প্রশ্ন

"আহত হইবার কতদিন পরে ভীষ্ম দেহত্যাগ করেন? অথবা তিনি কয়দিন শর-শয্যায় থাকিয়া দেহত্যাগ করেন?"

উত্তর।—এই প্রশ্নের উত্তর দুরূহ। মহাভারতে ত্রিবিধ উক্তি আছে।

প্রথম উত্তর।—ভীষ্মপর্বের ১২০ ও ১২১ অধ্যায়ে লিখিত আছে, যুদ্ধের দশম দিবসে সূর্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্বে শরজালে বিদ্ধ হইয়া ভীষ্ম রথ হইতে পতিত হইলেন, এবং প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহার নিধন বহুবার লিখিত হইয়াছে। ১১৯ অধ্যায়ের নাম ভীষ্ম-নিপাতন।

দ্বিতীয় উত্তর।—দ্বিতীয় কবি ভীষ্মকে রবির দক্ষিণায়ন কালে নিহত না করিয়া সংজ্ঞাহীন করিয়াছেন। তিনি ভাবিলেন, "নিখিল ধনুর্ধরগণের অগ্রগণ্য মহাত্মা ভীষ্ম কি নিমিত্ত দক্ষিণায়নে প্রাণত্যাগ করিবেন?" (১২০ অঃ)। শরশয্যায় শরের উপধান হইল, শরদ্বারা পৃথিবী ভেদ করিয়া সুশীতল বারি উৎক্ষেপিত হইল (১২৩ অঃ)। অর্জুনের এই অদ্ভুত কর্ম দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন।. ভীষ্ম শরশয্যায় অষ্টপঞ্চাশৎ তিথি শয়ান থাকিয়া যুধিষ্ঠিরকে নানাবিধ ধর্মোপদেশ করিয়া উত্তরায়ণের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিবসানন্তর উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলে যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া ভীষ্ম বলিলেন (অনুশাসন পর্ব। ১৬৭ অঃ),

> অষ্টাপঞ্চাশতং রাত্র্যঃ শয়ানস্যাদ্য মে গতাঃ।
> শরেষু নিশিতাগ্রেষু যথা বর্ষশতং তথা॥
> মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।
> ত্রিভাগশেষঃ পক্ষোঽয়ং শুক্লো ভবিতুমর্হতি॥

নিশিতাগ্র শরে শয়ান হইয়া অদ্য আমার আটান্ন তিথি গত হইয়াছে। মনে হইতেছে যেন শতবর্ষ। হে যুধিষ্ঠির, সুন্দর মাঘ মাস সমাগত। ইহার এক ভাগ গত, ত্রিভাগ অবশিষ্ট আছে। এই পক্ষ শুক্লও বটে।

"সৌম্যঃ" স্থানে "পুণ্যঃ" পাঠও আছে। "পুণ্যঃ" পাঠই সমীচীন। 'সৌম্যঃ, চান্দ্রঃ' এই বিশেষণ অনাবশ্যক। কারণ, মাস মাত্রেই চান্দ্র। 'ত্রিভাগশেষঃ—নীলকণ্ঠ অর্থ করিয়াছেন, মাস চতুর্ভাগ করিলে সাড়ে সাত তিথি, অর্থাৎ অষ্টমী।

অর্থাৎ আজ মাঘ শুক্লাষ্টমী। ইতিমধ্যে আটান্ন তিথি গত হইয়াছে। অতএব

মাঘ মাসের…৭ তিথি
পৌষ…… ৩০ „
অগ্রহায়ণ… ২১ „
———
৫৮ তিথি

যুদ্ধের দশম দিবসে ভীষ্মের শরশয্যা আরম্ভ। অতএব সেদিন অগ্রহায়ণ শুক্ল-দশমী। ইহা হইতে পাই, অগ্রহায়ণ শুক্ল-প্রতিপদে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। মাঘ শুক্লাষ্টমী, পাঁজিতে ভীষ্মাষ্টমী নামে খ্যাত। কিন্তু ইহার এই উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক বাধা আছে। পরে বিচার করিতেছি।

তৃতীয় উত্তর।—অষ্টাদশ দিবস যুদ্ধের পর পাণ্ডবেরা মৃতগণের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ও ভাগীরথী-জলে তর্পণ করিলেন। শুদ্ধি-নিমিত্ত ভাগীরথী-তীরে এক মাস বাস করিতে লাগিলেন। (শৌচং নির্বর্ত্তয়িষ্যন্তো মাসমাত্রং বহিঃ পুরাৎ, শান্তিপর্ব। ১ অঃ ২)। তদনন্তর পাণ্ডবেরা পুরপ্রবেশ করিলেন (৩৭।৩৮ অঃ)। যুধিষ্ঠির রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন (৪ অঃ), নিহত জ্ঞাতিগণের শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিলেন (৪২ অঃ)। রাজ্যপালন আরম্ভ হইল, যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে বিষণ্ণ দেখিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, কুরুপিতামহ ভীষ্ম শরশয্যায় থাকিয়া তাঁহাকে চিন্তা করিতেছেন (৪৬ অঃ)। ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতেছিলেন (৪৭ অঃ)। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের সহিত কুরুক্ষেত্রে ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন (৫১ অঃ),

পঞ্চাশতং ষট্ চ কুরুপ্রবীর
শেষং দিনানাং তব জীবিতস্য।
ততঃ শুভৈ কর্মফলোদয়ৈস্ত্বং
সমেষ্যসে ভীষ্ম বিমুচ্য দেহম্॥

হে কুরুপ্রবীর, আপনার জীবনের আর ষট্পঞ্চাশৎ দিন অবশিষ্ট আছে।

কিন্তু যুদ্ধের পর অশৌচ, পুরপ্রবেশ, অভিষেক ইত্যাদি কর্মে অন্ততঃ ৩৩ গিয়াছিল। নীলকণ্ঠ উপরি-উক্ত স্পষ্ট বর্ণনা স্বীয় পাণ্ডিত্যদ্বারা উড়াইয়া দিয়াছেন, এবং ছাপান্ন দিনকে ত্রিশ দিনে আনিয়াছেন। যদি মহাভারতের আদি-পর্বের পর্ব-সংগ্রহের সহিত শান্তি ও অনুশাসন পর্বের অধ্যায় মিলাইতেন, দেখিতেন শান্তি-পর্বে ৩৫ অধ্যায় এবং অনুশাসন-পর্বে ২২ অধ্যায় অধিক আছে। কবি শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া ভীষ্মকে আর ছাপান্ন দিন জীবিত রাখিয়াছেন, যুদ্ধের পর গত দিন গণেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান, এবং ভীষ্ম যে পরম ভক্ত, প্রদর্শন করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। কোথায় কুরুক্ষেত্র, আর কোথায় ভাগীরথী, সে চিন্তাও আসে নাই। কিন্তু তিনি ঠিকে ভুল করেন নাই, অনুশাসন-পর্বে ভীষ্ম গণিয়াছেন ৫৮ "রাত্রি" বা তিথি, ইনি গণিয়াছেন ৫৬ "দিন"। ৫৮ তিথিতে ৫৬ দিন হয়। অথবা দিন ও রাত্রি শব্দের প্রভেদ করেন নাই। কবির মতে ভীষ্ম এই ৫৬ দিন নানা ধর্ম ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সে, যেদিন হইতেই হউক। কিন্তু উত্তরায়ণে উপস্থিত হইতে গেলে কবিকে অগ্রহায়ণ শুক্ল-প্রতিপদে যুদ্ধ আরম্ভ করিতে হইবে।

অত্র মম মতি।—তৃতীয় কবি যুদ্ধের প্রায় তিন মাস পরে ভীষ্মের স্বর্গারোহণ কল্পনা করিয়াছেন। এই মত অগ্রাহ্য করিলে দ্বিতীয় মত গ্রাহ্য হইবে না। প্রথমে বিবেচ্য, উত্তরায়ণ কোন্ তিথিতে হইয়াছিল? বিরাট পর্বের ভীষ্মগণনার কবি বৈদিক পঞ্জিকা অনুসরিয়াছিলেন। সে পঞ্জিকায় মাঘ শুক্ল-সপ্তমীতে উত্তরায়ণ নাই। "সংবৎসরে"র অগ্রহায়ণ মাসে যুদ্ধ হইয়াছিল। শুক্ল-একাদশীতে হেমন্ত আরম্ভ। এইদিনে কিম্বা দুই-এক দিন পরে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। পৌষ গতে মাঘ মাস। মাঘ মাসে নূতন বৎসর, পরিবৎসর। পরিবৎসরে মাঘ শুক্ল-দ্বাদশীতে উত্তরায়ণ। এই শুক্ল-দ্বাদশী ভৈমী দ্বাদশী নামে খ্যাত। মৎস পুরাণ প্রাচীন। ইহাতে অনেক পুণ্য তিথিতে অনেক ব্রতের ব্যবস্থা আছে। ভৈমী দ্বাদশীর ও আছে। কিন্তু ভীষ্মাষ্টমীর উল্লেখ নাই। দেখা যাইতেছে, ভীষ্মাষ্টমী বৈদিক পঞ্জিকা-বাহ্য, প্রাচীনও নয়।

সাধারণ পণ্ডিতদিগের মত, এই, পৌষ অমাবস্যায় উত্তরায়ণ হইয়াছিল। কিন্তু শুক্লপক্ষের প্রথম সাত তিথি ক্ষীণচন্দ্র। অষ্টমী হইতে চন্দ্র বলবান্। ভীষ্ম সেদিন অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা নির্দোষ নয়। পূর্বকালে লোকে বিশ্বাস করিত, উত্তরায়ণে মৃত্যু হইলে দেব-যানে গতি হয়, দেব-যান অমর-ধামে গমনের পথ। কিন্তু দেব-যান সূর্যের দ্বারা নিয়মিত হয়। চন্দ্রের সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই। উত্তরায়ণ ছয় মাস। এই ছয় মাসে অমাবস্যাও পড়ে। কিন্তু তাহাতে দেব-যানের বিঘ্ন হয় না। যে-কোন ক্ষত্রিয় হউক, যুদ্ধ করিতে

করিতে নিহত হইলে স্বধর্মপালন হেতু স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে, ধর্মযুদ্ধে শত শত ক্ষত্রিয় নিহত হইয়াছিলেন, দক্ষিণায়ন কালে হইয়াছিলেন, শাস্ত্রানুসারে সকলেই স্বর্গে গিয়াছেন। ধর্মাত্মা ভীষ্মের বাধা কি ছিল? ভীষ্মের শরশয্যা ও উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা, কবি-কল্পিত। প্রথম উত্তর হইতে বোধ হয়, আদি মহাভারতে ছিল না।

ভীষ্মাষ্টমী কবি-সত্য। এক বিখ্যাত অষ্টমীর স্মৃতির সহিত জড়িত হইয়াছে। পূর্বকালে বৈদিক ক্রিয়ার নিমিত্ত যেমন বৈদিক পঞ্জিকা ছিল, লৌকিক ব্যবহারের নিমিত্ত অন্য পঞ্জিকা ছিল। এই পঞ্জিকায় ২৪৭ সায়নবর্ষ ১ মাসে এক যুগ গণা হইত। খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৪০ অব্দে আদিযুগ আরম্ভ হইয়াছিল। এক যুগ গতে আর এক যুগ আসিত, ১ সৌরমাস আগাইয়া আসিত। এই ক্রমে ষষ্ঠ যুগ, সৌর মাঘ মাসের ১লা আরম্ভ হইয়াছিল। তখন রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ, এবং ভাস্কর সপ্তমী (প্রচলিত নাম মাকরী সপ্তমী)। ইহার অপর নাম রথ সপ্তমী, বিধান সপ্তমী, আরোগ্য সপ্তমী। এই ষষ্ঠ যুগ খ্রীষ্টপূর্ব ২০৫ অব্দ হইতে খ্রীষ্টপর ৪৪ অব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। বোধ হয়, এই কালের মধ্যে মাঘ শুক্ল অষ্টমীতে ভীষ্মের স্বর্গারোহণ এবং আটান্ন রাত্রি গণনা মহাভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। মাঘ শুক্ল সপ্তমীতে উত্তরায়ণ, পরদিন ভীষ্মের স্বর্গারোহণ। বহু প্রাচীন কাল হইতে মাঘ মাস পুণ্য মাস। যে হেতু এই মাসে রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত। কিন্তু সে মাসের ত্রিশ তিথির মধ্যে শুক্ল-সপ্তমী বিশেষ করিবার হেতু অবশ্য ঘটিয়াছিল।

কবি আটান্ন তিথি গণিতে গিয়া অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল প্রতিপদে যুদ্ধ-আরম্ভ মনে করিয়াছেন। নচেৎ যুদ্ধের দশম দিবসে ভীষ্মের শরশয্যায় শয়ন ঘটে না। "ভারত সাবিত্রী" নামে এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে। নীলকণ্ঠ "সাবিত্রী" হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। তাহাতে আছে,

হেমন্তে প্রথমে মাসি শুক্ল পক্ষে ত্রয়োদশীম্।
প্রবৃত্তং ভারতং যুদ্ধং নক্ষত্রে যম দৈবতে॥

হেমন্তের প্রথম মাস অগ্রহায়ণ মাস। ইহার শুক্ল-ত্রয়োদশীতে ভারতযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। সেদিন ভরণী নক্ষত্র। "সাবিত্রী" মতে অমাবস্যায় দুর্য্যোধন-পরাভব হইয়াছিল। [রাঢ়ীয় মহাভারতে ইহার কোন প্রমাণ নাই।] এই হেতু ইহার আঠার দিন পূর্বে ত্রয়োদশীতে যুদ্ধ আরম্ভ করিতে হইয়াছে। অর্থাৎ

অগ্রহায়ণের	১৮ তিথি
পৌষের	৩০ "
মাঘের	৮ "
	৫৬ তিথি

অতএব ভীষ্মের শরশয্যা ৪৭ দিন বা ৪৮ রাত্রি।

নীলকণ্ঠ ত্রয়োদশী স্থানে চতুর্দশী, অমাবস্যা স্থানে পৌষ শুক্লপ্রতিপৎ, ভরণী স্থানে মৃগশিরা ইত্যাদি উপন্যাস করিয়াছেন, কিন্তু ৫৮ রাত্রি ভীষ্মের শরশয্যার পার্শ্ব দিয়াও যান নাই। অগ্রহায়ণ শুক্ল-একাদশীতে যুদ্ধ আরম্ভ না হইলে মাঘ শুক্লাষ্টমীতে ৫৮ তিথি পাওয়া যায় না। দেখা যাইতেছে, যিনি ৫৮ রাত্রি গণিয়াছিলেন, তিনি যুদ্ধারম্ভ দিন হইতে গণিয়াছিলেন। ভীষ্ম অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার দেহ হইতে শর নিষ্কাশিত করা হইত না, তিনি শরবিদ্ধ দেহে শয়ন করিতেন। যুদ্ধের প্রথম দিন হইতে তাহার শরশয্যা হইয়াছিল। অথবা শরশয্যা ও মাঘ শুক্লাষ্টমীতে দেহত্যাগ, কবি-কল্পিত। এক কালের এক উত্তরায়ণ তিথির স্মৃতিরক্ষার্থে ভীষ্মের নাম যোজিত হইয়াছে। পাঁজিতে এমন যোজনা অনেক আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে" এই অ-স্থির অষ্টমী-আধা নির্ভর করিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকাল নিরূপণ করিয়াছেন। ভীষ্মাষ্টমী সত্য স্বীকার করিলেও তদ্দ্বারা যুদ্ধ-বৎসর নিরূপিত হইতে পারে না।

মাতৃ-ঋণ

শ্রীসীতা দেবী

২০

সেদিন প্রতাপ বাড়ী ফিরিল অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মন লইয়া। যামিনীকে দেখিতে না পাওয়া তাহার কাছে এমনই অতিশয় মর্ম্মপীড়াদায়ক ব্যাপার, তাহার উপর কিসের যেন একটা অশুভ আশঙ্কা তাহার হৃদয়কে আরও ক্লিষ্ট ও অভিভূত করিয়া তুলিতে লাগিল। যামিনীর সঙ্গে দেখা অনেক দিনই হয় না, কিন্তু জানলায় দাঁড়াইয়া প্রতাপের তৃষিত দুই চক্ষুকে সার্থক করিতে কোনোদিনই তাহার ত্রুটি হয় না। আজ সে সেটুকু হইতেও প্রতাপকে বঞ্চিত করিল কেন? তাহার শরীর কি অসুস্থ? মিহির তাহা হইলে সে-কথার কি একেবারেই উল্লেখ করিত না? অথবা কোন কারণে কি সে প্রতাপের প্রতি বিরক্ত হইয়াছে? কিন্তু কিই-বা কারণ ঘটিয়া থাকিতে পারে? কাল মিহিরকে পড়াইয়া যাওয়া ও আজ পড়াইতে আসার সময়ের মধ্যে যামিনীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বা কথাবার্ত্তা কিছুই তাহার হয় নাই। একখানা চিঠি সে যামিনীকে লিখিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাও পাইবার সময় যামিনীর হয় নাই। সে-চিঠি যামিনী পাইবে কাল। তবে কি পিতার নিকট প্রতাপের সহিত ঘনিষ্ঠতা লইয়া কোনো তিরস্কার লাভ করিয়াছে? হইতেও পারে। কিন্তু নৃপেন্দ্রবাবুকে সে-ধরণের মানুষ বলিয়া ত মনে হয় না। পুত্রকন্যার অস্তিত্বই তিনি যেন বেশীর ভাগ সময় ভুলিয়া থাকেন। তবে যদি কাহারও কাছে কিছু শুনিয়া থাকেন। কে তাঁহার কাছে এ-সব কথা লাগাইতে যাইবে? চাকর-বাকরের কি এতটা সাহস হইবে? তাহারা বলিবেই বা কি? দিদিমণি মাষ্টারবাবুর সহিত কথা বলিয়াছেন, ইহা লইয়া বাবুর কাছে নালিশ করিতে নিশ্চয়ই কেহ যায় নাই? দিদিমণি ত নবাবের অন্তঃপুরিকা নহেন, নিঃসম্পর্কীয় ভদ্রলোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে চাকরেরা নিশ্চয়ই তাঁহাকে বহুবার দেখিয়াছে। যামিনীর সঙ্গে কি কথা তাহার হয়, চাকর-বাকর তাহা শুনিতে পায় না। যামিনী যদিও প্রতাপকে ভাবীপতিরূপে গ্রহণ করিয়াছে তবু প্রতাপ তাহার হাতখানি ধরিতেও কোনোদিন সাহসী হয় নাই। সুতরাং কোনো মানুষের চোখে তাহার ব্যবহার বিসদৃশ ঠেকিবারও সম্ভাবনা নাই। তবে যদি প্রতি-বেশীরা কেহ কিছু আন্দাজ করিয়া নৃপেন্দ্রবাবুর কাছে বলিয়া থাকে। আচ্ছা, রাজুর ইহার ভিতর কোনো-হাত নাই ত? মনে করিতেই তাহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। মানুষের অনিষ্ট করিয়া মানুষ এত সুখ পায় কেন? রাজুর কোনো অহিত চিন্তা প্রতাপ স্বপ্নেও করে নাই, অথচ সে-ই হয়ত প্রতাপের জীবনকে চিরদিনের জন্য পঙ্গু ও ব্যর্থ করিয়া দিবে। রাজু কিছু করিয়াছে কি-না, কিছু করিতে পারা তাহার পক্ষে সম্ভব কি-না, সে-কথা ভাবিয়া দেখিতেও তাহার ইচ্ছা হইল না। মনের উত্তেজনায় পাগলের মত হইয়া সে বাড়ী আসিয়া পৌছিল।

গজুর বন্ধু তখন আসিয়া জুটিয়াছেন, তিনতলায় বউদিদির ঘরে তাঁহাদের আড্ডা চলিতেছে। দোতলার ঘরে কেহ নাই। ঘরের কাজও আজ কিছু হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। বিছানা করা হয় নাই, ঝাঁটও দেওয়া হয় নাই। রাজুর ছাড়া কাপড় এককোণে তেমনি পড়িয়া আছে। প্রতাপ বিরক্ত মুখে ঘরখানা যথাসম্ভব গুছাইয়া ঠিক করিতে লাগিল।

কানু একবার ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "বাবা তোমাকে উপরে ডাকছে কাকা।"

প্রতাপের ঠোঁটের ডগায় একটা অস্বীকারোক্তি প্রায় আসিয়া পড়িয়াছিল, সে কোনোক্রমে নিজেকে সংবরণ করিয়া রইল। এই লইয়া হয়ত আবার হাজার

রকম কথার সৃষ্টি হইবে। চিরদিন দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া করিয়া আত্মসংবরণ করিবার ক্ষমতা প্রতাপের অসাধারণ জন্মিয়া গিয়াছিল। এক মিনিট থামিয়া, ঢোক গিলিয়া সে বলিল, "আচ্ছা, যাচ্ছি চল।"

নীচের ঘরের অবস্থা আজ যেমন শ্রীহীন মলিন, উপরের ঘরখানি ঠিক সেই পরিমাণেই তকতক্ ঝকঝক্ করিতেছে। বিছানার চাদর, জান্‌লার পরদা, আয়নার ঝালর সবই সদ্য পাটভাঙা, পরিষ্কার। দুইটি ফুলদানী কোথা হইতে বাহির হইয়াছে, তাহাতে টাট্‌কা ফুলের তোড়া। প্রতাপের আজ সব-কিছুতেই বিরক্তি বোধ হইতেছিল। ভাবিল, "বাবুদের মাছ তরকারি কিন্‌তে ভারি লজ্জা বোধ হয়, ফুল কিন্‌তে যেতে বেশ পারেন।"

প্রতাপ ঘরে ঢুকিতেই গজু তাহার সহিত নবাগত ভদ্রলোকের আলাপ করিয়া দিল। তাঁহাকে একটা নমস্কার করিয়া প্রতাপ নীরবে বসিয়া রহিল, সামান্য একটা ভদ্রতার কথাও তাহার মুখে আসিল না। রাজু এখানেও নাই, কোথায় সে গিয়াছে কে জানে? কি কাজে ব্যস্ত আছে তাহাই বা কে জানে?

বেচারা রাজু এদিকে পাড়ার তাসের ক্লাবে বসিয়া রাগে ফুলিতেছিল। বাড়ীতে দাদার উৎপাতে আজ আর তাহার টিঁকিবারই জো নাই। বাঙালী সংসারের নিয়মমত গজুতে এবং রাজুতে সখ্যের ভাব একেবারে ছিল না। গজু রাজুকে দেখিলে গম্ভীর মুখে সরিয়া যাইত এবং পত্নীর নিকটে রাজুর দায়িত্বহীনতা এবং আলস্য সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিত। রাজু গজুকে দেখিয়া মুখ গম্ভীর করিত না বটে, তবে অকারণে কাল-বিলম্ব মোটেই করিত না এবং বন্ধুবান্ধবমহলে ও মায়ের কাছেও দাদাকে লক্ষ্য করিয়া যে সব-বাক্যবাণ ঝাড়িত তাহা দাদার কানে যাইত না বলিয়াই এতদিন ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ ঘটে নাই। আজ বৌদিদির অবহেলায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সে আপিস হইতে ফিরিয়াই আবার বাড়ীর বাহির হইয়া আসিয়াছে। বিকালে যে বাড়ীতে ফিরিয়া এক পেয়ালা চাও পাওয়া যায় না, তেমন গৃহ আর অরণ্য রাজুর কাছে সমান।

গজুর বন্ধু প্রতাপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনিও কি এদের আপিসেই না কি?"

প্রতাপ অতি সংক্ষেপে বলিল, "না।" তাহার পর আবার একটু কি ভাবিয়া বলিল, "আমি ভবানীপুরে স্কুলে কাজ করি।"

সে নিজেও গল্প করিতে পারিতেছে না, আবার উপস্থিত থাকিয়া অন্যের গল্পেও বাধা দিতেছে, প্রতাপ মনে মনে একেবারে অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল। সে না থাকিলে এতক্ষণে দুই বন্ধুতে কত রসিকতা, কত মধু-স্মৃতির আদান-প্রদান চলিত তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই। কোন ছুতায় যে উঠিয়া যাইবে, তাহা প্রতাপ কিছুতেই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

তাহাকে রক্ষা করিল কানু। ছুটিয়া ডাকিয়া আসিল, "কাকা, তোমায় নীচে ডাকছে?"

প্রতাপ কিসের চিন্তায় জানি না মগ্ন ছিল। চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে রে, কে ডাকছে?"

কানু বলিল, "মা।"

গজুর বন্ধু উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "খোকা ঠিক বলছ ত? কাকাকেই ডেকেছেন, বাবাকে না?"

প্রতাপ সামনে থাকায় গজু একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "আমরা পুরণো হয়ে গেছি ভাই, আমাদের আর আদর নেই। এখন নূতনদেরই আদর।"

বৌদিদি তাহাকে কি কারণে যে ডাকিতে পারেন, প্রতাপ তাহা কিছুমাত্র ভাবিয়াই পাইল না। তবু উপস্থিত সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাওয়ায় আনন্দে কৃতজ্ঞ-চিত্তেই নামিয়া গেল। রান্নাঘরের দরজার সামনে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ডাকছেন কেন, বৌদিদি?"

বৌদিদি ছোট একটা বাটিতে একটুখানি মাংস তুলিয়া বলিলেন, "এটা একটু চেখে দেখ ত ভাই।"

প্রতাপ বলিল, "আপনারা একজন দেখলেই হত, আমি এ-সব আবার ভাল বুঝি না।"

বৌদিদি বলিলেন, "সে কি আর একটা কথা হল ভাই? মেয়েমানুষের রান্নাই বল আর যাই বল, সব-কিছুর আসল বিচারকই হচ্ছ তোমরা। তোমরা যাকে যা দাম দেবে তার তা-ই দাম।"

প্রতাপ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "তাই নাকি ? কিন্তু আমি ত দেখি আপনাদের পছন্দেই জগৎ চলছে।"

বৌদিদির সঙ্গিনী মেয়েটি হাসিয়া মুখ ফিরাইল। বৌদিদি বলিলেন, "সে সাহেবমেমের জগৎ ভাই, সে কি আর আমাদের জগৎ ? এখন মাংসটা কেমন হয়েছে বল।"

প্রতাপ মাংস চাখিয়া বলিল, "চমৎকার হয়েছে বৌদি, বহুকাল এমন রান্না খাইনি।" বলিয়া সে দোতলার ঘরে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল।

রাত্রে নিমন্ত্রণ খাওয়ানোর পালা এক রকম নির্ব্বিঘ্নেই কাটিয়া গেল। বৌদি পরিবেশন করিলেন, পিসিমা তদারক করিলেন, গজু এবং তাহার বন্ধু খাইয়া সকলকে খুশী করিলেন। প্রতাপের গলা যেন বুজিয়া গিয়াছিল, কোনোগতিকে সে দু-এক গ্রাস খাইল মাত্র। রাজু বাড়ীই ফিরিল না, পিসিমা বকবক করিতে করিতে তাহার খাবার ঢাকা দিয়া রাখিলেন।

সকালে উঠিয়াও প্রতাপের মনের ভার কাটিল না। এতক্ষণে যামিনী তাহার চিঠি পাইয়াছে। কি সে ভাবিতেছে কে জানে ? চিঠির উত্তর সে কি চিঠিতে দেবে, না মুখেই বলিবে ? বিকালের আগে জানিবার তাহার কোনোই সুবিধা হইবে না।

রাজুকে সোজাসুজি কোনো কথা প্রতাপ জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না, তবে কটমট করিয়া কয়েকবার তাহার দিকে না তাকাইয়া পারিল না। রাজু একবার তাহাও লক্ষ্যও করিল, জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে, কাঁচা গিলে খাবে নাকি ? অমন করে তাকাচ্ছ কেন ?"

প্রতাপ তাড়াতাড়ি নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া বলিল, "বিশেষ কোনোরকম করে তাকাচ্ছি নাকি ? তা ত জানা ছিল না।"

রাজু তখন কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিল, আর এ বিষয়ে কথা কাটাকাটি না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

স্কুলে সেদিন প্রতাপ কি করিয়া যে সময় কাটাইল তাহা সে-ই জানে। ছাত্ররা সুদ্ধ অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। গতিক সুবিধার নয় তাহা প্রতাপ নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল, সে আর পড়াইবার চেষ্টা না করিয়া একটা রচনা লিখিতে দিয়া চুপচাপ বসিয়া রহিল।

বিকালে বাড়ী ফিরিয়া চা খাইয়া বাহির হইবার জোগাড় করিতে লাগিল। বৌদিদি কালকার ক্রটির ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ আজ ভাল করিয়া চা ও জল-খাবার প্রস্তুত করিয়া দিয়া গেলেন। বলিলেন, "রাগটাগ মনে রেখো না ঠাকুরপো, দেখছ ত একলা মানুষ, কতদিক আর সামলাব ? কাল কাজ কি ঘাড়ে পড়েছিল কম ?"

প্রতাপ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "রাগ করতে যাব কিসের জন্যে ? অত কাজের ভিড়ে মনে ক'রে এক গেলাশ জলও যে দিয়েছিলেন, তার জন্যে বরং ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।"

বৌদিদি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তোমার মত বুদ্ধি-বিবেচনা ক'টা মানুষের আর আছে বল ? আর এক জন ত রাগ ক'রে কথাই বলছে না।"

প্রতাপ বলিল, "যেখানে অধিকার বেশী, সেখানে অভিমানও বেশী বৌদিদি। আমরা জগতে জন্ম-হতভাগা, দাবি কোথাও নেই, মিথ্যা অভিমান করবার যো তাও নেই।"

বৌদিদি আবার একটু হাসিয়া প্রস্থান করিলেন। প্রতাপও আর একবার চুলে চিরুণী চালাইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

নৃপেন্দ্রবাবুর বাড়ীর কাছে আসিয়াই সে আশান্বিত দৃষ্টিতে উপরের দিকে চাহিল। চাওয়া ব্যর্থ হইল না বটে, কিন্তু ব্যর্থ হইলেই বুঝি ভাল ছিল। যামনী দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু এই কি সে জ্যোৎস্নারূপিণী হাস্যময়ী যামিনী ? তাহার মুখ শুষ্ক, গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে, বেশ-ভূষা শ্রীহীন বিপর্য্যস্ত। হইয়াছে কি ? প্রতাপের বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা যেন হঠাৎ অচল হইয়া গেল।

আপিস ঘরে ঢুকিতেই দেখিল মিহির আজ ইহারই মধ্যে তাহার অপেক্ষায় বইখাতা লইয়া বসিয়া আছে। প্রতাপ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি ? আজ যে এত পাংচুয়াল ?"

মিহির কিছু উত্তর দিবার আগেই দরজার সম্মুখ দিয়া মলের শব্দ করিয়া কে যেন চলিয়া-গেল। প্রতাপ চকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিল, জানদার আয়া।

মিনিট দুই সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর গলা পরিষ্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মা ফিরলেন কখন ?" মিহির বলিল, 'আজ সকালে। কাল বিকেলে হঠাৎ টেলিগ্রাম এসে হাজির, তিনি ষ্টার্ট করেছেন। বাবা বারণ করবারও আর সময় পেলেন না।"

প্রতাপ জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছেন তিনি ?"

মিহির বলিল, "ভালই ত দেখলাম। আরও কিছু দিন থেকে এলে ভাল ক'রেই সেরে আসতেন। কি য়ে তাঁর জরুরী বিজ্‌নেস্ পড়ল, অমনি তাড়াতাড়ি চলে এলেন।"

অন্য সময় হইলে মিহিরের কাণ্ড দেখিয়া প্রতাপের হাসি পাইত। কিন্তু আজ আর তাহার হাসিবার ক্ষমতা ছিল না। জ্ঞানদার আকস্মিক প্রত্যাবর্ত্তন, আর যামিনীর কাতর অশ্রুপ্লাবিত মুখ, দু-ই সে মিলাইয়া দেখিল। বুঝিল ভবিষ্যৎ তাহার অন্ধকার, ঘোর নৈরাশ্য ও দুঃখে পূর্ণ। সে চিরদিন সংগ্রামে অভ্যস্ত, সে হয়ত এই অন্ধকারের ভিতর দিয়াও পথ করিয়া চলিবার চেষ্টা করিতে পারিত, কিন্তু যামিনী পারিবে কি ? প্রতাপ মনে কোনো আশার বাণী শুনিতে পাইল না।

মিহিরকে পড়াইতে আর তাহার মন উঠিল না। আর কটা দিন বা ? মাস শেষ হইতে আর চার-পাঁচ দিন আছে, এই ক'টা দিনই তাহার মেয়াদ। এ বাড়ীর দ্বার যে তাহার নিকট রুদ্ধ হইতে চলিয়াছে, তাহা প্রতাপ বুঝিতেই পারিতেছিল। কি উপায়ে ভদ্রতা বজায় রাখিয়া চট্ করিয়া বিদায় লওয়া যায় সেইটুকু ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেই হয়। ভদ্রতা করিবারও প্রয়োজন হইত না, যদি না যামিনী ইহার ভিতর জড়িত থাকিত। বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়িয়াছে বলিয়া ছেলের মাষ্টারকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইল, এ-কথা নিতান্ত প্রকাশ করা চলে না, তাই অন্য একটা ছুতা দেখিতে হইবে।

মিহিরকে ইংরেজী তর্জ্জমা করিতে দিয়া প্রতাপ বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। জ্ঞানদা ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং যামিনী ও প্রতাপের ভালবাসার কথা জানিয়াছেন ইহাও নিশ্চিত, না হইলে যামিনী কাঁদিয়া-কাটিয়া অমন চেহারা করিবে কেন ? এখন প্রতাপের কি করা কর্ত্তব্য ? জ্ঞানদাকেই তাহার ভাগ্যনিয়ন্ত্রী হইতে দেওয়া, না নিজে পুরুষের মত সংগ্রাম করিয়া দেখা ? বিনা সংগ্রামে সে যামিনীকে লাভ করিতে পারিবে না তাহা ত জানাই ছিল, সুতরাং এখন পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। কিন্তু কিছু করিবার আগে যামিনীর মন ভাল করিয়া জানা প্রয়োজন। সে কি এই কণ্টকাকুল পথে প্রতাপের হাত ধরিয়া বাহির হইতে রাজী হইবে ? প্রতাপের মন সায় দিল না। যামিনী যেমন ফুলের মত দেখিতে, তেমনই ফুলের মত কোমল। সংসারের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়িবার শক্তি তাহার ভিতর কোথায় ? পিতামাতা তাহাকে যে পথে চালাইবেন, সেই পথেই সে চলিবে। হৃদয় হয়ত তাহার ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইবে, জীবনের সব আশা সব আলো নিবিয়া যাইবে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে কিছু জানাইতে পারিবে না, কোনো প্রতিবাদ করিতে পারিবে না। সে যেন উপকথার বন্দিনী রাজকন্যা, লৌহকারা ভাঙিয়া তাহাকে বাহুবলে হরণ করিয়া আনিলেই এক তাহাকে অকরুণ ভাগ্যের হাত হইতে রক্ষা করা যায়। কিন্তু সে ক্ষমতা, সহায়সম্পদহীন প্রতাপের কোথায় ?

মিহিরকে পড়ান কোনোগতিকে শেষ হইল, প্রতাপ উঠিয়া পড়িল। বাহির হইয়া আবার যামিনীর জানালার দিকে তাকাইল, কেহ কোথাও নাই।

বাড়ী ফিরিতে ইচ্ছা করিল না। ময়দানে গিয়া একটা গাছের তলায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ঠিক এইখানে বসিয়াই কয়েকদিন আগে হতভাগ্য প্রতাপ কি অমরাবতীর স্বপ্নই না দেখিয়াছে। জগতে কিছু তাহার অসাধ্য বোধ হয় নাই, কোন্ ঐন্দ্রজালিকের মায়াদণ্ডের স্পর্শে ধরণী তাহার নিকট আশ্চর্য্য নূতন রূপ ধরিয়া উঠিয়াছিল। আজ সে ঘোর আবার হঠাৎ কাটিয়া গেল, নিজেকে পূর্ব্বের রূপেই সে আবার দেখিতে পাইল। দরিদ্র, হতভাগ্য, সহায়হীন প্রতাপ। জীবনে

কোনো আশা তাহার নাই, কোনো আনন্দ নাই, কেবল দুঃখ, কেবল হৃদয়ভেদী বেদনা, কেবল অসহ্য যাতনা। তাহার জীবনব্যাপী অন্ধকারের কোনো কূল নাই, কিনারা নাই।

বাড়ী অবশেষে ফিরিতে হইল। অসুখ করিয়াছে বলিয়া না-খাইয়া সে শুইয়া পড়িল। সকালে উঠিয়াই তাহার এক জায়গায় যাইবার কথা ছিল, বিলাত যাওয়া সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য। একখানা পোষ্টকার্ড লইয়া লিখিয়া দিল, শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাহার যাওয়া সম্ভব হইল না।

২১

সকালে চা খাওয়া হইয়া গিয়াছে। জ্ঞানদা ঘরদোর ঠিক করিতে ব্যস্ত। এতদিন বাড়ী ছিলেন না, চাকর-বাকর যাহা খুশী করিয়াছে, যেমন খুশী চলিয়াছে। গৃহিণী এক দিনেই সকল ত্রুটি সংশোধন করিবার চেষ্টায় লাগিয়া গিয়াছেন। ট্রাঙ্ক বাক্স, বিছানা সব খোলা, ঘরময় ছড়ান, আয়া এবং ছোট্ট যেখানকার জিনিষ সেখানে সাজাইয়া রাখিতেছে এবং অনর্গল বক্তৃতা শুনিতেছে। পাশের ঘরে যামিনী শালমুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে, সকালে সে ওঠে নাই, চা খাইতেও যায় নাই, আয়া তাহাকে চা জলখাবার উপরে আনিয়া দিয়াছে, তাহাও সে স্পর্শ করে নাই।

চা খাওয়া এবং কাগজপড়া শেষ করিয়া নৃপেন্দ্রবাবু স্ত্রীর ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। হাতের কাজ তাড়াতাড়ি চুকাইয়া আয়া এবং ছোট্ট বাহির হইয়া গেল।

ইজি চেয়ারে বসিয়া নৃপেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "যামিনী চা খেতে গেল না কেন? অসুখ-বিসুখ করল নাকি কিছু?"

জ্ঞানদা মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, "কে জানে, তোমার মেয়েই জানে। কত ত ডাকাডাকি করলাম কিছুতেই উঠ্‌ল না। ভারি ট্যাঁটা হয়ে উঠেছে এই ক'দিনের মধ্যে।"

নৃপেন্দ্রবাবু কিছু বলিলেন না। কয়দিনই বা গৃহিণী সংসার-তরণীর হাল ছাড়িয়া একটু সরিয়া বসিয়া ছিলেন, ইহারই মধ্যে এত অঘটন ঘটিয়াছে যে তাহা একমুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। তবু গৃহিণী চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না। কর্ত্তা প্রথম দু-একবার ক্ষীণ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, এখন তাহা একেবারে বিফল জানিয়া নিরস্ত হইয়াছেন।

জ্ঞানদা নিজেই আবার আরম্ভ করিলেন, "অবাক কাণ্ড বাপু! ক'টা দিনই বা সরেছি, এরই মধ্যে একেবারে সাতকাণ্ড রামায়ণ! আর দু-তিন দিন পরে এলে মেয়েকে ঘরে দেখতে হত না।"

কর্ত্তা এবারে নিতান্ত আর না পারিয়া বলিলেন, "কথার মাত্রা রেখে বল্‌লে একটু ভাল হয় না? মেয়েকে ঘরে দেখতে না কি রকম? মেয়ে কোথায় যেত?"

জ্ঞানদা ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "থাক্ থাক্ আমাকে আর শেখাতে হবে না। নিজের যদি একটু মাত্রাজ্ঞান থাকত, তাহলে এমন কাণ্ড ঘটে? কোথাকার কে, না ছেলের মাষ্টার, তার সঙ্গে মেয়েকে কথা বলতে দেওয়া, মেশামেশি করতে দেওয়া, এত কেন রে বাপু? ও-সব পাড়াগেঁয়ে হিঁদুর বাড়ীর ছেলে, ওদের কোনো ধর্ম্মজ্ঞান আছে? ওরা সব পারে। এই ত মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে পাঁচশ টাকা গুছিয়ে নিচ্ছিল।"

নৃপেন্দ্রবাবু কঠিনস্বরে বলিলেন, "তুমি কি বাংলা ভাষাও ভুলে গেছ? আমি ত চিঠিতে দেখলাম, সে টাকা নিতে অস্বীকার করেছে, তোমার মেয়েই যেচে তাকে টাকা দিতে যাচ্ছিল।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "ও-সব স্বাত্মামী গো স্বাত্মামী! প্রথম প্রথম একটু ওজর-আপত্তি না করে ঝাঁ করে যদি টাকাটা নিয়ে বসে তবে মেয়ে মনে করবে কি? হাজার হ'লেও বড় মেয়ে শিক্ষিতা মেয়ে ত? গোড়ায় একটু ভালমানুষী দেখালে মেয়ে আরও গলে যেত, তখন শুধু টাকা কেন, গায়ের গহনা বেচেও ঐ ছেলের হাতে তুলে দিত। তারপর একবার সাগরপার হতে পারলে, আর তোমার মেয়ের কথা স্বপ্নেও মনে করত না। অমন আমি ঢের দেখেছি।"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "যা করেনি তা কল্পনা ক'রে নিয়ে মানুষটার উপর চটে লাভ কি? এখন সব দিক যাতে বজায় থাকে, ভেবেচিন্তে তা স্থির করতে হবে।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "তোমার ও মাষ্টারকে আগে বিদায় করত বাপু, তার পরের ব্যবস্থা আমি সব ঠিক করছি।"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "কেন তাকে বিদায় করা ছাড়া আর কিছু কি করা যায় না? আমি ত তাঁর কাজে কোনো খুঁৎ পাইনি, মিহিরের পড়াশুনোয় এরই মধ্যে বেশ উন্নতি দেখা যাচ্ছে।"

গৃহিণী তেলেবেগুনে জলিয়া উঠিলেন। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিলেন, "তোমার মতলবখানা কি শুনি তবে? ঐ ছোঁড়ার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চাও নাকি?" রাগে উত্তেজনায় তাঁহার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "মেয়ের বিয়ে না-ই দিলাম, খোকাকে ও যেমন পড়াচ্ছে পড়াক না?"

জ্ঞানদা বলিলেন, "তা আর না? এমন না হ'লে আর বুদ্ধি? ওকে দিনের পর দিন চোখের উপর দেখলে যামিনীর মন আর ফিরবে? অন্য কোথাও তখন আর তুমি ওর বিয়ে দিতে পারবে?"

কর্ত্তা বলিলেন, "মেয়ের মন যখন একজনের উপরে পড়েছে তখন জোর ক'রে তাকে অন্যলোকের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া উচিত হবে না। প্রতাপ ছেলে ত মন্দ নয়, গরীব অবশ্য। কিছু সাহায্য করলে সে যদি মানুষ হয়ে উঠতে পারে—"

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত জ্ঞানদার রাগ একেবারে ফাটিয়া পড়িল। "কি, কি বললে তুমি? ঐ হতভাগা চালচুলোহীন হা-ঘরের সঙ্গে আমি বিয়ে দেব মেয়ের? তার আগে ওকে বিষ খাইয়ে মারব, নিজে গলায় দড়ি দিয়ে মরব। তোমার মাথা কি একেবারে খারাপ হয়ে গেছে? কি ক'রে এমন কথা মনেও আন্‌তে পারলে? আমার রাজরাণী হবার যুগ্যি মেয়ে আর ঐ একটা ক্যাওলা ছোঁড়া, সেদিন অবধি তালি দেওয়া কাপড় পরে এসেছে, সে হবে আমার জামাই?"

রাগে পত্নীর প্রায় দম আট্‌কাইয়া আসিতেছে দেখিয়া নৃপেন্দ্রবাবু উঠিয়া পড়িলেন, বলিলেন, "থাক, রাগারাগি ক'রে নিজের শরীর আর খারাপ করো না। মেয়ের মা ত তুমি, তার মঙ্গল-অমঙ্গল কিসে হয় সেটা স্থির হয়ে ভেবে তার পর কোনো কাজ করো। আমি আর এ-সব কথায় থাকব না।" এই বলিয়া তিনি নীচে নামিয়া চলিয়া গেলেন।

জ্ঞানদা খানিকক্ষণ একলা বসিয়াই নাক ঝাড়িতে এবং চোখ মুছিতে লাগিল। স্বামীর সংসারকে ঠিক নিজের মনের মত করিয়া গড়িবার চেষ্টায় চিরদিনই তাঁহার অশান্তির সীমা ছিল না। ঝগড়া-বিবাদ যে খুব বেশী হইত তাহা নয়, কারণ ঝগড়ার সূত্রপাত দেখিলেই নৃপেন্দ্রবাবু সরিয়া পড়িতেন। ইহাও অবশ্য জ্ঞানদার রাগের একটা কারণ ছিল। চোখা-চোখা বাক্যাবলী গুছাইয়া বলিতে আরম্ভ করিবামাত্রই যদি প্রতিপক্ষ পলায়ন করে, তাহা হইলে কোন্ নারীই বা স্থির থাকিতে পারে? অশান্তির আরও কারণ ছিল। স্বামী যদিও তাঁহার কার্য্যে বাধা দিতেন না, কিন্তু লেশমাত্র সমর্থনও কোনোদিনই করিতেন না। ছেলেমেয়ে মায়ের কথা শুনিয়া চলিত বটে, অন্তত মেয়ে চলিত বটে, কিন্তু তাহারাও মনে মনে যে বাপেরই মতে মত দিতেছে, তাহা জ্ঞানদা সর্ব্বদাই বুঝিতে পারিতেন। সংসারে সকলের মধ্যে থাকিয়াও তিনি একাকিনী ছিলেন। সাধারণ নারীর চেয়ে তাঁহার মনের শক্তি অধিক ছিল বলিয়া তিনি হাল ছাড়িতেন না, নিজের মতানুসারে কাজ করিয়া চলিতেন। আশা ছিল আখেরে ছেলে-মেয়ে স্বামী সকলেই তাঁহার দলে আসিবে, ঘাড় হেঁট করিয়া স্বীকার করিবে যে, জ্ঞানদার বুদ্ধি তাহাদের সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সেদিন এখনও বহুদূরে। থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার প্রাণ একটু সহানুভূতির জন্য হাঁপাইয়া উঠিত, কিন্তু কাহারও নিকট কণামাত্রও সমবেদনা তিনি পাইতেন না। এখন যে ব্যাপার ঘটিয়া উঠিয়াছে, ইহাতে পারিবারিক সংঘাত আর কঠিন হইয়া উঠিবে, তাহা জ্ঞানদা বুঝিতে পারিতেছিলেন, কিন্তু ভয়ে পিছাইবার মানুষ তিনি ছিলেন না। যেমন করিয়া হউক, এ জটিল সমস্যার সমাধান তিনি করিবেন। স্বামী যে রঙ্গমঞ্চ হইতে সরিয়া পড়িলেন, ইহা ভালই হইল। তাঁহাকে দিয়া উপকার ত কিছু হইত না, অপকার হইবার সম্ভাবনা ঢের ছিল। যা বুদ্ধি তাঁহার! না

হইলে যামিনীর মত মেয়ে, যাহাকে জ্ঞানদা সর্ব্বাংশে ধনী অভিজাত গৃহের বধূ হইবার জন্ম গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহার সহিত তিনি প্রতাপের বিবাহ দিতে চান? আহা, যা মানাইবে প্রতাপকে যামিনীর পাশে, তাহা আর বলিবার নয়। কেহ তাহাকে যামিনীর বাজার-সরকারও ভাবিবে না। নিজের প্রথম জীবনের জালাময় অভিজ্ঞতা জ্ঞানদাকে দারিদ্র্যের উপর হিংস্ররকম বিরূপ করিয়া তুলিয়াছিল। দরিদ্রকে তিনি সংসারের সর্ব্বাপেক্ষা পাপী বলিয়া জানিতেন। প্রাণ থাকিতে যামিনীকে সেই দারিদ্র্যের আগুনে ঝাঁপ দিতে তিনি দিবেন না। ইহাতে যে যা বলুক তাঁহাকে। স্বামী মনে মনে বিরক্ত হইবেন, তা হউন গিয়া, কবেই বা তিনি জ্ঞানদার প্রতি প্রসন্ন? মেয়ে কাঁদিবে, মুখ ভার করিয়া থাকিবে, মাকে নিজের শত্রু মনে করিবে, তা না হয় করিলই কিছু দিন? সে অপরিণতবুদ্ধি বালিকামাত্র, নিজের ভালমন্দ বুঝিবার মত জ্ঞান তাহার নাই। তাহাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই রক্ষা করিতে হইবে।

খানিক পরে নাক মুখ মুছিয়া জ্ঞানদা উঠিয়া পড়িলেন। পর্দ্দা তুলিয়া যামিনীর ঘরে ঢুকিয়া ডাকিলেন, "কি রে উঠ্‌বি না আজ? চা-টা একেবারে খাবি না?"

যামিনী অসম্মতিসূচক মাথা নাড়িল। জ্ঞানদা তাহার খাটে আসিয়া বসিলেন, মেয়ের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "যা হবার তা হয়ে গেছে, এখনও সামলে চল্‌লে বেশী লোক জানাজানি হবে না। কিন্তু তুমি এ রকম শুয়ে পড়ে থাকলে চল্‌বে না ত। লোকে তাহলে একখানাকে দশখানা করে বানিয়ে বল্‌বে।"

যামিনী অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "যার যা খুশী বলুক মা, আমার আর তাতে কিছু আসে যায় না।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "বড় অল্প বুদ্ধি তোমার। সংসারে লোকের মতকে অবহেলা করলে চলে কখনও? সামান্ত একটু ঘা খেয়ে এমন ক'রে ভেঙে পড়লে কখনও চলে না। ভুল সংশোধন করতে গেলে ঘা একটু খেতেই হয়।"

যামিনী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল, মায়ের কথার কোনো উত্তর দিল না। জ্ঞানদা মেয়েকে আর বেশী ঘাঁটাইলেন না, আস্তে আস্তে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। মেয়ের মন তিনি জানিতেন। জোর করিয়া বিদ্রোহ করিয়া কিছু করিবার মত ধাতুতে সে গঠিত নয়। শিশুকাল হইতে যাহা-কিছু শিক্ষা সে পাইয়াছে, তাহা স্বাধীনতার উল্টা পথেই তাহাকে লইয়া গিয়াছে। আজ বেদনায় হৃদয় শতধা হইয়া গেলেও তাহার সাধ্য হইবে না মাতার বিপক্ষে দাঁড়াইয়া নিজের জীবনের ভার নিজে গ্রহণ করিতে।

মেয়ের বেদনাটা অবশ্য তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন, ইহার জন্ম ব্যথাও অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু উপায় কি? শিশুকে যেমন অনেক সময় আঘাত দিয়া আরোগ্য করিতে হয়, ইহাকেও তাহাই করিতে হইবে। প্রতাপের পরিবর্ত্তে এমন কাহাকেও তাহার সম্মুখে ধরিতে হইবে, যাহার রূপে গুণে আভিজাত্যে প্রতাপ একেবারেই যামিনীর চক্ষে নিষ্প্রভ হইয়া যায়। সেটা খুব চট্ করিয়া করিলেও চলিবে না, আগে হতভাগ্য প্রতাপকে ভুলিয়া যাইবার জন্ম তাহাকে সময় দিতে হইবে। সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন এখন প্রতাপকে তাহার সম্মুখ হইতে সরান। ইহাতে স্বামীর সাহায্য তাঁহাকে একটু লইতেই হইবে। নিজে তিনি প্রতাপকে বিদায় করিতে গিয়া হাজির হইলে সেটা বড় বিশ্রী দেখাইবে, স্বামীও হয়ত এতটা বাড়াবাড়ি সহ্য করিবেন না।

কিন্তু আপিসের সময় হইয়া আসিল প্রায়, এখন নৃপেন্দ্র-বাবুর সঙ্গে বোঝাপড়া করিবার আর অবসর নাই। বিকালে তিনি আসিবার আগেই প্রতাপ আসিয়া হাজির হইবে। যামিনীকে লইয়া কোথায়ও বেড়াইতে চলিয়া গেলে হয়, একেবারে রাত্রে ফিরিলেই চলিবে। কিন্তু মেয়ে ত খাট ছাড়িয়া উঠিতেছেই না, তাহাকে বেড়াইতে লইয়া যাইবেনই বা কিরূপে? যাক্, আগ্‌লাইয়া রাখিলেই হইবে, যাহাতে সে মেয়ের ধারেকাছে ঘেঁষিতে না পারে। যামিনী সারাদিনের মধ্যে বিছানা ছাড়িয়া উঠিল না, সুতরাং তাহাকে আগ্‌লাইতে জ্ঞানদার বেশী বেগ পাইতে হইল না।

প্রতাপ যথাসময়েই পড়াইতে আসিল। আজও মিহিরকে আগে হইতেই ঘরে বসিয়া থাকিতে দেখিল। জ্ঞানদার একচ্ছত্র রাজত্বের চিহ্ন যেন চারিদিকেই

দেদীপ্যমান। যামিনীকে আজ সে জানালার নিকটেও দেখিতে পায় নাই।

আজ আর থাকিতে না পারিয়া সে মিহিরকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার দিদিকে কাল থেকে দেখছি না যে? অসুখ-বিসুখ করেনি ত?"

মিহির বলিল, "অসুখই করেছে বোধ হয়। সারাদিন শুয়ে পড়ে থাকে, খেতেও আসে না, কিছু না।

প্রতাপের বুকের ভিতরটা প্রচণ্ড বেদনায় মোচড় দিয়া উঠিল। এই ব্যথাই তাহার দান হইয়া রহিল যামিনীর জীবনে। প্রতাপ তাহাকে আর কিছু দিতে পারে নাই, পারিবেও না। এই কুসুমকোমল তরুণ জীবনে সে যে দহনের জ্বালা রাখিয়া গেল, তাহা হয়ত কখনও মুছিবে না, যামিনী প্রতাপকে কখনও ভুলিবে না। কি মর্ম্মভেদী সান্ত্বনা।

প্রতাপ পড়াইবার কোনো চেষ্টাই করিতেছে না দেখিয়া মিহির জিজ্ঞাসা করিল, "হোম্ টাস্কগুলো দেখবেন না!"

প্রতাপ বলিল, "দাও, দেখি।" খাতাগুলা বসিয়া বসিয়া উল্টাইতে লাগিল, দেখিবার কোনো চেষ্টা করিল না।

মিহির জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার শরীর খারাপ লাগছে নাকি?"

প্রতাপ উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "হ্যাঁ, আবার জ্বর-টর হবে বোধ হচ্ছে। আজ আর পড়াতে পারব না।" আর কিছু না বলিয়া সে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। মিহির খানিক হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

ক্রমশঃ

শারদাঞ্জলি

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

অম্বর-পথে সম্বরি লাজে দিগ্বধূ খোলে গুণ্ঠন
নীলরূপেরসে মন্‌ভোলা অলি ফুলমধু করে লুণ্ঠন
অরূপের দোলে রূপ্‌ঠাকুরের দুলে ওঠে রূপ-হিন্দোল্,
মুগ্ধ পবন দেয় নেচে নেচে ছন্দের নিশিদিন দোল্।
শিউলির বনে উৎসব উঠে মাঠে মাঠে শ্যামনৃত্য,
নাচে হরিহর সুধা ঝরঝর নেচে ওঠে কোটী চিত্ত।
নির্ম্মল শ্যাম কুঞ্জকানন গুঞ্জনভরা যৌবন,
প্রাণ-ফুলে ফুলে করে টলমল নিখিলের মধু যৌবন।
শুভ্র মেঘের চৌদলে নাচে কল্পনা-বন-বৌ-দল,
মৃত্তিকালোকে নদনদী নাচে নেচে নেচে চলে নৌ-দল।
সিন্ধুর হৃদি-মন্দির নাচে নান্দীপাঠের ছন্দে,
অম্বর করি ব্যোম্ ব্যোম্ রব আগমনী গানে বন্দে।
চন্দ্রতপন ধুয়ে দেয় পথ ঢালি আলোকের চন্দন,
বিশ্বনরের হৃদি-বন্ধনে জেগে ওঠে প্রেমনন্দন।
ঊষার মাধুরী বিহগের গানে বোধন আজি রে বিশ্বে,
বিশ্বমায়ের রথ আসে ওই শারদ মাধুরী-দৃশ্যে।

পুস্তক পরিচয়

সংবাদপত্রে সেকালের কথা, (১ম খণ্ড ১৮১৮-১৮৩০)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাবলী)। ২২৪+২৩ পৃষ্ঠা। মূল্য ২।০। ২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির হইতে প্রকাশিত।

আধুনিক অর্থাৎ ব্রিটিশ-শাসিত বাঙ্গলার ইতিহাসে দুইটি প্রধান যুগ দেখা যায়। প্রথম যুগ, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর দেওয়ানী অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শাসনভার লওয়া হইতে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের লাটরূপে আগমন পর্য্যন্ত (১৮২৮)। এই সময় কোম্পানী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বাঙ্গালীর আচারে বা শিক্ষারীতিতে কোনরূপ পরিবর্ত্তন সাধন করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক (১৮১৮-১৮৩৫) আইনের সহায়তায় সতীদাহ নিবারণ করিয়া, মেকলের পরামর্শ-মত ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত করিয়া এবং বিচার-বিভাগে (মুন্সেফ, সদরআলা এবং ডেপুটী মেজিষ্ট্রেটরূপে) দেশীয় লোকের নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া নবযুগের অবতারণা করিয়াছিলেন। তারপর গত এক শত বৎসর যাবৎ ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ সেই নীতির অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সংস্কার নীতি প্রবর্ত্তনের এক শতাব্দী পরে, জনতন্ত্রশাসনের আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে এখন বাঙ্গালীর ইতিহাসে আর এক যুগের সূত্রপাত হইতেছে। এই দেড় শতাধিক বৎসরের প্রথমার্দ্ধের, অর্থাৎ কোম্পানীর আমলের কথা এখন জীবিত লোকের স্মরণাতীত পুরাবৃত্তের সামিল। প্রাচীন ইতিহাসের এই শেষ অধ্যায়ের যথেষ্ট উপকরণ আছে। এই উপকরণ দুই প্রকার; সরকারী কাগজপত্র এবং পুরাতন সংবাদপত্র। পুরাতন সরকারী কাগজপত্র ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে, এবং এই সকল কাগজপত্র যেখানে রক্ষিত হয় অনুসন্ধানকারীকে সেখানে গিয়া মূল দলীল দেখিবার এবং নকল আনিবার সুযোগ দেওয়া হইতেছে। পুরাতন ইংরাজী সংবাদপত্রের মধ্যে ১৭৮৪ সালের ৪ঠা মার্চ্চ হইতে "কলিকাতা গেজেট" নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়।—এই গেজেটের সহিত বর্ত্তমান কলিকাতা গেজেটের অনেক তফাৎ। এই গেজেটে শুধু সরকারী খবর হুকুম এবং সরকারী ইস্তাহার থাকিত না, বেসরকারী খবর, বেসরকারী বিজ্ঞাপন এবং সম্পাদকীয় মন্তব্যও প্রকাশিত হইত। এই প্রথম কলিকাতা গেজেট ১৮১৫ সালের জুন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল, এবং "গভর্ণমেণ্ট গেজেট" নাম ধারণ করিয়া আরও ১৭ বৎসর কাল (১৮৩২ সাল পর্য্যন্ত) জীবিত ছিল। তারপর বেসরকারী খবর, বেসরকারী বিজ্ঞাপন এবং সম্পাদকীয় মন্তব্য বর্জ্জিত হইয়া গভর্ণমেণ্ট গেজেট এখনকার চলিত গেজেটের আকারে পরিণত হইয়াছিল। এই পুরাতন কলিকাতা গেজেট হইতে আহৃত অনেক তথ্য "*Selections from Calcutta Gazette showing the Political and Social condition of the English in India*" অনেক দিন পূর্ব্বে (১৮৬৪—১৮৬৯) পাঁচ খণ্ডে সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই নিবন্ধ ইংরাজ সমাজের খবরে ভরা থাকিলেও ইহাতে দেশী লোকের কার্য্যকলাপের যে যৎকিঞ্চিৎ খবর আছে তাহা অতি মূল্যবান। ইহা দেখিয়া মনে হয় যদি সেকালের অন্যান্য ইংরাজী খবরের কাগজের ফাইল খোঁজা যায় তবে দেশী সমাজের আরও অনেক খবর পাওয়া যাইতে পারে।

"কলিকাতা গেজেট" সুরু হইবার বত্রিশ বৎসর পরে, ১৮১৬ সালে, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্যক্তি "বাঙ্গাল গেজেট" নামক প্রথম বাংলা খবরের কাগজ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলা 'বাঙ্গাল গেজেটের' কোন সংখ্যা এ পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও চোখে দেখেন নাই। তারপর, ১৮১৮ সালের ২৩এ মে তারিখ হইতে শ্রীরামপুরের পাদ্রিরা "সমাচার দর্পণ" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে সুরু করেন। এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন স্বনামধন্য পাদ্রি মার্শম্যান এবং তাঁহার প্রথম সহযোগী ছিলেন পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার। প্রথম পর্য্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' ১৮৪১ সালের শেষ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ১৮২০ সালের পরে এবং ১৮৪০ সালের পূর্ব্বে আরও কয়েকখানি বাঙ্গলা খবরের কাগজ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তন্মধ্যে কোন কোন খানির পরমায়ু শৈশব অতিক্রম করিয়া কৈশোর পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিল। তন্মধ্যে সমাচার চন্দ্রিকার এবং বঙ্গদূতের কতকগুলি খুচরা সংখ্যা ছাড়া অন্যান্য পত্রের ১৮৪০ সালের পূর্ব্বেকার কোন সংখ্যা এ যাবৎ হস্তগত হয় নাই। সৌভাগ্যক্রমে সমাচার দর্পণের বাইশ বৎসরের (১৮১৮ সাল হইতে ১৮৪০ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত) সমস্ত সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বাইশ বৎসরের সমাচার দর্পণে সেকালের বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের ঘটনাপরম্পরার যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। সৎপাত্রে এই সৎকার্য্যের ভার ন্যস্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস সম্বন্ধে ইংরাজীতে কয়েকখানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। সাবেক সরকারী কাগজপত্র এবং সংবাদপত্র হইতে ঐতিহাসিক তথ্য সঙ্কলন কার্য্যে তিনি সিদ্ধহস্ত। পরিষদের পক্ষে সমাচার দর্পণ হইতে বাঙ্গালীর ইতিহাসের উপকরণ সঙ্কলনের এবং সম্পাদনের ভার ব্রজেন্দ্রবাবু গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সংগৃহীত প্রথম খণ্ড "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" প্রকাশিত হইয়াছে। এই খণ্ডে ১৮১৮ হইতে ১৮৩০ সালের বিবরণ নিবদ্ধ হইয়াছে। এই পুস্তকের গোড়ায় সংক্ষিপ্ত নির্ঘণ্ট এবং শেষের দীর্ঘ সূচীপত্র পুস্তকনিবদ্ধ বিষয়ের অবগতি সহজ করিয়াছে।

"সংবাদ পত্রে সেকালের কথা"র প্রথম খণ্ডের ভূমিকাটি বড় মূল্যবান। এই ভূমিকায় সমস্ত প্রয়োজনীয় কথাই সোজাসুজি সংযত ভাষায় সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রবাবু নির্ব্বিকার ঐতিহাসিক। তাঁহার বিবরণে আহা-উহুর স্থান নাই। অথচ তিনি কোন কাজের কথায় পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ভুলেন নাই। সেকালের গঙ্গায় নরবলির এবং সহমরণের কথা, এবং একালের প্রবর্ত্তক রামমোহন রায়ের কলিকাতায় আগমনের এবং হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা ব্রজেন্দ্রবাবু নিরপেক্ষ সাক্ষীর মত উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। "ভূমিকা"র প্রথমাংশের কয়েকটি কথা আমি এখানে উদ্ধৃত না করিয়া পারি না—

বহু মূল্যবান সংবাদপত্র একেবারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। যেগুলি পাওয়া যায়, সেগুলিও অনেক সময় সম্পূর্ণ নহে। এই অবস্থায় অবিলম্বে অবহিত না হইলে, যে-উপাদানগুলি এখনও আছে সেগুলিও বিনষ্ট হইয়া যাইবে, উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী-জীবন কিরূপ ছিল তাহা আর তেমন করিয়া জানা যাইবে না। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত খাঁটি বাঙালী-জীবন যেমন অনুমানসাপেক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর ইতিহাসও তেমন হইয়া দাঁড়াইবে।" (/০ পৃঃ)

আশা করি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ এই কথাগুলি স্মরণ রাখিবেন। সৌভাগ্যক্রমে ব্রজেন্দ্রবাবুর মত কাজের লোক যখন পাওয়া গিয়াছে, তখন তাঁহাকে পুরাপুরি খাটাইয়া লওয়াই কর্ত্তব্য। "সংবাদ পত্রে সেকালের কথা"র দ্বিতীয় খণ্ডও তিনি অবশ্যই সঙ্কলিত এবং প্রকাশিত করিবেন; তার পর তাঁহার দ্বারা পূর্ব্বেকার ইংরাজী খবরের কাগজ হইতে বাঙ্গালীর খবর সঙ্কলিত করিয়া লওয়াও কর্ত্তব্য। ইংরাজী বিবরণের সঙ্গে যদি বাঙ্গলায় লেখা ভূমিকা এবং সারসংগ্রহ প্রকাশিত হয় তবে বোধ হয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে তাহা প্রকাশ করিবার কোন অন্তরায় থাকিবে না। এই গ্রন্থ-সম্পাদন সম্বন্ধে আমার একটি নিবেদন আছে। সমাচার দর্পণের লেখাগুলিতে বিরাম-চিহ্ন অল্প থাকায় অনেক পাঠকের পক্ষে অর্থবোধ কঠিন হইতে পারে। বন্ধনীর মধ্যে আরও কতকগুলি বিরাম-চিহ্ন দিয়া দিলে ভাল হয়। আশা করি ব্রজেন্দ্রবাবু দ্বিতীয় খণ্ড সম্পাদনের সময় তাহা সম্ভব কিনা বিবেচনা করিবেন।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

সবুজ কথা—শ্রীহরিদাস ঘোষ, বি-এ প্রণীত। ৪৪ কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য বারো আনা। ১৩৩৬।

বয়স্ক ছেলেদের জন্য লেখা, এবং মাসিক পত্রিকায় পূর্ব্বে প্রকাশিত, গল্প-সপ্তক। আমাদের দেশে কিশোরদের কল্পনার খাদ্যের যে একান্ত অভাব তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। গ্রন্থকার এই অভাব দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া ধন্যবাদার্হ; তাঁহার পুস্তকখানি সেদিক দিয়া সুন্দর হইয়াছে। প্রচ্ছদপটও মনোরম। দৃশ্যত্রয়ে সমাপ্ত 'গো-ভূত' অভিনয় করার মত; বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ইহা অভিনয় করিয়া আনন্দ পাইবে। সাতটি গল্পের মধ্যে চারটিই কিন্তু করুণ ও বিয়োগান্ত।

বিদেশীবস্ত্রের প্রতিযোগিতা ও তাহার প্রতিকার—বুক কোম্পানী লিঃ, ৪।৩-বি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য আট আনা মাত্র। ১৯৩২।

মিঃ এম্ পি গান্ধী How to Compete with Foreign Cloth নাম দিয়া যে পুস্তিকা লিখিয়াছেন ইহা তাহারই বঙ্গানুবাদ। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের বস্ত্রশিল্প বিদেশী বণিকের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইতেছে না; সুতরাং এই শ্রেণীর রচনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। লেখকের ইংরেজী রচনা হিন্দী, গুজরাটী, তামিল ও তেলেগু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে; বাঙালী কর্ম্মীর পক্ষেও ইহা কম উপকারে লাগিবে না। ভারতের বস্ত্রশিল্পে চরখা, তাঁত ও কলের স্থান কোথায়, তাহা ভাল করিয়া দেখান হইয়াছে। ইহার যুক্তি সুন্দর এবং তাঁত, সূতা ও বস্ত্রের সম্বন্ধে যে আটটি তালিকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহাতে বিষয়বস্তু বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিবে। আচার্য্য রায় লিখিত ভূমিকা এবং মহাত্মা গান্ধীর মুখবন্ধ এই পুস্তিকার গৌরব। ●

"চন্দ্রশেখর" ও বঙ্কিমচন্দ্র—মৌলভী একরামুদ্দীন। প্রকাশক শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মিত্র, ৪।৩-বি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র। ১৩৩৯।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হওয়ায় বাংলা সাহিত্যের সমালোচনাশাখা পরীক্ষার চাপে গড়িয়া উঠিতেছে; এই পুস্তিকাখানি তাহার প্রমাণ। এ বিষয়ে আমাদের যে প্রচুর অভাব রহিয়া গিয়াছে তাহা এইরূপে কিছু কমিলেও ভাল।

লেখকের প্রণিধানজন্য কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। (১) 'বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্‌লা ভাষার জনক হইলেও, বঙ্কিমচন্দ্রকে আধুনিক বাঙ্‌লা ভাষার জনক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।' (পৃঃ ৩)—তবে কি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রাচীন বাংলাভাষার জনক বলিতে হইবে? (২) আয়েষা-চরিত্রে রেবেকার ছায়াপাত (পৃঃ ৫) অস্বীকার করিবার কারণ নাই,—তা ছাড়া ছায়াপাত চুরি নহে। (৩) ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-এর যে কাব্যাংশ (পৃঃ ৬) উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার নীচের দুই চরণে ভুল আছে। (৪) 'বিবাহে পাত্র নির্ব্বাচন জন্য ঘটনাচক্রই দায়ী' (পৃঃ ৮), অভিভাবকের মনোনয়ন, ঘটনাচক্র হইতে স্পষ্ট। ঘটনাচক্র ত জীবনের সর্ব্ববিধ ব্যাপারেরই কারণ। (৫) চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদের বিভাগ-তারতম্য বুঝিতে পারিলাম না, উভয়ই যদি 'বিবিধ-বিষয়' হয়, তবে দুইকে এক করিলেই হইত!

আমরা ও বিশ্বজগৎ—শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্। আট আনা। ১৯৩২।

পুস্তকখানি বিশেষ করিয়া বালক-বালিকাদের জন্য লিখিত; এবং Our World and Us নামক ইংরেজী গ্রন্থের আংশিক বঙ্গানুবাদ। বিজ্ঞানের গোড়ার কথা আমাদের দেশের বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তিও জানেন না; সুতরাং এই শ্রেণীর রচনা যে সুকুমারমতি শিশু ব্যতীত অন্যেরও প্রয়োজনে আসিবে তাহা সহজেই অনুমেয়। তবে এ যুগে বাংলা বইয়ের ভূমিকা ইংরেজী হওয়া নিতান্ত অশোভন, তাহাও যখন বাঙালী লেখকের হাত হইতে বাহির হয়!

পুস্তকে বিবৃত বিষয়ের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

গীতা—শ্রীশঙ্করাচার্য্য, শ্রীশ্রীধর স্বামী এবং শ্রীশ্রীতুরীয় স্বামীর ব্যাখ্যার সারাংশ সম্বলিত। শ্রীব্যোমব্রহ্ম গীতাধ্যায়ী। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্। ২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা আট আনা।

গীতাখানির তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। বাজারে গীতার বহু সংস্করণ প্রচলিত আছে। ইহা সত্ত্বেও এই গীতাখানি যে সাধারণের গ্রাহ্য হইয়াছে, অল্প সময়ের মধ্যে ইহার তৃতীয় সংস্করণ হওয়া তাহাই সূচিত করে। ইহাতে প্রাঞ্জল ভাষায় গীতার শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ভূমিকা ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

য. চ. ব.

মোসলেম-কীর্ত্তি—দ্বিতীয় খণ্ড। মৌলভী আবদুল কাদের প্রণীত। প্রকাশক—মুনসী মোহাম্মদ করমুল্লাহ্‌ জি, টি, ইতিকথা বুক ডিপো; ৩৬ কড়েয়া রোড, কলিকাতা।

পৃথিবীর নানাদেশে মোস্‌লেম-কৃষ্টির যে-সকল গৌরবময় নিদর্শন রহিয়াছে তাহাদের কতকগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় প্রদত্ত হইয়াছে। মোস্‌লেম-নরপতির ঔদার্য্য, বীরত্ব, মোস্‌লেম জাতির

জ্ঞানস্পৃহা, মোসলেম সভ্যতার নিকট ইউরোপের ঋণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের ঐতিহাসিক বিবরণ প্রাঞ্জল ভাষায় এই গ্রন্থমধ্যে পাওয়া যায়। পাদটীকায় বিভিন্ন প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে দীর্ঘ সন্দর্ভসমূহ উদ্ধৃত হওয়ায় অনুসন্ধিৎসু পাঠক বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন। স্থানে স্থানে কতকগুলি বর্ণাশুদ্ধি পরিলক্ষিত হইল। যথা 'যশোসৌরভ' 'প্রাণনাণ', 'বাগ্মীতা' 'সাহসীক' প্রভৃতি। আশা করি, পরবর্ত্তী সংস্করণে এইগুলি সংশোধিত হইবে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

মেজদার ডায়েরী—শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স, ২১ নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা। সুদৃশ্য কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য দেড় টাকা।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও নিপুণ সাহিত্য-সমালোচক শ্রীযুক্ত প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় অনেক দিন যাবৎ বাংলার মাসিক ও সাময়িক সাহিত্যের পাঠক-মহলে সুপরিচিত। স্বনামে এবং 'আনন্দসুন্দর ঠাকুর'-এর ছদ্মনামে বহু উপাদেয় প্রবন্ধ, গল্প ও সাহিত্য-সমালোচনা তিনি বঙ্গবাণীকে উপহার দিয়াছেন। "মেজদার ডায়েরী" তাঁহারই প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। সাহিত্য, সমাজ ও জীবনের এমন গভীর অথচ সরস আলোচনা সচরাচর চোখে পড়ে না। লেখার ভঙ্গীটি মনোরম, রচনায় প্রাণ আছে, আগাগোড়া এমন একটি সংযম আছে যাহা উৎকৃষ্ট সাহিত্যের লক্ষণ। 'ডায়েরী'-লেখক 'মেজদা'র মনটি সুস্থ সবল ও মার্জ্জিত। বইখানি পড়িতে পড়িতে তাঁর রসবোধ, চিন্তাশক্তি ও পাণ্ডিত্যের তারিফ করিয়াছি, দুঃখ কেবল 'ডায়েরী' এত সংক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া। সকল সাহিত্য-রসিককে এই বইখানি পড়িতে অনুরোধ করি।

ছাপা, কাগজ, বাঁধাই সুন্দর।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আরতি—শ্রীনলিনীমোহন শাস্ত্রী প্রণীত। প্রকাশক—এম, এন, রায় চৌধুরী এণ্ড কোং, ১১নং কলেজ স্কোয়ার।

কবিতাগুলি সঙ্গীতের রীতিতে রচিত। গ্রন্থকারের হাত মিষ্ট এবং রচনা রসপূর্ণ হইলেও এই গ্রন্থে এমন একটিও কবিতা নাই যাহা পাঠক-মনে স্পর্শ রাখিয়া যায়। 'শোধন' কবিতাটি ভাল লাগিল, সুর বসাইয়া দিলে গান হইত। গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ সুন্দর। মূল্যের উল্লেখ নাই।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

বাংলার বীরাঙ্গনা—শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী বিদ্যাভূষণ প্রণীত। গোল্ডকুইন এণ্ড কোং লিমিটেড, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। ১৩৩৮। পৃষ্ঠা ১০৭, মূল্য বারো আনা।

গ্রন্থকার ইতিপূর্ব্বে দেশের ইতিহাস হইতে বীরত্বসূচক কতকগুলি কাহিনী নানা পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "প্রবাসী"-সম্পাদক মহাশয়ের উপদেশ অনুসরণ করিয়া এবার তিনি বাংলা দেশের প্রাচীন ও নবীন কালের নারীদের বীরত্বের অবদান সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মুকুন্দরায়ের কন্যা, সোনাবিবি, রায়বাঘিনী, দেবীচৌধুরাণী প্রভৃতির কথা সকলেরই শুনিতে আগ্রহ হইবে। দুঃখের বিষয়, প্রকৃত ইতিহাস জানা না থাকায় অনেক সময় প্রচলিত কাহিনীর উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। আধুনিক কালের যে সব নারী বীরত্বের আদর্শ দেখাইয়াছেন তাঁহাদের কথাও লোকের জানা থাকা উচিত। ইহাতে নারীদের শক্তির প্রতি পুরুষদের এবং নারীদের নিজেরও শ্রদ্ধা বাড়িবে। গ্রন্থকারের চেষ্টা প্রশংসার যোগ্য। কতকগুলি ছবিদ্বারা গ্রন্থের বিষয় আরও চিত্তাকর্ষক করা হইয়াছে।

বিজ্ঞান-বুড়ো—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি প্রণীত। ১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, 'রামধনু' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৪৪। ১৩৩৮। মূল্য এক টাকা।

এই বইখানিতে বিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার-কাহিনী ছেলেমেয়েদের কাছে গল্পের মত করিয়া বলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই গল্পের অনেকগুলি "রামধনু"তে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং ছেলেমেয়েদের মনোরঞ্জন করিয়াছিল। গালিলিও হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের জগদীশচন্দ্র প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মূল কথাগুলি অতি সরল ভাষায় সরস করিয়া বলিয়া গ্রন্থকার ছেলেমেয়েদের ও তাহাদের অভিভাবকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কতকগুলি ছবি থাকাতে বইখানার আদর বাড়িবে।

শ্রীরমেশ বসু

স্বপ্নছবি—শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত।

কবিতার বই। বাংলা সাহিত্যে অপরিচিত হইলেও সত্যেনবাবু স্বভাব-কবি। প্রথম কবিতা হইতে পুস্তকের নাম-করণ হইয়াছে। উহার একটুখানি নমুনা উদ্ধৃত হইল,—

"বাতাস পরে লঘু যাদের চরণগুলি থামে
সাগর-মেঘে, কুসুম-রেণুতে,
তাদের আজ ধরিতে চাহি গানে;
স্বপনমাঝে সহজ ছবি যাহারা মৃদু নামে
সুরের কোলে বিলীন-বেণুতে
লভিতে চাই তাদেরে আহ্বানে।"

—এইরূপ অনেক সুন্দর কবিতা আছে।

মহাত্মা যিশুর পুণ্যকাহিনী—শ্রীঅমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ঋষি টলষ্টয়ের "Gospel in Brief" নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। টলষ্টয় যিশুখৃষ্টকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরপুত্র বলিয়া স্বীকার না করিলেও তাঁহার উপলব্ধি-প্রসূত উপদেশের শক্তি ও সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল—যিশুর উপদেশ সম্যকরূপে পালিত হইলে মানবসমাজ উন্নততর হইবে। অনুবাদক এই মূলভাব ছাড়াইয়া যান নাই। যাঁহারা ঋষি টলষ্টয়ের মূল গ্রন্থ পড়েন নাই, বা পড়িতে অসুবিধা বোধ করেন, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে উপকৃত হইবেন।

ব্যথার সাথী—শ্রীশচীন্দ্রকুমার সিংহ প্রণীত। ভাষা মন্দ নহে, কিন্তু যে ভাবোচ্ছ্বাস গ্রন্থকার ইহাতে ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা অব্যক্ত থাকিলেই ভাল হইত। অনেক জিনিষ যতক্ষণ অন্তরে থাকে ততক্ষণই ভাল, ভাষায় প্রকাশিত হইয়া গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইলে তাহাই আবার অত্যন্ত লঘু ও হাস্যাস্পদ হইয়া পড়ে। 'নগ-নন্দিনী' ও 'স্মৃতি মন্দির' নামক দুইটি গল্পও ইহাতে আছে, কিন্তু প্লট ও ঘটনা-বৈচিত্র্যের অভাবে তাহা একেবারেই মামুলি হইয়া পড়িয়াছে।

চন্দ্রেশ্বর

চোর

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

রাঁচি এসেছিলাম—চেঞ্জে। মাস-দুই থেকেই আর ভাল লাগল না; তাই ফিরে চলেছি। সকাল থেকে তল্পীতল্পা বিছানাপত্তর বাঁধা হচ্ছে;—ঝি-চাকর ছেলে-মেয়ে সকলেই লেগে পড়েছে। তা ছাড়া আমি ত একাই একশ। মহা ব্যস্ত। চারিদিকে ছুটোছুটি, হাঁকাহাঁকি বকাবকি ক'রে বাড়িসুদ্ধ লোককে অতিষ্ঠ করে তুলেছি।

ট্যাক্সি এসে পড়েছে; জিনিষপত্তর সব বোঝাই হচ্ছে—এমন সময় আমার মেজ মেয়েটা চেঁচিয়ে উঠল —"এই দেখ মা, বাবার কাণ্ড দেখ! চারদিকে কেমন নোটগুলো ফেলেছেন!" ফিরে দেখি সর্ব্বনাশ! ঘরে, বারান্দায়, আঙিনায়—চারদিকে একেবারে নোটের হরিল্লোট চলেছে। কখন যে কোঁচার খুঁট খুলে নোটগুলো পড়তে আরম্ভ করেছে তা একেবারেই জানতে পারি নি। তখনই ত শশব্যস্ত হ'য়ে সেগুলো কুড়োতে লাগলাম। পাঁচ টাকার দশ টাকার ক'রে প্রায় কুড়ি-বাইশখানা নোট! মাথা যতদূর সম্ভব ঠাণ্ডা ক'রে মিলোতে বসলাম; হিসেব আর মেলে না! কখনও দু-খানা কম হয়, কখনও তিনখানা, কখনও চারখানা! কখনও মনে হয় ঠিক আছে!

মহা হাঙ্গাম ত! স্ত্রীর সাহায্যে আবার নূতন ক'রে হিসেব মিলোতে বসলাম। শেষে ঠিক হ'ল একখানা দশ টাকার নোট গিয়েছে!

খোঁজ! খোঁজ! চারদিকে খোঁজের ধুম পড়ে গেল। শোবার ঘর, স্নানের ঘর, রান্নাঘর, আঙিনা, রাস্তা, ঝোপ-ঝাপ, খানাডোবা, আঁস্তাকুড়, কিছুই খুঁজতে বাকী রইল না! কিন্তু নোট ত মিলল না। ওদিকে ট্রেনের সময় পেরিয়ে গেল! কি করা যায়? আবার তল্পী-তল্পা লটবহর সব ট্যাক্সি থেকে নামাতে হ'ল! রাগে দুঃখে আমার কান্না পেতে লাগল।

সারাটা দিন আর কোথাও গেলাম না। কেবল এখানে-সেখানে নোটের সন্ধান ক'রে বেড়ালাম। শেষ-কালে যেদিকে চাই সেইদিকেই দশ টাকার নোট দেখি!

সন্ধ্যেবেলায় বারান্দায় পায়চারি করছি, আর ভাবছি—টাকা-দশটা শুধু শুধু গেল! যদি জানতাম কোন সৎকাজে ব্যয় হয়েছে তাহ'লে একটা সান্ত্বনা থাকত! এ কোন্ বেটা চোর না বদমাইসের হাতে পড়ল—কি কি-জানি হয়ত কারো হাতেই পড়ল না বা কখনও পড়বে না! কোন অজানা জায়গায় পড়ে থেকে থেকে জলে কাদায় নষ্ট হবে বা উইপোকার পেটে যাবে!

ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে উঠল!

হঠাৎ সামনে চাকরের ঘরটার দিকে দৃষ্টি পড়ল!—বেটা ত আমার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরছিল; ও পায় নি ত? তখনই মনে হ'ল—নাঃ, ওতো সেরকম নয়, আজ দু-মাস কাছে আছে কখনও কোন জিনিষে হাত দেয় নি; অথচ ইচ্ছে করলে অনেক কিছুই সে নিতে পারত!

আবার মনে হ'ল—নাঃ! এ ত চুরি নয়; কুড়িয়ে-পাওয়া জিনিষ, নেবে না কেন? দশটা টাকা! গরিব মানুষ; নেবে না?

অন্যমনস্কভাবে তার ঘরে ঢুকলাম। দেওয়ালে তার কোটটা টাঙান ছিল; ভাবলাম—একবার পকেটগুলো দেখব নাকি? কথাটা ভেবেই হাসি পেল! টাকা যদি নিয়েই থাকে তবে সে কি এমনি ভাবে এখানে তার কোটের ভিতর রেখে গেছে?

কিন্তু তবু কৌতূহল হ'ল—একবার দেখিই না। আস্তে আস্তে ওর পকেটে হাত দিতে গেলাম।

হঠাৎ মনটা কেমন ক'রে উঠল! ছি! এ আমি করছি কি! শেষকালে চোরের মত—!

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু কিছুতেই

কৌতূহল দমন করতে পারলাম না। নাঃ, একবার দেখতে দোষ কি? আমি ত আর ওর কিছু নিচ্ছি না!

বেশ ক'রে পকেটগুলো দেখলাম; কই কিছুই নাই! খালি কয়েকটা বিড়ি! জামাটা রাখতে যাচ্ছি হঠাৎ নজর পড়ল ভিতরের দিকে একটা পকেট! তার মধ্যে তাড়াতাড়ি হাত ঢুকালাম, একখানা রুমাল। অ্যাঁ একি! রুমালে বাঁধা দশ টাকার নোট!

'তবে রে বেটা চোর!' আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলাম; হঠাৎ চুপ ক'রে গেলাম। ভাবলাম—থাক্, গোলমাল ক'রে কাজ নেই। একটু মজা করা যাক্। আস্তে আস্তে নোটখানা খুলে নিয়ে জামাটি যথাস্থানে রেখে চলে এলাম।

কিছুক্ষণ পরেই চাকরটা ফিরে এল। আমি তার দিকে লক্ষ্য রাখলাম—দেখি বেটা কি করে!

খানিক পরে দেখি সে ব্যস্ত হয়ে চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে—ঠিক আমারই মত! মুখেচোখে বড় করুণ ভাব। খুবই মজা লাগল!

একবার ভাবলাম জিজ্ঞাসা করি! কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলাম—না, ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে দরকার নেই। বেচারী গরিব মানুষ, একটা অন্যায় ক'রে ফেলেছে; বড় লজ্জা পাবে!

সে অনেক খুঁজল। দু-একবার আমার কাছে এসে কি যেন বলতে চাইল। আমার মনটায় বড় দুঃখ হ'ল। একবার ভাবলাম—নোটখানা ওর পকেটে রেখে আসি! কিন্তু তখনই আবার কর্ত্তব্যবোধ জাগল—নাঃ! অন্যায় কাজে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়!

পরদিন সকালে তাকে ডাকলাম। আমার কাছে তার আট টাকা পাওনা ছিল; আমি সেই দশ টাকার নোটখানা তাকে দিলাম।

সে নোটখানা দেখেই চমকে উঠল। জড়িতস্বরে বলল—বাবু—

কি যেন বলতে গিয়ে আটকে গেল। আমি বললাম—কি বলচিস্!

সে তখন নিজেকে সামলে নিয়েছে; বললে—আমার কাছে ভাঙানি নেই।

আমি হেসে বললাম—ভাঙানির দরকার নেই, তোর আট টাকা মাইনে আর দু-টাকা বক্‌শিস।

সে কিছু না ব'লে নোটখানা নিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল!

কতক্ষণ পরে দেখি—সে আমায় দুটো টাকা ফেরত দিতে এসেছে! আমার ভয়ানক রাগ হ'ল—ওঃ, বেটা কি সাধু! যাক্! কিছু না ব'লে টাকা-দুটো পকেটে রেখে দিলাম। বুঝলাম দশ টাকার জায়গায় মাত্র দু-টাকা পেয়ে তার রাগ হয়েছে।

চলে যেতে যেতে সে আবার ফিরে দাঁড়াল; বললে—বাবু—

আমি বললাম—কিরে!

সে ধীরে ধীরে বললে—ও নোটখানা আমার ছিল, আপনার নয়।

আমি চোখ পাকিয়ে বললাম—তার মানে?

সে হাতজোড় ক'রে বলল—আপনি মিছে সন্দেহ ক'রে আমার পকেট থেকে—

বেটার আস্পর্দ্ধা ত কম নয়!

চুরি করল, ফের সে চুরি ঢাকবার জন্যে উল্টে আমাকে চোর বানাতে চায়! তারই চুরি ঢাকবার জন্যে আমার এত চেষ্টা! আর সে বেটা—

ক্রোধে অপমানে আত্মহারা হয়ে আমি ব'লে উঠলাম—দূর হ! বেটা এখুনি আমার সমুখ হ'তে দূর হ! তা না হ'লে পুলিসে দেব, বেরো বলছি।"

সে চলে গেল।

খাওয়াদাওয়া সেরে লটবহর নিয়ে ট্যাক্সিতে চড়ে বসেছি; ট্যাক্সি চলতে আরম্ভ করেছে এমন সময় ফিরে দেখি একটি ছেলে গাড়ীর পিছন পিছন ছুটে আসছে। গাড়ী থামান গেল।

ছেলেটি হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—আপনার নোটখানা পাওয়া গেছে, এই নিন!

শুনে আমার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। নোটখানা কোনরকমে হাতে গুঁজে নিয়ে ড্রাইভারকে ব্যগ্র হয়ে ব'লে উঠলাম—জলদি—জলদি—!

পশ্চিমে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রতিনিধি উদয়শঙ্কর ও তিমিরবরণ

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত



ইতিপূর্ব্বে উদয়শঙ্কর ও তিমিরবরণ প্রমুখ ভারতীয় শিল্পিবৃন্দের কৃতিত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় আলোচনা হয়েছে। এখানে শুধু চিত্রপরিচয় প্রসঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধে যেটুকু বলা প্রয়োজন তা'র বেশী বল্‌ব না। সম্প্রতি হল্যাণ্ডের হেগ্ শহরে একটি প্রদর্শনী হয়েছিল। ভারতীয় শিল্পীরা সেখানে গিয়েছিলেন। তারই প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে উপরের ছবিটি তোলা হ'য়েছে।

পরিচয়।—(চিত্রের বাঁ দিক থেকে) ১) উদয়শঙ্করের মাতুল ব্রজবিহারী—তব্‌লা ও সারেঙ্গী বাজনায় নিপুণ। (২) তিমিরবরণ। (৩) বিষ্ণুদাস সিরালী—মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। ইনি সঙ্গীত-বিশারদ। এঁর তব্‌লাতরঙ্গ ইউরোপে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। ভারত-বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ পরলোকগত পণ্ডিত বিষ্ণু-দিগম্বর এঁর গুরু। (৪) হাঙ্গেরীয়ান্ পথপ্রদর্শক। (৫) শ্রীমতী কনকলতা—উদয়শঙ্করের খুল্লতাত কেদারশঙ্করের কন্যা. উদয়শঙ্করের নৃত্যসঙ্গিনী-হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছেন। (৬) প্রদর্শনীতে পরিচিত ডাচ-মহিলা। (৭) শ্রীমতী অপরাজিতা নন্দী—বিখ্যাত বাঙালী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত অক্ষয় নন্দীর কন্যা। ইনিও নৃত্যে উদয়শঙ্করকে সাহায্য করেন। (৮) উদয়শঙ্কর। (৯) মাদ্‌মোয়াসেল সিম্‌কী। ভারতবর্ষের সঙ্গে এঁর সাক্ষাৎ পরিচয় নেই, অথচ উদয়শঙ্করের শিক্ষায় সেই সুদূর বিদেশেই এই ফরাসীকন্যা ভারতীয় নৃত্যকলায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছেন। ইনি উদয়শঙ্করের প্রধানা নৃত্যসঙ্গিনী। (১০) বেচু ভট্টাচার্য্য—সব রকম যন্ত্রে (বিশেষভাবে তবলা এবং এস্‌রাজে) এঁর দখল আছে। ইনি বেনারস ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্র ছিলেন। (১১) কেদারশঙ্কর—উদয়শঙ্করের পিতৃব্য। মৃদঙ্গ-জাতীয় প্রায় সব যন্ত্রেই ইনি সুপটু।

দলের আরও তিনজন ছবিতে অনুপস্থিত। তাঁর



স্নান
(কনকলতা ও সিমকা)

উদয়শঙ্করের তিন ভাই। মধ্যম ভ্রাতা রাজেন্দ্রশঙ্কর বাঁশী ও সেতার বাজনায় এবং কনিষ্ঠ রবীন্দ্রশঙ্কর সেতার বাজনায় পটু। রবীন্দ্রশঙ্করের বয়স মাত্র ১৪ বৎসর। তৃতীয় ভ্রাতা দেবেন্দ্রশঙ্কর একক নৃত্যের জন্য ইউরোপে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছেন।

গত দেড় বৎসর যাবৎ এঁরা প্যারিস নগরীকে কেন্দ্র ক'রে ইউরোপের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত (ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ইটালী, স্পেন্, হাঙ্গেরী, অষ্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, সুইট্জারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম্, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, এস্থোনিয়া, লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া, ফিন্ল্যাণ্ড, এবং পোলাণ্ড ইত্যাদি) সব দেশের রঙ্গমঞ্চে এঁদের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এঁদের নৃত্যের ছন্দ ও সুরের রেশ বারে বারে নূতন নূতন রূপে সে-দেশের নাট্যশালায় ধ্বনিত হয়েছে। কিছুকালের জন্য ভ্রমণ শেষ ক'রে সম্প্রতি রাজেন্দ্রশঙ্কর তাঁদের ডেনমার্ক ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া দর্শনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যে পত্র লিখেছেন



মোজার্টের জন্মভূমি স্যালস্বার্গে ভারতীয় শিল্পীর দল



চেকোস্লোভাকিয়ার কার্লস্বাদ্ শহরের উষ্ণজলের উৎসের সম্মুখে





শিব নৃত্য

বাম হইতে দক্ষিণে :—জয়া কনকলতা ; শিব—উদয়শঙ্কর ; পার্ব্বতী—সিমকী

'গজাসুর-বধ' নৃত্য*

বাম হইতে দক্ষিণে :—জয়া—কনকলতা, পার্ব্বতী—সিমকী ; গজাসুর—দেবেন্দ্রশঙ্কর

* যে পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন ক'রে এই নৃত্যের সৃষ্টি হ'য়েছে সেটি এই :—পুরাকালে মহেশ নামে এক নরপতি দেবর্ষি নারদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করাতে ঋষির শাপে রাজা পরজন্মে গজযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া অসুরত্ব প্রাপ্ত হন। পরে একদিন ঘটনাক্রমে এই গজাসুর পার্ব্বতীর অবমাননা করে। ইহাতে শিব ক্রুদ্ধ হইয়া গজাসুরকে বধ করেন এবং উহার চর্ম্ম নিজ ব্যবহারার্থ গ্রহণ করেন।



স্থাল্‌সবার্গের একটি প্রস্তর মূর্ত্তি



দ্যাভিয়ার গ্রাম্য অধিবাসী

তার অংশ-বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল। ভারতীয় শিল্পিবৃন্দ সেখানে কতখানি সমাদর লাভ করেছেন তা বোঝা যায় এই পত্র পড়লে। ইউরোপের যে-সব মনোরম স্থান এঁরা পরিদর্শন ক'রেছেন তার কিছু কছু ছবি এবিং কয়েকটি নৃত্যভঙ্গী এই সঙ্গে মুদ্রিত হ'ল।

ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনের রয়্যাল থিয়েটারে অভিনয় সম্বন্ধে রাজেন্দ্রবাবু লিখেছেন—



স্থাল্‌সবার্গের 'ওপন এয়ার থিয়েটার'



স্থাল্‌সবার্গের সর্ব্বপুরাতন গীর্জ্জা ; ১২০০ সালে নির্ম্মিত





শিব (উদয়শঙ্কর), গজাসুর (দেবেন্দ্রশঙ্কর)

শিব ও গজাসুর

"ইতিপূর্ব্বে এই নাট্যশালায় নৃত্য নিষিদ্ধ ছিল। এমন কি, প্রাতঃস্মরণীয়া নর্ত্তকী প্যাভ্লোভাকেও এর চেয়ে নিম্নতরশ্রেণীর রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণা হ'তে হ'য়েছে। সর্ব্বপ্রথম আমরা অনুমতি পেলাম।... যথাসময়ে অভিনয় আরম্ভ হ'ল। প্রতি দৃশ্যের পরে দর্শকদের করতালিতে মনে হ'চ্ছিল থিয়েটার ভেঙে পড়বে। প্রতি দৃশ্যের পর করতালির উত্তরে দর্শকবৃন্দকে নমস্কার ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন না-করা সৌজন্যবিরুদ্ধ;



হর-পার্ব্বতী
শিব (উদয়শঙ্কর) ; পার্ব্বতী (সিমকি)

কিন্তু অভিনয় সম্পূর্ণ শেষ হবার আগে যবনিকা উঠিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এই থিয়েটারের প্রচলিত প্রথাবিরোধী। সুতরাং অধ্যক্ষ মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সে কাজে বিরত হ'তে হ'ল। অভিনয় সম্পূর্ণ শেষ হবার পর আমরা প্রশংসমান এই বিরাট জনতাকে দেখবার সুযোগ পেলাম। রাজা তাঁর নিজের বক্সে উপস্থিত ছিলেন। আমরা অভিবাদন করাতে তিনি প্রতিনমস্কার জানালেন।..."(অনূদিত)

অস্‌লোর (নরওয়ের রাজধানী) অভিনয় বিবৃত ক'রে রাজেন্দ্রশঙ্কর লিখেছেন—

"অভিনয় আরম্ভ হবার আগে যবনিকার ছিদ্র দিয়ে দর্শকদে দেখলাম। সকলেই খুব সম্ভ্রান্ত বেশে সজ্জিত। ষ্টেজের বাঁ-পাে উপরতলার রাজার বক্সে রাজা, রাণী এবং রাজপরিবারের আরং কেউ কেউ বসেছিলেন। অভিনয় খুবই সুন্দর হয়েছিল এবং কয়েকা নৃত্যের পুনরাভিনয় করতে হ'ল। সপরিবারে রাজা শেষ পর্যন্ত ছিলেন। অভিনয়ের শেষে রাজার শরীররক্ষী এসে দাদাকে (উদয়শঙ্করকে রাজার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানালেন এবং বল্‌লেন সময় পেলে রাজা পরের দিনও আসবেন। পরে শুনলাম, বৃদ্ধ রাজা নিজে

মাথাদের 'তরবারী' নৃত্যের কয়েকটি ভঙ্গী অনুকরণ করতে চেষ্টা করেছিলেন।" (অনূদিত)

এ শুধু স্থানবিশেষের দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'ল। উদয়শঙ্কর ও তিমিরবরণ সর্ব্বত্রই লোকচিত্ত হরণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন—তিমিরবাবুর প্রতিভা, সাধনা এবং তার ফলে উদয়শঙ্করকে তিনি কি দিতে পেরেছেন।

বাল্যকাল থেকে তিমিরবরণ ছিলেন সুর-রসিক। সুরের স্বপ্নরাজ্যে ছিল তাঁর বাস। তার পরে তাঁর প্রচ্ছন্ন প্রতিভার উন্মেষের সুযোগ উপস্থিত হ'ল। তিনি সুরসাধনায় তাঁর প্রতিমুহূর্ত্ত নিয়োগ করলেন। 'রিলিজ্যান্' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করলে বলা চলে সুরসাধনা হ'ল তাঁর 'রিলিজ্যান্'। ক্রমান্বয়ে দীর্ঘ সাত বৎসরকাল তিনি মহম্মদ আমীর খাঁ ও ওস্তাদ্ আলাউদ্দীন প্রমুখ এদেশের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞদের কাছে স্বরোদ্ শিক্ষা করলেন। তাঁর কঠোর অবিশ্রান্ত সাধনার সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে স্থানাভাব হ'বে। এর পরে এল তাঁর সুরসৃষ্টির কাল। তিমিরবাবুর পরিচালিত ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ঐকতানবাদ্য তাঁর কৃতিত্বের পরিচায়ক।

তিমিরবরণকে সহায়রূপে পাবার আগে উদয়শঙ্কর গীতবাদ্য বিষয়ে 'ক্লাসিকেল' হ'তে পারেন নি। বিলাতী যন্ত্রে আধা-বিলাতী এবং আধা-দেশী চুট্‌কী সুরের সংযোগে তিনি নৃত্য করতেন। তা'তে তাঁর ভারতীয় নৃত্যকলার পরিপূর্ত্তি সাধন হয় নি। উদয়শঙ্করের সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশে ভারতীয় সঙ্গীতকে তিমিরবরণ দিলেন পূর্ণতা।

ভারতবর্ষের—বিশেষতঃ বাংলার—মুখ উজ্জ্বল ক'রে এঁরা দেশবিদেশে জয়ী হয়েছেন। আর একটি পত্রে জ্ঞাত হ'লাম তাঁরা আমেরিকা থেকে আহূত হয়েছেন—আগামী বৎসরে সেখানে যাবার জন্যে। আমরা অদূর ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে আছি আবার কবে তাঁদের নূতন ক'রে দেখ্‌ব। সম্ভবতঃ আগামী বৎসরের মাঝামাঝি সদলে উদয়শঙ্কর ভারতে ফিরবেন।

স্বরলিপি

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রাগ গান্ধী—সুরফাক্তা

ষাড়ব জাতি
নিখাদ বর্জ্জি
মধ্যম বাদী
ষড়জ সম্বাদী

তূ ধন ধন গাঁধী মহাত্মা
জগমেঁ যশ কীরত ঐসী পরকাশ
জ্যোঁ প্রভাত তপন।
মোহন দাস অনুপম দীনজন তারণ
লিয়ে করত অত কঠোর ব্রত সাধন।
জনম সফল হোত জব দেখত বদন
শ্রবণ শুনত তুঅ মধুর বচন ;
তূঁহী পরম যোগী তূঁহী পরম তিয়াগী
অচরজ লাগত সবকো
দেখ তুঅ অনশন ॥

কথা ও সুর সঙ্গীতরত্নাকর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১´ ২ ৩
II সা ধ্া সা রা I গা মা I মা -া মা মা I
তুঁ ০ ধ ন ধ ন গা ০ ম্বী ম

১ ২ ৩
গা পা -া ধা I গা পা I মা -া গা -া I
হা ০ ০ ০ আ ০ ০ ০ ০ ০

১´ ২ ৩
সা গ রা গা মা I পা মা I গা রা গা রা I
জ গ ০ মে ০ য় শ কী ০ র ত

১´ ২ ৩
সা পা ধা সা I সা রা I গা মা পা পা II
ঐ ০ সী ০ প র কা ০ ০ শ

১´ প ২ ৩
র্সা পা ধা গা I পা মা I গা রা গা রা I
জ্যো ০ প্র ভা ০ ত ত প ০ ন

১´ ২ ৩
পা মা গা পা I ধা র্সা I র্সা র্সা র্সা সা I
মো হ ন দা ০ স অ নু প ম

১´ ২ ৩
র্সা ধা র্সা র্রা I র্গা র্মা I র্রা র্গা -া র্রা র্সা I
দী ০ ন ০ জ ন তা ০ র ণ

১´ ২ ৩
-া পা র্গা র্রা I র্রা র্সা I র্সা ধা ধা পা I
লি ০ য়ে ক র ত ০ অ ত

১´ ২ ৩
ধা গা পা মা I গা মা I গা রা গা রা II
ক ঠো ০ র ব্র ত সা ০ ধ ন

১´ ২ ৩
পা পা প রা রা I গা মা I গা রা গা রা I
জ ন ম০ স ফ ল হো ০ ০ উ

১´ ২ ৩
সা ধ্‌া সা রা I গা মা I গা রা গা মা I
জ য় দে ০ খ ণ্ড ব দ ০ ন

১´ ২ ৩
পা পা র্সা র্সা I ধর্সা ধা I ধা পা মা গা I
প্র ব ০ ণ ভ ০ ন ত ভু ব

১´ ২ ৩
সা গা মা পা I ধা গা I পা মা । গা } I
ম ধু ০ র ব চ ০ ০ ০ ন

১´ ২ ৩
{ পা -া মা গা I পা ধা I র্সা -া র্সা -া I
{ তুঁ ০ হী প র ম যো ০ গী ০

১´ ২ ৩
র্সা র্গ র্রা র্গা র্মা I র্গা র্রা I র্সঃ র্সাঃ ধা পা } I
তুঁ ০ ০ হী প র ম ত্যি য়া গী ০

১´ ২ ৩
পা পা র্সা র্সা I গা মা I পা পা র্গা র্গা I
অ চ র জ লা ০ গ ত স ব

১´ ২ ৩
ধ র্সা র্সা -া ধা I ধা পা I সপা মা গা রা II II
কো দে ০ খ তু অ অ ন শ ন

[এই রাগটি আমার খুল্লতাত সঙ্গীতরত্নাকর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সৃষ্ট। মহাত্মা গান্ধীজীর অনশন-ব্রত উপলক্ষে উঁহার দ্বারা এই রাগ ও গান রচিত হয়।]

পত্রধারা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

লিখেচ 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' 'প্রভাত সঙ্গীত' 'ছবি ও গান' পড়চ। অঙ্কুর যদিও উদ্ভিদজাতীয় তবু তাকে গাছ বলা চলে না, ঐ লেখাগুলিও তেমনি কাকুতি কিন্তু কাব্য নয়। ওতে এই অতি সহজ কথাটার প্রমাণ হয় যে এক সময়ে আমি বালক ছিলুম। অমৃতং বাল ভাষিতং ব'লে একটা কথা আছে—কিন্তু সময় উত্তীর্ণ হ'লে সেই বাল ভাষিতকে কেউ রক্ষা করে না—করলেও সেই অমৃত ভদ্রলোকের পাতে দেবার যোগ্য থাকে না। 'ছবি ও গানে' তুমি আমার ভাঙা ছন্দ দেখে হেসেচ—ভেবেচ ছেলেরা হাঁটতে গিয়ে যেমন পড়ে, ওর ছন্দঃপতনও তেমনি। ঠিক তা নয়। আমি আজন্মকাল বিদ্রোহী। বালক বয়সেও স্পর্দ্ধার সঙ্গে বাঁধা-ছন্দের শাসন অস্বীকার করেই কবি-লীলা সুরু করেচি—বাঁধনে ধরা দিতে আপত্তি করিনে যদি ধরা না দেবারও স্বাধীনতা থাকে।

ঘরে বাস করতে হয় বলেই যদি বেরোলেই লোকে চারদিক থেকে তেড়ে আসে তাহ'লে সেটা তো হ'ল জেলখানা। বস্তুত কাব্যে দেয়াল-ছাদা ঘরও কবির, নির্দেয়াল বাগানও তার। আমার কবিতায় কোথাও কোথাও ছন্দের দেয়াল দেওয়া নেই ব'লে মনে কোরো না, যে, ইটের পাঁজা পোড়ে নি, মিস্ত্রির মজুরীর অভাব। ইতি ১৫ নভেম্বর ১৯৩১।

২

আকাশে মেঘে মেঘে ঋতুতে ঋতুতে ফুলে পল্লবে রঙের রসের অন্তহীন খেলা—এই খেলা ভেঙে যেত যদি বাঁধনের জালে আটকা পড়ত। বিশ্বব্যাপারকে আমরা লীলা ব'লে জানি—সেই লীলার মানেই এই যে তার মধ্যে সবই আছে কিন্তু কিছুই বাঁধা নেই। রসের ঝরণা পূর্ণ থাকচে না। কুমারসম্ভবে শুনি দৈত্যেরা স্বর্গকে অধিকার করেচে। তার মানে, যে-আনন্দ ছিল মুক্ত তাকে তারা বন্দী করতে চেয়েছিল। তখন সেটা হয়ে গেল ভোগ—ভোগে ক্লান্তি, ভোগে ম্লানতা, ভোগ নিজেকে নিঃশেষ ক'রে ম্লান হয়ে যায়। সেই জন্যেই মন বলে লোভ কোরো না। লোভে আমরা আপনাকেই বন্দী করি, কিন্তু যা পাই তাকে শেষ পর্য্যন্ত বাঁধতে পারিনে। তুমি নিশ্চয় জানো আজ জগৎ জুড়ে একটা আর্থিক দুর্গতি ঘনিয়ে উঠচে। বিষয়ী লোকেরা ব্যাকুল হয়ে তার কারণ খুঁজচে। তার কারণ এই যে মানুষ দীর্ঘকাল ধরে আপন আপন সম্পদকে কড়াকড় ক'রে আটেঘাটে বাঁধতে চেয়েছিল। কিন্তু লক্ষ্মী চঞ্চলা—অর্থাৎ ধন কোনো এক জায়গায় একান্ত বাঁধা থাকবে এটা বিশ্বনিয়মের বিরুদ্ধ। রাশিয়ার সোভিয়েট এ কথাটা বুঝেচে, তারা ব্যক্তিগত লোভের থেকে ধনকে মুক্ত করতে চায়। যদি পারে তাহ'লেই চঞ্চলা লক্ষ্মীকে তারা সত্য ক'রে পাবে। বিষয়লুব্ধ দৈত্যেরা লক্ষ্মীকে আপন ব্যাঙ্কের দুর্গে কড়া পাহারায় বন্দী করেছিল। তাই লক্ষ্মী আজ তার অদৃশ্য রাস্তা দিয়ে পালাচ্চেন। জীবনের সব দুর্মূল্য আনন্দই হচ্চে এই রকমের মুক্ত সম্পদ। তাকে বাঁধতে গেলেই নিজেকে বাঁধি। আমি তাই বলি মুক্তি মানে ত্যাগ নয়, বৈরাগ্য নয়, আপন অনুরাগের হাতকড়ি খসিয়ে দেওয়া, তাকে নিরাসক্তির সিংহাসনে রাজা করা—তাকে পাওয়া কিন্তু ধরা নয়। ইতি ২৪ নভেম্বর ১৯৩১।

৩

তোমার চিঠি পড়তে আমার খুব ভালো লাগে। তাতে তোমার নারীহৃদয়ের গভীরতম বেদনার স্পষ্ট পরিচয় পাই। বুঝতে পারি স্নেহ প্রেম ভক্তির আধার পাবার প্রয়োজন তোমাদের পক্ষে কত একান্ত প্রবল।

যেখানে তোমাদের হৃদয়ের নৈবেদ্য পরিপূর্ণভাবে বিশুদ্ধভাবে সার্থক হ'তে পারে, তোমাদের ত্যাগের শক্তি সমস্ত বাধা ভেদ ক'রে উচ্ছ্বসিত ধারায় প্রবাহিত হ'তে পারে. তোমাদের শ্রেষ্ঠ সাধনার পথ সেই অভিমুখেই। নারীর সেই আত্মনিবেদনের ব্যাকুলতা তোমার চিঠিতে অকৃত্রিম মাধুর্য্যে প্রকাশ পায়। বুঝতে পারি যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম তোমাকে আকর্ষণ করেচে তুমিও তাকে আকর্ষণ করেচ—পৃথিবী যেমন, যত ছোট হোক, তবুও সূর্য্যকে টানে। তুমি অকারণেই সন্দেহ করো যে, আমি হয়তো তোমার মনের ভাবটি ঠিক বুঝিনে। একটা কথা মনে রেখো আমরা সকলেই এক হিসাবে অর্দ্ধনারীশ্বর। কারো মধ্যে বা আধা আধা মিশোল, কারো মধ্যে বা ভাগের কম বেশি আছে। একান্ত নারী এবং একান্ত পুরুষে যদি সংসার বিভক্ত হ'ত তাহ'লে তারা মিলতেই পারত না। তাই পরস্পরকে বুঝতে বাধে না, অথচ নিজের নিজের অধিকারের মধ্যে নিজের যে বিশেষত্ব তাকেও বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়। অর্থাৎ পুরুষের প্রকৃতিতে পুরুষ মুখ্য, মেয়ে গৌণ, এবং মেয়েদের প্রকৃতিতে তার উল্টো, এইটেই সাধারণত হয়ে থাকে, না হ'লে সেটাতে সংসারের ওজন ঠিক থাকে না। মেয়েরা অজস্র স্নেহ প্রেম ভক্তি দিয়ে নিজেকে এবং নিজের সংসারকে পূর্ণ করে তুলবে এইটেই চাই। এইটে হ'ল তার রসের দিক,—এর সঙ্গে তার শক্তির দিক আছে যেদিকে তার নিষ্ঠা, ধৈর্য্য, ত্যাগের দৃঢ়তা, যে-শক্তির দ্বারা সে আপন আশ্রয়কেও আশ্রয় দেয়, পালন করে, প্রতিষ্ঠিত রাখে, তার বিকারকে শোধন ক'রে তার বেদনার আরোগ্য আনে, অর্থাৎ যাতে ক'রে সে নির্ভরের দ্বারা দুর্ব্বল করে না, চরিতার্থ করে। কিন্তু ঐ রসের ধর্ম্ম যদি পুরুষও আশ্রয় করে তাহ'লে নিজের উপরে পুরুষকে নারীভাব আরোপ করতে হয়, অর্থাৎ সেটা হয় তার স্বভাবের বিরুদ্ধ। পুরুষ নিজেরই স্বভাবকে প্রতিষ্ঠ ক'রে তবেই সার্থকতা লাভ করে, উজানে গেলে দুর্ব্বল হয়ে জীবনের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থতায় নিয়ে যায়। বুদ্ধি দিয়ে বিজ্ঞান দিয়ে বীর্য্য দিয়ে অপ্রতিহত অধ্যবসায় দিয়ে আমাদের সৃষ্টিকে কেবলি উৎকর্ষের দিকে নিয়ে চলব, সমস্ত বাধাকে পরাস্ত করব, প্রতিকূলতাকে ভাগ্যের অমোঘ লিখন বলে স্বীকার ক'রে নেব না, এই হলেই সত্যকার পুরুষের দ্বারা সংসারের স্বাস্থ্য শক্তি সম্পদ আত্মসম্মান বজায় থাকতে পারে, এই হলেই মেয়েরাও নিরাপদ নির্ভর ও গৌরব লাভ করে। নইলে পুরুষরাও যেখানে রসের তরঙ্গে হাবুডুবু খাওয়াকেই জীবনের চরম লক্ষ্য ব'লে গ্রহণ করে, সেই পৌরুষবর্জ্জিত দেশ সকল দিক থেকে পরাভবের বন্যায় যায় ডুবে। সেই জন্যে তোমার চিঠিতে তোমার হৃদয়ের মাধুর্য্যে আমি যতই পরিতৃপ্তি পাই না কেন আমার তরফে পুরুষোচিত যে বীর্য্যের আনন্দ, যে মুক্তির আদর্শ, যে সৃষ্টির তপস্যা, যে সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গলের বিরুদ্ধে প্রাণপণ বিদ্রোহ, যে আত্মত্যাগী কর্ম্মের কঠোরতা তার বিজয়বাণী না শুনিয়ে থাকতে পারিনে। বাংলা দেশে দীর্ঘকাল ধরে পুরুষও নারীর আদর্শে বিমুগ্ধ, সেই জন্যেই তার সৃষ্টিশক্তির বিকার ঘটেচে—সেইজন্যেই কেবলি পরের কুৎসায় পরশ্রীকাতরতায় পরস্পরকে ব্যর্থ করচে। কোনো বড় কর্ম্মকে স্থায়ী ভিত্তিতে গড়ে তুলতে পারচে না, তাই তপস্যা ভঙ্গ করতে, সাধু চেষ্টাকে অশ্রদ্ধা করতে, আরব্ধ কর্ম্মকে ভেঙে ফেলতে শ্রেষ্ঠতাকে অস্বীকার করতে, যে কোনো উপলক্ষ্যেই একত্র হবা মাত্র খুঁৎ ধরে, ছোট ছোট ছুতো নিয়ে, মিথ্যা বলে, অত্যুক্তি ক'রে সব কিছু পণ্ড ক'রে দিতে, অকথ্য ভাষায় কোঁদল করতে তার এমন একটা অস্বাভাবিক আনন্দ। চরিত্রের ভিত্তি দুর্ব্বল, মাটিতে অত্যন্ত বেশি রস, পাথুরে কঠিনতার অভাব—তাই আমাদের মিলনে আঁট নেই, অনুষ্ঠানে স্থায়িত্ব নেই, কেবলি তর্কবিতর্ক দলাদলি, তালকে তিল ও তিলকে তাল করা। ইতি ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮।

কষ্টিপাথর

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু

[প্রতি বৎসর নবেম্বর মাসে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মতিথি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৩০৪ সালের মাঘ সংখ্যা 'প্রদীপ' মাসিক পত্রে ইহার তৎকালীন সম্পাদক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। আচার্য্য বসু মহাশয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে সেই প্রবন্ধটি 'প্রবাসী'তে পুনর্মুদ্রিত হইল।]

ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরবের কথা উত্থাপিত হইলে আমরা সচরাচর আর্য্যঋষিগণের ধর্ম্মোন্নতি এবং আর্য্যমনীষিগণের দার্শনিক জ্ঞানের বিষয়ই ভাবিয়া থাকি। সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য প্রভৃতির কথাও আমরা ভাবিয়া থাকি বটে, কিন্তু প্রধানতঃ পরমার্থতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ে ভারতের প্রাধান্যই সচরাচর আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরবের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু বর্ত্তমান কালে পণ্ডিতগণ যাহাকে বিজ্ঞান বলেন, তাহাতেও আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রীক ও রোমকেরা পাটীগণিতের কোন উন্নতি করিতে পারেন নাই। কোন সংখ্যাবাচক অঙ্কের দক্ষিণে শূন্য বসাইলে তাহার মান দশগুণ বৃদ্ধি হয়, ইত্যাকার যে দশমিক অঙ্কপাত-পদ্ধতি, সভ্যজগৎ তজ্জন্য প্রাচীন হিন্দুগণেরই নিকট ঋণী। এই পদ্ধতি ব্যতিরেকে পাটীগণিতের কোনও উন্নতি হইতে পারিত না। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরবেরা বীজগণিতসম্বন্ধীয় হিন্দুগ্রন্থ অনুবাদ করেন; এবং পাইসা নিবাসী লিওনার্ডো উক্ত বিজ্ঞান আধুনিক ইউরোপে প্রবর্ত্তিত করেন। ত্রিকোণমিতিতেও হিন্দুগণ জগতের প্রথম শিক্ষাদাতা ছিলেন। জ্যামিতির আবিষ্ক্রিয়াও ভারতবর্ষেই হয়। গ্রীকগণ এই বিদ্যার অধিকতর উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এলাহাবাদ মিওর সেণ্ট্র্যাল কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ ডাক্তার টিব্ দেখাইয়াছেন যে ভারতবর্ষেই এই বিদ্যার সূত্রপাত হয়। প্রাচীন হিন্দুগণ স্বাধীনভাবে জ্যোতিষেরও অনেক উন্নতি করেন। জড়বিজ্ঞানও তাঁহাদের অনুশীলনের বিষয় ছিল। তাঁহারা নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে জানিতেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে :—

স্বর্ণমাক্ষিক, সৌবীরাঞ্জন, হরিতাল, তুত্থাং (তুঁতে ইতি ভাষা), পুষ্পকাসীশ, কাসীশ, লৌহভস্ম, মণ্ডূর, রসকর্পূর, রসপর্প টী, স্বর্ণসিন্দূর ও মকরধ্বজ।

হিন্দুগণ দ্রাবণ, বাষ্পীকরণ, ভস্মীকরণ, ঊর্দ্ধপাতন, তির্য্যক্‌পাতন প্রভৃতি রাসায়নিক প্রক্রিয়া অবগত ছিলেন।

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, প্রাচীন হিন্দুগণ যে কেবল ধ্যানপরায়ণ ছিলেন, সংসারকে মায়াময় ভাবিয়া কেবল আত্মস্থ হইয়া বসিয়া থাকিতেন, তাহা নয়। তাঁহারা নানাবিধ বিজ্ঞানের চর্চ্চা ও উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু যেমন একজন ভূমিশূন্য ব্যক্তির পূর্ব্বপুরুষগণ জমীদার ছিলেন বলিয়াই তাঁহার উদরপূর্ত্তি হয় না, তেমনি ভারতের পূর্ব্বগৌরব স্মরণ করিলেই আমাদের মানসিক দরিদ্রতা দূর হইতে পারে না। গৌরবান্বিত নামের উত্তরাধিকারী হইয়া আলস্যে উদ্যমহীন ভাবে কালযাপন করা অতি হেয়; পূর্ব্বপুরুষগণের যশ উজ্জ্বলতর করিতে না পারি, অন্ততঃ উহার ঔজ্জ্বল্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

বহু শতাব্দীর পরাধীনতায় যে জাতীয় স্ফূর্ত্তিহীনতা, নৈরাশ্য ও অনুদ্যমের উৎপত্তি হয়, জাতীয় প্রতিভার অবনতির তাহা একটি প্রধান কারণ। তাহার উপর আমাদের দারিদ্র্য, উপযুক্ত শিক্ষার অভাব এবং শিক্ষা পাইলেও উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্রের অভাব আমাদিগকে আরও প্রতিভাবিহীন করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনে শিক্ষা এবং অন্যান্য কোন কোন বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় নানা বিষয়ে আবার ভারতের জাতীয় প্রতিভা পুনরুজ্জীবিত হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে।

আজ আমরা যাঁহার কথা লিখিতে বসিয়াছি, তিনি বিজ্ঞানবিষয়ে জাতীয় প্রতিভাকাশে উষার রক্তিম রেখার মত। তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহার মূল্য প্রভূত; কিন্তু তিনি যে আশার আলো আমাদের হৃদয়ে জ্বালিয়াছেন, তাহা অমূল্য। তিনি জাতি-সমাজে আমাদের মুখ দেখাইবার পথ করিয়াছেন।

আমরা অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হই নাই। আমাদের ক্ষুদ্র কাগজে তদুপযুক্ত স্থান নাই। তদ্ভিন্ন সমসাময়িক ব্যক্তির জীবনচরিত লেখা বড় কঠিন। তাঁহার কার্য্যের, চরিত্রের ঠিক বিচারক এবং গুণগ্রাহী আমরা হইতে পারি না। যেমন চিত্রবিশেষের সৌন্দর্য্য অনুধাবন করিতে হইলে উহা হইতে কিছু দূরে যাইতে হয়, তেমনি কীর্ত্তিমানের কীর্ত্তি ঠিক্ বুঝিতে হইলে অনেক স্থলেই সময়ের দূরত্বের প্রয়োজন হয়। আর এক কথা,—

"History is half-dream—ay even
The man's life in the letters of the man."

সুতরাং প্রকৃত জীবনচরিত লেখা যে কত কঠিন, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে অধ্যাপক বসুর জীবনের কয়েকটি স্থূল স্থূল বিষয়ের উল্লেখ করিব মাত্র।

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু বিক্রমপুরের একটি প্রাচীন পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পিতার একমাত্র পুত্র। কিন্তু একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি। তাঁহার ভগিনীগণ সকলেই সুশিক্ষিতা। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষা সমাপনার্থ বিলাত যাত্রা করেন। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া ভারতীয় সরকারী চিকিৎসা বিভাগে প্রবেশ করিতে পরামর্শ দেন; কিন্তু তিনি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের মায়া কাটাইতে না পারিয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন এবং তথায় সুবিখ্যাত ক্যাভেণ্ডিশ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে বিজ্ঞানানুশীলন করেন। তিনি ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কেম্ব্রিজের বি-এ এবং লণ্ডনের বি-এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কেম্ব্রিজে অবস্থান কালে তিনি পরলোকগত মহাত্মা ফসেট্ সাহেবের প্রীতিলাভে সমর্থ হন। ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থ-বিজ্ঞানাধ্যাপক নিযুক্ত হন।

আমি তখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি। তিনি যখন অধ্যাপনা আরম্ভ করেন তখন হইতেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের যান্ত্রিক প্রমাণ প্রদর্শনে

বিলক্ষণ নিপুণহস্ত ছিলেন। সাধারণের মনোরঞ্জক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া প্রদর্শনে তিনি বরাবরই সিদ্ধহস্ত বলিয়া পরিচিত। আমাদের দেশের শিক্ষা-প্রণালীর একটি দোষ এই যে, ইহাতে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মিবার কোন সুযোগ নাই। এই দোষ দূর করিবার জন্ম বসু মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহ আছে। তিনি একদিন আমাদিগকে সন্ধ্যাকালে তাঁহার বাসভবনে যাইতে নিমন্ত্রণ করেন। তখন তিনি বৌবাজার ষ্ট্রীটে থাকিতেন। সেখানে আমাদের জন্ম আহার্য্য দ্রব্যের প্রচুর আয়োজন ছিল। তিনি আমাদের সহিত নানা বিষয়ে বন্ধুভাবে অমায়িকতার সহিত কথোপকথন করেন এবং রস্কিন্, প্রভৃতি গ্রন্থকারের লেখা কিছু কিছু পড়িয়া শুনান। আমার যতদূর মনে পড়ে, তাহাতে বোধ হয়, নিমন্ত্রিত ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই মিষ্টান্নের যথেষ্ট গুণগ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু আমাদের অধ্যাপক যে উদ্দেশ্যে আমাদিগকে ডাকিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম আমরা কতদূর বুঝিয়াছিলাম তাহা মনে নাই। আমার দুর্ভাগ্য এই যে, তাঁহার বিজ্ঞানোৎসাহ আমার হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় নাই।

বসু মহাশয় যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে আগমন করেন, তখন উহাতে পদার্থবিদ্যাবিষয়ক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি সামান্য রূপই ছিল। ইঁহারই যত্নে ক্রমে ক্রমে অনেক উৎকৃষ্ট যন্ত্র ক্রীত হওয়ায়, এখন তথায় পদার্থবিজ্ঞানের অনেক সূক্ষ্ম গবেষণা সম্ভবপর হইয়াছে।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে জগদীশবাবু তাড়িতবিকীরণ সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। ঐ বৎসর মে মাসে On the Polarization of the Electric Ray সম্বন্ধে তাঁহার একটি সন্দর্ভ বঙ্গদেশীয় রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির সমক্ষে পঠিত হয়। বৈজ্ঞানিক জগতে শীঘ্রই এই সকল গবেষণার প্রতি পণ্ডিতবর্গের নজর পড়ে। বর্ত্তমান যুগের প্রধান তাড়িত-তত্ত্বজ্ঞ লর্ড কেল্‌বিন্ আপনাকে "literally filled with wonder and admiration for so much success in these difficult and novel experimental problems" বলিয়া প্রকাশ করেন। লণ্ডনের টাইম্‌স্ পত্র বলেন,—

The originality of the achievements is enhanced by the fact that Dr. Bose had to do the work in addition to his incessant duties as Professor of Physical Science in Calcutta and with apparatus and appliances which in this country would be deemed altogether inadequate. He had to construct for himself his instruments as he went along. His paper forms the outcome of the twofold line of labour—construction and research.

বসু মহাশয়ের দ্বিতীয় সন্দর্ভ লর্ড রেলি কর্ত্তৃক রয়্যাল সোসাইটিতে প্রেরিত হয় এবং উক্ত সমিতির কার্য্য-বিবরণের মধ্যে প্রকাশিত হয়। ইহার বিষয় ছিল "The determination of the Indices of Refraction for the Electric Ray." এই সকল গবেষণার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া রয়্যাল সোসাইটি পার্লেমেণ্টপ্রদত্ত একটি ফণ্ড হইতে বসু মহাশয়কে তাঁহার কার্য্যসৌকর্য্যার্থ কিছু অর্থসাহায্যের বন্দোবস্ত করেন। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট এই সকল গবেষণার সাহায্যার্থ একটি গবেষণা-কক্ষ স্থাপিত করিয়া বসু মহাশয়কে তাঁহার অধ্যক্ষ করেন। তৎপরে ভারত-গবর্ণমেণ্টের সুপারিশে সেক্রেটরী-অব-ষ্টেট এতদ্দেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উৎকর্ষসাধনার্থ জগদীশ বাবুকে ইউরোপে প্রেরণ করেন। তদনুসারে তিনি সস্ত্রীক ইউরোপ যাত্রা করেন।

ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া জগদীশ বাবু ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের একটি অধিবেশনে "তাড়িত কম্পনের গুণাবলী নির্ণয়ার্থ একটি পূর্ণাঙ্গ যন্ত্র" সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন; এবং তাঁহার গবেষণা-কার্য্যে ব্যবহৃত যন্ত্র প্রদর্শন করেন। ইউরোপের প্রধান প্রধান পদার্থবিদ্যাবিদ্‌গণ তাঁহার শ্রোতা ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার প্রবন্ধটি এরূপ আগ্রহের সহিত শুনিয়াছিলেন যে অধিবেশন স্থগিত করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও তাঁহারা তাঁহাকে পাঠ করিয়া যাইতে নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করেন। অধ্যাপক বসু তাঁহার যন্ত্রের ক্রিয়ার যখন ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তখন লর্ড কেল্‌বিন্‌প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ ঘন ঘন করতালি দিয়া আনন্দজ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

গ্লাস্‌গো নগরে লর্ড কেল্‌বিন অতিশয় হৃদ্যতা ও আদরের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি আদরের সহিত গৃহীত হন। বিলাতে থাকিতে থাকিতে তিনি আর একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কার করেন। তিনি এতদ্বিষয়ক একটি প্রবন্ধ রয়্যাল সোসাইটির সমক্ষে পাঠ করেন। প্রবন্ধটির বিষয় "The Selective Conductivity Exhibited by Certain Polarizing Substances."

ইহার পর তিনি রয়্যাল ইনষ্টিটিউশনে শুক্রবাসরিক সান্ধ্য বক্তৃতা করিতে আহূত হন। যেখানে ডেবি, ফারাডে এবং টিণ্ডাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সেখানে একজন ভারতবর্ষীয় অধ্যাপক পদার্থবিদ্যার অতি দুরূহ একটি বিষয়ে সমবেত ইউরোপীয় প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর সম্মুখে বক্তৃতা করিতেছেন, ইহাকে একটি বিস্ময়কর ব্যাপার বলা যাইতে পারে।

সোসাইটি অব্ আর্টস্ নামক সমিতির এক অধিবেশনে তিনি ভারতবর্ষে-বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি উহাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ উত্থাপিত করেন:—বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্ম বিজ্ঞানের পঠিতব্য বিষয়ের সংখ্যার হ্রাস, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপন, গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক উচ্চতর বিষয়ের অনুশীলনার্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিগণের জন্ম বৃত্তি স্থাপন এবং সরকারী নানা বিভাগে বৈজ্ঞানিকশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নিয়োগ। উক্ত প্রবন্ধে তিনি ভারতবাসিগণের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার শক্তির প্রমাণ স্বরূপ অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের পারদসম্বন্ধীয় আবিষ্ক্রিয়াগুলির উল্লেখ করেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিভূষণ ভাদুড়ীর রাসায়নিক গবেষণারও উল্লেখ করেন। উক্ত প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি বলেন:—

"I have not yet said anything of the intellectual hunger that has been created by the spread of education, a hunger which is as imperative as that of the physical body. The *Spectator*, in a recent article, has well remarked that an educated man in my country wants something absorbing to think about. His intellect is at present left to consume itself, there being no vent for his useless energies. If it could be done he would betake himself 'ardently, thirstily, hungrily, to the research into nature, which can never end, yet is always yielding results upon which yet deeper inquiries can be based.' We have been called a nation of dreamers. There is a necessity for dreamers to think out the great problems of life, and make the world richer by their thoughts. But there is room for workers, too, toilers who by incessant work would increase the bounds of human knowledge. We want to have our share in this work. Our ancestors did at one time contribute to enrich the stock of the

world's knowledge, but that is so long past, that it is almost forgotten now. It would perhaps not be an unworthy work for England to help us to take our place again among the intellectual nations of the world."

বিলাতী প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে তাঁহার প্রস্তাবগুলি সমর্থিত হয়। লর্ড লিষ্টার, লর্ড কেল্‌বিন্‌ প্রভৃতি সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ ভারতীয় সেক্রেটারী অব্‌ ষ্টেটের নিকট ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগৃহ স্থাপনার্থ এক আবেদন করেন। সেক্রেটারী অব্‌ ষ্টেটের সহিত অধ্যাপক বসুর যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি সেক্রেটারী মহোদয়কে বলেন, যে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কার্য্যে পরিণত হইলে ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থার বিস্তর উন্নতি হইতে পারে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক জীবনধারণার্থ কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর করে। কৃষি বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে; অথচ বৃষ্টির পরিমাণ অনিশ্চিত। অপর দিকে অনেক ভারতবর্ষীয় যুবক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা লাভ করিয়া কোন কাজ না পাইয়া আলস্যে কালযাপন করে। নানা প্রকার শিল্পের উন্নতি হইলে, ইহারাও কাজ পাইবে, এবং ভারতবর্ষের অধিকাংশ অধিবাসীকেও কেবল কৃষির উপর নির্ভর করিতে হইবে না।

জর্ম্মনীতেও অধ্যাপক বসুর বিলক্ষণ আদর-অভ্যর্থনা হইয়াছিল। কীল্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি উহার সদস্যগণের সমক্ষে বক্তৃতা করিবার জন্য আহূত হন। বার্লিন নগরে তিনি বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক শ্রোতার সমক্ষে বক্তৃতা করেন। তৎপরে তিনি হল্‌ ও হাইডেলবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। ফ্রান্সেও তিনি অনেক বৈজ্ঞানিক পরিষদের সম্মুখে বক্তৃতা করিতে নিমন্ত্রিত হন। তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলির বৃত্তান্ত ফ্রান্সের প্রধান বৈজ্ঞানিক সভার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। উহার সভ্যগণ তাঁহার অভ্যর্থনা করেন, এবং তৎকৃত কার্য্যের সমুচিত প্রশংসা করেন।

বসু মহাশয় যে যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা দ্বারা অনেক দুরূহ তত্ত্বের অনুসন্ধান হইতে পারিবে। ফরাসী দেশে এবং আমেরিকার মিষিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ যন্ত্র বিবিধ নূতন গবেষণার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। দূরে সংবাদ প্রেরণ করিবার জন্যও যে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইতে পারিবে, এ সম্বন্ধে দুই বৎসর পূর্ব্বে বিলাতের প্রসিদ্ধ *Electrician* পত্রিকায় এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। *Electrical Engineer* এই যন্ত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"It is worth remark that no secret was at any time made as to its constructions, so that it has been open to all the world to adapt it for practical and possibly money-making purposes."

ইম্পীরিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউটে জগদীশবাবু যে বক্তৃতা করেন তাহার পর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যর হেন্‌রী রস্কো বলেন :—

"I am sure I express the feelings of all present, when I say that we have been listening to one of the most remarkable and interesting lectures that we have ever heard...I am sure you cannot have listened to what he has said without feeling that the work which he has done has been of the highest order, and it shows that eastern people are equally capable of making great scientific discoveries, and of becoming great experimentalists as those who live in the West....Really, if our rulers understood the trend of thought and action in the future, they would be rather more willing to place funds at the disposal of men like Dr. Bose for the purpose of rendering service to Science, and therefore rendering service to their country."

লর্ড রে বলেন :—

"I am quite sure that we shall envy the students of the Presidency College at Calcutta in having a professor who can explain with such extraordinary lucidity the most complicated problems of physical science."

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার জন্য তাঁহাকে ডি-এস্‌সি উপাধি দিয়াছেন।

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু সম্বন্ধে বিলাতের বিখ্যাত *Spectator* পত্রে একটি সুন্দর প্রবন্ধ বাহির হয়। আমরা তাহার কোন কোন স্থল উদ্ধৃত করিতেছি :—

"There is, however, to our thinking something of rare interests in the spectacle then presented, of a Bengalee of the purest descent possible lecturing in London to an audience of appreciative European savants upon one of the most recondite branches of the most modern of the physical sciences. It suggests at least the possibility that we may one day see an invaluable addition to the great army of those who are trying by acute observation and patient experiment to wring from nature some of her most jealously guarded secrets."

এস্থলে বলা আবশ্যক যে বিলাতের *Spectator* ভারতবাসীদিগকে এতকাল অসূয়ার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। উক্ত পত্রের পূর্ব্বমতের এখন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ভারতবাসীর মানসিক শক্তি সম্বন্ধে এখন লিখিয়াছেন :—

"He has just the burning imagination which could extort truth out of a mass of apparently disconnected facts; a habit of meditation without allowing the mind to dissipate itself, such as has belonged to the greatest mathematicians and engineers and a power of persistence—which is something a little different from patience—such as hardly belonged to any European. We do not know Professor Bose, but if he is like the thoughtful among his countrymen, as of course he must be, we venture to say that if he caught with his scientific imagination a glimpse of a wonder-working "ray" as yet unknown to man but always penetrating ether, and believed that experiment would reveal its properties and potentialities, he would go on experimenting ceaselessly through a long life, and dying, hand on his task to some successor, be it son or be it disciple. Just think what kind of addition to the means of investigation would be made by the arrival within the sphere of inquiry of men with the *Sunyasee* mind, the mind which utterly controls the body and can meditate or inquire

endlessly while life remains, never for a moment losing sight of the object, never for a moment letting it to be obscured by any terrestrial temptation. We can see no reason whatever why such a mind, turning from absorption in insoluble problems, should not betake itself ardently, thirstily, hungrily, to the research into nature which can never end, yet it always yielding results, upon which yet deeper inquiries can be based. If that happened—and Professor Bose is at all events a living evidence that it *can* happen, that we are not imagining an impossibility—that would be the greatest addition ever made to the sum of the mental force of mankind."

জগদীশবাবু বালকবালিকাগণের শিক্ষাকার্য্যে বিশেষ আগ্রহশীল। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও আমি তাঁহারই উৎসাহে শিশুদের জন্য 'মুকুল' নামক সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশের উদ্যোগ করি। অল্পদিন হইল তিনি একপত্রে 'মুকুলে'র উন্নতিকল্পে আমায় কয়েকটি কথা লিখিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে। আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনি ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় একটি বাঙ্গালা প্রবন্ধ লেখেন। উহাতে ফসেট-পরিবারে তিনি যে আদর প্রীতি পাইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ ছিল। তাহার পর আমি যখন "দাসী"র সম্পাদক ছিলাম, তৎকালে উক্ত পত্রিকায় তিনি "ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে" নামক একটি এবং "কলুঙ্গার যুদ্ধ" সম্বন্ধে আর একটি প্রবন্ধ লেখেন। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধটি সম্বন্ধে "সাহিত্য" সম্পাদক নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন :—"ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে" একটি সুন্দর প্রবন্ধ। লেখক কবিতার ভাষায়, গানের ঝঙ্কারে, বিজ্ঞানের গভীর তত্ত্ব গল্পের মত বর্ণনা করিয়াছেন।" এই প্রবন্ধের একটি স্থান এখনও আমার মনে আছে। তাহা এই :—

"সেই দুই দিন বহু বন ও গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া, অবশেষে তুষার-ক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। নদীর ধবল সূত্রটি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া এ পর্য্যন্ত আসিতেছিল, কল্লোলিনীর মৃদুগীতি এতদিন কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল ; সহসা যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রপ্রভাবে সে গীত নীরব হইল, নদীর তরল নীর অকস্মাৎ কঠিন নিস্তব্ধ তুষারে পরিণত হইল। ক্রমে দেখিলাম,স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড ঊর্ম্মিমালা প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে ; যেন ক্রীড়াশীল চঞ্চল তরঙ্গগুলিকে কে "তিষ্ঠ !" বলিয়া অচল করিয়া রাখিয়াছে। কোন্ মহাশিল্পী যেন সমগ্র বিশ্বের স্ফটিকখনি নিঃশেষ করিয়া এই বিশাল ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মূর্ত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন।"

তিনি একবার আলমোরা হইতে যে তুষারনদী (glacier) দেখিতে যান ইহা তাহারই বর্ণনা। ইহার পর তিনি "সাহিত্যে" "আকাশস্পন্দন ও আকাশসম্ভব জগৎ" শীর্ষক একটি এবং "মুকুলে" "গাছেরা কি বলে" শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধ লেখেন। সকলগুলিরই ভাষা মনোজ্ঞ, বিশুদ্ধ ও কবিত্বপূর্ণ। বাস্তবিক কবির কল্পনা ও বৈজ্ঞানিকের কল্পনা সচরাচর লোকে যেরূপ বিভিন্ন প্রকারের মনে করিয়া থাকে, তাহা নয়। কি সৌন্দর্য্য-রচনা, কি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার, উভয়েরই কল্পনার প্রয়োজন। কল্পনা ব্যতিরেকে নূতন কিছু গঠিত বা সৃষ্ট হইতে পারে না। জগদীশ বাবুর মুখচ্ছবিও কবিরই মত। শুষ্ক বৈজ্ঞানিকের মত নয়।

তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগের কথা বলিলাম। ইহা বলাও বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন হইবে না যে, তিনি বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহেন ; কারণ, যাঁহারা কখনও জাহাজে উঠেন নাই এরূপ অনেক ইংরেজী শিক্ষাভিমানী এখনও বাঙ্গালা লিখন, পঠন এবং উক্ত ভাষায় পত্রালাপ, এমন কি কথোপকথন পর্য্যন্ত, লজ্জাকর, অন্ততঃ সঙ্কোচের কারণ, মনে করেন। অন্যান্য বিষয়েও জগদীশ বাবুর "সাহেবী-আনা" কম। কিন্তু ইংরাজসুলভ সদগুণের অভাব নাই। জগদীশ বাবু গৃহে ধুতি পরেন ; কলেজে ইংরাজের পোষাক পরিয়া আসেন না ; হ্যাট পরেন না। হ্যাটটি হজমীগুলি বিশেষ। ইহার দ্বারা, বিশেষতঃ রেলের গাড়ীতে, জাতি, জন্ম, বর্ণ শিক্ষা ও পদগত অনেক "খুঁত" ঢাকিয়া যায়। শুনিয়াছি কোন কোন ব্যবসায়ে ও চাকুরীতে ইহা না পরিলে চলে না। অতএব, হ্যাটের অগৌরব করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি কেবল জগদীশ বাবুর পোষাক বিষয়ক রুচির কথা বলিতেছি।

জগদীশবাবু সৌন্দর্য্যানুরাগী। এ সম্বন্ধে একটি কথা মনে পড়িল। তাঁহার বাড়ীতে আমি একবার টেনিসনের "নির্ঝরিণী" (The Brook) নাম্নী কবিতার বর্ণনানুযায়ী কতকগুলি চিত্র দেখিয়াছিলাম। আমার যতদূর মনে পড়ে, সেগুলি তিনি কাশ্মীর ভ্রমণকালে নানা দৃশ্য হইতে ফটোগ্রাফ করিয়া তুলিয়া আনিয়াছিলেন।

অধ্যাপক ও ছাত্রের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তাহার বন্ধন তিনি সর্ব্বদাই স্বীকার করেন। অপর লোকের সহিত ব্যবহারেও তিনি অমায়িক ও নম্র প্রকৃতি। আমি তাঁহাকে "প্রদীপে" লিখিতে অনুরোধ করায় তিনি এই মর্ম্মে আমায় পত্র লিখিয়াছিলেন ;—"আমি তোমার কাগজে লিখিতে পারিলে বাস্তবিকই সুখী হইতাম, কিন্তু নানা কার্য্যে জড়িত হইয়া আমি এখন অনেক সুখে বঞ্চিত হইয়াছি। আমি যে কার্য্যে বৃত হইয়াছি, তাহার কূলকিনারা দেখিতে পাই না—অনেক সময়েই কেবল অন্ধকারে ঘুরিতে হয়। বহু ব্যর্থ প্রযত্নের পর কদাচ অভীষ্টের সাক্ষাৎ পাই।"

অন্যের জন্য

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

চা তৈয়ারী করিতে পারে না এমন ব্যক্তি বোধ হয় কোন পল্লীগ্রামেও আজকাল পাওয়া যায় না। কিন্তু রমেনের ভাগ্যে মুরলা হইয়াছিল সে-নিয়মের ব্যতিক্রম। হয়ত ব্যতিক্রম হইলেও বিশেষ ক্ষতি হইত না। নির্জ্জন, নিস্তব্ধ পল্লী, দু-বেলা ছোট সংসার লইয়া বিশেষ ভাবেই মগ্ন থাকা চলে—সাদাসিধা পরিবেষ্টনীর মধ্যে সরল মনটি লইয়া দিব্য আরামেই হয়ত কাটিয়া যায়।

রমেনের শনিবার বাড়ি আসা এক মহা সমারোহ ব্যাপার। ক্ষুদ্র জীবনের পক্ষে সেই উল্লাস মুহূর্ত্তের বৈচিত্র্যও বড় কম নহে। সপ্তাহের অবশিষ্ট দিনগুলি অনায়াসে তার ধ্যান করিয়া কাটাইয়া দেওয়া যায়।

কিন্তু রমেনই একদিন গোল বাধাইল।

আগের শনিবারে বাড়ি আসিয়া মুরলাকে বলিল,—আসচে সপ্তাহে আমার জন-কয়েক বন্ধু আসবে, তাদের অভ্যর্থনার সমস্ত ভার আমি তোমার ওপর দেব।

মুরলা ডাগর চক্ষু দুইটি রমেনের পানে ন্যস্ত করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিল,—সে আবার কি?

রমেন হাসিয়া বলিল,—মানে—তাদের রিসেপ্শনের ভার তোমায় দিলুম।

মানেটা রমেনের নিকট পূর্ব্বের চেয়ে সহজ হইলেও মুরলার সমান দুর্ব্বোধ্য বলিয়াই বোধ হইল। কোন কথা না বলিয়া সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া বোকার মত চাহিয়া রহিল। রমেনের মুখ যেন ঈষৎ ম্লান বোধ হইল। এটা যে শহর নহে এবং মুরলাও বিদ্যুৎ-বাতির তলায় মানুষ হয় নাই সে-কথা হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। যেমন পাড়াগাঁ এই পলাশপুর—মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স্ দিতে হয় না, শুক্লপক্ষে মেটে রাস্তার উপর জ্যোৎস্নাই যা একটু শোভা সৌন্দর্য্য বিস্তার করে, পানা-পচা ডোবার জলে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মশা জন্মগ্রহণ করে, কাদায় পথঘাট পিছল, গাছের ছায়ায় ভাল করিয়া আকাশ দেখা যায় না—তেমনই এক পাড়াগাঁ হইতে আসিয়াছে মুরলা। আসিয়াই গোয়ালের গরু দুটির পরিচর্য্যায়, রান্নাঘরের মাটির দেওয়ালে ও উঠানে গোময়-লেপনে এবং খিড়কীর ডোবা পুকুরটায় সকাল-বিকাল স্নান, গা ধোয়া, কাপড় কাচা ও দুপুর বেলায় বাসন মাজায় এমন মনোনিবেশ করিয়াছে যে, বাহির বিশ্বের একবিন্দু খবর জানিবার আগ্রহটুকু তার নাই। নারী-প্রগতির খবর ত দূরের কথা—ঘরের দুয়ারে চীন-জাপানের এমন যুদ্ধটা যে ভাল করিয়া বাধিয়াও বাধিল না—তার খবরও মুরলা রাখে না।

তবু রমেন মুরলাকে ভাল না বাসিয়া পারে নাই।

জগতের সর্ব্ববিষয়ে চোখ-কান বুজিয়া এই ক্ষুদ্র গৃহখানির প্রত্যেক ক্ষুদ্রতর জিনিষে অখণ্ড মনোযোগ দিয়া মুরলা প্রতিটি ক্ষণকে সেবা সুস্নিগ্ধতায় এক একটি রমণীয় চিত্রে রূপান্তরিত করিতে সুদক্ষ। সপ্তাহান্তে শহরের কোলাহল ছাড়িয়া নিরালা এই গৃহকোণে আসিয়া সত্যই সে শান্তি পাইত।

শহরের জগৎ নানা জনের, এই পল্লী একান্তভাবে তাহারই। এ যেন মুরলা—নির্ব্বাক, সেবাপরায়ণা, কুণ্ঠিতা এবং তাহারই মাঝে পরিপূর্ণ।

এ-সব অনুভূতি পাড়াগাঁয়ে বসিয়াই জাগে, কিন্তু শহরের রমেন বন্ধুবর্গের নিকট মুরলার যে পরিচয় দিয়াছিল তাহা অন্যরূপ। সেটুকু মিথ্যা পরিচয় দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার হেতু সম্ভবত এই:—

পাঁচজন বন্ধু মিলিয়া আপন আপন স্ত্রীর সুখ্যাতিতে যখন অন্যকে ম্লান করিবার প্রবল উদ্যম করিত, রমেন তখন চুপ করিয়া থাকিতে পারিত না। সে মুরলাকে ভালবাসে। যাহা মুরলার আছে তাহাতেই সে সুখী। সুতরাং, বন্ধুজনের সামনে মুরলাকে খাটো করিতে তার ভারি কষ্ট ও লজ্জা বোধ হইত।

সে জানিত, ইহাতে কাহারই বা কি ক্ষতি। বন্ধুরা কিছু ক্রোশ-দুই পথ জলকাদা বা ধূলা ভাঙিয়া মশা-ম্যালেরিয়া-ভরা গ্রামটিতে তাহার পদার্পণ করিবে না, এবং মুরলাও সংসার উঠাইয়া আপাতত কলিকাতায় আসিবে না! মুরলাকে উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিতে এটুকু করা তার—অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বামী হিসাবে—ও প্রিয় হিসাবে ত বটেই।

কিন্তু সেই বন্ধুজনেরা অকস্মাৎ মত বদলাইয়াছে।

চারজনে মিলিয়া ঠিক করিয়াছে,—রমেনের গাঁয়ে তারা যাইবেই। প্রতিজ্ঞা বলিলেও চলে!

এমন শোচনীয় প্রতিজ্ঞা কোন যুগেই কেহ করিয়াছিলেন কি-না রমেনের জানা নাই।

ক্রোশ-দুইয়ের মধ্যে ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায় না। গরুর গাড়ী যদি-বা মিলে ত সারা রাস্তা হটর-হটর করিয়া ঝাঁকনি খাইয়া যখন গ্রামে পৌছাইবে তখন সর্ব্বাঙ্গে আড়ষ্ট ব্যথা লইয়া গাড়ী হইতে নামাই এক মহাব্যাপার। তার চেয়ে হাঁটিয়া যাওয়াই ভাল।

বন্ধুরা বলিয়াছে দুই ক্রোশ অর্থাৎ চারি মাইল দিব্য গল্প করিতে করিতে হাঁটিয়াই যাইবে। এ যেন শহরের পীচ-বাঁধান সোজা রাস্তা যে, একটা কাণাকে ছাড়িয়া দিলেও সে অনায়াসে পথের শেষ সীমায় পৌছিতে পারে। মাইলও প্রায় মাপের আর কি! যাকে বলে ডাল-ভাঙা ক্রোশ। কিন্তু এ-সব কথা বলিলে পাছে বন্ধুরা মনে করে বাড়ি লইয়া যাইবার ভয়ে রমেনের যত কিছু আপত্তি, তাই সে শুধু ম্যালেরিয়া মশা ও খাবার কষ্টের কথাই বলিয়াছিল। বন্ধুরা হাসিয়া কর্ণপাত করে নাই। আগামী শনিবারে তাহারা আসিবেই। প্রতিজ্ঞা শোচনীয় নহে ত কি!

রমেন মুরলাকে ভাল করিয়া তালিম দিবার জন্ত কথাটা পাড়িল এবং মুরলার বিস্মিত ভাব দেখিয়া সত্য বলিতে কি রমেনের মুখখানা ঈষৎ ম্লান হইয়া গেল। যে রিসেপশন বোঝে না—তাহাকে লইয়া…

তথাপি রমেন আশায় বুক বাঁধিয়া কহিল, তুমি চা তৈরি করতে জান ত?

মুরলা পরম নিশ্চিন্তে ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—না ত।

রমেনের ধৈর্য্য অসাধারণ। একটুও না দমিয়া কহিল;—মানে কলকেতার বন্ধু, তারা এলেই প্রথমে চাইবে চা। শুধু চাওয়া নয়, বলবে;—অমুকের হাতের চা না হ'লে খাব না। তখন?

মুরলার মুখে চিন্তার ছায়া পড়িল না। কহিল,—তা তুমি না-হয় চুপি চুপি এসে তৈরি ক'রে নিও।

রমেন ঈষৎ ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিল,—তৈরি ক'রে তাদের গিয়ে বলব—বউ তৈরি করেচে! এমন ডাহা মিছে কথাটা বলব?

মুরলা কোন কথা কহিল না।

রমেন বলিল,—তা হয় না। চা তোমাকেই তৈরি করতে হবে—পরিবেষণ করতে হবে। অবাক্ হয়ে চাইচ যে! আমি তাদের ব'লেচি—তুমি—ওর নাম কি একজন—শিক্ষিতা লেডি। সেলাই জান, গাইতে পার, বাংলা নভেল লেখ—এবং নাচের পা-ও আছে।

রমেনের মুখে এমন ডাহা সত্যকথা শুনিয়া মুরলার বাঙ্‌নিষ্পত্তি না হইবারই কথা!

রমেন হাসিল। বলিল,—ভাবচ, কি ক'রে ব'ললুম এ-সব? কিন্তু বিয়ের আগে শুনেছিলুম যেন সেলাইয়ের কি একটা প্রাইজ তুমি পেয়েছিলে?

মুরলা শুষ্কস্বরে কহিল,—সে ত কাঁথা সেলাই করেছিলাম ব'লে ঠাকুমা একটা নোলক দিয়েছিলেন।

রমেন উৎসাহিত হইয়া কহিল,—ওই হ'ল। কাঁথা সেলাই যে জানে সে সব জানে। নোলক! নোলক বুঝি ভাল প্রাইজ নয়? পাঁচ সিকের রূপোর মেডেলের চেয়ে ঢের ঢের ভাল। আর বই লেখা? যা চিঠি তোমরা লেখ—তা নভেলের বাবা। ভাষা ত নয়—কবিতা।

মুরলা মনে মনে দারুণ অস্বস্তি ভোগ করিতেছিল। ব্যথাও যে ভোগ করিতেছিল না তাহা নহে। রমেনের মত তরুণ যুবকেরা কত আশা করিয়াই সংসার পাতে! পাঁচ জনের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিয়া চলিবার জন্ত যৌবনের একটা দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু এমন অপটু মুরলা যে চা-ও তৈয়ারী করিতে জানে না। না-সেলাই, না-গানবাজনা, না-নাচ। অথচ নাচগান জানা লেডীর

কালে পছন্দ করে না। নাচগান-জানা মেয়েদের সম্বন্ধে মুরলার ধারণা অন্তরূপ। কিন্তু সেলাই জানাটা তার উচিত ছিল। কার্পেটের কুকুর বিড়াল কিংবা চটের আসন—নিদেন পক্ষে আঁশের বাগান একটা। নাঃ, মুরলা কোন দিক দিয়া রমেনকে হয়ত সুখী করিতে পারে নাই। রমেন একটু থামিয়া বলিল,—আর সেই 'মঞ্জুল কুঞ্জে' গানটাও ত তোমার বেশ হয়।

—ছাই হয়, বলিয়া মুরলা বালিশে মুখ গুঁজিল।

রমেন হতাশ হইলেও বিরক্ত হইল না।

মুরলার মুখখানা তুলিতে গেল—পারিল না। আঙুলের ডগাটা ঈষৎ গরম ঠেকিল যেন। জোর করিয়া মুখখানা ফিরাইতেই দেখিল,—সত্যসত্যই মুরলা কাঁদিতেছে। এমন পাগলও কেহ কখন দেখিয়াছে কি?

রমেন দারুণ অপ্রতিভ হইয়া কহিল,—সত্যিই গানটা আমার ভাল লেগেছিল।

এ কথায় মুরলার কান্না বাড়িয়া গেল; সে অশ্রুভেজা স্বরে কহিল,—তার চেয়ে এক কাজ কর। ওঁরা আসবার আগে আমায় গোবরডাঙ্গা পাঠিয়ে দাও।

রমেন বলিল,—পাগল! তাকি হয়? ওরা যে তোমাকেই দেখতে আসচে। আবার কাঁদে? লক্ষ্মীটি শোন। আমি তোমায় সব এমন শিখিয়ে দেব—কাছে কাছে থাকব যে, তারা একটুও জানতে পারবে না।

মুরলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—না বাপু, আমি ওদের সঙ্গে ম'রে গেলেও কথা কইতে পারব না। কিছুতেই না।

রমেন মিষ্টি কথায় অনেকক্ষণ ধরিয়া মুরলাকে বুঝাইল। কত আদরসোহাগ করিল—কত বন্ধু-স্ত্রীর সৎ দৃষ্টান্ত দিল—জগতের খবর কত যে শুনাইল তার ইয়ত্তা নাই। নারী প্রগতির এমন একটা চমৎকার ইতিহাস সে গুছাইয়া বলিল যাহা লিখিলে উপভোগ্য ও তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ বলিয়া সুধীসমাজে সমাদৃত হইতে পারিত, কিংবা কোন রিপোর্টার থাকিলে অন্ততঃ দৈনিকে নামটা বাহির হইত। কিন্তু সে-সব বড় বড় কথা, যুক্তি, সত্য মুরলার অন্তর স্পর্শ করিল না। পুরা তিনটি ঘণ্টা বক্তৃতার পর মুরলা দুটি বিষয়ে রাজী হইল।—

প্রথম—শিখাইয়া দিলে চা তৈয়ারী সে করিয়া দিবে। দ্বিতীয়,—নিজ হাতে বন্ধুদের সে পরিবেষণ করিবে ও ভদ্রতা-রাখা-গোছ সংক্ষিপ্ত উত্তর তাঁহাদের দিবে।

বাকী সমস্ত ভার রমেনের। স্ত্রীর ত্রুটি সে যদি ঢাকিয়া লইতে না পারে সে লজ্জা তাহারই। মুরলা সত্যসত্যই যাহা জানে না তাহাতে মান অপমানই বা কি।

রমেন আনন্দিত হইয়া কহিল,—তুমি লক্ষ্মীটি। তাই দেখ দেখি এখন কেমন ভাল লাগচে। একবার জানালাটা খুলে দাও ত, আকাশে কতগুলো তারা উঠেচে দেখি।

জানালা খুলিয়া দিতে দিতে মুরলা বলিল,—তাঁরা কিন্তু না এলেই ভাল হয়। দু-পয়সার বাতাসা কিনে আমি হরির লুট দেব।

রমেন উৎফুল্ল স্বরে কহিল, দু-পয়সা! সত্যি বলচি স-পাঁচ আনার সিন্নি দেব। কিন্তু মুরলা, এ যে কলিকাল! দেবতারা সব ঘুমিয়ে। সিন্নি খাবে কে? এখন মানুষের কথার দাম দিন-দিন বেড়ে যাচ্ছে।

মুরলা বলিল,—সে আবার কি?

রমেন হাসিল,—দাম বাড়চে মানে চড়ছে নয়। যেমন তোমার চাল, ডাল, তেল, নুন। দাম মানে কথার ঠিক। তারা দু-চার ক্রোশকেও ডরায় না। ম্যালেরিয়া বা মশাকেও না। পল্লীমঙ্গল সমিতিই গড়চে কত ছোকরা।

মুরলা বলিল,—তা চা তৈরি করাটা—

হাসিয়া রমেন বলিল—ভারি ত কাজ! দুধ গরম আর কি।

জল গরম কর—চায়ের পাতা ফেল—কেটলীর মুখ বন্ধ কর। ব্যস্। যেই পাতা সেদ্ধ হ'ল অমনি দুধ চিনি মিশিয়ে কাপে ঢাল। পোলাও নয় কালিয়া নয় যে হাঙ্গাম।

মুরলা ঈষৎ সন্দিগ্ধ স্বরে বলিল,—তা হোক—কাল সকালে তুমি বরঞ্চ একবার দেখিয়ে দিও।

রমেন বলিল,—আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে। কাল বিষ্ণুদের বাড়ি থেকে প্লেট পেয়ালা কেটলী ছাঁকুনি সব আনতে হবে। চিনি পাঁচ ছটাকও চাই। আর হরিশদের সেলাইয়ের কলটা। হাঁ, ন-জ্যেঠাইমার বাড়ি থেকে হারমোনিয়ামটা—

মুরলা সভয়ে কহিল,—ওসব আবার কি হবে।

রমেন ওহিল,—ভয় নেই—তোমায় বাজাতে হবে না—

সেলাইও করতে হবে না। যাতে সে-সব না করতে হয় তার প্ল্যান একটা ঠাওরাব। তবে এনে রাখা চাই। বুঝলে না, একটা 'শো'। তারা ভাববে এদের বাড়ি সব চর্চ্চাই আছে। বইয়ের আলমারীটা একটু ঝেড়েঝুড়ে রেখ। মুরলা ঘাড় নাড়িল।

রমেন বলিল,—আর বৈঠকখানা এমন নোংরা হয়েচে—ছবিগুলো সব উইয়ে কেটে নষ্ট করচে।

খানিক ভাবিয়া কহিল,—যাক ওগুলো অমনি—পরিষ্কার ক'রে কাজ নেই। বলা যাবে রেয়ার পিক্‌চার। হাঁ, তুমি সেদিন পুকুরঘাটে ক্ষারে কাপড় কাচা, গা ধোওয়া, বাসন মাজার হাঙ্গামা ক'রো না। ছিপ নিয়ে ওরা ঘাটে বসতে পারে।

মুরলা বলিল,—ওমা, তবে ও-সব হবে কি ক'রে?

রমেন বলিল, সে হবে'খন। সৈরভীকে চার আনা পয়সা দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে'খন। একটা দিন বইত না--প্রেষ্টিজ রাখা চাই। আর দেখ, না, থাক্‌—শনিবার রাত্রিতে এসে তোমায় আরও গোটাকতক কথা শিখিয়ে দেব।—ধর, যেমন ওরা এসে পৌছল অমনি ষ্টোভটা জেলে চা তৈরি করতে দেবে। হারমোনিয়ামটায় একটু বা প্যাঁ পোঁ করলে—একটা এসেন্সের শিশি জানালার কাছে ভেঙেই দিলে—এই সব আর কি! মুরলা হাসিয়া বলিল,—রক্ষে কর! এত কাণ্ডও করতে হবে? সত্যিই যা জানিনে—

রমেন রাগ করিয়া কহিল,—ওদের বউয়েরাই সব জানে নাকি? তবু মুখে এমন চালের কথা যদি শোন।—এক একটি যেন জাহাজ থেকে সবে ল্যাণ্ড করল!—পরের কাছে কি খাটো হওয়া ভাল?

মুরলা ধীর স্বরে কহিল,—ওরা তোমার বন্ধু ত!

রমেন হাসিল,—বন্ধু—! হাঁ, বন্ধু মানে ফ্রেণ্ড।—

মুরলাও হাসিল। মানে বুঝিয়া নহে—এমনি। কালের গতি কুটীলই বটে! অতিথি-অভ্যাগত আসিলে সে-কালের গৃহস্থেরা নারায়ণ জ্ঞানে অকপট মনে তাঁদের পরিচর্য্যা করিতেন, আর একালে আন্তরিকতার বদলে বিষয়ে মানুষের বেশী দৈন্য সেইখানে সচ্ছলতার অভিনয় যেন অপরিহার্য্য। ছাই শহর!

জিনিষপত্র যাহা কিছু আনাইবার এই রবিবারেই আনা হইল। রমেনই ঘর সাজাইল, মুরলা শুধু দাঁড়াইয়া দেখিল। এ-সব বিষয়ে তার রুচির পার্থক্য বড় বেশী, কিংবা জ্ঞান আদৌ নাই। সমস্ত গুছাইয়া রমেন ঘর-খানির চারিদিকে সগর্ব্বে তাকাইয়া কহিল,—কেমন,—ভাল হ'ল না?

মুরলার ঘাড় নাড়িবার বিশেষ দরকার না থাকিলেও সে ঘাড় নাড়িল।

রমেন উৎফুল্ল হইয়া কহিল,—বাস্, ভাল কথা, রাস্থ নাকি কলকেতা থেকে কাল এসেচে? তার কাছ থেকে কাপড় পরার ধরণটা যদি দেখে নাও—

মুরলা লজ্জিত হইয়া কহিল,—কি যে বল! কাপড়টাও পরতে জানিনে নাকি?

অপ্রতিভ হইয়া রমেন বলিল,—না, না, তাই বলচি—কলকেতায় সব প'রে কি-না। বার হাত কাপড় কুঁচিয়ে মাদ্রাজী মেয়েদের মত—ভারী সুন্দর—সিম্‌প্লি গ্রাণ্ড!

অবশেষে শনিবার আসিল।

মুরলা সত্যসত্যই সেদিন বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। একদিন আগে সৈরভী আসিয়া আছে, কিন্তু কোন কাজটাই সুশৃঙ্খলে হইতেছে না। বাসনে সকড়ি রহিয়াছে, কাপড়ের ময়লা কাটে নাই, উঠানের এখানে-ওখানে ময়লা আবর্জ্জনা, কাপড়গুলি মেলিয়া দিবার যা ভঙ্গী! মুরলা নিজেই যতখানি পারিল, করিল। সূর্য্য ডুবিবার পরই স্বামী বন্ধুবান্ধব সহ আসিয়া পড়িবেন, তখন এদিক সামলাইবার উপায় থাকিবে না। কি যে সে করিবে! ও-বাড়ির বিমলার কাছে বসিয়া ভাল করিয়া চুল বাঁধিয়া আসিল, কপালে খয়েরের টিপও একটি পরিল। সীঁথিতে সিঁদুর দিয়া ফরসা সেমিজ ও কালা ডুমুরীপাড় কাপড়খানি বাহির করিল। মাদ্রাজীদের মত না হোক, (আসলে মুরলা মাদ্রাজী দেখে নাই) কাপড় পরিবার ধরণটি তার

আরসীর সামনে দাঁড়াইয়া মনে হইতেছে সে যেন প্রতিদিনকার গৃহস্থ বধূ, মুরলা নহে, যেন আর কেহ শহর হইতে আসিয়াছে। তাদের গ্রামে একবার একজন মেয়ে মাষ্টার আসিয়াছিলেন,—অনেকটা তাঁর মত। ঘাড় বাঁকাইলে ও ভ্রূ কুঁচকাইলে—হুবহু! মুরলা আপন মনেই আনন্দে হাসিয়া ফেলিল। সে মাষ্টার হইয়া গেল নাকি?

ঐ যাঃ সূর্য্য বুঝি ডুবিয়া গেল। ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিতেছে।

মুরলা তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা দেখাইয়া বৈঠকখানায় আলো জ্বালাইয়া দিল। দেলখোসের শিশিটা শোবার ঘরের জানালায় রাখিয়া দিল—হারমোনিয়ামের ডালাটাও খুলিয়া রাখিল। তাঁদের আসিতে যা বিলম্ব। সর্ব্বোপরি নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া কিছু ফুল সে বৈঠকখানার ঢালা ফরাসের উপর রাখিয়া দিল। এইবার ষ্টোভ ধরাইবার পালা। বহুকষ্টে ষ্টোভের আগুন জ্বলিল—চায়ের জলও চাপিল। পাতাগুলা ফেলিয়া দিলে হয় না? সেদিন স্বামী চা তৈয়ারীর প্রক্রিয়া বলিয়াছিলেন—শিখাইয়া দিবার সময় হয় নাই। মুরলার সে-সব ভালরূপই মনে ছিল। দুধ গরম আর কি! কালিয়া নয়, পোলাও নয়—শুধু পাতা সেদ্ধ! কিন্তু সাত মুলুক খুঁজিয়া চা কোথাও মিলিল না। হায়, হায়, স্বামী আসিয়া বলিবেন কি?—এমন অকর্ম্মণ্য স্ত্রী! বন্ধুবান্ধবেরা হয়ত কত নিন্দাই করিবে। সময়ে চা তৈয়ারী করিয়া দিতে পারে না যে-স্ত্রী তাকে লইয়া কেমন করিয়াই বা ঘর-সংসার চলে! দুঃখে ক্ষোভে মুরলার চোখে জল আসিবার উপক্রম হইল এবং জল আসিবার পূর্ব্বেই বিধাতার অনুগ্রহে চিনির কৌটায় চা পাওয়া গেল। চিনি বোধ হয় অন্য কৌটায় আছে।—থাকুক এখন চিনি, সে ত পরে মিশাইলেও চলিবে। ঐ যে বাহিরে জুতার শব্দ পাওয়া গেল না? সব আসিলেন বুঝি?—

মুরলার বুকখানা সজোরে ঢিপ-ঢিপ করিতে লাগিল। হাত দুখানিও যেন তার বশ নহে। কেটলীর মুখ খুলিতেই গরম বাষ্পে হাতের খানিকটায় এমন উত্তাপ লাগিল যে, মুরলা সত্রাসে হাত সরাইয়া লইল। হাত কোলের দিকে না আসিয়া কেটলীর গায়েই পড়িল এবং কেটলীটা উল্টাইয়া গেল। হাত ত পুড়িলই, পাও বাদ গেল না। কিন্তু আশ্চর্য্য মুরলার ধৈর্য্য। সে অস্ফুট শব্দ মাত্র করিল না। শুধু বাঁ-হাত দিয়া ডান হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া হতবুদ্ধির মত বসিয়া রহিল।

এমন সময় কক্ষদ্বারে রমেন আসিয়া দাঁড়াইল, মুখখানি তার হাসি হাসি।

রমেনের পানে চাহিয়া মুরলা রাঙা হইয়া উঠিল। যন্ত্রণায় নহে—অক্ষমতার অনুতাপে চোখ দিয়া তার দর-দর ধারে জল গড়াইতে লাগিল।

রমেন চীৎকার করিয়া মুরলার পাশে বসিয়া পড়িল এবং স্পিরিটের বোতলটা খুলিয়া হড় হড় করিয়া সেই পোড়া হাত-পায়ের উপর স্পিরিট ঢালিতে ঢালিতে কহিল,—দেখ দেখি,—কি করলে!

মুরলা লজ্জায় মরিয়া গিয়া মৃদুস্বরে কহিল—তুমি যাও, ওদের দেখগে।

রমেন বলিল,—কাদের দেখব? কেউ আসে নি।

রাম বল, তারা আসবে এই পাড়াগাঁয়ে? তুমি ক্ষেপেচ! কিন্তু তুমি কি করলে বল দেখি!

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া মুরলা বলিল,—আঃ!—তোমার স্পিরিটটা কি ঠাণ্ডা, হাত যেন জুড়িয়ে গেল।

শৃঙ্খল

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

৮

নন্দকে কাছে পাইয়া, সারাক্ষণ একটা পরিচিত মানুষের নিঃশ্বাস ও কাশির শব্দ কানে শুনিয়া অজয় ইহার পর কতকটা প্রকৃতিস্থ বোধ করিতে লাগিল বটে, কিন্তু সে-রাতে তাহারও ভাল করিয়া ঘুম হইল না। ফিরিয়া ফিরিয়া একটিই চিন্তা তাহার মনের দ্বারে করাঘাত করিয়া ফিরিতে লাগিল। সে অযোগ্য, সে অকিঞ্চিৎকর, ঐন্দ্রিলাকে ভাবিবার, ভালবাসিবার, মুগ্ধচিত্তে তাহার সুন্দর নামটিকে ইষ্টমন্ত্রের মত করিয়া জপ করিবার অধিকার তাহার নাই। ঐন্দ্রিলার তেজোগর্ব্বিত মুখখানিকে একবারও সে আজ মনে আনিতে চেষ্টা করিল না। সেই অপরিমেয় রূপরাশির এক কণাকে স্মৃতির ভাণ্ডার সাজাইয়া সে আজ রাখিল না। জানিতে চাহিল না দুইটি আয়ত চোখের গভীরতায় কোনও বেদনার ভাষা লুকান ছিল কি-না। নিজের বেদনা দিয়া সব-হইতে প্রিয় মানুষটির বেদনাকে সে স্পর্শ করিতে চাহিল না, শুধুমাত্র নিজেকে লইয়াই বেদনা পাইতে লাগিল।

নিদ্রাবেশ অতর্কিতে আসিয়া তাহার চিন্তাকাশের স্বচ্ছতাকে বারংবার অভিভূত করিয়া দিতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া উত্তেজিত চিন্তার প্রখর গতিচ্ছন্দের মধ্যে বড় বড় ফাঁক। নিজের জৈব-চৈতন্যের এই বিড়ম্বনাও আজ অতি-বড় পরাজয়ের মত হইয়া তাহার মনে বাজিল। খাটের উপর ছোট বিছানাটিতে ততোধিক ছোট নিজের দেহটা লইয়া সে যে ধূলি-মলিন ভূমিতলের কত কাছে তাহা চিন্তা করিয়াও আজ সে পীড়া অনুভব করিতে লাগিল। যত ভাবে, অলক্ষ্যে তাহার চতুর্দ্দিকে আশার প্রসার, সম্ভাবনার প্রসার সঙ্কীর্ণ হইতেও সঙ্কীর্ণতর হইয়া আসে। তাহার অন্তরের আশৈশব-লালিত যে উদ্‌গ্রীব দুরাশা অসীমতার সন্ধান করিয়া ফিরিতে লোভ করিত, চারিদিকের সীমাবদ্ধতায় আজ তাহার পাখা-সঞ্চালন করিবারও স্থানাভাব ঘটিতে থাকে।

ছাতা-ধরা অন্ধকার একটা গলিতে ছোট ছোট দুইটি ঘর। বারোমাসই যেন সেখানে বাদ্‌লা, কলতলার জল পায়ে পায়ে আসিয়া মেজেটাকে সারাক্ষণ আর্দ্র করিয়া রাখে। একটা শাড়ীর আধখানাকে দু-ঘরের মাঝখানে পর্দ্দা করিয়া ঝুলান, কদাচিৎ বাতাসের সাড়া পাইয়া সেটা নড়িয়া উঠে। এনামেল-চটিয়া-যাওয়া লোহার পেয়ালায় কাল্‌চে রঙের খানিকটা চা। পেয়ালার হাতলটা এত গরম, কোঁচার খুঁটে জড়াইয়া ধরিতে হয়।...হ্যাঁরে, চায়ে আজ চিনি দিতে ভুলে গিয়েছিস্?... চিনি? চিনি আর নেই, চিনি নেই, খোকার মিশ্রী এক টুক্‌রো ছিল, তাই গুঁড়ো ক'রে দেওয়া হয়েছে।... হীরার কাঁকন-পরা নিটোল একটি হাত চিম্‌টায় করিয়া ডেলার পর ডেলা মিশ্রী উঠাইয়া অজয়ের চায়ে পরিবেষণ করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই কি চা আজ মিষ্টি হইবে না?...মিশ্রীর জন্য কাহাদের একটা ছেলে কাঁদিতেছে। অজয় চিনি চায় না, মিশ্রীও আর চায় না, কাঁকন-পরা হাতখানিকে নিজের হাতে লইয়া ভাল করিয়া একটু দেখিতে চায়, কপালে বুকে বুলাইয়া লইতে চায়, কিন্তু ছেলেটা কাঁদিতেছে। তাহার কান্নার শব্দ যেন ছুরির মত ধারালো, অজয়ের চিন্তাসূত্রকে কচ-কচ করিয়া কাটিয়া দিতেছে।...অজয়ের কেমন মনে হইতেছে, হাতটি যে-মানুষের মুখটি সে-মানুষের নয়, অথবা কি যে মাথামুণ্ডু মনে হইতেছে, সে একটু ভাল করিয়া ভাবিয়া লইতে চায়, ছেলেটা কিছুতেই তাহাকে ভাবিতে দিতেছে না। অজয় ভাবিতেও পারিতেছে না। অকস্মাৎ কখন নিজেরই অজ্ঞাতে লুব্ধ কম্পিত হস্তে কাঁকন-পরা হাতটিকে সে স্পর্শ করিল, অপূর্ব্ব আনন্দের শিহরণে একসঙ্গে দেহবীণার সবকয়টা তার ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে

যেন গণ্ডদেশে কাহার সশব্দ চপেটাঘাত লাভ করিয়া আচম্‌কা তাহার স্বপ্নের ঘোর ছুটিয়া গেল। কেন ক্ষোভ, কিসের দুঃখ, কি লইয়া অপমান জানে না, তবু অন্ধকারে বালিশে মুখ গুঁজিয়া ইহার পর অবিরল ধারে অনেকক্ষণ ধরিয়া সে অশ্রুমোচন করিতে লাগিল।—ক্রমে চতুর্দ্দিক্‌ হইতে নিরুপায়তা এমন করিয়া তাহাকে ঘিরিয়া আসিল যে, তাহার চৈতন্য সঙ্কুচিত হইতে হইতে একটি বিন্দুতে আসিয়া ঠেকিল। এত তুচ্ছ জিনিষকে লইয়া ভাবিতে, দুঃখ করিতে ভাল লাগে না, চিন্তার রাশ আলগা করিয়া দিয়া শেষ-রাত্রির দিকে অলক্ষ্যে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, জানে না।

ভোরে উঠিয়া দুতলার পার্টিশান-দেওয়া বারান্দার একধারে ডিস্‌পেন্‌সিং টেবিলে সুভদ্র তাহার নিঃস্বর উদ্ভাবিত ফর্‌মুলা অনুযায়ী কি-এক রসায়ন প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত। নন্দ ভোর না-হইতেই উঠিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, রোজ যেমন যায়। অছিলা প্রাতর্ভ্রমণ, কিন্তু সুভদ্র বেশ জানে চায়ের সময়টা বাড়ীতে উপস্থিত না থাকাটাই তাহার আসল উদ্দেশ্য। তিন বন্ধুর সংসার-যাত্রায় প্রথম হইতেই নিজেকে সে ভারস্বরূপ মনে করিতেছে, প্রত্যহ এক-পেয়ালা চা এবং দুই টুকরা রুটি বাঁচাইয়া তাহাদের এই ভারকে সে যথাসাধ্য লাঘব করিতে চায়। স্নানের ঘরে বিমান প্রায় আধঘণ্টা হইল কল খুলিয়া বসিয়া আছে, খরস্রোতে জল ঝরিয়া পড়ার শব্দে ছোট বাড়ীটি মুখরিত। হঠাৎ চোখ চাহিয়া অজয় অনুভব করিল, বেদনাতুর যে-মানুষটাকে নিজের মধ্যে লইয়া রাত্রিতে সে ঘুমাইতে গিয়াছিল, ত্রিভুবনে কোথাও যেন সে আর নাই। এমন অনেক দিন হয়, ঘুম ভাঙিয়া পুরানো আমিটাকে সহসা নিজের মধ্যে সে খুঁজিয়া পায় না। কিন্তু আজ নিজের হইতে বৃহত্তর কোন অভিনব চৈতন্যের মধ্যে সে যেন চোখ মেলিল। যেন তাহার অস্তিত্ব তাহার দেহ অতিক্রম করিয়া আজ দূরে দূরান্তে ব্যাপ্ত হইয়া যাইতেছে। যেন শীতারুণদীপ্ত আকাশ জুড়িয়া তাহারই চৈতন্যের আবেগ আজ কাঁপিতেছে। অকারণেই তাহার বুক আজ ভরিয়া উঠিল। জীবনকে অপরূপ রহস্যময় বলিয়া বোধ হইল। মনে হইল, তাহার অসাধ্য কিছু নাই, অসাধ্য কিছু থাকিবে না, বিধাতার নিজ হাতে আঁকা এই জয়লিপি ললাটে লইয়াই সে যেন পৃথিবীতে আসিয়াছিল।

পরিপূর্ণ বক্ষে ঐন্দ্রিলার নামটি অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বার-বার সে উচ্চারণ করিল। একটা প্রিয় গানের সুর কানের কাছে গুঞ্জন করিয়া ফিরিতে লাগিল,

"তোমায় আমায় মিলন হবে বলে আলোয় আকাশ ভরা"

বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পূবদিকের জানালাটা সে খুলিয়া দিল। যেন তাহারই জন্য কোন্‌ অভিনন্দন বহন করিয়া একরাশ উজ্জ্বল স্বর্ণিম আলো তাহার পায়ের কাছে আসিয়া লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। রাস্তার কৃষ্ণচূড়া গাছটার একটা শাখা ফুলপল্লবের অর্ঘ্য বহিয়া কবে হইতে যে একেবারে তাহার বাতায়নের কোণটিতে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে এতদিন সে তাহা লক্ষ্য করে নাই এজন্য নিজেকে তাহার অপরাধী মনে হইল।

বিমান স্নান সারিয়া বাহির হইয়া দুতলার বারান্দায় নবাগত ভৃত্যটির পথ আগলাইয়াছে। বলিতেছে, "এই শোনো, অমন হামাগুড়ি দেওয়ার মত ক'রে হাঁটবে না, বুঝেছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবু।"

"কতই বুঝেছ, দাঁড়াও দেখি বুক টান ক'রে।··· না, হয়নি। এই রকম ক'রে ছাতি ফুলিয়ে।···আচ্ছা, এবারে বেশ মেপে মেপে বড় বড় ক'রে পা ফেল,— লেফ্‌ট রাইট, লেফ্‌ট রাইট, লেফ্‌ট রাইট···"

অজয় যখন স্নান সারিয়া ফিরিয়া আসিল তখনও ভৃত্য-বেচারা মুক্তি পায় নাই। বিমান বলিতেছে, "এর আগে কোথায় কাজ করেছিলে?"

"আজ্ঞে, বোস্‌ সায়েবের বাড়ী।"

"বোস্‌-সাহেব আবার কে হে?"

"সার জগদীশ, সেই যে পার্শীবাগানের কাছে পাথর-কুঠীতে থাকেন।"

"বটে, বটে, সার জগদীশকে তুমি চেন? তাঁর বাড়ীতে কাজও করেছ? তাই ত হে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, তারও আগে সার্‌ নীলরতনের বাড়ী দু-বচ্ছর ছিলুম।"

"বল কি হে? তোমার দেখ্‌ছি ইতিহাসে নাম থেকে যাবে। তারও আগে কার বাড়ীতে ছিলে, নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর?"

"আজ্ঞে না বাবু। ছেলেবেলায় রবিঠাকুরের সঙ্গে তাঁদের জমিদারীতে কিছুদিন ঘুরেছিলুম।"

"বানিয়ে বলছ না?"

"বানাব কিসের জন্তে বাবু?"

"হুঁ! এ ত ভারী মজা!...আমাদের এখানেই বা তোমার তা-হলে না এসে জো কি? বাংলা দেশের তিনটে চূড়ো খালি দেখেছ, বাকী একটা দেখবে না, তাও কি কখনো হয়?" বলিয়া বিমান অট্টহাসির শব্দে বাড়ী প্রকম্পিত করিতে লাগিল।

অজয়ও সে হাসিতে যোগ দিল বটে, কিন্তু তাহার নিজেরই অজ্ঞাতে তাহার কল্পনা উন্মুখ হইয়া উঠিল। বিমান ঠাট্টা করিয়া বলিতেছে বটে, কিন্তু কে জানে, হয়ত তাহাদের পুরাতন ভৃত্যের রোগাক্রান্ত হইয়া হাসপাতালে যাওয়া এবং বিশেষ করিয়া এই ব্যক্তিটি কাজে বাহাল হওয়া ব্যাপারটাতে দেবতার কোনও গভীর ইঙ্গিত সত্যসত্যই প্রচ্ছন্ন আছে। দেশের ইতিহাস যখন লেখা হইবে তখন তাহাতে ছিটের নিমা এবং হরিদ্রা-চিহ্নিত বস্ত্র পরিহিত বৈকুণ্ঠনাথ নস্কর নামধেয় কোনও ব্যক্তির উল্লেখ খুব সম্ভবত থাকিবে না, কিন্তু কে জানে...

মনটাকে তাড়াতাড়ি এই নিরর্থক কল্পনার পথ হইতে সে ফিরাইয়া লইল। কিন্তু মহত্ত্বের একটা নামহীন দুর্দ্দমনীয় আবেগ বর্ষার উদ্বেলিত নদীস্রোতের মত তাহার সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে অভিভূত করিয়া তাহার রক্তস্রোতের মধ্যে প্রখর বেগে বহিতে লাগিল।

সুভদ্র কহিল, "পাঁচন খেয়েছ?"

সে কহিল, "আজ থাক্।"

সুভদ্রের নিজের তৈয়ারী পাঁচন। অজয় খাইয়াই তাহাকে অনুগৃহীত করে। সে ইহা লইয়া তাই আর উচ্চবাচ্য করিল না, এক পেয়ালা চা ঢালিয়া নীরবে অজয়ের দিকে অগ্রসর করিয়া দিল।

আজিকার প্রভাত অনাদিকালের সমস্ত পণ্য বহিয়া অসীমতা জুড়িয়া আজ এই মুহূর্ত্তে কত কোটী সূর্য্য জ্বলিয়াছে। পাঁচন খাইয়া তাহাকে দেহধারণ করিতে হয় এই কথাটাকে সে আজ ভুলিয়া থাকিতে চায়।

বিমান চা খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া ড্রেসিং গাউনটাকে ভাল করিয়া গায়ে জড়াইতে জড়াইতে হঠাৎ কহিল, "তোমার কাছে দশটা টাকা হবে, সুভদ্র?" এই ব্যক্তিই যে একটু আগে ভৃত্যকে কুচ-কাওয়াজ করাইতেছিল, কথার সুরে তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

সুভদ্র কহিল, "হবে কি না, পুঁজিপাটা খতিয়ে পরে বলছি, কিন্তু এ মাসে তুমি বড্ড বেশী খরচ করেছ, এত টাকা নিয়ে কি কর?"

বিমান কহিল, "সাধে কি এ দেশের লোকের কিছু হয় না? টাকার অভাবে কত-কি কর্‌তে পাই না, সে খোঁজটাই না হয় ভুল ক'রে একদিন কর্‌তে?

সুভদ্র কহিল, "হ্যাঁ, অভাব বোধ ত তোমার কত। কল্‌কাতায় বাড়ীঘর রয়েছে, অবস্থাপন্ন বাপ, মা-ভাই-বোন, কিছুতে তোমার মন ওঠে না। সব ছেড়ে বেদুইনের মত ঘুরে বেড়াবে, বাপের দেওয়া টাকা ছুঁলে তোমার জাত যায়। কবচ্ছর ত আমার সঙ্গে রয়েছ, দেখছি। অভাব অনটন আছেই, ভ্রূক্ষেপও কর না। কেন নিজেকে এ রকম ক'রে কষ্ট দাও? কতদিন ধ'রে বলছি, দেখেশুনে কাজকর্ম্ম একটা জুটিয়ে নাও। কেবল ছবি এঁকে কিছু হয় না, তা ত দেখ্‌তেই পাচ্ছ।"

বিমান কহিল, "কি এমন কাজ আছে যে কর্‌তে পারি?"

"না হয় ছাত্রই গোটাদুই জুটিয়ে নাও, এবেলা-ওবেলা ছবি-আঁকা শেখাবে।"

"কত পাব তার থেকে আশা করছ?"

"কিছু ত পাবে?"

"হুঁ। গোড়ার দিকে কিছুদিন মাইনেটা তোমার কোনো কাজে লাগবে না।"

"তার অর্থ?"

"একটা magnifying glass কিন্‌তে সেটা খরচ হয়ে যাবে। উপার্জ্জনটাকে অতঃপর চোখে দেখতে হবে

অজয়ের মনের দ্বারে উদ্দীপ্ত ছটাকে প্রত্যক্ষ...

যেন গণ্ডদেশে কাহার সশব্দ চপেটাঘাত লাভ করিয়া আচম্‌কা তাহার স্বপ্নের ঘোর ছুটিয়া গেল। কেন ক্ষোভ, কিসের দুঃখ, কি লইয়া অপমান জানে না, তবু অন্ধকারে বালিশে মুখ গুঁজিয়া ইহার পর অবিরল ধারে অনেকক্ষণ ধরিয়া সে অশ্রুমোচন করিতে লাগিল।—ক্রমে চতুর্দ্দিক্ হইতে নিরুপায়তা এমন করিয়া তাহাকে ঘিরিয়া আসিল যে, তাহার চৈতন্য সঙ্কুচিত হইতে হইতে একটি বিন্দুতে আসিয়া ঠেকিল। এত তুচ্ছ জিনিষকে লইয়া ভাবিতে, দুঃখ করিতে ভাল লাগে না, চিন্তার রাশ আলগা করিয়া দিয়া শেষ-রাত্রির দিকে অলক্ষ্যে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, জানে না।

ভোরে উঠিয়া দুতলার পার্টিশান-দেওয়া বারান্দার একধারে ডিস্‌পেন্‌সিং টেবিলে সুভদ্র তাহার নিঃস্বর উদ্ভাবিত ফর্‌মুলা অনুযায়ী কি-এক রসায়ন প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত। নন্দ ভোর না-হইতেই উঠিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, রোজ যেমন যায়। অছিলা প্রাতর্ভ্রমণ, কিন্তু সুভদ্র বেশ জানে চায়ের সময়টা বাড়ীতে উপস্থিত না থাকাটাই তাহার আসল উদ্দেশ্য। তিন বন্ধুর সংসার-যাত্রায় প্রথম হইতেই নিজেকে সে ভারস্বরূপ মনে করিতেছে, প্রত্যহ এক-পেয়ালা চা এবং দুই টুকরা রুটি বাঁচাইয়া তাহাদের এই ভারকে সে যথাসাধ্য লাঘব করিতে চায়। স্নানের ঘরে বিমান প্রায় আধঘণ্টা হইল কল খুলিয়া বসিয়া আছে, খরস্রোতে জল ঝরিয়া পড়ার শব্দে ছোট বাড়ীটি মুখরিত। হঠাৎ চোখ চাহিয়া অজয় অনুভব করিল, বেদনাতুর যে-মানুষটাকে নিজের মধ্যে লইয়া রাত্রিতে সে ঘুমাইতে গিয়াছিল, ত্রিভুবনে কোথাও যেন সে আর নাই। এমন অনেক দিন হয়, ঘুম ভাঙিয়া পুরানো আমিটাকে সহসা নিজের মধ্যে সে খুঁজিয়া পায় না। কিন্তু আজ নিজের হইতে বৃহত্তর কোন অভিনব চৈতন্যের মধ্যে সে যেন চোখ মেলিল। যেন তাহার অস্তিত্ব তাহার দেহ অতিক্রম করিয়া আজ দূরে দূরান্তে ব্যাপ্ত হইয়া যাইতেছে। যেন শীতারুণদীপ্ত আকাশ জুড়িয়া তাহারই চৈতন্যের আবেগ আজ কাঁপিতেছে। অকারণেই তাহার বুক আজ ভরিয়া উঠিল। জীবনকে অপরূপ রহস্তময় বলিয়া বোধ হইল। মনে হইল, তাহার অসাধ্য কিছু নাই, অসাধ্য কিছু থাকিবে না, বিধাতার নিজ হাতে আঁকা এই জয়লিপি ললাটে লইয়াই সে যেন পৃথিবীতে আসিয়াছিল।

পরিপূর্ণ বক্ষে ঐন্দ্রিলার নামটি অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বার-বার সে উচ্চারণ করিল। একটা প্রিয় গানের সুর কানের কাছে গুঞ্জন করিয়া ফিরিতে লাগিল,

"তোমায় আমায় মিলন হবে বলে আলোয় আকাশ ভরা"

বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পূবদিকের জানালাটা সে খুলিয়া দিল। যেন তাহারই জন্য কোন্ অভিনন্দন বহন করিয়া একরাশ উজ্জ্বল স্বর্ণিম আলো তাহার পায়ের কাছে আসিয়া লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। রাস্তার কৃষ্ণচূড়া গাছটার একটা শাখা ফুলপল্লবের অর্ঘ্য বহিয়া কবে হইতে যে একেবারে তাহার বাতায়নের কোণটিতে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে এতদিন সে তাহা লক্ষ্য করে নাই এজন্য নিজেকে তাহার অপরাধী মনে হইল।

বিমান স্নান সারিয়া বাহির হইয়া দুতলার বারান্দায় নবাগত ভৃত্যটির পথ আগলাইয়াছে। বলিতেছে, "এই শোনো, অমন হামাগুড়ি দেওয়ার মত ক'রে হাঁটবে না, বুঝেছ ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবু।"

"কতই বুঝেছ, দাঁড়াও দেখি বুক টান ক'রে।··· না, হয়নি। এই রকম ক'রে ছাতি ফুলিয়ে।···আচ্ছা, এবারে বেশ মেপে মেপে বড় বড় ক'রে পা ফেল,— লেফ্‌ট রাইট, লেফ্‌ট রাইট, লেফ্‌ট রাইট···"

অজয় যখন স্নান সারিয়া ফিরিয়া আসিল তখনও ভৃত্য-বেচারা মুক্তি পায় নাই। বিমান বলিতেছে, "এর আগে কোথায় কাজ করেছিলে ?"

"আজ্ঞে, বোস্ সায়েবের বাড়ী।"

"বোস্-সাহেব আবার কে হে ?"

"সার জগদীশ, সেই যে পার্শীবাগানের কাছে পাথর-কুঠীতে থাকেন।"

"বটে, বটে, সার জগদীশকে তুমি চেন ? তাঁর বাড়ীতে কাজও করেছ ? তাই ত হে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, তারও আগে সার্ নীলরতনের বাড়ী দু-বচ্ছর ছিলুম।"

"বল কি হে? তোমার দেখ্‌ছি ইতিহাসে নাম ক যাবে। তারও আগে কার বাড়ীতে ছিলে, ব মুর্শিদকুলী খাঁর?"

"আজ্ঞে না বাবু। ছেলেবেলায় রবিঠাকুরের সঙ্গে র জমিদারীতে কিছুদিন ঘুরেছিলুম।"

"বানিয়ে বলছ না?"

"বানাব কিসের জন্যে বাবু?"

"হুঁ! এ ত ভারী মজা!...আমাদের এখানেই বা তোমার তা-হলে না এসে জো কি? বাংলা দেশের তিনটে চূড়ো খালি দেখেছ, বাকী একটা দেখবে না, তাও কি কখনো হয়?" বলিয়া বিমান অট্টহাসির শব্দে বাড়ী প্রকম্পিত করিতে লাগিল।

অজয়ও সে হাসিতে যোগ দিল বটে, কিন্তু তাহার নিজেরই অজ্ঞাতে তাহার কল্পনা উন্মুখ হইয়া উঠিল। বিমান ঠাট্টা করিয়া বলিতেছে বটে, কিন্তু কে জানে, হয়ত তাহাদের পুরাতন ভৃত্যের রোগাক্রান্ত হইয়া হাসপাতালে যাওয়া এবং বিশেষ করিয়া এই ব্যক্তিটি কাজে বাহাল হওয়া ব্যাপারটাতে দেবতার কোনও গভীর ইঙ্গিত সত্যসত্যই প্রচ্ছন্ন আছে। দেশের ইতিহাস যখন লেখা হইবে তখন তাহাতে ছিটের নিমা এবং হরিদ্রা-চিহ্নিত বস্ত্র পরিহিত বৈকুণ্ঠনাথ নস্কর নামধেয় কোনও ব্যক্তির উল্লেখ খুব সম্ভবত থাকিবে না, কিন্তু কে জানে...

মনটাকে তাড়াতাড়ি এই নিরর্থক কল্পনার পথ হইতে সে ফিরাইয়া লইল। কিন্তু মহত্ত্বের একটা নামহীন দুর্দ্দমনীয় আবেগ বর্ষার উদ্বেলিত নদীস্রোতের মত তাহার সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে অভিভূত করিয়া তাহার রক্তস্রোতের মধ্যে প্রখর বেগে বহিতে লাগিল।

সুভদ্র কহিল, "পাঁচন খেয়েছ?"

সে কহিল, "আজ থাক্।"

সুভদ্রের নিজের তৈয়ারী পাঁচন। অজয় খাইয়াই তাহাকে অনুগৃহীত করে। সে ইহা লইয়া তাই আর উচ্চবাচ্য করিল না, এক পেয়ালা চা ঢালিয়া নীরবে অজয়ের দিকে অগ্রসর করিয়া দিল।

আজিকার প্রভাত অনাদিকালের সমস্ত পণ্য বহিয়া অসীমতা জুড়িয়া আজ এই মুহূর্ত্তে কত কোটা সূর্য্য জলিয়াছে। পাঁচন খাইয়া তাহাকে দেহধারণ করিতে হয় এই কথাটাকে সে আজ ভুলিয়া থাকিতে চায়।

বিমান চা খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া ড্রেসিং গাউনটাকে ভাল করিয়া গায়ে জড়াইতে জড়াইতে হঠাৎ কহিল, "তোমার কাছে দশটা টাকা হবে, সুভদ্র?" এই ব্যক্তিই যে একটু আগে ভৃত্যকে কুচ-কাওয়াজ করাইতেছিল, কথার সুরে তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

সুভদ্র কহিল, "হবে কি না, পুঁজিপাটা খতিয়ে পরে বল্‌ছি, কিন্তু এ মাসে তুমি বড্ড বেশী খরচ করেছ, এত টাকা নিয়ে কি কর?"

বিমান কহিল, "সাধে কি এ দেশের লোকের কিছু হয় না? টাকার অভাবে কত-কি কর্‌তে পাই না, সে খোঁজটাই না হয় ভুল ক'রে একদিন কর্‌তে?

সুভদ্র কহিল, "হ্যাঁ, অভাব বোধ ত তোমার কত। কল্‌কাতায় বাড়ীঘর রয়েছে, অবস্থাপন্ন বাপ, মা-ভাই-বোন, কিছুতে তোমার মন ওঠে না। সব ছেড়ে বেদুইনের মত ঘুরে বেড়াবে, বাপের দেওয়া টাকা ছুঁলে তোমার জাত যায়। কবচ্ছর ত আমার সঙ্গে রয়েছ, দেখছি। অভাব অনটন আছেই, ভ্রূক্ষেপও কর না। কেন নিজেকে এ রকম ক'রে কষ্ট দাও? কতদিন ধ'রে বল্‌ছি, দেখেশুনে কাজকর্ম্ম একটা জুটিয়ে নাও। কেবল ছবি এঁকে কিছু হয় না, তা ত দেখ্‌তেই পাচ্ছ।"

বিমান কহিল, "কি এমন কাজ আছে যে কর্‌তে পারি?"

"না হয় ছাত্রই গোটাদুই জুটিয়ে নাও, এবেলা-ওবেলা ছবি-আঁকা শেখাবে।"

"কত পাব তার থেকে আশা করছ?"

"কিছু ত পাবে?"

"হুঁ। গোড়ার দিকে কিছুদিন মাইনেটা তোমার কোনো কাজে লাগবে না।"

"তার অর্থ?"

"একটা magnifying glass কিন্‌তে সেটা খরচ হয়ে যাবে। উপার্জ্জনটাকে অতঃপর চোখে দেখতে হবে

"কিছু তবু ত একটা করতে হবে? এরকম ক'রে চিরকাল কখনও চলতে পারে না।"

"কি করলে সুবিধে হয়, তুমিই না-হয় ভেবে ঠিক কর না।"

"দু-পয়সা ঘরে এনে সুখেস্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে পারি এমন কোনো পথ এই হতভাগা দেশে আমার জন্যে খোলা নেই।—এক ইন্‌স্যুরেন্সের দালালীর কাজ ছাড়া।"

"তা সেটা ত কুকাজ কিছু নয়?"

"তা নয়, তবু সেটা আমি করব না। যে-কারণে পানের দোকান করতে পারি অথচ করব না, সেটাও অপকর্ম্ম কিছু নয়। আমি এটা বিশ্বাস করি, পৃথিবীতে যে-কাজের থেকে আমি অন্ন আহরণ করব, তাকে মায়ের মত ক'রে আমায় ভালবাসতে হবে। তা যদি না পারি, সে-কাজের প্রতিও অবিচার করব, নিজের প্রতিও সুবিচার করা হবে না। যে-কাজটা কুকাজ নয় তুমি বলছ তাকে মায়ের প্রাপ্য শ্রদ্ধা কোনোদিনই আমি দিতে পারব না।"

"তুমি যাই বল বিমান, এই দরিদ্র দেশে কেবল ছবি এঁকে কোনোদিনও তোমার পেট ভরবে না, এ আমি তোমায় লিখে দিতে পারি।"

"বেশ ত, তাই যদি হয়, উপবাস ক'রেই দেশের দারিদ্র্যের যে-পাপ তার প্রায়শ্চিত্ত করব। কিন্তু যে পাপ আমার নয়, তার জন্যে আমাকে দোষারোপ করলে চলবে কেন? বিধাতা যে-কাজের যোগ্যতা দিয়ে আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, সে-কাজ একদিনের জন্যেও আমি অবহেলা করিনি, আমার দিক্ থেকে এইটুকু কেবল আমার দেখবার। অবহেলাটা আর-কোথাও আর-কারও দিক্ থেকে হচ্ছে। তারা কে তা জানি না, কিন্তু তারা এই দেশেরই মানুষ। তাদের পাপের ফল ভোগ আমি করছি।"

সুভদ্র নিঃশব্দে উঠিয়া গিয়া দশ টাকার একটা নোট আনিয়া বিমানের হাতে দিল। অত্যন্ত কাতর মুখ করিয়া টাকাটা লইয়া বিমানও কিছুক্ষণ নীরবে নতমুখে দেখ, তুমিও দেখতে পাবে; ভুল ক'রে একটা লক্ষ্মীছাড়া দেশে জন্মানো ছাড়া আর-কোনো অপরাধ আমি করিনি। যে-দেশের লোক দারিদ্র্যকে আস্তিকতা ব'লে পূজো দেয় তারপর গ্রাসাচ্ছাদনের ভাবনায় অষ্টপ্রহর আত্মা কাকে বলে তা মনে আনবার সময় পায় না। নিজের আর্টিষ্টদের খেতে দিতে পারে না, আবার দেশে আর্ট গ'ড়ে উঠবে এও আশা করে। এদেশের আর্টিষ্ট ছোকরারা কেবল শিব কেন আঁকে কাল জানতে চেয়েছিলে, কারণটা আমার মুখ থেকে আজ শোন। শিব আঁকে এইজন্যে যে সাহেবরাই একমাত্র ছবি কেনে, আর তারা শিবের ছবি চায়। সত্যিকারের আর্ট তাদের দেশে ঢের আছে, তোমাদের সেজন্যে তারা পয়সা দেবে কেন? তারা grotesque কিছু চায়, দেশে নিয়ে গিয়ে বলতে পারবে, দেখ ছবি, খাঁটি আর্ট নয়, কিন্তু খাঁটি ভারতীয়। শিব আঁকলে ছবির ভারতীয়ত্বে সন্দেহ করবার কিছু থাকে না, সাহেবরা কেনে, এই হচ্ছে শিব আঁকার ভেতরকার কথা। আর্টিষ্টদের দোষ দেবে কি ব'লে? তাদের কোনো দোষ নেই। শিব আঁকাটাও ত অপকর্ম্ম কিছু নয়।"

সুভদ্র বলিল, "তোমার সমস্যা মেটাতে হ'লে যদি দেশের ত্রিশ কোটী মানুষের অন্ন-সমস্যা আগে মিটিয়ে নিতে হয় ত সে-কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।"

বিমান বলিল, "কি আর করব বল, আমার দুর্ভাগ্য। কোনো সমস্যাকে isolate ক'রে নিয়ে নিজের সুবিধার জন্যে ছোট ক'রে দেখা আমার স্বভাবে নেই।"

বসিয়া বসিয়া অকস্মাৎ গৃহের মধ্যেকার এই তর্কযুদ্ধকে অজয়ের অত্যন্ত তুচ্ছ অর্থহীন বলিয়া বোধ হইল। বিমান বৃহৎ করিয়া দেখিবার কথা বলিতেছে, কিন্তু সে যে-সমস্ত সমস্যার কথা বলিতেছে তাহার একটিও কি বৃহৎ? শিবের ছবি কেহ আঁকিল কিংবা আঁকিল না, এই বিপুল বিশ্বব্যাপারে সত্যই কি তাহাতে এমন-কিছু আসিয়া যায়? কে জানে, হয়ত সমস্ত জিনিষের আসল মূল্য চিরকালের যে হিসাবের খাতায় জমা হইতেছে সেখানে পৃথিবীর মানুষের সমগ্র শিল্প প্রচেষ্টা অপেক্ষা সকলের দৃষ্টির অগোচরে নিভৃত

বেশী মূল্যবান্। ইহারা চতুষ্পার্শ্বের এই অত্যন্ত সচেতন জাগ্রত অসীমতার বিপুল রহস্যে আবৃত হইয়া বসিয়া দুদণ্ডের জন্যও নিজেদের অন্তরের আগ্রহকে কোন্ অর্থ-হীনতার শূন্য গহ্বরে ঢালিয়া দিতেছে, এই জিনিষটিকে অত্যন্ত অদ্ভুত অমার্জ্জনীয় অপচয় বলিয়া হঠাৎ সে আজ অনুভব করিল।

তাহার মনে পড়িল, ছেলেবেলায় তাহার এক সহপাঠীকে অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে সে একদিন বুঝাইতে ব্যাপৃত ছিল যে, অসীমতাকে ভাবা যায় না ইহা সত্য নহে, সীমাকেই ভাবা যায় না। তাহার বয়স তখন আট বৎসরের বেশী নয়। কে একজন অপরিচিত ব্যক্তি পশ্চাৎ হইতে সব শুনিয়া সেদিন ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, কালে সে একজন খ্যাতিমান্ মানুষ হইবে। আজ সে নূতন করিয়া তাহার পরিচিত বন্ধুদের সঙ্গে তাহার স্বভাবের পার্থক্যকে অনুভব করিল। সে বুঝিতে পারিল, অসীমতার সঙ্গে কোথাও কোনওরূপে যাহার যোগ নাই এমন কোনও বস্তুকে সমাদরে তাহার জীবনে সে আহ্বান করিতে পারিবে না। বাহিরের এই আকাশ, এই গ্রহচন্দ্রতারা, এই রৌদ্র বৃষ্টি কুজ্ঝটিকা, যুগে যুগে সার্থকতা হইতে সার্থকতায় বিশ্বসৃষ্টির বিরামহীন এই জয়যাত্রা, এ-সমস্তের সঙ্গে তাহার সুখদুঃখ যতদিন সম্বন্ধ-বিহীন থাকিবে ততদিন কিছু লইয়াই তাহার জীবনের অভাব মিটিবে না।

তাহার মনে হইল, তুচ্ছতা যেন তাহার সমস্ত দেহে গ্লানির মত হইয়া লিপ্ত রহিয়াছে। ইচ্ছা করিতেছে বাহিরের অজস্র জ্যোতিঃবৃষ্টির মধ্যে বাহির হইয়া পড়ে ও সেই গ্লানিকে প্রক্ষালিত করিয়া লয়, তারপর নিজের সমস্ত দৈন্য, সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে ভুলিয়া গিয়া প্রভাতের আকাশে দেবতার মত সদর্পে একবার মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়।

হঠাৎ রাস্তার দরজার কড়াটা রুদ্রতালে নড়িয়া উঠিল। প্রকৃতিস্থ মানুষ এত জোরে কড়া নাড়ে না। অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তর্ক থামাইয়া সুভদ্র ব্যস্তভাবে বৈকুণ্ঠনাথকে ডাকাডাকি করিতে লাগিল। বৈকুণ্ঠ বাজার হইতে ফিরে নাই, উপরে রান্নাঘরে পাশা-পাশি দুটি উনুনে ডাল ও ভাত চাপাইয়া দিয়া ছাতের আলিসায় ভর দিয়া উড়িয়া-ঠাকুর পাশের বাড়ীর আয়ার সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপে নিরত। নন্দ কখন বাড়ী ফিরিয়াছে, তিন বন্ধুর কেহই তাহা লক্ষ্য করে নাই। যাচ্ছি বলিয়া প্রায় ঝড়ের মত ছুটিয়া সে নীচে নামিয়া গেল।

দরজা খুলিতে যে দুই মিনিট দেরি হইল তাহার মধ্যে আরও পাঁচ-সাত বার কড়াটা সজোরে নড়িয়া উঠিল এবং প্রতিবারেই ধ্বনির পরিবর্ত্তে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঠিকরিয়া বাহির হইল। একটু পরেই পাড়ার দুই-তিনটি ভদ্রবেশ-ধারী ব্যক্তি এবং কয়েকজন সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে করিয়া পুলিশের একজন দারোগা সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলেন। নামধাম না জানাইয়া, অনুমতি না লইয়া, তিনজন ভদ্র-যুবকের পবিত্র পাঠাগার ও বিশ্রামকক্ষে একদল অপরিচিত মানুষ কি বলিয়া ঠেলাঠেলি করিয়া ঢুকিয়া পড়িতেছে, অজয় চমৎকৃত হইয়া তাহাই ভাবিতেছে এমন সময় স্মিতহাস্যে সকলকে শিষ্ট-সম্ভাষণ করিয়া দারোগা তাঁহার আগমনের কারণ জ্ঞাপন করিলেন। জানা গেল, নন্দলাল 'পোলিটিক্যাল সাস্পেক্ট,' সম্প্রতি পূর্ব্ববঙ্গের কোন গণ্ডগ্রামে একটা রাজনৈতিক ডাকাতি হইয়া যাওয়াতে সে-সম্পর্কে তাহার খোঁজ পড়িয়াছে। কলেজের কেহ তাহার বাড়ীর ঠিকানা জানে না, গোয়েন্দার সাহায্যে তাহার আস্তানা খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাঁহারা আজ আসিয়াছেন, সঙ্গে অবশ্য খানাতল্লাসীর পরোয়ানা আছে। নন্দলালবাবু তাঁহাদের এত হায়রাণ করিয়াছেন যে সে-কথা আর বলিবার নহে। কথা শেষ করিয়া নিজে হইতেই একটি চৌকি লইয়া বসিয়া দারোগা এক গ্লাস জল চাহিয়া লইয়া খাইলেন।

পুলিশের সঙ্গে অজয়ের জীবনে এই প্রথম পরিচয়। দারোগা অতি মিষ্টভাষী, তাঁহার সঙ্গীদের ব্যবহারও কিছুমাত্র অশিষ্ট নহে; তথাপি নিদারুণ অপমানের উত্তে-জনায় অজয়ের কপালের শিরা দপ্ দপ্ করিতে লাগিল। নিজেকে সে বহুপ্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিল, কাহাকেও সন্দেহ করা মাত্রই তাহাকে অপরাধী করা নহে, কিন্তু তাহার অবাধ্য মন কিছুতেই বুঝিল না। তাহার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করিতে লাগিল, পাঁজরের কাছে কি-রকম একটা ব্যথা, সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। সুভদ্র কেরোসি-

মাত্র গেঞ্জি গায়ে দিয়া বসিয়াছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া তাহার উপর একটা পাঞ্জাবী চাপাইয়া ফিরিয়া আসিল। দারোগার হাত হইতে অকম্পিত হস্তে খানাতল্লাসীর পরোয়ানাটি লইয়া আদ্যোপান্ত সেটা সে পড়িয়া দেখিল, তারপর সকলকে প্রথমেই নিজের ঘরে আহ্বান করিয়া লইয়া গেল। অজয়ের যেন চলচ্ছক্তি লোপ পাইয়াছিল, অসাড় পা-দুইটাকে কোনও প্রকারে টানিয়া টানিয়া মন্ত্র-মুগ্ধের মত সেও সকলের অনুসরণ করিল।

তারপর দুই ঘণ্টা ধরিয়া বাড়ীর সব-কয়টি মানুষের, সব-কয়টি বাক্সপেটরার তালা খোলা হইল। বিমান চাবির গোছাটা কয়েকদিন হইল হারাইয়াছে, তাহার বড় আদরের কুমীরের চামড়ার সুটকেশটার তালা ভাঙা হইল। ছড়ানো জিনিষপত্র সব-কয়টি ঘরের মেজে ভরিয়া স্তূপাকার হইয়া জমিল। এখানকার জিনিষ ওখানে গেল, ওখানকার জিনিষ এখানে, এ খামের চিঠি ঐ খামে, ঐ বইয়ের খসা-পাতা এই বইয়ে, সব মিলাইয়া একটা কুৎসিত লণ্ডভণ্ড ব্যাপার। প্রতিবেশী যাহারা সাক্ষী স্বরূপ আসিয়াছিল তাহারা চাপা হাসির দীপ্তিতে মুখ ভরিয়া আমোদ উপভোগ করিতেছে। উড়িয়াঠাকুর,—যাহাকে কাজ হইতে ছাড়াইয়া দিবে বলিয়া কাল সন্ধ্যায় অজয় শাসাইয়াছে, সেও বাহির হইতে জানালার ফাঁকে উঁকি মারিয়া মজা দেখিতেছে। দাঁতে দাঁত চাপিয়া বহু কষ্টে অজয় নিজেকে সংবরণ করিয়া রহিল।

অজয় নিজেকে সংবরণ করিতে জানে। দারোগা যখন তাহার ট্রাঙ্কের একেবারে নীচতলা হইতে তাহার বহু সঙ্কোচের কিন্তু বহুযত্নের সঞ্চয় কবিতার খাতাটি টানিয়া বাহির করিয়া হাস্যোদ্ভাসিত মুখে তাহার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইয়া যাইতে লাগিলেন, তখন সে কিছু বলিল না ত। একটু পরে একটা কবিতার খানিকটা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়া দারোগা যখন বলিলেন, "ঠিক এম্নিধারা একটা কবিতা ডি-এল্ রায় না রবিবাবুর কোন্ একটা বইয়ে পড়েছি না?" তখনও সে চুপ করিয়া রহিল, বিমানের ধরণে ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া অল্প একটু হাসিল মাত্র। অকারণে চিড়বিড় করিয়া জ্বলিয়া উঠা যাহার স্বভাব

সন্দেহজনক কিছুই এবারে পাওয়া গেল না। তাছাড়া নন্দলাল বরাবর কলেজে উপস্থিত ছিল বলিয়া তাহার alibi বিদ্যমান্ রহিয়াছে, সুতরাং এ-যাত্রা এই পর্য্যন্ত। কিন্তু নন্দলালকে আরও বেশী সাবধান হইয়া চলিতে উপদেশ দিয়া, এবং শেয়ালদা ষ্টেশনে যাত্রীর ভিড়ে লুকাইয়া রোজ রোজ রাত কাটাইতে গেলে সেটা আর কাহারও চোখে না পড়ুক, পুলিশের চোখ এড়ায় না, ইহা জানাইয়া পুনরায় পারস্পরিক শিষ্ট-সম্ভাষণের পর দারোগা সদলবলে প্রস্থান করিলেন।

সুভদ্র তাড়াতাড়ি ট্রাঙ্ক সুটকেশ প্রভৃতি টানিয়া লইয়া ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত জিনিষপত্র গুছাইতে প্রবৃত্ত হইল। এই বিশৃঙ্খলার উপর কাহারও হাত একবার লাগিলে কোনও জন্মে ইহাতে আর শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিবে না। মনের সমস্তটা সঞ্চিত রুদ্ধ জ্বালা নন্দের উপর ঝাড়িবে স্থির করিয়া গিয়া অজয় দেখিল, দুতলার বারান্দার এক কোণে নিজেকে গুঁজিয়া যেখানে সে পড়াশোনা করিত, সেখানে দুই করতলে মুখ ঢাকিয়া সে নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া আছে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কানের কাছে যে-রক্তস্রোত এতক্ষণ দপদপ করিয়া বহিতেছিল তাহা বড় করুণ সুরে বাজিতেছে। একটু কাশিয়া কহিল, "কিছু ভয় নেই, ওরা কিছু পায়নি, তা-ছাড়া কলেজে তোমার alibi রয়েছে, দারোগা নিজের মুখে ব'লে গেল।"

নন্দ কাঁদিয়া ফেলিল।

সেদিন কলেজে বসিয়া, প্রভাতে নিদ্রা-জাগরণের সঙ্গম-সৈকতে কুড়াইয়া-পাওয়া অপরূপ জ্যোতিঃসুষমাময় চিন্তার মাণিকটিকে অজয় মনের মধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল, কিন্তু কোথাও আর তাহার চিহ্নমাত্রেরও দেখা পাইল না।

নন্দ যথারীতি খাইয়া-দাইয়া কলেজে গিয়াছিল, কিন্তু বাড়ী ফিরিতে তাহার সেদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। অজয় বাড়ী নাই, সুভদ্রও বাহির হইয়া গিয়াছে, দুতলার স্নানের ঘরের দেয়ালে বিলম্বিত একটা প্রকাণ্ড আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া বিমান অসময়ে বাতির আলোয় দাড়ি কামাইতে ব্যস্ত। বারান্দার অন্ধকারে নন্দকে দেখিতে

পাইয়া গলার কাছটায় ক্ষুর ঘসিতে ঘসিতে ঊর্দ্ধগ্রীব হইয়া সে কহিল, "এত রাত অবধি বাইরে কি কর্‌ছিলে?"

নন্দ জড়সড় হইয়া একপাশে দাঁড়াইয়া কহিল, "একটা থাক্‌বার জায়গা ঠিক ক'রে এলাম। গুদাম বাড়ী, একপাশে একটা ঘরে আমায় একটু জায়গা দেবে বলেছে। আমি আজই যাচ্ছি, আমার জিনিষগুলো নিতে এসেছি।"

বিমান কহিল, "উঃ, জিনিষ ত তোমার কত। ক'টা 'লরী' সঙ্গে এনেছ?"

নন্দ মাথা নীচু করিয়া একটু হাসিয়া বেশ স্বাভাবিক সুরেই উত্তর দিল, "আজ্ঞে, বইয়ের বাক্সটা বেজায় ভারি, নিজে পেরে উঠব না, তাই একটা কুলী-ছোক্‌রাকে সঙ্গে এনেছি।"

ঠোঁট চাপিয়া চিবুকের উপর ক্ষুর চালাইতে চালাইতে বিমান আড়চোখে তাহাকে একবার চাহিয়া দেখিল, তারপর কহিল, "তা বেশ, কিন্তু সুভদ্র বাড়ী নেই, অজয় নেই, এতদিন তাদের প'ড়ে প'ড়ে খেলে, হঠাৎ কাউকে কিছু না ব'লে-ক'য়ে কেটে পড়বে কি রকম?"

নন্দের গলার স্বর এবার কাঁপিয়া গেল, কষ্টে নিজেকে সংবরণ করিয়া কহিল, "আমার হয়ে আপনি তাঁদের বল্‌বেন, আমি আর এ-মুখ তাঁদের দেখাতে পারব না।"

বিমান বলিল, "তোমার শ্রীমুখ না দেখ্‌তে পেলে তারাও যে দিনকের দিন রোগা হতে থাক্‌বে তা নয়। সে যাক্‌, তুমি চট ক'রে দুটি খেয়ে নাও। মিছিমিছি তোমার খাবারটা কেন ফেলা যাবে?"

নন্দ কিছুতেই শুনিল না। একটা ছেঁড়া মাদুরে জড়ানো বালিশ কাপড়চোপড়, এবং ভাঙা একটা বইয়ের তোরঙ কুলী-ছোক্‌রার মাথায় চাপাইয়া অন্ধকার বারান্দায় বিমানকে আসিয়া সে প্রণাম করিল। বিমান ততক্ষণে কাপড় ছাড়িয়া বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "একটু দাঁড়াও।" ঘরে গিয়া দরজাটাকে ভেজাইয়া দিয়া বাতির আলোয় মনিব্যাগটাকে বেশ করিয়া ঝাড়িয়া দেখিল, সুভদ্রের নিকট হইতে ধার-করা দশ টাকার নোটটা, আনা-চারেক পয়সা, মেয়েলী হস্তাক্ষর সম্বলিত এক টুক্‌রা কাগজ, সুন্দর 'মিনিয়েচার ড্রয়িং'-এর ছোট একটি প্রিন্ট—এইমাত্র তাহাতে আছে। ভাবিল, 'ধুত্তোর, খামোকা এত হাঙ্গাম ক'রে ভর সন্ধ্যেয় দাড়ি কামালাম। যাক্‌।' আলো নিবাইয়া ফিরিয়া আসিয়া দশ টাকার নোটখানি নন্দের দিকে বাড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "টুইশানীর মাইনে পেতে এখনও ত হপ্তা দুয়েক বাকী, এই টাকা-ক'টা রাখো, বুঝে-শুনে খরচ কোরো।"

নন্দ জিভ কাটিয়া পিছাইয়া গেল, তারপর হাত-দুটি জোড় করিয়া কহিল, "আমাকে আশীর্ব্বাদ করবেন, তাহলেই ঢের হবে। অজয়-দাকে, সুভদ্র-দাকে বলবেন আমার ওপর যেন রাগ না করেন। তাঁদের পায়ের ধুলো না নিয়েই পালাতে হচ্ছে, সেই শাস্তিই ত আমার যথেষ্ট।" উদ্যত অশ্রু সংবরণ করিয়া সে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

নির্ব্বান্ধব পৃথিবীতে এই তিনটি মানুষকে অত্যন্ত অভাবিত ভাবে তাহার আত্মার আত্মীয়রূপে সে পাইয়াছিল, বিনা-অপরাধেই তাহাদের হারাইতেছে। ইহার পর রোগে-শোকে আপদে-বিপদে মুখের দিকে এতটুকু নির্ভরের আশায় মুখ তুলিয়া চাহিতে পারে, এমন কেহ তাহার আর রহিল না।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাহার চলিয়া যাওয়ার পথের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বিমান একটু হাসিয়া ভাঁজ-করা নোটটিকে আবার মনিব্যাগের পকেটে রাখিল, তারপর ছড়ি ঘুরাইয়া বাহির হইয়া যাইতে যাইতে মনে মনে কহিল, 'যাক্‌, নগদ দশ-দশটা টাকা লাভ হয়ে গেল। আর একটু হলেই যাচ্ছিল আর কি! কপাল বলি এ'কেই!'

বিকালের রোদে তখন সোনালী রঙের ছোপ লাগিয়াছে। ঐন্দ্রিলা তাহার কলেজের কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া ধীরে আসিয়া তেতলায় তাহার পড়িবার ঘরের সমুখকার বারান্দায় রেলিঙের উপর দুইটি শুভ্রনিটোল বাহুর ভর রাখিয়া দাঁড়াইল। আজ সমস্ত দিন তাহার মনটা নিদারুণ তিক্ততায় ভরিয়া রহিয়াছে, ...

মুহূর্ত্ত বইয়ের পাতায় মন বসে নাই, বাড়ী ফিরিয়াও শান্তি পাইতেছে না। ইচ্ছা করিতেছে, এখনই আবার কোনও একদিকে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে, কিন্তু যাইবার মত জায়গাও কি ছাই পৃথিবীতে কোথাও একটা আছে।

তাহার অপরাধের মধ্যে কাল সমস্ত রাত নানা দুশ্চিন্তায় জাগিয়া কাটাইয়া প্রভাতে উঠিয়া মায়ের কাছে পিতার সংবাদ লইতে গিয়াছিল। "তোমার বাবা ভাল আছেন," কোনও প্রকারে এই কথা-কয়টি মাত্র বলিয়া মা এমন মুখ করিয়া রহিলেন, যে, আর কিছু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহসেই কুলাইল না। সমস্ত দিন তাঁহার মুখের সেই কি-এক অদ্ভুত-ধরণের কঠোরতার ছাপকে সে নিজের মনে বহিয়া বেড়াইয়াছে। মায়ের ভ্রূকুটিকুটিল কালো চোখের অন্ধকার তাহার চিত্তাকাশ ব্যাপিয়া কোন্ অশুভ ছায়া বিস্তার করিয়াছে, তাহার আসল রূপটাকে সে জানে না বলিয়াই তাহা আরও বেশী ভয়াবহ। কি হয় যদি সমস্ত নীরবতার আড়াল ভাঙিয়া দিয়া তাহার মা তাহাকে অনাবৃত নির্ম্মম সত্য যাহা তাহার সঙ্গে মুখোমুখি করিতে দেন? পৃথিবীতে এমন কি অকল্যাণ থাকা সম্ভব, এই কয়দিন কল্পনায় বারে বারে সাহসের সঙ্গে যাহার সম্মুখীন তাহাকে না হইতে হইয়াছে? যে-শাস্তি নীরবে দিনের পর দিন তাহাকে বহন করিয়া চলিতে হইতেছে, তাহা হইতে বেশী কঠোর আর কি আঘাত পৃথিবীর মানুষের মুখের দুইটি কথা হইতে সে পাইতে পারে?

পারে না সে পিতার কাছে ছুটিয়া গিয়া এই যন্ত্রণার অবসান করিতে? তিনি কখনও মিথ্যা বলিবেন না, ঐন্দ্রিলার দিন কত দুঃখে কাটিতেছে তাহা জানিতে পারিলে সত্য-গোপন করিতেও চাহিবেন না।...অন্ততঃ-পক্ষে তাঁহাকে চিঠিও একটা লেখা চলে? তা-ই সে লিখিবে, এবং পিতারই নিকট হইতে সত্য যাহা তাহা সে জানিয়া লইবে।...কিন্তু দেশ ছাড়িয়া আসিবার পূর্ব্বে কয়েক দিন ধরিয়া পিতার পলাইয়া বেড়ানো মনে পড়িল। চকিতে দু-একবার তখন তাঁহার ভীত-বিষণ্ণ মুখ সে ঐন্দ্রিলা না বুঝিয়া অসতর্কে আরও মর্ম্মান্তিক কোনও দুঃখ হয়ত তাঁহাকে দিয়া বসিবে।

যে-দেবতাকে শৈশব হইতে পিতার আসনে স্থাপন করিয়া সে পূজা করিতে শিখিয়াছিল, তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল,আমার এই নিষ্কলুষ জীবনে এত দুঃখ আমার পাওনা হইতে পারে না। আপনার জন পৃথিবীতে আমার ত বেশী নাই, আমার স্নেহময় পিতাকে তুমি আমার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইও না।

হেমবালা দুতলায় তাঁহার ঘরে বসিয়া সেলাই করিতেছিলেন। মন্দিরা তাঁহার পাশে বসিয়া পরিত্যক্ত কাপড়ের ছাঁট সংগ্রহ করিয়া সুভদ্রের কাছ হইতে পাওয়া তাহার নূতন পুতুলটিকে নানা বিচিত্র বেশে সাজাইতে-ছিল। অন্যদিন এমন সময় ঐন্দ্রিলা একবার আসিয়া অন্ততঃ মায়ের খবর লইয়া যায়, আজ সন্ধ্যা অবধি সে আসিল না দেখিয়া তিনি নিজেই ধীরপদে একবার তেতলায় আসিলেন। বলিবার মত কথা কিছু ছিল না, বলিলেন, "বীণাকে একটু না-হয় গিয়ে সাহায্যই কর্ ইলু। বেচারী সারাটা বিকেল ঠাকুরের সঙ্গে আগুনের আঁচে পুড়ছে।"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "যাচ্ছি মা," কিন্তু গেল না। ঘরের কাজ যাহা-কিছু প্রয়োজন হইলে বীণাই করিত, হেমবালা মন্দিরাকে দেখিতেন, তিনি যখন ছিলেন না আয়া দেখিত, ঐন্দ্রিলা পারতপক্ষে কোনও-কিছুতে হাত দিত না। পারিতও না, তাহার ভালও লাগিত না। বীণা সুবিধা পাইলে তাহাকে কথা শোনাইতে ছাড়িত না বটে, কিন্তু আসলে সেও ঐন্দ্রিলাকে সহজে কিছু করিতে দিত না। এই লইয়া ঐন্দ্রিলার অসাক্ষাতে হেমবালার সঙ্গে সে ঝগড়া করিত। বীণা বলিত, "আমরা যখন কলেজে পড়তাম তখন আমরাই কিছু কি কোনোদিন করেছি? কলেজের পড়া ক'রে আবার নাকি কিছু করা যায়।"

হেমবালা বলিতেন, "তা যদি না যায় বাছা, ত এরপর পড়াশোনা চুকলে, ঘরসংসার হলে তখন নিজের ঘরের কাজ নিজে গুছিয়ে করবে না ত কি পাড়ার লোকে এসে ক'রে দিয়ে যাবে?"

ঐন্দ্রিলাকে কলিকাতায় পড়িতে পাঠাইয়াছিলেন, বীণার সে-কথা অজানা ছিল না, একটু বিস্মিত হইয়া বলিত, "এত বড় জমিদারের ঘরের মেয়ে, ওর ভাবনা কি পিসীমা, একটা বড়লোক জামাই ধ'রে বিয়ে দিয়ে দিও।"

হেমবালা বলিতেন, "তা তোমরা দিতে দেবে কি-না বাছা, আমাদের কথায় এ-কালে আর কিছু হবার জো নেই। কবে কা'র পেছনে ছুট দিয়ে কোন্ খোলার ঘরে গিয়ে উঠবে, আমরা হয়ত টেরও পাব না তাছাড়া ও যতবড় জমিদারের মেয়েই হোক, ওর বিয়েতে একটি টাকাও আমি খসাব না, তা ঠিকই ক'রে রেখেছি।"

এইখানটায় বীণা হঠাৎ চুপ করিয়া যাইত।

নীচে হইতে বীণার গলা শোনা গেল, "পিসীমা, ইলুকে আসতে বল, খাবার তৈরি হয়েছে।"

হেমবালা বলিলেন, "শুনছিস ?"

ঐন্দ্রিলা শুনিল কি-না বোঝা গেল না। তাহাদের বাড়ীর সম্মুখে লাল সুরকির পথটা যেখানে দূরে মাঠের মাঝখানে বড় রাস্তার সঙ্গে গিয়া মিলিয়াছে, সেইদিকে তাকাইয়া সে হঠাৎ কোন অব্যক্ত আবেগে শিহরিয়া উঠিল। প্রথমে মনে হইল, ভুল দেখিয়াছে, কিন্তু ক্রমে আর সন্দেহ রহিল না। দূরের মানুষটি একটু একটু করিয়া কাছে আসিতে লাগিল। ঐন্দ্রিলা বুঝিল, একাগ্র প্রখর দৃষ্টিতে সে তাহাকেই দেখিতেছে। তাহার সে-দৃষ্টিকে সহ্য করাও যায় না অথচ সে-দৃষ্টির দিক্ হইতে চোখ ফিরাইয়া লওয়াও অসাধ্য। সে কি তাহাদেরই বাড়ীতে আসিতেছে ? তাহাকে ত কেহ এ বাড়ীতে আসিতে ডাকে নাই ? শুষ্ক চোখমুখ, ধূলিধূসরিত পা, রুক্ষ অসম্বৃত চুল, এ তাহার কি মূর্ত্তি ? কি সে চায় ? কি তাহার এই দৃষ্টির অর্থ ? ঐন্দ্রিলার কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল।

হেমবালা আবার ডাকিলেন, "কি হ'ল তোর ইলু ?"

"এই যে যাচ্ছি," বলিয়া একঝটকায় মুখ ফিরাইয়া লইয়া কম্পিত দ্রুতপদে ঐন্দ্রিলা নীচে নামিয়া গেল। বীণাকে কিছু বলিল না, কিন্তু ইহার পর বহুক্ষণ তাহার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

অজয়কে যতদূর হইতে দেখিয়া ঐন্দ্রিলা চিনিতে পারিয়াছিল, ঐন্দ্রিলাকে ততদূর হইতে অজয় চিনিতে পারে নাই। তাহার কারণ অজয় চলিতেছিল এবং চলমান্ মানুষকে চেনা সহজ। ঐন্দ্রিলা একে ছিল দাঁড়াইয়া, তাহার উপর অজয়ের ধারণা খানিকটা দূর হইতে প্রায় সব বাঙালীর মেয়েরাই দেখিতে একরকম। তাহারা একই রকম করিয়া চুল বাঁধে, একই ধরণে শাড়ী ঘুরাইয়া পরে এবং একই ভঙ্গিতে প্রায় দাঁড়ায়। অজয় জানিত ঐন্দ্রিলারা বালিগঞ্জের এই দিক্‌টাতেই কোথাও থাকে। প্রথমে ভাবিয়াছিল ঐন্দ্রিলা, তারপর ভাবিয়াছিল আর কেহ, শেষে ভাবিয়াছিল বীণা এবং সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু নিঃসন্দেহ ভাবে ঐন্দ্রিলাকে চিনিতে পারা মাত্র তাহার আর সম্মুখে চলিতে পা উঠে নাই। আজও প্রায় সমস্ত দিন নিজেকে ভুলিবার চেষ্টায় পথে পথে সে ঘুরিয়াছে, তাহার উপর এই আকস্মিক ভাবাবেগের আঘাতে তাহার দেহ অবশ হইয়া আসিতেছিল। বুকের মধ্যে দারুণ শুষ্কতা, নাক জলিতেছে, নিঃশ্বাস দ্রুত পড়িতেছে, এমনই অবস্থায় সে বালিগঞ্জের রেলষ্টেশনে একটা বেঞ্চিতে আসিয়া বসিল। গাড়ীর দেরী ছিল, দুই করতলে মুখ ঢাকিয়া সে তাহার ক্লান্ত দেহমন-ইন্দ্রিয়কে একটুখানি বিশ্রাম দিবার ব্যর্থচেষ্টা করিতে লাগিল।

ঐন্দ্রিলার খাওয়া শেষ হইতেই সুলতা আসিয়া পৌঁছিলেন। সোজা খাবার ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "সব শেষ করেছ, না আছে কিছু ?"

"ওমা, সব শেষ হবে কি ?" বলিয়া বীণা তাড়াতাড়ি এক রেকাবি ভরিয়া খাবার সাজাইয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিল।

সুলতা বসিয়া ছিলেন, উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, "দেখ বীণি, তুই রোজরোজ আমায় এইরকম অপমান করে অপমান করবি ?"

ঐন্দ্রিলা হাসিয়া উঠিল। বীণা বলিল, "সে কি, অপমান আবার কখন্ করলাম ?"

"আমি কি এতগুলো খাই ?"

"বেশী খাওয়াটা বুঝি ভারি অসম্মানের কথা ?"

"তা বই কি, এরিষ্টক্র্যাট্‌রা বেশী খায় না," বলিয়া

সুলতা প্রায় এক নিঃশ্বাসে থালাভরা খাবার শেষ করিলেন। বলিলেন, "এ মালপো বীণার হাতের তৈরি; মুখে দিয়েই তা বুঝতে পেরেছি।"

ঐন্দ্রিলা অন্যমনস্ক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সুলতা তাহাকে হুকুম করিলেন, "হাঁ ক'রে চেয়ে রয়েছিস্ কি? কারুকে কোনোদিন খেতে দেখিস্নি নাকি? দে, চা ঢেলে দে।" চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে কহিলেন, "হ্যাঁ রে বীণি, অজয়বাবু কি একলা এসেছিলেন? কতক্ষণ ছিলেন?"

বীণা নিজের উদ্যত পেয়ালা ঠোঁটের কাছ হইতে নামাইয়া বলিল, "কে, অজয়বাবু? কই, তিনি ত আসেন নি?"

সুলতা বলিলেন, "বা রে, আমি পথে আস্তে স্পষ্ট দেখলাম, তোদের বাড়ীর দিক্ থেকে এসে বড় রাস্তায় পড়লেন, ভুল হবার ত কথা নয়। রসিকতা কর্‌ছিস্ বুঝি?"

বীণা ব্যগ্রতা লুকাইবার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়াই বলিল, "না, সুলতাদি, না। কখন্ দেখলে?"

"এই ত কয়েক মিনিট আগে।"

বীণা চঞ্চল হইয়া উঠিল, তবু বলিল, "রসিকতটা তোমার দিক্ থেকে হচ্ছে বুঝি?"

সুলতা বলিলেন, "ভাল জ্বালা, এত লোক থাকতে অজয় বাবুকে নিয়ে হঠাৎ রসিকতা করতে যাব কেন।"

ঐন্দ্রিলা সচরাচর চা খায় না, এক পেয়ালা ঢালিয়া লইয়া বসিল। বীণা বলিল, "ইলু, তুই ত বাইরে ছিলি, জানিস কিছু?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "অজয়বাবুরই মত একজনকে মনে হল।"

বীণা কহিল, "আমাদের বাড়ীর দিকে আসতে দেখেছিলি?"

"এই দিকেই ত আসছিলেন—"

"আমায় আগে বলিসনি কেন?" বলিয়া বীণা উঠিয়া পড়িয়া ঝি-চাকর সব-ক'জনকে ডাকিয়া একসঙ্গে জড় করিল। সকলকে বারবার জেরা করা সত্ত্বেও কেহ স্বীকার করিল না, যে আজিকার দিনমানের মধ্যে দিদিমণিদের খোঁজ কেহ আসিয়া করিয়াছে। বীণার তবু দৃঢ় বিশ্বাস হইল, নীচে দারোয়ান বেহারা কাহারও সাড়া না পাইয়া অজয় ফিরিয়া গিয়াছে। দুঃখে অপমানে তাহার গলায় দড়ি দিয়া মরিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। কি মনে করিয়াছে ভদ্রলোক? সব হইতে তাহার বেশী রাগ হইতে লাগিল ঐন্দ্রিলার উপর। অজয় আসিতেছে দেখিয়া তারপর একবার খোঁজ লইতে হয় সে ফিরিয়া গেল কি না। সত্যসত্যই সে যখন আসিল না দেখিল, তখনও কি সেকথা একবার মনে হইতে নাই? কিন্তু ঐন্দ্রিলাকে মুখে সে কিছুই বলিল না। তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুইয়া কাপড় বদ্‌লাইয়া সুলতার সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

তাহারা চলিয়া যাওয়ার পর ঐন্দ্রিলা সেই যে তেতলার বারান্দায় তাহার আগেকার জায়গাটিতে আসিয়া দাঁড়াইল, শীঘ্র সেখান হইতে আর যে সে নড়িবে এমন ভরসা রহিল না। অজয় সত্যই ফিরিয়া গিয়াছে। অনাহূত আসিয়াছিল, ঐন্দ্রিলা তাহাকে দেখিয়াও সরিয়া চলিয়া গিয়াছে। চাকরটাকে পাঠাইয়াও তাহাকে ভিতরে আহ্বান করে নাই। তাহার আজন্মের সংস্কার-বহির্ভূত এ কি নিদারুণ অশিষ্টাচার সে আজ করিল? ইহার কি প্রয়োজন ছিল? নিজের ব্যবহার ভাবিয়া নিজেই সে এখন অবাক্ হইয়া গেল। যাহার সঙ্গে একদিন পূর্ব্বে পর্য্যন্ত কোনও সম্পর্কই তাহার ছিল না, আজ কৃত-অপরাধের অনুশোচনার সঙ্গে অলক্ষ্যে মিলিয়া গিয়া হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত বড় হইয়া সে দেখা দিল। অজয় যে এ-জীবনে তাহার এই অনিচ্ছিত অপরাধকে কোনওদিন ক্ষমা করিবে না, ইহা মনে করিয়া তাহার বুকের ভিতরটা কেমন একরকম করিতে লাগিল। কোনও কিছুতেই খুব বেশী অধীর হওয়া তাহার স্বভাব নহে, অন্ধকারে বাহিরে দূরে মাঠের দিকে নির্নিমেষ-নেত্রে চাহিয়া চিত্রার্পিতের মত সে দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্রমশঃ



বাংলা

কৃতী বাঙালী ছাত্র—

ডাঃ শশধর সিংহ বি-এস্-সি (লণ্ডন) পি এইচ-ডি (লণ্ডন) অর্থনীতি শাস্ত্রে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ইনি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক ও ছাত্র। ডাঃ সিংহের বাড়ি শ্রীহট্ট জেলার



ডাঃ শশধর সিংহ

অন্তর্গত রাড়িশাল গ্রামে। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় শশীন্দ্রচন্দ্র সিংহ মহাশয় আসামের একজন সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্রসেবী ছিলেন। ডাঃ সিংহ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "হুমবোল্ড" বৃত্তি পাইয়া দেড় বৎসরকাল জার্ম্মানীর বার্লিন ও হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ে অধ্যয়ন করেন। তাঁহার মৌলিক গবেষণা মূলক প্রবন্ধ ইউরোপের বহু খ্যাতনামা অধ্যাপকের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে।

রামকৃষ্ণ মিশন শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান—

রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা ভবানীপুরে ১০৪নং বকুলবাগান রোডে একটি "শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান" খুলিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য বিজ্ঞানসম্মত-ভাবে গর্ভিণীর তত্ত্বাবধান করা, শিক্ষিতা ধাত্রী দ্বারা প্রসবকালীন সাহায্য ও সেবা করা এবং অন্ততঃ এক বৎসর পর্য্যন্ত নবজাত শিশুর পর্য্যবেক্ষণ করা। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় (সভাপতি), স্যর হরিশঙ্কর পাল, ডাঃ বামনদাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে লইয়া পরিচালক সমিতি গঠিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশন শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী দয়ানন্দের নিকট ইহার বিষয় জানা যাইবে।

৺ ফণীভূষণ রায়—

ঢাকা নিবাসী শ্রীমান ফণীভূষণ রায় বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি সেতার বাজনায় ওস্তাদ হইয়াছিলেন। ঢাকার স্বর্গীয় ভগবান দাসের নিকট সেতার বাজনা শিক্ষা আরম্ভ করেন। তাঁহার



ফণীভূষণ রায়

মৃত্যুর পর ফণীভূষণ কলিকাতার বিখ্যাত ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁর নিকট সেতার বাজনা শিখিয়াছিলেন। ফণীভূষণের অকাল মৃত্যুতে সঙ্গীতকলা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

বালিকাদের লাঠি ও ছোরা খেলা—

কলিকাতার বাগবাজারে সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের সময় বালিকারা



মেয়েদের ব্যায়াম



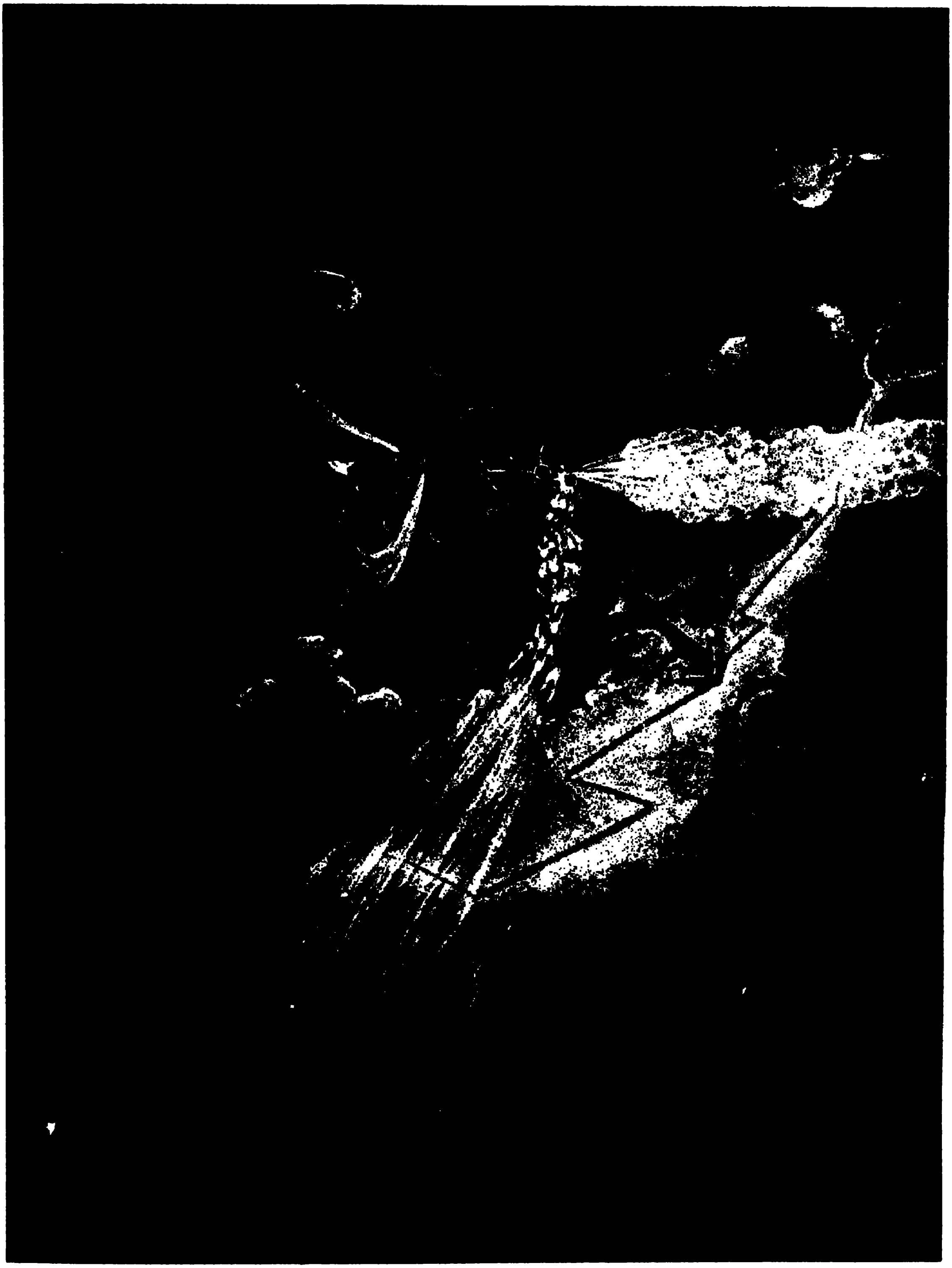
মেয়েদের ব্যায়াম

লাঠি ও ছোরা খেলায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা ইহার কয়েকটি চিত্র এখানে দিলাম।

পরলোকে চন্দ্রমাধব ঘোষ—

চন্দননগর নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ ১৩৩৯ সনের ৯ই আষাঢ় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি সরোজ নলিনী দত্ত নারী মঙ্গল সমিতির একজন প্রধান কর্ম্মী ও সহযোগী সম্পাদক, কাঁকিনাড়া শ্রমিক সমিতির সহকারী সভাপতি এবং কলিকাতা কেরাণী সমিতি ও ল্যান্সডাউন জুট মিল শ্রমিকসঙ্ঘের সহকারী সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৩৩৬ সালে কলিকাতা ইণ্ডিয়া ক্লাবের সম্পাদক এবং ১৩৩৮ সালে চন্দননগর স্পোর্টিং ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। এ ছাড়া তিনি নানা জনহিত কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বভারতী এবং অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সভ্য ছিলেন। সরোজ নলিনী নারীমঙ্গল সমিতিতে তিনি যোগদান করিয়া ক্রমে ক্রমে নিজ যোগ্যতায় প্রায় সকল বিভাগের কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৩৩৫ সালে ঐ সমিতির অর্থসাহায্য কল্পে যে বিরাট প্রদর্শনী এবং উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা চন্দ্রমাধব বাবুর ঐকান্তিক উদ্যমে সাফল্য লাভ করিয়াছিল।

চন্দ্রমাধব-বাবু নিখিল ভারত ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রাদেশিক সমিতির কার্য্যকরী সভার সদস্যরূপে ভারতীয় শ্রমিকদিগের উন্নতিকল্পে



প্রলয়ের আলো

শ্রীশৈলেন্দ্রভূষণ দে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা



মেয়েদের ব্যায়াম

চেষ্টা করিয়াছিলেন সেইজন্ত শ্রমিকদিগের নিকট তাঁহার বিশেষ সুনাম ছিল।

চন্দ্রমাধব-বাবু বিলিয়ার্ড ও টেনিস খেলায় খুব সুদক্ষ ছিলেন। তিনি ঐ সব খেলায় জিতিয়া অনেকগুলি রৌপ্যনির্ম্মিত 'কাপ' এবং নানারূপ পারিতোষিক পাইয়াছিলেন।

খদ্দরের প্রতি তাঁহার অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি তাঁহার পরিবারবর্গকে খদ্দর ছাড়া আর কিছু ব্যবহার করিতে নিষেধ করিতেন।

চন্দ্রমাধব-বাবুর উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষাকল্পে চন্দননগর স্পোর্টিং ক্লাবের সভ্যগণ উক্ত ক্লাবগৃহে তাঁহার প্রতিকৃতি রাখার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং তাঁহার নামে 'ট্রফি' দিবারও ব্যবস্থা করিয়াছেন।



চন্দ্রমাধব ঘোষ

সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির সদস্যগণ উপযুক্তরূপে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্ত অর্থসংগ্রহ করিয়া উক্ত সমিতিগৃহে একটি তৈলচিত্র এবং তাহার নিম্নে একটি মর্ম্মর প্রস্তরফলক স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এ ছাড়া সরোজনলিনা শিল্পশিক্ষালয়ে দুইটি ছাত্রীকে তাঁহার নামে দুইটি অবৈতনিক বৃত্তি দেওয়া হইবে ও প্রতিবৎসর তাঁহার নামে একটি করিয়া স্বর্ণপদক বা অন্ত কোনরূপ পারিতোষিক বিতরণ করা হইবে। ঐ সমিতির সদস্যগণ চন্দ্রমাধব-বাবুর নামে একটি স্মৃতিভাণ্ডারও খুলিয়াছেন।

—

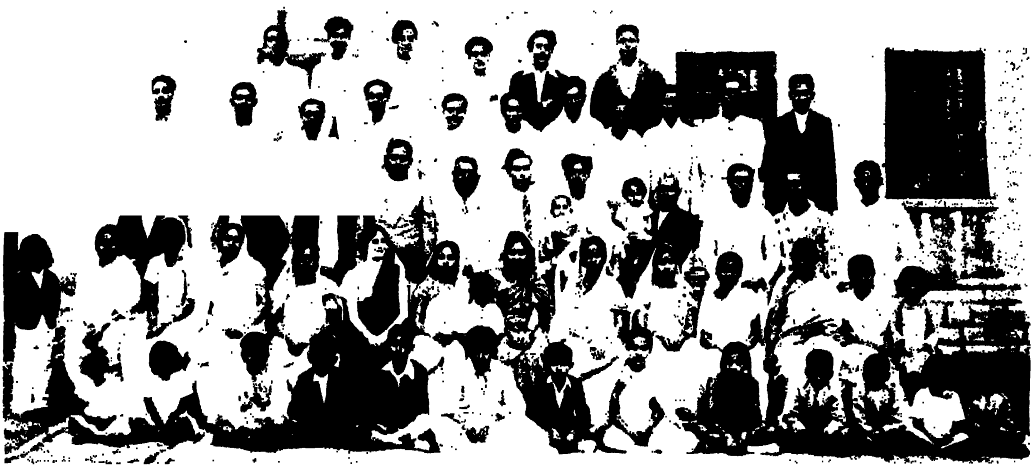
ভারতবর্ষ

করাচী বাঙালী সমিতি—

করাচী-প্রবাসী বাঙালীগণ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়কে



আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও করাচীর বাঙালীগণ



বঙ্গলোরে প্রবাসী বাঙালী

সেখানে অবস্থান কালে অভিনন্দিত করেন। অভিনন্দন প্রদান উপলক্ষ্যে প্রবাসী বাঙালী স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা সকলে সাগ্রহে যোগদান করিয়াছিলেন।

বঙ্গলোরে বাঙালী সম্মিলনী—

বঙ্গলোরে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের অধ্যাপক ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র গুহ ডি-এস্‌সির উৎসাহে ও চেষ্টায় গত ১২ই কার্ত্তিক শনিবার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে বঙ্গলোরে প্রথম বার্ষিক বাঙালী সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। তদুপলক্ষে সহরের সমগ্র বাঙালী যোগদান করেন। সম্মিলনীর অন্যান্য কার্য্যের পর বালকগণের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা ও তৎপর সমবেত সভ্যগণের একটি আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়। অতঃপর নাটকাভিনয় ও প্রীতিভোজন দ্বারা সম্মিলনীর কার্য্য সমাপ্ত করা হয়।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন—

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র সিংহ জানাইতেছেন,—

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের দশম অধিবেশন এ বৎসর বড় দিনের অবকাশে এলাহাবাদে হইবে। দিন—২৭, ২৮ ও ২৯এ ডিসেম্বর ধার্য্য হইয়াছে। মাননীয় বিচারপতি স্যর লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মহিলা-সংবাদ

কলিকাতা ব্রাহ্ম বয়েজ্‌ স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তীর কন্যা শ্রীমতী বীণা চক্রবর্ত্তী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দর্শনশাস্ত্রে এম এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে চতুর্থ হইয়া অনার্স সহ বি-এ পাস করেন। তিনি তাঁহার কৃতিত্বের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একটি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন।



পারস্য-ভ্রমণ

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

এদেশে আসবার আগেই এখানকার অনেক বিষয়ের সম্বন্ধে খুব কৌতূহল ছিল। দেশটা কি রকম, এখানকার লোকজনই বা কেমন, তাদের আচার-ব্যবহার ধরণধারণ এসবই বা কি রকম? এদের মধ্যে ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখ্‌তে পাব, না আমাদের দেশের নকল মোগল, পারসীক ও তুর্কীদেরই অতি উৎকট "ডবল ডিষ্টিল্‌ড্‌" সংস্করণ পাব? ইংরেজী ভাষার মারফৎ এদের সাহিত্যের যেটুকু পরিচয় পেয়েছিলাম তাহাতে ত কয়েকটি তৃষ্ণার্ত্ত দার্শনিকের মায়াবাদ—কিংবা অন্যদিকে ঘোরতর বস্তুতন্ত্র—এবং উন্মত্ত প্রেমিকের দিবাস্বপ্ন ছাড়া আর বিশেষ কিছু পাইনি। অবশ্য যাঁদের পারসী ভাষায় এবং তত্ত্বে জ্ঞান আছে ব'লে শুনেছিলাম তাঁদের কাছে এই সবের অন্য অর্থও পেয়েছিলাম এবং সেই টীকার সাহায্যে অনুপম এক মায়াপুরীর একটি আবছায়া ভাবও দেখতে পেয়েছিলাম। তবে নিজের দেশের সম্বন্ধে বিদেশীদের বর্ণনা, মতামত এবং ভালমন্দ দুই রকমই টীকা-টিপ্পনী পড়ে এটা বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, আসল পারস্য—আসল ভারতবর্ষের মতই—ইংরেজী বইয়ের পারস্য থেকে অন্যরকম কিছু একটা হবে। পশ্চিম দেশে এখন বিশেষজ্ঞের যুগ চলেছে, কাজেই তাঁদের বর্ণনায় প্রাচ্যজগতের মধ্যে হয় বিশেষভাবে দোষ দেখান আছে কিংবা বিশেষভাবে গুণ দেখান আছে, দুইয়ের মাঝামাঝি কিছু লেখা তাঁদের ধাতে আসে না।

সাক্ষাৎ পরিচয়ে চোখে-দেখা পারস্যে বই-পড়া জিনিষ থেকে অনেক প্রভেদ দেখা গেল। তবে এখানেই ব'লে রাখা ভাল যে, দু-মাস মাত্র দেশ দেখে তার সমস্ত বিষয়ে সর্ব্বজ্ঞের মত সঠিক খবর দেওয়া ইংরেজ বা আমেরিকান ভবঘুরে ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব নয় এবং উক্ত মহাপুরুষদের খবর যে কতটা খাঁটি হয় তাও এখন অনেকেই জানেন। সুতরাং এই বৃত্তান্তে যা লেখা আছে সেটার যাচাই পাঠক ঐ হিসাবেই করবেন। যাই হোক, প্রথমে এদেশের লোকের কথাই বলা যাক।

এদেশটার অধিকাংশ লোকই আমাদের দেশের মত অতি দরিদ্র, কায়ক্লেশে কঠোর পরিশ্রমের ফলে বেঁচে আছে মাত্র। অন্যদিকে খুব অল্পসংখ্যক এক দল আছেন যারা খুবই ধনী—আমাদের দেশের রাজা-মহারাজা, জমিদার-শ্রেষ্ঠীদের মত—যাদের ঐশ্বর্য্য বিদেশীরও চোখ ঝলসাইয়া দেয়। নূতন আমলে অনেকেরই অবস্থার হেরফের হচ্ছে, কিন্তু ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ সেই রকমই এখনও রয়েছে, খাঁটি মধ্যবিত্ত আমাদের দেশের মতই এদেশেও নেই বললেই চলে। তবে এদেশে



নূতন পারস্যের সেনানায়ক



পারস্যের-পর্ব্বতমালা। উপত্যকায় যাযাবরদিগের তাঁবুর ছাউনি

যাযাবর-জাতীয় আরও এক শ্রেণীর অধিবাসী আছে, যাহা আমাদের দেশে এখন প্রায় লোপ পেয়েছে। এদের ঘরবাড়ি বলতে পশমী কাপড়ের তাঁবু, দেশ বলতে খোলা মাঠ, ধনদৌলত অর্থে ভেড়া ছাগল উট ইত্যাদি পশু এবং হাল সাকিম যেখানে পশুর পাল চরচে সেই প্রান্তর! আধুনিক সভ্যতার হিসাবে এদের অবস্থা নিতান্তই খারাপ—খাওয়া থাকা পরণ বা শয্যা, কোনটাই সুবিধার নয়—কিন্তু তাতে যে এরা কষ্ট বোধ করে বা নাগরিকদের হিংসা করে ব'লে মনে হয় না।

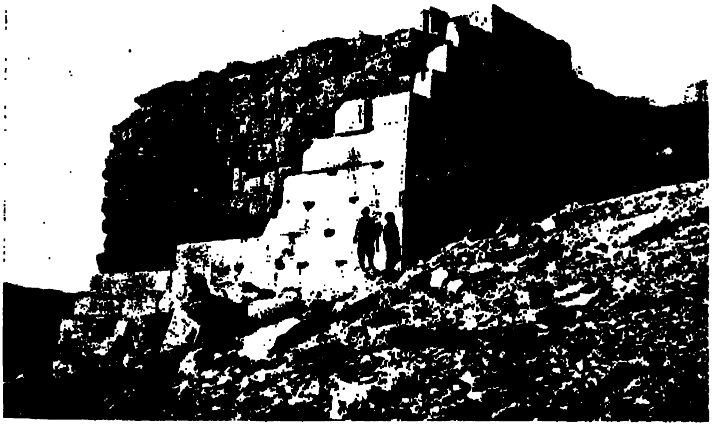
সাধারণ লোকদের মধ্যে যারা অবস্থাপন্ন, তারা প্রায় সকলেই ফরাসী বা আমেরিকান হবার চেষ্টা করছে। দরিদ্রদের অন্নচিন্তাই সার, তাদের বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক চাকরি বা কাজের জোগাড়ের জন্য বা রাজাদেশে যে বিদেশী পোষাক পরতে হয় সেই পর্য্যন্তই। অবস্থাপন্ন দলের মধ্যে এখন প্রধানত দু-রকম মনোবৃত্তির লোকই বেশী দেখলাম, এক দল ইটালীর ফাসিস্মোর মতাবলম্বী, দেশে প্রবল সামরিক শক্তি স্থাপনের জন্য যা-কিছু প্রয়োজন তাহার জন্য উদ্দীপনাপূর্ণ চেষ্টায় ব্যস্ত, অন্য দল বিদেশী বিলাস-সুখান্বেষী। অন্যপ্রকার চিন্তাস্রোতের ক্ষীণধারা মাঝে মাঝে দেখা যায়, তবে সেটা অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন।

এদেশবাসী ভারতীয়দের মধ্যে অধিকাংশই অশিক্ষিত—বেশীর ভাগই মোটরের চালক বা ব্যবসায়ী হিসাবে এখানে আছে। তাদের সঙ্গে এদেশীয়দের সদ্ভাব বা সহানুভূতি বিশেষ নেই, তবে স্পষ্ট বিদ্বেষও সে-রকম কিছু আছে ব'লে মনে হয় না। ভারতীয়দের

করিয়া টাকাটা লইয়া



পারস্যের পথের দৃশ্য। যাযাবর ও ভেড়ার পাল



মেশেদ মুরঘাব। কুরুষের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ

সম্পর্কে সুবিচারের অভাবের কথাও দু-এক জনের কাছে শোনা গেল। সে-বিষয়ে সত্যমিথ্যা বিচারের সময় বা সুযোগ আমাদের ছিল না, শুধু একথা বুঝলাম যে, এদেশে (অর্থাৎ বিদেশ মাত্রেই) ভারতীয় মাত্রেই অসহায়, তাঁদের যথার্থ প্রতিনিধি কেউ এখানে নেই, সুতরাং সকল বিষয়েই স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করেই চলতে হয়।

মোটের উপর এদেশে এখন ঘর-গোছানো চলেছে—তবে গোছাবার লোক এবং অর্থ দুইয়েরই অভাব। অন্যান্য বিষয়ে এরা আমাদেরই মত, তবে পরাধীন জাতির মধ্যে ঘরোয়া বিবাদ, পরস্পরের ছিদ্র অন্বেষণ, ধর্ম্মের নামে অত্যাচার ইত্যাদি যতটা থাকে, ততটা এখন এদেশে নেই। সভ্যতার হিসাবে, অর্থাৎ শিক্ষা কৃষ্টি বা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রপাতির ব্যবহারে এরা আমাদের চেয়ে



মেশেদ মুরঘাব। কুরুসের সমাধি



ইস্ফাহানের পথে। দূরে পাহাড়ের কোলে গ্রাম

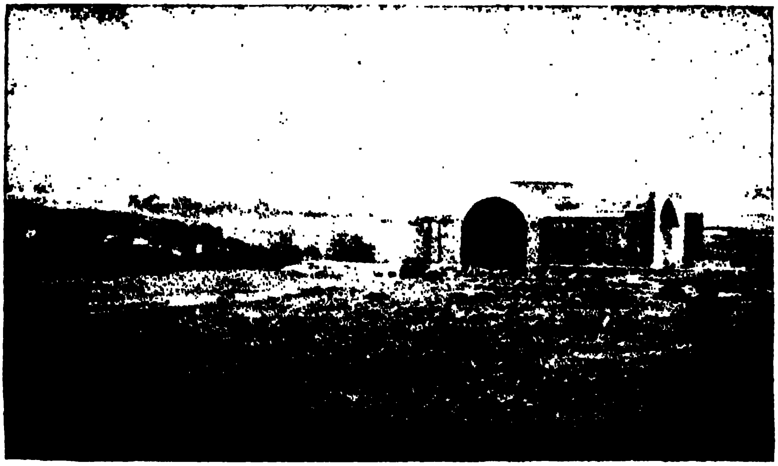
অনেক পিছাইয়া আছে। কিন্তু স্বাধীনতা অনেক দোষ ক্ষালন করে, সুতরাং এরা আমাদের চেয়ে অগ্রসর, একথা স্বীকার করতেই হবে।

* * *

ইংরেজী ভাষাটার বিশেষ কদর এদেশে নেই। যারা বিদেশী ভাষা শিক্ষা করে তাদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন ফ্রেঞ্চ শেখে, বাকী লোক ইংরেজী, জার্ম্মান বা অন্য ভাষা শেখে। বোধ হয় সম্প্রতি ঐশ্বর্য্যশালী আমেরিকার দিকে দৃষ্টি পড়ায় কিছু বেশী লোক ইংরেজী ভাষার দিকে ঝুঁকেছে, এবং কিছু লোক কাজ-কারবারের গতিকেও সেদিকে যাচ্ছে, নইলে এঁদের মতে শিক্ষা বা সভ্যতার পথ হিসাবে ইংরেজী ভাষা বা ইংরেজী শিক্ষাপদ্ধতি কোনটাই বিশেষ সুবিধার নয়। বুশিরের গভর্ণর প্রথম এই কথা আমাকে বলেন এবং তারপর আরও অনেকের কাছেই এই কথা শুনেছিলাম। এরূপ সিদ্ধান্তের কারণ যাই হোক, এটা সত্যি যে যদি কেউ এদেশে সহজ ভাবে চলাফেরা বা দেখাশুনা করতে চান, তবে ফারসী ভাষার অভাবে ফ্রেঞ্চ ভিন্ন তাঁর গতি নাই। ফারসী ভাষাও আমাদের দেশে যা শেখান হয় তার সঙ্গে আধুনিক ফারসী ভাষার অনেক প্রভেদ আছে, বিশেষতঃ উচ্চারণ ও



ইস্ফাহানের পথে। লেখকের গাড়ি বিকল



ইস্ফাহানের পথে। চায়ের দোকান

অলঙ্কারে। শ্রীযুক্ত ইরাণী ফারসী ভাষায় দক্ষ বলেই আমাদের দেশে পরিচিত—এমন কি, তাঁর এই ভাষায় লেখা বই বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য—কিন্তু এখানে আসার দিন-কয়েক পর থেকেই তিনিও দোভাষীর সাহায্যে কথাবার্ত্তা চালাতে লাগলেন। কবির জন্য ত দোভাষী ছিলই—আমার সম্বল ভাঙা ফ্রেঞ্চ এবং পুতুলনাচের মত অঙ্গভঙ্গী!

শিরাজে শিক্ষা-বিভাগের এক রাজকর্ম্মচারী আমাদের নিযুক্ত হলেন। তিনি প্রথমত হাত-পা নেড়ে আমাদের সঙ্গে কাজ চালাবার চেষ্টা করলেন, তাতে উভয় পক্ষেই হাস্যরসের সৃষ্টি ছাড়া আর কিছু হয় না দেখে আমি ভয়ে ভয়ে ভাঙা ফ্রেঞ্চে কথা বলতে আরম্ভ করি। ফল মন্ত্রবৎ হ'ল, কেননা দু-চারটা কথা বুঝতে পারলে বাকীটা ইঙ্গিতেই চলে। এর পর যেখানেই ঠেকেছি ঐ ভাষা ব্যবহার করলেই একজন-না-একজন সমঝদার পেতাম।

(অর্থাৎ কবি ও প্রতিমা দেবী [illegible] আমাদের) [illegible]



ইস্ফাহান। শহরের বাইরে প্রাচীন জরথুস্ত্রী অগ্নিমন্দির



পার্সিপোলিস দেখে আমরা আবার ইস্ফাহানের পথে রওয়ানা হলাম। আমার গাড়ীতে সেই শিক্ষা-বিভাগের রাজকর্ম্মচারী মাঝে মাঝে ফ্রেঞ্চে কথা বলছিলেন। যেটা বুঝতে পারছিলাম তার উত্তর দিচ্ছিলাম, আবার তিনি আমার যে উত্তরটা বুঝছিলেন তার পাল্টায় আরও কথা বলছিলেন। গাড়ীর সাম্‌নের অংশে শ্রীযুক্ত মাসানী ব'লে বোম্বাইয়ের এক পার্সী ভদ্রলোক বসেছিলেন, তাঁর কাছেই শুনেছিলাম যে তিনি ফারসী ভাষায় সুদক্ষ ব'লে পার্সী ধনকুবেররা তাঁকে এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা বিচার করতে পাঠিয়েছে। তিনি হঠাৎ রাজকর্ম্মচারী মহাশয়ের সঙ্গে ফারসীতে কথা বল্‌তে আরম্ভ করলেন। দু-চারবার কথাবার্ত্তা হতেই বুঝলাম যে, আমার ফ্রেঞ্চের যা অবস্থা তাঁর ফারসীর অবস্থা ততোধিক খারাপ!

খানিক দূর যাবার পর কর্ম্মচারী মশায় বাঁদিকে দূরের পর্ব্বতমালার এক অংশ দেখিয়ে বললেন, "ইল এ লাবা কে ডর্‌ ল্য গ্রঁ সিরুস" (ঐখানে মহান কুরুষ নিদ্রা যাইতেছেন) "কম্বুজ-পুত্র সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি কুরুষ," যাঁর নেতৃত্বে পারস্যের বিজয় সেনানী মিশর, পশ্চিম-এশিয়া, যবন দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি একচ্ছত্র রাজ্যে পরিণত করেছিলেন, তাঁর সমাধিস্থল! আমি ত দেখবার



ইস্ফাহান। জয়ন্দে নদীর দৃশ্য

হল, পাঁচ ফার্‌সাখ্‌। তাতে ঠিক বোঝা গেল না, কেন-না এঁদের "ফার্‌সাখ্‌" আমাদের ডাল ভাঙা ক্রোশেরই জাত ভাই। সম্প্রতি কিছু করবার উপায় নেই দেখে—কেন-না আমাদের মধ্যাহ্নভোজনের পর্ব্ব তখনও শেষ হয় নি, এবং এদিকে বেলা প্রায় একটা—কি উপায়ে সেটা দেখা যেতে পারে তাই ভাবতে লাগলাম। খানিক দূর গিয়ে সাদাতাবাদ নামে একটা গ্রামে পৌছান গেল। তার বাইরে একটি বাগান এবং সেই বাগানেরই এক অংশে একটি জলের স্রোতের পাশে গাছের তলায় কার্পেট বিছিয়ে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। খাওয়া-দাওয়ার মধ্যেই আমি এর-ওর সঙ্গে কথা বলে মেশ্‌হেদ মুর্‌ঘাব (পাসারগাডাইয়ের আধুনিক নাম) গিয়ে কুরুষের প্রাসাদ ও সমাধি দেখবার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করলাম। দেখ্‌লাম কেউই রাজী নয়, সকলেরই ভাবনা কতক্ষণে আবাদেহ্‌ পৌছান যায়—সেখানে আজকের মত রাত্রিযাপন করতে হবে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গেল, ছুটি-চারটি ক'রে গ্রামের আশের পাশের লোকজন কবিকে দেখ্‌তে এলেন, তার মধ্যে একটি বিলাতি ধরণের পোষাকপরা মহিলা—বোধ হয় আর্ম্মানি, কিংবা রুশদেশীয়া—ছিলেন। মেহেরবান ভাইয়ের সঙ্গে কি করা যায় তার পরামর্শ করলাম। গাড়ীর তবে সে ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তাঁকে অনেক কষ্টে রাজী করিয়ে ঠিক হ'ল যে, আমরা দলের থেকে পৃথক হয়ে ঐ জায়গা দেখবার চেষ্টা করব। সেই মত রওয়ানাও হওয়া গেল, কিন্তু দেখা আর ঘটে উঠল না। প্রায় উল্টো

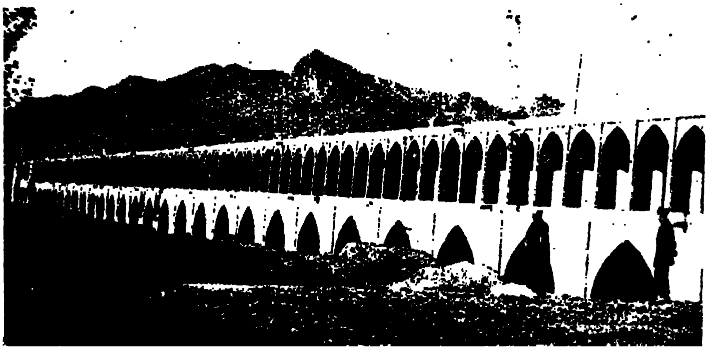


ইস্ফাহানের পথে। কবির গাড়ি থামাইয়া একদল ইরানি ভদ্রলোক অভিবাদন করিতেছেন

পথে যেতে হয় দেখে কর্ম্মচারী মশায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন, এবং আরও কাছে গিয়ে দেখা গেল যে, মোটরের পথ নেই। ড্রাইভার বললে যে প্রায় তিন মাইল হেঁটে যেতে হবে, এ দিকে সময়ও ছিল না ত কাজেই গাড়ী থেকে নেমে একটু দূর গিয়ে বাইনোকুলার দিয়ে দু-চারটে পাথরের দেয়াল আবছায়া ভাবে দেখে দূরের থেকেই নমস্কার করে ফিরতে হ'ল। সহযাত্রী অন্যদের এ সব দেখার উৎসাহ না থাকাতে এই রকম অনেক কিছুই দেখা গেল না। অন্যদের কথা না বললেও চলে, কিন্তু সঙ্গে



ইস্ফাহান। প্রসিদ্ধ পোল-ই-খাজু



ইস্ফাহান। অন্য একটি সেতু

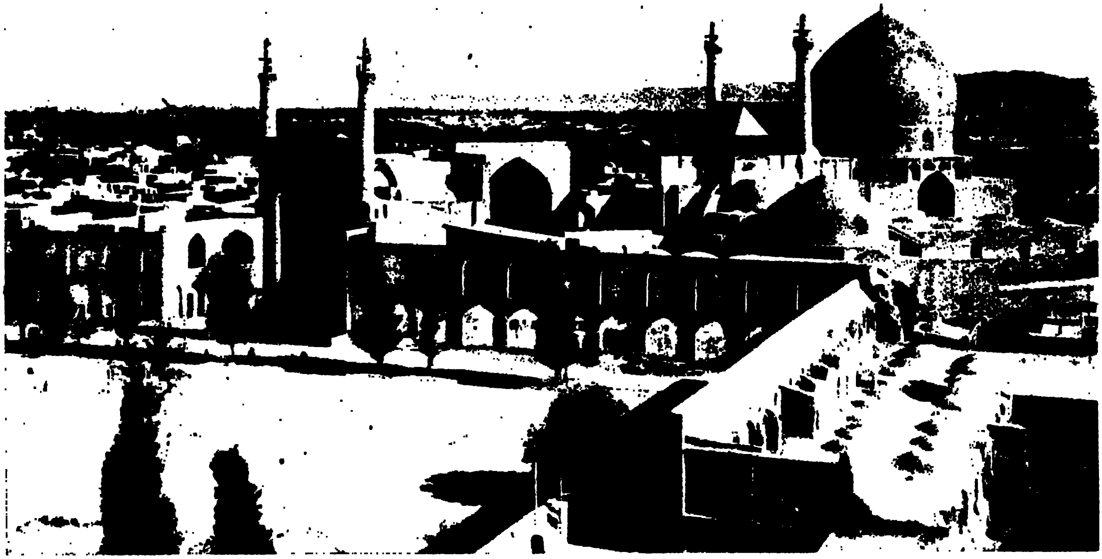
ছিলেন তাঁদেরও এ বিষয়ে উৎসাহ নেই এটা দেখে আশ্চর্য্য হয়েছিলাম। এই রকমে পার্সীপোলিসে সমাধিগুহাবলী এবং নবপ্রস্তর যুগের গ্রাম—যাহা হার্জফেল্ড সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন—এগুলোও ভাল ক'রে দেখা গেল না।

* * *

আবার পথ চলতে লাগা গেল। সেই জনমানবশূন্য বৃক্ষগুল্মবিরল প্রান্তর এবং অদ্ভুত ও অভিনব আকৃতির নানা বর্ণের পর্ব্বতমালা। পাহাড়ের গায়ে এত ভিন্ন ভিন্ন রঙের খেলা আগে আর দেখি নি। আমরা এখন চলেছি প্রায় ৫০০০ ফুট উঁচু মালভূমির বুকের ভিতর দিয়ে। সারাদিন আকাশে মেঘের খেলা চলেছে, দূরের পর্ব্বতশিখর কখন মেঘের মধ্যে দিয়ে একটু দেখা যাচ্ছে, কখন বা ঢেকে যাচ্ছে।

বেলা পড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আলোছায়ার খেলা যেন ক্রমেই বাড়তে লাগল। বাতাসের জোর আরও বাড়ল, মাঝে মাঝে বৃষ্টি এবং তুহিনের ঝাপটাও লাগতে লাগল। আশে পাশের পর্ব্বতমালার ভিতর দিয়ে মেঘের পর মেঘ ভেসে আসছিল, পাহাড়ের গায়ের রং রৌদ্রছায়ার ফেরে ক্ষণে ক্ষণে বদলে যাচ্ছিল। ধূমজ্যোতি সলিল-মরুতের এই অপূর্ব্ব খেলা, চারিধার নির্জ্জন, পথও মাঝে মাঝে ধূলিজালে ঢাকা, এই সব দেখে মনে হতে লাগল আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা এই রকমই কোন দেশের প্রাকৃতিক শক্তির রূপ-পরিবর্ত্তন দেখে প্রকৃতির উপাসক হয়েছিলেন। পক্ষধারি পর্ব্বত, ধূমায়মান গিরি এ সকল ঐরূপ দৃশ্য দেখলে সহজেই কল্পনা করা যেতে পারত।

হঠাৎ গাড়ী বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কল্পনার রাজ্য থেকে বাস্তবের রাজ্যে নেমে আসতে হ'ল। সন্ধ্যা হ'তে খুব জোর আর ঘণ্টা-দুই আছে, আগের দল ত অনেক এগিয়ে



ইস্ফাহান। আলাগাপ্ প্রাসাদ হইতে দৃশ্য

গিয়েছে, এদিকে বাতাস ত নয় যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে, তার দাপটে আর শৈত্যে খোলা গাড়ীতে বসে শরীর হিম হয়ে যাবার উপক্রম। সঙ্গের কর্ম্মচারী মশায় ত দু-চারবার ড্রাইভারকে "আকা, আকাজান, বেঞ্জীন না ডারি ?" (মহাশয়, প্রিয় মহাশয়, পেট্রোল নেই কি ?) ব'লে চুপ ক'রে গেলেন, আমি গাড়ীর থেকে নেমে লম্ফঝম্প ক'রে গা গরম করার চেষ্টা করতে লাগলাম। ড্রাইভার মশায় স্পার্ক, কম্প্রেশন, প্লগ ইত্যাদি দেখা শেষ ক'রে ট্যাঙ্ক থেকে সাইফনে পেট্রোল যাবার পাইপ পরীক্ষা ক'রে দেখলেন যে সেটি বালি ঢুকে বন্ধ হয়ে গেছে। পাইপ সাফ করা হ'ল, সাইফনেও পেট্রোল ঢালা হ'ল, এঞ্জিনও সজাগ হয়ে গর্জ্জন ক'রে উঠল, যাত্রীর দলও হাঁফ ছেড়ে গাড়ীতে চেপে বসবার পর আবার যাত্রারম্ভ হ'ল।

খানিক পরে ঝড়ের বেগ কমে এল, বাতাস কিন্তু তখনও বিষম ঠাণ্ডা। পাশে খুব উঁচু পাহাড়ের চূড়া ক্রমেই শাদা হ'তে লাগল। আরও কাছে আসতে দেখা গেল সেখানে তুষারপাত চলেছে। খানিক এগিয়ে গাড়ী উপত্যকার ঢালু পথ বেয়ে নীচে নেমে গেল, পাহাড়ের আড়াল পেয়ে ঝড়ঝাপটা থেকে রেহাই পেলাম। পথের পাশে শস্য ও শাক-সব্জীর ক্ষেত দেখা গেল, দূরে সুদীর্ঘ সরল গাছের সারিতে ঘেরা একটি বড় গ্রামও দেখা গেল। রাস্তার উপর এক চায়ের দোকান, তার পাশেই পেট্রোলের আড়ত। গাড়ির জন্যে পেট্রোল এবং যাত্রিদের জন্যে চায়ের ব্যবস্থা হবার 'পর ফের পথ চলা আরম্ভ হ'ল। ঘণ্টাখানেক পরে সন্ধ্যার অন্ধকারে আবাদেহ পৌঁছান গেল।

* * *

মুখহাত ধুয়ে চায়ের সদ্ব্যবহার করা গেল। খাবার আয়োজন খুবই ছিল। অন্য ব্যাপার আগেকার মতই সুতরাং সঙ্গের মেয়েদের এবং বয়ঃজ্যেষ্ঠদের অসুবিধা হয়েছিল। খানিক পরে দেখলাম, আরবাব কৈখসরু শাহরোখ, সহযাত্রী পার্সীরা এবং সঙ্গী পারসীক ভদ্র-লোকেরা বাইরে যাচ্ছেন। শুনলাম এইখানের জরথুষ্ট্রী কবরস্থানে আরবাবের জ্যেষ্ঠপুত্রের সমাধিতে প্রার্থনা করতে এঁরা যাচ্ছেন, আমিও সঙ্গেই চললাম।

শহরের প্রান্তে উঁচু দেওয়ালে ঘেরা কবরস্থান। ফটকের ঘরগুলি পার হয়ে প্রকাণ্ড উঠান, সেই উঠানের



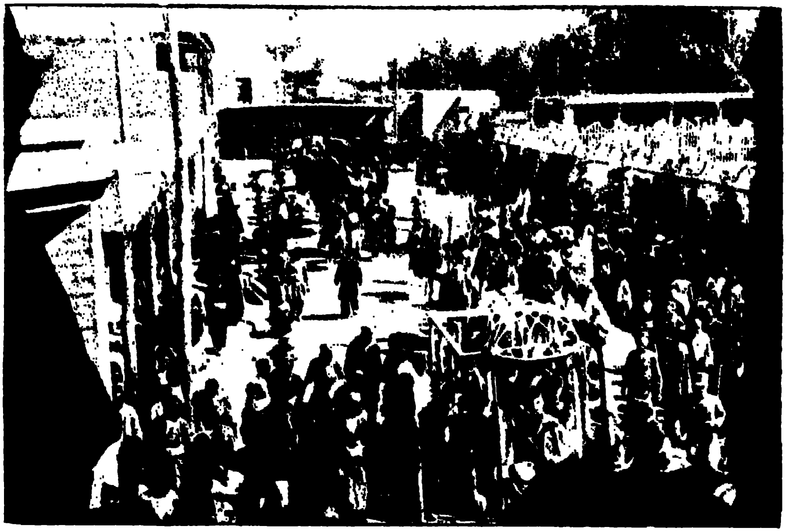
ইস্ফাহান। চারবাগ এভিনিউ



ইস্ফাহান। পথের পাশে চেনার বৃক্ষের দৃশ্য

চারিদিকে ছোট ছোট ঘর এবং প্রত্যেক ঘরেই একটি দুটি কবর রয়েছে। প্রত্যেক কবরের শিয়রে লম্বা সেজে মোমবাতি জ্বলছে এবং কবররক্ষীর দল ক্রমাগত-সেগুলি পরিষ্কার ক'রে জ্বালিয়ে রাখছে। এমনিই একটি ঘরে আরবাবের ছেলের সমাধি। সমাধির সামনে সকলে দাঁড়ালেন, স্ত্রপুরুষীরা নিঃশব্দে ঠোঁট নেড়ে পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে লাগলেন, আরবাবের ছোট ছেলেটি তার দাদার কবরের চারিধারে মোমবাতি জেলে সাজাতে লাগল। প্রার্থনা শেষ হতে একে একে সকলেই কবর ছুঁয়ে অভিবাদন করলেন। তার পর নিঃশব্দে সকলেই ফিরে এলেন।

এই ছেলেটি এগার বৎসর আগে বিদ্যাশিক্ষার জন্য টেহেরান থেকে বুশীয়ার যাবার পথে এই আবাদের কাছেই দিনের বেলায় রাজপথের উপর দস্যুর গুলিতে আহত হয়ে মারা যায়। সঙ্গীরা তাকে কবর দিয়ে টেহেরানে ফিরে যায়। সে সময়ের তুলনায় এখন

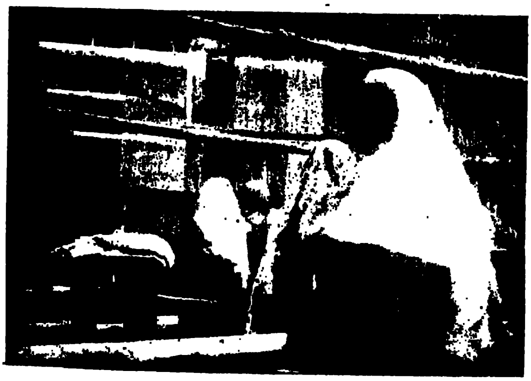


ইস্ফাহান। বাজারের এক অংশের দৃশ্য

পথঘাট কত নিরাপদ হয়েছে সেকথা ভাবলে নূতন শাহের রাজত্বের প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না।

* * *

আবাদেহ একটি ছোট শহর। চাষ, কাঠের খোদাইয়ের কাজ, এবং এক রকম জুতো তৈরি করা



ইস্ফাহান। কার্পেট বোনা

এখানকার লোকের প্রধান পেশা। সন্ধ্যার অন্ধকারে বাজার-হাট যতটা পারা যায় দেখা গেল, ফিরে এসে রাত্রের খাওয়া খেয়ে বিশ্রাম।

পরদিন সকালে ৭টায় আবার ইস্ফাহানের পথে রওনা হওয়া গেল। এবার পথ ক্রমেই আগের চেয়ে ভাল হ'তে থাকল। পথের মধ্যে প্রায়ই রাস্তা-মেরামতি কুলীর দলের সঙ্গে দেখা হ'তে লাগল। মাঝে মাঝে যাযাবরদের দলও দেখা যাচ্ছিল, শীতের শেষে তারা ভেড়া ছাগলের পাল নিয়ে উপরের উপত্যকা অধিত্যকায় চলেছে। ছাগলগুলির লম্বা শিং, ছোট এবং ঝাঁকড়া লোমযুক্ত বিলাতি ছাগলের মত—ভেড়াগুলি সবই দুম্বা। এবারেও সেই আগের মতই অনুর্ব্বর প্রান্তরের মধ্য দিয়ে পথ চলেছে। দু-পাশের পাহাড়ের গায়ে গৈরিক, পাটল, বেগুনী, পিঙ্গল ইত্যাদি অপরূপ নানা বর্ণের ছায়া, কুয়াসা ও রোদের হেরফেরে ক্ষণে ক্ষণে বদলে চলেছে। পাহাড়ের কোলে যেখানে একটি ঝরণা দেখা দিয়েছে সেখানেই একটি গ্রাম, দু-চারটি বাগান, শস্যের ক্ষেত ইত্যাদিতে ধূসর প্রান্তরের মাঝে এক ঝলক উজ্জ্বল হরিৎ রং মাখিয়ে দিয়েছে। উপত্যকার পথে গাড়ী ঘুরে ঘুরে নীচে নামতে আরম্ভ করল। একটি বাঁক ঘুরতেই সামনে ছোট একটি পাহাড়ে নদী দেখা গেল। নদীর মধ্যে একটি ছোট পাহাড়, সেটা দূর থেকে প্রথমে কি-রকম অদ্ভুত খাঁজকাটা এবং গুহায়-ভরা ব'লে মনে হ'ল। ঠিক যেন পাহাড়টা কেটে সারি সারি উঁচু-নীচু অসমান বাড়ি-ঘর কে থাকে থাকে সাজিয়েছে। কাছে এসে দেখা গেল, সত্যি-সত্যিই

পাহাড়টা কেটে এবং তার সঙ্গে গেঁথে কয়েক সারি বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। গুহার মত ব্যাপারগুলি বাড়ির নীচে গরু ভেড়া রাখবার গোয়াল আস্তাবল ইত্যাদি। এই সমস্ত বাড়িতে ঢুকবার পথ একটি মাত্র, এবং সেটিও লুকান, কাজেই হঠাৎ দেখলে কি ক'রে মানুষে ঐসব বাড়ি-ঘরের ভিতর যায়-আসে বুঝা যায় না। এই অদ্ভুত এক সারি বাড়ির গ্রামটির নাম য়াজদিখাস্ত।

পথের পাশে কুড়ি-পঁচিশ মাইল অন্তর এক একটি ঐ রকম গ্রামের কাছে সরাই এবং চায়ের দোকান আছে, আমাদের গাড়ীগুলি প্রায় প্রত্যেকটির কাছেই কিছু-না-কিছু অজুহাতে থাম্‌তে লাগল। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক বারই চায়েরও সদ্ব্যবহার হ'ল।

শাহরোজা নামে একটি ছোট শহরে দেখা গেল বিস্তর ভদ্রলোক রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছেন। শুনলাম এখানকার প্রসিদ্ধ কবি আলি আকবর বাজিরি (তখল্লুস "ওমিদ") কবিকে উপহার দেবার জন্য একটি কবিতা এবং প্রকাণ্ড এক ফুলের তোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। কবির গাড়ী ওখানে থামেনি, সুতরাং তিনি আমাদের হাতেই সেগুলি দিলেন।

কবিতাটির অর্থ এইরূপ :—

ভারতের কারাভানে শর্করা সর্ব্বদাই থাকে কিন্তু
এইবার রহিয়াছে কল্পনার সৌরভ
ও কারাভান, ক্ষণেক দাঁড়াও, তৃষ্ণার্ত্ত হৃদয় সকল
তোমার পিছনে চলিয়াছে—আলোকের পশ্চাতে
প্রজাপতির মত ;
মলয় পবন, সাদীর সমাধিস্থলে স্নিগ্ধ স্পর্শে
ও মৃদু শব্দে বহিয়া যাও, কবরের ভিতর সাদী
পুনর্জীবিত হইবেন ;

ঠাকুর! তিনি অপূর্ব্ব, তিনি জ্ঞানী দার্শনিক ও ত্রিকালজ্ঞ ;

মহান্ কুরুষের দেশে তাঁহার আগমন শুভ ও সৌভাগ্য-যুক্ত হউক। যেদেশে কুরুষের এক সন্তান এখন সৌভাগ্যক্রমে রাজমুকুট ধারণ করিতেছেন।

বেলা বারটা নাগাদ আমরা ইস্ফাহানের দশ মাইল দূরে পাহাড়ের কোলে গাড়ী থামালাম। দেখলাম কবির গাড়ীও দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং বিস্তর অন্য গাড়ীও এসেছে, এবং আস্‌ছে। শোনা গেল যে ইস্ফাহানের গভর্ণর ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকেরা কবিকে স্বাগতঃ বল্‌তে এতদূর এগিয়ে এসেছেন।

সম্বর্দ্ধনার পর্ব্ব শেষ হয়ে গেলে আবার সমস্ত গাড়ী চল্‌ল। অভ্যর্থনা করতে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন পার্সী পুরুষ ও মহিলা এবং ভারতীয় দু-তিন জন ছিলেন। আর একটি এদেশীয়া এসেছিলেন—পরে শুনলাম তিনি আকা কৈহানের ভাইঝি—ছোটখাট দেখতে, মুখও খুব ছেলেমানুষের মত গোলগাল। অভ্যর্থনাকারীদের নেতা ছিলেন মহামান্য আকা শামসুদ্দীন খাঁ জেলালি, ইস্ফাহানের গভর্ণর।

খানিক দূর গিয়ে একটি পাহাড়ের ঘাট থেকে দূরে ইস্ফাহান দেখা দিল। রোদ ছিল না, ছায়ার মধ্যে বালিভরা ছোটনদীর পারে সারি সারি গাছে এবং অসংখ্য গম্বুজ মিনার ভরা সুদীর্ঘ একটি শহর দেখা গেল। চারিধার পাহাড়ে ঘেরা, মাঝে জয়ন্দে নদীর শস্যশ্যামল উপত্যকা। এইখানে মধ্যযুগের জগদ্বিখ্যাত ইস্ফাহান, সাফাবি নৃপতিদের সময় অতুল ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ হয়ে সমস্ত সভ্যজগতের আদর্শ নগরীরূপে বিরাজ করেছিল। এখনও যাহা অবশিষ্ট আছে তাহাকে অতুলনীয় বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। তবে সে-সময় ছিল প্রায় বার লক্ষ লোকের বসতি, এখন রয়েছে মাত্র দেড় লক্ষ।

নদীর বুকে—আমাদের দেশের মত—তরমুজ সবুজ ইত্যাদির চাষ চলেছে, দু-তিনটি ব্রিজও রয়েছে, তার মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ পোল-এ-খাজু আকারে, গঠনে এবং ভিতরে নানা রঙের কারুকার্য্যে বিশেষ সুদৃশ্য।

এক বক্তিয়ারি সর্দ্দারের বাগ-ই-জেরেস্ক নামে এক প্রসিদ্ধ বাগান-বাড়িতে আমরা গিয়ে উঠলাম সেখানে সমস্ত ব্যবস্থাই রাজপ্রাসাদের মত হয়েছিল।

ক্রমশঃ



সুলেখা

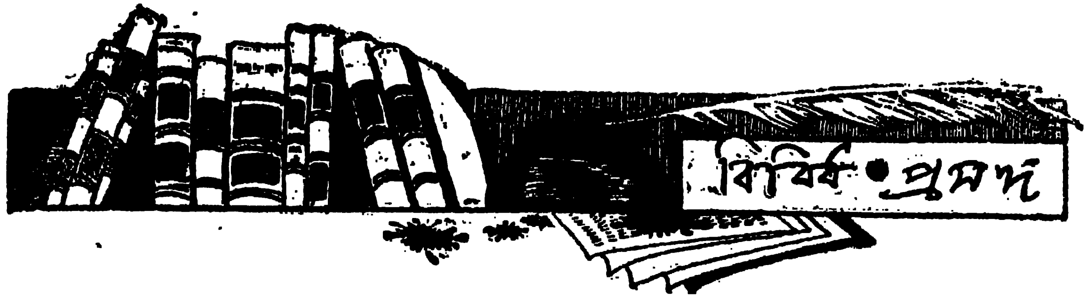
শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

অপরাহ্ণ বেলা।
পশ্চিম আকাশ প্রান্তে লাগে হোলিখেলা।
ঘরে দোরে, বাড়ির কানাচে ঝোপে ঝাড়ে
পুকুরের পাড়ে
মেঠো ঘাসে, পথের ধূলায়,
অস্তরাগ আবীর বুলায়।
ক্লান্ত পাখা নাড়ি
দিগন্তে ধরিয়া পাড়ি
অলস-মন্থরগামী চিল,
গগনের গায়ে কালো কালো তিল,—
কোথায় মিলায়ে গেল;
বেলা পড়ে এল॥

গোবরে নিকানো মেটে মাটির পৈঠায়
পরিষ্কৃত মেঝে দেখা যায়—
আর্শি খোলা রয়েছে সমুখে,
সিঁদুরের কৌটা আছে লাল টুকটুকে,
রেশমের ফিতে কয়গাছি,
সুগন্ধ তেলের শিশি তারি কাছাকাছি,
ছোট পেটরায় পরিপাটি
চূর্ণক, চুলের কাঁটা, খোঁপার চিরুণী আর টীপ্‌শলাকাটি।
জানু-যুগ বাড়াইয়া আগে
পা দু'খানি ভঙ্গী ক'রে ঘুরাইয়া পিছনের ভাগে
প্রসাধনে
বসেছে যতনে।
দুই কানে দোলে দুটি দুল
নীলরঙা ফুল।
শাড়ীর আঁচল রাঙা
পাটগুলি ভাঙা
বুকের তলায় দিয়ে পিঠে পড়ি লোটে অবহেলে।
তরল তনিমাধারা তনুতে গড়ায় হেসে খেলে,
চিরুণীর সাথে
[illegible]
উঠে নামে।
কখনো ডাহিনে হেলি কখনো বা বামে
সর্পিল অলকরাশ প্রসাধনে রত।
মুখে নাই কথা,
মনে আছে সুর
গুন্‌গুন্ ধ্বনিছে মধুর।

ওর বসিবার ঐ খেয়ালি ধরণে
খোলা হাতে,
গলাতে,
চিবুকে
সারামুখে
দুধে-আল্‌তায় মেশা কোমল বরণে
চিকণ চারুতা যাহা ভাসে
সুললিত কৈশোরের পূর্ণতা প্রকাশে।

থেকে থেকে অকারণে
মনের শাসন-নাশা গোপন কৌতুক প্রলোভনে
উচ্চকিত আঁখি ওর ধায় ঘুরে ফিরে
পথে নামি কি খোঁজে বাহিরে,
আবার ফিরিয়া আসে আর্শির বুকে।
তেলে-ভিজা চক্‌চকে চুলের গোছাটি ল'য়ে ঝুঁকে
বাঁধে বেণী, বাঁধে খোঁপা।
কখনো বা
ললাটে ঝাঁপিয়া পড়ে দু-গাছি অলক,
রূপের প্রবাহে লাগে ক্ষণে অপরূপের ঝলক।
চাঁপার কলির মত আঙুলে তুলিয়া লয় তারে,
সিঁথাতে মিশায় বারেবারে।
কুঞ্চিত অঞ্চলে দিয়ে মোছে গাল দুটি
বাঁকানো মুখের 'পরে গোলাপের কুঁড়ি ওঠে ফুটি।
ফুরায় না আর ফিরে ফিরে
ঘুরায়ে ফিরায়ে ধীরে
আর্শিতে খোঁপাঘেরা যত্নে মাজা মুখখানি দেখা;
নাম তার শ্রীমতী সুলেখা॥



পৃথক্ ব্যবস্থাপক পদ রক্ষণ ও স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন

সমগ্র ভারতবর্ষে এবং তাহার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে নানা-ধর্ম্মাবলম্বী লোক বাস করে। পাশ্চাত্য দেশ সকলে, মিশরে, জাপানে, এবং এশিয়ার অন্য অনেক দেশেও নানা-ধর্ম্মাবলম্বী লোক বাস করে। কোন দেশেই প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা অন্য এক একটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকসংখ্যার সমান নহে। নানা দেশে যেমন সংখ্যায় অধিকতম সম্প্রদায় আছে, তেমনি সংখ্যায় ন্যূন ও ন্যূনতম সম্প্রদায়ও আছে। যাহারা সংখ্যায় অধিক বা অধিকতম, তাহাদের দ্বারা সংখ্যায় ন্যূন ও ন্যূনতমদিগের উপর অত্যাচার অবিচার হইবার সম্ভাবনা সকল দেশেই ছিল ও আছে। অতীত ও বর্ত্তমান সময়ে এরূপ অবিচার অত্যাচার হইয়াছেও। ইহাও ঐতিহাসিক সত্য, যে, অনেক দেশে সংখ্যায় ন্যূন অথচ প্রবল সম্প্রদায়ের দ্বারা সংখ্যাভূয়িষ্ঠদের উপর অবিচার অত্যাচার হইয়াছে।

সংখ্যায় অধিক বা সংখ্যায় ন্যূনদের দ্বারা অন্যদের উপর অত্যাচার অবিচার নিবারণের জন্য ইউরোপের অনেকগুলি নূতন রাষ্ট্রে উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। সেরূপ উপায় ব্রিটেন প্রভৃতি পুরাতন রাষ্ট্রের মূল রাষ্ট্রীয় বিধিতে (কন্সটিটিউশ্যনে) ছিল না ও নাই। তাহার কারণ এখন আলোচ্য নহে।

যে-সকল ছাত্র ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়েন, তাঁহারা জানেন, ইংলণ্ডে অতীতকালে রোমান ক্যাথলিকদের ও ইহুদীদের উপর খুব অত্যাচার হইত, এবং তাহাদের শিক্ষালাভ, রাজকার্য্যে নিয়োগ, উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি লাভ, নিজ নিজ ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ে অনেক অসুবিধা ছিল। রাণী "ব্লাডি" মেরীর রাজত্বকালে প্রটেষ্টাণ্টদের উপরও খুব অত্যাচার হইয়াছিল। কিন্তু ইংলণ্ডে কোন কালে অত্যাচরিত সংখ্যান্যূনদের উপর অত্যাচার অবিচারের প্রতিকারের নিমিত্ত ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদের দ্বারা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচিত কতকগুলি সভ্য রাখিবার ব্যবস্থা করা হয় নাই; প্রতিকারের অন্য উপায় ক্রমে ক্রমে অবলম্বিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে এখনও রোমান ক্যাথলিক ও ইহুদীদের সহিত প্রটেষ্টাণ্টদের ঝগড়াবিবাদ মারামারি রক্তারক্তি হয়, যদিও আগেকার মত বেশী নয়। কিন্তু এখনও সংখ্যান্যূনদের দ্বারা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচিত তাহাদের কতকগুলি প্রতিনিধি তথাকার ব্যবস্থাপক সভায় নাই।

তাহা না থাকিলেও গ্রেট ব্রিটেন নামে পরিচিত ইংলণ্ড, ওয়েলস্ ও স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসীরা পৃথিবীতে স্বাস্থ্য, দীর্ঘ জীবন, শক্তি, ধন, শিক্ষা, জ্ঞান ও সভ্যতায় অগ্রসর জাতিদের মধ্যে পরিগণিত। এবং গ্রেট ব্রিটেনের যে-কোন শ্রেণীর লোক ঐ সব বিষয়ে মোটের উপর সভ্য দেশ সকলের তত্তুল্য শ্রেণীর লোকদের সমান। গ্রেট ব্রিটেনের যে কোন শ্রেণীর লোক ঐ সব বিষয়ে ভারতবর্ষের তত্তুল্য যে-কোন শ্রেণীর লোকদের চেয়ে যে শ্রেষ্ঠ সে-বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, যে, সংখ্যান্যূনদের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিনিধি না রাখিলেও তাহারা স্বাস্থ্যে, ধনে, শিক্ষায়, সভ্যতায় অগ্রসর হইতে পারে। তাহাদের প্রতি অবিচার নিবারণের অন্য ব্যবস্থা রাখাই যথেষ্ট।

এখন কথা উঠিতে পারে, যে, গ্রেট ব্রিটেনের মত প্রাচীন দেশসকলে যেরূপ ব্যবস্থা হয় নাই, সেরূপ ব্যবস্থা যে অনাবশ্যক বা অনুত্তম, তাহা স্বতঃসিদ্ধ ও অবশ্য-স্বীকার্য্য নহে। অতএব দেখা যাক, ইউরোপের নবগঠিত রাষ্ট্র সকলে কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে।

গত মহাযুদ্ধের পর পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। ইহার প্রত্যেকটিতে একাধিক ধর্ম্মের, জাতির ("রেস"-এর) ও

ভাষার লোক আছে। তাহাদের সংখ্যা সমান সমান নয়; প্রত্যেক দেশেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ জনসমষ্টি (অর্থাৎ মেজরিটি ও মাইনরিটি) আছে। এই সকল নবগঠিত স্বাধীন রাষ্ট্রসকলে সংখ্যায় ন্যূনদের প্রতি অবিচার অত্যাচার নিবারণের জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সব ব্যবস্থা ঐ সব রাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে লীগ অব নেশুন্সের অর্থাৎ মহাজাতিসংঘের দ্বারা প্রণীত হইয়াছে। ব্যবস্থাগুলি মাইনরিটি ট্রীটি-সমূহের অর্থাৎ সংখ্যালঘিষ্ঠদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার্থ সন্ধিসমূহের অন্তর্ভূত। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্য রাষ্ট্র লীগ অব নেশুন্সের সভ্য। গ্রেট ব্রিটেন এবং ভারতবর্ষের গবর্মেণ্টও উহার সভ্য। সুতরাং মাইনরিটি ট্রীটিগুলি পৃথিবীর বহুসভ্য জাতির সম্মিলিত রাষ্ট্রনৈতিক অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞতার ফল। ঐ সন্ধিগুলিতে গ্রেট ব্রিটেনের ও ভারত-গবর্মেণ্টের প্রতিনিধিদের স্বাক্ষর আছে।

ঐ সন্ধিগুলিতে সংখ্যান্যূনদের স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত কিরূপ ব্যবস্থা আছে? কোনটিতেই কোনও সংখ্যান্যূন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বা জাতির ("রেস"-এর) বা ভাষাভাষীদের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় স্বতন্ত্র কতকগুলি প্রতিনিধির পদ রাখা হয় নাই—স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন দ্বারা নির্ব্বাচিত বা সম্মিলিত নির্ব্বাচন দ্বারা নির্ব্বাচিত কোন রকমেরই তাহাদের ঐরূপ কোন আলাদা প্রতিনিধি রাখা হয় নাই। সন্ধিগুলিতে যে ব্যবস্থা আছে তাহার দ্বারা সংখ্যান্যূনদের ধর্ম্মবিশ্বাস, ধর্ম্মানুষ্ঠান, ভাষা, শিক্ষা, কালচার বা কৃষ্টি, উত্তরাধিকারাদি সম্বন্ধীয় অধিকার, সামাজিক আচার-ব্যবহার যোগ্যতা অনুসারে যে-কোন রাজকার্য্য পাইবার, অধিকার, যে-কোন ব্যবসা কারিগরী বা উপার্জ্জনের অন্য কোন আইনসঙ্গত উপায় অবলম্বনের অধিকার ইত্যাদি সংরক্ষিত হইয়াছে। সংখ্যান্যূন বা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টির রাষ্ট্রীয় স্বার্থ অন্য কাহারও উক্ত স্বার্থ হইতে ভিন্ন নহে, সুতরাং ঐ সন্ধিগুলিতে কোথাও তাহা স্বীকৃত হয় নাই।

পৃথিবীর আধুনিকতম ও উন্নততম রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুসারে তুরস্ক ও অন্য প্রায় কুড়িটি স্বাধীন রাষ্ট্রে ব্রিটিশ ও ভারত গবর্মেণ্ট এবং লীগ অব নেশুন্সের অন্যান্য সভ্যদের অনুমোদনক্রমে যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহা বলিলাম। উহাতে কোন সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যা-লঘিষ্ঠ জনসমষ্টিকে তাহাদের আলাদা প্রতিনিধি দেওয়া হয় নাই। তাহাতে ফল কি হইয়াছে? ঐ নবগঠিত প্রায় কুড়িটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রত্যেকটিতে তথাকার অধিবাসীদের স্বাস্থ্য, আয়ু, শক্তি, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, ধন, প্রভৃতি বিষয়ে অবস্থা ভারতীয়দের চেয়ে অনেক ভাল। ঐ সব রাষ্ট্রের সংখ্যান্যূন বা সংখ্যাগরিষ্ঠ যে-কোন জনসমষ্টির অবস্থা ভারতবর্ষের তৎসদৃশ যে-কোন জনসমষ্টির অবস্থা অপেক্ষা ভাল, তথাকার কোন জনসমষ্টির আলাদা আলাদা প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক সভায় না থাকায় কাহারও অনিষ্ট, অসুবিধা, উন্নতিতে বাধা, বা অবনতি হয় নাই।

এই সব কারণে আমরা ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে কোনও জনসমষ্টির স্বতন্ত্র প্রতিনিধি রাখিবার নিয়মের বিরোধী। কিন্তু সকলকে সন্তুষ্ট ও নিরুদ্বেগ করিবার নিমিত্ত আবশ্যক হইলে যদি নেতৃবর্গ নির্দ্দিষ্ট কোন সময়ের—পাঁচ বা দশ বৎসরের—জন্য ভিন্ন ভিন্ন জনসমষ্টির নিমিত্ত স্বতন্ত্র কতকগুলি প্রতি-নিধির ব্যবস্থা রাখিতে চান এবং সেই সব প্রতিনিধি সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদের দ্বারা সম্মিলিত ভাবে নির্ব্বাচিত হন, তাহা হইলে সেরূপ অস্থায়ী ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ আমরা করিব না।

—

স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন সম্বন্ধে মৌলানা মোহম্মদ আলীর মত

নিজ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্ব্বাচন কেন আবশ্যক, তাহা বুঝাইবার জন্য মৃত মৌলানা মোহম্মদ আলী সাহেব লিখিয়াছিলেন:—

"A separate electorate gives to the Mussalman client in the case he is fighting the counsel that he selects himself and can trust. In every law-court every client is permitted to do that even though sometimes he is provided with counsel at Government expense. The other party is certainly never allowed to choose his counsel for him."

তাৎপর্য্য। "স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রথা মুসলমান মক্কেলকে তাহার মোকদ্দমা লড়িবার জন্য তাহার নির্ব্বাচিত ও বিশ্বাসভাজন উকীল ব্যারিষ্টার পাইতে সমর্থ করে। প্রত্যেক আদালত প্রত্যেক মক্কেলকে

ইহা করিতে অনুমতি দেয়, যদিও কখন কখন তাহাকে সরকারী খরচে উকীল ব্যারিষ্টার দেওয়া হয়। অপর পক্ষকে নিশ্চয়ই কখনও ঐ মক্কেলের জন্ত উকীল ব্যারিষ্টার নির্ব্বাচন করিতে দেওয়া হয় না।"

মৌলানা মোহম্মদ আলী ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধিদের কাজকে আদালতে উকিল ব্যারিষ্টারদের কাজের সদৃশ মনে করিয়া তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ দুই রকম কাজের সাদৃশ্য মানিয়া লইয়া তাঁহার যুক্তির পরীক্ষা করিতেছি।

যে-সব আদালতে মুসলমান আইনজীবীরা ওকালতী ব্যারিষ্টারী করেন, সেখানেও দেখা যায়, অনেক মুসলমান মক্কেল তাঁহাদের মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্ত অমুসলমান উকীল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রথা অনুসারে মুসলমান নির্ব্বাচকেরা খুব যোগ্য অমুসলমান প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন না, তাঁহাদিগকে কেবলমাত্র মুসলমান প্রতিনিধিই নির্ব্বাচন করিতে হইবে। ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি ও আদালতের উকীল ব্যারিষ্টারদের কাজ একই রকম, মৌলানা সাহেবের এই উহ্য মত মানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করি, যদি এরূপ আইন হয়, যে, মোকদ্দমা চালাইবার জন্য মুসলমান মক্কেলদিগকে কেবল মুসলমান উকীল ও ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিতে হইবে, তাহা হইলে মুসলমান মক্কেলরা কি তাহাতে সন্তুষ্ট ও রাজী হইবেন? নিশ্চয়ই হইবেন না। কারণ, বর্ত্তমানে দেখিতে পাই, মুসলমান আইনজীবীরা যে-সব আদালতে ওকালতী ব্যারিষ্টারী করেন, সেখানেও মুসলমান মক্কেলরা অনেক সময় অমুসলমান উকীল ব্যারিষ্টার নিয়োগ করেন। ধর্ম্মমতনির্বিশেষে যে-কোন যোগ্য আইনজীবীকে নিযুক্ত করিবার স্বাধীনতা হইতে মুসলমান মক্কেলরা বঞ্চিত হইতে রাজী হইবেন না। ইহা সত্য বটে, মুসলমান আইনজীবীদের মধ্যে যে-সব উকীল ব্যারিষ্টারদের পসার নাই, কিংবা সামান্ত পসার আছে, তাঁহারা এরূপ আইন হইলে সন্তুষ্ট হইবেন, কারণ তাহাতে তাঁহাদের কাজ জুটিবে বা বাড়িবে। ব্যবস্থাপক সভা সম্বন্ধেও ইহা সত্য, যে, যে-সকল ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদপ্রার্থী মুসলমানের যোগ্যতা কম, তাঁহারা প্রতিযোগিতাকে ভয় করেন, তাঁহারাই সাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী।

আদালতে ওকালতী ব্যারিষ্টারী এবং ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধিদের কাজ এক রকম, ইহা মানিয়া লইয়া যাহা বলিবার সংক্ষেপে বলিলাম। কিন্তু বাস্তবিক উভয় শ্রেণীর লোকদের কাজ ঠিক্ এক রকম নয়।

আদালতে যদি কোন মোকদ্দমায় এক পক্ষে মুসলমান ও অন্য পক্ষে হিন্দু মক্কেল থাকেন, তাহা হইলে ঐ মুসলমান ও ঐ হিন্দুর স্বার্থ বিপরীত বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভায় অধিকাংশ স্থলে যে-সব প্রস্তাব বা যে-সব বিলের আলোচনা হয়, তাহাতে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের বৈপরীত্য থাকে না; অধিকাংশ স্থলে ভারতীয় সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদের স্বার্থ এক। অধিকাংশ স্থলে ধর্ম্মবিশ্বাসনির্বিশেষে ভারতীয় সকল প্রতিনিধির ইহাই দেখা আবশ্যক ও উচিত, যে, প্রস্তাবটির বা বিলটির দ্বারা ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট ও তাহার কর্ম্মচারীদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বাড়িবে, না, দেশের লোকদের স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় অধিকার বাড়িবে। বস্তুতঃ, ব্যবস্থাপক সভায় প্রায় সকল স্থলে ও সর্ব্বদা "মোকদ্দমা" হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে নহে, পরন্তু বৈদেশিক গবর্ন্মেণ্টের এবং ভারতীয়দের মধ্যে। সেইজন্য প্রতিনিধিরা হিন্দু বা মুসলমান, তাহা দেখা তেমন আবশ্যক নয়, যেমন দেখা আবশ্যক, যে, তাঁহারা যোগ্য ও স্বাধীনচেতা কি-না।

যে-সব স্থলে বিশেষ করিয়া মুসলমানদেরই স্বার্থের প্রশ্ন উঠে, তখন যথেষ্ট মুসলমান প্রতিনিধি না থাকিলে অস্থায়ী যথেষ্টসংখ্যক মুসলমান প্রতিনিধি লওয়া যাইতে পারে। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের সম্বন্ধেও এই নিয়ম অনুসৃত হইতে পারে।

আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। মুসলমান প্রতিনিধিরা ব্যবস্থাপক সভায় কেবল মুসলমানদের স্বার্থ সম্বন্ধীয় বিষয়ের আলোচনা করেন না, হিন্দু প্রতিনিধিরা কেবল হিন্দুদের স্বার্থ সম্বন্ধীয় বিষয়ের আলোচনা করেন না, খ্রীষ্টিয়ানেরাও তাই—ইত্যাদি। কোন প্রতিনিধির ধর্ম্মমত [illegible]

উপস্থাপিত সকল বিষয়েরই আলোচনা তাঁহাকে করিতে হয়। অধিকাংশ স্থলে এই বিষয়গুলি এরূপ, যে, তাহার সুমীমাংসার উপর ধর্ম্মসম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে দেশের সব শ্রেণীর লোকদের হিতাহিত নির্ভর করে। সুতরাং তৎসমুদয়ের আলোচনার সময়, প্রতিনিধি-বিশেষের ধর্ম্মমত যাহাই হউক, তাঁহাকে ধর্ম্মসম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে দেশের সব লোকদের হিতাহিত বিবেচনা করিতে হয়; অর্থাৎ তাঁহাকে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান শিখ প্রভৃতি সকলেরই প্রতিনিধির কাজ করিতে হয়। অতএব, প্রতিনিধিদের সব ধর্ম্মের লোকদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হওয়া আবশ্যক এবং সব ধর্ম্মের লোকদের বিশ্বাসভাজন হইলে ভাল হয়। অবশ্য প্রত্যেক প্রতিনিধি সব ধর্ম্মের ও শ্রেণীর সকল লোকের বিশ্বাস-ভাজন হইতে পারেন না। কিন্তু তাঁহার নির্ব্বাচকদের মধ্যে নানা ধর্ম্মের লোক থাকিলে, দেশের প্রতিনিধিত্ব করিবার তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ কম হয়।

—

"অস্পৃশ্য"দের দেবমন্দির প্রবেশ ও বর্ণাশ্রমী দল

কাশীর "শ্রীনগর বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সংঘ" "অস্পৃশ্য"-দিগের দেবমন্দির প্রবেশের বিরুদ্ধে বড়লাটের নিকট একটি দরখাস্ত করিয়াছেন। কোনও মানুষকে বংশগত ও জন্মগত কারণে অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয় মনে করা সাতিশয় অযৌক্তিক, অসঙ্গত ও অন্যায়। তাঁহাকে সেই কারণে কোন অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখাও তদ্রূপ অযৌক্তিক, অন্যায় ও অসঙ্গত। ইহা আমাদের নিকট এরূপ স্বতঃসিদ্ধের মত, যে, এ বিষয়ে আমরা কাহারও সহিত তর্ক করা অনাবশ্যক মনে করি। এইজন্য কাশীর বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সংঘ বড়লাটের নিকট যে দরখাস্ত পাঠাইয়াছেন, তাহার সব কথার সমালোচনা আমরা করিব না। কেবল দু-একটি ব্যক্তিগত কথা বলিব। দরখাস্তের এক জায়গায় বলা হইয়াছে :—

"...powerful handle and hoaxed importance is given to bodies like the Hindu Mahasabha led by Arya Samajists and Brahmo Samajists (like Dr. Moonje and Sjt. Ramananda Chatterjee..."

...ডাক্তার—মুঞ্জে আর্য্যসমাজী—নহেন। তিনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, সনাতনী হিন্দু। তিনি হিন্দু মহাসভার সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মিষ্ঠ নেতা বটেন। কিন্তু তিনি বা হিন্দু মহাসভা তথাকথিত অস্পৃশ্যদের দেবমন্দির প্রবেশের বর্ত্তমান আন্দোলনের প্রবর্ত্তক নহেন—প্রবর্ত্তক মহাত্মা গান্ধী। মহাত্মাজী যে সনাতনী হিন্দু, তাহার অনেক প্রমাণ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত বাংলা ও ইংরেজী অনেক কাগজে দিয়াছেন। মহাত্মাজী অনেক বার বলিয়াছেন, যে, তিনি বর্ণাশ্রমে বিশ্বাস করেন। তথাপি "বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সংঘে"র লোকেরা তাঁহাকে হিন্দু বলিয়া না মানিতে পারেন। কিন্তু পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় মহাশয়ের মত সাতিশয় আচারনিষ্ঠ হিন্দু এবং তাঁহারই মত আচারনিষ্ঠ অথচ অপেক্ষাকৃত অল্পবিখ্যাত বা অবিখ্যাত হাজার হাজার হিন্দু যে অস্পৃশ্যদিগের দেবমন্দির প্রবেশ সমর্থন করিতেছেন, সে-বিষয়ে দরখাস্ত-কারীরা কি বলিতে চান? পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন ও দরখাস্তের অন্যান্য স্বাক্ষরকারীরাই দেশের আচারনিষ্ঠ হিন্দু, আর কেহ নহেন, ইহা মানিয়া লওয়া যায় না।

এই দরখাস্তে ব্রাহ্মদিগের এবং 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নাম করা হইয়াছে। এই ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন ব্রাহ্ম মহাসভার সভ্য নহেন। এবং এই ব্যক্তির উপর যে দুরভিসন্ধি আরোপ করা হইয়াছে, তাহা হাস্যকর। একটু খুলিয়া বলিতে হইবে।

আমি দেবমন্দিরে গিয়া ভগবদারাধনা করি না, ব্রহ্মমন্দিরে, স্বগৃহে বা অন্যত্র করি, ইহা সত্য কথা। সেই কারণে আমার পক্ষে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসকদের সংখ্যা বাড়াইবার চেষ্টা স্বাভাবিক। কিন্তু দরখাস্তে আমার উপর সেরূপ কোন অভিসন্ধি আরোপ করা হইতেছে না। দেবমন্দিরে যত বেশী লোক প্রবেশের ও পূজার অধিকার পাইবেন, ব্রহ্মমন্দিরে উপাসকদের সংখ্যা ততই বাড়িবে কি? নিশ্চয়ই বাড়িবে না, তাহা হইলে কথাটা দাঁড়াইতেছে এইরূপ, যে, যদিও আমার পক্ষে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসকদের সংখ্যা বাড়াইবার চেষ্টা করাই স্বাভাবিক, তথাপি আমি দেবমন্দিরসমূহের দ্বার সকল হিন্দুর জন্য অবারিত করাইয়া তথাকার পূজকদিগের সংখ্যাই বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছি. ব্রহ্মমন্দিরে উপাসক বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছি

না! সমবিশ্বাসীদিগকে সকল বিষয়ে সমান অধিকার দেওয়া হিন্দুদের উচিত এই কারণে, যে, তদ্দ্বারা অনেক তথাকথিত অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় লোকদের হিন্দুসমাজ ত্যাগ নিবারিত হইতে পারে। আগে হইতে এইরূপ যুক্তিসঙ্গত ও উদার নিয়ম অনুসৃত হইলে, এখন যাঁহারা অহিন্দু এরূপ অনেক কোটি লোক হয়ত হিন্দুসমাজভুক্তই থাকিতেন।

একটা সাংসারিক কথাও বলি;--পুরোহিতেরা দক্ষিণাদি প্রাপ্তি দ্বারা আয়বৃদ্ধি সম্বন্ধে উদাসীন নহেন। তথাকথিত অস্পৃশ্য হিন্দুরা দেবমন্দির প্রবেশ, দেবদর্শন ও দেব পূজার অবাধ অধিকার পাইলে পুরোহিতগণের আয় বাড়িবার খুব সম্ভাবনা আছে। অথচ ইহাও ধ্রুব সত্য, যে, বিশ্বনাথের মন্দির যে সুবিশাল বিশ্বজগৎ, তাহা যেমন কোন মানুষ বা অন্য জীবের স্পর্শে অপবিত্র হয় না, তেমনি দেবমন্দিরও কাহারও স্পর্শে অপবিত্র হইতে পারে না।

—

অনগ্রসর হিন্দুদের সম্বন্ধে পুনায় মীমাংসা

পূজার ছুটির কয়েক দিন আগে কার্ত্তিক মাসের প্রবাসী বাহির করিতে হইয়াছিল বলিয়া তাহাতে, ব্যবস্থাপক সভায় অনগ্রসর শ্রেণীর হিন্দুদের প্রতিনিধি-সংখ্যা সম্বন্ধে পুনায় যে মীমাংসা হইয়াছে, সে-বিষয়ে কিছু লেখা হয় নাই। এখন সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি।

হিন্দুদের মধ্যে যিনি যে সম্প্রদায়, জাতি, বা শ্রেণীর লোকই হউন, তিনি হিন্দুদের প্রাপ্য কোন প্রতিনিধি-পদ পাইলে তাহাতে আপত্তির কোন কারণ নাই; তিনি যোগ্য লোক হইলেই হইল। সুতরাং হিন্দুদের জন্য নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি সভ্যপদ অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের লোকদের জন্য হিন্দু নেতারা নির্দ্দিষ্ট করায় অসন্তোষের কোন কারণ হয় নাই। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী এই সব শ্রেণীর লোকদিগকে যতগুলি সভ্যপদ দিয়াছিলেন, হিন্দুনেতারা তাহার দ্বিগুণ অপেক্ষাও সভ্যপদ তাঁহাদিগকে দেওয়ায় ইহা প্রমাণিত হইয়াছে, যে, হিন্দুনেতারা প্রধান মন্ত্রীর চেয়ে তাঁহাদের কম হিতাকাঙ্ক্ষী নহেন।

মহাত্মা গান্ধী হিন্দুসমাজের অখণ্ডত্ব অটুট রাখিতে চান। প্রধান মন্ত্রী "অবনত" হিন্দুদিগকে কেবল তাঁহাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত স্বতন্ত্র কতকগুলি প্রতিনিধি দেওয়ায় এই অখণ্ডত্ব নষ্ট হইয়াছিল। প্রধান মন্ত্রীর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মহাত্মাজী এই হেতু প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন। পুনায় নেতাদের মীমাংসায় প্রধান মন্ত্রীর ব্যবস্থার অনিষ্টকারিতা কিয়ৎপরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে, কেন-না "অবনত" হিন্দু প্রতিনিধিরা সকল জাতির ও শ্রেণীর হিন্দুনির্ব্বাচকদিগের দ্বারা সম্মিলিত ভাবে নির্ব্বাচিত হইবেন। কিন্তু ঐ অনিষ্টকারিতা সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। কারণ, "অবনত" প্রত্যেক হিন্দু প্রতিনিধি পদের জন্য প্রথমতঃ "অবনত" নির্ব্বাচকেরা চারি জন করিয়া "অবনত" প্রার্থী মনোনীত করিবেন এবং তাঁহাদের মধ্য হইতে এক জন করিয়া প্রতিনিধি সকল হিন্দু নির্ব্বাচক সম্মিলিত ভাবে নির্ব্বাচন করিবেন। এই যে প্রাথমিক স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন, ইহাতে হিন্দু সমাজের অখণ্ডত্বের ব্যত্যয় হইবে, এবং এই প্রাথমিক স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের মধ্যে প্রধান মন্ত্রীর ব্যবস্থার অনিষ্টকারিতা কিছু রহিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এই প্রাথমিক নির্ব্বাচন ব্যবস্থা দশ বৎসরে বা তৎপূর্ব্বেই রদ হইবে। একটি বিষয়ে নেতাদের মীমাংসা প্রধান মন্ত্রীর ব্যবস্থা অপেক্ষা অসন্তোষজনক হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রীর ব্যবস্থা অনুসারে "অবনত"দের জন্য সভ্যপদ সংরক্ষণ প্রভৃতি সকল ব্যবস্থাই ঊর্দ্ধপক্ষে কুড়ি বৎসরে লোপ পাইত। কিন্তু নেতাদের মীমাংসায় অবনতদের জন্য সভ্যপদ সংরক্ষণের নিয়ম তাহাদের সম্মতি ব্যতিরেকে লোপ পাইবে না। অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য হিন্দু সমাজের সংহতিনাশক এইরূপ অ-গণতান্ত্রিক নিয়ম থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। এই নিয়ম নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য না হওয়ায় ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক স্বরাজ প্রতিষ্ঠার বিরোধী যাহারা তাহারা এই অনিষ্টকর নিয়ম যথাসাধ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী করিবার চেষ্টা করিবে। তাহাতে হিন্দু সমাজের ও ভারতীয় জাতির ক্ষতি হইবে।

এই নিয়ম "অবনত"দের পক্ষেও অনিষ্টকর। তাঁহারা যত শীঘ্র কৃত্রিম ব্যবস্থা অপেক্ষা নিজেদের যোগ্যতার উপর নির্ভর করিতে শিখেন ততই মঙ্গল। কিন্তু এরূপ নিয়ম

থাকিতে তাঁহারা প্রতিযোগিতায় যোগ্যতম হইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে উদ্বুদ্ধ হইবেন মনে হয় না।

"অবনত"দের জন্য কতকগুলি পদ রাখিবার একটি কারণ এই, যে, তাহা না রাখিলে তাঁহারা সন্দেহ করিবেন, যে, উচ্চ হিন্দুরা তাঁহাদিগকে ব্যবস্থাপক সভায় ঢুকিতে দিবেন না। অন্যদিকে আবার এই সংরক্ষণ নীতি যতদিন থাকিবে, ততদিন উক্ত সন্দেহ ও অবিশ্বাসকে জিয়াইয়া রাখা হইবে। এই হেতু সংরক্ষণ নিয়মটা রদ হইবার একটা মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট করিলে ভাল হইত। তাহাতে "অবনত"দের কোন ক্ষতি হইত না। কারণ, এ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র একটি নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি পদও নির্দ্দিষ্ট না থাকা সত্ত্বেও, "অবনত" শ্রেণীর কয়েক জন হিন্দু অন্য সব হিন্দু প্রার্থীদিগকে সম্মিলিত নির্ব্বাচনক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করিয়া নির্ব্বাচিত হইতে সমর্থ হইয়াছেন।

প্রধান মন্ত্রীর ব্যবস্থার এবং হিন্দু নেতাদের মীমাংসার একটি প্রধান দোষ এই, যে, বহুসংখ্যক হিন্দুকে "অস্পৃশ্য" "অনাচরণীয়" বা "অবনত" বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে হইবে, তবে তাঁহারা সংরক্ষিত পদগুলির জন্য নির্ব্বাচক ও প্রার্থী হইতে পারিবেন। এরূপ পরিচয় অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তার সম্পূর্ণ বিনাশে বাধা ও বিলম্ব জন্মাইবে। তা ছাড়া, এরূপ পরিচয় অপমানকর ও মনুষ্যত্বহ্রাসকারী।

—

প্রধান মন্ত্রীর পুনা-চুক্তিতে সম্মতির কারণ

মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসনসংস্কারবিধি অনুসারে বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভাগুলি গঠিত। তাহাতে অনুন্নত শ্রেণী-সমূহের ও নারীদের স্বতন্ত্র প্রতিনিধি স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন করিবার অধিকার নাই। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী তাঁহার ব্যবস্থায় তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন দ্বারা মনোনীত আলাদা প্রতিনিধি দিয়াছেন। অর্থাৎ ভারতবর্ষের লোকদের মধ্যে যতটা ভেদ আগেকার শাসন-সংস্কার বিধিতে ছিল, তাহা অপেক্ষা আরও বেশী ভেদের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী হিন্দু নেতাদের পুনা-চুক্তি কেন গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কারণ অনুমান করিতে হইলে স্থির করিতে হইবে, যে, তাঁহার ভেদনীতি ঐ চুক্তিদ্বারা বিনষ্ট বা হীনবল হইয়াছে কি-না। আমরা দেখাইয়াছি, অনগ্রসর ও অগ্রসর হিন্দুদের মধ্যে ভেদ পুনা-চুক্তি দ্বারা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় নাই, এবং ঐ ভেদ প্রধান মন্ত্রীর মীমাংসা অনুসারে যত শীঘ্র দূর হইত, পুনা-চুক্তিতে তাহা অপেক্ষা বিলম্ব হইতে পারে। সুতরাং প্রধান মন্ত্রী যদি মনে করিয়া থাকেন, যে, পুনা-চুক্তি দ্বারা তাঁহার ভেদনীতি অনেকটা সফল হইবে, তাহা হইলে তাঁহাকে ভ্রান্ত বলা যায় না।

পুনা-চুক্তিতে তাঁহার রাজী হইবার আর একটি কারণ সম্ভবতঃ এই, যে, উপবাসে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু হইলে সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে যেরূপ অশান্তি উৎপন্ন হইত এবং পৃথিবীর অন্যত্রও তাহার যে ফল ফলিত, ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। সেই জন্যও পুনা-চুক্তি প্রধান মন্ত্রীদ্বারা শীঘ্র গৃহীত হইয়া থাকিবে। মহাত্মা গান্ধী শীঘ্র যাহাতে উপবাস ভঙ্গ করেন এবং তাহার দ্বারা যাহাতে ব্রিটিশ গবন্মেণ্টকে তাঁহার আসন্নমৃত্যু রূপ গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হইতে না হয়, সেইজন্য গবন্মেণ্ট হিন্দু নেতাদিগকে জেলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি দিয়া থাকিবেন।

পুনা-চুক্তিতে ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের রাজী হইবার আরও একটি কারণ হয়ত ছিল। "উচ্চ"শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবার উপযুক্ত শিক্ষিত ও স্বাধীনচেতা যত লোক আছেন, "অনুন্নত" শ্রেণীসমূহের মধ্যে তত নাই। এইজন্য "অনুন্নত" শ্রেণীসমূহের সভ্যের সংখ্যা পুনা-চুক্তিতে অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় গবন্মেণ্টের ভারতীয়স্বরাজবিরোধী নীতিতে প্রবল বাধা দিবার লোক ব্যবস্থাপক সভাসমূহে কিছু কমিবে। এই সম্ভাবনা গবন্মেণ্টের পক্ষে অপ্রীতিকর হয় নাই। বস্তুতঃ, বাংলা দেশেও (যেখানে "অস্পৃশ্যতা"র প্রকোপ কম) ৩০ জন "অনুন্নত" শ্রেণীর প্রতিনিধি নির্ব্বাচনার্থ তাহার চারিগুণ ১২০ জন যোগ্য প্রার্থী পাওয়া খুব সহজ হইবে না। অন্যান্য প্রদেশেও যথেষ্টসংখ্যক যোগ্য "অনুন্নত" প্রতিনিধি-পদপ্রার্থী পাওয়া সহজ হইবে না।

—

সমগ্রভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় "অনুন্নত" ও অন্যান্য প্রতিনিধি

গবর্ন্মেণ্ট পক্ষ হইতে গত গোলটেবিল বৈঠকে প্রস্তাব করা হইয়াছে, যে, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার নিম্নকক্ষে দেশী রাজ্যের প্রতিনিধিরা শতকরা ৩৩১/৩টি ব্যবস্থাপক পদ পাইবেন। মুসলমানেরা শতকরা ৩৩১/৩টি দাবি করিয়াছেন। হিন্দু নেতাদের পুনার চুক্তি অনুসারে "অবনত" শ্রেণীসমূহের প্রতিনিধিদিগকে শতকরা ১৮টি দেওয়া হইবে। শিখরা শতকরা ৫টি দাবি করিয়াছেন। এই সমস্ত দাবি অনুসারে যদি ব্যবস্থাপক পদগুলির ভাগবাঁটোয়ারা হয়, তাহা হইলে সংখ্যান্যূন এই সব দলের প্রতিনিধিরা শতকরা মোট ৮৯২/৩টি ব্যবস্থাপক পদ পাইবেন; বাকী শতকরা ১০১/৩টি পদ হইতে দেশীয় খ্রীষ্টিয়ান, ফিরিঙ্গী, ইউরোপীয় প্রভৃতিকে কিছু দিতে হইবে। তাহা দিবার পর হয়ত শতকরা আটটি পদ "উচ্চ" শ্রেণীর হিন্দুদের জন্য থাকিবে। তাহার মানে এই, যে, যাঁহাদের যোগ্যতা, পরিশ্রম, আত্মোৎসর্গ, ও দুঃখবরণের বলে স্বরাজপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ঘটিয়াছে ও তাহার সময় নিকটতর হইয়াছে, এবং সমগ্র ভারতে যাঁহারা সংখ্যায় অন্য যে-কোন দলের চেয়ে বেশী, তাঁহারা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় নগণ্য হইবেন। তাঁহারা আত্মবিলোপে রাজী হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের ক্ষতিলাভ প্রধান বিবেচ্য বিষয় নহে। প্রধান প্রশ্ন এই, যে, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের সংখ্যা ও প্রভাব খুব কম হইলে, দেশের প্রভূত ক্ষতি হইবে, আমলাতন্ত্র ও গবর্ন্মেণ্ট এবং তাঁহাদের দেশী অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী অনুচরদের সম্মিলিত বিরোধিতায় প্রকৃত স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। এরূপ কুফল যদি ফলে, তাহার জন্য দায়ী হইবে, ব্রিটিশ ভেদনীতি ও ভারতীয় স্বরাজবিরোধিতা এবং ভারতীয় নানা সংখ্যা-ন্যূন দলের সমগ্র ভারতবর্ষের হিত ও ভারতীয় স্বরাজস্থাপন সম্বন্ধে উদাসীনতা ও নিজ নিজ স্বার্থ সম্বন্ধে গৃধ্নুতা।

—

বাংলার ব্যবস্থাপক পদসমূহের বাঁটোয়ারা

অদ্যকার (২২শে কার্ত্তিকের) দৈনিক কাগজগুলিতে বাহির হইয়াছে, যে, গত কল্য ২১শে কার্ত্তিক এলাহাবাদের সাম্প্রদায়িক মিলন কন্‌ফারেন্সে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদগুলির নিম্নলিখিতরূপ ভাগ-বাঁটোয়ারা স্থির হইয়াছে—মোট ২৫০টি পদের শতকরা ৫১টি অর্থাৎ ১২৭টি মুসলমানরা পাইবেন, শতকরা ৪৪.৭টি অর্থাৎ ১১২টি হিন্দু ও অন্যান্য "সাধারণ" নির্ব্বাচকের পাইবেন, এবং ইউরোপীয়েরা ৭, দেশী খ্রীষ্টিয়ানেরা ২ ও ফিরিঙ্গীরা ২টি পদ পাইবেন। কমিটিতে যে-সব কথাবার্ত্তা হয় ও প্রস্তাব স্থির হয়, তাহা চূড়ান্ত নহে এবং তাহা অপ্রকাশ্য। কন্‌ফারেন্সে যাহা স্থির হইবে, তাহাই চূড়ান্ত ও প্রকাশ্য। সুতরাং এখন কোন খবর বাহির করা উচিত হয় নাই। কিন্তু কিছু খবর বাহির হওয়ায় আমরা ভ্রান্ত ধারণা নিবারণ করিবার জন্য কিছু লিখিতে বাধ্য হইতেছি। খবরটি টেলিগ্রামে আসায় সব কথা ইহাতে নাই। বাংলা দেশের যে মীমাংসা কলিকাতায় ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের হিন্দুদের কন্‌ফারেন্সে হইয়াছিল, তাহাতে কতকগুলি সর্ত্ত ছিল। সেই সর্ত্তগুলি উল্লিখিত ভাগ-বাঁটোয়ারার অবিচ্ছেদ্য অংশ। একটি সর্ত্ত এই, যে, পঞ্জাবের সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসা হইলে তবে বঙ্গের এই মীমাংসা অনুসারে কাজ হইবে। আর একটি সর্ত্ত এই, যে, যদি আপোষে সাম্প্রদায়িক সমুদয় প্রশ্নের মীমাংসা হয়, কিন্তু গবর্ন্মেণ্ট তদনুসারে নিজ সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা ("communal award") পরিবর্ত্তিত করিতে রাজী না হন, তাহা হইলে হিন্দু মুসলমান শিখ ভারতীয় সব ধর্ম্মসম্প্রদায় উক্ত কম্যুন্যাল্ য়্যাওয়ার্ড অগ্রাহ্য করিবেন, যত শীঘ্র সম্ভব স্বরাজ স্থাপনার্থ সম্মিলিত চেষ্টা করিবেন, এবং ভারতীয়দের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধীয় স্বার্থ-রক্ষার জন্য সম্মিলিত চেষ্টা করিবেন। আরও এই একটি সর্ত্ত ছিল, যে, "অবশিষ্ট ক্ষমতা" (residuary powers) প্রদেশগুলিকে দেওয়া, প্রাদেশিক সীমা পরিবর্ত্তন এবং সিন্ধুদেশ স্বতন্ত্রীকরণ, এই তিনটি বিষয়কে সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন করা হইবে না।

—

নূতন কন্‌ষ্টিটিউশ্যন প্রবর্ত্তিত হইবার সময় হইতে "at the longest" দশ বৎসর চলিবে, দশ বৎসর পরে "automatically" অর্থাৎ স্বতঃই উহা থাকিবে না—দশ বৎসর পরে কোনও প্রদেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ বা সংখ্যাভূয়িষ্ঠদের জন্য রিজারভেশ্যন থাকিবে না; কলিকাতায় হিন্দুদের কন্‌ফারেন্সে এইরূপ স্থির হইয়াছিল। সুতরাং হিন্দুদের পক্ষ হইতে বঙ্গের চুক্তির ইহা একটি সর্ত্ত ছিল। আর একটি সর্ত্ত এই ছিল, যে, পদ যাহার জন্য যতই থাকুক, সবগুলির নির্ব্বাচন সম্মিলিত নির্ব্বাচনের দ্বারা হইবে এবং তাহা নূতন কন্‌ষ্টিটিউশ্যন প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতেই হইবে; এবং বরাবর যুক্ত-নির্ব্বাচন থাকিবে।

—

মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎকারের অনুমতি ও নিষেধ

মহাত্মা গান্ধী যখন উপবাস করিয়াছিলেন, তখন "অবনত" ও "উন্নত" হিন্দুদের মধ্যে মিলন সাধনার্থ কেন হিন্দু নেতাদিগকে তাঁহার সহিত দেখা করিতে দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু হিন্দু-মুসলমান শিখদের মধ্যে মিলন-সাধনার্থ কেন মৌলানা শৌকৎ আলী প্রভৃতিকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হয় নাই, এ-বিষয়ে আমরা যাহা অনুমান করিয়াছিলাম তাহা এই। মহাত্মাজীর প্রভাবে হিন্দুদের প্রধান দুই সামাজিক দলের একটা বুঝাপড়া হইয়া গিয়াছে। পাছে তাঁহার প্রভাবে হিন্দু-মুসলমান-শিখদের মধ্যেও ঐরূপ কিছু একটা বুঝাপড়া হইয়া যায়, এই ভয় গবন্মেণ্টের আছে; এই জন্য হিন্দু-মুসলমান-শিখদের মিলনসাধনোদ্দেশ্যে কেহ মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে গবন্মেণ্ট তাহাতে রাজী নহেন।

এই বিষয়ে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ হেগকে অনেক প্রশ্ন করা হয়। তাঁহার উত্তর হইতে গবন্মেণ্টের মতিগতি স্পষ্টই বুঝা যায়। তিনি বলেন, "অবনত" হিন্দুদের সহিত অন্য হিন্দুদের মিলন একটা সামাজিক ও নৈতিক ব্যাপার; এই জন্য তৎসম্পর্কে হিন্দু নেতাদিগকে তাঁহার সহিত দেখা করিতে দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু হিন্দু-মুসলমান-শিখদের মিলন সম্বন্ধে আলোচনা একটা রাজনৈতিক ব্যাপার বলিয়া, তৎসম্পর্কে কাহাকেও মহাত্মাজীর সহিত দেখা করিতে দেওয়া হয় নাই, হইবে না!!! শ্রীযুক্ত রঙ্গ আয়ার একাধিক প্রশ্ন দ্বারা ইহা বিশদ করিয়া দেন, যে, দুই দলের হিন্দুদের মিলন যদি সামাজিক ও নৈতিক ব্যাপার হয়, তাহা হইতে হিন্দু-মুসলমান-শিখদের মিলন উচ্চতর সামাজিক ও নৈতিক ব্যাপার। কিন্তু মিঃ হেগ তথাপি বলেন, উহা সারতঃ ("essentially") একটি রাজনৈতিক প্রশ্ন! উহা যে আংশিক ভাবে রাজনৈতিক প্রশ্ন তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সে অর্থে হিন্দুদের দুই দলের মিলনও আংশিকভাবে রাজনৈতিক প্রশ্ন। আসল কথা এই, যে, হিন্দুদের আভ্যন্তরীণ অমিল কতকটা দূর হওয়ায় গবন্মেণ্ট ভয় পাইয়াছেন; সেই জন্য হিন্দু-মুসলমান-শিখদের সম্ভাবিত মিল আরও আশঙ্কার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

জেলে আবদ্ধ থাকিয়াও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য্য চালাইবার সুবিধা মহাত্মা গান্ধী কেন পাইয়াছেন, তাহা বুঝিতে হইলে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার দুই একটি প্রশ্ন ও তাহার উত্তর জানা আবশ্যক। শ্রীযুত রঙ্গ আয়ারের একটি প্রশ্নে ছিল, যে, মহাত্মা গান্ধীকে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইবার যে সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, তাহার দ্বারা ভারতীয়দের মন নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টা হইতে অন্যদিকে চালিত হইবে। মহাত্মা গান্ধী জেল হইতে খুব জোরে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইলে গোঁড়া হিন্দু ও অস্পৃশ্যতাবিরোধী হিন্দুদের মধ্যে বিবাদ যে প্রবল আকার ধারণ করিবে, তাহার আভাস বড়লাটের নিকট বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সংঘের দরখাস্ত হইতে এবং ব্যবস্থাপক সভার নিম্নোদ্ধৃত প্রশ্নোত্তর হইতে বুঝা যায়।

Mr. Satyendranath Sen: By the removal of restrictions placed on Mahatma Gandhi are we to understand that the Government indirectly identify themselves with anti-untouchability campaign?

Mr. Haig: The Government, as I think Mr. Gandhi himself stated in a communication that was published yesterday, stand on one side in this matter.

Mr. Satyendranath Sen: Are Government aware that anti-untouchability movement is directed against the basic principles of Hinduism?

Mr. Haig: It is a matter in which the Government are not prepared to take an active part.

Mr. Maswood Ahmed: Is it not a fact that separate electorates for the Depressed classes is also a political question?

Mr. Haig: That was a question which had an element of politics also in it.

Pandit Satyendranath Sen: In view of expression of opinion made by the Hon'ble Home Member will the Government convene a meeting of orthodox Hindus from different provinces and elicit their opinion on this matter?

Mr. Haig: I should prefer to leave that task to the Hon'ble Member himself.

—

বিনাবিচারে বন্দীদের সংখ্যা

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সর্দার শান্ত সিংহের প্রশ্নের উত্তরে মিঃ হেগ বলেন, যে, গত জানুয়ারি হইতে জুলাই পর্য্যন্ত বিনাবিচারে বন্দীকৃত লোকদের সংখ্যা বঙ্গে ৫১১, পঞ্জাবে ৫, দিল্লীতে ৪, এবং ব্রহ্মদেশে ২। ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে, যে, বাংলা-গবন্মেণ্ট অন্য সব প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টের চেয়ে ভড়কাইয়াছেন। তাহার কারণ কি এই, যে, বাঙালীরা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভীরু জাতি?

—

নিরাপত্তার সর্ত্ত

গত ৩১শে অক্টোবর বিকানেরের মহারাজা একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন, যে, সম্ভবতঃ দু-এক জন ছাড়া, দেশী রাজারা সবাই আগেকার মত এখনও ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের সহিত দেশী রাজ্যসমূহের সংযোগ দ্বারা এক যুক্ত রাষ্ট্র গঠনের অর্থাৎ ফেডারেশ্যনের পক্ষপাতী আছেন; তাঁহারা কেবল তাহার কন্‌ষ্টিটিউশ্যনে অর্থাৎ মূল রাষ্ট্রবিধিতে কিছু সেফগার্ড অর্থাৎ নিরাপত্তার সর্ত্ত চান। এই সর্ত্তগুলি কি, তাহা জানা আবশ্যক।

মুসলমান ভারতীয়েরা সমগ্র ভারতে হিন্দুদের চেয়ে সংখ্যায় কম বলিয়া সমগ্র ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং অন্যান্য সমগ্র ভারতীয় ব্যাপারে নিরাপত্তার ও স্বার্থরক্ষার সর্ত্ত চান। যে-যে প্রদেশে তাঁহারা সংখ্যায় ন্যূন সেখানে ঐরূপ সর্ত্ত চান। যে-যে প্রদেশে তাঁহারা সংখ্যায় অধিকতম, সেখানেও তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভায় অধিকতম সভ্যপদ অধিকার করিয়া নিরাপদ থাকিতে চান। শিখরা ঐরূপ নিরাপত্তার সর্ত্ত চান। কিন্তু হিন্দুরা যে-যে প্রদেশে সংখ্যায় কম, তাঁহাদিগকে শিক্ষা ও বৃত্তি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং সরকারী চাকরিতে প্রবৃত্ত হওয়া সম্বন্ধে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি মূলরাষ্ট্রবিধির মধ্যে দিতে অল্প অহিন্দুকেই রাজী দেখিতে পাই। অবস্থাটা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে, যে, আর সকলেরই স্বার্থরক্ষা ও নিরাপদ থাকা দরকার, কেবল হিন্দুদেরই তাহাতে কোনই প্রয়োজন নাই! এবং বিদেশী শাসকদের হাত হইতে দেশের স্বাধীনতার উদ্ধার করিয়া তাহাকে নিরাপদ রাখারও কোন দরকার নাই! যদি দরকার থাকে, তাহা হইলে সেই বিপজ্জনক, দুঃখময়, স্বার্থত্যাগসাপেক্ষ এবং আত্মোৎসর্গ দ্বারাই সম্ভব কাজটি প্রধানতঃ হিন্দুরা করিবে! বিশেষ করিয়া উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা করিবে! আর সকলে সুখে নিরাপদে স্বরাজ ভোগ করিবে!!!

নিরাপত্তার সর্ত্তপ্রার্থী ব্যক্তিরা কি জানেন না, যে, এরূপ একপেশে দরকষাকষি দ্বারা স্বরাজ পাওয়া যাইবে না, রক্ষিতও হইবে না, কেবল ব্রিটিশ শাসকদের নিকট হইতে কিছু উপাধি ও চাকরি পাওয়া যাইবে? আমাদের এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই হয়ত মূর্খতা। কারণ, নিরাপত্তার সর্ত্তের জন্য যাহারা একান্ত ব্যাকুল, তাহারা দেশের স্বরাজ চায় না, অন্য কিছু চায়।

হিন্দুদের নিরাপত্তা বা অন্য কিছু স্বার্থরক্ষার জন্য সর্ত্তে যে কম অহিন্দুই রাজী, ইহা আমরা কল্পনা করিয়া বলিতেছি না। এলাহাবাদে যে সাম্প্রদায়িক মিলন কন্‌ফারেন্স হইতেছে, কয়েক দিন ধরিয়া তাহার আলোচনার মধ্যে থাকিয়া দেখিলাম, বঙ্গে, পঞ্জাবে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, এবং, আলাদা সিন্ধু প্রদেশ গঠিত হইলে, সিন্ধুতে, সংখ্যান্যূন হিন্দুদের নিরাপত্তা বা নানাবিধ স্বার্থ রক্ষা সম্বন্ধে অনুকূল মনোভাবের স্পষ্ট প্রমাণ বিশেষ কিছু নাই।

—

বঙ্গে সরকারী ব্যয় হ্রাস

বঙ্গে সরকারী ব্যয় হ্রাসের সুপারিশ করিবার জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার রিপোর্টের চুম্বক কোন কোন দৈনিক কাগজ প্রকাশিত করিয়াছেন।

যাইবে, এবং বাকী অনেকের বেতন কমিবে। মোট দেড় কোটি টাকা ব্যয়সংক্ষেপ হইবার কথা।

এত লোকের চাকরি যাওয়ায় বেকার-সমস্যা আরও সঙ্গীন হইবে। তাঁহারা অবশ্য সবাই শিক্ষিত ভদ্রলোক। সাক্ষাৎ ভাবে যাঁহারা তাঁহাদের উপর নির্ভর করেন, তাঁহারাও ভদ্রলোক। কিন্তু অন্নাভাবে ভদ্রসন্তানরাও ডাকাতি করে — যদিও এরূপ ডাকাতিমাত্রকেই রাজনৈতিক ডাকাতি বলাই ফ্যাশন। যাঁহাদের চাকরি যাইবে বা বেতন কমিবে, তাঁহাদের চাকর-বাকর রাখিবার ক্ষমতা এবং নানাবিধ জিনিষ কিনিবার ক্ষমতা কমিবে। ইহাতেও বেকারের সংখ্যা বাড়িবে, তাহার যে কুফল হইতে পারে, তাহার প্রতিষেধক কি উপায় গবন্মেণ্ট অবলম্বন করিতেছেন? রাজস্ব আদায় যখন যথেষ্ট হইতেছে না, তখন কর্ম্মচারীর সংখ্যা কমাইয়া ও বাকী কর্ম্মচারীদের বেতন কমাইয়া আয়-ব্যয় সমান করা উচিত, তাহা বুঝি। কিন্তু এরূপ পরিবর্ত্তন হইতে যে-যে অনিষ্ট হইতে পারে, আগে হইতে তাহা নিবারণের বন্দোবস্তও করা দরকার।

সরকারী ব্যয়সংক্ষেপের উপায় সম্বন্ধে যেরূপ প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা গৃহীত হইলে তাহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অযৌক্তিক হইবে না, যে, গবন্মেণ্টের মতে প্রস্তাবিত কম-সংখ্যক কর্ম্মচারীদের দ্বারা এবং প্রস্তাবিত কম বেতনের কর্ম্মচারীদের দ্বারা দেশের সর্ব্ববিধ সরকারী কাজ চলিতে পারে। তাহা হইলে এই প্রশ্ন উঠিবে, যে, এতদিন এত বেশী কর্ম্মচারী এবং এত বেশী বেতনের কর্ম্মচারী রাখিয়া অপব্যয় কেন করা হইয়াছিল। সরকার-পক্ষ উত্তরে বলিতে পারেন, যে, প্রস্তাবিত বন্দোবস্তে কাজ চলনসই রকমে চলিবে, আদর্শ মাফিক ভাল করিয়া চলিবে না। এরূপ উত্তরে সন্তুষ্ট হওয়া কঠিন। এখন যত বেতন দেওয়া হয়, বিশেষতঃ ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদিগকে যত বেতন দেওয়া হয়, তাহা অপেক্ষা কম বেতনে যোগ্য লোক নিশ্চয়ই বরাবরই পাওয়া যাইতে পারিত, এবং ইউরোপীয় কর্ম্মচারীর সংখ্যাও বরাবরই কিছু বেশী রাখা হইয়া

প্রস্তাবিত ব্যয় হ্রাস সম্বন্ধে একটি আশঙ্কা ভারতীয়দের মনে উদিত হইয়াছে। তাহা এই, যে, ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদের সংখ্যা হ্রাস ও বেতন হ্রাসের সব প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবে না, সামান্যই কার্য্যে পরিণত হইবে, কিন্তু ভারতীয় কর্ম্মচারীদের সংখ্যা হ্রাস এবং বেতন হ্রাস প্রস্তাবসমূহ অনুসারে যথাসাধ্য করা হইবে। আরও একটি আশঙ্কা এই আছে, যে, গবন্মেণ্টের প্রিয় পুলিস আদি বিভাগে ব্যয়সংক্ষেপ সামান্য করা হইবে, কিন্তু শিক্ষা প্রভৃতি "জাতিগঠনমূলক" বিভাগগুলিতে ব্যয়সংক্ষেপ অধিক পরিমাণে হইবে।

ব্যয়সংক্ষেপ কমিটির রিপোর্ট এখনও গবন্মেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয় নাই। প্রকাশিত হইলে সংবাদপত্রসমূহে বিস্তারিত সমালোচনা হইতে পারিবে।

—

সংস্কৃত কলেজ ও স্কুল

ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে শুনা যাইতেছে, যে, সংস্কৃত কলেজের কলেজ-বিভাগে অতঃপর যে-সব ছাত্র পড়িবে, তাহাদিগকে ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি "আধুনিক" বিষয় প্রেসিডেন্সী কলেজে গিয়া পড়িতে হইবে। এখন কেবল ইংরেজীর ও ইতিহাসের অনার্স কোর্সের পাঠ্যগুলি প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতে হয়। এই বিষয়গুলি এবং ইংরেজীর সাহায্যে শিক্ষণীয় অন্যান্য কোন কোন বিষয় শিখাইতে সমর্থ অধ্যাপকবর্গ সংস্কৃত কলেজে আছেন সবগুলিই এই কলেজে অধ্যাপনার বন্দোবস্ত করিলে ইহার ছাত্রসংখ্যা বাড়িতে পারে। ব্যয়সংক্ষেপের জন্য নূতন যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহার মানে এই, যে, সংস্কৃত কলেজটিকে টোলে পরিণত করা হইবে। আমরা ইহার বিরোধী। কলেজটি যেমন আছে, সেইরূপ রাখিয়া বরং ইহাতে আরও আধুনিক বিষয় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করাই কর্ত্তব্য। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগকে ইংরেজী ভাষার মধ্য দিয়া যে-যে বিষয় শিখিতে হইবে, তাহা সবগুলি যদি প্রেসিডেন্সী কলেজে গিয়া পড়িতে হয়, তাহা হইলে তাহাতে উভয় কলেজেরই অসুবিধা। এরূপ বন্দোবস্তে সংস্কৃত কলেজের ছাত্র কমিবে, এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের কোন কোন শ্রেণীতে ছাত্রের ভি

অসুবিধাজনক হইবে। শুনিতে পাই, এরূপ প্রস্তাবও নাকি হইয়াছে, যে, সংস্কৃত কলেজে আশীটির বেশী ছাত্রের পড়িবার বন্দোবস্ত রাখা হইবে না। ছাত্র-সংখ্যার এরূপ সীমানির্দ্দেশও অনুচিত।

সংস্কৃত কলেজ সম্বন্ধে ব্যয়সংক্ষেপের প্রস্তাব হইলে স্বভাবতই জানিতে ইচ্ছা হয়, যে, কলিকাতা মাদ্রাসা ও কলিকাতার ইস্লামিয়া কলেজের ব্যয় হ্রাসের কোন প্রস্তাব হইয়াছে কি-না, ও তাহাদের ছাত্র-সংখ্যার কোন সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কি-না, এবং বঙ্গে অন্য যে-সব মাদ্রাসা ও মুসলমানদের জন্য ইণ্টারমীডিয়েট কলেজ আছে, সে-গুলির সম্বন্ধে ঐরূপ কোন প্রস্তাব হইয়াছে কি-না। কারণ 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকার ১৯৩১ সালের নবেম্বর সংখ্যায়, ৫৪৪-৪৭ পৃষ্ঠায়, দেখান হইয়াছে, যে, বঙ্গে কেবলমাত্র হিন্দুদের জন্য অভিপ্রেত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারী ব্যয় ১,১১,৫৫১ টাকা, কিন্তু কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্য অভিপ্রেত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যয় ১৫,৮৮,০৯১ টাকা। অর্থাৎ শুধু মুসলমানদের শিক্ষার সরকারী ব্যয় শুধু হিন্দুদের শিক্ষার সরকারী ব্যয়ের চৌদ্দ গুণের অধিক। এই অসাম্য ও পক্ষপাতিত্বের উপর যদি আবার এখন কেবল হিন্দুদের সংস্কৃত কলেজ সম্বন্ধেই ব্যয়সংক্ষেপের প্রস্তাব হইয়া থাকে, তাহা সাতিশয় গর্হিত। আমরা কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার জন্য সরকারী ব্যয় কমাইবার বিরোধী; কিন্তু যদি শিক্ষার ব্যয় কমাইতেই হয় তাহা হইলে সমান অনুপাতে সকলেরই কমান উচিত।

সংস্কৃত শিক্ষার বিরুদ্ধে আর একটি প্রস্তাবও হইয়াছে শুনিতেছি। সংস্কৃত কলেজের স্কুল-বিভাগটি উঠাইয়া দিয়া তাহা হিন্দু ও হেয়ার স্কুলের সহিত জুড়িয়া দিবার কথা উঠিয়াছে। এই প্রস্তাবও আপত্তিকর এবং গর্হিত। তাহার কারণ বলিতেছি।

হিন্দু ও হেয়ার স্কুলে এগার শত (১১০০) ছাত্র পড়ে। এই দুটি স্কুলের কোনটিতেই একটি সম্পূর্ণ স্কুল বা একটিতে আধখানা করিয়া স্কুল জুড়িয়া দিলে ছাত্র-সংখ্যার আতিশয্যে শিক্ষার ব্যাঘাত জন্মিবে। দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত স্কুল এবং হিন্দু-স্কুলের (হয়ত হেয়ার স্কুলেরও) ব্যয়নির্ব্বাহার্থ এণ্ডাউমেণ্ট বা স্থায়ী ফণ্ড আছে। তাঁহারা এই সব ফণ্ডে টাকা দিয়াছিলেন, তাঁহারা আলাদা আলাদা একটি স্কুল চালাইবার জন্যই দিয়াছিলেন। এখন দুটা স্কুল বা দেড়টা স্কুল সম্মিলিত করিলে সেই সর্ত্তের বিরুদ্ধাচরণ হয়। অন্য একটি আপত্তি আরও গুরুতর। সংস্কৃত কলেজের স্কুল-বিভাগে ছাত্রেরা অন্য সব উচ্চ ইংরেজী স্কুলের চেয়ে সংস্কৃত বেশী পড়ে। তাহারা স্কুলেই একখানা মূল সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িয়া ফেলে। তা ছাড়া, তাহারা প্রবেশিকা পরীক্ষার শ্রেণীতে উঠিবার দুই এক বৎসর আগেই কয়েকখানি কাব্য পড়িয়া কাব্যতীর্থ উপাধির পরীক্ষা দেয়। ইহা সংস্কৃত কলেজের স্কুল-বিভাগের একটি বিশেষত্ব, হিন্দু বা হেয়ার স্কুলের এই বিশেষত্ব নাই। সুতরাং সংস্কৃত স্কুলটি উঠাইয়া দিবার মানে সংস্কৃত শিক্ষাকে নিরুৎসাহিত করা।

গবর্ন্মেণ্ট মক্তব-মাদ্রাসাসমূহে পারসী আরবী শিক্ষা দিবার জন্য যত টাকা খরচ করেন, টোলে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্য তাহা অপেক্ষা অনেক কম খরচ করেন। তাহার উপর যদি সংস্কৃত কলেজের স্কুলটির প্রাণবধ করা হয়, তাহা হইলে এরূপ কার্য্য সম্বন্ধে ঠিক্ কি বিশেষণ প্রয়োগ করা উচিত, তাহা স্থির করিবার জন্য অভিধান দেখিতে হইবে।

—

মক্তব-মাদ্রাসায় ও টোলে সরকারী সাহায্য

বাংলা-গবর্ন্মেণ্ট মক্তব-মাদ্রাসায় ও টোলে কত টাকা দেন, অনেকেই সে খবর রাখেন না। তার কারণ, পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন ও অন্যান্য অনেক হিন্দু ব্রাহ্ম রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নিন্দা করিতে যতটা পরিশ্রম করেন, হিন্দুদের সংস্কৃত শিক্ষার এবং অন্যবিধ স্বার্থরক্ষার জন্য ততটা মনোযোগী নহেন।

১৯৩০-৩১ সালের বঙ্গের সরকারী শিক্ষা রিপোর্ট আধুনিকতম। তাহার ৯০ পৃষ্ঠায় দেখিতেছি ঐ বৎসর মক্তবগুলিতে সরকারী সাহায্য ৭,০৪,৪৬৬ টাকা দেওয়া হইয়াছিল, টোলগুলিতে সরকারী সাহায্য ৫৮,৪২০ টাকা দেওয়া হইয়াছিল। অর্থাৎ মক্তবে সাহায্য টোলে [illegible]

সংখ্যা টোলগুলির সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু মক্তবের শিক্ষায় গবন্মেণ্ট যেরূপ উৎসাহ দেন, টোলের শিক্ষায় সেইরূপ উৎসাহ দিলে টোলের সংখ্যাও অনেক বাড়িতে পারে।

—

হিন্দুরা শিক্ষায় অনগ্রসর

অনেকের এই ভ্রান্ত ধারণা আছে, যে, সমগ্র ভারতে শিক্ষায় সকল ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে হিন্দুরা মোটের উপর সকলের চেয়ে অগ্রসর ও উন্নত, এবং প্রত্যেক প্রদেশেও তাহারা অন্য সব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের চেয়ে উন্নত ও অগ্রসর। প্রত্যেক প্রদেশের শিক্ষা-রিপোর্ট এখন আমাদের সম্মুখে নাই। সেই জন্য প্রত্যেক প্রদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে কাহার স্থান কিরূপ তাহা লিখিতে পারিলাম না। কিন্তু ইহা আমরা জানি, যে, ইংরেজী শিক্ষায় আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানরা অগ্রসর।

সমগ্র ভারতবর্ষের আধুনিকতম শিক্ষা-রিপোর্টে (১৯২৯-৩০ সালের রিপোর্টে) উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন শিক্ষা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের যে-সব ছাত্রছাত্রী পাইতেছে, তাহাদের মোট সংখ্যা তাহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোক-সংখ্যার শতকরা কত অংশ, তাহা দেওয়া হইয়াছে। উক্ত রিপোর্টের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা হইতে ঐ তালিতাটি উদ্ধৃত করিতেছি।

সম্প্রদায়।	ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা।	শতকরা ব
ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী	৪৯৪৪০	১৯.০
দেশী খ্রীষ্টিয়ান	৩৯৬৬৫৮	১৪.২
হিন্দু	৭৮২৮৮৮৭	৪.৮
মুসলমান	৩২৩৩৪৯৮	৫.৪
বৌদ্ধ	৬৪১৮৮৫	৫.৬
পার্সী	১৯৮৯১	২২.২
শিখ	১৮৪৭৫৭	৭.৭
অন্যান্য	১৬১০৮১	২.৫
মোট	১২৫১৬০৯৭	৫.০

সমগ্র ভারতে হিন্দুরা উচ্চশিক্ষায় মুসলমানদের চেয়ে অগ্রসর বটে, কিন্তু সর্ব্ববিধ শিক্ষায় মোটের উপর কম অগ্রসর। ইহার কারণ, "অবনত" শ্রেণীর হিন্দুদের শিক্ষায় গবন্মেণ্ট যথেষ্ট মন দেন নাই, "উচ্চ" শ্রেণীর হিন্দুরাও যথেষ্ট মন দেন নাই।

—

বঙ্গে অনুন্নতদের শিক্ষার চেষ্টা

অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের শিক্ষার জন্য বঙ্গে যত বেসরকারী দেশী সমিতি আছে, তাহার মধ্যে বঙ্গ ও আসামের অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের উন্নতিবিধায়িনী সমিতি ("Society for the Improvement of the Backward Classes") সকলের চেয়ে বেশী কাজ করিতেছেন। এই সমিতি তেইশ (২৩) বৎসর কাজ করিতেছেন। বর্ত্তমানে ইহার বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা ৪৪১ এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৭৮০৯। তন্মধ্যে বালিকা-বিদ্যালয় ১১৩টি, ছাত্রী-সংখ্যা ৪৭০৩। এই বিদ্যালয়গুলিতে নমঃশূদ্র জাতির ছাত্র ও ছাত্রীদের সংখ্যা সকলের চেয়ে বেশী—যথাক্রমে ৫৭৩৬ ও ২৩৮২। বিদ্যালয় ছাড়া সমিতি কয়েকটি লাইব্রেরী ও পাঠাগার চালান, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে ম্যাজিকলণ্ঠনসহ বক্তৃতার বন্দোবস্ত করেন, কয়েকটি জায়গায় শিল্প শিক্ষা দেন, শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার জন্য শিক্ষা দেন, এবং বয় স্কাউট ও সেবাসমিতির ব্যবস্থা করেন। ইহার কাজ সাতিশয় মিতব্যয়িতার সহিত চালান হয়। ইহার কাজের প্রশংসা কবি রবীন্দ্রনাথ, আচার্য্য রায়, জজ চারুচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি করিয়াছেন। কাজ বাড়িয়াই চলিতেছে। সেই জন্য সর্ব্বদাই টাকার দরকার। শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় ইহার সম্পাদক। কার্য্যালয়ের ঠিকানা ১৩ বাদুড়বাগান রো, কলিকাতা।

অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য সম্প্রতি শেঠ ঘনশ্যামদাস বিড়লা মহাশয়কে সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঠক্কর মহোদয়কে সম্পাদক করিয়া যে নিখিলভারতীয় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, শিক্ষাদান তাহার কার্য্যপ্রণালীর একটি প্রধান অঙ্গ। এই প্রকার উদ্দেশ্য লইয়া বঙ্গ ও আসামের সমিতিটি ২৩ বৎসর প্রশংসনীয় কাজ করিয়া আসিতেছেন। এই জন্য ইহার কার্য্যের প্রতি বিড়লা ও ঠক্কর মহোদয়দিগের দৃষ্টিপাত বাঞ্ছনীয়।

—

বিদেশে ভারতবর্ষের ছাত্র

১৯২৯-৩০ সালে বিদেশে ভারতবর্ষের কত ছাত্র পড়িত, তাহার একটি তালিকা সরকারী সমগ্রভারতীয়

রিপোর্টে আছে। তাহাতে দেখিলাম, গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ডে ১৮১৯, আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সে ২০৫, ফ্রান্সে ২৫, জার্ম্মেনীতে ৪৬, ইতালীতে ১২, সুইডেনে ২, সুইট্‌জার্ল্যাণ্ডে ৪ এবং অষ্ট্রিয়ায় ১০ জন ছাত্র ঐ বৎসর পড়িত। মোট ২১২৩। উচ্চশিক্ষা ইংলণ্ডের চেয়ে ইউরোপের অন্য কোন কোন দেশে ভাল হয়, এবং কোন কোন বিষয়ে আমেরিকাতেও হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে সরকারী চাকরির বাজারে বিলাতী শিক্ষার আদর বেশী, ভারতবর্ষে ব্যারিষ্টারীই কেবল বিলাতী শিক্ষাতেই করা চলে। তা ছাড়া, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় শিক্ষা পাইতে হইলে ইংরেজী জানাই যথেষ্ট। ইউরোপ মহাদেশের যে-দেশে ছাত্র যাইবে, তথাকার ভাষা নূতন করিয়া শিখিতে হয়। এই সব কারণে সকলের চেয়ে বেশী ভারতীয় ছাত্র বিলাত যায়, তার পর আমেরিকা।

অনেক রকম উচ্চতম শিক্ষা আছে, যাহার বন্দোবস্ত ভারতবর্ষেই হওয়া উচিত। কিন্তু সেদিকে গবর্মেণ্টের দৃষ্টি নাই। দেশের ধনী লোকেরা কেহ কেহ শিক্ষার জন্য অনেক টাকা দান করিয়াছেন। কিন্তু অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিক্ষার জন্য ধনী শ্রেণীর লোকদের দানের এখনও আবশ্যক আছে।

গোলটেবিল বৈঠক

তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম দুই বৎসরের অধিবেশনগুলির জন্য গবর্মেণ্ট কতকগুলি ভারতীয় লোককে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি মনোনীত করিয়াছিলেন। যাহাদের প্রতিনিধিত্ব করিতে হইবে, তাহারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পাইবে না, অন্যেরা প্রতিনিধি বাছিয়া দিবে, ইহা অপূর্ব্ব প্রতিনিধিত্ব বটে। যাহা হউক, প্রথম দুই বারের বৈঠকে ভারতবর্ষের লোক অনেকগুলি ছিল, এবং ভারতের সকলের চেয়ে বড় ও শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের নেতা দ্বিতীয় বারের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সেইজন্য আগেকার বন্দোবস্ত কতকটা মন্দের ভাল ছিল। কিন্তু তাহাতে সুফল কিছুই হয় নাই। এবার যে বৈঠক বসিতেছে, তাহাতে ভারতীয় লোক খুব কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কংগ্রেসের কেহ তাহাতে নাই, বৈঠকের আলোচনা গোপনে হইবে, আলোচনা কেবল সেই সেই বিষয়ে হইবে যাহা ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, এবং অধিবেশনগুলির কার্য্য-তালিকা প্রকাশ করা হইবে না। সুতরাং এরূপ বৈঠক হইতে যে ভারতবর্ষের স্বরাজপ্রাপ্তির কোনই সম্ভাবনা নাই, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

বিলাতী শ্রমিক দল ও গোলটেবিল বৈঠক

তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠকে এবার আর একটি "নূতন কিছু" ঘটিয়াছে। তাহা দুঃখের বিষয় নহে।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজ রাজনীতির একটা বাঁধা বোল এই আছে, যে, ভারতবর্ষ বিলাতী রাজনৈতিক দলাদলির বিষয়ীভূত (অর্থাৎ "party question") নহে। তাহার মানে বুঝা কঠিন নয়। বিলাতী প্রায় সব রাজনৈতিক প্রশ্ন ও সমস্যার মীমাংসা দলাদলির বিষয়ীভূত। কোন সময়ে প্রবলতম দল যে-যে বিষয়ের পক্ষপাতী হয়, তাহার নিষ্পত্তি তাহাদের মত অনুসারে হয়। অবশ্য গ্রেট ব্রিটেনের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা সম্বন্ধে গুরুতর আশঙ্কার কারণ ঘটিলে সকল দল এক হইয়া কাজ করে—যেমন, গত মহাযুদ্ধের সময় করিয়াছিল। কিন্তু ইহা সাধারণতঃ ঘটে না। সাধারণতঃ, যে-প্রশ্ন প্রবল কোন দল সমর্থন করে, তাহারই আলোচনা এবং, সম্ভব হইলে, নিষ্পত্তি হয়। সুতরাং "ভারতবর্ষ বিশেষ কোন দলের প্রশ্ন নয়, উহার সম্বন্ধে বিহিত করা সকল দলেরই কর্ত্তব্য," এরূপ বলাতে, "ভাগের মা গঙ্গা পায় না," এই প্রবচনই মনে পড়ে। ভারতবর্ষ যে পার্টি কোশ্চান্ বা দলীয় প্রশ্ন নহে, তাহার আরও একটু অর্থ আছে। তাহার মানে, ভারতবর্ষকে কিছু অধিকার দিতে হইলে বিলাতী সকল রাজনৈতিক দলেরই ভাবা উচিত, তাহা দিলে গ্রেট ব্রিটেনের স্বার্থে আঘাত পড়িবে কি-না। বস্তুতঃ, সচরাচর এই ভাবেই পার্লেমেণ্টে ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় সব প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া থাকে। বাহিরে যে-দল যাহাই বলুন, অন্তরে কোন দলই ভারতবর্ষকে ভারতবর্ষীয় সমস্ত ব্যাপারে, এমন কি ছোট ছোট বিষয়েও, প্রভু হইতে দিতে নারাজ। কারণ তাহা হইতে

দিলে গ্রেট ব্রিটেন ভারতবর্ষে যে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া লাভবান্ হইয়াছে (এবং ভারতবর্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে), তাহাতে বাধা পড়ে।

এই জন্য তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠকে পার্লেমেণ্টের শ্রমিক দল আর যোগ দিবেন না, তাঁহারা তাঁহাদের এই নির্দ্ধারণ প্রকাশ করায় আমরা দুঃখিত হই নাই। আগেকার দুই বৎসরের বৈঠকে ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের মধ্যে রক্ষণশীল (Conservative), উদারনৈতিক (Liberal) এবং শ্রমিক (Labour) তিন দলেরই লোক ছিলেন। সম্প্রতি শ্রমিক দল স্থির করিয়াছেন, যে, এবারকার গোলটেবিল বৈঠকে তাঁহাদের দলের কেহ যোগ দিবে না। কারণ মোটামুটি দুটি; (১) ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা, এবং (২) গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের কোন লোক না থাকা। প্রথম কারণটির মানে বোধ হয় এই, যে, অতি কঠোর দমন-নীতির প্রয়োগে ভারতবর্ষে অবাঞ্ছনীয় সঙ্কট অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রমিক দলের শাসনের সময়ও দমন-নীতি বলবৎ ছিল। বর্ত্তমান অবস্থার সহিত তখনকার অবস্থার বেশী প্রভেদ ছিল না।

শ্রমিকরা এবারকার গোলটেবিল বৈঠকে যোগ না-দেওয়াতে বর্ত্তমান ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট তাঁহাদের সঙ্কল্প হইতে নড়িবেন মনে হয় না। তবে, শ্রমিক দল যদি ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞদের সহিত পরামর্শ করিয়া নিজেরা ভারতবর্ষকে কি দিতে চান তাহা বলেন, তাহা হইলে তাহা কাজে লাগিতে পারে। বিলাতী কোন দল যখন তথাকার গবর্ন্মেণ্টের বিরোধী থাকেন, তখন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আদর্শানুযায়ী অনেক উত্তম কথা বলেন। কিন্তু তাঁহারা যখন প্রবলতম হইয়া গবর্ন্মেণ্ট পদবাচ্য হন, তখন সেই সব কথা অনুসারে কাজ করেন না, ইহা আমরা জানি। তথাপি, এখন শ্রমিক দল বর্ত্তমান ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের ভারতীয় নীতির সমর্থন করেন না, শুধু ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া, তাঁহাদের নিজেদের ভারতীয় নীতি যদি পরিষ্কার করিয়া বর্ণনা করেন, তাহা হইলে অন্ততঃ তাঁহাদের আদর্শ ও লক্ষ্যটা বুঝা যায়। বিলাতের সব রাজনৈতিক দল একজোট হইয়া যদি ভারতবর্ষকে দাবাইয়া রাখিবার পক্ষপাতী হন, তাহা হইলে ভারতীয় স্বরাজের প্রশ্নটা কিছুকালের জন্য একেবারে চাপা পড়িয়া যায়, কিন্তু কোন একটা দল যদি দাবাইয়া-রাখা নীতির অন্ততঃ মৌখিক বিরুদ্ধাচরণও করে তাহা হইলে সেই দল প্রবল হইলে পর স্বরাজের কথাটা পার্লেমেণ্টে অপেক্ষাকৃত সহজে আর একবার উঠিবার সম্ভাবনা থাকে। আমরা একথা লিখিবার সময় ভুলিয়া যাইতেছি না, যে, স্বাধীনতা লাভের জন্য আসল চেষ্টা যাহা তাহা আমাদিগকেই করিতে হইবে। পার্লেমেণ্টে ভারতবর্ষের কথা উঠা উপলক্ষ্য মাত্র। সেই উপলক্ষ্য যদি অপেক্ষাকৃত সহজে ঘটে, তাহারও সামান্য মূল্য আছে।

—

চট্টগ্রামে "পাইকারী" জরিমানা

চট্টগ্রামের পাহাড়তলী ইউরোপীয় ক্লাবে কাহারা গুলি চালাইয়াছিল ও বোমা ছুঁড়িয়াছিল, ঐ শহরের লোকরা তাহাদিগকে ধরিয়া দিতে বা তাহাদের সম্বন্ধে সন্ধান দিতে না পারায় গবর্ন্মেণ্ট চট্টগ্রামের হিন্দুদের আশী হাজার টাকা জরিমানা করিয়াছেন। কেবল হিন্দুদিগকে শাস্তি দিবার কারণ এ নয়, যে, সকল হিন্দু ঐ কাজে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কারণ এই, যে, এ পর্য্যন্ত বঙ্গে যত বৈপ্লবিক হত্যা বা হত্যার চেষ্টা হইয়াছে, তৎসম্পর্কে ধৃত, অভিযুক্ত ও দণ্ডিত সবাই হিন্দু। ছেলে বা ভাইপো যাহা করে, তাহার জন্য পিতা বা পিতৃব্যের শাস্তি যে-রাজ্যে হয়, সেই রাজ্যে এবম্বিধ "পাইকারী" দণ্ড আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় না হইলেও অন্য দুটা প্রশ্ন উঠিতেছে।

চট্টগ্রামে কয়েক বৎসর হইতে যথেষ্ট সাধারণ পুলিস, টিকটিকি পুলিস, মিলিটারী পুলিস, এবং সৈন্য মোতায়েন আছে। তাহা সত্ত্বেও অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হইয়াছিল, এবং লুণ্ঠকদের সকলে এখনও ধৃত হয় নাই। যাহারা ধৃত ও দণ্ডিত হইয়াছে, তাহারা সকলেই ঐ কাজ করিয়াছিল ইহা ধ্রুবসত্য বলিয়া মানিতে পারা যায় না। তাহার পর অন্যান্য বৈপ্লবিক বা প্রতিহিংসামূলক ঘটনা এবং

পাহাড়তলীর ঘটনা ঘটিয়াছে। পাহাড়তলীর ঘটনা-সম্পর্কে আসামীরা ধৃত হয় নাই। সুতরাং, আসামী ধরিয়া না দিতে পারার কিংবা তাহাদের সন্ধান দিতে না-পারার অপরাধে অবৈতনিক চাটগাঁবাসী হিন্দুদের যদি পাইকারী শাস্তি হইতে পারে, তাহা হইলে সরকারী বেতনভোগী চাটগাঁবাসী হরেক রকম পুলিসের লোকদের এবং সৈন্যদলের অক্ষমতারও কিছু পাইকারী শাস্তি যুক্তিসঙ্গত। তাহা হইয়াছে কি?

চট্টগ্রামে ও অন্যত্র বৈপ্লবিক অপরাধ অনুষ্ঠিত হওয়ায় যতলোক হত ও আহত হইয়াছে এবং যত টাকার সম্পত্তি অপহৃত ও নষ্ট হইয়াছে, পাবনা জেলা, কিশোরগঞ্জ মহকুমা, ঢাকা শহর, ঢাকার নিকটবর্ত্তী রোহিতপুর প্রভৃতি গ্রাম, এবং চট্টগ্রাম শহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও লুণ্ঠনে তাহা অপেক্ষা কম লোক হত ও আহত এবং কম সম্পত্তি লুণ্ঠিত ও নষ্ট হয় নাই। ইহার অন্ততঃ কোন কোন অঞ্চলে দাঙ্গা আরম্ভ করিয়াছিল ও চালাইয়াছিল যাহারা তাহারা মুসলমান। চট্টগ্রাম শহরে ইউরোপীয়দেরও যোগ ছিল। আমরা পাইকারী শাস্তির সম্পূর্ণ বিরোধী। প্রকাশ্য আদালতের প্রকাশ্য বিচারে সাধারণ আইন অনুসারে বিচারের পর অপরাধী বলিয়া যাহারা প্রমাণিত হয়, তাহাদেরই শাস্তি সঙ্গত। কিন্তু যদি কোথাও কোন কোন হিন্দু একবিধ অপরাধ করিলে তথাকার সব হিন্দুর শাস্তি হইতে পারে, তাহা হইলে অন্য কোথাও কোথাও অহিন্দুরা অন্তবিধ অপরাধ করিলে ঐ সব অহিন্দুর পাইকারী শাস্তি না হইবার কারণ কি? উত্তরে বলা হইতে পারে, বক্ষ্যমাণ হিন্দুরা রাষ্ট্রবৈপ্লবিক অপরাধ করে বলিয়া হিন্দুদের পাইকারী দণ্ড হয়। কিন্তু তাহার প্রত্যুত্তর এই, যে, বক্ষ্যমাণ অহিন্দুরাও যাহা করে, তাহাতে সভ্য মানব সমাজের ভিত্তি নষ্ট হয় এবং রাষ্ট্রও বিপন্ন হয়।

"ইণ্ডিয়া ইন্ বণ্ডেজ"

পাঠকদের মনে থাকিতে পারে, যে, আমেরিকার একেশ্বরবাদী ধর্ম্মাচার্য্য ডক্টর সাণ্ডারল্যাণ্ডের "ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ" নামক পুস্তক প্রকাশ করায় প্রবাসী প্রেসকে দুই হাজার টাকা জরিমানা দিতে হইয়াছিল এবং ঐ পুস্তক ভারতবর্ষে বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত এবং বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। পরে আমেরিকায় উহার একটি সচিত্র সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং ফ্রান্সে তাহার ফরাসী অনুবাদ বাহির হয়। গত বৎসর ইংলণ্ডেও একটি সংস্করণ বাহির হইতে যাইতেছিল, কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাহা বন্ধ করিয়া দেন। সম্প্রতি আমেরিকায় উহার একটি সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত নূতন সংস্করণ দুই ডলার মূল্যে বাহির হইয়াছে। এই সংস্করণ ভারতবর্ষে পৌঁছে নাই, সুতরাং বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত ও বাজেয়াপ্তও হয় নাই। ইহার প্রকাশক The Lewis Copeland Company, 570 Lexington Ave., New York, N. Y. একটি মুদ্রিত বিজ্ঞাপনে দেখিলাম, এই নূতন সংস্করণে আটটি নূতন অধ্যায় আছে। যথা, The London Round Table Conferences, Gandhi in England, India's New Constitution, Boycott of British Goods, Lord Willingdon's Ordinances, India's Future, ইত্যাদি।

গত ৬ই অক্টোবর নিউ ইয়র্ক রাষ্ট্রের একটি শহরে ডক্টর সাণ্ডার্ল্যাণ্ডকে ভারতীয়দের কৃতজ্ঞতা-সূচক ও প্রীতিব্যঞ্জক ভোজ দেওয়া হয়। আমেরিকার যে রেভারেণ্ড জন হাইন্স্ হোম্স্ মহাত্মা গান্ধীকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া সর্ব্বপ্রথমে অভিহিত করেন, তিনি এই ভোজসভায় যে বাণী প্রেরণ করেন, তাহার মধ্যে বলেন, Dr. Sunderland is destined to immortality as the Lafayette of India. ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি বিঠলভাই পটেল মহাশয় সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার বক্তৃতার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"Dr. Sunderland," Mr. Patel pointed out, "is a man who believes in peace. He is convinced that world peace can come only if India is free. He is convinced that freedom of India is the essential condition of world peace, that India's question is not the domestic concern of Britain alone, that it is a world question, that all talk of world peace is meaningless sham, nonsense, until India is free. On behalf of the suffering, starving and sorrowing millions of India I hail Dr. Sunderland with heartfelt gratitude as one of the greatest of Americans. May he live long to see India free

"His services were rendered not only to India, but to a greator cau," speaker continued, "the cause of liberty and freedom, of peace and contentment in the world. He has dedicated his life to the cause of the freedom of all oppressed people of the world, convinced that deliverance of India will open the door to all oppressed people."

A scathing denunciation of England's part in the disarmament conferences was made by Mr. Patel. "Does England not know that disarmament and world peace are absolutely impossible until imperialism is crushed and the nations are made free?" the speaker asked. "Does England not know that India will be free tomorrow··· ?

"Do you believe that she means to disarm?

"India is determined to be free," Mr. Patel declared. "India wants what America has got, freedom, the right to her own culture and civilization."

—

গজনবী সাহেবের অতৃপ্ত ক্ষুধা

কাগজে দেখিতেছি, মিঃ এ এইচ গজনবী কোনও খবরের কাগজের প্রতিনিধিকে বলিয়াছেন,

"বাংলা দেশের ব্যবস্থাপক সভার ২৫০টি সদস্য-পদের মধ্যে হিন্দুদিগকে ১১২টি সদস্য-পদ দেওয়ার কথা হইয়াছে। বাংলায় হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা শতকরা ৪৩ জন। ২৫০এর শতকরা ৪৩ ভাগ লইলে ১০৭॥, না হয় ১০৮টি সদস্য-পদ হিন্দুর পাওয়া উচিত। সেই স্থলে হিন্দুকে দেওয়া হইয়াছে ১১২টি সদস্য-পদ। বাংলার মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৫৪.৮৫ জন। এই অনুপাতে ২৫০টি সদস্য-পদের মধ্যে তাহাদের পাওয়া উচিত ১৩৭টি। কিন্তু দেওয়া হইয়াছে মাত্র ১২৭টি। ইহাতে মুসলমানের প্রতি সুবিচার হইয়াছে কি-না তাহা সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ সকলকে জানাইবেন কি?"

গজনবী সাহেব ভুল বুঝিয়াছেন। কোনও সভ্যদেশে, স্বাধীন দেশে, সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘিষ্ঠ কোন সম্প্রদায়ের জন্য তথাকার ব্যবস্থাপক সভায় আলাদা সদস্য-পদ নির্দ্দিষ্ট নাই—সংখ্যাগরিষ্ঠদের জন্য ত কোথাও থাকিতেই পারে না। সংখ্যাগরিষ্ঠদের এরূপভাবে প্রোটেক্‌শ্যন চাওয়া লজ্জাকর ও হাস্যকর। শতকরা ৫১টি সদস্য-পদ পাইলে মুসলমান বাঙালীরা সম্মিলিত নির্ব্বাচনে রাজী হইবেন এইরূপ প্রতিশ্রুতি পাওয়ায় তাঁহাদিগকে ১২৭টি পদ দিবার কথা হইয়াছে। গজনবী সাহেব তাহাতে সন্তুষ্ট হইবেন, এমন দুরাশা কেহ করে না, কারণ কিছুতেই রাজী না হইবার হুকুম তাঁহার মনিবরা দিয়া থাকিবেন। জেনার‍্যাল কন্‌ষ্টিটিউয়েন্সীতে অর্থাৎ সাধারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলীতে বঙ্গে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, আদিমজাতিসমূহ, পার্শী, বঙ্গের লোকসমষ্টির শতকরা ৪৪.৭, ৪৩ নহেন। ২৫০এর শতকরা ৪৪.৭ পাটীগণিত অনুসারে ১১১.৭৫ হয়। তাহাকে ১১২ ধরা হইয়াছে। বঙ্গের হিন্দু প্রভৃতিকে মোটেই ওয়েটেজ বা বেশী কিছু দেওয়া হয় নাই। তাঁহারা তাহা চান নাই, কেবল সংখ্যার অনুপাতে যাহা প্রাপ্য হয়, তাহাই তাঁহাদিগকে দিবার কথা হইয়াছে। মুসলমানরা যে-যে প্রদেশে সংখ্যান্যূন সেখানেই ওয়েটেজ পাইয়াছেন। যেমন—আগ্রা-অযোধ্যায় তাঁহারা লোকসমষ্টির শতকরা ১৪ জন, কিন্তু সদস্য-পদ পাইয়াছেন শতকরা ৩০টি। বঙ্গের হিন্দু সভার পক্ষ হইতে কথা হইয়াছিল, যে, হিন্দু প্রভৃতিকে শতকরা ৪৪.৭ সদস্য-পদ দিয়া বাকী যতগুলি মুসলমানরা গবন্মেণ্ট ও ইউরোপীয়দের নিকট হইতে লইতে পারেন, তাহাতে হিন্দুদের আপত্তি হইবে না। গজনবী সাহেব ইহাতে রাজী আছেন?

—

বিচারপতি ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ রায় বাহাদুর ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক অকালমৃত্যুতে প্রবাসী বাঙালী সমাজ হইতে একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি অন্তর্হিত হইলেন। তিনি তাঁহার পিতা স্বর্গীয় স্যর প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মত বিখ্যাত জজ না হইলেও সুবিচারক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিনি পরিহাসরসিক ও আমোদ-প্রিয় লোক ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি একজন সুদক্ষ ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন। ওকালতীতে প্রবেশ করিবার পরও তিনি অনেক বৎসর পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে ক্রিকেট-খেলোয়াড়দের ক্যাপ্টেনের কাজ করিতেন। জজিয়তী করিবার সময়েও ক্রিকেটের উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে একটা ক্ষুদ্র কথা এখন মনে পড়িতেছে। তাঁহার হাতের লেখাও এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ উকীল সুপণ্ডিত স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতের লেখা ঠিক এক রকম ছিল। সতীশ বাবু যখন এক সময় চোখের ব্যারামে ভুগিতেছিলেন, তখন একটি লোক তাঁহার নিকট হইতে একটি প্রতিশ্রুত দান লইতে

সতীশ বাবু ললিত বাবুকে বলিলেন, "আমার দেরাজ থেকে চেক্ বহিটা নিয়ে লোকটিকে এক-শ টাকার একখানা চেক্ দাও, আমার নামটাও তুমিই দস্তখত ক'রে দাও।" ললিতবাবু তাহাই করিলেন। দস্তখতটি ঠিক সতীশ বাবুর স্বাক্ষরের মতই হইল।

—

মহারাণী সুনীতি দেবী

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা, কুচবিহারের বর্ত্তমান মহারাজার পিতামহী মহারাণী সুনীতি দেবী ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। তিনি দানশীলা এবং কথকতার দ্বারা ধর্ম্মোপদেশ দানে সুদক্ষা ছিলেন। দার্জ্জিলিঙের মহারাণী বালিকা বিদ্যালয় তাঁহার নারীশিক্ষানুরাগের সাক্ষ্য দেয়। কলিকাতায় আপার সার্কুলার রোডে তাঁহার পিতৃদেব কমলকুটীর নামক যে অট্টালিকায় বাস করিতেন, তাহার হাতা-সমেত সমস্ত বাড়িটি তিনি ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন নামক বালিকা-শিক্ষালয়ের জন্য দান করিয়া ট্রাষ্টীদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন।

—

বরিশালের জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সম্প্রতি বরিশালের আচার্য্য জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি জনসেবার কার্য্যে অশ্বিনীকুমার দত্তের সহকর্ম্মী ছিলেন। তত্ত্বজ্ঞানী, সেবাব্রতী, এবং সাধু প্রকৃতির মানুষ বলিয়া তিনি বরিশালে সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

—

ব্রজেন্দ্রনাথ দে

ব্রজেন্দ্রনাথ দে, এম-এ, আই-সি-এস্ গত ২৮শে সেপ্টেম্বর ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। গত শতাব্দীতে যে-সকল বাঙালী উচ্চ রাজপদ লাভ করেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। ১৮৭২ সনে তিনি আই-সি-এস্ পরীক্ষা পাস করেন। ইহার পর শিক্ষানবীশ রূপে তাঁহাকে দুই বৎসর বিলাতে থাকিতে হয়। এই সময়ের মধ্যেই তিনি ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সংস্কৃতে বোডেন বৃত্তির জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের নিকট অধ্যয়ন করেন। যথাসময়ে তিনি বৃত্তি প্রাপ্ত হন।

কার্য্যবশে তিনি বাংলা ও বিহারের বহু স্থানে বাস করেন। প্রবাসীর সম্পাদক যখন বাঁকুড়া জিলা স্কুলের উপরের ক্লাসের ছাত্র, তখন দে-মহাশয় বাঁকুড়ার জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া যান, এবং ঐ স্কুল ও ঐ ক্লাস পরিদর্শন করেন। ইহা 'প্রবাসী'-সম্পাদকের এখনও মনে আছে। কারণ সেকালে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়াও বেশী ভারতীয় বা বাঙালীর ভাগ্যে ঘটিত না। দে-মহাশয় কর্ম্ম-জীবনেও স্বাধীন মত ত্যাগ করেন নাই। তিনি হুগলীতে থাকাকালীন ইলবার্ট বিল লইয়া গোলযোগ চলিতেছিল। গবর্ন্মেণ্ট অন্যান্য উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদের মত দে-মহাশয়ের নিকটও মত চাহিয়া পাঠান। তিনি দৃঢ়তার সহিত স্পষ্ট ভাষায় মন্তব্য করেন, যে, বিচারক্ষেত্রে ভারতীয় ও ইউরোপীয়ের কোন প্রভেদ না রাখিয়া একই ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দে-মহাশয় সুপণ্ডিত ছিলেন। ১৯১০ সনে কর্ম্মত্যাগের পর তিনি বিদ্যালোচনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গলের একজন সদস্য ছিলেন। তিনি 'তবকাৎ-ই-নাসিরি'র ও সম্রাট আক্‌বরের সভাসদ্ নিজামুদ্দীন আহ্‌মদ্ রচিত 'তবকাৎ-ই-আকবরী' নামক একখানি ফার্সী পুঁথির সটীক অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন ও তাহা প্রায় সমাপ্ত করিয়া গিয়াছেন। কেবলমাত্র সূচীপত্র লেখার ভার সোসাইটির উপর ন্যস্ত রহিয়াছে।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮০ বৎসরেরও অধিক হইয়াছিল।

—

নিখিলনাথ রায়

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তিনি গত ১৮ই কার্ত্তিক দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ব্যবহারজীব হইলেও আইন-ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করিতে পারেন নাই, কৈশোর হইতেই বঙ্গসাহিত্যের ও বাংলা দেশের ইতিহাসের আলোচনায় নিজেকে

সম্পূর্ণ ভাবে নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ নিখিলনাথ সবিশেষ শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। বহু হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি ও মুর্শিদাবাদের নিজামৎ দপ্তর অনুসন্ধান করিয়া ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। বাঙালী জাতির ভাবধারা এবং হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান বাঙালী জাতির প্রকৃত ইতিহাস রচনায় তাঁহাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল।

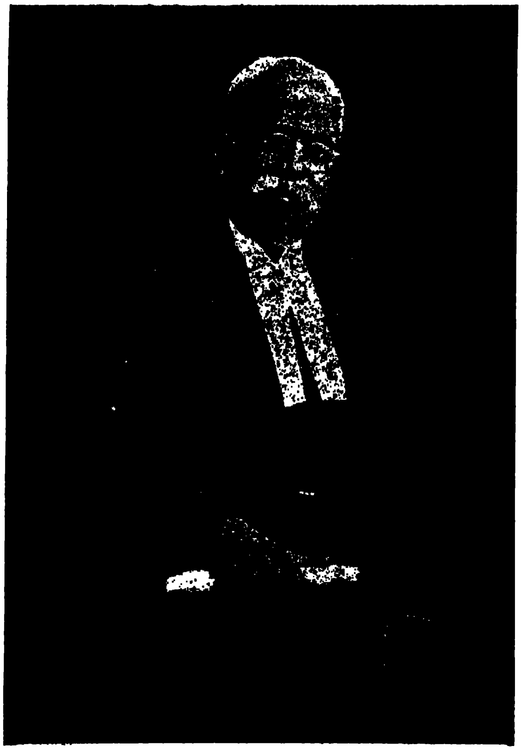
"মুর্শিদাবাদের ইতিহাস," "মুর্শিদাবাদ কাহিনী" "সোনার বাঙ্গালা," "জগৎ শেঠ," "প্রতাপাদিত্য" প্রভৃতি গ্রন্থ নিখিলনাথের গবেষণার পরিচায়ক।

২৪-পরগণার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত "পুঁড়া" গ্রামে নিখিলনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বসিরহাট মহকুমা হইতে একখানি মাসিকপত্র প্রচারে সুকবি শ্রীযুত ভুজঙ্গধর রায়-চৌধুরী ও নিখিলনাথ অগ্রণী ছিলেন। "পল্লীবাণী" মাসিকপত্র নিখিল বাবুর সম্পাদনায় দুই বৎসরকাল প্রকাশিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামে একখানি পত্রিকাও তিনি সম্পাদন করিয়াছিলেন।

যদুনাথ মজুমদার

রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার মহাশয়ের মৃত্যুতে বাংলা দেশ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তিনি রাজনীতি ও বিদ্যাচর্চ্চা উভয় ক্ষেত্রেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন, এবং নানারূপ জনহিতকর কার্য্যের দ্বারা তাঁহার নিজ জেলা যশোহরের প্রভূত উপকার করিয়াছিলেন। ১৮৮৯ সনে যখন যশোহরে দ্বিতীয়বার নীলবিদ্রোহ উপস্থিত হয় তখন যদুনাথ মজুমদার মহাশয়ই উদ্যোগী হইয়া সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যে বিলাতে দরখাস্ত পাঠান এবং তাহার ফলে ব্রাড্‌ল সাহেব পার্লেমেণ্টে এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এই ব্যাপারের মীমাংসার জন্য অবশেষে একটি সালিশী কমিটি স্থাপিত হয়। উহাতে প্রজাদের পক্ষে যদুনাথ মজুমদার মহাশয় উপস্থিত হন।

যদুবাবু প্রথম জীবনে সংবাদপত্র সম্পাদনের কার্য্যও করেন। তিনি কিছুকালের জন্য পঞ্জাবের বিখ্যাত সংবাদপত্র ট্রিবিউনের সম্পাদক ছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া, ব্রহ্মচারীন্, সম্মিলনী, হিন্দু-পত্রিকা নামে কয়েকটি পত্রিকাও সম্পাদন করেন। মজুমদার মহাশয়ের জীবন কর্ম্মবহুল হইলেও তিনি বিদ্যাচর্চ্চা ত্যাগ করেন নাই। হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তিনি কাশীতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন



যদুনাথ মজুমদার

এবং এক সময়ে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি হিন্দুধর্ম্ম ও দর্শন ইত্যাদি সম্বন্ধে সর্ব্বসুদ্ধ বাইশখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

রাজনৈতিক জীবনে যদুবাবুর যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল। তিনি বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষ, উভয় ব্যবস্থাপক সভারই সদস্য ছিলেন। যশোহরের জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান হিসাবে তিনি নিজের জেলার প্রভূত উপকার করিয়াছেন। বাংলা দেশের নদীগুলিকে সজীব রাখিবার আন্দোলন তিনি বহুপূর্ব্বেই আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং

জনসাধারণের জলকষ্ট নিবারণের জন্ম তিনি অনেক পুষ্করিণী ও কূপ খনন করাইয়াছিলেন। শিক্ষাপ্রচার-কার্য্যেও মজুমদার মহাশয়ের অপরিসীম উদ্যম ছিল। তিনি এগারটি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। ইহার মধ্যে দুইটি বালিকা-বিদ্যালয়। মহাত্মা গান্ধীর চরকা প্রচলনের বহু পূর্ব্বেই তিনি নিজের বাড়িতে ও অন্যত্র সূতাকাটার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং নিজে তুলার বীজ বিতরণ করিয়া প্রজাসাধারণকে তুলার চাষ করিবার উপকারিতা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার কয়েকটি পুস্তিকা আছে।

—

গোলাপলাল ঘোষ

গোলাপলাল ঘোষ মহাশয় স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ ও মতিলাল ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। ইঁহারা তিন



গোলাপলাল ঘোষ

জনেই পরপর অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। গোলাপবাবু তাঁহার দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত বিখ্যাত না হইলেও যোগ্যতার সহিত পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। তাঁহার সম্পাদকত্বে অমৃত বাজার পত্রিকার যশ অক্ষুণ্ণ ছিল।

—

স্যর আলি ইমাম

স্যর আলি ইমামের মৃত্যুতে ভারতবর্ষ একজন মুসলমানদের জন্ম স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী ছিলেন, এ-কথা তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। আগা খাঁর নেতৃত্বে মুসলমানদের যে ডেপুটেশ্যন লর্ড মিণ্টোর নিকট উপস্থিত হয়, তিনি তাহার একজন ছিলেন। কিন্তু পরজীবনে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হয়, এবং তিনি প্রকাশ্যে হিন্দু-মুসলমানের একত্র নির্ব্বাচন সমর্থন করেন। কোন বিশেষ জনসমষ্টির জন্ম ব্যবস্থাপক সভায় পদসংখ্যা রিজার্ভ করিয়া রাখারও তিনি বিরোধী ছিলেন।

—

জাতিভেদ ও জাতীয় স্বাধীনতা

জাতিভেদের সপক্ষে ও বিপক্ষে যে-সকল যুক্তি প্রয়োগ করা হয় তাহার সকলগুলির সত্যাসত্য বিচার করিবার স্থান আমাদের নাই। কিন্তু জাতিভেদ যে জাতীয় স্বাধীনতা প্রাপ্তির ও রক্ষার পরিপন্থী সে-সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা যাইতে পারে।

আমাদের যতদূর স্মরণ হয় ১৯২০ সনে মহাত্মা গান্ধী ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় লেখেন যে বর্ণাশ্রম হিন্দুধর্ম্মকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়াছে। তাঁহার উক্তি যে আংশিক ভাবে সত্য সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এ-কথাটাও সত্য যে এদিক হইতে জাতিভেদের আর প্রয়োজন নাই। জাতিভেদের জন্ম আজকাল বহু হিন্দু হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে, এবং এইরূপে হিন্দুসংখ্যা খর্ব্ব করিতেছে। এই প্রবন্ধটিতেই মহাত্মা গান্ধী আরও বলেন, জাতিভেদই যে ভারতবর্ষের পরাধীনতার কারণ তাহা ঠিক্ নহে। এই প্রশ্নটি একটি ঐতিহাসিক প্রশ্ন। এ-সম্বন্ধে মহাত্মাজী যাহা সত্য ও ঠিক্ মনে করেন তাহা অবশ্য বলিতে পারেন। অপরেরও আবার জ্ঞানবুদ্ধি মত যাহা সত্য বলিয়া মনে হয় তাহাতে বিশ্বাস করিবার অধিকার আছে। কিন্তু ইতিহাস পড়িলে মনে হয় জাতিভেদ প্রকৃতপক্ষেই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অধঃপতনের একটি কারণ। শ্রীযুত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের অভিমত ভারতবর্ষের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস সম্বন্ধে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। তিনি মারাঠা শক্তির পতন সম্পর্কে তাঁহার প্রণীত

মারাঠারা যখন শিবাজীর নেতৃত্বে স্বাধীনতালাভের জন্ত খাড়া হয়, তখন তাহারা বিজাতির অত্যাচারে অতিষ্ঠ, তখন তাহারা গরীব ও পরিশ্রমী ছিল, সাদাসিদে ভাবে সংসার চালাইত, তখন তাহাদের সমাজে একতা ছিল, জাত্ বা শ্রেণীর বিশেষ পার্থক্য বা বিবাদ ছিল না। কিন্তু শিবাজীর অনুগ্রহে রাজস্ব পাইয়া, বিদেশ লুঠের অর্থে ধনবান হইয়া, তাহাদের মন হইতে সেই অত্যাচারস্মৃতি এবং তাহাদের সমাজ হইতে সেই সরলতা ও একতা দূর হইল; সাহসের সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কার ও স্বার্থপরতা বাড়িল। ক্রমশঃ সমাজে জাতিভেদের বিবাদ উপস্থিত হইল।

বহুদিন ধরিয়া অনুর্বর দরিদ্র মহারাষ্ট্র দেশের অনেক ব্রাহ্মণই শাস্ত্রচর্চা ও যজন-যাজন ত্যাগ করিয়া হিন্দু মুসলমান রাজসরকারে চাকরি লইয়া অর্থ ও প্রতিপত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছিল। মারাঠা জাত্ নিরক্ষর, অসি বা হলজীবী; কিন্তু কায়স্থগণ জাতিতেই "লেখক," তাহারা লেখাপড়া করিয়া সরকারী চাকরি পাইতে লাগিল, ধনে মানে বাড়িতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা হিংসায় জ্বলিতে লাগিল, কায়স্থগণকে শূদ্র ও অন্ত্যজ বলিয়া ঘোষণা করিল। উপবীত গ্রহণের অপরাধে কায়স্থ ("প্রভু") জাতের অকথ্য কুৎসা প্রচার করিল, তাহাদের নেতাদের একঘরে ("গ্রামন্ত") করিল।

এমন কি শিবাজীর অভিষেকের সময়ই ব্রাহ্মণেরা একজোটে মারাঠা জাতের ক্ষত্রিয়ত্ব অস্বীকার করিয়া, বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্মে ও মন্ত্রপাঠে শিবাজীর কোন অধিকার নাই এই বলিয়া বসিল। তাহাদের এইরূপ অহঙ্কারে ও গোঁড়ামীতে উত্ত্যক্ত হইয়া শিবাজী একবার (১৬৭৪ সালে) বলেন, "ব্রাহ্মণদের জাতিগত ব্যবসা শাস্ত্রচর্চা ও পূজা; উপবাস ও দারিদ্র্যই তাঁহাদের ব্রত; শাসন-বিভাগে চাকরি করা তাঁহাদের পক্ষে পাপ। অতএব, সব ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ও আমলা, সেনাপতি ও দূতকে চাকরি হইতে ছাড়াইয়া দিয়া শাস্ত্রসম্মত কাজে লাগাইয়া রাখা হিন্দুরাজার কর্ত্তব্য। আমি তাহাই করিব।" তখন ব্রাহ্মণেরা কাঁদাকাটি করিয়া তাঁহার ক্ষমা পায়।

এইরূপে ব্রাহ্মণেরা অধিক ক্ষমতা পাইয়া অব্রাহ্মণদের প্রতি সামাজিক অত্যাচার অবিচার করিতে লাগিল। আবার ব্রাহ্মণদের মধ্যেও একতা ছিল না। তাহাদের মধ্যে শ্রেণী (বা শাখা) বিভাগ এবং কৌলিন্ত অভিমান লইয়া ভীষণ দলাদলি ও বিবাদ বাধিয়া গেল। পেশোয়ারা কোঁকনবাসী ("চিৎপাবন" শাখার) ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারা যখন দেশের রাজা তখন পুণা অঞ্চলের স্থানীয় ("দেশস্থ" শাখার) ব্রাহ্মণেরা কোঁকনস্থদিগকে অশুদ্ধ হীন-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘৃণা করিত, তাহাদের সঙ্গে পঙ্‌ক্তি-ভোজন করিত না। আবার চিৎপাবনেরা "কর্হাডে" শাখার ব্রাহ্মণদের উপর খড়্গহস্ত! পেশোয়ারা অপর অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের গৌরব খর্ব্ব করিবার জন্ত রাজশক্তি প্রয়োগ করিতেন। গোয়া-অঞ্চল-বাসী গৌড় সারস্বত (শেনবী)-শাখার ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত তীক্ষবুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষ, কিন্তু তাহাদিগকে আর সব শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা প্রায় এখানকার বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের মত অবজ্ঞা ও পীড়ন করিত। এইরূপে জাতের সঙ্গে জাত্, এমন কি, একই জাতের মধ্যে এক শাখার সঙ্গে অপর শাখা, বিবাদ করিতে লাগিল; সমাজ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল, রাষ্ট্রীয় একতা লোপ পাইল, শিবাজীর অনুষ্ঠান ধূলিসাৎ হইল।

মারাঠারা রাজ্য হারাইয়াছে, তাহাদের ভারতব্যাপী প্রাধান্ত [illegible]

তবুও তাহাদের চৈতন্ত হয় নাই, তাহাদের মধ্যে এই জাতে জাতে বিবাদ আজও চলিয়াছে—জাতিভেদের বিষ এতই ভীষণ।

রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলিয়াছেন—"শিবাজী যে হিন্দু-সমাজকে মোঘল-আক্রমণের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, আচার-বিচারগত বিভাগ-বিচ্ছেদ সেই সমাজের একেবারে মূলের জিনিষ। সেই বিভাগ-মূলক ধর্ম্মসমাজকেই তিনি সমস্ত ভারতবর্ষে জয়ী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাকেই বলে বালির বাঁধ বাঁধা—ইহাই অসাধ্য সাধন।"

—

সিন্ধুদেশ সম্বন্ধীয় মীমাংসা

সিন্ধুদেশ স্বতন্ত্রীকরণ সম্বন্ধে এলাহাবাদ কন্‌ফারেন্সে মীমাংসা হইয়াছে; এই মীমাংসার সর্ত্তসমূহ এইরূপ:—

(ক) সিন্ধুকে একটি প্রদেশে পরিণত করা হইবে এবং ব্রিটিশ-ভারতের অপরাপর বড় বড় প্রদেশের ন্যায় সিন্ধুও স্বায়ত্তশাসন পাইবে। অপরাপর প্রদেশের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে যে-সকল রক্ষাকবচ দেওয়া হইবে বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, সিন্ধুর সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্যও অনুরূপ রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যথা:—(১) প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা ব্যবস্থাপক সভার নিকট যুক্তভাবে দায়ী থাকিবেন এবং উক্ত সভায় অন্ততঃ একজন হিন্দু মন্ত্রী থাকিবেন। (২) পঞ্জাব কর্ম্মূলার তৃতীয় প্যারায় যে-সকল ব্যবস্থার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে সিন্ধুর কার্য্যপদ্ধতিও সেইরূপ হইবে। (৩) মিউনিসিপ্যাল ও জিলা বোর্ডসমূহে ভোটাধিকার সম্বন্ধে হিন্দু মুসলমানদের সমান ক্ষমতা দেওয়া হইবে।

(খ) দশ বৎসর পরে ১ নম্বর সর্ত্তে উল্লিখিত কার্য্যপদ্ধতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যতদূর সম্ভব নির্ব্বাচকমণ্ডলীতে উভয় সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্ত চেষ্টা করা যাইবে।

(গ) স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দুদের জন্ত শতকরা ৩৭টি আসন রাখিয়া যুক্তনির্ব্বাচন-পদ্ধতির (বিশেষ নির্ব্বাচকমণ্ডলী সমেত) ব্যবস্থা থাকিবে।

অবশ্য এই সর্ত্তে উক্ত ব্যবস্থা থাকিবে যে, হিন্দুরা যদি ইচ্ছা করেন, যে, দশ বৎসর পরে লোকসংখ্যার অনুপাতে তাঁহাদের আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইবে তবেই কিন্তু ঐরূপ ব্যবস্থায় তাঁহারা আরও আসন পাইবার জন্ত ভোটগ্রহণের অধিকার পাইবেন।

(ঘ) স্থানীয় আইন সভা বা ষ্ট্যাটিউট কর্ত্তৃক গঠিত কোন প্রতিনিধিমূলক সভায় যুক্তনির্ব্বাচনের ব্যবস্থা থাকিবে, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়দিগের অনুকূলে ঐ সকল সভায় কোনরূপ আসন সংরক্ষণ করা হইবে না। তবে তাঁহাদের জন্ত আসন সংরক্ষণ হইতে পারে, যদি সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় লোকসংখ্যানুপাতে ঐ সকল সভায় নিজেদের জন্য আসন সংরক্ষণের দাবি করেন বা সংখ্যালঘিষ্ঠ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ উভয় সম্প্রদায়ই স্ব-স্ব স্থানীয় এলাকার মধ্যে আসন-সংরক্ষণের জন্য যদি বদ্ধপরিকর হন।

(ঙ) সরকারী চাকুরিতে নূতন লোক গ্রহণের সময় তাহার ব্যবস্থার জন্য সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে পক্ষপাতশূন্য কয়েক ব্যক্তিকে লইয়া এক কমিশন নিযুক্ত করিতে হইবে। উক্ত কমিটীর এক-তৃতীয়াংশ হিন্দু সভ্য দ্বারা পূরণ করিতে হইবে। সরকারী চাকুরি [illegible]

উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের জন্য রাখিতে হইবে এবং সাম্প্রদায়িক অসামঞ্জস্য দূরীকরণের জন্য শতকরা ৪০ ভাগ পদ রাখিতে হইবে। ঐ সকল পদে লোক নিয়োগ করিবার সময় উক্ত কমিশন সিন্ধী এবং সিন্ধুর চিরস্থায়ী বাসিন্দাদিগকে অধিকতর সুবিধা দিবেন।

(চ) নাগরিক ও আর্থিক অধিকার এবং ভূসম্পত্তি খরিদ বিক্রয় বা হস্তান্তর করায় অথবা স্বাধীনভাবে যে-কোন ব্যবসায় অবলম্বনে জাতি-ধর্ম্মের অজুহাত দেখাইয়া কোনরূপ আপত্তি করা চলিবে না বা ঐ সকল বিষয়ে বিভেদাত্মক কোনরূপ আইন থাকিবে না। অবশ্য এই ব্যবস্থা সিন্ধুর বর্ত্তমান আইনে কোনরূপ আঘাত করিবে না। স্যর শাহ নওয়াজ ভাট্টো এবং অধ্যাপক চাবলানীকে উপরোক্ত ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এরূপভাবে কৃষকদিগের জন্য এক সংজ্ঞাপত্র তৈয়ারী করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে যে, কৃষকদিগকে রক্ষার জন্য আইনগত যে-কোন ব্যবস্থাই যেন গ্রহণ করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে তাঁহাদের সিদ্ধান্তই গৃহীত হইবে।

(ছ) বিচার-বিভাগ ও শাসন-বিভাগ সম্পূর্ণ পৃথক থাকিবে। উভয় বিভাগের মধ্যে কোনরূপ সম্পর্ক থাকিবে না।

(জ) সিন্ধুর জন্য একটি চীফ কোর্ট অথবা একটি হাইকোর্ট থাকিবে।

এলাহাবাদ কন্‌ফারেন্সে যে-সকল প্রশ্নের আলোচনা হইয়াছিল তাহার মধ্যে সিন্ধুপ্রদেশের সমস্যা অতিশয় জটিল। সেজন্য হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিষয়ে যে একটি সন্তোষজনক মীমাংসা হইয়া গিয়াছে তাহা সুখের বিষয়। এই মীমাংসার সর্ত্ত-গুলির বিস্তৃত আলোচনা করিবার স্থান আমাদের নাই। তবে মোটামুটি ভাবে এই বলা যাইতে পারে, যে, যদি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টকে অর্থসাহায্য না করিতে হয় তাহা হইলে, উভয় পক্ষের মত থাকিলে, সিন্ধুদেশ স্বতন্ত্রী-করণ সম্বন্ধে গুরুতর কোন আপত্তি হইবার নয়। কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্টের নিকট হইতে অর্থসাহায্যের প্রয়োজন হইলে, সিন্ধুপ্রদেশকে স্বতন্ত্র করা হইতে পারে না। এই অভিমত বাংলা দেশে সরকারী ও বেসরকারী ভাবে অনেকবার প্রকাশ করা হইয়াছে। আর একটি কথা এই, যে, সিন্ধুদেশ স্বতন্ত্র হইলেও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে চাকরি, ব্যবস্থাপক সভার পদ ও অন্যান্য বিষয়ে যে ভাগবাঁটোয়ারা হইয়াছে তাহা দশ বৎসরের অধিককাল স্থায়ী না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সিন্ধুদেশ চিরকালের জন্য স্বতন্ত্র হইল তাহা ধরিয়া লওয়াই ঠিক, তবুও সাম্প্রদায়িক বিভাগ যত অল্পকালস্থায়ী হয় ততই ভাল।

বঙ্গীয় বিপ্লব দমন আইন

'বঙ্গীয় বিপ্লব দমন আইন পরিপূরক বিল' ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হইয়াছে। গত ৬ই সেপ্টেম্বর বেঙ্গল স্পেশাল অর্ডিন্যান্সের স্থলে এই আইনটি পাস হইয়াছিল। কিছুদিন হইল ঐ অর্ডিন্যান্সের মেয়াদ শেষ হয়। স্পেশাল অর্ডিন্যান্সের কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা কর্ত্তৃপক্ষের হাতে আছে, ঐ গুলির মেয়াদও বর্ত্তমান বৎসরের শেষভাগে শেষ হইবে। বর্ত্তমান বিলটি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত আইনের পরিপূরক। ম্যাজিষ্ট্রেটের সাধারণতঃ দুই বৎসরের কারাদণ্ড বিধানের ক্ষমতা আছে; কিন্তু বর্ত্তমান আইন অনুসারে স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড বিধানের ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। এই বিলের তিন ধারায় এই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, যে, যে-সব মামলার আপীল দায়রা আদালতে যাইবে না, হাইকোর্টে সেগুলির আপীল হইতে পারিবে। কলিকাতা শহরের মধ্যে কোন স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রদত্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে কলিকাতা হাইকোর্টে আপীল করিবার ক্ষমতা একটি ধারায় দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার বাহিরে কোন স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে দুই বৎসরের অধিক কালের জন্য দ্বীপান্তর দণ্ড অথবা ৪ বৎসরের অধিক কাল মেয়াদের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিবার ক্ষমতাও প্রদান করা হইয়াছে। বিলের ৫ম ধারায় এই নির্দ্দেশ দান করা হইয়াছে, যে, মামলার পুনর্ব্বিচার করিবার কোন দরখাস্তের সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার অধিকার হাইকোর্টের থাকিবে না।

অদ্যকার (২৯এ কার্ত্তিক) সংবাদপত্রে প্রকাশ, এই ৫ম ধারা লইয়া ব্যবস্থাপক সভায় আলোচনা হয়। ভারত-শাসন-সংস্কার আইনের ১০৭ ধারা অনুসারে হাইকোর্টের ক্ষমতা খর্ব্ব করা পরিষদের ক্ষমতার বহির্ভূত—ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি এই নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

রামমোহন শতবার্ষিকী

রাজা রামমোহন রায় ১৮৩৩ সনের ২৭শে সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল শহরে দেহত্যাগ করেন। আগামী বৎসরের এই তারিখে তাঁহার মৃত্যুর পর শত বৎসর পূর্ণ হইবে। যাহাতে এই ঘটনাটি সমস্ত দেশে যথোচিতভাবে স্মরণ করা হয় তাহার জন্য আয়োজন এখন হইতেই করা উচিত।

—

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলন পৃথিবীব্যাপী আর্থিক সঙ্কটের একটি হেতু

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হুভার কিছুদিন পূর্ব্বে একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন, যে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলন পৃথিবীব্যাপী অর্থসঙ্কটের একটি কারণ। বলা বাহুল্য, এই উক্তিটি বিলাতী সাম্রাজ্যবাদীদের মনঃপূত হয় নাই।

—

কাহাকেও বিশ্বাস করা যায় না

কিছুদিন পূর্ব্বে বড়লাট যখন সিম্‌লা হইতে দিল্লী আসেন তখন ব্যবস্থাপক সভার কয়েকজন মেম্বরকে কাল্‌কা ষ্টেশনে ওয়েটিং-রুমে বন্ধ করিয়া রাখা হয়। ইঁহাদের মধ্যে মিঃ এ এইচ গজনভীও ছিলেন। ব্যবস্থাপক সভায় যখন এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় তখন মিঃ হেগ বলেন, যে, বড়লাটের জীবনরক্ষা সম্বন্ধে গবর্ন্মেণ্টের গুরুতর দায়িত্ব আছে, সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিলে চলে না।

—

কাশীর কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবিকাদের মোকদ্দমা

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় কাশীর কংগ্রেস স্বেচ্ছা-সেবিকাদের মোকদ্দমা সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত করিয়া ভারতীয় নারীদের প্রভূত উপকার করিয়াছেন। এই পুস্তিকায় তিনি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের রায় যে কতদূর ... দিবার স্থান আমাদের নাই, তবে উহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হয়, যে, সাক্ষ্যের সহিত এই রায়ের পূর্ণ সামঞ্জস্য নাই।

—

রাজনৈতিক বন্দীদিগকে আন্দামানে প্রেরণ

প্রায় দশ বৎসর আগে গবর্ন্মেণ্টের পক্ষ হইতে প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করা হয়, যে, স্বাস্থ্য ও নীতির দিক হইতে আন্দামান দ্বীপ অপরাধীদের বাসস্থান হইবার অযোগ্য, এবং সেজন্য আর কোন বন্দীকে সেখানে পাঠান হইবে না। এই প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও স্যর স্যামুয়েল হোর রাজনৈতিক বন্দীদিগকে সেখানে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রকাশ যে, কয়েকটি রাজনৈতিক বন্দিনীকেও আন্দামানে পাঠান হইয়াছে।

—

বেসরকারী ডাক

বোম্বাই প্রদেশের কয়েকটি জায়গায় বেসরকারী ভাবে এক পয়সায় ডাক পাঠানর চেষ্টা হইয়াছে এবং তাহা সফলও হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় সরকারী ডাক-বিভাগ ইচ্ছা করিলে এবং মিতব্যয়ী হইলে ডাকমাশুল আরও হ্রাস করিতে পারে।

—

নেপালের উন্নতির ব্যবস্থা

মহারাজ যুধা সামশেরজঙ্গ বাহাদুর নেপালের প্রধান মন্ত্রী ও সেনাধ্যক্ষের পদ গ্রহণের সময় ঘোষণা করিয়াছেন, যে, তিনি নেপাল-রাজ্যের শাসনব্যাপারে এই সকল বিষয়ে অবহিত হইবেন, যথা—কুটীরশিল্পের উন্নতি ও উৎসাহ কল্পে বিদেশী দ্রব্যের উপর শুল্কস্থাপন, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের সুব্যবস্থা, আমদানী যন্ত্রপাতির উপর শুল্ক হ্রাস, বৈদ্যুতিক আলো প্রবর্ত্তন, বণিকগণকে আর্থিক সাহায্য, বালকগণের আবশ্যিক কারিগরি নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা, এবং গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে মৈত্রিভাব। নেপাল-রাজ্যের উন্নতিতে আমরা বাস্তবিকই আনন্দ অনুভব করি।

অটোয়ার সিদ্ধান্ত অথবা ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স

ভারতবর্ষ বৃটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত, কিন্তু ভারতবর্ষে অল্পই লোক আছেন যাঁহারা সাম্রাজ্যকে প্রধান স্থান দিয়া ভারতকে ছোট করিয়া দেখেন। সাম্রাজ্যের অপরাপর অংশগুলি, যথা—কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতি, ইহাদের অধিবাসীরাও নিজ নিজ দেশকে আগে দেখেন, পরে সাম্রাজ্যের মঙ্গলচিন্তা করেন। আমরাও ভারতবর্ষকে, অর্থ বা রাজনীতি যে-কোন দিক দিয়াই হোক না কেন, ছোট স্থান দিতে কিছুতেই রাজী নই। আমাদের নিকট ভারতের মঙ্গল ও আর্থিক সচ্ছলতা সর্ব্বাগ্রে, সাম্রাজ্য অথবা অপর কোন দেশের কথা তৎপরে। অটোয়ার ইম্পিরিয়াল রেসিপ্রসিটি (পরস্পর সাহায্য চেষ্টা) নামে "রেসিপ্রসিটি" হইলেও কার্য্যে তাহাতে ভারত অপেক্ষা ইংলণ্ড বা অপরাপর শ্বেতপ্রধান সাম্রাজ্যাংশগুলির লাভ বেশী হইবে। কেন? কারণ ভারতীয়েরা উপযুক্ত প্রতিনিধির দ্বারা নিজের দিক সামলাইয়া চলিতে সক্ষম নহেন, ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নাই এবং ভারতীয় জনসাধারণ অর্থনীতিজ্ঞ নহেন। আমাদের সরকারী তরফ হইতে বলা হইয়াছে, যে, ভারতের এই "রেসিপ্রসিটি" বা "প্রেফারেন্স" ব্যবস্থায় প্রভূত লাভ হইবে। আমাদের চিনাবাদাম, তৈলসার ফসল, চা, কাষ্ঠ, পাট প্রভৃতির রপ্তানী এই ব্যবস্থায় বাড়িবে ও এই ব্যবস্থা স্বীকৃত না হইলে কমিবে ইত্যাদি। আমাদের বিশ্বাস নয়, যে, আমরা এই ব্যবস্থায় রাজী না হইলে আমাদের রপ্তানী কমিবে, কারণ ইংলণ্ড বা সাম্রাজ্যের অপর দেশগুলিতে আমরা যতটা মাল রপ্তানী করিয়া থাকি তাহা অপেক্ষা অধিক মাল আমরা সাম্রাজ্য-বহির্ভূত দেশে পাঠাই। সাম্রাজ্যকে আমাদের নিকট হইতে পাট লইতেই হইবে এবং চা সাম্রাজ্যের অপর কোন দেশ (আমরা ছাড়া) সরবরাহ করিতে পারে না। অন্যান্য কাঁচা মাল আমরা বেচিতে পারিব বলিয়াই বিশ্বাস। সাম্রাজ্যে না পারি অন্যত্র পারিব।

প্রেফারেন্স হইলে যে-সকল বৃটিশ জিনিষ বর্ত্তমানে মূল্যাধিক্য হেতু এদেশে বিক্রয় হয় না সেগুলির প্রতিযোগী জর্ম্মান, ফ্রেঞ্চ, আমেরিকান, জাপানী ও ইতালীয় জিনিষের উপর শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া দিলে তবে বিলাতি জিনিষগুলি চলিবে। ফলে—

১। আমাদের অনেকগুলি জিনিষ বেশী দামে খরিদ করিতে হইবে। আমাদের লোকসান।

২। শুধু বিলাতি মালই বিক্রয় হইলে শুল্ক হইতে আদায় কম হইবে ও রাজস্ব অপর উপায়ে বাড়াইবার চেষ্টা করিতে গবর্ন্মেণ্ট বাধ্য হইবেন। অর্থাৎ আমাদের লোকসান।

৩। বিলাতি যন্ত্রপাতি, মোটরগাড়ী, লরী, কলকব্জা ইত্যাদি অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে বাধ্য হইলে ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করা কষ্টসাধ্য হইবে। ফল আমাদের অর্থনৈতিক অবনতি—অন্ততঃ দ্রুত উন্নতি না হওয়া। আমাদেরই লোকসান।

আর একটা কথা আমাদের শোনান হইয়াছে—"পেট্রিয়টিজম্" বা দেশভক্তি। সাম্রাজ্যকে বা ইংলণ্ডকে আমরা নিজের দেশ বলিয়া মনে করি না—মনে করিবার ভাণও করি না। সুতরাং আমরা বলি, যে, এক্ষেত্রে রাজভক্তি অথবা প্রভুভক্তি বলিলে কথাটা সমীচীন হইত। একথা অবশ্য ঠিক, যে, এমন কোন প্রকার ব্যবস্থা হইতে পারে যাহাতে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের উভয়ের পারস্পরিক সাহায্যে উভয় দেশেরই উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু সেরূপ ব্যবস্থা সমানে সমানে হইতে পারে, প্রভু ও ভৃত্যে সম্ভব নয়। সাম্রাজ্যের অপর দেশগুলি আবার আমাদের প্রভুরও অধিক; তাঁহাদের দেশে আমাদের প্রবেশ নিষেধ। আমরা কেন যে তাঁহাদের উন্নতি চেষ্টা করিব, বা তাঁহারাই যে কেন আমাদের প্রতি এতটা সম্ভ্রমের ভাব লইয়া আমাদের উপকারে মাতিবেন, তাহা বুঝা বড়ই কঠিন।

—

প্রেসের মুখ বন্ধ

বোম্বাই সরকার সত্যবাদিতার জন্য ফ্রি প্রেস জর্নালের জামীনের ছয় হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। ফ্রি প্রেস জর্নাল ইহার পর আবার দশ হাজার টাকা জামীন রাখেন। বোম্বাই সরকার ইহাও বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। এই কাগজখানির বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অপরাধ—মহাত্মা গান্ধীর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' হইতে 'অস্পৃশ্যতা ও ধর্ম্মের গোঁড়ামী' নামে প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে সাহায্য প্রদান না করার জন্য সরকারী কর্ম্মচারীদের সমালোচনা এই প্রবন্ধে ছিল। তর্কের খাতিরে কাগজখানির অপরাধ মানিয়া লইলেও বলিতে হয়, যে, সরকারের এই কার্য্য অবিজ্ঞ-নোচিত, অরাজনৈতিক ও অত্যন্ত কঠোর হইয়াছে। ইহার উপর আবার হুকুম হইয়াছে, যে, বিশ হাজার টাকার নূতন জামীন না রাখিলে কাগজ বাহির হইতে পারিবে না!

—

নারীগণ স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের বিরোধী

সম্প্রতি দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদে ও মান্দ্রাজে যে-সকল মহিলা-সম্মেলন হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হয়, যে, নারীগণ স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রথার বিরোধী। এ-বিষয়ে তাঁহাদের মত অবশ্য অনেক দিন ধরিয়াই সুবিদিত।

শীয়া মুসলমানগণ সম্মিলিত নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী

ভারতবর্ষের শীয়া মুসলমানগণ সংখ্যায় প্রায় দুই কোটি। তাঁহারা সম্মিলিত নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী।

—

জার্ম্মেনী ও নিরস্ত্রীকরণ

জার্ম্মেনী শক্তিবর্গের নিকট দুই প্রকারে অস্ত্রশস্ত্রের সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিবার দাবি করিয়াছে। উহার একটি, সকলের অস্ত্রশস্ত্র কমাইয়া, অপরটি, জার্ম্মেনীর অস্ত্রশস্ত্র বাড়াইয়া। এই দুই দাবিই ন্যায়সঙ্গত। তবে আমরা প্রথম পন্থারই সমর্থন করি।

—

ডি ভ্যালেরা

আয়ার্ল্যাণ্ড ভারতবর্ষ নয়, দুই দেশের সমস্যাও এক নয়। তবু ডি ভ্যালেরার জীবন হইতে ভারতীয় রাজ-নৈতিক নেতাদের একটি শিখিবার বিষয় আছে। তাহা এই—ডি ভ্যালেরা ব্যক্তিগত বা সাময়িক লাভের প্রলোভনে নিজের আদর্শ ও নীতি বিস্মৃত হন নাই, কিংবা সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ অথবা সহজ পন্থাও অনুসরণ করেন নাই।



প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩২শ ভাগ, ২য় খণ্ড } পৌষ, ১৩৩৯ } ৩য় সংখ্যা

শুচি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রামানন্দ পেলেন গুরুর পদ,
সারাদিন তাঁর কাটে জপে তপে
সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুরকে ভোজ্য করেন নিবেদন,
তার পরে ভাঙে তাঁর উপবাস
যখন অন্তরে পান ঠাকুরের প্রসাদ।

সেদিন মন্দিরে উৎসব,
রাজা এলেন, রাণী এলেন,
এলেন পণ্ডিতেরা দূর দূর থেকে,
এলেন নানা চিহ্নধারী নানা সম্প্রদায়ের ভক্তদল।
সন্ধ্যাবেলায় স্নান শেষ করে
রামানন্দ নৈবেদ্য দিলেন ঠাকুরের পায়ে,—
প্রসাদ নামল না তাঁর অন্তরে,
আহার হোলো না সেদিন।

এমনি যখন দুই সন্ধ্যা গেল কেটে,
হৃদয় রইল শুষ্ক হয়ে
গুরু বল্‌লেন, মাটিতে ঠেকিয়ে মাথা,
"ঠাকুর, কী অপরাধ করেচি।"
ঠাকুর বল্‌লেন, "আমার বাস কি কেবল বৈকুণ্ঠে ?
সেদিন আমার মন্দিরে যারা প্রবেশ পায়নি
আমার স্পর্শ যে তাদের সর্ব্বাঙ্গে,

আমারি পাদোদক নিয়ে
প্রাণপ্রবাহিণী বইচে তাদের শিরায়।
তাদের অপমান আমাকে বেজেচে,
আজ তোমার হাতের নৈবেদ্য অশুচি।"

"লোকস্থিতি রক্ষা করতে হবে যে প্রভু"—
বলে গুরু চেয়ে রইলেন ঠাকুরের মুখের দিকে।
ঠাকুরের চক্ষু দীপ্ত হয়ে উঠল, বল্লেন,
"যে লোকসৃষ্টি স্বয়ং আমার,
যার প্রাঙ্গণে সকল মানুষের নিমন্ত্রণ,
তার মধ্যে তোমার লোকস্থিতির বেড়া তুলে
আমার অধিকারে সীমা দিতে চাও,
এত বড়ো স্পর্দ্ধা।"

রামানন্দ বল্লেন, "প্রভাতেই যাবো এই সীমা ছেড়ে,
দেবো আমার অহঙ্কার দূর করে তোমার বিশ্বলোকে।"
তখন রাত্রি তিন প্রহর,
আকাশের তারাগুলি যেন ধ্যানমগ্ন,
গুরুর নিদ্রা গেল ভেঙে, শুন্‌তে পেলেন,
"সময় হয়েচে ওঠো, প্রতিজ্ঞা পালন করো।"
রামানন্দ হাতজোড় ক'রে বললেন, "এখনো রাত্রি গভীর,
পথ অন্ধকার, পাখীরা নীরব।
প্রভাতের অপেক্ষায় আছি।"
ঠাকুর বল্লেন, "প্রভাত কি রাত্রির অবসানে?
যখনি চিত্ত জেগেচে, শুনেচ বাণী,
তখনি এসেচে প্রভাত।
যাও তোমার ব্রত পালনে।"

রামানন্দ বাহির হলেন পথে একাকী,
মাথার উপরে জাগে ধ্রুবতারা।
পার হয়ে গেলেন নগর, পার হয়ে গেলেন গ্রাম।
নদীতীরে শ্মশান, চণ্ডাল শবদাহে ব্যাপৃত।
রামানন্দ দুই হাত বাড়িয়ে তাকে নিলেন বক্ষে।
সে ভীত হয়ে বল্লে, "প্রভু আমি চণ্ডাল, নাভা আমার নাম,
হেয় আমার বৃত্তি,
অপরাধী করবেন না আমাকে।"

গুরু বল্‌লেন, "অন্তরে আমি মৃত, অচেতন আমি,
তাই তোমাকে দেখতে পাইনি এতকাল,
তাই তোমাকেই আমার প্রয়োজন,
নইলে হবে না মৃতের সৎকার।"

চল্‌লেন গুরু আগিয়ে।
ভোরের পাখী উঠল ডেকে,
অরুণ আলোয় শুকতারা গেল মিলিয়ে।
কবীর বসেচেন তাঁর প্রাঙ্গণে,
কাপড় বুন্‌চেন আর গান গাইচেন গুন্ গুন্ স্বরে।
রামানন্দ বসলেন পাশে,
কণ্ঠ তাঁর ধরলেন জড়িয়ে।
কবীর ব্যস্ত হয়ে বললেন,
"প্রভু, জাতিতে আমি মুসলমান,
আমি জোলা, নীচ আমার বৃত্তি।"
রামানন্দ বল্‌লেন, "এতদিন তোমার সঙ্গ পাইনি, বন্ধু,
তাই অন্তরে আমি নগ্ন,
চিত্ত আমার ধূলায় মলিন,
আজ আমি পরব শুচিবস্ত্র তোমার হাতে
আমার লজ্জা যাবে দূর হয়ে।"

শিষ্যেরা খুঁজতে খুঁজতে এল সেখানে,
ধিক্কার দিয়ে বল্‌লে, "এ কী করলেন প্রভু?"
রামানন্দ বললেন "আমার ঠাকুরকে এতদিন যেখানে হারিয়েছিলুম,
আজ তাঁকে সেখানে পেয়েচি খুঁজে।"
সূর্য্য উঠল আকাশে
আলো এসে পড়ল গুরুর আনন্দিত মুখে॥

পত্রধারা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক

এতদিন তোমার সঙ্গে তর্ক করেচি। কিন্তু আমি জাতে তার্কিক নই দলিল সমেত তার প্রমাণ করে দেবার জন্যে 'সঞ্চয়িতা' এক খণ্ড তোমার কাছে পাঠালুম। সংসারে তর্কবিতর্কের প্রয়োজন আছে, যেমন এই ধরাধামে পদক্ষেপ করে না-চললে চলে না। কিন্তু মানুষের পিঠে পাখা নেই বটে, মনে আছে। সে ওড়ার সুখেই উড়তে চায় অর্থাৎ সে প্রয়োজনের বন্ধন থেকে মুক্তি চায়। কবিতায় যে সঙ্গীত আছে, তার মধ্যেই আছে মুক্তি, আকাশে পক্ষ চালনের ছন্দ। সঙ্গীতের সুরে অর্থশাস্ত্রের সমস্যা আলোচনা ও সমাধান করা চাই এমন কথা আজকাল কেউ কেউ বলে থাকেন। তাঁরা লোকহিতৈষী, তাঁদের কাছে সঙ্গীতটা লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য। ধর্ম্মোপদেষ্টা যখন মুক্তির কথা বলেন তখন তিনি বন্ধন-ছেদনের পরামর্শ দেন—কিন্তু কাব্যে বন্ধনকেই অবস্থিত করে—রূপকে ত্যাগ করে না, তার অরূপতাকে উদ্ভাবিত করে। সুন্দরের বাঁশির সুরে টানে বিশ্বের দিকে কিন্তু টেনে বাঁধে না—টেনে নিয়ে চলে অসীমে, ক্ষণিকের দীনতা থেকে অনির্ব্বচনীয়ের পূর্ণতায়। তখন অপরূপকে ভালবাসি, নিজেকেই ভালোবাসার নাগপাশ থেকে পরিত্রাণ পাই। প্রাচীরবদ্ধ ঘরের চারিদিকে যেমন বাগান, সাহিত্য তেমনি সংসারক্ষেত্রের সংলগ্ন হয়েই আনন্দের মুক্তিক্ষেত্র রচনা করে। যে পরিমাণে তা সত্য হয় সেই পরিমাণেই সাহিত্যের নিত্যতা। ইতি ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২।

দুই

সহজ হও, প্রকৃতির সহজধারাকে যদি জবরদস্তি করে অবরুদ্ধ না করো তাহলে সে আপনিই আপন সমুদ্রপথ খুঁজে নেবে। মাটির বাধায় নদীর যাত্রাপথ বেঁকে বেঁকে যায় কিন্তু সে যদি পথের ভয়ে চলা বন্ধ না করে তাহলে তার স্রোতের প্রেরণা তাকে চরমেরই দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু সেই চরম সম্বন্ধে যদি একটা কাল্পনিক ভূগোলবৃত্তান্ত খাড়া করে তোলো তাহলে খাল-খোঁড়া-খুঁড়ির আর অন্ত থাকে না, তাহলে বাহিরের বাঁধাদস্তুরের অবরোধে তোমার আত্মপ্রকাশ পীড়িত হতে থাকবে। ভুবন ভরে আছে সৌন্দর্য্যসুধা, জীবনের মূলে আছে অমৃত রস, নানা কৃত্রিমতার ধাক্কার মধ্যে পড়ে আমরা যা পেয়েচি তাকেই পাইনে। যিনি আপন সৃষ্টিতে আনন্দ-রূপ বিস্তার করেচেন তাঁকে সমস্ত মন দিয়ে বিশ্বাস করো। কেন কেবলি ভাবো তিনি জেলখানার কর্ত্তা, তাঁর অর্ডিন্যান্সের কালো উর্দ্দি-পরা পেয়াদাগুলো তোমার খুঁৎ ধরবার জন্যে কেবলি উঁকিঝুঁকি মেরে বেড়াচ্চে। যে-দেবতার রাজত্বে এত ভয়, এত সংশয়, যিনি মানুষের আত্মপীড়নেই নিজের ট্যাকসো আদায় করেন, যিনি ভোজের পুরো আয়োজন সামনে রেখে পিছন থেকে সেটা হরণ করতে কথায় কথায় শাস্ত্রবুদ্ধির দোহাই দিয়ে হাত বাড়ান তাঁর সম্বন্ধে আন্‌সিভিল-ডিসোবীডিয়ান্সই তো বিধি। পৃথিবী জুড়ে তাঁর ভক্তদের হৃৎকম্প আর থামতে চায় না—এখানে তাদের রাস্তা বন্ধ, ওখানে অশুচিতা, সেখানে নিষেধ। এমন জগতে হতভাগাদের হাতকড়া দিয়ে বেঁধে ক্ষণে ক্ষণে চাবুকের ব্যবস্থা করে সৃষ্টিকর্ত্তার এ কি নিষ্ঠুর খেলা। ইংরেজের দেশে ধনীলোকেরা একটা ক'রে অরণ্য নিজের অধিকারে রাখে সেখানে সেই সীমানার মধ্যে বনজন্তু ছাড়া থাকে—তাদের আহারবিহারের বাধা নেই, সাধারণ লোকেরা তাদের শিকার করলে দণ্ড পায় কারণ সেটা অবৈধ। কর্ত্তা তাদের স্বয়ং শিকার করবেন বলেই তাদের পালন করেন। আমরা কি সেই রকম শিকারের পশু? দেবতা অর্থহীন বিধিনিষেধে জর্জ্জর ক'রে মারলে দোষ নেই—অথচ সে-রকম নিষ্ঠুরতা মানুষ যদি করে তবে সেটা অবৈধ হয়। তাই যখন দেবতার নামে মানুষ নিজেকে বঞ্চিত করে, শেলে শূলে বেঁধে, উপবাসে ক্লিষ্ট ক'রে অকারণ বাধায় জীবনের পথ সঙ্কীর্ণ করে তখন দেবতার নামে কত বড়ো অপবাদ দেয় তা বুঝতে পারে না, অথচ সে অত্যাচার মানুষের পক্ষে কলঙ্ক। যে-দেবতা বুদ্ধির দোহাই মানেন না, দয়ার দোহাইও না, তাঁকে যে-মানুষ ভয়ে ভয়ে মানে সে নিজেকে অমানুষ করে। সে দেবতা নেই, মানুষই নিজের প্রবৃত্তিকে মুখোষ পরিয়ে দেবতা তৈরি করেচে। তার পরে মানুষই মরে তার হাতে। ইতি ২৯ মাঘ, ১৩৩৮।

বাঙ্গালা টাইপ ও কেস

শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল, আমার এই প্রবন্ধের মধ্যে দুই-চারিটা তারিখ এবং দুই-পাঁচ জন প্রাচীন ব্যক্তির নামোল্লেখ প্রভৃতি থাকিলেও ইহা ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ের প্রবন্ধ নয়। আমার উদ্দেশ্য শুধু উপকারিতা, প্রয়োজনীয়তা ও কার্য্যকারিতার দিক্ হইতে বাঙ্গালা টাইপ ও কেসের বিশদ আলোচনা।

মনের কথাটি গোড়াতেই খুলিয়া বলা ভাল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের বাঙ্গালা টাইপ ও কেসের আমূল সংস্কার ও পরিবর্ত্তন হওয়া একান্ত আবশ্যক; আর ইহাও আমার ধ্রুব ধারণা যে, বাঙ্গালা টাইপ ও কেস যথোপযুক্তভাবে সংস্কৃত ও পরিবর্ত্তিত হইলে বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রণকার্য্য অনায়াসে সুসম্পন্ন হইবে, এখনকার অপেক্ষা অনেক কম খরচায় অনুষ্ঠিত হইবে এবং অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালা ভাল টাইপরাইটার, মনোটাইপ ও লিনোটাইপ মেশিন প্রবর্ত্তিত হইয়া বাঙ্গালার মুদ্রণকার্য্যে যুগান্তর উপস্থিত হইবে।

আমার এই বিশ্বাস ও ধারণাগুলি সুধীজনগণ-মধ্যে বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত ও পরিস্ফুট করিতে হইলে আমাকে নাতিদীর্ঘ পাঁচটি প্রবন্ধ লিখিতে হইবে। (১) এইটি প্রথম প্রবন্ধ; বাঙ্গালা টাইপ ও কেসের সাধারণভাবে পরিচয় এবং ইহাদের কোন সংস্কার ও পরিবর্ত্তন আবশ্যক কি-না, তাহাই এই প্রথম প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। (২) দ্বিতীয় প্রবন্ধে থাকিবে—প্রত্যেক টাইপের ধারাবাহিক আলোচনা ও প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে বিচার; টাইপ-সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি করার প্রস্তাব; নূতন টাইপের প্রবর্ত্তন-ও প্রচলন-প্রস্তাব এবং সংযুক্ত টাইপের আকৃতিগত বিশ্লেষণ প্রভৃতি। (৩) তৃতীয় প্রবন্ধে থাকিবে—কেসের গঠন ও আকার প্রভৃতি বিষয়ের সম্যক্ পরিচয়; কেসের মধ্যে বিভিন্ন ঘরে বা খোপে টাইপের অবস্থান-সম্বন্ধে আলোচনা; বাঙ্গালা সাট (fount): ইহার ওজন, সাটের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন টাইপের সংখ্যা অথবা পরিমাণ: ইহা নির্ণয় করার প্রকৃষ্ট উপায় ও নিয়ম প্রভৃতি। (৪) চতুর্থ প্রবন্ধে থাকিবে—মুদ্রাঙ্কণের নির্দ্দিষ্ট কেতা (style; বিশেষভাবে বাঙ্গালা শব্দের বাণান, বিরাম বা ছেদ (punctuation) এবং পঙ্‌ক্তি, শব্দ, ছেদ ও টাইপের মধ্যে ফাঁক- (spacing) সম্বন্ধে আলোচনা। আর পঞ্চম বা শেষ প্রবন্ধে থাকিবে—বাঙ্গালা প্রুফ দেখা-সম্বন্ধে আলোচনা ও বিবৃতি।

সম্ভবতঃ ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা টাইপে প্রথম বাঙ্গালা বই চুঁচুড়ায় (হুগলী) ছাপা হয়। বইখানি ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হাল্‌হেড কর্ত্তৃক প্রণীত বাঙ্গালা ব্যাকরণ। ইহার এক খণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকাগারে আছে। ইহার পূর্ব্বে লণ্ডনে বাঙ্গালা টাইপে অন্য একখানি বই প্রকাশিত হইয়াছিল। সেখানির কথা এই প্রবন্ধে আলোচনা করার দরকার নাই। এই বাঙ্গালা ব্যাকরণের জন্য লেফ্‌টেন্যাণ্ট চার্লস উইল্‌কিন্স (পরে প্রসিদ্ধ ভাষাবিৎ স্যর চার্লস) শ্রীরামপুরের পঞ্চানন কর্ম্মকারকে দিয়া বাঙ্গালা টাইপ তৈয়ার করাইয়া লন। সম্ভবতঃ সেই টাইপ কাঠে খোদাই করা হইয়াছিল। ইহার প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মার্শম্যান-প্রমুখ শ্রীরামপুরের মিশনরিগণ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা টাইপে মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে 'দিগ্‌দর্শন' মাসিক পত্রিকা এবং সাপ্তাহিক 'সমাচার-দর্পণ' প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুরের মনোহর কর্ম্মকার এই প্রথম সীসার টাইপ খোদাই করিয়া দেয়। কলিকাতায় ও শ্রীরামপুরে এই মনোহরের বংশধরগণের টাইপ ঢালাইয়ের কারখানা এখনও বেশ ভালভাবে চলিতেছে।

এই সময় হইতেই কলিকাতায় বটতলায় ছাপাখানার সূত্রপাত। বটতলার ছাপাখানা হইতে বঙ্গভাষা তথা সাহিত্য যেভাবে সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে, তাহা ভাষায়

প্রকাশ করা যায় না। 'শিশুবোধ' এইখান হইতেই প্রকাশিত হয়; তাহাতে বাঙ্গালা বর্ণমালা ও যুক্তাক্ষরের পরিচয় হইতে সুরু করিয়া সুরধুনীর স্তব ও দাতাকর্ণ পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছিল। তখনকার দিনে বাঙ্গালীর ছেলে (মেয়ে নয়) হাতেখড়ির পর পাঠশালায় ছাপার অক্ষরে 'শিশুবোধ'ই পড়িত।

তারপর উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা' (দ্বিতীয় ভাগ) প্রকাশিত হয়; ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' (দ্বিতীয় ভাগ) প্রকাশিত হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে 'বঙ্গবাসী' প্রকাশিত হয়। দুই-তিন বৎসরের মধ্যেই 'বঙ্গবাসী'র স্বত্বাধিকারী যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ সকল বাঙ্গালা টাইপে মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করেন।

বাঙ্গালা টাইপ প্রথম ঢালাই হইবার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত, এই প্রায় ১২০ বৎসরের মধ্যে, মাত্র তিন-চার বার উহার কিছু কিছু সংস্কার ও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া এখন আমরা যে টাইপ ও কেস ব্যবহার করিতেছি, তাহাই দাঁড়াইয়াছে। শেষ আমূল সংস্কার করিয়া গিয়াছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এই সংস্কারগুলির কিছু কিছু উল্লেখ করিতেছি।

(ক) শ্রীরামপুরের মিশনরিগণ তাঁহাদের প্রকাশিত পুস্তক ও সংবাদপত্র মুদ্রিত করিবার জন্য তাঁহাদের আবশ্যকমত টাইপ ঢালাই করাইয়া লন এবং ইংরাজী কেসের নকলে, কেবল মাত্র বাঙ্গালা কেসের ঘরগুলি সংখ্যায় বাড়াইয়া লইয়া বাঙ্গালা কেস তৈয়ার করান।

(খ) বটতলার ছাপাখানার জন্য কতকগুলি নূতন যুক্তাক্ষর টাইপ ঢালাই হয়। এই ছাপাখানায় সাধারণতঃ বাঙ্গালা রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইত বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণকে কম্পোজের সুবিধার জন্য বাঙ্গালা টাইপগুলিকে নূতনভাবে কেসে সাজাইতে হয়। বটতলার কেস এবং কেসের মধ্যে টাইপ-সংস্থাপন এখনও সাধারণ বাঙ্গালা কেস হইতে স্বতন্ত্র।

(গ) শিশুশিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ) মুদ্রিত করিবার সময় মদনমোহনকে আরও কয়েকটি নূতন টাইপ কাটাইতে হয়; কিন্তু সে সময় কেসের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

(ঘ) বর্ণপরিচয় (দ্বিতীয় ভাগ) মুদ্রিত করিবার সময় ঈশ্বরচন্দ্রকে বাঙ্গালা টাইপ ও কেসের আদ্যন্ত সংস্কার ও পরিবর্ত্তন সাধিত করিতে হয়। বহুসংখ্যক যুক্তাক্ষর টাইপ নূতন সৃষ্ট হয়; কেসের আকারপ্রকার বদলাইয়া যায়; কেসের মধ্যে টাইপ-সংস্থাপন বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত হয়। খণ্ড ত (ৎ) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অপূর্ব্ব সৃষ্টি, তাঁহার অসাধারণ মনীষার পরিচায়ক। এখন আমরা সচরাচর যে সাট ও কেস ব্যবহার করি এবং কেসের মধ্যে যেরূপভাবে টাইপ সাজাইয়া রাখি, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্ভাবিত ও প্রবর্ত্তিত; সেই জন্য ইহা 'বিদ্যা-সাগরী' নামে পরিচিত,—অবশ্য ছাপাখানার ভূতেদের কাছে।

(ঙ) বাঙ্গালা টাইপে সংস্কৃত শাস্ত্রাদি এবং অতিকায় সংবাদপত্র প্রচার করিতে গিয়া বঙ্গবাসীর যোগেন্দ্রচন্দ্রকে কেসের মধ্যে টাইপের সংস্থান পরিবর্ত্তন করিতে হয়। বঙ্গবাসী ছাপাখানা ভিন্ন কলিকাতার আরও পাঁচ-সাতটি ছাপাখানায় এইরূপ টাইপ-সংস্থাপন প্রচলিত আছে। ইহা 'বঙ্গবাসী কেস' বলিয়া অভিহিত হয়। কিন্তু যোগেন্দ্রচন্দ্রকে কোন নূতন টাইপের সৃষ্টি করিতে হয় নাই। ইহাও হইল প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা।

কাজেই বুঝা যাইতেছে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরে অর্থাৎ প্রায় ৮০ বৎসর হইল বাঙ্গালা টাইপ ও কেসের বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই। এতাবৎ এ সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধাদি লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সে সকল প্রায়ই ফাঁকা কথায় ভর্ত্তি,—সেগুলির মধ্যে কাজের কথা খুব কমই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। আবার পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি কয়েক জন যুক্তাক্ষর টাইপের আকৃতি পরিবর্ত্তন- করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন এবং কেহ কেহ নিজেদের প্রণীত পুস্তকাদিতে ঐ সকল পরিবর্ত্তিত যুক্তাক্ষর চালাইয়াছেন; কেহ-বা দুইটা ব-য়ের দেখাদেখি তিনটা 'স' তুলিয়া দিয়া একটা স চালাইবার পরামর্শ দিয়াছেন; বিশ্বকবি বিশ্ব-ভারতী হইতে প্রকাশিত পুস্তকে এ-কারের (ে) অ্যা

উচ্চারণ-স্থলে পাশের এ-কারের (ে) বদলে মাথের এ-কার (ৎ) চালাইতেছেন,—যেমন, যেন ইত্যাদি, কিন্তু 'এক' 'একাকী' প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ-সৌকর্য্যার্থ কোন কিছু চিহ্ন উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই। এইরূপভাবে একটু-আধটু আলোচনা ও গবেষণা বহুকাল হইতে চলিতেছে বটে, কিন্তু সে সকল প্রধানতঃ ইমারতের কার্নিস লইয়া—আসল ভিত. থেকে ছাদ পর্য্যন্ত ইমারতের আগাগোড়া বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা আজ পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই,—করা দরকার বলিয়া বোধও করেন নাই,—কিন্তু করা খুবই দরকার।

প্রথমেই ধরা যাক, টাইপগুলির সংখ্যার কথা। বাঙ্গালা কেসের ভিন্ন ভিন্ন টাইপের সংখ্যা কতগুলি তাহা বাঙ্গালা সম্পাদক, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকগণের মধ্যে কয় জন জানেন? ইহা জানা যে সাহিত্যের তথা মুদ্রণকার্য্যের উন্নতির পক্ষে বিশেষ আবশ্যক তাহা সাহিত্য-সমাজের মহারথ ও মহামহোপাধ্যায়গণ ভুলিয়াও ভাবেন না। কোন প্রবীণ সাহিত্যাচার্য্য একবার ব্যঙ্গচ্ছলে লিখিয়াছিলেন—আধুনিক মহামহোপাধ্যায়গণ কি মহামোহোপাধ্যায়? সেই ব্যঙ্গোক্তি হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল।

একটি বাঙ্গালা কেসের মধ্যে ৪৭৪টি বিভিন্ন প্রকারের টাইপ, ৪৯টি বিভিন্ন চিহ্ন, সংখ্যা, স্পেস প্রভৃতি এবং ৪০টি 'কর্ন্' (kerned) টাইপ—মোট ৪৭৪+৪৯+৪০ = ৫৬৩ প্রকারের রকমারি টাইপ থাকে। নিম্নে টাইপগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও বিভিন্ন প্রকার-সংখ্যা প্রদত্ত হইল।

টাইপের পরিচয়	বিভিন্ন প্রকারের সংখ্যা
(১) অ ই প্রভৃতি স্বর	১৪
২ ি ী প্রভৃতি	১৯
ং ঃ ন-ফলা, ব-ফলা প্রভৃতি	১০
ক ক্ এবং ক্-য়ে স্বর ও ব্যঞ্জন-যুক্ত	১৭
খ এবং খ্-য়ে "	৫
গ গ্ এবং গ্-য়ে "	১৩
ঘ এবং ঘ্-য়ে "	৬
ঙ এবং ঙ্-য়ায় "	১১
চ চ এবং চ-য়ে "	৮
ছ এবং ছ্-য়ে "	৩
জ এবং জ্-য়ে "	৯
ঝ এবং ঝ্-য়ে স্বরযুক্ত	২
ঞ এবং ঞ্-য় স্বর ও ব্যঞ্জন-যুক্ত	৭
ট ট্ এবং ট্-য়ে "	৯
ঠ ঠ্ এবং ঠ্-য়ে স্বরযুক্ত	৫
ড এবং ড্-য়ে স্বর ও ব্যঞ্জন-যুক্ত	৪
ঢ এবং ঢ্-য়ে স্বরযুক্ত	২
ণ এবং ণ-য়ে স্বর ও ব্যঞ্জন-যুক্ত	১৩
ণ (পাশে মাত্রাযুক্ত)	১
ত ৎ এবং ত-য়ে স্বর ও ব্যঞ্জন-যুক্ত	১৬
থ এবং থ্-য়ে "	৩
দ দ্ এবং দ্-য়ে "	২১
ধ এবং ধ্-য়ে "	১০
ন ন্ এবং ন্-য়ে "	২৫
প প্ এবং প্-য়ে "	১৬
ফ এবং ফ্-য়ে "	৪
ব এবং ব্-য়ে "	১৬
ভ এবং ভ্-য়ে "	৮
ম ম্ এবং ম্-য়ে "	২০
য এবং য্-য়ে স্বরযুক্ত	৩
র র্ রেফ এবং র্-য়ে এবং রেফে স্বর ও ব্যঞ্জন-যুক্ত	৪১
ল ল্ এবং ল্-য়ে "	১৪
শ এবং শ-য়ে "	১৬
ষ এবং ষ্-য়ে "	২৫
স স্ এবং স্-য়ে "	৩২
হ এবং হ্-য়ে "	১১
ড় এবং ড়্-য়ে ব্যঞ্জনযুক্ত	২
ঢ় … …	১
য় এবং য়-য় স্বরযুক্ত	৩
ক্ষ এবং ক্ষ-য় স্বর ও ব্যঞ্জন-যুক্ত	৫
৺ ৺-যুক্ত স্বর ও ব্যঞ্জন এবং ৺-যুক্ত ব্যঞ্জন-স্ব'-সমন্বিত টাইপ	২৪
	৪৭৪

(২) পাদটীকার চিহ্ন	৯
১ ২ প্রভৃতি সংখ্যা এবং গণিতের চিহ্ন	২৪
বিরাম- বা ছেদ-চিহ্ন	১১
স্পেস	১
থিক স্পেস	১
কোয়াড্রেট	১
এন স্পেস	১
এম স্পেস	১
	৪৯
(৩) কব্‌ন (kerned) টাইপ	৪০
মোট	৫৬৩

বাঙ্গালা কব্‌ন টাইপের কিঞ্চিৎ পরিচয় এইখানেই দিতেছি। টাইপের যে অংশটুকু টাইপের ডাঁটার বা থামের (stem or shank) উপর হইতে বাহিরের দিকে ঝুঁকিয়া থাকে তাহাকে ইংরাজীতে কার্ন (kern) বলে। সেই জন্ম যে টাইপে কার্ন থাকে, যেমন ইংরাজীর লোয়ার কেসের f j, তাহাকে কার্নড অক্ষর (kerned letter) বলে। বাঙ্গালা কেসে প্রায় সকল ব্যঞ্জনবর্ণের এবং তিন-চারটি স্বরবর্ণের পৃথক্ পৃথক্ কার্নড দেহ আছে। এইগুলিকে কম্পোজিটারেরা বাঙ্গালায় 'কব্‌ন' টাইপ বলে। টাইপগুলির আকার ঠিক মূল টাইপের মত, কেবল উপরে ও নিম্নে অল্প ফাঁক আছে,—যেখানে চন্দ্রবিন্দু, রেফ, হ্রস্ব ইকার বা দীর্ঘ ঈকার এবং হ্রস্ব উকার, দীর্ঘ উকার বা ব-ফলা, ম-ফলা, র-ফলা প্রভৃতি জুড়িয়া দিতে পারা যায়। বাঙ্গালার কব্‌ন টাইপ সংখ্যায় কম-বেশী ৪০টি।

এই ৫৬৩ প্রকার বিভিন্ন টাইপ লইয়া বাঙ্গালা কেস। ইংরাজী বর্ণমালায় ২৬টি বর্ণ আছে বটে, কিন্তু টাইপের প্রত্যেক কেসে প্রতি টাইপ বড় (CAPITAL), মাঝারি (SMALL CAPITAL) এবং ছোট (lower case type) —এই তিন সেট থাকে বলিয়া এবং সংখ্যা, ছেদ, স্পেস প্রভৃতি চিহ্নাদি লইয়া ইংরাজী কেসে মোট ১৬০ প্রকার বিভিন্ন টাইপ থাকে। স্মরণ রাখিতে হইবে—বাঙ্গালা কেসে বিভিন্ন প্রকারের টাইপের সংখ্যা ৫৬৩, আর ইংরাজী কেসে ১৬০, অর্থাৎ ইংরাজী কেস অপেক্ষা বাঙ্গালা কেসের টাইপ-সংখ্যা সাড়ে তিন গুণ বেশী।

এইবার কয়েকটি টাইপের প্রয়োজনীয়তা-ও অপ্রয়োজনীয়তা-বিষয়ে আলোচনা করিব।

(১) অ ই প্রভৃতি স্বরের কোঠায় ১৪টি টাইপের মধ্যে একই আকারের দুইটি ই কেসের দুইটি স্বতন্ত্র ঘরে থাকে। একই টাইপ দুইটি ঘর জোড়া করিয়া থাকার দরকার কি? ৯ ঌ এবং ঽ এখনও সগর্ব্বে বাঙ্গালা কেসে বিরাজমান। কেন? বাঙ্গালা বর্ণমালা-পরিচায়ক পুস্তকগুলি হইতে এখন পর্য্যন্ত ঌ উঠিয়া গেলেন না কেন? এই সকল প্রশ্নের কোন উত্তর আছে কি?

(২) ২ ি ী প্রভৃতি কোঠায় ১৯টি টাইপের মধ্যে ২ ে দুই প্রকার ে দুই প্রকার ৈ দুই প্রকার ৗ প্রভৃতি শোভা পাইতেছেন। ২ এবং ে ফেলিয়া দিলে এবং । ে ৗ এক প্রকারের রাখিলে কোন ক্ষতি হয় কি?

(৩) ঃ : ন-ফলা প্রভৃতি কোঠায় ১০টি টাইপের মধ্যে 'স্বর্গীয়' শব্দের সংক্ষিপ্ত ৺ (ঈশ্বর) চিহ্ন ফেলিয়া দেওয়া চলে না কি? সাহিত্যের আধুনিক শ্রী-হীনতার যুগে শ্রী-রই স্থান নাই, ৺ ত দূরের কথা।

(৪) খৃ এবং শ্রী—দুইটি পৃথক্ টাইপ থাকার দরকার কি? এই প্রসঙ্গে একটি সত্য ঘটনা মনে পড়িয়া গেল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ব্বাচিত কোন একখানি পাঠ্য পুস্তক প্রকাশিত করিবার জন্ম দুই জন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক যুগ্ম-সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রুফ সংশোধন করিতে গিয়া দেখি যে, খৃষ্ট, খৃষ্টীয় প্রভৃতি শব্দে এক জন রাখিতেছেন, আর এক জন অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া সেই ঋ-ফলাগুলি কাটিয়া ্রী করিয়া দিতেছেন। মহাবিড়ম্বনা! মাঝে পড়িয়া আমরা গরীব কম্পোজিটার ও প্রুফরিডাররা মারা যাইবার উপক্রম। ঐ বিষয়ে উভয় সম্পাদকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম; তখন লেগে গেল মহারথদ্বয়-মধ্যে তুমুল দ্বৈরথ যুদ্ধ,—ফলে ছাপা বন্ধ হইয়া রহিল। সে কি গবেষণার দৌড়, কি ভীষণ তর্ক, কি পাণ্ডিত্যময়ী বাক্-বিতণ্ডা! এমন কি হিব্রু ভাষায় খৃষ্টের বাণান কি, তাহার ঠিক উচ্চারণগত বাণান বাঙ্গালায় কি হওয়া

উচিত—ইত্যাদি নানা আলোচনা, আন্দোলন ও আস্ফালন। শেষে কোন পক্ষই হার মানেন না। এখন উপায়? পুস্তকখানি ছিল বিভিন্ন লেখকের লিখিত কতকগুলি রচনার সমষ্টি। শেষে সম্পাদকদ্বয় মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, যে লেখকের মূল রচনার কপিতে খৃষ্ট প্রভৃতি শব্দ যেরূপ ভাবে বাণান করা আছে, আলোচ্য পুস্তক-মধ্যে ঠিক সেই ভাবের বাণান ছাপা হইবে। আমাদের মত উলুখাগড়ার ধড়ে প্রাণ আসিল, দুই জনেরই জেদ বজায় রহিল,—পুস্তক-মধ্যে, 'খৃষ্ট' ও 'খ্রীষ্ট'—দুই রূপ বাণানই মুদ্রিত হইল। ইহা হাসির কথা কি কান্নার বিষয় তাহা পাঠকপাঠিকাগণের বিচার্য্য।

(৫) গ্‌ন-যুক্ত গ্ন টাইপ আছে, কিন্তু গ্‌ণ জোড়া টাইপ নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগে গ্‌ন্‌-য়ের চারটি মাত্র উদাহরণ দিয়াছেন,—ভগ্ন, মগ্ন, অগ্নি এবং আগ্নেয়; 'রুগ্ন' দেন নাই,—দিলে দেখিতে পাইতেন গ্‌ণ স্বতন্ত্র টাইপ করা আবশ্যক। তর্কালঙ্কার মহাশয় গ্ন্‌-য়ের একটি মাত্র উদাহরণ দিয়াছেন,—ভগ্ন গৃহে বাস করা অনুচিত। কাজেই আমরা আজ পর্য্যন্ত ছাপার অক্ষরে এবং হাতের লেখায় 'রুগ্‌ণ' লিখিতে 'রুগ্ন' লিখিতেছি, অর্থাৎ গ্‌ণ-য়ের বদলে অম্লান বদনে গ্ন চৌচাপটে চালাইতেছি। আমি দুই-একটি প্রবন্ধের কপিতে 'রুগ্‌ণ' লিখিয়াছিলাম, কিন্তু ভুল বাণান লিখিয়াছি স্থিরীকৃত হওয়ায় 'রুগ্ন' ছাপা হইয়াছে।

(৬) র্ত্ত টাইপ কি এখনও কেসে থাকা দরকার? বাঙ্গালা সাহিত্যে 'শ্রী'র ন্যায় বাঙ্গালা সমাজ গর্ত্তহীন করিবার প্রকৃষ্ট প্রচেষ্টা অনুসৃত হইতেছে; সুতরাং কেবল মাত্র বিজ্ঞাপন দিতে গিয়া ঐ শব্দটি প্রয়োগ করিতে হইবে, তখন গর্ত্তের পরিবর্ত্তে 'গর্ত' মুদ্রিত করিলে চলিবে না কি?

আর যদি এ কথা খাঁটি সংস্কৃত ব্যাকরণ-সম্মত হয় যে, রেফের খাতিরে যে ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়, তাহা কেবল মাত্র বিকল্পে, তবে সংস্কৃতের সেই বিকল্প ব্যবস্থাটিকে বাঙ্গালায় জোর করিয়া অবশ্যপ্রতিপালিত বিধি বলিয়া এখনও চালাই কেন? যদি সংস্কৃতের এই বিকল্প বিধান বাঙ্গালা হইতে তুলিয়া দেওয়া হয়—যেমন সংস্কৃতে ও হিন্দীতে চিরকাল চলিয়া আসিতেছে—তাহা হইলে সার্চ্চ লাইট জ্বালিয়া সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে হইবে না, কিছু কিছু অর্জ্জন করিবার অভ্যাস করিলে ভবিষ্যতে কর্জ্জ করিতে হইবে না, নর্দ্দামার কর্দ্দমে পতিত হইয়া অন্তর্য্যামীর শরণ লইতে হইবে না, পর্ব্ব-উপলক্ষে অর্দ্ধ মূল্যে বার্ত্তাকু ক্রয় করিয়া কর্ত্তব্যপরায়ণা গর্ব্বিণী গৃহিণী কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হইয়া মর্ম্মে মরিয়া গিয়া গর্দ্দভ বা বর্ব্বর বনিয়া যাইতে হইবে না। এই ভাবে নানাবিধ মহোপকার সংসাধিত হইয়া বাঙ্গালা কেস অনেক হাল্কা হইয়া যাইবে, ছেলেমেয়েরা গুরুভার বাণান-মুখস্থর দায় হইতে অনেকটা নিষ্কৃতি পাইবে, কম্পোজিটাররা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবে আর আমরা, প্রুফরিডাররা, একটু-বা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিব। এই ভাবে টাইপের একটু-আধটু সংস্কার করিবার আশা কি একান্তই দুরাশা?

(৭) অর্জ্জুন খর্জ্জুর খাইতে ভাল বাসিতেন কি-না—এই একটি মাত্র ঐতিহাসিক মৌলিক গবেষণা করিবার জন্য র্জ্জু, ঊর্দ্ধ শব্দের জন্য র্দ্ধ, একটি মাত্র ইংরাজী ষ্ট্রীট শব্দের জন্য ষ্ট্রী এবং ষ্ট্রি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন টাইপ বর্ত্তমান। এইগুলির সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা ও বিচার করা দরকার নয় কি?

(৮) তারপর কেসের মধ্যে এমন কতকগুলি যুক্তাক্ষর রহিয়াছে বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে যেগুলির প্রয়োগ অতিবিরল অথবা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত; যেমন—ঙ্ক ঙ্ঘ ঙ্খ প্ল ঞ্ঝ ন্ড ড্ড ম্ল ম্লু ভ্ব ল্ড ক্ষ কুঁ স্ব প্রভৃতি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দ্বিতীয় প্রবন্ধে ৫৬৩টি টাইপের প্রত্যেকটির উপযোগিতা-ও অনুপযোগিতা-হিসাবে ধারাবাহিক আলোচনা করিব।

এইবার বাঙ্গালা কেস-সম্বন্ধে দুই-চার কথা বলিব। সমগ্র বাঙ্গালা কেস চারখানি আলাদা আলাদা কেস লইয়া। কম্পোজিটা'রের সম্মুখে একখানি, কোলের কাছে একখানি, ডান দিকে একখানি এবং বাঁ দিকে একখানি। সম্মুখের, ডান দিকের এবং বাঁ দিকের প্রত্যেক কেসে ১২৮টি করিয়া সমান মাপের ঘর আছে এবং কোলের কাছের কেসের বাঁ ধারের আধখানায় ছোটবড় ৩২টি এবং ডান ধারের আধখানায় ছোটবড় ৩৭টি ঘর আছে। ঘরের মোট সংখ্যা—১২৮×৩+৩২+৩৭=৪৫৫। কিন্তু পূর্ব্বেই

বলিয়াছি, বাঙ্গালায় টাইপ-সংখ্যা ৫৬৩; তাহা হইলে ৪৫৫টি ঘরে ৫৬৩টি বিভিন্ন টাইপ কি করিয়া রাখা হয়? কোন কোন ঘরে দুইটি হইতে ছয়টি পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র টাইপ থাকে। এক একটি ঘরে একটি করিয়া টাইপ ধরিয়া ৪৫৫টি, কোন কোন ঘরে দুই-পাচটি করিয়া অতিরিক্ত ৬৮টি এবং ৪০টি কয়ূন টাইপ লইয়া মোট ৫৬৩টি টাইপ ৪৫৫টি ঘরে থাকে; অর্থাৎ ১০৮টি টাইপের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ঘর নাই, তাহারা প্রত্যেকে অন্য দুই-পাঁচ জন আত্মীয়-কুটুম্বের সহিত একত্র এক ঘরে ঘর করে। অতিশয় চমৎকার ব্যবস্থা নয় কি? একটা উদাহরণ দিই,— খৃ খ্রী খ্ র্খ র্খ এবং কয়ূন খ—খ-য়ের এই পাঁচজন আত্মীয়-কুটুম্ব একটি মাত্র সঙ্কীর্ণ ঘরে একত্র অবস্থান করেন। তাঁহাদের মধ্যে কোন এক জনের সহিত কম্পোজিটারের ঘনিষ্ঠতা করিতে হইলে অত ভিড়ের মধ্যে কী খোঁজাখুঁজি তথা খোঁচাখুঁচি না করিতে হয়!

বলিয়াছি, কোলের কেসের ৭১টি ঘরের মধ্যে কতকগুলি আকারে ছোটবড়, নতুবা বাকি ৩৮৪টি আকারে ঠিক সমান। মাঝের আকারের (া) ঘরটি সমগ্র কেসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ—অন্য সমান আকারের ছোট ঘরের ছয়গুণ; ক ত দ ন ম য স প্রভৃতি টাইপের প্রত্যেকের ঘর সাধারণ ঘরের চারগুণ; প ব ল হ শ প্রভৃতির ঘর সাধারণ ঘরের দুইগুণ। ঘর এইরূপ ছোটবড় করার কারণ কি? ভাষার মধ্যে যে টাইপ যে পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, সেই টাইপের জন্য সেই পরিমাণ বা আকারের ঘর করা হইয়াছে। মাঝের া-য়ের প্রয়োগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাই উহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় রাখার উদ্দেশ্যে উহার আধার বৃহত্তম করা হইয়াছে। কিন্তু সূক্ষ্ম হিসাব করিয়া ঘরগুলির আকার গঠিত হয় নাই—আন্দেমোজে করা হইয়াছে বলিয়া এই ব্যাপারের মধ্যে অনেক গোলযোগ আছে। পরে এই বিষয়টি স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি।

তারপর দ্বিতীয় কথা এই যে, ৪৫৫টি ঘরের মধ্যে কোন্ টাইপটিকে কোন্ ঘরে রাখা হয় এবং সেই নির্দ্দিষ্ট ঘরেই-বা কেন রাখা হয়? এই টাইপ-সংস্থাপনের কি কোন বাঁধাধরা নিয়ম আছে? নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেই নিয়মও সূক্ষ্ম হিসাবে নির্দ্ধারিত হয় নাই এবং যথাযথভাবে অনুসৃত হয় না। ইহার মধ্যেও গোলযোগ বিদ্যমান। এই নিয়মও ঘর ছোটবড় করার নিয়মের অনুরূপ,—যে টাইপ যত বেশী ব্যবহারে আসে তাহাকে কম্পোজিটারের হাতের তত কাছে কেসের মধ্যে রাখিতে হয়, যাহাতে অনায়াসে, অতিশীঘ্র ও সহজে কম্পোজিটার সেটিকে তুলিয়া লইয়া কম্পোজিং ষ্টিকে বসাইতে পারে। খুব বেশী কাজে লাগে, কাজেই ভাষার মধ্যে বহুল প্রয়োগ এমন টাইপকে ডান হাতের ঠিক সম্মুখে খুব কাছাকাছি না রাখিলে কাজের অসুবিধা হয়,—কম্পোজ করিতে অযথা অধিক সময় ব্যয়িত হয়।

তবেই বুঝা যাইতেছে, ভাষার মধ্যে কোন্ অক্ষরটি সাধারণ পুস্তকাদিতে কি পরিমাণ ব্যবহৃত হয়, তাহা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে নির্ণীত হইলে তবে কেসের ঘরের আকার কোন্টি কিরূপ হওয়া আবশ্যক, কোন্ ঘরে কোন্ টাইপটি রাখা দরকার এবং কোনও নির্দ্দিষ্ট ওজনের এক সাট টাইপ কিনিতে হইলে কোন্ টাইপটি সংখ্যায় বা ওজনে কি পরিমাণ হওয়া উচিত, তাহা নিরূপিত হইতে পারিবে। এখন পর্য্যন্ত এই তিনটি ব্যাপারই আন্দেমোজে এবং হতগজভাবে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ইংরাজী টাইপের বেলায় চুলচেরা ব্যবস্থা বহু দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। সেই কথাই বলিতেছি।

নানা বিষয়ের (যেমন রাজনীতিক, দার্শনিক, সামাজিক, ঔপন্যাসিক, বাগ্মিতামূলক প্রভৃতি) পুস্তক ও প্রবন্ধাবলীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন টাইপগুলির সংখ্যা গণনা করা হইল; তারপর তাহাদের গড়পড়্তা হিসাব করা হইল; পরে একটি টাইপকে মান (standard) স্থির করা হইল; শেষে এই মানের সহিত অন্য যাবতীয় টাইপের অনুপাত নির্দ্ধারিত হইল। এই ভাবে ইংরাজী সাটের নির্দ্দিষ্ট তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে এবং ইংরাজী ভাষাভাষী সকল জাতির ছাপাখানায় ঐ বাঁধা তালিকাভুক্ত টাইপ দুই শত বৎসরের অধিক কাল হইতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সমানে চলিয়া আসিতেছে। এই তালিকা দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ইংরাজী লোয়ার কেসের টাইপের মধ্যে z সর্ব্বাপেক্ষা কম, h অপেক্ষা a এবং a অপেক্ষা n বেশী,

আর e সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাগে। ১০০০ পাউণ্ড ওজনের সাটের মধ্যে z—১ পাং, h—৪০ পাং, a—৪৮ পাং, n—৫২ পাং এবং e—৬৫ পাউণ্ড থাকে। আবার A এবং a টাইপদ্বয়কে মান ধরিয়া অন্যান্য টাইপ সংখ্যায় কোন্‌টি কত লাগে, তাহার পৃথক্ তালিকাও প্রচলিত আছে; যেমন—A ৫০টি এবং a ১০০টি লাগিলে H ২৭ এবং h ৬৭, N ৫০ এবং n ১০০ আর E ৬০ এবং e ১৩৩টি লাগে। টাইপগুলি এইভাবে লাগে বলিয়া ইংরাজী লোয়ার কেসের ঘরগুলিও ছোটবড় করা হইয়াছে। ইংরাজী আপার কেস ৯৮টি সমান ঘরে এবং লোয়ার কেস ৫৩টি অসমান ঘরে বিভক্ত. ইংরাজী কেসে মাত্র ১৫১টি ঘর আছে। e সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাগে বলিয়া e-র ঘর সমান ঘরের ছয় গুণ এবং ইহার স্থান লোয়ার কেসের উপরিভাগের ঠিক মধ্যস্থলে.—যাহাতে ডান হাতখানি সটান আগাইয়া গিয়া টপ করিয়া ইহাকে তুলিয়া লইতে পারে। a h n প্রভৃতির জন্য সমান মাপের ঘর করা হইয়াছে, কিন্তু সেগুলি সাধারণ ঘর অপেক্ষা আকারে চারগুণ। এই ঘরগুলিও লোয়ার কেসের মধ্যে e-র ঘরের খুব নিকটে আশেপাশে করা হইয়াছে।

এইবার আর একবার বাঙ্গালা কেসের কথা তুলিব। ইংরাজী কেস সাত-ঘরা, অর্থাৎ আপার কেস দুই সমান ভাগে বিভক্ত আছে এবং প্রতি ভাগে ৭×৭=৪৯ করিয়া ৯৮টি সমান ঘর আছে। সেইরূপ লোয়ার কেসও দুই সমান অংশে বিভক্ত আছে, কিন্তু ডান দিকের অংশে ২৯টি ও বাঁ দিকের অংশে ২৪টি অসমান ঘর আছে। সমস্ত লোয়ার কেস টাইপগুলি, অর্থাৎ a b c d প্রভৃতি লোয়ার কেসের বড় বড় ঘরগুলিতে স্থান পাইয়াছে।

বাঙ্গালা কেস আট-ঘরা, অর্থাৎ সম্মুখের ও দুইখানি পার্শ্বের কেসে (৮×৮)+(৮×৮)×৩=৩৮৪ সমান ঘর এবং কোলের কেসের ডান দিকের অংশে ৩৯ এবং বাঁ দিকের অংশে ৩২ অসমান ঘর আছে। ইংরাজী লোয়ার কেসের যে ঘরটি যে পরিমাণে বড়, বাঙ্গালা কোলের কেসের ঠিক সেই ঘরটি সেই পরিমাণে বড়। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ e-র ঘরে া, তদপেক্ষা ছোট (অর্থাৎ চারগুণ বড়) ঘরগুলিতে c d i m n h u t thick space a r quadrat প্রভৃতির বদলে যথাক্রমে ক দ ে ম ন স য ত থিকস্পেস অ র এবং কোয়ারেট স্থান লাভ করিয়াছেন। দুইগুণ বড় ঘরগুলিতে b l v f g y এবং p প্রভৃতির স্থানে যথাক্রমে ব ল হ ষ গ ও এবং প বিরাজ করিতেছেন। এখন বুঝা গেল ইংরাজী লোয়ার কেসের পুরাপুরি নকল করিয়া বাঙ্গালা কোলের কেস বা লোয়ার কেস তৈয়ার করা হইয়াছে, কেবল সাত-ঘরার বদলে আট-ঘরা, আর মোটামুটি হিসাব করিয়া বাঙ্গালায় যে অক্ষরগুলি বেশী ব্যবহারে লাগে বলিয়া বোধ হইয়াছে, সেইগুলিকে ইংরাজীর বহুব্যবহৃত টাইপের ঘরে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আপদের শান্তি হইয়াছে! ইংরাজী ভাষায় যে পরিমাণে e লাগে বাঙ্গালায় মাত্রের আকার কি ঠিক সেই পরিমাণে লাগে? কে এই প্রশ্নের উত্তর দিবেন? ইংরাজী a r b l g এবং p কি যথাক্রমে বাঙ্গালার অ র ব ল গ এবং প-য়ের সহিত তুল্যরূপ ব্যবহৃত হয়? না, হয় না। কোনরূপ ভাবনাচিন্তা না করিয়া কেবল উচ্চারণের মিল দেখিয়া ইংরাজী টাইপ বিশেষের ঘরে বাঙ্গালা টাইপবিশেষকে চোখকাণ বুজিয়া বসাইয়া দেওয়া হয় নাই কি? অতিবিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করি, এইরূপ গোঁজামিল আর কত কাল চলিবে? আমাদের কি এখনও চোখ মেলিয়া চাহিবার এবং কাণ পাতিয়া শুনিবার সময় হয় নাই? এইরূপ গতানুগতিকভাবে গড্ডলিকা-যূথবৎ চলিতে থাকায় যে আমাদের সমূহ অমঙ্গল ঘটিতেছে,—উন্নতির কথা নাই তুলিলাম।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, আমাদের বাঙ্গালা সাটের কি কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ-তালিকা নাই? আছে, কিন্তু যাহা আছে তাহাকে 'আছে' বলিয়া অভিহিত করিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন টাইপ-ঢালাইকারের খেয়াল-বা মর্জ্জি-মত তাঁহাদের নিজেদের সাটের ফর্দ্দ থাকে।

মনে করুন আপনি দুই মন বাঙ্গালা স্মল পাইকা টাইপের অর্ডার দিলেন। আপনার টাইপ-ঢালাইকার া পাঠাইলেন ৵১৷০ সের, চারগুণ ঘরের টাইপ, অর্থাৎ ক ত দ ন প্রভৃতি পাঠাইলেন ৵১ সের করিয়া, দুইগুণ

ঘরের টাইপ, অর্থাৎ ব ল হ য প্রভৃতি ৵।৹ সের করিয়া এবং ছোট সমান ঘরের বাকি টাইপ আধ ছটাক বা এক কাঁচ্চা করিয়া। এইভাবে অর্ডারী দুই মন টাইপের মধ্যে ১।৹মন টাইপ তাঁহার ফর্দ্দমত তিনি আপনাকে সরবরাহ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া পাঠাইলেন বাকি ॥৹ মন টাইপ তিনি আপনার আবশ্যকানুযায়ী ফর্দ্দ পাইলে পাঠাইয়া দিয়া দুই মন টাইপ পুরা করিয়া দিবেন। তারপর টাইপগুলি ব্যবহারে আসিলে আপনি দেখিলেন, আসল প্রয়োজনীয় টাইপ ক্রমেই কম পড়িয়া যাইতেছে, আর কতকগুলা বাজে যুক্তাক্ষর টাইপ ঘর ভর্ত্তি করিয়া পড়িয়া আছে; সেই সব অব্যবহৃত টাইপে ক্রমে জং ও ময়লা ধরিতে লাগিল,—উপায় নাই; সেগুলি বেশী হইয়াছে বলিয়া ফেরৎ লওয়া হয় না। গত্যন্তর না দেখিয়া কাজ চালাইবার জন্য ক্রমাগত দিনের পর দিন 'সর্ট' বা খুচরা টাইপের ফর্দ্দ পাঠাইয়া হাঁটাহাটি করিয়া দুই-চার মাসে বাকি আধ মন টাইপের স্থলে আপনাকে বাধ্য হইয়া অন্ততঃ ত্রিশ সের টাইপ লইতে হইল।

এই বিচিত্র ব্যবস্থা গত এক শত বৎসর হইতে একভাবে চলিয়া আসিতেছে। টাইপ-ঢালাইকারদিগের পোয়া বার, আর প্রেসের স্বত্বাধিকারিগণের সর্ব্বনাশ ও অর্থনাশ। ইহার কি কোনও প্রতীকার নাই?

আমার তৃতীয় প্রবন্ধে কেসের ও প্রত্যেক টাইপের ঘরের নক্সা প্রকাশিত করিয়া এই সকল কথা বিশদ করিবার ইচ্ছা আছে। আজ সভয়ে ও সবিনয়ে শুধু এইটুকু জিজ্ঞাসা করিয়া বিদায় লইতেছি যে, আমাদের বাঙ্গালা টাইপ ও কেসের আগাগোড়া সংস্কার হওয়া খুবই দরকার নয় কি?

শুভযাত্রা

শ্রীপ্রবোধকুমার মজুমদার

চরিত্র

সুধাংশু—কলেজের অধ্যাপক
মৃণালিনী—সুধাংশুর স্ত্রী
জাহ্নবী — ঐ মাতা
মালতী — ঐ ভগ্নী
সরোজিনী—প্রতিবেশিনী, জাহ্নবীর সখী
মেনকা — — মালতীর সখী
বামা — ঝি
উপেন্দ্র — মৃণালিনীর বড় ভাই

ডাক্তার, মেনকার মা, মিত্রদের বড়বৌ ও ছোটবৌ

সংযোগস্থল—কলিকাতা

সময়—বিকাল পাঁচটা হইতে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা

[দোতলার উপরে বেশ প্রশস্ত একটি কক্ষ। ঘরের সাজসজ্জার গৃহস্বামীর সৌখীন রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। পিছনের দিকে তিনটি দরজা, পুরু রঙীন পর্দ্দা লাগানো—তাহার ওপাশে ভিতরের বারান্দা। ডান দিকের একটি দরজা দিয়া রাস্তার উপরের ছোট গোল বারান্দায় যাওয়া যায়। বাঁ-দিকের একটি দরজা শোবার ঘরের।

ঘরের ইতস্তত কয়েকটি টিপয়, একটি দেরাজ আলমারী, একটি ড্রেসিং টেবিল, দুখানা কৌচ, ও একটি বই-বোঝাই হোয়াট-নট। সর্ব্বত্র একটু অগোছালো ভাব—টেবিল-ক্লথ ময়লা—আলমারীর পাশে মাদুরের উপর একরাশি বই পড়িয়া আছে।

জাহ্নবী সামনের দরজা দিয়া প্রবেশ করিলেন। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। জীবনে অনেক দুঃখশোক রেখায় রেখায় তাহাদের চিহ্ন মুখের উপর রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মুখখানি একটি স্নিগ্ধ মাধুর্য্য-মণ্ডিত। জাহ্নবী একটু দাঁড়াইয়া ঘরের সবটা দেখিয়া লইলেন—তারপর ডাকিলেন]

জাহ্নবী। বামা, বামা।

[বামার প্রবেশ]

বামা। কি মা!

জাহ্নবী। বামা, একটু আয় তো। এই ঘরটা চট ক'রে গুছিয়ে ফেলি।

বামা। আমার যে ওপরের কাজ এখনও সারা হয় নি মা।

জাহ্নবী। আর কি বাকী আছে?

বামা। বাকী ঢের আছে। আলপনা, পিঁড়ি চিত্রি করা, চালুন-সাজানো ··

জাহ্নবী। তা হো'ক, এখুনি হয় তো লোকজন আসতে সুরু হবে; তাদের বসবার জায়গাটা আগে ক'রে রাখ। আর আজকের দিনে ঘরখানা এমন হয়ে আছে, এ কি দেখা যায়!

বামা। (ঘর গোছাইতে আরম্ভ করিয়া) শেষে কিন্তু আমার দোষ দেবেন না মা, যে অমুকটা হ'ল না।

জাহ্নবী। আচ্ছা, তা দেব না। এক রকম ক'রে সব হয়েই যাবে। ওরাও আসুক, সবাই মিলে করলে আর কতক্ষণের কাজ।

বামা। রক্ষে করুন মা, তাতে আর কাজ নেই। কথায় বলে 'অনেক সন্ন্যেসীতে গাজন নষ্ট।' ও পঞ্চাশ জন মিলে গণ্ডগোল করার চাইতে আমার যা কাজ সে আমি একলাই পারব।

জাহ্নবী। পাগল! পঞ্চাশ জন আবার কোথায়! আমি কি ধুমধাম লাগিয়ে দিয়েছি না কি। সরোজ আসবে, মিত্তিরদের বাড়ির দুই বৌ, ওদিকে মেনকা আর মেনকার মা; আর চাটুজ্জ্যেদের বাড়িতে বলেছি, তা তারা যে কেউ আসতে পারবে সে ভরসা কম। এই তো আমার নেমন্তন্নের লোক। নে, ওই কোণ থেকে চাদরটা এনে এই মাঝখানটায় পাত্। আমি ততক্ষণ এগুলো ঠিক ক'রে রাখি।

[উভয়ে মিলিয়া চাদর-পাতা, টেবিল-সাজানো, বইগুলি হোয়াট-নটে উঠানো ইত্যাদি করিতে লাগিলেন]

বামা। দিদিমণি কখন আসবে মা?

জাহ্নবী। বলেছিল তো চারটের মধ্যেই আসবে, কিন্তু কই···?

বামা। কেমন কুটুম গা! একটা দিনের জন্যেও ছেড়ে দিতে পারলে না।

জাহ্নবী। ও কথা বলিস্ নে। মালতীর শাশুড়ী খুব ভালমানুষ। তিনি তো আসতেই বলেছিলেন, কিন্তু দেওরের অমন অসুখ, তাকে ফেলে কি ক'রে আসে। তাই শুভযাত্রার সময় কয়েক ঘণ্টার জন্তে আসবে বলেছে। জামাই হয় ত আসতেই পারবে না। সবই আমার অদৃষ্ট।

(একটু পরে বাহিরে গাড়ীর শব্দ শুনিয়া)

দেখ তো, দেখ তো বামা, মালতী এলো বুঝি। গাড়ীর শব্দ পেলাম যেন।

[বামা ডানদিকের বারান্দায় গেল ও একটু পরে ফিরিয়া আসিল]

বামা। না মা, দিদিমণি নয়। ও-গাড়ী চ'লে গেল।

জাহ্নবী। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) আঃ, মালতী এসে পড়লে আমি বাঁচতাম। এ সব করতে আর আমার হাত সরছে না।

বামা। ও কি অলক্ষুণে কথা মা! আপনার মুখে এ সব কথা শুনলে দাদাবাবু কি ভাববেন বলুন তো!

জাহ্নবী। তাই ভেবেই তো শক্ত হয়ে আছি বামা। সুধার তো বিয়েতে মত ছিলই না—আমিই পেড়াপিড়ি ক'রে মত করিয়েছি। কিন্তু সময় যতই কাছে আসচে, ততই আমার মনে হচ্ছে বুঝি কাজটা ভাল করি নি।

বামা। ভাবলেই যত রাজ্যের ভাবনা আসে। কাজটা মন্দ কিসে শুনি? পুরুষ মানুষ কি দুটো বিয়ে করে না?

জাহ্নবী। কি জানি মা, থেকে থেকে আমার মনটা ভারী দমে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এতে বুঝি আমার পাপ হচ্ছে।

বামা। যত সব কথা! পাপ! আজকালই চল নেই, নইলে সেকালে তো শুনেছি কুলীন বামুনরা দুশো-তিনশোটা ক'রে বিয়ে করতেন। তাঁরা কি সব পাপী ছিলেন?

জাহ্নবী। ও রকম ক'রে ভেবে দেখলে তো সবই বুঝি। কিন্তু ওর কথা যখন মনে হয় ·····(দীর্ঘ-নিঃশ্বাস)

বামা। তা কি করবেন মা, যার যেমন অদেষ্ট। বৌ মরলেও তো মানুষ আবার বিয়ে করে! আর এও তো মরারই সামিল।

[কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে দুইজন কাজ করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে]

জাহ্নবী। বামা, ও এখন কি করছে রে?

বামা। কে?

জাহ্নবী। আবার কে? ঐ হতভাগী।

বামা। আজকে বড্ডই বেড়েছে মা। ভাত তো একটাও পেটে যায় নি। থালা দিতেই দুই হাতে সমস্ত ঘরময় ছিটোতে লাগল। কি? না—'আয়, আয় বুলবুলি, ধান খেয়ে যা।' তারপর বুলবুলি আসে না দেখে নিজেই বুলবুলি হয়ে হামা দিয়ে একটা একটা করে ঠোঁট দিয়ে খুঁটে খেতে লাগল। সে কি অঙ্গভঙ্গী! তারপর দুই বুলবুলির ঝগড়া—রঙ্গ দেখে হেসে মরি।

জাহ্নবী। থাক, থাক, অমন ক'রে বলিস নে। তাহ'লে খাওয়া আজ কিছুই হয় নি?

বামা। না, অমনি ক'রে আর ক'টা দানা পেটে যায়!

জাহ্নবী। যাক, এ তবু একরকম ভাল। সে ভাবটা যে আসে নি তাও রক্ষে।

বামা। আসে নি আবার। তারপরেই চীৎকার সুরু হ'ল—'বাপ রে, বাঁচাও রে, ঐ আমাকে কাটতে এল রে।' তারপর বাটী গেলাস ছুঁড়ে ছুঁড়ে আমাকে মারতে যায়—দরজার ওপরে দমাদম ঘা—বরঞ্চ আজ আরও বেশী বেশী।...ভালকথা মা, দাদাবাবুকে ব'লে দরজার শেকলটা ঠিক করিয়ে দিও। আমার ভারী ভয় করে। পাগলের মাথায় বুদ্ধি আসে না তাই—নইলে ভেতর থেকে হাত গলিয়ে অনায়াসে শেকল খুলে ফেলতে পারে।

[একতলার ঘর হইতে ক্রমাগত চীৎকারের শব্দ আসিতে লাগিল, "মা—ওমা, মা, মাগো, মা, ওমা, মা, মাগো, মা"]

জাহ্নবী। ওর বিকট চীৎকার অনেক শুনেছি। ওর হাতে মারও অনেক খেয়েছি—তাতে তত কষ্ট বোধ করি নে। কিন্তু ওর এই করুণ সুরে 'মা'-ডাক শুনলে আমার বুক ফেটে যায়।

বামা। কেন মা, এ ডাকটা তো অনেকটা ভাল-মানুষেরই মত।

জাহ্নবী। হ্যাঁ, তাইতেও মনে করিয়ে দেয় যে ও আমার সেই বৌমা। নইলে আগের মানুষ তো আর নেই। অমনি ক'রেই যে ও আমায় ডাকতো। ছেলেবেলা থেকে মা নেই—আমাকেই ও মা ব'লে জেনে এসেছে।

[নেপথ্যে, "দিদি, দিদি কোথায় গা।"]

জাহ্নবী। ঐ সরোজ এসেছে। (উচ্চস্বরে) এই যে ভাই, ওপরের ঘরে। এইখানে এস।...বামা, দেখ তো ওকে যদি মুড়িটুড়ি কিছু খাওয়াতে পারিস্—(চাবি দিয়া) এই যে ভাঁড়ারের চাবি নিয়ে যা।

[সরোজিনীর প্রবেশ। বিধবা। বয়স জাহ্নবীর চেয়ে চার-পাঁচ বছর কম হইবে। সঙ্গে একজন ভৃত্য একখানি আলপনা-দেওয়া পিঁড়ি পৌঁছাইয়া দিয়া গেল]

বামা। একেবারে বেলা গড়িয়ে এলেন মাসীমা। জানেনই তো কাজ করবার লোক কেউ নেই। আপনাদেরই ভরসায় কাজে হাত দেওয়া। মা'র তো দিনে সাতবার হাত-পা ভেঙে আসছে।

সরোজিনী। সত্যি দিদি, আমার বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে। তা, এদিককার কিছুই কি হয় নি?

জাহ্নবী। ওর কথা! ওর তো সব কাজেই তড়বড়ি। বামা, যা, যা বললুম কর গে।

[বামার প্রস্থান]

সরোজিনী। এ পিঁড়িখানা কোথায় রাখব? এই পিঁড়ির জন্যেই আরো দেরি হয়ে গেল।

জাহ্নবী। এখনকার মত ওখানেই রেখে দাও।

[সরোজিনী পিঁড়িখানা একপাশে রাখিলেন]

সরোজিনী। চুপচাপ বসে আছ যে দিদি? এদিককার কতদূর?

জাহ্নবী। সে-সব একরকম ঠিকঠাকই আছে। বাকী যা আছে, তা সব এয়োদের কাজ—তারা না এলে তো হবে না। আমার তো আর ধুমধামের কাণ্ডি নয়।

সরোজিনী। তবু যেটুকু না করলে নয়, তা তো করা চাই। সুধা কোথায়?

জাহ্নবী। নীচে বৌমার ভায়ের সঙ্গে কথা বলছে।

সরোজিনী। সে কি! বৌমার ভাই যায় নি? বৌমারও যাওয়া হয় নি তাহ'লে?

জাহ্নবী। না।

সরোজিনী। ও, তাইতে আসবার সময় বৌমার ঘরের দিক থেকে যেন সাড়া পেলাম। কিন্তু কেন?

বৌমাকে এ কয়দিনের জন্যে নিয়ে যাবে বলেই না তার ভাইকে টেলিগ্রাম ক'রে আনিয়েছিলে ?

জাহ্নবী। হ্যাঁ, আর উপেনও ওকে নিয়ে যাবে বলেই এসেছিল। কিন্তু কি করা যায়, কিছুতেই যে ওকে নিয়ে যাওয়া গেল না।

সরোজিনী। এটা তো ভাল হ'ল না দিদি। শুভ-কর্ম্মের বাড়ি—পাগল যে কখন কি ক'রে বসে তার ঠিক নেই—চেঁচানি তো সব সময়ে লেগেই আছে। তা ছাড়া, নতুন বৌ আসছে, বাড়িতে পা দিয়েই এই-সব দেখেশুনে তার মনটাই বা কি হবে।

জাহ্নবী। কি করব বল। সে দৃশ্য তো দেখনি। কিছুতেই বাড়ি ছেড়ে যাবে না। গাড়ীতে তুলবার সময় সে কি আছাড়ি-পিছাড়ি ক'রে কান্না—তিনটে লোক হয়রান হয়ে গেল। রাস্তায় লোক জমতে লাগল। শেষে আমি বললাম, 'যা হবার হবে,—এমন ক'রে আমি ওকে বাড়ি থেকে বিদেয় করতে পারব না।'

সরোজিনী। আহা, বাড়ি বাড়ি ক'রে মায়াটা ওর চিরদিনই। বাড়ি সাজানো, গোছানো, নতুন নতুন ক'রে সাজাবার খেয়াল, এই-সব নিয়েই থাকত।

জাহ্নবী। এই বাড়িটার মধ্যেই ছিল ওর প্রাণ। বাড়ি ছেড়ে দু-দিনও কোথাও গিয়ে সোয়াস্তি পেত না। ওদিককার মধ্যে তো এক ভাই, আর সেও থাকে সেই দিল্লীতে। ন-মাসে-ছ-মাসে যদি-বা সেখানে যেত, গিয়ে থাকতে পারত না। দু-দিন বাদেই চিঠি লিখত, 'আমাকে নিয়ে যাও।'

[নেপথ্যে চীৎকার, "যাব না, আমি যাব না, আমাকে কেটে ফেলবে, আর আমি যাব। বাবা গো!"]

সরোজিনী। আজকে যেন একটু বেশী-বেশী!

জাহ্নবী। হ্যাঁ, নিয়ে যাবার জন্যে খানিক টানাটানি করাতে মেজাজটা বিগড়ে আছে। কার মুখ দেখে উঠেছিল, আজ এক ফোঁটা জলও পেটে যায় নি।...আর বসে থাকব না। চল, ছাতে যাই।

সরোজিনী। ছাতে কেন?

জাহ্নবী। ছাঁদনা-তলা যে ছাতেই করেছি। একেবারে ওর চোখের সামনে হয় ব'লে নীচের উঠোনে আর করিনি।

সরোজিনী। সে তো ভারী অসুবিধে হবে। তার চাইতে বরং ওকেই দু-দিনের জন্যে ওপরের কোন ঘরে রাখলে পারতে।

জাহ্নবী। ও বাবা, তা কি হবার জো আছে। প্রাণ গেলেও তো সে ওপরে আসবে না। এ অবস্থা হয়ে অবধি আজ দু-বছরের মধ্যে এক দিনও তো ওপরে আসেনি। আনতে গেলে চীৎকার ক'রে অনর্থ বাধায়।

সরোজিনী। এ আবার কি খেয়াল?

জাহ্নবী। পাগলের খেয়াল! তার কি কোন অর্থ আছে? তবে এটা একেবারে খেয়ালও নয়। ওপরের এই ঘরেই তার পেটের শত্তুর মারা গিয়েছিল কি-না।

[বামার প্রবেশ]

বামা। দাদাবাবু আর উপেনবাবু একবার আসবেন।

জাহ্নবী। আচ্ছা, আসতে বল, এখানে আর কেউ নেই।......(সরোজিনীর প্রতি) ওকি, তুমি উঠলে কেন? উপেন তোমার পেটের ছেলের মত।

সরোজিনী। না, না, সেজন্যে নয়। তোমরা কথাবার্ত্তা বল। আমি ততক্ষণ ওপরে একটু দেখেশুনে আসি।... চল্ তো বামা, কর্ম্মা মানুষ একা একা কত কাজ করল দেখি গে।

বামা। (খুশী হইয়া) সে-সব আমি ঠিক ক'রে রেখেছি মাসীমা—এখন এয়োরা এলেই হয়।

[উভয়ের প্রস্থান—বামা যাইবার সময় বারান্দা হইতে ডাকিয়া গেল—"দাদাবাবু, এসো গো, কেউ নেই এখানে।" একটু পরে সুধাংশু ও উপেন্দ্র আসিল। সুধাংশুর বয়স ত্রিশ, উপেন্দ্র তাহার চেয়ে দুই-এক বছরের বড় হইবে]

সুধাংশু। মা, উপেন-দা তো আর থাকতে চায় না। জেদ ধরেছে, আজই চ'লে যাবে।

জাহ্নবী। সে কি কথা বাবা, আর একটা দিন থাকো না।

উপেন্দ্র। না দেখুন, আর অনর্থক থেকে কি হবে। আমি ঠিক করেছি সন্ধ্যের এক্সপ্রেসেই চ'লে যাব, তাই আপনাকে প্রণাম করতে এসেছি।

জাহ্নবী। না বাবা, এই দু-দিনের রাস্তা এসেছ কষ্ট ক'রে—আবার একটু না জিরিয়ে অমনি চলে যাবে।"

উপেন্দ্র। তাতে আর কি হয়েছে। মিনি যদি যেত তবে তো আমাকে আজকেই যেতে হ'ত।

জাহ্নবী। সে যেন আর উপায় ছিল না ব'লে। কিন্তু তা যখন হ'লই না, তখন শুধু শুধু কষ্ট করবে কেন বাবা?

উপেন্দ্র। শুধু শুধু তো নয়। পরের চাকরি করি—আবার একদিন আপিস কামাই করাটা—

সুধাংশু। আরে থেকে যাও হে। একটা দিনে আর আপিস দেউলে হবে না। তোমার আপিস তো তেমন কড়া নয়—একদিনের ছুটি অবিশ্যি পাবে।

জাহ্নবী। যেমনই হোক বাবা, তবু আমার কাছে তো এটা একটা শুভকার্য্য। আজকের দিনে বাড়িতে এসে তুমি অমনি অমনি চ'লে গেলে সেটা আমার মনে বড় বাজবে।

[উপেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল]

—অবিশ্যি তোমার মনে যে কি হচ্ছে তা আমি খুব বুঝতে পারছি।...আমারই কি বড় আনন্দের কথা। আমার অমন লক্ষ্মীপ্রতিমা বৌমা, তাকে নিয়ে আমি ঘর করতে পারলাম না। (চক্ষু মুছিলেন)...তুমি আমার ওপরে মন ভারী করো না বাবা।

উপেন্দ্র। না, না, ওকি বলছেন। আপনাকে কি আমি জানিনে। মিনি যে মা বলতে অজ্ঞান হ'ত। ওর নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে আপনার মত শাশুড়ী পেয়েও ওর আজ এই দশা। আপনার আমি কোন দোষ দিচ্ছি নে।

জাহ্নবী। এ কথা কি তুমি মন থেকে বলছ?

উপেন্দ্র। মন থেকে বই কি। আপনি আপনার কর্ত্তব্য করেছেন। একজনের জন্য একটা সংসার কখনও ছারখার হ'তে দেওয়া উচিত নয়। আর এতে যে কষ্ট পাবে সে তো এখন সুখদুঃখ-বোধের বাইরে চ'লে গেছে।

জাহ্নবী। তাহ'লে আজ তুমি থাকবে?

উপেন্দ্র। (একটু চুপ করিয়া) দেখুন, বুদ্ধি দিয়ে কথাটা বুঝলেও মনকে তো আঘাত থেকে বাঁচানো যায় না। নিজের চোখে দাঁড়িয়ে দেখাটা...

জাহ্নবী। না, না, তা কেন? সুধার সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে না। তুমি বাড়িতেই থেকো। তুমি থাকলে আমি অনেক ভরসা পাবো। আজ পাগলামীটে বড্ড বেড়েছে। সুধা তো ওর দুচক্ষের বিষ—আমি কাছে গেলেও ভারী রাগ করে। যদি তেমন কিছু হয়ে ওঠে তোমাকে দেখলে হয়ত শান্ত হবে।...এর পরেও যদি তুমি চ'লে যাও বাবা, তাহ'লে বুঝব যে, আমাদের ওপরে রাগ ক'রেই তুমি চ'লে গেলে।

উপেন্দ্র। এ কথার পর আর কি বলব! আচ্ছা বেশ, আমি থাকলেই যদি আপনি খুশী হন তাহ'লে আমি থাকব। কিন্তু কালকে যেন আর আমাকে যেতে বাধা দেবেন না।

জাহ্নবী। আচ্ছা, কালকেই তুমি যেয়ো। শুধু আজকের দিনটা...

[বামার প্রবেশ]

বামা। মা, ওপরে আসবেন তো একবার। মাসীমা ডাকছেন।

জাহ্নবী। যাই...তোমরা একটু বস বাবা, আমি আসছি।...বড় খুশী করেছ আমাকে। তোমার কথা শুনে আমার মনটা অনেকটা হাল্কা হয়ে গেল। আশীর্ব্বাদ করি, বাবা, চিরজীবী হয়ে থাকো।

[বামা ও জাহ্নবীর প্রস্থান]

সুধাংশু। তুমি আমাকে না জানি কি ভাবছ, উপেন-দা।

উপেন। পাগল! কি আবার ভাবব।

সুধাংশু। না না, তোমার মুখ দেখেই আমি বেশ বুঝতে পারছি।...দেখ, মা'র বয়েস হয়েছে। আর কতদিন তিনি এই সংসারের ভার টানবেন। মা'র জন্যেই...

উপেন। (ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে তো ঠিক কথা, মা'র জন্যেই...

সুধাংশু। না না, আমার নিজের জন্যেও বটে। তোমার কাছে আর বলতে কি। কিন্তু একটু বুঝে দেখ তো ভাই, সেটাই বা এমন কি দোষের?

উপেন। আমার মতামতের জন্যে তুমি এতটা ব্যস্ত হচ্চ কেন?

সুধাংশু। তোমার সহানুভূতি পেলে আমার বিবেকের কাছে তবু অনেকটা শান্তি পাব। একটু দরদ দিয়ে বুঝে দেখ ভাই—এ রকম মরুভূমি সামনে ক'রে দীর্ঘ জীবন কি কেউ কাটাতে পারে! সংসারের সুখ, গৃহের শান্তি, সন্তানের স্নেহ, এ সবের মূল্য যে কতখানি, যা'র হারায় নি, সে বুঝবে না। আমার তো সে সবই হয়েছিল—নির্ম্মম বিধাতা আমার সে সোনার সংসার পু'ড়িয়ে শ্মশান ক'রে দিল। এখন এই শ্মশান আঁকড়ে চিরজীবন বসে থাকতে যোগী বা সন্ন্যাসী হয়ত পারে, কিন্তু সাধারণ রক্ত-মাংসের মানুষের পক্ষে সে কি সম্ভব?

উপেন্দ্র। সে তো ঠিক কথা।

সুধাংশু। না, তুমি মুখেই শুধু বলছ, মন থেকে বলছ না।

উপেন্দ্র। তাহ'লে তোমাকে সত্যি কথাই বলি সুধা। সত্যিই আমার মন এতে সায় দিচ্ছে না। আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি নে যে, এই ব্যবস্থাই ঠিক।...তবে এ কথাও বলি, নইলে তোমার ওপর অবিচার করা হবে—যে, তোমার অবস্থাটা আমি হয়ত ঠিক প্রাণ দিয়ে অনুভব করতে পারছিনে। তোমার মত অবস্থায় পড়লে আমিও যে ঠিক তোমার মত আচরণ করতাম না, একথা কে বলতে পারে?

সুধাংশু। দেখ, চেষ্টার তো আমি কোন ত্রুটি করি নি। আজ দু-বচ্ছর ধ'রে কত রকম চিকিৎসাই তো হ'ল। তুমিও তো অনেক চেষ্টা ক'রে দেখেছ। শেষটায় ডাক্তার বললে যে, এ জীবনে আর সারবার আশা নেই।

উপেন্দ্র। থাক, সে সব কথা আর কেন?

সুধাংশু। কেবল সেবার দিল্লীতে তোমার কাছে সেই একবার মাত্র জ্ঞান হয়েছিল। তাও মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যে।

উপেন্দ্র। ও সব কথা এখন থাক সুধা। আজকের দিনটায় ও-সব ভুলে মনে একটু আনন্দ আনবার চেষ্টা কর।...তোমার ভাবী পত্নীর কথা আমাকে সব বল দেখি।

সুধাংশু। তার কথা আর বলবার কি আছে?

উপেন্দ্র। বলবার নেই, বল কি? আমার তো এখনও কিছুই শোনা হয় নি। ভুলে যেয়ো না যে, আমি টেলিগ্রাম পেয়ে এসেছি। তুমি তো চুপি চুপি সব কাজ সেরে নিতে যাচ্ছিলে—আগে তো কিছু জানতে দাও নি।

সুধাংশু। না না, চুপি চুপি আর কি? হঠাৎ সব ঠিক হয়ে গেল কি-না।

উপেন্দ্র। শুনেছি না-কি তিনি খুব বিদুষী।

সুধাংশু। হাঁ...না, খুব বিদুষী আর কি। ডায়োসেশানে সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাসে পড়েন। কিন্তু খুব প্রখর বুদ্ধি, এক একটা কঠিন বিষয়েও তাঁর মতামত শুনলে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়।

উপেন্দ্র। তোমার কি তাঁর সঙ্গে আগেই আলাপ হয়েছে না কি।

সুধাংশু। হ্যাঁ। ওর বাবা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, তা তো শুনেছ। একটা রিসার্চ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে প্রায়ই সেখানে যেতাম। সেই সূত্রেই আলাপ।

উপেন্দ্র। ও। তাহ'লে দেখছি দস্তুরমত 'লাভ-ম্যারেজ'!

সুধাংশু। দূর! 'লাভ-ম্যারেজ' আবার কিসের! বুড়ো বয়েসে আবার 'লাভ'!

উপেন্দ্র। সম্বন্ধটা তবে ঘটল কি ক'রে?

সুধাংশু। মা'র কাছে আমি মাঝে মাঝে নমিতার কথা বলতাম কি-না। তাই শুনে মা জেদ ধরলেন, ওরই সঙ্গে বিয়ে দেবেন।

উপেন্দ্র। ওর বাবা রাজী হলেন?

সুধাংশু। প্রথমটা রাজী হন নি। তারপর যখন শুনলেন যে, কলকাতার সব বড় বড় ডাক্তাররা মত দিয়েছেন যে, এর এ অসুখ সারবার নয়, তখন রাজী হয়েছেন।

উপেন্দ্র। আর তাঁর মেয়ে?

সুধাংশু। (ঈষৎ হাসিয়া) তাঁর দিক থেকে কোন আপত্তি ওঠে নি।

উপেন্দ্র। তবু বলছ 'লাভ-ম্যারেজ' নয়! বেশ বেশ

শুনে খুব খুশী হ'লাম। প্রার্থনা করি, তুমি নতুন ক'রে জীবন আরম্ভ ক'রে সুখী হও।…এ যাত্রায় তো আর হ'ল না। শীগ্‌গীরই সুবিধেমত একদিন এসে আমি মিনিকে নিয়ে যাব।

সুধাংশু। কেন?

উপেন্দ্র। আর এখানে শুধু শুধু থেকে কি হবে? চিকিৎসা যতদূর হবার তা তো হয়েছে। এখন থেকে ও আমার কাছেই থাকবে। তবে তোমার ঐ বামাকে আমার চাই—বামা নইলে ওকে রাখা মুস্কিল।

সুধাংশু। না না, তা কি হয়! কিছুদিনের জন্যে হয় তো তুমি মিনিকে নিয়ে যেতে পার, কিন্তু আমার এখানেই ও থাকবে।

উপেন্দ্র। তুমি না হয় এ কথা বলছ, কিন্তু যিনি আসছেন তিনি কি তাতে রাজী হবেন?

সুধাংশু। তুমি তাঁকে জান না তাই বলছ। অমন উঁচু মন কারো হয় না। তা নইলে কি আর আমি…। সে বলে, এখানে এলে তার একটা প্রধান কাজ হবে ওর সেবাশুশ্রূষা করা।

উপেন্দ্র। (উদাসীন ভাবে) সে তো বেশ ভাল কথা।

সুধাংশু। আমরা ঠিক করেছি আমরা দুজনে মিলে ওর শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে যা-কিছু করা সম্ভব, কোন বিষয়ে ত্রুটি রাখব না। কোন অযত্ন হ'তে দেব না।

উপেন্দ্র। (বিষণ্ণ হাস্যে) দেখ সুধা, আমার চেয়ে বয়েস তোমার বিশেষ কম নয়। সংসারে দেখেছ-শুনেছও ঢের। এ-সব বড় বড় সঙ্কল্পের কথা কার্য্যক্ষেত্রে নামলে ক'দিন ঠিক থাকে তা কি জান না?

সুধাংশু। আমাদের তুমি সাধারণ দশজনের মত মনে করো না উপেন-দা। আমাদের সঙ্কল্প ঠিক থাকে কি-না সে তুমি দেখে নিয়ো।

উপেন্দ্র। আচ্ছা বেশ, ও না হয় তোমাদের কাছেই থাকবে। কিন্তু যখনি তোমাদের মনে হবে যে, এ বোঝা আর বইতে পারছ না, তখনি আমাকে খবর দিয়ো; কোন সঙ্কোচ করো না। এ কথা আমি সন্তুষ্ট মনেই তোমাকে জানিয়ে রাখছি।

[জাহ্নবীর প্রবেশ]

জাহ্নবী। সুধা, উপেনকে নিয়ে নীচের বৈঠকখানায় বস্ গে যা। এ ঘরে মেয়েরা সব আসবেন। আমি উপেনের জলখাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

উপেন্দ্র। না না, এখন আর জলখাবার নয়। অবেলায় খেয়ে একটুও খিদে নেই।

জাহ্নবী। বেশী কিছু নয়। একটু চা তো খাবে?

উপেন্দ্র। তাহ'লে ঐ এক কাপ চা-ই শুধু। আর কিছু নয়।

[উভয়ে প্রস্থানোদ্যত। এমন সময় মাঝের দরজা দিয়া মালতী আসিল—উপেন্দ্রকে দেখিয়াই সে লজ্জায় আবার তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। বয়স আঠার-উনিশ—হাসিখুশী, চঞ্চল মেয়েটি। সামান্য কারণে হাসিয়া গলিয়া পড়ে—সামান্য দুঃখে চোখ ছলছল করিয়া আসে। বিবাহ উপলক্ষ্যে একটু সাজগোজ করিয়া আসিয়াছে। হাতে প্রকাণ্ড একছড়া মালা ও ফুলের তোড়া—অন্য হাতে দোকানের নাম-ছাপা একটা কাপড়ের প্যাকেট]

সুধাংশু। মালতী, যাস্ নে আয়। আমরা চ'লে যাচ্ছি।

[বামদিকের দরজা দিয়া সুধাংশু ও উপেন্দ্রের প্রস্থান। মালতী পর্দ্দা ঈষৎ সরাইয়া তাহাদের দেখিতে লাগিল। তাহারা চলিয়া গেলে ছুটিয়া প্রবেশ করিল]

মালতী। মা, দেখ দেখি মালাটা—খুব সুন্দর হয়নি? আমি নিজে দোকানে ব'সে ফুল বেছে বেছে তৈরি করিয়েছি।

জাহ্নবী। হ্যাঁ বেশ হয়েছে। তোর দেওর কেমন আছে আজ?

মালতী। কালকের চেয়ে আজ একটু ভালই আছে।

জাহ্নবী। তবে আসতে এত দেরি করলি যে? আমি সাত-পাঁচ ভেবে মরি।

মালতী। বাড়ি থেকে চারটের আগেই বেরিয়েছিলাম, মা। তারপর মার্কেট থেকে এই মালাটা আর কলেজ ষ্ট্রীট থেকে বৌভাতের জন্যে একখানা শাড়ী কিনতে কিনতে দেরি হয়ে গেল। আরও এক জায়গায় গিয়েছিলাম, তার কথা এখন বলব না।

জাহ্নবী। (ঈষৎ হাসিয়া) আচ্ছা, তা না বললি; তুই এলি কার সঙ্গে? জামাই আসেনি?

মালতী। আসেনি তো কি। নইলে আর কারো সঙ্গে কি এত দূর ঘোরা যায়!

জাহ্নবী। ওমা, তা এতক্ষণও বলিস্ নি! কি ভাবছে বল তো! যাই আমি দেখে আসি গে।

মালতী। কি আবার ভাববে! দাদাই তো গিয়েছেন।

[মেনকা, মেনকার মা, মিত্রদের বড়বৌ ও ছোটবৌ এবং সরোজিনী আসিলেন। জাহ্নবী সমাদর করিয়া সকলকে ফরাসে বসাইলেন। মালতী মেনকাকে জড়াইয়া ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া গিয়া একপাশে সোফার উপর বসিল ও দুইজনে হাসিগল্প চলিতে লাগিল। মেনকা অবিবাহিতা, কলেজে-পড়া মেয়ে। মালতীর সমবয়সী, গম্ভীরপ্রকৃতি ও তেজস্বিনী। দু-চারিটি কুশল প্রশ্নের পর জাহ্নবী বলিলেন]

জাহ্নবী। সরোজ, তুমি একটু এঁদের কাছে থাকো। জামাই এসেছে, আমি একবার দেখে আসি।

মালতী। (উঠিয়া) বৌদি কোন্ ঘরে আছে মা?

জাহ্নবী। নীচের সেই ঘরটাতেই।

মালতী। একটু দেখে আসি গে। মেনকা, আয় না ভাই, আমার একলা যেতে ভয় করে।

[জাহ্নবী, মালতী ও মেনকার প্রস্থান। নীচ হইতে পাগলের চীৎকার শোনা গেল—"গেল, গেল, স—ব গেল। যমে নিলে কি কিছু থাকে?"]

বড়বৌ। ঐ বুঝি সেই পাগলী বৌটা?

মেনকার মা। হ্যাঁ।

বড়বৌ। আহা এমন দশা কত দিন হ'ল হয়েছে?

মেনকার মা। বছর দুই।

ছোটবৌ। চিকিৎসা করায় নি?

মেনকার মা। করায়নি আবার? কোন চিকিৎসা বাকী রাখে নি। সব হার মেনে গিয়েছে।

[আবার চীৎকার—"ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, এমনি ক'রে আমাকে কাটবি তোরা? অ্যাঁ?"]

মেনকার মা। আজকে কিছু বাড়াবাড়ি বোধ হচ্চে।

ছোটবৌ। আহা, ওর অন্তরাত্মা বোধ হয় বুঝতে পেরেছে আজকে ওর কি সর্ব্বনাশ হচ্চে।

বড়বৌ। পেটে যদি একটা হ'ত তাহ'লে বোধ হয় এমন ক'রে ফেলে দিতে পারত না।

সরোজিনী। পেটে তো একটা হয়েছিলই—অভাগীর কপালে যে তাও টিকলো না। যেমন বরাত ক'রে সংসারে এসেছিল!

বড়বৌ। তাই না কি? কি ছেলে হয়েছিল?

সরোজিনী। বেটা ছেলে। বিয়ের পর বছর-চারেক যায়—ছেলে হবেই না, হবেই না। কত রকম ওষুধবিষুধ তাগা-তাবিজ ক'রে তো ঐ ছেলে হ'ল। ছেলে না শত্তুর। ছেলে হয়ে অবধিই মাথাটা একটু খারাপ খারাপ। মায়ের অযত্নে ছেলেটাও ভুগে ভুগে তিন মাসের হয়ে মারা গেল। তারপর থেকেই ঘোর উন্মাদ।

[মালতী ও মেনকার প্রবেশ। মেনকা বিবর্ণ, গম্ভীর মুখে পূর্ব্বের সোফায় গিয়া বসিল। মালতী চোখ মুছিতে মুছিতে সরোজিনীর কাছে গেল]

মালতী। জান মাসীমা, বৌদি আজ আমাকে চিনতে পেরেছে। আমাকে দেখেই বলছে, "কি লো ঠাকুরঝি, এত বাহার দিয়েছিস্ যে? বিয়ে করতে যাবি?"

সরোজিনী। তাই না কি?

মালতী। হ্যাঁ, এইটুকু কথাও ও আমার সঙ্গে কত দিন যে বলে নি। (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে) আজ আমার আগের কথা সব মনে পড়ছে মাসীমা। আমাকে কী ভালই যে বাসত!

[তাহার চোখ দিয়া টসটস্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল]

সরোজিনী। ছি, মা। আজ শুভদিনে চোখের জল ফেলতে নেই। কার জন্যে তুই কষ্ট করিস্। সে মানুষ কি আর আছে?…চল্, ওপরে যাই। কাজকর্ম্ম এখনও ঢের বাকী আছে।

[মালতীকে লইয়া সরোজিনী চলিয়া গেলেন। আবার চীৎকার শোনা গেল, "মা, ওমা, মাগো, মা, ওমা, মা, মাগো, মা"]

বড়বৌ। আমার বৌদির পিসতুতো বোনের ঠিক এই রকমটি হয়েছিল। কাঞ্চনতলার ভৈরব-মন্দিরের মাদুলি নিয়ে এখন একেবারে সেরে গিয়েছে। এরও তাই ক'রে দেখলে হয় না?

মেনকার মা। মাদুলিতে তো সবার বিশ্বাস নেই মা।

ছোটবৌ। মাদুলি না হোক, কোন টোটকা ওষুধ? আমি একজনের কথা জানি। পাটনা থেকে কি একটা ওষুধ এনে খাওয়ানোতে সে ভাল হয়ে গিয়েছে।

মেনকার মা। আচ্ছা, ব'লে দেখব।

(মেনকা তীব্র নৈরাশ্যের স্বরে হঠাৎ বলিয়া উঠিল)

মেনকা। আর ওষুধ-বিষুধ খাইয়ে কি হবে মা?

মেনকার মা। কেন?

মেনকা। ওষুধ খেয়ে ভাল হয়ে যা দেখবে, তার চাইতে ওর পাগল হয়ে থাকাই ভাল নয় কি?

মেনকার মা। সে তো ঠিক কথা মা। তবু, পাগল। ভাবতেই যে কি রকম লাগে!

মেনকা। যদি কোন দিন ওর জ্ঞান ফিরে আসে, তাহ'লে স্বামীর এই কাজ দেখে সেই মুহূর্ত্তেই ও আবার পাগল হয়ে যাবে না?

বড়বৌ। স্বামীর আর দোষ কি? মানুষ কি কখনও...

মেনকা। 'মানুষ' ব'লে কি বলছ বৌদি! বল 'পুরুষ-মানুষ।' এ অবস্থায় মেয়ে-মানুষ কি কখনও এই রকম আচরণ করতে পারতো?

বড়বৌ। আচ্ছা হ'ল 'পুরুষ মানুষ।' পুরুষ-মানুষকে সংসারধর্ম্ম করতে হবে, বংশরক্ষা করতে হবে,—

মেনকা। আর 'ভালবাসা' 'একনিষ্ঠতা' 'স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য' এগুলো কি সব কথার কথা! এত দিন যার সঙ্গে একপ্রাণ একমন হয়ে ঘর করেছিল, আজ একটু মায়াও হয় না তার ওপরে?

মেনকার মা। মেনকা, হয়েছে, থাম্। আর এ-সব কথায় কাজ নেই।

মেনকা। না মা, আমার ভারী অসহ্য ঠেকছে। আসবার সময় অতটা ভেবে দেখি নি। এখন চোখে দেখে আমার মনটা যে কেমন ক'রে উঠছে তা আমি বলতেই পারছি নে। এদিকে এই পাগলের বুকফাটা কান্না আর ওদিকে তার স্বামীর বিয়ের আয়োজন! আমার আর এক মুহূর্ত্তও এ বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করছে না।

ছোট-বৌ। তোমার কথা আমি মানি ভাই। তুমি যেমন বলছ—ঐ পাগল স্ত্রীকে নিয়েই চিরজীবন কাটিয়ে দেওয়া—সেইটেই নিশ্চয় আদর্শ লোকের কাজ। কিন্তু সে-আদর্শ মেনে চলতে পারে কয়জন ভাই?

মেনকা। ইনি না উচ্চশিক্ষিত! সমাজে দশ জনের এক জন! আদর্শ বললেও বেশী বলা হয় না। তবে এঁর এ আদর্শচ্যুতিকে সবাই কেন নিন্দে করছে না? কেন সবাই মেনে নিচ্ছে যে, যা হচ্চে এ-ই ঠিক এবং স্বাভাবিক?

মেনকার মা। আঃ মেনকা, চুপ কর্ বলছি।

[জাহ্নবীর প্রবেশ]

জাহ্নবী। এবারে তোমাদের আসতে হবে মা।

ছোটবৌ। আচ্ছা, আপনার এ বৌ যদি সেরে ওঠে তাহ'লে কি হবে?

জাহ্নবী। আহা, ভগবান যদি সেই দয়াই করেন, তাহ'লে দুজনে মিলে-মিশেই ঘরকন্না করবে। কিন্তু সে আশা আর নেই মা। ডাক্তাররা বলেছে এ রোগ জীবনেও সারবার নয়।

মেনকা। ডাক্তাররা তো সবই জানে!

মেনকার মা। আঃ মেনকা!

জাহ্নবী। সে কথা ঠিক মা। ডাক্তারদের কি আর ভুল হয় না। এক ভগবান ছাড়া আর সর্ব্বজ্ঞ কে আছে? তবু দেখ সাংসারিক-হিসাবে কাজ করতে গেলে ডাক্তারদের কথা মেনেই তো চলতে হয়।

মেনকা। তবে যে শুনেছিলাম অনেকদিন আগে একবার জ্ঞান হয়েছিল।

জাহ্নবী। হ্যাঁ, কিন্তু সে মোটে কয়েক ঘণ্টা ছিল। ডাক্তাররা তাও বলেছে—কালেভদ্রে হয়ত অল্প সময়ের জন্যে জ্ঞান হ'তে পারে, কিন্তু একেবারে সারবে না কিছুতেই।...আর দেরি করো না মা তোমরা, সময় হয়ে এসেছে।

[ডানদিকের দরজা দিয়া সকলের প্রস্থান। মেনকা সকলের শেষে যাইতেছিল, এমন সময় বাঁ দিকের দরজা দিয়া মালতী চুপি চুপি আসিয়া তাহার আঁচল ধরিয়া টানিয়া রাখিল ও তারপর একপাশে লইয়া গিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল—]

মালতী। আমার বরকে যে দেখতে চেয়েছিলি দেখবি?

মেনকা। কোথায়?

মালতী। বাইরের ঘরে বসে আছে। পাশের কুঠুরীর দরজার ফাঁক দিয়ে আমরা দেখতে পাব এখন।

মেনকা। না ভাই, বাড়িতে সব লোকজন। কেউ দেখতে পেলে কি মনে করবে?

মালতী। কেউ দেখতে পাবে না, ভয় নেই। সবা ছাতে চলে গিয়েছে।

মেনকা। না ভাই, আজ ভাল লাগছে না। আজ থাক।

মালতী। ও, এখন বুঝি নিজের বরের ভাবনা ভাবছিস—তাই অন্তের বর দেখতে ভাল লাগছে না!

মেনকা। দূর! আমি বিয়েই করব না, তার আবার বরের ভাবনা।

মালতী। ঈস, বিয়েই করবে না!

মেনকা। নিশ্চয়ই না। দেখিস তুই। আমি লেখাপড়া শিখে নিজের মত রোজগার ক'রে স্বাধীনভাবে থাকব।

মালতী। ঈস, দেখা যাবে লো দেখা যাবে। মনের মতন মানুষ পেলে এ সঙ্কল্প ক'দিন ঠিক থাকবে?

মেনকা। (বিষণ্ণ স্বরে) মনের মতন মানুষ কদিন মনের মতন থাকে ভাই? সংসারের ভাবগতিক দেখে বিয়ের ওপরে আমার ঘেন্না ধরে গিয়েছে।

মালতী। তুই কথায় কথায় অমন গম্ভীর হয়ে যাস্ কেন বল্ তো ভাই?

মেনকা। না না, গম্ভীর আবার কোথায়?

মালতী। তুই বোধ হয় দাদার কথা ভেবে এ কথা বলছিস। কিন্তু দাদা তো ভাই বিয়ে করতে চায়ই নি। বৌদির এ অবস্থা হবার পর থেকে কত ভাল ভাল সম্বন্ধ এসেছিল কিন্তু দাদা রাজী হয় নি। শেষটায় মা যখন কিছুতেই ছাড়লেন না…

মেনকা। না না, ও কথা আমি এমনিই বলেছি। চল্, ওপরে যাই।

মালতী। না ভাই, এখন ওপরে যাব না, কতদিন পর তোর সঙ্গে দেখা, আয় না একটু গল্প করি।

মেনকা। গল্প আর কি করব! তুই একটা গান কর না—অনেক দিন তোর গান শুনি নি।

মালতী। ওদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি যে। শুনতে পেলে কি বলবে।

মেনকা। তাহ'লে থাক, কাজ নেই। গল্পই করা যাক। তোর নতুন বৌদি দেখতে কেমন বল্।

মালতী। বেশ সুন্দর। তবে এ-বৌদির মত নয়।

মেনকা। তুই দেখেছিস?

মালতী। না, তবে ফটো দেখেছি, ভালই।

মেনকা। কই ফটো? আছে এখানে?

মালতী। কি জানি, দাদা কোথায় রেখেছে। আচ্ছা, খুঁজে দেখছি।

[মালতী দেরাজগুলি টানিয়া খুলিতে খুলিতে একটার মধ্যে ফটো পাওয়া গেল]

এই যে পেয়েছি।

[আনিয়া মেনকার হাতে দিল। মেনকা নিবিষ্টভাবে দেখিতে লাগিল।]

মেনকা। চেহারাটা তো ভালই বোধ হচ্ছে। তবে ফটোতে অবিশ্যি ঠিক বোঝা যায় না।

মালতী। চেহারা যেমনই হোক, দাদা বলেন যে, ওর মনটা ভারী ভাল। আর খুব বুদ্ধি। চোখ দুটো কেমন উজ্জ্বল দেখেছিস্? ঠিক তোর মত।

মেনকা। আর আঙুলগুলো দেখেছিস্, যেন চাঁপার কলি। ঠিক তোর মত।

মালতী। (আঙুল দিয়া মেনকার গালে আঘাত করিল) ঈস্, আর নিজের আঙুলগুলো যেন কিছু নয়।

মেনকা। (আবার ফটো দেখিতে দেখিতে) তাহ'লে দেখছি শুধু মায়ের অনুরোধই তোর দাদার রাজী হবার সবটা কারণ নয়।

['মালতী,' 'মালতী,' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে জাহ্নবী আসিলেন]

জাহ্নবী। ওমা, তুই এখানে? যা ওপরে, সবাই তোদের জন্যে বসে আছে। মিত্তিরদের ছোটবৌয়ের সঙ্গে তুই না জোড়-এয়ো হবি বলেছিলি।

মালতী। হ্যাঁ, এই যে যাই মা। আয় মেনকা।

মেনকা। তুই যা, আমি পরে আসচি।

[মালতী চলিয়া গেল। মেনকা বসিয়া আছে দেখিয়া জাহ্নবী বলিলেন]

জাহ্নবী। তুমিও যাও মা, সুধাকে ডেকে পাঠিয়েছি, সে এখনি এ ঘরে আসবে।

মেনকা। হ্যাঁ যাই, কিন্তু আমি আর ওপরে যাব না জ্যাঠাইমা। আমার বড্ড মাথা ধরেছে—আমি বাড়ি চললুম।

[ফটোখানি সোফার একপাশে রাখিল]

জাহ্নবী। মাথা ধরেছে? গরমে বোধ হয়। তাহ'লে এখন আর গিয়ে কাজ নেই। তুমি আমার ঘরে

গিয়ে শোও গে। মালতীকে ডেকে দিচ্ছি, একটু মাথায় বাতাস দিক।

মেনকা। না না, আপনি ব্যস্ত হবেন না। ও বিশেষ কিছু নয়। এইটুকু রাস্তা অনায়াসেই চলে যেতে পারব।

জাহ্নবী। তাহ'লে মালতীকে একটু ব'লে যেয়ো। নইলে সে দুঃখিত হবে।

মেনকা। আপনিই বলবেন জ্যাঠাইমা। আমি বলতে গেলে সে আর আমাকে ছাড়তে চাইবে না।

(মেনকার মনের ভাব বুঝিয়া একটু আঘাত পাইলেন—মৃদুস্বরে বলিলেন)

জাহ্নবী। আচ্ছা।

মেনকা। আমি আসি তাহ'লে। মা'কেও বলবেন।

[মেনকা বাঁ-দিকের দরজার দিকে যাইতেছিল এমন সময় সেই দরজা দিয়া সুধাংশু প্রবেশ করিল। মেনকা ফিরিয়া মাঝের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। সুধাংশু দরজার কাছে একটু দাঁড়াইয়া মেনকা চলিয়া গেলে পর ভিতরে আসিল]

সুধাংশু। আমাকে ডেকেছ মা?

জাহ্নবী। হ্যাঁ, এইবার তৈরি হয়ে নাও। একটু সকাল সকালই বেরিয়ে পড়তে হবে। স্ত্রী-আচার-টি-আচার সব আছে তো।

সুধাংশু। আচ্ছা।

জাহ্নবী। তোর সঙ্গে যে যে যাবে তারা এসেছে?

সুধাংশু। বেশী তো কেউ নয়। জন-তিনেক বন্ধু। তাদের আরও আধ ঘণ্টাটাক পর আসতে বলেছি। আর সতীশ যখন এসে পড়েছে তখন সেও যাবে। ওর ভাই তো আজকে ভালই আছে।

জাহ্নবী। গাড়ী আনা হয়েছে?

সুধাংশু। এত আগেই কেন? বেরোবার একটু আগে মোড় থেকে একখানা ট্যাক্সি ডেকে আনলেই হবে।

জাহ্নবী। আজ রাত্তিরে তো তোর ফেরা হবে না। তা তুই কিছু ভাবিস্ নে। সরোজকে বলেছি, সে রাত্তিরটা এখানেই থাকবে। আর উপেনও তো রইল।

সুধাংশু। মেয়েরা যাঁরা এসেছেন তাঁদের একটু জল খাইয়ে দেবে তো?

জাহ্নবী। হ্যাঁ, তা দেবো বইকি। সে-সব ব্যবস্থা আমি ঠিক ক'রে রেখেছি।

[চলিয়া যাইতেছিলেন—সুধাংশু ডাকিল]

সুধাংশু। মা,...ও এখন কি করছে মা? অনেকক্ষণ কোন সাড়াশব্দ পাইনি যেন।

জাহ্নবী। হ্যাঁ, তাই আমি দেখতে গিয়েছিলাম। দেখি ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুধাংশু। ঘুমিয়ে পড়েছে?...বল কি! এ সময়ে তো ও কক্ষণো ঘুমোয় না।

জাহ্নবী। এ সময় কেন, কোন সময়ই ও এমন শান্ত-ভাবে ঘুমোয় না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তো বিড়-বিড় ক'রে বকে আর মাঝে মাঝে চমকে চমকে ওঠে। কিন্তু এখন গিয়ে দেখি, অঘোরে ঘুমুচ্ছে—যেন সে মানুষই নয়।

সুধাংশু। ভগবান রক্ষে করেছেন।

জাহ্নবী। হ্যাঁ, আমার ভারী ভয় ছিল, আজ শুভ-কাজের সময় না-জানি কি ক'রে বসে। ভগবানের দয়া!

সুধাংশু। আজ না-কি কিছু খাওয়া হয় নি?

জাহ্নবী। নাঃ, আজ সারাদিনের মধ্যে একটি দানাও পেটে যায় নি। তার ওপর ঐ রকম চীৎকার—তাই বোধ হয় ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। এখন ভগবানের দয়ায় আর একটুক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে তাহ'লেই মঙ্গল।

সুধাংশু। আচ্ছা মা, তুমি যাও, আমি আসছি।

জাহ্নবী। বেশী দেরি করিস্‌নে যেন।

[সুধাংশু বাঁ-দিকের ঘরে চলিয়া গেল। জাহ্নবী বাহিরে যাইতেছে এমন সময় বামা আসিল]

বামা। মা, সরকার-মশাই বললেন, ময়রার দোকান থেকে মিষ্টিগুলো এসেছে।

জাহ্নবী। আচ্ছা, ভাঁড়ার-ঘরে রেখে দিগে যা।

বামা। তাহ'লে ভাঁড়ারের চাবীটে দিন।

জাহ্নবী। (আঁচল খুঁজিয়া) ও, চাবী তো তোরই কাছে।

বামা। (নিজের আঁচল দেখিয়া) ওমা, তাই তো

(প্রস্থানোদ্যত)

জাহ্নবী। সব ভাল ক'রে ঢেকে রাখিস্, বুঝলি?

বামা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সে আর আমাকে বলতে হবে না।

[ঝামা চলিয়া গেল। মালতী ঘরে আসিয়া সরোজিনীর আনা আলপনা-দেওয়া পিঁড়িখানি লইয়া যাইবে এমন সময় দেয়ালে একখানি ছবির দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল]

মালতী। মা, দাদা-বৌদির এ ছবিখানা তুলে রাখি ?

জাহ্নবী। (একটু ভাবিয়া) রাখ।

[মালতী পিঁড়ি রাখিল। ছবিখানি খুলিয়া লইয়া দেরাজে রাখিতে যাইবে এমন সময় জাহ্নবী বলিয়া উঠিলেন]

না না, মালতী, তুলে রেখে কাজ নেই। ও যেমন ছিল তেমনিই থাক।

[মালতী ছবিটি আবার দেয়ালে টাঙাইয়া রাখিল। উভয়ের প্রস্থান।...ধীরে ধীরে ঘরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।... নীচের তলায় বাহিরের দিক হইতে শানাই বাজিয়া উঠিল।...মালতী ঘরে আসিয়া অন্ধকার দেখিয়া সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিল ও ঘর হইতে টোপর ইত্যাদি বিবাহের আনুষঙ্গিক কয়েকটি জিনিষ লইয়া গেল।... শানাই অল্পক্ষণ বাজিবার পর সুধাংশু অর্দ্ধপরিহিত সজ্জায় বাঁ-দিকের ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া ডানদিকের গোল বারান্দায় গেল ও চীৎকার করিয়া বলিল]

সুধাংশু। এই···বন্ধ কর, বন্ধ কর···এখনি বন্ধ কর।

[শানাই থামিয়া গেল—সুধাংশু ঘরে আসিল]

(ডাকিয়া) মা, মা।

[মালতীর প্রবেশ]

মালতী। মাকে ডাকছ কেন দাদা ? মা ওপরে।

সুধাংশু। ঐ শানাইওয়ালাদের আনিয়েছে কে রে ?

মালতী। আমি আনিয়েছি। আসবার সময় ওদের আড্ডায় খবর দিয়ে এসেছিলাম।

সুধাংশু। এ কথা আগে বলিস্ নি কেন ?

মালতী। (হাসিয়া) হঠাৎ বাজনা শুনিয়ে সবাইকে আশ্চর্য্য ক'রে দেব, সেইজন্যে বলি নি।

সুধাংশু। বেশ করেছিলে। এখন যাও, এখনি ওদের বিদেয় ক'রে এস।

মালতী। সে কি দাদা ?

সুধাংশু। (সরোষে) তোর যত বয়েস হচ্ছে তত বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পাচ্ছে। দিন-দিন বড় হচ্ছিস্, না ছোট হচ্ছিস্ ? যা, শীগ্‌গীর ওদের বিদেয় করগে যা।

[মালতী অভিমানে মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল]

শুনতে পাচ্ছিস্, যা শীগ্‌গীর (মালতী তবু নড়ে না) ··(একটু নরম সুরে) যা, লক্ষ্মীটি, যা বললুম, করগে।··· রাগ করিস্ নে বোন্, হঠাৎ কেমন রাগটা হয়ে পড়ল। কিছু মনে করিস্ নে।······তোর আর কি দোষ, তুই তো ভাল ভেবেই করেছিলি। দোষ তোর বুদ্ধির।

মালতী। (রাগিয়া) দোষ আমার বুদ্ধির ! কি আমার বুদ্ধির দোষ শুনি ? লোকের বিয়েতে বাজনা বাজে না ?

সুধাংশু। ওরে, লোকের বিয়ে আর আমার বিয়েতে অনেক তফাৎ।

মালতী। তফাৎ আবার কি ? বিয়ে বিয়েই। হিন্দুর বিয়ে বাজনা ছাড়া হয় ?

সুধাংশু। আচ্ছা বেশ, ঐ তো বাজনা হ'ল, এখন ওদের বিদেয় করগে ভাই লক্ষ্মী'টি।···দেখ, আর কিছু না-হোক, ও সারাদিনের পর একটু ঘুমিয়েছে, জানিস্ তো। এখন যদি বাজনার শব্দে জেগে ওঠে তাহ'লে কি মুস্কিল হবে বল্ তো।

মালতী। আচ্ছা বেশ। আমি ওদের এখন বন্ধ রাখতে বলছি। কেবল বর বেরুবার সময় একবার বাজাবে।

সুধাংশু। ওরে না না, ওদের একেবারে যেতে বল। নইলে—

মালতী। আচ্ছা, আচ্ছা, তাই বলছি গিয়ে।

(গলার স্বরে বোঝা গেল মিথ্যা কথা)

[মালতীর প্রস্থান। সুধাংশু কাপড়ের কোঁচা ঠিক করিয়া পরিল। জামার বোতাম লাগানো, চাদর গায়ে দেওয়া ইত্যাদি সজ্জা সমাপ্ত করিল। তারপর ডানদিকের আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া মাথায় চিরুণী চালাইতে লাগিল।

পিছনে বাঁ-দিকের পর্দ্দা সরাইয়া মৃণালিনী ঘরে আসিল। বয়স বাইশ-তেইশ, রোগা শরীর—একখানা আধ-ময়লা মিলের শাড়ী পরিয়া আছে। মাথার চুল এলোমেলো—আর কোন অস্বাভাবিকতা নাই। মৃণালিনী ঘরে ঢুকিয়া সহজভাবে কি যেন খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। টিপয়ের উপর, আলমারীর উপর, বইয়ের পিছনে দেখিয়া একটি দেরাজ টানিয়া খুলিল। শব্দে সুধাংশু চমকিয়া ফিরিয়া যাহা দেখিল তাহাতে সে স্তম্ভিত হইয়া দুই পা পিছাইয়া একটু আড়ালে যাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সেখানে কোন আড়াল নাই। আরও দু-একটা দেরাজ খুলিবার পর মৃণালিনী সুধাংশুকে দেখিতে পাইল—খুব সহজস্বরে বলিল]

মৃণালিনী। ওগো, আমার চুলের ফিতে-কাঁটা খুঁজে পাচ্ছিনে। তুমি দেখেছ ?

[সুধাংশু মাথা নাড়িয়া জানাইল "না।" মৃণালিনীর খোঁজা চলিতে লাগিল]

তুমি তো বেশ মানুষ! আমি নীচের ঘরে অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তা আমাকে একবার ডেকেও দাও নি।

[সুধাংশু এইবার প্রকৃত অবস্থাটার যেন একটু আভাস পাইল। কিন্তু তাগতে সে আরও বেশী স্তম্ভিত হইয়া কি বলিবে খুঁজিয়া পাইল না]

মৃণালিনী। এই যে পেয়েছি।

(চুলের ফিতা-কাটা লইয়া সুধাংশুর কাছে আয়নার দিকে আগাইয়া আসিল)

...দেখ, আমি ঘুম থেকে উঠে দেখি, ঘরের বাইরে থেকে কে শেকল লাগিয়ে দিয়েছে। তুমি নাকি?

সুধাংশু। (কলের পুতুলের মত) হঁ্যা।

মৃণালিনী। কেন? আমাকে জব্দ করবে ভেবেছিলে? এখন কে জব্দ হ'ল? (হাসি)...আমি কি ক'রে বেরিয়ে এলাম জান?

সুধাংশু। (পূর্ব্ববৎ) না।

মৃণালিনী। কি বোকা! ও-ঘরের শেকলটা যে ভেতর থেকে হাত গলিয়ে খোলা যায়, তা জানতে না?... কেমন জব্দ!......সর, আমি চুলটা ফস্ ক'রে জড়িয়ে নিই। বেলা একেবারে গেছে, এখন আর বিনুনি-খোঁপা করবার সময় নেই। সব কাজ পড়ে আছে।

[সুধাংশু সরিয়া নিকটে সোফায় বসিয়া স্তম্ভিতভাবে দেখিতে লাগিল। তাহার চিন্তা করিবার শক্তি যেন লোপ পাইয়াছে। মৃণালিনী আয়নার নিকটে গেল। আয়নায় মুখ দেখিয়া—]

মৃণালিনী। ওমা! আজ আমায় ধরেছে কিসে! চান করে উঠে সিঁথেয় একটু সিঁদুরও দিই নি!

[কৌটা বাহির করিয়া সিঁদুর পরিল। তারপর চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে কথা বলিতে লাগিল]

দেখ, ঘুমের ভেতর আবছায়ার মত একটা যেন শানায়ের বাজনা কানে আস্‌ছিল। তুমি শুনেছ?

সুধাংশু। হঁ্যা।

মৃণালিনী। কাছে কোথাও বিয়ে-টিয়ে আছে বোধ হয়, তাই না?

সুধাংশু। তা হবে।

মৃণালিনী। সুরটা ভারী মিষ্টি। আমার ভারী সুন্দর লাগছিল। শুনতে শুনতে আমাদের বিয়ের দিনের কথা সব মনে পড়ে যাচ্ছিল। আরও কতদিনকার কত সুখের স্মৃতি যেন বাঁশীর সুরে ভেসে আসছিল।

... (হঠাৎ ফিরিয়া) আমার কথা শুনে তুমি হাসচ না কি?

সুধাংশু। না, কই! হাসব কেন?

মৃণালিনী। ভাবছ না তো যে বুড়োবয়সে আবার এত কবিত্ব!

সুধাংশু। না, তা ভাবছি নে।

[মৃণালিনী আবার আয়নার দিকে ফিরিল। মালতী হঠাৎ ঘরে আসিয়াই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। মৃণালিনীর অগোচরে সুধাংশু তাহাকে হাতের ইসারায় চলিয়া যাইতে বলিল। মালতী বাহিরে গিয়া পর্দ্দার আড়াল হইতে লুকাইয়া দেখিতে লাগিল]

মৃণালিনী। তুমি আজ ভাল ক'রে কথা কইছ না কেন বল তো?

সুধাংশু। না, কই?

মৃণালিনী। হঁ্যা, একটু যেন অন্যমনস্ক আছ।

সুধাংশু। কিসে বুঝলে?

মৃণালিনী। নইলে এতক্ষণ তোমার কাছে খুব বকুনি খেতাম।

সুধাংশু। কেন?

মৃণালিনী। তুমি ময়লা কাপড় পরা যে দেখতে পার না—আর আজ এত ময়লা কাপড় পরে আছি তা এতক্ষণও তোমার চোখে পড়ে নি।

সুধাংশু। (জোর করিয়া স্বাভাবিক ভাব আনিবার চেষ্টা করিল) তাই তো বড্ড ময়লা কাপড় পরে আছ। খুব বকুনি খাবে তুমি।

মৃণালিনী। না গো, আর বকতে হবে না। এই চুলটা বাঁধা হয়ে গেলেই আমি কাপড় ছেড়ে ফেলব।

[চুল-বাঁধা শেষ করিয়া মৃণালিনী বাঁ-দিকের ঘরে গেল]

সুধাংশু। (উঠিয়া, নিম্নস্বরে ডাকিল) মালতী!

[মালতী পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরে আসিল]

মালতী। (উদ্বেগের সহিত) কি হয়েছে দাদা? বৌদি এখানে? এর মানে কি? বৌদি তোমাকে কি বলছিল?

সুধাংশু। চুপ.…শীগগির মাকে ডেকে আন ·না না এখন ডাকতে হবে না, আগে সব কথা বুঝে দেখি।

মালতী। কি হয়েছে বল না, দাদা? বৌদি কি আর পাগল নেই?

সুধাংশু। হ্যাঁ, এখন তো পাগলামীর কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি নে—এমন কি কখনও যে পাগল হয়েছিল তা পর্য্যন্ত ওর মনে নেই।

মালতী। অ্যাঁ, বল কি দাদা! তাহ'লে এখন কি হবে?

সুধাংশু। ভগবান জানেন। তুই শীগগির যা। এখুনি হয়ত ও এসে পড়বে। মাকে সব কথা বলগে যা। কিন্তু সাবধান, আমি না ডাকলে যেন কেউ এ ঘরে না আসে।

[মালতী প্রস্থানোদ্যত]

আর দেখ, ডাক্তারবাবুকে আনতে এক্ষুনি লোক পাঠা। বাড়িতে যদি না থাকেন, যেখানে থাকেন সেইখান থেকে নিয়ে আসবে। আনা চাই-ই, বুঝলি?

[মালতীর প্রস্থান। সুধাংশু তাড়াতাড়ি আবার বসিয়া স্বাভাবিক ভাব দেখাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। একখানা ফর্সা শাড়ী পরিয়া মৃণালিনী প্রবেশ করিল]

মৃণালিনী। (হাসিতে হাসিতে) ওগো, তুমি এমন গোছালো হ'লে কবে থেকে?

সুধাংশু। কেন?

মৃণালিনী। গোছালো হও সে তো ভালই। কিন্তু একটু বুদ্ধিও কি থাকতে নেই! আমার আটপৌরে কাপড়-গুলো পর্য্যন্ত ভাঁজ ক'রে ক'রে বাক্সে তুলে রেখেছ। আমি আলনায় খুঁজে না পেয়ে শেষে বাক্স থেকে বার ক'রে তবে পরি।

[সুধাংশুর পার্শ্বে বসিল]

সুধাংশু। ও, সে তোমাকে একটু জব্দ করবার জন্যে।

মৃণালিনী। তাই না-কি? আচ্ছা বেশ। কাল দেখো, আমিও তোমাকে কেমন জব্দ করি। তোমার কলেজে যাবার পোষাক এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখব যে তুমি কিছুতেই খুঁজে পাবে না। কলেজে যাওয়াও হবে না। সারাটা দুপুর আমার কাছে থাকতে হবে। সেই হবে তোমার উপযুক্ত শাস্তি, তাই না?

সুধাংশু। হ্যাঁ।

মৃণালিনী। (কৌতুকের ফাঁদ পাতিয়া) সেই হবে তোমার উপযুক্ত শাস্তি?

সুধাংশু। (অন্যমনস্কভাবে) হ্যাঁ।

মৃণালিনী। (কপট অভিমানে) কি আমার কাছে থাকাটা তোমার শাস্তি! আচ্ছা বেশ।

[মুখ ফিরাইয়া বসিল]

সুধাংশু। ও, না না, আমি ভুল ক'রে বলেছি।

[সুধাংশু মৃণালিনীর হাত ধরিয়া তাহাকে ফিরাইতে গেল। কপট অভিমানে হাত ছাড়াইয়া মৃণালিনী দূরে আর একটা সোফায় গিয়া বসিল। সুধাংশু উঠিয়া ধীরে ধীরে তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইল। মৃণালিনী মুখ ফিরাইয়াই রহিল]

সুধাংশু। ওগো…শুনছ…দেখ…ওগো!…

মৃণালিনী। (মুখ না ফিরাইয়া) ওকি ডাকের ছিরি! আমার কি নাম নেই না-কি?

সুধাংশু। মৃ—মিনি…

মৃণালিনী। উঁহু, ও রকম কাঠখোট্টার মত ডাকলে হবে না।

সুধাংশু। (আদর করিয়া) মিনি…

মৃণালিনী। (সুধাংশুর অলক্ষ্যে হাসিয়া) তোমার অপরাধ গুরুতর। সব কটা নাম বলা চাই, নইলে রাগ যাবে না।

সুধাংশু। মৃণালিনী, মৃণাল, মিনি, লিনি…

মৃণালিনী। আরও একটা বাকী থাকল।

সুধাংশু। মালিনী!

[ফিরিয়া বসিয়া সুধাংশুর হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে পাশে বসাইল]

মৃণালিনী। কি গো, কেন গো, কি বলছ গো?

সুধাংশু। আমার ওপর আর রাগ নেই তো?

মৃণালিনী। কি বোকা তুমি! আমি কি সত্যি সত্যি রাগ করেছি না-কি। ও শুধু একটু আদর পাবার জন্যে।…আচ্ছা, এখন তাহ'লে ছেড়ে দাও লক্ষ্মীটি। অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।

[উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিল]

দেখ, আজ আমার মাথার ভেতরে থেকে-থেকে যেন কেমন ক'রে উঠছে। মনে হচ্ছে যেন দাঁড়াতেই পারছি নে।

সুধাংশু। [ব্যস্ত হইয়া] তাহ'লে তুমি ব'সো। এখন গিয়ে কাজ নেই।

মৃণালিনী। ও কিছু নয়, এক্ষুনি সেরে যাবে।

সুধাংশু। তা হোক। তবু আমি এখন তোমাকে যেতে দেব না।

[সুধাংশু মৃণালিনীকে টানিয়া বসাইল। পর্দার আড়ালে মেয়েরা ভিড় করিয়া উঁকিঝুঁকি দিতেছে দেখা গেল। সুধাংশু সরোষ কটাক্ষে চাহিয়া হাতের ইসারায় তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলিল। মেয়েরা সরিয়া গেল]

মৃণালিনী। কি পাগল! বসে থাকলে আমার কাজ-গুলো ক'রে দেবে কে?

(সুধাংশু অনুসন্ধানের এই সূত্র অবলম্বন করিয়া)

সুধাংশু। তুমি কি খুব কাজ কর না-কি?

মৃণালিনী। করি না! আমি বুঝি অমনি অমনি ব'সে খাই?

সুধাংশু। ঈস্ ভারী তো কাজ কর! আচ্ছা, বল দেখি, আজ সকাল থেকে কি কি কাজ করেছ?

মৃণালিনী। আচ্ছা শোন। আজ সকাল থেকে··· সকাল থেকে···(স্মরণ করিবার জন্য একটুক্ষণ বৃথা চেষ্টা করিল]···কত কাজ করেছি, অত কি মনে থাকে? কাজ না করলে কি শুধু শুধু তুমি আমাকে খেতে দিচ্ছ।

সুধাংশু। আচ্ছা, তবু দুটো-একটা বলই না শুনি।

মৃণালিনী। আচ্ছা বলছি।···(ভাবিয়া) ভারী মজা তো, একটাও মনে পড়ছে না।

সুধাংশু। আচ্ছা, আজ না হোক কাল। কাল কি কাজ করেছ বল তো?

মৃণালিনী। (চিন্তা করিয়া) নাঃ, কালকের কথাও কিছু মনে পড়ছে না।

সুধাংশু। তাহ'লে পরশু,···কিংবা তারও আগে?

মৃণালিনী। নাঃ, আমার মাথার মধ্যে কেমন করছে। সব যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে; কিচ্ছু মনে পড়ছে না। অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েই আমার এই দশা হ'ল।···যাই, একটু ঘুরে-ফিরে আসিগে—তাহ'লেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

[উঠিতেই নমিতার ফটোখানা সোফার উপর হইতে মেঝেতে পড়িয়া গেল। মৃণালিনী ফটোখানি তুলিয়া লইয়া দেখিতে লাগিল।]

মৃণালিনী। বাঃ, বেশ তো মেয়েটি। এ ফটো তুমি কোথায় পেলে?··· [সুধাংশু নিরুত্তর]··· মেয়েটি কে গা? ভারী সুন্দর তো দেখতে।

সুধাংশু। ও ইউনিভার্সিটির হরেনবাবুর মেয়ে।

মৃণালিনী। এ ফটো তুমি কি ক'রে পেলে?

সুধাংশু। (ইতস্তত করিয়া) ও, ওখানা বাঁধিয়ে দেবার জন্যে হরেনবাবু আমাকে দিয়েছিলেন।

মৃণালিনী। আর তুমি এমনি ক'রে যেখানে-সেখানে ফেলে রেখেছ! বেশ মানুষ! তুলে রাখি। পরের জিনিষ।

[উঠিয়া গিয়া ডানদিকের টিপয়ের উপর ফুলদানীর গায়ের সঙ্গে দাঁড় করাইয়া রাখিল। আবার তুলিয়া দেখিতে লাগিল]

বেশ মেয়েটি। বিয়ে হয় নি?

সুধাংশু। না।

মৃণালিনী। ওদের বাড়িতে আমাকে একদিন নিয়ে যেয়ো।

[ফটো রাখিয়া দিল। ফিরিতেই আর একটি টিপয়ের উপর মালতীর আনা মালা ও ফুল চোখে পড়িল। মালাটি হাতে তুলিয়া লইল]

ওমা, এ কিগো! এই মালা, এত ফুল, এ সব আনিয়েছ কেন?···কোন পূজো-টুজো না-কি?

সুধাংশু। (আশ্বস্ত হইয়া) হ্যাঁ।

মৃণালিনী। ওমা, তাই তো, আজ যে পূজো তা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। [মালা হাতে লইয়া সুধাংশুর কাছে আসিল] তাই তো, এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি। ফিটফাট্ কাপড়-চোপড়, গায়ে এসেন্সের গন্ধ ভুর-ভুর করছে—আজ বচ্ছরকার দিন ব'লে সাজগোজ করেছ বুঝি, তাই না?

[সুধাংশু মাথা নাড়িয়া জানাইল "হ্যাঁ"]

তাহ'লে আমিও যাই—বচ্ছরকার দিনে ভাল কাপড় পরতে হয়। কাপড়টা বদলে আসি গে। তারপর আমাকে পূজো দেখাতে নিয়ে যেয়ো, কেমন?

[মালা সুধাংশুর পাশে সোফার হাতার উপর রাখিল]

সুধাংশু। আচ্ছা।

মৃণালিনী। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) কোন্ শাড়ীটা পরব বল তো?

সুধাংশু। যেটা তোমার পছন্দ হয়, সেইটে পরে এসো।

মৃণালিনী। না না, তুমি বল না গো। সেই ছাপ-দেওয়া সিল্কেরটা?

সুধাংশু। হ্যাঁ।

মৃণালিনী।—না, সেই খয়েরীটা?

সুধাংশু। হ্যাঁ।

মৃণালিনী। বেশ। এও হ্যাঁ, ও-ও হ্যাঁ। তোমাকে তবে জিজ্ঞেস্ করছি কি করতে?

সুধাংশু। তাহ'লে ঐ খয়েরীটাই পরে এসো।

মৃণালিনী। আচ্ছা বেশ। আমি ভাল কাপড় পরে এসে তারপর তোমাকে মালা পরিয়ে দেব।

[বাঁ-দিকের ঘরে চলিয়া গেল। জাহ্নবী, সরোজিনী ও মালতীর প্রবেশ]

জাহ্নবী। সুধা, কি হয়েছে? বৌমা কি…

সুধাংশু। বলছি। ডাক্তারবাবুকে কি ডাকতে পাঠিয়েছ?

জাহ্নবী। পাঠিয়েছি। বৌমা কি আর পাগল নেই?

সুধাংশু। এখন তো ঠিক আগের মত। কিছু অস্বাভাবিক নেই। কেবল স্মরণশক্তিটা লোপ হয়ে গিয়েছে। পাগল যে হয়েছিল সে কথা পর্য্যন্ত ওর মনে নেই।

জাহ্নবী। এখন কি হবে বাবা?

সুধাংশু। ভগবান জানেন মা। আমার ভাববার শক্তি লোপ পেয়েছে।

সরোজিনী। এদিকে হরেনবাবুরা হয় তো দেরি দেখে কত ব্যস্ত হচ্ছেন। তার কি করা যায় সুধা?

সুধাংশু। মাসীমা, ও-সব কথা এখন একেবারে বন্ধ করুন।

সরোজিনী। বলিস্ কি? তারা সমস্ত আয়োজন ক'রে বসে আছে—একটা খবর তো দিতে হয়।

সুধাংশু। মা, তাহ'লে একটা লোক দিয়ে বলে পাঠাও যে, আজকে তো আর আমি যেতে পারছি নে।

সরোজিনী। ওমা, বলিস্ কি তুই? তাও কি হয়!

সুধাংশু। হতেই হবে। উপায় কি?

সরোজিনী। ওমা, মেয়ের যে গায়েহলুদ হয়ে গিয়েছে। তাঁদেরও তো সমাজ আছে, সম্ভ্রম আছে।

সুধাংশু। কি করব মাসীমা? এই অবস্থায়, এই রকম মানুষকে ঘরে ফেলে রেখে কি আপনি আমায় যেতে বলেন?

জাহ্নবী। দীনবন্ধু, মধুসূদন, এ কি পরীক্ষায় তুমি আমায় ফেললে প্রভু!

সুধাংশু। মা, আর দেরি করো না। ও হয়ত এখনি এসে পড়বে। তোমরা শীগ্‌গীর যাও।

সরোজিনী। তাহ'লে কি উপায় হবে বাবা?

জাহ্নবী। উপায় ভগবান, বোন্। এ সমস্যার সৃষ্টি যিনি করেছেন, মীমাংসার ভারও তাঁর ওপরে দাও। আমরা ভেবে আর কি করব!

মালতী। দাদা, আমি যে আর থাকতেই পারছি নে। ছুটে গিয়ে বৌদির গলা জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে।

সুধাংশু। না না, খবরদার। এখন যেন কিছুতেই ও তোকে দেখতে না পায়। হঠাৎ দেখলে না জানি কি মনে করবে। কত রকম সন্দেহ মনে জাগতে পারে।… আর মা, ওঁদেরও বলে দাও পর্দার আড়াল থেকে যেন উঁকিঝুঁকি না দেন। হঠাৎ যদি দেখে ফেলে!

জাহ্নবী। আচ্ছা, আমি ওদের বলছি, সবাই ওপরে গিয়ে বসুক।

সুধাংশু। ঐ আসচে বুঝি। যাও, শীগগীর যাও।

[জাহ্নবী, সরোজিনী ও মালতী চলিয়া গেল। খয়েরী রঙের শাড়ী ও কয়েকটি গহনা পরিয়া বিষণ্ণ ও চিন্তিত মুখে মৃণালিনী আসিল]

মৃণালিনী। দেখ, ও-ঘরে একা একা হঠাৎ আমার কেমন যেন ভয় ক'রে উঠল। এত ভাবি, সন্ধ্যেরাত্তিরে আবার ভয় কি? তবু ভয় করে।

[সুধাংশুর পাশে বসিল]

সুধাংশু। না, ভয় কিসের। এই তো আমি রয়েছি।

মৃণালিনী। না, সে রকম ভয় নয়।… এ যেন কি…

কী যেন বিপদ। (আকুল স্বরে) ওগো, আজ আমার সব ভুল হয়ে গেল কেন ?

সুধাংশু। ও কিছু নয় মিনি। রাত্তিরটা ঘুমুলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

মৃণালিনী। না গো না। আমি এতক্ষণ ভাবতে চেষ্টা করছিলাম। আবছায়ার মত আমার যেন কি সব মনে আসছিল। কি অন্ধকার···কি যন্ত্রণা ভাবতেই যেন গা শিউরে ওঠে।···কি যেন···কোথায় যেন···দেখ, আমার কি খুব অসুখ করেছিল ?

সুধাংশু। (বিবর্ণ মুখে ধীরে মাথা নাড়িল) হাঁ্যা।

মৃণালিনী। কি অসুখ ?

সুধাংশু। এই নানারকম অসুখ।

মৃণালিনী। কতদিন ?

সুধাংশু। অনেক দিন।

মৃণালিনী। তবে তো আমি ঠিকই ভেবেছি।

[বলিতে বলিতে মৃণালিনী ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিল]

শুধু তাই নয়। এ ঘরে যেন আমি কতদিন ছিলাম না। কোথায় যেন···অনেক দূরে···সব নির্জ্জন···চারদিক আঁধার···তুমি কাছে নেই···

সুধাংশু। মিনি, মিনি, ও-সব কথা এখন থাক। সব ভুলে যাও। ভুলেই তো গিয়েছিলে, আবার কেন মনে করছ ?

মৃণালিনী। উঃ, সে কি বিভীষিকা—দিনরাত, দিনরাত—কার কাছে যাব, কাকে আঁকড়ে ধরব—কিছুই ভেবে পাই না। কি ভীষণ একা···জগৎ সংসারে কেউ নেই, কেউ নেই।···খালি খড়্গ, খালি তলওয়ার···খালি কাটাকাটি,···রক্তে ভেসে যায়, এই সব, এই সব···আরও কত কি···ওগো সত্যি বল না, সত্যি বল···(প্রায় চীৎকার করিয়া)···আমি কি···আমি কি পাগল হয়েছিলাম ?

সুধাংশু। না না, কে বললে! কি সব যা-তা ভাবছ ? ও সব কথা ভেবো না লক্ষীটি।

মৃণালিনী। না না, তুমি আমাকে ভোলাতে পারবে না। আমার একটু একটু ক'রে সব মনে পড়ছে।···ঐ নীচের ঘরটায় আমি থাকতাম, তাই না ?

[সুধাংশু মাথা নাড়িয়া জানাইল "হাঁ্যা,"]

মৃণালিনী। কতদিন ?

সুধাংশু। দু-বছর।

মৃণালিনী। তারপর এখন···এখনও কি···

সুধাংশু। না না মিনি, এখন তুমি সেরে গিয়েছ।

মৃণালিনী। সত্যি বলছ ?

সুধাংশু। সত্যি বইকি। তুমি নিজে কি বুঝতে পারছ না ?

মৃণালিনী। কি জানি, আমার মাথার ভেতরে যেন কেমন ···না না, কোন ভয় নেই, কোন ভয় নেই, তাই না ? তোমার কাছে আছি, কোন ভয় নেই।

সুধাংশু। কোন ভয় নেই মিনি।

মৃণালিনী। দু ব—চ্ছ—র। উঃ কতদিন, কতযুগ ধ'রে এই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করেছি।···আর তুমি, তোমরা, দু-বছর ধরে আমার বোঝা টেনেছ। না জানি কত কষ্টই তোমাদের দিয়েছি।

সুধাংশু। ও কথা কেন বলছ মিনি ? আমার হ'লে তুমি কি করতে না ?

মৃণালিনী। ক'জন স্বামী এ রকম ক'রে ভাবে! তোমার গুণের তুলনা নেই।···দেখ, আমি···আমি কি বেশী উৎপাত করতাম ?

সুধাংশু। না না, কিচ্ছু না। কিন্তু মিনি, ও-সব কথা এখন থাক।

মৃণালিনী। হাঁ্যা, ও-সব কথা এখন থাক। আমি তো সেরেই গিয়েছি। আর ওসব কথা ভেবে কি হবে, কি হবে, তাই না ?

সুধাংশু। হাঁ্যা, তাই বইকি।

মৃণালিনী। (অপ্রকৃতিস্থ) আর ওসব ভেবে কি হবে, কি হবে ?···অ্যাঁ, আর ও-সব ভেবে কি হবে, কি হবে ?

সুধাংশু। (ভীতস্বরে) মিনি!

মৃণালিনী। (প্রকৃতিস্থ হইয়া) হাঁ্যা, কি বলছিলাম ? ···দেখ, আমাকে নীচের ঐ ঘরটায় রেখেছিলে কেন ?

সুধাংশু। তুমি যে কিছুতেই ওপরে আসতে চাইতে না।

মৃণালিনী। আচ্ছা, আর যদি কখনও ঐ রকম হই—

আর তো হবই না—যদি কখনও হই, তাহ'লে, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে ঐ ঘরটায় আর রেখো না।

সুধাংশু। বালাই, আবার কেন ও-রকম হবে।

মৃণালিনী। আমার ভারী ভয় করবে। [শোবার ঘর দেখাইয়া] ঐ ঘরটিতে আমাকে রেখো। আমি আসতে না চাইলে জোর ক'রে আমাকে ধরে এনো।··· তোমার কোলের কাছটিতে আমাকে রেখো। তাহ'লেই আমি শীগগীর সেরে উঠব।

সুধাংশু। ছি মিনি, কেন ভাবছ ও-সব কথা ?

মৃণালিনী। না, তুমি বল।

সুধাংশু। আচ্ছা, তাই হবে।

[একটু পরে]

মৃণালিনী। দেখ, আর একটা কথা আমার মনে পড়ছে।

সুধাংশু। কি কথা বল।

মৃণালিনী। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে আমার ভয় করছে —না জানি কি শুনতে হবে।

সুধাংশু। তাহ'লে বলে কাজ নেই মিনি, থাক।

মৃণালিনী। না বললেও যে শান্তি পাব না।···দেখ, আমার কি একটি খোকা হয়েছিল ?

সুধাংশু। হ্যাঁ।

মৃণালিনী। সে কোথায় ? (সুধাংশু নিরুত্তরে মুখ ফিরাইল) বল না সে কোথায় ?···সে নেই ? অ্যাঁ, সে নেই ?···উঃ মাগো! ওগো ভুলিয়ে দাও, আমায় ভুলিয়ে দাও, নইলে আমি আবার পাগল হয়ে যাব।···যাই, আমি মা'র কাছে যাই। [যাইতে উদ্যত]

সুধাংশু। না না, মিনি, যেও না, এইখানেই থাকো। আমি মাকে ডাকছি। মা, মালতী···

[জাহ্নবী ও মালতী আসিলেন]

মৃণালিনী। মা, মাগো! (ছুটিয়া গিয়া তাঁর বুকে মুখ লুকাইল)

জাহ্নবী। কি মা ?

মৃণালিনী। আমার বুকের ভেতরে যে কেমন করে।

জাহ্নবী। একটু চুপ ক'রে থাকো মা, তাহ'লেই সেরে যাবে।

[মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন]·· তোমার দাদাকে দেখবে মা ?

মৃণালিনী। (চকিতে মুখ তুলিয়া) দাদা এসেছে না-কি ? কই কোথায় ?

জাহ্নবী। হ্যাঁ, নীচে আছে। আমি ডাকতে পাঠাচ্ছি! বামা, বামা।

মালতী। বামা তো নেই মা। তুমি যে তাকে চাটুজ্জ্যেদের বাড়িতে পাঠিয়েছ।

জাহ্নবী। ও, তাহ'লে তুই-ই যা তো মা। উপেনকে ডেকে আন।

[মালতী চলিয়া গেল]

মৃণালিনী। মা, আপনার কোলে মাথা রেখে আমার বেশ লাগছে। আঃ, মনে হচ্চে যেন কত শান্তি।

জাহ্নবী। বেশ তো এমনি করেই থাক।

মৃণালিনী। (অপ্রকৃতিস্থ) সব সময় যে থাকতে পাইনে মা। কে আমাকে সরিয়ে দেয়। সব সময়ে কেন থাকতে পাইনে ?

[জাহ্নবী ও সুধাংশু অর্থপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময় করিলেন]

জাহ্নবী। সব সময়ই থাকতে পাবে মা। এখন একটু চুপ কর।

[মালতী ও উপেন্দ্র আসিল। মৃণালিনী উপেন্দ্রকে প্রণাম করিল]

মৃণালিনী। দাদা, তোমার শরীর ভাল আছে ?

উপেন। আছে।

মৃণালিনী। এখন হঠাৎ এলে যে ?

উপেন্দ্র। এই···এমনিই···তোকে দেখতে এলাম।

মৃণালিনী। বৌদি ভাল আছে ?

উপেন্দ্র। হ্যাঁ।

মৃণালিনী। নগেন, রেণু, পটু—ওরা সবাই ভাল আছে ?

উপেন্দ্র। হ্যাঁ, সবাই ভাল আছে।

মৃণালিনী। দাদা, আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। দু-বছর পাগল হয়ে ছিলাম। তা আমাকে একবার দেখতেও আস নি ?

উপেন্দ্র। এসেছিলাম বইকি মিনি। তোর কি আর তখন জ্ঞান ছিল!

মৃণালিনী। ও, হাঁ্যা, তাইতে আমার মনে নেই।

উপেন্দ্র। মিনি, তোর বৌদি তোকে দেখবার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়েছে। আজকে যাবি আমার সঙ্গে ?

মৃণালিনী। না দাদা, আজকে নয়। কতদিন পরে আজকে ভাল হয়েছি। ছু-দিন এখানে থাকি, তারপর যাব।

[আলুথালু বেশে ছুটিয়া বামার প্রবেশ]

বামা। (হাসিয়া কাঁদিয়া) ও বৌদি গো, তুমি সেরে উঠেছ—তাই শুনে আমি ছুটতে ছুটতে এসেছি গো। ও বৌদি, তুমি সেই ভাল হ'লে, ছু-দিন আগে কেন হ'লে না—তাহ'লে তো দাদাবাবু আজ আর···

সুধাংশু। (গর্জ্জন করিয়া) এই বামা, চুপ। দূর হ ! চলে যা এখান থেকে।

[বামা হতবুদ্ধি হইয়া বাহির হইয়া গেল। মৃণালিনী জিজ্ঞাসু নেত্রে একে একে সকলের দিকে চাহিতে লাগিল]

মৃণালিনী। বামা কি বলছিল ? আজ কি হবে ?

সুধাংশু। ও কিছু নয়।

মৃণালিনী। মা, আপনি বলুন না। আমার শুনলে কি কোন দোষ আছে ? ওকে অমন ক'রে তাড়িয়ে দিলে কেন ?

জাহ্নবী। ও বিশেষ কিছু নয় মা। পরে শুনো এখন।

মৃণালিনী। দাদা, বল না কি কথা ? আজকে কি হবে এখানে ? তুমি কেন এসেছ ? মালতী কেন এসেছে ?

সুধাংশু। ওঃ, আজকে আমাদের সব থিয়েটার দেখতে যাবার কথা ছিল কি-না, তাই।

মৃণালিনী। না না, বামা তো তা বলে নি। আজ কি করবে তুমি—ছু-দিন আগে আমি ভাল হ'লে যা করতে না ?···ওগো, তোমরা যতই ঢাকতে চেষ্টা করছ আমার বুকের ভিতরটা ততই কেঁপে কেঁপে উঠছে। কত কি অকল্যাণের কথা মনে হচ্চে।···বল, বল, এ সংশয় যে আর আমি সইতে পারছি নে।

উপেন্দ্র। আর মিথ্যের পর মিথ্যে দিয়ে জাল বুনে কি হবে ! যে আঘাত আসবেই তাকে মেনে নেওয়াই ভাল। মিনি, তোর আর ভাল হবার আশা নেই জেনে সুধা আজ আবার বিয়ে করতে যাচ্ছিল।

মৃণালিনী। (বিবর্ণ মুখে) অ্যাঁ···সত্যি ?···না, আমি আবার পাগল হয়ে গিয়েছি ! [সুধাংশুর দিকে অগ্রসর হইল]···ওগো, তুমি কথা কইছ না কেন ? দাদা তামাসা ক'রে বলেছে, তাই না ?···তবু চুপ ক'রে রইলে !···তবে কি তোমার এই সব সাজপোষাক সেই জন্যে ?

উপেন্দ্র। মিনি, একটু শান্ত হ। সব কথা শোন্।

মৃণালিনী। আর এই বুঝি বিয়ের বরণমালা ? ·· (ছবির দিকে নির্দ্দেশ করিয়া)···আর ওই,···ওই সে ?··· (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে) দাদা, দাদা, তুমি আমাকে শান্ত হতে বলছ। আশীর্ব্বাদ কর যেন এখনি আবার পাগল হ'য়ে যাই।

[মৃণালিনী ছুটিয়া বাঁ-দিকের ঘরে চলিয়া গেল। জাহ্নবী ও মালতী তাহার অনুসরণ করিল। সুধাংশু ও উপেন্দ্র স্তম্ভিতভাবে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে কাটিয়া গেল—]

উপেন্দ্র। আগের বারেও ঠিক এমনি হয়েছিল।

সুধাংশু। কোন্ বার ?

উপেন্দ্র। সেই ও-বছর দিল্লীতে যখন কয়েক ঘণ্টার জন্যে জ্ঞান হয়েছিল।

সুধাংশু। ঠিক এমনি জ্ঞান হয়েছিল ?

উপেন্দ্র। ঠিক এমনি।

সুধাংশু। আজ এসে যখন প্রথম কথা বলতে লাগল তখন কে বলবে যে এই মানুষ কোনদিন পাগল হয়েছিল।

উপেন্দ্র। সেবারেও ঠিক তাই। ঘণ্টাকয়েক ভাল মানুষের মত থাকবার পর হঠাৎ কি ছুতোনাতায় মাথা গরম হয়ে উঠে আবার যে-কে-সেই হয়ে দাঁড়াল।

[বামার সঙ্গে ডাক্তারবাবু আসিলেন। প্রৌঢ়, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, প্রশান্ত গম্ভীর মুখ]

বামা। ডাক্তারবাবু এসেছেন।

[বামার প্রস্থান]

সুধাংশু। কাকাবাবু, আসুন। সব শুনেছেন ?

ডাক্তার। হাঁ্যা, কতক্ষণ জ্ঞান হয়েছে ? [বসিলেন]

সুধাংশু। এই ঘণ্টাখানেক।

ডাক্তার। তারপর, এর মধ্যে, আবার কি কিছু—?

সুধাংশু। নাঃ, বেশ স্বাভাবিক ভাব চলছে।···হাঁ্যা, তবে এক-একবার কথাবার্ত্তাগুলো যেন কেমন একটু···

ডাক্তার। (মাথা নাড়িয়া) হুঁ।

[মালতী ছুটিয়া আসিল]

মালতী। কাকাবাবু, আসুন দেখে যান, বৌদি এ ঘরে।

ডাক্তার। আর দেখে কি হবে মা? এখন তো ভালই আছে শুনছি।

মালতী। না, আপনি দেখুন কাকাবাবু, আবার সেই রকম হবে কি-না।

ডাক্তার। (স্তোকবাক্যে) তা,...আর নাও হ'তে পারে।

সুধাংশু। কেন কাকাবাবু, আপনার কি সন্দেহ হয় যে এ জ্ঞান থাকবে না।

ডাক্তার। নতুন আর কি সন্দেহ হবে বাবা। আমার বিদ্যেবুদ্ধিতে যে কথা বলে সে তো আগেই তোমাদের বলেছি। আর শুধু আমি কেন, শহরের বড় বড় ডাক্তাররাও তো সেই কথাই বলেছেন।

সুধাংশু। কিন্তু আজকে যে একেবারে স্পষ্ট জ্ঞান হয়েছে কাকাবাবু। পাগলামীর কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। এ থেকে কি কোন...?

ডাক্তার। হঠাৎ দু-একবার যে এ রকম হ'তে পারে সে কথাও তো আমরা বলেছি। কিন্তু তা থেকে এমন আশা করা চলে না যে, ও একেবারে সেরে উঠবে।

সুধাংশু। কিন্তু অদৃষ্টের কি খেলা! ঠিক আজকেই এই সময়েই ..

ডাক্তার। কি করবে বাবা। এ জিনিষ তো কারও হাত-ধরা নয়।

[জাহ্নবীর প্রবেশ]

জাহ্নবী। মালতী তুই একটু যা তো মা ওর কাছে।

[মালতীর প্রস্থান]

ডাক্তারবাবু, বৌমাকে আপনি একবার দেখবেন চলুন।

ডাক্তার। দেখতে বলেন দেখতে পারি। কিন্তু ওকে আরও খানিকটে উত্ত্যক্ত করা ছাড়া তাতে আর কি লাভ হবে?

জাহ্নবী। তবু আপনি একবার দেখলে সব বুঝতে পারবেন।

ডাক্তার। নতুন ক'রে বোঝবার আর কি আছে?

জাহ্নবী। তবে কি আপনি মনে করেন...

ডাক্তার। হ্যাঁ।

জাহ্নবী। কতক্ষণ?

ডাক্তার। সেটা ঠিক বলা যায় না। দু-ঘণ্টাও হ'তে পারে, দু-দিনও হ'তে পারে।

জাহ্নবী। ডাক্তারবাবু, আপনি আমাদের শুধু ডাক্তার নন, এ পরিবারের অনেক দিনের হিতৈষী বন্ধু। আপনি ব'লে দিন এ সঙ্কটে এখন আমাদের কি করা উচিত?

ডাক্তার। সুধাংশুর বিয়ের কথা বলছেন?

জাহ্নবী। হ্যাঁ।

ডাক্তার। ও, তা বিয়েটা আজকের মত বন্ধই করতে হবে। এ সময়ে ওকে অতবড় একটা আঘাত দেওয়া যায় না। আর দেখুন, খুব সাবধান, আজকে যে বিয়ের আয়োজন হচ্ছিল তা যেন ও ঘুণাক্ষরেও টের না পায়। দু-চারদিন দেখুন, পরে যদি...

জাহ্নবী। আর তা হয় না ডাক্তারবাবু, ও সব জেনে ফেলেছে।

ডাক্তার। তাই না কি? আহা, তাহ'লে তো বড্ডই শক্ পেয়েছেন।

উপেন্দ্র। ডাক্তারবাবু, ওর অসুখ আবার শীগগীরই ফিরে আসবে এ কথা যদি সত্যি হয়—তাহ'লে সুধাংশুর বিয়েটা আর বন্ধ ক'রে কাজ কি?

ডাক্তার। [একটু ভাবিয়া জাহ্নবীর দিকে চাহিলেন] উপেনবাবু ঠিক কথাই বলেছেন।

জাহ্নবী। না না, এখন আর তা হয় না।

ডাক্তার। না হবে কেন? নতুন তো আর কিছু ঘটে নি, যার জন্যে আগের ব্যবস্থার বদল করতে হবে। দু-দিন আগেও যা ছিল, আজও তাই।

জাহ্নবী। আজও কি তাই?...এই যে বৌমার জ্ঞান হ'ল?

ডাক্তার। তা তো হ'ল। কিন্তু সে কতক্ষণের জন্যে? আমাদের শাস্ত্র যদি ঠিক বুঝে থাকি তাহ'লে এ নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী।

জাহ্নবী। কিন্তু তবু এখন তো ওর জ্ঞান আছে। সব দেখছে, বুঝছে। কত বড় আঘাত পাবে এতে।

ডাক্তার। দেখুন, আমরা ডাক্তার মানুষ, অনেক দেখে শুনে প্রাণটা শক্ত হয়ে গিয়েছে। সেন্টিমেন্টের—হৃদয়াবেগের বড় ধার ধারি নে। তবে এটুকু বলতে পারি যে, যদি বিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য ব'লেই বুঝে থাকেন তাহ'লে সেন্টিমেন্টের খাতিরে নিবৃত্ত হওয়া উচিত নয়।…আর বৌমাও যদি সুবুদ্ধি হন।তাহ'লে নিশ্চয়ই এতে সায় দেবেন।

জাহ্নবী। বৌমা আমার খুবই সুবুদ্ধি। এতক্ষণ আমার কাছে সব কথা শুনছিল। ওর বুক ভেঙ্গে যাচ্ছিল, তা কি আর বুঝতে পারি নি, তবু নিজেই বললে, 'ঠিকই তো, এ রকম অবস্থায় বিয়ে করাই উচিত।'

ডাক্তার। তবেই দেখুন।…আর সে ভদ্রলোকের প্রতিও তো আপনাদের একটা কর্ত্তব্য আছে। এতদূর এগিয়ে এখন বিয়েটা বন্ধ করা কি অন্যায় হবে না?

সুধাংশু। না না, তবু আজকে থাক।

ডাক্তার। তাতে আর কার কি লাভ হবে বাবা? প্রথমটা বৌমার কথা ভেবে আমি আজ বিয়েটা বন্ধই করতে বলেছিলাম। কিন্তু দেখছি আঘাত যা পাবার তা তো বৌমা পেয়েছেনই—তবে আর কেন?

সুধাংশু। তবু…

ডাক্তার। দু-দিন আগে আর পরে? তার জন্যে এই শেষ মুহূর্ত্তে বিয়ে বন্ধ ক'রে ভদ্রলোকের উদ্যোগ-আয়োজন সব পণ্ড ক'রে দেবে কেন? তাঁরও তো আত্মীয়স্বজন আছেন; তাঁরাই বা কি ভাববেন?

জাহ্নবী। হরেনবাবু ব্যস্ত হয়ে এর মধ্যে দু-বার লোক পাঠিয়েছেন।

উপেন্দ্র। আর দ্বিধা করছ কেন সুধা? ডাক্তারবাবু ঠিক কথাই বলেছেন। এক্সপ্রেসের এখনও খানিকটে সময় আছে—আমি দেখি যদি ওকে ব'লে-কয়ে আমার সঙ্গে যেতে রাজী করাতে পারি।

ডাক্তার। হ্যাঁ, তাই দেখুন। এখন হয়ত রাজী হতেও পারেন।

উপেন্দ্র। পথের মাঝখানে যদি আবার ঐ রকম হয় তবেই বিপদ। ডাক্তারবাবু আপনার কি মনে হয়? এ জ্ঞান কতক্ষণ থাকবে?

ডাক্তার। কিছুই বলা যায় না। সেবারে কতক্ষণ ছিল?

উপেন্দ্র। আট দশ ঘণ্টা।

ডাক্তার। এবারেও তাই হওয়া সম্ভব। কিছু বেশীও হ'তে পারে।

উপেন্দ্র। তাহ'লে সঙ্গে একটা লোক নেওয়া দরকার।

জাহ্নবী। ডাক্তারবাবু, আপনি কি ঠিক বলতে পারেন যে, ও নিশ্চয়ই আবার পাগল হয়ে যাবে? আপনার কি ভুল হ'তে পারে না?

ডাক্তার। ভুল হ'তে পারে না এ কথা কি কেউ বলতে পারে। কিন্তু যদি আমাদের ভুলই হয়ে থাকে, যদি ও আর কখনও পাগল নাও হয়, তবু ওর চলে যাওয়াই আমি সঙ্গত মনে করি।

জাহ্নবী। কেন?

ডাক্তার। দেখুন, আমরা ডাক্তার মানুষ, সবদিকই আমাদের ভেবে দেখতে হয়। ওর যদি সন্তান হয় তাদেরও এই রকম হবার খুব সম্ভাবনা থাকবে। এই ভীষণ ব্যাধির মূর্ত্তি এতদিন ধরে তো চোখের সামনে দেখলেন। কতকগুলো নিরীহ শিশু এই অভিশাপ মাথায় নিয়ে—সংসারে আসুক সেটা কি ইচ্ছে করেন?

উপেন্দ্র। (জাহ্নবীর প্রতি) আপনি আর দেরি করবেন না। সুধাংশুর যাত্রার সমস্ত ঠিকঠাক করুন। আমি দেখি যদি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওকে নিয়ে যেতে পারি।

[উপেন্দ্র বাঁ দিকের ঘরে চলিয়া গেল]

ডাক্তার। আচ্ছা, আমিও আসি তাহ'লে। আপনি আর মিছামিছি দেরি না ক'রে সুধাংশুকে রওনা ক'রে দিন।

[ডাক্তারের প্রস্থান]

জাহ্নবী। (আস্তে আস্তে ডাকিলেন) মালতী, মালতী।

[মালতীর প্রবেশ

যা তো, তোর মাসীমাকে ডেকে আন।

[মালতীর প্রস্থান]

সুধাংশু। মা, ওদের যদি আজই যাওয়া হয় তাহ'লে বামাকে আর সরকার-মশাইকে সঙ্গে দিও।

জাহ্নবী। হ্যাঁ বাবা, তা তো দিতে হবে। নইলে পথের মাঝখানে যদি আবার কিছু হয় তাহ'লে উপেন একলা ভারী বিপদে পড়বে।

[মালতী ও সরোজিনীর প্রবেশ]

সরোজ, ওদিকে সব ঠিক আছে ?

সরোজিনী। সব ঠিক আছে। এখন তোমরা এলেই হয়।

জাহ্নবী। এয়োরা সবাই আছে তো ?

সরোজিনী। আছে।

জাহ্নবী। আমি বলি কি, আর উপরে গিয়ে কাজ নেই। ওদের সব নীচে ডেকে নিয়ে যাও—কোন রকমে ধানদূর্ব্বো দিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাত্রা করিয়ে দাও গে।

সরোজিনী। ওমা, সে কি কথা! এয়োরা সব এতক্ষণ ধরে খেটে-খুটে সব আয়োজন করলে সে-সব কিছু কাজে লাগবে না! আর এ সব যে শুভকার্য্যের অঙ্গ।

জাহ্নবী। তা হোক সরোজ। সময় আর নেই। শেষটায় লগ্ন বয়ে গিয়ে বিয়ে পণ্ড হবে সেইটেই কি ভাল ? যাও, তুমি ওদের ডেকে নিয়ে এস গে।

সরোজিনী। আচ্ছা।

জাহ্নবী। বল গে, শুধু বরণ-ডালা আর মঙ্গল-ঘট নিয়ে আসুক।

সরোজিনী। আচ্ছা যাচ্ছি।...ওরা কিন্তু ভারী দুঃখিত হবে।

জাহ্নবী। চল, আমিও যাই, ওদের বুঝিয়ে বলি গে। এখন কোন রকমে শুভকাজটা সমাধা হলেই বাঁচি।...সুধা আমি ডেকে পাঠালে তুই একেবারে নীচেই চলে আসবি।

[জাহ্নবী, সরোজিনী ও মালতী চলিয়া গেলেন। সুধাংশু কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারী করিল। তারপর হঠাৎ দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া সোফায় বসিয়া পড়িল।

পর্দ্দার ওধারে বারান্দা দিয়া মেয়েরা উপর হইতে নীচে যাইতেছে, তাহার আভাস পাওয়া গেল। তাহা দেখিয়া সুধাংশু একটু ইতস্ততঃ করিয়া উঠিয়া দরজার দিকে যাইবে, এমন সময় পিছন হইতে উপেন ডাকিল—]

উপেন্দ্র। সুধা, যাবার আগে মিনি তোমাকে প্রণাম করতে এসেছে।

[সুধাংশু সোফায় উপর বসিল। মৃণালিনী ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার পায়ের কাছে বসিয়া প্রণাম করিল]

সুধাংশু। (রুদ্ধকণ্ঠে) মিনি, আমায় ক্ষমা কর।

মৃণালিনী। (মুখ তুলিয়া) ছি, ওকথা ব'লো না। তোমার দোষ কি ?

[মিনি হাসিয়া হাসিয়া বলিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু তাহার মর্ম্মের বেদনা কান্নার সুরে উথলিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে।]

তুমি মনে কষ্ট করো না লক্ষ্মীটি। দেখ, আমি আজ ভাল আছি, আবার কালই হয়ত পাগল হয়ে যাব... তখন আমার দুঃখই বা কি কষ্টই বা কি...তাই না ?

(ছবির দিকে চাহিয়া) ও মেয়েটি বেশ...খুব ভাল মেয়ে · তুমি খুব সুখী হবে...তাইতেই আমার সুখ, তাই না ?

সুধাংশু। (রুদ্ধকণ্ঠে) মিনি, মিনি, চুপ কর।

মৃণালিনী। কেন, আমার তো কোন কষ্ট নেই।... ভগবান আমার সব সাধ-আহ্লাদ কেড়ে নিয়েছেন · কিন্তু আমার জন্যে তুমি কেন চিরজীবন কষ্ট পাবে ?...তুমি যাতে সুখী হও, তাই করা আমার উচিত, তাই না ?... সংসারে তো আর আমার কোন আশা নেই, তাই না ?

[সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া সুধাংশুর কোলের উপর লুটাইয়া পড়িল]

ওগো, সত্যিই কি আমার আর কোন আশা নেই ?

[উপেন্দ্র ধীরে ধীরে মৃণালিনীর হাত ধরিয়া উঠাইয়া ডাকিল, "মিনি"। মৃণালিনী ধীরে ধীরে মুখ তুলিল। চোখের জলে তাহার মুখ ভাসিয়া যাইতেছে।

সরোজিনী "সুধা" বলিয়া ডাকিয়া ঘরে ঢুকিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইলেন। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—]

সরোজিনী। সুধা, তোমাকে বাইরে একটি লোক ডাকছে।

[এ ছলনাটুকু বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না।

উপেন সুধাংশুকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল। সুধাংশু একটু ইতস্ততঃ করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। যতক্ষণ দেখা গেল মিনি তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর সোফার উপর মুখ লুকাইয়া কান্নার বেগ থামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। উপেন্দ্র পাশে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

নীচের তলা হইতে তিনবার চাপা গলায় উলুধ্বনির শব্দ আসিল। ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িয়া গেল।]

সুইডেনে শিশু ও মাতৃ মঙ্গল

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

প্রত্যেক সভ্যদেশে শিশুশিক্ষা ও শিশুসংরক্ষণ মূলক আইন আছে। মানব সভ্যতার বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুশিক্ষা ও শিশুমঙ্গল কার্য্য দ্রুতগতিতে বৈজ্ঞানিক পথ লইতেছে। এই শিশুশিক্ষা যে জাতিগঠনের গোড়াকার জিনিষ, তাহা হয়ত সকলেই বুঝেন। এই প্রবন্ধে সুইডেন দেশে শিশুমঙ্গল কার্য্য সরকারী আইনের দ্বারা ও বেসরকারী চেষ্টায় কি ভাবে চলিয়াছে, সে-সম্বন্ধে বলিব। কারণ, কর্ম্মপরায়ণ শ্রমশীল সুইডেনবাসীর এই সামাজিক উন্নতির মূলে রহিয়াছে সেখানকার জাতীয় শিশুমঙ্গল কার্য্য।

শিশুদের যত্ন করা সম্বন্ধে আইন সর্ব্বপ্রথম ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে সুইডেনে প্রবর্ত্তিত হয়। তখন হইতেই পিতৃ-



ষ্টকহলমে গৃহহীন দরিদ্রদের বাসভবন

মাতৃহীন বা অভিভাবকশূন্য শিশুদের শিক্ষা ও যত্নের জন্য স্থানে স্থানে বিদ্যালয় ও শিশুগৃহের সৃষ্টি হয়। অনাহারে যাহাতে কেহ কষ্টভোগ না করে, সে জন্য দরিদ্ররক্ষা আইন অনেক দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে বেকার পিতামাতারা আপন শিশুদের জন্য শিশুমঙ্গল আইনের সাহায্যে অর্থ পাইতেন। কিন্তু ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষামূলক আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুশিক্ষা ও শিশুমঙ্গল-কার্য্য স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে এবং জনসাধারণের ভিতর এই চেষ্টা দ্রুত বিস্তৃত হইতে থাকে। গত শতাব্দীর শেষভাগে সেখানকার জনসাধারণ জাতীয়ভাবে শিশুমঙ্গল আইন প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন বোধ করে। ফলে, ১৯০২ খৃষ্টাব্দে শিশুমঙ্গল আইন সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রবর্ত্তিত হয়। এই আইনের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, যে-সকল শিশুর পিতামাতা পরস্পরের সহিত বিবাহিত নহে, সেই সকল শিশুর যথোপযুক্ত যত্ন ও শিক্ষা; শিশুদের নিকট মাদক দ্রব্য বিক্রয় বন্ধ করা; শিশু অপরাধীদিগকে সুশিক্ষাদানের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

বর্ত্তমানে শিশুমঙ্গল আইন কার্য্যকরী করিবার ক্ষমতা ও দায়িত্ব সমাজের লোকের হাতে ন্যস্ত হইয়াছে। যেখানে একটি মিউনিসিপ্যালিটি বা ছোট জনসঙ্ঘ রহিয়াছে সেই স্থানে শিশুদের জন্য শিশুমঙ্গল সমিতি বা বোর্ডও একটি করিয়া আছে। এই বোর্ডের সভ্যদের মধ্যে আইন অনুসারে একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক, একজন ধর্ম্মযাজক, শিশুমঙ্গল কার্য্যে উৎসাহী দুইজন কর্ম্মী ও প্রয়োজনমত একজন ডাক্তার থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ একজন মহিলা সভ্য থাকেন। এক একটি পাড়ার গণ্ডীর মধ্যে প্রত্যেক শিশুর যত্ন যথোপযুক্ত হইতেছে কি-না তাহা দেখা ও যত্নের ত্রুটি হইলে আইন অনুসারে বিহিত ব্যবস্থাদান—এই দুইয়ের দায়িত্ব সমিতির হাতে থাকে। এই সমিতির অন্য প্রধান কাজ—শিশুমঙ্গল-কার্য্যের ক্রমোন্নতি সাধন। অভিভাবকশূন্য বা অসমর্থ অভিভাবক বা পিতামাতাদের শিশুদিগকে স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষার জন্য শিশুগৃহে বা বিদ্যালয়ে পাঠানো; পরস্পর বিবাহসম্পর্কহীন পুরুষনারীর শিশুদিগকে সম্পূর্ণভাবে বৈধ সন্তানদের অধিকার সম্পন্ন করিয়া লওয়া। গভর্ণমেণ্ট-নিয়োজিত পরিদর্শকমণ্ডলী এই সমিতিগুলির কাজ সম্বন্ধে রিপোর্ট করেন।

প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা প্রয়োজনমত এই সকল কাযে হাত দিতে পারেন।

শিশুদের যত্নের প্রণালী :—শিশুসংরক্ষণ ও শিশুমঙ্গল গৃহ একই আইনের অধীনে দুইটি প্রতিষ্ঠান। তাহা ছাড়া অভিভাবকদের স্বতন্ত্র সমিতি আছে। শিশুসংরক্ষণ সমিতি কোনো শিশুর যথোপযুক্ত যত্ন হইতেছে না দেখিলে আইনের সাহায্যে এবং অভিভাবক সমিতির মতের বিরুদ্ধেও যে-কোনো শিশুর দায়িত্ব লইতে পারেন। তবে সে রকম কোনো প্রশ্ন উঠিলে অভিভাবককে কিছু সময় দেওয়া হয় এবং সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের ভিতর যদি অভিভাবক আপন শিশুর যথোপযুক্ত শিক্ষা ও যত্ন সম্বন্ধে সন্তোষজনক ফল না দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে শিশু-মঙ্গল সমিতি শিশুর ভার লইয়া থাকেন।

শিশুসংরক্ষণ সমিতির প্রধান কাজ দুষ্ট ও অচরিত্রবান ছেলেমেয়েদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাদান। সুইডেনে



শিশুগৃহে শিশুদের অতিপ্রিয় 'রেড্ ইণ্ডিয়া'ন খেলা

বালকদের জন্য বর্ত্তমানে সর্ব্বশুদ্ধ চৌত্রিশটি এবং মেয়েদের জন্য চৌদ্দটি সংরক্ষণগৃহ রহিয়াছে এবং ঐ সকল সংরক্ষণ-গৃহে ১২৪২টি শিশুর সম্পূর্ণ ভার লইবার বন্দোবস্ত আছে। উপরোক্ত সংখ্যার মধ্যে চারিটি গৃহে সেই সকল শিশুদের যত্ন করা হয় যাহাদের শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা আছে অথচ যাহারা পাগল বা কাজে অসমর্থ নহে। চারিত্রিক দোষের জন্য শারীরিক ও মানসিক অসুস্থ ছেলেমেয়েদের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে।



মুক্ত প্রকৃতির কোলে দাপাদাপি শিশুগৃহের শিশুদের স্বাধীন জীবন যাপন

মস্তিষ্কের অসম্পূর্ণতা, দুর্ব্বলতা বা বিকৃতি বা অন্য কোনো জন্মগত দোষ লইয়া যে-সকল শিশু জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের জন্য গভর্ণমেণ্টের দুইটি স্বতন্ত্র বিদ্যায়তন আছে। উহাদের মধ্যে একটি ছেলেদের এবং অন্যটি মেয়েদের জন্য। শিশু অপরাধীদিগকে স্বতন্ত্র ভাবে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আরও দুইটি পৃথক প্রতিষ্ঠান আছে।

সুইডেনে ঘুরিবার কালে শিশু-গৃহগুলি ও বৃদ্ধবৃদ্ধাদের উপনিবেশ-গুলি দেখা আমার প্রধান কাজ ছিল। নিম্নে শিশুগৃহ ও উপনিবেশগুলির ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি। সমগ্র সুইডেনে ২৬০টি শিশুগৃহ ও সেই সকল গৃহে ছয় হাজারের উপর শিশুদের শিক্ষা ও থাকার ব্যবস্থা আছে। স্থান ও প্রয়োজনভেদে গৃহগুলি ছোট-বড় নানা আকারের। কতকগুলি শিশুগৃহ আছে যেখানে গৃহহীন ও নিরুপায় মাতারা আপন শিশুসন্তান-সহ থাকিতে পারেন এবং শিশুরা শিক্ষার সঙ্গে সংসর্গ ও স্তন্য দুগ্ধ পাইতে পারে।



ল্যাপ দের জীবনযাপন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিবার উদ্দেশ্যে সমবেত শিশুগৃহের শিশুরা



দরিদ্র শিশুদের স্বাস্থ্যভবনে 'মে-পোল' উৎসব

শিশুসংরক্ষণ আইন:——ষোল বৎসরের নিম্নবয়স্ক শিশু যাহারা আপন গৃহে পিতামাতার নিকট হইতে ভাল ব্যবহার না পায় ও তাহাদের অবহেলায় শিশুদের যত্নের ত্রুটি হয়,—পিতামাতাদের বা তাহাদের কোনো একজনের অসচ্চরিত্রতা, অবজ্ঞা বা অসমর্থতা-হেতু যে সকল শিশুর কুপথে যাইবার আশঙ্কা আছে,—আঠার বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালকবালিকা যাহাদের বিশেষ শিক্ষা পাওয়ার প্রয়োজন, শিশুরক্ষণ আইনানুযায়ী সংরক্ষণ সমিতি, প্রয়োজন বোধ হইলে, পিতামাতাদের অসম্মতিতেও ঐ সকল শিশুর শিক্ষার ও যত্নের ভার লইতে পারেন। তাহা ছাড়াও শিশুমঙ্গল সমিতির অধীনে অনেকগুলি শিশুগৃহ রহিয়াছে; ইহাদের অধিকাংশই জনসাধারণের অর্থে পরিচালিত। উক্ত প্রকারে শিশুগৃহ সমিতির নির্দ্দিষ্ট পরিচালক ভিন্ন গভর্ণমেণ্ট নিযুক্ত ইন্‌স্পেক্টরও পরিদর্শন করিয়া থাকেন।

সুইডেনবাসী জনসাধারণের শিশুমঙ্গল ও পীড়িতদের সেবার জন্য উৎসাহ লক্ষ্য করিবার বিষয়। নিজের অভিজ্ঞতা হইতে দুই একটি ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। সুইডেন পরিভ্রমণ কালে অজানা-অচেনা জায়গায় দুইবার

আকস্মিক ভাবে আহত হইয়াছিলাম। তখন অপরিচিত লোকেরা যেভাবে যত্ন ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়াছিল তাহা জীবনে কখনও ভুলিবার নহে। একবার পায়ে একটা পেরেক্ বিঁধিয়াছিল। ইহার ফলে, পা ফুলিয়া অল্প সময়ের মধ্যে অসহ্য বেদনা বোধ করিতেছিলাম। সাধারণতঃ চলাফেরার সময় গাড়ীতে যাত্রীরা কথাবার্ত্তা কম বলে বা বলেই না। এইরূপ চুপ থাকা উত্তর দেশের লোকদের মজ্জাগত গুণ। আমার পার্শ্বে যে ভদ্রলোকটি বসিয়াছিলেন, একটু ইতস্ততঃ করিয়া আমার অসুস্থতা-বোধের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে গাড়ী ষ্টেশনে আসিয়া থামিলে তিনি নামিয়া গিয়া ষ্টেশনের কোনো কর্ম্মচারীর সঙ্গে হয়ত বা আলাপ করিয়াছিলেন। কয়েক মিনিট পরে আমাকে নামাইবার জন্য কয়েকটি লোক আসিলেন। আমার জিনিষপত্র নামাইয়া ষ্টেশন-



মেয়েদের কর্ম্মাগারে বস্ত্রবয়নরত তরুণীগণ

ঘরে রাখা হইল; তাহার পরে একটি মোটর গাড়ীতে করিয়া আমাকে প্রায় সাত মাইল দূরে এক হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে হাসপাতালের চিকিৎসক ক্ষতস্থান চিরিয়া যথারীতি চিকিৎসা করিলেন। অবশ্য পরে আমি নিকটবর্ত্তী কোনো স্থানীয় বন্ধুর গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলাম, কিন্তু অজানা-অচেনা লোকেরা আগন্তুকের যে ভাবে যত্ন করিয়াছিলেন তাহা ব্যক্তিগত হইলেও উল্লেখ করিতেছি; কারণ, এরূপ ঘটনা সুইডেনবাসীদের চরিত্রের একটা দিক স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দেয়। আমি



মুক্ত প্রকৃতির কোলে শিশুদের সঙ্গীতচর্চ্চা

আজও জানি না কাহার মোটরে করিয়া হাসপাতালে গিয়াছিলাম। আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাইলে শুধু এই উত্তরটি পাইয়াছিলাম—"আপনি শীঘ্র সুস্থতা লাভ করুন; আমাকে ধন্যবাদ দিবার কোনো কারণ নাই।"

বরাদ্দ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী; তার পরেই জাতীয় আত্মরক্ষার সামরিক ব্যবস্থা, এবং তাহার খুব কাছাকাছি পরিমাণ অর্থ সামাজিক উন্নতির জন্য ব্যয় করা হয়।

শিশুমঙ্গল ব্যুরো (চাইল্ড ওয়েলফেয়ার ব্যুরো) বলিয়া কতকগুলি সমিতি রহিয়াছে যাহাদের কাজ পিতামাতা-দিগকে শিশুর যত্ন করা সম্বন্ধে বিনা পয়সায় পরামর্শ দান। এই সকল সমিতির হাতে আইনতঃ এতটুকু ক্ষমতা আছে যে, ইহারা যে-কোনো পিতামাতা বা অভিভাবককে শিশুর অবহেলার জন্য আদালতে হাজির করাইতে পারেন। এই সকল আইনগত ব্যবস্থার বাহিরেও শিশুমঙ্গল সম্পর্কীয় কয়েকটি বড় বড় কাগজ রহিয়াছে। এই কাগজগুলি নানা প্রকারের; কয়েকটি পিতামাতা বা অভিভাবকদের জন্য,

আর কতকগুলি অল্পবয়স্ক শিশুদের জন্য, যাহারা বিদ্যালয়ে যাইবার বয়সে পদার্পণ করে নাই। ঐ সকল কাগজের একটি অংশে নানা প্রকার খেলনা ও ঘরবাড়ি তৈরি করিবার



শিশুগৃহের চিরক্রীড়ারত শিশুদের প্যারেডিং শিক্ষা

নক্সা থাকে। শিশুরা ছুরি বা কাঁচির সাহায্যে কাটিয়া নানা প্রকার জিনিষ তৈরি করিতে পারে।

অবৈধভাবে যে-সকল শিশুর জন্ম হয় তাহাদের সম্বন্ধে সুইডেনের আইনকানুন খুব উদারমতাবলম্বী। ১৯১৭ সালে যে-সকল সংশোধন আইন পাস হয়, তাহার অংশবিশেষ তুলিয়া দিতেছি।

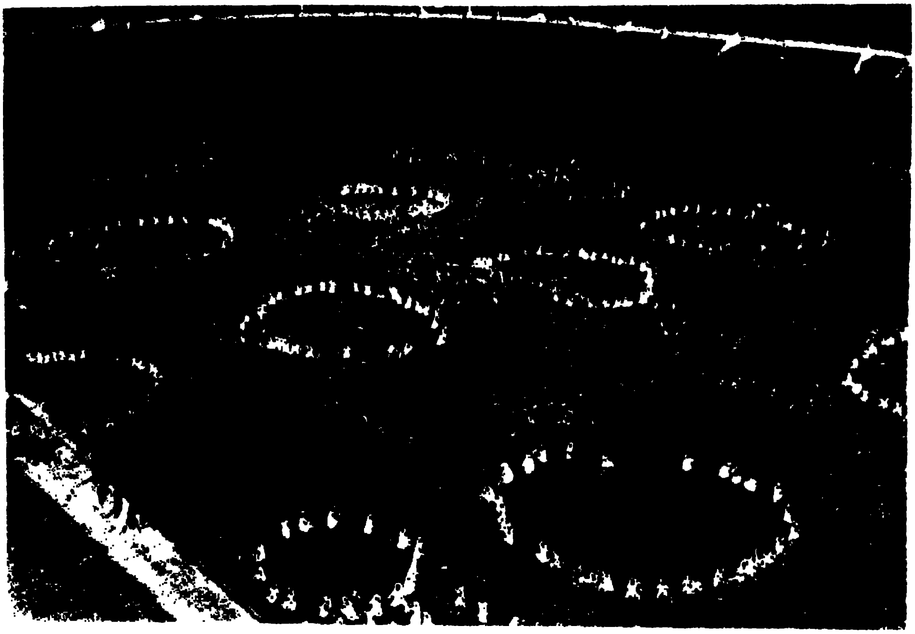
"অবৈধভাবে জাত শিশু বৈধ সন্তানের মত মাতার সহিত একই সম্বন্ধের অধিকারী। আইনতঃ পিতা এই সব শিশুর জীবিকা নির্ব্বাহ ও পড়াশুনার সমস্ত দায়িত্ব লইতে বাধ্য। মাতা বাগদত্তা হওয়ার পর, কিন্তু তাঁহার বিবাহের পূর্ব্বে যে-সকল শিশুর জন্ম হয়, তাহারা পিতৃ-পরিবারের নাম লইতে পারে। পিতাও সে-ক্ষেত্রে সন্তানের উপর আইনতঃ দাবি খাটাইতে পারেন। শিশু সে-স্থানে পিতৃসম্পত্তির অধিকারী।



গ্রীষ্মকালে মুক্ত প্রকৃতির কোলে আপনাদের গৃহ-আঙ্গিনায় ক্রীড়ারত শিশুগণ

"যদি মাতা সন্তানের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে শিশু মাতৃপরিবারের নাম লইতে পারে; কিন্তু যদি মাতা শিশুর ভার লইতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে বিবেচনা অনুসারে জন্মদাতা বা অন্য কোন ব্যক্তি অভিভাবকত্বের পদে নিযুক্ত হন। পিতামাতা আইনতঃ ষোল বৎসর বয়সের নিম্নস্থ বা আঠার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সন্তানের সম্পূর্ণ ভার লইতে বাধ্য। যদি শিশু আঠার বৎসর বয়সের মধ্যে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে সমর্থ না হয় এবং যদি পিতা-মাতা শিশুকে অতিরিক্ত শিক্ষা দিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে পিতামাতা আইনতঃ সে ভার লইতে বাধ্য। পিতা-মাতার আর্থিক সচ্ছলতার অনুযায়ী সচ্ছলতা শিশু ভোগ করিবার অধিকারী; কিন্তু যদি পিতা ও মাতা একসঙ্গে বাস না করেন এবং তাঁহাদের দু-জনের অবস্থা ও সঙ্গতি সমান না হয়, তাহা হইলে শিশুর নির্দ্দিষ্ট ব্যয় আদালত ধার্য্য করিয়া দিবেন। পিতা শিশুর জন্মের প্রাক্কালে ও পরেও মাতার সমস্ত খরচ জোগাইতে বাধ্য।"

আইনে অবৈধ সন্তান সম্বন্ধে একটি বিশেষ ধারা আছে, যাহার সাহায্যে শিশুর সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য একজন বিশেষ লোক নিযুক্ত করা হয়। তিনি মাতার স্থান অধিকার করেন না; কিন্তু মাতাকে উপযুক্ত পরামর্শ দেওয়া ও শিশুর উপযুক্ত স্বার্থরক্ষা করা, শিশুপ্রতিপালনের



ষ্টকহলমে ষ্টাডিয়মে শিশুদের বাৎসরিক উৎসব

বায় যথারীতি আসিতেছে কি-না তাহা দেখা তাঁহার বিশেষ কর্ত্তব্য। এই ব্যক্তি শিশুমঙ্গল সমিতির দ্বারা নিযুক্ত হন। শিশুর আঠার বৎসর বয়স উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হয় না। কিন্তু শিশুমঙ্গল সমিতি প্রয়োজন বোধ করিলে শিশুর আঠার বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে মুক্তি দিতে পারেন। অবৈধ ভাবে শিশুর জন্ম হইলেই শিশুমঙ্গল সমিতিকে খবর দিতে হয়—যাহাতে সেই সময় হইতে উপযুক্ত লোক শিশুকে দেখিবার জন্য নিযুক্ত করা যাইতে পারে। এই পদে যাঁহারা নিযুক্ত হন তাঁহারা সাধারণতঃ কোন বেতন লন না। কিন্তু বেতন দেওয়া আবশ্যক হইলে সমাজ তাহা বহন করিতে বাধ্য।

অবৈধ সন্তানের জন্মগ্রহণের পরেই শিশুর প্রতিপালন-সম্পর্কীয় বিষয়ে সম্মতি-পত্র লেখা হয়। এই সম্মতি-পত্র নিযুক্ত অভিভাবক ও শিশুমঙ্গল সমিতি দ্বারা অনুমোদিত হয়। তারপর আদালতের নির্দ্দেশ অনুসারে ইহাকে কার্য্যে পরিণত করা হয়। এই সম্মতি-পত্রে শিশুর জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ ধার্য্য করা হয়। শিশুমঙ্গল সমিতি ঐ অর্থ হাতে রাখেন এবং প্রয়োজন-মত শিশুর জন্য খরচ করেন। পিতৃত্বস্বীকৃতি ঐ সম্মতি-পত্রে দাখিল করা হয় এবং তাহাতে মাতার সম্মতিজ্ঞাপক স্বাক্ষর লেখাইয়া লওয়া হয়।

যদি পিতৃত্বস্বীকৃতি এবং সন্তানের ব্যয়ভার বহন সম্পর্কীয় বিষয় সহজভাবে মীমাংসা না হয়, তাহা হইলে আদালত বিচারের ভার গ্রহণ করেন। আদালতে শপথ করিয়া যদি পিতা সন্তানের জন্মদাতা বলিয়া স্বীকার না করেন, অথচ যদি মাতার সাক্ষ্যকে আদালত বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে কার্য্যকারণ সাক্ষ্য লইয়া আদালত উক্ত ব্যক্তির উপর পিতৃত্বের দায়িত্ব চাপাইতে পারেন এবং ঐ ব্যক্তি শিশুর ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য। এই স্থলে আত্মসমর্থনকারী ব্যক্তি যদি শিশুর মাতার অন্য কোনরূপ দোষ আরোপ করে, তাহা হইলেও শিশুর ব্যয়ভারের দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গভর্ণমেণ্ট আইনতঃ শিশুমঙ্গল কার্য্যের ভার লইয়া থাকিলেও জনসাধারণের চেষ্টা ও মনোযোগ এই বিষয়ে তাহাদের এত উন্নতির মূল কারণ। শিশু ও মাতৃ মঙ্গলকার্য্যে জনসাধারণ যথেষ্ট দান করিয়া



শীতকালে স্কি খেলার উদ্দেশ্যে শিশুদের পার্ব্বত্য প্রদেশে যাত্রা

থাকে। নিম্নে শিশু-মৃত্যুর হার তুলিয়া দিতেছি। তাহা হইতে শিশুমঙ্গল কার্য্যের ফল সহজেই বুঝা যাইবে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের গণনায় শিশুমৃত্যুর হার হাজারকরা ৩৩·১৫; ১৯২০ খৃষ্টাব্দের গণনায় দেখা যায় যে, হাজারকরা ১০·০৮-এ দাঁড়াইয়াছে; আবার ১৯২২ সালের গণনায় দেখা যায় যে, তাহা নামিয়া হাজার-করা ৮-এ আসিয়াছে।

শিশুমঙ্গল সমিতির উদ্যোগে দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই দুগ্ধবিতরণ কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। গরিব ও রুগ্ন পিতামাতাদিগকে অল্প খরচে ও বিনা আয়াসে দুধ পাইতে সাহায্য করা দুগ্ধবিতরণ সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য; বিশেষ করিয়া মাতার অসুস্থতাবশতঃ যে-সকল শিশু স্তন্যদুগ্ধ হইতে বঞ্চিত হয় সে সকল শিশুর জন্য। প্রয়োজন-মত এই সকল বিতরণী সভা শিশুখাদ্যও সরবরাহ করিয়া থাকে। এই সকল কেন্দ্র দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই স্থাপিত হইতেছে এবং তাহা চালাইবার জন্য যে বিপুল অর্থ-ব্যয় হয় তাহার অধিকাংশই বদান্য ব্যক্তিদের দানের দ্বারা নির্ব্বাহিত হয় ও বাকী জনসাধারণ বহন করিয়া থাকে। তদুপরি অনেক স্থানেই এক একটি করিয়া শিশু ও শিশু মাতৃগৃহ স্থাপিত হইয়াছে। অবিবাহিতা মাতাদিগকে শিশুসন্তানসহ থাকিতে সুযোগ দেওয়া এই শিশুগৃহ স্থাপনের উদ্দেশ্য। সেই সময় মাতারা যাহাতে আপন সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত করিয়া তুলিতে পারে সে রকম সকল বন্দোবস্ত ও সুযোগ আছে। সুইডেনের প্রধান শহর ষ্টকহলমে ১৮৫৪ সালে সর্ব্বপ্রথম শিশুগৃহ স্থাপিত হয়। আমার ঐ গৃহটি পরিদর্শন করিবার সুযোগ হইয়াছিল। সেখানে ও অন্য সকল শিশুগৃহে কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষার বিপুল ব্যবস্থা আছে, যাহা দ্বারা শিশুরা শৈশব উপযোগী শিক্ষা পাইতে পারে।



যে-সকল বালক-বালিকার গৃহে বিদ্যালয়ের সময়ের বাহিরে দেখিবার মত কেহ নাই, তাহাদের জন্য শিশু কর্ম্মাগার হইয়াছে। শিশুমঙ্গল সমিতির তত্ত্বাবধানে এই সকল কর্ম্মাগার পরিচালিত হয় এবং সেখানে বেতের কাজ, কাগজের কাজ, কাঠের কাজ, ধাতুর কাজ, দর্জ্জীর কাজ, সেলাইয়ের কাজ ইত্যাদি শেখান হয়। ঘর পরিষ্কার করা, ধোয়া প্রভৃতি গৃহকর্ম্ম সকলকেই করিতে হয়। অনেকগুলি কর্ম্মালয়ে রান্না শিখাইবার উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে। যে-সকল শিশু খুব গরিব, তাহারা বিনা খরচে কর্ম্মালয়ে খাদ্য পায়। সময় সময় এই সকল কর্ম্মালয় হইতে ছেলেমেয়েদিগকে বাড়ির জন্য কাজ দেওয়া হয়। সেই জন্য তাহারা উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইয়া থাকে।

যে-সকল ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ভাল নয় এবং পিতা মাতা বা অভিভাবক অতিরিক্ত অথচ প্রয়োজনীয় যত্ন করিতে অসমর্থ, তাহাদের জন্য বিনা খরচে খাবার ব্যবস্থা সর্ব্বত্রই আছে। সাধারণতঃ স্থানীয় অধিবাসীরা তাহাদিগকে খাওয়াইবার ভার লইয়া থাকে। এই প্রকার ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য শিশুরা যাহাতে সবল হইয়া শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে। স্থানে স্থানে ঐ প্রকার শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যকর দ্বীপের উপর শিশু-উপনিবেশ আছে। ঐ সকল ঔপনিবেশিক বিদ্যালয় শিক্ষানীতিবিদ্‌গণ দ্বারা চালিত হয়। তাহা দেখিবার মত জিনিষ।

শিশুস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য উপরোক্ত যে-সকল উপনিবেশ আছে, সেইগুলিতে সাধারণ বিদ্যালয়ের মত রুটিনমাফিক নিয়মে কাজ করান হয় না। গৃহের সমস্ত কর্ম্ম শিশুরা নিজেরাই করে। ষ্টকহলমের পার্শ্ববর্ত্তী এক শিশু-উপনিবেশের পরিচালকের মুখে শুনিয়াছি যে, এই প্রকার শিক্ষাদান-প্রণালীর ফল অতিশয় সন্তোষজনক। মুক্ত হাওয়ায় ও ঠিক আপন গৃহের আবহাওয়ায় এই ভাবে বর্দ্ধিত শিশুদের স্বাস্থ্য যে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে তাহা নহে, পরন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা থাকার অভ্যাস, আত্ম-নির্ভরতার ইচ্ছা, এমন কি সাধারণ শিক্ষায়ও তাহাদের উন্নতি লক্ষিত হয়।

উপরোক্ত ব্যবস্থা ছাড়াও যাহাতে ঐ সকল শিশুরা গ্রীষ্মের ছুটি উপভোগ করিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা আছে। ছুটির সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে কোনো পরিবারের অতিথি হিসাবে তাহাদিগকে পাঠানো হয়—যাহাতে গৃহসুখ ও মমতা হইতেও শিশুরা বঞ্চিত না হয়। রেল কোম্পানী অল্প ভাড়ায় বা বিনা ভাড়ায় শিশুদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করে।

শিশু স্বাস্থ্যসমিতির তত্ত্বাবধানে কতকগুলি শিশু হোটেল আছে। যে-সকল শিশু পিতামাতা বা অভিভাবকের আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য বিপদে পড়িয়াছে, তাহাদিগকে সময়বিশেষের জন্য এই সকল হোটেলে আনিয়া তাহাদের যত্ন করা হয়।

শিশুগৃহগুলি স্থান ও অবস্থাভেদে ছোটবড় নানা আকারের। পূর্ব্বে শিশুগৃহ ও বিদ্যালয় একসঙ্গে জড়িত ছিল। এখন তাহা ভাঙিয়া ক্রমশঃ পারিবারিক নিয়মে ছোট ছোট করিয়া গৃহগুলি নির্ম্মিত হইতেছে

আত্মীয়স্বজনবিহীন শিশুরা বিদ্যালয়ে শিক্ষা সম্পূর্ণ করার পর যাহাতে কুসংসর্গে না পড়ে সেজন্য শিশু ক্লাব বা সমিতি আছে। বালিকাদের জন্য গৃহকর্ম্ম শিখাইবার বিদ্যালয় আছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্তির পর বালিকারা যাহাতে অসৎ উদ্দেশ্যে না চালিত হয়, সে জন্য কন্যাগৃহ আছে; এই সকল কন্যাগৃহের ব্যবস্থা মেয়েদের উপযোগী, কিন্তু কতকটা ছেলেদের মত। বালক বালিকাদিগকে কুসংসর্গ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সমিতি আছে। এই সমিতিকে হোয়াইট রিবন য়ুনিয়ন (White Ribbon Union) বলা হয়। অসুস্থ দরিদ্র ব্যক্তি-দিগকে সাহায্য করিবার জন্য পৃথক সমিতি আছে। এই সমিতির হাসপাতালের অধীনে অনেক শিক্ষিত নার্স আছেন যাঁহারা প্রয়োজন-মত অসুস্থ ব্যক্তির গৃহে গিয়া শুশ্রূষা করেন বা গৃহের আবহাওয়া রোগীর স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রতিকূল বুঝিলে হাসপাতালে পাঠাইয়া শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেন।

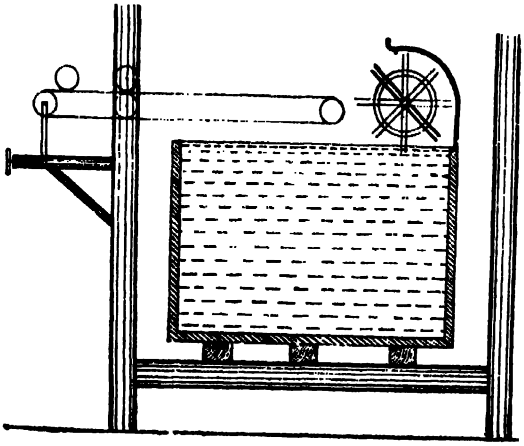
ইহা ছাড়া বোম্বাই প্রদেশে একটি, পঞ্জাবে একটি এবং ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে একটি মিল আপাততঃ বন্ধ আছে। অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহাদের প্রায় প্রত্যেকটি মিলই টাকা পয়সা কিংবা সুযোগ্য পরিচালনার অভাবে এমতাবস্থায় আছে। আশা করা যাইতেছে যে, পঞ্জাবের মিলটি শীঘ্রই পুনর্গঠিত হইয়া কাগজ তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিবে।

যদিও উপরি উক্ত হিসাব অনুসারে আমাদের দেশের এই ২০টি কলে ৪৫,৬০০ টন্ কাগজ তৈয়ার হইতে পারে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইয়া উঠে না। কারণ টিটাগড়, বেঙ্গল এবং ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প কোম্পানী ব্যতীত অন্য সমুদয় মিলই বার্ষিক উৎপাদন করিবার ক্ষমতা অনুযায়ী কাগজ তৈয়ার করিতে সমর্থ হয় না। ভারতীয় সমুদয় মিলে ১৯২৪-২৫ সাল হইতে কোন্ কাগজ কত টন্ তৈয়ার হইয়াছে নিম্নে বর্ষ অনুসারে তাহার একটা তালিকা দেওয়া গেল।

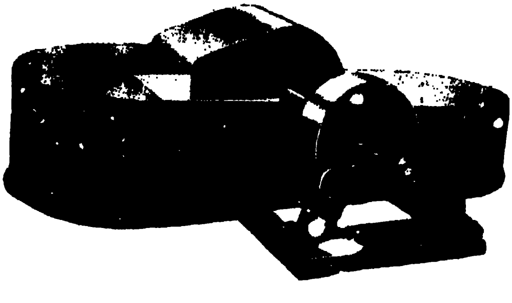
২ নং তালিকা

বৎসর	ছাপিবার কাগজ	লিখিবার কাগজ	বাদামী	প্যাকিং কাগজ	মোট
১৯২৪-২৫	১৫,১৪০	৫,০২১	৩,১৭০	২,৫৪৮	২৫,৮৭৯
১৯২৫-২৬	১৫,৭৩৬	৫,৮০৩	৩,১৫০	২,৩২৩	২৭,০১২
১৯২৬-২৭	১৬,৭৩৮	৭,২৩৮	৩,৭৬৫	২,৩১৮	৩০,০৫৯
১৯২৭-২৮	১৮,১০১	৮,৪২৪	৩,৯৬৬	২,৪৩৮	৩২,৯২৯
১৯২৮-২৯	১৯,৯৪১	৯,১৪৩	৪,৫১৫	২,৬৫৫	৩৬,২৫৪
১৯২৯-৩০	১৯,৯৯১	৯,৩৪১	৪,১৫৯	২,৫৭৪	৩৬,০৬৫
১৯৩০-৩১	২১,০০৯	৯,৮৪০	৪,০১৮	১,৯২৪	৩৬,৭৯১
মোট	১২৬,৬৫৬	৫৪,৮১০	২৬,৭৪৩	১৬,৭৮০	২২৪,৯৮৯

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই শিক্ষা এবং উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কাগজের খরচ বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু সেই তুলনায় আমাদের দেশী মিলে তৈয়ারি কাগজের পরিমাণ সম্যক বর্দ্ধিত হইতেছে না। কাজেকাজেই প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে অধিকতর পরিমাণে কাগজ আমদানী হইতেছে;



লুই রোবেয়ার নির্ম্মিত কাগজ-কলের নমুনা



'হলেণ্ডার বিটার' বা পেষাই যন্ত্র

নিম্নোদ্ধৃত তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলেই ইহা প্রতীয়মান হইবে। এই তালিকায় আরও দেখান যাইতেছে যে, যত

কাগজ আমাদের দেশে ব্যবহৃত হয় তাহার শতকরা প্রায় এক-চতুর্থাংশেরও কম কাগজ মাত্র আমাদের দেশী মিলে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং গত সাত বৎসর হইতে বিদেশী কাগজের উপর টন্-প্রতি ১৪০ টাকা রক্ষণ-শুল্কের ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও আমদানী কাগজের তুলনায় আমাদের স্বদেশীয় কাগজের পরিমাণ প্রায় আগের মতই আছে।

৩ নং তালিকা

	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১
আমদানী কাগজের পরিমাণ (টন্)	৮৪,৯৪৩	৮৭,৪১৪	১০০,৭১৯	১০৪,৪৫০	১১৫,৬২৯	১৩৭,০১৮	১১৪,৬৯০
দেশীয় মিলে উৎপন্ন কাগজের পরিমাণ (টন্)	২৭,০২০	২৮,২২১	৩১,৩৭২	৩৪,৬৭৮	৩৮,২২২	৩৮,৬০৯	৩৯,৫৮৭
মোট	১১১,৯৬৩	১১১,৬৩৫	১৩২,০৯১	১,৩৯,১২৮	১৫৩,৮৫১	১৭৫,৬২৭	১৫৪,২৭৭
১৯২৪-২৫ সালের তুলনায় কাগজ খরচ কত বৃদ্ধি পাইয়াছে	—	৩·৩১%	১৭·৯৮%	২৪·২৬%	৩৭·৪%	৫৬·৮৬%	৩৭·৭৯%
ভারতে ব্যবহৃত কাগজের শতকরা কত অংশ ভারতে প্রস্তুত হইয়াছে	২৪·১৩	২৪·৪০	২৩·৯৮	২৪·৯২	২৪·৮৩	২১·৯৮	২৫·৬৬

২ নং এবং ৩ নং তালিকায় দেশীয় মিলে উৎপন্ন কাগজের পরিমাণে কিঞ্চিৎ অনৈক্য লক্ষিত হইবে। তাহার কারণ ২ নং তালিকায় ডেকান পেপার মিলের কাগজ এবং ব্লটিং ও অন্যান্য কাগজ যাহা অল্প পরিমাণে হইয়া থাকে তাহা ধরা হয় নাই।

যদিও কাগজের কলের অতি প্রথম যুগেই ডনকিন দ্বারা প্রস্তুত একটি কাগজের কল বিলাত হইতে শ্রীরামপুরে প্রেরিত হইয়াছিল তথাপি অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের কাগজ-শিল্পের অবস্থা আজ অতি শোচনীয়। দেশীয় কাগজের কলগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য রক্ষণ-শুল্কের ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও আশানুরূপ উন্নতি হইতেছে না। ইহার কারণ খুঁজিয়া দেখিতে গেলে প্রধানতঃ লক্ষিত হয় যে, আমাদের কলগুলির দৈনিক কাগজ প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা বিদেশীয় কলের তুলনায় অতি সামান্য—প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। অথচ এই সমুদয় কল চালাইবার জন্য প্রায় প্রত্যেক মিলই বিদেশ হইতে অত্যধিক বেতনে লোক আনাইয়া থাকে। দ্বিতীয় কারণ, সাবাই ঘাস যাহা আমাদের দেশীয় মিলে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয় তাহা মিলে আনাইবার খরচ অত্যধিক। আট আনা মূল্যের ঘাস মিলে আনিতে ভাড়া বাবদ প্রায় এক টাকা রেল কোম্পানীকেই দিতে হয়। গত ১৯২৫ সালের টেরিফ বোর্ড কর্তৃক দেখান হইয়াছিল যে, সাবাই ঘাসের উৎপত্তি-স্থানের কাছাকাছি অর্থাৎ পঞ্জাবে যদি একটি মিল স্থাপিত হয় তাহা হইলে উহা বিলক্ষণ লাভের সহিত চলিতে পারে। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেল যে, যদিও ইহাতে ঘাসের মূল্য তুলনায় কম পড়ে, কিন্তু তাহা পোষাইয়া যায় কয়লার খরচ দিতে, কারণ বাংলা দেশ হইতেই সেখানে কয়লা লইয়া যাইতে হয়। এই সঙ্গে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, এক টন কাগজ তৈয়ার করিতে ঘাস এবং কয়লার তুলনায় কয়লারই বেশী দরকার হয়।

এখন পর্য্যন্ত যদিও বাঁশের মূল্য সাবাই ঘাস হইতে সস্তা তথাপি বাঁশ যে কাগজ তৈয়ার করিবার উপযুক্ত কাঁচা মাল তাহা এখনও নির্ব্বিরোধে প্রমাণিত হয় নাই। এখনও যে ইহার পরীক্ষামূলক অবস্থা চলিতেছে তাহা বলাই বাহুল্য। অবশ্য আশা করা যাইতে পারে যে ভবিষ্যতে

ইহাই ভারতের প্রধান কাগজ করিবার উপাদান হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু ইহাও ঠিক যে যতদিন পর্য্যন্ত মিলগুলি—অন্ততঃ পক্ষে পাল্প মিল, বনের কাছাকাছি না স্থাপিত হয় তত দিন আমাদের দেশের কলের আশানুরূপ উন্নতি হইবে না।

যদিও সাবাই ঘাস এখনও ভারতীয় মিলের কাগজ-উৎপাদনের প্রধান উপকরণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে তথাপি পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে শুধু ঘাস কিংবা বাঁশ হইতে কাগজ তৈয়ার করিলে তাহা সন্তোষজনক হয় না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য আমাদের মিল-গুলিতে প্রচুর পরিমাণে বিদেশ হইতে 'উড পাল্প' আমদানী হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত ছেঁড়া নেকড়া, শণ ইত্যাদিও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। উড পাল্প ব্যবহার করিবার সুবিধা এই যে ইহাকে বাষ্প ও রাসায়নিক পদার্থ সংযোগে নরম করিবার জন্য কোনও প্রতিক্রিয়ার আবশ্যক হয় না, কাজেই অতি সহজে এবং অল্প সময়ে ইহা হইতে কাগজ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। নিম্নলিখিত তালিকায় চারিটি মিল ১৯২৪-২৫ এবং ১৯৩০-৩১ সালে কি পরিমাণ কাঁচা মাল কত ব্যবহার করিয়াছিল তাহা দেওয়া গেল।

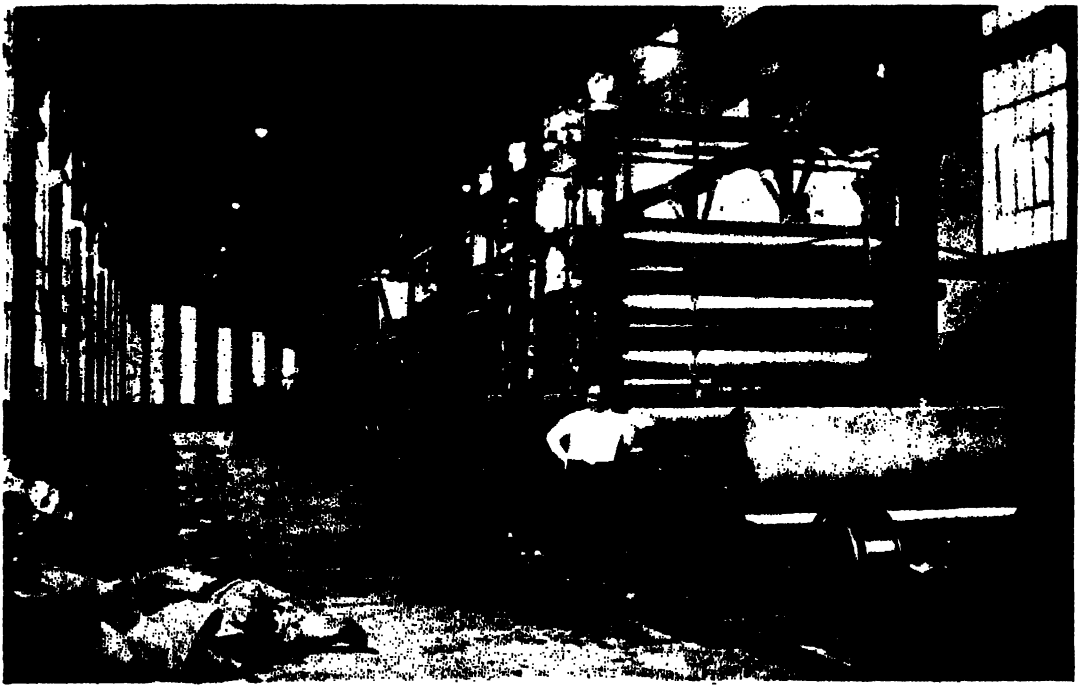
৪ নং তালিকা

—	বাঁশের পরিমাণ (টন্)	শতকরা পরিমাণ	ঘাসের পরিমাণ (টন্)	শতকরা পরিমাণ	অন্যান্য জিনিষ (টন্)	শতকরা পরিমাণ	উড পাল্প (টন্)	শতকরা পরিমাণ
১৯২৪—২৫								
টিটাগড় পেপার মিল	০·৬৩	—	৫,৬৮৬	৩৬·৫৫	৩,১৪৭	২৬·৭০	৫,৭১৫	৩৬·৭৫
বেঙ্গল পেপার মিল	—	—	২,৬২৬	৪১·৩৬	১,৯৯৮	৩১·৪৭	১,৭২৫	২৭·১৭
ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প কোং	১,৯৪৩	৭৬·৩৫	—	—	৬৭	২·৬৩	৫৩৫	২১·০২
আপার ইণ্ডিয়া কুপার মিল	—	—	৪০৭	২৩·৯২	১,২৯৪	৭৬·০৮	—	—
১৯৩০—৩১								
টিটাগড় পেপার মিল	১,৮৪২	৯·৫৬	৫,৪৮৭	২৮·৪৯	৩,৪০৯	১৭·৭০	৮,৫২২	৪৪·২৫
বেঙ্গল পেপার মিল	১৬	০·১৭	২,৯১৮	৩১·৬৫	১,৪৮৩	১৬·১২	৪,৮০১	৫২·০৬
ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প কোং	১,৮৭৬	৩০·৩২	—	—	৪১১	৬·৬৪	৩,৯০১	৬৩·০৪
আপার ইণ্ডিয়া কুপার মিল	—	—	৪০৫	১৪·৯৭	১,৯৯৬	৭৩·৭৬	৩০৫	১১·২৭*

এই দুই বৎসরের হিসাব দেখিলেই বোঝা যাইবে যে ভারতীয় মিলে বিদেশীয় উড পাল্পের চলন কিরূপ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার কারণ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই খানিকটা আভাস দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ উড পাল্প হইতে স্বল্প আয়াসে কাগজ করিবার সুবিধা। এখানে ইহাও বলা যাইতে পারে যে গত কয়েক বৎসরে উড পাল্পের মূল্য আশাতীত ভাবে হ্রাস পাইয়াছে। ১৯২৬-২৭ সালে যাহা ২২৭ টাকায় বিক্রয় হইত তাহা আজকালে ১৪০ টাকায় নামিয়াছে এবং আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে আরও হ্রাস পাইবে।

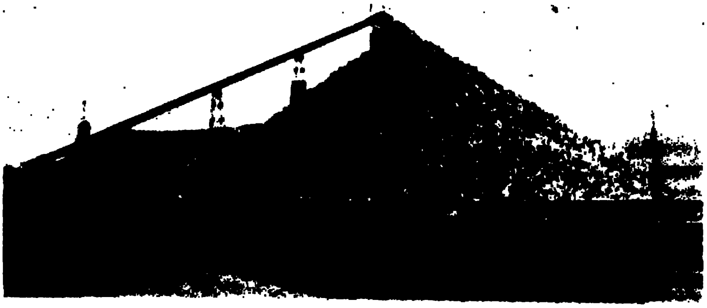
টিটাগড়, বেঙ্গল এবং ইণ্ডিয়া পেপার মিলে গত ১৯২৪-২৫ সালে যে-পরিমাণ কয়লা ব্যবহৃত হইত তাহার

*এই তালিকার অন্যান্য জিনিষের মধ্যে ছেঁড়া নেকড়া, শণ এবং ছেঁড়া কাগজ ইত্যাদি ধরা হইয়াছে।



একটি আধুনিক কাগজের কল

মূল্য গড়ে টন-প্রতি ৯৸৵০ স্থলে আজকাল গড়ে মাত্র ৫।৶১৫ পড়িতেছে। প্রত্যেক টন কাগজ তৈয়ার করিতে ৩·৬৫ টন করিয়া কয়লার দরকার হয় ধরিয়া লইলে, বৎসরে যে এক-একটি মিলের ইহাতে অনেক লক্ষ্য টাকা উদ্বৃত হয় তাহা বলাই বাহুল্য।

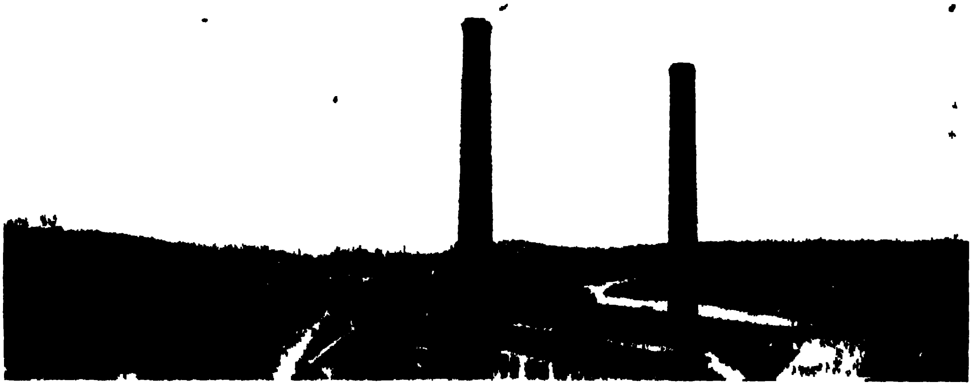


মিলে কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্য কাঠের স্তূপ

সর্ব্বোপরি গত সাত বৎসর হইতে ভারতীয় কাগজ-কলের উন্নতির জন্ত রক্ষণ-শুল্কের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং তাহার জন্ত বিদেশ হইতে আমদানী কাগজের উপর টন-প্রতি ১৪০ টাকা শুল্ক বসান হইয়াছে।* এই আইন আরও সাত বৎসর বলবৎ থাকিবে।

সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে স্বতঃই মনে হইবে যে নূতন মিল স্থাপন করিয়া কাগজ-শিল্পের উন্নতি করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট সময়। এক্ষণে দেখা যাক যে উপস্থিত ক্ষেত্রে কি উপায়ে এই শিল্পের উন্নতি করা যাইতে পারে। অনেকেরই হয়ত ধারণা যে আজকাল একট আধুনিক কাগজের কল করিতে অনেক লক্ষ টাকার দরকার। কিন্তু যদি বিদেশ হইতে উড পাল্প আমদানী করিয়া এখানে কাগজ করিবার বন্দোবস্ত করা যায় তাহা হইলে স্বল্পমূল্যের একট মিল করিতে খুব

* Paper containing 65% or more mechanical wood pulp are admitted duty free.



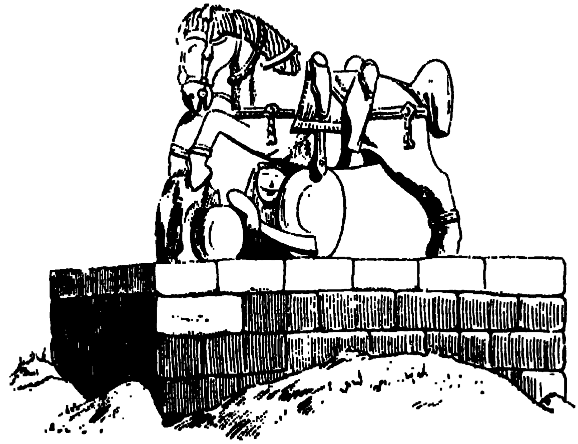
কাগজের মিল। ইহার দশটি কলে প্রত্যহ এক হাজার টন্ কাগজ তৈয়ার হয়

বেশী টাকার দরকার হয় না। এই ধরণের একটি ছোট মিল করিতে আনুমানিক কি খরচ হইতে পারে নিম্নে তাহার একটি তালিকা দিতেছি—

কাগজের কল বাবদ	৭৫,০০০ টাকা
অন্যান্য সরঞ্জাম (টারবাইন, বয়লার, নলকূপ ইত্যাদি)	১,২৫,০০০
শুল্ক এবং কল স্থাপন করিবার খরচ ইত্যাদি	৫০,০০০
উড পাল্প আমদানী বাবদ	৫০,০০০
জমি এবং কারখানা	৭৫,০০০
মিল চালাইবার খরচ বাবদ	১,২৫,০০০ ঐ
মোট	৫,০০,০০০ টাকা

বৎসরে এই কল হইতে ৯০০ টন কাগজ তৈয়ার হইবে এবং তাহার মূল্য ৪৬০ টন হিসাবে ৪,১৪,০০০ টাকা। উড পাল্প আমদানী করিবার খরচ ২২৫ টাকার বেশী লাগিবে না* এবং তাহা হইতে কাগজ করিতে টন্-প্রতি আরও ৭৫ টাকা পড়িবে অর্থাৎ মোট ৩০০ টাকা। কাগজ বিক্রয় করিবার কমিশন ও অন্যান্য খরচ বাবদ টন-প্রতি আরও ৬০ টাকা ধরিলে বৎসরে ৯০০ টনে মোট ৯০,০০০ টাকা লাভ হয়।

* উড পাল্পের দাম ব্যতীত টন-প্রতি আরও ৪৫ টাকা শুল্ক এবং শতকরা ২৫ টাকা surcharge বেশী পড়িবে।



ভণ্ডুলমামার বাড়ি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায

পাড়াগাঁয়ের মাইনর স্কুল। মাঝে মাঝে ভিজিট্ করতে আসি, আর কোথাও থাকবার জায়গা নেই, হেড্মাষ্টার অবিনাশবাবুর ওখানেই উঠতে হয়। অবিনাশবাবুকে লাগেও ভাল, বছর বিয়াল্লিশ বয়েস, একহারা চেহারা, বেশ ভাবুক লোক। বেশী গোলমাল ঝঞ্ঝাট পছন্দ করেন না, কাজেই জীবনের পথে বাধা ঠেলে অগ্রসর না হ'তে পেরে দেবলহাটি মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে পনেরো বছর কাটিয়ে দিলেন এবং বাকী পনেরো৷টা বছর যে এখানেই কাটাবেন তার সম্ভাবনা ষোলো আনার ওপরে সতেরো আনা।

কার্ত্তিক মাসের শেষ, হেমন্ত সন্ধ্যা। স্কুলের বারান্দাতে ক্লাস-রুমের দুখানা চেয়ার টেনে নিয়ে আমরা গল্প করছিলাম। সামনে একটা ছোট মাঠ, একপাশে একটা বড় তুঁত গাছ, আর এক পাশে একটা মজা পুকুর। সামনের কাঁচা রাস্তাটা গ্রামের বাজারের দিকে চলে গিয়েচে, স্থানটা নির্জ্জন।

চায়ের কোন ব্যবস্থা এখানে হওয়া সম্ভব নয়, তা জানি। একটি গরিব ছাত্র হেডমাষ্টারের বাসায় থেকে পড়ে আর তাঁর হাটবাজার করে। সে এসে দুটো রেকাবিতে ঘি-মাখানো রুটি, আলুচচ্চড়ি ও একটু গুড় রেখে গেল। আমি বল্লুম—অবিনাশবাবু, বেশ ঠাণ্ডা পড়েচে—বেশ গরম মুড়ি খাবার ইচ্ছে হচ্চে, কিন্তু···

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—সার্টেন্লি—ওরে ও কানাই, শোন্, শোন্, যা দিকি একবার গজার বৌয়ের বাড়ি, আমার নাম ক'রে বলগে দুটি গরম মুড়ি ভেজে দ্যায়—এক্ষুণি···

আমি বল্লুম—কুঞ্জবে চাল ভাজা···

তারপরে গল্পগুজবে আধঘণ্টা কেটে গেল। অবিনাশবাবু কথা বলতে বলতে কেমন অন্যমনস্কভাবে মাঝে মাঝে ঐ-ধারের মজা পুকুরটার দিকে চাইছিলেন। হঠাৎ বললেন—মুড়ি আসছে, একটা গল্প বলি শুনুন, ইন্সপেক্টরবাবু। এই রকম শীতের সন্ধ্যাতেই কথাটা মনে পড়ে। আপনাকে পেয়ে মনে এত আনন্দ হয়।··· এখানকার লোকজন দেখচেন তো? সব দোকানদার, লেখাপড়ার কোন চর্চ্চা নেই, ছেলেপিলেকে লেখাপড়া শেখায় এইজন্যে যে কোনো রকমে ধারাপাত আর শুভঙ্করীটা শেষ করাতে পারলেই দাঁড়ি ধরাবে। কারুর সঙ্গে কথা ব'লে সুখ পাইনে, ক্ষালমশলার দরের কথা কাঁহাতক আলোচনা করি বলুন। ভদ্রঘরের ছেলে, না-হয় এসে প'ড়েচি পেটের দায়ে এই পাণ্ডববর্জ্জিত দেশে, কিন্তু তা বলে মনটা তো—কলেজের দু-চার ক্লাস চোখে দেখেছিলামও তো—পড়াশুনো না-হয় নাই করেচি···

দেখলাম অবিনাশবাবু কলেজের দিনগুলোর কথা এখনও ভুলতে পারেন নি। বেচারীর জীবনে জাঁকজমক নেই, আত্মপ্রতিষ্ঠার দুরাশা নেই, সে সাহসও বোধ করি নেই। তাঁর যা-কিছু অভিজ্ঞতা, যা-কিছু কর্ম্মনৈপুণ্য, সবই এই অনাড়ম্বর সরল জীবনধারাকে আশ্রয় ক'রে। কলেজের দিনগুলোতেই শহরের মুখ দেখেছিলেন, আড়ম্বর বা বিলাসিতা—মনেরই বলুন বা দেহেরই বলুন—ঐ কলেজের ক'টা বছরেই তার আরম্ভ ও শেষ। সে দিনগুলো যত দূরে গিয়ে পড়চে, অতীন স্মৃতির প্রলেপ তাদের ওপর যে তত বিচিত্র ও মোহময় হয়ে পড়বে এটা খুব স্বাভাবিক বটে।

অবিনাশবাবু তামাক ধরিয়ে আমার হাতে দিয়ে আবার বলতে সুরু করলেন।

—হুগলী জেলার কোনো এক গ্রামে ছিল আমার মামার বাড়ি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—ছিল কেন? এখন নেই?

—সে কথা পরে বলচি। না, এখন নেই ধরে নিতে পারেন। কেন যে নেই, তার সঙ্গে এই গল্পের একটা সম্বন্ধ আছে, গল্পটা শুনলেই বুঝবেন।

হুগলী জেলার কোনো এক গ্রামে আমার মামার বাড়ি ছিল। ছেলেবেলায় যখন সর্ব্বপ্রথম মায়ের সঙ্গে সেখানে যাই, তখন আমার বয়েস বছর পাঁচেক। আমাদের মামার বাড়ির পাড়ায় আট নয় ঘর ব্রাহ্মণের বাস, ঘেঁষাঘেঁষি বসতি, এক চালে আগুন লাগলে পাড়া-সুদ্ধ পুড়ে যায়, এমন অবস্থা। কোঠাবাড়ি ছিল কেবল আমার মামাদের, আর সব খড়ের ছাউনি, ছোট-বড় আটচালা ঘর। এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া যাবার পথে একটা বড় আম কাঁঠালের বাগান, বনজঙ্গল, সজনে গাছ ও দু-একটা ডোবা। বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অনেকদূর গেলে তবে ও-পাড়ার প্রথম বাড়িটা। সেই বনজঙ্গলের মধ্যে কাদের একটা কোঠাবাড়ি খানিকটা গাঁথা হচ্চে।

সে-বার কিছুদিন থেকে চলে আসবার পর আবার যখন মামার বাড়ি গেলুম, তখন আমার বয়স আট বছর। গ্রামটা অনেক দিন পরে দেখতে বেরিয়ে চোখে পড়ল, এ-পাড়া ও ও-পাড়ার মধ্যে বাঁ-দিকে ডোবার ধারের একটা জায়গা। একটু অবাক হয়ে গেলাম। ডোবার পাড়ের জঙ্গল অনেকটা কাটানো, কাদের একটা কোঠাবাড়ি খানিকটা গাঁথা অবস্থায় দাঁড়িয়ে, কিন্তু মনে হ'ল অনেক দিন গাঁথুনির কাজ বন্ধ আছে, যে-জন্যই হোক, কারণ, ভিতের গায়ে ও ঘরের মেজেতে ছোট-বড় কাঁটশেওড়ার গাছ গজিয়েচে, চুণ-সুরকী মাখার ছোট খানাতে পর্য্যন্ত বনমূলোর চারা। মনে পড়ল, সে-বার এসে বাড়িটা গাঁথা হচ্চে দেখেছিলুম; এখনও গাঁথা শেষ হয়নি তো? কারা বাড়ি তুলচে?

ছুটে গিয়ে দিদিমাকে জিজ্ঞেস করলুম।

—কারা ওখানে বাড়ি করচে দিদিমা, সে-বার এসে দেখে গিইচি, এখনও শেষ হয়নি?

—তোর এত কথাও মনে আছে।...ও তোর ভণ্ডুলমামা বাড়ি করচে...এখানে তো থাকে না, তাই দেখাশোনার অভাবে গাঁথুনি এগুচ্চে না।

আমার ভারী কৌতূহল হ'ল, সাগ্রহে বললুম—ভণ্ডুলমামা কোথায় থাকে দিদিমা? ভণ্ডুলমামা কে?...

—ভণ্ডুল রেলে চাকরি করে, লালমণিরহাটে না কোথায়। আমাদের গাঁয়েই ছেলেবেলায় থাকত, বাড়িঘর তো ছিল না। ও-পাড়ায় মুখুয্যে-বাড়ির ভাগ্নে, এখন চাকরিবাকরি করচে, ছেলেপুলে হয়েচে, একটা আস্তানা তো চাই? তাই টাকা পাঠিয়ে দ্যায়, মুখুয্যেরা মিস্ত্রী লাগিয়ে ঘরদোর সুরু ক'রে দিয়েচে, নিজে ছুটিতে এসে মাঝে মাঝে দেখাশুনো করে...

আমি ছাড়বার পাত্র নই, বললুম—তবে বাড়ি গাঁথা হচ্চে না কেন? মুখুয্যেরা তো দেখলেই পারে?

—তা নয়, সব সময় তো টাকা পাঠাতে পারে না? যখন পাঠায়, তখন মিস্ত্রী লাগানো হয়।

কি জানি কেন, সেই থেকে এই ভণ্ডুলমামা ও তাঁর আধ-গাঁথা বাড়িটা আমার মনে একটা অদ্ভুত স্থান অধিকার ক'রে রইল। রূপকথার রাজপুত্রের মতই এই ভণ্ডুলমামা হয়ে রইলেন অবাস্তব, স্পর্শের অতীত, দর্শনের অতীত, এক মানস-রাজ্যের অধিবাসী, তাঁর চাকরির স্থান লালমণিরহাট, মায় তাঁর ছেলেমেয়ে-সুদ্ধ। তাঁর টাকা পাঠাবার ক্ষমতা বা অক্ষমতাও যেন কোথায় আমার ব্যক্তিগত সহানুভূতির বিষয়ীভূত হয়ে দাঁড়াল, অথচ কেন এসব হ'ল তার কোনো ন্যায়সঙ্গত কারণ আজও মনের মধ্যে খুঁজে পাই না।

কতবার দিদিমাদের চিলকোঠার ছাদে শুয়ে দিদিমার মুখে রূপকথা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক মনে ভেবেচি—লালমণিরহাট থেকে ভণ্ডুলমামা আবার কবে টাকা পাঠাবে বাড়ি গাঁথার জন্যে?...না, এবার বোধ হয় নিজে আসবে। মুখুয্যেরা বোধ হয় ভণ্ডুলমামার টাকা চুরি করে, তাই ওদের হাতে আর টাকা দেবে না। বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গল্পের ফাঁকে দিদিমাকে কখনো বা জিগ্যেস্ করি—লালমণিরহাট কোথায় দিদিমা? দিদিমা অবাক হয়ে বলেন—লালমণিরহাট! কেন, তাতে তোর হঠাৎ কি দরকার পড়ল?...তা, কি জানি বাপু কোথায় লালমণিরহাট? নে না, ঘুমুস্ ত আমায় রেহাই দে,—রাত্তিরে এখন গিয়ে আমায় ছুটো মোচা কুটে রাখতে হবে, ঠাকুরঘরের বাসন বের করতে হবে, ছিষ্টির কাজ পড়ে রয়েচে—তোমায় নিয়ে সারা রাত গল্প করলে তো চলবে না আমার?

আমি অপ্রতিভের সুরে বললুম—না দিদিমা, গল্প বল, যেও না, আচ্ছা মন দিয়ে শুনচি।

এর পরে আবার মামার বাড়ি গেলুম বছর দুই পরে। এই দু-বছরের মধ্যে আমি কিন্তু ভণ্ডুলমামার বাড়ির কথা ভুলে যাইনি। শীতের সন্ধ্যায় গোয়ালে সাঁজালের ধোঁয়ায় আমাদের পুকুর পাড়টা ভরে যেত, বনের গাছপালাগুলো যেন অস্পষ্ট, যেন মনে হ'ত সন্ধ্যায় কুয়াসা হয়েচে বুঝি আজ, সেই দিকে চাইলেই আমার অমনি মনে পড়তো ভণ্ডুলমামার সেই আধ-তৈরি কোঠাবাড়িটার কথা—এমনি শেওড়াবনে ঘেরা পুকুর পাড়ে—এতদিনে কতটা গাঁথা হ'ল কে জানে? এতদিন নিশ্চয় ভণ্ডুলমামা মুখুয্যেবাড়ি টাকা পাঠিয়েচে!

মামার বাড়িতে রাতে এসে পৌছলাম। সকালে ঐ পথে বেড়াতে গিয়ে দেখি—ও মা, এ কি, ভণ্ডুলমামার বাড়িটা যেমন তেমনি পড়ে আছে! চার-পাঁচ বছর আগে যতটা গাঁথা দেখে গিয়েছিলুম, গাঁথুনির কাজ তার বেশী আর একটুও এগোয়নি, বনে জঙ্গলে একেবারে ভর্ত্তি, ইটের গাঁথুনির ফাঁকে বট-অশথের বড় বড় চারা! আহা, ভণ্ডুলমামা বোধ হয় টাকা পাঠাতে পারেনি আর!

ভণ্ডুলমামার সম্বন্ধে সে-বার অনেক কথা শুনলুম। ভণ্ডুলমামা লালমণিরহাটে নেই, সান্তাহারে বদলি হয়েচে। তার এখন দুই ছেলে, দুই মেয়ে। বড় ছেলেটি আমারই বয়সী, ভণ্ডুলমামার মা সম্প্রতি মারা গিয়েচে। বড় ছেলেটির পৈতে হবে সামনের চৈত্র মাসে। সেই সময়ে ওরা দেশে আস্‌তে পারে।

কিন্তু সে-বার চৈত্রমাসের অনেক আগেই দেশে ফিরলুম, ভণ্ডুলমামার সঙ্গে দেখার যোগাযোগ হয়ে উঠল না।

বছর তিনেক পরে। দোলের সময়। মামার বাড়ি দোলের মেলা খুব বিখ্যাত, নানা জায়গা থেকে দোকান-পসারের আমদানি হয়। আমি মায়ের কাছে আবদার সুরু করলুম, এবার আমি একা রেলে চড়ে মেলা দেখতে যাব মামার বাড়ি। আমার একা ছেড়ে দিতে বাবার ভয়ানক আপত্তি, অবশেষে অনেক কান্নাকাটির পরে তাঁকে রাজি করানো গেল। সারাপথ সে কি আনন্দ! একা টিকিট ক'রে, রেলে চড়ে, মামার বাড়ি চলেচি। জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম একা বাড়ির বার হয়েচি সেই আনন্দেই সারাপথ আত্মহারা!

কিন্তু এ সুখ সইল না। মামার বাড়ির ষ্টেশনে নেমেই কি রকমে হোঁচট খেয়ে প্লাটফর্ম্মের কাঁকরের উপর পড়ে গিয়ে আমার হাঁটু ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। অতি কষ্টে মামার বাড়ি পৌছে বিছানা নিলুম। পরদিন সকালে উঠতে গিয়ে দেখি আর উঠতে পারিনে—দুই হাঁটুই বেজায় টাটিয়েচে, সঙ্গে সঙ্গে জ্বর। কোথা দিয়ে দোল কেটে গেল টেরও পেলুম না। দিদিমাকে অনুরোধ করলুম, বাড়িতে যেন তাঁরা চিঠি না লেখেন যে আমি আসবার সময় ষ্টেশনে পড়ে গিয়ে হাঁটু কেটে ফেলেছি।

সেরে উঠে বেড়াতে বেরিয়ে একদিন দেখি ভণ্ডুলমামার বাড়িটা অনেক দূর গাঁথা হয়ে গেছে। কাঠ-থামাল পর্য্যন্ত গাঁথা হয়েছে, কিন্তু কড়ি এখনও বসানো হয়নি।

হঠাৎ এত খুশী হয়ে উঠলুম যে আছাড় খেয়ে হাঁটু-কাটার কথা টের পেলে বাবা কি বলবেন, তখনকার মত সে দুশ্চিন্তা মন থেকে মুছে গেল। উৎসাহে ও কৌতূহলে এক দৌড়ে ভণ্ডুলমামার বাড়িতে গিয়ে হাজির। গাঁথুনি অনেক দিন বন্ধ আছে মনে হ'ল, গত বর্ষার পরে বোধ হয় আর মিস্ত্রি আসেনি। ঘরের মেজেতে খুব জঙ্গল গজিয়েচে, গাঁথুনির ফাঁকে ফাঁকে আমরুল শাকের গাছ; বাড়ির উঠোনে বড় একটা সজনে গাছে প্রথম ফাগুনে ফুলের খই ফুটেচে। ঘুরে ঘুরে দেখলুম, ভণ্ডুলমামার বাড়িতে তিনটে ঘর, একটা ছোট দালান, মাঝে একটা সিঁড়ির ঘর, আট-দশ ধাপ সিঁড়ি গাঁথা হয়ে গেছে। ওদিকের বড় ঘরটা বোধ হয় ভণ্ডুলমামার, মাঝের ঘরটাতে ছেলেমেয়েরা থাক্‌বে। ভণ্ডুলমামার বাপ আছে? কে জানে? তিনি বোধ হয় থাক্‌বেন সিঁড়ির এপাশের ঘরটাতে। রান্নাঘর কোথায় হবে? বোধ হয় উঠোনের একপাশে ওই সজনে গাছটার তলায়। ভণ্ডুলমামা ছেলেমেয়ে নিয়ে যখন এসে বাস করবে, তখন এদের উঠোনে কি আর এমন জঙ্গল থাকবে? ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি ক'রে খেলবে, হয়ত বাড়িতে সত্যনারায়ণের সিন্নি দেবে

পূর্ণিমায় কি সংক্রান্তিতে সংক্রান্তিতে। পুকুর পাড়ের এ জংলী চেহারা তখন একেবারে বদলে যাবে যে! আমার মামার বাড়ির এ পাড়াতে এক ঘর লোক বাড়বে ... ও-পাড়া থেকে খেলা ক'রে ফেরবার পথে সন্ধ্যে হয়ে গেলেও আর ভাবনা থাকবে না...ওদের বাড়িতে আলো জলবে, ছেলেমেয়েরা কথা বল্‌বে, কিসের আর তখন ভয়? দিব্যি চলে যাব।

আরও বছর দুই কেটে গেল। থার্ড ক্লাসে পড়ি। মামার বাড়ি একাই গেলুম। একাই এখন সব জায়গায় যাই। ভণ্ডুলমামার বাড়ির ছাদ-পেটানো হয়ে গিয়েছে, সিমেন্টের মেজে, দালানের বাইরে রোয়াক্‌ হয়েছে কবে আমি দেখিনি তো? রোয়াকের ওপর কেমন টিনের ঢালু ছাদ! কেবল একটুখানি এখনও বাকী, দরজা জানালায় এখনও কপাট বসানো হয়নি। বাঃ, ভণ্ডুলমামার বাড়ি তাহলে হয়ে গেল!

ভণ্ডুলমামা নাকি আজকাল বড় সুদখোর হয়ে উঠেছেন, মাঝে মাঝে গাঁয়ে আসেন, চড়া সুদে লোকজনকে টাকা ধার দেন, বাড়ি দেখাশুনো করেন, আবার চলে যান। মাস-কতক পরে আবার এসে কাবুলীওয়ালার মত চড়াও হয়ে সুদ আদায় করেন। গাঁয়ের লোক তাঁর নাম রেখেচে রক্তদন্ত।

তারপর এল একটা সুদীর্ঘ ব্যবধান। ছেলেবেলার মত মামার বাড়িতে আর তত যাইনে, গেলেও এক-আধ দিন থাকি। সেই এক-আধ দিনের মধ্যে পথে যেতে যেতে হয়ত দেখি, জঙ্গলের মধ্যে ভণ্ডুলমামার বাড়িটা তেম্‌নি জনহীন পড়ে আছে ... বনজঙ্গল চারিপাশে আরও গভীরতর, কেউ কোনদিন ও-বাড়িতে পা দিয়েচে ব'লে মনে হয় না ... একটা ছন্নছাড়া লক্ষ্মীছাড়া চেহারা ... শীতের সন্ধ্যায়, বর্ষার দিনে, চৈত্র-বৈশাখের দুপুরে কত বার ও-বাড়িটা দেখেচি, সেই একই মূর্ত্তি...

এম্‌নি ক'রে বছর অনেক কেটে গেল।

ক্রমে এণ্ট্রান্স পাস দিয়ে কলকাতায় এসে কলেজে ঢুকলুম। সেবার সেকেণ্ড ইয়ারের শেষ, এফ-এ দেব, কি একটা দরকারে মামার বাড়ি গিয়েচি। বোধ করি মাঘ মাসের শেষ। দুপুরে পুবের ঘরে জানালার ধারে খাটে শুয়ে আছি, বোধ হয় একখানা লজিকের বই পড়চি, এমন সময়ে একজন কালো, শীর্ণকায় প্রৌঢ় লোক ঘরে ঢুকলেন। বড় মামীমা বললেন—এই তোর ভণ্ডুলমামা, প্রণাম কর্‌।

আমার সে ছেলেবেলাকার মনের অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েছিল—বয়স হয়েছে, কলেজে পড়ি; নানা ধরণের লোকের সঙ্গে মিশেছি, সুরেন বাঁড়ুয্যে ও বিপিন পালের বক্তৃতা শুনেছি, স্বদেশী মিটিঙে ভলাণ্টিয়ারী করেছি, জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীই গেছে বদ্‌লে—তখন মনের কোন্‌ গভীর তলদেশে আরও পাঁচটা পুরোণো দিনের আদর্শের ও কৌতূহলের বস্তুর স্তূপের সঙ্গে ভণ্ডুলমামা ও তাঁর বাড়িও চাপা পড়ে গিয়েছে। তাই ঈষৎ অবজ্ঞামিশ্রিত চোখে সামান্য একটু কৌতূহলের সঙ্গে চেয়ে দেখলুম মাত্র—ভণ্ডুলমামার বয়স পঞ্চাশের ওপর হবে, টিকিতে একটা মাদুলী বাঁধা, গলায় কিসের মালা, কাঁচাপাকা একমুখ দাড়ি। এই সেই ছেলেবেলাকার ভণ্ডুলমামা! উদাসীন ভাবে প্রণামটা সেরে ফেললুম।

ভণ্ডুলমামা কিন্তু আমার সঙ্গে খুব আলাপ করলেন, একটু গায়ে পড়েই যেন। আমি কোন্‌ কলেজে পড়ি, কোন্‌ মেসে থাকি, কবে আমার পরীক্ষা ইত্যাদি নানা প্রশ্নে আমায় জ্বালাতন ক'রে তুললেন। আজকাল তিনি কল্‌কাতায় চাকরি করেন, বাগবাজারে বাসা, তাঁর বড় ছেলেও এবার ম্যাট্রিক দিয়ে ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ছে—এ-সব খবরও দিলেন।

আমি জিগ্যেস্‌ করলুম,—আপনাদের এখানকার বাড়িতে ছেলেমেয়ে আন্‌বেন না?

ভণ্ডুলমামা বল্‌লেন,—আন্‌ব, শিগ্‌গীরই আন্‌ব বাবা। এখনও একটু বাকী আছে, একটা রান্নাঘর আর একটা কুয়ো—এ দুটো করতে পারলেই সব এনে ফেলি। কল্‌কাতায় বাসাভাড়া আর দুধের খরচ যোগাতেই... সেইজন্যেই তো খেয়ে-না-খেয়ে দেশে বাড়িটা করলুম, তবে ঐ একটুখানি যা বাকী আছে...তা ছাড়া চিলে-কোঠার ছাদটা এখনও...এইবারেই ভাবছি শ্রাবণ মাসের দিকে ওটাও শেষ করব।

বলে কি! এখনও বাকী! জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত দেখে আসছি ভণ্ডুলমামার বাড়ি উঠছে! এ তাজমহল নির্ম্মাণের শেষ বেঁচে থেকে দেখে যেতে পারব তো!

ভণ্ডুলমামা আপন মনেই ব'লে যেতে লাগলেন— সামান্য চাকরি, ছা-পোষা মানুষ বাবা, কাচ্চাবাচ্চা খাইয়ে যা থাকে তাতেই তো বাড়ি হবে? এখন ত বাসায় বাসায় কাটচে, আজ যদি চাকরি যায় তবে ছেলে-পুলে নিয়ে কোথায় দাঁড়াব, তাই ভেবে আজ চোদ্দ-পনেরো বছর ধ'রে একটু একটু ক'রে বাড়িটা তুলচি। তা এইবার আর দেরি হবে না, আসছে বছর সব এনে ফেলব। জায়গাটা বড় ভালবাসি।

ভণ্ডুলমামা বললেন ত চোদ্দ-পনেরো বছর, কিন্তু আমার মনে হ'ল ভণ্ডুলমামার বাড়ি উঠছে আজ থেকে নয়, জীবনের পিছন ফিরে চেয়ে দেখলে যতদূর দৃষ্টি চলে ততকাল ধ'রে···যেন অনন্তকাল, অনন্ত যুগ ধ'রে ভণ্ডুলমামার বাড়ির ইট একখানির পর আর একখানি উঠছে···শিশু থেকে কবে বালক হয়েছিলুম, বালক থেকে কিশোর, কৈশোর কেটে গিয়ে এখন প্রথম যৌবনের উন্মেষ, আমার মনের এই অনাদ্যন্ত মহাকাশ বেয়ে কত শত জন্মমৃত্যু, সৃষ্টি ও পরিবর্ত্তনের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ভণ্ডুলমামার বাড়ি হয়েই চলেছে···ওরও বুঝি আদিও নেই, অন্তও নেই।

পরের বছর আবার ভণ্ডুলমামার সঙ্গে কলকাতাতেই দেখা। আমি তখন থার্ড ইয়ারে পড়ি। ভণ্ডুলমামা বললেন—এস একবার আমাদের বাসায়। তোমার মামী তোমার দেখলে খুশী হবে। সামনের রবিবার তোমার নেমন্তন্ন রইল, অবিশ্যি অবিশ্যি যাবে।

গেলুম, ভণ্ডুলমামার ছেলেদের সঙ্গেও আলাপ হ'ল। ভণ্ডুলমামা অনুযোগের সুরে বললেন,—ওদের বলি, যা একবার এই সময়ে। আষাঢ় মাসে দেশে গিয়ে উঠোনে খাসা বরবটি আর সিম লাগিয়ে রেখে এলেছি, মাচাও বেঁধে রেখে এলেছি—তা কেউ কি কথা শোনে?

মামীমা ঝঙ্কার দিয়ে ব'লে উঠলেন,—যাবে সেখানে কেমন ক'রে শুনি? কোনো ঘরে বাস করবার জো নেই, শুধু সিম আর বরবটির পাতা চিবিয়ে ত মানুষে···তা বাড়ি হাট আলগা, পাচিল নেই।

ভণ্ডুলমামা মৃদু প্রতিবাদের সুরে ভয়ে ভয়ে যা বললেন তার মর্ম্ম এই যে, মানুষ বাস না করলেই বাড়িতে বট-অশথের গাছ হয়, ছাদ ফাটা হয়ে গেছে আজ অনেক দিন, কিন্তু কেউ বাস ত করে না। বাড়ি কাজেই খারাপ হয়ে থাকে। তবুও তিনি বছরে দু-তিনবার যান ব'লে এখনও ঘরদোর টিকে আছে। পাতকুয়োর আর কত খরচ? চৈত্র মাসের দিকে না হয় ক'রে দেওয়া যাবে। আর তোমরা সবাই যদি যাও, পাচিল আষাঢ় মাসেই ক'রে দেওয়া যাবে।

বুঝলুম পাঁচিল পাতকুয়া এখনও বাকী। ভণ্ডুলমামার বাড়ি এখনও শেষ হয়নি, এখনও কিছু বাকী আছে। কিন্তু এতদিন ধ'রে ব্যাপারটা চলচে যে এক দিক গড়ে উঠতে অন্য দিকে ধরেছে ভাঙন।

এর পরে মামার বাড়ি গিয়ে দু একবার দেখেছি ভণ্ডুলমামা দু-পাঁচ দিনের ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসে আছেন। এটা সারাচ্ছেন, ওটাতে বেড়া বাঁধছেন, এ-গাছটা খুঁড়ছেন, ও-গাছটা কাটছেন। ছেলেরা আসতে চায় না কলকাতা ছেড়ে। নিজেকেই আসতে হয়, দেখা-শুনো করতে হয় ব'লে এক দিন সলজ্জ কৈফিয়ৎও দিলেন।···পাঁচিল? হ্যাঁ তা পাঁচিল—সম্প্রতি একটু টানাটানি যাচ্ছে···সামনের বর্ষায়···ঘরদোর বেঁধেছি সারাজীবন পেটে, ওই আমার বড় আদরের জায়গা—তোরা না থাকিস, আমিই গিয়ে থাকি।

আমি বললুম,—ওখানে কেমন ক'রে থাকেন? সারা গাঁয়েই ত মানুষ নেই, মামার বাড়ির পাড়া ত একেবারে জনশূন্য হয়ে গেছে।

—কি করি বাবা, ওই বাড়িখানার ওপর বড় দম আমার যে। দেখ, চিরকাল পরের বাসায়, পরের বাড়িতে মানুষ হয়ে ঘরের কষ্ট বড় পেয়েছিলুম—তাই ঠিক করি বাড়ি একখানা করবই। ছেলেবেলা থেকে ওই গাঁয়েই কাটিয়েছি, ওখানটা ছাড়া আর কোথাও মন বসে না। চিরকাল ভাবতুম রিটায়ার ক'রে ওখানেই বাস

পিলে নিয়ে বাসায় বাসায় ঘুরছি, কিন্তু এর পরে দাঁড়াব কোথায়? তাই জলাহার ক'রেও সারাজীবন কিছু কিছু সঞ্চয় ক'রে ওই বাড়িখানা করেছিলুম। তা ওরা তো কেউ এল না—আমি নিজেই থাকি। না থাকলে বাড়িখানা ত থাকবে না—আর এককালে না-এককালে ছেলেদের ত এসে বসতেই হবে বাড়িতে। কলকাতার বাসায় বাসায় ত চিরকাল কাটবে না।

তারপর মামাদের মুখে ভণ্ডুলমামার কথা আরও সব জানা গেল। ভণ্ডুলমামা একা বিজন বনের মধ্যে নিজের বাড়িখানায় থাকেন। তাঁর এখনও দৃঢ়বিশ্বাস তাঁর ছেলেরা শেষ পর্যন্ত ওই বাড়িতেই গিয়ে বাস করবে। তিনি এখনও এ-জায়গাটা ভাঙছেন, ওটা গড়ছেন, নিজের হাতে দা দিয়ে জঙ্গল সাফ করছেন। ছেলেদের সঙ্গে বনে না—ওই বাড়ির দরুণই মনান্তর, স্ত্রীও ছেলেদের দিকে। ছেলেরা বাপকে সাহায্যও করে না। ভণ্ডুলমামা গাঁয়ে একখানা ছোট মুদির দোকান করেছিলেন—লোক নেই তার কিনবে কে? যা দু-এক ঘর খদ্দের জুটেছিল—ধার নিয়েই দোকান উঠিয়ে দিলে। এখন ভণ্ডুলমামা এ-গাঁ ও-গাঁ বেড়িয়ে কোনো চাষার বাড়ি থেকে দু-কাঠা চাল, কারুর বাড়ির পাঁচটা বেগুন—এই রকম ক'রে চেয়ে-চিন্তে এনে বাড়িতে হাঁড়ি চড়িয়ে দুটো ফুটিয়ে খান।

তারপর ধীরে ধীরে অনেক বছর কেটে গেল। আমি ক্রমে বি-এ পাস করে চাকরিতে ঢুকলুম। মামার বাড়ি আর যাইনে, কারণ সে-গ্রাম আর যাবার যোগ্য নেই। মামার বাড়ির পাড়ায় গাঙলীরা, রায়েরা, ভড়েরা সব একে একে মরে হেজে গেল, যারা অবশিষ্ট রইল তারা বিদেশে চাকরি করে, ম্যালেরিয়ার ভয়ে গ্রামের ত্রিসীমানা মাড়ায় না। ও-পাড়াতেও তাই, জীবন মজুমদারের প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি ছাদ ভেঙে ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েছে, শুধু এক দিকের দোতলাসমান দেয়ালটা দাঁড়িয়ে আছে। যে পূজোর দালানে ছেলেবেলায় কত উৎসব দেখেছি, এখন সেখানে বড় বড় জগডুমুরের গাছ, দিনেই বোধ হয় বাঘ লুকিয়ে থাকে। বিখ্যাত রায়দীঘি মজে গিয়েছে, দামে বোঝাই, জল দেখা যায় না, গরুবাছুর কচুরীপানার দামের ওপর দিয়ে হেঁটে দিব্যি পার হ'তে পারে।

সন্ধ্যা রাতেই গ্রাম নিশুতি হয়ে যায়। দু-এক ঘর নিরুপায় গৃহস্থ যারা নিতান্ত অর্থাভাবে এখনও পৈতৃক ভিটেতে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ হাতে সন্ধ্যাদীপ জালাচ্ছে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'তে-না-হতেই তারা প্রদীপ নিবিয়ে শয্যা আশ্রয় করে—তারপর সারারাত ধ'রে চারিধারে শুধু প্রহরে প্রহরে শৃগালের রব ও নৈশপক্ষীর ডানা ঝটাপটি!

আমার মামারাও গ্রামের ঘর-বাড়ি ছেড়ে শহরে বাসা করেছেন। ছোটমামার ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে সেখানে একবার গিয়েছি। ব্রাহ্মণভোজনের কিছু আগে একজন শীর্ণকায় বৃদ্ধ একটা পুঁটুলি-হাতে বাড়িতে ঢুকলেন। এক পা ধূলো, বগলে একটা ময়লা সাদা কাপড়-বসানো বাঁশের বাঁটের ছাতা। প্রথমটা চিনতে পারিনি। পরে বুঝলুম ভণ্ডুলমামা। ভণ্ডুলমামা এত বুড়ো হয়ে পড়েছেন এর মধ্যে!···শহরে এসে মামাদের নতুন সভ্য সৌখীন আলাপী বন্ধুবান্ধব জুটেছে, তাদের পোষাক-পরিচ্ছদের ধরণে ও কথাবার্তার সুরে ভণ্ডুলমামা কেমন ভয় খেয়ে সঙ্কোচের সঙ্গে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের সভরঞ্চির এককোণে বসলেন। তিনিও নিমন্ত্রিত হয়েই এসেছিলেন বটে, কিন্তু মামারা তখন শহুরে বন্ধুদের আদর-অভ্যর্থনায় মহা ব্যস্ত; তাঁর আগমন কেউ বিশেষ লক্ষ্য করেছে এমন মনে হ'ল না।

আমি গিয়ে ভণ্ডুলমামার কাছে বসলুম। চারিধারে অচেনা মুখের মধ্যে আমায় দেখে ভণ্ডুলমামা খুব খুশী হলেন। আমি জিগ্যেস করলুম—আপনি কি কলকাতা থেকে আসছেন?

ভণ্ডুলমামা বললেন,—না বাবা, আমি রিটায়ার করেছি আজ বছর-পাঁচেক হবে। গাঁয়ের বাড়িতেই আছি। ছেলেরা কেউ আসতে চায় না।

অন্নপ্রাশন শেষ হয়ে গেল। ভণ্ডুলমামা কিন্তু মামার বাড়ি থেকে আর নড়তে চান না। চার-পাঁচ দিন পরে কিছু চাল-ডাল ও বাসি সন্দেশ-রসগোল্লা নিয়ে দেশে রওনা হলেন। পায়ে দেখি কটক থেকে কিনে-আনা বড় মামার সেই পুরোনো চটি জুতো জোড়া। আমায় দেখিয়ে বললেন,—নবীন কটক থেকে এনেছে, দেখে বড় সখ হ'ল, বয়েস হয়েছে কবে মরে যাব, বললুম তা দাও নবীন,

জুতোজোড়াটা পুরোণো হ'লেও এখনও দু-তিন মাস যাবে। বাড়িতে একজোড়া রয়েছে, আগুলে বড় লাগে ব'লে খালি পায়েই—

তিনি বাড়ির বার হয়ে গেলেন। আমি চেয়ে চেয়ে দেখলুম শীর্ণকায় ভণ্ডুলমামা ভারী চাল ডালের মোটের ভারে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে চটজুতোর ফটাং ফটাং শব্দ করতে করতে ষ্টেশনের পথে চলেছেন। হঠাৎ আমার মনে তাঁর উপরে আমার বাল্যের সেই রহস্যময় স্নেহ ও অনুকম্পার অনুভূতিটুকু কতকাল পরে আবার যেন ফিরে এল। আমি চেঁচিয়ে বললুম—একটু দাঁড়ান মামা, আপনাকে তুলে দিয়ে আসি। ভণ্ডুলমামার পুঁটুলিটা নিজের হাতে নিলুম, টিকিট ক'রে তাঁকে গাড়ীতে তুলেও দিলুম। ট্রেনে ওঠবার সময় একমুখ হেসে বললেন—যেও না হে একদিন, বাড়িটা দেখে এস আমার—গাঁথা করেছি—কেবল পাঁচিলটা এখনও বা বাকি। কি করি, আমার হাতে আজকাল আর ত কিছু নেই, ছেলেরা নিজেদের বাসার খরচই চালিয়ে উঠতে পারে না—অবিশ্যি ওদের জন্যেই ত সব—দেখি, চেষ্টায় আছি—সামনের বছরে যদি…

ভণ্ডুলমামার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। কিন্তু এর মাস-কতক পরে তাঁর বড়ছেলে হরিসাধনের সঙ্গে কলকাতায় দেখা হয়েছিল। ম্যাকমিলান কোম্পানীর বাড়িতে চাকরি করে, জিনের কোট গায়ে, হাতে বইয়ের আকারের খাবারের কৌটো, মুখে একগাল পান—বৌবাজারের ফুটপাথ দিয়ে বেলা দশটার সময় আপিসে যাচ্ছে। আমিই ভণ্ডুলমামার কথা তুললুম। হরিসাধন বললে—বাবা দেশের বাড়িতেই আছেন—আমরা বলি আমাদের সংসারে এসে থাকুন, তাতে রাজি নন। বুদ্ধিশুদ্ধি ত কিছু ছিল না বাবার, নেইও—সারা জীবন যা রোজগার করেছেন ওই জঙ্গলের মধ্যে এক বাড়ি করতে গিয়ে সব নষ্ট করেছেন, নইলে আজ হাজার চার-পাঁচ টাকা হাতে জমতো। ও-গাঁয়ে যাবেই বা কে, আর ও-বাড়িতে থাকবেই বা কে? রামোঃ, যেমন জঙ্গল তেমনি ম্যালেরিয়া—তাছাড়া লোকজন নেই, অসুখ হ'লে একটা ডাক্তার নেই—চার-পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে বাড়ির পিছনে, বেচতে গেলে এখন ইট কাঠের দরেও বিক্রী হবে ভেবেছেন? কে নিতে যাবে, পাগল আপনি?

আমি বললুম—কথাটা ঠিক বটে। কিন্তু ভেবে দেখ, তোমার বাবা যখন বাড়িটা প্রথম আরম্ভ করেছিলেন, তখন গ্রাজন্যমান গ্রাম। বাড়িটা তৈরি করতে এত দেরি হয়ে গেল যে ইতিমধ্যে গাঁ হয়ে গেল শ্মশান, লোকজন উঠে অন্যত্র চলে গেল, আর সেই সময় তোমাদের বাড়ির গাঁথুনিও শেষ হ'ল। কার দোষ দেবে?

তারপরে ভণ্ডুলমামার আর কোন সংবাদ রাখিনি অনেক কাল। বছর-তিনেক আগে একবার মেজমামা চেঞ্জে গিয়েছিলেন দেওঘরে। পূজোর ছুটিতে আমিও সেখানে যাই। তাঁর মুখেই শুনলুম ভণ্ডুলমামা সেই শ্রাবণেই মারা গিয়েছেন। অসুখ-বিসুখ হয়ে ক'দিন ঘরের মধ্যেই ছিলেন, কেউ বিশেষ দেখাশুনা করেনি, আর আছেই বা কে গাঁয়ে যে দেখবে? এ অবস্থায় ঘরের মধ্যে ম'রে পড়েছিলেন, দু-তিন দিন পরে সবাই টের পায়, তখন ছেলেদের টেলিগ্রাম করা হ'ল। ভণ্ডুলমামার এইখানেই শেষ।

এর পর আমি আর কখনও মামার বাড়ির গ্রামে যাইনি, হয়ত আর কোন দিন যাবও না, বাড়িটাও আর দেখিনি, কিন্তু জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত যে-বাড়িটা গাঁথা হ'তে দেখেছি, সেটা আমার মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্থান অধিকার ক'রে আছে। আমার কল্পনায় দেশের মামার বাড়ির গ্রামের, একগলা বনের মধ্যে শীতের দিনের সন্ধ্যায় ভণ্ডুলমামার বাড়িটা একটা কায়াহীন, অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন রূপ নিয়ে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে…সেই গাছ-গজানো উঠোনটাতে ঢোক্‌বার পথ বনে ঢাকা, দরজা জানালার কপাট নেই, থামে থামে কাঠ-খামাল পর্য্যন্ত গাঁথা হয়েছে! …

আমার জীবনের সঙ্গে ভণ্ডুলমামার বাড়িটার এমন যোগ কি ক'রে ঘটল, সেটা আজ ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে যাই—আমার গল্পের আসল কথাই তাই। অমন একটা

সাধারণ জিনিষ কেন আমার মন এমন জুড়ে বসে রইল, অথচ কত বড় বড় ঘটনা তো বেমালুম মন থেকে মুছেই গিয়েছে!

বিশেষ ক'রে এই সব শীতের সন্ধ্যাতেই মনে পড়ে এইজন্যে, যে-পাঁচ বছর বয়সে এই শীতের সন্ধ্যাবেলাতেই বাড়িটা প্রথম দেখি।

* * *

অবিনাশবাবুর ছাত্রটি মুড়ি নিয়ে এল।

ভারতভারতী

শ্রীশৈলবালা দেবী

সংকীর্ণতা আমি ভাল নাহি বাসি,
উদার আমার স্নেহ।
সকলেরে আমি টেনে নিতে চাই,
কোলে আসে যেই কেহ।
কাহারেও আমি নাহি ভাবি পর,
বিরোধ আমার নাই;
সকলের তরে আছে মোর ঘরে
দাঁড়াবার দৃঢ় ঠাঁই।
শাক্যসিংহ মোর প্রচার করিল
অহিংসা পরম ধর্ম্ম;
তাই লয়ে ওরা ভাবিল পৃথক্,
না বুঝে' তাহার মর্ম্ম,
দেশ হ'তে তারে দিল নির্ব্বাসন।
চীন জাপানীরা মিলে,
সমাদরে আর কত ভক্তিভরে,
লইল মাথায় তুলে'।
তৈলঙ্গ, দ্রাবিড়, জাঠ, শকজাতি
এসেছে আমার কোলে;
উদার হৃদয়ে সকলেরে আমি
সাদরে নিয়েছি তুলে'।
আর্য্য অনার্য্য করি নাই ভেদ,
পাপী তাপী বাছি নাই;
শ্রীগৌরাঙ্গ মোর এক হরি নাম
বিলালেন সব ঠাঁই।

পতিতপাবন সে-নামের গুণে
পবিত্র হইল সবে;
শ্রদ্ধা প্রীতি আর কত ভক্তিস্রোত
স্বর্গ মিলাইল ভবে।
শিখ, তুমি হেন করিও না ভেদ,
নানক আমারি ছেলে।
জ্ঞান, ভক্তি, শিক্ষা দিয়েছে সম্মান
তাহারই শিষ্য বলে।
ব্রহ্মজ্ঞানী ব'লে করিও না ভেদ,
আমারি মনস্বী ছেলে
রামমোহন সে যে উপনিষদের
মর্ম্ম দিয়েছে খুলে'।
আবার সেদিন শ্রদ্ধানন্দ মোর
শুদ্ধিমন্ত্রের বলে
শরণাগতকে বক্ষেতে তুলিয়া
প্রাণ দিল অবহেলে।
অজ্ঞান ছিল যে শিশুরা আমার
জানে নাই সব কথা,
তাই তো তাহারা বিরোধ করিয়া
জন্মাইল কত বাধা।
বুঝিয়াছে আর বুঝে নাই কেহ,
আমি তো বিরূপ নই,
উদার হৃদয়ে সকলেরে আমি
অঙ্কে টানিয়া লই।

ঝারখণ্ডে ভক্তি-ধর্ম্মের প্রভাব

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

হিন্দীতে ঝাড়খণ্ড বা ঝারখণ্ড অর্থ জঙ্গলময় দেশ। এখন এই যে হাজারীবাগ ছোটনাগপুর প্রভৃতি অধিত্যকা তাহা পুরাতন ঝারখণ্ডেরই অন্তর্গত। বৈদ্যনাথের তীর্থও এই ঝারখণ্ডে। এখানকার লোকদের সাধারণতঃ ভিল ও কোল বলিয়াই আমরা খালাস। যাঁহারা এ সব বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা করেন তাঁহারা বলেন এই ভূভাগে প্রধানত মুণ্ডা, খাড়িয়া ও ওরাওঁ এই তিন আদিম জাতির বাস। ওরাওঁরা খুব রসিক সামাজিক ও আমোদ-প্রিয়। মুণ্ডারা গর্ব্বিত ও গম্ভীরপ্রকৃতি। খাড়িয়ারা শান্ত ও সরল।

ইহাদের খুব উচ্চদরের সভ্যতা না থাকিলেও ইহারা চিরদিনই সরল ও স্বাধীনতাপ্রিয়। বহু প্রাচীনকাল হইতেই ইহাদের গ্রাম ও সমাজ পঞ্চায়েতের দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত। তাহা ছাড়া ইহারা প্রাচীনকালে কখনও কোনও রাজা জমিদারের ধার ধারে নাই। গ্রাম-সমাজের সাহায্যে ইহারা চিরকাল আত্মশাসন করিয়া আসিয়াছে। কাজের সুবিধার জন্য অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই গ্রাম-সমাজের নানা ভাগ আছে। তার প্রত্যেকটির নাম "পাড়হা" বা "পাঢ়া" ও তাহার চালকের নাম "করতাহা"।

ছোটনাগপুরে যে মহারাজা আছেন তাঁর পূর্ব্বপুরুষ এই রকমেরই একজন নায়ক ছিলেন। মুসলমান ও হিন্দু রাজাদের মাঝে মাঝে তখন আক্রমণ ঘটিত। তাই কাজের সুবিধার জন্য তিনি অন্য সব "করতাহা"দের উপর নায়কতা করেন ও ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করেন। ধীরে ধীরে তিনি ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া বিদেশ হইতে হিন্দু আমলা কর্ম্মচারী ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতাদি আমদানী করেন। ক্রমে অন্যান্য 'করতাহা'দের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ বাধিল। তখন তিনি নিজ শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া বিহার ও উত্তর-পশ্চিম হইতে আনীত বিদেশী সমস্ত আমলাদের সহায় করিতে লাগিলেন ও তাহাদের হাতে অকারণে সম্পত্তি জমীদারী বাঁটিয়া দিতে লাগিলেন। ইহাই "ঠিকাদারী" বন্দোবস্ত। ইহাতেই প্রাচীন গণতান্ত্রিক "খুঁটাকাটি" প্রথা প্রায় লোপ হইয়া আসিল। কাজেই বিহার ও উত্তর-পশ্চিমের সঙ্গে ঝারখণ্ডের যে যোগ সে বড় দুঃখের ইতিহাস। যাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে জানিতে চাহেন তাঁহারা ঝারখণ্ডের সমাজ সম্বন্ধে সুপণ্ডিত রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায় মহোদয়ের কাছে সন্ধান করিবেন।

নিজের কোন উচ্চদরের সভ্যতা ও সাহিত্যাদি না থাকিলেও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সপ্তরথীর দ্বারা পরিবেষ্টিত অভিমন্যুর মত ঝারখণ্ড চারিদিকে উড়িয়া মহারাষ্ট্রী হিন্দী বাংলা প্রভৃতি শক্তিশালী ভাষা ও সভ্যতাদির দ্বারা পরিবেষ্টিত। এখনকার খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দিলে প্রাচীন কালে ঝারখণ্ড প্রধানতঃ দুইদিকের দুইটি ধর্ম্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত। এক বাংলার দিক হইতে চৈতন্য মহাপ্রভুর বৈষ্ণবধর্ম্মের ও অন্যদিকে কবীরপন্থী ধর্ম্মদাসী শাখার ভাব ঐশ্বর্য্য ঝারখণ্ডকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে।

চৈতন্য চরিতামৃতে, মধ্যখণ্ডে, সপ্তদশ পরিচ্ছেদে দেখিতে পাই,—মহাপ্রভু জগন্নাথধাম হইতে ঝারখণ্ড-পথে বৃন্দাবন চলিয়াছেন। ঝারখণ্ডের প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে তিনি মুগ্ধ। পথে ব্যাঘ্রমৃগকুলকেও তিনি প্রেম দিয়া চলিয়াছেন।

"মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারিখণ্ড।
ভিল্ল প্রায় লোক তাঁহা পরম পাষণ্ড॥"

যেখানে যেখানেই তিনি যান সেখানেই চমৎকার আতিথ্য পান।

"যে গ্রামে রহেন প্রভু তথায় ব্রাহ্মণ।
পাঁচ সাত জন আসি করে নিমন্ত্রণ॥"

মহাপ্রভুর আদেশ মতে শ্রীশ্রীসনাতনও মথুরা হইতে জগন্নাথধামে আসিলেন। তিনিও ঝারখণ্ড-পথেই আসিলেন।

"ঝারিখণ্ড বনপথে আইল চলিয়া।"

চৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্যলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

ফিরিবার সময় শুধু সেই বন দিয়া নহে, মহাপ্রভু যে পথ দিয়া ঝারখণ্ডের ভূভাগ অতিক্রম করিয়াছেন সেই পথে সনাতন যাইতে চাহিলেন।

"যেই বন পথে প্রভু গেলা বৃন্দাবন।
সেই পথে যাইতে মন কৈল সনাতন॥
যে পথে যে গ্রামে নদী, যাঁহা যেই লীলা।
বলভদ্র ভট্ট স্থানে সব লিখি নিলা॥" ঐ

মানভূম ত বাংলা দেশই। হাজারী বাগেরও অনেক স্থান একেবারে বাংলাভাষী। ঝালদা প্রভৃতি দিকের রাঁচীর অনেক অংশ বাংলা ভাষাভাষীদেরই দেশ। রাঁচী জেলার মধ্যে "সিল্লি" প্রভৃতি তিনটি থানার অধিবাসী বাংলাভাষী। তাহারা সেখানে বাহির হইতে আসিয়া কৃত্রিম ভাবে প্রাচীন অধিবাসীদের উপর চাপিয়া বসে নাই; বা "ঠিকাদারী" প্রণালীতে স্থানীয় প্রাচীন অধিবাসীদের অধিকার কাড়িয়া লয় নাই; তাহারা সেখানকার সাধারণ গৃহস্থ, চাষী, প্রজা। মহাপ্রভু এই ভূভাগের কোন্ পথে তবে গিয়াছিলেন? খোঁজ করিয়া দেখা গেল "বুণ্ডু" গ্রামে রাধাগোবিন্দের অতি প্রাচীন মন্দির আছে। স্থানীয় লোকেরা সবাই জানেন মহাপ্রভু সেখানে বিশ্রাম করিয়া ছিলেন। সেখানে অধিবাসীরা বাংলাভাষী বাঙ্গালী, যদিও তাহাদের উচ্চারণে টান আছে। এই সব বাঙ্গালীদের বৈষ্ণব ভাব এই ভূখণ্ডের চারিদিকে ছড়ায়। এ সব স্থানে ঘরে ঘরে বাংলা পদাবলীর কীর্ত্তন চলে। এমন কি এই সব বৈষ্ণবদের প্রভাববশতঃ কোলদের মধ্যেও অনেকে বৈষ্ণব হইয়া গিয়াছে। যাহারা বৈষ্ণব হয় নাই তাহারাও অনেক সময় যে গান গায় তাহা ভাল করিয়া ঠাহর করিয়া শুনিলে বুঝা যায় বাংলা পদ। অনেক স্থলে কোলরা তাহাদের ক্রিয়াকর্ম্মঅনুষ্ঠানের অন্তে "হরি বোল" "হরি বোল" বলিয়া তাহারা সমাপ্তি সূচনা করে।

রাঁচী প্রভৃতি ঝারিখণ্ডের যে ভূভাগে বাঙ্গালী আছেন সেখানে বহু স্থানেই বৈষ্ণব মন্দির, মঠ প্রভৃতি আছে। বৈষ্ণব ভাব কীর্ত্তনাদিরও সেখানে খুব ধুম। উত্তর-পশ্চিম বিহার ও রাঁচী জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়া কবীরপন্থের প্রভাব এই ঝারিখণ্ডে প্রবেশ করে। এই কবীরপন্থী মতবাদের মধ্যে আসিয়া বহু ওরাওঁ প্রভৃতি জাতির লোক ভক্ত হইয়াছেন ও গুরু হইয়া দীক্ষা দিয়াছেন। এই ঝরিখণ্ডেরই ওধারে বিলাসপুর জেলায় কবীরপন্থের ধর্ম্মদাসী শাখার প্রধান কেন্দ্র "কুদরমাল"ও "দামাখেড়া"। ঝারিখণ্ডে কবীরপন্থী ভক্তদের কথা সময়ান্তরে আলোচনা করা যাইবে।

আলোচনা

মহাভারতীয় প্রশ্নোত্তর

গত অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের "দুইটি মহাভারতীয় প্রশ্ন" নামক প্রবন্ধের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে আমার বক্তব্য নিম্নে নিবেদন করিলাম।

"সাবিত্রী"র শ্লোকোক্ত শুক্ল ত্রয়োদশীতে ভারতযুদ্ধ আরম্ভ ঠিক নহে। মহাভারতেই উদ্যোগপর্ব্বে ১৪১ অধ্যায়ে লিখিত আছে —

সপ্তমাচ্চৈব দিবসাদমাবস্যা ভবিষ্যতি।
সংগ্রামে যুজ্যতাং তস্যাং তামাহুঃ শক্রদেবতাং ॥ ১৮

অর্থাৎ যদা হইতে সপ্তম দিবসে অমাবস্যা হইবে। ইন্দ্র দেবত বলিয়া উক্ত দিবস সংগ্রামের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত।

সুতরাং অমাবস্যা তিথিতে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। যুদ্ধের দশম দিবসে ভীষ্ম শরশয্যায় পতিত হইয়াছিলেন। সে দিবস শুক্লানবমী তিথি। এই দিন হইতে শুক্লপক্ষের ৭+কৃষ্ণপক্ষের ১৫+শুক্লপক্ষের ১৫+কৃষ্ণপক্ষের ১৫+শুক্লপক্ষের ৮=৬০ দিন হয়। তন্মধ্যে ত্র্যহস্পর্শের দুই দিন বাদ দিলে ৫৮ দিন পাওয়া যায়।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ৫১ অধ্যায়ে ৫৬ দিন পরে ভীষ্মের মৃত্যু লিখিত আছে। কিন্তু অনুশাসন পর্ব্বে ১৬৭ অধ্যায়ে ভীষ্ম স্বয়ং বলিয়াছেন, "আমি অষ্টপঞ্চাশৎ রাত্রি এই সমুদয় নিশিত শরনিকরে শয়ান রহিয়াছি।" কবি হয়ত ৫৮ রাত্রির পরিবর্ত্তে ৫৮ তিথি ধরিয়া দুই ত্র্যহস্পর্শ বাদ দিয়া ৫৬ দিন গণনা করিয়া থাকিবেন।

ঐ দিবস মাঘ মাসের কোন তারিখ, তাহাও নির্ণয় করিবার উপায় মহাভারতে আছে, কিন্তু অর্থ করিবার দোষে সে তারিখ ভেস্তা হইয়া গিয়াছে। এই শ্লোকটি বিদ্যানিধি মহাশয় ২৩৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার অর্থ সৌর মাঘ মাস উপস্থিত হইলে এবং চান্দ্র মাঘ প্রাপ্ত হইলে তখন সৌর মাঘ মাসের ত্রিভাগ শেষ হইয়াছিল এবং চান্দ্র মাঘের ত্রিভাগ অবশিষ্ট ছিল এমন দিনে শুক্লপক্ষে অষ্টমী তিথিতে ভীষ্মদেব দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। 'শেষ' অর্থ গত হওয়া এবং অবশিষ্ট থাকা দুই-ই বুঝায়। সুতরাং সৌর মাসের ত্রিভাগ (২২॥ দিন) গত হইলে ২৩ মাঘ তারিখ হয়। ঐ তারিখে শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথি হইলে অমাবস্যান্ত চান্দ্র মাসের তিনভাগ অবশিষ্ট থাকে। অতএব সৌর ২৩ মাঘ ভীষ্ম দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইহা কবিকল্পিত নহে; ঠিক বলিয়াই বোধ হয়। ভীষ্মাষ্টমী ধরিয়া গণনা করিলে যুদ্ধ-বৎসর ঠিক নিরূপিত হয়। তাহা নিম্নে দেখাইলাম—

২৩ মাঘ তখন উত্তরায়ণ হইত। এখন সূক্ষ্মমতে ৭ই পৌষ উত্তরায়ণ হইয়া থাকে। হিন্দু শাস্ত্রের একমতে উত্তরায়ণ অনুলোম-প্রতিলোম ভাবে ঘড়ির পেণ্ডুলমের মত ৪ঠা পৌষ হইতে ২৭ মাঘ মধ্যে যাতায়াত করে। এই অয়ন গতি ধরিয়া একটি অব্দ গণনা করা হইত। উক্ত গণনানুসারে ২৩ মাঘ হইতে অনুলোমভাবে ৫ দিনের ৫°+২৭ মাঘ হইতে প্রতিলোম ভাবে ২৭ দিনের ২৭°+পৌষ মাসের ২২°।৫৭′।২০″ বিকলা=৫৪°।৫৭′।২০″ বিকলা অয়ন গতি হইয়াছে। ৭১।৮ মাসে ১ অংশ অয়ন গতি হয়। সুতরাং ৭১।৮×৫৪° অংশ=৩৮৩৪।০+(৫৭′।২০″ বিকলা) ৬৯ বৎসর=৩৯০৩ বৎসর হয়। ৩৯০৩-১৯৩২=১৯৭১ খৃঃ পূঃ পাওয়া যায়।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—

তে তু পারিক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম।
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দ শতাত্মকঃ ॥ ৪।২৪।৩৪

অর্থাৎ "পারিক্ষিতের অভিষেকের সময় সপ্তর্ষিগণ মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। তখন কলির ১২০০ বৎসর প্রবৃত্ত হইয়াছিল।" ৩১০১ খৃঃ—১২০০= ১৯০১ খৃঃ পূঃতে পরীক্ষিতের অভিষেক হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে যুধিষ্ঠির ৩৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন, অতএব ১৯০১+৩৬=১৯৩৭ খৃঃ পূঃ তে এবং ১২০০—৩৬=১১৬৪ কল্যব্দে ১০ই অগ্রহায়ণ অমাবস্যা তিথিতে ভারত-যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। ২৩ মাঘ ভারত-যুদ্ধের পূর্ব্বে ১৯৭১—১৯৩৭=৩৪ বৎসর অয়ন গতি হইয়াছিল। হিন্দু শাস্ত্রমতে ৫৪″৪ সেকেণ্ড অয়ন গতি গণনা যে ভুল তাহা ইহা হইতেই বুঝা যায়। সূক্ষ্ম মতে ৫০″২ সেকেণ্ড অয়ন গতি।

শ্রীবিনোদবিহারী রায় বেদরত্ন

—

প্রত্যুত্তর

বেদরত্ন-মহাশয় উদ্যোগ পর্ব হইতে "সপ্তমাচ্চৈব" ইত্যাদি শ্লোকটি দেখাইয়া দিয়া আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করিয়াছেন। আমি এইরূপ উক্তি প্রত্যাশা করিতেছিলাম। শ্লোকটি "বঙ্গবাসী"র মহাভারতের ১৪২ অধ্যায়ে আছে। কালীপ্রসন্ন সিংহ-কৃত বঙ্গানুবাদের ১৪০ অধ্যায়ে। তাহাতে আছে,—"আজি হইতে সপ্তদিবসের পর অমাবস্যা হইবে, পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, পুরন্দর এই তিথির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অতএব আপনারা সেইদিনে সংগ্রাম সাধন সামগ্রী-কলাপ সংগ্রহ করুন।"

নীলকণ্ঠ টীকা করেন নাই। পূর্বাপর চিন্তা করিলে বেদরত্ন মহাশয়-কৃত অর্থ সঙ্গত মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণ সান্ধ্য নিমিত্ত বহু যত্ন করিলেন, কিন্তু দুর্যোধন পাণ্ডবদিগকে সূচাগ্র ভূমিও দিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব সমীপে প্রত্যাগমন কালে কর্ণকে স্বীয় রথে লইয়া তাঁহাকে পাণ্ডব-পক্ষে আনিতে নানা নীতি প্রয়োগ করিলেন। সত্য-পরায়ণ কর্ণ অটল। তখন শ্রীকৃষ্ণ কর্ণকে ভীত করিবার নিমিত্ত বলিলেন, "দেখ, যখন অর্জুন গাণ্ডীব লইয়া যুদ্ধে আসিবেন, তখন কি সত্য কি ত্রেতা কি দ্বাপর কোনও যুগ থাকিবে না।" [যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব যুদ্ধে নামিলেও এই দশা ঘটিবে। কি দশা, শ্রীকৃষ্ণ বলেন নাই। ভাবে বোধ হয় তখন কলি আসিবে, যুদ্ধে ধর্মাধর্ম-বিচার থাকিবে না।] তর্জন সমাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণ স্বাভাবিক স্বরে কর্ণকে বলিলেন, "তুমি দ্রোণ ভীষ্ম কৃপকে কহিবে [দুর্যোধনের নাম নাই] এই মাস মনোহর, এখন হেমন্ত। আজ হইতে সাত দিন পরে ইন্দ্র-নক্ষত্র-যুক্ত অমাবস্যা হইবে। সেদিন যুদ্ধ আরম্ভ জানিবে। আর, রাজাদিগকে কহিবে, কেশব সকলকে নিহত করিবেন। [ইহার পরে কর্ণ দুর্নিমিত্ত দেখিতে লাগিলেন, সূর্যগ্রহণও দেখিলেন।]

সাত দিনের মধ্যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর যুদ্ধোপকরণ-সংগ্রহ অসম্ভব। পূর্ব হইতে সংগ্রহ চলিতেছিল। কোন্ শুভ তিথিতে কৌরবেরা আয়োজন করিবেন, তাঁহারা বুঝিবেন, শ্রীকৃষ্ণের বচন নিষ্প্রয়োজন।

কবে যুদ্ধ আরম্ভ হইবে, এই কথা বলিবার জন্যই এই অধ্যায়। যে কবি শান্তিপর্বে ছল করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভীষ্মের নিকট লইয়া গিয়াছেন, এই অধ্যায় তাঁহারই কর্ম। কথা নাই, বার্তা নাই, শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মকে দেখিয়াই বলিলেন, "আপনি আর ছাপ্পান্ন দিন বাঁচিবেন।" বলা হইবামাত্র পুরী-প্রত্যাগমন। এখানেও সভায় দুর্যোধনকে যুদ্ধের দিন না জানাইয়া ফিরিবার পথে কর্ণকে বলা, পত্রের পুনশ্চের তুল্য। শরশয্যার আটান্ন রাত্রি পূরণ করিবার নিমিত্ত কবি ব্যাকুল হইয়াছিলেন। একবার রাত্রি গণিলেন, আর একবার দিন গণিলেন। তথাপি, কি জানি, পাঠক আরম্ভ-দিন না পান, ভীষ্মাষ্টমী মিথ্যা মনে করেন, বহুভাষী কবি শ্রীকৃষ্ণকে বাচাল করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাকুলতা ভীষ্মের নিমিত্ত নয়, পাঞ্জির ভাস্কর-সপ্তমীর নিমিত্তে। এমন কবির উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বাক্য বিশ্বাস্য নয়।

শরদন্তে অমাবস্যা, ইন্দ্রনক্ষত্র কি-না জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র-যুক্ত অমাবস্যা, কার্ত্তিক অমাবস্যা হইবে। কিন্তু অমাবস্যায় পার্বণশ্রাদ্ধ ক্ষত্রিয়েরও বিহিত। এটি দীপান্বিতা অমাবস্যা, শ্রাদ্ধ অবশ্য কর্তব্য। সেদিন যুদ্ধের কিম্বা উদ্‌যোগের অবসর কই? কবি সে আশঙ্কা করেন নাই। শুক্ল নবমীতে ভীষ্মের পতন। অতএব অগ্রহায়ণের ২২,, পৌষের ৩০, মাঘের ৬ রাত্রি গতে ভীষ্মের স্বর্গারোহণ। মাঘের শুক্ল সপ্তমীতে। রাত্রি, তিথি। অগ্রহায়ণ প্রতিপৎ হইতে গণিলে শ্রাদ্ধের ব্যাঘাত হয় না, ৫৮ তিথিও পাওয়া যায়। তথাপি কবি কেন অমাবস্যায় ধরিয়াছেন, তাহা পরে প্রকাশ পাইবে।

২। বেদরত্ন-মহাশয় অনুশাসন পর্বের

মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃসৌম্যো যুধিষ্ঠির।
ত্রিভাগশেষঃ

শ্লোকের 'ত্রিভাগশেষঃ' পদটি সৌর পক্ষে ও চান্দ্র পক্ষে ব্যর্থ করিয়াছেন। এরূপ ব্যাখ্যা পণ্ডিত-সম্মত হইবে কিনা, সন্দেহ। 'শেষ' শব্দের অর্থ 'গত,' সংস্কৃত কোষে পাই না। কি সমাসই বা করা যাইবে? 'শেষ' শব্দে 'অন্ত' অর্থ হইতে পারে। কিন্তু তাহাতেও অবশেষ বুঝাইবে।

বরং নিম্নলিখিত অর্থ করা যাইতে পারে। "এই মাঘ, সৌরমাঘ, সম্-উপস্থিত (১লা কি ২রা)। চান্দ্রমাস চতুর্থাংশ গত (৭।০ তিথি)। [যেহেতু মাস অমান্ত] পক্ষটি শুক্ল হইবেই।" 'সৌম্য' পদটি সার্থক হইতেছে। চান্দ্র মাস যে মাঘ, তাহা না বলিলেও বুঝাইবে। ফাল্গুন হইতে পারে না, পৌষ শুক্ল হইতে পারে না।

খ্রীষ্ট-পূর্ব ২০৫ সালের পাঁজি দেখি। সে বৎসর উত্তরায়ণ, (ইংরেজী পুরাতন পাঞ্জির) ২৫ শে ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার, মাঘ-শ কৃষ্ণষষ্ঠী ১৯ দণ্ড। (তখনকার বাংলা পাঞ্জির ১লা মাঘ। এখনকার পাঞ্জির ১৩ই মাঘ)। কবির নিবাস জানা নাই। কিন্তু জানি দিবা হ্রস্বতম। দিবামান ২৬ কি ২৫ দণ্ড ধরিতে পারি। কুরুক্ষেত্রে ২৫ দণ্ড। ভীষ্ম কখন দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা লিখিত নাই। বোধ হয়, তিনি সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বসুলোকে প্রয়াণ করিয়াছিলেন (বসু, সূর্য্য)। তখন অষ্টমী পড়িয়াছিল। আরও দেখা যাইতেছে, কবি ৭।০ তিথি বুঝাইতে "ত্রিভাগশেষঃ" পদটি লিখিয়াছেন। সপ্তমী-অষ্টমীর সন্ধিকাল না হইলে তিনি সপ্তমী কি অষ্টমী লিখিতেন। এই কারণে কবিকে দীপান্বিতা অমাবস্যায় যুদ্ধ-ঘোষণা করিতে হইয়াছে।

অমাবস্যাটি ঐ সালের ২১শে অক্টোবর সোমবার। স্থিতি ৩৮ দণ্ড। (তৎকালের) জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র ২৩ দণ্ড। ইন্দ্র-দৈবত অমাবস্যাই বটে। ২২শে অক্টোবর যুদ্ধ, ৩০শে ভীষ্মের পতন। অক্টোবরের ১, নভেম্বরের ৩০, ডিসেম্বরের ২৫ = ৫৬ "দিন," শরশয্যা।

ঐ সালের পাঞ্জির সহিত কবি-বাক্যের এত ঐক্য আকস্মিক বোধ হয় না। যুদ্ধের বহু পরবর্ত্তী কালের কবির উক্তি বিশ্বাস্য হয় না। "ভারত সাবিত্রী" ঠিক নয়, বলাও কঠিন। বলরামের তীর্থযাত্রার ও তীর্থ হইতে প্রত্যাগমনের নক্ষত্রের সহিত "সাবিত্রী"র ঐক্য আছে।

৩। প্রথমে আধার দৃঢ় হউক, পরে যুদ্ধ-বৎসর গণনা। মহাভারতে আছে, কার্ত্তিক অমাবস্যায় সূর্যের পূর্ণ-গ্রাস হইয়াছিল। কেহ কেহ এই উক্তিতে নির্ভর করিয়া যুদ্ধ-বৎসর নির্ণয় করিতে গিয়াছেন। কিন্তু মৃগতৃষ্ণিকায় স্নান করিলে সান্ত্বনা হইতে পারে, স্নানের ফল হইবে না। বেদরত্ন মহাশয় উত্তরায়ণ ২৩শে মাঘ ধরিয়াছেন। ইহা সত্য মনে করিলেও তাঁহার নির্ণীত কাল আসিবে না। প্রচলিত পাঞ্জির মতে ইং ৫০০সালে অয়নাংশ ছিল না, মাঘ-সংক্রমণ দিবসে উত্তরায়ণ হইত। তদবধি ২৩ দিন পিছাইয়াছে। অতএব ১৯৩২—৫০০=১৪৩২ বৎসরে। ইং ৫০০ সালের পূর্বে ২৩ দিন আগে যাইতেও ১৪৩২ বৎসর লাগিয়াছিল। অতএব ১৪৩২—৫০০=৯৩২ খ্রীষ্ট-পূর্ব সালে যুদ্ধ আসিতেছে।

৪। পরীক্ষিতের অভিষেচন নয়, তাঁহার রাজ্যশাসন কালে "দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ কলিঃ প্রবৃত্তঃ।" অর্থাৎ যে কলির পরিমাণ ১২০০ মানুষ বর্ষ, সে কলি আরম্ভ হইয়াছিল।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ-বৎসর নির্ণয় আমার প্রবন্ধের বাহ্য। এখানেও বাহ্য রহিল।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

চড়ক-পূজা

গত কার্ত্তিক মাসের প্রবাসীতে "শতবৎসর পূর্ব্বেকার বাঙ্গালী জীবনের ছবি" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চড়ক-পূজা সম্বন্ধে একস্থলে মন্তব্য করিয়াছেন :—

"আজকাল কলিকাতার দুই-এক জায়গায় ও কলিকাতার বাহিরে কোনও কোনও স্থলে গাজন-উপলক্ষে চড়ক-পূজার অনুষ্ঠান হয় বটে, কিন্তু বাণ ফোঁড়া আর হয় না।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীহট্ট জেলার নানাস্থানে এখনও বাণ ফুঁড়িয়া চড়ক-পূজা হইয়া থাকে। চড়ক-পূজা নামক অনুষ্ঠানটি চৈত্রসংক্রান্তির দিনে হইয়া থাকে। প্রবন্ধের ২ নং ছবিতে চিত্রিত সকল "দেহপীড়াদায়ক ভীষণ অনুষ্ঠান"ই এতদঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

গীতা

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

১৫

সপ্তম অধ্যায়

প্তম অধ্যায়ে দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা আছে। াপিল সাংখ্যবাদই শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের মূল ভিত্তি। কাপিল াংখ্যবাদে ব্রহ্মসত্তা স্বীকৃত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ কাপিল াংখ্যের ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাতে ব্রহ্মতত্ত্ব যোগ রিয়াছেন। ইহাতে বেদান্ত ও কাপিল সাংখ্যের সমন্বয় ইয়াছে। যোগীর সমস্ত বহির্বিষয়ের ও আত্মতত্ত্বের াকৃত জ্ঞান লাভ হয় ও তখন সৃষ্টির যথার্থ তত্ত্ব তাঁহার নকট উদ্ভাসিত হয় এই সূত্রেই ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগমার্গের ালোচনার পর সপ্তম অধ্যায়ে দার্শনিক তত্ত্বের বতারণা। যোগীর নিজ অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান যখন যুক্তি বচার ইত্যাদির দ্বারা সমর্থিত হয় তখনই তাহা বিজ্ঞান ামে অভিহিত হয়। এই বিজ্ঞানেরই অপর নাম দর্শন। র্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ যুক্তি বিচার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ওয়ায় যোগসিদ্ধি ব্যতীতও সাধারণের বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়। ইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন।

৭।১-২—"হে পার্থ, আমাতে মন নিবিষ্ট করিয়া এবং ামাকেই আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ আত্মার প্রতি মন নিবদ্ধ রিয়া যোগযুক্ত হইলে আমাকে সমগ্রভাবে অর্থাৎ চরাচর াশসমেত নিঃসংশয়ে যেরূপ জানিতে পারিবে তাহা ানো। আমি তোমাকে এই জ্ঞান সবিজ্ঞান অর্থাৎ াহার বিজ্ঞানসমেত সমস্তই বলিতেছি; ইহা জানিলে থিবীতে পুনরায় আর অন্য কিছুই জানিবার বিষয় াকিবে না।"

ভাষ্যকারগণ 'বিজ্ঞান' শব্দে অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান এবং 'জ্ঞান' শব্দে বিচারসিদ্ধজ্ঞান এই অর্থ করেন। আমি এই দুই শব্দের অর্থ পূর্ব্বে ও এখানে যাহা দিয়াছি তাহা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ আমার মতে 'জ্ঞান' মানে অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান এবং বিজ্ঞান মানে যুক্তি বিচারসিদ্ধ জ্ঞান; অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান যখন যুক্তি বিচার দ্বারা সমর্থিত ও পুষ্ট হয় তখনই তাহাকে বিজ্ঞান বলা যায়। 'জ্ঞান'শব্দ সাধারণত প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেই নির্দ্দেশ করে, অতএব যোগলব্ধ অনুভূতি বা অনুভবসিদ্ধ জ্ঞানও ইহারই অন্তর্গত। 'বিজ্ঞান' শব্দ 'বুদ্ধি' এই অর্থে উপনিষদে বহুস্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—বিজ্ঞানময় কোশ। অতএব বিজ্ঞান অর্থে বুদ্ধিসিদ্ধ জ্ঞান বা যুক্তিবিচার-সিদ্ধজ্ঞান। এখানে শ্লোকের ভাষা দেখিলে এই ব্যাখ্যাই সমর্থিত হইবে। ৭।১ শ্লোকে বলিলেন, 'যোগযুক্ত হইলে যাহা জানিতে পারিবে তাহা শোনো' তাহার পরের শ্লোকে বলিলেন, 'এই জ্ঞান বিজ্ঞান সহিত তোমাকে বলিতেছি।' যোগলব্ধ অনুভূতিকে এখানে স্পষ্ট 'জ্ঞান' শব্দে অভিহিত করা হইল।

৭।৩ "মনুষ্যগণের মধ্যে সহস্রে কোন এক ব্যক্তি হয়ত সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করে এবং সিদ্ধগণের মধ্যে চেষ্টা করিলেও কচিৎ কেহ আমাকে তত্ত্বত অর্থাৎ বিজ্ঞান-রূপ তত্ত্ব সহিত জানিতে পারে।"

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য—কদাচিৎ কেহ সিদ্ধি লাভের জন্য চেষ্টিত হন এবং চেষ্টা করিয়াও অনেকে সফলকাম হন না, অতএব সিদ্ধযোগী অতিশয় দুর্লভ। আবার যোগসিদ্ধ হইলেই তত্ত্বজ্ঞান (অর্থাৎ কিরূপে অখণ্ড

ভগবানুবাচ—

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥ ১

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২
মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩

পরমব্রহ্ম হইতে বিশ্বসংসার বা সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হইল তাহার যথার্থ বিজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান) হয় না। যোগসিদ্ধগণের মধ্যে চেষ্টা করিলেও সকলে এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারগ হন না। তত্ত্বদর্শী সিদ্ধযোগী ততোধিক বিরল। তত্ত্বজ্ঞানী সিদ্ধযোগী বলিতে পারেন কিরূপে এক অখণ্ড পরমাত্মা হইতে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে আমি তাহা অনুভব করিয়াছি এবং আমি সেই তত্ত্ব যুক্তি বিচার দ্বারা সাধারণকে বুঝাইয়া দিতে পারি।' তত্ত্বদর্শী সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল সর্ব্বপ্রধান এবং তাঁহারই প্রণীত সাংখ্য শাস্ত্রে সৃষ্টিতত্ত্ব সাধারণের বুদ্ধিগম্য ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। এই সৃষ্টিতত্ত্ব যোগসিদ্ধি ব্যতীতও জ্ঞানীর বুদ্ধিগ্রাহ্য কিন্তু কেবলমাত্র যুক্তাবস্থাতেই তাহা অনুভব সিদ্ধ। দৃষ্টান্তের দ্বারা এই শ্লোকের অর্থ বিশদ হইবে। বলা যাইতে পারে সমগ্র ইংরেজ জাতির মধ্যে সহস্রে এক জন সন্দেশ খাইবার জন্য চেষ্টিত হন এবং সন্দেশ খাইয়া থাকিলেও ইহার তত্ত্ব জানেন এমন ইংরেজ অতিশয় বিরল। অর্থাৎ সন্দেশের আস্বাদ-জ্ঞান থাকিলেও কি করিয়া সন্দেশ প্রস্তুত হয় তাহার যথার্থ তত্ত্ব বা বিজ্ঞান না জানা থাকিতে পারে।

৭। ৪-৬—ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই অষ্ট প্রকারে আমার প্রকৃতিকে বিভাগ করা যায়। হে মহাবাহো, এই প্রকৃতির নাম অপরা প্রকৃতি। ইহা ব্যতীত আমার আরও এক প্রকৃতি আছে তাহার নাম পরা প্রকৃতি; এই প্রকৃতি জীবভূতা এবং ইহার দ্বারাই এই জগৎ বিধৃত রহিয়াছে। সর্ব্বভূত প্রকৃতিরূপ যোনি হইতে উৎপন্ন জানিও। আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের হেতু।

শ্রীকৃষ্ণ অতি-সংক্ষেপে সৃষ্টি ও প্রলয়তত্ত্ব বর্ণনা করিলেন। এই সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান কেবল যোগীরই হইতে পারে, অতএব সাধারণের পক্ষে সৃষ্টিতত্ত্বের সম্যক ধারণা করা দুঃসাধ্য। অর্জ্জুনকে বিশদভাবে সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয় না; পরবর্ত্তী শ্লোক-সমূহেও এমন কোন ব্যাখ্যা নাই যাহাতে সাধারণের পক্ষে এই তত্ত্ব বুঝা সরল হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্টিতত্ত্ব কাপিল সাংখ্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীকৃষ্ণ নানা প্রকার সাধনমার্গ ও ধর্ম্মবিশ্বাসের উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহারই মধ্যে সাংখ্যবাদ আসিয়াছে; এই জন্যই ইহার বর্ণনা এত সংক্ষেপ। কাপিল সাংখ্যও দুর্ব্বোধ্য। পূর্ব্বপ্রকাশিত কাপিল সাংখ্যের বিবরণে সাংখ্যবাদের মূল তত্ত্বগুলির পরস্পর সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে। কিরূপ যুক্তিবিচার দ্বারা এই মূল তত্ত্বগুলিতে পৌছান যায় তাহা বুঝা কঠিন। কি করিয়াই বা 'মহৎ' হইতে ক্রমে ক্রমে স্থূল জগৎ উৎপন্ন হইল তাহা আধুনিক যুক্তিবাদীর অবোধ্য। পঞ্চ মহাভূতেরই বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি?

আমি এই সৃষ্টিতত্ত্ব যতটুকু বুঝিয়াছি তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। সৃষ্টি অর্থে মনুষ্য পশু-পক্ষী কীট বৃক্ষলতা ইত্যাদি সমন্বিত পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারকা প্রভৃতি বিশ্বজগতের তাবৎ পদার্থ বুঝায়। যাহা কিছুর অস্তিত্ব আমরা জানিতে পারি তাহাই সৃষ্টির অন্তর্গত। সৃষ্টিতত্ত্বজিজ্ঞাসুর নিকট সৃষ্টির পূর্ব্বোক্ত প্রকটিত বা ব্যক্ত অবস্থাই প্রতিভাত হয়। অতএব সৃষ্টির তত্ত্ব জানিতে হইলে এই দৃশ্য জগতের স্থূল পদার্থসমূহ হইতেই অন্বেষণ আরম্ভ করিতে হইবে। আধুনিক বিজ্ঞানী পর্য্যবেক্ষণ, যুক্তিবিচার ইত্যাদির দ্বারা প্রমাণ করেন যে, এই পৃথিবীর পূর্ব্বে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না, তাহা জলন্ত সূর্য্যের অন্তর্গত ছিল এবং এই সূর্য্য নীহারিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। যে অণুসমষ্টির দ্বারা নীহারিকা গঠিত তাহা আবার সূক্ষ্মতর 'ইলেকট্রন' ও 'প্রোটন' নামক পরমাণুর সমষ্টি। এই ইলেকট্রন ও প্রোটন অপেক্ষা সূক্ষ্মতর পদার্থ এখনও কিছু জানা যায় নাই। এই পরমাণুর উৎপত্তি কোথা হইতে হইল এবং কি করিয়াই বা ইহাদের সংযোগে নীহারিকার জন্ম হইল এখনও সে সকল তত্ত্ব জানা যায় নাই। নীহারিকা হইতেই জলন্ত সূর্য্য তারকার উৎপত্তি। এই সকল সূর্য্য

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫

এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬

তারকা কেহই স্থির নহে, তাহারা সকলেই ভীমবেগে আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কালক্রমে সূর্য্য হইতে কিয়দংশ বিক্ষিপ্ত হইয়া পৃথিবীর সৃষ্টি হইল ও পৃথিবী বায়বীয় ও জলন্ত অবস্থায় সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। বহু যুগ অতীত হইলে ক্রমে পৃথিবী অপেক্ষাকৃত শীতল হইল ও তাহার বহিরাবরণ প্রথমে তরল ও পরে কঠিন হইয়া মৃত্তিকা ও প্রস্তরাদির উৎপত্তি হইল। আরও শীতল হইলে বাষ্প জমিয়া পৃথিবীতে বারিপাত হইতে লাগিল ও নদী, নদ ও সমুদ্রের উৎপত্তি হইল। এত দিন পর্য্যন্ত পৃথিবীতে প্রাণবন্ত কিছুই ছিল না। সমুদ্রমধ্যেই প্রথমে 'প্রোটোপ্লাসম্' নামক জৈবিক পদার্থ জন্মিল এবং ইহা হইতে অতি ক্ষুদ্র আদি জীব উৎপন্ন হইল। ক্রমে ক্রমে বহু যুগে এই আদি জীব হইতে এক দিকে বৃক্ষলতাদি ও অপর দিকে প্রাণীবর্গ জন্মিল। প্রাণীবর্গের মধ্যেই প্রথম চেতনা দেখা দিল। আদিম প্রাণী হইতে বহু সহস্র যুগে ক্রমোন্নতির ফলে মনুষ্যের উৎপত্তি হইল এবং মনুষ্যেই চেতনার সম্যক স্ফুরণ হইল। আধুনিক বিজ্ঞানমতে ইহাই সৃষ্টি-প্রকরণ। এই মতে জড় পদার্থ প্রথমে উৎপন্ন হইয়া পরে প্রাণীবর্গ ও সর্ব্বশেষে চেতনার উদ্ভব হইয়াছে। হিন্দু দর্শনের মত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। হিন্দু শাস্ত্রমতে চেতনাই সর্ব্বপ্রথম এবং তাহা হইতেই সমস্ত জড়বর্গ উৎপন্ন হইয়াছে। মানুষের শরীর ও এমন কি মনও এই জড়বর্গের অন্তর্গত। প্রাচ্য দর্শন ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সৃষ্টিতত্ত্বে এই গুরুতর ভেদের কারণ বিচার্য্য।

হিন্দু দার্শনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদীকে বলিবেন, তুমি যে-উপায়ে সৃষ্টিরহস্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছ তাহাতে কখনই চরম তত্ত্বে পৌঁছিতে পারিবে না। ইলেক্ট্রন ও প্রোটনের উৎপত্তি খুঁজিতে গিয়া হয়ত আরও সূক্ষ্ম জড়ের সন্ধান পাইতে পার, কিন্তু জড়ের মূল কোথায় কোন কালেই তাহার ইয়ত্তা পাইবে না। তোমার সূক্ষ্মজড় যে-আকাশে রহিয়াছে সেই আকাশের উৎপত্তিই বা কোথা হইতে হইল? তুমি সৃষ্টির যথার্থ তত্ত্ব না বুঝিয়া প্রথমেই ভ্রান্ত পথ ধরিয়াছ অথবা সৃষ্টির মূল তত্ত্বে পৌঁছান তোমার বিজ্ঞানের উদ্দিষ্ট নহে। যেমন ভোক্তার অভাবে ভোজ্য দ্রব্যের স্বাদের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না সেইরূপ জ্ঞাতার অভাবে সৃষ্টির কল্পনা অসম্ভব। আমরা চিনিতে মিষ্টত্ব গুণ আরোপ করি সত্য, কিন্তু এই মিষ্টত্ব আস্বাদন দ্বারাই প্রত্যক্ষ হয় এবং আস্বাদন কালেই ইহার উৎপত্তি। চিনি ও রসনেন্দ্রিয় এই দুইয়ের সংযোগেই মিষ্টত্বের সৃষ্টি; ইহার যে-কোনটির অভাবে মিষ্টত্বের অস্তিত্ব অসম্ভব। আমরা চিনিকে যে মিষ্ট বলি তাহার কারণ এই যে, চিনির সহিত সর্ব্বদাই কোন আস্বাদনকারীর অবিচ্ছিন্ন সংযোগ কল্পনা করি। যিনি চিনির মিষ্টতার উৎপত্তির বিষয় অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত তাঁহার পক্ষে আস্বাদনকারীকে বাদ দেওয়া চলিবে না। চিনির মিষ্টতা ব্যতীত আরও কতকগুলি গুণ আছে, যথা—চিনির বিশিষ্ট রূপ বিশিষ্ট স্পর্শ ইত্যাদি। আস্বাদনকারী ব্যতীত যেমন চিনির মিষ্টতা উৎপন্ন হয় না সেইরূপ দ্রষ্টা ব্যতীত চিনির কোন রূপও কল্পনা করা যায় না এবং স্পর্শকারী-নিরপেক্ষ চিনির কোন স্পর্শগুণ থাকাও সম্ভব হয় না। আমরা ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যেই চিনি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বহির্বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করি। যদি আমাদের কাহারও ইন্দ্রিয়জ্ঞান না থাকিত তবে জগতের কোনও পদার্থের অস্তিত্ব জানিতে পারিতাম না অর্থাৎ কোন পদার্থই থাকিত না। জ্ঞাতা ভিন্ন জ্ঞাতব্য থাকিতে পারে না; বিষয়ী ভিন্ন বিষয় থাকে না। বিষয় ও বিষয়ী, দ্রষ্টা ও দৃশ্য পদার্থ, চেতন ও জড় পরস্পরের সংযোগে উভয়ে সার্থক হয়। একেকে বাদ দিয়া অপরের অস্তিত্ব কল্পনা করা চলে না। সৃষ্টি, অস্তি ইত্যাদি ভাবের পশ্চাতে সর্ব্বদাই এক অপরিহার্য্য চেতন সত্তা মানিতে হয়। এই জন্যই কাপিল সাংখ্য প্রকৃতিরূপ জড় ও পুরুষরূপ চেতন পদার্থের সংযোগে সমস্ত সৃষ্টি হয় বলিয়াছেন। বিজ্ঞানীর প্রতিপাদ্য চেতন-নিরপেক্ষ জড়োৎপত্তি গ্রাহ্য নহে। আমরা দৃশ্য হউক, অদৃশ্য হউক, অতীতে, বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে যখনই কোনও জড়ের স্থিতি মানিয়া লই তখনই অজ্ঞাতসারে তাহার এক কাল্পনিক জ্ঞাতার অস্তিত্বও মানিয়া লই। পদার্থ বিজ্ঞানের চেষ্টা বিষয়ী-নিরপেক্ষ বিষয়ের অনুসন্ধান। এই চেষ্টা একদেশদর্শী, সে জন্য ইহার দ্বারা দার্শনিক চরম তত্ত্বে পৌঁছান যাইবে না। পদার্থবিজ্ঞান ইচ্ছা করিয়াই নিজের জ্ঞাতব্য বিষয়

সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, ইহাতে তাহার কোন দোষ স্পর্শে নাই।

সাংখ্য, জড় ও চেতন অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই সত্তা মানিয়া লইয়া সৃষ্টি-প্রকরণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই দুইয়ের কোন একটিকে বাদ দেওয়া চলে না, কিন্তু একটু বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে, এই দুই তত্ত্বের গুরুত্ব সমান নহে। ইন্দ্রিয়দ্বার ব্যতিরেকে জড় প্রতিভাত হয়, না অর্থাৎ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান বা চেতনার আশ্রয়েই জড় সিদ্ধ হয়, কিন্তু চেতনা স্বয়ং-সিদ্ধ। আমরা জড়জগতের সমস্ত ব্যাপার ইন্দ্রিয় জ্ঞান-রূপ দোভাষীর সাহায্যে জানিতে পারি। মধ্যে এই দোভাষী থাকায় মনে স্বতই সন্দেহ জন্মে যে, জড়ের প্রকৃত তত্ত্ব আমরা জানিতে পারিতেছি কি না। যখন দেখি যকৃতের দোষে চক্ষুরিন্দ্রিয় বিকৃত হইলে শ্বেতবর্ণকে হরিদ্রা বর্ণ বলিয়া অনুভূত হয় তখন এই সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হয়। ইন্দ্রিয়গুলির স্বভাবজাত কোন দোষ থাকিলে বহির্বস্তু বিকৃত হইয়াই প্রতিভাত হইবে এবং সেই ভ্রম কোন কালেই আমরা ধরিতে পারিব না। এরূপ ক্ষেত্রে বহির্বস্তুর প্রকৃততত্ত্ব আমরা জানি বলা চলে না। দূরবীক্ষণের কাচের দোষে আমরা যেরূপ দূরস্থ বর্ণহীন পদার্থকেও বর্ণসংযুক্ত দেখি হয়ত সেইরূপ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক গঠনের দোষে বাস্তবিক বর্ণহীন পৃথিবীকে বিচিত্র বর্ণময় দেখিতেছি। এই সন্দেহ নিরাকরণের কোন উপায় নাই। আরও গুরুতর সন্দেহের কথা আছে। স্বপ্ন কালে আমরা এক বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করি। স্বপ্নদৃষ্ট নদী, পর্ব্বত, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতির কোন বাস্তব সত্তা নাই। স্বপ্নকালীন চেতনায় যে সকল জড়বস্তু প্রতিভাত হয় তাহাদের বাস্তব অস্তিত্বে প্রতীতি জন্মিলেও তাহারা বস্তুনিরপেক্ষ ও মনঃকল্পিত। স্বপ্নকালে স্বপ্নজগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণ করা যায় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইন্দ্রিয়সমূহের প্রত্যক্ষজ্ঞান ও তদ্দ্বারা প্রকাশিত জড়জগৎ বাস্তব সত্তা নাও হইতে পারে। জাগ্রত অবস্থায় যে-জগৎ সত্য বলিয়া অনুভূত হয় মোক্ষা-বস্থায় হয়ত তাহার মিথ্যাত্ব ধরা পড়ে। এই সকল বিচার হইতে বুঝা যাইবে যে, চেতন ও জড় এই দুই আদিতত্ত্বের মধ্যে চেতনারই গুরুত্ব অধিক। বেদান্ত মতে চেতনা হইতেই জড়ের উৎপত্তি। ব্রহ্মরূপ চেতনার আশ্রয়েই জড়জগৎ প্রতিভাসিত হয়। জড়ের নিজস্ব পৃথক সত্তা নাই। মোক্ষকালে জগতের সমস্ত পদার্থ ব্রহ্মে লীন হইয়া নানাত্ব জ্ঞান লোপ পায়। এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সত্তাই থাকিয়া যায়। কাপিল মতে জড় ও চেতন অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ উভয় সত্তাই সত্য এবং উভয়ের সংযোগেই জগৎ সৃষ্ট হয়। পুরুষ বহুসংখ্যক কিন্তু প্রকৃতি এক এবং সেই জন্যই প্রত্যেক পুরুষের নিকট সৃষ্টি একই প্রকার বলিয়া অনুভূত হয়। সৃষ্টির অভিব্যক্তি কালে পুরুষের চেতনার আশ্রয়েই সমস্ত জগৎ প্রকটিত হয়। সূক্ষ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ স্থূল জগতের অনুভূতি জন্মে। ইহাই সৃষ্টি।

বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ কোনও-না-কোন ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা পুরুষের চেতনায় প্রবেশ করে। অধিকাংশ পদার্থের অস্তিত্ব একাধিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা জানিতে পারি। বহির্বস্তুর প্রকাশক ইন্দ্রিয়গুলিকে আমরা জ্ঞানেন্দ্রিয় বলি। এই জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংখ্যা মাত্র পাঁচটি, যথা—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক। স্থূল চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নহে কিন্তু ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়স্থান মাত্র। যে-শক্তির দ্বারা আমরা দেখি তাহাই চক্ষুরিন্দ্রিয়। চক্ষু দুইটি কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয় একটি। সেইরূপ শ্রবণেন্দ্রিয় ইত্যাদি। বহির্বস্তুতে বিশেষ বিশেষ গুণ থাকাতেই তাহারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে ক্রিয়াশীল করে। বহির্বস্তুর যে গুণে চক্ষুরিন্দ্রিয় ক্রিয়াশীল হয় তাহার নাম রূপ, কিন্তু রূপবোধ মনের অনু-ভূতি। রূপের অনুভূতিকেও রূপ বলা হয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ বলিলে বাহিরের রূপ, রস ইত্যাদি ও মনের রূপ, রস ইত্যাদির অনুভূতি উভয়ই বুঝাইতে পারে। এই দুইয়ের পার্থক্য পরে আরও বিশদ হইবে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের অনুভূতির উত্তেজক বহির্বস্তুতে পাঁচটি পৃথক গুণ কল্পিত হইয়াছে, যথা—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং শব্দ। সকল পদার্থেই এই পাঁচটি গুণ বিদ্যমান নাই। গুণের সংখ্যাধিক্যে জড় পদার্থ স্থূল বিবেচিত হয় এবং সংখ্যালাঘবে তাহা সূক্ষ্ম হয়। মৃত্তিকাতে পাঁচটি গুণই বর্ত্তমান, কারণ আমরা চক্ষুদ্বারা মৃত্তিকা দেখিতে পাই, জিহ্বাদ্বারা

তাহার স্বাদ পাই, নাসিকা দ্বারা তাহার গন্ধ পাই, ত্বকের দ্বারা তাহার স্পর্শ অনুভব করি এবং কর্ণের দ্বারা মৃত্তিকায় আঘাতজনিত শব্দ শুনিতে পাই। বিশুদ্ধ জলে কোন গন্ধ নাই, কিন্তু তাহার এক বিশিষ্ট স্বাদ অনুভূত হয় অর্থাৎ জল পান করিলে বুঝিতে পারি জল পান করিতেছি, জল দেখিতে পাই, জলোত্থিত শব্দ শুনিতে পাই এবং স্পর্শদ্বারাও জলের অস্তিত্ব জানিতে পারি। জলে গন্ধব্যতীত আর চারিটি গুণই বর্ত্তমান। জল পৃথিবী অপেক্ষা সূক্ষ্ম জড়। অগ্নি জল অপেক্ষা সূক্ষ্ম, কারণ তাহাতে মাত্র তিন গুণ বর্ত্তমান, যথা—রূপ, স্পর্শ ও শব্দ। জিহ্বার স্পর্শগুণ দ্বারা অগ্নির অস্তিত্ব জানিতে পারি সত্য, কিন্তু অগ্নির কোন স্বাদ নাই, অর্থাৎ অগ্নির রসনেন্দ্রিয়-উত্তেজক কোন গুণ নাই। ধূমে গন্ধ অনুভূত হইলেও অগ্নিতে গন্ধ নাই। বায়ু অগ্নি অপেক্ষা সূক্ষ্ম, কারণ মাত্র স্পর্শ ও শব্দ দ্বারা বায়ুর অস্তিত্ব জানিতে পারা যায়। আকাশ সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম জড়পদার্থ। আকাশে মাত্র শব্দ-গুণ বর্ত্তমান।

আকাশ বলিলে হিন্দুশাস্ত্রকারেরা কি বুঝিতেন তাহা বিচার্য্য। প্রথমতঃ, আকাশ শূন্য নহে। যাহা শূন্য তাহা নাই। পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ এবং চন্দ্র সূর্য্য তারকা ইত্যাদি সমস্তই আকাশে অবস্থিত। জড় পদার্থের মধ্যে আকাশ যেরূপ সূক্ষ্মতম সেইরূপ বৃহত্তমও বটে। এজন্য অনেক ঋষি আকাশকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, অনেকে আকাশকে ইংরেজীতে space বলেন। তাঁহাদের মতে বিস্তার, দূরত্ব, ব্যবধান ইত্যাদির অনুভূতি আকাশেরই অনুভূতি। আধুনিক মনোবিদ বলেন, আমরা প্রধানতঃ দৃষ্টি, স্পর্শ ও শব্দের দ্বারা দূরত্ব বা ব্যবধান বুঝিতে পারি; অতএব এই সকল শব্দে যদি আকাশ পদার্থ নির্দ্দিষ্ট হয় তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, আকাশের অন্ততঃ তিনটি গুণ আছে, যথা—রূপ, স্পর্শ ও শব্দ; অতএব আকাশকে বায়ু অপেক্ষা সূক্ষ্ম বলা চলিবে না। কেহ বলিতে পারেন যে, আকাশকে আমরা দেখিতেও পাই না বা স্পর্শ করিতেও পারি না, অতএব দূরত্ব ব্যবধান প্রভৃতি যাহা দৃষ্টি বা ত্বক দ্বারা অনুভব করি তাহা প্রত্যক্ষ নহে, অনুমান মাত্র। অতএব আকাশে রূপ বা স্পর্শগুণ নাই। এই যুক্তিতে আকাশে শব্দগুণও আরোপ করা চলে না; কারণ শব্দদ্বারা যে দূরত্বের অনুভূতি হয় তাহাও অনুমানসাপেক্ষ। এই বিচারে আকাশের কোন গুণই রহিল না এবং আকাশ বলিয়া কোনও মৌলিক পদার্থ বা ভূতের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইল না। বৌদ্ধমতে শব্দগুণ বায়ুর, আকাশ বলিয়া কোন পদার্থ নাই। উপরি উক্ত বিচার হইতে বুঝা যাইবে যে, দূরত্ব, ব্যবধান, বিস্তার ইত্যাদিকে কপিল শাস্ত্রে আকাশ বলা হয় নাই। আকাশ ভিন্ন পদার্থ। সাংখ্যে দূরত্বাদি দিক্‌শব্দে অভিহিত হইয়াছে। সাংখ্যপ্রবচন ২।১২ সূত্রে আছে 'দিক্কালাবাকাশাদিভ্যঃ' অর্থাৎ দিক ও কাল আকাশাদি হইতে সমুৎপন্ন; আদি শব্দে আকাশ ব্যতীত অন্যান্য মহাভূতও বুঝাইতেছে। অর্থাৎ সাংখ্যমতে দিক ও কাল মহাভূতাদিগের গুণ হইতেই উৎপন্ন, অর্থাৎ রূপ, স্পর্শ, শব্দ, রস ও গন্ধাদি গুণ হইতেই দিক ও কালের অনুভূতি আসিয়াছে। দিক্ ও কালের অনুভূতি মূল অনুভূতি নহে। আমরা যাহা কিছু দেখি বা শুনি বা স্পর্শ করি তাহাতেই দিক্ জ্ঞান আছে। অনুভূতির ক্রমিক পরিবর্ত্তন হইতে কালজ্ঞানের উৎপত্তি। আধুনিক মনোবিদও বলেন যে, কালজ্ঞান ও দিক্‌জ্ঞান পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি হইতেই ক্রমে ক্রমে শিশুর মনে বিকশিত হয়। সাংখ্যের সহিত আধুনিক মনোবিদ্যার এ বিষয়ে কোন বিরোধ নাই। আকাশ, দিক্ শব্দের অন্তর্গত, দূরত্বাদি নহে। কিন্তু আকাশাদি হইতেই দিকের উৎপত্তি। তবে আকাশ কি পদার্থ?

কেহ কেহ মনে মনে করেন পদার্থ বিজ্ঞানের 'ঈথর'ই (ether) আকাশ, কিন্তু ঈথর অনুমানসিদ্ধ পদার্থ, তাহা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নহে, অপর পক্ষে আকাশকে মহাভূত বলায় তাহা প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য বুঝিতে হইবে। বায়ু বলিলে আমরা কি বুঝি প্রথমে তাহার আলোচনা করিব। স্পর্শ ও শব্দের দ্বারাই আমরা বায়ুর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিতে পারি; বায়ুর অস্তিত্ব জানিবার অন্য কোন উপায় নাই। একটি বিশিষ্ট স্পর্শ ও একটি বিশিষ্ট শব্দ অনুভূত হইলে আমরা বলি বায়ু আছে। এই দুই অনুভূতি মানসিক ব্যাপার মাত্র, কিন্তু ইহাদের

সাহায্যেই আমরা বায়ুরূপ বহির্বস্তর অস্তিত্ব বুঝিতে পারি। বায়ুর 'রূপ' একটি বিশিষ্ট স্পর্শ ও একটি বিশিষ্ট শব্দ মাত্র, তদ্ভিন্ন বায়ুর অন্য কোন মূর্ত্তি নাই। অতএব বায়ুর গুণই বায়ুর মূর্ত্তি। এই প্রকার বিচার দ্বারাই কপিল কি পদার্থকে আকাশ বলিয়াছেন বুঝা যাইবে। কাপিল মতে আকাশের একটি মাত্র গুণ স্বীকৃত হইয়াছে এবং তাহা শব্দ, অতএব শব্দের রূপই আকাশের রূপ। শব্দায়মান বস্তুকে বাদ দিয়া শব্দের অনুভূতি মাত্র ধ্যান করিলে শব্দগুণের স্বরূপ বুঝা যাইবে এবং এই অনুভূতির অনুযায়ী যে সূক্ষ্ম বহির্বস্তু তাহাই আকাশ। এই আকাশ অত্যন্ত সূক্ষ্ম পদার্থ, এজন্য তাহা সহজে সাধারণের অনুভূতিগ্রাহ্য নহে। যে কখনও লাল রং দেখে নাই তাহাকে যেমন লাল রঙের স্বরূপ বুঝান যায় না, সেইরূপ আকাশকে যে প্রত্যক্ষ করে নাই তাহাকে আকাশের স্বরূপ বুঝান যাইবে না। যোগী এই আকাশকে শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষ করেন। এই শব্দজ্ঞানের সহিত দিক্‌জ্ঞানও জড়িত আছে এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই হিসাবে আমরা যাহাকে আজকাল আকাশ বলি এবং সাংখ্যে যাহাকে দিক্ বলা হয় তাহার সহিত কাপিল আকাশের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। আধুনিক বিজ্ঞানী বলেন, বায়ুতরঙ্গবিশেষই শব্দরূপে প্রতিভাত হয়। কোন কোন সাংখ্যবাদীও এই মত পোষণ করেন। তাঁহারা বলেন, আকাশেই শব্দের উৎপত্তি কিন্তু সেই শব্দ বায়ুই শ্রবণেন্দ্রিয়ে বহন করিয়া আনে। কাষ্ঠাদির ন্যায় কঠিন পদার্থ এবং জলও শব্দ বহন করিতে পারে। পত্রবাহক যেমন পত্র নহে সেইরূপ শব্দবাহক শব্দ নহে। অনুভূতি বিশেষই শব্দ এবং এই অনুভূতি যে জড়বস্তুকে (শব্দায়মান পদার্থ নহে) প্রকাশ করে সেই সূক্ষ্মজড়ই আকাশ।

সাংখ্যের সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের বিরোধ নাই, কিন্তু উভয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় বিভিন্ন। আধুনিক রসায়নবিদ্ বলিবেন, মূল পদার্থ (elements) মাত্র বিরানব্বইটি। আধুনিক পদার্থবিদ বলিবেন, মূল পদার্থ মাত্র দুইটি,—ইলেকট্রন এবং প্রোটন; ইহাদেরই বিভিন্ন সংযোগে পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থের উৎপত্তি। সাংখ্য বলিবেন, তোমাদের কাহারও সহিত আমার বিরোধ নাই, তবে তোমাদের মূল পদার্থগুলিকে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে পাঁচটি ইন্দ্রিয়দ্বার ভিন্ন অন্য রাস্তা নাই, অতএব তোমাদের মূল পদার্থে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের মধ্যে এক বা ততোধিক গুণ স্বীকার করিতে হইতেছে। রাসায়নিকের চক্ষে স্বর্ণ মূল পদার্থ হইলেও তাহা চক্ষু, কর্ণ ও ত্বকের দ্বারা গ্রাহ্য, সুতরাং তাহাতে অন্ততঃ তিনটি গুণ আছে, অতএব আমার নির্ব্বচনমতে স্বর্ণ মূলপদার্থ নহে, তাহাতে তিন গুণের সমবায় দেখা যায়। যদি চক্ষুগ্রাহ্য পরীক্ষাদ্বারা ইলেকট্রোনের অস্তিত্বের অনুমান করিয়া থাক, তবে ইলেকট্রোনে রূপের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে, ইত্যাদি।

সাংখ্যমতে জড়বর্গের মধ্যে সূক্ষ্মতম আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি বা তেজ, তেজ হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব আকাশের শব্দগুণ অন্য চারিভূতেও আসিয়াছে। সেইরূপ বায়ুর স্পর্শগুণ অগ্নি, জল ও পৃথিবীতে, অগ্নি বা তেজের রূপ জল ও পৃথিবীতে, এবং জলের রস পৃথিবীতে আসিয়াছে। যে-গুণ যে-পদার্থে প্রথম দেখা দিয়াছে সেই পদার্থই সেই গুণের বিশেষ আধার বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। এইজন্য আকাশকে শব্দগুণের, বায়ুকে স্পর্শের, তেজকে রূপের, জলকে রসের এবং পৃথিবীকে গন্ধগুণের আধার বলা হয় এবং আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীকে পঞ্চ মহাভূতের প্রতীক বলিয়া ধরা হইয়াছে।

এইবার স্থূল জগত হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টিপ্রকরণ বিচার করিব। গীতার মতে সৃষ্টিতত্ত্বের প্রত্যক্ষ জ্ঞান কেবল যোগীরই সম্ভব। বিচারবুদ্ধির দ্বারা সাধারণে এই সৃষ্টিতত্ত্বের পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারে। একজন চেতন দ্রষ্টা ভিন্ন সৃষ্টির কল্পনা করা যায় না এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যাহা-কিছু ঘটুক না কেন সর্ব্বদাই তাহার একজন দ্রষ্টা আছে। সাংখ্যে এই দ্রষ্টা পুরুষ নামে অভিহিত হইয়াছে। পুরুষের চেতনাই সৃষ্টির পর পর সমস্ত অবস্থাকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। দৃশ্যমান পৃথিবী এই চেতনার দ্বারাই উদ্ভাসিত। ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারাই এই জগতের সত্তা উপলব্ধ হয়। অতএব পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অনুযায়ী মাত্র পঞ্চ মহাভূতের সত্তা প্রমাণিত

হইতেছে। এই মহাভূতগুলিকে পুরুষ বহির্বস্তু রূপে উপলব্ধি করে, কিন্তু এই উপলব্ধির মূলে পাঁচ প্রকারের ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান। এই জ্ঞান পুরুষের অন্তরের অনুভূতি। বাহিরের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের অনুরূপ ভিতরের রূপ, রস ইত্যাদির মানসিক অনুভূতি রহিয়াছে। এই পঞ্চ অনুভূতিকে পঞ্চ তন্মাত্র বলা যায়। পুরুষের চেতনায় এই পঞ্চ তন্মাত্র হইতেই পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি। পঞ্চ তন্মাত্র পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ে প্রতিফলিত হয় ও মন এই জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির সহিত সংযুক্ত থাকাতেই তাহারা ক্রিয়াক্ষম হয়। পুরুষের দেহও এই পঞ্চ মহাভূত হইতে উৎপন্ন এবং মনই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে এই দেহকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। অতএব এ পর্য্যন্ত বিচারের দ্বারা পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র, মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এই একুশটি তত্ত্ব পাওয়া গেল। এই একুশটি তত্ত্বের মধ্যেই জগতের যাবতীয় ব্যাপার রহিয়াছে। অবশ্য ইহার প্রত্যেকটি পুরুষের চেতনার দ্বারা উদ্ভাসিত। সাংখ্যমতে এই সমস্ত তত্ত্ব অহংকার হইতে উৎপন্ন। অহংকার অর্থে আমিত্ব ভাব। পুরুষ যে মুহূর্ত্তে নিজেকে জড়জগতের জ্ঞাতা বলিয়া জানিলেন, অর্থাৎ কতকগুলি বস্তুকে নিজ হইতে পৃথক দেখিলেন অর্থাৎ অহং ও ইদং এই ভেদ করিলেন তখনই জগত তাঁহার নিকট প্রকটিত হইল। ইন্দ্রিয়জ্ঞান সম্পন্ন মন ও তন্মাত্রের মূলে এই অহং ইদং ভাব আছে। মানসিক অনুভূতি অর্থেই তাহার একজন জ্ঞাতা আছে, অর্থাৎ অহংইদং ভেদ না থাকিলে মনের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এই জন্যই অহংকার হইতে মন ও তন্মাত্রার উৎপত্তি বলা হইয়াছে। অহংকারের মূলে অহং ইদং রূপ দুইটি বিভাগ। বিভাগের পূর্ব্বাবস্থা এক অখণ্ড সত্তা। এই সত্তাই মূল প্রকৃতি। অখণ্ড মূল প্রকৃতি যখন বিভাগের জন্য উন্মুখ হইল তখন তাহার নাম মহৎ। প্রকৃতি পুরুষের চেতনার সহিত মিলিত আছে অনুমান করিলে মহৎ অবস্থাকে দ্বিভাগ হইব এই রূপ সঙ্কল্পাত্মক অবস্থা বলা যায়, এই জন্যই মহতের অপর নাম বুদ্ধি। আমরা যে-শক্তির দ্বারা সঙ্কল্প করি তাহাকে বুদ্ধি বলা হয়। পূর্ব্বোক্ত একুশটি তত্ত্বের সহিত অহংকার, মহৎ ও প্রকৃতিকে যোগ করিলে সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্ব পাওয়া গেল। ইহাদের সহিত পুরুষরূপ চেতন তত্ত্ব সংযুক্ত থাকায় সৃষ্টিকে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বসমন্বিত বলা হয়। আধুনিক বিজ্ঞানবাদীর সৃষ্টিপ্রকরণের সহিত বেদান্ত সাংখ্য প্রভৃতি হিন্দুদর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টিপ্রকরণের বিরোধ নাই। কেবল সৃষ্টির প্রত্যেক অবস্থায় হিন্দু শাস্ত্র এক জন করিয়া চেতন সত্তা স্বীকার করিয়াছেন। বেদান্ত-অনুমোদিত সৃষ্টিপ্রকরণে প্রকৃতিকে ব্রহ্মের মায়াশক্তি বলা হইয়াছে এবং পুরুষবর্গ ব্রহ্মেরই অংশ স্বীকার করা হইয়াছে; বেদান্তমতে মূল সত্তা এক ব্রহ্ম মাত্র। গীতারও এই মত। ৺চন্দ্রশেখর বসু প্রণীত 'সৃষ্টি' গ্রন্থ হইতে হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত সৃষ্টিপ্রকরণ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি। বাহুল্য ভয়ে নানা শাস্ত্রোদ্ধৃত শ্লোকগুলি দিলাম না। মূল গ্রন্থে তাহা পাওয়া যাইবে।

"উপযুক্ত সময়ে সূক্ষ্মভূতগণ পঞ্চীকৃত ও মিলিত হইল এবং আত্মামাত্রা সকল উহাদের সহিত মিলিত হইয়া রহিল। এই সকল কাল ক্রমে একটা অণ্ডরূপে পরিণত হইল। প্রথমে উহার অন্তর্গত মৃত্তিকা, জল, জ্যোতি, বায়ু ও আকাশ (পঞ্চভূত) একাকার রূপে মিশ্রিত থাকাতে উহা অতি তরল ছিল। ক্রমে উহা জলবুদ্বুদের ন্যায় স্ফীত হইয়া হিরণ্য ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। "তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশু সমপ্রভং"। পৃথিবীই মূল অণ্ড। অন্য চারিভূত ও ইন্দ্রিয়াদি তাহারই সহিত মিশ্রিত থাকায় সর্ব্বশুদ্ধ অণ্ড বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কাল ক্রমে পৃথিবীরই গাত্রে জল, জ্যোতিঃ বায়ু এবং আকাশ অল্পে অল্পে এবং পৃথক পৃথক জমিতে লাগিল।...জল পৃথিবীকে বেষ্টন ও প্লাবিত করিয়া রহিল। জ্যোতিঃ জলকে ব্যাপিয়া থাকিল। বায়ু জ্যোতিকে ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিল। আকাশ বায়ুকে বেষ্টন করিল। ...এই পৃথিবী বহুদিন ধরিয়া জলমগ্ন ছিল পশ্চাৎ উপযুক্ত সময়ে ভগবান তাহাকে উদ্ধার করিলেন।...তাহার পৃষ্ঠে এক দিকে পর্ব্বত সকল সৃষ্টি করিলেন অন্যদিকে স্বতন্ত্র স্থানে সমুদ্র স্থাপন করিলেন। এইরূপে আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল সমন্বিত হইয়া ধরণী সৃষ্টি হইল। ঐ সমস্ত ভূত মণ্ডল সমন্বিত এই ধরণীই অণ্ড শব্দের বাচ্য।...পরমেশ্বর কেবল একটা মাত্র পৃথিবীর স্রষ্টা নহেন। তিনি কোটি কোটি অণ্ড সৃজন করিয়াছেন। সেই কোটি কোটি অণ্ড কালক্রমে কোটি কোটি পৃথিবী সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্ররূপে পরিণত হইয়াছে। হয়ত এখনও তেমন অসংখ্য অসংখ্য অণ্ড জন্ম. বৃদ্ধি ও পরিণতি লাভ করিতেছে।...শাস্ত্র বলিয়াছেন যে ভগবানের সৃষ্টি শক্তি যখন অব্যক্ত ছিল তখনও তিনি তাহাতে, আর ক্রম পরিণতির দ্বারা তাহা যখন ব্যক্ত হইতে লাগিল তখনও তিনি সেই প্রত্যেক পরিণতিতে, বিরাজমান ছিলেন। এখনও তিনি এই সৃষ্টির সর্ব্বাংশে প্রবেশ করিয়া আছেন। অতএব অব্যক্ত হইতে অণ্ড পর্য্যন্ত সকল অবস্থাতেই তিনি পুরুষরূপে বর্ত্তমান।...অব্যক্ত প্রকৃতিতে তিনি পুরুষ, ঈশ্বর অথবা ব্রহ্মা; পৃথিবীর কারণজলে তিনি নারায়ণ; অণ্ডেতে তিনি হিরণ্যগর্ভ ও পিতামহ ব্রহ্মা; সর্ব্বভূতে তিনি ভূতাত্মা; সূক্ষ্মদেহে হিরণগর্ভ, বৈশ্বানর বা বিরাট; স্থূল দেহে তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, বিশ্ব বা বিরাট; জীবাত্মাতে তিনি পরমাত্মা বা অন্তরাত্মা; এবং সমগ্র জগতে এবং কোটি কোটি অণ্ডে প্রবেশ করায় তিনি বিরাট

নামে উক্ত হয়েন। ব্রহ্মের একপাদ মাত্র সৃষ্টিতে ব্যাপ্ত হইয়া আছে অবশিষ্ট তিন পাদ নিষ্ক্রিয় নিঃসঙ্গ নিরঞ্জন, নির্গুণ, শান্ত, বাক্য মনের অগোচর এবং সৃষ্টিসংসারের অতীত ও অব্যক্ত।...

জল হইতে পৃথিবী উদ্গত হইয়া সহস্রসহস্র বৎসর নিস্তব্ধ শূন্যক্ষেত্রবৎ পতিত ছিল।...তখন জলগর্ভ বিনির্গত নবীন ভূমি ঊর্দ্ধমুখী পর্ব্বতমালা এবং দূরপ্রসারিত অমিত জলধি এই ত্রিবিধ দৃশ্য ব্যতীত প্রকৃতির অন্য কোন প্রভাব ভূপৃষ্ঠে আবির্ভূত হয় নাই। তখন ঐ তিন পদার্থ মাত্রই বর্ষিত সূর্য্য, চন্দ্র, তারাগণের জ্যোতিঃ এবং অন্তরীক্ষস্থ মেঘ ও বায়ুর ফলভোগ করিত। কোন দ্রষ্টা বা ভোক্তা ছিল না। কেবল বিধাতা স্বয়ং নির্ম্মাতা নিয়ন্তা ও প্রভবীরূপে বর্ত্তমান ছিলেন।.

প্রজাপতি পঞ্চভূতময়ী উপকরণবর্ণী পৃথিবী হইতে অচেতন, অজ্ঞানান্ধ, পঞ্চপ্রকার উদ্ভিদ পদার্থ প্রকাশ করিলেন যথা 'বৃক্ষ গুল্মলতাবিরুৎ সমত্বাক্তৃণজাতয়ঃ'। এই সৃষ্টির নাম মুখ্য-সর্গ অর্থাৎ প্রাথমিক সৃষ্টি। যেহেতু ইহা পশ্বাদি ও মানবের পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছিল। এইরূপে পৃথিবী প্রথমেই বৃক্ষ গুল্ম, লতাদি ঘটিত শোভাবরণে আবৃত হইল।... উদ্ভিদ সৃষ্টির পর ব্রহ্মা যখন জীবকে সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন পূর্ব্বক সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন ঐ অন্ন হইতে তিনি বিবিধ জীব উৎপন্ন করিলেন।... মাতা পিতার সংযোগে প্রত্যেক জীবের বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাহাতে যে জীবের যে স্বভাব ও ব্যবহার তাহাই তাহার বংশে আবহমান হইল। কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, পশু প্রভৃতি ইতর প্রাণীগণই ব্রহ্মার দ্বিতীয় সৃষ্টি। জরায়ুজ, এবং অণ্ডজ ও স্বেদজ জীবগণের মধ্যে কোন্ জাতি প্রথমোৎপন্ন হইয়াছিল শাস্ত্রে সে বিষয়ে কোন বিবরণ দৃষ্ট হয় না। শাস্ত্র যদি সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন, তবে বোধ হয়, যেমন ভূতের বিকার হইতে ভূতান্তরের ও ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি এবং অন্নের বিকার হইতে অব্যবহিতরূপে জীবের প্রকাশ নিরূপণ করিয়াছেন, সেই রূপ সম্ভবতঃ অন্নের বিকার হইতে প্রথমে কীট (যাহাদিগকে স্বেদজ কহেন) ও কীটের বিকার হইতে অণ্ডজ জন্তুগণ, অণ্ডজ জন্তুগণের বিকার হইতে পশ্বাদি পশ্বাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদে বানর এবং বানরের বিকার হইতে নরের উৎপত্তি হইয়াছে বলিতেন। যদি তাহা বলিতেন, তবে শাস্ত্র যেরূপ ক্রম পূর্ব্বক সৃষ্টির বিবরণ দানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা উত্তমরূপে সমাধা হইত। যাঁহারা নরকে বানরের সন্তান বলেন তাঁহারাও তাহা হইলে শাস্ত্র হইতে স্ব স্ব মতের বিস্তর পোষকতা পাইতেন। ফলে শাস্ত্র সেরূপ অভিপ্রায় দিলেও ঈশ্বরকে প্রত্যেক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্তারূপে রাখায় এবং নরের জীবাত্মাকে নিত্য পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করায় তাহাতে উক্ত বাদীগণের অন্ধ প্রকৃতি-বাদের কোন পোষকতা হইত না। সে যাহা হউক শাস্ত্রের এতদূর নিশ্চিত সিদ্ধান্ত দেখা যাইতেছে যে, ইতর প্রাণীদিগের পশ্চাৎ পিশাচ, যক্ষ, রাক্ষস, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, বিদ্যাধর, কিন্নর, সাধ্য, পিতৃ, সিদ্ধ, দেবতা প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহার পর মানবের উৎপত্তি হইয়াছে।"

কাণ্ডারী ভগবান

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

কর্ম্মক্ষেত্র হাঁকে ওই যবে শর্ব্বরী হ'ল ভোর,
রংমহালের নর্ম্ম-লীলা কি ভাঙিল রে আজি তোর?
মর্ম্মে মর্ম্মে এঁটে নে বর্ম্ম আজি রে কর্ম্ম দিয়া,
যাত্রার পথে ওঠে আজি তোর এ ধরণী ছন্দিয়া।
হারানো জীবন দেবতার খোঁজে যাত্রা করিবি চল্,
সম্মুখে ওই উত্তাল নদী গর্জ্জিছে কলকল্।
কলকল্লোল দিতে হবে পাড়ি সম্বল ডিঙাখান,
জোরে ধরে হাল তুলে দেরে পাল, কাণ্ডারী ভগবান।

হেরেছিস কিরে, অগ্নির সম দগ্ধ করার ছলে,
ছুটেছে ক্ষুধিত সবলের গ্রাস অতল সৃষ্টি-তলে।
যাত্রার পথে কত না যাত্রী আগে এসেছিল যারা,
জয় গৌরবে ভাসাইয়া তরী ওই চলে যায় তারা,
দলে দলে জয় পতাকা উড়ায় তুই একা পড়ে' পিছে,
তবু আজ তোরে যেতে হবে, নব জন্ম নহে রে মিছে।
গর্জ্জাক্ নদী দুর্য্যোগে আজ খুলে দেরে ডিঙাখান্,
জোরে ধরে হাল তুলে দেরে পাল, কাণ্ডারী ভগবান।

আজও র'ল যারা রঙ্গে মাতিয়া পড়িবে রে তারা ফাঁকী
জলে ও মাটিতে দাঁড়াবার স্থান আর নাহি ওরে বাকী।
কর্ম্ম-সমরে যাত্রীরা সব ক'রে নেছে অধিকার,
জন্মভূমির যজ্ঞের লাগি; তুই সব পিছে তার।
তবু যেতে হবে বাঁচিবার লাগি। দাঁড়া উন্নত শিরে,
সকলের মাঝে নিতে হবে ঠাঁই আজি ওরে চুল চিরে।
গর্জ্জাক নদী দুর্য্যোগে আজ দাঁড়া রে দীপ্ত প্রাণ,
জোরে ধরে হাল তুলে দেরে পাল, কাণ্ডারী ভগবান।

পশ্চাতে টানে স্বপ্নের মোহ আঁকড়িয়া বাহুপাশে,
তবু যেতে হবে—মথুরার ডাক্ ছুটে আসে সন্ত্রাসে।
হাঁকে নরনারী দীন অক্ষম, আর্ত্তের হাহাকার,
গর্ব্বোদ্ধত মানব চাহিছে দেবতার অধিকার।
অতীতে অস্ত গিয়াছে সূর্য্য—আঁধার ভবিষ্যৎ,
বালুর সিন্ধু-মরীচিকা-মাঝে খুঁজে নিতে হবে পথ।
নবজন্মের যাত্রায় আজি জীবনের অভিযান,
বাজে ওই শিঙা, খুলে দেরে ডিঙা কাণ্ডারী ভগবান।

মাতৃ-ঋণ

শ্রীসীতা দেবী

২২

প্রতাপের জীবনে এমন রাত্রি ইতিপূর্ব্বে আর আসে নাই। সারাসন্ধ্যা পথে পথে ঘুরিয়া সে বাড়ি ফিরিয়া আসিল। যন্ত্রচালিতের মত খাইতে বসিল, কি যে মুখে দিল তাহা বুঝিলও না, কিন্তু অন্যদের সঙ্গে সমানে বসিয়া রহিল। পিসিমা বলিলেন, "খাওয়ায় যদি এর কোনো রুচি আছে, এই বয়সের ছেলে এমন হবে কেন? একটু তেতো টেতো বেশী করে রেঁধ তো বৌমা।"

চিত্তের উপর বিপুল পাষাণভার লইয়া সে শয়ন করিতে গেল। ভাবিয়াছিল তাহার চক্ষে ঘুমও আজ আসিবে না। কিন্তু বেদনা তাহার সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। দয়াময়ী প্রকৃতিদেবীই যেন তাহাকে নিদ্রার কোমল অঙ্কে বহন করিয়া লইয়া গেলেন। মূর্চ্ছার মত গভীর ঘুম তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিল। দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা তাহার চেতনার চারিপাশে বিচরণ করিয়া ফিরিল, তাহাকে ভাল করিয়া যেন স্পর্শ করিতে পারিল না।

অন্যদিন ভোরে প্রতাপ ওঠে সর্ব্বাগ্রে, পিসিমাও সবদিন তাহার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারেন না। আজ কিন্তু গজু পর্য্যন্ত উঠিয়া পড়িল, তবু প্রতাপ উঠিল না। রাজু তাহাকে ডাকিতে গেলে পিসিমা বারণ করিলেন, "আহা থাক থাক, দেহটা ওর মোটে ভাল নেই কাল থেকে, যা ভূতের মত খাটুনি।

যাহা হউক, খানিক পরে প্রতাপ নিজেই উঠিয়া বসিল; চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "এঃ, বড্ড বেলা হয়ে গেছে, আমাকে ডাকনি কেন?"

গজু তাহার ঘরের সামনে দিয়া যাইতে যাইতে বলিল, "নিদ্রিত প্রতাপ দেখা ত ভাগ্যে ঘটে ওঠে না, তাই সবাই সেটা একটু উপভোগ করে নিচ্ছিলাম।"

প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতাপ যেন কাহার অশুভ পদধ্বনির জন্য কান পাতিয়া ছিল। জীবনের একটা অধ্যায় আজই যে তাহার শেষ হইয়া যাইবে, এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ মাত্র ছিল না। তাহার পর যে কি ঘটিবে সে-কথা ভাবিতে তাহার মস্তিষ্ক অস্বীকার করিতেছিল। মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হতভাগ্যের মত সে কেবল যেন স্বল্পাবশেষ মুহূর্ত্ত পল-অনুপলগুলি অতি তীব্র ভাবে অনুভব করিতেছিল। অস্তিত্বের শেষ তাহার এইখানেই নয় হয়ত, কিন্তু তাহার পরিচিত জীবনের এই শেষ। ইহার পর যে বাঁচিয়া থাকিবে সে কি প্রতাপ? যে মানুষটা সহস্র দুঃখদৈন্য নির্য্যাতন ও অভাবের মধ্যে ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিয়াছে, মৃত্তিকাশয়নে যে-হতভাগ্য ইন্দ্রপুরীর স্বপ্ন দেখিয়াছে, ভাগ্যদেবীর কঠিনতম পীড়নেও যে বিশ্বাস করিতে পারে নাই, যে, সে শুধু এই হীনতার সাগরে বিলীন হইয়া যাইবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই প্রতাপ কি আর এই পৃথিবীর বুকে বিচরণ করিবে? তাহার কি কোন আশা থাকিবে, কিসের প্রেরণা তাহাকে জীবন-সংগ্রামে চালিত করিবে? সে নিঃশ্বাস লইবে কিসের আনন্দে, সে চাহিয়া দেখিবে কিসের মূর্ত্তি দেখিবার জন্য? শুধু স্মৃতির বন্ধনে বাঁধা থাকিবে তাই সে প্রতাপ, না হইলে প্রতাপের আজই ত মৃত্যু হইল।

সকালটা কিন্তু কাটিয়া গেল, কেহ আসিল না। পোষ্টম্যান সকালে একবার ডাক বিতরণ করিয়া যায়, সেও আসিল, দু তিনখানা চিঠি দিয়াও গেল, কিন্তু প্রতাপের জন্য একখানাও নয়। তাহার অস্থিরতা ইহাতে আরও যেন বাড়িয়া উঠিল। যাহা হইবেই, তাহা হইয়া গেলেই ভাল। আর যেন সে সহ্য করিতে পারিতেছিল না।

স্নানাহার সবই সে যন্ত্রচালিতের মত করিয়া গেল। রাজু শুদ্ধ তাহার রকম দেখিয়া বলিল, "বড় বেশী হয়ে যাচ্ছে, দিন কতক ছুটি নিয়ে একটু চেঞ্জ-টেঞ্জে ঘুরে এস,

নইলে হঠাৎ একদিন মুখ থুবড়ে পড়বে। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। একবার বেহাল হয়ে পড়লে তখন মা বাপ ভাই বোন কেউ তোমাকে সামলাতে আসবে না।"

প্রতাপ শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ চেঞ্জেই যেতে হবে এবারে, আর পারছি না।"

স্কুলে প্রথম দিকের কয়েক ঘণ্টা সে ভালই পড়াইল। হঠাৎ তাহার অস্থিরতা কেমন করিয়া যে জুড়াইয়া গেল, তাহা নিজেই বুঝিতে পারিল না। টিফিনের ঘণ্টা পড়িবার পর বাহিরে ছোট যে একটুখানি তৃণাচ্ছাদিত স্থান ছিল সেইখানে গিয়া ঘুরিতে লাগিল। সহকর্মীদের কণ্ঠস্বর শুনিবার মত অবস্থা আর তাহার ছিল না।

দরোয়ান তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। আসিবেই ত। এত দেরি কেনই বা তাহারা করিতে গেল, সকালেই ত যাহা জানাইবার জানাইয়া দিলেই হইত। গেটের বাহিরে ও লোকটা কে? ছোট্ট সিং না? বোধ হয় বাড়ির ঠিকানা জানা নাই, তাই স্কুলে ইহাদের ধাওয়া করিতে হইয়াছে। আচ্ছা, চিঠিখানা লিখিবে কে? যামিনী কি? তাহা নয় সম্ভবতঃ। হয় তাহার পিতা, নয় তাহার মাতা। পিতা হওয়াই সম্ভব, কারণ মাতার সহিত ছেলের গৃহ-শিক্ষকের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই, যদিও ইহার রোগের সূত্র ধরিয়াই যামিনীর সহিত প্রতাপের পরিচয় হইয়াছিল। কঠিন হাসি হাসিয়া প্রতাপ ভাবিল, সেবা না করিয়া জানদাকে যাইতে দিলেই তাহার নিজের পক্ষে ভাল ছিল।

দরোয়ান পিওন বুক এবং একখানা মোটা খাম তাহার দিকে অগ্রসর করিয়া দিল। নাম সহি করিয়া প্রতাপ খাতাটা ফিরাইয়া দিল। দরোয়ান চলিয়া গেল।

খামের উপরে নিজের নামটা খানিকক্ষণ ধরিয়া প্রতাপ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। হাতের লেখা নৃপেন্দ্রবাবুর, ভিতরের চিঠিটাও অবশ্য তাঁহারই। কি লিখিয়াছেন তিনি? প্রচুর তিরস্কার করিয়াছেন, না সংক্ষেপে সারিয়াছেন? খুলিয়া দেখিলেই হয়।

প্রতাপ চিঠি খুলিয়াই ফেলিল। মোটা একখানা কাগজ ঠক করিয়া তাহার পায়ের কাছে পড়িয়া গেল। সেখানা কুড়াইয়া খুলিয়া দেখিল চেক। ছুইমাসের মাহিনা তাহাকে হিসাব করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কেন? বিনা নোটিশে তাহাকে ছাড়ান হইল বলিয়া? যাক, এদিকে ভদ্রতার ত্রুটি কিছু হয় নাই।

আসল চিঠিখানা অতি সংক্ষিপ্ত। নৃপেন্দ্রবাবু ইংরেজীতে লিখিয়াছেন, বিশেষ কারণ বশতঃ প্রতাপকে তিনি বিদায় দিতে বাধ্য হইতেছেন। তাহার কার্য্যে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন, একখানি সার্টিফিকেটও সেই মর্ম্মে তিনি লিখিয়া দিয়াছেন। বিনা নোটিশে ছাড়াইয়া দেওয়ার জন্ত তাহাকে যাহাতে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত না হইতে হয় সেইজন্য ছুই মাসের মাহিনা তাহাকে দেওয়া হইল।

চিঠিখানা পড়িয়া, পাট করিয়া প্রতাপ আবার খামে পুরিল, খামটা পকেটে রাখিয়া যেমন ঘুরিতেছিল তেমনই ঘুরিতে লাগিল। পদক্ষেপগুলি সামান্য একটু দ্রুততর হইল এই যা। যাক, চুকিয়া গেল। প্রতাপ নিশ্চিন্ত হইল, এ জন্মের মত ভাবনাচিন্তা করিবার আর তাহার কোনো কারণ রহিল না। এখনও সে বাঁচিয়া আছে বটে, কিন্তু নিজের জন্য তাহার কোনো দায়িত্ব নাই। যিনি তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, তিনিই সে ভাবনা ভাবিবেন। আর পরিবার, পরিজন? তাহারাই বা প্রতাপের কে? তাহাদের কাহারও জীবন-মরণের জন্য সে দায়ী নয়। অবস্থাচক্রে একত্র আসিয়া জুটিয়াছে, আবার কোথায় ছিটকাইয়া পড়িবে, কাহারও সহিত কাহারও সম্পর্কও থাকিবে না।

টিফিনের ঘণ্টা শেষ হইয়া গেল। প্রতাপ আবার ক্লাসে ফিরিয়া গেল। নিয়মমত পড়াইল, তাহার কার্য্যে বা ব্যবহারে বিশেষ কোনো উত্তেজনা বা বিষাদ প্রকাশ পাইল না। স্কুল ছুটি হইবামাত্র একটা গাড়ী ডাকিয়া বাড়ি চলিয়া আসিল।

আজ আর বিকালে তাহাকে বাহির হইতে হইবে না। তাই ত, সমস্ত সন্ধ্যাটা লইয়া সে করিবে কি? এখনই ত বৌদিদি তাহাকে চা জলখাবার দিতে আসিবেন। খাইয়া-দাইয়াও যদি তাহাকে বসিয়া থাকিতে দেখেন, তাহা হইলে তিনি, না হয় অন্ততঃপক্ষে পিসিমা, বসিয়া থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করিবেনই। প্রতাপ কারণ বলিতে পারিবে

কি? সদ্যমৃত শিশুর উল্লেখমাত্র করা জননীর যেমন অসাধ্য তাহার এই সদ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত জীবনের বিষয় কাহাকেও কিছু বলা প্রতাপের পক্ষে তেমনই অসাধ্য। সে এখন কাহাকেও কৈফিয়ৎ দিতে পারিবে না।

কিন্তু এ বাড়িতে থাকিয়া কথা চাপা দিয়া রাখিতে পারিবে কি? হয় ত পারিবে না। আচ্ছা, হাতে ত এখনও টাকা আছে, কোনো একটা মেসে পলাইয়া গিয়া উঠিলে কেমন হয়? সেখানে কেহ কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিবে না। কিন্তু পিসিমা কি মনে করিবেন? বিপদের সময় তিনি দয়া করিয়া আশ্রয় দিয়াছিলেন, এখন এমন ভাবে চলিয়া যাওয়াটা বড়ই অকৃতজ্ঞের কাজ হইবে। তা হইলই বা? কৃতজ্ঞতা, অকৃতজ্ঞতা, দয়া, স্নেহ, মমতা, ভালবাসা, সব বাংলা ভাষার কতগুলা কথা ভিন্ন প্রতাপের কাছে আর কিছু নয়। একটামাত্র অনুভূতি এখন তাহার আছে, তাহা বেদনা। আর ক্রোধ? ক্রোধও আছে নাকি? কাহার উপর? প্রতাপ ঠিক যেন বুঝিতে পারিতেছে না। জানদার উপর, না যামিনীর উপর? যামিনীই কি বেশী অপরাধিনী নয়? জানদার নিকট প্রতাপের কোনো মূল্যই নাই, সে একটা আকস্মিক উৎপাত মাত্র। তিনি যদি তাহাকে পথ হইতে দূর করিবার চেষ্টা করেন তাহাতে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় কি? কিন্তু যামিনী ত প্রতাপকে ভাবী পতিরূপে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার প্রণয়-নিবেদন কান পাতিয়া শুনিয়াছিল, সে আজ এই হত্যাব্যাপারে সায় দিল কি করিয়া? সে নিজে কিছু করে নাই বলিলেই কি তাহার দোষ স্খালন হইল। সে বাধা দিল না কেন? সে বিদ্রোহ করিল না কেন? অক্ষমতা, দুর্ব্বলতাও কি পাপ নয়, অন্ততঃ সময়বিশেষে? যামিনী শিশু নয়, সে কি জানিত না, এই সংগ্রাম তাহার সম্মুখে আছে? জানিয়া কেন সে প্রতাপকে নিবৃত্ত করে নাই? কেন সে তাহার দুরাশাকে প্রশ্রয় দিয়াছিল? কেন সে প্রতাপকে আকাশ কুসুমের মালা গাঁথিতে সহায়তা করিয়াছিল?

যামিনীরই অপরাধ, কিন্তু তাহাকে শাস্তি দিবে কে? প্রতাপ নয়, প্রতাপের সাধ্য নাই। তাহার তরুণ জীবনের ধ্বংসকারিণীই তাহার জীবনের একমাত্র প্রেয়সী। ভগবান যামিনীকে শাস্তি দিন, ইহা সে চায় না, কিন্তু দণ্ড যামিনীর প্রাপ্য রহিল। প্রতাপের আর কি কিছু করিবার নাই? হয়ত যামিনী সত্যই নিরুপায়, সহায়হীনা। কেহ তাহার পাশে দাঁড়াইলে সে এখনও সত্যবিচ্যুতি হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু প্রতাপ কি উপায়ে তাহার নাগাল পাইবে? যামিনী এখন তাহার কাছে সুদূর নক্ষত্রের মতই দুরধিগম্য। প্রতাপ ও নিরুপায়, সহায়হীন। কে তাহাকে পথ দেখাইবে?

বৌদিদি চা জলখাবার লইয়া আসিয়া ডাক দিলেন, "কি আকাশ-পাতাল ভাবছ, ঠাকুরপো?"

প্রতাপ নীরসকণ্ঠে বলিল, "কি আর ভাবব, মনে মনে জমাখরচ মেলাচ্ছি।"

বৌদিদি ঠাট্টার সুরে বলিলেন, "ওঃ, মস্ত সংসার তোমার ঠাকুরপো, জমাখরচ আর কিছুতেই মেলে না? হ'ত আমার মত ত বুঝতে। একধারে কর্ত্তা বলেন, দু-হাতে সব উড়িয়ে দিচ্ছি, অন্যধারে শাশুড়ী বলেন, এমন কিপ্পন বউ, যে, তার হাত দিয়ে জল গলে না।"

প্রতাপ তাঁহার কথা শুনিল কি-না বোঝা গেল না। নীরবে চা খাওয়া শেষ করিয়া বলিল, "রাত্রে হয়ত আমি ফিরব না আজ, পিসিমাকে বলবেন, তিনি যেন চিন্তা না করেন।"

বৌদিদি হাসিয়া বলিলেন, "আজ আবার হল কি ঠাকুরপো? গিন্নির অসুখে একপালা রাত জেগে হাড় কালি করলে, এখন কি তার মেয়ের জন্যে রাত জাগতে যাচ্ছ?"

প্রতাপের মুখখানা একেবারে কালো হইয়া উঠিল। "একরকম তাই-ই বটে", বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

সারা বিকাল সারা সন্ধ্যা সে ঘুরিয়া বেড়াইল। কোথায় যাইবে স্থির করিতে পারে না। একেবারে অপরিচিত স্থানে যাইতে তাহার ইচ্ছা, কিন্তু তেমন স্থানে চট করিয়া জায়গা পাওয়া যাইবে কি? পরিচিত কোনো স্থানে যাইতে তাহার ইচ্ছা করে না।

অনেক ঘোরাঘুরি করিয়া একস্থানে একটু জায়গা পাইল। যে-প্রেসের প্রুফ ইত্যাদি সে দেখিত সেখানকারই কয়েকজন কম্পোজিটার প্রভৃতি

এখানে থাকে। প্রতাপের মত শিক্ষিত ভদ্রলোককে এখানে জায়গা দিতে সকলেই ইতস্ততঃ করিতেছিল, কিন্তু প্রতাপের অত্যধিক আগ্রহাতিশয্যে অবশেষে রাজী হইল। তাহাদের তখন রাত্রির আহারের স্থান হইতেছে। প্রতাপ সকলের সন্ত্রস্ত ভাব দেখিয়া বলিল, "আমি যে মুট বোরয়েছি, রাত্রে আর পারব না, তবে আমার জন্যে একটি কাজ করতে হবে।"

কম্পোজিটার বিহারীর সঙ্গেই প্রতাপের বেশী পরিচয় ছিল, সে অগ্রসর হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলুন?"

প্রতাপ বলিল, "আমার ভবানীপুরের বাসা থেকে বিছানা আর বাক্সটা নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু আগে খেয়ে নাও।"

সকলে খাইতে বসিল। ক্ষুদ্র, প্রায়ান্ধকার ঘরের কোণে প্রতাপ জড়ের মত বসিয়া রহিল। মস্তিষ্কের ভিতর ঝড় যত তুমুল হইয়া উঠিতেছে, দেহ ততই যেন তাহার বিকল হইয়া যাইতেছে, সে যেন আর হাত পাও নাড়িতে পারিবে না।

খাওয়া চুকিয়া গেল। বিহারী বলিল, "তবে ঠিকানাটা লিখে দিন।"

এক টুকরা ছেঁড়া কাগজে প্রতাপ গজুর নাম এবং ঠিকানা লিখিয়া দিল। বিহারীর হাতে পয়সা দিয়া বলিল, "ট্রামে করে যাবে। আসবার সময় গাড়ীভাড়া করে আসবে, আমি ভাড়া দিয়ে দেব।"

বিহারী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আমাকে ত তাঁরা চেনেন না, আমার হাতে যদি জিনিস না দেন?"

নিজের বোকামীতে প্রতাপের নিজেরই হাসি পাইল। জিনিস আনাইবার বেশ সুব্যবস্থা সে করিতেছিল বটে। তাহার পাগল হইতে আর বেশী দেরি নাই। আর একখানা কাগজ চাহিয়া লইয়া, সে গজুকে একখানা চিঠি লিখিয়া দিল, যে বিশেষ কারণে তাহাকে এখানে আসিতে হইয়াছে। জিনিষগুলি যেন পত্রবাহকের হাতে দেওয়া হয়। প্রতাপ দুই একদিনের ভিতরই গিয়া তাহাদের সঙ্গে দেখা করিবে।

বিহারী চলিয়া গেল। মেসের অধিবাসী সব কয়জনই দারিদ্র, সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে। বৈকালিক আহার তাহাদের জোটে না, সেইজন্য ফিরিয়া আসিয়া, হাতমুখ ধুইয়াই তাহারা রাত্রির খাওয়া পেট ভরিয়া খাইয়া লয়। তাহার পর কেহ-বা মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়ে, কেহ বা হ্যারিকেনের স্তিমিত আলোয় বন্ধুবান্ধব জোগাড় করিয়া তাস খেলিতে বসে, কেহ-বা পাড়ার কনসার্ট পার্টিতে গিয়া জুটে। চাকর ঠাকুরের বালাই নাই, মাহিনা দিবে কে? একজন একজন পালা করিয়া রাঁধিয়া কাজ চালায়। যাহার সকালে কাজ আরম্ভ, বিকালে শেষ, সে সন্ধ্যায় রান্নার ভার লয়, যাহার দশটায় গেলে চলে অথচ আসিতে রাত্রি হয়, সে ভোরে উঠিয়া রাঁধিয়া রাখে। আর যাহা কাজ, তাহা প্রত্যেকে নিজেরটা নিজে করে।

মেস দেখিতে দেখিতে নিঝুম হইয়া গেল। সাড়ে ন'টা দশটার আগে ইহারা কেহ ফিরিবে না। খালি প্রৌঢ় নিবারণ মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে, সঙ্গ বা আমোদ অপেক্ষা বিশ্রামই তাহার অধিক প্রয়োজন। আর এক কোণে ভাঙা টুলের উপর বসিয়া আছে প্রতাপ।

বহুক্ষণ পরে গলির খোয়াগুলার উপর গাড়ীর চাকার উৎকট আর্তনাদ শোনা গেল। বিহারী ফিরিল তবে? কিন্তু প্রতাপ উঠিয়া দেখিতে গেল না।

জিনিষগুলি গাড়োয়ান আর বিহারী বহন করিয়া ভিতরে আনিল। প্রতাপ বসিয়া বসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "ভাড়া কত?"

গাড়োয়ান কাঁইমাঁই করিয়া নিজের বক্তব্য বলিতে আরম্ভ করিতেই বিহারী তাহাকে তাড়া দিয়া বাহিরে পাঠাইয়া দিল। তাহার পর বলিল, "এক টাকার কমে বেটা কিছুতেই রাজী হয় না, বলে বহুৎ দূর, হেন তেন। তা দিন চোদ্দ আনা, দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিই। না হয় চেঁচাবে খানিকক্ষণ।"

কিন্তু দুই আনা লইয়া দরদস্তুর করিবার দিন প্রতাপের চলিয়া গিয়াছে। সে ঠন্ করিয়া একটা টাকা ফেলিয়া দিয়া বলিল, "বিদেয় করে দাও, এত রাতে আর চেঁচামেচিতে কাজ নেই।"

বিহারী মুখ বিকৃত করিয়া টাকাটা গাড়োয়ানকে

ছুঁড়িয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর বলিল, "এই ঘরেই ত শুতে হবে আপনাকে। বিছানাটা করে দেব ?"

নিজের অদ্ভুত শারীরিক জড়তাকে নিতান্ত মনের জোরে অতিক্রম করিয়া প্রতাপ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, আমি নিজেই করে নিচ্ছি। তোমাকে করতে হবে কেন ? আমি কি লাটসাহেব ?" সে কথার কোনো জবাব না দিয়া বিহারী বলিল, "কাল একটা ছোট দেখে তক্তপোষ কিনে নেবেন, যা স্যাঁতা মেঝে, আপনার অসুখ করবে।"

"কিছু হবে না, চিরজন্ম আমি মাটিতেই ত শুয়েছি," বলিয়া বিছানাটা খুলিয়া প্রতাপ যেমন-তেমন করিয়া এক কোণে পাতিয়া ফেলিল। তাহার পর শুইয়া পড়িয়া লেপ চাপা দিল। কথা বলিবার ইচ্ছার অভাবটা তাহার এতই সুস্পষ্ট যে, বিহারী ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

আজ কিন্তু ঘুম সহজে আসিল না। স্থান পরিবর্ত্তন, মশকের দংশন, নিবারণের নাসিকা গর্জ্জন, সর্ব্বোপরি তাহার নিজের অস্বাভাবিক উত্তেজনা তাহাকে জাগাইয়া রাখিল। কি করিবে সে ? সত্যই কি এই শেষ, তাহার আর কিছুই করিবার নাই ? কত প্ল্যান কতবার করিল, কতবার বিসর্জ্জন দিল, তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই। জগতে এমন একটা মানুষ নাই যে তাহাকে একটু উপদেশ দিয়াও সাহায্য করে। তাহাকে মরিতে হইবে, মুখ বুজিয়া। দুঃখ সে হয়ত সহ্য করিতে পারিবে, কিন্তু প্রকাশ করিতে গিয়া দুঃখের যে অবমাননা, তাহা সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না।

২৩

সকালে উঠিয়া প্রতাপ যামিনীকে চিঠি লিখিতে বসিল। একখানা চিঠি অনেকখানি লিখিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। না, অত কথা লিখিবার কিছু প্রয়োজন নাই। ছোট করিয়া লিখিল। নৃপেন্দ্রবাবু তাহাকে জবাব দিয়াছেন জানাইয়া লিখিল, সে যামিনীর কাছে পরামর্শ চায়। তাহাদের যাহা সম্বন্ধ ছিল, তাহাই অটুট থাকিবে কি ? না, সে-ক্ষেত্রেও পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা যামিনী যেন নিজে তাহাকে জানায়। যামিনীর পিতা মাতার মতই প্রতাপ মানিয়া নিতে পারে না।

বাসার সকলেই কাজে ব্যস্ত। কাক পক্ষীর সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদের জাগিয়া উঠিতে হয়। ঘরের কাজ-কর্ম্ম সারিয়া, রাঁধিয়া খাইয়া সকলেই বাহির হইয়া যায়। বাড়ীর সদর দরজায় তালা বন্ধ থাকে। চাবি সকলের কাছেই এক-একটা থাকে, যে সর্ব্বাগ্রে ফেরে, সে-ই তালা খোলে।

সকালে শুধু এক পেয়ালা চা, তাহার সঙ্গে আর কিছু জোটে না। অবশ্য খাইবার ইচ্ছাও প্রতাপের বিন্দুমাত্র ছিল না। চিঠিখানা নিজেই সে গিয়া ডাক বাক্সে ফেলিয়া আসিল। এদিকে রান্না শেষ হইয়া আসিয়াছে, কয়েক জন খোলা উঠানে চৌবাচ্চার পাশে দাঁড়াইয়া ঝপাঝপ শব্দে স্নান সুরু করিয়াছে। স্নানের ঘরের বালাই বাড়ীতে নাই, থাকিলেও কেহ তাহা ব্যবহার করিত না। এই খানটায় সকালের রৌদ্র এক টুকরা আসিয়া পড়ে, এইখানেই স্নান করিবার সুবিধা। বিহারী ডাকিয়া বলিল, "আপনিও স্নান করে নিন্ না ? রান্না ত হয়ে গেছে।"

প্রতাপ পাড়াগাঁয়ের ছেলে, খোলা জায়গায় দশজনে মিলিয়া স্নান করা তাহার অনভ্যাস ছিল না, কিন্তু তাহা সে পছন্দ করিত না। বলিল, "না আজ আর স্নান করব না, শরীরটা ভাল নেই।"

আহারের জায়গা করিয়া সকলে খাইতে বসিয়া গেল। পিসিমার বাড়ি কিছু কাল বাস করিয়া প্রতাপের জিহ্বাটা একটু বিলাসী হইয়া উঠিয়াছিল, রান্না তাহার অসম্ভব রকম বিস্বাদ লাগিতে লাগিল। পাঁচ-দশ রকমও নাই যে, একটা ফেলিয়া একটা খাইবে। খালি একটা মাছের ঝোল, আর একটা তেঁতুল গোলা টক। তাহাই দিয়া কোনমতে দুই চার গ্রাস খাইয়া সে উঠিয়া পড়িল। এখনও তাহার স্কুল বসিতে অনেক দেরি, অথচ বাসার সকলেই বাহির হইয়া যাইতেছে। প্রতাপ বলিল, "তালা চাবিটা আমাকেই দিয়ে যাও, যাবার সময় বন্ধ করে দিয়ে যাব।"

তালা চাবি তাহার হস্তে সম্প্রদান করিয়া সকলে বাহির হইয়া গেল। নিজের বিছানাটা বাহিরের রোয়াকের উপর টানিয়া আনিয়া প্রতাপ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। কিন্তু শান্তি কোথাও নাই, মাথার ভিতর তাহার যেন আগুনের ঝড় বহিতে লাগিল। সব শেষ

হইবার আগে তাহার সংশয়াকুল চিত্ত কেবলই সব শেষ করিবার জন্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু শেষ হওয়ার সংবাদে কই সে অধীরতা ত দূর হইল না? ইহাকে কিছুতেই যে সে মানিয়া লইতে পারিতেছে না। কোনো ফল নাই জানিয়াও বিদ্রোহ করিবার জন্ত তাহার সমস্ত হৃদয় যে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে? কি করিবে সে? মৃত্যুর অতলস্পর্শ শান্তির ভিতর একেবারে সে তলাইয়া যাইবে আশা করিয়াছিল, কোথাও সে শান্তির তো চিহ্নও দেখিতে পায় না?

শুইয়া থাকাও অসম্ভব দেখিয়া সে উঠিয়া পড়িল। ঘর বন্ধ করিল, বাহিরের দরজায়ও তালা দিল। তখনও কিছু সময় হাতে আছে। ভাবিল হাঁটিয়া গেলেই হইবে, তাহা হইলেই সময় বেশ ফুরাইয়া যাইবে।

প্রতাপ হাঁটিয়াই ভবানীপুর চলিল। স্কুলে সময়মতই পৌঁছিল। নিজের কাজ নিয়মমত করিয়া গেল, কিন্তু টিফিনের ঘণ্টায় মনটা আবার উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় আকুল হইয়া উঠিল। যামিনী হয়ত চিঠি পাইয়াছে, সে কি উত্তর দিবে? চাকরের হাতে এইখানেই কি চিঠি পাঠাইবে, না ডাকেই দিবে? তাহার মা কি চিঠি তাহার হাতে পৌঁছিতে দিয়াছেন, না উহা মাঝপথেই বাজেয়াপ্ত হইয়াছে? কে জানে? নৃপেন্দ্রবাবুকে ত ভদ্রলোক বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু জ্ঞানদার অসাধ্য কর্ম্ম নাই।

টিফিনের সময় আবার পূর্ব্বদিনের মত সে বাহিরে ঘুরিতে লাগিল,কিন্তু আজ আর কাহারও সন্ধান পাইল না। ঘণ্টা শেষ হইয়া গেল। স্কুলের পর খানিক হাঁটিয়া, খানিক ট্রামে চড়িয়া সে বাসায় ফিরিয়া আসিল। তখনও আর কেহ ফেরে নাই। তালা খুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া প্রতাপ বাহিরের বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একবার ভাবিল বাহিরে গিয়া একপেয়ালা চা খাইয়া আসিবে, কিন্তু অবসাদ তাহাকে এমন করিয়া আচ্ছন্ন করিয়া ছিল যে, শেষ পর্য্যন্ত উঠিতে পারিল না।

শীতকালের বেলা দেখিতে দেখিতে গড়াইয়া আসিল। একজন দুইজন করিয়া মেসের অন্ত মানুষগুলিও ফিরিতে লাগিল। ভাঙা হ্যারিকেন জ্বালা হইল, রান্নাঘরের চুলায় আঁচ পড়িয়া ধোঁয়ায় ক্ষুদ্র বাড়াটা একেবারে ঝাপসা হইয়া উঠিল।

বিহারী জিজ্ঞাসা করিল কাছেই একটা দোকান আছে চায়ের, আপনার জন্তে নিয়ে আস্‌ব এক পেয়ালা? দু-পয়সা করে।

প্রতাপ বলিল দরকার, "নেই। বিকালে চা খাওয়া আমার তত বেশী অভ্যাস নেই।"

সময় আর কাটিতে চায় না। ঘরের ভিতরের ধোঁয়াও অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। র‍্যাপারখানা গায়ে জড়াইয়া প্রতাপ আবার বাহির হইয়া পড়িল। খানিকটা লক্ষ্যহীন ভাবে এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইল। একবার ভাবিল পিসিমার ওখানে গিয়া তাঁহাদের যাহা হয় একটা কিছু বলিয়া আসিবে, কিন্তু মনের দারুণ অনিচ্ছাটাকে কোনমতেই অতিক্রম করিতে পারিল না। কি তাঁহাদের বলিবে সে? সত্য গোপন করিবার মত চাতুর্য্য তাহার আছে কি?

ঘণ্টা দেড় ঘুরিয়া আবার সে মেসেই ফিরিয়া আসিল। তখন ধোঁয়া খানিকটা কাটিয়া গিয়াছে, রান্নাও প্রায় হইয়া আসিয়াছে। সকলেই খাবারের আশায় এধার ওধার বসিয়া আছে। প্রতাপও এক জায়গায় বসিয়া রহিল।

খাওয়ার পর দেখিতে দেখিতে সব কয়জন মানুষই বাহির হইয়া গেল। প্রতাপের যাইবার স্থান কোথাও নাই, অল্পক্ষণ আগে সে ঘুরিয়াও আসিয়াছে। সুতরাং ঘরের কোণে বিছানা পাতিয়া শুইয়া সে ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল।

রাতটা তাহার দারুণ উৎকণ্ঠার ভিতর দিয়া কাটিয়া গেল। প্রচণ্ড আঘাতের পর মানুষের মন অনেক সময় অসাড় হইয়া পড়ে, বেদনাবোধ তাহার থাকে না, ব্যথা জাগিয়া ওঠে ক্রমে ক্রমে। প্রতাপেরও হইয়াছিল তাহাই। অবরুদ্ধ যাতনায় তাহার যেন হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে-ছিল। যামিনী যদি তাহাকে রক্ষা করে, এই তাহার শেষ আশা। কিন্তু যামিনীর সে সাধ্য, সে শক্তি আছে কি? প্রেমের খাতিরে অসম্ভবও দুর্ব্বল মানুষের পক্ষে সম্ভব হইয়া ওঠে বলিয়া প্রতাপ শুনিয়াছে, কিন্তু কার্য্যতঃ কখনও দেখে নাই। যামিনীর সম্বন্ধে বিশ্বাস তাহার খুব প্রবল।

ছিল না, হৃদয়ের অন্তস্তলে সে তাহা অনুভব করিতেছিল, কিন্তু নিজের কাছেই স্পষ্ট করিয়া স্বীকার করিতে তাহার মন সভয়ে পিছাইয়া যাইতে ছিল।

সকালবেলাটা তবু একরকম কাটিয়া গেল। দিনের সদ্যজাগ্রত কর্মকোলাহলের মধ্যে পীড়িত চিত্তের একটা আশ্রয় আছে। জগৎসংসারের গতি সমানে চলিতেছে, কোথাও তাহার বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে না, এই বোধটা মানুষকে তাহার অজ্ঞাতসারেই সান্ত্বনা দেয়। তাহার দুঃখবেদনা তাহা হইলে অসীম, অনন্ত নয়, ইহা যেন সে কেমন করিয়া অনুভব করে, জগৎব্যাপারে সেটার স্থান অতি অল্প, অতি নগণ্য।

যথাসময়ে স্কুলে গিয়া হাজির হইল। চমকিত হইয়া দেখিল গেটের কাছে রাজু দাঁড়াইয়া আছে। প্রতাপকে দেখিবামাত্র সে অগ্রসর হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারখানা কি শুনি? বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ একেবারে লোপাট হয়ে গেলে কেন?

প্রতাপ সে কথার সোজাসুজি কোনো উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার আপিস নেই নাকি? এমন সময় এখানে যে?"

রাজু বলিল, "তোমার কল্যাণে। বিনা বাক্যব্যয়ে উড়ে গেলে, এসব রোম্যান্টিক মনোভাব বুঝবার মত বুদ্ধি আমাদের মা-মাসীদের ত নেই? মায়ের প্যানপ্যানানিতে বাধ্য হয়ে অবশেষে আমাকেই তোমার সন্ধানে আসতে হল। আপিসে লেট্ হব আর কি?"

প্রতাপ একটু লজ্জিতভাবে বলিল, "আমি বিকালেই আজ যাব ভাবছিলাম।"

রাজু বলিল, "তা যেও এখন, তার আর কি? তবে হঠাৎ মেসে গিয়ে হাজির হলে কেন, সেটা কি শুনতে পাই? আমাদের ওখানে যদি তোমার কিছু অসুবিধা হচ্ছিল ত সেটা আমাদের বললেই পারতে।"

প্রতাপ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "মোটেই তা না। ওখানে আমি যতটা সুখে ছিলাম, নিজের বাড়িতেও কখনও তা থাকিনি।"

রাজু বলিল, "তবে পালালে কেন?"

বলতে পারব না ভাই, অন্ততঃ এখন নয়। তবে এইটুকু জেনে রাখ যে, তোমাদের বাড়ি-সংক্রান্ত কোনো কারণই নয়। ওখানে সত্যিই সকল রকমে আমার খুবই সুবিধা হয়েছিল।"

রাজু বলিল, "তা বেশ, এত গোপন কথা যখন তখন নাই বললে। পার ত যেও বিকালে, মা তোমাকে দেখলে তবু নিশ্চিন্ত হবেন।"

রাজু চলিয়া গেল। প্রতাপ গিয়া ক্লাসে ঢুকিল। এই রকম না বলিয়া চলিয়া আসাটা সত্যই তাহার ঠিক হয় নাই। অন্যকে ভাবাইবার তাহার কি অধিকার? কিন্তু এখন দশা তাহার হইয়াছে যে, মাথা ঠিক করিয়া কিছু করাই অসম্ভব।

দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িয়াছে, এক ক্লাস হইতে উঠিয়া প্রতাপ আর এক ক্লাসে চলিয়াছে। দরোয়ান আসিয়া একখানা চিঠি তাহার হাতে দিয়া গেল। প্রতাপ তাড়াতাড়ি বারান্দায় বাহির হইয়া গেল। তাহার চিঠিরই উত্তর সন্দেহ নাই। কিন্তু লিখিয়াছে কে? উপরের হস্তাক্ষর তাহার অপরিচিত।

চিঠিখানা খুলিয়া ফেলিল। লিখিয়াছেন জ্ঞানদা, অতি বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায়। প্রতাপ তাঁহার নাবালিকা কন্যাকে ভুলাইয়া-ফুসলাইয়া বিবাহ করিবার চেষ্টায় আছে। তাহার মতলব যামিনীর টাকাকড়ি হস্তগত করা। যামিনীর পিতামাতার ইহাতে সম্পূর্ণ অমত, তাঁহারা প্রতাপকে সর্বাংশে অনুপযুক্ত পাত্র মনে করেন। সুতরাং প্রতাপ যদি ইহারও পর লুকাইয়া-চুরাইয়া যামিনীকে চিঠিপত্র লেখে বা তাহার সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করা হইবে। সংক্ষেপে ইহাই জ্ঞানদার বক্তব্য।

প্রতাপ চিঠিখানা কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। আর তাহার ভাবিবার, আশা করিবার কিছু রহিল না। সব সংশয়, সব উৎকণ্ঠার অবসানও হইল। যামিনী হয় মাটির পুতুল, নয় যামিনী জেলের কয়েদী। প্রতাপ আর কোনো দিন তাহার নাগাল পাইবে না। এই সঙ্গে সঙ্গে নিজের এই পীড়িত জীবনটাকে যদি শেষ করিয়া

ঘণ্টাটা ঢং ঢং করিয়া শেষ হইয়া গেল। প্রতাপ ক্লাসে না গিয়া হেডমাষ্টারের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। তিনি চশমাটা কপালের উপর ঠেলিয়া তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ব্যাপার প্রতাপবাবু ?"

প্রতাপ বিনা ভূমিকায় বলিয়া বসিল, "বিশেষ প্রয়োজনে আজ রাত্রেই আমাকে বাড় যেতে হচ্ছে।"

হেডমাষ্টার বিরক্তভাবে বলিলেন, "এ রকম চট করে যাওয়া ত হতে পারে না। আপনার ক'দিন দেরি হবে ?"

প্রতাপ বলিল, "ঠিক বলতে পারছি না। আর নাও আসতে পারি।"

হেডমাষ্টার বলিলেন, "তাহলে রীতিমত নোটিশ দিতে হবে। আপনার কাজটা পারমানেণ্ট হবার বেশ চান্স ছিল, তা যদি এ রকম করেন—"

বাধা দিয়া প্রতাপ বলিল, "তার দরকার নেই, আমি আর কাজ করব না ঠিক করেছি।"

হেডমাষ্টার বলিলেন, 'সে আপনার খুশী, কাউকে কাজ করতে ত আমরা কম্পেল করতে পারি না ? তবে এভাবে যাওয়ার কন্‌সিকোয়েন্স বেশ আন্‌প্লেজেণ্ট হতে পারে।"

"তা ত হবেই" বলিয়া প্রতাপ তাঁহার ঘর হইতে বাহির হইয়া সোজা রাস্তায় গিয়া পড়িল। পায়ে হাঁটিয়াই দুপুর রৌদ্রে বাসায় ফিরিয়া আসিল।

তালা খুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। কি দীনতা, কি অন্ধকার, কি নিরানন্দ! ইহার ভিতর সে থাকিবে কেন ? না, সে থাকিবে না। সে পরিবার, পরিজন কাহারও কথা ভাবিতে পারিবে না। তাহার অপরিমেয় ব্যথা, অসহ্য চিত্তগ্লানির লাঘব কাহাকেও দিয়া হইবে কি ? হইবে না, তাহা সে জানে। তবে অন্যের দুঃখ লাঘবের চেষ্টা সে কেন করিবে ?

জিনিষ গুছাইবার মত কিছু ছিল না। বাক্সটা বন্ধ করিয়া, বিছানাটা সে বাঁধিয়া লইল। বিহারীর নামে একখানা চিঠি লিখিয়া তাহার সঙ্গে দুইটি টাকা মুড়িয়া দিয়া চিঠিখানা সে বিহারীর বাক্সের উপর রাখিয়া দিল। তাহার পর বাক্স বিছানা টানিয়া বাহির করিয়া সদর দরজায় তালা লাগাইয়া দিল, চাবির জন্য ভাবনা নাই, সকলের কাছেই এক একটা চাবি আছে।

গলি হইতে একটু অগ্রসর হইয়া গিয়া, বড়রাস্তা হইতে একটা গাড়ী ডাকিয়া আনিল। জিনিষপত্র তুলিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "চল হাবড়া।"

গভীর অন্ধকার রাত্রে প্রতাপ নিজের জীর্ণ ভগ্ন পল্লীভবনে ফিরিয়া আসিল। মা ভাই বোন সকলে বিস্মিতদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, কিন্তু কেহই তাহার নিকট কোনো কথা জানিতে পারিল না।

ক্রমশঃ

কষ্টিপাথর

মাতৃভাষাই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাহন

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শৈশবে ও বাল্যকালে আমরা পিতামাতা ও অন্য আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবেশীদের মুখের কথা শুনিয়া যে জ্ঞানলাভ করি, তাহা মাতৃভাষার সাহায্যেই করি। সুতরাং শৈশবে ও বাল্যে পুস্তকাদি হইতে যে জ্ঞানলাভ করি, তাহাও মাতৃভাষার সাহায্যে করাই যে স্বাভাবিক এবং তাহাই যে প্রকৃষ্টতম উপায়, সে বিষয়ে প্রমাণ ও যুক্তির প্রয়োগ অনাবশ্যক। কৈশোর ও যৌবনে জ্ঞানলাভও যে মাতৃভাষার সাহায্যেই ভাল হয়, তাহাই কেবল আমাদিগকে বিবেচনা করিতে হইবে। ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ বলিয়া এবং সেই কারণে আমাদিগকে অল্প বয়স হইতেই ইংরেজী শিখান হয় বলিয়া এরূপ আলোচনা এদেশে আবশ্যক বোধ হয়। মাতৃভাষাই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাহন, না বিদেশী কোন ভাষা শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাহন, এরূপ আলোচনা স্বাধীন ও সভ্য কোন দেশে হয় বলিয়া অবগত নহি।

ইংরেজী শিক্ষা করা যে আমাদের পক্ষে উচিত ও আবশ্যক, তাহা নিশ্চয়ই স্বীকার্য্য। মানুষের জ্ঞান বিদ্যার সকল বিভাগেই বাড়িয়া চলিতেছে। নূতন জ্ঞানের সহিত পরিচয়ের জন্য কোন-না-কোন শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য ভাষা জানা দরকার; কারণ, ভারতবর্ষের কোনও ভাষায় কোন বিদ্যার উচ্চতম ও নবীনতম জ্ঞানের পুস্তক, পত্রিকা আদি প্রকাশিত হয় না। ফরাসী, জার্ম্যান, ইংরেজী ইত্যাদি পাশ্চাত্য ভাষায় এইরূপ পুস্তক পত্রিকাদি প্রকাশিত হয়। আমাদিগকে অন্য কারণে ইংরেজী শিখিতে হয়। তাহাতে জ্ঞান-অর্জ্জন সম্বন্ধীয় এই উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়। ইংরেজী ছাড়া অন্যান্য পাশ্চাত্য ভাষা যদি কেহ শিখিতে পারেন ত আরও ভাল। সকল বিষয়ে উচ্চতম ও আধুনিক জ্ঞান যাহা হইতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে ইংরেজীই পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বেশী লোকে ব্যবহার করে। অতএব, ভারতবর্ষের লোকেরা ইংরেজী জানিলে তাহার সাহায্যে সভ্য জগতের বত লোকের সহিত চিন্তা ও ভাবের আদানপ্রদান করিতে পারিবে, অন্য কোন ভাষার সাহায্যে তাহা পারিবে না। এইরূপ আদানপ্রদান একান্ত আবশ্যক; কেন-না, তাহা ব্যতিরেকে আমাদিগকে কূপমণ্ডুক হইয়া থাকিতে হইবে। ইংরেজীর সাহায্যে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকেরা চিন্তা ও ভাবের বিনিময় করে, বাণিজ্য চালায় এবং নিখিল-ভারতীয় ধার্ম্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি প্রচেষ্টা চালায়। তাহার দ্বারা ভারতীয় মহাজাতি গঠনের সাহায্যও হইয়া আসিতেছে। ইংরেজীর সাহায্যে সকল মহাদেশের সহিত ভারতীয়েরা ব্যবসাবাণিজ্যও চালাইয়া থাকে। চাকরী, ওকালতী, ডাক্তারী, অধ্যাপকতা ইত্যাদির জন্য ইহা যে আবশ্যক, তাহা সকলেই জানে।

অতএব, মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করা উচিত, এরূপ বলিলে ইহা বলা হয় না যে, ইংরেজী শিক্ষা করা অনাবশ্যক। বস্তুতঃ, যে-সব বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাদের প্রত্যেকটিতে ইংরেজীও শিখান হইয়া থাকে। যেমন, অধ্যাপক কার্ভে মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ে, স্বামী শ্রদ্ধানন্দের প্রতিষ্ঠিত গুরুকুলে, লালা দেবরাজের প্রতিষ্ঠিত জালন্ধর কন্যা মহাবিদ্যালয়ে, ইত্যাদি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে ১৯৩৭ সন হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তদ্বিষয়ক ব্যবস্থাতেও ইংরেজী শিখাইবার বন্দোবস্ত আছে।

আমরা যে-যে কারণে ইংরেজী শিক্ষা করা আবশ্যক বলিয়াছি, তাহার সবগুলিই মনে রাখিয়া লোকে যে সন্তানদিগকে ইংরেজী শিখান, তাহা নহে; চাকরী ও উপার্জ্জনের অন্যান্য উপায় সুগম হইবে বলিয়াই প্রধানতঃ ইংরেজী শিখান। এই উদ্দেশ্যটি ছেলেদের শিক্ষায় যতটা মুখ্য, মেয়েদের শিক্ষায় ততটা মুখ্য নহে। মেয়েদেরও আর্থিক বিষয়ে স্বাবলম্বী হওয়া বাঞ্ছনীয় বটে; কিন্তু আমরা কেবল ইহাই বলিতেছি, যে, ছেলেদের মধ্যে প্রায় সকলেই উপার্জ্জনের জন্য উচ্চ শিক্ষা পাইবার অভিলাষী হয়; মেয়েদের সম্বন্ধে ঠিক তাহা বলা চলে না। এই জন্য মাতৃভাষাকে ছেলেদের শিক্ষার বাহন করার বিরুদ্ধে যতটা আপত্তি শোনা যায় মেয়েদের শিক্ষার জন্য মাতৃভাষার ব্যবহারের বিরুদ্ধে ততটা আপত্তি হইতে পারে না। অবশ্য আমাদের মতে, ছাত্র-ছাত্রী কাহাদেরই শিক্ষায় মাতৃভাষা ব্যবহারের বিরুদ্ধে আপত্তি যুক্তিসঙ্গত নহে। পাছে কেহ ভুল বুঝেন এইজন্য ইহাও বলিয়া রাখা ভাল, যে, আমাদের মতে ছেলে-মেয়ে উভয়েরই উচ্চ শিক্ষা হওয়া উচিত।

এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার সমুদয় সভ্য দেশে শিশু ছাড়া আর প্রায় সমুদয় পুরুষ ও নারী লিখিতে পড়িতে পারে। জাতির সকল প্রাপ্তবয়স্ক লোকের লিখিতে পড়িতে জানা বর্ত্তমান সময়ে সভ্যতার একটি লক্ষণ, এবং তাহা প্রগতির জন্য আবশ্যক। আমাদের দেশে আমরা যাহাকে সেকেণ্ডারী শিক্ষা (অর্থাৎ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষা) বলি, অনেক সভ্য দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে (এলিমেণ্টারী স্কুলে) সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়। আমাদের দেশে সেকেণ্ডারী শিক্ষা প্রধানতঃ ইংরেজীর সাহায্যে দেওয়া হয়। তাহার পর কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়সকলেও ইংরেজীর সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। এইরূপ ইংরেজীর সাহায্যে শিক্ষা ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে প্রায় দেড়শত বৎসর দেওয়া হইয়া আসিতেছে। তাহার ফলে ১৯২১ সালে ভারতবর্ষের সাড়ে একত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে কেবল পঁচিশ লক্ষ লোক ইংরেজী লিখনপঠনক্ষম ছিল বলিয়া গণিত হয়। দেড়শত বৎসরে পঁচিশ লক্ষ লোক ইংরেজী লিখনপঠনক্ষম হইয়া থাকিলে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান পঁয়ত্রিশ কোটি পরিচিত লোককে ইংরেজীতে লিখনপঠনক্ষম করিতে দুই শত দশ শতাব্দী অর্থাৎ একুশ হাজার বৎসর লাগিবে! এখন যেরূপ ধীরে ধীরে মাতৃভাষাতে প্রাথমিক শিক্ষা অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে সকল লোককে মাতৃভাষায় লিখন-পঠনক্ষম করিতেও অতি দীর্ঘকাল লাগিবার কথা। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার মত এত বেশী সময় লাগিবে না, এত বেশী খরচও হইবে না, এবং আমাদের হাতে স্বরাজ আসিলে পাঁচ কিংবা দশ বৎসরেই দেশ হইতে নিরক্ষরতা দূর করা যাইবে।

অনেকে বলেন, মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দিবার পক্ষে উপযোগী উচ্চাঙ্গের পাঠ্যপুস্তক নাই। কিন্তু গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিষয়ে ছাত্রছাত্রীরা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্য যে-সব বাংলা বই পড়ে

তাহাতে তাহারা প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী ঐ সব বিষয়ের ইংরেজী বহির চেয়ে কম শিক্ষা পায় না। ছাত্রবৃত্তির জন্য যখন নানাবিষয়ে বাংলা বহি লিখিত হইয়াছে, তখন প্রবেশিকা পর্যান্তও ত নিশ্চয়ই লিখিত হইতে পারিবে। তাহার প্রমাণ দিতেছি।

ইংলণ্ড, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশেও আগে উচ্চ শিক্ষা মাতৃভাষায় হইত না, লাটিন গ্রীকে হইত। ক্রমশঃ উচ্চ শিক্ষা যেমন মাতৃভাষায় হইয়াছে অমনি উচ্চতম শিক্ষার জন্য মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তকও লিখিত হইয়াছে, প্রয়োজনমত নূতন নূতন পারিভাষিক শব্দ রচিত হইয়াছে। ইউরোপে এই প্রকারে উচ্চতম শিক্ষার জন্য মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচিত হওয়ায় তথাকার নানা দেশের মাতৃভাষার সাহিত্যও সমৃদ্ধ হইয়াছে। আমাদের দেশেও উচ্চতম শিক্ষার জন্য মাতৃভাষা ব্যবহৃত হইলে এই প্রকার উচ্চাঙ্গের পাঠ্যপুস্তক মাতৃভাষায় রচিত হইতে পারিবে এবং তাহার দ্বারা মাতৃভাষার সাহিত্য পুষ্ট হইবে। সব উচ্চ প্রয়োজন-মত পারিভাষিক শব্দ প্রধানতঃ সংস্কৃত হইতে রচিত হইতে পারিবে। আরবী-ফারসীরও সাহায্য স্থলবিশেষে লইলে সুবিধা হইবে, যেমন হায়দরাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় লইতেছেন। কোন কোন স্থলে ঠিক ইংরেজী শব্দই রাখা বাঞ্ছনীয় হইবে। প্রাচীন কালে উচ্চতম জ্ঞান ভারতীয়েরা সংস্কৃত গ্রন্থাবলীতে নিবদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন। সংস্কৃত প্রভৃতির সাহায্যে আমাদের এখন দেশভাষায় তাহা করিতে না পারিবার কোন কারণ নাই। বাংলা মাসিক পত্রে বিজ্ঞানের অনেক কঠিন বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখকেরা আবশ্যক-মত পারিভাষিক শব্দ রচনা করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। প্রাচীন কালে হিন্দু বৈজ্ঞানিকগণ দরকার হইলে বিদেশী শব্দ গ্রহণ করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। যেমন, জ্যোতিষে ব্যবহৃত "হোরা" শব্দটি। উহা গ্রীক "হোরা" (Ὥρα) হইতে গৃহীত, যাহা হইতে ইংরেজী ("Hour") শব্দের উৎপত্তি। কলিকাতার অনেক কলেজে রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ রায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রভৃতি বিখ্যাত অধ্যাপকেরা পদার্থবিদ্যা, গণিত, রসায়নীবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যাপনা অনেক সময় বাংলায় করিতেন; কেবল কোন কোন স্থলে ইংরেজী পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিতেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, উচ্চ শিক্ষা মাতৃভাষার সাহায্যে হইলে তাহার জন্য উচ্চাঙ্গের পাঠ্যপুস্তক রচিত হওয়ায় মাতৃভাষার সাহিত্য সমৃদ্ধ হইবে। এখানে "সাহিত্য" ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিতেছি। উচ্চ শিক্ষা মাতৃভাষার সাহায্যে না হইলেও ভাল ভাল কবিতা, উপন্যাস, গল্প, সাধারণ প্রবন্ধ মাতৃভাষায় রচিত হইতে পারে, হইয়াছেও; কিন্তু জ্ঞানগর্ভ অন্য নানাবিধ গ্রন্থ মাতৃভাষায় যথেষ্ট রচিত হইবে না, সুতরাং, মাতৃভাষার সাহিত্য অঙ্গহীন থাকিয়া যাইবে। জ্ঞানের নানা শাখার গ্রন্থ মাতৃভাষায় রচিত হইলে আর একটি সুবিধা এই হইবে, যে, যাহারা কম শিক্ষিত, এমন কি হয়ত নিরক্ষর, তাহাদের মধ্যেও কিছু কিছু উচ্চ জ্ঞান মুখে মুখে পরোক্ষভাবে গিয়া পৌঁছিবে।...

আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য ভাষায় শিক্ষা প্রচলিত হওয়ায় যে উপকার হইয়াছে তাহা স্বীকার করি। কিন্তু তাহার কোন কোন কুফলেরও উল্লেখ আবশ্যক।

সংস্কৃত টোলে যে পণ্ডিত মহাশয় উচ্চতম শিক্ষা পাইয়াছেন এবং যে কৃষক হয়ত সম্পূর্ণ নিরক্ষর—ইহারা দুই জন ঠিক্ ভিন্ন ভিন্ন জগতের লোক এমন মনে হয় না। কিন্তু একজন প্রবেশিকা পাস্ করা ছেলে ও একজন মজুরকে অনেক সময় যেন ভিন্ন জগতের লোক মনে হইবে। এক পক্ষের জ্ঞানবত্তা ও অন্যপক্ষের অজ্ঞানতা ইহার একমাত্র কারণ নয়। কিছু ইংরেজীর জ্ঞান মানুষকে একটা স্বতন্ত্র শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান দেয় বলিয়া এরূপ ঘটে। সকলেরই অধিকাংশ শিক্ষা প্রধানতঃ দেশভাষায় হইলে অহঙ্কারের এই কারণটা অনেকটা না থাকায় দেশের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধানের অন্ততঃ একটা কারণ কিছু কমিবে মনে করি। অবশ্য 'উচ্চ জাতি" "নীচ জাতি" প্রভৃতি কুসংস্কার আরও বেশী ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু ব্যবধানের অন্যান্য কারণ আছে বলিয়া ভাষাগত এই একটা কারণকে মন্দীভূত করা অনাবশ্যক, এরূপ মনে করা উচিত নয়।

পুরুষজাতীয় ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষাজাত যে ব্যবধানের কথা বলিলাম, তাহা নারীদের মধ্যে আগে বেশী ছিল না; এখন ক্রমশঃ তাহার সৃষ্টি হইতেছে। তাহা প্রবল হইবার আগেই যদি ছাত্রীদের শিক্ষা প্রধানতঃ মাতৃভাষায় হয়, তাহা হইলে ব্যবধানটা দূর করিবার জন্য বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না।

জাতীয় একতা ও সংহতি বৃদ্ধির জন্য এরূপ কোন ব্যবধান থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু ব্যবধান আছে বলিয়া রাষ্ট্রনৈতিক নেতাদিগকে তাহা দূর করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতে হইয়াছে। আজকাল সকল শ্রেণীর লোকদের পরিচ্ছদ আগেকার চেয়ে এক রকমের হওয়ায় এবং জাতীয় মহাসভা হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট ছোট সভাসমিতিতে দেশভাষায় সমুদয় কাজ করিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হওয়ায় জাতীয় সংহতি বৃদ্ধি পাইতেছে।

সমুদয় বিষয়ের শিক্ষা মাতৃভাষার সাহায্যে দিয়া কেবল ইংরেজী ভাষার শিক্ষা ইংরেজী পুস্তক ও কথোপকথনের সাহায্যে দিলে ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরেজীর যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে না, কেহ কেহ এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। এখন ইংরেজী যেমন করিয়া শিখান হয়, তাহাতে এই আশঙ্কাকে সম্পূর্ণ অমূলক বলিতে পারি না। কিন্তু সুপ্রণালী অনুসারে ইংরেজী শিখাইলে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা নিশ্চয়ই ঐ ভাষা এখনকার মত কাজ চালাইবার মত শিখিতে পারিবে মনে করি, হয়ত তার চেয়ে ভাল পারিবে। কারণ, আমরা দেখিতে পাই, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের শিক্ষা-বিভাগে, প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে ও তদ্রূপ অন্য কোন কোন কাজের জন্য, এবং কোন কোন বিদ্যালয়ে কিছু বক্তৃতা দিবার জন্য যে-সব ফরাসী, জার্ম্মান, ডচ্, চেক্, নরুজিয়ান প্রভৃতি পণ্ডিত আমদানী করেন, তাঁহারা নিজ নিজ দেশে উচ্চতম শিক্ষা নিজ নিজ মাতৃভাষাতেই লাভ করেন, ইংরেজীটা কেবল একটা ভাষা-হিসাবে বিদ্যালয়ে সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা করিয়া শিক্ষা করেন; অথচ তাঁহারা এদেশে তাঁহাদের কাজ ইংরেজীতে করিয়া যান। তাহার কারণ, তাঁহাদের দেশে ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষা শিখাইবার প্রণালী ভাল। আমাদেশ দেশে ঐরূপ সুপ্রণালী অবলম্বিত হইলে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরাও অল্প সময়ে ইংরেজী শিখিতে বলিতে এবং লিখিতে পারিবে।

মাতৃভাষার সাহায্যে জ্ঞান যত সহজে ও অল্প সময়ে অর্জ্জিত হয় এবং উহা মনের যেমন "অস্থিমজ্জাগত" হয়, বিদেশী ভাষার সাহায্যে তাহা হয় না। অল্প সময়ের মধ্যে মাতৃভাষার সাহায্যে যে অধিক জ্ঞান লাভ হয়, তাহার একটি মাত্র প্রমাণ উল্লেখ করিলেই হইবে। আমরা অনেকে বাল্যকালে দশ-এগার বৎসর বয়সে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিবার জন্য বাংলা ভাষায় ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি যাহা শিখিয়াছিলাম, ইংরেজী ইস্কুলের ছেলেরা এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিবার জন্য পনর-ষোল বৎসর বয়সে ইংরেজী ভাষায় তাহা অপেক্ষা বেশী শিখিত না—এখনও বোধ হয় শিখে না।

র নানা যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া এই সিদ্ধান্তেই উপনীত ত হয়, যে, মাতৃভাষাই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাহন, এবং শিক্ষাকার্য্যে র ব্যবহার স্বাভাবিকও বটে।

(লক্ষ্মী, আশ্বিন, ১৩৩৯)

—

বাঙ্গালার গৌরব

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

ভারতবর্ষের বাহিরে যে এককালে বাঙ্গালার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার সম্বন্ধে আমরা ক্রমশঃই নূতন নূতন তথ্য লাভ করিতেছি। এই প্রভাব অস্ত্রবলে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইহার প্রেরণা ছিল ধর্ম্মের আকুল আহ্বান। ধর্ম্মবলে বলীয়ান, আদর্শ বাঙ্গালী গুরু, উপদেষ্টা ও প্রচারকরূপে এই সমুদয় দেশে বাঙ্গালার অমর কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী তাহাদের কথা ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু ঐ সমুদয় সুদূর দেশে তাহার স্মৃতি একেবারে লোপ হয় নাই।

খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত পালরাজগণের রাজ্যকালে বাঙ্গালা দেশ বৌদ্ধধর্ম্মের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। পালরাজগণ প্রায় সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত জয় করিয়া এককালে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কীর্ত্তি ও খ্যাতি তখন চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত। যখন ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছিল তখনও পালরাজগণের প্রভাবে বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য অব্যাহত ছিল। এশিয়ার অন্যান্য দেশের বৌদ্ধগণ তখন বাঙ্গালা দেশের নিকট হইতেই মূল ধর্ম্মের প্রেরণা পাইত। এইরূপে তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম্ম বাঙ্গালী অতীশ দীপঙ্কর ও অন্যান্য বাঙ্গালী বৌদ্ধগণের শিক্ষাদীক্ষা ও প্রভাবে নবজীবন লাভ করিয়াছিল।...

সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গালী বৌদ্ধগণ এই সময়ে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জেও ঐ ধর্ম্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।...

যে সময়ে পালরাজগণ বাঙ্গালায় রাজত্ব করিতেন সেই সময়ে মলয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও অন্যান্য অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ লইয়া একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজগণ এই বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। আরবদেশীয় বণিকগণ বাণিজ্য উপলক্ষে এই সমুদয় দ্বীপে যাইতেন। সুতরাং আরবদেশীয় গ্রন্থে এই সাম্রাজ্যের বহু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আরবদের বিবরণ পাঠ করিলে জানা যায় যে, সাম্রাজ্য তৎকালে শক্তি ও সমৃদ্ধির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। ইহার ধনৈশ্বর্য্যের কাহিনী উপকথার গল্পের মত মনে হয়। চীনদেশীয় ইতিহাসে ও ভারতীয় শিলালিপিতেও এই শৈলেন্দ্র-রাজ্যের উল্লেখ আছে। যবদ্বীপের যে বড়বুদুর স্তূপ আছে জগতের বিস্ময়স্থল যে বিরাট গৌরবের তুলনা পৃথিবীতে আর কোথায়ও নাই তাহা এই শৈলেন্দ্র-রাজগণেরই কীর্ত্তি। এতদ্ব্যতীত যবদ্বীপে আরও অনেকগুলি বিখ্যাত মন্দির তাঁহারা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আমলে যবদ্বীপে শৈবধর্ম্মের পরিবর্ত্তে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপিত হয় ও সমস্ত মলয়দ্বীপপুঞ্জে ও মলয় উপদ্বীপে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম এক নবীন জীবন লাভ করে।

সহসা এক নূতন ধর্ম্মের প্রেরণা কোথা হইতে আসিল, এতদিন তাহা একটি সমস্যার বিষয় ছিল। সম্প্রতি কতকগুলি শিলালিপির সাহায্যে এ কথা সহজেই প্রতিপন্ন করা যায় যে, বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্ম্মই ছিল এই নূতন ধর্ম্মের প্রেরণার মূলে। শৈলেন্দ্র-রাজগণের বৌদ্ধ-গুরু কুমারঘোষ গৌড়দ্বীপ হইতে আসিয়াছিলেন এবং এই গুরুর আদেশেই একটি তারাদেবীর মূর্ত্তি, মন্দির ও তৎসংলগ্ন বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল। যবদ্বীপের শিলালিপিতে গৌড়দেশীয় রাজগুরুর স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তা ছাড়া নালন্দায় দেবপালের রাজ্যকালের যে একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে শৈলেন্দ্র-বংশীয় রাজা বালপুত্রদেবের সহিত দেবপালের সৌহার্দ্দ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নালন্দায় বহুসংখ্যক অষ্টধাতু-নির্ম্মিত বৌদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এগুলির সহিত যবদ্বীপের বৌদ্ধমূর্ত্তির সাদৃশ্য এত বেশী যে, অনুমান হয় যবদ্বীপের বৌদ্ধগণ নালন্দা পরিদর্শন কালে স্বদেশ হইতে আসিতে এই মূর্ত্তিগুলি উপহার দিয়াছেন। কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন যে শৈলেন্দ্ররাজ বালপুত্রের মাতা বাঙ্গালার পালরাজা ধর্ম্মপালের কন্যা ছিলেন। ইহা সত্য না হইতে পারে, কিন্তু পালরাজগণের সহিত শৈলেন্দ্র রাজগণের যে বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল এবং এই দুই দেশের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের ফলেই যে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া তথাকার ধর্ম্ম শিল্প রাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বহুদিন পূর্ব্বে পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় যবদ্বীপের স্থাপত্যে বাঙ্গালার প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। বিশিষ্ট প্রমাণের অভাবে তাহা তখন স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু এখন যে-সমুদয় প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে অক্ষয়কুমারের নির্দ্দেশ একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। বাঙ্গালার অতীত ইতিহাসের এক নূতন পরিচ্ছেদ আমাদের নিকট ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইতেছে।...

(শান্তি, আশ্বিন, ১৩৩৯)

—তাহলে একটা গোলযোগ হবে না ?

—সে সম্ভাবনাও আছে বটে। যাই হোক একবার স্থবর্ণপুর হয়ে কলকেতায় ফেরা যাবে।

—তাই চল।

স্থবর্ণপুরে গিয়াই কার্ত্তিকের সঙ্গে দেখা। একটা গাছতলায় কার্ত্তিক একা দাঁড়াইয়া, সেখানে আর কেহ ছিল না। তাহাদিগকে দেখিয়া কার্ত্তিক বলিল,—আপনারা আবার যে এখানে ? সে ফোটোগ্রাফ নিয়ে কি কাণ্ড হয়ে গিয়েচে জানেন ?

হরিনাথ বলিল,—তুমি সে কথা কাউকে বলতে গেলে কেন ?

—আমি আমার ছোট বোনকে বলেছিলাম, সে বাবাকে বলে দেয়। বাবা আমাকে কত কি জিজ্ঞাসা করলে।

—তুমি কি আমাদের নাম করলে ? টাকার কথা বলেছিলে ?

—না, সে কথা বলিনি, তবে আপনারা এখানে এসেছিলেন তা বলেছিলাম।

হরিনাথ বলিল,—তার আর কি হবে ? তোমাকে আর আর কিছু টাকা দিতে এসেচি। আমাদের একটা কাজ করতে পারবে ?

—কি কাজ ?

—ফোটোগ্রাফখানা দেখে ভুল হ'তে পারে। যাঁর কথা বলছিলে তাঁকে ভাল ক'রে চিনত এমন কাউকে ছবিখানা একবার দেখাতে পার ?

—তাহলে আমার আর মাথা থাকবে না। বাড়িতে হুলস্থুল পড়ে যাবে, আমাকে নিয়ে আবার টানাটানি আরম্ভ হবে।

এই সময় একটি স্ত্রীলোক ধামা বগলে করিয়া সেইখান দিয়া যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া কার্ত্তিক বলিল,—ঐ গোবরার মাসী যাচ্ছে। ও চিরকাল ঐ বাড়িতে চাকরি করে, তাঁকে ছেলেবেলা থেকে দেখেচে।

হরিনাথ ব্যাগ্রতার ফোটোগ্রাফ আর দুখানি দশ টাকার নোট কার্ত্তিকের হাতে দিয়া কহিল,—ওকে ডেকে একবার দেখাও ত।

নোট দুখানা কার্ত্তিক পকেটে পুরিল, ফোটোগ্রাফ হাতে করিয়া ডাকিল,—ও গোবরার মাসী, একটা কথা শুনে যা !

গোবরার মাসী আসিয়া কহিল,—পথের মাঝখানে আবার কি কথা ? আজ হাট বসেচে, হাটে যেতে আমার দেরি হয়ে যাবে।

—এখানা কার ছবি বল দেখি ?

ফোটোগ্রাফ দেখিয়া গোবরার মাসী বলিল,—আমি সত্যি এখনও কাণা হই নি। দিদিমণির ছবি দেখে চিনতে পারব না ? আহা, কোথায় গেল তীর্থ করতে আর পথে ডুবে মলো।

গোবরার মাসী চক্ষের কোণে আঁচল দিল। তাহার পর একটু সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—এরা কে ?

—এঁরা আমার চেনা লোক, এখানে বেড়াতে এসেছেন। তুই এখন হাটে যা।

গোবরার মাসী চলিয়া গেল। গঙ্গাধর বলিল,—আমাদের কথা শেষ হয় নি। ফোটোগ্রাফের কথা শুনে তোমার বাবা আর কিছু করেচেন ?

—বাবা সেই দিনই কলকেতায় চলে গেল। আজ চার-পাঁচ দিন হ'ল।

হরিনাথ কার্ত্তিকের হাত হইতে ফোটো লইল। তাহাতে ও গঙ্গাধরে কটাক্ষ মাত্র বিনিময় হইল। হরিনাথ কার্ত্তিককে বলিল,—আমরা চললাম, আর এক জায়গায় বিশেষ দরকার আছে।

কার্ত্তিক রসিকতা করিয়া কহিল,—তোমারাও কি কলকেতায় চললে না কি ?

—কলকেতায় গেলেই হ'ল, বলিয়া দুই জনে দ্রুত পদে চলিয়া গেল।

বোকাধূর্ত্ত কার্ত্তিক কেমন করিয়া জানিবে যে, সে তাহার পিতার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে ? নিয়তি যে বাছিয়া বাছিয়া তাহাকেই নিযুক্ত করিয়াছে সে তাহা কেমন করিয়া জানিবে ; তাহার হস্ত দ্বারা নিয়তির যন্ত্রচালিত হইতেছে কেমন করিয়া বুঝিবে ? জানিলে নিজের হস্ত অগ্নিতে দগ্ধ করিত। তাহার মুখ দিয়া তাহার পিতার অনিষ্ট হইতেছে জানিলে জিহ্বা কাটিয়া ফেলিত। যে-

টাকা হরিনাথ তাহাকে দিয়াছিল তাহা যে কিসের পুরস্কার জানিতে পারিলে সে টাকা স্পর্শ করিত না। নিয়তির চালনায় নিজের ও অপরের অজ্ঞাতসারে ভবিতব্যতা পূর্ণ করিতেছিল।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

স্বাগতা ও কামিনী

মধ্যাহ্ন অতীত হইয়াছে। সুলোচনা কোন একটা কর্ম্মের উপলক্ষে একবার নিজের বাসায় গিয়াছেন। বাড়িতে স্বাগতা একা। আহারান্তে কিছুক্ষণ শয়ন করিয়াছিল, নিদ্রা হয় নাই, দিবানিদ্রার অভ্যাস ছিল না। একখানি পুস্তক লইয়া পড়িল, পড়াতেও তেমন মন লাগিল না। যখন-তখন হারান স্মৃতির জন্য তাহার মন খুঁজিয়া বেড়াইত, কিন্তু অতীতের রুদ্ধ দ্বার কিছুতেই খুলিতে পারিত না।

স্বাগতা আরাম-চেয়ারে বসিয়াছিল, কোলের উপর খোলা উল্টা পুস্তক। একজন দাসী আসিয়া বলিল,—দিদিমণি, এক মাগী অনেক জিনিষ বেচতে এনেচে। দেখবে?

আলস্য ভাঙিয়া স্বাগতা কহিল,—দেখব, ডেকে দাও।

দাসী কাজ ফেলিয়া আসিয়াছিল, ফেরিওয়ালীকে ডাকিয়া দিয়া নিজের কাজে গেল।

মাথায় চাঙারী করিয়া ফেরিওয়ালী ঘরে প্রবেশ করিয়াই স্বাগতাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। কাহার সঙ্গে দেখা হইবে জানিয়া সে আসিয়াছিল তথাপি বিস্ময় সম্পূর্ণ গোপন করিতে পারিল না। স্বাগতা একবার চক্ষু তুলিয়া আবার অন্যমনা হইল।

প্রথমে স্বাগতাকে দেখিয়া ফেরিওয়ালী চারিদিকে চাহিয়া দেখিল ঘরে আর কেহ আছে কি-না। স্বাগতার নিকটে চাঙারী নামাইয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল,—বাড়িতে আর কেউ নেই? আর কাউকে দেখতে পাচ্ছিনে।

স্বাগতা বলিল,—এখন কেউ নেই। একজন আমার কাছে থাকেন তিনি তাঁর নিজের বাড়ি গিয়েছেন, বিকেল বেলা আসবেন।

স্বাগতা এইবার স্ত্রীলোকটিকে দেখিল। ত্রিলোচন প্রদীপের মিটমিটে আলোকে কামিনীকে যেমন দেখিয়াছিলেন এখন তাহাকে তাহার অপেক্ষা ভাল দেখাইতেছে। পরণে থান কাপড়, মাথায় পেটে-পাড়া চুল, কোন অলঙ্কার নেই, কেবল গলায় ছোট ছোট রুদ্রাক্ষ ও প্রবালের কণ্ঠি। পুঁতিতে ছোট উল্কি। বেশ নরম সরম, চক্ষে হাবভাব নাই, কোন রকম চপলতা নাই। স্বাগতা তাহাকে নিতান্ত নূতন লোকের মত দেখিল। কামিনীকে যে কখন কোথাও দেখিয়াছে স্বাগতার চক্ষে তাহার কোন চিহ্ন নাই। বলিল,—কি এনেচ দেখি।

কামিনী চাঙারী হইতে নানা রকম সামগ্রী বাহির করিয়া স্বাগতাকে দেখাইতে আরম্ভ করিল। ছোটবড় সেফটিপিন, মাথার কাঁটা, সাবান, চিরুণী, পাউডার, গন্ধ-সামগ্রী, মাথায় মাখিবার সুগন্ধ তৈল, ফিতা, একে একে সমস্ত বাহির করিল। স্বাগতা হাতে করিয়া সেই সকল জিনিষ দেখিতে লাগিল, কামিনী একদৃষ্টে তাহার মুখ দেখিতেছিল। তাহার হাতের আংটী অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিল। তাহার পর স্বাগতার নিকটে আর একটু সরিয়া বসিয়া চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করিল,—দিদিমণি, আমাকে চিনতে পারচ না?

স্বাগতা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কিছু বিস্ময়ের সহিত কহিল,—তোমাকে ত কখন দেখি নি? এর আগে তুমি কি এ বাড়িতে আসতে?

—এখানে কেন? দেশে তোমার নিজের বাড়িতে। তোমাকে যে ছেলেবেলা থেকে বরাবর দেখেচি।

—কই, আমার ত কিছু মনে পড়ে না। ছেলেবেলাকার কোন কথা আমার মনে পড়ে না।

—ও মা, সে কি কথা! তোমার অত বিষয়আশয়, অত বড় বাড়ি, কত লোকজন, কিছু তোমার মনে নেই?

—আমি সব ভুলে গিয়েচি। আগেকার কোন কথা কিছুতেই মনে হয় না।

—তাহলে এরা তোমাকে ওষুধ করেচে, সেই জন্য তুমি সব ভুলে গিয়েচ। পুরুষমানুষদের তুমি ত চেন না, তোমাকে এখানে ভুলিয়ে এনেচে।

—কেন? এঁরা ত আমার আত্মীয় লোক। আমাকে ভুলিয়ে আনবেন কেন?

—তোমার বিষয় ভোগা দেবে ব'লে। তুমি ত জান না, এরা ভারি ধূর্ত্ত লোক।

স্বাগতা বলিল,—এখানে ত আমি বেশ যত্নে আছি, আমার কোন কষ্ট নেই।

কামিনী মুচকিয়া হাসিয়া বলিল,—ঐ ত ওদের চালাকি! তোমার গায় মাথায় হাত বুলিয়ে তোমার সর্ব্বস্ব ফাঁকি দিয়ে নেবে।

—এঁদের ত কোন অভাব নেই, আর কারুর সম্পত্তি কেন নেবেন?

—যার যত টাকা তার তত খাঁকতি। তুমি একবার দেশে চল তাহলেই তোমার সব মনে পড়বে।

—আচ্ছা, আমাকে দেশে নিয়ে যাবার কথা এঁদের বলব।

—সর্ব্বনাশ! তাহলে কি আর রক্ষে থাকবে? আমি তোমাকে যা বললাম তার একটি কথা ওরা টের পেলে তোমার ভারি বিপদ হবে।

—তা না-হয় কিছু বলব না। আমাকে কি করতে বল?

—তুমি এখানে কাউকে কিছু না ব'লে চুপি চুপি আমার সঙ্গে দেশে চল। সেখানে গেলেই তুমি সব জানতে পারবে।

—দেশে আমার কে আছে? আপনার লোক থাকলে এত দিন কেউ আমার খোঁজ করে নি কেন?

—খোঁজ আবার করে নি? দেশময় খুঁজে খুঁজে তারা সারা হয়ে গেল। অনেক কষ্টে সন্ধান পেয়ে আমাকে পাঠিয়েচে।

—তা চুপি চুপি যাব কেন? তাঁরা ত এসে আমাকে নিয়ে যেতে পারেন।

কামিনী চক্ষু কপালে তুলিয়া অত্যন্ত ভয়ের ভাণ করিয়া কহিল,—এরা কি সেই রকম লোক? কেউ এলে হাঁকিয়ে দেবে। আমি এই সব জিনিষ মাথায় ক'রে না আনলে কি আমাকে বাড়ি ঢুকতে দিত?

হারান পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া পাইবার প্রলোভন স্বাগতার মনে বড় প্রবল হইল। যাহাদের কাছে রহিয়াছে তাহারা তাহার শত্রু কি মিত্র সে-বিচারে সে প্রবৃত্ত হইল না। দেশে গেলে পূর্ব্বকথা মনে পড়িবে এই আশায় সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। কহিল,—চুপি চুপি এখান থেকে কেমন ক'রে যাব?

—সদর দরজা ছাড়া অন্য দরজা নেই?

—আছে। বাড়ির পিছন দিকে একটা ছোট দরজা আছে, সে দিকে কেউ বড় একটা যায় না। দরজার সামনে একটা গলি।

—সে গলিতে গাড়ী চলে?

—চলে।

—পরশু সন্ধ্যার পর আমি গাড়ী নিয়ে সেইখানে থাকব। তুমি চুপি চুপি এস, কেউ যেন টের না পায়। তুমি বাড়ি গেলে তোমাকে দেখে সকলে কত আহ্লাদ করবে।

—আচ্ছা, তাই যাব।

কামিনী কয়েকটা সামগ্রী বাছিয়া স্বাগতাকে দিল। স্বাগতা বলিল,—এ কি হবে?

—এ বাড়িতে দেখিয়ে বলতে পারবে তুমি কিনেচ।

—দাঁড়াও দাম এনে দি।

—দাম আবার কি দেবে? এ সব ত তোমারই টাকা দিয়ে কেনা। আমরা ত তোমাদেরই খেয়ে মানুষ।

কামিনী ঝুড়ি মাথায় করিয়া চলিয়া গেল। ত্রিলোচন তাহাকে যেমন শিখাইয়াছিলেন সেইরূপ বলিয়াছিল। সুবর্ণপুরের নাম করে নাই, ত্রিলোচন নিষেধ করিয়াছিলেন। ত্রিলোচনের যে কি অভিসন্ধি তাহাও কামিনী ঠিক জানিত না। জানিলে হয়ত তাঁহার নিয়োগে স্বীকৃত হইত না। ত্রিলোচন সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিলেন যে, এবার পূর্ব্বের মত ভুল হইবে না। বনবিহারী ও শ্যামাচরণ তাঁহার অভীষ্ট পূর্ণ করিতে পারে নাই, উল্টা তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করিয়াছিল। এবার আশঙ্কার কারণ তিনি নিজে ঘুচাইবেন।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

ছিন্ন জাল

নির্দ্দিষ্ট দিবস সন্ধ্যার পর স্বাগতা গোপনে খিড়কির দরজা খুলিয়া গলিতে বাহির হইল। নিকটেই একটা

ট্যাক্সি দাঁড়াইয়াছিল, তাহার ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া কামিনী ডাকিল,—এস, দিদিমণি, গাড়ীতে ওঠ।

স্বাগতা আসিয়া গাড়িতে উঠিল। গলি ছাড়াইয়া ট্যাক্সি যখন বড় রাস্তায় আসিল সেই সময় একবার দাঁড়াইল। পথের পাশে ত্রিলোচন দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি আসিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। স্বাগতা জিজ্ঞাসা করিল, —ইনি কে?

কামিনী বলিল, তুমি চিনতে পারচ না? ইনি যে তোমার কাকা হন।

ত্রিলোচনের চেহারা দেখিয়া স্বাগতা কিছু বিস্মিত হইল, বলিল,—আমি ত এঁকে কখন দেখি নি।

ত্রিলোচন বলিলেন,—তুমি সব ভুলে গিয়েচ। বাড়ি গেলে আবার সব মনে পড়বে।

ট্যাক্সি ষ্টেশনের সম্মুখে থামিল। সকলে নামিলে পর ত্রিলোচন ভাড়া দিয়া গাড়ী বিদায় করিয়া দিলেন। ষ্টেশনে প্রবেশ করিয়া স্বাগতা ও কামিনীকে কহিলেন, —তোমরা এইখানে একটু দাঁড়াও, আমি টিকিট নিয়ে আসি।

ত্রিলোচনের স্থবর্ণপুরের টিকিট কিনিবার অভিপ্রায় ছিল না।

টিকিট কিনিবার স্থানে ভিড়। ত্রিলোচনের টিকিট কিনিতে কিছু বিলম্ব হইল। স্বাগতা ও কামিনী প্লাটফর্মে দাঁড়াইয়া ছিল,তাহাদের সম্মুখে একখানা গাড়ী, তাহাতে লোক উঠিতেছিল। প্লাটফর্মের অপর পার্শ্বে আর একখানা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। সেই গাড়ী হইতে লোক নামিতে আরম্ভ হইল। সেই সময় ত্রিলোচন টিকিট হাতে করিয়া আসিতেছিলেন। গাড়ী হইতে দুই জন লোককে নামিতে দেখিলেন, এক জনকে চিনিতে পারিলেন। যে বেশে তিনি গঙ্গাধরকে স্থবর্ণপুরে দেখিয়াছিলেন এখন সে বেশ নয়। সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের পরিচ্ছদ।

কামিনী স্বাগতার পিছনে দাঁড়াইয়া ছিল। ত্রিলোচনের সঙ্কেত দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকটে গেল। স্বাগতা সম্মুখ দিকে চাহিয়া ছিল, হরিনাথ ও গঙ্গাধরকে সেও দেখিতে পাইল। হরিনাথ ও গঙ্গাধরের অপর কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না, স্বাগতাকে দেখিতে পাইয়া সোজা তাহার নিকটে আসিল। হরিনাথ জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি এখানে কেন?

স্বাগতা কিছু সঙ্কোচের সহিত কহিল,—দেশে যাচ্ছি।

—তোমার দেশ কোথায়?

স্বাগতা কোন উত্তর দিতে পারিল না। দেশের নাম কামিনী কিংবা ত্রিলোচন কেহই তাহাকে বলে নাই।

হরিনাথ বলিল,—দেশের নাম পর্য্যন্ত তুমি জান না। কার সঙ্গে তুমি যাচ্ছিলে?

—এই যে এঁদের সঙ্গে, বলিয়া স্বাগতা পিছনে ফিরিয়া চাহিল। কামিনী কিংবা ত্রিলোচনকে দেখিতে পাইল না, তাহাদের কোন চিহ্নই নাই!

স্বাগতা বলিল,—এঁরা কোথায় গেলেন? এক জন মেয়েমানুষ, আর এক জন বললেন, তিনি আমার কাকা হন। তিনি টিকিট কিনতে গেলেন।

—তোমার কাকা কি রকম দেখতে?

স্বাগতা ত্রিলোচনের অবয়ব বর্ণনা করিল। সে সন্দেহ হরিনাথ ও গঙ্গাধরের পূর্ব্বেই হইয়াছিল।

হরিনাথ জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি বাড়িতে ব'লে এসেছিলে?

—না।

—তোমার দেশে যাবার কথা বাড়িতে কেউ জানে?

—না, আমি কাউকে না ব'লে খিড়কির দরজা দিয়ে এসেছি।

—যারা তোমাকে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের মতলব ভাল নয়, এখন বুঝতে পারচ? তোমার কাকা কেউ থাকলে আমরা জানতাম না? আমাদের দেখতে পেয়েই পালিয়েচে।

স্বাগতার ভয় হইয়াছিল, তাহার অপরাধ হইয়াছে তাহাও বুঝিতে পারিতেছিল।

গঙ্গাধর এদিক-ওদিক খুঁজিয়া দেখিল, ত্রিলোচনকে কোথাও দেখিতে পাইল না।

বাড়ি ফিরিবার পথে গাড়ীতে স্বাগতা সকল কথা বলিল। হরিনাথ বলিল,—তোমার কি বিশ্বাস হয় আমরা তোমার মন্দ চেষ্টা করব?

—না, তা নয়, তবে আগেকার কথা জানতে আমার ইচ্ছা করে।

বাড়িতে আসিয়া হরিনাথ কাহাকেও কিছু বলিল না। খিড়কির দরজায় তালা বন্ধ করিয়া চাবি নিজের কাছে রাখিল। সুলোচনা স্বাগতাকে দেখিতে না পাইয়া ভয় পাইয়াছিলেন, হরিনাথ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল স্বাগতার মনের স্থিরতা নাই, তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা।

হরিনাথ ও গঙ্গাধর রাত্রে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আশঙ্কার ব্যাপার বিচার করিতে লাগিল। ভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময় যদি তাহারা ষ্টেশনে আসিয়া না পড়ে তাহা হইলে স্বাগতার আর কোন সন্ধান পাওয়া যাইত না। তাহারা দেখিতে পাইয়াছিল বলিয়াই যে স্বাগতার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে সে-বিষয়ে তাহাদের কিছু মাত্র সংশয় রহিল না। পথের মাঝখানে যখন স্বাগতাকে অচৈতন্য অবস্থায় দেখিতে পায় সেবার তাহাদেরই চেষ্টায় স্বাগতা রক্ষা পায়, এবারও তাহারা উপস্থিত না হইলে স্বাগতা রক্ষা পাইত না। কোথাও তাহাকে লইয়া গিয়া ত্রিলোচন নিশ্চিত তাহাকে হত্যা করিত। কার্ত্তিক অকপটে কিছু না বুঝিয়া সকল কথাই বলিয়া ফেলিয়াছিল। স্বাগতা অথবা করুণাময়ী ইহ-লোকে নাই, সুবর্ণপুরে সকলে তাহাই জানে। সে জীবিতা থাকিলেই ত্রিলোচনের সমূহ বিপদ। ত্রিলোচন জানিতে পারিয়াছেন করুণাময়ী মরেন নাই, স্বচক্ষে জীবিত অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়াছেন। দেখিয়া ত্রিলোচন কিছুতেই নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারিবেন না।

সমস্যা এই যে ত্রিলোচন কিরূপে জানিতে পারিলেন যে, স্বাগতা কলিকাতায় হরিনাথের গৃহে আছে? হরিনাথ ও গঙ্গাধর কত ঘুরিয়া, কত ক্লেশ স্বীকার করিয়া দৈবাৎ স্বাগতার পরিচয় জানিতে পারিয়াছিল আর ত্রিলোচন সুবর্ণপুরে নিজের বাড়িতে বসিয়া কিরূপে অবলীলাক্রমে স্বাগতার সন্ধান জানিলেন? শুধু তাহাই নয়, অদ্ভুত কৌশলের সহিত স্বাগতাকে হরিনাথের গৃহ হইতে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। দেবতার ইচ্ছা নয় যে, স্বাগতার এখন মৃত্যু হয় সেই কারণে ত্রিলোচন সম্পূর্ণ-রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। দেবতার কৃপাতেই স্বাগতা দুইবার মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। বনবিহারী ও শ্যামাচরণ ছাড়া কি আর কেহ ত্রিলোচনকে সংবাদ দেয়? বনবিহারী কলিকাতায় আসিয়াছিল বটে, কিন্তু হরিনাথের বাড়ি সে কেমন করিয়া জানিবে? শ্যামাচরণকে এ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় নাই, সে কোথায় থাকে? যদি কলিকাতায় কোথাও মোটর চালকের কাজ করে? স্বাগতাও সময়ে সময়ে মোটরে বেড়াইতে যান, যদি শ্যামাচরণ তাঁহাকে কোথাও দেখিয়া থাকে? তাহা হইলে বাড়ির ঠিকানা জানিতে কতক্ষণ? শ্যামাচরণকে কোনমতে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

হরিনাথ কহিল,—তা কর, কিন্তু আমি আর কোথাও যাচ্ছি নে। স্বাগতাকে আর একা রাখা হবে না।

গঙ্গাধর বলিল,—তোমাকে আর কোথাও যেতে হবে না, এইখানে গট হয়ে বসে থাক।

—তোমাকেও আমার কাছে থাকতে হবে।

—আচ্ছা, তাই হবে।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

নিয়তি-জাল

কামিনীকে সঙ্গে করিয়া ত্রিলোচন ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া একখানা ট্যাক্সি করিলেন। মোটর-চালককে আর একটা ষ্টেশনে যাইতে আদেশ করিলেন।

কামিনী কিছুই বুঝিতে পারিল না। অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—ওঁকে একা ফেলে রেখে কোথায় যাচ্ছ?

ত্রিলোচন ঘামিতেছিলেন, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। কহিলেন, চুলায় যাচ্ছি।

—ওঁকে নিয়ে যাবে না?

ত্রিলোচন বলিলেন,—যাদের বাড়িতে থাকে তারা যে এসে পড়ল। তুমি দেখতে পাও নি, তাদের সামনে আমরা পড়লে ভারি মুস্কিল হ'ত।

কামিনী বুঝিতে পারিয়াছিল করুণাময়ীর মৃত্যুসংবাদ মিথ্যা, কিন্তু আর কিছু বুঝিতে পারে নাই। বলিল,—তা হ'লে কি ওঁকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হবে না।

—সে পরের কথা, কিন্তু তুমি যে ওঁকে দেখেচ, খবরদার যেন সে কথা প্রকাশ না হয়।

—আমাকে দিয়ে কিছু প্রকাশ হবে না। আমাকে তুমি যা বলবে তাই করব। দিদিমণি ও-রকম হয়ে গিয়েচেন কেন? আমাদের চিনতে পারেন না, আগের কোন কথা মনে নেই।

—বোধ হয় পাগল হয়ে গিয়েচে।

সুবর্ণপুরে ফিরিয়া আসিয়া ত্রিলোচন নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। সর্ব্বদাই ভয় কখন কি হয়। করুণাময়ী যাহাদের আশ্রয়ে আছেন তাহারা যে সহজ লোক নয় তাহা বুঝিতে ত্রিলোচনের বাকি ছিল না। করুণাময়ী কে, তাহাও তাহারা জানিতে পারিয়াছে। তাঁহার ফোটোগ্রাফ লইয়া নানা স্থানে ঘুরিতেছিল। করুণাময়ীর মস্তিষ্কের কোনরূপ বিকার হইয়াছে, সেই কারণে তিনি সব ভুলিয়া গিয়াছেন। যদি তিনি সারিয়া উঠেন তাহা হইলে আর ত্রিলোচনের পরিত্রাণ নাই। এত কৌশল করিয়া করুণাময়ীকে ষ্টেশন পর্য্যন্ত আনিয়া ত্রিলোচনকে ব্যর্থকাম হইতে হইল। যাহাদের কাছে করুণাময়ী রহিয়াছে তাহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবে না। তাহাদের অর্থেরও অভাব নাই, মামলা-মকদ্দমা করিতেও তাহারা কুণ্ঠিত হইবে না।

ত্রিলোচনের সম্পূর্ণ রাগ হইল বনবিহারী ও শ্যামাচরণের উপর। তাহারা যাহা করিতে স্বীকার করিয়াছিল তাহা করিতে পারে নাই, তাহার উপর মিথ্যা কথা বলিয়া ত্রিলোচনকে আশ্বস্ত ও প্রবঞ্চিত করিয়াছিল। মোটরের দুর্ঘটনায় করুণাময়ী যদি রক্ষা পাইয়াছিলেন সে-সংবাদ পূর্ব্বে জানিতে পারিলে ত্রিলোচনের এত বিপদ হইত না, জলমগ্ন হইবার মিথ্যা ঘটনা রটাইতে হইত না। অর্থলোভে বনবিহারী ও শ্যামাচরণ তাঁহাকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়াছিল, তাহাদের কথায় বিশ্বাস না করিলে এখন এরূপ ঘোর আশঙ্কা হইত না।

দুষ্কর্ম্মের একটা প্রণালী আছে, দুর্বৃত্ত হইলেই নির্ভয়ে সকল প্রকার কুকর্ম্ম করিতে পারে না। যে বিষ দিয়া হত্যা করে তাহার সম্মুখে রক্তারক্তি হইয়া একটা খুন হইলে রক্ত দেখিয়া হয়ত সে মূর্চ্ছিত হয়। পুলের উপর দুই জন লোক দাঁড়াইয়া আছে, এক জন যদি ধাক্কা দিয়া আর এক জনকে জলে ফেলিয়া দেয় আর সে ডুবিয়া মরে তাহা হইলে সেই হত্যাকারী যে আর এক ব্যক্তিকে পিস্তল দিয়া মারিয়া ফেলিতে পারে এমন কোন স্থিরতা নাই। নেশার যেমন মাত্রা বাড়ে, দুষ্কর্ম্মও সেইরূপ অভ্যাসের গুণে বাড়িয়া যায়। ত্রিলোচন লুব্ধ, করুণাময়ীর শাসনে লোভ-তৃপ্তির সুযোগ হইত না। করুণাময়ী তীর্থভ্রমণে যাইতেছেন দেখিয়া ত্রিলোচনের দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হইল, বনবিহারী জুটিল, বনবিহারী শ্যামাচরণকে যোগাড় করিল। করুণাময়ীর যদি মৃত্যু হইত অথবা মৃত্যু না হইলেও দুর্ঘটনার যথার্থ বৃত্তান্ত প্রকাশ হইত তাহা হইলে ত্রিলোচনের শঙ্কার কোন কারণ হইত না। করুণাময়ী মরেন নাই আর মোটেরের সংবাদ চাপা দিয়া নৌকাডুবির কথা প্রচার করাতেই এরূপ বিপদ উপস্থিত। এখন ত্রিলোচনের আর কোন দ্বিধা নাই, আত্মরক্ষার জন্য সকল পাপ করিতে প্রস্তুত, নারীহত্যায় কোন বাধা নাই।

মানুষের অপেক্ষা দৈব বলবান্। সেই কারণে সকল ষড়যন্ত্র সকল সময় সফল হয় না। ত্রিলোচনের সকল জাল ছিন্ন হইয়া যাইতেছিল, নিয়তির জাল তাহাকেই বেষ্টন করিতেছিল।

(ক্রমশঃ)

পুস্তক পরিচয়

ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ কৃত সংস্কৃত ভাষায় সূত্রবৃত্তি, ইংরেজীতে সূত্র ও সূত্র বৃত্তির অনুবাদ, এবং রামমোহন ভাষ্য নামক ইংরেজীতে সূত্র তাৎপর্য্যসম্বলিত। ইহার দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথমপাদের ১১শ সূত্র হইতে সূত্র ও সূত্রবৃত্তির ইংরেজী অনুবাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম-এ করিয়াছেন। রামমোহন ভাষ্য ১২০ পৃষ্ঠা এবং মূল গ্রন্থ ৪৩৮ পৃষ্ঠা। মূল্য চার টাকা। উত্তম বাঁধান, ডবল ক্রাউন ১৬ পৃষ্ঠার আকার। তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের নিকট ২১১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট এবং চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট ১৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতায় পাওয়া যায়।

তত্ত্বভূষণ মহাশয় এইবার ইংরেজী ও বঙ্গভাষায় বেদান্তের প্রস্থান-ত্রয়ের অনুবাদ প্রকাশকার্য্য সমাপ্ত করিলেন। তিনি প্রথমে শ্রুতিপ্রস্থানে হস্তক্ষেপ করেন, তৎপরে স্মৃতিপ্রস্থান গীতার এবং এক্ষণে ন্যায়প্রস্থান বেদান্তের অনুবাদ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তিনি যে কেবল অনুবাদমাত্র করিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু স্বয়ং মুখে সংস্কৃত একটি বৃত্তিবিশেষও সর্ব্বত্রই সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন এবং এতদ্দ্বারা জিজ্ঞাসু সমাজের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। তত্ত্বভূষণ মহাশয় যতদিন হইতে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহাতে ইহা তাঁহার প্রায় জীবনব্যাপী পরিশ্রমের ফল বলা যায়।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে প্রায় সকল সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ এই প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যাদি রচনা করিয়া স্বমত প্রচার ও নিজ নিজ সম্প্রদায়ের পুষ্টিসাধন করিয়া গিয়াছেন। যাঁহাদের গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায় তাঁহাদের মধ্যে আচার্য্যশঙ্কর, ভাস্কর, রামানুজ, নীলকণ্ঠ, শ্রীকণ্ঠ, শ্রীকর নিম্বার্ক, মধ্ব, বিজ্ঞানভিক্ষু বল্লভ ও বলদেব প্রভৃতিই প্রধান। ইঁহারা সকলেই এই কার্য্য করিয়া আচার্য্য পদবী লাভ করিয়া গিয়াছেন। কারণ, কোন সম্প্রদায়ের আচার্য্য হইতে গেলে এই তিন শ্রেণীর পুস্তকের মধ্যে একবাক্যতা প্রদর্শন করিয়া এবং পরমত খণ্ডন করিয়া নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করিতে হইত। আজ তত্ত্বভূষণ মহাশয় কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে এই কার্য্য করিয়া প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদ সমলঙ্কৃত করিলেন। কারণ, এই ব্রাহ্মসমাজেরও একটি নিজ মতবাদ আছে বলা যায়। স্বর্গীয় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই কার্য্য কতকটা করিয়াছিলেন, কিন্তু তত্ত্বভূষণ মহাশয় ইহা তদপেক্ষা অধিকতর পূর্ণমাত্রায় সাধিত করিয়াছেন বলিতে হইবে। বাঙ্গালীর পক্ষে এবং তৎপরে ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে ইহা পরম আনন্দের কথা নিশ্চয়ই বলিতে হইবে।

তত্ত্বভূষণ মহাশয় এই কার্য্যটি প্রাচীন কোন আচার্য্যের মতে প্রবিষ্ট হইয়া করেন নাই, এজন্য হিন্দু সমাজের নিকট ইহা অভিনব মতবাদ বলিয়া গৃহীত হইবে। কারণ, পুরাণের বচন অনুসারে হিন্দুসমাজের ঋষিগণের তিরোধানের পর আচার্য্যগণের দ্বারা শাসিত হইবার কথা। এই সব আচার্য্যই বেদকে অভ্রান্ত বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন, আর তজ্জন্যই তাহার মধ্যে একবাক্যতা প্রদর্শনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। কিন্তু তত্ত্বভূষণ মহাশয় তাঁহার সম্প্রদায়ের অনুসরণে বেদবেদান্তকে অভ্রান্ত বলিয়া জ্ঞান করেন না, বেদবেদান্তের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেও তাহাদিগকে অভ্রান্ত বিবেচনা করেন না। এজন্য প্রাচীন আচার্য্যগণের ন্যায় তাঁহাকে বেদাদি শাস্ত্রের বেদানুকূল একবাক্যতা প্রদর্শনে প্রয়াস করিতে হয় নাই। তবে তিনি যে কোনরূপ একবাক্যতাই প্রদর্শন করেন নাই, তাহা বলা যায় না। কারণ ক্রমোন্নতিবাদ বা অখণ্ড উন্নতিবাদের সাহায্যে তিনি বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ঋষিগণের মতবাদ বলিয়া শাস্ত্রসমূহের আপাতদৃষ্ট বিরোধ পরিহার করিয়া থাকেন, অন্য কথায় যে মতটি নিজ মতের অনুকূল তাহাই অভ্রান্ত বলিয়া বিবেচনা করেন। অবশ্য বেদের অভ্রান্ততাবাদী হিন্দু এ পথে গমন করেন না, সুতরাং প্রাচীন বিভিন্ন আচার্য্যগণের ব্যাখ্যা বেদের অভ্রান্ততাবাদী হিন্দুগণ যে-দৃষ্টিতে গ্রহণ ও আলোচনা করেন, তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের ব্যাখ্যা তাঁহারা সে দৃষ্টিতে গ্রহণ ও আলোচনা করিবেন না।

তাহার পর আর এক কথা। ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থখানি বেদবেদান্তের ন্যায় অপৌরুষেয়, সুতরাং অভ্রান্ত প্রমাণ বলিয়া বেদবিশ্বাসী হিন্দুগণের নিকটও স্বীকৃত হয় না। সূত্রার্থ নির্ণয়ে সূত্রকার-তাৎপর্য্য নির্ণয় একটি অঙ্গ। বেদানুগত্যের দ্বারাই ইহার প্রামাণ্য। বেদানুগামী বলিয়াই ব্যাস বাক্য প্রমাণ। এজন্য পৌরুষেয় অপৌরুষেয় গ্রন্থে গ্রন্থকার-তাৎপর্য্য নির্ণয় আবশ্যক নহে। তাহাতে সব কথাই সত্য বলিয়া কেবলমাত্র পূর্ব্বাপর বিরোধ পরিহাররূপ একবাক্যতা প্রদর্শন মাত্রই আবশ্যক। পৌরুষেয় গ্রন্থেই গ্রন্থকার-তাৎপর্য্য নির্ণয় অত্যাবশ্যক। পৌরুষেয় গ্রন্থ অভ্রান্ত হয় না বলিয়া তাহাতে অপৌরুষেয় গ্রন্থার্থ নির্ণয়-কৌশল একান্তভাবে প্রযোজ্যও হয় না। এজন্য এতাদৃশ গ্রন্থে গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা, অভাবে তৎশিষ্যের ব্যাখ্যা, আর তদভাবে তৎসম্প্রদায় ব্যাখ্যা অন্বেষণ করা প্রয়োজন হয়। অধিক কি, এরূপ ব্যাখ্যা যত প্রাচীন হয় ততই আদরণীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। বিশুদ্ধযুক্তি প্রয়োগরূপ কৌশল অথবা মানবস্বভাবসুলভ প্রবৃত্তি নির্ণয়রূপ কৌশল, প্রাচীন পৌরুষেয় গ্রন্থের ব্যাখায় তত আদরণীয় হয় না। গ্রন্থকারের সম্প্রদায়ভুক্ত প্রাচীনতর ব্যাখ্যাতার কথাই অধিকতর আদরণীয় হইয়া থাকে।

এমন পৌরুষেয় গ্রন্থের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়া যদি কেহ নিজ বুদ্ধি-বলে, তৎসম্প্রদায়ের প্রাচীন ব্যাখ্যা উপেক্ষা করিয়া অগ্রসর হন, তাহা হইলে তাহা গ্রন্থকারের অভিপ্রায় অভিব্যক্ত করিতে ততই দূরে অবস্থিত হইয়া থাকে। আমাদের মনে হইল, এই ব্যাপারটি তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের ব্যাখ্যামধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কারণ, তিনি মত বিষয়ে কোন প্রাচীন আচার্য্যের অনুসরণ করেন নাই, পক্ষান্তরে শাঙ্কর ভাষ্যের সূত্র শব্দার্থাদি গ্রহণ করিয়া এবং তাঁহার প্রদর্শিত সূত্রার্থ নির্ণায়ক প্রকরণ বিভাগের অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। যাঁহার যাহা সিদ্ধান্ত হয়, তাঁহার গৃহীত সূত্র শব্দার্থসমূহ এবং প্রকরণ-বিভাগরূপ অধিকরণ বিভাগাদি তদনুকূলই হয়। আর এইজন্যই প্রায় সকল আচার্য্যই ভিন্ন ভিন্ন রূপে সূত্রার্থ ও সূত্র যোজনাদি করিয়া গিয়াছেন। আমাদের মনে হইল এ বিষয়ে তত্ত্বভূষণ মহাশয় যে স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা চিন্তনীয় বিষয়। পৌরুষেয় ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের ব্যাখ্যাতে গ্রন্থকারের সহিত সম্বন্ধপ্রদর্শন মানসে পূর্ব্বতন প্রায় সমস্ত ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যাতা

আচার্য্যগণ, ব্যাস দেবের শিষ্য পুত্র বা শিষ্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা যামত অনুসারে সূত্রভাষ্যাদি করিতেছেন—এই কথা বলিয়াছেন। তাঁহারা কেহই প্রায় প্রাচীনের দোহাই দিতে বিস্মৃত হন নাই। এইজন্যই শঙ্করাচার্য্য নিজ ভাষ্যমধ্যে "সম্প্রদায়বিৎ আচার্য্যে"র নাম করিয়া নিজ ব্যাখ্যার প্রামাণিকত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন এবং নিজ সম্প্রদায়কে ব্যাসপুত্র শুকদেব সম্প্রদায় বলিয়া গিয়াছেন। এইজন্যই রামানুজাচার্য্য নিজভাষ্য মধ্যে ব্যাসের শিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত বোধায়ন ঋষির নাম করিয়া তাঁহার মতানুসারে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিতেছি—বলিয়াছেন। এইজন্যই ভাস্করাচার্য্য নিজ ভাষ্যমধ্যে উপবর্ষ সম্প্রদায়ানুগত ব্যাখ্যা করিতেছেন—বলিয়া গিয়াছেন। এইজন্য মধ্বাচার্য্য বদরি আশ্রমে গিয়া ব্যাসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার মতে সূত্র ব্যাখ্যা করিতেছেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এইরূপ অপর সমুদয় আচার্য্য নিজ ব্যাখ্যার প্রামাণিকতার জন্য প্রাচীনের দোহাই বা গ্রন্থকর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় সম্বন্ধের দোহাই দিয়াছেন। এক্ষেত্রে তত্ত্বভূষণ মহাশয় সেরূপ করিলে বেদবিশ্বাসী পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ করায় তিনি যে স্বাধীন চিন্তাশীল সুধীবৃন্দের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন তাহাতেও সন্দেহ নাই।

গ্রন্থের সংস্কৃত বৃত্তিটি যারপর নাই সরল হইয়াছে। ইহাতে মোটামুটিভাবে সূত্রার্থ বুঝিবার খুব সহায়তা হইবে। ইংরেজী অনুবাদও যেমনই যথাযথ তেমনি সুন্দর হইয়াছে। রামমোহন ভাষ্যের মধ্যে সমুদয় গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়টি সংক্ষেপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং তন্মধ্যে তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের সিদ্ধান্তও প্রকটিত হইয়াছে। যাহা হউক, গ্রন্থখানি পাশ্চাত্য শিক্ষিত জিজ্ঞাসুগণের পক্ষে খুবই উপযোগী হইয়াছে। ইহাতে পাশ্চাত্য দার্শনিকের দৃষ্টিতে বেদান্ত সিদ্ধান্ত বিষয়ে বেশ একটা ধারণা জন্মিবে সন্দেহ নাই। তত্ত্বভূষণ মহাশয় যেরূপ জরাজীর্ণ শরীরে এই গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য্যের ও প্রগাঢ় চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

অষ্টোত্তর শতোপনিষৎ—তিন খণ্ড। শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র তত্ত্বনিধি বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং কুমিল্লার উকীল শ্রীবিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

উপনিষদগুলির জ্ঞান না থাকিলে হিন্দুধর্ম্মের জ্ঞান নিতান্ত অসম্পূর্ণ থাকে। তত্ত্বনিধি মহাশয় সুলভ মূল্যে অনুবাদ সহ একশত আটটি উপনিষদ প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প করায় এবং এই কার্য্যে বহুদূর অগ্রসর হওয়ায় এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থগুলি সহজপ্রাপ্য হইতেছে। এই কারণে তিনি সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন। তিনি গড়ে এক এক খানি উপনিষদের মূল্য এক আনা রাখিয়াছেন। তাঁহার এই উদ্যম সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন:—"শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি মহাশয় কৃত অনুবাদ সহিত উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী তিনখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, তিনখণ্ডে মোট ২৪ খানা উপনিষৎ আছে, শাঙ্কর ভাষ্যের সহিত মূল উপনিষৎসমূহের সরল ও সুন্দর বঙ্গানুবাদ ও প্রথমাংশে সম্পূর্ণ গ্রন্থের একটি ভূমিকা সহ এত অল্প মূল্যে ইহা পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই।......তাঁহার বঙ্গানুবাদ মূলের অনুগত হইয়াছে।" প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য আট আনা, অর্থাৎ প্রকাশিত ২৪টি উপনিষদের মূল্য দেড় টাকা।

উপনিষৎ।—শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র তত্ত্বনিধি বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং কুমিল্লার উকীল শ্রীবিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

এই পুস্তকে তত্ত্বনিধি মহাশয় উপনিষদুক্ত তত্ত্বসকলের জ্ঞান পাঠকদিগের সহজে অধিগম্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

মরণের পরপারে—বা বৈদিক সাহিত্যে পরলোকতত্ত্ব। শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি-বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ২৫৫ নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী, হইতে ডাক্তার সুরেন্দ্রকুমার রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

"'পরলোক' যে কোন স্থানবিশেষের নাম নহে, 'পরলোক গমন' বলিতে যে ব্রহ্ম পরমাত্মার সহিত দেহবিমুক্ত জীবচৈতন্যের একত্র সম্মিলন," ইহা বেদ-বেদান্ত হইতে প্রতিপাদন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইহা গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। ইহাতে, প্রস্তাবনার পর প্রথম অধ্যায়ে স্মৃতিকথিত পরলোকতত্ত্ব, পৌরাণিক কর্ম্মকাণ্ডোক্ত পরলোকতত্ত্ব, তন্ত্রোক্ত পরলোকতত্ত্ব, থিয়সফি মত, কোরানপ্রোক্ত পরলোকতত্ত্ব, বাইবেলপ্রোক্ত পরলোকতত্ত্ব, বৌদ্ধধর্ম্মে পরলোকতত্ত্ব, ইত্যাদি বিবৃত ও আলোচিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী অধ্যায় সকলের নাম, "পরলোক দেব-ঋষি-মানবের অবিদিত," "শব্দপ্রমাণ বেদ," "শ্রুতিপ্রমাণ," ইত্যাদি।

র. চ.

ফুলপাতা—শ্রীহেমলতা দেবী লিখিত। মূল্য—১৲। প্রবাসী কার্য্যালয়। যে সকল ছেলেমেয়ে বাংলা লেখাপড়া শিখিয়াছে এবং নিতান্ত শিশু নয়, এ বইখানিতে তাহাদের জন্য গদ্যে মহর্ষিরত্ন ও ভোজরাজা বিষয়ে দুটি-গল্প আছে। ইহা ছাড়া "পৃথিবীর ডাক" নামে গদ্য ও পদ্যে লিখিত একটি ছোট নাটিকাও ছেলেমেয়েদের অভিনয়ের জন্য আছে।

কিরূপে দস্যু রত্ন বালিকার মুখে সর্ব্বব্যাপী অন্তর্যামী পরমপুরুষের কথা শুনিয়া পরে মহর্ষি রত্ন হইয়াছিলেন প্রথম গল্পটিতে তাহা জানা যায়।

রাজার স্বপ্ন গল্পে ভোজরাজা আপনার "চরিত্রের প্রচ্ছন্ন কদর্য্যতা" প্রজামণ্ডলীর নিকট প্রকাশ করিয়া সত্যের আনন্দ লাভ করিয়া বিন্ধ্যাচলে তপস্যায় চলিয়া গেলেন।

"পৃথিবীর ডাক" মানুষ ও পৃথিবীর সম্বন্ধ বিষয়ে রূপক। গল্পগুলি সুনীতি ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ক। ভাষা ও ভাব উচ্চদরের। বড় বড় ছেলেমেয়েদের উপযোগী। ভাষা আর একটু সহজ হইলে ছোটছেলেরাও পড়িতে পারিত। বইখানিতে প্রচ্ছদপট সমেত নয়খানি পূর্ণপাতা সুন্দর ছবি ও সাত খানি ছোট ছবি আছে। মাত্র ৩৩ পৃষ্ঠার পুস্তকে এত ছবি প্রায় দেখা যায় না। কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট।

রূপাবলী (দ্বিতীয় ভাগ) শ্রীনন্দলাল বসু। শিল্পীগুরু নন্দলাল বসুর রেখাচিত্রের নূতন করিয়া পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। রূপাবলীর রেখা-চিত্রগুলি তিনি ছাত্রদের সাহায্যের জন্য বাহির করিয়াছেন। প্রথমভাগ হাতের ও আঙুলের নানা ভঙ্গী ও নানা দিকের রূপ, পায়ের ও পদাঙ্গুলির কয়েকটি ভঙ্গী, কয়েক খানি মুখ ও কেশরচনার চিত্র আছে। এইগুলির সাহায্যে আপনার ইচ্ছামত ছবি খাড়া করা ছাত্রদের পক্ষে অনেক সহজ হইয়া আসে। যাহারা

মডেল দেখিয়া আঁকে না, তাহারা হস্তাক্ষরের বর্ণমালার মত এই চিত্রাক্ষরগুলি আয়ত্ত করিয়া লইলে এবং এই ভাবে রেখাবিন্যাস করিতে শিখিলে চিত্রবিদ্যার অনেক সমস্যা দূর হয়।

দ্বিতীয় ভাগে প্রাচীন পদ্ধতিতে আঁকা কয়েকটি সম্পূর্ণ মনুষ্যচিত্র আছে। সেগুলি কেবল মাত্র যে রেখাঙ্কণে সাহায্য করিবে তাহা নহে, সমগ্রচিত্র রচনার ওজন ও ছন্দ বুঝিতেও সাহায্য করিবে। ছাত্রদের জন্য রূপাবলীর আরও বহু খণ্ড বসু মহাশয় প্রকাশ করিলে চিত্র বিদ্যাশিক্ষার পথ সুগম হয়।

শ্রীশান্তা দেবী

ভারত-লক্ষ্মী—শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত। প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা। পৃঃ ১৩৯।

জাতীয় চরিত্র গঠনে নারীর প্রভাব যথেষ্ট। নারীদের কৃতিত্বের কথা অবগত না হইলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে রাণী রাসমণি, রাণী ভবানী, মাতাজী তপস্বিনী, রাণী দুর্গাবতী, অহল্যা বাই, ঝান্সীর রাণী প্রভৃতির চরিত-কথা বর্ণিত হইয়াছে। এরূপ চরিত-কথা আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। 'ভারত-লক্ষ্মী' এই প্রয়োজন মিটাইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, চরিত-কথা আলোচনা করিতে গিয়া গ্রন্থকার সত্যকার ইতিহাস অপেক্ষা অন্ধ গাথা ঐতিহ্যের উপরই অধিক নির্ভর করিয়াছেন। রাণী রাসমণির দান ও সুকৃতির কাহিনী সমসাময়িক সংবাদপত্র পাঠে জানা যায়। লেখক তাহা হইতে অনেক নূতন কথা পুস্তকে সন্নিবেশিত করিতে পারিতেন। পুস্তকখানির ভাষাও প্রায় দুর্বোধ্য ও স্থলবিশেষে উৎকট হইয়া উঠিয়াছে। "এই শ্মশান বুকেই যদি কালীর নৃত্য হয়, তবে সমাজের আর একপ্রকার শ্রী ফুটিয়া উঠে"— ইহার অর্থ কি?

গ্রন্থকার যে বাল্য-বিবাহের সমর্থক এবং বিধবা-বিবাহের কার্য্যতঃ বিরোধী তাহা পুস্তকের নিবন্ধগুলির মধ্যে বিশেষরূপে প্রকটিত হইয়াছে। ইহাতেও আলোচ্য বিষয়গুলির অঙ্গহানি হইয়াছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

Indian Literature in China and the Far East—by Probhat K. Mukherji, Librarian & Lecturer, Visvabharati, Santi Niketan, Hemchandra Vasu Mallik Professor of History, National Council of Education, Bengal, 1927-30. Greater India Society 120-2 Upper Circular Road, Calcutta.

দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রভাতবাবু ভারতের বাহিরে ভারতীয় সাহিত্য চর্চ্চার বিবরণ আলোচনা করিতেছেন। ইতঃপূর্ব্বে নানা পত্রিকায় এ বিষয়ে লিখিত তাঁহার প্রবন্ধাদিও প্রকাশিত হইয়াছে। Indian Historical Quarterly পত্রে এ সম্বন্ধে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারেও Calcutta Oriental Series নামক গ্রন্থাবলীতে প্রচারিত হইয়াছিল। চীনদেশে ভারতীয় সাহিত্য চর্চ্চার বিস্তৃত বিবরণ প্রভাত বাবু আলোচ্য গ্রন্থখানিতে প্রদান করিয়া অনুসন্ধিৎসু পাঠকের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। প্রাচীন কাল হইতে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতীয় গ্রন্থসমূহের যে সমস্ত অনুবাদাদি চীনা ভাষায় রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল তাহাদের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। তবে গ্রন্থের নামানুসারে Far East বা সুদূর প্রাচ্যে ভারতীয় সাহিত্য চর্চ্চার কোনও বিবরণ এ গ্রন্থে দেওয়া হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী চৈনিকগণ কেবল যে বৌদ্ধশাস্ত্রীয় গ্রন্থই অনুবাদ করাইয়াছিলেন এমন নহে। ন্যায়বৈশেষিক (পৃঃ ২৬৩), জ্যোতিষ (পৃঃ ৩০১) প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রের গ্রন্থও চীনা ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। কোন কোন গ্রন্থ আবার ভাষান্তরিত না হইয়া কেবল অক্ষরান্তরিত হইয়াছিল (পৃঃ ৩০৫)। চীনা-সাহিত্যের এই সকল গ্রন্থ যে কেবল চীনাদেরই আদরের বস্তু তাহা নহে। ভারতবর্ষীয়দিগের নিকটও এগুলি পরম গৌরব ও শ্রদ্ধার বস্তু। তবে ভারতীয় সাহিত্য ও কৃষ্টির প্রসারের দিক্ হইতেই তাহাদের একমাত্র মূল্য নহে। অনেক ক্ষেত্রে অনূদিত গ্রন্থগুলির ভারতীয় ভাষার মূল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—অনেক পণ্ডিত বিপুল পরিশ্রম সহকারে এই সকল অনুবাদাদি হইতে সেই সকল মূলের উদ্ধার করিতেছেন। এই দিক্ হইতেই এই বিপুল সাহিত্য ভারতবর্ষীয়দিগের পরম আদরের বস্তু। সেই সাহিত্যের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া প্রভাতবাবু এদিকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। গ্রন্থশেষে একটি বিষয় নির্ঘণ্ট থাকিলে সাধারণ পাঠকের আলোচনার সুবিধা হইত। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বপ্রচারিত যে সমস্ত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ অবলম্বনে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে তাহাদের একটা তালিকাও গ্রন্থশেষে নিবদ্ধ করিয়া দিলে ভাল হইত। গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন গ্রন্থমধ্যে অনেক ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। ভুলগুলি অনেক স্থলে গুরুতর।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

শ্রীরামকৃষ্ণ চন্দ্রিকা—ব্রহ্মচারী প্রজ্ঞাচৈতন্য প্রণীত। কলিকাতা, ৩১ সিমলা ষ্ট্রীট হইতে ব্রহ্মচারী সুবোধচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ষোল-পেজি ২৬৮ পৃষ্ঠা। বোর্ড বাঁধাই, দাম ১৸০।

ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন—"পুস্তকখানি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী লিখিত 'শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণ স্তোত্রামৃত' অবলম্বনে রচিত।... ...শ্লোকপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের যতটুকু লীলামৃত আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাকেই বিশদভাবে শাস্ত্রযুক্তি, উদাহরণ এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব ও তদীয় লীলাসহচরগণের উপদেশবাক্যসহ প্রকাশ করিতে লেখক চেষ্টা করিয়াছে।"

বইখানি তত্ত্বজিজ্ঞাসুদের ভাল লাগিতে পারে। ভাষা স্থানে স্থানে অনাবশ্যক গুরুগম্ভীর হইয়াছে মনে লইল। এরূপ ভাষা পাঠক সাধারণকে আকৃষ্ট করিবে না। পুরু কাগজে পাইকা হরফে পরিষ্কার ছাপা, তবে নির্ভুল নয়। সে-কথা লেখক ভূমিকায় স্বীকার করিয়াছেন। ছবিগুলি সুমুদ্রিত।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রোগীর জগৎ—শ্রীসুধাকান্ত দে। প্রকাশক:—শ্রীপ্রিয়নাথ দাশ। কলিকাতা। ১৫৮+৵০, মূল্য পাঁচসিকা মাত্র।

একখানি ছোটগল্পের সমষ্টি, ইহাতে আটটি গল্প আছে। প্রথম গল্পটির নামানুসারেই গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে। গল্পগুলির প্রত্যেকটি ছোটও বটে, গল্পও বটে, কিন্তু ছোটগল্প নয় একটিও। প্রায় সবগুলিই উদ্ভিন্ন যৌবনের ভাবাবেগে ভরা।

শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

শৃঙ্খল

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

৯

সুলতার গাড়ী বীণাদের সদর দরজা পার হইতেই তিনি কহিলেন, "এবারে অজয়বাবুর পেছনে ধাওয়া করতে হবে ত ?"

বীণা কহিল, "লাভ আছে কিছু ? এতক্ষণ কতদূরে গেছেন, কোন্‌দিকে গেছেন তার ঠিক কি ?"

সুলতা ইহার পর কিছু একটা রসিকতা করিবেন বীণা ইহাই আশা করিয়াছিল, কিন্তু খুব স্বাভাবিক সুরেই তিনি কহিলেন, "তার চেয়ে ক্লাবেই যাই চল্। সেখানে দেখা হয়ে গেলেও যেতে পারে। যদিও আজ এত তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরব না ঠিক ক'রেই বেরিয়ে ছিলাম।"

বীণা কহিল, "এমন কঠিন সঙ্কল্প ক'রে বেরতে ত তোমাকে প্রায় দেখা যায় না, কি হ'ল আজ হঠাৎ ? ক্লাব আর ভালো লাগছে না ?"

ড্রাইভারকে বাড়ী ফিরিতে আদেশ দিয়া সুলতা কহিলেন, "তা নয়। ওঁর ভারি আস্পর্দ্ধা বেড়ে যাচ্ছে। কিছুদিন ধ'রে রোজ সন্ধ্যা না হ'তেই পালাতে সুরু করেছেন, কি যে ব্রিজ্ খেলার বাতিক। আজ জোর ক'রে দরজায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে এসেছি। সবাইকে রিসিভ ক'রে বসাবেন।"

বীণা কহিল, "এতক্ষণ হাঁপিয়ে উঠেছেন নিশ্চয়। তা ভদ্রলোককে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। সুভদ্র-বাবুর ক্লাবটি যা জমাট আড্ডার জায়গা, খানিকক্ষণ বস্‌লেই মানুষের হাই উঠ্‌তে থাকে। সবাই কাঠ হয়ে ব'সে থাক্‌বে, হাস্‌বে না, কথা বল্‌বে না। কি যে হচ্ছে তোমাদের এই দুর্ভোগ ভুগিয়ে তাও জানি না।"

সুলতা বীণার একটি হাতকে নিজের হাতে লইয়া আস্তে একটু টিপিয়া দিয়া কহিলেন, "একেবারেই যে কিছু হচ্ছে না তা এখন আর বলি কি ক'রে ?"

বীণা হাসিয়া কহিল, "ভালো জ্বালা যা-হোক ঐতেই কি মজুরি পোষাবে ?"

সুলতাও হাসিয়াই কহিলেন, "তোর আর আমার ত পোষাবে, তাহ'লেই হল।"

এবারে সুলতার হাতটি টিপিয়া দিয়া বীণা কহিল, "তুমি সত্যি ভারি ভালো, সুলতাদি।"

সুলতা কহিলেন, "অন্যেরা শুন্‌লে ভালো বল্‌বে না।"

বীণা কহিল, "তাঁর এত যত্নের ক্লাবটির এমন সুন্দর সদ্‌গতি হচ্ছে শুন্‌লে সুভদ্রবাবু অন্ততঃ খুশী ত হবেনই না।"

সুলতা কহিলেন, "তা কিন্তু ঠিক বলা যায় না। সুভদ্র কিসে যে খুশী হয়, কিসে হয় না, বোঝা শক্ত। আমি ত অন্ততঃ আজ অবধি বুঝতে পারিনি। একটা কিছু কাজ নিয়ে লেগে প'ড়ে থাকাটাই যেন তার আসল দরকার। কাজগুলোর প্রতি আসলে তার যে কিছু মমতা আছে তার ব্যবহার থেকে তা কিন্তু মোটেই মনে হয় না। একেবারেই মা ফলেষু কদাচন। তা দেশের লোকগুলো ত কুঁড়েমি ক'রেই গেল। নিতান্ত কাজের ঝোঁকেই যদি কেউ কাজ করে সেটাও মন্দ নয়।"

বীণাদের বাড়ী হইতে ক্লাব খুব বেশী দূরে নয়। অল্পক্ষণেই গাড়ী পৌছিয়া গেল। গাড়ীবারান্দার ছাত হইতে বীণাকে দেখিতে পাইয়া রমাপ্রসাদ তাড়া-তাড়ি নামিয়া আসিল, কহিল, "এই যে আপনি এসেছেন। উপরে ওঁরা সব ব'সে আছেন, আপনাদের কথা সবাই জিজ্ঞেস করছিলেন।"

সুলতা কহিলেন, "উনি ওপরে নেই ?"

রমাপ্রসাদ একটু ভাবিয়া লইয়া কহিল, "কে, ডাক্তার চাটার্জ্জি ? আজ্ঞে না, আমি এসে পৌছবার পরেই তিনি চ'লে গেলেন, আমাকেই ব'লে গেলেন সকলকে

দে'খে শুনে বসাতে। কোথায় জরুরী খুব কাজ ছিল। কারও কিছু অসুবিধা হয়নি অবিশ্যি।"

"না, না, আপনি রয়েছেন, অসুবিধা কেন হতে যাবে।" বলিয়া সুলতা বীণার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরে গিয়া উঠিলেন।

মেয়েরা বীণার চতুর্দ্দিকে গোল হইয়া ঘিরিয়া আসিলে বীণা বলিল, "নাঃ, এই ক্লাবের চাঁদার টাকাটা এরপর অর্দ্ধেক আমাকে হিসেব ক'রে নিয়ে নিতে হবে। আমাকে নিয়ে ভিড় কর্‌বার জন্যেই কি তোরা ক্লাবে আসিস্?"

রমাপ্রসাদ তাহার নিজের ধরণে রসিকতা করিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "চাঁদা যা আদায় হয়, তা শুন্‌লে আপনার আর তাতে ভাগ বসাতে ইচ্ছে কর্‌বে না। দেখবেন একবার হিসেবটা?"

বীণা বলিল, "রক্ষা কর বাবা, বাড়ীতে বাজারের হিসেব রোজ দেখতে হয়, সেই দুঃখ ভুল্‌তে ক্লাবে আসি, এখানেও যদি তাই করতে হয় ত এরপর দেশ ছেড়ে পালাতে হবে। আপনার ভয় নেই, চাঁদার টাকা পরিমাণে খুব বাড়লেও আমি সত্যিই তাতে ভাগ বসাব না। সুভদ্রবাবু আজ আসেননি বুঝি?"

বলিতে বলিতেই সুভদ্র আসিয়া পৌঁছিল। কিন্তু বীণার উৎসুক দৃষ্টি তাহার দিক্ হইতে যেন প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিল। সে আজ কোথা হইতে একটি পশ্চিম-দেশীয় সুশ্রী চেহারার মুসলমান বন্ধুকে জুটাইয়া আনিয়াছে, প্রথমেই বীণার সঙ্গে তাহার পরিচয় করাইয়া দিল। বন্ধুটি বেশ সপ্রতিভ, বিলাত ঘুরিয়া আসিয়াছেন, মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহারে কোনও আড়ষ্টভাব প্রকাশ পাইল না। সকলের সঙ্গে মৌখিক পরিচয় সমাধা হইয়া গেলে সুভদ্রের অনুরোধে তিনি কয়েকটি পারসীক গজল গাহিয়া সকলকে শোনাইলেন। পরিষ্কার সুকণ্ঠ, শ্রুতিমধুর ভাষা, মধুরতর সুর মিলিয়া সহজেই সকলের মনোহরণ করিল। কাহারও সঙ্গে কাহারও কথা বলিবার দায় নাই, শুদ্ধমাত্র এই কারণেই ক্লাব সেদিন জমিল ভাল। গান শেষ হইয়া গেলে তথাকথিত হিন্দু-সঙ্গীতের উপর ইস্‌লামীয় প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা জুড়িয়া সুভদ্র সকলকে তাহাতে যোগ দিতে আহ্বান করিল, কিন্তু ছেলেরাও আজ কথার মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত টীকা-টিপ্পনী করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিল, আলোচনা প্রধানতঃ সুভদ্র এবং তাহার মুসলমান বন্ধুটির মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া রহিল।

সেদিনকার মত ক্লাবের কাজ ঐ পর্য্যন্ত হইয়া শেষ হইল। অন্যদিন হইলে এই সময়টাই বীণাকে ঘিরিয়া ছোটখাট আর-একটি ক্লাব জমিয়া উঠিত, এবং সত্যিকারের হইয়া জমিত, কিন্তু আজ তাহার মন ভার হইয়া ছিল। সুভদ্রকে অজয়ের খবর জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু সে তখন তাহার নবাগত বন্ধুটিকে লইয়া মহাব্যস্ত, তাঁহাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। অজয় শেষ পর্য্যন্ত আসিল না দেখিয়া সুলতাও অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন। বীণাকে নিজেদের গাড়ীতে বাড়ী রওনা করিয়া দিতে নীচে আসিয়া বলিলেন, "ক্লাব আজ মোটেই ভালো লাগল না, না?"

বীণা কহিল, "মন্দ কি, গানগুলি সত্যিই শোন্‌বার মত, আর গলাটিও বেশ মিষ্টি। কিন্তু এ আর চল্‌বে না সুলতাদি, আমার হয়ে তুমিই সুভদ্রবাবুকে ব'লে দিও।"

সুলতা অবাক্ হইয়া কহিলেন, "কি চল্‌বে না?"

বীণা কহিল, "মুসলমান মেম্বার কেউ হতে চান, স্বচ্ছন্দে হতে পারেন। কিন্তু নিজের আওরাতটিকে সাবধানে ঘেরাটোপ দিয়ে নিজের বাড়ীতে জমা ক'রে রেখে এসে অন্যদের আওরাতদের সঙ্গে মজলিসি আলাপ জমাবেন, এ হতে পার্‌বে না।"

সুলতা হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, "তা যদি বল, তাহ'লে ক্লাবের অনেক হিন্দু মেম্বারকেও নাম কেটে বিদেয় কর্‌তে হয়।"

বীণা কহিল, "তা যদি ঠিকঠিক জান্‌তে পাই যে ঐ প্রকারের মনোবৃত্তি তাদেরও কারও মধ্যে আছে তবে তার জন্যেও ঐ ব্যবস্থা কর্‌তেই আমি চাই। পর্দ্দা ঢাকা না দিলে নিজের পরিবারের মেয়েদের সম্ভ্রম থাকে না যারা মনে করে, পর্দ্দা ঢাকা দেয় না এমন মেয়েদের কখনও তারা সম্ভ্রম করত পারে এ আমি বিশ্বাস করি না।"

গাড়ী ষ্টার্ট লইয়া চলিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় হেড লাইটের প্রখর আলোয় দেখা গেল, বড় বড় করিয়া পা ফেলিয়া অজয় আসিতেছে। সুলতাই প্রথম তাহাকে দেখিতে পাইলেন, চাপা গলায় কেবল কহিলেন, "বীণি, বীণি!"

বীণা ত্রস্তে নামিয়া পড়িল। গাড়ীর মধ্য হইতে অজয়কে সে দেখিতে পায় নাই, কিন্তু সুলতা কি বলিতে চাহিতেছেন তাহা তাঁহার গলার স্বরেই অতি অনায়াসে সে বুঝিতে পারিয়াছিল। অজয়ও ততক্ষণে আসিয়া পড়িয়াছে। গাড়ীবারান্দার নীচে অন্ধকারে বীণার কমনীয় চোখ-দুইটি নিজের প্রসন্ন অদৃষ্টের প্রতি কৃতজ্ঞতায় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হেড লাইটের আলোয় অজয়ের চোখ ধাঁধিয়া গিয়াছিল, একবার বীণাদের দিকে সে চাহিল বটে কিন্তু কাহাকেও চিনিতে পারিল বলিয়া মনে হইল না। সসম্ভ্রমে পাশ কাটাইয়া উপরে উঠিতে যাইবে, সুলতা একটি হাতে আস্তে বীণার বাহু স্পর্শ করিয়া ডাকিয়া কহিলেন, "এই যে এইখানে।"

অজয় ফিরিল। নত হইয়া দুইজনকে অভিবাদন করিয়া বীণাকে কহিল, "আপনি এই আস্‌ছেন বুঝি?"

বীণা কলকণ্ঠে হাসিয়া কহিল, "আপনি যে বিমান-বাবুকেও ছাড়িয়ে ওঠবার জোগাড় করেছেন! কিন্তু আমিও তাঁর দলের, এ ধারণা আপনার কিসের থেকে হ'ল? রাত ক'টা এখন তার হিসেব আছে?"

অজয় নিজের হাত-ঘড়িটার দিকে চাহিয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সুলতা কহিলেন, "না না, রাত এমন কিছু বেশী হয়নি। বড় জোর আটটা হবে। ন'টা-সাড়েন'টার আগে কোন্‌দিন তোমাদের ক্লাব ভাঙে শুনি? চলুন অজয়বাবু ওপরে, বস্‌বেন। আর সকলেই প্রায় চ'লে গিয়েছে, রমাপ্রসাদ-বাবু আছেন এখনও। আমরা চার জনেই ব'সে আড্ডা দেব।"

অজয় তাড়াতাড়ি কহিল, "আজ থাক, আজ সত্যিই বেশ রাত হয়েছে, তাছাড়া রমাপ্রসাদ-বাবু হিসেবপত্র নিয়ে ব্যস্ত আছেন, তাঁকে এখন বিরক্ত করা ঠিক হবে না।"

সুলতা কহিলেন, "তা বেশ ত, তাঁকে না বিরক্ত করতে চান, আমরা তিনজন রয়েছি, আড্ডা দেবার পক্ষে তিনজনই যথেষ্ট।"

বীণা কহিল, "রমাপ্রসাদ-বাবু বেচারা কাজ কর্‌বেন, আর আমরা তাঁর পাশে ব'সে গল্প জমাব সেটা কিন্তু জীবে দয়ার পরিচয় হবে না। তার চেয়ে অজয়বাবুকে আমিই সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাই। আজ সন্ধ্যায় উনি যা করেছেন, তার শাস্তি ত ওঁর পাওনাই আছে।"

অজয় সভয়ে কহিল, "কি, কি করেছি আজ সন্ধ্যায়?"

বীণা কহিল, "কথাটা শুনে আপনি যে-রকম চমকালেন, তাতে আমার এখন মনে হচ্ছে, আমি যে-ব্যাপারের কথা বল্‌ছি তার চেয়ে গুরুতর কিছুই ইতিমধ্যে ক'রে থাক্‌বেন।"

সুলতা কহিলেন, "ওঁর অপরাধ যাই হোক্, তার জন্যে শাস্তি ব্যবস্থা যা হচ্ছে তাতে ওঁকে শোধরাবার বদলে উৎসাহই না বেশী ক'রে দেওয়া হয় তাই ভাবছি।"

অজয় ঘামিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু নিজের কাছে তাহাকে স্বীকার করিতে হইল, তাহার ভাল লাগিতেছে। সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রি। শীতের শিহরণ অলক্ষ্যে প্রিয়-স্পর্শজনিত শিহরণের বিভ্রান্তি মনে আনিয়া দেয়। দুইটি রূপসী প্রগল্‌ভা নারীর নিভৃত সান্নিধ্য, দু-চারিটা সহজ কথার আদান-প্রদানের মধ্যে প্রচ্ছন্ন কোন্ মাধুর্য্যের ইঙ্গিত। আজ এই রহস্যগভীর রাত্রিতে এই দুইটি মানুষের রসস্নিগ্ধতামণ্ডিত চিত্তের দ্বার অধিকার করিয়া সে রহিয়াছে—সে, অজয়। বহুদূর জগতের অপরিচিত অতিথি, কিন্তু কোন্ মায়ামন্ত্রে ইহাদের মনের নিভৃত মহলে তাহার স্থান হইয়াছে। এই দুইটি মানবীর দৃষ্টিতে নিজের সেই রহস্যরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া সে অভিভূত হইল। মনে মনে কথা সাজাইয়া কহিল, "কর্ত্তব্যপরায়ণ বিচারককে শাস্তি দিতে হয়, তার ফলাফল না ভেবে, এই ত নিয়ম।"

বীণা কহিল, "আমি তাহলে স্বীকারই কর্‌ছি, এতটা কর্ত্তব্যজ্ঞান আমার নেই। আপনাকে শাস্তি দেব অথচ আপনার ওপর তার ফল কিছুই হবে না, এ আমি সইতে পারব না।"

সুলতা কহিলেন, "শাস্তিটা কতখানি জোরের সঙ্গে

দিস্ তার ওপর সেটা নির্ভর করবে। ফল ত হবেই এবং কি ফল যে হবে সেও ত আমি আগে থেকেই ব'লে রেখেছি।"

বীণা গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। গাড়ী আবার অট্টশব্দে ষ্টার্ট্ লইতে আরম্ভ করিতেই সুলতা তাহার বাহু স্পর্শ করিয়া তাহাকে ফিরাইলেন, তারপর তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া কহিলেন, "হ্যাঁরে, মাল্পো আর আছে?"

বীণা কহিল, "কেন, তোমার আরও চাই?"

সুলতা কহিলেন, "দেখ্, মার খাবি। সত্যি বল্‌ছি, যদি মালপো আর থাকে ত ওঁকে দিস্, ভালোবেসে খাবেন।"

বীণা কহিল, "মুখের যা চেহারা দেখছি, নিশ্চয়ই সমস্ত দিন খায়নি। বাজারের তেলেভাজা বাসি কচুরী দিলেও এখন কিছুমাত্র কম ভালোবেসে খাবে না।"

সুলতা কহিলেন, "তাই না-হয় দিস্। খাওয়া যেমনই হোক, ভালোবাসাটা থাকলেই হ'ল।"

গাড়ীর দম লওয়া হইয়া গেলে শাড়ীর অঞ্চল সম্বরণ করিয়া বীণা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল, অজয়কে কহিল, "আসুন।"

অজয় একটু ইতস্ততঃ করিয়া গাড়ীর সম্মুখ ঘুরিয়া ড্রাইভারের পাশে বসিতে গেলে বেশ বিরক্ত হইয়াই আবার কহিল, "ও আবার কি করছেন? ভেতরে এসে বসুন।"

সে-আদেশ অমান্য করিবার শক্তি অজয়ের ছিল না। ভিতরে ঢুকিতে গাড়ীর দরজায় তাহার শালের প্রান্ত আটকাইয়া গেল। বীণা হইতে যথেষ্ট দূরত্ব রক্ষা করিয়া একপাশে সঙ্কোচে জড়সড় হইয়া সে বসিয়া পড়িল। মুক্তিপ্রাপ্ত গ্যাসের দাপটে একবার থরথর করিয়া কাঁপিয়া তারপর পালের নৌকার মত স্থির মন্থর গতিতে সুলতাদের সিত্রোঁআঁ হাজরা রোড দিয়া গড়াইয়া বালিগঞ্জের মাঠে পড়িল।

অন্ধকার পথের পাশে দূরে দূরে স্থাপিত আলোগুলি বারবার বীণার মুখের উপর পড়িতেছিল। কুণ্ঠিতদৃষ্টিতে চাহিয়া অজয় আজও দেখিল, সেই মুখটি কমনীয়, হৃদয়বত্তায় সুকুমার, প্রগল্‌ভতায় দীপ্ত। কিন্তু সে-মুখের সদাউৎসারিত হাসির উৎসমুখ আজ কি সহসা শুকাইয়া গেল? চকিতে চাহিয়া প্রতিবারে যতটুকু দেখিল, সে-মুখটিকে অত্যন্ত ক্লান্ত ভারাক্রান্ত মনে হইল। তাহার উদাস-দৃষ্টি কোন্ সুদূরে আজ নিবদ্ধ? অজয় বুঝিল, সেখানে এই মুহূর্ত্তটিতে অজয় আর নাই, চতুষ্পার্শ্বের কেহ-কিছু সেখানে নাই। প্রাণপণে নিজেকে যতটা প্রকাশ করে তাহা ছাড়াও বীণার মনের মধ্যে গভীরতার স্থান কি একটা আছে? সেখানে কোন্ রহস্য-নাট্যের অভিনয় আজ চলিতেছে? কাহারা সে-নাটকের পাত্র-পাত্রী? কি সেই নাটকের বিষয়বস্তু?

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পরে অজয়ই প্রথমে কথা কহিল, বলিল, "আজ হঠাৎ এমন ক'রে শাস্তি দেবার লোভ দেখিয়ে নিয়ে এলেন যে?"

বীণা কহিল, "লোভ আপনাকে দেখানো যাবে না তা আমি এই ক'দিনেই বেশ বুঝতে পেরেছি। জোর ক'রে নিয়ে এলাম কেন যদি জানতে চান ত তার উত্তর এই যে, তা না হ'লে আপনি আস্‌তেন না।"

"কিসে আপনার মনে হ'ল যে আস্‌তাম না?"

"আজ বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত গিয়ে কি ব'লে ফিরে চ'লে এলেন?"

"আমি জান্‌তামই না যে সেটা অপনাদের বাড়ী, তাছাড়া আপনাদের বাড়ী যাব ব'লে একেবারেই প্রস্তুতও ছিলাম না। কিন্তু আপনি কি ক'রে জান্‌লেন যে আমি গিয়েছিলাম?"

বীণা একমুহূর্ত্ত থামিয়া বলিল, "ওপরের বারান্দায় ঐন্দ্রিলা ছিল, সে আপনাকে দেখেছে।"

অজয় বলিল, "ও।" তারপর একেবারেই চুপ করিয়া গেল।

বীণা বলিল, "ঐন্দ্রিলাকে আপনিও ত নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছিলেন, আপনার বোঝা উচিত ছিল, আমরা আশা করব আপনি আস্‌বেন। কি হয়েছিল বলুন ত? দারোয়ান-বেহারা কারও সাড়া পান্‌নি?"

অজয় বলিল, "না না, আমি বাড়ীতে মোটে ঢুকিইনি।"

"মাঝপথ থেকেই ফিরে গেছেন ?"

"মাঝপথ থেকেই।"

আধ-অন্ধকারে অজয়কে বীণা সন্ধানী দৃষ্টি দিয়া ভাল করিয়া একবার দেখিয়া লইল। তারপর আর কোনও কথা হইল না। বীণার মন হইতে এ ধারণা তবু কিছুতেই গেল না যে, অজয় আসিয়াছিল, চাকরবাকরদের কোনও ত্রুটি বশতঃ ফিরিয়া গিয়াছে, এখন তাহাদের বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে কিছুতেই তাহা প্রকাশ করিতে চাহিতেছে না। স্থির করিল, আজিকার অতিথেয়তায় কোনও ত্রুটি থাকিতে না দিয়া সেই অনিচ্ছিত ত্রুটির অপরাধ সে স্খালন করিবে।

বীণাদের বাড়ীর বাগানে গাড়ী প্রবেশ করিল। গিরি-গুল্মে আকীর্ণ একটি সাজান প্রস্তরস্তূপের পাশ কাটাইয়া মোড় ফিরিবার সময় একটি চকিত মুহূর্ত্তের জন্য অজয় আবার ঐন্দ্রিলাকে দেখিতে পাইল। এবারেও স্পষ্ট কিছু দেখিল না, কুয়াসাচ্ছন্ন মৃদু জ্যোৎস্নায় চাহিয়া কেবল অনুভব করিল, চতুর্থ প্রহর বেলাতে ঐন্দ্রিলাকে যে-ভাবে যে-স্থানে যে-বেশে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া গিয়াছিল, রাত্রির প্রথম প্রহরান্তেও সেইখানে সেই বেশে সেইভাবেই সে দাঁড়াইয়া আছে। অজয় বিস্মিত হইল না, আজ অভাবিতের জন্য তাহার কল্পনা-প্রবণ চিত্ত কেমন অলক্ষ্যে প্রস্তুত হইয়া আছে। তাহার মনে হইল, এইরূপই যেন হইবার কথা ছিল।

গাড়ীবারান্দার নীচে সিঁড়ি উঠিবার সময় তাহার কেমন অস্পষ্ট করিয়া মনে হইল, সে যেন রূপকথার সেই রাজপুত্র, ঘুমের দেশের রাজকন্যার সন্ধানে আসিয়াছে। ঐন্দ্রিলা সেই রাজকন্যা, সে মৃদু জ্যোৎস্নায় তিনতলার বারান্দার রেলিঙে দুই বাহুকোণ স্থাপন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে বটে, কিন্তু তাহার ঘুম ভাঙে নাই। অজয়ের উপর ভার, ঐন্দ্রিলাকে জাগাইবে।···এত বড় বাড়ীটাতে একটি দুটির বেশী আলো নাই। একতলার প্রায় সমস্তটাই অন্ধকার। বীণার গাড়ীর শব্দ শুনিয়া একটা বেহারা ছুটিয়া আসিয়া দুই সারি ঘরের মাঝখানের সিঁড়ির পথের আলোটা জালিয়া দিয়াছে। গায়ের কোটটা খুলিতে খুলিতে বীণা কহিল, "বসবার ঘরের চাবি কার কাছে আছে ?"

বেহারা চাবি লইয়া আসিলে দরজার তালা খুলিতে খুলিতে কহিল, "এ-বাড়ীতে বড় কেউ ত আসে না, এই ঘরটা বেশীর ভাগ সময় তাই বন্ধই থাকে।" ভিতরের দুইটি আলো জ্বালিয়া দিয়া অজয়কে ডাকিল, "আসুন।" কম্পিত বক্ষে ঘরে প্রবেশ করিয়া ক্লান্ত-দেহ অজয় আর আমন্ত্রণের অপেক্ষা না রাখিয়া একটা গদিমোড়া আসনে বসিয়া পড়িল। বেহারাকে জানালাগুলি খুলিয়া দিতে বলিয়া বীণা কহিল, "আপনি একটুখানি বসুন, আমি আসছি।"

ঘরের ভিতরটাতে সত্যই অনেকদিন ঝাঁট পড়ে নাই। দেয়ালের ছবির কাচে, পুঁথির ঝালর দেওয়া হলদে রঙের আলোর শেডে, সাটিনের পর্দ্দার ভাঁজে ভাঁজে বেশ পুরু হইয়া ধূলা জমিয়াছে। সমস্ত বাড়ী নিঝুম। বেহারা বাহিরের দিকের কয়েকটা জানালা খুলিয়া দিয়া প্রস্থান করিয়াছে, বিদ্যুতের আলোর নীচে হইতে খোলা জানালার পথে বাহিরের জ্যোৎস্নাকে কালো মনে হইতেছে। বসিয়া বসিয়া অজয়ের মনে হইতে লাগিল, এই ঘরের প্রতিটি দেয়াল যেন কোন্ গভীর ঘুমের মায়ায় আস্তৃত। প্রবেশ-পথের উপরে দেয়ালঘড়ির দুলুনিটা দুলিতেছে, ঘুমন্ত মানুষের হৃৎস্পন্দনের মত। গৃহসজ্জার প্রতিটি উপকরণ, প্রতিটি আসবাব কোন্ স্বপ্নে বিভোর হইয়া রহিয়াছে। ইহারা প্রত্যেকে জাগিয়া উঠিয়া কি কথা যেন বলিতে চায়, অজয়ের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। অভাবিত এবং অপরিচিত মিলিয়া অজয়ের ক্লান্ত মনের উপর নিদ্রারই মত কোন্ নিবিড় মায়ার যবনিকা বিস্তার করিতে লাগিল।

এই মধুর অপরিচয়। তাহার মধ্য চৈতন্য ভরিয়া একটি তন্বী নারী-দেহের গভীরতম রহস্যের আভাস। প্রাত্যহিক নারী-জীবনের কত-শত তুচ্ছ খুঁটিনাটির অপরূপ অপরিচিত সুষমা। বাতাসে কোন্ নাম-না-জানা ফুলের মৃদু গন্ধের ইঙ্গিত। হরিদ্রাভ আলোতে কি মায়াঘন করুণ কমনীয় কোমলতা! সবকিছু অবাস্তব, অপার্থিব, কিন্তু দেবমন্দিরের স্তিমিত

দাপালোকে অস্পষ্ট করিয়া প্রত্যক্ষ-করা-প্রতিমার সুন্দর মুখের মত মোহময়।

চতুর্দ্দিক্‌কার এই রহস্য-সমাকুল মোহময়তার মধ্যে একমাত্র বীণা কোনওরূপে খাপ খাইল না। সদা জাগ্রত বীণা, সদা স্বপ্রকাশ বীণা। কয়েক মুহূর্ত্ত বীণাকে অজয় ভুলিয়া রহিল।

ঐন্দ্রিলা অলক্ষ্যে কখন্ ঘরে প্রবেশ করিয়াছে অজয় বুঝিতে পারে নাই, তাহার কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল। ঐন্দ্রিলা বলিল, "দিদি এখনি আস্‌ছে।… আপনি আছেন কেমন?"

অজয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল। ঐন্দ্রিলার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কথা তাহার মনে হইল না। ঐন্দ্রিলা তাহার খুব কাছেই একটি আসনে আসিয়া বসিলে সেও তাহার পরিত্যক্ত আসনটিতে বসিয়া পড়িল। কুণ্ঠিত ভাবটা একটু কাটিয়া গেলে ঐন্দ্রিলার দিকে চাহিয়া ক্ষণকাল পূর্ব্বেকার কল্পনার ঘোর একটু একটু করিয়া তাহার চৈতন্যকে আবার ঘিরিয়া আসিল। কেমন অস্পষ্ট করিয়া তাহার মনে হইল, এই মেয়েটি সত্যই পুরোপুরি জাগিয়া নাই। স্পর্শমাত্রেই ইহার মনের দ্বার খুলিবে না। আজীবনের সমস্ত তপস্যার শক্তি লইয়া দ্বারে করাঘাত করিতে হইবে।

আজ সন্ধ্যায় ঐন্দ্রিলা তাহাকে প্রায় তাহাদের গৃহদ্বার হইতে ফিরিয়া যাইতে দেখিয়াছে। অজয়ের সেই অদ্ভুত ব্যবহারের সে কি অর্থ করিয়াছে কে জানে? হয়ত কোনও অর্থ সে করে নাই, অজয়ের চিন্তা এক মুহূর্ত্তের বেশী হয়ত তাহার মনে স্থান পায় নাই। তবু সেই প্রসঙ্গ লইয়াই কথা সুরু করা উচিত কি-না, অজয় ভাবিতে লাগিল। অনেক ভাবিয়াও নিজের ব্যবহারের বেশ প্রত্যয়যোগ্য এবং বলিবার মত কোনও সদর্থ নিজের মনে মনেও সে যখন করিতে পারিল না তখন বীণা তাহাকে পরিত্রাণ করিল। কলহাসির শব্দে স্তব্ধ পুরীকে সচকিত করিয়া ঐন্দ্রিলার পায়ের কাছে একটি কুশন-ঢাকা মোড়ায় বসিয়া পড়িয়া সে কহিল, "শুনেছিস্, রাহু-সর্দ্দারের কথা? বলছে, অজয়বাবুকে একলা বসিয়ে চা খেতে দিলে তিনি ভাববেন, এদের বাড়ীতে পুরুষছেলে কেউ নেই, কিম্বা থাক্‌লেও তারা ভদ্রতা জানে না। এই একটু আগে গুছিয়ে রাতের খাওয়া খেয়ে গিয়েছে।"

ঐন্দ্রিলা মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। রাহু বীণার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া দ্বারের অন্তরালে লুকাইয়াছিল, তাহার পায়ের প্রতিবাদসূচক আস্ফালন শুনিতে পাওয়া গেল। অজয় কহিল, "আচ্ছা, রাহুবাবুর কাল আমার ওখানে নিমন্ত্রণ রইল, আমি এসে তাঁকে নিয়ে যাব সঙ্গে ক'রে। সেদিনও আপনারা তাকে বাদ দিয়ে হোটেলে চা খেয়েছেন। একটা মানুষের ওপর ক্রমাগত অবিচার হওয়া কিছু নয়।"

বীণা হাসিতে হাসিতেই কহিল, "পুরুষ জাত এমনি অকৃতজ্ঞই বটে। সমস্ত শহরময় ধাওয়া ক'রে বেড়িয়ে চা খাওয়াতে ধ'রে নিয়ে এলাম আমি, নিমন্ত্রণ জুট্‌ল রাহুর। তা কি আর করব। রাহুকেই বল্‌ব আমাদের জন্যে কিছু খাবার রুমালে বেঁধে নিয়ে আস্‌তে।"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "বাড়ী পর্য্যন্ত এসে আর পৌঁছবে না তাহলে।"

আবার বাহিরে দুম্‌দুম্ করিয়া শব্দ হইল। অজয় উঠিয়া গিয়া রাহুকে ধরিয়া আনিয়া নিজের পাশে বসাইল। কহিল, "তোমার দিদিরা তোমাকে এই রকম জালান?"

রাহু সে-কথার কোনও জবাব না দিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল।

অজয় কহিল, "দিদিরা এই রকম জালায়। আমার মামাবাড়ীতে এক দিদি ছিলেন, উকুন বেছে দিচ্ছি ব'লে চুলের গুছি উপড়ে দিতেন। শেষে যখন মাথায় চুল আর থাকে না তখন একদিন মামাদের ব'লে তাঁর বিয়ে দিয়ে দিলাম। দিদিদের জব্দে রাখবার ঐ এক রাস্তা আছে।"

ঐন্দ্রিলা ভাবিতে লাগিল, ছেলেটির হঠাৎ হইয়াছে কি। বীণা কহিল, "তাতে ওর লাভ কিছু হবে না। দিদিরা শ্বশুরবাড়ী গেলে দারোয়ানী কর্‌তে কে সঙ্গে যাবে? তারাও ত ভাবতে পারে, এদের বাড়ী পুরুষ-ছেলে কেউ নেই, কিম্বা থাক্‌লেও তারা ভদ্রতা জানে না? সেটা রাহুর সহ্য হবে না।"

রাহুকে আর ধরিয়া রাখা যাইতেছিল না। অজয়



কহিল, "তোমার বড়দিদিই তোমাকে বেশী জ্বালান তা বেশ বুঝতে পারছি। আচ্ছা তুমি এক কাজ কর, জ্বালাবার ক্ষমতায় তাঁকেও বেশ ছাড়িয়ে যায় এমন একটি বৌ দে'খে ঘরে নিয়ে এসো, তখন দেখা যাবে উনি কি করেন।"

"ছেড়ে দিন্, আঃ ছেড়ে দিন্" বলিতে বলিতে জোরে অজয়ের হাত ছাড়াইয়া রাহু একছুটে অদৃশ্য হইয়া গেল।

"দিদিমণি, একটু এদিকে আসবে?" বলিয়া ক্ষান্ত আসিয়া দরজার বাহিরে কপাটের পাশ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। তাহার সঙ্গে ছিল মন্দিরা, অজয়কে দেখিবা-মাত্র ছুটিয়া আসিয়া তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। অজয় তাহাকে দু-হাতে বুকে জড়াইয়া চুম্বন করিতেই সে তাহার বাহুবন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া কহিল, 'মাকেও আদর ক'রে দাও!" বীণা তাহাকে প্রায় হিঁচড়াইয়া টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

ঐন্দ্রিলাকে আবার একাকী পাইয়া অজয়ের মন খুশী হইল। এবারে তাহার নিজের চেতনার উপর হইতে ঘুমের জড়তা কাটিয়া গিয়াছে। স্থির করিল, এবারে আর ভুল করিলে চলিবে না। কোনও কথার সূত্র ধরিয়া এই অপূর্ব্ব-সুন্দরী, স্বল্পভাষী, দর্পিতা মেয়েটির মনের অন্ততঃ বাহির-অঙ্গনের চৌকাঠ অতিক্রম করিতে হইবে। কে জানে হয়ত এই মুহূর্ত্তটি এমন ভাবে কোনওদিন আর আসিবে না।

কিন্তু মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত কাটিয়া যাইতে লাগিল। বীণার কলহাসির ছোঁয়াচ-লাগা অজয়ের সচেতন মন ঐন্দ্রিলার বসিবার বিশেষ-রকম দর্পিত ভঙ্গীটিতে, দর্পণের মত নির্ম্মল স্বচ্ছ নখররাজির দীপ্তিতে, নিটোল শুভ্র হাত-দুইটির পেলব-মাধুর্য্যে, জরীর কাজ করা ছোট দুইটি লাল মখমলমণ্ডিত পাদুকায়, জরীপাড় লাল শাড়ীটির প্রত্যেকটি ভাঁজে ভাঁজে বিহ্বল হইয়া ফিরিতে লাগিল, কি কথা বলিয়া আরম্ভ করিবে তাহা ভাবিবার অবকাশ পাইল না।

ঐন্দ্রিলাই এবারেও প্রথম কথা কহিল। বলিল, "আপনি এখন কি লিখছেন?"

অজয় চকিতে অনুভব করিল, ইহার নিকট বিনয় প্রকাশ করিতে যাওয়া নিরর্থক। পৃথিবীতে এমন কোনও গৌরবের আভরণ নাই যাহাদ্বারা নিজেকে মণ্ডিত করিয়া সে ইহার ঐ রহস্যময় গভীর দৃষ্টির দিকে স্পর্দ্ধিত দৃষ্টি তুলিয়া চাহিতে পারে। তাহার সমস্ত আত্মশ্লাঘা চিরকাল ইহার সম্মুখে বিনয়েরই নামান্তর হইয়া থাকিবে। তাই কিছুমাত্র সঙ্কোচ না করিয়াই কহিল, "কিছুদিন থেকে বাণভট্টের হর্ষচরিতের একটা সমালোচনা লিখছি। আমার মনে হয়, রাজ্যবর্দ্ধন এবং গ্রহবর্ম্মার হত্যায় শ্রীহর্ষের হাত ছিল, এবং তখনকার দিনের সমস্যা দিয়ে বিচার করলে এই দুই হত্যার রাজনৈতিক সমর্থন খুঁজে পাওয়াও কঠিন হয় না।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "আপনার লেখা কাগজে নিশ্চয় ছাপা হবে, তখন পড়ব। হর্ষচরিত কলেজের লাইব্রেরীতে ব'সে একবার উল্টে ছিলাম। সত্যিই তখন মনে হয়েছিল, অনেক কথা বাণভট্ট যেন বলতে বলতে থেমে গিয়েছেন।...অনেক নাটকের খোরাক আছে বইটাতে।"

"তা ত আছেই। আমাদের ইতিহাসে নাটকীয় উপকরণ যে কত আছে তার পরিমাণই হয় না।"

"সে-সমস্ত নিয়ে নাটক-উপন্যাস কেন আজকাল আর কেউ লেখে না, কে জানে? অতীতটাকে ঠিকমত ক'রে গড়তে পারলে তার মধ্যে দেশের ভবিষ্যতের কত বড় একটা আশ্রয় হয়। তা না ক'রে, যে-সমস্যা আমাদের নয়, কোনোদিন হবে কি-না তাও কেউ বলতে পারে না, তাই নিয়ে ক্রমাগত নাটক আর উপন্যাস, উপন্যাস আর নাটক লেখা হয়ে চলেছে। আমাদের জাতের সত্যিই কোনও জিনিষ নিয়ে কোনোদিকে সত্যনিষ্ঠার কিছু বালাই নেই।"

"তা ত নেইই। সেই কথাই ত বিমানদের ইস্কুলে সেদিন আপনার সঙ্গে হচ্ছিল। আসল মানুষটা কোথায় যে তার মুখে সত্যি কথা শুনতে পাবেন? আমরা লিখতে যখন বসি তার আগে দিনকতক auto-suggestion দিয়ে নিজেকে ঠিক ক'রে নিতে হয়, ভাবতে হয় আমি প্রুস্ত, আমি লরেন্স, আমি মান্, নিদেন পক্ষে আমি আল্ডুস্ হাক্স্লি, তারপর আমাদের কলমের ডগায় কথা ফোটে। আর্টিষ্ট ছোক্‌রারা শিষ ঝাঁকে ব'লে বিমান দুঃখ করে,

আমাদের কলমের আর্টিষ্টরা শিবও কেউ একটা আঁকে না, সেখানে সমস্তটাই বাঁদরের রাজত্ব। নকল-নবিশি হলেও তার মানে বুঝতাম, আগাগোড়া মানুষটাই নকল হয়ে ওঠে কি ক'রে সে আমাদের বুদ্ধির অগোচর।"

"আমাদের দেশের লোকের সাহিত্য-বুদ্ধির কিছু কি অভাব আছে?"

"অভাবটা সাহিত্য-বুদ্ধির নয়, সহজ সতেজ স্বাভাবিক বুদ্ধির। আমাদের সমস্ত রকম বুদ্ধি, বিবেক, চিন্তাশক্তি চারদিক্‌কার পাহাড়প্রমাণ কৃত্রিমতায় চাপা প'ড়ে দুর্ব্বল ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে গিয়েছে। আপনি যে-জিনিষটাকে সত্যনিষ্ঠা বল্‌ছেন, কোনওরকমে সেই জিনিষটার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা না হলে এ ব্যাধি সারবে না। এদেশের মানুষের সত্যিকারের যেটা মন তার চারদিকে কতরকমের আড়াল তা আপনি জানেন না। সেখানকার প্রত্যেকটি দরজা-জানালা বন্ধ। দরজার বাইরে একটুখানি জায়গা যা খোলা আছে সেইখানে ব'সে নিজের সঙ্গে, পরস্পরের সঙ্গে, পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে আমাদের কারবার। আমাদের সত্যিকারের সমস্যাগুলি ঘরের মধ্যে তালাবন্ধ থাকে, সেখানে আমাদের দৃষ্টি পৌঁছয় না।"

কথাটা বলিতে বলিতে অজয়ের হঠাৎ মনে হইল, তাহার নিজেরও মনের এমনই একটা ঘরের সব-কয়টা দরজা-জানালা সে আজ সতর্ক হইয়া বন্ধ করিয়া বসিয়াছে। সে-ঘর নন্দের। সেখানে সে অত্যন্ত কাতর মুখ কাঁচুমাচু করিয়া থাকে। সেখানে বলা নাই, কওয়া নাই, অকস্মাৎ একদল অপরিচিত লোক হুড়মুড় করিয়া ঢুকিয়া পড়ে। তাহাদের কাহারও কাহারও মাথায় পাগ্‌ড়ি, হাতে লাঠি।...বালিগঞ্জ ষ্টেশনে ক্লান্ত দেহ এবং ভারাক্রান্ত মন লইয়া বসিয়া ছিল, একটি হ্যাট্‌বুট্‌-সমাবৃত মনুষ্য তাহার দিকে তির্য্যক্ দৃষ্টিপাত করিয়াছিল বলিয়া সে কেমন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা মনে পড়িল। যেন যে-বেঞ্চিটাতে সে বসিয়াছে সেখানে বসিবার সত্যসত্যই তাহার কোনও অধিকার নাই। এখনই ঘাড়ে ধরিয়া তাহাকে কেহ উঠাইয়া দিতে পারে, হয়ত উঠাইয়া দিবে। নিজের সেই কাপুরুষতার লজ্জা ভুলিতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে ক্লাবের পথ ধরিয়াছিল। এখনও আবার সেই চিন্তা হইতে মনটাকে সে জোর করিয়া ঐন্দ্রিলার দিকে ফিরাইয়া লইল।

ঐন্দ্রিলা কহিল, "কিন্তু শাস্তিভোগও ত আমাদের কম হয়নি, কবে আমাদের চোখ ফুটবে? আরও আঘাত কি এদেশের গায়ে সইবে?"

অজয় এবার সত্য কথাই কহিল, "জানি না, ভাবতে চেষ্টা করিনি কখনও।...আমিও ত এই দেশেরই মানুষ? আমারও বুদ্ধির জড়তা কম নয়।"

কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই তাহার সমস্ত অন্তর বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনার মূল্যে যাহাকে সে আপনার করিয়া পাইতে লোভ করে, তাহার সম্মুখে বসিয়া নিজের এই নিদারুণ অক্ষমতাকে সে স্বীকার করিতেছে কোন্ লজ্জায়? উচ্ছ্বসিত আবেগে কণ্ঠ ভরিয়া কহিল, "তবে আমার মত ক'রে এই সমস্যাকে আমি ভাবতে চেষ্টা কর্‌ছি। আমি ব'সে নেই। আমি বুঝতে চেষ্টা কর্‌ছি, এই-সমস্ত কৃত্রিমতার মূল কোন্‌খানে। দেশের লুপ্তপ্রায় ইতিহাসের মধ্যে কতদিকে কতদূর অবধি আমাদের এই দুর্ভাগ্যের শিকড় চ'লে গিয়েছে, আপ্রাণ চেষ্টায় দিনের পর দিন আমি তার সন্ধান কর্‌ছি। আমার আশা আছে, এমনি ক'রে অনেক হারানো সুতো আমি খুঁজে পাব। দেশের মনের সবক'টা দরজা একটার পর একটা কেমন ক'রে বন্ধ হয়েছে, কবে বন্ধ হয়েছে, কেন বন্ধ হয়েছে, একদিন তা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে।...এক-এক সময় মনে হয়, সবক'টা দরজা প্রায় একই সময়ে একই কারণে একসঙ্গেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। চকিতের মত সুদূর অতীতের সেই মহা দুর্দ্দৈব আমার মনের উপর ছায়াপাত ক'রে চ'লে যায়, তাকে ধর্‌তে পারিনে। আমি নিশ্চয় জানি, যদি ক্লান্ত হয়ে না পড়ি, যদি আমার বুদ্ধিবিকৃতি না ঘটে, একদিন না একদিন তাকে ধর্‌তে পার্‌বই।" বলিতে বলিতে অজয়ের দেহ শিহরিত হইল। এই কথাটাকে এমন করিয়া সে ত আগে কখনও ভাবে নাই, নিজেকে আজ হঠাৎ কাহার যাদুমন্ত্রে সে এমন নিবিড় করিয়া আবিষ্কার করিল। তাহার সম্মুখে এই ত

কর্মক্ষেত্র খোলা রহিয়াছে। নিজেকে প্রকাশ করিয়া নিজেকে পাইবার পথ। ইহারই সন্ধান কি এতদিন এত ব্যাকুল আগ্রহে সে করিয়াছে?

শুনিতে শুনিতে সেদিনের মত ঐন্দ্রিলারও গায়ে কাঁটা দিল। সে ভাবিতে লাগিল, ঐ ত ঐটুকু দেহ, গদি-মোড়া চেয়ারটাতে বসিতে গিয়া যেন ডুবিয়া গিয়াছে। ইহার কণ্ঠস্বরে এত জোর কোথা হইতে আসে কে জানে?

এমনই করিয়া অনেক কথা বলা হইল, অনেক আবেগ প্রকাশ পাইল, অথচ শুভমুহূর্ত্ত আসিয়া বহিয়া গেল, অজয় কিছুতেই সহজ চিন্তা, সহজ কথার সূত্র ধরিয়া ঐন্দ্রিলার মনের সঙ্গে সহজ পরিচয়ের যোগ স্থাপন করিতে পারিল না। কিন্তু তাহা লইয়া অজয়ের মনে আজ কোনও ক্ষোভ নাই। সে আজ এমন কিছু পাইয়াছে যাহার মূল্য আজ এই মুহূর্ত্তে পৃথিবীর আর সবকিছু হইতে তাহার কাছে বেশী। ঐন্দ্রিলা হইতেও কি বেশী? কে সে-কথার উত্তর দিবে?

বীণা ইহার মধ্যে আর অজয়ের খোঁজ লইবার অবকাশ পায় নাই। অজয়ের জন্য একটি বিশেষ ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া, হেমবালার খাবার উপরে পাঠাইয়া, হৃষীকেশের খাবার তাঁহার মহলে পৌঁছাইয়া দিয়া হাতমুখ ধুইয়া সে ফিট্‌ফাট্ হইয়া আসিল। বলিল, "চলুন।"

সকলে মিলিয়া খাইবার ঘরে গেল। দেখা গেল, চা খাওয়া নয়, পুরাদস্তুর খাওয়ার আয়োজন হইয়াছে। রাহু পূর্ব্ব হইতেই টেবিলের এক দূরপ্রান্তে একটি প্লেট্ উল্টাইয়া লইয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছে।

বাড়ী ফিরিবার পথে বীণাদের আর্ম্মিন্ সেডানের অন্ধকারে আলস্যে ও আরামে একাকী দেহ এলাইয়া বসিয়া অজয় ভাবিতেছিল, এই ঐন্দ্রিলা মেয়েটির মনের মধ্যে কি আছে তাহা কোনওদিনই কি সে বুঝিয়া উঠিতে পারিবে? চকিতে তাহার চোখের মধ্যে কোন্ চিরপরিচয়ের দীপ্তি সে দেখিতে পায়, তাহার বহু জন্মান্তরের বিস্মৃতির পাষাণস্তূপ ভেদ করিয়া সেই আলো তাহার নিভৃততম অস্তিত্বকে সূক্ষ্ম উজ্জ্বল করিয়া তোলে, কিন্তু ঐন্দ্রিলার মনের মধ্যে তাহার দৃষ্টির আলোককে সে এতটুকু দূর অবধিও লইয়া যাইতে পারে না।

ঐন্দ্রিলা ছবি আঁকে, কিন্তু সৌন্দর্য্য কখনও কি তাহাকে মুগ্ধ করে, প্রলুব্ধ করে? স্তব্ধ জ্যোৎস্নারাতে তাহার মন কখনও কি উদাস হইয়া দূরদিগন্তের স্বপ্নলোকে ভাসিয়া বেড়ায়? অকারণের নামহীন বেদনায় মেঘান্ধকার বর্ষার দিনে তাহারও হৃদয় কি থাকিয়া থাকিয়া ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে?

তাহার তেজো-দর্পিত মুখের দিকে চাহিয়া কিছু বুঝিবার উপায় নাই। সে ঐশ্বর্য্যবতী, একথা তাহার দুইটি চোখের দূর-নিহিত দৃষ্টিতে, তাহার চিবুকের গর্ব্বিত দৃঢ় ভঙ্গীতে, তাহার ওষ্ঠাধরের বিশেষ একপ্রকার কুঞ্চনে অতি সহজে ধরা পড়ে। সে শুধু পার্থিব সম্পদ্ নহে, অন্তরের কোন্ গূঢ় ঐশ্বর্য্যে সে চির-ঐশ্বর্য্যবতী। তাহার কোনও অভাব নাই, কোনও বেদনা নাই, পৃথিবীর কাহারও নিকট হইতে তাহার কোনও প্রত্যাশা নাই। সে আপনাতে-আপনি পরিপূর্ণ, দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত।

তবু অজয় মনে মনে তাহার আজিকার নানা ব্যবহারের মধ্যে আশান্বিত হৃদয়ে কোথাও এতটুকু একটু ফাঁকের সন্ধান করিতে লাগিল। ঐন্দ্রিলা যে প্রথমে কিছুক্ষণ স্বভাবিক-ভাবে অজয়ের সঙ্গে কথা বলিতে পারে নাই, ইহা কি শুধু অপরিচয়জনিত কুণ্ঠা, না তাহা-অপেক্ষা বেশী আর-কিছু? তাহার পর যেমন করিয়াই হউক, বাক্যালাপ বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু খাইবার টেবিলে বসিয়া অবধি ছোটখাট দুটি-একটির বেশী কথা আর সে বলে নাই। বীণার হাসি-পরিহাস উদ্দাম স্রোতে তাহার নীরবতাকে অগ্রাহ্য করিয়া বহিয়াছে, সে-স্রোত তাহাকেও স্পর্শ করিয়া গিয়াছে, দু-একটি তরঙ্গ তাহাকে আঘাতও করিয়া গিয়াছে, তবু সে বিচলিত হয় নাই। অজয় নানা গভীর বিষয়ের অবতারণা করিয়া কথা জমাইবার চেষ্টা দুই-একবার করিয়াছিল, কিন্তু ঐন্দ্রিলার অবিটুট নীরবতা কোনও প্রসঙ্গকে জমাট বাঁধিতে দেয় নাই, কেবল বীণার অহেতুক কলহাস্য বিনা অবলম্বনেও সমান মুখর হইয়া জমিয়াছে।

আহার শেষ করিয়া তাহারা যখন বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিল, রাত তখন সাড়ে-নয়টার কম হইবে না। ইহার বেশী দেরী করা উচিত নহে মনে করিয়া অজয় বিদায় লইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু বীণা তাহাকে ছাড়িল না, বলিল, "কি সুন্দর জ্যোৎস্না দেখুন, আকাশটাকে কে যেন দুধ দিয়ে ধুয়ে দিয়েছে। আমার রোজ ইচ্ছে করে, এই সময়টাতে ঐ মাঠের মাঝখান দিয়ে একটানা যতদূর দু-চোখ যায় চ'লে যাই, কিন্তু একলা যেতে ভরসা হয় না। রাহুকে সঙ্গে নেওয়া যায়, কিন্তু সে সঙ্গে থাকা-না-থাকা সমান কথা। আর কেউ আসেও না এ-বাড়ীতে। যদি বেড়াতে নিয়ে যান ত আমরা যাই, কি বলিস্ ইলু?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "তোমার সব সৃষ্টিছাড়া সখ বাপু।"

বীণা বলিল, "তুমিই ত রোজ বল, আজ হঠাৎ এমন সাধু কেন সাজ্‌ছ?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "ভদ্রলোককে খাইয়ে-দাইয়ে এই রাত্রে এখন মাঠে মাঠে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াবে?"

অজয় তাড়াতাড়ি বলিল, "তাতে আমার কিছু কষ্ট হবে না, আপনাদের যদি না হয়। চলুন না, না-হয় বেশীদূর যাব না। সত্যিই ভারি সুন্দর রাতটি, আপনার ছবি আঁকার ঢের inspiration পেতে পার্‌বেন।"

ঐন্দ্রিলা মনে মনে অত্যন্ত ইতস্ততঃ করিতেছিল, কিন্তু আজই সন্ধ্যায় এই মানুষটির সম্পর্কে একবার অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ সে করিয়াছে, এখনই আবার তাহাকে কোনও কারণে ক্ষুণ্ণ করিতে তাহার মন চাহিল না। বলিল, "আচ্ছা, চলুন। রাহু-সর্দ্দারকেও সঙ্গে নেওয়া যাক্, নয়ত ও যা ছেলে, ভাববে, আবার আমরা তাকে ফাঁকি দিয়ে কোনো হোটেলে খানা খেতে গিয়েছি।" তাহার এইটুকু সাবধানতা অবলম্বনের চেষ্টা অজয়কে আজ খুশীই করিল।

মেয়েরা শাল জড়াইল, রাহু একটা আলষ্টার চাপা দিয়া তাহার বেতের ছড়িটা হাতে করিয়া আসিল। হেমবালা দু-তলার সিঁড়িতে ঐন্দ্রিলার পথরোধ করিলেন, কহিলেন, "এতরাত্রে কোথায় চলেছিস্?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "বেড়াতে।"

হেমবালা একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া কহিলেন, "তোদের কি মাথা খারাপ হয়েছে?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "যদি হয়েও থাকে, শীতের হাওয়ায় বাইরে বেড়ালে উপকারই হবে।"

"যা-খুসি কর্ বাছা" বলিয়া হেমবালা তাড়াতাড়ি তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে দরজার খিল লাগাইয়া দিলেন। মন্দিরা চমকিয়া জাগিয়া "মা" বলিয়া একবার কাঁদিল শোনা গেল।

চার জনে মাঠের পথে বাহির হইল। নগরোপান্তের নির্ধূম নির্ম্মল নৈশ আকাশ প্লাবিত করিয়া জ্যোৎস্না-স্রোত বহিতেছে। মাঠের মধ্যেকার বাঁধান পথ ধূলি-হীন, শিশিরসিক্ত। দুই পাশের তরুরাজি সেই জ্যোৎস্নাময় স্তব্ধতায় দূর বসন্তের পুষ্পভারাক্রান্ত ঐশ্বর্য্যের স্বপ্ন দেখিতেছে। প্রথমে সকলে পাশাপাশি চলিতেছিল, কিন্তু বীণার সঙ্গে অজয়ের গল্প জমিয়া উঠিবার পর দেখা গেল, ঐন্দ্রিলা ও রাহু বার বার দু-এক পা করিয়া পিছাইয়া পড়িতেছে। বীণার সেদিকে লক্ষ্য ছিল না, কিন্তু অজয় মাঝে মাঝে থামিয়া তাহাদের সঙ্গে জুটাইয়া লইতেছিল।

রাহুর নিতান্তই কথা বলিবার সঙ্গীর অভাব না হয় ঐন্দ্রিলার ইহা দেখা প্রয়োজন, বীণা অজয়কে এক মুহূর্ত্তের জন্য ছাড়িবে না, সুতরাং দলের মধ্যে ইহা সত্ত্বেও অতি সহজেই একটি শ্রেণীবিভাগ হইয়া গেল। ঐন্দ্রিলা সারাক্ষণ প্রায় দূরে দূরেই রহিল, তবু অজয়ের চিত্ত কিছু মাত্র ক্ষোভ মানিল না। এই মায়াভরা অপূর্ব্ব রাত্রিটিকে সে অন্তরের সমস্ত দ্বার খুলিয়া দিয়া অস্তিত্বের মধ্যে লইতে লাগিল। জ্যোৎস্নালোককে চিরকাল সে বাহিরে দেখিয়া আসিয়াছে, আজ এই দুইটি তরুণীর মাধুর্য্যময় তরুণ চিত্তের দোলা লাগিয়া জ্যোৎস্না-স্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। বাহির হইতে তীরের বন্ধন অতিক্রম করিয়া অজয়ের অন্তরের মধ্যে প্লাবন বেগে বহিতেছে। বিশ্বের সৌন্দর্য্যলোকে প্রতিদিন যে-উৎসব জমিয়া উঠে, এতকাল বাহিরে দাঁড়াইয়া অজয় তাহার কোলাহল শুনিয়াছে, ভিতর হইতে তাহার আহ্বান আসে নাই। আজ তাহার মনে হইল, সেই উৎসবক্ষেত্রের ভাষাহীন আমন্ত্রণ বহন করিয়া এই দুইটি তরুণী তাহাকে সেখানে লইতে

আসিয়াছে। তাহার আজিকার এই অনির্দ্দেশ-যাত্রা সৌন্দর্য্যলোকের একেবারে মর্ম্মস্থলে তীর্থযাত্রা। যাত্রা-পথে এত বেশী দেনা-পাওনার হিসাব করিয়া কি হইবে।

সে সত্যই উত্তেজিত হইয়াছিল। নারীজাতিকে এতকাল খুব বেশী দূর হইতে সে দেখিয়াছে। যতটুকু সম্ভ্রম সত্য সত্য তাহাদের পাওনা তাহার সহস্রগুণ বেশী তাহাদের সে দিয়াছে। বীণাকেও বহু জনসমাবেশের মধ্যে কাছে পাইয়াছে বলিয়া, মনের এতটা কাছে আর কখনও সে পায় নাই। আজ অকস্মাৎ ইহাদের এত কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়া আত্মীয়তার মাত্রা রক্ষা করা অনভিজ্ঞতা হেতু তাহার কঠিন হইয়া পড়িল। বীণা যখন তাহাকে বেড়াইতে লইয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছিল তখন ইহা ভাবে নাই যে, অজয় আদৌ রাজি হইবে। অজয় আগ্রহসহকারেই রাজি হইল দেখিয়া সেও অবাক্ হইয়াছিল কম নয়। নিজে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া নিজেই ইহার পর তাহা প্রত্যাহার করিতে তাহার ভাল লাগে নাই।

কিন্তু অজয়ের ব্যবহারে কোথাও কোনও অভব্যতা প্রকাশ পাইল না। ঐন্দ্রিলা বুঝিতেছিল, এই মানুষটির নিকট হইতে যাহাই পাওয়া যাইবে তাহা তাহার অন্তরের স্বাভাবিক আভিজাত্যের দ্বারা চিহ্নিত হইবে। যদি কোথাও লৌকিক ভব্যতার মাত্রা কিঞ্চিৎ সে অতিক্রম করে, তাহাতেও ক্ষতি নাই। ইহার সত্যনিষ্ঠ তেজোময় স্বভাবে এমন একটি জিনিষের প্রকাশ আছে, যাহা বৈঠক-খানার বাতির মত সলিতার নির্দ্দেশে আলো বিকীরণ করে না, যাহা সূর্য্যালোকের মত মুক্ত, স্বভাবের দ্যোতনায় পরিপূর্ণ। হইতে পারে মাঝে মাঝে মেঘ করিয়া আসে, এই আলোক ব্যাহত হয়। অব্যাহত বাতির আলো অপেক্ষা তবুও ইহা বড় জিনিষ।

চলিতে চলিতে হঠাৎ বীণা করতালি দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "গন্ধ পাচ্ছেন? চাঁপাফুল, চাঁপাফুল!"

সকলে চমকিয়া দাঁড়াইল। সত্যই নৈশ বাতাস কোন্ অজানা সৌরভের গভীর উন্মাদনায় ভারাতুর হইয়া আছে, জ্যোৎস্না যেন টলিয়া পড়িতেছে। সে গন্ধ শুধু মিষ্ট নয়, তীব্রও। ঈর্ষ্যাভরা, কামনাভরা প্রেমের জ্বালাময় মধুর স্পর্শের মত। "আপনারা এইখানে একটু দাঁড়ান্" বলিয়া অজয় ক্ষিপ্রগতিতে সেই গন্ধের উৎপত্তিস্থানের সন্ধানে প্রস্থান করিল।

পথের এক পাশে দূরে মাঠের মধ্যে একটুখানি উঁচু জমির উপর কয়েকটি পত্রপল্লবসমাচ্ছন্ন তরুর ঘন-সন্নিবেশ। নীচে আলোছায়া-বিচিত্র মসৃণ সবুজ তৃণাস্তরণ, তাহার উপর চাঁদের কণার মত কতকগুলি ফুল ঝরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। অজয় এ ফুল পূর্ব্বে আর কখনও দেখে নাই, এই ফুলের কি নাম তাহাও সে জানে না। তাড়া-তাড়ি নিজের রুমালটি লইয়া সে ঘাসের উপর বিছাইল তারপর গাছের একটি নীচু শাখাকে আরও নোয়াইয়া সপল্লব ফুলের গুচ্ছ ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া তাহার উপর রাখিতে লাগিল।

একটু পরে রাহু ছুটিয়া আসিল। ঝরিয়া-পড়া ফুল দু-হাতে কুড়াইয়া জামার পকেট ভর্ত্তি করিতে লাগিল। পথের দিকে চাহিয়া অজয় বুঝিল, বীণাও আসিবার জন্য উৎসুক হইয়া আছে, ঐন্দ্রিলাকে একাকী ফেলিয়া আসিতে হয় বলিয়া আসিতে পারিতেছে না। ঐন্দ্রিলার মনে তখন কি হইতেছিল, কে জানে?

ফিরিয়া গিয়া ফুলের ভাগ প্রথম বীণাকে দিল। বীণা এমন করিয়া ফুলগুলির প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহাকেই প্রথমে না-দেওয়াটা নিষ্ঠুরতা হইত। তারপর একমুহূর্ত্ত দুই চোখ মুদ্রিত করিয়া অন্তরের নীরব গভীর আরাধনা মিশাইয়া বাকী ফুল ঐন্দ্রিলার হাতে সে তুলিয়া দিল। তাহার একটি হাতে চকিতের মত ঐন্দ্রিলার একটি হাতের এতটুকু স্পর্শ সে লাভ করিল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, সুভদ্রের বাড়ীতে তাহার ঘরের এককতার মধ্যে ফিরিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত ঐ হাতটিতে আর-কিছু যেন সেদিন তাহাকে স্পর্শ করিতে না হয়।

ফিরিবার পথে ঐন্দ্রিলার নীরবতার বাঁধ অল্প একটু যেন খসিল মনে হইল। অজয় রাহুকে সারাক্ষণ নিজের পাশে ধরিয়া রাখিয়া ঐন্দ্রিলাকে আলাদা করিয়া দল গড়িবার সুযোগ দিল না। সকলে পাশাপাশি চলিল। জোর করিয়াই অজয় এবার প্রথমে কথা বলিল। কহিল, "আপনাকে ক্লাবে কেন দেখতে পাই নে?"

ঐন্দ্রিলা এ কথার কি উত্তর দিবে স্থির করিতে না

পারিয়া নীরব রহিল। কত কথাই ত বলা যায়, সবই কিছু আর ইহাকে বলা চলে না। যে কারণগুলি সত্যই বলিবার মত তাহার কোন্‌টা বলিলে এখনকার মত কাজ চলিতে পারে ?

বীণা বলিল, "আসল কারণটা আমি বলব ?"

বীণা কি বলিতে কি বলিয়া বিপদ্ বাধাইবে, এই ভয়ে তাহাকে বাধা দিয়া ঐন্দ্রিলা তাড়াতাড়ি কহিল, "আমিই না-হয় বলছি। কারণটা আমার কুড়েমি। রোজ কলেজে যেতে হয়, এইটেই আমার পক্ষে যথেষ্ট ক্লান্তিজনক ব্যাপার।"

অকাজের মাধুর্য্যে অজয়ের মন আজ কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, কহিল, "আমি হলে কলেজে না গিয়ে ক্লাবে যেতাম।

ঐন্দ্রিলা কহিল, "এবারে আপনি আমাকে সদুপদেশ দিচ্ছেন না।"

অজয় কহিল, "সম্ভবতঃ দিচ্ছি না। কলেজেও যে যেতে পারছেন, এইটেকেই আমাদের এখনকার মত যথেষ্ট মনে করা উচিত। সেখানে কি হচ্ছে-না-হচ্ছে তা নিয়ে সমালোচনা করবার সময় সত্যিই এখনও আসেনি।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "সমালোচনা কেন চলতে পারবে না ? খুব চলতে পারে। কলেজ ছেড়ে ক্লাবে যাওয়াটাই ত আর একমাত্র সমালোচনা নয়।"

বীণা কহিল, "আসল কথাটা হচ্ছে, সমালোচনাও চলতে পারে, ক্লাবে যাওয়াও চলতে পারে, কোনো অবস্থাতেই কলেজ ছাড়ার কথাটা অবান্তর।"

সকলে হাসিয়া উঠিল। অজয় আর অন্ততঃ এই বিষয় লইয়া তর্ক করিবে না স্থির করিয়া কথার স্রোতকে ইহার পর সহজ গতিতে বহিতে দিল।

বীণাদের বাড়ীর গাড়ীবারান্দার নীচে সিঁড়ির কাছে দুই বোনের নিকট নত হইয়া এবং খোকাকে কল্যকার নিমন্ত্রণের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া সে যখন বিদায় লইল, তখন তাহার সমস্ত হৃদয় মন হাসিতে, জ্যোৎস্নায়, সৌন্দর্য্য এবং সৌরভের তন্ময়তায় বিভোর হইয়া আছে। নন্দের ঘরের দরজাটা মনের মধ্যে বন্ধ হইয়াই রহিল। বাড়ী ফিরিয়া কাহারও খোঁজ সে করিল না, সোজা নিজের ঘরে গিয়া আলো নিবাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল।

দুই দিনের জমান ঘুম। সমস্ত দিনের উপবাস, পথশ্রম। চতুর্দ্দিক হইতে অন্ধকারের নাগপাশ নির্ম্মমভাবে জড়াইয়া আসে, তাহার সঙ্গে ক্লান্তমনে বিরামহীন মল্লযুদ্ধ। তারপর বিদ্যুত্তুজ্জল একটি অপরূপ সন্ধ্যা। রসনাতৃপ্তিকর অপর্য্যাপ্ত সুখাদ্য, সুপেয়। কলহাসি-মুখর, কঙ্কণ-ঝঙ্কৃত, আবেশ-ভঙ্গুর পরিপূর্ণ কয়েকটি মুহূর্ত্ত। জ্যোৎস্নাধৌত আকাশ, রহস্যময় তরুচ্ছায়া, অজানা ফুলের সুগন্ধ। অজয়ের দেহমনে কোথাও আর কিছু আজ ধরিতেছে না। একবার মাত্র গায়ের লেপটিকে আরও ভাল করিয়া জড়াইয়া দক্ষিণ করতল কপোলের নীচে স্থাপন করিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল, তারপর মুহূর্ত্তে নিদ্রার গহনতম তলে তলাইয়া গেল।

অকস্মাৎ এক সময় তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। কোথাও খট্ করিয়া একটা শব্দ হইল কি ? কি জানি, সে বলিতে পারে না। সুপ্তিমগ্ন নিস্তব্ধ রাত্রি। পশ্চিম দিক্‌কার বাতায়ন-পথে অস্তোন্মুখ পাণ্ডুর জ্যোৎস্না বিষণ্ণ মুখে উঁকি দিতেছে। বারান্দায় দেয়াল-ঘড়ির একটানা টিক্‌টিক্ শব্দ।

অজয় অত্যন্ত গভীর করিয়া অনুভব করিল, সে একাকী আছে। হয়ত সমস্ত বাড়ীটাতেই সে আজ একাকী। অকারণেই তাহার কেমন ভয়-ভয় করিতে লাগিল। বাড়ী আসিয়া বন্ধুদের খোঁজ করে নাই, হয়ত কোনও কারণে সকলেই তাহারা আজ বাহিরে রাত কাটাইতেছে। বাহির হইতে নন্দের একটু কাশির শব্দের জন্য সে উৎকর্ণ হইয়া রহিল। আশা করিতে লাগিল, নন্দের কাশির শব্দেই তাহার ঘুম ভাঙিয়াছে।

কেহ একজন কাশিল। নন্দ সচরাচর বারান্দার যেই কোনোটিতে ঘুমাইত সেখানে নয়, নীচে বাহিরের দরজার কাছে কিম্বা সিঁড়ির পথে ঠিক বোঝা গেল না। পর মুহূর্ত্তেই উচ্চকণ্ঠের বিকট চীৎকারের শব্দে নৈশ আকাশ বিদীর্ণ হইয়া গেল। আর্ত্তের চীৎকার নয়, ক্রন্দন শব্দও নয়। মনে হইল, দলপতি তাহার সেনাদলকে কুচ করাইতেছে।

ছুটিয়া গিয়া পূর্ব্বদিকের জানালাটা অজয় খুলিয়া দিল। নীচে ঝুঁকিয়া দেখিল, বাহিরের দরজার পথে তিনজন অপরিচিত লোক ধরাধরি করিয়া বিমানকে ভিতরে আনিতেছে। অজয়ের মেরুদণ্ড বহিয়া কেমন একটা শৈত্যের শিহরণ ধীরে তাহার মস্তিষ্কের দিকে উঠিতে লাগিল। রাত্রির বাতাস আজ কি অস্বাভাবিক রকম ঠাণ্ডা, না অজয় ভয় পাইয়াছে ?

হ্যাঁ, অজয় ভয় পাইয়াছে। তাহার দাঁতে দাঁতে ঠক্ ঠক্ করিয়া বাজিতেছে।

(ক্রমশঃ)

সংবাদপত্রে সেকালের কথা*

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠানে যে বাংলা দেশে অনুষ্ঠানকারী কাহার পুত্র, কাহার পৌত্র বা কাহার প্রপৌত্র ইত্যাদি সংবাদ না হইলে অনুষ্ঠান পণ্ড হইয়া যায়, নিতান্ত আশ্চর্য্যের ও পরিতাপের বিষয় এই যে, জাতিগত ভাবে সেই দেশই, কাহার প্রপৌত্র বা পৌত্র সে সংবাদ দূরে থাকুক, কাহার পুত্র তাহাই বিস্মৃত হইয়াছে; গত পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাসও যথাযথ স্মরণ নাই। রাজা রামমোহন রায় সর্ব্বপ্রথম বেলুনে চড়িয়াছিলেন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় রাণীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লার খনি আবিষ্কার করিয়া প্রভূত ধনসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এসকল কথাও যদি কেহ বলিয়া বসে, যে-নজিরের জোরে তাহাকে প্রতিবাদ করিতে পারি সে-নজির পর্য্যন্ত আমাদের ছিল না।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া দেশের ও জাতির ইতিহাসের সম্পূর্ণ বিস্মৃত পূরা একটি শতাব্দীর—ঠিক বিগত শতাব্দীর—মালমশলা সংগ্রহ করিয়া সেই ইতিহাসের একটি অধ্যায় লিখিবার কার্য্যে আত্মনিবেশ করিয়াছেন। তাঁহার কাজ এখনও শেষ হয় নাই কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার বিপুল অধ্যবসায়ের প্রমাণ লইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অর্থে "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। সমগ্র বাঙালী জাতির তরফ হইতে এই জন্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রবাবুকে ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহারা আমাদিগকে আমাদের ভুলিয়া-যাওয়া পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহদের খবর শুনাইতেছেন।

এই ধরণের পুস্তক প্রকাশ করিয়া লাভবান হইবেন না, ইহা জানিয়াও যাঁহারা এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাঁহাদিগের সদিচ্ছাকে নমস্কার করিতেই হইবে; নাম বা যশের প্রলোভনও ইহাতে যৎসামান্য। ভবিষ্যতে যাঁহারা এই পুস্তকের সাহায্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস লিখিতে বসিবেন ব্রজেন্দ্রবাবু কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত উপকরণগুলি তাঁহাদের এতই নিতান্ত আপনার মনে হইবে যে, ব্রজেন্দ্রবাবু হিসাব হইতে বাদ পড়িবেন। ট্রেনে বা ষ্টীমারে চাপিবার সময় আমরা কয়জনে ওই যন্ত্রগুলির আবিষ্কারকের কথা ভাবি? এই সকল নৈরাশ্যসূচক আশঙ্কা সত্ত্বেও ব্রজেন্দ্রবাবু যে পরিশ্রম করিয়াছেন ও করিতেছেন, এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাহা বাঙালীসুলভ নহে। দেখিয়াছি তিনি ব্যাধিগ্রস্ত দেহ লইয়া একখণ্ড 'সংবাদ প্রভাকর' বা 'সমাচার দর্পণ' দেখিবার লোভে বাঁশবেড়ে হইতে বহরমপুর এবং বহরমপুর হইতে বেলডাঙা ছুটাছুটি করিয়াছেন, স্বোপার্জ্জিত অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়া বিলাতের ইণ্ডিয়া অফিস হইতে রাজা রামমোহন রায়ের একখানি দরখাস্তের নকল আনিবার জন্য দরখাস্তের উপর দরখাস্ত করিয়া ক্লান্ত হন নাই; সামান্য একখানি ছবির জন্য কোনও পারিবারিক পাঠাগারে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে কৌশলী সেনাপতির মত কৌশলজাল বিস্তার করিতেও দ্বিধা করেন নাই। তাঁহার নিষ্ঠা ও একাগ্রতা, তাঁহার সাধনা, এমন কি তাঁহার একগুঁয়েমিও অতীব প্রশংসনীয়।

একথা কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ব্রজেন্দ্রবাবু যে-সকল মালমশলা সংগ্রহ করিতেছেন তাহা তো তাঁহার স্বীয় মস্তিষ্কপ্রসূত নয়, একত্রে একস্থানে না থাকিলেও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় এখানে-ওখানে তো সেগুলি আছেই—যাঁহার প্রয়োজন তিনি ইচ্ছা করিলেই সেগুলি ব্যবহার করিতে পারেন; ব্রজেন্দ্রবাবুর কৃতিত্ব তেমন বেশীটা কি? ইহার জবাব দিতে হইলে এখন পর্য্যন্ত যে-সকল পণ্ডিত ও গবেষকেরা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সাহিত্য, সমাজ বা রাষ্ট্রের ইতিহাস পুস্তকে, পুস্তিকায় বা প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, সেইগুলির উল্লেখ করিতে হয়। সে আলোচনা অনেকের পক্ষে অপ্রিয় হইবে। মোটামুটি এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই সকল গবেষকদলের দলে ডিগ্রিধারী বড় বড় পণ্ডিত আছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরাও আছেন, তৎসত্ত্বেও তাঁহাদের লিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধ ভ্রমপ্রমাদ, কল্পিত তথ্য ও বিকৃত সত্যে এমন ভাবে পরিপূর্ণ যে, মনে হয় তাঁহারা ইতিহাসকে সরল না করিয়া জটিল করিবারই সাধনা করিয়াছেন। নিতান্ত হাতের নাগালে যে উপকরণ ছিল তাহাও তাঁহারা ভাল করিয়া দেখেন নাই; অত্যন্ত আলস্যভরে পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে যাহা চোখে পড়িয়াছে তাহার বেশী কিছু তাঁহারা অনুসন্ধান করিবার পরিশ্রম স্বীকার করেন নাই। ব্রজেন্দ্রবাবুই প্রথম তন্ন তন্ন করিয়া যেখানে যত প্রাচীন সংবাদপত্র পাওয়া সম্ভব সবগুলি মিলাইয়া মিলাইয়া, কীটদষ্ট গলিতপ্রায় পুঁথি ঘাঁটিয়া ও নকল করিয়া সত্য ইতিহাসের সম্মুখীন হইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এই সাধনার প্রাপ্য বর ব্রজেন্দ্রবাবুর আরাধ্য দেবতা হয়ত তাঁহাকে দিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে নিজেদের ও ভবিষ্যৎ বংশীয়দের তরফ হইতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি। আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে আরও বুঝিয়াছি যে, ব্রজেন্দ্রবাবুর পরিশ্রমপ্রসূত গ্রন্থগুলির প্রচারে সাহায্য করা প্রত্যেক দেশহিতৈষীরই কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য সাধনের জন্য ব্রজেন্দ্রবাবুর পুস্তকের সামান্য পরিচয় দেওয়াও যুক্তিযুক্ত বোধে নিম্নে সেই পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতেছি। বিষয়বস্তু দেখিয়া যদি একজন বাঙালীরও এই পুস্তক সংগ্রহে প্রবৃত্তি জন্মে তাহা হইলেও নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

ভূমিকায়, পুরাতন বাংলা সংবাদপত্রের একটি নিখুঁত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনরীগণ (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহাদের স্মৃতি অমর হউক!) কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিবরণী ইহাতে আছে। ব্রজেন্দ্রবাবুর প্রথম খণ্ড "সেকালের কথা"র মালমশলা অধিকাংশই এই পত্রিকাটি হইতে গৃহীত। ব্রজেন্দ্রবাবু অপূর্ব্ব অধ্যবসায়ের সহিত স্তূপীকৃত সংবাদসমূহ

---

* শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত; সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাবলী—৮২। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১ম খণ্ড বাহির হইয়াছে, মূল্য ২৷৹ টাকা মাত্র।

হইতে বাছিয়া বাছিয়া বিষয় ভাগ করিয়া গ্রন্থমধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা ১৮১৮ সনের ২৩এ মে হইতে ১৮৩০ সনের এপ্রিল পর্য্যন্ত বিভিন্ন বিভাগে বাঙালীর কৃতিত্ব, গৌরব ও অগৌরবের ইতিহাস। গ্রন্থের বিষয়-বিভাগ এইরূপ—

১।	শিক্ষা	৩ হইতে ৪০ পৃষ্ঠা
২।	সাহিত্য	৪৩ হইতে ৭৮ পৃষ্ঠা
৩।	সমাজ	৮১ হইতে ১৩২ পৃষ্ঠা
৪।	ধর্ম্ম	১৩৫ হইতে ১৭৪ পৃষ্ঠা
৫।	বিবিধ	১৭৭ হইতে ১৯৪ পৃষ্ঠা

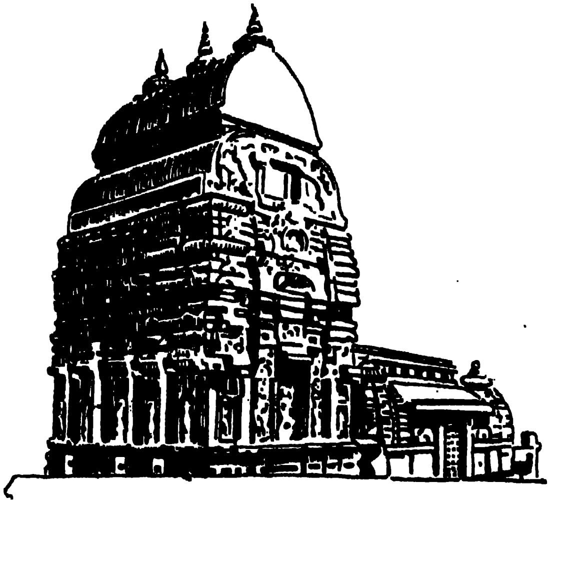
পরিশিষ্টে সমসাময়িক 'বঙ্গদূত' নামক একটি অতি দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা হইতে সেকালের কথা দেওয়া হইয়াছে। সূচীপত্রটিতে পুস্তকান্তর্গত ব্যক্তি ও বিষয় সম্বন্ধে কোথায় কি উল্লেখ আছে তাহা বিস্তারিত দেখানো হইয়াছে। দুইটি ত্রিবর্ণ চিত্র, শতবর্ষ পূর্ব্বের বাঙালী মেয়ে ও শতবর্ষ পূর্ব্বের বাঙালী সরকার।

বিভিন্ন বিভাগে কত ধরণের জ্ঞাতব্য বিষয় দেওয়া হইয়াছে তাহাও লক্ষ্য করিবার মত। শিক্ষা-বিভাগে—কলিকাতা স্কুল-বুক-সোসাইটি, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা মাদ্রাসা, হিন্দুকলেজ, লামার্ট্টিনিয়ের কলেজ ইত্যাদির বিবরণ, স্ত্রীশিক্ষা, চতুষ্পাঠী ও পণ্ডিতদের সম্বন্ধে বহুবিচিত্র তথ্য। সাহিত্য-বিভাগে—সাহিত্য ও ভাষার সংস্কার, নূতন পুস্তক ও সাময়িক পত্র সম্বন্ধে আলোচনা। সমাজ-বিভাগে—নৈতিক অবস্থা, আমোদ-প্রমোদ, জনহিতকর অনুষ্ঠান, অর্থনৈতিক অবস্থা, আইন-কানুন ও সম্ভ্রান্ত লোক সম্বন্ধীয় বহু সরস কথা। ধর্ম্ম-বিভাগে—পূজা-পার্ব্বণ, বিবাহ, সহমরণ, শ্রাদ্ধ, ধর্ম্মস্থান ও বিভিন্ন সম্প্রদায় সম্বন্ধে মন্তব্য উদ্ধৃত হইয়াছে এবং বিবিধ-বিভাগে—কলিকাতার রাস্তাঘাট, বিভিন্ন স্থানের ইতিবৃত্ত ও নানা কথা আছে।

মোটের উপর এরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে এই সকল ইতিহাস অন্যত্র পাইবার উপায় নাই। কাশীপ্রসাদ ঘোষ, প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস প্রভৃতি কে ছিলেন, বাংলার সাহিত্য ও সমাজ-জীবনে কাহার কোথায় স্থান, এই সকল লুপ্ত সংবাদ জানিবার উপায় ব্রজেন্দ্রবাবু করিয়াছেন। কবে বেগারদের ধরিয়া চালান দেওয়া হইয়াছিল, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র দেওয়ান বিজয়গোবিন্দ সিংহ বাবুজী কবে আটশত লোক সঙ্গে লইয়া বজরা ভাউলিয়া ও পিনিস ইত্যাদি আটাশখানা নৌকা সমভিব্যাহারে কাশী গয়া প্রয়াগ ও বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছিলেন, খিদিরপুর সেতু নির্ম্মাণ-কর্ম্ম কবে আরম্ভ হইয়াছিল—রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিভা কত দিকে কার্য্যকরী হইয়াছিল, এই সকলের সঠিক বিবরণ জানিতে হইলে ব্রজেন্দ্রবাবু সম্পাদিত পুস্তকের সাহায্য লওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। সদর ও মফঃস্বল, সাধারণ ও ব্যক্তিগত লাইব্রেরীগুলিতে মাথা ঠুকিয়া ঠুকিয়া এই সকল সংবাদ সংগ্রহের ধৈর্য্য অন্য দ্বিতীয় ব্যক্তির হইবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

পরিশেষে, আমাদের বক্তব্য এই যে, সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেখাদেখি অন্য দুই-একটি বিশ্ববিদ্যালয়েও বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস (বিশেষ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর) অবশ্যপাঠ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত যতগুলি পুস্তক পুস্তিকা ও প্রবন্ধ এ বিষয়ে দেখিয়াছি কোনটিই প্রামাণ্য নয়। অনেকগুলি পুস্তক পাঠ করিলে কিছু শেখা দূরে থাকুক ভুল শিখিবার আশঙ্কা আছে। ব্রজেন্দ্রবাবুর 'সেকালের কথা' এখন পর্য্যন্ত এ বিষয়ের প্রামাণ্য গ্রন্থ। তিনি নিজের কোনও থিওরী বা মতবাদ এই পুস্তকে দিবার প্রয়াস করেন নাই, কিন্তু উপকরণ দিয়াছেন প্রচুর ; এবং এই উপকরণ-গুলিকে ভিত্তি করিয়া সত্য ইতিহাস খাড়া করাও বিশেষ কঠিন নয়। অন্য যে-কোনও ইতিহাসই ছাত্রেরা পাঠ করুন, ব্রজেন্দ্রবাবুর পুস্তক-খানিকে বাদ দিলে তাঁহারা ভুল করিবেন। ইহার দ্বিতীয় খণ্ডটিও এইরূপ হইতেছে।

আর কিছু না পারি, একনিষ্ঠ সাধনা ও অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়কে যেন আমরা সম্মান করিতে পারি।



দেশ-বিদেশের কথা

ভারতবর্ষ

আর্য্যকন্যা-মহাবিদ্যালয়—

বড়োদার আর্য্যকন্যা মহাবিদ্যালয় সাত বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য সমাজ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে ইহার সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে মহাবিদ্যালয়ের কন্যাগণ কলিকাতায় আসিয়া তাঁহাদের ব্যায়ামচর্চার কৌশল দেখাইয়া



বিদ্যালয়ের খেলোয়াড়দের ক্যাপটেন্



লাঠি খেলায় বালিকাগণ



বিদ্যালয়ে উপনিবেশের বালিকাগণ



বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষা



বিদ্যালয়ে সেলাই শিক্ষা

গিয়াছেন। শান্তি-নিকেতনেও তাঁহারা গমন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের কসরৎ আদি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন।

আর্য্য কন্যা মহাবিদ্যালয়ের দুইটি বিভাগ আছে—স্কুল বিভাগ ও কলেজ বিভাগ। এখানকার শিক্ষা অবৈতনিক। ছাত্রী সংখ্যা ১৯০, ইহার মধ্যে ৪০ জন বিভিন্ন উপনিবেশ হইতে আগত। ছাত্রী-দিগকে বোর্ডিং-এ থাকিতে হয়। মাতৃভাষাই এখানকার শিক্ষার বাহন। সকল ছাত্রীকেই হিন্দী ও ইংরেজী শিখিতে হয়। সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কণ প্রভৃতি ললিতকলা বিদ্যালয়ের শিক্ষার অঙ্গ।

শারীরিক ব্যায়াম-চর্চ্চা ছাত্রীগণের একটি বিশেষ অনুশীলনের বিষয়। তাঁহারা ভারত-পরিক্রমায় বাহির হইয়া নানা স্থানে কৌশল দেখাইয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতেছেন।

প্রবাসী মহিলা সমিতি—

শ্রীযুক্তা প্রতিমা মিত্রের চেষ্টায় ১৯৩০ সনের আগষ্ট মাসে ৫০ জন বঙ্গ মহিলা লইয়া প্রবাসী মহিলা সমিতি গঠিত হয়। এখন ইহার সভ্য সংখ্যা ৮৫। সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য - দিল্লী ও সিমলা প্রবাসী বঙ্গমহিলাদের মধ্যে শিক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা ও ভাবের আদান-প্রদান এবং অর্থ ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া দুঃস্থ জনকে সাহায্য করা এবং ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে প্রবাসী বঙ্গমহিলাদের মধ্যে শাখা-সমিতি স্থাপন করা। দুইটি শাখা সমিতি ইতিমধ্যেই স্থাপিত হইয়াছে এবং সমিতির অন্যান্য উদ্দেশ্য অনুযায়ী কার্য্য করা হইতেছে। সমিতির অর্থে দুইটি পিতৃহীনা বালিকাকে বৎসরাধিক কাল স্কুলে পড়ান হইয়াছে। সমিতি মূখবধির স্কুলে এ যাবৎ ৭০৲ টাকা এবং এক দুঃস্থ পরিবারকে এক কালীন ১৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। শাখা সমিতি হইতে জল প্লাবনের দরুণ ২৬৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে। সমিতি দুই বৎসরে প্রায় ৮০৲ টাকা দানস্বরূপ পাইয়াছেন।

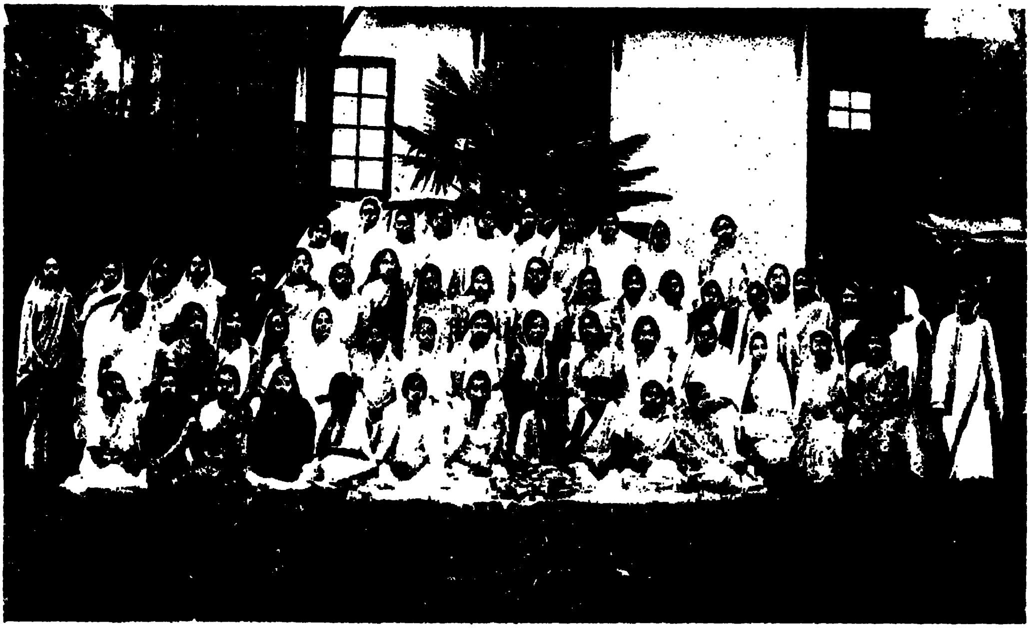
আমরা সমিতির উন্নতি কামনা করি।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন দশম অধিবেশন—

সম্মেলনের কার্য্যাধ্যক্ষ লিখিতেছেন—আগামী বড়দিনের অবকাশে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের দশম অধিবেশন এলাহাবাদে এংলো বেঙ্গলী ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে হইবে। অধিবেশনের দিন ১১ই, ১২ই ও ১৩ই পৌষ, ইংরাজী ২৬এ, ২৭এ ও ২৮এ ডিসেম্বর স্থির করা হইয়াছে।

"প্রবাসী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মূল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন। সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী শ্রীমতী অনুরূপা দেবী মহিলা সম্মেলনের সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিবেন।

শান্তিনিকেতনের পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী সাহিত্যশাখার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবীর দর্শন শাখার, রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ ইতিহাস শাখার, শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় রায় চৌধুরী শিল্পশাখার এবং অধ্যাপক ডাক্তার হরপ্রসাদ চৌধুরী বিজ্ঞানশাখার নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন।



প্রবাসী মহিলা সমিতির সভ্যাগণ

মাননীয় প্রধান বিচারপতি স্যর লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। উক্তসমিতি প্রতিনিধি-দিগের আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত স্থানীয় এংলো বেঙ্গলী ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে করিবেন। মহিলা প্রতিনিধিদিগের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইবে। প্রতিনিধিদিগের দেয় চাঁদা (১৬ হইতে ২০ বৎসরের ছাত্রদিগের জন্য ৩৲ তিন টাকা এবং অন্য সকলের জন্য ৫৲ টাকা) অভ্যর্থনা সমিতির কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীনলিনবিহারী মিত্র মহাশয়ের নিকট (৫ নং কোটাপার্চ্চা, এলাহাবাদ) পাঠাইতে হইবে।

প্রবন্ধাদি ৫ই পৌষ, ইংরাজী ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে অভ্যর্থনা

সমিতির কার্যাধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীকিরণচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের নিকট (১৭৮ নং কর্ণেলগঞ্জ এলাহাবাদ) পাঠাইতে হইবে।

অধিবেশনের সময় একটি শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইবে স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই বিষয়ক পত্রাদি ও শিল্প সামগ্রী অভ্যর্থনা সমিতির অন্যতম সহকারী কার্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট (মুকুলকুঠি, লুকারগঞ্জ, এলাহাবাদ) পাঠাইতে হইবে।

মহাযুদ্ধে ভারতের ব্যয়—

ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তরে প্রকাশ, ১৯৩২ সনের ১০ই সেপ্টেম্বরের প্রস্তাবানুসারে ইউরোপের যুদ্ধের নিমিত্ত ভারতে সংগৃহীত সৈন্যের নিমিত্ত ১৩,৬০০,০০০ পাউণ্ড ভারত সরকারের তহবিল হইতে খরচ হইয়াছে। ইহা ছাড়া ভারত যুদ্ধ বাবদ ১০০,০০০,০০০ পাউণ্ড প্রদান করিয়াছে।

ভারতবর্ষে সৈন্য পিছু ব্যয়—

ব্যবস্থা পরিষদে বক্তৃতায় প্রকাশ, ১৯০৮ সনের পূর্ব্বে ভারতের জন্য শিক্ষিত এবং ভারতের কাজে নিযুক্ত প্রত্যেক গোরা সৈন্যের জন্য ভারতকে ৭ পাউণ্ড ১০ শিলিং হিসাবে দিতে হইত। ১৯০৮ সনে এই ব্যয় বৃদ্ধি হইয়া ১১ পাউণ্ড ৮ শিলিং দাঁড়ায়। ইউরোপীয় যুদ্ধের পর এই ব্যয় বাবদ ২৮ পাউণ্ড ১০ শিলিং দাবী করা হয়।

— ত্রিস্রোতা

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের ত্যাগ—

সার পি-সি রায় নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বিশেষ বিষয়ের বক্তৃতা দেওয়ার পারিশ্রমিক দশ হাজার টাকা গ্রহণ করেন নাই বলিয়া প্রকাশ।

— স্বায়ত্ত-শাসন পত্রিকা

ভারতে খদ্দর বিক্রয়—

গত ৫ বৎসরে সমগ্র ভারতে মোট যত টাকার খদ্দর বিক্রয় হইয়াছে তাহার হিসাব—

১৯২৬—২৭	৩২৮৮৭৯৪, টাকা
১৯২৭—২৮	৩৩০৮৬৩৪, "
১৯২৮—২৯	৬৯৪৩০৭৭, "
১৯২৯—৩০	৮৬১৯৮৬৯, "
১৯৩০—৩১	৯০৯৪৯৩২, "

খদ্দর আন্দোলনের ফলে গত তিন বৎসরে কাটুনী ও তাঁতীগণ যে টাকা পাইয়াছে তাহার হিসাব—

	কাটুনী	তাঁতী
১৯২৮—২৯	৫২৭১২১,	৭৩৯১১৬,
১৯২৯—৩০	১১০২২৪৫,	১২২০৪৭৫,
১৯৩০—৩১	৭০৫৮৭১,	১১৪৯৬৭৯,

চাষীর ঋণ—

আসাম—২২ কোটি টাকা, বাংলা—১০০ কোটি, বিহার ও উড়িষ্যা—১৫৫ কোটি, বোম্বাই—৮১ কোটি, মধ্যপ্রদেশ—৩৬ কোটি, মাদ্রাজ—১৫০ কোটি, পাঞ্জাব—১৩৫ কোটি, যুক্তপ্রদেশ—১২৪ কোটি।

সাহিত্য ও সংবাদপত্র—

১৯৩০-৩১ সনের যে শাসন বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ঐ বৎসরের সাহিত্য ও সংবাদপত্র সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্য আছে :—

১৯৩০-৩১ সনে ৯৯০৩ খানা পুস্তক এবং ১৪৩১ খানা সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকের মধ্যে ৩৭৫৮ খানি নূতন, ১৪৩ খানি পুনর্মুদ্রণ বা অনুবাদ। শিক্ষাবিষয়ক পুস্তকের সংখ্যা ১০৭২।

আলোচ্য বর্ষে মোট ৬৬৩ খানা সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ২৩৩ খানি সংবাদপত্র এবং ৯৯৪ খানি সাময়িক পত্র। পূর্ব্ব বৎসর সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের সংখ্যা ছিল ৭৪৩। আলোচ্য বর্ষের সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের মধ্যে ১৩৪ খানি ইংরেজী, ৩৩৯ খানি বাংলা। এ বৎসর ২৬৬ খানি নূতন সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রকাশিত হইয়াছে এবং ২৬৬ খানি বন্ধ হইয়াছে।

—ত্রিস্রোতা

বাংলা

বাঙালীর কৃতিত্ব—

শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র সেন জার্ম্মানির ম্যুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এয়ারোপ্লেন সম্বন্ধে শিক্ষা করিতেছেন, এবং এ বিষয়ে দক্ষতার জন্য লণ্ডনের



শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন

রয়্যাল এরোনটিক্যাল সোসাইটির সহকারী সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সুরেশচন্দ্র ১৯৩০ সনে ফাণ্ডা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্রিফিথ প্রাইজ পাইয়াছেন।

বালিকাদের কৃতিত্ব—

স্কুল অব ফিজিক্যাল কালচারের উদ্যোগে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে রবিবার সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত নানারূপ ও কসরৎ

প্রদর্শিত হইয়াছে। কলিকাতার বহু ব্যায়াম সমিতি তাহাতে যোগদান করিয়াছিল। বড়োদার আর্য্যকন্যা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ ৭টার সময় তথায় উপস্থিত হইয়া নানারূপ ব্যায়াম প্রদর্শন করেন। বড়োদার বালিকাদের নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রশংসনীয় কিন্তু স্থানীয় বালিকাগণ ব্যায়ামের বৈচিত্র্যে অধিকতর দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমতী শিবকালী দেবী এক মণের অধিক ভার উত্তোলন করিয়াছেন। শ্রীমতী প্রভাবতী দেবীর লাঠি খেলা প্রশংসনীয়। খেয়ালী সঙ্ঘ ও অপরাপর বহু প্রতিষ্ঠান ক্রীড়ায় যোগদান করিয়াছিলেন। প্রফেসার ননীলাল বসু তরবারির খেলা প্রদর্শন করেন।

মিঃ জে-কে শীল উক্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছিলেন। ক্রীড়ার পর বরদার বালিকাগণকে একটি ক্ষুদ্র শিল্ড উপহার প্রদান করা হয়।

ঢাকা হাসপাতালে দান—

ঢাকার ধনি-ব্যবসায়ী রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার দাস স্থানীয় মিটফোর্ড হাসপাতালে একটি "মেটারনিটি ওয়ার্ডের" জন্য চল্লিশ হাজার টাকা এবং তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাস ঐ হাসপাতালে রক্তনিরাক্ষা পরীক্ষার ফি কমাইবার জন্য দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

—স্বায়ত্তশাসন পত্রিকা

খুলনা জেলা বোর্ড ও লোকাল বোর্ডের উদ্যম—

গত ২৫এ সেপ্টেম্বর খুলনা জেলা বোর্ডের একটি সভায় সাব্যস্ত হয় যে, খুলনা জেলা বোর্ড ও লোকাল বোর্ড যতটা সম্ভব স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিবেন এবং উক্ত বোর্ডের ব্যবহৃত সমস্ত কার্ড ও খামে "স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার কর" এইরূপ ছাপ থাকিবে।

বাংলা দেশের কথা, ১৯৩০-৩১ সালের সরকারী রিপোর্ট—

গবর্ণমেণ্টকে রাজস্ব প্রদান করে এরূপ এষ্টেটের সংখ্যা ১০১,১৬০ তন্মধ্যে ৯৩৭৭৮টী চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আমলের; ৪৪০২টি অস্থায়ী বন্দোবস্তের এবং ২৯৩০টি সরকার পরিচালিত। এই সকল এষ্টেট হইতে রাজস্বের পরিমাণ ৩,০১,৭৬,০৩৬৲ হইতে কিন্তু আদায় হইয়াছিল ২,৭৮,১৩,২৪৭৲ অর্থাৎ মোট দাবীর শতকরা ৮২·২৩ ভাগ আদায় হইয়াছিল।

নীলামের সংখ্যা ছিল ১৬,১২২ এবং সার্টিফিকেটের সংখ্যা ছিল ১,২৫,৫৫১।

অপরাধের সংখ্যা—

	১৯৩০	১৯২৯
পুলিশচালানী	৮৯,৬৮৫	৯১,৫৯৫
দাঙ্গা	১,৬০৮	৭৫৫
ডাকাতি	১,১০৩	৬৯৩
হত্যা	৬০১	৫০০

মোট ফৌজদারী মোকদ্দমার সংখ্যা

৩,২৫,৫১৪

দেওয়ানী মোকদ্দমার সংখ্যা—

৬,২২,১৮৪ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১৫,২৬২টি কম, ময়মনসিং জেলায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ৫১,২৮৭ মোকদ্দমা রজু হইয়াছিল। —ত্রিস্রোতা

ভুহালিয়ায় বিধবা বিবাহ—

শ্রীহট্টের ভুহালিয়ার জননায়ক শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত লোকনাথ দাস নায়েব মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে ভুহালিয়া পানাইল নিবাসী শ্রীমান্ মনমোহন দাসের সহিত শ্রীমতী বিনোদিনী দাসের শুভবিবাহ গত ১৬ই কার্ত্তিক বুধবার দিবস সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভুহালিয়ার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার মৌলবী দেওয়ান মোহাম্মদ আনচক চৌধুরী ও মৌলবী দেওয়ান রউফুর রজা চৌধুরী সাহেবান উক্ত ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ সহকারে উৎসাহ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। ভুহালিয়ার হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ শূদ্র, দাস, চন্দ্রবৈদ্য, মালী, পাটুনী, প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুরা বিবাহ আসরে যোগদান করিয়া বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের উচ্চবংশসম্ভূত শ্রীযুক্ত বাবু অতুলচন্দ্র গুপ্ত পুরকায়স্থ মহাশয় অকাতরে বিবাহের অধিকাংশ খরচ নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী সুনীতি গুপ্ত 'শিক্ষা' বিষয়ে অধ্যয়ন করিবার জন্য ১৯৩০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বিলাত গমন করেন। সেখানে লিড্‌স্ ইউনিভারসিটি হইতে পর বৎসর ডিপ্লোমা লাভ করেন। তিনি এই পরীক্ষায় "শিশুর মনস্তত্ত্ব" বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি অতঃপর 'শিশুর শিক্ষার প্রতি আগ্রহ' বিষয়ে গবেষণা করেন এবং গত জুন মাসে (১৯৩২) এম্-এড্ উপাধি লাভ করেন। এই উপাধির জন্য দুই বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে হয়। শ্রীমতী সুনীতি গুপ্তের কৃতিত্ব এই যে, তিনি এক বৎসরেই এই উপাধি লাভ করতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার এম-এড উপাধির 'থিসিস্' উচ্চদরের হইয়াছে বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'পি-এইচ-ডি'র জন্য 'থিসিস্' পেশ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাধ্যাপক এবং 'ব্রিটিশ জর্ন্যাল অফ্ সাইকলোজি' পত্রিকার সম্পাদক ভ্যালেণ্টাইন-মহাশয় শ্রীমতী সুনীতির এম্-এড্ উপাধির থিসিস্ পুস্তকাগারে ছাপিবার যোগ্য বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।



শ্রীমতী সুনীতি গুপ্ত

গুপ্ত-মহাশয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীত বিষয় ছাড়া আরও কতকগুলি বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। কালা বোবা ও অন্ধ বিদ্যালয়ে, শিশু-স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্রে শ্রমজীবী-বসতি অঞ্চলে এবং কারখানার বালিকাদের নৈশ সমিতিতে গমন করিয়া নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন।

শিশুসাহিত্যে সুরুচি

শ্রীসুখলতা রাও

শিশুসাহিত্যে সুরুচি সম্বন্ধে কিছুদিন হইল লিখিব লিখিব মনে করিতেছিলাম। 'প্রবাসী'তে শ্রদ্ধাস্পদা শ্রীযুক্তা কামিনী রায় মহাশয়া সুনীতি ও সুরুচি বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন শিশুপাঠ্য সচিত্র মাসিকপত্র ও ছোটদের উপযোগী বই খুব অল্পই ছিল, এবং সেগুলির ছবিও মোটা মোটা কাঠে খোদা ব্লক হইতে ছাপা। আজকাল ছোটদের জন্য কত সুন্দর সুন্দর রঙীন ছবিতে ভরা চমৎকার বাঁধাই রঙীন কাগজে ছাপা মাসিক পত্র, বার্ষিকী গল্পের বই প্রভৃতি বাহির হইতেছে। ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু শিশুমনকে আনন্দ ও শিক্ষা দিবার ভার যাঁহারা হাতে লইতেছেন, তাঁহাদের দায়িত্ব গভীর। শিশুসাহিত্যের ভিতর দিয়া শিশুর সরল মনে যে-ছবি, যে-শিক্ষা, যে আদর্শ পৌঁছায়, তাহা তাহার অজ্ঞাতসারে সেখানে নিজের ছাপ রাখিয়া যায়, এবং ভবিষ্যতে তাহার শিক্ষা দীক্ষা, এমন কি রুচির উপরে প্রভাব বিস্তার করে।

ভালমন্দ বাছিবার ক্ষমতা তাহার তখনও হয় নাই, যে-বই যে-ছবি তাহাকে আকৃষ্ট করে, সেই বই সেই ছবিই সে আগ্রহের সহিত দেখে ও পড়ে।

আধুনিক শিশুসাহিত্যে এমন কতকগুলি জিনিষ ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করিতেছে যাহা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। ভারতীয় রীতিতে আঁকা ছবি দেওয়া খুবই ভাল, কিন্তু অজন্টা চিত্রই একমাত্র ভারতীয় চিত্র নহে। রূপকথার রাজপুত্র রাজকন্যাদের সুসভ্য সুরুচিসঙ্গত সাজপোষাক হওয়া উচিত; তাহাতে তাঁহাদের সৌন্দর্য্যের বা মনোহারিণী শক্তির একটুও হানি হইবে না। এতদিন ত তাঁহারা ভারতীয় ঐতিহাসিক রমণীদের ঘাঘরা ও ওড়নায় সাজিয়া বা পৌরাণিক নারীদের সংযত শাড়ী পরিয়াই শিশুসাহিত্যের আসরে নামিয়া তাহাদের মুগ্ধ করিয়াছেন।

কেবল ছবি নয়, ছোটদের জন্য লিখিত বইয়ের বিষয়েও কোন কোন স্থানে রুচির অভাব দেখা যায়। সময়ে সময়ে এমন বিষয়ে গল্প লেখা হয় যাহা শিশু ছাড়িয়া বালক-বালিকা বা কিশোর-কিশোরীর পক্ষেও অনুপযুক্ত। আমাদের দেশের সেকালের রূপকথাগুলির একটি মস্ত দোষ এই যে, সৎমা বা সপত্নীর অসদ্ব্যবহার চিত্রিত না করিলে যেন সেগুলি সম্পূর্ণ হইত না। এই অসদ্ব্যবহারের ফলে দোষীকে যে হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়া পুঁতিয়া ফেলার নিষ্ঠুর শাস্তি ভোগ করিতে হইত, সেই শাস্তির কথা শুনিয়া অনেক কোমলমতি বালক-বালিকার প্রাণ যে শিহরিয়া উঠে, তাহা আমি জানি। 'বেশ হ'ল, যেমন কর্ম্ম তেম'ন ফল', এ কথায় তাহাদের মনে সায় দেয় না, দেওয়া বাঞ্ছনীয়ও নয়। বিদেশী রূপকথায় তেমনি গল্পের বিষয় সাধারণতঃ নায়ক-নায়িকার প্রেম ও তাহাদের বিবাহ। বিবাহ মানুষের জীবনের একটি প্রধান ব্যাপার, কিন্তু সেই কথাটি বালক-বালিকার মনে অকালে ঢুকাইয়া না দেওয়াই ভাল। লুকাইয়া দেখা করা প্রভৃতি বিষয়ও শিশুসাহিত্যে স্থান পাইতেছে এবং বাহবা পাইতেছে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। ছোটদের গল্পে যুবক-যুবতীর প্রেম অপেক্ষা পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, বন্ধুপ্রীতি, মাতৃস্নেহ, ভাইবোনের ভালবাসা, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি প্রেমের অন্য রূপই বড় করিয়া দেখান ভাল। রামায়ণ মহাভারতের গল্পে শিশুদিগকে এমন মোহিত করে কিসে? সীতা বা দ্রৌপদীর পতিভক্তির ছবি নয়; রাম লক্ষ্মণের পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম, সত্যনিষ্ঠা ও শৌর্য্য-বীর্য্যের কাহিনী, ভীম অর্জ্জুন প্রভৃতি পঞ্চভ্রাতার বীরত্বের চিত্র ও অপূর্ব্ব ঘটনা সকলের সমাবেশ।

শিশুসাহিত্যের ভাষার দিকেও নজর রাখা কর্ত্তব্য। কতকগুলি কথা যাহা উচ্চারণ করিলে 'গালি দেওয়া' হয়, যাহা নিজেদের সন্তানসন্ততির মুখে আমরা শু'নতে চাহি না, তাহা পুস্তকে ছাপার অক্ষরেও তাহাদের সম্মুখে ধরিতে চাহি না।

প্রবাসী সম্পাদকের একটি বক্তব্য। আমি এই উপলক্ষ্যে অন্য একটি কথা বলিতে চাই। অনেক শিশুপাঠ্য পুস্তকে ও মাসিক পত্রে এমন সব ভূতের গল্প ও ছবি থাকে, যাহাতে পাঠক-পাঠিকার ভয় পায়। ভূত আছে কি নাই, তাহার আলোচনা করিতে চাই না। কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়েদের মনে ভয়ের সঞ্চার হওয়া কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নয়। তাহাদিগকে ভীরু বানাইবার আয়োজনের অভাব এদেশে নাই। তাহার উপর আর একটা উপদ্রব বাড়ান কেবল অবাঞ্ছনীয় নহে, নিতান্ত গর্হিত। যদি ভূতের গল্প একান্তই কেউ দিতে চান, গল্প ও ছবি এমন দিবেন, যাহা দ্বারা ভূতগুলা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মত কিছু হয়। এই রকম ভূতের গল্প আমি একখানা ফরাসী বহির ইংরেজী অনুবাদে পড়িয়াছিলাম। দুঃখের বিষয় তাহার নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছি। ভূতকে হাস্যকর অকিঞ্চিৎকর কিছু করিয়া গল্প লিখিতেও আমি বলি না। কিন্তু সে রকম গল্প তবুও চলিতে পারে। আর সব রকম ভূতের গল্প ছেলেমেয়েদের বহি ও মাসিক পত্র হইতে বিদূরিত হওয়া উচিত।

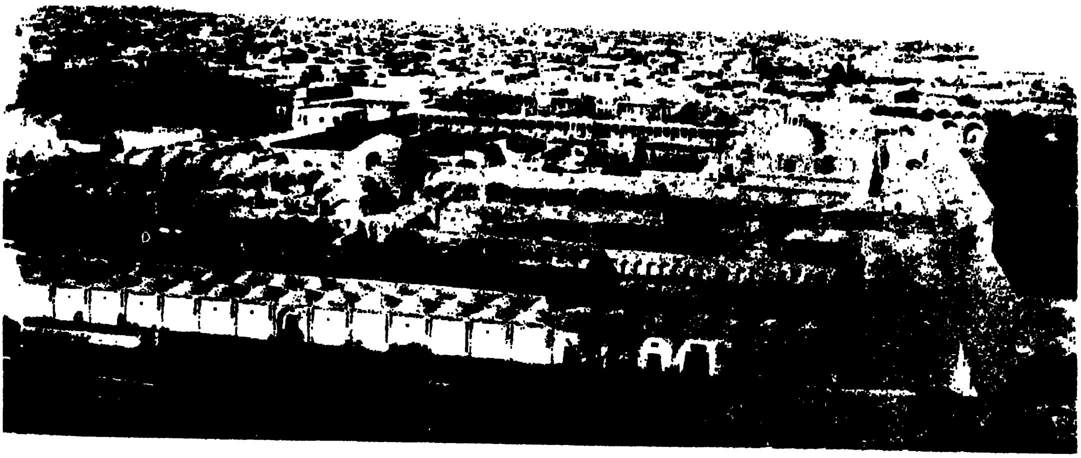
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

পারস্য-ভ্রমণ

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

শিল্প ও ললিতকলার ক্ষেত্রে মুস্লিম সভ্যতার দান এতই সুপরিচিত যে, তাহার বিশদ ব্যাখ্যার কোনই প্রয়োজন নাই। ভাস্কর্য্য ও ঐ জাতীয় দুই একটি বিশেষ অঙ্গ ভিন্ন অন্য সকলগুলিতেই মুস্লিম কৃষ্টির প্রভাব অনুভব করা যায়। বিশেষ স্থাপত্য ও স্থাপত্য অলঙ্কার, চিত্রাঙ্কন ও কলাশিল্পের ক্ষেত্রে মুস্লিম শিল্পপ্রতিভার বিকাশ ও উৎকর্ষ সুন্দরভাবে দেখা যায়। এই প্রতিভার মূলে বাইজান্টিয়াম, প্রাচীন অন্যান্য দেশে ঐ বিষয়ে মুস্লিম কীর্ত্তি যাহা-কিছু আছে সে সকলের মধ্যে পারস্যের প্রভাব ও শিক্ষা সর্ব্বতোভাবে বিরাজ করিতেছে। প্রাচীন ইরাণের গৌরবের যুগে তখনকার শিল্পীদের যে সৌন্দর্য্যস্পৃহা, রূপরসজ্ঞান ও সকল বিষয়ে সমতা ও সামঞ্জস্যের ভাব ছিল, বহু শতাব্দী পরের পারস্যের শিল্পীদের মধ্যেও তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের ঐ সকল গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

পারস্যের মুসলমান যুগের প্রথমে, দামস্কস ও বগদাদের



ইস্ফাহান। শহরের সাধারণ দৃশ্য

পারস্য, চীন ও ভারতবর্ষের প্রাচীন শিল্পকলার প্রেরণা সর্ব্বত্র থাকা সত্ত্বেও ইহা স্বীকার করা উচিত যে, মুস্লিম স্থপতি ও শিল্পী ঐ সকল কলার যথেষ্ট উন্নতি এবং অভিনব উৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছে।

এই সকল ললিতকলা ও কলাশিল্পের বিকাশ স্পেন, মিশর, পশ্চিম এসিয়া ও ইউরোপীয় তুর্কি, পারস্য ও ভারতবর্ষেই প্রধানত হয়। ইহার মধ্যে স্থাপত্য ও স্থাপত্য অলঙ্কারের নূতন নূতন পরিকল্পনা ও উপায় উদ্ভাবন—অর্থাৎ প্রাচীন শিক্ষার অভিনব প্রয়োগ—পারস্যে যত হইয়াছিল সেরূপ আর বোধ হয় কোথাও হয় নাই। আরব খলিফাদিগের আমলে (ওমায়য়দ, ৬৭০-৬৫০ খৃঃ, পরে আব্বাসিদদিগের আমলে নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত) ঐ দেশের পুনর্জ্জাগরণের আরম্ভ বিশেষ দেখা যায় নাই; ৮২০ খৃঃ পারস্যে আরব মুসলমান রাজত্বের পতন আরম্ভ হয়। ঐ সময় খোরাশানের পারসীক শাসনকর্ত্তা তাহির নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহার বংশকে উচ্ছেদ করিয়া সাফারিদ বংশের নৃপতিগণ পূর্ব্ব পারস্যে ৮৭২ হইতে প্রায় ৯০০ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাহারও পরে প্রথম নাসর্ সামানিদ বংশকে ঐ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশে নৃপতিদিগের রাজধানী বোখারায়



ইস্ফাহান। মসজিদ-ই-শাহ

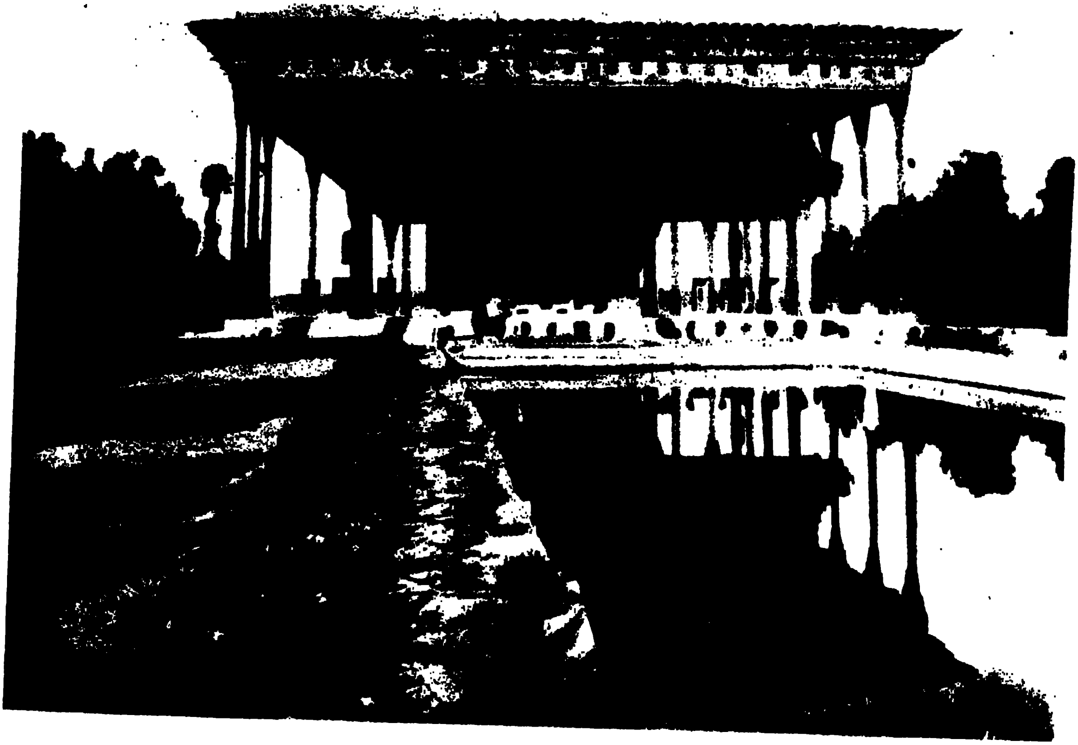


ইস্ফাহান। মস্‌জিদ-ই-শাহের ভিতরের লিওয়ানের খিলানের কারুকার্য্য ও অলঙ্কার

(ঐ অঞ্চল তখনও ইরাণের অন্তর্গত ছিল) ছিল। এই বংশের নৃপতিগণ (নাস্‌র্‌, ইস্মাইল, আহমদ্‌ নুহ্‌, আব্দল মালিক, মন্সর ইত্যাদি) প্রাচীন ইরাণের সভ্যতার ধারা বজায় রাখিবার বিশেষ চেষ্টা করেন এবং ইহাদের আমলেই পারস্যের কলাশিল্প সাহিত্য ইত্যাদির পুনর্জীবন লাভ হয়।

পূর্ব্ব পারস্যে সামানিদদিগের রাজত্ব কালে অন্য এক ইরাণী বংশ—বুয়িদ—পশ্চিম পারস্যে প্রভুত্ব স্থাপন করে এবং ৯৩৫ হইতে ১০৫৫ খৃঃ পর্য্যন্ত এই বংশের তিনটি শাখা ইরাক-ই-আরাবি, ইরাক-ই-আজামি এবং ফার্স প্রদেশে রাজত্ব করে। ৯৪৫ খৃষ্টাব্দে এই বংশের মুইজ-অল-দৌলা নামের এক প্রধান বগদাদে প্রবেশ করিয়া নিজেকে আমির-অল-উমারারূপে পশ্চিম ইরাণে নিযুক্ত করিতে তখনকার খলিফাকে বাধ্য করেন। সেই সময় হইতে ১০৫৫ খৃঃ পর্য্যন্ত ইহারাই রাজত্ব করেন, আব্বাসিদ খলিফাদিগের প্রভুত্ব নামমাত্রই ছিল। এই রাজকুলের রায়ই, হামাদান ও ইস্ফাহানের শাখার নৃপতিগণ দার্শনিক ইবন্‌সিনার (আভিসেনা) পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই বংশও পূর্ব্বাঞ্চলের সামানিদদিগেরই মং দেশের কলাশিল্প, সাহিত্য ইত্যাদির পোষণ ও পাল করিয়াছিলেন।

খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম ইরাণের এ দুইটি পারসীক রাজকুলই তুর্কীদের আক্রমণে উচ্ছেদ হয় মাহমুদ গজনভি নামক তুর্কী প্রধান প্রথমে সামানিদ



ইস্ফাহান। চাহিল সেতুন প্রাসাদ

দিগকে ধ্বংস করিয়া পরে বুয়িদদিগকে উচ্ছেদ করেন, পরে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া কিছু অংশ দখল করেন, বগদাদের খলিফা ইহাকে সুলতান উপাধি দান করেন। তুর্কী মুসলমানগণের মধ্যে ইনিই প্রথম ঐ উপাধি ধারণ করেন। এই সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত তুর্কী মুসলমান আরব-পারসীক কৃষ্টির উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফিরদৌসি, উনসুরি, মিনুচিহ্রি ইত্যাদি প্রসিদ্ধ কবি ইহারই দরবারে ছিলেন।

১০৪০ খ্রীঃ সেলজুক তুর্কী বংশ গজনভিদিগকে বিতাড়িত করিয়া পূর্ব্ব পারস্যের অধিপতি হন। ১০৫৫ খ্রীঃ সেলজুক তুগ্রিলবেগ বুয়িদদিগকেও উচ্ছেদ করিয়া বগদাদে খলিফার পাশে, সুলতান ও শাহিনশাহ্ উপাধি লইয়া বিরাজ করেন। দ্বিতীয় সেলজুক-সুলতান অল্প আরসলান বাইজান্টিয়দিগকে পরাজিত করিয়া সমস্ত আর্মেনিয়া দখল করেন। তাঁহার পরের নৃপতি মালিকশাহ ইরাণ, ইরাক, সিরিয়া এবং এসিয়া মাইনরের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন।

সেলজুকরা যদিও সুন্নি ছিলেন, তবুও তাঁহাদের রাজত্বে শিয়া-পারস্যে সভ্যতা ও কৃষ্টির উন্নতির প্রবাহ অপ্রতিহতই ছিল। বিশেষ করিয়া মালিকশাহের আমলে তাঁহার প্রসিদ্ধ উজির নিজাম-অল-মুল্কের চালনায় এই বিষয়ের বিশেষ উন্নতি হয়। এই নিজাম-অল-মুল্ক নিজে জ্ঞানী লোক ছিলেন এবং কবি উমর-ই-খইয়াম এবং দার্শনিক অল-গজালি দুজনই ইহার অনুগৃহীত ছিলেন।

সেলজুক বংশের শেষ নৃপতিগণের সময় অন্য তুর্ক ও মোঙ্গলজাতি সকলের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ চলে, শেষে ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে খিভার তুর্ক রাজা সেলজুকদের পরাজিত করিয়া ইরাণ দখল করেন। এই খিভার

বংশ ঐ সময় হইতে ১২২০ খৃঃ পর্য্যন্ত পারস্যে রাজত্ব করেন।

গজনবি সেলজুক ও খিভার খ্বারিজম্ বংশের তুর্ক নৃপতিদিগের সময় মুস্লিম পারস্যের কলাশিল্পের গৌরবের যুগের প্রারম্ভ। একদিকে সাহিত্যে ফির-দৌসি, ঘজালি উমর-ই খইয়াম, নিজামী, অন্ভার, সা'দী, জলাল-অল-দিন রুমী যেমন এই সময়ের মধ্যে পারস্যের গৌরব জগৎ-বিখ্যাত করেন, অন্যদিকে কলাশিল্পে বহু অজ্ঞাতনাম শিল্পী চিত্রে, আলেখ্যে, চীনা-মাটির পাত্রের অলঙ্কারে, পারস্যের প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন।



ইস্ফাহান। আলি কাপু প্রাসাদ

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জঙ্গিস খাঁর প্রচণ্ড আক্রমণে পারস্যের এই নূতন সভ্যতায় এক বিষম আঘাত লাগে। অসভ্য মোঙ্গল-বিজেতা—প্রায় অসভ্য গ্রীকবিজেতা আলেকজাণ্ডারের মতই—সমস্ত দেশে হত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংসের প্রলয়কাণ্ড চালান। প্রথমে দক্ষিণ-পশ্চিম



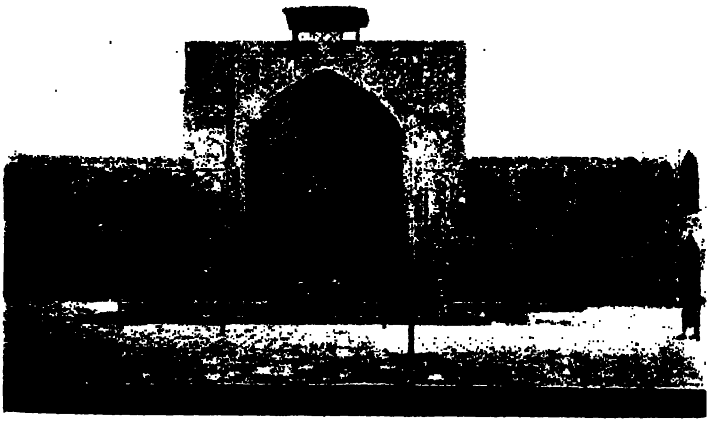
ইস্ফাহান। ময়দান-ই-শাহ্। বামে আলি কাপু প্রাসাদ

অঞ্চল ইহা হইতে রক্ষা পায়, কিন্তু জঙ্গিসের বংশধর হুলাগু খাঁ ১২৫৮ খ্রীঃ বগদাদ জয় করিয়া খলিফাকে হত্যা করিয়া পারস্যের অবশিষ্ট অংশটুকুও ধ্বংসের পথে আনেন। এই সকল মোঙ্গল নৃপতিদিগের প্রথম কয়জন, যথা জঙ্গিস খাঁ, হুলাগু খাঁ, অবাঘা ও অর্ঘুন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ইঁহাদের প্রথম কয়েকজন অসভ্য হিংস্র,-কিন্তু দুর্জ্জয় যোদ্ধামাত্র ছিলেন। সভ্যতা ও কৃষ্টির অনুপাতে বিজিত পারস্য ও আরব সাম্রাজ্য এই বৌদ্ধদিগের বহু ঊর্দ্ধে ছিল, কিন্তু ইঁহাদের তরবারির সম্মুখে ভুবনবিজয়ী ইসলামের তরবারিও খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যায়। তবু সভ্যতা ও কৃষ্টির গুণে পারস্য পুনর্ব্বার বিজেতাকেও জয় করে। এই মোঙ্গল বংশের (ইল-খাঁ বংশ) নৃপতিগণের মধ্যে যাঁহারা মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করেন যথা,—ঘাজান (১২৯৫-১৩০৫ খৃঃ) ওল্জাইতু (১৩০৪-১৬ খৃঃ)—তাঁহারা দেশের উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা ও উৎসাহ দান করেন। ইঁহাদের আমলেই স্থাপত্য অলঙ্কারে মিনাকারি ইট ও টালি আলেখ্যের প্রচুর ব্যবহারের সূত্রপাত হয়। স্থাপত্যের ক্ষেত্রে এইরূপ উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে পারসীক চিত্রশিল্পেরও অনেক উন্নতি এই ইল-খাঁ মোঙ্গল বংশের আমলে হয় এবং এই সময়ের চিত্রে চৈনিক প্রভাব বিশেষভাবে প্রকাশ পায়।

১৩৩৫ খৃঃ পারস্যে ইল-খাঁ বংশের প্রভুত্ব লোপ পাইয়া সমস্ত দেশ কয়েকটি সামন্ত রাজকুলের অধীনস্থ হয়। ইঁহাদের মধ্যে বগদাদের মোঙ্গল জালায়িরিদ বংশ (১৩৩৬-১৪১১), ইস্ফাহান ও ফার্সের আরব-পারসীক মুজাফারি (১৩১৩-৯৩), এবং হিরাটের আফঘান কর্ত্ত (১২৪৫-১৩৮৪) এই তিনটি বংশই প্রধান ছিল। কবি হাফিজ

মুজাফারিদ বংশের শাহ সুজা ও শাহ মন্সরের অনুগৃহীত ছিলেন।

খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষে পারস্যের উপর আবার প্রবল ঝড় বহিয়া যায়। জঙ্গিস খাঁর জ্ঞাতি বংশের সন্তান, তুর্কী মোঙ্গল (মুঘল্) সম্রাট তৈমুরলঙ্গ ১৩৮৩ হইতে ১৩৯৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সমস্ত পারস্য জয় করেন। পরে এই প্রবলপরাক্রান্ত বিজেতা রুশ দেশে মস্কো পর্য্যন্ত (১৩৯৬), ভারতবর্ষে দিল্লী পর্য্যন্ত (১৩৯৮) এবং এসিয়া মাইনরে আঙ্গোরা পর্য্যন্ত দিগ্বিজয় করেন। সকল ক্ষেত্রেই জয়ের সঙ্গে সঙ্গে লুণ্ঠন, ধ্বংস ও অমানুষিক অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড সমানে চলে। আরও আশ্চর্য্য এই যে, ইনি নিজে মুসলমান ছিলেন এবং যে-সব দেশে এইরূপ পশুবৃত্তির বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন সেগুলিও মুসলমানেরই দেশ। যদিও ইঁহার মধ্যে শিক্ষা বা জ্ঞানের অভাব ছিল না, তবু ইঁহার



ইস্ফাহান। মস্জিদ-ই-শাহের ভিতরের প্রাঙ্গণ

অত্যাচারে পারস্য দেশের সকল প্রকার শিল্পবাণিজ্য ইত্যাদি ধ্বংসপ্রায় হইয়া যায়। ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে তৈমুরের মৃত্যুর পর তাঁহার চতুর্থ পুত্র শাহরোখ ইরাণের অধীশ্বর হ'ন। তৈমুর সমরকন্দকে সমস্ত দেশের লুণ্ঠিত ধনে সজ্জিত করিয়াছিলেন। শাহরোখ সমরকন্দ ও হিরাটকে ললিতকলা, শিল্প ও সাহিত্যের লীলাভূমিতে পরিণত করেন এবং ইঁহার পরবর্ত্তী নৃপতিগণও (আবু সায়েদ ও হুসেন বাইকারা) এই রূপরসের ধারা সমান ভাবে প্রবাহিত করিয়া রাখেন। প্রসিদ্ধ চিত্রকর বিহ্‌জাদ এই



ইস্ফাহান। আলি কাপু প্রাসাদ ও মস্জিদ-ই-শাহ

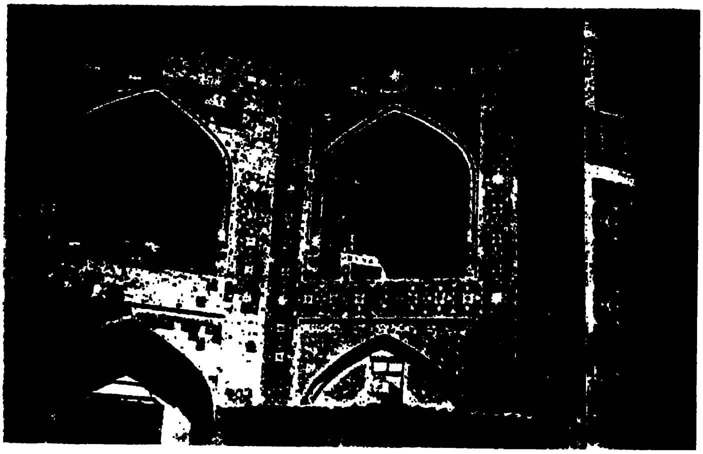
হুসেন বাইকারারই দরবারে ছিলেন। এই বংশের শেষ নৃপতি বাবর অন্য এক মোঙ্গল রাজা সম্মান শইবানি কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন (১৫০০-১৫০১)। পশ্চিম পারস্য ইতিপূর্ব্বেই তুর্কোমান "কারা কুয়ুনলু" ও "অক কুয়ুনলু" (কালো ভেড়া ও সাদা ভেড়া) নামক দুই জাতির দ্বারা বিজিত হয়।

মত ললিতকলা, শিল্প ও সাহিত্যের চর্চ্চা ও পোষণ করেন এবং এই দুই রাজকুলের আধিপত্যের সময় পারস্যে চিত্রাঙ্কণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুগ।

এতদিন পারস্যে বিদেশী তুর্কি ও মোঙ্গল রাজত্ব চলিতেছিল। কিন্তু উপরোক্ত বিবরণে দেখা যায় যে, পারস্যের নিজস্ব রূপরসজ্ঞান ও কৃষ্টি বিজেতার হস্তে বারংবার লাঞ্ছিত হওয়া সত্ত্বেও শেষে জয়ী হইতেছিল, পারসীক কৃষ্টির ধারা—সমান ভাবে না হইলেও—প্রবাহিত হইয়া নিজ পথে অগ্রসর হইতেছিল।

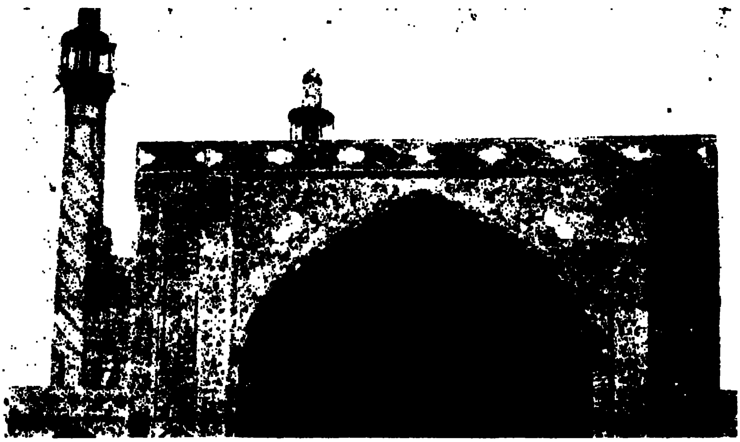
খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিশুদ্ধ পারসীক

কুলোদ্ভব সাফাবিদ বংশ উত্তর পারস্যের আজরবৈজানে, প্রথমে বিদেশীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়। ইঁহারা ধর্ম্মে পারসীকদিগের জাতীয় শিয়া শ্রেণীর মুসলমান ছিলেন, সুতরাং সমস্ত পারস্য ইঁহাদের পতাকার নীচে বিদেশী সুন্নিদিগের বিরুদ্ধে একত্র হইল। প্রথম সাফাবিদ শাহ্, প্রথম ইস্মাইল (১৫০৩-১৫২৪) আজরবৈজান, ইরাক-ই আজামী ও ফার্স অঞ্চল ১৫০২খৃঃ ও পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরে তুর্কোমান অক কুয়ুন-জাতির কবল হইতে উদ্ধার করেন এবং ১৫১০ খৃঃ মাভে শইবানিদিগকে যুদ্ধে ছত্রভঙ্গ করিয়া সমস্ত ইরাণ বিদেশীর প্রভুত্ব হইতে মুক্ত করেন। কিন্তু এই সময় হইতে সাফাবিদ বংশের রাজত্ব লোপ পর্য্যন্ত পশ্চিমে অটোমান তুর্ক এবং পূর্ব্বে উজবেগ তুর্কোমান শত্রুর সঙ্গে ইঁহাদের সমানে যুদ্ধ করিতে হয়। প্রথম ইস্মাইলের জীবনের শেষ অংশ এবং শাহ্ প্রথম তাহ্মস্পের সমস্ত জীবন এই যুদ্ধেই অতিবাহিত হয়, যদিও ইহা সত্ত্বেও শাহ্ তাহ্মস্প দেশের কলাশিল্প ইত্যাদি অনেক উন্নতি করিয়া যান।



ইস্ফাহান। মসজিদ-ই-শাহের ভিতর মিনাকারি টালির কারুকার্য্য

তাহার পর শাহ আব্বাস (প্রথম, ১৫৮৭-১৬২৯ খৃঃ) পারস্যের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হ'ন। এই মহান্ সম্রাট বাস্তবিকই ইরাণে পুনরায় স্বর্ণযুগ আনয়ন করেন। ইনি একদিকে সমরকুশলী অন্যদিকে বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা ও জ্ঞান ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে সম্রাটোচিত উৎসাহী ও দাতা ছিলেন। ইঁহার অধীনে পারসীক সৈন্য প্রথমে হিরাটে উজবেগদিগকে সম্পূর্ণ পরাজিত করে (১৫৯৭ খৃঃ) পরে অটোমান তুর্কদিগকে আজরবৈজান হইতে বিতাড়িত করিয়া (১৬০৬ খৃঃ) সর্ব্বশেষে তাহাদিগকে বগদাদ হইতেও তাড়াইয়া দেয় (১৬২৩ খৃঃ)। ইনি একদিকে ইউরোপীয় প্রথায় সৈন্যসামন্তকে যুদ্ধনিপুণ করেন এবং অন্যদিকে রাজধানী ইস্ফাহানকে সুন্দর সৌধপ্রাসাদ মসজিদ ইত্যাদিতে সুশোভিত করিয়া উহাকে কৃষ্টিজগতে সমুজ্জ্বল রত্নের ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ইঁহার পরের নৃপতিগণ—সফি (১৬২৯-৪২), দ্বিতীয় আব্বাস (১৬৪২-৬৭) এবং সুলেমান (১৬৬৭-৯৪)—যদিও উচ্ছৃঙ্খল ও অত্যাচারী ছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও ঐ বিষয়ে শাহ্ আব্বাসের পন্থাই



ইস্ফাহান। মসজিদ-ই-শাহের খিলানের কারুকার্য্য

মোটামুটি অনুসরণ করেন। ইঁহাদের সময়ে ইস্ফাহান ললিতকলায় শিল্পজগতের অন্যতম কেন্দ্ররূপে খ্যাতিলাভ করে। এই

বংশের শেষ নৃপতি সুলতান হুসেনের সময় (১৬৯৪-১৭২২) আফঘান প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া পারস্য আক্রমণ করিয়া ইস্ফাহান দখল ও বিধ্বস্ত করিয়া শাহকে রাজ্যচ্যুত করে। প্রধান সেনাপতি অফসর নাদির আফঘানদিগকে বিতাড়িত করিয়া নাদির শাহ্ নামে নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৭৩৬ খৃঃ)। ইঁহার রাজত্বকাল বিষম সংগ্রামেই অতিবাহিত হয়। যে সকল অভিযানে ইনি বিদেশের ধনরত্নে পারস্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করেন তাহার মধ্যে ভারতের দিল্লীজয়ই সর্ব্ব প্রধান। মুঘল সম্রাটের দুই চক্রান্তকারী মুসলমান অমাত্য ইঁহাকে ভারতে আহ্বান করে এবং তাহাদের সর্ব্বপ্রধান (নিজাম-উল-মুল্ক) অমাত্যের বিশ্বাসঘাতকতায়ই ইঁহার দিল্লীজয় অত সহজেই সম্ভব হয়।

নাদির শাহ্ বিদ্রোহী তুর্ক সর্দ্দারদিগের হস্তে নিহত হইবার পর পারস্যে আবার রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয় এবং সেই সময় হইতে এই অভাগা দেশের ক্রমেই সকলক্ষেত্রে অবনতি হইতে থাকে। মধ্যে করিম খাঁ জেন্দের শাসনকালে (১৭৫০-৭৯ খৃঃ) দেশে সাময়িক শান্তি ও সমৃদ্ধি আসে, কিন্তু তাহার পর তুর্কোমান কাজারদিগের আমল হইতে (১৭৯৪ খৃঃ) নানাপ্রকার যুদ্ধবিগ্রহ ও বিপ্লবে দেশে কৃষ্টির ধারা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া লোপ পাইবার উপক্রম হয়। কাজার বংশের কয়েকজন নৃপতি যথা,—ফাথ আলি শাহ্ ও নাসীর-উদ্দীন—দেশে পুনর্ব্বার সমৃদ্ধি ও শিল্পের প্রতিষ্ঠার বৃথা চেষ্টা করেন।

কাজারদিগের পর পুনর্ব্বার বিশুদ্ধ ইরাণী বংশ সিংহাসনে আসিয়াছে। এই নূতন রাজত্বে দেশের উন্নতির চেষ্টাও চলিতেছে, তাহা কৃতকার্য্য হইবে কি-না সে ভবিষ্যদ্বাণী করা অসম্ভব। তবে যদি হয় তবে তাহা প্রাচ্য-জগতের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

* * *

জয়ন্দেহ্ নদীর উপর, প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট উচ্চ অধিত্যকায়, ইস্ফাহান শহরের জীর্ণ কঙ্কাল এখনও সাফাবিদ বংশের আমলের স্মৃতি মনে আনিয়া দেয়। তখন ছিল ইস্ফাহান মধ্যাহ্নসূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, গৌরবময়, জগতের সকল নগরীর ঈর্ষার কারণ। এখন রহিয়াছে আফগান-তুর্ক লুণ্ঠিত, রাষ্ট্রবিপ্লবে বিধ্বস্ত, অস্তগত মহিমার ক্ষীণ আলো। খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিখ্যাত ইউরোপীয় পরিব্রাজক শার্দ্যাঁ ইস্ফাহানে বহুকাল যাপন করেন। তাঁহার বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, সে সময়



শাহ্ আব্বাস (সাফাবি)

ইস্ফাহানে ১৬২টি মসজিদ, ৪৮টি সাধারণের জন্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৮০০ কারবন সরাই ও ২৭৩টি হামাম ছিল। নদীর ওপারে শাহ্ আব্বাস প্রতিষ্ঠিত জুল্ফা সহরতলীতে ৩০০০০ আর্ম্মানী বাস করিত। খাস শহরে অন্ততপক্ষে ৬ লক্ষ এবং সম্ভবতঃ ১০ লক্ষ লোকের বাস ছিল। সহরের বিরাট বাজার, প্রশস্ত ময়দান, চেনার শোভিত সুন্দর চাহারবাগ রাজপথ এবং চাহিল সেতুন, হস্ত বেহেস্ত, আলিকাপু ইত্যাদি সুন্দর প্রাসাদ ইহাকে ইন্দ্রপুরীর মত শোভন ও সুন্দর করিয়াছিল। সহরের পরিধি ছিল প্রায় ২৪ মাইল।

এখন শহরে ৯০ হাজার লোকের বসতি এবং জুলফায় সাড়ে-তিন হাজার মাত্র। যেখানে অসংখ্য লোকের বসতি ছিল সেখানে এখন গমের ক্ষেত। তবে পঙ্কোদ্ধার অল্পে অল্পে আরম্ভ হইয়াছে, শহরের প্রসিদ্ধ কার্পেট, চীনা-



ইস্ফাহান। মাদ্রাসা চাহার বাব

মাটির টালি, রূপার কাজ, কাপড়ের উপর কলমকারী ইত্যাদি শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু দেশে অর্থের দারুণ অভাব এবং যা-কিছু রাজস্ব আমদানীর পথ আছে তাহার প্রায় সবই বিদেশীর বাধায় বন্ধ।

* * *

ইস্ফাহানে দ্রষ্টব্য অনেক জিনিষ আছে। সবগুলির বর্ণনা লেখকের পক্ষে সম্ভব নহে। তবে সহজে বলা চলে যে, মিনাকারী টালি-সংযোগে নানাবর্ণের জ্যামিতিক আলেখ্য, খিলান গম্বুজ মিনার ও প্রশস্ত আঙিনায় বিরাট সামঞ্জস্যের সৌম্য গাম্ভীর্য্য, ও স্থপতির কৌশল, জ্ঞান এবং অসাধারণ পরিকল্পনার ক্ষমতার পরিচয় ইস্ফাহানের মসজিদ, প্রাসাদ ও সেতু, সকলের মধ্যে যাহা পাওয়া যায় তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা দুরূহ।

ইস্ফাহানের মসজিদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মস্‌জিদ-ই-জামী। পোপের মতে ইহা খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত, তাহা না হইলেও ইহা ঠিক যে, ইহার কিছু অংশ মুহম্মদ ওলজয়তু (১৩১৪-১৩১৬) নির্ম্মাণ করাইয়া-



ইস্ফাহান। মস্‌জিদ শেখ লুৎফুল্লাহ্‌

ছিলেন, সুতরাং ইহা অন্ততঃপক্ষে ছয়শত বৎসর আগেকার। ইহার অবস্থা এখন অতিশয় জীর্ণ। প্রাকার, অলিন্দ, গম্বুজ, খিলান সকল অংশই ভাঙিয়া পড়িতেছে। কিন্তু ভিতরের খিলান-করা ছাদের ক্ষুদ্র খিলান ও দেওয়ালের স্তম্ভশ্রেণীর সজ্জা অতুলনীয়।

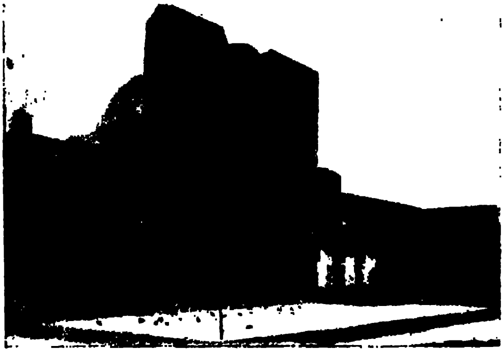
মস্‌জিদ-ই শাহ (১৬১২-১৩) শাহ আব্বাসের একটি কীর্ত্তি। ইহার বিরাট প্রাঙ্গন, চারিধারে চারটি অভ্রভেদী খিলান-করা তোরণ, সুন্দর গম্বুজ এবং মিনারের শ্রেণী—সমস্তই সর্ব্বাঙ্গ মিনার অলঙ্কারে শোভিত হইয়া আছে।

কিন্তু নানাবর্ণের শোভা শেখ লুৎফুল্লাহের মস্‌জিদের (১৬১৮) মিহ্‌রাবের লিওয়ানের চারিধারে যেমন সুন্দর ওরকম আর কোনটিতেই নাই। যদিও ইহা মালমশলা বা শিল্প চাতুর্য্যের হিসাবে অন্য অনেক মস্‌জিদ অপেক্ষা খেলো, কিন্তু সৌন্দর্য্যের হিসাবে ইহা শ্রেষ্ঠ।

প্রাসাদের মধ্যে চাহিল সেতুন (চল্লিশ স্তম্ভ), তাহার সুঠাম সুদীর্ঘ নানাবর্ণে রঞ্জিত স্তম্ভশ্রেণীতে শোভিত দরবার আয়তন, ভিতরে অমূল্য চিত্রে ভূষিত কক্ষশ্রেণী, এবং

সুন্দর বাগানের হিসাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অযত্নে ইহার বহু সম্পদ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও ইহা সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়।

অন্য প্রাসাদগুলির মধ্যে আলি কাপুর ভিতরের দেওয়ালের উপর কিংখাবের কাজের মত নক্সা এবং নানা প্রকার স্থাপত্য-অলঙ্কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।



ইস্ফাহান। মসজিদ-ই-জামি

চাহারবাঘ মাদ্রাসা (ধর্মশিক্ষা প্রতিষ্ঠান) হষ্ট বেহস্ত প্রাসাদ, বাজারের সম্মুখে বিরাট নাকাড়ার তোরণ, সকলই অতীতের গৌরব কীর্ত্তন করিতেছে।

বর্ত্তমানে ঐ সকল কীর্ত্তি ও স্মৃতিচিহ্নের রক্ষণাবেক্ষণের বিশেষ চেষ্টাই চলিতেছে। তবে সাফাবি নৃপতিগণের একশতের উপর ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রাসাদের এখন মাত্র চারটি অবশিষ্ট আছে। মসজিদগুলি যে শুধু ভাঙিয়াই গিয়াছে তাহা নহে, সেগুলির মিনাকারি টালির মধ্যে যে সকল রিজা আব্বাসি এবং অন্য প্রসিদ্ধ চিত্রকরের পরিকল্পনায় অঙ্কিত মূর্ত্তিসংযুক্ত চিত্রাবলী ছিল সে সকল অমূল্যধন ঐ সকল মসজিদের মোল্লার দল খুলিয়া ইউরোপীয়দিগকে বিক্রয় করিয়াছে।

অসভ্য আরব, মোঙ্গল, তুর্ক, তুর্কোমান, আফঘান ইত্যাদি একের পর এক আসিয়া এদেশের গৌরবময় প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংস করে, এবং আরও আশ্চর্য্য এই যে সর্ব্বাপেক্ষা হিংস্র ও লুব্ধ ব্যবহার যাহারা করিয়াছিল তাহারা সকলেই মুসলমান, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহারা মুসলমান-কীর্ত্তি বা মুসলমানের প্রাণ কোনটাই নষ্ট করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। তৈমুর ৭০০০০ নরমুণ্ড দিয়া ইস্ফাহানে জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। আফঘানেরা প্রায় ৫০০০০০ নিরীহ ইস্ফাহান প্রদেশবাসীকে হত্যা করে; কিন্তু এত আঘাত সত্ত্বেও আর্য্য ইরাণের অদম্য আত্মার প্রগতির পরিচয় এখনও পাওয়া যায়।



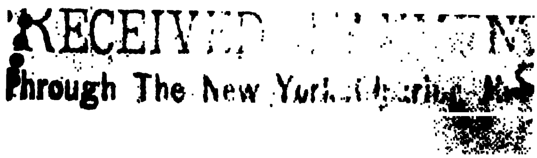
ইস্ফাহান। আলি কাপু প্রাসাদ

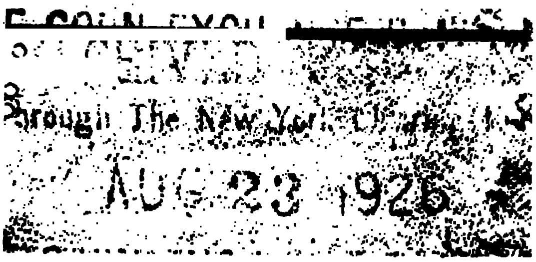
আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির সাহায্যে জাল দলিলপত্র ধরা—

চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হওয়ার দরুণ আজকাল অনেকেই আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির নাম শুনিয়াছেন। কিন্তু জাল দলিলপত্র ধরিবার জন্য এই রশ্মির ব্যবহার মাত্র অল্পদিন ধরিয়া সুরু হইয়াছে। এই উপায় আবিষ্কার হওয়াতে কোন দলিলের অংশবিশেষ উঠাইয়া নূতন লেখা বসান হইয়াছে কিনা তাহা নির্ণয় করা অতি সহজ হইয়া

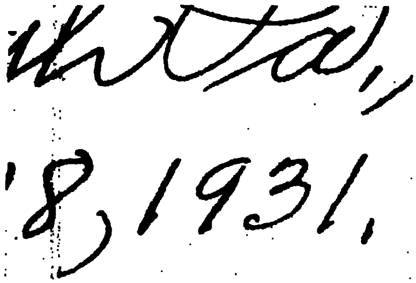


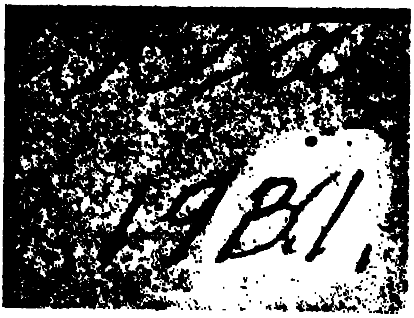
আলট্রা ভায়োলেট রশ্মির সাহায্যে জাল দলিলপত্র ধরিবার যন্ত্র। ডানদিকের যন্ত্রটির উপরের বাক্স হইতে আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি ফেলা হয়, নীচের খোপে দলিলটি থাকে।



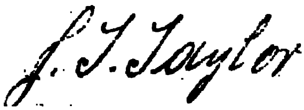


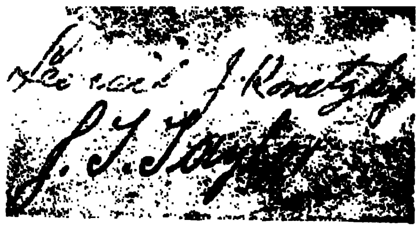
উপরে—দলিলটি খালি চোখে দেখিতে যেরূপ।
নীচে—উহার আলট্রা ভায়োলেট রশ্মির সাহায্যে গৃহীত ফটোগ্রাফ। ইহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, দলিলটিতে এক সময়ে আগষ্ট ২৩, ১৯২৬, এই তারিখের ষ্টাম্প ছিল; পরে ইহা তুলিয়া ফেলা হইয়াছে।





উপরে—একটি উইলের তারিখ—১৯৩১ সন।
নীচে—আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির সাহায্যে দেখা গেল পূর্ব্বে উহার তারিখ ছিল ১৯১৬ সন, পরে তুলিয়া ১৯৩১ করা হইয়াছে।

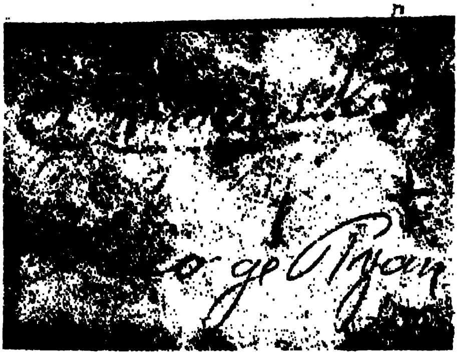




উপরে—একটি নোটের পিছনে মাত্র একটি দস্তখত।
নীচে—আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির সাহায্যে আর একটি দস্তখত বাহির হইয়া পড়িল।

গিয়াছে। কিন্তু সহজ বলিয়াই উহা যে কম আশ্চর্য্যের বিষয় তাহা নয়।

আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মি নিজে অদৃশ্য। কিন্তু উহা কতকগুলি বিশেষ বস্তুর উপর পড়িলে সেগুলি আগুনের মত জ্বলজ্বল করিতে থাকে। এই ব্যাপারটিকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় 'ফ্লুয়োরেসেন্স' বলে। এই 'ফ্লুয়োরেসেন্স'-এর কারণ বৈজ্ঞানিকেরা এখনও নিশ্চিতরূপে বাহির করিতে না পারিলেও উহার দ্বারা দুইটি বিষয় নিরূপণ করা যায়—প্রথমতঃ দুইটি বা অধিকতর বস্তু দেখিতে ঠিক এক রকম হইলেও একই উপাদানে গঠিত কিনা; দ্বিতীয়তঃ অনুবীক্ষণের দ্বারাও ধরা যায় না এরূপ কোন লেখা বা চিহ্ন কোথাও বর্ত্তমান আছে কি না। আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মি ফেলিলে সকল জিনিসের ফ্লুয়োরেসেন্স একই রং-এর বা সমান উজ্জ্বল হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ নানা জাতীয় কাগজের উল্লেখ করা যাইতে পারে। দুইটি কাগজের টুকরা দেখিতে ঠিক এক রকম হইলেও একই উপাদানে নির্ম্মিত কি না তাহা আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মি ফেলিলেই বোঝা যায়। আল্ট্রা-ভায়োলেট বাল্বের নীচে ন্যাকড়ার তৈরী কাগজকে সাদা দেখায়, কিন্তু কেমিকেল

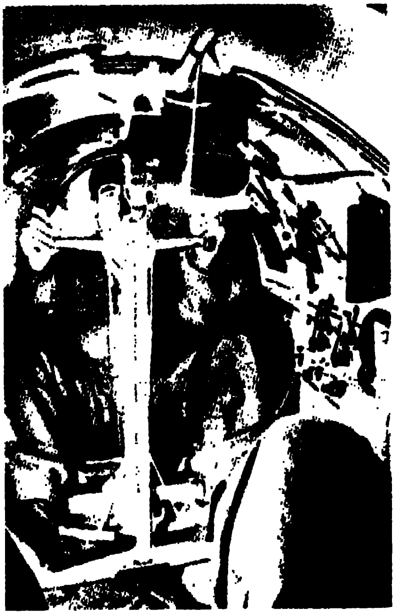


উপরে—একটি চেকের পিছনের দিক; কোন লেখা বা নাম দস্তখত দেখা যায় না।
নীচে—উহারই আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মির সাহায্যে গৃহীত ফটো; তিনটি নাম দস্তখত দেখা যাইতেছে।

উড্‌ পাল্প মিশানো কাগজকে ধূসর-মিশ্রিত কটা রং-এর দেখায়। আবার, পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল এমন কোন লেখা দলিল হইতে অতিযত্নে কোন আসিড বা ঔষধ দিয়া তুলিয়া ফেলিলেও আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মির নীচে উহা নূতন করিয়া দেখা দেয়। সুতরাং আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মি ফেলিয়া কোন দলিলের ফটোগ্রাফ লইলে উহাতে যে-কোন সময়ে যে যে লেখা ছিল, সে-সকলই সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে। আমেরিকায় কয়েকটি মোকদ্দমায় আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মির সাহায্যে জালিয়াতি ধরা হইয়াছে। সঙ্গের চিত্রগুলিতে এইরূপ জাল দলিলপত্র ধরার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল।

স্ট্রেটোস্ফিয়ার এরোপ্লেন—

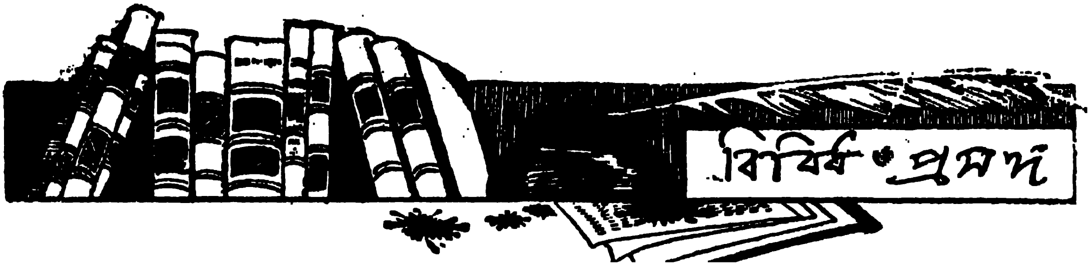
এরোপ্লেন বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী যান। উহার বেগ ঘণ্টায় সাধারণতঃ একশো হইতে দুইশো মাইল পর্যন্ত। ইহাতেও মানুষের সন্তোষ না হওয়াতে এরোপ্লেনকে আরও দ্রুতগামী করিবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু বেগ বাড়াইবার পক্ষে একটি গুরুতর বাধা আছে। এরোপ্লেনকে বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়া চলিতে হয়। জল অথবা স্থল



স্ট্রেটোস্ফিয়ার এরোপ্লেনের অভ্যন্তর

অপেক্ষা আকাশে বাধা কম হইলেও বায়ুরও একটা চাপ আছে। খুব শক্তিশালী ইঞ্জিনসম্পন্ন এরোপ্লেনও বায়ুর এই চাপ অতিক্রম করিয়া এক নির্দ্দিষ্ট বেগের বেশী জোরে চলিতে পারে না। সেজন্য যেখানে বায়ুর চাপ অপেক্ষাকৃত কম বায়ুমণ্ডলের সেই স্তরের (ইহাকেই স্ট্রেটোস্ফিয়ার বলা যায়) ভিতর দিয়া চলিতে পারে এইরূপ এরোপ্লেন নির্ম্মাণের চেষ্টা ফ্রান্সে হইতেছে এবং একটি এরোপ্লেন পরীক্ষাও করা হইয়াছে।

আকাশে যত উপরে উঠা যায় ততই বায়ুর চাপ কমিয়া যায়। কিন্তু বায়ুর চাপ খুব বেশী কমিয়া গেলে মানুষের পক্ষে সেখানে নিঃশ্বাস লওয়া সম্ভবপর হয় না। এই কারণে এই নূতন এরোপ্লেনটিকে সম্পূর্ণ 'এয়ার টাইট' করা হইয়াছে। উহার দ্বারা বার্লিন হইতে নিউ ইয়র্ক অল্প ঘণ্টায় যাওয়া যাইবে আশা করা হইতেছে।



গোলটেবিলের অর্থ

আমেরিকার শিকাগো শহর হইতে "য়ুনিটি" নামক যে সাপ্তাহিক কাগজখানি বাহির হয়, তাহার নাম ভারতবর্ষের অনেক শিক্ষিত লোক জানেন। এই কাগজটিরই সম্পাদক হোম্‌স্ (Holmes) সাহেব প্রথমে মহাত্মা গান্ধীকে বর্ত্তমানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ বলিয়াছিলেন। ইহাতে লণ্ডনের গোলটেবিল বৈঠক সম্বন্ধে ব্যঙ্গচ্ছলে বলা হইয়াছে, যে, ইহা এই অর্থে গোলটেবিলের বৈঠক, যে, ইহার সভ্যেরা কেবলই চক্রাকারে ঘুরিতেছেন, কোন একটি রাজনৈতিক আদর্শ বা লক্ষ্য-স্থলে উপনীত হইতেছেন না।* ভারতবর্ষ হইতে ইহার যত সভ্য প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনাবলীর জন্য লণ্ডন গিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই ব্যঙ্গ সত্য বটে। তাঁহারা, স্বেচ্ছায় বা জ্ঞাতসারে না-হইলেও, কলুর ঘানির বলদের মত ঘুরিয়াছেন ও ঘুরিতেছেন বটে, কিন্তু অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কিন্তু ব্রিটিশ সভ্যদের সম্বন্ধে আমেরিকার এই বিদ্রূপটি খাটে না। একটা লক্ষ্য ও আদর্শ বরাবরই চোখের সাম্‌নে রাখিয়া তাঁহারা কাজ করিয়া আসিতেছেন। প্রথম প্রথম সেটার উপর একটা আবরণ দিবার চেষ্টা ছিল—যদিও তাহা আমাদের কাছে প্রায় স্বচ্ছই মনে হইত। এখন ভারত-সচিব সে আচ্ছাদন-টুকুও রাখেন নাই। এখন বেশ বুঝা যাইতেছে, তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠক দ্বারা ভারতবর্ষের উপর ইংরেজ জাতির প্রভুত্ব বাড়াইবার এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী করিবার বন্দোবস্ত হইতেছে।

*"It apparently is a conference where men go round and round, and never get anywhere."

গোলটেবিল বৈঠক ও স্বরাজ

ভারতবর্ষের কোনও রাজনৈতিক দল কখনও ভাবিয়াছিলেন কি না জানি না, যে, গোলটেবিল বৈঠক ভারতবর্ষকে, পূর্ণ স্বরাজ না হউক, আংশিক স্বরাজ দিবে। যদি কোন দল তাহা কখনও ভাবিয়া থাকেন, তাহা হইলে এখন তাঁহাদেরও ভুল ভাঙা উচিত। আমরা স্বরাজপ্রাপ্তি সম্বন্ধে ভুলভাঙার কথাই বলিতেছি। কোন দল বা কোন কোন দল যদি, স্বরাজ নয়, নিজেদের কোন সুবিধা হইবে আশা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কাহারও কাহারও সেরূপ আশা পূর্ণ হইতেও পারে। তাঁহাদের সেইরূপ আশা পূর্ণ করিয়া তাঁহাদের সাহায্যে স্বরাজ ঠেকাইয়া রাখিবার চেষ্টা ভারত-সচিব স্যর স্যামুয়েল হোর প্রভৃতি ব্যক্তিরা হয়ত করিবেন বলিয়া অনুমান হয়।

পূর্ণ স্বরাজ হইলে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ সব ব্যাপারে এবং ভারতবর্ষের সহিত বিদেশসমূহের বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক ও অন্য সকল প্রকার সম্বন্ধ বিষয়ে ভারতীয়দের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা। আংশিক স্বরাজ হইলে অন্ততঃ কতকগুলি আভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারতীয়দের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা। কিন্তু এবারকার অর্থাৎ তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক উপলক্ষ্যে কর্ত্তৃপক্ষ যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, কোন কোন বিষয়েও, কি সমগ্র ভারতে, কি প্রদেশগুলিতে, ভারতীয়দের চূড়ান্ত কর্ত্তৃত্ব হইবে না। মন্ত্রীদের কোন সিদ্ধান্ত বা মত গবর্ণর বা গবর্ণর-জেনার‍্যালের মনঃপূত না হইলে তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। এখন শুধু বড়লাট অর্ডিন্যান্স জারি করিতে পারেন। ভবিষ্যতে প্রাদেশিক লাটেরাও তাহা করিতে পারিবেন। এখন বড়লাটের শুধু (ছয়মাসস্থায়ী) অর্ডিন্যান্স জারি করিবার ক্ষমতা আছে। ভবিষ্যতে বড় এবং ছোট

লাটেরা তাঁহাদের ব্যবস্থাপক সভার সাহায্য বা সম্মতি ব্যতিরেকেও স্থায়ী আইন জারি করিতে পারিবেন। এইরূপ নানা প্রকারে শাসনকর্তাদের ক্ষমতা বাড়াইবারই অভিপ্রায় দেখা যাইতেছে।

সৈনিক-বিভাগের ও সেনাদলের ভারতীয়তাপাদনও স্পষ্টতঃ সুদূরপরাহত করা হইয়াছে। বাণিজ্যিক, মুদ্রাবিষয়ক, বাণিজ্যশুল্কবিষয়ক, এবং আর্থিক অন্যান্য বিষয়েও বড়লাটের ক্ষমতা চূড়ান্ত থাকিবে।

এই প্রকার নানা সংবাদ দৈনিক কাগজে বাহির হইয়াছে। পুনরুক্তি অনাবশ্যক। মোট কথা এই, ভারতীয়দের পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপিত ত হইবেই না, কোন দিকে রাষ্ট্রীয় অধিকারও বাড়িবে না। বরং অন্যদিকে শাসনকর্তাদিগকে এখনকার চেয়ে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া হইবে।

কিন্তু কোনও মানুষ, কোনও মানবসমষ্টি, কোনও জাতি বা সাম্রাজ্য অন্য কোন জাতির ও দেশের ভাগ্যবিধাতা নহে। যে জাতির লোকেরা সত্য সত্যই মানুষের মত সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্তা হইতে চায়, তাহাদের চেষ্টা কেহ ব্যর্থ করিতে পারে না।

—

সমগ্রভারতীয় ও প্রাদেশিক দমনাত্মক আইন

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় সম্প্রতি কতকগুলি আইন প্রণীত হইয়াছে এবং আরও কতকগুলি হইতে যাইতেছে, যাহার প্রকাশিত উদ্দেশ্য অপরাধ দমন। অপরাধ বলিতে সকল সভ্য ও স্বাধীন দেশে সাধারণতঃ শান্তির সময়ে যেরূপ গর্হিত কাজ বুঝায়, তাহার দমনের ব্যবস্থায় আপত্তি করা অযৌক্তিক। কিন্তু দমনাত্মক আইনগুলিতে এরূপ অনেক কাজ ও ব্যবহারকে অপরাধ বানান হইতেছে, যাহা ইংরেজদের নিজের দেশে অপরাধ নহে, বরং কোন কোনটি প্রশংসনীয় বলিয়াই ইংরেজরা মনে করে।

যে-সব রাজপুরুষ এই আইনগুলি ব্যবস্থাপক সভাসমূহ দ্বারা মঞ্জুর করাইয়া লইবার নিমিত্ত বক্তৃতা ও তর্কবিতর্ক করিয়াছেন, তাঁহাদের নানা কথা হইতে আগে হইতেই জানা এই কথাটা আরও স্পষ্টতর হয়, যে,গবর্মেণ্ট এক দিকে টেররিষ্ট বা আতঙ্কোৎপাদকদিগকে যেমন নির্মূল করিতে চান, অন্যদিকে তেমনি নিরুপদ্রব অসহযোগ ও আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টাও বিনষ্ট করিতে চান। তাঁহারা ভারতীয়দের সশস্ত্র কোন চেষ্টা ত সহ্য করিতে পারেনই না—কোন দেশের কোন গবর্মেণ্টই এরূপ বিদ্রোহাত্মক প্রয়াস বরদাস্ত করিতে পারেন না, অধিকন্তু তাঁহারা, যাহা প্রার্থনা নহে, নিরস্ত্র ও নিরুপদ্রব এমন স্বরাজলাভ-প্রয়াসকেও তাঁহারা ভারতীয়দের পক্ষে আস্পর্দ্ধা ও ঔদ্ধত্য মনে করেন। তাঁহাদের বিবেচনায় কংগ্রেস এরূপ প্রচেষ্টা দ্বারা গবর্মেণ্টকে শক্তির পরীক্ষায় আহ্বান অর্থাৎ চ্যালেঞ্জ করিয়াছে। দমনাত্মক আইনগুলি এই চ্যালেঞ্জের জবাব মনে করিতে হইবে।

কোন রাজপুরুষ অবশ্য এমন ভাষা ব্যবহার করেন নাই যাহার অনুবাদ, "তোমরা কেবল আমাদের কাছে প্রার্থনা করিবার অধিকারী, সুতরাং শুধু প্রার্থনাই কর"। তাঁহারা এই মর্ম্মের কথা বলেন, "কোন রকম ভয় দেখাইয়া বা কোন প্রকারে বাধ্য করিয়া আমাদের নিকট হইতে কোন অধিকার আদায় করিতে পারিবে না। যাহা চাও, কন্‌ফারেন্সের দ্বারা, তর্ক করিয়া, ভোটে জিতিয়া আদায় করিয়া লও।" ইহার অর্থ আমরা বুঝি। এ রকম কথার আলোচনা করিয়া সময় নষ্ট করিতে চাই না। কেবল একটা কথা পাঠকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। কিরূপ প্রণালীতে কিরূপ যোগ্যতাবিশিষ্ট লোকেরা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন, ইংরেজ-গবর্মেণ্টই বরাবর তাহা স্থির করিয়া দিয়া থাকেন। তাহার উপর তাঁহাদের মনোনীত কতকগুলি দেশী ও বিদেশী সভ্য থাকেন, দেশী ও বিদেশী সরকারী সভ্যেরা আছেন, এবং গবর্মেণ্টের সমর্থক বেসরকারী নির্ব্বাচিত ইংরেজ সভ্য আছেন। এই প্রকার বন্দোবস্ত সত্ত্বেও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তর্কবিতর্কের পর আংশিক স্বরাজের অনুকূল প্রস্তাব অধিকাংশ সভ্যের ভোটের দ্বারা একাধিক বার গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু একবারও তো গবর্মেণ্ট এরূপ কোন প্রস্তাব অনুসারে কাজ করেন নাই।

যদি এমন কোন দল থাকে যাহারা অস্ত্রব্যবহার-সাপেক্ষ আতঙ্কোৎপাদন দ্বারা স্বাধীনতালাভ করিতে চায়, তাহারা দেখিতেছে, যে, তাহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই; কংগ্রেসের লোকেরা দেখিতেছে, যে, নিরস্ত্র ও নিরুপদ্রব অসহযোগ ও আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টা দ্বারা আংশিক স্বরাজও লব্ধ হয় নাই। রাজপুরুষেরা ভারতবর্ষের লোকদেরই মত জানেন, যে, ভারতীয়েরা প্রতিকূল বন্দোবস্ত সত্ত্বেও তর্কবিতর্কে এবং ভোটে জিতিলেও আংশিক স্বরাজও পায় নাই। এবং ইহা তাহার আগেও দেখা গিয়াছে, যে, প্রার্থনা দ্বারা স্বরাজ লব্ধ হয় নাই।

অতএব আমাদের অভিলাষ এই, মিঃ হেগ, মিঃ প্রেণ্টীস্ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা স্বরাজলাভের অন্য কোন উপায় নির্দ্দেশ করুন, কিংবা "নূতন কিছু" একটা বুলি আবিষ্কার করুন।

—

অর্ডিন্যান্সের মত আইনগুলার উদ্দেশ্য

ভারত-সচিব স্যর সামুয়েল হোর হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক ভারতশাসক রাজপুরুষ বলিয়াছেন, কংগ্রেস-প্রবর্ত্তিত আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টা খুব দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে—প্রায় লোপ পাইয়াছে। অন্য দিকে ইহাও বলা হইয়াছে, যে, ভারতীয় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে অর্ডিন্যান্সসমূহের মত যে সব আইন বিধিবদ্ধ হইতেছে, তাহার উদ্দেশ্য কংগ্রেসের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়া তাহার নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টা বিনষ্ট করা। কিন্তু সরকারী মতে যাহা প্রায় লোপ পাইয়াছে এবং ক্রমশঃ আরও দুর্ব্বল হইতেছে, তাহাকে মারিবার জন্য এত আয়োজন হইতেছে, বিশ্বাস করা যায় না। এই জন্য ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার কোন কোন সভ্য ঐ সভায় এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, যে, ভারতবর্ষে যে নূতন শাসনবিধি প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহা মোটেই ভারতীয়দিগের পছন্দসই হইবে না, সেই কারণে দেশে অসন্তোষ উৎপন্ন হইবে এবং ঐ শাসনবিধির বিরুদ্ধে আন্দোলন হইবে, সেই আন্দোলন দমন করিবার জন্য বক্ষ্যমান আইনগুলা প্রণীত হইতেছে। এই মত সত্য কি না, তাহা বুঝিবার জন্য খুব দীর্ঘ কাল অপেক্ষা করিতে হইবে না।

ইহাও হইতে পারে, যে, গবন্মেণ্ট আশঙ্কা করেন, কংগ্রেসের এক রকম চেষ্টা কমিয়া গিয়া থাকিলেও কংগ্রেস মরে নাই, সুতরাং কংগ্রেস স্বরাজলাভার্থ নূতন রকম কোন প্রণালী অবলম্বন করিতে পারে, এবং তাহা দমন করা আবশ্যক।

—

শহরে মহিলাদের বেড়াইবার জায়গা

বাংলা দেশ পল্লীগ্রামপ্রধান। পল্লীগ্রামে বরাবরই নারীদের মধ্যে অবরোধের বাড়াবাড়ি কম। এখন আরও কমিয়াছে। তাঁহারা বরাবরই শহরের মেয়েদের চেয়ে স্বচ্ছন্দে চলাফেরার সুবিধা ভোগ করেন। অনেকে নদী ও পুকুরে স্নান ও নানা গৃহকর্ম্ম করিয়া থাকেন। তথাপি গ্রামসকলেও তাঁহাদের মুক্ত বায়ুসেবনের স্থান থাকা আবশ্যক। শহরে এই প্রয়োজন আরও অনেক বেশী। কলিকাতায় মেয়েদের মধ্যে মৃত্যুর হার—বিশেষতঃ যক্ষ্মারোগে মৃত্যুর হার—পুরুষদের মৃত্যুহারের চেয়ে যে অনেক বেশী, নারীদের ঘরের মধ্যে দিনরাত কাটাইতে বাধ্য হওয়া তাহার একটি কারণ।

এই জন্য আমরা খবরের কাগজে দেখিয়া সুখী হইলাম, কলিকাতার অনেক পাড়ায় মহিলারা আপনাদের নিমিত্ত বেড়াইবার আলাদা আলাদা খোলা জায়গা মিউনিসি-পালিটির নিকট চাহিয়াছেন। আমরা এই আবেদন খুবই যুক্তিসঙ্গত মনে করি। সামাজিক প্রথা হঠাৎ বদলাইয়া যায় না। বাঙালী মেয়েরা এখনও পুরুষদের সান্নিধ্যে স্বচ্ছন্দে বেড়াইতে অভ্যস্ত হন নাই। এই জন্য এখনও কিছু কাল তাঁহাদের জন্য আলাদা বেড়াইবার জায়গার দরকার আছে।

—

সর্ব্বসাধারণের জন্য খোলা জায়গা

খোলা জায়গা এবং সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য যে জাতীয় আনন্দ ও কল্যাণের জন্য কত আবশ্যক, তাহা আমরা

এখনও ভাল করিয়া উপলব্ধি করি নাই। ইহার প্রয়োজন একটি পাশ্চাত্য দেশের দৃষ্টান্ত হইতে ভাল করিয়া বুঝা যায়।

পুরুষদের মধ্যে অবরোধ-প্রথা কোনো দেশেই নাই; স্ত্রীলোকরা যেখানে পর্দ্দানশীন নহেন, এরূপ দেশও বিস্তর আছে। আমেরিকা সেইরূপ দেশ। সেই দেশের শ্রমিক-বিভাগের (United States Department of Labor) অনেক পুস্তিকা ও পুস্তক আমরা পাই। এই বৎসর প্রকাশিত এইরূপ একটি পুস্তিকার নাম "Park Recreation Areas in the United States, 1930", "১৯৩০ সালে ইউনাইটেড ষ্টেটসে অবসর-বিনোদনের জন্য উদ্যানভূমি।" এই পুস্তিকায় দেখিতেছি, ঐ বৎসর যে সব গ্রাম ও শহরের প্রত্যেকটির লোকসংখ্যা ৫০০০ বা তাহা অপেক্ষা বেশী তাহাদের ভ্রমণোদ্যান সকলের মোট আয়তন ৩৫০০০০ (সাড়ে তিন লক্ষ) একার অর্থাৎ মোটামুটি এগার লক্ষ বিঘা ছিল। ইহার মধ্যে স্কুল-কলেজাদির ছাত্রছাত্রীদের খেলার জায়গা ধরা হয় নাই।

আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটসে শহরে ও বড় বড় গ্রামে ভ্রমণ, বায়ু সেবন প্রভৃতির জন্য উদ্যানাদির ব্যবস্থা করা কিরূপ প্রয়োজনীয় মনে করা হয়, তাহা কয়েকটি অঙ্ক হইতে বুঝা যাইবে। সেখানে শহরগুলিতে গড়পড়তা প্রতি এক শত জন অধিবাসীর জন্য এক একার (মোটামুটি তিন বিঘা) পরিমিত উদ্যানাদি রাখিবার চেষ্টা করা হয়। এইরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন উপলব্ধ হইবার বহু পূর্ব্বেই আমেরিকার অধিকাংশ বড় শহর নির্ম্মিত হইয়া গিয়াছিল। এই জন্য ঐগুলিতে উক্ত পরিমাণ উদ্যানাদি নাই। কিন্তু অনেক শহরে প্রতি ১০০ জন অপেক্ষা কম লোকের জন্যও এক একার করিয়া বায়ুসেবনাদির স্থান আছে। মিনিয়াপোলিসে আছে প্রতি ৯০ জনের জন্য এক একার, ডেনভারে প্রতি ২১ জনের জন্য এক একার, ড্যালাসে প্রতি ৪২ জনের জন্য এক একার, ইত্যাদি। বাংলা দেশে কলিকাতায় ত এই বিষয়টির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া একান্তই আবশ্যক, মফস্বলেও খুব দরকারী।

বঙ্গের মিউনিসিপালিটিগুলি কেমন চলিতেছে সে বিষয়ে সরকারী মন্তব্যে অনেক প্রয়োজনীয় কথা আছে। কিন্তু ভ্রমণ ও বায়ুসেবনোদ্যান যে প্রয়োজন, তাহার উপলব্ধির চিহ্ন মাত্রও উহাতে নাই।

—

বয়কট ও পিকেটিং

বিদেশী জিনিষ বয়কট করিবার একটি উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশী জিনিষ উৎপাদন ও তাহার ব্যবহার বাড়ান। পিকেটিঙেরও একটি উদ্দেশ্য ঐরূপ ছিল। এখন যে আইন হইল, তাহাতে বয়কট বেআইনী হইয়া গেল, এবং সম্পূর্ণরূপে বলপ্রয়োগহীন ভয়প্রদর্শনহীন পিকেটিংও বেআইনী হইল। সুতরাং যাঁহারা আইন মানিয়া চলিতে চান, তাঁহারা স্বদেশী জিনিষ উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির নিমিত্ত বয়কটের প্রচার ও সমর্থন করিতে পারিবেন না, পিকেটিংও করিতে পারিবেন না। এইরূপ লোকদের সংখ্যাই বেশী।

স্বদেশী জিনিষ উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য অন্য যে-সব উপায় আছে, খুব উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহকারে সেগুলি অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক। স্বদেশী জিনিষের প্রতি একনিষ্ঠ অনুরাগ উৎপাদন ও বৃদ্ধি তাহার মধ্যে প্রধান এবং একান্ত আবশ্যক।

—

কোন কোন স্বদেশী দ্রব্যের অর্দ্ধমূল্যে বিজ্ঞাপন

আমরা স্বদেশী জিনিষের ব্যবহার বাড়াইবার চেষ্টা বরাবর করিয়া আসিতেছি। কয়েক মাস স্বদেশী জিনিষের ছোট ছোট বিজ্ঞাপন বিনামূল্যে ছাপিয়াছিলাম। ঐ বিজ্ঞাপনগুলি চারি পংক্তি অপেক্ষা বড় হইবে না, এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলাম।

এখন অন্য একটি নিয়ম করিতেছি। **সচরাচর যে-সব জিনিষ বিদেশ হইতেই আসিয়া থাকে, সেই রকম জিনিষ দেশী লোকদের বাড়িতে ও কারখানায় প্রস্তুত হইলে তাহার বিজ্ঞাপন আমরা অর্দ্ধমূল্যে প্রকাশ করিব।** এই সব জিনিষের পূর্ণ তালিকা দিতে পারিতেছি না; কারণ এরূপ যে-যে জিনিষ আমাদের

দেশে প্রস্তুত হইতেছে, তাহার সবগুলির নাম জানি না। দেশী কারখানায় উৎপন্ন কোন্ কোন্ জিনিষের বিজ্ঞাপন অর্দ্ধমূল্যে ছাপিব, তাহা আমাদের বিবেচনা অনুসারে স্থির করিব, এবিষয়ে তর্কবিতর্ক করিতে পারিব না। অর্দ্ধমূল্যের এরূপ বিজ্ঞাপন পণ্যদ্রব্যনির্ম্মাতারা যত বড় ইচ্ছা দিতে পারিবেন। এই সকল বিজ্ঞাপনের দাম প্রতিমাসে অগ্রিম দিতে হইবে। এই নিয়ম আপাততঃ বর্ত্তমান ১৩৩৯ সালের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত চলিবে।

যাঁহারা এখন নিজেদের জিনিষের বিজ্ঞাপন পূর্ণ মূল্যে দিতেছেন, তাঁহারা অর্দ্ধমূল্যে বিজ্ঞাপন দিবার সুবিধা দাবি করিতে পারিবেন না। এজেণ্টদের মারফৎ অর্দ্ধমূল্যের বিজ্ঞাপন লওয়া হইবে না; অর্দ্ধমূল্যের বিজ্ঞাপনদাতারা সাক্ষাৎভাবে আমাদের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন।

ব্যবস্থাপক পদের অধিকার ও কর্ত্তব্য

ব্যবস্থাপক সভাগুলির অধিকাংশ সভ্যের পদ আইনের ব্যবস্থা অনুসারে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের, কোন রাজনৈতিক দলের বা অন্য কোন দলের বরাবর অধিকৃত থাকিলে তাহাতে দেশের কল্যাণ হয় না, এবং এই প্রকারে অধিকাংশ পদের অধিকারী সম্প্রদায়ের বা দলেরও অবিমিশ্র কল্যাণ হয় না। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ও দলের সম্মিলিত নির্ব্বাচকমণ্ডলী দ্বারা সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে নির্ব্বাচিত যোগ্যতম লোকদিগের দ্বারাই ব্যবস্থাপক সভাগুলি পূর্ণ হওয়া ভাল।

এই আদর্শে পৌঁছিবার পূর্ব্বে পরিমিত কয়েক বৎসরের জন্য কোন কোন প্রদেশে যে অধিকাংশ পদ সম্প্রদায়বিশেষের লোকদিগের জন্য আইন অনুসারে নির্দ্দিষ্ট করিবার প্রস্তাব হইয়াছে তাহা আমাদের অনুমোদিত না হইলেও তাহাতে আপত্তি করিতেছি না। কারণ, আদর্শে পৌঁছিবার ইহাই সকলের চেয়ে নির্ব্বিবাদ উপায় মনে হইতেছে।

যাঁহারা আইন অনুসারে কয়েকটি প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় অধিকাংশ পদ পাইবেন, তাঁহাদের একটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক হইবে। আমরা মুসলমান ব্যবস্থাপকদিগের কথা বলিতেছি। এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ব্যবস্থাপক হইয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশ সাধারণতঃ নিজেদের সম্প্রদায়ের সুবিধা ও স্বার্থের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, তাহা অনুচিত না হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা যখন, অন্যূন দশ বৎসরের জন্যও, কয়েকটি ব্যবস্থাপক সভায় প্রবলতম দল হইতে যাইতেছেন এবং তজ্জন্য অন্য সব সম্প্রদায়ের লোকেরা অনেকটা বলহীন হইতে যাইতেছেন, তখন প্রবলতম দলের লোকদিগকেই দেশের সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের কল্যাণসাধনের ও স্বার্থরক্ষার ভার লইতে হইবে; বৈদেশিক প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এই প্রবলতম দলকে করিতে হইবে, ও বৈদেশিক বাণিজ্যের আক্রমণ হইতে স্বদেশী বাণিজ্যকে রক্ষা করিবার চেষ্টায় তাঁহাদিগকেই অগ্রণী হইতে হইবে। তাঁহাদের কর্ত্তব্য তাঁহারা এই প্রকারে করিতে পারিলে তাঁহাদের প্রবলতম দল হওয়া সার্থক হইবে, তাঁহাদের প্রবলতম দল হওয়ায় অন্য সব সম্প্রদায়ের ও শ্রেণীর লোকদের মনে অসন্তোষ তীব্র হইবে না, এবং এই প্রকারে সকল সম্প্রদায় ও শ্রেণীর বিশ্বাসভাজন হইতে পারিলে দশ বৎসর অতীত হইবার পরও তাঁহারা আপনাদের প্রভাব রক্ষা করিতে পারিবেন।

ইহা সুজ্ঞাত ঐতিহাসিক সত্য হইলেও ইহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক নহে, যে, কোন শ্রেণীর লোকই কোন কৃত্রিম ব্যবস্থার বলে দীর্ঘকাল ক্ষমতাশালী থাকিতে পারে না; প্রত্যুত যোগ্যতা অর্জ্জন ও যোগ্যতা রক্ষাই ক্ষমতা রক্ষার প্রধান ও স্বাভাবিক উপায়।

অটাওয়া চুক্তি

অটাওয়া চুক্তি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সভ্যের মত অনুসারে মঞ্জুর হইয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে বিলাতের অনেক জিনিষ তদ্রূপ অন্য বিদেশের জিনিষের চেয়ে ভারতবর্ষে বিক্রীর অধিকতর সুবিধা পাইবে, এবং ভারতীয় কোন কোন জিনিষ বিলাতে তদ্রূপ অন্য অবিলাতী জিনিষের চেয়ে বিক্রীর সুবিধা

পাইবে। এই বন্দোবস্তে ভারতবর্ষ অপেক্ষা গ্রেট ব্রিটেনেরই বেশী সুবিধা হইবে, এবং ভারতবর্ষের লাভ অপেক্ষা ক্ষতিই বেশী হইবে। কারণ, যে-সব বিদেশী জিনিষ সেই রকমের বিলাতী জিনিষের চেয়ে সস্তা, তাহাদের উপর বেশী শুল্ক বসায় সেগুলা আর সস্তা থাকিবে না; আমাদিগকে বেশী দাম দিয়া বিলাতী জিনিষই কিনিতে হইবে। যে-সব বিদেশী জাতি আমাদের জিনিষ ক্রয় করে, ভারতবর্ষের বাজারে তাহাদের জিনিষগুলিকে এইরূপ অসুবিধায় ফেলায় তাহারাও যথাসম্ভব আমাদের জিনিষ না কিনিবার চেষ্টা করিবে। এইরূপ আরও অসুবিধা আছে।

একদিকে অর্ডিন্যান্সগুলা আরও কড়া আকারে আইনে পরিণত হওয়ায় ভারতীয়দের যতটুকু স্বাধীনতা ছিল তাহা খুব কমিয়া গেল, যেরূপ কাজ ও আচরণ সাধারণতঃ কোন সভ্য দেশে অপরাধ নহে, এমন কোন কোন ব্যবহার অপরাধ-শ্রেণীভুক্ত হইল এবং তাহার জন্য ভারতীয়দিগকে দণ্ডিত করা সহজ হইল; অন্য দিকে অটাওয়া চুক্তি হওয়ায় ভারতবর্ষের পণ্যশিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

—

দ্বিকাক্ষিক ব্যবস্থাপক সভা

বিলাতী পার্লেমেণ্টের একটি ভাগের নাম হাউস্ অব লর্ডস্, অন্যটির নাম হাউস্ অব কমন্স। পার্লেমেণ্ট নামক ব্যবস্থাপক সভা বলিতে এই দুটি ভাগের সমষ্টি বুঝায়। দুই চেম্বারে বা কক্ষে বিভক্ত ব্যবস্থাপক সভা অন্য অনেক দেশেও আছে। সমগ্র ভারতের ব্যবস্থাপক সভাও এইরূপ দুটি জিনিষের সমষ্টি। একটির নাম লেজিসলেটিভ য়্যাসেম্ব্লী, অন্যটির নাম কৌন্সিল অব ষ্টেট্। ভারতবর্ষের সব প্রদেশে এখন ব্যবস্থাপক সভা অখণ্ড একটি জিনিষ, কোথাও উহা দ্বিকাক্ষিক নহে। ভবিষ্যৎ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিকে দ্বিকাক্ষিক করিবার প্রস্তাব কোন কোন ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হইয়াছে। সর্ব্বত্র উহা গৃহীত হয় নাই। বঙ্গে উহা দুই ভোটে অগ্রাহ্য হইয়াছে।

সমগ্রভারতীয় লেজিসলেটিভ এসেম্ব্লীতে যে প্রস্তাব বা বিল পাস হইয়াছে, তাহা কৌন্সিল অব ষ্টেট অগ্রাহ্য করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। পূর্ব্বোক্ত সভাকে শেষোক্ত সভা অপেক্ষা বেশী পরিমাণে জনমতের মুখপাত্র বলা যাইতে পারে। সুতরাং কৌন্সিল অব ষ্টেট্ দ্বারা জনমতের কার্য্যকারিতায় অনেক সময় বাধা দেওয়া হয়, এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে। সেই জন্য, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিকে দ্বিকাক্ষিক অর্থাৎ দুই ভাগে বিভক্ত করিবার আগ্রহ ইংরেজ রাজপুরুষদের কথায় বা কাজে প্রকাশ পাইলে তাহা জনমতকে যথাসাধ্য শক্তিহীন করিবার ইচ্ছা হইতে উৎপন্ন মনে করা যাইতে পারে।

কিন্তু দ্বিকাক্ষিক ব্যবস্থাপক সভা মাত্রেরই উদ্দেশ্য জনমতকে বাধা দেওয়া, এরূপ মত গ্রহণযোগ্য নহে, যদিও অনেকে তাহাই মনে করেন। যথা, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কেহ কেহ বলিয়াছেন, ব্যবস্থাপক সভার একটা দ্বিতীয় কক্ষ স্থাপন ডিমক্র্যাসির অর্থাৎ গণতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধ। উহা যে ডিমক্র্যাসির বিরুদ্ধ নহে, তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি।

বিলাতের ব্যবস্থাপক সভা পার্লেমেণ্টের দুটি ভাগের কথা আগেই বলিয়াছি। গ্রেট ব্রিটেন যে খুব বেশী পরিমাণে গণতান্ত্রিক ভাবে শাসিত, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তবে উহার হাউস্ অব লর্ডসের সভ্যেরা উত্তরাধিকারসূত্রে সভ্য হইয়া থাকেন, জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচন দ্বারা নহে। ইংরেজদের মধ্যে কতকগুলি লোক হাউস্ অব লর্ডস্‌টিই তুলিয়া দিতে চায়। কিন্তু পরিবর্ত্তনপ্রার্থীদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকেই চায় বংশানুক্রমিক হাউস্ অব লর্ডসের বদলে নির্ব্বাচিত হাউস্ অব লর্ডস্।

ইহা সত্য, যে, গ্রেট ব্রিটেন বহুপরিমাণে গণতান্ত্রিক হইলেও উহা খুব পুরাতন রাষ্ট্র; উহার কন্‌টিটিউশ্যন বা মূল রাষ্ট্রগঠনবিধি আধুনিক কোন মূল রাষ্ট্রবিধিতে হুবহু অনুকরণযোগ্য নহে। কিন্তু পুরাতন হইলেই তাহা মন্দ ও অননুকরণীয়, ইহা স্বীকার্য্য নহে। তাহা হইলেও বিলাতের চেয়ে নূতন মূল রাষ্ট্রীয় বিধির দৃষ্টান্ত দিতেছি।

সাধারণতন্ত্র ফ্রান্সের মূল রাষ্ট্রীয় বিধি বিলাতের চেয়ে অনেক আধুনিক, প্রায় দেড়শত বৎসর আগে প্রণীত। উহার আইনপ্রণয়নাদির ব্যবস্থা দ্বিকাক্ষিক।

আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ এখন পৃথিবীর সকলের চেয়ে বড় সাধারণতন্ত্র। ইহার ব্যবস্থাপক সভার নাম কংগ্রেস। তাহা সেনেট ও হাউস অব রেপ্রেজেন্টেটিভস্ এই দুই ভাগে বা কক্ষে বিভক্ত। এই সাধারণতন্ত্রের মূল রাষ্ট্রবিধি ১৭৮৭ সালে প্রণীত হয়। উনিশ বার উহা সংশোধিত হইয়াছে; ১৯২০ সালে উহার উনবিংশতম সংশোধন দ্বারা নারীদিগকে নির্ব্বাচনের ও নির্ব্বাচিত হইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং এই বৃহৎ সাধারণতন্ত্রের সংশোধিত রাষ্ট্রবিধিকে আধুনিক বলা যাইতে পারে। তাহাতে ইহার দ্বিকাক্ষিকত্ব বজায়ই আছে। আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ বা সম্মিলিত রাষ্ট্রমণ্ডলের আর একটি বিশেষত্ব এই, যে, ইহার অন্তর্গত মোট আটচল্লিশটি ষ্টেট বা রাষ্ট্রের প্রত্যেকটির ব্যবস্থাপক সভা দ্বিকাক্ষিক। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে, সমগ্রভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা দ্বিকাক্ষিক হইলেও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিকে দ্বিকাক্ষিক করা গণতান্ত্রিক হইবে না। কিন্তু আমেরিকার মত এত বড়, প্রসিদ্ধ, শক্তিশালী ও শিক্ষিত গণতন্ত্রের প্রত্যেক প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভাও দ্বিকাক্ষিক।

আরও কতকগুলি দৃষ্টান্ত লউন। ইটালীর ব্যবস্থাপক সভা দুই কক্ষে বিভক্ত।

কানাডার ব্যবস্থাপক সভা দ্বিকাক্ষিক। উহার প্রদেশগুলির মধ্যে কেবল কুইবেকের ব্যবস্থাপক সভা একাক্ষিক, অন্য সব প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভাগুলি একাক্ষিক। অর্থাৎ একই রাষ্ট্রে অবস্থাভেদে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিকে একাক্ষিক বা দ্বিকাক্ষিক করা হইয়াছে। কুইবেকের ব্যবস্থাপক সভাকে দ্বিকাক্ষিক করিবার কারণ নিম্নলিখিত তথ্যগুলি হইতে বুঝা যাইবে:—ইহা পূর্ব্বে ফরাসী উপনিবেশ ছিল এবং ইহার নাম ছিল "নব ফ্রান্স"। ১৯২১ সালে ইহার ২৩,৬১,১৯৯ জন অধিবাসীর মধ্যে ১৮,৮৯,২৭৭ জন ছিল ফরাসী-বংশোদ্ভূত এবং ৩,৫৭,১০৮ জন ছিল ব্রিটিশ-বংশজাত। ধর্ম্মসম্প্রদায় হিসাবে, ২০,২৩,৯৯৩ জন ছিল রোমান কাথলিক; ১,২১,৯৬৭ ইংলণ্ডীয় খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী-ভুক্ত; ৭৩,৭৪৮ প্রেসবিটীরিয়ান; ৪১,৮৮৪ মেথডিষ্ট; ৪৭,৭৬৬ ইহুদী এবং ১৪,১৪৮ প্রটেষ্টাণ্ট।

অষ্ট্রেলিয়ার ব্যবস্থাপক সভা দ্বিকাক্ষিক, এবং কুইন্সল্যাণ্ড ছাড়া ইহার সমুদয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিও দ্বিকাক্ষিক।

নবজীল্যাণ্ডের ব্যবস্থাপক সভা দ্বিকাক্ষিক। বেলজিয়মের ব্যবস্থাপক সভা দ্বিকাক্ষিক।

গত মহাযুদ্ধের পর অষ্ট্রিয়া সাধারণতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। ইহার ব্যবস্থাপক সভা দ্বিকাক্ষিক। জার্ম্মেনীও ঐ মহাযুদ্ধের পর সাধারণতন্ত্র বা গণতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। এই নূতন সাধারণতন্ত্রের ব্যবস্থাপক সভা দ্বিকাক্ষিক। ইহার একটি প্রদেশ প্রশিয়ার ব্যবস্থাপক সভাও দ্বিকাক্ষিক।

গত মহাযুদ্ধের পর ভূতপূর্ব্ব অষ্ট্রোহাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্য হইতে বোহীমিয়া, মোরেভিয়া, সিলেসিয়া ও শ্লোভাকিয়াকে পৃথক করিয়া একটি নূতন রাষ্ট্র গঠিত হয়। ইহার নাম দেওয়া হয় চেকোশ্লোভাকিয়া। ইহা সাধারণ-তন্ত্র। ইহার ব্যবস্থাপক সভা দুই ভাগে বিভক্ত।

পুরাতন ও নূতন এইরূপ অনেক রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায়, যে, কোন রাষ্ট্রের বা প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভা দ্বিকাক্ষিক হইলেই তাহা অ-গণতান্ত্রিক হইয়া যায় না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপক সভা একাক্ষিক ও দ্বিকাক্ষিক দুই রকমেরই হইতে পারে। নূতন রাষ্ট্রের মধ্যে তুরস্ক সাধারণতন্ত্র একাক্ষিক। তবে তুরস্ক সম্বন্ধে ইহা মনে রাখিতে হইবে, যে, ইহার শেষ সুলতান পদচ্যুত হইবার পর ইহার কন্সটিটিউশ্যান, নামতঃ যাহাই হউক, কার্য্যতঃ দেশটি মুস্তাফা কমাল পাশার ইচ্ছা অনুসারে শাসিত হইতেছে, যেমন ইটালী শাসিত হয় মুসোলিনীর মত অনুসারে। ইহা গণতান্ত্রিক রীতি নহে।

যদি জনমতকে প্রতিহত করাই ব্যবস্থাপক সভার দ্বিতীয় কক্ষের একমাত্র বা প্রধান উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে জনমত অনুসারে গঠিত এতগুলি দেশের নূতন রাষ্ট্রবিধিতে দ্বিতীয় কক্ষের ব্যবস্থা থাকিত না। দ্বিতীয় কক্ষ এরূপ নিয়ম অনুসারে গঠিত ও পরিচালিত হইতে পারে, যাহাতে দেশে স্বাধীনতা বিন্দুমাত্রও কমিবে না,

সর্ব্বসাধারণের অহিত হইবে না, পরন্তু সাধারণভাবে দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে, এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ কোন কোন শ্রেণীর লোকদের স্বার্থ সংরক্ষিত হইবে।

—

অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের পুরাতন দৃষ্টান্ত

মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চালাইতেছেন, তাহার উদ্দেশ্য, হিন্দুদের মধ্যে যে-সকল জাতিকে "উচ্চ" বর্ণের হিন্দুরা অস্পৃশ্য মনে করে, তাহাদিগকে দেবমন্দিরে প্রবেশের অধিকার দেওয়া, অন্যসব জাতির সঙ্গে রাস্তাঘাট জলাশয় বিদ্যালয় ব্যবহার করিবার সমান অধিকার দেওয়া এবং সর্ব্বসাধারণের সভায় অন্য সকল জাতির সহিত বসিতে দেওয়া। এগুলি অতিশয় সাধারণ সামাজিক অধিকার। হরিজনদের এগুলি হইতে বঞ্চিত করা সাতিশয় অন্যায় হইয়াছে। অবশ্য তাহারা সর্ব্বত্র এরূপ অধিকারচ্যুত হয় নাই।

হিন্দুসমাজের সকল জাতির একত্র ভোজন মহাত্মাজীর বর্ত্তমান কার্য্যতালিকার অন্তর্গত নহে, যদিও তিনি সহভোজন হিন্দুধর্ম্মবিরুদ্ধ মনে করেন না। সহভোজন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার "সংবাদ পত্রে সেকালের কথা"র দ্বিতীয় খণ্ডে নিম্নমুদ্রিত সংবাদটি "সমাচার দর্পণ" নামক পুরাতন খবরের কাগজ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন।

(২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ । ১৬ ফাল্গুন ১২৩৭)

নববাবুদিগের নবকীর্ত্তি।—যদ্যপি নীচের লিখিত বিষয় গ্রহণযোগ্য নহে কিন্তু গুণজ্ঞ মহাশয়েরা উদাস্য না করিয়া অবশ্যই বিবেচনার দ্বারা ইহার কারণানুসন্ধান করিবেন এতদুৎসাহে উৎসাহী হইয়া ভবদীয় সন্নিধানে প্রেরিত করিলাম আপনি কৃপাবলোকন করিয়া পাঠকবর্গকে অবগত করাইবেন বাঁশবাড়িয়া নিবাসিনঃ ৺মথুরামোহন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুত শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় ও ৺রামলোচন গুণাকরের পুত্র শ্রীযুত কৃষ্ণকিঙ্কর গুণাকর এবং শ্রীযুত নবকিশোর বাবুর পুত্র শ্রীযুত মতিলাল বাবু এই কএক জন বাবু একত্র হইয়া মোং কাচড়াপাড়ার অন্তঃপাতী পাঁচঘরা সাকিনে একজন গোয়ের ভবনে এক ইষ্টকনির্ম্মিতা বেদি তদুপর চৌকী এবং তদুপরে কুসুম মাল্য প্রদানপূর্ব্বক পরম সুখে পরম সত্যনামক বেদি স্থাপন করিয়া বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য আয়োজনপূর্ব্বক বিবিধ বর্ণ প্রায় পঞ্চ সহস্র লোক এক পংক্তিতে বসিয়া অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়াছেন এবং ত্রিবেণী ও বাঁশবেড়িয়া ও হালিশহরনিবাসি প্রায় শত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া এক এক পিত্তলের থাল ও সন্দেশাদি বিদায় পাইয়াছেন এবং তৎস্থানে কিরিঙ্গীতে বাইবেল পুস্তক পাঠ করিয়াছে এবং মুসলমানে কোরাণ পাঠ করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গীতা পাঠ করিয়াছেন এবং ঐ পরম সত্যবিষয়ে দুই নহবত দুই স্থানে বসাইয়াছিলেন একটা গুড়ের থালের সম্মুখে আর একটা ঐ বেদির নিকটে আর দুই ইশতেহার কথিত দুই স্থানে রাখিয়াছিলেন তাহাতে পরম সত্যবিষয়ের অনেক বিবরণ লেখা ছিল তাহা সমুদয় পাঠ করি নাই কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হইয়া নিবেদনপূর্ব্বক লিখিলাম ইতি।

শ্রীজগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এই "নববাবু"গণ যে হিন্দু সমাজের লোক ছিলেন, তাহা ব্রাহ্মণদিগকে "বিদায়" দান ও তাঁহাদের তাহা গ্রহণ হইতেই বুঝা যায়। এই "নববাবু"দিগের কোন বংশধর বাঁশবেড়িয়া, কাঁচড়াপাড়া ও পাচঘরা সাকিনে থাকিলে, তাঁহারা এই সংবাদটি পড়িয়া কৌতুক অনুভব করিবেন। এই "নবকীর্ত্তি" যাঁহাদের, তাঁহারা পরে সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন কিনা, অতঃপর আর কিছু করিয়াছিলেন কিনা, জানিতে কৌতূহল হয়। যাহা হউক, এই সংবাদটি হইতে বুঝা গেল, যে, শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে বাংলা দেশে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের চেষ্টা আরব্ধ হইয়াছিল।

মহাত্মা গান্ধী সম্প্রতি সংবাদপত্রের মারফতে সর্ব্বসাধারণকে জানাইয়াছেন, যে, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য যে সমগ্রভারতীয় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, তাহার ইংরেজী নাম Anti-Untouchability League এর পরিবর্ত্তে এখন হইতে Servants of the Untouchables Society অর্থাৎ অস্পৃশ্যদিগের সেবক সমিতি হইল, কারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত বিঠল রাম শিন্দে অনেক বৎসর পূর্ব্বে Anti-Untouchability League নাম দিয়া এক সমিতি স্থাপন পূর্ব্বক উহার কাজ চালাইয়া আসিতেছেন।

—

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় জয়ন্তী

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় জীবনের সপ্ততি বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন। সেই উপলক্ষ্যে তাঁহাকে নানা সভাসমিতি হইতে অভিনন্দিত করা হইয়াছে। তিনি স্বয়ং রসায়নী বিদ্যায় নূতন আবিষ্কার করিয়া এবং তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার ইচ্ছা জাগাইয়া ভারতবর্ষে রসায়নী বিদ্যার গবেষণার নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি যে অন্যকে গবেষণার পথে চালাইয়াছেন, ইহা তাঁহার স্বয়ং গবেষক হওয়া অপেক্ষাও বড় কাজ।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কাজে লাগাইয়া কেমন করিয়া পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করিয়া দেশের ধন দেশে রাখা যায় ও বাড়ান যায় এবং সেই কাজের আয়োজন ও সম্পাদন করিতে গেলেই কেমন করিয়া অনেক লোকের কাজ জোটে ও তাহাদের রোজগারের উপায় হয়, সেই পথও তিনি দেখাইয়া পণ্যশিল্পক্ষেত্রেও তিনি পথপ্রদর্শক হইয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় রসায়নী বিদ্যার ইতিহাস লিখিয়া এবং আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে তাহার একটি অংশ লিখাইয়া তিনি এ বিষয়ে জগতের জ্ঞান ও ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

ছাত্রদের প্রতি তাঁহার প্রীতি এবং দরিদ্র ছাত্রদিগকে আনুকূল্য প্রদান সুবিদিত। বহুসংখ্যক ছাত্র তাঁহার সাহায্য পাইয়া জ্ঞানবান, কৃতী ও উপার্জ্জক হইয়াছে। তিনি ছাত্রদিগকে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভে উৎসাহিত না করিয়া জ্ঞান অর্জ্জনে ও স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বনে উৎসাহ দেন।

আড়ম্বরবিহীন সাদাসিধা জীবন যাপন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান আহরণ ও উচ্চ চিন্তায় কালক্ষেপ তাঁহার জীবন ও চরিত্রের একটি বিশেষত্ব।

ভারতবর্ষ—বিশেষতঃ বাংলা দেশ পল্লীর দেশ। পল্লীগ্রামের সঙ্গে যোগ রাখিতে পারিলে স্বদেশপ্রীতি ও স্বদেশহিতৈষণা বাস্তবতা ও প্রগাঢ়তা লাভ করে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বৎসরের কয়েক মাস স্বগ্রামে যাপন করেন কিংবা উত্তর-বঙ্গে জলপ্লাবনে বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থ তাহাদিগকে চরখায় সুতা কাটা প্রভৃতিদ্বারা উপার্জ্জনের যে-সব বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার তত্ত্বাবধান করেন।

তিনি যেমন খদ্দরের প্রচারক, তেমনই সুতার ও ও কাপড়ের কলের পক্ষপাতী। ভারতবর্ষে উভয়েরই প্রয়োজন ও স্থান আছে।

নানা দেশহিতকর কার্য্যের সহিত তাঁহার আন্তরিক যোগ আছে।

কলিকাতার টাউন হলে ২৫শে অগ্রহায়ণ তাঁহাকে যে-সভায় অভিনন্দিত করা হয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাহার সভাপতি ছিলেন। তিনি এই উপলক্ষ্যে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা নীচে মুদ্রিত হইল।

আমরা দুজনে সহযাত্রী। কালের তরীতে আমরা প্রায় এক ঘাটে এসে পৌঁচেছি। কর্ম্মের ব্রতেও বিধাতা আমাদের কিছু মিল ঘটিয়েছেন।

আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর সেই আসনে অভিবাদন জানাই, যে-আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন,—কেবলমাত্র তাকে জ্ঞান দেননি, নিজেকে দিয়েছেন, যে দানের প্রভাবে ছাত্র নিজেকেই পেয়েছে।

বস্তুজগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদ্ঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তার চেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছেন, কত যুবকের মনোলোকে ব্যক্ত করেছেন তার গুহাহিত অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি, বোধশক্তি। সংসারে জ্ঞানতপস্বী দুর্লভ নয়, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে চরিত্রের ক্রিয়া প্রভাবে তাকে ক্রিয়াবান করতে পারেন এমন মনীষী সংসারে কদাচ দেখতে পাওয়া যায়।

উপনিষদে কথিত আছে, যিনি এক তিনি বললেন, আমি বহু হব। সৃষ্টির মূলে এই আত্মবিসর্জ্জনের ইচ্ছা। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সৃষ্টিও সেই ইচ্ছার নিয়মে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তিনি বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সঞ্জীবিত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে। নিজেকে অকৃপণভাবে সম্পূর্ণ দান না করলে এ কখনও সম্ভব হ'ত না। এই যে আত্মদান-মূলক সৃষ্টিশক্তি এ দৈবীশক্তি। আচার্য্যের এই শক্তির মহিমা জরাগ্রস্ত হবে না। তরুণের হৃদয়ে হৃদয়ে নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির মধ্য দিয়ে তা দূরকালে প্রসারিত হবে। দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে জয় করবে নব নব জ্ঞানের সম্পদ। আচার্য্য নিজের জয়কীর্ত্তি নিজে স্থাপন করেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে, পাথর দিয়ে নয়—প্রেম দিয়ে। আমরাও তাঁর জয়ধ্বনি করি।

প্রথম বয়সে তাঁর প্রতিভা বিদ্যাবিতানে মুকুলিত হয়েছিল; আজ তাঁর সেই প্রতিভার প্রফুল্লতা নানা দল বিকাশ করে দেশের হৃদয়ের মধ্যে উৎসারিত হ'ল। সেই লোককান্ত প্রতিভা আজ অর্ঘ্যরূপে ভারতের বেদীমূলে নিবেদিত। ভারতবর্ষ তাকে গ্রহণ করেছেন, সে তাঁর কণ্ঠমালায় ভূষণরূপে নিত্য হয়ে রইল। ভারতের আশীর্ব্বাদের সঙ্গে আজ আমাদের সাধুবাদ মিলিত হয়ে তাঁর মাহাত্ম্য উদ্‌ঘোষণ করুক।

—

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি

রাজসাহী কলেজের ছাত্রছাত্রীদের একটি সামাজিক উৎসব উপলক্ষ্যে আমাকে সম্প্রতি রাজসাহী যাইতে হইয়াছিল। তাহাদের অনেকের মধ্যে দৈহিক মানসিক আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ উন্নতির প্রয়াস দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলাম। সেখানকার কলেজ, সর্ব্বসাধারণের লাইব্রেরী, সমাজসেবক সংঘের নানা কাজ, দীননাথ বিদ্যালয়, প্রভৃতি প্রশংসার যোগ্য। এই রকমের প্রতিষ্ঠান বঙ্গের আরও কোন কোন জায়গায় আছে, এবং এই রকম কাজও অন্যত্র কোথাও কোথাও হয়। কিন্তু রাজসাহীর একটি প্রতিষ্ঠান বঙ্গে অদ্বিতীয়—

বোধ হয় ভারতবর্ষে অদ্বিতীয়। এটি বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ও তাহার মিউজিয়ম। দেশের লোকদের নিজের চেষ্টায় এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান আর কোথাও স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া অবগত নহি। ইহার গৃহ যে প্রশস্ত ভূখণ্ডের উপর নির্ম্মিত তাহা দিয়াছিলেন দিঘাপাতিয়ার ভূতপূর্ব্ব রাজা বাহাদুর এবং গৃহনির্ম্মাণের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন তাঁহার ভ্রাতা কুমার শরৎকুমার রায়। কুমার শরৎকুমার কেবল যে টাকা জোগাইয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে উৎসাহী কর্ম্মীও বটে। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির জন্য পরলোকগত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দের নামও এই প্রতিষ্ঠানটির সহিত জড়িত।

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির মিউজিয়ামে রক্ষিত নানা মূর্ত্তি ও অন্য প্রাচীন বস্তুসমূহ কলাবিৎ ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুশীলনের যোগ্য। আমি এখানে একটি সাধারণ জিনিষের উল্লেখ করিব। পুরাতন বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় একখণ্ড প্রস্তরের গাত্রে এই লেখাটি উৎকীর্ণ দেখিলাম :—

শ্রীরস্তু
শাকে পঞ্চপঞ্চা-
শদধিক চতুর্দ্দ-
শ শতাব্দিতে মধ্যে
শ্রীশ্রীমন্মহামুদ সা-
হ নৃপতেঃ সময়ে নু-
র বাজ খাঁন পুত্র ম-
হাপাত্রাধিপাত্র শ্রীম-
ৎ ফরাস খাঁনেন সংক্র
মোয়ং বিনির্ম্মিত ইতি।

১৪৫৫ শকাব্দে এক মুসলমান নৃপতির এক মুসলমান অমাত্য "শ্রীমৎ ফরাস খান" একটি সংক্রাম অর্থাৎ সাঁকো নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। প্রস্তরে উৎকীর্ণ লিপিটি তাহারই দলীল। ইহা হইতে বুঝা যায়, চারি শত বৎসর পূর্ব্বে সম্ভ্রান্ত মুসলমান বাঙালীরা বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় নিজেদের কীর্ত্তির বিষয় লিপিবদ্ধ করান স্বাভাবিক মনে করিতেন এবং নিজেদের নামের পূর্ব্বে "শ্রীমৎ" ব্যবহার অসাধারণ কিছু মনে করিতেন না।

এই লিপিযুক্ত প্রস্তরখণ্ডটি ধুরাইল গ্রাম হইতে প্রাপ্ত। ইহার একটি ফোটোগ্রাফ পাইবার আশা করিয়াছিলাম। তাহা না-পাওয়ায় শুধু লিপিটির নকল দিলাম।

—

নামের আগে "শ্রী" ব্যবহার

শ্রীমৎ আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে নিজের নামের আগে "শ্রী" ব্যবহার করিতে বিরত হইয়াছেন। তিনি এখন শুধু "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" এইরূপ স্বাক্ষর করেন। তাহার কারণও তিনি বলিয়াছেন। একজন ভদ্রলোক, বোধ হয় ছাত্র, এ বিষয়ে আমার মত প্রবাসীর মারফতে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

আমি যে কেন নিজের নামের আগে "শ্রী" বসাইয়া দস্তখত করি, তাহার কোন কারণ বলিতে পারি না। নিজেই নিজের নামের আগে "শ্রী" ব্যবহার রীতির কোন ব্যাখ্যা আমি জানি না। এই রীতি, আমি যতটা জানি, পঞ্জাব মহারাষ্ট্র গুজরাট অন্ধ্র প্রভৃতি দেশে প্রচলিত নাই। আমি যে রীতির অনুসরণ করি তাহা গতানুগতিকতা মাত্র। ছেলেবেলা আমার জন্মভূমি বাঁকুড়ায় শিক্ষা পাইয়াছিলাম, কেহ নাম জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হইবে, "শ্রী অমুক", নাম স্বাক্ষর করিতে হইবে "শ্রী" দিয়া। ছেলেবেলা একটা কৌতুকজনক প্রশ্নের কৌতুকাবহ উত্তরও আমাদিগকে মুখস্থ করিতে হইত। কেহ নাম জিজ্ঞাসা করিলে যেমনই "শ্রী অমুক" বলা, অমনই প্রশ্ন হইত "শ্রী কোথায় পেলে?" তখন উত্তর দিতে হইত :—

"যখন জন্মিলাম আমি জননী-জঠরে
শ্রীপদ পাইলাম আমি মহাদেবের বরে।
শ্রীপদ পাইয়া আমার হরষিত মন।
হয় নয় জিজ্ঞাসা কর ব্রাহ্মণনন্দন।"

এটা বামুনের ছেলের উত্তর। কেহ কায়স্থ হইলে কায়স্থনন্দন, তাম্বুলী হইলে তাম্বুলীনন্দন, ইত্যাদি বলিতে হইত। মহাদেবের এই অযাচিত বরটির মূল্য বাল্যকালে

বুঝিতে পারি নাই, এখনও জানি না। এবং মন কখনও যে ঐ বর পাইয়া হরষিত হইয়াছিল, তাহাও মনে পড়ে না। চারিটি পংক্তির শেষ পংক্তিটির অর্থ জানি না।

আমাদের বাল্যকালে কোথাও বরযাত্র হইয়া গেলে এইরূপ নানা প্রশ্নোত্তরের সংগ্রাম চলিত।

কেহ যদি অন্য কাহারও নামের আগে "শ্রী" ব্যবহার করেন, তাহার অর্থ অনুমান করিতে পারি।

—

মিসেস্ সখাওৎ হোসেন

মিসেস্ সখাওৎ হোসেনের মৃত্যুতে বঙ্গীয় সাহিত্যের ক্ষতি হইল, এবং বঙ্গীয় নারীশিক্ষাক্ষেত্র হইতে একজন বিশিষ্ট আত্মোৎসৃষ্টা সমাজসেবিকার তিরোভাব ঘটিল। তাঁহার নিজের নাম না-জানায় তিনি যে নামে পরিচিত ছিলেন তাহাই ব্যবহার করিতেছি। অকালে তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি স্বামীর নিকট হইতে প্রাপ্ত দশ হাজার টাকা মুসলমান বালিকাদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপনে ব্যয় করেন। স্বামীর স্মরণচিহ্ন-স্বরূপ বিদ্যালয়টির নাম রাখেন তাঁহারই নাম অনুসারে। তাহার পর নিজের পুঁজিপাটা এবং নিজের সমুদয় শক্তি এই কাজে নিয়োগ করিয়া তিনি বহুবৎসর বিদ্যালয়টি চালাইয়া আসিতেছিলেন। তিনি ইহাকে উচ্চশ্রেণীর বালিকা-বিদ্যালয়ে পরিণত করিয়া রাখিয়া যাইতে পারিয়াছেন। তাঁহার এই কীর্ত্তিটি দাম্পত্য প্রেমের নিদর্শন, সাধ্বীর যোগ্য অবদান, এবং মুসলমান সমাজের হিতকর প্রতিষ্ঠান।

তিনি সুলেখিকা ছিলেন। পুরুষজাতির উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত তাঁহার বাক্যবাণের তীক্ষ্ণতা অনুভূত হইলেও তাঁহার সমালোচনার ন্যায্যতা নিরপেক্ষ লোকদিগকে স্বীকার করিতে হইত।

—

মেদিনীপুরের মর্ম্মন্তুদ সংবাদ

গত ১০ই ডিসেম্বর তারিখের অ্যাডভান্স পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদগুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

(From Our Correspondent)
Tamluk (Midnapore), Dec. 8.

The villagers of Nandigram thana, who, determined not to pay the punitive tax, left their hearths and homes and took shelter at different thanas and the Sundarbans, are now returning to their respective homes. Most of them have been reduced in health under various unfavourable circumstances. So far as we are informed, of these homeless villagers 8 boys, 10 men and 38 ladies died at their shelters for want of food and living in unsuitable circumstance. It is also reported that a poor pregnant lady untimely gave birth to a child on her way while fleeing away from her house, and breathed her last with her new born babe for want of proper treatment.

অনুবাদ। "নন্দীগ্রাম থানার পল্লীবাসী যে-সকল লোক দণ্ডার্থ স্থাপিত ট্যাক্স না-দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া নিজ নিজ ঘর বাড়ি ছাড়িয়া অন্যান্য থানায় ও সুন্দরবনে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারা এখন বাড়ি ফিরিয়া আসিতেছে। নানা প্রতিকূল অবস্থা বশতঃ তাহাদের অধিকাংশের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিয়াছে। আমরা যতটা অবগত হইয়াছি, এই গৃহহীন পল্লীবাসীদের মধ্যে আট জন বালক, দশ জন পুরুষ এবং আটত্রিশ জন মহিলা, খাদ্যাভাবে এবং অনুপযুক্ত অবস্থায় বাস প্রযুক্ত, তাহাদের আশ্রয়স্থানসমূহে মারা পড়িয়াছে। এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, যে, একটি দরিদ্রা অন্তঃসত্ত্বা মহিলা নিজ গৃহ হইতে পলাইবার সময় পথে অকালে একটি শিশু প্রসব করেন, এবং যথোপযুক্ত চিকিৎসা শুশ্রূষাদির অভাবে শিশুটিসহ মারা পড়েন।"

এই সংবাদগুলি মর্ম্মভেদী। যাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহাদের নাম লিখিত হয় নাই, ইতিহাসে তাঁহাদের নাম ও বৃত্তান্ত থাকিবে না ; কিন্তু তাঁহারা ইতিহাসের উপাদান সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

—

চৌকীদারী ট্যাক্স না-দেওয়ার ফল

১০ই ডিসেম্বরের অ্যাডভান্স কাগজে মেদিনীপুর জেলার নিম্নমুদ্রিত সংবাদগুলিও বাহির হইয়াছে।

The collecting panchayet of the Union No. 1 in P.S. Nandigram, with several chowkidars and the dafadar, raided the cowsheds of the villagers of Daibar, and attached 2 cows worth about Rs. 25 for the non-payment of their chowkidari taxes of Rs. 6 from Sjta. Uttami Bala Maity and Dharani Dhar Kar. Afterwards they raided the house of Gora Chand Maity of Bargram and attached one bullock worth about Rs. 14 for the non-payment of his brother's tax.

Though the punitive police were withdrawn from the Nandigram thana a few days before, the police sub-inspector, Mafjil Hossain, with 5 sepoys, 4 dafadars and 20 chowkidars, raided the houses of the following men on the 1st December last and

attached 12 bullocks, 16 cows, 5 goats and various other movabl-s altogether worth about Rs. 427-3 as. and household articles worth about Rs. 4 -12 as: Shrihari Jana, Kr shna Mohan Jana, Dayaram Jana, Muku da Jana. Gopal Bhunia Vikan Bhunia, Hari Pada Bhunia, Sjta Matangani Bhunia, Gun dhar Jana, Dharanidhar Kar, Indra Narayau Kar, Baikuntha Jan, Damodar Jana, and Sjt. Uttami Bala Maity They al-o attached the movable properties worth a out Rs. 37 inc uding 2 cows be onging to the following men:-Bipin Patra. Jiban Das, Kumud Jana, Kedar Jana, Manik Jana, Ram nath Jana and Bnuban Adak. Aft-rwards they arrested Prahlad Mandal, Haradhan Maity, Mahosw r Jana, Mukunda Jana, Haradhan Adak, and Raghunath Das and took them to the thana.

মেদিনীপুর জেলায় অনেক দিন হইতে যেরূপ ঘটনা ঘটিয়া আসিতেছে বলিয়া কাগজে দেখা যায়, এই সংবাদগুলি তাহারই নমুনা।

চৌকীদারী ট্যাক্স না-দেওয়ার জন্য কাহার কাহার কি কি পশু চৌকীদার ও দফাদারেরা ক্রোক করিয়াছে, কাহার ভাইয়ের ট্যাক্স আদায় না-হওয়ায় তাহার বলদ ক্রোক হইয়াছে, এবং কাহাদের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পর তাহাদিগকে থানায় ধরিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে, তাহা উপরে বিবৃত হইয়াছে। প্রাপ্য ট্যাক্সের পরিমাণ সামান্য, কিন্তু ক্রোকী সম্পত্তির দাম তার চেয়ে অনেক বেশী।

—

এলাহাবাদে প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন

আমরা প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের এলাহাবাদস্থিত কার্য্যালয় হইতে নিম্নমুদ্রিত সংবাদগুলি পাইয়াছি।

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের দশম অধিবেশন আগামী ১১ই, ১২ই ও ১৩ই পৌষ (ইং ২৬ হইতে ২৮ ডিসেম্বর) এলাহাবাদে হইবে। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মূল সভাপতি ও মাননীয় বিচারপতি স্যর লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি এবং শ্রীমতী অনুরূপা দেবী মহিলা-সম্মেলনের সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শাখা-সভাপতিগণের নাম :—

সাহিত্য-শাখা—পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী। (শান্তিনিকেতন)

বৃহত্তর-বঙ্গ শাখা ডাঃ কালিদাস নাগ। (কলিকাতা)

ইতিহাস শাখা—রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ। (কলিকাতা)

অর্থনীতি শাখা—ডাঃ যোগীশচন্দ্র সিংহ। (কলিকাতা)

দর্শন শাখা—শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবীর। (অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়)

শিল্প শাখা—শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় রায়চৌধুরী। (লক্ষ্ণৌ)

বিজ্ঞান শাখা—শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ চৌধুরী। (লাহোর)

সঙ্গীত শাখা—শ্রীমতী সরলা দেবী-চৌধুরাণী, বি.এ.

প্রতিনিধিগণের দেয় চাঁদা (৫৲ টাকা ও ছাত্র-ছাত্রীগণের ৲ টাকা) অভ্যর্থনা-সমিতির কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীনলিনবিহারী মিত্র মহাশয়ের নিকট (৫ নং কোটাপার্চা—এলাহাবাদ) পাঠাইতে হইবে।

প্রতিনিধিগণ বিছানা, মশারি ইত্যাদি সঙ্গে আনিবেন। স্থানীয় এংলো-বেঙ্গলী ইণ্টারমীডিয়েট কলেজে প্রতিনিধি-নিবাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আহারাদির বন্দোবস্ত অভ্যর্থনা-সমিতি করিবেন। মহিলা প্রতিনিধিগণের অবস্থানের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে। মহিলা-বিভাগের সম্পাদিকা শ্রীমতী প্রতিভা দেবী।

প্রবন্ধাদি আগামী ২০এ ডিসেম্বরের মধ্যে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

এলাহাবাদে তিনটি ষ্টেশন আছে। প্রত্যেক ষ্টেশনেই প্রত্যেক আপ্-ডাউন ট্রেনের সময় স্বেচ্ছাসেবকগণ উপস্থিত থাকিবেন। স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রতিনিধিগণকে প্রতিনিধি-নিবাসে পৌঁছাইয়া দিবেন।

এই সম্মেলনের সংস্রবে একটি শিল্পপ্রদর্শনী খোলা হইবে। চিত্র, সূচিশিল্পাদি, সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রনাথ ঘোষ, অতুল-কুটীর—৭৮, লুকারগঞ্জ—এলাহাবাদ এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

এলাহাবাদের নিকটে কৌশাম্বী, কড়া, প্রতিষ্ঠানপুর, ঝুঁসী প্রভৃতি বৌদ্ধযুগে সুপরিচিত ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দর্শনীয় স্থান আছে। সমাগত প্রতিনিধিগণ যদি ঐ সকল স্থান পরিদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে অধিবেশনের শেষে কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় তাহার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

—

মুসলমান বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন

বর্ত্তমান ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে মুসলমান বাঙালীদিগের একটি সাহিত্য-সম্মেলন হইবে। তাঁহাদের একটি পৃথক সাহিত্যপরিষদও স্থাপিত হইয়াছে। হিন্দু বাঙালীদের মত তাঁহাদেরও মাতৃভাষা বাংলা। সুতরাং বাংলা সাহিত্য চর্চ্চায় মনোযোগী হওয়া তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। তাঁহারা যে ক্রমশঃ অধিকতর মনোযোগী হইতেছেন, ইহা হইতে সুফলের আশা করা যাইতে পারে।

সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ও শ্রেণীর বাঙালীরা সম্মিলিত ভাবে বাংলা সাহিত্যের আলোচনা ও উন্নতিচেষ্টা করিলে সুফলের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। মুসলমান বাঙালীরা কেন তাঁহাদের সাহিত্যিক সমিতি প্রভৃতি পৃথক ভাবে করিতেছেন, তাহা আমরা অবগত নহি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ও বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সহিত আমাদের যোগ না থাকায় এবং এই সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান ও বার্ষিক সভা দুইটির পরিচালকবর্গের মধ্যে আমরা কখনও ছিলাম না বলিয়া আমরা বলিতে পারি না, মুসলমান বাঙালী সাহিত্যিকদের এই দুটিতে যোগ দিতে

কোন বাধা আছে কিনা, কিংবা কোনও মুসলমান বাঙালী সাহিত্যিক এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে যোগ দিতে চাওয়ায় প্রত্যাখাত হইয়াছেন কি না। কিছু কাল পূর্ব্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু আমাদিগকে কথাপ্রসঙ্গে বলিতেছিলেন, যে, তিনি মুসলমান বাঙালী সাহিত্যিকদিগকে পরিষদের সভ্য হইবার জন্য সাদর আহবান করিবেন। তাঁহার এই অভিপ্রায়ের আমরা সমর্থন করিয়াছিলাম।

এখন রাজনৈতিক বিষয়ে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের শুভ চেষ্টা হইতেছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে, সাহিত্যিক যে বিচ্ছেদ পাঠশালা বিদ্যালয় এবং মক্তব মাদ্রাসায় ঘটান হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাকে দৃঢ় হইতে না দিয়া বরং তাহা দূর করিবারই চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের ইচ্ছা হইয়াছিল, নিমন্ত্রিত না হইলেও, মুসলমান বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনে দর্শক ও শ্রোতা রূপে যাইব। কিন্তু তাহার অধিবেশনের সময়ে এলাহাবাদে প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনে উপস্থিত হইতে হইবে বলিয়া সে ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্গীত সম্মেলন

গত ১১ই অগ্রহায়ণ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত সম্মেলনের সপ্তাহব্যাপী অধিবেশন শেষ হইয়াছে। ইহাতে নারায়ণ রাও ব্যাস, ইনায়েৎ খাঁ, কৃষ্ণরাও পণ্ডিত, শ্রীকৃষ্ণরতনজনকর প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ ওস্তাদ উপস্থিত ছিলেন এবং কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীতে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অল্পবয়স্ক ছাত্রছাত্রী এবং অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক ছাত্রেরা সংগীতে নৈপুণ্যের জন্য পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তাহাদের সংখ্যা বেশী বলিয়া সকলের নাম দিতে পারা যাইবে না। কয়েক জনের নাম দিতেছি। নয় বৎসরের নিম্নবয়স্কা বালিকা:—নৃত্যের জন্য—কুমারী সান্ত্বনা ভট্টাচার্য্য, কুমারী রেবা দত্ত। কণ্ঠসঙ্গীতের জন্য—কুমারী রাজদুলারী মাথুর, কুমারী অর্চ্চনা দেবী, কুমারী মাধুরী সাপ্রু, কুমারী সান্ত্বনা ভট্টাচার্য্য (বিশেষ পারদর্শিতার জন্য)। তবলার জন্য কুমারী সান্ত্বনা ভট্টাচার্য্য। হার্মোনিয়মের জন্য কুমারী অর্চ্চনা দেবী।

নয় বৎসরের নিম্নবয়স্ক পুরস্কার প্রাপ্ত বালকদের নাম—শান্তরাম বিষ্ণু কুশলকর (কণ্ঠ), হেমচন্দ্র জোশী (হারমোনিয়ম) এবং হেমচন্দ্র যোশী, বিশ্বরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও নিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য (তবলা)। ইহা ছাড়া পুরস্কারপ্রাপ্ত অধিকবয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের এবং পুরস্কারপ্রাপ্ত ওস্তাদদের নাম এক শত বাইশটি আছে। এতগুলি নাম ছাপিবার জায়গা নাই। "প্রবাসী" মাসিক-পত্র প্রথমতঃ প্রবাসী বাঙালীদের জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবাসী বাঙালী ছেলে-মেয়েদের নাম দিতেছি। মেয়েরা সকলেই কুমারী।

মায়া ভট্টাচার্য্য, শোভা ভট্টাচার্য্য, বীণাপাণি মুখোপাধ্যায়, অন্নপূর্ণা দেবী, মীরা মুখোপাধ্যায়, হেনা মুখোপাধ্যায়, রেণুকা সাহা, চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, ভানুগোপাল গোস্বামী, ইলা বন্দ্যোপাধ্যায়, সরলা নাগ, ডলী বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, প্রমোদরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, প্রজেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিময় ঘোষ, র র মুখুজ্জ্যে, ব ভট্টাচার্য্য, যতীন্দ্র রায়, ত্রিলোচন বসু, মণীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, রেবা সেন।

ওস্তাদদের জন্য বারটি স্বর্ণপদক ও দুটি রূপার বাটী পুরস্কার দেওয়া হয়। তাহার মধ্যে কেবল একটি স্বর্ণপদক একজন প্রবাসী বাঙালী পাইয়াছিলেন। ইংরেজীতে লেখা তালিকায় তাঁহার নাম আছে জী সী চাটুজ্জ্যে।

এই সঙ্গীত-সম্মেলনের অভ্যর্থনা-কমিটির সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্য, পি-এইচ ডি, ডি এস্ সি, এবং সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার পণ্ডিত ইক্‌বাল নারায়ণ গুর্টু।

কলিকাতায় ললিতকলা প্রদর্শনী

কলিকাতায় গবর্মেণ্ট আর্ট স্কুলে যে বার্ষিক ললিতকলা প্রদর্শনী হয়, তাহা এ বৎসর ১লা পৌষ হইতে ১৭ই পৌষ পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণের জন্য বেলা ১০টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে। ইহাতে প্রধানতঃ চিত্র প্রদর্শিত হয়। তদ্ভিন্ন কিছু মূর্ত্তি প্রভৃতিও থাকে।

এই শীতকালে প্রাচ্যকলার ভারতীয় সমিতিও (ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্ট্যাল আর্ট) একটি ললিতকলার প্রদর্শনী খুলিয়া থাকেন।

এই প্রকার প্রদর্শনীগুলির সব জিনিষ বুঝাইবার লোক থাকিলে দর্শকদিগের নয়নরঞ্জন হওয়া ব্যতীত ললিত-কলা সম্বন্ধে জ্ঞানও জন্মিতে পারে।

—

আধুনিক "কালাপাহাড়!"

চন্দননগরের প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ "নবসঙ্ঘ" নামক একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন। খামের মধ্যে আমাকে প্রেরিত তাহার ১৬ই অগ্রহায়ণের সংখ্যাটিতে "হিন্দু জাগরণে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের আহ্বান" প্রবন্ধের গোড়ায় লিখিত হইয়াছে:—

আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ভট্টপল্লীর পণ্ডিতশিরোমণি শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় "বর্ণাশ্রম-স্বরাজ্য-সঙ্ঘের" নামে গোঁড়া হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে বড়লাট বাহাদুরের নিকট এক দীর্ঘ আবেদন-পত্র দাখিল করিয়াছেন; তাঁহার মর্ম্মকথা—হিন্দুসভার কর্ণধারগণের মধ্যে ডাঃ মুঞ্জে ও শ্রীযুক্ত রামানন্দ, যাঁহারা আর্য্য ও ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্গত, তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের প্রতিমা-পূজা ও বিশেষত্ব অস্বীকার করেন। কাজেই মন্দির-প্রবেশের আন্দোলনে এই কালাপাহাড়গণের প্রচেষ্টায় যাবত হিন্দুধর্ম্মের মহিমা ক্ষুন্ন হইতেছে।

আমরা ১লা অগ্রহায়ণ প্রকাশিত অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী'র ৩০০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলাম, "ডাক্তার মুঞ্জে আর্য্যসমাজী নহেন, তিনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, সনাতনী হিন্দু।" এই ভ্রম-সংশোধনটা প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের চোখে পড়ে নাই।

পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন প্রমুখ গোঁড়া হিন্দুরা বড়লাটের নিকট যে ইংরেজী দরখাস্ত পাঠাইয়াছেন, তাহার মুদ্রিত প্রতিলিপি দরখাস্তকারীদের পক্ষ হইতে আমার নিকট একখানি আসিয়াছিল। তাহাতে "কালাপাহাড়" শব্দের ব্যবহার নাই। উহা প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ আমদানী করিয়াছেন। দরখাস্তটির সম্বন্ধে আমার কিছু মন্তব্য অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী'তে আছে। এ বিষয়ে আমার আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনই প্রয়োজন নাই।

আমরা জানিতাম, কালাপাহাড় দেবদেবী মূর্ত্তি ভাঙিয়াছিল। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের গবেষণায় বোধ হয় ইহাই আবিষ্কৃত হইয়াছে, যে, কালাপাহাড় "অস্পৃশ্য"দিগকে দেবমন্দিরে ঢুকাইয়া দিয়াছিল!

—

"প্রিয় ভারতবর্ষ"

ইংলণ্ডের বিখ্যাত মাসিক-পত্র কন্টেম্পোরারি রিভিউতে মিঃ আর্থার মূর "বিলাভেড ইণ্ডিয়া" বা "প্রিয় ভারতবর্ষ" নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহা ঐ কাগজখানির গোড়াতেই ছাপা হইয়াছে। মিঃ মূরের পরিচয় ঐ পত্রিকার সম্পাদক এই দিয়াছেন, যে, তিনি ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের প্রধান রাজনৈতিক লেখক, বিলাতী অবজার্ভারের ভারতীয় পত্রলেখক, এবং এই সেদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ইউরোপীয় দলের নেতা ছিলেন।

তাঁহার প্রবন্ধটি পড়িলে তাঁহার ভারতপ্রেম সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা জন্মে। মিঃ মূর লিখিয়াছেন:—

"We came to trade and stayed to rule, and gradually we talked less and less of our trade, and more and more of our mission to govern India for its good."

ভারতবর্ষের ভালর জন্যই মিঃ মূর প্রমুখ লোকেরা ভারতশাসন করেন, ইহা বলিয়া তিনি বলিতেছেন, যে, এই নিঃস্বার্থ ভারতসেবায় যৎকিঞ্চিৎ সুবিধাও আছে। যথা—

"Moreover the discharge of this lofty responsibility provided a vast and noble field for the talents of Britons in war and peace. Honourable careers lay open to the products of our schools and universities, with posts of the highest dignity as objects of legitimate ambition for those who served India most faithfully. Also an army could be supported and trained under conditions approximating to active service without expense to the British tax-payer. Inevitably, therefore, India had by the middle of the nineteenth century established an affectionate hold on the romantic imagination of the English."

তাহার পর, সিপাহী-যুদ্ধের কথা পাড়িয়া, মিঃ মূর তাঁহার বর্ণিত ব্যাকেরক্কাউন্ট হোল্ডট কি প্রকার তাহার বর্ণনান্তর লিখিতেছেন, "We did a good job of work which still stands"। মিঃ মূর কথাটি ভুলিবার পাত্র নহেন। তার পর শুনুন—

"When the strain of the fifties was over we had held our loved India. We were proud of it and loved India all the more. But we were terribly impersonal. We loved India more than the Indians."

মিঃ মূর যে ভারতবর্ষকে ভারতবাসীদের চেয়েও ভালবাসেন, তাহা আগে জানা ছিল না, এখন জানা গেল।

অতএব অতঃপর মন্দিরে মন্দিরে তাঁহার প্রতিমা গড়িয়া পূজার আয়োজন হইবে।

কিন্তু মিঃ মূরকে খুব সাবধান ভাষায় বলিতে হইতেছে, যে, ভারতপ্রেম ক্রমশঃ কম লাভজনক হওয়ায় কম কবিত্ব-পূর্ণ হইয়া পড়িতেছে :—

"We have now to face the fact that the glamour of governing India for its good is disappearing, and that the country is becoming more and more unattractive to many Englishmen."

কেন ?

"There are still honourable careers offered, but their arduousness is more in evidence than their honour. The civil service and the corps of army officers, even though automatically shrinking in numbers, find difficulty in maintaining the standard of British *personnel*. The railways, and the engineering services generally despite unemployment at home, find recruitment for technical posts an increasing problem."

মিঃ মূর জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "how much do we love India ?" "আমরা ভারতবর্ষকে কত ভালবাসি ?" তাহার অব্যবহিত পরেই, বোধ হয় ঐ প্রশ্নেরই ব্যাখ্যা স্বরূপ, আর একটি প্রশ্ন করিতেছেন, "what do we get out of India and what do we want ?" "ভারতবর্ষ হইতে আমরা কি পাই এবং কি চাই ?" অতএব তাঁহার প্রেমের মানে বাণিজ্য। তাঁহার প্রশ্ন দুটির তিনি যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"Material wealth and moral satisfaction both weigh in the balance. The pessimist argues, plausibly enough, that both are rapidly on the down grade. The days when Englishmen shook the pagoda tree and picked up the fortunes that fell are gone for ever. As a field for official careers India is becoming uncongenial, for none but exceptional men can do their best work in face of a highly popular press which represents British officials as brutes and bloodsuckers. The business world is mapped out by limited companies keenly competing with one another and so heavily capitalized as to make the payment of dividends a strenuous task. The importing houses are hit by tariffs, and their goods are subjected to periodical boycott as well. The European exporter and industrialist is naturally exposed to the ever-increasing competition of Indians whose wage bills and general over-heads are smaller than his."

মিঃ মূরের ভারতপ্রেম সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধে আরও অনেক কথা আছে। সবগুলা ছাপিবার জায়গা নাই। তাঁহার শেষ প্যারাগ্রাফ হইতে দু-একটা কথা তুলিয়া শেষ করি।

"The Englishman still loves India, and it is still worth holding."

ইহার মানে অতি সোজা। নীচের বাক্যটিতে তাহা আরও স্পষ্ট হইয়াছে।

"To hold for the Crown a self-governing India will be a greater political achievement than any yet."

ইংলণ্ডের নৃপতির জন্য অর্থাৎ ইংরেজ জাতির জন্য মিঃ মূর ভারতবর্ষ দখল করিয়া থাকিতে চান। উত্তম কথা। কিন্তু তিনি দখলীকার থাকিবেন, অথচ ভারতবর্ষ সেল্ফ গভার্নিং (স্বশাসক) হইবে, এ দুটা একসঙ্গে কেমন করিয়া সম্ভব ?

—

শাসনকেন্দ্র ভারতবর্ষে স্থাপন

মিঃ মূরের মতে,

"Everybody in India, including certainly the unofficial British community, is agreed (will Mr. Churchill please note ?) that a prolongation of the system of government by the British Parliament is impossible. Power must be shifted from Westminster and Whitehall, and some centre and source of power found in India itself."

অর্থাৎ ভারতবর্ষের বেসরকারী ইংরেজরা-সমেত সবাই একমত যে বিলাত হইতে ভারতশাসন আর চলিবে না ; সেখান হইতে ক্ষমতার কেন্দ্র সরাইয়া আনিয়া ভারতেরই কোথাও উহার উৎপত্তিস্থল ও কেন্দ্র আবিষ্কার করিতে হইবে।

ইহা সত্য কথা। কিন্তু মিঃ মূর চান, যে, ভারতপ্রবাসী ইংরেজরাই সেই কেন্দ্র হউক। ভারতীয়েরা চায়, ভারতীয়েরাই কেন্দ্র হইবে।

—

ভারতবর্ষের দারিদ্র্য

মিঃ মূরের মতে, "The outstanding fact about India is the poverty of the people... ...No one is doing anything about this. We have no plan, and the Indians have no plan." "ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সব চেয়ে সুপ্রকট তথ্য ভারতীয় লোকদের দারিদ্র্য।... ...এ সম্বন্ধে কেহ কিছু করিতেছে না।

[এই দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য] আমাদের কোন কার্য্যপদ্ধতি নাই, ভারতীয়দেরও নাই।"

যে-ইংরেজরা ভারতীয়দের চেয়েও ভারতবর্ষকে ভালবাসে, ভারতের দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য তাহাদের কোন কার্য্যপদ্ধতি নাই, তাহাদের ভারতপ্রেমের দাবির সঙ্গে ইহার সঙ্গতি না থাকায় মিঃ মুর কোথাও একটা ভুল করিয়াছেন মনে হইতেছে।

—

সোনা রপ্তানিতে ভারতবর্ষের ক্ষতি

এ-বৎসর এপর্য্যন্ত মোটামুটি একশত কোটি টাকার সোনা ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী হইয়াছে। আগে আগে সমস্তই ইংলণ্ডে যাইত, সম্প্রতি আমেরিকাতেও যাইতেছে। ইংরেজ অর্থনীতিজ্ঞেরা ভারতীয়দিগকে বুঝাইতে চান, ইহাতে ভারতবর্ষের কোন ক্ষতি নাই; কারণ ভারতবর্ষ সোনার দাম পাইতেছে। কিন্তু প্রশ্ন এই, দাম পাইতেছে কি আকারে? দাম পাওয়া মানে সোনার বিনিময়ে আর কিছু পাওয়া। সেই আর কিছুটা কি? যদি বলেন কাগজের নোট, তাহা হইলে বলি, যে-কাগজটার উপর কিছু ছবি ও অক্ষর ছাপিয়া তাহাকে নোট বানান হয়, সেই কাগজখানার দাম এক পয়সাও নয়। সেই কাগজটা সরকারী কারেন্সী আপিসে দিলে তাহার বদলে কতকগুলি ধাতু-মুদ্রা পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে আমরা নোটের বিনিময়ে সোনার মুদ্রা পাইবার অধিকারী নই, পাইবার অধিকারী কিঞ্চিৎখাদমিশ্রিত রূপার টাকা। মনে করুন ভারতবর্ষ হইতে যত সোনা রপ্তানী হইয়াছে, তাহার বিনিময়ে আমরা খাদমিশ্রিত রূপার এইরূপ টাকা-নামক মুদ্রা এক শত কোটি পাইলাম। কিন্তু আমরা কি সত্য সত্যই রপ্তানী করা সোনার সমতুল্য কিছু পাইলাম? অর্থাৎ আমরা যে একশত কোটি টাকা পাইলাম, তাহা গলাইয়া খাদযুক্ত রূপার বৃহৎ বৃহৎ ঢেলা প্রস্তুত করিলে তাহার বিনিময়ে কি রপ্তানী-করা সোনার সমান পরিমাণ সোনা পাইব? তাহা পাইব না। তাহার কারণ, একটা টাকাতে যত রূপা আছে, গলাইয়া তাহা অর্থাৎ এক তোলা রূপা বিক্রী করিলে তাহার দাম মোটামুটি আজকালকার দরে আট আনা পাওয়া যাইবে; কারণ আজকাল ১০০ তোলা রূপার দাম মোটামুটি ৫১।৫২ টাকা।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, ১০০ কোটি টাকার সোনা রপ্তানী করিয়া ভারতবর্ষ টাঁকশালের ছাপ দেওয়া টাকা-নামক একশতটি রূপার চাকতি পাইয়া থাকিলে বস্তুতঃ একশত কোটি তোলা খাদমিশ্রিত রূপা পাইয়াছে। তাহার মূল্য ৫০ কোটি টাকা। বাকী ৫০ কোটি টাকা ভারতবর্ষের লোকসান ও ইংলণ্ডের লাভ হইয়াছে।

—

বঙ্গে নিরক্ষর লোকদের সংখ্যাবৃদ্ধি

১৯৩১ সালের সেন্সস অনুসারে ব্রিটিশ-শাসিত বাংলা দেশের লোকসংখ্যা ৫,১০,৮৭,৩৩৮। ইহার মধ্যে ৫ বৎসর ও তাহার অধিক বয়সের মোট ৪৭,৪৩,২৭১ জন লিখিতে পড়িতে জানে, বাকী ৪,৬৩,৪৪,০৫৭ জন সম্পূর্ণ নিরক্ষর। ইহার মধ্যে ৫ বৎসরের কম বয়সের শিশু কিছু আছে, যাহাদের লিখনপঠনক্ষম হইবার কথা নয়। ১৯২১ সালের অর্থাৎ দশ বৎসর আগেকার সেন্সস অনুসারে ব্রিটিশ-শাসিত বঙ্গের লোকসংখ্যা ছিল ৪,৭৫,৯২,৪৬২ এবং লিখনপঠনক্ষমদের সংখ্যা ছিল ৪৩,২২,৬৪৫, সুতরাং তখন নিরক্ষরদের সংখ্যা ছিল ৪,৩২,৬৯,৮১৭। ইহার দশ বৎসর পরে নিরক্ষরদের সংখ্যা হইয়াছে ৪,৬৩,৪৪,০৫৭। অতএব, দশ বৎসরে ব্রিটিশ শাসিত বঙ্গে ৩০ লক্ষ ৭৪ হাজার ২৪০ জন নিরক্ষর লোক বাড়িয়াছে।

—

নিরক্ষরতা দূর করিবার চেষ্টা

এই প্রকারে নিরক্ষর লোকের সংখ্যাবৃদ্ধি নৈরাশ্যজনক বটে। কিন্তু নিরাশ ও নিরুৎসাহ হইলে চলিবে না। নিতান্ত অল্পবয়স্ক শিশু এবং আজন্ম জড়বুদ্ধি ব্যতীত আর সকলেরই নিরক্ষরতা দূর করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত। প্রায় সকল আধুনিক সভ্য দেশের লোকেরা ইহা করিতে পারিয়াছে। আমাদেরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও অধ্যবসায় থাকিলে আমরাও পারিব। গবর্মেণ্ট যথেষ্ট চেষ্টা করুন বা না-করুন, আমাদিগকে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। বৎসরে অন্ততঃ দু-জন নিরক্ষর লোককে

স্বয়ং নিরক্ষর-পাঠক করা, কিংবা দু-জন গরিব নিরক্ষর লোকের প্রাথমিক শিক্ষার বেতন দেওয়া প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য।

কলিকাতার কলেজসমূহের কতকগুলি ছাত্র-ছাত্রীর মনে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্ম ইচ্ছা জাগিয়াছে। তাঁহাদের এই ইচ্ছা প্রশংসনীয়। আশা করি তাঁহারা শীঘ্র কাজে নামিতে পারিবেন। তাঁহাদিগকে আমরা নিজ নিজ কলেজের প্রিন্সিপ্যালের তত্ত্বাবধানে এই কাজ করিতে পরামর্শ দিয়াছি। স্কটিশ চর্চ কলেজের ছাত্রেরা অনেক বৎসর হইতে এই কাজ করিয়া আসিতেছেন। মফস্বলের সব কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদেরও প্রিন্সিপ্যালদিগের সহায়তায় এই কাজে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

যাঁহারা এইরূপ কাজ সম্বন্ধে সংবাদ ও পরামর্শ চান, তাঁহারা কলিকাতা ১২ নং বাদুড় বাগান রো ঠিকানায় শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ সেনকে চিঠি লিখিতে পারেন।

—

সাম্প্রদায়িক মিলন কন্‌ফারেন্স

যাহা ঠিক্ গণতান্ত্রিকতা ও স্বাজাতিকতা (ন্যাশন্যালিজম্) সম্মত নহে, দশ বৎসরের জন্ম তাহা করিয়া যদি সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে মিল হয়, তাহাতে আমরা আপত্তি করিব না। কিন্তু এক এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের জন্ম ব্যবস্থাপক সভার কতকগুলি আসন দশ বৎসরের জন্যও নির্দ্দিষ্ট রাখা আমরা পছন্দ করি না। এরূপ বন্দোবস্তে কেবল ধর্ম্মমতের জন্ম কতকগুলি যোগ্যতর লোকের পরিবর্ত্তে কতকগুলি অযোগ্যতর লোককে ব্যবস্থাপক সভার পাঠাইবার সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে, দেশের কাজ যতটা ভাল হইতে পারিত, ততটা হয় না, এবং জাতীয় সংহতি বৃদ্ধিতে বাধা দেওয়া হয়। তথাপি যদি নির্দ্দিষ্ট দশ বৎসরের জন্ম অগণতান্ত্রিক এরূপ কিছু করিলে, পরে খাঁটি গণতান্ত্রিক নিয়ম অনুসারে চলিতে সকলে রাজী হন, তাহা হইলে আপত্তি করিব না, আগেই বলিয়াছি। কিন্তু যাঁহাদের জেদে গণতান্ত্রিকতার বিপরীত কাজ এখন হইতে যাইতেছে; তাঁহারা দশ বৎসর পরে খাঁটি গণতান্ত্রিকতা মানিবেন কি না, সে-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। নূতন কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল এবং তাহার কারণীভূত সাম্প্রদায়িক চাপ আমাদের সন্দেহের সমর্থন করিতেছে।

মন্ত্রীদের পদের সাম্প্রদায়িক ভাগাভাগিও অগণতান্ত্রিক, এবং দায়িত্বপূর্ণ গবন্মেণ্টের সহিত তাহার সামঞ্জস্য হইতে পারে না। এলাহাবাদে যুনিটি কন্‌ফারেন্সের কমিটিতে এইরূপ ভাগাভাগির যে প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা দশ বৎসরের জন্ম কিনা জানি না। দশ বৎসরের জন্ম হইলে তাহা মন্দের ভাল। কিন্তু তাহা বরাবরের জন্ম হইলে আমরা তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী।

সমগ্রভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদিগকে শতকরা ৩২টি আসন দিবার প্রস্তাব ১০ বৎসরের জন্ম হইলে আমরা আপত্তি করি না, বরাবরের জন্ম হইলে এই অ-গণতান্ত্রিক ও অন্যায় বন্দোবস্তের আমরা বিরোধী। যদি লোকসংখ্যা অনুসারে ব্যবস্থাপক সভার আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হয়, তাহা হইলেও মুসলমানরা শতকরা ২৫টির বেশী পান না। কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়কে অতিরিক্ত আসন দিলে অন্য সব শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচার হয়। অবিচার ও অন্যায় কখনও শুভ ফল উৎপন্ন করিতে পারে না।

সরকারী প্রায় সব বিভাগের চাকরিগুলি সম্প্রদায় অনুসারে ভাগ করিয়া দিবার প্রস্তাবও হইয়াছে। স্থায়ী ভাবে এরূপ অন্যায় ব্যবস্থা হইলে তাহার ফল কখনও ভাল হইবে না। দেশের সরকারী কাজও ইহাতে ভাল হইবে না। যথেষ্ট যোগ্যতা না থাকিলেও সম্প্রদায়-বিশেষের লোক বলিয়াই কতকগুলি মানুষকে চাকরি দিলে সেই মানুষগুলির অর্থপ্রাপ্তি ঘটে বটে, কিন্তু সেই সম্প্রদায়টির উপকার হয় না। কারণ, এরূপ ব্যবস্থায় সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগ্যতর হইবার ইচ্ছা ও চেষ্টা কমিয়া যায়।

যাহারা কোন কোন রকম কাজ করিবার খুব যোগ্যতা রাখে এবং যোগ্যতরদিগেরই কাজ পাইবার নিয়ম থাকিলে যাহারা কাজ পাইত, বিশেষ কোন একটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক বলিয়া যদি তাহাদের অনেকে কাজ না-পায়, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হইবে। বুদ্ধিমান, শিক্ষিত ও যোগ্য লোকদের মধ্যে অসন্তুষ্ট বেকার লোকের সংখ্যা বাড়িলে তাহাদের দ্বারা [illegible]

উন্নতি হইবে না, শান্তির অনুকূল অবস্থাও তাহা হইতে উৎপন্ন হইবে না।

সচরাচর ইহা ধরিয়া লওয়া হয়, যে, মুসলমানেরা শিক্ষায় অনগ্রসর; অতএব মুসলমান উমেদাররা যোগ্যতম বা যথেষ্ট যোগ্য না-হইলেও তাহাদিগকে অনেকগুলি চাকরি দেওয়া চাই। যোগ্যতার প্রতিযোগিতায় কোন কোন শ্রেণীর লোক দাঁড়াইতে পারে না বলিয়াই তাহাদের জন্য নির্দিষ্টসংখ্যক চাকরি রাখিবার নিয়মের আমরা বিরোধী। কিন্তু যদি ঐ নিয়ম আপত্তিজনক নহে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও বলি, সমগ্রভারতের সব রকম শিক্ষার হিসাব লইলেও দেখা যায়, যে, মুসলমানেরা সকলের চেয়ে অনগ্রসর নহে। তাহার প্রমাণ দিতেছি। বর্তমান ১৯৩২ সালে ১৯২৯-৩০ সালের যে সরকারী সমগ্রভারতীয় রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, তাহার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় এই তালিকাটি আছে :—

সম্প্রদায়	ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা	ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা শতকরা কয় জন
ইংরেজ ও ফিরিঙ্গী	৪১৪৪০	১৯.০
ভারতীয় খ্রীষ্টিয়ান	৩৯৬৬৫৮	১৪.৯
হিন্দু	৭৮৯৮৮৮৭	৪.৮
মুসলমান	৩২৩৩৪৯৮	৫.৪
বৌদ্ধ	৬৪১৮৮৫	৫.৬
পার্সী	১৯৮৯১	২২.২
শিখ	১৮৪৭৫৭	৭.৭
* অন্যান্য	১৬১০৮১	২.৫
মোট	১২৫১৬০৯৭	৫.০

এই তালিকাটি হইতে বুঝা যায়, কোল ভীল সাঁওতাল প্রভৃতিকে বাদ দিলে হিন্দুরা অন্য সব সম্প্রদায়ের চেয়ে আজকাল শিক্ষায় পশ্চাদ্বর্তী। হিন্দুদের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর কতকগুলি লোক উচ্চশিক্ষিত বলিয়া একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে, যে, হিন্দুসমাজ সমাজ-হিসাবেও শিক্ষায় খুব অগ্রসর। যাঁহারা শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্ট ঘাঁটেন তাঁহাদের এ ভুল হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বর্তমান ১৯৩২ সালে প্রকাশিত ১৯৩০-৩১ সালের সরকারী বঙ্গীয় শিক্ষা রিপোর্টের ৭২ হইতে ৭৮ পৃষ্ঠা দেখুন। তাহাতে হিন্দুসমাজের জাতিসমূহকে "শিক্ষায় অগ্রসর" ও "শিক্ষায় পশ্চাদ্বর্তী" এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে, মুসলমানদিগকে এরূপ ভাগ করা হয় নাই। তাহারা হিন্দুসমাজের অনগ্রসর জাতিদের চেয়ে শিক্ষায় অগ্রসর, যদিও তাহারা হিন্দুসমাজের অগ্রসর জাতিদের চেয়ে শিক্ষায় অনগ্রসর। এই কারণে মুসলমানদের জন্য যেমন অনেক বৃত্তি, অনেকের বিনাবেতনে পড়িবার বন্দোবস্ত, একজন সহকারী ডিরেক্টর, পাঁচজন সহকারী ইনস্পেক্টর প্রভৃতি ব্যবস্থা আছে, হিন্দুসমাজের এই সকল অনগ্রসর জাতিদের এবং আদিম নিবাসী সাঁওতাল প্রভৃতির শিক্ষার জন্যও সেই প্রকার ব্যবস্থা যথেষ্ট পরিমাণে থাকা উচিত।

ধর্মসম্প্রদায় হিসাবে যদি একান্তই চাকরির ভাগ রূপ অনিষ্টকর কোন ব্যবস্থা বা চুক্তি করা হয়, তাহা হইলে তাহা নির্দিষ্ট কয়েক বৎসরের জন্য করাই উচিত, এবং মুসলমানদের জন্য যেমন একটা ভাগ রাখা হইবে, হিন্দুসমাজের অনগ্রসর জাতিদের জন্য একটি পর্য্যাপ্ত ভাগ এবং সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম নিবাসীদের জন্য একটি পর্য্যাপ্ত ভাগও সেইরূপ রাখা উচিত হইবে।

—

বঙ্গে সরকারী ব্যয়সংক্ষেপ

শিক্ষিত বাঙালীদের—অন্ততঃ 'প্রবাসী'র নিয়মিত পাঠক-পাঠিকাদের—ইহা অজ্ঞাত নহে যে, ভারতবর্ষের সব বড় প্রদেশগুলির মধ্যে বাংলা দেশের গবর্মেণ্ট জনপ্রতি যত কম টাকায় সরকারী সব কাজ চালাইতে বাধ্য হন, এমন আর কোন বড় প্রদেশ নয়। অথচ বাংলা দেশ হইতে মোট ট্যাক্স আদায় যে কম হয়, তাহা নহে। ভারত-গবর্মেণ্ট বাংলা দেশ হইতে যত টাকা লইয়া থাকেন, অন্য কোন একটা বা দুটা প্রদেশ হইতে তত লন না বা পান না। ১৯২১-২২ সালে ভারত-গবর্মেণ্টের মোট রাজস্ব ছিল ৬৪,৫১,৬৬,০০০ টাকা। তাহার মধ্যে শুধু বাংলা দেশ হইতেই ভারত-গবর্মেণ্ট শুষিয়া লয়েন ২৩,১১,৭৮,০০০ টাকা! তাহার পরও, এত বেশী না হইলেও, ভারত-গবর্মেণ্ট বাংলা দেশ হইতেই বেশী টাকা আদায় করিতেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯২৮-২৯ সালে ভারত-গবর্মেণ্ট কোন্ প্রদেশের নিকট হইতে

মাদ্রাজ	৭ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা
বোম্বাই	৫ „ ৮৪ „
আগ্রা-অযোধ্যা	৭ „ ১৭ ”
পঞ্জাব	৩ ” ৪৬ ”
বিহার-উড়িষ্যা	৫ ” ৭৬ ”
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	২ ” ২৫ ”
আসাম	১ ” ২৭ ”
বাংলা	১৬ ” ৫৯ ”

বাংলার নীচেই বেশী টাকা লওয়া হইয়াছিল আগ্রা-অযোধ্যা ও মান্দ্রাজ হইতে। কিন্তু একা বাংলাকে যত দিতে হইয়াছিল, ঐ দুই প্রদেশের প্রদত্ত টাকার সমষ্টি ১৪ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা তার চেয়ে ২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা কম! ভারত-গবন্মেণ্ট এই প্রকারে বাংলা দেশ হইতে অত্যন্ত বেশী টাকা লওয়ায় বাংলা-গবন্মেণ্ট বঙ্গের সংগৃহীত রাজস্ব হইতে সরকারী প্রাদেশিক ব্যয়ের জন্য কিরূপ কম টাকা রাখিতে পান, তাহা নীচের তালিকা হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন। ইহা ১৯৩০-৩১ সালের প্রাদেশিক বজেটসমূহ হইতে বাংলা-গবন্মেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত ব্যয়সংক্ষেপ কমিটি প্রস্তুত করিয়াছেন।

প্রদেশ	লোকসংখ্যা	মোট প্রাদেশিক রাজস্ব	জনপ্রতি প্রাদেশিক রাজস্ব
মাদ্রাজ	৪৬৭৪০০০০	১৮৩৯৭০০০০	৩.৯
বোম্বাই	২১৯৩১০০০	১৫২০৪৭০০০	৬.৯
বাংলা	৫০১১৪০০০	১০৫২৪২০০০	২.১
পঞ্জাব	২৩৫৮১০০০	১১৮৪০৮০০০	৫.০
আগ্রা-অযোধ্যা	৪৮৪০৯০০০	১৩২৬৫০০০০	২.৭
বিহার-উড়িষ্যা	৩৭৬৭৮০০০	৫৭৫০০০০০	১.৫
ব্রহ্মদেশ	১৪৬৬৭০০০	১০৩৫৫৯০০০	৭.০
মধ্যপ্রদেশাদি	১৫৫০৮০০০	৫১২১৫০০০	৩.৩
আসাম	৮৮২২০০০	২৬৬৯১০০০	৩.০

বাংলা দেশের সরকারী কাজ চালাইবার নিমিত্ত বাংলা-গবন্মেণ্ট বিহার-উড়িষ্যা গবন্মেণ্ট ছাড়া জনপ্রতি আর সকলের চেয়ে কম টাকা পান। অথচ, কৃত্রিম উপায়ে দরিদ্রীকৃত এই বাংলা-গবন্মেণ্টকে ১৯৩২ সালের আগে পাঁচ পাঁচ বার ব্যয় সংক্ষেপ করিতে হইয়াছে! এ বৎসর আবার ব্যয়সংক্ষেপের জন্য এক কমিটি নিযুক্ত হয়। তাহার রিপোর্ট গবন্মেণ্টের বিবেচনাধীন। বাংলা দেশে যে ব্যয়সংক্ষেপের কোন ন্যায্য ক্ষেত্র নাই, তাহা নহে। সমুদয় কমিশনারের পদ তুলিয়া দেওয়া চলে, আরও কয়েকটা বড় চাকরি ছাঁটিয়া দেওয়া চলে। দেশে শিক্ষাবিস্তার, শিল্পবাণিজ্যের যথ বিস্তার ও উন্নতি হইলে এবং দেশের অধিবাসীদের স্বশাসন অধিকার পর্য্যাপ্তরূপে বৃদ্ধি পাইলে পুলিসের ও জেলের খরচ খুব কমান যায়। কিন্তু স্বরাজ-সম্বন্ধীয় কোন প্রস্তাব ব্যয়সংক্ষেপ কমিটির আলোচ্য হইতে পারে না, এবং তাঁহাদের অনেক প্রস্তাব যথাযথ হয় নাই। আমরা এখানে শিক্ষা-সম্বন্ধে ব্যয়সংক্ষেপের কথাই কিছু বলিব।

—

বঙ্গে শিক্ষার ব্যয়সংক্ষেপ

বাংলা দেশে শিক্ষার জন্য মোট ব্যয়ের শতকরা ৩৪.৯ অংশ মাত্র গবন্মেণ্ট দেন। মান্দ্রাজে দেন ৪৯.৫, বোম্বাইয়ে ৫১.৯৫, আগ্রা-অযোধ্যায় ৫৭.৩, পঞ্জাবে ৫৬.৭, ব্রহ্মে ৪১.৫, মধ্যপ্রদেশে ৪৯.৯, আসামে ৫৮.৩, উ-প-সীমান্তে ৭০.০, বিহার-উড়িষ্যায় ৩৪.৯। সমগ্র ভারতবর্ষে গবন্মেণ্ট মোট শিক্ষাব্যয়ের শতকরা ৪৮.৩ অংশ দেন; বঙ্গে দেন ৩৪.৯ অংশ— গড়ের অনেক কম। গবন্মেণ্ট বঙ্গে ছাত্রপ্রতি খরচ করেন ৫৸৵৫, মাদ্রাজে ৯৷৴৯, বোম্বাইয়ে ১৭৲১০, আগ্রা-অযোধ্যায় ১৪৸৮, পঞ্জাবে ১৫৲১, ব্রহ্মে ১৯৵০, বিহার উড়িষ্যায় ৬৴৮, মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে ১৩৲১১, আসামে ৯৵১১, উ-প-সীমান্তে ২৬৷৩। সমগ্র-ভারতে গড়ে গবন্মেণ্ট ছাত্রপ্রতি ব্যয় করেন ১১৵৩, বঙ্গে করেন ৫৸৵৫। সুতরাং বাংলা দেশে গবন্মেণ্ট ছাত্রপ্রতি খুব কম খরচ করেন। বঙ্গে মোটের উপর শিক্ষার সরকারী ব্যয় না কমাইয়া বাড়ানই উচিত। তবে কোন কোন দিকে বাজে খরচ আছে; তাহা ছাঁটিয়া আবশ্যক দিকে খরচ বাড়ান উচিত। আমরা এখানে কয়েকটি অন্যায় ও অনিষ্টকর প্রস্তাবিত ছাঁটের উল্লেখ করিব।

বালিকাদের শিক্ষার প্রতি বঙ্গে যথেষ্ট মন দেওয়া হয় নাই। ১২ জন সহকারী মহিলা ইন্‌স্পেক্ট্রেস আছেন। এই সমস্ত পদ ছাঁটিয়া দিয়া কেবল একজন সহকারী ডিরেক্ট্রেস্ রাখিবার সুপারিস হইয়াছে। একজন সহকারী ডিরেক্ট্রেসের দ্বারা বার জনের কাজ হইতে পারে না। কমিটি বলেন, ছোট বালিকাদের বিদ্যালয়গুলি পুরুষ সব ইন্‌স্পেক্টররা পরিদর্শন করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের বর্ত্তমান সংখ্যা ২৫৩ কমাইয়া ১৫০ করিবার প্রস্তাব

হইয়াছে, এবং ৬১ জন সবডিভিজন্যাল ইন্স্পেক্টরের পদ ছাঁটিয়া দিয়া তাঁহাদেরও কাজ সব-ইনস্পেক্টরদিগকে করিতে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ বর্ত্তমান ২৪৩ জন সব-ইনস্পেক্টরের কাজ, ৬১ জন সবডিভিজন্যাল ইন্স্পেক্টরের কাজ এবং ১২ জন সহকারী মহিলা ইনস্পেক্ট্রেসের কাজ ১০০ জন সব-ইনস্পেক্টর দ্বারা নির্ব্বাহিত হইবে আশা করা হইয়াছে। ইহাতে স্কুল পরিদর্শন ভাল করিয়া ত হইবেই না, বেগার-সারাও হইবে না। তদ্ভিন্ন মহিলা ইনস্পেক্ট্রেসরা বালিকাদের অভিভাবিকাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া পরোক্ষভাবে যে নারীশিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করেন, পুরুষ সব-ইন্স্পেক্টারদিগের দ্বারা তাহা হইবে না।

বঙ্গে শিক্ষকদিগকে শিক্ষার কাজ শিখাইবার জন্য মোটে দুটি ট্রেনিং কলেজ আছে। কমিটি একটি ছাঁটিয়া দিতে চান। ইহা অনিষ্টকর প্রস্তাব। বঙ্গে উচ্চ ও মধ্য স্কুলের সংখ্যা অন্য সব প্রদেশের চেয়ে খুব বেশী, অথচ শিক্ষণকার্য্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক অত্যন্ত কম। ইংলণ্ড ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের সহিত তুলনা করিব না। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সহিতই করি। মাম্রাজে শতকরা ৭৮.৭ জন শিক্ষক এইরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত, দিল্লীতে ৭০, পঞ্জাবে ৬৯.৯, উ-প-সীমান্তে ৬৮.৯, বিহার-উড়িষ্যায় ৪১.৯, আসামে ৪৫, বোম্বাইয়ে ২৯.৭, কিন্তু বঙ্গে ১৮.৭। ইহার মধ্যে বঙ্গের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়-গুলি আলাদা করিয়া ধরিলে তাহাদের ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সংখ্যা হয় শতকরা ১.৮ অর্থাৎ হাজারে ১৮ জন; এবং ট্রেনিংপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকদের সংখ্যা শতকরা .৪ অর্থাৎ হাজারে ৪ জন। স্যাডলার কমিশনের রিপোর্টে বঙ্গে অন্ততঃ ৫টি ট্রেনিং কলেজ এবং দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি শিক্ষণ-শিক্ষা বিভাগ খোলা সমর্থিত হইয়াছিল, যাহাতে বৎসরে ৮০০ ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক তাহা হইতে বাহির হইতে পারেন। সে অনেক বৎসরের কথা। এখন উচ্চ স্কুলের সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। এখন বৎসরে ১১০০ এরূপ শিক্ষক বাহির হওয়া আবশ্যক। সুতরাং দুটির মধ্যে একটি ট্রেনিং কলেজ উঠাইয়া দেওয়া ত উচিত নহেই, ওরূপ কলেজের সংখ্যা বাড়ান উচিত।

শিক্ষক প্রস্তুত করিবার কলেজ একটি কমিটি ছাঁটিয়া দিতে চান, কিন্তু পুলিসের লোকদের শিক্ষা দিবার দুইটিই তাঁহাদের মতে থাকা চাই!

বঙ্গের বর্ত্তমান লাট স্যর জন এণ্ডার্সন গত সেণ্ট এণ্ড্রু খানার পর বক্তৃতায় বঙ্গে কেবল ঝুড়িঝুড়ি কেতাবী শিক্ষা প্রাপ্ত যুবকের সংখ্যা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কিছু বলিয়াছেন। কিন্তু বাঙালী পিতা-মাতারা কি করিবেন? তাঁহারা সন্তানদিগকে হয় কেতাবী শিক্ষা দিতে পারেন, নতুবা অশিক্ষিত অবস্থায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দিতে পারেন। তাঁহারা, যাঁহারা খরচ করিতে সমর্থ, সম্পূর্ণ শিক্ষাহীনতার চেয়ে কেতাবী শিক্ষাই বরং শ্রেয়ঃ মনে করেন। কারণ, বঙ্গে শিল্পশিক্ষা ও অন্যান্য বৃত্তি শিক্ষা দিবার জন্য যথেষ্ট বিদ্যালয় নাই; যাহা আছে তাহা পিত্তি-রক্ষা নীতির অনুযায়ী। সামান্য যাহা আছে, তাহাও কমিটি ছাঁটিয়া দিতে চান।

কমিটির প্রস্তাবে বেঙ্গল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কার্য্যকারিতা কিছু কমিবে। কুমিল্লার জরীপ বিদ্যালয় কমিটি উঠাইয়া দিতে বলেন। তাঁহারা গবন্মেণ্ট কমার্শ্যাল ইনষ্টিটিউটটি বন্ধ করিয়া দিতে বলিয়াছেন। মেডিক্যাল স্কুলগুলির সংখ্যাও কিছু কমাইয়া দিতে বলিয়াছেন। রেশমের ব্যবসার উন্নতি ও বিস্তৃতির জন্য যে-সব নার্সারী আছে, কমিটি তাহার মধ্যে কেবল মালদহের পিয়াস-বাড়ীর নার্সারীটি রাখিয়া আর সব বন্ধ করিয়া দিতে বলিয়াছেন। বস্ত্রবয়নের উন্নত প্রণালী শিখাইবার জন্য যে ভ্রমণকারী বয়নপ্রদর্শকদের দলগুলি আছে, কমিটি সেগুলি উঠাইয়া দিতে বলিয়াছেন। কাঁচরাপাড়া টেক্নিক্যাল স্কুল উঠাইয়া দিতে বলিয়াছেন। কলিকাতা টেক্নিক্যাল স্কুলও তাঁহাদের মতে রাখা অনাবশ্যক। খনিবিদ্যা শিখাইবার ক্লাসগুলি আপাততঃ বন্ধ রাখা তাঁহারা পরামর্শসিদ্ধ মনে করেন।

অকেজো কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অকেজো অবস্থাতে রাখিয়া দেওয়া হউক, আমাদের এরূপ কোন অভিলাষ নাই। কিন্তু বৃত্তিশিক্ষার জন্য যত প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাদিগকে উঠাইয়া না-দিয়া কেজো করা হউক, এবং তাহাদের সংখ্যা বাড়ান হউক, ইহাই আমাদের

প্রস্তাব। এক দিকে লাটসাহেব বলিবেন, তোমরা ছেলেদের কেবল কেতাবী শিক্ষা দাও, অন্যদিকে ব্যয়সংক্ষেপ কমিটি বৃত্তিশিক্ষার শিক্ষালয়গুলিকে হয় উঠাইয়া দিতে নয় পঙ্গু করিতে বলিবেন, ইহা সঙ্গত নহে।

কমিটি কলেজসমূহের ছাত্রছাত্রীদের বেতন বাড়াইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। সরকারী সব চাকুরিয়ার আয় কমিয়াছে, এবং আরও কমাইবার প্রস্তাব হইয়াছে। অন্য লোকদেরও আয় কমিয়াছে। এরূপ অবস্থায় তাহারা অধিকতর বেতন দিয়া সন্তানদিগকে কলেজে পড়াইবে, ইহা আশা করা কি সঙ্গত?

—

শান্তিনিকেতনে হস্তশিল্প

বিশ্বভারতীর অন্তর্গত শ্রীনিকেতনে নানাজাতীয় হস্তশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা গোড়া হইতেই আছে। এদেশে বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথ হস্তশিল্প শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ হিসাবে শান্তিনিকেতন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে গোড়া হইতেই চালাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে যাঁহারা খোঁজ রাখেন, তাঁহারা সকলেই ইহা জানেন।

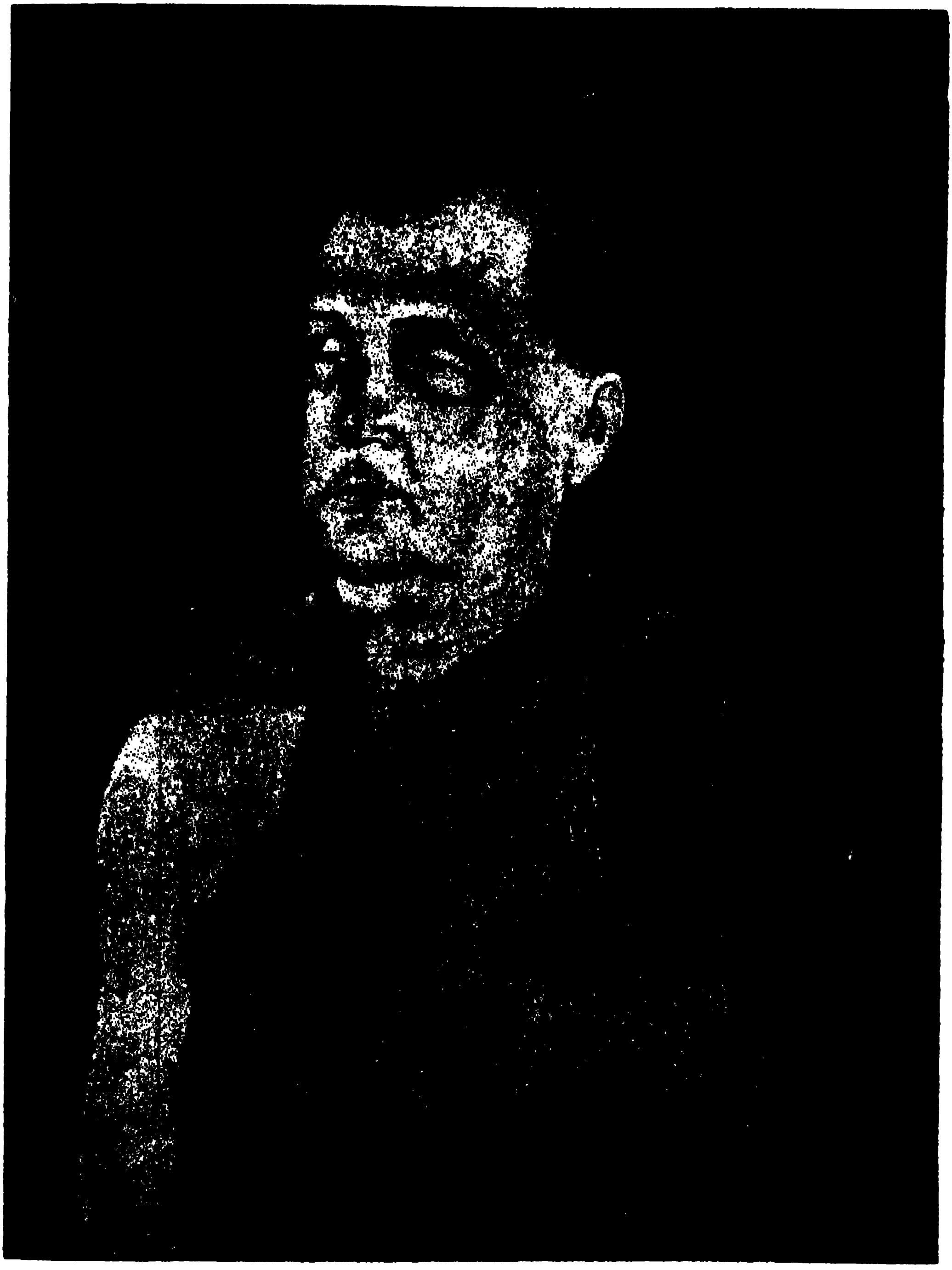
কয়েক মাস হইল শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীশ্বর সিংহ শিক্ষানৈতিক হস্তশিল্প সুইডেন হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া শান্তি-নিকেতনে যোগ দিয়াছেন, তাহাও পাঠকবর্গ অবগত আছেন। এই বিদ্যায় তিনি প্রথম বাঙালী যিনি অনেক দেশ ঘুরিয়া এই জাতীয় কাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা, শান্তি-নিকেতনের মত প্রতিষ্ঠানের ভিতর ঐ জাতীয় কাজের একটি আদর্শ কেন্দ্র স্থাপন করা এবং ক্রমে ঐ শিক্ষা সমগ্র দেশে ছড়াইয়া দেওয়া। আমরা যে-সকল রিপোর্ট পাইয়াছি, তাহাতে বুঝা যায়, যে, শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভেচ্ছু অনেকেই সেখানে যাইয়া শিখিতে চান। লক্ষীশ্বর বাবু গত পূজার ছুটীতে জনকয়েক শিক্ষক ও অন্য বয়স্কদের লইয়া ১৫ দিনের জন্য একটি ক্লাস খুলিয়াছিলেন। এই অল্পসময়ে ও অল্পব্যয়ে, যে-অনুপাতে কাজ হইয়াছে, তাহার ফল দেখিয়া এখন শিক্ষার্থীর খুবই ভীড় হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই কাজ শিখিবার চাহিদা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া চলিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দারুণ অর্থাভাব বশতঃ অতি সাধারণ ভাবেও কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা করা যাইতেছে না।

তাঁহার কাজের বিষয়ে গত নবেম্বর মাসের 'বিশ্বভারতী নিউস' কাগজে যে খবর বাহির হইয়াছে, তাহা অতিশয় আনন্দজনক ও উৎসাহপ্রদ। কিন্তু যদি অর্থাভাব বশতঃ দেশের এই সময়েও এই ধরণের কাজ না চলে, তবে তাহা নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। এ দেশের ধনী লোকদের কেহ কেহ যদি অর্থসাহায্য দিয়া এই প্রতিষ্ঠানটিকে গড়িয়া তুলিতে সহায়তা করেন, তবে তাঁহারা দেশের উপকার করিবেন এবং অনেকের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারিবেন। কারণ, লক্ষ্মীশ্বর বাবুর নিকট শিক্ষা পাইলে অনেকেই রোজগারী ও স্বাবলম্বী হইতে পারিবেন।

—

শান্তিনিকেতনে সংগীত শিক্ষা

শান্তিনিকেতনে সংগীত শিখাইবার বন্দোবস্ত বরাবরই আছে। কিছু কাল পূর্ব্বে পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী চলিয়া যাওয়ায় কিছু অসুবিধা হইয়াছিল। কয়েক মাস হইল, লক্ষ্ণৌয়ে দীর্ঘকাল বিশেষশিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায় সংগীতশিক্ষক নিযুক্ত হওয়ায় এই অসুবিধা দূর হইয়াছে। হেমেন্দ্র বাবু কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি সংগীতনিপুণ এবং সংগীতের সুশিক্ষক ত বটেনই, অধিকন্তু তাঁহার সাধারণ শিক্ষা ও সংস্কৃতিও আছে।



ভিক্ষু

শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩২শ ভাগ, ২য় খণ্ড — মাঘ, ১৩৩৯ — ৪র্থ সংখ্যা

বড়দিন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যাঁকে আমরা পরম মানব ব'লে স্বীকার করি তাঁর জন্ম ঐতিহাসিক নয়, আধ্যাত্মিক। প্রভাতের আলো সদ্য প্রভাতের নয়, সে চির-প্রভাতের। আমরা যখনই তাকে দেখি তখনি সে নূতন কিন্তু তবু সে চিরন্তন। নব নব জাগরণের মধ্যে দিয়ে সে প্রকাশ করে অনাদি আলোককে। জ্যোতির্ব্বিদ জানেন নক্ষত্রের আলো যেদিন আমাদের চোখে এসে পৌঁছয় তার বহু যুগ পূর্ব্বেই সে যাত্রা করেচে। তেমনি সত্যের দূতকে যেদিন আমরা দেখতে পাই সেইদিন থেকেই তাঁর বয়সের আরম্ভ নয়—সত্যের প্রেরণা রয়েচে মহাকালের অন্তরে। কোনো কালে অন্ত নেই তাঁর আগমনের এই কথা যেন জানতে পারি।

বিশেষ দিনে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠান ক'রে যাঁরা নরোত্তম তাঁদের শ্রদ্ধা জানানো সুলভে মূল্য চুকিয়ে দেওয়া। তিন শত চৌষট্টি দিন অস্বীকার ক'রে তিন শত পঁইষট্টিতম দিনে তাঁর স্তব দ্বারা আমরা নিজের জড়ত্বকে সান্ত্বনা দিই। সত্যের সাধনা এ নয়, দায়িত্বকে অস্বীকার করা মাত্র। এমনি ক'রে মানুষ নিজেকে ভোলায়। নামগ্রহণের দ্বারা কর্ত্তব্য রক্ষা করি, সত্যগ্রহণের দুরূহ অধ্যবসায় পিছনে পড়ে যায়। কর্ম্মের মধ্যে তাঁকে স্বীকার করলেম না, স্তবের মধ্যে সহজ নৈবেদ্য দিয়েই খালাস। যাঁরা এলেন বাহ্যিকতা থেকে আমাদের মুক্তি দিতে তাঁদেরকে বন্দী করলেম বাহ্যিক অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তির মধ্যে।

আজ আমি লজ্জা বোধ করেচি এমন ক'রে এক দিনের জন্যে আনুষ্ঠানিক কর্ত্তব্য সমাধা করবার কাজে আহূত হয়ে। জীবন দিয়ে যাঁকে অঙ্গীকার করাই সত্য, কথা দিয়ে তাঁর প্রাপ্য চুকিয়ে দেওয়া নিরতিশয় ব্যর্থতা।

আজ তাঁর জন্মদিন একথা বলব কি পঞ্জিকার তিথি মিলিয়ে? অন্তরে যে-দিন ধরা পড়ে না সে-দিনের উপলব্ধি কি কাল-গণনায়। যেদিন সত্যের নামে ত্যাগ করেচি, যেদিন অকৃত্রিম প্রেমে মানুষকে ভাই বলতে পেরেচি, সেইদিনই পিতার পুত্র আমাদের জীবনে জন্মগ্রহণ করেচেন, সেইদিনই বড়দিন, যে তারিখেই আসুক। আমাদের জীবনে তাঁর জন্মদিন দৈবাৎ আসে, কিন্তু ক্রুসে বিদ্ধ তাঁর মৃত্যু সে তো আসে দিনের পর দিন। জানি আজ বিশেষ দিনে দেশে দেশে গির্জ্জায় গির্জ্জায় তাঁর স্তবধ্বনি উঠচে, যিনি পরমপিতার

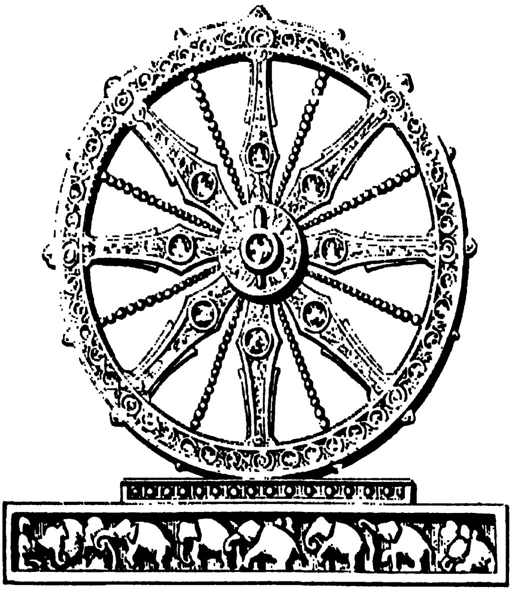
বার্ত্তা এনেচেন মানবসন্তানের কাছে—আর সেই গির্জ্জার বাইরে রক্তাক্ত হয়ে উঠচে পৃথিবী ভ্রাতৃহত্যায়। দেবালয়ে স্তবমন্ত্রে তাঁকে আজ যারা ঘোষণা করচে, তারাই কামানের গর্জ্জনে তাঁকে অস্বীকার করচে, আকাশ থেকে মৃত্যুবর্ষণ ক'রে তাঁর বাণীকে অতি ভীষণ ব্যঙ্গ করচে। লোভ আজ নিদারুণ, দুর্ব্বলের অন্নগ্রাস আজ লুণ্ঠিত, প্রবলের সামনে দাঁড়িয়ে খৃষ্টের দোহাই দিয়ে মার বুকে পেতে নিতে সাহস নেই যাদের, তারাই আজ পূজাবেদীর সামনে দাঁড়িয়ে মৃত্যুশূলবিদ্ধ সেই কারুণিকের জয়ধ্বনি করচে অভ্যস্ত বচন আবৃত্তি ক'রে। তবে কিসের উৎসব আজ? কেমন ক'রে জানব খৃষ্ট জন্মেচেন পৃথিবীতে। আনন্দ করব কী নিয়ে। একদিকে যাঁকে মারচি নিজের হাতে, আর একদিকে পুনরুজ্জীবন প্রচার করব শুধুমাত্র কথায়। আজও তিনি মানুষের ইতিহাসে প্রতিমুহূর্ত্তে ক্রুসে বিদ্ধ হচ্চেন।

তিনি ডেকেছিলেন মানুষকে পরমপিতার সন্তান ব'লে, ভাইকে মিলতে বলেছিলেন ভাইয়ের সঙ্গে। প্রাণোৎসর্গ করলেন এই মানবসত্যের বেদীতে। চিরদিনের জন্যে এই মিলনের আহ্বান রেখে গেলেন আমাদের কাছে।

তাঁর আহ্বানকে আমরা যুগে যুগে প্রত্যাখ্যান করেচি। বেড়েই চল্‌ল তাঁর বাণীর প্রতিবাদ করবার অতি বিপুল আয়োজন।

বেদমন্ত্রে আছে তিনি আমাদের পিতা, পিতা নোঽসি। সেই সঙ্গে প্রার্থনা আছে, পিতা নো বোধি, তিনি যে পিতা এই বোধ যেন আমাদের মনে জাগে। সেই পিতার বোধ যিনি দান করতে এসেছিলেন, তিনি ব্যর্থ হয়ে উপহসিত হয়ে ফিরচেন আমাদের দ্বারের বাইরে—সেই কথাকে গান গেয়ে স্তব ক'রে চাপা যেন না দিই। আজ পরিতাপ করবার দিন, আনন্দ করবার নয়। আজ মানুষের লজ্জা সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত ক'রে। আজ আমাদের উদ্ধত মাথা ধূলায় নত হোক, চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে যাক। বড়দিন নিজেকে পরীক্ষা করবার দিন, নিজেকে নম্র করবার দিন।

শান্তিনিকেতন
২৫ ডিসেম্বর ১৯৩২



হিন্দুর অধঃপতন *

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ



Copyright, Archaeological Survey of India. ১নং চিত্র

মথুরায় (কাটারা) প্রাপ্ত কুষাণ-যুগের বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি

নানাবিধ বিদ্যার মধ্যে ইতিহাসে সাহিত্য এবং বিজ্ঞান উভয় বিদ্যার লক্ষণই বিদ্যমান আছে। ইতিহাসের এক উদ্দেশ্য প্রাচীন কালের ঘটনার অবিকল বিবরণ সংগ্রহ। এই হিসাবে অন্যান্য প্রকার কাহিনীর মত ঐতিহাসিক কাহিনীও সাহিত্য শ্রেণীভুক্ত। আবার ঘটনার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক বিচার-প্রণালী অনুসৃত হয়, এবং ঐতিহাসিক বিবরণে ঘটনাপরম্পরা কার্য্য-কারণ সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত করিবার চেষ্টা করা হয়। এই হিসাবে ইতিহাস বিজ্ঞানের সামিল। সাধারণ সাহিত্যের মত সরস ভাষায় লিখিত পুরাতন কাহিনী পাঠকের মনোরঞ্জন করিতে পারে; কিন্তু পুরাতন ঘটনা-পরম্পরা কার্য্যকারণসূত্রে গ্রথিত করিয়া বিজ্ঞানের ছাঁচে ঢালিয়া না সাজাইতে পারিলে, সেই ইতিহাস কোন কাজে আসে না; সেই ইতিহাস সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার রহস্য উদ্‌ঘাটনে এবং ভবিষ্যতে নিয়তি সমাজকে কোন্ পথে চালিত করিতে পারে তাহা নির্দ্ধারণে সহায়তা করিতে পারে না। আমাদের দেশের হিন্দুর ইতিহাস গড়িতে হইলে তাহার প্রধান বিচার্য্য প্রশ্ন, হিন্দুর অধঃপতনের কারণ কি? এখানে আমাদের দেশ পদ সমস্ত ভারতবর্ষ অর্থে ব্যবহৃত হইল না, আর্য্যাবর্ত্ত অর্থে মাত্র ব্যবহৃত হইল; কেন-না আর্য্যাবর্ত্তের এবং দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসের ধারা অনেকটা স্বতন্ত্র খাতে প্রবাহিত। সুতরাং আপনারা দয়া করিয়া স্মরণ রাখিবেন, এই প্রস্তাবে হিন্দু শব্দে কেবল হিন্দুস্থানের হিন্দু বুঝায়।

* প্রয়াগে প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের দশম অধিবেশনে ইতিহাস-শাখার সভাপতির অভিভাষণ (১১ই পৌষ, ১৩২৯)।

আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দুদিগের অধঃপতনের কারণ কি, এই প্রশ্ন সম্বন্ধে এক আপত্তি হইতে পারে, আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দুরা যে অধঃপতিত তাহারই বা প্রমাণ কি? রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা অধঃপতনের একমাত্র নিদর্শন নহে। রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা অনেক সময় যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের মত আকস্মিক ঘটনার উপর নির্ভর করে। জাতীয় জীবনের অন্যান্য বিভাগে যে জাতি উন্নত, কেবল রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার জন্য সেই জাতিকে অধঃপতিত বলা যায় না। জাতীয় চরিত্রের অবনতিই জাতীয় অধঃপতনের প্রধান নিদর্শন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আকস্মিক ঘটনার স্থায়ী ফল জাতীয় চরিত্রের অবনতি সূচিত করে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দের শেষভাগে ঘোরের মুইজুদ্দীন মোহম্মদ সাম এবং তাঁহার সেনানায়কগণ কর্ত্তৃক আর্য্যাবর্ত্ত-বিজয় আকস্মিক ঘটনা বলিয়াই মনে করিতে হইবে। কিন্তু ইহার ফল স্থায়ী হইয়াছিল। তারপর সাত শত বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দুরা আর কখনও মাথা তুলিতে পারে নাই। অথচ তাহার পূর্ব্বে গ্রীক্-বিজয়ের পরে, শক-কুষাণ বিজয়ের পরে, হূন বিজয়ের পরে, হিন্দুরা পুনঃ পুনঃ প্রবল রাজ্য এবং সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। পক্ষান্তরে ত্রয়োদশ শতাব্দে মুসলমান-বিজয়ের পরে দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরা চতুর্দ্দশ শতাব্দে কর্ণাটে বিজয়নগর সাম্রাজ্য, এবং অষ্টাদশ শতাব্দে মারাঠা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। সুতরাং দ্বাদশ শতাব্দীর পরে আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দুদিগের চরিত্রেরও যে একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেহ কেহ বলিতে পারেন, মুসলমান-বিজয়ই এই পরিবর্ত্তনের কারণ। কিন্তু গ্রীক-বিজয়ের বা শক-বিজয়ের বা কুষাণ-বিজয়ের পর আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দুদিগের এইরূপ দশা ঘটে নাই কেন? মুসলমান-বিজয়ের পর দাক্ষিণাত্যের হিন্দুদিগের এইরূপ স্থায়ী পতন হয় নাই কেন? মুসলমান-বিজয়ের পর দাক্ষিণাত্যের হিন্দুদিগের মাথা তুলিবার যেরূপ সুযোগ সময়-সময় উপস্থিত হইয়াছিল, আর্য্যাবর্ত্তে তেমন সুযোগের অভাব ছিল না। তবে দুই ভাগের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস এমন বিভিন্ন আকার ধারণ করিল কেন?

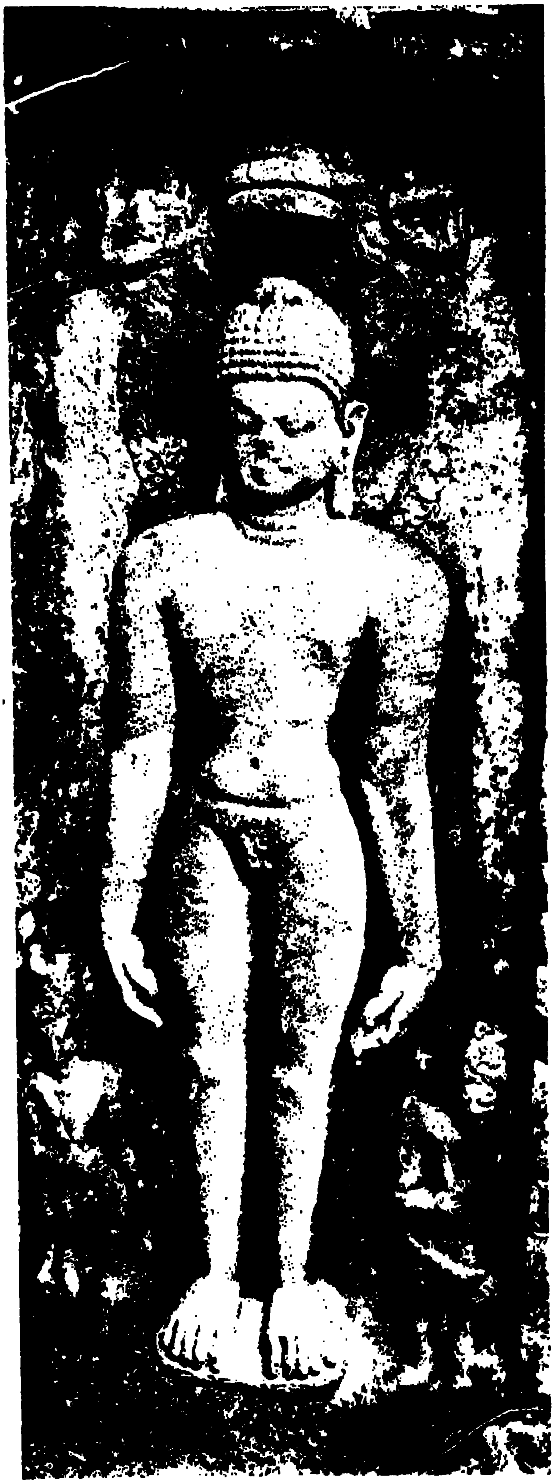


 ২নং চিত্র

বোধগয়ায় প্রাপ্ত মথুরার শিল্পীর গঠিত ৩৮৩-৩৮৪ খৃষ্টাব্দের বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি
(ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম)

অবশ্যই ইহার একটি গূঢ় আভ্যন্তরীণ কারণ আছে। এইরূপ কোন আভ্যন্তরীণ কারণ আবিষ্কার করিতে হইলে আকস্মিক্ ঘটনাবহুল রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের আশ্রয় না করিয়া সভ্যতার ইতিহাস অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

হিন্দুসভ্যতার ইতিহাসের বিভিন্ন শাখার মধ্যে আমরা সংক্ষেপে প্রতিমা-শিল্পের ইতিহাস আলোচনা করিব; কারণ পূজার জন্য গঠিত প্রতিমায় শুধু শিল্পীর কৌশলের নহে, উপাসক-সাধারণের আধ্যাত্মিক ভাবেরও পরিচয় পাওয়া যায়। আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দুদের প্রতিমা-পূজা ঠিক পৌত্তলিকতা নহে; অর্থাৎ প্রতিমাকে দেবতা বা ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা নহে। হিন্দুর দেবদেবীর এবং জিন, বুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের প্রতিমা মূলতঃ উপাস্যের প্রতিমা নহে, উপাসনা-রীতির আদর্শস্বরূপ। সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুর মতে যোগ বা ধ্যান-ধারণা সমাধি মোক্ষদায়ক জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। জৈনদিগের জিন বা তীর্থঙ্করগণ ধ্যান করিয়া কেবল-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন; বৌদ্ধদিগের বুদ্ধগণও ধ্যান করিয়া সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন। সাংখ্য-যোগীর প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞান লাভের উপায় ধ্যান-ধারণা-সমাধি; বৈদান্তিকের জীবাত্মা-পরমাত্মার অভেদজ্ঞান লাভের উপায়ও ধ্যান-ধারণা সমাধি। বৌদ্ধের উপাস্য বুদ্ধমূর্ত্তি বা বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি, এবং জৈনের উপাস্য জিন মূর্ত্তি ধ্যানমগ্ন সাধকের মূর্ত্তি। প্রতিমার বিবরণে যাহাকে ধ্যান মুদ্রা বলে তাহার প্রধান লক্ষণ, পর্য্যঙ্ক আসনে অর্থাৎ এক এক জানুর উপর অপর পা রাখিয়া এবং ক্রোড়ে হাতের উপর হাত রাখিয়া উপবেশন; মস্তক, গ্রীবা এবং শরীর সমসূত্রে রক্ষণ; এবং নাসাগ্রবদ্ধ দৃষ্টি। এই সকল লক্ষণের মধ্যে দণ্ডায়মান জিন প্রতিমায় এবং বুদ্ধ প্রতিমায়, এবং অন্যপ্রকারে উপবিষ্ট বুদ্ধ প্রতিমায়, নাসাগ্রবদ্ধ দৃষ্টি সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং শিল্পে নাসাগ্রবদ্ধ দৃষ্টিকেই ধ্যানের মুখ্য লক্ষণ মনে করিতে হইবে। ভক্তিমার্গী বৈষ্ণবের প্রাচীন বাসুদেব মূর্ত্তিতে, শৈবের প্রাচীন শিবমূর্ত্তিতে এবং শাক্তের প্রাচীন দেবী মূর্ত্তিতেও সর্ব্বদাই ধ্যানযোগীর নাসাগ্রবদ্ধ দৃষ্টি লক্ষিত হয়। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, বৌদ্ধ এবং জৈনদিগের ন্যায় শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণবেরাও ধ্যানযোগ সাধকেরই



৩নং চিত্র

রাজগিরের বৈভারগিরির উপরস্থ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দের জিন মূর্ত্তি

উপাসক। দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন দেবদেবীর মূর্ত্তির দৃষ্টি নাসাগ্রবদ্ধ নহে, বহির্মুখ। দাক্ষিণাত্যের আধ্যাত্মিক হিসাব (spiritual outlook) স্বতন্ত্র।

আর্য্যাবর্ত্তের ভাস্কর্য্যের সুদীর্ঘ ইতিহাসে পর পর



Copyright, Archaeological Survey of India. ৪ নং চিত্র
রাণুসিরের উদয়গিরির উপরস্থ জিন পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি

তিনটি কল্প বা মহাযুগ দেখা যায়। প্রথম কল্প, পঞ্জাব এবং সিন্ধুর প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভাস্কর্য্য। পঞ্জাবের অন্তর্গত হরপ্পায় এবং সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত মোহেঞ্জোদাড়োতে এই কল্পের শিল্পের অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই দুইটি স্থানে আবিষ্কৃত মুদ্রায় বা সিলমোহরে মনুষ্যাকার উপাস্য দেবতার যত চিত্র পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকটি যোগাসনে উপবিষ্ট, এবং আর কয়েকটি ধ্যানরত জৈন তীর্থঙ্করগণের মত কায়োৎসর্গ রীতিতে (দুই পার্শ্বে দুই বাহু ঝুলাইয়া) দণ্ডায়মান। মোহেঞ্জোদাড়োতে একখানি মাত্র পূর্ণাঙ্গ প্রতিমার (statue in the round) বক্ষঃস্থলের কতক অংশসহ মস্তক পাওয়া গিয়াছে। এই মস্তকে চক্ষুদ্বয়ের দৃষ্টি নাসাগ্রবদ্ধ। সুতরাং পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে হরপ্পায় এবং মোহেঞ্জোদাড়োতে ধ্যাননিষ্ঠ যোগীর ভঙ্গীতে উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান প্রতিমার পূজা প্রচলিত ছিল এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য।

দ্বিতীয় কল্প—খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয়, দ্বিতীয় এবং প্রথম শতাব্দের মৌর্য্য এবং শুঙ্গ শিল্প। মৌর্য্যশিল্পের নিদর্শনের মধ্যে এ যাবৎ প্রতিমা-পূজার কোন চিত্র পাওয়া যায় নাই। শুঙ্গশিল্পের নিদর্শনে—ভারহুতের বৌদ্ধস্তূপের বেদিকায় (বেড়ায়), বোধগয়ার বোধিবৃক্ষের প্রাচীন বেদিকায়, এবং সাঞ্চীর প্রধান স্তূপের তোরণ-চতুষ্টয়ে বুদ্ধের পূজার অনেক চিত্র আছে। কিন্তু এই সকল চিত্রে বুদ্ধের প্রতিমা নাই; শূন্য সিংহাসন, পদচিহ্ন বা ধর্ম্মচক্র বুদ্ধ প্রতিমার স্থানে পূজিত হইতেছে। উড়িষ্যার অন্তর্গত ভুবনেশ্বরের নিকটবর্ত্তী উদয়গিরি এবং খণ্ডগিরিতে জৈন সাধুগণের বাসের নিমিত্ত খোদিত যে-সকল গুহাগৃহ আছে তাহাদের সম্মুখভাগে অঙ্কিত চিত্রনিচয়ের মধ্যেও কোন জিনের মূর্ত্তি দেখা যায় না। তৎকালের বৈষ্ণবেরাও বোধ হয় বিষ্ণুর বা বাসুদেবের মূর্ত্তির পূজা করিতেন না। প্রাচীন বিদিশার উপকণ্ঠে, বর্ত্তমান বেসনগরে, খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দে প্রতিষ্ঠিত ভগবান বাসুদেবের দুইটি গরুড়-ধ্বজের এবং প্রদ্যুম্নের একটি মকরধ্বজের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। বেসনগরে তালপত্রবিশিষ্ট আর একটি পাষাণের স্তম্ভচূড়াও পাওয়া গিয়াছে। শ্রীমান অচ্যুত-কুমার মিত্র দেখাইয়াছেন এই তালপত্র সঙ্কর্ষণের বা বলরামের ধ্বজ।* প্রাচীন ভাগবত বা বৈষ্ণবেরা বাসুদেব সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ এবং প্রদ্যুম্ন এই চারিটি ব্যূহের বা বিষ্ণুরূপী মহাপুরুষের পূজা করিতেন। এই চারিটি ব্যূহের মধ্যে বেসনগরে শুঙ্গ-যুগের বাসুদেবের গরুড়ধ্বজ, সঙ্কর্ষণের তালপত্রধ্বজ, এবং প্রদ্যুম্নের মকরধ্বজ পাওয়া গিয়াছে, অথচ বিষ্ণুমূর্ত্তির কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। সুতরাং অনুমান করিতে হইবে, শুঙ্গ-যুগে বৈষ্ণবেরা

* *Morning Star* (Patna, May-June, 1932, pp. 184 and 187.

বাসুদেবাদির ধ্বজের প্রতিষ্ঠা এবং পূজা করিতেন, প্রতিমার পূজা করিতেন না। বৈদিক ধর্ম্মের প্রভাব বোধ হয় মৌর্য্য এবং শুঙ্গ যুগে প্রতিমাপূজা অপ্রচলনের কারণ। বৈদিকধর্ম্মে দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু যজ্ঞশালায় প্রতিমাস্থাপন করিয়া তাহার পূজা করিবার বিধান নাই। সুতরাং বৈদিক ধর্ম্ম যখন প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল তখন পূজার জন্য প্রতিমা গড়নের প্রথা রহিত হওয়াই সম্ভব। মৌর্য্য এবং শুঙ্গ যুগের যক্ষ-যক্ষিণীর এবং নাগ-নাগিনীর অনেক মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহারা নিম্নস্তরের দেবতা, এবং ভারহুতের বেদিকায় যক্ষের এবং নাগের মূর্ত্তি চামরহস্তে সেবকের বা জোড়হস্তে উপাসকের আকারে গঠিত হইয়াছে।

তৃতীয় কল্প—খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে গান্ধার, পঞ্জাব এবং মথুরায় শকরাজ মোগ এবং অজ কর্ত্তৃক শকপ্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা অবধি এই কল্পের সূত্রপাত। এই শক-যুগে মথুরায় জিনমূর্ত্তির গড়ন এবং সম্ভবতঃ গান্ধারে বুদ্ধমূর্ত্তির গড়ন আরম্ভ হইয়াছিল। শতাব্দীকাল পরে, কুষাণ সম্রাটগণের আমলে, মথুরায় মূর্ত্তিশিল্পের বিশেষ অনুশীলন দেখা যায়। খৃষ্টাব্দের তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত গান্ধার এবং মথুরা ভিন্ন আর্য্যাবর্ত্তের আর কোথাও বুদ্ধ এবং জিন মূর্ত্তি প্রস্তুত হইত না; মথুরায় নির্ম্মিত মূর্ত্তি লইয়া গিয়া বোধ হয় আদৌ আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বভাগে প্রতিমাপূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। মথুরায় কুষাণ-যুগের শিল্পীরা শাস্ত্রানুসারে ধ্যানযোগীর প্রতিমা গড়িতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কুষাণ-যুগের বুদ্ধ এবং জিন মূর্ত্তি প্রাণশূন্য এবং ভাবশূন্য। মথুরায় শক-কুষাণ যুগের মূর্ত্তিশিল্পের এই দীনতা অনভিজ্ঞতার ফল। ধ্যানমগ্ন জীবন্ত প্রতিমা গড়ন সহজসাধ্য নহে। তার উপর স্বাভাবিক মনুষ্যাকৃতির অনুকরণে বুদ্ধের বা জিনের প্রতিমা গড়ন সম্ভব ছিল না; প্রতিমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শাস্ত্রোক্ত মহাপুরুষের লক্ষণানুযায়ী করা আবশ্যক ছিল। এই সকল লক্ষণের মধ্যে অনেকগুলিই স্বভাববিরুদ্ধ। প্রাগৈতিহাসিক যুগের ধ্যানযোগীর মূর্ত্তির সহিত মথুরায় ভাস্করগণের কোন পরিচয় ছিল কি-না বলা যায় না। একেবারে পরিচয় না থাকিলে, অথবা ঐ সম্বন্ধে কোন জনশ্রুতি না থাকিলে, তাঁহারা যে বৌদ্ধধর্ম্মের এবং জৈনধর্ম্মের জন্মভূমি প্রাচ্যভারতের প্রাচীন রীতি লঙ্ঘন



 ৪নং চিত্র

রাজগিরের সোনাগিরির উপরস্থ জিন ঋষভের মূর্ত্তি

করিয়া জিনের বা বুদ্ধের মূর্ত্তিগড়নে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিতে পারিতেন এমন মনে হয় না। কিন্তু মোটের উপর শক-কুষাণ যুগের জিনের এবং বুদ্ধের প্রতিমা মথুরার ভাস্করগণের নূতন সৃষ্টি মনে করিতে হইবে। এই যুগের প্রতিমায় বাহ্যলক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিলেও প্রাণও নাই, ভাবও নাই। তিন-চারি শত

বৎসর অবিশ্রান্ত চেষ্টার পর মথুরার ভাস্করগণ জিন এবং বুদ্ধ প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে চন্দ্রগুপ্ত নামক মগধের একজন রাজা প্রাচ্যভারতে প্রয়াগ এবং অযোধ্যা



Copyright, Archaeological Survey of India. ৬নং চিত্র
বারাণসীতে প্রাপ্ত আনুমানিক ৪০০ খৃষ্টাব্দের গোবর্দ্ধনধারী কৃষ্ণমূর্ত্তি

পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটি সুবৃহৎ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত (তৎপরিগৃহীত) উত্তরাধিকারী সমুদ্রগুপ্ত পিতৃরাজ্যকে বিরাট সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যলাভের শতাব্দীরও অধিককাল পূর্ব্বে বোধ হয় কুষাণ-সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়াছিল; এবং তাহার স্থানে মথুরায়, পঞ্জাবে এবং গান্ধারে শক এবং কুষাণ বংশীয় নরপতিগণের শাসিত কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্য অভ্যুদিত হইয়াছিল। এলাহাবাদের দুর্গের ভিতরকার অশোকস্তম্ভের গায়ে সমুদ্রগুপ্তের যে সুদীর্ঘ প্রশস্তি আছে তাহাতে কথিত হইয়াছে দৈবপুত্রষাহি—ষাহানুষাহি—শকমুরুণ্ডগণ সমুদ্রগুপ্তের পদানত হইয়াছিলেন। কুষাণরাজগণের সুবর্ণ মুদ্রার একদিকে রাজার যে ঢঙের প্রতিকৃতি দেখা যায়, সমুদ্রগুপ্তের সুবর্ণ মুদ্রার একদিকে তাঁহার সেই ঢঙেরই প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে। কুষাণরাজের প্রতিকৃতি প্রাণহীন; কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের প্রতিকৃতি প্রাণের স্পন্দনে পরিপূর্ণ। সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুসভ্যতার সকল অঙ্গেই প্রাণের সঞ্চার দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রতিমাশিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মথুরার কুষাণ যুগের উৎকৃষ্ট বুদ্ধ প্রতিমার সহিত মথুরায় নির্ম্মিত গুপ্ত-যুগের প্রাচীনতম প্রতিমা তুলনা করিলে মনে হয় পাষাণের সিদ্ধার্থ গৌতম যেন সম্বোধিসুধাপানে উদ্বুদ্ধ হইয়া নির্ব্বাণের পথ দেখাইবার জন্য জনসমাজে আবির্ভূত হইয়াছেন।

আমাদের প্রথম চিত্র (১ নং) কুষাণ-যুগের একখানি উৎকৃষ্ট বুদ্ধ প্রতিমার প্রতিকৃতি। পাদদেশের লিপিতে প্রতিমাকে বোধিসত্ত্ব বলা হইয়াছে। সম্বোধির সাধক বোধিসত্ত্ব নামে কথিত হয়েন, এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে তিনি বুদ্ধে পরিণত হয়েন। এই প্রতিমার পদদ্বয় পর্য্যঙ্কবদ্ধ; কিন্তু চক্ষু দুইটি অর্দ্ধনিমীলিত হইলেও আসনানুরূপ নাসাগ্রবদ্ধদৃষ্টি নহে। মুখমণ্ডল ভাবহীন। তাহাতে ধ্যানযোগীর চিত্তের অন্তর্ম্মুখীনতা প্রতিবিম্বিত হয় নাই। এই অভাব পরিপূর্ণ হইয়াছে ২নং চিত্রে। এই বোধিসত্ত্ব প্রতিমা মথুরা অঞ্চলের লাল পাথরে মথুরার রীতিতে গঠিত; কিন্তু বুদ্ধগয়ায় পাওয়া গিয়াছিল, এবং কলিকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে রাখা হইয়াছে। এই প্রতিমার পাদপীঠে ৬৪ সম্বৎ অর্থাৎ ৩৮৩-৩৮৪ খৃঃ সম্পাদন কাল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রতিমার দৃষ্টি নাসাগ্রবদ্ধ, এবং ইহার প্রসন্ন-গম্ভীর মুখমণ্ডলে ধ্যাননিমজ্জিত চিত্তবৃত্তি সুন্দর প্রতিফলিত হইয়াছে। এই প্রতিমার বক্ষঃস্থল বিশাল (ব্যূঢ়োরস্ক), এবং ইহার স্কন্ধ বৃষের স্কন্ধের ন্যায় সুগঠিত। সারনাথে গুপ্ত-যুগের যে-সকল বুদ্ধপ্রতিমা পাওয়া গিয়াছে তাহারা অপেক্ষাকৃত

ক্ষীণাঙ্গ, তাহাদের অনেকের অঙ্গ অধিকতর কমনীয়, এবং মুখের ভাব আরও যেন গভীর।

জৈনদিগের জিন প্রতিমা মূলতঃ বুদ্ধ প্রতিমা হইতে অভিন্ন। কিন্তু বুদ্ধ প্রতিমা যেমন পর্য্যঙ্কাসন ভিন্ন অন্য ভাবে উপবিষ্ট এবং দক্ষিণ হস্তের দ্বারা বর বা অভয়দানে রত এবং সহজভাবে দাঁড়ান দেখা যায়, জিন প্রতিমায় এই সকল বৈচিত্র্য নাই। দাঁড়ান জিন প্রতিমার একই ভঙ্গী, কায়োৎসর্গমুদ্রা। ৩নং চিত্র রাজগিরির অন্তর্গত বৈভারগিরির উপরে একটি ভগ্ন মন্দিরে রক্ষিত একখানি দাঁড়ান জিন প্রতিমার প্রতিকৃতি। গড়ন-রীতি দেখিলে মনে হয়, এই প্রতিমাখানি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দে গঠিত হইয়াছিল। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দুই পার্শ্বে দুই বাহু ঝুলাইয়া সটান দাঁড়ান থাকিলেও এই প্রতিমায় লালিত্যের অভাব নাই; অনেক অঙ্গে ঢল-ঢল ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে।

গুপ্ত-যুগের পর, অর্থাৎ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে মূর্ত্তির ভাবসম্পদের ক্রমশঃ হ্রাস আরম্ভ হয়, কিন্তু মূর্ত্তি এবং মন্দির উভয়েরই অলঙ্কারের এবং আড়ম্বরের বৃদ্ধি হইতে থাকে। সুতরাং গুপ্ত-যুগের শিল্পকে সাত্ত্বিক শিল্প, এবং পরবর্ত্তী মধ্যযুগের শিল্পকে রাজস শিল্প বলা যাইতে পারে। এই শেষোক্ত যুগের প্রতিমার নিদর্শনস্বরূপ ৪নং চিত্রে রাজগিরের উদয়গিরির একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত একখানি পার্শ্বনাথের প্রতিকৃতি দেওয়া হইল। প্রতিমাখানি খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে গঠিত বলিয়া মনে হয়। এই প্রতিমায় গুপ্ত-যুগের প্রতিমার অঙ্গসৌষ্ঠব নাই, এবং দৃষ্টি নাসাগ্রবদ্ধ হইলেও মুখমণ্ডলে মনের অন্তর্মুখীনতা তেমন পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ পায় নাই। নমুনাস্বরূপ এই যে কয়খানি প্রতিমার চিত্র দেওয়া হইল তাহা হইতে বুঝা যাইবে হিন্দুর উপাস্য প্রতিমা দেবতার বা মহাপুরুষের সাঙ্কেতিক চিহ্ন মাত্র নহে, এবং সৌন্দর্য্য তাঁহার উপসর্গ নহে। হিন্দুরা শুধু ভাবের উপাসক ছিলেন না, সৌন্দর্য্যেরও উপাসক ছিলেন। "তিথিতত্ত্বে" রঘুনন্দন "হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র" হইতে এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

> অর্চ্চকস্য তপোযোগাদর্চ্চনস্যাতিশায়নাৎ।
> আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বানাং দেবঃ সান্নিধ্যমৃচ্ছতি॥

"পূজকের তপস্যার এবং যোগের বলে, পূজার প্রচুর আয়োজন থাকিলে, এবং প্রতিমা অভিরূপ বা সুন্দর হইলে, দেবতা পূজকের সাক্ষাতে আগমন করেন।"

সোমসেন ভট্টারক নামক একজন জৈন লেখকের খৃষ্টীয় ১৬১০ সালে সংগৃহীত "ত্রৈবর্ণিকচর" নামক নিবন্ধে এই বচনটি আছে—

> "ভাবরূপানুবিদ্ধাঙ্গং কারয়েৎ বিম্বমর্হতঃ"

"অর্হতের (জিনের) প্রতিমা ভাবে এবং রূপে ভরপুর করিয়া গড়িতে হইবে।"

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দের শেষভাগে মুসলমান আক্রমণকারিগণ কর্ত্তৃক আর্য্যাবর্ত্তের প্রধান প্রধান রাজ্যগুলি বিজিত হইলে হিন্দুস্থানে, বিহারে এবং বাংলায় আড়ম্বরের সহিত মন্দির প্রতিষ্ঠা বোধ হয় অনেক দিন বন্ধ ছিল। কিন্তু ইহার পরও আড়াই শত বৎসরের অধিককাল উড়িষ্যা স্বাধীন হিন্দুরাজাদিগের শাসনাধীন ছিল, এবং উড়িষ্যার তীর্থক্ষেত্রে পূর্ব্ববৎ মন্দির প্রতিষ্ঠাও চলিতেছিল। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দে গঙ্গা-বংশীয় রাজা প্রথম নরসিংহদেব কোণার্কের বিশাল সূর্য্যমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই মন্দিরের মন্দিরাংশ (বিমান) ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও বিরাট মুখমণ্ডপ এখনও দণ্ডায়মান আছে। এই মণ্ডপ আর্য্যাবর্ত্তের স্থাপত্যের একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহার আয়তন যেমন বিশাল, কারুকার্য্য তেমনই চমৎকার। এই মন্দিরে সংলগ্ন সূর্য্য প্রতিমার মধ্যে প্রাচীন ভাস্কর্য্যের ভাবের ধারা ক্ষীণ আকার ধারণ করিয়া থাকিলেও বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু এই মন্দিরের অলঙ্করণের জন্য নির্ম্মিত নায়ক-নায়িকার অশ্লীলভঙ্গী হিন্দুর রুচির অধোগতি সূচিত করে।

পুরীর মন্দিরের মাদলাপঞ্জীর অন্তর্গত রাজপঞ্জীমতে গঙ্গরাজবংশ লুপ্ত হইবার পর, ১৪৩২ খৃষ্টাব্দে কপিলেন্দ্রদেব উড়িষ্যার সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। পুরীর বর্ত্তমান রাজা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দেবের অনুগ্রহে আমি তিন খণ্ড স্বতন্ত্র রাজপঞ্জী দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। এই তিনখানি পঞ্জীর মতেই কপিলেন্দ্রদেবের উত্তরাধিকারী পুরুষোত্তম দেব (খৃষ্টাব্দ ১৪৭৯-১৫০৪ রাজ্যকাল) পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের ভোগমণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; এবং সত্যবাদী বা সাক্ষীগোপালের মূর্ত্তি

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পুরুষোত্তমদেবের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী সুপ্রসিদ্ধ প্রতাপরুদ্রদেব (খৃষ্টাব্দ ১৫০৪-১৫৩৩ রাজত্ব) কটকের অদূরবর্ত্তী মহানদীর একটি দ্বীপের উপর ধবলেশ্বর শিবের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পুরীর ভোগমণ্ডপের এবং ধবলেশ্বরের মন্দিরের সংলগ্ন মূর্ত্তিনিচয়ের সহিত এবং সাক্ষীগোপালের প্রতিমার সহিত প্রাচীন প্রতিমার তুলনা করিলে দেখা যায়, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দে প্রতিমাশিল্পের অত্যাশ্চর্য্য অধঃপতন ঘটিয়াছিল। এই সকল প্রতিমা ধ্যানমগ্ন নহে, এবং ইহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রাণের স্পন্দন বা লালিত্যের চিহ্ন নাই। মুসলমানের আধিপত্য লাভের সহিত এই অধোগতির কোন কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ দেখা যায় না; কেন-না, পুরুষোত্তমদেবের এবং প্রতাপরুদ্রদেবের সময় পর্য্যন্ত স্বাধীন উড়িষ্যা রাজ্য দক্ষিণে গোদাবরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মাদলাপঞ্জীর রাজপঞ্জীর মতে পুরুষোত্তমদেবের বিজয়ী সেনা কাঞ্চী পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিল, এবং প্রতাপরুদ্রদেব গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহর উড়িষ্যা-বিজয়ের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দে হিন্দুরাজার শাসিত উড়িষ্যার মত মুসলমান সুলতানের শাসিত বিহারের প্রতিমাশিল্পও অধঃপাতে গিয়াছিল। প্রথম মুসলমান আক্রমণকারীরা অনেক মন্দির ও মূর্ত্তি নষ্ট করিয়া থাকিলেও পরবর্ত্তী মুসলমান নরপতিগণ যে সময়-সময় হিন্দুমন্দির প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিতেন এমন প্রমাণের অভাব নাই। রাজগিরে প্রাপ্ত ১৪১২ বিক্রমসম্বতের (১৩৫৪-৫৫ খৃষ্টাব্দের) একখানি শিলালিপিতে কথিত হইয়াছে :—

> সকলমহীপালচক্রচূড়ামাণিক্যমরীচিমঞ্জরীপিংজরিতচরণ সরোজে
> সুরত্রাণ শ্রীনাহিপেরোজেমহীমনুশাসতি।
> তদীয়নিয়োগাৎ মগধেষু মলিক বয়োনামমণ্ডলেশ্বর সময়ে।·
> তদীয় সেবকসহ নাসরুদ্দীন সাহায্যেন।।

অর্থাৎ, দিল্লীশ্বর সুলতান ফিরোজশাহ তুঘলাকের রাজত্বকালে, মালিক বয় যখন মগধের শাসনকর্ত্তা, সেই সময়ে মালিক বয়ের কর্ম্মচারী শাহ নাসিরুদ্দীনের সহায়তায় বিহারপুর নিবাসী বচ্ছরাজ এবং দেবরাজ রাজগিরের অন্তর্গত বিপুলগিরির উপর পার্শ্বনাথের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ১৪১২ বিক্রমসম্বতের আষাঢ় মাসে (১৩৫৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে) তাহা উৎসর্গ করিয়াছিলেন।* বিপুলগিরির উপর এই মন্দিরের কোন চিহ্নের সহিত এখন কাহারও পরিচয় নাই। রাজগিরের বিভিন্ন স্থানে ১৫০৪ সম্বতে (১৪৪৭ খৃঃ) প্রতিষ্ঠিত কয়েকখানি জিনমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এই কালের প্রতিমাশিল্পের নিদর্শন-স্বরূপ ৫নং চিত্রে সোনাগিরির উপরের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ঋষভনাথের প্রতিমার প্রতিকৃতি দেওয়া হইল। প্রতিমাখানি ধ্যানযোগীর ন্যায় পদ্মাসনে উপবিষ্ট। কিন্তু মুখশ্রীতে ধ্যানের ভাব ত মোটেই নাই, দৃষ্টিও নাসাগ্রবদ্ধ নহে। গলায় মহাপুরুষের কম্বুগ্রীবার লক্ষণ তিনটি রেখাও নাই। এই যুগের সন তারিখ সহ লিপিযুক্ত যত জিন প্রতিমা পরীক্ষা করিয়াছি, সকলগুলিই ভাবহীন, প্রাণহীন, এমন কি অনেক বাহ্য লক্ষণ হীন। এই যুগের এবং পরবর্ত্তী যুগের শৈব, বৈষ্ণব এবং শাক্ত মূর্ত্তিরও এই দুর্গতি। প্রতিমাশিল্পের এই অধোগতি অবশ্যই হিন্দুর আধ্যাত্মিক অধোগতির ফল, কেন-না, পূর্ব্বতন আধ্যাত্মিক ভাব জাগ্রত থাকিলে হিন্দুরা এইরূপ প্রতিমাপূজা করিতে সম্মত হইত না। এই প্রসঙ্গে কেহ কেহ বলিতে পারেন মুসলমানের আমলে হিন্দুর প্রতিমাশিল্প অধঃপাতে গেলেও, খৃষ্টীয় সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দে রাজপুতানার এবং কাংড়ার চিত্রশিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এই সকল চিত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য কৃষ্ণের এবং হরপার্ব্বতীর লীলা অঙ্কন। এই সকল চিত্রে যথেষ্ট সজীবতা আছে, এবং কৃষ্ণের দৈহিক লীলা অতি চমৎকার চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল চিত্রের অন্তর্গত দেবদেবীর চিত্রে প্রাচীন প্রতিমার গাম্ভীর্য্যের এবং আধ্যাত্মিক ভাবের, অর্থাৎ জ্ঞানামৃত-পানরত ধ্যানযোগীর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা একখানি উৎকৃষ্ট প্রাচীন কৃষ্ণপ্রতিমার সহিত একই বিষয়ক একখানি রাজপুত চিত্রের তুলনা করিব।

৬নং চিত্র প্রমাণ মনুষ্যাকার অপেক্ষা বৃহত্তর

* *Journal of the Bihar and Orissa Research Society*, Vol. V. 1919, pp. 331-343; শ্রীপূরণচন্দ নাহর, "জৈন লেখ সংগ্রহ" প্রথম খণ্ড, ৫৮-৬০ পৃঃ।

গোবর্দ্ধনধারী কৃষ্ণ প্রতিমা। বারাণসীর অন্তর্গত আরা নামক মহল্লায় মুসলমানদিগের গোরস্থানে এই প্রতিমাখানি পাওয়া গিয়াছিল এবং সারনাথে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের অধ্যক্ষ হারগ্রিভস সাহেবের অনুমতি লইয়া প্রতিমাখানিকে আমি সারনাথ মিউজিয়ামের ভিতরেই রাখিয়া আসিয়াছি। সারনাথ মিউজিয়ামের দক্ষিণের হলের পূর্ব্বদিকের প্রাচীরের সহিত সংলগ্ন করিয়া প্রতিমাখানি রাখা হইয়াছে। দর্শক যাহাতে একাগ্রচিত্তে এই প্রতিমাখানি পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন সেইজন্য ঐ প্রাচীরের গায়ে আর কোন প্রতিযোগী প্রতিমা স্থাপন করা হয় নাই। ভারতীয় শিল্পরত্নভাণ্ডারে এই গোবর্দ্ধনধারীর কোন প্রতিযোগীও নাই। এই প্রতিমা এক সময় বারাণসীর একটি বিশাল বিষ্ণুমন্দিরের এক পার্শ্ব অলঙ্কৃত করিত। গঠনভঙ্গী লক্ষ্য করিলে মনে হয়, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দের আরম্ভে চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের সময়ে গুপ্ত-সাম্রাজ্য যখন উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছিল এই প্রতিমা সেই সময়কার সৃষ্টি। এই প্রতিমার দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্রই ইহার মহান্ মাধুর্য্য এবং গাম্ভীর্য্য দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ করে। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের আকার স্বভাবসঙ্গত নহে, তৎকালে প্রচলিত সঙ্কেত অনুযায়ী। কৃষ্ণ বামহাত বিস্তারিত করিয়া পর্ব্বতখানি তুলিয়া ধরিয়াছেন; ভার সামলাইবার জন্য মাথাটি ডানদিকে ঈষৎ হেলাইয়াছেন এবং কোমর বামদিকে বাঁকা করিয়া রাখিয়াছেন। পেটের ডানপার্শ্ব কুঞ্চনের ফলে যে বলি দেখা দিয়াছে তাহা প্রতিমার অঙ্গের কোমলতা সুন্দররূপে সূচিত করিতেছে। পেটের বাম অংশ যেন ঈষৎ স্ফীত। সুতরাং এই ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা স্বভাবসঙ্গত। দুর্ভাগ্যের বিষয় বাহু দুটি, বাম পা, এবং পায়ের নলাসহ ডান পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট শরীরের গঠন শাস্ত্রোক্ত মহাপুরুষের লক্ষণানুযায়ী। "সিংহপূর্ব্বার্দ্ধকায়", সিংহের মত শরীরের উপরার্দ্ধের গঠন। প্রশস্ত বক্ষ এবং ক্ষীণকটি। সকল অঙ্গই গোলগাল; কোথাও মাংসপেশীর নতোন্নত আকার দেখা যায় না (সুসংবৃত্ত স্কন্ধ, বৃত্তগাত্র, বৃত্তকুক্ষি, সুবিবর্দ্ধিতোরু)। কিন্তু বাম পায়ের নলার যে-অংশ এখনও বর্ত্তমান আছে তাহা দণ্ডায়মান জিনের পায়ের নলার মত গোলাকার নহে, স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক অংশ এবং স্বাভাবিক ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়, শিল্পী কেবল মহাপুরুষের লক্ষণ স্মরণ করিয়া এই প্রতিমা গড়েন নাই, স্বভাবের দিকেও তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তিনি শাস্ত্রের এবং স্বভাবের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। তাই প্রতিমাখানি এমন চমৎকার হইয়াছে। যে-সকল অসাধারণ সৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন শিল্পী গুপ্তশিল্পের প্রবর্ত্তক, এই প্রতিমার নির্ম্মাতা বোধ হয় তাঁহাদের অন্যতম। গোবর্দ্ধনধারীর সুছন্দোবদ্ধ অঙ্গভঙ্গী হইতে দেখা যায় কৃষ্ণ মানুষের মত মানুষী চেষ্টার ফলে এই গুরুভার বহন করিতেছেন। পর্ব্বতের ভারে কৃষ্ণের দেহ ত্রিভঙ্গ ধারণ করিলেও তাহাতে শ্রান্তির বা কষ্টের চিহ্ন নাই; তিনি যেন অনায়াসে গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া আছেন। কৃষ্ণের মহত্ত্বের এবং দেবত্বের চিহ্ন, ধ্যানযোগীর অন্তর্মুখীনতা, তাঁহার সৌম্য শান্ত মুখে সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাম চক্ষুর এখনও যেটুকু বাকী আছে, তাহাতে দেখা যায় এই কৃষ্ণপ্রতিমার দৃষ্টিও নাসাগ্রবদ্ধ ছিল। অথচ মুখশ্রীর সহিত দেহের ভঙ্গীর কিছুমাত্র অমিল নাই। আধ্যাত্মিক এবং দৈহিক সৌন্দর্য্যের অতুলনীয় আধার এই প্রতিমায় আশ্চর্য্যরূপে ভগবদ্গীতায় প্রচারিত জ্ঞানযোগের এবং কর্ম্মযোগের সমন্বয় প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

গুপ্ত-যুগের এই বিরাট গোবর্দ্ধনধারী প্রতিমা দেখিয়া তারপর জয়পুর কলমের উৎকৃষ্ট গোবর্দ্ধনধারণের চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় যেন আমরা আর এক লোকে উপস্থিত হইয়াছি। এই চিত্রখানি শ্রীযুক্ত নানালাল চমনলাল মেহতা *Studies in Indian Painting* নামক পুস্তকে প্রকাশিত করিয়াছেন (৩২ পৃষ্ঠার সম্মুখের চিত্র)। এই চিত্রের গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের চিত্রে পাশ্চাত্য প্রভাব পরিষ্কার বিদ্যমান রহিয়াছে। ঊর্দ্ধে উত্তোলিত গোবর্দ্ধনের তলে সম্মিলিত গোপগোপীগণের এবং গাভী ও গোবৎসগণের চিত্রে অপার্থিব সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই চিত্রে সকল প্রাণীরই সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবার ভঙ্গী এবং

অঙ্গভঙ্গী সুছন্দোবদ্ধ। এককোণে একটি বকপক্ষী একই ভাবে অনুপ্রাণিত প্রাণিসজ্ঞের চিত্রকে বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে। চিত্রে নিবদ্ধ দেবতা, মানুষ, পশু—সকলের মধ্যেই একটা বিস্ময়ের, বিজয় গর্ব্বের এবং ভক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই চিত্রের গোবর্দ্ধন ধারণ লীলার নায়ক কৃষ্ণ ঠিক গোবর্দ্ধন বহন বা ধারণ করিতেছেন না, ঐন্দ্রজালিকের মত বাম হাতের কনিষ্ঠা অঙ্গুলীর সঙ্কেতে পর্ব্বতখানিকে উর্দ্ধে উঠাইয়া রাখিয়াছেন। এই কৃষ্ণ ধ্যানস্থ নহেন; ইনি সতৃষ্ণ নয়নে গোপীগণের দিকে চাহিয়া আছেন।

সারনাথ মিউজিয়ামের গোবর্দ্ধনধারীর প্রতিমা-নির্ম্মাতা যেমন অতি উচ্চশ্রেণীর ভাস্কর, জয়পুরের গোবর্দ্ধনধারণ লীলার চিত্রকরও উচ্চশ্রেণীর চিত্রকর। কিন্তু উভয়ের সৃষ্ট গোপালকৃষ্ণের কল্পনায় ঘোরতর প্রভেদ। গুপ্ত-যুগের এই গোবর্দ্ধনধারী ধ্যানযোগী এবং কর্ম্মযোগী; তিনি যথার্থই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতখানিকে তুলিয়া ধরিয়া ধ্যানস্থ আছেন। জয়পুর চিত্রের কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত লইয়া খেলা করিতেছেন; এবং তাঁহার দৃষ্টি বহির্মুখ, গোপীগণের দিকে। উভয় চিত্রের আখ্যানবস্তু এক হইলেও, দুইখানি চিত্রে দুইজন স্বতন্ত্র ব্রজের গোপালের পরিচয় পাওয়া যায়। দুই যুগের দুইখানি গোপালকৃষ্ণের প্রতিমার মধ্যে এই গুরুতর প্রভেদের অর্থ এই, গুপ্ত-যুগের বৈষ্ণবধর্ম্মের এবং বর্ত্তমান যুগের বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক হিসাব (spiritual outlook) স্বতন্ত্র, এবং গুপ্ত-যুগের তুলনায় আধুনিক বৈষ্ণব ধর্ম্ম আধ্যাত্মিকতার হিসাবে অধোগত। জয়দেবের "গীত-গোবিন্দ"কে বৈষ্ণবেরা ভক্তিরসের আকর মনে করেন। জয়দেব গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেনের সভাসদ্ ছিলেন। বাংলায় এবং বিহারে অনেক প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে যাহা নিঃসন্দেহে সেন-যুগের অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর সৃষ্টি বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। এই যুগের বৈষ্ণব-প্রতিমার মধ্যে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ধ্যানমগ্ন বাসুদেব প্রতিমারই প্রাধান্য। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, জয়দেবের সময় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পূর্ব্বতন আধ্যাত্মিকতা অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু জয়দেবের সময়ের বাসুদেবের মূর্ত্তির সহিত পরবর্ত্তী কালের মুরলীধর গোপাল-মূর্ত্তির তুলনা করিলেই দেখা যাইবে, পরবর্ত্তীকালে ভাস্কর্য্যের কতদূর অধঃপতন ঘটিয়াছে। শিল্পের এই অধঃ-পতনের কারণ অবশ্যই হিন্দু সাধারণের আধ্যাত্মিক ভাবের অধোগতি এবং রুচির বিকার। যদি হিন্দু সাধারণের হৃদয়ে পূর্ব্ব আধ্যাত্মিক ভাব জাগরুক থাকিত তবে তাহারা নিশ্চয়ই শিল্পীর নিকট গুপ্ত-যুগের গোবর্দ্ধনধারীর ঢঙের কৃষ্ণমূর্ত্তি দাবি করিত, এবং শিল্পীও সেই দাবি পূরণ করিতে বাধ্য হইত। তখন শিল্পী যে মুরলীধর গড়িত তাহা দেখিলে মনে হইত না পাষাণের পুতুল বাঁশী হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহা দেখিলে মনে হইত ভগবান যেন বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে চিদানন্দ-রসে বিভোর হইতেছেন। এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণবগণের নিকট আমার নিবেদন এই, চৈতন্যদেব সনাতনকে উপদেশ দিবার সময় যে বলিয়াছিলেন—

> ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
> গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ—

আমি এখানে সেই ভাগ্যবানগণের কথা বলিতেছি না; হিন্দুসাধারণ—বৌদ্ধশাস্ত্রে যাহাদিগকে পৃথক্জন বলে সেই average হিন্দুর কথা বলিতেছি। চৈতন্য-দেবের কথিত ভাগ্যবানের সংখ্যা চিরকালই খুব কম। ভগবদ্গীতায় (৭।১৩) আছে—

> মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
> যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥

এখানে গীতাকার "কশ্চিৎ" শব্দ যাঁহাদের সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা মনের মন্দিরেই ভগবানের দর্শন লাভ করেন; বাহ্যমূর্ত্তি ও মন্দির তাঁহাদের জন্য নহে। প্রধানতঃ যাঁহাদের জন্য মূর্ত্তি ও মন্দির, শিল্পের অধঃপতন তাঁহাদের আধ্যাত্মিক অধঃপতন সূচিত করে।

মূর্ত্তি ছাড়িয়া বর্ত্তমান কালের আর্য্যাবর্ত্তের মন্দিরের দিকে তাকাইলে হিন্দুর রুচির শোচনীয় বিকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। আর্য্যাবর্ত্তের নাগর রীতির মন্দির পূর্ণতালাভ করিয়াছিল গুপ্ত-যুগের বোধ হয় অব্যবহিত পরে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দে। যদি মন্দিরের বিভিন্ন ভাগের আকারের সুসঙ্গতি থাকে, এবং মন্দিরের বহির্ভাগের ভঙ্গিমায় যদি

ধারার এবং ছন্দের প্রমাণ থাকে তবেই মন্দির সুন্দর দেখায়। প্রাচীন নাগর মন্দিরের দুইটি প্রধান অঙ্গ, নীচে গর্ভগৃহ এবং উপরে শিখর। আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচীন নাগর মন্দিরের শিখর গর্ভগৃহের উপর হইতে সমসূত্রে উঠিয়া ক্রমশ বাঁকিয়া শুকনাসার আকার ধারণ করিয়া আমলকের সহিত সংলগ্ন হইয়াছে। এই শ্রেণীর কোন একটি মন্দিরের পাদদেশে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টি আমলকের দিকে তাকাইলে দর্শকের চিত্তও ঊর্দ্ধমুখে একটা আকর্ষণ অনুভব করে। অনেক প্রাচীন মন্দিরের শিখরে একাধারে গথিক গির্জ্জার চূড়ায় বলবীর্য্য, এবং মসজেদের গুম্বজের গাম্ভীর্য্য, দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ নাগর মন্দিরের বহির্ভাগ নানা কারুকার্য্যখচিত এবং মূর্ত্তির দ্বারা শোভিত। এই সকল অলঙ্কার বাদ দিয়া নগ্ন শিখরের ভঙ্গিমার দিকে লক্ষ্য করিলেও দেখা যায় আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ প্রাচীন মন্দিরই বড় সুন্দর।

প্রাচীন মন্দিরের গর্ভগৃহের সম্মুখের দিকে একটিমাত্র দরজা; এবং আর তিন দিকে দরজার বা জানালার পরিবর্ত্তে বহির্ভাগের কোটরে এক একখানি প্রতিমা। এই তিনখানি প্রতিমা, এবং প্রত্যেক কোণের দুই দিকে দুইখানি করিয়া অষ্টদিকপালের প্রতিমা, পূজার জন্য স্থাপিত নহে, মন্দির প্রদক্ষিণকারী দর্শনের জন্য স্থাপিত। এই সকল ধ্যানমগ্ন প্রতিমা দর্শন জীবন্ত ধ্যানযোগীর সৎসঙ্গের তুল্য আধ্যাত্মিক ভাবের উদ্দীপক। তিন দিক বন্ধ থাকায় মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগ সর্ব্বদাই আধ-অন্ধকারে আচ্ছন্ন। মন্দিরের সম্মুখে মুখমণ্ডপ থাকিলে সে অন্ধকার আরও গাঢ় হয়। ঈশ্বরের স্বরূপ রহস্যময়। মন্দিরের ভিতরের এই আধ-অন্ধকার সেই রহস্যই সূচিত করে। প্রাচীন নাগর মন্দিরের সহিত তুলনায় আমাদের বর্ত্তমান কালের মন্দির সর্ব্বপ্রকার সৌন্দর্য্যবিহীন। বর্ত্তমান কালের মন্দিরের গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বার ভিন্ন আর তিন দিকের প্রাচীরে দরজা জানালা ধ্যানমগ্ন প্রতিমার স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু গর্ভ গৃহের অভ্যন্তর ভাগ এখন আলোক পূর্ণ হইলেও আধ্যাত্মিক হিসাবে শূন্য।

এতক্ষণ আমরা আর্য্যাবর্ত্তের ভাস্কর্য্যের এবং স্থাপত্যের যে ইতিহাস আলোচনা করিলাম তাহা হিন্দুসাধারণের আধ্যাত্মিক ভাবের এবং রুচির যে অধোগতির পরিচয় প্রদান করে, হিন্দুর চরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তন ভিন্ন তাহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। এখন জিজ্ঞাসা, হিন্দুর চরিত্রের এই গুরুতর পরিবর্ত্তনের কারণ কি? অন্যান্য দেশে পরধর্ম্ম জাতীয় চরিত্রের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ হিন্দু খৃষ্টধর্ম্ম বা ইসলাম গ্রহণ করে নাই, বরাবরই প্রাচীন মন্দিরের দেবদেবীর প্রতিমা পূজা করিয়া আসিতেছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে যে হিন্দুর এইরূপ অধঃপতন ঘটিয়াছে তাহা বলা যায় না। এই অধঃপতনের দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে—

(১) প্রাচীন মন্দিরের এবং প্রতিমার নির্ম্মাতা এবং প্রতিষ্ঠাতাগণের বংশলোপ। অথবা (২) বর্ব্বর জাতির শোণিতের মিশ্রণের ফলে হিন্দুচরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তন।

হয়ত উভয়বিধ কারণ আংশিকভাবে মিলিত হইয়া হিন্দু জাতির বর্ত্তমান অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। এই অনুমানের অনুকূলে কোন অপরোক্ষ ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই; এবং অস্পৃশ্যতা, অসবর্ণ বিবাহের অভাব প্রভৃতি আচার ইহার বিরোধী। কিন্তু এই সম্বন্ধে পরোক্ষ প্রমাণের অভাব নাই। এই প্রস্তাবে এই সকল প্রমাণ আলোচনা করিবার স্থান নাই। ভাস্কর্য্যের এবং স্থাপত্যের অধঃপতন হিন্দু মনোবৃত্তির যেরূপ পরিবর্ত্তন সূচিত করে তাহার অন্য কোন কারণ অনুমান করা সম্ভব নহে।

শোণিত মিশ্রণ অর্থাৎ বংশানুগত দোষ আমাদের অধঃপতনের প্রধান কারণ,—এই কথা শুনিলেই অনেকের হৃদয়ে ভবিষ্যতের উন্নতি সম্বন্ধে নিরাশার সঞ্চার হইতে পারে। মানুষের উন্নতির এবং অবনতির কত টুকু বংশানুগত দোষগুণের উপর নির্ভর করে, এবং কত টুকুই বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা নিয়মিত হয়, বৈজ্ঞানিকেরা তাহার হিসাব-কিতাব লইয়া ব্যস্ত আছেন। বংশোন্নতি বিদ্যার (Eugenics) সেবকগণ উন্নত বংশের অবনতি নিবারণের এবং অবনত বংশের উন্নতি সাধনের উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট আছেন। মনুষ্য সমাজের মঙ্গলামঙ্গলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবও একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

আমার মনে হয়, এদেশে যদি প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য পুনরুজ্জীবিত করা যাইতে পারে, নগরে নগরে যদি ধ্যানমগ্ন প্রতিমা অলঙ্কৃত অভ্রভেদী মনোরম শিখরযুক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তবে বোধ হয় জনসাধারণের মনে ধ্যানধারণার প্রবৃত্তি এবং শক্তি ক্রমশঃ পুনরায় জাগিয়া উঠিবে। নানা দিকেই এখন প্রাচীন শিল্প পুনরুজ্জীবনের ইচ্ছা এবং চেষ্টা প্রকাশ পাইতেছে, এবং চিত্র-বিভাগে এই চেষ্টা কতকটা সফলতা লাভ করিয়াছে। প্রাচীন ভাস্কর্য্য এবং স্থাপত্যকে নূতন জীবন দিতে হইলে দুই শ্রেণীর লোকই চাই; নিপুণ শিল্পী চাই এবং একদল নিপুণ সমজদারও চাই। ভারতের প্রাচীন রীতির মূর্ত্তি ও মন্দির গড়িতে হইলে শিল্পীকে আগে সেই রীতি ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচলিত হইবার পরেও ইউরোপে বরাবরই গ্রীক ভাস্কর্য্যের অনুকরণ চলিয়াছিল। কিন্তু মধ্যযুগের শিল্পীরা গ্রীক-প্রতিমার লালিত্যের লক্ষণ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিত না বলিয়া তাঁহাদের অনুকরণ ব্যর্থ হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দে আপুলীয়া-নিবাসী নিকোলো গ্রীকো-রোমীয় শিল্পের সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহা অনুকরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে প্রাচীন শিল্পের পুনরুজ্জীবনের (Renaissance) পথপ্রদর্শক বলিয়া গণ্য করা হয়। আধুনিক কালেও অনেক দিন হইতেই গ্রীক-শিল্পের সৌন্দর্য্যতত্ত্বের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর সমালোচকেরা প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্য্যের রোমীয় নকল লইয়াই মুগ্ধ ছিলেন। ফার্টোয়াংলারের বিশ্লেষণের ফলে মূল গ্রীক প্রতিমাসমূহের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে গথিক শিল্পের মহিমাই বা কয়জনে বুঝিত। ইউরোপের স্বভাবানুকারী শিল্প বুঝাই যখন এত কঠিন, তখন হিন্দুর ভাবানুকারী শিল্প বুঝা যে তদপেক্ষা অনেক কঠিন হইবে ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বিপদ এই, এদেশের শিল্পরসিকেরা অনেক স্থলেই কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। ইউরোপের অভিজ্ঞতার সহিত অসহযোগ ঘোষণা করা হইয়াছে; সুতরাং ইউরোপীয় নজীর কেহ মানে না। এদেশের অনেক শিল্প-ব্যাখ্যাতাই "আহা মরি!" বলিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিতে চাহেন। কেহ কেহ এমনও মনে করেন, শিল্পের মহিমা বুঝিবার জন্য যে কষ্ট স্বীকার করা কর্ত্তব্য বোধ করে, সে নিশ্চয় অরসিক। তথাপি প্রাচীন ভাস্কর্য্যের পুনরুজ্জীবন-কার্য্যে বাঙালী জাতি বিশেষ উদ্যোগী হইবে এমন আশা করা যাইতে পারে। নাগর মন্দির নির্ম্মাণ করা যে সহজ নহে, ইহা বাঙালীরা অনেক দিন আগে বুঝিতে পারিয়া, নাগর মন্দিরের কদর্য্য অনুকরণে সময় সামগ্রী নষ্ট না করিয়া, নিজেদের দোচালা, চৌচালা আটচালা ঘরের অনুকরণে মন্দির গড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। বাংলার এই চালাঘরের ঢঙের মন্দির প্রাচীন নাগর মন্দিরের মত সুন্দর না হইলেও সুপরিচিত। এইরূপ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত প্রতিমা স্বর্গের দেবতা মনে না হইলেও আপনার ঘরের লোক—আপন জন বলিয়া মনে হয়। বাংলার নূতন স্থাপত্যের প্রভাব এক সময় সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস, ইচ্ছা করিলে বাঙালী আবার স্থাপত্যে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে পারে। আমাদের প্রাচীন ভাস্কর্য্য স্থাপত্যেরই অঙ্গ। শাস্ত্রানুসারে মন্দির গড়িতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্তিও গড়া হইবে।

দুর্য্যোধন

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

দূর দিগন্তে সন্ধ্যাসায়রে
কালোয় মিলিছে রক্তরেখা,
নীচে নির্জ্জনে প্রান্তর 'পরে
কা'র ও মূর্ত্তি লুটিছে একা ?
—কে আমি, জান না ? ভুলিনি সে নাম—
রাজা আমি—রাজা দুর্য্যোধন !
কুরুক্ষেত্র শেষ হ'ল নাকি—
কোথা আমি—এ কি দ্বৈপায়ন ?
—মহিষি, মহিষি—রাণি ভানুমতি,
কোথা গেলে সতি দুঃসময় ?
—রথ, মোর রথ—সারথি, সারথি—
কৈ, কোথা গেল রক্ষিচয় ?

উহু—বড় ব্যথা, দারুণ যাতনা—
রাজবৈদ্যেরে কে আনে ডাকি ?
রাজার বীর্য্য, বীরের ধৈর্য্য—
সেও আজি হার মানিবে নাকি !
—তবু, তবু আমি করি না শঙ্কা,
একাকী যুঝিব নির্ব্বিকার ;
অধর্ম্মরণে পরাজয় তবু
করিব সবলে অস্বীকার।
—হায় রে ভাগ্য ! তাও যে পারি না,
ভগ্ন এ উরু ধূলায় লুটে,
আশ্রয়হারা বীর্য্য আমার
হাহাকারে শুধু কাঁদিয়া উঠে !
—বৃকোদর, তুই পাণ্ডবগ্লানি,
পাণ্ডুর গালে লেপিলি কালি,
চোরের মতন দহিলি ধর্ম্মে
আপনার হাতে আগুন জালি ;
ক্ষত্রবংশে অক্ষত্রিয়—
বায়ুপুত্রেরই প্রমাণ ঠিক,
কলঙ্কী ঐ পাণ্ডবনামে
ধিক্ ধিক্ তোর শতেক ধিক্ !
—বিশ্বে কি কারো চক্ষু ছিল না—
হায় রে, বিশ্বে কেই বা আছে ?
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ বিগত,
কে লভে শাস্তি কাহার কাছে !
—সবই সেই শঠ কৃষ্ণের কাজ,
ক্রূর চক্রীর কুমন্ত্রণা ;
ধর্ম্মরাজ্য ধর্ম্মরাজ্য—
মুখে যার বাণী-বিড়ম্বনা !
কৃষ্ণার সাথে দুষ্টের দল
সখা বলি যার দাস্য করে,
যদুবংশের সেই কলঙ্ক
চালায় তাদেরি হাস্যভরে !

—কোথা বলরাম উদারবীর্য্য—
শুভ্রোজ্জ্বল রৈবতক ?
কুলপাংশুল এই তার ভ্রাতা—
পক্ষপাতী ও প্রবঞ্চক !

উহু—সেই ব্যথা, আবার, আবার !
কে ও ? কাছে এস হে সঞ্জয়,
দুর্জ্জয় তব দুর্য্যোধনের
হের আজ দশা-বিপর্য্যয়।
—কুরুকুল—সে কি নির্ম্মূল তবে—
কুরুক্ষেত্র ধ্বংস নাকি ?

বলো না মন্ত্রি, নির্ব্বাক কেন ?
বুঝিবার আরও আছে কি বাকী !
—ভাবিতেছ মনে, দুর্য্যোধনেরে
শুনাবে না সেই অশুভ কথা,—
হায় তাত ! এই মৃত্যুর কূলে
আছে তার কোনো সার্থকতা !

—আজ মনে পড়ে, রাজসভাগৃহে
ক্ষত্তার সেই যুক্তপাণি,
এদিনের কথা সেদিন জানিলে
কহি তারে সেই তিক্ত বাণী !
রাজবংশের সম্ভ্রম চাহি
তবু কোনো তাপ নাহি এ মনে,
দুর্য্যোধনের মর্য্যাদাবোধ
কে না জানে তার শত্রুজনে ?
ধর্ম্ম তাহার কর্ম্ম তাহার
রাজরাজেন্দ্র যোগ্য সবই,—
মানী পেত মান, গুণী আহ্বান,
অর্থী ফিরিত অর্থ লভি।
—ওহো সেই কথা ! দ্যূতক্রীড়ার
ক্ষত্রাধিকার বিদিত লোকে,
কে বলিবে পাপ ? কোনো অনুতাপ-
-বাষ্প তা লাগি নাহি এ চোখে।

হিংসায় যদি গণ' অপরাধ,
কাপুরুষ তুমি ; সাক্ষ্য তার—
দেবতা-দৈত্যে নিত্য বিরোধ
জাতি হয়ে, কে বা অন্যে ছার !
হিংসা জীবের সহজ ধর্ম্ম
হিংসা-অন্নে পুষ্ট প্রাণ,
ধ্বংসে যে বীজ কালের কাম্য,
বংশে তাহাই মূর্ত্তিমান !

—পাঞ্চালীকথা ? তুলো না মন্ত্রি,
পঞ্চপতি যে ভজনা করে,
যৌতুকসম কৌতুকে তার
চির-অধিকার বিধির বরে !
রাজার ধর্ম্ম—সে যে গুরুতর,
কামের কামনা তাহার নয়,
সারাজীবনের সে একনিষ্ঠা
তুমি জানো তাত, হে সঞ্জয়।
কুন্তিতনয়—দ্রৌপদীপতি,
কি নির্যাতন কঠিন তায় ?
কুরুকুলপতি রাজ্যে তাহার
সমদর্শী সে বজ্রসার।
—সূচ্যগ্রের ভূমি দিই নাই
পাণ্ডবে, সে কি কৃপণ ব'লে ?
দুর্য্যোধনের দরাজ হস্ত
কে না জানে এই পৃথ্বিতলে ?
—তা নয় মন্ত্রি, ন্যায়ের দাবিতে
অধিকার চাহে শত্রুগণ !
প্রার্থনা হ'লে ? রাজ্য বিলায়ে
বনে চলে যেত দুর্য্যোধন।
শুধু এক কথা পারিনি ভুলিতে,
মন্ত্রি, যা আজও বিঁধিছে মনে,
অভিমন্যুর হীন হত্যা সে—
সপ্তরথীর আক্রমণে !
—উহু ! সেই ব্যথা উরু হ'তে উঠি
মস্তকে পশি ভুলায় সব,
অন্ধ নয়ন, ক্ষিপ্ত এ মন,
কর্ণে পশিছে প্রলয়-রব !
—মন্ত্রি, মন্ত্রি, সব ছেড়ে গেছে—
বৈদ্য কেহ কি নাহিক আর ?
সংবাদ দাও, ডাকাও ডাকাও—
এ কণ্ঠহার পুরস্কার।

ঊর্দ্ধ আকাশে সন্ধ্যা ঘনায়,
প্রান্তরশিরে বনের পারে,

দূরে বনজল কালো হয়ে আসে
ঘন ঘনায়িত অন্ধকারে!
কুরুক্ষেত্র-প্রান্তর ভরি
জলে উঠে শত আলেয়া-আঁখি,
নিশাচর যত হিংস্র শ্বাপদ
হুঙ্কার দিয়া ফিরিছে ডাকি';
—সঞ্জয়, তুমি রহ ক্ষণকাল,
হয়ত এ মোর শেষের রাতি,
জয়-পরাজয় প্রশ্ন সে নয়,
জানি তা জীবের জীবনসাথী!
কোনো ক্ষোভ মোর নাহি এ জীবনে,
স্বভাব-রাজা এ দুর্য্যোধন,
নিন্দা-খ্যাতির ঊর্দ্ধে তাহার
সর্ব্বশক্তী সিংহাসন!
—শত প্রণিপাত জানাইও শুধু
পিতার চরণে মন্ত্রিবর,
বলো—আমি সেই মহৎ পিতার
মহিমান্বিত বংশধর।
মৃত্যুরে আমি সহজ গর্ব্বে
নিত্যকালের ভৃত্য গণি,
হরে সে জীবন, পারে না হরিতে
কীর্ত্তি তাহার চিরন্তনী!
হউক পিতার নয়ন অন্ধ,
ভাগ্যের হাতে কি বা না হয়?
পুত্রের 'পরে জানি স্নেহ তাঁর
অপার, তবু সে অন্ধ নয়!

সন্তান লাগি মঙ্গল মাগি
রাজশাসনের নিগড়ে বাঁধি
যুদ্ধের পথে লৌকিক মতে
পারিতেন তিনি হইতে বাদী,
—মন্ত্রদাতার অভাব ছিল না,
কৃষ্ণ বিদুর ভীষ্মবীর,
পুত্রের 'পরে বিশ্বাসে তবু
শ্রদ্ধানত সে উচ্চশির।
কাপুরুষতার শান্তি হইতে
সংগ্রামক্ষ শ্রেয় নিত্যকাল,
পুত্রস্নেহে সে রাজধর্ম্ম
ভুলেন নি সেই পৃথ্বিপাল।
মানী পুত্রের মান্য পিতা সে
মনশ্চক্ষে দিব্য জ্যোতি—
চরণে তাঁহার তাই বার-বার
দেহ-মনে শেষ জানাই নতি।

—রাত্রি ঘনায়, বন্ধু, বিদায়,
ফিরে' যাও ঘরে প্রণাম লয়ে,
দুর্য্যোধনের দৃপ্ত মহিমা
জাগুক শিয়রে সঙ্গী হয়ে!
বেদব্যাসের পূত নামযুক্ত
জ্বলুক অদূরে দ্বৈপায়ন,
ক্ষাত্র তেজের দীপ্ত তারকা
জলুক আঁধারে দুর্য্যোধন!

স্বাগতা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

এঁরা কে?

হরিনাথের বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া স্বাগতা পূর্ব্বের মতন রহিল, কিন্তু তাহার মনে একটা দুশ্চিন্তা আরম্ভ হইল। যে-স্ত্রীলোক ও পুরুষ তাহাকে দেশে লইয়া যাইবে বলিয়াছিল তাহাদের অভিসন্ধি যে ভাল নয় তাহা সে সহজেই বুঝিতে পারিল। তাহাদের অভিপ্রায় ভাল হইলে তাহারা স্বাগতাকে গোপনে লইয়া যাইবে কেন, আর হরিনাথ ও গঙ্গাধরকে দেখিয়া পলায়ন করিবেই বা কেন? যে-ব্যক্তি বলিয়াছিল সে স্বাগতার পিতৃব্য সে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল, যে-স্ত্রীলোক ধামা মাথায় করিয়া সামগ্রী বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল তাহারও সকল কথা মিথ্যা। ইহারা স্বাগতাকে কোথায় লইয়া যাইতেছিল, তাহাকে লইয়া গিয়া কি করিত? ইহারা কি স্বাগতার শত্রু, শত্রুতার কারণই বা কি? স্বাগতা কে নিঃসন্দেহ তাহারা জানে, সন্ধান পাইয়াই তাহারা স্বাগতাকে ছলনা করিয়া লইয়া যাইতেছিল। যে পূর্ব্বস্মৃতি হারাইয়া গিয়াছিল তাহার সহিত ইহারা কোন রূপে জড়িত আছে, কিন্তু পূর্ব্বের কোন কথাই ইহারা প্রকাশ করে নাই। স্ত্রীলোকটি বলিয়াছিল স্বাগতার নিজের সম্পত্তি, নিজের বাড়ি আছে, সেকথাও মিথ্যা হইবে। যাঁহাদের কাছে স্বাগতা রহিয়াছে ইহারা যে তাহার অমঙ্গল কামনা করেন ইহা তাহার কিছুতেই বিশ্বাস হইল না, কিন্তু নানা প্রকার চিন্তা তাহার মনে উদয় হইতে লাগিল।

হরিনাথ ও গঙ্গাধর অনেক পরামর্শ করিয়া কিছু স্থির করিতে পারিল না। ত্রিলোচন যে স্বাগতাকে তাহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন তাহা সহজেই বুঝিতে পারিল, কিন্তু স্বাগতার যেরূপ অবস্থা তাহাতে কি করা যাইতে পারে? তাহার কিছুই স্মরণ নাই, আগেকার কোন কথাই বলিতে পারিবে না। তাহাকে সুবর্ণপুরে লইয়া গেলে তাহার কি কিছু মনে পড়িবে? ত্রিলোচন ত তাহাই চান, সেইজন্যই স্বাগতাকে গোপনে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে একবার হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল সে কি দ্বিতীয় বার বিরত হইবে?

গঙ্গাধর হরিনাথকে জিজ্ঞাসা করিল, এখন কি করবে?

—কিছু ঠিক করতে পারছিনে।

—স্বাগতাকে বিয়ে করবে? এখন ত তার পরিচয় জানা গিয়েচে।

—সে ত নিজে জানে না, বুঝতেও পারবে না। এখন লোকে বলবে আমি ওর বিষয়ের লোভে বিয়ে করেচি।

—তুমি ত দরিদ্র নও।

—তাহলেও কথা উঠবে। ও যদি সেরে ওঠে তাহলেই বিয়ের কথা হ'তে পারে।

—তখন যদি ও রাজি না হয়?

—তাহলে চুকে গেল, আমি আর বিয়ে করব না।

গঙ্গাধর বুঝিল হরিনাথ নিজের চিত্ত বশীভূত করিয়াছে। স্বাগতা আরোগ্যলাভ না করিলে বিবাহের কথা উত্থাপন করিবে না।

বৈশাখ মাস। বড় গরম। বৈকাল বেলা হরিনাথ স্বাগতাকে মাঠে কিংবা গঙ্গার ধারে বেড়াইতে লইয়া যাইত। সঙ্গে সুলোচনা থাকিতেন, গঙ্গাধরও থাকিত। একদিন সায়ংকালে তাহারা বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। মোটরের ভিতর এক পাশে স্বাগতা, মাঝখানে সুলোচনা, আর এক পাশে হরিনাথ। গঙ্গাধর মোটর চালকের পাশে বসিয়াছিল। কিছুক্ষণ তাহারা গঙ্গার ধারে দাঁড়াইল। সেখানে আরও অনেক মোটর, ব্যারিষ্টার ঘোষ সাহেবের মোটরও ছিল। মিসেস ঘোষ সকৌতুকে স্বাগতাকে দেখিতে লাগিলেন। শ্যামাচরণ ও রামনাথ পরস্পরকে চাহিয়া দেখিল,

বাক্যালাপ করিতে পারিল না। গঙ্গাধর ও হরিনাথও ঘোষ-দম্পতী ও শ্যামাচরণকে দেখিল, কিন্তু যাহার জন্ম তাহারা এত সন্ধান করিতেছিল সেই শ্যামাচরণ যে তাহাদের সম্মুখে তাহা তাহারা কেমন করিয়া জানিবে?

হরিনাথ স্বাগতাকে জিজ্ঞাসা করিল,—এখন কি বাড়ি ফিরে যাবে?

—এরির মধ্যে? বড় গরম। এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে খানিক ঘোরা যাক।

হরিনাথ বলিল,—রামনাথ টালিগঞ্জে চল।

রামনাথ মোটর ঘুরাইয়া টালিগঞ্জে চলিল। খুব জোরে নয়, যাহাতে গায় বাতাস লাগে এই রকম গতিতে। মোটর ভাল, নড়ে না, শব্দ নাই, আরামে চলিল।

উত্তর-পশ্চিম কোণে আকাশপ্রান্তে অল্প মেঘ করিয়াছিল, কেহ লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই। স্বাগতার দক্ষিণ হস্ত গাড়ীর বাহিরে, দরজা খুলিবার হাতল ধরিয়া ছিল।

আকাশের কোণে দুই-চারিবার বিদ্যুৎ চমকিল, ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক দীপ্তি। মাথার উপর এক খণ্ড মেঘে আঁকাবাঁকা অলস বিদ্যুৎ, চিত্রকর যেন বক্র রেখা অঙ্কিত করিয়া আবার মুছিয়া ফেলিতেছে। সহসা চারিদিক ধূলায় অন্ধকার করিয়া ঝড় উঠিল। হরিনাথ বলিল,—কালবৈশাখী! শীঘ্র বাড়ি ফিরে চল।

রামনাথ মোটর ঘুরাইয়া দ্রুতবেগে বাড়ির অভিমুখে মোটর চালাইল। আকাশ দেখিতে দেখিতে মেঘাচ্ছন্ন হইল, অনবরত বিদ্যুতের স্ফুরণ ও মেঘগর্জন। সেই সঙ্গে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি।

পথে আরও অনেক মোটর ও গাড়ী। সকলেই শহরের দিকে ফিরিতেছে। একবার দৃষ্টি ঝলসিত করিয়া বিদ্যুৎ জলিল তাহার পরেই কড়কড় করিয়া বজ্রপাত! হরিনাথের মোটরের সম্মুখে একখানা গরুর গাড়ী যাইতেছিল, বিদ্যুতের আলোকে ও বজ্রশব্দে ভয় পাইয়া বলদ দুইটা পথের পাশে ছুটিয়া গেল। রামনাথ সতর্ক না থাকিলে তখনি গরুর গাড়ী ও মোটরে ধাক্কা লাগিত। রামনাথ মোটর অর্দ্ধেক ঘুরাইয়া, পাশ কাটাইয়া বাহির হইয়া গেল।

যে-মুহূর্ত্তে মোটর বাঁকিয়া চলিল ঠিক সেই সময় স্বাগতার হাতে হাতল ঘুরিয়া দরজা খুলিয়া স্বাগতা নীচে পড়িয়া গেল। সুলোচনা চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

রামনাথ তৎক্ষণাৎ ব্রেক বাঁধিয়া মোটর থামাইল। হরিনাথ ও গঙ্গাধর গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া স্বাগতাকে তুলিল।

স্বাগতার চক্ষু মুদ্রিত, সংজ্ঞাহীন। মাথার এক পাশ দিয়া অল্প রক্ত পড়িতেছে। হরিনাথের স্মরণ ছিল প্রথম বারে স্বাগতার মাথার ডান দিকে লাগিয়াছিল, এবার বাঁ দিকে।

বাড়িতে আসিয়াই মোটরে করিয়া গঙ্গাধর এক জন বড় ডাক্তারকে লইয়া আসিল। স্বাগতার চৈতন্যোদয় হয় নাই, সর্ব্বাঙ্গ স্থির, ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস বহিতেছে। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—প্রাণের কোন ভয় নেই।

রক্ত বন্ধ করিয়া ডাক্তার ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিলেন, তাহার পর চৈতন্যোৎপাদনের উপায় করিতে লাগিলেন। সেই অবসরে হরিনাথ ও গঙ্গাধর যাহা জানিত সমস্ত বলিল।

সকল কথা শুনিয়া ডাক্তার বলিলেন,—এ রকম কদাচ কখন হয়। প্রথম বার মোটর থেকে পড়ে যাবার আগে এঁর কি মাথার কোন ব্যারাম ছিল?

হরিনাথ বলিল,—না, দিব্য সহজ মানুষ।

কার্ত্তিকের মুখে যাহা শুনিয়াছিল তাহাতে হরিনাথ ও গঙ্গাধরের এই ধারণা হইয়াছিল। স্বাগতার মাথার দোষ থাকিলে ত্রিলোচন তাহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিত না।

ডাক্তার বলিলেন,—এবার জ্ঞান হ'লে কি রকম হয় বলা যায় না। হয়ত বেশ সহজ অবস্থা হবে, কিংবা কোন নতুন উপসর্গ হবে। এখনই বুঝতে পারা যাবে।

সকলেই লক্ষ্য করিয়া স্বাগতাকে দেখিতেছিল তাহার নিঃশ্বাস আগের অপেক্ষা জোরে বহিতেছিল, নেত্রপল্লব স্পন্দিত হইতেছিল। চক্ষু উন্মীলিত করিয়া চারিদিকে চাহিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে উঠিয়া

বসিবার চেষ্টা করিল, ডাক্তার তাহাকে উঠিতে দিল না। স্বাগতা বিস্ময় ও বিরাক্তর সহিত জিজ্ঞাসা করিল,—আপনি কে?

—আমি ডাক্তার।

স্বাগতা চক্ষু ফিরাইয়া সুলোচনা, হরিনাথ ও গঙ্গাধরকে দেখিল। নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায়। জিজ্ঞাসা করিল,—এঁরা কে?

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বস্মৃতি

হরিনাথ ও গঙ্গাধর পরস্পরের প্রতি চাহিল। তাহারা বুঝিল স্বাগতার ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। প্রথম বার সেই গ্রামে মূর্চ্ছাভঙ্গের পর তাহার আত্মবিস্মৃতি হইয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমি কে? এবার নিজের সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিল না, যাহারা তাহার নিকটে উপস্থিত ছিল তাহাদিগকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এঁরা কে?

প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া স্বাগতা বলিতে লাগিল,—আমি কোথায় এসেচি? আমাদের মোটর কি হ'ল? জ্যাঠামশায় কোথায়?

সুলোচনা বলিলেন,—তুমি আমাদের চিনতে পারচ না?

স্বাগতা সকলের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—আপনাদের কাউকে আমি ত কখন দেখি নি, কি ক'রে চিনব?

ডাক্তার হাত তুলিয়া অপর সকলকে কথা কহিতে নিষেধ করিলেন। স্বাগতার মাথায় হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—মাথায় ব্যথা আছে?

স্বাগতা বলিল,—হাঁ, বড় ব্যথা। কি হয়েচে, আমাকে সব বলুন। জ্যাঠামশায়কে দেখতে পাচ্চি নে কেন? আমি কি মোটর থেকে পড়ে গিয়েছিলাম? সেখানে ত বাড়িঘর কিছু ছিল না, এখানে আমাকে কে এনেচে? এ কাদের বাড়ি?

ডাক্তার স্বাগতার নাড়ী দেখিতেছিলেন। কহিলেন,—এখন আপনি বেশী কথা কইবেন না, অসুখ বেড়ে যাবে। একটু ভাল হ'লেই সব জানতে পারবেন।

স্বাগতা কোন মতে স্থির হয় না। কহিল,—মাথায় লেগেচে আর আমার কোন অসুখ হয় নি। কি হয়েচে সব আমি জানতে চাই।

ডাক্তার বলিলেন,—সব জানবেন, এখন আমার কথায় একটু চুপ করতে হবে। একটা ওষুধ দিয়ে আমি আপনাকে ভাল ক'রে দেখব আর কোথাও লেগেচে কি-না।

ব্যাগ খুলিয়া ডাক্তার একটা সরু কাঁচের পিচকারীতে কয়েক ফোঁটা ঔষধ পূরিলেন। পিচকারীর মুখ সূচের ন্যায়। স্বাগতার উপর হাতে অল্প একটা ঔষধ লাগাইয়া, পিচকারীর মুখ বিদ্ধ করিয়া, আঙুল দিয়া টিপিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলেন।

স্বাগতা বলিল,—আপনি আমাকে কিসের ইন্‌জেকশন দিলেন? ঘুমের জন্য না কি?

—একটু ঘুম হবে, ব্যথাও কমবে। ডাক্তার কি ওষুধ দেয় রোগীকে জিজ্ঞাসা করতে নেই।

—আমার ত রোগ কিছু বুঝতে পারচি নে। আপনি ডাক্তার, আপনি ভাল বোঝেন।

স্বাগতা চুপ করিল, দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িল। ডাক্তার, হরিনাথ ও গঙ্গাধর বাহিরে আসিলেন, স্বাগতার কাছে কেবল সুলোচনা বসিয়া রহিলেন।

বৈঠকখানার ঘরে আসিয়া ডাক্তার বলিলেন,—ওঁর কি অবস্থা আপনারা বুঝতে পেরেচেন? এবার আগেকার সমস্ত কথা ওঁর মনে পড়েচে, প্রথম বার মোটর থেকে পড়ে যাবার পরের কোন কথা মনে নেই। আপনাদের কাউকে চিনতে পারলেন না। মনের অত্যন্ত চঞ্চলতা, এর পর ওঁকে বুঝিয়ে রাখা শক্ত হবে। হয়ত এখানে থাকতে চাইবেন না। আপনারা কি করবেন?

হরিনাথ বলিল,—এখন ওঁকে কিছুতেই আর কোথাও যেতে দেওয়া হ'তে পারে না। ভাল ক'রে সেরে উঠুন তার পর যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন।

ডাক্তার বলিলেন,—আমারও সেই মত। ওঁর স্মৃতির এক দোষ গিয়ে আর এক দোষ হয়েচে, সেটা ভাল লক্ষণ। আগের কথা যখন মনে পড়েচে এর পর পরের কথাও মনে পড়তে পারে। আপনা-আপনি সে অবস্থা হবে কি-

না তা আমি বলতে পারিনে। তবে একটা কথা আমার মনে হচ্ছে। ওঁর মনের উৎকণ্ঠা এত বেশী যে কিছুদিন ওঁকে সাবধান না রাখলে অন্য কোন ব্যারাম হ'তে পারে। আমার পরামর্শ আমি এক জন নর্স পাঠিয়ে দিই, সে ওঁর কাছে বরাবর থাকবে। তার কথা উনি শুনবেন, আপনাদের কথা শুনবেন না। আপনারাও মাঝে মাঝে ওঁর কাছে যাবেন কিন্তু বেশীক্ষণ থাকবেন না।

হরিনাথ বলিল,—আপনাকে রোজ দু-বেলা আসতে হবে। নর্স আপনি পাঠিয়ে দিন কিন্তু আপনি না বোঝালে উনি কারুর কথা শুনবেন না।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

উদ্বেগ

হরিনাথের অনুরোধে গঙ্গাধর তাহার পত্নী প্রভাবতী ও মাতাকে দেশ হইতে কলিকাতায় লইয়া আসিল। স্বামীর প্রতি প্রভাবতীর অভিমান হইয়াছিল কিন্তু স্বাগতার অবস্থা শুনিয়া সে অভিমান ভুলিয়া গেল। তাহারা আসিয়া দেখিল স্বাগতা কাহাকেও চিনিতে পারে না, ক্রমাগত অন্য কথা বলে, নিজের বাড়ি যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। নর্স তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া, তাহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ বলিয়া কোন রূপে তাহাকে আটকাইয়া রাখিয়াছে।

গঙ্গাধর ও হরিনাথ স্বাগতার প্রকৃতিতে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল। ইতিপূর্ব্বে প্রথম দুর্ঘটনার পর পূর্ব্বস্মৃতি বিস্মৃত হইয়া স্বাগতা সর্ব্বদা সঙ্কুচিত কুণ্ঠিত হইয়া থাকিত, যে যাহা বলিত তাহাই করিত, কোন বিষয়ে নিজের মতামত ছিল না। এখন সে তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী, আত্মনির্ভরপ্রকৃতি। নিজের বিবেচনা মত কাজ করিতে চায়, কাহারও নিষেধ সহজে মানে না।

প্রভাবতী আসিয়া স্বাগতার পাশে বসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল,—তুমি আমাকে চিনতে পারচ না?

স্বাগতা প্রভাবতীকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল,—তোমাকে ত আমি কখন দেখি নি, কেমন ক'রে চিনব?

—সে কি কথা! কত দিন এখানে তোমার কাছে ছিলাম, আমার সঙ্গে তুমি কত গল্প করতে, তোমার কিছু মনে নেই?

এমন সময় হরিনাথ সেই ঘরে আসিল। প্রভাবতী বলিল,- দেখেচেন্ এর কিছু মনে নেই। আমাদের চিনতেই পারচে না।

স্বাগতা বলিল,—এ সব কথা আমি ত কিছুই বুঝতে পারচিনে। এই ত দিন-দুই-চার হ'ল মোটর থেকে পড়ে গিয়ে আমার লেগেছিল, আর ইনি বলচেন এখানে আমার সঙ্গে উনি অনেক দিন ছিলেন। এখানে আমি থাকব কেন? জ্যাঠামশায়ের কি হ'ল, তিনি কোথায় কিছু জানিনে। ডাক্তার কিছু বলেন না, আপনারাও কেউ কিছু বলেন না। এর মানে কি?

হরিনাথ বলিল,—এটা আপনার কোন্ মাস মনে হয়?

—কেন, অগ্রাণ মাস। আমি কি মাসও ভুলে গিয়েচি?

প্রভাবতী বলিল,—অবাক্, অগ্রাণ মাস আবার কি?

হরিনাথ বলিল,—তুমি কিছু ব'লো না, আমি এখনই আসচি।

হরিনাথ বৈঠকখানায় গিয়া তখনি একখানা খবরের কাগজ হাতে করিয়া আসিল। স্বাগতার হাতে দিয়া বলিল, এখানা আজকের কাগজ, মাস আর তারিখ দেখুন।

স্বাগতা দেখিল, বৈশাখ মাস, তারিখ ১১ই। তাহার মুখ শুকাইয়া গেল, বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে বলিল,—পাচ মাস? আমার ত কিছুই মনে নেই। আর পাচ মাস কি মাথায় ব্যথা থাকে? আমার এখনও অল্প অল্প ব্যথা রয়েচে।

হরিনাথ বলিল,—আপনার বিপদ দু-বার হয়েচে। সেই জন্য ডাক্তার আপনাকে সাবধানে থাকতে বলেচেন। আমি আপনাকে যা বলচি তাও ডাক্তারের কথায়। আপনি সকল কথাই জানতে পারবেন কিন্তু উতলা হ'লে চলবে না, অন্য রোগ হ'তে পারে। চার-পাচ মাসের কথা আপনার কিছুই মনে নেই, সেই জন্য আমাদের চিনতে পারচেন না। একটু সেরে উঠলেই সুবর্ণপুরে যাবেন। আমরা সাধ্যমত আপনার যত্ন করচি।

স্বাগতা বলিল,—তা ত দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু আমি ত আপনাদের কেউ নই, আমার জন্ম কেন এত খরচ করচেন, কেনই বা আপনারা সকলে আমাকে এত যত্ন করচেন? টাকা শোধ দেওয়া যায় কিন্তু কৃতজ্ঞতার ঋণ কখনও শোধ করা যায় না।

-- ও সব কথায় কাজ নেই, আপনি ভাল হ'লেই সব সফল হবে।

এমন সময় নর্স আসিয়া বলিল,—বেশীক্ষণ কথা কইলে ওঁর আবার মাথা ধরবে, তাহ'লে ডাক্তারবাবু আমার উপর রাগ করবেন।

হরিনাথ ও প্রভাবতী চলিয়া গেল। স্বাগতা চিন্তামগ্ন হইল।

স্বাগতার এই এক নূতন অবস্থা। যদি পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া আসিল ত আধুনিক স্মৃতি লুপ্ত হইল। সেই যে জনশূন্য পথে হঠাৎ মোটর বাঁকিয়া বনে প্রবেশ করিয়াছিল তাহার পর আর কিছুই মনে পড়ে না। এ কয়মাস সে কোথায় ছিল? সুবর্ণপুরে না গিয়া সে এখানে রহিয়াছে কেন? এখানে সে কেমন করিয়া আসিল, ইহারাই বা তাহাকে কোথায় পাইলেন? কোথায় সেই নির্জ্জন দীর্ঘ পথ আর কোথায় এই কলিকাতা নগরী, এই সজ্জিত সৌধভবন? স্বাগতার স্মৃতির এক কক্ষ মুক্ত আলোকিত হইয়া আর এক কক্ষ রুদ্ধ, অন্ধকার হইয়া গেল। মনের এক উদ্বেগ গিয়া আর এক দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইল।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

আশাভঙ্গ

সুবর্ণপুরে ফিরিয়া ত্রিলোচন আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় ভাবিতে লাগিলেন। করুণাময়ী জীবিতা আছেন তাহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার মস্তিষ্কের কোন দোষ হইয়াছে তাহারও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছিলেন, কারণ করুণাময়ী তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। করুণাময়ী যাহাদের গৃহে বাস করিতেছেন তাহারা কি তাঁহার পরিচয় জানে? জানিলে এত দিন তাঁহারা কিছু করে নাই কেন? কামিনীর মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহাতে ত্রিলোচন সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে করুণাময়ী পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিলেন; তিনি কে, কোথায় নিবাস, তাঁহার কি অবস্থা ছিল কিছুই তাঁহার মনে নাই। এই কারণেই যাহাদের গৃহে তিনি আছেন তাহারা তাঁহার ফোটোগ্রাফ লইয়া নানা স্থানে সন্ধান করিতেছিল। কামিনীর কথায় ত্রিলোচন ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, করুণাময়ী কোন সম্পত্তিপন্ন ব্যক্তির গৃহে আছেন।

যদি মস্তিষ্কের পীড়া আরোগ্য হয় তাহা হইলে করুণাময়ী তাঁহার সম্পত্তি দখল করিবেন। তাহাতে ত্রিলোচনের কি আশঙ্কা? করুণাময়ীকে যে হত্যা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল তাহার কি প্রমাণ আছে? যাহা হইয়াছিল তাহা দুর্ঘটনা মাত্র, তাহার সহিত ত্রিলোচনের কি সংস্রব? গোলের একটা কথা ছিল। ত্রিলোচন স্বয়ং সন্ধান করিতে গিয়াছিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন জলমগ্ন হইয়া করুণাময়ীর মৃত্যু হইয়াছে। এ ঘটনায় তিনি কি প্রমাণ দেখাইবেন? করুণাময়ী অসামান্য বুদ্ধিমতী, মিথ্যা কথা বলিয়া তাঁহার নিকট নিস্তার নাই। তাঁহাকে কলিকাতা হইতে গোপনে লইয়া যাইবার চেষ্টা হয়, সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সে কথাও প্রকাশ হইয়া পড়িবে কিন্তু ত্রিলোচন যে ইহাতে লিপ্ত আছেন তাহার প্রমাণ কি?

বনবিহারী ও শ্যামাচরণ কোন কথা প্রকাশ না করিলে ত্রিলোচনের কি ভয়? আর তাহারাই বা নিজের গলায় ফাঁসী পরাইতে যাইবে কেন? এই প্রকার যুক্তিতে ত্রিলোচন নিজেকে সান্ত্বনা করিতেছিলেন কিন্তু কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিলেন না। সুবর্ণপুরে ফিরিয়াই তিনি অবিলম্বে কার্ত্তিকের বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি সমস্ত চক্রান্তের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

যে ষড়যন্ত্র করে তাহার হিসাবে কখন যে কি ভুল হয় তাহার কোন স্থিরতা নাই। শৈলবালা নিতান্ত ভাল মানুষ, জমিদারীর আয়-ব্যয়ের কিছু জানিতেন না, কিছু বুঝিতেও পারিতেন না, সে-সকল বিষয়ে তিনি ত্রিলোচনের মুঠার মধ্যে। তাহাই বলিয়া কোন বিষয়ে যে তাঁহার নিজের মত ছিল না, দ্বিরুক্তি না করিয়া দেওয়ানের সকল কথাই

শুনিবেন ত্রিলোচনের এই ধারণা ভুল। শৈলবালার একমাত্র কন্যা, সম্প্রতি তাঁহার হাতে বিস্তর বিষয়সম্পত্তি আসিয়াছিল, কন্যার বিবাহে সাধ-আহ্লাদ করিবার ইচ্ছা স্বতঃই হইতে পারে। কার্ত্তিককে জামাই করিতে কোন মতেই তাঁহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না। একে ত ঐ রূপ, গণ্ডমূর্খ বলিলেই হয়, গ্রামের গোঁয়ার ছেলেদের সঙ্গে বেড়ায়, কি দুঃখে সাতআদরের একমাত্র মেয়ে সুবালার ঐ বর হইবে ?

শৈলবালা সম্পত্তি পাইয়া পর্য্যন্ত ত্রিলোচন আটঘাট ঘিরিয়া রাখিয়াছিলেন। অন্দরমহলে যে-সে যাইতে পাইত না। তাহা হইলেও গ্রামবৃদ্ধ স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষেধ করা সম্ভব নয়, হাজার হউক বাড়ি, সম্পত্তি শৈলবালার, তাঁহাকে বন্দিনীর মতন রাখা যায় না। যাহারা বাড়িতে ছিল এবং যাহারা শৈলবালার কাছে আসা-যাওয়া করিত তাহারা সকলেই সুবালার বিবাহ সম্বন্ধে ত্রিলোচনের প্রস্তাব জানিতে পারিল। এ বিবাহে কেহই সম্মতি প্রকাশ করিল না। গ্রামের যে রমণীর সহিত শৈলবালার বিশেষ সৌহার্দ্দ্য তিনি বলিলেন,—আমি ত তোমার বোনের কাছে আসতাম, কার্ত্তিকের সঙ্গে সুবলার বিয়ের কথা একবারও শুনি নি। বলবার হ'লে তিনি তোমাকেই বলতেন, দেওয়ানকে বলতে যাবেন কেন ? তোমার অমন রূপের গুণের মেয়ে তাকে কি হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে হবে ? আর কার্ত্তিক ত ধুমশো কার্ত্তিক, যেমন রূপ তেমনি গুণ! তুমি মেয়ে জামাইকে ঢেলে মেপে দেবে, তোমার সোনার চাঁদ জামাই হবে, তোমার কিসের ভাবনা ? ঘটক-ঘটকী লাগাও, কত ভাল সম্বন্ধ আসবে।

শৈলবালা বলিলেন,—দেওয়ান যে চেপে ধরেচেন ওঁর ছেলের সঙ্গে সুবির বিয়ে দিতেই হবে।

—তাহলে সমস্ত বিষয় ওঁর হাতে হয়। এখন ত দু-হাতে লুটচেন, এর পর এত বড় বিষয় ওঁর ছেলে নাতি ভোগ করবে।

ত্রিলোচন শৈলবালার সঙ্গে দেখা করিয়া এমন ভাবে কথা পাড়িলেন যেন বিবাহের সমস্ত ঠিকঠাক হইয়া গিয়াছে, কোন আপত্তি হইতেই পারে না। বলিলেন,—এই জ্যৈষ্ঠ মাসে বিয়ে হয়ে যাক। গহনা-গাঁটি, কাপড়-চোপড়, বরাভরণ—যা দরকার কলকেতায় ফরমায়েশ দেওয়া যাক

এবার শৈলবালা সঙ্কোচ প্রকাশ করিলেন না, একেবারে বাঁকিয়া বসিলেন, বলিলেন,—আমি এ বিয়ে দেব না।

—আপনি বলেন কি! সব ঠিকঠাক রয়েচে আর আপনি এখন বলচেন বিয়ে দেবেন না, এ কেমন কথা! আপনার ভগিনী এই বিয়ে স্থির করেছিলেন। আপনিও ত এতদিন কোন আপত্তি করেন নি।

—এখন করচি। মেয়ে আমার, আমার বোনের নয়। এ বিয়েতে তাঁর মত হ'লে তিনি আমাকে কিছু বলেন নি কেন ? আপনার চেয়ে আমি ত তাঁর বেশী আপনার লোক।

ত্রিলোচন দেখিলেন যে-আশায় তিনি ঘোর দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত হইয়াছিলেন তাহাই নিষ্ফল হয়। ক্রোধ সম্বরণ করিয়া কহিলেন,—আপনাকে আমি বলেচি অপর লোকে বিষয়ের দাবি করবে, তাহলে বিষয় আপনার হাতছাড়া হয়ে যাবে। তখন মেয়ের বিয়ের টাকা কোথা থেকে আসবে ?

—যদি এ বিষয় আমার হাতে না আসত তাহলেও আমার মেয়ের বিয়ে হ'ত, বিষয় গেলেও হবে। আমি কী লাগিয়ে শীঘ্রই আমার মেয়ের বিয়ে দেব।

ত্রিলোচন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিলেন, আর রাগ সামলাইতে পারিলেন না। বলিয়া ফেলিলেন,—ঘটকী-কটকী কেউ এ বাড়ি ঢুকতে পাবে না।

শৈলবালা বলিলেন,—আপনি কার সঙ্গে কথা কইচেন ভুলবেন না। আমার বাড়িতে লোক এলে আপনি বারণ করবার কে ? আপনি আমার মাইনে খান, আপনাকে বিদায় করতে কতক্ষণ ?

ত্রিলোচনের মুখে কে যেন সজোরে চড় মারিল। তিনি আর দাঁড়াইলেন না।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

শ্যামাচরণের শেষ

স্বাগতা সুস্থ হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহার স্মৃতির নূতন দোষ থাকিয়া গেল। সে সুবর্ণপুরে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল, ডাক্তার তাহাকে বুঝাইলেন আরও কিছুদিন অপেক্ষা করা উচিত, যদি অন্য কোন উপসর্গ হয়। হরিনাথ কতক কতক কথা প্রকাশ করিল, বলিল,—সম্পূর্ণরূপে সারিয়া না ফিরিলে আশঙ্কা আছে। দেওয়ান ত্রিলোচন বিষয়ের লোভে তাহাকে হত্যা করাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। দ্বিতীয় বার হরিনাথের গৃহ হইতে তাহাকে গোপনে লইয়া গিয়াছিল সে কথা বলিল। স্বাগতা জানিতে পারিল তাহার জ্যেষ্ঠতাতের মৃত্যু হইয়াছে ও হরিনাথ ও গঙ্গাধর তাহাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছে। সুবর্ণপুরের সংবাদ হরিনাথ যাহা জানিতে পারিয়াছিল স্বাগতাকে বলিল।

স্বাগতা বুঝিতে পারিল। সম্পত্তি এখন শৈলবালার হাতে, তাঁহার কন্যার সহিত নিজের পুত্রের বিবাহ দিয়া ত্রিলোচন সমস্ত বিষয় নিজের হাতে করিবেন। হরিনাথ বলিল,—আপনি এখন সুবর্ণপুরে ফিরিয়া গেলেই আপনাকে বিষয় ছাড়িয়া দিবে না। আপনাকে আদালতে প্রমাণ করিতে হইবে যে, আপনিই যথার্থ সম্পত্তির মালিক, আর কেহ নহেন। ত্রিলোচন যে আপনাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই। আপনার সম্পত্তি হইলে পথে দুর্ঘটনার পরেই আপনি সুবর্ণপুরে ফিরিয়া যান নাই কেন? আপনার স্মৃতির এখনও দোষ রহিয়াছে, বিষয়ের ভার এখন পাইবেন না। বিশেষ, ত্রিলোচন সব করিতে পারে, এখন সুবর্ণপুরে গেলে আপনার প্রাণের আশঙ্কা।

স্বাগতা কহিল,—আমি যদি না সেরে উঠতে পারি তা হ'লে কি সুবর্ণপুরে কখনও যাব না?

হরিনাথ বলিল,—আপনি শীঘ্রই সেরে উঠবেন, কোন চিন্তা করবেন না। আমি এখানে উকীলের সঙ্গে পরামর্শ করব। আপনি যখন যাবেন এখান থেকে আপনার সঙ্গে লোকজন যাবে, উকীল যাবে। যখন এতদিন গেল ত আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন।

অগত্যা স্বাগতা স্বীকৃত হইল।

হরিনাথের অনুরোধে ডাক্তার মাঝে মাঝে স্বাগতাকে দেখিতে আসিতেন। তিনি বলিলেন,—আপনি আবার বেড়াতে যাবেন। মোটরে যেতে ভয় হয় গাড়ী ক'রে যাবেন।

স্বাগতা স্মিতমুখে কহিল,—ভয় কিসের? গাড়ী থেকে কি পড়ে না? পড়বার হ'লে গাড়ী থেকেও পড়ে।

বৈকাল বেলা আবার ভ্রমণ আরম্ভ হইল। স্বাগতার সঙ্গে কখন সুলোচনা, কখন প্রভাবতী। হরিনাথ কিংবা গঙ্গাধর, অথবা দুই জনই মোটরে থাকিত, ত্রিলোচনের অসাধ্য কিছুই নাই তাহা তাহারা উত্তমরূপে জানিত।

স্বাগতার চক্ষে সব নূতন। এই সকল স্থানে কতবার ভ্রমণ করিয়াছে, এই গঙ্গার ধার জাহাজের সারি, সবই তাহার দেখা, কিন্তু কিছুই মনে নাই।

মোটর গঙ্গার ধারে পূর্ব্বের ন্যায় দাঁড়াইল। স্বাগতা গাড়ীর ভিতর মাঝখানে, একপাশে প্রভাবতী আর এক পাশে হরিনাথ। গঙ্গাধর চালকের পাশে বসিয়া।

প্রভাবতী বলিল,—তুমি ত এখানে কত দিন এসেচ, তোমার মনে নেই?

—কিছু মনে নেই। এ সব ত এর আগে আমি দেখি নি।

স্বাগতা চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। কিছু দূরে ঘোষ-সাহেবের মোটর। তাঁহারা স্ত্রী পুরুষ নামিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে খানিক আগাইয়া গিয়াছিলেন। গাড়ীতে শ্যামাচরণ। হরিনাথের মোটর আসিতে সে দেখে নাই। জাহাজে কলের কপিকলে মাল বোঝাই হইতেছিল, সে তাহাই দেখিতেছিল।

হঠাৎ স্বাগতার চক্ষে শ্যামাচরণ পড়িল। তাহার দৃষ্টি স্থির হইল, মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। হরিনাথকে বলিল, ঐ যে খালি মোটরের শোফর ব'সে আছে ঐ আমাদের মোটর পথে উল্টে দিয়েছিল। আমি ওকে চিনি, ওর নাম শ্যামাচরণ।

সকলেই স্বাগতার কথা শুনিতে পাইল। হরিনাথ বলিল,—রামনাথ তুমি ওকে চেন?

রামনাথ বলিল,—বেশ চিনি, ওর নাম শ্যামাচরণই বটে। ও ঘোষ-সাহেব ব্যারিষ্টারের গাড়ী চালায়।

গঙ্গাধর মোটর হইতে নামিল, হরিনাথকে বলিল,—তুমি নেমো না আমি যাচ্ছি।

গঙ্গাধর গিয়া শ্যামাচরণকে জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার নাম শ্যামাচরণ?

শ্যামাচরণ আর কাহাকেও দেখে নাই সুতরাং তাহার কোন ভয় হইল না। বলিল,—কেন বলুন দেখি? আমি ত আপনাকে চিনতে পারচি নে।

—চেনবার কথাও নয়। এটা চিনতে পার?

শ্যামাচরণের রুমাল একটা ন্যাকড়ায় বাঁধা সর্ব্বদাই গঙ্গাধরের পকেটে থাকিত, বাহির করিয়া চিহ্ন দেখাইল। বলিল, দশঘরা গ্রামের কাছে পথের ধারে বনের মধ্যে গাছের উপর এই রুমাল পাওয়া যায়। সেখানে যে মোটর পুড়ে গিয়েছিল তুমি চালাচ্ছিলে না?

শ্যামাচরণ একটিও কথা কহিল না। তাহার মুখের ভিতর যেন ধুলা ভরিয়া গেল। তাহার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, সর্ব্বাঙ্গ প্রস্তরের ন্যায় নিস্পন্দ হইল।

গঙ্গাধর অঙ্গুলি দিয়া স্বাগতাকে দেখাইয়া দিয়া বলিল,—ওঁকে চিনতে পার? উনি তোমাকে চিনেছেন।

শ্যামাচরণ পায়ের তলায় কল চাপিল, এঞ্জিনের শব্দ হইতে আরম্ভ হইল। হাত দিয়া মোটরে পূর্ণ বেগ দিয়া চালাইল। মোটর প্রায় লাফাইয়া উঠিল। গঙ্গাধর লম্ফ দিয়া এক পাশে সরিয়া গেল।

গঙ্গাধর নিজেদের মোটরে ফিরিয়া আসিয়া রামনাথকে বলিল,—ঐ মোটরের পিছনে চল। বেশী জোরে চালাবার আবশ্যক নেই, কোথায় যায় দেখতে হবে।

শ্যামাচরণের দিকবিদিক বা অন্য কোন জ্ঞান ছিল না, যে-কোন দিকে হয় পলায়ন করিতে পারিলেই হইল। পুলিসের বাঁশী বাজিতে লাগিল, পাহারাওয়ালারা মোটর থামাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কেহই মোটরের গতি রোধ করিতে পারিল না। শ্যামাচরণ উন্মত্তের ন্যায় মোটর চালাইতেছিল। পথে এক জায়গায় একটা দমকল ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে বেগে আসিতেছিল। দমকল দেখিয়া অন্য গাড়ী সরিয়া যায়, দমকল কাহাকেও পথ ছাড়িয়া দেয় না। একেবারে সম্মুখে পড়িয়া শ্যামাচরণ যেমন পাশ কাটাইতে যাইবে অমনি ধাক্কা লাগিয়া শ্যামাচরণের মোটর ঠিকরিয়া পড়িয়া উল্টাইয়া গেল। দমকলের কিছু হইল না, যেমন বেগে যাইতেছিল সেইরূপ চলিয়া গেল।

শ্যামাচরণ মোটরের তলায় পড়িল, মোটর আগুন ধরিয়া জ্বলিয়া উঠিল। হরিনাথের মোটর কিছুদূরে ছিল। মোটর থামাইয়া গঙ্গাধর নামিয়া দেখিতে গেল। আগুনের এমন উত্তাপ যে নিকটে যাওয়া যায় না, গঙ্গাধর পথের পাশে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

অন্য দমকল ডাকিতে, জল ঢালিবার উদ্যোগ করিতে মোটর পুড়িয়া গেল। গঙ্গাধর দেখিল জ্বলন্ত মোটরের তলায় শ্যামাচরণের একটা পা দেখা যাইতেছে। গঙ্গাধরের স্মরণ হইল আর একবার এই রকম দেখিয়াছিল—নির্জ্জন পথের পাশে বনের মধ্যে এই রকম করিয়া মোটর পুড়িয়া গিয়াছিল, মোটরের তলায় এইরকম একজনের পা দেখা যাইতেছিল।

গঙ্গাধর ফিরিয়া আসিয়া মোটরে উঠিল। হরিনাথের দিকে চাহিয়া ঈষৎ মস্তক হেলাইল।

প্রভাবতী শিহরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—মানুষটা পুড়ে গেল না কি? ওকে তুমি কি বলেছিলে, আর গাড়ী নিয়ে অমন করে পালালই বা কেন?

গঙ্গাধর বলিল,—সে সব কথা পরে বলব।

স্বাগতা কি ভাবিতেছিল। বলিল,—দেবতার বিচার দেখলে! (ক্রমশঃ)

পণ্ডিত ভুবনমোহন কর

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

বারো বৎসর হইল পণ্ডিত ভুবনমোহন কর নশ্বর জীবন ত্যাগ করিয়াছেন। এ যাবৎ আমরা তাঁহাকে স্মরণ করি নাই; আজ তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার মূর্ত্তি, তাঁহার জীবনের কথা পুনরায় স্মৃতিপটে উঠিল। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকের নিকটেই তাঁহার নাম সুপরিচিত নয়, আমরা বিচিত্র ঘটনাসমাবেশের মধ্য দিয়া চলিয়াছি, পিছনে তাকাইবার অবসর নাই, সমস্ত মনটা গতির দিকে, চলার পথে, মনের যে একটা সনাতন দিক আছে সে কথা ভাবিতে এবং স্বীকার করিতেও আমরা নিতান্ত নারাজ। তাই বোধ হয় পণ্ডিত ভুবনমোহনের জীবন-কথা আলোচনা করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। এ প্রয়োজন নিতান্তই নিজস্ব, নিজের মনের সঙ্গে মাঝে মাঝে এমন ভাবে একটা বোঝাপড়া করা দরকার। এরূপ প্রয়োজনবোধ না থাকিলে স্মৃতিসভায় দু-চার কথা বলিবার চেষ্টা সম্পূর্ণ অসঙ্গত হইবে।

পণ্ডিত ভুবনমোহনের আদি বাসস্থান ঢাকা জেলায় বিক্রমপুর পরগণায় তালতলার নিকটে। ১২৩২ সনের ১১ই চৈত্র তাঁহার জন্ম। বাল্যে তিনি ঢাকায় ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন, তারপর সংস্কৃত ব্যাকরণে মনোনিবেশ করেন। মুগ্ধবোধ তিনি প্রথমে পড়েন; তারপর, জনশ্রুতি, ব্যাকরণঘটিত তর্কে একবার হারিয়া যান; তাঁহার প্রতিপক্ষ কলাপ ব্যাকরণে কৃতী ছিলেন, সুতরাং তিনিও নূতন শিক্ষার্থীর উৎসাহ লইয়া কলাপ ব্যাকরণ শিখিতে আরম্ভ করেন। চতুষ্পাঠীতে রীতিমত বিদ্যার্জ্জনের জন্য তাঁহাকে বিদ্যাভূষণ উপাধি দেওয়া হয়।

ষোল বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়; সেই সময় হইতে তিনি হবিষ্যান্ন আহার আরম্ভ করেন; পরে হবিষ্যান্ন ভিন্ন তরকারীও খাইতেন, কিন্তু চিরকাল নিরামিষাশী ছিলেন। শিক্ষাজীবনের পর যখন শিক্ষক-জীবনের সূচনা হইল তখন প্রথমে পাবনা জেলার পোরজনায় ও তৎপরে রাজসাহী জিলাস্কুলে সংস্কৃত পণ্ডিতের কার্য্যে ভুবনমোহন কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এই সময়ে শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদস্থ কোনও শ্বেতাঙ্গ রাজকর্মচারী রাজসাহীতে গিয়া বলেন, ইংরেজী ভাল জানা না থাকিলে জেলাস্কুলে কেহ প্রধান পণ্ডিতের পদে থাকিতে পারিবেন না; পণ্ডিত মহাশয় একবার বলিলেন, তাঁহার শিক্ষাদান-রীতি দেখিয়া তারপর তাঁহার সম্বন্ধে স্থির করা হউক, কিন্তু সে কথা শোনা হইল না। তখন রাজসাহী-বিভাগের যিনি কমিশনার ছিলেন তিনি দিনাজপুর স্কুলে পণ্ডিত মহাশয়ের কর্ম্ম বহাল রাখেন। যথাসময়ে অর্থাৎ পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করার কথা উঠিল; শরীর তাঁহার কর্ম্মপটু ছিল, কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় ইতিপূর্ব্বেই লোকের সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেবা ও শিক্ষকতার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি সেবাকার্য্যে ব্যাঘাত হইতেছে বলিয়া শিক্ষকতা হইতে অবসর লওয়া শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। তখনকার দিনে হয়ত ইচ্ছা করিলে বিনা আপত্তিতে আরও কিছুদিন শিক্ষকতা করিতে পারিতেন। প্রায় শতাবধি বৎসর বাঁচিয়াছিলেন, এই দীর্ঘকাল পেন্সনের অল্প কয়েকটা টাকাই ছিল তাঁর অবলম্বন, ব্যক্তিগত অভাবের জন্য কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে হয় নাই, স্বোপার্জ্জিত অর্থে—অকৃতদার তিনি—তাঁহার সংকুলান হইত।

ভুবনমোহনকে শিক্ষকতা গ্রাস করিতে পারে নাই,—তাঁহাকে আমরা সেবাধর্ম্মে ব্রতী বলিয়াই জানি। সেবাকার্য্যকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিবার মূলে তাঁহার মাতৃদেবীই পণ্ডিত মহাশয়ের আদর্শস্থানীয়া ছিলেন। গ্রামে কোথায় কাহার অভাব, কোথায় কে কষ্ট পাইতেছে সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি সদা সতর্ক ছিল।

পারিবারিক গঞ্জনাও তাঁহাকে এজন্ত সময়-সময় সহ্য করিতে হইত। কিন্তু তিনি সন্তানের শৈশবেই তাঁহার দৃষ্টি সংসারের এই দিকে আকর্ষণ করিয়া দিয়াছিলেন। মাতার ভাবপূর্ণ ইঙ্গিত পুত্রকে জীবনের লক্ষ্য দেখাইয়া দিল। পুত্র মাতাকে মনে প্রাণে ভালবাসিতেন;—মাতৃআজ্ঞা পালন করিবার জন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন দামোদর নদ সাঁতার দিয়া পার হইয়াছিলেন, ছাত্রাবস্থায় পণ্ডিত মহাশয়ও একদিন তেমনি মাতার নির্দ্দেশমত অগ্রজের বিবাহোপলক্ষে বাড়ি আসিবার পথে ধলেশ্বরী নদী সাঁতরাইয়া পার হন; সেদিন ঝড় উঠিয়াছিল,পণ্ডিত মহাশয় যে চরে আশ্রয় পান, কতকগুলি কুম্ভীরও সেই চরে বিশ্রাম করিতে আসিয়াছিল, ঝটিকার প্রচণ্ড তাণ্ডবে তাহারা এতই ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে, অনায়াসে করতলগত মনুষ্য শিকারের দিকে তাহাদের লক্ষ্য ছিল না। বিদেশে তিনি যখন শিক্ষকতাকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন তখন মাতৃদেবীর আশীর্ব্বাদ ও প্রার্থনাই তাঁহাকে সকল বিপদ হইতে কবচের মত রক্ষা করিত। তারপর পুত্র যখন দিনাজপুরে চাকুরি উপলক্ষে আসেন তখন আশঙ্কাপ্রবণ মাতৃহৃদয় তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে চাহিল না, তখনকার দিনে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, কামরূপ রঙ্গপুর দিনাজপুর অঞ্চলে কোনও অবিবাহিত যুবক গেলে সে আর দেশে ফিরিয়া আসিতে পারে না,—ভুবনমোহনকে তাঁহার মাতা কি করিয়া ছাড়িয়া দেন! তাই তিনি কিছুতেই পুত্রকে একা ছাড়িয়া দিলেন না, আর সেই যে গেলেন সেই অবধি পুত্রের নিকটে ছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় ব্রাহ্ম ছিলেন; বিধবা হওয়ার পর হইতে মা নিষ্ঠার সঙ্গে নির্জ্জলা একাদশী পালন করিয়া আসিতেছিলেন; একবার তাঁর বৃদ্ধবয়সে রোগ হয়, রোগে ও ক্ষুধায় ছটফট্ করিতেছেন তবু ঔষধ বা পথ্য কিছু মুখে দিবেন না, তখন পুত্র মাকে ধরিয়া সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন,—মা, তুমি এখন খাও, তোমার যা ব্রত আমি নিলাম, তোমার পাপও আমি নিলাম, আমরণ একাদশী পালন করিব, নির্জ্জলা উপবাস করিব। সেই হইতে পণ্ডিত মহাশয় আমরণ এই ব্রত পালন করিয়াছিলেন; তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন, এই দীর্ঘ জীবনে বরাবর একাদশীতে জলটুকু গ্রহণ করিতেন না। পিতামাতা তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষ দেবতা ছিলেন; মুখের কথা নয়, অন্তরের পূজা তাঁহারা পাইতেন।

পণ্ডিত মহাশয়ের সেবার প্রতি দৃষ্টি যে তাঁহার মাতাঠাকুরাণী প্রথমে আকর্ষণ করেন, সে কথা বলিয়াছি। তিনি প্রথমে রোগীর শুশ্রূষাই করিতেন, পরে তাঁহার মনে হইল যে, রোগীর শুধু শুশ্রূষা না করিয়া যদি ঔষধ দিতে পারেন, চিকিৎসা করিতে পারেন, তাহা হইলে অনেকের উপকার হইতে পারে এবং আরও বেশী উপকার হইতে পারে। সেই জন্ত তিনি আয়ুর্ব্বেদ পড়িবেন ঠিক করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার যথেষ্ট পরিচয় ছিল; তিনি পরামর্শ দিলেন,—আয়ুর্ব্বেদের সাহায্যে চিকিৎসা বড় সহজ নয়,—একার পক্ষে অসম্ভব, ঔষধ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হইলে অন্তের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে। তার চেয়ে আপনি বরং হোমিওপ্যাথি পড়ুন। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেও হোমিওপ্যাথি জানিতেন। হাঁপানীর ঔষধ ব্ল্যাটা ওরিয়েণ্টালিস্ তাঁহারই আবিষ্কার। পণ্ডিত মহাশয় ক্রমে সাধারণ রোগীদিগকে হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিতে আরম্ভ করেন। তার পর রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে এবং অবসর লইবার সময় হইলে তিনি শিক্ষকতাকর্ম্ম হইতে সরিয়া আসিয়া সমস্ত সময় ঐ ব্রতেই নিয়োগ করেন, যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন একর্ম্মে তাঁহার না-ছিল বিরক্তি না-ছিল শৈথিল্য। বাস্তবিক, সমস্ত জীবনটাই তিনি এই সেবার সুরে বাঁধিয়াছিলেন। নিত্য তাঁহার গড়ে ১৫০ রোগী আসিত; দিনাজপুর হাসপাতালেও তখন এত রোগীর সমাবেশ হইত না। দিনাজপুর ও তাহার নিকটবর্ত্তী লোকেরা তাঁহাকে 'পণ্ডিত মশায়' বলিয়াই জানিত; তাহাই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট পরিচয় ছিল। রাত্র দুইটায় সময়ে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইত, তাঁহার দৈনিক কর্ম্মযজ্ঞের আরম্ভ হইত। তখন তিনি প্রথমে প্রত্যহ যে-সব পত্র আসিয়া জমিত তাহাদের উত্তর দিতেন, তারপর ভোর হওয়ার পূর্ব্বে লণ্ঠন হাতে করিয়া, নিকটে যে-সব রোগী থাকিত তাহাদের খোঁজ নিয়া আসিতেন। সেখান হইতে ফিরিয়া রোগী

দেখিতে বসিতেন, এ কাজে বেলা একটা দুইটা হইত। তাহার পর খাওয়া; বহুদিন পরে দিনাজপুরের স্বনামধন্য রায়-সাহেব রাধাগোবিন্দবাবু তাঁহার জন্য রাধাগোবিন্দজীর প্রসাদ পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন, পণ্ডিত মহাশয়ের জীবনের শেষ ভাগে তিনি হবিষ্যের উপকরণ পাঠাইয়া দিতেন, তাহাই বাড়িতে রান্না হইত। রোগীরা তাঁহাকে নিতান্তই আপনার মনে করিত, তাহাদের আত্মীয়স্বজন তাঁহার নিকট কোনই সঙ্কোচ বোধ করিত না, সাধারণতঃ 'পণ্ডিত মশায়' নামের কাছে তাঁহার প্রকৃত নাম চাকা পড়িয়াছিল। এক-একদিন এমনও হইত যে, রোগীর বৃদ্ধ আত্মীয়স্বজন মনের আবেগে তাঁহার হাত ধরিয়া নিজের বাড়িতে লইয়া যাওয়ার জন্য টানাটানি করিত, নিতান্ত আবদারের সহিত কথাবার্ত্তা বলিত, তাহাতে তিনি কখনও বিরক্ত হন নাই। তাঁহার সদা সর্ব্বদা এই রাগনিবারণ মন্ত্র ছিল,—লোকে আমাকে গালি দেয়, মিথ্যাবাদী বলে, নিন্দা করে—বাস্তবিক আমি যদি দোষী হই তাহা হইলে তাহারা তো ঠিকই বলে, আর যদি তাহাদের নিন্দা অযথা হয় তবে সে নিন্দায় আমার কি আসে যায়? তাঁহার ভাব ছিল সর্ব্বদা শ্রদ্ধার, উপকার করিতেছি বলিয়া কখনও কিছু করিতেন না, ভগবানের ছেলে-মেয়ের সেবা করিতেছি জানে সব কাজ করিতেন,—'বাবা আপনি'— 'মা আপনি'—এই ছিল তাঁর সকলের সঙ্গে কথা বলিবার ধরণ। স্ত্রী-পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন— এ সব ভেদের বহু উর্দ্ধে তিনি ছিলেন, যে-কেহ তাঁহার কাছে আসিত সে-ই 'বসেক্' এই সম্ভ্রমপূর্ণ দিনাজপুরী ভাষায় সংবর্দ্ধনা লাভ করিত।

প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের একদিনের ব্যাপার মনে পড়ে। সেদিন অবিরল জলধারায় আকাশ অন্ধকার; এত বেশী বৃষ্টি যে লোকে ঘর হইতে বাহির হইতে পায় না। তার পূর্ব্বে পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে আমাদের একটি আত্মীয়ের অসুখ সম্বন্ধে জানান হইয়াছিল; তবে ঐ জলঝড়ের মধ্যে তিনি যে আসিতে পারিবেন এরূপ সম্ভাবনা কাহারও মনে উদয় হয় নাই। কিন্তু ভীষণ দুর্য্যোগের মধ্যেও পণ্ডিত মহাশয়ের শান্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, তিনি আসিয়া এবং ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া একই উদ্দেশ্যে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। এই ভাবে তিনি সেবাধর্ম্ম পালন করিতেন, শ্রান্তি ছিল না, বিরাম ছিল না।

মাধ্যাহ্নিক আহারের পর তিনি গাড়ীতে উঠিতেন, তাঁহার একখানি পাল্কীগাড়ী ছিল, আর একখানি টম্‌টম্, টম্‌টমেই পণ্ডিত মহাশয় বেশী ঘুরিতেন, তাঁহার অনুচর দরবারী গাড়ী হাঁকাইত, সন্ধ্যাবেলায় শহরের রোগী দেখিয়া যখন তিনি বাড়ি ফিরিতেন তখন যে সব যুবক—কেহ তাঁহার বাড়িতে থাকিয়া, কেহ বা অন্যত্র হইতে—তাঁহার চিকিৎসায় সাহায্য করিত, তাহাদিগকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাবিধি শিক্ষা দেওয়া তাঁহার নিত্যকর্ম্ম ছিল। তাহার পর তিনি নিজে কিছুক্ষণ পড়াশুনা করিতেন; রাত বারোটায় শুইতেন, দুইটায় উঠিতেন, উঠিয়া আবার কাজে প্রবৃত্ত হইতেন, এই ভাবে দিনের পর দিন চলিত। শুধু শেষ কয় বৎসর তিন ঘণ্টা ঘুমাইতেন, অর্থাৎ দুইটায় না উঠিয়া তিনটায় উঠিতেন। তাঁহার নিয়মানুবর্ত্তিতা, তাঁহার অনলস কর্ম্মপটুতা, তাঁহার অমায়িক ব্যবহার এবং সদাজাগ্রত সেবার ভাব আমাদের আদর্শস্থানীয়, ধ্রুবতারার মত সেবাধর্ম্মের গহন পথে পথপ্রদর্শক।

তাঁহার ধর্ম্মজীবনের কোনও কথা বলা এখানে সম্ভব নয়; শুধু এইটুকু জানি যে, তাঁহার নিকট ধর্ম্মের ভাব সম্প্রদায়বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। প্রতি রবিবার তিনি স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন; কিন্তু ধর্ম্মপ্রচারের ভাব তাঁহার ছিল না। শুনিয়াছি, এক সময়ে প্রচারে আস্থাবান্ ধর্ম্মোৎসাহী কোনও বিশিষ্ট ভদ্রব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন,—আপনার এতখানি সেবার ভাব, আপনি ধর্ম্মপ্রচার করেন না কেন? তিনি উত্তর দেন,—প্রচারের প্রয়োজন কি? আমি তো কাজ করিয়া যাইতেছি, তাঁহারই কাজ করিতেছি, যদি কেহ শিখিতে চায় তো ইহা হইতেই শিখিতে পারিবে। "যৎকরোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্," এই ছিল তাঁর জীবনের এক বড় কথা। তা ছাড়া তিনি সকল ধর্ম্মের সম্বন্ধেই শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, হিন্দু জানিত তিনি হিন্দু,

ব্রাহ্ম জানিত তিনি ব্রাহ্ম, মুসলমান দেখিত তাহার ধর্মশাস্ত্র মতে তিনিই সাধু, আপনার জন বলিয়া সকলেরই তাঁহার উপর দাবি ছিল। তিনি যে একজন মানুষ ছিলেন, আমরা হিন্দু ব্রাহ্ম মুসলমান খ্রীষ্টান গণ্ডী টানিয়া যে কৃত্রিম ভেদ গড়িয়া তুলি, তাঁহার অনাবিল প্রীতি-রসের ধারায় সেই ভেদ দূর হইত, সেই গণ্ডী মুছিয়া যাইত। তাঁহার সেবাকর্ম্মে কত লোক সাহায্য করিতে আসিত, সে-সব সাহায্য তিনি সাধারণতঃ গ্রহণ করিতেন। কতলোকে কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার নিকট বহু সামগ্রী আনিয়া দিত। দিনাজপুরের আম প্রসিদ্ধ, কেহ বাগানের ফল আনিয়া উপহার দিত, কেহ শীতের পূর্ব্বে শীতবস্ত্র আনিত, তিনি সে-সব বিলাইয়া দিতেন, পাড়ার গরিব দুঃখী ডাকিয়া তাহাদিগকে বিতরণ করিতেন, নিজের জন্য কিছুই রাখিতেন না। এক সময়ে গবর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহার ঔষধালয় চালাইবার পক্ষে সাহায্যের জন্য কিছু বৃত্তি দেওয়ার কথা হয়, কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় তাহাতে রাজী হন না; কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন যে, তাঁহার হিসাব দেওয়ার ক্ষমতা থাকিবে না, তাঁহার লোকেরা কাজকর্ম্মে এমনি ব্যস্ত যে সময় পাইবে না, হিসাব দিতে গেলে আলাদা লোক রাখিতে হইবে, সুতরাং এ টাকা তিনি নিতে পারিবেন না। তাঁহার সাধনার জন্য তিনি কখনও পরমুখাপেক্ষী হন নাই, কাহারও দ্বারস্থ হন নাই, কোমলে কঠোরে তাঁহার চিত্ত গড়া ছিল। সাধু অঘোরনাথ, সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়, ইঁহারা ছিলেন তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু; অঘোরনাথ যখন পূর্ণিয়ার নিকটে দস্যুহস্তে সঙ্কটে পড়িয়া কেবলমাত্র ভগবৎ প্রেমের দ্বারা উদ্ধারলাভ করেন, তাহার পর তিনি পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে কিছু দিন থাকেন। ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্কলহে যখন গোস্বামী মহাশয় নির্য্যাতিত হন, তখন পণ্ডিত মহাশয় বন্ধুর কোনও পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি-না দেখিবার জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে কলিকাতায় আসেন এবং গোস্বামী মহাশয়ের চিত্ত পূর্ব্ববৎ প্রীতিরসে আপ্লুত দেখিয়া সন্তুষ্ট মনে দিনাজপুরে ফিরিয়া যান। সাধক প্রকাশচন্দ্রও পণ্ডিত মহাশয়ের সেবাপরায়ণতায় ও সেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ ব্যাপারে মুগ্ধ হইয়া শেষ বয়সে কিছুদিন পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে কাটাইয়া যান। এইরূপে সাধুদের সঙ্গলাভ তাঁহার জীবনে বহুবার ঘটিয়াছিল।

বাংলা ১৩২৭ সনের ১৯শে ভাদ্র তাঁহার মৃত্যু হয়। পণ্ডিত ভুবনমোহন করের স্মৃতি দিনাজপুরবাসীর পক্ষে এক অমূল্য সম্পদ, বাঙ্গালীর একটা গৌরবের পরিচয়। তাঁহাকে দেখিলে জানিলে তাঁহার সঙ্গে কথা বলিলে জীবনে প্রচুর শিক্ষালাভ হইত। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এই আকুমার ব্রহ্মচারী তেজস্বী হৃদয়-মন লইয়া, পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা, অটুট ধৈর্য্য ও দুর্জ্জয় শক্তি লইয়া দিনাজপুরের মত স্থানে ব্যাধিপ্রপীড়িতের সেবাশুশ্রূষায় জীবন কাটাইয়া দিয়াছেন। স্তুতিনিন্দা তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই, কর্ম্ম হইতে ভক্তি কখনও ভ্রষ্ট হয় নাই, জ্ঞান তাঁহার নিত্যসাথী ছিল। এরূপ অলোকসামান্য ব্যক্তিকে, জীবনে যিনি লোকচক্ষুর সামনে নিজের কর্ম্মকে 'জাহির' করিতে চাহেন নাই, মৃত্যুর পরেও যে তাঁহাকে লোকচক্ষুর সামনে আনিয়া সমারোহ করা হয় নাই, তাহা সঙ্গতই হইয়াছে। কতকগুলি বিষয়ে সংসারে বেশী বলিতে গেলে কুণ্ঠা আসে, তাঁহাদের সম্বন্ধে অনেক কথাই অকথিত থাকে, পণ্ডিত মহাশয়ের সম্বন্ধেও সেইরূপ। তাঁহার এই স্মৃতিসভার দিনে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি লোকান্তরে তাঁহাকে তৃপ্ত করুক।*

* সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ছাত্রসমাজে পঠিত।

পরম পূজনীয়

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

'বিপর্য্যয় না ?

দেখি, অদূরে রাস্তার মোড়ের বিড়ির দোকানের ঠিক সাম্‌নে দাঁড়াইয়া একজন লোক নারিকেল দড়ির মাথার আগুন হইতে অতি যত্নে বিড়ি ধরাইতেছে। যদিও প্রায় এক যুগ পরে দেখিলাম, তবু লোকটি যে বিপর্য্যয় বাঁড়ুয্যে ভিন্ন অন্য কেহ হইতেই পারে না—সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইলাম। বিপর্য্যয়ের সঙ্গে আই-এস্‌সি একই কলেজে পড়িয়াছি, তারপরে ও আই-এস্‌সি পাস করিয়াছিল কি না ঠিক জানি না, হয়ত জানার আগ্রহও আমার ছিল না, তবে তাহাকে এতদিন পরেও ভুলিতে পারি নাই। তাহার কারণও আছে,—বিপর্য্যয় কলেজে পড়িতে আসে নাই, আসিয়াছিল সময় কাটে না বলিয়া তাহারই একটা সুব্যবস্থা করিতে, এবং ব্যবস্থা সে ভালই করিয়াছিল,—কলেজের সরস্বতী পূজা হইতে সুরু করিয়া থিয়েটার, ডিবেটিং সোসাইটি কোন কিছুতেই সে অনুপস্থিত থাকিত না, এমন কি সব-কিছুতে স্বয়ংসিদ্ধ নেতা ছিল বলিলেই চলে, শুধু পরীক্ষাগৃহে কখনও কেহ তাহাকে উপস্থিত থাকিতে দেখে নাই। তখনই জানিতাম,—শুধু পরীক্ষা পাস নয়, সে জীবনে অনেক কিছু করিতে পারে, কিন্তু করিবে না। এ বিষয়ে এমন স্থিরপ্রতিজ্ঞ আর কাহাকেও দেখি নাই।

আরে, বিপর্য্যয় যে!—বলিয়া তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই সে ফিরিয়া একটু বিস্ময় ও আনন্দে হাসিয়া বলিল,—তা'পর, আরে···অপ্রকাশ ? গুড লর্ড! আছিস্ কেমন ? কচ্ছিস্ কি ?

—তোর খবর কি আগে শুনি ? আমার—সে বলছি। উঃ, কতকাল পরে দেখা!—বলিয়া তাহার একখানি হাত প্রায় চাপিয়া ধরিলাম।

বিপর্য্যয় ইহারই মধ্যে একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। সে রাস্তার অপর পারের ফুটপাথে একটি সাত-আট বছরের ছেলেকে অতি যত্নের সহিত কেন জানি নিরীক্ষণ করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ একটু চকিত হইয়া আবার কথা সুরু করিল,—ও, হ্যাঁ,···কি করছি আমি ? অনেক কিছুই করেছি এ জীবনে, আপাততঃ একটা যাত্রা-পার্টি খুলে তারই অধিকারী মহারাজ সেজে ব'সে আছি।

তাহার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় চট করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে একটা দৃষ্টি বুলাইয়া লইলাম। মাথার চুলগুলি সে একরকম মন্দ করে নাই। যাত্রার দলের অধিকারী মহাশয়ের অনুরূপই হইয়াছে বটে! মুখের ভাবে একটা গাম্ভীর্য্যও আনিয়া ফেলিয়াছে, চোখ দুইটি ইহারই মধ্যে বহু অনিদ্র রজনীর সাক্ষ্য দিতে সুরু করিয়াছে। বিড়ি টানার ভঙ্গীটি যে বহু সাধ্যসাধনা করিয়া তাহাকে আয়ত্ত করিতে হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। গায়ের ঢোলা মলিন পাঞ্জাবীটার বুকের কাছে খানিকটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে—হয়ত যাত্রা-পার্টির তরবারির খোঁচাই লাগিয়াছে, অবশ্য, নাও লাগিতে পারে। কিন্তু সব-কিছুর সুন্দর সমাবেশে সে একটি যাত্রাদলের আদর্শ অধিকারীর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ধন্য বিপর্য্যয় বাঁড়ুয্যে! এতদিনে তাহার সেই কলেজের থিয়েটারে প্রথম হাতেখড়ি সার্থক হইয়াছে। এতদিনে বিপর্য্যয় যথাস্থান আবিষ্কার করিয়াছে, এখানে তাহার যোগ্যতা সন্দেহ করিবার মত কিছু আর নাই।

বিপর্য্যয় কথা শেষ করিয়া আবার সেই ছেলেটির দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু কেন যে সে এতদিন পরে বহু পুরাতন সহপাঠীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া এই সাধারণ ছেলেটির উপর এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিল তাহা ঠিক ধারণা করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। বলিলাম,—বিপর্য্যয়, যাত্রা-পার্টি চলছে কেমন ?

—হুঁ, চলছে, খুব চলছে।—বলিয়া ছেলেটির দিকে জলন্ত বিড়িটি তুলিয়া ধরিয়া তাহাকে নির্দ্দেশ করিয়া বিপর্য্যয় বলিল,—বেড়ে হয় কিন্তু! আহা, ওকে যা ধ্রুব'র পার্টে মানায়—ফার্ষ্ট ক্লাস একেবারে। ভাল কথা অপ্রকাশ,—হ্যাঁ, ধ্রুব চরিত্র নিয়ে আমি যা নাটক লিখেছি একখানা—বি-উ-টি-ফু-ল! আঃ, ঐ ছেলেটাকে যদি পেতাম—তবে তো মার দিস্ আর কি! গান সে ও জানুক, আর নাই জানুক, এমন ট্রেনিং দিতাম যে সাত দিনে সব সড়গড় হ'য়ে যেত। ওঃ, বই চড়াক ক'রে জমে যেত।

—ও, তাই বুঝি এতক্ষণ অমন ক'রে ছেলেটিকে দেখছিলি?—বলিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম।

বিপর্য্যয় কেমন একটু মলিন হাসিয়া বলিল,—এতক্ষণ মানে—পুরো তিনটি কোয়ার্টার ঠায় এম্‌নি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকছি। ছেলেটাকে আমার পাওয়া চাই-ই চাই।

মনে মনে ভাবিলাম, অধিকারীকে তাহা হইলে এবম্বিধ বহু কৃচ্ছ-সাধনও করিতে হয়? 'হা ধ্রুব' 'হা ধ্রুব' করিয়া পথে পথে বিড়ি ফুঁকিয়াও ফিরিতে হয়? বলিলাম—বলিস কি, তাহ'লে এম্‌নি ক'রে ছেলে যোগাড় করতে হয়?

—হুঁ, তা করতে হয় বইকি! যাকে-তাকে ধ্রুব সাজিয়ে বই ত মাবৃভার করতে পারি না তা ব'লে।—বলিয়া বিপর্য্যয় হাতের নিঃশেষিতপ্রায় বিড়িটি রাস্তায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আর একটা নূতন করিয়া ধরাইল। তারপরে বলিল,—দেখি, ছেলেটাকে একটু বাজিয়েই দেখা যাক না।—বলিয়া বিপর্য্যয় আমার কাছে বিদায় না লইয়া আমাকে এক প্রকার অগ্রাহ্য করিয়াই ছেলেটির কাছে গিয়া দাঁড়াইল। তারপরে ছেলেটির সঙ্গে তাহার কি যে দু-এক কথা হইল তাহা আর শুনিতে পাই নাই। কিন্তু সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা সুবুদ্ধির কাজ হইবে না মনে করিয়াই হাঁটিতে সুরু করিলাম। দু-এক পা অগ্রসর হইয়া পিছু ফিরিতেই দেখিলাম, ছেলেটি বিপর্য্যয়কে কি যেন বলিয়া আস্তে আস্তে সামনের একটি দ্বিতল বাড়িতে প্রবেশ করিল! বিপর্য্যয় সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

পথে পথে বিপর্য্যয়ের কথা ভাবিলাম, কলেজ-জীবনের কথা, আরও কত কথা। সেদিন বিপর্য্যয় ছিল একটি নির্ভীক বেপরোয়া যুবক, আর আজ সে ধ্রুব-সন্ধানী কোন্ এক নাম-না-জানা অপেরা পার্টির সুযোগ্য অধিকারী মহাশয়। বিপর্য্যয় আবার একখানা নাটকও লিখিয়াছে। কে জানে কেমন নাটক লিখিয়াছে, কিন্তু অধিকারিত্ব তাহার ষোলকলায় পূর্ণ হইয়াছে। বিপর্য্যয় বাঁড়ুয্যে কি-না যাত্রাদলের 'অধিকারী-মশায়'—না হাসিয়াও পারিলাম না।

এদিক-সেদিক ঘুরিয়া ঘণ্টা-দুই পরে বাড়ি ফিরিতেছি, দেখি, বিপর্য্যয় তখনও সেই বিড়ির দোকানের সামনের গ্যাসপোষ্টে গা ঠেস দিয়া নিশ্চপ নিস্পৃহভাবে একাগ্রমনে বিড়ি ফুঁকিতেছে, তেমনই পূর্ব্ববৎ অধিকারীর ষ্টাইলে। একটু বিশেষ বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম,—কি, এখনও এখানে দাঁড়িয়ে যে?

বিপর্য্যয় সহসা বড় বিচলিত হইয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তেই সে আগাইয়া আসিয়া আমার কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া বলিল,—এগিয়ে চ, সব বলছি।

নীরবে আমরা কিছুদূর পথ অগ্রসর হইলে সে বলিতে সুরু করিল,—উঃ, ছেলেটা কি তোখোড় রে বাবা! যেই ওকে সব বলা—ওমনি রাজী। বললে; দাঁড়াও তুমি। আমার বাক্সে জমানো দুটো টাকা আছে আমি তা নিয়ে চট ক'রে পালিয়ে আসছি। কিন্তু সেই যাওয়াই যাওয়া! ঠায় দু-ঘণ্টা কেটে গেল, তবু আর তার পাত্তা নেই। হুঁ, ছেলে বটে! ভাল কথা, তুই কি করছিস আজকাল অপ্রকাশ?

—আমি? আমি? এই চেষ্টা-চরিত্তির করে একটা প্রফেসারি জুটিয়েছি কোনরকমে, তাই চলছে—বলিয়া সঙ্কোচ কাটাইয়া উঠার পূর্ব্বেই সে বলিল,—বে-শ! বলিয়া এমনিভাবে সে আমার একটি হাত তাহার নিজের হাতের মধ্যে জড়াইল যে, আমি স্পষ্টই অনুভব করিলাম আমার সৌভাগ্য সে সমস্ত হৃদয় মন দিয়া গ্রহণ করিল।

আমি নীরবেই ছিলাম। সে আবার বলিল,—তোকে ভারী হিংসে হয়।

তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলাম,—বিপর্য্যয়, একটা যাত্রা-পার্টির অধিকারীকে ত কৃচ্ছ্রসাধন তাহলে কম করতে হয় না? বাবা, নাটক লেখা থেকে এমনি ক'রে ছেলে জোটান পর্য্যন্ত?

—হুঁ, তা করতে হয় বইকি!—বলিয়া পরমুহূর্ত্তেই আবার সে আমার একটা হাত সাগ্রহ কাতরতার সঙ্গে তাহার দুই হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া পথের মাঝে আমার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া ধরা-গলায় বলিয়া চলিল,—সব মিথ্যে কথা ভাই অপ্রকাশ। যাত্রা-পার্টিই আমি খুলিনি মোটে, তার আবার অধিকারী হব কি! পথে পথে 'হা অন্ন' 'হা অন্ন' ক'রে শুধু ঘুরে বেড়াই। চাকরি-বাকরি জুটলো না, আর যা বাজার পড়েছে—কোনোদিন জুটবে ব'লেও ত মনে হয় না। একটা মতলব তাই ঠাউরেছিলাম। তোকে তা বলতে অবশ্য বাধা নেই কোন। আর—জেলে যাওয়া, মান-অপমান, সে-সব ভয় অনেক দিন কাটিয়ে উঠেছি, আমি মরীয়া এখন। যাক, ভেবেছিলাম, দু-একটা ভদ্রঘরের ছেলে জুটিয়ে এনে তাদের যদি সাত দিনও তাদের বাপ-মার চোখের আড়াল ক'রে রাখতে পারি তাহলে সংবাদপত্রে ছেলের বাপমায়েরা পুরস্কার ঘোষণা ত করবেই—পঞ্চাশ হ'ক, পাঁচ-শ হ'ক একটা কিছু দেবেই। ব্যস, তাহলেই মেরে দিলাম আর কি! বেবী লিণ্ডবার্গ কেসটা পড়েছিস নিশ্চয়ই! কিন্তু ছেলেদের আমি সত্যি ভালবাসি, খুন আমি মরে গেলেও তাদের করতে পারব না।

ক্ষণিকের জন্ম সারা দেহে একটা অস্বস্তিকর আগুনের প্রবাহ অনুভব করিলাম। ত্রস্তে বিপর্য্যয়ের হাত হইতে নিজের হাতটা ছিনাইয়া লইয়া বলিলাম,—ডেভিল কোথাকার! একটু লজ্জাও করল না বলতে?

বিপর্য্যয় হো হো করিয়া পাগলের মত হাসিয়া উঠিয়া বলিল,—লজ্জা? ছাত্রজীবন শেষ ক'রে অন্নের সন্ধানে বেরিয়ে সত্যি কথা কোনোদিন কাউকে বলেছি ব'লে মনে পড়ে না। আজ তোকে এই প্রথম বললাম। সত্যি কথা বলতে—এতকালের অনভ্যাসের ফলে—লজ্জা একটু করেই, কিন্তু কি যে তৃপ্তি সে তুই বুঝবি অপ্রকাশ, বুঝবে শুধু তারা যারা আমারই মত ভদ্রবংশে জন্মে লেখাপড়া কিছু শিখে অন্ন জোটাতে পারে না—হুঁ, তারা।

সোজা বাড়ি ফিরিতে পারি নাই। পথে পথে আরও কিছুক্ষণ কাটাইয়া দিয়া আহত চিত্তে বাড়ির দরজায় পা দিতেই শুনিতে পাইলাম আমার স্ত্রী অমুচ্চকণ্ঠে একাকাই গজ-গজ করিতেছে,—যার এক কড়া রোজগারের ক্ষ্যামতা নেই তার আবার মরতে বিয়ে করাই কেন আর ছেলে-পুলের সখই বা কেন? গেছেন কোন্ চুলোয় বেড়াতে, আমার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার ক'রে কখন বাড়ি ফিরবেন তা তিনিই জানেন। আমারও যে কপাল!...

আজ এই প্রথম বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলাম না, কারণ, এতদিন পরে আমার ছাত্রজীবনের একজন সহপাঠীকে এমন খুঁজিয়া পাইয়াছি যে আমারও নমস্য। সত্যই তাহার উদ্দেশ্যে নতি জানাইতে হাত তুলিয়াছিলাম, কিন্তু এ নীচ বিকৃত জীবনকে লইয়া আর ব্যঙ্গ করিতেও কেন জানি প্রবৃত্তি হইল না। বিপর্য্যয় হয়ত এখনও পথে পথে যাত্রার দলের অধিকারী মহাশয় সাজিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে আর ভাবিতেছে, অপ্রকাশটার বরাৎ ভাল, প্রফেসার হয়ে গেল।

যাক, বিপর্য্যয় আমাকে হিংসা করে।—ভাবিতেও পরম তৃপ্তি।

বাউল

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি বিশেষ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকদিগকে বাউল বলে। এই শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে নানা জনে নানা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন বাউল শব্দটি 'বায়ু' শব্দের সহিত 'আছে' এই অর্থদ্যোতক 'ল' প্রত্যয় যোগ করিয়া নিষ্পন্ন, এবং এই বায়ু শব্দের অর্থে যোগশাস্ত্রের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার বুঝায়। যে সম্প্রদায় দেহের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার সঞ্চয় করিবার সাধনা করে, তাহারা বাউল। কেহ বলেন, 'বায়ু' মানে নাসার শ্বাস-প্রশ্বাস, এবং শ্বাস-প্রশ্বাসই জীবনধারা; সেই শ্বাস-প্রশ্বাস সংরোধ করিয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিবার সাধনা করে যাহারা তাহারা বাউল। আবার কেহ বলেন, সংস্কৃত বাতুল শব্দের প্রাকৃত রূপ বাউল; যাহারা বাতাধিক তাহারা পাগল, যাহাদের আচরণ সাধারণের তুল্য নহে, লোকে তাহাদিগকে বাতুল বা পাগল বলে; সেইরূপ সাধারণ-সমাজ-বহির্ভূত-আচার-ব্যবহার-সম্পন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বাউল।

বাউল সম্প্রদায় কোনও প্রকারের শাসন রীতি নীতি প্রথা গতানুগতিক ভাবে মানিয়া চলিতে চাহে না। ইহারা Non-conformists। যেখানে বাক্য আর অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না সেখানে আসে কবিতা; কবিতা যেখানে ভাবের নাগাল পায় না সেখানে আসে গান। বাউলদের মরমীয়া অনুভব সেইজন্য গানের আকারেই প্রকাশ পাইয়াছে—ইহাদের সাধনার অঙ্গ হইয়াছে গান। ইহারা সমাজে মৃতকল্প হইয়া বাস করিতে চায়। এই জীবন্মৃত অবস্থাকে সুফী সাধকেরা বলেন 'ফনা', আর বৈষ্ণব সাধকেরা বলেন 'জীবন্মুক্ত' বা 'প্রাপ্তব্রহ্মলয়'। ইহারা অহেতুক প্রেমের সাধনা করে; ইহারা বলে প্রেম নিষ্প্রয়োজন অর্থাৎ কামনাশূন্য না হইলে কামপূর্ণ প্রেমের দ্বারা মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—প্রেম এমন হইবে যে 'কামগন্ধ নাহি তায়', এবং

আপন সুখেতে যে করে পীরিতি
তাহারে বাসিব পর।

যাহারা

সক'ম লাগিয়া কেরয়ে ঘুরিয়া
পরতত্ত্বে নাহি চায়।
করিয়া চাতুরী মধু পান করি'
শেষে উড়িয়া যায়।
সখি, না করো সে প্রেম-আশ।
ঘটিয়া পীরিতি কেবল কুরীতি
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।

বাউলদের মতে প্রেম মানে জীবনের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে প্রাণসম্পদ ও প্রাণের উল্লাস, Joi de vivre, কেবল বাঁচিয়া থাকিয়া সৌন্দর্য্যসম্ভোগের আনন্দ। ইহাকেই অথর্ব বেদে 'উচ্ছিষ্ট' বলা হইয়াছে, অর্থাৎ যাহা প্রয়োজনাতিরিক্ত।

সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রকৃত কাম।
কামক্রীড়া-সাম্যে তারে কহে কাম নাম।

—চৈ, চ, ২।৮

অথর্ব বেদে এক সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখা যায়, তাহারা ব্রাত্য নামে পরিচিত ছিল। ইহারা কোনও প্রকারের বিধিনিষেধ শাস্ত্রশাসন প্রভৃতির অধীনতা স্বীকার করিত না; এইজন্য তাহাদের নাম হইয়াছিল ব্রাত্য বা ব্রতহীন। তাহারা নিজের নিজের অন্তরের বুদ্ধি বিচার ও প্রেরণা দ্বারা নিজেদের পরিচালিত করিত, তাহারা ছিল free-thinkers। যাহারা স্বকীয় বুদ্ধি-বিবেচনার দ্বারা স্বাধীন ভাবে জীবন নির্ব্বাহ করিত, তাহাদের প্রশংসা করিয়া বলা হইয়াছে—

ব্রাত্য আসীদ্ ঈয়মান এব, স প্রজাপতিং সমৈরয়ৎ।

ব্রাত্য ছিলেন সদা চলমান ও গতিশীল, তিনি কোনও বন্ধনে আবদ্ধ নহেন, তিনি স্বয়ং জীবনবিধাতা প্রজাপতিকে সঞ্চালিত করেন।

সোঽবর্দ্ধত, স মহান্ অভবৎ, স মহাদেবোঽভবৎ।

সেই ব্রাত্য বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, তিনি মহান্ হইয়াছিলেন,

তিনিই মহাদেব হইয়াছিলেন, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

যদ্ এনম্ আহ—ব্রাত্য, যথা তে প্রিয়ং তথাস্ত্বিতি, প্রিয়ম্ এব তেনাবরুন্ধে।

যে লোক ব্রাত্যকে বলিতে পারে যে হে ব্রাত্য, তোমার যাহা প্রিয় তাহাই হোক, সেই ব্যক্তি তাহার প্রিয় লাভ করে।

ঐনং প্রিয়ং গচ্ছতি, প্রিয়ঃ প্রিয়স্য ভবতি, য এবং বেদ।

যিনি ব্রাত্যের মতিগতি জানেন তাঁহার নিকটে তাঁহার প্রিয় ও অভিলষিত বস্তু আগমন করে, তিনি প্রিয়জনের প্রিয় হন।

যদ্ এনম্ আহ—ব্রাত্য, যথা তে বশস্ তথাস্ত্বিতি, বশম্ এব তেনাবরুন্ধে।

যিনি ব্রাত্যকে বলিতে পারেন—হে ব্রাত্য, তোমার ইচ্ছা যেরূপ তাহাই হোক, তিনি তাহার দ্বারা নিজের ইচ্ছার প্রভু হইতে পারেন।

ঐনং বশো গচ্ছতি, বশী বশিনাং ভবতি, য এবং বেদ।

তাহার নিকটে তাহার ইচ্ছা আয়ত্ত হয়, সে ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন হয়, যে ব্রাত্যকে ঐরূপ জানে।

—অথর্ব বেদ, ১৫শ কাণ্ড, ২ অনুবাক, ৪র্থ পর্য্যায়, ৬ সূক্ত।

বাউলেরা এই ব্রাত্যদিগেরই স্বাধীন ভাবের আরাধনার উত্তরাধিকারী।

বাউলেরা বলেন—সত্যকে লাভ করিতে হইবে, এবং সেই সত্যস্বরূপ যিনি তিনি মানুষের অন্তর্যামী। ইহাও অথর্ব বেদের মনুষ্য-স্তুতিরই ভাবধারা।

যে পুরুষে ব্রহ্ম বিদুস্ তে বিদুঃ পরমেষ্ঠিনম্।

যে মানুষের মধ্যে বৃহত্ত্বকে উপলব্ধি করিতে পারে, সে পরমদেবতাকে জানিতে পারে।

তস্মাদ্ বৈ বিদ্বান্ পুরুষম্ ইদং ব্রহ্মেতি মন্যতে।
সর্ব্বা হ্যস্মিন্ দেবতা, গাবো গোষ্ঠ ইবাসতে।

অতএব যে ব্যক্তি মানুষকে নিশ্চিত করিয়া জানে সে তাহাকে বৃহৎ বলিয়া মনে করে, কারণ সকল দেবতা তাহার শরীরে অবস্থান করেন, যেমন গোষ্ঠে বহু গো একত্র অবস্থান করে।

যা আপো যাশ্চ দেবতা, যা বিরাড্ ব্রহ্মণা সহ।
শরীরং ব্রহ্ম প্রাবিশচ্ছরীরেধি প্রজাপতিঃ।

যেখানে যত জলধারা অর্থাৎ রস ও গতি আছে, দেবতা আছেন, যাহা কিছু ব্রহ্মের সহিত বিরাজ করে বলিয়া বিরাট্, এবং স্বয়ং জগৎকারণ ব্রহ্ম অন্তর্যামী-রূপে, তাহার শরীরে প্রবেশ করেন, এবং তাহার সহিত বিরাজ করেন প্রজাপতি-রূপে জীবনধারা।

—অথর্ব বেদ ১০ম কাণ্ড, ৪র্থ অনুবাক, ১ম সূক্ত।

সনাতনম্ এনম্ আহুর্ উতাদ্য স্যাৎ পুনর্ণবঃ।

ইহাকে তাহারা পুরাতন বলিয়া থাকে, অথচ তিনি নিত্য নব পুনঃ পুনঃ নব।

বাউলেরাও বলেন যে এই যে মানব-দেহ, ইহাই দেব-মন্দির, এমন কি সমস্ত জীবই তাঁহার অবতার।

জীব জীবে চাইয়া দেখি, সবই যে তা'র অবতার।
ও তুই নূতন লীলা কী দেখাবি, যার নিত্য লীলা চমৎকার।

দেহ-মন্দিরে বাস করেন মানুষের 'মনের মানুষ'। এই মনের মানুষের সন্ধান করাই বাউলদের সাধনা।

আমি কোথায় পাবো তা'রে,
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে, তা'র উদ্দেশে দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।
লাগি সেই হৃদয়-শশী সদা প্রাণ হয় উদাসী,
পেলে মন হতো খুশী,
দিবানিশি দেখ্তাম নয়ন ভ'রে।
আমি প্রেমানলে মরছি জ্ব'লে, নিভাই কেমন ক'রে?
ও তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে, দেখ্ না তোরা হৃদয় চিরে।
দিব তা'র তুলনা কি, যার প্রেমে জগৎ সুখী,
হেরিলে জুড়ায় আঁখি,
সামান্যে কি দেখিতে পায় তা'রে।
তা'রে যে দেখেছে সেই মজেছে ছাই দিয়ে সংসারে।
ও সে না জানি কি কুহক জানে, অলক্ষ্যে মন চুরি করে,
কুল মান সব গেল রে, তবু না পেলাম তা'রে,
প্রেমের লেশ নাই অন্তরে।
তাইতে মোরে দেয় না দেখা সে রে।
ও তা'র বসত কোথায়, না জেনে তায়
গগন ভেবে মরে।
ও সে মানুষের উদ্দিশ যদি জানিস,
কৃপা ক'রে (ব্যথার ব্যথিত হয়ে) আমায় ব'লে দে রে।

এই মনের মানুষের বিরহে বাউল কাতর হন, কিন্তু তিনি অন্তর্যামী, তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করার সাধনারই অভাব, নতুবা তাঁহাকে পাওয়া কঠিন নয়।

মনের মানুষ কোথায় গেলে পাই?
তা'রে একদিন না দেখ্লাম ভাই।
সে মনের মানুষ না পেলে যে মন ওঠে না বল্‌ছি তাই।
আমি ঘুরে ঘুরে হইলাম হয়রান,

তা'র ঠিক ঠিকানা কেউ জানে না, না পাই সন্ধান।
আমার সকল চেষ্টা বৃথা হলো, এখন আমি কোথায় যাই ?
ক্ষেপা বলে—ওরে আমার মন,
মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ,
একবার দিব্যচক্ষু খুলে গেলে দেখতে পাবি সর্ব্ব ঠাঁই॥

যিনি অরূপ অপরূপ তিনি নানা রূপের অন্তরালে আপনাকে গোপন করিয়া রাখেন, অতএব রূপের মধ্যেই রূপাতীতকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

ভাবের ভাবুক প্রেমের প্রেমিক যেই জন,
সে করে রূপ-সাধন।
রূপ কোথায় ছিল, কে আনিল,
কৈল রূপের গঠন,
সাক্ষী আছে রে ভোলা মন,
ভাগ্যে যদি হয় মিলন।

সে যে করে রূপ-সাধন—মানুষ যে জন,
বাণিয়া যেমন সে জানে সোনার মরণ,
সুনার মাঝে সুহাগা দিলে সুনায় রূপায় হয় মিলন॥
ভবেরই বাজারে আসি রূপ চিনে না যেই জন,
সে তো দিনের কাণা, রাইত দেওয়ানা, রে ভুলা মন,
পায় না রূপের অন্বেষণ॥

মনের মানুষ মানুষের হৃদ্‌বিহারী, তাহার দেহের রক্তবহা নাড়ীতে নাড়ীতে তাঁহার সঞ্চরণ। এই সংবাদ যদি না জানা যায় তবে হৃদয়েশ্বরকে হারাইতে হয়।

চল্‌ছে মানুষ বঙ্কনালে।
আমার হৃদয়-কমল মেল্‌বে যে দল, খবর তা'রে কে জানালে ?
ওরে গন্ধ তাহার কে ছড়ালে ?
আমার কমল-রসে ডুব্‌বে ব'লে বন্ধু তুমি ভ্রমর হ'লে।
এখন চল্‌ছ ফিরে গুনগুনিয়ে, কমল যে তার দল না মেলে॥
এখন হৃদয়-কমল মেল্‌ল না দল, গুনগুনিয়ে ভ্রমর চলে॥

বাউলেরা বলেন—যাহা সহজ, তাহাই ধর্ম্ম, তাহাই উপাস্য। প্রতিমা ঠাকুর প্রভৃতি কোনও প্রতীকেরই আবশ্যক নাই, ঐ মনের মানুষই মানুষের উপাস্য। তাঁহাকেই চিনিতে হইবে, নতুবা সর্ব্বনাশে হাহাকার করিতে হইবে।

সহজ মানুষ ছিল হৃদয়-বৃন্দাবনে।
জানি না তায় হারাইলাম কোন্ ক্ষণে॥

এই মানুষ রূপে ভগবানের উপাসনার আদি চিহ্ন পাওয়া যায় বেদের পুরুষ-সূক্তে। চণ্ডীদাস বুঝাইয়া দিয়াছেন যে বাউলদের এই মানুষ কে।

মানুষ মানুষ সবাই কহয়ে
মানুষ কেমন জন।
মানুষ রতন মানুষ জীবন
মানুষ পরাণ ধন।
ভ্রময়ে ভুলয়ে অনেক জন
মরম নাহিক জানে।
মানুষের প্রেম নাহি জীবলোকে
মানুষ সে প্রেম জানে।
মানুষ যারা জীয়ন্তে মরা,
সেই সে মানুষ সার।
মানুষ-লক্ষণ মহাভাবগণ
মানুষ ভাবের পার।
মানুষ নাম বিরল ধাম
বিরল তাহার রীতি।
চণ্ডীদাস কহে সকলি বিরল
কে জানে তাহার রীতি।

বাউলেরা বলেন—এই মনের মানুষই মানুষের গুরু, কোনও পার্থিব ও প্রাকৃত মানুষের একচেটিয়া গুরুগিরি করিবার অধিকার নাই। যিনি সহজ সত্যকে স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া তাহা লোকের মনোগোচর করিয়া দিতে পারেন, তিনিই মানুষের গুরু। পূর্ণ সত্য কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না, এইজন্য সকল মানুষেরই মধ্যে যতটুকু সত্য নিহিত আছে তাহা সন্ধান করিয়া লাভ করাই হইতেছে সৎ শিষ্যের কাজ। সুতরাং গুরুর অন্ত নাই, জন্মক্ষণ হইতে মৃত্যুক্ষণ পর্য্যন্ত নিরন্তর মানুষের গুরুকরণ চলিতে থাকে।

আমার যেদিন জনম সেদিন আমি দীক্ষা পেয়েছি।
এক অক্ষরের মন্ত্র মায়ের শিক্ষা পেয়েছি॥
দীক্ষা বিনা চলে না যে একটি প্রাণের শ্বাস,
সেই কথাতে গভীর আমার রয়েছে বিশ্বাস।
আমি নীর পেয়েছি, ক্ষীর পেয়েছি, পরাণ পেয়েছি,
তা'রি সাথে সাথে মায়ের শিক্ষা পেয়েছি॥

জন্মমাত্র মাতা যেমন মানুষের গুরু হন, তেমনই প্রতিদিন সে যাহার সন্নিহিত হয় তাহার নিকট হইতেও কিছু-না-কিছু শিক্ষা লাভ করে, অতএব সেই-সব ব্যক্তিও তাহার গুরু।

গুরু ব'লে কারে প্রণাম করবি মন ?
তোর অথিক গুরু, পথিক গুরু, ও তোর গুরু অগণন,
ও তোর গুরু সর্ব্বজন।
গুরু রে তোর বরণ-ডালা, গুরু রে তোর মরণ-জ্বালা,
গুরু রে তোর হৃদয়-ব্যথা যে ঝরায় দুনয়ন॥

তন্ত্রশাস্ত্রও বলেন যে, মৌমাছি যেমন এক ফুল হইতে অপর ফুলে বিচরণ করিয়া মধু আহরণ করে, মানুষকেও তেমনই এক গুরুর কাছে জ্ঞান আহরণ করিয়া অপর গুরুর সন্ধানে ফিরিতে হইবে।

মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধস্ তথা শিষ্যো গুরোর্ গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ।

তাই বাউলেরা বলেন,

গুরু করব শত শত, মন্ত্র করব সার।
যার সঙ্গে মন মিল্‌বে, দায় দিব তা'র।

গুরুকে বুঝিতে হইলে আগে আপনাকে বুঝিতে হইবে, আত্মানং বিদ্ধি, এবং মনকে প্রস্তুত করিতে হইবে।

ক্ষেপা, তুই না জেনে তোর আপন খবর যাবি কোথায়?
আপন ঘর না বুঝে' বাহির খুঁজে' পড়্‌বি ধাঁধায়।
আমি সত্য না হইলে, হয় গুরু সত্য কোন কালে?
আমি যেরূপ, দেখ না সেরূপ দীন দয়াময়।
আত্মা রূপে সেই অ-ধর সঙ্গী অংশ কলা তা'র,
ভেদ না জেনে বনে বনে বেড়ালে কি হয়?
আপনারে আপনি না চিনিলে, ঘুরবি কত ভুবনে?
লালন বলে, অন্তিম কালে নাই রে উপায়।

যিনি হৃদয়স্বামী ও ভুবনস্বামী, তাঁহাকে চিনিতে হইলে মনকে সচেতন করিয়া সন্ধান করিতে হইবে, আত্মচেতনাই হইবে আমার গুরু।

কোথা আছে রে দীন দরদী সাঁই!
চেতন গুরুর সঙ্গ লয়ে খবর করো ভাই!
চক্ষু আঁধার দিলের ধোঁকায়,
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়,
কি রঙ্গ সাঁই দেখ্‌ছে সদাই ব'সে নিগম ঠাঁই
এখানে না দেখ্‌লাম তা'রে,
চিন্‌ব তা'রে কেমন ক'রে,
ভাগ্যেতে আখেরে তা'রে দেখ্‌তে যদি পাই।
সমঝে সবে সাধন করো,
নিকটে ধন পেতে পারো,
লালন কয় নিজ মোকাম ঢোঁর,
সাঁই বহু দূরে নাই।

নিজের মন সচেতন না হইলে গুরুর সাধ্য নাই আমার হৃদয়স্বামীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিবেন। কেবল গুরুর উপর ভরসা করিয়া থাকিলে নিজের ঘরের চাবি পরের হাতে দিয়া ঘরে ঢুকিবার ব্যর্থ চেষ্টার অনুরূপ ব্যর্থ হইতে হইবে।

আমার ঘরের চাবি পরেরই হাতে
কেমনে খুলিয়ে সে ধন দেখব চক্ষেতে?
আপন ঘরে বোঝাই সোনা, পরে করে লেনা দেনা,
আমি হলেম জন্ম-কাণা, না পাই দেখিতে।
রাজী হ'লে দরওয়ানী, দ্বার ছাড়িয়ে দিবেন তিনি,
তা'রে বা কই চিনি শুনি, বেড়াই কুপথে।
এই মানুষে আছে রে মন, যারে বলে মানুষ-রতন,
লালন বলে পেয়ে সে ধন পারলাম না চিন্‌তে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবই আমাদের গুরু। তাই বাউল গাহিয়াছেন—

কোন্‌ পথে যে আস্‌বা গুরু,
ওরে তা তো আমার জানা নাই।
তাই ভাইবা মরি, প্রণাম আমার
রাইখা দিমু কোন্‌ বা ঠাঁই।

এইজন্য বাউলেরা গুরুকে বলেন শূন্য। এই শূন্য মানে নেতি নহে, ইহার মানে সর্ব্বময়, সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণতার মধ্যে স্বাধীন বিচরণের মহাক্ষেত্র।

বাউলেরা সহজ পথের পথিক। সহজ ভাবে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া উপলব্ধি করা যায় তাহারই সাধন করাই বাউলদের সহজ সাধন। ইহা বৌদ্ধ সহজ-যানেরই কথা। রাঢ় দেশের সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদ খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে এই মত প্রথম প্রচার করেন। সহজিয়া ধর্ম্ম তান্ত্রিকতারই প্রকারভেদ। ইহা শিব ও শক্তির, পুরুষ ও প্রকৃতির সহযোগ্য-জনিত যে আনন্দ তাহাই উপভোগ করিবার সাধনা। ইহাই সহ-জ। ইহাকে যুগল রূপের উপাসনাও বলে। যে রসের বিকাশ সৃষ্টিতে, মনুষ্য-দেহেও তাহার আস্বাদ পাওয়া যাইতে পারে। মানুষের দেহ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড—যাহা নাই ভাণ্ডে তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে। বাউল বলেন—ভজনের মূল এই নরবপু দেহ। তাই কবীর বলিয়াছেন—

য়া ঘট ভীতর সপ্ত সমুন্দর, য়াহী মেঁ নদ্দী নারা।
য়া ঘট ভীতর কাশী দ্বারকা, য়াহী মেঁ ঠাকুরদ্বারা।
য়া ঘট ভীতর চন্দ্র সূর হৈ, য়াহী মেঁ নৌলখ তারা।
কহেঁ কবীর সুনো ভাই সাধো, য়াহী মেঁ সত করতারা।

ইহাকেই রজ্জবজী বলিয়াছেন "নর-নারায়ণ", রবিদাস বলিয়াছেন "নরহরি"। দেহের মধ্যেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত মনের যোগ ঘটে, দেহের মধ্যেই বিশ্বেশ্বরের সহিত আমাদের পরিচয় সহজ ভাবে সাধিত হয়। এই কায়ার মধ্যেই জগতের ও জগৎপতির যোগ অনুভব করিবার সাধনই "সহজ সাধন" বা "কায়া সাধন"। সেইজন্য চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

শুন রে মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

দীপকোজ্জ্বল নামক রসশাস্ত্রে আছে—

নরদেহ বিনু নহে রসের আস্বাদন।
পুরুষারে পরা কিঞ্চিৎ, সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।

দেহের মধ্যে অবস্থিত শক্তিসমূহকে আয়ত্ত করিতে পারিলে অনেক ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারা যায়। দৈহিক শক্তিগুলির সাহায্যে যাহাতে চৈতন্যস্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়, এবং অখণ্ড চৈতন্যের সহিত মিলিত হইয়া অখণ্ড আনন্দে আত্মোৎসর্গ করিতে পারা যায়, তাহাই সহজিয়া সাধকদের উদ্দেশ্য। মানুষ মানুষের প্রতি অনুরাগে আকৃষ্ট হয়, পুরুষের নিকট রমণীর আকর্ষণ প্রবল। এইজন্য তন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, যোষিৎ হইতে যে আনন্দ সেই আনন্দই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সেই আনন্দই আসল আনন্দ। প্রকৃতিই শক্তি। প্রকৃতি বা নারীর ভিতর দিয়াই শক্তির এবং আনন্দের বিকাশ হয়। যিনি শক্তি কেবল তিনিই অপর ব্যক্তিতে শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন। বৈষ্ণবের নিকট এই শক্তি হইতেছেন রাধা-প্রকৃতি। তাঁহারা বলেন গোপিনীই প্রেমের গুরু হইতে পারেন, যাঁহাদের প্রেম বৈরাগ্যের দ্বারা অনাসক্ত ছিল, যাঁহাদের প্রেমের মধ্যে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছার লেশ মাত্রও থাকে না। বাউল তাই বলিয়াছেন—

প্রেম আমার পরশমণি,
তা'রে ছুঁইলে যে কাম হয় রে সেবা।
তাই গোলোক চায় যে ভূলোক হইতে,
মানুষ হইতে চায় যে দেবা।

বাউলেরা বলেন যে একরস বা সমানুরাগের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সমরস দ্বারা প্রবৃত্তি সমন্বয় ও দমন করিয়া অনাসক্ত হইতে হইবে। স্থূল আনন্দকে সূক্ষ্ম আনন্দে পরিণত করারই সাধনা সহজ সাধনা।

বাউল ভাবের সহজ সাধন ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদ ইহার আদি প্রবর্ত্তক। তাঁহার পরে ভারতের নানা প্রদেশে নানা সময়ে সহজ সাধক আবির্ভূত হইয়াছেন। নাথ সিদ্ধগণ, জয়দেব, বিল্বমঙ্গলঠাকুর, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, বল্লভাচার্য্য, কবীর, নানক, দাদূ, রজ্জবজী, প্রভৃতি মধ্যযুগের সাধকেরাও এই সহজ পথের পথিক ছিলেন। ইঁহারা অনেকে অব্রাহ্মণ ছিলেন, এমন কি অন্ত্যজ ছিলেন, ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ইঁহারা সহজ পথের পথিক বলি· ইঁহাদের কাছে জাতিভেদ নাই, উচ্চ নীচ বিচার নাই, হিন্দু মুসলমান ভেদ নাই। কবীর নানক প্রভৃতির বাণীর মধ্যে সহজ ও বাউর শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়।

বাংলা দেশে বাউল-সম্প্রদায়ের বহুলতার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শঙ্করাচার্য্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পুরী-সম্প্রদায়ের একজন সন্ন্যাসী বাংলা দেশে আবির্ভূত হন, তাঁহার নাম মাধবেন্দ্র পুরী। কোথায় তাঁহার জন্ম, কে বা তাঁহার পিতা মাতা, কেনই বা তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাহা কেহই অবগত ছিল না। তিনি অন্যান্য সন্ন্যাসীর ন্যায় যাচ্ঞা করিতেন না, কেহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কিছু দিলে তিনি আহার করিতেন, নতুবা উপবাসী থাকিতেন, এমনই কতকগুলি বিশেষ ও অসাধারণ গুণ দেখিয়া লোকে তাঁহাকে ভক্তি করিতে আরম্ভ করে। তিনি সর্ব্বদা উন্মনা থাকিতেন, নির্জ্জনে একাকী বসিয়া কখনও হাসিতেন, কখনও কাঁদিতেন, ইহা দেখিয়া লোকে তাঁহাকে বাউল বলিত। কিন্তু লোকে তাঁহার সহিত আলাপ করিলে বুঝিতে পারিত যে তাঁহার বাহ্য বাতুলতার অন্তরে শাস্ত্রজ্ঞান ও বিচারশক্তি বিদ্যমান আছে। পুরী-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা অদ্বৈতবাদী, ব্রহ্মজ্ঞানী। কিন্তু লোকে বুঝিল যে মাধবেন্দ্র পুরী অদ্বৈতবাদ-সম্মত ব্রহ্ম-জ্ঞানকে শুষ্ক নীরস বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং তৎপরিবর্ত্তে ভগবদ্‌ভক্তি ও ঈশ্বরপ্রেম অবলম্বন করিয়াছেন; তিনি একজন প্রেমিক ভক্ত ও বিষ্ণুর উপাসক; তিনি কৃষ্ণলীলার কথা শুনিলে ভাবাবেশে অধীর হইয়া পড়েন। বিজ্ঞ লোকে বুঝিল যে পুরী গোসাইর বাউল ভাব তাঁহার অন্তরের প্রগাঢ় প্রেমভক্তিরই বাহ্য বিকাশ মাত্র। কিন্তু সাধারণের কাছে তাঁহার যে বাউল নাম রটিয়া গিয়াছিল তাহা আর বদল হইল না। তিনি শঙ্করাচার্য্যের শারীরক ভাষ্য অপেক্ষা শ্রীমদ্‌ভাগবৎকে শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র ও ভগবদ্‌প্রেমকে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব বলিয়া প্রচার করিতে থাকেন। ইহার ফলে তাঁহার শিষ্যেরা দুই দলে বিভক্ত হয়—একদল শুষ্ক অদ্বৈতবাদী, অপর দল ভক্তিবাদী বৈষ্ণব। অদ্বৈত-বাদী দলের প্রধান শিষ্য ছিলেন রামচন্দ্র পুরী, এবং ভক্তিবাদী দলের প্রধান শিষ্য ছিলেন ঈশ্বর পুরী ও

অদ্বৈত আচার্য্য। মাধবেন্দ্র পুরীর ন্যায় ঈশ্বর পুরী ও অদ্বৈত আচার্য্য প্রভৃতিও বাউল নামে অভিহিত হইতে থাকেন। রামচন্দ্র পুরী এই ভক্তিবাদীদের অত্যন্ত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতেন, এবং তাঁহার ভয়ে ভক্তগণ সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতেন। রামচন্দ্র পুরী ভক্তদের নিকট হইতে বিদায় হইয়া গেলে তাঁহারা সকলে মনে করিতেন—

শিরের পাথর যেন পড়িল ভূমিল।
—চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ।

মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট অদ্বৈত আচার্য্য দীক্ষা গ্রহণ করেন, এবং শান্তিপুরের এই অদ্বৈত আচার্য্যই শচী দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপকে প্রেমভক্তি লাভ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে প্ররোচনা দেন, এবং তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র গৌরাঙ্গ নিমাইকেও নিজের ভক্তিপথে আনিবার জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেন। ঈশ্বর পুরীও গৌরাঙ্গকে ভক্তির পথে আনিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু জ্ঞানগর্ব্বিত নিমাই-পণ্ডিত ঈশ্বর পুরীর ভক্তিভাবকে বরাবর পরিহাস করিয়াই আসিতেছিলেন। কিন্তু অবশেষে গয়ায় গিয়া যখন আবার ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে সেখানে সাক্ষাৎ হইল, তখন নিমাই-পণ্ডিতের ভাবান্তর উপস্থিত হইল, এবং তিনি উপহসিত ঈশ্বর পুরীকেই গুরু স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকটে বৈষ্ণব মন্ত্র গ্রহণ করেন, এবং একেবারে অন্যবিধ মানুষ হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। তখন তাঁহার নাম হয় ক্ষেপা নিমাই। নিমাই অল্প দিন পরেই আবার কেশব ভারতীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করেন। ইহার পর হইতেই চৈতন্য মহাপ্রভু আদি বাউলদের প্রধান হইয়া উঠেন। চৈতন্যদেবের সহচর নিত্যানন্দ প্রভুও মাধবেন্দ্র পুরীর দলভুক্ত ছিলেন, এবং তিনি মহাবাউল নামে পরিচিত ছিলেন। এবং "তাঁহার আচার—বিধি নিষেধের পার" ছিল। (চৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড ২৪ অধ্যায়, অন্ত্যখণ্ড ৮ম অধ্যায়।) বাউল তাঁহারাই যাঁহারা ঈশ্বরপ্রেমে অধীর হইয়া হাস্য ক্রন্দন করেন, হরিনাম শ্রবণে উদ্দণ্ড নৃত্য করেন, ও অশ্রু কম্প পুলক স্বেদ রোমাঞ্চ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ করেন। বাউলদের মধ্যে কেহ কেহ আবার ক্ষেপা বা ক্ষেপা বাউল নাম ধারণ করেন। এই দুই শব্দের অর্থ একই। গৌরাঙ্গদেব ক্ষেপা নিমাই নামে পরিচিত ছিলেন।

অদ্বৈত আচার্য্য ও চৈতন্যদেব যে বাউল ছিলেন তাহা অদ্বৈত আচার্য্যের নিজের স্বীকারোক্তির মধ্যে দেখিতে পাই। চৈতন্যচরিতামৃতে (অন্ত্যলীলা ১৯শ পরিচ্ছেদে) আছে যে অদ্বৈত আচার্য্য চৈতন্যদেবকে সাঙ্কেতিক ভাষায় কিছু তত্ত্বকথা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন—

তরজা প্রহেলি আচার্য্য কহে ঠারে ঠোরে।
প্রভু মাত্র বুঝে, কেহ বুঝিতে না পারে॥
বাউলকে কহিও লোক হইল বাউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কামে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥

বৈষ্ণব কবি প্রেমদাস তাঁহার বংশীশিক্ষা নামক পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন—

কলি-পাপ-তাপাচ্ছন্ন দেখি ভক্তগণে।
উদয় হইলা প্রভু শচীর ভবনে॥
দুই ভাবে দুই কার্য্য করিলা সাধন।
অন্যে ইহা নাহি জানে, জানে ভক্তগণ।
বাহ্যঙ্গ ভাবে হরেকৃষ্ণ রাম নাম।
প্রচারিলা জগমাঝে গৌর গুণধাম॥
অন্তরঙ্গ ভাবে অন্তরঙ্গ ভক্তগণে।
রসরাজ-উপাসনা করিলা অর্পণে॥

চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ও রামানন্দ রায়ের কথোপকথনের মধ্যে এই রসরাজ-তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়।

এখন বাংলা দেশে যে বাউল-সম্প্রদায় দেখা যায়, তাহারা মহাপ্রভু চৈতন্যদেবকেই নিজেদের সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্ত্তক বলিয়া ঘোষণা করে। বাউল-সম্প্রদায়ের অপর শাখা নেড়ানেড়ী সম্প্রদায় নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র বা বলভদ্র গোস্বামীকে নিজেদের আদি প্রবর্ত্তক বলিয়া পরিচয় দেয়। বঙ্গদেশে ১০ম শতাব্দীতে চৈতন্যদেবের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে সহজিয়া মতের প্রচারক ছিলেন নাথপন্থের ৮৪ সিদ্ধপুরুষের অন্যতম নাড়া পণ্ডিত ও তাঁহার পত্নী নাড়ী। এই নাড়া ও নাড়ী হইতে নেড়ানেড়ী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও নাম হইয়াছে। চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্যকে 'নাড়া' বলিয়া সম্বোধন করিতেন তাহা চৈতন্যভাগবতের নানা স্থানে দেখা যায়। সহজিয়া বৈষ্ণবগণ বলেন, তাঁহাদের

আদিগুরু হইতেছেন চৈতন্যদেবের পারিষদ-স্বরূপ দামোদর। স্বরূপের শিষ্য রূপ গোস্বামী, রূপের শিষ্য রঘুনাথ দাস, দাস গোস্বামীর শিষ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ যিনি চৈতন্যচরিতামৃত প্রণয়ন করেন, কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য সিদ্ধ মুকুন্দদাস। মুকুন্দদাসের চারি শিষ্য হইতে আউল বাউল সাঞী দরবেশ এই চারি শ্রেণীর ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। সহজ ধর্ম্ম 'নব রসিকের ধর্ম্ম' বলিয়া পরিচিত। এই নব রসিকের মধ্যে পাঁচ রসিকের নাম পাওয়া যায় কাটোয়া-নিবাসী যদুনাথ দাসের সংগ্রহ-তোষণী পুঁথিতে। সেই পাঁচ রসিক হইতেছেন—বিল্বমঙ্গল, জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও কবি রায় শেখর। ইঁহারা প্রত্যেকেই পরকীয়া সাধন করিয়াছিলেন, এবং ইঁহাদের প্রকৃতি ছিলেন যথাক্রমে চিন্তামণি, পদ্মাবতী, রজকিনী রামী, লছিমা দেবী ও দুর্গাদাসী। ইঁহাদের প্রত্যেকের পরকীয়া প্রেম ছিল বিশুদ্ধ, কামগন্ধ নাহি তায়। ঐ সব নায়িকা কিশোরী-স্বরূপা। এইরূপ বিশুদ্ধ-প্রেমতত্ত্ব ও প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে, সেইজন্য বাউলেরা বলে ঐ গ্রন্থ সহজ-প্রেম-সাধনেরই শাস্ত্র।

সহজ ভাবে জীবন যাপন ও ধর্ম্ম সাধন করাই বাউলদের আদর্শ বলিয়া ইহারা নিজেদের চুল দাড়ি যথেচ্ছ ভাবে বাড়িতে দেয়, কিছুই কাটে না। ইহারা কাহারও উচ্ছিষ্ট মতের ধার ধারে না, ইহারা বলে যে আমরা কি কুকুর যে পরের উচ্ছিষ্ট চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিব। তাহারা প্রত্যেকে নিজের বিবেক-বুদ্ধির নির্দ্দেশ ও ধারণা অনুযায়ী চলিতে চায়। এইজন্য বাউলেরা নিজেদের বলে নিবর্ত্তিয়া, অর্থাৎ ব্রতবিরহিত বা অথর্ব বেদের ব্রাত্য। প্রভু নিত্যানন্দের পরিচয়ে আগে দেখিয়াছি 'তাঁহার আচার—বিধি-নিষেধের পার' ছিল। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

> বেদবিধি-পার এমন আচার
> যাজন করিবে যে।
> ব্রজের নিত্য ধন পায় সেই জন,
> তাহার উপরে কে?

বাউলেরা বলিয়াছেন—

> তাইতে বাউল হইনু ভাই।
> এখন লোকের বেদের ভেদ-বিভেদের
> আর তো দাবী দাওয়া নাই।

বাউল আরও বলিয়াছেন—

> তোরি ভিতর অতল সাগর,
> তা'র পাইলি না মরম।
> তা'র নাই কূল কিনারা. শাস্ত্রধারা,
> নাই ধরম কি করম।

বাউলেরা নানাবিধ লোকবিরুদ্ধ আচার-অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ইহার কথা চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে আমরা পাই।

> লোকধর্ম্ম দেহধর্ম্ম-বেদধর্ম্ম কর্ম্ম।
> লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ-মর্ম্ম॥
> দুস্ত্যাজ্য আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
> স্বজন করিবে যত তাড়ন ভৎসন।
> সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন॥
> —আদি লীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

এইজন্য বাউলেরা আপনাদের সাধন-প্রণালী সহজে প্রকাশ করিতে চাহে না। ইহারা বলে—

> আপন ভজন-কথা না কহিবে যথাতথা।
> আপনাকে আপনি হইবে সাবধান।

ইহারা লোকালয়ে লোকাচার পালন করিলেও নিজেদের চক্রের ভিতর সামাজিক হিসাবে অনাচার করে, যেমন ইহারা সকল জাতির লোকের সঙ্গে একত্র পান-ভোজন করে, সকল শ্রেণীর লোককেই গুরু অথবা শিষ্য বলিয়া স্বীকার করে। এইজন্য ইহারা বলে—

> লোক-মধ্যে লোকাচার।
> সদ্গুরু-মধ্যে একাচার॥

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

মাতৃ-ঋণ

শ্রীসীতা দেবী

২৪

শীতকাল কাটিয়া গিয়াছে, বসন্তকালও নিজের রঙীন পুষ্পপত্রের সম্ভার লইয়া বিদায় হইয়াছে, এখন গ্রীষ্মের পূর্ণ প্রভাব। যাহারা পারে, তাহারা কলিকাতা ছাড়িয়া শৈলাবাসে হাওয়া খাইতে চলিয়াছে, যাহাদের সে ক্ষমতা নাই, তাহারা বসিয়া বসিয়া গরম কালকে গালি দিতেছে।

নৃপেন্দ্রবাবুর বাড়িতে এই লইয়া মহা গৃহ-বিপ্লব সুরু হইয়াছে। নৃপেন্দ্রবাবুর শরীর হঠাৎ খারাপ হইয়াছে, যামিনীরও স্বাস্থ্য আশঙ্কাজনক। তাহার ক্ষীণ তনুলতা আরও ক্ষীণতর হইয়া উঠিয়াছে, মুখের কোমল আরক্তিম আভাটুকু কে যেন কর্কশ হাতে মুছিয়া লইয়াছে, তাহার আয়ত চোখের কোণে কালিমা ক্রমে ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। ঘর হইতে তাহাকে টানিয়া বাহির না করিলে আর চলে না, শেষে কি একটা শক্ত অসুখ বাধাইয়া বসিবে?

জ্ঞানদার কিন্তু এখন কলিকাতা ছাড়িয়া যাওয়া মত নয়। যামিনীর শুষ্ক ম্লান মুখের দিকে যতবার তিনি তাকান, তত তাঁহার মনে সঙ্কল্প কঠিনতর হইয়া ওঠে যে ইহার অবিলম্বে খুব ভাল ঘর দেখিয়া বিবাহ দেওয়া প্রয়োজন, না হইলে মেয়ের শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি হইবে না। স্বামীর দুর্ভাবনা যে মেয়ে আর বিবাহ করিতে রাজী হইবে না, তিনি সে-কথা একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দেন। স্বামীর বয়সই হইয়াছে, সাংসারিক জ্ঞান কিছুই হয় নাই। অল্প বয়সে অমন সকলেরই এক-আধবার ঘটিয়া থাকে, তাই বলিয়া কে-বা সেই ক্ষত পুষিয়া চিরকাল বসিয়া থাকে? সকলেই আবার বিবাহ করে, ঘর-সংসার করে, সুখীও হয়। জগতটা সত্যই ত আর নভেল-নাটকের জগতের মত নয়? এই ত তাঁহার নিজের জীবনই দেখ না? তিনি কি অসুখী? তিনি কি সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর করিতেছেন না? তাঁহারও কৈশোর বয়সে কতরকম ঘটিয়া গিয়াছে।

কিন্তু ভাল বিবাহের ব্যবস্থা করিতে হইলে কলিকাতায় থাকা দরকার। পাত্র ত আর তাঁহাদের সন্ধানে দেশ-বিদেশে ছুটিয়া বেড়াইবে না, তাঁহাদেরই পাত্রপক্ষকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। এক ভাবনা, মেয়ের চেহারা ক্রমেই বড় খারাপ হইয়া যাইতেছে। এমন হইলে সুপাত্র তিনি বাগাইবেন কি করিয়া? তাঁহাদের টাকাকড়ি এমন কিছু বেশী নাই, তিনি অত্যন্ত গোছানী গৃহিণী তাই এমনভাবে থাকা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয়। না হইলে, দু-হাতে পয়সা উড়াইলে আর ভাবনা ছিল না। যামিনীর চেহারার কথা ভাবিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার এক-একবার বায়ু পরিবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা হয়, না হইলে স্বামীর অসুস্থতার কথা তিনি কানেই তোলেন না। ছেলেপিলের মা-বাপের অত নিজেদের কথা ভাবিলে চলে না। এই ত তিনি যে অমন সাংঘাতিক অসুখের পর চেঞ্জে গিয়াছিলেন, মেয়ে এক গোলযোগ ঘটাইয়া বসিয়া আছে শুনিয়া নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া তখনই কি ফিরিয়া আসেন নাই? অথচ তাঁহার অসুখ কিছু বানানো অসুখ নয়, সিভিল সার্জ্জেন পর্য্যন্ত তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছে।

সম্প্রতি গুটি দুই-তিন সৎ পাত্রের সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন, ইহার যে-কোনো একটির সঙ্গেই মেয়ের বিবাহ দিতে পারিলে তিনি নিশ্চিন্ত হন। একটি প্রসিদ্ধ ধনী-বংশের একমাত্র সন্তান, চেহারাও বেশ সুশ্রী, তবে বিলাত-ফেরৎ নহে। দেশেই কলেজে বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, তবে চোখ খারাপ বলিয়া পরীক্ষা দেওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। তা পাস করা, বিলাত যাওয়া, সকলই ত অর্থোপার্জ্জনের জন্য? সেই অর্থেরই যখন



যবদ্বীপের নৃত্য

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব-বর্ম্মণ

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ইহাদের বিন্দুমাত্র অভাব নাই, তখন এ খুঁৎটুকুকে খুঁৎই বলা চলে না।

দ্বিতীয়টি আই-সি-এস্ পাস করিয়া ফিরিয়াছে, তবে তাহার মা-বাপের অবস্থা ভাল নয়, অনেকগুলি ছোট ভাইবোনও আছে। সুতরাং বহুদিন এখনও তাহাকে পিতার পরিবার গলায় ঝুলাইয়া বেড়াইতে হইবে। এটা একটা বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিবার জিনিষ। তাহা ছাড়া ছেলেটি দেখিতে মোটে ভাল নয়। মেয়ের হয়ত পছন্দ হইবে না।

তৃতীয়টি বিলাত-ফেরৎ ডাক্তার। ভাল কাজ পাইয়াছেন, বাহিরের প্র্যাক্‌টিস্‌ও মন্দ নয়। তবে একটা খুঁৎ আছে, তিনি বিপত্নীক। সন্তানসন্ততি কিছুই নাই, সুতরাং এদিকে দৃষ্টি না দিলেও চলে। কিন্তু অল্পবয়সী মেয়েদের কথাই আলাদা, কি যে তাহাদের ভাল লাগে, আর কি যে ভাল লাগে না, তাহা স্বয়ং ভগবানও বলিতে পারেন না। অন্য সময় হইলে জ্ঞানদা হয়ত যামিনীর মতামতের কথা এত বেশী করিয়া ভাবিতেন না, কিন্তু সম্প্রতিই কি-না তাহার হৃদয়ের উপর ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ হইয়া গিয়াছে, তাই এত শীঘ্রই আবার তাহাকে কাঁদাইতে বা তাহার উপর জোর ফলাইতে জ্ঞানদার ইচ্ছা ছিল না। তাঁহার বরং ইচ্ছা যে এমন একটি সুপাত্র আনিয়া মেয়ের চোখের সম্মুখে হাজির করেন, যাহার রূপগুণের জ্যোতিতে সে একেবারে মুগ্ধ হইয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া যায়। বেশ ভাল করিয়া চেষ্টা করিবার সকল প্রকার আয়োজন তিনি মনে মনে স্থির করিতে-ছিলেন, এমন সময় এই বাহিরে যাওয়ার রব তুলিয়া স্বামী সব মাটি করিতে বসিয়াছেন। যামিনীও সময় বুঝিয়া, এমন মূর্ত্তি বাহির করিয়াছে যে তাহারই জন্য এখন অবিলম্বে কলিকাতার বাহিরে চলিয়া যাওয়া প্রয়োজন। তাঁহার সংসারটি এমনই। কোনো ব্যাপারে এ পর্য্যন্ত তিনি স্বামী বা সন্তানদের বিন্দুমাত্র সাহায্য বা সহানুভূতি পান নাই। বরং কি করিয়া তাঁহার সকল কাজ পণ্ড করিবে, এই যেন তাহাদের একমাত্র সাধনা। এমন সময় বুঝিয়া তাহারা বাগড়া দেয় যে লোকে দেখিলে ভাবিবে, মাস দুই-তিন আগে হইতে রিহার্সেল দিয়া সব ঠিক করা ছিল।

বিকাল হইয়াছে। এতক্ষণ রৌদ্রের ঝাঁঝে যে যাহার ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া ঘুমাইয়া বা জাগিয়া সময় কাটাইতেছিল, এখন উঠিয়া একে একে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইল। কর্ত্তা নীচে আপিস ঘরে গিয়া বসিলেন। মিহিরের স্কুল বন্ধ, এবং প্রতাপ বিদায় হওয়ার পর মাষ্টারও আর এখন পর্য্যন্ত রাখা হয় নাই। সে ঘর হইতে বাহির হইয়া একবার খাবার ঘরটা নীচে গিয়া তদারক করিয়া আসিল। চায়ের টেবিল তখনও সাজান হয় নাই দেখিয়া চটিয়া আবার উপরে চলিয়া আসিল। জ্ঞানদার ঘরের দরজা আধ-ভেজান, তিনি জাগিয়াছেন, তবে এখনও খাট ছাড়িয়া উঠেন নাই। মিহির ঘরে ঢুকিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "আমি চল্‌লাম খেল্‌তে, তোমাদের বাড়ি চা হ'তে হতেই ত আটটা বেজে যাবে।"

জ্ঞানদা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, এই দুপুর রোদে তোমার সব সাথীরা খেলার মাঠে এসে বসে আছে আর কি? যাবি যা না, মাংসের সিঙাড়া করতে দিয়েছিলাম, তোরই খাওয়া হবে না।"

মিহির বড় দমিয়া গেল, অত সহজে হার মানাও কিছু নয়, আবার সিঙাড়ার লোভ ত্যাগ করাও কঠিন। তবু সুর সমান চড়া রাখিয়াই বলিল, "কয়েকটা বাজে সিঙাড়া ভাজতে তোমার চাকরদের ত পঞ্চাশ ঘণ্টা কেটে গেল।"

মিহিরের সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে আয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিল। চাকরদের তাড়া দিবার জন্য জ্ঞানদা আবার তাহাকে নীচে পাঠাইয়া দিলেন। নিজেও খাট ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। যামিনীর ঘরের দরজায় ঘা দিয়া ডাকিলেন, "খুকি, উঠেছিস্ না কি রে?"

যামিনী ভিতর হইতে ক্লান্ত সুরে বলিল, "হ্যাঁ, আমি স্নান করতে যাচ্ছি, কেন ডাকছ?"

জ্ঞানদা বলিলেন, "স্নান করেই নীচে আয়, চা দিয়েছে বোধ হয়।"

যামিনী সুবিধা পাইলেই এখন খাবার সময় ফাঁকি দেয়, তাই জ্ঞানদা এখন তাহার সম্বন্ধে খুব সতর্ক

হইয়াছেন। কিন্তু হাজার কড়াকড়ি করিয়াও তিনি এখন যামিনীকে ইচ্ছামত খাওয়াইতে পারেন না। মেয়ে দিন দিন চোখের উপর শুকাইয়া উঠিতেছে।

একে একে সকলে আসিয়া খাবার ঘরে উপস্থিত হইলেন। মিহির টপাটপ গোটা ছয় সিঙাড়া মুখে পুরিয়া, চায়ের পেয়ালায় এক চুমুক দিয়া উঠিয়া পড়িল। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে তাহার খালি মন ছট্‌ফট্‌ করে, বাড়ির আবহাওয়া এখন কেমন যেন এক রকম হইয়া উঠিয়াছে। সবাই বিষণ্ণ, সবাই পরস্পরকে খোঁচা মারিবার জন্য ব্যস্ত। প্রতাপকে এমন অকস্মাৎ বিদায় করিয়া দেওয়াতে মিহির খানিকটা চটিয়াও গিয়াছে। প্রতাপ ত শুধু তাহার গৃহশিক্ষক ছিল না, বন্ধুর কাজও তাহাকে দিয়া অনেকখানি হইত। তাই যতক্ষণ না থাকিলে নয়, তাহার বেশী সময় মিহির কিছুতেই বাড়ি থাকিতে চায় না।

নৃপেন্দ্রবাবু খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে অতিশয় সংযমী এবং সাবধান। তিনি যেটুকু খাইবার মাপিয়া খান, তাহার বেশী হাজার অনুরোধেও স্পর্শ করেন না। নিয়মিত স্যানাটোজেন খান। যামিনী ঘরে ঢুকিয়াই পিতার স্যানাটোজেন প্রস্তুত করিতে বসিয়া গেল।

জ্ঞানদা ধীরেসুস্থে এক প্লেট সিঙাড়ার সদ্ব্যবহার করিতেছিলেন। তিনি তাড়া দিয়া বলিলেন, "চা যে জুড়িয়ে গেল, আগে খেয়ে নাও। ওটা পাঁচ মিনিট পরে হলেও কোনো ক্ষতি হবে না।"

নৃপেন্দ্রবাবু কি একখানা বহি উল্টাইতেছিলেন, তিনি মুখ তুলিয়া বলিলেন, "থাক মা, কিছু তাড়াতাড়ি নেই। তুমি আগে চা খেয়ে নাও।"

যামিনী অগত্যা স্যানাটোজেন সরাইয়া রাখিয়া চায়ের পেয়ালা টানিয়া লইল। জ্ঞানদা আবার বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "ও আবার কি হচ্ছে? শুধু চা কেউ খায়? এমন মেয়ের অসুখ করবে না ত কার করবে? নে সিঙাড়া নে দুটো।"

জোর করিয়া অবাধ্য হওয়া যামিনীর কোষ্ঠীতে লেখে নাই। সে শুষ্কমুখে একটা সিঙাড়া তুলিয়া লইল, তবে আধখানা খাইয়াই ফেলিয়া দিল। এমন করিয়া আর মানুষকে কত খাওয়ান যায়? জ্ঞানদা ক্রুদ্ধমুখে খাইয়া চলিলেন। যামিনী নৃপেন্দ্রবাবুর স্যানাটোজেন প্রস্তুত করিয়া দিয়া খানিকক্ষণ শুধু শুধু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর কখন এক সময় নীরবে উঠিয়া চলিয়া গেল। মিহির অনেক আগেই প্রস্থান করিয়াছিল।

খাওয়া কিছুক্ষণের জন্য থামাইয়া জ্ঞানদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইরকম ভাবে কতদিন চলবে শুনি?"

নৃপেন্দ্রবাবু সংক্ষেপে বলিলেন, "কিরকম ভাবে?"

জ্ঞানদা ক্রোধতিক্ত স্বরে বলিলেন, "এই যে মেয়ে না খেয়ে খেয়ে শুকচ্ছেন, তারপর একটা অসুখ-বিসুখ বাধলে সামাল দেবে কে? এই ত আমার শরীর।"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তা আমাকে কি করতে বল?" স্বামী কি করিলে যে মেয়ের অনাহারব্রত ভঙ্গ হয় তাহা জ্ঞানদার জানা ছিল না, কিন্তু তাহাতে তাহার বিরক্তি বাড়িল বই কমিল না। তিনি সুর চড়াইয়া বলিলেন, "কি করতে হবে তা কি আমিই চিরকাল ব'লে দেব? না হয় নিজেই একটু ভেবে স্থির করলে।"

নৃপেন্দ্রবাবুর শরীর এবং মেজাজও কিছু দিন যাবৎ ভাল ছিল না। তিনিও একটু বিরক্তভাবে বলিলেন, "আমি ভেবে ঠিক করলে সে অনুসারে ত কাজ হবে না, অনর্থক ভেবে কি করব? তুমি যা করতে চাও বল, সাধ্যমত তার ব্যবস্থা করা যাবে।"

জ্ঞানদা উত্তেজিত ভাবে কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় বাহিরে একটা গাড়ী দাঁড়ানোর শব্দ শোনা গেল এবং আয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল যে, কোন এক বাড়ির মেমসাহেবরা বেড়াইতে আসিয়াছেন।

জ্ঞানদা চা-পান অসমাপ্ত রাখিয়াই তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন। বসিবার ঘরে গিয়া দেখিলেন একজন ক্ষীণকায়া বৃদ্ধা এবং একটি তরুণী বসিয়া আছেন, একটি তিন-চার বছরের ছেলে ঘরময় খেলা করিয়া বেড়াইতেছে।

জ্ঞানদা উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওমা, সুধা যে! কি ভাগ্যি! মাসীমা কেমন আছেন?"

মাসীমা বলিলেন, "ভালই আছি বাছা, তোমরা ত বুড়ীর খোঁজখবর নাও না, তা আমিই এলাম আজ। আমরা ত অত সহজে মায়া কাটাতে পারি না।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "আমাদেরই কি আর অনিচ্ছা? কিন্তু নিজের আর ছেলেপিলের অসুখ-বিসুখ নিয়ে এমনই ব্যস্ত যে এক পা কোথাও নড়বার জো নেই।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "তা ত বটেই মা। এখন তোমাদের সময় কোথা? আমাদের না-হয় ভগবান এখন সব বন্ধন ঘুচিয়ে দিয়েছেন, তাই ছটফটিয়ে বেড়াচ্ছি, নইলে তোমাদের বয়সে আমরাই কি বেরতে পেরেছি? তা যামিনী কোথায়? দেখছি না যে?"

জ্ঞানদা বলিলেন, "এই যে ডাক্‌ছি, উপরেই রয়েছে।"

তিনি আয়াকে ডাকিয়া তাহাকে যামিনীকে ডাকিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

তরুণী বলিল, "মা ত খুব গুছিয়ে গল্প করতে বস্‌লে, আমাদের যে এখনও পঞ্চাশ বাড়ি ঘুরতে হবে।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "কেন এত তাড়া কিসের? এলে ত দু-বছর পরে একদিন। বোসো একটু চা-টা খাও।"

তরুণী অস্থির হইয়া উঠিল, "না দিদি, আজ আর কিছুতে হবে না, কত কাজ যে বাড়িতে পড়ে আছে তার ঠিকানা নেই। একলা আমার উপর ত নির্ভর—"

বাধা দিয়া জ্ঞানদা বলিলেন, "ব্যাপার কি? ক্রিয়াকর্ম্ম আছে নাকি কিছু বাড়িতে? মাঝে একবার শুনেছিলাম বটে যে অমূল্যর বিয়ে, তাই নাকি?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "ওমা, তোমরা কোনো খবরই রাখ না দেখছি, অমূল্যর বিয়ে ত পরশু হয়ে গেছে। আস্‌চে পরশু বৌ-ভাত, তাই—"

জ্ঞানদা আবার মাঝে বাধা দিয়া বলিলেন, "ওমা, বিয়ে হয়েই গেল, আমরা কোনো খবরই পেলাম না।"

তরুণী সুধা বলিল, "আমরাই যে খবর পেয়েছি, সেই ভাগ্যি, তা আপনারা পাবেন। যা কিপ্‌টে কুটুম, পারলে আমাদেরও বাদ দিয়ে দিত। বৌ-ভাতে আমরা নিজেদের আত্মীয়স্বজন সবাইকে বলছি অবিশ্যি। পরশু কিন্তু বেশ বেলাবেলি যেতে হবে, গিয়ে যে অমনি নেমন্তন্ন রক্ষা ক'রে চলে আসবেন তা হবে না।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "কাদের বাড়ি বিয়ে হ'ল? তোমাদের অমন সুগ্যি ছেলে, ভাল ক'রে খুঁজে-পেতে দিলে না কেন?"

সুধা ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "বিয়ে দেবার কর্ত্তা আমরা কি-না? আজকালকার ছেলেমেয়েরা নিজেরাই নিজের কর্ত্তা।"

এমন সময় যামিনী ধীরে ধীরে আসিয়া ঘরে ঢুকিল। জ্ঞানদা তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিয়া বলিলেন, "তা বেশ, খুব খুশী হলাম শুনে। বৌ কেমন হ'ল তোমাদের?"

সুধার মা বলিলেন, "তা মন্দ নয়, তবে বড় রোগা। সংসারের ধবল সামলাতে হ'লে কেমন উৎরবে তা বলা শক্ত।"

তরুণী যামিনীর হাত ধরিয়া টানিয়া পাশে বসাইয়া বলিল, "এমন শুকিয়ে যাচ্ছিস্ কেন ভাই? পরীক্ষার ঠেলায় বুঝি?"

যামিনী ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, পরীক্ষার ঠেলা ত কত? পড়াশোনা মোটেই করছি না।"

বৃদ্ধা মহিলা এইবার উঠিয়া পড়িলেন, "না, এবার নিতান্ত উঠতে হ'ল। আর একদিন এসে অনেকক্ষণ গল্প করা যাবে।"

জ্ঞানদাও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বলিলেন, "মনে থাকে যেন।"

সুধা যামিনীকে অনেকবার করিয়া বলিয়া গেল, "তুই কিন্তু নিশ্চয় যাস্ ভাই। কোনো ওজর আমি শুন্‌ব না।"

২৫

যামিনীর ঘরে জ্ঞানদা মহা ব্যস্তভাবে তাহাকে সাজাইতেছেন। আজ সুধাদের বাড়ির বৌভাত। যামিনী অনেক দিন মাঝে বাড়ির বাহির হয় নাই, এতদিন পরে লোকে তাহাকে দেখিবে। দেখিয়া খুঁৎ ধরিবার কিছু না পায়, সেই জন্যই এত চেষ্টা। তাহা ছাড়া বিশেষ কারণও কিছু আছে। জ্ঞানদা এধার-ওধার হইতে নানা খবর সংগ্রহ করিতেছেন হয়ত বা আজ ওখানে কিছু সুবিধা ঘটিয়া যাইতেও পারে। মেয়ে দেখিয়া সবাই যেন তারিফ করে, এই তাঁহার ইচ্ছা।

যামিনী নীরবে মায়ের আদেশ পালন করিয়া যাইতেছিল। গহনাগাঁটি সমস্তই সে তাঁহার আদেশমত বাহির

করিল এবং পরিলও। কিন্তু তাহার অতিপ্রিয় নীল রেশমের শাড়ীখানি বাহির করিয়া মা যখন বলিলেন, "এইটে প'র," তখন হঠাৎ কেন জানি না সে বাঁকিয়া বসিল, বলিল, "ওটা পরব না।"

জ্ঞানদা কন্যার আপত্তির কারণ কিছু বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "কেন? ওটাতেই ত তোকে মানায় সবচেয়ে ভাল।"

যামিনী জেদ ছাড়িল না, বলিল, "ওটা ত উপরি উপরি অনেকবার পরেছি। আরও ত ঢের কাপড় রয়েছে। ঐ বাসন্তী রঙের কাপড়টা ত নূতন, ওটা ত কোনো দিন পরা হয়নি।"

জ্ঞানদা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন, এমন ভাবে জেদ যামিনী কোনো দিনই করে না। কিন্তু জোর করিতে গেলে হয়ত মেয়ের চোখে জল আসিয়া পড়িবে, তখন এত কষ্ট করিয়া ক্রীম পাউডার মাখান সব ভাসিয়া যাইবে। কাজ নাই, তাহার যাহা ইচ্ছা পরুক, ভাল দেখাইলেই হইল। বলিলেন, "যা খুশী তোমার পর বাছা, সব কথাতেই আজকাল তোমার অবাধ্যপনা" বলিয়া নিজে প্রস্তুত হইবার জন্য অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন।

যামিনী নীল শাড়ীখানার উপর কয়েকবার হাত বুলাইয়া আবার আলমারীতে তুলিয়া রাখিল। একেবারে সবগুলি কাপড়ের তলায় সেখানাকে চাপা দিল, যেন আর কোনো দিন কাহারও চোখে না পড়ে। যে-চোখের জলের ভয় জ্ঞানদা করিতেছিলেন, সেই চোখের জলই ঝর ঝর করিয়া অনেকখানি তাহার চোখ হইতে গড়াইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া, আরও খানিকটা গোলাপী পাউডার গালের উপর ঘসিয়া সে অশ্রুজলের সকল চিহ্ন মুছিয়া ফেলিল। তাহার পর কাপড়চোপড় বাহির করিয়া সাজসজ্জা সমাপ্ত করিতে লাগিয়া গেল।

জ্ঞানদা খানিক বাদে আবার আসিয়া প্রবেশ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর হ'ল রে খুকি?" তিনি সাজপোষাক সমাধা করিতে অত্যন্ত হাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বিপুল শরীর এখন উৎসব-সজ্জায় অতিশয় কাতর হইয়া ওঠে, কিন্তু না করিলে নয়। উঁচু গোড়ালীর জুতাটা তাঁহাকে যন্ত্রণা দেয় সব চেয়ে বেশী, তবু সেটার মায়া তিনি কাটাইতে পারেন না। লোকে মনে করিবে সেকেলে, জুতো পরা অভ্যাস নাই, তাহার চেয়ে নয় খানিক অসুবিধাই সহ্য করিলেন।

যামিনী রেশমের মোজা পরিতে পরিতে বলিল, "হয়ে গেছে প্রায়।"

জ্ঞানদা জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া সহিসকে গাড়ী হাজির করিতে আদেশ দিলেন, তাহার পর মিহিরকে ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন।

মিহির বৌভাতে যাইবার 'অনারে' বহুদিন পরে ধুতি পাঞ্জাবী পরিবার অনুমতি পাইয়াছিল, নহিলে ঘরে বাহিরে কোথাও তাহার হাফপ্যাণ্ট এবং শার্ট ভিন্ন আর কোনো পরিচ্ছদ পরিবার উপায় ছিল না। সে মা এবং দিদির সঙ্গে গাড়ীতে উঠিয়াই বলিল, "আমি কিন্তু বেশী রাত থাকতে পারব না।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "কেন তোমার কি যজ্ঞি নষ্ট হবে শুনি? যখন আমরা আস্‌ব, তখন তুমিও আস্‌বে।"

মিহির বলিল, "না, আমি শিশিরের বাড়ি যাব একবার। ওদের বাড়ি ত সুধামাসীমার বাড়ির খুব কাছে।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "তা হোক কাছে। আজ না গেলেই নয়? অন্য একদিন যেও।"

মিহির বিরক্ত হইয়া উঠিল, "হ্যাঁ, আর একদিন সে আমার জন্যে বসে থাকবে কি-না? তারা পরশু দার্জ্জিলিং চলে যাচ্ছে না? আমার আর তাহলে পণি ঘোড়া দেখা হবে না।"

যামিনী এতক্ষণ মুখ বুজিয়া চুপ করিয়াছিল। সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "পণি ঘোড়া আবার কার কোত্থেকে এল?"

মিহির বলিল, "বা রে, শিশিরের দাদা শিশিরকে একটা ঘোড়া কিনে দিয়েছে, তোমায় বলেছিলাম না? তোমার যদি কোনো কথা মনে থাকে! সেই যে তার অভিষেকের সময়?"

যামিনী কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়াই আবার অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার দুই চোখ আবার রাস্তার জনস্রোতের উপর গিয়া নিবদ্ধ হইয়াছিল, মিহিরের কথা

তাহার কানে গেল কি-না তাহার ঠিকানা নাই। জ্ঞানদা কিন্তু একটু উৎসুকভাবে বলিলেন, "অভিষেক কি রকম? শিশির রাজা হয়েছে নাকি?"

মিহির বলিল, "শিশির নয়, তার দাদা।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "শিশিরের দাদাই বা রাজা হ'ল কবে? ঐ গোপীকান্ত রায়ের ছেলে ত?"

মিহির বলিল, "ঐ রাজা না হোক জমিদার হ'ল ত? তার বাবার শ্রাদ্ধ হয়ে যাবার পর কি সব হ'ল যে? তাকে অভিষেক বলে না? রামায়ণে তাই ত আছে।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "বাংলা ভাষার কি চমৎকার জ্ঞান ছেলের! মোটে কি পড়াশুনোয় মন আছে? খালি খেলা আর খেলা।"

মিহির বলিল, "তা আমি কি করব? একখানাও বাংলা বই তুমি আমায় পড়তে দাও? সেদিন অমন সুন্দর বইখানা আনলাম, তুমি অমনি ছোঁ মেরে নিয়ে গেলে। এ রকম করলে আমি বাংলা শিখব কি করে?"

জ্ঞানদা চটিয়া বলিলেন, "হ্যা, বাংলা শেখবার জন্যে তোমার যত বাজে নভেল পড়ারই দরকার। তাও যদি ইংরিজি হ'ত ত বুঝতাম যে ইংরিজিটা একটু শিখছ। সে দিকে ত ঢুঁ ঢুঁ বিদ্যে।"

মিহির বলিল, "আহা বঙ্কিমবাবুর বই বুঝি বাজে বই হ'ল? আমি স্যারকে জিজ্ঞেস ক'রে নিয়েছিলাম না?"

জ্ঞানদা উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "যেমন তোমার 'স্যার'দের আক্কেল! সব সমান!" বলিয়াই তাড়াতাড়ি চুপ করিয়া গেলেন, এবং আড়চোখে একবার মেয়ের দিকে তাকাইয়া দেখিয়া লইলেন।

যামিনী তাঁহার কথা শুনিয়াছিল কি-না বুঝা গেল না। সে যেমন রাস্তা দেখিতেছিল, তেমনই দেখিতে লাগিল। জ্ঞানদাদের গাড়ীও দেখিতে দেখিতে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া গেল।

বাড়িখানি বিশেষ বড় নয়, তবে সামনে ছোট একটি 'লন' আছে। তখনকার দিনে নহবৎ বসান প্রভৃতিকে পৌত্তলিক আচরণ জ্ঞানে অনেকেই বর্জ্জন করিয়া চলিতেন। সুতরাং বাজনা বসে নাই, তবে গেট এবং বাড়ি ফুল লতা পাতা, ও রঙীন জাপানী লণ্ঠনের সাহায্যে যথাসম্ভব সুসজ্জিত করা হইয়াছে। 'লন'টিতে একটি ছোট দরবার তাঁবুও খাটান হইয়াছে। পুরুষ অভ্যাগতরা অনেকে সেখানেই বসিয়া আছেন, মেয়েরা সোজা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিতেছেন।

গাড়ী হইতে নামিয়া গেটের ভিতর প্রবেশ করিয়াই মিহির লাফাইয়া উঠিল, "ঐ ত মা শিশির! আমি যাচ্ছি ওর কাছে।"

জ্ঞানদা তাকাইয়া দেখিলেন, একটি উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছেলে, মিহিরেরই বয়সী হইবে, তাহাকে দেখিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। মিহিরের হাত ধরিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া জ্ঞানদা বলিলেন, "দাঁড়া দাঁড়া, একেবারে হন্যে হয়ে ছুটলি যে।"

শিশির ইতিমধ্যে আসিয়া হাজির হইল। মিহির তাহার সঙ্গে জ্ঞানদার পরিচয় করাইয়া দিল, "এই আমার মা, আর ঐ দিদি।" যামিনী অল্প একটু হাসিয়াই কাজ শেষ করিল, কথা বলিবার কোনো চেষ্টা করিল না। শিশির লজ্জিত ভাবে কোনোমতে দুজনকে দুইটা প্রণাম করিয়া ফেলিল।

বড়মানুষের ছেলে এবং দেখতে সুশ্রী, সুতরাং জ্ঞানদার ছেলেটিকে বেশ ভালই লাগিল, বলিলেন, "মিহিরের কাছে তোমার গল্প অনেক শুনেছি। ওরই সঙ্গে তুমি পড়, না? তোমাদের বাড়ির সকলে এসেছেন বুঝি?"

শিশির বলিল, "দাদার সঙ্গে আমি এসেছি।"

জ্ঞানদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের বাড়ির মেয়েরা কেউ আসেননি?"

শিশির বলিল, "বাড়িতে ত মা ছাড়া কেউ নেই, তিনি ত কোথাও বেরোন না।"

মিহিরের আর এ সব ভদ্রতা পছন্দ হইতেছিল না। সে শিশিরকে ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া গেল। জ্ঞানদা কন্যাকে লইয়া মেয়ে-মজলিশের দিকে চলিলেন। সুধা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাদের খুব উচ্ছ্বসিত ভাবে অভ্যর্থনা করিল। যামিনীকে ত একেবারে জড়াইয়াই ধরিল, বলিল, "আয় ভাই আয়, তুই আসিস্ নি ব'লে এতক্ষণ হাজার আলোতেও বাড়ি আঁধার হয়েছিল।"

যামিনী এ রসিকতায়ও যোগ না দিয়া শুধু একটুখানি হাসিল মাত্র। জ্ঞানদা বলিলেন, "তোমরা ভালবাস ব'লে বল্‌ছ, নইলে আমার মেয়ে কি আর এমন সুন্দর? ওর চেয়ে সুন্দর ঘরে ঘরেই রয়েছে।"

সুধা বলিল, "হ্যাঁ, তা আর না? বাংলা দেশে চারিদিকে রূপের বান ডেকে যাচ্ছে। তা চলুন, বউ দেখবেন চলুন।"

জ্ঞানদা অগ্রসর হইয়া চলিলেন। যামিনীও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সুধা চুপিচুপি বলিল, "তুই বাপু বৌয়ের বেশী কাছে দাঁড়াস্‌নে। একে ত এই রূপ, তার উপর ইন্দ্রাণীর মত সেজে এসেছিস্‌। আমাদের বৌয়ের দিকে তাহলে আর কেউ তাকাবে না।"

যামিনী অগত্যা বলিল, "কি যে বলেন তার ঠিক নেই। আপনার সব তাতেই ঠাট্টা।"

সুধা বলিল, "তা ত বল্‌বিই। বিনয়ের অবতার কি-না!"

বৌয়ের চারিদিকে নানা বয়সের ন না চেহারার মেয়ে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। একটি গদি-আঁটা চেয়ারে বৌ বসিয়া। শ্যামবর্ণ রং পাউডার 'স্নো'র আধিক্যে প্রায় ফরসাই বোধ হইতেছে। ফিকা বাদামী রঙের রেশমের পরিচ্ছদ, তাহাকে বিশেষ মানায় নাই। হাতে গলায় দুই চারিখানা গহনা, বেশী গহনা পরা তখন ফ্যাশান ছিল না। পায়ে জুতা মোজা, মাথায় পাতলা রেশমের ওড়্‌না।

জ্ঞানদা হাতে টাকা দিয়া বৌয়ের মুখ দেখিয়া বলিলেন, "তা বেশ বউ হয়েছে। খাইয়ে-দাইয়ে একটু মোটা করে নাও, তাহলে আর কোনো খুঁৎ থাকবে না।"

বধূ একবার তাঁহার দিকে তাকাইয়া, আবার মাথা নীচু করিয়া লইল।

যামিনীকে একদল মেয়ে আসিয়া টানিয়া লইয়া গেল। জ্ঞানদা গিন্নিবান্নীদের দলে ভিড়িয়া গেলেন।

সুধা সারা বাড়ি চরকির পাকের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে-ছিল। সে-ই গিন্নি, তাহার আজ আর ব্যস্ততার সীমা নাই। মেয়েদের পাতা হইয়াছে কি-না দেখিবার জন্য সে হাঁকডাক সুরু করিয়াছে, এমন সময় একটি বালক ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "মা, বাবুরা যে বৌ দেখতে চাচ্ছে?"

সুধা বলিল "যাও, এখন বৌ আবার কে নিয়ে যায়? আমার ত মরবার সময় নেই। ডাক্‌ না আর কাউকে?"

ছেলেটি গাল ফুলাইয়া বলিল, "আমি আবার কাকে ডাকব? তুমি ডাক না।"

সুধা বলিল, "গেলাম বাবা, আর পারি না।" সে মেয়েদের ভীড়ে ছুটিয়া গিয়া একটি মেয়ের কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়া বলিল, "এই তরু, যা না ভাই বউ নিয়ে একটু বাইরে, আমার ত সময় নেই।"

তরুর আপত্তি ছিল না। বলিল, "তা যাচ্ছি না হয়, কিন্তু আর একজন হ'লে হয়।"

সুধা বলিল, "ঐ যামিনীকে নিয়ে যা। বাবুরা একটু সত্যি দেখবার জিনিষ দেখে চক্ষু সার্থক করুক্‌।"

তরু বলিল, "এরি মধ্যে বড়জা-গিরি ফলাতে লেগে গেছ? কেন বউ দেখতে মন্দ কি? না হয় যামিনীর মত নূরজাহান নাই হ'ল?"

সুধা বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, তুই যা ত এখন।" বলিয়া সে ফর-ফর করিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল।

যামিনীকে অনেক সাধাসাধি করিয়া তরু তাহার সঙ্গে যাইতে রাজী করিল। যামিনী শেষে বলিল, "মাকে জিগ্‌গেষ কর।"

তরু বলিল, "তুই চল ত। কিছু বলবেন না তোর মা। বলেন ত সব দায় আমার।"

যামিনী বউকে হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। তরু পিছন পিছন চলিল। ক্রমশঃ

বাঙ্গালা টাইপ ও কেস

শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার

২

আমার প্রথম প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম,—দ্বিতীয় প্রবন্ধে থাকিবে, প্রত্যেক টাইপের ধারাবাহিক আলোচনা ও প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে বিচার; টাইপ-সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি করার প্রস্তাব; নূতন টাইপের প্রবর্ত্তন- ও প্রচলন প্রস্তাব এবং সংযুক্ত টাইপের আকৃতিগত বিশ্লেষণ প্রভৃতি।

প্রথমেই স্মরণ করাইয়া দিই, বাঙ্গালায় বিভিন্ন প্রকারের টাইপ-সংখ্যা মোট ৫৬৩। ইহাদের প্রত্যেকটির প্রয়োজনীয়তা- ও অপ্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে এবং উপযোগিতা- ও অনুপযোগিতা-হিসাবে ধারাবাহিক আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য।

কয়েকটি টাইপ-সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি, যেমন—ই, ৯, ৢ, ঃ, ই, , দুই প্রকার ে, দুই প্রকার ৈ, দুই প্রকার ৗ, ৺ (ঈশ্বর) চিহ্ন, ধ্বু, শ্রী, গ্ন, গ ণ, র্ভ, র্দ্ধ, র্ক, ষ্ট্রী, ঞ্জি, ক্ষ্ণ, ক্ষ, হ্ন, প্ম, খ্ব, ভ্র, ক্ত, স্ত্র, ভ, ন্ড, ক্ষ, কুঁ এবং ।

প্রথম প্রবন্ধে ৫৬৩ রকম টাইপকে তিনটি প্রধান বিভাগে সাজাইয়াছিলাম,—(১) স্বর ও ব্যঞ্জন প্রভৃতি অযুক্ত ও যুক্ত টাইপ—৪৭৪; (২) পাদটীকার চিহ্ন, ১ ২ প্রভৃতি সংখ্যা, গণিতের চিহ্ন এবং ছেদ-চিহ্ন প্রভৃতি—৪৯; (৩) কর্ন টাইপ—৪০; মোট—৫৬৩।

১৩৩৯ সালের পৌষ মাসের সংখ্যার ৩২৭ পৃষ্ঠায় দেখুন, উপরি উক্ত (১) বিভাগে ৪১টি দফা আছে। প্রথমে এই ৪১ দফায় সাজানো ৪৭৪টি টাইপের আলোচনা করিতেছি।

১ দফা—অ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ৯ ঃ এ ঐ ও ঔ ই—১৪।

ৠ, ৢ, ঃ এবং দুই নম্বর ই—এই ৪টি টাইপ বাদ দিলে হয় না কি? কারণ প্রথম প্রবন্ধে দর্শাইয়াছি।

২ দফা—া া ি ী ে ে ৈ ৈ ৗ া ি ী ৢ ৣ ২—১৯।

শেষের া, গোড়ার ে ৈ এবং শেষের ৗ—এই ৪টি অর্থাৎ মাত্রাহীন চারিটিকে বাদ দিয়া মাত্রাযুক্ত চারিটিকে দিয়া পাশের এবং মাঝের—সকল স্থানের সব কাজ চালাইয়া লওয়া যায় না কি? কেবল ে এবং ে-র বেলায় অবশ্য বিশ্বকবির নির্দ্দেশ রক্ষা করিতে পারা যাইবে না; তবে তাঁহার নির্দ্দেশমত কাজ বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাদি ভিন্ন অন্য কোথাও অনুসৃত হইতেছে না, এবং আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয় বলিয়াই মনে হয়। ভাবিয়া দেখুন, কম্পোজ করিবার সময় এবং প্রুফ দেখিবার সময় া া ে ে ৈ ৈ এবং ৗ লইয়া যথেষ্ট সময় অযথা নষ্ট হয়; তাহার উপর যদি এ-কারের (ে) অ্যা উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য গোড়ার এ-কারের (ে) বদলে এ-কার (ে) চালানো যায় তাহা হইলে আরও বিশেষ গোলযোগ ও বিভ্রাট ঘটিবে, আরও অনেক সময় বাজে খরচ হইবে। তারপর আর একটা মস্ত বড় কথা হইতেছে, আমরা পশ্চিম-বঙ্গ-বাসীরা যে সকল স্থলে এ-কারের 'অ্যা' উচ্চারণ করি, সেই সকল স্থলেই পূর্ব্ব বঙ্গ-বাসীরা স্পষ্ট করিয়া 'এ' উচ্চারণ করেন। সুতরাং এ বিষয়েও অবহিত হওয়া আবশ্যক। পূজনীয় পিতৃদেব একবার এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—"'কেবল'—এই শব্দটি 'ক্এবল' অথবা 'ক্যাবল' উচ্চারণ করা ভাল এই নিয়ে মাথা ঘামানো মহামূর্খতা,—কেন-না আমরা এ অঞ্চলে বলি, 'কেশবচন্দ্র স্যান,' কিন্তু বাঙ্গালরা বলেন, 'ক্যাশবচন্দ্র সেন,'—কাজেই আমরা দু'জনরাই সমান দোষে দোষী।"

ৄ বাদ দিলে হয় না কি? পিতার নিকটে এখন ত সন্তানেরা কোন প্রকারে ঋণী নহেন; পরন্তু এই জরা-মৃত্যুব্যাধিসঙ্কুল সংসারে জন্ম দিয়াছেন বলিয়াই-না

সন্তানের নিকটে পিতা মহাপাপে পাপী! সুতরাং বাঙ্গালায় 'পিতৃণ' লিখিবার প্রয়োজনই আর নাই।

লুপ্ত অকার (ऽ) বাদ দিলে হয় না কি?

আমি যতটুকু জানি, সংস্কৃত ব্যাকরণের দুইটি সন্ধি-সূত্রের খাতিরে সংস্কৃত ভাষায় লুপ্ত অকারের চিহ্ন দেওয়া হয়। (১) পদের অন্তস্থিত একার কিংবা ওকারের পর যে অকার থাকে, তাহার লোপ হইয়া লুপ্ত অকার চিহ্ন হয়,—যেমন, সখেऽর্পয়, গুরোऽনুমতি। এই প্রথম সূত্রানুযায়ী কোন প্রয়োগ বাঙ্গালায় এখনও পাই নাই। (২) অকারের পরবর্ত্তী বিসর্গের পর যে অকার থাকে, তাহার লোপ হইয়া লুপ্ত অকার চিহ্ন হয় এবং পূর্ব্বের অকার ও বিসর্গ মিলিয়া ওকার হয়,—যেমন, নরোऽয়ম্, বেদোऽধীতঃ ইত্যাদি। এই দ্বিতীয় সূত্রানুযায়ী একটি মাত্র বাঙ্গালা প্রয়োগ উপস্থিত মনে পড়িতেছে,—'ততোऽধিক'; কিন্তু বাঙ্গালী উৎকট সংস্কৃত পণ্ডিত ভিন্ন অন্য কাহাকেও কখনও ততোऽধিক লিখিতে দেখি নাই,—সকলেই 'ততোধিক' লেখেন, অর্থাৎ লুপ্ত অকারের চিহ্ন দেন না।

একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আর একটি বিষয় এই ऽ-কার-প্রসঙ্গে নিবেদন করিতে চাই। বোম্বাই দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত অধিকাংশ সংস্কৃত পুস্তকে লুপ্ত অকারের ছড়াছড়ি; সন্ধির খাতিরে যেখানে অকার অন্য কিছুর সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে, অথবা পাশে আছে সেইখানেই অকারের স্থানে একটি লুপ্ত অকার চিহ্ন দেওয়া হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই প্রথা কলিকাতা দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত কোন পুস্তকে প্রচলিত ছিল না; এখন দেখিতেছি, বাঙ্গালী ছেলের জন্য লিখিত, বাঙ্গালীর রচিত এবং কলিকাতায় মুদ্রিত কোন কোন প্রথম পাঠ্য সংস্কৃত পুস্তকেও এই লুপ্ত অকারের বাড়াবাড়ির প্রথা পুরাদস্তুর চলিতেছে, উদ্বাऽপতৎ ইত্যাদি। গোদের উপর বিষফোড় কেন? এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

দ্বিতীয় দফা হইতে ৬টি টাইপ বাদ দিবার প্রস্তাব করিলাম।

৩ দফা—ং ঃ ঁ (চন্দ্রবিন্দু) ্ (হসন্ত চিহ্ন) এবং ্য ্র ্ব ্ন ্ম ্ল প্রভৃতি ফলা—১০।

১০টিই থাকিবে; একটিকেও বাদ দিবার উপায় নাই।

৪ দফা—ক কৃ কু কূ ক্ক ক্ষ ক্কু ক্ট ক্ত ক্তৃ ক্ম ক্ব ক্ষ্ম ক্র ক্রু ক্ল ক্স—১৭।

কূ, ক্ক, ক্কু, ক্ট, ক্ম, ক্ব, ক্ষ্ম এবং ক্স—এই ৮টি টাইপ বাদ দিলে হয় না কি?

কূ-যুক্ত শব্দ বাঙ্গালায় খুবই কম ব্যবহৃত হয়। দরকার মত 'কবূন' ক-য়ে ূ জুড়িয়া দিয়া অনায়াসে কাজ চলিতে পারে।

ক্ক—চিক্কণ, ধিক্কার ছাড়া অন্য কোন শব্দ মনে পড়িতেছে না। ধরিয়া লওয়া গেল, আরও চার-পাঁচটি শব্দ আছে। প্রত্যেকটিকে 'ক্‌ক' দিয়া মুদ্রিত করিলে ক্ষতি কি? আমার মনে হয়, ধিক্কার না লিখিয়া ধিক্‌কার লিখিলে অর্থ অধিকতর পরিস্ফুট হয়।

ক্কু—কুক্কুট আর কুক্কুর ভিন্ন অন্য কোন শব্দ স্মরণ হইতেছে না। 'ক্‌কু' লিখিলে দোষ কি?

ক্ট, ক্ম—বাঙ্গালায় ব্যবহার আছে কি?

ক্ব,—পক্ব ছাড়া ক্ব দিয়া আর কোন শব্দ বাঙ্গালায় ব্যবহার আছে কি? তবে 'পক্ব' 'পক্‌ব' রূপে চলিবার পক্ষে অনেকের উচ্চারণগত আপত্তি থাকিতে পারে। আমাদের বহু কালের উচ্চারণ-দোষে আমরা নিম্নে লিখিত যুক্তাক্ষরগুলির বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিতে পারি না, এবং পারিলেও বিশুদ্ধ উচ্চারণ না করিয়া অশুদ্ধ উচ্চারণ করাই রীতি দাঁড়াইয়া গিয়াছে:—

ক্ব জ্ব ত্ব ত্ত্ব দ্ব ধ্ব ন্ব ল্ব শ্ব স্ব ক্ষ্ম ত্ম দ্ম শ্ম স্ম হ্ম প্রভৃতি।

লিখি পক্ব, উচ্চারণ করি পক্‌ক; লিখি জ্বর, উচ্চারণ করি জর; লিখি গুরুত্ব, উচ্চারণ করি গুরুত্ত; লিখি সত্ত্ব, উচ্চারণ করি এমন ভাবে যেন মনে হয় গালে আমসত্ত্ব গুঁজিয়া উচ্চারণ করিতেছি; (আচ্ছা, বাঙ্গালায় রস বা নির্য্যাস বা সার বুঝাইতে যে 'সত্ব' লিখি তাহার বানান কি হইবে? 'সত্ব', 'সত্ত', না 'সত্ত্ব'? 'সত্বও' 'ত্ত' দিয়া বাঙ্গালায় লেখা হয় কেন?) লিখি দ্বয়, উচ্চারণ করি দয়; লিখি ধ্বনি, উচ্চারণ করি ধনি, ইত্যাদি। সুতরাং উপরে লিখিত যুক্তাক্ষরগুলির প্রথম অক্ষর বা উপরকার অক্ষরটি হসন্ত চিহ্ন দিয়া ছাপা হইলে ছেলেরা ছেলেবেলা থেকে

বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিখিয়া ফেলিবে এবং এত কাল বাদে ছেলে-মুখে সেই সব বিশুদ্ধ উচ্চারণ বুড়দের কাণে বড়ই বাজিবে! এইরূপ আপত্তি অনায়াসে উঠিতে পারে, তাহা মানি।

ক্স—বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগে রুক্ম পড়িয়াছিলাম, আর আজ অভিধান খুলিয়া তাহার অর্থ শিখিলাম—স্বর্ণ, ধুস্তুর, লৌহ; ভাষায় রুক্ম শব্দের প্রয়োগ কখনও দেখি নাই। আর কৃষ্ণদ্বেষী রুক্মী ও তাঁহার ভগিনী রুক্মিণীর কথা মহাভারতে পড়িয়াছি। এ ছাড়া ক্ম-যুক্ত অক্ষর আর কোথাও চোখে পড়ে নাই।

ক্স—গোফেন বাক্স বা ডেস্কের উপর খাতা রাখিয়া পিতার আদেশে চৌদ্দ বৎসর বয়স্ পর্য্যন্ত হাতের লেখা মক্স করিতে হইয়াছিল। এখন পর্য্যন্ত এই দুই বার মাত্র আমার সঙ্গে ক্স-র পরিচয় ও মাখামাখি। সুতরাং বাক্স ও মক্স লিখিলে বোধ হয় মহাভারত অশুদ্ধ হইবেন না। তারপর 'বাক্স' আর 'বাক্‌স' আমরা দুই-ই বলি। তবে বক্সী মহাশয়দের কাছে ক্ষমা চাহিতেছি, আর ট্যাক্‌সি ও বাসের কল্যাণে রিক্স ত যায় যায়।

৪ দফা হইতে ৮টি টাইপ বাদ দিবার কথা বলিলাম।

এইখানে আর একটি বিশেষ কথার অবতারণা করিয়া ৫ দফায় হাত দিব। কথাটি এইখানেই স্পষ্ট করিয়া বলিলে পরে বার বার একই কথার পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে না। বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে এমন কতকগুলি যুক্তাক্ষর রহিয়াছে যেগুলি শব্দের আদিতে বসে,—যেমন, ক্র, প্র প্ল, ম্ল, শ্ল, জ্ঞ, স্ক, স্খ, স্ত, স্ব, স্ন, স্প, স্ফ প্রভৃতি। ইহাদের প্রত্যেকের উপরকার অক্ষরে হসন্ত জুড়িয়া দিয়া এবং নিচের অক্ষরটি স্বরান্ত রাখিয়া মুদ্রিত করা এবং লেখা শব্দের ডাক্তার সুনীতিবাবুর মত। তিনি স্বয়ং যখন শিয়ালদা স্‌টেসন দিয়া স্থানান্তরে যান, তখন তাঁহার হাতে থাকে একটা মস্ত গ্লাড্‌স্টোন ব্যাগ, বগলে থাকে স্কটের ওয়ার্কস ও স্কন্দ পুরাণ আর স্কন্ধে থাকে একটা আল্‌স্টার। পদস্খলন হইলেই মুস্কিল। আমি তাঁহার মতের পক্ষপাতী নই; স্বভাবকতা করিয়া তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিলে মুদ্রণকার্য্যের বিশেষ অসুবিধা হইবে। লক্ষ্য করিয়াছি, ইতিমধ্যে কতকগুলি উপন্যাসে তাঁহার এই ব্যবস্থা চালতেছে। এই সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

আবার উল্টা উৎপত্তি দেখুন, অঙ্গরাগ-সামগ্রী snow শব্দ বাঙ্গালায় 'স্নো' লেখা হইতেছে। স্ন-র খাঁটি বিশুদ্ধ উচ্চারণ সংস্কৃতে এবং বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে—স্নান, স্নায়ু, স্নিগ্ধ, স্নেহ প্রভৃতি। সুতরাং 'স্নো' বাঙ্গালায় 'এস্‌নো' উচ্চারিত হইতে পারে না। বোধ হয় 'মীরাস্নো'র বিজ্ঞাপন প্ল্যাকার্ডে দেখিয়া প্রথমে আমার কোন অর্থাগম হয় নাই। ইংরাজী যে সকল শব্দের গোড়ায় এস্ (s) স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয় এবং পরে এন (n) থাকে সেই সকল শব্দের প্রথম অক্ষরে স্ন যুক্ত টাইপের পরিবর্ত্তে এস্ লিখিতেই হইবে—গত্যন্তর নাই। Snow, snake, snail, প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালায় স্নো, স্নেক, স্নেল, না লিখিয়া এস্‌নো, এস্‌নেক, এস্‌নেল লেখাই উচিত নয় কি? কিন্তু বাঙ্গালায় স্প-র বেলায় কোন গোলযোগ নাই—spade, spider, space প্রভৃতি বাঙ্গালায় স্পেড, স্পাইডার ও স্পেস প্রভৃতি লিখিলে উচ্চারণগত কোন বিড়ম্বনাই ঘটে না।

কাজেই আমার বক্তব্য হইতেছে, যে সকল যুক্তাক্ষর শব্দের গোড়ায় বসে সেই টাইপগুলিকে ভাঙ্গিয়া প্রথমটি হসন্তযুক্ত টাইপ ও দ্বিতীয়টিকে স্বরান্ত টাইপ করিয়া ছাপায় ব্যবহার করিলে মুদ্রণকার্য্যে অধিক সময় লাগিবে, কাগজ বেশী লাগিবে এবং পাঠের মধ্যে অসুবিধা হইবে। সুতরাং এই সকল টাইপ যেমন আছে, ঠিক তেমনি রাখিয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন।

৫ দফা—খ খৃ খৄ খৢ শ্রী—৫।

খৄ এবং শ্রী—এই ২টি টাইপ বাদ দিলে হয় না কি?

খৄ—খুবই কম ব্যবহার; কাজেই করন্ খ এবং ৄ জুড়িয়া অনায়াসে কাজ চালাইতে পারা যায়।

শ্রী-সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি; তবে আমি হিব্রু ও গ্রীক একটুও জানি না। বিশেষজ্ঞের উপদেশ প্রার্থনা করিতেছি।

৬ দফা ধরিবার পূর্ব্বে সংযুক্ত টাইপের আকৃতিগত বিশ্লেষণ করা বিশেষ দরকার।

পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র রায় কতকগুলি যুক্তাক্ষর

টাইপের আকৃতি পরিবর্ত্তন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন এবং নিজের লিখিত পুস্তকে, এমন-কি প্রবন্ধেও তাঁহার উদ্ভাবিত ও প্রবর্ত্তিত নূতন টাইপ চালাইতেছেন। প্রথমেই দেখা যাক, কোন্ কোন্ টাইপ-সম্বন্ধে তিনি পরিবর্ত্তন-প্রয়াসী। যে সকল ব্যঞ্জনে প্রভৃতি স্বর সাধারণভাবে মিলিত না হইয়া ঐ সকল স্বরসংযোগে তাহাদের রূপ বদলাইয়া যায়, যেমন—শু, গু, রু, রূ, হৃ প্রভৃতি এবং যে সকল যুক্তাক্ষর দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় না যে, ঠিক কোন্ কোন্ অক্ষরের যোগে উহাদের সৃষ্টি হইয়াছে, অর্থাৎ যে দুইটি বা তিনটি টাইপে মিলিয়া ঐ যুক্তটাইপ তৈয়ার হইয়াছে, সেই দুইটি বা তিনটির সাধারণ অযুক্ত অবস্থার রূপ যুক্ত টাইপে ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে, যেমন—কৃত ক্ত, ক্-য়ে রফলা ক্র, গ্ধ গ্ধ, ইত্যাদি। বিদ্যানিধি মহাশয় ঐ যুক্তাক্ষরগুলিকে এইরূপভাবে মুদ্রিত করিতে বলেন,—শ, শ, র, রূ, হ্, ক্ ইত্যাদি।

যে সকল টাইপ লইয়া এই গণ্ডগোল, তাহাদের একটি পূরা তালিকা নিম্নে দিতেছি।

ক্তু ক্রু	...	২
গু গ্ধ	...	২
ঙ্গ	..	১
জ্ঞ	...	১
ঞ্চ	...	১
ট্র	...	১
ণ্ড	...	১
ত্তু থ্ব ত্র ত্রঁ ত্রু ত্রূ	...	৬
দ্ধ দ্রু দ্রূ	...	৩
ধ্রু ধ্রূ	...	২
ন্থ ন্ধ ন্তু	...	৩
প্রু প্রূ	...	২
ব্ধ ব্রু ব্রূ	..	৩
ভ্র ভ্রু ভ্রূ	...	৩
রু রূ		২
শু শ্রু শ্রূ	...	৩
ষ্ণ	...	১
স্থ স্তু স্রু স্রূ	...	৪
হু হ্ন হৃ হ্ম	...	৪
ক্ষ	...	১
		মোট—৪৬

রায় মহাশয় এই ৪৬টি টাইপের রূপ বদল করিতে চাহেন। তাহাতে আমার ব্যক্তিগত কোন আপত্তি নাই, মুদ্রণকার্য্যের দিক্ হইতেও কোন অসুবিধা হইবার কথা নয়, পরন্তু কোন কোন স্থলে বিশেষ সুবিধাই হইবার কথা। সুবিধার দিক্ হইতে দুই-একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

গু আর গু ছোট টাইপে (বর্জ্জাইসে) এবং অল্প একটু কালি জুব্‌ড়াইয়া গেলে ধরা বড় কঠিন; সেই জন্য ছাপায় প্রায়ই ভুল হয়। ঞ্চ-য়ের বদলে ক্ষ কয়েকজন সাহিত্যিকের কপিতেও দেখিয়াছি; ঞ্চ ঞ্‌চ রূপ পাইলে ছেলেবুড় অনেকেই অনেক বিড়ম্বনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পান। ট্র-য়ের নীচের অংশ প্রায়ই ভাঙিয়া যায়, পাশে আর একটি ট থাকিলে ভাঙিয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই। ণ্ড আর ন্ত—কালি একটু জুব্‌ড়াইয়া গেলে প্রুফে ধরা বড় শক্ত। দ্ধ, দ্ধ দ্ধ—এই তিনটিকে লইয়া কম্পোজিটারেরা এবং প্রুফরিডারেরা বড়ই জ্বালাতন হয়; দ্‌ধ-য়ের স্বাভাবিক যুক্ত রূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ক্র সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। হ্‌ন-য়ের রূপ প্রচলিত হ্ন না হইয়া 'হ্ন' বা ঐ রকম কিছু হইলে লেখক, পাঠক, কম্পোজিটার, প্রুফরিডার—সকলেরই মহোপকার সাধিত হইবে। হ্ণ আর হ্ন—এই দুইটি টাইপের মধ্যে কোন্‌টি হ্‌ণ আর কোন্‌টি হ্‌ন তাহা বড় বড় পণ্ডিতেও অবগত নহেন,—তাঁহাদের হাতের লেখা কপি ও চিঠি দেখিয়া জানিয়াছি; তাই ছেলেবুড়, গুরুশিষ্য সকলেই 'মধ্যাহ্ন' ও 'অপরাহ্ণ' শব্দের বাণান ভুল করেন।

ঙ্ক-সম্বন্ধে একটি নিবেদন আছে। ঙ্ক দিয়া একটি মাত্র 'বাঙ্কা' শব্দ বাঙালায় প্রচলিত আছে। কিন্তু এই শব্দের বাঙালা উচ্চারণ লক্ষ্য করিয়াছেন কি?—'বাঙ্‌ক্কা'। আমরা

আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই এইরূপ উচ্চারণ করি। বঙ্গরঙ্গমঞ্চের অন্যতম প্রধান অভিনেতা শ্রীযুক্ত নির্মলেন্দু লাহিড়ীর মুখে অভিনয়-কালে ঐ অশুদ্ধ উচ্চারণ শুনিয়া অতি বিনয়ের সহিত ঐ বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিতে নারাজ। তাঁহার যুক্তি—অনেক দিন হইতে ঐ বিকৃত উচ্চারণ চলিয়া আসিতেছে, এখন শুদ্ধ ক.রয়া 'যাচ্ঞা' উচ্চারণ করিলে শ্রোতার শ্রুতিকটু হইবে। সেই প্রসঙ্গে 'হিংস্র' শব্দের বিকৃত উচ্চারণের কথাও তাঁহার নিকট নিবেদন করিয়াছিলাম; বলিয়াছিলাম,—"অন্ততঃ আপনারা নামজাদা শ্রেষ্ঠ অভিনেতারা দয়া করিয়া আর 'হিংঅস্র' উচ্চারণ করিবেন না।" কিন্তু এ ক্ষেত্রেও তিনি ঐ যাচিঞ্জার পাঁতিই বজায় রাখিলেন!

সুতরাং এই ৪৬টি টাইপের রূপ বদল করিলে কোন ক্ষতি ত নাই, অধিকন্তু ছেলেমেয়েদের বাণান শিক্ষার সম্বন্ধে মহালাভ। এই নূতন নূতন রূপের সঙ্গে সম্যক্ পরিচিত হইতে তাহাদের তথা তাহাদের শিক্ষক ও অভিভাবকদের যে কী প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতে হয়, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যে কত অযথা নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়, তাহা আমরা সকলেই বিশেষরূপে জানি, কিন্তু জানিয়া-শুনিয়া এইরূপ চুপচাপ বসিয়া থাকা কি এখনও শোভা পায়?

গুজরাটী ভাষার এবং হিন্দী ভাষার টাইপ, কেস ও বাণানের আমূল সংস্কার সাধিত হইয়াছে। পণ্ডিত তারাপুরওয়ালার কল্যাণে গুজরাটী ভাষার মনোটাইপ মেশিন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ভি. এস্. আপ্তের সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধানে পর্য্যন্ত—আর সেখানি একখানি উৎকৃষ্ট প্রামাণিক গ্রন্থ—ঙ ঞ ণ ন এবং ম—এই পাঁচটি অনুনাসিক বর্ণের স্থানে অনুস্বার (ং) চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে,—অহঙ্কার, অঞ্চল, অণ্ড, অন্ত, অম্বর প্রভৃতি শব্দ যথাক্রমে অহংকার, অংচল, অংড, অংত, অংবর মুদ্রিত হইয়াছে, অর্থাৎ যুক্তাক্ষরের আদ্য ব্যঞ্জন যে-যে স্থলে ঙ ঞ ণ ন ম আছে, সেই-সেই স্থলেই বিনা-ব্যতিক্রমে ঐ পাঁচটি অনুনাসিক বর্ণের পরিবর্ত্তে অনুস্বার ব্যবহৃত হইয়াছে। অনুস্বারের এই চৌচাপট প্রচলনে সংস্কৃত ব্যাকরণের মস্তকে কতটা অযথা আঘাত করা হইয়াছে তাহা বিশেষজ্ঞের বিচার্য্য। আমি শুধু এইটুকু নিবেদন করিতে চাই যে, যুক্তাক্ষরের পরিবর্ত্তে অনুস্বারের এই বহুল প্রয়োগে মুদ্রণকার্য্যের আশাতীত সুবিধা হইয়াছে,—টাইপের সংখ্যা অনেক হ্রাস হইয়াছে, বাণানের বিভীষিকা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে,—কাগজ, কালি, সময় ঢের কম লাগিতেছে।

শুধু আমরা বাঙ্গালীরাই কি নিশ্চেষ্ট হইয়া নিষ্ক্রিয়ভাবে বসিয়া থাকিব? বাঙ্গালা টাইপ ও কেস সংশোধন করিবার কি এখনও সময় আসে নাই? সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি, তবে কবে আসিবে?—না, আমাদের গ্রহবৈগুণ্যে কখনই আসিবে না?

মানসী

শ্রীশান্তা দেবী

বাপ-মায়ের একটিমাত্র মেয়ে মানসী। মেয়ের কথায় তাঁহারা উঠেন বসেন, এতই তাহার আদর! আটটি সন্তানের ভিতর ওই একটিমাত্র শিব-রাত্রির সলিতা তাঁহাদের অন্ধকার বুক আলো করিয়া আছে। উহার মুখ চাহিয়া জীবনের সকল দুঃখ, হতাশা, বেদনা তাঁহারা ভুলিয়া আছেন। কিন্তু ইহাকেও একদিন স্বহস্তে পরের ঘরে তুলিয়া দিতে হইবে, তাই তিন জনের পছন্দ মিলাইয়া বর বাছাই হইত, তবু তাহার ভিতর মেয়ের কথাই সকলের অপেক্ষা বড়।

সম্বন্ধ ত হাজার জায়গা হইতে আসিতেছে। নাই-বা আসিবে কেন? মানসীর কোন্ গুণটা নাই? কন্যার সবার বড় গুণ যে রূপ, সে-রূপে বিধাতা ত বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই। মেয়ে যেন পটে-আঁকা ছবি, গায়ের রঙে যেন আকাশের বিদ্যুৎ বাঁধা পড়িয়াছে, যে-পথে চলে বর্ণের আভায় পথ আলো হইয়া যায়। লক্ষ্মী-প্রতিমার মত নিখুঁৎ পেলব মধুর মূর্ত্তি, দেখিতে আসিয়া মানুষ কোন্ অঙ্গ হইতে কোন্ অঙ্গে চোখ ফিরাইবে ভাবিয়া পায় না। তাহার মাথার বর্ষার মেঘের মত ঘন চুল হইতে আরক্তিম পদপল্লবের মুক্তাস্বচ্ছ নখগুলি পর্য্যন্ত সবই যেন কোন্ মহাশিল্পী আপনার রূপস্বপ্ন সার্থক করিতে মনের সকল মাধুর্য্য ঢালিয়া গড়িয়াছেন।

সে রূপজ্যোতি আরও উজ্জ্বল করিয়াছিল পিতার অর্থ ও কুলগৌরব। ধনী ও কুলীন কায়স্থের একমাত্র কন্যা। এমন অনিন্দ্য সম্পদ আগ্রহ করিয়া ঘরে তুলিতে কে না চায়?

জমিদারের ঘরের প্রথম পুত্র নধর গঠন বর মনোহর হীরার বোতাম হীরার আংটি পরিয়া আসিল কন্যা দেখিতে। পিতাপুত্রে মিলিয়া কন্যা পছন্দ করিয়া গেলেন তাঁহারা, কিন্তু হইলে কি হয়? কন্যা ঘরের বাহিরে আসিয়াই মাকে বলিল, "মা, অমন বোকা বোকা পয়সাওয়ালা মাড়োয়ারীর সঙ্গে আমার বিয়ে দিও না। আমি কিছুতেই করব না। এই জন্তে কি আমায় এত লেখাপড়া শিখিয়েছিলে?"

মা কি আর করেন? সম্বন্ধ ভাঙিয়াই দিতে হইল। যদিও তাঁহার মনে এমন জামাই হাতছাড়া হওয়ার একটা অসন্তোষ স্থায়ী হইয়া রহিয়া গেল। জ্যোতির্ম্ময় মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পুত্র। কিন্তু বিলাত গিয়া অনেক বিদ্যাবুদ্ধির ছাপ নামের পিছনে জুড়িয়া আসিয়াছে। দেখিতে শুনিতে ভাল, কথাবার্ত্তায়ও বেশ ঘসামাজা সান দেওয়া একটা প্রখর দীপ্তি আছে। অপছন্দ করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। কিন্তু বর হঠাৎ বলিয়া বসিল বিবাহের সময় তাহার চৌদ্দ হাজার টাকার প্রয়োজন আছে। না হইলে তাহার ঋণ শোধ হয় না। কর্ত্তা একটু বিরক্ত হইয়া গৃহিণীকে বলিলেন, "বিলেত-ফেরতের হিসেব আবার আমাদের পাড়াগেঁয়েদের চেয়েও বেশী। তারা বাপের এক মেয়ে দেখে ধরেই নেয় টাকাটা মেয়েই সব পাবে, এরা আবার ভাবে—কি জানি কার মনে কি আছে, এক সঙ্গেই মেয়ে আর টাকা দুই-ই হাত করা ভাল!"

গৃহিণী বলিলেন, "তাই ব'লে ছেলেমানুষের অত হুঁসিয়ার হওয়া আবার ভাল নয়। একটু লজ্জাতেও বাধল না।"

মানসীর কানেও কথাটা গেল। সে বাঁকিয়া বসিল। "শেষে জামাই কি টাকা দিয়ে কিনে আনবে? অমন যদি কর তবে আমি আর জলস্পর্শও করব না। তোমরা তোমাদের জামাই নিয়েই থেকো।"

ইহাকেও ছাড়িয়া দিতে হইল। কেহ লোভী, কেহ নির্ব্বুদ্ধি, কেহ কুৎসিত, কেহ হিসাবী, কেহ অভদ্র, কেহ দোজবরে, কেহ ছোটলোক, এমনি করিয়া কত জন ফিরিয়া গেল। মানসীর মনোহরণ করিতে কেহ পারিল

না। সে তাহার প্রেমলোকের তপস্যায় নিজ ধ্যানলব্ধ যে-শিবের পূজা আপনার তরুণ মনের অসীম প্রীতি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্যভার দিয়া এতদিন করিয়া আসিয়াছে, তাহার অনবদ্য দিব্য কান্তির সহিত এই-সব মানুষগুলির কি কোনই মিল থাকিতে নাই? ইহারা যেন কেবলই পৃথিবীর ধূলি দিয়া গড়া। ইহাদের চক্ষে সে অপূর্ব্ব স্বপ্ন, হাস্যে সে প্রসন্নতা, বাক্যে সে শালীনতা, দেহে সে বীর্য্য কোথাও ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু মানসীর নবীন মনের অমর আশা তবু তাহারই প্রতীক্ষায় চাহিয়া রহিল।

মায়ে মেয়েতে বেশ ভাব। মায়ের সঙ্গে বিবাহের বিষয় আলোচনা করিতে মানসীর বাধিত না। বর আসিত মানসীকে দেখিতে, কিন্তু বরকে আগাগোড়া দেখিয়া লইত মানসীই বেশী। এই সামান্য চোখের দেখা ও অতি-সামান্য কানের শোনাতেই মানসীর মনের তাপমান যন্ত্রে ভালমন্দ লাগা এবং তাহার নানা কারণ বেশ স্পষ্ট চিহ্ন আঁকিয়া যাইত। মা বলিতেন, "ধন্যি মেয়ে বাপু তুই! মা-বাপে পাত্র দেখে, মেয়ে দেখে, বড়-জোর বর একটু মেয়ে দেখে যায়। তুই ধিঙ্গি হয়ে সবার আগে বর, বরের চৌদ্দ পুরুষ, সব তদারক করতে যাবি, এ রকম করলে তোর বিয়েই হবে না মোটে!"

মানসী বলিত, "না হয় নাই হবে। তাই ব'লে ঠক বোকা হাবা বোবা যা ধরে দেবে তাই-ই করব নাকি? আহা, কি-না সব ছিরি? কেউ পরীক্ষা করতে বসেন যেন পাঠশালার গুরুমশায়, কেবল হাতে একটা ছড়ি থাকলেই হয়। কেউ যেন ঠিক পাটের দালাল, দর হাঁকছেন বারো, সাড়ে এগারো, সওয়া দশ! কেউ-বা এমন হাঁ-করা-গঙ্গারাম যে দেখলেই হাসি পায়।"

মা তাড়া দিয়া চুপ করাইয়া দিতেন, "থাম্, আইবুড়ো মেয়ের অত কটকটানি আবার ভাল নয়। যেখানেই যাও অত কথাও কেউ সইবে না, অত সাগর ছেঁচা মাণিকও কোথাও পাওয়া যাবে না।"

সাগর-ছেঁচা না হউক পরিমলকে দেখিয়া সকলেই বলিল, "এ ছেলে হীরের টুকরো।" পরিমলও নানা দিক্ দিয়া ঘুরাইয়া হীরার সহস্র রশ্মির মত মানসীর অসংখ্য যোগ্যতা যেমন দেখিয়া তৃপ্ত হইয়াছিল, মানসীও যেন তেমনি মুগ্ধ হইয়া গেল।

পরিমলের বয়স নিতান্ত কাঁচা নয়; যৌবন যায় নাই বটে, কিন্তু প্রথম যৌবনের উচ্ছলতার পরেই যেন কিসের একটা স্থৈর্য্য তাহার সমস্ত চঞ্চলতাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। তাহার কথাবার্ত্তা মার্জ্জিত, সংযত অথচ সে সদালাপী। তাহার কৌতূহল, লোভ, উচ্ছ্বাস কি গর্ব্ব কোনটারই বাড়াবাড়ি নাই। মেয়ে দেখিতে আসিয়া সে কিংবা তাহার আত্মীয়টি কেহ অনাবশ্যক বিদ্যা পরীক্ষার ছলে মেয়ের নাড়ীনক্ষত্র জানিতে চেষ্টা করিল না, টাকাকড়ি দেনা-পাওনার কোনো কথাই সে তুলিতে দিল না, কন্যাপক্ষের কোনো প্রশংসায় কিংবা নিজ কীর্ত্তিকলাপের বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল না। মানসীর পিতা উপস্থিত হইতেই সে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিজের প্রবাসের এবং দেশের আধুনিক অবস্থার কথা ফাঁদিয়া বসিল, এবং মানসী আসিবার পরও সেই কথাই চালাইতে লাগিল। সে যেন আজ সান্ধ্যসভার নিমন্ত্রণে আলাপ করিতে আসিয়াছে।

মানসীর শিশুকাল হইতেই পরিমল তাহার কথা শুনিয়া আসিতেছে। মেয়েরা মেয়েদের নিন্দা করিতে পাইলে বাড়াভাত ছাড়িয়া উঠিয়া পড়ে এই ছিল পরিমলের চিরকালের বিশ্বাস। তবু তাহার আত্মীয় মেয়েমহলে সম্প্রতি এই অনুপমা মানসীর প্রশংসা শুনিয়া শুনিয়াই তাহার বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছে। বিশেষ গত এক বৎসর ধরিয়া মাসী পিসি, বোন ভাজদের মুখে ও চিঠিতে এই কথা ছাড়া অন্য কথা সে প্রায় শোনেই নাই।

মানসী কলিকাতায় পড়িয়া পাস করিয়াছে, পাক-প্রণালী দেখিয়া সুখাদ্য প্রস্তুত করে, পিত্রালয়ের সকলে বিবাহে তাহাকে রাশি রাশি যৌতুক দিবে, ছোটবড় এই সব কোন কথাই পরিমলের অজানা ছিল না। কন্যা দেখিতে আসিবার পূর্ব্বেই যাহা যাচাই করিয়া লইবার তাহা সে লইয়াছে। এখন মানসীকে দেখিয়া ভদ্র রকম একটি নমস্কার করা ছাড়া এমন আর কিছুই সে করে নাই, যাহাতে সে কন্যা দেখিতে আসিয়াছে বুঝা যায়।

বরের অবস্থা সচ্ছল, স্বাস্থ্য সুন্দর, রুচি মার্জ্জিত, বিদ্যা-

বুঝি বিনয় কিছুরই খুঁৎ চোখে পড়ে না দেখিয়া সকলেরই পছন্দ হইল।

মা বলিলেন, "মানসী, তুই কি বলিস্ রে?"

মানসী সলজ্জ হাসিয়া বলিল, "তোমরা কি চাও না-চাও তার আমি কি জানি? আমি কি বাড়ির গিন্নী?" মা খুশী হইয়া গেলেন।

পরিমলেরই গলায় বরমাল্য পড়িল। বিবাহের দিনে মানসীর অনুপম সৌন্দর্য্য বসনে-ভূষণে গর্ব্বে আনন্দে ও তৃপ্তিতে যেন ঝলকিয়া উঠিল।

* * *

বাহিরের উৎসবের উজ্জ্বল আলোক নিবিয়া গিয়াছে। আনন্দ ও উত্তেজনার মত্ততায় যাহারা মাতিয়া উঠিয়াছিল, তাহারা এখন যবনিকার অন্তরালে। এখন স্তিমিত দীপালোকে নিভৃত গৃহকোণে কেবল দুইটি মাত্র মানুষ। মানসীর রত্ন আভরণ আগুনরাঙা বেশবাস সে খুলিয়া রাখিয়াছে। তাহার পরণে পীতাভ একখানি সরু জরি-পাড় শাড়ী, হাতে দুই গাছি চুড়ি আর আধখোলা চুলে এক ছড়া বেলফুলের মালা জড়ানো। পরিমল শান্ত হাসি হাসিয়া তাহার পুষ্পকলির মত হাত দুইখানি একসঙ্গে ধরিয়া বলিল, "বোসো, এইখানে।"

মানসী বলিল, "তুমি একটুখানি দাঁড়াও দেখি আগে।"

পরিমল বিস্মিত হইয়া মানসীর প্রেম-গভীর চোখের দিকে চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মানসী জানু পাতিয়া বসিয়া পরিমলের দুই পায়ের উপর মাথা রাখিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। মুক্ত কেশভার ও শুভ্র ফুলের মালা আলপনার পদ্মের উপর লুটাইয়া পড়িল। পরিমল তাহাকে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "এ কি, আমাকে নিয়ে এমন ক'রে লজ্জা দিচ্ছ কেন? আমি একটা সামান্য মানুষ।"

মানসী বলিল, "আমি যে এমনি করেই আমার জীবন সুরু করব কত দিন ধরে ভেবে রেখেছি। তোমাকে আমার নিজের থেকে অনেক বেশী বড়, ধ্রুবতারার মত উজ্জ্বল সুন্দর মনে করতে ইচ্ছা করে।"

মানসীর কথায় কোনো সঙ্কোচের জড়তা নাই। পরিমল বলিল, "মানুষকে অত বড় ভাবতে নেই মানসী। তুমি ছেলেমানুষ, তাই এ কথা বলতে পারছ, বড় হ'লে বুঝবে মানুষের পক্ষে মানুষ হওয়াই কত শক্ত।"

মানসী তাহার হাতের উপর আপনার কপালটা চাপিয়া মুখ নীচু করিয়া বলিল, "আমার জন্যে তোমাকে বড় হতেই হবে যে। পারবে না তুমি?"

পরিমল দেখিল মানসী ঠিক আধুনিক নববধূর মত নয়। স্বামীর দেওয়া অলঙ্কার আর আদর লইয়াই সে খুশী হইতে পারিবে না। সে তাহার কৌমার্য্যের স্বপ্ন দিয়া যে কিশোর শিবমূর্ত্তি মনে মনে গড়িয়াছে স্বামী বলিয়া তাহাকেই সে চায়। পরিমলের বুক ঠেলিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস উঠিল। এত বড় হওয়া কি তাহার সাধ্য আছে? আজিকার স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসের আদর্শের দিনে একথা ভাবিবার অবসরই ত মানুষের হয় না।

মানসী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার যেন কিসের একটা মস্ত দুঃখ! তোমার মন কি খুশী হয় নি?"

মানসীর শিশুর মত সরল মুগ্ধ দৃষ্টির দিকে চাহিয়া তাহার পদ্মকান্তি মুখখানি দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া আদর করিয়া পরিমল বলিল, "তোমার এমন মুখের আলোতেও যদি মন না আলো হয় তবে আমার অন্ধ হওয়াই ভাল।"

মানসী দুই হাতে তাহার মুখ চাপা দিয়া বলিল, "আজকের দিনে ওসব ছাই কথা তুমি মুখে আনবে না বলছি। আজ এমন কথা বল যা চিরকাল ধরে প্রতিদিন নূতন ক'রে ভাবতে মন মুগ্ধ হবে, যে কথা সুরে ছন্দে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত কবিতার মত সুন্দর হয়ে উঠবে।"

হাসিয়া পরিমল মানসীকে কাছে টানিয়া বলিল, "মানসী, আমি ত তোমার মত কবিতারূপিণী অর্দ্ধেক কল্পনা আর অর্দ্ধেক মানবী নই, আমি নিতান্ত গদ্যময় পুরুষ। তুমি আমার জীবনে কবিতা এনে দাও, সে কাজ তোমাকেই সাজে।"

পরিমল ভাবিল নানা গুণের মধ্যে মানসীর এই একটা দোষের কথা সে ত শুনিয়াই ছিল—এই অতিরিক্ত ভাব-প্রবণতা। আজ এ সব কথা ভাবিবার দিন নয়, তবু

পরিমলের মনে পড়িল, দিদি বলিয়াছিলেন, "মেয়ে সংসারের কাজকর্ম্ম সবই শিখেছে বটে, কিন্তু সংসারের মতিগতি বোঝে না। পৃথিবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয়ই নেই, কাব্য পড়ে কল্পনায় সংসার গড়েছে। চমৎকার মেয়ে, কিন্তু ওকে নিয়ে সাবধানে চলতে হবে।" কিন্তু এ কথাতে ত পরিমল ভয় পায় নাই, বরং আকৃষ্টই হইয়াছিল। সংসারে অভিজ্ঞ মানুষ দেখিয়া দেখিয়া চোখে ত জ্বালা ধরিয়া গিয়াছে। শকুন্তলার মত শরীরিণী কবিতার দর্শন পাওয়াই বরং দুর্ঘট। জীবনে তাহাকে সঙ্গীরূপে পাওয়া ত পরম ভাগ্য। কাব্যলোকের স্বপ্ন এক দিন ত সকলেরই টুটিয়া যায়, কিন্তু ক্ষণিকের স্বপ্নবিহার জীবনের যে কয়েকটি মুহূর্ত্তকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে তাহার লোভ কি সামান্য? কত কাব্যরূপিণী সংসারের পোড় খাইয়া জমাখরচের খাতার মত নীরস গদ্য হইয়া গিয়াছে, তাহা এ জীবনে পরিমল কি দেখে নাই? এক দিন তাহারাও পৃথিবীতে ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর বীণাঝঙ্কার ছাড়া আর কিছু শুনিত না, এবং ছয় ঋতুর বর্ণসম্ভার ছাড়া মর্ত্ত্যলোকে আর কিছু দেখিতে পাইত না। কিন্তু তবু আজ সেই সব মেয়েদেরই সংসারধর্ম্মে পান হইতে চুন খসে না, জীবনের বসন্তপর্য্যায় সমাপনের পর তাহাদের কোনো আচরণে কাব্যগন্ধ ধরা পড়িতে আর দেখা যায় না! সুতরাং ভয় কিসের? মানসীও এক দিন সংসারসর্ব্বস্ব সুগৃহিণী হইয়া উঠিবে। আজ তাহার কাব্যলোকের সৌরভই না হয় জীবনটাকে সমৃদ্ধ করুক।

মানসী বলিল, "এত সমারোহের মধ্যে এমন ক'রে না পেয়ে যদি অজানা-অচেনা পথের ধারে হঠাৎ ভিখারীর মত নিঃস্ব আমাকে কুড়িয়ে পেতে, তাহলে কি আমাকেই তোমার চিরকালের সাথী বলে চিনতে পারতে?"

পরিমল উত্তর দিতে গিয়া চমকিয়া উঠিল। সে ত অর্থ সম্পদ রূপ গুণের সমারোহ দেখিয়াই আসিয়াছিল, যে ছাড়া জগতে তাহার আর দ্বিতীয় দোসর নাই তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইবার কল্পনা ত করে নাই। সাধারণ মানুষ যেমন সকল দিক্ দেখিয়া আসে সেও তেমনি আসিয়াছিল, প্রেমতীর্থে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিবার কথা ত তখন মনে পড়ে নাই। বাহিরের সকলই দেখা হইয়াছিল, কিন্তু এই যে মানুষটি তাহার দেহ-মন-প্রাণ উৎসর্গ করিয়া দিতেছে, সব-কিছু বাদ দিয়া একান্তই ইহার কথা ত ভাবিয়া দেখা হয় নাই। মানসীর চোখের ভিতর চাহিয়া পরিমল বলিল, "আজ ত তোমাকে নিশ্চিত চিনেছি, আর কবে কোন্ দিন চিনতে পারতাম কি-না সে-কথা ভেবে কি লাভ বল?"

মানসী বলিল, "লাভ আছে বইকি? পৃথিবীতে যেখানে যেমন করেই লুকিয়ে থাকি না, এত মানুষের এত রূপ গুণের ভীড়ের মাঝখান থেকে তুমি এসে আমাকে বেছে হাত ধরে নিয়ে দাঁড়াবে মনে করে যে আনন্দ হয় তার চেয়ে বড় কি আছে?"

পরিমল বলিল, "তোমার মত প্রেমের দিব্যদৃষ্টি কি সকলের থাকে, মানসী? হয়ত আমি কত ভুল করে করে তবে তোমায় খুঁজে পেতাম কে বলতে পারে?"

মানসী ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "কি অদ্ভুত মানুষ তুমি! ভুল করার কথাটাই আগে মনে হ'ল!"

* * * *

পরিমলের ছবির মত সুন্দর ছোট বাড়িখানি শহর হইতে একটু আড়ালে, ভাগীরথীর কূলে। তিনতলার ছাদের উপর নদীর দিকে মুখ করিয়া একখানি মাত্র ঘর। সমস্ত দিন ঝিরঝিরে জলো হাওয়া ঘরের ভিতর দিয়া বহিয়া যাইতেছে; যে আসিয়া দাঁড়ায় তাহারই গায়ে যেন স্নিগ্ধ চন্দন-পরশ বুলাইয়া দেয়। ঘরের ছোট দুই জোড়া দরজা রূপমুগ্ধ কবির দুটি চোখের মত অপলকে অষ্টপ্রহর নদীর দিকে চাহিয়া আছে। খড়ে বোঝাই নৌকার সারির পর কাঠের নৌকা, ধানের নৌকা চলিয়াছে পাল তুলিয়া অতি ধীরমন্থর গতিতে, যেন জলে এমনি অলস ভাসিয়া চলা ছাড়া তাহাদের এ যাত্রার আর কোনো উদ্দেশ্য নাই। মাঝে মাঝে মাছের নৌকা একটু ক্ষিপ্রগতিতে আসিয়া তীরের দিক ঘেঁসিয়া দাঁড়াইতেছে। মাঝিরা মাথার উপর শূন্যে প্রকাণ্ড জাল চক্রের মত ঘুরাইয়া জলে ছাড়িয়া দিতেছে, আবার ধীরে ধীরে টানিয়া রূপালি মাছের চঞ্চল বোঝা সমেত নৌকায় তুলিয়া লইতেছে। কলের চাকায় জল ছড়াইয়া আর আকাশে-বাতাসে ধোঁয়ার পিচকারী দিয়া স্টীমার এদিকে বড় আসে না।

নদীর ধারের নিরালা এই বাড়িখানিতে পরিমল মানসীকে লইয়া আসিয়া তুলিল। মানসী দেখিয়া খুশী হইয়া উঠিল যে বৌ তুলিতে বাড়িতে লোকের সমারোহ মোটেই হয় নাই। বিবাহের মর্য্যাদা রাখিতে দরজার দুইধারে দুইটি মঙ্গল কলস ও সিঁড়িতে শুভ্র আলপনার বৌছত্র। দরজার ভিতর পরিমলের ছোটবোন সুধা একেবারে একলা একখানা রূপার থালায় দুধ ও আলতা গুলিয়া লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, বৌকে দুধে আলতায় দাঁড় করাইয়া ঘরে তুলিবে। তাহার সঙ্গে পাড়ার পাঁচজন এমন কি দুই চারিটা পুরাণো দাসীও নাই। দূরে একটা ঝি সুধার তিন বছরের মেয়েকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে; সে মানুষটা একেবারেই আনকোরা বলিয়া চাঞ্চল্যে ও কোলাহলে বিবাহ-বাড়ি মাতাইবার কোনো চেষ্টা করিতেই সঙ্কোচ বোধ করিতেছে। তাহাদের বাড়ির সহস্র কণ্ঠের একতান সঙ্গীতের পর এই নীরব অভ্যর্থনা মানসীর মনে বিস্ময় জাগাইল বটে, কিন্তু প্রাণটা যেন তাহার জুড়াইয়া গেল। ঠিক এমনি নিভৃত নির্জ্জন একটি কোণ সে মনে-প্রাণে চাহিতেছিল, আপনাদের হৃদয়ের উৎসবের সমারোহে শুধু দুইজনে তাহা পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবে বলিয়া।

বৌকে ঘরে তুলিয়া সুধাই তাহাকে লোহা পরাইয়া মিষ্টিমুখ করাইয়া গলায় এক ছড়া মুক্তার মালা পরাইয়া দিল।

পরিমল বলিল, "যা সুধা, তোর বৌদিকে উপরের ঘরে নিয়ে গিয়ে মুখহাত ধুয়ে একটু বিশ্রাম করতে দে গিয়ে; আমি একটু এদিকে কাজকর্ম্ম কয়েকটা দেখে যাই।"

মানসী পরিমলের সুব্যবস্থায় ক্রমেই বিস্মিত হইতে-ছিল। বাড়িতে কোলাহল করিবার মানুষের অভাব আছে বটে, কিন্তু কাজের মানুষের নিশ্চয় অভাব নাই। গোপনে নীরবে বহু যত্নে কাজ করিয়া তাহারা চোখের আড়ালে সরিয়া গিয়াছে, উপরের ঘরে পা দিয়াই মানসী বুঝিতে পারিল। সুন্দর বেগুনফুলী-রং করা ঘরে বেগুনী রঙের রেশমের পর্দা দেওয়া দরজা জানালা; মেঝেতে নীলকণ্ঠি বেগুনী, ঘন আলতা ও সোনালী রঙের বিচিত্র মিশ্রণে বোনা দুটি ছোট কার্পেট; একদিকে পা দিয়া কালো আবলুষ কাঠের জোড়া পালঙ্কে উঠিতে হয়, আর একটির উপর ছোট দুটি গদি-আঁটা চেয়ার ও ছোট একটি তেপায়া টেবিল। কালো আলমারীর গায়ে এক-মানুষ উচু একটা আরসি আঁটা, তাহারই ভিতর দিয়া মানসী দেখিল পিছনে আর একখানি দাঁড়ানো আয়নার ভিতর মানসীরই অবগুণ্ঠিত কবরীর স্বর্ণপত্র হইতে গোড়ালির আলতা ও ঘুঙুর পর্য্যন্ত ছবিটি ধরা পড়িয়াছে।

মানসী হাসিয়া ফেলিল। সুধা বলিল, "বৌদি, দেখছ কি? দাদা সকল দিকে পাহারা খাড়া করেছে। কোনো দিকটি লুকোতে পাবে না।"

মানসী নূতন বৌ, ঠোঁটের আগায় জবাব আসিলেও কিছু বলিল না।

পাশেই পোষাক-পরার ঘরে একটা আলনায় ধুতি চাদর পাঞ্জাবী, আর একটিতে তিন চার রঙের তিন চার খানা নূতন শাড়ী, মার্ব্বেল পাথরের তাকে প্রসাধনের কোনো মালমশলার অভাব নাই, দেয়ালের পিতলের খুঁটিতে ছোটবড় নানা মাপ ও ধরণের কাচা তোয়ালে।

মানসী এবার না বলিয়া পারিল না, "এত আয়োজন করে রাখবার কি দরকার যে ছিল!"

সুধা বলিল, "তুমি আমাদের কত আদরের জিনিষ তা এ সামান্য আয়োজনে যে ভাই কিছুই বোঝানো যায় না।"

জনবিরল গৃহে কতক্ষণ আর পরস্পরকে দূরে রাখিয়া চলা যায়। কখন যে মানসীর বিশ্রামের সব ব্যবস্থা করিয়া অলক্ষ্যে সুধা সরিয়া গিয়াছে আর পরিমল আসিয়া তাহাকে পিছন হইতে গ্রীবায় একটি চুম্বন দিয়া সচকিত করিয়া তুলিয়াছে মানসী জানিতেই পারে নাই। লজ্জিত মুখে চোখ দুটি উপরে তুলিয়া চাহিতেই পরিমল বলিল, "চুপটি ক'রে একলা কিসের ধ্যান করছ, মানসী?"

মানসী উঠিয়া দাঁড়াইয়া পরিমলের দুই কাঁধে দুটি হাত রাখিয়া রাঙা ঠোঁট উল্টাইয়া অভিমানের সুরে বলিল, "ধ্যান করা ছাড়া আর কি কাজ আছে আমার?"

পরিমল অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "বড় একা পড়েছ, না? সুধা ছাড়া কেউ নেই, তা সেও সারাদিন সংসার আর মেয়ে

নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। তাই ত সব কাজ ফেলে দিনে দুপুরে ছুটে উপরে এলাম। আর এখানে কাকেই বা লজ্জা করব বল ?"

মানসী এবার হাসিয়া বলিল, "সেইজন্যে বুঝি বলছি আমি ? তুমি পুরুষমানুষ, এমন করে যদি ঘরকন্না গুছিয়ে রাখ ত আমি কি করব বল দেখি ?"

পরিমল বলিল, "এই দু-ঘণ্টায় তুমি কি আমার সব ঘরকন্না দেখে ফেলেছ ? ভবিষ্যতের সবটাই ত তোমার হাতে, তখন যত পার গুছিও।"

মানসী বলিল, "না বাপু, তোমার ধরণ দেখে আমার সে-রকম আশা একটুও হচ্ছে না। তোমার মত স্বামী নিয়ে কাজের লোকের চলে না। পুরুষমানুষ হবে কচি ছেলের সামিল। লম্বায় চওড়ায় খালি বেড়ে যায়, নইলে সংসারবুদ্ধি আবার তাদের কবে থাকে ?"

পরিমল বলিল, "তাই নাকি ? বিয়ে না করতেই স্বামী সম্বন্ধে এত অভিজ্ঞতা হ'ল কোথা থেকে ?"

মানসী বলিল, "আহা পাঁচজনকে দেখে আর কিছু বোঝা যায় না, না ? আমাকে তুমি কচি খুকি পেয়েছ কি না ! আমাদের কুসুমদিদির স্বামীটি বেশ। ঘরে ঢোকে যেন ঝড় ! বই ছাতা জামা চাদর জুতো ঘরে ঢুকতে-না-ঢুকতে সদর দরজা থেকে শোবার ঘর পর্য্যন্ত ছড়াতে ছড়াতে চলে। আর কুসুমদি আবার উল্টো পথে শোবার ঘর থেকে সদরদরজা পর্য্যন্ত সেগুলি কুড়িয়ে কুড়িয়ে আনে।"

পরিমল বলিল, "এ আর শক্ত কথা কি ? তুমি যদি চাও ত আমি ঘরে যত লাঠিসোঁটা আছে সব সারা বাড়িময় ছড়িয়ে দেব, যত পার কুড়িও।"

মানসী বলিল, "কি যন্ত্রণা ! গল্পটা শেষ করতে দাও আগে। কুসুমদির স্বামী ছিল পণপ্রথানিবারণী সভার সভ্য, তাই বিয়ের সময় খাট-বিছানা পর্য্যন্ত নিলে না। তারপর বৌ নিয়ে গিয়ে বাসাবাড়িতে উঠল। বাড়িতে আসবাবের মধ্যে একটা পা-ভাঙা তক্তপোষ, একটা এক-মানুষ উঁচু টুল, খান-তিনেক বিছানার চাদর আর দুটো তোয়ালে। বিছানার খোঁজ করতে চাকরটা বললে, 'বিয়েতে ত সবাই নতুন বিছানা পায়, তাইতে হরি কাকাবাবু পুরানোটা কাল নিয়ে চলে গেল, চাদর ক'টা ধোপার বাড়ি ছিল তাই বেঁচে গেছে। মেসের বাড়ি বদল করে আনবার সময় এ বাড়ির দরজা মাপা হয় নি, তাই তক্তপোষটা দরজায় ঢোকে না বলে মুটেরা একটা পা ভেঙে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে।' কুসুমদি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে তার স্বামী বললে, 'তাই ত কুসুম, আজ রাত্রে কি করে ঘুমোন যাবে বল দেখি।' সেই দিনই গাছকোমর বেঁধে তক্তা মেরামত করা কুসুমদির কপালে ছিল এবং তারপর থেকে আজ পর্য্যন্ত তার সুন্দর সাজানো সংসারে যেখানে যা-কিছু দেখবে সবই সে নিজে হাতে মেপেজুখে হিসেব করে করিয়েছে, সাজিয়েছে। স্বামীর ওর দুটি কাজ, এক টাকা এনে দেওয়া আর এক কুসুমদির কাছে জগতের সব অসম্ভব জিনিষের আব্দার করা। কিন্তু ওদের মত সুখী স্বামি-স্ত্রী দেখা যায় না।"

পরিমল বলিল, "তবে কুসুমদির স্বামীর গলাতেই মালা দিলে না কেন ? এ অভাগার ত কোন যোগ্যতাই নেই।"

মানসী বলিল, "দেখ, ওই পচা রসিকতাগুলো কোরো না, আমার একটুও ভাল লাগে না।"

পরিমল তাহাকে টানিয়া জানালার ধারে আনিয়া বসাইয়া বলিল, "আচ্ছা, তোমার কি ভাল লাগে তাই বল না শুনি। আমি না-হয় কিছুই বলব না।"

মানসী বলিল, "বাবা ত আমার জন্যে সব জিনিষ-পত্রই করিয়েছেন, এসে পড়তে একটু যা দেরি। যদি কিছু বাকি থাকত আমি সেগুলি সব করে গুছিয়ে-গাছিয়ে সংসার সাজাতাম, তবে না গিন্নী হওয়ার সুখ। তুমি কেন আগে থাকতে বিশ্বের ব্যবস্থা করে রেখে আমায় পুতুলটি করে এনে বসালে ? মেয়েমানুষের মত এমন নিখুঁৎ করে সংসার গুছিয়ে রাখলে পুরুষকে মোটেই মানায় না। এমন ঘরে বৌয়ের আর কি দরকার ? কিই বা কাজ ?"

পরিমল হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল। মানসী তাড়াতাড়ি তাহার চিবুক ধরিয়া মুখটা তুলিয়া বলিল, "রাগ করলে বুঝি ? আচ্ছা, আর আমি ওসব বলব না।"

পরিমল মানসীর কোলের ভিতর মাথাটা গুঁজিয়া

দিয়া বলিল, "মানসী, যা হয়েছে তা হয়েছে। ও ত ঘোরানো যাবে না। এর পর আমি তোমার কুসুমদির স্বামীর চেয়েও অবুঝ দস্যি ছেলে হয়ে উঠব। তখন আমার বৌয়ের কাজের অন্ত থাকবে না। তুমি দেখে নিয়ো আমার স্বভাবই ঠিক অমনি, চেষ্টা করে কিছু করতে হবে না।"

সেদিনকার মত ঝগড়া মিটিল বটে, কিন্তু মানসীর সেবা-উন্মুখ মনটা তৃপ্তি পাইতেছিল না কিছুতেই। সুধাও দুই চার দিন পরে চলিয়া গেল; নূতন বৌ লইয়া ঘটা করিয়া আদর-অভ্যর্থনা করিবার জন্য শাশুড়ী ননদ জা পাঁচজন কোথাও নাই। সে-ই বাড়ির গৃহিণী। অথচ তাহার চারিধারে এত আয়োজন এত সমারোহ যেন তাহার গৃহিণীত্বকে গলা টিপিয়া মারিতেছিল। বাপের বাড়িতে আরামে বিলাসে সে অভ্যস্ত, কিন্তু সেখানে সে ছিল তাহার মায়ের সেবা-প্রবণতার আধার। এখানে তাহার পদবৃদ্ধি হইয়াও তাহাকেই নিষ্কর্মা বসিয়া আপনার কল্পিত সংসারের কর্মনিপুণা গৃহিণীর ছবিটি মনে মনে ভাঙিয়া চুরমার করিতে হইতেছে, ইহাতে প্রতি খুঁটিনাটি আয়োজনই তাহাকে পৃথক ভাবে পীড়া দিতেছিল।

তাহার নিজের জন্য সব আয়োজন ত আছেই তাই একদিন সে চলিল পরিমলের অজ্ঞাতে তাহার পোষাকে-আষাকে জিনিষপত্রে আপনার সেবার একটু স্পর্শ রাখিয়া আসিতে। কাপড়ের আলমারীর চাবিটা লাগানো নাই, মানসী একটা টান দিতেই খুলিয়া গেল। থাকে থাকে কাপড় জামা চাদর আবার শার্ট কোট ইত্যাদি বিলাতী পোষাক। ছোট দেরাজে আলাদা করিয়া ডজন ডজন রুমাল মোজা টাই-কলার যথাস্থানে সজ্জিত। দুই এক জায়গায় টানাটানির সামান্য চিহ্ন আছে, খুব বেশী নয়। টেবিলে ঢাকা, চেয়ারে কুশান, আলোয় শেড সবই পরিমল দিয়া রাখিয়াছে, বিলাস-ঐশ্বর্য্যের কোনো অনুষ্ঠান বাকি নাই। মানসীর মনটা দমিয়া গেল, শুধু নিজের সেবার ক্ষেত্র না পাওয়ার জন্য নয়, পরিমলকে এত বিলাসে অভ্যস্ত দেখিয়াও। বিবাহের আগে পরিমলকে দেখিয়া সে ভাবিয়াছিল তাহার স্বামীটি হইবে ভোলানাথ মহেশ্বরের মত উদাসীন, সে-ই তাহাকে অল্পে অল্পে নানা সুখ ও আরামে ঘিরিয়া ক্রমে সংসারের পাঁচজনের মত করিয়া তুলিবে। কোথায় কেমন বেশবাস পরিতে হয়, কোন্ গৃহসজ্জাটির কি প্রয়োজন, সব সে-ই একটি একটি করিয়া স্বামীকে শিখাইয়া নব্য করিয়া গড়িবে ঠিক করিয়াছিল, কিন্তু এ ত দেখিতেছি তাহার চেয়েও সভ্য ও নব্য। এ যেন বড় বেশী সংসারী। সংসার করিবার সাধ তাহারও আছে বটে, কিন্তু এমন নিখুঁৎ সংসার কি নূতন প্রেমের সঙ্গে মেলে? বার-বার নানা অভাব, নানা বিশৃঙ্খলা, নানা বেহিসাব শুধু তাহাদের প্রেমের ঐশ্বর্য্যেই তাহারা জয় করিয়া যাইবে, আর পরস্পরকে দিবার আগ্রহে ধীরে ধীরে সংসার গড়িয়া উঠিতে থাকিবে, এ না হইলে পথ চলার আনন্দ কোথায় হইল? এ যেন সকলের সেরা পথটুকু বাদ দিয়া একেবারে মধ্যজীবনে আসিয়া পড়া।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল। নদীর জলে আকাশের এক চাঁদ হাজার হাজার টুক্‌রা হইয়া ঢেউয়ের মাথায় মাথায় নাচিতেছিল। মাঝে মাঝে দুই-একটি ছই-ঢাকা পান্‌সি চাঁদের আলোর ভিতর ছোট কেরাসিনের আলোর রশ্মি ছড়াইয়া ভাসিয়া যাইতেছিল, হয়ত কোনো সৌখীন যাত্রীকে নৌকা-বিহার করাইতে। এমনি চাঁদিনী রাত্রে পরিমলের সহিত নৌকায় বেড়াইতে মানসীর বড় সাধ ছিল। এই ত দু-দিন আগে সে পরিমলকে বলিয়াছিল লইয়া যাইতে। পরিমল বলিয়াছিল—"না না, কোথায় রাত্রে জলে ডুবে যাবে, অমন করিতে কাজ নেই!"

মানসী ভাবিতেছিল, "অদ্ভুত মানুষ এই পরিমল!" এই কয় দিনেই মানসীর মনটাকে সে এমন করিয়া গ্রাস করিয়াছে যে, তাহার কথা ছাড়া অন্য কথা মানসী ভাবিতে পারে না; এক ঘণ্টার জন্য সে বাড়ির বাহিরে গেলেও মানসীর মনটা ব্যথায় টন্ টন্ করিয়া উঠে। তাহার মুখ দেখিয়াই সকল প্রয়োজন বুঝিয়া লইতে মানসী যেন উন্মুখ হইয়া থাকে। পরিমলও তাহাকে কম সুখে রাখে নাই। কিন্তু যাহার ঘর-সংসারের পার্থিব সুখ-সুবিধার দিকে এত দৃষ্টি সে-ই যেন একটা জায়গায় কেমন তালকাণা। সেদিন সন্ধ্যায় মানসী যখন খোঁপায় কনকচাঁপার মালা জড়াইয়া মাথার ঘোমটা খুলিয়া

ছাদের আলিসার ধারে মাদুর পাতিয়া বসিয়া মালা গাঁথিতেছিল, তখনও চাঁদের আলো এমনি চারি ধারে রহস্যের শুভ্র জাল মেলিয়া দিতেছিল। পরিমল ছাদে আসিয়াই একবার থমকিয়া দাঁড়াইল, তারপর বলিল, "মানসী, সিনেমা দেখতে যাবে? আজ চমৎকার একটা ফিল্ম আছে।"

মানসী বলিল, "আজকে যেতে ইচ্ছে করছে না একটুও। এইখানেই বোসো না।"

পরিমল বলিল, "একবার যদি গ্রেটা গার্বোকে দেখতে তাহলে আর ও কথা বলতে না।"

মানসী হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া বলিল, "আচ্ছা থাক্, যারা সাম্‌নের মানুষকে দেখতে পায় না, তাদের আর গ্রেটা গার্বো দেখে কাজ নেই।" বলিয়া খোঁপা হইতে খুলিয়া ফুলের মালাগুলা সে ছাদের উপর হইতে নীচে ফেলিয়া দিল। পরিমল হাসিয়া বলিল, "এই জন্যে এত রাগ! ফুলের মালা ত সব মেয়েই খোঁপায় জড়ায়। ওতে নূতন আর কি আছে, এই ভেবে কিছু বলি নি।"

কি যেন সৃষ্টিছাড়া মানুষ! ঠিক যে কথাগুলি শুনিবার জন্য মানসীর মনটা ব্যাকুল হয়, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অগত্যা নিজেই সে যে-কথার সূত্রে পরিমলকে ধরাইয়া দিতে চায়, ঠিক সেই কথা কয়টাই যেন পরিমলের মুখে কিছুতেই আসে না। এক এক সময় মনে হয় মানুষটা একেবারে বৃদ্ধ হইয়াই বুঝি জন্মাইয়াছিল, প্রণয়িনীর সঙ্গে কেমন করিয়া কথার লীলা করিতে হয় তাহাও ইহাকে শিখাইয়া দিতে হইবে। আবার মনে হয়—না, ইচ্ছা করিয়াই ওই গাম্ভীর্য্যের দেওয়ালটা সে খাড়া করিয়া রাখে মানসীকে তাহার মনের গোপনতম কক্ষগুলিতে ঢুকিয়া পড়িতে দিবে না বলিয়া।

কয়দিনেরই বা তাহাদের পরিচয়, এখন ত প্রণয়-গুঞ্জন ছাড়া অন্য কথা শুনিবার ধৈর্য্যই মানসীর নাই। অথচ পরিমল ঘর-সংসারের সুখ-সুবিধা স্বাস্থ্য শিক্ষা—কেবল এই সব হাজার কথা বলিবার এত উৎসাহ পায় কোথা হইতে? কালও নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে মানসী যখন এলোচুলের রাশ পিঠে ছড়াইয়া নদীর জলের একটানা সুরের সঙ্গে আপনার স্বপ্নের গান মিলাইতে চেষ্টা করিতেছিল, তখন পরিমল আসিয়া বলিল, "চাকরগুলার কাজকর্ম্ম তোমার পছন্দ হচ্ছে ত? রোগা হয়ে যেন বাপের বাড়ি ফিরো না। আমার নিন্দে হবে।" মানসী বলিল, "এ কি, তোমার আপিসের বড়সাহেব তোমার বাড়ি অতিথি হয়ে এসেছেন ভাবছ না কি? সারাক্ষণ কেবল যত বাজে কথা। অন্য কথা যদি বলতে না জান ত অত সেবাযত্নের কথা বলতে হবে না।"

পরিমল ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কেন কোন্ কথাটা না বলি? বোম্বের হাঙ্গামে গান্ধীজী কি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেছেন পড়েছ কাগজে?"

মানসী রাগ করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

আজও তাহারই আদর সোহাগে ডুবিয়া এই পৃথিবীটা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাইবার আশায় জ্যোৎস্না-রাত্রে মানসী পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। ঘরসংসারে যত আসবাব-আয়োজন সে দেখে তত যেন পৃথিবীটাই তাহার চোখে উৎকট হইয়া উঠিয়া মনকে পীড়া দিতে থাকে। এসব ভুলাইয়া দিবার ক্ষমতা ত পরিমলের আছে, প্রাণ ভরিয়া মানসী তা বিশ্বাস করে। তাহার আশারও শেষ নাই। প্রতিদিনই অতৃপ্ত হৃদয়ে সে পরিপূর্ণ তৃপ্তির প্লাবনের আহ্বান করে। বিশ্বজগৎ ভুলিয়া একবারও কি পরিমল কেবল একমাত্র মানসীর মনের ভিতর তলাইয়া যাইতে পারে না?

চন্দ্রালোকের সমস্ত মোহিনী মায়াকে ছিন্ন করিয়া হঠাৎ এক বেহারী মুটের কণ্ঠস্বর উঠিল, "আরে, কিধর বাতাও না বাবুসাহেব।" মানসী চাহিয়া দেখিল গ্রামোফোন ও রেকর্ডের বাক্স মাথায় করিয়া একটা মুটে উপরে উঠিতেছে, পিছনে পরিমল। মানসীর চোখে জল আসিয়া গেল। পরিমল যেন কৈফিয়ৎ দেওয়ার মত সুর করিয়া বলিল, "ভাল ভাল রেকর্ড বেরিয়েছে আজকাল। তোমার খুব ভাল লাগবে, আমি নিশ্চয় বলছি।"

মুটেটাকে বিদায় করিয়া মানসী বলিল, "না, আমার তোমাকে ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না।" পরিমল হাসিয়া বলিল, "তাহলে ত খুব সস্তার ব্যাপার দেখছি, আমি ত তোমারই রয়েছি।"

মানসী পরিমলের দুই কাঁধে দুই হাত রাখিয়া বলিল,

"আমার যদি তবে এমন পুরুতঠাকুরের মত আমায় বসিয়ে রেখে কেবল দূরে দূরে বেড়াও কেন?"

পরিমল বলিল, "এই বুঝি দূরে থাকা হ'ল?"

মানসী বলিল, "আমি অতশত বুঝিয়ে বলতে পারি না বাপু, তুমি কেমন যেন বানিয়ে বানিয়ে কেবল বাইরের কথা বল। তোমার মনটাকে মোটে দেখতে পাই না। যেন একটুখানি খোলা আর অনেক খানিই ঢাকা।"

পরিমলের গলাটা একটু ভার হইয়া আসিয়াছিল, সে বলিল, "কি করলে তুমি আমায় যেমনটি চাও তেমনি হব, তুমিই আমায় শিখিয়ে দাও মানসী। আমার নিজের বুদ্ধিতে ত পথ পাচ্ছি না।"

মানসী বলিল, "তোমার মন যদি তোমায় না ব'লে দেয়, তবে তোমার জন্তে আমায় এমন কোনো পরম দুঃখ স্বীকার করতে দাও, এমন কিছু ত্যাগ করতে বল, যার জোরে তোমায় আমি জয় করে নিতে পারি। তখন আর তোমায় ভেবেচিন্তে আমার মন জোগাতে হবে না। তুমি ভাববার আগেই আমার মন খুশীতে ভরে উঠবে। সব যদি দখল করতে পারি, আড়াল থাকবে কি করে?"

পরিমল বলিল,"জয় ত তুমি আমাকে করেছই, আমার বলবার ভাষা নেই তাই বলতে পারি না; আর দুঃখ পাই যে আমার মত অযোগ্যকে কেন তুমি এমন করে ভাল-বাসলে, কেন তার জন্তে পরম দুঃখও বরণ করতে চাও?"

মানসী বলিল, "জানি না কেন। কিন্তু আমার বড় ইচ্ছা করে নিজের মনকে এমনি করে কষ্টিপাথরে কষে নিই। আর তোমাকেও এমনি করেই কাছে টেনে নি। মনে হয় পৃথিবীতে দুটি দুঃখ ছাড়া আর সব আমি তোমার জন্ত সইতে পারি। পারিনে কেবল তোমার ভাগ ভূত ভবিষ্যতে কাউকে দিতে, আর তোমার মধ্যে কোনো মিথ্যা দেখতে।"

পরিমল বলিল, "মানসী, ঠিক তোমারই মত আরও একটি মেয়েকে আমি চিন্‌তাম। সে তোমার মত সুন্দরী ছিল না, এত লেখাপড়াও শেখেনি, পাড়াগাঁয়ে গরিব বাপমায়ের পাঁচটা ছেলেমেয়ের মধ্যে মানুষ হয়েছিল। কিন্তু তোমারই মত করে ভালবাস্‌তে আর ভালবাসাতে সে চাইত, তোমারই মুখের কথার মত কথা যেন তোমারই গলার সুরে তার মুখে শুনেছি।"

মানসী ম্লান করুণ মুখ পরিমলের মুখের দিকে তুলিয়া বিস্ফারিত চোখে তাহার দিকে তাকাইল। হাত দু-খানা তখন তাহার নিজের কোলের কাছে নামিয়া আসিয়াছে। একটুখানি কাঁপাগলায় দ্রুত তালে সে জিজ্ঞাসা করিল, "কে সে মেয়েটি? কি করে এত বেশী তাকে চিন্‌লে তুমি? সে কি তোমায় ভালবাস্‌ত?"

পরিমল চোখ নামাইয়া বলিল, "বেসেছিল একদিন।"

মানসী বলিল, "আর তুমি?"

"আমি! আমিও বেসেছিলাম বইকি!"

"তবে তবে?"—মানসী আর কিছু বলিল না।

পরিমল বলিল, "সে আজ পৃথিবীতে নেই, মানসী।

মানসী কোমল কণ্ঠে বলিল, "এমন করে তুমি যদি তাকে না ভুলে যেতে তাহলে ভাল হ'ত না কি? অত বড় ভালবাসার এই কি প্রতিদান?"

পরিমল বলিল, "তা ত নয়ই। কিন্তু তার চেয়েও তোমার কাছে আমি বেশী অপরাধী, মানসী। তুমি পরম দুঃখ চেয়েছিলে। দুর্ভাগা আমি তোমাকে পরম দুঃখই দিলাম। কিন্তু এমন সে দুঃখ যা তুমিও সইতে পারবে না বলেছ। তোমাকে আমার মিথ্যা রূপই আমি দেখিয়েছি, এতদিন তোমাকে ঠকিয়ে এসেছি। কিন্তু তোমার কলুষহীন অন্তরের কাছে মিথ্যা নিয়ে সহজ হ'তে পারতাম না বলেই আপনাকে ঢাকা দিতে আরও চেষ্টা করতাম। তোমার প্রেমের অন্তর্দৃষ্টিতে তাও ধরা পড়ে যেত। সেই আমার হারানো স্ত্রীর সাজানো সংসারে তোমাকে এনে বসাতেই তুমি যেন টের পেয়েছিলে এ পুরুষের হাতের কাজ নয়। তাই বার-বার তাকে আরও চাপা দিতে চেষ্টা করেছি।"

মানসী বলিল, "কেন তুমি এমন কাজ করলে? ভগবান, আমার দেবতা যে ধূলায় লুটিয়ে গেল।"

পরিমল বলিল, "না হলে যে তোমাকে নিশ্চয় পেতাম না, এই জেনেই লোভে পড়ে অপরাধ করেছি। এ অপরাধের কি ক্ষমা নেই, মানসী?"

মানসী বলিল, "জানি না, জানি না: যাকে পূজা করতে চেয়েছিলাম তাকে ক্ষমা করে আমার মনটা বেঁচে থাকবে না, এইটুকু শুধু জানি।"

নবযুগ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ অনুভব করচি নূতন যুগের আরম্ভ হয়েচে। আমাদের দেশের পুরাতন ইতিহাস যদি আলোচনা করি তাহলে দেখতে পাই যে এক-একটি নূতন নূতন যুগ এসেচে বৃহতের দিকে মিলনের দিকে নিয়ে যাবার জন্য, সমস্ত ভেদ দূর করবার দ্বার উদ্ঘাটন ক'রে দিতে। সকল সভ্যতার আরম্ভেই সেই ঐক্যবুদ্ধি। মানুষ একলা থাকতে পারে না। তার সত্যই এই, যে, সকলের যোগে সে বড় হয়, সকলের সঙ্গে মিলতে পারলেই তার সার্থকতা; এই হোলো মানুষের ধর্ম্ম। যেখানে এই সত্যকে মানুষ স্বীকার করে সেখানেই মানুষের সভ্যতা। যে-সত্য মানুষকে একত্র করে, বিচ্ছিন্ন করে না, তাকে যেখানে মানুষ আবিষ্কার করতে পেরেচে সেখানেই মানুষ বেঁচে গেল। ইতিহাসে যেখানে মানুষ একত্র হয়েচে অথচ মিলতে পারে নি, পরস্পরকে অবিশ্বাস করেচে, অবজ্ঞা করেচে, পরস্পরের স্বার্থকে মেলায় নি সেখানে মানুষের সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে নি।

আমি যখন জাপানে গিয়েছিলেম তখন একজন জাপানী বৌদ্ধ আমাকে বলেছিলেন যে বুদ্ধদেবের উপদেশ অনুসারে তিনি বিশ্বাস করেন যে মৈত্রী কেবল একটা হৃদয়ের ভাব নয়, এ একটি বিশ্বসত্য, যেমন সত্য এই আকাশের আলোক; এ তো কেবল কল্পনা নয় ভাব নয়। আলোক একান্ত সত্য ব'লেই তরুলতা জীবজন্তু প্রাণ পেয়েচে, সমস্ত শ্রী সৌন্দর্য্য সম্ভব হয়েচে। এই আলোক যেমন সত্য তেমনি সত্য এই মৈত্রী, প্রেম। আমার অন্তরেও সত্য বাহিরেও সত্য। তিনি বললেন, আমি জানি, এই যে গাছপালা নিয়ে আমি আছি এ-কাজ মালীও করতে পারত; কিন্তু সে ঐ প্রেমের সত্যটিকে স্বীকার করতে পারত না; সে কেবল তার কর্ত্তব্য ক'রে যেত, ভালোবাসার সত্য থেকে সে গাছকে বঞ্চিত করত। যে একটি সত্য আছে বিশ্বের অন্তরে, ভালোবাসার দ্বারা আমি তার উদ্রেক করচি, তাইতে আমার কাজ পূর্ণ হয়েচে।

বৌদ্ধশাস্ত্রে যাকে বলে পঞ্চশীল সে শুধু 'না'-এর সমষ্টি, কিন্তু সকল বিধিনিষেধের উপরে ও অন্তরে আছে ভালোবাসা, সে 'না' নয়, 'হাঁ'। মুক্তি তার মধ্যেই। সকল জীবের প্রতি প্রেম যখন অপরিমেয় হবে, প্রতিদিন সকল অবস্থায় যখন কামনা করব সকলের ভালো হোক্, তাকেই বুদ্ধ বলেচেন ব্রহ্মবিহার, অর্থাৎ বৃহৎ সত্য যিনি তাঁকে পাওয়া। এইটিই সদর্থক, কেবলমাত্র পঞ্চশীল বা দশশীল নঞর্থক। মানুষের জীবনে যেখানে প্রেমের শক্তি ত্যাগের শক্তি সচেষ্ট সেখানেই সে সার্থক, নইলে সে আপন নিত্যরূপ পায় না, পদে পদে ছিন্নবিচ্ছিন্ন জীর্ণ হয়ে পড়ে। যেখানে সমাজের কেন্দ্রস্থল থেকে সেই প্রেম নানা কর্ম্মে সেবায় আপনাকে প্রকাশ করে সেখানেই মানুষের সমাজ কল্যাণে শক্তিতে সুন্দর; যেখানে প্রেমের অভাব সেখানেই বিনাশ।

ভারতবর্ষে এক সময়ে আর্য্য ও অনার্য্যের সংগ্রামে মানুষের সত্য পীড়িত হয়েছিল; ভারতবর্ষ তখনও প্রতিষ্ঠালাভ করেনি। তারপরে আর একটা যুগ এল। রামায়ণে আমরা তার আভাস পাই, তখন আর্য্য-অনার্য্যের যুদ্ধের অবসান হয়ে মিলনের কাল এসেচে। শ্রীরামচন্দ্র সেই মিলনের সত্যকে প্রকাশ করেছিলেন এমন অনুমান করবার হেতু আছে। আমরা আরও দেখেচি এক সময় যে-আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম কর্ম্মকাণ্ড আকারে প্রধান হয়ে উঠেছিল অন্য সময়ে সে জ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকার ক'রে বিশ্বভৌমিকতাকে বরণ করেচে। তখন এই বাণী উঠল যে নিরর্থক কৃচ্ছ্রসাধন নয় আত্মপীড়ন নয়; সত্যই তপস্যা, দান তপস্যা, সংযম তপস্যা। ক্রিয়াকাণ্ড স্বভাবতই সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ, সে সকলের নয়, সে বিশেষ দলের অনুষ্ঠান, সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান। যে-ধর্ম্ম শুধু

বাহ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে শৃঙ্খলিত তাতে কার কী প্রয়োজন; অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে আপনার প্রাণ আহুতি দিয়ে ব্যক্তিবিশেষ যে অদ্ভুত কর্ম্ম করল তাতে কার কি এল গেল? কিন্তু যিনি সত্যকার যোগী, সকলের সঙ্গে যোগে তিনি বিশ্বাত্মার সঙ্গে যুক্ত, তিনি বললেন, যা-কিছু মঙ্গল, যা সকলের ভালোর জন্য তাই তপস্যা। তখন বন্ধ দুয়ার খুলে গেল। দ্রব্যময় যজ্ঞে মানুষ শুধু নিজের সিদ্ধি খোঁজে; জ্ঞানযজ্ঞে সকলেরই আসন পাতা হোলো, সমস্ত মানুষের মুক্তির আয়োজন সেইখানে। এই কথা স্বীকার করবামাত্র সভ্যতার নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। ভগবদ্গীতায় আমরা এই নূতনের আভাস পাই, যেখানে ত্যাগের দ্বারা কর্ম্মকে বিশুদ্ধ করবার কথা বলা হয়েচে, নিরর্থক অনুষ্ঠানের মধ্যে তাকে আবদ্ধ রাখতে বলেনি। ইহুদীদের মধ্যেও দেখি ফ্যারিসিরা সংস্কার ও অনুষ্ঠানকেই বড় স্থান দিয়ে আসছিল। যীশু বললেন, এ তো বড় কথা নয়, কী খেলে কী পরলে তা দিয়ে তো লোক শুচি হয় না, অন্তরে সে কী তাই দিয়ে শুচিতার বিচার। এ নূতন যুগের চিরন্তন বাণী।

আমাদের যদি আজ শুভবুদ্ধি এসে থাকে তবে সকলকেই আমরা সম্মিলিত করবার সাধনা করব। আজ ভাববার সময় এল। মানুষের স্পর্শে অশুচিতার আরোপ ক'রে অবশেষে সেই স্পর্শে দেবতারও শুচিতানাশ কল্পনা করি। এ বুদ্ধি হারাই যে, তাতে দেবতার স্বভাবকে নিন্দা করা হয়। তখন আমরা সম্প্রদায়ের মন্দিরে অর্ঘ্য আনি, বিশ্বনাথের মন্দিরের বিশ্বদ্বার রুদ্ধ ক'রে দিয়ে তাঁর অবমাননা করি। মানুষকে লাঞ্ছিত ক'রে হীন ক'রে রেখে পুণ্য বলি কাকে?

আমি এক সময় পদ্মাতীরে নৌকোয় ছিলেম। এক দিন আমার কানে এল, একজন বিদেশী রুগ্ন হয়ে শীতের মধ্যে তিন দিন নদীর ধারে পড়ে আছে। তখন কোনো একটা যোগ ছিল। সেই মুমূর্ষুর ঠিক পাশ দিয়েই শত শত পুণ্যকামী বিশেষ স্থানে জলে ডুব দিয়ে শুচি হবার জন্য চলেচে। তাদের মধ্যে কেউ পীড়িত মানুষকে ছুঁলো না। সেই অজ্ঞাতকুলশীল পীড়িত মানুষের সামান্য মাত্র সেবা করলে তারা অশুচি হ'ত, শুচি হবে জলে ডুব দিয়ে। জাত বলে একটা কোন্ পদার্থ তাদের আছে মানবজাতীয়তার চেয়েও তাকে বড় বলে জেনেচে। যদি কারো মনে দয়া আসত, সেই দয়ার প্রভাবে সে যদি তার বারুণীস্নান ত্যাগ ক'রে ঐ মানুষটিকে নিজের ঘরে নিয়ে সেবা করত তাহলে সমাজের মতে কেবল যে বারুণীর স্নানের পুণ্য সে হারাত তা নয়, সে দণ্ডনীয় হ'ত, তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ত। তার ঘরে এসে রোগী যদি মরত তাহলে সমাজে সে বিষম বিপন্ন হয়ে পড়ত। যে-মানবধর্ম্ম সকল নিরর্থক আচারের বহু ঊর্দ্ধে তাকে দণ্ড মেনে নিতে হবে আচারীদের হাতে।

এক জন প্রাচীন অধ্যাপক আমাকে বল্লেন, তাঁর গ্রামের পথে ধূলিশায়ী আমাশয় রোগে পীড়িত এক জন বিদেশী পথিককে তিনি হাটের টিনের চালার নীচে স্থান দিতে অনুরোধ করেছিলেন। যার সেই চালা সে বল্লে, পারব না। তিনিও লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করলেন যে, তিনিও সমাজের দণ্ডের ভয়েই তাকে আশ্রয় দিতে পারেন নি। অর্থাৎ মানুষের প্রতি মানুষের কর্ত্তব্যসাধন শাস্তির যোগ্য। তিনি হোমিয়োপ্যাথি জানতেন, পথের ধারেই ত'কে কিছু ওষুধপত্র দিয়েছিলেন। আরোগ্যের দিকে যাচ্ছিল, এমন সময় রাত্রে শিলাবৃষ্টি হ'ল, পরদিন সকালে দেখা গেল, সে মরে পড়ে আছে। পাপপুণ্যের বিচার এত বড় বীভৎসতায় এসে ঠেকেচে। মানুষকে ভালবাসায় অশুচিতা, তাকে মনুষ্যোচিত সম্মান করায় অপরাধ। আর জলে ডুব দিলেই সব অপরাধের ক্ষালন। এর থেকে মনে হয় যে-অভাব মানুষের সকলের চেয়ে বড় অভাব সে প্রেমের অভাব। সে প্রেমের অভাবকে হৃদয়ে নিয়ে আমরা যাকে শুচিতা ব'লে থাকি তাকে রক্ষা করতে পারি কিন্তু মনুষ্যত্বকে বাঁচাতে পারিনে।

আশা করি দুর্গতির রাত্রি অবসানে দুর্গতির শেষ সীমা আজ পেরবার সময় এল। আজ নবীন যুগ এসেচে। আর্য্যে-অনার্য্যে একদা যেখানে মিলন ঘটেছিল, শ্রীরামচন্দ্র যেমন চণ্ডালকে বুকে বেঁধেছিলেন, সেই যুগ আজ সমাগত। আজও যদি আমাদের মধ্যে প্রেম না আসে, কঠিন কঠোর নিষ্ঠুর অবজ্ঞা মানুষের থেকে

মানুষকে দূর ক'রে রাখে, তবে বাঁচবো কী ক'রে? রাউণ্ড টেবিলে গিয়ে, ভোটের সংখ্যা নিয়ে কাড়াকাড়ি ক'রে? পশুর প্রতি আমরা যে ব্যবহার করি মানুষকে যদি তার চেয়েও অধম স্থান দিই তবে সেই অধমতা কি আমাদের সমস্ত সমাজেরই বুকের উপর চেপে বসবে না?

মানুষকে কৃত্রিম পুণ্যের দোহাই দিয়ে দূরে রেখেছি তারি অভিশাপে আজ সমস্ত জাতি অভিশপ্ত। দেশজোড়া এত বড় মোহকে যদি আমরা ধর্ম্মের সিংহাসনে স্থির-প্রতিষ্ঠ ক'রে বসিয়ে রাখি তবে শত্রুকে বাইরে খোঁজবার বিড়ম্বনা কেন?

নবযুগ আসে বড় দুঃখের মধ্য দিয়ে। এত আঘাত এত অপমান বিধাতা আমাদের দিতেন না যদি এর প্রয়োজন না থাকৃত। অসহ্য বেদনায় আমাদের প্রায়শ্চিত্ত চল্‌চে, এখনও তার শেষ হয়নি। কোনো বাহ্য পদ্ধতিতে পরের কাছে ভিক্ষা ক'রে আমরা স্বাধীনতা পাব না, কোনো সত্যকেই এমন ক'রে পাওয়া যায় না। মানবের যা সত্য বস্তু সেই প্রেমকে আমরা যদি অন্তরে জাগরূক করতে পারি তবেই আমরা সব দিকে সার্থক হব। প্রেম থেকে যেখানে ভ্রষ্ট হই সেখানেই অশুচিতা কেননা সেখান থেকে আমাদের দেবতার তিরোধান। আমাদের শাস্ত্রেও বল্‌চেন যদি সত্যকে চাও তবে অন্যের মধ্যে নিজেকে স্বীকার করো। সেই সত্যেই পুণ্য এবং সেই সত্যের সাহায্যেই পরাধীনতার বন্ধনও ছিন্ন হবে। মানুষের সম্বন্ধে হৃদয়ের যে সঙ্কোচ তার চেয়ে কঠোর বন্ধন আর নেই।

মানুষকে মানুষ ব'লে দেখতে না পারার মতো এত বড় সর্ব্বনেশে অন্ধতা আর নেই। এই বন্ধন এই অন্ধতা নিয়ে কোনো মুক্তিই আমরা পাব না। যে-মোহে আবৃত হয়ে মানুষের সত্য রূপ দেখতে পেলুম না, সেই অপ্রেমের অবজ্ঞার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাক্, যা যথার্থভাবে পবিত্র তাকে যেন সত্য ক'রে গ্রহণ করতে পারি।*

৭ই পৌষ ১৩৩৯

* শান্তিনিকেতনে বার্ষিক উৎসবে কবির সম্ভাষণ। শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্ত্তৃক অনুলিখিত ও বক্তাকর্ত্তৃক সংশোধিত।

রাণু ও লছমী

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

সেদিন তখনও "কলে" বাহির হই নাই,—বৈঠকখানায় বসিয়া খবরের কাগজে ভারী এক মজার খবর পাঠ করিতেছি। তাহার বিষয়গত রস ও কৌতুক যতটা না থাক, রিপোর্টার সংবাদটিকে এমন রসালো ও রঙীন করিয়া বর্ণনা করিয়াছে, যে, পড়িতে পড়িতে খেয়ালই নাই, ওদিকে সন্ধ্যা আসন্ন, আমার বাহির হইবার নির্দ্দিষ্টকাল উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে এবং হাতে একটি ওলাউঠার রোগী। সংবাদটি নিশ্চয়ই শেষ অবধি পাঠ করিতাম। কিন্তু পথ হইতে এক আকস্মিক হাঁকে স্বপ্নোত্থিতের মত সহসা জাগিয়া উঠিয়া জানালার বাহিরে তাকাইয়া দেখি, আমার পাঁচ বছরের মেয়ে রাণু রোয়াকের উপর দাঁড়াইয়া এক খোট্টা ফেরিওয়ালার নিকট হইতে "আলু-কাবলী" কিনিতেছে। লোকটার মুখমণ্ডল আসন্ন সন্ধ্যার ম্লান ছায়ায় স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম না;—তাহার কেরোসিনের ডিবাটি তখনও আলোকহীন, পথের গ্যাসগুলিও জ্বলে নাই, কেবল দেখিলাম, তাহার শুভ্র দন্তপংক্তি পরম খুশী-ভরে বিকশিত আলুর টুক্‌রাগুলির গায়ে উত্তমরূপে লবণ, গোলমরিচ ও তেঁতুলের রস মাখাইতে শালপাতার ক্ষুদ্র ঠোঙাটি অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া সে বার বার ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপ করিতেছে; আর, তাহার তালে তালে তাহার পাগড়ীঘেরা মাথাটিও দুলিতেছে। রাণু আমার দিকে পিছন ফিরিয়া হাত দুখানি পিছনে দিয়া দাঁড়াইয়া একমনে লোকটার

কার্য্যকলাপ দেখিতেছিল। তাহার মাথার নাতিদীর্ঘ কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশদল ও ক্ষুদ্র দেহের অস্থিরতা দেখিয়া বোধ হইল, তাহারও মনে খুশী ধরে না!

কিন্তু আমার সমস্ত মন শঙ্কা, বিরক্তি ও ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

হাতের কাগজখানা টেবিলের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই লোকটা পসরাপূর্ণ বারকোশখানি ক্ষিপ্রহাতে মাথায় তুলিয়া, দীর্ঘ মোড়াটি কুক্ষিতলে চাপিতে চাপিতে দ্রুত পদে গলির শেষদিকে চলিয়া গেল। রাণুকেও আর দেখিতে পাইলাম না, সেও কোন্ পথে ছুটিয়া একেবারে অন্দরে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে! ইচ্ছা ছিল কুখাদ্যগুলি তৎক্ষণাৎ তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া পথের ধূলায় ফেলিয়া দি। ঐ সকল কুখাদ্য খাইয়াই ঘরে ঘরে নানা কঠিন রোগ ছড়াইয়া পড়িতেছে। রাশি রাশি গ্রন্থ লিখিয়া, রবিবারের দৈনিকে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ ছাপাইয়া, ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যেও এ পাপ দূর করা যাইতেছে না। ফেরিওয়ালার দল শিশুর মন ভুলাইয়া ঐ সকল সুদৃঢ় ও সুউচ্চ বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে নিয়ত পসরা ফেরি করিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

একরূপ ছুটিয়াই অন্দরে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু রাণুকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না। তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভৃত্যকে চারিদিকে অন্বেষণে পাঠাইয়া দিলাম, নিজেও বার-দুই হাঁক ছাড়িলাম, তথাপি তাহার বা তাহার অগ্রজের কাহারও সন্ধান মিলিল না। দুটিতে যেন কোন্ নিভৃত নিরাপদ কক্ষে গিয়া বসিয়া আছে।

ইহাতে মন আরও তিক্ত হইয়া উঠিল।

এবার স্বয়ং কক্ষগুলি অন্বেষণ করিতে করিতে দ্বিতলের ছাদে গিয়া উঠিলাম। অধিক দূরও অগ্রসর হইতে হইল না, সিঁড়ি-পথে দাঁড়াইয়া দেখিতে পাইলাম, প্রায়ান্ধকার ছাদের এক কোণে ভ্রাতা-ভগ্নী পাশাপাশি বসিয়া পরম আনন্দিত মনে সেই কুখাদ্যগুলি খাইতে ব্যস্ত। আর কোন দিকে মন দিবার অবসর তাহাদের নাই।

অবিলম্বে গিয়া তাহাদের হাত হইতে খাদ্যগুলি ছিনাইয়া লইলাম। তারপর সেগুলি ছাদের উপর ফেলিয়া দিয়া পদদলিত করিতে করিতে তাহাদের ধমক দিলাম, মারিতে উদ্যত হইলাম। কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া উভয়ের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে তাহাদের মাতার নিকট আনিয়া উপস্থিত করিলাম।

পুত্র মাতার পাশটিতে বসিয়া তাঁহার বস্ত্রাভ্যন্তরে মুখ লুকাইল। রাণু বসিল না বা তাহার মাতার আশ্রয় গ্রহণ করিল না—আমার ক্রোধ-রক্তিম মুখের প্রতি অশ্রুপূর্ণ ডাগর চোখ দুটি তুলিয়া নিতান্ত অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার হাতে তখনও মশলা-মাখোনো এক টুকরা আলু। কচি অধরের দুই প্রান্তে খাদ্যের সামান্য অংশ লাগিয়া আছে। তাহার হাত হইতে সেই টুকরাটি তৎক্ষণাৎ কাড়িয়া লইলাম। সেও সেই অবসরে অধরপ্রান্ত-সংলগ্ন খাদ্যাংশ জিহ্বার সাহায্যে চাটিয়া লইয়া নিমেষে মুখে পুরিল।

ব্যাপারটা তাহার মাতার চোখ এড়াইল না। তিনি হাসিয়া ফেলিলেন। আমারও ক্রোধ তরল হইয়া যায়, এ আশঙ্কায় সেই হাসিতে যোগ না দিয়া যথাসাধ্য গাম্ভীর্য্যের সহিত উভয়কে আর একবার ধমক দিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম। আসিবার কালে তাহাদের মাতাকে কহিলাম, "আর কখনও ওদের হাতে পয়সা দিও না—"

তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "ও পয়সা পায় তোমার কাছ থেকেই—"

ইহা লইয়া তাঁহার সহিত বচসা করা সমীচীন নহে। একারণ প্রারম্ভেই নীরব হইতে হইল।

বাহিরে আসিয়া ভৃত্যদের ডাকিয়া কহিলাম, সাবধান! কোন ফেরিওয়ালা যেন আমার গৃহের ত্রি-সীমানায় না আসে। তাহা হইলে এক টাকা জরীমানা ত হইবেই, চাকরিও থাকিবে না। এবং গাড়ীতে উঠিয়া রোগীর গৃহের পথে চলিতে চলিতে চিন্তা করিতে লাগিলাম, কি উপায়ে এই পাপগুলির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে? স্থির করিলাম, পর পর কয়েকটি রবিবারের দৈনিকে গুটিকয়েক এমন সাংঘাতিক প্রবন্ধ লিখিব যাহা পাঠ করিয়া দেশের লোক আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, ফেরিওয়ালা দেখিলেই তাহাকে দূর করিয়া দেয়।

বলা বাহুল্য, ইহার পর হইতে ফেরিওয়ালারা পথ দিয়া হাঁকিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু কেহই আমার গৃহ-

থারে দাঁড়াইতে সাহস করিল না ; পুত্রকন্যাও উপর হইতে তাহাদের স্বরের নকল করে মাত্র—নামিয়া আসিয়া কিছু কিনিবার আগ্রহ আর দেখায় না। আমিও নিশ্চিন্ত মনে প্রবন্ধ লিখিতে সুরু করিয়া দিলাম।

মনে পড়িতেছে যেন ইহার পক্ষকাল পরেই হইবে, আমি প্রাত্যহিক নিয়মমত একদিন সকালে আমার ডিস্‌পেন্সরীতে বাহির হইতেছি, এমন সময় রাণু ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল ; বলিল, সে-ও আমার সহিত যাইবে। এবং এ বিষয়ে আমার মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়া স্বয়ং চালককে কহিল, "চালাও—"

চালক আমার মুখের দিকে তাকাইল। কিন্তু এই ক্ষুদ্র কর্ত্রীটির হাতে আমি নীরবে আত্মসমর্পণ করায় সে তাহারই আদেশ মানিয়া লইয়া গাড়ী চালাইয়া দিল।

অগ্রহায়ণ তখন শেষ হইয়া আসিয়াছে। শীতও সে-বার পড়িয়াছিল খুব প্রখর। তাহার উপর দুই দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিয়া পূর্ব্ব দিনে বাতাসের সহিত থাকিয়া থাকিয়া বর্ষণ সুরু হইয়াছিল। শীত, বৃষ্টি ও বাতাসে সারা শহরের দেহে সাড় ছিল না—গৃহকোণে জড়সড় হইয়াও অন্তরে অন্তরে কাঁপিয়া মরিতেছিল। কিন্তু সেদিন ভোর হইতে বৃষ্টি থামিয়াছে, শীতটা হইয়া উঠিয়াছে আরও প্রখর, দুরন্ত উত্তরে বাতাস মুখে চোখে নির্ম্মম কশাঘাত করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। রাণুর গায়ে শীতবস্ত্র ছিল প্রচুর। তথাপি তাহাকে আমার দেহের সহিত চাপিয়া ধরিয়া র‍্যাগখানা বেশ করিয়া গায়ে মাথায় জড়াইয়া দিলাম। গাঢ় কৃষ্ণ কম্বলের মধ্য হইতে তাহার মুখখানি বাহির হইয়া রহিল যেন স্থির কালো জলে একটি অর্দ্ধবিকশিত কমল-কলিকা।

প্রতিদিন অপেক্ষা সেদিন ডাক্তারখানায় রোগীর সংখ্যা ছিল অধিক। ইহাদের অধিকাংশই সঙ্গতিহীন। বড় ঘরটার ভিতর দিয়া আমার বসিবার ভিতর কক্ষে যাইতে যাইতে দেখিলাম, সকলে আমারই প্রতীক্ষায় জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে। ইহার অধিক তখন আর দেখিবার অবকাশ ছিল না। ভিতরে গিয়া গুটিকয়েক জরুরী কাজকর্ম্ম সারিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

তারপর রোগী দেখিবার পালা—

বাহিরে বসিয়া রোগী দেখিতে সুরু করিয়াছি। তাহারই ব্যস্ততায় এতক্ষণ রাণুর দিকে মনোযোগ দিতে পারি নাই। সহসা ঘরের কোণে নজর পড়িতেই দেখি, সে একটা প্রৌঢ় গোছের খোট্টার সহিত দাঁড়াইয়া দিব্য আলাপ জমাইয়াছে—যেন উভয়ে বহুদিনের পরিচিত। লোকটার কোলে একটা রুগ্ন শিশু ; তাহার বয়স অনুমান করা কঠিন। অঙ্গে একখানি মলিন বস্ত্র দোলাইয়ের মত মাথা ঢাকিয়া বাঁধা। শিশুটি তাহার নিষ্প্রভ চোখ দুটি অতি কষ্টে বিস্ফারিত করিয়া রাণুর মুখের দিকে মেলিয়া নির্জ্জীবের মত লোকটার কোলে পড়িয়া আছে। রাণুকে লোকটার এত নিকটে দাঁড়াইয়া সহাস্য আলাপ করিতে দেখিয়া আমার কেমন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু নিষেধ করিবার পূর্ব্বেই দেখি, রাণু তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেছে। আমি আবার রোগী দেখিতে সুরু করিলাম।

মন পূর্ব্ব হইতেই কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন ছিল। তাহার উপর আমি ডাক্তার। হৃদয়ের সকল কোমল বৃত্তিই যে সজাগ তাহা বলিতে পারি না। সে কারণ সময় সময়, অনাবশ্যক কঠিন ও রুক্ষ হইয়া পড়ি। রোগ নিরাময় করিতে গিয়া রোগী ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তীগণের অন্তরকেও উপেক্ষা করিতে দ্বিধা জাগে না। তাই সেই লোকটা রুগ্ন শিশুটিকে আমার নিকট লইয়া আসিতেই নিতান্ত নীরস কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"হয়েছে কি ?"

এই সময় রাণু আমার পিছনে আসিয়া সস্মিত কণ্ঠে লোকটাকে ডাকিল,—"ও আলু-চচ্চড়িওয়ালা— ?"

লোকটা তাহার কথায় কেবল হাসিয়া শিশুটিকে আমার দিকে একটু আগাইয়া দিয়া কহিল,—"কি জানি হুজুর। দু-বচ্ছর হয়ে গেল, এর কি হয়েছে, কিছুতেই সারে না। দিন দিন দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে। আগে একটু-আধটু খেলা করত, আজকাল তাও করে না। খালি এক জায়গায় চুপ ক'রে বসে থাকে—"

ভাবিলাম, এই লোকটা নিজেও চারিদিকে রোগ ছড়াইয়া বেড়ায় ; ইহার সন্তান যে রুগ্ন হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই।

কহিলাম,—"হুঁ। দেখি—"

শিশুটির গায়ের কাপড়খানি সরাইতেই দেখিলাম, একটি জীবন্ত কঙ্কাল—মাথাটি বড়, চোখ দুটি কোটরগত ও নিষ্প্রভ। হাত পাগুলা তালব্যজনীর শুষ্ক হাতলের মত শীর্ণ নীরস। দেহের অস্থিগুলি চামড়া ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। মনে ঈষৎ কারুণ্যের সঞ্চার হইল। কহিলাম,—"এ তোমার কে? কি নাম?"

"লড়্‌কি—। নাম এর লছ্‌মী—"

"গায়ে একখানা গরম কাপড় দাও নি কেন?

"কোথায় পাব, হুজুর?"

তাহার বেশভূষা দেখিয়াও এই সহজ কথাটি বুঝিতে পারি নাই! বুঝিতে পারি নাই যে, মেয়ের নাম "লছমী" হইলেও লছমী দেবী ইহার ঘরে বাস করেন না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "খেতে দাও কি? দুধ?"

"দুধ? হাঁ—তা—আধ পোয়া দিই। আর দু-এক টুকরা রুটি—"

"সর্ব্বনাশ! দুধের অভাবেই যে এই রোগ দাঁড়িয়েছে। ওর দু-গুণ দুধ দিতে হবে। হজম করতে পারলে আরও বেশী—মা আছে ত?"

লোকটা কপালে করাঘাত করিয়া কহিল,—"না হুজুর! একে দু মাসের রেখে মারা গেছে। আমার এক বুড়ী নানী ছিল—তার কাছে এ দেশে থাকত। সেও এর মা মারা যাবার দু-মাস পর মারা গেল। সেই থেকে আমার কাছে এনে রেখেছি। আর কার কাছে রাখব? কারুর কাছে থাকে না, খালি কাঁদে; সেই জন্যে কোথাও যেতে পারি না; কোন কাজও করতে পারি না। বিকেলের দিকে একটু ঘুমোয়। সেই ফাঁকে চট্‌পট্‌ মাথায় নিয়ে ফেরি করতে বার হই। তাতে দু-চার আনা যা পাই, তা দিয়ে বাপ-মেয়ের দুটো পেট ভরে না। আমার জন্যে ভাবি না, হুজুর। একবেলা না খেলে কি হবে? কিন্তু এ বাঁচবে কি করে? এ ক'দিন মেয়েটা আমায় একদণ্ড ছাড়ে নি। ফেরী করতে বার হ'তে পারি নি। পাড়ায় কিস্তিওয়ালার কাছ থেকে এক টাকা ধার করে ক'দিন চালিয়েছি। বাড়িওয়ালাও চার মাসের বাকী ভাড়ার জন্যে তাগিদ দিয়ে বলে গেছে ঘর ছেড়ে দাও—আমি—"

তাহার দুঃখের কাহিনী হয়ত আরও চলিত। মাঝ-পথে থামাইয়া দিয়া কহিলাম,—"কিন্তু দুধ না হ'লে সারবে কি ক'রে? ওষুধ দিচ্ছি। কিন্তু দুধ চাই-ই—বাটি দুধ, যতটা খেতে পারে—নইলে কোন কাজ হবে না—"

সহসা বাহির হইতে শীতের বাতাসের একটা দমকা ছুটিয়া আসিয়া ঘরময় ছড়াইয়া গেল। মেয়েটি তাহার হিমস্পর্শে হাত-পা সঙ্কুচিত করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পিতার বক্ষে মুখ লুকাইল।

ঔষধের ব্যবস্থাপত্রখানা লোকটার হাতে তুলিয়া দিতেই সে ব্যথাতুর কণ্ঠে কহিল,—"হুজুর আমি বড় গরিব। দাওয়াই কিনি সে পয়সাও আমার নেই। আমার লড়্‌কী বাঁচবে না?" বলিতে বলিতে তাহার চোখের পাতা দুটি অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিল।

তখনই আমার কোটের পিছনে টান পড়িতেই দেখি, রাণু আমার পিছনে দাঁড়াইয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকাইয়া আছে। মনে জাগিয়া উঠিল, তাহার মত আমারও যে মেয়ে আছে। নানা ঐশ্বর্য্যের মধ্যে পরম আনন্দে রাখিয়া স্নেহ দিয়া, ভালবাসা দিয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া পালন করিতেছি। তাহার ম্লান ক্লিষ্ট মুখ দেখিতে পারি না, ক্ষুদ্র বক্ষের ব্যথা-বেদনা আমার মর্ম্মে একটি গভীর রেখাপাত করে। কহিলাম,—"আচ্ছা, তোমার লড়্‌কীর সব বন্দোবস্ত ক'রে দেব। একটু ব'স—"

সেইদিনই দ্বিপ্রহরে রাণুর মাতাও এই শিশুটির জন্য রাণুরই পরিত্যক্ত অব্যবহার্য্য শীতবস্ত্রগুলি ও কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পাঠাইয়া দিলেন। ইহাতে কতক পরিমাণে নিশ্চিন্ত হইলাম। কিন্তু প্রাবন্ধ প্রবন্ধের শেষ অংশটুকু লিখিবার আর উৎসাহ রহিল না।

ইহার পর দুটি দিন-রাত্রি মাত্র কাটিয়াছে। লোকটা আবার সকালে আমার ডাক্তারখানায় হাজির। কিন্তু তাহার চোখ মুখ শুষ্ক।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কিরে, তোর লড়্‌কী কেমন আছে?"

কম্পিত কণ্ঠে সে কহিল,—"সে কাল থেকে কিছু খায় না, খালি "মা"—"মা" করে। বোধ হয় আর বাঁচবে

না হুজুর—" বলিতে বলিতে তাহার শুষ্ক গণ্ড বহিয়া জল ঝরিল।

হাতে তখন দুই চারিটি রোগী ছিল। কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা করিতে বলিয়া তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার গৃহোদ্দেশ্যে রওনা হইলাম।

খালের ধারে প্রকাণ্ড এক খোলার বস্তী। তাহার মধ্যে একখানি স্যাঁৎস্যেঁতে ঘরে তাহার বাসা। শিশুটি তাহারই এককোণে একখানি ছিন্ন কাঁথায় শুইয়া আছে। চারিদিক হইতে কেমন একটা অসুখকর গন্ধ আসিয়া আমার নাসিকা স্পর্শ করিতে লাগিল। সেই কদর্য্য ঘরে আমার এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইবারও স্পৃহা রহিল না। ইহার মধ্যেও মানুষ বাস করে, স্বর্গের কল্পনায় বিভোর হয়, সময় সময় আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়ে? পৃথিবী ছাড়িয়া যাইবার কালে ইহারই কঠিন মায়া তাহাকে কাঁদাইয়া দেয়—মনে হয়, ইহার বন্ধন চিরন্তন হোক, ইহার কোলেই যেন আবার ফিরিয়া আসি!

তাড়াতাড়ি শিশুটিকে পরীক্ষা করিলাম। কিন্তু সে যে বাঁচিবে এ আশা আমিও করিতে পারিলাম না। তবুও তাহার শঙ্কিত পিতাকে যথাসম্ভব ভরসা দিলাম। এবং সেইদিন হইতে মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলাম।

বন্ধুরা আমার কার্য্যকলাপে হাসিলেন। একজন কহিলেন,—"এমন কত মরছে—তুমি ক'জনকে এই ভাবে সাহায্য করবে?"

উত্তরে মাত্র কহিলাম;—"প্রত্যেকে যদি এই যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টাটুকুও করে, তাহলে অনেক হবে—"

অতঃপর তাঁহারা ইহা লইয়া আর মাথা ঘামাইলেন না।

কিন্তু পরদিনই শিশুটি আমার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া, তাহার পিতার স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া চলিয়া গেল!

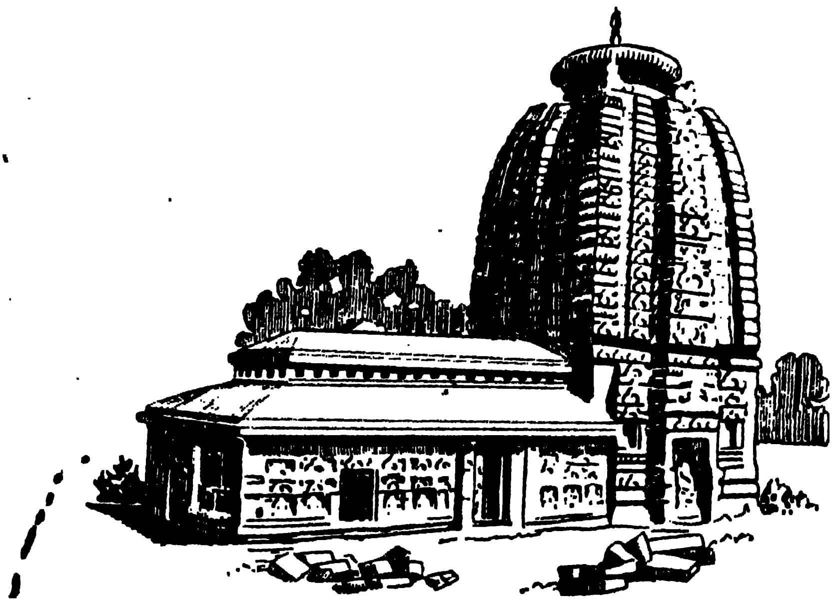
শুষ্ক মুখে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। রাধু তখনও আমার প্রতীক্ষায় বৈঠকখানায় বসিয়াছিল। আমাকে দেখিয়াই ছুটিয়া আসিল। এবং পরম আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা, সেই খুকুটা ভাল হয়েছে?"

তাহাকে তুলিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিলাম। ধীরে ধীরে কহিলাম,—"না মা, সে মারা গেছে।"

"তার বাবা খুব কাঁদছে?"

"হুঁ—"

সে আর কিছু বলিল না, আমার বক্ষে মুখ লুকাইল। আমার কানে তখন কেবলই বাজিতেছিল বন্ধহারা পিতার হাহাকার ধ্বনি। মনে হইতেছিল, তাহা যেন ক্রমে দেহ বিস্তার করিয়া চারিদিক হইতে ঊর্দ্ধে আকাশে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া যাইতেছে।



শ্রমের মর্য্যাদা—বাঙ্গালীর পরাজয়

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

গত ৩০ বৎসর যাবত সর্ব্বসাধারণের জন্য এই প্রশ্নের উত্তর ক্রমাগত ভাবিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি। দেখিতেছি, বাঙ্গালী যুবক সকল ক্ষেত্র হইতে পরাজিত হইয়া বিতাড়িত হইতেছে। মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, পঞ্জাবী, ওড়িয়া, পশ্চিমা, মান্দ্রাজী বন্যাস্রোতের মত কলিকাতা শহর দখল করিতেছে, এমন কি সুদূর মফঃস্বল পর্য্যন্ত ছাইয়া ফেলিতেছে—বাঙ্গালী আজ সত্যসত্যই "নিজ বাস ভূমে পরবাসী হলে"।

আনুপূর্ব্বিক কয়েকটি প্রবন্ধে ইহার কারণ নির্দ্ধারণ করিতেছি। প্রথমতঃ যাহা চোখের উপর প্রতীয়মান তাহারই দৃষ্টান্ত দিব।

বর্ত্তমান জগতে রাজনীতিক ক্ষেত্রে যে তিন চারি জন মহাশক্তিশালী পুরুষকে সমগ্র পৃথিবীর ভাগ্যবিধাতা-রূপে গণ্য করা যাইতে পারে—পর পর তাঁহাদের জীবন কাহিনী হইতে সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের বাল্যজীবনের সংগ্রামের বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

যাঁহারা "with a silver spoon in the mouth" লইয়া জগতে জন্মগ্রহণ করেন নাই, নিজের পুরুষকার এবং কর্ম্মবলেই পৃথিবীতে উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের বিশেষত্ব এই যে তাঁহারা তাঁহাদের বাল্যজীবনের কঠোর দারিদ্র্য এবং ভীষণ জীবন-সংগ্রামের কথা লোকসমক্ষে বর্ণনা করিতে কখনও কোন প্রকার লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করেন না।

ইংলণ্ডের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড তাঁহার বাল্যজীবন সম্বন্ধে বলেন "আমি জীবনে আজ সফলকাম হইয়াছি—অনেক দুঃখকষ্ট এবং বিরুদ্ধ স্রোতের সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করিয়াছি। কিন্তু একদিনের তরেও আমার বাল্যজীবনের কথা ভুলিয়া যাই নাই। পরম সুখের দিনে সেই সকল কথাই আমার বেশী করিয়া মনে পড়ে। একদিনের কথা বলি—খুব ভোরে উঠিয়া আলুর ক্ষেত্রে ঝুড়ি লইয়া আলু তুলিতে গিয়াছি। সেদিন দারুণ শীত, চারিদিকে ভীষণ তুষারপাত হইতেছে। ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়ায় মুখ, হাত পা জ্বালা করিতেছে। কষ্ট সহ্য করা অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে, চোখ দিয়া প্রায় জল পড়িবার মত অবস্থা! কাজে একটু বোধ হয় ঢিলা পড়িয়াছে—এমন সময় পরিদর্শক আমার গালে ভীষণ ভাবে এক চড় মারিল। আমার চোখ দিয়া ঝরঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। এখনও আমার সেই দিনের কথা মনে হইলে বেদনা অনুভব করি। পার্লামেণ্ট হাউসে বসিয়াও আমার এই দিনের কথা প্রায়ই মনে হয়—সেই প্রহারের বেদনা যেন নতুন করিয়া অনুভব করি। এই সময়ের সুখের স্মৃতিও আমার আছে। দিনের কাজ শেষ করিয়া যখন দল বাঁধিয়া গান করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতাম তখন আমাদের সঙ্গে রঙীন কাপড়ের পোষাক পরিয়া একটি মেয়ে ৩।৪ বছরের একটি ছেলের হাত ধরিয়া যাইত—তাহার কথাও আজ বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে!"

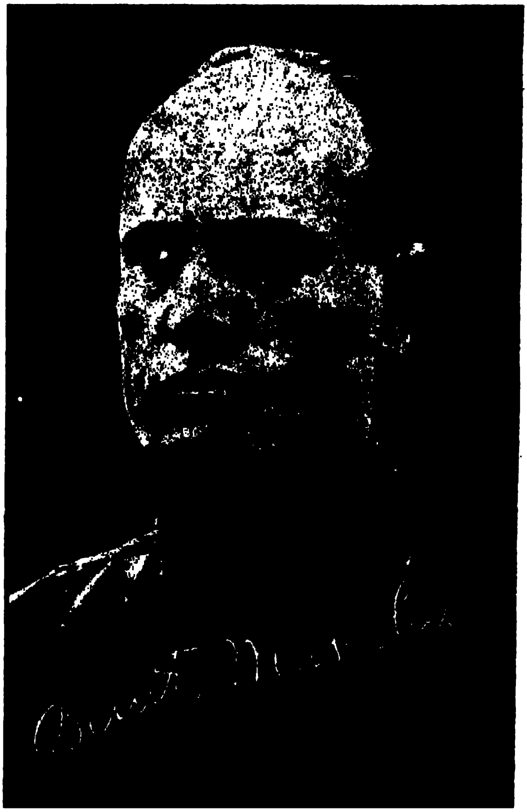
"আমার বাল্যকালের আর একটি ঘটনার কথা বেশ মনে আছে। কোন কারণবশতঃ পাদরী-গিরির চেষ্টা ছাড়িয়া এক ব্যক্তি লসিমাথের রাস্তায় ঠেলা-গাড়ী লইয়া ছেঁড়া ন্যাকড়া এবং হাড় সংগ্রহ করিয়া বেড়াইত (বিক্রয়ের জন্য)—তাহার ঠেলা-গাড়ীর সামনে একটি ফ্রেমে বই পাতাখোলা অবস্থায় পড়িবার মত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। 'হাড়গোড় বিক্রি, ছেঁড়া ন্যাকড়া বিক্রি,' হাঁকিতে হাঁকিতে সে পথ চলিত এবং সামান্য একটু অবসর পাইলেই বই পড়িত। ইহার কথা এত করিয়া মনে থাকিবার কারণ এই যে—সে

আমার হাতে একদিন একটি বিশেষ বই দেখিয়া জিজ্ঞাসা করে,—'তুমি এই-সব বই পড়তে ভালবাস না কি?'—আমি 'হাঁ' বলাতে সে আমাকে একখণ্ড গ্রীক ভাষায় লিখিত হেরোডোটাসের ইতিহাস পড়িতে দিল। ইহার পর সে বেশ কয়মাস আমাকে নানাপ্রকার পুস্তক দিয়া বহু সাহায্য করে। এই ব্যক্তি অবস্থার বৈগুণ্য জন্ত বিদ্যালয় ছাড়িয়া ঠেলা-গাড়ি ঠেলিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত, কিন্তু এই ভীষণ দারিদ্র্য দুঃখকষ্টের মধ্যেও নিজের পড়িবার অদম্য উৎসাহ দমন করিতে পারে নাই। অতি হীন কাজের মধ্যেও নিজের পড়িবার সুবিধা করিয়া লইয়াছিল।

ইটালীর বর্ত্তমান ভাগ্যবিধাতা কর্ম্মবীর মুসোলিনীর দিন এক সময় কি কঠিন দারিদ্র্য এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে—এমন গিয়াছে যে ক্ষুধার তাড়নায় তিনি পাগলের মত হইয়া রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি ছিল স্থির—লক্ষ্য ছিল ধ্রুব, তাই সকল কষ্ট, সকল বাধা অতিক্রম করিয়া আজ একটি প্রকাণ্ড রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। দেশের রাজাকেও আজ মুসোলিনীর কথা-মত চলিতে ফিরিতে হয়!

জীবনে মুসোলিনীকে কি প্রকার কঠোর সংগ্রাম করিতে হয় তাহার দু-একটির দৃষ্টান্ত এইস্থানে দেওয়া হইল।

"মুসোলিনী লোজানে আসিয়া প্রথমে কোন কাজই পান নাই; এবং জীবনধারণ করিবার মত কোন কাজের জন্ত তাঁহাকে অনেক ঘুরিতে হইয়াছিল। কাজ পাইবার পূর্ব্বে তিনি নিদারুণ কষ্ট পাইয়াছিলেন। এমনও হয় যে একবার পয়সার অভাবে তাঁহাকে অনেকের নিকট সাহায্য চাহিতে হইয়াছিল, এবং আর একবার ৩৬ ঘণ্টা অনশনে থাকিবার পর তিনি সামান্য এক টুকরা রুটি পর্য্যন্ত ভিক্ষা করিয়াছিলেন। রোসাটে এইরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। একদিন রাত্রে মুসোলিনী এক বাড়িতে কয়েক জনকে অঙ্গনে বসিয়া খাইতে দেখিয়া কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিবার পর, সাহস করিয়া অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনাদের আর রুটি আছে কি?' হঠাৎ এইরূপ একজন লোকের আবির্ভাবে সকলেই অবাক হইয়া গেল। মুসোলিনী বলিলেন, 'আমাকে এক টুকরা রুটি দিন্।' কোন উত্তর নাই। অবশেষে গৃহকর্ত্তা এক টুকরা রুটি মুসোলিনীকে দান করিলেন। তিনি ধন্যবাদ দিয়া বাহিরে গেলেন। কেহ কোন কথা না বলিয়া কেবল এক টুকরা রুটি ছুঁড়িয়া দিতে দেখিয়া মুসোলিনী অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলেন—তিনি



মুসোলিনী

এই রুটির টুকরা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবার জন্ত হাত উঠাইলেন, কিন্তু দারুণ ক্ষুধার তাড়নায় তাঁহার উত্তোলিত হস্ত মুখে আসিয়া ঠেকিল! শেষকালে তিনি অত্যন্ত আগ্রহসহকারে সেই রুটি পথ চলিতে চলিতে খাইয়াছিলেন।

১৯২৭ সালের মার্চ্চ মাসে ইটালীর অনেক সংবাদপত্রে মুসোলিনীর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ঘটনাটি প্রকাশিত হইয়াছিল। ঘটনাটি পিয়েত্রোনাজে নামে বের্গামোবাসী একজন গৃহনির্ম্মাতা লিখিয়াছেন।

"এই সময়ে মুসোলিনী কাজের অন্বেষণে লোজানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। একদিন সকালে আমার স্ত্রী বাজার হইতে কিছু জিনিষপত্র কিনিয়া ফিরিতেছিলেন, এমন সময় একটি পুলের উপরে ছাই রঙের পোষাক পরিহিত এক যুবক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কি ইটালিয়ান?' আমার স্ত্রী বলিলেন, 'না, আমি বের্গামাস্কা।' এই কথা শুনিয়া যুবকটি অল্প হাসিয়া বলিলেন, 'দেখুন আমি কাজ খুঁজছি, আপনি কি আমায় এমন কোন লোকের কাছে পাঠাতে পারেন যিনি আমায় কোন কাজ দিতে পারেন?' এই কথা শুনিয়া যুবকটিকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন; আমি তখনই তাহাকে মজুরের কাজে নিযুক্ত করিয়া পরদিন হইতে আসিতে বলিলাম।"

সুইট্‌জারলাণ্ডে শীত খুব বেশী বলিয়া শীতকালে সেখানে গৃহ-নির্ম্মাণ কাজ বন্ধ থাকে। মুসোলিনী এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ও নৈশ-বিদ্যালয়ের ক্লাসে যাইতেন; কিন্তু দৈহিক পরিশ্রমের কাজ একেবারে ছাড়িতেন না। তিনি কোনও দোকানদারের অধীনে কুলির কাজ লইয়া মালপত্র খরিদ্দারের বাড়িতে বহন করিতেন; ইহাতে তাঁহার যে আয় হইত, তাহা হইতে তিনি খাবার খরচ ও পড়াশুনার খরচ চালাইতেন।

রুসিয়ার রাষ্ট্র অধিনায়ক ও সর্ব্বেসর্ব্বা ষ্টালিন (Stalin) বাল্যকালে তাঁহার পৈত্রিক ব্যবসায়—জুতা-সেলাই—অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেন। কিন্তু অবসর পাইলেই পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিতেন। আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট হুভারও বাল্যজীবনে ঘোড়ার সহিসগিরি করিয়া দিন গুজরাণ করিয়াছিলেন।

ইতিহাস-পাঠে দেখা যায়—পৃথিবীর সর্ব্বত্রই যে-সকল মহামানব সামান্য অবস্থা হইতে সংগ্রামের পর সংগ্রাম করিয়া জীবনে সাফল্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই অতি অসম্ভব দুঃখকষ্ট এবং দারিদ্র্যের মধ্যেও নিজের পথ হারান নাই—সকল অবস্থাতেই তাঁহারা পূর্ণ আশা ও উদ্যম লইয়া কাজ করিয়াছেন। সামান্য বাধাবিপত্তিতে যাহারা নিরাশ হইয়া স্রোতে গা ভাসায়, তাহারা জীবনে কখনও সাফল্যলাভ করে নাই। উপরে যে কয়জন কর্ম্মবীরের কথা লেখা হইল তাঁহারা যদি সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হইতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহাদের নাম, আমরা দূরের কথা, তাঁহাদের নিজ নিজ দেশের লোকেরাও শুনিতে পাইত না। যুগের পর যুগ ধরিয়া যে বিস্মৃতির পথে অগণিত মানব-স্রোত চলিয়া গিয়াছে—তাঁহারাও সেই স্রোতে ভাসিয়া যাইতেন।

বাঙালীকে যদি আজ দাঁড়াইতে হয়, তাহা হইলে জীবনসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। বাংলা দেশে বাঙালীর স্থান যে কোথায়, তাহা পূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি। আজ সকল রকম ব্যবসাবাণিজ্য বাংলা দেশে অবাঙালীর হাতে—বাঙালী আজ সামান্য চাকুরিয়া মাত্র। বাঙালী আজ 'বাবু' বলিয়া পরিচিত। সামান্য কায়িক পরিশ্রমে বাঙালী অপমান বোধ করে! কায়িক পরিশ্রমের কাজে বাঙালী ভয় পায়! ইহার ফলে বাংলা দেশে আজ বাঙালী কুলী, মজুর, কারিগর, রাজমিস্ত্রি, ছুতারমিস্ত্রি, কলের কুলী, ইত্যাদি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না বলিলেই হয়। এই সমস্ত কাজে বাংলা দেশে এখন শতকরা ৯০ জন অবাঙালী বাংলার টাকা নিজের দেশে লইয়া যাইতেছে। আর বাঙালী বিনা অন্নে প্রায় ধ্বংসের মুখে আসিয়া পৌঁছিয়াছে! এই ভাবে চলিলে আর পঞ্চাশ বছর পরে বাংলা দেশে জনকয়েক উকীল মোক্তার ও জনকয়েক আপিসের বাবু ছাড়া আর অন্ততঃ মধ্যবিত্ত বাঙালী খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

পত্রধারা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১)

শান্তিনিকেতন

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুশি হলুম। দুরবস্থাগ্রস্ত শরীর মন নিয়ে কর্ম্মসংক্ষেপ করবার চেষ্টা করি কিন্তু কর্ম্ম বেড়েই চলে।

চিঠিতে তুমি যে আশ্রমের বর্ণনা করেচ তার মধ্যে রসের যে উদ্ভাবনা আছে আমার কল্পনাকে তা যে স্পর্শ করে না এমন কথা মনে কোরো না। কিন্তু মানব-সংসারের সমস্ত দায়িত্বকে বাইরে ঠেকিয়ে রেখে বুদ্ধি-বৃত্তিকে অন্ধ ক'রে নিরন্তর ভাবরসসম্ভোগে আত্মবিস্মৃত হওয়ার মধ্যে যতই সুখ বা শান্তি থাক, তাকে আমি কোনোমতেই শ্রেয় বলে মনে করতে পারিনে। এই ধর্ম্মবিলাসিতায় আমাদের দেশকে মর্ম্মে মর্ম্মে মেরেচে। সম্প্রতি নবজাগ্রত পারস্য ও আরব্যকে দেখে এসেচি, পূর্ব্বে দেখেচি জাপানকে, তারা ধর্ম্মমোহ থেকে মুক্ত হয়ে তবেই রাষ্ট্রীয় মুক্তি পাবার অধিকারী হয়েচে— হতভাগ্য ভারতবর্ষ এই মোহের কুহেলিকায় আবৃত। তাই সে সকলপ্রকার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত, তার অপমানের আর অন্ত নেই। তবু কর্ত্তব্যবিমুখ মূঢ় ভক্তি নিয়ে ঠাকুরঘরের মধ্যে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকাকেই যারা পরমার্থ বলে জানে—তারা যে কত বড় অকৃতার্থ তা বোঝবার শক্তিও তাদের নেই, কেননা তারা ভাবমদে অপ্রকৃতিস্থ।

কঠিন দুঃখের দিন এসেচে কিন্তু নেশায় নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চাইনে—কণ্টকিত পথের উপর দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত নিজের লক্ষ্য অভিমুখে চলতে হবে। এক এক সময়ে ক্লান্তি আসে, তখন পালাতে ইচ্ছা করে যেমন ক'রে একদিন ইস্কুল পালাতুম। তখন আবার ধিক্কার আসে মনে, লজ্জা পাই। ইস্কুল মাষ্টার তো নেই, নিজেকেই নিজে বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে দিই। অতএব ফাঁকি দেব কাকে, পশ্চাতে নিজের চৌকিদার নিজেই আছি। মনকে এক একবার বোঝাতে চাই, কর্ম্ম আমার জন্যে নয় আমার জন্যে কাব্য। কিন্তু মন যে বোকা নয়, তাকে কথায় ভোলানো শক্ত। অতএব শেষ পর্য্যন্তই আছে খাটুনি। ইতি ৬ শ্রাবণ ১৩৩৯।

(২)

শান্তিনিকেতন

ভারতবর্ষে দ্রাবিড়জাতীয়দের সমাজ মাতৃতন্ত্র, অর্থাৎ সে সমাজে স্ত্রীপ্রাধান্য। এটা যে হ'তে পেরেচে তার প্রধান কারণ, তাদের ভাবপ্রবণ স্বভাব। সর্ব্বদা ভাবরসে তাদের মন আর্দ্র। যাদের এই রকমের প্রকৃতি নিজের মধ্যে এই ভাবরসকে উদ্বেল ক'রে তোলাই তাদের ধর্ম্মসাধনার চরম লক্ষ্য। তারা আপন হৃদয়বৃত্তিকে চরিতার্থতা দেবার জন্যেই নিজের দেবতাকে ব্যবহার করে। এই রসোন্মত্ততায় বিশ্বসংসারকে ভুলে থাকাকেই তারা ধার্ম্মিকতা ব'লে মনে করে। এই পানগোষ্ঠীর বাইরে তাদের পক্ষে সমস্তই অশুচি, সমস্তই পরিত্যাজ্য। এত বড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেন তৈরি হয়েছিল, এ ভুল করেছিল কে? ভোজ্য আয়োজনে নিরন্তর ব্যাপৃত, ধূপে দীপে মাল্যে মণ্ডিত, কীর্ত্তনে ভজনে নিত্যমুখরিত, আত্মবিস্মৃত এই এক-একটি সঙ্কীর্ণ রসমণ্ডলীর বাইরে যে বিপুল সংসার পড়ে আছে, ভক্তিভাবাকুলদের পক্ষে সেখানে যেন দেবতার অরাজকতা,—সেখানে বিশ্ববিধাতার কোনো দাবি নেই, কোনো আহ্বান নেই। এই রকম মনোভাবটি মেয়েলি— সেই চিত্তবৃত্তির মধ্যে কর্ম্মের প্রাধান্য নেই, বুদ্ধির সর্ব্বদা গদ্গদ বাষ্পাবিলতা। এই প্রেমভক্তি নিজের মধ্যেই নিজে আবর্ত্তিত। এ'কে স্বার্থপরতা যদিবা না বলি তবু এ'কে বলা যায় আত্মপরতা।

বাঙালী অনেক অংশে দ্রাবিড়, এই জন্তে তার এত বেশী ভাবাকুলতা। তার মানসক্ষেত্রের এই অতিরিক্ত আর্দ্রতা যদি না ঘোচে তাহলে সে ভাবোদ্বেগে মরীয়া হ'তে পারবে কিন্তু কিছুই সৃষ্টি করতে পারবে না। একদিকে তার আছে কোনো একটা সঙ্কীর্ণ কেন্দ্রকে ঘিরে ভাবাবিষ্ট অন্ধ আত্মনিবেদন, আর একদিকে নিজের চক্রের বাইরে ঈর্ষা বিদ্বেষ কলহ-পরতা। কী জানি আমার প্রকৃতির কাছে এই মাতামাতি, এই হৃদয়াবেগে আবর্ত্তিত বিচিত্র নিরর্থকতা একান্ত অরুচিকর। অন্তত পুরুষের পক্ষে এটা একান্ত অমর্য্যাদাকর এবং দেশের পক্ষে এটা সাংঘাতিক দুর্ব্বলতা-জনক ব'লে মনে হয়। ভারতবর্ষে একরকম সন্ন্যাসী আছে যারা শুষ্কতার মরুভূমির মধ্যে নিরুদ্দেশ, আর একরকম ভক্তবৈরাগী আছে যারা সিক্ততার তারল্যের মধ্যে আপাদমস্তক নিমজ্জিত। এদের কাছে যারা দীক্ষা নিচ্চে মানুষের বিধাতা তাদের হারালেন। তবে তারা মানুষের ঘরে জন্মালো কেন? মানুষের কাছে জ্ঞানে ভাবে ভোগে তাদের যে অপরিসীম ঋণ তার কী শোধ করলে? আমি তো বলি, থাক্ ভক্তি থাক্ পূজা, মানুষের সেবায় দেবতার যথার্থ প্রসন্নতা যেন লাভ করি।

আমার এমনি স্বভাব যে প্রথম থেকেই তোমাকে কেবল পীড়া দিচ্চি। ধর্ম্মকে অবলম্বন ক'রে রস-সম্ভোগ করাকেই তুমি যদি চরম শ্লাঘনীয় না বলতে তাহলে আমি চুপ করে থাকতুম। কিন্তু তুমি যে তোমার পূজার উপলক্ষ্য করে আমার মানব-দেবতাকে উপেক্ষা করতে চাও, তার মধ্যে কাল্পনিক অশুচিতা মূঢ়ভাবে আরোপ ক'রে তাকে অবমানিত করতে চাও সে আমি সহ্য করতে পারিনে। তুমি আমাকে অনুনয় ক'রে বলেচ দেবতাকে আমি যেন অবজ্ঞা না করি—কেন করব অবজ্ঞা—যে জীবনবেদীতে তাঁর সত্য প্রতিষ্ঠা, যেখান থেকে তিনি আমাদের কঠোর তপস্যা ও আত্মত্যাগ চান সেখানেই তাঁকে আমার সমস্ত সম্মান দিতে চাই—পারিনে বলেই আমার দুঃখ। আশা করি আমার সাধনা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয় নি। ইতি ১২ই শ্রাবণ ১৩৩৯।

(৩)

শান্তিনিকেতন

পরমার্থ শব্দের অর্থ আমি যতদূর জানি তাতে এই বুঝেচি যে ওটা স্বার্থ ও সমাজবিধির উপরে। যাঁরা পরমার্থ সাধন করেন তাঁদের কাছে স্বার্থ নেই সামাজিক বিধিবিধান নেই। কোনো মানুষকে তাঁরা অবজ্ঞা করেন না ঘৃণা করেন না অস্পৃশ্য ব'লে বর্জ্জন করেন না। তাঁদের শুচিবায়ুগ্রস্ত সাধনার সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র কৃত্রিম প্রাচীর ঘেরা নয়। তাঁরা নির্বিচারে সকল মানুষের আপন। তে **সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ** প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ **সর্ব্বমেবাবিশন্তি**। তোমার পরমার্থ ছোঁওয়া খাওয়া নিয়ে, ব্রাহ্মণ শূদ্রের জাতবিচার নিয়ে। তুমি সর্ব্বদাই যে হিন্দুয়ানির কথা ব'লে থাকো সেই হিন্দুর অধ্যাত্মশাস্ত্রেও পরমার্থ শব্দের এমন কোনো ব্যাখ্যা শুনিনি যাতে নমশূদ্রের আঙিনার কাছে এসে তাকে ঠোকর খেয়ে পড়তে হয়। শাস্ত্রবিহিত আচারের ব্যত্যয় সত্ত্বেও পারমার্থিক উৎকর্ষ লাভ করেচেন এমন নমশূদ্র সাধককে আমরা জানি।

তারপরে প্রাচীন কালের কথা আলোচনা করলে দেখা যায়, তপোবনে ভোজ্য-সম্বন্ধে ঋষিদের যে রুচি ছিল তৎসত্ত্বেও তখনকার কালে যদি পরমার্থসাধন সম্ভব হ'ত তবে এখন হবে না কেন? কালের গায়ে তো জাতের ছোঁয়াচ লাগে না। ভবভূতির উত্তরচরিতে তপোবনের আহার্য্যের উল্লেখ আছে। পৃথিবীতে ভারতবর্ষের বাইরে আরও অনেক দেশ আছে। যে-দেবতাকে আমরা স্মার্ত্ত পণ্ডিতের লাগাম বেঁধে শুচি ক'রে রেখেচি, আশা করি সেই সব দেশও এই দেবতারই সৃষ্টি। সে-সব দেশেও এমন সকল ভক্ত ও সাধকদের জন্ম হয়েচে, পৃথিবী যাঁদের পায়ের ধুলো পেয়ে পবিত্র। আজ তোমার ঘরে তাঁরা প্রবেশ করলে তোমার ঘর গোবর গঙ্গাজল দিয়ে তুমি শোধন ক'রে নিতে, কিন্তু তাই বলেই তুমি তাঁদের চেয়ে শুচিতর যেহেতু তুমি ছুঁৎমার্গে অনেকদূর অগ্রসর হয়েচ, পরমার্থের খাতিরে এমন অহঙ্কার মনে পালন কোরো না। মানবের ইতিহাস সেই সব ম্লেচ্ছদের আবির্ভাবে গৌরবান্বিত হয়েচে, তাঁদের

চরিত স্মরণ করলে অনুসরণ করলে পরমার্থের পথ বাধাহীন হয়।

যথার্থ পরমার্থের আদর্শে বিচার করলে আমি অশুচি তাতে সন্দেহ নেই। তার কারণ এ নয় যে, আমি খাওয়া ছোঁওয়া বাঁচিয়ে চলিনে—তার কারণ আমার মন নিষ্পাপ নয়। দিনে দশবার গঙ্গাস্নান ক'রে সকল প্রকার শকড়ি বাঁচিয়ে আতপ তণ্ডুল খেলেও আমি অশুচি। কিন্তু তবু বিধাতা আমাকে ত্যাগ করেন নি, মানুষও যে করবে এমন অমানুষিকতা আমি প্রত্যাশা করিনে। তুমি যে-সব অতি-সাবধানী সাধকদের কথা লেখো, বিশ্ববিধাতার অধিকাংশ সৃষ্টি যাঁদের কাছে বর্জ্জনীয় তাঁরা বিশ্বদেবকেও অশুচি ব'লে জেনেচেন ও সেইভাবে ব্যবহার করেচেন এত বড় পারমার্থিক অশুচিতা কিছু কি কল্পনা করা যেতে পারে?

আমার সময় নেই অথচ এসব প্রশ্ন উঠলে চুপ ক'রে থাকা আমি অকর্ত্তব্য ব'লে মনে করি। তোমাকে পীড়া দিতে দুঃখ পাই তবুও সত্যের অপমান চুপ ক'রে স্বীকার করতে পারি নে।

তীর্থসংস্কার সম্বন্ধে যা-কিছু লিখেচ তা আমি মানি কিন্তু দেশের লোকের অন্তরে যে তামসিকতা যে মলিনতা আছে তীর্থে তাই ব্যক্ত না হয়ে থাকতে পারে না। আমরা সংস্কার মানি সত্যকে মানিনে বলেই সর্ব্বত্র এত বাহ্য আচার এবং আন্তরিক নোংরামি। আমাদের পৌরুষ-হীন কর্ম্মহীন ভাবরসাবেশে সর্ব্বদা বাষ্পাচ্ছন্ন ভক্তি কেবল আপনার ভাববিলাসিতা পরিতৃপ্তির জন্যে নিজেকে বিহ্বল করেচে, মানুষকে সে চেয়ে দেখে না, ঠেকিয়ে রাখে; মানুষের মূঢ়তা মলিনতা দূর করবে কি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে অশ্রুবর্ষণ ক'রে? নিজের শুচিতা রক্ষার আগ্রহে তারা যদি অশুচি মানুষকে দূরে রাখে তবে সেই সব মানুষের কলঙ্কগুলো জমে উঠবে না কেন? যখন সেই কালিমা চোখে পড়ে তখন তারা নিজের পবিত্রতা-বোধের খাতিরেই নাসাকুঞ্চন করে কিন্তু সেই সব মানুষের পরিত্রাণের কথা ভাবে কি? ইতি ৪ আগষ্ট ১৯৩২।

শৃঙ্খল

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

১০

"Halt · Form force···As you were···Dismiss."

বিমানের গলা।

সিঁড়িতে কতগুলি পায়ের দুপদাপ। কাহারা উপরে উঠিল···নামিয়া গেল। গলির মুখে বাহিরের দরজার কপাটটা বন্ধ হইল। সুভদ্র বৈকুণ্ঠকে ডাকিয়া উপরে বিমানের ঘরে এক বাল্‌তি জল দিতে বলিতেছে।··· কিছুক্ষণ ধরিয়া জল ঢালা-ঢালির ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ। আরও মিনিট পাঁচসাত কাটিয়া গেলে অজয় পা টিপিয়া বাহির হইয়া বিমানের ঘরে উঁকি দিল। জামাজুতা সুদ্ধ বিমান বিছানায় চিৎপাত হইয়া শুইয়া আছে, তাহার মাথার কাছে একটা ঈজি-চেয়ারে সুভদ্র স্তব্ধ হইয়া বসিয়া। দ্বারের কাছ হইতে কুণ্ঠিত স্বরে অজয় কহিল, "কি হয়েছে সুভদ্র?"

সুভদ্র কহিল, "কি আবার হবে?"

ঘরের বাতাসে একটা উৎকট গন্ধ। যেন কোথাও ষ্টোভ ধরাইতে গিয়া কেহ মেথিলেটেড স্পিরিটের একটা বোতল উল্টাইয়াছে। অজয় সব বুঝিয়াও যেন কিছুই বুঝিল না। ধীরে ঘরে প্রবেশ করিতে যাইবে, বেশ কঠিন স্বরেই সুভদ্র কহিল, "তুমি এই শীতের রাতে কি করতে আবার উঠে এসেছ? যাও, শোওগে যাও।"

"ঘুম পাচ্ছে না।"

"তা ঘুম না পাচ্ছে, বই নিয়ে পড় গে। এখানে তোমায় আসতে কে বলল?"

অজয় নিঃশব্দে ফিরিয়া চলিল। বারান্দাটুকু পার হইতে হইতে শুনিল, বিমান গোঙাইয়া বলিতেছে, "কেন বাবা তাড়িয়ে দিচ্ছ? চরিত্তির খারাপ হয়ে যাবে? ঐ ত তোমাদের জাতের দোষ। মাটিতে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকো আর রাম-নাম জপ করো, ভূতটাকে চোখ তাকিয়ে দেখলে যে ভূত পালায় সে আর তোমরা কোনো জন্মে শিখবে না।"

সুভদ্র তাহাকে ধম্‌কাইয়া বলিতেছে, "আচ্ছা, আচ্ছা, ঢের বক্তৃতা হয়েছে, তুমি থামো।"

বিমান রুখিয়া উঠিয়া বলিতেছে, "খবর্দার..."

কি অদ্ভুত! জীবনকে তাহার কুৎসিত অন্তরঙ্গতায় এত কাছ হইতে তাহাকে আজ প্রত্যক্ষ করিতে হইবে তাহা কে জানিত? অজয়ের সমস্ত দেহ যেন ক্লেদাক্ত হইয়া শিহরিয়া উঠিল। না, আজিকার এই অভিজ্ঞতা তাহার নহে, দেহে মনে কোথাও তাহাকে ইহা স্পর্শ করে নাই, ইহা স্বপ্ন, অজয় স্বপ্ন দেখিতেছে।...সত্যই হয়ত এই কয়দিন ধরিয়া অজয় স্বপ্ন দেখিতেছে। তাহার চতুষ্পার্শ্বের পৃথিবী কোথাও তাহাকে নিবিড় করিয়া, দৃঢ় করিয়া স্পর্শ করিতেছে না ত। সে কেমন করিয়া জানিবে সে জাগিয়া আছে? বিমান, সুভদ্র, বীণা, ঐন্দ্রিলা, তাহার পরিচিত জগতের কাহারও সঙ্গে, কোনও কিছুর সঙ্গে তাহার অন্তরতম মনের কোনও যোগ নাই। তাহার সত্যকারের সুখদুঃখ দিয়া অপর কাহাকেও সে ছুঁইতেছে না, নিজের মনে অপর কাহারও সত্যকারের সুখদুঃখের ছোঁয়া সে পাইতেছে না। স্বপ্নময় অবাস্তবতায় রঙীন ছায়ার মত সকলে আজ এই মুহূর্ত্তে কাছাকাছি ভাসিয়া বেড়াইতেছে, পলক ফেলিতে কে কোথায় ভাসিয়া যাইবে তাহার ঠিক নাই, চরমতম বিচ্ছেদেরও কোনও চিহ্ন তখন কোথাও আঁকা পড়িবে না। বিছানায় শুইয়া গভীর নিশ্চিন্ততায় অজয়ের দুই চোখ জুড়িয়া আসিল।

আর-একটা রাত্রি প্রভাত হইল। পূবদিকের বাতায়ন খোলাই ছিল, বিপরীত দিকের দেওয়ালে আলো পড়িয়া ঝকঝক করিতেছে। এত অজস্র আলোয় চোখ চাহিয়া জীবনকে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সহজ হয় না। কেবল জোর করিয়া বিমানের চিন্তাকে অজয় দূরে সরাইয়া রাখিল। আকাশ জুড়িয়া লক্ষ তরবারি ঝলকিয়া উঠিয়াছে, অন্ধকারের বিরুদ্ধে, কদর্য্যতার বিরুদ্ধে যোদ্ধ আলোকের এই জয়যাত্রা। ছোট একটা অন্ধকার ঘরে গভীর রাত্রিতে কাহারা জল-ঢালাঢালি করিয়াছে, সে স্মৃতি এক ফোঁটা কালির মত আলোকের মহাসমুদ্রে পড়িয়া অনায়াসে নিশ্চিহ্ন হইয়া মিশিয়া গেল।

একটা ফেরি-ওয়ালা হাঁকিয়া যাইতেছে। রোজ এই পথ দিয়া এই সময়ে সে হাঁকিয়া যায়। তাহার চেহারা অজয় কখনও দেখে নাই, দেখিতে তাহার ইচ্ছাও করে নাই। মানুষটাকে বাদ দিয়া তাহার হাঁকটা শুনিতেই তাহার ভাল লাগে।...পূর্ব্ব রাত্রির কথা মনে পড়িল, বীণা-ঐন্দ্রিলা, ঐন্দ্রিলা-বীণা। কিছুক্ষণ পর নিজেরই অজ্ঞাতে মানুষগুলিকে বাদ দিয়া একটা নামহীন মাধুর্য্যের আস্বাদ সমস্ত মন দিয়া সে লইতে লাগিল। মনে পড়িল, কথা বলিতে বলিতে কাল কি গভীর আবেগ তাহার কণ্ঠে প্রকাশ পাইয়াছিল। দেশের দুঃখদুর্গতির মূল সে খুঁজিয়া বাহির করিবে এই তাহার দুঃসাহসিক পণ, দেশের লুপ্ত ইতিহাসের অন্ধকার গুহাপথে কেবলমাত্র অন্তরের অনির্ব্বাণ আগ্রহকে বাতির মত জ্বালিয়া সে অগ্রসর হইয়া যাইবে। আজই সে যাত্রা সুরু করিবে, আজ এই মুহূর্ত্তে। এতকাল সময়ের অপব্যবহার, ক্ষমতার অপচয় করিয়া সে কাটাইয়াছে। কলেজে বৎসরের পর বৎসর সে পুঁথির পর পুঁথি মুখস্থ করিয়াছে। যুগে যুগে পৃথিবীতে কত শক্তির অভ্যুত্থান তিরোধান, শক্তির সঙ্গে শক্তির সংঘর্ষ, কত যুদ্ধ-বিগ্রহ অরাজকতা, সর্ব্বগ্রাসী প্লাবনের শেষে পলিপড়া মাটিতে নূতন সভ্যতার অভ্যুদয়, তাহার প্রত্যেকটির সম্বন্ধে সকল জ্ঞাতব্য তথ্যই তাহার অধিগত হইয়াছে, কিন্তু কলেজের প্রাচীরের বাহিরে যেখানে মানুষের বহুদুঃখদুর্গতি দিয়া গড়া সত্যকারের পৃথিবীর সুরু সেখানে এই অধীত বিদ্যা তাহার কোন্ কাজে লাগিবে তাহা কেহ তাহাকে আজ অবধি বলিয়া দেয় নাই। ভারতের বহু ইতিহাস সে পড়িয়াছে, বহু গৌরবের, অগৌরবেরও ইতিহাস কিন্তু ভারতের আজিকার অধোগতির সঙ্গে তাহার অতীত ঐতিহ্যের যে

কোনও সংস্পর্শ আছে এমন কথার উল্লেখমাত্র কোথাও তাহার চোখে পড়ে নাই।

ওপাশের ঘর হইতে ভাঙা গলায় বিমান গাহিয়া উঠিল,

"There was a man of Peru, He didn't know what to do···

ঘুম ভাঙা সত্ত্বেও বিমান বিছানাতেই এতক্ষণ পড়িয়া ছিল। শিয়রের জানালাটা খুলিয়া দিতেই তীব্র রোদের ঝাঁজ তাহার চক্ষে আসিয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ জানালাটা আবার বন্ধ করিয়া দিয়া সুভদ্রের পরিত্যক্ত ঈজিচেয়ারটাতে বসিয়া পড়িয়া নিজের মনেই সে কহিল, "রোদের ইউনিট্ শুনে কেউ বিল্ করে না কিনা তাই এত তেজ। কি বিটকেল বাবা, চোখদুটো ঝল্‌সে গেছে একেবারে।···and that was the end of the man of Peru."

এদিকের ঘরে অজয়ও এক মুহূর্ত্ত দুই চোখ বন্ধ করিয়া মনটাকে স্থির করিয়া লইল। না, সে শুনিতে পায় নাই। আজ তাহার জীবনের ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত, নূতন যাত্রাপথে অসীমতা-ভরা আলোর আশীর্ব্বাদকে সে পাথেয় করিয়া লইবে। আজ কোনও অন্ধকার না, কদর্য্যতা না, বিমানকে আজ সে ভুলিয়া থাকিবে। সে জানে তাহার অভীষ্টলাভ সহজ হইবে না। নিজের মধ্যেকার চূড়ান্ত মূল্য তিলতিল করিয়া তাহাকে দিতে হইবে। দুস্তর সাধানার পথে বহু আত্মোৎসর্গের বিনিময়ে একটু একটু করিয়া সিদ্ধি তাহার করতলগত হইবে। হয়ত শেষ পর্য্যন্ত কোনও সুখ, কোনও আনন্দ তাহার জীবনে অবশিষ্ট থাকিবে না, হয়ত এই পথে ঐন্দ্রিলাকেও সে হারাইবে, কিন্তু সে ভয় করিবে না। নিরর্থক বাঁচিয়া থাকার এই যে জীবন ইহার মধ্যে ঐন্দ্রিলাকে পাইয়াই কি সে সুখী হইবে?

গলাটাকে পরিষ্কার করিয়া লইয়া বিমান গাহিয়া উঠিল,

"There was a man of Madras, He sat upon the grass;··"

অজয় স্থিরই করিয়াছে বিমানকে আজ গ্রাহ্য করিবে না। তাহার আজ অনেক কথা ভাবিবার আছে।·· হয়ত তাহার সাধনার পথে সেলফের ঐ বইগুলি তাহার বিশেষ কোনও কাজে আসিবে না। দেশের বিস্মৃত ইতিহাসের যে সূত্রগুলিকে সে ধরিতে চায়, হয়ত তাহার নিভৃততম ধ্যানের মধ্যে অকস্মাৎ সেগুলি ধরা দিবে। ভারতবর্ষের ধূলিতে যুগে যুগে কত মহাপুরুষের পদরজঃ মিশিয়াছে, কত মহাসত্যকে শুধুমাত্র একাগ্র ধ্যানের শক্তিতে তাঁহারা লাভ করিয়াছেন। এই ভারতবর্ষের মাটিতে তাহার জন্ম, সেও তেমনই করিয়া সত্যকে লাভ করিবে। অজয়ের কতদিন হাসি পাইয়াছে,—যাহার নিজের কাছে নিজের ব্যক্তিত্বের কোনও অর্থ প্রায় নাই, দিনের পর দিন তাহাকে পড়িতে হইতেছে ঐ ইতিহাসের বইগুলি, যাহার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা প্রধানতঃ ব্যক্তির কীর্ত্তি এবং অপকীর্ত্তির কাহিনীতে ভারাক্রান্ত! ইহার পর ইচ্ছা করিলেই এগুলিকে সে পোড়াইয়া দিতে পারিবে। তাহার পর তাহার একনিষ্ঠ তপস্যায় অন্ধকারের দ্বার একটু একটু করিয়া যখন খুলিয়া যাইবে, তাহার মধ্যে অনুসন্ধিৎসার অভাব আছে বলিয়া কেহ আর তাহাকে উপহাস করিতে সাহসী হইবে না।

বিমানের গলার প্রাভাতিক জড়তা ততক্ষণে কাটিয়া গিয়াছে। সে গর্জ্জিয়া উঠিয়া গাহিল, "There was a man of Kentucky···"

উৎকট সুর, তদুপযুক্ত বাক্যবিন্যাস। কোনও মাতাল গোরা সৈনিকের মুখে শুনিয়া শিখিয়া থাকিবে। অজয়ের চোখের সম্মুখে সহসা জ্যোতিঃস্নাত প্রভাতের চেহারা কালো হইয়া গেল, দশদিক্ হইতে দশটা বিমান গর্জ্জিয়া গাহিল, "There was a man of Kentucky···" সে কি করিতেছে জানিল না, ছুটিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া বিমানের রুদ্ধ দরজায় আঘাতের পর আঘাত বৃষ্টি করিয়া সে বলিতে লাগিল, "দরজা খোল, খোল খোল, শীগগির খোল বলছি—"

বিস্ময়ে মুখ ভরিয়া বিমান দ্বার খুলিয়া দিল। স্নানের জন্য প্রস্তুত হইয়া বাহির হইতেছিল, ড্রেসিং গাউনটাকে টানিয়া গায়ে জড়াইয়া কহিল, "কি ব্যাপার!"

"ভোরে উঠেই কি ভাঁড়ামো সুরু করেছ?"

"ভাঁড়ামো আবার কি? স্ফূর্ত্তি হয়েছে, গান গাইছি।"

"ফুর্ত্তি? তুমি বেহায়া তাই...আশ্চর্য্য, কথাটা তোমার মুখে আটকাল না।"

"দেখ অজয়, বেহায়া আমরা সকলেই। আমাকে আলাদা ক'রে ঐ গালটা দেবার কিছু দরকার আছে?"

"হ্যাঁ আছে, তোমার ভারি আস্পর্দ্ধা বেড়ে গিয়েছে তাই আমাদের সুদ্ধ তোমার দলে টান্‌ছ!"—অজয়ের প্রায় বাক্‌রোধ হইবার উপক্রম হইল।

বিমান একটু থামিয়া কহিল, "না অজয় দলে টানবার আমার সত্যিই ইচ্ছে নেই। যতটা দূরে এবং যতটা উঁচুতে তুমি থাক্‌তে চাও, অবাধে থাকতে পার। দর্‌কার হলে জায়গা ছেড়ে দিতেও আমার আপত্তি নেই। ততক্ষণ স্নানটা সেরে ফেলি, কি বল? বেহায়া লোকদের স্নান করতে ত কোনো বাধা নেই?"

"না নেই, স্নানের দরকার সত্যিই তোমার খুব বেশী আছে; ভালো ক'রেই সেটা করগে।" বলিয়া অজয় দুইহাত সজোরে দোলাইয়া চটি ফট্‌ফট্‌ করিতে করিতে নিজের ঘরে আসিয়া ঢুকিল। একটুক্ষণ দাঁড়াইয়া, নিজের ধরণে ঠোঁট টিপিয়া একটু হাসিয়া বিমান স্নানের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। মনে মনে কহিল, 'এরই নাম গেরো। এই কনকনে শীতে গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে যে একটু গরম হয়ে নেব তারও জো রইল না।'

ঘরে ঢুকিয়াই অজয় একেবারে অনুশোচনার গভীর তলায় তলাইয়া গেল। সুভদ্র ভোর না হইতেই কি একটা কাজে বাহির হইয়া গিয়াছে, বৈকুণ্ঠ চা করিয়া লইয়া আসিল, পেয়ালাটা ঠোঁটে ঠেকাইয়া মিষ্টি বেশী হইয়াছে বলিয়া অজয় খাইল না। খাটের একপ্রান্তে নতমস্তকে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

আঃ, কেন সে কলহ করিতে গেল, কেন করিতে গেল। সে না তপস্বী, দুস্তর সাধনার পথ না তাহার সম্মুখে বিস্তৃত, পদে পদে অপরের পদস্খলনের হিসাব লইয়া নিজের চলাকে ব্যাহত করা কি তাহার সাজে? কাল রাত্রির সেই ব্যাপারের পর হইতে বিমানের প্রতি তিক্ততায় তাহার মনটা কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাহা ঠিক। কিন্তু কেন তিক্ততা, আর সেটাকে প্রকাশ করিতেই বা সে গেল কেন? অধঃপাতে যাইবার অধিকার প্রতি মানুষের আছে, বিমানেরও আছে, অজয় কে যে তাহাকে গায়ে পড়িয়া কথা শোনাইতে গেল?

এবার কলিকাতায় ফিরিয়া অবধি তাহার মনে আশা হইতেছিল, তাহার ক্রোধন স্বভাব অনেকটা সংশোধিত হইয়া গিয়াছে। আজ ক্ষণিকের আত্মবিস্মৃতি তাহাকে অত্যন্ত গভীর করিয়া লজ্জা দিল। বেলা বহিয়া চলিল। স্নানাহার পড়িয়া রহিল। কলেজে যাওয়ার কথাও সেদিন আর মনে পড়িল না।

বেলা যখন বারোটার কিছু বেশী তখন অজয়ের দরজার বাহিরে ঠুক্‌ঠুক শব্দ। বিমান। বাহিরে দাঁড়াইয়াই বলিল, "তোমার সঙ্গে মিটিয়ে যেতে এসেছি, মেটাতে যদি দাও।"

"মিটিয়ে নেবার কথা ত আমার।"

"ও সে একই কথা, মিটে গেলেই হল। ভেতরে আসব?"

"হ্যাঁ এসো। বসো এইখানে।......আমার সত্যিই অপরাধ হয়েছে বিমান। তোমাকে ও-রকম ক'রে বলা আমার উচিত হয় নি। মাপ চাচ্ছি।"

"আরে কি পাগল। অপরাধ আবার হ'ল কোনখানে। তোমার মনটা তাজা আছে তাই বলেছ। আমি হলেও বলতাম।...আমি সবই বুঝি।...তোমার জীবনে বোধ হয় এই প্রথম। ঠিক চোখের ওপর গোল্লায় যেতে এর আগে আর কাউকে দেখনি..."

"তুমি তাহলে জানো—"

"যে আমি গোল্লায় যাচ্ছি?" বিমান ঠোঁট টিপিয়া একটু হাসিয়া কহিল, "হ্যাঁ, তা জানি বই কি একটু একটু।"

"কেন তাহলে এরকম কর?"

বিমান একথার জবাবে কিছু বলিল না দেখিয়া অজয় আবার কহিল, "আমার কথার উত্তর দিতে তোমার ইচ্ছে না করে দিও না।"

বিমান আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আর কেউ হলে উত্তর দিতাম না, কিন্তু তুমি জানতে চাচ্ছ ব'লেই বলব। বুঝতে পারছি জানতে চাওয়ার ইচ্ছেটা তোমার দিকে আন্তরিক। জেনেও গোল্লায়

কেন যাচ্ছি জিজ্ঞেস করছ। আমি ভুলে থাকতে চাই, ঠিক যেমন ক'রে তুমি ভুলে থাকো, সুভদ্র ভুলে থাকে। কাল আমার অসহ্য হয়েছিল। আমি দেখলাম, তোমরা কত সহজে মন থেকে সব ঝেড়ে ফেলে দিলে। সে ক্ষমতা ভগবান্ আমাকে দেন নি, আমি কি করব? তুমি কবি-মানুষ, ইচ্ছে করলেই নিজের মনের মধ্যে তলিয়ে যেতে পার। সুভদ্র তার হাজারো রকম কাজ নিয়ে মেতে যায়। ও দুটোর একটাও আমি পারি না। আমি যদি গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে সবাইকে বল্‌তে পারতাম, হয়ত বেঁচে যেতাম, তাও পারি না ব'লে ভুলে থাকবার জন্যে অন্য পন্থা খুজতে হয়।"

"কিন্তু কি তুমি ভুলে থাকতে চাও যার কথা কাউকে বলাও চলে না?"

"বলব না।"

"কেন?"

"বলা চলে না ব'লে। সবাই সেকথা ভুলে থাকতেই চাই ব'লে।"

সুভদ্র আলিপুরের কোন্ বাগান হইতে একরাশ দুষ্প্রাপ্য গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, অজয়ের টেবিলের উপর হাতের বোঝা নামাইয়া রাখিয়া কহিল, নন্দ নাকি কাল রাত থেকে আর আসে নি?"

বিমান কহিল, "সে আর এমুখো হচ্ছে না।" কথাটা বলিয়া ঠোঁট টিপিয়া হাসিবার চেষ্টাও একটু করিল কিন্তু একেবারেই হাসির মত সেটা দেখাইল না।

অজয় কহিল, "সে কি, কোথায় গেল?"

"কি জানি কোথায় কাদের একটা গুদাম বাড়ীতে।"

"কি খাবে?"

"ভগবান্ জানেন।"

"সেই ভালো। আমরা জেনেই বা কি করতে পারব?"

সুভদ্র কাগজের পুঁটুলি খুলিয়া গাছ-গাছড়ার নাম লেখা মোড়কগুলিকে মিলাইয়া লইতেছে।

বিমান অকস্মাৎ বিকৃতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ধার-করা টাকা-দশটা ছিল, দিতে গেলাম, যদি নিত, তোমরা রক্ষা পেয়ে যেতে। কাল রাতের অনাচারটা ঘটতে পেত না। নিলে না, বললে, আশীর্বাদ করবেন, ঢের হবে। যেন এই হতভাগা দেশে কোনো মানুষের আশীর্বাদ কোনো মানুষকে লাগে! কি আশীর্বাদ করতে পারতাম তাকে? হঠাৎ কোনো যাদুমন্ত্রে পুলিশের খাতা থেকে তোমার নামটা মুছে যাক্? বলতে পারতাম, যাদের ছেলে পড়িয়ে মাসে দশটা ক'রে টাকা পাও তারা হঠাৎ খুসি হয়ে তোমার মাইনে বাড়িয়ে দেড়শো ক'রে দিক্? বলতাম, এই শীতে তোমার গায়ে দেবার একটা কম্বল নেই, তার হয়েছে কি, এই আমি তোমার মাথায় হাত রেখেছি, তোমার বুকের কাশি সেরে যাক্?"

অজয় দাঁতে দাঁত চাপিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। এত অল্পেতে সে মন খারাপ করিবে না! না, এই-সমস্ত তুচ্ছ দুঃখদৈন্যের অনেক উপরে তাহার স্থান। জীবনের মধ্যে মুহূর্ত্তে জীবনাতীতকে আশ্রয় করিয়া নির্লিপ্ত হইয়া যাইবার সঙ্কেত সে জানে।

উঠিয়া গিয়া স্নান করিল। বৈকুণ্ঠকে ডাকিয়া অবেলায় ভাত চাহিয়া লইয়া খাইল। ভাত প্রায় বরফের মত ঠাণ্ডা, কিন্তু নিজেকে লইয়া নির্লিপ্ত হইয়া যাইবার সঙ্কেত জানা থাকিলে শীতের অবেলায় স্নানান্তে ঠাণ্ডা ভাত খাইতেও তেমন-কিছু অসুবিধা বোধ হয় না।

বিকালের দিকে বিমান আবার একবার নন্দের কথা পাড়িবার চেষ্টা করিতেছিল, সুভদ্র তাহার সেদিনকার কাজের লম্বা একটা ফিরিস্তি দিয়া তাহাকে চুপ করাইয়া দিল। বিমান বলিল, "ওর খোঁজও কি একবার করবার দরকার নেই?"

"কখন্ করব? খোঁজ যাদের জানা আছে তাদের নিয়েই হাঙ্গামার শেষ নেই।—তুমি যেতে চাও, যাও না।"

"আমার বয়েই গেছে। অজয় যাচ্ছ?"

"গিয়ে কি করব? তাকে জ্বালাতন করা ছাড়া কিছু লাভ হবে না।"

"তা বেশ," বলিয়া ছড়ি ঘুরাইয়া বিমান বাহির হইয়া গেল।

নীচে বসিবার ঘরে লিখিবার দেরাজে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া অজয় ভাবিতে লাগিল, সত্যই নন্দের খোঁজ একবার করা তাহার উচিত ছিল কি? তাহার পর নিজেই নিজেকে

নানা ছলনায় ভুলাইতে লাগিল। যে পলাইয়া গিয়াছে তাহাকে পশ্চাৎ হইতে তাড়া করিয়া কেন বৃথা বিপন্ন করা? তাহাতে তাহার দুঃখই কেবল হয়ত বাড়ান হইবে। কিন্তু তাহার অন্তরের একটা অত্যন্ত গভীরতার জায়গায় একটা মানুষ কোনও ছলনাতেই ভুলিল না। সে মানুষটা ক্রমাগত বলিতে লাগিল, নন্দ যে তোমাকে শ্রদ্ধা করিত, দেবতার মত করিয়া পূজা করিত। তাহার মুগ্ধদৃষ্টির মধ্য দিয়া তাকাইয়া নিজের মধ্যে যে দেবতাকে তুমি দেখিতে পাইতে, আজ কিসে সেই দেবতাকে আড়াল করিল? সে কি প্রকারের দেবত্ব, সে কেমন শ্রদ্ধার্হতা, একটি খানাতল্লাসীর পরোয়ানা যাহাকে টলাইয়া ধূলিসাৎ করিয়া দিল! ভয়ের চেয়ে বড় মানুষের আর পাপ নাই, বুদ্ধি দিয়া বিচার করিয়া এই কথাটাকে সে বিশ্বাস করিত। সে কি ভয় পাইয়াছে? কি জানি, আজ থাক্, অন্য একদিন ভাবিয়া দেখিবে। আজ নিজেকে কেবল এই কথা বলিয়াই সে শেষ করিল, নন্দকে সে ভালবাসে হয়ত গভীর করিয়াই ভালবাসে। স্বজনহীন নির্ব্বান্ধব ছেলেটির এতটুকু একটু দুঃখ মোচন করিতে পারিলে সে সুখী হয়। পৃথিবীর কেহ জানিবে না, নন্দ নিজে জানিবে না, কিন্তু হে অন্তর্য্যামী, তুমি জানো, মনে মনে অজয় নন্দকে প্রতিমুহূর্ত্তে ভাবিতেছে, নন্দকে সে ভোলে নাই।

চা খাইতে বসিয়া সুভদ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কি এত ভাবছ?"

অজয় বলিল, "এইমাত্র মনে পড়ল, আমাদের বাড়ী আজ একজনের চা খাবার নিমন্ত্রণ ছিল।"

"কার?"

"রাহুর।"

"রাহুর? তা বেশ ত; সে এলে আর-একবার সবাই মিলে চা খাওয়া যাবে।"

"সে এলে ত? তাকে আমারই গিয়ে নিয়ে আস্বার কথা ছিল।"

সুভদ্র আপাদমস্তক তাহাকে একবার দেখিয়া লইল, কহিল, "তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে; যাওনি কেন এতক্ষণ?"

অজয় কহিল, "মাথাটা একটু খারাপই হয়ে থাক্‌বে, একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।"

সুভদ্র চায়ের পেয়ালা ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল, বলিল "ওঠ, এখুনি যাও, কি ভাবছেন ওঁরা বল দেখি।"

অজয় আসন ছাড়িয়া নড়িল না, কহিল, "সেই ভাবনাতেই ত আরও যেতে পার্‌ছি না। ছ'টা বাজতে চলেছে, খুব তাড়াতাড়ি গেলেও রাত সাতটার আগে পৌছতে পারব না, মানুষকে চা খেতে ডাকবার উপযুক্ত সময় সেটা নয়। ওঁরা ভাবতে পারেন, চা খাওয়ানোর কথাটা বাজে, একটা ছুতো ক'রে আর-একবার তাঁদের বাড়া আমি বেড়াতে এসেছি।"

"তা তাঁদের বাড়ী কিছু একটা ছুতো ক'রেই তুমি যদি যাও, সেটা এমন কিছু মহাপাপ হবে না।—দেখ অজয়, জিনিষটা তোমার স্বভাবে নেই, তা আমি জানি। কিন্তু স্বভাবে এমন কত জিনিষ থাকে না, মেয়েদের জন্যে যা একটু-আধটু কর্‌তে হয়। সব দেশের লোকেই তা করে। মেয়েদের দশা আমরা যা ক'রে রেখেছি, আমাদের সেটা আরও বেশী ক'রেই করা উচিত।"

"তুমি আছ সারাক্ষণ তোমার সমস্ত খেয়াল নিয়ে। এই ত সবাইকার অবস্থা। মেয়েদের কথা ভাববার এই কি সময়?"

"নিশ্চয় এই সময়। মেয়েদের কথা ভাব্‌ব না ত ভাব্‌ব কি? ভাববার মত, আশা কর্‌বার মত এদেশে আর আছে কি শুনি? সেটা জানি ব'লেই ত আর-সব ফে'লে ক্লাব নিয়ে পড়েছি।"

"ঐতেই কি দেশোদ্ধার হবে?"

"না, কিন্তু কতগুলি মানুষ উদ্ধার হবে ব'লে আশা হচ্ছে।"

"তার মানে?"

"মানে খুব সোজা। স্ত্রীপুরুষকে ঠিক জায়গায় যদি মিলিয়ে দিতে পারি, কতগুলি পুরুষ অন্ততঃ আর-একটু পুরুষের মতো হবে। তুমি জানো অজয়, এ দেশের বেশীর ভাগ ছেলেগুলোকে যখন দেখি, কেবল মনে হয়, মেয়েতে পুরুষ সেজে বেড়াচ্ছে। এমন মিষ্টি ক'রে হাসে, এমন নরম ক'রে কথা বলে, পা টিপে টিপে চলে পাছে

মাটির গায়ে আঘাত লাগে, এমন নিরীহ করুণ চোখ ক'রে তাকায়! আঃ! কেন এমন হয় জানো? ওরা যে পুরুষ সেটা মনে পড়িয়ে দিতে মেয়েরা ওদের জগতে বর্ত্তমান্ নেই। স্ত্রীহীন জগতের শূন্যতা স্বভাবের নিয়মে নিজেরাই ওরা পরিপূর্ণ করছে।"

অজয় হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "কি আজে-বাজে বকছ।"

সুভদ্র কহিল, "তুমি হাসছ? একটা কথা বলব, কিছু মনে কোরো না। এবারে দেশ থেকে আসতে পথে সেই ফিরিঙ্গি ছোকরার সঙ্গে আমার লড়াই বেধেছিল, কে হারে-জেতে দেখবার জন্যেও তুমি সেখানে দাঁড়াওনি। তোমার ভয় ছিল, ঐন্দ্রিলা দেবী আমাদের অবস্থাটা পাছে দেখতে পান। কিন্তু তিনি সত্যিই যদি দেখতে পেতেন, সত্যিই যদি তিনি সেখানে উপস্থিত থাকতেন বন্ধুকে সাহায্য করবার জন্যে তোমাকেও সেখানে থাকতে হত। ঠিক বলছি কিনা বল।"

অজয় নত মস্তকে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার হাসি মিলাইয়া গিয়াছে। লজ্জায় তাহার কর্ণমূল উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। না, সুভদ্র কোথাও কিছু একটা ভুল করিতেছে। এই সোজাসুজি ভীরুতার অপবাদ, অজয়ের ইহা প্রাপ্য নহে। কিন্তু প্রতিবাদ করিবার কোনও ভাষা তাহার মুখে জোগাইল না।

সুভদ্র কহিল, "নাও, ওঠ।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া অজয় কহিল, "তুমিও যদি সঙ্গে যাও ত যাই।"

সুভদ্র কহিল, "তাই যাব না-হয়। পথে কালিঘাটে বক্সিংএর আখড়ায় একটু ঢুঁ মেরে যাব, পাঁচ ছ'দিন যাওয়া হয়নি,—আজ যাবই কথা দিয়েছিলাম।"

পথে যাইতে ট্রামে অজয়ের কানের কাছে মুখ লইয়া সুভদ্র কহিল, "একএকবার ভাবি, অবরোধ-প্রথা আমাদের জাতের হয়ত বা একটা উপকারই করেছে। কৃপণের ধনের মতো আমাদের স্ত্রীজাতিকে এতকাল আমরা সঞ্চয় করেছি। আমাদের এতদিনকার পরাধীনতার পাপ, অধোগতির গ্লানি তাদের তেমন ক'রে স্পর্শ করেনি। এখন যখন পৃথিবীর কারবারে দেউলে হতে আমাদের আর বাকী নেই তখনই এই গুপ্তধনকে বাইরে এনে কাজে লাগাবার সময়।"

একপাল ছেলেমেয়ে লইয়া সস্ত্রীক এক ভদ্রলোক যাইতেছেন। ছেলেগুলি খুব সাজিয়াছে, আলষ্টার, র‍্যাপার, বুটজুতা, রঙীন মোজা। বছর আটেকের একটি ছোট মেয়ে মায়ের কোল ঘেঁসিয়া জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, খালি পা, শীতে কুঁকড়াইয়া গিয়াছে। মা ত মা, তাঁহার কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। মা ও মেয়ের দিকে একবার দেখিয়া লইয়া অজয় কহিল, "কাজে লাগাতে চেষ্টা করতে পার, কিন্তু বহুপুরুষের জমানো টাকা-কড়ি, আজকালকার বাজারে আর চলে কি না সেটা দেখতে হবে। একটু ঘসামাজা না করলে চলবে না যে সে ত বোঝাই যাচ্ছে।"

চারটায় কলেজ হইতে ফিরিয়া ঐন্দ্রিলা দেখিল, বীণা সাজিয়া-গুজিয়া প্রস্তুত হইয়া আছে। বইয়ের বোঝা নামাইয়া রাখিয়া বীণার পাশ ঘেঁসিয়া বসিয়া কহিল, "ভুলেই গিয়েছিলাম আজ অজয়-বাবুর আসবার কথা। তা তুমি অত ক'রে সেজেছ কেন, তুমিও যাচ্ছ নাকি চা খেতে?"

বীণা হাসিয়া কহিল, "নিয়ে যদি যায় তাহলে কি আর ছেড়ে দি? কিন্তু এদেশের পুরুষ-জাতের যা সাহস সে আর বোলো না। যত বীরত্ব সে কেবল ঐ মাসিক পত্রের পাতায়। চা খেতে ডাকলেও সাহস ক'রে আসে না, তা আবার চা খাওয়াতে নিয়ে যাবে।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "আহা, এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, যাক্ না আরও কিছুদিন। কাল ত হাওয়া খেয়ে এলে, এর পর চায়ে প্রোমোশন পেতে কতক্ষণ? আমি আপাততঃ বাড়ীর চা এক পেয়ালা পেলেই খুসী। তোমার নিজের ক্ষুধাতৃষ্ণা কিছু আছে না একেবারেই গেছে?"

বীণা কহিল, "না, সে-সমস্তের কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। যাই দেখি গে, উনুনে আঁচ দিয়েছে কি না। তুই ততক্ষণ কাপড় ছেড়ে নে। হ্যাঁ, আর দেখ, একটু পরিপাটি ক'রে সাজিস্। ভদ্রলোক আসছে, একটু সাজ-গোজ দেখলে খুসি হবে।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "হ্যাঁ, আমার বয়েই গিয়েছে। আমি নীচে নাম্‌ছিই না মোটে। ভদ্রলোক আস্‌ছে রাহুকে নিতে, হঠাৎ দুই বোনে মিলে তার ঘাড়ে প'ড়ে কি হবে?"

বীণা বলিল, "আহা, কি কথার ছিরি। ঘাড়ে পড়া আবার কি? একটা লোক বাড়ীতে আস্‌ছে, তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে হবে না?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "তুমি বাড়ীর গিন্নি, তুমি দেখা কোরো। আমার ওসব আসেটাসে না তা ত জানোই।"

চা খাওয়া শেষ হইতে হইতে পাঁচটা। বীণা মাছের কচুরি করিয়াছিল, রাহুর অতি প্রিয় খাদ্য, গোটা পাঁচ-ছয় চাহিয়া লইয়া খাইয়াও সে অজয়ের দেরিতে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। উৎসুক বীণা বারে বারে বাহির হইয়া মাঠের পথটা দেখিয়া আসিতেছে। যা অদ্ভুত মানুষ, বলা ত যায় না, হয়ত কোনও ছুতায় আবার দরজার গোড়া হইতে ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু ছয়টা বাজিতে চলিল, তখনও অজয় আসিল না। রাহুর নাকে কান্না সুরু হইয়া গেল। তাহাকে বকিয়া ঝকিয়া থামাইয়া, বীণা মুখটিকে কালো করিয়া আসিয়া ঐন্দ্রিলাকে কহিল, "কি হ'ল বল্ দেখি? আজও কি মাঝপথ থেকে ফিরে গেলেন?"

ঐন্দ্রিলা ঝাঁঝিয়া কহিল, "তা যদি গিয়ে থাকেন ত কি আর করা যাবে বল। সবাই মিলে বাড়ী ছেড়ে তাঁর জন্যে মাঝপথে গিয়ে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে, এই কি তিনি আশা করেন?"

বীণা একথার কোনও উত্তর না দিয়া তাড়াতাড়ি আবার বারান্দায় ফিরিয়া গেল। পনেরো মিনিট না যাইতেই রাহু এত হুলস্থূল বাধাইল, যে তাহাকে বাড়ীতে রাখা দায়। তাহার হঠাৎ ধারণা জন্মাইয়াছে, অজয় আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবে এমন কথা ছিল না। নিমন্ত্রিতকে কে কবে আবার বাড়ী বহিয়া লইতে আসে? বড়দিদির কাছ হইতে ঠিকানা পাইলেই সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে পারে।

ঐন্দ্রিলা নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া নিঃশব্দে সাজসজ্জা সমাধা করিল, তারপর বারান্দায় বাহির হইয়া কহিল, "দিদি, চল তোমাদের সেই হোটেলে, রাহুকে চা খাইয়ে আনা যাক্। নয়ত ওর কাছে নিজেদের মান-সম্মান আর থাকে না।"

বীণা কহিল, "তুই কি ক্ষেপেছিস্ ইলু, ভদ্রলোক এসে কাউকে বাড়ীতে না দেখতে পেলে ভাববে কি?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "তাহলে তুমি থাকো, রাহুকে নিয়ে আমি চল্‌লাম।"

"তারপর?"

"তারপর আবার কি? অজয়বাবু যদি আসেন, রাত আটটায় রাহু তাঁর সঙ্গে চা খেতে যাবে আশা ক'রে নিশ্চয়ই আস্‌বেন না।"

দ্বিতলায় হেমবালা কহিলেন, "আজ আবার কোথায় চলেছিস্?"

"রাহুকে চা খাওয়াতে।"

"চা এইমাত্র সে খেল না?"

"ঘরের চায়ে রাহুবাবুর আর মন উঠছে না।"

"কোথায় গিয়ে চা খেলে মন উঠবে?"

"দেখি কোথায় যাওয়া যায়, হোটেলে যাব ব'লে ত বেরিয়েছি।"

"তার মানে? হোটেলে মেয়েরা আবার যায় নাকি? তোরা দিনদিন সব কি হচ্ছিস্?"

ঐন্দ্রিলা নিঃশব্দে নামিয়া চলিল। হেমবালা দৃঢ়কণ্ঠে ডাকিলেন, "ইলু!" নীচে হইতে কোনও সাড়া আসিল না। ঐন্দ্রিলা জীবনে এই প্রথম মায়ের শাসন অমান্য করিল, কিন্তু তাহার অন্তর্যামী জানেন, তাহার মা তাহাকে কম জ্বালান নাই। শোধবোধ স্বরূপ এইটুকু বিদ্রোহের অধিকার এতদিনে তাহার জন্মাইয়াছে।

ক্ষেন্তি সেইখানেই মন্দিরাকে আগলাইয়া বসিয়া ছিল, চাপা গলায় কহিল, "বারণ করো রাণী মা, বারণ করো। তোমার চোখের সামনে এমন অনাছিষ্টি সব ঘটতে দিয়ো না। কত করে সবাই তখন বললুম শুনলে না ত, দিলে মেয়েকে কলকাতায় পাঠিয়ে। এখন বোঝো কেন মেয়ে-মানুষের লেখাপড়া শিখতে নেই। মাগো, হোটেল কিনা মুসাফিরখানা, কত জাত-বেজাতের আড্ডা, সেইখেনে দিদিমণি চলেছে চা খেতে!"

হেমবালা বলিলেন, "আঃ চুপ কর্ তুই।"

কিন্তু ক্ষেন্তি নিজের মনে বকিয়াই চলিল।

হেমবালা চিরকাল একটা বিরাট্ সংসারের কর্তৃত্ব করিয়া আসিয়াছেন। এবাড়ীর গৃহিনী প্রকৃত পক্ষে বীণা। ছুতলার একটা ঘরে কোণ-ঠ্যাসা হইয়া থাকা তাঁহার ধাতে সহিতেছে না। ভিতরে ভিতরে কিছুদিন হইতে একটা বিদ্রোহ জাগিতেছে, বাহিরে তাহার প্রকাশ নাই। কেবল ক্ষেন্তি নিজের বিদ্রোহ দিয়া তাঁহার এই বিদ্রোহকে বুঝিতেছে এবং ইহাকে প্রধূমিত করিয়া তুলিতেও তাহার চেষ্টার ত্রুটি নাই। যখন হাতে কোনও কাজ থাকে না, হেমবালার পায়ের কাছে বসিয়া চাপা গলায় সে ছুই সংসারের তুলনা-মূলক সমালোচনা জুড়িয়া দেয়। খাওয়া-দাওয়া, রান্নাবান্না, গৃহসজ্জা, শিশুদের পরিচর্য্যা, বিধবার সধবোচিত আচরণ, কোনও কিছুই বাদ যায় না। হেমবালা সাধারণতঃ তাহার কোনও আলোচনায় যোগ দেন না, কিন্তু তাহাকে বাধাও বড় একটা দেন না। আজও প্রায় ঘণ্টা-খানেক একটানা বকিয়া ক্ষেন্তি বলিল, "মামা-বাবুও যেন কেমনধারা, কারুর ভালোমন্দে নেই, একেবারে ভোলা মহেশ্বর। নিজের মেয়ের ওপর যদি শাসন থাকত তাহলে কি আমাদের দিদিমণিই এমন ক'রে বয়ে যায়? সংসারে থাকতে হলে অত শিব হয়ে থাকলে চলে না মা, অত ভালো আবার ভালো নয়। হতেন আমাদের কর্ত্তা-মহারাজ—"

হেমবালা তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "কি যা তা বক্‌ছিস? যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা। পালা এখান থেকে হতচ্ছাড়ী।"

রাহুকে চা খাওয়াইয়া, মার্কেট হইতে তাহার জন্য এক জোড়া পেন্টিংবুক্ সংগ্রহ করিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে ঐন্দ্রিলা ভাবিতে লাগিল, অজয় আসুক, মনে মনে সেও কি আজ ইহাই কামনা করিতেছিল? তাহার সঙ্গে চোখো-চোখি হইলে অজয়ের বিষণ্ণ ছায়ান্ধকার দৃষ্টি পলক ফেলিতে কেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তাহাই দেখিতে পাইবার কৌতূহল কি তাহার মনে ছিল? হ্যাঁ, অজয়ের দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠে, ছুই দিনই সে ইহা লক্ষ্য করিয়াছে, কিন্তু সেকথা কাহাকেও বলিবার নয়। কে জানে, তাহার ভুল হইতে পারে। কিন্তু আজ চিরাভ্যস্ত সঙ্কোচ কাটাইয়া রাহুকে লইয়া সে যে একেবারে হোটেলে আসিয়া হাজির হইল, মনটা খুব প্রকৃতিস্থ অবস্থায় থাকিলে কখনই তাহা পারিত না। হঠাৎ আজ এ তাহার হইল কি?

গাড়ীবারান্দার নীচে হইতেই বীণার কলহাসির শব্দ শুনিতে পাইল। কণ্ঠস্বরে বুঝিল, অজয় এবং সুভদ্র উভয়েই আসিয়াছে। রাহু গাড়ী হইতে নামিয়াই ছুটিয়া বসিবার ঘরে ঢুকিয়া গেল। সিঁড়ির গোড়ায় ছুই মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া এখন কি কর্ত্তব্য ভাবিতেছে, বীণা বাহির হইয়া আসিয়া তাহাকে বন্দী করিল। কহিল, "পালাতে পাবে না। সুভদ্রবাবুর তোমার সঙ্গে খুব জরুরী কি দরকার আছে। ঘরে ঢুকেই ভদ্রলোক তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছেন।"

অজয় আজ ঐন্দ্রিলার দিকে চোখ তুলিয়া চাহিলই না ত কি করিয়া বোঝা যাইবে তাহার দৃষ্টিতে কোনও জ্যোতিঃসঞ্চার হইল কিনা। রাহুর কাছে বেচারা সত্যই বড় লজ্জিত হইয়াছে। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ নিবিড় বাহু-বন্ধনে তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। তদুপরি তাহার জন্য একটা চকোলেটের বাক্স আর মন্দিরার জন্য এক টিন টফি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে।

বীণা কহিল, "ভাগ্যিস কাজের ভিড়ে অজয়বাবু আজ যথা-সময়ে আস্‌তে পারেননি, তাই চকোলেটগুলো জুটে গেল। আমরা ছুবোনে মিলেই ওটা শেষ করব, কি বলিস ইলু?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "রাহু-সর্দ্দার কি বলেন?"

বীণা বলিল, "রাহু আবার কি বলবে, তার চা খাবার কথা ছিল, চা সে ত ছুছুবার পেয়েছে।"

বাহিরের ছুইটি অভ্যাগত মানুষের সম্মুখে রাহু মুখ ফুটিয়া প্রতিবাদ করিল না, চকোলেটের বাক্সটাকে আরও একটু দৃঢ় করিয়া চাপিয়া ধরিল মাত্র।

ঐন্দ্রিলা কহিল, "অজয়বাবুর হঠাৎ আজ কি এত কাজ পড়ল? হর্ষচরিতের সমালোচনা শেষ হয়নি এখনো?"

অজয় এতক্ষণে মুখ তুলিয়া চাহিল, তাহার চোখের দৃষ্টির কোনও ভাবান্তর আজ বিশেষ বোঝা গেল না। কহিল, "সেটা আর শেষ কর্‌ব না ঠিক করেছি। কি হবে শুধু শুধু কতগুলি data জুটিয়ে, যার থেকে সত্যিকারের কাজে লাগে এমন কিছু গড়তে পার্‌ব না?"

সুভদ্র বলিল, "কোন্ জিনিষটা কাজে লাগবে আর কোন্‌টা লাগবে না, সে বিচার গোড়া থেকে এত বেশী না করাই ভালো।"

অজয় কহিল, "তোমার মত সব মানুষের কাজের শক্তি ত অফুরন্ত নয়, আমাদের অল্পই সাধ্য, যথাশক্তি ফলাফল বিচার ক'রেই তাকে কাজে নিয়োগ করতে হয়।"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "আজ কি কাজ করছিলেন?"

সুভদ্র বলিল, "কাজ ত কত।"

অজয় বলিল, "সত্যিই কিছু করিনি। অসময়ে আপনাদের বাড়ী আসা উচিত কিনা তাই নিয়ে সুভদ্রের সঙ্গে খানিক তর্ক করেছিলাম। সেটাকে যদি কাজ বলেন।"

দুই বোনে নীরবে একটুখানি দৃষ্টি-বিনিময়, তারপর বীণা কহিল, "তর্কে সুভদ্রবাবুর জিত হয়েছে জেনে একটা দিন আমি অন্ততঃ খুসি হয়েছি। সুভদ্রবাবুই তাহলে এঁকে ধ'রে এনেছেন?"

সুভদ্র কহিল, "এবিষয়ে অজয়ের বক্তব্যটাই শোনা যাক্।"

অজয় কহিল, "না, এতটা প্রশংসা সত্যিই সুভদ্রের পাওনা নয়। তর্ক করেছিলাম ঠিক, কিন্তু তর্কে হেরে যাবার ইচ্ছেটা গোড়াগুড়িই আমার মনে ছিল।"

নিতান্ত অকারণেই ঐন্দ্রিলার কানের কাছটা হঠাৎ লাল হইয়া উঠিল। বীণা কহিল, "তাই যদি ছিল ত মোটেই তর্ক না ক'রে একেবারে সোজা যদি এইদিকে চ'লে আসতেন তাহলে এই হার-মানার অগৌরবকে আর স্বীকার করতে হত না।"

সকলে হাসিয়া উঠিল। ঐন্দ্রিলার আর-একটু কাছে নিজের আসনটিকে টানিয়া লইয়া সুভদ্র কহিল, "আমার আজ আস্‌বার কোনও কথা ছিল না, কেবল আপনার সঙ্গে ঝগড়া করব ব'লে এসেছি।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "অজয়বাবুকে হার মানিয়ে আজ আপনার সাহস বেড়ে গিয়েছে।"

সুভদ্র কহিল, "না, সাহসের আমার কোনো সময়েই কমতি নেই। আমি জান্‌তে এসেছি, আমাদের ক্লাবে কেন আপনি যান্ না।"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "কথাটার জবাব কাল অজয়বাবুকে একবার দিয়েছি। আমার ভয়ানক কুঁড়েমি কর্‌তে ভালো লাগে, বাড়ীতে সেকাজ যত নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় আর কোথাও তেমন হয় না।"

সুভদ্র কহিল, "এই কুঁড়েমি কাটাতে হবে।"

ঐন্দ্রিলা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "সত্যিই কি এই ক্লাব থেকে কোনো কাজ হবে?"

বীণা কহিল, "এইরে! কুঁড়েমি না ছাই। গোড়া থেকেই কাজের হিসেব। তোমরা সবাই বড় বেশী কাজের লোক হয়েছ। ক্লাব ত ক্লাব, সেখানে কাজ আবার কি হবে শুনি? মানুষের একসঙ্গে গোল হয়ে ব'সে গল্প কর্‌বার একটা জায়গা থাক্‌বে না?"

সুভদ্র, অজয়, ঐন্দ্রিলা, কথাটা তিনজনের কাহারও মনঃপূত হইল বলিয়া মনে হইল না। ইহার পর কে কি বলিবে ভাবিতেছে এমন সময় উপরের সিঁড়ির পথ হইতে হেমবালার গলা শোনা গেল, "ইলু।"

বীণা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, "আমিই যাচ্ছি, ইলু তুই বোস্। বাবার সঙ্গে অজয়বাবুদের পরিচয় ক'রে দিয়েছি। পিসীমার কথাটা মনে ছিল না। তাঁর খোঁজ একবার নিয়ে দেখ্‌ছি।"

একটু পরে নীচে নামিয়া কহিল, "ইলু, তুই একবার ওপর থেকে হয়ে আয়।"

ঐন্দ্রিলা উঠিতেই অজয় এবং সুভদ্রও উঠিয়া পড়িল। সুভদ্র কহিল, "মন্দিরাকে আজ ত দেখ্‌তে পেলাম না?"

বীণা কহিল, "ওর শরীরটা ক'দিন ধ'রে ভালো যাচ্ছে না।"

অজয় কহিল, "সুভদ্র ত ছোটছেলেদের অসুখের মস্ত স্পেশালিষ্ট।"

সুভদ্র কহিল, "স্পেশালিষ্ট ত কত। তবে একদিন এসে দেখে যাব, যদি অনুমতি দেন।"

বীণা কহিল, "সত্যি আসবেন? বড় খুশি হব তাহলে।"

রাত্রিতে আহারাদির পর দুই বোনের অনেকক্ষণ অবধি ঘুম আসিল না। বীণা বলিল, "অজয়কে সত্যিই আমার খুব ভালো লাগে, তোর ভালো লাগে না?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "বেশ sincere ধরণ-ধারণ। কিন্তু আগেই ব'লে রাখছি, আমার ভালো লাগাটা ঠিক তোমার ভালো লাগার মতো নয়।"

বীণা বলিল, "অর্থাৎ তুই তাকে ভালোবাসিস্ না, এই ত?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "অর্থাৎ তুমি তাকে ভালোবাসো, এই ত? মাগো মা, এরই মধ্যে ভালো পর্য্যন্ত বেসে ফেলেছ? তুমি সব পারো, বাছা।"

বীণা বলিল, "পারি ব'লে কি বেসেছি? না বেসে পারিনি।"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "কাউকে ভালো না বেসে বেশীদিন থাকতে পারা তোমার স্বভাবে নেই, তা জানি। ওর তরফ থেকেও সাড়াশব্দ পেলে নাকি কিছু?"

"পাইনি, কিন্তু আশা হচ্ছে যেন পাব।"

"শেষকালে ফাঁকিতে পোড়ো না কিন্তু।"

"যদি পড়ি, কি আর করতে পারি বল? সে সম্ভাবনাকে বাদ দিয়ে ত কেউ আর ভালোবাসতে পারে না।"

ঐন্দ্রিলা একটু ভাবিয়া লইয়া কহিল, "তা তোমাকে বেশীদিন সন্দেহ নিয়ে কাটাতে হবে না। ওর যখন সময় হবে, ও সোজাসুজি তোমাকে এসে বলবে।"

বীণা কৌতূহলী হইয়া বলিল, "কিসে তোর তা মনে হ'ল?"

ঐন্দ্রিলা তাড়াতাড়ি কহিল, "না, অম্‌নি। ওর সঙ্গে দুদিন কথা ব'লেই মনে হ'ল, ওর মনে যা আসে মুখে তাই বলে। তোমাকে ভুল করতে ও দেবে না।"

বীণা হঠাৎ নিস্তব্ধ হইয়া গেল। জীবনে আরও একবার সে ভুল করিয়াছিল। দুইদিনের পরিচয়ে এমনই করিয়া আরও একজনকে সে ভালবাসিয়াছিল। আত্মীয় বন্ধু কাহারও কথায় সেদিন কর্ণপাত করে নাই। জোর করিয়া নিজের অতি অন্তরঙ্গ জীবনকে প্রায় অপরিচিত আর-একটি জীবনের সঙ্গে নিবিড়তম গ্রন্থিতে সে গ্রথিত করিয়াছিল। মৃত্যু সে বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া দিয়া গিয়াছে, কিন্তু যে ব্যর্থতার বিষে, তাহার প্রেমের যে নিদারুণ অপমানের জ্বালায় তাহার জীবনের সেই দিনগুলি বেদনাতুর হইয়া আছে, দুশ্চিকিৎস্য ক্ষতের মত তাহাকে আমরণ স্মৃতিতে বহন করিয়া বীণাকে বাঁচিতে হইবে। কিন্তু কেন বিধাতা তাহাকে এমন করিয়া গড়িয়াছিলেন তাহা সে জানে না। তাহার পরিচিতের সংখ্যা কলিকাতায় সামান্য নয়। কৈশোর উত্তীর্ণ হওয়ার পর হইতেই তাহার চতুষ্পার্শ্বের জগতের সমস্ত তরুণদের মনে সে বিষম চাঞ্চল্যের সঞ্চার করিয়া আসিয়াছে। কতজন তাহার জন্য প্রাণপাত করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের কাহাকেও তাহার মনে ধরে নাই। সে চিরকাল অপরিচিতকে, অভিনবকে, দুর্লভকে, দুরধিগম্যকেই কামনা করিয়াছে এবং দুঃখ পাইয়াছে। অজয়ের দিক্ হইতে সাড়া পাইবে আশা করিতেছে, একটু আগে ঐন্দ্রিলাকে সে বলিয়াছে, কিন্তু মিথ্যা বলিয়াছে। তাহার অন্তরতম মনে সে জানে, চিরকাল তাহাকে আজিকার এই ভালবাসা লইয়া দুঃখ পাইতে হইবে। তবু পশ্চাৎ ফিরবার সাধ্য তাহার নাই।

ঐন্দ্রিলাও ইহার পর স্তব্ধ হইয়া গেল। যখন নূতন করিয়া কোনও কথা উঠিয়া পড়িবার সম্ভাবনা আর দেখা গেল না, বীণা উঠিয়া শুইতে গেল। ঐন্দ্রিলাকে ডাকিয়া গেল, কিন্তু সে গেল না।

কষ্টিপাথর

পুরাণ ও হিন্দু সংস্কৃতি

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

...পুরাণ-কথা ও তন্নিহিত গভীর ও উচ্চ ভাবাবলী, ভারতীয় সভ্যতার আদিম অবস্থা হইতেই এদেশীয় জনগণের মধ্যে নিবদ্ধ রহিয়াছে। বহু বিভিন্ন জাতির মিলনে আমাদের ভারতীয় হিন্দুজাতির উদ্ভব। ভারতীয় অথবা অন্য কোন দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির উৎপত্তি ও বিকাশের আলোচনায় নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে, আধুনিক মনোভাব অনুযায়ী অর্থাৎ যুক্তিতর্কানুমোদিত কতকগুলি প্রতিজ্ঞা প্রথমেই আমাদের স্বীকার করিয়া লইতে হয়, অন্যথা আলোচনা সার্থক হয় না, সমদর্শী ও সর্ব্বগ্রাহী হয় না—একদেশদর্শী ও অসম্পূর্ণ এবং নিরর্থক থাকিয়া যায়।... প্রতিজ্ঞা দুইটি এই :—এক, ভারতের ও ভারতীয় মানবের ইতিহাস, জগতের অর্থাৎ ভারতের বাহিরের সমগ্র বিশ্বের মানবগণের ইতিহাসেরই অন্তর্ভুক্ত, এক অখণ্ড মানব-প্রচেষ্টার অংশরূপেই ভারতের মানব-প্রচেষ্টাকে ধরিতে হইবে, ইহার বহির্ভূতরূপে নহে; এবং দুই, কোনও বিশেষ জাতি সম্প্রদায় বা শ্রেণী বিশেষরূপে ভগবানের অনুগৃহীত হইতে পারে না—প্রাচীন ইহুদী, প্রাচীন ইরাণী, প্রাচীন ও আধুনিক খ্রীষ্টান ও মুসলমান, জাপানী, চীনা প্রভৃতি বহু সভ্য জাতি মধ্যে (এবং ব্যবহারিক ভাবে ব্রাহ্মণাদি বহু ভারতীয়ের মধ্যে), তথা বহু অসভ্য জাতিমধ্যেও, ঈশ্বরের প্রতি পক্ষপাতিত্ব আরোপকারী এইরূপ অনুচিত বিশ্বাস বিদ্যমান দেখা যায়। শিষ্টজনের উচিত, এইরূপ মনোভাব পরিহার করা; সর্ব্ব জীবে ও সর্ব্ব জাতিতে ঈশ্বরের পক্ষপাতশূন্য সমদৃষ্টিতে আস্থা স্থাপনপূর্ব্বক, বিভিন্ন জাতি মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তির কত বিচিত্র বিলাস ও প্রকাশ হইয়াছে, সেই বৈচিত্র্য আলোচনা করিয়া, কি ভাবে বিভিন্ন জাতি-সমূহের কৃতিত্ব পরস্পরকে সম্পূরণ করিয়া এক অখণ্ড, সর্ব্বাবলম্বী, সমবায়-মূলক মানবজাতির কৃতিত্ব গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার চর্চ্চা করা, এবং এই কার্য্যে প্রত্যেক জাতিকে তাহার চেষ্টার ও সার্থকতার অনুরূপ জয়মাল্য অর্পণ করা।

এই প্রতিজ্ঞা দুইটি মানিয়া লইলে, যুক্তিতর্কানুমোদিত ঐতিহাসিক আলোচনায় স্পষ্টীকৃত হয় যে, ভারতের বাহির হইতে আর্য্যজাতি তাঁহাদের চর্য্যা ও ধর্ম্মনীতি তথা পুরাণ-কথা লইয়া এদেশে আগমন করেন। এদেশে আর্য্যজাতির আগমনের পূর্ব্বে, দ্রাবিড় ও কোল জাতীয় অনার্য্যগণ বাস করিতেন। এই অনার্য্যদের যে নিজস্ব সংস্কৃতি ছিল, নিজ ধর্ম্ম ও অনুষ্ঠান, নিজ ইতিকথা ও পুরাণ ছিল, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। আর্য্যের ধর্ম্ম ও সমাজ এবং অনার্য্যের ধর্ম্ম ও সমাজ বহু বিষয়ে পৃথক্ ছিল। আর্য্য ও অনার্য্যের প্রথম সংঘর্ষের পরে, উভয় জাতির মধ্যে মিলন ঘটিল, এবং আর্য্য ও অনার্য্য জাতি ও ধর্ম্ম মিলিয়া হিন্দু বা প্রাচীন ভারতীয় জাতি ও ধর্ম্মের উদ্ভব হইল। এই মিলন-সঞ্জাত নবীন সভ্যতা ও ধর্ম্মের বাহন হইল আর্য্যের ভাষা সংস্কৃত। ধর্ম্মবিশ্বাস, দেবতাবাদ, আচার ও অনুষ্ঠান, ইতিহাস ও পুরাণ-কথা উভয় জাতির নিকট হইতেই গৃহীত হয়, এবং ধীরে ধীরে এই সমস্ত বিষয় সংস্কৃত ভাষায় গ্রথিত হইয়া চিরতরে রক্ষিত হইতে থাকে। আর্য্যের সভ্যতার ও ধর্ম্মের নিদর্শন অনেকটা অবিমিশ্র রূপে আমরা ঋগবেদ সংহিতায় পাই। পরবর্ত্তী যুগে বিশুদ্ধ আর্য্য ধর্ম্ম ও মতবাদ ধীরে ধীরে অনার্য্য তথা মিশ্র আর্য্যানার্য্য ধর্ম্ম ও মতবাদের প্রভাবে ম্লান হইয়া যাইতে থাকে—আর্য্যের অনুষ্ঠিত উপাসনা-রীতির সহিত অনার্য্যের উপাসনা-রীতির একটা অচ্ছেদ্য সমন্বয় সাধিত হইয়া উঠে। হোম আর্য্যদের রীতি; ব্রাহ্মণাদি তিন দ্বিজবংশেরই হোমে অধিকার, শূদ্রের ইহাতে অধিকার নাই। বেদে ও অন্য বৈদিক সাহিত্যে কেবলমাত্র হোমেরই কথা আমরা পাই—পুষ্প-চন্দন অক্ষতাদি দ্বারা পূজার উল্লেখ পর্য্যন্তও বৈদিক সাহিত্যে কুত্রাপি নাই। পূজার অনুষ্ঠানটি মূলতঃ অনার্য্যদেরই অনুষ্ঠান বলিয়া অনুমিত হয়। আধুনিক হিন্দুজনগণ মধ্যে যে সমুদয় দেবতার পূজা প্রচলিত—যাঁহারা হিন্দুজাতির প্রথম ও প্রধান শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করেন, ঋগ্বেদের দেবসভায় তাঁহাদের স্থান অপ্রধান ও নগণ্য; বৈদিক উপাসনায় তাঁহাদের আবাহন নাই বলিলেই হয়। অথচ হিন্দুধর্ম্মে শিব ও উমা, শ্রী ও বিষ্ণুর কল্পনার মত মর্য্যাদাময়ী কল্পনা আর কোথায়? সমস্ত পুরাণ ইঁহাদেরই অনন্ত মহিমা বর্ণনে নিযুক্ত, হিন্দুর শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও দর্শন ইঁহাদেরই শ্রীচরণ বেড়িয়া ঘুরিয়া ফিরিয়াছে। পুরাণ-বর্ণিত দেব-কল্পনা ও দেবলীলা হঠাৎ একদিন বেদের পরবর্ত্তী কোনও কালে হিন্দুর মস্তিষ্কে গজাইয়া উঠিয়াছিল, এরূপ অনুমানের পক্ষে কোনও যুক্তি নাই। বহু শত বৎসর ধরিয়া, বেদের সময় হইতেই, (এমন কি তাহার পূর্ব্ব হইতেই) পুরাণের প্রধান দেব-কাহিনীগুলি কোন-না-কোন রূপে বিদ্যমান ছিল, ইহা অনুমিত হয়; অবশ্য হিন্দুজাতির কল্পনা ও দর্শনশক্তির প্রৌঢ়ত্বের সঙ্গে সঙ্গে পরে সেগুলি সম্পূর্ণতা লাভ করে—কাব্য-সৌন্দর্য্য ও সত্য-দর্শনের আলোক দ্বারা সেগুলি উদ্ভাসিত হয়। পৃথিবীর মানব কল্পনা এবং মানবের চিন্তা, ঈশ্বরের সত্তাকে ও স্বরূপকে শব্দের দ্বারা ও রূপ-সৃষ্টির দ্বারা প্রকাশ করিবার জন্য যুগে যুগে দেশে দেশে নানাবিধ প্রয়াস করিয়াছে—কিন্তু শিব ও উমা, শ্রী ও বিষ্ণুর প্রতীককে আশ্রয় করিয়া মানুষের এই কল্পনা ও চিন্তা ভারতবর্ষে যেরূপ গভীরভাবে ও যতটা ব্যাপকভাবে ব্রহ্মের আস্বাদন করিতে আমাদের সহায়তা করিয়াছে, সেভাবে মানবের পক্ষে পৃথিবীর আর কোথাও সম্ভব হয় নাই; বিভিন্ন ধর্ম্মের সামান্য মাত্রও তুলনামূলক আলোচনা যিনি করিবেন, তিনিই এই কথা স্বীকার করিবেন। শিব ও উমা—শিব ও শক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি যে ভারতবর্ষে বেদ-রচক আর্য্যদের আগমনের পূর্ব্বেই বিরাজ করিতেছিলেন, এমন কি লিঙ্গ ও গৌরীপট্টময় তাঁহাদের প্রতীকও যে ভারতবর্ষে আর্য্য-পূর্ব্ব যুগেও বিদ্যমান ছিল ও লোকের নিকট পূজিত হইত, তাহার প্রমাণ দক্ষিণ পাঞ্জাবে হারাপ্পায় ও সিন্ধুপ্রদেশে মোহেন্-জো-দড়োতে (যেখানে আর্য্য-পূর্ব্ব যুগের বিশাল নগরীর সুবৃহৎ ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে সেখানে) পাওয়া গিয়াছে। পুরাণে হরপার্ব্বতীর যে লীলা প্রকটিত হইয়াছে, তাহার মূল উৎস যেমন একদিকে আর্য্যদের মূলগ্রন্থ বেদে গিয়া খুঁজিতে হয়, তেমনি অপরদিকে তাহা বেদ পূর্ব্ববর্ত্তী মোহেন্-জো-দড়োর যুগের আর্য্যেতর জাতির ধর্ম্ম এবং দেবার্চ্চনা-রীতির সম্পর্কিত নানা নিদর্শন হইতেও দেখা যায়। দেবতাদের সম্বন্ধে যে সমস্ত গভীর তত্ত্বপূর্ণ কথা পুরাণে পাওয়া যায়, সেগুলি আংশিক ভাবেও যে আর্য্যপূর্ব্ব যুগের, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না। হিন্দুধর্ম্মের

সব চেয়ে বড় কথা হইতেছে যোগ; এই যোগসাধন-পদ্ধতিও যে প্রাগ্‌বৈদিক, অনার্য্য,—সে সম্বন্ধে যথেষ্ট আভাস আমরা মোহেন্-জো-দড়োর সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ হইতে পাইয়াছি। সৃষ্টি-প্রকরণ—ক্ষীরাব্ধিতে অনন্ত-শয্যায় শায়িত নারায়ণ, তাঁহার নাভি-জাত কমলে ব্রহ্মার অধিষ্ঠান, মধুকৈটভ বধ প্রভৃতি ব্যাপার; সাগর-মন্থন; দেবাসুর যুদ্ধ, শক্তির আবির্ভাব; দশাবতার কথা; ইত্যাদি শত শত দেব-কাহিনী আছে; ঐতিহাসিক বিচারের দিক হইতে এগুলির গভীর ভাবে আলোচনা হয় নাই। কিন্তু এই সমস্ত কাহিনী পুরাপুরি বৈদিক জগৎ হইতে লব্ধ নহে, বেদবহির্ভূত অনার্য্য জগতেও ইহাদের অনেকগুলি রূপ গ্রহণ করিয়াছিল।...

দেব-কাহিনীর মত ইতিহাস কথা—প্রাচীন রাজগণের জীবনী ও কীর্ত্তির কথা, যাহা পুরাণে ও রামায়ণ-মহাভারতে রক্ষিত আছে, সেই ইতিহাস-কথাও যে দেব-কাহিনীর মতই কতক অংশে আর্য্যেতর জাতিরও প্রাচীন ইতিকথাকে রক্ষা করিয়া আছে, সে সম্বন্ধেও অনুকূল মত ও যুক্তি প্রচারিত হইয়াছে। প্রাচীন রাজন্ত বা ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে প্রচলিত রীতি নীতি এবং ইতিকথা যে অনেকটা অনার্য্য জাতিরই রীতিনীতি এবং ইতিকথা, এরূপ স্পষ্ট ইঙ্গিতও করা হইয়াছে।...

ভারতের পুরাণের ধারা আর্য্য ও অনার্য্য উভয় জাতির দেবতাবাদ ও ঐতিহ্যকে অবলম্বন করিয়া; পুরাণের মূল উৎস আংশিক ভাবে বেদেরও পূর্ব্বেকার যুগে ভারতে প্রচলিত দেব-কাহিনী ও রাজ-কাহিনী। আর্য্য এবং অনার্য্যের মিশ্রণের ফলে হিন্দুজাতির উদ্ভব ঘটার সঙ্গে সঙ্গে, অনার্য্য পুরাণও আর্য্য ভাষায় গ্রথিত হইতে থাকে;—কোথাও সংস্কৃতে, কোথাও প্রাকৃতে; এবং অবশেষে গুপ্ত-বংশীয় সম্রাট্‌দের রাজ্যকালে, ব্যাসদেবের নামের সঙ্গে পুরাণ-কাহিনীগুলিকে জড়িত করিয়া, রামায়ণ-মহাভারতের পাশে পুরাণগুলির শেষ সংস্কৃত রূপ হিন্দুজনমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সংস্কৃত রূপ দিবার আবশ্যকতা ছিল; অন্যথা সমগ্র ভারতে প্রচারের সম্ভাবনা ছিল না, কারণ সংস্কৃতভাষাই হিন্দুভারত, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের দ্বারা চালিত ভারতকে একসূত্রে বাঁধিয়া খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত নানা প্রদেশ হইতে এক অখণ্ড দেশে পরিণত করিয়াছিল। সংস্কৃতে রূপ দেওয়ার ফলেই এগুলিকে আরও বিকৃত করিবার সম্ভাবনা কম হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সংস্কৃত রূপ ছিল পণ্ডিতের আলোচনার জন্য; পুরাণের প্রাচীন কাহিনীগুলি দেশভাষায়ও জনসমাজ মধ্যে প্রচলিত ছিল—প্রাকৃতে, দ্রাবিড় ভাষায়। এখন যেমন নিরক্ষর কৃষক বা শ্রমিক, অথবা ভদ্রঘরের অশিক্ষিত ব্যক্তি, বাঙ্গালা বা হিন্দী বা তামিল ভাষায়ই পুরাণের গল্প শুনে ও শিখে, এবং সেগুলি হইতে জীবনের শ্রেষ্ঠ রসায়ন সংগ্রহ করে, তখনও তাহাই করিত; প্রাকৃতে, প্রাচীন তামিলে বা প্রাচীন কানাড়ীতে এইরূপ পুরাণের গল্প প্রচলিত থাকার প্রমাণ আমাদের হাতে যথেষ্ট আছে। ভারতের গণ-চিত্ত কখনও পুরাণ ও রামায়ণ-মহাভারতের সঙ্গে জীবন্ত যোগ হারায় নাই। অষ্টাদশ পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতের কথা ভাষায় শুনিলে মানুষ রৌরব নরকে যাইবে—এইরূপ উক্তি অর্ব্বাচীনকালের কোন্ ইতিহাসানভিজ্ঞ মূর্খের রচনা তাহা জানি না।

প্রাচীনকালে সংস্কৃতেতর পুরাণ লোকভাষায় যে ছিল, তাহা আমাদের আধুনিক আর্য্য ও দ্রাবিড় ভাষায়, পুরাণ ও ইতিহাসের পাত্র-পাত্রীদের নামের কতকগুলি রূপ হইতে বুঝা যায়। আজি হইতে দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে আমাদের অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষী জনগণের পূর্ব্বপুরুষগণ সংস্কৃত শব্দ 'কৃষ্ণ', 'রাধিকা', 'অভিমন্যু' প্রভৃতির প্রাকৃত রূপ 'কণহ' 'রাহিআ', 'অহিবন্ন', বলিতেন, তাই না আমরা এই সব প্রাকৃত পদের আধুনিক বাঙ্গালা রূপ 'কানু' 'রাই' 'আয়ান' এখনও ভুলিতে পারি নাই, এবং ইহাদের প্রাচীন বাঙ্গালা রূপ 'কান্হ', 'রাহী', 'আইহণ' শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রমুখ প্রাচীন পুঁথিতে পাই। এইরূপ যে কত প্রাকৃত রূপ পরবর্ত্তীকালে মূল সংস্কৃত রূপের দ্বারা বিতাড়িত হইয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এই কারণেই উত্তর-ভারতে হিন্দীতে 'সীতা'র পাশে উক্ত শব্দের প্রাকৃতজ রূপ 'সীয়, সিয়' এখনও পাওয়া যায়, 'লক্ষ্মণ'-এর পাশে 'লখন', এবং প্রাচীন হিন্দীতে 'রাম'এর যে একটি প্রাকৃতজ রূপ 'রাও' ছিল, তাহারও ইঙ্গিত আমরা পাই। তামিলে প্রাচীন কাল হইতেই প্রধান পৌরাণিক দেবতাদের বিশুদ্ধ দ্রাবিড় নাম পাই—'মাল্' অর্থাৎ বিষ্ণু, 'পেরুমাল্' অর্থাৎ মহাবিষ্ণু, 'অয়ন্' অর্থাৎ ব্রহ্মা; 'শিবন্' বা 'শিব' শব্দটিকেই কেহ কেহ দ্রাবিড় ভাষার শব্দ বলিয়াছেন; উমার এক তামিল নাম 'কোর্‌বৈ'; গণেশ 'পিল্লৈয়ার্' রূপে পূজিত, কার্ত্তিকেয় তামিলদেশে 'মুরুগন্' নামে লোকপ্রিয় দেবতা।

কতকগুলি প্রমাণ ও যুক্তি বলে এইরূপ বোধ হয় যে আমাদের অধুনা-প্রচলিত সংস্কৃতে রচিত পুরাণ ও ইতিহাস আদিম যুগে প্রাচীন ভারতবর্ষে ছিল না; প্রাচীন আর্য্যযুগে ছিল, কতকটা বৈদিক ভাষায় ও কতকটা নানা আদিম অনার্য্য ভাষায়—দেব-কাহিনী ও রাজ-কাহিনী; এবং পরবর্ত্তী কালে ছিল প্রাকৃতে ও প্রাচীন তামিল প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষায় পুরাণ-কথা। অধিকন্তু সংস্কৃত পুরাণাদি হইতে স্বতন্ত্রাকারে প্রাচীন বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষায়ও কতকগুলি পুরাণ-কাহিনী বিদ্যমান ছিল। পুরাণ চিরকাল ধরিয়া ভারতের জনগণের সাহিত্য, ভাষা-সাহিত্য, লোক-সাহিত্য। লোক-সাহিত্য বলিয়া ইহাকে মার্জ্জিত করিয়া লইবার আবশ্যকতা উপলব্ধ হইয়াছিল। পণ্ডিতেরা যতগুলি সম্ভব আখ্যানকে সংস্কৃত করিয়া লইয়াছিলেন, পুরাণনামক গ্রন্থাকারে গ্রথিত করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপে সংস্কৃতী করণের ফলে, ও সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণের চিন্তা দর্শন ও কল্পনাদ্বারা উন্নীত হওয়ার ফলে এবং প্রামাণিক গ্রন্থমধ্যে সংগৃহীত হওয়ায়, এগুলির লোক প্রসিদ্ধি ও সমাজে প্রতিপত্তি বাড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু সংস্কৃত অষ্টাদশ পুরাণের ও তৎসংখ্যক উপপুরাণের বাহিরেও শত শত অন্য পুরাণ-কাহিনী এখনও বিদ্যমান; কোথাও সম্পূর্ণ পৃথক্ বা নূতন দেব-কাহিনী বা ঐতিহ্যময়, কোথাও বা সংস্কৃত পুরাণ ও ইতিহাস ধৃত আখ্যায়িকা হইতে অল্পাধিক বিভিন্ন রূপের আখ্যায়িকাময়। হয়তো এগুলিও সংস্কৃতে নীত হইয়া ব্যাসদেবের নামের ছাপ লইয়া পুরাণ-রূপেই পরিগণিত হইত। কিন্তু উত্তর-ভারত বিদেশীয় তুর্কী মুসলমান কর্ত্তৃক বিজিত হইবার পরে, এবং তদনন্তর মুসলমানীকৃত উত্তর-ভারতীয়গণের দ্বারা দক্ষিণ ভারত বিজয়ের পরে, দেশে যে অরাজকতার ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চলিল, তাহার ফলে ব্রাহ্মণগণ এবিষয়ে আর অবহিত হইতে পারিলেন না। কেন্দ্রীভূত হিন্দুর রাজশক্তির ও ব্রাহ্মণ-শক্তির অভাবে নূতন পুরাণ আর প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হইল না, এই সকল পুরাণের কাহিনী ও উপদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশেই নিবদ্ধ রহিল। দক্ষিণের প্রায় প্রত্যেক বড় বড় তীর্থস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার লীলা অবলম্বন করিয়া বহু 'স্থল-পুরাণ' বা 'মাহাত্ম্য' আছে, সেগুলি মনোহারিত্বে অথবা প্রাচীনত্বে সাধারণ পৌরাণিক কাহিনী হইতে কোনও অংশে হীন নহে; কিন্তু গয়াখণ্ড, কাশীখণ্ড, জগন্নাথ-মাহাত্ম্য প্রভৃতির ন্যায় এগুলি সর্ব্বজন-স্বীকৃত পুরাণ বা উপপুরাণ মধ্যে স্থান পাইল না। বাঙ্গালা দেশের মঙ্গল-কাব্যগুলি পুরাণ ব্যতীত আর কিছুই নহে; কিন্তু মনসা-মঙ্গলের সতী বেহুলার কাহিনী, বা চণ্ডীমঙ্গলের কাল-

কেতু ও শ্রীমন্ত সদাগরের কাহিনী, সংস্কৃতে গৃহীত না হওয়ায় ও পুরাণ পদবী না পাওয়ায়, বাঙ্গালা ভাষায় ও বাঙ্গালা দেশেই সীমাবদ্ধ রহিল। বৌদ্ধমতের পুরাণ বলিয়া ধর্ম্মমঙ্গলে বর্ণিত লাউসেনের কাহিনীও অনাদৃত রহিল, এবং রাজা গোপীচাঁদের কাহিনী সংস্কৃতে গৃহীত হইল না, যদিচ এই গোপীচাঁদ কাহিনী সমগ্র ভারতের বিভিন্ন আধুনিক ভাষায় জনগণ মধ্যে বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়া আছে। রামায়ণের কথা বাঙ্গালা দেশে যে ভাবে আবহমানকাল ধরিয়া প্রচলিত, যাহার ধারাটি আমরা কৃত্তিবাস-প্রমুখ কবিগণের বাঙ্গালা রামায়ণে পাই, তন্মধ্যে এমন দুই-একটি সুপ্রাচীন কথা আছে যেগুলি বাল্মীকি-রচিত সংস্কৃত রামায়ণে নাই, অথচ যবদ্বীপের রামায়ণে আছে। বাঙ্গালা রামায়ণের মূলে যে বাল্মীকি-বহির্ভূত অন্য প্রাচীন রামায়ণ আছে, তাহা স্বীকার করিতে হয়।

বহুস্থলে আবার এরূপ দেখা যায় যে, বিশেষ কোনও দেবলীলার কোনও অংশ বা অঙ্গ সেই লীলা বিষয়ক প্রাচীন সংস্কৃত পুরাণে পাইতেছি না পাইতেছি পরবর্ত্তী যুগের ভাষায় রচিত কোনও আখ্যানে বা কাব্যে। দুইটি কারণে ইহা ঘটিতে পারে; এক—দেবলীলার প্রাচীন পুরাণ-বহির্ভূত এই অঙ্গ বা অংশ পরবর্ত্তী কালের কল্পনা-প্রসূত, এবং নূতন সংযোজন; অথবা দুই—প্রাচীন পুরাণে কোনও কারণে অগৃহীত সুপ্রাচীন কথাই লোকমুখে প্রচার অবলম্বন করিয়া ভাষা পুস্তক মধ্যে প্রথম গ্রথিত। এরূপ ক্ষেত্রে বিশেষ সমীক্ষার সহিত তথ্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—প্রাচীন পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ লীলার দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের উল্লেখ নাই, শ্রীরাধার অস্তিত্ব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের মত গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ নাই; অথচ হিন্দী ও বাঙ্গালা কাব্যে দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড শ্রীকৃষ্ণ-লীলার দুইটি অংশরূপে গৃহীত, এবং শ্রীরাধা ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব পরবর্ত্তী কাব্যে ও কবিতায় কল্পনাই করিতে পারা যায় না। বাঙ্গালার প্রাচীনতম বৈষ্ণব কাব্য শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে রাধা-কৃষ্ণের মধ্যে দৌত্য করিবার জন্য বড়ায়ি বা জরতীকে মাত্র পাই, শ্রীরাধার ললিতাদি অষ্টসখীর নাম অজ্ঞাত, শ্রীকৃষ্ণের সুবলাদি সখাগণও অজ্ঞাত, এবং জটিলা কুটিলার সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গই নাই। কৃষ্ণায়নে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় বৃন্দাবন-খণ্ডের আলোচনায় এই সকল অসঙ্গতিপূর্ণ সমাধানের প্রয়াসকে পুরাণ-আলোচনার অংশ বলিয়াই ধরিতে হইবে। বাঙ্গালায় প্রচারিত শিবায়নেও সংস্কৃত পুরাণের অতিরিক্ত, অর্ব্বাচীন যুগে বাঙ্গালার হিন্দুজাতি কর্ত্তৃক গৃহীত, শিব-বিষয়ক কতকগুলি কাহিনী মিলে। বাঙ্গালার ব্রতকথাগুলিও অ-সংস্কৃত লোক-পুরাণের অন্তর্গত।

এইরূপ নানা দিক দিয়া ভারতের ধর্ম্ম, চিন্তা ও রসসৃষ্টির প্রাচীনতম ধারা, ভারতীয় সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতির চিরন্তন অনুপ্রাণনা, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষবিধানে ভারতের নরনারীর চির-সহচর পুরাণগ্রন্থগুলি প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতীয়ের আলোচনার বস্তু হওয়া উচিত। পুরাণ ও ইতিহাস কথা ভারতের ঋষিগণের বাণীকে সকলের নিকট সহজবোধ্য করিয়া দিয়াছে, গভীরতম আধ্যাত্মিক সত্যকে রূপক-চ্ছলে সুলভ করিয়া দিয়াছে। ভারতের বাহিরে যেখানে যেখানে ভারতের সভ্যতা প্রসৃত হইয়াছে, সেখানে সেখানে ভারতের পুরাণকাহিনীও পঁহুছিয়াছে। শকজাতীয় কুষাণ সম্রাটদের (কণিষ্কাদির) মুদ্রায় 'উগ্র' 'অহীশ' 'মহাদেব' নামে শিবের মূর্ত্তি, 'বাত' নামে বায়ুর মূর্ত্তি, 'স্কন্দ' 'কুমার' মহাসেন' নামে কার্ত্তিকেয়ের মূর্ত্তি চিত্রিত দেখা যায়; কুষাণ সাম্রাজ্য মধ্য-এশিয়া পর্য্যন্ত প্রসৃত ছিল, সুতরাং তখন এই সমস্ত পৌরাণিক দেবতাদের সঙ্গে, এবং সম্ভবতঃ ইহাদের পুরাণনিবদ্ধ লীলা কথার সম্বন্ধে মধ্য-এশিয়ার লোকেরাও কিছু কিছু খবর পাইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন কুষাণ সম্রাটদের পরবর্ত্তী কালে মধ্য-এশিয়ায় পঞ্চমুখ বৃষবাহন শিবের, হরপার্ব্বতীর ও বজ্রপাণি ইন্দ্রের চিত্র পাওয়া গিয়াছে, গণেশ ও সরস্বতী চীন ও জাপানে এখনও পূজিত। মধ্য-এশিয়ার লোকেরা তথা চীন কোরিয়া ও জাপানের অধিবাসীরা ভারতের ব্রাহ্মণ ও ঋষিদের কথা ভালরূপেই জানিত—জটাজুটধারী দীর্ঘশ্মশ্রু ব্রাহ্মণ ও ঋষিদের অনেক চিত্র মধ্য-এশিয়ায়, চীনে ও জাপানে (সেখানকার শিল্পীদের অঙ্কিত) পাওয়া গিয়াছে। মধ্য-এশিয়ায়, চীনে ও জাপানে বৌদ্ধ প্রভাবই সমধিক ঘটিয়াছিল, সেইজন্য জাতক অবদান প্রভৃতি বৌদ্ধ পুরাণই এই সকল দেশে অধিকতর আদৃত; ব্রাহ্মণ্যানুমোদিত পুরাণ ও ইতিহাস সেখানে প্রসৃত হইতে পারে নাই। তথাপিও বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম উভয়ের মধ্যে দেবতাবাদে একটা সাধারণ ঐক্য আছে, এবং সেই ঐক্য-হেতু আমাদের সুপরিচিত অনেক পৌরাণিক কাহিনী চীন ও জাপানের লোকেরা বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে পাইয়াছে।

দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়ায় কিন্তু ভারতের পুরাণ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যানুমোদিত পুরাণ, একেবারে দিগ্বিজয় করিয়া সেই দেশের লোকের চিত্তে অধিষ্ঠিত হইয়া বসিয়াছে। ইন্দোচীন নামধেয় ভূভাগে—অর্থাৎ সুবর্ণভূমি বা দক্ষিণ বর্ম্মা, ব্রহ্মদেশ বা উত্তর ও মধ্য বর্ম্মা, দ্বারাবতী বা দক্ষিণ শ্যাম, কম্বোজ, চম্পা বা কোচিন্ চীন, এবং শ্যামরাষ্ট্র, এই কয়টি দেশে, এবং ইন্দোনেসিয়া অর্থাৎ দ্বীপময় ভারতে, অর্থাৎ মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, বোর্ণিও প্রভৃতি স্থানে, ভারতের পুরাণ-কথা এবং রামায়ণ-মহাভারত নব নিকেতন প্রাপ্ত হইয়াছিল। বর্ম্মা, শ্যাম ও কম্বোজের লোকেরা এখন বৌদ্ধ; মালয়, সুমাত্রা ও যবদ্বীপের লোকেরা এখন মুসলমান; কেবলমাত্র ক্ষুদ্র বলিদ্বীপের লোকেরা মিশ্র ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম পালন করিয়া থাকে। তথাপি ঐ সব স্থানে রামায়ণ-মহাভারত এবং আমাদের বহু পৌরাণিক কাহিনী, ভারতবর্ষের হিন্দুদের কাছে যতটা আদৃত, ততটাই আদৃত; এবং ইন্দোনেসিয়া বা দ্বীপময় ভারতে বোধ হয় ভারতবর্ষের চেয়েও অধিক আদৃত। ভারতবর্ষেরই মত ঐ সব দেশের ভাস্কর্য্য ও শিল্পকে আমাদেরই ইতিহাস ও পুরাণ পুষ্ট করিয়াছে—রামায়ণ-মহাভারত বা তদবলম্বনে রচিত নানা কাব্য ও নাটক গ্রন্থ বাদ দিলে যবদ্বীপীয় সাহিত্যের, শ্যাম ও কম্বোজ ভাষায় সাহিত্যের এবং বর্ম্মী সাহিত্যের অনেকখানি চলিয়া যায়। যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ ও শ্যামদেশে রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি...। যবদ্বীপের প্রাম্বানান্-এর বিশাল শিবক্ষেত্রের ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের তিনটি বিরাট মন্দিরগাত্রে খোদিত রামায়ণ ও কৃষ্ণায়ন চিত্র ভারতীয় শিল্পকলার অপূর্ব্ব নিদর্শন; ভারতবর্ষেও এত সুন্দর ও বর্ণনীয় অনুরূপ চিত্রাবলী কুত্রাপি নাই। কম্বোজের সুবিখ্যাত আঙ্কর-বাৎ মন্দিরের ভিত্তিতেও তদ্রূপ রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণের দৃশ্যাবলী অঙ্কিত আছে। রামায়ণ-মহাভারত এবং কতকগুলি পৌরাণিক আখ্যান এখনও বিশেষ লোকপ্রিয় নাটকের কথাবস্তু, এবং এইগুলিকে আশ্রয় করিয়া শ্যাম, কম্বোজ, যবদ্বীপ ও বালিদ্বীপের অভিনব ছায়ানাট্য সৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়াছে।

(ভারতবর্ষ—পৌষ ১৩৬৯)

পুস্তক পরিচয়

সরলক্রিয়াকৌমুদী—(পূজা ব্রত-দশসংস্কার-শ্রাদ্ধ-তর্পণ-সন্ধ্যা-স্বস্ত্যয়নাদির সরল পদ্ধতি)। আর্য্যবিদ্যাপরিষৎ গ্রন্থমালা—৩য় গ্রন্থ। শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার বেদার্থচিন্তামণি-সঙ্কলিত। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্। ২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

হিন্দুর বিবিধ ধর্ম্মকৃত্য সম্বন্ধে বর্ত্তমানে নানা গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে ও হইতেছে। ইহাদের মধ্যে অতি অল্প গ্রন্থেই লক্ষ্য করিবার মত বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। গতানুগতিকতা'ই ইহাদের অধিকাংশের প্রধান অবলম্বন। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থখানি কিন্তু ঠিক এই ধরণের নহে। ইহাতে প্রচলিত পদ্ধতিগুলির মধ্যে কালোপযোগী কিছু সংস্কার সাধনের চেষ্টা করা হইয়াছে। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় একস্থানে অল্পকথায় এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ প্রসঙ্গে তাহা স্পষ্টই বলিয়াছেন। তিনি বলেন—"যাহাতে বর্ত্তমানের আচরিত পদ্ধতির ভিতর দিয়াই নরনারীগণ উচ্চতর সাধনার পথ দেখিতে পায় এবং সেই পথে চলিতে ব্যগ্র হয় এমন ভাবে-তাহার সংস্কার সাধনের চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য।...বর্ত্তমানে প্রচলিত দেবদেবীগণের স্তুতি ও বন্দনায় কেবল পূজকের নিজ কল্যাণ প্রার্থনা আছে, দেশের ও লোকসাধারণের কল্যাণকামনা তাহাতে নাই। আমি এই অভাব পূরণ করিতে কিঞ্চিৎ প্রয়াস করিয়াছি।...আমি এই পুস্তকে দেবদেবীগণের অর্চ্চনায় নারীজাতির অধিকার স্বীকার করিয়াছি।" (পৃ. ৫)। আমরা সকল বিষয়ে গ্রন্থকর্ত্তার সহিত একমত হইতে না পারিলেও নানা দিক্ হইতে এই গ্রন্থের উপযোগিতা স্বীকার করি। পাদটীকায় সমস্ত মন্ত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া থাকায় অর্থ-বোধ না করিয়া মন্ত্রোচ্চারণের বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে না। ব্রতকথা ও দেবতাদের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক উপাখ্যানগুলির কেবল অনুবাদ মাত্রই দেওয়া হইয়াছে—তাহাতে সাধারণের পক্ষে এগুলি বুঝিবার বিশেষ সুবিধা হইবে।" ব্রতকথাদি যে সংস্কৃতেই পঠিত হওয়া চাই এরূপ নিয়ম গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রেত নয়, ইহাই এই অনুবাদ হইতে মনে হয়। তবে তাঁহার মতে পৌরাণিক ব্রতকথাই দেবতার প্রসন্নতা আনয়ন করিতে পারে। পৃ. ১৬৯ পাদটীকা।। তাই তিনি বঙ্গদেশে ও প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত সত্যনারায়ণ, শনি ও মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী উপেক্ষা করিয়া অল্পপ্রচলিত বা অপ্রচলিত পৌরাণিক উপাখ্যানের অনুবাদ মাত্র দিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। অথচ কোন কোন দেবতার বন্দনা ও প্রার্থনায় তিনি কোনও ইঙ্গিতমাত্র প্রদান না করিয়াই স্বরচিত বা আধুনিক ব্যক্তিবিশেষ রচিত সংস্কৃত মন্ত্র অন্য প্রাচীন মন্ত্রের সহিত সন্নিবেশিত করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই (পৃ ১১২, ১৮৬, ২৭৫ দ্রষ্টব্য)। গ্রন্থমধ্যে এই খুঁটিনাটি বিরোধ একেবারে উপেক্ষণীয় নহে।

এ জাতীয় গ্রন্থে একটি অভাব অনুসন্ধিৎসু পাঠককে বড়ই পীড়িত করে। সে বিষয়ের উল্লেখ এখানে না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। অনেকে এই সকল গ্রন্থ হইতে দেশের আচারাদির সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করিতে উৎসুক হন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন লৌকিক আচারের এবং তাহাদের স্থানগত পার্থক্যের কোনও উল্লেখ করার বিশেষ প্রয়োজন কেহই অনুভব করেন না—বর্ত্তমান গ্রন্থকারও করেন নাই। ইহা বিশেষ দুঃখের বিষয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

হিন্দুধর্ম্ম ও অস্পৃশ্যতা—শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। অনুবাদক শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত। মূল্য পাঁচ আনা। কার্ত্তিক, ১৩৩৯।

ইংরেজী ১৯২০ হইতে ১৯২৭ সাল পর্য্যন্ত মহাত্মাজীর হিন্দুধর্ম্ম ও অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় প্রকাশিত রচনার বঙ্গানুবাদ। প্রায় প্রত্যেক খণ্ডের শেষে প্রকাশকাল দেওয়া আছে, শুধু 'আন্তর্জাতিক ভোজন' ও 'অস্পৃশ্যতার পক্ষে পণ্ডিতের যুক্তি' এই দুই খণ্ডে দেওয়া নাই, ইহা চোখে একটু ঠেকিল। রচনাগুলি কালানুক্রমিক সাজানো হয় নাই, কি ভাবে সাজানো হইয়াছে সে-সম্বন্ধে অনুবাদকের কোনও নির্দ্দেশ দেওয়া নাই। সুতরাং ক্রমের অর্থ বুঝিতে পারিলাম না

হিন্দুসমাজের গলিত ক্ষত বহু শতাব্দী ধরিয়া তাহাকে দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছে, সে-সম্বন্ধে মহাত্মাজী যাহা বলিয়াছেন তাহার প্রতি বঙ্গবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সতীশবাবু বাঙ্গালীর ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন; এইসঙ্গে মহাত্মাজীর সম্প্রতিকার মন্তব্য ও বিবৃতি সমস্ত একত্র করিয়া বাংলায় প্রকাশিত করিলে আরও ভাল হইত; অস্পৃশ্যতা নিবারণ যে আজ ভারতের সকল কর্ম্মীর এবং ভাবুকের কর্ম্ম ও ভাবনার বিষয়। আশা করা যায় গান্ধী সাহিত্য অনুবাদে সিদ্ধহস্ত সতীশবাবু মহাত্মাজীর এই বৎসরকার খণ্ডবিবৃতিগুলি অচিরে অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালী পাঠকের নিকট উপস্থিত করিবেন।

রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

আমাদের যুগ যে রবীন্দ্রনাথের যুগ এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত হইলেও দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে যে রবীন্দ্রনাথকে লইয়া যতটা আলোচনা করা উচিত, রবীন্দ্রসাহিত্যের ভিতর যতটা গভীর ভাবে প্রবেশ করা উচিত, তাহার কিছুই হয় নাই। আমরা হয় 'মিষ্টিক' বলিয়া দূরে রাখি, নয় কবিগুরু বলিয়া দূর হইতে সম্বর্দ্ধনা করি, নয় দুই চারিটি বাণী আওড়াইয়া রসজ্ঞানের পরিচয় দিই। বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক প্রভাতবাবু রবীন্দ্রনাথের ১৬ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া গত ৫৭ বৎসরের মুদ্রিত রচনার সময় ও বিবরণ এই পুস্তিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে পাঠকদের যে কত সুবিধা করিয়া দিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সন তারিখের ঠিকানা সাহিত্যিকের নিকট নিতান্ত হেয় নয়, একেবারে বর্জ্জন করিবার মত নয়, চিন্তাপ্রগতি বুঝিবার পক্ষে কালের পরিমাপ যে আমরা অবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারি না; সুতরাং রবীন্দ্র-সাহিত্য-পিপাসু বাঙ্গালী পাঠক প্রভাত বাবুর নিকট কৃতজ্ঞ থাকিল।

পুস্তিকাখানির প্রকাশকাল কোথাও দেওয়া নাই, ১৩৩৮ সালের বিবরণ পর্য্যন্ত আছে, ঐ বৎসরেই কি ইহা প্রকাশিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে? প্রচ্ছদপটে ।০ মূল্য এবং তাহার পরের পৃষ্ঠায় ৵০ মূল্য নির্দ্ধারিত আছে, ইহার অর্থও বোঝা গেল না।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

সাম্যবাদ—শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। ২৩২ পৃ. মূল্য দেড় টাকা।

গ্রন্থকার ইহাকে "পাশ্চাত্য সমাজ-তন্ত্রবাদের বিস্তৃত ইতিহাস" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এত অল্প পরিসরের ভিতর এত সব বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন যে, ইহাকে "বিস্তৃত ইতিহাস" মনে করা কঠিন। সমাজ-সাম্যবাদ (socialism) সম্বন্ধে ইউরোপে মধ্যযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যত মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে তাহার বিস্তৃতি না হইলেও সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইহাতে রহিয়াছে। যাঁহারা এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু তাঁহারা এই গ্রন্থে অনেক উপাদান পাইবেন, সন্দেহ নাই। তবে ঐতিহাসিক বিবৃতি শুধু স্থান ও তারিখের তালিকায় সীমাবদ্ধ থাকিলে উহা কদাচিৎ সুখপাঠ্য হয়। সেই জন্য এই গ্রন্থে সংগৃহীত উপাদান-সমষ্টি আয়ত্ত করিতে সাধারণ পাঠকের একটু শ্রম স্বীকার করিতেই হইবে।

অর্থনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতির আলোচনায় পাশ্চাত্য ভাষা-সমূহে অনেক সংজ্ঞা ও পরিভাষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে যাহার প্রতিযোগী সংজ্ঞা বাংলায় অনেক সময়েই পাওয়া যায় না। এখন যখন এই সব বিষয়ের আলোচনা বাংলা ভাষায়ও দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, তখন নূতন নূতন কথার আমদানীও না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু গ্রন্থকার কতকগুলি ইংরেজী কথার যে বাংলা তর্জ্জমা করিয়াছেন, তাহা চলিবার মত কি-না ভাবিবার বিষয়।—যথা,—value—কদর (১৯ পৃ.), surplus value—অতিরিক্ত কদর (২৪ পৃ.), feudalism—সামন্ত প্রথা (৫৫ পৃ.), standard of living—জীবিকার মান (১৮২ পৃ), ইত্যাদি।

অনুবাদ ছাড়াও গ্রন্থকারের ভাষা মধ্যে মধ্যে এমন আকার ধারণ করিয়াছে যে, সকলে তাহা অনুমোদন করিবেন কি-না, সন্দেহ। যথা, "মনেও করিত না উপলব্ধিও করিতে পারিত না" (৫১ পৃ.); "তাহা হইলে কোন নালিশ থাকিবে না, সারা জগৎ মধুময় হইয়া উঠিবে" (৫২ পৃ), ইত্যাদি। "ইস্তাহার ঘোষণা" (৮৯ পৃ.) প্রভৃতি শব্দও কানে বাজে।

তথাপি গ্রন্থকারের পরিশ্রম প্রশংসনীয়। আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে তিনি অনেক তথ্য নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় এইরূপ বই খুব বেশী আছে বলিয়া মনে হয় না। সাম্যবাদ-সম্পর্কে ইহার চেয়ে বিস্তারিত বিবরণ যাঁহারা জানিতে চান, তাঁহারাও এই বইয়ে অনেক আকর-গ্রন্থের ঠিকানা পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মায়া-তরু—(কাব্য গ্রন্থ) শ্রীমতী সরোজিনী দেবী প্রণীত, প্রকাশক শ্রীবিমলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মুড়াপাড়া, ঢাকা।

গ্রন্থের প্রথমেই 'প্রার্থনা' পাঠে গ্রন্থকর্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা না আসিয়া থাকিতে পারে না। এই গ্রন্থের সমস্ত কথাই সহজ সরল ভাষায় লেখা। সেকেলে ছন্দে কবিতাগুলি লিখিত হইলেও, এবং বিষয়গুলি মামুলি হইলেও তাহার মধ্যে কবি-প্রাণের স্পর্শ অনুভব করিয়াছি। কবিতাগুলি পড়িয়া মনে হয় গ্রন্থকর্ত্রীর বর্ত্তমান যুগের কাব্যজগতের সঙ্গে কোনও পরিচয়ই নাই। সত্য সত্যই যদি কাব্য সাধনা করিতে হয় তবে গ্রন্থকর্ত্রীকে আমরা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এবং বর্ত্তমান যুগের কবিগণের কবিতার সহিত পরিচিত হইতে অনুরোধ করি। এই গ্রন্থে মূল্যের উল্লেখ নাই। রচনা সেকেলে এবং তাহাতে সহস্র ত্রুটি থাকিলেও ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত ধনী-অন্তঃপুরের নারী হইয়া তিনি অন্তরের শ্রদ্ধা দিয়া যে এই কাব্য-সাধনা করিয়াছেন সেজন্য তাঁহাকে আমরা শ্রদ্ধা প্রদান করিতেছি।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

জীবনী কোষ—শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার প্রণীত। ভারতীয়-পৌরাণিক। ১০ম, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা। মূল্য প্রতি সংখ্যা এক টাকা। ৮১ নং ওয়েষ্ট কমায়ুট. রেঙ্গুন, বর্ম্মা।

এই জীবনী কোষের পরিচয় আমরা একাধিক বার দিয়াছি ও ইহার প্রশংসা করিয়াছি। ইহা জ্ঞানানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী সকল শিক্ষিত ব্যক্তির এবং বঙ্গের সকল স্কুল কলেজের লাইব্রেরীতে রাখা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ইহার ব্যবহার দ্বারা পৌরাণিক বিষয়ের সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়িবে, এবং মনোরঞ্জনের উপায়ও হইবে।

রবীন্দ্রনাথ এই অভিধান সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "জীবনী কোষ গ্রন্থের প্রথম অংশ ভারতীয় পৌরাণিক অভিধান। ইহার দ্বাদশ সংখ্যা বাহির হইয়াছে। গ্রন্থকারের অধ্যবসায় বিস্ময়জনক। তাঁহার বিষয়সংগ্রহ বহুব্যাপক, পৌরাণিক ইতিহাস আলোচনায় এই গ্রন্থের আনুকূল্য অত্যাবশ্যক হইবে, এবং সেইরূপ প্রয়োজন না থাকিলেও অবসর-যাপনের পক্ষে ইহা মনোগ্রাহী। আমরা অন্তরের সহিত এই গ্রন্থের সম্পূর্ণতা কামনা করি।"

প্রফুল্ল প্রশস্তি—শান্তিশঙ্কর দাশগুপ্ত, বিনয়েন্দ্রনাথ (যুগ্মসম্পাদক। মূল্য আট আনা।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয়ের জীবনের সপ্ততিতম বর্ষ অতিক্রম উপলক্ষ্যে প্রকাশিত এই বহিখানিতে তাঁহার জীবন ও চরিত্রের নানা বিভাগ ও দিকের পরিচয় আছে, অধিকন্তু অনেক বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনাও আছে। এই কারণে ইহা উপাদেয় হইয়াছে। ইহার শেষে আচার্য্য রায় রসায়নী বিদ্যার গবেষণা দ্বারা নূতন তথ্যমূলক যত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার তালিকা দেওয়া আছে। তাহাতে দেখিলাম ১৯৩২ সালেও তিনি এইরূপ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

দেশের কথা— স্বদেশী শিল্পের তালিকা), দ্বিতীয় সংস্করণ। স্বদেশী শিল্প প্রচার সমিতি ১নং ডালিমতলা লেন, কলিকাতা। আশ্বিন ১৩৩৯। মূল্য পাঁচ পয়সা।

দেশী জিনিষ ব্যবহার করিতে যাঁহারা চান, তাঁহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে; যে চায় না, এমন লোক একজনও থাকা উচিত নয়, অতএব ১২০ পৃষ্ঠার এই বহিটি সকলেরই রাখা উচিত। কোন্ দেশী জিনিষ কোথায় পাওয়া যায়, তাহার তালিকা ইহাতে আছে। দোকানদারদের পক্ষে ইহা অত্যাবশ্যক।

র. চ.

জড়বুদ্ধি ছেলেমেয়েদের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য

শ্রীগিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়

অতি আদিম কাল হইতেই মনুষ্যসমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জড়বুদ্ধি ছেলেমেয়েদের লইয়া কি করা যাইতে পারে, এই কঠিন সমস্যা বরাবরই সমাজকে বিব্রত করিয়া আসিতেছে; তাহাদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

অতি প্রাচীন কালে সমাজের অবস্থা এরূপ ছিল যে জড়বুদ্ধি সন্তানদের নির্য্যাতন দ্বারা বহিষ্কৃত বা নিহত করা হইত। ইউরোপে স্পার্টা দেশে ইহাদের খুব শৈশবাবস্থায় পর্ব্বতশিখরে ফেলিয়া দিয়া আসা হইত এবং গ্রীসের অন্যান্য স্থানে নদীগর্ভে ইহাদের ফেলিয়া দেওয়া হইত। মহামনীষী প্লেটোর মত এই ছিল যে, সমাজের ও ইহাদের উভয়েরই মঙ্গলের জন্য ইহাদের মৃত্যুই একমাত্র উপায়। মনুষ্যপ্রকৃতি চিরকালই অত্যন্ত স্বার্থপর এবং জগতের সর্ব্বজাতিই এইরূপ সন্তানদিগের উপর অযথা অবিচার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। আমাদের দেশেও রাজা জড়ভরত ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও ঐরূপ লাঞ্ছনা হইতে অব্যাহতি পান নাই। তাহার বৃত্তান্ত শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম স্কন্ধ নবম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

এই হতভাগ্যদিগের দাবি ইউরোপে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে জনসাধারণের দ্বারা প্রথম গ্রাহ্য হয়। প্যারী (Paris) মূকবধির বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক ডাক্তার ইটার্ড (Dr. Itard) আভিরোঁ (Aveyron) গ্রামের বন্য পশুদ্বারা প্রতিপালিত একটি যুবা পুরুষকে সম্পূর্ণ পশু অবস্থা হইতে শিক্ষিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হন। কিন্তু তাঁহার অন্যতম সুযোগ্য ছাত্র (ডাক্তার সেগুঁই) Dr. Seguin জড়বুদ্ধি ছেলেদের শিক্ষা দিবার অত্যন্ত ফলবতী কয়েকটি প্রণালী বাহির করেন এবং তন্মধ্যে অধিকাংশই এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হইয়া চলিয়া আসিতেছে।

গত উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ ও আমেরিকার সর্ব্বত্রই এই সকল ছেলেমেয়েদের জন্য বহুতর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় এবং পাশ্চাত্য জগতের সকল জাতিই ইহা উপলব্ধি করেন যে এই সকল হতভাগ্য সন্তানদিগের জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া শিক্ষাপ্রদান ও যত্ন ও পরিচর্য্যা করা, শুধু ইহাদের নহে, মানবজাতির পক্ষেও শাশ্বত কল্যাণপ্রদ। এই সকল সন্তানকে কেবল মাত্র হতভাগ্য বলিয়া ঘৃণা বা উপেক্ষা করা এখন সভ্যজগতের সর্ব্বত্রই বন্ধ হইয়া গিয়াছে, এবং সমগ্র জগতেরই মনস্তত্ত্ববিদ্গণ ও মনোব্যাধি বিশেষজ্ঞগণ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ একাগ্রচিত্তে সাধনার ন্যায় বিশেষ গবেষণা দ্বারা এরূপ সন্তানদের কি ব্যবস্থা বা কি চিকিৎসা বা কি উপায়ে ইহাদের প্রকৃত কল্যাণ ও শান্তি হইতে পারে তজ্জন্য চেষ্টা করিতেছেন। যে সমাজের এক অঙ্গ ইহারা, সেই সমাজেরই অবশ্য কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম ইহাদের ভার লওয়া, ইহাই ইঁহাদের মত। এই মতের অনুকূলে গুটিকতক যুক্তি এস্থলে লিপিবদ্ধ করা হইল।

মানবজাতির হৃদয়ের মধ্যে ভগবান যে বিশ্বপ্রেমের অঙ্কুর নিহিত করিয়া দিয়াছেন এবং যে প্রেম সারা মনুষ্য-জগতকে "সভ্যসমাজ" এই আখ্যার প্রকৃত অধিকারী করিয়াছে সেই প্রেমের প্রভাবে এই কথাগুলি আমাদের বিবেচনা করা ও সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত :—

(১) ইহারা আমাদেরই সন্তান। ইহাদের কল্যাণের ব্যবস্থা করিতে ন্যায়ত ও ধর্ম্মত আমরাই দায়ী। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে এরূপ নিঃসহায় অবস্থার জন্য উহারা নিজেরা মোটেই দায়ী বা দোষী নহে।

প্রতীচ্য জগৎ তাঁহাদের জ্ঞানালোক দ্বারা এই গূঢ়তত্ত্বের অন্বেষণে নিয়ত চেষ্টা করিতেছেন, যে, কেন এরূপ সন্তান হয়, তাহার প্রকৃত প্রতিকার কি, চিকিৎসা কি, ইত্যাদি। আমাদের দেশে এরূপ সন্তানদের জন্য কোনও

প্রতিষ্ঠান বা কোনও গবেষণা কখনও ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ তাহার উল্লেখ মাত্র কোনও শাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে ভাগবত বা মহাভারতে যতদূর পাওয়া যায়, তাহাতে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলেই এ জন্মে ঐরূপ অবস্থা হয়, এই সিদ্ধান্তই পাওয়া যায়। ইউরোপের ও আমেরিকার বড় বড় বিশেষজ্ঞগণ বংশানুক্রম এরূপ অবস্থার মুখ্য কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, কোনও বিশেষ মনোবৃত্তি বা কোনও বংশগত ব্যাধি পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসে। কিন্তু ইহাও অনেকস্থলে দেখা যায়, যে, জড়বুদ্ধি ছেলের পিতা বা মাতা বা তাঁহাদের উভয়েরই পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে কখনও কাহারও এরূপ অবস্থা বা তাঁহাদের মধ্যে এরূপ ফলোৎপাদক কোনও কারণ ছিল না। আবার ইহাও যথেষ্ট দেখা যায়, যে, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন নর বা নারীর বিবাহের পর পুত্রকন্যাগণ বেশ স্বাভাবিক বা খুব বুদ্ধিমান হইয়াছে। সেই জন্যই মনে হয়, যে, এই জটিল সমস্যার সমাধান প্রতীচ্য জগতের বিজ্ঞান-আলোক অপেক্ষা আমাদের দেশের মহাঋষিদের যে-সকল শাস্ত্র ও যোগপ্রণালী কত শত কঠিন সমস্যার সমাধান করিয়াছিল, সেই সকল শাস্ত্র ও যোগপ্রণালী দ্বারাই ইহাদের প্রকৃত উপায়ের পুনরুদ্ভাবন হইবে। রাজা জড়ভরত, মহাজ্ঞানী শুকদেব বা হস্তামলকের যে চিত্র পাওয়া যায়, তাহাতে বেশ মনে হয় যে, এরূপ সন্তানদের অবহেলা বা ঘৃণা না করিয়া বিশেষ যত্ন ও প্রাণপণ সেবার দ্বারা উহারা এই মনুষ্য জন্মে যাহাতে কোনও কষ্ট না পায়, তাহার সবিশেষ ব্যবস্থা করা উচিত।

(২) আধুনিক জগতে ঐরূপ বিশ্বপ্রেম—উদ্ভূত অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান আমরা দেখিতে পাই,—

মূক ও বধির বিদ্যালয়, অন্ধবিদ্যালয়, কুষ্ঠাশ্রম, জীবক্লেশ-নিবারিণী-সমিতি ইত্যাদি। অথচ অসহায় জড়বুদ্ধি সন্তানদের জন্য কোনও প্রতিষ্ঠানই আমাদের নাই। ইহা আমাদের পক্ষে অতীব লজ্জা ও দুঃখের বিষয়।

ইহা ভিন্ন সমাজের স্বার্থ ও মঙ্গল সাধনের জন্য এ বিষয়ে গুটিকতক কথা আমাদের বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা ও সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত :—

(১) যাঁহারই ঘরে এরূপ একটি সন্তান আছে তিনিই জানেন যে সেই ছেলেটি সেই পরিবারের উপর একটি নিরবচ্ছিন্ন বিষাদের ছায়া ফেলিয়া দেয়, ও পরিবারবর্গের প্রত্যেকেরই সমস্ত সময়, মন ও শক্তি সেই ছেলেটিই দখল করে, এবং তাহার ফলে স্বাভাবিক ছেলে-মেয়েগুলির যথেষ্ট ক্ষতি হয় এবং তদ্দ্বারা সমাজেরও সমূহ ক্ষতি হয়। ইহার প্রতিকার করা অতি শীঘ্র ও অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে। ইহাদের জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া তাহাতে এই সকল ছেলেমেয়েকে আধুনিক প্রণালী মতে রাখিলে এই ক্ষতির কোনও সম্ভাবনা থাকিবে না।

(২) ইহা সকলেই জানেন যে স্বাভাবিক ছেলেরা এইরূপ জড়বুদ্ধি ছেলেদের লইয়া বিদ্রূপ বা "পাগলা" বলিয়া বিরক্ত করিয়া একটু বিশেষ আমোদ উপভোগ করে। ইহার ফল অত্যন্ত খারাপ দাঁড়ায়। ক্রমশঃ এই হতভাগ্যরা ঐরূপ বিরুদ্ধাচরণের মধ্যে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত অসামাজিক, যুক্তিবিহীন ও অধিকাংশ স্থলেই নিষ্ঠুরভাবাপন্ন হইয়া উঠে ও অসংশোধনীয় আইনলঙ্ঘক অপরাধী হইয়া দাঁড়ায়। আরও একটি বিষময় ফল দাঁড়ায়, যে, প্রত্যেক মনুষ্যেরই উন্নতির প্রধান ভিত্তিস্বরূপ যে মনোবৃত্তি—আত্মনির্ভরতা, যাহা এইরূপ ছেলেদেরও বিভিন্ন মাত্রায় অল্প-স্বল্প রূপে থাকে, সেটি চিরদিনের মত লুপ্ত হইয়া যায়। ইহাও একটি আমাদের পক্ষে বিষম ক্ষোভের কথা।

(৩) সমাজে জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্যই আইনের সৃষ্টি। মানবের জীবনযাত্রা যাহাতে নিরাপদ হয়, ইহাই আইনের মুখ্য ও একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই আইনেই বিধান আছে, যে, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন কোনও ব্যক্তি যদি অপরাধ করে বা হত্যাও করে তাহা হইলে সে দায়ী হয় না এবং আইনেও সে শাস্তি পায় না। কিন্তু তার দায়িত্ব আইনে তাহার উপর আরোপ না করিলেও, হত্যার অপরাধের গুরুত্ব কত সে নিজে না বুঝিলেও, সমাজের লোকদের পক্ষে তজ্জন্য যে-বিপদ সে-বিপদ চিরকালই বর্ত্তমান থাকে। আমরা ত অনেক স্বাস্থ্যসভা, অনেক কোয়ার‍্যাণ্টাইন আইন (সংক্রামক রোগের জন্য সংস্রব-রাহিত্যের আদেশ) ইত্যাদির ব্যবস্থা করি—সকলেরই

সেই একই উদ্দেশ্য নহে কি—আমাদের জীবনযাত্রাটি শান্তিময় ও নিরাপদ করা ? এরূপ ছেলেদের দ্বারা সমাজের কোন ক্ষতিই হয় না, যদি আমরা ইহাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া ইহাদের কল্যাণসাধন করি।

(৪) আমরা এরূপ ছেলেমেয়েদের প্রতি কোনও কর্ত্তব্য ত করিই না বরং ইহাদের উপর, এবং ফলে সমাজের উপর ঘোরতর অবিবেচনাপূর্ণ অবিচার করি উহাদের বিবাহ দিয়া। প্রথমতঃ জড়বুদ্ধি পুত্রকন্যার বিবাহ দিলে দাম্পত্যজীবনের শান্তি অধিকাংশ কিংবা সকল স্থলেই চূর্ণ হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ—যে পরিবারের মধ্যে ঐরূপ পুত্র বা কন্যার বিবাহ হয় সেই পরিবারবর্গের মধ্যেও দারুণ অশান্তির সূত্রপাত হয়। তৃতীয়তঃ—ইহাদেরও ঐরূপ পুত্রকন্যা জন্মিবার সম্ভাবনাই খুব বেশী থাকে এবং অধিকাংশ স্থলেই জন্মে, ও সমাজের গুরুভার আরও বর্দ্ধিত হয়।

এই সব বিষয় ভাবিলেই আমাদের মনে এই প্রশ্নই আসে—এরূপ ছেলেদের কি উপায় করা যাইতে পারে ? ইহার উত্তর এই—ইহাদের ও সমাজের উভয়েরই কল্যাণের জন্য ও পরস্পরের শান্তির জন্য ইহাদের এমন একটি স্থানে রাখা উচিত যেখানে তত্ত্বাবধায়কগণ ইহাদের মনোভাবের সহিত পরিচিত এবং ইহাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন এবং যেখানে উহাদের স্বাভাবিক গতিবিধি বা জীবনধারণে যথাসম্ভব সুখকর হয়, বা উহাদের আত্ম-নির্ভরতা-সংহারক কোনও রূপ ব্যবহার বা রূঢ়তা না হয়। এরূপ প্রতিষ্ঠানের মূলমন্ত্রই এই। এইরূপ প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্যই আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধি করা। ইহার বৃদ্ধি শাসনে হয় না,—প্রেমে হয়, সদ্ব্যবহারে হয়, নিয়মিত প্রণালীসমূহের দ্বারা হয়। ইউরোপ ও আমেরিকার মনুষ্যসমাজ এরূপ বালকবালিকা ও পরিণতবয়স্ক জড়বুদ্ধিদের বুকে করিয়া তুলিয়া লইয়া প্রতিষ্ঠানে রাখিয়া কতপ্রকমের বিদ্যাশিক্ষা ইহাদের দিতেছে,—কৃষি, সূত্রধরের কর্ম্ম, কামারের কর্ম্ম, বয়নবিদ্যা, ইত্যাদি নানা প্রকারের ব্যবসায় শিক্ষা দ্বারা ইহাদের স্বাবলম্বী করিতেছে। উহাদের এই সকল প্রতিষ্ঠান সাধারণের অর্থসাহায্যেই পরিচালিত হয়। আমাদের দেশেও যে যোগ্য লোক নাই তাহা নহে। তবে এইরূপ প্রতিষ্ঠানের মর্ম্ম ও প্রয়োজন যে কি, তাহা পূর্ব্বে কখনও কেহ জানেন নাই বা কেহ বুঝাইবার চেষ্টা করেন নাই।

এই বিষম অভাব দূরীকরণের জন্য গত বৎসর



রাজা শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্ল দেব বাহাদুর

(১৯৩২) ২৪শে এপ্রেল তারিখে "বোধনা" সমিতি নামে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। এরূপ জড়বুদ্ধি বালক-বালিকা বা পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা, আধুনিক বা অন্যান্য উপযুক্ত প্রণালী মতে তাহাদের উন্নতিসাধন করা বা উহাদের জন্য বিশেষ উপনিবেশ স্থাপন করিয়া উহাদের যাহাতে শান্তিতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় তাহার ব্যবস্থা করা এই "বোধনা"র মুখ্য উদ্দেশ্য। "বোধনা" নামটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন, এবং সুপ্তচেতনার বিকাশ কার্য্যই যে এই প্রতিষ্ঠানের মূলমন্ত্র, তাহা নামটিতে বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। এই সমিতির বিষয় পূর্ব্বে 'প্রবাসী' ও অন্যান্য প্রায় সকল সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হইয়াছে।

এরূপ ছেলেমেয়েরা স্বভাবতঃই বড় রুগ্ন হয়। সেই

দরকার। বোধনা সমিতি ভগবানের কৃপায়, ও উদারহৃদয়, দয়ালু ঝাড়গ্রামের রাজার অনুকম্পায় কলিকাতার মাপের প্রায় আড়াই শত বিঘা জমি দানসূত্রে পাইয়াছেন এবং সেইখানেই "বোধনা" স্থাপনের ব্যবস্থা হইতেছে এবং গৃহনির্ম্মাণাদি কার্য্যও শীঘ্র আরম্ভ হইবে। ঝাড়গ্রাম জায়গাটি খুব স্বাস্থ্যকর, কলিকাতা হইতে ৯৬ মাইল দূরে, বেঙ্গল-নাগপুর মেন লাইনে খড়্গপুর ও গিড্‌নি, ঘাটশিলা ইত্যাদি ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী একটি ষ্টেশন।

এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্যভার গ্রহণ করিবার জন্ম সুযোগ্যা ও এই বিষয়ে সুশিক্ষিতা মহিলাবৃন্দও বোধনা সমিতি পাইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন মহিলা বিলাতে মোণ্টেসরি শিক্ষাপ্রণালীতে শিক্ষালাভ করিয়া বিলাতের এইরূপ বড় বড় আশ্রম সকল পরিদর্শনপূর্ব্বক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসিতেছেন এবং ঝাড়গ্রামের গৃহনির্ম্মাণাদি কার্য্য সমাপ্ত হইলেই তিনি ফিরিয়া আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

বোধনা সমিতির সম্পাদকের সহিত এইরূপ জড়বুদ্ধি ছেলেমেয়েদের প্রায় ৫০ জন পিতামাতা পত্র আদান-প্রদান করিয়াছেন এবং যত শীঘ্র "বোধনা" কার্য্য আরম্ভ হয় তাহার জন্ম তাগাদা করিতেছেন।

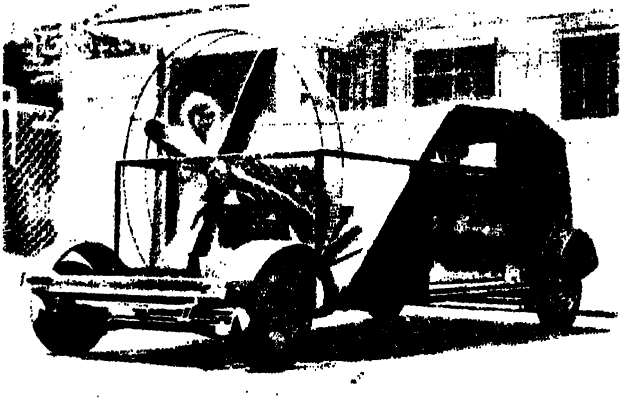
ঝাড়গ্রামে গৃহাদি নির্ম্মাণ, কূপখনন, বাগান করার জন্ম যন্ত্রাদি ক্রয়, শিক্ষা দিবার জিনিষপত্রাদি বা অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয়, গৃহের আসবাব খরিদ, বাসন-কোশন খরিদ ইত্যাদি সর্ব্ব বাবদ প্রায় দশ বারো হাজার টাকার প্রয়োজন। সাধারণের সহানুভূতির উপরই এই প্রতিষ্ঠান নির্ভর করিতেছে। এইরূপ ছেলে-মেয়েদের পিতামাতারও কর্ত্তব্য তাঁহাদের যথাসাধ্য অর্থ দিয়া সাহায্য করা। এইরূপ ছেলেমেয়েদের মঙ্গলের জন্ম সমাজের কল্যাণার্থ মানবের হিতসাধনের জন্ম "বোধনা" সমিতি আজ সর্ব্বসাধারণের নিকট ভিক্ষার ঝুলি লইয়া দণ্ডায়মান। এরূপ মহৎ উদ্দেশ্যে যে-কেহ যে-পরিমাণ অর্থ দান করিবেন, বলা বাহুল্য সেই পরিমাণ অর্থই কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে। বোধনা সমিতি আরও ভিক্ষা করিতেছেন সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি।

চিঠিপত্রাদি সব ৬।৫ বিজয় মুখুজ্যে লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা, এই ঠিকানায় শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল্, "বোধনা"র সম্পাদকের নামে এবং অর্থাদি সব ২।১ টাউনশেণ্ড রোড, ভবানীপুর, ঠিকানায় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বোধনার সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

পাঁচমিশালী

বায়ু-চালিত যন্ত্র—

বায়ু-চালিত যন্ত্র সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ঘণ্টায় ৮০ মাইল যায়। এই যন্ত্রটির বিশেষত্ব এই যে, ইহা উঁচু নীচু, কর্দমাক্ত রাস্তায় এবং পিচ্ছিল খাড়া পাহাড়েও চালান যায়। এত কাল বরফে ঢাকা খাড়া পাহাড় অতিক্রম করা একটা কঠিন ব্যাপার



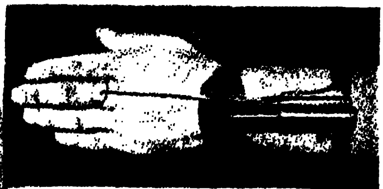
বায়ু-চালিত যন্ত্রের সম্মুখভাগের দৃশ্য

ছিল। এই যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় সে অসুবিধা দূর হইয়াছে। চিত্র দেখিয়া এই যন্ত্র সম্বন্ধে কতকটা ধারণা হইবে। যন্ত্রটি ওজনে ১৫০০ শত পাউণ্ড। এক ঘণ্টা চলিতে ইহার মাত্র এক গ্যালন তেল আবশ্যক। সাধারণ যন্ত্রের মত এ যন্ত্রের চাকাগুলি মাটি কামড়াইয়া ধরে না।

—

কব্জীতে অশ্রু-বাষ্প বন্দুক—

আত্মরক্ষার একটি নূতন কৌশল এই চিত্রটিতে দেখান হইল। হাতের কব্জীতে অশ্রু-বাষ্প (tear gas)-ভরা একটি বন্দুক বাঁধা। যাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া এই অশ্রু-বাষ্প ছাড়া হয় সে আর সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে না। কেরাণী, ধন রক্ষক অথবা যাহারা কর্মচারীদের বেতন লইয়া স্থানান্তরে গমনাগমন করে তাহাদের পক্ষে এটির খুব প্রয়োজন। মধ্যমা অঙ্গুলির আংটীর সঙ্গে একটি তার দ্বারা কব্জীর বন্দুক যুক্ত করা, তারসমেত আঙ্গুলগুলি নত করিলে তারে টান লাগে, অমনি বন্দুক হইতে অশ্রু-বাষ্প বাহির হইতে থাকে। কব্জীটি চামড়া দিয়া মোড়া, তাহার উপরে বন্দুক। কাজেই বন্দুক ছুঁড়িবার সময় হাতের কোন স্থান মোটেই ক্ষত-বিক্ষত হয় না।





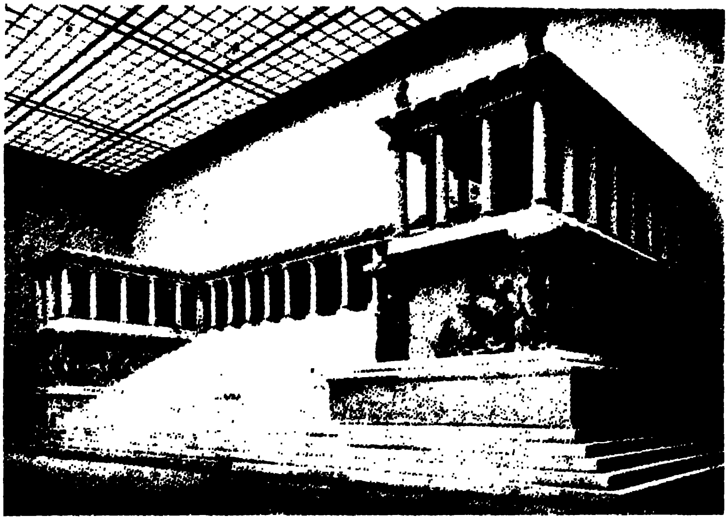
উপরে—কব্জাতে অশ্রু বাষ্প বন্দুক, মধ্যমা অঙ্গুলির আংটির সঙ্গে বন্দুক তারে বাঁধা, কব্জী চামড়া দিয়া মোড়া।

বাম পার্শ্বে—এই চিত্রটিতে অশ্রু-বাষ্প বন্দুক ছুঁড়িবার পদ্ধতি দেখানো হইতেছে।

বার্লিনের যাদুঘরের নির্ম্মাণ-কৌশল

বার্লিনের পের্গামন যাদুঘরের নির্ম্মাণকৌশল অতি চমৎকার। প্রাচীন স্থাপত্যের সুন্দর সুন্দর নিদর্শন যাহা এখনও জগতের নানা স্থানে বর্ত্তমান আছে তাহার হুবহু অনুকরণে বার্লিনের যাদুঘরের গৃহের অংশবিশেষ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। যাদুঘরের আলোর বন্দোবস্ত সুন্দর, দেয়ালগুলি নগ্ন এবং মেঝে রঙীন মার্ব্বেল পাথরের; দ্রষ্টব্য জিনিষগুলির নামও সহজ সরল করিয়া লেখা। দর্শক এখানে আসিয়া অতি সহজেই অতীত যুগের কীর্ত্তির সঙ্গে পরিচিত হইতে পারেন। এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত পের্গামনের উচ্চ ভূমিতে একটি বৃহৎ মার্ব্বেল পাথরের বেদী আছে। এই বেদী সুসজ্জিত এবং জিউস্-এর নামে উৎসর্গীকৃত। বেদীটি দেব-দানবের যুদ্ধের স্মৃতিরক্ষার জন্য ১৮০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে রাজা দ্বিতীয় ইউমিনিস কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। এই বেদীটির অনুকরণে বার্লিন যাদুঘরের বেদীটিও এরূপ সুনিপুণ ভাবে নির্ম্মিত যে, দেখিলে আসল কি নকল বুঝা যায় না।

ইহার পার্শ্ববর্ত্তী 'রোম্যান হলে' বা'লবাকের দুইটি বিশিষ্ট স্তম্ভের অনুকরণে দুইটি স্তম্ভ নির্ম্মিত এবং মিলেটাসের রোম্যান গৃহের চিত্রের অনুকরণে চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে। পের্গামন যাদুঘরের সংশ্লিষ্ট 'নিয়ার ঈষ্ট মিউজিয়াম' বেবিলনের ইশ্‌টার গেটের অনুকরণে প্রবেশদ্বার প্রস্তুত-করা হইয়াছে।



গ্রীক ভাস্কর্য্যের শেষ নিদর্শন—এশিয়া-মাইনরের অন্তর্গত পের্গামন শহরের বেদীর অনুকরণে বার্লিনের যাদুঘরে নির্ম্মিত বেদী



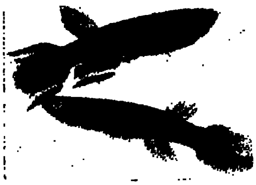
বেবিলনের ইশ্‌টার গেটের অনুকরণে নির্ম্মিত যাদুঘরের ফটক



বার্লিন পের্গামন যাদুঘরে এশিয়া-মাইনরের প্রসিদ্ধ বা'লবাকের স্তম্ভের অনুকরণে দুইটি স্তম্ভ



এই পুষ্করিণীতে গরম দেশের সুন্দর সুন্দর মাছ আছে


মাছ পোষা—

মার্কিন দেশে মাছ পোষা একটা খেয়াল। হাজার হাজার লোক মাছ পুষিয়া আনন্দ লাভ করে। অবসর-বিনোদনের জন্যও লোকেরা মাছ পুষিয়া থাকে। গরম দেশের ছোট ডানাওয়ালা মাছ মার্কিনের সাধারণ গৃহস্থের ঘরে রাখার পক্ষে সুবিধা। এই মাছ পুষিয়া অনেকে প্রাণিবিদ্যা শেখার দিকে ঝুঁকিয়াছেন। অনেকে নিজে নিজেও এই বিষয় শিখিতে চেষ্টা করিতেছেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষার জন্য গরম দেশের এই মাছগুলি প্রাণি-বিদ্যার ও চিকিৎসা বিদ্যার পরীক্ষাগারে কাজে লাগিতেছে। লোকে এই মাছগুলির আদর করায় ছোট মাছের ব্যবসা করিয়া অনেকে জীবিকা অর্জ্জন করে। এই ব্যবসা দিন-দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। নিউ-ইয়র্কের কোন কোন দোকানে পঞ্চাশ রকমের মাছ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। এক একটি মাছের দাম পঞ্চাশ সেণ্ট হইতে পঞ্চাশ ডলার পর্য্যন্ত। অতলান্তিক মহাসাগর-গামী বাণিজ্যপোতে একটি করিয়া কামরা থাকে; এই কামরায় মাছ জীবিত অবস্থায় চালান দেওয়ার জন্য রাখা হয়। নিউ-ইয়র্কের একটি পুষ্করিণীতে হরেক রকমের মাছ পোষা হইতেছে। এমন-সব ছোট ছোট পুষ্করিণীও আছে যেখানে দুই শত বিভিন্ন জাতীয় মাছ রাখা হইতেছে।

কয়েকটি বিভিন্ন জাতীয় মাছের চিত্র এই সঙ্গে দেওয়া হইল।



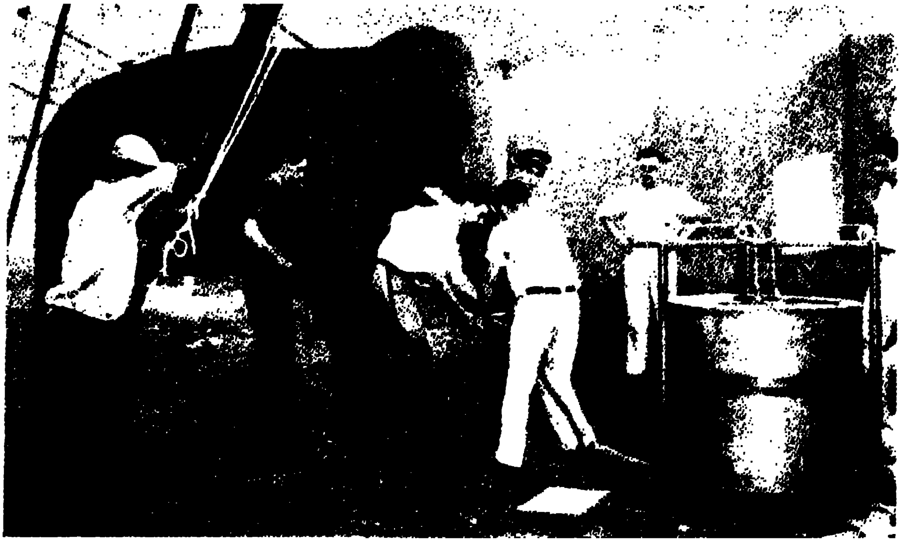






শান্ত হাতীর আহার কম—

এক একটা হাতীর কত খাদ্য প্রয়োজন কলম্বিয়ার অন্তর্গত মিশুরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর স্যামুয়েল ব্রোডি তাহা লইয়া আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বিশ্রাম কালে আট হাজ পাউণ্ড ওজনের সার্কাস-হাতীর দুইটা ঘোড়ার উপযোগী অল্পজান খাদ্য প্রয়োজন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, যে-জন্তু আকারে বড় তাহার আহার্য্যও সেই অনুপাতে তত কম।



ছায়া

শ্রীকালিদাস রায়

ছেড়ে যেতে চাহি পিছুপানে,
পথপাশে ছায়াখানি দিয়া যেন হাতছানি
ডাকে ফিরে, দেহ মোর টানে।
রৌদ্রতাপ বিগলিত স্নেহরস উচ্ছলিত
গড়ায়ে ঘিরেছে তরুতল,
ঘন পর্ণ শ্যামলিমা দেছে তারে মধুরিমা
বায়ু তারে করেছে শীতল।
দেহ আগে যায় যত প্রাণ পিছু হাঁটে তত,
অই তরু ছায়ার মায়ায়
দু দণ্ড তাহার ক্রোড় জুড়াইল প্রাণ মোর
এলায়ে পড়িল মোর কায়।
যেন রাজশয্যা 'পরে মধ্যাহ্ন শ্রান্তির ভরে
কৃষাণ ঘুমায়ে আছে হোথা,
পশারী পশারা থুয়ে নিশ্চিন্ত রয়েছে শুয়ে
কোথা গঞ্জ ; গৃহ তার কোথা ?
রাখাল বাজায় বেণু চক্ষু মুদি তার ধেনু,
তৃপ্তি-সুখে করে রোমন্থন,
বিগলিয়া পড়ে স্নেহ ছাগলী শাবক-দেহ
মধুর তন্দ্রার সুখে, কুকুরটি হোথা ধুঁকে,
পাশে বেজি নিদ্রায় বিভোর,
বটফলে তৃপ্যমাণ বিহগের কলতান,
ঘনায় সবার ঘুমঘোর।
শিবিকাবাহীরা সব শুনি সেই কলরব,
একে একে ঘুমে নিমগন,
নববধূ মুদি আঁখি সুখে দুখে মাখামাখি
এলোমেলো হেরিছে স্বপন।
স্নেহের অঞ্চলখানি মাটিতে বিছানো জানি
অইখানে দুপুর বেলায়,
মায়ের সকল ছেলে সব কাজ খেলা ফেলে
জুটে শ্রান্ত শরীর এলায়।
ক্ষণেকের ও সংসার ছেড়ে যেতে বার-বার,
পিছুপানে চাই থেকে থেকে,
পাখীদের কলস্বর ক্রমে হয় ক্ষীণতর,
শ্রান্ত তারা বুঝি পিছু ডেকে।
আগে পথ করে ধু ধু পঙ্গু হয় গতি শুধু
বার-বার চাহিয়া পশ্চাতে,
ছায়াখানি পড়ে রয় তারে ছেড়ে যেতে হয়,



প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

গীতা

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

১৬

সপ্তম অধ্যায় (অনুবৃত্তি

৭।২ শ্লোকে প্রকৃতিকে অষ্টধা বলায় ভাষ্যকারেরা নানা প্রকার জটিল ব্যাখ্যার অবতারণা করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রে সর্ব্বত্র সৃষ্টিপ্রকরণে নিম্নলিখিত ক্রম স্বীকৃত হইয়াছে :—

১ প্রকৃতি	১ প্রধান বা প্রকৃতি	
	১ মহৎ বা বুদ্ধি	
৭ প্রকৃতি-বিকৃতি	১ অহঙ্কার	
	৫ পঞ্চতন্মাত্রা	
১৬ বিকৃতি	৫ পঞ্চ মহাভূত	মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ১১

সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্বের মধ্যে কোন্‌টির পর কোন্‌টি আবির্ভূত হইয়াছে এবং ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ কিরূপ উপরিউক্ত তালিকা দেখিলে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। প্রধান বা প্রকৃতি হইতে মহতের উৎপত্তি, কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মহৎ রূপ বিকার প্রাপ্ত হইলেও প্রধান নিঃশেষ হইয়া যায় না। সেইরূপ মহৎ হইতে অহংকারের উৎপত্তি হইলেও মহৎ থাকিয়া যায়। সাংখ্যের কোন তত্ত্বই পরবর্ত্তী তত্ত্বে লোপ পায় না। একপাত্র দুগ্ধ যেমন দধিতে পরিণত হইলে দুগ্ধের সার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না—সমস্তটাই দধি হইয়া যায়, সাংখ্যের তত্ত্বগুলির পরিণাম সেরূপ নহে। পিতা হইতে পুত্র উৎপন্ন হইলে যেমন পিতা ও পুত্র উভয়েই বর্ত্তমান থাকে, সেইরূপ সাংখ্যের এক তত্ত্ব হইতে তত্ত্বান্তরে উৎপত্তি হইলে উভয় তত্ত্বই বর্ত্তমান থাকে। এই জন্যই প্রকৃতি হইতে অন্যান্য তত্ত্বগুলি সন্তান-পরম্পরা ন্যায়ে উৎপন্ন হইয়া মোট চতুর্বিংশতি সংখ্যক তত্ত্বে পরিণত হইয়াছে।

সাংখ্যের 'প্রকৃতি' শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এক অর্থে মূলপ্রকৃতি বা প্রধান, ও অপর অর্থে কারণ বা যোনি অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান। শেষোক্ত অর্থে মহতের প্রকৃতি প্রধান, অহঙ্কারের প্রকৃতির নাম মহৎ। পঞ্চতন্মাত্রা ও ইন্দ্রিয়সমন্বিত মনের প্রকৃতি অহঙ্কার। পঞ্চ মহাভূতের প্রকৃতি পঞ্চতন্মাত্রা। এই অর্থেই প্রধানকে মূল প্রকৃতি বলা হয়। পূর্ব্বগামী তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন তত্ত্বের নাম বিকৃতি বা বিকার ; অর্থাৎ কারণরূপ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন পদার্থের নাম বিকৃতি। মহৎ প্রধানের বিকৃতি, অহংকার মহতের বিকৃতি। পঞ্চতন্মাত্রা ও ইন্দ্রিয়সমেত মন অহঙ্কারের বিকৃতি। পঞ্চ মহাভূত পঞ্চ তন্মাত্রার বিকৃতি। পঞ্চমহাভূত, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এই ষোড়শ তত্ত্ব সাংখ্যমতে চরম বিকার। এই ষোড়শ তত্ত্ব অন্য কোন তত্ত্বের প্রকৃতি বা উৎপত্তিস্থান নহে অর্থাৎ এই সকল তত্ত্ব হইতে অন্য কোন নূতন তত্ত্ব উৎপন্ন হয় নাই। চতুর্বিংশতি তত্ত্বের মধ্যে এই ষোলটিকে বাদ দিলে বাকী আটটি তত্ত্বের অর্থাৎ প্রধান, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রা ইহাদের প্রত্যেকটি কোন-না-কোন তত্ত্বের প্রকৃতি। এই জন্যই বলা হয় অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শ বিকারাঃ" অর্থাৎ প্রকৃতিসংখ্যা আট ও বিকারের সংখ্যা ষোল। আট প্রকৃতির মধ্যে মূলপ্রকৃতি বা প্রধান কাহারও বিকার নহে কিন্তু বাকী সাতটি মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রা—প্রত্যেকটি প্রকৃতিও বটে, বিকৃতিও বটে। এই জন্য এই সাতটিকে প্রকৃতি-বিকৃতিও বলা হয়। সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্যে ১।৬১ সূত্রের ব্যাখ্যায় বিজ্ঞানভিক্ষু বলিতেছেন—

এত এব পদার্থাঃ পরস্পর প্রবেশাপ্রবেশাভ্যাং কচিৎ তত্র একমেব কচিৎ তু ষট্ কচিচ্চ ষোড়শ কচিচ্চ সংখ্যান্তরৈরপ্যুপদিশ্যন্তে। বিশেষস্তু সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্যমাত্র ইতি মন্তব্যম। তথা চোক্তং ভাগবতে—"একস্মিন্নপি দৃশ্যন্তে প্রবিষ্টানীতরাণি চ। পূর্ব্বস্মিন বা পরস্মিন্ বা তত্ত্বে তত্ত্বানি সর্ব্বশঃ। ইতি নানাপ্রসংখ্যানং তত্ত্বানামৃষিভিঃ কৃতম্। সর্ব্বং ন্যায্যং যুক্তিমত্ত্বাদ্বিদুষাং কিমশোভনম্।"

অর্থাৎ পদার্থ এই কয়টি (২৪) মাত্রই; এই সকল পদার্থ পরস্পরের অন্তর্ভুক্ত করায় বা বিভিন্ন রাখায় কোন শাস্ত্রে পদার্থের সংখ্যা এক, কোথাও বা ছয়, কোথাও বা ষোড়শ এবং কোথাও বা অন্য কোন সংখ্যা ধরা হয়। সাধর্ম্ম্য বা বৈধর্ম্ম্য লক্ষ্য করিয়াই এই সকল সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হয়। ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে প্রথম তত্ত্বেই কখন কখন অন্যান্য সমস্ত তত্ত্ব প্রবিষ্ট করান হয়, কখনও বা কোন এক তত্ত্বে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী তত্ত্বসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়, এই প্রকারে ঋষিরা তত্ত্বসমূহের বিভিন্ন সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সমস্তই বিদ্বান ব্যক্তিদের যুক্তিযুক্ত হওয়ার কিছুমাত্র অশোভন না হইয়া ন্যায্যই হইয়াছে।

৭।৪ শ্লোকে যদি শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রকৃতি অষ্টধা বিভক্ত বলিয়া ক্ষান্ত হইতেন তবে কোন গোলই হইত না। ষোল বিকার বাদ দিয়া প্রকৃতিকে অষ্টধা বলিলে কোন দোষ হইত না, কারণ যাহা হইতে বিকৃতি উৎপন্ন হইয়াছে তাহাকেই প্রকৃতি বলা যায়। শঙ্কর এই শ্লোকে প্রকৃতি শব্দের এই অর্থই ধরিয়াছেন; অগত্যা শ্লোকোক্ত ভূমি, আপ, অনল ইত্যাদিকে পঞ্চ মহাভূত রূপ বিকার না বলিয়া তাহাদিগকে প্রকৃতি বা কারণরূপ তন্মাত্রা বলিতে হইয়াছে। শ্লোকোল্লিখিত বুদ্ধি ও অহংকারকে প্রকৃতি বলা যায় কিন্তু মন বিকারমাত্র, তাহা কারণরূপ প্রকৃতি হইতে পারে না। এই দোষ পরিহারের জন্য শঙ্কর ৭।৪ শ্লোকে 'মনে'র অর্থ অহংকার করিয়াছেন। অগত্যা 'অহংকারে'র অর্থ মূলপ্রকৃতি করিতে হইয়াছে। 'বুদ্ধি' শব্দ মহৎ অর্থেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শঙ্কর-ব্যাখ্যা কষ্টকল্পিত। তিলকের ব্যাখ্যা দেখিলে মনে হয় তিনি প্রকৃতি শব্দের 'কারণ' এই অর্থ না ধরিয়া প্রধান বা মূলপ্রকৃতি অর্থ করিয়াছেন। ইহাতে অন্য প্রকার গোল আসিয়াছে। প্রকৃতিকে প্রধান (মূলপদার্থ) বলিলে তাহার আট প্রকার ভেদের মধ্যে আবার প্রধানকে আনা চলে না। সাত প্রকৃতি-বিকৃতিকেই মূলপ্রকৃতির ভেদ বলিতে হয়। তিলক বলিতেছেন, "বেদান্তী যে প্রকৃতিকে আট প্রকারের বলেন গীতা কি তাহাকেই সাত প্রকারের বলেন—এই স্থানে এই বিরোধ দেখা যায়। এই বিরোধ না রাখিয়া 'অষ্টধা প্রকৃতি'র বর্ণনাকেই বজায় রাখা গীতার অভীষ্ট। তাই মহান, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই সাতের মধ্যেই অষ্টম তত্ত্ব মনকে পুরিয়া দিয়া পরমেশ্বরের কনিষ্ঠ-স্বরূপ অর্থাৎ মূলপ্রকৃতিকে অষ্টধা করিয়াই গীতায় বর্ণিত হইয়াছে।" পূর্ব্বে উদ্ধৃত বিজ্ঞান-ভিক্ষুর মন্তব্য অনুসারে তত্ত্বগুলির বিভাগ সাধর্ম্ম্য বা বৈধর্ম্ম্য অনুসারে নানা প্রকারের হইতে পারে সত্য, কিন্তু তিলক-কৃত ব্যাখ্যা মানিলে স্বীকার করিতে হয় যে প্রকৃতি-বিকৃতি রূপ পদার্থগুলির সহিত ভিন্নধর্ম্মী বিকৃতিরূপ মনকে এক বর্গে ফেলা হইয়াছে; ইহাতে বর্গীকরণ ন্যায্য ও শোভন হয় নাই।

৭।৪ শ্লোকের 'প্রকৃতি' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, প্রথমে তাহাই দেখা যাক্। ৭।৫ শ্লোকে জীবভূতা পরা প্রকৃতির কথা আছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, আমার দুই প্রকৃতি, এক পরা ও দ্বিতীয় অপরা। পুরুষ রূপ তত্ত্বকে সাংখ্যকার বলিয়াছেন 'ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ' অর্থাৎ পুরুষ কাহারও কারণ নহে এবং কোন তত্ত্বের বিকারও নহে। শ্রীকৃষ্ণ পুরুষকেও প্রকৃতি শব্দের অন্তর্ভুক্ত করায় বুঝিতে হইবে যে এখানে প্রকৃতি শব্দের অর্থ মূল-পদার্থ; শঙ্কর-কথিত কারণ উপাদান নহে। শঙ্কর পূর্ব্ব-শ্লোকের ব্যাখ্যার সহিত সঙ্গতি রাখিবার জন্য পুরুষকে প্রাণধারণ নিমিত্ত বলিয়া কারণ বর্গের মধ্যে ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমার মতে শ্রীকৃষ্ণ এই দুই শ্লোকে অর্জ্জুনের বুদ্ধিগ্রাহ্য সৃষ্টির প্রকটিত পদার্থসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন, কোন সূক্ষ্ম তত্ত্বের অবতারণা করেন নাই। ৭ হইতে ১১ শ্লোকগুলিতে এই কথার পোষকতা পাওয়া যাইবে। প্রকটিত জড় জগৎকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—এক মৃত্তিকা প্রভৃতি স্থূল জড়রূপ বহির্বস্তুসমূহ ও অপর সূক্ষ্ম জড়রূপ মানসিক ব্যাপারসমূহ। গীতার শ্লোকে এই প্রকার বিভাগ দেখান হইয়াছে। ইন্দ্রিয়াধিপতি মন শব্দের উল্লেখ থাকায় জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলির পৃথক উল্লেখ করা হয় নাই। ইন্দ্রিয় সহিত মন, বুদ্ধি ও অহংকার এই তিন সত্তা লইয়াই মানসিক জগৎ; ভূমি, জল, অনল, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচ মহাভূতের সমষ্টিই বহির্জগৎ, অতএব প্রকৃতির এই আট প্রকার ভেদের কল্পনা। শ্রীকৃষ্ণ

বলিতেছেন, প্রধানরূপ অপরা মূল প্রকৃতি ভূমি, জল ইত্যাদি পঞ্চ স্থূল জড়ে ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই তিন সূক্ষ্ম জড়ে বিভক্ত হইয়া অষ্ট প্রকারে প্রকটিত হইয়াছে। চেতনা ভিন্ন জড়ের ধারণা হয় না এজন্য এ সমস্তই পুরুষের দ্বারাই বিধৃত হইয়া আছে বলা হইল। শ্লোকে 'ধার্য্যতে' শব্দ আছে। যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ—"যাহার দ্বারা এই জগৎ ধার্য্য হয়, জগতের ধারণা (conception) উৎপন্ন হয় (রাজশেখর)। সূক্ষ্ম ও স্থূল জড় ভেদে জগতের সৃষ্টির কথা মুণ্ডক উপনিষদেও পাওয়া যায়। দ্বিতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডে যে সৃষ্টিপ্রকরণ বর্ণিত হইয়াছে তাহা গীতার ৭।৪ হইতে ৭।১১ শ্লোকের বর্ণনার অনুরূপ। মুণ্ডক ২।১।৩ শ্লোকে আছে—

> এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
> খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥

অর্থাৎ এই পুরুষ হইতে প্রাণ, মন, সকল ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও যাবতীয় পদার্থের আধার পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। এই শ্লোক গীতার ৭।৪ শ্লোকের সদৃশ। প্রকৃতির ব্যক্তাবস্থার বর্ণনাই শ্লোকের উদ্দেশ্য।

৭।৭ "হে ধনঞ্জয়, আমা হইতে পরতর অন্য কিছুই নাই; মণিমালার সূত্রে যেরূপ সমস্ত মণি গ্রথিত থাকে সেইরূপ এই সমস্তই আমাতে গ্রথিত রহিয়াছে।" পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে তাঁহা হইতেই পরা ও অপরা প্রকৃতির উদ্ভব, এই শ্লোকে বলিতেছেন যে তিনিই চরম কারণ, তাঁহার আর কারণান্তর নাই এবং তিনি সমস্ত জগতে ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছেন, জগতে যাহা কিছু আছে তাহাতেই তিনি তাহার সত্তারূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন।

৭।৮-৯—"হে কৌন্তেয় আমি জলে রস, চন্দ্র সূর্য্যে প্রভা, সমস্ত বেদে প্রণব বা ওঁকার, আকাশে শব্দ, মনুষ্যে পুরুষত্ব, পৃথিবীতে পুণ্যগন্ধ, বিভাবসুতে তেজ, সর্ব্বভূতে জীবন এবং তপস্বিগণে তপ।" পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ পঞ্চভূতের গুণ অর্থাৎ এই কয়টির উপর পঞ্চভূতের ভূতত্ব নির্ভর করিতেছে; শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন এই সমস্তই তিনি। এই দুই শ্লোকে পঞ্চ মহাভূতের উল্লেখ স্পষ্ট নহে। জল, আকাশ, পৃথিবী ও বিভাবসু বা অগ্নির কথা স্পষ্ট বলা হইয়াছে কিন্তু সর্ব্বভূতের জীবন অর্থাৎ প্রাণবায়ু রূপে বায়ুর নাম আসিয়াছে। শ্লোকে পৌরুষ শব্দের অর্থ সাংখ্যোক্ত পুরুষের পুরুষত্ব অর্থাৎ চেতনা। সাংখ্যের সমস্ত তত্ত্বে ভগবানই বীজরূপে রহিয়াছেন ইহাই বলা উদ্দেশ্য। কাপিল সাংখ্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথিত সাংখ্যের প্রভেদ এই কয়টি শ্লোকে (৭।৪-৯) স্পষ্ট হইয়াছে। কেবল যে মূল পঞ্চভূতের ও পুরুষের বীজরূপেই ভগবান রহিয়াছেন তাহা নহে। জগতের সমস্ত প্রকটিত ব্যাপারেও ভগবান আছেন। চন্দ্রসূর্য্যেও তিনিই প্রভা, সর্ব্ববেদের তিনিই সার বা প্রণব, তপস্বীদের তিনিই তপস্যা ইত্যাদি। পরের শ্লোকগুলিতে এইরূপ কথাই বলা হইয়াছে।. পৃথিবীর গন্ধগুণকে পুণ্য বা পবিত্র কেন বলা হইল বুঝা যায় না। শঙ্কর বলেন, পুণ্য বিশেষণ অন্যান্য ভূতেও প্রযোজ্য এবং পবিত্রতাই এই সকল গুণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

৭।১০-১২—"হে পার্থ, আমাকেই সর্ব্বভূতের সনাতন বা অনাদি বীজ বলিয়া জানিও; আমি বুদ্ধিমানদিগের বুদ্ধি, তেজস্বীদিগের তেজ, হে ভরতর্ষভ আমি বলবানের কামরাগ-বিবর্জ্জিত বল এবং সর্ব্বভূতে ধর্ম্মের অবিরোধী কামনা অথবা যাহা কিছু সাত্ত্বিক রাজসিক বা তামসিক ভাব আছে তাহা আমা হইতেই উৎপন্ন জানিবে কিন্তু আমি সে সকলের কবলে নাই তাহারাই আমার আশ্রয়ে রহিয়াছে। কামরাগ-বিবর্জ্জিত বল অর্থে সাত্ত্বিক বল বুঝাইতেছে; অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির ইচ্ছার নাম কাম এবং প্রাপ্ত বিষয়ে আসক্তির

> মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
> ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥ ৭
>
> রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
> প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥ ৮
>
> পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
> জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥ ৯
>
> বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
> বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥ ১০
>
> বলং বলবতা মস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
> ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ॥ ১১
>
> যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসা তামসাশ্চ যে।
> মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥ ১২

নাম রাগ। পূর্ব্বশ্লোকে পবিত্র গুণ সকলের উল্লেখ আছে এবং ১১ শ্লোকেও উৎকৃষ্ট গুণাবলী উল্লিখিত হইয়াছে। কামনা মাত্রেই নিকৃষ্ট নহে, এজন্য বলা হইল ধর্ম্মসম্মত কামনাই ভগবান। পাছে এইরূপ ধারণা জন্মে যে অপকৃষ্ট বিষয়সমূহ ভগবানের আশ্রয়ে নাই—কেবল উৎকৃষ্ট গুণাবলীতেই ভগবান বিদ্যমান, সেজন্য ১২ শ্লোকে বলিলেন যে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক সমস্ত ভাবই ভগবান হইতে উৎপন্ন। ১০ অধ্যায়ে কোন্ কোন্ বস্তুকে ভগবদ্বুদ্ধিতে চিন্তা করা যায় তাহার উদাহরণ হিসাবে এক এক শ্রেণীর প্রধান পদার্থের নাম করা হইয়াছে। এখানে পদার্থের গুণমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে। ১০।৩৯ শ্লোকেও ভগবান নিজেকে সর্ব্বপদার্থের বীজ বলিয়াছেন। শঙ্কর ৭।১২ শ্লোকে 'ভাব' শব্দের অর্থ পদার্থ করিয়াছেন এবং পরের শ্লোকে ত্রিবিধ গুণময় ভাব অর্থে রাগ দ্বেষ মোহ করিয়াছেন। 'গুণময় ভাব' অর্থে গুণবিকার হইতে উৎপন্ন ভাব না ধরিয়া গুণযুক্ত ভাব এই অর্থ করিলে ব্যাখ্যায় সঙ্গতি নষ্ট হয় না।

৭।১৩ "এই ত্রিবিধ গুণময় ভাব দ্বারা মোহিত হইয়া এই সমস্ত জগৎ আমাকে ভাবত্রয়ের অতীত অব্যয় সত্তা বলিয়া জানিতে পারে না।" পদার্থে যে গুণ থাকায় তাহা মনকে অন্তর্মুখ করে তাহাই সত্ত্বগুণ; মন অন্তর্মুখ হইলে পদার্থজ্ঞান জন্মে, এই জন্যই সত্ত্বকে প্রকাশগুণ বলা হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান পদার্থকে প্রকাশ করে বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়কে সত্ত্বগুণান্বিত বলা হয়। যে গুণের বশে মন বহির্বস্তুর প্রতি ধাবমান হয় তাহাকে রজোগুণ বলা হয়। মন বহির্মুখ হইলে বিষয়-কামনা জন্মে। বিষয়কামনা কর্ম্মপ্রবৃত্তির মূল। এই জন্য রজোগুণকে প্রবৃত্তিমূলক বলা হয়। যে গুণ সত্ত্ব ও রজ অর্থাৎ প্রকাশ ও প্রবৃত্তি উভয়কে বাধা দেয় তাহাই তম। সত্ত্ব, রজ, তমের বিস্তারিত আলোচনা চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে আছে।

'প্রবাসী'তে সত্ত্ব, রজ, তম নামক আমার পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। মানুষের মন সাধারণত বহির্বস্তুতে নিবদ্ধ থাকে; কখনও কখনও তাহা অন্তর্মুখ হইয়া ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের স্বরূপ চিন্তনও করিয়া থাকে; তমোগুণ প্রবল হইলে এই উভয়ই সাধিত হয়। যতক্ষণ মানুষ গুণত্রয়ের বশীভূত থাকে ততক্ষণ আত্মদর্শন সম্ভব নহে, কারণ আত্মা ত্রিগুণাতীত। তাহা বহির্বস্তুও নয়, ইন্দ্রিয়লব্ধ অন্তরের অনুভূতিও নয়। এই উভয়ের জ্ঞাতাই আত্মা।

৭।১৪—"আমার এই দৈবী গুণময়ী মায়া দুরতিক্রমণীয়; যাহারা আমাকেই আশ্রয়রূপে গ্রহণ করে তাহারা ঐ মায়া উত্তীর্ণ হয়। সাংখ্যের প্রকৃতির গুণত্রয়কে এখানে মায়া শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে, কিন্তু এই মায়াকে ভগবানের শক্তি হিসাবে স্বীকার করায় তাহাকে দৈবী বলা হইয়াছে।

৭।১৫—"দুরাচার মূঢ় নরাধমগণ মায়াদ্বারা অপহৃতজ্ঞান হইয়া আসুর স্বভাব প্রাপ্ত হয় এবং আমার শরণাপন্ন হয় না।" যাহারা ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে তাহাদের কথা পরের শ্লোকে বলা হইয়াছে। আসুর-স্বভাব ব্যক্তিগণ বিষয়ভোগে উন্মত্ত থাকিয়া আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা করে না। ১৬।৪-২০ শ্লোকে আসুরী স্বভাবের বর্ণনা আছে। যথাস্থানে তাহা ব্যাখ্যাত হইবে।

৭।১৬-১৯—"হে ভরতবর্ষভ অর্জ্জুন, চতুর্বিধ সুকৃতিশালী মনুষ্য আমাকে ভজনা করে, আর্ত্ত অর্থাৎ বিপদগ্রস্ত, জিজ্ঞাসু অর্থাৎ যাহার জানিবার কৌতূহল আছে, অর্থার্থী অর্থাৎ ভোগকামী এবং জ্ঞানী। তন্মধ্যে জ্ঞানী সতত যুক্তাবস্থায় থাকায় অর্থাৎ আত্মোপলব্ধি করায় একভক্তি বিশেষণে অভিহিত হন অর্থাৎ আত্মরত জ্ঞানী অপর কোন বিষয়ে প্রীতি করেন না। আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্। ১৩

দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। ১৪

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ। ১৫

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ। ১৬
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ। ১৭
উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্। ১৮
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ। ১৯

প্রিয় এবং তিনিও আমার প্রিয়। ইহারা সকলেই অর্থাৎ চতুর্বিধ ভগবৎকামীই উদারচরিত কিন্তু জ্ঞানী আমার আত্মাই অর্থাৎ আমার সহিত অভিন্ন ইহাই আমার মত, কারণ তিনি যুক্তাত্মা হওয়ায় অর্থাৎ তাঁহার আত্মা ব্রহ্মের সহিত মিলিত হওয়ায় তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় আমাতেই অবস্থান করেন। বহু জন্ম জন্মান্তে, এই সমস্তই বাসুদেব, এই জ্ঞান লাভ হয় ও তৎফলে জ্ঞানী আমাকে প্রাপ্ত হন। এই প্রকার মহাত্মা সুদুর্লভ।" ষষ্ঠ অধ্যায়ে যুক্ত যোগীর যে বিবরণ আছে জ্ঞানী সম্বন্ধে সেই সমস্ত বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ জ্ঞানী ও যুক্তযোগী একই। আর্ত্ত ব্যক্তি বিপদের তাড়নায় ও অর্থার্থী লোভের বশে ভগবানের শরণাপন্ন হয়। কেবল মাত্র বিপদে পড়িলে অথবা নিজ কার্য্যোদ্ধার মানসে যে ভগবানের শরণাপন্ন হয় অথচ অন্য সময় ভগবানকে ভুলিয়া থাকে তাহাকে আমরা হীনচক্ষে দেখিয়া থাকি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এরূপ ব্যক্তিকেও সুকৃতিশালী ও উদার বলিয়াছেন, কারণ ভিতরে ভগবৎপ্রীতি না থাকিলে বিপদের সময়েও মানুষ ভগবানকে ডাকে না; বিপদ উপলক্ষ্য মাত্র। এরূপ ব্যক্তিরও ভগবানে ভক্তি কালে বিকশিত হয়।

বিপদে পড়িয়া বা অর্থলাভের উদ্দেশ্যে মানুষ যে ভগবানের সাধনা করে তাহার কারণ এই যে নিজের ক্ষমতায় সাধ্যবস্তু না মিলিলে স্বভাবতই মানুষের মনে এই ইচ্ছা জাগে—এমন কি কোন শক্তিমান পুরুষ নাই যাঁহার ইচ্ছামাত্রে আমার কাম্যবস্তু লাভ হয়। বালক যেমন বিপদে পড়িলেই শক্তিমান পিতার অন্বেষণ করে, সেইরূপ বয়স্ক ব্যক্তিও কাম্য লাভের জন্য বৃহত্তর সর্ব্বশক্তিমান পিতার অনুসন্ধান করে। পার্থিব পিতার আদর্শেই পরমপিতার কল্পনা করিয়া মানুষ ভগবানের সাহায্য প্রার্থনা করে। আধুনিক বিজ্ঞানবাদী শুধু জানিবার জন্যই যেমন বিজ্ঞান আলোচনা করেন, মেরুদেশে ধাবিত হন, হিমালয়শৃঙ্গে উঠিতে চান, ভূত আছে কি-না নির্ণয়ের জন্য প্রেততত্ত্ব আলোচনা করেন, সেরূপ জিজ্ঞাসু কেবল সহজাত কৌতূহল-প্রবৃত্তির বশে ভগবানকে অনুসন্ধান করে। জ্ঞানী ভগবানকে জানিয়াছেন বলিয়াই ভগবানের ভজনা করেন, তাঁহার আর অপর কোন বিষয়ে প্রীতি থাকে না। তাঁহার পক্ষে অনুসন্ধান অনাবশ্যক। শঙ্কর ৭।১৮ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন, "জ্ঞানী সমাহিত চিত্ত হইয়া গন্তব্য পরব্রহ্মরূপ আমাকে পাইবার জন্য অত্যুৎকৃষ্ট পথে যাইতে উদ্যত হন।" শ্লোকে গতি শব্দ থাকায় শঙ্কর 'গতিং গন্তুং প্রবৃত্ত' এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু জ্ঞানীকে নিত্যযুক্ত বলায় বুঝিতে হইবে যে তিনি গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে ১।৮-১০ খণ্ডে 'গতি' শব্দের বার-বার উল্লেখ আছে, যথা :—স্বরের গতি কি? জলের গতি কি? স্বর্গলোকের গতি কি? পৃথিবীর গতি কি? আকাশের গতি কি? ইত্যাদি। ছান্দোগ্যে গতি শব্দের অর্থ চরম আশ্রয়। এখানেও এই অর্থই যুক্তিযুক্ত, অন্যথা ব্যাখ্যায় সঙ্গতি নষ্ট হয়।

৭।২০—"হৃতজ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ প্রকৃতি দ্বারা চালিত হইয়া বিশেষ বিশেষ ফললাভের জন্য বিশেষ বিশেষ নিয়ম পালন করিয়া অপর দেবতাগণের শরণাপন্ন হয়।" অর্থাৎ নানা প্রকার ফললাভের আশায় অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার দেবতার উপাসনা করে; আর্ত্ত ব্যাধি হইতে উদ্ধারের জন্য তারকেশ্বরের মানত করে, অর্থার্থী মোকদ্দমা জিতিবার আশায় ষোড়শোপচারে কালীঘাটে পূজা দেয়, জিজ্ঞাসু সংন্যাসী, সাধু প্রভৃতির অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের কথা শুনিয়া তত্তৎ ব্যক্তির সঙ্গ করে ইত্যাদি।

৭।২১-২৩—"যে-যে ভক্ত যে-যে মূর্ত্তি শ্রদ্ধাসহকারে অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে আমি সেই সেই ব্যক্তির সেই প্রকার অচলা শ্রদ্ধা বিধান করি। সেই শ্রদ্ধা-যুক্ত হইয়া তাহারা নিজ নিজ উপাস্য দেবতার আরাধনায়

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥ ২০

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥ ২১

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্।

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥ ২৩

চেষ্টিত হয় এবং তাহা হইতে আমার দ্বারাই নির্দ্দিষ্ট ফললাভ করে। কিন্তু সেই সকল অল্পবুদ্ধিযুক্ত সাধকের লব্ধফলসমূহ বিনশ্বর। দেবতার উপাসকেরা দেবগণকে পাইয়া থাকে, পক্ষান্তরে আমার ভক্তেরা আমাকেই অর্থাৎ পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত হয়।" পরমেশ্বরই একমাত্র নিয়ন্তা, সেজন্য দেবতা-পূজার দ্বারা যে ফললাভ হয় পরমেশ্বরই তাহা বিধান করিয়া থাকেন। ব্যাধি ইত্যাদি বিপদ হইতে মুক্তি, অর্থ, যশ, মান প্রভৃতি দেবতার কৃপায় মিলিতে পারে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে এ সমস্তই নশ্বর অর্থাৎ চিরভোগ্য নহে; যে-দেবতা ফল দান করেন তিনিও নশ্বর, প্রলয়কালে তাঁহারও বিনাশ আছে কিন্তু ব্রহ্মের আশ্রয় লইলে ব্রহ্মজ্ঞানীর কখনও বিনাশ হয় না। তিনি অব্যয় পদ লাভ করেন। পরের শ্লোকে ইহাই বলা হইয়াছে।

দেব-উপাসকগণ দেবগণকে প্রাপ্ত হন এবং ব্রহ্ম-উপাসক ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন ইহা শ্রীকৃষ্ণের মত। ব্রহ্ম-উপাসক ব্রহ্মলাভ করেন ইহার অর্থ যুক্তিদ্বারা বুঝা যায়। জীবাত্মা পরমাত্মারই 'স্বরূপ' অর্থাৎ সমানরূপ এজন্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে জীবাত্মা ব্রহ্মভূত হইয়া যায়; এ কথা অনেক স্থলেই উক্ত হইয়াছে। দেবতা-উপাসক দেবতাকে প্রাপ্ত হন ইহার অর্থ কি? দেবতা ইষ্টফল দান করিতে পারেন; দেবতাকে ইষ্টফলের প্রতীক মানিলে দেব-উপাসক দেব-তাকে পান বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা যথেষ্ট নহে। উপাসক উপাস্যের সহিত এক হইয়া যান একথা হিন্দুশাস্ত্রে বহু স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। শিব-উপাসক শিবত্ব প্রাপ্ত হন, বিষ্ণু-উপাসক বিষ্ণুত্ব লাভ করেন এ সকল কথা প্রসিদ্ধ; উপাসনার দ্বারা উপাস্য পদ লাভ করা যায় এই উক্তি যুক্তিসহ কি-না তাহা বিচার্য্য।

প্রথমে উপাস্য ও উপাসকের সম্বন্ধ কি তাহা বলিব। উপাসনা, আরাধনা, প্রার্থনা, পূজা, অর্চ্চনা, ভজনা, ধ্যান প্রভৃতি কথার ধাতুগত অর্থে পার্থক্য আছে। উপাসনা অর্থে উপাস্য দেবতার সন্নিকটস্থ হওয়া, আরাধনা অর্থে দেবতার তুষ্টিবিধান করা, প্রার্থনা অর্থে কোন বস্তু যাচ্ঞা করা, পূজা অর্থে ফল পত্র পুষ্পাদি উৎসর্গ করিয়া দেবতার প্রীতিসাধন করা, অর্চ্চনা অর্থেও পূজা, ভজনা অর্থে সেবা, এবং ধ্যান অর্থে দেবতার মূর্ত্তি বা অঙ্গবিশেষে বা গুণ-বিশেষে চিত্তবৃত্তি একাগ্র করা। আধুনিক কালে উপাসনা, আরাধনা, ইত্যাদি শব্দের বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না। ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা শব্দে ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন, ধ্যান, প্রার্থনা বা অনুগ্রহভিক্ষা সমস্তই বুঝায়। হিন্দুসমাজে দেবতার বা বীজমন্ত্রের ধ্যান পূজার অন্তর্গত, অনেক স্থলেই কোন বিশেষ অর্থসিদ্ধির জন্য এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। গীতার ৭।২১ শ্লোকে অর্চ্চনা, ৭।২২ শ্লোকে আরাধনা কথার উল্লেখ আছে এবং ৭।২৩ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে দেবযাজী অর্থাৎ যিনি দেবতার যজনা করেন তিনি দেবতার সকাশে যান। অতএব যজনা, আরাধনা, অর্চ্চনা প্রভৃতির পার্থক্য না মানিয়া ব্যাখ্যায় উপাসনা শব্দ ব্যবহার করিব এবং আরাধনা, অর্চ্চনা, ধ্যান, প্রার্থনা প্রভৃতি উপাসনার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরিব।

মানুষ কোন বিশেষ কার্য্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই দেবতার উপাসনা করে; যাহা নাই অথচ যাহা চাই তাহা পাইবার জন্যই দেবতার উপাসনা, অতএব কাম্যবস্তু দেবতার আয়ত্তে আছে ইহা মানিয়া লইয়া মানুষ উপাসনা করে। দরিদ্র ধনীর উপাসনা করে কারণ দরিদ্রের কাম্য ধন ধনীর আয়ত্তে আছে। দরিদ্র উপাসকের নিকট ধনীর ধন মাত্রই প্রতিভাত হয়, ধনীর রূপ, বিদ্যা, বুদ্ধি, ইত্যাদির অন্যান্য গুণ তাহার উপাসনার বহির্ভূত। অবশ্য ধনীর রূপ বা গুণ বর্ণনা করিলে যদি সহজে অর্থ পাওয়া যায় তবে দরিদ্র উপাসক তাহা উপাসনার অন্তর্ভুক্ত করে সত্য, কিন্তু এই আরাধনা ধনপ্রাপ্তির সহায়ক মাত্র; উপাসনার মূল অঙ্গ ধন প্রার্থনা। ধনী ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দরিদ্র ধন প্রার্থনা করিতে পারে কিন্তু দেবতার নিকট যাওয়া যায় না; দেবতা অদৃশ্য থাকেন। ধনীকে যদি দেবতার মত অদৃশ্য করিয়া দেওয়া যায়, তবে দরিদ্র ধনীর কোন কাল্পনিক মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহার উপাসনা করিতে পারে; এই কাল্পনিক মূর্ত্তি যে-প্রকারই হউক না কেন দরিদ্র উপাসকের চক্ষে ইহার মাত্র একটি গুণ প্রতিভাত হইবে; মূর্ত্তিতে ধনবত্তা গুণ আরোপিত হইলে তবে তাহা দরিদ্রের উপাস্য

হইবে। এই মূর্ত্তির উপাসনা করিতে হইলে দরিদ্র উপাসককে মূর্ত্তির ধনবত্তা গুণ সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে। মানুষ উপাসনা কালে আকাঙ্ক্ষিত এক বা ততোধিক গুণ দেবতাতে আরোপ করে এবং এই সকল গুণাবলীর চিন্তন বা ধ্যান এবং তদনুরূপ প্রার্থনা উপাসনার প্রধান অঙ্গরূপে অবলম্বন করে। উপাসক দেবতাতে যে কয়টি গুণ আরোপ করে তাহার নিকট সেই দেবতা সেই কয়টি গুণের সমষ্টি মাত্র। গীতার বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে দেবতা-উপাসক তাঁহার উপাসনা অনুযায়ী দেবতাকেই প্রাপ্ত হন। যিনি মাত্র রোগ-আরোগ্যের জন্য শিবের উপাসনা করিবেন, তিনি মাত্র আরোগ্যরূপ শৈবগুণ লাভ করিবেন, পূর্ণ শিবত্ব প্রাপ্ত হইবেন না। যদি কেহ শিবের সমস্ত গুণের উপাসনা করেন, তবে গীতামতে তিনি শিবত্ব প্রাপ্ত হইবেন।

উপাসনাকালে উপাসকের চিত্তবৃত্তি প্রথমতঃ দ্বিধা বিভক্ত হয়; দরিদ্র উপাসকের মনে একদিকে নিজের দরিদ্রতা ও অপর দিকে দেবতার ধনবত্তার কথা উঠে। উপাসনার বিধি এই যে একাগ্রমনে দেবতাকে চিন্তন করিতে হইবে অর্থাৎ দরিদ্র ব্যক্তি নিজের দরিদ্রতার প্রতি মন না দিয়া একাগ্রচিত্তে ধনবত্তা চিন্তন করিবেন। উপাস্য ও উপাসকের গুণ সম্পূর্ণ বিপরীত। ধনবত্তা ও দারিদ্র্য পরস্পর-বিরোধী ভাব। এই উদাহরণে ধনবত্তার মূলে ধনদানের ইচ্ছা এবং দারিদ্র্যের মূলে ধনগ্রহণের ইচ্ছা আছে ধরা যাইতে পারে। ধনবত্তার ধ্যান করিতে করিতে যদি দরিদ্র সাধকের চিত্ত তাহাতে তন্ময় হইয়া যায় তবে সে তাহার আরাধ্য দেবতার ন্যায় ধন দান করিব এই ইচ্ছাই অনুভব করে অর্থাৎ সে দেবতার সহিত একাত্ম হইয়া যায়। এক হিসাবে এই অবস্থাকে উপাস্য দেবতা প্রাপ্তি বলা যায়। এই অবস্থায় দরিদ্রতার কোন কষ্ট অনুভূত হয় না সত্য, কিন্তু ধ্যানচ্যুত হইলেই পুনরায় দরিদ্রতার কথা মনে আসিবে। উপাসনার দ্বারা মনে যে শান্তি আসে তাহার কয়েকটি কারণ আছে। ক্রন্দনে যেমন মনের আবেগ প্রশমিত হয়, সেইরূপ দুঃখ-কষ্ট দেবতার নিকট নিবেদনে মনে কথঞ্চিৎ শান্তি আসে। দেবতা দুঃখ নিবারণ করিবেন এই বিশ্বাসেও কষ্ট নিবারিত হয়। ধ্যানে দেবতার সহিত একাত্ম হইলে দরিদ্রের মনে যেরূপ ধনীর ভাব আসে সেইরূপ উপাসকের মনে উপাস্যের ভাব আসে। এই মনোভাব উপাসকের দুঃখযুক্ত মনোভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। উপাসনায় শান্তিলাভের ইহাই প্রধান কারণ। এই ভাবের বশেই দেবতার কৃপালাভের কথা মনে উঠে। উপরি উক্ত যে সকল কারণে উপাসকের মনে শান্তি আসে মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তনই তাহার মূল।

উপাসনায় মন শান্ত হয় স্বীকার করিলেও তাহাতে উপাসকের কাম্যবস্তু লাভ হয় কি-না প্রশ্ন উঠিতে পারে। দরিদ্র ব্যক্তি ধনীর উপাসনা করিলে মনে শান্তি পাইতে পারে দেখা গেল, কিন্তু এই উপায়ে তাহার বাস্তবিক ধনলাভ হয় কি? যিনি দেবতায় বিশ্বাসী তিনি বলিবেন, দেবতা তৃপ্ত হইলে বাস্তবিক ফল দান করেন অতএব উপাসনায় মনেও আপাততঃ শান্তি আসে এবং কাম্যবস্তুও লাভ হয়। যুক্তিবাদী বলিবেন, ফলদাতা দেবতার অস্তিত্বের প্রমাণাভাব, অতএব উপাসনায় মনের শান্তি মাত্রই লভ্য; অভাব দূরীকরণের জন্য অলৌকিক দেবতায় আস্থা রাখিয়া অলস হইয়া থাকিও না; পুরুষকার অবলম্বন কর এবং লৌকিক উপায়ে কষ্ট দূর করিবার চেষ্টা কর। অসুখ হইলে তারকেশ্বরের উপর নির্ভর না করিয়া চিকিৎসকের আশ্রয় লও। মনোবিৎ বলিবেন, যদি তুমি দেবতায় বিশ্বাস কর তবে উপাসনা কর, উপাসনার দ্বারা তোমার পুরুষকার স্ফূর্ত্তি পাইবে এবং তাহাতে কাম্যবস্তু লাভ সুগম হইবে। মনোবিদের মতে আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী ইচ্ছাসমূহ বর্ত্তমান আছে। কেবল যে আমাদের মনে ধনী হইবার ইচ্ছাই আছে তাহা নয়, ইহার বিরুদ্ধ ইচ্ছা অর্থাৎ দরিদ্র হইবার ইচ্ছাও মনের অজ্ঞাত প্রদেশে লুক্কায়িত আছে। এই দুই বিরোধী ইচ্ছার সংঘাতের ফলে অনেক সময় আমাদের মনের শান্তি নষ্ট হয় এবং কার্য্যশক্তিও ক্ষুণ্ণ হয়। দরিদ্র হইলে ধনী হইবার ইচ্ছা পীড়া দেয়, এবং ধনী হইবার চেষ্টা করিলে দরিদ্র হইবার ইচ্ছা তাহাতে বাধা দেয়, ফলে ক্রিয়াশক্তি ক্ষুণ্ণ হয় ও পুরুষকার ব্যহত হয়; কি উপায়ে ধন অর্জ্জন করা যায় তাহা মনে প্রতিভাত হয় না এবং সর্ব্বান্তঃকরণে ধনার্জ্জনের চেষ্টাও সম্ভব হয় না। পরস্পর-

বিরোধী ইচ্ছার মধ্যে কোন একটির যদি সম্যক্ স্ফূরণ হয় তবে দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায়। বিরুদ্ধ ইচ্ছা সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ আমার 'স্বপ্ন' পুস্তকে দ্রষ্টব্য। ধনবত্তার ধ্যান করিলে দরিদ্রের এই বাধা কাটিয়া যাইতে পারে। তখন ধনার্জ্জনের চেষ্টা ফলবতী হয়। অতএব কোন অলৌকিক ব্যাখ্যা না মানিলেও বলা যায় দরিদ্র ধনীর ধ্যান করিলে যেমন ধনী হয়, সেইরূপ ভক্ত উপাসনার দ্বারা উপাস্য দেবতার পদ লাভ করেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, "যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ" (১।৪।১০) অর্থাৎ যে অন্য দেবতার উপাসনা করে এবং মনে করে এই দেবতা পৃথক এবং আমি পৃথক সে কিছুই জানে না।

৭।২৪-২৮—পূর্ব্ব শ্লোকে দেবতা-পূজকের কথা বলা হইয়াছে। এই সকল দেবতা প্রধান বা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি মাত্র। ব্রহ্মের দুই প্রকৃতি; এক অপরা ও অন্য পরা। দেবতা-উপাসনা অপরা প্রকৃতিরই উপাসনা। নিম্নাধিকারী অপরা প্রকৃতির উপাসনা করে, উচ্চাধিকারী পুরুষরূপ পরা প্রকৃতির তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করে। অপরা প্রকৃতিও ব্রহ্মোদ্ভূত এজন্য উপযুক্ত ভাবে অপরা প্রকৃতির তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারাও ব্রহ্মলাভ হইতে পারে; এই সাধনা অধিভূত অধিদৈব ও অধ্যাত্মবাদ নামে পরিচিত। সপ্তম অধ্যায়ের শেষে এবং অষ্টম অধ্যায়ে অধিবাদের আলোচনা আছে। বক্ষ্যমাণ শ্লোকে পরা প্রকৃতির উপাসনার কথা বলা হইতেছে।

"আমার অব্যয় শ্রেষ্ঠ পরমস্বরূপ না জানিয়া অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ অব্যক্ত আমাকে শরীরবিশিষ্ট মনে করে অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ পুরুষ বা আত্মাকে দেহ বলিয়া কল্পনা করে। আমি যোগমায়া সমাবৃত বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশিত নাই। মনুষ্যগণ মোহিত হইয়া আমাকে অজ ও অব্যয় বলিয়া বুঝিতে পারে না। হে অর্জ্জুন, আমি অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্ত প্রাণবর্গকে জানি, কিন্তু আমাকে কেহ জানে না। হে পরন্তপ ভারত, সংসারে অবস্থিত সর্ব্বপ্রাণী ইচ্ছা-দ্বেষ সমুৎপন্ন দ্বন্দ্বজাত মোহবশে সম্মোহিত হইয়া থাকে, কেবল যাহাদের পাপ ক্ষয় হইয়াছে সেইরূপ পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তি দ্বন্দ্বজনিত মোহ হইতে মুক্ত হইয়া অচলচিত্তে আমাকে ভজনা করে।" সাধারণ মনুষ্য ইচ্ছা-দ্বেষ সমুৎপন্ন সুখ-দুঃখের বশে বহির্বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাহারা আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। সুখ-দুঃখে নির্ব্বিকার না হইলে আত্মদর্শন হয় না। আত্মা অজ অব্যয় এবং আত্মাই সর্ব্বভূতের জ্ঞাতা, আত্মার জ্ঞাতা কেহ নাই। যোগমায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় সাধারণে আত্মদর্শনে সক্ষম হয় না। যোগমায়া শব্দে প্রকৃতির গুণত্রয় বুঝাইতেছে। অথবা "ঈশ্বরকে যখন কর্ম্মশীল মনে করা যায়, তখন তিনি যোগী; যথা ১১।৯ শ্লোকে মহাযোগেশ্বরো হরিঃ। এই তথাকথিত যোগী নিষ্ক্রিয় থাকিয়াও স্রষ্টা, পাতা, হর্ত্তা রূপে কর্ম্মশীল প্রতীয়মান হন। ইহাই তাঁহার যোগমায়া।" (রাজশেখর) অথবা "সরস্বতী ও যমুনা যেমন গঙ্গায় সঙ্গমিত হইয়াছেন সেইরূপ প্রকৃতি ও জীবের অদৃষ্টরূপিণী দুই মায়া নদী, ব্রহ্মসনাতনী মহামায়া স্বরূপিণী গঙ্গাতে আসিয়া মিলিয়াছেন। এই সংযোজিত শক্তিকে যোগমায়া কহা যাইতে পারে।" (চন্দ্রশেখর) মায়া শব্দের তিনটি বিভিন্ন অর্থ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য (১) প্রধান বা প্রকৃতি। ইহা সাংখ্যের মূল প্রকৃতি এবং জগতের জড় উপাদান কারণ। সাংখ্য ইহাকে মায়া না বলিলেও বেদান্তে ইহাকে মায়া বলা হইয়াছে। (২) জীবের অনাদি কর্ম্ম বা অদৃষ্ট। ইহা প্রকৃতির আশ্রয়ী। ইহাকে দৈবিকী শক্তি বলা হয়। জীবকে অনাদি বলিয়া ধরায় এই শক্তির কল্পনা। এবং (৩) উপরি উক্ত দুই প্রকার মায়ার আধার পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন সৃষ্টিশক্তি। ইনি চৈতন্যরূপিণী মহামায়া ও

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয় মনুত্তমম্ ॥ ২৪
নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫
বেদাহং সমতী তানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬

ইচ্ছাদ্বেষ সমুত্থেন দ্বন্দ্ব মোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮

জগতের বিবর্ত্তকারণ। চন্দ্রশেখর বসুর মতে এই তিনের সংযোগই যোগমায়া।

৭।২৯-৩০—অপরা প্রকৃতির উপাসনায় অর্থাৎ দেবতা-উপাসনায় পরা প্রকৃতির জ্ঞানলাভ হয় না। পরা প্রকৃতির তত্ত্ব অবগত হইলে অপরা প্রকৃতির তত্ত্বও প্রতিভাত হয়। "যাহারা জরামরণ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আমাকে আশ্রয় মানিয়া সাধনা করেন তাঁহারা ব্রহ্ম, সমস্ত অধ্যাত্ম এবং অখিল কর্ম্মের স্বরূপ জানিতে পারেন; অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ সহিত আমাকে জানিয়া যুক্তাত্মা পুরুষ মৃত্যুকালেও আমার স্বরূপ উপলব্ধি করেন।" অধ্যাত্ম, অধিভূত,অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ শব্দের অর্থ যাহার অধীনে আত্মা, ভূত, দেবতা এবং যজ্ঞ অর্থাৎ নিখিল কর্ম্ম আছে। 'অধ্যাত্ম' শব্দের 'আত্মা' অর্থে প্রাণবন্ত দেহ, ভূত অর্থে পৃথিবীর জড় উপাদানসমূহ, দেবতা অর্থে ইন্দ্রিয়াদি ও সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ভক্তি-উদ্রেককারী জড়বস্তুর অভিমানী দেবতা বা প্রকাশিকা শক্তি। পূর্ব্বপ্রকাশিত অধিবাদের বিচার দ্রষ্টব্য। প্রাণবন্ত দেহ, ভূতগ্রাম, দেবতা ও কর্ম্ম এই সমস্তই অপরা প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত; এই কারণেই সপ্তম অধ্যায়ে প্রকৃতিতত্ত্বের আলোচনায় ইহাদের উল্লেখ আসিয়াছে। তত্ত্বসমাস নামক কাপিল-সাংখ্য শাস্ত্রের সপ্তম সূত্রে অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈবের উল্লেখ আছে। অধ্যাত্ম, অধিভূত ইত্যাদি শব্দগুলি এক বিশেষ সাধনমার্গের পারিভাষিক শব্দ। শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতি তত্ত্ব হইতে অতি-কৌশলে এই সাধনমার্গের অবতারণা করিলেন। অষ্টম অধ্যায়ে অধিবাদের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। মৃত্যুকালে ওঁকার স্মরণে মুক্তি হয় এই বিশ্বাস অধিবাদের অন্তর্গত।

জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

জরা মরণ মোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তেব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্ন মধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্ ॥২৯

সাধিভূতাধি দৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চমাং তে বিদু যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০

কর্ত্তার কীর্ত্তি

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

১

বর্দ্ধমান জেলার ধনী ও বনিয়াদী জমিদারবাবু হৃষীকেশ রায় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হেমন্তকে বাড়ি হইতে নির্ম্মমভাবে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার কারণ আর কিছু নয় শুধু সে তাঁহার মনোনীতা পাত্রীকে উপেক্ষা করিয়া একটি আই-এ পাস করা মেয়েকে নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিয়াছিল।

ভয় নাই, ইহা পিতৃরোষপীড়িত হেমন্তের দুর্দ্দশার করুণ কাহিনী নয়। হেমন্তকে শেষ পর্য্যন্ত অর্থাভাবে স্ত্রীপুত্রকে পথে বসাইয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে হয় নাই। বিবাহের পূর্ব্বেই সে কলিকাতার একটা বড় কলেজে অধ্যাপনার কাজ পাইয়াছিল; তাহা ছাড়া পরীক্ষার কাগজ দেখিয়া ও ঘরে বসিয়া শিক্ষকতা করিয়াও যথেষ্ট উপার্জ্জন করিত। সুতরাং পিতা ত্যাজ্যপুত্র করিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিলেও, অর্থের দিক দিয়া অন্তত তাহার কোনো ক্লেশ হয় নাই।

হৃষীকেশবাবুর মত বদ্‌রাগী অগ্নিশর্ম্মা লোক আজকাল-কার দিনে বড়-একটা দেখা যায় না। পুরাকালে বদ্‌রাগী বলিয়া দুর্ব্বাসা মুনির একটা অপবাদ ছিল বটে, কিন্তু তিনিও অকারণে কাহাকেও অভিসম্পাত দিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। হৃষীকেশবাবুর কারণ-অকারণের বালাই ছিল না, তিনি সর্ব্বদাই চটিয়া থাকিতেন। শুনা যায়, সতের বৎসর বয়সে তাঁহার একবার টাইফয়েড হয়, সারিয়া উঠিয়া তিনি তেঁতুলের অম্বল দিয়া ভাত খাইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। ডাক্তারের আদেশে তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না, ফলে সেই যে তিনি চটিয়া

গিয়াছিলেন সে রাগ তাঁহার এখনও পড়ে নাই। একাদিক্রমে এত বৎসর রাগিয়া থাকার ফলে তাঁহার গোঁপ সমস্ত পাকিয়া গিয়াছিল এবং মাথার সম্মুখ দিকে চুল উঠিয়া পরিষ্কার ও চিক্কণ হইয়া গিয়াছিল। চক্ষু দুটি সর্ব্বদাই রোষকষায়িত হইয়া থাকিত।

রাগের মাত্রা বাড়িয়া গেলে তিনি ঘরের আসবাব-পত্র ভাঙিতে আরম্ভ করিতেন। বাড়ির ভঙ্গপ্রবণ জিনিষগুলি প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছিলেন, এমন সময় একদিন দৈবক্রমে হাতের কাছে একটা কাচের গ্লাস পাইয়া প্রথমেই সেটা ভাঙিয়া ফেলিলেন। ইহাতে ইন্দ্রজালের মত কাজ হইল। কাচ-ভাঙার শব্দে কর্ত্তার অর্দ্ধেক রাগ পড়িয়া গেল—সেদিন আর তিনি অন্য কিছু ভাঙিলেন না। অতঃপর তাঁহার রাগের মাত্রা চড়িয়া গেলেই বাড়ির যে-কেহ একটা কাচের গেলাস তাঁহার হাতে ধরাইয়া দিয়া সবেগে প্রস্থান করিত। তিনি সেটা মেঝেয় আছড়াইয়া ভাঙিয়া ফেলিতেন। এই অভিনব উপায়ে বাড়ির টেবিল, চেয়ার, আয়না, ঝাড় ইত্যাদি দামী আস্‌বাব অনেকগুলি রক্ষা পাইয়াছিল।

দুই মাস অন্তর কলিকাতা হইতে এক গ্রোস্ করিয়া নূতন কাচের গেলাস আনান হইত। তাহাতেই কোনো রকমে কাজ চলিয়া যাইত।

রাগ যখন কম থাকিত তখন তিনি তাঁহার খাস-বেয়ারা গয়ারামকে 'শূয়ারকা বাচ্চা' না বলিয়া স্রেফ্ 'হারামজাদা' বলিয়া ডাকিতেন। তখন বাহিরের গোমস্তা হইতে ভিতরে গৃহিণী পর্য্যন্ত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিতেন।

দুই বৎসর পূর্ব্বে হেমন্ত যখন জানাইল যে, সে পিতৃ-নির্ব্বাচিতা কলাবতী নাম্নী একাদশবর্ষীয়া কচি মেয়েটিকে বিবাহ করিবে না, উপরন্তু বেথুন কলেজের একটি অষ্টাদশী মাতৃহীনা কুমারীকে বধূরূপে মনোনীত করিয়াছে তখন কর্ত্তা দ্রুতপরম্পরায় তেইশটা গেলাস ভাঙিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাহাতেও যখন ক্রোধ প্রশমিত হইল না তখন তিনি হেমন্তর ঘরে ঢুকিয়া একখানা ছয় ফুট লম্বা ভিনীসিয় আয়না পদাঘাতে ভাঙিয়া ফেলিয়া দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক ঘোর গর্জ্জনে কহিলেন, 'বেরিয়ে যা এখনি আমার বাড়ি থেকে, এককাপড়ে বেরিয়ে যা। তোর মত শূয়ারের মুখ দেখ্‌তে চাই না।' বলিয়া হ্রেষাধ্বনির মত একটা শব্দ করিলেন।

হেমন্ত সেই যে এককাপড়ে বাহির হইয়া গেল, তাহার পর আজ পর্য্যন্ত পিতৃভবনে পদার্পণ করে নাই।

হেমন্তর বিবাহের সমস্ত ঠিক হইয়াই ছিল,—তাহার মাসীর বাড়ি হইতে বিবাহ হইবে। বিবাহের দিন-দুই পূর্ব্বে গৃহিণী কাঁপিতে কাঁপিতে কর্ত্তার নিকট গিয়া বলিলেন, 'আমি কালীঘাট যাব—মানত আছে। শিশিরের সঙ্গে আমায় পাঠিয়ে দাও।'

রাগী হইলেও হৃষীকেশবাবু অত্যন্ত কূটবুদ্ধি; গৃহিণীর আর্জ্জি শুনিয়া তিনি হ্রেষাধ্বনিবৎ শব্দ করিলেন, কট্‌মট্ করিয়া তাকাইয়া বলিলেন, 'মানত আছে, শিশিরের সঙ্গে পাঠিয়ে দাও! চালাকি! আচ্ছা, আমিই সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি। দেখি কেমন কালীঘাটের মানত!—গয়া শূয়ারকা বাচ্চা কোথায় গেল—'

গৃহিণী চক্ষে অঞ্চল দিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। গয়া দ্বারের বাহিরে এক গেলাস সরবৎ হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, ঘরে ঢুকিয়া কর্ত্তার হাতে দিতেই তিনি সেটা দেয়ালে মারিয়া ভাঙিয়া ফেলিলেন, ঘোর গর্জ্জনে বলিলেন, 'ম্যানেজারকে ডাক্।'

ম্যানেজার আসিলে তাহাকে হুকুম দিলেন,—'খিড়কি আর সদর দেউড়িতে চারটে করে খোট্টা দারোয়ান বসাও। বুড়ী না পালায়!—আর গয়া হারামজাদা তামাক দিয়ে যাক্।' হারামজাদা শুনিয়া সকলে বুঝিল গৃহিণীর চক্রান্ত ধরিয়া ফেলিয়া কর্ত্তা মনে মনে খুশী হইয়া উঠিয়াছেন।

গৃহিণীর কালীঘাটে পূজা দিতে যাওয়া হইল না। ওদিকে হেমন্তর বিবাহ হইয়া গেল।

ইহার পর দুই বৎসর কাটিয়াছে। গৃহিণী বাড়ির মধ্যে কর্ত্তার নজরবন্দী আছেন, একদিনের জন্যও কোথাও যাইতে পান নাই। এমন কি ভগিনীপতির অতবড় অসুখেও তাঁহাকে বোনের বাড়ি যাইতে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু শিশিরকে বাড়ির মধ্যে অন্তরীণ রাখা শক্ত। সে কলেজে পড়ে তাই বাধ্য হইয়া তাহাকে

কলিকাতায় মাসীর বাড়ি থাকিতে দেওয়া হইয়াছে। যা-হ'ক, হৃষীকেশবাবু তাহাকে ডাকিয়া শাসাইয়া দিয়াছেন যে কোনোদিন যদি সে হেমন্তর বাড়িতে যায় কিংবা তাহার সহিত বাক্যালাপ করে তাহা হইলে তাহাকেও তিনি ত্যাজ্যপুত্র করিয়া বাড়ি হইতে দূর করিয়া দিবেন।

কিন্তু সম্প্রতি কয়েকদিন হইতে বাড়ির মধ্যে ভিতরে ভিতরে কি-একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে কর্ত্তা তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। গত শনিবার শিশির আসিয়াছিল, সে মা'র কানে ফুস্ ফুস্ করিয়া কি বলিয়া গেল সেই অবধি গৃহিণী অতিশয় চঞ্চল ও বিমনা হইয়া বেড়াইতেন। গৃহকর্ম্মে তাঁহার মন নাই; একদিন ক্রন্দনরত অবস্থায় কর্ত্তার কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছেন। কিন্তু বহু উৎপীড়ন ও তর্জ্জন করিয়াও কর্ত্তা ভিতরের কথা কিছুই বাহির করিতে পারেন নাই। তাঁহার সকল প্রশ্নই গৃহিণী উদাস মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া সহ্য করিয়াছেন। তাহাতে আর কিছু না হউক, বাড়িতে কাচের গেলাসের সংখ্যা ভয়ানক দ্রুত কমিয়া আসিতেছে।

একে ত এইরূপ অবস্থা, তাহার উপর আজ সকালে উঠিয়াই কর্ত্তা একেবারে সপ্তমে চড়িয়া গিয়াছেন। হতভাগ্য সরকার সকালবেলা হুকুম লইতে আসিয়া কর্ত্তার সম্মুখেই হাঁচিয়া ফেলিয়াছিল। আর যায় কোথা! কর্ত্তা একেবারে হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন,—বেয়াদব, উল্লুক কোথাকার! এতবড় আস্পর্দ্ধা! গয়া শূয়ারকা বাচ্চা কোথায় গেল? সরকার ত প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল কিন্তু কর্ত্তার সে রাগ সমস্ত দিনে পড়িল না। আজই কি-না সন্ধ্যার সময় আবার শিশির আসিল। এ যেন গোদের উপর বিষফোড়া! নিজের বসিবার ঘর হইতে তাহার গলার আওয়াজ শুনিতে পাইয়াই কর্ত্তা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শিশির ঘরে ঢুকিতেই তিনি আরম্ভ করিলেন—'বাঁদর, তুই হেমন্তর বাড়িতে যাস্? সত্যি কথা বল্ হতভাগা, নইলে আজ তোকে মেরেই খুন করব।'

কুড়ি বছরের ছেলে শিশির পিতার মুখের পানে হতভম্ব হইয়া তাকাইয়া রহিল, তাঁহার প্রশ্নের হাঁ-না কোনো উত্তরই দিতে পারিল না।

হৃষীকেশবাবু তাঁহার কণ্ঠস্বর তারাগ্রামের ধৈবতে তুলিয়া বলিলেন,—'কার হুকুমে তুই সেখানে গিয়েছিলি রে পাজি, নচ্ছার! কি বলেছিলাম তোকে আমি! আমার হুকুম হুকুম নয়, বটে?

শিশির গোঁজ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হৃষীকেশবাবু এক পদাঘাতে জ্বলন্ত কলিকাসুদ্ধ গড়গড়াটা দূরে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন,—'কি করতে তুই গিয়েছিলি সেখানে বল্ আমাকে! আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন! নিজের মা'র কাছে এসে ফিস্‌ফিস্ ক'রে কি বলেছিস্? বল্ শিগ্‌গীর হতভাগা, নইলে গাছে বেঁধে তোর গায়ে জলবিছুটি দেওয়াব।'

শিশির ভিতরে ভিতরে মরিয়া হইয়া উঠিল। সে দু-হাত শক্তভাবে মুঠি করিয়া বলিল,—'আমি এখন থেকে দাদা বৌদিদির কাছেই থাক্‌ব ঠিক করেছি। আর—আর মাকেও তাঁদের কাছে নিয়ে যাব।'

হৃষীকেশবাবু একেবারে লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, 'কী, এতবড় আস্পর্দ্ধা!'

শিশির গোঁ-ভরে বলিয়া চলিল,—'আমাকে থাকতেই হবে,—বৌদিদির শরীর খারাপ, তাঁর—তাঁর—ছেলে হবে—'

হৃষীকেশ আবার চীৎকার করিবার জন্য হাঁ করিয়াছিলেন, সেই অবস্থাতেই হঠাৎ বসিয়া পড়িলেন। সংবাদটা পরিপাক করিতে মিনিট-খানেক সময় লাগিল, তারপর পুনশ্চ গর্জ্জন ছাড়িলেন,—'ছেলে হবে ত তোর কি রে শূয়ার।'

শিশির বলিল,—'দাদা সমস্ত দিন বাড়ি থাকেন না, বৌদি একলা, তাই আমাকে থাকতে হবে। আর মাকেও—'

'বেরোও! বেরোও! এইদণ্ডে আমার বাড়ি থেকে দূর হ—নইলে চাবুকে লাল করে দেব। শূয়ার পাজি বোম্বেটে কোথাকার! যাবি নে? গয়া শূয়ারকা বাচ্চা কোথায় গেল, নিয়ে আয় ত আমার হাণ্টার—'

শিশির আর অপেক্ষা করিল না, যেমন আসিয়াছিল তেমনি বাহির হইয়া গেল। মা'র সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করা হইল না।

সমস্ত রাত্রি হৃষীকেশ বাড়িময় দাপাইয়া বেড়াইলেন। সেদিন আর ভয়ে কেহ তাঁহার কাছে গেলাস লইয়াও অগ্রসর হইতে পারিল না।

পরদিন বেলা নয়টার সময় স্নানাহার করিয়া তিনি ম্যানেজারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, বলিলেন, 'আমি কলকাতায় যাচ্ছি, সন্ধ্যে নাগাদ ফিরব। তুমি সাবধানে থেকো—গিন্নী না পালায়। আর শিশির লক্ষ্মীছাড়া যদি বাড়ি ঢুকতে চায় মেরে তাড়াবে।—গাড়ী যুততে বল।'

ম্যানেজার ভয়ে ভয়ে বলিলেন,—'মোটর-কোম্পানীর এজেন্টকে আজ ডেকেছিলেন, সে এসেছে। তাকে—'

হৃষীকেশবাবু বলিলেন, 'তাকে চুলোয় যেতে বল। আমি কলকাতায় যাচ্ছি, নিজে দেখে মোটর কিনব। গাড়ী যুততে বল।' বলিয়া চেক্ বহিখানা পকেটে পুরিলেন।

ম্যানেজার 'যে আজ্ঞে' বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

গাড়ীতে ষ্টেশনে যাইতে যাইতে হৃষীকেশ নিজের মনে গর্জিতে লাগিলেন,—'কি আস্পর্দ্ধা! আমার সঙ্গে চালাকি! দেখে নেব। আমার বৌ—আমার নাতি! আমি হৃষীকেশ রায়—দেখে নেব কে কি করতে পারে।'

২

বেলা প্রায় দেড়টার সময় একখানা ঝকৃঝকে নূতন ফিয়েট্ গাড়ী কলিকাতায় প্রফেসার হেমন্ত রায়ের বাড়ির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ীর আরোহী গলা বাড়াইয়া দেখিলেন, ছোট্ট সুদৃশ্য বাড়িখানি, চারিধারে একটুখানি সঙ্কীর্ণ ঘাসের বেষ্টনী; সামনে লোহার ফটক বন্ধ।

হ্রেষাধ্বনি করিয়া হৃষীকেশবাবু গাড়ী হইতে নামিলেন। ফটক খুলিয়া সম্মুখের বন্ধ দরজায় সজোরে কড়া নাড়িলেন। একটা ছোকরা-গোছের চাকর দ্বার খুলিয়া সম্মুখে কষায়িত নেত্র বৃদ্ধ ও তাঁহার পিছনে একখানি দামী নূতন মোটর-কার দেখিয়া সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল,—'কি চাই বাবু?'

হৃষীকেশবাবু উত্তর না দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। চাকরটা বলিল,—'বাবু বাড়ি নেই, কলেজ গেছেন। তাঁর ফিরতে দেরি আছে।'

হৃষীকেশ কর্ণপাত না করিয়া ভিতরের দিকে চলিলেন। চাকরটা এই অদ্ভুত বৃদ্ধের আচরণ দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার সম্মুখের পথ আগলাইয়া রুক্ষস্বরে কহিল, 'ওদিকে কোথায় চলেছেন! ওটা অন্দরমহল। বাবু বাড়ি নেই এসময় আপনি কি চান? আপনার নাম কি?'

হৃষীকেশ শুধু একটি হ্রেষাধ্বনি করিয়া চাকরটার কর্ণধারণপূর্ব্বক একধারে সরাইয়া দিলেন। তারপর সম্মুখের সিঁড়ি দিয়া গট্‌গট্ করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন।

উপরের একটা ঘরে তখন মেঝের উপর মাদুর বিছাইয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া প্রতিমা ভেল্‌ভেটের জুতার কাপড়ে রেশমের ফুল তুলিতেছিল। কৃশাঙ্গী সুন্দরী, বুদ্ধির বিভায় মুখখানি জলজলে, চুলগুলি পিঠের উপর ছড়ানো, নূতন সৌভাগ্যের কোনো লক্ষণই এখনও দেহে প্রকাশ পায় নাই, তাহাকে দেখিলেই মন খুশী হইয়া উঠে। তাহার হাঁটুর কাছে মাথা রাখিয়া শিশির কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া লম্বা ভাবে শুইয়া ছিল। গতকল্য বাবার সহিত যে ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে তাহা বৌদিদিকে বলা যাইতে পারে কি-না সে মনে মনে তাহাই গবেষণা করিতেছিল। কিছুক্ষণ ভাবিয়া সে স্থির করিল—না, বলিয়া কাজ নাই। বৌদিদি দুঃখ পাইবেন মাত্র, আর কোন ফল হইবে না। দাদাকে চুপি চুপি এক সময় বলিলেই হইবে।

বৌদিদির সন্তান-সম্ভাবনার কথা গত সপ্তাহে দাদার মুখে শুনিয়া শিশির আপনা হইতে ছুটিয়া মা'র কাছে গিয়াছিল। মাও শুনিয়া আনন্দে ও আশঙ্কায় অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু কর্ত্তার রোষ-বহ্নি ডিঙাইয়া কিছু করিতে সাহস করেন নাই। গতকল্য শিশির দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আবার বাড়ি গিয়াছিল—যেমন করিয়া হউক মাকে লইয়া আসিবে। তারপরেই সেই বিভ্রাট! মা'র সঙ্গে শিশির দেখা পর্য্যন্ত করিতে পাইল না।

এই কথাটাই মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতে করিতে শিশির বলিল, 'আচ্ছা বৌদি, মা যদি এখন কোনো রকমে হঠাৎ এসে পড়েন?'

সম্মুখের দেয়ালে শ্বশুর ও শাশুড়ীর এন্‌লার্জ করা ফটোগ্রাফ টাঙানো ছিল। সেই দিকে চোখ তুলিয়া

কিছুক্ষণ শাশুড়ীর ছবির দিকে চাহিয়া থাকিয়া একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রতিমা বলিল,—'তা যদি হ'ত ঠাকুরপো—'

শিশির সহসা কনুইয়ে ভর দিয়া উঠিয়া বলিল,—'আচ্ছা, মাকে যদি চুরি করে নিয়ে আসি—বাবা কিছু টের না পান ?'

জিভ কাটিয়া প্রতিমা বলিল,—'বাপ রে! তাহলে কি আর রক্ষে থাকবে। বাবা তাহলে কাউকে আস্ত রাখবেন না।'

বস্তুত, চোখে না দেখিলেও শ্বশুরের মেজাজ সম্বন্ধে কোনো কথাই প্রতিমার অজ্ঞাত ছিল না। তাহাকে বিবাহ করার ফলেই যে স্বামীর সহিত শ্বশুরের এমন বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল তাহা সে বিবাহের সময় হইতেই জানে। হেমন্ত অবশ্য কোনোদিন এসম্বন্ধে তাহাকে কোনো কথা বলে নাই, কিন্তু শ্বশুরঘরের জন্য সর্ব্বদাই প্রতিমার প্রাণ কাঁদিতে থাকিত। রাগী হউন কিন্তু শ্বশুর যে কখনই মন্দ লোক নহেন ইহা তাহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। শ্বশুর-শাশুড়ীর আদরে বঞ্চিত হইয়া এই মেয়েটি যে মনের মধ্যে কতখানি বেদনা পোষণ করিয়া রাখিয়াছিল তাহা তাহার স্বামীও কোনোদিন জানিতে পারেন নাই। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী বলিয়া সে ও-ভাব কখনও ইঙ্গিতেও প্রকাশ করে নাই, পাছে স্বামী উদ্বিগ্ন হন।

শিশির আবার কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া শুইয়াছিল, প্রতিমা ছলছল চক্ষে বলিল,—'আমার ভাগ্যে সে কি আর হবে ঠাকুরপো। বাবা-মা'কে আমি এজন্মে চোখে দেখতে পাব না।' বলিয়া একটা উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

এমন সময় নীচে হ্রেষাধ্বনির মত শব্দ শুনিয়া শিশির তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিল। এ শব্দ ত ভুল হইবার নয়! সে প্রতিমার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল—'বাবা! বাবা এসেছেন!' বলিয়াই একলাফে পাশের ঘরে ঢুকিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

প্রতিমার মুখ সাদা হইয়া গেল, বুক ঢিব্‌ঢিব্‌ করিয়া উঠিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাথায় আঁচল টানিয়া দিতেই হৃষীকেশবাবু ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রতিমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে কহিলেন, 'আমার নাম শ্রীহৃষীকেশ রায়। আমি বর্দ্ধমান থেকে আসছি।'—বলিয়া একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া তাহাতে উপবেশন করিলেন।

এইখানে প্রতিমা একটু অভিনয় করিল। মনে যে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা জোর করিয়া চাপিয়া সে সচকিতে ফিরিয়া মুখের ঘোমটা সরাইয়া দিল। বিস্ময়-আনন্দ-ভক্তি-লজ্জা-মিশ্রিত চক্ষে হৃষীকেশবাবুর মুখের দিকে এক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিল—'বাবা!' তারপর গলায় আঁচল দিয়া তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল।

অগ্ন্যুদ্‌গারী ভিসুভিয়াসের মাথার উপর উত্তর-মেরুর সমস্ত বরফ চাপাইয়া দিলে কি ফল হয় বলিতে পারি না, হৃষীকেশবাবুরও মুখের কোনো ভাব-পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। তিনি ক্ষীণভাবে একটু হ্রেষাধ্বনি করিয়া বলিলেন, 'তুমিই আমার পুত্রবধূ? তোমার নাম কি?'

'আমার নাম প্রতিমা' বলিয়া সে তাঁহার পায়ের কাছেই বসিয়া পড়িল। এইটুকু অভিনয় করিয়াই তাহার উরুদুটা থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

হৃষীকেশবাবু চাহিয়া দেখিলেন—হাঁ নাম সার্থক বটে। বধূর মুখ দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। শুনিয়াছিলাম বধূ আই-এ পাস, কিন্তু কই তাহার আবরণে বিদ্যাভিমানের কোনো চিহ্নই ত নাই। তিনি এক দর্পিতা তীক্ষ্ণভাষিণী যুবতী মনে মনে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এ কি? হৃষীকেশবাবু মনে মনে একবার হ্রেষাধ্বনি করিলেন, কিন্তু তাহা পুত্রদের উদ্দেশে। হতভাগারা তাঁহাকে বলে নাই কেন?

প্রতিমা শ্বশুরের মুখের দিকে একবার চাহিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, 'আপনি বড্ড ঘেমেছেন, জামাটা খুলে ফেললে হ'ত না বাবা!'

হাতপাখা আনিয়া সে বাতাস করিবার উপক্রম করিতেই হৃষীকেশবাবু বলিয়া উঠিলেন, 'থাক্ থাক্, তোমায় আর কষ্ট করতে হবে না মা। আমি নিজেই বাতাস খাচ্ছি,' বলিয়া ফেলিয়াই হৃষীকেশবাবু একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, এ ধরণের কথা গত তেত্রিশ

বৎসরের মধ্যে তাঁহার মুখ দিয়া একবারও বাহির হয় নাই।

পাশের ঘরের দরজায় কান লাগাইয়া শিশির নিস্পন্দ বক্ষে এতক্ষণ শুনিতেছিল; এবার সে পা টিপিয়া টিপিয়া সরিয়া গিয়া দেয়ালে-টাঙানো রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ছবির সম্মুখে দাঁড়াইয়া একমনে দুর্গানাম জপ করিতে লাগিল।

হৃষীকেশবাবু গায়ের জামা খুলিয়া মাদুরের উপর বসিলেন, পাখার হাওয়া খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সে শয়তানটা ফিরবে কখন? তোমাকে বুঝি এই রকম একলা ফেলে রেখে যায়?'

চোখের জল ও মুখের হাসি একসঙ্গে নিরুদ্ধ করিয়া প্রতিমা নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

হৃষীকেশবাবু গলা একপর্দ্দা চড়াইয়া দিয়া বলিলেন, 'দুর্পিণ্ড বদমায়েস সব! শিশিরটাকেও বাড়ি থেকে দূর করে দিয়েছি। এমন বৌ আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিল, আজই আমি তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাব, দেখি কোন্ ব্যাটা কি করতে পারে।'

শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিয়া প্রতিমা আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না, ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। হৃষীকেশবাবু তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া নিজের থানের খুঁট দিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া সগর্জ্জনে কহিলেন,—'কেঁদো না। আমি এই হেমন্তটাকে দেখে নেব। সব ঐ ছোঁড়ার শয়তানী—আমি বুঝেছি। গিন্নিও এর মধ্যে আছেন। আমাকে এতদিন বলেনি কেন? ষড়যন্ত্র! যত-সব চোর বোম্বেটের দল। নইলে এই বৌকে আমি দু-বচ্ছর বাইরে ফেলে রাখি?'

প্রতিমা শ্বশুরের কোলের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া রুদ্ধস্বরে বলিল,—'বাবা, আমাকে বাড়িতে মা'র কাছে নিয়ে চলুন।'

'যাবই ত। এখনি নিয়ে যাব। আমি হৃষীকেশ রায়, আমি কি কারু তোয়াক্কা রাখি?' জামাটা গায়ে দিতে দিতে পুনরায় বলিলেন,—'তোমায় নিয়ে যাব ব'লে নতুন মোটর কিনে নিয়ে একেবারে এসেছি। ট্রেনে ত আর তোমার যাওয়া হ'তে পারে না।'

হৃষীকেশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রতিমা থতমত ভাবে একবার ঢোক গিলিয়া বলিল,—'এক্ষুনি? কিন্তু বাবা—'

হৃষীকেশবাবু চড়া সুরে বলিলেন, 'কিন্তু কি? সেই রাস্কেলটার অনুমতি নিয়ে তবে তোমাকে নিয়ে যেতে হবে? [হ্রেষাধ্বনি করিলেন] আমি এই তোমাকে নিয়ে চললাম, ওদের যদি ক্ষমতা থাকে মোকদ্দমা করুক গিয়ে।'

প্রতিমা আর দ্বিরুক্তি করিল না, যেমন ছিল তেমনি বেশে শ্বশুরের সঙ্গে নামিয়া চলিল।

সদর দরজা পর্য্যন্ত গিয়া হৃষীকেশবাবু থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। উদ্বিগ্নভাবে পুত্রবধূর দিকে তাকাইয়া কহিলেন, 'কিন্তু শুনেছিলাম—ঐ শিশির হতভাগা বলছিল যে তুমি নাকি—তোমার নাকি—? কোনো ভয়ের কারণ নেই ত মা। মোটরে প্রায় ষাট মাইল যেতে হবে। যদি কষ্ট হয়—যদি কোনোরকম—'

আরক্ত মুখ কোনোমতে ঘোমটায় ঢাকিয়া প্রতিমা তাড়াতাড়ি গাড়িতে গিয়া উঠিল।

তিনটার সময় হেমন্ত বাড়ি ফিরিতেই শিশির ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—'দাদা, বাবা এসেছিলেন, বৌদিকে বাড়ি নিয়ে গেছেন। ব'লে গেছেন আমাদের ক্ষমতা থাকে ত যেন মোকদ্দমা করি।' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

ভাইয়ের কাছে সমস্ত কথা আদ্যোপান্ত শুনিয়া হেমন্ত স্মিতমুখে বলিল, 'সব ত তুই-ই করলি। এখন আমি কি করব উপদেশ দে।'

অতঃপর দুই ভায়ে আধঘণ্টা ধরিয়া পরামর্শ করিয়া বিকাল পাঁচটার গাড়ীতে বর্দ্ধমান রওনা হইল।

৩

রাত্রি আটটার সময় বৌমার তত্ত্বাবধান করিবার জন্য অন্দরে প্রবেশ করিয়া কর্ত্তা দেখিলেন দুই ভাই হেমন্ত ও শিশির মায়ের ঘরের মেঝেয় আহারে বসিয়াছে। গৃহিণী সম্মুখে বসিয়া খাওয়াইতেছেন এবং নববধূ একখানা রেকাবি হস্তে দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়া আছে। হৃষীকেশবাবু ভীষণ ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন,—'এ দুটোকে কে বাড়ি ঢুকতে দিলে? নিশ্চয় খিড়কী দিয়ে ঢুকেছে! হুঁ—আস্পর্দ্ধা! এখনি ওদের বেরিয়ে যেতে বল।'

হেমন্ত ও শিশির কথা কহিল না, হেঁটমুখে আহার করিতে লাগিল। গৃহিণী বলিলেন,—'কেন যাবে—যাবে না। আর যায় যদি, বৌমাকে নিয়ে যাবে। আমিও যাব। দেখি তুমি কি করে আটকাও!'

হৃষীকেশবাবু কট্‌মট্‌ করিয়া তাকাইয়া বলিলেন,—'হুঁ। ভারি আস্পর্দ্ধা হয়েছে। আচ্ছা, এখন কিছু বলছি না, বৌমার শরীর খারাপ, কিন্তু এর পরে—। বৌমা তুমি শোও গে যাও, হতভাগাদের আর পরিবেশন করতে হবে না।' বলিয়া মধ্যম রকমের একটা হ্রেষাধ্বনি করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে বৈঠকখানা হইতে কর্ত্তার গলা শুনা গেল,—'গয়া হতভাগা কোথায় গেল, তামাক দিয়ে যাক্‌।'

গয়ারামের এতবড় সৌভাগ্য জীবনে কখনও হয় নাই। সে নববধূঠাকুরাণীর পায়ের কাছে ঢিব করিয়া একটা গড় করিয়া বাহিরে ছুটিল।

হেমন্ত ও শিশির মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল। গৃহিণী চোখের জল মুছিয়া বধূর চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন করিয়া ভাঙা গলায় বলিলেন, 'যাও বৌমা, তোমার শ্বশুর হুকুম দিয়ে গেলেন, আজকের মত শুয়ে পড়গে বাছা, কাল তখন ওদের পরিবেশন ক'রে খাইও।'

পঞ্চেন্দ্রিয়ের ব্যথা

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

ব্যাকুল চোখের দৃষ্টি আমার দাও গো ক'রে বন্ধ
তোমার মোহন আঁখির দিঠিমাঝে,
কর্ণে আমার এই নিখিলের সকল কলরবে
তোমার যেন মধুর বাণী বাজে।
নাসার পথের অন্ধকারে অন্ধ হয়ে ওগো
ভুবন নাচে ভোগের ঘ্রাণে ঘ্রাণে,
তোমার তনুর চন্দনে আজ নন্দি ওগো তারে
বিলাও সে ঘ্রাণ তোমার দানে দানে।

এই রসনার তৃপ্তি লাগি জগৎ রসেরসে
মণ্ডিত গো করলে তুমি মধু,
জগৎ-মধু তোমার সুধায় পূর্ণ ক'রে দিয়ো
প্রাণেশ তুমি, আমি তোমার বধূ।
এই দেহেরি ত্বকের তৃষার স্নিগ্ধ মিলন-বারি
ফিরছে ওগো তোমার তনুর সাথে,
মনের জ্বালা দেহের মাঝে কাঁদছে ওগো বঁধু
আজকে এস এই বেদনার রাতে।

ভ্রম-সংশোধন

গত মাসের 'প্রবাসী'র ৩৩৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ১ নং তালিকার 'মিলের নাম' স্তম্ভে 'ডেকান্ পেপার মিল'-এর স্থলে 'বেঙ্গল পেপার মিল' এবং 'বেঙ্গল পেপার মিল'-এর স্থলে 'ডেকান্ পেপার মিল' পড়িতে হইবে।



ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষের বহির্ব'ণিজ্য, ৭ মাসে ভারতের ক্ষতির বহর—

গত এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত ৭ মাসে ভারতের বহির্বাণিজ্যে ভারতবর্ষের কত টাকা লাভক্ষতি হইয়াছে তাহার হিসাব এই,—

এই ৭ মাসে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী জিনিষের পরিমাণ ১৯৩১ সনের উক্ত ৭ মাসের তুলনায় ১৯ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা অথবা শতকরা ১৮'১ ভাগ কম হইয়াছে। বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে যে সব জিনিষ আমদানী হইয়' পুনরায় অন্ত দেশে রপ্তানী হয়, তাহার পরিমাণও এই ৭ মাসে ১৯৩১ সনের তুলনায় ১ কোটি ২২ লক্ষ টাকার অথবা শতকর: ৪১·২ ভাগ কমিয়াছে। কাজেই, এই উভয় প্রকার রপ্তানীর পরিমাণ মোট ১৭ কোটি ১৭ লক্ষ টাকার অথবা শতকরা ১৮·৮ ভাগ কমিয়াছে। ১৯৩১ সনের এই ৭ মাসে মোট ৯১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার মালপত্র বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরে এই ৭ মাসে ৭৩ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকার মাল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

পক্ষান্তরে, এই ৭ মাসে বিদেশ হইতে আমদানী মালের পরিমাণ ১৯৩১ সনের ৭ মাসের তুলনায় ৪ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকার অথবা শতকরা ৫৯ ভাগ বাড়িয়াছে। ১৯৩১ সনের এই ৭ মাসে বিদেশ হইতে মোট ৭৬ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকার মালপত্র ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরের এই ৭ মাসে আমদানী হইয়াছে ৮০ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার মাল। সুতরাং বর্ত্তমান বৎসরের ৭ মাসে ভারতবর্ষ বিদেশে মালপত্র রপ্তানী করিয়া যত টাকা পাইয়াছে—বিদেশ হইতে মাল ক্রয় করিবার জন্ত এই ৭ মাসে তাহা অপেক্ষা ৬ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা বেশী প্রদান করিয়াছে।

স্বর্ণ, রৌপা, নোট প্রভৃতি ধনসম্পত্তি আমদানী রপ্তানীতেও ভারতের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। এই ৭ মাসে গবর্ণমেণ্ট ও ব্যবসায়ি-গণ কর্ত্তৃক মাত্র ১ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকার ধনসম্পত্তি আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর এই ৭ মাসে উহা অপেক্ষা আরও ২ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকার বেশী ধনসম্পত্তি আমদানী হইয়াছিল। এই ৭ মাসে ৪৪ লক্ষ টাকার কাঁচা স্বর্ণ, ২৫ লক্ষ টাকার সভারেণ ও অন্তান্ত বৃটিশ স্বর্ণমুদ্রা এবং ২ লক্ষ টাকার অন্ত প্রকারের স্বর্ণমুদ্রা ভারতে আমদানী হয়। অর্থাৎ এই ৭ মাসে স্বর্ণ ও স্বর্ণমুদ্রা মিলিয়া মোট ৭১ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হয়। গত বৎসর এই ৭ মাসে ১ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার স্বর্ণ ও স্বর্ণমুদ্রা আমদানী হইয়াছিল। গত বৎসর এই ৭ মাসে ভারতবর্ষ হইতে মোট ১০ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার স্বর্ণ ও স্বর্ণমুদ্রা রপ্তানী হয়। কিন্তু এই বৎসর ৭ মাসে ৩৫ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকার স্বর্ণ ও স্বর্ণমুদ্রা বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। গত বৎসর এই ৭ মাসে ৩ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার রৌপ্য আমদানী ও ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার রৌপ্য বিদেশে রপ্তানী হয়। কিন্তু এই বৎসর ৭ মাসে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার রৌপা ভারতে আমদানী হইয়াছে এবং ৫৫ লক্ষ টাকা মূল্যের রৌপ্য বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে এই ৭ মাসে গত বৎসর এই ৭ মাস অপেক্ষা ৪৮ হাজার টাকার বেশী নোট আমদানী হইয়াছে। মোটমাট সমস্ত ধনসম্পত্তির আমদানী ও রপ্তানীর হিসাব করিলে দেখা যায় যে, গত বৎসর এই ৭ মাসে যত টাকার ধনসম্পত্তি ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা এই বৎসর ৭ মাসে আরও ২৩। কোটি টাকার বেশী ধনসম্পত্তি রপ্তানী হইয়া মোট রপ্তানীর পরিমাণ ৩৭ কোটি ১৮ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

এই সব ছাড়া ভারতের ঋণের সুদ এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইংলণ্ডে প্রেরিত অর্থের হিসাব ধরিয়া দেখা যায় যে, এই ৭ মাসে ভারতবর্ষ হইতে স্বর্ণ প্রভৃতি ধনসম্পত্তি বাদেও ১৯ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা বাহির হইয়া গিয়াছে।

—জনশক্তি

ভারতের আদমসুমারি (১৯৩১)—

ভারতবর্ষের আয়তন ও লোক-সংখ্যা

বর্গমাইল	১৮০৮৬৭৯
লোকসংখ্যা—	৩৫২৮৩৭৭৭৮
(ক) শহর	৩৮৯৭৯২১১
(খ) পল্লী	৩১৩৮৫৮৫৬৭
শহর-সংখ্যা	২৫৭৫

পুরুষের সংখ্যা ১৮ কোটি ১৮ লক্ষ ২৮ হাজার ৯২৩ ; নারীর সংখ্যা ১৭ কোটি ১০ লক্ষ ৮ হাজার ৮৫৫। হাজার জন পুরুষের মধ্যে স্ত্রীলোকের অনুপাত ৯৪০।

সমগ্র ভারতে গড়ে প্রতি-বর্গমাইলে ১৯৫ জন লোকের বাস। সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা কোচিনে ৮১৪, বৃটিশ ভারতের বাংলায় ৬৪৬, সর্ব্বনিম্ন সংখ্যা বেলুচিস্তানে ৫, বৃটিশ বেলুচিস্তানে ৯।

শহরবাসীর সংখ্যা বর্ত্তমানে সমগ্র লোক-সংখ্যার শতকরা ১১ ভাগ। ১৯২১ সনের পর শতকরা ৯ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিবাহিত

পুরুষদের মধ্যে শতকরা ৪৬'৭ ও স্ত্রীলোকদের মধ্যে ৪৯'৩ বিবাহিত। যথাক্রমে শতকরা ৫'৪ ও ১৫'৪ বিপত্নীক ও বিধবা।

১৫ বৎসরের কম বয়সের, ১৫ হইতে ৫০ বৎসরের এবং ৫০ হইতে তদূর্দ্ধ বৎসর বয়সের লোকসংখ্যা শতকরা যথাক্রমে ৩৯'৯, ৫০'৫ ও ৯'৬।

পেশা

কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত লোকসংখ্যা ৬৬'৪, ব্যবসায় শতকরা ৫'১৩, শ্রমশিল্পে ৯'৯৫, যানবাহনের কার্য্যে ১'৫২ জন।

লিখিতে পড়িতে সক্ষম

ভারতে এক হাজার অধিবাসীর মধ্যে ৫ ও তদূর্দ্ধ বয়সের যাহারা কোন ভাষা লিখিতে ও পড়িতে পারে এমন পুরুষের সংখ্যা ১৫৬, স্ত্রীলোকের সংখ্যা ২৯। ১৯২১ সনে ঐরূপ অনুপাত ছিল যথাক্রমে ১২২ ও ১৮।২০। ঐ বয়সের একহাজার লোকের মধ্যে ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ পুরুষের সংখ্যা ২৫, স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৩। শিশু সহিত মোট শিক্ষিতের সংখ্যা ২ কোটি ৩৯ লক্ষ ৬২ হাজার ২৭৯ পুরুষ, ৪১ লক্ষ ৬৯ হাজার ৩৬ স্ত্রীলোক। ১৯০১ সনে উক্ত সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৪৬ লক্ষ ৯০ হাজার ৮০ ও ৯ লক্ষ ৯৬ হাজার ৩৪১। ১৯৩১ সনে মোট অশিক্ষিতের সংখ্যা ১৫ কোটি ৬২ লক্ষ ৪৩ হাজার ৩০৫ পুরুষ, ১৬ কোটি ৫৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ৬৯৮ স্ত্রীলোক।

ভাষা

সমগ্র ভারতে ২২৫টি ভাষা আছে। জেলা ভেদে ভাষার যে স্বাতন্ত্র্য তাহা ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই। অন্ততঃ ২০টি বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে উর্দ্দু ও নাগরী অধিক লোকে ব্যবহার করে, তাহার নিম্নে স্থান বাংলা, তেলেগু ও তামিলের। ইংরেজী ভাষাভাষী লোকের সংখ্যা ৩ লক্ষ ১৯ হাজার ১১২।

বিভিন্ন জাতি—হ্রাস বৃদ্ধি

	হাজারের মধ্যে	১৯২১ সনের তুলনায় শতকরা বৃদ্ধি বা হ্রাস	
হিন্দু	৬৮২	১০.৪	বৃদ্ধি
মুসলমান	২২২	১৩	ঐ
বৌদ্ধ	৩৬	১০.৫	ঐ
উপজাতি	২৪	১৫.৩	হ্রাস
খৃষ্টান	১৮	৩২.৫	বৃদ্ধি
অন্যান্য	১৮	৩৭	ঐ

—বসুমতী ও বাঁকুড়া দর্পণ

বিদেশী বস্ত্রের আমদানী হ্রাস—

১৯১৩-১৪ সনে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ১৫৩ কোটি ৪২ লক্ষ গজ কোরা কাপড়, ৭৯ কোটি ১১ লক্ষ গজ ধোলাই কাপড় এবং ৮৩ কোটি ১৮ লক্ষ গজ রঙীন ও ছাপা প্রভৃতি কাপড় আমদানী হইয়াছিল। কিন্তু গত ১৯ বৎসরে উহা ক্রমশঃ কমিয়া গত ১৯৩১-৩২ সনে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে মাত্র ২৪ কোটি ৯৪ লক্ষ গজ কোরা কাপড়, ২৭ কোটি ৯৭ লক্ষ গজ ধোলাই কাপড় এবং ২২ কোটি ৩২ লক্ষ গজ রঙীন ও ছাপা কাপড় আমদানী হইয়াছে। —আনন্দ বাজার পত্রিকা

বিনাবিচারে বন্দীর সংখ্যা—

বাংলা ৫১১, পঞ্জাব ৫, দিল্লী ৪, ব্রহ্মদেশ ২, মোট ৫২২ জন।

বোম্বাই শহরে সত্যাগ্রহ আন্দোলন—

গত বৎসরে বোম্বাই শহরে গ্রেপ্তার হইয়াছিল ৪,৩৫৫ জন, জরিমানা আদায় হইয়াছিল ১,৮৩,০০০ টাকা। ব্যাঙ্ক হইতে সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন ৫০,০০০ টাকা।

ব্রহ্মে ভারতীয় মেয়র—

রেঙ্গুন, ৬ই জানুয়ারি

অদ্য বৈকালে ডাঃ আর, এস, ডুগাল সর্ব্বসম্মতিক্রমে রেঙ্গুন কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ডাঃ ডুগাল পঞ্জাবের রাওয়ালপিণ্ডিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ। তাঁহার বয়স মাত্র ৩৭ বৎসর। বিগত ১৯৩১ সনে ব্রহ্মদেশে ভারতীয়দের বিষয়-সম্পত্তি সংরক্ষণ সম্পর্কে বড়লাটের নিকট যে ডেপুটেশন প্রেরণ করা হইয়াছিল ডাঃ ডুগাল তাহার একজন প্রতিনিধি ছিলেন। — [illegible] প্রেস

—

বাংলা

শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি—

কলিকাতা কর্পোরেশন স্থির করিয়াছেন যে, কর্পোরেশনের অধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের বেতন ৫ টাকা করিয়া বৃদ্ধি করা হইবে। ১৯৩২ সনের ১লা এপ্রিল তারিখের পূর্ব্বে যে সকল শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই বর্দ্ধিত হারে বেতন পাইবেন। ইহা ছাড়া, শিক্ষকদের বেতনের একটা গ্রেড স্থির করা হইয়াছে। মডেল স্কুলসমূহের প্রধান শিক্ষকদের বেতন ৮০ টাকা হইতে ১৩০ টাকা এবং সহকারী শিক্ষকদের বেতন ৪৫ টাকা হইতে ৯০ টাকা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইবে। কলিকাতা শহরের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের বর্ত্তমান ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৮০ হাজার।

সৎকার্য্যে দান—

বাঙালী প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান ছাত্রদিগকে ব্যবহারিক বিদ্যাশিক্ষার্থ বিদেশে প্রেরণ করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজসমূহের ইন্সপেক্টর ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জ্জি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের হস্তে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন। ইহার সুদ দ্বারা ছাত্রদিগকে মাসিক ২৫০ টাকা বৃত্তি দেওয়া চলিবে।

ফরিদপুরের বঙ্গেশ্বরদী শশীমুখী দাতব্য চিকিৎসালয়ের উন্নতিকল্পে কলিকাতা হেয়ার স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ জেলা বোর্ডের হস্তে দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

—এডুকেশন গেজেট

জনহিতে দান—

ঢাকা গেণ্ডারিয়া আনন্দ আশ্রমের সাহায্যকল্পে শ্রীযুক্ত আনন্দ-মোহন পোদ্দার এম, এল, সি মহোদয় এককালীন আড়াই শত টাকা দান করিয়াছেন। ঢাকার আনন্দ পরিষৎ নাট্যসমাজ কর্ত্তৃক আনন্দ আশ্রমের সাহায্যার্থে 'নিবেদিতা' অভিনীত হইয়াছিল। অভিনয়লব্ধ অর্থ (ব্যয় বাদে) পঞ্চাশ টাকা আনন্দ পরিষদ আশ্রমকে দান করিয়াছেন। —বাংলার বাণী

মফঃস্বলে বালিকাগণের শিক্ষা ব্যবস্থা—

কুষ্টিয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির এক সভায় সম্প্রতি স্থির হইয়াছে যে, উক্ত বিদ্যালয়ে বালিকাদের জন্য ৪র্থ শ্রেণী হইতে ১ম শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইবে এবং উহাদের শ্রেণীতে সকালে পড়াইবার বন্দোবস্ত হইবে। কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে আবশ্যক অনুমতি পাওয়া মাত্র বালিকাদের ভর্ত্তি কার্য্য আরম্ভ হইবে। —ফ্রী প্রেস

কৃতী কর্ম্মী—

বেহালার শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ রায় তেইশ বৎসর [illegible] সাউথ সুবার্বান মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি বেহালার একজন কৃতী কর্ম্মী এবং বেহালা ফ্লাইং ক্লাবের একজন সভ্য। তিনি লণ্ডনের টেলিভিশন সোসাইটি, বেহালা বালিকা বিদ্যালয়

বেহালা স্পোর্টিং ক্লাব, সাউথ সুবার্বান করদাতা সমিতি, বেহালা গ্রন্থাগার প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত আছেন।



শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায়

পাঁচদিনে ৪০০ মাইল—

গত ১৩ই পৌষ বুধবার, ভবানীপুর 'স্বাস্থ্য সমিতি' হইতে ১২ বৎসরের বালক শ্রীমান আলোকনাথ রায় চৌধুরী, ১৩ বৎসরের



শ্রীমান্ আলোকনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীমান্ নলিনীরঞ্জন বিশ্বাস ও শ্রীমান্ দিলীপকুমার রায় চৌধুরী

শ্রীমান দিলীপকুমার রায় চৌধুরী এবং ১৬ বৎসরের বালক শ্রীমা নলিনীরঞ্জন বিশ্বাস সাইকেলযোগে পরেশনাথ পাহাড় দেখিবার জ প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় যাত্রা করিয়া শুক্রবার দুপুর ১২টার স পরেশনাথ (২০০ মাইল) পৌঁছিয়াছিল। গত ১৭ পৌষ রবিব সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় তাহারা পুনঃ সাইকেলযোগে ফিরি আসিয়াছে। বালকগণের উদ্যম প্রশংসনীয়।

প্রবাসী বাঙালীর কৃতিত্ব—

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অসহযোগ আন্দোলনের স লেখাপড়া ছাড়িয়া নানা স্থানে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে ভ্র করেন। সেই সময়ে তিনি প্রবাসীতে গোয়ালিয়ার সম্বন্ধে অনেকগু



শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সচিত্র প্রবন্ধ লিখেন। তৎপরে ১৯২৩ সনে তিনি গোয়ালিয়ারের জিয়াজী রাও কটন মিলে অবৈতনিক শিক্ষানবিশ হইয়া ভর্ত্তি হন। ক্রমে সেখানে তাঁতির কাজে দক্ষতা লাভ করিয়া তিনি টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের মারফতে লণ্ডন সিটি অ্যাণ্ড গিল্ড্‌স্-এর বয়নবিদ্যার শেষ পরীক্ষা দেন এবং তাহাতে প্রথম বিভাগে পাস করিয়া উক্ত ইন্‌ষ্টিটিউটের পরীক্ষক নিযুক্ত হন।

১৯৩০ সনে তিনি বিশেষ দক্ষতা লাভের জন্য জার্ম্মানীতে যাত্রা করেন। জিয়াজী মিলের ম্যানেজার তাঁহাকে এক বৎসরের বেতন সহিত বিদায় ও এক বৎসরের বিনা বেতনে বিদায় মঞ্জুর করেন। জার্ম্মানীতে গিয়া বার্লিন টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটে ভর্ত্তি হইয়া হাতে-কলমে কাজ শিখিতে লাগিলেন। বোম্বাই হইতে কোল্‌কার্ট ব্রাদার্স নামক জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে সুপারিস ও পরিচয়-পত্র পাইয়া তিনি বার্লিনের কাছাকাছি অনেক

বৃহৎ বয়নের কারখানা পরিদর্শন করেন। তৎপরে তিনি শেমনিট্‌জ্‌ নগরে গিয়া সেখানকার সব রকমের তাঁতে সামান্য মজুরের ও তাঁতির ন্যায় কাজ করিয়া কাজ শিক্ষা করেন ও দক্ষতা লাভ করেন। তিনি হানুবোলড কোম্পানীর ডিরেক্টরের সাহায্যে ভাইজ্‌বাকের কারখানায় সূতা রং করা ও কাপড় সূতা সাদা করার নানাপ্রকারের কল পরিচালনার প্রণালী শিক্ষা করেন। ভাইজ্‌বাকের ম্যানেজারের সাহায্যে হার্টমানের কারখানায় সূতা কাটার কল চালনা শিক্ষা করেন। পরে নানা কারখানায় নূতন নূতন ধরণের সূতা-গুটানো কল ইত্যাদির কাজও শিক্ষা করেন। জার্ম্মানীর বিখ্যাত কার্পেট তৈয়ারির কারখানা ও অন্যান্য বয়ন কল পরিদর্শন করিয়া নানাবিধ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। তৎপরে ভিয়েনায় ও চেকোশ্লো ফাকিয়াতে গিয়া কাপড় সূতার রং করিবার কারখানা পরিদর্শন করেন।

শেমনিট্‌জ্‌ হইতে উইভিং ইঞ্জিনিয়ারের ডিগ্রি লইয়া তিনি ইউরোপের নানা দেশের নানা মিল পরিদর্শন করিয়া পরিশেষে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের কল পরিদর্শন করেন।

দেশে ফিরিয়া তিনি গোয়ালিয়ার মিলে ও হুকুমচাঁদের কলে কাজ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি ইন্দোর রাজ্যের রাজকুমার মিলে রাত্রি-দলের উইভিং মাষ্টার হইয়া কাজ করিতেছেন।

মহিলা-সংবাদ

এবার লক্ষ্ণৌতে নিখিল-ভারত মহিলা-সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী জামির্ উন্নেসা বেগম।



শ্রীমতী জামির্ উন্নেসা বেগম

আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের মহিলা সম্মেলনের অধিবেশনও সম্প্রতি লক্ষ্ণৌতে হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনের মূল সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী নানাভাতী।



শ্রীমতী নানাভাতী

ইনি অযোধ্যা চীফ্‌ কোর্টের বিচারপতি নানাভাতীর সহধর্ম্মিণী।

পারস্য-ভ্রমণ

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

চাহিল সেতুন প্রাসাদে কবিকে নাগরিক সম্বর্দ্ধনার সময় শ্রীযুক্ত ফুরুঘি বলেন,—

"আজ আমার হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হইতেছে, আমার মনও বিচলিত। ইহাতে আমি আশ্চর্য্যান্বিত নি কেন-না আজকার দিন বহুপূর্ব্বের এক সময়ের কথা আমাে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। তখন এই অপূর্ব্ব প্রাসাদে



চাহিল সেতুন চিত্রাবলী। নাদির শাহের ভারত-অভিযান



চাহিল সেতুন চিত্রাবলী। শাহ আব্বাসের দরবার



চাহিল সেতুন চিত্রাবলী। ইস্পাহান দরবারে মুঘল রাজদূত

এই বিরাট আয়াতনে বহু শিল্পী বহু সভাসদে শোভিত সভামধ্যে বসিয়া এক মহান রাজরাজেশ্বর (প্রথম শাহ আব্বাস) জগতের শ্রেষ্ঠ কবি, দার্শনিক এবং মনীষীদিগকে নিজ সভায় সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে স্বর্ণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

"তাঁহার যে-কামনা বিফল হইয়াছিল, খ্যাতি



চাহিল সেতুন চিত্রাবলী। বিরহিণী রাজকন্যা ও সখী

প্রতিপত্তি ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও তাঁহার যে-চেষ্টা ব্যর্থ হয়, আজ তাঁহার এবং অক্ষমনিয় নৃপতিদিগের উপযুক্ত বংশধর তাহাতে সফলকাম হইয়াছেন, কেন-না, পূর্ব্বভূমিখণ্ডের শ্রেষ্ঠতম কবি এবং জগদ্বিখ্যাত আর্য্যকুল-গৌরব দার্শনিক আজ আমাদের মধ্যে আসিয়াছেন…"



আলি কাপু প্রাসাদ। চীনামাটির বহুমূল্য পাত্র রাখিবার কুকর

ইহা সত্য যে শাহ্ আব্বাস একদিকে যেমন ইস্ফাহানকে প্রাসাদ, মস্‌জিদ, বাজার, উদ্যান, সুন্দর রাজপথ ইত্যাদিতে ভূষিত করেন অন্যদিকে তেমনই চেষ্টা করেছিলেন যাতে তাঁর প্রিয় নগরী চিত্রকর, কারুশিল্পী, কবি, দার্শনিক এবং সকল প্রকার গুণীর আগমনে কৃষ্টির বিষয়ে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে; ওলন্দাজ ও ইটালীয় চিত্রকর, চৈনিক ও আর্মানি কারুশিল্পী, দেশ-দেশান্তরের গায়ক ও বাদ্যকর তাঁর সভা আলোকিত করে, কিন্তু সাহিত্য দর্শন ইত্যাদির ক্ষেত্রে শাহ্ আব্বাসের রাজসভার দারিদ্র্য দূর হয় নি।

* * * *

সে যাই হোক, শিল্পের ক্ষেত্রে, স্থাপত্যের ক্ষেত্রে ও ললিতকলার ক্ষেত্রে এই মহান নৃপতির রাজোচিত উদ্যম

যে কতদূর সফল হয়েছিল তাহা ইস্ফাহানের মস্‌জিদ্‌ প্রাসাদ, আয়তনগুলির জীর্ণ অবশিষ্ট থেকে যথেষ্ট বুঝা যায়।

মস্‌জিদ-ই-শাহ্‌, মস্‌জিদ শেখ লুৎফুল্লাহ্‌ ও মাদ্রাসা মসজিদ মাদের-ই-শাহের মিনাকারি, হফৎরেঙ্গি (সপ্তবর্ণ) ও কর্ত্তিত রঙীন টালির মোজাইক (সংযোগ চিত্র) নক্সা ও চিত্রাবলী, মসজিদ শেখ লুৎফুল্লাহের আরবি ও ও পারসীক অক্ষর আলেখ্যের শোভা, আলী কাপু প্রাসাদের দেয়ালে নানা প্রকার নক্সা ও চিত্র এবং একটি কক্ষের বহুমূল্য চীনামাটির তৈজসপত্র রাখবার ফুকর-কাটার দৃশ্য, আলী কাপু, মসজিদ-ই-জামী এবং চাহিল সেতুনের দ্বার, স্তম্ভ ও খিলানের শোভা এবং সর্ব্বোপরি চাহিল সেতুনের চিত্রাবলী, এ সকলই শাহ্‌ আব্বাসের মহিমা কীর্ত্তন করচে।



চাহিল সেতুন চিত্রাবলী। রাজপুত্র

চাহিল সেতুন প্রাসাদের সমস্ত পরিকল্পনাই সে সময়ের পারস্যের কৃষ্টির উৎকর্ষের এবং ইরাণী-কলাশিল্পী ও স্থপতির দিব্যদৃষ্টির পরিচয় দেয়। বাগান, পাথর-বাঁধান সুগঠন জলাশয়, সুদীর্ঘ দারুস্তম্ভশোভিত সভাগৃহ, নানাবর্ণে চিত্রিত স্বর্ণখচিত ছাদ, দ্বার, অলিন্দ সবই যেন অপূর্ব্ব সমতা ও সুরুচির সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েচে। চিত্রাবলীর বিষয়েও তাহাই বলা চলে। ছোট-বড় নানা বিষয়ের নানাভাবের পরিকল্পনার চিত্রাবলী প্রাসাদের ভিতরটি আলোকিত ক'রে রেখেচে।



চাহিল সেতুন চিত্রাবলী। রাজকন্যা ও সখী

বড় ছয়টি চিত্রের বিষয় দরবার ও যুদ্ধ-বিগ্রহ। এগুলির মধ্যে আমাদের বিশেষ আগ্রহ হবার কথা তিনটিতে। দুটিতে মুঘল দরবার থেকে আগত রাজদূতের ছবি এবং অন্যটিতে নাদির শাহের ভারতে যুদ্ধের ছবি আঁকা আছে। বড় ছবিগুলির মধ্যে তিনটি দরবারের ছবির বিরাট কলেবরে একটা স্থানাভাবজনিত আড়ষ্টভাবের লক্ষণ দেখা যায়, নাদির শাহের এবং শাহ্‌ তাহ্‌মস্পের যুদ্ধের ছবিতে ঐ ভাব আরও স্পষ্ট। কিন্তু ছোট ছবিগুলি যেন এক-একটি উজ্জ্বল রত্নের মত ঘর আলো ক'রে বিরাজ করচে। পারসীক চিত্রের বর্ণের বিশুদ্ধতা, দৃঢ় রেখাপাতের নৈপুণ্য ও রচনার পারিপাট্য এখন ভুবনবিদিত। সাধারণত সেগুলি ছোট আকারের এবং অতিসূক্ষ্ম তুলি-চালনার এবং সুচারু আলেখ্যের কারণে পশ্চিম দেশে মিনিয়েচার (ক্ষুদ্র চিত্র) ব'লে পরিচিত। চাহিল সেতুনের দেয়ালে অঙ্কিত ছোট ছবিগুলিও দু-তিন হাত লম্বা এবং এক-দেড় হাত চওড়া, কিন্তু সেগুলিতে ঐ প্রসিদ্ধ পারসীক মিনিয়েচারের সকল গুণই রয়েচে, বরঞ্চ আকারে

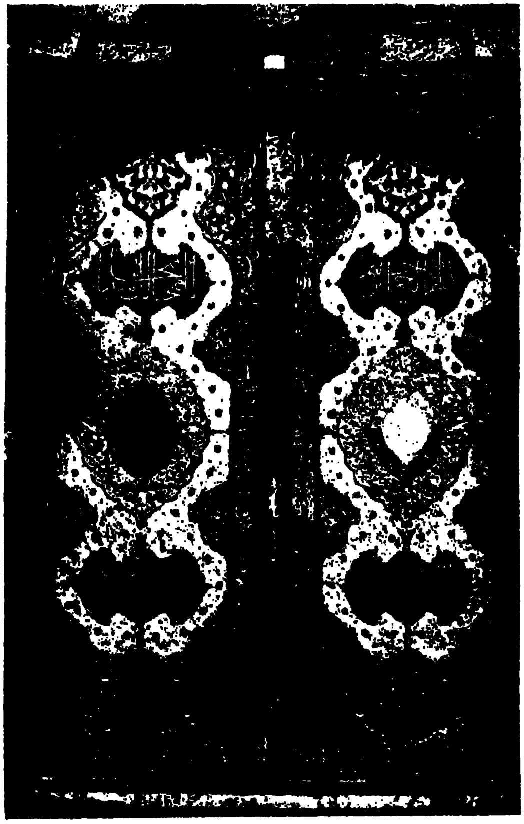
বড় ব'লে তাদের সৌন্দর্য্য যেন আরও প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেচে।

এ ছবিগুলির বিষয় প্রায় সবই কবিকল্পনার রাজ্য থেকে নেওয়া। কোথাও রাজকন্যা উদ্যানে তরুতলে ব'সে প্রণয়ীর কথা ভাবছেন, কোথাও বা প্রেমিকযুগল আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে রয়েচে। সুন্দর রাজপুত্র, মদবিহ্বল প্রেমিক, প্রসাধনরতা সুন্দরী, উদ্যানবিহার, কাননবিহার সবই যেন কবি-কল্পনার রাজ্য থেকে চিত্রের রূপে দৃষ্টিজগতের মধ্যে এসে পড়েচে। ছবির নায়ক-নায়িকাদের সুঠাম দেহ ও মুখের সুললিত ভাবভঙ্গী,

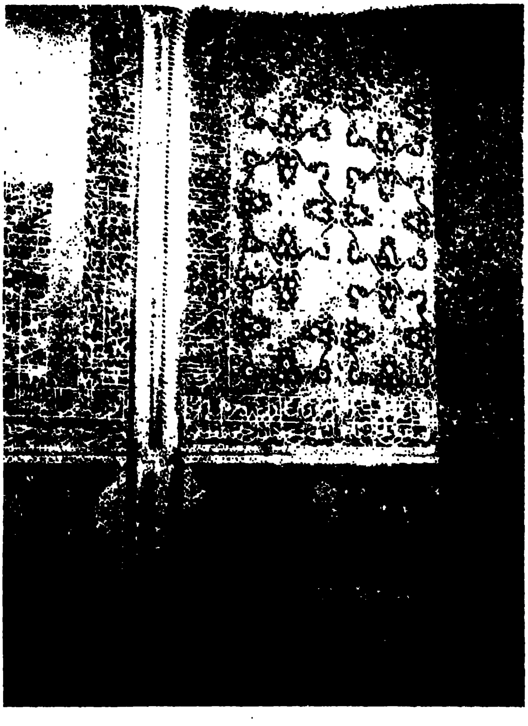




চাহিল সেতুন চিত্রাবলী।
রাজপুত্র এবং প্রসাধনরতা সুন্দরী



মাদ্রাসার দ্বার



মসজিদ শেখ লুৎফুল্লাহ্। ভিতরে টালির নক্সা

প্রাকৃতিক দৃশ্যের অপরূপ চিত্রণ, নিপুণ বর্ণসংযোগ (স্বর্ণপ্রয়োগ যথেষ্ট আছে) ইত্যাদিতে এগুলির সৌন্দর্য্য অনুপম ক'রে তুলেচে।

চাহিল সেতুনের ছবিগুলি বিশেষজ্ঞদের মতে চিত্রজগতের শ্রেষ্ঠ রত্নাবলীর মধ্যে গণিত হয়। এগুলির প্রতিরূপ অধিকাংশই অপ্রকাশিত, কতকগুলির ফোটো

অতি কষ্টে সংগ্রহ করেছিলাম, তারও সবগুলি ভাল হয় নি। যে-কয়টি এই সংখ্যায় দেওয়া গেল, রসজ্ঞ পাঠক তা থেকে কিছু পরিচয় পাবেন।

* * *

ইস্ফাহানের গালিচা, জরী, কিংখাব, সোনা-রূপার কাজ, মিনাকারি, রেশম, মখমল, ইস্পাতের কাজ ইত্যাদি এক সময় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পের মধ্যে স্থান পেয়েছিল। গালিচার স্থান এখনও যায়নি, অন্য শিল্পগুলির দশা আমাদের দেশীয় শিল্পেরই মত। সম্প্রতি ইস্ফাহানে ব্রাসিয়ে নামে এক ফরাসী এক বিরাট কারখানায় ঐ সকল প্রাচীন জিনিষের নকল করাচ্ছেন, তার মধ্যে কতক উৎকৃষ্ট, কতক মামুলী এবং বাকী জঘন্য। যাই হোক, তবুও এঁর চেষ্টায় প্রায় দু-শ কারিগরের অন্নসংস্থান হচ্ছে।

এজ্জাতোল্লা খাঁ জাবী নামে এক ভদ্রলোক সম্প্রতি প্রাচীন রঞ্জন ও বয়নপ্রথায় প্রাচীন নক্সার অনুকরণে গালিচা তৈরির এক কারখানা খুলেছেন। এঁর মধ্যে ইরাণের পূর্ব্বেকার শিল্পের প্রেরণা যথেষ্টই আছে এবং ইনি সুশিক্ষিত যুবক। এঁর কারখানা দেখে মনে হয় যে, যদি আমাদের দেশে ঐ রকম চেষ্টা হয় তবে এদেশের শিল্পেরও জাগরণ হ'তে পারে।

মিরজা আকা ইমামী নামে এক প্রসিদ্ধ চিত্রকর আবার প্রাচীন পন্থায় চিত্রশিল্পের পুনর্গঠন আরম্ভ করেছেন। এঁর ছবি এখন খুব প্রতিষ্ঠা ও সমাদর পেয়েছে। দুটি-একটি ক'রে অন্য শিল্পেরও পুনঃপ্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়েচে।

ইস্ফাহানে যে-কয়দিন ছিলাম প্রায় প্রতিদিনই গানবাজনা শোনা যেত। আকবর খাঁ নামে প্রসিদ্ধ "তার"-বাদক কয়দিন কবির সামনে বাজাতে আসেন। সঙ্গে রহিম খাঁ নামে "ডুম্বক" (খুব বড় ডমরুর অর্দ্ধেকের মত দেখতে)-বাদক সঙ্গত দিত। তারযন্ত্রে বোধ হয় পারসীক সঙ্গীতের ও সুরের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হয়। লোকটি তন্ময় হয়ে বাজাতেন এবং আমরাও মুগ্ধ হয়ে শুনতাম।

* * *

একদিন ইস্ফাহানের উপকণ্ঠে আর্ম্মানীদের জুলফা গ্রামে যাওয়া হ'ল। আর্ম্মানীরা কবিকে বিরাট সম্বর্দ্ধনা দেয়। প্রায় এক হাজার গায়কের ঐকতান গান, বিলাতি ব্যাণ্ড, আবৃত্তি, ইংরেজীতে অভিনন্দন-পাঠ ইত্যাদি হ'ল, কবির কবিতা আর্ম্মানী ভাষায় অনুবাদ ক'রে তার আবৃত্তি হ'ল। আর্ম্মানীদের গীর্জ্জাটি সপ্তদশ শতাব্দীর, তার ভিতরের সমস্তটা ইটালীয় পন্থায় চিত্রিত। গীর্জ্জার পাশে একটি ছোটখাট যাদুঘর রয়েচে, তাতে আমাদের দেশের কিছু জিনিষও আছে যা জুলফার আর্ম্মানীরা এদেশে এসে অর্থোপার্জ্জন ক'রে তাদের দেশে নিজেদের স্মৃতিরক্ষার জন্য পাঠিয়েছিল।



ভবানন্দের "হরিবংশ" *

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

১৩৩২ সালের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুত সতীশচন্দ্র রায় ভবানন্দের 'হরিবংশ" শোনাইয়াছিলেন। সম্প্রতি ঢাকা-বিশ্ব-বিদ্যালয় সে হরিবংশ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাচ্য-পুস্তক-প্রকাশ-পঞ্চক ইহার অধ্যক্ষ, এবং সতীশচন্দ্র রায় সংস্কর্তা।

তাঁহার নাম পড়িয়া হরিষে বিষাদ হইতেছে। বৈষ্ণবপদ-মগ্নচিত্ত রসগ্রাহী বিদগ্ধবরের নাম শ্রীযুক্ত করিতে পারিতেছি না। তাঁহার গাঢ় জ্ঞানগরিমা গ্রন্থের বিস্তৃত ভূমিকা গৌরবিত করিয়াছে। তাঁহার ধীরতা, অক্লান্ত অধ্যবসায়, সবিবেক প্রযত্ন গ্রন্থের পাতায় পাতায় প্রকট হইয়াছে। বৃহৎ গ্রন্থ, ৮×৬ ইঞ্চি মুদ্রণের চারিশত পৃষ্ঠা। বয়সে ও বিষয়েও গুরু। বয়সে তিনশত বৎসর, বিষয়ে নূতন। আমরা কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার এমন পরিণাম শুনি নাই। ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তক-প্রকাশ-পঞ্চক এই অজ্ঞাত-পূর্ব গ্রন্থের প্রকাশ, এবং সতীশ বাবুকে সংস্কর্তৃ-বরণ করিয়া বঙ্গীয় পাঠকের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন।

এই সমালোচনা লিখিতে বসিয়া প্রতিপদে শ্রান্তি আসিতেছে। যিনি পড়িয়া আনন্দিত হইতেন, মতান্তরের জন্য যাঁহার সহিত কলহ করিয়া আনন্দিত হইতাম, তিনিই নাই। তথাপি তাঁহার স্মৃতির সম্মানার্থে অল্পস্বল্প লিখিতেছি।

সংস্করণ।

গ্রন্থসংস্করণে বৈলক্ষণ্য আছে। একটু নিরীক্ষণ করি।

১। বইখানি মোটা এক ইঞ্চি, দীর্ঘে প্রস্থে ৯×৭ ইঞ্চি। পাতার ধার কাটা, পৃষ্ঠ-পার্শ্ব আধ ইঞ্চিরও কম। এমন বইর দুই ফর্দ কাগজের আবরণ উপযুক্ত হয় নাই। একবার পড়িতে না পড়িতে পাতা সরিয়া আসিতেছে, পাতার কোণ মুড়িয়া যাইতেছে। বাঁধাইতে গেলে বহিঃপার্শ্ব সিকি ইঞ্চি হইবে, মুদ্রণ বিশ্রী দেখাইবে।

২। কাগজ অপচয় করা হয় নাই। ফলে গ্রন্থ সুলভ হইয়াছে। মূল্য তিন টাকা মাত্র। গ্রাহক ও পাঠক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট কৃতজ্ঞ হইবেন। আমি আনন্দিত, বিদ্যালয় পণ্যালয় হয় নাই।

৩। নাম-পত্রের পর ঢাকা-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শ্রীযুত সুশীল-কুমার দে, বোধ হয় প্রকাশ-পঞ্চক-পতি, জানাইয়াছেন, সংস্কর্তা মুদ্রণ-কার্য্য সম্পূর্ণ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই, তাঁহার অ-দৃষ্ট অংশে ভুল থাকিতে পারে। দেখিতেছি, তাঁহার দৃষ্ট অংশেও দুই চারিটা ভুল আছে। কিন্তু ভুল কিনা, বলিবার জো নাই। কারণ ভাষা পুরাতন, ভাষা অনেক।

৪। দ্বিতীয় পত্র উলটাইলে বামপৃষ্ঠে "সূচীপত্র"। কিসের সূচীপত্র? পৃষ্ঠাঙ্কে ভুল দেখিতেছি। ভূমিকা একপণ পৃষ্ঠে আরম্ভ, সূচীতে পাঁচ পণ। তৃতীয় পত্রে "বিষয়সূচী", কিসের তাহা ব্যক্ত নাই। বোধ হয় হরিবংশের। সংস্কর্তা ৬১+২ 'বিষয়ে' হরিবংশ বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু ভবানন্দের রচিত দুইটি বিষয় প্রক্ষিপ্ত বিবেচিত হইয়াছে। ইহাতে বিস্ময় জন্মে। বিষয়সূচী পংক্তিতে দেওয়া হইয়াছে। উত্তম। কিন্তু ৮৬৪৬ পংক্তির পর প্রক্ষিপ্তের পংক্তি হঠাৎ ৬৪২ অঙ্কে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার মর্ম বুঝিতে আমায় কষ্ট করিতে হইয়াছে। সূচীপত্রে একটা পরিশিষ্ট আছে। বাস্তবিক দুইটি। প্রথমটি মূলের, দ্বিতীয়টি সংস্কর্তার টীকার। টীকার নয়, টীকা। টীকাকে পরিশিষ্ট বলা চলে কি? মূলের পরিশিষ্ট-পত্রের মাথায় "পরিশিষ্ট" লেখা নাই, হাতড়াইতে হইতেছে। গীতগুলি সংখ্যাত করিলে পাঠকের সুবিধা হইত।

বিষয়সূচীর পর গীতসূচী। এখানেও ভবানন্দ-রচিত প্রক্ষিপ্ত গীত আছে। তদনন্তর ভূমিকা ৫।৶৹ অর্থাৎ ৯১ পৃষ্ঠা। ইহার পর "সাঙ্কেতিক অক্ষর।" তদনন্তর হরিবংশ, মূলের নীচে পাঠান্তর। তদনন্তর পরিশিষ্ট, পদ ও গীত। আবার পরিশিষ্ট, এবার টীকা। লিখিত আছে, "মূলের দুরূহ পংক্তিগুলি তারকা চিহ্নিত করা হইয়াছে।" বাস্তবিক সব হয় নাই। শেষে অর্থসহ "শব্দসূচী", অবশ্য পংক্তিতে।

প্রথম দ্রষ্টব্য, "সাঙ্কেতিক অক্ষর" ও "বিষয়সূচী" প্রচলিত রীতির স্থানভ্রষ্ট করা হইয়াছে। ভূমিকায় সাঙ্কেতিক-অক্ষর প্রচুর আছে। সঙ্কেত নির্মাণেও দোষ হইয়াছে। পং 'ভূমিকায় পঙ্ক্তি, পঃ 'শব্দসূচীতে পরিশিষ্ট।' যে নাম পুনঃ পুনঃ লিখিতে হয় সে নাম সংক্ষেপ করিলে পাঠকের বুঝিবার বিঘ্ন হয় না। 'ভূমি-প°' এবং 'পরি-প°' সঙ্কেত করিলে পাঠকের স্মৃতি পীড়িত হইত না। পরিশিষ্টও ত একটি নয়। শব্দসূচী-নির্মাণ আয়াস-সাধ্য। দুই জন ছাত্রকে এই কর্ম করিতে দিলে তাহারা শব্দ খুঁটিয়া বাহির করিতে পারিত, পরে মিলাইয়া দেখা চলিত, শব্দসূচীর উপযোগ বাড়িত। আমি শব্দসূচী দেখিয়া 'হরিবংশ' শব্দ বাহির করিতে পারি নাই। শব্দসূচীতে 'ওলে' শব্দের দুইটি প্রয়োগ-স্থল লেখা হইয়াছে কিন্তু আর সাত আটটা আছে। কতক শব্দ ছাড়ও পড়িয়াছে।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য, ভূমিকার পর বিষয়সূচী দেওয়া হয় নাই, পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থের পরিচ্ছিন্ন প্রসঙ্গ, এই অর্থে 'বিষয়' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই সংস্করণে বিষয়সূচী ও গ্রন্থ, এই দুয়ের মধ্যে দীর্ঘ ভূমিকার ব্যবধান আছে। বোধ হয় অভিপ্রায় এই, বই খুলিয়াই পাঠক হরিবংশের বস্তু অনুমান করিতে পারিবেন। কিন্তু গ্রন্থনাম সে কল্পনার অন্তরায় হইয়াছে। হরিবংশ নাম শুনিলেই ব্যাসোক্ত হরিবংশ মনে হয়। কিন্তু ভবানন্দের হরিবংশ কৃষ্ণের ব্রজলীলা। ইহাতে কোন পাঠক বিস্মিত হইবেন, কেহবা বিরক্ত হইবেন। বিষয়-সূচীর অগ্রস্থান বিফল হইয়াছে। কাব্যগ্রন্থে সঙ্কেত-বাহুল্যই বা কেন? অ-ব্যাখ্যাত সঙ্কেত দ্বারা পাঠককে কবির প্রতিকূল করা সুবিবেচনার কাজ হয় নাই।

৫। ভূমিকা সংস্কর্তার লিখিত, ৯১ পৃষ্ঠা। সংস্কর্তা এত কি লিখিয়াছেন, জানিতে ইচ্ছা হয়। ইহার বিষয় নির্দেশ নাই, সূচীও

* শ্রীসতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত। ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। সন ১৩৩৯।

নাই। পাতা উল্‌টাইয়া উল্‌টাইয়া দেখিতেছি, (১) পুথির বিবরণ (/০—২।৶ পৃষ্ঠা), (২) ছন্দ ও অলঙ্কার (২।৶—৩।৶ পৃঃ). (৩) হরিবংশের কথাবস্তু (৩।৶—৪৸০ পৃঃ). (৪) ভবানন্দের ব্যক্তিত্ব ও কবিত্ব (৪৸৶—৫।৶ পৃঃ)। ভূমিকার এই চারিভাগের মধ্যে মধ্যে কোথাও কোথাও পার্শ্বনাম আছে, কিন্তু তদ্দ্বারা চারি পাদই ভগ্ন হইয়া গিয়াছে।

দীর্ঘপথ পরিচ্ছিন্ন না দেখিলে পথিকের ক্লান্তি জন্মে। সতীশবাবু মুক্তা ছড়াইয়া গিয়াছেন, গাঁথিয়া দিলে সাত লহর হার হইত, যে পাঠকের যে লহরের প্রয়োজন তিনি তাহা অক্লেশে অবলোকিতে পারিতেন।

সংস্কর্তা ও কবি যিনিই হউন, উভয়ে স-হৃদয় সুহৃদ। কবি, সংস্কর্তার মান্য সুহৃদ। সংস্কর্তা পাঠকের পরিচিত, কবি অপরিচিত। সতীশবাবু কবিকে বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান রাখিয়া পুথী-নিরীক্ষণে মগ্ন হইলেন! এমন একাগ্রচিত্ততা পণ্ডিতেরই হয়।-বহু ক্ষণ পরে হঠাৎ মনে পড়িয়াছে, ৬২-এর পৃষ্ঠে পাঠককে বিষয়-সূচী দেখিতে বলিয়াছেন, ৪৯-এর পৃষ্ঠে হরিবংশ নামের হেতু ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ২৬-এর পৃষ্ঠে কবির কাল ও দেশ অন্বেষণ নিমিত্ত 'বরাত' দিয়াছেন। এখানেও সেই অন্যমনস্কতা, বরাতের অর্ধেকও সত্য নয়। তিনি মনে করিয়াছেন, তাঁহার কবি-সুহৃদকে সবাই চেনে, সুহৃদের কাব্য প্রকাশ দ্বারা পরিচয় হইয়া যাইবে। হইবে বটে; আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা কবি নই, স্বল্প কথায় কবির পরিচয় পাইলেই কৃতার্থ হইতাম। তিনি বাহুল্য ও পুনরুক্তি না করিলে ত্রিশ চল্লিশ পৃষ্ঠায় সব শোনাইতে পারিতেন।

৬। সংস্কর্তা হরিবংশের ছয়খানি পুথী পাইয়াছিলেন; যথা ক-চিহ্নিত পুথীর বয়স ১৯১ বৎসর,* পাবনা হইতে

খ	,,	,,	,,	১২১	ত্রিপুরা	,,
গ	,,	,,	,,	২৪৩	ময়মনসিংহ	,,
ঘ	,,	,,	,,	১৮৯	ঐ	,,
চ	,,	,,	,,	১১২	ঐ	,,
ছ	,,	,,	,,	১৩৮	শ্রীহট্ট	,,

পাঠান্তর বিচারকালে ছ-পুথী পাওয়া যায় নাই।

সংস্কর্তা লিখিয়াছেন (।৶ পৃঃ) "বস্তুতঃ হরিবংশ পুথিখানির [?] মত এত বৈষম্য-পূর্ণ প্রাচীন পুথি আমরা কমই দেখিয়াছি। ...আমরা একখানা পুথিও সম্পূর্ণ নির্ভর-যোগ্য মনে করিতে পারি নাই। প্রত্যেকটী শ্লোক ও প্রত্যেকটী গীত বা উহার অংশ আমাদিগকে তুলনা ও যাচাই করিয়া লইতে হইয়াছে।" কথাটি ছোট কিন্তু ভাবিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। হরিবংশে প্রায় এগার হাজার পংক্তি আছে. প্রতি পংক্তিতে পাঁচটি শব্দ ধরিলে পঞ্চান্ন হাজার শব্দ, পাঁচখানা পুথীতে দুইলক্ষ পঁচাত্তর হাজার! যিনি এত পারেন, তিনি আর পাঁচখানা পুথী পাইলেও তাঁহার ধৈর্যের লাঘব হইত না। ছাপা নয়, হাতে লেখা পুথী; সকল লিপিকরের অক্ষরও ভাল নয়, অক্ষরও পুরাতন। বানানের বিভীষিকা আছে। ধন্য সতীশবাবুর কবিপ্রেম! কিন্তু কোন্ দোকানে তিনি মণি যাচাই করিয়াছেন, যাচাইর পর কি করিলেন, কোন্‌টাকে লইলেন, সে বিষয়ে একটা কথাও বলেন নাই। মূলের নীচে পাঠান্তর দিয়াছেন, কোন্ বা কোন্ কোন্ পুথীর, তাহা জানাইয়াছেন, কিন্তু কোন্ পুথীর পাঠ গ্রহণ করিলেন তাহাও বলেন নাই। হয়ত এখানে বুঝিতে হইবে, যে বা যে যে পুথীর পাঠান্তর দেওয়া হয় নাই, গৃহীত পাঠ সে বা সে সে পুথীর। এই সঙ্কেত ঠিক কিনা কে জানে।

৭। কবি পণ্ডিত হইলে এবং তাঁহার স্বকীয় পুস্তক পাইলে, যদ্দৃষ্টং তন্মুদ্রিতং অবশ্য করিতে হইবে। বাংলা ভাষায় "সম্পাদক" নামের উৎপত্তি এই। তখন মুদ্রাকরও সম্পাদক। কিন্তু আমাদের সে সৌভাগ্য হয় না, কবির পুথী পাই না। লিপিকর পুণ্যার্থে ও বেতনার্থে, কদাচিৎ অনুরোধার্থে, পুথী লিখিত, যথাসাধ্য যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং করিত। তথাপি ভুল করিত। সে ভুল শব্দের বানানে। মাতৃকা পড়িয়া প্রায়ই নিজের ইচ্ছামতন বানান লিখিত। লিপিকর শব্দান্তর, শ্লোকান্তর, পদান্তর, গীতান্তর করিত না। তাহার সে বিদ্যাও থাকিত না। পাঠান্তর মাতৃকার। অতএব তাহার বানান ছাপিয়া তাহাকে অমর করিয়া কোন লাভ হয় না। সতীশবাবু তাহা করেন নাই। তিনি পুথীর বানান সংশোধন করিয়াছেন। কিন্তু সংশোধনের সীমা নির্দেশ করেন নাই। এই ত্রুটি না হইলে আমরা বর্ণান্তরের হেতু বুঝিতে পারিতাম। দেখিতেছি ল-ব-না ও মু-র-রি আছে, ন-ব-নী ও মু-র-লী বানানও আছে। আরও অসংখ্য শব্দের নানা পরিবর্তিত রূপ আছে। সংস্কর্তার বিবেচনায় ক-পুথী কবির আদর্শের অনুরূপ। কিন্তু উহা খণ্ডিত এবং অনেক স্থলে অপাঠ্য। অন্য কেহ সংস্কর্তা হইলে ক-পুথী মাতৃকা করিতেন, খণ্ডিতাংশ তৎসদৃশ অন্য পুথী হইতে লইতেন। যে উপাখ্যান ও গীত ভবানন্দের রচিত বলিয়া সংস্কর্তার বিশ্বাস হইয়াছিল তাহা "প্রক্ষিপ্ত" বিবেচিত হইতে পারে না। এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখিলে আমাদের বিস্ময়ভঞ্জন হইত। ফলে দাঁড়াইয়াছে, পাঁচ পুথীর মিশ্র, এক নূতন পুথী। সতীশবাবুর বাছনি দ্বারা হরিবংশের উৎকর্ষ হইয়া থাকিবে। না হইলেও মিশ্র ভাষা দেখিয়া তাহার ব্যাকরণ আবিষ্কার দুরাশা।

হরিবংশ কাব্য

সতীশবাবু একস্থানে লিখিয়াছেন (৫/০ পৃঃ), "ভবানন্দের কাব্যখানার উপরে আমাদিগের একটা ভালবাসা জন্মিয়া গিয়াছে।" ইহাতে আশ্চর্য নাই। একত্রে যাহার সহিত সদ্ভাবে বহুকাল বাস করা যায়, তাহার প্রতি আসক্তি জন্মে। তদুপরি, ভবানন্দ তাঁহার আনন্দ বর্ধন করিয়াছিলেন। আর, কোন্ কাব্য কোন্ কবির প্রতি তাঁহার ভালবাসা জন্মে নাই? তাঁহার কবিস্তুতি স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা রবাহূত পথিক, কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া কিম্বা কলিকাতা বাগ্‌বাজারের রসগোল্লা চাই না, একটু কাঁচা গুড় পাইলেই তুষ্ট, নূতন এখো চোখা গুড় পাইলে ত কথাই নাই। হরিবংশে গুড় আছে, তাঁহার দর্শিত দানা দেখিতে পাইতেছি, কৈমিতিক বিশ্লেষণে শর্করাও বটে। কিন্তু গুড়ের মাৎ মাপেন নাই, বিশ্লেষণও করেন নাই। মাৎ ঝরাইতে পারিলে সত্য সত্য চোখা গুড় পাওয়া যাইবে।

বাঁশের বাঁশীতে রাধানাম বলিতে শুনিয়াছি। কোকিলের কুহুর মতন ঘাটে ঘাটে পঞ্চমে, সপ্তমে উঠিয়া শ্রোতাকে অধীর করে। শুনিয়াছি, শ্যামের বাঁশী রাধা নামে সাধা ছিল। রাধা সে বাঁশীর নিসানে যমুনা-পুলিনে পাগলিনী-প্রায় ছুটিয়া যাইতেন, চণ্ডীদাসাদি কবিকুলের প্রসাদে আমরা রাধার আর্তি মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছি। হয়ত সে কারণে মনে হইতেছে, ভবানন্দের বাঁশী গ-সুরে বাঁধা, কদাচিৎ ম-সুরেও শুনিতেছি। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য, আমরা হরিবংশের অক্ষর দেখিতেছি, বাঁশর শুনিতে পাইতেছি না। বৈষ্ণব-কবি-

* সতীশবাবু ক-পুথীর সন ১১৭৮ লিখিয়াছেন। কিন্তু এই সনের সহিত বার তারিখ তিথির মিল নাই। সন ১১৪৮ হইবে। গ-পুথীর সন ঠিক আছে।

কুলের গানের এক আঁধরে পাষাণ দ্রব করিতে পারে। হরিবংশ কেবল গীত নয়, পদবন্ধ (পয়ারাদি ছন্দোবদ্ধ কথা) আছে। সুস্বরে পদবন্ধ আবৃত্তি, ও নানা রাগরাগিণীতে গীত শুনিলে নানা রসের সঞ্চার হইতে পারে। স্থানে স্থানে পদলালিত্য ও রচনা-চাতুর্য চমৎকৃত করে। ভবানন্দকে কবিকঙ্কণ, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দ-দাসের পাশে বসাইতে পারি। সতীশবাবুর এই মত অত্যুক্তি নয়।

সতীশবাবু মনে করিয়াছেন, পাঠকে বা কথকে হরিবংশ পাঠ করিতেন। আমার মনে হয় গায়কে গান করিতেন। দোহার না থাকিলে ধুয়া থাকিত না। গান বলিয়াই হরিবংশ লোকপ্রিয় হইয়াছিল, একশত বৎসর পূর্বেও লিপিকর লিখিয়া লইয়াছিল। গায়কের যত সম্প্রদায়, তত পুথী। ইহা হরিবংশে নূতন নয়। অধিকারী প্রায়ই কবি হইতেন, পদবন্ধ রচনা করিতে পারিতেন। তিনি গায়কও হইতেন। অধিকারী গুরুর দাঁড়াটি (সরণি) লইতেন। শ্রোতার মনোরঞ্জন নিমিত্ত তাঁহাকে স্বাধীন হইতে হইত। কিন্তু তিনি কদাপি গুরুলঙ্ঘন করিতেন না। গুরুর নামে ভণিতা করিতেন, কিম্বা গুরুকে প্রণতিপূর্বক গান আরম্ভ করিতেন।

ভবানন্দের গুরু কে ছিলেন, হরিবংশ হইতে জানিতে পারা যায় না। বোধ হয়, গুরু অনেক ছিলেন, অর্থাৎ হরিবংশের দাঁড়া বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। ভবানন্দ পুরাণের আদিগুরু মহাকবি ব্যাস স্মরণ করিয়াছেন। ব্যাসই পুরাণের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, তিনিই বক্তা। ক্ষেত্র যাহাই হউক, তিনিই অষ্টাদশ পুরাণের, মহাভারতের ও তদন্তর্গত হরিবংশের জনক।—

জয়তি পরাশরসূনুঃ সত্যবতীহৃদয়নন্দনো ব্যাসঃ।
যস্যাস্যকমলগলিতং বাঙ্ময়মমৃতং জগৎ পীবতি॥

ব্যাসের জয় হউক। যাঁহার মুখ-কমলগলিত বাঙ্ময় অমৃত জগৎ পান করিতেছে। পুরাণ উপপুরাণ ও অসংখ্য কবি সে অমৃতের কণামাত্র পাইয়া ধন্য হইয়াছেন। মহাভারতে ও হরিবংশে জনমেজয় শ্রোতা, বৈশম্পায়ন বক্তা। ভবানন্দ স্বয়ং ব্যাসকেই বক্তা করিয়াছেন।

ই বড় বিস্ময় মুনি জিজ্ঞাসিয়ে তোমা।
কৃষ্ণ অঙ্গে লীন কেনে হৈলা তিলত্তমা॥ ২০
অপরে যতেক আর কৃষ্ণের রমণী।
সমাকে তেজিয়া কেনে লৈলা গোয়ালিনী॥২৪

(মুদ্রিত সংস্করণে মুনি স্থানে লাগি, তেজিয়া স্থানে এড়িয়া আছে। এড়িয়া ও তেজিয়া, অর্থে বহু ভেদ।) তখন বেদব্যাস জনমেজয়কে গুহ্যাতিগুহ্য হরিবংশ শোনাইলেন।

সত্যবতীসুত ব্যাস নারায়ণ অংশ।
সঙ্ক্ষেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ॥
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদবন্ধে।
লোকে বুঝিবারে বোলে দীন ভবানন্দে॥

অর্থাৎ ব্যাসদেব হরিবংশ বিস্তারিয়া রচেন নাই। তিনি বৃন্দাবন-লীলা লেখেন নাই। ভবানন্দ সেই লীলা ব্যাখ্যান করিতেছেন। মথুরা-লীলা ও দ্বারকা-লীলা দুই-এক কথায় সারিয়াছেন। তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রথম দর্শন হইতে লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। এই লীলায় কত মাস গিয়াছে, কে জানে, বোধ হয় বৎসরেক গিয়াছে। কংস যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণকে মথুরায় আনিতে অক্রূরকে পাঠাইলেন। রাধাকে কৃষ্ণ শোনাইলেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবেন রাধার বিশ্বাস হইল না। যখন বিশ্বাস হইল, তখন ভাবী বিরহের পালা আরম্ভ। কৃষ্ণ চলিয়া গেলেন, মথুরা হইতে দ্বারকায় গিয়া রহিলেন। বৃন্দাবনে ফিরিলেন না। রাধা সপ্তদশ মাস বিরহ ভোগ করিয়া উদ্ধবের সহিত দ্বারকায় গেলেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার স্থান নাই। তিনি কৃষ্ণ অঙ্গে লীন হইলেন, লক্ষ্মী-নারায়ণ একাঙ্গ হইলেন।

পুনশ্চ বলি, হরিবংশের স্থানে স্থানে চমৎকার কবিত্ব-মাধুর্য্য আছে, সুখ-দুঃখ-সমুদ্ভূত রস আছে। সেকালের অর্থাৎ ইংরেজী কালের পূর্বের কবিদিগের রচনার আর্জব ও প্রসাদগুণ সকলকেই মুগ্ধ করে। কিন্তু অ-ব্যাঙ্গ বৃত্ত-বর্ণনা কাব্য-কলা নয়। সেকালে কবি ও শ্রোতা স-হৃদয় ছিলেন। একালে পুরাতন কবি নবীন শ্রোতা অ-সহৃদয় হইয়া পড়িয়াছেন। ভবানন্দের কৃষ্ণ জানিতেন, তিনি নারায়ণ। রাধা প্রথমে জানিতেন না, তিনি লক্ষ্মী। কিন্তু কৃষ্ণ সে ভ্রম রাখিলেন না। ইহার পর রাধাকৃষ্ণের নর-লীলা ব্যর্থ। তথাপি রাধা মুগ্ধা। কবি একূল ওকূল দুই কূল রাখিতে গিয়া কাব্যখানি 'মাটি' করিয়াছেন। কবির রাধিকার প্রতি-নায়িকা নাই, তথাপি ক্ষণে মান ক্ষণে ভঙ্গ। ননদী কৃষ্ণের হস্তগত, শাশুড়ী ভয়ভীত, এমন কি স্বামী ভক্ত্যানুগত! চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনে দোষ আছে, নেপথ্য নাই। কিন্তু তাহাতে ভবানন্দ-কল্পিত অ-মানুষ চরিত্র একটিও নাই।

সকল পদবন্ধে ভবানন্দের ভণিতা নাই। তাঁহার ভণিতা থাকিলেই যে ভবানন্দের, তাহাও নিশ্চয় করিতে পারা যায় না। বোধ হয় এই কারণে সতীশবাবু ভবানন্দের ভণিতাযুক্ত কয়েকটি পদবন্ধ ও গীত মূল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া পরিশিষ্টে দিয়াছেন। এক গায়ন কৃষ্ণকে দিয়া রাধার শাশুড়ীর মুখ ও চুল পোড়াইয়া দিয়াছেন, এবং অনেকদিন পরে পোড়া মুখ সুরূপ ও লুপ্ত চুল জীবিত করিয়াছেন। যে যে পদবন্ধের ও গীতের ভাব এক, তুচ্ছ অবান্তরে কিম্বা ভাষায় ভিন্ন, তাহাদের একটি কবির, অন্যগুলি গায়নের। কবি পুনরুক্তি করেন না। ভবানন্দের রাধিকার অকারণ ঈর্ষা, অকারণ মান, তৎক্ষণাৎ ভঙ্গ, অমনই কৃষ্ণকে প্রণাম, কবি একথা একবার দুইবার লিখিয়া থাকিবেন, গায়নেরা চর্বণদ্বারা তিক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। গ্রাম্য শ্রোতা কিন্তু এই রকম গান শুনিতে ভালবাসে, বিরহের গান শুনিতে ব্যগ্র হয়। হরিবংশে বিরহের গীত অগণ্য। বহুকাল পূর্বে কলিকাতার এক ধনাঢ্যের বাড়ীতে সারা কার্তিকমাস চণ্ডীর গান হইত। বর্দ্ধমান জেলার এক বিখ্যাত গায়ন গান করিতেন। কিন্তু পালাটি শ্রীমন্তের মশান। আমি অল্প স্থানে তিন চারি দিন শুনিয়াছি। গায়ন প্রত্যহ তিন ঘণ্টা গাহিয়াও শ্রীমন্তের ডিঙ্গী মগরা পার করিতে পারেন নাই! তাঁহার স্বরচিত গীত, কিন্তু কোন-কোনটাতে মুকুন্দরামের ভণিতাও থাকিত। তাঁহার পালা কোথায় গেল, কে জানে।

সেকালের গায়ন ঠারে (সাঙ্কেতিক ভাষায়) পদবন্ধ ও গীত দ্বারা শ্রোতার কৌতুক উৎপাদন করিতেন। হরিবংশের দুইস্থানে ঠার আছে। একস্থানে (৯ পৃঃ পশ্চা) মদনভস্মের পর রতি বিলাপ করিতেছেন, ত্রিলোচন বলিলেন "তুমি আমার কনিষ্ঠা শ্যালী, আমাকেই বরণ কর না।" রতি কুপিত হইয়া শিবের নিন্দা করিতে লাগিলেন। "তুমি ভাঙ্গড়, তোমার কিবা জ্ঞান আছে। দেখ না, ললাটে চন্দ্র ধরিয়াছ, সে চন্দ্র-গলিত অমৃত তোমার বাঘছালে পড়িয়া বাঘকে জীবিত করিয়াছে। সে তোমার বাহন খাইতে চায়।" অর্থাৎ তোমার বুদ্ধির দোষে শিবানীর সহিত ঘর করিতে পার না, আবার আমাকে চাও? চন্দ্র অমৃতময়; অমৃত যে দ্রব্য স্পর্শ করে, সে-ই জীবিত হয়। শিবের বৃষ শিবানীর ব্যাঘ্র, খাদ্য-খাদক। এই পয়ারের ভণিতা নাই। লিপিকর ঠার বুঝিতে পারে না, শব্দও ঠিক লিখিতে পারে না।

ইহার উদাহরণ একস্থলে (২০ পৃষ্ঠা পদ্য) আছে। রাধার নর্মসখী কৃষ্ণকে ঠারে জানাইয়াছিল, "যে চন্দ্রমুখী যমুনার ঘাটে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে জলধর গ্রাস করিয়াছে।" ইত্যাদি। কিন্তু এই ঠার পর্যাপ্ত নয়, চন্দ্রমুখীর পরিচয় নাই। অন্য গায়ন বৃক-ভানু-সুতা নাম ঠারে জানাইয়াছেন। এখানে গায়ন উত্তম সুযোগ পাইয়াছিলেন, ঠার বাড়াইতে পারিয়াছিলেন। লিপিকর কি পড়িতে কি পড়িয়া ঠার অবোধ্য করিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয়, এই পয়ারেও ভণিতা নাই। ছোট ছোট আরও দুইটি হেঁয়ালী আছে। ১৮৮ পৃষ্ঠে "শোকে হইলুঁ অবল, না বহে আঁখির জল, মুখে নাইসে বিরাট সন্ততি।" (৮১৮৩ পং)। এত অ-বল যে আঁখিতে জল নাই, মুখেও রা নাই। *

ভবানন্দের রাধার দুঃখ অসহ্য হইলে রাধা যোগিনী হইয়া গৃহ ছাড়িয়া দেশান্তরী হইতে চাহিতেন, কিম্বা বিষ ভক্ষিয়া কৃষ্ণকে স্ত্রীবধের ভয় দেখাইতেন। একস্থানে (১৯৩ পৃঃ, ৮১৭৮ পং পদ্য) বিষ বলিতে পারিলেন না; বলিলেন "দিকবেদ দিয়া পূরি তার আধা করিনু ভক্ষণ।" দিকবেদ পূরণ করিলে চল্লিশ; তার আধা বিশ।

কবি গোপীগণের বস্ত্রহরণ ও রাস অ-কালে বর্ণন করিয়াছেন। গোপীরা শরতের শুক্লপক্ষে অষ্টমী পাইয়া যমুনাপুলিনে হেমন্ত-নন্দিনীর পূজা করিতে গেল। জলক্রীড়াকালে তাহাদের বস্ত্রহরণ হইল এবং কোনক্রমে বস্ত্র উদ্ধার করিয়া গৃহে ফিরিয়া গিয়া বলিল, নিশিযোগে ভবানী পুত্র-বর দিবেন। যামিনী প্রবেশে কৃষ্ণের ধবলী ধেনু হারাইয়া গেল, গোপীরাও আসিল, রাস-নৃত্য নাই, রাসলীলা হইয়া গেল। তদনন্তর মধ্যরাত্রে শশীর উদয় হইল। নিশি অবসানকালে কৃষ্ণ গাভী লইয়া ঘরে গেলেন। সারাদিনরাত্রি আহার নাই, যশোদা কৃষ্ণকে স্তন-পান করাইলেন, রোহিণীও করাইলেন। কৃষ্ণ সরলবনী খাইয়া যশোদার কোলে নিদ্রিত হইলেন। দিবা তৃতীয় প্রহর নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং 'আচম্বিত নগর ভ্রমিতে হৈল মন'। তিনি বেশভূষা করিয়া মাতুলালয়ে গমন করিলেন। (কৃষ্ণের বয়স দশ বৎসর। তিনি সে বয়সেও মাতৃস্তনপান ও সরননী খাইয়া থাকিতেন)।

কবি কৃষ্ণের দোল খেলাও ছাড়েন নাই। ঋতুরাজ উপস্থিত, 'গোবিন্দের জন্মিল খেয়াল' (১৪৭ পৃঃ)। তিনি ব্রহ্মার রূপ ধরিয়া যজ্ঞসেন গোপকে স্বপ্নে বলিলেন, "এই মধুমাস কুম্ভরাশি। 'পূর্ণমাসী পূর্ণ যে হইল পূর্ণিমা' (৬৪৫০ পং পদ্য)। তার উপর যুগাদ্যা। যমুনার কূলে মঞ্চে সিংহাসন পাতিয়া ও বামে রাধাকে বসাইয়া কৃষ্ণের পূজা কর।" তদনুসারে অরুণ উদয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণের ফাগু উৎসব হইল, অপরাহ্ণে সিংহাসনে রাধাকৃষ্ণ নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। ইন্দ্র বারজন বীর বলবান ক্ষেত্রপাল বাহক পাঠাইলেন। (ক্ষেত্রপাল বটুক ভৈরব বিশেষ। ইঁহারা অনেক কবির মতে দ্বাদশ। তাহারা রাধাকৃষ্ণের সিংহাসন বহিতে আসিয়াছিল। শিবপূজার পূর্বে দশ ক্ষেত্রপালের পূজা করিতে হয়। ফাল্গুন পূর্ণিমা যুগাদ্যা নয়।)

তিন দিন দোলের পর অক্রূর-সংবাদ। কৃষ্ণ মধুপুরে চলিয়া গেলেন, রাধার দীর্ঘ বিরহ আরম্ভ হইল। কবি ছয় ঋতুতে রাধার দুঃখ বর্ণন করিয়াছেন। বসন্ত হইতে শিশির, ঋতুভেদে বিরহীর দুঃখ স্মরণ স্বাভাবিক। ইহাই ঠিক। অনেক কবি কিন্তু বার মাসের বারমাস্যা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এক এক মাসের দুই-এক পংক্তি মাত্র। ভবানন্দ এক এক ঋতুর দুঃখ পদে ও গীতে দিয়াছেন। 'তিল পল দণ্ড গেল, প্রহর দিন মাস। বৎসরেক গেল মুই হইলু নৈরাশ।' (বোধ হয় এখানে পাঠান্তর হইয়া গিয়াছে। "সপ্তদশমাস গেল হইলু নৈরাশ॥") রাধার দশা দেখিয়া তাঁহার সখী মধুপুরে কৃষ্ণের গোচর করিতে গেলেন। পথে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

দ্বিজ বোলে লোকে আর মথুরা না রয়।
জরাসন্ধে পুড়িয়া করিল ভস্মচয়॥
প্রজাগণ লৈয়া হরি সমুদ্র ভিতর।
করিছে নির্ম্মাণ তথা দ্বারকা নগর॥

সখী দ্বারকায় গিয়া কৃষ্ণকে সকরুণ বচনে সন্দেশ দিলেন। কৃষ্ণ রাধাকে দ্বারকায় আনিবার নিমিত্ত সখীর সহিত ভাই উদ্ধবকে গোকুলে পাঠাইলেন। গোবিন্দ গোকুলে আসিলেন না। কারণ,

ত্রিদশের অধিকারী দ্বারকাঈশ্বর।
গোকুলে আসিলে নন্দ-যশোদা কোঙর॥
খণ্ডায়ে মহীর ভার নাম মহীপাল।
বৃন্দাবনে আসিলে ধেনুর রাখোয়াল॥

রাধা সপ্তদশ মাস পরে কৃষ্ণের দর্শন পাইলেন। সে দৃশ্য বর্ণনা যে সে কবির সাধ্য হইত না। ভবানন্দ অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। প্রভুর রাতুল পদ দেখিয়া রাধা পুলকিত হইলেন, আঁখির জলে বসুমতী তিতিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে অভিমানভরে কৃষ্ণকে মিষ্ট মিষ্ট ভৎসনাও চলিল।

সপ্তদশমাসে আজি হৈল দরশন।
জীবন মরণ মোর অখনে সমান।
নমো অবিবেক-সিন্ধু নমস্কার করোঁ॥
কঠিন হৃদয় তোমার কুলিশ আকার।
সত্যহীন মিথ্যাবাদী করোঁ নমস্কার॥
তিনলোকের পতি জানি চরণেত ধরোঁ।
নমহুঁ কুটিলার্ণব নমস্কার করোঁ।—

কৃষ্ণ রাধাকে পাটেশ্বরী করিতে চাহিলেন। রাধা উত্তর করিলেন—

সৌতিনের মেলে মুই বঞ্চিতে দুষ্কর।
তেজিমু পরাণ দঢ় এই সত্য মোর॥

রাধার প্রচণ্ড কোপে দ্বারকা দগ্ধ হইতে লাগিল। কি জানি, যত দুষ্ট বধ না করিয়া বিষ্ণু বৈকুণ্ঠে চলিয়া আসেন। ইন্দ্র ব্রহ্মার শরণ লইলেন। ব্রহ্মা রাধাকে স্তব দ্বারা তুষ্ট করিতে লাগিলেন।

রাধা বোলে তবে আমি রহিবারে পারি।
গুপ্ত করি রাখে যদি শঙ্খচক্রধারী।

এই কারণে "গোবিন্দের অঙ্গে লীন হইলা তিলোত্তমা।" দোল-পূর্ণিমায় বিচ্ছেদ হইয়া সপ্তদশমাস পরে হিন্দোল (ঝুলন) পূর্ণিমায় মিলন হইয়াছিল।

* এখানে ছাপায় আছে 'হইলু' 'না ইসে'। যে আঁ-খি বলিত, সে হইলুঁ বলিত। 'নাইসে'=না আইসে। শব্দসূচীতে 'বিরাট-সন্ততি' ভুলে ৮০৭৬ লিখিত হইয়াছে। বিরাট-সন্ততি, উত্তর। কবি 'বিরাট-সন্ততি' প্রয়োগ লোভে পড়িয়াছিলেন। ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্বেও বিবাহের আসরে বর-যাত্রীকে বিরাটতনয় দিতে হইত। দিতে না পারিলে কন্যাযাত্রীর নিকট অপমান পাইত। চণ্ডীদাসের নামে প্রচারিত, বিষ্ণুপুরে প্রাপ্ত এক গীতে—

সখি হে,—বিরাটতনয় দেহ দান।
বায়স-অজরবে, তনুমোর জর জর কিয়া ভেল পাপ পরাণ॥

ইত্যাদি সমুদায় গীত ঠারে রচিত। চণ্ডীদাসের ভণিতা নাই। বায়স-অজ রব=কা-ম।

কবির কাল।

ভবানন্দের পিতার নাম শিবানন্দ ছিল। কবি নারায়ণের 'অধম' 'দীন' ভক্ত ছিলেন। হরিবংশ হইতে আমরা মাত্র এই দুই তথ্য পাইতেছি। তাঁহার কাল ও দেশ দুই-ই অজ্ঞাত। প্রথমে স্মর্তব্য, আমরা হরিবংশের দাঁড়াটি পাইয়াছি। কবির কিছু পাইয়াছি, কিছু পাই নাই। কোন্ অংশ তাঁহার, কোন্ অংশ নয়, তাহার নির্ণয় বর্তমানে দুঃসাধ্য হইয়াছে। কাল সম্বন্ধে আমার অনুমান সংক্ষেপে লিখিতেছি।

১। সতীশবাবুর অনুমানে পাবনায় প্রাপ্ত পুথীর (ক-পুথীর) আদর্শ ভবানন্দের রচিত। যদি সে আদর্শ পাবনায় নির্মিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তথা হইতে সুদূর পূর্বে ও পূর্বোত্তরে প্রচারিত হইতে বহুকাল লাগিয়াছিল। ময়মনসিংহে প্রাপ্ত গ-পুথীর বয়স প্রায় ২৫০ বৎসর। এই জেলা বৃহৎ, ইহার কোথায় গ-পুথী পাওয়া গিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান কর্তব্য। তথাপি দেখা যাইতেছে, পাবনার মূল পুথীর বয়স এখন ৩০০ বৎসর, এমন কি ৩৫০ বৎসর হইত। সতীশবাবুর এই অনুমান ঠিক মনে করি। ৩৫০ বৎসর ধরিতে দ্বিধা হইতেছে না:

২। সতীশবাবু মনে করিয়াছেন, ভবানন্দ দীক্ষিত বৈষ্ণব ছিলেন। আমার মনে হয়, তিনি লক্ষ্মী-নারায়ণের ভক্ত ছিলেন। মঙ্গলাচরণে নারায়ণের পদ বন্দনা করিয়াছেন, রাধাকৃষ্ণের করেন নাই। যদিও লক্ষ্মী-নারায়ণ ও রাধা-কৃষ্ণ পরমার্থতঃ এক, এবং কবিও অভিন্ন মনে করিয়াছেন, তথাপি ভাবনায় ভিন্ন। চৈতন্য-সম্প্রদায়ের মতে রাধাকৃষ্ণ গোলক-বিহারী। কিন্তু ভাগবত বৈষ্ণবের ভাবনায় লক্ষ্মী-নারায়ণ বৈকুণ্ঠ-বিহারী। গোলক বৈকুণ্ঠের ঊর্ধ্বে। ভবানন্দ বৈকুণ্ঠ চিন্তা করিয়াছেন, গোলোক করেন নাই। ইহাতে মনে হয়, তিনি চৈতন্য প্রভুর অনুবর্তী বৈষ্ণব ছিলেন না। আরও মনে হয় তিনি চৈতন্য প্রভুর সমকালিক কিম্বা কিছু পূর্বে ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের শিষ্য হইলে তিনি কোথাও না কোথাও তাঁহাকে প্রণাম করিতেন। শিবানন্দ ভবানন্দ নাম হইতে মনে হয়, তাঁহার বংশ বৈষ্ণব ছিল না।

৩। চৈতন্য-সম্প্রদায় রাধাকে কদাপি মাতৃ-জ্ঞান করিতে পারেন না। মাতৃজ্ঞান রাধাকৃষ্ণ-ভজনাকে নির্মূল করিয়া ফেলে। ভবানন্দ রাধাকে এক স্থানে মা বলিয়াছেন (৮২২৪)। অন্য দুই তিন স্থানেও এই ভাবের কথা আছে। এই ব্যতিরেক আকস্মিক বোধ হয় না। ইহাতে মনে হয় কবি চৈতন্য প্রভুর পূর্ববর্তী।

৪। চৈতন্য-সম্প্রদায়ের মতে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার পর আর লীলা নাই। রাসলীলা তাহার পরিসমাপ্তি। সেখানেই নিত্য মিলন। কৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া এক পদও গমন করেন নাই। মাথুর ও প্রভাস, মন্দ কবির মূঢ় কল্পনা। ভবানন্দ মথুরালীলা ও দ্বারকালীলা বর্ণনা করেন নাই। কৃষ্ণ-অঙ্গে রাধাকে লীন করিয়া লক্ষ্মী-নারায়ণের একত্ব বাধান করিয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামী "গোপাল চম্পূ"তে কৃষ্ণকে এক ছলে বৃন্দাবনে আনাইয়াছেন। আমার ক্ষুদ্র বোধে মনে হয় ভাল করেন নাই। ইহাতে কাব্যেরও হানি হইয়াছে। যদি সত্য সত্য বিচ্ছেদ হইয়া থাকে, তাহা হইলে একবার দর্শন দিয়া বিচ্ছেদাগ্নি প্রজ্বলিত করা হইয়াছে। ভবানন্দ সে দিক্ দিয়া যান নাই। চৈতন্য প্রভুর পরবর্তী হইলে তিনি রাধাকে কৃষ্ণ-অঙ্গে লীন করিতে পারিতেন না। কারণ তদ্দ্বারা নিত্য রাস লুপ্ত হয়, সংসার অচল হয়।

৫। ভবানন্দের রাধিকার এক নাম তিলোত্তমা, সখীর নাম শ্রীমতী, ননদীর নাম মহোদা (মহোদয়া), স্বামীর নাম আ-ই-ম-ন। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তনে স্বামীর নাম আ-ই-হ-ন। আ-ই-হ-ন, বোধ হয় উচ্চারণে আ-ই-হ-ন। ইহা আ-ই-ম-ন রূপে পরিবর্তিত। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের রাঢ়ীয় সংস্করণে নাম রা-য়া-ণ। এই সংস্করণ ষোড়শ খ্রীষ্টশতকের নিকটবর্তী। তৎপূর্বে আ-য়া-ন, আমার মতে আ-য়-ন নাম ছিল, এবং তাহা আ-ই-অ-ন আ-ই-হ-ন আ-ই-ম-ন হইয়া গিয়াছিল। অতএব কবিকে চারিশত বৎসরের এদিকে আনিতে পারা যায় না। আমার বিশ্বাস আ-ই-হ-ন নাম দেখিয়া অ-ভি-ম-ন্যু নাম সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীরূপগোস্বামীর পূর্বে এই ভাল নাম ছিল কিনা সন্দেহ।

৬। হরিবংশের অনেক শব্দ কৃষ্ণকীর্তনের তুল্য। সতীশবাবু সে সকল শব্দ একত্র করিয়াছেন। কৃষ্ণকীর্তনের প্রাপ্ত পুথীর বয়স যাহাই হউক উহার মূল বড়ু চণ্ডীদাসের। তিনি পাঁচ শত বৎসর পূর্বে ছিলেন। কৃষ্ণকীর্তনে তাঁহার ভাষাও রহিয়া গিয়াছে। ইহাতে মনে হয় ভবানন্দ চণ্ডীদাসের পরে, শব্দের ঈষৎ রূপান্তর দেখিলে শত বৎসর পরে ছিলেন। এখানে মনে করিতেছি, দুই কবি নিকটবর্তী দেশে ছিলেন।

কৃষ্ণকীর্তনে বন্ধু শব্দ একটি স্থলে আছে, ৩৭৫ পৃঃ)

বন্ধুজন করাঁসী বিমনে।
ছলেবলে তোষিবে কমনে।

বন্ধুজন, দয়িত জন, বল্লভ। তাহাকে বিমনা করিয়া কেমনে তোষিবে। 'বন্ধু' দয়িত, তাহা হইতে পরে উপপতি। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে 'বন্ধু-সম্বন্ধ' এক নূতন সম্বন্ধ, তৎকালের অবৈধ সম্বন্ধ।

হরিবংশে 'বন্ধু' বিনা কথা নাই। বৈষ্ণবপদকর্তারা 'বঁধু' করিয়া শব্দটি কোমল করিয়াছিলেন। হরিবংশে 'বন্ধু' শব্দ প্রাচীন অর্থেও প্রযুক্ত হইয়াছে। পরে দেখা যাইবে।

কৃষ্ণকীর্তনে দি-আ-র (দেহ) ক-হি-আ-র (কহ) আ-নি-আ-র (আনহ) পদ আছে। হরিবংশে দি-য়া-র এই একটি পদ আছে। 'কলসী দিয়ার মোর', 'মোরে দিয়ার বিদায়।' দিয়ার দিআর দিবার—সং দাতুং অর্হসি, দিবার ইচ্ছা হউক। কৃষ্ণকীর্তনে দি-আ-র শব্দের উ যেন দাতু-এর উ-কার। অর্হসি লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তদনন্তর ইআর প্রত্যয়ও লুপ্ত হইতে অবশ্য বহুকাল গিয়াছে। 'বিদায়' সং বি+দা ধাতু না হইতে পারে, এমন নয়। আ দায় গ্রহণ, বি-দায় পরিহার। ব্রহ্ম-বৈবর্তপুরাণে (প্রাঃ৭০) 'বিদায়ং দেহি ভো নাথ' আছে। বোধ হয় 'বিদায়ং চক্রে', বিদায় করিল এরূপ প্রয়োগও পাইয়াছি। তথাপি 'মেলানি' শব্দ ভাষায় প্রচলিত ছিল। হরিবংশে 'মেলানি মাগয়ে হরি রাধিকার স্থান'। (১৪৩৮ পং) মেলানি=মেল+বাণী, পুনশ্চ মিলন-সূচক বাক্য, যেমন 'এখন আসি।' হরিবংশের 'চল, চল.' এখনও শিষ্টমুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

সতীশবাবু হরিবংশ হইতে যাবনিক শব্দ তুলিয়াছেন। কামান গুমান কবুল কানাৎ দেওয়ান খেয়াল খোয়ারী বেহাল বরাবর। তিনি 'বদল' ছাড়িয়া গিয়াছেন। এই সকল শব্দের অস্তিত্ব দ্বারা বুঝিতেছি, আড়াই শত বৎসর পূর্বে ও পরে গায়নেরা পুঁথীতে নূতন পাঠ প্রবেশ করাইয়াছিলেন। আরও বুঝিতেছি, গায়নেরা মুসলমানী ভাষাবহুল দেশে বাস করিতেন। ক-বু-ল শব্দ ক-উ-ল হইতে দেখিয়া বুঝিতেছি গায়ন গ্রাম্যজন ছিলেন।*

---

* সতীশবাবু বাং খন্দ শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষ্ণকীর্তনে "খন্দ নঠ করে যেহ্ন উদাও সাণ্ডে" (১৪২ পৃঃ)। বাঙ্গালা-শব্দকোষে ইহার বুৎপত্তি ভুল লেখা হইয়াছে। সং ষণ্ড, ষণ্ড, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে শীত-কালের শস্য। ষ-ণ্ড হইতে, সং খ-ণ্ড, বাং খ-ন্দ। সং শব্দের অর্থ সমূহ। ধান্য ব্যতীত অপর শস্যসমূহ। বোধ হয় এই রূপে শব্দটি চলিয়াছিল।

কবির দেশ।

গানের বই দেখিয়া দেশ-নির্ণয় দুরূহ। সতীশবাবু লিখিয়াছেন, ভবানন্দকে "পূর্ব ময়মনসিংহ বা ত্রিপুরা অথবা শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইয়াছি।" (ভূমিকা ৷৹ পৃঃ) তিনি হ'বংশে পূর্ববঙ্গের নিজস্ব-ভাষা দেখাইয়াছেন। কিন্তু তন্মধ্যে তো-মা-রার (তোমাদের), তা-ক্রি (তিনি), হৈলা হয়, মরিল হয়, ইত্যাদি হেতুদ্বারা ঐ-ঐ জেলা অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু যদি স্বীকার করি, ভবানন্দ ৪০০ বৎসর পূর্বে ছিলেন, এবং পরে গায়নে হ'বংশ পূর্ববঙ্গে গান করিয়া বেড়াইতেন, পাঠান্তর ও উপাখ্যান করিয়াছিলেন, তাহা হইলে উক্ত হেতু দুর্বল হইয়া পড়িবে। কবির স্বকীয় পুথী পাওয়া যায় নাই। আমরা পূর্ববঙ্গের, বিশেষতঃ ময়মনসিংহের, গায়নের পুথী পাইয়াছি। কেবল অন্বয় সাধন দ্বারা সাধ্য সিদ্ধ হয় না, ব্যতিরেক সাধন সবিশেষ চিন্তনীয়। ভাষা ব্যতীত নৈসর্গিক চিহ্ন, উপমা ও উপাখ্যান চিহ্ন দ্রষ্টব্য। এ বিষয়ের সম্যক্ আলোচনার অবসর নাই। দিগ্‌দর্শন নিমিত্ত দুই চারি কথা লিখিতেছি।

পূর্ববঙ্গের লৈখিক ও মৌখিক ভাষায় অনেক অন্তর। বর্ত্তমানে মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে ও গমনাগমনের সৌকর্যে সে অন্তর হ্রাস পাইতেছে, কিন্তু তিন চারি শত বৎসর পূর্বে এই সুযোগ ছিল না। তথাপি সাহিত্যের ভাষা স্বীয় লক্ষণ রক্ষা করিয়াছিল। সে লক্ষণ জানিতে হইলে পূর্বকালে রচিত গ্রন্থ দেখিতে হইবে। হ'বংশে অন্যথা পাইলে উত্তরবঙ্গে, এমন কি পশ্চিম বঙ্গেও অন্বেষণ করিতে হইবে। আমি চারিখানি বই দেখিলাম। যথা, (১) ছুটি খানের অশ্বমেধ পর্ব। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত। কবি শ্রীকর নন্দী। বয়স ৪০০ বৎসর। নিবাস হয়ত ত্রিপুরা, হয়ত চট্টগ্রাম। পুথীর বয়সও তিন চারি শত বৎসর।

(২) পদ্মা-পুরাণ। শ্রীরামনাথ ও দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত। কবি বংশীদাস। বয়স ৩৬০ বৎসর ("জলধির বামেত ভুবনমাঝে দ্বার। শকে"—১৪৯৪। ১৪ পৃঃ)। নিবাস ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ। পুরাণ গান করা হইত। পুথীর বয়স ১৪০ বৎসর। (৩) সঞ্জয়-কৃত মহাভারত। বয়স ৪০০ বৎসর। নিবাস শ্রীহট্ট। বোধ হয় ছাপা হয় নাই। শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন কৃত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" ও ১৩২৭ বঙ্গাব্দের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় কিছু কিছু উদ্ধৃত হইয়াছে। পুথীর বয়স ২১৫ ও ১০০ বৎসর। (৪) চণ্ডিকা-বিজয়। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত। কবি কমললোচন। বয়স ২৫০ বৎসর। নিবাস রঙ্গপুর। পুথীর বয়স ১২১ বৎসর। এই চারি গ্রন্থের ভাষার সহিত হ'বংশের ভাষার সমতা বুঝিতে হইলে শব্দের শ্রেণী বিভাগ কর্তব্য।

ভাষার শব্দ নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি। যথা, (১) সংস্কৃত-সম শব্দ। বঙ্গদেশের সর্বত্র সমান। কিন্তু এরূপ কোন শব্দের অর্থান্তর ঘটিয়া থাকিলে সে শব্দ চিন্তনীয়। যথা হ'বংশের 'অ কুমারী,' অর্থ কুমারী। (সঞ্জয়ে আছে।)

(২) সংস্কৃত-ভব শব্দ। এই সকল শব্দ তিন ভাগ করিতে পারি। (ক) সর্বত্র প্রচলিত, অর্থাৎ মুখে না বলিলেও শুনিলে বা পড়িলে সকলেই বুঝে। অতএব ভাষা-শব্দ। যথা, গাছ পাথর তোমার আমার করিয়াছি। (খ) ভাখা-শব্দ। এক এক স্থানের প্রাচীন ভাষার অবশেষ। কথায় বলে, যোজনান্তে ভাখা। যোজনান্তে না হউক, তিন চারি যোজনান্তে বটে। কবি যত সাবধান হউন, বৃহৎ রচনায় স্বীয় ভাখা এড়াইতে পারেন না। দ্রব্য, গুণ, কর্ম, ত্রিবিধ বাচকেই ভাখা থাকিতে পারে। যথা, ভাষা-শব্দ বাসা কচি ধড় ঘর, ভাখায় বাঁসা কঁচি ধর ঘড়। ভাষা শব্দ যাইব যাব, ভাখায় যাইমু যামু যাইম যাইবাম। (গ) তদ্দেশীয় শব্দ। ভাষা-শব্দের বিকার না হইয়া নূতন ও স্থল-বিশেষের শব্দ। যথা, হৈমন্তিক (ধান্য), হৈ-অত, আমন, বড়ান। (৩) দেশজ শব্দ। মূল সংস্কৃত নয়। প্রায়ই দ্রব্যবাচক। যথা, থৈকল, এক বৃক্ষ, রঙ্গপুরে ও আসামে। (৪) বিদেশজ শব্দ।

ভাখা প্রধান আলোচ্য। (১) হ'বংশে ড়-যুক্ত অনেক শব্দ আছে। ইহা নূতন নয়। কিন্তু সংস্কৃত-ভব শব্দে ঢ় আছে। বুঢ়ী, বা-ঢ়া-ই-লু, কা-ঢ়ি, দ-ড়। ঢ় ভবানন্দের প্রাচীনতার সাক্ষী। দেশেরও নয় কি? এ যে রাঢ়ের ও কলিঙ্গের মনে হয়। রাঢ় ঢ়-কে ড় করিয়াছে। ওড়িয়ায় ঢ় বিদ্যমান আছে।

২। কবির দেশে চন্দ্রবিন্দু, ঙ, ঞ উচ্চারণ সহজ ছিল। আঁ-পি, (দুইস্থানে আছে। শব্দসূচীতে নাই) (৮৬১৪), তেঁ-ই (৩৩৬৭) কাঁ-চা সোনা, ঝাঁ-প, কো-ঙ-র (১৫৫৫) (শব্দসূচীতে নাই), গোঙাইল (৭৮৮৬), গোসাঞি (৬০৮৪), ঠাঞি এবং বহু ক্রিয়াপদে যেমন করোঁ, মাগোঁ, ধরোঁ, বাজাঞি, গাঞি (গাএ গান করে), করঞি, ইত্যাদি ছিল। চারি সাক্ষী এত বলিতেন না। সতীশবাবু লিখিয়াছেন (ভূমিকা ৷৹ পৃঃ) "ক-পুথিতে (পাবনার) 'হঞা' 'যাঞা' ইত্যাদি রূপ অনেক আছে।" পুনশ্চ (৷/৹ পৃ°) "যাহা হউক ক-পুথির 'খাঞা' 'যাঞা' ইত্যাদি রূপগুলি পাবনা জেলায়, লেখ্যভাষায় না হউক কথা ভাষায় আজ পর্য্যন্তও প্রচলিত।" তিনি পাবনা সাজাদপুরে (যমুনার নিকটে) বহুকাল ছিলেন, এবং পাবনার কথ্য ভাষায় অর্দ্ধানুস্বর শুনিয়াছেন, ইহাতে আমার দ্বিরুক্তি কর্তব্য নয়। তথাপি আমি কিছুতে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। 'হয়্যা' বরং 'হঁআ' আছে, কিন্তু 'হঞা' আছে, এ যে অসম্ভব ঠেকিতেছে। কবির দেশ উত্তরবঙ্গ যেমন রঙ্গপুর, শ্রীহট্ট অথবা রাঢ় মনে হইতেছে। বহুদিন হইল বৈষ্ণবপদ-কবিকুল গত হইয়াছেন, কিন্তু মানভূম জেলায় ও বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণভাগে ও পশ্চিমভাগে ঞ অদ্যাপি বিদ্যমান। ইংরেজী শিক্ষিত ভদ্রলোকও গেঞে, খেঞেছি বলেন। অন্য লোকে বলে যাঞা খাঞাছি। সতীশবাবুর উদ্ধৃত (৷৹ পৃঃ)

ভয় পা-ই-য়া প্রাণী সবে বোলে নারায়ণ।

নিশ্চয় পা-ঞা ছিল। 'পাঠাইল' 'পাইল', নিশ্চয় 'পাঠাল্য' 'পাল্য' ছিল। আমি বাঁকুড়ায় সর্বদা শুনিতেছি। পাবনায় 'পঠাল্য' 'পাল্য'।

গেলু, বোলিলু, মৈলু (২৮৮৯) লুঁ ছিল। লু হইতে পারে না। ইহার সাক্ষী 'মনু' (৪২৫৯)। 'চঞ্চল চপল মূঢ় দুরাশায় মনু।' উপরের পংক্তিতে ত নুঁ। মনুঁ, গেনুঁ, গেলুঁ, বোলনুঁ, ইত্যাদি রূপ হুগলী জেলার পশ্চিম-উত্তর ও মেদিনীপুর জেলায় অদ্যাপি বর্ত্তমান। লুঁ, লুম্ এর রূপান্তরে নুঁ।

অর্দ্ধানুস্বর-ত্যাগের চিহ্ন হ-নে। ছিল হ-ঞেঁ। ইহার বিশেষ দৃষ্টান্ত 'উনাইয়া'। উ-না ধাতু চারি-পাঁচ স্থলে আছে। সতীশবাবু 'উ-ন' হইতে উ-না মনে করিয়াছেন। কিন্তু

যদ্যপি উদয় হইত কল্পাপতনয়।
উনাইয়া কোমলতনু হৈত জলময়। (৪৮৭০)
প্রচণ্ড উদয় ভানু, ননীর কোমল তনু
উনাইয়া হইবা জলময়। (৭২২৭)

তোমার ননীর তনু উন্নাইয়া জল হইত।

উষ্‌মা হইতে রাঢ়ে উ-মা, হ'বংশে উ-না। মুড়ির চাল উমাইয়া পরে ভাজিতে হয়। উম্মাতে বাষ্প নির্গত হয়, উষ্ণতে হয় না। অর্ধানুস্বর-ত্যাগ-প্রয়াসে ভাষায় ভুলও হইয়া গিয়াছে।

মুই যদি জানিমু কান্থ আসিবে আপনে।
তবে কেনে অভাগিনী যাইমু রন্ধনে॥ (৫৯০০)

'জানিমু' হইতে পারে না। ছিল, জানিতুঁ (জানিতাম)।

মুই যদি জানিমু হৈব এত আথান্তর।
তবে নাকি এত বিড়ম্বন হয় মোর॥ (৬০৫৫)

এখানে ক খ পুথীতে 'জানিতু' আছে। ছিল, 'জানিতুঁ'।

(৩) হ'বংশে সর্বত্র কেনে। সাক্ষীরাও কে-নে বলিয়াছেন। এখন পূর্ববঙ্গে অপ্রচলিত। কিন্তু রঙ্গপুর ও পশ্চিম রাঢ়ে প্রচলিত।

(৪) নারোঁ নারিল নারিবা, ইত্যাদি না+পার হইতে উৎপন্ন। এখানেও উত্তর-বঙ্গ ও পশ্চিম-রাঢ়। বাঁকুড়ায় 'নারিব' শুনিতে শুনিতে অস্থির হইয়াছি। বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগে হ'বংশের অ-খ-ন (এখন) পূর্ণরূপে বিদ্যমান। ওড়িয়াতে এ-খ-ন নাই কিন্তু কেহ বলিতে গেলেই অ-খ-ন বলে।

(৫) সতীশবাবু কৃ'কীর্ত্তনের ও হ'বংশের বহু সমশব্দ তুলিয়াছেন (১৶ পৃঃ)। এই সকল শব্দ দ্বারা হ-বংশের প্রাচীনতা যেমন প্রমাণিত হয়, দেশ-নৈকট্যও তেমন হয়। সাক্ষীরা এত সাদৃশ্য করেন নাই।

(৬) হ'বংশে পূর্ববঙ্গের ক্রিয়া-বিভক্তি আছে। তন্মধ্যে সতীশবাবু অতীত কালের প্রথম পুরুষের 'করিছি', 'চিন্তিছি', 'জানিছি', অর্থাৎ 'ইয়াছি' স্থলে 'ইছি' বিভক্তি পূর্ববঙ্গের নিজস্ব মনে করিয়াছেন। কিন্তু এই বাঁকুড়া সহরে 'ইছি' বিভক্তি সর্ব্বদা শুনিতে পাই। আইছি (আসিয়াছি) কহিছি করিছি রইছে হইছে ইত্যাদি নূতন মনে হইতেছে না। বোধ হয়, সকল ধাতুর তিন পুরুষের রূপে হয় না। আমি বিশেষ লক্ষ্য করি নাই। হ'বংশে ইয়াছে বিভক্তিও আছে।

হ'বংশে কারক বিভক্তির নানা রূপ, কেবল পূর্ববঙ্গের নয়। উহাদের মধ্যে পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের রূপও আছে। অতএব তদ্দারা হ'বংশের একদেশত্ব প্রমাণিত হইতেছে না। 'তাঞি' (তিনি) রঙ্গপুরে প্রচলিত। পশ্চিম-বঙ্গের কতকগুলি বিভক্তি অক্লেশে পূর্ব-বঙ্গীয় করা যাইতে পারে। সব পারা যায় না। কৃ'কীর্ত্তনের গাঅ, মাঅ হ'বংশের গাও মাও। কিন্তু 'অ' অক্লেশে 'ও' হইতে পারে। এইরূপ পরিবর্ত্তনের সাক্ষী হ'বংশেই আছে। মা, গা শব্দ-দ্বয়ের ষষ্ঠী রূপ ভাগীরথীর পূর্বপার হইতে পূর্বদিকে মা-র গা-র। পশ্চিম পার হইতে পশ্চিম দিকে মা-য়ে-র, গা-য়ে-র। হ'বংশে "সলিলে নিবার নহে গা-য়ে-র আগুনি॥" (৭৯২১)। মা-য়ে-র পদ অনেক আছে। মা-র কুত্রাপি নাই। "তোমার মায়ের ঘরে" (৬১৬৭), "মায়ের প্রাণ" (৪৭৩৯), "মায়ের চরণ" (৫৮১৯), "মায়ে পুত্রে" (৭৫১৯), ইত্যাদি। দুই এক সাক্ষী মা-য়ে-র লিখিয়াছেন।

তদ্দেশীয় শব্দ। হ'বংশে 'ওলে' শব্দ দশ-বার স্থলে আছে। অর্থ, রক্ষায়, সহিতে। সতীশবাবু শব্দটির টীকা করেন নাই। তিনি ও-র (পার, সীমা) হইতে ও-লে মনে করিয়াছেন। কিন্তু তদ্দারা অর্থ পাই না।

তুমি দুইজন আইস রাধিকার ওলে। (৫৩৫৭)
অবোধ আইমনে ভাল তোরে দিল ওলে॥ (৬০৪৯)
অভাগীরে নাহি নিবা ওলে। (৭১১২)

রাঢ়ে ওল-তলা অতি প্রচলিত শব্দ। প্রকৃত রূপ, অ'ল তলা, অলি-তলা। এই অ-লি হইতে অলি-গলি। (বাঙ্গলা শব্দকোষ) অ-লি, ও-ল, চালের ছাঁইচ। ওল-তলা, ছাঁইচতলা। হয়ত ইহা হইতে ও-লে রক্ষাস্থানে, আশ্রয়ে, সহিতে। পূর্ববঙ্গের কোথাও ও-লে আছে কি না, অনুসন্ধান কর্তব্য।

উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের স্বকীয় শব্দ না-ই-অ-র, না-ই-য়-র, কন্যার মাত্রালয়। হিন্দী নৈ-হ-র, স্ত্রীর মাতৃবংশ। বোধ হয়, সং মাতৃ-গৃহ, মাতৃ-ঘর, মাইঅর, নাইঅর। ম স্থানে ন, উষ্‌মা-উমা; মিতবর নিতবর (পূর্ববঙ্গে কোল জামাই), মিষি (দাঁতের) নিষি। বিবাহিতা কন্যা পূর্ব্ববঙ্গে মায়ের বাড়ী যায়, পশ্চিম-বঙ্গে বাপের বাড়ী যায়। হ'বংশে না-ই-য়-ব মাত্র একটি স্থানে ক-পুথীতে আছে। সতীশবাবু ক-পুথী হইতে কয়েকটি সুন্দর পদ দিয়াছেন। একদিন যমুনার ঘাটে রাধা যশোদার সমুখে পড়িয়া গিয়া কানুর দোষ দিতে লাগিলেন (৪৫১০)। যশোদা বুঝিতে পারিলেন এবং রাধাকে যথোচিত ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন।

চাতুরী করহ আরো মিথ্যা কথা কৈয়া।
মায়ের নাইয়র বন্ধু তুঞি গেলে লৈয়া॥ (৪৫৩৮)

ব-ন্ধু অর্থে ত্রিবিধ, মাতৃবন্ধু, পিতৃবন্ধু, শ্বশুর-বন্ধু। এই অর্থে, নীতিবাক্যে, বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি। জ্ঞাতি-বন্ধু, সগোত্র ও পরগোত্র। কবিকঙ্কণ ও ওড়িয়াতে এই অর্থে বন্ধু। আমরা এখন বলি কুটুম্ব। সং কুটুম্ব শব্দের অর্থ পোষ্যজন, ওড়িয়াতে প্রচলিত। নীতিবাক্যে বসুধৈব কুটুম্বকম্। সং কুটুম্বী, গৃহস্থ। এখন বাংলায় পরিবার। উদ্ধৃত শ্লোকে, তুই তোর মায়ের মায়ের বাড়ীর কুটুম নিয়ে গেলি। এই অর্থ করিলে রাধাকৃষ্ণের সম্বন্ধ বহু দূরে চলিয়া যায়। আরও নিকট সম্পর্ক ছিল। আইমন যশোদার ভাই। বোধ হয়, মূলে ছিল, তোহোর মায়ের বন্ধু। মা-য়ে-র দ্রষ্টব্য।

লু-ড় এড় (৩৭৮৬)। লু-ড় শব্দটিও নূতন। সতীশবাবু সং লো-ত্র চোরিত দ্রব্য হইতে মনে করিয়াছেন। সে নিমিত্ত লু-ঠ মনে করা সহজ। কিন্তু শব্দটির প্রয়োগ দেখিলে উহার অর্থ সত্য করিবার নিদর্শন। ওড়িয়াতে লো-ড়া প্রয়োজন, লু-ড় ধাতু অন্বেষণ, ইচ্ছা; পূর্ববঙ্গে অন্বেষণ কর্তব্য।

গ-ঞা-ব-রা। "একেত অবলা আমি, গঞাবরা-খান তুমি," (৪১৬৪)। সতীশবাবু ব্যুৎপত্তি বলেন নাই। বোধ হয় গো-ঞা-ব-রা; ব-রা, বরাহ। একগোঞা বরাহ। না-শু-দা। রাগরাগিণীর মধ্যে না-শু-দা ভাটিয়াল নাম পাইতেছি। সতীশবাবু ধরেন নাই; ক-রু-ণ ভাটিয়ালের বিপরীত কি-না, কে জানে। না-শু-দা রাগও আছে (১৭১ পৃঃ)। অনুসন্ধান কর্তব্য।

নৈসর্গিক চিহ্ন। কবি স্বভাবের শোভা সন্দর্শনে পরাঙ্মুখ ছিলেন। পূর্ববঙ্গ নদী-বহুল দেশ। কিন্তু হ'বংশে নদীর বিশেষ চিহ্ন পাই না। একটি মাত্র স্থানে হা-ও-য়ে-র ডাকাইত (২০৮৩) আছে। সাগর, সাঅর, হাঅর, হাওর। বিস্তীর্ণ নদীর বিশাল বাঁককে হাওর বলে। মনে পড়িতেছে, হাওড়ার দক্ষিণে গাঙ্গে হাঅর শুনিয়াছি। হয়ত হা-ও-ড়া এই হা-ও-রা। বিস্তীর্ণ নিম্নভূমি জলপূর্ণ হইলে বাঁকুড়ায় বলে, হাবড়া। হ'বংশে পূর্ববঙ্গের ব-ই-টা নাই। আছে কে-রো-য়া-ল, ও দাঁড়। পদ্ম-পুরাণে বৈ-টা (১০৮ পৃঃ)।

হ'বংশে ল-ব-ঙ্গ ফুল দুই স্থানে আছে। "লবঙ্গমালতী মাল"

(৩৭৬)। বসন্তকালের ফুল। এই মালতী, জাতি সন্দেহ নাই। আর এক স্থানে (১৪০৭) বসন্তকালে কবি রাত্রির চারি প্রহরে চারি ফুল ফুটিতে দেখিয়াছেন। প্রথম প্রহরে লবঙ্গ, দ্বিতীয় প্রহরে মালতী, তৃতীয় প্রহরে চাঁপা, চতুর্থ প্রহরে বকুল। পদ্মাপুরাণে "লবঙ্গ কস্তুরী" (১৭২ পৃঃ), কিন্তু লবঙ্গ-তরু হইতে পারে। চণ্ডিকা-বিজয় কাব্যে দুই স্থানে লবঙ্গ ফুলের উল্লেখ আছে। "লবঙ্গ মাধবীলতা মল্লিকা সুন্দর" (৩৮ পৃঃ)। পুনশ্চ,

নেহালি বান্ধুলি যুতি মল্লিকা টগর।
লবঙ্গ মাধবীলতা চাঁপা নাগেশ্বর॥ (২২০ পৃঃ)

জয়দেব "ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন" দেখিয়াছিলেন। কিন্তু সংস্কৃতে লবঙ্গলতা নামে কোন লতা নাই। বীরভূমেও এই নামে কোনও লতা নাই। আমাদের পরিচিত লবঙ্গ সমুদ্রান্তরিত বহু দক্ষিণ দেশস্থ এক তরুর আ-ফোটা শুখনা ফুল। জয়দেব ল-কার অনুপ্রাস নিমিত্ত সে লবঙ্গ-তরুকে লতা বলিয়াছেন কিনা কে জানে। শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের পাহাড়ে এক লংফুলের গাছ আছে। আসামেও তাহাকে লংফুল বলে। সেটি নেবু-বর্গের এক কণ্টকী বিস্তীর্ণ, আনত-শাখ ক্ষুপ (আমি দেখি নাই, বই দেখিয়া লিখিতেছি)। বসন্তকালে ফুল হয়, ফুল চতুর্দল শ্বেতবর্ণ, সুগন্ধ। আমাদের পরিচিত লবঙ্গের সহিত ইহার ফুলের সাদৃশ্য নাই। এই ক্ষুপের এই নাম শাস্ত্রীয় নহে। অর্থাৎ এই লবঙ্গ নাম স্থানীয় লোকের প্রদত্ত, সংস্কৃত-সম, কিন্তু অর্থান্তরিত। চণ্ডিকা-বিজয় ও হংবংশে এই শ্রীহট্টীয় লতার উল্লেখ দ্বারা উত্তর-বঙ্গ মনে আসিতেছে। তিন সাক্ষী 'জীবন সাফল্য' করিয়াছেন।

উপমা ও উপাখ্যান। হংবংশে কৃংকীর্ত্তনের হরিণীর মাংস আপনার বৈরী, বাঁশী চুরি, নৌকা-খণ্ড ও দান-খণ্ড আছে। ক-পুথী হইতে তুলসীর জন্ম, ও মৃগনতী কন্যার উপাখ্যান উদ্ধৃত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ও বৃহদ্ধর্মপুরাণে তুলসীর জন্ম লিখিত আছে, কিন্তু ভিন্ন প্রকার। এই সকল উপাখ্যান লোকমুখে প্রচারিত ছিল। ভবানন্দ এক বর্বর বাখান লিখিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয় আমি বাল্যকালে 'গেন্দু খেন্দুর' দেশে চারি বর্বরের গল্প শুনিয়াছিলাম। কেবল কোতোয়াল ও চোরের কথা মনে ছিল। হংবংশে সে গল্প পাইতেছি। হংবংশের সৃষ্টি বর্ণনের সহিত শূন্যপুরাণের সৃষ্টি পত্তন তুলনীয়। কালে কালে বাঙ্ময়ী কাহিনী কতদিকে প্রচারিত হইয়াছে, যে কবি যাহা শুনিয়াছেন, তিনি তাঁহার নিজের কাব্যের উপযোগী করিয়া লইয়াছেন। উপসংহারে দেখিতেছি এতদিন এক কৃষ্ণকীর্ত্তনের দেশ ও কাল সমস্যা হইয়াছিল, এখন আর একটি জুটিল। হংবংশের পদবন্ধ ও গীতের ভাষা দেখিয়া পৃথক পৃথক করা অসম্ভব হইবে না। তখন কবির দেশ কতকটা অনুমান করিতে পারা যাইবে। সম্প্রতি জেলার নাম না করিয়া পূর্ববঙ্গ বলা উচিত।

সমর্পণ

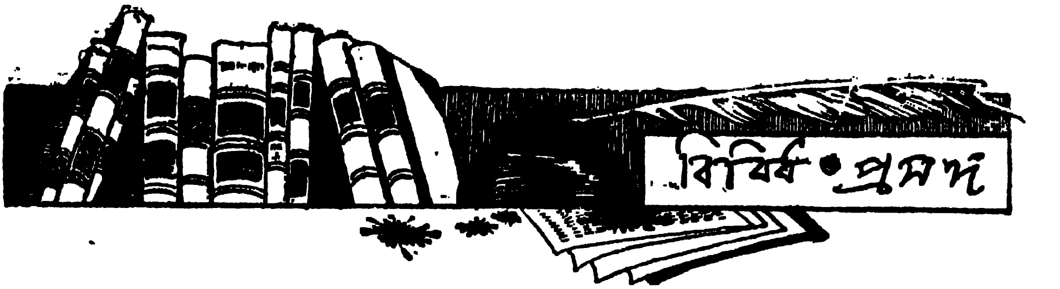
শ্রীঅমিয়া দেবী

তব সিংহাসনতলে আমারে ডেকেছ তুমি আজ,
ওগো মহারাজ!
যত বর্ণ যত গন্ধ যত ছন্দ সুর
অন্তরের পাত্রখানি করি ভরপুর
দিনে দিনে ক'রেছি সঞ্চয়,
আনন্দের যে সম্পদ কুড়ায়েছি প্রতি পলে পলে
অনুক্ষণ যে পূজার ব্যাকুলতা ওঠে জাগি মনরাজীবের
প্রতি দলে

জানি না সে তোমারি লাগিয়া!
এ কি আজ পরম বিস্ময়,
আপনার অজানিতে অশ্রান্ত জাগিয়া
কত দিন রাত্রি হতে ক'রেছে তোমারি ধ্যান
প্রতীক্ষার বেদনা বহিয়া
মোর এই হিয়া!

আজ এ পরমক্ষণে তুমি চাও অন্তরের দান
তোমারি চরণে মোর বেজেছে আহ্বান,
বক্ষোমাঝে
কি অপূর্ব্ব অনুভূতি রাজে,
প্রকাশের সব বাধা সবলে টুটিয়া
মুকুলের বেদনা যে ফুল হয়ে উঠিল ফুটিয়া
গন্ধভারে
বিকাশ করিয়া আপনারে।
রিক্তের পরম সুখ ব্যথার কোরকে ছিল সুপ্ত এতদিন
আপনারে নিঃস্ব করি আজ তার সার্থকতা তার আজি
জীবন নবীন।

নাও তবে কেড়ে নাও যতকিছু প্রাণের সঞ্চয়,
নির্মম দস্যুর মত নিঃশেষে আমারে কর ক্ষয়,
আমার দিবস নিশি অশ্রু-হাসি আলোক-আঁধার
হে বিজয়ী, কর অধিকার;
এ আমার আজি যে দুঃসহ
লহ ওগো নিঙাড়িয়া লহ
হৃদয়ের রক্তধারা লহ দেহ-প্রাণ
আমার সর্ব্বস্ব নাও করগো আমায় অবসান,
লঘু হোক জীবনের ভার
নিঃস্ব করি লহ কাছে পরিপূর্ণ করি দাও হে মধুর
অমৃতে তোমার।



কি দয়া!

১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি বক্তৃতায় ভারত-সচিব স্তর সামুয়েল হোর বলেন, আগামী বৎসরে আর কোন এমার্জেন্সী অর্ডার (অর্থাৎ অর্ডিন্যান্স অর্থাৎ আকস্মিক সঙ্কট অবস্থার দরুণ হুকুম) জারি করা হইবে না। কি দয়া! অর্ডিন্যান্সগুলা জারি হইবার পর ছয় মাস পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিত। তাহার জায়গায় সমগ্র-ভারতীয় এবং প্রাদেশিক কতকগুলা আইন হইয়াছে, যেগুলা দীর্ঘতর কাল বলবৎ থাকিবে—হয়ত যতদিন ভারতে ইংরেজ রাজত্ব ও প্রভুত্ব থাকিবে, ততদিন থাকিবে। এইসব আইন অর্ডিন্যান্সগুলার চেয়ে একটুও কম কঠোর নয়; বরং কোন কোন স্থলে উহাদের কোন কোন ধারা অর্ডিন্যান্স অপেক্ষা কঠোরতর ও ব্যাপকতর করা হইয়াছে।

ভারত-সচিবের সদয় আশ্বাসবাণীতে ভারতীয় লোকেরা আনন্দিত হইতে পারে নাই।

—

বঙ্গের প্রতি সরকারী ও বেসরকারী অনুকম্পা

প্রধান মন্ত্রী মিঃ র‍্যামজি ম্যাক্‌ডোনাল্ড ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় ও শ্রেণীর জন্ত ভারতের প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক আসনের যে ব্যবস্থা প্রকাশ করেন, তাহাতে কোন কোন প্রদেশে অবনত শ্রেণীর হিন্দুদের জন্ত কতকগুলি আসন নির্দ্দিষ্ট রাখিয়াছিলেন। সেই আসনগুলি হিন্দুদের জন্ত নির্দ্দিষ্ট আসনের বহির্ভূত ও অতিরিক্ত ছিল। বাংলা দেশের বেলায় হিন্দু ও সাধারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্গত অন্যান্য সম্প্রদায়ের জন্য যে আশীটি পদ রাখা হয়, অবনতদের জন্য অন্যূন দশটি পদ তাহারই মধ্য হইতে দেওয়া হইবে বলা হয়—অন্যূন দশটি অর্থাৎ দশের চেয়ে বেশীও হইতে পারে। ইহার মানে বুঝিতে বেশী কষ্ট হয় না।

প্রথমতঃ, বঙ্গের হিন্দু প্রভৃতিকে ত তাহাদের যোগ্যতা, শিক্ষা, জনহিতকর কার্য্যে উৎসাহ, পরিশ্রম, স্বার্থত্যাগ, অর্থদান প্রভৃতির অনুপাতে যথোচিত আসন দেওয়া হয়ই নাই, তাহারা তাহাদের লোকসংখ্যার অনুপাতে যত আসন পাইতে পারিত তাহাও দেওয়া হয় নাই, তার চেয়ে অনেক কম দেওয়া হয়। যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্য হইতে আবার "অন্যূন" দশটি আসন অবনতদের জন্য রাখা হইল। ইহাতে হিন্দু প্রভৃতি সদস্যদলের স্বাধীনচিত্ততা কমাইবার একটি উপায় রাখা হইল। যাহারা অনুগ্রহভাজন, তাহাদের স্বাধীন-চিত্ততা কম হইবারই কথা। যে-সব হিন্দু সভ্য গবন্মেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হন, তাঁহারা সাধারণতঃ কম স্বাধীনচেতা হইয়া থাকেন—যদিও সকলেই সব সময়ে ধামাধরা হন না। অবনত শ্রেণীর সদস্যেরা স্বাধীনচিত্ত হইতেই পারেন না, এমন নয়। কিন্তু তাঁহারা অবাধ প্রতি-যোগিতার দ্বারা ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিলে যতটা স্বাধীনচিত্ত হইতে পারেন, সরকারী কৃপায় সংরক্ষিত আসনে বসিয়া ততটা না হইবার কথা। তদ্ভিন্ন, এরূপ দেখা গিয়াছে, যে, ঐ শ্রেণীর সদস্য যাঁহারা এপর্য্যন্ত প্রতিযোগিতার দ্বারা ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারাও বঙ্গের সকল সম্প্রদায় ও শ্রেণীর হিতকর কার্য্যে ও আইনে উৎসাহ দেখান নাই, নিজ দলের ও শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির দিকে বেশী মন দিয়াছেন।

অতএব, প্রধান মন্ত্রীর ব্যবস্থাই যদি কায়েম থাকিত, তাহা হইলেও বঙ্গে প্রধানতঃ যাহাদের চেষ্টায় স্বরাজ পাইবার ও দিবার কথা উঠিয়াছে, সেই হিন্দু প্রভৃতি শ্রেণী ব্যবস্থাপক সভায় হীনবল ও কতকটা অস্বাধীনচিত্ত

এবং আমলাতন্ত্রের প্রভুত্বের বিরোধিতা করিতে শক্তিহীন হইত, কিন্তু পুণা-চুক্তির বলে, অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী আশীটির মধ্যে অন্যূন দশটি আসন অবনতদের জন্য রাখিয়াছিলেন, পুণা-চুক্তিতে ত্রিশটি আসন তাহাদের জন্য রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ প্রধানতঃ যাহারা এপর্য্যন্ত রাজনীতি, সমাজসংস্কার, জনহিতকর প্রচেষ্টা প্রভৃতি ক্ষেত্রে খাটিয়াছে, ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদিগকে আরও হীনবল করা হইয়াছে।

ইহা বঙ্গের হিন্দুদের প্রতি বঙ্গের বাহিরের অবাঙালী হিন্দু নেতাদের অযাচিত অনুগ্রহ। অবশ্য তাঁহারা দুরভিসন্ধিপূর্ব্বক বঙ্গের অনিষ্ট করিবার নিমিত্ত এরূপ ব্যবস্থা করেন নাই, ভারতবর্ষের হিতের জন্যই ইহা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের অনভিপ্রেত হইলেও পুণা-চুক্তি দ্বারা বাংলা দেশকে ভারতসেবার কার্য্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অক্ষম করা হইয়াছে।

—

বঙ্গে কাহারা "অবনত" হিন্দু ?

আমরা কোন মানুষ বা মনুষ্যশ্রেণীকে অস্পৃশ্য বলা বা মনে করা অযৌক্তিক ও অন্যায় মনে করি। তাহাদিগকে "অবনত" "দলিত," "অনুন্নত," বা "হরিজন" বলিলেও যদি অর্থটা তাহাই থাকে, তাহা হইলেও ঐ সকল শব্দের কোনটার প্রয়োগে প্রকৃত প্রতিকার হয় না। কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে গেলে একটা কোন শব্দের ব্যবহার আবশ্যক হয় বলিয়া আমরা "অবনত" শব্দ ব্যবহার করিতেছি; বস্তুতঃ, আমরা কাহাকেও অস্পৃশ্য বা অবনত মনে করি না। কেহ দরিদ্র বা নিরক্ষর হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার এরূপ সদ্গুণ থাকিতে পারে, তাঁহার দ্বারা সমাজের এরূপ অত্যাবশ্যক কাজ হইতে পারে, যাহার জন্য তিনি সম্মানার্হ।

প্রধান মন্ত্রী কতকগুলি লোককে আলাদা দশটি আসন দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই লোকগুলিকেই পুণা-চুক্তি অনুসারে ত্রিশটি আসন দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা কাহারা এবং তাঁহাদের সংখ্যাই বা কত? প্রধান মন্ত্রী যখন তাঁহাদের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় দশটি আসন রাখিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা কাহারা এবং তাঁহাদের সংখ্যাই বা কত, তাহা গবন্মেণ্ট জানেন, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। আজকাল মাথাগুন্তি দ্বারাই কাজ চালাইবার কথা হইতেছে। এই জন্য ঐ লোকগুলির সংখ্যা কত তাহা গবন্মেণ্টের জানা উচিত। কিন্তু বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভায় সেদিন অনেকে প্রশ্ন করিয়াও, অবনত জা'ত কাহারা, কি কি লক্ষণ দ্বারা তাহাদিগকে অবনত বলিয়া চেনা যাইবে, তাহাদের সংখ্যা কত, তাহা সরকারপক্ষ হইতে জানিতে পারিলেন না। প্রশ্নটা উত্থাপন করেন, নশিপুরের রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ এবং পরে নরেন্দ্রকুমার বসু, বিজয়চন্দ্র চাটুজ্যে, বিমলানন্দ নাগ, খাঁ-বাহাদুর আবদুল মোমিন, শান্তিশেখরেশ্বর রায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জিতেন্দ্রলাল বাঁড়ুজ্যে, খাঁ-বাহাদুর আজিজুল হক্, ফজলল হক্, ও অমূল্যধন রায় মহাশয়গণ নানা প্রশ্ন দ্বারা উত্তর আদায় করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সরকারপক্ষের উত্তরদাতা মাননীয় আলহজ স্তর আব্দেল কেরিম ঘজনবী মহাশয়ের নিকট হইতে কোন স্পষ্ট উত্তর আদায় করিতে পারেন নাই। অথচ প্রধান মন্ত্রী অবনতদিগকে দশটি আসন দিলেন এবং তাঁহাদিগকেই পুণার চুক্তি ত্রিশটি আসন দিল। আসনগুলি কতগুলি লোকের মধ্যে বণ্টনীয় এবং তাঁহাদের যোগ্যতাদিই বা কিরূপ, তাহা না জানিয়াই অবাঙালী হিন্দু-নেতারা কেন প্রধান মন্ত্রী অপেক্ষা তিনগুণ বদান্য হইলেন, তাহা বুঝা কঠিন।

—

ব্যবস্থাপক সভায় আসনের মূল্য

কেহ যেন মনে না করেন, আমরা ব্যবস্থাপক সভায় অবনতদের আসন প্রাপ্তির বিরুদ্ধতা করিতেছি। আমরা চাই যে, সকল শ্রেণীর লোকই আত্মসম্মান বিসর্জ্জন না দিয়া ব্যবস্থাপক সভার সদস্যত্ব লাভ করেন। আমরা যাহা বলিলাম তাহার অর্থ বুঝাইবার নিমিত্ত অবনত জাতিদের লোকেরা কিরূপ আত্মপরিচয় দান দ্বারা সংরক্ষিত পদগুলি পাইতে পারেন, তাহা বর্ণনা করিতেছি।

কেহ যদি ঐ এক একটি পদের প্রার্থী হন, তাহা হইলে তাঁহাকে বলিতে হইবে, "আমি অমুক জা'তের লোক, এবং সেই জা'ত অস্পৃশ্য বা দলিত বা অবনমিত।" এরূপ পরিচয় দেওয়া অসম্মানজনক ও লজ্জাকর। কিন্তু লোকে পেটের দায়ে বা "মানের দায়ে" অনেক সময় অপমান সহ্য করে। সুতরাং তদ্রূপ কোন দায়ে আসনপ্রার্থী ব্যক্তি **আপনাকে** অস্পৃশ্য বা তদ্রূপ কিছু বলিতে রাজী হইতে পারেন। কিন্তু তিনি যে জা'তের লোক, সেই সমগ্র জা'তটাকে অস্পৃশ্য বানাইবার তাঁহার কি অধিকার আছে? সমগ্র জা'তটার মান যদি তিনি বাড়াইতে পারিতেন, তাহা হইলে না-হয় তাহারা কিছু অসুবিধা মানিয়া লইত। কিন্তু নিজের জা'তটাকে অস্পৃশ্য বা সেইরূপ কিছু বলিয়া মানিয়া লইবার পর সেই জা'তের মান বাড়াইবার কথা তোলা হাস্যকর। মান বাড়াইবার যত চেষ্টাই কেহ করুন না, যে-মুহূর্ত্তে ঐ জাতির লোকেরা বলিবেন, "আমরা সম্মানিত জাতি," তখনই সরকারী উত্তর আসিবে, "আপনারা তাহা হইলে ত অস্পৃশ্য বা অবনত নহেন—সম্মানিত ও অবনত দুই একসঙ্গে হইতে পারে না; অতএব আপনারা আর সংরক্ষিত আসন পাইবেন না।" অর্থাৎ যতক্ষণ কোন জা'ত অস্পৃশ্য বলিয়া আত্মপরিচয় দিবে, ততক্ষণ তাহারা সংরক্ষিত আসন পাইবে, তাহার পর নহে—সংরক্ষিত আসনের মূল্য হইতেছে নিজের হীন আত্মপরিচয় দান।

কেহ কেহ বলিবেন, "পেটে খে'লে পিঠে সয়।" কিন্তু সদস্যপদ ত জুটিবে এক জনের, তাহাতে সমগ্র জা'তটার কি মান বাড়িবে?

আরও একটা কথা বিবেচ্য। ঘজনবী সাহেব বলুন বা না-বলুন, অস্পৃশ্য বা অবনত জা'তদের এক বা একাধিক সরকারী তালিকা আছে, এবং ৮০।৮৫টি জা'ত তাহার অন্তর্গত। তাহাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা মোট ত্রিশটি। কোন কোন অস্পৃশ্য জা'তের লোক শিক্ষায় বেশী অগ্রসর বা বেশী উদ্যোগী বলিয়া একাধিক আসন পাইতে পারিবেন। কিন্তু যদি ধরিয়া লওয়া যায়, যে, কোন জা'তের লোকেরাই একটির বেশী আসন পাইবেন না, তাহা হইলে ৮০।৮৫টি জা'তের মধ্যে কেবল ত্রিশটি জা'তের ত্রিশটি লোক ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে পারিবেন, বাকী ৫০।৫৫টি জা'তের লোক কোন আসন পাইবেন না। অথচ এই ৫০।৫৫টি জা'তের লোককেও অস্পৃশ্য বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে হইবে। খুব লাভের কারবার বটে!

অতএব, এই আলোচনায় শেষ সিদ্ধান্ত এই দাঁড়াইতেছে, যে, প্রত্যেক বারের নির্ব্বাচনে ঊর্দ্ধসংখ্যায় ৩০টি জা'তের কেবল একজন করিয়া ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবে, ঐ সব জা'তের বাকী লোকদের কোন মান বাড়িবে না, এবং ৫০।৫৫টি জা'ত অস্পৃশ্য বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেও তাহাদের একজন লোকও ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইতে পারিবে না।

এ অবস্থায় অস্পৃশ্য বলিয়া আত্মপরিচয় দিবার সার্থকতা কি?

এরূপ যুক্তি উত্থাপিত হইতে পারে, যে, অধিকাংশ অস্পৃশ্য জা'তের লোকরা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইতে না পারিলেও অন্য যে-সব অস্পৃশ্য জা'তের ৩০টি লোক সভ্য হইবেন, তাঁহারা সমুদয় অস্পৃশ্য জা'তের লোকদের উপকার করিবার চেষ্টা করিবেন। তাহা যদি করেন, তাহা সন্তোষের বিষয় হইবে। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভার বাহিরে বা ভিতরে কোন একটি অস্পৃশ্য জা'তের লোকদের দ্বারা অন্য সব তদ্বিধ জা'তের লোকদের হিত চেষ্টার দৃষ্টান্ত এযাবৎ বিরলই আছে, অন্যদিকে স্পৃশ্য জা'তের অনেক লোকেরাই বরং অস্পৃশ্যদের সকলেরই হিতচেষ্টা করিয়াছে।

—

বঙ্গের অস্পৃশ্যদের জন্য আসন সংরক্ষণ কি অত্যাবশ্যক?

যদি এমন হইত যে এপর্য্যন্ত তাহাদের জন্য সংরক্ষিত আসন না থাকায় কোন অবনত শ্রেণীর লোক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ঢুকিতে পারে নাই, তাহা হইলে বরং কিছু কালের জন্য তাহাদের সংখ্যা অনুসারে তাহাদের নিমিত্ত কতকগুলি আসন আলাদা করিয়া

রাখা যুক্তিসঙ্গত হইত। কিন্তু বাস্তবিক অবস্থা সেরূপ নহে। কাহারা অবনত বা অস্পৃশ্য তাহা বলিতে আমরা অনিচ্ছুক। কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত সরকারী তালিকায় যাঁহারা অবনত জাতি বলিয়া গণিত, তাঁহাদের মধ্যে ন্যূনকল্পে ১০।১২ জন (কেহ কেহ বলেন ১৪।১৫ জন) লোক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। যাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ দশ জন লোক অস্পৃশ্য বলিয়া আত্মপরিচয় না দিয়াও স্পৃশ্য অস্পৃশ্য সকলের সঙ্গে অবাধ প্রতিযোগিতায় ব্যবস্থাপক সভায় ঢুকিতে পারিয়াছেন, "অস্পৃশ্য" মার্কা মারিয়া তাঁহাদিগকে প্রধান মন্ত্রী কেন ১০টি আসন দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

—

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ একান্ত আবশ্যক। ইহা ব্যতীত মনুষ্যত্ব রক্ষা হয় না, জাতিগঠনও হয় না। সুশিক্ষা-দান এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের প্রধান উপায়। সুশিক্ষা যে কেবল অস্পৃশ্যদিগকে দিতে হইবে, তাহা নহে; কাহাকেও অস্পৃশ্য মনে করা রূপ ঘোর কুসংস্কার দূর করিবার নিমিত্ত স্পৃশ্যদিগকেও সুশিক্ষা দিতে হইবে। অতি সত্বর ফললাভ না হইলে নিরাশ বা নিরুৎসাহ হওয়া চলিবে না।

আপাততঃ অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ চেষ্টার একটি অংশের প্রতি সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি বেশী করিয়া পড়িয়াছে। তাহা তাঁহাদের দেবমন্দিরে প্রবেশের অধিকার লইয়া। এই বিষয়টির মীমাংসা কেবল তাঁহাদেরই মতামত অনুসারে হইতে পারে যাঁহারা দেবমন্দিরে পূজা করেন বা করিতে ইচ্ছা করেন। অর্থাৎ যাঁহারা সাধারণতঃ হিন্দু বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের মত অনুসারেই মীমাংসা হওয়া চাই। মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান ইহুদী প্রভৃতির মত অনুসারে ইহার মীমাংসা হইবে না; ব্রাহ্ম আর্য্যসমাজী প্রভৃতি যাঁহারা ব্যাপক অর্থে হিন্দু বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের মত অনুসারেও মীমাংসা হইতে পারে না। কিন্তু বিষয়টি আলোচনা করিবার অধিকার হিন্দু অহিন্দু সকলেরই আছে।

গোঁড়া হিন্দুদের মধ্যে সকলেই অবনত শ্রেণীর লোকদের মন্দির-প্রবেশে আপত্তি করেন না; যেমন পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, কালীঘাটের কালীমন্দিরের সেবাইতগণ ইত্যাদি। কিন্তু অনেক গোঁড়া হিন্দুর অবনত শ্রেণীর লোকদের মন্দির-প্রবেশে আন্তরিক আপত্তি আছে। ইহাদিগকে ভণ্ড বলিলে চলিবে না। ইহাদিগকে শাস্ত্রীয় ও অন্য যুক্তিদ্বারা তাঁহাদের ভ্রম বুঝাইতে হইবে। কটূক্তি কিংবা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ বলপ্রয়োগ অনুচিত; সুফলদায়কও নহে।

মহাত্মা গান্ধী তর্কযুক্তি বেশ সংযত ও ধীর ভাবে প্রয়োগ করিতেছেন। অধিকন্তু অবস্থাবিশেষে তিনি যে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণার্থ প্রায়োপবেশনও করিতে পারেন, ইহাও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান লোকদের মনের উপর চাপ দিবে। কেবলমাত্র এইরূপ চাপের ফলে কেহ অবনতদের মন্দির-প্রবেশে রাজী হইলে তাহা সম্পূর্ণ বাঞ্ছনীয় মনে করা যাইতে পারে না—কারণ, চাপের প্রতিক্রিয়া বশতঃ পরে তাহাতে কুফল ফলিতে পারে।

অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে আমাদের মত অনেক বার প্রকাশ করিয়াছি। পুনরুল্লেখ করিতে চাই না। অবনতদের মন্দির-প্রবেশ সম্বন্ধে আমাদের মত এই, যে, যাঁহারা যে ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, বংশ ও অবস্থা নির্বিশেষে তাঁহাদের সকলেরই সেই ধর্ম্মের মন্দিরে পূজা করিবার অধিকার থাকা উচিত। নতুবা তাঁহাদের সেই ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত থাকার কোন সার্থকতা থাকে না। কতকগুলি লোক হিন্দু থাকিবে অথচ হিন্দুর সব অধিকার পাইবে না, এরূপ হইলে হিন্দু সমাজের সংহতি একতা দলবদ্ধ ভাব থাকিতে বা জন্মিতে পারে না।

এরূপ প্রশ্ন কেবল যে হিন্দু সমাজ সম্বন্ধেই উঠিতে পারে, তাহা নহে, অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায় সম্বন্ধেও উঠিতে পারে এবং উঠিয়াছে।

আমেরিকায় শ্বেত খ্রীষ্টিয়ানদের অনেক গির্জ্জায় নিগ্রোরা উপাসনা করিতে যাইতে পায় না। তাহাতে জাতিগত বিদ্বেষ বাড়ে। মুসলমানদের মধ্যেও এরূপ সমস্যার আবির্ভাব হয়। তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

পরলোকগত রায় বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র বসু বিদ্যার্ণব

যখন আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের গাজীপুরে সবজজ ছিলেন (১৯০৬—১৯০৮), তখন সেখানে এই প্রশ্নঘটিত একটি মোকদ্দমার বিচার তাঁহাকে করিতে হয়, যে, ওআহাবীরা (Wahabis) সুন্নীদের সহিত এক মসজিদে নামাজ করিতে পারে কি-না। শ্রীশবাবু খুব ভাল আরবী জানিতেন। তিনি এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য মিশর এবং পারস্য হইতে অনেক বহি আনাইয়া তাহা পড়িয়া রায় দেন। এই রায়টি অনুসারে তাঁহার "The Right of Wahabis to pray in the same mosque with the Sunnis" (ওআহাবীদের সুন্নীদের সহিত এক মসজিদে প্রার্থনা করিবার অধিকার) নামক পুস্তকের মূল অংশ।

—

অবনতদের মন্দির-প্রবেশ সম্বন্ধে আইন

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনেক মন্দিরের সেবাইত ও ন্যাসরক্ষক (ট্রাস্টী) এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, যে, তাঁহারা ইচ্ছা করিলেও ঐ সকল মন্দিরে অবনত শ্রেণীর হিন্দুদিগকে প্রবেশ করিতে দিতে পারেন না, আইনে বাধে। এই কারণে এরূপ আইন প্রণয়ন আবশ্যক যাহাতে ঐ বাধা দূর হইতে পারে। মান্দ্রাজের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ডক্টর সুব্বারায়ন্ ঐরূপ একটি আইনের পাণ্ডুলিপি মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাহা করিতে হইলে বড়লাটের অনুমতি আবশ্যক। সেই অনুমতি প্রার্থনা করা হইয়াছে। যাহাতে তিনি অনুমতি দেন, তজ্জন্য সমগ্র ভারতে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। যাঁহারা আন্দোলন করিতেছেন, তাঁহারাও দেবমন্দিরে পূজক হিন্দু। অন্যদিকে এই শ্রেণীরই গোঁড়া হিন্দু অনেকে অনুমতি না দিবার জন্য বড়লাটকে অনুরোধ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত সি এস্ রঙ্গ আইয়ার ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাতেও এইরূপ একটি বিল উপস্থিত করিতে চান। তাহাও বড়লাটের অনুমতিসাপেক্ষ। এরূপ স্থলে বড়লাটের কর্ত্তব্য কি, তাহাই বিচার্য্য।

যে-সকল হিন্দু সকল শ্রেণীর হিন্দুকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা বলিতেছেন, বড়লাট অনুমতি দিলে তাহার দ্বারা হিন্দুর ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ ও আঘাত করা হইবে। হিন্দুদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ও সামাজিক বিষয়ে ইহার আগেও ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট কোন কোন আইন করিয়াছেন। তাহার যখন উপক্রম হয়, তখনও সংস্কারবিরোধী হিন্দুগণ ঐরূপ আপত্তি করিয়াছিলেন। সে আপত্তি টেকে নাই। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও আপত্তি টেকা উচিত নহে। কারণ, প্রস্তাবিত আইন দ্বারা হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাস পরিবর্ত্তিত হইবে না; হিন্দু কি বিশ্বাস করিবেন, কোন্ কোন্ দেবতার পূজা কি প্রণালীতে হইবে, তাহা নির্দ্ধারিত হইবে না। কেবল ইহাই বলা হইবে, যে, কতকগুলি হিন্দু এখন যে অধিকার হইতে বঞ্চিত আছে, স্থানীয় প্রতিনিধিস্থানীয় অধিকাংশ হিন্দুর মত হইলে তাহারা সে অধিকার পাইবে। বড়লাটের অনুমতি দিবার পক্ষে ইহাও বলা যাইতে পারে, যে, যাঁহারা তাঁহাকে অনুমতি দিতে অনুরোধ করিতেছেন, তাঁহারা অহিন্দু নহেন—তাঁহারা দেবমন্দিরে পূজক হিন্দু এবং তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের নিজের মন্দির আছে তাহাতে তাঁহারা সকলশ্রেণীর হিন্দুদিগকে প্রবেশের অধিকার দিয়াছেন।

হিন্দুর ধর্ম্মবিধি ও সমাজবিধি আবহমান কাল অপরিবর্ত্তিত আকারে চলিয়া আসিতেছে না। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রের মতানৈক্য হইতেই তাহা বুঝা যায়। আগে কালক্রমে যে পরিবর্ত্তন হইত, তাহাতে হিন্দু রাজাদেরও হাত ছিল। এখন ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে হিন্দু রাজা নাই বটে, কিন্তু রাজশক্তি বা রাষ্ট্রীয় শক্তি আছে। সেই শক্তি ব্যবস্থাপক সভাসমূহের হিন্দু সদস্যেরা আংশিক ভাবে পরিচালন করেন। আলোচ্য আইন সম্বন্ধে হিন্দু সদস্যেরা কি মীমাংসা করেন, তাহা জানিবার সুযোগ দেওয়া বড়লাটের কর্ত্তব্য।

সত্য বটে, ইঁহাদের সকলে হিন্দুসমাজের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকৃত না হইতে পারেন। কিন্তু হিন্দুদের অন্য নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিই বা কোথায়? কংগ্রেস যে-পরিমাণে সমুদয় ভারতবাসীর প্রতিনিধিস্থানীয়, অন্য কোন সমিতি তাহা নহে। হিন্দু কংগ্রেসওয়ালারা হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি মোটেই নহেন, এরূপ বলা চলে না। যদি কেহ তাহা

বলেন, তাহা হইলে হিন্দু মহাসভার দেবমন্দিরে পূজক হিন্দু সভ্যেরাও হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি নহেন, এরূপ বলা চলে না। অন্য সব হিন্দুরা হিন্দুসমাজের প্রতিনিধি নহেন, কেবল তাঁহারাই প্রতিনিধিস্থানীয় যাঁহারা অবনত শ্রেণীর হিন্দুদের মন্দির-প্রবেশে আপত্তি করেন, এরূপ দাবি মানা যায় না। কংগ্রেসওয়ালা হিন্দুগণ, হিন্দু মহাসভার দেবমন্দিরে পূজক হিন্দুসভ্যগণ, দেবমন্দিরে পূজক এবং দেবমন্দিরের সেবাইত অন্য অনেক হিন্দু অবনত শ্রেণীর হিন্দুদের মন্দির প্রবেশ সমর্থন করেন।

এই সব কারণে বড়লাটের অনুমতি দেওয়া উচিত।

তমলুকের মর্ম্মন্তুদ সংবাদ

পৌষের 'প্রবাসী'তে (৪৫৪ পৃষ্ঠা) আমরা যেরূপ সংবাদ উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, ২৪ পৌষের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নমুদ্রিত চিঠিটিতে তাহার কিছু বিস্তারিত বৃত্তান্ত পাওয়া যাইবে।

তমলুক, ৬ই জানুয়ারী

নন্দীগ্রাম থানার যে সকল নরনারী পিটুনী ট্যাক্স না দিবার সঙ্কল্প করিয়া পিউনিটিভ এলাকা ছাড়িয়া সুন্দরবন ও অন্যান্য স্থানে চলিয়া গিয়াছিল, বিরুদ্ধ আবহাওয়া মধ্যে অর্থাভাবে, অনাহারে ও চিকিৎসার অভাবে তাহাদের মধ্যে ১৩ জন পুরুষ, ৩৬ জন নারী এবং ৩০ জন বালকবালিকা মারা গিয়াছে। নিম্নে তালিকা দেওয়া হইল:—

[এইখানে চিঠিটিতে এক-একটি গ্রাম ধরিয়া উনআশী জন নরনারী ও বালকবালিকার নাম আছে।]

এরূপ শোচনীয় অপমৃত্যু নিবারণের ক্ষমতা গবর্মেণ্টের ছিল ও আছে। যথাসময়ে সংবাদ পাইলে নেতৃস্থানীয় ভারতীয়েরাও এরূপ অপমৃত্যু নিবারণ করিতে পারেন—অবশ্য যদি তাঁহারা জেলের বাহিরে ও স্বাধীন থাকেন।

যাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে, ইতিহাসে তাঁহাদের নাম ও মৃত্যুর কারণ লিখিত না থাকিতে পারে; কিন্তু তাঁহাদের মৃত্যু দ্বারা ইতিহাসের উপাদান সৃষ্ট হইল। তাহার দ্বারা ইতিহাসের ধারা কি বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তিত হইবে না? ইতিহাসের স্রোত কি গতানুগতিক পথেই চলিতে থাকিবে?

"বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মিলন"

বাংলা যাঁহাদের মাতৃভাষা, বাংলা যাঁহারা লেখেন পড়েন, বাংলা সাহিত্যের উন্নতি অবনতিতে যাঁহারা লাভ ক্ষতি গণনা করেন, জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে তাঁহাদের সকলেরই একত্র সম্মিলিত হইয়া সাহিত্যিক বিষয়ের আলোচনা সম্ভবপর। এই কারণে ধর্ম্মসম্প্রদায়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন বাঙালীসমষ্টির স্বতন্ত্র সাহিত্যিক সভার প্রয়োজন নাই, বরং তাহাতে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। কিন্তু উদাসীন থাকা অপেক্ষা পৃথক সভা করা একদিক দিয়া ভাল। সেই জন্য মুসলমান বাঙালীরা যে বাংলা সাহিত্যের আলোচনা নিজেদের মধ্যে করিতেছেন ইহা সন্তোষের বিষয়—বিশেষতঃ যখন তাঁহাদের এই সাহিত্যিক সভার নেতারা বাংলা ভাষাকে বিকৃত করিতে চাহিতেছেন না। আমরা আশা করি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ইঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া সম্মিলিত সাহিত্যিক আলোচনা আদির বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন।

কবি কায়কোবাদের অভিভাষণ

মুসলমান বাঙালীদের এই সাহিত্যিক সভার অধিবেশনে কবি কায়কোবাদ সভাপতির কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণটি মনোগ্রাহী হইয়াছিল। তিনি বাংলা ভাষাকেই মুসলমান বাঙালীদের মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহার শিক্ষা ও চর্চ্চাকে প্রধান স্থান দেন।

বাংলার মুসলমানের ধর্ম্ম-ভাষা আরবী; ফারসী এবং উর্দ্দুও প্রায় সেই পর্য্যায়ভুক্ত। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিতে উর্দ্দু ভাষা শিক্ষারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে গৌণ প্রয়োজন। মুখ্য প্রয়োজন হইল মাতৃভাষার ভিতর দিয়া নিজেদের জাতীয় জীবন গড়িয়া তোলা।

বঙ্গভাষা যে বঙ্গীয় মুসলমানদের মাতৃভাষা, এ-সম্বন্ধে বোধ হয় এখন আর দ্বিমত নাই। অন্ততঃ অধিকাংশ বঙ্গীয় মুসলমানই একথা একবাক্যে স্বীকার করেন। অল্পসংখ্যক যাঁহারা করেন না, তাঁহারা এখনও উর্দ্দুর স্বপ্নেই বিভোর হইয়া আছেন। দীর্ঘ নিদ্রার পর তাঁহারা মাঝে মাঝে গা ঝাড়া দিয়া উঠেন, এবারও সেইরূপ-কিছু আয়োজন দেখা যায়। কিন্তু তাহাতে ভয় বা আশঙ্কার কোন কারণ নাই। প্রকৃতির নিয়মকে উল্‌টাইয়া দিয়া উর্দ্দু কোনরূপেই বাংলার মুসলিম জনসাধারণের ভাষা হইতে পারিবে না। উহা কয়েকজন ভাব-বিলাসীর ভাষা হইতে পারে, ইহার বেশী কিছু নয়।

আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, বাংলা ভাষা কেবল আমাদের মাতৃভাষা নয়, আমাদের জন্মভূমির ভাষা। ইহা হিন্দুরও ভাষা, মুসলমানেরও ভাষা। ইহার উপর হিন্দু-মুসলমান সকলের তুল্য অধিকার। আজ হয়ত কাহারও কাহারও নিকট মুসলমানের সাহিত্য-সাধনার—বাংলা সাহিত্য-সাধনার কোন মূল্য নাই,—কিন্তু এমন একদিন আসিবে, যেদিন ইহার দেহে মুসলমানের দেওয়া অলঙ্কার

দেখিয়া কেহ আর শিহরিয়া উঠিবেন না; হয়ত সেদিন মুসলমানের পরিচর্য্যায় ফলে বাংলা ভাষা নবজীবন লাভ করিবে, উহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আদর্শের ছাপ, আমাদের ভাবের ছাপ, আমাদের সাধনার ছাপ দীপ্যমান হইয়া উঠিবে।—আমি সে আশার স্বপ্ন দেখি।

আমার মাতৃভাষার পরিবর্ত্তনপ্রয়াসী মুষ্টিমেয়কে আমি বলিতে চাই, আমার মায়ের যে-ভাষা, যে-ভাষায় আমি প্রথম কথা বলিতে শিখিয়াছি, যে-ভাষা আমি প্রাণমন দিয়া শিক্ষা করিয়াছি, যে-ভাষায় আমি গল্প করিয়াছি, স্বপ্ন দেখিয়াছি—বন্ধুবান্ধবের সহিত মন খুলিয়া নানা বিষয়ে আলাপ ও আলোচনা করিয়াছি,—গীত গাহিয়াছি, কবিতা লিখিয়াছি, সেই অমৃতোপম ভাষা আমার মাতৃভাষা না হইয়া বাংলার বাহিরের একটি ভাষা যে কেমন করিয়া আমার মাতৃভাষা হইতে পারে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

মুসলমান বাঙালীদের মাতৃভাষার সেবা সম্বন্ধে অতঃপর তিনি বলেন :—

একথা অবিসংবাদিত সত্য যে, মাতৃভাষার অনুশীলন ব্যতীত আমাদের জাতীয় জীবন সম্যকরূপে গঠিত ও প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। যাঁহারা বাঙ্গালী মুসলমানের জন্ম এক প্রকারের বাংলা ভাষা এবং বাঙালী হিন্দুর জন্ম আর এক প্রকারের বাংলা ভাষার প্রচলন দেখিতে চান, আমি তাঁহাদের কেহ নহি। আমি বাংলার হিন্দু এবং বাংলার মুসলমানের জন্ম এক মিলিত ভাষা চাই। আমি ভাষার দিক দিয়া মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার কোনই প্রয়োজন অনুভব করি না। ভাষার দিক দিয়া না করিয়া, ভাবের দিক দিয়া, আদর্শ ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়া স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করিলেই চলিতে পারে এবং মুসলমান হিসাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে এইরূপ স্বাতন্ত্র্যরক্ষার প্রয়োজনও কম নয়। আমি একথা বলিতেছি না যে, সুষ্ঠু ভাবপ্রকাশক আরবী-ফারসী শব্দ বাদ দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে অস্পষ্টভাবপ্রকাশক দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। আমার বক্তব্য এই যে, বাংলা ভাষার গতি ও প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সাহিত্যের দিক দিয়া সকল প্রকার সাধনা করিতে হইবে। আমার নিবেদন এই যে, আমরা যেন বাংলা-ভাষাকে অস্বাভাবিক না করিয়া তুলি। বাংলা-সাহিত্যের বুকে ইসলামী ছাপ ফুটাইয়া তুলিতে হইলে ভাবের দিক দিয়াই উহার বিকাশ করিতে হইবে, প্রচুর আরবী-ফারসী শব্দের প্রচলন দ্বারা তাহা সম্ভবপর হইবে না। আমরা যাহা রচনা করিব, তাহা যেন আমাদের প্রতিবেশীরাও অনায়াসে বুঝিতে পারেন, সে-বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। নতুবা আমাদের রচিত ভাষা বা সাহিত্য সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য ভাষা বা সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

বাংলা দেশ যে আমাদের মাতৃভূমি, এ-বিষয়ে বোধ করি এখন আর কোন শিক্ষিত মুসলমানের সংশয় নাই। এই মাতৃভূমির ভাষা হইবে এক ও অখণ্ডিত। ইহাকে যাঁহারা খণ্ডিত করিতে চান, আমি তাঁহাদের রুচির এবং দেশপ্রেমের প্রশংসা করিতে পারি না। আমার ভরসা আছে, মাতৃভাষাকে দ্বিধাবিভক্ত না করিয়াও আমরা আমাদের কৃষ্টি, সভ্যতা এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে পারিব। উহা বজায় রাখাই আমাদের কাজ,—ভাষাকে দ্বিখণ্ডিত করা নয়।

বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টির প্রথম যুগে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের হাতে ইহার পরিচর্য্যা হয় নাই। ইহার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন তাঁহারা, যাঁহারা বাংলার স্বভাবকবি ছিলেন। সে-কালের বাংলার মুসলমান নবাবগণ এই পরিচর্য্যার প্রভূত সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ বাঙালীর খাঁটি সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং এই সাহিত্যের ভিতর দিয়াই এখন জাতির মনের কথা আত্ম-প্রকাশ করিবার পথ পাইয়াছে। দেশের সাহিত্য দ্বারাই যে দেশবাসীর প্রাণ-শক্তি উপচিত হয়, ইহা কে না স্বীকার করিবে?

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগে মুসলমান কবিদের মধ্যে কবি সৈয়দ আলোয়াল ও দৌলত কাজি অতুলনীয়। দৌলত কাজির—

নবচুত অঙ্কুর কিসলয়মঞ্জুল
রঞ্জিত তরুলতাপুঞ্জে,
কোকিল কাকলি কলকল কূজিত
ললিত ললিত নিকুঞ্জে।

কবিতাতে 'গীতগোবিন্দ'-রচয়িতা জয়দেব গোস্বামীর ঝঙ্কার আছে।

—

খান্ সাহেব সৈয়দ এম্‌দাদ আলীর অভিভাষণ

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন খান্ সাহেব সৈয়দ এমদাদ আলী। তিনি মুসলমান তরুণ সাহিত্যিকদের উদ্দেশে বলেন :—

আমি আমার সমাজের উৎসাহী তরুণ সাহিত্যিকদের বলি, ইহার পূর্ব্বে মুসলমানের দিক দিয়া যে চারিটি সাহিত্য-সম্মিলন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে যে পন্থা অনুসরণ করা হইয়াছিল আপনারা সেই পুরাতন পথ ও মত পরিত্যাগ করিয়া আজ যে নূতন পথ গ্রহণ করিয়াছেন, জ্ঞানের নানা বিভাগের আলোচনার জন্ম যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা কেবল সমীচীন নয়, সুসঙ্গতও বটে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়, যে, আমাদের তরুণদের মনে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য যে বিপুল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে ইহা তাহার বাহ্যপ্রকাশ। আমি এই আকাঙ্ক্ষাকে সকল প্রাণমন দিয়া অভিনন্দন করি।

জ্ঞানের জয়যাত্রার মত বড় যাত্রা আর নাই। আমি আশা করি, আমাদের তরুণের দল জ্ঞানের অন্বেষণে আজ যে শুভযাত্রা করিলেন, তাহা বিজয়মণ্ডিত হইবে। যে আকাঙ্ক্ষার ভিতরে উচ্চ আদর্শ, মহান উদ্দেশ্য লুক্কায়িত থাকে, তাহা কখনও ব্যর্থ হয় না। আপনারা মনে রাখিবেন হীনতার পঙ্কে আদর্শ ও উদ্দেশ্যের মৃত্যু ঘটে, অতএব আপনারা তাহার ছায়াও স্পর্শ করিবেন না।

—

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মিলনের অন্যান্য অভিভাষণ

সাহিত্য-শাখার সভাপতি অধ্যাপক কাজী আব্দুল ওদুদের অভিভাষণে মুসলমান বাঙালীদের পুঁথি সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য, গাথা সাহিত্য, মারফতী সাহিত্য, মুসলমান বাউলদের গান, প্রভৃতি নানা শ্রেণীর সাহিত্যের উল্লেখ ও আলোচনা আছে। এগুলিতে বাঙালীর বিশেষত্ব আছে। বঙ্গে মুসলমানদের সাহিত্যসাধনা কেন কিছু কালের জন্ম অন্য পথ—উর্দূর পথ—লইয়াছিল, বক্তা তাহার আলোচনা করিয়াছেন। এখন পুনর্ব্বার যে মুসলমান বাঙালীরা মাতৃভাষার দিকে ঝুঁকিতেছেন,

তাহার ফল কি হইবে, বক্তা মহাশয় তাহারও আভাস দিয়াছেন।

বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি ডক্টর মুহম্মদ কুদরত্-এ-খুদা প্রধানতঃ আরবদেশের বৈজ্ঞানিকদের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন।

ইতিহাস-শাখার সভাপতি অধ্যাপক জহুরুল ইসলাম এই বলিয়া তাঁহার অভিভাষণ শেষ করিয়াছেন :—

আমাদের প্রতিবেশী হিন্দুসমাজের মধ্যে ইতিহাসের বেশ একটা চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে। এই চর্চ্চা যদিও বর্ত্তমান দেশাত্মবোধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, ইহাও দেশের জন্য একটা শুভ লক্ষণ। ইদানীং বাঙ্গলা দেশে কয়েকখানা উচ্চদরের ইতিহাস রচিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইংরাজী ভাষায়। আমাদের সমাজেও তেমনি একটা চেষ্টা হওয়া প্রয়োজন। তবে আমার বক্তব্য এই যে, ইতিহাস লিখিবার পূর্ব্বে কেহ যেন কোন সংস্কার-বশীভূত না হন। আমি মুসলমানকে ইতিহাস লিখিতে আহ্বান করিতেছি—মুসলমান রূপে নয়, ঐতিহাসিক রূপে। তাঁহারা মুসলমানের ইতিহাস লিখিতে পারেন—মধ্যযুগের মনোভাব লইয়া নয়, থুকিদিদিসের উচ্চ আদর্শ লইয়া, ইবনে খালদুনের ভাবে প্রণোদিত হইয়া। আমীর আলী সাহেব, খোদাবখশ সাহেব আমাদের সম্মুখে উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আমি আপনাদিগকে সে-আদর্শ অনুসরণ করিতে অনুরোধ করি। মুসলমানের বা হিন্দুর ইতিহাস আছে ; মুসলমানী, হিন্দুয়ানী ইতিহাস বলিয়া কিছুই নাই। যাহা কিছু সত্য তাহাই ইতিহাস। ইতিহাসের উচ্চ আদর্শ আপনাদিগকে অনুপ্রাণিত করুক, প্রাচীন মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের সত্যনিষ্ঠা আপনাদিগকে উদ্বুদ্ধ করুক, আপনারা পুনর্ব্বার ভারতে ইতিহাস-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করুন, ইহাই আমার খোদার দরবারে আরজ।

ইতিহাস লেখার অন্ত নাই। আকবর বা আওরংজেব সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিবে চিরকাল। প্রথম চার্লসের প্রাণদণ্ড ন্যায় হইয়াছিল কি অন্যায় হইয়াছিল, সে-সম্বন্ধে সুসভ্য জগতে বিতণ্ডা চলিতেছে এখনও। ঐতিহাসিক সত্যও দেশকালপাত্রভেদে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। সেই ভয়ে সত্য-নিরূপণের চেষ্টা ব্যাহত করিলে চলিবে না। ইতিহাস সত্যেরই গাথা গায়। এই সত্যের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া সংসারে মানব আপন জীবনকে ধন্য জ্ঞান করে।

দর্শন-শাখার সভাপতি অধ্যাপক কাজেমুদ্দীন আহমদ প্রধানতঃ মুসলিম দর্শনের আলোচনা করিয়া পরিশেষে এই আক্ষেপ করিয়াছেন :—

ইমাম গজ্জালীর মৃত্যুর পর আটশত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, ইসলামে স্বাধীন চিন্তার আর আবির্ভাব হয় নাই। যাহা-কিছু দর্শন আলোচনা হইয়াছে, তাহা ধর্ম্মমূলক। চিন্তার স্বাধীনতার সহিত ইসলাম হইতে কর্ম্মের সজীবতাও বিলুপ্ত হইয়াছে। মুসলমানের কর্ম্ম-জীবন এখন গতিহীন, লক্ষ্যহীন ও স্পন্দনহীন। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া শাস্ত্রীয় ধর্ম্মের অন্তঃসারলুপ্ত অনুষ্ঠানগুলি কুসংস্কার ও অজ্ঞতার সহিত মিলিত হইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে এক দুর্লঙ্ঘ্য পাষাণ-প্রাচীর গাঁথিয়া তুলিয়াছে। বাহিরের মুক্ত আলো ও বাতাস হইতে সে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। বর্ত্তমানে জগতের সর্ব্বত্র এক মহাজাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সত্য, সৌন্দর্য্য ও কল্যাণের কুলবধূগণ সহস্র সজ্জায় সজ্জিত ও সহস্র বর্ণে প্রকাশিত হইয়াছে। মানবতার প্রাণশক্তি সাধনায় আকাশ-বাতাস ভরিয়া গিয়াছে। সজাগপ্রাণ উদ্যোগী পুরুষ যাহারা, মুক্তবুদ্ধির চতুর্দ্দোলায় চড়িয়া তাহারা বধূর পানে ছুটিয়া চলিয়াছে। আজ বিজয়লক্ষ্মী তাদেরি অঙ্কে, বিজয়মালা তাদেরি গলায়। আর হতভাগ্য মুসলমান আমরা, জ্ঞান বিজ্ঞান-বিবর্জ্জিত কুসংস্কারের পাষাণ-পুরীতে আবদ্ধ। বাহিরের কর্ম্ম-কোলাহল আমাদের কর্ণে পৌঁছায় না। যুগের ডাকে আমাদের প্রাণ সাড়া দেয় না। এ নিদ্রার কি অবসান নাই ?

—

গিরিশচন্দ্র বসুর অশীতিতম জন্মোৎসব

বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়কে অনেকবার দেখিয়াছি, কিন্তু কখনও মনে হয় নাই, যে, তিনি



অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু

ভারতীয় জীবিত কর্ম্মিষ্ঠ অধ্যাপকদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। অথচ এই সেদিন তাঁহার অশীতিতম জন্মোৎসব হইয়া গেল। শিক্ষিত একজন বাঙালী যে আশী বৎসর বাঁচিয়া আছেন, এবং কেবল বাঁচিয়া নাই, এখনও নিজের কাজ করিতেছেন, ইহাতে তাঁর বয়ঃকনিষ্ঠদের আশা ও উৎসাহ নিশ্চয়ই বাড়া উচিত। তাঁহার দীর্ঘায়ু হইবার একটি কারণ তাঁহার সংযত নিয়মানুগত জীবন। আরও একটি কারণ এই, যে, তিনি রাজনৈতিক আন্দোলন, সামাজিক সংস্কার আন্দোলন প্রভৃতি হইতে দূরে থাকিয়া শিক্ষকের উত্তেজনাবিহীন জীবন যাপন করিয়া আসিতেছেন।

"বাংলা টাইপ ও কেস"

ছাপাখানার সৃষ্টির আগে হইতেই ভাল সাহিত্যের প্রচার নানা-দেশে ছিল। কিন্তু সেকালে সকল লোকে সহজে সাহিত্যরস আস্বাদন করিতে পারিত না। ছাপাখানার দ্বারা উৎকৃষ্টতম পুস্তকও সর্ব্বসাধারণের অধিগম্য হইয়াছে। উহার কাজ যত সহজে করা যাইবে, উহার উন্নতি যত হইবে, সাহিত্য-প্রচারের সুবিধাও তত বাড়িবে। এই জন্য আমরা শ্রীযুক্ত অজরচন্দ্র সরকারের "বাংলা টাইপ ও কেস" সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলির প্রতি বাঙালী সাহিত্যিক, সাংবাদিক, পুস্তক-প্রকাশক, ছাপাখানার মালিক ও টাইপ-ঢালাই কারখানার মালিকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্রতিভায় ও কৃতিত্বে রবীন্দ্রনাথ বাংলার সাহিত্যিকদের নেতা। তিনি বাংলা টাইপের সংস্কারকার্য্যে অগ্রণী হইয়া অপর সকলকে সহযোগিতা করিতে আহ্বান করিলে সুফলের আশা করা যায়।

প্রফুল্লজয়ন্তী স্বদেশী প্রদর্শনী

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নানাবিষয়ক কৃতিত্বের মধ্যে একটি এই, যে, তিনি বঙ্গে দেশী জিনিষের কারখানার স্থাপন কার্য্যে অগ্রণী। এইজন্য তাঁহার জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ছাত্রছাত্রীরা দেশী জিনিষের যে প্রদর্শনী খুলিয়াছিলেন, তাহা সুসঙ্গত কাজ হইয়াছিল। প্রদর্শনীটি দেখিয়া আমাদের মনে হইয়াছে, পণ্যশিল্পে বাঙালীদের মানসিক শক্তি এবং হাতের দক্ষতা যথেষ্ট আছে। যদি মূলধন জুটে এবং দেশের লোকে দেশী জিনিষ ক্রয়ে আরও অধিক উৎসাহ দেখান, তাহা হইলে বাঙালীর প্রয়োজনীয় অধিকাংশ জিনিষ বঙ্গে প্রস্তুত হইতে পারে। প্রদর্শনী সার্থক এবং উহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে।

অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত

অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাসগুপ্তের মৃত্যুতে বাংলা দেশ এক জন বিদ্যোৎসাহী ভূতত্ত্ববিৎ হারাইল। তিনি অধ্যাপন এবং নিজ আলোচ্য বিদ্যা ভূতত্ত্ব ব্যতীত সাধারণভাবে সাহিত্যোৎসাহীও ছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-পরিচালনে তিনি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সহকর্ম্মী ছিলেন, এবং তাঁহার মৃত্যুর পরও পরিষদের কার্য্যের সহিত দাসগুপ্ত মহাশয়ের যোগ ছিল।

"বোধনা" সমিতির কাজে উৎসাহ

"বোধনা" সমিতি কি কাজ করিতে চান এবং কেন তাহা করিতে চান, তাহা অন্যত্র শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। এই সমিতির প্রতিষ্ঠানটি নির্ম্মাণের জন্য ঝাড়গ্রামের রাজা নরসিংহ মল্ল দেব, বি-এ, মহাশয় কলিকাতার মাপের প্রায় আড়াই শত বিঘা জমি দান করিয়াছেন। কোন্ খানে জমি লইলে সমিতির কাজের সুবিধা হইবে, তাহা দেখিবার জন্য আমি গিরিজাবাবুর সহিত কয়েক দিন পূর্ব্বে ঝাড়গ্রাম গিয়াছিলাম। ঝাড়গ্রামের রাজার সৎকর্ম্মোৎসাহী সুযোগ্য দেওয়ান শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সাহায্যে আমরা কয়েকটি জায়গা দেখিয়া একটি নির্ব্বাচন করিয়া আসিয়াছি। স্থানটি মনোরম ও অতিশয় স্বাস্থ্যকর। নিকটেই শালবন ও অন্যান্য গাছের বন আছে, কিন্তু হিংস্র জন্তুর ভয় নাই। নিকট দিয়া পাকা রাস্তা গিয়াছে। শীঘ্রই গৃহাদি নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইবে। সমিতির হাতে টাকা নাই। সমিতি কেবল এই বিশ্বাসে কাজে অগ্রসর হইতেছেন, যে, ভগবান্ সদাশয় মানুষদের হাত দিয়া আর্থিক ও অন্যবিধ সাহায্য জুটাইয়া দিবেন।

বিশ্বভারতীর পহ্‌লবী অধ্যাপক

পারস্যের শাহ্‌ বিশ্বভারতীতে পহ্‌লবী অধ্যাপকের কাজ করিবার জন্য পারস্যের বিখ্যাত কবি, মনীষী ও বিদ্বান পুর্-ই-দাউদকে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি ইরানী কৃষ্টি ও বিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষা দিবেন। শান্তিনিকেতনে সম্প্রতি তাঁহার আগমনে তাঁহার সমুচিত অভ্যর্থনা হইয়াছে।

পারস্যের এই কবি সম্বন্ধে জানুয়ারী মাসের মডার্ন্‌ রিভিউ পত্রে একটি সচিত্র প্রবন্ধ আছে। তাহাতে তাঁহার উদ্দীপনা ও স্বদেশপ্রেমপূর্ণ কবিতার অনুবাদ আছে।

—

হেমচন্দ্র সরকার

ডক্টর হেমচন্দ্র সরকার, এম-এ, ডি-ডি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য্য ও প্রচারক ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। অর্থ উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত না হইয়া তিনি সাধনায় এবং সমাজহিতব্রতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। অনেক বৎসর বাংলা ও আসামের অনুন্নত শ্রেণীসমূহের উন্নতিবিধায়িনী সমিতি তাঁহার অনুরাগ উৎসাহ ও পরিশ্রমে উপকৃত হইয়াছিল। এখন এই সমিতি প্রায় সাড়ে চারিশত বিদ্যালয় চালাইতেছেন। তাহাতে সকল জা'তের ছেলেমেয়েরা পড়ে। হেমবাবুর মত অদম্য সৎকার্য্যানুরাগ ও কর্ম্মোৎসাহ আমি অল্পই দেখিয়াছি। কুড়ি বৎসরেরও অধিক কাল তিনি দুরারোগ্য রোগে ভুগিতেছিলেন। অথচ তিনি এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে ধর্ম্মপ্রচারার্থ ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। জীবনের শেষ ছয় বৎসর তিনি দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়াছিলেন, রোগ বশতঃ তাঁহার কথা প্রায় বুঝা যাইত না, এবং তিনি কঙ্কালসার হইয়া গিয়াছিলেন। অথচ তাঁহার কাজের বিরাম ছিল না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, তিনি এই সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও চৈতন্যদেবের জীবনচরিত প্রভৃতি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট বাংলা ও ইংরেজী গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন।

হেমবাবু অক্সফোর্ডের ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজে তত্ত্ববিদ্যাবিষয়িনী শিক্ষা লাভ করেন। তিনি যদিও খ্রীষ্টিয়ান ছিলেন না, তথাপি তাঁহার জ্ঞানবত্তা এবং ধর্ম্মপ্রচার ও সমাজহিতসাধনে উৎসাহের জন্য আমেরিকার ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টিয়ানদিগের মীডভিল্‌ তত্ত্ববিদ্যা



میرزا ابراهیم خان پورداود

মির্জ্জা ইব্রাহিম খাঁ পুর-ই-দাউদ

শিক্ষায়তন তাঁহাকে সম্মানসূচক ডক্টর অব্‌ ডিভিনিটি ("পরমার্থতত্ত্বের আচার্য্য") উপাধি প্রদান করেন।

—

ললিতমোহন দাস

ললিতমোহন দাস মহাশয় দীর্ঘকাল সিটি স্কুল ও কলেজে শিক্ষকের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ উপলক্ষ্যে যখন বাংলা দেশে স্বদেশী পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য এবং বিদেশী পণ্যদ্রব্যের বর্জ্জনের নিমিত্ত প্রবল আন্দোলন হয়, তখন তিনি একাগ্রতা ও উৎসাহের সহিত তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। আনুষঙ্গিক রাজনৈতিক আন্দোলনেরও তিনি একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী ছিলেন। এই আন্দোলন দমনের জন্য যে-সকল সরকারী উপায় অবলম্বিত হয়, তাহার মধ্যে একটি এই, যে, যে-সব লোক রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিবেন, তাঁহারা—সরকারী ত নহেই—বেসরকারী শিক্ষালয়-সকলেও শিক্ষক বা অধ্যাপকের কাজ করিতে পারিবেন না। ললিতমোহন দাস মহাশয় দরিদ্র হইলেও শিক্ষকতা ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু রাজনীতির সংস্রব ছাড়িলেন না। কংগ্রেসের সহিত তিনি বরাবর যোগ রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। যখন কংগ্রেস অসহযোগ নীতি অবলম্বন করেন, তিনি তখনও উহার সহিত যোগ রক্ষা করিয়া চলেন, এবং তিনি দীর্ঘকাল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন। উহার প্রেসিডেন্টের কাজও তিনি কিছু দিন করিয়াছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে তাঁহাকে কারাদণ্ডও ভোগ করিতে হইয়াছিল। "সঞ্জীবনী"র সম্পাদকীয় বিভাগের সহিত বহু বৎসর তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তিনি বরিশালের সেবা সমিতির অন্যতম নেতা ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অতি শ্রদ্ধাভাজন অন্যতম আচার্য্য ছিলেন।

—

"প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন"

গত (পৌষ) মাসে এলাহাবাদে "প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে"র দশম অধিবেশন হয়। নামের সাদৃশ্য আছে বলিয়া বলা দরকার, 'প্রবাসী' কাগজের নাম অনুসারে এই সম্মেলনের নামকরণ হয় নাই, স্বাধীন ভাবেই হইয়াছিল। এই অধিবেশনে বিচারপতি স্যর লালগোপাল মুখোপাধ্যায় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি, অধ্যাপক নলিনবিহারী মিত্র কোষাধ্যক্ষ, অধ্যাপক কিরণচন্দ্র সিংহ অভ্যর্থনা-সমিতির কার্য্যাধ্যক্ষ এবং শ্রীমতী প্রতিভা দেবী মহিলা-বিভাগের সম্পাদিকার কাজ করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই বিশেষ সৌজন্য, বুদ্ধি, শৃঙ্খলা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত নিজ-নিজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। স্থানীয় এংলোবেঙ্গলী ইণ্টারমীডিয়েট কলেজে প্রতিনিধি-নিবাস নির্দিষ্ট হইয়াছিল। এই কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মহাশয়ের পরিচালনায় ছাত্রেরা দিবারাত্রি প্রতিনিধিদের সেবাযত্ন করিয়াছিল। তাঁহাদের ব্যবহারে ও পরিশ্রমে সকলে সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। পৌষের প্রবাসীর ৪৫৫ পৃষ্ঠায় মহিলা-বিভাগের ও সঙ্গীতশাখার সভানেত্রী-দ্বয়ের এবং অন্যান্য শাখার সভাপতিগণের নাম দেওয়া আছে।

সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ ঘোষের তত্ত্বাবধানে একটি শিল্প-প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল, তাহাতে প্রদর্শিত সূচিশিল্পের নমুনাগুলি ও চিত্রাদি দর্শকদিগের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল বঙ্গের বাহিরেও যে বাঙালী মহিলা ও পুরুষেরা তাঁহাদের জাতীয় ললিত-কলানুরাগ রক্ষা করিতেছেন, ইহা সাতিশয় আনন্দের বিষয়।

অধিবেশনের প্রতিদিনই শ্রোত্রী ও শ্রোতাদের সংখ্যা যথেষ্ট এবং স্থানীয় উদ্যোক্তাদের আশাতীত হইয়াছিল। মহিলা-বিভাগের অধিবেশনে মহিলাদের উপস্থিতি যথোচিত হইয়াছিল। সমগ্র অধিবেশনটির সফলতা সকলে অনুভব করিয়াছিলেন।

সভাপতি নিজের বক্তৃতা আগে হইতে লিখিয়া লইয়া পাঠ করিতে না পারায় এবং তাহার কোন রিপোর্ট হস্তগত না হওয়ায় তাহার কোন অংশের তাৎপর্য্য দিতে পারিলাম না। প্রথমে উহাতে নানা তথ্য ও ষ্টাটিষ্টিক্‌স্‌ দ্বারা ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, যে, সাহিত্যের প্রসার উৎকর্ষ ও চর্চ্চা বৃদ্ধি শিক্ষাবিস্তারের ও শিক্ষিত লোকদিগের সংখ্যার উপর নির্ভর করে। পরে অন্যান্য বিষয়ও আলোচিত হয়। সাহিত্যশাখার সভাপতি বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সুলিখিত ও মুদ্রিত অভিভাষণের শেষে যে-কয়টি কথা বলেন, তাহার মর্ম্ম নীচে দিতেছি।

ভারতের সাধনার মূলে আসক্তি, বা কামনা, বা তৃষ্ণা, বা কামের ত্যাগ, এবং তাহাতেই নিজের ও পরের সকলেরই কল্যাণ। ভারতের সাধনার মূল এই মাত্র মনে করিয়াই যে, ইহা গ্রহণ করিতে হইবে তাহা নহে। যে-কোনো কারণেই হউক, ভারতের প্রতি কাহারো কোনো শ্রদ্ধা বা অনুরাগ থাকিলে তিনি তাহার সাধনকে মানিয়া লইয়া চলিতে পারেন, কিন্তু অন্যে সে জন্য তাহা মানিবেন কেন? ভারতে জন্ম হইলেও কেহ তাহা না মানিতে পারেন। তাই বুদ্ধদেবের মত বলিতে হয়, সম্প্রদায় বা আগম বলিয়া নহে, কিম্বা কোনো শাস্ত্রের কথা বলিয়া নহে, বিশেষ কোনো ব্যক্তির কথা বলিয়া নহে, কিন্তু যদি নিজে বুঝিয়া-শুনিয়া ভাবিয়া-চিন্তিয়া মনে হয়, যে ভারতের এই আদর্শ ঠিক, অর্থাৎ কল্যাণের জন্য, তবেই তাহা কেহ গ্রহণ করিতে পারেন। বুদ্ধদেব শিষ্যগণকে বলিতেন, "ভিক্ষুগণ, স্বর্ণ গ্রহণ করিতে হইলে পণ্ডিতেরা যেমন তাহা কাটিয়া ঘষিয়া ও পোড়াইয়া

পরীক্ষা করিয়া তবে তাহা গ্রহণ করেন, তেমনি তোমরা আমার কথা পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিবে, আমার প্রতি তোমাদের গৌরব-বুদ্ধি হেতু গ্রহণ করিও না।" অতএব যদি সত্য সত্যই মনে হয় যে, ভোগে আসক্তি মহানর্থের মূল, তবে যাহাতে তাহা পরিহার করিতে পারা যায় তাহাই যে, নিজের ও অন্যের হিতৈষী ব্যক্তির কর্ত্তব্য, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ইহা না করিয়া যদি কেহ নিজেরই হউক বা অন্যেরই হউক, ভোগাসক্তিকে উত্তরোত্তর বাড়াইয়া চলেন, তবে তাহার পরিণাম কি হয় ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

কিছুদিন হইতে সাহিত্যক্ষেত্রে একদল নবীন লেখককে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইঁহারা 'তরুণ সাহিত্যিক' নামে পরিচিত হইয়াছেন। অতি তীব্র ভোগাসক্তি বা ইন্দ্রিয়সুখলালসার উত্তেজনাই ইঁহাদের রচনার বিশেষত্ব। সময়ে সময়ে ইহা এতদূর পর্য্যন্ত গিয়া পড়িয়াছে যে, সমস্ত মর্য্যাদা বা সীমা উল্লঙ্ঘিত হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বহু-বহু পরীক্ষার পর সার বলিয়া যাহা সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্য দান করিয়াছে, আজ ইঁহারা তাহারই উচ্ছেদের জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

পশ্চিম হইতে লইবার বহু জিনিষ আছে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহা কিছু পশ্চিমের তাহাই নির্ব্বিচারে লইতে হইবে, এ বুদ্ধি বড় ভয়ানক। 'তরুণ সাহিত্যিকে'রা যাহা লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছেন তাহা পশ্চিমের আমদানী। পশ্চিম তাহা লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছে, সে পরীক্ষা এখনো শেষ হয় নাই। সে ঠেকিয়া শিখিবে, নিশ্চয়ই শিখিবে। আর যদি না শিখে তো নাই শিখিল। ভারত যখন বহু পূর্ব্বেই বার-বার পরীক্ষা করিয়া তাহার কু-পরিণাম দেখিতে পাইয়াছে, তখন সে কেমন করিয়া ঐ অসংযমেরই পথে অগ্রসর হইবে? যাহা ভাল লাগে তাহাই কল্যাণ নহে। প্রেয় হইলেই তাহা শ্রেয় হয় না। প্রেয় এক, শ্রেয় আর এক। দুই-ই মানুষের কাছে আসে। বিচার করিয়া যিনি শ্রেয় গ্রহণ করেন তাঁহারই হয় কল্যাণ।

অর্থনীতি-শাখার সভাপতি অধ্যাপক যোগীশচন্দ্র সিংহের মুদ্রিত অভিভাষণটি অর্থনীতি সম্বন্ধে তাঁহার ঐতিহাসিক জ্ঞান, এবং ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, গোষ্ঠিবাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞান ও ধীর চিন্তার পরিচায়ক। তিনি এই বলিয়া তাঁহার বক্তব্য শেষ করেন, যে,

ধনতন্ত্র যেমন আংশিক পরিমাণে কল্যাণকর, জাতীয়তাবোধও তেমনই নিছক মন্দ নয়। অন্ততঃ আমাদের দেশে ত নয়ই। পাশ্চাত্য-দেশে জাতির ধর্ম্ম এই যে, দুর্ব্বল দেশকে নিপীড়ন ক'রে শক্তিশালী দেশগুলিকে আরও শক্তিমান্ করা। ওখানকার আন্তর্জাতিক মতবাদ একটা কথার কথা মাত্র। কারণ তা না হ'লে নিরস্ত্রীকরণ, যুদ্ধঋণ, যুদ্ধের খেসারত, আমদানী জিনিষের উপরে চড়াশুল্ক এসবেরই একটা সমাধান এতদিনে হ'য়ে যেত। আমাদের দেশে জাতিপ্রেমের ফলে যদি আমরা শিল্প বাণিজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করি এবং আমাদের অর্থনৈতিক শক্তি লাভ হয় তা হ'লে আর আমাদের দেশের সঙ্গে অন্য দেশের মিলন মৃৎপাত্রের সঙ্গে কাংস্যপাত্রের মিলনের মত হবে না। অন্ততঃ এটি নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, দেশের যাবতীয় অভাব দূর করুতেই আমাদের অনেক দিন লাগবে; অন্ততঃ ততদিন দুর্ব্বল বিদেশের উপরে শ্যেনদৃষ্টি দেওয়া আমাদের দরকারই হবে না। তথাপি জাতিপ্রেমের নামে জাত্যাভিমান যা'তে আমাদের না পেয়ে বসে সেই বিষয়ে সাবধান হওয়া আবশ্যক। এখানেও সেই মনোভাবের কথা শুধু প্রতিষ্ঠানের কথা নয়। ভারতের ভাগ্যে কি আছে জানি না। কিন্তু যে-শক্তি ভারতের ভাগ্যবিধাতা হবে, সে শক্তিকে জনগণ-মন-অধিনায়ক হ'তে হবে। অন্য উপায় নেই।

ইতিহাস-শাখার সভাপতি রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের অভিভাষণ আগে হইতেই আমরা পাইয়াছিলাম বলিয়া তাহা এই সংখ্যায় অন্যত্র মুদ্রিত হইল। তিনি সংক্ষেপে মৌখিক তাঁহার বক্তব্য চিত্র-সহযোগে বেশ হৃদয়গ্রাহী করিয়াছিলেন। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান-অধ্যাপনা-কক্ষ ও লণ্ঠন ব্যবহার করিতে দেওয়ায় চন্দ-মহাশয়ের বক্তৃতা বিশদ করিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতার পর অধ্যাপক ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে-প্রবন্ধটি পড়েন, তাহাতে তাঁহার বিস্তৃত শাস্ত্রাধ্যয়ন, প্রগাঢ় চিন্তাশীলতা ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা আর্য্য ও অনার্য্য সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহাতে উপস্থিত সকলেরই বুঝিতে পারা উচিত, যে, তিনি কেবল পদার্থ-বিদ্যাবিৎ বৈজ্ঞানিক নহেন, পরন্তু অন্য বহু বিদ্যাও তাঁহার অধিগত।

অন্যান্য শাখার সভাপতিদিগের এবং সঙ্গীত-শাখার সভানেত্রীর অভিভাষণও মনোগ্রাহী এবং শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল। সেগুলির কোন হস্তলিখিত বা মুদ্রিত প্রতিলিপি আমাদের নিকট না-থাকায় তাহাদের কোন অংশের তাৎপর্য্য দিতে পারিলাম না। মহিলা-বিভাগে পুরুষদের প্রবেশাধিকার ছিল না। সভানেত্রীর অভিভাষণের মুদ্রিত বা হস্তলিখিত কোন প্রতিলিপিও সম্মুখে না থাকায় তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলাম না।

অবাঙালীরা যেমন কোন-না-কোন বিষয়কর্ম্ম দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত বাংলা দেশে আসিয়া কিছুকাল থাকেন বা ইহার স্থায়ী বাসিন্দা হন, বাঙালীরাও সেই উদ্দেশ্যে ও সেই প্রকারে বঙ্গের বাহিরে গিয়াছেন। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকদের এই প্রদেশান্তর গমনের উপলক্ষ্য যাহাই হউক, তাহাকে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে উচ্চতর ফলের উৎপাদক করিতে পারিলে সমগ্র ভারতবর্ষ লাভবান্ হইবে। কেবল প্রবাসী বাঙালীদের কথাই এখন বলি।

আমরা প্রবাসী বাঙালীদিগকে অন্যান্য প্রদেশে বঙ্গের কালচার্যাল দূত (cultural ambassador) মনে করি। কালচার কথাটির ঠিক্ প্রতিশব্দ কৃষ্টি, সংস্কৃতি, চিত্ত-প্রকর্ষ, বা অন্য কিছু শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইবে বলিতে পারি না; কিন্তু কাল্‌চার বলিতে কি বুঝায় তাহা শিক্ষিত বাঙালীরা জানেন। আমরা প্রবাসী বাঙালী-দিগকে বঙ্গের কালচার্যাল দূত এ অর্থে বলিতেছি না, যে, তাঁহারা বক্তৃতা দ্বারা নিজ নিজ কর্ম্মস্থানে বঙ্গের কালচার প্রচার করিবেন। তাহা তাঁহারা কেহ কেহ করিতে

পারিলে ত ভালই হয়। কিন্তু তাঁহাদের সমগ্র জীবনে বঙ্গের সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যাইবে, ইহাই আমাদের বক্তব্য। সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহারা যে প্রদেশে বাস করিবেন, তথাকার সংস্কৃতি দ্বারাও নিজের হৃদয়মনের সমৃদ্ধি বাড়াইতে চেষ্টা করিবেন।

নিজের জীবনে বঙ্গের সংস্কৃতির পরিচয় দিতে গেলে উহার সাহিত্যের ও ললিতকলার চর্চ্চা রাখা আবশ্যক। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ইহা আমরা অন্যতম লক্ষ্য মনে করি। এলাহাবাদে ইহার দশম অধিবেশনে নানা দূরবর্ত্তী স্থান হইতে মহিলা ও পুরুষ প্রতিনিধিগণ আসিয়াছিলেন দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম। আমরা যে-লক্ষ্যটির কথা বলিলাম, তাহা স্পষ্টতঃ সকলের মনে না থাকিলেও এই বার্ষিক মিলন দ্বারা সম্মেলনের উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে সিদ্ধ হইবে। আরও অধিক পরিমাণে উহা সিদ্ধ হইবে, যদি সম্মেলনের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি সারা বৎসর কর্ম্মশীল থাকেন।

—

তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠক

গোলটেবিল বৈঠক নামধেয় বৈঠকের অধিবেশনের তৃতীয় পালা শেষ হইয়াছে। ফল কি হইল, তাহার পরিষ্কার আভাস পাওয়া যাইবে এই অনুষ্ঠানটির সম্বন্ধে হোয়াইট পেপার বা "শাদা কাগজ" নামক সরকারী বিবৃতি বাহির হইবার পর। ভারতবর্ষের লাভের দিক দিক দিয়া হয়ত উহা বাস্তবিকই শাদা কাগজ হইবে—অর্থাৎ উহাতে প্রকৃত লাভের কথা কিছুই লিখিত থাকিবে না। কিন্তু লাভের কথা লিখিত না থাকিলেও উহা বাস্তবিক শাদা কাগজ এই অর্থে না হইতে পারে, যে, উহাতে কৃষ্ণবর্ণ অক্ষরে লিখিত অনেক বাক্য হইতে ভারতবর্ষের ক্ষতি অনুমিত হইতে পারিবে।

গত ২৭শে ডিসেম্বর ভারত সচিব স্যার সামুয়েল হোর রেডিও দ্বারা গোলটেবিল বৈঠকের ফল সংক্ষেপে বলেন। তাহাতে এই সিদ্ধান্তের কথা আছে, যে, ভারতবর্ষকে অধিকতর পরিমাণে স্বশাসন ("a greater measure of self government") দিতে হইবে। আমাদের এখন যে অধিকার আছে, তাহাতে অতি সামান্য একটু যোগ করিয়া দিলেও তাহাকে "অধিকতর" বলা চলিবে! অথবা, যেহেতু খুব খাঁটি সত্য কথা বলিতে গেলে, ভারতীয় লোকদের নানাবিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতা মোটেই নাই বলিয়া তাহা শূন্যের সমষ্টি দ্বারা নিম্নলিখিত গাণিতিক রূপে প্রকাশিত হইতে পারে—

০০০০০০০০ ইত্যাদি;

সেই জন্য এই শূন্যসমষ্টিতে নিম্নলিখিত রূপে আরও কতকগুলি শূন্য যোগ করিয়া দিলে তাহা "অধিকতর" হইতে পারে:—

০০০০০০০০০০০০ ইত্যাদি।

ভারত-সচিব আরও বলিয়াছেন, যে, দেশী রাজাদের অধিকারের উপর কোন হস্তক্ষেপ করা চলিবে না—ফেডারাল গবন্মেণ্টকে তাঁহারা যাহা ছাড়িয়া দিবেন, তাহা ছাড়া। দেশী রাজারা অনিয়ন্ত্রিত স্বামিত্ব বা স্বৈরতন্ত্রের ভক্ত। তাঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে থাকিবেন, অথচ সেই ভারতবাসীরা স্বশাসক হইবে যাহাদের একটি অংশ দেশী রাজ্যসমূহের প্রজারা, ইহা ত নিতান্ত স্ববিরোধী বাক্য।

ভারত-সচিব তৃতীয় কথা এই বলিয়াছেন, যে, ভারতবর্ষের উপর দাবিগুলি ("obligations") এবং ভারতবর্ষের সহিত ব্রিটেনের অংশীদারত্ব সংরক্ষিত ("safe-guarded") করিতে হইবে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের নামে ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট যত ঋণ করিয়াছেন ও করিবেন, তাহা ভারতবর্ষের স্বকৃত না হইলেও এবং তাহাতে ভারতবর্ষের স্বাধীন সম্মতি না থাকিলেও ভারতবর্ষকে সেগুলা সুদ সমেত শোধ করিতে হইবে। ভারতের ও ব্রিটেনের অংশীদারত্বের মানে ত সবাই বুঝে। আমরা ব্রিটেনের শত্রুতা চাই না, তাহার শত্রুতা করিতেও চাই না—পারস্পরিক বন্ধুত্ব চাই। কিন্তু বন্ধুত্ব করিতে হইলে ব্রিটেন যেমন স্বশাসক ভারতবর্ষেরও তেমনি স্বশাসক হওয়া চাই। তাঁবেদারী বন্ধুত্ব নয়, অংশীদারত্বও বন্ধুত্ব নয়।

ভারত-সচিব গোড়াতেই বলেন—

"For more than two years we have been trying to harmonize the three elements, viz. Britain British India, and Indian States."

"আমরা দুই বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া ব্রিটেন, ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষ এবং ভারতীয় দেশী রাজ্যসমূহ এই তিনটি উপাদানের সামঞ্জস্য বিধান করিতে চেষ্টা করিতেছি।"

ব্রিটিশ রাজপুরুষদের এই চেষ্টা কলিকাতার সখের কন্সার্ট পার্টি নামক ঐকতান বাদ্যের দলগুলির বাজনা মনে পড়াইয়া দেয়। তাহাতে ভারতীয় বীণার নামগন্ধও নাই—সকল যন্ত্রের আওয়াজ ছাড়াইয়া উঠিতে শোনা যায় ক্লারিয়োনেট আদি ব্রিটিশ বাদ্যযন্ত্রের। যে হারমনি বা স্বরসঙ্গতি উৎপাদন স্যর স্যামুয়েল হোরের অভিপ্রেত, তাহাতে ব্রিটেনের হুকুমের ভীমনাদই শোনা যাইবে, ভারতের ক্ষীণ অনুনয়ধ্বনি কর্ণগোচর হইবে না।

—

জাপানের চীন আক্রমণ

জাপান পুনর্ব্বার চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। চীনে সাম্রাজ্য লুপ্ত করিয়া তথাকার বিপ্লবী নেতারা শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পারিবার পূর্ব্বেই সেই দেশকে

অন্তর্বিপ্লব ও বৈদেশিকের আক্রমণ প্রতিহত করিতে হওয়ায় জাপান সুবিধা পাইয়াছে। লীগ অব নেশুন্স বা তাহার অন্তর্ভূত ব্রিটেন আদি মহাশক্তিসকল জাপানকে ডাকাইতি হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিতেছেন না বা চাহিতেছেন না। আমেরিকাও কার্য্যতঃ কিছু করিতেছেন না। এক দেশ অন্যায়ভাবে অন্য দেশ দ্বারা আক্রান্ত হইলে, যে-যুগে আত্মরক্ষার জন্য অন্য কোন দেশের সাহায্য পাইত, সে-যুগ যেন আর নাই।

সম্ভবতঃ জাপান বহু বৎসর হইতে বিশাল চীন সাধারণতন্ত্রের বৃহৎ একটি অংশ দখল করিবার আয়োজন করিতেছিল। গত মহাযুদ্ধের আগে, ১৯১৪ সালে, পৃথিবীর বড় বড় দেশ যুদ্ধায়োজনে যত ব্যয় করিত ১৯৩০-৩১ সালে তাহা অপেক্ষা এক জার্ম্মেনী ছাড়া আর সকলেরই ব্যয় বাড়িয়াছে। জার্ম্মেনীর কমিয়াছে শতকরা ৬৩; বাড়িয়াছে ব্রিটেনের শতকরা ৪২, ফ্রান্সের ৩০, ইটালীর ৪৪, জাপানের ১৪২, রুশিয়ার ১৩০, আমেরিকার ১৯৭। ১৯৩০-৩১ সালে সামরিক-বিভাগের ব্যয় আমেরিকার ছিল ২০৮ নিযুত পাউণ্ড, রুশিয়ার ১৬৬ নিযুত পাউণ্ড, ব্রিটেনের ১৫৩, ফ্রান্সের ১৩০, জাপানের ৬৯। সুতরাং আমেরিকা, এবং ইউরোপের কয়েকটি দেশ জাপানের ডাকাতিতে বাধা দিতে সমর্থ। তবে, বাধা দিবার ইচ্ছা তাঁহাদের না থাকিতে পারে।

—

ডি ভ্যালেরা

ডি ভ্যালেরা আয়ার্ল্যাণ্ডকে রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক দিয়াই স্বাধীন করিতে চান। শীঘ্রই আইরিশ পার্লেমেণ্টের সভ্য-নির্ব্বাচন নূতন করিয়া হইবে। তাহাতে ডি ভ্যালেরার দলের সভ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্ব্বাচিত হইলে (এবং তাহা হইবারই সম্ভাবনা) তিনি স্বদেশকে স্বাধীন করিবার সুযোগ পাইবেন। তখন ব্রিটেন বলপ্রয়োগ দ্বারা তাহাতে বাধা দিবেন কি না, দেখা যাইবে।

—

দশ বৎসরে ফিলিপাইন্সের স্বাধীনতা

প্রশান্ত মহাসাগরের ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ৩৩ বৎসর আমেরিকার অধীন আছে। দশ বৎসর পরে ফিলিপিনোদিগকে স্বাধীনতা দিবার জন্য একটি আইন আমেরিকার ব্যবস্থাপক সভা কংগ্রেসের উভয় কক্ষে পাস্ হইয়াছে। এখন উহাতে প্রেসিডেণ্ট সম্মতি দিলেই দশ বৎসর পরে ফিলিপিনোরা স্বাধীনতা পাইবে। বিনা-যুদ্ধে পরাধীন জাতির স্বাধীনতা প্রাপ্তির ইহা একটি দৃষ্টান্ত হইবে।

—

বোম্বাইয়ে বার্ণার্ড শ

বিখ্যাত লেখক জর্জ বার্ণার্ড শ দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। বোম্বাই বন্দর পৌঁছিয়াছেন, জাহাজেই আছেন, ডাঙায় নামেন নাই। সেখানে খবরের কাগজের লোকেরা তাঁহাকে নানা প্রশ্ন করিয়াছে এবং তিনিও রসিকতা ও ব্যঙ্গের সহিত উত্তর দিয়াছেন। তাঁহার উত্তরগুলির রস অনুবাদে রাখা কঠিন। এখানে কেবল দুটি উত্তরের দুটি অংশের উল্লেখ করিব।

"যদি ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের সহিত আপনাদের বিরোধ হয়, আশা করিবেন না, যে, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া বা আমেরিকা তৎক্ষণাৎ আপনাদের সাহায্যার্থ দৌড়িয়া আসিবে। তাহারা আপনাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য একটি আঙুলও তুলিবে না। ভারতের সব কাজ ভারতীয়দিগকেই করিতে হইবে, বিদেশীদিগকে নহে।"

সত্য কথা, এবং আগে হইতেই আমাদের জানা কথা।

"গান্ধী যদি ষাট লক্ষ মানুষ মারিতে পারিতেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার কথা শিরোধার্য হইত।"

ইহা ব্যঙ্গের সুরে বলা হইলেও সত্য কথা। অবশ্য, মহাত্মা গান্ধীর এক জন মানুষকেও বধ করিবার ইচ্ছা নাই, কাহারও সেরূপ ইচ্ছা থাকিলে তিনি বরং তাহাকে নিবৃত্ত করিতেই চেষ্টা করিবেন। বার্ণার্ড শ কেবল সভ্য মানুষের যেরূপ মনোবৃত্তি এখনও আছে, তাহাই যথাযথ বলিয়াছেন। জ্ঞানে সাত্ত্বিকতায় কোন জাতি বড় হইলেও, যতক্ষণ তাহার যুদ্ধশক্তি ভয়াবহ না হয়, ততক্ষণ তাহাকে অন্য কোন জাতি গ্রাহ্যই করে না।

—

জাতীয় ঐক্য ও বাঙালী হিন্দু

এলাহাবাদে জাতীয় ঐক্যের জন্য যে কন্‌ফারেন্স হইতেছিল, তাহাতে মুসলমান পক্ষ হইতে এই প্রস্তাব হয়, যে, বঙ্গের হিন্দু প্রভৃতিরা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের জন্য বরাদ্দ ৮০টি আসন হইতে কয়েকটি ছাড়িয়া দিয়া মুসলমানদের ১২৭টি পূর্ণ করিয়া দিউন, তাহা হইলে মুসলমানেরা "ঐক্যে" মত দিবেন। মুসলমানেরা যে যে প্রদেশে সংখ্যান্যূন সর্ব্বত্রই তাঁহাদের সংখ্যানুপাতের অধিক আসন পাইয়াছেন। বঙ্গে হিন্দু প্রভৃতিরা সংখ্যান্যূন। তাঁহারা সংখ্যানুপাতের অতিরিক্ত আসন ত পানই নাই, তাহা অপেক্ষা অনেক কম পাইয়াছেন। তাহা হইতেও কিছু ছাড়িয়া দিয়া মুসলমানদিগকে আইনানুসারে গরিষ্ঠতম দল বানাইতে হইবে! এরূপ "ঐক্যকে" বঙ্গের হিন্দু প্রভৃতিরা অগত্যা গড় করিয়া বিদায় লইয়াছেন।

—

পুণা-চুক্তি ও বঙ্গের হিন্দুগণ

বঙ্গের হিন্দুদের অসাক্ষাতে ও তাহাদের বিনা

সম্মতিতে হিন্দুদিগকে যে বর্ণহিন্দু ও অবনত হিন্দু এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, এবং (অবনত হিন্দুদের সংখ্যা জানা না-থাকা সত্ত্বেও) অবনত হিন্দুদিগকে ৩০টি আসন দেওয়া হইয়াছে, বাঙালী "উচ্চ" শ্রেণীর হিন্দুরা তাহাতে বরাবর অসন্তুষ্ট ছিলেন।

সম্প্রতি সকল দলের হিন্দুরা একত্র হইয়া এই চুক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং প্রধান মন্ত্রীকে ইহা অগ্রাহ্য করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই প্রতিবাদ ও অনুরোধ ন্যায়সঙ্গত। আমাদের এই মতের কারণ বিবিধ প্রসঙ্গের গোড়ার দিকে বলিয়াছি।

—

যোগীরা "অবনত" হইতে চান না

বঙ্গের যোগী জাতির লোকেরা "অবনত" বলিয়া গণিত হইতে চান না। মাহিষ্যেরা আগেই বাদ পড়িয়াছেন। যাঁহাদের আত্মসম্মান-বোধ আছে, তাঁহারা অস্পৃশ্য বা অবনত বলিয়া গণনার মূল্যে ব্যবস্থাপক সভার এক-আধটা আসন নিজের জা'তের জন্য চাহিবেন না।

—

সৈনিকদের অভ্যর্থনার চাঁদা

বঙ্গের কোথাও কোথাও সৈন্যদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য চাঁদা তোলা হইতেছে! এই চাঁদা কি পিটুনী ট্যাক্সের ছোট ভাই?

—

কুমারী কল্পনা দত্ত নিখোঁজ

কি একটা অপরাধে মনে নাই, চট্টগ্রামে কুমারী কল্পনা দত্তের বিচার হইতেছিল। তিনি জামীনে খালাস ছিলেন; সম্প্রতি কিছুদিন বেমালুম অন্তর্হিত হইয়াছেন। যেহেতু চট্টগ্রামের বেসরকারী হিন্দুরা তাঁহাকে ধরাইয়া দিতে পারিতেছেন না, অতএব তাঁহাদের লাখ টাকা পাইকারী জরিমানা হইবে কিনা, বলা যায় না। নানা প্রকার পুলিস এবং সৈন্য সান্ত্রী চট্টগ্রামে গিজ-গিজ করা সত্ত্বেও যে কুমারী কল্পনা দত্ত অদৃশ্য হইয়াছেন, তাহাতে অবশ্য তাহাদের কোন ত্রুটি হয় নাই।

—

আলোয়ারে মুসলমান-মেও বিদ্রোহ

কাশ্মীরের পর আলোয়ার। তথাকার মেও-জাতীয় মুসলমানেরা রাজার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করিয়াছে। তাহাদের হাতে আধুনিক রকমের আগ্নেয় অস্ত্র এবং গুলি বারুদ আছে। সেগুলা তাহারা কোথায় পাইল?

আলোয়ারের প্রজাদের, মুসলমান প্রজাদের, কোনই দুঃখ ও অভিযোগের কারণ নাই, এরূপ বলিবার মত জ্ঞান আমাদের নাই। কিন্তু উপর্যুপরি দুটি হিন্দুরাজ্যে কেবল মুসলমানেরাই বিদ্রোহ কেন করিল, তাহা ভাবিবার বিষয়। আলোয়ারে বিদ্রোহীরা কোথাও কোথাও হিন্দু প্রজাদের দেবতার মূর্ত্তি নষ্ট করিয়াছে এবং তাহাদের শাস্ত্রগ্রন্থও নষ্ট করিয়াছে। মুসলমানদের উপর অত্যাচার যদি হইয়া থাকে, তাহার জন্য দায়ী মহারাজা ও তাঁহার মুসলমান প্রধান মন্ত্রী। হিন্দু প্রজারা কি দোষ করিল?

দেশী রাজ্যসকলের নিরাপত্তার জন্য ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট দায়ী। যথাসময়ে ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহাদের ম্যাও ধরা উচিত।

—

বোম্বাইয়ে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা

সম্প্রতি ক্রিকেট খেলার সামান্য একটা ছুতা লইয়া বোম্বাইয়ে হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ আরম্ভ হয়; এখন খুনাখুনি চলিতেছে। বিলাতী ডেলী মেল বলিতেছেন, ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষকে ভারতে কেমন পরস্পরবিরোধী বিপজ্জনক শক্তিসমূহকে সর্ব্বদা বাগে রাখিতে হয়, এই দাঙ্গা তাহার একটি দৃষ্টান্ত। গোলটেবিল বৈঠকের ফল স্বরূপ এখন ভারতবর্ষকে "স্বশাসন" দিবার সময় ঘনাইয়া আসিতেছে। এই জন্য ডেলী মেল ইঙ্গিত করিতেছেন, যে, যখন রাশ খুব টানিয়া ধরিয়া থাকাই দরকার, তখন যেন তাহা আলগা করিয়া কর্ত্তৃত্ব ছাড়িয়া দেওয়া না হয়। আকস্মিকতা-দেবতাকে ধন্যবাদ, যে, তিনি সর্ব্বদাই ডেলী মেলের মত কাগজের উপদেশবাণী উচ্চারণের উপলক্ষ্য যথাসময়ে জুটাইয়া দেন। "ঐক্য" কন্‌ফারেন্সের উপরও আলোয়ার এবং বোম্বাইয়ের ঘটনা অকস্মাৎ টিপ্পনী জুটাইয়াছে। বিলাতী টাইম্‌স্ বলিয়াছেনও বটে,

"It is surprising that the Maharaja of Alwar ostentatiously left his state last month to participate in the Allahabad Unity Conference."

"ইহা বিস্ময়কর, যে, আলোয়ারের মহারাজা গত মাসে ঘটা করিয়া এলাহাবাদের ঐক্য কন্‌ফারেন্সে যোগ দিবার জন্য নিজের রাজ্য ছাড়িয়া গিয়াছিলেন।"

টাইম্‌স্ বোধ হয় বলিতে চান, "ঐক্য চাও? ঐক্যের মজাটা নিজের রাজ্যেই দেখ।"

—

বঙ্গে কি শিক্ষিতা মহিলা নাই?

ঢাকার ইডেন স্কুলে শিক্ষামন্ত্রী নাজিমুদ্দিন সাহেব একজন মান্দ্রাজী মহিলাকে প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত করিয়াছেন। বঙ্গে অনেক সুযোগ্য এম্ এ পাস করা মহিলা আছেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও কেন নিযুক্ত করা হইল না? ইহাতে বাঙালী দমিবে না।



তীর্থের পথে

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'

৩২শ ভাগ, ২য় খণ্ড | ফাল্গুন, ১৩৩৯ | ৫ম সংখ্যা

প্রেমের সোনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবিদাস চামার ঝাঁট দেয় ধূলো।
সজন রাজপথ বিজন তার কাছে,
পথিকেরা চলে তার স্পর্শ বাঁচিয়ে।
গুরু রামানন্দ প্রাতঃস্নান সেরে
চলেছেন দেবালয়ের পথে,
দূর থেকে রবিদাস প্রণাম করল তাঁকে,
ধূলায় ঠেকালো মাথা।
রামানন্দ শুধালেন, বন্ধু কে তুমি।
উত্তর পেলেন, আমি শুক্‌নো ধূলো,
প্রভু, তুমি আকাশের মেঘ,
ঝরে যদি তোমার প্রেমের ধারা
গান গেয়ে উঠবে বোবা ধূলো
রঙ-বেরঙের ফুলে।
রামানন্দ নিলেন তাকে বুকে
দিলেন তাকে প্রেম।
রবিদাসের প্রাণের কুঞ্জবনে
লাগল যেন গীত-বসন্তের হাওয়া।

চিতোরের রাণী, ঝালি তাঁর নাম।
গান পৌঁছল কানে,
তাঁর মন করে দিল উদাস।
ঘরের কাজে মাঝে মাঝে
দু-চোখ দিয়ে জল পড়ে ঝরে।
মান গেল তাঁর কোথায় ভেসে।
রবিদাস চামারের কাছে
হরি-প্রেমের দীক্ষা নিলেন রাজরাণী

স্মৃতি-শিরোমণি
রাজকুলের বৃদ্ধ পুরোহিত,
বল্‌লে ধিক্, মহারাণী ধিক্।
জাতিতে অন্ত্যজ রবিদাস,
ফেরে পথে পথে, ঝাঁট দেয় ধুলো,
তাকে তুমি প্রণাম করলে গুরু বলে
ব্রাহ্মণের হেঁট হোলো মাথা
এ রাজ্যে তোমার।

রাণী বল্‌লেন, ঠাকুর শোনো তবে,
আচারের হাজার গ্রন্থি
দিনরাত্রি বাঁধো কেবল শক্ত করে—
প্রেমের সোনা কখন পড়ল খসে
জান্‌তে পারো নি তা।
আমার ধূলোমাখা গুরু
ধূলোর থেকে কুড়িয়ে পেয়েছে।
অর্থহারা বাঁধনগুলোর গর্ব্বে, ঠাকুর
থাকো তুমি কঠিন হয়ে।
আমি সোনার কাঙালিনী
ধূলোর সে দান নিলেম মাথায় করে॥

পত্রধারা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১)

কল্যাণীয়াসু

অনেক দিন চিঠি লিখিনি। শরীর মন ও সংসারের উপর দিয়ে বিস্তর উৎপাত গেছে। সেজন্যে বিলাপ পরিতাপ করা আমার অভ্যাস নয়, করিও নি। কিন্তু সাধারণত, মনকে বাইরের নানা কর্ত্তব্যের মধ্যে বিক্ষিপ্ত করতে এখন আর একটুও ইচ্ছা করে না। যে কর্ম্ম-সাধনার মধ্যে অনেক দিন মন কেন্দ্রীভূত, তাকে কোনো কারণেই বর্জ্জন করা দুর্ব্বলতা এবং সেটা লজ্জাজনক—তার মধ্যে নিবিষ্ট থাকতে হয়েচে, অথচ তার সঙ্গে নিঃসংসক্ত আছি। নানা মতামত নিয়ে তোমার সঙ্গে অনেক তর্ক করেচি, সেও তোমাকে স্নেহ করি বলেই। তোমার চিঠি থেকে আমার দেশের অনেক কথা জানতে পেরেচি—তার কোনো অংশ সুন্দর, কোনো অংশ নিরালোক এবং অনার্য্য—সেটার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকা সম্ভব নয় উচিতও নয়। সেইজন্যে তা নিয়ে আলোচনা করেচি, তোমাকে দলে টানবার জন্যে নয় কিন্তু কর্ত্তব্যবোধে। আঘাত অনেক পেয়েচ, সে আমার ভালো লাগেনি। এ সব তর্ক এখানেই শেষ হল। ক্লান্ত লেখনীকে আর খাটিয়ে মারতে ইচ্ছা করে না। আমার সম্পর্কে কোনো ব্যবহার করার মধ্যে ঐহিক ও পারত্রিক সঙ্কোচের কারণ তোমার মনে আছে। আমি তার উপলক্ষ্য হতে ইচ্ছা করিনে—তোমাকে অকৃত্রিম স্নেহ করি বলেই। আমার চিন্তার, আমার সাধনার, আমার জীবনযাত্রার পথ তোমার থেকে অনেক দূরে। তুমি সম্পূর্ণ তাকে বুঝতে পারবে না। তা নিয়ে আক্ষেপ করা মূঢ়তা। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তুমি আমাকে যদি শ্রদ্ধা করতে পার সে কম কথা নয় পরলোকগত ত্রিবেদী-মশায় আমার সেই রকম বন্ধু ছিলেন। আমার মতের জন্যে নয়, সকল তর্কবিতর্কের বহির্ভূত মনুষ্যত্বেরই জন্যে। সেই অকৃত্রিম মৈত্রীর স্বাদ আমি তাঁর প্রীতি থেকে অনুভব করেছিলুম। অতএব জানি সংসারে সেটা দুর্ল'ভ হলেও অলভ্য নয়। তোমার ছেলেমেয়েকে আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ দিয়ো। ইতি

৩১ আগষ্ট, ১৯৩২।

(২)

কল্যাণীয়াসু

তোমার কয়েকটি চিঠি পড়ে দেখলুম। আমার সঙ্গে মতান্তর নিয়ে তোমার মন অত্যন্ত অশান্ত হয়েচে। কোনো উপায় নেই, কারণ মত তো গায়ের চাদর নয় যে, কাউকে খুশি করবার জন্যে বদল করা চলে। বুঝতে পেরেচি তোমার মন এমন অবস্থায় এসেচে, আমার সম্বন্ধে তোমার সহিষ্ণুতা বেশিক্ষণ টি'কবে না,—ভুল বুঝতে আরম্ভ করেচ শেষকালে সম্পূর্ণ উল্টো বুঝবে। তার পূর্ব্বেই সম্পূর্ণ স্তব্ধ হওয়াই ভালো। স্নেহের বন্ধনকে বিরক্তিতে নিয়ে যাওয়া শ্রেয় নয়। দুই-একটি কথা পরিষ্কার করে দিতে চাই, আর কেউ হলে কোনো কথাই বলতেম না।

তুমি সাম্যতত্ত্ব নিয়ে আমাকে খোঁটা দিয়েচ। আমি সাম্যনীতির চূড়ান্তে উঠেচি এমন অহঙ্কার কখনো করি নে, কিন্তু তাই বলেই যতটা পারি তাও ত্যাগ করতে হবে একে সুযুক্তি বলে না। আমি মানুষটা স্বল্পাশী, জানি ভূরিভোজন মনের শক্তি হ্রাস করে; জনরব এই যে কোনো একজন পওহারী বাবা না খেয়ে সাধনা করেন। তুমি যদি বলো, আপনি যখন পবন আহার করে থাকতে পারেন না তখন স্বল্পাহারের বড়াই করেন কেন—এমন খোঁচা চুপ করে স্বীকার করে নিলেও অগৌরব হবে না।

তুমি লিখেচ, দরিদ্র ও অস্পৃশ্যদের আর্থিক

সহায়তার জন্ত যাঁরা স্বার্থত্যাগ করেচেন তাঁরা সাহিত্যিক নন, তাঁরা ধনী নন, তাঁরা অমুক অমুক অমুক। আমি কিছু করেচি কি-না তার হিসাব তোমার কাছে দিতে চাইনে কিন্তু যদি এক পয়সা ব্যয় নাও করে থাকি তাই বলেই কি যেটা উচিত সেটাকে উক্ত করতেও পারব না? আমি পাড়ায় পাড়ায় আগুন নিবিয়ে বেড়াইনে, চেষ্টা করতে গেলে পারিও নে, তাই বলে কি তুমি আমাকে লিখতে দেবে না যে লোকের ঘরে আগুন দেওয়া অন্যায়। আমি যে-সকল কাজ করে থাকি যারা তার কোনো খোঁজ রাখে না, তারা আমার কাজে খোঁটা দিয়ে থাকে, বাঙালীর মধ্যে জন্মেচি বলে আমার এই দুর্ভাগ্য। তুমিও খোঁটা দিতে যদি সুখ পাও তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু তবুও মনের মধ্যে এইটুকু সংশয় রেখো যে, সব খবর হয়তো তোমার জানা নেই এবং জানার সম্ভাবনামাত্র নেই। বস্তুতই আমি তোমার অপরিচিত, অতএব বিচার করবে কেমন করে—কিন্তু তাই বলেই যে অবিচার করবে সেটা কেবল আমার সম্বন্ধে কেন কারো সম্বন্ধেই ভালো নয়। তোমার সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য হওয়াকে যদি অপরাধ বলে গণ্য কর তবে সেই সূত্রে আমার প্রতি কাল্পনিক অপরাধ আরোপ করা ন্যায়সঙ্গত হবে না।

মহাত্মাজী সম্বন্ধেও তুমি কিছুই জানো না, আমি ঘনিষ্ঠভাবে জানি—তিনি আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো। তোমার সঙ্গে কোনো কোনো বিষয়ে তাঁর মতের মিল নেই বলেই তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা শ্রদ্ধেয় নয়। এ ক্ষেত্রেও তোমাকে বলি, মনকে এই বলে নম্র কোরো "আমি হয়তো তাঁকে জানি নে, জানা আমার সাধ্যের মধ্যে নয়, অতএব নীরব থাকব।"

আর আমি কৈফিয়ৎ দেব না। তোমার মন উত্তেজিত হয়েচে, এ অবস্থায় বাদপ্রতিবাদে সুফল ফলে না।

আমারও অবকাশের একান্ত অভাব। অতএব তর্কবিতর্ক না করে সম্পূর্ণ নীরব হওয়াই নিরাপদ। ইতি

২ অক্টোবর, ১৯৩২

কল্যাণীয়াসু

যারা নিজেকে ধর্ম্মকর্ম্মের পুতুল করে তোলে তারাই আনুষ্ঠানিক অভ্যাসের প্রতিদিন পুনরাবর্ত্তনের দ্বারা নিজের শূন্যতাকে ভরাট করে মনে করে জীবন সার্থক হল। যে-সকল ক্রিয়াকর্ম্মে বুদ্ধির অন্ধতা এবং হৃদয়ের জড়তা, সেই সমস্ত নিরর্থকতার জালে নিজেকে নিয়ত জড়িয়ে রাখা ভুলিয়ে রাখার মতো দুর্গতি আর নেই। এই সমস্ত চিত্তহীন আচারে জীবন অসাড় হয়ে যায়। এই অসাড়তায় সুখ-দুঃখের বোধকে কমিয়ে দেয় বলে অনেকে একে শান্তি বলে ভ্রম করে। কী হবে এই নির্জ্জীবতার শান্তি নিয়ে।

তুমি তোমার অতৃপ্ত হৃদয়কে পূর্ণতা দেবে বলে ঘুরে বেড়িয়েচ, আজও শান্তি পাও নি। যার মন সজীব, যে চিন্তা করতে পারে, ভালোবাসতে পারে, সে কি দিনের পর দিন অনুষ্ঠানের কলের চাকা ঘুরিয়ে বাঁচে? মনুষ্যত্বের বিচিত্র প্রবর্ত্তনাকে অন্ধ অভ্যাসে সঙ্কীর্ণ করে আনাকে অনেকে ধর্ম্মসাধনা বলে, মানব স্বভাবকে পঙ্গু করাকেই মনে করে সাধুতা। জীবনকে এমন অকৃতার্থ করাই যদি বিধাতার অভিপ্রেত হ'ত তবে তাঁর সৃষ্টিতে এত আয়োজন কেন? জ্ঞান প্রেম ও কর্ম্মের মধ্যে নিজেকে বড়ো করে পাওয়ার মধ্যেই মুক্তি। জ্ঞান প্রেম কর্ম্মের পরিধিকে ছেঁটে ছোটো করে আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রকে অপ্রশস্ত করা আত্মহত্যার রূপান্তর। সংসারের খাঁচায় যারা কষ্ট পাচ্চে ধর্ম্মের খাঁচা বানিয়ে তারা নিষ্কৃতি পায় এ কখনো সম্ভব হয়না—মাদকসেবীর মতো তারা অচেতনতার মধ্যে পালিয়ে রক্ষা পেতে চায়, অর্থাৎ তারা মরে বাঁচতে ইচ্ছা করে। একরকম আধমরা স্বভাব আছে তাদের পক্ষেই এটা সম্ভব, কিন্তু যাদের হৃদয় বুদ্ধি সজীব সচল, নিজেকে বলপূর্ব্বক আড়ষ্ট করে তারা কখনোই সুখী হতে পারে না। একদিন তোমাদের আশ্রমে তুমি আনন্দ পেয়েছিলে, নিজেকে কৃত্রিম নিয়ম-শৃঙ্খলে বেঁধেছিলে বলে সে আনন্দ নয়, তোমার হৃদয় পূর্ণতার তৃপ্তি পেয়েছিল ব'লেই সে আনন্দ—সে একটা সত্য পদার্থ, সে বানানো জিনিষ নয়। তোমার সে তৃপ্তির উৎসাহটাই আজ পাথরচাপা পড়েচে, তাই বলেই সেই পাথর নিয়েই তুমি

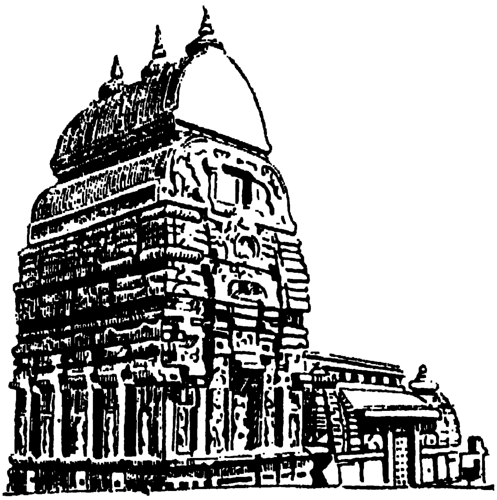
বাঁচবে কী? যারা সেই রুদ্ধ উৎসকে ভুলে কেবল পাথরকে সিঁদুর মাখিয়ে ঘণ্টা নেড়ে সময় কাটাতে অন্তরে বাধা পায় না, তারা তোমার অসন্তোষের চাঞ্চল্য দেখে তোমাকে অবজ্ঞা করে, বস্তুত তাদেরই সন্তোষের স্থাবরতা অবজ্ঞার বিষয়।

তোমার প্রশ্ন এই, কী করে জীবন সার্থক হবে। কী উত্তর দেব ভেবে পাইনে। আমাদের দেশে মেয়েদের জীবনক্ষেত্র বেড়া দিয়ে খাটো করা, তার মধ্যে মানুষের সব চিত্ত খোরাক পায় না, উপবাসী থাকে। সুবিধা এই, অধিকাংশ মানুষ সঙ্কীর্ণ সীমার উপযুক্ত হয়েই জন্মায়, যাদের ডানা নেই আকাশের অধিকার হারালেও তাদের চলে। ঘরকন্নার সঙ্কীর্ণতা বা ধর্ম্মাচরণের সঙ্কীর্ণতা সে সব মেয়েদের মনকে বঞ্চিত করে না। বরঞ্চ তারা এই নিয়ে খেলাচ্ছলে একরকম আরাম পায়—তাদের কোনো নালিশ নেই। তোমার হৃদয়-মনকে অত সহজে শিকল পরিয়ে তুমি দমিয়ে রাখতে পারচ না, তাই কষ্ট পাচ্চ। তোমার এই সঙ্কীর্ণ অবস্থায় থেকেও মুক্তির আস্বাদ পেতে পারতে যথেষ্ট পড়াশোনায়, এবং রচনার মধ্যে। বহির্জ্জগতের স্বাধীনতা, যা তোমার নিজের ছেলের আছে, তা তোমার নেই,—মানুষের এই মস্ত অধিকার থেকে তুমি বঞ্চিত। কাজেই অন্তর্জ্জগতের মধ্যে সঞ্চরণের স্থান প্রশস্ত করা ছাড়া আর তো কোনো উপায় নেই। নিজের মধ্যে সৃষ্টি করে সেটাকে সত্য করে তুলতে পারো যদি তবে তাতেই পাবে আনন্দ। নইলে খাঁচার শলাগুলোতে কেবলি ডানাঝাপটা মারায় কী লাভ।—আমার কথা যদি বলো, সংসারে আমার দুঃখশোক অভাব অতৃপ্তি কম নয়—কিন্তু জগতে চারিদিক থেকে আমি খোরাক সংগ্রহের রাস্তা রেখেচি, আমার চিত্তের ঔৎসুক্য কোনোদিকেই বাধাগ্রস্ত হয় নি।

তুমি একটি বিশেষ পথ দিয়ে হৃদয়ের চর্চ্চা করেচ—সেই পথটাই তোমার পক্ষে সহজ। সেই পথে তোমার প্রধান আশ্রয়কে হারিয়েচ। অন্যপথ তোমার অনভ্যস্ত, দুর্গম, হয়ত বা তোমার স্বভাববিরুদ্ধ। তাই মনে প্রশ্নস্তরে যে-সব বৈষ্ণবশাস্ত্রে তোমার মন রস পেতে পারে তার মধ্যে একান্তভাবে মগ্ন হ'তে পারনা কি?

বার-বার বলেচি গুরুর পদ আমার নয়। আমি কবি, নানাভাবে নানাদিকে আমার মন সঞ্চরণ করে—আমার স্বভাবের বৈচিত্র্যবশত নিজেকেও নিজে বুঝি নে, অন্যেও আমাকে বোঝে না। আমার প্রধান সার্থকতা সব কিছু প্রকাশ করা—বাণীর দ্বারা করেচি, কর্ম্মের দ্বারাও করেচি। মনে কোরো না, আরামে করতে পেরেচি, দিতে হয়েচে অনেক, কষ্ট ও অপমান সয়েচি যথেষ্ট, নিজেকে প্রায় নিঃস্ব করেচি—কিন্তু ছুটি পাব না কোনোদিন, কেননা এই আমার স্বভাব। ইতি

২২ আশ্বিন ১৩৩৯



পেয়ালা

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সামান্য জিনিষ। আনা তিনেক দামের কলাই-করা চায়ের ডিস্-পেয়ালা।

যেদিন প্রথম আমাদের বাড়িতে ওটা ঢুকল, সেদিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। শীতকাল, সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে লেপের মধ্যে যাওয়ার চেষ্টা করচি, এমন সময় কাকার গলার সুর শুনে দালানের দিকে গেলাম। কাকা গিয়েছিলেন দোকান নিয়ে কুলবেড়ের মেলায়। নিশ্চয়ই ভাল বিক্রী-সিক্রী হয়েচে!

উঠোনে দুখানা গরুর গাড়ী। কৃষাণ হরু মাইতি একটা লেপতোষকের বাণ্ডিল নামাচ্চে। একটা নতুন ধামায় একরাশ সংসারের জিনিষ,—বেলুন, বেড়ী, খুন্তী, ঝাঁঝ্‌রি, হাতা। খান কতক নতুন মাদুর, গোটা দুই কাঁটাল কাঠের নতুন জলচৌকী। এক বোঝা পালংশাকের গোড়া, দু ভাঁড় খেজুরে গুড়, আরও সব কি কি।

কাকা আমায় দেখে বললেন—নিবু, একটা লণ্ঠন নিয়ে আয়—এটায় তেল নেই।

আমি এক দৌড়ে রান্নাঘরের লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে এলাম। পিসিমা হাঁ-হাঁ ক'রে উঠলেন, কিন্তু তখন কে কথা শোনে?

কাকাকে জিগ্যেস করলাম—এলায় এবার লোকজন কেমন হ'ল কাকা?

কাকা বললেন—লোকজন প্রথমটা মন্দ হয় নি, কিন্তু হঠাৎ কলেরা সুরু হয়ে গেল, ওই তো হ'ল মুস্কিল! সব পালাতে লাগ্‌ল, বাঁওড়ের জলে রোজ পাঁচটা-ছ'টা মড়া ফেল্‌ছিল, পুলিস এসে বন্ধ ক'রে দিলে, খাবারের যত দোকান ছিল সব উঠিয়ে দিলে, কিছুতেই কিছু হয় না, ক্রমেই বেড়ে চলল। শেষে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলাম। বিক্রী-সিক্রী কাঁচকলা, এখন খোরাকী, গাড়ীভাড়া উঠলে বেঁচে যাই।

খেতে বসে কাকা মেলার গল্প করছিলেন, বাড়ির সবাই সেখানে ব'সে। কি রকম ক'রে প্রথমে কলেরা আরম্ভ হল, কত লোক মারা গেল, এই সব কথা।

—আহা সাম্‌টা মানপুর থেকে কে একজন যদু চক্কোত্তি, না, কি নাম—একখান ছইএ গাড়ী পুরে বাড়ির লোক নিয়ে এসেচে মেলা দেখতে। ছেলেমেয়ে, বৌ-ঝি, সে একেবারে গাড়ী বোঝাই। বাঁওড়ের ধারের তালতলায় গাড়ী রেখে সেখানেই সব রেঁধে খায়-দায়, থাকে। দু-দিন পরে রাত পোয়ালে বাড়ি ফিরবে, রাত্রিরেই ধরল তাদের একটা ন বছরের মেয়েকে কলেরায়। কোথায় ডাক্তার, কোথায় ওষুধ, সকাল দশটায় সেটা গেল তো ধরল তার মাকে। রাত আটটায় মা গেল তো ধরল বড় ছেলের বৌকে। তখন এদিকেও রোগ জেঁকে উঠেচে, কে কাকে দ্যাখে—তারপর সে যা কাণ্ড। এক-একটা ক'রে মরে, আর পাশেই বাঁওড়ের জলে ফেলে—আদ্ধেক গাড়ী খালি হয়ে গেল। ব্রাহ্মণের যা সর্ব্বনাশ ঘটল আমাদের চোখের সাম্‌নে, উঃ!

কাকা ভুষি মালের ব্যবসা করেন। প্রায় চল্লিশ মণ সোনামুগ মেলায় বিক্রীর জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন, মণ বারো, না তেরো কাটাতে পেরেছিলেন, বাকী গরুর গাড়ীতে ফিরে আস্‌চে, কাল সকাল নাগাৎ পৌঁছুবে। গাড়ীতে আছে আমাদের আড়তের সরকার হরিবিলাস মান্না।

খেয়ে কাকা উঠে যাবার একটু পরেই কাকার ছোট মেয়ে মন্টু একটা কলাই-করা পেয়ালা রান্নাঘরে নিয়ে এসে বল্লে এই দ্যাখো জ্যাঠাই-মা, বাবা এনেচেন, কাল আমি এতে চা খাব কিন্তু। হাতে তুলে সকলকে দেখিয়ে বল্লে—বেশ, কেমন, না? মেলায় তিন আনা দরে কেনা—

এই প্রথম আমি দেখলুম পেয়ালাটা।

সে আজ চার বছরের কথা হবে।

তারপর বছর দুই কেটে গেল। আমি কাজ শিখে এখন টিউব ওয়েলের ব্যবসা করি—ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও লোকাল বোর্ডের কাজ সংগ্রহ করবার জন্যে এখানে ওখানে বড় ছুটোছুটি ক'রে বেড়াতে হয়; বাড়িতে বেশীক্ষণ থাকা আজকাল আর বড় ঘটে না।

সেদিন সন্ধ্যার গাড়ীতে কলকাতা আসব, আমার বিছানাপত্র বেঁধে রান্নাঘরে চায়ের জন্যে তাগাদা দিতে গিয়েচি—কানে গেল আমার বড় ভাই-ঝি বলচে—ও পেয়ালাটাতে দিও না পিসিমা, বাবা মারা যাওয়ার পর মা ও পেয়ালাটাকে দেখতে পারে না দু চোখে—

আমি বল্লুম—কোন্ পেয়ালাটা রে? কি হয়েচে পেয়ালার?

আমার ভাই-ঝি পেয়ালা নিয়ে এল, মনে হ'ল কাকার কেনা অনেক দিনের সে পেয়ালাটা।

সে বল্লে—বৌদিদির অসুখের সময় এই পেয়ালাটা ক'রে দুধ খেতেন, তারপর বাবার সময়ও এতে ক'রে ওঁর মুখে সাবু ঢেলে দেয়া হত—মা বলে, আমি ওটা দেখতে পারিনে—

আমার এই জ্যাঠতুতো ভাইয়ের স্ত্রী কলকাতা থেকে আমাদের এখানে বেড়াতে এসে অসুখে পড়েন এবং তাতেই মারা যান। এর বছর দুই পরে কাকাও মারা যান পৃষ্ঠব্রণ রোগে। কিন্তু এর সঙ্গে পেয়ালাটার সম্পর্ক কি? যত সব মেয়েলি কুসংস্কার!

পরের বছর থেকে আমার টিউব ওয়েলের কাজ খুব জেঁকে উঠল, জেলা বোর্ডের অনেক কাজ এল আমার হাতে। আমার নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই, দূর দূরান্তর পাড়াগাঁয়ের নানা স্থানে টিউব ওয়েল বসানো ও মিস্ত্রী খাটানোর কাজে মহা ব্যস্ত—বাকী সময়টুকু যায় আর বছরের বিলের টাকা আদায়ের তদ্বিরে।

সংসারেও আমাদের নানা গোলোযোগ বেধে গেল। কাকা যত দিন ছিলেন কেউ কোনো কথাটি বলতে সাহস করেনি সংসারের পুরানো ব্যবস্থাগুলির বিরুদ্ধে। এখন—সবাই হয়ে দাঁড়াল কর্ত্তা, কেউ কাউকে মেনে চল্‌তে চায় না।

ঠিক এই সময় আমার ছোট ছেলের ভয়ানক অসুখ হলো। আমার আবার সেই সময় কাজের ভিড় খুব বেশী। জেলা বোর্ডের কাজ শেষ হয়ে গিয়েচে, কিন্তু টাকার তাগাদা ক'রতে হবে ঠিক ওই সময়টাতে। নইলে বিল চাপা পড়তে পারে ছমাস বা সাত মাসের জন্যে। আমি আজ জেলা, কাল মহকুমা ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগলুম, এ মেম্বর ও মেম্বরকে ধরি, যাতে আমার বিলের পাওনাটা চুকিয়ে দিতে তাঁরা সাহায্য করেন।

কাজ মিটিয়ে যখন বাড়ি ফিরলুম, তখন এদিকেও কাজ মিটে গিয়েচে। ছেলেটি মারা গিয়েচে—অবিশ্যি চিকিৎসার ত্রুটি হয় নি কিছু, এই যা সান্ত্বনা।

বছরের শেষে আমি শহরে বাসা ক'রে স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের সেখানে নিয়ে এলাম। বাড়ির ওই সব দুর্ঘটনার পরে সেখানে আমাদের কারুর মন বসে না, তাছাড়া আমার ব্যবসা খুব জেঁকে উঠেচে—সর্ব্বদা শহরে না থাকলে কাজের ক্ষতি হয়।

টিউব ওয়েলের ব্যবসাতে নেমে একটা জিনিষ আমার চোখে পড়েচে যে, আমাদের দেশের, বিশেষ ক'রে পাড়াগাঁয়ের, লোকেদের মত অলস প্রকৃতির জীব বুঝি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এত অল্পে সন্তুষ্ট মানুষ যে কি ক'রে হতে পারে সে যাঁরা এদের সঙ্গে পরিচিত নন, তাঁদের ধারণাতেও আসবে না। নিশ্চিত মৃত্যুকেও এরা পরম নিশ্চিন্তে বরণ ক'রে নেবে, সকল রকম দুঃখ দারিদ্র্য, অসুবিধাকে সহ্য করবে কিন্তু তবু দু-পা এগিয়ে যদি এর কোন প্রতিকার হয় তাতে রাজী হবে না। তবে এদের একটা গুণ দেখেচি, কখন অভিযোগ করে না এরা, দেশের বিরুদ্ধেও না, দৈবের বিরুদ্ধেও না।

বাইরে থেকে এদের দেখে যাঁরা বল্‌বেন এরা মরে গিয়েচে, এরা জড় পদার্থমাত্র, ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখলে কিন্তু তাঁরা মত বদ্‌লাতে বাধ্য হবেন। এরা মরে নি, বোধ হয় মরবেও না কোন কালে। এদের জীবনীশক্তি এত অফুরন্ত যে, অহরহ মরণের সঙ্গে যুঝে এবং পদে পদে হেরে গিয়েও দমে যায় না এরা, বা ভয় পায় না, প্রতিকার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে না। সহজ ভাবেই সব মেনে নেয়, সব অবস্থা।

খারাপ বিলের পাটপচানো জল খেয়ে কলেরায় গ্রাম উৎসন্ন হয়ে থাকে, তবু এরা টিউব ওয়েলের জন্যে একখানা দরখাস্ত কখনও দেবে না বা তদ্বির করবে না। কে অত ছুটাছুটি করে, কেই বা কষ্ট করে? শুধু একখানা দরখাস্ত করা মাত্র, অনেক সময় দরকার বুঝলে জেলা বোর্ড থেকে বিনা খরচায় টিউব ওয়েল বসিয়ে দেয়—কিন্তু ততটুকু হাঙ্গামা করতেও এরা রাজী নয়।

বাসায় একদিন বিকেলে চা খাওয়ার সময়ে লক্ষ্য করলুম, আমার ছোট মেয়েটি সেই কলাই করা পেয়ালাটা ক'রে চা খাচ্ছে।

যদিও ওসব মানিনে, তবুও আমার কি-জানি-কি মনের ভাব হল—চা খাওয়া-টাওয়া শেষ হয়ে গেলে পেয়ালাটা চুপি চুপি বাইরে নিয়ে গিয়ে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম পাঁচিলের ওধারের জঙ্গলের মধ্যে।

কাকার বড় মেয়েটির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, ছোট মেয়েটির বয়স দশ বছর, খুব বুদ্ধিমতী। শহরের মেয়ে-স্কুলে লেখাপড়া শেখাব বলে ওকে বাসায় এনে রেখেছিলুম, স্কুলেও ভর্ত্তি করে দিয়েছিলুম।

মাস পাঁচ-ছয় কাটল। বৈশাখ মাস।

এই সময়েই আমার টিউব ওয়েলের কাজের ধুম। আট দশ দিন একাদিক্রমে বাইরে কাটিয়ে বাসায় ফিরি কিন্তু তখনই আবার অন্য একটা কাজে বেরিয়ে যেতে হয়। এতে পয়সা রোজগার হয় বটে, কিন্তু স্বস্তি পাওয়া যায় না। স্ত্রীর হাতের সেবা পাইনে, ছেলেমেয়েদের সঙ্গ পাইনে, শুধু টো টো ক'রে দূরদূরান্তর চাষাগাঁ ঘুরে ঘুরে বেড়ানো—শুধুই এষ্টিমেট কষা, বোরিং করা, মিস্ত্রী খাটানো। মানুষ চায় দু-দণ্ড আরামে থাকতে, আপনার লোকেদের কাছে ব'সে তুচ্ছ বিষয়ে গল্প করতে, নিজের সাজানো ঘরটিতে খানিকক্ষণ ক'রে কাটাতে, হয় তো একটু বসে ভাবতে, হয় তো ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একটু ছেলেমানুষি করতে—শুধু টাকা রোজগারে এসব অভাব তো পূর্ণ হয় না?

হঠাৎ চিঠি পেয়ে বাসায় ফিরলাম, কাকার ছোট মেয়েটির খুব অসুখ।

আমি পৌঁছলাম দুপুরে, একটু পরে রোগীর ঘরে ঢুকে আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলুম। আমার পিসিমা সেই কলাই-করা পেয়ালাটাতে রোগীকে সাবু না বার্লি খাওয়াচ্চেন।

আমি আমার মেয়েকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম—ও পেয়ালাটা কোথা থেকে এল রে? খুকী বললে—ওটা কুকুরে না কিসে বনের মধ্যে নিয়ে ফেলেছিল বাবা, মনুদি দেখতে পেয়ে নিয়ে এসেছিল। সে ত অনেকদিনের কথা, পাঁচিলের বাইরে ওই যে বন, ওইখানে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

আমি বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞেস্ করলুম—মনু নিয়ে এসেছিল? জানিস্ ঠিক তুই?

খুকী অবাক্ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—হ্যাঁ বাবা, আমি খুব জানি। তুমি না হয় মাকে জিজ্ঞেস্ ক'রো, আমাদের সেই যে ছোকরা চাকরটাকে কুকুরে কাম্‌ড়েছিল না, ওইদিন সকালে মনুদি পেয়ালাটা কুড়িয়ে আনে। ওই পেয়ালাতে তাকে কিসের শেকড়ের পাঁচন খাওয়ানো হ'ল, আমার মনে নেই?

আমি চমকে উঠলুম, বললুম—কাকে রে? রামলগনকে?

—হ্যাঁ বাবা, সেই যে তারপর এখান থেকে চলে গেল দেশে, সেই ছেলেটা।

আমার সারা গা ঝিম্‌ঝিম্ করছিল—রামলগন কুকুরে কামড়ানোর পর দেশে চলে গিয়েছিল—কিন্তু সেখানে যে সে মারা গিয়েচে, এ খবর আমি কাউকে বলিনি। বিশেষ ক'রে গৃহিণী তাকে খুব ভাল বাস্‌তেন ব'লেই সংবাদটা আর বাসায় জানাই নি। আমাদের টিউব-ওয়েলের মিস্ত্রী শিউবরণের শালীর ছেলে সে—সে-ই খবরটা মাসখানেক আগে আমায় দেয়।

মনুর অসুখ তখনও পর্য্যন্ত খুব খারাপ ছিল না, ডাক্তারেরা বল্‌ছেন, ভয়ের কোন কারণ নেই। আমার কিন্তু মনে হ'ল ও বাঁচবে না।

ও পেয়ালাটার ইতিহাস এ বাসায় আর কেউ জানে না, অসুখের সময় যে ওতে করে কিছু খেয়েচে সে আর ফেরে নি। জান্‌ত কেবল কাকার বড় মেয়ে, সে আছে শ্বশুরবাড়ি।

পেয়ালাটা একটু পরেই আবার চুপি চুপি ফেলে দিলুম—হাত দিয়ে তোলবার সময় তার স্পর্শে আমার

সারা দেহ শিউরে উঠল—পেয়ালাটা যেন জীবন্ত, মনে হল যেন একটা ক্রূর, জীবন্ত, বিষধর সাপের বাচ্চার গায়ে হাত দিয়েছি, যার স্পর্শে মৃত্যু···যার নিঃশ্বাসে মৃত্যু ··

পরদিন দিন দুপুর থেকে মন্থর অসুখ বাঁকা পথ ধরলে, ন' দিনের দিন মারা গেল।

আমি জানতুম ও মারা যাবে।

মন্থর মৃত্যুর পরে পেয়ালাটা আবার কুড়িয়ে এনে ব্যাগের মধ্যে পুরে কাজে বেরুবার সময় নিয়ে গেলুম। সাত-আট ক্রোশ দূরে একটা নির্জ্জন বিলের ধারে ফেলে দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

শোকের প্রথম ঝাপটা কেটে গিয়ে মাস দুই পরে বাসা একটু ঠাণ্ডা হয়েছে তখন। কথায় কথায় স্ত্রীর কাছে একদিন এমনি পেয়ালাটার কথা বলি। তিনি আমার গল্প শুনে যেন কেমন হয়ে গেলেন, কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন, মুখ দিয়ে তাঁর কথা বেরুল না। আমি বললুম—বোধ হয় অত খেয়াল ক'রে তুমি কখন দ্যাখোনি, তাই ধরতে পারনি—আমি কিন্তু বরাবর—

আমার স্ত্রী বিবর্ণমুখে বললেন—বলব একটা কথা? আমার আজ মনে পড়ল—একটু চুপ করে থেকে বললেন—

—খোকা যখন মারা যায় আর বছর আষাঢ় মাসে, সেই কলাই-করা পেয়ালাটাতে তাকে ডাবের জল খাওয়াতুম। আমি নিজের হাতে কত বার খাইয়েচি। তুমি তো তখন বাইরে বাইরে ঘুরতে, তুমি জানো না।

আমার কোনো উত্তর খানিকক্ষণ না পেয়ে বললেন,—জানতে তুমি একথাটা?

—না, জানতুম না অবিশ্যি। কিন্তু অন্যমনস্ক হয়ে আর একটা কথা মনে তোলাপাড়া করছিলুম—পেয়ালাটা আমাদের ছেড়েচে ত? ওটাকে কেন তখন ভেঙে চুরমার করে নষ্ট ক'রে দিই নি? আবার কোনো উপায়ে এসে এ বাড়িতে ঢুকবে না ত?

কে

শ্রীসরোজরঞ্জন চৌধুরী

আমার এই ব্যথার বাঁশী মোহন-তানে
কে বাজালো রে!
আমার এই শূন্য-ডালা শোভন-ফুলে
কে সাজালো রে!
আমার শুকনো ডালের আগে আগে
কাহার মধু-পরশ লাগে'
নবীন-প্রাণে পত্র জাগে,—
কে জাগালো রে!

আমার এই গভীর আঁধার ঘরের দ্বারে
কে এলো রে আজ!—
আলোর মালা গলায় দোলে
অঙ্গে আলোর সাজ।
আমার পাষাণ-বাঁধন কে ভাঙালো,
নির্ঝর-ধারা কে জাগালো,
মরা-গাঙে বান ডাকালো,—
কে ডাকালো রে!

জ্ঞান ও সত্তা

শ্রীরাসবিহারী দাস

জ্ঞান শব্দের যে-অর্থে কাহাকেও জ্ঞানী এবং কাহাকেও অজ্ঞানী বলা হয়, আমি সে-অর্থে এই প্রবন্ধে জ্ঞান শব্দ ব্যবহার করিতেছি না। জ্ঞান শব্দের এই রকম বিশেষ অর্থ ছাড়া সাধারণ অর্থও আছে, যে-অর্থে জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেরই জ্ঞান রহিয়াছে বলা যাইতে পারে। যাহাকে আমরা সাধারণতঃ 'জানা' বলি, তাহাকেই আমি জ্ঞান বলিতেছি। এই জ্ঞান বা 'জানা' জিনিষ যে কি তাহা কোনও সংজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে লোকের কাছে ব্যক্ত করিতে পারা যায় না। জ্ঞান বলিতে যাহা বোঝা উচিত, তাহা যদি কেহ না বুঝে তবে তাহাকে শব্দ বা অন্য কোনপ্রকার ইঙ্গিতের দ্বারা জ্ঞানের অর্থ বোঝান যাইবে না। তবে আমরা দর্শন-শাস্ত্রে এবং সাধারণ দৈনিক জীবনে জ্ঞান শব্দ এত বেশী ব্যবহার করি যে, ইহার অর্থ সম্বন্ধে কাহারও বাস্তবিক সন্দেহ আছে বলিয়া মনে হয় না। আমরা যখন কিছু দেখি, শুনি বা স্পর্শ করি, তখনই আমাদের কিছু অনুভূতি হয়, এই অনুভূতির নামই জ্ঞান।

জ্ঞান ছাড়া আমাদের কোন মানুষিক ব্যবহারই সম্ভবপর নয়। জ্ঞান না থাকিলে আমাদের কোন-কিছুই বলিবার বা করিবার থাকে না। জাগ্রত অবস্থায় সর্ব্বদাই আমরা কিছু-না-কিছু জানিতেছি। সুষুপ্তিতেও আমাদের জ্ঞান থাকে বলিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। জ্ঞান নাই অথচ আমরা আছি, এর কোন সাক্ষাৎ প্রমাণ আমাদের নাই। সুষুপ্তিতে ও মূর্চ্ছিত অবস্থায় আমাদের জ্ঞান থাকে না, কিন্তু আমরা থাকি, এরকম কথা অনেকে বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু একথার সত্যতা আবার অনেকেই মানেন না। ঐ সব অবস্থায় বাস্তবিকই আমাদের জ্ঞান থাকে না, কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই থাকি, এ কথা মানিলেও এ-কথার কোন সাক্ষাৎ প্রমাণ আমাদের কাছে নাই। আমাদের তখনকার অস্তিত্বের কথা অনুমানের দ্বারা আমরা বুঝিবার চেষ্টা করিতে পারি বটে, কিন্তু অনুমান সাক্ষাৎ প্রমাণ নয়। ইহা এক প্রকারের পরোক্ষ প্রমাণ। অন্ততঃ এ-কথা সহজেই বলা যাইতে পারে যে, আমরা জ্ঞানবিরহিত অবস্থায় যে কি রকম থাকি তাহার কোন কল্পনা করা আমাদের পক্ষে খুবই কঠিন; কেন-না, আমাদের জ্ঞানবিরহিত অবস্থার সঙ্গে আমরা কখনই পরিচিত নই। যখন আমাদের জ্ঞান থাকে না, তখন পাথরের মত পড়িয়া থাকি, আমরা এ রকম ভাবিতে পারি, কিন্তু আমাদের মানুষরূপে না থাকা এবং পাথরের মত পড়িয়া থাকার মধ্যে বিশেষ কোন ভেদ আছে বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, এ-কথা বোধ হয় সর্ব্ববাদি-সম্মত যে, আমাদের সব ব্যবহারেই জ্ঞান অনুস্যূত রহিয়াছে।

কোন শব্দ অথবা অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা দেখাইবার জিনিষ না হইলেও, আমরা সকলেই অন্তরে অন্তরে জ্ঞান যে কি জিনিষ, তাহা অনুভব করিয়া থাকি। জ্ঞানের সাহায্যেই আমরা জগতের অন্য সব-কিছু বুঝিয়া থাকি, কিন্তু জ্ঞান বুঝিতে হইলে অন্য কাহারও সাহায্য আবশ্যক হয় না। জ্ঞান কি বস্তু আপনা হইতে না বুঝিলে কোন পারিভাষিক সংজ্ঞা দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে তাহা বুঝাইতে পারা যাইবে না। সুতরাং আমি ধরিয়া লইতেছি যে, যিনি এই প্রবন্ধ পড়িবেন তিনি আপনা হইতে জ্ঞান যে কি জিনিষ তাহা বুঝেন।

জ্ঞান যেমন কোন সংজ্ঞা দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, সত্তাও তেমনই কোন সংজ্ঞা দ্বারা যথাযথভাবে ব্যক্ত করিবার নয়। যাহা-কিছু আছে, যাহা-কিছু ঘটে, তাহারই সত্তা আছে বলিতে পারা যায়। এমন কোন বস্তু নাই যাহার সত্তা নাই। কিন্তু বস্তুর সত্তা বা অস্তিত্ব, থাকা বা 'আছা' যে কি, তাহা আমাদের আপনা হইতেই বুঝিতে হইবে। নানা দর্শনে 'সত্তা'র বিভিন্ন পারিভাষিক লক্ষণ

দেওয়া আছে বটে, কিন্তু সেই সকল লক্ষণ হইতে সত্তার প্রকৃত অর্থ কখনই স্পষ্টভাবে প্রতীত হইবে না, যদি সত্তার বোধ বা অনুভূতি পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে না থাকে। কেহ কেহ বলেন, সত্তা একটি জাতিবিশেষ। হইতে পারে সত্তা একটি জাতি; কিন্তু সে জাতি যে কি তাহা আমাদের আপনা হইতেই বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, কালসম্বন্ধিত্বের নামই সত্তা—অর্থাৎ কালের সহিত যাহার সম্বন্ধ আছে,তাহাই আছে বলিয়া বলা যাইতে পারে। আবার কেহ কেহ বলেন, বর্ত্তমানত্বের নামই সত্তা, শুধু কালসম্বন্ধিত্ব সত্তার লক্ষণ নয়; অর্থাৎ যে-কোন কালের সহিত সম্বন্ধ থাকিলেই কোন বস্তুকে আছে বলিয়া বলা যায় না। যাহাকে 'আছে' বলিতে হইবে তাহার বর্ত্তমান কালে থাকা চাই। অনেকে মনে করেন, সে-ই বাস্তবিক আছে যাহার স্থান দেশকালের মধ্যে রহিয়াছে।

এ কথা খুবই সত্য হইতে পারে যে, যে-সকল বস্তুকে আমরা আছে বলিয়া মনে করি তাহারা কালের সহিত বা বর্ত্তমানের সহিত সম্বন্ধ হইয়া অথবা দেশকালপরিচ্ছিন্ন হইয়াই আছে। দেশকালের সহিত অসম্বদ্ধ অবস্থায় তাহাদের হয়ত কোন সত্তাই নাই। কার্য্যতঃ তাহাদের থাকা এবং দেশকালের সহিত সম্বন্ধ হওয়া একই কথা হইতে পারে। কিন্তু তথাপি তাহাদের অস্তিত্বের নামই দেশকালের সহিত সম্বন্ধ একথা বলা যাইতে পারে না। তাহাদের যদি কোন রকমের সত্তা থাকে, তবে তাহারা সম্বদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু নিজের মাঝে সত্ত হীন হইয়া দেশকালের সম্বন্ধ হইতে সত্তা লাভ করিবে, একথা সহজেই বোধগম্য নয়। বিশেষতঃ যখন আমরা দেশ-কালের সহিত সম্বন্ধের কথা বলি তখন দেশকালকেও আছে বলিয়া মনে করি। তাহারা নিজে 'নাই' হইয়া তাহাদের সম্বন্ধের দ্বারা অন্যকে 'আছে' করিয়া তুলিবে এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। দেশকালের সত্তা দেশকালের সম্বন্ধ হইতে আসিয়াছে বলিতে পারা যায় না। সুতরাং সত্তার অর্থই দেশকালের সহিত সম্বন্ধ এ কথা মানিতে পারা যায় না।

কেহ কেহ আবার বলেন, অর্থক্রিয়াকারিত্বের নামই সত্তা। যাহা দ্বারা কোন কাজই হয় না, যাহার কোন ক্রিয়াই কোথাও লক্ষিত হয় না, সে আছে বলিয়া বলিতে পারা যায় না। সুতরাং একদৃষ্টিতে অর্থক্রিয়াকারিত্বই সত্তা। কিন্তু বাস্তবিক কোন বস্তুর অর্থক্রিয়াকারিত্ব এবং সত্তা কি একই পদার্থ? কোন জিনিষের কাজ দেখিয়া তাহা আছে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি। কিন্তু কাজের নামই তার থাকা বা 'আছা' নয়। কোন প্রকারের ক্রিয়া করিতে হইলেই ক্রিয়ার আগে জিনিষের থাকা চাই, এবং ক্রিয়াই সেই থাকার একমাত্র নিদর্শন হইলেও পশ্চাৎভাবী ক্রিয়া এবং পূর্ব্ববর্ত্তী অস্তিত্ব একই পদার্থ হইতে পারে না।

অনেকে বলেন, যে-বস্তুর কখনই বাধ হয় না সে-ই বাস্তবিক আছে, অর্থাৎ যাহাকে কখনই 'নাই' বলিতে পারা যায় না সে-ই আছে। অবাধিতত্বই সত্তা। কিন্তু আমরা কোন বস্তুকে 'নাই' বলিতে পারি না কেন? 'আছে' বলিয়া মনে করি বলিয়াই 'নাই' বলিতে পারি না। এবং তখনই কোন বস্তুকে কখনই 'নাই' বলিয়া মনে করি না যখন তাহাকে 'সর্ব্বদা আছে' বলিয়া মনে করি। (ইহারই নাম অবাধিতত্ব)। কিন্তু শুধু 'আছে' এ কথার কোন অর্থ না জানিলে বা মানিলে 'সর্ব্বদা আছে' এ কথা আমরা বুঝিব না।

সুতরাং আমার মনে হয়, পারিভাষিক সংজ্ঞা দ্বারা সত্তা বা অস্তিত্বের প্রকৃত অর্থ কখনই সম্পূর্ণ ভাবে ব্যক্ত হয় না। হয়ত কোন কোন দার্শনিক ঐ সকল পারি-ভাষিক অর্থ ব্যতীত সত্তার অন্য কোন অর্থ মানেন না বা বুঝেন না। কিন্তু আমি সত্তা শব্দ কোন পারিভাষিক অর্থে এই প্রবন্ধে ব্যবহার করিতেছি না।

যখনই আমি বলি, 'আমি আছি' 'আমার চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার বস্তু আছে,' তখনই সত্তা বা অস্তিত্ব আমার জ্ঞানের বিষয় হয়। সত্তা সম্বন্ধে আমার কোন বোধ না থাকিলে, 'আছে' বলিতে কি বোঝায়, আমি না বুঝিলে, আমি আছি বা কোন জিনিষ আছে,এ কথা আমি বলিতে পারি না। সত্তা সম্বন্ধে আমার যে-ধারণা আছে, তাহা অত্যন্ত সহজ ও সরল বলিয়া মনে হয়। কোন প্রকারের বিশ্লেষণের দ্বারা তাহার অর্থ সরলতর করিয়া তুলিতে পারা যাইবে বলিয়া মনে হয় না।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, জ্ঞানের সহিত সত্তার, জানার সহিত 'থাকা'র, কোন সম্বন্ধ আছে কি-না? সত্তা সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক পদার্থ। এমন কোন জিনিষ নাই, যাহার সত্তা নাই। জ্ঞানও যখন আছে, তখন জ্ঞানেরও সত্তা আছে বলিতে হয়। কিন্তু সত্তা থাকিলে কি জ্ঞানও থাকিবে? আমাদের নিজের সম্বন্ধে অনেক স্থলে বলিতে পারা যায় যে, আমরা থাকিলে আমাদের জ্ঞানও থাকে। মূর্চ্ছা ও সুষুপ্তি সম্বন্ধে হয়ত খুব জোর করিয়া বলিতে পারা যায় না যে, তখনও আমাদের কিছু-না-কিছু জ্ঞান থাকে। যদিই-বা ধরিয়া লই যে, তখনও জ্ঞান থাকে এবং জ্ঞান ব্যতিরেকে আমাদের অস্তিত্বই সম্ভবপর নয়, তথাপি সকল স্থানে অস্তিত্ব থাকিলে জ্ঞান থাকিবে এমন কথা আমরা বলিতে পারি না। আমাদের সাধারণ বিচারে মনে হয় যে, যদিও জ্ঞান থাকিলে অস্তিত্ব থাকে, তথাপি অস্তিত্ব থাকিলে জ্ঞান থাকে, এ রকম কোন নিয়ম নাই। ঘটপটাদি অসংখ্য জিনিষ সংসারে পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের জ্ঞান আছে বলিয়া ত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এখানে প্রশ্ন উঠিবে ঘটপটাদির তাহাদের নিজের সম্বন্ধে নিজের জ্ঞান না থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে অন্য কাহারও জ্ঞান থাকা চাই; তাহা না হইলে সেই সকল পদার্থ আছে, এ কথাই বা কিরূপে বলি? এই প্রশ্ন লইয়া দর্শনশাস্ত্রে জ্ঞানতান্ত্রিক (idealist) এবং বস্তুতান্ত্রিক (realist)দের মধ্যে মহা বিরোধ। এই বিরোধের কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বস্তুতান্ত্রিকেরা মনে করেন, জ্ঞান বস্তুর অধীন। জ্ঞান থাকিতে হইলে বস্তু থাকা চাই; তাহা না হইলে কিসের জ্ঞান হইবে? কিন্তু বস্তু থাকিতে হইলে জ্ঞান থাকিবেই এমন কোন নিয়ম নাই। জ্ঞানতান্ত্রিকেরা এ কথা মানেন না। তাঁহারা বলেন, জ্ঞান-নিরপেক্ষ কোন বস্তু যে আছে তাহার কোন প্রমাণ নাই। বস্তু থাকিতে হইলে তাহার জ্ঞান থাকা আবশ্যক; জ্ঞান ছাড়া বস্তুর অস্তিত্বের কোন প্রমাণও নাই, অর্থও নাই।

আমার বিশ্বাস, জগতের অধিকাংশ লোকই বস্তু-তান্ত্রিক। সাধারণবুদ্ধির লোকের পক্ষে জ্ঞানতন্ত্র মানিয়া লওয়া খুবই কঠিন। আর সাধারণবুদ্ধি যে সকল সময় ভুলই দেখে, তাহাও নয়। অসাধারণবুদ্ধির অভিমানে আমরা কখনও কখনও সাধারণবুদ্ধিকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে পারি বটে, কিন্তু যে সাধারণবুদ্ধি অধিকাংশ মানবের জীবনেই সময় এবং অভিজ্ঞতার নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে, তাহাকে সহজে ভ্রান্ত বলিয়া দূরে ফেলিয়া দেওয়া যায় না। তবে এ-বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে জ্ঞানতন্ত্রের যাহা বক্তব্য তাহা আমাদের সর্ব্বাগ্রে প্রণিধানপূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখা উচিত।

বিশপ বার্কলী জ্ঞানতন্ত্রের একজন প্রধান পুরোহিত। তাঁহার মতে থাকা আর দেখা একই কথা; কোন জিনিষ আছে এবং তাহার সম্বন্ধে জ্ঞান হইতেছে ইহা দুই কথা নয়। কোন জিনিষের থাকার নামই আমাদের তাহার সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়া। (Esse is percipi)। এই বিশ্বে দৃশ্য ছাড়া আমরা আর কিছুই পাই না। দৃশ্য বলিতে চোখ দিয়া যাহা দেখি শুধু তাহাই বুঝিতে হইবে না। কান দিয়া যাহা শুনি, নাক দিয়া যাহার গন্ধ পাই, সেই সকলই দার্শনিক অর্থে দৃশ্য। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহার জ্ঞান হয় তাহাই দৃশ্য। এই দৃশ্য আমাদের দর্শন বা জ্ঞানসাপেক্ষ। আমাদের দর্শন ছাড়া দৃশ্যের কোন অস্তিত্ব নাই। প্রথমতঃ, দর্শন ব্যতীত দৃশ্যের যে শুধু কোন প্রমাণ নাই, তাহাই নহে। দর্শন ব্যতিরেকে দৃশ্যের কোন অর্থই আমাদের কাছে থাকে না। গন্ধে ঘর ভরপুর হইয়া আছে, অথচ তার কোন অনুভূতি হইতেছে না, নানা সুরে বিশ্ব মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, অথচ তাহা কাহারও শ্রুতিগোচর নহে, এইরূপ কল্পনা আমরা করিতে পারি না। যে-গন্ধের আঘ্রাণ নাই, যে-শব্দ কোন অবস্থাতেই শুনিতে পাওয়া যায় না, যে-রূপ কিছুতেই দেখিবার নয়, সে গন্ধ, শব্দ ও রূপ শুধু কথামাত্র, তাহাদের কোন অস্তিত্বের কল্পনা আমরা করিতে পারি না।

দ্বিতীয়তঃ, দৃশ্যের জ্ঞান ব্যতিরিক্ত নিজস্ব কোন রূপ থাকিলে তাহা একই ভাবে সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিত। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে তথাকথিত

একই বস্তু বিভিন্ন লোকে, অথবা একই লোকে বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন ভাবে দেখে। এই টেবিলখানি এই দিক হইতে আমি যে-রকম দেখিতেছি অপর পাশ হইতে আমার বন্ধু সেই রকম দেখিতেছেন না। আমরা যাহা দেখিতে পাই তাহারই নাম যদি দৃশ্য হয়, তবে এ-কথা সত্য যে বিভিন্ন ব্যক্তির দৃশ্যও বিভিন্ন। দৃষ্টিভেদে অবশ্যই দৃশ্য ভিন্ন হইয়া থাকে। এক কথায় দৃশ্য সর্ব্বথা দর্শনসাপেক্ষ।

আচ্ছা, স্বীকার করা গেল, যাহা-কিছু দেখি তাহা আমাদের দেখার উপরই নির্ভর করে। কিন্তু এমনও ত অনেক জিনিষ আছে, যাহা আমরা দেখি না। সেগুলি কি করিয়া থাকে? বার্কলী এ-কথা বলিতে চান না যে, আমরা বিভিন্ন ব্যক্তি যাহা দেখিতে পাই না, তাহা মোটেই নাই। তিনি বলেন, আমরা মানুষেরা যাহা দেখিতে পাই না, তাহা ভগবানের জ্ঞানে আছে। আমরা সর্ব্বজ্ঞ না হইলেও ভগবান যে সর্ব্বজ্ঞ তাহাতে সন্দেহ নাই।

এখন কথা হইতে পারে যে, আমরা যাহা দেখি, তাহা ত বস্তুর গুণ মাত্র। রূপ, রস, গন্ধ ত বস্তুর গুণ, এই গুণের নীচে ত গুণবান্ দ্রব্য রহিয়াছে। তাহা ত আমাদের জ্ঞানসাপেক্ষ নয়। বার্কলী বলেন, রূপ, রস, গন্ধ আমরা দেখিতে পাই এবং তাহারা আছে বলিয়া মানিয়া লইতে পারি। কিন্তু তাহাদের নীচে বা পশ্চাতে দ্রব্য বলিয়া যে কোন পদার্থ আছে, তাহা ত আমরা দেখিতে পাই না এবং আছে বলিয়া মানিবার কোন কারণও নাই। ঐ রকম একটা জড় দ্রব্য মানিবার কারণ তখনই হয়, যখন আমরা মনে করি আমাদের মধ্যে রূপরসের জ্ঞান বাহ্য পদার্থের দ্বারা উৎপাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু শুধু বাহ্য জড়পদার্থের দ্বারাই যে আমাদের ঐ রকম জ্ঞানের উপপত্তি হইতে পারে তাহা নহে। সাক্ষাৎ ভগবানের নিকট হইতে আমরা ঐ জ্ঞান লাভ করিতে পারি। 'বাহিরে জড়পদার্থ আছে, তাহার পর তাহারা আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর কাজ করিয়া আমাদের বিষয়জ্ঞান উৎপাদন করে' একথা না ভাবিয়া আমরা আরও সহজে ভাবিতে পারি যে ভগবান নিজ ইচ্ছার বলে সাক্ষাৎ ভাবে ঐ সব জ্ঞান আমাদের মধ্যে উৎপাদন করেন। দৃশ্যের জ্ঞান লইয়াই ত কথা। সেই জ্ঞানের উপপত্তির জন্য নানা জড়পদার্থের কল্পনা করা এবং তাহাদের ক্রিয়ার দ্বারা এক দুনিরূপ্য উপায়ে অজড় জ্ঞানের সৃষ্টি হয়, এই কথা ভাবা অপেক্ষা এক ভগবানের কল্পনা করাই সমীচীন। বাস্তবিকপক্ষে শুধু আমরা আছি ও ভগবান আছেন (বাহ্য কোন জড়পদার্থ নাই) এবং ভগবান তাঁহার ইচ্ছাবলে আমাদের মধ্যে নানা দৃশ্যপদার্থের জ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকেন।

হেগেল পাশ্চাত্য জ্ঞানতাত্ত্বিকদের একজন প্রধান নেতা। তিনি যে-জ্ঞানতন্ত্রের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাশ্চাত্য দেশে এবং আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষিত বিদ্বৎ সমাজে অনেক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তাঁহার জ্ঞানতন্ত্র বার্কলীর জ্ঞানতন্ত্র হইতে কিয়দংশে বিভিন্ন। বার্কলীর মতে বিষয়ের জ্ঞান-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা নাই; হেগেলও বিষয়ের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেন না। কিন্তু বিষয়ের অস্তিত্বের জন্য বার্কলীর মতে কোন ব্যক্তির—মানুষের বা ভগবানের—জ্ঞান থাকা আবশ্যক। হেগেলের মতে বিষয়ের গঠনই এমন যে, বৌদ্ধিক আকার ছাড়া তাহার কল্পনা করা যায় না। এ-কথার সম্পূর্ণ অর্থ স্পষ্টভাবে বুঝিতে হইলে হেগেলীয় দর্শনের গোড়ার দুই-একটা কথা আমাদের বোঝা দরকার।

হেগেলের আগে কাণ্ট প্রমাণ করিয়া গিয়াছিলেন যে, আমরা বিষয়রূপে যে জগতকে জানি তাহা দৃশ্যপ্রপঞ্চ (phenomenal) মাত্র। পদার্থের উপরে কতকগুলি বৌদ্ধিক আকারের (the forms of the understanding) ছাপ দিয়া আমরা পদার্থকে জ্ঞানের বিষয় করিয়া থাকি। দেশ, কাল, কার্য্যকারণসম্বন্ধ, একত্ব, বহুত্ব প্রভৃতির ভিতর দিয়া আমরা বিষয়কে উপলব্ধি করিয়া থাকি। আমরা এমন কিছু জানি না যাহা কোন দেশে বা কালে নাই, কাহারও কার্য্য বা কারণ নয়, এক বা বহু নয়। কিন্তু দেশ বা কাল, একত্ব, বহুত্ব বা দ্রব্যত্ব, বিষয়-নিষ্ঠ বাস্তবিক কোন ধর্ম্ম নহে। এই সকল রূপ বিষয়গত

না হইলেও মানববুদ্ধিতে বিষয়ের উপলব্ধি হইতে হইলে এই সকল আকারের ভিতর দিয়াই হইতে পারে। কাণ্টের মতে বাস্তবিক বিষয়ের সত্তা জ্ঞানসাপেক্ষ নয়। স্বতন্ত্র বাস্তবিক বিষয় বা বিষয়রাশিই (the things in themselves) বৌদ্ধিক আকার ধারণ করিয়া দৃশ্য-প্রপঞ্চরূপে আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়। এই অর্থে দৃশ্যপ্রপঞ্চ জ্ঞানসাপেক্ষ। কিন্তু ব্যক্তিগত জ্ঞানের দ্বারা দৃশ্যপ্রপঞ্চ নিয়ন্ত্রিত নয়; মানব জ্ঞানের যে সকল সর্ব্বসাধারণ আকার রহিয়াছে, সেগুলির দ্বারাই তাহা নিয়ন্ত্রিত। দৃশ্যপ্রপঞ্চের পদার্থনিচয় ব্যক্তিগত জ্ঞানের দৃষ্টিতে স্বতন্ত্র হইলেও শেষ দৃষ্টিতে জ্ঞাননিরপেক্ষ নয়।

কিন্তু বাস্তবিক বিষয়রাশির সব দৃষ্টিতেই স্বতন্ত্র সত্তা রহিয়াছে। তাহাদের স্বগত রূপ আমরা জানি না, জানিতে পারিও না। আমরা যাহা কিছু জানি তাহাই বৌদ্ধিক আকার ধারণ করিয়া আমাদের কাছে আসে। তাহার নিজের স্বগত রূপ আমাদের কাছে ব্যক্ত করে না। রঙীন চশমা পরিয়া যেমন বাহ্য পদার্থের বাস্তবিক রূপ দেখা যায় না, বৌদ্ধিক আকারের ভিতর দিয়াও তেমনই আমরা বাস্তবিক পদার্থের স্বগত রূপ দেখিতে পাই না। পদার্থের বাস্তবিক স্বগত রূপ আমাদের কাছে একান্ত অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়।

হেগেল বলেন, পদার্থের যে-রূপ আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়, সে-রূপ আছে বলিয়াই আমরা বুঝিতে পারি না। যাহাকে আমরা কখনই জানিতে পারি না, সে জিনিষ আছে বলিয়া মানিবার প্রমাণ আমাদের কিছুই নাই। দৃশ্যপ্রপঞ্চই আমরা জানি, ইহার নীচে বা পশ্চাতে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় রূপ লইয়া কোন বস্তু বা বস্তুবাংশ বসিয়া আছে, তাহা মানিয়া লইবার কোন প্রয়োজন নাই। সুতরাং হেগেলের মতে দৃশ্যপ্রপঞ্চের জ্ঞেয় সত্তাই একমাত্র সত্তা, দৃশ্যপ্রপঞ্চের বাহিরে বস্তুর স্বগত অনির্দ্দেশ্য সত্তার কথা আমরা অবগত নই, মানিয়া লইবারও আমাদের কোন কারণ নাই।

দৃশ্যপ্রপঞ্চের সত্তাই যদি একমাত্র বাস্তব সত্তা হয়, তবে এই সত্তা যে সম্পূর্ণ জ্ঞানসাপেক্ষ তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছি। দৃশ্যপ্রপঞ্চ থাকিতে হইলেই তাহার প্রতিযোগিরূপে জ্ঞানের থাকাও অত্যন্ত আবশ্যক। টাকার এক পিঠ আছে, অপর পিঠ নাই, এ-রকম যেমন হয় না, তেমনি দৃশ্যপ্রপঞ্চ আছে, কিন্তু জ্ঞান নাই, এ-রকম হয় না। বাস্তবিকপক্ষে দৃশ্য বিষয় ও জ্ঞান দুই পদার্থ নয়। একই অন্তিম পদার্থের দুই দিক বা রূপমাত্র।

বস্তুর স্বগত কোন রূপ নাই। জ্ঞানের দেওয়া আকার লইয়াই বস্তু আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়। নির্জীব জড়-পদার্থরূপে কোন বস্তু নাই। জ্ঞানের আকার লইয়া সকল বস্তু সচেতন হইয়া আছে। আবার শূন্যময় নির্ব্বিষয় চিৎ রূপেও কোন জ্ঞান নাই। বিষয়কে আলিঙ্গন করিয়াই জ্ঞান বাস্তবতা লাভ করে। নিরাকার বা অরূপ কোন বস্তু নাই। কিন্তু সকল রূপই জ্ঞানের দেওয়া রূপ। ফলতঃ সত্তা ও জ্ঞান সম্পূর্ণ বিভিন্ন নয়। জ্ঞেয় সত্তাই একমাত্র সত্তা এবং সে সত্তা জ্ঞানের আকারে নিগড়িত হইয়াই প্রতিভাত হয়। বিষয়ের দ্বারা জ্ঞানের শূন্যতা দূর হয়, জ্ঞানের দ্বারা বিষয়ের জড়তা ও অন্ধতা দূর হয়। সবিষয় জ্ঞান বা সজ্ঞান বিষয়ই অন্তিম তত্ত্ব।

হেগেলীয় দর্শনের সুগভীর ও জটিল তত্ত্বের সুস্পষ্ট আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয় নয় এবং এক প্রবন্ধে তাহা সম্ভবপরও নহে। অতিসাধারণভাবে জ্ঞান ও সত্তার সম্বন্ধ বিষয়ে যাহা বলা অতিপ্রয়োজনীয় মনে করিয়াছি তাহাই উপরে বিবৃত করিলাম।

শুধু পাশ্চাত্য দেশেই যে জ্ঞানতন্ত্রের বিকাশ হইয়াছে তাহা নহে। জ্ঞানতান্ত্রিকতার পরাকাষ্ঠা আমাদের দেশেই দেখিতে পাই। শুধু জ্ঞানই মানি, আর কিছুই মানি না, এমন কথা কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক বলেন না। বার্কলীও নানা জীব ও ভগবান মানেন; তাহা ছাড়া জ্ঞানের বিষয়ও মানেন। জীব বা ভগবান শুদ্ধ জ্ঞানময় পদার্থ নন। তাঁহাদের জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু তাঁহারাই জ্ঞান নন। তেমনই বিষয়েরও জ্ঞান হয়, কিন্তু বিষয়ই জ্ঞান নয়। হেগেলের মতেও জ্ঞান মুখ্যতত্ত্ব হইলেও জ্ঞানের বিষয় থাকা চাই। হেগেল বিষয়কে একেবারে অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু আমাদের দেশের অদ্বৈতবাদী বেদান্তিগণ শুধু জ্ঞানই মানেন, আর কিছুই মানেন না। তাঁহারা এই কথা বলিতেছেন না যে, আমরা কোন বিষয়ই

জানি না। আমাদের বিষয়জ্ঞান অস্বীকার করা আমাদের প্রতীতির অপলাপ করা মাত্র। বিষয়ের জ্ঞান হইতেছে এ-কথা তাঁহারা মানেন, কিন্তু বিষয়ের কোন সত্তা আছে, এ-কথা তাঁহারা মানেন না। মুখ্য বেদান্ত সিদ্ধান্ত মতে যাহা-কিছু আমরা দেখি সেগুলির সত্তা শুধু প্রাতীতিক মাত্র। তাঁহাদের সত্তা আমাদের প্রতীতি বা জ্ঞানেই পর্য্যবসিত। জ্ঞানাতিরিক্ত তাঁহাদের কোন সত্তাই নাই। অদ্বৈতবাদীর মতে 'জানা'তেই 'আছা'র (বা 'থাকা'র) অর্থ ব্যক্ত হয়। যে অস্তিত্ব বা সত্তার কথা জানি না সে সত্তার কোন অর্থ নাই। অজ্ঞাত সত্তা ও সত্তাশূন্যতা একই কথা। সুতরাং যাহা-কিছু আছে সেগুলি জ্ঞানেই আছে। জ্ঞান ছাড়া কিছুই নাই।

আচ্ছা, ধরা গেল, জ্ঞানের বাহিরে কোন বস্তু নাই; কিন্তু জ্ঞানের ভিতরে বা জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া ত বিষয় রহিয়াছে? বিষয়ের জ্ঞান যখন রহিয়াছে, তখন বিষয়কেও ত মানা চাই। অদ্বৈতিগণ একথা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের প্রথম কথা, জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তার কোন অর্থ নাই, সুতরাং জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তাই নাই। তাঁহাদের দ্বিতীয় কথা, আপাতদৃষ্টিতে জ্ঞানের সত্তায়ই সত্তাবান বলিয়া বিষয়কে যদিও ধরিয়া লইতে হয়, তথাপি চরম দৃষ্টতে বিষয়ের কোন সত্তাই নাই। জ্ঞানাতিরিক্ত যখন সত্তা নাই তখন জ্ঞানের সহিত এক হইয়াই বিষয় সত্তাবান হইতে পারে। কিন্তু জ্ঞানের সহিত এক হওয়া বিষয়ের পক্ষে অসম্ভব। জ্ঞানের সহিত সম্পূর্ণভাবে এক হইয়া গেলে বিষয়ের বিষয়ত্বই থাকে না। জ্ঞানের সহিত বিষয় কোনরূপে সম্বন্ধও হইতে পারে না। জ্ঞানের সঙ্গে বিষয় সংযুক্ত হইতে পারে না, কেন-না সংযোগ দুই দ্রব্যের মধ্যেই হইয়া থাকে, জ্ঞান দ্রব্য নয়। বিষয় ও জ্ঞানের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধও সম্ভবপর নয়; কেন-না, সমবায় গুণ ও গুণীর মধ্যে হইয়া থাকে, বিষয় ও জ্ঞানের মধ্যে গুণগুণিভাব নাই। সংযোগ ও সমবায় ব্যতীত আর কোন সাক্ষাৎ বাস্তব সম্বন্ধের কথা আমরা জানি না, সুতরাং আমরা যাহাকে বিষয় বলিয়া মনে করি, তাহা একটা মিথ্যা প্রতিভাস মাত্র। ইহার কোন বাস্তবিক সত্তা নাই। অতএব জ্ঞানই একমাত্র সত্তা, আর কোন সত্তাই নাই।

আমরা মোটামুটিভাবে জ্ঞানতান্ত্রিকদের কথা বলিলাম। তাঁহারা বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থে যে-সকল সূক্ষ্ম যুক্তি-তর্কের সাহায্যে তাঁহাদের মত-প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়া থাকেন তাহার অতি ক্ষীণ আভাসও এই প্রবন্ধে দিতে পারা গিয়াছে বলিয়া আমি মনে করি না। কিন্তু সাধারণ ভাবে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ও যুক্তির ধারা আশা করি নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এখন দেখা যাউক, জ্ঞানতন্ত্রের বিরুদ্ধে বস্তুতন্ত্রের কি কথা বলিবার আছে।

জ্ঞানতান্ত্রিকেরা একটি কথা খুব জোর দিয়া বলেন এবং সে-কথা এই যে, জ্ঞানের বাহিরে সত্তা কখনই উপলব্ধ হয় না এবং যে-জিনিষের কখনই উপলব্ধি হয় না, সে-জিনিষ আছে বলিয়া কোন প্রমাণ নাই, অর্থাৎ সেই জিনিষ নাই। কিন্তু একথা কি ঠিক? ধরিয়া লইলাম, যাহা-কিছু জানি তাহাই জ্ঞানের ভিতরে আসে এবং জ্ঞানের বাহিরে কিছু আছে বলিয়া আমাদের কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু কোন বস্তুর প্রমাণ নাই এবং সে-বস্তুই নাই, এক কথা নয়। কেন-না, বস্তু এবং বস্তুর প্রমাণ এক জিনিষ নয়। হইতে পারে, প্রমাণের দ্বারাই বস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, সুতরাং যখন প্রমাণ পাওয়া গেল না তখন বস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধ হইল না। কিন্তু 'বস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধ হইল না' এ-কথার অর্থ এই নহে যে, 'বস্তু নাই' একথা সিদ্ধ হইল। অনেক বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিও তাঁহাদের বিশেষ মত পোষণের আগ্রহাতিশয্যে এই স্পষ্ট ভেদ বুঝিতে পারেন না এবং কোন জিনিষ সিদ্ধ করিতে না-পারার নামই সেই জিনিষের অভাবসিদ্ধি বলিয়া ধরিয়া লন। যখন কোন জিনিষের প্রমাণ পাওয়া গেল না, তখন সেই জিনিষ আছে কি নাই বলিতে পারা যায় না, এবং হয়ত নাই, এই সম্ভাবনাও থাকিতে পারে। কিন্তু এই সম্ভাবনাকে সেই জিনিষ না থাকার নিশ্চিত প্রমাণরূপে গ্রহণ করা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ।

কল্পনা করা যাউক, জ্ঞানের বাহিরেও জিনিষ আছে, জ্ঞানের বাহিরে বলিয়াই সে জিনিষকে আমরা জানিতে পারিব না। সুতরাং যে-জিনিষ থাকিলেও আমরা জানিতে পারি না, সে-জিনিষ আমরা জানি

না বলিয়াই যে নাই একথা কিছুতেই বলিতে পারা যায় না।

বিভিন্ন লোকে একই বস্তুর বিভিন্ন রূপ দেখে বলিয়া বস্তুর জ্ঞান ব্যতিরিক্ত নিজস্ব কোন রূপই নাই একথা বলা যায় না; কেন-না পরস্পরবিরুদ্ধ বহু রূপ একই বস্তুর সম্বন্ধে সত্য না হইলেও বস্তুর কোন রূপই নাই একথা কোন প্রমাণ হইতে সিদ্ধ হয় না। তাহার বাস্তবিক রূপ কি, তাহা হয়ত আমরা ঠিক করিয়া না জানিতে পারি, কিন্তু কোন জিনিষ ঠিক করিয়া না জানার অর্থ এই নহে যে সে জিনিষই নাই।

জ্ঞানের আকার লইয়াই বস্তু আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় এ-কথা যখন বলা হয় তখন ভুলিয়া যাওয়া যায় যে, জ্ঞানের বাস্তবিক কোন আকার নাই। তথাকথিত বৌদ্ধিক আকার (the forms of the understanding) বিষয়েরই সাধারণ রূপ মাত্র। বস্তুগত আকারই আমরা জ্ঞানে উপলব্ধি করিয়া থাকি, জ্ঞানগত আকার বিষয়ের উপর চাপাই না। সুতরাং যে-আকারে বিষয় দেখিতে পাই সে-আকার জ্ঞানগত না হওয়াতে সে-আকারের বিষয়ের থাকার সঙ্গে জ্ঞানের থাকা আবশ্যক হয় না। অদ্বৈতীরা যখন বলেন, যে-সত্তা জানি না, তাহার কোন অর্থ নাই, তখন তাঁহাদের কথা আন্তরিকভাবে মানিয়া লইতে পারা যায়। যে-বস্তু জানি না, তাহার অর্থ কি করিয়া বুঝিব? কিন্তু এ-কথার অর্থ এই নয় যে যখন জ্ঞানে কোন অর্থ বুঝি, তখন সেই অর্থ আর জ্ঞান এক। এ-কথা খুবই সত্য যে, সত্তার অর্থ জ্ঞানে বুঝিতে হয়; কিন্তু এ-কথা মোটেই সত্য নয় যে সে-অর্থ জ্ঞানের সহিত এক বলিয়া বুঝি। সত্তা ও জ্ঞান যদি একার্থক হইত, তাহা হইলে জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তা আছে কি-না এ-রকম প্রশ্ন কখনই উঠিত না। হইতে পারে সত্তা বলিতে কেহ কেহ জ্ঞান মাত্রই বুঝেন; কিন্তু তাঁহাদের কাছে এই প্রশ্ন কখনই উঠিবে না। সত্তা ও জ্ঞান একার্থক নয় বলিয়াই আমাদের প্রশ্ন উঠিয়াছে এবং এই প্রশ্নের মীমাংসা-স্বরূপ এই কথা বলিতে পারা যায় না যে, সত্তা ও জ্ঞান বলিতে একই পদার্থ বুঝায়।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যাইবে, জ্ঞানের বাহিরে বস্তু নাই, জ্ঞানতান্ত্রিকদের এই কথা নির্ব্বিবাদে মানা যায় না। তাঁহারা যে-সকল যুক্তি প্রদান করেন, উহা তাঁহাদের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। এখন দেখা যাউক, এমন কোন যুক্তি আছে কি-না, যাহার জোরে জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তা মানিতে আমরা বাধ্য।

প্রথমতঃ, আমাদের ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে যে, জ্ঞান ও তাহার বিষয় কখনও এক হয় না। আমরা যাহা জানি এবং আমাদের জানা একই পদার্থ নয়। যাহা জানি তাহা যদি জানার সহিত এক হইয়া যাইত, তাহা হইলে কিছুই জানা হইত না। সুতরাং জ্ঞেয় বিষয় জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দ্বিতীয়তঃ, আমরা যাহা কিছু জানি তাহাই আছে বলিয়া জানি। যে-পদার্থ নাই, সে পদার্থ জানা যায় না। বিষয় জানার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ের সত্তাও উপলব্ধ হয়, কেন-না, আছে বলিয়াই আমরা বিষয়কে জানি। বিষয় যে জ্ঞান হইতে ভিন্ন সে-কথা আগেই বলিয়াছি। সুতরাং বিষয়ের সত্তাও জ্ঞান হইতে ভিন্ন হওয়া উচিত। বিষয়ের সত্তা যদি জ্ঞানের সহিত এক হইয়া যায়, তাহা হইলে বিষয়ের বিষয়ত্বই থাকে না। জ্ঞানেই তাহার অস্তিত্ব লোপ হইয়া যায়। সূক্ষ্মদর্শী বৈদান্তিকগণ এ-কথা বুঝিতে পারিয়া বিষয়কেই একেবারে অস্বীকার করেন। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত বিষয়ের প্রতীতি হইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত আমরা বিষয়কে অস্বীকার করিতে পারি না,—এবং বিষয় যদি মানি, তবে জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তা না মানিব কি করিয়া? শুধু জ্ঞান দিয়া কোন বস্তু বা বিষয় গঠিত হইতে পারে না। যেখানে সকল সত্তা জ্ঞানেই পর্য্যবসিত, শুধু জ্ঞানই যেখানে আছে, সেখানে কিছু বিষয় হইতে পারে না। জ্ঞানাতিরিক্তেরই জ্ঞানের কাছে বিষয় হওয়া সম্ভবপর হয়।

কেহ কেহ বলেন, জ্ঞানের ভিতরেই জ্ঞান ও বিষয়ের ভেদ হয়, জ্ঞানের বাহিরে নয়। সুতরাং বিষয়ও জ্ঞানেরই অন্তর্গত। কিন্তু 'জ্ঞানের ভিতরে' এ কথার অর্থ কি? জ্ঞানপদার্থ ত ভাণ্ডবিশেষ নয়, যে, তাহার ভিতরে নানা বস্তু রাখিতে পারা যাইবে। জ্ঞান বৌদ্ধিক

গ্রহণ মাত্র, ইহার বাহির ভিতর নাই। জ্ঞানের ভিতরে আসিয়া বিষয় কি করিয়া জ্ঞান হইতে তাহার ভেদ ও বিষয়ত্ব রক্ষা করিবে? হয়ত বলা হইবে (যেমন হেগেল বলেন) যে জ্ঞান ও বিষয় একই অন্তিম পদার্থের দুই অবিচ্ছেদ্য দিক মাত্র। কিন্তু সেই পদার্থটি কিরূপ? তাহা কি জানা যায়? না, জানা যায় না? যদি জানা যায় তবে ত বিষয় হইয়া যাইবে, তাহাতে জ্ঞান কি করিয়া থাকিবে? আর যদি জানা না যায়, তবে, জ্ঞানতান্ত্রিকদের মতে, সে পদার্থ আছে বলিয়া কি করিয়া মানিব? বাস্তবিকপক্ষে জ্ঞান-ও-বিষয়-সম্মিলিত পদার্থের আমরা কোন কল্পনা করিতে পারি কি? হেগেলের মত মানিয়া লইলেও এই দাঁড়ায় যে, জ্ঞান অন্তিম পদার্থের একদিক্ মাত্র; কিন্তু সত্তা দুই দিকেই আছে। সুতরাং জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তা কিয়দংশে মানাই হইল।

জ্ঞানাতিরিক্ত বিষয়ের সত্তা মানিলেও এমন হইতে পারে যে বিষয় কখনই জ্ঞানের সঙ্গে অসম্বদ্ধ নয়; সুতরাং তাহার সত্তাও সর্ব্বদা জ্ঞানের সহিত সম্বদ্ধ হইয়াই আছে। বিষয়ের বিষয়ত্বই জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, অতএব তাহার সত্তাও জ্ঞানের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এ-রকম কথা কেহ কেহ বলিতে পারেন।

দেখা যাউক, বিষয়ত্ব জিনিষটা কি। কোন জিনিষ যখন জানা যায়, তখনই তাহা জ্ঞানের বিষয় হইল বলিয়া বলা যায়। সুতরাং বিষয়ত্ব কোন বস্তুর অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম নয়। জ্ঞানের সহিত সম্বদ্ধ হওয়ার নামই বস্তুর বিষয়ত্ব। এই সম্বন্ধটা কিরূপ? বস্তু যেমন ভাবে আছে, তেমন ভাবে উপলব্ধি করার নামই জ্ঞান, যে-জ্ঞানে বস্তুর রূপান্তর ঘটাইয়া দেয়, সে-জ্ঞান সত্য জ্ঞান নয়। সুতরাং এ-কথা অবশ্য মানিতে হইবে যে জ্ঞানের সহিত সম্বদ্ধ হওয়াতে বস্তুর কোন রূপান্তর ঘটে না। জ্ঞানের স্বভাব বস্তুকে শুধু প্রকাশ করা; জ্ঞানের কার্য্যকরী কোন শক্তি নাই, যাহার দ্বারা জ্ঞান বস্তুর রূপান্তর ঘটাইতে বা নূতন বস্তু সৃষ্টি করিতে পারে। যাহা এখন বলা হইল তাহা যদি সত্য হয়, তবে এ-কথা মানা উচিত যে বিষয়ত্বের দ্বারা বস্তুর আসল কোন গুণ-ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হয় না। জ্ঞান যখন কোন বস্তুর সৃষ্টি করে না, প্রকাশ ছাড়া জ্ঞানের যখন কোন কার্য্যকরী শক্তি নাই, তখন জ্ঞানের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া বস্তুর বিষয়ত্ব ছাড়া অন্য কোন ধর্ম্মই লাভ হয় না। কাজেই জ্ঞানের সঙ্গে অসম্বদ্ধ হইলেও বস্তুর অন্য কোন গুণধর্ম্মের নাশ হইতে পারে না। অতএব জ্ঞানের সহিত অসম্বদ্ধ অবস্থায় বস্তুর সত্তা অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এ কথা মানিতে বিশেষ বাধা থাকিতে পারে না। জ্ঞানের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া যদি বস্তু সত্তা পাইত, অর্থাৎ জ্ঞান যদি বস্তুর সৃষ্টি করিত, তাহা হইলে জ্ঞান ছাড়া বস্তু থাকিতে পারিত না। কিন্তু তাহা যখন নয় তখন জ্ঞানের সহিত অসম্বদ্ধ হইয়াও বস্তু কখনই সত্তা হারাইতে পারে না।

হইতে পারে সর্ব্বজ্ঞ কেহ আছেন, যিনি যাহা কিছু আছে তাহা সবই জানেন। কিন্তু বস্তুর থাকা এবং তাঁহার জানা এক নহে। বস্তুর অস্তিত্ব বস্তুতে আছে এবং তাঁহার জানা তাঁহাতেই আছে। কোন বস্তু থাকিলেই কেহ-না-কেহ তাহা জানিবে এমন কথা বস্তুর অস্তিত্বের অর্থের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 'থাকা'র মধ্যে 'জানা'র অর্থ নিহিত নয়, এই অর্থেই বস্তুতান্ত্রিকেরা মনে করেন যে, সত্তা সর্ব্বথা জ্ঞাননিরপেক্ষ।

স্বাগতা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

আরোগ্য

এক সপ্তাহ পরে যে ডাক্তার স্বাগতাকে দেখিয়াছিলেন তিনি হরিনাথকে টেলিফোনে ডাকিলেন। ডাক্তার বলিলেন, আপনি ডাক্তার কার্লসের নাম শুনিয়াছেন ?

হরিনাথ বলিল, কই, না।

ডাক্তার বলিলেন, মস্তিষ্কের রোগের তিনি অদ্বিতীয় চিকিৎসক। তাঁহার সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি য়ুরোপ থেকে ভ্রমণে বেরিয়েচেন, দু-দিন হ'ল এখানে এসেচেন। আমার ইচ্ছা আপনাদের বাড়ির রোগীকে তাঁকে দিয়ে একবার দেখান। ডাক্তার কার্লস বলেচেন তিনি কর্ম থেকে অবসর নিয়ে ভ্রমণ করচেন, রোগী দেখবেন না, তবে তাঁকে অনেক ক'রে ধরলে আর রোগের নতুন রকম লক্ষণ শুনলে দেখতে রাজি হ'তে পারেন।

—বেশ ত, তাঁকে নিয়ে আসুন না।

—তাঁর ফী কত জানেন ?

—তা যতই হোক, তার জন্য কিছু এসে যায় না। আপনি যেমন ক'রে পারেন তাঁকে নিয়ে আসুন।

—তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে আমি আপনাকে খব'র দেব।

ডাক্তার কার্লস প্রথমে কোন মতেই রোগী দেখিতে স্বীকার করেন না, তাহার পর অনেক পীড়াপীড়িতে ও রোগের সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া রোগীকে দেখিতে স্বীকার করিলেন।

বাড়ির ডাক্তারের সঙ্গে ডাক্তার কার্লস আসিলেন। বয়স পঞ্চাশ বৎসর হইবে, দীর্ঘ শীর্ণ মূর্ত্তি, প্রশস্ত উচ্চ ললাট, ঘন ভ্রূর নীচে উজ্জ্বল কোমল চক্ষু, কাঁচাপাকা দীর্ঘ দাড়ী বক্ষের উপর পড়িয়াছে। হরিনাথ ও গঙ্গাধর অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিল।

ডাক্তার কার্লস ইংরাজ নহেন, স্পেনের অধিবাসী, ভাঙাভাঙা ইংরেজী বলেন। স্বাগতার সম্বন্ধে প্রথমে হরিনাথ ও গঙ্গাধরকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার পর স্বাগতাকে দেখিতে গেলেন। স্বাগতা খাটের উপর বসিয়াছিল। ডাক্তার কার্লস তাহার সম্মুখে একটা চেয়ারে বসিলেন, অন্য ডাক্তার পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হরিনাথ কহিল, উনি ইংরাজী জানেন, আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন।

প্রথমবার যে স্বাগতাকে হত্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল সে-কথা চাপা দিয়া ডাক্তারকে বলা হইয়াছিল দুইবারই মোটর হইতে পড়িয়া গিয়াছিল।

ডাক্তার কার্লস অনেকক্ষণ স্বাগতাকে দেখিলেন, তাহার পর তাহার স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। মস্তক ও অঙ্গ পরীক্ষা করিবার সময় হরিনাথ ও গঙ্গাধর ঘরের বাহিরে গেল।

দীর্ঘকাল পরীক্ষার পর ডাক্তার কার্লস বাহিরে আসিলেন। বলিলেন, আমি অস্ত্র করিতে স্বীকৃত আছি।

হরিনাথ আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, সেরে যাবে ?

—খুব আশা করা যায় সেরে যাবে, কিন্তু নিঃসন্দেহে কিছু বলা ডাক্তারের কর্ত্তব্য নয়। আমি এই পর্যান্ত বলতে পারি, বিশেষ কোন আশঙ্কা নেই।

হরিনাথ অন্য ডাক্তারকে চুপিচুপি বলিল, এই বেলা টাকার কথাটাও হয়ে যাক।

ডাক্তার কার্লসকে আলাদা এই কথা বলিতেই তিনি মাথা নাড়িয়া হাত তুলিলেন, বলিলেন, আমি এখানে পথিক, টাকা নিয়ে চিকিৎসা করবার জন্য আসি নি। এ-রকম রোগ প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না, আর অস্ত্রও খুব সাবধানে করতে হয় ব'লে আমি হাতে নিয়েচি। টাকা-পয়সার কোন কথা নেই।

কোন্ দিন অস্ত্র করা হইবে, কি কি আবশ্যক, ডাক্তার সব বলিয়া গেলেন। কয়েকটা যন্ত্র তিনি নিজে আনিবেন বলিলেন।

অস্ত্র করিবার দিন ডাক্তার কার্লসের সঙ্গে বাড়ির ডাক্তার ও আর এক জন ডাক্তার আসিলেন। সঙ্গে এক জন ভাল নর্স‌ও আসিয়াছিল। স্বাগতাকে অজ্ঞান করিয়া অস্ত্র করিতে হইবে। অস্ত্র করিবার সময় ঘরে আর কেহ রহিল না।

অস্ত্র হইয়া গেলে পর ডাক্তারেরা বাহিরে আসিলেন। ডাক্তার কার্লসের আদেশ অনুসারে ঘর অন্ধকার করা হইল। প্রয়োজন হইলে নর্স একটা মোমবাতি জ্বালিবে কিন্তু রোগীর চক্ষে আলোক পড়া একেবারে নিষেধ।

বাহিরে আসিয়া বাড়ির ডাক্তার হরিনাথ ও গঙ্গাধরকে বলিলেন, অস্ত্র খুব ভাল হয়েচে। ডাক্তার কার্লস না হ'লে আর কেউ এ-রকম অস্ত্র করতে পারত না।

ডাক্তার কার্লস বলিলেন, আমি দু-বেলা আসব। কাল মাথার পটি খুলে আমি নিজে আবার বেঁধে দেব। এক সপ্তাহ রোগীকে অন্ধকারে রাখতে হবে, বাড়ির কোন লোক ওঁর কাছে যাবে না।

হরিনাথ জিজ্ঞাসা করিল, উনি বেশ সেরে উঠবেন ত?

ডাক্তার বলিলেন, হাঁ, একেবারে সেরে যাবে।

—কত দিনে বিছানা থেকে উঠতে পারবেন?

—পনর দিন লাগবে। এক সপ্তাহ পরে আপনারা ওঁর ঘরে যেতে পারেন, ওঁর সঙ্গে কথা কইতে পারেন।

এক সপ্তাহ পরে হরিনাথ গঙ্গাধর প্রভাবতী ঘরে প্রবেশ করিল। একটা জানালা খোলা, তাহার উপর পর্দা টানা, ঘরে অল্প আলোক প্রবেশ করিতেছে। স্বাগতার মাথা পটি দিয়া বাঁধা, চক্ষু নির্ম্মল, রোগশয্যায় মুখ কিছু কৃশ দেখাইতেছে। সকলকে দেখিয়া স্বাগতার মুখে মেঘমুক্ত সূর্য্যালোকের ন্যায় হাসি ফুটিল।

প্রভাবতী শয্যার পাশে বসিয়া স্বাগতার হাত তুলিয়া লইল, বলিল, চিনতে পার?

স্বাগতা প্রভার হাত চাপিয়া হাস্যমুখে বলিল, চিনতে পারব না কেন? প্রভার যেমন কথা!

হরিনাথ জিজ্ঞাসা করিল, এখন আপনার সব মনে পড়চে?

স্বাগতার ভ্রূ একবার কুঞ্চিত হইয়া আবার তখনই ললাট নির্ম্মল হইল। বলিল, সব মনে পড়চে, তবে দু-বার যে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম তখনকার কথা মনে নেই।

গঙ্গাধর বলিল, মাথার কোন যন্ত্রণা নেই?

—না, কাটা সারতে যা দেরি। সেরে উঠেই সুবর্ণপুরে যাব। দেওয়ান ত্রিলোচনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে হবে।

স্বাগতার মুখের হাসি মিলিয়া গেল, চক্ষে কঠিন জ্বালা।

হরিনাথ বলিল, এখন ও-সব কিছু ভাববেন না, আগে ত সেরে উঠুন তার পর যেমন ভাল বোঝেন করবেন।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

কার্ত্তিক কাহাকে দেখিল

কোন একটা কর্ম্মের উপলক্ষ্যে কার্ত্তিক একবার কলিকাতায় আসিয়াছে। এক দিন বৈকালবেলা মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে গঙ্গার ধারে উপস্থিত হইল। সে দাঁড়াইয়া জাহাজ দেখিতেছে এমন সময় হরিনাথ মোটর করিয়া সেইখান দিয়া যাইতেছিল। কার্ত্তিককে দেখিয়া মোটর দাঁড় করাইল। বলিল, এই যে কার্ত্তিকবাবু, তুমি কলকেতায় কবে এলে?

কার্ত্তিক মোটরের পাশে আসিয়া বলিল,—দিন-দুই হ'ল একটা কাজে এসেচি।

—এস, গাড়ীতে এস, আমার সঙ্গে একটু বেড়াতে যাবে।

কার্ত্তিক মোটরে উঠিয়া হরিনাথের পাশে বসিল। মোটর ও হরিনাথের বেশ দেখিয়া বলিল,—এ আপনার নিজের মোটর?

হরিনাথ অল্প হাসিয়া বলিল,—তোমার কি মনে হয়? আমার মনিবের গাড়ী?

কার্ত্তিক বিজ্ঞভাবে মাথা হেলাইয়া বলিল,—সে-সব আপনার বানানো কথা। আপনি চাল-ডালের ব্যবসা

করেন না, গরিবের মতন সেজে কোন মতলবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

হরিনাথ বলিল,—তোমার মতন সেয়ানা লোক মেলা ভার। এ গাড়ী আমারই, আর আমি চালের দর জানবার জন্ম এ-দেশ ও-দেশ ক'রে ঘুরে বেড়াতাম না। যে-জন্ম গিয়েছিলাম তা সফল হয়েচে। এখন চল, একবার আমাদের বাড়ি যাবে।

তাহাতে কার্ত্তিকের কি আপত্তি? হরিনাথের প্রদত্ত টাকা এখনও তাহার কাছে ছিল, সামান্তই খরচ করিয়াছিল। হরিনাথ আবার কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কোন্ না আরও কিছু দিতে পারে। উৎসাহের সহিত বলিল,—বেশ ত, চলুন না।

হরিনাথ কার্ত্তিককে বাড়িতে লইয়া গেল। বাড়ি-ঘরের সজ্জা দেখিয়া কার্ত্তিকের চমক লাগিল, সম্ভ্রান্ত হইয়া কহিল,—বাড়িও আপনার নিজের?

হরিনাথ হাসিতে লাগিল। বলিল,—যেমন গাড়ী, তেমনি বাড়ি। এসব চাল-ডাল বেচে হয়েচে।

গঙ্গাধর কার্ত্তিককে দেখিয়া বলিল,—আরে এস এস, কার্ত্তিকবাবু! তোমার সঙ্গে কলকেতায় দেখা হবে মনে করি নি।

দেখিয়া-শুনিয়া কার্ত্তিক অবাক হইয়া গিয়াছিল। এই দুই ব্যক্তি যে ধনী তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। কার্ত্তিক সমিহা করিয়া কথা কহিতে লাগিল।

হরিনাথের আদেশে চাকর থালা সাজাইয়া কার্ত্তিককে জলখাবার আনিয়া দিল। খাওয়া হইলে হরিনাথ বলিল,—চল, একবার বাড়ির ভিতর যাবে।

বাড়ির ভিতর কেন? ইহাদের বাড়িতে কি মেয়েদের পর্দ্দা নাই? কার্ত্তিক কোন কথা কহিল না, নীরবে হরিনাথ ও গঙ্গাধরের সঙ্গে অন্দরমহলে গেল।

বিদ্যুতের আলোকে আলোকিত কক্ষে গদি-দেওয়া আরাম-চেয়ারে বসিয়া স্বাগতা। পাশে প্রভাবতী বসিয়া ছিল, অপরিচিত লোককে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া উঠিয়া গেল।

প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াই স্বাগতাকে দেখিয়া কার্ত্তিক একবার ওঁ্যা করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। মুখের কথা বন্ধ হইয়া গেল, সর্ব্বাঙ্গ ঠক-ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল, দাঁত-কপাটী লাগিয়া অজ্ঞান হইবার উপক্রম হইল।

স্বাগতা হাসিল। রৌপ্য ঘণ্টিকার ন্যায় মধুর ধ্বনি, চক্ষে হাসির উজ্জ্বল ছটা। মাথায় পটি বাঁধা নাই, ক্ষত স্থান সারিয়া গিয়াছে। বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে কহিল,—কার্ত্তিক, ভয় কিসের? আমি ম'রে ভূতপেত্নী হইনি, আর এঁরা কি বাড়িতে পেত্নী পুষেছেন? তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বস।

কার্ত্তিকের হাঁটুতে যেন খিল ধরিয়াছিল, হরিনাথ তাহার কাঁধ ধরিয়া একটা চেয়ারে বসাইয়া দিল। কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া কার্ত্তিক বলিল,—আপনি—আপনি—আপনি—

আর তাহার কথা বাহির হয় না। স্বাগতার মুখে চক্ষে হাসি লাগিয়াছিল, কহিল,—আমি ম'রে গিয়েছিলাম, না? মরা মানুষও আবার বাঁচে, দেখেচ আশ্চর্য্য ব্যাপার!

এবার কর্ত্তিকের কথা ফুটিল, কহিল,—তা হলে সে-সব মিথ্যা কথা!

—এখন কি তোমার তাই মনে হচ্চে না? আমি ডুবেও মরি নি, পুড়েও মরি নি, যম না নিলে কেমন ক'রে মরব?

—আর বড়বাবু?

স্বাগতা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—তিনি নেই। আমাদের দু-জনেরই যাবার কথা, তা হ'ল না, আমি এখন আছি।

কার্ত্তিক বলিল,—আপনি এতদিন দেশে যান নি কেন?

—আমার মাথার ব্যারাম হয়েছিল, সব ভুলে গিয়েছিলাম। এখন ডাক্তার আমাকে ভাল করেচে।

—তাহলে এইবার দেশে যাবেন ত?

—যাব বইকি। তোমার বাবা একবার কামিনীকে সঙ্গে ক'রে আমাকে নিয়ে যেতে এসেছিলেন, তারপর আমাকে ষ্টেশনে ফেলে রেখে তাঁরা চলে গেলেন।

কার্ত্তিক ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানে না। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কামিনী এখানে?

স্বাগতা আবার হাসিল, বলিল,—প্রথমবার ধামা-মাথায়

ক'রে বিক্রীওয়ালী সেজে এসেছিল, তারপর আমাকে চুপি চুপি নিয়ে গিয়েছিল। তখন আমি লোক চিনতে পারতাম না।

কার্ত্তিক কিছুই বুঝিতে পারিল না। হরিনাথ বলিল,—কার্ত্তিকবাবু আমাদের বড় উপকার করেচেন। আপনার ফোটোগ্রাফ উনি চিনেছিলেন, ওঁর কাছেই আমরা সব জানতে পারি।

স্বাগতা বলিল,—কার্ত্তিকের উপকার আমি ভুলব না। হাঁ কার্ত্তিক, এখন বিষয় কি শৈল-দিদির হাতে?

—আজ্ঞা হাঁ।

—সুবালার বিয়ে হয়েচে?

—এখনও হয়নি, কথা হচ্চে।

—কোথায়?

কার্ত্তিক মাথা হেঁট করিয়া লজ্জিত ভাবে কহিল,—এই আমার সঙ্গে বিয়ে হবার কথা হচ্চে।

শৈলবালা যে ত্রিলোচনকে সাফ জবাব দিয়াছিলেন কার্ত্তিক তাহা জানিত না।

স্বাগতা স্মিত মুখে কহিল,—তাহলে ঘরে ঘরে বিয়ে, বর আর খুঁজতে হবে না।

কার্ত্তিক বিদায় হইবার জন্য উসখুস করিতে লাগিল, বলিল,—বাড়ি গিয়ে আমি কি বলব?

—যেমন দেখ্‌চ সেই রকম বলবে। আমি আর একটু সেরে উঠলেই যাব।

বাহিরে আসিয়া হরিনাথ কার্ত্তিককে বলিল,—কেমন, কার্ত্তিকবাবু, আর কিছু টাকার দরকার?

কার্ত্তিক পিছাইল, তাড়াতাড়ি বলিল,—না, না, আমি টাকা নেব না। আমি কালই দেশে ফিরে যাব। সেখানে সবাই শুনে অবাক হয়ে যাবে।

—শুধু হাতে যেতে নেই, বলিয়া হরিনাথ স্বাগতার একখানি ফোটোগ্রাফ বাহির করিয়া কার্ত্তিকের হাতে দিল।

উনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

ঘটকালি

স্নিগ্ধ, নির্ম্মল, প্রশান্ত তড়াগতুল্য স্বাগতার স্মৃতি। তাহাতে তটস্থ তরুরাজির ছায়া পবনে ক্ষুদ্র তরঙ্গমালায় হিল্লোলিত হইতেছে। দিনমানে সূর্য্যবিম্ব, রাত্রে চন্দ্র তারকা প্রতিবিম্বিত হইতেছে। স্মৃতির সকল প্রকোষ্ঠই এখন অর্গলমুক্ত, সকল কক্ষই আলোকিত। স্বাগতার রূপরাশিতে পূর্ব্বে যে অভাব ছিল এখন তাহা পূর্ণ হইয়াছে। স্মৃতিমন্দিরে চৈতন্যপ্রতিমা অধিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অতীতের বদ্ধ রুদ্ধ প্রাচীর অন্তর্হিত হইয়া নয়নাভিরাম হরিৎ শস্যক্ষেত্র দেখা দিয়াছে।

প্রভাবতী ইতিপূর্ব্বে যে-স্বাগতাকে দেখিয়াছিল এখন আর সে-স্বাগতা নাই। যে-সময় স্মৃতির দোষ ঘটিয়াছিল তখন স্বাগতা ভীরু সঙ্কুচিতা, মনের বল ছিল না, আত্ম-নির্ভর ছিল না, কলের ন্যায় চলিত ফিরিত, যে যাহা বলিত বিনা আপত্তিতে তাহাই করিত। এখন স্বাগতা নিজেকে ফিরিয়া পাইয়াছিল, নিজের উপর নির্ভর হইয়াছিল, বুদ্ধিমতী রমণীর ন্যায় নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিত।

স্বাগতার সুবর্ণপুরে ফিরিয়া যাইবার কথা হইতেছিল। এখন পর্য্যন্ত দিনস্থির হয় নাই, কিন্তু শীঘ্রই যাইবার কথা। হরিনাথ ও গঙ্গাধর সঙ্গে যাইতে স্বীকৃত হইয়াছিল। ত্রিলোচনের বিরুদ্ধাচারের আর কোন আশঙ্কা ছিল না। ত্রিলোচন আত্মরক্ষার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিবেন তাহা কেহ জানিত না, কিন্তু তিনি যে সাহস করিয়া স্বাগতার বিপক্ষে দাঁড়াইবেন তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। আর যাহা কিছু আবশ্যক হরিনাথ তাহা করিয়া রাখিয়াছিল। উকীলের পরামর্শ গ্রহণ করা, প্রয়োজন হইলে মোকদ্দমা করা, এ সকল উদ্যোগ হইয়া গিয়াছিল। স্বাগতা সম্পূর্ণরূপে সুস্থ সবল হইয়া সুবর্ণপুরে ফিরিবে ইহাই স্থির হইয়াছিল।

সন্ধ্যার সময় বারান্দায় বসিয়া প্রভাবতী ও স্বাগতা কথা কহিতেছিল। তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না। স্বাগতা বলিল,—তোমরা আমাকে স্বাগতা বল কেন? এ নাম কোথা থেকে পেলে?

প্রভাবতী হাসিয়া বলিল,—তোমার কি কিছু মনে ছিল, সব ভুলে গিয়েছিলে। তুমি কে, তোমার কি নাম

সব ভুলে গিয়েছিলে। স্বাগতা নাম কার রাখা বল দেখি ?

স্বাগতা প্রভাবতীর হাতের উপর হাত রাখিয়া বলিল,—স্বাগতা—বেশ নাম। শুভাগতা। আমার ত শুভাগমন নয়, তোমাদের সকলেরই বিপদ। তোমরাই কেউ এ নাম রেখে থাকবে।

—আমাদের অত বিদ্যে নেই, যাঁর বাড়িতে রয়েচ তিনি ঐ নাম রেখেচেন। তিনি আমাদের বুঝিয়েছিলেন যে, ওঁর ঘরে তোমার শুভাগমন হয়েচে তাই তুমি স্বাগতা।

ধীরে ধীরে স্বাগতার গণ্ডস্থল রক্তবর্ণ হইল। নিভৃতে হরিনাথের সঙ্গে একদিন কি কথোপকথন হইয়াছিল তাহা স্মরণ হইল। হরিনাথের অধীরতা, তাহার আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি, তাহার কথার আবেগ মনে পড়িল। স্বাগতার বক্ষ চঞ্চল হইল, অঙ্গ আবেশপূর্ণ হইল। প্রভাবতী তাহার মুখ দেখিতেছিল, যে-সকল লক্ষণ দেখিল তাহার অর্থ বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না।

একটু পরে স্বাগতা বলিল,—হরিনাথবাবু আর তোমার স্বামী আমার প্রাণ রক্ষা করেচেন। তাঁরা এসে না পড়লে মাঠের মাঝখানে আমাকে কে দেখত? ওদের দেখে শ্যামাচরণ পালায়, তা না হ'লে আমাকে খুন করত। এতদিন ত আমি মানুষ ছিলাম না, পাগল বললেই হয়। এখানে এমন আদর-যত্নে রয়েচি, এ উপকার আমি কেমন ক'রে শোধ করব ?

প্রভাবতী কিছু বেগের সহিত কহিল,—ও রকম কথা তোমার মুখে শুনলে হরিনাথবাবুর বড় দুঃখ হবে, তা জান ?

স্বাগতা কহিল,—তা জানি, তোমাকে বলচি, ওঁকে আর কি বলব ?

প্রভাবতী বলিল,—ওঁর মনের কথা তুমি জান ?

স্বাগতা চক্ষু নত করিল, তাহার মুখে আবার রক্তিম আভা দেখা দিল। কহিল,—কারুর মনের কথা কেমন ক'রে জানব ?

প্রভাবতী স্বাগতার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি কহিল,—তোমার মনের কথা আমাকে বল দেখি।

—আমার আবার মনের কি কথা!

—তুমি হরিনাথবাবুকে ভালবাস, উনিও তোমাকে ভালবাসেন।

—ও রকম কথা আমার শুনতে নেই। আমার কপালে বিধাতা ও-সব কিছু লেখেন নি। আমার ত সব চুকে-বুকে গিয়েচে।

—কেন? ছেলেবেলা তোমার বিয়ে হয়েছিল ব'লে? তুমি ত বিয়ের মর্ম্ম কিছু জান না, ভালবাসা কাকে বলে তুমি কবে জানলে ?

—ও-সব কথায় কাজ কি ভাই? আমি যেমন ছিলাম, দেশে গিয়ে আবার সেই রকম থাকব। তোমাদের কাছে যে আদরযত্ন পেয়েচি তা চিরকাল মনে থাকবে।

—শুধু কি তাই? হরিনাথবাবুকে মনে পড়বে না? উনি কি কখন তোমাকে কিছু বলেন নি ?

স্বাগতা অতি মৃদুস্বরে কহিল,—বলেছিলেন। এখানে যখন প্রথম আসি, আগেকার কোন কথা মনে ছিল না, তখন আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন।

—তুমি কি বলেছিলে ?

—আমি ত তখন কিছুই বুঝতে পারতাম না, আমি ওঁর কথায় সায় দিয়েছিলাম।

—আর এখন যদি আবার উনি সেই কথা বলেন, তাহলে তুমি কি বলবে ?

—মেয়েমানুষের কি দু-বার বিয়ে হয় ?

—বিধবার বিয়ে হয় তা ত তুমি জান, আর বাল্যবিধবার বিয়েতে কোন দোষ নেই।

স্বাগতা আর কোন কথা কহিল না, আঁচল পাকাইতে লাগিল।

ঘটকালির উত্তম অবসর বুঝিয়া প্রভাবতী স্বামীর কাছে কথা পাড়িল। কহিল,—তোমরা সাত দেশে ঘুরে ত স্বাগতার খোঁজখবর সব নিয়েচ, এক জন মস্ত ডাক্তার এসে ওঁকে সারিয়েও দিয়েচে। এখন কি হবে ?

—কি আবার হবে? স্বাগতা দেশে গিয়ে নিজের বিষয় নেবে আর ঐ দেওয়ানটাকে তাড়িয়ে দেবে কিংবা জেলে দেবে।

—আর কিছু না ?

—আবার কি ?

—কেন, হরিনাথবাবু স্বাগতাকে বিয়ে করুন না কেন ?

—ওহো, ঘট্‌কী ঠাকরুণ! ঘটকালি বিদ্যে কবে হ'ল ?

—তুমি বুঝি মনে করতে তোমার কানমলাই আমার একমাত্র বিদ্যে !

—সে ত গুরুমারা বিদ্যে, পণ্ডির বাড়া গুরু নেই। ঘটকালি কি পাবে, শুনি ?

—অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্তে। তা রাজকন্তেটা না হয় তুমি নিও, না-হয় আমার বাঁদি হয়ে থাকবে ;

—আস্পর্দ্ধার কথা শোন! তামাশা ছেড়ে সত্যি কথা বল। এ ঘটকালিটা তোমার মনে হ'ল কি করে ?

—আমি কি তোমার মতন চোকে চশমা পরি, না আমি কানা? হরিনাথবাবু স্বাগতাকে বিয়ে করতে চান তা কি তুমি জান না ?

—আমি ত জানি, তুমি জানলে কেমন করে ?

—সেটুকুও বোঝবার বুদ্ধি নেই! যাকে বিয়ে করতে চান সে-ই আমাকে বলেচে।

—বটে? এইবার বুঝেচি। সে কি বলে ?

—হরিনাথবাবুকে জিজ্ঞাসা করতে ব'লো। মেয়েমানুষ কি বিয়ে-পাগ্‌লী হয়ে বেড়ায় ?

—দিব্য পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলে। হরিনাথকে বলব তোমাকে সোনার পাঁইজর গড়িয়ে দেবে।

—আর তোমার পায়ে লোহার বেড়ী

—সে কি আবার নতুন ''র গড়াতে হবে ?

—কী, আমি তোমার পায়ের বেড়ী ?

—বাস রে, তুমি আমার মাথার মাণিক !

পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

ত্রিলোচনের সঙ্কট

কার্ত্তিকের হাতে স্বাগতার ফোটোগ্রাফ দিবার সময় হরিনাথ তাহাকে একটা সংবাদ শুনাইয়াছিল। বলিয়াছিল, তুমি ত শ্যামাচরণকে চেন? তোমার বাবার কাছে যাওয়া-আসা করত ?

কার্ত্তিক বলিল,—চিনি বইকি! লাঠির ভিতর গুপ্তি নিয়ে বেড়াত, আর আমাকে বেতপেটা করবে বলেছিল। তাকে আমরা ঠিক করে দিয়েছিলাম।

হরিনাথ বলিল,—শ্যামাচরণ মোটর উল্টে গিয়ে পুড়ে মারা গেছে। আমরা স্বচক্ষে দেখেছি !

—অ্যাঁ, আপনি বলেন কি !

—সত্যি কথা। তোমাদের চৌধুরাণী ঠাকরুণের ডুবে মরা মিথ্যা কথা। শ্যামাচরণ ওঁকে মোটরে পুড়িয়ে মারবার চেষ্টা করেছিল। উনি একদিন শ্যামাচরণকে চিনে ফেলেছিলেন। সে মোটর হাঁকিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল, দমকলে ধাক্কা লেগে মোটর উল্টে পুড়ে মরেচে। আমরাও সেখানে ছিলাম। তোমার বাবাকে এ খবরটা দিও।

কার্ত্তিক আর কোন কথা কহিল না, স্তম্ভিত হইয়া চলিয়া গেল।

স্পষ্ট কিছু বুঝিতে না পারুক কার্ত্তিকের মনে বড় ভয় হইল। সে সুবর্ণপুরে ফিরিয়া গিয়া পিতাকে অপরের অসাক্ষাতে সকল কথা বলিল, স্বাগতার ফোটোগ্রাফ দেখাইল। অনেকক্ষণ ত্রিলোচনের বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না, হৃৎপিণ্ড কে যেন চাপিয়া ধরিল, নিয়তি যেন ঘনাইয়া আসিল। ক্রমাগত কোঁচার কাপড় দিয়া মুখের ও মাথার ঘাম মুছিতে লাগিলেন। চক্ষে ত্রস্ত দৃষ্টি, মুখে কালিমা ছাইয়া আসিল। কার্ত্তিকের কথা শেষ হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই তাদের বাড়ি গেলি কেমন ক'রে ?

—যাঁর সঙ্গে আমার রেলে দেখা হয়েছিল তাঁরই বাড়ি। আমাকে পথে দেখতে পেয়ে মোটরে তুলে নিয়ে গেলেন।

—চৌধুরাণী ঠাকরুণ কি তোকে দেখেই চিনতে পারলেন ?

—তখনি। তিনি বললেন,—কামিনী আর আপনি তাঁকে আনতে গিয়েছিলেন, তাঁকে ষ্টেশনে ফেলে চলে গিয়েছিলেন।

—ও-সব পাগলামীর কথা। ওঁর মাথার এখনও ঠিক নেই।

—শ্যামাচরণ মারা গেছে, মোটরের তলায় পড়ে পুড়ে মরেচে। আর সে বাবু বললেন, শ্যামাচরণ চৌধুরাণী ঠাকরুণকে ঐ রকম ক'রে পুড়িয়ে মারতে গিয়েছিল, ডুবে যাওয়া মিথ্যা কথা।

কথা শেষ হইলে ত্রিলোচন বলিলেন,—কোন কথা যেন প্রকাশ না হয়, চৌধুরাণী ঠাকরুণ এলে পর আমি তাঁকে বুঝিয়ে দেব।

একা বসিয়া ত্রিলোচন স্থির হইয়া সমস্ত কথা ভাবিতে চেষ্টা করিলেন। প্রথমে ভাবিলেন সব ছাড়িয়া-ছুড়িয়া পলায়ন করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। কিন্তু পলায়ন করিলে যে নিজের অপরাধ স্বীকার করা হয়। তিনি যে কোন অপরাধ করিয়াছেন তাহার ত কোন প্রমাণ নাই। শ্যামাচরণ ধরা পড়িলে আশঙ্কা ছিল, সে তাঁহাকেও জড়াইবার চেষ্টা করিতে পারিত কিন্তু সে মরিয়াছে, আপদ চুকিয়া গিয়াছে। বাকি রহিল বনবিহারী। তাহার সম্বন্ধে কাহারও কি সন্দেহ হইতে পারে? যাহারা করুণাময়ী অথবা স্বাগতার পরিচয় জানিবার জন্য এত চেষ্টা করিয়াছিল তাহারা চতুর। তাহারা বনবিহারীকে জানে, আশঙ্কার এই এক কারণ। বনবিহারী যে তাহাদের নিকট হইতেও কিছু আদায় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল ত্রিলোচন তাহা জানিতেন না। বনবিহারী হইতে কোন আশঙ্কা ছিল না, কিন্তু তাহার মুখ একেবারে বন্ধ করিতে পারিলে ত্রিলোচন নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। শ্যামাচরণের যেরূপ অপঘাত মৃত্যু হইয়াছিল বনবিহারীর কি সেই রকম হয় না? কি উপায়ে বনবিহারীকে সরাইতে পারা যায় ত্রিলোচন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ

বাউল

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বাউলদের মতে পরমদেবতার যুগলমূর্ত্তি নরদেহে বিদ্যমান আছেন, তাঁহাকে অন্যত্র অনুসন্ধান করিবার আবশ্যক নাই, মন্দিরে বা তীর্থে তাঁহার সন্ধান বৃথা।

কারে বলব, কে করবে বা প্রত্যয়।
আছে এই মানুষে সত্য নিত্য চিদানন্দময়।

লালন ফকির বলিয়াছেন—

যারে আকাশ পাতাল খুঁজে মরিস,
এই দেহে সে রয়।

লালন আরও বলিয়াছেন—

আছে আদ মকা এই মানব-দেহে,
দেখ না রে মন চেয়ে।
দেশ-দেশান্তর দৌড়িয়ে এবার
মরিস কেন হাঁপিয়ে।

মানব-দেহে নিত্যবিরাজিত পরমদেবতার প্রতি প্রেম লাভ করাই বাউলদের মুখ্য সাধন। প্রকৃতি-পুরুষের পরস্পরের কামনা-বিরহিত অহেতুক প্রেমের দ্বারা ঐ প্রেম লাভ করা যায়। যখন নরনারীর যুগলপ্রেম পরিপক্বতা লাভ করে, তখন তাহারা পরস্পরের প্রেমে কেবল রাধাকৃষ্ণের লীলা মাত্র অনুভব করিতে থাকে।

বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ন্যাসী ও গৃহী দুই-ই আছে। সন্ন্যাসী বাউলেরা সন্ন্যাসের নগ্নবেশ পছন্দ করে না, তাহারা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ন্যায় লম্বা আলখেল্লা পরিয়া সমস্ত শরীর সমাবৃত রাখে। তাহারা কোনও সাম্প্রদায়িক তিলক বা গৈরিক রঙের পরিচ্ছদ ধারণ করাও আবশ্যক মনে করে না, তাহারা বলে যে তাহারা সহজ পথের পথিক, কোনও কৃত্রিমতার ধার ধারে না। ভেক ধারণ করা সম্বন্ধে বাউলের মত এই যে অন্তরে প্রেম ভক্তি বৈরাগ্য নাই, কেবল বাহিরে ভড়ং করিয়া লোক ঠকাইয়া কোনও লাভ নাই। বাউল বলেন—

ভিতরে রস না হইলে রে বাইরে কি গো রং ধরে ?
কলে কি অমৃত নামে বাইরে তারে রং ক'রে ?

বাউলদের মতে বিগ্রহসেবা বা প্রতিমাপূজার আবশ্যক নাই ; যিনি বিশ্বরূপ ও অন্তর্যামী, তাঁহাকে একটি বিশেষ মূর্ত্তির মধ্যে বন্দী করিয়া দেখা নিরর্থক অন্ধতা -

সে লীলা বুঝ্‌বি ক্ষেপা কেমন ক'রে ?
লীলার যার নাই রে সীমা কোন্ খানে কোন্ রূপ ধরে।
আপনি ঘর সে, আপনি ঘরী,
আপনি করে রসের চুরি, ঘরে ঘরে,
ও সে আপনি করে ম্যাজেষ্টরী,
আবার আপনি বেড়ায় বেড়ি প'রে।
গঙ্গায় রইলে গঙ্গাজল কয়,
গর্ত্তে গেলে কূপজল সে হয়,
তেমনি সাঁইর বিভিন্ন আকার জানায় পাত্র অনুসারে।
একে বয় অনন্ত ধারা,
তুমি আমি নাম বেওরা সব মিছে,
অধীন লালন বলে, কেবা আমি জান্‌লে ধাঁধা যেত দূরে।

ইহারা উপবাস ব্রতনিয়ম কিছুই পালন করে না—

বুঝুক সে বুঝুক বুঝুক, যার মনে যা লয় গো,
আপনা পথের পথিক আমি, কার বা করি ভয় গো !
আমের বীচে হয়ই রে আম,
জামের বীচে হয় তো রে জাম,
আমির বীচে পাকা আমি, জয় গুরু জয় জয় গো।

ইহারা তীর্থযাত্রা আবশ্যক মনে করে না—

যাইতে তো চায় না রে মন মক্কা মদিনা।
এই যে বন্ধু আমার আছে, আমি রই যে তারি কাছে,
পাগল হৈতাম দূরে রৈতাম তা'রে চিন্‌তাম রে যদি না।
নাদান হৈতাম দূরে রৈতাম ও সে ডাক্‌তো রে যদি না।
আমার নাই মন্দির কি মস্‌জিদ, নাই পূজা কি বক্‌রিদ,
তিলে তিলে মোর মক্কা কাশী, পলে পলে মদিনা।

*

ব্রেথা তা'রে খুঁইজে মরা মাটির এই বৃন্দাবনে।
ভুইঞেনি সে বস্‌বারি ধন, বস্‌বে হিঞের সিংহাসনে।
ব্রেথা সে যমুনার কূলে, ব্রেথা সে কদম্বমূলে,
ব্রেথা কুঞ্জে মরিস বুলে, দেখ্ না চেঞে আপন মনে।
লগন তো নয় সস্তা হাতে, ছড়িয়ে দিবি যাতে তাতে
যাচ্ছে ব'য়ে দিনে রাতে, দেখ্‌না খুঁজে সযতনে।

ইহারা মালা জপেরও আবশ্যকতা স্বীকার করে না।

আছে যার মনের মানুষ মনে, সে জপে মালা ?
অতি নির্জ্জনে ব'সে ব'সে দেখ্‌ছে সে খেলা।
কাছে রয়ে ডাকে তা'রে উচ্চস্বরে কোন পাগলা।
ওরে যে যা বোঝে, তাই সে বোঝে, থাক রে ভোলা।
যথা যার ব্যথা নেহাৎ, সেইখানে হাত ডলামলা।
ওরে তেমনি জেনো মনের মানুষ মনে তোলা।
যেজন দেখে সে রূপ করিয়ে চুপ রয় নিরালা।

ও সে লালন ভেঁড়োর লোক-জানানো হরি বলা,
মুখে হরি হরি বলা।

ধর্ম্মের নামে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে দ্বন্দ্ব ও কুসংস্কারের সঙ্কীর্ণতায় বাউল ব্যথিত হন।—

তোমার পথ ঢেকেছে মন্দিরে মসজেদে।
ও তোর ডাক শুনে সাঁই, চল্‌তে না পাই,
আমায় রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুরশেদে।
ডুইব্যা যাতে অঙ্গ জুড়াই, ওরে তাতেই যদি জগৎ পুড়াই,
তবে অভেদ সাধন মর্‌ল ভেদে।
ওরে প্রেম-দুয়ারে নানান তালা, পুরাণ কোরান তসবী মালা,
হায় গুরু এই বিষম জ্বালা, কাইন্দা মদন মরে খেদে।

বাউলেরা কোনও শাস্ত্রের দোহাই মানে না। যদি মন সচেতন না হয় তবে কেবল পরের কথায় কি উপকার হইবে ?

আরে কাঙলে আর করবে কত, যদি চাউনি না থাকে।
মনে মনে জাগ্‌ল যেজন, ওরে কে বাঁধ্‌বে তাকে ?
ওরে বামুন, মিছে দেখাস পুঁথির ভয়,
কেই বা শোনে, কেই বা গণে, কে করে প্রত্যয়,
ওরে কে আমায় কি কয় ?
ওরে লাগ্‌লে নেশা রয় কি দিশা,
সে আপন রস চাখে।
ওরা দাঁড়ায় যদি হাজারে হাজার,
ওরে মান্‌ব নাকো যদি সবাই দোহাই দেয় রাজার,
এ চাইবে যারে নেবেই তা'রে নেবেই এক ডাকে।

*

আমার আপন খবর আপনার হয় না।
একবার আপনারে চিন্‌লে পরে যায় অচেনারে চেনা।
সাঁই নিকট থেকে দূরে দেখায়,
যেমন কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়, দেখ না।
আমি ঢাকা দিল্লী হাৎড়ে ফিরি, আমার কোলের ঘোর তো যায় না।
আত্মা-রূপে কর্ত্তা হরি, মনে নিষ্ঠা হলে মিল্‌বে তা'রি ঠিকানা।
বেদ বেদান্ত পড়্‌বে যত, বাড়্‌বে তত লক্ষণা।
আমি আমি কে বলে মন,
যে জানে তার চরণ শরণ লও না।
সাঁই লালন বলে, মনের ঘোরে হলাম চোখ থাকিতে কাণা।

ভগবান্ হইতেছেন রসস্বরূপ, তাঁহাকে সম্ভোগ করিতে পারিবে যে ভাবুক, শুষ্ক পাণ্ডিত্যের সাধ্য নাই তাঁহার পরিচয় পায় বা অপরকে দেয়। তাই তত্ত্ব ও শাস্ত্রকথার দাস পণ্ডিতকে রসস্বরূপের পরিচয় জানিবার প্রয়াস করিতে দেখিয়া বাউল খেদ করিয়া বলিয়াছেন—

ফুলের বনে কে ঢুকেছে রে, সোনার জহরি।
নিকষে কষয়ে কমল, আ মরি মরি।

ফুলের শোভা উপলব্ধি করিতে পারে যে-জন ভাবুক,

ফুলের মধু আহরণ করিতে পারে মধুকর ভ্রমর, অতএব রসাহুভবের আলোক যাহার অন্তরে নাই সে অন্ধকারে ফুলবনে গেলে তাহার যাওয়াই বৃথা হইবে। তাই বাউল অনুরোধ করিয়াছেন—

নিশীথে যাইও না ফুলবনে রে ভোমরা. নিশীথে যাইও না ফুলবনে।
ডাল পাতা বৃক্ষ নাই এমন ফুল ফুটাইছে সাঁই,
ভাবুক ছাড়া না বুঝবে পণ্ডিতে রে,
ভোমরা নিশীথে যাইও না ফুলবনে রে।
নয় দরজা কইরে বন্ধ লইও ফুলেরি গন্ধ,
অন্তরে জপিও বন্ধুর নাম রে,
ভোমরা নিশীথে যাইও না ফুলবনে।
জ্বালাইলে দিলের বাতি দেখবে ফুল নানান জাতি,
কত রকম ধরবে ফুলের কলি রে,
ভোমরা নিশীথে যাইও না ফুলবনে।
অধীন সেখ ভানু বলে, ঢেউ খেলাইও আপন দিলে,
পদ্ম যেমন ভাসবে গঙ্গার জলে রে,
ভোমরা নিশীথে যাইও না ফুলবনে।

যিনি অরূপ তিনি আবার সর্ব্বরূপ, তিনিই আলোক, তিনিই অন্ধকার, তাঁহাকে পাইবার আগ্রহে বাউল গাহিয়াছেন—

আমার মন ছুটেছে তা'র পাছে।
আমি কখনো তা'রে দেখছি দূরে, কখনো কাছে।
ও তা'র রূপের জ্যোতি রে, আমার ধাঁধা লাগালে,
দিনের আলোয় রেতের আঁধারে একই করালে;
অন্ধ আমি হাৎড়ে হাৎড়ে ছুটছি তবু তা'রি পাছে।
আমি তা'র গন্ধ পেয়েছি, ওরে আমি তা'র গন্ধ পেয়েছি,
ফুলের বাসে, চন্দনের রসে তারে ধরেছি,
আমি মজেছি, মরেছি গো;
এবার হ'তে সাজব আমি ফুল-চন্দনের সাজে।
যদি পাই তারে হায় গো।

তার ছায়া রেতের আকাশে,
কখনো কাঁদে, কখনো হাসে,
হেসে হেসে আমায় নাচিয়ে তোলে,
কেঁদে গলিয়ে দেয় জলে, হায় হায় গো।
এবার আমি ধরব তারে,
আমাকে এবার ছাড়িয়ে দেবো ধরার মাঝারে,
ফাঁদ রূপে গো,
দেখি ধরা পড়ে কি না পড়ে।
তা'রে পাবার লাগি কাঁদবে সবার নাছে নাছে গো।
আমার ডুবল নয়ন রসের তিমিরে।
কমল যে তার গুটালো দল আঁধারের তীরে।
গভীর কালোর যমুনাতে চলছে লহরী,
গভীর কালোর যমুনাতে রসের লহরী,
ও তার জলে ভাসে, কানে আসে রসের বাঁশরী,
ও তার জলে ভাসে, কানে আসে সাঁইয়ের বাঁশরী।
আমি বাইরে ছুটি বাউল হয়ে সকল পাসরি'।
শুধু কেঁদে মরি, ভাসাই কুম্ভ রসের নীরে।
আমার চোখ ডুবেছে রসের তিমিরে।

যিনি শূন্যমূর্ত্তি রূপহীন তিমির-রূপী অন্ধকার, তিনিই আবার সকল রূপের আকর জ্যোতিঃস্বরূপ। এ তত্ত্বও বাউলের অজ্ঞাত নয়।

চাঁদ আছে চাঁদে ঘেরা।
আজ কেমন ক'রে সে চাঁদ ধরবি গো তোরা?
লক্ষ লক্ষ চাঁদে করেছে শোভা,
তার মাঝে অ-ধর চাঁদের আভা।
ও সে চাঁদের বাহার দেখে ঘূর্ণী লাগে,
দেখিস দেখিস পাছে হবি জ্ঞানহারা।
চাঁদের গায়, চাঁদের কল ধরেছে তায়,
থেকে থেকে ঝলক দেখা যায়,
একবার দৃষ্টি ক'রে দেখি,
ঠিক থাকে না আঁখি,
রূপের কিরণে চমকে পারা॥

বাউল বিশ্বরূপে বিশ্বেশ্বরকে দেখিতে পান—

চোখে দেখে গায়ে ঠেকে ধূলা আর মাটি।
প্রাণ-রসনায় দেখ রে চাইখ্যা রসের সাঁই খাঁটি।
রূপের রসের ফুল ফুটা্য যায়, মরম-সূতা কই?
বাইরে বাজে সাঁইয়ের বাঁশী, আমি শুইন্যা আকুল হই।
আমার মিলন-মালা হইল না রে, আমি লাজে পথ হাঁটি।
আমি চলি দূর আর দূর, তবু সমান শুনি সুর,
আরে কতদূর আর যাবি ক্ষেপা, সবই সাঁইয়ের পুর।
আরে যেই দরিয়া সেই সমুদ্র, সেই ঘাটের ঘাটী।

বাউল-কবি জানেন যে যিনি অনন্ত তিনি সীমার মধ্যে ধরা দিয়া মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করেন, আবার সেই অরূপ সীমাতীত অসীমে হারাইয়া যান।

খাঁচার মাঝে অচিন পাখী কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখীর পায়।

মানুষের হৃদয়-কমল ক্রমাগত রসে রূপে বিকশিত হইয়া চলিতেছে, এই বিকাশের আরম্ভ ও শেষ নাই, ইহা অনন্ত ও নিরন্তর। এবং হৃদয়েশ্বরও ইহার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশমান হইতে থাকেন।

হৃদয়-কমল চলতেছে ফুটে কত যুগ ধরি'।
তাতে তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা, উপায় কি করি।
ফুটে ফুটে ফুটে কমল, ফুটার না হয় শেষ;
এই কমলের যে-এক মধু, রস যে তার বিশেষ।
ছেড়ে যেতে লোভী ভ্রমর পারো না যে তাই,
তাই তুমিও বাঁধা, আমিও বাধা, মুক্তি কোথাও নাই।

গরজের তাগাদায় হৃদয়-কমলকে অকালে বিকশিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলে ফুলকে নষ্ট করাই হয়; তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

তোমরা কেউ পারবে না গো,
পারবে না ফুল ফোটাতে।
যতই বলো, যতই করো,
যতই তারে তুলে ধরো,
ব্যগ্র হয়ে রজনীদিন
আঘাত করো বোঁটাতে।
তোমরা কেউ পারবে না গো,
পারবে না ফুল ফোটাতে॥

*　*　*

যে পারে সে আপনি পারে,
পারে সে ফুল ফোটাতে।
সে শুধু চায় নয়ন মেলে
দুটি চোখের কিরণ ফেলে,
অমনি যেন পূর্ণ প্রাণের মন্ত্র লাগে বোঁটাতে।
যে পারে সে আপনি পারে,
পারে সে ফুল ফুটাতে॥ (—খেয়া)

আর বাউল কবি বলিয়াছেন—

নিঠুর গরজী,
তুই কি মানস-মুকুল ভাজবি আগুনে?
তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি, সবুর বিহুনে।
দেখ্ না আমার পরমগুরু সাঁই,
যে যুগযুগান্তে ফুটায় কমল, তাড়াহুড়া নাই।
তোর লোভ প্রচণ্ড,
তাই ভরসা দণ্ড,
এর আছে কোন উপায়?
কয় যে মদন,
শোন নিবেদন,
দিস্‌নে বেদন
সেই শ্রীগুরুর মনে।
সহজ ধারা
আপন হারা
তাঁর বাণী শুনে।
রে গরজী॥

যিনি হৃদয়স্বামী তিনিই আবার বিশ্বেশ্বর, এই বোধ বাউলেরা অন্তরে সতত জাগ্রত করিয়া রাখিতে চাহেন। বাহিরের সকল প্রকার শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ তাহাদের সৃষ্টিকর্তারই বার্তা বহন করিয়া আনে। তাই বাউল বলিয়াছেন যে যিনি রসস্বরূপ তিনি আমাদের হৃদয়কুসুম বিকশিত হইবার অপেক্ষায় দ্বারে দ্বারে ভিখারী হইয়া ফিরিতেছেন। আমাদের মনের সকল আবরণ উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে অনুভব ও গ্রহণ করিতে হইবে।

ভাঙ্ বেড়া তোর, ভাঙ্ বেড়া তোর, বেহান জেগেছে।
ওগো সকল ফুলের ঘরে ঘরে সুবাস মেগেছে।
ওরে ফুলের দ্বারে দ্বারে বাতাস সুবাস মেগেছে॥

প্রথম দৃষ্টিপাতেই তাঁহার প্রিয় স্বামীর বা সাঁইয়ের সহিত শুভদৃষ্টি করিতে চাহেন।

আমি মেলুম না নয়ন যদি না দেখি তায় প্রথম চাওনে।
তোরা গন্ধে আমায় বল, বল রে শ্রবণে,
সে এসেছে, সে এসেছে, পূরব গগনে॥
তোরা বল গো ঘ্রাণে বল, বল রে শ্রবণে—
তোর বন্ধু এসেছে, এসেছে সে পূরব গগনে॥
কমল মেলে কি আঁখি তা'রে সঙ্গে না দেখি,
তা'রে অরুণ এসে দিল দোলা রাতের শয়নে।
আমি মেলুম না নয়ন যদি না দেখি তায় আমার প্রথম চাওনে॥

বাউলের সাঁই বাউলের জন্য ফুলের বনে বিনা-সুতার মালা গাঁথেন—

এক বোঁটাতে মালা গাঁথে ফুলের পর ফুলে।
বিনিসুতা মালা গাঁথা কেমনে গো চলে?
কেমনে অরূপ দিয়ে পাড়ি পেলে এরূপ বুঝতে নারি,
ও সে গন্ধে শোভায় মনকে ভোলায়, কে গো এর মূলে?
ঘরে যে আর রইতে নারি, ফুলের সাথে ধরব পাড়ি,
অরূপ রূপের ও কাণ্ডারী, নিবি কি তোর নায়ে তুলে?

হিন্দী বাউলও ফুলের মধ্যে সাঁইয়ের আবির্ভাব অনুভব করিয়া বলিয়াছেন—

ফুলন মারত
ফুলসে চলত আজি গন্ধক-পিচকারী।
বনমে সকল তন উঠত উজারি';
রঙ্গ রঙ্গ সুরঙ্গ আজি সুর উবারি।

ফুল হইতে গন্ধের পিচকারী ছুটিতেছে, বনের সকল তনু আজ ফুলে ফুলে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, ফুল হইতে রংবেরঙের সুরঙ্গের সুর বাজিতেছে।

বাংলার বাউল-কবিও তাঁহার অঙ্গনের ফুলফোটার মধ্যে বন্ধুর পিচকারী-খেলা অনুভব করিয়াছেন।

বন্ধু এবার খেলবে হোরি শুধু তোরি আঙিনায়।
ওরে তোর দুয়ারেই ফুল ফুটেছে, আর কোথাও ফুল যে নাই॥
ওরে আগে যে তার খবর এসেছে,
ওরে ফুলের ফুলের গন্ধে যে তার ধারা লেগেছে;
এবার পিচকারী সেই গন্ধেতে চলে,
তুই বা'র না হ'লে বন্ধু যে তোর যাবে রে চ'লে।
ওরে আর না রে ভাই, খেল্‌বি হেথায়, আর যে এবার সময় নাই॥

যিনি স্বামী প্রভু, তিনিই আবার কাঙাল ভিখারী; যিনি পতিতপাবন তিনি তো পতিতের চিরসঙ্গী, যিনি বিধাতা তিনিই তো সকলের দাস। সাহসিক বাউল-কবি গাহিয়াছেন—

জ্ঞানের অগম্য তুমি, প্রেমেতে ভিখারী, প্রভু প্রেমের ভিখারী।
সে যে এসেছে, এসেছে, কাঙালের সভার মাঝে এসেছে, এসেছে,

কোথা রইল ছত্রদণ্ড কোথা সিংহাসন,
কাঙালের সভার মাঝে পেতেছ আসন গো,
পেতেছ আসন;
কোথা রইল ছত্রদণ্ড, ধূলাতে লুটায়,
পাতকীর চরণরেণু উড়ে পড়ে গায়,
পতিতের চরণরেণু শোভে তোমার গায়।
জ্ঞানের অগম্য, প্রেমে দাসের অনুদাস,
সবার চরণতলে প্রভু তোমার বাস।

বাউল বিশ্বশোভার মধ্যে পরমসুন্দরকে অনুভব করিয়াই বাউল, সেই রসাস্বাদের আনন্দ তাঁহার জীবনে মরণে, তাহা সুখ না দুঃখ এ বোধও তাহার আর থাকে না।

আমি মজেছি মনে।
না জানি মন মজল কিসে, আনন্দে কি মরণে।
ওগো এখন আমার ডাকা মিছে,
আমার নাই যে হিসাব আগে পিছে,
আনন্দে এই মন নাচিছে
তার নূপুর বাজে রাত্রে দিনে।
আজব ব্যাপার তাজব লেগেছে,
কই সে সাগর, কই এ নদী,
তবু চলছে খবর নিরবধি,
এ তরঙ্গ দেখ্‌বি যদি,
মিলা নয়ন হৃদয় সনে।
এত রঙ্গ দেখ্‌বি যদি
মিলা মন হৃদয় নয়নে।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার মধ্যে এই জীবন সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।

প্রাণীদিগের জন্মের পূর্ব্বের কি অবস্থা তাহা জানা যায় না, জন্মের পর মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবনটুকু কেবল জানা যায়, আবার মৃত্যুর পর তাহাদের কি হইবে তাহাও জানা যায় না, অতএব কাহারও মৃত্যুর জন্য শোক করা বৃথা, কারণ প্রাণধারার কতটুকুর পরিচয় বা আমরা পাই যে তাহার জন্য আমরা শোক করিব।

কিন্তু বাউল-কবি অনুভব করেন তাঁহার জীবনযাত্রার আদিতে অন্তে তাঁহার সঙ্গে তাঁহার সাথী সর্ব্বদা আছেন, যখন প্রাণপ্রদীপ নির্ব্বাণ লাভ করিবে তখনও সেই সর্ব্বাশ্রয়ের বুকেই তাহা নিবিয়া শান্তি লাভ করিবে।

পরাণ আমার সোতের দীয়া,
আমার ভাসাইলে কোন্ ঘাটে?
আগে আন্ধার পাছে আন্ধার, আন্ধার নিশুইত ঢালা,
তারার তলে কেবল চলে নিশুইত রাইতের ধারা,
তারার তলে চলে চলে নিশুইত রাইতের ধারা,
সাথের সাথী চলে বাতি, নাই গো কূল কিনারা, গো।
দিবারাতি চলে গো বাতি, জ্বলে সাথে সাথে গো,
অচিন কূলে নদীর কূলে ডাকে গো কারা,
টানে গো পরাণ।
কূলে ভিড়া, ক্ষণেক জিরা, সোতেরে ছাড়া।
অকূল পাড়ি, থাম্‌তে নারি, আর চলে যে ধারা,
আর চলি বেঠিকান,
অকূলের কূল গো, দরিয়ার সাগর গো,
আর কয় কাঁকে কেমন ডাকে পাইমু গো লাগর,
তোমার কোলে লহবা তুইলে জুড়াইমু গিয়া,
তোমার কোলে নিবুম সুখে, জুড়াইমু গিয়া।

বংশীবদনের বাঁশী বিশ্বের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজিতেছে, মানুষও তাঁহার হাতের একটি বাঁশী। আবার মানুষের ভিতর দিয়াই ত্রিলোকস্বামীর সকল সৌন্দর্য্যের অনুভব চলিতেছে, তাই সেই মানুষ তাঁহার বাঁশীর ফুঁ, যাহার জন্য বাঁশীর রন্ধ্র হইতে সুরের সুরধুনী বহিয়া যায়।

ধন্য আমি বাঁশীতে তোর আপন মুখের ফুঁক।
এক বাজনে ফুরাই যদি নাই রে কোনো দুখ।
ত্রিলোকধাম তোমার বাঁশী, আমি তোমার ফুঁক,
ভালো মন্দ রন্ধ্রে বাজি, বাজি সুখ আর দুখ।
সকাল বাজি, সন্ধ্যা বাজি, বাজি নিশুইত রাত,
ফাগুন বাজি, শাওন বাজি তোমার মনের সাধ।
একবারেই ফুরাই যদি কোনো দুঃখ নাই,
এমন সুরে গেলাম বাইজা, আর কি আমি চাই।

বাউলদের কাছে জীবনোপায় প্রত্যেক অন্নকণা প্রভুর মূর্ত্তিমতী করুণা, তাই তাঁহারা অন্নগ্রহণের সময় অন্নদাতাকে নমস্কার করিয়া স্মরণ করেন। প্রধান বাউল সুর করিয়া প্রণাম ঘোষণা করেন, অপর সকলে পংক্তিতে বসিয়া ধূয়া ধরে—

পঞ্চামৃত রস বণ্টেন আপনি শ্রীহরি।
সকলে ভুঞ্জহ অন্ন নমস্কার করি'।
সবে নমস্কার করি।
পঞ্চামৃত রস দেখহ প্রভুর করুণা।
প্রভুকৃপা মূর্ত্তিমান্ প্রতি অন্নকণা।
সবে নমস্কার করি।

বাউল জানেন মৃত্যুও জীবনবিধাতারই কোল। ইহজীবনে ও এই পৃথিবীতে যে অফুরন্ত আনন্দ তিনি ঢালিয়া রাখিয়াছেন তাহা নিঃশেষে সম্ভোগ করিয়া যাইতে মন চায়, আবার যিনি ইহপরকালের আত্মীয়

এ যেন কন্যা বাপের বাড়ি ছাড়িয়া প্রিয়তম স্বামীর সহিত মিলিত হইতে শ্বশুরবাড়ি চলিয়াছে। স্বামীর সহিত মিলিত হইবার আগ্রহে প্রতি মুহূর্ত্ত এক যুগ বলিয়া মনে হইতেছে, আবার মাকে ছাড়িয়া যাইতেও মনে ব্যথা লাগিতেছে। তাই বাউল মৃত্যুরূপা মাঝিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন

স্বামীর ঘরে যাইমু আমি,
যেন পলকে যুগ গণি।
তবু ধীরে ধীরে বাও রে মাঝি
যেমন আমি মায়ের কাঁদন শুনি।*

* এই প্রবন্ধ রচনায় প্রধানতঃ আমি বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ ও অপ্রকাশিত গানের সংগ্রহ হইতে উপকরণ আহরণ করিয়াছি, এজন্য তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞভাবে ঋণস্বীকার করিতেছি। এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধ হইতেও সাহায্য পাইয়াছি—(১) অথর্ব্ববেদ। (২) চৈতন্য-চরিতামৃত। (৩) কবীর ও দাদূ প্রভৃতির বাণী। (৪) চণ্ডীদাসের পদাবলী। (৫) ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। (৬) বাউল সম্প্রদায়ের আদি- উমেশচন্দ্র বটব্যাল সাহিত্য ১৩০৮। (৭) The Bauls and their Cult of Man—Prof. Kshitimohan Sen, *Visva-Bharati Quarterly* January 19 9। (৮) The Religion of Man Rabindranath Tagore Hibbert Lectures। (৯) হারামণি—মৌলবী মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন। (১০) বাউলের ধর্ম্ম—ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী, উত্তরা—অগ্রহায়ণ ১৩৩৮।

"মধুলিড়্"

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

আমার নূতন প্রতিবেশী গৌরীকান্তবাবু নেহাৎ সাদামাটা চালের লোক। বিকালের দিকে নির্দ্দিষ্ট নিমতলাটিতে রোজ আমাদের একবার করিয়া দেখা হয়, আমি সে সময় খেলিতে বাহির হই আর তিনি ফেরেন আপিস হইতে। সেই রেলীর বাঁশের বাঁটের ভারী ছাতা, উপরে আবার শাদা কাপড় বসান, রেলীর মোটা জিনের চীনে কোট, জিনের প্যাণ্ট, ভুটিতে স্থূল উদরের মাঝামাঝি থেকে গোল হইয়া বুকের আর পায়ের দিকে যে-যার ঘুরিয়া গিয়াছে, পায়ে চীনাবাড়ির জুতা, ফিতা-টিতার হাঙ্গাম নাই।

মনটিও এই রকম নির্ঝঞ্ঝাট। দেখা হইলেই মুখে এবং সমস্ত শরীরটিতে হাসির তরঙ্গ তুলিয়া বলেন,—এই যে টেনিসে চলেচেন, বেশ-বেশ, মন্দ নয়, তবে হ্যাপা অনেক—গোড়ালি-চাঁছা জুতোরে ব্যাটরে তার রবার্টের জামারে—ওর চেয়ে একটা বৌ পোষা ঢের সহজ। আবও জোরে হাসি উঠে।

তাহার পর প্রায়ই আপিসের কোন একটি গল্প ওঠে, খুব আড়ম্বরের সহিত আরম্ভ করিয়া মাঝপথে হঠাৎ ছাড়িয়া দিয়া বলেন,—আমি ওসব সাতেও নেই পাঁচেও নেই রে দাদা, খাই-দাই গাজন গাই—বলি, একাউণ্টের দপ্তর হাতে তুলে নিয়েচি, সেখানে যেদিন কোন গলদ দেখবে, বোলো…যান, আপনার আবার খানিকটা দেরি হয়ে গেল, একদিন আসুন না গরিবের বাসায়, ইয়ে বাবু—কি যে দিব্যি নামটি আবার ভুলে গেলাম…

তাঁহার বিশ্লেষণের ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া হয়ত নামটা মনে করাইয়া দিলাম—গোবর্দ্ধন।

ঠিক, ঠিক, গোবর্দ্ধনবাবু—গোবর-ধনবাবু, এত লোক আর এত নাম হয়ে পড়েছে যে আর হিসেব রাখা যায় না। এই এতটুকু শহরটার কথাই ধরা যাক্ না, কটা ক'রেই বা নাম মিটুচ্ছে বছরে? অথচ কোন্-না শ-খানেক ক'রে বাড়চে কি বছরে? দশ বছরের সেন্সস্ 'মলিয়ে দেখুন না।…সেদিন পিওন ব্যাটা দাঁত বের ক'রে এসে হাজির ছুটি চাই…কি রে ব্যাপার-খানা কি?…ব্যাপার—পনের দিন হ'ল তার একটি

ছেলে হয়েছে, তারই নামকরণ···নিন্, এই আর একটি বাড়ল!

অযথা একটা নামের বোঝা ঘাড়ে করিয়া পৃথিবীতে ভীড় জমাইয়া লোককে কি অসুবিধাতেই ফেলিয়াছি জানিতে পারিয়া অপরাধীর মত মাথা নীচু করিয়া নিরুত্তর থাকি।

কোনদিন হয়ত বা কথাটা পারিবারিক প্রসঙ্গে আসিয়া ঠেকিল; গৌরীকান্তবাবু হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিলেন,—পুরুষে অত হাঙ্গাম ক'রে বিয়ে করে কেন মশাই?

এককথায় এত বড় সমস্যার কি সদুত্তর হইতে পারে ভাবিতেছি, গৌরীকান্তবাবু নিজেই বলিলেন,—একটু জুতসই ক'রে আহার করতে পাবে, এই তো—না, আরও কিছু!

স্বস্তির সহিত বলিলাম,—কই আর কোন উদ্দেশ্ত তো চোখে পড়ে না।

ওঁরা কিন্তু মনে করেন স্বামীর সখের জ্যান্ত আসবাব ঘরে উঠলাম; বিশেষ ক'রে যদি আবার লেখাপড়ার বালাই থাকে।

আমার মুখের দিকে একটু চাহিয়া রহিলেন; সপক্ষে কি বিপক্ষে কোন রকম উত্তর না পাইয়া বলিলেন,—তবে গোড়া থেকে আপনাকে বলতে হয়। এ-পক্ষের ইনি আসবার অনেক দিন পর্য্যন্ত আশায় আশায় কেটে গেল; কিন্তু রান্না খোলে না। তারপর টের পাওয়া গেল—কলেজ মাড়িয়ে এসেচেন।

—আমি তো মাথায় হাত দিয়ে বসলাম রে দাদা। ক্রমে সব একে একে দেখা দিতে লাগলেন,—শরৎ চাটুজ্যে, ডি. এল. রায়, রবিবাবু—কস্মিন কালে যাঁদের সব নামও শুনিনি—একে একে সব ট্রাঙ্ক থেকে বেরুতে লাগলেন। তখন বুঝলাম ব্যাপারটা—রান্নার হাত দিন-দিন এমন হচ্চে কেন,—কোথায় দিন-দিন পাকবে, না···তা শাক্তাহান তেলমসলার খবর দেবে কেন ইয়ে বাবু,···তখন থেকে তক্কে তক্কে রইলাম; যিনি বেরুচ্চেন তাঁকে আর ঢুকতে হচ্চে না,—বাড়ির ত্রিসীমানার বার ক'রে এসে ট্রাঙ্ক হালকা ক'রতে লাগলাম। বেশী দিন আর লুকোনো রইল না কথাটা। দিন-কতক রাগ, তম্বী, বাপের বাড়ি,—অনেক রকম চলল—কুরুক্ষেত্র কাণ্ড আর কি! কলকাতার মেয়ে, তায় নতুন রক্তের তেজ···আমি কিন্তু কড়া ক'রে রাশ টেনে রাখলাম। ক্রমে রসটি ম'রে এসেচে; ব'লতে নেই, হেঁসেলেরও শ্রী ফিরেচে—আমিও নিশ্চিন্দি হয়ে হাত-পা গুটিয়ে, আপনারা যাকে বলেন পবিত্র দাম্পত্য জীবন, তাই একটু ভোগ ক'রব ক'রব করচি এমন সময়···কি? বড় দেরি হ'য়ে যাচ্চে, না? আচ্ছা, থাক্ তা'হলে; এক দিন বলব'খন সব কথা, একখানি আস্ত মহাভারত রে দাদা, বলেন কেন···

২

সেদিন একটা কাজের হিড়িকে পড়িয়া প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল বলিয়া আর বাহির হইলাম না। বাড়ির সামনে খোলা উঠানটিতে একটা আরাম-কেদারা বিছাইয়া পড়িয়া রহিলাম।

পাশে একটি বাগান করিয়াছি। এতটুকু এক ফালি জায়গা—আমাদের তিনজনের সখে সখে একেবারে নিরবচ্ছিন্নভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, বাড়ির একটি মাত্র মেয়ে যেমন অনেকের স্নেহের নিদর্শনে ভারাক্রান্ত হইয়া ওঠে। আমার গোলাপ আছে, ম্যাগ্নোলিয়া আছে, বার মেসে ডালিয়া আছে, একটা কেয়ার ঝাড় আছে; ওর আছে মল্লিকা, যূথী, মালতী, রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ, আরও কত কি; আর এরই মধ্যে মা'র গাম্ভীর্য্য আর সৌম্যতা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে মা'র সখের সজনে গাছ, বক ফুলের গাছ, করঞ্চা গাছ, তাহাদের শত শত হস্তে ফলন্ত কুমড়া, লাউ, ঝিঙা, উচ্ছের ভার তুলিয়া ধরিয়া।

—বোধ হয় একটু পরিচ্ছন্নতার অভাব আছে। তা থাক; ওখানে কিন্তু আমরা মাতা পুত্র-বধূ তিন জনে সংসারের বাহিরে, এক প্রচুর মুক্তির মাঝে আর এক ভাবে মিলিয়া গিয়াছি···

গরমের এই সময়টা সব ফুল ফোটে। একটু বাতাস ছিল—যেন ফুলের গন্ধের নেশা ধরিয়াছে,—ভারী, অলস, আর একটু দিকভ্রান্ত। সন্ধ্যা গাঢ় হইতে আকাশে চাঁদটা

স্পষ্ট হইয়া উঠিল ; বোধ হয় পূর্ণিমা কি ঐ গোছের একটা তিথি হইবে।

বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম পৃথিবীটার কথা। একে বুঝিয়া ওঠা গেল না ; এই সৌন্দর্য্যও আছে, আবার ঐ গৌরীকান্তও আছে। কলেজে-পড়া বিড়ম্বিত জীবটির কথা মনে পড়িল ; তাহার পর বোধ হয় এই কথাটাই মনে হইল যে, আমরা নারীকে ঠিক-মত পাইতে জানি না। অল্প-বিস্তরভাবে সব পুরুষই গৌরীকান্ত। সুযোগ আসে, অবসর আসে, রচিত মাল্য হাতে লইয়া ; আমরা বুঝিতেই পারি না,—কখন আসিল, কখন ফিরিয়া গেল।

চাকরটাকে বলিলাম—আর একখানা ইজিচেয়ার নামিয়ে দিয়ে যা তো এখানে।

চেয়ার বসাইয়া দিলে প্রশ্ন করিলাম,—তোর বহুমাঈজি কি করচে রে ?

উত্তর করিল,—ডেকে দোব না কি ?

সংসার-সংক্রান্ত কোন কাজ নাই কি না ;—"হুঁ।" বলিতে কেমন বাধিল একটু। সে ততক্ষণ চলিয়া গিয়াছে কিন্তু।

একটু পরেই সামনের দুয়ারটার পরদা ঝনাৎ করিয়া এক পাশে সরিয়া গেল। নিজের চেয়ারটা সেই প্রতীক্ষমান চেয়ারটার কাছে একটু টানিয়া লইতেছি, এমন সময় পিছনে পরুষ কণ্ঠে শুনিলাম,—এই যে ইয়ে বাবু, কি যে দিব্যি নামটি, আবার ভুলে গেলাম···

সত্য গোপন করিয়া লাভ নাই, একটা যেন বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল,—কোথায় গেল আলো, কোথায় হাওয়া, কোথায় গন্ধ ; একখানি রাগিণীর সমস্ত সুরটিকে বিকৃত করিয়া একটা বিসম্বাদীর পরদা যেন ঝঙ্কার করিয়া উঠিল। একবার করুণ নেত্রে সেই চেয়ারটার দিকে চাহিলাম, এক মুহূর্ত্তের বিভ্রম মাত্র,···তখনই আবার নিজেকে সামলাইয়া লইয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম···এই যে, আসুন···আসুন···

গৌরীকান্ত বসিতে বসিত বলিলেন,—আসতেই হ'ল। আপনিও বোধ হয় আমার জন্যেই হাঁ ক'রে বসে আছেন,—চেয়ার পর্য্যন্ত মজুদ দেখচি যে। ও হ'তেই হবে কি-না ; রোজকার দেখা-শোনায় একটু অব্যেস হ'য়ে গেচে। সেই নিমতলাটিতে আজ আর দেখতে পেলাম না, মনটা বড় খারাপ হ'য়ে রইল। এই সময়টা আবার প্লেগ-ট্লেগ আরম্ভ হয়ে থাকে, ভাবলাম···হয়ত প্রথম আমাদের বাঙ্গালীকেই ধরলে এবার। ওখান থেকে বাইরে হাওয়ায় ব'সে থাকতে দেখে প্রাণটা ঠাণ্ডা হ'ল,···না, যা ভেবেচি তবে না নয়।···তবুও মাঝে মাঝে বগলটা, গলাটা টিপে টিপে দেখবেন মশায়—সাবধানের মার নেই···

কথাগুলো চরম গালাগালির এত কাছাকাছি যে কি রকম একটা অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। নিরুপায় ভাবে বসিয়া রহিলাম ; গৌরীকান্তবাবু বেশ সরলভাবেই বলিয়া চলিলেন,—সাবধানের কথায় কাল সন্ধ্যের কথা মনে প'ড়ে গেল।···বেড়িয়ে এসে দেখি খোলা ছাতে দিব্যি শেতলপাটিটিতে গিন্নী একরকম গা আদুড় ক'রেই শুয়ে ! ওপরে বেশ হাওয়া ; আর চাঁদের একটা ঠাণ্ডা এফেক্ট আছে তা'তো জানেনই—কাল আবার মশায় পূর্ণিমা ছিল বোধ হয়।

···জানে এই সময়টা বাড়ি ফিরি আমি, তবু জেনে শুনে এই বেয়াক্কেলেপনা। বেড়িয়ে এসে কোথায় একটু আয়েস করব, না···দেখে তো পিত্তি জ্বলে গেল মশায়। একলা মানুষ—এই দোরসার সময়···দরকার কি চটাচটি ক'রে ?

—বুঝিয়েই বললাম—ওগো, এটি হচ্চে বেহারে প্লেগের সময়। এবারটা এখনও ভাল আছে ব'লে অতটা এলে দিও না। বড় বিষম রোগ, একবার ধরলে ত্রিসীমানার মধ্যে কেউ ঘেঁষবে না। খদ্দর তো ভালবাস বাপু, তবু ঐ পাতলা সেমিজটা প'রে কেন সময় বুঝে ?

চুল এলো করা মশায় ; গা ধুয়ে এসে শুয়েছে আর কি, চুলে জল লেগে গেছে,—দেখলাম কি-না, চাঁদের আলোয় জায়গায় জায়গায় ঝিকমিক করচে তাই শুখোনো হচ্চে আর কি। খোঁচা দিতে ছাড়ব কেন ইয়েবাবু—ব'ললাম—সূর্য্যের আলোতেই তো চুল শুকোয় জানি, চাঁদ বেচারা···

ঠিক এই পর্য্যন্ত বলেচি ; সে রাগ দেখে কে !—গট্ গট্ ক'রে নেমে গিয়ে রান্নাঘরে খিল দিলে, সেই গরম গুমোট ঘর !···কথাগুলো তো শুনলেন—রাগের কিছু

পেয়েছেন ?···ফল—ভাত গেল গ'লে, ডাল গেল ধ'রে, তরকারি হ'ল নুনে বিষ,—কি, না একটু বুঝিয়ে বলতে গিয়েছিলাম ব'লে। কিসের জন্যে তবে সংসার করা বলুন না ?

আমি বোধ হয় একটু বেশী রকম অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিলাম, গৌরীকান্তবাবুর কথাতেই আবার চমক ভাঙিল ; বলিতেছেন—আক্কেলখানা দেখে ভাবচেন তো ? চুলোয় যাক্ ; কপালের লেখন কে মেটাবে বলুন ? অ'স্ত যে বেরুন নি ?

একটা কথা কহিবার সুবিধা পাইয়া তাড়াতাড়ি বলিলাম—সন্ধ্যের সময় বেরুতাম, কিন্তু চমৎকার জ্যোৎস্নাটির লোভ···

এতটা বলিয়া হুঁস হইল—জ্যোৎস্নার তারিফ করিবার খুব লোক পাইয়াছি তো !

গৌরীকান্তবাবু ততক্ষণে কথাটা লুফিয়া লইয়াছেন, বলিতেছেন,—হাঁা, দিব্যি জ্যোৎস্নাখানা। এ-কথা এক-শ বার স্বীকার করি। তা, আপনার আমার আর কি বলুন ? লাভ মিউনিসিপ্যালিটির···

সপ্রশ্ননেত্রে মুখের দিকে চাহিতে আমার মূঢ়তার জন্য সদয়ভাবে বলিলেন,—সে খোঁজ বুঝি রাখেন না ? রাস্তায় ল্যাম্পপোষ্টগুলির দিকে চেয়ে দেখুন দিকি—জ্বেলেচে একটাও ? স্রেফ হিসেবের খেলা। ঐ যে সকালে সিঁড়ি ঘাড়ে ক'রে পোষ্টে পোষ্টে তেল জুগিয়ে জুগিয়ে বেড়ায়, ওদের বুদ্ধি সোজা ভাবেন ?···কি তিথি-জ্ঞান মশায় ! আজ এই মাসের এই তিথি,—এতটা তেল লাগবে। চাঁদ উঠেচে কি আলো নিবল—মুখ-দেখাদেখি নেই।

—ঐ যে বললাম,—চাঁদ ওঠে মিউনিসিপ্যালিটির বরাতে ; মারা পড়ে কবি, বিরহিণী আর চোর ··

একটু গুমোট ছিল খানিকক্ষণ, সেটাকে ছিন্ন করিয়া একটা দমকা হাওয়া বহিল। গৌরীকান্তবাবু হঠাৎ সোজা হইয়া বসিয়া দ্রুত নিঃশ্বাস টানার সঙ্গে সঙ্গে দুই-তিন বার নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন ; অনেকটা যেন নিজের মনেই বলিলেন,—ফুলের গন্ধ পাচ্ছি যেন, কাছে-পিঠে বাগানটাগান আছে নাকি ?

ভয়ে একেবারে কাঁটা হইয়া রহিলাম—সাক্ষাৎ ফুলের বাগান রাখার লাঞ্ছনা মনে মনে আন্দাজ করিয়া আর কথা কহিতে সাহস হইল না।

এই সময় বাতাসের ঢেউয়ের গায়ে আর একটা ঢেউ ভাঙিয়া পড়িল—আরও বেশী গন্ধ লুটিয়া আনিয়াছে—আরও বিলাসোচ্ছল !

গৌরীকান্তবাবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস টানিয়া বলিলেন,—এ যে রজনীগন্ধার গন্ধ, ইয়েবাবু, কি যে দিব্যি নামটি ভুলে গেলাম ; বাগানের সখ আছে না-কি আপনার ?

৩

আমতা-আমতা করিয়া বলিলাম—বাগান না ছাই ; ঐ পাশে একটুকরো জমি পড়েছিল—ওরা সব কি দু-একটা ফুলের ডাল বুঝি কবে···

দু-টো-একটা ফুলের ডালই বা এ কাট্‌খোট্টার দেশে কে বসাবে বলুন তো ? আমি তো এসে পর্য্যন্ত হা-ফুল জো-ফুল ক'রে বেড়াচ্ছি। কই আপনি তো কখন বলেন নি আমায় !—ইঃ ···

আমি তো নিজের চক্ষুকর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিতে-ছিলাম না ; এই কি সেই গৌরীকান্তবাবু না-কি ! বিস্ময়ের উগ্রতায় এমন একটা অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি, মনে হইতেছে এখনই বুঝি দেবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বলেন,—বৎস, এতদিন তোমায় ছলনা করিতেছিলাম মাত্র ··

সেই মানবমূর্ত্তিতেই বলিয়া যাইতেছিলেন,—উঃ, কি আপশোষ বলুন দেখি !···আপনাদের বাড়িতে তাহ'লে দেখছি উল্টো। আপনার স্ত্রীরই সখ। আমার তো তিনি বাড়িতে ফুল দেখলে আগুন হয়ে ওঠেন,—আর দুঃখের কথা বলবেন না।

আচ্ছা সমস্তাত !

ভাবিলাম—হইতেও পারে ; লোকচরিত্র বোঝা কঠিন। মনস্তত্ত্ববিৎ হইলে বোধ হয় বোঝা যাইত মস্তিষ্কের মধ্যে সৌন্দর্য্যজ্ঞানের কোন্ সূক্ষ্ম কোষগুলি এঁর বেশী প্রবুদ্ধ। হইতে পারে ফুলের উপরেই নিজের প্রীতিধারা এমন নিঃশেষ করিয়া ঢালিয়া দিয়াছেন যে

অন্য কিছুর উপরই আর রসসিঞ্চন হয় না; সবই ফিকা ওঁর কাছে।

যাক্, ওসব বড় কথা। লোকটি তাহ'লে যে একেবারেই নীরস তাহা নয়। এদিকে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে ক্রমেই এত বিব্রত হইয়া পড়িতেছিলাম যে, মনে মনে একটা স্বস্তি অনুভব করিলাম। সাহস করিয়া—যদিও খুব সন্তর্পণের সহিত—বলিলাম,—ওর নাম কি, আমিও বোধ হয় কখনও দু-একটা এগাছ সেগাছ লাগিয়ে থাকব।

—তাহ'লে উঠতেই হচ্চে মশায়; ও যে আমার কী নেশা...কোন্ দিক দিয়ে রাস্তা বলুন দিকিন?

দাঁড়াইয়া উঠিয়াছেন। আমি কৃতকৃতার্থ হইয়া গিয়াছি; এ অনাড়ম্বর প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য্য-উপাসকের দর্শনেও পুণ্য। কিন্তু রাত্রিকাল, বলিলাম,—এখন না হয় থাক গৌরীকান্তবাবু, বাগানটা একটু জঙ্গুলে তায় গোটাকতক কেয়া ফুটেচে—গরমের রাত্রি......

—কেয়া ফুল!—না ইয়েবাবু, আমার ফুলের বাতিক দেখে আপনি নিশ্চয় ঠাট্টা করচেন। এই মরুভূমির মাঝখানে কেয়াফুল! এ হইতেই পারে না......

—না, সত্যিই ফুটেছে। এক ঝাড় গাছ করেছি কি না। এঃ, আপনি ফুলের এত ভক্ত জানলে মাঝে মাঝে পাঠিয়ে দিতাম; কত ফুলই যে রোজ নষ্ট হয়......

—ফুল আমার প্রাণ মশায়; না হ'লে দিন চলে না। ঐ যে বললাম,—ফুল এক মৌমাছিই চেনে, কি গৌরীকান্তই চেনে; এইটুকু গুমোর আমার আছে, হ্যাঁ। কাব্যচুঞ্চু মশায় নাম রেখেছিলেন মধুলিড়্—মধুলেট্টি অর্থাৎ লেহন করে ইতি মধুলিট কি-না ভ্রমর...তাই তো···নাঃ, এখন মোটেই বাগানে যাওয়া সমীচীন নয়, কি বলেন? তাঁরা আবার আমাদের চেয়েও সৌখীন, ঘাঁটান ঠিক নয়...

আস্তে আস্তে আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। এমন সমদরদী কখনও পাই নাই, মধুলিড়ই বটে, বাহিরটাতে কি আসিয়া যায় তাহার? একটা গুমোর ছিল; কিন্তু ফুলের আদর তো দেখিতেছি আমরা কিছুই জানি না। একে সামান্য একটুও তৃপ্ত করা যায় না?... চাকরটাকে ডাক দিলাম। আসিল, বলিলাম,—দেখ দিকিন, আজ ফুল কিছু তুলেচে কি না; থাকে তো নিয়ে আয়।

প্রায়ই কিছু ফুল তোলা থাকে। একটা তোড়া আর কতকগুলো আলগা ফুল লইয়া আসিল—বেলা, গন্ধরাজ, একটা লবঙ্গ লতার গুচ্ছ, হালকাভাবে জলের ছিটা দেওয়া।

এত আগ্রহ কখনও দেখি নাই; গৌরীকান্তবাবু একরকম লাফাইয়াই উঠিয়া হাত-দুটো প্রসারিত করিয়া ধরিলেন, বলিলেন,—ইস, স্বর্গ যে উজোড় ক'রে এনেচে! এ-সব আপনার নিজের বাগানে ফুটেচে?···কাল সকালেই আবার বিরক্ত করতে—যা-ই না মনে করুন...

গদ-গদ হইয়া বলিলাম—নিশ্চয়ই আসবেন। আমি নয় ডেকে নিয়ে আসব'খন খুব ভোর বেলা, সে-সময় যা হয়ে থাকে!

ছোট শিশুর মত আনন্দ সমস্ত মানুষটিকে এত স্বচ্ছ করিয়া দিয়াছে—যেন অন্তঃস্তল পর্য্যন্ত দেখা যায়। শিশুর মতই হাসিয়া বলিলেন—আপনি আমায় ডাকবেন? তবেই হয়েচে। দেখবেন রাত থাকতে এসে হানা দিয়েচি; যা নেশা ধরিয়ে দিয়েচেন......

আমার যাইবার আগে তিনিই আসিয়া হাজির অতি প্রত্যূষে। প্রথম কথা—সমস্ত রাত ঘুম হয় নি মশায়; চলুন, কোন্ দিকটা?

যাইতে যাইতে বলিলেন,—যা আহারটি হ'ল কালকে! গরমে কিছু মুখে দিতে পারতাম না।

বলিলাম—হ্যাঁ, ফুল জিনিষটাই খুব খিদে জাগায়; সাহেবদের দেখেন না? ফুলের তোড়া টেবিলে চাই-ই।

বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মুগ্ধ প্রশংসায় গৌরীকান্ত দুয়ারটির কাছে দাঁড়াইয়া রহিলেন। যে-দিকটা চান, দৃষ্টি যেন আর ফিরাইতে পারেন না। মুখে কথা নাই, শুধু একটা আবেগমাখা হাসি।

ফুলের গন্ধ সবও তাদের এই উদার অতিথিদের অভিনন্দিত করিবার জন্য যেন ভীড় করিয়া পড়িয়াছে।

পরিচয় দিতে লাগিলাম—এটা ডালিয়া; ঠিক এখন ফোটবার সময় নয়; তবুও একটা-না-একটা ফুল থাকেই, এই ফুটন্তদের দলে পড়ে বেচারা যেন চক্ষুলজ্জায় পড়ে গেছে আর কি।

—এ রকম বেলা আপনি এ তল্লাটে পাবেন না। জোগাড় করতে যা বেগটা পেতে হয়েছে, লিখলে একটা ইতিহাস হয়ে যায়; ওর চেয়ে রাজপুতরা তাদের কনে উঠিয়ে আনত ঢের সহজে · খোষামোদ করতে হয়েচে, ঘুষ খাওয়াতে হয়েচে, তাতেও যখন হ'ল না, তখন চোর বনতে হ'ল; একটা ডাল কেটে এনেছিলাম।

গৌরীকান্ত বলিলেন,—এ চুরিতে পাপ নেই। আমি ভেবেছিলাম শাদা গোলাপ! বেলার এত পাপড়ি আর রসে যেন ভেঙে পড়চে পাপড়িগুলো...

এমন উৎসাহভরে কখনও ফুলের ব্যাখ্যান করি নাই। কোথায় এমন সমঝদারই বা এ রুক্ষ পৃথিবীতে?

গোলাপ ফুটিয়াছে, মার্শাল নীল। তার চাঁপার মত রঙে কোথায় একটু গোলাপী রেখা, কাঁচা সোনার যার রঙ তারই রাঙা ঠোঁটের হাসির মত। তুলিতে হাত ওঠে না; কিন্তু পূজার আগ্রহটা প্রবল। একটা তুলিয়া হাতে দিলাম। বলিলাম,—সটনস্ প্রাইড নাম দিয়েচে। এর পূর্ব্বগোত্র প্যারিস একজিবিশনে প্রথম প্রাইজ পায়; দেখুন না, ফোটার মধ্যে বেশ একটি দেমাকের ভাব নেই?···আর একটা জিনিষ দেখাচ্ছি, এইদিকে আসুন।

পথে মা'র কুমড়োলতা অবহেলায় লঙ্ঘন করিয়া যাইতেছিলাম। গৌরীকান্তবাবু পিছনে আসিতেছিলেন; থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—ইয়েবাবু! কি যে দিব্যি নামটি, ভুলে গেলাম···

বলিলাম,—গোবর্দ্ধন।

—হ্যাঁ ঠিক, মশায় এ কি কুমড়োর ফুল?

বলিলাম-হ্যাঁ, কাঁচড়াপাড়া থেকে বিচি আনান; মা'র একেবারে প্রাণ বললেই চলে; বোধ হয় আমি ছেলে হয়েও অত যত্ন পাই নি।

—এ জিনিষ আমার গোটা-কতক চাই-ই চাই···এ যে বাগান আলো ক'রে রয়েচে একেবারে!

কাল সন্ধ্যার সময় যখন অমন জ্যোৎস্না রাত্রিটার লাঞ্ছনার কথা শুনিতেছিলাম, মনে মনে ভাবিতেছিলাম··· কি করিয়া এই শুষ্ক কাঠের মত অতি নীরস মানবটিকে সৌন্দর্য্যরসে দীক্ষিত করা যায়।

এখন দেখিলাম ইহার মধ্যেই তো রসের গূঢ় রহস্যটি ধরা পড়িয়াছে। এই তো দরদ যা প্রভেদ বোঝে না; যা উচ্চ-নীচ-নির্ব্বিশেষে সমস্তর 'পরেই উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে। নূতন চক্ষে কুমড়ার ফুল দেখিতে লাগিলাম। মৃণালের চেয়েও শীর্ণ, সুকুমার বৃন্তের উপর গোলাপী মেশা হলুদ রঙের ফুলগুলি তাদের একটি দলেই কী সুষমায় না ফুটিয়া উঠিয়াছে! নিজেকে এমন পরিপূর্ণ ভাবে মেলিয়া কোন ফুলই বোধ হয় ফুটিতে পারে না। গোটাকতক তুলিলাম; আমার আঙলগুলা যেন আবীরে ভরিয়া গেল।

গৌরীকান্তবাবু তাড়াতাড়ি অথচ খুব আলগা হাতে আমার নিকট হইতে ফুলগুলা তুলিয়া লইলেন, বলিলেন,—দেখবেন, ওগুলো হ'ল পরাগ, খুব বাঁচিয়ে, ঐ তো আসল। ও যে রজনীগন্ধা! তাই তো বলি,—এত ফুল না হ'লে কাল অত গন্ধ আসছিল কোথা থেকে! ওর কেরামতি রাত্তিরে, থাক রাত্তিরেই এসে নিয়ে যাব'খন; ততক্ষণ যতটা রস টানে।···চলুন, এইবার আপনার কেয়া দেখিগে,—সংস্কৃতে হলেন কেতকী—

কেতকীবেণু খদির রসে দিয়া,—
শুখায়ে নিয়ো কমল কিশলয়ে;
অধর তাতে সুরভি ক'রে প্রিয়া,
আমারে দিয়ো মরণ বিলাইয়ে।

একটুখানির মধ্যে কেয়া খয়েরের ফর্ম্মলাটি কেমন দিয়ে দিয়েচে। খয়েরের রস ক'রে তাতে কেয়ার ধুলো দিয়ে কচি পদ্মপাতায় শুকিয়ে নেবে।···আগেকার তারা সব ফুলপাতার সঙ্গে ঘর ক'রত। সেদিন ওর একখানা বইয়ে দেখছিলাম না?—শকুন্তলার জ্বর এল—তক্ষুনি চন্দন ঘসে পদ্মপাতায় লেপে বসিয়ে দিলে; এখন হ'লে—ছোটো মটর, ডাক সিবিল সার্জ্জনকে···

৪

আমরা পুষ্পলোকে বাস করিতেছি বলিলেও চলে। সমস্ত দিন কেবল ফুল, ফুল, আর ফুল।

গৌরীকান্তবাবু সকালে আসেন, সন্ধ্যায় আসেন। সময়টা প্রায়ই বাগানে কাটিয়া যায়। ফুলের পরিচর্য্যা,

ফুলের আলোচনা আর পাত্র ভরিয়া ফুল সঞ্চয়,—এই কাজ। বলেন—নন্দনকানন সম্বন্ধে যা শোনা যায়, তা কতকটা এই রকম হবে; কি বলেন ইয়েবাবু?···

তাঁহার জন্য একটি সাজি কিনিয়াছি; সেইটিই পূর্ণ করিয়া ফুল দি। সাজি ভরিয়া ফুল দিয়া মনে হয়—এ পূজা—তাঁহার অন্তরের মন্দিরে যে সৌন্দর্য্যের দেবতা আছেন তাঁহাকে অর্ঘ্য দিতেছি।

দেবতার সংস্পর্শে আমার বাগানের শ্রীবৃদ্ধিও হইয়াছে। কোথায় ইঞ্জিনিয়ারের বাগান, কোথায় কমিশনার সাহেবের গ্রীন্‌হাউস্,—এইসব দুষ্প্রবিশ্য স্থান হইতে কতকগুলি নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য আর দামী ফুল আমার বাগানে আসিয়া পহুঁছিয়াছে; বেশীর ভাগই গৌরীকান্তবাবুর চেষ্টায়। সে-সবের মধ্যে একটি আছে নীলপদ্ম। কাশ্মীর ষ্টেট্‌গার্ডনস্ থেকে আমদানি করা,—ভূস্বর্গের পারিজাত। বাগানের মাঝখানে ওরই জন্য একটি হউজ হইবে স্থির হইয়াছে—মাঝখানে থাকিবে একটি ঝরণা।

বলি,—এত কষ্ট ক'রে জোগাড় ক'রে সব আমায়ই দিয়ে দিচ্ছেন; কিছু তো আপনিও রাখলে পারেন।

বিমর্ষভাবে কপাল স্পর্শ করিয়া বলেন,—সে অদৃষ্ট করিনি ইয়েবাবু, তা'হলে আর ভাবনা কি। হাজির হ'তে দেরি হবে না, গিন্নী সঙ্গে সঙ্গে টান মেরে ফেলে দেবেন। কী যে আক্রোশ, দেখেন নি তো!···সে পক্ষের সঙ্গে কিছুই মেলে না, মেলে শুধু এইখানটায় ·

রহস্য এইখানেই শেষ নয়। আরও আছে। আজ-কাল আমাদের দুটি বাড়ির স্ত্রীমহলেও ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, আমার স্ত্রী প্রায়ই যান। ফিরিয়া আসিয়া রোজই বলেন, —আচ্ছা, এই যে ঠাকুরপূজার ভাগ থেকে কেটে কেটে নিত্যি সাজি-ভরা ফুল পাঠাও, কই, বাড়িতে তো কোথাও একটা পাপড়িও দেখতে পাই না।

বলি,—তুমি বোধ হয় খোঁজ কর না।

উত্তর হয়,—ওমা, অবাক করলে যে! বলে গোয়েন্দাগিরি করতেই আজকাল আমার যাওয়া। আর ফুল কি শুধু দেখতে হবে! যা ফুল যায় তাতে সারা বাড়িটা গম্ গম্ করবে না? কি যে বল!

বলি—দু-বেলা টাটকা ফুল যাচ্ছে, তাই বাসী হবা মাত্রই নিশ্চয় ফেলে দেন। তুমি যাও তো সেই তিনটে-চারটের সময়, তখন বোধ হয় তাই আর দেখতে পাও না।

তাহাও নয়; কেন-না, আমার গোয়েন্দাটি দু-দিন পরে আসিয়া খবর দিলেন,—আজ ওৎ পেতে ছিলাম, কর্ত্তা আপিসে বেরিয়ে যেতেই হাজির হয়েছি—ঠিক এগারটা দশ। ফুলের বিন্দুবিসর্গ নেই। সাতটা আটটার সময় তোলা ফুল দশটা এগারটার সময় বাসী মনে করে এমন পুষ্প-বিলাসও আছে না-কি?

বলিলাম,—ওঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখলে তো পার।

—সেও হয়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করলেই কথা উল্টে নেয়, মুখটা একটু গম্ভীর হয়ে পড়ে, তার ওপর খুঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করা চলে না।···এমনি তো বেশ আমুদে মানুষটি।

একটু হতবুদ্ধি হইয়া রহিলাম। তাহার পর একটা কথা মনে উদয় হইল, বলিলাম,—হয়েচে গো, নিশ্চয় পুজোটুজো করেন; কথাটা আমাদের কাছ থেকে গোপন···

স্ত্রী গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—স্বামী পুজো-অর্চ্চা করলে নিষ্ঠাবান হ'লে হিন্দুর মেয়ের লজ্জিত হবার তো কথাই। বরং নাস্তিক, অনাচারী হ'লে ·

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কথাটা পাল্টাইয়া লইতে যাইতেছিলাম, স্ত্রী বলিলেন—আমি যা ভেবে ঠিক করেচি শুনবে?

আমি আগ্রহভরে বলিয়া উঠিলাম,—"বল না।" মনে ঠিক আছে যতই সম্ভবপর আন্দাজ হোক্ না কেন একটা খুঁৎ বাহির করিয়া আক্রোশ মিটাইবই,—টাট্‌কা-টাট্‌কি!

স্ত্রী বলিলেন,—আমার মনে হচ্চে সাহেব-টাহেবের বাড়ি ভেট পাঠায়।

অসম্ভব নয়। আমি কিন্তু তাচ্ছিল্যের সহিত হাসিয়া বলিলাম,—আরে দুৎ, রোজ রোজ···

তিনি সহজ দৃঢ়তার সহিত বলিয়া চলিলেন—না হ'লে সাহেবের কাছে অত খাতির আছে শোনা যায়—সে কি ক'রে হয়; মাইনেও বেড়েচে এর মধ্যে বলছিলে। ফুল দিয়ে খোসামোদ করবার ফল নিশ্চয়।

যুক্তিটা সহজেই খণ্ডন করিবার নয়, সেই জন্যই বেশী অবহেলা দেখাইয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া তর্কটা চাপা দিয়া দিলাম।

সন্ধ্যার সময় গৌরীকান্তবাবু আসিলে বলিলাম,—মশায়, আপনি ফুলের কি-ভাবে সদ্ব্যবহার করেন সেই নিয়ে আমাদের স্ত্রী-পুরুষে কাল সমস্ত রাত গভীর গবেষণায় কেটেচে। আপনার ভাদ্দরবৌয়ের যত আজগুবি আন্দাজ, বলে—বাড়িতে ফুল দেখতে পাই না, নিশ্চয়ই একটু বাসী হলেই ফেলে দেন।·বললাম—আরে ধ্যাৎ, একেই বলে মেয়েলী বুদ্ধি··বড় বড় সাহেবদের সঙ্গে আলাপ, তাদের সব ভেটটেট্ দেন নিশ্চয়।··বলে—হ্যাঁ, তোমার যা বুদ্ধি, অমন চমৎকার ফুলগুলো ঐ মেলেচ্ছগুলোর পায়ে ঢালতে যাবেন; সাত্ত্বিক মানুষ, নিশ্চয় পুজোটুজো করেন···

গৌরীকান্তবাবু খুব মনোযোগসহকারে শুনিতেছিলেন, এইবার প্রবল বেগে হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন,—দেখছিলাম কার কতটা বুদ্ধির দৌড়; সে ধরবার যো নেই তো গবেষণা ক'রে কি হবে? তবুও উনি পুজোর দিকে গেছেন—অনেকটা কাছাকাছি; তবে কার পুজো ধরতে পারেন নি—হাঃ—হা—হা।... তবে; আর দেরি নয়, এইবার জানাব।—তখন বুঝতে পারবেন ফুলগুলো এতদিন কী ভাবেই না নষ্ট ক'রে এসেচেন। একটু দেরি করছিলাম—মল্লিকের গোড়েটা ঠিক তোয়ের হয়নি এতদিন; আজ বোধ হয় পদ্ম দু'টাও ঠিক তোয়ের হয়েচে, আর সেই কেয়াটা, চলুন, দেখা যাক্···

বাগানের মাঝে দাঁড়াইয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন,—নাঃ, সব ঠিক আছে। তবে আজই হোক্, বুঝলেন ইয়ে-বাবু?—কি যে দিব্যি নামটি···বলিলাম,—গোবর্দ্ধন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক···আজ ফুলের বাহার দেখবার নেমন্তন্ন; ঐখানেই পায়ের ধুলো দেবেন। ভাগ্যগুণে আজ খাসা একটা মিরগেল মাছও পাওয়া গেছে। তবে হ্যাঁ;—ঠাকুরটিকে চাই আপনার; গিন্নী বলেন,—'আমি আজ রান্নাঘরের ত্রিসীমানার মধ্যে ঢুকতে পারব না।' কাজ কি ও-জাতকে খাটিয়ে মশায়? বললাম,—বেশ, ওঁর ঠাকুরকে ডেকে আনছি, দেখিয়ে শুনিয়ে দোব'খন; তুমিও তো আজ আমার কাছ থেকেই গুণী। আর ওঁর স্ত্রী, বোন সব আসচেন, তোমার এদিকে থাকলে চলবেই বা কেন?···

*　　*　　*

আহারে বসিয়াছি। গলদঘর্ম্ম গৌরীকান্তবাবু সামনে একটি টুলে বসিয়া পাখার হাওয়া খাইতেছেন; এতক্ষণ রান্নাঘরে ছিলেন। নানা ফুলের একটা ক্ষীণ মিশ্র গন্ধ যেন মাঝে মাঝে নিঃশ্বাসে ধরা দেয়; কিন্তু ফুল কোথাও দেখিলাম না! শুধু সামনে একটা ছোট ঝুড়িতে আর সব আবর্জ্জনার সঙ্গে সেই পদ্মের কতকগুলা পাপড়ি, আর কেয়াফুলের কচি পাতা।—বোঝাই যায় ছোট মেয়েটির কীর্ত্তি 'ফুলের বাহার' নিশ্চয় ওপরে শোবার ঘরে, খাওয়া-দাওয়ার পর লইয়া যাইবেন।

বলিলেন,—ঠাকুর, এইবার নিয়ে এস সেই চপটপগুলো।··কি রকম হ'য়েচে কে জানে, একেবারে আনাড়ি লোক···

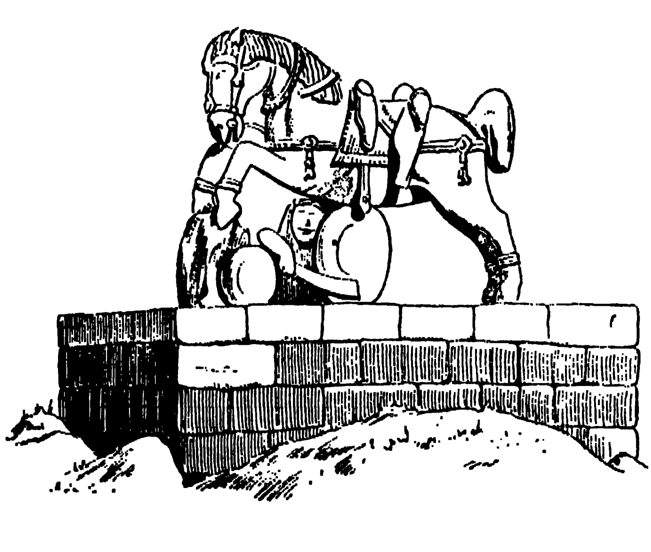
ঠাকুর একটি রেকাবিতে একপ্রস্ত তরকারি, ভাজা আনিয়া হাজির করিল। গৌরীকান্তবাবু প্রবল উৎসাহে নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন,—আগে ঐটে দাও; বাৎলান দিকি জিনিষটা কি?

রজনীগন্ধার বাসের সঙ্গে ছোলার বেসনের সোঁদাটে গন্ধ···একেবারে জলের মত পাতলা ক'রে নিতে হবে বেসনটা···আগার দিকটা কেমন, মুচ মুচে তো? এইবার গোড়ার দিকটা একটু জিবের চাপ দিন; বেশ একটু মিষ্টি নয়? ঐটি হ'ল মধু···এইবার ঐটি দাও বাবাজি। না বললেও নিশ্চয় ধরে নেবেন, গন্ধই যে ওকে ধরিয়ে দিচ্চে;—কেয়াফুলের চপ···মাছটিকে সেদ্ধ ক'রে নিয়ে কাঁটা বেছে ফেললেন, তারপর আস্তে আস্তে কেয়াফুলের ওপরকার কচি পাতাগুলো তুলে ফেলে ফুলটা কুচি-কুচি করে ফেললেন—মাইণ্ড ইউ—কেয়ার ধুলোগুলো সব মাছেই পড়া চাই; তারপর···না, না, ও তিনটিই

খেতে হবে। গিন্নী করলেও একটা কথা ছিল; দেখচেন তো—যেন ফুলের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ ক'রে উঠেচি, কম মেহনৎ!···আচ্ছা, অন্তত আর একটা···এইবার এইটে দেখুন তো···দাও ঠাকুর···আপনার সেই নীল-পদ্মের ডালনা; আপনি সাধ ক'রে নাম রেখেচেন 'নীলা'...কখনও এ ব্যাপার মাথায় ঢুকেছিল?—সব পদ্মেরই হয়, তবে এমনটি হয় না। এ জিনিষটির জন্যে আমি মাড়োয়ারিদের কাছে ঋণী...দেখবেন পদ্মের সিজ্‌নে দোকানে ঝুড়ি ঝুড়ি পদ্ম কিনে রেখেচে; ভাবচেন বুঝি খদ্দের মারবার জন্যে রামচন্দ্রের মত অকালবোধন করচে সব, হাঃ হা—হা...আমারও ফুলের দিকে ঝোঁক, একদিন ধরলাম—'বলি শেঠজি···ও কি ইয়ে-বাবু! ফুল খাবেন ফুলের মত তাজা হ'য়ে; এ যেন ফাঁসিতে উঠতে যাচ্ছেন! নেন্ পেয়াদা বসে আছে, হাত গুটোলে ছাড়চি নে। হ্যাঁ, কি যে বলছিলাম,—সে-ই আমায় বাৎলে দিলে। একটু কামড় দিলে, বললে—'বাবু, ফুল তোমরা ব্যাভার করতে জান না...লজ্জায় ঘাড় হেঁট হয়ে গেল মশাই...অথচ এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। প্রথমটা পাপড়ি টাপড়ি বাজে হিস্যেগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিলেন, পাখীটির রোঁয়া তুলে ফেলবার মত আর কি—দেখবেন নরম প্যাডের মতন একটা জিনিষ ছিঁড়ে ফাটিয়ে ফেলুন...দেখবেন ভাতের মত দানা দানা সব—ঘিয়ে ভেজে নিন্...ওটা দিয়ে দাও ঠাকুর··খাবেন বইকি...তুমি ততক্ষণ ওদের কাছ থেকে বেলফুলের গোড়ের মোরব্বাটা নিয়ে এস···ঐটি বড় শক্ত জিনিষ মশায়, একটু ভাজবার তারতম্য হ'ল, কি রসের বেআন্দাজ হ'ল তো বাস্···বড্ড মোলায়েম জিনিষ কি না—এ তো আর আমলকিও নয়, কুমড়োও নয়··· আপনার ঠাকুর তো এদিককার সব শিখেই ফেললে; যাক যদি চলেও যাই এখান থেকে তো মাঝে মাঝে নাম করতে হবে। এর পরে কলকে ফুলের শুক্তনি, শিউলির ঘন্ট, চন্দ্রমল্লিকের গুড়-অম্বল—শিখিয়ে দোব'খন।

ঠাকুর খালি-হাতে আসিয়া বলিল,—মাঈজি বললেন 'আমি ছুঁতে পারব না, নিজে এসে বের ক'রে নিয়ে যেতে বল।'

—ঐঃ, তবু আপনারা বলবেন—'মেয়েমানুষেরই ফুলের দিকে টান বেশী; কী যে বিষদৃষ্টি! সে গুমোর করব আমি। সেই যে বলছিলাম না? কাব্যচুঞ্চু-মশায় বলতেন—'গৌরীকান্ত, তুমি মধুলিড়্'...বসুন, আমি নিজের হাতেই নিয়ে আসচি...



গীতা

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

১৭

অষ্টম অধ্যায়

৮।১-২ সপ্তম অধ্যায়ের শেষে পরা ও অপরা প্রকৃতির বিজ্ঞান ও ব্রহ্ম ও বিভিন্ন দেবতার পূজার আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ অধিবাদের উল্লেখ করিয়াছিলেন, সেই সূত্রে অর্জ্জুন প্রশ্ন করিতেছেন "হে পুরুষোত্তম, সেই ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্ম কি, কর্ম্ম কি, অধিভূত কাহাকে বলে, অধিদৈবই বা কি? হে মধুসূদন, এই দেহে অধিযজ্ঞ কি প্রকারে অবস্থিত এবং তিনি কে এবং সংযত চিত্ত ব্যক্তির মরণ-কালে কেন এবং কি প্রকারে তুমি তাহার ধ্যেয় হও?" অর্জ্জুন অধিবাদের পারিভাষিক শব্দগুলির অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সেই উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ পরের শ্লোকগুলিতে অধিবাদ সম্বন্ধে নিজের মত ব্যক্ত করিলেন। অধিবাদ তখনকার দিনের এক বিশেষ সাধনমার্গ। অধিবাদ সম্বন্ধে পূর্ব্বপ্রকাশিত আলোচনা দ্রষ্টব্য (প্রবাসী—আষাঢ়, ১৩৩৯)। অধিবাদীরা ব্যক্ত চরাচরের তাবৎ পদার্থকে অধিদৈব, অধিভূত এবং অধ্যাত্ম এই তিন বিভাগে বিভক্ত করেন এবং তাহাদের তত্ত্বানুসন্ধানের দ্বারা মুক্তিলাভের চেষ্টা করেন। অধিবাদ এই হিসাবে কতকটা সাংখ্য-বাদের অনুরূপ। অখিল কর্ম্মের স্বরূপনির্ণয় এবং অন্তকালে ওঁকারের ধ্যানও অধিবাদের অন্তর্গত ছিল বলিয়া মনে হয়।

৮।৩-৪ ভগবান বলিলেন, "পরম অক্ষরই ব্রহ্ম এবং স্বভাবকে অধ্যাত্ম বলা হয়, ভূতভাবের উদ্ভবকর যে বিসর্গ তাহারই নাম কর্ম্ম, ক্ষরভাব অধিভূত এবং পুরুষই অধিদৈবত এবং হে দেহধারিগণের শ্রেষ্ঠ, এই দেহে আমিই অধিযজ্ঞ।" এই শ্লোক দুইটির ব্যাখ্যা লইয়া অনেক মত-ভেদ আছে। অক্ষর শব্দের অর্থ যাহার ক্ষয় নাই; অক্ষর শব্দে ওঁ এই অক্ষর, জীবাত্মা, কূটস্থ, ও পরম ব্রহ্ম ইহার যে-কোনটি বুঝাইতে পারে, কিন্তু যখন অক্ষর শব্দে পরম বিশেষণ যোগ করা হয় তখন ইহা পরমাত্মা বা ব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করে। স্বভাব শব্দে নিজের ভাব অর্থাৎ আত্মভাব কিংবা সাধারণ প্রচলিত অর্থে প্রকৃতিজাত স্বভাব যাহার বশে আমরা সমস্ত কর্ম্ম করি। ভূতভাবোদ্ভবোকরঃ বিসর্গঃ বাক্যের অন্তর্গত ভূত শব্দের অর্থ পঞ্চমহাভূত বা প্রাণী উভয়ই হইতে পারে; ভাব শব্দের অর্থ সত্তা কিংবা পদার্থ। উদ্ভব শব্দের অর্থ উৎপত্তি বা সম্যক বিকাশ এবং বিসর্গ শব্দের অর্থ বিসর্জ্জন, ত্যাগ বা সৃষ্টি।

এই দুই শ্লোকের শঙ্করব্যাখ্যা:—"অক্ষর যাহা বিনষ্ট হয় না তাহাই পরমাত্মা। পরম এই বিশেষণটি নিরতিশয় ব্রহ্মরূপ অক্ষরেই প্রযুক্ত হইয়াছে, এই প্রকার মতই উৎপন্নতর হয়। সেই পরব্রহ্মেরই প্রতিদেহে প্রত্যগাত্ম-ভাবে অবস্থিতিকেই 'স্বভাব' কহা যায়; ইহাই 'স্বভাব' অধ্যাত্ম বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। দেহরূপ আত্মাকে অধিকৃত করিয়া প্রতিপুরুষের আত্মভাবে অবস্থিত সেই পরমব্রহ্মরূপ পরমার্থ বস্তু পর্য্যন্ত সকল পদার্থকেই স্বভাব বা অধ্যাত্ম শব্দের দ্বারা প্রতিপাদন করা হইতেছে। ভূত অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি যে ভাব অর্থাৎ বস্তু তাহাই ভূতভাব; সেই ভূতভাবের উদ্ভব যে করে তাহার নাম

অর্জ্জুন উবাচ—
কিং তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চকিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাংবর ॥ ৪

ভূতভাবোদ্ভবোকর; বিসর্গ এই শব্দটির অর্থ বিসর্জ্জন অর্থাৎ ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতাগণের তৃপ্তি উদ্দেশে যে পুরোডাশ প্রভৃতি দ্রব্যের ত্যাগ তাহাই বিসর্গ শব্দের অর্থ—এই বিসর্গই ভূতনিচয়ের উৎপাদক। সেই বিসর্গ শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ যজ্ঞ; কর্ম্ম শব্দের দ্বারা যজ্ঞই অভিহিত; এই যজ্ঞরূপ বীজ হইতে স্থাবর-জঙ্গমরূপ দ্বিবিধ ভূতনিচয় উৎপন্ন হয়। প্রাণিগণের ভোগের জন্য যাহা উৎপন্ন হয় তাহাকেই অধিভূত কহা যায়। যাহা বিনষ্ট হয় তাহাই ক্ষর, এমন যে ভাব তাহাই অধিভূত অর্থাৎ যাহা কিছু উৎপন্ন হয় এমন সকল বস্তুই অধিভূত শব্দের দ্বারা অভিহিত হয়। পুরুষ অর্থাৎ যাহার দ্বারা জগৎসকলই পরিপূরিত অথবা যিনি দেহরূপ পুরে বিরাজমান, তিনিই পুরুষ। সেই আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী সকল প্রাণীর সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা হিরণ্যগর্ভ; সেই পুরুষই অধিদৈবত। সকল যজ্ঞের উপর আত্মীয়ত্বাভিমান যে দেবতার আছে, সেই বিষ্ণুই অধিযজ্ঞ। শ্রুতিতেও নির্দ্দিষ্ট আছে যে বিষ্ণুই যজ্ঞ, সেই বিষ্ণু আমিই, এই দেহে অধিযজ্ঞরূপে আমিই বিদ্যমান আছি। দেহের দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে এইজন্য যজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞের ফল দেহে থাকে, অর্থাৎ লিঙ্গশরীরকে আশ্রয় করিয়া থাকে সুতরাং যজ্ঞাভিমানিনী দেবতাও এইরূপ" (অর্থাৎ দেহে থাকেন) (প্রমথনাথ তর্কভূষণ)।

সংক্ষেপে শঙ্করব্যাখ্যা বলিতেছি—

ব্রহ্ম = অবিনাশী পরম সত্তা = পরম অক্ষর।

অধ্যাত্ম = দেহকে আত্মভাবে অধিকৃত করিয়া যাহা কিছু আছে = স্বভাব।

কর্ম্ম = ভূতনিচয়ের উৎপাদক যজ্ঞ = ভূতভাবোদ্ভবোকর বিসর্গঃ।

অধিভূত = উৎপত্তি বিনাশশীল সমুদয় বস্তু = ক্ষর ভাব

অধিদৈবত = সমুদয় প্রাণীর ইন্দ্রিয়াভিমানী আদিত্যান্তর-গত দেবতা হিরণ্যগর্ভ = পুরুষ

অধিযজ্ঞ = যজ্ঞ-ফলভোগী লিঙ্গশরীরকে অধিকৃত করিয়া যিনি আছেন = বিষ্ণু = শ্রীকৃষ্ণ

এই পারিভাষিক শব্দগুলির শঙ্করব্যাখ্যা সর্ব্বস্থলে সঙ্গত হয় নাই। পূর্ব্বপ্রকাশিত অধিবাদের বিচারে শ্রুতি প্রমাণাদির সাহায্যে দেখাইয়াছি যে, অধ্যাত্ম শব্দের অর্থ শরীরের ইন্দ্রিয়াদি অধিকৃত করিয়া যাহা আছে অর্থাৎ মানুষের স্বভাব। স্বভাব অর্থে পরমেশ্বরের আত্মভাব নহে। গীতায় অন্যত্রও সাধারণ অর্থেই স্বভাব শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অধিভূত শব্দের অর্থ যাহা ভূতবর্গকে অধিকৃত করিয়া আছে অর্থাৎ নশ্বরত্ব বা ক্ষরভাব। অধিদৈবত শব্দের অর্থ যাহা বায়ু, আকাশ প্রভৃতি বস্তুর অভিমানী দেবতাদের অধিকৃত করিয়া আছে। দেবতা অর্থে প্রকাশমান বা দ্যোতন সত্তা। প্রকাশগুণ চেতনশীল জীবাত্মা বা পুরুষের আশ্রয়ে অভিব্যক্ত হয় এজন্য পুরুষই অধিদৈবত। শঙ্কর 'দেবতা' শব্দে ইন্দ্রিয়াদিও ধরিয়াছেন। উপনিষদে অন্যত্র দেবতা শব্দের এই অর্থ স্বীকৃত হইলেও অধিবাদে ইন্দ্রিয়গণ দেবতা শব্দে অভিহিত হয় নাই; ইন্দ্রিয়সমূহকে অধ্যাত্মের অন্তর্গত করা হইয়াছে। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ৩১৪ অধ্যায়ে এবং আশ্বমেধিক পর্ব্বে ৪২ অধ্যায়ে অধ্যাত্ম ইত্যাদির উল্লেখ আছে, যথা:— চরণেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, গমন অধিভূত এবং বিষ্ণু তাহার অধিদেবতা; বুদ্ধি অধ্যাত্ম, জ্ঞাতব্য বিষয় অধিভূত এবং আত্মা তাহার অধিদেবতা; চক্ষু অধ্যাত্ম, রূপ অধিভূত এবং সূর্য্য তাহার অধিদেবতা ইত্যাদি। মহাভারতের উদাহরণে 'অধি' শব্দের অর্থ তদ্বিষয়ক; অধিভূত অর্থাৎ ভূত-সম্বন্ধীয়। গীতায় অধি শব্দের অর্থ—যাহা অধিকৃত করিয়া আছে। মহাভারতে এজন্য চক্ষুকেই অধ্যাত্ম বলা হইয়াছে, কিন্তু গীতামতে চক্ষু অধ্যাত্মের অন্তর্গত অর্থাৎ প্রকৃতিজাত স্বভাব চক্ষুরিন্দ্রিয়কে অধিকৃত করিয়া রাখিয়াছে ইহাই বলা উদ্দেশ্য। গীতা, মহাভারত ও উপনিষদে অধিবাদের বিবরণে বাস্তবিক ফলতঃ কোন পার্থক্য নাই। অধিভূত, অধ্যাত্ম ও অধিদৈব শব্দের অন্তর্গত ভূত, আত্মা, দেবতা পদের প্রকৃত অর্থ কি তাহা তত্ত্বসমাস নামক কাপিল-শাস্ত্রের সপ্তম এবং দ্বাবিংশ সূত্রের দীপিকা নামক ব্যাখ্যায় পরিস্ফুট হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা পাঠ করিলে শব্দগুলির অর্থ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকিবে না। দ্বাবিংশ সূত্রে ত্রিবিধ দুঃখের উল্লেখ আছে; এই ত্রিবিধ দুঃখ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। "তত্রাধ্যাত্মিকং দ্বিবিধম্। শারীরম্ মানসঞ্চেতি। শারীরং বাতপিত্তশ্লেষ্মাণাং

বৈষম্যনিমিত্তং দুঃখম জরাতিসারবিসূচ্যাদিকম্। কামক্রোধশোকমোহলোভবিষাদের্ষ্যাদিকস্তু মানসম্। অধিভূতেভ্যোভবং আধিভৌতিকম্। মনুষ্য পক্ষি সরীসৃপ-স্থাবরাদিভ্যো ভবং দুঃখমাধিভৌতিকম্। শীতোষ্ণবাত-বর্ষাদিনিমিত্তং যৎ দুঃখমুৎপদ্যতে তদাধিদৈবিকম্।" অর্থাৎ আধ্যাত্মিক দুঃখ দ্বিবিধ—শারীরিক ও মানসিক; বাত পিত্ত শ্লেষ্মার বৈষম্যজনিত জ্বর অতিসার প্রভৃতি রোগ হইতে যে কষ্ট হয় তাহা শারীরিক এবং কাম-ক্রোধাদিজনিত কষ্ট মানসিক। অধিভূত হইতে যে কষ্ট হয় তাহা আধিভৌতিক; অপর মনুষ্য, পক্ষী, সর্প প্রভৃতি প্রাণী এবং স্থাবরাদি হইতে যে কষ্ট উৎপন্ন হয় তাহা আধিভৌতিক। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষাদি নিমিত্ত যে কষ্ট তাহা আধিদৈবিক।" এখানে শরীর ও মনকে অধ্যাত্ম বলা হইল। স্থাবর ও প্রাণিবর্গকে অধিভূত বলা হইল এবং গ্রীষ্ম বর্ষাদি প্রাকৃতিক ব্যাপারকে অধিদৈব বলা হইল। পূর্ব্বপ্রকাশিত আধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের নির্দেশ দেখিলে (প্রবাসী—আষাঢ়, ১৩৩৯) অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈবের পরস্পর সম্বন্ধ সহজে বুঝা যাইবে।

এইবার ৮।৩ ও ৮।৪ শ্লোকের কর্ম্ম ও অধিযজ্ঞ শব্দের অর্থ নির্ণয়ের চেষ্টা করিব। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অধিবাদের সমস্ত শব্দই পারিভাষিক। কর্ম্ম শব্দের সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিলে চলিবে না, এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ এখানে কর্ম্ম শব্দের নির্ব্বচন দিয়াছেন— ভূতভাবোদ্ভবোকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ। ৭।২৯ শ্লোকে এই কর্ম্মকে অখিল কর্ম্ম বলা হইয়াছে অর্থাৎ কর্ম্ম শব্দের অর্থ এখানে অত্যন্ত ব্যাপক; কেবলমাত্র জীবের কর্ম্ম এখানে উদ্দিষ্ট হয় নাই। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ নানা প্রকার কর্ম্মকে যজ্ঞ নামে অভিহিত করিয়াছেন। এখানেও যজ্ঞ ও কর্ম্ম একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অধিকর্ম্মই অধিযজ্ঞ। যিনি অখিল কর্ম্মকে অধিকৃত করিয়া আছেন তিনিই অধিযজ্ঞ। জীবের সমস্ত কর্ম্মও অধিযজ্ঞের অধীন, এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন এই দেহে আমিই অর্থাৎ পরমাত্মাই অধিযজ্ঞ। ১৮।৬১ শ্লোকে আছে "হে অর্জ্জুন, মায়াদ্বারা সর্ব্বভূতকে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় ভ্রমণ করাইতে থাকিয়া ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান করেন।" অর্থাৎ সমস্ত প্রাণী নিজ নিজ অদৃষ্ট বা কর্ম্মানুযায়ী পরিচালিত হইলেও সেই অদৃষ্ট বা কর্ম্ম ঈশ্বরের মায়াশক্তির অন্তর্গত হওয়ায় ঈশ্বরই সমস্ত কর্ম্মের নিয়ন্তা। ঈশ্বরই প্রতি দেহে অধিযজ্ঞ। কৌষীতকি উপনিষদে চতুর্থ অধ্যায়ে বালাকি অজাতশত্রু সংবাদে অধিদৈবত ও অধ্যাত্ম তত্ত্বের আলোচনার পর কর্ম্মের উল্লেখ আছে। অজাতশত্রু বলিতেছেন 'যস্যবৈতৎ কর্ম্ম স বৈ বেদিতব্য' অর্থাৎ এই জগৎ যাঁহার কর্ম্ম তাঁহাকে জানিতে হইবে। এখানে জগৎ অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টিকে কর্ম্ম বলা হইল। সৃষ্টি-ব্যাপারে ঈশ্বরের অহংকার কর্ত্তৃপদবাচ্য এবং সমুদয় সৃষ্টি কর্ম্ম। শাস্ত্রে অন্যান্য নানা স্থানেও সৃষ্টিকে কর্ম্ম বলা হইয়াছে। এই কর্ম্মই অধিবাদের কর্ম্ম। অধিবাদের কর্ম্মের নির্ব্বচনে বলা হইয়াছে ভূতভাবের উদ্ভবকর বিসর্গই কর্ম্ম। ভূতভাব, উদ্ভব ও বিসর্গ এই তিনটিই পারিভাষিক শব্দ। চন্দ্রশেখর বসু 'সৃষ্টি' গ্রন্থে লিখিতেছেন:—"পঞ্চভূত, দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, বুদ্ধি, মন ও জীবাত্মা এই সকল যে একেবারেই স্ব স্ব বর্ত্তমান অবয়বে সৃষ্ট হইয়াছিল শাস্ত্রের সেরূপ অভিপ্রায় নহে। ঐ সমুদয় তত্ত্ব প্রথমে অতি সূক্ষ্মভাবে উৎপন্ন হইয়া প্রকৃতির ক্রোড়ে নিদ্রিত ছিল।...ভাগবতে সে সূক্ষ্ম সৃষ্টিকে কেবল ভাবরূপী বলিয়াছেন যথা—এই সকল ভূত ইন্দ্রিয় প্রভৃতি 'ভাব' পূর্ব্বে অমিলিত ছিল, সুতরাং শরীর নির্ম্মাণে সমর্থ হয় নাই (ভাগবত ২।৫।৩২)... পশ্চাৎ উপযুক্ত সময়ে সূক্ষ্মভূতগণ পঞ্চীকৃত ও মিলিত হইল এবং আত্মামাত্রাসকল (জীবাত্মা ও ইন্দ্রিয়াদি) উহাদের সহিত সমবেত হইয়া রহিল। মিলিত পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট জীবাত্মা এই সকল কালক্রমে একটা অণ্ডরূপে পরিণত হইল। ...মহত্তত্ত্ব হইতে অণ্ড পর্য্যন্ত সমস্তই ঈশ্বরের সৃষ্টি। তাহার নাম 'সর্গ' অথবা প্রাকৃত। (ভাগবত ২।১০।৩ ও ৩।১০।১৭) এবং বৈরাজ পুরুষ ব্রহ্মা হইতে যে পৃথিবীপৃষ্ঠে রচনা তাহার নাম 'বিসর্গ' অথবা বৈকারিক। (ভাগবত ২।১০।৩) সৃষ্টির নিমিত্তে পরমেশ্বরের যে পুরুষভাব প্রথমাবধি অব্যক্ত প্রকৃতির মধ্যে বর্ত্তমান ছিল তাহাই পশ্চাৎ অণ্ডেতে প্রবেশ করিল। পরমেশ্বরের সেই ভাবটি

ব্রহ্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ।” ব্রহ্মা প্রথমে উদ্ভিদ ও পরে অন্যান্য জীব সৃষ্টি করিলেন। এই বিবরণ হইতে ভূতভাবের উদ্ভবকর বিসর্গ কাহাকে বলে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। ‘ভূতভাব’ বা সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে দৃশ্যমান প্রপঞ্চের ‘উদ্ভব’ বা ক্রমবিকাশ রূপ ‘বিসর্গ’ বা সৃষ্টিই কর্ম্ম শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। জীবের অদৃষ্ট বা কর্ম্মও ইহার অন্তর্গত। অধিযজ্ঞ বা পরমাত্মাই এই সৃষ্টিরূপ যজ্ঞের নিয়ন্তা এবং তিনিই মনুষ্যদেহে অবস্থান করিয়া জীবের কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। ‘এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ’—এই দেব বিশ্বকর্ম্মা ও মহাত্মা ও সর্ব্বদা সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৪।১৭)।

৮।৫-৬ “এবং অন্তিমকালে যিনি আমাকেই স্মরণ করিয়া কলেবর ত্যাগ করেন তিনি আমার ভাব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ব্রহ্মভূত হন এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। হে কৌন্তেয়, আরও জানিবে যে অন্তিমকালে যে-যে ভাব স্মরণ করিয়া জীব দেহ ত্যাগ করে সদা সেই ভাবে অনুরক্ত থাকায় সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়।” মৃত্যুকালীন চিন্তা অনুযায়ী জীবের পরজন্মের গতি হয় এই বিশ্বাস অধিবাদের অন্তর্গত; ৮।৫ শ্লোকের ‘চ’ বা ‘এবং’ শব্দের দ্বারা পূর্ব্ব শ্লোকের অধিবাদের সহিত এই শ্লোকের যোগ আছে বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ অধিবাদের এই মত ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, মৃত্যুকালীন চিন্তাদ্বারা পরজন্মের গতি নির্দ্ধারিত হয় একথা নিঃসন্দেহ, কিন্তু ‘সদা তদ্ভাব ভাবিত’ অর্থাৎ জীবিতকালে সর্ব্বদা সেই ভাবে অনুরক্ত থাকিলে তবে মৃত্যুকালে সেই চিন্তা মনে আসিবে। পরের শ্লোকে এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন।

৮।৭ “অতএব সর্ব্বকালে আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর; আমাতে মনোবুদ্ধি অর্পিত হইলে নিশ্চিত আমাকেই পাইবে।” সমস্ত সময়ে যাহার চিত্ত ভগবানে অর্পিত আছে সে নিশ্চিন্ত মনে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে পারে; এই জন্যই এই শ্লোকে যুদ্ধের কথা আসিয়াছে।

৮।৮-১০—“হে পার্থ, অভ্যাসযোগযুক্ত ও অনন্যগামী চিত্তে অর্থাৎ চিত্তস্থৈর্য্য সহকারে মনকে অন্য বিষয়ে যাইতে না দিয়া চিন্তা করিলে সাধক দিব্য পরমপুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। যিনি তমের অতীত, আদিত্যের ন্যায় দ্যোতন-স্বভাব, অচিন্ত্যরূপ, সকল জগতের আধার ও নিয়ন্তা, অণু হইতে সূক্ষ্মতর, চিরন্তন, সর্ব্বজ্ঞ পুরুষকে মরণকালে অবিচলিত মনে ভক্তিযুক্ত হইয়া এবং যোগবলের দ্বারা ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রাণকে সম্যক স্থাপিত করিয়া স্মরণ করেন তিনি সেই দিব্য পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন।” অভ্যাসযোগযুক্ত শব্দের অর্থ অভ্যাস-রূপ যোগের সহিত যিনি যুক্ত হইয়াছেন; চিত্তস্থৈর্য্যের জন্য যত্নের নাম অভ্যাস (পাতঞ্জলসূত্র ১।১২) অতএব যিনি চিত্তস্থৈর্য্য আয়ত্ত করিয়াছেন তিনি অভ্যাসযোগযুক্ত। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে বলিলেন অনন্যগামীচিত্তে চিন্তা করিলে পরমপুরুষকে পাওয়া যায় অর্থাৎ সর্ব্বদা পরমব্রহ্মের প্রতি মন নিবিষ্ট থাকিলে ব্রহ্মলাভ হয়; পরে বলিলেন, মরণকালে অবিচলিত মনে ধ্যানের দ্বারা ব্রহ্মলাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য এই যে জীবিতকালে সর্ব্বদা ব্রহ্ম স্মরণ করিলে মরণকালেও অবিচলিত ব্রহ্মধ্যান সম্ভব হয়। ৮।৫, ৬ ও ৭ শ্লোকেও এই ধরণের কথা আছে।

৮।১১-১৪—“বেদবিদগণ যে অক্ষরের কথা বলেন, বীতরাগ অর্থাৎ বাসনাশূন্য হইয়া যতিগণ যাহাতে প্রবেশ করেন, যাহাকে পাইবার ইচ্ছায় সাধকগণ ব্রহ্মচর্য্য

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্যচ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥ ৭
অভ্যাস যোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮
কবিংপুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদযঃ
সর্ব্বস্য [illegible] ॥ ৯

প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥১০
যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥১১
সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্যচ।
মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥১২
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং সযাতি পরমাং গতিম্ ॥১৩
অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪

অবলম্বন করেন সেই পদ তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারকে সংযমিত করিয়া অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নিরস্ত করিয়া মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া, আপনার প্রাণ মূর্দ্ধায় স্থাপিত করিয়া যোগধারণা অবলম্বনপূর্ব্বক ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্ম উচ্চারণ করিতে করিতে আমাকে স্মরণ করিয়া যিনি দেহত্যাগ করিয়া যান তিনি পরমাগতি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ব্রহ্মপদ লাভ করেন। হে পার্থ, যিনি অনন্যচিত্ত হইয়া সর্ব্বদা আমাকে প্রত্যহ স্মরণ করেন আমি সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে অনায়াস-লভ্য।" শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলিলেন, যে প্রত্যহ আমাকে স্মরণ করে সে-ই মৃত্যুকালে অবিচলিত চিত্তে ওঁকার-রূপ ব্রহ্মের ধ্যান করিতে পারে। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে 'ধারণা' শব্দটি পারিভাষিক। 'দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা" (পাতঞ্জল সূত্র ৩৷১) অর্থাৎ চিত্তকে দেশ-বিশেষে বন্ধন করিয়া রাখার নাম ধারণা। ধ্যেয় মূর্ত্তির কোন অঙ্গে বা নিজ শরীরের কোন অংশে দৃষ্টি বা মন নিবদ্ধ করার নাম ধারণা। যখন যোগী স্বীয় নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া কোন বিষয়ের ধ্যান করেন তখন নাসিকাগ্রেই তাঁহার যোগের ধারণা; যখন উপাসক দেব-মূর্ত্তির চরণে মন নিবদ্ধ করিয়া দেবতার ধ্যান করেন তখন সেই চরণেই তাঁহার যোগের ধারণা। গীতায় ৬৷১৩ শ্লোকে স্বীয় নাসিকাগ্রে, ৮৷১০ শ্লোকে ভ্রূযুগলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে এবং ৮৷১২ শ্লোকে মূর্দ্ধায় যোগধারণার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রমতে কোন বিশেষ অঙ্গে ধারণা অবলম্বন করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। সাধক নিজ দীক্ষামত যে-কোন ধারণা অবলম্বন করিতে পারেন। নাসিকাগ্রে সহজেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায়, কিন্তু ভ্রূযুগলের মধ্যবর্ত্তী স্থান বা মূর্দ্ধা সাধকের দৃষ্টিগোচর নহে, এজন্য তথায় প্রাণকে স্থাপিত করিয়া তাহাতে মনোনিবেশের কথা বলা হইয়াছে। প্রাণস্থাপনা কাহাকে বলে তাহা বুঝা চাই। শরীরের যাহা কিছু কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় প্রাণবায়ুর সাহায্যেই তাহা হইয়া থাকে, এজন্য কোন কোন উপনিষদে প্রাণকে ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে; কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের মূল উপদেশ এই যে ক্রিয়া জড়িত আছে। সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে ২৷৩১ সূত্রে আছে "সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ" অর্থাৎ প্রাণ অপান প্রভৃতি পঞ্চবায়ু করণগুলির সাধারণী বৃত্তি। করণ শব্দে মন, বুদ্ধি ও অহংকার রূপ অন্তঃকরণত্রয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বুঝায়। মনই সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা; মন নিশ্চল না হইলে ইন্দ্রিয়ের প্রাণক্রিয়া সংযমিত হইবে না। মনের স্থান হৃদয়, এজন্য হৃদয়ে মনকে নিরুদ্ধ করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সর্ব্ববিধ শারীরিক চেষ্টাই প্রাণের ক্রিয়া; শরীর নিশ্চল না হইলে যোগ সফল হয় না, এজন্য প্রাণসংযম আবশ্যক। প্রাণক্রিয়া দুই প্রকারের। ইচ্ছা-সংকারে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে-সকল কর্ম্ম করা যায় তাহা ঐচ্ছিক ক্রিয়া (voluntary action)। মন নিরুদ্ধ হইলে ঐচ্ছিক ক্রিয়াও নিরুদ্ধ হয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিও নিশ্চল হয়। মনই এই সকল ক্রিয়ার অধিপতি। ঐচ্ছিক ক্রিয়া ব্যতীত শরীরের আর এক প্রকার ক্রিয়া আছে, যথা—হৃৎপিণ্ডের (heart) ক্রিয়া, বিভিন্ন স্নায়ুর স্পন্দন, অন্ত্রের নড়াচড়া ইত্যাদি; এই সকল ক্রিয়া আমাদের ইচ্ছাধীন নহে। অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার অত্যধিক বিক্ষেপ থাকিলেও যোগ সিদ্ধ হয় না। পেট কা মন স্থির হয় না। মূর্দ্ধাকে ধারণা-স্থান করিয়া প্রাণের ধ্যানে ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক সমস্ত প্রাণক্রিয়া সংযমিত হয়, এজন্য মূর্দ্ধায় প্রাণকে স্থাপনা করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বপ্রকাশিত ইন্দ্রিয়াদি সংযমের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

মূর্দ্ধায় প্রাণ স্থাপিত করিবার উপদেশের আরও একটি উদ্দেশ্য আছে। এখানে যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক দেহত্যাগের কথা বলা হইয়াছে। ইহা ঋষিবাদীদের সাধনার এক অঙ্গ। মৃত্যুকাল আসন্ন জানিয়া সাধক যোগাবলম্বন করেন এবং ব্রহ্মস্মরণ করিতে করিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক দেহত্যাগ করেন। এইরূপ ইচ্ছামৃত্যুকে কালবঞ্চনা বলে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা মুখ, নাভি, মলদ্বার, উপস্থ, পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং ব্রহ্মরন্ধ্র এই কয়টি স্থান প্রাণনির্গমনের দ্বার বলিয়া কথিত হইয়াছে। অধশ্ছিদ্র

এবং ঊর্দ্ধ ছিদ্র দিয়া প্রাণ নির্গত হইলে ঊর্দ্ধগতি লাভ হয়। ব্রহ্মরন্ধ্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান এবং এই রন্ধ্র দিয়া প্রাণ নির্গত হইলে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। এই কারণে অধিবাদী সাধক প্রাণত্যাগের পূর্ব্বে প্রাণকে মূর্দ্ধায় স্থাপিত করেন। যাঁহারা কোনও বিশেষ কালে মৃত্যু হইলে ব্রহ্মলাভ হয় মনে করেন তাঁহারাও কালবঞ্চনা সাধনা করেন। ইঁহাদের কথা ৮।২৪ শ্লোকে বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ নিজের মত ৮।২৭-২৮ শ্লোকে বলিয়াছেন। ঐ শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যাকালে তাহার আলোচনা করিব।

৮।৫ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন অন্তকালে যিনি আমাকে স্মরণ করেন তিনি আমার ভাব প্রাপ্ত হন, ৯।১০ শ্লোকে বলিলেন যিনি প্রয়াণকালে সকল জগতের আধার পুরাণ পুরুষকে স্মরণ করেন তিনি পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন; পুনরায় ১৩ শ্লোকে বলিতেছেন যিনি আমাকে স্মরণ করিয়া ওঁকার উচ্চারণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন তিনি পরমাগতি প্রাপ্ত হন। একই প্রকার কথার কেন পুনরুক্তি হইল তাহা বিচার্য্য। ওঁকার-সাধনা অধিবাদের অঙ্গ একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি (পূর্ব্বপ্রকাশিত অধিবাদ দ্রষ্টব্য। প্রবাসী—আষাঢ় ১৩৩৯) এজন্য ১৩ শ্লোকের উল্লেখ। অনুমান করা যায় মহাভারতের যুগে সাধারণের মধ্যে মৃত্যুকালে ওঁকার-ধ্যান ব্যতীত আরও দুই প্রকার সাধনা প্রচলিত ছিল। অধিবাদিগণ যোগাবলম্বনপূর্ব্বক ওঁকার ধ্যান করিতে থাকিয়া কালবঞ্চনা করিতেন অর্থাৎ ইচ্ছামৃত্যু সাধনা করিতেন এবং অপরে ওঁকার-রূপ বিশেষ আলম্বন গ্রহণ না করিয়া কেবলমাত্র পরমাত্মার ধ্যান করিতে করিতে যোগাবলম্বনপূর্ব্বক কালবঞ্চনা সাধনা করিতেন; ইঁহাদের কথা ৯ ও ১০ শ্লোকে বলা হইয়াছে। এই শেষোক্ত সাধনায় যোগ ধারণা ভিন্ন প্রকারের। ওঁকার-সাধনায় যোগধারণার স্থান মূর্দ্ধা এবং এই সাধনায় ভ্রূযুগলের মধ্যবর্ত্তী স্থান। ওঁকার-সাধনার সময়ও শ্রীকৃষ্ণ 'মামনুস্মরণ' এই কথা বলিয়া পরমাত্মা চিন্তনের উপদেশ দিয়াছেন। খুব সম্ভব ইহা শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব উপদেশ; অধিবাদিগণ হয়ত কেবল ওঁকার রূপ অক্ষরের ধ্যান করিতেন। ৯-১০ এবং ১২-১৩ শ্লোকে যে দুই প্রকার সাধকের কথা বলা হইয়াছে ইচ্ছামৃত্যুই ইঁহাদের উভয়ের সাধনা, কেবল উপায় সম্বন্ধে ইঁহাদের সামান্য পার্থক্য আছে। ৫ শ্লোকে যোগাবলম্বনপূর্ব্বক ইচ্ছামৃত্যুর কথা নাই। এখনও অধিকাংশ হিন্দু যেরূপ মৃত্যুকালে তারকব্রহ্ম নাম স্মরণ করেন মহাভারতের যুগেও সেইরূপ করিতেন বলিয়া মনে হয়; ৫ শ্লোকে তাঁহাদেরই কথা বলা হইয়াছে। অতএব মনে হয়, পুনরুক্তি না করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ৫ হইতে ১৪ শ্লোকে তৎকাল-প্রচলিত বিভিন্ন সাধন-প্রণালীর বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের মর্ম্ম এই—যদি মৃত্যুকালে পরমাত্মার ধ্যান দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তির আশা কর, তবে সদাসর্ব্বদা ব্রহ্মচিন্তা কর।

সুন্দরবন কি কখন জনপদ ছিল ?

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

'আদিগঙ্গা' নামে কালীঘাটে প্রবাহিত ক্ষীণ জলধারাই প্রাচীন ভাগীরথীর প্রধান শাখা ও প্রবাহ। কালীঘাটের পশ্চিম দিক দিয়ে ক্রমশ দক্ষিণে বৈষ্ণবঘাটা রাজপুর কোদালিয়া মালঞ্চ মাইনগর বারুইপুর সূর্য্যপুর মূলটা হাসগেড়িয়া জলঘাটা ছত্রভোগ খাঁড়ী প্রভৃতি গ্রামের পাশ দিয়ে গঙ্গার গতি ছিল। ধনপতি শ্রীমন্ত চাঁদসাগরের বাণিজ্যযাত্রা-প্রসঙ্গে ভাগীরথী-তীরের দুই পাশে জনপদের উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যদেব জাহ্নবীর তীরে তীরে আটিসারা গ্রাম থেকে নীলাচল যাবার জন্য ছত্রভোগে এসেছিলেন।

> গঙ্গা তীরে তীরে চারিজন সাথে
> নীলাদ্রি চলিল প্রভু ছত্রভোগ পথে।
> —মধ্যলীলা, ৩য় পরিচ্ছেদ।

রায়মঙ্গল কাব্যে দক্ষিণ দিক থেকে প্রবাহের উল্লেখ আছে।

> সারি সারি জুড়ি জুড়ি কাকদ্বীপ গঙ্গখড়ি
> ছাড়াইল বণিকের লোক।
> টাঁয়াখোল পাছু আন গঙ্গা ধারায় করি স্নান
> উপনীত হইল ছত্রভোগ।
>
> বাদ্য বাজে সুমধুর বাহিয়া রাজা বিষ্ণুপুর
> জয়নগর করিল পশ্চাৎ।
> সঘনে দামামা ধ্বনি শুনি রায় গুণমণি
> বহড় ক্ষেত্র বহিল আনন্দে॥
>
> বারাসাতে উপনীত হইয়া সাধু হরষিত
> পূজিল ঠাকুর সদানন্দে।
> বাহিল মূলটি ছাড়ি চালাইল সপ্ততরী
> গলটি করিল পাছু আন॥
>
> সাধুঘাটা পিছে করি সূর্য্যপুর বাহি তরী
> চাপাইলা বারুইপুরে আসি।
> মালঞ্চ রহিল দূর বাহিয়া কল্যাণপুর
> কল্যাণ-মাধবে প্রণামিল।
> বহিলেক যতগ্রাম কি কাজ করিয়া নাম
> বড়দহ ঘাটে উত্তরিল॥

এই বড়দহ কোদালিয়া গ্রামের ঈষৎ পশ্চিমে, বর্ত্তমানে বড়দা নামে পরিচিত। এখানকার মজা গঙ্গার গর্ভে বহুদিন থেকে চাষ-আবাদের কাজ চলে আসছে। শোনা যায়, এই বড়দায় লাঙলের ফলায় বহুবার নৌকার কাঠ নোঙ্গর প্রভৃতি পাওয়া গিয়েছে।

ভারতের সার্ভেয়ার-জেনারেল কর্ত্তৃক প্রকাশিত ১৯২৫ সালের $79\frac{B}{NW}$ নম্বর মানচিত্রে Old Steeplechase Course বা আদি গঙ্গানালা নামে খাল বারুইপুর পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, এবং দক্ষিণে খাঁড়ীর কাছে বকুলতলা নামক মানচিত্র-চিহ্নিত স্থানে 'চোরা গঙ্গাধারা খাল' নামে জলরেখা দেখা যায়। গঙ্গা 'শতমুখী' নামে এইখানেই বহুভাগে বিভক্ত হয়ে পরে সাগরে মিলিত হয়েছেন। পুরাতন গঙ্গার এই দুটিমাত্র জলরেখা ছাড়া আর কোন চিহ্ন বর্ত্তমান নেই, মধ্যে মধ্যে কতকগুলি লম্বা আকারের পুকুর দেখা যায়। এই পুকুরগুলি একটা রেখায় যোগ করলে মানচিত্রে উক্ত 'আদিগঙ্গা নালা' 'চোরা গঙ্গাধারা খালে'র সঙ্গে এক হয়ে যায়। পুকুরগুলি অধিকারীদের উপাধি অনুযায়ী ঘোষের গঙ্গা, বোসের গঙ্গা, চক্রবর্ত্তীর গঙ্গা প্রভৃতি নামে প্রচলিত। চব্বিশ-পরগণার এই গঙ্গাকূলবর্ত্তী গ্রামে গ্রামে প্রচলিত আছে যে, এখনও এই-সব গঙ্গায় স্নান করলে গঙ্গাস্নানের পুণ্য লাভ হয়।

মহাভারতে পাওয়া যায় গঙ্গাসাগরসঙ্গম তীর্থ ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রাচীনতম হিন্দুতীর্থ ছিল। কথিত আছে, পৃথিবীর সর্ব্বজাতি-সম্মেলন এই সঙ্গমতীর্থ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হ'ত। গঙ্গাই তখন সমগ্র ভারতের এই তীর্থে আসার একমাত্র পথ ছিল। এই সাগরদ্বীপ সুন্দরবনেরই অংশ। শোনা যায়, সাগরের মেলায় এসে রাজা ও সন্ন্যাসীরা সাধ্যমত মন্দির স্তম্ভ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করতেন।

খাঁড়ীর সন্নিকটবর্ত্তী প্রাণকৃষ্ণপুর গ্রামে তিন দিন ব্যাপী এক বিরাট মেলা হয়। সেখানে গঙ্গাচক্রঘাটা

নামে একটি পুষ্করিণী আছে। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস সেটি গঙ্গার অংশ। কথিত আছে যে, এককালে মহাদেবের বহু মন্দির এই গ্রামে ছিল।* পাজিটার তাঁহার *Revenue History of Sunderbans* পুস্তকে সুন্দরবনের চতুঃসীমার একটা বিবরণ দিয়াছেন।—

দক্ষিণে—বঙ্গোপসাগর

পূর্ব্বে—হরিণঘাটা নদী

পশ্চিমে—রায়মঙ্গল নদী

উত্তরে—তুলিয়াপুর গ্রাম, খাড়ীঘাট গ্রাম, চিংড়িখালি গ্রাম, ঢাকী খালের মুখ, ঢাকী খালের শেষ, সপতলা গ্রাম,





পাষাণ-প্রতিমার পাদপীঠ

কাচনা গ্রাম। কলিঙ্গ নদী (রায়মঙ্গলের শাখা), যমুনা নদী, কবদক (কপোতাক্ষ), মাৰ্জ্জটা নদী, পাদোর নদী (ভাদর), দাউদখালী নদী, বলেশ্বর নদী।

সুন্দরবনের ভেতরে ছত্রভোগ অম্বুলিঙ্গ ও মাদপুরা† বকুলতলা রায়দীঘি গজমুড়ি জটার দেউল রাধাকান্তপুর দেলবাড়ী* কাঁকনদীঘি ১১৪নং লাট বুড়ীর তট পাথর প্রতিমা নানখানা† প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ



দরজার মাথা ; মধ্যে গণেশের মূর্ত্তি খোদিত

জৈন প্রভৃতি নানা ধর্ম্মের, চারুশিল্পের বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি ও নানা রকমের স্তূপ স্তম্ভ ও মন্দির পাওয়া গেছে।

মানচিত্রে চিহ্নিত করঞ্জলী ও কাঁটাবেনে গ্রামে (কুলপী থানার অন্তর্গত) কয়েকটি মূর্ত্তি ও মন্দিরের (পাথরের) ভগ্নাবশেষের সন্ধান পাওয়া গেছে। সবগুলিই পুষ্করিণী-খননকালে প্রাপ্ত।

প্রত্নবিভাগের অন্যতম প্রদেশাধিকৃত অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গণেশপ্রসাদ চন্দ্র মহাশয়ের মতে ১নং ছবি, পাষাণ-প্রতিমার পাদপীঠ ; ২নং ছবি, দরজার মাথা, মধ্যে গণেশের মূর্ত্তি খোদিত। এ দুটি করঞ্জলীতে প্রাপ্ত। ৩নং ছবি, শিবলিঙ্গ ও নন্দী ; ৪নং পরেশনাথের মূর্ত্তি (দিগম্বর সম্প্রদায়),

* Hunter's Statistical Account of Bengal vol 1, p 106.

† বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

* বসুমতী, কার্ত্তিক ১৩৩৪

† বসুমতী, মাঘ ১৩৩৪,

আরও ২৩টি তীর্থঙ্কর সঙ্গে বর্ত্তমান। এ দুটি কাঁটাবেনেতে প্রাপ্ত।

পরেশনাথের মূর্ত্তি কষ্টিপাথরের। এ-রকম নিখুঁত অপরূপ কারুকার্য্যের নিদর্শন ও-অঞ্চলে আর পাওয়া



শিবলিঙ্গ ও নন্দী

যায় নি। মূর্ত্তিটি দৈর্ঘে প্রায় ৩॥ হাত। চন্দ্র মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহ ছিল এই দুটি গাঁয়ে খনন-কার্য্য সুরু করবেন, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সরকারী তহবিলের অবস্থা ভাল না থাকায় তাঁকে সে আশা ত্যাগ করতে হয়েছে। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ওখানে খননকার্য্য সুরু করলে ভারতের ইতিহাস লাভবান হবে।

সুন্দরবনের এই ঐশ্বর্য্যের কথা এ-পর্য্যন্ত সবিশেষ আলোচিত হয় নি। এই-সব মূর্ত্তি স্তম্ভ ও স্তূপের মূল সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে যে-কটি তথ্য পাওয়া গিয়েছে সেগুলি দিয়ে সুন্দরবনের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দেবার চেষ্টা করব।

ব্যারোর দক্ষিণ-বঙ্গের কয়েকখানি মানচিত্রে পাঁচটি বড় শহরের চিহ্ন আঁকা আছে। এই থেকে লোকে অনুমান করে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে সুন্দরবন সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল।১ এই অনুমানের সপক্ষে কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। বড় বড় পুকুর, অট্টালিকা, স্তম্ভ, উঁচু বাঁধ প্রভৃতি সারা সুন্দরবনের, প্রধানতঃ ২৪-পরগণা ও খুলনা জেলার (সুন্দরবন অংশের) নানাস্থানের পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের সাক্ষ্য দেয়।২

ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বেও সুন্দরবন যে সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়।

চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ বলেছেন খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এই জেলা (২৪-পরগণা) **সমতটের খানিকটা অংশ ছিল।** সমুদ্রবেষ্টিত নিম্নভূমির দেশ, শস্যে ফুলে ফলে পরিপূর্ণ। দেশের জলবায়ু মৃদু, মানুষ খর্ব্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ এবং পরিশ্রমী।৩

জেনারেল কানিংহামের মতে, ভাগীরথী ও গঙ্গার প্রধান স্রোতের মধ্যবর্ত্তী ব-দ্বীপের সমস্তটাই **সমতটের অন্তর্বর্ত্তী ছিল।**৩

এখন এই প্রাচীন জনপদে ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রভাব কি ভাবে বিস্তার লাভ করেছিল, সেই বিষয়ের তথ্যগুলি দেখা যাক।

সমুদ্রগুপ্তের একখানি খোদিত লিপিতে (আনুমানিক ৩৬০ খ্রীষ্টাব্দের) সমতটের নাম গুপ্ত-সাম্রাজ্যের সীমান্ত করদ-রাজ্যরূপে পাওয়া যায়।৪

খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে বাঙলা মগধের সঙ্গে অন্ত-র্বাণিজ্য-সম্পর্কে যুক্ত ছিল।৫

চীন-পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ বলেছেন, সপ্তম শতাব্দীতে এই জেলা (২৪-পরগণা) সমতটের কতকটা অংশ ছিল। এই স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের নিদর্শন-স্বরূপ ত্রিশটি বিহার ও দু-হাজার পুরোহিত ছিল। কিন্তু ইহার তুলনায় হিন্দুমন্দির বহুগুণে বেশী ছিল।

---

(১) Hunter's *Statistical Account of Bengal*, vol I, p. 381.

(২) Calcutta Review, 1889, vol. lxxxix, p. 284.

(৩) Bengal District Gazetteer (24 Pergs.) p. 25.

(৪) Ibidem, p. 26.

(৫) *Origin and Development of the Bengali Language*, vol 1.

তখনকার ধর্ম্মপ্রয়াসীদের ধর্ম্মবিদ্বেষ ছিল না। এই কারণেই বোধ হয় পাশাপাশি বিভিন্ন এবং বহু ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হ'লেও কেউ তার স্বাধীনতায় বাধা পায় নি, সমান প্রভাবে সবাই বাড়তে পেয়েছে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগেও সুন্দরবন যে খুব সমৃদ্ধিশালী ছিল তার কারণ, প্রতাপাদিত্য তখন সুন্দরবনের রাজা১ এবং সমগ্র বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু নৌশক্তির কেন্দ্র তখন চণ্ডীকান বা সাগরদ্বীপে, যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। তা ছাড়া জাহাজ রাখা ও জাহাজ-মেরামতের কয়েকটি জায়গা ছিল, ধুমঘাট, জাহাজঘাটা ও চাকশ্রী।২ মানসিংহের প্রতিদ্বন্দ্বিত্বের সময় হিন্দুদিগের প্রধান নৌশক্তির কেন্দ্র,—বাগরগঞ্জের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে শ্রীপুরের অন্তর্গত বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপে ও চণ্ডীকান বা সাগরদ্বীপে ছিল। শ্রীপুরের রাজা তখন কেদার রায়।৩

প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাওয়া যায়। কথিত আছে, প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য তাঁর রাজধানী ঈশ্বরীপুরে স্থাপন করেছিলেন। এই ঈশ্বরীপুর বর্ত্তমান খুলনা জেলার মধ্যে কালিগঞ্জের বার মাইল দক্ষিণে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এইটি যশোর নামে পরিচিত। প্রতাপাদিত্য নিজ রাজত্বকালে তাঁর রাজধানী সুন্দরবনের ভেতরেই ধুমঘাট নামে আর একটি জায়গায় স্থানান্তরিত করেন।

আরও কয়েক বছর পরে এই প্রাচীন ও সমৃদ্ধ জনপদের রীতিমত ধ্বংসের পরিচয় পাওয়া যায়।

'শাজাহান (১৬২১ খৃঃ) কিছু না বলায় পর্ত্তুগীজেরা আরও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। তাহাদের উৎপাতে নিম্নবঙ্গ অস্থির হইয়া উঠিল। ভাগীরথী দিয়া যে সকল জাহাজ বা নৌকা যাইত প্রত্যেকের নিকট হইতে পর্ত্তুগীজেরা মাশুল আদায় করিত। এই সময়ে ছেলেধরার ভয় হইয়াছিল। পর্ত্তুগীজেরা ছোট ছোট ছেলে ধরিয়া লইয়া গিয়া বিভিন্ন দেশে বিক্রয় করিত। ইহাদের উৎপাতে কত শহর কতশত গ্রাম উৎসন্ন হইয়াছে তাহার ঠিকানা নাই।৪

পর্ত্তুগীজদের অত্যাচারে (১৬৬৫ খ্রীঃ) পূর্ব্ববঙ্গ ও নিম্নবঙ্গ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছিল। ইহাদের সঙ্গে মগেরা আসিয়া লুটপাট করিত, সেই জন্যই নিম্নবঙ্গের বহুস্থান আজও জনশূন্য বলিয়া পরিচিত।৫

অর্থাৎ ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে নিম্নবঙ্গ পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেই ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগ



পরেশনাথের মূর্ত্তি; সঙ্গে ২৩টি তীর্থঙ্কর

থেকে ১৯শ শতাব্দী পর্য্যন্ত, প্রায় বৎসর ধরে সমতটের এই ঐশ্বর্য্যশালী জনপদ জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে এসেছে। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি (১৭৬৫ খ্রীঃ) যখন বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেছিল, ডায়মণ্ড-হারবার তখন জঙ্গল ছিল।৬

(১) Bengal District Gazetteer (2 Pergs.)
(২) History of Indian Shipping, 1
(৩) Ibidem, p. 216.
(৪) বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড পৃ. ৪১।
(৫) ঐ পৃ. ৪৪।
(৬) Calcutta Review, 1889, vol. lxxxix, p. 285.

খেলাঘর

শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শহর নয়। অথচ ক্রোশখানেক পশ্চিমে হাঁটিয়া গেলে ছোট শহরের সামান্য সুবিধা আছে। দিগন্তপ্রসারী অসমতল প্রান্তরের বিস্তীর্ণ নীল রেখা—কোথাও শস্যহীন, আবার কোথাও-বা ছোট ছোট ধানের ক্ষেত, শাল আর মহুয়ার বনের ধারে ছায়া-ঢাকা ছোট-ছোট গ্রাম। পূর্ব্বপুরুষের বহু প্রাচীন আভিজাত্যের শেষ-সাক্ষীর মত জরাজীর্ণ একটি প্রাসাদ কোনোরকমে এখনও টিকিয়া আছে মাত্র। অসংখ্য ফাটলে অশ্বত্থ-চারার অবারিত সমারোহ—নোনা-ধরা দেয়ালে মাকড়সার জাল-রচনার বিরাম নাই, মাঝে-মাঝে দু-একটি টিক্‌টিকির শব্দ ছাড়া সেই ভীষণ নির্জ্জনতার সঙ্গীও আর কেহ ছিল না।

এহেন ভাঙা মন্দিরে দেবতার থাকিবার কথা কবিতায় আছে,—কিন্তু মানুষ যে কেমন করিয়া থাকিতে পারে, তাহাই আশ্চর্য্য। কিন্তু বীরেন আর মাধবী ছিল। বীরেন ছাড়া ঐ বংশের আর কেহ অবশিষ্ট নাই এবং তাহারও থাকিবার বোধ করি অন্য কোনো জায়গা ছিল না। দুই বেলা চারক্রোশ হাঁটিয়া বীরেন টিউশানি করে; মাসে মাসে সম্পত্তির সামান্যতম কিছু প্রাপ্তিও আছে। কাজেই এমন-কিছু অভাব নাই যে, অভিযোগ থাকিবে। মাধবী কাছে থাকিলে সমস্ত ভয়াবহ কুশ্রীতা অপরূপ সৌন্দর্য্যে রূপান্তরিত হইয়া উঠিবে, ভীষণ নিঃসঙ্গ নির্জ্জনতাও রমণীয় হইয়া উঠিবে, জুঁইফুলের মত শাদা জ্যোৎস্নায় তামসী-রাত্রির ঘন অন্ধকার অকস্মাৎ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে! অন্ততঃ বীরেন তাহাই ভাবিয়াছিল। বিবাহের পর মাস-ছয়েক ধরিয়া সে কবিতা লিখিবারও কসরৎ করিতেছিল।

এখন সে একটা ইস্কুল-মাষ্টারি খুঁজিতেছে।

নিরাভরণ যে-ঘরখানির মধ্যে আমাদের গল্পের যবনিকা সেখানকার বাতাসকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে গতরাত্রে মাধবী একটি মৃতকন্যা প্রসব করিয়া নিজের মৃত্যুকে শিয়রের কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে। জ্ঞান যখন হইয়াছে, নিতান্ত কোমল ভীরু ঐ ছোট দেহটি তাহার নিদারুণ পিপাসায় থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছে, শরাহত পাখীর মত সর্ব্বাঙ্গে তাহার অপরিসীম যন্ত্রণা—স্বজনবান্ধবহীন বীরেন আর বেশীক্ষণ সেদিকে চাহিয়া থাকিতে পারে নাই। অবশেষে পাশের বাড়ির পিসিমা যখন জোর করিয়া তাহাকে ডাক্তার ডাকিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন, তখন তাড়াতাড়ি সে জামাটা উল্টা করিয়া গায়ে দিয়াই পথে নামিয়া পড়িল।

বহু পথ ঘুরিয়া ডাক্তার-বাড়ি পৌছিয়া, ডাক্তারকে কি যে সে বলিয়াছে, তাহা নিজেই জানে না। ডাক্তার-বাবুও তাহার মুখ-চোখের চেহারা দেখিয়া আর কোনো প্রশ্ন করেন নাই।

ডাক্তারকে নীচে অপেক্ষা করিবার ইঙ্গিত করিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া বীরেন ঘরে প্রবেশ করিল। পিসিমা চোখ ফিরাইয়া উদ্‌গত অশ্রু গোপন করিবার চেষ্টা করিলেন, বীরেন মাধবীর শয্যাপ্রান্তে একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িল। দেখিল মূর্ত্তিমতী সেই শেফালি-শুভ্রতার পাণ্ডুর দুটি কপোল বহিয়া বিগলিত অশ্রুর ধারা তখনও শুকাইয়া যায় নাই—অসহায় দুটি চোখের পাতায় জমাট অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। বীরেন ট্রাঙ্ক হইতে সশব্দে দুটি টাকা পকেটে ফেলিয়া নীচে নামিয়া আসিল। ডাক্তার-বাবুর-উৎসুক উদ্বিগ্ন চোখের উপরে কঠোরভাবে চাহিয়া নির্লজ্জকণ্ঠে কহিল, Finished.

তারপর পকেটে হাত দিতেই ডাক্তারবাবু বলিলেন,—



বীরেনের চোখে সমস্ত পৃথিবী তখন বরফের মত হিম হইয়া গিয়াছে।

মাধবীর আলুলায়িত কেশদাম রাত্রির নিবিড় অন্ধকারকে লজ্জা দিতেছে! কপালে আর সীমন্তে এয়োস্ত্রী বধূরা দীর্ঘ করিয়া সিন্দুর লেপিয়া দিয়াছে। কাঁদিবার কেহ নাই। শুভ্র সুকোমল দুটি পায়ে অলক্তকরাগ বেশ চওড়া করিয়া টানিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিবাহ-রাত্রির সেই লাল শাড়ীখানি বীরেন বাহির করিয়া দিল। দুই বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। মাধবী আবার সেই বিবাহের বধূবেশ পরিয়াছে।......

শবযাত্রীদের নির্ব্বিকার উচ্চ কোলাহল, বহুদূরে ট্রেনের হুস্‌হুস্ শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে—বীরেন মূঢ় বহিঃপ্রকৃতির নিষ্করুণ নির্লজ্জতার মধ্যে আচ্ছন্নের মত শ্মশানের দিকে চলিতেছে।

রামাই বীরেনের পাশে দাঁড়াইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, 'পয়সা-টয়সা কিছু আছে নাকি হে ট্যাকে—গণ্ডা-দুই বা'র করো না বাবাজি, সারারাতের রসদ্ কিছু জোগাড় ক'রে রাখি!—আহা-হা, কি সব্বনাশটাই না হয়ে গেল, দশখানা গাঁয়ের মধ্যে অমন লক্ষী-প্রিতিমের মতন বউ আর কারু নেই। আর গেল গেল, ভগমানের হাত, এক দিন যেতে ত হবে সকলকেই, তাও শুঁড়োটুকুনও যদি থাকত ত হ্যাঁ একটা স্মিতি চিহ্ন বলা যেত। বরাৎ।'

বীরেন একটা সিকি বাহির করিয়া দিয়া ধরা-গলায় কহিল, 'তুমি একবার ওদিকটায় দেখ রামাই-দা, কি কি সব নিয়ম-কম্ম আছে '

সিকিটা যত্নে ট্যাকে গুঁজিয়া রামাই বলিল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, সব ঠিক করে নিচ্ছি বাবাজি, তুমি মন খারাপ করো না...সতীলক্ষীর কাজ নিয়মকম্ম কি কিছু বাদ পড়বার জো আছে? মহাপুণ্যবতী ছিলেন তিনি...মা সতীরাণী!

গদগদকণ্ঠে রামাই বোধ করি আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া যুক্তকরে সতীরাণীকে বার-বার তাহার প্রণাম জানাইল।—এয়ো-স্ত্রী মরা কি কম ভাগ্যির কথা বাবাজি···

—আমি ঐ বিলটার ধারে রাইলাম রমাই-দা, দরকার হ'লে ডেকো।

বীরেন সকলের অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে বিলের ধারে গিয়া বসিল।

শুক্লাচতুর্দ্দশীর চাঁদ তখন অজস্র কিরণধারায় সমস্ত প্রান্তর প্লাবিত করিতেছে। ঝির্-ঝির্ করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল। নক্ষত্রখচিত নীলাকাশের দিকে বীরেন একদৃষ্টে বহুক্ষণ তাকাইয়া রহিল। শাল-মহুয়ার বনের ফাঁকে জ্যোৎস্নার তরল রূপালি আলো চঞ্চল হরিণ-শিশুর মত কাঁপিতেছে! গাছের পাতায় একটা অতি মৃদু মর্ম্মর ধ্বনি উঠিতেছে। মেঠোফুলের একটি করুণ গন্ধ...

আকাশের অগণিত নক্ষত্রমালার চোখে বীরেন একটি অন্তহীন জিজ্ঞাসার অপরিসীম ক্লান্তি লক্ষ্য করিল। দূরে হঠাৎ কোথায় একটা পেচকের চীৎকার, আর শৃগালের কর্কশ শব্দ শোনা গেল।

বীরেন একবার চমকিয়া উঠিয়া পকেট হইতে একটা পোড়া চুরুট বাহির করিয়া ধরাইল।

—এই যে বাবাজি তুমি এখানে? ওঠো, ওঠো, সব তৈরি। দেখবে এস একবার কেমন মানিয়েছে!

আরও কি যেন বলিতে যাইতেছিল, বীরেন কহিল, 'ভাগবতরত্ন এসেছেন?'

রামাই তামাটে মুখখানাকে যথাসাধ্য করুণ করিয়া কহিল, 'হ্যাঁ বাবাজি, বলি অত বড় বংশের বৌ, দুটি আমরা কিছুই রাখতে দেব না—বেঁচে থাকলে তুমি অমন কত টাকা রোজগার করবে বাবাজি, কিন্তু যে গেল তার এই খতম। 'চন্নকাঠ' দিয়ে এমন সাজিয়ে দিলাম বাবাজি, যেন বৌমা আমার হাসচেন!'

বীরেনের মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া গেল,—টাকা, টাকা কোথায় পেলে রামাই-দা, আমার কাছে ত—

ততক্ষণে তাহারা সুসজ্জিত চিতার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। রামাই শুধু কহিল, 'ওসব হয়ে যায় বাবাজি, তুমি কিচ্ছু ভেবো না—আমরা ত আছি! সতীলক্ষীর এই শেষ কাজ...'

বীরেন দেখিল, চন্দন-কাঠের বিস্তীর্ণ শয্যায় মাধবীর সেই অনিন্দ্যসুন্দর দেহলতা আপাদ-মস্তক ফুলে ফুলে

ঢাকা। মৃত্যু-দেবতার পরুষ-কঠিন করাঘাত তাহাকে বিবর্ণ পাণ্ডুর করিতে পারে নাই। শুধু আরক্ত কপোলে একটি বেদনার মলিন ছায়া! সেই স্ফুটকমলের মত রক্তিম ওষ্ঠাধর আলুলায়িত নিবিড়কৃষ্ণ কেশদাম! আকর্ণবিস্তৃত সেই গভীর কালো চোখের পলকে যেন ঘুম এখনও লাগিয়া আছে। আব্‌ছায়া-জ্যোৎস্নার আলোকে বিবাহ-রাত্রির সেই প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার মতই রক্তবর্ণ শাড়ীটি সর্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

মাধবীর একখানি হাত একটু দূরে অলসভাবে পড়িয়া আছে। ভাগবতরত্ন হঠাৎ একবার সেদিকে তাকাইতেই তাঁহার চোখ যেন হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলিয়া উঠিল। চাঁপার কলির মত একটি আঙুলে হীরা-বসানো চমৎকার একটি আংটি।

ভাগবতরত্ন তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া চারিদিকে একবার ভয়ে ভয়ে তাকাইলেন। শবযাত্রীরা দূরে বসিয়া রাত্রির আকাশকে ধূমাচ্ছন্ন করিতেছে আর মেঠোসুরে দেহতত্ত্বের গান ধরিয়াছে। বীরেন মাথা গুঁজিয়া এককোণে বসিয়াছিল। ভাগবতরত্ন সজোরে আংটিটি তাড়াতাড়ি খুলিবার চেষ্টা করিলেন।

কাঠের একটা শব্দ হইতেই বীরেন একবার চোখ তুলিয়া চাহিল।

ভাগবতরত্ন ততক্ষণে অর্দ্ধেকটা খুলিয়াছেন। একটু অপ্রস্তত হইয়াই হাসিয়া উঠিলেন।—'তুমি বড় ছেলে-মানুষ ভায়া, সখ ক'রে একখানা কাপড় পরালে তাই বেশ, এর কি আর চেতনা আছে, এই শরীরটা ত আর এখন এর নয়, একটা ইটকাঠের সামিল, মিছিমিছি দামী সোনা-দানা আর পুড়িয়ে ছাই ক'রে লাভ কি বল? আত্মা, ও এখন বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ো হয়ে জল জল ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে!—হ্যাঁ, জল-টল ঠিক ক'রে নিয়েছ ত?'

ভাগবতরত্ন সযত্নে আংটি পৈতায় বাঁধিয়া নির্ব্বিকার কণ্ঠে মন্ত্রপাঠ করাইতে সুরু করিলেন।

বীরেন নিশ্চল নিস্পন্দভাবে শব্দানুকরণ করিয়া গেল।

দুপুরবেলা বীরেন একাকী ঘরে বসিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়াছিল। পুরাতন কত স্মৃতি বার-বার তাহার চোখের সুমুখে জ্বলিয়া উঠিতেছে। মনে হয় রান্নাঘরের দরজায় গিয়া দাঁড়াইলে এখনই শুনিতে পাইবে মাধবীর রক্তিম নিটোল হাতে চুড়িগুলি ঝিনঝিন করিয়া বাজিতেছে। কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীর মুখে ক্লান্তির একটি বর্ণনাতীত সুকুমার সৌন্দর্য্য! জুতার শব্দ পাইয়া গ্রীবাটি ঈষৎ হেলাইয়া মৃদু হাসিয়া হয়ত জিজ্ঞাসা করিবে, 'চান কি হয়ে গেল নাকি এরই মধ্যে?'

বীরেন হয়ত বলিবে, 'না, এমনি এলাম, কেমন রান্না করছ তাই—'

সকৌতুকে দুষ্টামির হাসি হাসিয়া মাধবী বলিবে।—'না বাপু, এখন যাও, পেছনে কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে রান্না আমার হবে না।'

—কেন, হরিদাসী কাছে থাকলে ত রান্নার বিশেষ কিছু অসুবিধে দেখি নে—

মাধুরী হয়ত বীরেনকে এবার একেবারে চুপ করাইয়া দিবে।—'তুমি কি হরিদাসী নাকি?'

বীরেন বলিবে, 'তবে?'

মাধবী অবিন্যস্ত কেশপাশ সংযত করিয়া তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া বলিবে,—'নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না দেখছি!'

কল্পনা যেন শরীরী হইয়া বীরেনের চোখে একটি রমণীয় মোহাবেশ রচনা করিয়া চলিয়াছে। হঠাৎ বীরেন বালিশটি টানিয়া সোজা হইয়া বসিতেই দেখিল, কপালের ছোট একটি টিপ সেখানে লাগিয়া আছে! তাহার মনে পড়িল, কয়েক দিন ধরিয়া নাছোড়-বান্দা বীরেনের জ্বালায় অস্থির হইয়া কাচপোকার টিপ সে পরিতে সুরু করিয়াছিল।

প্রথম যেদিন সে টিপ পরিয়া সলজ্জভাবে যেন লুকাইয়াই বীরেনের সামনে সেই ম্লানালোক ঘরখানির মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বীরেন ভাবিয়াছিল, রাম-ধনু-রঙা-আকাশে পেঁজাতুলোর মত,—অপার সমুদ্রের ঢেউয়ের ফেনার মত শাদা মেঘে যেন ছোট একটি কালো স্থির বিদ্যুৎ জ্বলিয়া উঠিয়াছে! জোর করিয়া মাধবীকে আরসির কাছে লইয়া গিয়া বীরেন কানে-কানে কহিয়াছে,—'দেখছ কেমন দেখাচ্ছে!'

সম্রাজ্ঞীর মত একটি চমৎকার ভঙ্গীতে গ্রীবাটি সরাইয়া মধুর হাসিতে চোখ দুটি উজ্জ্বল করিয়া মাধবী বলিয়াছে, 'ছাই দেখাচ্ছে। এ আমি এক্ষুনি তুলে ফেলব।'

কিন্তু তুলিয়া সে ফেলে নাই। নিরালোক নিস্তব্ধ সেই জীর্ণ বাড়িখানির একটি নিতান্ত ছোট গৃহস্থালীর মধ্যে একটি নিরাভরণ ঘরে যেন দূরাগত অশ্বখুরধ্বনিকে মাধবী বন্দী করিয়াছে। রাজকন্যার আয়ত গভীর দুটি কালো চোখে সেই অপার বারিধির অতলস্পর্শী নীলিমা, উন্নতদীর্ঘ নাসিকায় চন্দন-দ্বীপের উন্মদ গন্ধ!

শ্রাবণ-রাত্রির ছায়ান্ধকারে চিরন্তন বর্ষণধারা যখন ঝমঝম করিয়া ছাদের উপরে বাজিতে থাকিত, বাহিরের ছোট বাগান হইতে রজনীগন্ধা আর হেনার গন্ধ সমস্ত ঘরে মৃগনাভির মত অবিশ্রাম ঘুরিয়া বেড়াইত, বীরেন তখন নিষ্পলক চোখে সেই রূপকন্যার মুখের দিকে মুগ্ধভাবে চাহিয়া থাকিত; মাধবী অত্যন্ত মৃদু মধুর কণ্ঠে আবদারের ভঙ্গীতে বলিত, 'একটা গল্প বলবে আজ!'

বীরেন বলিত, 'আগে যদি আস্তে আস্তে একটা গান গাও!'

রাগ করিয়া মাধবী সরিয়া গিয়া বলিত, 'তবে যাও, তোমার যত বাজে কথা,—'

তারপর অনেকক্ষণ ধরিয়া মান-অভিমানের পালা চলিতে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত গান মাধবীকে গাহিতেই হয়।

তারপর এক অপূর্ব্ব মধুর সম্ভাবনায় মাধবীর দেহে একদিন আসন্ন জননীর আনন্দ-বেদনা মেদুর হইয়া উঠিয়াছে। বাহিরে সেই অজস্র মাধবীলতার রক্তিম সমারোহ, রাত্রির নিষ্পন্দ নিঃশ্বাস, আর এইখানেই অপরিমেয় কণ্টক-রোমাঞ্চে মাধবীর সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিত!

বীরেন একবার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—'কি নাম রাখবে?'

তাড়াতাড়ি ডান হাতের তর্জ্জনী দিয়া বীরেনের মুখ চাপিয়া ধরিয়া সে বলিয়াছিল,—চুপ! এখন নয়।

দুপুর গড়াইয়া কখন বিকালের কোমল ছায়া নামিয়া আসিয়াছে, বীরেনের মোটেই খেয়াল নাই। পড়ন্ত রৌদ্রের একটি নিস্তেজ মুমূর্ষু আলো বীরেনের বইগুলির উপর আসিয়া পড়িয়াছে। বাহিরে অবিশ্রান্তভাবে একটানা ঘুঘুর ডাক বহুক্ষণ ধরিয়া সমানে চলিয়াছে।

অন্যমনস্কভাবে বীরেন সামনের টেবিল হইতে একখানা বই টানিয়া লইল। পাতা উল্টাইতেই একখানি অসমাপ্ত চিঠি তাহার চোখে পড়িল। মাধবী তাহার বিশেষ বন্ধু রেবাকে লিখিয়াছে:—

ভাই রেবা,

কলেজের ছুটি ত তোদের এসে পড়লো। কতদিন ধরে আসবো আসবো বলছিস, একবার ত কই এলি না? এখানে সমবয়সী কেউ নেই ভাই—ঐটুকুই যা কষ্ট। একেবারে ভুলে গেলি নাকি? উনি ত প্রায়ই ঠাট্টা করেন, বলেন বন্ধুর খবর কি, হিংসে হবে বলেই আসেন না বোধ করি। আর না হয় ত নানা ব্যাপারে ব্যস্ত আছেন। আর পারা গেল না ভাই! অস্থির করে মারে। তুই এসে একবার খুব ক'রে শুনিয়ে দিয়ে যেতেও পারিস ত? তোর ত সে-সম্বন্ধে বেশ সুনাম আছে?

এই পর্য্যন্তই লেখা হইয়াছে। তারিখ দেখিল, পাঁচ দিন আগের। বন্ধুকে সে পাঁচ দিন আগেও—এই অসমাপ্ত চিঠিখানি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে। তাহার হাতে যে এ-চিঠি আর কোনদিনই শেষ হইবে না সেও বোধ করি তাহা ভাবিতে পারে নাই। ছুটিতে রেবা আসিলে তাহার সন্তানকে দেখিতে পাইবে, সেই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটুকুও অভাগিনীর হাতে নিত্যকালের জন্যই অলিখিত রহিয়া গেল।

বীরেন আর ভাবিতে পারে না। অসহ্য যন্ত্রণায় কপালের শিরাগুলি তাহার টন্‌টন্ করিতেছে। আসন্ন সন্ধ্যার এই ভয়াবহ অন্ধকারে সে আপনার নিদারুণ একাকীত্ব কল্পনা করিয়া শিহরিয়া উঠিল। ভাঙা দেয়ালের ফাটলে অশ্বত্থের ছোট চারাগুলি ঝিব্‌-ঝিব্ করিয়া কাঁপিতেছে। হেমন্ত কালের ঠাণ্ডা বাতাস হু-হু করিয়া ভাসিয়া আসিতেছে। সিঁড়ির উপরে মাকড়সার জালের কাছে কালো-কালো বাদুড়ের ডানা অস্পষ্ট অন্ধকারে দুলিতেছে, মাঝে মাঝে টিক্‌টিকির শব্দও শোনা যায়।

বীরেনের মনে হইল, নির্জ্জন নিস্তব্ধ সেই বহুকালের প্রাচীন বাড়িটি যেন কুৎসিত একটা ভীষণাকার দৈত্যের মত তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিষ্ঠুরভাবে হাসিতেছে। দৈত্যের পায়ের তলায় পড়িয়া যেন সেই অপরূপ রূপকন্যা অসহায়ভাবে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছে। বীরেনের কল্পনা-প্রবণ বিকৃত পীড়িত মস্তিষ্কে যেন সহস্র বৃশ্চিকের দংশন সুরু হইয়াছে। কপাল ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে, পরিক্লান্ত পা-দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। হঠাৎ সিঁড়িতে পদশব্দ শুনিতেই সে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া চোখ মেলিয়া অস্পষ্টকণ্ঠে কহিল,—কে ?

—আমি, বীরু। এখনও আলো জ্বালো নি ? বাড়িতে রান্না-বান্না সেরেই একেবারে এলাম !

বীরেন সহজকণ্ঠে বলিল, তুমি এসেছ, একটু ঘুরে আসি পিসিমা। পিসিমা সস্নেহ ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন, —বেশী রাত করো না যেন।

অন্যমনস্কের মত বীরেন ষ্টেশনের দিকে চলিতেছিল। নিঃসহায় একাকী আর ভাল লাগে না—স্মৃতির দুয়ারে সতর্ক মন তাহার কেবলি পাহারা বসাইয়া রাখিতে চায়। আশেপাশের সব মানুষকেই সে জানে, তবু আজ তাহারাও মনের সুমুখে ভিড় করিয়া আসিয়া দাঁড়ায়। নিদারুণ নিঃসঙ্গতার মধ্যে একটি নিষ্ঠুরতম বিস্মৃতির স্বাদ পাইবার জন্য তাহার দেহ-মন উন্মুখ হইয়া উঠে।

—ওই যে আমাদের বীরু বাবাজি যায় না,—ওহে ও বাবাজি, শোনো, শোনো, এই তোমারই কাছে যাব মনে করছিলাম আমরা।

সরকারী কালী-ঘরের সুমুখে একটি দাওয়ায় প্রতিদিন কয়েকজন লোক বসিয়া বসিয়া তামাক টানে আর রাজনৈতিক হইতে সুরু করিয়া গ্রামনৈতিক নানা রকমের গল্প করে। বীরু কোনোদিন এখানে আসিয়া বসে না, কারণ এ-সময়টা সে টিউশানি করে। ধীরে ধীরে আসিয়া সে একপাশে অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে বসিয়া পড়িল।

—তা বাপু, বীরুর আমাদের 'স্তিরি-ভাগ্যি' ছিল —আমাদের এই পঞ্চগ্রামী দশগ্রামীর মধ্যে ওই বৌটিই ছিল ফাষ্টো। না, কি বল দাদা ?

—তা আর বলতে !

বীরেনের সমস্ত শরীরে যেন আর চেতনা নাই। মুহ্যমানের মত সে মুখ গুঁজিয়া বসিয়াই রহিল। সেখানে এমন দু-চারজন শ্রদ্ধেয় লোক ছিলেন, যাঁহাদের বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি গিয়া ঠেকিয়াছে।

শম্ভু কহিল,—আগে আমি কখন দেখি নি, বুঝলে রামাই, তবে এই সেদিন দেখলাম—বিষ্টুচরণের বাড়ি ভোজ খেতে যাচ্ছিল। হঠাৎ চোখ পড়তেই আমি ত একেবারে অবাক ! বলি, হাঁ বাপু, মেয়ে বটে ! তা গেল গেল আমাদের বীরু বাবাজিরই গেল। মরেও গেল আবার মেরেও গেল। নাই নাই করেও এই মাগ্‌গী-গণ্ডার বাজারে 'ছাদ্দ'র দিন গাঁয়ের বামুন-কটিকে ত ভাল ক'রে খাওয়াতে হবে, না, কি বল রামাই ?

রামাইয়ের তামাকটানা বন্ধ হইল। বলিল, তা ত বটেই ভাই। ছেলেপুলে এক-আধটা থাকলেও-বা বছরে বছরে একটু জল দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, তা ওর হ'ল কি এই শেষ। এই পিণ্ডি জনম শোধ। বামুন-খাওয়ানো বলো আর যা বলো, হবার যা এই দশ দিনেই হয়ে যাবে।

ভুবন ততক্ষণে রামাইয়ের হাত হইতে হুঁকাটি টানিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছে। একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া হুঁকাটি প্রসন্নমনে রামাইয়ের দিকে আগাইয়া দিয়া কহিল,—তাহলে বরাদ্দটা কিরকম হ'ল ? গাঁয়ের বামুন, মেয়ে-ছেলে কটি ক'রে দাওগে। না, কি বলো শম্ভু ? তোমাদের বাড়ির কাজে এককালে ঐ সামনের বারোয়ারীতলাটা ক্যাঙালীতে ভরে যেত, না, হরি-জ্যাঠা ? —বলিয়া ভুবন জবাবের প্রত্যাশায় বৃদ্ধ হরি-জ্যাঠার দিকেই বোধ করি তাহার ট্যারা চোখের দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিল।

মনে হইল হরি-জ্যাঠার বেশ কিছু বলিবার ছিল। কিন্তু একটি প্রবল কাশির বেগ আসিতেই তাঁহার মনের সাধ মনেই রহিয়া গেল। অগত্যা শুধু প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়াই তিনি ভুবনের কথার সমর্থন করিলেন।

পকেট হইতে একটি আধ-পোড়া বিড়ি বাহির করিয়া ভুবন জনতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—দাও দিয়াশলাইটা! তাই আমরা বলাবলি কচ্ছিলাম, বলি, না বাপু, এ ত আর সুখের মরা নয়, ওর যা-খুশী তাই করুক। সাধারণ যা না কল্লে নয় তা কত্তে হবে বই কি? তারপর মাছটা একটু বেশী ক'রে কোরো। সধবার মৃত্যু কি-না। বাস্, তা হলেই হবে। দক্ষিণে-টক্ষিণে দিয়ে আর কাজ নেই, বুড়োবুড়ী মরে ত বলি—হ্যাঁ, দক্ষিণে দাও।

বলিয়াই সে চোঁ-চোঁ করিয়া সশব্দে বিড়িটা বারকতক টানিয়াই সেটা শম্ভুর হাতের দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল,—খাও। মাছ আজকাল পাঁচ আনা ছ-আনা সের। মণ দুই হলেই ভেসে যাবে। আর হ্যাঁ, ভালকথা মনে পড়েছে, ইষ্টিশনের পাশের ওই ব্যাটা বজরং মাড়োয়ারীর দোকানে জিনিষপত্র যেন কিনো না—ব্যাটা ডাহা চোর।

রামাই এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, এবার কহিল, 'না না, না না, তোমার কম্ম নয়, তুমি ছেলেমানুষ, জিনিসপত্তর ভাল দেখে-শুনে তুমি কিনতে পারবে না। তোমার বিষ্টু-কাকাকে পাঠিও, আর না হয়ত, বলো আমিও সঙ্গে যাব। ঘি-টা আজকাল দেখে-শুনে কেনা উচিত।

তারকব্রহ্ম ভাগবতরত্ন পাশের রাস্তা দিয়া পার হইতেছিলেন, তাঁহার এক হাতে লণ্ঠন ও অন্যহাতে একটি বাটি। বোধ করি দোকানে কি যেন কিনিতে যাইতে-ছিলেন, মজলিসের একপাশে বীরেনকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া দাঁড়াইলেন।—'নারায়ণ! নারায়ণ! ভায়া বড় মুষড়ে পড়েছ মনে হচ্ছে? আহা-হা তা ত হবারই কথা। কতই-বা আর বয়েস তোমার? কি আর করবে বলো, সবই সেই নারায়ণের ইচ্ছা।'

এই বলিয়া তিনি তাঁহার হাতের লণ্ঠনটি নামাইয়া বীরেনের কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িলেন। বাটিটি তাঁহার গম্বুজাকৃতি পেট ও পায়ের মাঝখানে চাপিয়া রাখিয়া লণ্ঠনের পলিতাটি ঈষৎ খাটো করিয়া দিয়া বলিলেন,—'ওর জন্যে দুঃখুটুঃখু ক'রে লাভ নেই ভায়া, ভাল জিনিষ আমাদের টেঁকে না। তোমার নিজের জীবনটা যাতে থাকে তা'র ব্যবস্থা কর। অনেক সাধ-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ওরা যায়। কবচ-টবচ ধারণ ক'রে ভাল ক'রে শুদ্ধ হয়ে, দেখে-শুনে একটা—,বয়সটা আর কিই-বা তোমার, এ বয়সে অনেকে—'

বীরেনের অলক্ষ্যে রামাই ক্রমাগত ভাগবতরত্নকে চোখ টিপিতে লাগিল। ভাগবতরত্ন অগত্যা কবচের কথাতেই ফিরিয়া গেলেন।—কবচ-টবচ ধারণ করেছ নাকি?

বীরেন ঘাড় নাড়িয়া কহিল, 'না।'

—অন্যায় করেছ, মহা অন্যায় করেছ। আজকালকার ছেলে কি-না, বিশ্বাস করো না; না? কিন্তু তুমি ত শিক্ষিত, ভায়া, বিশ্বাস ত তোমার করা উচিত।

বীরেন ভাল-মন্দ কিছুই বলিল না।

ভাগবতরত্ন বলিতে লাগিলেন, 'আমার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু যখন হ'ল তখন আমিও ভেবেছিলাম, স্ত্রী ত! এতদিন ধ'রে যার সঙ্গে ঘর করলাম সে আর আমার কি অনিষ্ট করবে? কিন্তু তা কি আর বলবার জো আছে? মরবার দিন-পনেরো পরেই হবে, গেলাম এক জায়গায় ভাগবত পাঠ করতে। তিন দিন পরে ফিরে আসছি। বৈকালে যে-ট্রেনটা আজকাল আসচে, ওই ট্রেনটাই আসতো তখন ঠিক 'মুখ-আঁধারি'র সময়। ইষ্টিশানে নামলাম। অন্ধকার রাত। হাতে লণ্ঠন নেই। একা। সঙ্গে কিছু জিনিষপত্তর আছে। ভাবলাম, কি আর হবে, চলে যাই। ভাবতে ভাবতে এগোতে লাগলাম। কখনও আপন মনেই গান ধরি, কখনও-বা কিছু ভাবি,—এমনি ক'রে ভাবতে ভাবতে ত পথ চলেছি। তারপর ওই যে ঐ হরিশপুরের কাছে, মাঠের মাঝখানে বেঁটে একটা পলাশের গাছ আছে, ওইখানে আসতেই মনে হ'ল যেন পলাশ গাছটার তলায় শাদা ধবধবে কাপড় প'রে একটি নারীমূর্ত্তি দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কে? কে গো তুমি? কোনো সাড়াশব্দ পেলাম না, পলাশ গাছটার পাতাগুলো শুধু মড় মড় ক'রে নড়ে উঠলো। বাস্। সেই নারীমূর্ত্তিটিকেও আর দেখতে পেলাম না। গা'টা চম্ করে উঠলো। সেদিক পানে আর ফিরে না তাকিয়ে 'নারায়ণ নারায়ণ' বলতে বলতে চলে এলাম। কিন্তু এমনি মজা, মনে হ'ল কে যেন আমার পিছু পিছু আসচে, পষ্ট পায়ের শব্দ! পেছন ফিরে তাকাতেও পারি না, অথচ এগোতে গেলেও পা-দুটো যেন জড়িয়ে আসে।

সমস্ত গা'টা তখন কাঁটা দিয়ে উঠেছে। একবার মনে হ'ল ছুটি। আবার মনে হ'ল,—না, ছোটা উচিত হবে না। খুব সাহসে ভর ক'রে চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে, রাধা ?' রাধা আমার স্ত্রীর নাম। হঠাৎ মনে হ'ল আমার ঘাড়ের ওপর কার যেন নিঃশ্বাসের বাতাস লাগছে। কিন্তু দু-হাতে দুটো পুঁটুলি, একবার যে হাত বুলিয়ে দেখব, তারও উপায় নেই। 'রাম' 'রাম' বলতে বলতে কেমন ক'রে যে সারা পথটা চলে এলাম, বুঝতেই পারি নি। গাঁয়ে ঢুকতেই বটগাছটার একটা ডাল যেন মড়-মড় করে উঠলো। সে শব্দটার কথা ভাবলে এখনও হৃৎকম্প হয়। তারপর ঘরে এসে যখন ঢুকলাম, বুকের ভেতরটা তখনও আমার ঢিপ-ঢিপ করছে। এক-গা ঘেমে নেয়ে উঠেছি। মাকে বললাম, 'দাও এক গ্লাস জল দাও, আগে খাই। জল খেয়ে ঠাণ্ডা হ'লাম। কিন্তু তার পরদিন থেকে সন্ধ্যে হ'লেই গা ছমছম করতে থাকে। দিবারাত্র মনে হয় কে যেন আমার পিছু পিছু আসছে। তখন নিজেই এক কবচ তৈরি করলাম। সমস্ত দিন ভাগবত পাঠ ক'রে পুরশ্চরণসিদ্ধ সেই কবচটি হাতে ধারণ করতেই ভয় ভাবনা আমার গেল। বুঝলে ? তুমিও তাই করো ভায়া, একটি কবচ ধারণ করো। মানুষ মলেও তার প্রেতাত্মা যাবে কোথায় ? সে অমনি পিছু পিছু ঘুরে বেড়ায়, সুযোগ পেলেই অনিষ্ট করতে ছাড়ে না। বলিয়া তিনি চুপ করিলেন।

ভুবন কহিল,—ঠিক বলেছ খুড়ো, আমরাও তাই বলব বলব ভাবছিলাম। বলিয়া সেও একটা গল্প ফাঁদিবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু সেটা ফাঁসিয়া গেল।

শম্ভু তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, 'তবে শোনো। আমার একেবারে প্রত্যক্ষ জানা কথা। খালিশপুরের সেই যে আমার শালার ছেলেটি আসে মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি—সেই তারই ব্যাপার। ছোকরাটি কলিয়ারীতে চাকরি করতো। বাড়িতে ছিল শুধু বিধবা মা আর তার বৌ। প্রতি শনিবার দিন যেমন বাড়ি আসে, তেমনিই এসেছে। অমাবস্যের রাত। গাঁয়ের লোক সবাই সন্ধ্যে থেকেই ঘরে ঘরে দোর বন্ধ ক'রে শুয়েছে। দিনকাল খারাপ। ছেলেটি বাড়ি গিয়ে ডাকলে, মা! বৌ একটি কেরোসিনের বাতি হাতে ক'রে এসে বললে—'গাঁয়ে বড় কলেরা হচ্চে, এ সময় না এলেই পারতে! ছেলেটি বললে, কই তা ত কিছু জানি না। তোমরা সব বেশ সাবধানে আছ ত ? এমন সময় মা এসে বললেন, 'তা বেশ করেছিস এসেছিস, চল, ওকে চারটি রান্না ক'রে দিই গে, ও খেয়ে নিক। ব'লে শাশুড়ী বৌ দু-জনেই রান্নাঘরে গিয়ে রান্না ক'রে ওকে খেতে ডাকলে। ছেলেটি খেতে বসে বললে, লেবু আছে মা ঘরে ? উঠোনে একটা লেবুর গাছে তখন বিস্তর কাগজি-লেবু ধরেছে। মা বললে,—দাও ত মা, গাছ থেকে একটা লেবু পেড়ে এনে, বঁটি দিয়ে কেটে। বৌ কাছেই বসেছিল। মুখে কিছু না ব'লে বৌ সেখানে যেতেই উঠোনের দিকে হাত বাড়ালে। গাছটা ছিল অনেক দূরে, কিন্তু অবাক কাণ্ড! বউয়ের হাত দেখতে দেখতে ভীষণ লম্বা হয়ে গেল। বউ সেই হাত দিয়ে একটা লেবু পট্‌ করে না ছিঁড়ে আবার সেই আগেকার মত ছোট ছোট হাত দিয়ে বঁটি দিয়ে সেটাকে কাটতে বসলো। ছোকরাটি তখন ভয়ে কাঠ। হঠাৎ কিছু না বলেই সে ছুটতে ছুটতে পাড়ায় এক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে হাঁপাতে লাগলো।

—কিরে হাঁপাচ্চিস যে ? এই এলি বুঝি ? সব শুনেছিস! ছেলেটি হাঁপাতে হাঁপাতে শুধু বললে 'কি ?' বন্ধু বললে, 'কাল সন্ধ্যের সময় তোর মা গেল কলেরায়, ঘণ্টা-দুই বাদে তোর বউ।'

গল্প শেষ করিয়া শম্ভু একবার সকলের দিকে চাহিল। ভাগবতরত্নের লণ্ঠনের সেই মৃদু আলোকে দেখা গেল সকলেরই মুখ আতঙ্কে শাদা! বাহিরে বিস্তীর্ণ অন্ধকার।

বীরেন এইবার ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া চাহিল। কহিল, : রাত অনেক হ'ল রামাই-দা, এইবার আমি উঠি।

রামাই তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল।—'হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো বাবাজি, তোমাকে পৌঁছেই দিই। অন্ধকার রাস্তা। আর তা ছাড়া এখন ত তোমার—'

সকলেই জোট পাকাইয়া ভাগবতরত্নের সঙ্গী হইল। রাত একটু বেশীই হইয়াছে। এতটা রাত্রি হইবে এবং এই ধরণের গল্পই চলিবে তাহা অবশ্য কেহই আশা

করিতে পারে নাই, নহিলে বোধ করি সকলেই একটি করিয়া লণ্ঠন সঙ্গে করিয়া আনিত।

পথে নামিয়া রামাই ফিস-ফিস করিয়া কহিল, 'বুড়োর কথাগুলি কি বিশ্বেস করলে না কি বাবাজি,—সব তাহা মিথ্যে কথা! ওই মাদুলি বেচেই খায় কি না—আর ওই ওর ভাইঝিটার কথাও বলতে যাচ্ছিল বাবাজি, আমি থামিয়ে দিলাম। বলি, দশটা দিনও পেরুতে দে, নইলে যে তোকেও এসে ধরবে রে বুড়ো।

রামাইয়ের অসংলগ্ন কথায় বীরেন এই দুঃসহ দুঃখের মধ্যেও কেমন অজ্ঞাতসারে হাসিয়া ফেলিল। কহিল, 'কিন্তু তুমি...যেন বেশ বিশ্বেস করেছ ব'লে মনে হচ্ছে।'

রামাই কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কথাটাকে চাপা দিবার জন্য বলিয়া উঠিল, 'তা নয়, তা নয়, বাবাজি, তুমিও আমাকে তাই মনে করো নাকি?'

—তোমার বাড়ি এসে পড়লো রামাই-দা, তুমি যাও। কাল সকালে পার ত একবার যেও। আমার সঙ্গে অতটা গিয়ে এই শীতের রাতে আবার ফিরতে তোমার কষ্ট হবে।

রামাই তা-না-না করিয়া বাড়িতে ঢুকিয়া কহিল, 'হ্যাঁ, তুমি নিশ্চিত হয়ে থেকো বাবাজি, ফর্দ্দ-টর্দ্দ আমি গিয়েই ঠিক করবো'খন।'

আলপথের পাশেই ছোট একটি বাঁকা পায়ে-চলা পথ। বীরেন আপন মনেই চলিতে লাগিল। দিগন্ত-বিস্তারী ঐ বন্ধুর প্রান্তরটিকে একটা ঘন অন্ধকার যেন সাপিনীর মত বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে। অগণিত নক্ষত্রমালার সামান্য আলোকে রবিশস্যের ছোট ছোট চারাগুলি কাঁপিতেছে, দূরের ষ্টেশন হইতে এইমাত্র একটি ট্রেনের বাঁশীর আওয়াজ শোনা গেল।

বীরেনের মনে তখন প্রশ্নের সমুদ্র ছুটিয়া চলিয়াছে। মানুষের জীবন লইয়া এত ছিনিমিনি মানুষ ছাড়া আর কে করিয়াছে? মানুষের দেহের জীর্ণ মন্দিরে অন্তরের দেবতা যে কখন পাষাণে পরিণত হইয়াছে, তাহা সে কি নিজেই জানে? বীরেনের মনে পড়িল...চুড়ি বেচিয়া চন্দনকাঠের ইতিহাস, সেই নিষ্ঠুর বর্ব্বরতা,—আঙুল ছিঁড়িয়া আংটি...আর ভয় দেখাইবার প্রচেষ্টা করিয়া মাদুলির দাম, কন্যাদায়,...ভোজনের বীভৎস লোলুপতা! সারাজীবন ধরিয়া শিক্ষা ইহারা পায় নাই, কিন্তু শুধু কি তাহারই জন্য? কিন্তু বীরেন ভাবিতে লাগিল, সভ্যতাহীন সেই আদিমতম বন্যতম যুগেও কি এতটা অন্যায়ের কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারিত! অপরাধের সম্বন্ধে কোনো চেতনা-বোধও ইহাদের নাই। ইহাদের জন্য দায়ী কে?

বীরেনের সাড়া পাইয়া পিসিমা আসিয়া দাঁড়াইলেন—'ভেবে ভেবে সারা হচ্চি বাবা, এতটা দেরি করতে হয়?'

—আমার সুটকেশটাতে জামা কাপড় আর খান-কতক বই—ওই টেবিলের ওপর যা আছে—তা-ই দিয়ে গুছিয়ে দাও ত পিসিমা!

—সে কিরে, কোথায় চললি হঠাৎ এসময়—

—এখানে আর ভাল লাগছে না পিসিমা!

আধ ঘণ্টার মধ্যেই বীরেন প্রস্তুত হইয়া নীচে নামিয়া আসিল। পিসিমা আঁচলে অশ্রু মুছিয়া এইবার শেষ চেষ্টা করিলেন। নিজের পিসিমা হ'লে তাকে কি এ রকমভাবে ফেলে যেতে পারতিস রে?

উদ্গত অশ্রু গোপন করিয়া বীরেন কহিল, 'তোমার ঋণ পরিশোধ করবার কথা যেন ভুলেও কোনদিন মনে না করি, আজ তুমি আমায় সেই আশীর্ব্বাদই করো পিসিমা। যদি কোনো দিন ফিরি ত সে তোমার কথা মনে করেই ফিরবো।

পিসিমা একটি মহিমান্বিতা বেদনাময়ীর মত দুয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সুটকেশটি হাতে লইয়া বীরেন তাঁহাকে একটি প্রণাম করিল। তারপর ধীরে ধীরে পথে নামিয়া সোজাপথে বহুদূর পর্য্যন্ত জোরে জোরে চলিতে আরম্ভ করিল। মোড় ফিরিবার সময় একবার পিছনে চাহিয়া দেখিল, শাদা কাপড়ে ঢাকা সেই নিস্পন্দ মর্ম্মর-ছবি তখন প্রায় অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে!

কষ্টিপাথর

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস

শ্রীযদুনাথ সরকার

যে নবীন ভারতে আমাদের বাস, যাহার চিন্তার ও ভাবের মধ্যে আমাদের চিত্তের চিরবসতি, তাহার জন্ম আজ দেড়-শ পৌনে দু-শ বৎসর মাত্র হইয়াছে।...

নবীন ভারতের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে এই দেশময় ছিল মুঘলদের রাজত্ব, এবং মুঘলদের রাজসভায় পালিত সভ্যতা। সে সভ্যতা দিল্লীর বাদশার রাজ্যসীমা অতিক্রম করিয়া সমস্ত করদ ও স্বাধীন দেশীয় রাজ্যে নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাহারই ফলে, আমাদের এই মহাদেশটা জুড়িয়া আচার ব্যবহার, উচ্চশ্রেণী লোকের বেশভূষা, চিন্তা, সাহিত্য-রচনা, শাসন ও পত্রব্যবহারের প্রণালী, অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধবিদ্যা, কলা ও শিল্প, প্রায় একই আকার ধারণ করে। অবশ্য, আজকার পাশ্চাত্য সভ্যতার অস্ত্রের প্রভাবে এগুলি যেমন এক ছাঁচে ঢালা, কলে তৈয়ারি সমান মাপের জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে ততটা নহে, কিন্তু সেই পথে বটে।

এই বৃটিশ-পূর্ব্ববর্ত্তী মুঘল সাম্রাজ্য ভারতবর্ষের অর্দ্ধেকেরও বেশী ভাগের উপর একছত্র রাজত্ব, একই ধরণের শাসনপদ্ধতি, একই প্রকারের ভদ্রসমাজের আমোদ-প্রমোদ, বেশ ও ভব্যতা, শিক্ষা ও সাহিত্যের ধারা প্রচলিত করিয়া দেয়। দেশের অনেকটা জুড়িয়া এবং অনেক বৎসর পর্য্যন্ত এই প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজশক্তি শান্তি স্থাপন করে; পথঘাট রক্ষা করে, একমাত্র সরকারী ভাষা ও মুদ্রা প্রচলন করে; এবং তাহার অনিবার্য্য ফলে ধন-উৎপত্তি ও বাণিজ্য-বৃদ্ধি, প্রদেশে প্রদেশে কর্ম্মচারীলোকের ভাবের পণ্যদ্রব্যের ও কলার বিনিময় হইতে আরম্ভ হয়। এক সমবেত ভারতীয় জাতি যে একদিন গঠিত হইবে ইহা যদি কল্পনাতীত স্বপ্নের দেশ হইতে সম্ভাবনীয় আশার রাজ্যে আসে, তবে তাহা মুঘল সাম্রাজ্যের আরম্ভ করা কাজেরই পূর্ণ পরিণাম একথা বলিতে হইবে।

এই দিল্লী সাম্রাজ্যের গৌরব ও কীর্ত্তি দেড়শত বৎসর (১৫৫৬-১৭০৭) ধরিয়া বাড়িয়া চলে। আকবর ও জহাঙ্গীর, শাজহান ও আওরংজীবের ইতিহাস ইহারই আলোকে উদ্ভাসিত। কিন্তু আওরংজীবের মৃত্যুর পর ৪০ বৎসর ধরিয়া দ্রুত অবনতি (মুহম্মদ শা বাদশার মৃত্যু ১৭৪৮ পর্য্যন্ত)। অবশেষে এই সাম্রাজ্য ও সভ্যতার পতন এবং দেশে বিদেশী-প্রাধান্য স্থাপন (১৮০৩ খৃষ্টাব্দে) হইয়া এই বিয়োগান্ত নাটকের যবনিকা পতন। এ-পর্য্যন্ত কেহই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস মৌলিক ও বিস্তৃতভাবে রচনা করেন নাই। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, জীবদেহের ক্ষয় এবং সাম্রাজ্যের পতন দুইটিই সমান দুঃখকর দৃশ্য। কিন্তু প্রাচীন গ্রীস দেশের অলঙ্কারশাস্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তারা সভাই বলিয়া গিয়াছেন যে, বিয়োগান্ত নাটক (ট্র্যাজেডি) করুণা ও ভয় জন্মাইয়া দর্শকের হৃদয় পরিষ্কৃত পবিত্র করিয়া দেয়। আমরা এইরূপ নাটকে হাতে হাতে ঈশ্বরের ন্যায়বিচার এবং পাপের অনিবার্য্য দণ্ড যেন চোখের সামনে দেখিতে পাই। এই সত্য মনে রাখিলে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকেও একটি মহান্ শিক্ষাপ্রদ ট্র্যাজেডি নাটক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আর এই নাটকের চরিত্রগুলি আমাদের জাতির ও দেশের অতি-নিকটস্থ পূর্ব্বপুরুষ, আমাদের সঙ্গে ইহাদের বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এমন নাটক আমরা অবহেলা করিতে পারি না।

তাহার উপর, যদি ইতিহাসকে জাতীয় জীবনের গীতা বলিয়া, জীবন্ত দর্শন গ্রন্থ বলিয়া, অন্ধ বর্ত্তমানের পথপ্রদর্শক দীপ্ত দীপ বলিয়া মানি, তবে এই মুঘল সাম্রাজ্যের পতন-কাহিনী আমাদের আর সব বিষয় অপেক্ষা অধিক মূল্যবান রাজনৈতিক শিক্ষা দিবে। নবীন ভারতের ভাগ্যকর্ত্তারা যদি এই ইতিহাস না জানেন, যদি ইহা পড়িয়া সাবধান না হন, তবে পদে পদে বিপদ আনিবেন, বিফলপ্রযত্নে জীবন কাটাইবেন। অতএব, এই যুগের সত্য ইতিহাস আজকার পক্ষে অত্যাবশ্যক। ভারতের হিন্দু যুগের, বৌদ্ধ যুগের, এমন কি আদি মুসলমান যুগের ইতিহাসে অনেক স্থল অন্ধকার। তাহার কোন সমসাময়িক, এমন কি বিস্তৃত পরবর্ত্তী কাহিনী নাই। সুতরাং সামান্য দুই একটি প্রস্তরফলক বা অর্দ্ধলুপ্ত প্রাচীন মুদ্রা লইয়া কল্পনার সাহায্যে ঐ সব সময়ের একটি "বোধ হয় এইরূপ ছিল" ছবি আঁকা ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু অপর দিকে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অসংখ্য সাক্ষী বিদ্যমান; তাহারা নানা জাতির নানা ধর্ম্মের লোক, নানা ভাষায় নিজ নিজ দৃষ্ট ঘটনা লিখিয়া গিয়াছে। এবং এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক উপাদান অগণ্য। সুতরাং এই যুগের ভারত-ইতিহাস যিনি চর্চ্চা করিবেন তাঁহার সুবর্ণ সুযোগ।

সত্য বটে, সেই পতনের যুগে দিল্লীর রাজশক্তি দুর্ব্বল সঙ্কীর্ণ, রাজপরিবার দরিদ্র, সদা উৎপীড়িত, দিল্লী-মধ্যে বন্দী ছিল। সুতরাং আকবর ও শাজহানের মত সরকারী পরিপূর্ণ সুদীর্ঘ ইতিহাস ("আকবর-নামা," "বাদশা-নামা" প্রভৃতি) রচনা করাইবার শক্তি ও প্রবৃত্তি এই সব দিল্লীশ্বরের ছিল না। কিন্তু অনেক কর্ম্মী পুরুষ ফার্সী ভাষায় নিজ নিজ জীবনের ঘটনা লিখিয়া গিয়াছেন; অসংখ্য চিঠি এবং রাজসভা বা শিবির হইতে প্রেরিত হাতে-লেখা সংবাদপত্র ('আখবারাৎ') রহিয়া গিয়াছে। ইংরেজ ও ফরাসী সৈনিক ও রাজপুরুষদের আত্মকাহিনী, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, সংগৃহীত ইতিহাস এবং রিপোর্ট (despatches) আছে, এবং তাহার প্রায় সবগুলি মুদ্রিত আকারে পাওয়া যায়। সকলের চেয়ে বেশী সুখের বিষয় এই যে, সে-যুগের ভারত-ইতিহাসের যাহা অর্দ্ধেক উপাদান, অর্থাৎ মারাঠাদের লিখিত চিঠি, বিবরণ ও রিপোর্ট—তাহার প্রায় সবটা গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ছাপা হইয়া গিয়াছে। সমস্ত অষ্টাদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া মারাঠা-শক্তি শুধু দাক্ষিণাত্যে নহে, উত্তর-ভারতেও—সিন্ধুতীরে আটক হইতে ভাগীরথী-তীরে মুর্শীদাবাদ পর্য্যন্ত—ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেই রাজসরকারের প্রায় সমস্ত কাগজপত্র এতদিন অপ্রকাশিত, একরূপ অজ্ঞাত ভাবে পুণায় "দাখরাজ জমীর অফিসে" বন্ধ হইয়া ছিল। গত তিন বৎসর ধরিয়া বম্বে গভর্ণমেণ্টের, এবং শেষ বা চতুর্থ বৎসর (১৯৩২) মারাঠা রাজাদের চাঁদায়, এই দেড় কোটি কাগজের বোঝাগুলি শ্রীযুক্ত গোবিন্দ সখারাম সরদেশাই এক দল কেরাণী লইয়া ঘাঁটিয়া, তাহার মধ্য হইতে ঐতিহাসিক কাগজগুলি বাছিয়া লইয়া,

তারিখ ও টীকা যোগ করিয়া, ২৭ খণ্ড ইতিমধ্যে ছাপিয়াছেন; অবশিষ্ট ১৮ খণ্ডও প্রায় প্রস্তুত হইয়া আছে। এক বৎসরের মধ্যেই ছাপা শেষ হইবে আশা করা যায়। এই মহাকীর্ত্তির মূল্য যে কত তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত-ইতিহাসের প্রত্যেক লেখকই বুঝিতে পারিবেন।

ইতিপূর্ব্বে অনেক মারাঠা ঐতিহাসিক পত্র রাজবাড়ে সানে ও পারসনিস (১৮৯৮ হইতে) এবং খরে (১ম খণ্ড ১৮৯৭) ছাপিয়াছেন। পারসনিসের প্রকাশিত পত্রগুলি সবচেয়ে মূল্যবান্, তাহার অধিকাংশই পেশোয়া-রাজের সরকারী দপ্তরের বিক্ষিপ্ত এক শাখা হইতে লওয়া। খরের পত্রগুলি শুধু দক্ষিণ মারাঠার পটবর্দ্ধন রাজবংশ (বর্ত্তমান মিরজ জুনিয়ার ঘর)এর সংগ্রহ হইতে লওয়া এবং প্রায়শই শুনা কথা, দৃষ্ট ঘটনার বিবরণ নহে। রাজবাড়ে ও সানের সংগ্রহে কিছু সার উপাদান ও প্রচুর অকেজো কাগজ আছে। কিন্তু সরদেশাই সম্পাদিত খণ্ডগুলিতে প্রথম শ্রেণীর প্রামাণিক ঐতিহাসিক উপকরণ আছে। সুতরাং এখন এমন সময় আসিয়াছে যে ঘরে বসিয়া প্রায় সমস্ত ঐতিহাসিক মালমসলা সংগ্রহ করা যায় এবং তাহার সাহায্যে এই যুগের ইতিহাস রচনা করা সম্ভব। সরদেশাই ও কুলকর্ণী সম্পাদিত "ঐতিহাসিক পত্রব্যবহার" (দ্বিতীয় সংস্করণ), যদিও পেশোয়া-দপ্তর হইতে লওয়া নহে, ইহাতে ঐ দপ্তরের কাগজপত্রের মত অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক চিঠি নানাস্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার ভিত্তি সানে সম্পাদিত পত্রসংগ্রহ, কিন্তু এই দ্বিতীয় সংস্করণে আকার দ্বিগুণের অধিক বাড়িয়াছে, এবং অনেক ভ্রম সংশোধন করা হইয়াছে। সরদেশাই এবং অপর দুইজন সরকারী সম্পাদিত "পত্রে ইয়াদি বগৈরে" (২য় সংস্করণ) দ্রষ্টব্য বটে, কিন্তু "ঐতিহাসিক পত্রব্যবহার"এর মত মূল্যবান নহে।

ঐ যুগে ফরাসী ভাষায় Law of Lauriston, Gentil, ও De Boigneএর কাহিনী এবং বর্ত্তমানে M Alfred Martineau রচিত Dupleix এবং Perronএর জীবনী এবং Emile Barbe রচিত Rene Madecএর পত্র ও ইতিহাস অত্যন্ত কাজের জিনিষ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের প্রথমে Xavier Wendel নামক একজন জেসুইট পাদরী ভরতপুরের জাঠ-রাজাদের আশ্রয়ে ছিলেন, তিনি ইংরাজদের চরের কাজও করিতেন। তাঁহার লেখা জাঠ-ইতিহাস (ফরাসীতে) হস্তলিপির আকারে ইণ্ডিয়া অফিসে আছে (দুই প্রতি) আর টাইরোল-দেশীয় জেসুইট Tieffenthaler যদিও ১৫।১৬ বৎসর ধরিয়া নারওয়ার নগরে (মালবের উত্তর অংশে) বাস করেন, তাঁহার পুস্তক (ফরাসী অনুবাদ বার্নুলী কর্ত্তৃক রচিত) ভূগোলের বই মাত্র, ঐতিহাসিক সংবাদ কম দেয়। চন্দননগর ও পণ্ডিচেরীর সমস্ত সরকারী চিঠিপত্র যাহা লোপ পায় নাই, মার্টিনো সাহেবের যত্নে ছাপা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে উত্তর-ভারত সম্বন্ধে বড় কম কথা আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ ও ফরাসীদের রচিত ভারত-সম্বন্ধীয় বইগুলি এখন অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য হইয়াছে। আমাদের হতভাগ্য রাজধানীগুলির পুস্তকাগারে তাহার কোন সম্পূর্ণ বা অর্দ্ধ-সম্পূর্ণ সংগ্রহও নাই। ইহা দরিদ্র ঐতিহাসিকের পক্ষে কম কষ্টের কারণ নহে।

পারসিক হস্তলিপির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিরল গ্রন্থগুলি বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে ও ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে আছে, এদেশে পাওয়া যায় না। তাহার ফটো আনান ব্যয়সাধ্য, কিন্তু এই বই-গুলির মধ্যে অনেক এত আবশ্যক যে তাহাদের ফটো আনান ভিন্ন উপায় নাই, ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্-এর সময় হইতে ভারতে ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ পারসিক ভাষায় লেখা ইতিহাসের হস্ত-লিপির খুব খোঁজ করেন, তাঁহাদের অনুগ্রহপ্রার্থী লোকেরা তাঁহাদের জন্য ঐ ভাষায় নিজদর্শিত ঘটনার বিবরণ লিখিয়া তাঁহাদের উপহার দেয়। আর ওয়েলেস্‌লীর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হইবার পর ফার্সী হস্তলিপি সংগ্রহ এবং ইতিহাস রচনার খুব উৎসাহ পড়িয়া যায়। এমন কি তাঁহার এদেশে আসিবার পূর্ব্বেই গভর্ণমেণ্টের পার্শিয়ান্ ট্রান্সলেটর অথবা ফরেন্ সেক্রেটরির মন যোগাইবার জন্য অনেকে ফার্সী ইতিহাস রচনা করিয়া দেন। সর্ব্বশেষে ডাল্‌হাউসীর ফরেন্ সেক্রেটরি বিখ্যাত সর্ হেনরি এলিয়ট হিন্দুস্থানের সব নবাব জমিদারের ঘর ঘাঁটিয়া পুরাতন ফার্সী ইতিহাস সংগ্রহ করেন, তাহা এখন ব্রিটিশ মিউজিয়মে, এবং তাহার অনেকগুলি জগতে একক।

ইংরেজ কর্ম্মচারীদের জন্য রচিত ফার্সী ইতিহাসের দৃষ্টান্ত দিতেছি, ইহার প্রায় সবগুলিই খুব কাজের বই এবং মূল্যবান সংবাদ দেয়:—

রিয়াজ-উস্-সালাতীন (বাঙ্গলার ইতিহাস)

তারিখে বাঙ্গালা। ১৭০৮—১৭৬৩ বঙ্গ-ইতিহাস।

তারিখে শাহাদৎ-ই-ফরুখ্‌সিয়র (বাদশা মুহম্মদ শাহ খাঁপুর "দুধ-ভাই" মুহম্মদ বখ্‌শ আশোব রচিত)

ইব্‌রৎনামা। (ফকীর খয়েরউদ্দীন রচিত)

ইমাদ-উস-সাদৎ (গুলাম আলী রচিত), ইত্যাদি।

বিলাতে কিরূপ মূল্যবান ফার্সী ঐতিহাসিক হস্তলিপি আছে, যাহার নকল এদেশে একেবারে পাওয়া যায় না, তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

(১) পূর্ব্বোক্ত আশোবের গ্রন্থ

(২) কাশীরাও রচিত পাণিপথের যুদ্ধের ইতিহাস

(৩) নজীব খাঁর জীবনী

(৪) বাদশাহ আহম্মদ শাহ (রাজ্যকাল ১৭৪৮-১৭৫৪)-এর বিস্তৃত ইতিহাস

(৫) বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীর (রাজ্যকাল ১৭৫৪-১৭৫৯)-এর বিস্তৃত ইতিহাস

(৬) পাণিপথ যুদ্ধের বর্ণনা, মুনাজিল্-উল্-ফতুহ

(৭) মিস্কিন নামধারী একজন তুর্কী-বালক ক্রীতদাসরূপে ১৭৪৮ সালে ৮ বৎসর বয়সে পঞ্জাবে আসে। পরে তহমাস খাঁ নামে দিল্লীর ওমরা হয়। তাহার আত্মকাহিনী। ইহার এক অংশ মাত্র এদেশে আছে।

(৮) দিল্লীর দরবারে সংবাদপত্র, সহস্র পৃষ্ঠারও অধিক।

(বঙ্গশ্রী—মাঘ, ১৩৩৯)

পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ

নব্যপন্থী হিন্দু বর্ত্তমান সময়ে দুই ভাগে বিভক্ত, প্রাচীন আচারের আবশ্যকতা নাই, সহস্র বৎসরের পরীক্ষায় ইহার কুফল যে হিন্দুর সর্ব্বপ্রকার জাতীয় উন্নতির প্রতিকূল, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে সুতরাং বাঁচিয়া থাকিয়া জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে, ঐ সকল আচার একেবারে পরিবর্জ্জন হিন্দুর পক্ষে যত শীঘ্র সম্ভব কর্ত্তব্য, এই মত যাঁহারা পোষণ করিয়া থাকেন---তাঁহারা প্রথম পক্ষের অন্তর্গত। দ্বিতীয় পক্ষে ---যাঁহারা প্রবিষ্ট, তাঁহারা বলেন প্রাচীন সকল আচারই যে পরিবর্জ্জনীয়, তাহা বলিতে পারা যায় না, প্রাচীন আচার যাহা বর্ত্তমান সময়ে চলিতে পারে না তাহারই পরিবর্জ্জন করিতে হইবে আর যাহার

অনুষ্ঠান জাতীয় বৈশিষ্ট্যের রক্ষণ করিয়া থাকে, তাহা আবশ্যক হইলে বাহ্য আকারের পরিবর্ত্তন করিয়া ও নূতন সময়োপযোগী আকারে সর্ব্বথা পালনীয়।...এই দুই দলের মধ্যে প্রথম দলকে পরিবর্জ্জনবাদী নব্যপন্থী...এবং দ্বিতীয় দলকে পরিবর্ত্তনবাদী নব্যপন্থী বলা যাইতে পারে।...

পরিবর্জ্জনবাদী নব্যপন্থী হিন্দু...সংবাদপত্রে ও সভাসমিতিতে নিঃসঙ্কোচে বলিয়া থাকেন যে, শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্রসম্মত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই হিন্দুর বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে সকল প্রকার লৌকিক উন্নতির একান্ত বিরোধী। এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম হিন্দু-সমাজকে শতধা বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে---মানুষ কেবল জন্ম দ্বারা উন্নত বা নিকৃষ্ট হইয়া থাকে —স্পৃশ্য বা অস্পৃশ্য হয়, এইরূপ সিদ্ধান্তের উপর এই শাস্ত্রানুমোদিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, এই ধর্ম্ম প্রত্যেক মানবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অত্যন্ত প্রতিকূল, উচ্চতর বিজ্ঞান ও দর্শন দ্বারা পরিচালিত বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে এই ধর্ম্ম শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বথা উপেক্ষণীয়। মানুষ জন্মের পর হইতে মরণ পর্য্যন্ত মানুষই থাকে—ক্ষুধা তৃষ্ণা ভোগ বাসনা প্রত্যেক মানুষেরই আছে ও আমরণ থাকিবে। ক্ষুধা তৃষ্ণাকে নিবৃত্ত করিয়া আজন্মসিদ্ধ ভোগ বাসনাকে চরিতার্থ করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার যে অধিকার তাহা প্রত্যেক মানুষেরই আছে ও থাকিবে। সেই অধিকার যদি অপর মানুষের স্বার্থের বিরোধী না হয়, তাহা হইলে তাহাতে বাধা দিবার শক্তি কাহারও থাকা উচিত নহে, ইহাই হইল মানুষের আজন্মলব্ধ প্রকৃতিসিদ্ধ অধিকার--যে ধর্ম্ম বা আচার এই অধিকারের বিরোধী তাহা মানুষের ধর্ম্ম বা আচার বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। এই মানুষের আজন্মসিদ্ধ অধিকারের যাহা অনুকূল ও পরিপোষক সেই ধর্ম্ম বা সেই আচার--উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বা উৎকৃষ্ট আচার,—বর্ত্তমানকালে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বা বর্ণাশ্রমাচার আমাদের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে তাহা এই প্রকৃতিসিদ্ধ মানবাধিকারের একান্ত বিরোধী, এই কারণে তাহা যত শীঘ্র সম্ভব, একেবারে পরিবর্জ্জনীয়।

একই জলাশয়ে কুকুর বা শৃগাল জল পান করিতেছে, সেই জলাশয়ের জল উচ্চজাতির পক্ষে অবর্জ্জনীয় নহে, কিন্তু একজন তথাকথিত নীচ জাতির মানুষ যদি সেই জলাশয় হইতে পানীয় গ্রহণ করে তাহা হইলেই তাহার জল অপেয় হইবে—এই যে আচার তাহা সমস্ত শাস্ত্র দ্বারা সমর্থিত হইলেও মানুষের বিবেকদ্বারা কিছুতেই সমর্থিত হইতে পারে না। অথচ এই চিরন্তন প্রচলিত আচারকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাচীনপন্থী হিন্দুগণ বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করিতেছেন —সনাতন ধর্ম্ম গেল, হিন্দুজাতির সর্ব্বনাশ হইল, হিন্দুর বৈশিষ্ট্য রসাতলে ডুবিল,---এইরূপ কোলাহলে আকাশপবন মুখরিত করিয়া তুলিতেছেন, ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার আর কি হইতে পারে? মুসলমানের, খ্রীষ্টিয়ানের হোটেলে ধনী ও মধ্যবিত্ত হিন্দু বিনা সঙ্কোচে উপস্থিত হইয়া সকল প্রকার চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়ের আস্বাদন করিতেছে, সমাজ তাহা দেখিয়াও দেখিতেছে না, অথচ চামার মেথর বা ডোম প্রভৃতি তথাকথিত নীচ জাতির হিন্দু যদি স্নান করিয়া বিশুদ্ধভাবে আহার্য্য পরিবেশন করে, তবে তাহা অগ্রাহ্য, গ্রহণ করিলে গুরু প্রায়শ্চিত্ত ব্যতিরেকে নিস্তার নাই---এইরূপ ধারণা এখনও যত্নের সহিত উচ্চজাতীয় হিন্দুনেতৃগণ হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন এবং নানা শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া ইহার সমর্থন করিতেছেন, বাজারের পাঁউরুটি বিস্কুট সোডা লিমোনেড অবাধভাবে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর গৃহে সমাদৃতভাবে প্রবেশ করিতেছে, তাহাতে সামাজিকগণের কোন আপত্তির চিহ্ন আত্ম-প্রকাশ করিতেছে না অথচ অস্পৃশ্য নামে প্রসিদ্ধ হিন্দুর হস্তের পানীয় সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয় এইরূপ যে ব্যবস্থা তাহা সর্ব্বথা শাস্ত্রীয় হইলেও কেন যে উপেক্ষণীয় হইবে না, তাহার অনুকূল সদ্‌যুক্তি কাহারও মুখে শুনা যাইতেছে না—এই সকল জীর্ণ, গলিত সদাচারের দোহাই দিয়া ---যাঁহারা হিন্দুর জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্য কোলাহলে দিঙ্‌মণ্ডল আলোড়িত করিতেছেন, তাঁহারা জাতীয় জীবন বলিলে কি বুঝায়, তাহা বুঝেন না বলিলে অণুমাত্রও অত্যুক্তি হয় না,---এই সকল শাস্ত্রসম্মত প্রাচীন আচার পালন করিতে করিতে জীর্ণ হিন্দু-সমাজ শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে--মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা ঈর্ষা ও অসহিষ্ণুতাকে সহস্রগুণে বাড়াইয়া আত্মীয়কে পর করিতেছে, হিন্দুবিদ্বেষী অহিন্দু মানবগণের আত্মদলপোষণী শক্তিকে প্রতি পলে বাড়াইয়া দিতেছে,--এই শোচনীয় বুদ্ধিবিকারের পরিণাম যে অতি ভয়াবহ, তাহা বুঝিবার শক্তি যে শাস্ত্রবিশ্বাসী সনাতনীগণের লুপ্ত হইয়াছে ইহা জাজ্বল্যমান সত্য।

তাই পরিবর্জ্জনকামী নব্যহিন্দুগণ বলিতেছেন, হিন্দুকে বাঁচিতে হইলে, বাঁচিয়া পৃথিবীর উদীয়মান জাতিগণের মধ্যে আত্মসম্মান রক্ষা করিতে হইলে প্রাচীন বর্ণাশ্রমাচার পরিত্যাগ করিতে হইবে, হিন্দুর মধ্যে জাতিগত উচ্চনীচ ভাব একেবারে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে, সাম্য স্বাধীনতা ও মৈত্রীর বিজয়পতাকার নীচে সকল হিন্দুকে সমবেত হইতে হইবে—সঙ্ঘ শক্তি সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দ্বারা ব্যক্তিগত লুপ্ত শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করা ব্যতিরেকে বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুর এই ভারতে সসম্মানে বাঁচিয়া থাকা সম্ভবপর নহে, ইহা প্রত্যেক হিন্দুকে বুঝিতে হইবে। এই সঙ্ঘশক্তি লাভ করিবার জন্য তাহাকে যদি সকল শাস্ত্রগ্রন্থ আপাততঃ সিন্দুকে পুরিয়া রাখিতে হয়, তাহাও করিতে হইবে, আবার যদি জাতীয় জীবনের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয় তখন স্বতন্ত্র হইয়া সমর্থ হইয়া, সদসদ বিবেক সম্পন্ন সেই সিন্দুকের তালা ভাঙ্গিতে পার--- সেই সকল শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িয়া প্রাচীনকালে কি ভাল ছিল—এখন তাহা ভাল বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে কি-না তাহার বিচার করিতে পার, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, স্বরাজ লাভ যতদিন না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আর শাস্ত্রীয় বচনবাগাশতার কোন আবশ্যকতা নাই, হিন্দুর পুনরুজ্জীবনের একমাত্র নিদান হিন্দুর সঙ্ঘশক্তির জাগরণের যাহা যাহা প্রতিকূল তাহার বর্জ্জনই এখন হিন্দুর স্বধর্ম্ম, ইহা ছাড়া অন্য ধর্ম্ম বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া বর্ত্তমান ভারতে পরিগৃহীত হইতে পারে না।

(উত্তরা, পৌষ, ১৩৩৯)

বাংলায় কার্পাস উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা

শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা দেশে অতি সামান্ত পরিমাণেই তুলা জন্মে। বাংলায় মোট ৭৭,০০০ একর জমিতে কার্পাস তুলা জন্মে। এই কার্পাস অতি নিকৃষ্ট প্রকৃতির ও অপ্রচুর। কাপড়ের কলে এই তুলায় কাজ হয় না বলিলেই চলে। কাজেই বাংলার মিলগুলি বাহির হইতে তুলা আনিয়া বস্ত্র উৎপাদন করে এবং ভবিষ্যতেও করিবে যদি বাংলায় যথেষ্ট পরিমাণে ভাল তুলা না জন্মে। বাংলার দেশ-হিতৈষী নেতারা কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ইতিমধ্যে কাহারও কাহারও নামে মিল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এককালে বাংলা দেবকার্পাস উৎপাদন করিয়া সেই তুলায় যে সূক্ষ্ম সূতা উৎপাদন করিত, তাহা জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সেই বাংলা দেশে হাজার হাজার বিঘা পতিত জমি থাকাতেও বাংলার মিল তুলা আনিবে বাহির হইতে! জগতের মধ্যে সূক্ষ্মতম মসলিনের সূতা উৎপাদন করিত বাংলা। তখনকার তুলার আঁশ এত সূক্ষ্ম, কোমল ও চিক্কণ ছিল যে, তাহাতে মসলিনের সূক্ষ্মতম সূতাও উৎপন্ন হইতে পারিত। আজ বাঙালীরা যে মিল প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন তাহার তুলা জোগাইবে কি বেহারীরা, পাঞ্জাবীরা অথবা মারাঠীরা? বাংলায় কি যথেষ্ট জমি নাই, না, বাংলার জল-হাওয়া তুলা উৎপাদনের অনুকূল নয়? পরিধেয় বস্ত্র বিষয়ে আমাদের যেমন স্বাধীনতা প্রয়োজন সেইরূপ তুলা উৎপাদনের দিক দিয়াও আমাদের আত্মনির্ভরতা থাকিবে না কেন? যাঁহারা বাংলাকে ভালবাসেন, বাংলার পয়সা যাঁহারা বাংলাতেই রাখিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা বাংলায় কার্পাস জন্মাইবার উপায় করুন, বাংলার মিলের যে পরিমাণ ভাল তুলার দরকার হইবে সেই পরিমাণ কার্পাস বাংলাই জোগাইবে। সেইজন্য আজ বাঙালীকে বাংলার চতুর্দ্দিকে তুলা চাষের প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। সাধারণ লোকদিগকে এই সম্বন্ধে উৎসাহিত করিতে হইবে, কার্পাস চাষ সম্বন্ধে উপদেশ দান করিয়া ইহাকে অর্থনীতির উপরে দাঁড় করাইতে হইবে। সাধারণ লোকে আজ তুলা চাষ সম্বন্ধে একরূপ অজ্ঞ বলিলেই চলে, কাজেই বাংলায় প্রভূত পরিমাণে উত্তম জাতীয় কার্পাস উৎপাদন করিতে হইলে শিক্ষিত স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি বোর্ড গঠন করা উচিত। এই বোর্ডের নাম হইবে বঙ্গীয় কার্পাস সমিতি। এই সমিতি বাংলায় প্রভূত পরিমাণে উত্তম জাতীয় তুলা উৎপাদন করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। এই সমিতির নিজস্ব একটি ব্যাঙ্ক থাকিলেই কাজের সুবিধা হইবে, কারণ সমিতি গ্রামে গ্রামে ঋণদান দ্বারা শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে অনেকগুলি কার্পাস উৎপাদনকারী সমবায় সমিতির জন্মদান করিতে পারেন। আর দরিদ্র দেশের পক্ষে সমবায় সমিতির মধ্য দিয়া কাজ না করিলে কোন বড় কাজ করা যায় না। গ্রামের মধ্যে এইরূপ সমবায় সমিতির জন্ম দিতে পারিলে, এই সব সমবায় সমিতির কার্য্যকলাপ ও কৃষি-পদ্ধতি দেখিয়া এবং তুলা চাষে লাভ আছে বুঝিয়া, সাধারণ চাষীরা ইহার চাষে মনোনিবেশ করিবে। এইভাবেই দেশময় কার্পাস চাষ বিস্তার লাভ করিতে পারে।

বঙ্গীয় কার্পাস সমিতি সর্ব্বপ্রথমে দেখিবেন কোন্ কোন্ জেলায় প্রচুর পরিমাণে কার্পাস জন্মিতে পারে। কারণ বাংলায় অনেক জেলা আর্দ্র বলিয়া কার্পাসের পক্ষে অনুকূল নয়। যে-যে জেলায় এখনও কার্পাস জন্মায়, সেই সেই জেলায় ইঁহারা আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রত্যেক কেন্দ্রে দশ বার জন শিক্ষিত যুবককে লইয়া কার্য্যারম্ভ করিতে পারেন। এই আদর্শ-ক্ষেত্রগুলিতে শ্রেষ্ঠজাতীয় ও স্থানীয় ভাল কার্পাস লইয়া পরীক্ষা চলিবে, কোন্ জাতীয় কার্পাস সেই স্থানে উত্তম

ফল প্রদান করিবে দেখিবার জন্য। বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করিয়া ব্যয় সংক্ষেপ করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্য লইয়া দেখিতে হইবে তূলার ফলন কত বাড়াইতে পারা যায়। এক একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র পাঁচ ছয় বিঘা জমি লইয়াই চলিতে পারে। এইরূপ আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের ফলাফলের উপরেই বাংলায় কার্পাসের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। কারণ কোন্ স্থানে কোন্ জাতীয় তূলা ভাল হইবে, কি সার প্রদান করিতে হইবে, আধুনিক কোন্ যন্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে, কার্পাসের সহিত অন্য ফসল চাষ চলিবে কি-না, জলসেচন দরকার কি-না, ইত্যাদি কার্পাস সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্য সাধারণ লোক জানে না। আদর্শ কর্ম্মীরা হাতে-কলমে যে তথ্য আবিষ্কার করিবেন তাহাই সাধারণ লোকের ভরসা-স্বরূপ হইবে। বঙ্গীয় কার্পাস সমিতি যদি অনেকগুলি জেলায় এইরূপ আদর্শ কার্পাস কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারেন, তাহা হইলে অন্ততঃ উত্তর-বঙ্গে, পশ্চিম-বঙ্গে, পূর্ব্ববঙ্গে ও মধ্যবঙ্গে, উপযুক্ত জমি লইয়া চারিটি কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়া কার্য্য করিতে পারেন। পরীক্ষার দ্বারা তাঁহারা স্থির করিবেন স্থানীয় কার্পাস বা বাহিরের শ্রেষ্ঠ জাতীয় কার্পাস, কোন্‌টা সেই স্থানের উপযোগী, এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষের দ্বারা ইহার উন্নতি হইতে পারে কি-না। কার্পাস চাষ সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে কিছু সময় লাগিবে। ততদিন তাঁহারা স্থানীয় কার্পাস ও বাহিরের শ্রেষ্ঠজাতীয় কার্পাসের বীজ ও তাহার চাষ-পদ্ধতি সাধারণে প্রচার করিয়া তূলার চাষের দিকে লোকের অনুরাগ বাড়াইতে থাকিবেন। পরে কার্পাস চাষ সম্বন্ধে ঐরূপ পরীক্ষার দ্বারা স্থিরীকৃত চাষ-পদ্ধতি প্রচার করিলেই চলিবে। এই প্রচারের প্রথম উপায় হইতেছে শিক্ষানবিশী যুবকদের দ্বারা, বেকার যুবকদের লইয়া গ্রামের মধ্যে সমবায়-কার্পাস-কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করা। যখন চাষীরা এ চাষ সুবিধাজনক বলিয়া বুঝিবে তখনই তাহারা এই বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিবে। সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহারা সমবায় কৃষিক্ষেত্র বা আদর্শ কার্পাস কৃষিক্ষেত্র হইতে সাহায্য ও উপদেশ পায় তাহা হইলে খুব শীঘ্রই কার্পাস চাষে দেশ ছাইয়া যাইবে। বেকার যুবকদের অন্নসমস্যারও ইহাতে একটা মীমাংসা হয় এবং দেশের সাধারণ চাষীরাও সংঘবদ্ধভাবে কৃষিকার্য্য করিতে শিখিতে পারে। সমবায় সমিতির ভিতর দিয়া কাজ না করিলে এ-দেশে কৃষির উন্নতি হওয়া একেবারে অসম্ভব, কাজেই তাঁহাদের সম্মুখে এইরূপ আদর্শ সমবায় কৃষিক্ষেত্র স্থাপন ছাড়া তাঁহাদিগকে শিখাইবার আর অন্য পন্থা কি আছে। যাহা হউক বঙ্গীয় কার্পাস সমিতি ও সমবায় সমিতিগুলি উচিত মূল্যে সাধারণ চাষীদিগের নিকট বীজসুদ্ধ তূলা ক্রয় করিবেন। পরে ভাল যন্ত্রের দ্বারা তূলা হইতে বীজ ছাড়াইয়া, গাঁটবন্দী করিয়া মিলগুলিকে সরবরাহ করিবেন। এই তূলার বীজ হইতে তৈল প্রস্তুত করিয়া তাঁহারা একটা নূতন ব্যবসায়ের পথ খুলিতে পারেন। যতদিন না সমস্ত চাষী সমবায় পদ্ধতিতে চাষ করিতে শিখিবে, সাধারণ চাষী ও মিলওয়ালাদের মধ্যে একজন মধ্যবর্ত্তীর দরকার হইবে, কারণ তূলা হইতে বীজ ছাড়াইবার, গাঁটবন্দী করিবার ও বীজ হইতে তৈল প্রস্তুত করিবার যন্ত্র প্রত্যেক চাষীর থাকা অসম্ভব। এক্ষেত্রে বেকার যুবকেরা ঐ তূলা ক্রয় করিয়া তাহার বীজ হইতে তৈল প্রস্তুত করিয়াও নিজেদের অন্নসমস্যার মীমাংসা করিতে পারেন। অবশ্য যদি গ্রামের মধ্যে এরূপ প্রতিষ্ঠান না গড়িয়া উঠে তাহা হইলে বঙ্গীয় কার্পাস সমিতি তূলাক্রয়-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া চাষী ও মিলের মধ্যে মধ্যবর্ত্তী স্বরূপ হইবে। মোট কথা, চাষীরা যদি তূলা বিক্রয় করিবার সুবিধা না পায় তাহা হইলে কার্পাস-চাষ দেশ হইতে লোপ পাইবে। বঙ্গীয় কার্পাস সমিতিকে এই দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হইবে, দেখিতে হইবে কাহারও তূলা যেন অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া না থাকে।

এক্ষণে দেখা যাউক বাংলার সর্ব্বসুদ্ধ পতিত জমির পরিমাণ কত? ১৯৩০-৩১ সালের হিসাবে দেখা যায় বাংলায় পতিত জমির মোট পরিমাণ ১,৫৯,৮৬,৫২০ একর। তন্মধ্যে কর্ষণযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ ৫৭,১৩,২৩৮ একর। এই কর্ষণযোগ্য পতিত জমি নেহাৎ কম নহে। এক্ষণে আমরা যদি মোট কর্ষণযোগ্য

পতিত জমির অর্দ্ধেক পরিমাণ অর্থাৎ ২৯,৫৬,৬১৯ একর জমি কার্পাস উৎপাদনে লাগাই তাহা হইলে ঐ তূলার দ্বারা আমরা বাংলার পাচ কোটী নর-নারীর বস্ত্র-সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিব। কারণ পচিশ বৎসরের গড় হিসাব পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, লোকপ্রতি ৮.৮০ গজ হইতে ১৬.৮ গজ কাপড় ব্যবহৃত হইয়াছে। গড়ে ধরিলে বলা যাইতে পারে এ-দেশে প্রত্যেক লোক বৎসরে ১২·৫ গজ কাপড় ব্যবহার করে। পাচ কোটী লোক প্রত্যেকে ১২·৫ গজ কাপড় কিনিলে বাংলায় প্রতি বৎসর ৬২·৫ কোটী গজ কাপড় দরকার হইবে। একর-প্রতি এখন গড়ে ৮২ পাউণ্ড তুলা পাওয়া যায় অর্থাৎ এক মণেরই কাছাকাছি। যদিও প্রতি একরে ৮২ পাউণ্ড তুলার ফলন নিকৃষ্ট ফলন তথাপি আমরা খুব কম পক্ষেই হিসাব করিয়া দেখাইতেছি যে, আমরা ঐ পরিমাণ পতিত জমি হইতে ২৯,৫৬,৬১৯ মণ তুলা বৎসরে পাইতে পারি। প্রতি মণ তূলায় খুব কম পক্ষে ৩০০ গজ কাপড় হইবে ধরিলে বৎসরে আমরা ঐ তুলা হইতে ৮৮,৬৯,৮৫,৭০০ গজ কাপড় উৎপন্ন করিতে পারি। তুলার ফলনের বেলায় আমরা তাহার নিকৃষ্ট ফলন ধরিলাম এবং কাপড়ের বেলায় আমরা বেশীর দিকটাই ধরিয়া দেখাইতেছি যে, বাংলার জমিতে বাংলার আবশ্যকের বেশী তুলা জন্মাইবার পক্ষে কোন বাধা নাই।

এখন দেখা যাউক তুলার ফলন আমরা কিরূপ আশা করিতে পারি, এবং কোন্ জাতীয় তুলা লইয়া এখনই কার্য্যারম্ভ করিতে পারি। বাংলার নিজস্ব তুলার অভাব নাই। ৺নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁহার Hand-book of Indian Agriculture নামক পুস্তকে বাংলার তুলা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"On the whole, the Burhi cotton seems to be the best to grow in Bengal though persistent attempt should be made to grow the superior tree cotton."

বুড়ী কার্পাসের ফলন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "Burhi and Nausari variety often yield as much as 400 lbs. of lint per acre."

কাজেই বাংলার বুড়ী কার্পাস হইতে আমরা খুব কমপক্ষে বিঘা-প্রতি এক মণ তুলা আশা করিতে পারি। এক মণ তুলার দাম কুড়ি-পচিশ টাকা ও দুই মণ বীজের দাম চার-পাচ টাকা একুনে পচিশ-ত্রিশ টাকা বিঘা প্রতি আয় দাঁড়াইতে পারে। এ ছাড়া তুলার নীচে চীনাবাদামের চাষ করিয়া আমরা তুলার সারের খরচ উঠাইয়া লইতে পারি। বাংলার উচ্চ জমিতে বর্ষাকালে পাট, আউস ধান প্রধান ফসল। বাংলার জমিতে বিঘা-পিছু পাট পাচ-ছয় মণ ফলে, উহার দাম বিশ-পচিশ টাকা, আউস ধানও ঐরূপ ফলে, কাজেই তুলা জন্মাইয়া আমরা লোকসান দিব না। তাহা-ছাড়া বুড়ী কার্পাসের দর ক্যাম্বোডিয়ান কটনের অপেক্ষা কম হইবে না, কারণ বুড়ী কার্পাস উৎকৃষ্ট কার্পাস। ক্যাম্বোডিয়ান কার্পাসের দর পচিশ-ত্রিশ টাকা। পাটের বাজার এত মন্দা যে পাট চাষ আমাদের কমাইতেই হইবে। কাজেই পাটের বদলে ইক্ষু, চীনাবাদাম, ধান্য, তুলা জন্মাইতে আমাদের কোন বাধা নাই। তাহা ছাড়া বৰ্দ্ধমান, বীরভূম, মানভূম, বাঁকুড়া মেদিনীপুর জেলায় এমন সব পতিত জমি আছে যাহাতে জলাভাবে এ পর্য্যন্ত কোন ফসলই জন্মে না। এই-সব পতিত জমির পরিমাণ হাজার হাজার বিঘা: এ জমি-গুলিতে তুলা, চীনাবাদাম জন্মাইয়া সকলেই লাভবান হইতে পারেন।

৺নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সুপরিচিত ট্রি কটনের সম্বন্ধে আমি নিজের অভিজ্ঞতা হইতে কিছু বলিতে পারি। এই ট্রি কটনের মধ্যে দেবকার্পাস, ঢাকাই কার্পাস ও বুড়ী কার্পাস প্রসিদ্ধ। এই গাছগুলি খুব বড় হইয়া দশ-পনর বৎসর বাঁচিয়া থাকে। ইহার মধ্যে বুড়ী কার্পাস সকলের অপেক্ষা ভাল। এই কার্পাস যেন বাংলার অযত্ন-সম্ভূত সম্পদ। এই বুড়ী কার্পাসই বিনা জল-সেচনে দশ-পনর বৎসর পর্য্যন্ত অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে তুলা প্রদান করে। বুড়ী কার্পাসের (বৃক্ষজাতীয় ও গুল্মজাতীয়) চাষই সর্ব্বপ্রথমে বাংলায় প্রবর্ত্তন করা বিধেয়। বৃক্ষজাতীয় বুড়ী কার্পাস সম্বন্ধে অনেকের আপত্তি এই যে, এই কার্পাস গাছ প্রথম দুই-তিন বৎসর কোনরূপ ফল প্রদান করে না।

কিন্তু প্রথম বৎসরে ক্ষেত্রে গুল্মজাতীয় বুড়ী অথবা শ্রেষ্ঠ জাতীয় কোন কার্পাসের চাষ করিয়া সেই জমিতেই ছয় ফুট অন্তর বৃক্ষজাতীয় বুড়ী কার্পাসের বীজ বপন করিলে উপরি উক্ত অসুবিধা দূর হইতে পারে। কারণ গুল্মজাতীয় কার্পাস (যেমন—আমেরিকান, ধারওয়ার বা ইজিপ্‌সীয়ান) তিন বৎসর বাঁচিয়া থাকে। কাজেই প্রথম তিন বৎসরে গুল্মজাতীয় কার্পাস হইতে লাভবান হইতে পারি। ইতি-মধ্যে বুড়ী কার্পাস ক্ষেত্রে স্থায়িভাবে রহিয়া গেল। তিন বৎসর পরে গুল্মজাতীয় কার্পাস উঠাইয়া ফেলিলে আমি স্থায়িভাবে বুড়ী কার্পাসের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে পারিলাম, অথচ প্রথম তিন বৎসর আমাকে বসিয়া থাকিতে হইল না। জলাভাবে উক্ত জেলায় যে প্রান্তরগুলি আজ পর্য্যন্ত বন্ধ্যাবস্থায় পড়িয়া আছে সেগুলিতে আমরা এইরূপ বুড়ী কার্পাস জন্মাইয়া লাভবান হইতে পারি। বুড়ী কার্পাসের সঙ্গে যদি চীনাবাদামের চাষ করা যায় তাহা হইলে জমিতে সারও দিতে হইবে না, উপরন্তু আর একটি ফসলও পাইতে পারি। চীনাবাদামের চাষ করিলে প্রতি বৎসর বুড়ী কার্পাসের একবার ডাল ছাঁটিয়া দেওয়া ছাড়া আর কোন পাইটের আবশ্যক করিবে না। চীনাবাদাম চাষের জন্য মাটি ওলটপালট হইলেই বুড়ী কার্পাসের পাইট হইয়া গেল। ইহা ছাড়া শ্রেষ্ঠ গুল্মজাতীয় (যেমন—ইজিপ্‌সীয়ান, আমেরিকান বা সি-আইল্যাণ্ড) কার্পাসের গুণ যদি বুড়ী কার্পাসে সংক্রামিত করিতে পারা যায় তাহা হইলে অতি অল্পপরিশ্রম ও অল্প খরচে আমরা শ্রেষ্ঠজাতীয় কার্পাস উৎপন্ন করিতে পারিব। কারণ বিদেশীয় উক্ত প্রকারের কার্পাসের আঁশ বুড়ী কার্পাসের অপেক্ষা দীর্ঘতর। বিদেশীয় কার্পাস এখানকার জলহাওয়ায় খারাপ হইয়া যায়, সেই হেতু উহাদের লইয়া শঙ্কর জাতি উৎপন্ন করাই আমাদের একমাত্র পন্থা। এই উপায়ে আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতীয় কার্পাসের সমকক্ষ কার্পাস উৎপন্ন করিয়া প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারি।

মোট কথা বঙ্গীয় কার্পাস সমিতি প্রথমে গুটীকতক আদর্শ কার্পাস কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করুন, এবং ঐ সব প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় বেকার যুবকদিগকে কার্পাস-চাষ শিক্ষা দিন। এই সব যুবকই পরে গ্রামে সমবায় সমিতি গঠন করিয়া কার্পাস উৎপন্ন করিতে থাকুন। এই সব যুবকদিগকে লইয়া গ্রামে গ্রামে প্রচার চলুক। বঙ্গীয় কার্পাস সমিতি তুলা চাষ প্রবর্ত্তন করিবার জন্য এই-সব যুবকদিগকে লইয়া গ্রামে গ্রামে সভা-সমিতির দ্বারা আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের ফলাফল প্রচার করুন, উত্তমজাতীয় বীজ নামমাত্র মূল্যে বিতরণ করুন, চাষ-পদ্ধতি কাগজে প্রকাশ করুন। সঙ্গে সঙ্গে বেকার যুবকদিগের দ্বারা সমবায় কার্পাস কৃষিক্ষেত্র দেশের মধ্যে গড়িয়া উঠুক, তাহা হইলেই সাধারণ লোক এই চাষে ভরসা পাইবে। সমিতির যদি অর্থ সংকুলান হয় তাহা হইলে সাধারণ কৃষকদের মধ্যেও সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন।

উপসংহারে লেখকের বক্তব্য এইটুকু যে, বাংলা দেশে বাঙালীর কাপড়ের মিল যখন হইতেছে তখন কার্পাস বা না-হইবে কেন? আমাদের দেশে অসংখ্য পতিত জমি থাকা সত্ত্বেও এবং তুলা চাষে লোকসান না থাকা সত্ত্বেও কেন আমরা আমাদের দেশের অর্থ-সম্পদ অন্য দেশে মিছামিছি চালান দিব। আমরা যদি বাংলার সমস্ত কাপড়ের চাহিদা মিটাইতে চাই, তাহা হইলে বাংলা হইতে শুধু তুলার জন্য সাত-আট কোটী টাকা প্রতি বৎসরে বাহির হইয়া যাইবে। ইহা সামান্য কথা নহে। তাই বাঙালীকে আমার একান্ত অনুরোধ তাঁহারা কার্পাস উৎপাদনে তৎপর হউন। বাংলার অর্থ-সম্পদ বাড়ান। অন্নহীনের অন্নের সংস্থান করুন।

মাতৃঋণ

শ্রীসীতা দেবী

২৬

বৌকে লইয়া যামিনী আর তরু প্রবেশ করিবামাত্র সমাগত অতিথিদের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। সকলেই প্রায় উঠিয়া দাঁড়াইল, যুবকের দল বেশ খানিকটা অগ্রসর হইয়া আসিল।

যামিনী নীচুগলায় বলিল, "ভারি বিচ্ছিরি লাগে, একরাশ মানুষের মধ্যে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকতে।"

তরু বলিল, "দাঁড়াবার দরকারটা কি? ঐ ত মাঝে বৌ আর বরকে বসাবার জন্তে চেয়ার রয়েছে, চল না ওখানে বৌকে নিয়ে বসাই। অমূল্য বাবু গেলেন কোথায়? একটু এসে টোপর মাথায় দিয়ে বসুন।"

দুজনে বৌকে লইয়া গিয়া বসাইল। অমূল্যের বন্ধু-বান্ধবের দল তাহার নাম ধরিয়া মহা চেঁচামেচি জুড়িয়া দিল। খানিকপরে তাহাকে পাওয়া গেল। তবে বাড়ীতে লোক কম, বরকেও বোধ হয় কোনো কাজে ভিড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহার বেশ ভূষার অবস্থা মোটেই বরোচিত নয়। সকলে এ বিষয়ে এত মন্তব্য সুরু করিল যে হঠাৎ সুধা ছুটিয়া আসিয়া দেবরকে হিড়হিড় করিয়া বাড়ির ভিতরে টানিয়া লইয়া গেল। যাইবার সময় মুখ ফিরাইয়া বলিয়া গেল, "দাঁড়াও এখনি বর সাজিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

একজন যুবক তরু এবং যামিনীকে বসিবার জন্ত দুখানা চেয়ার অগ্রসর করিয়া দিল। বউ দেখিবার জন্ত চারিদিক হইতে লোক ভিড় করিয়া ঠেলিয়া আসিতে লাগিল, উপহারও দুচারটা বৌয়ের হাতে পড়িল, সে আবার তাড়াতড়ি সেগুলি সঙ্গিনীদের হাতে গছাইয়া দিতে লাগিল। তরু ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "গিন্নি-বান্নী কেউ একজন সঙ্গে এলেই ভাল হত। এর দু চারটে হারিয়ে গেলেই গেছি আর কি? বলবে শেষে যে আমি নিজেই মেরে দিয়েছি।"

যামিনী বলিল, "যাঃ, তাই নাকি আবার কেউ বলে!"

তরু বলিল, "নাঃ, তা কি আর বলে? সেদিন নাতাদিদের বাড়ী যা গল্প শুন্‌লাম ভদ্রসমাজে চুরির তা তোকে কি বল্‌ব। এই সব বিয়ে বৌভাতেই ত চুরি বেশী হয়। প্রেজেণ্ট দেখার নাম করে সব ঝেঁটিয়ে ঘরে ঢোকে, তার পর কাপড়-চোপড়, শাল আলোয়ানের তলায় দুচারটে ছোটখাট জিনিষ কি যায় না ভাবিস্? ভদ্রলোক যদি নাও করে, ভদ্রবেশধারী চোর ঢুকতে কতক্ষণ? সব অতিথিদের ত আর পাস্‌পোর্ট দেখে ঢোকান হয় না?"

এমন সময় বর সাজিয়া গুজিয়া আসিয়া বৌয়ের পাশে বসিল। বরের যুবক বন্ধুরা এতক্ষণ যদি বা একটু সসম্ভ্রমে দূরে দাঁড়াইয়া ছিল, এখন স্বজাতীয় মানুষ দেখিয়া সকলে হুড়মুড় করিয়া সামনে আসিয়া পড়িল। বয়োজ্যেষ্ঠদের কান বাঁচাইয়া রসিকতা করাও সুরু হইয়া গেল।

কে একজন প্রকাণ্ড দুই তোড়া ফুল আনিয়া বর-কনের সামনে দাঁড়াইল। বাছা বাছা সুন্দর বহুমূল্য জিনিষ। সুগন্ধে স্থানটি যেন আমোদিত হইয়া উঠিল। কনের হাতে একটি তোড়া দিয়া আর একটি বরের হাতে দিতে যাইবা মাত্র সে বলিয়া উঠিল, "আমার কেঠো হাতে দিয়ে অমন সুন্দর ফুলের অপমান করো না, যাঁর হাতে মানাবে তাঁকেই দাও," বলিয়া সে দুষ্টামি করিয়া যামিনীকে দেখাইয়া দিল।

অমূল্যের সঙ্গে যামিনীর বাল্যকাল হইতে পরিচয় আছে, তবু এ হেন রসিকতা সে বিশেষ পছন্দ করিল না। লোকের চোখে পড়িতে এখন তাহার বড় ভয়। আহত পশুর মত মাথা লুকাইয়া থাকিতে পাইলেই সে যে

বাঁচিয়া যায়। তাহাকে কেহ যেন আর তাকাইয়া না দেখে।

"কি যে করেন অমূল্য দা!' বলিয়া সে পাশ কাটাইবার একটু চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু উপহারদাতা ফুলের তোড়া ততক্ষণ তাহার হাতের উপর একেবারে আনিয়া ফেলিয়াছে, কাজেই যামিনীকে বাধ্য হইয়া সেটা হাতে লইতেও হইল, এবং দাতার দিকে একবার তাকাইয়া দেখিতেও হইল।

অতি সুদর্শন যুবক, যেমন গায়ের উজ্জ্বল রং, তেমনি সুন্দর নাক মুখ। অমূল্য আবার তাড়াতাড়ি পরিচয় করাইয়া দিল, "ইনি কুমারী যামিনী সরকার, ইনি শ্রীযুক্ত সুরেশ্বর রায়।"

যামিনীর লোকজনের সঙ্গে আলাপ করা বড় একটা অভ্যাস ছিল না। অবিবাহিত যুবক-যুবতীর মেলামেশা করার জ্ঞানদা মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। ইহাতেই জগতে যত গোলমালের সৃষ্টি হয়। তবু আরক্তমুখে একটা নমস্কার যামিনী কোনো-রকমে একটা সারিয়া লইল। এমন স্থানে কথোপকথন করিবার চেষ্টা করা বৃথা জানিয়া যুবকও সরিয়া গেল।

যামিনী ফুলের তোড়াটা তরুর হাতে ঠুশিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, বলিল, "এটা একটু ধর না ভাই।"

তরু দুষ্টামি করিয়া বলিল, "আমি বউয়েরটাও ধরব তোরটাও ধরব? বেশ বাবা চিনির বলদ পেয়েছ!"

যামিনী মুখখানা আরও একটু লাল করিয়া বলিল, "আহা, চিনির বলদ আবার কি? আমারটাও ত আসলে অমূল্যদার, আমার ত নয়?"

তরু বলিল, "আসলে যারই হোক, তোর হাতে দিতে পেয়ে ভদ্রলোক বর্তে গিয়েছে। বেশ হল, একটা বৌভাতে আর একটা বিয়ের জোগাড় হয়ে রইল।"

"কি যে বলিস্ তার ঠিক নেই," বলিয়া যামিনী ফুলের তোড়াটা এক রকম জোর করিয়াই তরুর হাতে গুঁজিয়া দিল। তাহার চোখে প্রায় জল আসিয়া পড়িয়াছিল।

খানিক পরে একটু সামলাইয়া লইয়া সে আবার মুখ তুলিল। সুরেশ্বর অল্প একটু দূরেই দাঁড়াইয়াছিল এবং যামিনীর দিকেই তাকাইয়াছিল। যামিনী আবার মুখ ফিরাইয়া লইল। বউ সভাস্থলে বেশীক্ষণ বসিল না। খানিক পরেই সুধা আসিয়া তাহাদের উঠাইয়া লইয়া গেল। যামিনী এতক্ষণে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

তরু ভিতরে ঢুকিয়াই চীৎকার করিয়া জ্ঞানদাকে ফুলের তোড়ার বৃত্তান্ত শুনাইতে বসিল। তিনি শুনিয়া খুসি হইলেন কি বিরক্ত হইলেন, ঠিক বুঝা গেল না। গম্ভীরভাবেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুরেশ্বর রায় আবার কে?"

সুধা বলিল, "ওমা, ওদের নাম শোনো নি? সম্ভবতঃ জমিদার যে? সেদিন বাপের অত বড় সম্পত্তি পেল দুই ভায়ে? ছোট ভাইটা ত একেবারে বাচ্চা, স্কুলে পড়ে। আমাদের বাড়ীর কাছেই বাড়ী নিয়ে রয়েছে। আমার বসবার ঘরের জান্‌লা থেকে দেখা যায়।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "ছোট ছেলের নাম শিশির নাকি? খোকার সঙ্গে পড়ে, খোকা খুব গল্প করে। পণি খোড়া নাকি দেখতে যাবে বলে আজও জেদ করছিল।"

সুধা বলিল, "এই হবে, ছোট ছেলেটার ভাল নাম কি তা জানি না, বুড়ো বুড়ো বলে ডাকে।"

জ্ঞানদা আবার চুপ করিয়া গেলেন। সুধা তাঁহার কাণের কাছে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "দেখ না একবার। এখনও ত সুরেশ্বর রায়ের বিয়ে হয় নি? নিজেই কর্ত্তা।"

জ্ঞানদা বিশেষ কোনো উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, "তুমিও যেমন বাছা। ওরা আমার মেয়ে নিতে চাইবে কেন? হিন্দুসমাজের মানুষ। তা ছাড়া ও নিজে কর্ত্তাই বা কিসে? মা রয়েছে ত?"

সুধার বেশী গল্প করিবার সময় ছিল না। মেয়েদের এইবার পাত পাড়িবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মেয়েদের হইয়া গেলে তবে বাবুদের খাওয়া। সে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "কিসের? মা আছে ঐ নামে মাত্র। কারো সাতেও নেই পাঁচেও নেই। স্বামী মরে গিয়ে অবধি কারো সঙ্গে কথা কওয়া অবধি বন্ধ করে দিয়েছে। শুনছি নাকি শীগ্‌গিরই কাশী চলে যাবে। ছেলেরা ত যা খুসি করে বেড়ায়।"

জ্ঞানদা কিছু বলিলেন না। মেয়েদেরও অল্প পরেই খাইবার ডাক পড়িল ছাতের উপর। সকলে উঠিয়া চলিয়া গেল।

বাড়ি ফিরিবার সময় যামিনীরা সকলে যখন গাড়ী চড়িতেছে, তখন তরু হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া গাড়ীর ভিতর ফুলের তোড়াটা রাখিয়া দিল। "তোর জিনিষ ফেলে যাচ্ছিস্ যে বড় ?"

যামিনী কোনো উত্তর দিল না। জ্ঞানদা তোড়াটা গাড়ীর এক কোণে গুঁজিয়া রাখিয়া দিলেন। মিহির বলিল, "ওটা আবার দিদিকে কে দিল ?"

জ্ঞানদা বলিলেন, "সব খবরে ছেলের প্রয়োজন। যে-ই দিক না, তোর কি ?"

বাবাও সেই গাড়ীতে বসিয়া, কাজেই মিহিরের জবাব দিবার বিশেষ সুবিধা হইল না। "হুঁ," করিয়া চুপ হইয়া গেল।

যামিনী গাড়ী হইতে নামিয়াই একছুটে উপরে উঠিয়া গেল। জ্ঞানদা যতক্ষণে একটা একটা করিয়া সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া দোতলায় উঠিলেন ততক্ষণে তাহার ঘরের দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মেয়েকে দুই চারটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা জ্ঞানদার ছিল, কিন্তু যামিনীর আর সে রাত্রে নাগাল পাওয়া গেল না।

সকালে সে যখন চা খাইতে নামিল, তখন নিয়মমত মা ও বাবাতে তর্ক লাগিয়া গিয়াছে, বিষয় চেঞ্জে যাওয়া। যামিনী কোনোদিনই মা বাবার কথার মধ্যে কথা বলে না, আজ কিন্তু কেন জানি না সে একটু অন্য পথ ধরিল। কথাটা হইতে ছিল তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধেই। সে হঠাৎ জ্ঞানদার কথার বাধা দিয়া বলিয়া বসিল, "আমার শরীর এখানেই ত বেশ আছে, শুধু শুধু বাইরে গিয়ে একগাদা টাকা খরচ।"

জ্ঞানদা অবাক হইয়া গেলেন। মেয়ের দেখি সকল দিকেই পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। তিনি বলিলেন, "নিজের শরীরের ভালমন্দ তুমি ত ঢের বোঝো কি না ? তা হলে আর এ দশা হয় ?"

যামিনী বলিল, "সমস্ত দিন ঘরের কোণে বসে থাকি তাই। আমায় আবার স্কুলে যেতে দিলে অনেক ভাল হয়।"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "সেটা সত্যি। আচ্ছা গরমের ছুটির পর আবার স্কুলেই যাস্।"

জ্ঞানদা চটিয়া উঠিলেন। তাঁহার মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়া এ বাড়িতে যাহা কিছুই হইত, সেইটাকেই তিনি নিজের সম্বন্ধে অপমানজনক মনে করিতেন। বলিলেন, "থাক, তোমাদের আর অত বিলিব্যবস্থা করতে হবে না, তারপর তাল সাম্‌লাতে আমার প্রাণ বেরবে। এই শরীর নিয়ে নাকি ইস্কুলে যাবে। আগে শরীর সারুক তারপর ও সব কথা।"

যামিনী আর কথা বলিল না। নৃপেন্দ্রবাবুও চায়ের পেয়ালা শেষ করিয়া উঠিয়া গেলেন।

স্কুলে তাহাকে যাইতে দেওয়া হোক বা নাই হোক, যামিনী বই খাতাপত্র আবার দেরাজ হইতে টানিয়া বাহির করিল। পড়াশুনা নিজেই সুরু করিয়া দিল। যে মহিলা তাহাকে পিয়ানো এবং ফ্রেঞ্চ শিখাইতেন তাঁহাকেও চিঠি লিখিয়া জানাইল যে সে আবার পড়িতে চায়। জ্ঞানদা বিরক্তই হইলেন, মেয়ের বা ছেলের স্বাধীনতাকে তিনি সর্ব্বদাই অবাধ্যতা আখ্যা দিতেন, কিন্তু ঠিক কি বলিয়া আপত্তি করিবেন বুঝিতে পারিলেন না।

মিহির সারা দুপুর বাড়িতে বন্দী অবস্থায় ছট্‌ফট্ করিয়া কাটাইয়া বিকালে একটু রোদ পড়িতে আরম্ভ করিবামাত্র ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। জ্ঞানদা মেয়েকে বলিলেন, "চল না একটু ঘুরে আসি, ঘোড়াটা ত বসে বসে শুধু মোটা হচ্ছে।"

যামিনী পড়িতেছিল। মুখ তুলিয়া বলিল "কোথায় যাবে ?"

জ্ঞানদা বলিলেন, "চল না সুধাদের বাড়ি কাল গোলমালে তাদের সঙ্গে কোনো কথাই হল না।"

যামিনী নিরুৎসাহভাবে বলিল, "কারুর বাড়ি গিয়ে বসে থেকে কি লাভ হবে ? তার চেয়ে খোলা হাওয়ায় ঘুরে এলে ঢের ভাল লাগে।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "সব কথায় আপত্তি করাই ত তোমার এখন রোগ দাঁড়িয়ে গিয়েছে। একদিন তোমাদের ভালমন্দ সব আমিই ভেবেছি, এখন তোমরা

নিজেরা ভার নিতে চাও নাও, পরে আমাকে যেন নিমিত্তের ভাগী করতে এস না।"

একটু খোলা হাওয়ায় বেড়াইতে চাওয়া হইতে এতবড় কথা কোথা হইতে আসিল, বেচারী যামিনী তাহা ভাবিয়াই পাইল না। মায়ের মেঘাচ্ছন্ন মুখের দিকে তাকাইয়া বিষন্নভাবে বলিল, "আচ্ছা চল, তুমি যেখানে যেতে চাও।"

জ্ঞানদা প্রসন্ন হইয়া চলিয়া গেলেন। যামিনী বইখাতা আবার গুছাইয়া রাখিয়া চুল বাঁধিতে সাজসজ্জা করিতে উঠিয়া গেল।

মিহির আগেই পালাইয়াছে, নৃপেন্দ্র বাবু স্ত্রীর সহিত বেড়াইতে যাওয়া যথাসাধ্য এড়াইয়া চলেন, সুতরাং মা ও মেয়েই শুধু চলিলেন। সুধাদের বাড়ি পৌঁছিতে বেশী বিলম্ব হইল না।

উৎসাবাস্তে বাড়িটা কেমন যেন শ্রীহীন হইয়া আছে। সামনের লনে কয়েকটা কুলি সামিয়ানা খুলিতেছে, ফুল-পাতার মালা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে। গেটের পত্রাভরণও ম্লান হইয়া ঝুলিতেছে। বাসি খাবার পাইবার লোভে কয়েকটা ভিখারী সদর দরজার কাছে বসিয়া একঘেঁয়ে নাকি সুরে আবেদন জানাইয়া চলিয়াছে!

জ্ঞানদা ও যামিনী নামিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। আত্মীয়স্বজন এখনও দুই চারিজন রহিয়াছেন, বাড়ি একেবারে খালি হইয়া যায় নাই। তবে সকলেই অতিরিক্ত পরিশ্রমের পর শ্রান্ত ক্লান্ত। সুধা তখন খাবার ঘরে বসিয়া সবে চা ঢালিবার আয়োজন করিতেছে। অভ্যাগতদের দেখিয়া সেইখানেই অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল, চা খাইতেও অনুরোধ করিল।

জ্ঞানদা বলিলেন, "না, না, আর চা টা খেয়ে কাজ নেই, এই ত একগাদা গিলে বেরিয়েছি। যা গরম পড়েছে, আর কি মানুষের খাওয়ার রুচি আছে?"

সুধা বলিল, "যামিনী খাক্ না একটু? সে-ও কি এই বয়সে নিখাকীর দলে ভর্ত্তি হয়েছে? জ্ঞানদা বলিলেন, "আসল নিখাকী ত ওরাই? ওদের কাছে ধন্না দিয়ে পড়ে থাকলেও খাওয়ান যায় না। বুড়ো মানুষের খাওয়া জোর করে থামাতে হয়, আর এদের জোর করে খাওয়াতে হয়।"

খাওয়ার আলোচনা সুরু হইলে যামিনীর অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হইত। সে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "বৌ কোথায়? তোমাদের নূতন বৌ?"

সুধা বলিল, "উপরে রয়েছে। কাল শুতে ত একটা বেজে গেল। তাই আজ দিনের বেলা তার শোধ তুলছে।"

"যাই, তাকে একটু দেখে আসি", বলিয়া যামিনী চায়ের টেবিল হইতে উঠিয়া গেল। জ্ঞানদা আর একটু গুছাইয়া বসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, দাও না হয় এক পেয়ালা—যদিও ডাক্তারে আমাকে চা বেশী খেতে বারণ করেছে।"

সুধা তাঁহার দিকে এক পেয়ালা চা ও ছোট এক প্লেট খাবার অগ্রসর করিয়া দিল। জ্ঞানদা আর আপত্তি না করিয়া সেগুলির সদ্গতি করিতে বসিলেন।

সুধা একটা চাকরকে ডাকিয়া বাড়ির আর সকলকে খবর দিতে উপরে পাঠাইয়া দিল। বলিল, "একটু নিজেরা যে খেতে এসে বাধিত করবেন, তাও কারুর দ্বারা হবে না। ঝক্‌মারি বাবা, এ ঘর-সংসার করা।"

জ্ঞানদা একটু হাসিয়া বলিলেন, "তা বল্‌লে কি চলে? আবার ঘর সংসার যতক্ষণ না হয় ততক্ষণও ত ছট্‌ফট্ করতে হয়। দুনিয়ায় যার যা কাজ।"

সুধা বলিল, "মেয়ের বিয়ের ভাবনা খুব ভাবছো বুঝি?"

জ্ঞানদা বলিলেন, "তা মেয়ে থাকলেই ভাবতে হয়। কিন্তু শুধু ভেবে কি করব? পাঁচজনে সাহায্য না করলে কি এ সব কাজ হয়? ওঁকে ত জানই, তাঁকে দিয়ে সংসারের একটা কাজ হবার জো নেই। একলা মানুষ আমাকে সব দিক সাম্‌লাতে হয়।"

সুধা বলিল, "তোমার অমন রাজকন্যার মত সুন্দরী মেয়ে, তার আবার বিয়ের ভাবনা। যাকে বল্‌বে, সেই লুফে নেবে।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "হ্যাঁ, তেমনি আমাদের দেশ কিনা? এখানে কি লোকে সুন্দর, কুৎসিত, ভালমন্দ

দেখে? দেখে শুধু টাকা। তা না হলে সত্যিই মেয়ে আমার কিছু দেখতে মন্দ নয়।" যথাসাধ্য সুশিক্ষাও দিয়েছি।"

সুধা কণ্ঠস্বর নামাইয়া বলিল, "যা বলেছ। এই দেখ না আমার গুণধর দেওর কেমন বিয়ে করে আন্‌লেন, কাউকে জিগ্‌গেষ শুদ্ধ করলেন না। কি, না বউয়ের বাপের কাঁড়িখানিক টাকা আছে, তবু যদি হাড়-কিপ্পন না হত। বিয়েতে মেয়েকে জিনিষ পত্তর যা দিয়েছে, দেখ্‌লে লোকে হাস্‌বে।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "সে যা হবার তা হয়ে গেছে, তা নিয়ে কথা বলে লাভ কি? তোমাকে কিন্তু ভাই আমার জন্যে একটি কাজ করতে হবে। নিজের ছোট বোনের মত মনে করি তাই বল্‌ছি।

সুধা বলিল, "পারলে নিশ্চয়ই করব, তার জন্যে আবার অত করে বল্‌তে হবে কেন তোমাকে?"

জ্ঞানদা বলিলেন, "ঐ সুরেশ্বর ছেলেটি বেশ। ওর সঙ্গে একবার চেষ্টা করে দেখতে চাই। কি করে আলাপ করা যায় বল্‌তে পার? ছোট ছেলেটার সঙ্গে অবিশ্যি খোকার খুব আলাপ আছে, কিন্তু তাকে দিয়ে কি আর সুবিধা হবে?"

সুধা পরম বিজ্ঞের মত মুখ করিয়া বলিল, "না, না, ও সব ছেলে ছোকরার কাজ নয়। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক। সামনের রবিবারে যারা যারা বৌভাতে খেটেছে, তাদের খাওয়ান হবে। তোমাদের ত ডাকতামই, সুরেশ্বরদের দুই ভাইকেও না হয় বলা যাবে। সেদিন লোকজন কমই থাকবে, দিনের বেলা খাওয়া, আলাপ পরিচয়ের বেশ সুবিধে হবে। তারপর একদিন বাড়িতে ডেকো এখন।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "সেই ভাল। হট্ করে আগেই নিজের বাড়িতে ডাকলে, এখনি দশ কথা উঠবে। সেটা আমি চাইনা। ওতে মেয়ের মন বিগ্‌ড়ে যেতে পারে, ছেলেটাও আদিখ্যেতা ভাববে। মেয়ের মা বাপকে নীচু একটু ত হতে হয়ই, তবু যতটা কমের উপর দিয়ে যায়, ততই ভাল।"

সুধা বলিল, "আদিখ্যেতা আবার কিসের? তাই বলে মানুষ মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করবে না? এই আমাদের বুড়ীকে দেখ না? ধেড়ে হয়ে গেল, এখন অবধি বিয়ের নাম নেই। কেউ এসে পায়ে ধরে না সাধলে তিনি বিয়ে করবেন না। সংসারটাকে উপকথা মনে করেছে এরা।"

২৭

রবিবারে নিমন্ত্রণে যাওয়া লইয়াও স্বামীর সঙ্গে জ্ঞানদার একপালা খিটিমিটি বাধিয়া গেল। নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "মেয়েকে মানুষ করেছে একেবারে মেমসাহেবী আদর্শে, এখন বিয়ে দিতে চাও পাড়াগাঁয়ের জমিদারের বাড়ি, এটা কি রকম হবে? মেয়ে তাদের সঙ্গে মানিয়ে চল্‌তে পারবে?"

জ্ঞানদা বলিলেন, "সব কিছুতে গোড়াতেই কুডাক ডাকা তোমার নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোথায় বিয়ে তার ঠিক নেই, আগেই মেয়ে গোবর লেপ্‌তে, ধান ভান্‌তে পারবে কিনা, তার ভাবনা পড়ে গেল।"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "বিয়ে হোক এই আশা করেই যখন তুমি আলাপ পরিচয় করতে এগোচ্ছ, তখন এগুলো ভাবতে হবে না? নিজের অহঙ্কার যতই কেন না তোমার পরিতৃপ্ত হোক, মেয়ের সুখ কিসে হবে সেইটাই আসলে ভেবে দেখবার জিনিষ।"

জ্ঞানদা রীতিমত ঝাঁঝিয়া উঠিলেন, "আমি কথাটা তুলেছি বলেই এখন এত সব আপত্তি বেরচ্ছে না হলে কেউ টুঁ শব্দও করত না। এর বেলা পাড়াগেঁয়ে বলে মহা চিন্তা, আর সেই কেলে চিম্‌ড়ে হাঘরে মাষ্টার ছোঁড়ার বেলা এ সব ভাবনা কোথায় ছিল? সে বুঝি বিলেতের লর্ড, আর টাকায় বুঝি তার বাপ ডাকছিল?"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তার কথা আলাদা। মানুষ ভালবাসার খাতিরে সহ্য না করতে পারে এমন কি আছে জগতে? তা ছাড়া, সে বিলেত গিয়ে শিক্ষিত হয়েও আস্‌তে পারত।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "সে বিলেত যেতে পারত আর এ পারে না! তোমার সব গা-জুরী কথা।"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "এ যেতে চাইবেই যে তার মানে কি? ওরা ত সেধে বিয়ে করতে আসছে না যে তুমি যা বলবে তাতেই রাজী হবে? তুমিই যাচ্ছ সেধে মেয়ে দিতে, ওদের দাবিই তোমাকে রাখতে হবে। ওরা যদি হিন্দুমতে বিয়ে দিতে চায়, তখন তুমি কি তাতেই রাজী হবে?"

জ্ঞানদা বলিলেন, "আচ্ছা, আগে কথাই পাড়া হোক, তারপর হিন্দুমত কি মুসলমান মত তখন দেখা যাবে। ছেলে নিজেই কর্ত্তা, মেয়েকে পছন্দ হলে, সে মতামত নিয়ে অত হাঙ্গাম করবে না। ও-রকম আমি ঢের দেখেছি। এই ত শশীবাবুর মেয়ে বনলতার হল না বিয়ে? তারা ত গোঁড়াহিন্দু, কিন্তু ছেলে ব্রাহ্মমতে বিয়ে করল ত?"

তাঁহার স্বামী বলিলেন, "তুমি ভাল করে ভেবে দেখছ না, যেমন তোমার স্বভাব। নিজের ছেলেমেয়ে সামান্য কিছুতে তোমার বিরুদ্ধাচরণ করলে তুমি রেগে আগুন হয়ে ওঠ, অথচ পরের ছেলে নিজের মা বাবার বিরুদ্ধাচরণ করুক এটা তুমি কামনা কর কেন? এ-ছেলেও একেবারে নিজেই নিজের কর্ত্তা নয়। বাবা না থাকুন, এর মা এখনও বর্ত্তমান রয়েছেন। তিনি নানা-কারণে আমাদের মেয়েকে বউ করতে না চাইতে পারেন।"

জ্ঞানদা সগর্জ্জনে বলিলেন, "তোমার তাহলে মতলবখানা কি শুনি? মেয়ে নিজের ইচ্ছামত মুচি মুদ্দফরাসের গলায় মালা দেবে, না চিরজন্ম আইবুড়ী থুবড়ী হয়ে বসে থাকবে?"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "এ ছাড়াও অন্য পন্থা থাকতে পারে, কিন্তু তুমি তা ত এখন চোখে দেখতে পাবে না। মেয়ের অদৃষ্টে দুঃখ আছে, তা আমি বুঝতে পারছি। তোমার একবার জেদ চাপলে স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মাও তোমাকে থামাতে পারবেন না।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "তা বেশ ত, মেয়ে তোমার, তুমি বিয়ে দিতে না চাও তা আমারই বা কি এত মাথা ব্যথা? থাক তবে, আমি সুধাকে লিখে দিচ্ছি, আমার শরীর খারাপ, আমি নেমন্তন্ন খেতে যেতে পারব না।"

নৃপেন্দ্রবাবু তর্কই করিতেন, কার্য্যে স্ত্রীর বিপক্ষে দাঁড়ান, কোনোদিনই এই দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের বিবাহিত জীবনের ভিতর ঘটিয়া উঠে নাই, আজও ঘটিল না। তিনি উঠিয়া চলিয়া গেলেন। জ্ঞানদা নিজের মনে খানিকক্ষণ গজর গজর করিয়া নিজের কাজে প্রস্থান করিলেন।

যামিনী ব্যাপারটার একটু একটু আঁচ পাইতেছিল, কিন্তু নিজের দুর্ব্বলতা, অক্ষমতা সে ভাল করিয়াই জানিত, কিছু বাধা দিবার বা প্রতিবাদ করিবার কোনো চেষ্টা করিল না। প্রতাপের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর তাহার শরীর মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, নিজের সুখদুঃখ সম্বন্ধেও সে এক রকম উদাসীন হইয়া উঠিয়াছিল।

রবিবারের সুধাদের বাড়ি যাইতে তাহার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু জ্ঞানদার বাক্যবাণের খোঁচাকে সে সর্ব্বাপেক্ষা ভয় করিত, কাজেই আপত্তি জানাইতে সাহস করিল না। মায়ের নির্দ্দেশমত স্নান করিয়া কাপড়-চোপড় পরিতে গেল। জ্ঞানদা একবার আসিয়া তদারক করিয়া গেলেন, "এমন মেয়ে পেলে নাকি আবার ছেলে অমত করবে? এত যে শরীর খারাপ, তবু যা চেহারা আছে, কলকাতা উল্টে ফেললে এর জুড়ি বেরবে না।"

মিহির প্রথমে যাইতে চাহিল না। বলিল, "আমি মোটে পরিবেশন করিই নি ত খেতে যাব কেন? সবাই তারপর লোভী বলে আমাকে ক্ষ্যাপাক আর কি? তোমরা যাচ্ছ ত হ্যাংলার মত?"

জ্ঞানদা ধমক দিয়া বলিলেন, "চুপ কর্, যত বড় মুখ নয় ছেলের ততবড় কথা। হ্যাংলার মত যাচ্ছি! কেন আমরা কি বাড়িতে খেতে পাই না নাকি? তোমার প্রাণের বন্ধু শিশিরও ত যাচ্ছে। সেও হ্যাংলা তাহলে, তার দাদাও হ্যাংলা।"

মিহির চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "খাওয়া হয়ে গেলেই যদি ওদের বাড়ি যেতে দাও ঘোড়ায় চড়তে তা হলে যাব। তা না হলে না।"

শিশিরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিবার জন্যই যাওয়া আজ, সুতরাং জ্ঞানদা আপত্তি করিলেন না। বলিলেন, "বেশ

ত, হাত পা না ভাঙলে তোমার যদি ভাল না লাগে, তাই ভাঙতে যেও এখন।"

নৃপেন্দ্রবাবু নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন না অবশ্য, কিন্তু কখন খাইয়া, কখন যে প্রস্থান করিলেন, তাহা জ্ঞানদাও জানিতে পারিলেন না। সুধা বলিল, "ভাল মানুষ যা হোক তোমার কর্তা জ্ঞানদাদি। বলে যার বিয়ে তার খোঁজ নেই, পাড়াপড়সীর ঘুম নেই, এ হয়েছে তাই। তবু ধরে ভদ্রে সুরেশ্বরের সঙ্গে উনি পরিচয়টা করে দিয়েছেন। না হলে তুমি ডাকতেই বা কি করে?

জ্ঞানদা বলিলেন, "বাঁচিয়েছ ভাই। সত্যি এমন মানুষ নিয়ে, আমার সকল দিক দিয়ে হাত পা বাঁধা। সাহায্য ত কিছু হবেই না, কি করে কাজ মাটি করবেন এই ভাবনা ভাবতেই আছেন।"

সুধা বলিল, "কাকে আর বলছ বাপু, ওসব আমার ঢের দেখা আছে। বাবারই জাতভাই আর কি? দেখছ না আমাদের বুড়ীর দশা? যেমন বাবা, মা-ও ত তেমনই? নিতান্ত আমি একেবারে লক্ষ্মীছাড়া স্বভাবের তাই ও বাড়ির বেড়া ভেঙে বেরিয়েছি। বুড়ী এখনও আকাশের তারা গুনছে।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "সত্যি বাপু, বাপ মায়ের মেয়ের বিয়ের ভাবনা নেই, এ এক এঁদেরই দেখেছি। মেয়ে যেন ঘরে পুষে রাখতে পারলে বত্তে যায় সব।"

এমন সময় অমূল্যের সঙ্গে সুরেশ্বর আসিয়া বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল। অমূল্য বলিল, "সুরেশ্বরকে আমি রাজধানীর সব দ্রষ্টব্য জিনিষ দেখাবার ভার নিয়েছি বৌদি, অতএব বুঝতেই পারছ।"

সুধা বলিল, "বুঝতে ত পারছি। দাঁড়াও দ্রষ্টব্যটিকে খুঁজে আনি," বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

অমূল্য জ্ঞানদার সঙ্গে সুরেশ্বরের আলাপ করাইয়া দিল। তিনি শিশিরের সঙ্গে মিহিরের যে কি প্রকার গলায় গলায় ভাব, সেই বিষয়ে গল্প জুড়িয়া দিলেন, সুরেশ্বরের পরিবার পরিজনের খোঁজ-খবরও ঐ সূত্রে অনেকখানি জানিয়া লইলেন।

সুধা যামিনীকে দোতলা হইতে খুঁজিয়া লইয়া আসিল। অনাত্মীয় যুবকের সহিত আলাপ করার অভ্যাস যামিনীর বিশেষ নাই। তাহা ছাড়া এ ক্ষেত্রে মায়ের যে কি মতলব তাহা সে খানিকটা জানিতই। ঘরে ঢুকিতে না ঢুকিতেই তাহার সুন্দর কোমল মুখখানি গোলাপ ফুলের মত লাল হইয়া উঠিল।

অমূল্য পরিচয় করাইয়া দিল, "ইনি কুমারী যামিনী সরকার, আমাদের সমাজের উজ্জ্বলতম রত্ন, আর ইনি সুরেশ্বর রায়, আমাদের হতভাগা জাতের একজন।"

যামিনী নমস্কার করিয়া মায়ের পাশে বসিয়া পড়িল। জ্ঞানদা রসিকতা যে খুব পছন্দ করিতেন তাহা নয়, তবে আজ তিনি সব কিছুই পছন্দ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আসিয়াছিলেন। বলিলেন, "অমূল্যর কথা শুনলে মানুষের হয়ে আসে। এতও হাসাতে পারে। এবার কর্তা মানুষ হলে বাছা, একটু ভারিক্কি হতে শেখ।"

সুধা বলিল, "সে আর ওর দ্বারা এ জন্মে হবে না। ছোটবৌ ত ওর রকম সকম দেখে হাঁ হয়ে গেছে। ও-বাড়িতে বোধহয় খুব ভাণ করে গম্ভীর হয়ে থাকত, এখন নিজ মূর্ত্তি ধরেছে।"

অমূল্য বলিল, "গম্ভীর হলেও বিপদ, হাসলেও বিপদ। কোনদিকে যে যাই। আচ্ছা যামিনী, তোমার কি রকম মানুষ পছন্দ। পেঁচার মত গম্ভীর?"

যামিনী হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "না।" সুধা বলিল, "না না, যামিনী খুব হাসিখুসি পছন্দ করে। ছোটবেলা মনে নেই জ্ঞানদা দি? কারো মুখ ভার দেখলেই কান্না জুড়ে দিত। আমার একটা নর্সারী রাইম্‌স্ ছিল, তার মলাটের উপর একটা বুড়োর ছবি, সে হেসেই খুন হচ্ছে। সে বইখানা এক বার যামিনীর হাতে ধরিয়ে দিলেই হত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করে বসে থাকবে।

জ্ঞানদা বলিলেন "ওমা, সে কথা সুধার এখন মনে আছে? সত্যি ছবিটা খুকী বড় ভাল বাসত। বড় হয়ে যখন পেন্টিং শিখল মেমের কাছে, তখন ঐ বুড়োর ছবিখানা মন থেকে এঁকেছিল। বেশ হয়েছিল সেটা"।

সুরেশ্বর যামিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি পেন্টিং খুব করেন বুঝি?"

যামিনী বলিল, "না, বেশী আর কই? কয়েক খানা মাত্র করেছি।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "সময় পায় কখন? পড়া নিয়েই ব্যস্ত। তবু পনেরো কুড়িখানা এঁকেছে। একখানা ঝরণার ছবি সে বছরের এক্‌জিবিশনে দিয়ে সোনার মেডেল পেয়েছিল। ওদের মেম বলে,ও যদি আঁকাতে মন দেয় ত খুব ভাল আর্টিষ্ট হতে পারে।"

অমূল্য বলিল, "সুরেশ্বর একজন মস্ত কলেক্টার তা জান না বুঝি যামিনী? একদিন ওকে তোমার ছবিটবি ভাল করে দেখাও। চাই কি দুচারখানা কিনেও ফেল্‌তে পারে।"

সুরেশ্বর কিছু বলিবার আগেই জ্ঞানদা বলিলেন, "তা যাবেন বৈ কি একদিন, যখন আলাপ পরিচয় হল। সামনের শনিবার বিকেলে আমাদের ওখানে গিয়ে চা খেলে আমরা খুব খুসি হব।"

সুরেশ্বর বলিল "নিশ্চয়ই যাব।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "আপনার ছোট ভাইটিকেও নিয়ে আসবেন। তার সঙ্গে আমার ছেলের ভারি ভাব। শিশিরের গল্প আরম্ভ হলে সে আর থামতে চায় না।"

সুরেশ্বর বলিল, "শিশিরও মিহিরের বেজায় ভক্ত।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "আপনার মা এখানে আছেন ত?"

সুরেশ্বর বলিল, "হ্যাঁ, বাবা মারা যাবার পর কেউ আর গ্রামের বাড়িতে ফিরতে পারিনি, সকলেই এখানেই রয়েছি।"

জ্ঞানদা আন্দাজে ঢিল মারিয়া বলিলেন, "তিনিও যদি অনুগ্রহ করে আসেন, তাহলে বড় খুসি হব আমরা।"

সুরেশ্বর অপ্রতিভ ভাবে বলিল, "তিনি ত কোথাও বেরন না। আত্মীয়স্বজনের বাড়ি শুদ্ধ যান না।"

ক্রমশঃ

বোধনার ব্যথা ও বোধনার কথা

শ্রীগিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়



শিল্পী শ্রীযুক্ত অরবিন্দ দত্ত

বাছারে!

পথের প্রদীপ তাও জলে না কো,
(তোর) পথ যে কোথাও নাই,

আঁধারের পর আঁধার ঘিরেছে,
(তোর) কোথাও নাহি যে ঠাঁই

সুপ্ত চেতন অন্ধ করেছে
কমল নয়ন তোর,
বিশ্বভরা ছড়ান মাধুরী
তোর কাছে সব ঘোর !
জগতের মাঝে র'বি চিরশিশু,
ব্যর্থ জনম তাই,
নিঠুর জগৎ জঞ্জাল ভেবে
করে শুধু দূর, ছাই।
বিশ্বের নিতি নব উৎসবে
তুই শুধু গ্রহ, পাপ,
পথের কাঙাল,—তোর আঁখি লোরে
কারো নাই পরিতাপ।

* * *

এ জগতে কি গো,—দেবতার বাণী,
মরমের ব্যথা, মায়া ?
জাগে না, বাজে না কারো প্রাণে কভু,
কভু কি হয় না দয়া ?
তোমারি অপর শিশুদের মত
জনম দিয়েছ তারে,
জঞ্জাল ভেবে এবে পায়ে ঠেলে
কেন দাও দূর করে ?
বিশ্বের মাঝে নর নারায়ণ,
নরের সেবাই পূজা,—
প্রেমের প্রদীপে, বোধনার পীঠে
আরতির ডালি সাজা।

ঐ যে অসহায়, চির-অনাদৃত, লাঞ্ছিত শিশু, ঐ শিশুর ব্যথা বুঝেছ কি ?

জননী-জঠর হতে ভূমিষ্ঠ হয়ে তোমারি মত সেও একদিন জীবনের ক্ষুদ্র মাহেন্দ্রক্ষণে তার সংসারের প্রত্যেক প্রাণীরই নয়নানন্দ হয়ে হাসির রোল উঠিয়েছিল, তোমারই মত মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনের পরম স্নেহে ও যত্নে লালিত-পালিত হয়েছিল। তারপর ? তারপর, তোমাদের জগতের সাধারণ হিসাবে তোমাদের তালে তালে তার বুদ্ধিবৃত্তি পরিস্ফুট হ'ল না। জগতের প্রত্যেক জীবই বুঝে নিলে যে জগতের কোনও কাজে সে লাগবে না, আর তারপর জগৎও এইটে বুঝিয়ে দিলে যে, জগৎও তার কোনও কাজে লাগবে না।

তুমি ত "মানুষ" এই আখ্যা নিয়ে ধরার বুকে বেশ স্পর্দ্ধা ক'রে নিজের অর্থ ও সামর্থ্যের গৌরবে ঘুরে বেড়াচ্ছ। একটি বার ভেবে দেখ, এ-বিষয়ে তোমার জগৎ ও এই শিশু—এদের মধ্যে অপরাধ কার ? শিশু ত জন্মগ্রহণ করছে, এ জন্মের তার কোনও কৃতকর্ম্মের ফলে অবশ্য নয়।

তার এই যে জড়বুদ্ধির অবস্থা, এর জন্য দায়ী সে কিসে ? অথচ তার এই অবস্থার জন্য সে আজীবন শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করবে তোমাদেরই হাতে। আর তোমরা,—বুদ্ধিমান, বিবেচক, জগতের সর্ব্বরকম বাঞ্ছিত ও কাম্য আদায়ে সক্ষম হয়ে, তোমরা তাকে অপদার্থ, হতভাগা বলে পায়ে ঠেলে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ।

সাধারণ জগৎ অতীতে চিরকালই এই রকম স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর হয়ে চ'লে এসেছে। অতি পুরাকাল হতেই তার এই ধারা চলে আসছে—যে শক্তিমান তারই জয়, সেই জগতে একমাত্র শ্রেষ্ঠ ও তার জন্যই জগৎ, আর যে দুর্ব্বল সে হেয়, ঘৃণ্য এবং মৃত্যুই তার পক্ষে বাঞ্ছনীয় ও একমাত্র ব্যবস্থেয়।

কিন্তু আজকালের জগতে ত সে-ধারার বদল হয়েছে। শক্তির সঙ্গে এখন দুর্ব্বলতাও তার একটা স্থান অধিকার করেছে মানুষের প্রাণের মধ্যে। এখন জগতের কত বড় বড় পণ্ডিত ও চিকিৎসক নিজের স্বার্থে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিয়ে কেবলমাত্র জীবের দুঃখ মোচনের উপায় বা দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার অন্বেষণে সারা জীবনটাই অতিবাহিত করছেন, কত ধনী তাঁদের সমস্ত অর্থ জগতের হিতকারী এরূপ কার্য্যের জন্য দান করে নিজেদের ধন্য মনে করছেন। এখন ত জগতের সর্ব্বত্রই যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, মৃগী প্রভৃতি রোগাক্রান্ত এবং পঙ্গু ও জড়বুদ্ধি ব্যক্তিদের জন্য হাঁসপাতাল বা তদ্রূপ প্রতিষ্ঠান হয়েছে ও ঐ সব ব্যক্তিদের চিকিৎসা, সেবা বা শিক্ষার জন্য কত প্রভূত অর্থ ব্যয় হচ্ছে।

এ সব প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিই হচ্ছে প্রাণ ও প্রেম। আমাদের ভারতবর্ষে পুরাকালে "নর-নারায়ণ" তত্ত্বের

আভাস ও চর্চ্চা আরব্ধ হয়, কিন্তু আজ আমাদের কত অবনতি হয়েছে। কিন্তু একটু প্রাণ দিয়ে এরূপ জড়বুদ্ধিদের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবলেই প্রেম আপনিই এসে প্রাণের সহায় হয়ে দাঁড়াবে।

'বোধনা' সেই প্রাণ ও প্রেমের ভিত্তির উপরই স্থাপিত হয়েছে। এই-সব অসহায়, হতভাগ্য, চির-অনাদৃত ও লাঞ্ছিত ব্যক্তিদের যথাসাধ্য উপায় করতে, তাদের লাঞ্ছনা নিবারণ করতে, তাদের চোখের জল মুছাতেই বোধনার সৃষ্টি। ঐ সব সন্তানরা স্বভাবতই দুর্ব্বল ও রুগ্ন হয়। সেই জন্য ঝাড়গ্রামের মত স্বাস্থ্যকর স্থানেই 'বোধনা'র নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হচ্ছে। এই বোধনায় এরূপ সন্তানদের যথাসাধ্য চিকিৎসা ও যত্ন করা এবং শিক্ষা দেওয়া হবে। এখানে ঐ সব শিশুরা সাধারণ জগতের জটিলতা কিছুমাত্র বোধ করবে না, তাদের স্ব স্ব বুদ্ধির উপযোগী সঙ্গী পাবে ও খেলাধুলা করবে, আধুনিক প্রণালীমতে শিক্ষা পাবে—আর পাবে অনাবিল শান্তি:ও প্রেম, আরও পাবে উৎসাহ তার উপরে বুঝতে পারবে এ জগতে তাদেরও স্থান আছে।

এই বোধনার কার্য্যের জন্য প্রয়োজন হবে,—

(১) অর্থ—(ক) ছেলেমেয়েদের পৃথক আবাস স্থান,—চিকিৎসক, শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী, তত্ত্বাবধায়কগণ, অভ্যাগত ব্যক্তিগণ ইত্যাদির জন্য বাসগৃহ নির্ম্মাণের জন্য অর্থের প্রয়োজন।

(খ) কূপখনন, চিকিৎসাগার, বিদ্যাগার, তড়িৎগৃহ ইত্যাদির জন্যও অর্থের প্রয়োজন।

(গ) কৃষিকর্ম্মাদির জন্য যন্ত্রাদি, শিক্ষাপ্রদ দ্রব্যাদি, ছেলেমেয়েদের জন্য গৃহের সরঞ্জাম ও শয্যা, রান্না ও খাওয়া-দাওয়ার বাসন-কোসনাদি ইত্যাদি সব দ্রব্যের জন্য অর্থের প্রয়োজন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—(ক) বা (খ) লিখিত যে-সকল অভাবের তালিকা দেওয়া হল, উহার এক একটি দফার উপযুক্ত অর্থ যে-কোনও দাতা দান করবেন সেই দাতার নামে বা তাঁর ইচ্ছানুসারে কোনও ব্যক্তির নামে সেই দফাটির নামকরণ হয়ে উৎসর্গীকৃত হবে।

ছাত্র ও ছাত্রীদের আলাদা দুটি শয়নগৃহ ছাড়া অন্যান্য গৃহগুলির ও কূপের আনুমানিক ব্যয়ের টাকা এইরূপ ধরা হইয়াছে। তড়িৎগৃহ ৪০০০, কূপ ২০০০, আপিস ১০০০, প্রিন্সিপ্যালের গৃহ ১০০০, অতিথিগৃহ ১০০০, চিকিৎসাগার ২০০০, চিকিৎসকের বাড়ি ১০০০, তত্ত্বাবধায়কের গৃহ ১০০০, ছাত্রদের বিদ্যালয় ৬৫০, ছাত্রীদের বিদ্যালয় ৬৫০, শিল্পশিক্ষকের বাড়ি ১০০০, ছাত্র ও ছাত্রীদের রন্ধন ও আহারের স্থান ৭৫০ করিয়া, ছাত্রদের ও ছাত্রীদের আলাদা স্নানাগার দুটি ২৫০ করিয়া, শৌচগৃহ দুটি ৫০০ করিয়া, চাকর ও চাকরাণীদের দুটি আলাদা গৃহ ৩০০ করিয়া, গোশালা ও পক্ষীশালা ২০০০। আপাততঃ এখন মাটিরই বাড়ি সব তৈরি হবে। তবে যদি উপযুক্ত দান পাওয়া যায়, তাহলে ছেলেমেয়েদের স্বতন্ত্র শয়নাগার দুটির জন্যে পাকা ইমারৎ প্রস্তুত হবে।

(২) সহানুভূতি ও অনুকম্পা—এতকাল এই বোধনার ব্রত এদেশে কেউ জানতেন না। আজ যখন 'বোধনা' তার ব্রত নিয়ে এসে তার অস্তিত্ব জানিয়ে দিয়েছে, দেশের প্রত্যেক নর-নারীরই সহাভূতি ও অনুকম্পা বোধনা আজ ভিক্ষা করছে। একটু চিন্তা, একটু প্রাণ, একটু প্রেম স্ব স্ব অবসর মত এ-বিষয়ে দিলেই বোধনার ব্রত সার্থক হবেই।

(৩) বোধনার ব্রত যাতে দেশময় ছড়িয়ে পড়ে তার চেষ্টা প্রত্যেক নর-নারীর নিকটই প্রত্যাশা করা যায়। এ-বিষয় পরস্পর আলোচনা করা, কিছু জিজ্ঞাস্য স্থলে সম্পাদকের সঙ্গে পত্র আদান-প্রদান করা, এরূপ জড়বুদ্ধি-সম্পন্ন ছেলেমেয়ে যেখানেই দেখা যাবে, তাদের বোধনার নিকট পাঠানোর ব্যবস্থা করা ইত্যাদি কার্য্যেই ঐ ফল পাওয়া যাবে।

(৪) বোধনার ব্রতে ব্রতী হওয়া ও বোধনার কার্যে আন্তরিক সহানুভূতি করা সকলের নিকটই প্রত্যাশা করা যায়। ঐ উদ্দেশ্য সার্থক করার জন্য বোধনার সভ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। বোধনার সভ্য-সংখ্যা যতই বেশী হবে ততই বোধনার শ্রীবৃদ্ধি হবে ও সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করবে। সভ্য হবার জন্য নিম্নলিখিত হারে চাঁদা দিতে হবে :—

(ক) এককালীন এক হাজার টাকা বা ততোধিক অর্থ কিংবা ঐ মূল্যের সম্পত্তি যিনি দান করবেন তিনি পেট্রন বা পৃষ্ঠপোষক হবেন।

(খ) এককালীন এক শত টাকা যিনি দান করবেন তিনি আজীবন সভ্য হবেন।

এরূপ সন্তানদের পিতা বা অভিভাবকদের আজীবন সভ্য হওয়া আবশ্যক।

(গ) সাধারণ সভ্য হতে হলে বারো টাকা প্রবেশ ফী দিতে হবে ও প্রতিমাসে এক টাকা করে চাঁদা দিতে হবে।

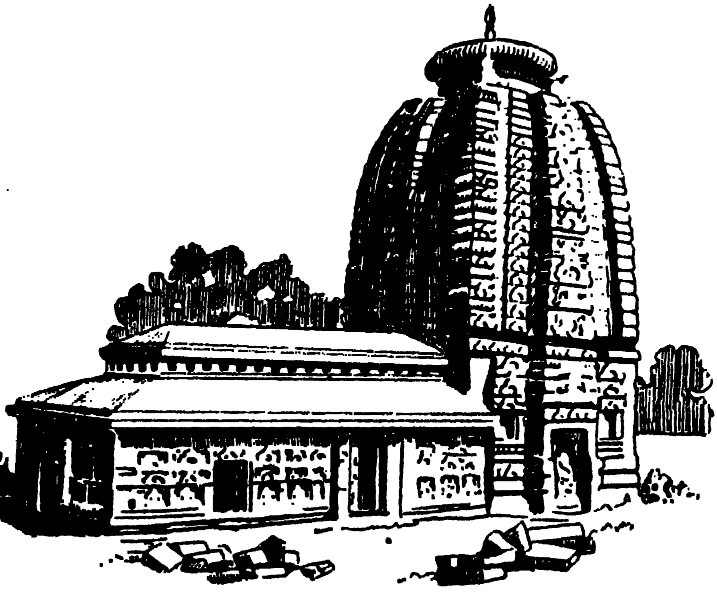
(ঘ) ইহা ছাড়া চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, বিশেষজ্ঞ কিংবা অন্য কোনও ব্যক্তি যিনি বোধনার কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করবেন, তিনিও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি দ্বারা অবৈতনিক সভ্য নির্ব্বাচিত হতে পারেন।

(৫) এই বোধনার পরিচালনা কার্য্যের জন্য কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রবংশীয়া মহিলার প্রয়োজন। এঁদের বোধনার ব্রতে ব্রতী হওয়া ও অশেষ সহশক্তিসম্পন্না, দয়াবতী ও স্নেহশীলা হওয়া চাই। এরূপ শিশুদের তত্ত্বাবধানকার্য্যে বিন্দুমাত্র বিরক্তি বা রাগ প্রকাশ করা চলবে না, বা এদের কোনও প্রকার শারীরিক শাস্তি দেওয়া চলবে না। এদের শিক্ষার কার্য্য, রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্য, রাত্রের পরিচর্য্যা, ভাঁড়ার ও রন্ধনাদি গৃহস্থালী কর্ম্ম সেবা ইত্যাদি এইসব কার্য্যেরই ভার যোগ্যতা অনুসারে এই মহিলাদের উপর দেওয়া হবে। যাঁদের এরূপ মহৎ কার্য্যে প্রকৃত আস্থা হবে ও এরূপ সন্তানদের মাতৃস্থানীয়া যাঁরা হতে চান, তাঁরা সম্পাদকের নিকট চিঠি লিখবেন এবং ঐ সকল চিঠি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য ছাড়া অন্য কাহাকেও জানতে দেওয়া হবে না। কলিকাতাস্থ বা কলিকাতায় যাঁদের স্থান আছে এরূপ মহিলা সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন। আপাততঃ থাকবার স্থান, আহার, ও কিছু হাতখরচা দেওয়া হবে, তবে শিক্ষয়িত্রী ভাবে যাঁরা নিযুক্ত হবেন, তাঁদের আলাদা বেতন দেওয়া হবে।

ঝাড়গ্রামে রেল লাইনের পাশেই প্রায় এক মাইল ব্যাপী কলিকাতার মাপে প্রায় ২৫০ বিঘা জমির উপর বোধনার কর্ম্মভূমি স্থাপন হচ্ছে। স্থানটি অতি মনোরম ও দৃশ্য সুন্দর। এই স্থানটি ক্রমশঃ প্রকৃতিদেবীর সুরম্য দিব্য একটি লীলাভূমিতে পরিণত করা হবে।

সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ—শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ
২।১ টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

সম্পাদক—শ্রীগিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় এম্-এ,বি-এল,
৬।২ বিজয় মুখার্জ্জি লেন ভবানীপুর, কলিকাতা।



জানাইয়াছেন। অক্ষরের আকৃতি এমন হইবে যে, কম্পোজিটরের কর্ম ক্লেশকর হইবে না। ইহাতে গ্রন্থকারেরও লাভ হইবে, মুদ্রণব্যয় কমিয়া যাইবে, ছাপায় ভুলের শঙ্কা থাকিবে না। বাঙ্গালা ভাষায় যত বর্ণ (ধ্বনি) আছে, তত অক্ষর অবশ্য চাই। সংস্কৃত শব্দের বানান সংস্কৃত-সম না করিলে নয়। এই কারণে বাঙ্গালা অক্ষর কিছু বাড়িয়াছে। অপর শব্দে ও বিদেশী শব্দে আমরা বাঙ্গালা ধ্বনি করিয়া থাকি। ইহাই স্বাভাবিক, ঠিকও বটে। উ-জী-র না-জী-র শব্দের আবীধ্বনি আমাদের স্বাভাবিক নয়। এইরূপ বহু বিলাতী শব্দেরও নয়। সংস্কৃত-পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিকে বাঙ্গালা করিয়া ফেলিয়াছেন, সংস্কৃত টোলে ও কলেজে সংস্কৃত ধ্বনি শুনিতে পাই না। বাঙ্গালা দেশের সংস্কৃত পাণ্ডিত্য দেশে বিদেশে উপহাস্য হইয়াছে। একটা দুঃখের আখ্যান বলি। চারি বৎসর হইল একদিন একখানা পুথীর খোজে এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরিতে গিয়াছিলাম। দেখি, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রোফেসর টুচীর সহিত 'আর্যনাথ' সম্বন্ধে কি বলিতেছেন। শাস্ত্রী মহাশয় আর্জনাথ্‌, আর্জনাথ্‌ বলিতেছেন, টুচী সাহেব ব্যাকুল-নেত্রে শাস্ত্রী-মহাশয়ের মুখের পানে তাকাইয়া আছেন। আমি ব্যাপার বুঝিলাম, আর মনে মনে বলিতে লাগিলাম পৃথিবী দ্বিধা হও, এত বড় পণ্ডিত আর্য্নাথ্‌ বলিতে পারিলেন না, এক বিদেশী শ্রদ্ধালু পণ্ডিতকে ফাঁপরে ফেলিতে লাগিলেন। প্রসঙ্গ হইতে সাহেব নামটি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার চক্ষু প্রসারিত হইল। তিনি মুখের ভাবে বলিলেন, "ক্ষমা করুন, আমি এতক্ষণ নামটি ধরিতে পারি নাই।" তিনি সংস্কৃতের গৌড়ীয় রীতি ভাবিলেন কি-না, কে জানে। শ্রীযুত সরকার খৃষ্ট-খ্রীষ্ট বিবাদ ব্যাখ্যান করিয়াছেন। অনেক দিন হইল, কলেজের এক ছাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, অমুক অমুক খৃ-ষ্টাব্দ লেখেন, আমি কেন খ্রি-ষ্টাব্দ লিখি। (কখন কখন কলমের টানে খ্রী-ষ্টাব্দ লিখিয়া ফেলি, যদিও জানি খ্রী ভুল।) আমার উত্তর, যেহেতু (১) খ্রি বলি, পণ্ডিতেরা ক্রি-স্তাব্দ, উত্তরদেশের পণ্ডিতেরা খ্রি-স্তাব্দ লেখেন। আমরা বলি, জিশুখ্রিষ্ট, খ্রিষ্টান, খ্রিষ্টানি, খ্রিষ্টানী। গ্রাম্যজন খ্রি-জন, গ্রি-হ লেখে। তাহারা পৃ-ম্বনাথ কৃ-য়াকর্মও লেখে। পণ্ডিতেরা এই দৃষ্টান্ত অনুসরিলে বলিতে হয় তাঁহারা বাঙ্গালা বানানের 'দফা রফা' করিতেছেন, আমি করি নাই।

কতগুলি টাইপ হইলে এক সাট হইতে পারে, তাহা মুদ্রাকর চিন্তা করিবেন। কতগুলি অক্ষর চাই, বলিতে পারি। স্বরবর্ণের নিমিত্ত, অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ওঁ অং অঃ,—১৪টি। দুই রকম ই অদ্যাবধি দেখি নাই। ব্যঞ্জনে জুড়িতে চাই, ্ া ি ী ু ূ ে ৈ ৄ ো ৌ,—১২টি। দুই দুই রকম ে ৈ ো ৌ আমার অজ্ঞাত। সংস্কৃত লিখিতে লুপ্ত অকার চিহ্ন, ঽ ঁ চাই। মোট ১৪+১২=২৬। ২৬+৩=২৯। আর একটি চিহ্ন, অকারান্ত চিহ্ন চাই। পরে বলিতেছি। ব্যঞ্জনাক্ষর অন্তঃস্থ ব বাদে ক হইতে ক্ষ,—৩৩টি। আর চাই, জ্ঞ ক্ষ ড় ঢ় য়,—৫টি। মোট ৩৮টি। স্বরাক্ষর ২৬। একুনে ৬৪। সংস্কৃত লিখিতে অন্তঃস্থ ব চাই। সংস্কৃতের জন্য অতিরিক্ত ৫টি এক খোপে থাকিতে পারে।

ব্যঞ্জনে ব্যঞ্জনে জুড়িতে গিয়া টাইপের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। আমরা এখন বলি সংযুক্তব্যঞ্জন। কিন্তু দেশীয় নাম, ফলা। স্বর, ব্যঞ্জন, ফলা, অক্ষরের তিন শ্রেণী। ফ-ল-ক হইতে ফ-লা। ফলক, ঢাল। যে ব্যঞ্জনাক্ষর অপর ব্যঞ্জনাক্ষরের বক্ষে ঢালের মতন থাকে, তাহা ফলা। ফলা ত্রিবিধ। কফিয়, আঙ্ক, আঙ্ক। কফিয়, স্বরপ্রায় ব্যঞ্জন ফলা। যেমন ক্য, ক্র, ক্ল ক্ব। আঙ্ক, পঞ্চ অনুনাসিকের বক্ষে ফলা। যেমন, আঙ্ক। আঙ্ক, মিশ্র ফলা।

এই এই ভাগ বৈজ্ঞানিক। যে-দেশে পাণিনি ও কপিলের জন্ম, সে-দেশে অবৈজ্ঞানিক বিধি কল্পনাও করিতে পারা যায় না। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ ভাষার মূল ধ্বনি। ব্যঞ্জনে স্বর যুক্ত হইলে উভয়ে মিলিয়া এমন এক মিলিত ধ্বনি হয় যে ব্যঞ্জনে স্বরটি লীন হইয়া যায়। কা, ক্‌+আ হইলেও এক ধ্বনি কা। এই লীনতা প্রকাশের নিমিত্ত আ অক্ষরের যোগ্যরূপ া হইয়াছে।

য র ল ব, এই চারি বর্ণ অপর ব্যঞ্জনে যুক্ত হইলে তাহাতে স্বরবৎ লীন হইয়া যায়। ক্য উচ্চারণে কিয়। এই হেতু ককিয় নাম। ক্র, ক্র নয়, ক্র। এইরূপ, ক্ন ক। ক্ন, কন নয়, ক্ন। পূর্বকালে এই উচ্চারণ ছিল, এখন ক ন বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, ওড়িয়াতে পূর্ববৎ আছে। তথাপি স্না-ন আছে। স্ন, কঁ নয়, ক্ন। স্ম-র-ণ হইতে স-ঙ-র-ণ হইয়াছিল, সঁ-র-ণ হয় নাই। ওড়িয়াতে স্ম-র-ণ আছে। কৃষ্ণ=কৃ, ফলার মধ্যে দেখিয়া বুঝিতেছি বাঙ্গালা ভাষায় ঋকার ছিল। এই কারণে ঘৃ-ত উচ্চারণ ঘ-র্ত, এবং তাহার অপভ্রংশের ঘ্র-ত শব্দ হইয়াছিল। কিন্তু জিহ্বার জাড্যহেতু জাল্ম জনে যদি ফলা ব্যঞ্জনে লীন করিতে পারিত না। য-ফলা পারিত, এখনও নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষর নরনারীও য-ফলা উচ্চারণ করিতেছে। শহরে শিক্ষিত জনে লুপ্ত করিয়া দিয়াছেন। গ্রাম্য লোকে অন্য ফলাগুলি বিশ্লিষ্ট লুপ্ত দ্বিত্ব করিয়া ফেলিয়াছে। ক্রমে, কর্মে, কেরমে; গ্লা-নি গেলানি; প-ক্ক পক্কক। তথাপি তাহারা সোআমীর খিয়াতি রক্ষা করিয়া সোআস্তি বোধ করে। স্না-ন, সিনান; অ-গ্নি আগনি (প্রাচীন), আগুন; প-দ্মা, পদুমা (প্রাচীন), পদ্দাঁ। কালকাতায় শিক্ষিত শিষ্ট ভদ্রলোককে আঁত্তীয় বলিতে শুনিয়াছি। এখন কে যে শিক্ষিত, কে যে নয়, তাহা শব্দের উচ্চারণ হইতে বুঝিতে পারা যায় না।

দেখা যাইতেছে, য র ল ব ফলাকে বিচ্ছেদ করিলে ভুল হইবে। ন-ফলা ও ম-ফলা আদ্যে হইলে জুড়িতেই হইবে। সুখের বিষয়, এরূপ শব্দ অত্যল্প। আদ্যে না হইলে স্বচ্ছন্দে ভাঙ্গিতে পারি। আঙ্ক আঙ্কের ফলাও এইরূপ। ব্য-ক্তিকে ব্যকৃত, অন্‌ধকে যত্‌ন করিলে উচ্চারণ বিকৃত হয় না।

কিন্তু এমন কথা নাই যাহাতে কিন্তু নাই। ভাঙ্গা লেখায় ব্যঞ্জনাক্ষর কমে বটে, কিন্তু লিখিতে সময় লাগে, হসন্ত চিহ্নের আধিক্য ঘটে। অতএব কম্পোজ করিতেও সময় বাড়ে। গতিবিদ্যায় একটা সূত্র আছে, কাল কমাইতে চাও, প্রযত্ন বাড়াও; প্রযত্ন কমাইতে চাও, কাল বাড়াও। কোনটা লাভ হইবে দুই কথাই পারে সেটাই চিন্তা। মধ্যপথ-নির্ণয় কোনও কর্মে সোজা নয়।

কিন্তু পড়িবার কথাও ভাবিতে হইবে। (১) উপরে লিখিত স্বরাক্ষরে স্বল্পাকৃতির মধ্যে ১ অক্ষর আছে। শৃঙ্গটির প্রয়োজন বলি। বাঙ্গালা কোন কোন শব্দের অ আ স্বরের পর ঈষৎ ই উচ্চারিত হয়। অ'ল-তলা, আজ কাল চাল ডাল। ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপে ঈষৎ ই আসে। বর্তমানে লেখকেরা উর্ধ্ব কমা দ্বারা পাশ কাটাইতেছেন। ক-রি-য়া, ক-রে কো-রে কদাপি নয়। ক'-রে, কিম্বা ক-র্যে। র-এ য-ফলা দিতে গেলে লেখকের হাত কাঁপে, কি জানি কোর্‌রে হইয়া যায়। এমন কি, চা-ক-র্যে-কে চা-ক-রের দলে ফেলা হইতেছে। যদি এত ভয়, ক'রে লিখুন। হ-ই-ল, হ-ল, হ-লো হো-লো নয়। হ'ল, লিখিয়া পাশ কাটাইবার প্রয়োজন কি আছে, পাঠককে অক্ষরটি দেখাইয়া দিলে তাঁহাকে ভাবিতে হয় না। ইংরেজী don't শব্দের o লুপ্ত।

(২) ি অক্ষরের বাঁয়ে দাঁড়ি। দাঁড়ির হেতু কিছু আছে কি? এটির প্রাচীন রূপ নিশ্চয় ধনুক ছিল, ওড়িয়াতে এখনও আছে। ধনুকে দাঁড়ি জুড়িয়া ী, (ঈ)। কিন্তু অবিধি হেতু ডাইনে দাঁড়িতে ডবল ধনুক দিতে হইতেছে। ে ৈ, ব্যঞ্জনের বাঁয়ে দিয়া কে কৈ লিখিতেছি। ক+এ, ক+ঐ, ক-এর পরে এ ঐ, পূর্বে নয়। নাগরী के कै। এইরূপ, কো কৌ, আর নাগরী को कौ তুলনা করুন। কোন্‌টিতে নিয়মভঙ্গ হইয়াছে?

(৩) গ র র, শ প্রভৃতি না লিখিয়া গু রু রূ শু লিখিলে কোন লাভ নাই। শ্রীযুত সরকার এই রকম অনিয়ম দেখাইয়াছেন। সঙ্কেত যত বাড়ে, শিখিতে আয়াসও তত বাড়ে।

(৪) ক্ষ একটি স্বতন্ত্র অক্ষর। এটি বাঙ্গালা ভাষায় কৃষ বর্ণদ্যোতক নয়। ইহার নাম খিঅ। এই কারণে ক্ষু-ধা খি-দা, ক্ষ-মা খে-মা। জ্ঞ, নাম গ্যঁ। এই কারণে জ্ঞা-ন গেঁ-য়া-ন, য-জ্ঞ যগ্যাঁ। ষ্ণ, নাম ষ্ট। এই কারণে কৃ-ষ্ণ ক্রি-ষ্ট, কি-ষ্ট; বি-ষ্ণু বি-ষ্টু। এক ভদ্রলোক পত্রে লেখেন ক-ষ্ণ (কষ্ট)। আমি কলেজের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যের দুই তিন জন অধ্যাপকের মুখে ক্রিস্‌ন. শুনিয়াছি। এখন কলকাতাকে কিলকাতা বলিবার অপেক্ষা।

(৪) সংস্কৃতে অন্তঃস্থ ব নইলে নয়, বর্গীয় ব অল্প। বাঙ্গালা অক্ষর নাই, সংস্কৃত ছাপায় অগণ্য ভুল হইতেছে। বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তি বিচারে অন্তঃস্থ ব আবশ্যক হয়। আমি নাগরী ব লইয়াছিলাম। কিন্তু বাঙ্গালা টাইপের সাটে মিল খায় নাই। অগত্যা আসামী ৱ লইতে হইয়াছিল। কিন্তু ৱফলার টাইপ পাই নাই। ৱ্রী-হি, ৱ্-হ্ব লিখিতে গেলে ৱ-এর নীচের হল দেখিতে পাওয়া যায় না। বাঙ্গালা টাইপের সাটে ৱ গড়িয়া লইলে দোষ থাকে না। অন্তঃস্থ ব-টির পুনরুদ্ধার হইলে ব-ফলার উচ্চারণ আসিতে পারিবে। তখন কিং-বা, বশং-বদ বানান শুদ্ধ হইবে। অন্যথায় কি-ম্বা বশ-ম্বদ শুদ্ধ। হওয়া, যাওয়া ইত্যাদি হৱা যাৱা লিখিতে পারা যাইবে।

(৫) রেফাক্রান্ত ব্যঞ্জন কেহ দ্বিত্ব করিত, কেহ দ্বিত্ব করিত না। আমাদেরও কেহ করে, কেহ করে না। যাহারা দ্বিত্ব উচ্চারণ করে, তাহারা সকল বর্ণ করে না। ধ্বনিসম্বাদী বানান করিতে গেলে প্রত্যেকের মুখ দেখিতে হয়। তাহা অসম্ভব। এই কারণে এখন দুর্গ্‌গা তর্ক্ক বানান আর নাই। কবিরা দ্বিত্ব মানেন নাই। তাঁহারা 'গরজে ঘন দেআ', 'নিরমিল বিধি চাঁদে', 'ধরম করম সই' 'গুরুগরবিত' ইত্যাদি স্বচ্ছন্দে লিখিয়া গিয়াছেন। গদ্যে দুইটা লিখিয়া বিশেষ ফল দেখি না। যদি যাবতীয় ব্যঞ্জন দ্বিত্ব করা হইত, তাহা হইলে আপত্তি উঠিতে পারিত।

(৬) বাঙ্গালা বানানে বাঁকা একার আবশ্যক হয় না। ইহার সাক্ষী বে-পারী বে-ভার। মে-নাজার, কেমিকা-ল বানান শুদ্ধ। ম্যা-নেজার কেমিক্যা-ল বানান অশুদ্ধ। কিন্তু কেহ কেহ বাঁকা একারকে ব্যাঁ-কা না করিয়া স্বস্তি পান না। যদি ইঁহারা র‍্যাসিড (অর্থাৎ রাসিড) লিখিতেন, তাহা হইলে বুঝিতাম দুঃখের অন্ত হইল। কিন্তু স্বরাক্ষরে ব্যঞ্জনের ফলা জুড়িয়া কেহ অ্যা, কেহ এ্যা লিখিয়া ব্যাকরণের মূলোচ্ছেদ করিতেছেন। এক ভাষার শব্দ অবিকল ধ্বনি লইয়া অন্য ভাষায় প্রবেশ করে না। প্রচলিত শত শত প্রচলিত ইংরেজী শব্দ বাঙ্গালা ধরণে বলি। ইস্কি, অর্ডার, সমন, জজ, বুরুষ, ইস্কুল, কত উদাহরণ আছে। তথাপি হ্যার দ্যাখ ন্যায় লিখিবার নিমিত্ত কাহার কাহারও হাকুলি-বিকুলি দেখিলে দুঃখ হয়। বিষয়-বিশেষে বাঁকা একার আবশ্যক হয়। আমি ে উল্‌টাইয়া 2 লইয়াছি। ইহার গুণ এই, একই আকারে শব্দের আদ্যে ও মধ্যে বসিতে পারে, নূতন টাইপও দরকার হয় না। নূতন টাইপ করিলে বোধ হয় ৭ আরও ভাল। ৭কুট প্র৭ন। নূতন, কিছু দিন নূতন ঠেকে।

(৭) ব্যঞ্জনাক্ষর ক্ষ বাদে ৩৩টি। শ্রীযুত সরকারের প্রবন্ধে দেখিতেছি, হস্‌-চিহ্নিত টাইপ ৩২টি রাখিতে হয়। অর্থাৎ ব্যঞ্জনাক্ষর দ্বিগুণ হইয়া যাইতেছে। ৎ অক্ষরটি আকারে ত্‌ মাত্র। পূর্বকালে ছিল না। ক্ষতিও হয় নাই। অকারান্ত ব্যঞ্জন যত লাগে, হসন্ত ব্যঞ্জন তত লাগে না। অতএব হসন্ত ব্যঞ্জনের টাইপ না রাখিলে চলিতে পারে। যখন খাঁজ-কাটা কর্ণিত টাইপ আছে, তখন আর চিন্তা কি? কর্ণিত টাইপ থাকিলে অকাণত টাইপ রাখার প্রয়োজন জানি না। সব ব্যঞ্জন টাইপ কর্ণিত ও স্থায়ী করাইতে পারিলে পরম লাভ হইবে। হস্‌-চিহ্নের বিপরীত, অকার চিহ্ন। আমার মনে হয় ˙ চিহ্ন বেশ হইবে। 'কাল বৈশাখীর কাল. মেঘ উঠিলে চল. চল. বলিতে হয়।' 'বিষ.বৃক্ষ নয়, বিষ.বৃক্ষ।'

(৮) নাগরী ফলার সহিত বাঙ্গালা ফলার অক্ষর তুলনা করিলে নাগরীকে ভাল বলিতে হইবে। সে টাইপের দুই চারিটি ফলার আকারের দোষ আছে, অধিকাংশে নাই। এক সাট নাগরী টাইপ কত, জানি না। বোধ হয় বাঙ্গালা অপেক্ষা কম। নইলে সরু মোটা টাইপ থাকিত না। মরাঠী লেখকেরা ব্যক্তিবাচক নামের আদ্যক্ষর মোটা করিয়া বুঝিবার কত সুবিধা করিয়াছেন। 'হিমালয় হিমালয় বটে।' ইংরেজীর অনুকরণে **হিমালয়** ছাপিতে পারিলে শিশুও বাক্যটির অর্থ প্রভেদ করিতে পারিত। আমি ছোট পাইকায় ছাপায় বড় পাইকা বসাইয়া বিশেষ করিতে পারি নাই। আরও বড় টাইপ দিলে ছাপা বিশ্রী দেখায়, কম্পোজিটরও বিরক্ত হন।

ছাপাখানার চিন্তা ছাড়িয়া আর এক চিন্তা আছে। বাঙ্গালা টাইপার (টাইপ-রাইটার) আবশ্যক হইয়া পড়িতেছে। পূর্বকালের পাঠশালায় বালকেরা লেখা-পড়া

করিত, এখন পড়া-লেখা করে। পাঠশালার গুরুমহাশয়েরা শিষ্যের হাতের লেখায় অমনোযোগী হইয়াছেন। মেট্রিক-পাশ দূরে থাক, বি-এ পাশের কদর্য লেখা দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। অনেকে কতকগুলি যুক্তাক্ষরের রূপও জানে না। হয়ত টাইপার চায়। রেমিংটন কোম্পানী বাঙ্গালা টাইপার করিয়াছেন, কিন্তু দাম ৪০০৲ টাকা! আমার জানায়, তিন জন উৎসাহী ভদ্রলোক টাইপার উদ্‌ভাবনা করিতেছিলেন। শেষফল শুনি নাই। ক অক্ষরে দুইটি সঙ্কেত আছে। ইহাতে অ-স্বর নিত্য বর্ত্তমান। কিন্তু অন্য স্বর যোগের কালে অকার লুপ্ত হয়। এই সঙ্কেত দ্বারা শ্রমলাঘব যে কত হইয়াছে, তাহা বলিবার নয়। কিন্তু ভাঙ্গা লেখায় হস্-চিহ্ন অনিবার্য। নিপুণ শিল্পী কিছু অর্থ পাইলে বাঙ্গালা টাইপার করিয়া দিতে পারেন।

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন

বেগম শামসুন নাহার মাহমূদ; বি-এ

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন সম্পর্কে দু-কথা বলতে হবে, কিন্তু বলবার কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। বলতে গেলে বহু কথা আছে,—কতদিনের কত তুচ্ছ কথা, কত খুঁটিনাটি স্মৃতি আজ মনের মধ্যে ভিড় করে আসছে, কিন্তু গুছিয়ে বলবার আজ সামর্থ্য নাই। শুধু আমাদের কেন, বাংলার গোটা মুসলীম নারীসমাজের হৃদয়ের স্পন্দন আজ থেমে গেছে—বাংলার মুসলমান পুরুষ নারী সকলেই আজ বজ্রাহত।

রক্তের বন্ধন যে সবচেয়ে বড় কথা নয়, হৃদয়ের যোগ যে তার চেয়ে কত বড় জিনিষ এ-কথা আজ প্রথম ভাল ক'রে উপলব্ধি করলাম। রক্তের সম্পর্ক, দেহের সম্পর্ক তাঁর সঙ্গে আমার ছিল না, কিন্তু তাঁর অমৃত-সরস, স্নেহ-সুকুমার হৃদয়খানির উত্তপ্ত স্পর্শ আমাদের চেয়ে আর কে বেশী অনুভব করেছিল! তিনি ছিলেন গোটা সমাজের —অথচ তিনি ছিলেন আমাদের প্রত্যেকের। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় চিঠিপত্রে এবং মাসিক পত্রিকার ভিতর দিয়ে। দশ বছর বয়সেই যখন স্কুল ছেড়ে পর্দ্দানশীন হই, তখন থেকে উচ্চশিক্ষার জন্য মনে একটা আগ্রহ জেগেছিল,—আর তাই ছিল বেগম রোকেয়ার কাছে সবচেয়ে বড় জিনিষ। বাংলা দেশের কোন্ নিভৃত পল্লীতে কোন্ অবরোধরুদ্ধা বন্দিনী মেয়ে লেখা-পড়া শিখবার জন্যে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখিয়েছে,—সে-ই ছিল তাঁর সবচেয়ে আপন; তারই সঙ্গে ছিল তাঁরই প্রাণের যোগ সবচেয়ে বেশী।

সবাই জানেন বেগম রোকেয়া একটি স্কুল করেছেন। সবাই জানেন সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস্ হাই-স্কুলের তিনি প্রতিষ্ঠাত্রী। কিন্তু কেমন করে ঐশ্বর্য্য-লালিতা এই অবরোধবাসিনী—এই সর্ব্বভোগত্যাগিনী বিধবা স্বামীর স্মৃতি বুকে নিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ান, কেমন ক'রে পাঁচটি মেয়ে নিয়ে স্কুল আরম্ভ করেন, আর কেমন করে পঁচিশ বৎসর পরে সেই স্কুলকে একটি হাই স্কুলে পরিণত করেন—সে-কথা অনেকেই জানেন না।

প্রথম যখন স্কুল সুরু করেন, তখন লেখাপড়া তিনি জানতেন না বেশী। সম্ভ্রান্ত মুসলমান ঘরের মেয়ে ছিলেন তিনি—যাঁদের পক্ষে ইংরাজী বা বাংলা লেখা ত্রিশ বছর আগে একেবারেই হারাম ছিল। আজ আমরা মনে করি লেখাপড়া শিখবার জন্যে আমাদের অনেক কষ্ট ক'রতে হয়েছে, সমাজের অনেক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে তবে আমরা লেখাপড়া শিখেছি। কিন্তু তুচ্ছ মনে হয় আমাদের কষ্ট, আমাদের বাধাবিঘ্ন, যখন তুলনা করি সেই চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে বেগম রোকেয়ার যখন শিক্ষা সুরু হয় তখনকার যুগের কুসংস্কারের সঙ্গে। আজ আমরা হয়ত পুরুষের সামনে

পর্দ্দা করি, কিন্তু তখন কুলবালারা পর্দ্দা ক'রতেন মেয়েদের সঙ্গেও। বেগম রোকেয়া বলেছেন, তাঁদের পরিবারের অবিবাহিতা মেয়েরা অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া এবং বাড়ির চাকরাণী ছাড়া অন্য কোন মেয়েমানুষের সামনে বেরুতেন না। তাঁদের শুধু দেহই পর্দ্দানশীন ছিল না—পাছে পরপুরুষের চোখে পড়ে তাঁদের হাতের লেখার বেপর্দ্দা হয়, এই ভয়ে লেখাপড়া শেখাই তাঁদের পক্ষে ছিল একেবারে নিষিদ্ধ। সেই আঁধার যুগে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বুকে জ্বলেছিল জ্ঞানের আলো—আর সেই আলো সঞ্চারিত হয়েছিল পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার সেই অবরোধরুদ্ধা বন্দিনী বালিকাটির ক্ষুদ্র হৃদয়ে। তিনি বলেছেন—আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা একদিন একখানি বড় ছবিওয়ালা ইংরেজী বই আমার সামনে খুলে ধ'রে বললেন—"বোন, এই ইংরেজী ভাষাটা যদি শিখতে পারিস, তবে পৃথিবীর এক রত্নভাণ্ডারের দ্বার তোর কাছে খুলে যাবে।" ভাই নিজেও কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী ছিলেন না; কিন্তু তিনি ক্ষুদ্র বোনটিকে সেদিন যে নতুন পথের সন্ধান দিলেন, যে নতুন আশার বাণী শোনালেন—সে যুগে সত্যিই তা এক বিচিত্র বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল। এমনি করে সেই পরম স্নেহময় জ্যেষ্ঠভ্রাতার কাছে তাঁর প্রথম শিক্ষারম্ভ হয়। গভীর রাত্রে পৃথিবী অন্ধকারে ঢেকে যেত—আর সেই সঙ্গে জ্বলে উঠ্‌ত দুটি কিশোর-কিশোরীর শয়নকক্ষে স্তিমিত দীপশিখা। চোখ মুছে সেই নীরব নিশীথে দু-ভাইবোনে বসতেন পড়াশোনা নিয়ে। জ্ঞান দান করতেন ভাই—আর বালিকা ভগ্নী সেই জ্ঞানসুধা আকণ্ঠ পান করতেন।

তারপরে জীবন-যৌবনের বাসন্তী উষায় আশা, সুখ, ঐশ্বর্য্যের প্রীতি পরিবেষ্টনের মধ্যে তিনি যখন স্বামীকে হারালেন, তখন থেকে সুরু হ'ল তাঁর কঠোর ত্যাগ-সাধনা—সেই দিন থেকে সুরু করলেন তিনি অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম, স্বামীর দেওয়া শেষ সম্বল দশ হাজার টাকা নিয়ে তিনি যখন ঘরের বা'র হলেন তখন তিনি জানতেন না স্কুল কি জিনিষ—কাকে বলে স্কুল। তিনি বলেছেন—"প্রথম যখন পাঁচটি মেয়ে নিয়ে স্কুল আরম্ভ করি তখন ভারী আশ্চর্য্য ঠেকেছিল এই কথা, যে একই শিক্ষয়িত্রী কেমন ক'রে একসঙ্গে একই সময়ে পাঁচটি মেয়েকে পড়াতে পারেন।" এমনি অনভিজ্ঞতা নিয়ে কাজে নেমেছিলেন পঁচিশ বছর আগেকার সেই কিশোরী বিধবা—বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন। তারপরে তাঁর পঁচিশ বছরের কর্ম্মজীবনের কাহিনী—সে একটা বিরাট ব্যথার কাহিনী, একটা বিপুল সংগ্রামের ইতিহাস। পঁচিশ বছর আগে—পঁচিশ বছর আগেই বা বলি কেন—এখনও অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান আছেন যাঁরা স্কুলে মেয়ে পাঠানোকে একটা মস্ত বড় পাপের কাজ বলে মনে করেন। যিনি মেয়েকে লেখাপড়া শিখতে দিয়েছেন তিনি মনে করেছেন 'আমি বেগম রোকেয়াকে ধন্য করলাম।' আর যিনি স্কুলের ছুতানাতা ধ'রে, পান থেকে চুণ খসবার অপরাধে মেয়ের পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়েছেন তিনি মনে করেছেন—'বিরাট শাস্তি দিলাম বেগম রোকেয়াকে।' স্কুলে মেয়েদের ব্যায়ামচর্চ্চা করবার, গানবাজনা শিখবার বন্দোবস্ত করলেন—পরদিন থেকে সুরু হ'ল উর্দ্দু কাগজসমূহে তাঁর শ্রাদ্ধ, তাঁর স্কুলের শ্রাদ্ধ, তাঁর সাতপুরুষের শ্রাদ্ধ। প্রথম মোটর বাস তৈরি করালেন—সে হ'ল "moving Blackhole." প্রথম দিন 'বাসে'র ভিতর অন্ধকারে মেয়েদের ভয়ে মূর্চ্ছা হ'ল—গরমে হল ফিট। সুরু হল অসংখ্য বেনামী উর্দ্দু চিঠি। লেখাপড়া শেখাবার নামে মেয়েদের তিনি মেরে ফেলতে চান নাকি? তার পরে বাসের দুপাশের খড়খড়ি ফেলে দিয়ে রঙীন কাপড়ের পর্দ্দা ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল; এবারে অভিযোগ আসতে লাগল—পর্দ্দা বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে মেয়েদের বেপর্দ্দা করে। বড় দুঃখে তিনি 'অবরোধ বাসিনী'তে বলেছেন—'এ ত ভারী বিপদ। না ধরিলে রাজা বধে, ধরিলে ভুজঙ্গ।' রাজার আদেশে একদিন নয়, দুদিন নয়—পঁচিশ-পঁচিশ বৎসর কেউ বোধ করি এমন করে জীবন্ত সাপ ধ'রতে পারেনি।

সমাজের এ-সব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর তিনি আঘাতের পর আঘাত পেয়েছেন,—জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিল তিল করে নিজের প্রতি রক্তবিন্দু বিসর্জ্জন দিয়েছেন। তিনি জন্মে-

ছিলেন যে অধ্যবসায়, যে দৃঢ়তা আর লাঞ্ছনা সহ্য করবার যে অমানুষী শক্তি নিয়ে—দুনিয়ার যে-কোন বড় সৈনিক, যে-কোনো বড় সংস্কারকের শক্তির সঙ্গে তার তুলনা হ'তে পারে,—এ-কথা আজ আমি বড়গলায় বলতে পারি। জীবনে যাঁরা তাঁকে বোঝেননি, মরণের পরে আজ তাঁদের বিচার করবার সময় এসেছে—কত বড় সৈনিক, কত বড় যোদ্ধা ছিলেন এই বেগম রোকেয়া, কত ক্ষতবিক্ষত, কত জর্জ্জরিত হয়েছিলেন তিনি এই দীর্ঘ পচিশ বৎসরব্যাপী সংগ্রামে।

আগেই বলেছি, এই অল্প সময়ে এত অল্প কথায় বেগম রোকেয়ার পরিচয় দেবার চেষ্টা করা ভুল। শুধু একটা স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী বললে কিছুই বলা হ'ল না—স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্যে অনেক কষ্ট করেছেন বললেও অনেক কথাই বলা বাকী থেকে গেল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ শাজাহানকে বলেছেন—'তোমার কীর্ত্তির চেয়ে, তোমার তাজমহলের চেয়ে তুমি ছিলে মহত্তর।' ঠিক বেগম হোসেন সম্পর্কেও এই কথাই বলা চলে। তাঁর কীর্ত্তির চেয়ে—তাঁর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের চেয়ে তিনি ছিলেন ঢের ঢের বড়। বাংলার মুসলমান নারী প্রগতির তিনি ছিলেন অগ্রনায়িকা—স্ত্রীশিক্ষার ছিলেন সর্ব্বপ্রথম নিশানবরদার।

"তুমি আলোকের, তুমি সত্যের ধরার ধূলার তাজমহল
রৌদ্রদগ্ধ আকাশের চোখে পরালে স্নিগ্ধ নীল কাজল।
বন্দিকারার প্রাকারে তুলেছ বন্দিনীদের জয় নিশান,
অবরোধ রোধ করিয়াছে দেহ, পারেনি রুধিতে কণ্ঠে গান।"

কবির এই কথার সত্যিকারের সার্থকতা যদি কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়, তবে তা পাওয়া গিয়েছিল একটি মাত্র নারীর জীবনে; তিনি এই বেগম রোকেয়া।

ভারতে মুসলমান রাজত্বের অবসান হ'ল। মুসলমানের রাজ্য গেল, ক্ষমতা গেল, ঐশ্বর্য্য গেল—সেটা তত দুঃখের কথা নয়। সবচেয়ে বড় কথা তাঁদের জ্ঞানের বাতি নিবল;— সেদিন থেকে মুসলমান মেয়েরা, বিশেষ ক'রে বাংলার মেয়েরা, হ'লেন খাঁচার পাখী, সেই অন্ধকার যুগে কেমন ক'রে তাঁর মনে জেগেছিল জ্ঞানের পিপাসা, কেমন করে ঢুকেছিল স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা—অন্ধকারের কুঁড়িতে কেমন ক'রে তিনি ফুটে ছিলেন আলোকের শতদল পদ্মের মত, সে-কথা আজও আমাদের কাছে একটা বিরাট রহস্যই রয়ে গেছে। অজ্ঞানতার অন্ধকারে, কুসংস্কারের নিবিড় তিমিরে দীপ জ্বালালেন তিনি জ্ঞানের, আলো দেখালেন মুক্তির, বাণী শোনালেন স্বাধীনতার। এই যে আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি মুসলমান মেয়েরা 'চলি চলি পা পা' ক'রে মুক্তির পথে অগ্রসর হচ্ছেন—এর গোড়ার কথা খুঁজতে গেলে কি বলতে হয়? বলতে হয়—এর জন্য বেশ অনেকখানি দায়ী মিসেস্ হোসেনের সাধনা—তাঁর দীর্ঘ পচিশ বছরের সংগ্রাম। মেয়েদের জন্য তিনি করেছিলেন স্কুল—আর মেয়ের মায়েদের জন্য করেছিলেন এক নারীসমিতি। তাঁদের অনেককেই তিনি এই সমিতির ভিতর দিয়ে তিলতিল ক'রে প্রেরণা জুগিয়েছেন। দিনের পর দিন চেষ্টা করে ঘরে ঘরে গিয়ে তাঁদের মুখের ঘোমটা খসিয়েছেন, হাত ধ'রে ধ'রে তাঁদের ঘরের বার করেছেন। আর যাঁরা সাক্ষাৎভাবে তাঁর সঙ্গে পরিচিত নন—প্রত্যক্ষে যাঁরা তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা পাননি, তাঁরাও পরোক্ষে তাঁর কাছে ঋণী। এ-কথা আজ আর অস্বীকার করবার উপায় নাই, জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে বাংলার প্রত্যেকটি মুসলমান মেয়ে তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়েছে; প্রত্যেকেরই তিনি ছিলেন—friend, philosopher and guide.

বেগম রোকেয়ার প্রতিভা ছিল বহুমুখিনী প্রতিভা। সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুলের আর-এস, হোসেনকে হয়ত অনেকে জানেন; কিন্তু "মতিচূরে"র আর-এস, হোসেন, "পদ্মরাগে"র আর-এস, হোসেন আজও অনেকের কাছেই অপরিচিতা। তাঁর "মতিচুর", "পদ্মরাগ", "সুলতানার স্বপ্ন" প্রভৃতি পুস্তক বহুদিন পর্য্যন্ত বাংলা ভাষায় স্থায়ী আসন অধিকার ক'রে থাকবে, সহজ, সরস, সাবলীল অথচ তীক্ষ্ণ, জোরালো ভাষার জন্য বাংলা সাহিত্যসেবী তাঁকে বহু দিন স্মরণ করবে। আজ বাংলার মুসলমান বাংলাকে মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করতে শিখেছে। কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন

তারা হোসেন শাহ, নসরত শাহ, পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁ প্রভৃতির কথা ভুলে গিয়েছিল। বাঙালী ব'লে পরিচয় দিতে তারা অপমান মনে করত, বাংলা ভাষায় কথা ব'লতে ঘৃণাবোধ করত।

তাঁর জীবনের বেশীর ভাগ কেটেছিল ভাগলপুরের ও কলকাতার উর্দ্দুভাষী সমাজে। গোঁড়া উর্দ্দুভাষী সমাজের মধ্যেই তাঁর জ্ঞানের বিকাশ হ'য়েছিল। তা সত্ত্বেও কেমন ক'রে যে তিনি আজীবন মনেপ্রাণে বাঙালী ছিলেন সে-কথা ভাবলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। বাংলার মাটিতে তাঁর জন্ম,—বাংলার বায়ু, বাংলার জলে তিনি মানুষ, এ-কথা ভোলেননি তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও। তিনি ছিলেন গজনভী পরিবারের অতি নিকট আত্মীয়া; কিন্তু বাংলার প্রতি ধূলিকণার সঙ্গেই ছিল তাঁর নাড়ীর যোগ। ইরাণী, তুরাণী, গজনভী 'খবাব' তিনি কখনও দেখেননি—আরবী, আফঘানী স্বপ্নেও কখনও বিভোর থাকেন নি। তিনি ছিলেন Bengali first, Bengali next and Bengali always.

বাংলায় তিনি কথা বলেছেন, বাংলায় চিন্তা করেছেন এবং বাংলা রচনার ভিতর দিয়েই তাঁর সত্যিকারের প্রকাশ মূর্ত্তিপরিগ্রহ করেছে। বাংলার অভিশপ্ত উৎপীড়িত মুসলিম নারীসমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা, তাঁদের ব্যথা বেদনা তাঁর "মতিচুর" "পদ্মরাগের" প্রতি পাতায় পাতায় প্রতি ছত্রে ছত্রে। মেয়েরা শুধু লেখা পড়া শিখবে—বড় জোর ম্যাট্রিক পাশ ক'রবে—এই-ই তাঁর আদর্শ ছিল না। এর চেয়ে ঢের ঢের উঁচু ছিল তাঁর ideal, ঢের ঢের বড় ছিল তাঁর dream। মেয়েরা শুধু good mothers এবং good wives হবে এইখানেই তাঁর আশা আকাঙ্ক্ষার সমাপ্তি হয়নি। পঁচিশ বছর আগে তিনি কল্পনা করেছিলেন—'lady magistrates, lady barristers এবং lady legislators.' মতিচুরের "মুক্তিফল" প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন—মেয়েদের সহায়তা না হ'লে একা পুরুষের প্রচেষ্টায় দেশ-জননীর স্বাধীনতা অসম্ভব—একেবারেই অসম্ভব। "সুলতানার স্বপ্নে" তিনি এর চেয়েও অনেক অনেক উঁচু আদর্শের অবতারণা করেছেন। তিনি স্বপ্নে দেখেছেন—এক অপূর্ব্ব, অদ্ভুত নারী রাজত্ব। পুরুষ সেখানে পর্দ্দার আড়ালে গৃহকোণে আবদ্ধ। আর নারীরা এক অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রকৃতিকে বশীভূত ক'রে নিয়ে আশ্চর্য্য শৃঙ্খলার সহিত সমস্ত কাজ চালাচ্ছেন। দুনিয়ার যত পাপ, তাপ, যুদ্ধবিগ্রহ সব-কিছুর জন্য তিনি দায়ী করেছেন পুরুষকে। তাঁর কল্পিত নারীস্থানে—পুরুষ যেখানে অবরোধরুদ্ধ সেখানে দুঃখকষ্ট অশান্তির সব লেশমাত্র অবশিষ্ট নাই; সেখানে চারিদিকে খালি শান্তি আর শান্তি। তাঁর এই স্বপ্ন সফল হ'তে হয়ত বহু দিন লাগবে, হয়ত বা এই স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। কিন্তু তাঁর এই একটি মাত্র স্বপ্ন থেকেই মানুষ বহু বহু কাল পরে ও এক নিমেষেই বুঝতে পারবে—তাঁর নারীত্বের আদর্শ কত উঁচু ছিল—নারীর শক্তিতে তাঁর বিশ্বাস কত পর্ব্বতপ্রমাণ ছিল। তাঁর এই স্বপ্ন থেকেই যুগে যুগে বাংলার নারী অনুপ্রেরণা পাবে; এই আদর্শ সম্মুখে রেখেই যুগে যুগে তারা উন্নতির পথে, মুক্তিপথে অগ্রসর হবে।

কবির কথার প্রতিধ্বনি ক'রে বলি—

Mrs. R. S. Husain is no more.
Long live R. S. Husain.

এমিলিয়া গালোত্তি

লেসিং প্রণীত নাটকের যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত অনুবাদ

অনুবাদক—শ্রীকানাইলাল গাঙ্গুলী

১৭২৯ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানীর অন্তর্গত সাক্সনির এক পুরোহিত-গৃহে খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিক গট্হোল্ড এফ্রাইম লেসিং-এর জন্ম হয়। উহার প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপীয় নব্যদর্শনের জন্মদাতা কান্ত্ জন্মলাভ করেন। তখন ফরাসী দেশে ভল্টেয়ারের প্রভাব পূর্ণ মাত্রায়, এবং রুসো তখন তরুণ যুবক। গ্যোতে, হাইনে, শিলের, ভীলান্দ প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত সাহিত্যিক লেসিং-এর অব্যবহিত পরবর্ত্তী। প্রাচীন জার্ম্মান সাহিত্যের এই সব উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং আধুনিক নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত গেরহার্ড্ হাউপ্টমান্, থমাস্ মান্ প্রভৃতি বর্ত্তমান সত্ত্বেও প্রথমেই লেসিং-এর 'এমিলিয়া গালোত্তি'র অনুবাদ বঙ্গসাহিত্যে প্রবর্ত্তনের চেষ্টা কেন ক'রছি, তার কিছু পরিচয় প্রয়োজন।

প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে 'লেসিং' যখন মাতৃভাষায় লেখা আরম্ভ করেন, তখন বিশ্বসাহিত্যের দরবারে জার্ম্মান ভাষা "পারিয়া" মাত্র। বিশ্বে কেন, স্বদেশেও জার্ম্মান সাহিত্যের আদর ছিল না। তখন জার্ম্মানীর দরবারী ভাষা "ফরাসী" এবং শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় জার্ম্মান মাত্রেই ফরাসী ভাষায় আলাপ ও পত্রব্যবহারাদি করতেন। জার্ম্মানীর তৎকালীন অতি-মানব ফ্রিড্রিক দি গ্রেট ভল্টেয়ারের শিষ্য, এবং তাঁর সমস্ত গ্রন্থ ফরাসী ভাষায় লিখেছিলেন। এই সময়ে লেসিং-এর অসাধারণ প্রতিভা জার্ম্মান ভাষার দৈন্য ঘুচালে। তাঁর 'মিনা ফন্ বার্ণহাইম,' 'এমিলিয়া গালোত্তি,' 'নাথান দের ভাইসে,' 'লাওকোন' ইত্যাদি অসংখ্য পুস্তক শুধু স্বদেশে জার্ম্মান ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে নবযুগের প্রবর্ত্তন করেনি, পরন্তু বিশ্বসাহিত্যে তার উচ্চস্থান ক'রে দিলে। তাঁর পরবর্ত্তী গ্যোতে, শিলের প্রভৃতি সকলে তাঁর প্রতিভা দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হ'য়েছিলেন। এমন কি এঁরা লেসিং-এর মানস পুত্র বললে হয়ত অত্যুক্তি করা হয় না। সুতরাং এই হিসাবে লেসিং জার্ম্মান সাহিত্যের জনক, তথা জার্ম্মান জাতির একজন প্রতিষ্ঠাতা।

তাঁর প্রতিভার প্রভাব থেকে আজ পর্য্যন্ত জার্ম্মান নাট্য-কলা মুক্ত হ'তে পারেনি। জার্ম্মানীতে অবস্থানকালে ইহা বিশেষ নজরে পড়ে। জার্ম্মান-কৃষ্টিতে নাট্য-কলা চর্চ্চা একটা বড় অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে যেমন এখন বা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কোন বঙ্গীয় কবির মুক্তি লাভ অসম্ভব, জার্ম্মান নাট্য-কলার ওপর লেসিং-এর প্রভাব অনুরূপ। জার্ম্মান থিয়েটার-সমূহে যে-সব সাধারণ নাটক-নাটিকা আজও অভিনীত হয়, তার অধিকাংশই লেসিং-এর ধাঁজের ব'লে মনে হয়। এর কারণ, হয় লেসিং তাঁর অসাধারণ প্রতিভা-প্রসূত চিন্তাধারা দ্বারা নূতন জার্ম্মান সমাজের জন্ম দিয়েছেন, যার আসল রূপ এখনও অপরিবর্ত্তিত, নয় ত শিক্ষিত জার্ম্মান সমাজের শাশ্বত স্বরূপ তিনি তাঁর নাটকাদির ভেতর দিয়ে এমন নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে তাকে অতিক্রম করা যে-কোন নাট্যকারের পক্ষে দুঃসাধ্য।

লেসিং-এর আর এক বিশেষত্ব তাঁর সার্ব্বভৌমিকতা। তাঁর 'দি য়ুদেন্' বা 'নাথান দের ভাইসে' এবং তাঁর গদ্য ও প্রবন্ধাদি হ'তে এর পরিচয় পাওয়া যায়। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে গোঁড়া খৃষ্টান-পুরোহিতের ঘরে জন্মে, তিনি সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়ের ভেতর দিয়ে যে মহামানবতার শিক্ষা দিয়ে গেছেন তা আধুনিকতম যে-কোন উদার-নৈতিকের বিস্ময় উৎপাদন করবে।

সুতরাং প্রথমেই লেসিং-এর একটা উৎকৃষ্ট নাটকের অনুবাদ ক'রে বঙ্গভাষায় তাঁকে পরিচিত করা হ'ল। তাঁর 'মিনা ফন্ বার্ণ-হেল্ম' 'মিস সারা সাম্পসন্' ইত্যাদি নাটক ইউরোপীয় সমাজে অধিক প্রিয়। কিন্তু এগুলির ভাব ও চরিত্রাবলী আমাদের পক্ষে অতিশয় বৈদেশিক ঠেকবে। অথচ 'এমিলিয়া গালোত্তি'র নায়িকা-চরিত্র সীতা, সাবিত্রী জাতীয় বলে আমাদের পক্ষে উপাদেয়। তাই, 'এমিলিয়া গালোত্তি' প্রথমেই নির্ব্বাচন করেছি।

'এমিলিয়া গালোত্তি' নির্ব্বাচন করবার অপর উদ্দেশ্য, শিক্ষিত বাঙালীর—এমন কি বহু ইউরোপ-প্রত্যাগতেরও—ইউরোপীয় স্ত্রী-চরিত্র সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূর করা। বর্ত্তমান কালের 'মাদার ইণ্ডিয়া' ও তার প্রত্যুত্তর 'আঙ্কল স্যাম' বা 'আনফর্টুনেট্ ইণ্ডিয়া' ইত্যাদি দ্বারা এই ভ্রান্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। এই জাতীয় ঘৃণাজাত গ্রন্থ সত্যকে প্রকাশ না ক'রে অধিক আবরণ করে। যে নারী জননী-রূপে, সহধর্ম্মিণী-রূপে, কন্যা-রূপে, ভগ্নী-রূপে, আত্মীয়া-রূপে বান্ধবী-রূপে মঙ্গল বিতরণ করেন, তাঁর সনাতন আদর্শ-বৈশিষ্ট্য মূলতঃ সকল সভ্যসমাজেই এক। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে লেসিং-অঙ্কিত ইউরোপীয় নারীচরিত্রে এই সত্যই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। লেসিং তৎকালীন সমাজের নিখুঁত চিত্র দিয়েছেন—সুতরাং দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ইতালী তথা সমস্ত ইউরোপে 'এমিলিয়া গালোত্তি' জাতীয় নারী-চরিত্রই অন্ততঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের আদর্শ ছিল এবং আজও বহু বাহ্য-পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও মূলত একই আছে।

এমিলিয়ার চরিত্রে সীতার নিষ্ঠা ও তেজস্বিতা উভয়ই সমভাবে বিদ্যমান। তাতে দুর্ব্বলতা বা দাসোচিত মনোবৃত্তির স্থান শূন্য। এতে যে অলৌকিকত্ব বা অস্বাভাবিকত্বও কিছুমাত্র নেই—তার পিতার সঙ্গে শেষ আলাপে তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। অথচ ইহা দৃঢ় ও আপন মহিমায় উজ্জ্বল। এ চরিত্র-চিত্রে লেসিং-এর আর এক বৈশিষ্ট্য—নাট্যে নায়িকার আপন কথা অল্প। এ যেন কয়েকটি মাত্র তুলির খোঁচায় এক অতুলনীয়ার প্রাণসৌন্দর্য্যকে রূপ দেওয়া হয়েছে। দুঃখের বিষয়, অনিপুণ হস্তের অনুবাদে এর অনেক মাধুর্য্য নষ্ট হয়েছে। তবু, আশা করি ইউরোপীয় নারীর এই আদর্শ-চিত্র ইউরোপীয় সমাজ-সম্বন্ধে আমাদের বহু ভ্রান্ত-ধারণা বিনষ্ট করবে।

শ্রীকানাইলাল গাঙ্গুলী

স্থান :—গুয়াস্তালা [ইতালীর সামন্ত-রাজ্য]

সময় :—অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

নাটকের চরিত্রাবলী—

এমিলিয়া গালোত্তি—অসামান্য রূপ-গুণবতী কন্যা।

ওদোয়ার্দো গালোত্তি—এমিলিয়ার পিতা, সাবিওনেত্তার অধিবাসী একজন কর্ণেল।

ক্লাউদিয়া গালোত্তি—ওরোয়াদের পত্নী, এমিলিয়ার মাতা।
রাজা গোন্‌ৎসাগা—গুয়াস্তালা-রাজ।
মারিনেল্লি—রাজার প্রাসাদ-সচিব।
কামিল্লো রোতা—একজন মন্ত্রী।
কন্তি—চিত্রকর।
কাউন্ট আপ্পিয়ানি সম্ভ্রান্ত যুবক জমিদার।
কাউন্টেস অর্সিনা—সম্ভ্রান্তা মহিলা রাজার বাগ্‌দত্তা পূর্ব্ব-প্রণয়িনী।
আঞ্জেলো—গুপ্তঘাতক গুণ্ডা।
পিরুরো বাতিস্তা প্রভৃতি ভৃত্যগণ ও অপরাপর ব্যক্তি।

প্রথম অঙ্ক

স্থান—গুয়াস্তালার রাজপ্রাসাদ।

রাজার কার্য্য-গৃহ

সময় প্রত্যূষ

দৃশ্য—রাজোচিত সুসজ্জিত গৃহের বাম দিকে এক কারুকার্য্য-খচিত সেক্রেটারিয়েট টেবিল। টেবিলের উপরে স্তূপাকার কাগজ, চিঠিপত্র অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ভাবে ছড়ান। টেবিলের এক পার্শ্বে রাজোচিত এক চেয়ারে রাজা আসীন, এবং কাগজপত্রের স্তূপ ঘাঁটছেন। টেবিলের অপর পার্শ্বে, রাজার ঠিক সামনে, কোন চেয়ার নেই—কিন্তু টেবিল থেকে কিছু দূরে, দেওয়ালের নিকটে, কয়েকটি জমকাল আরাম-কেদারা। দেওয়ালের গায়ে কয়েকটি মনোরম গবাক্ষ। তার ভিতর দিয়ে প্রভাত-কিরণ ঘরের মধ্যে পড়ায় ঘর বেশ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। রাজার বয়স প্রায় পঁচিশ। দেহ দীর্ঘ, নাতি স্থূল, নাতি কৃশ। অতি সুপুরুষ। রাজোচিত বেশ পরিহিত। মুখে বা দেহে দৃঢ়তার কোন চিহ্ন নেই। দেখলে মনে হয় খুব ভাল মানুষ, কিন্তু মানসিক বলের একান্ত অভাব।

রাজা—নাঃ, অভিযোগ, কেবল অভিযোগ। কেবল দরখাস্ত, স্তূপাকার দরখাস্ত! কী আপদ!! তবু লোকে আমাদের হিংসে করে! হ্যাঁ, সকলের ইচ্ছে পূর্ণ করা সম্ভব হ'লে হিংসার পাত্র হতুম বটে।—এটা কি? [হঠাৎ একটা দরখাস্তে স্বাক্ষরকারীর নাম নজরে পড়ায়] এমিলিয়া?—একজন—এমিলিয়া? না— এ এমিলিয়া ব্রুনেস্কি—গা-লো-ত্তি নয়!! [দীর্ঘশ্বাস] হোক—কী চায় এই এমিলিয়া? [দরখাস্ত পাঠ] নাঃ—বড় বেশী চায়—বড় বেশী!!—তবু তো এর নাম এমিলিয়া!—আচ্ছা, দরখাস্ত মঞ্জুর [দরখাস্তের উপর নাম সহি ক'রে ঘণ্টাবাদন, ভৃত্যের প্রবেশ] পাশের ঘরে মন্ত্রীদের কেউ নেই?

ভৃত্য—না, মহারাজ।

রাজা—বড় সকাল-সকাল ঘুম থেকে উঠেছি! [গবাক্ষের দিকে চেয়ে] কিন্তু কি সুন্দর প্রভাত! আমি বেড়াতে যাব। মার্কুইস্ মারিনেল্লি আমার সঙ্গে যাবেন। ডাকো তাঁকে। [ভৃত্যের প্রস্থান] নাঃ, আর তো আমার পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়!—বেশ শান্তিতে ছিলুম—অন্ততঃ মনে হচ্ছিল খুব শান্তি—হঠাৎ এক জনের নাম হ'ল—এ-মি-লি-য়া—আর গেল আমার শান্তি-টান্তি সব রসাতলে!

ভৃত্য—[পুনঃপ্রবেশ] মার্কুইস্ মহাশয়কে ডেকে পাঠিয়েছি। আর কাউন্টেস্ অর্সিনার কাছ থেকে এই চিঠি—

রাজা—ও, অর্সিনা? আচ্ছা রেখে দাও।

ভৃত্য—তাঁর পত্রবাহক অপেক্ষা করছে।

রাজা—যেতে বল। প্রয়োজন হ'লে উত্তর পাঠিয়ে দেব। অর্সিনা কোথায়? শহরে, না তাঁর বাগান-বাড়িতে?

ভৃত্য—গতকল্য তিনি শহরে এসেছেন।

রাজা—খুব খারাপ—না—ভাল ব'লতে যাচ্ছিলুম। তাঁর পত্র-বাহকের অপেক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন। [ভৃত্যের প্রস্থান] প্রেয়সী কাউন্টেস্! [পত্র হাতে নিয়ে] নাঃ, ধরা যাক্ এ পড়াই হ'য়ে গেছে [পত্র টেবিলে রেখে] হুঁ! আমার বিশ্বাস ছিল এঁকে আমি ভালবাসি। মানুষ কী না বিশ্বাস করে! হ'তে পারে—একদিন এঁকে সত্যই ভালবাসতুম। কিন্তু—বাসতুম!

ভৃত্য—[পুনঃপ্রবেশ] চিত্রকর কন্তি মহারাজের দর্শনপ্রার্থী।

রাজা—কন্তি? খুব ভাল। আসতে দাও। আঃ বাঁচা গেল—তবু ভিন্ন চিন্তা এসে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হবে।

[ভৃত্যের প্রস্থান, কন্তির প্রবেশ]

রাজা—সুপ্রভাত কন্তি। কেমন আছেন? শিল্প-কলার কি খবর?

কন্তি—মহারাজ, শিল্পকলা অর্থেরই ক্রীতদাস।

রাজা—তা হ'তেই পারে না—তা হওয়া উচিত নয়। অন্ততঃ আমার এই ক্ষুদ্র রাজ্যে তা কিছুতেই হ'তে দেব না। তবে শিল্পীদেরও খাটতে হবে!

কস্তি—কার্য্যেই তো শিল্পীর আনন্দ! তবে বেশী পরিশ্রম করলে সুনাম নষ্ট হ'তে পারে!

রাজা—না, না, গাধা-খাটুনির কথা বলিনি!—খালি হাতে আসেননি তো?

কস্তি—আপনি যা ফরমায়েস করেছিলেন, সেই তৈল-চিত্রটা এনেছি, মহারাজ! আর একটা এনেছি—এটার আদেশ হয়নি—তবু দেখার যোগ্য ব'লে এনেছি।

রাজা—কার তৈল-চিত্র চেয়েছিলুম? কই, মনে তো পড়ছে না—

কস্তি—কাউন্টেস্ অর্সিনার!

রাজা—ও, ঠিক কথা। তবে এ ফরমায়েসটা বড় পুরান হ'য়ে গেছে—

কস্তি—আমাদের সুন্দরী মহিলাদের রোজ তো আর ছবি আঁকতে পাওয়া যায় না। গত তিন মাসের মধ্যে কাউন্টেস্‌কে মাত্র একদিন পেয়েছিলুম।

রাজা—ছবিগুলি কোথায়?

কস্তি—পাশের ঘরে, এখুনি আন্‌ছি। [প্রস্থান]

রাজা—কাউন্টেসের ছবি!—হোক ছবি মাত্র। স্বয়ং তো নয়! হ'তে পারে মানুষটার মধ্যে যা আর নজরে পড়ে না, ছবিতে তা অনুভব করবো।—নাঃ—সে অনুভূতি আর ফিরে আসবে না। হ'তেও তো পারে—ছবিটা হয়ত এমন রঙে, এমন ভঙ্গীতে এমন রূপে আঁকা যে এর দর্শন আমার প্রাণকে আবার রঙীন ক'রে তুলবে! হয়ত তাহ'লে ভালই হ'ত! তাকে যখন ভালবাসতুম আমার জীবন কত তরল, কত আমোদপূর্ণ, কত স্বচ্ছন্দ ছিল—আর এখন ঠিক তার বিপরীত!—কিন্তু না না না সুখী হই বা অসুখী হই, এখন যা আছি তাই ভাল। [কস্তির পুনঃপ্রবেশ। হাতে দুটি তৈল-চিত্র। একটি উল্টা ক'রে আরাম-কেদারার ওপর রেখে, কাউন্টেসের চিত্র রাজার সম্মুখে ধ'রে]

কস্তি—মহারাজ, অনুরোধ করি, আমাদের শিল্পকলার এই দীন অবদান নিরীক্ষণ করুন। এই সুন্দরীর অনেক মাধুর্য্যই তুলির আয়ত্তাধীন হয় নি। একটু এগিয়ে এসে দেখুন!

রাজা—[হৃদবস্থাতেই, একটু দেখেই] বাঃ, চমৎকার। কিন্তু বাড়িয়ে এঁকেছেন কস্তি, বড় বেশী বাড়িয়েছেন।

কস্তি—এ যাঁর ছবি তিনি তা মনে করেন না। আর সত্যই এতে আতিশয্য-দোষ নেই। আমাদের কর্ত্তব্য অন্তরের রূপকে ফুটিয়ে তুলে, তাকে অমরত্ব দেওয়া।

রাজা—রূপ-দক্ষ চিত্রশিল্পীর পক্ষে তা সম্ভব বটে। হ্যাঁ—যাঁর ছবি তিনি এ দেখে কী বল্‌লেন?

কস্তি—মার্জ্জনা করবেন! তিনি আমার অতি শ্রদ্ধার পাত্রী। তাঁর বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই।

রাজা—ভয় নেই—যা খুশী বলতে পারেন। কী বল্‌লেন, নির্ভয়ে বলুন।

কস্তি—কাউন্টেস্ ব'ললেন, "এর চেয়ে কুৎসিত না হ'লেই সন্তুষ্ট।"

রাজা—বটে!

কস্তি—আর তা এমন মুখভঙ্গী ক'রে বল্‌লেন, যার কোন চিহ্ন এ ছবিতে নেই।

রাজা—তাই তো বলি, তাই তো ব'লি, এ ছবিতে আতিশয্য-দোষ ঘটেছে। সে মুখ-ভঙ্গী আমি চিনি—সেই দম্ভপূর্ণ ক্রূর পরিহাস যা মুখের সমস্ত মাধুর্য্য নষ্ট করে। কস্তি, তাঁর আসল প্রকৃতিই বা এতে কোথায় ফুটেছে? তার সেই অসহ্য দম্ভের পরিবর্ত্তে এঁর মুখে আপনি যে সলাজ হাসি ফুটিয়েছেন!

কস্তি—[বিরক্ত হয়ে] মহারাজ, প্রীতির চক্ষে আমরা আঁকি, প্রীতির চক্ষুই এর সঠিক বিচার করতে পারে।

রাজা—হ্যাঁ-হ্যাঁ—এক মাস আগে এটা আন্‌লেন না কেন?—এটা সরিয়ে রাখুন—ও ছবিটা দেখি?

কস্তি—[কাউন্টেসের ছবি রেখে, অপর ছবিটা এনে, কিন্তু তখনও উল্টো ক'রে ধ'রে] এও স্ত্রীলোকের ছবি।

রাজা—ও, তাহ'লে আর ও দেখার প্রয়োজন নেই। স্ত্রী-রূপের যে আদর্শ এ-হৃদয়ে আঁকা [বুক দেখিয়ে] তার তুল্য কিছুই হ'তে পারে না। কস্তি, স্ত্রী-চিত্র ছেড়ে দিয়ে অন্য কিছু আঁকুন।

কস্তি—আমার চেয়ে প্রকৃষ্ট শিল্প নৈপুণ্য সুলভ হ'তে পারে কিন্তু এর চেয়ে সুন্দর মুখ দুষ্প্রাপ্য।

রাজা—বটে! তাহ'লে বাজি রাখতে পারি, ইনি

আপনার প্রেয়সী! [কন্তি ছবি সোজা ক'রে ধ'রলে। দেখামাত্র রাজা চেয়ার ছেড়ে উঠে, ছবিতে দৃষ্টি নিবদ্ধই রেখে টেবিলের অপর পার্শ্বে ছবির একেবারে নিকটে এসে, বিমোহিতের ন্যায়]—এ—কী? এ ছবি—না স্বপ্ন?—এমিলিয়া গালোত্তি?

কন্তি—সে কি! এ দেবীকে চেনেন?

রাজা—[আত্মস্থ হবার চেষ্টা ক'রে, কিন্তু ছবি থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে] হাঁা—এঁকে একবার এঁর মার সঙ্গে এক উৎসবে দেখেছিলুম; সে কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে। পরে একবার গীর্জ্জাতেও এঁকে উপাসনারতা দেখেছিলুম। সেখানে আর কথা বলা সম্ভব হয় নি। এঁর পিতাকে চিনি। তিনি আমার বন্ধু নন! সাবিত্তনেত্তার ওপর আমার দাবির তিনিই সবচেয়ে বেশী বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন।—বৃদ্ধ যোদ্ধা—তেজস্বী ও কর্কশভাষী কিন্তু বড় কোমলহৃদয়—বড় ভালমানুষ।

কন্তি—সে তো পিতা। এটি তাঁর কন্যা।

রাজা—আশ্চর্য্য, যেন আয়নার প্রতিবিম্বটা চুরি ক'রে বসান হয়েছে [ছবিতে নির্নিমেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে] জানেন তো কন্তি, শিল্পীকে তখনই সত্যিকারের প্রশংসা করা হয় যখন তার সৃষ্টির ধ্যানে ভক্ত নির্ব্বাক হয়ে যায়, প্রশংসা করতে আর অবসর পায় না?

কন্তি—মহারাজ, আপনি এ ছবি দেখে সন্তুষ্ট হয়েছেন আমি কিন্তু এ এঁকে তৃপ্ত নই। চোখে দেখে প্রাণে যা অনুভব করেছি—তা যদি চোখ দিয়েই আঁকতে পারতুম,—তা'হ'লে হয়ত কতকটা ভাল হ'ত। আচ্ছা মহারাজ, রাফ্‌ফেল যদি নুলো হয়ে জন্মাতেন, তাহ'লেও কি তিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পী হ'তেন না?

রাজা—[অন্যমনস্ক। সবেমাত্র ছবি থেকে চোখ তুলে] অ্যাঁ—কী ব'ললেন, কন্তি? কী জান্‌তে চাইলেন?

কন্তি—না, না, কিছুই না। বাজে বক্‌ছিলুম। আপনার সমস্ত মন দেখায় ব্যস্ত। এমন মন, এমন দৃষ্টি উভয়ই আমার প্রিয়।

রাজা—[জোর ক'রে নির্লিপ্ত ভাব দেখাবার চেষ্টা ক'রে] আচ্ছা কন্তি, সত্যিই মনে করেন এমিলিয়া গালোত্তি এ শহরের সুন্দরী-শ্রেষ্ঠাদের মধ্যে একজন?

কন্তি—সুন্দরী-শ্রেষ্ঠাদের মধ্যে একজন? তাও মাত্র এই শহরের? তামাশা করছেন, মহারাজ? আমার জীবন সার্থক, এঁকে ছবি আঁকবার জন্যে পেয়েছি। এই মুখ, এই ললাট, এই চোক, এই নাক, এই অধর, এই চিবুক, এই গ্রীবা, এই গঠন, এই স্বাস্থ্যযুক্ত স্ত্রী-সৌন্দর্য্য আঁকবার সৌভাগ্য অল্পলোকের ভাগ্যেই জুটেছে। আসল ছবিটা সুন্দরীর পিতা পেয়েছেন—এইটা তার নকল—

রাজা—[ক্ষিপ্রভাবে কন্তির দিকে চেয়ে] এটা তো কাউকে দিতে প্রতিশ্রুতি নন?

কন্তি—এটা আপনাকেই দিতে চাই, যদি অবশ্য পছন্দ করেন।

রাজা—পছন্দ! [একটু হেসে] ঐ ছবিটা [কাউন্তেসের ছবি দেখিয়ে] নিয়ে যান। ওকে একটা অতি মূল্যবান ফ্রেমে বাঁধিয়ে, আমার চিত্রশালায় টাঙিয়ে রাখবেন। আর এটা অমনি আমার কাছেই থাক [এমিলিয়ার চিত্র নিজ হাতে নিয়ে, তাতে পুনরায় পলকহীন দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে] বহু ধন্যবাদ! আর যা বল্‌লুম, আমার রাজ্যে শিল্পীকে অন্ন-চিন্তা করতে হবে না, অন্ততঃ যতক্ষণ আমার অন্ন জুটবে। দুটোরই মূল্য পাবেন। যত চান, তত।

কন্তি—মহারাজ, ভয় হ'চ্চে, শিল্প ছাড়া অন্য ব্যাপারেও আপনি এমনি মুক্ত-হস্ত হ'য়ে পুরস্কার দেন!

রাজা—হিংসা হ'চ্চে? না, না, শুনুন, যত মূল্য চান ততই পাবেন।

[কাউন্তেসের চিত্র নিয়ে কন্তির প্রস্থান]

রাজা—হাঁা, যত চায়, তত পাবে। [হাতের ছবির প্রতি] যত মূল্যই দিই না, তবু তোমাকে অল্প-মূল্যেই পেলুম!—কী সুন্দর! কী চান—তোমার গর্ব্বিত পিতা—যা চান তাই পাবেন—শুধু চান আমার কাছে। সবচেয়ে ভাল হ'ত, যদি তোমার হৃদয় জয় করতে পারতুম। কী সোহাগভরা সুন্দর চোখ! কী-অ-ধ-র!—এ যদি··· [পদশব্দ শুনে] কে আস্‌ছে? আঃ—[দেওয়ালের দিকে মুখ ক'রে ছবিটা রেখে দিয়ে] সম্ভবতঃ মারিনেল্লি!—না ডাকলেই ভাল হ'ত। ছবির ধ্যানে সকালটা তাহ'লে ভালই কাটতো।

[মারিনেল্লির প্রবেশ]

মারিনেল্লি—মহারাজ, বিলম্ব মার্জ্জনা ক'রবেন। পূর্ব্বে কখন এত প্রত্যুষে ডাক পড়েনি, তাই প্রস্তুত ছিলাম না।

রাজা—সকালটা সুন্দর ব'লে একবার ইচ্ছে হয়েছিল বটে বেড়াতে যাবার, কিন্তু এখন আর সে ইচ্ছা নেই [কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে] নূতন খবর কি, মারিনেল্লি?

মারিনেল্লি—খারাপ কিছুই না। কাউন্তেস্ অর্সিনা কাল শহরে ফিরেছেন।

রাজা—ঐ যে তাঁর চিঠি! এখনও খোলা হয়নি। দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে?

মারিনেল্লি—হ্যাঁ—আমি তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু। তিনি অনেক অভিযোগ করলেন—মহারাজ এখন…

রাজা—থাক, থাক, জানেন তো, রাজনৈতিক কারণে হয়ত বা আমাকে মাসার রাজপুত্রীকেই বিবাহ করতে হবে।

মারিনেল্লি—শুধু রাজনৈতিক কারণে বিবাহ করেন তো কাউন্তেসকে আপনার হৃদয়-চ্যুত করবার কী প্রয়োজন?—তবে যদি—

রাজা—তবে যদি অন্য নারীকে ভালবাসি? সেটা কি মহাপাপ হবে, মারিনেল্লি?

মারিনেল্লি—না, না, তবে—তবে—

রাজা—এ প্রসঙ্গ থাক মারিনেল্লি, শহরের নূতন খবর বলুন।

মারিনেল্লি—তেমন কোন খবর নেই। আজ কাউন্ত আপ্পিয়ানির বিবাহ। এ একটা সংবাদই নয়।

রাজা—আপ্পিয়ানির বিয়ে? কার সঙ্গে বলুন তো? এর কোন কথাই তো পূর্ব্বে শুনিনি?

মারিনেল্লি—গোপনে বিয়ে করছেন! আপনি হাসবেন, ভালবাসার ফাঁদে পড়লে মানুষের এই দশাই হয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের এক সুন্দরীর রূপ-গুণের প্রভাবে কাউন্তের এই দশা হয়েছে।

রাজা—তাহ'লে তো কাউন্ত হিংসার পাত্র! পরিহাস কিসের?—কে এই ভাগ্যবতী? আপনার শত্রু হ'লেও, কাউন্ত একজন ধনবান, গুণবান, রূপবান সম্মানী যুবক। তাঁর কোন উপকারে এলে সুখীই হতুম। ভেবে দেখতে হবে, কি ক'রে তা সম্ভব হয়।

মারিনেল্লি—সে অবসর আর পাবেন না, মহারাজ! বিয়ের পরই কাউন্ত মহাশয় সস্ত্রীক তাঁর জমিদারী পিয়েমন্ উপত্যকায় পালাবেন, আর শিকার ও পশুপালনে ব্যস্ত থাকবেন। তা ছাড়া আর করবেনই বা কী? এ বিয়ের পর তো আর তাঁর সম্ভ্রান্ত সমাজে স্থান হবে না!

রাজা—চুলোয় যাক্ আপনার সম্ভ্রান্ত সমাজ! সেখানে আছে তো কেবল বাহ্যাড়ম্বর, আচারের কড়াকড়ি আর আনন্দশূন্য বিলাস! বলুন তো, কার জন্যে তিনি এত ত্যাগ স্বীকার করলেন?

মারিনেল্লি—কে একজন এমিলিয়া গালোত্তি।

রাজা—[অত্যন্ত উত্তেজিত স্বরে] কী বল্লেন? —কে একজন—

মারিনেল্লি—এমিলিয়া গালোত্তি।

রাজা—এমিলিয়া গালোত্তি?—অসম্ভব।

মারিনেল্লি—সুনিশ্চিত, মহারাজ।

রাজা—না বলছি, না! তা হ'তে পারে না। আপনার নিশ্চয়ই নামে ভুল হচ্চে। গালোত্তি-বংশ প্রকাণ্ড। কেউ গালোত্তি হ'তে পারে—এমিলিয়া নয়।

মারিনেল্লি—এমিলিয়া—এমিলিয়া গালোত্তি।

রাজা—তাহ'লে নিশ্চয়ই অন্য কোন এমিলিয়া গালোত্তি। আপনি তো তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বল্লেন কে একজন এমিলিয়া গালোত্তি—কে একজন! আসল এমিলিয়া সম্বন্ধে পাগলেও অমন ভাবে বলতে পারে না।

মারিনেল্লি—মহারাজ, আপনি যে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। এমিলিয়াকে চেনেন নাকি?

রাজা—আমাকে প্রশ্ন করতে হবে না, আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। ইনি কি সাবিওনেত্তার কর্ণেল গালোত্তির কন্যা?

মারিনেল্লি—হ্যাঁ, মহারাজ।

রাজা—এঁর মার সঙ্গে এই শহরে বাস করেন?

মারিনেল্লি—হ্যাঁ, মহারাজ।

রাজা—গীর্জ্জার অতি নিকটের বাসায়?

মারিনেল্লি—হ্যাঁ, মহারাজ।

রাজা—এক কথায় [ক্ষিপ্রভাবে এমিলিয়ার ছবি তার হাতে দিয়ে] ইনি ?—ফের বল্ তোর সর্ব্বনেশে "হ্যাঁ, মহারাজ !"

মারিনেল্লি—মহারাজ, ইনিই।

রাজা—শয়তান !—ইনি—এই এমিলিয়া গালোত্তি আজ—

মারিনেল্লি—কাউন্তেস্ আপ্পিয়ানি হবেন। [রাজা তার হাত থেকে ছবিটা ছিনিয়ে নিয়ে কেদারায় নিক্ষেপ করলে] সাবিওনেত্তায় এমিলিয়ার পিতৃভবনে বিনা সমারোহে বিবাহ হবে। আজ দুপুরেই বর, বধূ ও কন্যার মাতা সেখানে যাবেন। স্থানীয় কয়েকটি বিশিষ্ট বন্ধু বিবাহে যোগ দেবেন।

রাজা—[হতবুদ্ধি হয়ে এক কেদারায় ব'সে প'ড়ে] সব গেল ! আমি আর বাঁচবো না !

মারিনেল্লি—কি হ'ল—মহারাজ ?

রাজা—[মারিনেল্লির ওপর লাফিয়ে প'ড়ে] বিশ্বাসঘাতক !—কি হ'ল ! আমি তাকে ভালবাসি, পূজা করি !! তোরা তা জানতিস্ না ? অনেক দিন ধ'রে তোরা সকলে তা জানতিস্, সকলে জানাতস্। তোরা চাস্ না, আমি সুখী হই। তোরা সকলে চাস্, আমি আজীবন ঐ অর্সিনার নিষ্ঠুর বন্ধন শৃঙ্খল বহন করি !! [তাকে ছেড়ে দিয়ে, একটু আত্মস্থ হ'য়ে] মারিনেল্লি, আপনিও এই করলেন ? আপনি না বলেন, আপনি আমার পরম মিত্র ?—হায়, রাজার বন্ধু নেই, বন্ধু হ'তে পারে না—! এত বড় বিপদ ঘ'টতে দিলেন—আর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তা গোপন করলেন ? এ আমি কখনও মার্জ্জনা করতে পারবো না।

মারিনেল্লি—মহারাজ, বিস্ময়ে আমার বাক্‌রোধ হবার উপক্রম হয়েছে। আপনি এমিলিয়া গালোত্তিকে ভালবাসেন ? শপথ ক'রে বলছি, এর বিন্দুবিসর্গ না জানতুম আমি, না জানে অর্সিনা। তাঁর সন্দেহ ভিন্ন রকমের।

রাজা—ও, তাহ'লে মাপ করবেন [মারিনেল্লিকে আলিঙ্গন ক'রে] আমার জন্যে দুঃখ হয় না কি ?

মারিনেল্লি—মহারাজ, বিশ্বাসী বন্ধুর কাছে কথা গোপন করার ফল কি বিষম হয়, তা এখন বুঝুন ! এইমাত্র বললেন, "রাজার বন্ধু নেই, বন্ধু হ'তে পারে না।" এ কথা যদি সত্যিই হয়, তো তার কারণ জানেন ? আপনারা বন্ধু চান না ! আজ হয়ত দায়ে ঠেকে প্রাণের সব কথা প্রকাশ করলেন, কালই হয়ত দায়ে খালাস হয়ে এমন ব্যবহার করবেন, যেন আর চেনেনই না। তা দুঃখ কিসের মহারাজ ! এমিলিয়ার কাছে প্রাণের কথা বলেছেন তো ?

রাজা—না, তার অবসর পাইনি ! ওঃ, মারিনেল্লি, আর বেশী ব'কলে আমি পাগল হয়ে যাব। প্রশ্ন করবেন না, পারেন তো আমাকে বাঁচান !

মারিনেল্লি—বাঁচাবো ? কী এমন হয়েছে যে বাঁচাতে হবে ? বেশ তো, যা কুমারী গালোত্তিকে বলতে পারেন নি, তা কাউন্তেস্ আপ্পিয়ানিকে বলবেন !

রাজা—একি সত্যি সত্যি বলছেন ?

মারিনেল্লি—নিশ্চয় ! তবে, এতে একটু খারাপও হয় বটে।

রাজা—আপনি অতি নির্লজ্জ।

মারিনেল্লি—আর এর মুস্কিল হচ্চে, কাউন্ত শহরেই থাকবেন না। সুতরাং, অন্য উপায় চিন্তা করতে হবে !

রাজা—কী উপায় ?—বন্ধুশ্রেষ্ঠ মারিনেল্লি, একবার ভেবে দেখুন আমার কী দশা হ'ল ! আমার অবস্থায় পড়লে আপনি কি করতেন ?

মারিনেল্লি—প্রথমতঃ যা সত্যিই তুচ্ছ, তা তুচ্ছই ভাবতুম, দ্বিতীয়তঃ আমি যে রাজা তা বৃথা হ'তে দিতুম না।

রাজা—এক্ষেত্রে রাজ-শক্তির ব্যবহার অসম্ভব।—আজকেই বিয়ে হবে ? আজই ?

মারিনেল্লি—আজই। কী আর করবেন বলুন [কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে] হ্যাঁ, এক উপায় হ'তে পারে ! মহারাজ ! আমাকে কাজের স্বাধীনতা দেবেন ? আর যা করবো তাই মঞ্জুর করবেন ?

রাজা—সব ! মারিনেল্লি—সব ! আমাকে শুধু এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

মারিনেল্লি—তাহ'লে সময় নষ্ট করা চলবে না।

আপনি এখুনি আপনার দোসালোর প্রমোদ-ভবনে যান। ওটা সাবিত্তনেত্তার পথে। কিন্তু যদি কাউন্ত আপ্পিয়ানিকে আজকের মত কোথাও সরান না যায় তাহ'লেই তো মুস্কিল!—হ্যাঁ ঠিক হবে! মহারাজ, মাসসায় একজন দূত পাঠানো তো প্রয়োজন? কাউন্ত আপ্পিয়ানিকে এই মুহূর্ত্তে সেই দৈত্যকার্য্যে পাঠান।

রাজা—চমৎকার! আপনি তাকে এখুনি আমার কাছে আহ্নন। যান্, যান্, তাড়াতাড়ি করুন। আমি এখুনি প্রমোদ-ভবনে যাচ্ছি। [মারিনেল্লির প্রস্থান] এখুনি যাই! [সন্দিগ্ধ চিত্তে] কিন্তু,—মারিনেল্লি যদি সব ব্যবস্থা ঠিকমত না করে? তার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করি কেন? আমার বিশ্বাস, ঠিক এই সময়ে [ঘড়ির দিকে চেয়ে] হ্যাঁ ঠিক এই সময়ে প্রতিদিন সেই পুণ্যবতী গীর্জ্জায় উপাসনা করতে আসে! যাই, আগে গিয়ে তার কাছে প্রণয়-নিবেদন করি! কিন্তু আজ, তার বিবাহের দিনে? হ্যাঁ আজই! তার প্রাণের গোপন কথাই বা কে জানে? হয়ত আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে [টেবিলের উপরের কাগজপত্র গোছাতে গোছাতে—ঘণ্টা-বাদন—ভৃত্যের প্রবেশ] আমি বাহিরে যাব! মন্ত্রীরা কেউ নেই?

ভৃত্য—কামিল্লো রোতা আছেন।

রাজা—ডাকো তাঁকে [ভৃত্যের প্রস্থান] দেরি করিয়ে না দিলেই বাঁচি। হ্যাঁ—এমিলিয়া ব্রুনেস্কির দরখাস্তটা কই? [খুঁজতে খুঁজতে] এই যে!—বেচারা ব্রুনেস্কি—কোথায় [মন্ত্রীর প্রবেশ, হাতে একতাড়া কাগজপত্র] আসুন রোতা আসুন। এগুলো নিন্ [দরখাস্ত ইত্যাদি প্রদান] যা হয় করুন এগুলি নিয়ে। আমায় রেহাই দিন।

মন্ত্রী—বেশ তো মহারাজ!

রাজা—হ্যাঁ, এটা হচ্চে এমিলিয়া গালো-না-না—ব্রুনেস্কির দরখাস্ত। মঞ্জুর করেছি বটে কিন্তু বড় বেশী চাহিদা। এখন নয় মূলতুবি—নাঃ দিয়েই দেবেন। যা ভাল বোঝেন করবেন!

মন্ত্রী—আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।

রাজা—আর কোন জরুরি কাজ আছে? সই-টই করবার?

মন্ত্রী—একটা ফাঁসির আদেশ সই করতে হবে।

রাজা—আনন্দের সহিত সই করছি, কই আসুন!

মন্ত্রী—[স্তম্ভিত হয়ে] মহারাজ ফাঁসির হুকুম বললুম।

রাজা—বেশ তো! ফাঁসি হয়ে গেলেই পারতো! আসুন! বড় তাড়াতাড়ি।

মন্ত্রী—[কাগজপত্র খুঁজে] নাঃ, মাপ করবেন, ওটা আনতে ভুল হয়েছে।

রাজা—আঃ, তাও ভুললেন। কাল অন্য কথা হবে [প্রস্থান] মন্ত্রী [কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে যেতে-যেতে মাথা নেড়ে] ফাঁসির হুকুম আনন্দের সহিত সই ক'রবে! আনন্দের সহিত! আমার পুত্র হন্তা হ'লেও এখুনি সই করতে পারতুম না। আমার প্রাণে বিঁধছে এই বিশ্রী কথা "আনন্দের সহিত!"

দ্বিতীয় অঙ্ক

স্থান—গুয়াস্তালায় গালোত্তি গৃহের বহিঃপ্রকোষ্ঠ।

সময়—প্রাতঃকাল। একই দিন।

দৃশ্য—মধ্যবিত্তের বৈঠকখানা। সামনের দেওয়ালের বাম দিকে ঘরে প্রবেশ করবার দরজা, এবং মধ্যে ও ডান দিকে দুইটি জানালা। জানালার ভেতর দিয়ে বাড়ির সামনের উঠান এবং তার পাশে রাজপথ দেখা যাচ্ছে। ডান দিকের দেওয়ালে বাড়ির অন্দরে প্রবেশ করবার দরজা। ঘরের আসবাব মধ্যবিত্তের উপযোগী। অতি ভক্ত ও ধর্ম্মনিষ্ঠ পরিবারের গৃহ। সামনের দেওয়ালের মাঝখানে এক প্রকাণ্ড রাফেল অঙ্কিত মাদোনা চিত্র। বামদিকের দেওয়ালের বড় কুলুঙ্গিতে মেরির অতি সুন্দর মৃন্ময় মূর্ত্তি। তার সামনে সার-করা মোম-বাতি জ্বলছে। ডানদিকের দেওয়ালের দরজার মাথায় প্রকাণ্ড ক্রুশ-বিদ্ধ যিশু-মূর্ত্তি। দেওয়ালের গায়ে অপরাপর ছবি—বাইবেলের ঘটনাবলীরই দৃশ্য।

[পিরুরো (গালোত্তির ভৃত্য) বাহিরের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করছে, ক্লাউদিয়া গালোত্তি অন্দরের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ ক'রে, জানলা দিয়ে উঠানে তার স্বামী ওদোয়ার্দো গালোত্তিকে আবছা দেখে]

ক্লাউদিয়া—উঠানে কে?

পিরুরো—আমাদের কর্ত্তা!

ক্লাউদিয়া—আমার স্বামী? এও কি সম্ভব?

পিরুরো—এইযে তিনি! [ওদোয়ার্দো দরজার সম্মুখে]

ক্লাউদিয়া—এমন অতর্কিতে? [ওদোয়ার্দোর সেই মুহূর্ত্তে প্রবেশ। তাহার দর্শনে] এই যে—তুমি—

ওদোয়ার্দো—সুপ্রভাত প্রিয়ে! বড় অকস্মাৎ এসেছি, নয়?

ক্লাউদিয়া—বেশ করেছ, কোন অমঙ্গল ঘটেনি তো?

ওদোয়ার্দো—কিছুই না, নিশ্চিন্ত থাক। ভোরে উঠে মেয়েটির সৌভাগ্য চিন্তা করতে করতে মনটা আনন্দে ভ'রে উঠলো। হঠাৎ মনে হ'ল, যাই একবার দেখে আসি তাদের ব্যবস্থা সব ঠিকমত হচ্ছে কিনা! অমনি চ'লে এলুম ঘোড়া ছুটিয়ে! এমিলিয়া কোথায়? সাজপোষাক করতে খুব ব্যস্ত, নয়?

ক্লাউদিয়া—না, সে উপাসনা করছে। বল্‌লে, আজই আমার ভগবানের আশীর্ব্বাদ বেশী দরকার, অমনি গেল ছুটে গীর্জ্জায়।

ওদোয়ার্দো—একা গেল?

ক্লাউদিয়া—গীর্জ্জা তো বাড়ির গায়েই!

ওদোয়ার্দো—এইটুকু যেতেও বিপদ ঘটতে পারে!

ক্লাউদিয়া—রেগো না। বাড়ির মধ্যে চল, কিছু খেয়ে বিশ্রাম কর।

ওদোয়ার্দো—তা চল,কিন্তু তার একা যাওয়া ঠিক হয়নি।

ক্লাউদিয়া—পিরুরো, তুই এখানে থাক্। কেউ যেন বাড়িতে না ঢোকে। আমরা আজ বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করবো না [স্বামীর হাত ধ'রে অন্দরে প্রবেশ]

পিরুরো—তা ঠিক! এক ঘণ্টা ধ'রে রাস্তায় ভিড় জমে গেছে জানতে এ বাড়িতে আজ ব্যাপার কি! আবার কে আস্‌ছে?

[আঞ্জেলো বাহিরের দরজা দিয়ে অর্দ্ধেক শরীর প্রবেশ করিয়ে। ওভারকোট ও টুপি দিয়ে মুখ ঢাকা]

আঞ্জেলো—পিরুরো, ও পিরুরো!

পিরুরো—এ তো চেনা গলা! [আঞ্জেলো ঘরে প্রবেশ ক'রে, ওভারকোট, টুপি খুলে ফেললো] সর্ব্বনাশ, আঞ্জেলো—তুই?

আঞ্জেলো—দেখ্‌চিস্ তো—আমি রে আমি। তোর সঙ্গে একটা কথা আছে।

পিরুরো—আচ্ছা বুকের পাটা তোর! রাস্তায় বেরুলি,—অ্যাঁ? তোর শেষ খুনের পর থেকে তোর নামে হুলিয়া বেরিয়েছে যে রে?

আঞ্জেলো—তুই তো আর টাকার লোভে আমাকে ধরিয়ে দিবিনে!

পিরুরো—কী মতলব বল তো? দোহাই, আবার কিন্তু আমাকে ফেসাদে ফেলিস্ নি!

আঞ্জেলো—দূর! [এক তোড়া টাকা দিয়ে] এই নে, এ তোর!

পিরুরো—বলিস্ কিরে?

আঞ্জেলো—ভুলে গেলি? সেই জার্ম্মাণটারে—তোর আগেকার মনিব—

পিরুরো—চুপ চুপ! ও কথা রাখ!

আঞ্জেলো—আরে—যাকে তুই পিসার পথে আমাদের হাতে ফেলে দিয়ে সাবাড় করলি!

পিরুরো—থাম্ বলছি! কেউ যদি এ কথা শুনে থাকে?

আঞ্জেলো—সেই ভদ্দরলোক আমাদের জন্যে একটা ভারী দামী আঙটীও রেখে গেছেন। এতদিন এটা ভাঙাতে ভরসা হয়নি। সম্প্রতি এটা ভাঙিয়ে হাজার-খানেক টাকা পাওয়া গেছে—এই নে তোর ভাগ।

পিরুরো—বাবা রে, দরকার নেই আমার ও টাকায়।

আঞ্জেলো—তা বেশ তো! তুই যখন এতই সাধু হয়েছিস্

[টাকার তোড়া নেবার উপক্রম করলে]

পিরুরো [প্রলুব্ধ] আচ্ছা—দে! [টাকার তোড়া নিয়ে পকেটে পূরে] এখন আসল মতলবটা বল তো? শুধু টাকা দিতে নিশ্চয়ই আসিস নি!

আঞ্জেলো—বিশ্বাস হয় না—নয় রে? ওরে—সঙ্গীদের ন্যায্য ভাগ মারা আমরা পারিনে, তা পারে শুধু তোদের শিক্ষিত ভদ্রব্যক্তির দল—জানিস্! এখন চললুম—সুখে থাক ভাই! [প্রস্থানের উপক্রম ক'রে হঠাৎ ফিরে পুনরায় জিজ্ঞাসা] আচ্ছা বল তো বুড়ো গালোত্তি হঠাৎ ঘোড়া ছুটিয়ে এখানে এল কেন রে?

পিরুরো—ও শুধু বেড়াতে এসেছে। আজ সন্ধ্যায় ওর জমিদার-বাড়িতে কাউন্ট আপ্পিয়ানির সঙ্গে ওর মেয়ের বিয়ে। সব ব্যবস্থা ঠিক হ'চ্ছে কিনা দেখতে একবার এসেছে।

আঞ্জেলো—এখুনি আবার ফিরে যাবে তো?

পিরুরো—তোকে একবার দেখতে পেলে হয়—মজাটা টের পাবি! সাবধান ও একটা মানুষ!

আঞ্জেলো—আমি আর ওকে চিনি নে? ভুলে গেলি—আমি ওর অধীনে সৈনিক ছিলুম! বর-কনে কখন বেরুবে রে?

পিরুরো—দুপুরে।

আঞ্জেলো—সঙ্গে অনেক লোক থাকবে?

পিরুরো—না, একটা গাড়ীতে বর কনে আর কনের মা যাবে।

আঞ্জেলো—চাকর-বাকর?

পিরুরো—আমি, আর দু-জন। আমি ঘোড়ায় চ'ড়ে এগিয়ে যাব।

আঞ্জেলো—বেশ, বেশ! আর একটা কথা—কার গাড়ীতে যাবে রে?

পিরুরো—কাউন্টের।

আঞ্জেলো—কি মুস্কিল! তাহ'লে হাত জোড়া সহিস ছাড়া আর একটা লোক ঘোড়ার ওপর থাকবে! তা হোক!

পিরুরো—কি সর্ব্বনাশ! কি মতলব এঁটেছিস্ রে? কনের গায়ের দুটো গয়নার জন্যে এমন কাণ্ড বাধাবি? তাতে কোন লাভ নেই।

আঞ্জেলো—ওরে বোকা স্বয়ং কনেই মস্ত লাভের জিনিষ।

পিরুরো—আর আমাকেও এই পাপে জড়াবি?

আঞ্জেলো—তুই তো দায়ে খালাস থাকবি রে। ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে চলে যাবি। একবারও পিছু ফিরবি না।

পিরুরো—অসম্ভব!

আঞ্জেলো—(ভর্ৎসনা স্বরে) কি! সাধু বনতে চাস্, বটে! ছোকরা সাবধান! চিনিসতো আমাকে! মজা টের পাবি—যদি এর ঘুণাক্ষরও কেউ জানতে পায় বা তুই এখন যা খবর দিলি তার এক বর্ণও মিথ্যে হয়!

পিরুরো—[অত্যন্ত ভীত] দোহাই ভগবান—

আঞ্জেলো—আমি—

আঞ্জেলো—চাকর হিসাবে যা না করলে নয় তাই শুধু করবি—বুঝলি। [প্রস্থান]

পিরুরো—তোকে এখুনি যমে ধরুক! হায় আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

[ওদোয়ার্দো ও ক্লাউদিয়ার প্রবেশ, পিরুরোর প্রস্থান]

ওদোয়ার্দো—এমিলিয়া বড় দেরি করছে! আর অপেক্ষা করা অসম্ভব।

ক্লাউদিয়া—আর একটু দাঁড়াও! তোমাকে না দেখলে সে বড় মনঃকষ্ট পাবে।

ওদোয়ার্দো—আমি এখুনি কাউন্ট আপ্পিয়ানিকে দেখতে যাব। তাকে একবার দেখতে আমার প্রাণ আকুল হয়ে উঠেছে। এ ভাবলেও আমার বুক ফুলে ওঠে যে অমন সম্মানী যুবক আমার জামাতা হবে। জান ক্লাউদিয়া,—আমার সব চেয়ে ভাল লাগে যে সে বিয়ের পর এই শহরে না থেকে তার গ্রামে গিয়ে আপন জমিদারী দেখবে।

ক্লাউদিয়া—সে কথা ভাবলে আমার বুক ভেঙে যায়। এত শীঘ্র আমাদের একমাত্র মেয়েকে হারাতে হবে।

ওদোয়ার্দো—ছি, ছি! শুধু আপন স্বার্থের কথা ভাব, মেয়ের সৌভাগ্যের কথা ভুলে গেলে? তোমার এই শহরের মোহ আজীবন আমাকে আমার স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে থেকে বঞ্চিত করেছে।

ক্লাউদিয়া—এ তোমার বড় অন্যায় কথা! এই শহরে ছিলুম বলেই তো এই বিয়ে হ'ল! এখানে না থাকলে ওদের পরস্পরের দেখাও হ'ত না,—এ বিয়েও সম্ভব হ'ত না।

ওদোয়ার্দো—সে কথা মানি! দেখ, আপ্পিয়ানি কেন এ শহরে থেকে রাজ-রাজড়ার পোসামোদি করতে যাবে? নিজের রাজ্যে সে হুকুম চালাবে—আর এখানে তাকে হুকুম মানতে হবে! কোনটা ভাল? আর জানই তো! রাজার সঙ্গে আমার সদ্ভাব নেই! ও যখন আমার মেয়ে বিয়ে করচে, রাজা ওর ওপর নিশ্চয়ই রুষ্ট হবেন। রাজা আমাকে ঘৃণা করে।

ক্লাউদিয়া—যতটা ভাব ততটা নয়। রাজা আমাদের মেয়েকে দেখেছেন—ওর ওপর তিনি ভারি সন্তুষ্ট।

ওদোয়ার্দো।—[উত্তেজিত হয়ে] কি! রাজা এমিলিয়াকে দেখেছে? কোথায়? কবে?

ক্লাউদিয়া—ও, তোমাকে তা বলিনি বুঝি? প্রধান মন্ত্রী গৃমন্ডির বাড়িতে শেষ উৎসবে রাজার সঙ্গে এমিলিয়ার সাক্ষাৎ হয়। রাজা তার রূপে, গুণে, কথা-বার্ত্তায় মুগ্ধ হয়েছিলেন আর অনেক প্রশংসা করলেন।

ওদোয়ার্দো। [অতিশয় উত্তেজিত কণ্ঠে] আমার কন্যার রূপে, রসিকতায় মুগ্ধ হ'য়েছে ঐ লম্পট, কামুক যুবক—আর তুমি তার বুদ্ধিহীনা, মূঢ়া জননী—তাই নিয়ে গর্ব্ব করছ! এতদিন আমাকে এ খবরও দাও নি!—এই শুভদিনে তোমাকে রূঢ় কথা বলতে চাই না, ক্লাউদিয়া [ক্লাউদিয়া স্বামীর হাত চেপে ধরলো]—না—আমাকে ছেড়ে দাও, পাছে বা তাই ক'রে বসি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—তোমরা যেন ভালয় ভালয় পৌছতে পার। [প্রস্থান]।

ক্লাউদিয়া—অদ্ভুত মানুষ! কী অমানুষিক নিষ্ঠা! সকল ব্যাপারেই সন্দেহ!—কিন্তু সত্যিই তো এমিলিয়ার এত দেরি হচ্ছে কেন?

[অত্যন্ত ত্রস্তভাবে এমিলিয়ার প্রবেশ]

এমিলিয়া [মুখ ঘোমটায় ঢাকা—ছুটতে ছুটতে] কী হবে! কী হবে!—এখানে কি নিরাপদ হলুম—না এখানেও পেছু নিয়েছে? [মুখের আবরণ খুলে, মা'কে দেখে] মা, মা [ক্লাউদিয়ার বুকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে] আমাকে কিনা আজ শুনতে

ক্লাউদিয়া—কী হয়েছে বাছা! শীগ্‌গির বল্! তোর সমস্ত শরীর কাঁপছে! গিয়েছিলি গীর্জ্জায়? সেখানে কী এমন বিপদ ঘটতে পারে?

এমিলিয়া—হায় মা, গীর্জ্জাতেও এমন পাপ কথা শুনতে হ'ল!—আর আজকের এই পুণ্য দিনে!

ক্লাউদিয়া—একটু সাম্‌লে, বল তো মা, কী হয়েছে?

এমিলিয়া—গীর্জ্জায় হাঁটু গেড়ে বসেছি মাত্র, উপাসনায় যোগ দেবার জন্যে, অম্‌নি কে আমার পেছনেই গা ঘেঁষে বসলো—আর আমার কাছে প্রণয় নিবেদন আরম্ভ করলে! হায়, সে-সময় বজ্রপাত হয়ে আমি বধির হলুম না কেন? না পারলুম এগুতে, না পারলুম পেছুতে। তার সমস্ত পাপ কথা শুনতে বাধ্য হলুম। একবারও পেছু ফিরে চাইনি, কেবলমাত্র ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলুম আমি যেন সেই মুহূর্ত্তে চিরকালের জন্যে বধির হয়ে যাই, তাহ'লে আর ঐ কলুষ কথা শুন্‌তে হয় না। গীর্জ্জার উপাসনা শেষ হ'তেই উঠে দাঁড়ালুম্ এবং সে ব্যক্তিকে না দেখেই পালিয়ে আস্‌বার চেষ্টা করলুম—কিন্তু সে নজরে প'ড়ে গেল।

ক্লাউদিয়া—কে সে?

এমিলিয়া—স্বয়ং রাজা!

ক্লাউদিয়া—রাজা!! ভগবান আমাদের বাঁচিয়েছেন যে তোর বাপ একথা শুন্‌তে পায় নি! তুই আস্‌বার আগেই তিনি চলে গেছেন!

এমিলিয়া—বাবা এসেছিলেন? আমার সঙ্গে দেখা না ক'রেই চলে গেলেন?

ক্লাউদিয়া—হাঁ—ভাগ্যিস্! এর একটা কথাও তাঁর কানে গেলে কী কাণ্ডই আজ হ'ত!

এমিলিয়া—কেন মা, এতে আমার কি অপরাধ?

ক্লাউদিয়া—কিছুই না, তবু তাঁকে তো তুই চিনিস্‌নে মা!—তারপর কি হ'ল বল। তার দিকে চেয়ে তার প্রাপ্য ঘৃণা প্রকাশ ক'রে এসেছিস্?

এমিলিয়া—না মা, দ্বিতীয় বার তার দিকে চাইতে সাহস হ'ল না। সেখান থেকে ছুটে বাড়িতে এলুম। কিন্তু সমস্ত পথে মনে হ'ল সে আমার পিছু নিয়েছে।

ক্লাউদিয়া—না, সে সাহস তার হয় নি। ভয়েতে ও রকম মনে হয়! যাক্—কাউকে এ কথা বলিস্ নি! আজকের শুভকাজ ভালয় ভালয় হয়ে যাবার পর—এ তোর কাছে মাত্র একটা দুঃস্বপ্ন ব'লে মনে হবে।

এমিলিয়া—কিন্তু মা, তাঁকে এ কথা বল্‌তেই হবে।

ক্লাউদিয়া—ছিঃ, অমন নির্বুদ্ধির কাজ কখন করে? কাউন্টের মনে হিংসের বিষ ঢুকিয়ে কী লাভ হবে বল্?

এমিলিয়া—কিন্তু মা, আমি না বললেও তিনি অন্য লোকের কাছে এ খবর শুনলে আরও খারাপ হবে না?

ক্লাউদিয়া—ও তোর একেবারে ভুল ধারণা। তুই দরবারী ব্যাপারের কী বুঝিস্ মা? ওর ভাষা অন্তঃসার-

শূন্য। ও ভাষায় যদি কেউ মনে করে একটু রূপগুণের প্রশংসা করবে—তো এমন বাড়িয়ে কথা বলে যে মনে হবে সে কতই ভালবাসে।

এমিলিয়া—তাই না-কি মা?—আঃ, বাঁচলুম [আরামের নিঃশ্বাস ফেলে]—আমি কি নির্ব্বোধ, ভীতু মেয়ে। তাঁকে এ কথা বললে—তাঁর কাছে কী হাস্যাস্পদই হতুম! আমাকে কী বোকাই ভাবতেন!—ঐ যে তাঁর পায়ের শব্দ—তিনিই আসছেন।

[কাউন্ট আপ্পিয়ানির প্রবেশ। অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত, ও অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতে হাঁটতে একেবারে এমিলিয়ার অতি নিকটে উপস্থিত হ'ল কিন্তু তখনও তাকে দেখতে পেলে না। এমিলিয়া গায়ে হাত দিতে চমক ভাঙলো এবং এমিলিয়াকে প্রথম দেখলে]

আপ্পিয়ানি—ও, এমিলিয়া! বৈঠকখানায় তোমার দেখা পাব ভাবিনি।

এমিলিয়া—নাই-বা ভাবলেন! এত চিন্তা কিসের? আপনার স্ফূর্ত্তি কোথায় গেল? আজ কি আনন্দের দিন নয়?

আপ্পিয়ানি—আজ আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন। এর গুরুত্ব ভেবেই এত গম্ভীর হয়েছি [এমিলিয়ার জননীর ওপর নজর পড়ায়] ও, মা! আপনিও এখানে?

ক্লাউদিয়া—হ্যাঁ বাবা, কি দুর্ভাগ্য, এমিলিয়ার পিতা এই মুহূর্ত্তে এখানে নেই।

আপ্পিয়ানি—এই মাত্র তাঁর আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে এখানে এসেছি। কী পুরুষ! কী নিষ্ঠা! কী চরিত্র! তাঁর জামাতা হব—এ চিন্তায় আমার হৃদয় গর্ব্বে ভ'রে ওঠে। ওঁর সঙ্গ আমাকে মানুষ ক'রে দেবে।

এমিলিয়া—[অভিযোগের সুরে] ভারি! তিনি তো আমার সঙ্গে দেখাই করলেন না!

ক্লাউদিয়া—তিনি ভেবেছিলেন তুই সাজগোজে ব্যস্ত। কিন্তু যখন শুনলেন তুই গীর্জ্জায়—

আপ্পিয়ানি—তাঁর কাছে সে খবর পেয়েছি! আমার পরম সৌভাগ্য, আমি এমন ধার্ম্মিকা সহধর্ম্মিণী পাব!

ক্লাউদিয়া—কিন্তু বাছারা, এখনও মস্ত কাজ বাকী রয়েছে অথচ সময় বেশী নেই!

আপ্পিয়ানি—কী, মা?

ক্লাউদিয়া—এমিলিয়া সাজগোজ করবে না?

আপ্পিয়ানি—ও, তা বটে! কেন—এই বেশে গেলে কি হয়?

এমিলিয়া—না, তা হয় না। সেদিন যে-সব দামী দামী গহনা পাঠিয়েছেন—তার কিছু অন্তত পরতেই হবে। আর তা পরতে হ'লে—এ পোষাকে চলবে না। আপনি না পাঠালে, ও গহনার ওপর ভারি রাগ হ'ত। কাল রাত্রে তিন-তিনবার ওর স্বপ্ন দেখেছি।

ক্লাউদিয়া—কি স্বপ্ন? আমাকে তো কিছু বলিস্ নি!

এমিলিয়া—স্বপ্নে দেখলুম সব গহনা পরেছি, আর ওর যত পাথর সব মুক্তো হয়ে গেছে। স্বপ্নে মুক্তো দেখলে অনেক চোখের জল ফেলতে হয়—নয় মা?

ক্লাউদিয়া—ও প্রবাদ স্বপ্নের মত আজগুবি! তুই মুক্তো ভালবাসিস্, তাই স্বপ্নে মুক্তো দেখেছিস্!

আপ্পিয়ানি—[অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে] স্বপ্নে মুক্তো দেখার ফল চোখের জল!

এমিলিয়া—আপনারও একথা মনে লেগেছে?

আপ্পিয়ানি—বড়ই লজ্জার কথা বটে, কিন্তু কেমন যেন হচ্ছে! আজ সকাল থেকে একটা অমঙ্গল আশঙ্কা মনকে বার-বার বিষণ্ণ ক'রে দিচ্ছে।

এমিলিয়া—[প্রফুল্ল হবার চেষ্টা ক'রে] ওসব কিছু নয়! [হাসিমুখে] আচ্ছা বলুন ত, প্রথম যেদিন আমাকে দেখেছিলেন—কোন্ পোষাক পরেছিলুম?

আপ্পিয়ানি—তার ছবি আমার মনে গাঁথা আছে।

এমিলিয়া—আচ্ছা, তাই যদি আজ প'রি, কেমন হয়?

আপ্পিয়ানি—[প্রফুল্ল হয়ে] চমৎকার!

এমিলিয়া—একটু বসুন—সেইটা প'রে—মাথায় একটা গোলাপফুল গুঁজে এখুনি আসছি [প্রস্থান]।

ক্লাউদিয়া—কাউন্ট! এমিলিয়া ঠিকই লক্ষ্য করেছে—আপনি আজ বড় গম্ভীর! কেন বলুন্ তো? আপনার কি অনুতাপ হচ্ছে—এ বিবাহ করতে হবে ব'লে?

আপ্পিয়ানি—ছিঃ, মা, সন্তানের ওপর এ সন্দেহ করা অতি অনুচিত। তবে এ ঠিক—আজ কেমন একটা অমঙ্গল আশঙ্কা হচ্ছে! বিয়ে হ'তে এখনও অনেক

দেরি—এর মধ্যে কত কি ঘটতে পারে। বিশেষ ক'রে আমার বন্ধুদের ওপর বড় রাগ হচ্ছে!

ক্লাউদিয়া—কেন?

আপ্পিয়ানি—তাঁরা চান—রাজাকে আমার বিবাহের সংবাদ দিই। তাঁদের কথায় আমি অনেকটা রাজীও হয়েছি। সুতরাং এই অল্প সময়ের মধ্যে আবার রাজার কাছে একবার যেতে হবে!

ক্লাউদিয়া—[উত্তেজিত কণ্ঠে] রাজার কাছে?

[হঠাৎ পিবুরোর প্রবেশ]

পিবুরো—মা-ঠাকরুণ, মাকু ইস্ মারিনেল্লি এসেছেন। তিনি কাউন্ত আপ্পিয়ানির দর্শনপ্রার্থী।

আপ্পিয়ানি—আমাকে চান?

পিবুরো—এই যে—তিনি এসে পড়েছেন।

[মারিনেল্লিকে দরজা খুলে দিয়ে—পিবুরোর প্রস্থান। মারিনেল্লির প্রবেশ]

মারিনেল্লি—কাউন্তের সঙ্গে বড় জরুরি কাজ আছে, তাই হঠাৎ এসে পড়লুম, মাপ করবেন, ঠাকুরাণী! দুই এক মিনিটেই কাজ শেষ হয়ে যাবে, একটু যদি দয়া ক'রে—

ক্লাউদিয়া—নিশ্চয়, নিশ্চয়, আমি অন্য ঘরে যাচ্ছি!

[মারিনেল্লিকে অভিবাদন ক'রে প্রস্থান]

আপ্পিয়ানি—কি চান?

মারিনেল্লি—মহারাজের কাছ থেকে এসেছি।

আপ্পিয়ানি—কি তাঁর আদেশ?

মারিনেল্লি—আপনার পরম বন্ধু হিসাবে এই রাজ-আদেশের বার্ত্তা-বাহক হয়েছি—

আপ্পিয়ানি—ভূমিকা রাখুন—আসল কথা বলুন।

মারিনেল্লি—বটে!—মাস্সার রাজপুত্রীর সঙ্গে আমাদের মহারাজের যে বিবাহের কথা চলছে, সেই সম্পর্কে মাস্সায় একজন রাজদূত পাঠান দরকার। মহারাজ আপনাকেই সেই কাজে পাঠাতে চান।

আপ্পিয়ানি—পরম বাধিত হলুম। আমি কখন ভাবিনি রাজা আমাকে এত কৃপা করবেন।

মারিনেল্লি—আপনার বন্ধু-হিসাবে আমিই তাঁকে রাজী করিয়েছি, আপনাকেই নির্ব্বাচন ক'রতে।

আপ্পিয়ানি—বহু ধন্যবাদ! কিন্তু আপনাকেও বন্ধু ভাবতে হবে?

মারিনেল্লি—স্বীকার করি বটে, আপনার বিনা অনুমতিতে আপনার বন্ধুত্বের কাজ করা অন্যায় হয়েছে। সে যাই হোক—এ গৌরবের একমাত্র ভাগী কিন্তু আপনিই হবেন।

আপ্পিয়ানি—তা ঠিক!

মারিনেল্লি—তাহ'লে চলুন!

আপ্পিয়ানি—কোথায়?

মারিনেল্লি—দোসালোতে রাজার নিকট। সমস্ত প্রস্তুত—এখুনি মাস্সায় যেতে হবে।

আপ্পিয়ানি—কী বলছেন আপনি, আজই যেতে হবে?

মারিনেল্লি—এক ঘণ্টার মধ্যে।

আপ্পিয়ানি—সত্যি?—তাহ'লে বড়ই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি রাজসম্মানে বঞ্চিত হ'তে হ'ল।

মারিনেল্লি—অর্থাৎ?

আপ্পিয়ানি—আমি আজ, কাল বা পরশু যেতে পারবো না।

মারিনেল্লি—পরিহাস করছেন?

আপ্পিয়ানি—আপনি আমার পরিহাসের পাত্র নন।

মারিনেল্লি—তা ঠিক!—তবে কি রাজার সঙ্গে পরিহাস হচ্ছে? সেটা খুবই মজার ব্যাপার বটে!

আপ্পিয়ানি—পরিহাস নয়, রাজাকে এর কারণ বললেই তিনি বুঝবেন!

মারিনেল্লি—কী কারণ, শুনতে পারি কি?

আপ্পিয়ানি—আমি আজ বিবাহ করবো!

মারিনেল্লি—ওঃ, এই কথা! দেখুন, বিবাহ পেছিয়ে দেওয়াও চলে, কিন্তু কর্ত্তার আদেশ অমান্য করা কি ভাল?

আপ্পিয়ানি—তিনি আপনার কর্ত্তা—আমার নন। এ নিয়ে বাক্যব্যয় করতে আর চাই না। রাজাকে গিয়ে এ-সংবাদ দিন।

মারিনেল্লি—এ খবরটাও দিতে পারি কি, কার সঙ্গে বিবাহ?

আপ্পিয়ানি—এমিলিয়া গালোত্তি আমার ভাবী স্ত্রী।

মারিনেল্লি—[পরিহাসের সহিত] ওঃ, এই বাড়ির কন্যা? তাহ'লে বিবাহ মুলতুবী রাখায় মুস্কিলটা কি? এঁরা তো আর আপনার মত পাত্রকে হাতছাড়া করবেন না?

আপ্পিয়ানি—তুমি একটা আস্ত বাঁদর!

মারিনেল্লি—আমাকে এই অপমান! এর জবাবদিহি হ'তে হবে।

আপ্পিয়ানি—বাঁদর আবার রসিকতা জানে!

মারিনেল্লি—জাহান্নমে যাও! আমি দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ চাই!

আপ্পিয়ানি—নিশ্চয়!

মারিনেল্লি—এখুনি চাই! তবে আজকের বরটিকে রেহাই দিচ্চি।

আপ্পিয়ানি—অত দয়ায় প্রয়োজন নেই [মারিনেল্লির হাত চেপে ধরে]—মাস্সায় যাবার সময় নেই বটে, কিন্তু তোমার সঙ্গে এক হাত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের সময় যথেষ্ট হবে। চল, চল। এই উঠানেই কাজ সারা যাবে।

মারিনেল্লি—[হাত ছাড়িয়ে পালাতে পালাতে] একটু ধৈর্য্য ধরুন, একটু ধৈর্য্য ধরুন [পলায়ন]

আপ্পিয়ানি—পালা, ভীরু, অকর্ম্মণ্য! এ বেশ হ'ল। আবার আমার রক্ত তাজা হয়ে উঠেছে।

ক্লাউদিয়া—[ত্রস্তভাবে প্রবেশপূর্ব্বক] কী সর্ব্বনাশ! ঝগড়া হ'ল!—কী হবে?

আপ্পিয়ানি—কিছুই না! মারিনেল্লি আমার বিশেষ উপকার ক'রে গেল—রাজার কাছে আর যেতে হবে না।

ক্লাউদিয়া—সত্যি?

আপ্পিয়ানি—আমাদের এখুনি সাবিওনেত্তায় যেতে হবে। আপনারা প্রস্তুত হ'ন, আমি এখুনি গাড়ী নিয়ে হাজির হব।

ক্লাউদিয়া—আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারি?

আপ্পিয়ানি—সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হন!

[ক্লাউদিয়া অন্দরে প্রবেশ করলে আপ্পিয়ানি বাহিরের দরজা দিয়ে প্রস্থান করলে]

তৃতীয় অঙ্ক

স্থান---গুয়াস্তালার উপকণ্ঠে দোসালোয় রাজার প্রমোদভবন।

সময়---দ্বিতীয় অঙ্কের অব্যবহিত পরে।

দৃশ্য:--রাজকীয় বাগানবাড়ির বহিঃপ্রকোষ্ঠ। সুন্দর কারুকার্য্য খচিত দরজা, জানলা। সামনের দেওয়ালের ঠিক মাঝখানে এক জমকাল দরজা। দরজার দুই পাশে দুই জানলা। সমস্ত দরজা জানলার সামনে মূল্যবান পরদা। বামদিকের দেওয়ালের খোলা দরজা দিয়ে একটা ছোট পাশের ঘর দেখা যাচ্ছে। ডান দিকের দেওয়ালের দরজা দিয়ে প্রাসাদের ভিতর যাবার পথ। ঘরের চেয়ার টেবিল, সোফা ইত্যাদি আসবাবপত্র 'রোকোকো' নমুনার। দুই জানলাই খোলা, পরদা পাশে সরান। তার ভেতর দিয়ে আলো এসে দেয়াল-জোড়া ফ্রেস্কো চিত্রাবলীকে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে। অধিকাংশ চিত্রই মদনোৎসবের দৃশ্য। খোলা জানলা দিয়ে মনোরম প্রমোদকানন দৃষ্টিগোচর হয়। বাগানে লাল পেবল্‌স ঢাকা প্রশস্ত পরিষ্কার রাস্তা। তার স্থানে স্থানে মর্ম্মর-নির্ম্মিত নগ্ন পরীমূর্ত্তি। রাস্তার এক অংশে, কিছুদূরে, এক চত্বর। চত্বরে এক অপূর্ব্ব সুন্দর শ্বেত ফোয়ারা—অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তার জলোচ্ছ্বাসের শব্দ অল্প অল্প শোনা যাচ্ছে। সমস্ত বাগান উজ্জ্বল সূর্য্য-কিরণে ঝলমল করছে।] রাজা ভিতরের দরজা দিয়ে ও মারিনেল্লি বাহিরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছে।

মারিনেল্লি—মহারাজ, বৃথা গিয়েছিলুম। সে ব্যক্তি অবজ্ঞার সহিত রাজসম্মান প্রত্যাখ্যান ক'রলে।

রাজা—তবে, কি হবে? এমিলিয়ার তো আজই বিয়ে হয়ে যাবে?

মারিনেল্লি—তাই তো মনে হচ্ছে।

রাজা—নির্ব্বোধের ওপর কাজের ভার দিয়ে এই দশা হ'ল। আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল।

মরিনেল্লি—উত্তম পুরস্কার পেলুম, মহারাজ!

রাজা—আবার পুরস্কারও চান? কিসের জন্যে?

মারিনেল্লি—আপনার জন্যে জীবন বিপন্ন করেছিলুম!

রাজা—কি রকম?

মারিনেল্লি—দুর্দ্দান্ত আপ্পিয়ানি যখন মাস্সায় যেতে কিছুতেই স্বীকৃত হ'ল না, তাকে ক্ষেপাবার জন্যে অপমান-জনক ভাষা ব্যবহার করলুম। সেও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে আমাকে দারুণ অপমান করলে। আমি তখন তাকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করলুম। ভাবলুম, যদি সে মরে তাহ'লে তো আপনার পথ সম্পূর্ণ পরিষ্কার হ'ল, আর আমি যদি মরি, তো তাকে খুনের দায়ে তখুনি দীর্ঘকালের জন্যে পালাতে হবে, তাতেও এ বিবাহ স্থগিত হবে এবং আপনার উদ্দেশ্য সফল করতে যথেষ্ট অবসর পাবেন।

রাজা—বটে! তাহ'লে বেঁচে ফিরলেন কি ক'রে? আল্পিয়ানি তো ভাল যোদ্ধা, আর মহাবীর! সে তো কখন দ্বন্দ্ব যুদ্ধে বিমুখ হয় না!

মারিনেল্লি—হুঁ! মহারাজ! তার যে আজ বিবাহ! আজ কি আর সে অস্ত্র ধরে? ভয় খেয়ে বললে এক সপ্তাহ পরে লড়বে!

রাজা—আর আপনি তাতেই রাজী হয়ে এলেন তো? এক সপ্তাহ পরে লড়ুন বা না-লড়ুন, বাঁচুন বা মরুন, তাতে আমার কি এসে যায়? আজ এমিলিয়ার বিবাহ তো আর আটকে থাকবে না? [উত্তেজিত হয়ে উঠে] ওঃ, আজই এমিলিয়ার বিবাহ—অনিবার্য্য! একথা ভাবলেও আমি পাগল হবার উপক্রম হই! [গম্ভীরভাবে আদেশ-দান] মারিনেল্লি, আমার যথেষ্ট উপকার করেছেন, এখন আমার সামনে থেকে দূর হন! চিরদিনের মত দূর হন!

মারিনেল্লি—মহারাজ! বেশী আর কী করা সম্ভব বলুন? তবে, এক কাজ করলে এখনও কার্য্যোদ্ধার হয়। আল্পিয়ানি তার বধূকে নিয়ে এই দোসালে দিয়েই যাবে। সে-পথ এই বাগানের গায়েই পড়ে। যদি এমিলিয়াকে এমন ভাবে ধ'রে আনা যায় যে, কোন বল-প্রয়োগ করা হ'ল বাহ্যতঃ তা বোঝাই যাবে না—তাহ'লে বিবাহটা নিরাপদে স্থগিত করা চলে।

রাজা—এমন ব্যবস্থা করার বুদ্ধি কি আপনার ঘটে আছে?

মারিনেল্লি—এ সব কাজ করতে গেলে, সময় সময় দুর্ঘটনাও হয়। তার জন্যে কে দায়ী হবে মহারাজ? আমাকে সে দায় থেকে খালাস দেবেন কি?

রাজা—রাজকার্য্যে অবশ্যম্ভাবী বিপদ ঘটলে কবে আমি কর্ম্মচারীকে দায়ী করেছি? আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যে-কোন বিপদ ঘটুক তার জন্যে আপনি দায়ী হবেন না।

মারিনেল্লি—আচ্ছা, মহারাজ! [দূরে এক বন্দুকের শব্দ] ঐ যে! মহারাজ, বন্দুকের আওয়াজ শুনলেন না? [পুনরায় বন্দুকের শব্দ] আবার একটা!

রাজা—ওকি? এর কি অর্থ?

মারিনেল্লি—মহারাজ, যতটা নির্ব্বোধ ভাবেন, ততখানি হয়ত নই। ইতিমধ্যেই কাজ হাসিল হয়েছে!

রাজা—তার মানে?

মারিনেল্লি—এইমাত্র যে প্রস্তাব করলুম—তা কার্য্যে পরিণত হ'ল।

রাজা—তাও কি সম্ভব?

মারিনেল্লি—শুধু আপনার প্রতিশ্রুতিটুকু ভুলবেন না।

রাজা—বেশ, বেশ, কিন্তু ব্যাপার তো কিছুই বুঝতে পারছি না!

মারিনেল্লি—মহারাজ, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এমিলিয়া আপনার নিকট হাজির হবেন। কোন ভয় নেই। খুব বিশ্বস্ত ও অতি উপযুক্ত লোকের ওপর কাজের ভার দিয়েছি। বর-কনের গাড়ী বাগানের সামনে এলেই, একদল ডাকাত তাকে আক্রমণ করবে। ঠিক সেই সময়ে আমার ভৃত্য কয়েক জন লোক নিয়ে সেখানে দৈবাৎ উপস্থিত হবে এবং ডাকাতদের বাধা দেবার ভাণ করবে। সেই গোলমালে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবার ছলে, আমার ভৃত্য এমিলিয়াকে সোজা এইখানে এনে তুলবে। [জানলার সামনে গিয়ে] মহারাজ, কার্য্য সফল হয়েছে, ঐ একটা লোক মুখোস প'রে এদিকে আসছে। নিশ্চয়ই শুভসংবাদ দেবে। আপনি এখানে থাকবেন না। আপনাকে ও-ব্যক্তি দেখতে পেলে বড় খারাপ হবে। ভেতরে যান [রাজার প্রস্থান] ঐ যে গাড়ী ফিরে শহরে চললো। সঙ্গে অনেক লোক। আশা করি ওটা এখন কাউন্ট মহাশয়ের শববাহী শকট। হাঃ, হা, কাউন্ট মহাশয়, মাস্সায় যেতে চাইলেন না, এখন অনেক দূর যেতে হচ্ছে। কেমন, বাঁদরটা কেমন রসিকতা করলে? [দরজার নিকট গিয়ে, দরজা খুলে দিলে। আঞ্জেলো সম্পূর্ণ মুখ ঢেকে প্রবেশ করলে]

মারিনেল্লি—কি খবর?

আঞ্জেলো—[মুখোস খুলে ফেলে] সাবধান, মেয়েটাকে এখুনি এখানে আনবে।

মারিনেল্লি—কেমন হ'ল?

আঞ্জেলো—কাম ফতে!

মারিনেল্লি—কাউন্ট মরেছে?



আঞ্জেলো—আলবৎ! আহা বেচারার জন্যে দুঃখ হচ্ছে।

মারিনেল্লি—[উল্লসিত] তোর দরদী প্রাণের জন্যে এই নে পুরস্কার [এক তোড়া অর্থ দান]।

আঞ্জেলো—ধন্যবাদ! আমার নিকোলোকে হারাবার খানিক ক্ষতি-পূরণ হ'ল।

মারিনেল্লি—ও, তাহ'লে এ পক্ষেও খুন হয়েছে?

আঞ্জেলো—হ্যাঁ, ভদ্রলোক প্রস্তুত ছিলেন। আমরা আক্রমণ করবামাত্র এক গুলিতে ছোকরাটাকে সাবাড় করলে আমিও ঠিক বুকে এক গুলি চালিয়ে তাঁকে কাৎ করলুম!

মারিনেল্লি—ও, তাই দুই গুলির আওয়াজ হ'ল। তাকে মোটে এক গুলি মারলি রে! ঠিক ম'রেছে তো?

আঞ্জেলো—বুকে গুলি খেয়ে কি আর কেউ বাঁচে? এখন যাই কর্তা! অনেক দূর যেতে হবে। সন্ধ্যে হবার আগেই এ-রাজ্য পেরিয়ে যেতে হবে। আবার দরকার হ'লে ডাক দেবেন, হুজুর! আমার ঠিকানা তো জানেনই। আর এও জানেন আমি খুব সস্তায় কাজ করি। প্রণাম [অভিবাদন ক'রে প্রস্থান।]

মারিনেল্লি—বাঁচা গেল!—নাঃ, ঠিকই বা কই হ'ল? যদি না মরে থাকে? ছিঃ, আঞ্জেলো, আর একটা গুলি মারতে পারলি নে? তাহ'লে তো লোকটা তৎক্ষণাৎ মরতো! হয়ত এখন বেচারাকে কতদিনই ভুগতে হবে—মানুষের প্রতি কি এত নিষ্ঠুর হ'তে আছে?—যাক—এ মৃত্যু-সংবাদ রাজাকে দেওয়া হবে না। আগে বুঝে নিই ওঁর মেজাজ কি রকম!

রাজা—[প্রবেশপূর্ব্বক জানলার নিকট গিয়ে] ঐ যে, একটা লোক এমিলিয়াকে নিয়ে আসছে! আসার ভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে, এখনও ওর সন্দেহ হয়নি। এখনও ও ভাবছে, সত্যিই ডাকাত পড়েছে, আর ওকে উদ্ধার ক'রে এখানে আনা হচ্ছে। কিন্তু এ কতক্ষণ লুকান যাবে—আসল সংবাদ বার হ'লেই তো পেছুতে হবে!

মারিনেল্লি—মহারাজ, চিন্তিত হবেন না। পেছুবার কোন প্রয়োজন হবে না। সহস্র উপায়ে সমস্যার সমাধান সম্ভব; [শ্রেষ্ঠতম উপায়—মহারাজের আপন হাতেই আছে।

রাজা—সেটা কি?

মারিনেল্লি—আপনি তো ওঁকে বহুক্ষণ একা পাবেন! নারীর হৃদয় জয় করার কৌশলও কি মহারাজকে শেখাতে হবে?

রাজা—হায়, মারিনেল্লি, আজ প্রত্যুষেই তার শত চেষ্টা বৃথা হয়েছে। আমার একটা কথাতেও কর্ণপাত করলে ব'লে মনে হ'ল না। স্পষ্ট দেখলুম—ভয়ে তার সর্ব্বশরীর কাঁপতে লাগলো—ফাঁসির হুকুমপ্রাপ্ত আসামীর মত। সে ভয় আমাতেও সংক্রামিত হ'ল। আমারও শরীর কেঁপে উঠলো। শেষে মাপ চেয়ে গীর্জ্জা থেকে চলে এলুম। ঐ এসে পড়লো! মারিনেল্লি, আপনি আলাপ করুন। আমি যাই [ডাইনের দরজা দিয়ে প্রস্থান]। [মারিনেল্লির ভৃত্য বাত্তিস্তা ও এমিলিয়া বাহিরের দরজার নিকট উপস্থিত হ'ল]

মারিনেল্লি—আমিই বা কেন এ ঘরে দেখা দিই—[বামদিকের দরজা দিয়ে—পাশের ঘরে অদৃশ্য হ'ল]

[বাত্তিস্তা ও এমিলিয়ার প্রবেশ]

এমিলিয়া—[ত্রস্তভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে] বহু ধন্যবাদ, বন্ধু, বহু ধন্যবাদ। কিন্তু আমার মা কোথায়, তিনি কোথায়? পেছনে কি তাঁরা আসছেন?

বাত্তিস্তা—সম্ভবতঃ।

এমিলিয়া—সম্ভবতঃ? ঠিক জান না? গুলির আওয়াজও পেলুম। হয়ত ডাকাতে তাঁদের মেরে ফেলেছে!

বাত্তিস্তা—আমি যাই সন্ধান করতে!

এমিলিয়া—আমিও যাই, তাঁদের ছেড়ে আসাই অন্যায় হয়েছে [প্রস্থানোদ্যত]।

মারিনেল্লি—[হঠাৎ প্রবেশ ক'রে, যেন এই প্রথম এ-ঘরে প্রবেশ করলে] এই যে আপনি এখানে? কী সৌভাগ্য আমাদের!

এমিলিয়া [চমকিত হয়ে] আপনি এখানে? একি আপনার গৃহ? মাপ করবেন—না ব'লে প্রবেশ করেছি। আমাদের ওপর ডাকাত পড়েছিল—এই বন্ধু

বাঁচিয়ে এখানে এনেছে [বাত্তিস্তাকে দেখিয়ে]। কিন্তু আমার জননী ও কাউন্ত মহাশয়ের কী হ'ল জানি না। বন্দুকের আওয়াজও শুনলুম। সম্ভবতঃ তাঁদের বিপদ হয়েছে। আমি এখুনি সেখানে যাব।

মারিনেল্লি—আপনি নিশ্চিন্ত হন, কোন বিপদ ঘটে নি। বাত্তিস্তা!—তুই যা, তাঁরা হয়ত জানেন না ইনি এখানে! তাঁদের নিয়ে আয় এখানে। [বাত্তিস্তার প্রস্থান] আপনি একটু বিশ্রাম করুন। আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্চে! কোন চিন্তা করবেন না। রাজা স্বয়ং গেছেন তাঁদের সাহায্য করতে।

এলিমিয়া [অত্যন্ত চমকিত]—কে?—রাজা?

মারিনেল্লি—আপনাদের বিপদের সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি ছুটে গেছেন। তাঁর বাগানের সামনে এত বড় দুষ্কর্ম্ম করবার আস্পর্দ্ধা যাদের হয়েছে, পেলে তাদের তিনি কঠোর শাস্তি দেবেন।

এমিলিয়া—আমি তাহ'লে কোথায়?

মারিনেল্লি—দোসালোয়, রাজার প্রমোদ-ভবনে। ঐ যে রাজাও এসে পড়েছেন। [রাজার প্রবেশ]

রাজা—আপনি এসে প'ড়েছেন? যাক্! নিশ্চিন্ত হওয়া গেল! আপনাকে আমরা সর্ব্বত্র খুঁজছিলুম। আর—

এমিলিয়া—মহারাজ আমার মা কোথায়?

রাজা—তাঁরা দু-জনেই এসে পড়লেন ব'লে! সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হন। আপনি বড় ক্লান্ত। চলুন অন্দরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করুন।

এমিলিয়া—তাঁরা এখনও এলেন না কেন? নিশ্চয়ই বিপদ হয়েছে! [হাঁটু গেড়ে বসে] মহারাজ, গোপন করবেন না, কী হয়েছে বলুন!

রাজা—[হাত ধ'রে তুলে] ছি—অত অধীর হবেন না। কিছুই হয় নি। চলুন—অন্দরে চলুন!

এমিলিয়া—[ভীত হয়ে হাতে হাত কচলাতে কচলাতে] কী করি?

রাজা—বুঝেছি! আমার ওপর সন্দেহ হচ্চে। আজ সকালে যে বর্ব্বরতা করেছি—তাতে এ ভীতি স্বাভাবিক। কিন্তু বিশ্বাস করুন, তার জন্তে আমি আন্তরিক অনুতপ্ত। আমাকে মার্জ্জনা করুন। এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তা ক'রে ফেলেছি, কিন্তু আমি যে সৎ তা প্রমাণ করবার সুযোগ একবার দিন? একবার আমাকে বিশ্বাস করুন? আমার সঙ্গেই আসুন! [এমিলিয়ার হস্ত ধারণ] চলুন ভেতরে! [উভয়ে ডানদিকের দরজা দিয়ে অন্দরে যেতে যেতে] মারিনেল্লি, আপনিও আসুন! [উভয়ের প্রস্থান]

মারিনেল্লি—হোঃ, হোঃ, 'আপনিও আসুন!' অর্থাৎ আপনি আসবেন না—দেখুন কেউ যেন আমাদের বিরক্ত না করে।' কাউন্ত মহাশয়ের সে ক্ষমতা তো এ জন্মে আর হবে না! তবে, মা-ঠাকুরুণটি নিশ্চয় এখুনি এসে পড়বেন। [জানলার নিকট গিয়ে] বাত্তিস্তা, আসছে!

[বেগে বাত্তিস্তার প্রবেশ]

বাত্তিস্তা—হুজুর! এমিলিয়ার মা আসছেন!

মারিনেল্লি—ঠিক ভেবেছি!

বাত্তিস্তা—আর রাস্তার মেলা লোক তাঁকে ঘিরে আসছে। তিনি সন্ধান পেয়েচেন তাঁর কন্যা এখানে। তবে আমাদের চক্রান্তের কোন সন্দেহ বোধ হয় করেন নি। কী করবো?

মারিনেল্লি—একটু দাঁড়া [কিছু চিন্তা ক'রে] তিনি যখন জানেন এমিলিয়া এখানে, তাঁকে আটকালে ফল খারাপই হবে। এলে বরং ফল ভাল হবে। রাজার শাশুড়ী হবার লোভ কোন্ নারীকে না প্রলুব্ধ করে?—আসতে দে তাঁকে! [দূর হ'তে ক্লাউদিয়ার চীৎকার—'এমিলিয়া এমিলিয়া, বাছা আমার, তুই কোথায় মা' ও সেই সঙ্গে এক জনতার হল্লা শোনা যেতে লাগল]

বাত্তিস্তা—ওই শুনুন, হুজুর!

মারিনেল্লি ছুটে যা! লোকগুলোকে আর এক পাও এগুতে দিবি নে। তাদের বাগান থেকে বের ক'রে দিবি। শুধু ওঁকে নিয়ে আয়।

[বাত্তিস্তা বাহির হবার জন্তে দরজা খোলবামাত্র বেগে ক্লাউদিয়ার প্রবেশ]

ক্লাউদিয়া [চীৎকার ক'রে] এই যে সেই হতভাগা

ঠিক চিনেছি! তুই ত আমার মেয়েকে গাড়ী থেকে তুলে এনেছিস!—কোথায় আমার বাছা—বল্, হতভাগা!

বাত্তিস্তা—তাঁকে বাঁচানোর এই পুরস্কার?

ক্লাউদিয়া—সত্যি? [নম্রস্বরে] তা হ'লে মাপ কর্ বাছা!—লক্ষ্মী বাপ আমার—বল্ সে কোথায়?

বাত্তিস্তা—আপনি ভয় করবেন না! এ বাড়িতে তিনি বেশ আছেন! আমার কর্ত্তাই তাঁর কাছে আপনাকে নিয়ে যাবেন। [মারিনেল্লিকে দেখিয়ে] [ইতিমধ্যে ঘরের বাহিরে এক জনতা সমবেত হয়েছে। বাত্তিস্তা বাহির হয়ে তাদের সরাতে সরাতে প্রস্থান।]

ক্লাউদিয়া—[মারিনেল্লির ওপর প্রথম নজর পড়ায়, চমকে উঠে, দুই পা পেছু হেঁটে] আপনি এখানে? আমার কন্যাও এখানে? আর আপনি আমাকে তার কাছে নিয়ে যাবেন?

মারিনেল্লি—অতি আনন্দের সহিত।

ক্লাউদিয়া—আপনিই না আজ সকালে আমার গৃহে কাউন্ট আপ্পিয়ানির সঙ্গে কলহ ক'রে এসেছেন?

মারিনেল্লি—কলহ নয়! একটু মতান্তর হওয়ায় কাথাবার্ত্তা কিছু উষ্ণ হয়েছিল বটে।

ক্লাউদিয়া—আপনার নাম মারিনেল্লি?

মারিনেল্লি—মার্কুইস্ মারিনেল্লি।

ক্লাউদিয়া—শুনুন তাহ'লে। মৃত্যুর সময়ে কাউন্ট মহাশয় আপনার নাম এমন "স্বরে" বললেন যে তা থেকে স্পষ্ট অনুমান করা যায় আপনিই তাঁর হন্তা।

মারিনেল্লি—[বিস্ময়ের ভাণ ক'রে] কি বলছেন আপনি? কাউন্ট মৃত?

ক্লাউদিয়া—[তিক্ততার সহিত ও দৃঢ়স্বরে] মৃত্যুর সময়ে কাউন্ট আপ্পিয়ানি "মারিনেল্লির" নাম এমন স্বরে উচ্চারণ করেছেন যে তা থেকে স্পষ্ট অনুমান করা যায় আপনিই তার হন্তা।

মারিনেল্লি—দেখুন, তখন আপনাদের ওপর ডাকাত পড়েছে। আপনি তখন ভীষণ ভয় পেয়েছেন। সেই সময়ে একটা গলার "স্বরের" তারতম্য ঠিক ক'রে এক সম্মানী ব্যক্তির ওপর এই হীন অপবাদ দেওয়া কি উচিত? মৃত্যুর সময়ে কাউন্টের পক্ষে আমার নাম করা খুবই স্বাভাবিক। আমি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। সেই বিপদের সময় আমাকে ডাকবেন, সে আর আশ্চর্য্য কি?

ক্লাউদিয়া—বিচারকের কাছে সে স্বর প্রকাশ করতে পারলে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকবে না, কে আপ্পিয়ানির ঘাতক! এখন অনুগ্রহ ক'রে আমার কন্যাকে দেখান। আপ্পিয়ানি আপনার শত্রু ছিল ব'লে আমার কন্যা কি দোষ করলে?

মারিনেল্লি—মাতৃহৃদয়ের ব্যথা বুঝি, তাই আপনাকে ক্ষমা করলুম। কন্যার জন্যে ব্যস্ত হবেন না। রাজা স্বয়ং তাঁর শুশ্রূষা করছেন।

ক্লাউদিয়া—কে? রাজা এমিলিয়ার কাছে? ওঃ এখন সব পরিষ্কার বুঝতে পারছি! [অত্যন্ত উচ্চৈস্বরে] কাপুরুষ গুপ্তঘাতক!

মারিনেল্লি—চীৎকার করবেন না, ভেবে দেখুন এ কার বাড়ি।

ক্লাউদিয়া—এ নরহন্তার বাড়ি! [স্বর আরও উচ্চে তুলে] ওরে মূর্খ, সিংহীর যখন শাবক চুরি হয়, সে কি স্থানকাল বিচার ক'রে গর্জ্জন করে? [সর্ব্বোচ্চ স্বরে] কাপুরুষ, তুই এক কামুকের হীন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্যে গুপ্তহত্যা করাস্! নরঘাতকরাও তোকে ঘৃণায় স্থান দেবে না!

[ভিতর হ'তে এমিলিয়ার স্বর "আমার মার কণ্ঠস্বর। আমার মা!"]

ক্লাউদিয়া—ঐ আমার মেয়ে! ভাগ্যিস্ চেঁচিয়েছি, তাই তো আমার স্বর শুনতে পেয়েছে! আস্‌ছি মা, আস্‌ছি। [বেগে ডান দিকের দরজা দিয়ে অন্দরে প্রবেশ। মারিনেল্লি একটু চিন্তাযুক্ত হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। এমন সময় অত্যন্ত গম্ভীর ও বিমর্ষ হয়ে রাজার প্রবেশ]

রাজা—মারিনেল্লি, আপনাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

মারিনেল্লি—হাঃ, হাঃ, মায়ের রাগে একটুও ঘাবড়াবেন না মহারাজ! রাজা যদি মেয়েকে পছন্দ করে ত, তার জন্যে কোনো মা বিরক্ত হয় না। দেখছেন না, আপনাকে দেখবামাত্র ঠাক্‌রুণ কেমন ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে ভাল মানুষটি সেজে......

রাজা—থামুন! বোঝেন ত সবই! আমার জন্যে নয়, মাকে দেখেই মেয়ে মূর্চ্ছা গেছে তাই উনি শান্ত হ'য়ে

আছেন। মারিনেল্লি, উনি আমাকে যে দারুণ সংবাদ কানে কানে বল্লেন তা কি সত্যি?

মারিনেল্লি—যদি সত্যিই হয়?

রাজা—ওঃ, বুঝেছি, তাহ'লে কাউন্ট সত্যিই নিহত। হা, ভগবান, তুমিই জান, আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। এ আমি চাই নি। এ যে সম্ভব, তার সামান্য কল্পনাও কখন করি নি। [অত্যন্ত কাতর স্বরে] এমনটা হবে জান্‌লে, আমার প্রাণ গেলেও এসব হ'তে দিতুমনা! মারিনেল্লি, এমনটা যে হ'তে পারে, তার কিছু আভাসও তো পূর্ব্বে দেন নি?

মারিনেল্লি—মহারাজ! আমিই কি এ কল্পনাতে আন্‌তে পেরেছিলুম?—দোষ কিন্তু পুরাপূরি কাউন্ট মহাশয়ের। তিনি প্রথমেই ওদের একজনকে গুলি ক'রে মেরে ফেল্‌লেন, ওরাও রেগে উঠে ওঁকে গুলি করলে। নতুবা বিনা-রক্তপাতে সব ঘটত। তবু আমি এর জন্যে ওদের সর্দ্দারকে বিশেষ ক'রে ব'কে দিয়েছি!

রাজা—[অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে] আপনার অসীম দয়া! সেই বদ্‌মায়েস যদি আমার রাজ্যে ফের পা দেয়, তো তার গর্দ্দান যাবে।

মারিনেল্লি—মহারাজ, তার কাজের জন্যে আমিই দায়ী! আর এ ব্যাপারে যা-কিছু বিপদই ঘটুক না, আমি দায়ে খালাস পাব, এ প্রতিশ্রুতি আপনার কাছে দু-দুবার পেয়েছি।

রাজা—তাই ব'লে এই ভীষণ ব্যাপার ঘটা উচিত ছিল?

মারিনেল্লি—আমিই কি জান্‌তুম এমন হবে? না চেয়েছিলুম? জানেনই তো, ওঁর আর অন্ততঃ সাত দিন বেঁচে থাকা আমার বিশেষ দরকার ছিল! উনি আমাকে সাংঘাতিক অপমান করেছিলেন। সাত দিন পরে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হ'লে তবে এ অপমান থেকে নিষ্কৃতি পেতুম। তার আগেই উনি চিরবিদায় নিলেন, আমার সম্মান রক্ষা আর হ'ল না। [খুব ব্যথিত ও উত্তেজিত হবার ভাণ ক'রে] তবু আমার ওপর সন্দেহ?

রাজা [পরাজিত] দুঃখ করবেন না!—এটাকে আকস্মিক ঘটনা ব'লেই ধ'রে নেব। [পুনরায় চিন্তিত হয়ে] কিন্তু দেখুন, আমরা যেন তা বুঝলুম, কিন্তু লোকে কী ব'লবে? এমিলিয়া, এমিলিয়ার মা, তাঁদের বন্ধুবান্ধব কি এ-কথা বিশ্বাস করবে?

মারিনেল্লি [নির্লিপ্তভাবে]—সম্ভবতঃ নয়।

রাজা—[শঙ্কিত হয়ে] তবে?—তারা কি ভাববে? আমাকেই তো তারা এর জন্যে দায়ী করবে?

মারিনেল্লি—[অতিশয় নির্লিপ্তভাবে] সম্ভবতঃ।

রাজা—[অতিশয় উত্তেজিত হয়ে] আমাকে! স্বয়ং আমাকে তারা সন্দেহ করবে! [নম্রস্বরে] আর নয় তো আমাকে "এমিলিয়া" পাবার আশা ত্যাগ করতে হবে।

মারিনেল্লি—[নির্ব্বিকার] কাউন্ট আপ্পিয়ানি জীবিত থাকতেই আপনার তা করা উচিত ছিল।

রাজা [অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজকে সম্বরণ ক'রে] মারিনেল্লি! আমাকে পাগল ক'রে তুলবেন না! [স্বগত] নাঃ এ পাপ থেকে আর নিস্তার নেই। [মারিনেল্লির প্রতি] এ থেকে উদ্ধারের আর কী উপায় আছে, মারিনেল্লি? আপনার বুদ্ধির দোষেই তো এমন ঘটলো? এ তো আর গোপন করবারও উপায় নেই!

মারিনেল্লি—[সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্ন] মহারাজ, অকারণ আমার বুদ্ধিকে দোষ দিচ্ছেন। দেখুন—আজ সকালে গীর্জ্জায় গিয়ে প্রকাশ্যে এমিলিয়ার কাছে যদি প্রণয়-নিবেদন না করতেন তো পৃথিবীতে আর তৃতীয় ব্যক্তি কি কখন জান্‌তে পারতো আপনি এমিলিয়াকে ভালবাসেন? সেটা না জান্‌লে, কেউ কি কখনও সন্দেহ করতে পারতো এ বিবাহে বাধা দান করায় আপনার স্বার্থ আছে? তাহ'লে কি আমার বুদ্ধি-মত চলে নির্ব্বিঘ্নে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হ'ত না? আমি কি আপনাকে কখন বলেছি গীর্জ্জায় গিয়ে ঐ বোকামিটা করুন?

রাজা—[ললাটে করাঘাত ক'রে] হায়, হায়, এ ঠিক কথা!

মারিনেল্লি—আপনি নিজেই তো সব পণ্ড করলেন। কিন্তু তবু চিন্তিত হবেন না, মহারাজ! আমাদের নির্ভয়ে অথচ সন্তর্পণে এগিয়ে চলতে হবে—[বেগে বাত্তিস্তার প্রবেশ]

বাত্তিস্তা—কাউন্টেস্ এসে পড়েছেন!

রাজা—কোন্ কাউন্টেস্?

বাত্তিস্তা—কাউন্টেস্ অর্সিনা!

রাজা—অর্সিনা? [শিশুর মত অসহায় হয়ে] অ্যাঁ, অর্সিনা? ও মারিনেল্লি! অর্সিনা এল যে? কী হবে?

মারিনেল্লি—আশ্চর্য্য!

রাজা—বাত্তিস্তা, ছুটে গিয়ে তাকে আটকা। সে যেন এখানে কিছুতেই না আস্‌তে পায়! যা, যা, দৌড় [বাত্তিস্তার প্রস্থান] ও পাগলী জান্‌লে কি ক'রে আমরা এখানে? ও কি চায়?—ও মারিনেল্লি, কথা বলুন না [খোসামুদির স্বরে] রাগ করেছেন, বন্ধু? কড়া কথা বলেছি?—মাপ করুন?

মারিনেল্লি—যথেষ্ট হয়েছে মহারাজ, আমাকে আর লজ্জা দেবেন না। আমি পুনরায় আপনার ক্রীতদাস!—কিন্তু দেখুন, অর্সিনাকে ঢুকতে না-দেওয়া অসম্ভব।

রাজা—তবে?—আমি তাহ'লে সরে যাই?

মারিনেল্লি—হ্যাঁ, তাই করুন [বাম পাশের ঘর দেখিয়ে] এই ঘরে ঢুকুন। ওখান থেকে আমাদের সব কথাবার্ত্তা শুন্‌তে পাবেন। ওঁর মেজাজটা সম্ভবতঃ কড়াই হবে—তবু ভয় পাবেন না—যান্—শিগ্‌গির যান্। [রাজার বামদিকের কক্ষে প্রবেশ]

[কাউন্টেস্ অর্সিনার প্রবেশ। বাহিরে দরজা দিয়ে।]

অর্সিনা—এখানে আমার পথ আটকাবার চেষ্টা? আর একি? এখানেও তো কেউ নেই আমাকে অভ্যর্থনা করতে? হায়—কী পরিবর্ত্তন? এই দোসালোয় আগে শত ব্যক্তি এগিয়ে আস্‌ত আমার ইঙ্গিত-মত কাজ করবার জন্যে! আর আজ—[মারিনেল্লির ওপর নজর পড়ায়] আপনি এখানে? রাজা আপনাকে সঙ্গে এনেছেন? তিনি কোথায়?

মারিনেল্লি—মহারাজকে চান?

অর্সিনা—আবার কাকে?

মারিনেল্লি—আপনি ভাবছেন তিনি এখানে?

অর্সিনা—নিশ্চয়! সকালে তাঁকে চিঠি লিখে পাঠালুম এই সময়ে এখানে আসতে অনুরোধ ক'রে, আমিও আস্‌ব জানিয়ে! চিঠির উত্তর দেন নি বটে, কিন্তু চিঠি পাবার এক ঘণ্টার মধ্যে যে তিনি এখানে এলেন, সে সংবাদ পেয়েছি। তার চেয়ে ভাল উত্তর আর সে চিঠির কী দেবেন?

মারিনেল্লি—আশ্চর্য্য ঘটনা-পরম্পরা!

অর্সিনা—ঘটনা-পরম্পরা কি? শুনছেন, আমি তাঁকে এখানে আস্‌তে অনুরোধ করাতে তিনি এসেছেন! এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে?—আমি আপনার সঙ্গে বৃথা সময় নষ্ট করছি। [অন্দরের দরজার দিকে অগ্রসর হ'ল]

মারিনেল্লি [বাধা দান ক'রে] কোথায়?

অর্সিনা—যেখানে আমার আগেই যাওয়া উচিত ছিল! রাজা আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন, আর আমি এখানে ব'কে সময় নষ্ট করছি! ছিঃ!

মারিনেল্লি—মাননীয়া কাউন্টেস্, রাজা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান না। আপনার জন্যে তিনি এখানে আসেন নি। আপনার চিঠি তিনি পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তা পড়েন নি!

অর্সিনা—[উচ্চৈঃস্বরে] পড়েন নি? [অনুচ্চঃস্বরে] পড়েন নি? [ব্যথিত কণ্ঠে] একবার পড়লেনও না? [অত্যন্ত ব্যথিতচিত্তে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে, পরে দৃঢ়তার সহিত] কিন্তু, আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই হবে। [ভৎসনার সহিত আদেশ দান] পথ ছাড়ুন।

রাজা—[বামদিকের প্রকোষ্ঠ থেকে বাহির হয়ে] নাঃ, এবার মারিনেল্লি বেচারাকে সাহায্য ক'রতে হবে।

অর্সিনা—[রাজাকে দেখে, স্থির করতে না পেরে তাঁর দিকে অগ্রসর হবে কি না] এই যে উনি!

রাজা—[বাম দরজা থেকে ডান দরজার দিকে সোজা যেতে যেতে—অর্সিনার নিকটবর্ত্তী হয়েও তার দিকে না চেয়ে এবং একটুও না থেমে] এই যে! আমাদের কাউন্টেস সুন্দরী! আজ কিন্তু আমার কথা বলবার একটুও অবসর নেই! আমি বড় ব্যস্ত। অন্য লোক আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। অন্য সময়ে এসো। আর এখানে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করবে না। এখুনি চলে যাও [অন্দরের দরজা দিয়ে প্রস্থান]

মারিনেল্লি—শুনলেন তো।

অর্সিনা—হ্যাঁ শুনলুম [স্বগত, ব্যথিত কণ্ঠে] "আমি বড় ব্যস্ত, সময় নেই" এ ব'লে তো ভিখারী, কুলি মজুরকেও ভাগায়। আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে মোলায়েম ক'রে একটা মিথ্যা ওজরও করলে না! [মারিনেল্লির প্রতি] মারিনেল্লি, আপনি কি আমার ওপর একটু সদয় হবেন? কিছুই চাই না—শুধু একটা মিথ্যা কথা ব'লে আমাকে বিদায় দিন। যা মিথ্যা কথা প্রথম মুখে আসে, বলুন, আমি সন্তুষ্ট হয়ে চলে যাব।

মারিনেল্লি—উত্তর শুনে এখুনি চলে যাবেন, এই সর্ত্তে বলতে পারি।

অর্সিনা—কারা এখানে এসেছেন, যাদের জন্যে রাজা এত ব্যস্ত?

মারিনেল্লি—এঁদের কিছুক্ষণ আগেই বিষম বিপদ ঘটেছে! কাউন্ত আপ্পিয়ানি ও—

অর্সিনা—কাউন্ত আপ্পিয়ানি? বড়ই দুঃখের বিষয় আপনার এ মিথ্যা কথাটা টিকলো না! এই মাত্র শহরে দেখে এলাম নিহত কাউন্ত আপ্পিয়ানির দেহ তাঁর গাড়ীতে ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি তাঁর বধূ ও বধূর মাতাকে নিয়ে বিবাহ করতে যাচ্ছিলেন, তাঁদের গাড়ীতে ডাকাত পড়ে তাঁকে বধ করেছে। এ-খবর জানেন না নাকি?

মারিনেল্লি—সে কথা ঠিক। এই বাগানের সামনেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে! তাঁর বধূ ও বধূর মাতাকে উদ্ধার ক'রে এখানে আনা হয়েছে। তাঁদের নিয়েই রাজা ব্যস্ত রয়েছেন।

অর্সিনা—আপ্পিয়ানির বধূ! নিশ্চয়ই তিনি সুন্দরী? কে বলুন তো?

মারিনেল্লি—এমিলিয়া গালোত্তি!

অর্সিনা—কে? এমিলিয়া গালোত্তি? যে-আপ্পিয়ানিকে খুন করা হ'ল তার হতভাগিনী বধূ হচ্ছেন "এমিলিয়া গালোত্তি?" রাজা এখন তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত? [অট্টহাস্য করতালি ক'রে] বাহবা, বাহবা, বাহবা! কোন্ শয়তান এ করালে?

মারিনেল্লি—কী হ'ল [স্বগত] হয়ত বা বেশী ব'লে ফেললুম! [অর্সিনার প্রতি] আপনি এঁকে চেনেন?

অর্সিনা—খুব চিনি! মারিনেল্লি, আপনাকে একটা নূতন খবর দেব। যা শুনে আপনার মাথার সব চুল খাড়া হয়ে উঠবে। এগিয়ে আসুন, এগিয়ে আসুন, খুব চুপি-চুপি কানে-কানে বলবো! কেউ না শুনতে পায় [মারিনেল্লির কাছে গিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে, কিন্তু অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে] আপনাদের রাজা হচ্ছেন নর-ঘাতক! তিনিই কাউন্ত আপ্পিয়ানিকে হত্যা করিয়েছেন !!

মারিনেল্লি—এমন ভীষণ কথা মুখে আনেন কি ক'রে?

অর্সিনা—খুব সহজ! মিলিয়ে দেখুন! আজ সকালেই রাজা গিয়ে গীর্জ্জাতে বধূটির কাছে প্রাণভরে প্রণয়-নিবেদন করলেন। আমার চরেরা সে-খবর আমাকে দিয়েছে। আর পূর্ব্বাহ্নেই রাজার প্রমোদভবনের সামনে বরকে হত্যা করা হ'ল, এবং বধূকে রাজার বাগান-বাড়িতে তোলা হ'ল! কেমন মিলে যায়? এও একটা আশ্চর্য্য ঘটনা-পরম্পরা, কী বলেন?

মারিনেল্লি—এ কথার জন্যে আপনার গর্দ্দান যাবে—

অর্সিনা—বটে! তাহ'লে এখুনি হাটের মাঝখানে গিয়ে চীৎকার ক'রে লোক জড়ো ক'রে সকলের কাছে প্রচার করবো—রাজাই আপ্পিয়ানির হত্যাকারী। আর যে সে-কথার প্রতিবাদ করবে সে তাঁর সহায়ক। [প্রস্থানোদ্যত এমন সময়ে বাহিরের দরজা খুলে বৃদ্ধ ওদোয়ার্দো গালোত্তি প্রবেশ করলে]

ওদোয়ার্দো—এ হতভাগ্য পিতার বেয়াদপি আপনারা মাপ করবেন! আমার স্ত্রী-কন্যার বিষম বিপদ হয়েছে। শুনলুম, আমার কন্যাকে এখানে আনা হয়েছে, তাই অস্থির হয়ে না বলেই ঢুকে পড়েছি! আমাকে বলতে পারেন আমার কন্যা কোথায়?

অর্সিনা—পিতা? [পুনরায় ফিরে] এমিলিয়ার পিতা নিশ্চয়! হাঁ, স্বাগতম্!

মারিনেল্লি—কর্ণেল মহাশয়, অস্থির হবেন না। আপনার স্ত্রী-কন্যা উভয়েই নিরাপদে আছেন। আমি এখুনি রাজাকে খবর দিচ্ছি! [অর্সিনার প্রতি] ভদ্রে, চলুন আপনাকে আগে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি। জানেন তো, রাজার হুকুম!

অর্সিনা—অত ভদ্রতার প্রয়োজন নেই। রাজা নিজে এসে আবার সে হুকুম দিন, তখন দেখা যাবে! আগে এই ভদ্রলোককে এঁর স্ত্রী-কন্যার কাছে নিয়ে যান!

মারিনেল্লি—[ওদোয়ার্দোর প্রতি চুপি-চুপি] মহাশয় একটু অপেক্ষা করুন, এখুনি রাজাকে ডেকে আন্‌ছি, ইতি-মধ্যে কিন্তু এই স্ত্রীলোকের কথায় কর্ণপাত করবেন না। ইনি পাগল!

ওদোয়ার্দো—বুঝেছি! আপনি ত্বরায় ব্যবস্থা করুন যাতে আমার স্ত্রী-কন্যাকে দেখতে পাই। [মারিনেল্লির প্রস্থান] [কিছুক্ষণ ওদোয়ার্দো ও অর্সিনা পরস্পরকে কৌতূহল-দৃষ্টিতে দেখে]

অর্সিনা—হায়, সব হতভাগ্যের দল একত্রে জোটে।

ওদোয়ার্দো—বাঃ, এ তো পাগলের মত কথা বলে না?

অর্সিনা—ও, আমি পাগল, এই পরম সত্যটি আপনাকে বুঝিয়ে গেছে? দেখুন, আমি এখুনি এমন কথা বলতে পারি, যাতে আপনিও পাগল হয়ে যাবেন! আপনার মাথা তো এখন বেশ ঠাণ্ডা আছে? বেরুক আমার মুখ থেকে সেই কথাটি—অমনি ক্ষেপে উঠবেন।

ওদোয়ার্দো—কী এমন কথা? বলুন শুনি! শীঘ্র বলুন!

অর্সিনা—কাউন্ট আপ্পিয়ানি নিহত, শুধু আহত নয়!

ওদোয়ার্দো—আপ্পিয়ানি নিহত? ওঃ, এ কথায় আমার বুক ভেঙে দিলেন!

অর্সিনা—মাথাও খারাপ হবে, আরও শুনুন! আপনার কন্যা নিহতের চেয়েও অধম!

ওদোয়ার্দো—নিহতের চেয়েও অধম? নিহত তো বটে?

অর্সিনা—না, তাঁর শরীর খুব সুস্থ! রাজার সঙ্গে বিহার করছেন! এখনি তো তাঁর সুখের জীবন, বিলাসের জীবন, নির্ভাবনার জীবন সুরু হ'ল!

ওদোয়ার্দো—[ক্রুদ্ধ] আমার কন্যার প্রতি অন্যায় ইঙ্গিত করছেন!

অর্সিনা—একটুও না, মিলিয়ে দেখুন! আজ সকালেই রাজা তাঁর সঙ্গে গীর্জায় অনেকক্ষণ ধ'রে গোপন পরামর্শ করলেন, আর তার এক ঘণ্টার মধ্যেই রাজ-বাগানের সামনেই আপ্পিয়ানি নিহত হ'ল, আর তার পরই আপনার কন্যা রাজার এই বিলাস-কুঞ্জে রাজার সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদে ব্যস্ত!! কেমন মেলে? তবে এতে হয়েছেই বা এমন কী? আপনার কন্যা তো স্বেচ্ছায় এসেছেন, মাত্র একটু গুপ্তহত্যা ঘটেছে! রাজা-রাজড়ার ব্যাপারে অমন হয়েই থাকে! কী বলেন?

ওদোয়ার্দো [অর্সিনার কথা শুন্‌তে শুন্‌তে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠে] আমার কন্যাকে আমি চিনি! এ অতি মিথ্যা অপবাদ! [ক্ষিপ্তের মত চারিদিকে চেয়ে, সজোরে মেঝেয় পদাঘাত ক'রে] কিন্তু হায় আমি বিনা অস্ত্রে ডাকাতের গুহার সামনে এসেছি। বন্দুকটা, এমন কি পিস্তলটাও আনিনি।

অর্সিনা—কেমন "আমার একটি কথা"র কাজ হচ্ছে? দেখুন আপনার কন্যের জন্যে দুঃখও হয়! আমি তাঁরই মত একজন হতভাগিনী। এখন অবশ্য বাতিলের সংখ্যায় পড়েছি। রাজার লালসা একবার চরিতার্থ হ'লে উনিও বাতিলের দলে পড়বেন। একটার পর একটা এমন বহু সুন্দরীরই এই রকম কপাল পুড়বে! আর……

ওদোয়ার্দো—[ক্ষিপ্তের মত পদচারণ করতে করতে এবং কোটের পকেট, কোমর খুঁজতে খুঁজতে] না, কিছুই সঙ্গে আনিনি। দুঃসংবাদ পেয়ে তাড়াতাড়ি চলে এসেছি; বড় ভুল হয়েছে!

অর্সিনা—হাঃ, হাঃ, বুঝেচি কি চান! এই নিন্ [জামার ভেতর থেকে একটা ছোরা বার ক'রে বৃদ্ধের হাতে দিয়ে] এটা আর এই বিষ নিয়ে এসেছিলুম, আমার অপমানের প্রতিশোধ নিতে। কিন্তু সুযোগ পেলুম না। আমি যা পারলুম না—আপনি তা নিশ্চয়ই পারবেন। আপনাকে আমি চিনেছি। আপনি আমারও পিতা! তেজস্বী উন্নতশির পিতা, আপনার উভয় কন্যার অপমানের প্রতিশোধ নিন। [এমন সময়ে ক্লাউদিয়া দরজার সামনে উপস্থিত হ'ল। স্বামীকে দেখে চীৎকার ক'রে তার দিকে ছুটে এসে]

ক্লাউদিয়া—স্বামিন! এসেছ! বাঁচাও আমাদের—শুনেছ তো সবই!

ওদোয়ার্দো—[স্ত্রীর ওপর রোষ কটাক্ষ নিক্ষেপ ক'রে]

আগে আমার একটা কথার উত্তর দাও। একি সত্যি যে আজ সকালে গীর্জ্জায় রাজার সঙ্গে এমিলিয়ার সাক্ষাৎ হয়েছিল ?

ক্লাউদিয়া—সত্যি ! কিন্তু এমিলিয়া সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ !

অর্সিনা—কেমন, আমি কি মিথ্যা কথা বলেছি ?

ওদোয়ার্দো [ক্ষিপ্তের মত ঘরের মধ্যে পদচারণ করতে করতে] কে বলে তুমি মিথ্যা কথা বলেছ মা ! আর কে বলে তুমি পাগল ! আমি ঘোড়ায় চড়ে এসেছি, এখন ক্লাউদিয়াকে নিয়ে যাই কি ক'রে ? মা, তুমি তো গাড়ী করে এসেছ ? আমার স্ত্রীকে তুমি নিয়ে যাবে ?

অর্সিনা—নিশ্চয়—আনন্দের সঙ্গে !

ওদোয়ার্দো—ক্লাউদিয়া, ইনি কাউণ্টেস্ অর্সিনা, অতি বুদ্ধিমতি সম্ভ্রান্ত মহিলা—আমার কন্যাস্থানীয়া ! তুমি এঁর সঙ্গে বাড়ি যাও। বাড়ি পৌঁছে, গাড়ীটা পাঠিয়ে দিও ! [তিন জনই বাহিরে যাবার উপক্রম করলে] তখন এমিলিয়াকে নিয়ে যাবো। চল আমি তোমাদের গাড়ীতে উঠিয়ে দিই [সকলের প্রস্থান]

[অল্প পরেই রাজা ও মারিনেল্লির প্রবেশ]

রাজা—এখন কি করি ? ঐ বৃদ্ধকে চিনি। অতি একগুঁয়ে, আর ভীষণ সম্মান-জ্ঞান। ও যদি ওর মেয়েকে নিয়ে আমার রাজ্যের বাহিরে এক সন্যাসিনীর আশ্রমে পোরে, তখন কি হবে ? আপ্পিয়ানির জীবনপাত তো বৃথা হবে ? এর শেষ পরিণতি কী যে হবে কিছুই বুঝতে পারছি না !

মারিনেল্লি—মহারাজ, সাহসে বুক বাঁধুন। সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি নিশ্চয় জানবেন, ঐ বৃদ্ধ আপনাকে দেখেই ভেড়াটির মত শান্ত হয়ে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাবে, আর মেয়েকে শহরে নিয়ে গিয়ে মহারাজের দ্বিতীয় আদেশের জন্যে অপেক্ষা করবে।

রাজা—[গবাক্ষের নিকট গিয়ে] আপনি আচ্ছা লোক চেনেন। ও ব্যক্তি তেমন নয় ! ঐ যে বৃদ্ধ যোদ্ধা সিংহের মত এদিকে আসছে ! মারিনেল্লি, আমি যাই—[দ্রুত প্রস্থান]

[ওদোয়ার্দোর প্রবেশ]

ওদোয়ার্দো—আমার কন্যাকে এখনও আনলেন না না, সে ইতিমধ্যে এসে ফিরে গেল ?

মারিনেল্লি—না, রাজা এসেছিলেন। আপনি কোথা গিয়েছিলেন ?

ওদোয়ার্দো—আমার স্ত্রীকে কাউণ্টেসের স বাড়ি পাঠাতে।

মারিনেল্লি—অত হাঙ্গামার কী প্রয়োজন ছিল রাজা স্বয়ং আপনার স্ত্রী-কন্যাকে শহরে পৌঁছে দিতে না কি ?

ওদোয়ার্দো—আমার কন্যার সে সম্মানে প্রয়োজ নেই

মারিনেল্লি—তার অর্থ ?

ওদোয়ার্দো—আমার কন্যাকে আমি সঙ্গে নি প্রথমে সাবিওনেত্তায় যাব, তারপর তাকে এক সন্যাসিনী আশ্রমে রাখ্‌ব। সে আর শহরে থেকে কি করবে কাউন্ট আপ্পিয়ানি নিহত !

মারিনেল্লি—সেই কারণেই আপনার কন্যাকে শহ থাকতেই হবে। একটু ভেবে দেখ্‌লেই কার বুঝতে পারবেন !

ওদোয়ার্দো—অসম্ভব ! আমি পিতা, আমি স্থি করবো আমার কন্যা কোথায় থাকবে। আমার কন্য কখনই শহরে থাক্‌বে না।

মারিনেল্লি—আপনার কন্যাকে শহরে রাখতেই হবে চিন্তা ক'রে দেখুন।

ওদোয়ার্দো—চিন্তা করবার কি আছে ? সে আমা সঙ্গে নিশ্চয়ই যাবে।

মারিনেল্লি—আপনার সঙ্গে কলহ করা বৃথা রাজাকে ডেকে আনি। তিনি যেমন নির্দ্দেশ দেবে তাই হবে। [প্রস্থান]

ওদোয়ার্দো—কী ? আমাকে ঐ নরকের কীট নির্দ্দে দেবে আমি কোথায় এমিলিয়াকে রাখ্‌ব ? অসম্ভব [ছোরা হাতে ক'রে] হায়, বৎস আপ্পিয়ানি, কাঁদতে কখনও শিখিনি এখন আর শিখতেও পারব না, কিন্তু আমার বুক ভেঙে গেছে ! জানি, তুমি প্রতিশোধ চাচ্ছ ! কিন্তু আর একজন তা করুক [ছোরা লুকিয়ে]

যে আশায় ঐ নারকী তোমাকে হত্যা করেছে, আমি ওর সেই আশা নির্মূল করবো। তাতেই ওর সব চেয়ে বেশী শাস্তি হবে। ওর অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ওকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারবে! কিন্তু স্থির হই। আগে বুঝি এদের কি মতলব। হায় এই পক্ককেশের নিম্নে তরুণ মন। একে দমন করি কি ক'রে? অধীর হ'লেই ত সব পণ্ড হবে!

[রাজা ও মারিনেল্লির প্রবেশ]

রাজা—হায়, গালোত্তি, এমন বিপদও ঘটলো যে আপনাকেও আমার কাছে আসত হ'ল? অল্প কারণে তো আর আপনি আসতেন না?

ওদোয়ার্দো—মহারাজ, ছোট ব্যাপার নিয়ে রাজাকে বিরক্ত করতে চাই না, তাই আপনার কাছে আসি না। তবে ডাকলেই আসি।

রাজা এমন গর্ব্বভরা বিনয় রাজ্যের সকলের অনুকরণীয়। এখন আসল কথা হোক। আপনার স্ত্রী চলে যাওয়ায়, আপনার কন্যা আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কেন তাঁকে নিয়ে গেলেন? আমি শুধু অপেক্ষা করছিলুম এমিলিয়া একটু সুস্থ হোক। তখন দু-জনকেই মহাসমারোহে শহরে নিয়ে যেতুম! উভয়ের সম্মানে শহর মুগ্ধ হ'ত! আপনার স্ত্রীকে এখন অনর্থক এ-থেকে বঞ্চিত করলেন!

ওদোয়ার্দো—মহারাজের অশেষ কৃপা! বেয়াদপি মাপ করবেন, আমার কন্যাকেও এ-সম্মান থেকে বঞ্চিত হ'তে হবে।

রাজা—সেকি? এতে আমারও সম্মান! আমি এ থেকে বঞ্চিত হ'তে চাই না!

ওদোয়ার্দো—আমাকে অনুমতি করুন, আমি তাকে নিয়ে সন্ন্যাসিনীর আশ্রমে রেখে আসি। যতদিন সেখানে না যায়, ততদিন সাবিত্তনেত্তায় আমার কাছে থেকে তার মন্দ ভাগ্যের জন্যে অশ্রুবর্ষণ করবে।

রাজা—কী সর্ব্বনাশ! সন্ন্যাসিনীর আশ্রমে এমিলিয়াকে রাখবেন? এত রূপ, এত গুণ, এত মাধুর্য্য, সন্ন্যাসিনীর আশ্রমে নষ্ট হবে? একটা আশা পূর্ণ না হ'লেই, সংসারের প্রতি এত বিরূপ হ'তে আছে?—কিন্তু, আমি বাধা দেবার কে?—আপনি পিতা—আপনার কন্যার ব্যবস্থা আপনিই করবেন। গালোত্তি, আপনার কন্যাকে যেখানে খুশী নিয়ে যান।

ওদোয়ার্দো—[মারিনেল্লির প্রতি বিদ্রূপের স্বরে] কেমন মশায়, এখন?

মারিনেল্লি—বটে আমাকে দ্বন্দ্বে আহ্বান?

রাজা—এ আবার কি? মারিনেল্লি, এর কি অর্থ?

ওদোয়ার্দো—কিছুই না মহারাজ, আমরা শুধু দেখছিলুম কে মহারাজের সঠিক অভিপ্রায় অনুমান করতে পেরেছে।

মারিনেল্লি—মহারাজ, বাধ্য হয়ে আপনার এই আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করতে হ'ল। জানেনই তো আমি কাউন্ত আপ্পিয়ানির অন্তরঙ্গ বন্ধু!

ওদোয়ার্দো—সত্যি না কি মহারাজ?

মারিনেল্লি—আপনার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে সে খবর পাবেন। কাউন্ত মরবার সময় আমার নাম এমন স্বরে ক'রে গেছেন যে. তা থেকে স্পষ্ট অনুমান করা যায় তিনি চেয়েছিলেন আমিই তাঁর হত্যার প্রতিশোধ নেই।

রাজা—আপনি কি বলতে চান?

মারিনেল্লি—এমিলিয়াকে বিচারাধীন করবার জন্যে শহরে আটকে রাখতে হবে। শহরসুদ্ধ লোকে ভাবছে কাউন্তকে একজন প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী হত্যা করেছে। ডাকাত-পড়া বাজে কথা।

ওদোয়ার্দো—এমিলিয়ার তাতে সড় আছে?

মারিনেল্লি—এমিলিয়া সাক্ষাৎ দেবী। এমন পাপ-কথা মুখেও আনতে পারি না। তবে কি জানেন, বিচারের খাতিরে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষকেও অনেক সময় কষ্ট পেতে হয়! তিনি নিশ্চয় সম্মানের সঙ্গে খালাস পাবেন, কিন্তু কর্ত্তব্যের খাতিরে তাঁকে আটকাতে আমরা বাধ্য।

রাজা—ও, এ তো ঠিক কথা! তাহ'লে আমি নিরুপায়! গালোত্তি, আপনি নিজেই বুঝুন!

ওদোয়ার্দো—হা ভগবান্, যা বোঝবার তা বুঝেছি! বেশ, এমিলিয়া শহরে তার মা'র কাছেই থাকুক।

মারিনেল্লি—মহারাজ, এমিলিয়াকে তার মার কাছে

রাখাও চলবে না। আইনে চায়, এমিলিয়াকে কারাগারে রাখতে হবে।

ওদোয়ার্দো—হাঃ, হা, কারাগারে রাখতে হবে। ঠিক্, ঠিক্ [দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে একটু অগ্রসর হয়ে, ছোরা বার করবার চেষ্টা করলে রাজা পেছনে পেছনে এসে গায়ে হাত দিয়ে]

রাজা—[সহানুভূতির স্বরে] প্রিয় গালোত্তি, অধীর হবেন না।

ওদোয়ার্দো [ছোরা না বার ক'রে, স্বগত] তোমার ইষ্ট দেবতা তোমাকে এ কথা বলিয়ে বাঁচালে।

রাজা—মারিনেল্লি— বড় বাড়িয়ে তুলেছেন। এমিলিয়াকে কখনই কারাগারে রাখা হবে না। আমার আদেশ—তাকে আমার প্রধান মন্ত্রী গৃমল্ডির বাড়িতে রাখা হোক। সেখানে তার যত্ন ও সম্মানের একটুও ত্রুটি হবে না। এই আমার স্থির সিদ্ধান্ত। গৃমল্ডিকে তো আপনি চেনেন?

ওদোয়ার্দো—খুব চিনি! তাঁর গৃহিণী ও কন্যা-দুটিকেও চিনি! মারিনেল্লি, আপনার দাবি ছাড়বেন না! এমিলিয়াকে দুর্গম কারাগারেই রাখা হোক, গৃমল্ডির বাড়িতে নয়!

রাজা—এ কথার অর্থ বুঝলুম না! আর কি করতে পারি?

ওদোয়ার্দো—আমার কন্যাকে কি একবার দেখতে পারি?

রাজা—নিশ্চয়, নিশ্চয়, এখুনি তাঁকে এখানে পাঠাচ্ছি। তবে আমার আদেশের আর নড়চড় হবে না। [রাজা ও মারিনেল্লির প্রস্থান]

ওদোয়ার্দো—অভিনয় শেষ হ'তে চল্‌ল। কিন্তু—[কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে] কিন্তু—এমিলিয়ার যদি এতে সত্যিই রোগ থাকে? তার জন্যে যা করতে চাই—সে যদি তার উপযুক্ত না হয়? [আবার কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে] নাঃ, আমিই বা এ হাত আপন কন্যার রক্তে কলঙ্কিত করি কেন?—কী বীভৎস চিন্তা! [শিহরে উঠে] না, না, আমি চলে যাই। যে ভগবান তাকে এ বিপদে ফেলেছেন, তিনিই তাকে উদ্ধার করুন [ওদোয়ার্দো প্রস্থানোদ্যত, এমন সময় এমিলিয়াকে প্রবেশ করতে দেখে] বড় দেরি হয়ে গেল! তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক [এমিলিয়ার প্রবেশ]

এমিলিয়া—এ কি? বাবা, আপনি এখানে? একা? মা কোথায়? কাউন্ট মহাশয় কোথায়? এত উত্তেজিত কেন আপনি?

গালোত্তি - তুমি এত শান্ত কেন?

এমিলিয়া—কী হয়েছে যে অস্থির হব? হয় সব গেছে, নয় কিছুই হয় নি। যাই হোক, ধৈর্য্য হারাব কেন?

ওদোয়ার্দো—কী মনে হয়, কি হয়েছে? 'সব গেছে'র কি অর্থ? যদি কাউন্ট নিহত হয়ে থাকেন?

এমিলিয়া—তিনি মারা যাবেন কেন? [পিতার প্রতি চেয়ে] ওঃ, তাহ'লে মার মুখ-চোখ দেখে যা সন্দেহ করেছিলুম তা সত্যি? [কষ্টে আত্মসম্বরণ করে কিন্তু দৃঢ়স্বরে] বাবা, মা কোথায়?

ওদোয়ার্দো—বাড়িতে গেছেন।

এমিলিয়া—আমরাও এখুনি যাই, চলুন! এখানে আর এক মুহূর্ত্তও থাকা হবে না। আমরা শহরেও থাকব না। সাবিওনেত্তায় চলুন।

ওদোয়ার্দো—এরা তোমাকে ছাড়বে না। তোমাকে একা এখানে থাকতে হবে।

এমিলিয়া—আমার স্বামী-হন্তার হাতে আমাকে একা ফেলে যাবেন? আপনি আমার পিতা? বেশ, তাই করুন! দেখি, পৃথিবীর কোন্ মানুষ আমাকে এখানে আটকাতে পারে?

ওদোয়ার্দো—এখন তোকে বুঝেছি! আয় মা, আমার বুকে আয়। [এমিলিয়ার মস্তক বক্ষে ধারণ] আমার কথাই ঠিক, নারীই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ভূষণ। ভগবানের শুধু একটা ভুল হয়েছে, তোদের গলাটা বড় মিহি করেছেন। না হ'লে, সব বিষয়ে তোরা আমাদের চেয়ে ঢের ভাল। এতক্ষণে আমার মনের শান্তি ফিরে পেলুম! ভেবে দেখ মা, বিচারের অজুহাতে এরা তোকে গৃমল্ডীর বাড়িতে আটকে রাখতে চায়!

এমিলিয়া—এরা রাখতে চায়! কেন, আমাদের কোন ইচ্ছা নেই?

ওদোয়ার্দো—আমি সে কথায় ক্ষেপে উঠে, ওদের দু-জনকেই এই ছোরা দিয়ে [ছোরা দেখিয়ে] বিনাশ করতে চেয়েছিলুম।

এমিলিয়া—ছিঃ, ছিঃ, তা কি করে, বাবা! পাপীদের ইহজীবনই সর্ব্বস্ব! তা কি নেয়? ও ছোরাটা আমাকে দাও বাবা।

ওদোয়ার্দো—এ ত আর মাথার কাঁটা নয়, মা!

এমিলিয়া—তাহ'লে মাথার কাঁটায় কাজ সারি।

ওদোয়ার্দো—ছিঃ মা! তা কি করে? তুইও জীবন হারাবি মাত্র একবার।

এমিলিয়া—স্ত্রীলোকেও সতীত্ব হারায় মাত্র একবার।

ওদোয়ার্দো—পাশবিক বল তা কখন কাড়তে পারে না।

এমিলিয়া—তা ঠিক! কিন্তু বাবা, আমারও রক্ত-মাংসের শরীর। ঐ গ্রিমল্ডির গৃহে এক মুহূর্ত্তও থাকতে চাই না। ও বাড়ি আমি চিনি। ওখানে এক উৎসবে মা'র সঙ্গে গিয়ে মাত্র এক ঘণ্টা ছিলুম। সেই অল্প সময়ের মধ্যে আমার মনে যে বাসনার স্রোত উথলে উঠেছিল, বহুদিন ধরে তপস্যা করেও তা ভালরকম দমন করতে পারি নি। সারাজীবনের ধর্ম্মসাধনা ও সংযম ঐ এক ঘণ্টার পাপ-সংসর্গে ভেসে যাবার উপক্রম করেছিল। আবার সেখানে যেতে চাই না। এক মুহূর্ত্তের জন্যেও না। দাও বাবা, ছোরাটা দাও।

ওদোয়ার্দো—যদিই বা দিই, এ নিয়ে কি করবি? [ছোরা দান]

এমিলিয়া—[তৎক্ষণাৎ ছোরা বুকের উপর তুলে] আঃ, বাঁচলুম!

[ওদোয়ার্দো তার হাত আটকে ছোরা কেড়ে নিলে]

ওদোয়ার্দো—দেখলি মা, তুই কত অধীর! তোর হাতে কি এ দেয়?

এমিলিয়া—বেশ, তাহ'লে মাথার কাঁটায় কাজ সারি [চুলের খোঁপা খুলে ফেলে, কাঁটা সন্ধান করতে করতে গোলাপ ফুল হাতে পড়লো, তা বাহির ক'রে এনে] ছিঃ, তুই এখনও এই মাথায়! আমি না ঐ পিতার মেয়ে?

ওদোয়ার্দো—এর কি অর্থ, মা?

এমিলিয়া—কী চাও বাবা? আমার জীবন তো নিতে পাচ্ছ না। তোমার হাত কাঁপছে। ভয় হচ্চে? কথা বলতে বলতে [গোলাপ ফুলটা ছিঁড়ে ফেলে, ব্যঙ্গের স্বরে] হাঁ, প্রাচীনকালে এমন নির্ভীক বাপ হ'ত বটে, যে কন্যার সম্মান রক্ষা করতে তার বুকে আমূল ছোরা বসাতে একটুও দ্বিধা বোধ করত না। এখন আর তেমন বাপ হয় না।

ওদোয়ার্দো—নিশ্চয় হয় [নিমেষে এমিলিয়ার বক্ষে আমূল ছোরা বিঁধিয়ে] হা ভগবান, এ কি করলুম!!

[পতনোন্মুখ এমিলিয়াকে দুই হাতে ধারণ]

এমিলিয়া—আঃ, বাবা, ঝড়ে নষ্ট হ'তে না দিয়ে একটা ফুলকে আগেই তুলে নিলে! দাও বাবা, তোমার ঐ ছোরাসুদ্ধ হাতটা দাও, ওকে একবার চুমু খাব।

[রাজা ও মারিনেল্লি দরজার সম্মুখে]

রাজা—ওকি? এমিলিয়া কি অসুস্থ?

ওদোয়ার্দো—খুব সুস্থ! খুব সুস্থ!!

রাজা—[এমিলিয়ার নিকট এসে] একি দেখছি?— কি ভীষণ!

মারিনেল্লি—হতভাগ্য আমি।

রাজা—নিষ্ঠুর পিতা! একি করলে?

ওদোয়ার্দো—ঝড়ে নষ্ট হবার আগে, এক বিশুদ্ধ ফুলকে তুলে ফেলেছি! কেমন মা! তাই নয়?

এমিলিয়া—তুমি নয় বাবা, আমি নিজে—আমি নিজে—

ওদোয়ার্দো—তুমি নয়, মা!—তুমি নয়! কোন মিথ্যা নিয়ে পৃথিবী থেকে যেও না মা! তুমি নয় মা! তোমার হতভাগ্য বাবা, তোমার বাবা এ করেছে!

এমিলিয়া—আঃ——বা—বা [মৃত্যু]

[এমিলিয়ার দেহ অতি সন্তর্পণে মেঝেয় নামিয়ে রেখে, ওদোয়ার্দো তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসলে]

ওদোয়ার্দো—যাও মা! [কিছুক্ষণ মাথা নীচু ক'রে চুপ ক'রে থেকে, পরে রাজার দিকে ভীষণ দৃষ্টিতে চেয়ে, মুখের আকৃতি ভয়াবহ] কী! মহারাজ! এই রক্তাক্ত দেহও কি আপনার পছন্দ হয়, আপনার বাসনা জাগায়?

রাজা—[এমিলিয়ার মৃতদেহ দেখতে দেখতে ভীত ও বিহ্বল হয়ে, কিছুক্ষণ চুপ ক'রে—মারিনেল্লির প্রতি] এই নে, এটা তুলে নে।—এখন ? কী ভাবছিস্ নরাধম ? [মারিনেল্লি ছোরা তুলে নিয়ে, আপন বক্ষে বিঁধতে গেল, রাজা ছোরা কেড়ে নিয়ে] না, না, ঐ পবিত্র রক্তের সঙ্গে তোর রক্তের স্পর্শ ঘটতে দেব না।—যা—দূর হ'য়ে যা ! চিরকালের জন্যে নিজকে লুকাগে।—দূর হ বলছি—দূর হ !—হা ভগবান্, রাজাকেও মানুষের দেহ দিয়ে যে শাস্তি দিয়েছ, তাতে তৃপ্ত নও, আবার শতায়নকেও তার কাছে বন্ধুরূপে পাঠাও !!

[কিছুক্ষণ শুদ্ধ থেকে] কিসের অপেক্ষা করছেন ? দেখতে চান শেষটা কি হয় ? ভাবছেন হয়ত, এই শাণিত ইস্পাত আবার আমার বুকে বসিয়ে, এ অভিনয় শেষ করব ! খুব ভুল বুঝেছেন। এই নিন্ [ছোরাটা রাজার পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে] এই রইল আমার পাপের রক্তমাখা সাক্ষী। আমি নিজে গিয়ে কারাবরণ করব। সেখানে আপনাকেই বিচারকরূপে পাবার আশায় থাকব।—আর তারপর—সেইখানে—সেইখানে আপনার জন্যে অপেক্ষা করব—যেখানে আমাদের সকলের বিচারক বিচার করেন।

শৃঙ্খল

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

ভ্রাতার পায়ের কাছে একটানা ঘণ্টা-দুই বসিয়া থাকিয়াও হেমবালা সেদিন শান্তি পাইলেন না। ঐন্দ্রিলা ফিরিল কি-না খোঁজ লইতে তেতলায় আসিয়া দেখিলেন, কলেজের কাপড় না-ছাড়িয়াই সে ছবি লইয়া বসিয়াছে। কহিলেন, "কি আঁকছিস্ ?"

ছবি হইতে চোখ না তুলিয়াই ঐন্দ্রিলা কহিল, "রাহু-সর্দার একটা হাতী ফর্‌মাইস্ করেছিলেন, আঁকা শেষ ক'রে এখন দেখছি এর পায়ে একটা সরু শিকল পরিয়ে দিলে জিনিষটা বেশ ভালো ছবি হয়ে উৎরয়, তাই দিচ্ছি।"

তাহার পাশেই বসিয়া-পড়িয়া হেমবালা কহিলেন, "তা দিস্ এখন, শিকলটা একটু দেরিতে পরালেও রাহু-সর্দারের হাতী পালিয়ে যাবে না। আর দুটো কথা বলি। কথা বল্‌তে যে কোনোকালে শিখেছিলাম তাও প্রায় ভুলে যাবার জোগাড়।"

ঐন্দ্রিলা ছবির উপর আরও একটু ঝুঁকিয়া কহিল, "বালো।" আলো কমিয়া আসিতেছে, ছবি ইহার পর এমনিই তুলিয়া রাখিতে হইবে, কিন্তু হেমবালার সঙ্গে কি বলিয়া কথা সুরু করিবে সে ভাবিয়া পাইল না।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিলে হেমবালা আহত হইয়া কহিলেন, "তোর এখন কথা বলতে ভালো লাগছে না ?"

ঐন্দ্রিলা অনুতপ্ত হইয়া রং-তুলি সরাইয়া রাখিল। মায়ের একাকতার বেদনা তাহারও অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছে। কহিল, "ভালো লাগছে বই কি, বোসো তুমি।" তারপর মায়ের আরও একটু কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া যথাসাধ্য প্রসন্নতার হাসি মুখে আনিয়া বলিল, "কিন্তু কথা বলতে ভুলে যাচ্ছ বলছিলে কেন বল ত ? বেশ ত দু-তিন ঘণ্টা ক'রে রোজ মামাবাবুর কাছে কাটিয়ে এসো। কথা আবার কত বলতে হয়।"

"হ্যাঁ, দাদার সঙ্গে ত কত কথাই আমার হয় ! কি এমন কথা আছে যা তাঁকে বলতে পারি ?"

"কি তাহলে সেখানে কর সারাক্ষণ ?"

"কিছু না, যতক্ষণ ব'সে থাকতে পাই বসি, তারপর উঠে চ'লে আসি।"

"বাস্? মামাবাবুও একটা কথা বলেন না?"

"তা নেই বা বললেন? তাঁর কথা শুনতে ত যাই না, তাঁকে দেখতেই যাই, সে তিনি জানেন। কিন্তু সেকথা যাক্, বীণি কোথায় গিয়েছে বলতে পারিস্?"

একটু থামিয়া ঐন্দ্রিলা কহিল, "না, বাড়ী এসে তাকে দেখতে পাইনি।"

গলার স্বর একটু নামাইয়া হেমবালা কহিলেন "বীণিকে আমি ত আর কিছু বলতে পারি না, আর আমি বললেই বা সে শুনবে কেন, এ-বাড়ীতে সে-ই হ'ল সর্ব্বেসর্ব্বা। তোকেই বলছি। এ কিন্তু বাপু বাড়াবাড়ি হচ্ছে। একটা দিনও কি ফাঁক যেতে নেই? এই ক'দিন ত বাড়ীতেই সভা বস্ত। কি, না মেয়ের চিকিৎসা হচ্ছে। তা মেয়েটা ভালো ক'রে সেরে ওঠা পর্য্যন্ত যদি সবুর সইত ত বুঝতাম, না-হয় বাড়ীতেই আরো দুদিন সভা বস্ত। তা না, রুগ্ন মেয়েটাকে একটা আয়ার কাঁধে ফে'লে দিয়ে সেই দুপুর না পেরতেই সফর করতে বেরিয়েছে। এখন রাত দুপুরের আগে বাড়ি ফেরে ত বাঁচি।"

ঐন্দ্রিলা একটু ভাবিয়া কহিল, "দিদির কাজগুলো ভালো হচ্ছে তা আমি বলতে চাইনে, কিন্তু তুমি এই নিয়ে মাঝ থেকে কেন মিছিমিছি ভেবে মরছ? তোমার ত ভাববার কথা নয়?"

হেমবালা কহিলেন, "ভাবি কি আর সাধে? তোরই জন্যেই ভাবি। কলেজেই না-হয় পড়ছিস, তোর বয়েসটা কি শুনি? চোখের ওপর দুবেলা যেমন দেখাব, তেমনিই ত শিখ্‌বি। তোকে নিয়ে যে আমার কি বিপদ্ হয়েছে আমি ছাড়া সে আর কেউ জানে না।" তারপর প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া নানা রকম করিয়া বীণারই প্রসঙ্গের আলোচনা। গত কয়েক দিনই এইরূপ হইতেছে। বেচারি দিদি! একমাত্র হাসির আয়ুধ লইয়া অকরুণ ভাগ্যের বিরুদ্ধে তাহার বিদ্রোহ। তাহারও সম্বন্ধে কোনও মানুষের মনে ভিতরে ভিতরে যে এতখানি বিরূপতা সঞ্চিত হইয়া থাকিতে পারে, ইহা মনে করিয়াই ঐন্দ্রিলা চমৎকৃত হইল।

ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া শেষ পর্য্যন্ত শুনিয়া কহিল, "দিদির সংসারযাত্রা তোমার ভালো লাগছে না বুঝতে পারছি। ও নিয়ে দিদিকে খোলাখুলি যে তুমি কিছু বলবে, তারও কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই। সবদিক্ ভেবে দেখলে, আমার মনে হয় তোমার দেশে ফিরে যাওয়াই উচিত।"

হেমবালা রুক্ষস্বরে কহিলেন, "তাহলে নিজের খুসি-মতো তুইও খুব ধিঙ্গিপনা ক'রে বেড়াতে পারিস্, এই-ত?"

ঐন্দ্রিলাও হঠাৎ কঠোর স্বরেই জবাব দিল, "সে তুমি থাকলেও পারব, তুমি দেখে নিও।"

বিস্ময়ের আতিশয্যে হেমবালার মুখে কিছুক্ষণ কথা সরিল না। একটু সরিয়া বসিয়া কন্যাকে ভাল করিয়া একবার দেখিয়া লইয়া ধীরে কহিলেন, "তোর কি হয়েছে বলতে পারিস?"

ঐন্দ্রিলা কহিল, "আমার আবার কি হতে যাবে? যেমনকার তেমনিই আছি।"

কথার সুর আরও নামাইয়া হেমবালা কহিলেন, "আমার কথার এমন অবাধ্য ত তুই কোনোদিন ছিলি না, মুখে মুখে কথা কোনোদিন তোকে বলতে শুনিনি। লেখাপড়া শিখে এ কি সহবৎ তোর হচ্ছে?"

ঐন্দ্রিলা লজ্জিত হইয়া মাথা নত করিল, তাহার দুই চোখ অশ্রুসজল হইয়া আসিয়াছে।

"ইলু।"

এবার ঐন্দ্রিলার অশ্রু আর বারণ মানিল না।

তাহার মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে হেমবালা কহিলেন, "লক্ষ্মীটি, তুই চুপ কর্। এমনিতেই আমার সুখের শেষ নেই, তার ওপর তোর চোখের জল আর দেখতে পারি নে। কথা দিচ্ছি, আর কোনোদিন কিছু বলব না তোকে।"

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে ঐন্দ্রিলা বলিল, "মা গো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি দেশে ফিরে যাও। সেখানে তুমি রাজরাণী, এখানে ভায়ের সংসারে তুমি কেউ নও।... এ বাড়ীর চাকর-বাকরগুলোর কাছে শুদ্ধ আমি ছোট হয়ে আছি তোমার জন্যে।...তুমি জানো না, বেশী কাছে এসেই দিন দিন কিরকম তুমি আমার পর হয়ে যাচ্ছ।"

অঞ্চলে চোখের প্রান্ত হইতে এক ফোঁটা উদ্যত অশ্রু মুছিয়া লইয়া হেমবালাও গাঢ়স্বরেই কহিলেন, "তা কি আর আমি বুঝি না ভেবেছিস্? তোর ব্যবহারে কতদিন যে আমার বুক ফেটে গেছে, তবু আমি কিছু বলিনি।... আজ কথাটা তুইই তুললি—"

ইহার পর বেশ কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। চোখমুখ মুছিয়া একটু স্থির হইয়া লইয়া মায়ের একটি হাতের উপর নিজের হাতটিকে রাখিয়া ঐন্দ্রিলা কহিল, "এরকম ক'রে আর একটা দিনও আমাদের চলা উচিত নয় মা। পরস্পরকে এরকম ক'রে আমরা হারাতে পারব না। আমাদের দুজনেরই ভালোমন্দ আমার চেয়ে তুমি ঢের বেশী বোঝ, তুমিই উপায় ভেবে ঠিক কর। ভাববার ভার তোমারই ওপর আমি দিচ্ছি।"

একথার উত্তরে হেমবালা কেবল কহিলেন, "সে আমার ভাবাই আছে। তুই একটু বুঝে চললেই উপায় হয়।"

ঐন্দ্রিলা বড় আশা করিয়াছিল, আজ অশ্রুর প্লাবনে মায়ের চিত্তের আড়াল ভাঙিয়া পড়িবে। তাহা পড়িল না। যতখানি অনুকূলতা লইয়া আজ সহসা মায়ের কাছে সে আসিয়া পড়িয়াছিল, ততখানিই প্রতিকূলতা লইয়া উঠিয়া গিয়া মুখহাত ধুইল। তারপর তাড়াতাড়ি কাপড় বদলাইয়া বাড়ীর গাড়ীর অভাবে একটা ঠিকা গাড়ী ডাকিয়া সেই প্রথম সুভদ্রদের ক্লাবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে বাহির হইল। হেমবালা আজ আর তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা পাইলেন না।

সুলতাদের বাড়ীর নীচে গাড়ীবারান্দায় সুভদ্র তাহার অভ্যর্থনা করিল। বীণা উপরে সুলতার সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপে ব্যস্ত ছিল, ঐন্দ্রিলাকে দেখিবা মাত্র হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "সুভদ্রবাবুর যেমন কপাল, এমন দিনে ক্লাবে লোক নেই!"

রমাপ্রসাদ কাছেই ছিল, কহিল, "আগে যাও বা দুচারজন আসত, চাঁদার তাগাদার ভয়ে তারাও এখন আর আসে না।"

বীণা কহিল, "শুনছেন সুভদ্রবাবু? ক্লাব জমাবার কিছুমাত্র আশা যদি মনে থাকে, আপনার এই সহ-কারীটিকে একটু সংযত করতে হবে। এমনিতেই ত আপনাদের জাতের ভয়ের শেষ নেই, তার ওপর উনি সুদ্ধ যদি ভয়াবহ হয়ে ওঠেন—"

রমাপ্রসাদ অভিযোগের সুরে কহিল, "আমার আর দোষ কি বলুন, আমার কর্ত্তব্য আমি করি।"

কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বীণা কহিল, "ভুল করেন। অনেকের অনেক কর্ত্তব্য ভুলে ক্লাবে এসে বসতে হয়, আপনি একলা কেবল কর্ত্তব্যপরায়ণ হলে চলবে কেন?"

সুভদ্র কহিল, "আমি বলি, কিছুদিন চাঁদার পাটটা উঠিয়ে দিয়েই দেখা যাক্ না?"

বীণা কহিল, "সে অতি উত্তম প্রস্তাব। আমি defaulterদের দলে নেই, তাই স্বচ্ছন্দ চিত্তে একথা বলতে পারছি। মেম্বারদের চাঁদা দেওয়ার তৎপরতা-বিষয়ে রমাপ্রসাদবাবুর যা অভিমত, তাতে ও জিনিষটাকে বাদ দিয়ে রাখলে তিনি নিজে এবং মেম্বাররা একসঙ্গেই ভারমুক্ত হয়ে বাঁচবেন।"

সুভদ্র আজ একটু চঞ্চল হইয়াছে। পারিলে বাহির হইয়া পথের লোক ডাকিয়া আনে। বন্ধুবান্ধব যাহাদের টেলিফোন আছে তাহাদের টেলিফোন করিয়া আসিতে ডাকিতেছে। বিমানদের ইস্কুলে খবর লইয়া জানিল, এইমাত্র একটি বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া সে সিনেমা দেখিতে গিয়াছে। প্রিয়গোপালের উপর সুলতার শাসন আজকাল অত্যন্ত কড়া। তেতলার বারান্দায় একটি সিগার মুখে করিয়া বসিয়া ভদ্রলোক পেসেন্স খেলিতেছিলেন, তাঁহাকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া ঐন্দ্রিলাদের মাঝখানে বসাইয়া দিল।

ঐন্দ্রিলা কহিল, "সুভদ্রবাবু নিজে এসে এখানে বসলেই ত আমরা আর-একটা মানুষকে দলে পাই, এই সহজ কথাটা ওঁর মাথায় কেন আসছে না?"

সুলতা কহিলেন, "সুভদ্রের ত সবই অসুবিধায়। নিজকে বাদ দিয়ে রেখেই ওর সমস্ত-কিছুর হিসেব। এঁকে ধরে আনতে পেরেছে, এইটুকু এর মধ্যে যা ভাল।"

মেয়ে দুচারজন যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা সুলতাদের প্রতিবেশী। খোঁজ লইয়া জানা গেল, গান কেহ গাহিতে জানে না। কি অবলম্বন করিয়া যে আজ

ক্লাব জমিবে সুভদ্র ভাবিয়া পাইল না। প্রিয়গোপাল তাঁহার স্বাভাবিক ক্লান্ত স্বরে কহিলেন, "সেই যে আপনার বন্ধুটি, কি তাঁর নাম, তিনি আজ আসেননি বুঝি? তিনি ত বেশ গাইতে পারেন।"

বীণা নীরবে একবার সুলতার মুখের দিকে চাহিল। সুলতা কহিলেন, "অজয়বাবুর আবার কি হয়েছে? তাঁকে ত অনেকদিন ক্লাবে দেখিনি?"

সুভদ্র হাসিয়া কহিল, "defaulterদের দলে সেও নেই, এইটুকুই মাত্র আমি জানি। হয়ত খানিক পরে এসেও পড়তে পারে।"

ঐন্দ্রিলা ভাবিতে লাগিল, অজয়কে দেখিতে পাইবার কিছুমাত্র আগ্রহ তাহার মনে নাই বটে, কিন্তু সে আসিয়া পড়িলে হয়ত বা তাহার ভালই লাগে। মায়ের সঙ্গে কলহ করিয়া মনটা এত ভার হইয়া আছে, অজয়ের সঙ্গে কথা বলিয়া হয়ত সে একটু হাল্‌কা বোধ করিতে পারে। কলহ সে ত মায়ের সঙ্গে করে নাই, তাহার কলহ সত্য-গোপনের সঙ্গে, মিথ্যাচারের সঙ্গে, আত্মপ্রবঞ্চনার সঙ্গে। অজয়ের সঙ্গে ঐ একটা জায়গায় তাহার আশ্চর্য্য রকম মেলে। অজয়ের সত্যকারের জীবনের চেহারাটা কি তাহা সে জানে না, জানিতে চাহেও না, কিন্তু যে-মিথ্যাকে নিজের জীবনে ঐন্দ্রিলা সহিতে পারিতেছে না, বাহিরে স্পর্দ্ধার সঙ্গে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে অজয়। অজয়ের কণ্ঠস্বরের তীব্রতা তাই ঐন্দ্রিলার মনকে একটি বিশেষ অন্তরতম স্থানে স্পর্শ করে।

কিন্তু অজয়ের রক্তের মধ্যে ভারতবর্ষের নির্লিপ্ততার সাধনা। ক্লাবে যাইবে কিম্বা যাইবে না, এই চিন্তা লইয়া তাহার সমস্ত বিকাল-বেলাটা কাটিয়াছে, সন্ধ্যাও কাটিতেছে।...এই নির্লিপ্ততার কারণও এবারে একটু ছিল। নন্দকে আজও পর্য্যন্ত সময় করিয়া সে দেখিতে যাইতে পারে নাই, কিন্তু বীণা-ঐন্দ্রিলার সঙ্গে ইতি-মধ্যে আরও কয়েকবার তাহার সাক্ষাৎ ঘটিয়া গিয়াছে। অবশ্য ইহা লইয়া অজয়ের মনে কোনও গ্লানি নাই। এই ক'দিন একবারও কোনও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া সে বালিগঞ্জে গিয়াছে, নিজের মনে তাহা সে স্বীকার করে না, করিলে নন্দের কাছে অপরাধী হইতে হয়!

বিমান মুখ টিপিয়া হাসে। মুখ ফুটিয়া কিছু বলে না কেন, অজয় তাহা হইলে বেশ দুকথা তাহাকে শোনাইতে পারে। সুভদ্র মন্দিরার চিকিৎসার ভার হাতে লইয়াছিল, অজয়কে জোর করিয়া রোজ সঙ্গে লইয়া যাইত। কোনও দিন গল্প জমিত, কোনও দিন বা ওষুধ-পত্র বুঝাইয়া দিয়াই ফিরিয়া আসিতে হইত, কিন্তু কোনও অবস্থাতেই অজয়ের মনে মোহের ছোঁয়াচ লাগিতে পায় নাই, অন্তত অজয় তাহাই জানে। সে নির্লোভ, তাহার ভালবাসাকে ঘিরিয়া তাহার তপস্যার দুর্ভেদ্য আবরণ।

কেবল চতুর্দ্দিক্‌কার নিঃস্বতা, হীনতা, মিথ্যাচার এবং ব্যাধিজীর্ণতা দেখিয়া দেখিয়া মনের পারা যখন শূন্যের ঘর ছাড়াইয়াও নীচে নামিতে থাকে, তখন প্রাণপণে নিজেকে ডাকিয়া বলিতে হয়, এই হতভাগ্য দেশ আর ঐ অনাবিষ্কৃত ঐন্দ্রিলা! ঐন্দ্রিলা আছে, এই দেশের মাটিতে গড়া জীবন্ত দেবী প্রতিমা, এই দেশেরই বহুযুগের পাপক্লিষ্ট বাতাসে আর-সকলের সঙ্গে সেও নিঃশ্বাস লইতেছে, অথচ হতভাগ্যরা সে-সংবাদ জানে না, জানিয়া উৎসব করে না।

উৎসবের প্রয়োজন অজয়েরও জীবনে একটু হয়ত ছিল, কিন্তু নিজের কাছেও সে-কথাটা শেষ পর্য্যন্ত সে চাপিয়া গেল। বিমানের ঠোঁট-চাপা হাসিকে তাহার ভারি ভয়!

মন্দিরা সুস্থ হইয়া উঠিল, ভালই হইল। সুভদ্র খুব খুসি। বলিল, "দেখলে, দিশি গাছ-গাছড়ার গুণ? আমাদের দেশের ওষুধগুলি আমাদের দেশের অন্তরের জিনিষ। একই মাটিতে আমাদের জন্ম, একই মাটি এবং জলবায়ু থেকে আমরা প্রাণ আহরণ করি। বিলিতি লেবেল্‌-মারা ওষুদের ভাষা আমাদের দেহের অণুপরমাণু বোঝে না। এদেশের চিকিৎসকদের গবেষণা-বুদ্ধিও এই কারণেই স্ফূর্ত্তি পায় না, বিলিতি মার্কা ওষুদের ভাষা তাদের সাধ্য কি যে ভালো ক'রে বুঝবে?..."

অজয় তর্ক করে না, সে ভাবে, মন্দিরার শিয়রের

কাছে বসিয়া এই ক'দিন যখনই সুযোগ পাইয়াছে নিমীলিত নেত্রে তাহার আরোগ্য-কামনা করিয়াছে। সুভদ্রের টোট্‌কা-গুলিই কি সব? একটি তপোনিষ্ঠ মানবাত্মার একাগ্র নীরব শুভকামনা মন্দিরাকে কোনও রূপে কি কিছুমাত্র সাহায্য করে নাই?

ইহার পর কয়েকটা দিন আবার নিজেকে লইয়া কাটিতেছে। মনের চতুর্দ্দিকে অন্ধকার রচনা করিয়া ততোধিক অন্ধতমসাচ্ছন্ন অতীতের ধ্যান করে। দুরন্ত প্রখর কল্পনাকে অধীত ইতিহাসের পল্‌কা সুতায় বাঁধিয়া দেয়, সেই রশ্মির শাসন অলক্ষ্যে কখন্ ছিঁড়িয়া খসিয়া পড়ে, কল্পনা উধাও হইয়া মায়া-মরীচিকা-ভরা অনির্দ্দেশ্যতার জগতে আনাগোনা করে, সত্যকারের পথ অনধ্যুষিত পড়িয়া থাকে।

এই অন্ধকারের ধ্যান লইয়া আরও কিছুদিন তাহার চলিতে পারিত, বিমান হঠাৎ একদিন সব ঘোলাইয়া দিল। কহিল, "কিছু মনে কোরো না অজয়, আজকাল কি খুব কবিতা লিখছ?"

অজয় কহিল, "মোটেই লিখছি না, কিন্তু হঠাৎ ওকথা কেন?"

বিমান কহিল, "এই, কিছুদিন থেকে ভাবের হাওয়া একটু জোর বইছে যেন। কলেজে যাবার নাম কর না, উস্ক-খুস্ক চুল, চোখের দৃষ্টিও কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আস্‌ছে। এত সাধের জীবন তোমার, শেষটা কবিতা লিখে না শেষ করতে হয়, বন্ধু-মানুষ, আগে থেকেই তাই সাবধান ক'রে দিচ্ছি।"

অজয় কহিল, "তা কবিতা জিনিষটা এমনই কি আর খারাপ? তুমিও ত ছবি আঁকো, তুমি আর কোন্ মুখে অন্যদের সাবধান কর্‌তে এসো?"

বিমান কহিল, "ভুক্তভোগী বলেই সাবধান কর্‌তে পারি, তা না হলেই কাজটা অনধিকারচর্চ্চা হ'ত। দেখছ ত আমার গতিক।...তা ছবি আঁকা ত ভালো, ছবির ভাষা সব দেশের মানুষেই বোঝে, কিন্তু বাঙালী জাত কবিতা লেখেই কেবল, পড়ে না, আর বিদেশীরা তোমাদের ভাষা বোঝে না, সুতরাং সময় থাক্‌তে সাবধান হও, কলেজে গতিবিধি সুরু কর, ভালো ক'রে পাস ক'রে বেরুতে পার্‌লে আর-না-হোক ত্রিশ টাকা মাইনের মাষ্টারীও কোথাও একটা জুটে যাবে।"

অজয় কহিল, "চিরটা কাল কি টাকার মূল্যেই সব-কিছুর বিচার কর্‌বে?"

বিমান কহিল, "মিথ্যে আমার ওপর রাগ কর্‌ছ, টাকার মূল্য কোনো জিনিষের জন্যে না দিতে হলে আমিই সবচেয়ে বেশী বেঁচে যাই। এই দেখো না, একটা ছবিও যে এবার শেষ পর্য্যন্ত বিক্রি হবে তার সম্ভাবনা আর দেখা যাচ্ছে না।...কিন্তু তুমিই এমন একটা জিনিষের নাম কর, টাকার মূল্য কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে না দিয়ে এই হতভাগা দেশে যা পাওয়া যায়।...তুমি কি বলবে বুঝতে পারছি, কিন্তু সময় থাকতে তোমাকে ব'লে দিচ্ছি, সে-গুড়ে বালি। যে-তল্লাটে যাওয়া-আসা কর্‌ছ, গাড়ীর তেলের খরচ জুগিয়ে উঠতে পারবে না। ভাবছ, দুচারটে লাগসই রকম কবিতা লিখে লুকিয়ে শ্রীহস্তে গুঁজে দিলেই কাজ উদ্ধার হবে, মোটেই তা হবে না। সে-সব romantic soulদের যুগ আমরা পার হয়ে এসেছি, অন্ততঃ এযুগের রোমান্স মোটরকারেই জমে ভালো।...কথায় কথায় মনে প'ড়ে গেল, তোমার কাছে পাঁচটা টাকা হবে অজয়? আসচে মাসে দিয়ে দেব।"

ইদানীং মনে মনে অজয় গান্ধী এবং টলষ্টয়ের শিষ্য হইতেছিল। ভাবিতে চেষ্টা করিতেছিল, অভাব-বোধটাই সত্যকারের দারিদ্র্য, সম্পদ আছে কি নাই, থাকিলে কতটুকু আছে, তাহা দিয়া দারিদ্র্যের বিচার হয় না। কিন্তু হায় রে, নিজেকে লইয়া সে যাহা-খুসি করিতে পারে, করিবার অধিকার তাহার আছে, কিন্তু অপরকে সে বঞ্চিত করিতে চাহে কোন্ অধিকারে? না, তাহার অন্ধকারের ধ্যান তাহার থাকুক, সে-তপস্যা তাহার একলার। কিন্তু তাহার যে-জীবনে সে ঐন্দ্রিলাকে চায় সেখানে কোনও একদিক্‌কার চরিতার্থতা লইয়া অজয় খুসি হইবে না, সেখানে অসীম তাহার তৃষ্ণা। সেখানে দেহে সে চায় অপরিমিত স্বাস্থ্য, চায় সবল মাংসপেশী, মনে চায় অপরাজেয় পৌরুষ। বুদ্ধির দর্পে জীবনের জটিলতম সমস্যাগুলির সম্মুখীন হইয়া সে জয়ী হইতে চায়।

সেখানে জীবনযাত্রায় সে চায় প্রচুর অর্থ, চায় প্রতিষ্ঠা। সে-যাত্রার অবসানে সে চায় বহুযুগব্যাপী কীর্ত্তির অমরতা। জীবন ভরিয়া সে জীবনাতীতকে চায়, চায় অমৃতের আস্বাদ, অসীমতার স্পর্শ।

অতৃপ্তি আবার বিশ্বজোড়া হইয়া উঠে, ধ্যান-ধারণা পড়িয়া থাকে, আয়োজন-মাত্রকেই মনে হয় পণ্ডশ্রম। নিজের নিঃস্বতা লইয়া ঐন্দ্রিলার মুখ মনে করিতেও সে লজ্জা পায়।

এমনই সময় বীণার একটুকরা চিঠি পাইল। সে লিখিয়াছে,. 'আপনাকে এই ক'দিন একবারও দেখতে পাইনি কেন? ক্লাবেও ত আর আসেন না। আজ সন্ধ্যার পর ক্লাবে একবারটি আমার সঙ্গে দেখা করবেন। দেরি হলে এসে-যাবে না, আমি অপেক্ষা করব।'

চিঠিটিকে বাক্সে তালাবন্ধ করিয়া রাখিয়া অজয় স্থির করিল, এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবে না। কিন্তু ইহার পর যেখানেই গেল, যাহাই করিল, তাহার মন এক মুহূর্ত্তের জন্ম তালাবন্ধ বাক্সের মধ্যে সেই ছোট নীল কাগজের টুকরাটিকে ভুলিতে পারিল না। নিজের অজ্ঞাতে তাহার মনের মধ্যে বীণার চিঠিটির প্রতিটি ছত্র, প্রতিটি কথা, তাহার নারীহস্তের প্রত্যেকটি ছাঁদ একটি অপরূপ সঙ্গীতের সুরে বাজিতে লাগিল। চিঠিটি তালাবন্ধ রহিল বটে, কিন্তু মনে মনে চিঠির কথাগুলিকে কতবার সে যে আবৃত্তি করিল তাহার ঠিক নাই। যে-কথা প্রকাশ পাইয়াছে তাহার অন্তরালে আরও কত কথা যেন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সেগুলিকে আবিষ্কার করিবার চেষ্টা নানাভাবে বহুবার সে করিল। কিন্তু একবারও ভুলিতে পারিল না, চিঠির কথাগুলিতে লুকানো অর্থ কিছু থাকুক-আর-নাই-থাকুক চিঠিটিতে একটি সুন্দরী তরুণীর চম্পকাঙ্গুলির স্পর্শ লাগিয়াছে, কাগজের টুকরাটিকে নখে ভাঁজ করিয়া সে ছিঁড়িয়াছে, হয়ত চিঠির কাগজের প্যাড কাপড়ের দেরাজে তোলা থাকে, বন্ধ কাপড়ের দেরাজের বহুদিন সঞ্চিত অস্ফুট সৌরভ চিঠিটির সারা দেহ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে।

চিঠিটি ঘেরিয়া যে মোহ তাহা সম্পূর্ণই বীণার রচনা, কিন্তু অজয় চিনিয়াও প্রথমটা চিনিতে পারে না। কয়দিন ধরিয়াই এইরূপ হইতেছে। হাসিতে, সৌন্দর্য্যে, সৌরভে, সঙ্গীতে, দেহমনের অকুতোভয় প্রগলভতায় বিচিত্র রসলোকের সৃষ্টি করিতেছে বীণা, তাহার মধ্যে বারম্বার অজয় অলক্ষ্যে ঐন্দ্রিলাকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতেছে। লুব্ধচিত্তে চিঠিটিকে বাহির করিয়া তাহার সৌরভে বুক ভরিয়া নিঃশ্বাস লইতে গিয়া কখন সেটাতে নিজেরই অজ্ঞাতে সে অতি মৃদু অধরস্পর্শ করিয়াছিল, করিয়াই ভয়ে তাহার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। এ কি করিতেছে সে? বীণা ঐন্দ্রিলার আত্মীয়া, শুধু এই কারণেই কি তাহার মনে আজ বীণা সম্বন্ধে এই মুগ্ধতা জাগিতেছে? তাহার চিত্তবৃত্তিতে এ কোন্ দুর্ব্বোধ্য অব্যবস্থিততা দিয়া বিধাতা তাহাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন? এই বহুধা-খণ্ডিত, দুর্ব্বল মন লইয়া পৃথিবীতে সে কি করিবে, নিজের বা অপরের কোন্ কাজে সে লাগিবে? নিজেকে অত্যন্ত মমতাহীন তিরস্কারে সে জর্জ্জরিত করিল। তাহার উন্মুখ-কল্পনায় যে-একটি অনির্দ্দেশ্য সৌন্দর্য্যলোক একটুকরা নীল কাগজের তুচ্ছ কয়েকটি ছত্রকে আশ্রয় করিয়া এতক্ষণ মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিতেছিল, তাহার দ্বার হইতে মুগ্ধমনকে কঠোর কশাঘাতে সে ফিরাইয়া আনিল, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে নিজেকে আর-কিছু সে দিতে পারিল না। দেখিল, পূজার বেদী অশ্রু-ধৌত হইয়া আছে, মণিরত্নে জলজল্ করিতেছে, কিন্তু মনকে একবার কঠোর করিয়া তুলিয়া ঐন্দ্রিলাকেও সেখানে আজ আর সে বসাইতে পারিল না। যে-মন দিয়া ঐন্দ্রিলাকে সে ভালবাসে, যেন সেই মন দিয়াই বীণাকেও অত্যন্ত গভীর করিয়া তাহার ভাল লাগে। এই দুটি মনোভাব যেন একই জিনিষের এপিঠ আর ওপিঠ, একটিকে ভাঙিয়া ফেলিয়া আর একটিকে অটুট রাখিবার উপায় নাই। তখন নিরুপায়তার দুঃখে দুই চক্ষু অশ্রুভরাক্রান্ত করিয়া সেই শূন্য বেদীরই উপর তাহার মস্তক বারম্বার সে লুণ্ঠিত করিতে লাগিল।

• কিন্তু সন্ধ্যা যত নিকটতর হইতে লাগিল, বেদনার বোঝা, জীবনব্যাপী শূন্যতার ভার ক্রমে তাহার দুর্ব্বহ বোধ হইতে লাগিল। সুভদ্র যখন ডাকিয়া গেল,

সে তাহার সঙ্গে গেল না। কিন্তু সন্ধ্যার পর একাকী অন্ধকার ঘরে বসিয়া থাকা অসাধ্য হইল, তখন আলো নিবাইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল।

মনের গায়ে বৈরাগ্যের ছদ্মবেশ। নিজেকে থাকিয়া থাকিয়া সম্পূর্ণ ভাবে হারাইয়া ফেলিত, পুনরায় আকুলি-বিকুলি করিয়া ফিরিয়া পাইত। কিছুদিন ধরিয়া বৈরাগ্য অভ্যাস চলিতেছে, ফলে নিজেকে একটু একটু করিয়া হারাইয়া এমন এক অবস্থায় পৌঁছিয়াছে যখন নিজেকে ফিরিয়া পাইবার প্রয়োজনও সে আর অনুভব করে না, যখন সব-কিছুই তাহার মধ্যে থাকিয়া অন্য কেহ তাহাকে দিয়া করাইয়া লয়। আজও অজয়ের হইয়া যেন আর কেহ তাহাকে ভবানীপুরের পথ ধরাইয়া দিল।

সমস্ত পথ হাঁটিয়া চলিল। পাথেয়ের অভাব সত্যই সেদিন তাহার ছিল, তাহা ছাড়া চিন্তাকুল মন লইয়া সর্ব্বদাই সে হাঁটিতে ভালবাসিত, একাগ্র-মনে চিন্তা করিবার তাহাতে সুবিধা হইত। পথ চলিতে চলিতে অজয়ের হইয়া আর একজন কেহ ভাবিল, ভাবিয়া স্থির করিল, বীণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, তাহাকে অসঙ্কোচে সমস্ত কথা বলিয়া, চিরদিনের মত জীবনের এই গভীর অনন্যবেদনাময় অপরূপ অধ্যায়টিকে শেষ করিয়া দিবে। বীণাকে সে ভালবাসে না, তবু তাহাকেই আশ্রয় করিয়া ঐন্দ্রিলার সমীপবর্ত্তী হইবার নিষ্ঠুর সুযোগ সে গ্রহণ করিয়াছিল, সেই অপরাধের যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত সময় থাকিতে সে করিবে। বীণার নিকট হইতে বিদায় লওয়ার অর্থ সে জানে, চিরকালেরই মত ঐন্দ্রিলাকেও তাহা হইলে সে হারাইবে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, কিন্তু সে ভয় করিবে না।

কি ইহার পর অবশিষ্ট থাকিবে? কিছু না। তা নাই থাকুক। বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের যুবকের সত্যই প্রেম করিবার অধিকার নাই, ত্যাগী হইয়া অনন্যমনা হইয়া শুধু কর্ম্মের অধিকার তাহার আছে। কিন্তু কর্ম্মের অধিকারই কি তাহার আছে? কি তাহার কাজ, কোথায় কোন্ শক্তিপরীক্ষার ক্ষেত্রে ইচ্ছা থাকিলেই সে প্রবেশ করিতে পারে? শুধু চিন্তা, শুধু দুর্ভাবনা, শুধু ব্যর্থতার লজ্জা, শুধু নৈরাশ্যের গ্লানি? হয়ত তাই, অন্তত আলো কোনওদিন যদি জাগে, এই অন্ধকারের বুকের মধ্যকার সুপ্ত বহ্নি হইতেই জাগিবে, এই ব্যর্থতার অরণ্যের বুকের মধ্যে দিয়াই চরিতার্থতার পথ কাটা হইবে। বাধা যাহা আছে তাহা পর্ব্বত-প্রমাণ হইতে পারে, অন্ধকার দুর্ভেদ্য, পথ সংশয়-সমাকুল হইতে পারে, দেবতার অভিপ্রায় জীবনে কোথাও না প্রত্যক্ষ হইতে পারে, অবকাশহীন দুঃখের রাত্রিতে তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিতে পারে, তবু হাল ছাড়িলে চলিবে না, তবু পথ চলিতে হইবে। পথের পাশে শুইয়া, ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিলে, অথবা কপালে করাঘাত করিয়া রোদন করিলে সময় কাটিবে, পথ একটুও কাটিবে না। অপ্রতিহত গতিতে পথ চলিয়া পথকে অতিক্রম করিতে হইবে।

এ পথের সাথী কেহ নাই, নাই-বা রহিল কেহ সাথী। একটি মানুষের একাগ্র তপস্যার শক্তিতে বিশ্বদেবতার আসন টলিয়া উঠিতে পারে বলিয়া যে-দেশের মানুষ বিশ্বাস করিত, আজ সে-দেশের কোটী কোটী নিরন্ন, বস্ত্রহীন, রোগশোকজীর্ণ, অত্যাচার-প্রপীড়িত মানুষেরও মনে এ কি নিদারুণ নৈরাশ্য, এ কি নিশ্চেষ্টতা তাহাদের জীবনে? এই দেশব্যাপী, বহুযুগব্যাপী তমঃ ইহাকে বিদূরিত করিবার কোনও উপায় তাহারা কল্পনা করিতে পারে না। কল্পনা করিতে পারে না, দেশের ঐশ্বর্য্য-শালীতার দিনে, গতিশীলতার দিনে যে-তপস্যা গিরি-অরণ্য-লোকালয় ব্যাপৃত করিয়া জাগিয়া থাকিত, আজ এই দুঃখের দিনে, মুমূর্ষুতার দিনে একান্তে একটি মানুষের নিভৃত জীবনে তাহা জাগিতেছে। সেই একটি মানুষের একাগ্র উগ্র তপশ্চর্য্যায় দেবতার আসন টলিতেছে, অঘটন-ঘটনা সম্ভব হইতেছে।

স্থির করিল, মমতাহীন ত্যাগের দ্বারা নিজের জীবনের সমস্ত সঞ্চয়কে জ্বালাইয়া সে এই তপস্যার বহ্নিকে প্রজ্বলিত করিবে। সুখ তাহার জন্য নহে, প্রেম তাহার জন্য নহে। সে বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে-ভারতবর্ষের কোটী কোটী নরনারী অহোরাত্র মৃত্যুকে জীবনধারণ অপেক্ষা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করে। সে সর্ব্বত্যাগী, সে তপস্বী। ভাবিল

না, কোন্ পথ্য ধরিয়া তাহার তপস্যা অগ্রসর হইবে, সেই তপস্যার বহ্নিতে কোন্ দেবতার উদ্দেশে সে হবিঃ প্রদান করিবে, কোন্ মন্ত্রবলে সেই অ-দৃষ্ট দেবতাতে সে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবে। কেবল অনুভব করিল, সুদুস্তর কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন আছে, এবং ভাবাবেগে তাহার দুই-চক্ষু বারম্বার অশ্রুসিক্ত হইতে লাগিল।

ত্যাগমন্ত্রের দুর্ভেদ্য বর্মে নিজেকে আবৃত করিয়া সে যখন সুলতাদের বাড়ী আসিয়া পৌছিল, তখন বুকের মধ্যে হৃদয়ের অস্তিত্বকে সে আর অনুভব করিতেছে না। সে নিষ্কাম, সে নির্লোভ, নিবাত দীপশিখার মত উর্দ্ধগতিতে সে অটল, কোনও নারীর সান্নিধ্য তাহাকে বিচলিত করে না, তাহার অন্তরের দীপ্তিকে মেঘজালে আবৃত করিতে পারে না, নিজের কাছে ইহাই সে আজ প্রমাণ করিবে। কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া দৃঢ়পদে সে উপরে গিয়া উঠিল।

কিন্তু বীণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেই সে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, ঐন্দ্রিলাকে হঠাৎ আজ ক্লাবে দেখিতে পাইবে ইহা ছিল তাহার কল্পনারও অগোচর। মুহূর্ত্তে তাহার চিত্তের সমস্ত দৃঢ়তা কণা কণা হইয়া ভাঙিয়া পড়িল, যেন ঐন্দ্রিলাকে হারাইতে হারাইতে ফিরিয়া পাইয়াছে এমনই ভাবে সমস্ত মন হাহাকার করিয়া বলিয়া উঠিল, না গো না, আমি মিথ্যা বলিয়াছি, নিজেকে প্রবঞ্চনা করিয়া ভুলাইয়াছি, তোমাকে নহিলে আমার চলিবে না। তপস্যা করিয়া, সংগ্রাম করিয়া জয়ী হওয়া আমার নিরর্থক, যদি পুরোভাগে জয়লক্ষ্মীরূপে তুমি না নির্মাল্য হস্তে অপেক্ষা করিয়া থাকো। দুঃখের সাধনা ত আমার আছেই, হয়ত বহুযুগ ধরিয়া থাকিবে, বারে বারে এই দেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করিয়া, প্রাণপাত করিয়া সে-সাধনা সমাপ্ত করিব। কিন্তু নিরবধি-কাল ব্যাপিয়া আর কোথাও আর কখনও ঠিক এই মূর্ত্তিতে তোমাকে ত আর আমি পাইব না। অসীমতাতে তুমি যে পরিপূর্ণরূপেই সীমাবদ্ধ, তুমি যে সুসীম, সেই ত তোমার সুষমা, তোমার মায়া। তুমি যে একান্তভাবেই তুমি, আমার চিরকালের জীবনে তোমার স্থান আর-কিছু দিয়া পূর্ণ হওয়া অসম্ভব।

বীণা আজ ইচ্ছা করিয়াই অনেকক্ষণ অজয়কে লক্ষ্য করিল না। সে অনুস্থান করা মাত্র অজয় ছুটিয়া আসিয়াছে, এই আনন্দকে সে কি অজয়ের নিকট হইতে লুকাইতে চায়, না চিঠিতে গোপন অন্তরের ব্যাকুলতা অসতর্কে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া সে লজ্জিত হইয়াছে? সুলতা যথারীতি অজয়ের অভ্যর্থনা করিলেন, তাঁহারই সঙ্গে গল্প জমিয়া উঠিল। সুভদ্রের অদৃষ্ট সত্যই খুব খারাপ নয়, সন্ধ্যার পর হইতেই একটি-দুইটি করিয়া অনেকগুলি মানুষের সমাগম হইয়াছে। চিরাচরিত প্রথামতে অভ্যাগতরা যদিও স্ত্রী ও পুরুষ দুইদলে বিভক্ত হইয়া বসিয়াছে, তথাপি গল্পগুজবে, গীতবাদ্যে, হাসি-পরিহাসে সমষ্টি-চৈতন্যের উদ্দীপনা প্রকাশ পাইতেছে।

এক সুভদ্র বারেবারেই অন্তরালে পড়িয়া যায়। সমস্ত ব্যবস্থা করে সে, সকলের দিকে দৃষ্টি রাখে সে, নিজে সে কাহারও দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে না। একমাত্র ঐন্দ্রিলা ইহা লক্ষ্য করিয়া ব্যথিত হয়। সমস্ত আয়োজন করে সুভদ্র, অর্থব্যয় করে সে, সুবিধা লয় অন্যেরা এবং তাহাকে পরিপূর্ণ করিয়া ভুলিয়া যায়। ঐন্দ্রিলার ন্যায়নিষ্ঠায় ইহা বাধে, সকলের দৃষ্টির অগোচরে সে সুভদ্রের কাছে ঘেঁসিয়া যায়। অজয় ইহা লক্ষ্য করে মাত্রই, সুভদ্র তাহার বন্ধু, সুভদ্রকে তাহার স্বাভাবিক মনে সে ভালবাসে, নির্লিপ্ত মনে সে অবজ্ঞা করে, কোনও অবস্থাতেই তাহাকে সে ভয় করে না।

কিন্তু আরও একটি কে যুবক, সুভদ্র তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে উঠিয়া আসিয়াছে, তাহাকে লইয়া ঐন্দ্রিলার সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিতেছে। দুজনে গল্প জমিয়া উঠিয়াছে। ছেলেটি সুপুরুষ, বাঙালীর পক্ষে আশ্চর্য্য ফরসা, ইউরোপীয় পোষাকে তাহাকে এমন চমৎকার মানাইয়াছে। কথার মাঝে মাঝে সামনের দিকে ঝুঁকিয়া নত হইয়া হাসিয়া সে কথা বলিতেছে। ঐন্দ্রিলাও খুব হাসিতেছে। ঐন্দ্রিলা হাসিতেছে, তাহার সেই হাসি অকারণেই অজয়কে কেন জানি বিদ্রূপের কশাঘাত করিল। পাশ হইতে রমাপ্রসাদ বলিল, "নির্ম্মল সান্যাল, এফ. আর. সি. এস. ডাক্তার। তিন বছর ফিরেছে, এরই মধ্যে টাকার

কুমীর।" মনে মনে তাহার সঙ্গে অজয় নিজের তুলনা করিয়া বেদনা পাইতে লাগিল।

সচকিত হইয়া নির্লিপ্ততার গেরুয়া পরিচ্ছদটাকে মনের চতুর্দ্দিকে টানিয়া দিতেছে এমন সময় বীণা উঠিয়া তাহারই পাশ দিয়া গাড়ী-বারান্দার ছাতে চলিয়া গেল। সেখানে তাহার অস্থির পাদচারণা অজয় লক্ষ্য করিল না, সুলতা লক্ষ্য করিলেন, কহিলেন, "আমি এবার উঠি। বীণা আছে ঐখানে, গাড়ী-বারান্দার ছাতে। যান্ না, একটু গল্প ক'রে আসুন। substitute দিয়ে যাচ্ছি, অপরাধ না নিতে পারেন সেইজন্যে।"

ছাতে বীণা কহিল, "যাক্, আপনার ক্রমে উন্নতি হচ্ছে দেখে আশান্বিত হচ্ছি।"

অজয় কহিল, "উন্নতি কিসে দেখলেন?"

বীণা হাসিয়া কহিল, "চেঁচিয়ে না ডাকা সত্ত্বেও বুঝতে পেরে নিজে থেকেই উঠে এসেছেন।"

অজয় সে হাসিতে যোগ দিল না, তপস্বীর উপযুক্ত গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া রহিল। বলিল, "বিকেলেই আপনার চিঠি পেলাম, কেন ডেকেছেন?"

বীণা বলিল, "অমনি।"

অজয় একটু কাষ্ঠহাসির অভিনয় করিল, কিন্তু তাহার মনের মধ্যে যে-একটি অব্যক্ত আনন্দের কম্পন মর্ম্মর শব্দে বাজিয়া উঠিল, বহু চেষ্টাতেও তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিল না। আরও একটু সতর্ক হইয়া কহিল, "আমি ভাবলাম, খুব বড় রকম কিছু কাজ হবে।"

বীণা বলিল, "হঠাৎ খুব ত কাজের লোক হয়েছেন আপনি? বিনা কাজে মানুষের সঙ্গে দেখা করা যায় না, না? কি হয়েছে আপনার, আসেননি কেন এতদিন?"

অজয় বলিল, "ব্যস্ত ছিলাম একটু।"

বীণা বলিল, "কলেজেও ত আর যান্ না শুন্‌লাম।"

অজয় বলিল, "হ্যাঁ, ব্যস্ততাটা বেশীর ভাগ সেই সম্পর্কেই।"

বীণা বলিল, "বিকেলেও কি আপনার কাজ থাকে? এত কাজ কিন্তু কারুরই থাকা উচিত নয়। আসল কথা আমাদের বাড়ী অনাহূত যে আপনার বাধে। তা ক্লাবে ত আস্‌তে পারেন?"

বীণাদের বাড়ী যে আর-কোনও বাড়ী হইতে অজয়ের মনের দৃষ্টিতে আলাদা, অজয় আজ ইহা স্বীকার করিবে না। কহিল, "আপনাদের বাড়ী অনাহূত যেতে আমার বাধে, কেন আপনার তা মনে হ'ল। আপনারা না-ডাকা সত্ত্বেও ত কতবার গিয়েছি।"

বীণা বলিল, "আপনি বলতে চান, আপনার বাধে না?"

অজয় কিছুমাত্র চিন্তা করিয়াই বলিল, "নিশ্চয়ই না।"

বীণা তাড়াতাড়ি কহিল, "ব্যস্, চলুন তাহ'লে। গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে।"

অজয় গম্ভীর মুখেই কহিল, "সে কি! যা-কিছু অবাধে করতে পারি তার সমস্তই এই মুহূর্ত্তে ক'রে ফেল্‌তে হবে?"

বীণা বুঝিতে পারিল, অজয় যে-কারণেই হউক আজ কঠিন হইয়াই আসিয়াছে। কিন্তু তাহার এত আগ্রহভরা নিমন্ত্রণকে অজয় যে এত তাচ্ছিল্যভরে উপেক্ষা করিবে, ইহার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। বেদনায় তাহার সুন্দর হাস্যদীপ্ত মুখখানি কালো হইয়া গেল। মেয়েটিকে ফেলিয়া আসিয়াছে, একবার ভাবিল, নমস্কার করিয়া প্রস্থান করে। কিন্তু শেষ অবধি হৃদয় তাহাতে সম্মত হইল না। আজ কতদিন পরে দেখা হইয়াছে, আরও কতদিন হয়ত দেখা হইবে না, এই উপবাসী চিত্ত লইয়া কেমন করিয়া তাহার দিন কাটিবে? আধ অন্ধকারে ছলছল চোখে অজয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, কই, একটুও মনে হইল না ত যে সে-মুখে হৃদয়হীনতার কোনও চিহ্ন আছে। ভাবিল, হয়ত অজয়ের জীবনে এমন কোনও বেদনা আছে যে যাহার আভাস মাত্র এতদিন পায় নাই। অজয়ের এই বেদনা কোথায়, তাহাকে তাহা জানিতে হইবে, প্রীতির প্রলেপে সেই ক্ষতকে নিরাময় করিতে হইবে। অভিমান করিয়া বেদনা দিবার এবং বেদনা পাইবার সময় এ ত নয়।

অজয়ের উদাস দৃষ্টির আরও নীচে ঘেঁসিয়া আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "কেন যেতে চাচ্ছেন না ?"

নিষ্ঠুরতা অজয়ের স্বভাবসিদ্ধ নহে, তাহার মন ভিজিয়া আসিতেছিল, কহিল "আজ থাক্, আর-একদিন যাব।"

"কবে যাবেন ?"

"হাতের কাজগুলো চুকে যাক্, দু-তিন দিন পরেই গিয়ে হাজির হব।"

বীণার মনে হইল, কতকাল যেন তাহাকে পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। একটুও সান্ত্বনা বোধ করিল না। অগত্যা কহিল, "আচ্ছা চলুন, আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি। বাড়ীই ত যাবেন এখন ?"

অজয়ের তখনই বাড়ী ফিরিবার কোনও তাড়া ছিল না, কিন্তু বীণাকে বারম্বার দুঃখ দিতে তাহার ইচ্ছা করিল না। বলিল, "আপনার অসুবিধা হবে না ত ?"

দরজার কাছে ঐন্দ্রিলাকে অজয় শুষ্ক একটি নমস্কার করিল। ঐন্দ্রিলাও নীরবেই প্রতিনমস্কার করিল। বীণা কহিল, "ইলু, তুই বোস, আমি বাড়ী গিয়েই গাড়ী পাঠিয়ে দেব, যখন খুসি তারপর যাস। মেয়েটা এতক্ষণ কি করছে কে জানে, আমাকে একটু তাড়াতাড়িই পালাতে হচ্ছে আজ।"

ঐন্দ্রিলার চোখের গভীর দৃষ্টি অজয়কে কি কথা বলিতে চাহিল কে জানে ? অজয় আজ তাহা জানিবার চেষ্টা মাত্র করিল না। নিজের মধ্যে এত জোর ত তাহার লুকানো ছিল দেখিয়া সে অবাক্ হইয়া গেল।

গাড়ী হাজরা রোড অতিক্রম করিতেই বীণা কহিল, "রাত ত কিছুই হয়নি, একটু নদীর ধার দিয়ে ঘুরে যাবেন ? মেয়েটার অসুখ হয়ে অবধি দিনরাত ঘরে বন্ধ হয়ে থেকে থেকে হাঁপ ধ'রে গেছে।"

অজয় কি যে বলিল, বোঝা গেল না। ড্রাইভারকে গাড়ী ফিরাইতে হুকুম দিয়া বীণা কোলের উপরকার কোটটি খুলিয়া লইয়া গায়ে জড়াইল।

নদীর ধার হইয়া আউট্রাম ঘাটের কাছাকাছি গাড়ী পৌঁছিলে বীণা কহিল, "ড্রাইভারকে এখানে একটু থামতে বলুন না।" গাড়ী থামিলে বিনা-বাক্যব্যয়ে সে পাশের মাঠে নামিয়া পড়িল। কহিল, "শীতে হাত-পা জ'মে যাবার জোগাড়। চলুন, মাঠটুকু হেঁটে পার হয়ে যাই, আড়ষ্ট ভাবটা একটু কাটুক। ভালো লাগবে না আপনার হাঁটতে ?"

অজয় কহিল, "তা বেশ ত, হেঁটেই চলুন।"

নিজের গাড়ীতে করিয়া যে পৌঁছিয়া দিতে আসিয়াছে, সে-ই যদি খানিকটা পথ হাঁটাইয়া লইয়া যাইবার প্রস্তাব করে, তাহাকে মুখ ফুটিয়া 'না' বলা অজয়ের পক্ষেও সহজ হয় না।

ড্রাইভারকে বলা হইল, সে গাড়ী লইয়া মাঠের ওপারে চৌরঙ্গীর কোণে অপেক্ষা করিবে। সেই অবধি হাঁটিয়া গিয়া তাহারা গাড়ী ধরিবে।

মাঠের পথ প্রায় অন্ধকার। সারি সারি আলোর মালা সেই অন্ধকারের চারিপাশ ঘিরিয়া প্রহরায় দাঁড়াইয়াছে, যেন সতর্ক হইয়া ইহাকে রক্ষা করিতেছে, বিলুপ্ত করিতেছে না। চতুষ্পার্শ্বের দূরাগত-কোলাহলগুঞ্জনের মাঝখানে স্তব্ধতার হ্রদ নিস্তরঙ্গ, চারিদিকে বাধা পাইয়া এই স্তব্ধতা যেন জমাট বাঁধিয়াছে, স্রোতের মত নিঃশব্দ সঞ্চারে বহিতেছে না। মাঝে মাঝে দুই-চারিটি, পথিকের আনাগোনা, মোটরের আলোর ছুটাছুটি বিচিত্র ছন্দের হর্ণের শব্দ মধুর বিক্ষিপ্ততা আনিয়া দিতেছে।

অজয় এবং বীণা নিঃশব্দে চলিয়াছে। অজয়ের মধ্যে অজয় আজ কোথায় যে সে কথা বলিবে ? যে গেরুয়া পরিহিত মানুষটা আজ বীণার সঙ্গে পথ অতিবাহিত করিতেছে অজয় তাহার পরিচয় ভাল করিয়া এখনও পায় নাই, নিজের মনের লুকান সমস্ত কথা তাহাকে সেইজন্যই সে এখনও বলে নাই। বীণা ভাবিতেছে, কথা দিয়াই কি সব কথা বলা যায় ? আর যত প্রকার করিয়া বলা চলে সব ত প্রায় নিঃশেষ করিলাম। এই মানুষটির আশা কি অপরিসীম, না উহার বুদ্ধিশুদ্ধি বলিয়া কিছু নাই ?

বীণা যতদূর জানে এটা লীপ-ইয়ারও নয়, তবু একবার

শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবে মনে করিয়া বলিল, "সত্যি যদি এমন হয়, এই পথটুকু আর না ফুরোয় ?"

অজয় কহিল, "সেটা অবিশ্যি একটা দুর্ঘটনা হবে।"

বীণা তবু আশা ছাড়িল না, কহিল, "সবদিক্ দিয়েই কি দুর্ঘটনা, সব জিনিষেরই ত ভালোমন্দ দুটো দিক্ থাকে।"

অজয় কহিল, "তা থাকে বটে, আচ্ছা, দাঁড়ান ভেবে দেখছি।"

বীণা কহিল, "থাক্, এতটা কষ্ট আর আপনাকে করতে হবে না। পথটা শেষ হবে এবং একটু পরেই শেষ হবে, আপনার ভয় নেই। সম্প্রতি একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, জবাব দেবেন ?"

অজয় কহিল, "কি কথা ?"

বীণার কোটের আস্তিন অজয়ের শালের প্রান্ত ছুঁইয়া গেল, কহিল, "নিজেকে নিয়ে আপনার খুব একলা থাকতে ভালো লাগে, না ?"

অজয় কহিল, "চিরকাল একলা থাকাটাই অভ্যেস করেছি।"

বীণা কহিল, "তাতে ত আসে যায় না কিছু, চিরকালের সমস্ত অভ্যাসই মানুষ কোনো-না-কোনোদিন বদলায়।"

অজয় কহিল, "আশা করা যাক্, সময় যখন হবে, আমিও বদলাব।"

অত্যন্ত মৃদুস্বরে বীণা কহিল, "কিন্তু সময়টা কখন্ হবে, সেই কথাটাই ত জানতে চাচ্ছি। আপনি না-হয় আশা করেই খুসি থাকতে পারেন, তাগিদটা আমার দিকে তার চেয়ে যদি একটু বেশীই হয়।"

অজয় এ কথার কোনও জবাব দিল না।

বীণা সহসা কহিল, "সত্যি, আপনারা এ যুগের ছেলেরা যে কি হয়ে যাচ্ছেন, নিজেরাই তা ভেবে দেখছেন না। পৃথিবীতে কোনও-কিছুর সঙ্গে কি আপনাদের কোনো সম্পর্ক থাকতে নেই ? বাড়ীঘরের সংস্পর্শ এড়িয়ে বেড়ায় বলে দু-বন্ধুতে মিলে বিমানবাবুকে তর্কে সেদিন ত খুব নাজেহাল করলেন, কিন্তু ভাব দেখে ত মনে হয় না, বাড়ীঘর বলতে আপনাদেরও কিছু আছে। আপনার ত বাড়ী একটা আছে শুনেছি, কে আছেন সেখানে ?"

"আমার বাবা আছেন।"

"তাঁর কথা ভাবেন একবারও ?"

অজয় এবারেও জবাব দিল না।

"পৃথিবীর কোনো মানুষের কথাই কি ভাবেন একবারও ?...সুভদ্রবাবু, বিমানবাবু ত আপনার বন্ধু, কি অর্থে তাঁরা আপনার বন্ধু ? কেউ কারুর ভালোমন্দেও নেই আপনারা।"

এ কথার পর একটুক্ষণ চুপ করিয়া কাটিলে অজয় কহিল, "কিন্তু এসব কথা আপনি ভাবলেনই বা কখন, আর আজ এ সময়ে হঠাৎ আমাকেই বা কেন বলছেন ?"

বীণা কহিল, "বলছি প্রাণের দায়ে। তবে কোনো আশা মনে নিয়ে বলছি না। মানুষকে মানুষ ব'লে কোনো মূল্য যে দিতে শেখেনি তার মনের কষ্টিপাথরে আমার আর কি দাম উঠবে ? আমি নিতান্তই রক্ত-মাংসের মানুষ।"

গেরুয়া পরিচ্ছদটা খসিয়া খসিয়া পড়িতেছিল, অজয় আবারও সেটাকে ভাল করিয়া গায়ে জড়াইল। বীণা কহিল, "আর বেড়াতে ভালো লাগছে না, চলুন বাকী রাস্তাটা একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে পার হয়ে যাই।" বীণা যে এত দ্রুত হাঁটিতে পারে অজয় জানিত না, তাহার সঙ্গে তাল রাখিতে গিয়া নিজে সে হাঁপাইয়া গেল।

মাঠের মাঝখানে দীপালোকিত একটা পথ পার হইয়া গভীর পয়ঃপ্রণালী। এ সময়ে জল থাকিবার কথা নয়, দুদিক হইতে মেঠো-পথ ঢালু হইয়া নামিয়াছে, মাঝখানটা অন্ধকার। একেবারে নীচের মাটি আর্দ্র হইলেও হইতে পারে। বীণা দুমনা হইয়া অন্ধকারে কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিল, পশ্চাৎ হইতে অজয় আসিয়া জুটিতেই ছোট একটি লাফ দিয়া সেই জায়গাটুকু পার হইতে গেল। তারপর ঠিক যে কি ঘটিল বোঝা গেল না। হয় শাড়ীর আবেষ্টনে দুই পা যথেষ্ট অবকাশ পাইল না, অথবা ওপারের অসমান মাটিতে পা হড়কাইল, অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া দুই হাতে একটি পা চাপিয়া

ধরিয়া বীণা বসিয়া পড়িল। অজয় পাশ হইতে ঝুঁকিয়া কহিল, "কি হ'ল আপনার? লাগল কি?"

বীণা একথার উত্তরে আরও একবার অর্দ্ধস্ফুট একটু কাতরোক্তি করিল মাত্র।

অজয় কহিল, "খুব বেশী লেগে গেছে বুঝি?"

বীণা হাঁটুতে ভর দিয়া কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল "না, তেমন কিছু লাগেনি।"

"এখুনি কি চলতে পারবেন? একটু না-হয় ব'সে বিশ্রাম ক'রে নিন্।"

"না, থাক্ বাড়ীতে মেয়েটাকে ফে'লে এসেছি, এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে, ইনু বেচারিও অপেক্ষা ক'রে ব'সে থাকবে গাড়ীর জন্যে। মাঠে বেড়াবার কল্পনাটা মাথায় না এলেই ভালো ছিল দেখছি।"

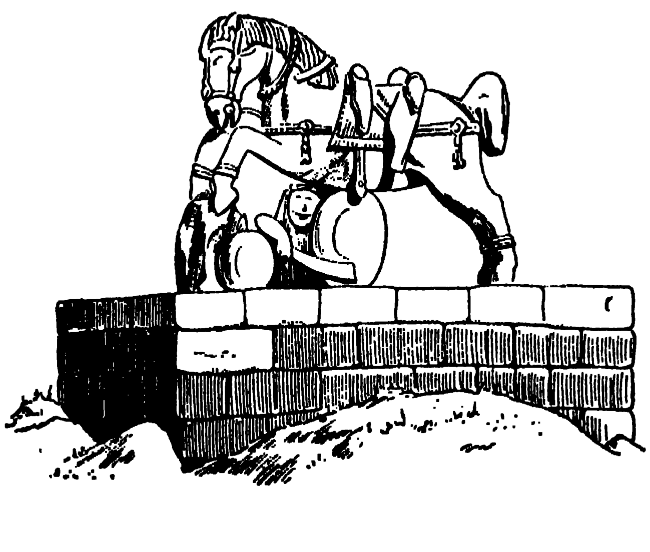
ঢালু জায়গাটুকু বাহিয়া ওপারের মাঠে উঠিতে সে কি ক্লেশ! যে-পা-টা মচকাইয়াছে তাহার উপর বীণার তনুলতার ভার সয় না, মনে হয় ভাঙিয়া পড়ে বুঝি। অজয়ের বুকের মধ্যে কেমন যেন করিয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু পাশাপাশি পথ-চলা ছাড়া সে আর কি করিতে পারে। যদি বাংলা দেশ না হইত, বীণাকে পাঁজাকোলা করিয়া তুলিয়া সে বাকী পথটুকু পার হইয়া যাইত, কিন্তু এত জোরই বা তাহার গায়ে কোথায়? সতর্ক হইয়া থামিয়া থামিয়া পথ চলিতে চলিতে ঘন নিঃশ্বাসের কাতরতায় বীণা তখন কি বলিতে চাহিতেছিল? বলিতে চাহিতেছিল, বন্ধু, তোমার কাঁধে আমার ডান-হাতখানি একটু রাখিতে দাও, তাহাতে আকাশটা হঠাৎ ভাঙিয়া পড়িবে না, আমার খোঁড়া ডান পা-টা একটু বিশ্রাম পাইয়া বাঁচুক? কি জানি, অন্তত অজয় সে ভাষা বুঝিতে পারে না।

কিন্তু ক্লান্ত বীণাকে চৌরঙ্গীর মোড়ে গাড়ী ধরাইয়া দিয়া বাড়ী ফিরিয়া অজয়েরও হঠাৎ কি হইল, গভীর বেদনায় সে একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। আজ সে জয়লাভ করিয়া ফিরিয়াছে। ঐন্দ্রিলা তাহার নিকট তাহার জীবনের চরিতার্থতার প্রতিরূপ, তাহাকে অন্তরের সিংহাসন হইতে সে আজ বাহিরের ধূলিকর্দ্দমে টানিয়া নামায় নাই। বীণা তাহার নিকট জীবনের উৎসব-সমারোহের প্রতিরূপ, সে উৎসবের আহ্বানকে সে আজ অবলীলায় অগ্রাহ্য করিয়া ফিরিয়াছে। কত মধু-মুহূর্ত্ত, কত গভীর ইঙ্গিত, কত সুবর্ণসুযোগ বৃথা বহিয়া গিয়াছে, সে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করে নাই। নিজের মধ্যে নিজের দুর্দ্দম শক্তিমত্তার রূপ সে আজ পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া ফিরিয়াছে। তবু অশ্রুর স্রোত এমন করিয়া উদ্বেল হইয়া উঠে কেন? *

(ক্রমশঃ)

---

* ভ্রম-সংশোধন—এই উপন্যাসের গত সংখ্যার দ্বিতীয় প্রথম ছত্রে Force স্থলে Fours পড়িতে হইবে।



পুস্তক পরিচয়

শিশু-ভারতী—সম্পাদক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ; প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য বার আনা মাত্র।

পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই শিশু-শিক্ষার বিপুল আয়োজন চলিতেছে ; ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকগণ শিশুগণের শিক্ষাবিধানের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতেছেন। সে-সকল দেশে প্রতি মাসে এত শিশু-সাহিত্য প্রচারিত হয় যে, শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে সে-ভাবের প্রচেষ্টা হয় নাই বলিলেই হয় ; দুই চারিজন কৃতী লেখক দুই চারিখানি পুস্তক লিখিয়াছেন মাত্র ; এমন কি শিশুপাঠ্য সাময়িক পত্রিকা তিন চারিখানিরও অধিক নাই, এবং তাহারাও যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতেছে এমন মনে হয় না। এই সময়ে প্রসিদ্ধ প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস এই শিশু-ভারতী প্রকাশিত করিয়া সত্য সত্যই শিশু-সাহিত্য ক্ষেত্রের একটি অভাব দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এই শিশুভারতীর সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়াছেন খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। সম্পাদকের বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, সুধী সুপণ্ডিত লেখকগণ এই শিশু-ভারতীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন। সুতরাং এখানি যে সর্ব্বাংশে শিশুভারতী হইবে, সে-বিষয়ে অণুমাত্রও সংশয়ের অবকাশ নাই। আমি এই সাধু প্রচেষ্টার সম্পূর্ণ সাফল্য কামনা করি।

শ্রীজলধর সেন

যুগের দাবী—শ্রীশরৎচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৩৩৫ পৃষ্ঠা, এণ্টিক কাগজে ছাপা, কাপড়ে সুদৃশ্য বাঁধাই। দাম দুই টাকা।

এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু বাংলার বর্ত্তমান সামাজিক সমস্যা। সমাজের প্রাচীন আদর্শের সঙ্গে আধুনিক আদর্শের সংঘাত ও অবশেষে যুগধর্ম্মেরই দাবি জয়যুক্ত হওয়ার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ দুইটি প্রাচীন-পন্থী পরিবারের মধ্যে নব্য-যুবকেরা কেমন করিয়া নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল, এবং তাহার ফলে নিজেদের পরিবারের মধ্যেই কেমন করিয়া কাহারও সমর্থন ও কাহারও বা প্রতিরোধ দ্বন্দ্ব উপস্থিত করিল তাহাই দেখানো হইয়াছে, এবং অবশেষে যুগের দাবি জয়ী হইয়া সব সমস্যার সমাধান করিয়াছে। গল্পের প্লটটি বেশ অনাড়ম্বর নিপুণতার সঙ্গে বুনা হইয়াছে, এবং চারটি পরিবারের সম্পর্কে নানাবিধ সামাজিক সমস্যা উপস্থাপিত হইয়াছে—প্রণয়মূলক পবিত্র দাম্পত্যজীবন বিবাহে সিদ্ধ নহে বলিয়া সমাজে অন্যায় লাঞ্ছনা, বালবিধবার বিবাহ, রমণীর শিক্ষা ও বলচর্চ্চার দ্বারা আত্মরক্ষার ক্ষমতা অর্জ্জন, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য-বিচার ও মন্দির-প্রবেশ, কিশোর-কিশোরীর বিবাহ ও প্রথম যৌবনে উভয়ের মিলনের আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে অভিভাবকদের উদাসীনতা, শিক্ষিত যুবকের সহিত নিরক্ষর বালিকার বিবাহে উভয়ের অসামঞ্জস্য ও অসন্তোষ, পল্লীসংস্কার, গ্রামে বালক-বালিকার শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম প্রচার, বিপ্লব দ্বারা দেশ স্বাধীন করিবার ব্যর্থ চেষ্টা, শিক্ষা ও অর্থ দ্বারা দেশ-সেবা, ইত্যাদি বহু বিষয় ইহার মধ্যে কৌশলে আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ বক্তৃতা রসভঙ্গ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'শেষ-প্রশ্নে'র আদর্শে এই লেখক তাঁহার উপন্যাসে বহু সমস্যা উপস্থিত করিয়াছেন, কিন্তু শেষ-প্রশ্নের আলোচনার উজ্জ্বলতা না থাকাতে এই পুস্তকের বক্তৃতাগুলির আতিশয্য সৌন্দর্য্যহানি ঘটাইয়াছে। কিন্তু মোটের উপর লেখকের ভাষা ভাল, উদ্দেশ্য ভাল, যুক্তি-তর্ক সমীচীন, রচনা নিপুণ, আর গল্প চিত্তাকর্ষক বলিয়া বক্তৃতাগুলি নিতান্ত অসহ্য হয় নাই। গল্পের মধ্যে অনেকগুলি নরনারী উপস্থিত হইয়াছে, সকলেই সৎ, কেবল মাতাল নিখিলনাথ ও ইংরেজ চাকর ছিল ছাড়া ; কিন্তু সকল চরিত্রই অর্দ্ধস্ফুট হইয়াছে, অনেকগুলিকে লইয়া কারবার করিতে গিয়া কোনোটিই উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠে নাই। মনীশ ও অনিশ দুই ভাই প্রধান চরিত্র। কিন্তু উহাদের নামের মানে কি? সংস্কৃত বচন উদ্ধৃতির মধ্যে দু-এক জায়গায় ভুল আছে, এখানে-সেখানে দু-চারটা বানান ভুলও আছে। কিন্তু মোটের উপর বইখানি পাঠ করিলে মন প্রসন্ন ও উন্নত হয়। যুগের দাবিকে লেখক বাক্যে-মনে সমর্থন করিয়াছেন দেখিয়া আমি সুখী হইয়াছি।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের কাব্য—শ্রীননীলাল ভট্টাচার্য্য। দাস এণ্ড কোং, ২০ ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ১৯৩২। আট আনা।

বর্ত্তমান যুগে নানাস্থানে রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা হইতেছে। রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যে রেঙ্গুনে প্রদত্ত এক বক্তৃতা এই পুস্তকের মূল কারণ। লেখক টম্‌সনের গ্রন্থকে অন্যতর প্রধান অবলম্বন-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া বিচক্ষণতার পরিচয় প্রদান করেন নাই, সম্ভবতঃ ইহাই তাঁহার প্রথম রচনা। বাংলার কবিগুরুর সাহিত্য যতই আলোচনা হয় ততই মঙ্গল, সে-দিক হইতে এই ক্ষুদ্র পুস্তকের মূল্য আছে ; কিন্তু ইহার অত্যধিক মুদ্রাকরপ্রমাদ পুস্তক-সম্পাদনের অপকর্ষ সূচিত করিতেছে। পুস্তকের পরিশিষ্ট বিষয়বস্তুর প্রতিবাদ, ইহা পাঠকের কৌতুকের সৃষ্টি করিবে।

অতিথি—শ্রীসুবোধ বসু। বীণা লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ১৯৩২। আট আনা।

তিনটি দৃশ্যে সমাপ্ত আদ্যোপান্ত উপভোগ্য প্রহসন। তবে পূর্ব্বের অতিভদ্র অতিলাজুক অর্দ্ধেন্দু পরিণামে অত্যন্ত চতুর প্রেমিক হইয়া দাঁড়াইল। ইহার মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা পাইয়াছে কি-না তাহা লেখক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। প্রেমে অবশ্য বোবার মুখেও কথা ফুটে, ইহা কি তাহারই দৃষ্টান্ত? আমাদের মতে শেষের তিন পৃষ্ঠায় হাস্যরসের উপাদান থাকিলেও যবনিকা তাহার পূর্ব্বে পড়িলেই ভাল হইত, অন্ততঃ অর্দ্ধেন্দুর ভাবাবেশে চেয়ার-সহ উল্টাইয়া পড়িবার পূর্ব্বে।

আনোয়ার পাশা—ইব্রাহিম খাঁ, এম-এ, বি-এল। মোহাম্মদী বুক এজেন্সী। ১৯৩৩। মূল্য এক টাকা দুই আনা।

প্রসিদ্ধ বীর আনোয়ার পাশার জীবন অবলম্বনে রচিত পঞ্চাঙ্ক নাটক। সমসাময়িক তুরস্কের ইতিহাসে এই প্রচণ্ডবেগ কর্ম্মীর কোথায় স্থান তাহা সুনিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে। গানগুলি সুন্দর, লেখকের ভাষাও ঝর্‌-ঝরে, শুধু 'ছর্দ্দার', 'ছুলতান,' 'ছবুর' প্রভৃতি শব্দের 'ছ'-এর উচ্চারণ আমাদের মত পাঠকের নিকট বিকট বলিয়া মনে হয়। পুঁথি, ওঁৎ, প্রভৃতি চন্দ্রবিন্দুর বাহুল্য মুদ্রাকর-প্রমাদের দৃষ্টান্ত নিশ্চয়, 'অসহায়া রুদ্রানারী'-র (৮১ পৃঃ) অবশ্য অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু নাটকের মধ্যে কয়েকটি কথা আমাদের বড়ই ভাল লাগিয়াছে, তাহার দুই-একটি এখানে উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। দ্বিতীয় অঙ্কে ওস্তাদ তাঁহার শিষ্যদিগকে বুঝাইতেছেন যে পূর্ব্বাচার্য্যদের সিদ্ধান্ত ইহকালের জন্য শেষ সিদ্ধান্ত নাও হইতে পারে:—'অনাগত সুদীর্ঘ ভবিষ্যতের জন্ত আল্লাহ্ রছুলের যে-বাণী নির্দ্দিষ্ট, তার বিপুল মর্ম্ম-ঐশ্বর্য্য যুগবিশেষের মুষ্টিমেয় ইমামের ব্যাখ্যাতেই নিঃশেষে ফুরিয়ে গেল, এই বিশ্বাস পোষণই কি ইছলামের প্রতি চরম-শ্রদ্ধার পরিচয়? হাঁ, ইমামগণ পরম মনীষী, পরম পণ্ডিত, পরম ধার্ম্মিক ছিলেন; তাঁদের সিদ্ধান্তকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গেই বিচার করতে হ'বে, আর জনসাধারণকে সাধারণতঃ তাঁদের সিদ্ধান্তই মেনে চল্‌তে হ'বে। কিন্তু তাঁদের সিদ্ধান্তের বিচারের দুয়ার তাঁরা নিজেরাই যে মার্জ্জিত বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের জন্ত খুলে রেখে গিয়েছেন। যুগে যুগে জগতে এই যে নব নব সমস্তার সমুদ্ভব হ'চ্ছে, তার সমাধানকল্পে ইসলামের মূলনীতির যদি নব-প্রয়োগ প্রয়োজন হয়, তবে কি তা করতে হবে না?' পুনরায়, ৭৭ পৃষ্ঠায়, 'পেশীপুষ্ট বাহুর চেয়ে জ্ঞানোজ্জ্বল মস্তিষ্ক বড়,' একথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন,—'শুধু তলোয়ার সম্বল ক'রে কোন জাতি কখনো বড় হয় নাই, শুধু শাস্ত্র সম্বল করেও নয়।' 'যদি সাধনার মত সাধনা করতে পার আবার সব হবে; আর তা না করে যদি কাপুরুষের মত শুধু হা-হুতাশ-দীর্ঘ-নিশ্বাসের জাল বুনতে থাক, তবে সে জাল তোমারি কণ্ঠে জড়িয়ে তোমার শ্বাসরোধ ক'রে হত্যা করবে।' (১২৭ পৃঃ) গ্রন্থকারের এই সব উক্তি মুসলমান সমাজের বাহিরেও প্রযোজ্য; নাটকে সবল মনোবৃত্তির পরিচয় আমরা পাই এবং ইহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

বাঘ-সিংহের মুখে—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত। ইণ্ডিয়ান্ পাব্‌লিশিং হাউস, ২২।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৮।

আফ্রিকার বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্ব্বতে, নদী-নালায় বাঙালী যুবকেরা কত রকম হিংস্র জন্তু ও নানা বিপদ-আপদের সম্মুখীন হইয়া বুদ্ধির কৌশলে তাহা অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে বই-খানিতে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বাঘ, চিতা, সিংহ, জেব্রা, ভালুক, উট পাখী, অজগর, হস্তী, জলহস্তী, কুমীর প্রভৃতি শীকার, ও ইহাদের বর্ণনাও দেওয়া হইয়াছে। বইখানি পড়িয়া শিশুদের ভ্রমণের প্রবৃত্তি হইবে, নানা বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া সাহস বাড়িবে, জীব-জন্তুর বিষয় পড়িয়া ও চিত্র দেখিয়া তাহাদের সম্বন্ধে ধারণা হইবে। পুস্তকখানি ছেলেমেয়েদের অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত। আফ্রিকার কাফ্রি-পরিবারের আমোদ-আহ্লাদের আভাসও ইহাতে আছে।

স্কুলের মেয়ে—জাহান্ আরা চৌধুরী প্রণীত। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স, মানিকতলা স্পার, কলিকাতা। মূল্য আট আনা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬০।

সচিত্র গল্পের বই। ছয়টি গল্প আছে। প্রথম গল্পের নাম অনুসারে বইখানির নামকরণ হইয়াছে। গল্পগুলি পূর্ব্বে মৌচাকে প্রকাশিত হইয়াছিল। বইখানি পড়িয়া মনে হয় ইহা শুধু কিশোর-কিশোরীদের জন্যই লেখা নয়, ইহা একটি কিশোরীরও লেখা। প্রথম গল্পটি শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে মেয়েদের ব্যবহারের একটি নমুনা। ছাত্র-ছাত্রীর মুখে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর প্রতি অবজ্ঞাসূচক ভাষা প্রয়োগ করানো উচিত নয়। অন্যান্য গল্পগুলির প্লটও সব নূতন নয়। শিশুদের মধ্যে চলিত কাহিনী লেখিকা ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। গল্পগুলির বিষয়-বস্তু চিত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ভারতের সাধনা—শ্রীযুক্ত স্বর্ণভূষণ বাগচি প্রণীত। মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১০ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ২০৬ পৃষ্ঠা।

বইখানি ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের জীবনী লইয়া লিখিত। বিজয়কৃষ্ণের জীবনে ভারতীয় সাধনার গূঢ় তত্ত্ব কি ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা বিবৃত করাই গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্য, এবং সেই জন্যই বোধ হয় তিনি গ্রন্থের এ প্রকার নাম দিয়াছেন।

বিজয়কৃষ্ণের জীবনের আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনার বর্ণনা করাও বোধ হয় গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু তিনি গোস্বামী প্রভুর সাধনা-জীবনের মুখ্য ঘটনা কয়টির বিশদ এবং বিস্তৃত বিবরণই দিয়াছেন।

গ্রন্থকার বিজয়কৃষ্ণের এক জন ভক্ত, এবং ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিতই তিনি বিজয়কৃষ্ণের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণের মতভেদ ও পরধর্ম্ম-বিচ্ছেদের আলোচনায় তিনি কোনও প্রকার অসংযত ভাষার প্রয়োগ করেন নাই। তাহার সমদর্শিতা প্রশংসনীয়।

গ্রন্থকারের ভাষা ভাল। কিন্তু দুই এক স্থলে তিনি অনাবশ্যক রকম কাব্যের ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। যেমন, ১৫ পৃষ্ঠায় বিজয়কৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত লিখিতে গিয়া সেই উপলক্ষ্যে তাহার জননীর মনোভাবের বর্ণনায় যে-ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা ঠিক এই বইয়ের উপযুক্ত কি-না, সন্দেহ।

গোড়ার দিকে 'নিবেদন', 'ভূমিকা', 'পরিচায়িকা', 'প্রকাশকের নিবেদন', ইত্যাদি এত বেশী না দিলেও বইখানার অঙ্গহানি হইত না। তবে ইহাতে গ্রন্থকারের বৈষ্ণবোচিত বিনয় প্রকাশ পাইয়াছে, সন্দেহ নাই।

বইখানা আমাদের কাছে ভালই লাগিয়াছে। মহাপুরুষদের ধর্ম্মজীবনের বিবরণে অনেক অলৌকিক কথা আসিয়া পড়ে। সকলে সে-সব কথা বিশ্বাস হয়ত করিবেন না। তবে ইহা প্রায় সমস্ত ধর্ম্মসাহিত্য সম্বন্ধেই খাটে। কিন্তু তাহা দ্বারা বইয়ের ভাল-মন্দ বিচার করা চলে না। ধর্ম্মসাহিত্যে যাঁহাদের রুচি আছে, তাঁহারা এই বইখানা পড়িয়া নিশ্চয়ই আনন্দ পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সনৎসুজাতীয়মধ্যাত্মশাস্ত্রম্—কালীঘাট কালিকা গ্রন্থমালা। ক্রমিক সংখ্যা ১-২। শাঙ্করভাষ্যোপেতম্। কালীঘটস্থিত শ্রীশ্রীকালিকামহাদেবীসেবাভৃৎকুলোদ্ভব শ্রীগুরুপদহালদার প্রণীত—কালিকা-কালিকাগসাপ্যটীকাদিসমেত। ৪৭ হালদার পাড়া লেন হইতে শ্রীভারতীবিকাশ শর্ম্মা হালদার প্রকাশিত।

ডিমাই আটপেজী আকারের প্রায় ১৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই বিশাল গ্রন্থখানি হালদার মহাশয়ের বহু পরিশ্রমের ফল। মহাভারতের সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক তথ্য পরিপূর্ণ সনৎসুজাতীয় পর্ব্বাধ্যায়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও অনুবাদাদি দ্বারাই হালদার মহাশয় নিজ কর্ত্তব্য সমাপন করেন নাই। গ্রন্থের শেষে চারিটি দীর্ঘ পরিশিষ্টে পারিভাষিক শব্দাদির অর্থ, টীকাদিধৃত গ্রন্থকারদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক বৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত চুম্বক ও বিস্তৃত সূচী প্রভৃতির মধ্য দিয়া তিনি সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য এই গ্রন্থমধ্যে সঙ্কলিত করিয়া দিয়াছেন। সংস্কৃতসাহিত্যামোদী ব্যক্তিগণ এই সকল টীকাটিপ্পনী ও পরিশিষ্টাদির ভিতর একস্থানে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাইবেন সত্য, কিন্তু আধুনিক রীতি অনুসারে সর্ব্বত্র প্রমাণাদি উদ্ধৃত না হওয়ায় এই গ্রন্থস্থিত উপকরণের উপর সকল স্থলে নির্ভর করা সম্ভবপর হইবে না। উদাহরণ-স্বরূপ, হালদার-মহাশয় কর্ত্তৃক উল্লিখিত বহু প্রাচীন গ্রন্থের বিষয় বলা যাইতে পারে। এই সকল গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে কি-না অথবা তাহাদের পুথি প্রসিদ্ধ কোন পুস্তকাগারে পাওয়া যায় কি-না এই সকল বিষয়ের ইঙ্গিতমাত্রও এই গ্রন্থে নাই। তবে গ্রন্থকার মহাশয়ের উদ্যম প্রশংসনীয়—সনৎসুজাতীয় পর্ব্বাধ্যায় বাঙ্গালী পাঠক-সাধারণের নিকট সুপরিচিত করিবার তাঁহার এই প্রয়াস বিশেষ প্রশংসার্হ।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

সরল নরদেহ-তত্ত্ব—ডাঃ শ্রীসুশীলকুমার দাস প্রণীত। সায়েন্স ভিলা, রমনা, ঢাকা হইতে শ্রীঅজিতকুমার দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রথম সংস্করণ, ১৭৯ পৃষ্ঠা, মূল্য ১।০।

গ্রাম্য চিকিৎসকগণের মধ্যে অতি সরল ভাষায় দেহতত্ত্বাদি সম্বন্ধে জ্ঞানপ্রদানের উদ্দেশ্যে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানিতে শরীরতত্ত্ব ও শরীরের গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক কথাই বর্ণিত হইয়াছে। একমাত্র ত্রুটি এই যে, ইহাতে কোন বিষয়েরই শৃঙ্খলা নাই। আলোচ্য বিষয়গুলি বেশ গুছাইয়া লিখিলে পুস্তকখানি প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য করা যাইত।

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

কৃপাকণা—(কবিতার বই)—শ্রীসন্ধ্যা দেবী প্রণীত। ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলে মুদ্রিত এবং শিল্প-সাহিত্য পুস্তক-বিভাগ হইতে প্রকাশিত।

কতকগুলি তত্ত্ব-কথার ডালি সাজাইয়া গ্রন্থকর্ত্রী তাহারই 'কৃপাকণা' নাম দিয়া শ্রীগুরুচরণে উৎসর্গ করিয়াছেন। গ্রন্থের নিবেদনে প্রকাশ, গ্রন্থকর্ত্রীর অব্যক্ত ভাবগুলি তাঁহার গুরুর কৃপায় এই গ্রন্থে পরিস্ফুট হইয়া ভাষার আকার ধারণ করিয়াছে। গ্রন্থকর্ত্রীর এই উক্তি সত্য হইলেও গ্রন্থের কবিতাগুলির ভাষা ভাবকে মূর্ত্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। কাঁচা হাতের দোষে ছন্দগুলি অতি দুর্ব্বল হইয়াছে। ছন্দ দুর্ব্বল না হইলে এই অধ্যাত্ম ভাবপূর্ণ কবিতাগুলি পাঠকের চিত্তে মধুবর্ষণ করিত সন্দেহ নাই। গ্রন্থকর্ত্রীর এই প্রথম উদ্যম। কাঁচা হাত হইলেও গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহার প্রত্যেক কবিতার ভিতর দিয়া যে একটি ভক্তিধারা বহাইয়াছেন তাহা অন্তর্মুখী ভক্তপ্রাণের উপভোগ্য। কাব্যের দিক দিয়া ইঁহার কোন সার্থকতা না থাকিলেও ভক্তির দিক দিয়া কৃপাকণা সার্থক হইয়াছে। গ্রন্থে মূল্যের কথা লেখা নাই। ছাপা সুন্দর।

শ্রীকৃষ্ণ গীতিকা—শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী প্রণীত ও প্রকাশিত। শিলং নেপালী প্রেসে শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য সাড়ে বার আনা মাত্র।

বর্ত্তমান সাহিত্যক্ষেত্রে কাব্যের দিক দিয়া এই গ্রন্থের কোন সার্থকতা না থাকিলেও কাব্যানুরাগী প্রাচীন বৈষ্ণবগণের নিকটে ইহা অনাদৃত হইবে না।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

যাদের নামে সবাই ভয় পায়—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। প্রকাশক মেসার্স এম্. সি. সরকার এণ্ড সন্স, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শিশুপাঠ্য পুস্তক। ইহাতে নয়টি ছোট গল্প আছে। একে ত ভৌতিক গল্প, তাহার উপর লেখকের রচনা কৌশল—পাঠে কেবল শিশুদের কেন, বড়দের মনেও গভীর ছাপ রাখিবে। "এক-রাতের ইতিহাস," "কঙ্কাল সারথী," "বিজয়ার প্রণাম" প্রভৃতি গল্প পড়িতে পড়িতে তাহাদের ঘটনাগুলি চোখের সম্মুখে রূপ ধরিয়া দাঁড়ায়। এই ধরণের রচনা কল্পনাকে উদ্দীপিত করে।

প্রত্যেকটি গল্পে নিপুণ শিল্পীর একখানি করিয়া রেখাচিত্র আছে। মোটা মলাটের উপরের রঙীন ছবিখানিও গ্রন্থের নামের অনুরূপ। ছাপা ও কাগজ ভাল। দাম বার আনা।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

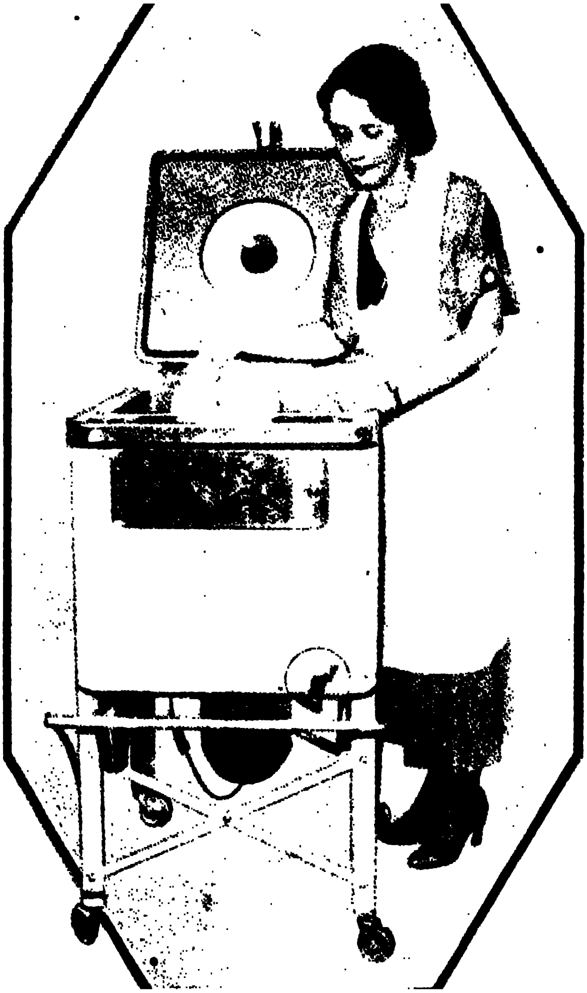
ঘোষের ডায়েরী—বাংলা ও ইংরেজী। প্রকাশক এম্-সি-সরকার এণ্ড সন্স, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ আনা হইতে পাঁচ টাকা বার আনা পর্য্যন্ত।

প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসে ঘোষের ইংরেজী ডায়েরী প্রকাশিত হয়। এবার ঘোষের বাংলা ডায়েরীও প্রকাশিত হইয়াছে। এই ডায়েরীগুলিতে সন তারিখ ছাড়াও এমন কতকগুলি বিষয় সন্নিবেশিত আছে যাহা প্রত্যেকের দৈনন্দিন কাজে লাগে। ছুটির দিন, মাস-মাহিনার হিসাব, সুদকষা, ইনকমট্যাক্স আইন, রেজেষ্ট্রী আইন, ষ্ট্যাম্প আইন, কোর্টফিজ্ সেডিউল, ইনকমট্যাক্সের রেট, বাল্যবিবাহ-দমন আইন, কনভারসন টেব্‌ল, পোর্ট-কমিনার্সের ষ্টীমারের ভাড়ার তালিকা, ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানের বর্ণনা, কলিকাতার রাস্তার তালিকা, এবং বহু নিত্য প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় এই ডায়েরীগুলিতে আছে। ডায়েরীগুলির কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই উত্তম।

পাঠশালা

বাসন ধুইবার কল—

এই ইলেকট্রিক বাসন ধুইবার কলটি দ্বারা বিনা কষ্টে থালা গেলাস ধোয়া যায়। প্লেটগুলি জায়গায় বসাইয়া দিয়া একটু সাবান ও জল দিয়া সুইচ টিপিলেই বাসন ধোয়া আরম্ভ হয়। ইহাতে বাসনগুলি মাজা, দুইবার পরিষ্কার জলে ধোয়া ও শুকান আপনি হয়। কাজ শেষ হইয়া গেলে কলটিও আপনি বন্ধ হইয়া যায়।



"রবার" কাচ—

জার্ম্মেনীর এক কারখানায় সম্প্রতি এক প্রকার কাচ তৈরী হইয়াছে যাহা চাপ দিলে রবারের মত বাঁকিয়া যায়। এই "রবার" কাচ মোটর গাড়ীতে ও অন্যান্য যে সব জায়গায় কাচ ভাঙিয়া গেলে জখম হইবার সম্ভাবনা সেখানে ব্যবহৃত হইবে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, চার ফুট লম্বা ও এক ফুট চওড়া একখণ্ড কাচ তিন জন লোকের ভার বহন করিতে পারে। এই চাপেও উহা ভাঙে নাই, কিন্তু লোহা বা অন্য কোন ধাতু নির্ম্মিত পাতের মত নুইয়া পড়িয়াছিল।



রবার কাচ তিন জন লোকের ভার বহন করিতেছে

এরোপ্লেনের চাঁদমারী—

এরোপ্লেন হইতে বোমা ফেলিয়া শত্রুর যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস করার চেষ্টা করা হয় এ-কথা সকলেই শুনিয়াছেন। কিন্তু উহার জন্য কিরূপ শিক্ষালাভ করিতে হয় তাহা হয়ত অনেকেই জানেন না। আমেরিকায় সত্যকার যুদ্ধজাহাজের উপর বোমা ফেলিয়া এই অভ্যাস করা হয়। কিন্তু এই যুদ্ধজাহাজে লোক থাকিলে প্রাণহানি হইবার সম্ভাবনা. সেজন্য একটি পুরাতন যুদ্ধজাহাজকে একেবারে খালি করিয়া মাইল খানেক দূর হইতে রেডিওর দ্বারা পরিচালনা করা হয়। আর একটি জাহাজ হইতে কল টিপিয়া জাহাজখানা ইচ্ছামত চালান যায়। এই জাহাজের উপর এরোপ্লেন বোমা ফেলে। সঙ্গের চিত্রগুলি হইতে এই চাঁদমারীর কিছু কিছু ধারণা করা যাইবে।



বামে—আমেরিকার পুরাতন যুদ্ধের জাহাজ 'ইউটা'র উপর এরোপ্লেন হইতে বোমা ফেলা হইতেছে। এই জাহাজটিতে কোন লোক নাই। এক মাইল দূরে আর একটি জাহাজ হইতে রেডিওর সাহায্যে উহাকে চালান হইতেছে।

নীচে—দূরে রেডিও-পরিচালিত 'ইউটা'। নিকটে পরিচালক জাহাজের কর্ম্মচারিগণ।



রেডিওর চাবি টিপিয়া 'ইউটা'কে চালান হইতেছে।







'ইউটা'র নাবিকেরা জাহাজ ত্যাগ করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের ছোট কুকুরটিকেও নামান হইতেছে।

পারস্য-ভ্রমণ

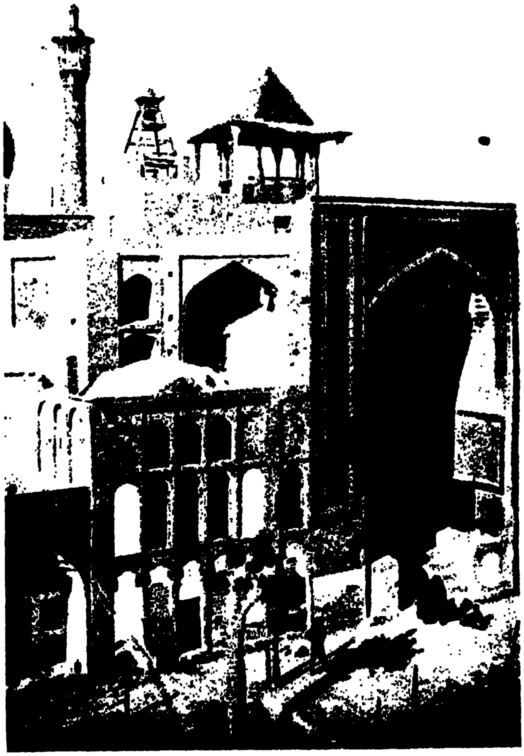
শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

ইস্ফাহান দেখা শেষ হয়ে গেল। ক্রমেই আমাদের গন্তব্য স্থান এগিয়ে আস্‌ছে। সেখানে রাজদর্শন ও রাজশক্তির উৎস দর্শন, তারপর প্রত্যাবর্ত্তন! পথে ইরাণের প্রত্যেক পূর্ব্বযুগেরই কিছু কিছু নিদর্শন পেয়েছি—পার্সিপোলিসে হখামনিষ্য, শাপুরে শাশানিয়, ইস্ফাহানে মুসলমান ইরাণের স্বাধীন যুগ—বাকি আছে এক্‌বাটানায় মাদ জাতির অভ্যুত্থানের স্থান দর্শন এবং বাকি আছে বর্ত্তমান ইরাণের কেন্দ্র টেহেরান! একথা সত্য যে যা দেখার আছে তার দশমাংশও দেখা হবে না, কিন্তু যা দেখা হবে তারই বা মূল্য কে নির্দ্ধারণ করে?

ইস্ফাহানের পাশে জুল্‌ফায় প্রবাসী আর্ম্মানি জাতির একটি প্রকাণ্ড উপনিবেশ। শাহ্‌ আব্বাস ত্রিশ হাজার আর্ম্মানি কারিগর এনে নিজের রাজধানীর শিল্পসমৃদ্ধি বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন। পরে এই উপনিবেশের লোকদের উপর নানা অত্যাচার ও বহু উপদ্রব হয়, কিন্তু এই অভাগা জাতির বিদেশ ছেড়ে স্বদেশে গিয়েও উদ্ধার

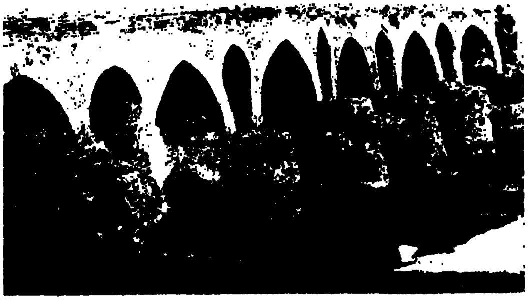


ইস্ফাহান। মিনার চম্‌চম্‌



কুম। মস্‌জিদের সান্নিধ্যে

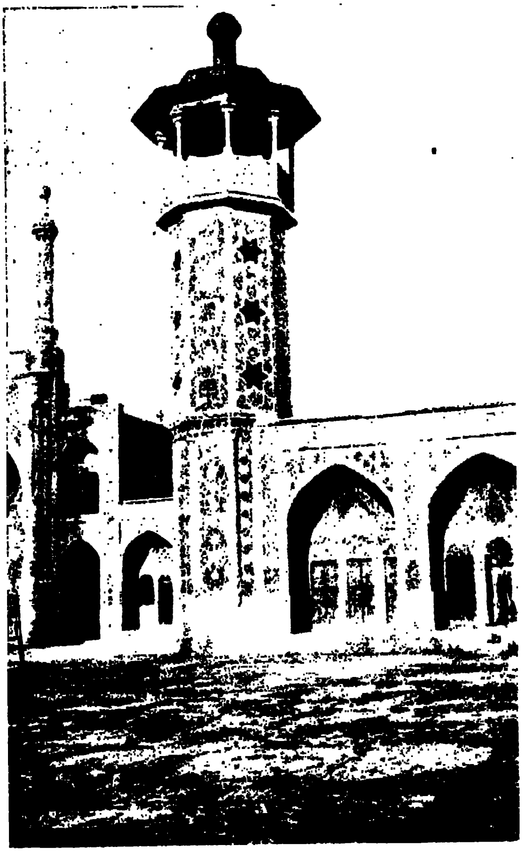
হবার উপায় ছিল না, কাজেই তারা নিরুপায় হয়ে অত্যাচার সহ্য করে। কিন্তু এদেরই উদ্যোগী সন্তানের দল পরে ভারতবর্ষ, ইউরোপ, আমেরিকায় গিয়ে অধ্যবসায় ও তীক্ষ্ণ ব্যবসাবুদ্ধির গুণে অসম্ভব ধনসম্পদ



ইস্ফাহান। প্রাচীন সেতু

অর্জ্জন করে। এখন এদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। পথেঘাটে আর্ম্মানি মেয়েরা ইউরোপের অভিনব ফ্যাসনের কাপড় পোষাক প'রে ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে—ছেলেদের পোষাক সেই "কোলে পাহ্‌লবি" টুপি এবং কোট প্যান্টলুন।

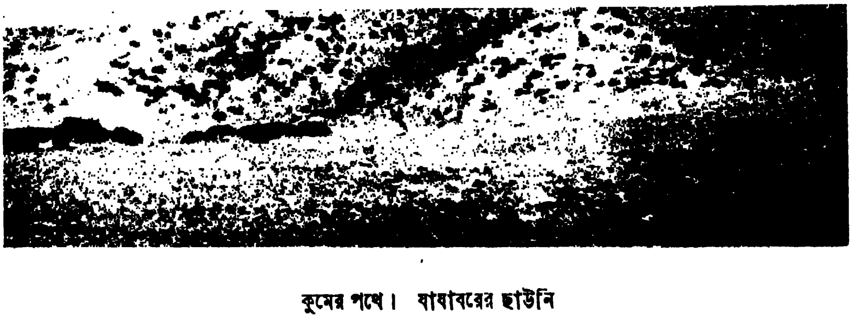
ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আর একটি পরাধীন জাতির উদ্যমের পরিচয় এদেশে এবং সারা জগতে পাওয়া যায়। ইহুদীরা "স্বদেশ বিহীন জাতি" ব'লে এতদিন জগতে পরিচিত ছিল। গত মহাযুদ্ধের পরে "জায়নিষ্ট" সম্প্রদায়ের চেষ্টায়—এবং কয়েকটি প্রবলপরাক্রান্ত জাতির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য—প্যালেষ্টাইনে এদের স্বদেশ গঠন করতে দেওয়া হয়েছে এবং অনেক স্বার্থত্যাগী ইহুদীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ২৬০০ বৎসর পরে সল, দায়ুদ সলোমনের দেশে পুনর্ব্বার ইহুদী রাষ্ট্র স্থাপিত হচ্ছে।



কুম। মসজিদের মিনার ও আঙ্গিনা

* * *

দিন ঘনিয়ে এল, ইস্ফাহানের নূতন পুরাতন সৌধ সেতু উদ্যান সব দেখা হয়ে গেছে। শহরের বাইরে "মিনার চম্‌চম্‌" (কম্পমান মিনার), পুরাণো সেতু, শহরের ভিতরে শাহ্‌ আব্বাসের "হস্ত বিহিস্ত" (অষ্ট স্বর্গ) প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ,—যার দেওয়ালে পলস্তারার আবরণের নীচে চাহিল সেতুনের ধরণের চিত্রাবলী বেরোচ্ছে—সবই দেখা



কুমের পথে। যাযাবরের ছাউনি



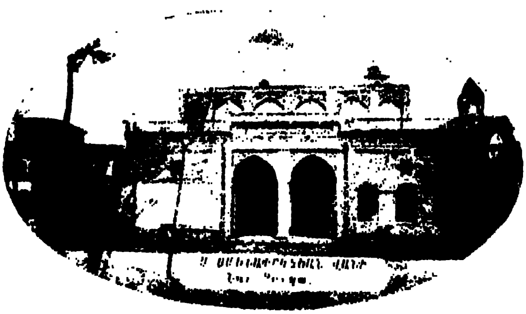
সেতু হইতে দূরে কুমের দৃশ্য

হয়ে গেছে, এখন পথের ব্যবস্থা হয়ে গেলে উত্তর মুখে যাত্রা করলেই হয়।

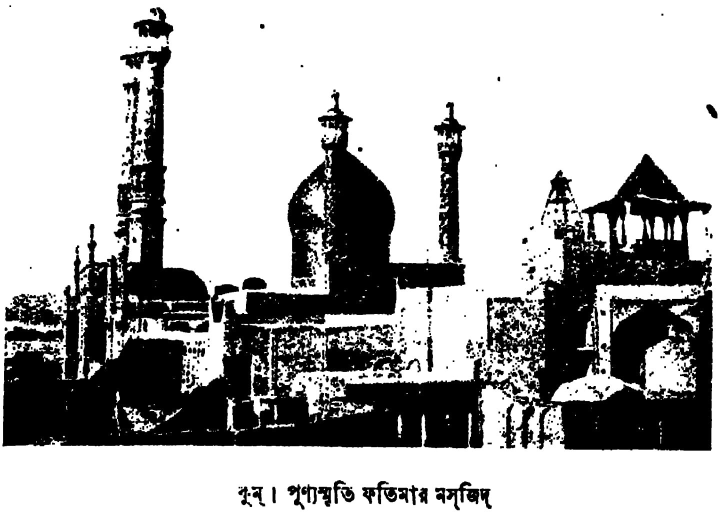
পারস্য ভ্রমণ ও প্রত্যাবর্তনের কয়েক মাসের মধ্যেই পশ্চিম-এশিয়ায় ধরিত্রী মাতার এবং এখানকার চারি ঋতুর প্রায় সকল রূপের দর্শন আমাদের ঘটেছিল বুশীরে বসন্তের শেষ, শিরাজে বসন্তের পূর্ণোদ্যম, ইস্ফাহানে ও হামাদানের অধিত্যকায় দারুণ শীত এবং ইরাকে আরব মরুভূমির গ্রীষ্মের রুদ্র প্রচণ্ড মূর্ত্তি—সবই আমাদের দেখা হয়েছিল। তেমনি আবার বুশীরের মরুময় বেলাভূমি, শিরাজ ও কাজেরুণের সুন্দর উপত্যকা, অভ্রংলিহ পর্ব্বত ও গিরিসঙ্কট এবং লবণাক্ত হ্রদ ও জলাভূমি দেখার পর ইস্ফাহানের পরে প্রস্তরময় নগ্ন বিরস অধিত্যকা এবং আরও এগিয়ে কুমের কাছে পারস্যের মরুভূমির প্রকৃত পরিচয় পাবার পর হিমতুষার আবৃত এলবোর্জ পর্ব্বতমালার পাশ দিয়ে পশ্চিম-মুখে বহুদূর গিয়ে, আমরা ইরাণের কাছে বিদায় নিয়ে ইরাকের সমতল ভূমিতে জগদ্বিখ্যাত যুগ্মনদী ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস এবং আরব মরুভূমির শেষ অংশ দেখতে পেয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বলা যায় যে, ধীবর যাযাবর থেকে অতি-আধুনিক নগরবাসী পর্য্যন্ত মানব-সভ্যতারও প্রতিস্তর আমাদের সামনে এসেছিল। তবে ক্ষণিক পরিচয় এক জিনিষ এবং ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার, আমাদের বেলায় প্রথমটাই হয়েছিল, দ্বিতীয়টা হবার সময় সুযোগ—বিশেষে সময়—মোটেই ছিল না।

*

২৮শে এপ্রিলের ভোরের কুয়াশা ও অন্ধকারের মধ্যে আমরা রওয়ানা হলাম। একদিনের মধ্যে টেহেরানে পৌছাতে হবে, পথও অনেকটা, কাজেই তাড়াতাড়ি যাত্রা করা গেল। নদী পার হয়ে শহর



ইস্ফাহানের (জুলফা) আর্ম্মানি গির্জা



কুম। পুণ্যস্মৃতি ফতিমার মসজিদ

ও শহরতলী দিয়ে টেহেরানের পথে গিয়ে পড়লাম। নগরের সীমানায় অন্ধকারের মধ্যে কতকগুলি কালো মূর্ত্তি সাদা হাত বার ক'রে প্রেতিনীর মত লম্ফঝম্প ও চীৎকার করছে দেখা গেল। মুখ নাক চোখ কিছুই দেখা যায় না, কেবল কালো আবছায়া আকৃতি, সরু



কুম। প্রাচীন বর্ম্ম

লম্বা সাদা হাত এবং বিষম উচ্চকণ্ঠের বেসুরো চীৎকার। কাছে এসে দেখা গেল সেগুলি ভিখারিণী—কালো চাদরে আপাদমস্তক ঢাকা!



কুম। কলমে লেখার এক পৃষ্ঠা

শহরের বাইরে বাগানের সারি, মধ্যে মধ্যে একটা ক'রে বেঁটে গোল বাড়ি। উঁচু কম, কাজেই সেগুলি সামরিক 'মাচান' (watch tower) হ'তে পারে না। আবার চারিদিকে খোপ, কাজেই শস্যের গোলাও নয়। পরে শুনলাম সেগুলি বাদশাহী আমলের পায়রার খোপ।

পথে একটি প্রাচীন কালের অগ্নিমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখলাম। বেলা বারটা আন্দাজ ডেলিজান নামের ছোট



কুম। ভিখারি ফকির

শহরে মধ্যাহ্নভোজনের জন্যে থামা হ'ল। এখানে খাওয়া-দাওয়ার পর ইস্ফাহানের বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা আবার যাত্রা করলাম।

বেলা দেড়টা নাগাদ দূরে শিয়া মুসলমানদের অন্যতম তীর্থ কুম্ দেখা গেল। এখানে ইমাম রিজার ভগিনী পুণ্যস্মৃতি ফতিমার কবর, মস্‌জিদ ও দরগা। শহরের পাশে নদী, সেই নদীর এক সেতুর উপর থেকে



রায়ই। প্রাচীন মৃৎপাত্রের নক্সা

প্রথমে সমস্ত শহরটা দেখা গেল। নদী পার হয়ে ক্রমে শহরের দিকে এগিয়ে আসা গেল। মসজিদের স্বর্ণমণ্ডিত গম্বুজ এবং নূতন ধরণের মিনার (কতকটা সমুদ্রতীরের 'লাইট হাউসে'র মত দেখতে) দেখা দিল।

কুম্ দূরের থেকে আমাদের দেশের পশ্চিম অঞ্চলের পুরাণো শহরের মতই দেখতে। সেই বেলে মাটির রং, শহরের দেওয়ালের উপর দিয়ে অসমান ছাদের দৃশ্য, মাঝে মাঝে দু-চারটে গাছ। আবার শহরের বাইরে নদীর বুকে তীর্থযাত্রী দলের কাপড়-কাচা নাওয়া-খাওয়াও আমাদের দেশেরই মত। তীর্থযাত্রীর মধ্যে সেই গরীব ভিখারী, ফকির সাধু—সবই যেন চেনা চেনা ঠেকে।

মসজিদ ও দরগা অমুসলমানের কাছে রুদ্ধ, কাজেই তার আশেপাশে ঘুরেই সন্তুষ্ট হতে হ'ল। নদীর উপর আর একটি সেতু পার হয়ে শহরের ভিতর যেতে হয়। শহরটি আমাদের দেশের তীর্থপুরীর মতই নতুন পুরাণোর সমষ্টি, যেন জীবন্মৃত একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান। এক সময়ে এখানকার বর্ম্ম চর্ম্ম ইস্পাতের কাজ, সুন্দর কলমে লেখা কোরাণ ইত্যাদি প্রসিদ্ধ ছিল।

* * * *

আবার নদী পার হয়ে টেহেরানের পথে যাওয়া গেল। এবার খাঁটি মরুভূমি, চারিধারে বালি ধু ধু করছে, দূরে উটের সারি—ক্যারাভান। উত্তর-পশ্চিমে চলেছে, মাঝে মাঝে একটা যাত্রী-বোঝাই মোটরলরী উল্টাদিক থেকে এসে ধুলো-বালির ঝড় উড়িয়ে মরুভূমির চিত্রটি সম্পূর্ণ করে দিচ্ছে।

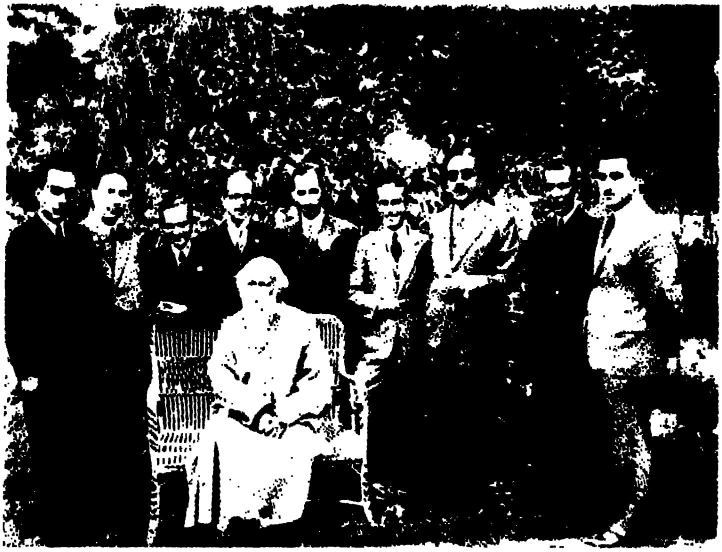
* * *

একদিনে ইস্পাহান থেকে টেহেরান, পথে মুর্চে খার, মেইমেহ্, রোবাৎতুর্ক, দেলিজান, কুম্, আলি আবাদ ও হাসান আবাদ! আগে এই পথ লোকে পনর কুড়ি দিনে যেতে পারলে খুশী হ'ত, তা-ও লোকলস্কর পাইক বরকন্দাজ সঙ্গে নিয়ে, এবং অজস্র টাকা খরচ করে। এটা সম্ভব হয়েছে মোটরকার ও রিজা শাহ পাহ্লবীর রাস্তা-ঘা'টের ব্যবস্থার গুণে।

ইস্ফাহান, কুম্, ইত্যাদিতে বিজলীবাতি মোটর, টেলিফোন এই-সব থাকা সত্ত্বেও কি রকম যেন মনে হ'ত যে, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যেই রয়েছি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম



টেহেরানের একটি নগর-তোরণ



জনাব ডাস্টি (কবির পশ্চাতে, বুকে রুমাল) ও নব্য ইরাণি সঙ্ঘ

বাগানের মধ্যে প্রাসাদ, সেখানে আমাদের সকলের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। এখানে কবির জন্ম প্রায় সকল প্রকার আধুনিক ব্যবস্থাই ছিল। আসাদি নামে এক ভদ্রলোক কবির অনুবাদক এবং আতিথ্যের ব্যবস্থাপক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

যথাস্থানে উপস্থিত হওয়া গেল। পথে প্রায় একমাস, (কবির হিসাবে তিন সপ্তাহ, কেন না, তিনি সাতদিন পরে কলিকাতা থেকে যাত্রা করেন) এবং এই মাসের মধ্যে এত নতুন জিনিষ দেখাশোনা এবং অন্ত ভাবে উপলব্ধি করাগেছে যে, তার সম্যক পরিচয় পেলাম টেহেরানের কাছে এক বিট চিনির কারখানায়। কল-কারখানা ধূমায়মান চিম্‌নি এই-সব দেখে মনে হল যে, সভ্যতার (?) মধ্যে ফিরে এলাম। আরও এগিয়ে একটি অতি ক্ষুদ্র রেলওয়ে—টেহেরান থেকে শাহ্‌ আব্দল আজিমের দরগা ও মস্‌জিদ পর্য্যন্ত—দেখা গেল। এবার বিংশ শতাব্দীর ইরাণে এসে পড়েছি সুনিশ্চয়।

টেহেরানে প্রবেশের পথে জগদ্বিখ্যাত রাগিস বা রায়ই নগরীর ভিত্তির উপর দিয়ে গেলাম। সন্ধ্যার অন্ধকারে কিছুই বোঝা গেল না—দিনের আলোতেও পার্থবদের এই প্রসিদ্ধ পুরীর বিশেষ কিছু দেখতে পাওয়া যায় না, যা ভগ্নাবশিষ্ট আছে তাও মৃত্তিকাস্তুপের নীচে।

নগর প্রবেশের সময় কবির প্রথম সম্বর্দ্ধনা করলেন টেহেরানের জরথুস্ত্রী সম্প্রদায়। সেখানে অনেক গণ্যমান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে মান্যবর পারস্যের শিক্ষাসচিব কবিকে অভ্যর্থনা ক'রে নিজের গাড়ীতে তাঁকে নিয়ে চললেন। শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগের বন্ধু আকা রহিমজাদা সাফাবী আমার সঙ্গে এসে আলাপ করলেন। অল্পক্ষণ আলাপের পর আমাদের জন্ম নির্দ্ধারিত বাগ নেয়েরেদ্দৌলেহ্‌ উদ্যান প্রাসাদে যাওয়া গেল। সুন্দর



শ্রীযুক্ত ফুরুঘি

বর্ণনায় একটা বড় বই লেখা চলে। তার সামান্ত আভাসমাত্র পাঠক এই প্রবন্ধগুলিতে যদি পেয়ে থাকেন তবে লেখক সন্তুষ্ট।

*   *   *

কবির অভ্যর্থন সম্বৰ্দ্ধনা, লোকজনের দেখা শুনা আলাপ-পরিচয় ইত্যাদি এবার যথার্থ রাজসিক ভাবে আরম্ভ হ'ল। বুশীরে, শিরাজে ও ইস্ফাহানে এ-সব ব্যাপারের যা পরিচয় ও অভিজ্ঞতা হয়েছিল, এখন দেখা গেল আসল ব্যাপারের কাছে সেটা যৎসামান্য মাত্র।

সাড়ে ছয় লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত, সওয়াকোটি অধিবাসীযুক্ত, ইতিহাস-প্রখ্যাত একটি রাজ্যে যাঁহারা নূতন জীবন নূতন উদ্যম এনেছেন সেই সকল আন্তর্জ্জাতিক প্রসিদ্ধিযুক্ত লোকের সঙ্গে তিন সন্ধ্যা আদান-প্রদান, সঙ্গে সঙ্গে বহুদেশের রাজদূত, উচ্চপদস্থ গণ্যমান্য লোক, অসংখ্য চিঠিপত্র, টেলিফোন, টেলিগ্রাম, সভাসমিতি ভোজ ইত্যাদির রাজসূয় পর্ব্ব দু-সপ্তাহের উপর ধরে ক্রমাগত চলল। পারস্যের যত সভাসমিতি, যত সাহিত্যিক রাজনীতিক সকলের সঙ্গে আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ আলাপ-পরিচয় এরই মধ্যে করে নিতে হ'ল।

এখানে আমাদের প্রধান সহায় ও কর্ণধার ছিলেন তিনজন বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী, মহামান্য ফুরুঘি (বৈদেশিক মন্ত্রী), মান্যবর শিক্ষাসচিব ও আবৃবাব কৈখসরো শাহরোখ (পারস্য পার্লামেন্টের অধ্যক্ষ) এবং পরোক্ষভাবে ছিলেন শ্রীযুক্ত ফুরুঘি (বৈদেশিক মন্ত্রীর ভ্রাতা এবং ইরাণ সাহিত্য পরিষদের সভাপতি)।

*   *   *

টেহেরানের সম্বৰ্দ্ধনার ব্যাপারে আঠারটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হয়।

১। ২রা মে কবির রাজদর্শন ও সম্ভাষণ। মহামহিম রিজা শাহ পাহ্‌লবী অতিশয় প্রীতির সহিত প্রায় একঘণ্টা কবির সঙ্গে রাজপ্রাসাদের খাস কামরায় বসে আলাপ করেন। কবির সমস্ত কার্য্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন এবং তাঁহাকে স্বাগত করেন।



মান্যবর শিক্ষাসচিব। মহামান্য ফুরুখি

২। ৫ই মে শিক্ষাবিভাগের প্রধান হলে কবিকে নাগরিক সম্বৰ্দ্ধনা করা হয় এবং সেইদিন কবি তাঁহার পারস্য অভিভাষণ পড়েন।

৩। ঐ দিন বিকালে টেহেরানের প্রধান সঙ্গীত বিদ্যালয়ে কবিকে টি-পার্টি এবং অভিনন্দন দেওয়া হয়।

৪। ৬ই মে কবির জন্মদিন উপলক্ষ্যে ইরাণরাজের আদেশে বাগ নেয়েরেদ্দৌলেহ্‌তে সমস্ত দিন উৎসব হয়। সমস্ত দিন লোকজন খাওয়ান, কয়েক হাজার লোকের অভিবাদন ও অভিনন্দন গ্রহণ ও দেশ-বিদেশ থেকে টেলিগ্রামের রাশি পাওয়া, নেয়েরেদ্দৌলেহ্‌ প্রাসাদের সমস্ত (বিরাট হলটি বিশেষ করে) ফুল দিয়ে সাজান, এবং বহু লোকের অভিনন্দন-পত্র, ফুলের ডালি এবং অসংখ্য উপহার গ্রহণে সমস্ত দিন সকলের অবিশ্রান্ত খাটুনি চলে। পারস্যরাজ কবিকে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের

প্রথম শ্রেণীর রাজকীয় পদক ও সনদ দেন। মহামান্য ফুরুঘি, শ্রীযুক্ত ফুরুঘি, মহামান্য তৈমুরতাশ্ (তখন প্রধান মন্ত্রী—এখন রাজনৈতিক ব্যাপারে কারারুদ্ধ) আরবাব কৈখসরো শাহ্‌রোখ, মান্যবর শিক্ষাসচিব, জরথুষ্ট্রী সম্প্রদায়, আর্ম্মানি সম্প্রদায়, টেহেরানের ভারতীয় সম্প্রদায়, ইত্যাদি সকলের কাছ থেকে নানাপ্রকার মূল্যবান উপহার আসে। রাত্রে বৈদেশিক মন্ত্রী এবং অন্য কয়েকজন



টেহেরান-প্রবাসী ভারতীয়দিগের কবি-সম্বর্দ্ধনা

উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী কবির সঙ্গে সায়াহ্ন ভোজন করেন।

৫। ৭ই মে কবির জন্য টেহেরান থিয়েটারে বিশেষ অভিনয় হয়।

৬। ৮ই মে আফগান রাজদূতের ভবনে সায়াহ্ন ভোজন, বহু রাজকর্ম্মচারী ও বিশিষ্ট ব্যক্তির নিমন্ত্রিত।

৭। ৯ই, মে কবি বাগ নেয়েরেদ্দৌলেহ্ উদ্যানে সাধারণের জন্য বক্তৃতা দেন। বিষয় "মানব জীবনে ললিত কলার স্থান।"

৮। ঐ দিনে কবির জরথুষ্ট্রী স্কুল দর্শন এবং জরথুষ্ট্রীদের অভিনন্দন গ্রহণ।

৯। ১০ই মে পারস্যের সাংবাদিক সঙ্ঘের কবিকে অভিনন্দন দান ও টি পার্টি।

১০। ১১ই মে পারস্যের জার্ম্মান রাজদূতের উদ্যান-ভবনে মধ্যাহ্ন ভোজন ও চা পান। পারস্যের যত গণ্যমান্য জার্ম্মান প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

১১। ঐ দিন সন্ধ্যাবেলায় জনাব ডাস্টি (পারস্যের নবীন সম্প্রদায়ের নায়ক ও পার্লামেণ্টের সভ্য) কর্ত্তৃক আহূত সভায় নব্য পারস্য সম্প্রদায়ের অভিনন্দন ও কবির অভিভাষণ।

১২। ১২ই মে মহামান্য ফুরুঘির ভবনে মধ্যাহ্ন ভোজন। রাষ্ট্রীয় ও বৈদেশিক বিশিষ্ট লোক অধিকাংশেরই উপস্থিতি।

১৩। ঐ দিন টেহেরান প্রবাসী ভারতীয়দিগের অভিনন্দন।

১৪। ঐ দিন আর্ম্মানি সম্প্রদায়ের অভিনন্দন ও টি-পার্টি।

১৫। ১৩ই মে আরবাব কৈখসরো শাহ্‌রোখের ভবনে সায়াহ্ন ভোজন ও গীতবাদ্যের ব্যবস্থা।

১৬। ঐ দিন বিকালে আমেরিকান কলেজে টি-পার্টি এবং কবিকে অভিনন্দন।

১৭। ১৪ই মে মিশর রাজদূতের ভবনে মধ্যাহ্ন ভোজন।

১৮। ঐ দিন ব্রিটিশ রাজদূতের ভবনে টি-পার্টি।

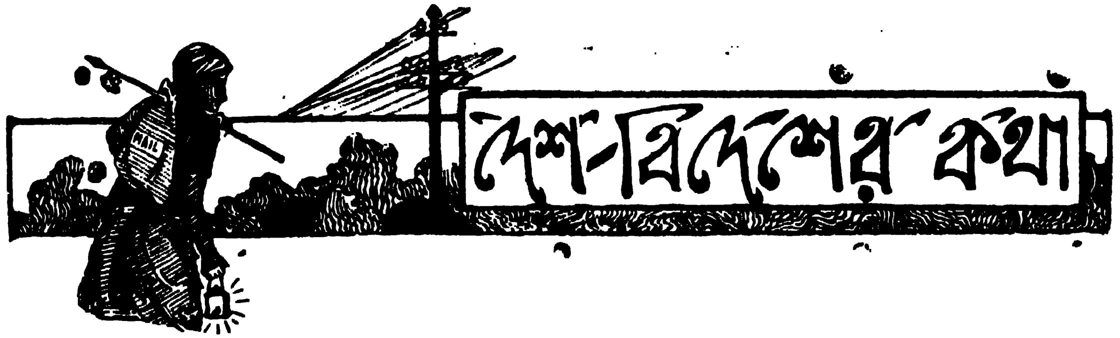
এই ব্যাপারগুলি প্রত্যেকটি বিশেষ সমারোহের সঙ্গে হয়। এ ছাড়া ছোট-খাট অনেক উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হয়, এই প্রবন্ধের মধ্যে তার স্থান দেওয়া মুস্কিল। আর্ম্মানি সম্প্রদায়ের একটি মহিলা (তরুণী বললেই চলে, এত কম বয়স) টেহেরানে মণ্টিসোরীর ধরণে ছোট ছেলে মেয়েদের স্কুল করেছেন। কবি সময়াভাবে সেখানে যেতে পারেননি, কাজেই তিনি কয়েকটি ছাত্রছাত্রী এনে কবির সামনে সুন্দর নাচ গান দেখালেন। ভদ্রমহিলা—বরুসালি



কুমারী বেরসালি হম্পিয়ান ও তাঁহার ছাত্র-ছাত্রীর কয়েকটি

হম্পিয়ান নামে—বাচ্চাগুলিকে বেশ শিখিয়েছেন, তারা বেশ হাসিখুশী ও সপ্রতিভ। অনেকগুলি ছোটবড় স্কুল কবি ঘুরে দেখলেন। অনেক দার্শনিক, কবি, গায়ক গায়িকা এসে কবির সঙ্গে আলাপ করলেন। গান বাজনারও ব্যবস্থা অনেক রকম হয়েছিল।

আমাদের শহর দেখা-শোনা এরি মধ্যেই করতে হয়েছিল। তবে দেখা-শোনাই লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কাজেই খাওয়া-দাওয়া এবং অন্য গৌণ অনেক ব্যাপার বাদ ও ফাঁকি দিয়েই যথাসম্ভব কার্য্যসিদ্ধি করতে হয়।



ভারতবর্ষ

কয়েকটি জ্ঞাতব্য কথা—

ভারতবর্ষের ভাষা

হিন্দী ভাষায় কথা বলে	১২,১২,৫৪৮৯৮ জন
বাংলা „ „	৫,৩৪,৬৮৫৬৯ „
মরাঠী „ „	২,১৩,৫১৩৯৯ „
উড়িয়া „ „	১,১১,৯৪২৬৫ „

জন্ম ও মৃত্যু (১৯৩০) „

জন্ম	৮৬,৯০,৭১৪—হাজারকরা—৩২·৯
মৃত্যু	৬৪,৮৩,৪৪৯—হাজারকরা—২৪·৫

ভারতবাসীর বাৎসরিক আয়

নৌরজীর মতে—(১৮৭০)	২০৲
ডেভিড্ বারবারোর মতে—(১৮৮২)	১৭৲
লর্ড কার্জ্জনের মতে—(১৯০১)	৩০৲
মিঃ বুকের মতে—(১৯১১)	৫০৲
প্রঃ শ্লেটারের মতে—(১৯২৫)	১০০৲
ষ্টাটিউটারী কমিশন—(১৯২৯)	১০৮৲
চাষীর ঋণ প্রায়	৯০০ কোটী টাকা
মহাজনের সংখ্যা	৪৫ হাজার

মিল ও মজুর

	মিল	মজুর
কাপড়ের কল	২৯৫	৩৩৮ হাজার
পাট কল	৯৫	৩৫৭ „
অন্যান্য সূতার	৬৮	১৯ „
টেক্‌ষ্টাইল	৪৫৮	৬৯৬ „
ইঞ্জিনিয়ারিং	৮৭১	৩১৫ „
অন্যান্য	১১২২	১৫৫ „
	খনি	মজুর
কয়লা	৫৮৪	১৫৬ হাজার
ম্যাঙ্গানিজ	১২৫	×
মাইকা (অভ্র)	৪৬৪	×

রেলওয়ে—

মোটর রেল লাইন	৪১ হাজার মাইল
বাৎসরিক গড় যাত্রী	৬২ কোটী
[illegible]	প্রায় ৭৫০ কোটী টাকা

বীমা কোম্পানী—(১৯৩০)

দেশী	১৩০
বিদেশী	১৪৭
কতকগুলি পলিসি দেশী	১,০৫,৬৮৬
বিদেশী	৩৯,৫২৩
বীমার পরিমাণ—	
দেশী	প্রায় ১৬ কোটী
বিদেশী	১২ কোটী
মোট জীবন বীমা—	
দেশী	প্রায় ৮৫ কোটী টাকা
বিদেশী	৭০ কোটী

—"বঙ্গবাণী" ও স্বায়ত্ত-শাসন পত্রিকা

স্বর্ণ রপ্তানী—

এখনও ভারত হইতে স্বর্ণ রপ্তানী বন্ধ হয় নাই। গত ১৪ই জানুয়ারি যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে ১,৯৮৩,৪,০৪০ টাকার স্বর্ণ বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। ব্রিটেন স্বর্ণমাণ পরিত্যাগ করার পর অবধি বোম্বাই হইতে এ পর্য্যন্ত মোট ১০৭,৮১,৬৫,২০৮ টাকার স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

—ত্রিপুরা হিতৈষী

পুলিশ—

১৭৯৩ সালে দেশীয় জমিদারের হাত হইতে পুলিশের কাজ ছাড়াইয়া লইয়া তৎকালীন বড়লাট লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রথম পুলিশের প্রবর্ত্তন করেন। সি. আই. ডি. পুলিশের প্রবর্ত্তন করেন লর্ড কার্জ্জন ১৯০২ সালে।

বর্ত্তমান ভারতের পুলিশের সংখ্যা—

ইনস্‌পেক্টর জেনারেল ও ডেপুটী ইনস্‌পেক্টার	৪৭
সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট	৩৩১
এসিস্‌ট্যাণ্ট সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট	৩০১
ডেপুটী „	৩৫৮
ইনস্‌পেক্টর	১,৭১৬
সাব ইনস্‌পেক্টর	১১,১৭১
	৩৮৫ "
হেড কনেষ্টবল	২১,৮৫৮ "
কনেষ্টবল	১,৪৩,৬১৬ "
মোট	১,৭৯,৭৮৩ জন



শ্রীযুত ডি গুহের সৌজন্যে   পুরী মহিলাসমিতি

অপরাধী—

আমাদের দেশে কি পরিমাণ লোক বিনা অপরাধে নির্য্যাতিত হয়?

	গ্রেপ্তার	শাস্তিপ্রাপ্ত	শতকরা
পুনা	৬,৪২২	১,৮৭৭	২৯ জন
ডাকাতি	৩,২২৩	৭৯৯	২৪ জন
চুরি	১,৬,০১৪৪	৪৬,১০০	২৮ জন
ট্রেসপাস ইত্যাদি	১,৭১,৮৮০	২২,৫৯৬	১৩ জন

—সঙ্ঘ

মিরাট মামলার রায়—

দীর্ঘকাল পরে মিরাট মামলার রায় প্রকাশিত হইয়াছে। অনেকগুলি আসামী প্রায় ৪ বৎসরকাল হাজতে অবস্থান করিয়াছে।

গত ১৬ই জানুয়ারী সোমবার মিরাটের দায়রা জজ মিঃ ইয়র্ক মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার রায় দিয়াছেন। তিনজন ব্যতীত সমস্ত আসামীই কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

দণ্ডের পরিমাণ

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস—(১) মজঃফর আমেদ। ১২ বৎসর দ্বীপান্তর বাস—(২) ডাঙ্গে, (৩) স্প্র্যাট, (৪) ঘাটে (৫) যোগলেকার ও (৬) নিম্বকার। ১০ বৎসর দ্বীপান্তর বাস—(৭) ব্র্যাডলি, (৮) মিরাজকার ও (৯) উসমানী। ৭ বৎসর দ্বীপান্তর বাস—(১০) সোহান সিং যোশী (১১) মজিদ ও (১২) গোস্বামী। ৫ বৎসর দ্বীপান্তর বাস—(১৩) অযোধ্যা প্রসাদ, (১৪) অধিকারী (১৫) পি, সি, যোশী ও (১৬) দেশাই। ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড—(১৭) চক্রবর্ত্তী, (১৮) বসাক, (১৯) হাচিনসন (২০) মিত্র, (২১) ঝাবওয়ালা ও (২২) সেগাল। ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড—(২৩) সামসুল হুদা, (২৪) আলে (২৫) কাসলে, (২৬) গৌরীশঙ্কর, ও (২৭) কদম।

বেকসুর খালাস

(১) শ্রীকিশোরীলাল ঘোষ, (২) শ্রীশিবনাথ ব্যানার্জ্জি ও (৩) ডাঃ এন মুখার্জ্জী। এই মামলায় মোট ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

—হিতবাদী

মিউনিসিপালিটীতে যুক্ত নির্ব্বাচন—

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সদস্যদের সমবেত সভায় করাচী মিউনিসিপালিটী ২৪-৮ ভোটে মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে আসন নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া যুক্ত-নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তনের জন্য এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

এ, পি

পুরী মহিলা সমিতি—

গত ২৪এ পৌষ স্থানীয় তিনকোনিয়া বাগানের গাছপালা ও ফুলে ভরা সুন্দর দৃশ্যের মধ্যে প্রশস্তক্ষেত্রে বৃহৎ চন্দ্রাতপতলে পুরী মহিলা-সমিতির পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন ও তদুপলক্ষ্যে উদ্যানসম্মিলনী হইয়াছিল। সমিতির সদস্যাগণ এবং নিমন্ত্রিতা মহিলা ও বালক-বালিকা মিলিয়া বৃহৎ সভাস্থানটি একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। শ্রীযুক্তা নবনিধি পাহানি মহোদয়া সভানেত্রীত্ব করিয়াছিলেন। প্রথমে সমিতির সদস্য ও নিমন্ত্রিত মহিলাদের কয়েকজন মিলিয়া একটি গ্রুপ ফটো তোলা হয়। পরে একটি বৈদিক মঙ্গলাচরণ পঠিত হয়। সম্পাদিকা সমিতির বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করিলেন। উহাতে জানা যায় যে, গত বৎসরের প্রথমে সমিতির তহবিলে ৮২॥৵০ ছিল। বৎসরের খরচ বাদে এখন তাহা ১১১১৶০ হইয়াছে। ইহার ভিতর সমিতি হইতে একটি আনন্দবাজার হইয়াছিল, খরচ বাদে তাহাতে ১৮৮॥৶১০ লাভ হয়। বাকি টাকা সভ্যাদের চাঁদা হইতে সংগৃহীত। কালেক্টর মহোদয়ের নিকট বিনা খাজনায় জমি পাইবার আশ্বাস পাওয়ায় এই অর্থ সমিতির গৃহনির্ম্মাণের জন্য সঞ্চিত হইতেছে। সমিতি হইতে একটি লাইব্রেরী গঠিত হইতেছে এবং ইহা ইতিমধ্যেই মহিলাদের অনুরাগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। দান দাতব্যও সমিতি হইতে সময়ে সময়ে হইয়া আসিতেছে এবং নিয়মিত সাহায্যও কিছু কিছু হইতেছে। মেয়েদের পারিবারিক, সামাজিক, শিক্ষাবিষয়ক, আর্থিক,

রাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক সর্ব্ববিধ অবস্থার উন্নতি ও অধিকার প্রসার এই সমিতির উদ্দেশ্য। সেইজন্ম সকল বিষয়েরই উন্নতিমূলক প্রবন্ধাদি পাঠ, আলোচনা দ্বারা সে সম্বন্ধে মেয়েদের মনকে জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। দেশের সাধারণ উন্নতি ও কল্যাণমূলক বিষয়ের আলোচনা, মেয়েদের মধ্যে খেলাধূলা, আমোদ আহ্লাদ, সামাজিকতা ইত্যাদিও ইহাতে হয়।

কার্য্যবিবরণী পাঠের পর সমিতির নূতন মুদ্রিত নিয়মাবলী সকলের মধ্যে বিতরিত হইল। অস্পৃশ্যতা নিবারণকল্পে যৎকিঞ্চিৎ সহায়তার জন্ম রবীন্দ্রনাথের অস্পৃশ্যতা দূর বিষয়ের নূতন পুস্তিকা সমাগত মহিলাদের মধ্যে বিক্রয়ের জন্ম সমিতি হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। মহিলারা অনেকেই তাহা ক্রয় করিয়া উহাতে আপনাদের সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন, ঐ অর্থ শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী সংস্কার সমিতিতে প্রেরিত হইবে। তাহার পর একটি সুদক্ষ ওস্তাদের সেতার বাজনা হইল। বালিকারাও গান করিল। শেষে জলযোগান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

বাংলা

বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের আদেশানুসারে শীঘ্রই আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায় বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রচলন করা হইবে। উক্ত অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার কার্য্য পরিচালন জন্ম ৫ জন সভ্য লইয়া এক শিক্ষা বোর্ড গঠিত হইয়েছে। আমরা আশা করি, বোর্ডের সভ্যগণ অচিরেই কার্য্য আরম্ভ করিয়া উক্ত আইন কার্য্যে পরিণত করিবেন।

—ত্রিপুরা হিতৈষী

অনুন্নত কাহারা—

সরকার নিম্নলিখিত হিন্দু শ্রেণীগুলিকে অনুন্নত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

আগরিয়া, বাগ্দী, বাহেলিয়া, বাইতি, বাউরি, বেদিয়া, বেলদার, বেরুয়া, ভাটিয়া, ভুঁইমালি, ভুঁইয়া, ভূমিজ, বিন্দ, বিন্ঝিয়া, চামার, ধেনুয়ার, ধোবা, দোসাই, ডোম, দোসাদ, গারো, ঘাসি, গোনরি, হাড়ি, হাজং, হালালখোর, হাড়ি, হো, জেলিয়া, কৈবর্ত্ত, ঝালো, মালো, কাদার, খয়রা, কালওয়ার, কান, কাঁস, কান্দ্রা, কেওরা, কাপালি, কাপুরিয়া, কারেঙ্গা, কস্তা, কউর, খণ্ডাইত, খাতিক, কোরক, কোচ, কোনাই, কোনওয়ার, কেরা, কোটাল, লালবেগি, লোধা, লোহার, মাহার, মালি, মাল, মল্ল, মাল পাহাড়িয়া, মেচ, মেথর, মুচি, মুণ্ডা, মুসাহার, নাগর, নাগেসিয়া, নৈয়া, নমঃশূদ্র, নাথ, নুনিয়া, ওরাওঁ, পালিয়া, পান, পাসি, পাটনি, পোদ, পুন্ড্রী, রাভা, রাজবংশী, রাজু, রাজওয়ার, সাঁওতাল, সাগির্দপেশা, সুকলী শুঁড়ি, তিয়র ও তুরী।

যাঁহারা ইহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইতে চাহেন না তাঁহাদিগকে ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে গবর্ণমেণ্টকে জানাইতে হইবে।

—আর্য্যগৌরব

পল্লীশ্রী ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার—

গত শ্রীপঞ্চমী তিথিতে পল্লীশ্রী সঙ্ঘের উদ্যোক্তৃগণ কলিকাতা ৬-বি, ডাফ্ লেনস্থ বাবু জিতেন্দ্রনাথ নিয়োগী মহাশয়ের ভবনে একটি ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। জনসাধারণের মধ্যে সর্ব্বোপায়ে শিক্ষা প্রচারই উক্ত সঙ্ঘের একমাত্র লক্ষ্য। সঙ্ঘ নায়ক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অশেষ চেষ্টায় ইহা সম্পন্ন হইয়াছে।

—বঙ্গবাণী

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঘটক, এম্-এস্‌সি, পি এইচ-ডি, ডি-আই-সি—

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঘটক সম্প্রতি বিলাত হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বিলাত গমনের পূর্ব্বে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। তিনি লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অব্ সায়েন্সে



শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঘটক

জগদ্বিখ্যাত অধ্যাপক ডি. এইচ. ব্লকম্যান, এফ্-আর্-এস্ ও ডক্টর আর. টি টাবর-এর অধীনে থাকিয়া গাছপালার রোগনির্ণয় ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে গবেষণা ও মৌলিক আবিষ্কারাদি করেন। তাঁহার গুণপণা দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে হাক্‌স্‌লি পরীক্ষাগারে গবেষণা করিতে অনুমতি দেন। তিনি একটি নূতন germs of fungus, যাহা সাধারণতঃ গাছপালার রোগ উৎপাদন করে, আবিষ্কার করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সাফল্য কামনা করি।

মহাজনদের বদান্যতা—

হেমন্তকালে নহাইরঘাট (শ্রীহট্ট) হইতে ঠাকুরবাড়ী পর্য্যন্ত যাতায়াতের জন্য একটি রাস্তা আছে। ইতিপূর্ব্বে লোকালবোর্ড প্রতি বৎসরই এই রাস্তার কয়েকটি খালের উপর পুল নির্ম্মাণ করাইয়া দিতেন। কিন্তু 'ভিলেজ অথরিটি'র উপর ঐ কাজের ভার ন্যস্ত হওয়ার দুই এক বৎসর পর হইতেই আজ কয়েক বৎসর যাবৎ পুল নির্ম্মাণ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। স্থানীয় জনৈক জমিদারের প্রজা খালে খেয়া দিত।

ইহাতে জন-সাধারণ ও ব্যবসায়ীদের দুর্দশার আর অন্ত ছিল না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য এবার ঠাকুরবাড়ী বাগানের মহাজনগণ বহু অর্থব্যয়ে একটি পুল তৈয়ার করাইয়া দিয়াছেন।

—জনশক্তি

অমৃতময়ী টেক্‌নিক্যাল স্কুল—

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী রায় বাহাদুর বিনোদবিহারী সাধু খাঁ মহাশয়ের বহু যত্ন ও চেষ্টায় খুলনা জেলার কপোতাক্ষ নদীর তীরবর্ত্তী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কপিলমুনি নামক স্থানে অমৃতময়ী টেকনিকাল স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। এই স্কুল স্থাপন উদ্দেশ্যে তিনি যথেষ্ট অর্থব্যয়ও করিয়াছেন। এই স্কুলে নিম্নলিখিত বিভাগ সমূহ খোলা হইতেছে :—(১) ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, (২) ইলেকট্রিকাল বিভাগ, (৩) মেকানিকাল (যানবীয় মেসিনের কাজ শিক্ষা) বিভাগ, (৪) স্মিথি (কামারের কাজ ও যন্ত্রাদি প্রস্তুত শিক্ষা) বিভাগ, (৫) কার্পেন্টার (কাঠের কাজ) বিভাগ, (৬) বয়ন বিভাগ, (৭) কৃষি বিভাগ, (৮) সেলাই (দর্জ্জির কাজ) বিভাগ, (৯) মৃৎশিল্প বিভাগ। পঞ্চাশ জন ছাত্রের থাকিবার মত বিজলী বাতির ব্যবস্থাসহ সুন্দর হোটেল আছে। স্থানটিও স্বাস্থ্যকর। বাঙালী ছাত্রগণ এই বিদ্যালয়ে অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ভবিষ্যতে উপার্জ্জনক্ষম হইতে পারিবে।

—ত্রিপুরা হিতৈষী

পুরুষদের কলেজে মহিলা অধ্যাপক—

কলিকাতার স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক পদে এক মহিলাকে নিয়োগ করা হইয়াছে। ইঁহার নাম মিস্ লোগান।

বিদেশে বাঙালীর কৃতিত্ব—

সুযোগ ও সুবিধা পাইলে ভারতীয়গণ যে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিতে পারে, তাহার পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। আসামের ধুবড়ী জেলার অধিবাসী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহার একটি প্রমাণ। তিনি ১৯০৫ সালে কলিকাতা হইতে এফ-এ পাস করিয়া ১৯০৭ সালে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য আমেরিকায় যাত্রা করেন। সেখানে নানা উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া নিজের শিক্ষার ব্যয় নিজেই নির্ব্বাহ করিয়া ১৯১৪ সালে ডিগ্রী লাভ করেন। তাহার পর নানা শিল্প প্রতিষ্ঠানে ও রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানে কার্য্য করেন। সম্প্রতি তিনি সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের উরল নদীর পার্শ্বস্থিত ম্যাগনিটোষ্ট্রয় (Magnitostroy) নামক এক বিরাট লৌহ কারখানার প্রথম সহকারী নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার পদের মর্য্যাদা ইহা হইতে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই কারখানার নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হইলে ইহা সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবে। ইহা হইতে বৎসরে ২৭,০০,০০০ টন ইস্পাত তৈয়ারী হইবে। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই সাফল্য সহজে লাভ হয় নাই। ইহা ২৫ বৎসরেরও উপর সময়ের সাধনার ফল। তাঁহার এই সাফল্যে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতীয়গণের মস্তিষ্কের শক্তি পৃথিবীর অন্যান্য জাতির তুলনায় কোন অংশ কম নহে।

—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

মহিলা শিল্প প্রদর্শনী—

নারী শিক্ষা সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা অবলা বসু জানাইতেছেন—

আগামী ৫ই মার্চ্চ (বাং ২১এ ফাল্গুন) রবিবার শিল্প ও নানাবিধ কারুকার্য্যের উন্নতিকল্পে একটি মহিলা-শিল্প প্রদর্শনী খোলা হইবে। প্রদর্শনী সাত দিন খোলা থাকিবে।

১। স্থান—বিদ্যাসাগর বাণী-ভবন আশ্রম, ২৯৪।৩ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

২। সময়—২টা হইতে ৬টা।

৩। প্রবেশ ফি :—পুরুষদিগের জন্য—৵০, মহিলা ও বালকদিগের জন্য—/০, ফি দ্বারে গৃহীত হইবে।

৪। ষ্টল—(নানাবিধ জিনিষ বিক্রয়ের জন্য) পরিসর—৭৷০ × ৭৷০ ফুট, বাঁধান ষ্টল দুইটি বিজলী বাতী পয়েন্ট সহ ভাড়া ১০৲।

এই উপলক্ষ্যে মহিলাদিগকে হস্তনির্ম্মিত নানাপ্রকার শিল্প ও কারুকার্য্য প্রদর্শনী কমিটির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা শ্যামমোহিনী দেবীর নামে ২৮ নং বাদুড়বাগান লেন (বাণী-ভবনে) পাঠাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারি হইতে ২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত প্রদর্শনীর দ্রব্যাদি গৃহীত হইবে। দ্রব্যাদির দুইটি তালিকা তৎসঙ্গে প্রেরণ করিতে হইবে। প্রত্যেক জিনিষে নির্ম্মাতার নাম ও ঠিকানা ও মূল্যের টিকিট লাগান না থাকিলে তাহা গ্রহণ করা হইবে না। সম্পাদিকাকে খবর পাঠাইলে তিনি লোক পাঠাইয়া প্রদর্শনীর জন্য দ্রব্যাদি আনাইতে পারিবেন। কোন জিনিষ নষ্ট হইবার বা হারাইয়া যাইবার আশঙ্কা নাই।

যাঁহারা প্রদর্শনীতে 'ষ্টল' লইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ২০এ ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রদর্শনী কমিটির সম্পাদিকা মহাশয়ার নিকট নারী-শিক্ষা সমিতির আপিস ৬।১ বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটে আবেদন করিবেন। ষ্টলের ভাড়া ১০৲ টাকা আবেদন পত্রের সহিত জমা দিতে হইবে।

নিম্নলিখিত বিভাগে কার্য্যের উৎকৃষ্টতা অনুসারে পারিতোষিক দান করা হইবে। জেলা হিসাবে প্রদর্শিত দ্রব্যাদির জন্য বিশেষভাবে পারিতোষিকের ব্যবস্থা করা হইবে।

(১) বয়ন—সূতী, রেশম। (২) চাঁচের কাজ। (৩) সাধারণ সেলাই। (৪) জ্যাম, জেলী, চাটনী। (৫) বেতের কাজ। (৬) লক্ষ্ণৌর কাজ। (৭) চট ও কার্পেটের আসন। (৮) মাটীর কাজ। (৯) চরকা। (১০) পুঁথির কাজ। (১১) কাগজের কাজ। (১২) চিত্রকলা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—প্রতিদিন অপরাহ্নে শিক্ষাপ্রদ বিষয়ে বক্তৃতা ও আমোদজনক ক্রীড়াকৌতুকের ব্যবস্থা করা হইবে।

বিধবা বিবাহ—

গত ২০শে অগ্রহায়ণ আসানসোলে লোকালবোর্ডের এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীসুরেন্দ্রমোহন চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী উষারাণীর সহিত কলিকাতা বাগবাজার নিবাসী শ্রীমান্ ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ গোঁড়া হিন্দুমতে সুসম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রটি স্থানীয় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে কাজ করেন এবং বিনা কপর্দ্দকে বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার এরূপ উদারতা প্রশংসনীয়। বিবাহ সভাতে স্থানীয় গণ্যমান্য লোক এবং মহিলাবৃন্দ আনন্দের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। আসানসোল শহরে এরূপ বিবাহ এই প্রথম।



বঙ্গের অবনত শ্রেণীসমূহের তালিকা

বাংলা দেশে কাহারা "অস্পৃশ্য" বা অন্য প্রকারে "অবনত", তাঁহাদের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় স্বতন্ত্র আসন রাখা দরকার কি-না, তর্কস্থলে দরকার মানিয়া লইলেও কতগুলি আসন দরকার, ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনায় কিছু আশঙ্কার কারণ আছে। তাহা এই। সরকারী মতে যাঁহারা অবনত, তাঁহাদের মনে এই সন্দেহ হইতে পারে, যে, গবর্মেণ্ট ও পুণা-চুক্তি তাঁহাদিগকে যাহা দিয়াছে, আলোচকেরা তাঁহাদিগকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিতেছে। যাঁহাদের মনে এইরূপ সন্দেহ হইবে, তাঁহাদের সেই সন্দেহ দূর করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত না হইতে পারে। তথাপি, ইহা বলা দরকার মনে করি, যে, আমাদের জা'ত নাই, আমরা কাহাকেও অস্পৃশ্য মনে করি না, সেরূপ ব্যবহার করি না, ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই ও কখনও ছিল না, এবং সমগ্র দেশের মঙ্গলপ্রয়াসী, যোগ্য, স্বাধীনচিত্ত যে-কোন লোক ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করুন, তাহাতে আমরা সন্তুষ্ট, এবং তাঁহার ধর্ম্মমত ও জা'তের বিচার করা আমাদের মতে অনুচিত ও অনাবশ্যক।

বাংলা গবর্মেণ্ট গত ১৯শে জানুয়ারীর কলিকাতা গেজেটে হিন্দু সমাজের অবনত জাতিদের একটি তালিকা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, যে, ইহা চূড়ান্ত নহে, সমালোচনার জন্য প্রকাশিত হইয়াছে। অর্থাৎ ইহা হইতে কোন কোন জাতিকে হয়ত বাদ দেওয়া যাইতে পারিবে, যেমন তালিকাটি প্রকাশিত করিবার পূর্ব্বেই কলু ও তেলীদিগকে এই কারণে বাদ দেওয়া হইয়াছে, যে, তাঁহারা অবনত শ্রেণীসমূহের অন্তর্গত হইবার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট আপত্তি জানাইয়াছিলেন। মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যেও "অস্পৃশ্য" ও অবনত জাতি আছে। কিন্তু তাঁহাদিগকে অন্যান্য মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ানদিগের হইতে আলাদা করিয়া দেখাইয়া তাঁহাদের জন্য ব্যবস্থাপক সভা-সমূহে আলাদা আসন রাখিবার বিধান গবর্মেণ্ট করেন নাই। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে আমরা অসমর্থ। কেবল হিন্দুসমাজের কতকগুলি জাতিকে এবং তাহার সঙ্গে কতিপয় আদিম জাতিকে তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। এই জাতিগুলির নাম ও লোকসংখ্যা (১৯৩১ সালের সেন্সস অনুসারে) নীচে মুদ্রিত হইল।

অবনত জাতি	লোকসংখ্যা
আগরীয়া	২৪০
বাগ্দী	১৮৭৫৭০
বাহেলিয়া	৪৪৪৯
বাগ্তি	৮৮৮৮
বাউরী	৩৩১২৬৮
বেদিয়া	৭২৬৩
বেল্দার	৩১৩৯
বেরুয়া	৩১৩৫
ভাটিয়া	৩২২
ভুঁইমালী	৭৩৮০৪
ভুঁইয়া	৫০৪০৫
ভুমিজ	৮৫১৬১
বিন্দ	১৯৫১৮
বিঝিয়া	৫০২
চামার	১৫০৪৫৮
ধেনুয়ার	৪৪
ধোবা	২২৯৬৭১
দোআই	১৯৬০
ডোম	১৪০০৬৭
দোসাধ	৩৬৪২০
গারো	৩৮২২৮
ঘাসি	৫৬৪০
গোনরি	৫১৪৯
হদি	১৪৩৩৪
হাজং	১৯৬৯৪
হালালখোর	৮৭৬
হাড়ি	১৩২৪০১
হো	২৬
জালিয়া কৈবর্ত	৩৫২০৭২

অবনত জাতি	লোকসংখ্যা
ঝালো, মালো	১৯৮০২৯
কাদার	১১০০
খয়রা	৩৮২৮৭
কালওয়ার	১৩৫৪০
কান	৬৬
কাঁথ	১৫২৫
কাদ্রা	৪৭২৯
কাওরা	১০৭৯০৮
কাপালী	১৬৫৫৮৯
কাপুরিয়া	১৭০
করেঙ্গা	৯৮৫৫
কাহ্	২৬০১
কাউর	১৮০১
খণ্ডাইত	৩৫০৮০
খটিক	১১৫৭
কীচক	২
কোচ	৮১২৯৯
কোনাই	৪১০৫৮
কোনওয়ার	১৩৩
কোড়া	৪৯২৬৫
কোটাল	৭৬৫১
লালবেগী	৪৯১৫
লোধা	১১০০১
লোহার	৫০১৮২
মাগার	১৯৮৬
মাহ্‌লি	১৯১০৬
মাল	১১১৪২২
মাল্লা	২৬২৫৪
মালপাহাড়িয়া	১৩৫২১
মেচ	৯৯৮৪
মেথর	২৩২৮১
মুচি	৪১৪২২১
মুণ্ডা	১০৮৮৮৬
মুসাহর	১১৭৮৪
নাগর	১৬১৬৪
নাগেসিয়া	২২৯১
নৈয়া	৪৮
নমশূদ্র	২০৯৭৯৫৭
নাথ (যোগী, যুগী)	৩৮৪৬৩৪
নুনিয়া	২৮১০০
ওরাওঁ	২২৮১৬১
পলিয়া	৪৩১৬৩
পান	১৮৫৫
পাসি	১৮০৭৫
পাটনি	৪০৭৬৬
পোদ	৬৬৭৭৩১
পুণ্ডরী	৩১২৫৫
রাভা	৩০৫৬

অবনত জাতি	লোকসংখ্যা
রাজবংশী	১৮০৬৩৯০
রাজু	৫৬৭৭৮
রাজওয়ার	৩১৩৩৭
সাঁওতাল	৭৯৬১৫৬
সাগির্দপেশা	৩৩৯
সুক্লি	৩৮৬০
শুঁড়া	৭৬৯২০
তিয়র	৯৫৪১৩
তুরী	১৭৫০২

ফ্র্যাঙ্কিস্ কমিটি কেবল সেই সকল জাতিকে অবনত বলিয়া ধরিতে বলিয়াছিলেন যাহারা স্পর্শ বা সান্নিধ্য দ্বারা ব্রাহ্মণাদি "উচ্চ" জাতিকে অশুচি করে। মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশগুলিতে এই সংজ্ঞা অনুসৃত হইয়াছে। অন্য সকল প্রদেশের বিষয় এস্থলে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা অনাবশ্যক। উত্তর-ভারতের কোন কোন প্রদেশে এই সংজ্ঞা অনুসৃত হইলে প্রধান মন্ত্রীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন। সেই জন্য তিনি বলেন, যে, এই সব প্রদেশে সংজ্ঞাটির পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইতে পারে। বাংলা গবর্মেণ্ট তাঁহার এই মন্তব্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়া এমন কতকগুলি জাতিকে তাঁহাদের তালিকাভুক্ত করিয়াছেন, যাঁহারা সরকারী মতে সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা দিকে অনগ্রসর।

প্রধান মন্ত্রীর মন্তব্যটিরই আলোচনা প্রথমে করা যাক্। দক্ষিণ ভারতের প্রদেশগুলিতে যে-সংজ্ঞা অনুসারে কতকগুলি জাতিকে অবনত গণনা করা হইল, উত্তর-ভারতে সেই সংজ্ঞা কেন অনুসৃত হইল না? ইহার একটা সহজবোধ্য কারণ এই, যে, উত্তর-ভারতে—যেমন বাংলা দেশে—উহা অনুসৃত হইলে এখানে অবনতদের সংখ্যা কম হয়। বঙ্গে অস্পৃশ্য অর্থে অবনতদের সংখ্যা কম হওয়ায় কি অসুবিধা বা ক্ষতি আছে, তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ। যদি কোন প্রদেশে অস্পৃশ্য অর্থে অবনত একটি জাতি বা একটি মানুষও না থাকে, তাহা ত ভালই। কিন্তু সম্ভবতঃ প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের মনে কোনও কারণে এই জেদ জন্মিয়া থাকিবে, যে, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র হিন্দু সমাজকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া নীচের ভাগটাকে ব্যবস্থাপক সভায় স্বতন্ত্র

আসন ও স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনাধিকার দিতে হইবে। দক্ষিণ-ভারতের প্রদেশগুলিতে অস্পৃশ্যতাকে অবনতত্বার লক্ষণ বলিয়া ধরাতেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। উত্তর-ভারতে কেবল বঙ্গের কথাই আমরা আলোচনা করিতেছি। বঙ্গে এমন কোন জা'ত নাই, খুব গোঁড়া ব্রাহ্মণদের মতেও যাঁহারা নিকটে আসিলে ব্রাহ্মণরা অশুচি হন; কিন্তু এমন জা'ত আছেন যাঁহারা ব্রাহ্মণকে ছুঁইলে ব্রাহ্মণ অশুদ্ধ হইয়া যান। কিন্তু এই সব জা'তের লোকসংখ্যা কম। সুতরাং কেবল এই লোকগুলিকে অবনত বলিলে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের নীচের ভাগটা বড় ক্ষুদ্র হইয়া যায়, এবং তাহাদিগকে বেশী আসন দেওয়া যায় না। সেই জন্য, বঙ্গে সংজ্ঞাটা অন্য রকম করা হইয়াছে। এখানে বিভাগের ভিত্তি করা হইয়াছে সামাজিক ও রাজনৈতিক অনগ্রসরতা ("The list has been prepared on the basis of the social and political backwardness of these castes")। যাঁহাদের স্পর্শ বঙ্গে গোঁড়া ব্রাহ্মণদিগকে অশুদ্ধ করে, তাঁহারা ত বঙ্গে অবনত আছেনই; অধিকন্তু, যাঁহারা সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে অনগ্রসর তাঁহারাও এই প্রদেশে সরকার কর্ত্তৃক অবনত বলিয়া গণিত হইয়াছেন। মান্দ্রাজ, বোম্বাই এবং মধ্যপ্রদেশসমূহে যাঁহারা অস্পৃশ্য তাঁহারা ছাড়া অন্য কতকগুলি লোকও তথায় আছেন যাঁহারাও রাজনৈতিক ও সামাজিক হিসাবে অনগ্রসর। এখন জিজ্ঞাস্য এই, বঙ্গে যদি স্পৃশ্য অথচ সমাজে ও রাজনীতিতে অনগ্রসর লোকদিগকে স্বতন্ত্র আসন এবং কতকটা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া ন্যায়সঙ্গত মনে হইল, তাহা হইলে মান্দ্রাজ বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশে স্পৃশ্য অথচ সমাজে ও রাজনীতিতে অনগ্রসর জা'তদিগকে স্বতন্ত্র আসন ও কতকটা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের অধিকার কেন দেওয়া হইল না? প্রশ্নটা আর এক রকমে প্রকাশ করা যাক্। দক্ষিণ-ভারতে যদি কেবল অস্পৃশ্যদিগকেই স্বতন্ত্র আসনাদি দেওয়া রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থার পক্ষে যথেষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে বঙ্গে কেবল অস্পৃশ্যদিগকেই তাহা দেওয়া কেন যথেষ্ট হইল না? দক্ষিণ-ভারতে শিক্ষা, আর্থিক অবস্থা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, রাজনৈতিক প্রচেষ্টা, সামাজিক মর্য্যাদা প্রভৃতি বিষয়ে সমাজে অস্পৃশ্যদের স্থান যেরূপ, বঙ্গে স্পৃশ্য অথচ সরকারী মতে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে অনগ্রসর জাতিসমূহের স্থান তাহার অপেক্ষা উচ্চে।

এই সকল কারণে আমাদের মনে হয়, ঠিক সমশ্রেণীস্থ লোকদের সম্বন্ধে ন্যায্য ব্যবহার ও ব্যবস্থা করা প্রধান মন্ত্রীর ততটা অভিপ্রেত ছিল না, হিন্দুসমাজকে দুটা প্রধান স্বতন্ত্র অংশে বিভক্ত করা বা বিভক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করা যতটা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। আমাদের এই অনুমানের আর একটা কারণ এই, যে, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান ও শিখদের মধ্যেও অস্পৃশ্য ও অবনত জা'ত আছেন। কিন্তু তাঁহাদের জন্য আলাদা আসনাদির ব্যবস্থা করিয়া ঐ তিন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অখণ্ড বিবেচিত হইবার দাবি বিনষ্ট করা হয় নাই।

বাংলা দেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক অনগ্রসরতার ভিত্তিতে হিন্দুসমাজকে দু-টুকরা করা হইয়াছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক অনগ্রসরতা আপেক্ষিক জিনিষ। ইহার কোন নির্দ্দিষ্ট ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা মান নাই। গোঁড়া হিন্দুদের মতে সব হিন্দুই সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণদের পশ্চাদ্বর্ত্তী, দেবার্চ্চনা ও দেবদেবীর মূর্ত্তি ও বিগ্রহ স্পর্শ করিতে কেবল উক্ত ব্রাহ্মণেরাই অধিকারী। কিন্তু তা বলিয়া সমগ্র হিন্দুসমাজে শুব্রাহ্মণ ছাড়া আর সব জা'তকে অনগ্রসর বলা চলিবে না। বস্তুতঃ সামাজিক হিসাবে অগ্রসর ও অনগ্রসরের মধ্যে কোথাও রেখা টানা অসম্ভব। ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সামাজিক মর্য্যাদায় হীন শ্রেণী অনেক আছে। ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট অনেক অনধিকারচর্চ্চা করিয়া থাকেন। সামাজিক বিষয়ে তাঁহারা কেবল সেই সেই স্থলে হস্তক্ষেপ করিতে অধিকারী যেখানে হস্তক্ষেপ না করিলে নিষ্ঠুরতা হয়, বা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় বা উৎসাহ দেওয়া হয়। সামাজিক হিসাবে হিন্দুসমাজে "নীচ জা'ত" কাহারা এবং "উঁচু জা'ত" কাহারা, এই অনধিকারচর্চ্চা ১৯০১ সালের সেন্সস্ রিপোর্টে করা হইয়াছিল। সমগ্র ভারতের সেন্সস্ রিপোর্ট সে বার রিজলী ও গেট সাহেবদ্বয় লিখিয়া পরিশিষ্টে সব জা'তকে

কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। সেই শ্রেণীবিভাগে বাংলা ও উড়িষ্যাকে মোঙ্গোলো-দ্রাবিড়ীয় অঞ্চল ("Mongolo-Dravidian Tract") বলা হইয়াছিল। আমাদের মধ্যে যাঁহাদের "আর্য্যামি" আছে, তাঁহারা ইহাতে সন্তুষ্ট হইবেন না। রিজলী ও গেটের এই শ্রেণীবিভাগে বাংলা ও উড়িষ্যার হিন্দুদিগকে সাত শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ময়লা-পরিষ্কারক ("scavengers")দিগকে এই সাত শ্রেণীরই বাহিরে ফেলা হইয়াছিল। শ্রেণীগুলি এই:—প্রথম শ্রেণীতে কেবল ব্রাহ্মণদিগকে ফেলা হইয়াছিল, তাঁহাদের কোন বর্ণনা দেওয়া হয় নাই; দ্বিতীয়, শুদ্ধ শূদ্রদের ঊর্দ্ধস্থিত জা'ত সকল ("Castes ranking above clean Sudras"); তৃতীয়, শুদ্ধ শূদ্রসমূহ; চতুর্থ, অবনমিত বা পতিত ব্রাহ্মণ-পুরোহিত বিশিষ্ট জা'ত সকল; পঞ্চম, যে সব জা'তের জল গ্রহণীয় নহে; ষষ্ঠ, যে-সব "নীচ" জা'ত গোমাংস, শূকরমাংস ও কুক্কুটাদির মাংস খায় না; সপ্তম, যাহারা অশুচি জিনিষ খায়। এই সব বর্ণনা সেনসস্ রিপোর্টের, আমাদের নহে। কোন্ কোন্ জা'তকে কোন্ শ্রেণীতে ফেলা হইয়াছিল, তাহা লিখিব না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ময়লা-পরিষ্কারকদিগকে সকল শ্রেণীর বাহিরে ও নীচে ফেলা হইয়াছিল। বঙ্গের মুসলমানদিগকে তিন শ্রেণীতে ফেলিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীকে চারটি উপশ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছিল।

সামাজিক শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে পরে আরও কিছু লিখিব। এখন রাজনৈতিক অগ্রসরতা ও অনগ্রসরতার সম্বন্ধে কিছু বলি।

রাজনৈতিক অধিকার ও অনধিকার ভারতীয় সব ধর্ম্মের, শ্রেণীর ও জা'তের লোকদের সমান; আমরা সবাই পরাধীন। সুতরাং আমরা সবাই সমান অনগ্রসর। পৃথিবীতে রাজনৈতিক জাতিবিভাগ প্রধানতঃ দুটি—স্বাধীন ও পরাধীন। অতএব, রাজনৈতিক হিসাবে বঙ্গের কোন জা'তকে অগ্রসর বলা চলে না। কোন জা'তেরই রাজনৈতিক অধিকার অন্য কোন জা'তের চেয়ে বেশী নয়। আমরা সবই ডিপ্রেষ্ট বা অবনত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভারতীয়েরা অনেক জায়গায় অস্পৃশ্যও বটে। দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয় খুব শিক্ষিত খুব ধনী লোকও কুলি বলিয়া অভিহিত হয়। অনেক জায়গায় ট্রামে চড়িবার, ফুটপাথে চলিবার, হোটেলে থাকিবার খাইবার অধিকার তাহাদের নাই। মহাত্মা গান্ধীর আত্মজীবনচরিতে দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের অস্পৃশ্য বিবেচিত হইবার অনেক দৃষ্টান্ত লিখিত আছে।

রাজনৈতিক প্রচেষ্টায় কাহারা বেশী বা কম যোগ দিয়াছে, সে দিক দিয়া অবশ্য অগ্রসরত্ব অনগ্রসরত্বের বিচার হইতে পারে। কিন্তু কোন্ জাতের কত লোক যোগ দিয়াছে, তাহার কোন ফর্দ্দ নাই। কংগ্রেস বা অন্য রাজনৈতিক সভাসমিতির সভ্য কোন্ কোন্ জাতের লোক বেশী, তাহা বলা সহজ নয়। তবে নেতাদের ফর্দ্দ অপেক্ষাকৃত সহজে করা যায়। আমরা যখন ছাত্র, তখন প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক নেতা ছিলেন কৃষ্ণদাস পাল, তখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উদীয়মান। বঙ্গবিভাগের আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রধান নেতা। অন্য নেতাদের মধ্যে অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতিও অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তৎকালে চরমপন্থীদের নেতৃস্থানীয় বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতিও ব্রাহ্মণ ছিলেন না। পরে বঙ্গে প্রধান রাজনৈতিক নেতা হন চিত্তরঞ্জন দাস। তাঁহার মৃত্যুর পর বঙ্গের কংগ্রেস নির্দ্দিষ্ট রাজনৈতিক আন্দোলনে যে দু জনের নেতৃত্ব স্বীকৃত হয়, তাঁহারা কেহই ব্রাহ্মণ নহেন। বঙ্গে রাজনৈতিক কারণে যত লোকের কারাদণ্ড, দ্বীপান্তর বা প্রাণদণ্ড হইয়াছে, তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণের চেয়ে অন্য কোন কোন জা'তের লোকই বেশী। এইরূপ নানা দিক্ দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে, যে, বঙ্গে, সামাজিক হিসাবে গোঁড়া হিন্দুদের মতে এবং সরকারী শ্রেণীবিভাগেও ব্রাহ্মণদের স্থান সর্ব্বোপরি হইলেও, রাজনৈতিক দিক্ দিয়া ব্রাহ্মণেরা অনগ্রসর! ভারতীয় ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা দুটির সভ্যের তালিকা, হাইকোর্টের জজদের তালিকা, অ্যাডভোকেট জেনার‍্যাল প্রভৃতি সরকারী আইন-কর্ম্মচারীর তালিকা, সিবিল সার্বিসের ও শিক্ষাবিভাগ,

প্রভৃতির উচ্চপদস্থ লোকদের তালিকা দেখিলেও বুঝা যাইবে, যে, ব্রাহ্মণদের সামাজিক স্থান যাহাই হউক, সরকারী ও বেসরকারী রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহাদের স্থান সকলের উপর নহে—তাঁহারা অনগ্রসর!

সামাজিক হিসাবে যাঁহারা সকলের উপরে রাজনৈতিক হিসাবে তাঁহারা অনেকের পশ্চাদ্বর্ত্তী হওয়ায়, গবন্মেণ্ট তাঁহাদিগকে অবনত বলিয়া স্বীকার করিবেন কি?

ব্যবস্থাপক সভায় স্বতন্ত্র আসন কাহাদিগকে দেওয়া দরকার, গবন্মেণ্ট মুখ্যতঃ তাহারই বিচার করিতেছেন। অতএব, যে-সব জাতের লোকে অবাধ প্রতিযোগিতায় মিলিত নির্ব্বাচনদ্বারা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে রাজনৈতিক হিসাবে অগ্রসর মনে করিলে অন্যায় হইবে না। বর্ত্তমান বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সকল নির্ব্বাচিত হিন্দু সভ্যের জাত আমরা জানি না। তাঁহারা সকলেই মিলিত নির্ব্বাচনের অবাধ প্রতিযোগিতায় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করিয়া যতটা জানিতে পারিলাম, তাহাতে তাঁহাদের মধ্যে দুই জন রাজবংশী, তিন বা চারি জন নমঃশূদ্র, এক জন মেথর, এবং আরও কয়েক জন অন্য তথাকথিত অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয় জাতির। অসহযোগ আন্দোলন সংপৃক্ত পরিহাসের ফলে মেথর-জাতীয় সভ্যটি নির্ব্বাচিত হইয়া থাকিবেন। অন্যেরা প্রতিযোগিতায় জয়ী হইয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এই কারণে রাজবংশী নমঃশূদ্র প্রভৃতি কয়েকটি জাতকে রাজনৈতিক হিসাবে বাউরী, বেদিয়া, ডোম, খটিক প্রভৃতির মত অবনত বা অনগ্রসর বলা উচিত নহে। কোন-না কোন বার কোচ, পোদ, চামার ও দোসাধ জাতির লোকেরাও প্রতিযোগিতা দ্বারা ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়াছেন। অথচ অবনতদের সরকারী ফর্দ্দে রাজবংশী, নমঃশূদ্র, কোচ, পোদ, চামার ও দোসাধদের নাম আছে। রাজবংশীদের সম্বন্ধে সরকারী ইণ্ডিয়ান ফ্র্যাঞ্চিস্ কমিটির রিপোর্টের ১১৭ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে:—

"A few days before our report was signed, we received a telegram from the local [Bengal] Government to the effect that up to the date of the telegram the revised figure for depressed classes in the province was 10.3 millions. This total includes the Rajbansis numbering 1,804,371, who have themselves asked for exclusion, and who, it is generally agreed, should be excluded."

তাৎপর্য্য।

আমাদের রিপোর্ট স্বাক্ষরিত হইবার কয়েক দিন পূর্ব্বে বাংলা গবন্মেণ্টের নিকট হইতে আমরা এই মর্ম্মের একটি টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হই, যে, ঐ টেলিগ্রামের তারিখ পর্য্যন্ত বঙ্গে অবনত শ্রেণীসমূহের সংশোধিত লোকসংখ্যা এক কোটি তিন লক্ষ। ১৮,০৪,৩৭১ সংখ্যক রাজবংশী জাতির লোক এই সংখ্যার অন্তর্গত ছিল, যাহারা নিজে অবনতদের তালিকা হইতে আপনাদিগকে বাদ দিতে অনুরোধ জানাইয়াছিল, এবং যাহাদিগকে তালিকা হইতে বাদ দেওয়া উচিত, ইহা সাধারণতঃ সকলের মত।

তালিকাটি চূড়ান্ত ও কায়েম করিবার পূর্ব্বে গবন্মেণ্ট সমালোচনার জন্য উহা প্রকাশ করিয়াছেন। উহার সমালোচনা হইতেছেও, কিন্তু তাহার ফলে কোন জাতি বাদ পড়িবে কি-না, বলা যায় না। কোনও জাতি কি প্রকারে বাদ পড়িতে পারে, তাহার একটা সম্ভাবনার পথ গবন্মেণ্টের তালিকার সঙ্গে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি হইতে পরোক্ষভাবে অনুমিত হইতে পারে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে:—

"It excludes some castes like the Telis and Kalus, from which definite objections have been received against inclusion in any list of 'depressed classes'."

তাৎপর্য্য।

তেলী ও কলুদের মত কোন কোন জাতকে এই তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে, যাহাদের নিকট হইতে অবনত শ্রেণীর তালিকাভুক্ত হওয়ার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট আপত্তি পাওয়া গিয়াছে।

ইহা হইতে এরূপ আশা করা অসঙ্গত হয় না, যে, কোন জাতি তালিকার অন্তর্গত হইতে আপত্তি করিলেই তাহার নাম তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইবে। কিন্তু ঐ প্রকার আশার বিরুদ্ধেও কিছু বলিবার আছে। আমরা আগে সরকারী ইণ্ডিয়ান ফ্র্যাঞ্চিস্ কমিটির রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, যে, রাজবংশীরা তালিকাভুক্ত হইতে আপত্তি করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের আপত্তি অনুসারে তাঁহাদিগকে বাদ দেওয়া উচিত, এই মতও কমিটি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তথাপি সরকারী কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত তালিকা হইতে তাঁহাদিগকে বাদ দেওয়া হয় নাই। ইহা হইতে আমাদের মনে

একটা অনুমানের উদয় হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, প্রধান মন্ত্রী এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী লোকেরা দেখাইতে চান, যে, বাংলা দেশে খুব বেশীসংখ্যক হিন্দু সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক্ দিয়া অবনত। সেই জন্য তাঁহারা সংখ্যাবহুল কোন জাতিকে তালিকা হইতে বাদ দিতে অনিচ্ছুক। এরূপ অনুমানের কারণ বলিতেছি। বঙ্গে কলু ও তেলীদের মোটসংখ্যা ২,৯৫,৩০৬, এবং রাজবংশীদের সংখ্যা ১৮,০৬,৩৯০। সেই জন্য অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক কলু ও তেলীকে বাদ দেওয়া সহজ হইয়াছে, কিন্তু আঠার লাখের উপর রাজবংশীকে বাদ দেওয়া হয় নাই। ১৯০১ সালের সেন্সসে রিজলী ও গেটের তালিকায় সুবর্ণবণিকদিগকে সেই পঞ্চম শ্রেণীতে ফেলা হইয়াছিল "যাহাদের জল গ্রহণীয় নহে" ("whose water is not taken")। তাঁহাদিগকে কিন্তু আলোচ্য তালিকায় অবনতশ্রেণীভুক্ত করা হয় নাই (তাহা ঠিকই হইয়াছে)। কিন্তু তাঁহাদিগকে বাদ দিবার একটা কারণ এই অনুমান হয়, যে, তাঁহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম।

আমাদের অনুমান সত্য হউক বা না হউক, যাঁহারা আপনাদিগকে সামাজিক হিসাবে হীন মনে করেন না, তাঁহাদের তালিকাভুক্ত থাকিতে আপত্তি জানানই উচিত। কপালে অপমানের তিলক পরা অনুচিত।

১৯৩১ সালের সেন্সস্ রিপোর্টে অবনতদের তালিকাভুক্ত কয়েকটি জাতির অন্য যে-সব নাম দেখিতেছি, তাহাতে তাঁহাদের আপত্তি জানান উচিত ও স্বাভাবিক, মনে করি। এই জাতিগুলির নাম নীচে দিতেছি।

বাগদী, ব্যগ্রক্ষত্রিয়; ভুঁইমালী, বৈশ্য-মালী; ঝালো, মল্লক্ষত্রিয়; মালো, মল্ল-ক্ষত্রিয়; কপালী, বৈশ্য-কপালী; কোচ, ক্ষত্রিয়-কোচ, কোচ-ক্ষত্রিয়; নমশূদ্র, নম-ব্রাহ্মণ, নম-ব্রহ্ম; পাটনী, লুপ্ত মাহিষ্য; পোদ, পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়; পুণ্ডরী, পুণ্ড্র-ক্ষত্রিয়; রাজবংশী, রাজবংশী ক্ষত্রিয় বা ক্ষত্রিয় রাজবংশী; শুঁড়ি, শৌণ্ডিক ক্ষত্রিয়, শোণ্ডিয়া ক্ষত্রিয়।

এতদ্ভিন্ন হাড়ীরা আপনাদিগকে হৈহয় ক্ষত্রিয় বলিয়া থাকেন।

এখন এই প্রশ্ন উঠিতেছে যে, কতকগুলি জাতি আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বলিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের দ্বিজত্ব-প্রতিপাদক উক্ত নামগুলি সরকারী সেন্সস্ রিপোর্টে পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে; তাহা হইলে অবনতদের তালিকায় তাঁহাদিগকে ফেলা হইল কেন?

সরকারী কর্ম্মচারীরা যে-কারণেই তাঁহাদিগকে অবনত শ্রেণীসমূহের তালিকাভুক্ত করিয়া থাকুন, যাঁহারা দ্বিজত্বের দাবি করেন, তাঁহারা সত্যবাদিতা ও সঙ্গতি রক্ষা করিতে চাহিলে তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে, যে, তাঁহারা অবনতদের তালিকাভুক্ত থাকিতে চান না। তাঁহারা যদি তাহা না বলেন, তাহা হইলে ব্যাপারটা দাঁড়াইবে এই, যে, তাঁহারা এক দিকে আপনাদিগকে সামাজিক মর্য্যাদার অধিকারী প্রমাণ করিবার নিমিত্ত বলিবেন, যে, তাঁহারা দ্বিজ, অন্যদিকে সহজে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবার লোভে আপনাদিগকে বলিবেন অবনত। রাজনৈতিক কারণে গবন্মেণ্ট তাঁহাদিগকে অবনত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবেন। কিন্তু মানুষ অবনত ও অনবনত যুগপৎ দুই-ই হইতে পারে না। কোন জাতির লোকে নিজেদেরই স্বীকৃতি অনুসারে সরকারী অবনত শ্রেণীর তালিকাভুক্ত থাকিলে তাহাদের পক্ষে সামাজিক মর্য্যাদা লাভ কঠিন হইবে। আমরা চাই, সমাজে সকল শ্রেণীর লোক সম্মানিত স্থান লাভ করেন। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভার ৩০টি আসন অনেকের কাছে এমন একটা লোভ উপস্থিত করিয়াছে, যে, তাহাতে অনেকে দ্বিজত্বের দাবি ভুলিয়া গিয়া বা আপাততঃ চাপা দিয়া আপনাদিগকে অবনত বলিয়া মানিয়া লইতে পারেন। প্রলোভনবশতঃ এরূপ করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে—যদিও এরূপ প্রলোভনে মানুষকে ফেলা কাহারও উচিত নহে।

১৯১৭ সালে ভারত-গবর্ন্মেণ্টের এডুকেশ্যন কমিশনার স্যর হেন্রী শার্প অবনতদের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া তৎসংলগ্ন মন্তব্যে অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন :—

"Sometimes the whole community declares itself to be depressed with a view to reaping special concessions of education or appointment."—Indian Franchise Committee's Report, Vol. i, p 109.

তাৎপর্য্য।

কখন কখন এক একটি সমগ্র জাতি শিক্ষা বা চাকরির বিশেষ সুবিধা লাভের জন্য আপনাদিগকে অবনত বলিয়া ঘোষণা করে।

সুতরাং ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদের লোভে লোকে যে আপনাদিগকে অবনত বলিবে তাহা অসম্ভব নহে।

—

ব্যবস্থাপক সভার সভ্যত্বের লোভে অবনতত্ব স্বীকার

শিক্ষালাভের ও চাকরিলাভের সুবিধা হইবে বলিয়া অবনতত্ব স্বীকার এবং ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইবার লোভে অবনতত্ব স্বীকার, এই উভয়ে প্রভেদ আছে। অবনত শ্রেণীর ছাত্রদিগকে শিক্ষালাভের যে সুযোগ দেওয়া হয়, তাহাতে অনেক ছাত্র বৃত্তি পায়, অনেকে অর্দ্ধ বেতনে, কম বেতনে বা বিনা বেতনে পড়িতে পায়। অবনত শ্রেণীর লোক বলিয়া চাকরিও বহুসংখ্যক পায় বা পাইতে পারে। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভায় অবনতদের জন্য কেবল ৩০টি আসন রক্ষিত থাকিবে। নির্ব্বাচন হইবে তিন চার বৎসর অন্তর অন্তর। অবনতদের তালিকাভুক্ত আছে ৮৬।৮৭টি জা'ত। ইহাদের মধ্যে কোন কোন জা'তের লোক একাধিক আসন দখল করিতে পারে। কিন্তু যদি তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া যায়, যে, কোন জা'তের লোকই একটির বেশী আসন পাইবে না, তাহা হইলেও ফল এই দাঁড়াইবে, যে, ৩০টি জা'তের এক এক জন লোক এক একটি করিয়া মোট ত্রিশটি আসন পাইবেন। বাকী ৫৬।৫৭টি জা'তের একজন লোকও একটিও আসন পাইবেন না। সুতরাং এই ৫৬।৫৭টি জা'তের লোকদের অবনতত্ব স্বীকার নিষ্ফল লাঞ্ছনারই কারণ হইবে। ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইতে পারিলেই, যে, মানুষের হীনতা স্বীকার করা উচিত বা সার্থক, এরূপ অসত্য কথা বলিতেছি না। তাহা উচিত নয়, তাহাতে কোন সার্থকতা নাই। কিন্তু অনেকে ভাবিতে পারেন, "পেটে খেলে পিঠে সয়"। সেইজন্য বলিতেছি, অধিকাংশ জা'তকে বৃথাই হীনতা স্বীকার করিতে হইবে। অন্যদিকে, যদি যোগ্যতা থাকে তাহা হইলে যোগ্যতার জোরেই ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইতে পারা যায়। তাহাই বাঞ্ছনীয়। অপমান ও হীনতার বিনিময়ে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যত্ব লাভ বাঞ্ছনীয় নহে।

যে-সব জা'তের দু-এক জন লোক কপালে হীনতার ছাপ লাগাইয়া ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবেন, তাঁহাদেরও বাকী অনেক লাখ অনেক হাজার লোক কেবল দাগীই হইয়া থাকিবেন, "সভ্য" হইবেন না।

—

অবনতদিগকে আলাদা আসন দিবার ওজুহাত

বাংলা গবর্মেণ্টের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, যে, অবনত শ্রেণীর লোকদিগের তালিকা প্রস্তুত করিবার কারণ, "the necessity of securing for them special representation in order to protect their interests"—"তাহাদের স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত তাহাদিগের জন্য বিশেষ প্রতিনিধি দিবার আবশ্যকতা।" রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে এক একটা জা'তের বিশেষ বিশেষ স্বার্থ আছে এবং তাহা রক্ষার জন্য তাহাদের বিশেষ বিশেষ প্রতিনিধির দরকার, ইহা সত্য কথা নহে। তাহা সত্য হইলে, প্রত্যেক "উন্নত" জা'তের আলাদা আলাদা প্রতিনিধি এবং প্রত্যেক অবনত জা'তের আলাদা আলাদা প্রতিনিধি দরকার হইত। যদি বলেন, ব্রাহ্মণের সঙ্গে বাগ্দীর খাওয়া-দাওয়া এবং ঔদ্বাহিক আদানপ্রদান নাই বলিয়া ব্রাহ্মণ সদস্য বাগ্দীর স্বার্থ রক্ষা করিতে পারেন না বা করেন না, তাহা হইলে বলি, বাগ্দীর সঙ্গে মেথরের বা মুচির পংক্তিভোজন ও ঔদ্বাহিক আদান-প্রদান নাই বলিয়া বাগ্দী সদস্যও মুচির বা মেথরের বা অন্য কোন তথাকথিত অস্পৃশ্য জা'তের স্বার্থরক্ষা করিতে পারেন না ও করেন না। ব্রাহ্মণ, বাগ্দী, মুচি ও মেথরের নাম ব্যবহার কেবল দৃষ্টান্ত-হিসাবে করিলাম। অন্য "উন্নত" বা "অবনত" জা'তদের নামও করা যাইতে পারিত।

অবনত জা'তের সদস্যেরা যদি সমগ্র দেশের মঙ্গলচিন্তা ও মঙ্গলচেষ্টা করেন, কিংবা অন্ততঃ যদি সমুদয় "অবনত" লোকদের হিতচিন্তা ও হিতসাধন করেন, তাহা ত খুবই

ভাল। কিন্তু কেহ যদি বলেন, "অবনত" লোকদের নেতারা বা প্রতিনিধিরা উন্নত শ্রেণীর লোকদের চেয়ে "অবনত"দের হিতচেষ্টা অধিক করেন বা করিয়াছেন, তাহা হইলে এরূপ কথা সত্য বলিয়া মানিতে পারি না। এ পর্য্যন্ত বরং ইহার বিপরীতই বঙ্গদেশে সত্য বলিয়া দেখা গিয়াছে। অনুন্নতদের উন্নতির জন্য সভাসমিতি "উচ্চ" শ্রেণীর লোকেরাই অধিকাংশ স্থলে চালাইয়া আসিতেছেন। আমরা এজন্য তাঁহাদের কোন প্রশংসা করিতে চাই না—বড়াই করিবার তাঁহাদের কোন কারণ নাই। আমরা উচ্চশ্রেণীর লোকদের এরূপ কাজের উল্লেখ কেবল এই জন্য করিতেছি, যে, তাঁহারা অন্য কাহাদেরও চেয়ে নিম্নশ্রেণীর হিতচিন্তা কম করেন, ইহা সত্য নহে। তাঁহারা যে যথেষ্ট করেন, ইহা অবশ্য বলিতেছি না। নিম্নশ্রেণীর লোকদের প্রতি বহু শত বৎসর ধরিয়া যে অন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত উচ্চশ্রেণীর লোকদের করা উচিত। সে প্রায়শ্চিত্ত এ-পর্য্যন্ত সামান্যই হইয়াছে। নিম্নশ্রেণীর লোকদের পরিশ্রমে ও দুঃখস্বীকারে উচ্চশ্রেণীর লোকদের অনেক সুবিধা হইয়াছে। সেই জন্য উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা ঋণী হইয়া আছেন। এই ঋণ তাঁহারা অল্পই শোধ করিয়াছেন।

—

আদিম জাতিদের অবনতদের তালিকাভুক্তি

বাংলা-গবর্ন্মেণ্টের বিজ্ঞপ্তিতে আছে,

"It is to be noted that the list includes not only Hindu castes but also some groups of aboriginal derivation now resident in Bengal which profess tribal or mixed religions."

তাৎপর্য্য।

ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে, যে, তালিকাটিতে কেবল যে হিন্দু জাতি আছে তাহা নহে; কিন্তু ইহাতে অধুনা বঙ্গের অধিবাসী কতকগুলি আদিম জাতিকে অন্তর্ভূত করা হইয়াছে যাহারা স্ব স্ব জাতির ধর্ম্মে বা মিশ্র ধর্ম্মে বিশ্বাস করে।

তালিকাতে যে-সব আদিম জাতির নাম নিবিষ্ট করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে হিন্দু, অনেকে খ্রীষ্টিয়ান, এবং অনেকে আদিম কোন ধর্ম্মে বিশ্বাস করে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, গারোদের উল্লেখ করিতেছি। ইহাদের কতক ট্রাইব্যাল (আদিম জাতীয়), কতক খ্রীষ্টিয়ান, এবং কতক হিন্দু ধর্ম্মে বিশ্বাস করে। ইহাদের সকলকেই হিন্দু সমাজের অবনত শ্রেণীর মধ্যে ফেলার কোন ন্যায্যতা নাই। তদ্রূপ সাঁওতালদের কতক লোক হিন্দু, কতক ট্রাইব্যাল, কতক খ্রীষ্টিয়ান ও কতক বৌদ্ধ ধর্ম্মে বিশ্বাসী। সকলকেই হিন্দু সমাজের অবনত শ্রেণীতে ফেলা অযৌক্তিক।

যখন হিন্দুদের সংখ্যা কম দেখাইবার প্রয়োজন হয়, তখন আদিম জাতির অনেক লোককে হিন্দুর সমষ্টি হইতে বাদ দেওয়া হয়। হিন্দু সমাজের অবনত শ্রেণীর সংখ্যাবাহুল্য দেখাইবার জন্য আদিমজাতীয় খ্রীষ্টিয়ান-দিগকেও তাহাদের তালিকাভুক্ত করা কি উচিত?

ভারতবর্ষের আদিমনিবাসীদের কল্যাণচেষ্টা সামান্যই হইয়াছে—সরকারী বেসরকারী কোন রকম চেষ্টাই যথেষ্ট হয় নাই। এই জন্য ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদের প্রতিনিধি থাকিলে ভাল হয়। কিন্তু তাহাদের প্রতিনিধিত্ব করিবার উপযুক্ত লোক পাওয়া কঠিন। এ-বিষয়ে ফ্র্যাঞ্চিস্ কমিটির রিপোর্টে অনেক কথা লেখা হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, "এই লোকগুলি ভারতবর্ষের অন্য সাধারণ অধিবাসীদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীবন যাপন করে, তাহাদের স্বার্থ ব্যবস্থাপক সভায় কার্য্যকর প্রতিনিধিত্ব দ্বারা রক্ষিত হওয়া খুব বেশী আবশ্যক; তাহা সম্ভব না হইলে নূতন শাসনবিধিতে অন্য কোন ব্যবস্থা দ্বারা তাহা করা কর্ত্তব্য।" (ইণ্ডিয়ান ফ্র্যাঞ্চিস্ কমিটির রিপোর্টের প্রথম ভল্যুম, ১৩৫ পৃষ্ঠা।) কিন্তু ফ্র্যাঞ্চিস্ কমিটি স্পষ্ট করিয়া ইহাও বলিয়াছেন, যে, আদিমনিবাসীদিগকে অবনত শ্রেণীসমূহের সহিত মিশাইয়া ফেলাও উচিত নহে। যথা—

"The only evidence which we have been able to hear on the subject was from the Chota Nagpur Improvement Society of Bihar and Orissa and from the Census Commissioner for India and the Census Superintendent of the Central Provinces. They pressed upon us the view that the aboriginals are an entirely distinct community from the depressed classes, and that under no circumstances should the two communities be amalgamated for purposes of representation. We have already suggested that this view should be accepted."—Indian Franchise Committee's Report, vol. i, paragraph 342, page 135.

তাৎপর্য্য।

আদিমনিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে আমরা কেবল ছোটনাগপুর উন্নতিবিধায়িনী সমিতি, ভারতবর্ষের সেন্সস কমিশনার এবং মধ্য-প্রদেশের সেন্সস সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সাক্ষ্য শুনিতে পারিয়াছিলাম।

তাঁহারা এই মতের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যে, আদিম-নিবাসীরা অবনত শ্রেণীসমূহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ জনসমষ্টি, এবং প্রতিনিধিত্বের জন্য কোন অবস্থাতেই তাহাদিগকে একত্র মিশাইয়া ফেলা উচিত নহে। আমরা ইতিপূর্ব্বেই সূচিত করিয়াছি, যে, এই মত গৃহীত হওয়া উচিত।"

কিন্তু বাংলা গবর্ন্মেণ্ট এই মত গ্রহণ না করিয়া তাহার বিপরীত কার্য্যই করিয়াছেন।

আদিমনিবাসীরা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করেন, ইহা আমরাও চাই।

—

কাহারা "অবনত" হইতে অসম্মত

অবনতদের সরকারী তালিকাভুক্ত কোন্ কোন্ জা'ত ঐ তালিকাভুক্ত থাকিতে অসম্মতি জানাইয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ ফর্দ্দ আমরা পাই নাই। কয়েকটি সংবাদ পাইয়াছি। মানকী (ডাকঘর ফুলকোচা, জেলা ময়মনসিংহ) হইতে শ্রীযুক্ত ডাক্তার মনোমোহন নাথ তাঁহাদের জাতির বৃহৎ সভায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী নাথ মহাশয়ের সভাপতিত্বে নিম্নলিখিত তিনটি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাঠাইয়াছেন :—

১। সম্প্রতি বাঙ্গালা গভর্ণেমণ্ট যোগী (নাথ) জাতিকে অবনত-শ্রেণীভুক্ত করিয়া অবনতশ্রেণীর যে এক তালিকা প্রচারিত করিয়াছেন, তাহাতে যোগী সমাজের সামাজিক মর্য্যাদা বিশেষ ভাবে আহত হইয়াছে। সেজন্য যোগীজাতিকে এবম্প্রকার অবনত শ্রেণীভুক্ত করার বিরুদ্ধে এই সভা তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

২। সমগ্র যোগী সমাজের পক্ষ হইতে এই সভা বাঙ্গালা গবর্ণেমণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন, যেন অতি সত্বর উক্ত অবনত শ্রেণীর তালিকা সংশোধন করে যোগী জাতিকে উক্ত তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হয় এবং বঙ্গদেশের পঞ্চায়েৎ সমূহকে উক্ত সংবাদ যেন সত্বর দেওয়া হয়।

৩। এই সভার গৃহীত প্রস্তাবসমূহ প্রচারার্থে বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকগণকে অনুরোধ করা হউক।

ইহা ছাড়া রাজু জাতি, বৈশ্য কপালী জাতি, শোলাঙ্কি (সুকুলি) সমাজ এবং বেরুয়া সম্প্রদায় হইতে এইরূপ প্রতিবাদ হইয়াছে বলিয়া সংবাদপত্রে খবর বাহির হইয়াছে। অন্য কোন কোন জাতিও যদি প্রতিবাদ করিয়া থাকেন, তাহা ২৭শে মাঘ পর্য্যন্ত আমাদের চোখে পড়ে নাই। যাঁহারা প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাঁহাদের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হইবে না; বরং তাঁহাদের নিজেদের ও অন্য সকলের বিবেচনায় তাঁহারা সম্মানার্হ হইবেন।

—

তথাকথিত "স্বাধীনতা দিবস"

গত ২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষের নানা স্থানে কংগ্রেস-পন্থীরা তথাকথিত "স্বাধীনতা দিবস" পালন করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে সর্ব্বত্র বহুসংখ্যক লোককে পুলিস গ্রেপ্তার করে। কতক লোককে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, বিচারান্তে অন্য অনেকের কারাদাণ্ড হয়। পুলিসের লাঠি অনেক জায়গায় চলিয়াছিল। গুলি যে কোথাও চলে নাই, এরূপ বলিবার জো নাই। বন্দেই আরামবাগে চলিয়াছিল। কংগ্রেসওয়ালারা মধ্যে মধ্যে এই রূপ অনুষ্ঠান দ্বারা এবং কোন-না-কোন জায়গায় পতাকা উত্তোলন, শোভাযাত্রা বা পিকেটিং দ্বারা জানান দিয়া থাকেন, যে, কংগ্রেস লুপ্ত হয় নাই। সরকারী ডাকঘরের মারফতে "নিষিদ্ধ" ও "অপ্রকাশ্য" খবরের কাগজও যে মধ্যে মধ্যে বিলি হয়, তাহা অনেকে জানে, যদিও এরূপ কাগজ বাংলার লাট সাহেবের হস্তগত না হইবারই কথা।

—

কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন

তাহার উপর শুনা যাইতেছে, আগামী মার্চ মাসে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। অধিবেশনের স্থান ও ঠিক্ তারিখ এখনও স্থির হয় নাই। কংগ্রেসের সাধারণ কমিটি এবং কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, কিন্তু কংগ্রেস বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হয় নাই। সুতরাং কংগ্রেসের অধিবেশন সম্বন্ধে সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশ করিতে বাধা জন্মে নাই।

কংগ্রেস বেআইনী বলিয়া ঘোষিত না হইয়া থাকিলেও দিল্লীতে যখন গত বৎসর অধিবেশন হয়, তখন তাহা বন্ধ করিবার বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল এবং অনেক লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও কতকগুলি প্রতিনিধি অল্প সময়ের জন্য একত্র হইয়া প্রস্তাব ধার্য্য করিয়াছিলেন। এবারেও সেইরূপ হইতে পারে।

যাহাই ঘটুক, আন্দোলনকারীদিগকে সায়েস্তা করা যে-সব রাজকর্ম্মচারীর কাজ, তাঁহারা বোধ হয় ভাবিতেছেন—সম্ভবতঃ লর্ড উইলিংডনও ভাবিতেছেন—"মরিয়া না-মরে রাম এ কেমন বৈরী।"

মহাত্মা গান্ধীর মুক্তির গুজব

মহাত্মা গান্ধীকে জেল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে কিনা, হইলে কখন হইবে, ইত্যাদি বিষয়ে কল্পনা-জল্পনা অনেক দিন হইতে চলিতেছে। এ-বিষয়ে ভারত-গবর্ন্মেণ্ট ও ভারত-সচিবের সঙ্গে পত্র বা টেলিগ্রাম ব্যবহার হইয়াছিল কিনা, ভারত-গবর্ন্মেণ্টের শাসনপরিষদে বিষয়টি আলোচিত হইয়াছিল কিনা, তৎসম্পর্কে ভারতীয় ব্যবস্থাপক প্রশ্নোত্তর এবং খবরের কাগজে আলোচনাও হইয়াছে। এই সকলের সার নিষ্কর্ষ এই, যে, মহাত্মা গান্ধী যদি কথা দেন, তিনি জেলের বাহিরে আসিয়া নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টা চালাইবেন না, তাহা হইলে সরকার বাহাদুর তাঁহাকে খালাস দিতে পারেন; শুধু তাঁহাকে কেন, অন্য অনেক ছোট ছোট নেতা এবং রাজনৈতিক বন্দীকেও খালাস দিতে পারেন।

কিন্তু মহাত্মা গান্ধী যে এরূপ প্রতিশ্রুতি দেন নাই বা দিবেন না, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে।

আইন অমান্য করিবার প্রচেষ্টা গবর্ন্মেণ্টের নানা অর্ডিন্যান্স ও আইন এবং অন্যবিধ নানা বিশেষ প্রয়াস সত্ত্বেও বন্ধ হয় নাই। সুতরাং তাহাতে নূতন করিয়া বল সঞ্চার হয়, এরূপ কিছু গবর্ন্মেণ্ট করিতে পারেন না।

—

কি হইলে মহাত্মাজীর মুক্তি হয়

একটা কাজ করিলে মহাত্মা গান্ধী এবং অন্যান্য অসহযোগী বন্দীকে ছাড়িয়া দেওয়া চলে এবং আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টাও বন্ধ হইতে পারে। সেটি আর কিছু নয়, মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের জন্য যেরূপ রাষ্ট্রীয় অধিকার আপাততঃ পাইলে সন্তুষ্ট হন, তাহা অনতিবিলম্বে দেওয়া। ইহা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নহে, তবে স্বাধীনতার সার অংশ বটে; অর্থাৎ কানাডা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির যেরূপ স্বশাসন অধিকার আছে, সেইরূপ স্বরাজ। ভারতবর্ষ কালক্রমে যে এইরূপ অধিকার অর্জ্জন করিবে এবং তার চেয়ে বেশী স্বাধীনও যে হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যত গোল এই "কাল" লইয়া। ভারতবর্ষের স্বরাজপ্রাপ্তিতে যাহাদের ঐহিক ক্ষতি, তাঁহারা ভাবিতেছেন, এই কাল "নিরবধি", তবে তাঁহাদের মনেও এ আশঙ্কা আছে, যে, "অবধি" হয়ত বা শীঘ্রই আসিয়া পড়ে। অন্য পক্ষে, যাঁহারা স্বরাজ চান, তাঁহারা মনে করেন, স্বরাজ লাভ শীঘ্রই ঘটিবে—অন্ততঃ ঘটা উচিত।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বলিতে বস্তুতঃ ভারতবর্ষকেই বুঝায়। কানাডা, দক্ষিণ-আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশগুলা ত প্রায়-স্বাধীন সাধারণতন্ত্র। সেগুলা হইতে ইংরেজরা রাজকীয় বা বাণিজ্যিক বিশেষ কোন মুনফা পায় না। ভারতবর্ষই তাহাদের সকল রকম লাভের প্রধান আকর। এই জন্য তাহারা ভারতবর্ষের উপর রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রভুত্ব একটুও ছাড়িয়া দিতে চায় না। কিন্তু সংস্কৃতে যে একটা বচন আছে, যে, সবটা যাইবার উপক্রম হইলে, "অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ", বুদ্ধিমান লোকে আধটা ছাড়িয়া দেয়, তাহা কি তাঁহাদের জানা নাই? ইংরেজরা ত অন্য সকলের সঙ্গে, অর্থাৎ যাহারা শক্তিমান তাহাদের সঙ্গে, রফা করিতে সুদক্ষ। ভারতবর্ষের সঙ্গে তবে রফা করেন না কেন? অথবা এরূপ প্রশ্ন করাই বেকুবী। যে শক্তিমান্ নয়, তার সঙ্গে রফা কে কবে করিয়া থাকে?

—

মহাত্মাজীর অনুচরদের সমস্যা

মহাত্মা গান্ধী এখন হিন্দু সমাজের "অস্পৃশ্য" ও অনুন্নত জাতিসমূহের উন্নতি বিধান—বিশেষ করিয়া তাহাদের দেবমন্দির-প্রবেশের অধিকার—সমস্যা লইয়া ব্যস্ত আছেন। সেই কারণে, যে অসহযোগ ও আইন-লঙ্ঘন প্রচেষ্টা সম্পর্কে তিনি ও তাঁহার দলের অনেক লোক জেলে গিয়াছেন এবং অনেকে আরও নানাবিধ দুঃখভোগ করিয়াছেন, তাহা এখন কতকটা চাপা পড়িয়া গিয়াছে; দেশে সেই সম্পর্কে যত কাজ হইতেছে, তাহাতে লোকের দৃষ্টি তত পড়িতেছে না। এইরূপ অবস্থা ঘটিবে অনুমান করিয়াই গবর্ন্মেণ্ট মহাত্মাজীকে জেল হইতে অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলন চালাইবার অনুমতি ও সুযোগ দিয়াছিলেন কিনা, জানা যায় নাই। তবে, সম্প্রতি ভারত-সচিব বিলাতে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন বটে, যে, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলায় লোকের মন অসহযোগ আন্দোলন হইতে অন্য দিকে গিয়াছে। সে

যাহা হউক, অবস্থা এইরূপ ঘটায় কংগ্রেসওয়ালারা অনেকে স্থির করিতে পারিতেছেন না, যে, রাজনীতি ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাদের সকলের এখন অস্পৃশ্যতা দূরীকরণেই সম্পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করা উচিত কিনা। হিন্দু কংগ্রেস-ওয়ালারা তাহা হয়ত করিতে পারেন; কিন্তু মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান ও পারসী কংগ্রেসওয়ালারা কি করিবেন? ব্যাপক অর্থে হিন্দু নামে অভিহিত ব্রাহ্ম এবং আর্য্য-সমাজীরাই বা কি করিবেন?

এতদ্বিষয়ক একটি বর্ণনাপত্রে মহাত্মাজী বলিয়াছেন, "If many are filled with doubts, let them confer together and come to a decision as to the proper course to take"—"যদি অনেকে সংশয়াপন্ন হইয়া থাকেন, তাঁহারা সকলে একত্র আলোচনা মন্ত্রণা করুন এবং কোন্ পথ অবলম্বনীয় সে বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হউন।"

সংশয়ের কারণ উপস্থিত হওয়ায় বোম্বাইয়ের কংগ্রেস-পন্থী কাগজ বোম্বাই ক্রনিক্ল লিখিয়াছেন :—

"When he side-tracks his energy deliberately to a wholly different problem, what are his followers to do? Their sacrifices apparently prove all unavailing midway in the struggle. Their languishing in jail any longer now seems to be beside the point, unless they themselves choose to conduct Civil Disobedience even when the original author of the programme betakes himself to a new field."

তাৎপর্য্য। "মহাত্মাজী যখন চিন্তার পর ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার কর্ম্মশক্তিকে সম্পূর্ণ পৃথক্ একটি সমস্যার দিকে চালিত করিয়াছেন, তখন তাঁহার অনুচরেরা কি করিবেন? দৃষ্টতঃ তাঁহাদের সব স্বার্থ-বলিদান সংগ্রামের মাঝপথে ব্যর্থ প্রতীয়মান হইতেছে। যখন নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টার মূল প্রবর্ত্তক নিজেকে নূতন কার্য্যক্ষেত্রে লইয়া গিয়াছেন, তখন যদি অনুচরেরা নিজেই তাহা চালাইবার ভার না লন, তাহা হইলে তাঁহাদের এখনও জেলে পচিতে থাকা নিরর্থক মনে হইবে।"

বোম্বাই ক্রনিক্লের সম্পাদক কি মনে করেন, যে, মহাত্মা গান্ধী জেলে থাকিয়াই তাঁহার পুরাতন কার্য্যক্ষেত্রের কাজ পুনর্ব্বার চালাইতে আরম্ভ করিতে পারিতেন? কিংবা সে-বিষয়ে কোন উপদেশ দিতে পারিতেন? তাহা ত পারিতেন না। আমাদের মনে হয়, মহাত্মাজীর মত কর্ম্মিষ্ঠ মানুষকে কর্ম্মবিমুখতা কিংবা কোন জনহিতকর কাজ—এই দুইয়ের একটি বাছিয়া [illegible] নিষ্ক্রিয় থাকা কঠিন। বন্দী অবস্থায় রাজনৈতিক কিছু করাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। এই জন্য তিনি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ রূপ মহৎ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তিনি যে-কাজে হাত দিয়াছেন, তাহা রাজনৈতিক প্রচেষ্টা অপেক্ষা কম আবশ্যক নহে।

মহাত্মাজীর দলের লোকদের এখন কি করা উচিত, সে-বিষয়ে আমরা কিছু বলিতে অসমর্থ। কারণ, আমরা অসহযোগসংপৃক্ত কোন কাজে যোগ দি নাই।

—

মন্দির-প্রবেশ ও রাজনীতি

কালিকটের জামোরিন ধুয়া ধরিয়াছেন, "অস্পৃশ্য"-দিগকে মন্দিরে ঢুকাইবার চেষ্টা একটা রাজনৈতিক চা'ল। এ-রকম সন্দেহ ভারতীয়দের রাজনৈতিক অধিকার লাভের বিরোধী অনেক লোকদেরও মনে উদিত হইয়া থাকিবে। হয়ত তাহারাই কেহ এই বুলিটা জামোরিনকে শিখাইয়া দিয়াছে।

ইহা যে রাজনৈতিক চা'ল নয়, সে-বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজনীতির সহিত ইহার কোন পরোক্ষ সম্বন্ধও নাই, এরূপ কথা আমরা বলিতে পারি না। আর, যদি কোন জিনিষ সাক্ষাৎভাবে ও পূর্ণমাত্রায় রাজনৈতিকই হয়, তাহাতে ত দোষের বিষয়, লজ্জিত হইবার কারণ, কিছু নাই। তবে, মন্দির-প্রবেশের অধিকারের সঙ্গে মুখ্যতঃ ও মূলতঃ রাজনীতির কোন সম্পর্ক নাই, ইহা সত্য কথা।

এই প্রসঙ্গে বহু বৎসর আগেকার একটা কথা মনে পড়িল। এলাহাবাদের পাইয়োনীয়ার কাগজখানা তখন ইংরেজদের ছিল এবং তাহার প্রভাবও খুব ছিল। সেই সময় পাইয়োনীয়ার এই মর্ম্মের কথা লিখিয়াছিল, যে, প্রাচীন গ্রীস ও রোমের পতনের প্রধান কারণ ম্যালেরিয়া। বাংলা দেশকে ম্যালেরিয়া হইতে মুক্ত করিতে পারিলে বাঙালীরা শক্তিমান হইবে এবং তাহার পর আরও কিছু ঘটিবে, বাঙালীরা হয়ত এরূপ স্বপ্ন দেখে। অতএব, ম্যালেরিয়া-নিবারণের চেষ্টা একটা রাজনৈতিক চা'ল,, পাইয়োনীয়ারের এরূপ ইঙ্গিত করা অভিপ্রেত ছিল কিনা বলিতে পারি না।

বস্তুতঃ সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক কিছু থাকিতে পারে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। অন্নচেষ্টা মানুষের প্রাত্যহিক আদিম ব্যাপার। পরাধীন অপরাধীন সব জাতির লোক পেট ভরিয়া খাইতে পাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু পেট ভরিয়া খাওয়াটার মত চরম রাজনৈতিক কাজ কি হইতে পারে? মানুষ সুপুষ্ট হইলে বলিষ্ঠ হয়, বলিষ্ঠ হইলে সোজা হইয়া দাঁড়ায়; তার শিরদাঁড়াটা সোজা হয়, মাথাটাও উঁচু হয়। তদনুরূপ মানসিক পরিবর্তন, যথা স্বাধীনতা লাভ বা রক্ষার ইচ্ছা ইত্যাদি, হয়। অতএব, যাঁহারা রাজনৈতিক সব ব্যাপারের বিরোধী তাঁহাদের দেখা উচিত, যে, লোকে যেন পেট ভরিয়া খাইতে না পায়। কিন্তু তাহাতেও বিপদ আছে। কেন-না, ইতিহাসে লেখে, ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব এবং আরও অনেক তদ্রূপ বিপ্লব ক্ষুধিত লোকেরা ঘটাইয়াছিল।

যে-সব হিন্দু এখন মন্দির প্রবেশ করিতে পান না, অন্য হিন্দুরা তাঁহাদিগকে মৈত্রীর সহিত তথায় প্রবেশ করিতে দিলে, সমগ্র হিন্দু সমাজের সংহতি ও শক্তি বাড়িবে। তাহার পরোক্ষ রাজনৈতিক ফল আছে। যদি তাঁহারা, গবর্ন্মেন্টের বা গোঁড়া হিন্দুদের সহানুভূতির অভাবে, মন্দির-প্রবেশের অধিকার না-পান, তাহা হইলে অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইবে। তাহারও পরোক্ষ রাজনৈতিক ফল আছে।

অতএব, রাজনীতির সহিত মন্দির প্রবেশের সম্পর্ক কি সে-সম্বন্ধে মাথা না ঘামাইয়া, যাহা ন্যায্য তাহা করাই গবর্ন্মেন্ট ও জনসাধারণের কর্ত্তব্য।

—

সকল হিন্দুর দেবমন্দিরে প্রবেশ

কাহারও কাহারও মত এইরূপ, যে, যাঁহারা স্বয়ং মন্দিরে গিয়া দেবদেবীর পূজা করেন না, "অস্পৃশ্য"দের মন্দির-প্রবেশের অধিকার সম্বন্ধে তাঁহাদের কিছু বলা উচিত নয়। আমাদের মত সম্পূর্ণ এ-রকম নয়। আমরা মনে করি, যাঁহারা দেবদেবীর পূজা করেন, তাঁহাদের অধিকাংশের সম্মতি অনুসারেই সকল হিন্দুর মন্দিরসমূহে প্রবেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়; কিন্তু প্রশ্নটি সম্বন্ধে মত-প্রকাশের অধিকার অহিন্দুদেরও আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি, আমেরিকায় অনেক স্থানে খ্রীষ্টিয়ানদের গির্জায় কেবল শ্বেত খ্রীষ্টিয়ানদিগকে ঢুকিতে দেওয়া হয়, কৃষ্ণকায় নিগ্রোখ্রীষ্টিয়ানদিগকে ঢুকিতে দেওয়া হয় না। অখ্রীষ্টিয়ান লালা লাজপৎ রায় এবং অন্য অনেক অখ্রীষ্টিয়ান শ্বেত খ্রীষ্টিয়ানদের এইরূপ ব্যবহারের সমালোচনা করিয়াছেন—আমরাও করিয়াছি। কারণ, খ্রীষ্টিয়ান মাত্রেরই জাতি ও গায়ের রং নির্বিশেষে খ্রীষ্টীয় গির্জায় উপাসনা করিবার অধিকার থাকা উচিত, নতুবা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মেরই অপমান হয়। যাঁহারা হিন্দু নহেন, তাঁহারাও এইরূপ বলিতে পারেন, যে, হিন্দুদের ধর্ম্মমন্দিরে হিন্দু-মাত্রেরই প্রবেশের ও পূজার অধিকার থাকা উচিত, নতুবা হিন্দুধর্ম্মেরই অগৌরব হয় এবং হিন্দু সমাজের ক্ষতি হয়। অনেক নিষ্ঠাবান হিন্দু নিজেদের মন্দিরে সকল হিন্দুকে প্রবেশ করিতে দিতেছেনও।

সম্প্রতি প্রয়াগে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের নেতৃত্বে সনাতন হিন্দুদিগের মহাসভার যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে এইরূপ স্থির হইয়াছে, যে, "অস্পৃশ্য"দিগকে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দূর হইতে দেবদর্শন করিতে দেওয়া হইবে। কিন্তু তাঁহারা গর্ভমন্দিরে, অর্থাৎ মন্দিরের অভ্যন্তরস্থিত যে-অংশটিতে মূর্ত্তি বা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত, সেখানে, প্রবেশ করিতে বা বিগ্রহসমূহকে স্পর্শ করিতে পাইবেন না। গোঁড়া হিন্দুরা যে কতকটা অগ্রসর ও উদার হইয়াছেন, তাহা আশাপ্রদ বটে। এ-বিষয়ে ন্যায় ও যুক্তির কথা আগেই উত্থাপন না করিয়া আমরা বঙ্গে নানাবিধ সার্ব্বজনীন পূজার আয়োজন হইতে যাহা বুঝা যায় তাহাই বলিতে চাই। কয়েক বৎসর হইতে বাংলা দেশে সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজা, সার্ব্বজনীন কালীপূজা ও সার্ব্বজনীন সরস্বতী পূজা হইতেছে। এই সকল পূজায় সকল হিন্দুর দেবীমূর্ত্তি দর্শনের অধিকার ত থাকেই, অধিকন্তু সকল জাতির হিন্দুরা পৌরোহিত্য, মন্ত্রপাঠ, ভোগরন্ধন, প্রসাদ পরিবেষণ এবং এক পংক্তিতে বসিয়া প্রসাদ ভোজন করিয়া থাকেন। অবশ্য এরূপ ব্যবস্থা সকল গোঁড়া হিন্দুর অনুমোদিত নহে। কিন্তু ইহা হইতে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মনের ভাব বুঝা যায়—তাঁহারা কি না হইলে সন্তুষ্ট হইবেন না, বুঝা যায় না।

ন্যায় ও যুক্তির দিক্ দিয়া বিচার করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে, যে, যে-কেহ যে-প্রকারের হিন্দুত্বে বিশ্বাসী, তাঁহার সেই প্রকার হিন্দুত্বের সকল অনুষ্ঠান করিবার অধিকার থাকা উচিত, নতুবা হিন্দুসমাজ অক্ষুণ্ণ থাকিবে না, তাহার ক্ষয় হইবে—যেমন উহার ক্ষয় অনেক শতাব্দী হইতে আরব্ধ হইয়া খ্রীষ্টীয় ও মুসলমান সমাজের বৃদ্ধি হইতেছে। মন্দিরের সকল স্থানে প্রবেশ যখন কীট-পতঙ্গ ও অন্য নানা ইতর প্রাণী করিয়া থাকে, তখন জীব-শ্রেষ্ঠ মানুষেরও তাহা করিবার অধিকার থাকা উচিত। অবশ্য যে-সব মানুষ দেব-দেবীর পূজা করেন না, সুতরাং যাঁহারা কেবল কৌতূহলবশতঃ বা অবজ্ঞাভরে মন্দির প্রবেশ করিবেন—শ্রদ্ধার সহিত নহে, সে-সব মানুষের সেখানে যাওয়া অকর্ত্তব্য, যাইবার অধিকারও থাকিতে পারে না।

—

মন্দির-প্রবেশসম্বন্ধীয় আইন

আমরা যতটুকু বুঝিয়াছি, সকল হিন্দুর হিন্দু-মন্দিরে প্রবেশাধিকার সাব্যস্ত করিবার জন্য যে-কয়টি বিল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করা হইবে, তাহাদের উদ্দেশ্য কাহাকেও জোর করিয়া মন্দিরে ঢুকিবার অধিকার দেওয়া নহে। বর্ত্তমানে বৃটিশ আইনে যে বাধা জন্মাইয়াছে, তাহা দূর করাই বিলগুলির উদ্দেশ্য। এইরূপ শুনা গিয়াছে, যে, মান্দ্রাজ অঞ্চলে, এবং সম্ভবতঃ অন্যান্য প্রদেশেও, এমন মন্দির অনেক আছে যাহার সেবাইতরা ইচ্ছা করিলেও "অস্পৃশ্য"দিগকে ঢুকিতে দিতে পারেন না—তাহাদের নাকি এরূপ ট্রাষ্টডীড আছে, যাহাতে বাধে। এই বাধা দূর করিয়া এইরূপ নিয়ম করা বিলগুলির অভিপ্রেত, যে, কোনও মন্দিরে যাঁহারা এখন পূজা করেন বা দেন, তাঁহাদের অধিকাংশের মত হইলে "অস্পৃশ্যে"রাও মন্দিরে প্রবেশ করিয়া পূজা দিতে পারিবেন।

এইরূপ একটা রফা প্রস্তাবিত হইয়াছে, যে,"অস্পৃশ্য"গণ মন্দিরে পূজা দিবার পর মন্দিরকে শুদ্ধ করিয়া লওয়া হইবে। ইহা আমরা ভাল মনে করি না, তাঁহাদের পক্ষে অপমানকর মনে করি। তবে, তাঁহারা নিজে রাজী হইলে আমরা কিছু বলিতে চাই না। ভগবান্ স্বয়ং পতিতপাবন। তাঁহাকে ও তাঁহার পূজার স্থানকে কেহ স্পর্শ ও সান্নিধ্য দ্বারা অপবিত্র করিতে পারে না।

—

"গান্ধী দিবস"

"গান্ধী দিবস" এবং রাজনৈতিক "বন্দী দিবস" উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের নানা স্থানে বিস্তর পুরুষ ও নারীকে গ্রেপ্তার করার সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা হইতেও প্রমাণ হইতেছে, যে, কংগ্রেস বিনষ্ট হয় নাই।

—

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে চিকিৎসার জন্য গবর্ন্মেণ্ট যে ইউরোপ যাইতে দিতে রাজী হইয়াছেন এবং তিনিও যে যাইতে সম্মত হইয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। তিনি আরোগ্য লাভ করিলে সাতিশয় আনন্দের বিষয় হইবে। এখনও আশা আছে, যে, তিনি রওনা হইবার পূর্ব্বে বৃদ্ধ পিতা-মাতার সহিত দেখা করিয়া যাইতে পারিবেন। গোড়া হইতেই এ-বিষয়ে গবর্ন্মেণ্টের তাঁহাকে যথেষ্ট সুবিধা দেওয়া উচিত ছিল।

জেলে যে-অবস্থায় তাঁহাকে থাকিতে হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার গুরুতর পীড়া হইয়াছে। সে-সকল অবস্থাও গবর্ন্মেণ্টকৃত আইন, নিয়ম ও হুকুমের ফল। এই প্রকারে গবর্ন্মেণ্ট যখন পরোক্ষভাবে তাঁহার পীড়ার জন্য দায়ী, তখন দেশে থাকিতে যেমন, বিদেশেও তেমনি, তাঁহার চিকিৎসার ব্যয় গবর্ন্মেণ্ট নির্ব্বাহ করিলে ন্যায়সঙ্গত হইত।

—

অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীগণ

অন্য অনেক রাজনৈতিক বন্দীও পীড়িত হইয়া থাকেন, এবং অনেকে এখনও পীড়িত আছেন। তাঁহারা বিখ্যাত লোক নহেন বলিয়া তাঁহাদের পীড়ার সম্বন্ধে এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গ ও পোষ্যবর্গ সম্বন্ধে বেশী আলোচনা আন্দোলন হয় না। কিন্তু সকল স্থানের সকল অবস্থার সমুদয় দুঃখী লোকই সমবেদনার পাত্র।

—

ভারত-সরকারের কর্ম্মচারীদের বেতনের ছাঁট

আর্থিক অসচ্ছলতা বশতঃ ভারত-সরকার স্বীয় কর্ম্মচারীদের বেতন শতকরা দশ টাকা কমাইয়া দিয়াছিলেন। দেশের লোকের আয়বৃদ্ধির কোন লক্ষণ ত আমরা দেখিতে পাইতেছি না। কিন্তু শুনা যাইতেছে, ভারত-সরকারের রাজস্বে আগামী বৎসর বাড়তি হইবে অনুমিত হইয়াছে। গুজব রটিয়াছিল, সেই জন্য কর্ম্মচারীদের বেতন পূর্ব্ববৎ করিয়া দেওয়া হইবে। দেশের সর্ব্বত্র ইহার প্রতিবাদ হইয়াছিল। দেশের লোকদের পক্ষ হইতে এইরূপ মত প্রকাশিত হইয়াছিল, যে, ভারতীয়েরা করভারে পীড়িত, সরকারী তহবিলে বাড়তি হইলে আগে ট্যাক্স কমাইয়া দেওয়া উচিত। এখন স্থির হইয়াছে, যে, সরকার শতকরা ১০ টাকা হ্রাসই রহিত না করিয়া শতকরা ৫ টাকা হ্রাস রহিত করিবেন, বাকী পাঁচ টাকা এখন থাকিবে। এই অর্দ্ধেক ছাঁট আপাততঃ থাকিয়া যাওয়ায় ট্যাক্স কিছু কমিবে কি-না জানা যায় নাই।

অর্দ্ধেক ছাঁট যে মাফ করা হইল, তাহা ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনের সময়ও সভাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া করায় সভ্যেরা অনেকে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু শাসনকর্ত্তারা এই অসন্তোষ থোড়াই কেয়ার করেন।

ভারতীয়দের গড়পড়তা আয় যেরূপ কম, তাহাতে এদেশে উচ্চ, উচ্চতর ও উচ্চতম সরকারী চাকরোদের বেতন খুব বেশী। অনেকের বেতন ধনী আমেরিকার তৎসদৃশ চাকরোদের চেয়েও বেশী। এই জন্য ইহাদের বেতন শতকরা দশ টাকার চেয়েও বেশী কমাইয়া দিলে অন্যায় হয় না।

—

ব্যবস্থাপক সভায় বড়লাটের বক্তৃতা

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার বর্ত্তমান অধিবেশনের প্রারম্ভে বড়লাট এক বক্তৃতা করেন। তাহাতে এই রূপ মর্ম্মের সব কথা ছিল যেন ভারতবর্ষ দ্রুত ও অবিরত স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতেছে, শীঘ্রই ফেডারেশ্যন কার্য্যে পরিণত হইবে, ইত্যাদি।

স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা তাঁহার আদর্শ হইতে পৃথক্। ভারতবর্ষে রাজপুরুষেরা যাহাকে স্বাধীনতা বলিয়া বুঝাইতে চান, ইংলণ্ডে তাহাকে স্বাধীনতা বলে না।

বৃথা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে আমরা অনিচ্ছুক।

—

বাংলার লাট ও ইউরোপীয় সভা

কলিকাতায় সেদিন ইউরোপীয় সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সভার সভ্যসংখ্যা দু-হাজারের উপর, কিন্তু অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন জনা চল্লিশ। সভার কাজে এমনই এঁদের উৎসাহ। কিন্তু গবর্ন্মেণ্টের উপর এই সভার খুব প্রভাব আছে। ইহা এই মত প্রকাশ করিয়াছে, যে, বাংলাকে প্রভিন্শ্যাল অটনমি অর্থাৎ প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত রাখা হউক। ইহার সভাপতি মিঃ মর্গ্যান বার্ষিক সভায় বলিয়াছেন, "আমরা বিশ্বাস করি না, যে, শাসনপ্রণালীর যেরূপ পরিবর্ত্তন প্রস্তাবিত হইয়াছে, তাহাতে বাংলা দেশের ভারতীয় বা ব্রিটিশ লোকদের কল্যাণ হইবে, কিংবা শেষ পর্য্যন্ত প্রদেশটি সমৃদ্ধ হইবে।" ভারতবর্ষে যেরূপ শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবে বলিয়া আভাস পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে আমরাও মনে করি না ভারতীয় লোকদের মঙ্গল হইবে। তবে ভারতপ্রবাসী ব্রিটিশরা তাহাতে সমৃদ্ধ থাকিতে পারে। যাহা হউক, দেশের লোকদিগকে যে সামান্য কর্তৃত্ব দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, মিঃ মর্গ্যানের মতে বাঙালীদের তাহাও পাওয়া উচিত নয়। তাঁহার মনের ভাবটা তাঁহার নিম্নলিখিত কথাগুলি হইতে বুঝা যায়।

"Peace within limitations had been secured by special methods, but would that endure if the special methods were abandoned? Could they hope for a change of heart under a different form of Government? Was it in fact the fault of the form of Government, or was it due to an inherited lack of love of law and order?"

তাৎপর্য্য।

"বিশেষ উপায় অবলম্বন দ্বারা সীমাবদ্ধ শান্তি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু বিশেষ উপায়গুলি বর্জ্জিত হইলে তাহা টিকিবে কি? ভিন্নরূপ গবর্ন্মেণ্টের অধীনে বাঙালীদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হইবে কি? বঙ্গের অবস্থা কি শাসনপ্রণালীর দোষে খারাপ হইয়াছে, না লোকেরা আইন ও শৃঙ্খলার প্রতি অনুরাগের অভাব উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়ায় খারাপ হইয়াছে?"

মিঃ মর্গ্যানের উক্তির উপর অবাঙালী-সম্পাদিত এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ লীডার কাগজের মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি।

"For years and years Bengal was one of the most law-abiding provinces. Did that show an inherited lack of love of law and order? Why has the position deteriorated? For years it has been governed with the aid of special laws of exceptional severity, and yet the problem of 'law and order' has become progressively difficult. Politico-economic causes are at the root of the trouble and they are intimately connected with the system of Government which has been breeding political etxremism. The causes cannot be removed without a change in the system. The highly developed political consciousness of Bengal has been finding it increasingly intolerable. A study of the history of the national movement in the province during the last thirty or forty years ought to make it abundantly clear that the remedy for its political ills is to be found in the grant of free and democratic institutions."

সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য।

দীর্ঘকাল ধরিয়া বাংলা দেশ সর্ব্বাপেক্ষা আইনানুগ প্রদেশগুলির অন্যতম ছিল। তাহা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আইন ও শৃঙ্খলার প্রতি অনুরাগের অভাব প্রমাণ করে না। বঙ্গের অবস্থা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কারণের সমবায়ে এরূপ হইয়াছে। বঙ্গের রাজনৈতিক ব্যাধিসমূহের প্রতিকার স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রবর্ত্তনেই পাওয়া যাইবে।

বঙ্গের গবর্ণর ইউরোপীয় সভার মতকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—

"It would certainly be a great misfortune for the province and for all interests connected with it if, when self-government was being conferred upon the other provinces of India, Bengal had to be singled out for special treatment. I trust that the province may be spared that humiliation and the bitter feeling that it would inevitably arouse."

তাৎপর্য্য।

যখন ভারতের অন্য সব প্রদেশকে স্বশাসন দেওয়া হইতে যাইতেছে, তখন বঙ্গের জন্য আলাদা ব্যবহারের ব্যবস্থা হইলে মহা দুর্ভাগ্যের বিষয় হইবে। আমি ভরসা করি বঙ্গদেশ এই অবমাননা ও তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল যে তিক্ত মনোভাব তাহা হইতে রক্ষা পাইবে।

লাটসাহেব কথাগুলি ঠিকই বলিয়াছেন। তবে, 'ভারতবর্ষকে' যে স্বশাসন দেওয়া হইতে যাইতেছে, আমাদের ধারণা সেরূপ নয়।

মিঃ মর্গ্যান বলিয়াছেন, বাঙালীরা "ল এণ্ড অর্ডার" ভালবাসে না এবং এই ভাল না-বাসাটা তাহাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি। কথাটার জবাব 'লীডার' দিয়াছেন। আমরা আরও কিছু বলিতে চাই। আমরা মনে করি না, যে, বঙ্গে বা ভারতবর্ষের অন্যত্র

কোন কোন লোকদের দ্বারা অস্ত্রব্যবহারসাপেক্ষ যে-প্রকার উপদ্রব অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহার ফলে দেশ স্বাধীন হইবে বা হইতে পারে। ন্যায় ও মানবিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত আইন ও শৃঙ্খলার মর্য্যাদা রক্ষিত হওয়া সর্ব্বথা, সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয়। মিঃ মর্গ্যানের মতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বশাসক অংশগুলি আইন ও শৃঙ্খলার প্রতি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত একান্ত অনুরাগের পুরস্কারস্বরূপ স্বশাসনের অধিকার পাইয়া থাকিলে, সেই দেশগুলির ইতিহাস যাহাতে ভারতবর্ষের স্কুলকলেজসমূহে পঠিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করাইবার চেষ্টা তাঁহার করা উচিত।

—

সরকারী মত প্রচার

গবন্মেণ্ট নানা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে পুস্তকপুস্তিকা লিখাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন—বিশেষতঃ পল্লীগ্রাম অঞ্চলে, যেখানে লোকে সাধারণতঃ পড়িবার জিনিষ কম পায় এবং ছাপার অক্ষরে যাহা দেখে তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। সরকার বাহাদুরের হাতে ক্ষমতা আছে ও টাকা আছে। সুতরাং এইপ্রকার মত প্রচারের কাজে বাধা জন্মিতেছে না।

ইংরেজীতে স্পোর্ট্‌স্‌ম্যান্‌লাইক্‌ বলিয়া একটি বিশেষণ আছে। ইংরেজরা তাহা নিজেদের বিশেষত্ব মনে করেন। খবরের কাগজওয়ালাদের কাছে যে ঐ সব পুস্তকপুস্তিকা পাঠান হয়, তাহাতে ঐ খেলোয়াড়ত্বের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। সরকারী লেখকরা যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিতে পারেন, তাহার উত্তরে সাংবাদিকদের কাছে অকাট্য যুক্তি ও তথ্য থাকিলেও তাঁহাদের তাহা লিখিবার জো নাই। সুতরাং একজন খেলোয়াড় আর একজনের হাত-পা বাঁধিয়া দিয়া যদি বলেন, "এসো না হে, খেলা যাক্", ব্যাপারটা প্রায় সেই রকম দাঁড়াইতেছে।

সাংবাদিকদের কাছে মুদ্রিত, হস্তলিখিত, মৌখিক এমন নানা জিনিষ আসিয়া পৌঁছে, যাহার সত্যতা পরীক্ষা করিবার জন্যও ছাপিতে না-পারায়, তাঁহাদের অনিদ্রার সম্ভাবনা ঘটে। তাহার উপর, যাহার জবাব আছে অথচ নিরাপদে জবাব দেওয়া চলে না, এমন জিনিষ পড়িয়া অনিদ্রাগ্রস্ত হইতে আমরা কোন বুদ্ধিমান সাংবাদিককে পরামর্শ দিতে পারি না।

—

রামমোহনের সহিত বিবেকানন্দের আত্মিক সম্পর্ক

গত মাসে কলিকাতার আলবার্ট হলে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রবাসীর সম্পাদককে সভাপতির কার্য্য করিতে হইয়াছিল। কলিকাতায় বক্তৃতার রিপোর্ট লইবার সুবন্দোবস্ত না থাকায় কোন কোন বক্তৃতার ভ্রান্তিজনক বা খুব অসম্পূর্ণ রিপোর্ট বাহির হয়। সেইজন্য আমরা উক্ত সভায় যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার কিছু উল্লেখ করিতে হইতেছে।

প্রাচীন কালের বুদ্ধদেব হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারতীয় ধর্ম্মোপদেষ্টাদের যে আধ্যাত্মিক বংশধারা ও যোগ চলিয়া আসিতেছে, তাহার উল্লেখ করিয়া আমরা রামমোহন রায়ের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের এইরূপ যোগ সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতার একটি গ্রন্থ হইতে নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি পাঠ করি।

"It was here, too, that we heard a long talk on Ram Mohun Roy, in which he pointed out three things as the dominant notes of this teacher's message, his acceptance of the Vedanta, his preaching of patriotism and the love that embraced the Musalman equally with the Hindu. In all these things he claimed himself to have taken up the task that the breadth and foresight of Ram Mohun Roy had mapped out."—*Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda*, by Sister Nivedita, edited by the Swami Saradananda (Authorized Edition, 1913) page 19.

"এইখানেই রামমোহন রায় সম্বন্ধে তাঁহার [বিবেকানন্দের] একটি দীর্ঘ কথন শুনিয়াছিলাম, যাহাতে তিনি তিনটি জিনিষকে এই উপদেষ্টার বাণীর প্রধান সুর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন—তাঁহার বেদান্ত-মত স্বীকার, তাঁহার দেশহিতৈষণা প্রচার, এবং সেই প্রেম যাহা সমভাবে হিন্দু ও মুসলমানকে আলিঙ্গন করিয়াছিল। স্বামীজি দাবি করিয়াছিলেন, যে, এই সকল বিষয়ে তিনি সেই কাজের ভার গ্রহণ করিয়াছেন যাহার নক্সা রামমোহনের ঔদার্য্য ও ভবিষ্যদ্দৃষ্টি অঙ্কিত করিয়া গিয়াছে।"

স্বামীজি নিজে যেমন কোন ভাষ্যকারেরই বেদান্ত-ব্যাখ্যা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ না করিয়া অনেক স্থলে স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, রামমোহনও তেমনি নিজের অনুমোদিত এবং অংশতঃ উদ্ভাবিত ব্যাখ্যা অনুসারে বেদান্ত-মত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

স্বামীজি রামমোহনের উপদেশের যে তিনটি প্রধান সুরের উল্লেখ করিয়াছিলেন, তা ছাড়া আরও দুটি বিষয় দুইজন হিন্দুশিরোমণি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই দুটি স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ইংরেজী বক্তৃতা ও লেখাবলীতে পাওয়া যায়। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :—

"In matters of religion, no doubt, every allowance must be made for diversity of opinion. But one thing, I believe, we all will be agreed upon—all sects whether orthodox Hindoos or progressive Brahmos, whether Mahomedans or Christians, that to Ram Mohun Roy is due the credit of forcibly pointing out to learned Hindoos that religion does not require one to be a *jogi*, a *suttee*, or to go to the forest, but that home and society are the best surroundings of appropriate worship. —Page 301.

সমাজ ও গৃহপরিবারই যে যথাযোগ্য ভগবদারাধনা ও ধর্ম্মসাধনের শ্রেষ্ঠ পরিবেষ্টন, রামমোহন ইহা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন বলিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বলেন :—

"In connection with the versatility of the late Raja Ram Mohun Roy, I hope I shall be permitted to take this opportunity of saying that it is a matter of great rejoicing that he should be claimed by all sections of the community as a man who ought to be admired. Gentlemen, while it is a matter for rejoicing, I must at the same time raise my warning voice that we should not lose sight of the great central truth to the propagation of which the late Raja Ram Mohun Roy devoted his whole life, and that was, the unity of the Godhead. The great aspiration of the late Raja Ram Mohun Roy was to enable the human mind to acquire the highest truth which it was capable of acquiring, and that was to have a just, correct, and true idea of the unity of the Godhead..." "I am an outspoken man, and may be blamed for making these remarks, but still, when I recollect what the late Raja Ram Mohun Roy did for the abolition of idolatry, and what we have since been doing towards the same object, I must say that we cannot congratulate ourselves upon our energy." Pp. 363-64.

রামমোহন রায় যে পরমাত্মার একত্ব প্রমাণ করিতে এবং সেই নিরাকার পরমপুরুষের পূজা প্রবর্ত্তিত করিতে জীবনব্যাপী চেষ্টা করিয়াছিলেন, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাহা বলেন।

—

জাতিভেদ সম্বন্ধে বিবেকানন্দের মত

আলবার্ট হলে জাতিভেদের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের নিম্নমুদ্রিত মতগুলি আমরা পাঠ করিয়াছিলাম।

"Just as man must have liberty to think and speak, so he must have liberty in food, dress and marriage and in every other thing, so long as he does not injure others."—*Complete Works of the Swami Virekananda*, part iv, p. 313.

"...the conviction is daily gaining on my mind that the idea of caste is the greatest dividing factor and the root of *Maya*....

"It is in the books written by priests that madness like that of caste is to be found, and not in the books revealed from God."—*Ibid.*, part vi, p. 355.

"Buddha was the only great Indian philosopher who would not recognize caste..."

"All the other philosophers pandered more or less to social prejudices..."—*Ibid.*, pt. vii, p. 37.

স্বামীজির বক্তৃতাদিতে এই মতগুলির বিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান কথাও আছে বলিয়া আমরা অবগত আছি। কিন্তু যে উপলক্ষ্যে আলবার্ট হলে সভার অধিবেশন হইয়াছিল, সেস্থলে তর্কবিতর্কের উত্থাপন করা আমাদের অভিপ্রেত ছিল না বলিয়া আমরা সেগুলি উদ্ধৃত করিয়া তর্কযুক্তির দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করি নাই, যে, স্বামীজি প্রচলিত "ছুঁৎমার্গের" এবং বংশানুক্রমিক জাতিভেদের বিরোধী ছিলেন।

উপরের শেষ উদ্ধারটিতে বুদ্ধদেবের উল্লেখ আছে। সেই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের সহিত স্বামীজির কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্যের কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছিলাম।

—

বিবেকানন্দের কয়েকটি অবদান

ভারতীয়দের যে একটা বদ্ধমূল নিকৃষ্টতাবোধ (inferiority complex) এবং পরাজিতের অবসাদ (defeatism) আছে, বিবেকানন্দ তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, একথা আমরা বলিয়াছিলাম। তাঁহার মতে ভারতীয়েরা এক সময় যেমন বড় ছিলেন ও মহৎ কাজ করিয়াছিলেন, আবার সেই রূপ হইতে ও করিতে পারেন। তিনি সেবাধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, যাহার সহিত হৃদয়বান্ বাঙালীর মনের ভাবের সামঞ্জস্য আছে।

তাঁহার মতে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের শ্রেষ্ঠ যাহা কিছু, তিনি তাহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস এরূপ ছিল না, যে, যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ সমুদয়ই ভারতবর্ষে আছে বা ছিল কিংবা কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই আছে বা ছিল। তিনি পাশ্চাত্য মহাদেশ সকলেরও ভাল দিক্ দেখিতে সমর্থ ছিলেন। সেই জন্য নিম্নলিখিত এবং তদ্রূপ অন্য নানা কথা বলিয়াছিলেন :

"Can you not make a European society with Indian religion? I believe it is possible and it must be." *Complete Works of the Swami Vivekananda*, part iv, p. 313.

"তোমরা কি ভারতীয় ধর্ম্মবিশিষ্ট একটি ইউরোপীয় সমাজ গড়িতে পার না? আমার বিশ্বাস ইহা সম্ভবপর এবং ইহা হইবেই।"

এই বাক্যগুলি হইতে মনে হয়, তিনি পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিক সামাজিক সাম্য, তাহাদের কর্ম্মিষ্ঠতা ও উদ্যোগিতা, তাহাদের স্বাধীনতা-প্রিয়তা, তাহাদের বিজ্ঞানানুশীলন, অমঙ্গলকে আক্রমণ করিবার এবং অধ্যবসায়ের সহিত অমঙ্গলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার তাহাদের সাহস ও সামর্থ্য এবং তাহাদের প্রগতিশীলতা ভারতীয় চরিত্রে বিকশিত হউক, ইহা তিনি বাঞ্ছা করিতেন।

আমরা বক্তৃতাতে ইহাও বলিয়াছিলাম, যে, আজকাল আমাদের দেশে ধর্ম্মের প্রতি ঔদাসীন্যের ভাব দেখা যাইতেছে, তাহা অংশতঃ স্লেভ্ মেণ্টালিটি বা দাসমনোভাবের ফল। অনেকে মনে করেন, যে-হেতু রুশিয়ার প্রবল রাজনৈতিক দল ধর্ম্মকে উড়াইয়া দিয়েছে [illegible]

নয়। অন্য জাতির লোক একটা কিছু করিতেছে বলিয়াই আমাদিগকেও তাহাই করিতে হইবে, ইহা ঠিক্ নয়। বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, তাহারা ঠিক্ পথ ধরিয়াছে কি-না। দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম্মের নাম ও আকারটা রুশিয়ার প্রবল দল বর্জ্জন করিলেও ধর্ম্মের অন্যতম সার বস্তু যে কল্যাণে বিশ্বাস এবং কল্যাণের অবশ্যম্ভাবী প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাস এবং তাহার জন্য অদম্য চেষ্টা, তাহা রুশিয়ায় রহিয়াছে। তৃতীয়তঃ, ধর্ম্মের সহিত জড়িত আবর্জ্জনাগুলা বাদ দিয়া ভারতীয় মহামানবদের মত বিশ্বাস ও চরিত্র আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে, ধর্ম্ম কত বড় ও কিরূপ হিতকর জিনিষ।

—

রাজনৈতিক নিলামের ডাক

ভারতবর্ষীয় রাজনীতিক্ষেত্রে নিলাম চলিতেছে, ন্যাশন্যালিষ্ট অর্থাৎ স্বাজাতিক মুসলমান যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের দল কত বড় জানি না। কিন্তু তাঁহারা এখনও প্রভাবশালী হইতে পারেন নাই। তাঁহারা স্বাতন্ত্র্যকামী মুসলমানদিগকে নিজেদের দলে আনিবার চেষ্টায় তাঁহাদের প্রায় সব দাবিই মানিয়া লইয়াছেন এবং হিন্দু স্বাজাতিকদিগকেও তৎসমুদয় মানিয়া লইতে অনুরোধ করিয়াছেন। অনেক হিন্দু নেতা এই অনুরোধ রক্ষা করিতে রাজীও হইয়াছেন। কিন্তু এখানে একটি বিঘ্ন ঘটিয়াছে। বিঘ্নটির দুটি দিক আছে। একটি দিক্ এই যে, স্বাজাতিক হিন্দু ও মুসলমানেরা স্বাতন্ত্র্যকামী মুসলমানদিগকে মৌখিক বা কাগজে-লেখা অঙ্গীকার মাত্র দিতে পারেন, আসল জিনিষটা দিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। স্বাতন্ত্র্যবাদী মুসলমানেরা বস্তুতান্ত্রিক ("realists"), বাক্যতান্ত্রিক নহেন; কথায় তাঁহাদের চিঁড়া ভিজিতে পারে না। গবন্মেণ্ট আসল জিনিষটা সদ্যসদ্যই দিতে সমর্থ। বিঘ্নের দ্বিতীয় দিক্ এই, যে, স্বাজাতিক হিন্দু-মুসলমানরা কেবল কথায় বা কাগজে যতটা দিতে চাহিতেছেন, ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট কার্য্যতঃ তার চেয়ে বেশী দিতেছেন। দৃষ্টান্ত লউন। রাজনৈতিক নিলামে স্বাজাতিকেরা স্বাতন্ত্র্যকামী মুসলমানদের মৈত্রীর দর হাঁকিলেন, "সিন্ধুদেশকে আলাদা প্রদেশ করিয়া দিব; কিন্তু তথাকার হিন্দুদের কিছু কিছু সুবিধা রক্ষিত হওয়া চাই, এবং আলাদা প্রদেশের খরচটা কি প্রকারে চলিবে তাহা স্থির করিবার জন্য উভয় সম্প্রদায়ের একটি কমিটি হইবে।" ভারত-সচিব দর চড়াইয়া হাঁকিলেন, "সিন্ধুকে বিনা সর্ত্তে আলাদা করিলাম।" বাস্—নিলামের একটা দফা শেষ হইল।

স্বাজাতিক হিন্দু-মুসলমান বলিলেন, "ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার শতকরা ৩২টি আসন মুসলমানদের জন্য রক্ষিত থাকিবে।" ভারত-সচিব দর দিলেন, "ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় শতকরা ৩৩⅓টি আসন মুসলমানেরা পাইবেন।" বাস্—নিলামের দ্বিতীয় পর্ব্ব শেষ হইল!

প্রধান মন্ত্রী কিন্তু একটা নিলামের ডাকে হারিয়া গিয়াছেন। অস্পৃশ্য ও অবনতদের মৈত্রী ক্রয় করিবার জন্য তিনি বঙ্গের ঐ শ্রেণীর লোকদিগকে দশটি আসন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। আম্বেদকরী প্ররোচনা, পরামর্শ ও চাপে পুণার চুক্তিকারীরা দশের জায়গায় ত্রিশ ডাকিয়া ফেলিলেন, এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় যেখানে প্রধান মন্ত্রী তাহাদিগকে কিছুই দেন নাই, সেখানে শতকরা আঠারটি আসন অঙ্গীকার করিলেন। পাছে মহাত্মা গান্ধী উপবাসে মারা যান, সেই ভয়ে প্রধান মন্ত্রী ত্রিশেই রাজী হইলেন!

—

চিনির কারখানা

পনর বৎসরের জন্য বিদেশী চিনির উপর শুল্ক বসায় দেশী চিনি প্রতিযোগিতায় অন্ততঃ পনর বৎসর টিকিতে পারিবে, এবং সেই সময়ের মধ্যে সুদ-সমেত কারখানাগুলির মূলধন আদায় হইয়া যাইবে। এই জন্য যে-যে অঞ্চলে আকের চাষের এবং চিনির কারখানা চালাইবার সুবিধা আছে, সেখানে অনেক চিনির কারখানা স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে। এক বৎসরে ২৫টি নূতন চিনির কারখানা ভারতবর্ষে স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার মধ্যে শতকরা ৯০টি আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে স্থাপিত হইয়াছে। তাহার কারণ, ঐ প্রদেশে আকচাষের উপযুক্ত জমী খুব বেশী (৯ লক্ষ একর) আছে, সেখানে উৎকৃষ্ট জা'তের আক-চাষে চাষীরা অভ্যস্ত হইয়াছে, জলসেচনের খালাদি সুব্যবস্থায় জমীর উর্ব্বরতা বাড়িয়াছে, কারখানার কাজে দক্ষ ও অভিজ্ঞ মজুর ঐ প্রদেশে পাওয়া যায়, এবং কারখানাগুলি রেলওয়ে লাইনের ধারে অবস্থিত হওয়ায় কারখানায় আক আনিবার এবং কারখানা হইতে চিনি চালান দিবার সুবিধা আছে। মাড়োয়ারীরা কারবারী লোক। কোথায় টাকা খাটাইলে বেশী লাভ হয়, তাহা আমাদের চেয়ে তাহারা বেশী বুঝে। এই জন্য তাহারা ইতিমধ্যেই আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে অনেক চিনির কারখানা খুলিতেছে। বাঙালীদের মধ্যে যাঁহাদের টাকা আছে এবং যাঁহারা চিনির কারখানাতে তাহা

খাটাইতে চান, তাঁহারা কোম্পানী করিয়া আগ্রা-অযোধ্যায় চিনির কারখানা খুলিতে পারেন। বঙ্গদেশে চিনির কারখানা খুলিতে হইবে না বলিতেছি না; খুলিতে হইবে। কিন্তু আগ্রা-অযোধ্যা বা বিহারে কারখানা খুলিয়া তথাকার অর্জ্জিত অভিজ্ঞতা এবং সেখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত মজুর ও কারিকর লইয়া পরে বঙ্গদেশে কাজ করিলে সুবিধা হইবে। যাঁহারা আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে কারখানা করা সম্বন্ধে আরও বৃত্তান্ত জানিতে চান, তাঁহারা এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসের ঠিকানায় শ্রীযুক্ত হরিকেশব ঘোষকে চিঠি লিখিবেন। আগ্রা-অযোধ্যায় চিনির কারখানা করিবার যে-সব সুবিধা বলিলাম, বঙ্গের যে-সব জায়গায় এখনই সেরূপ সুবিধা আছে, সেখানে বাঙালীরা অবশ্যই এখনই কারাখানা স্থাপন করুন।

—

সংস্কৃত কলেজ ও স্কুল এবং হিন্দু স্কুল

বঙ্গের সরকারী ব্যয়সংক্ষেপ কমিটি সংস্কৃত কলেজের ডালপালা ছাঁটিয়া উহাকে ন্যাড়া ও বোঁচা করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, সংস্কৃত কলেজের স্কুল-বিভাগটি উঠাইয়া দিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাকে সম্মিলিত হিন্দু ও হেয়ার স্কুলের সঙ্গে মিশাইয়া দিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন—তৎসমুদয়ের আলোচনা আমরা অনেক আগে প্রবাসীতে ও মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় করিয়াছি। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, যে, বঙ্গের প্রসিদ্ধ হিন্দু জমিদার, ব্যারিষ্টার, উকীল, ব্যবসাদার প্রভৃতি বহুসংখ্যক ভদ্রলোক ব্যয়সংক্ষেপ কমিটির প্রস্তাবগুলির প্রতিবাদ করিয়া গবর্মেণ্টের নিকট একটি আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারা যে-সকল যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, পূর্ব্বে আমরাও সেই সকল যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলাম।—গত অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসী, ৩০৬-০৭ পৃষ্ঠা, এবং গত বর্ষের ডিসেম্বর মাসের মডার্ণ রিভিউ, ৭১৮-১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হিন্দুদের শিক্ষা অপেক্ষা মুসলমানদের শিক্ষার জন্য গবর্মেণ্ট অনেকগুণ বেশী খরচ করেন, মুসলমানদের শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারী স্কুল-কলেজের সংখ্যা হিন্দুদের জন্য পরিচালিত তদ্রূপ প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা অনেক বেশী। গবর্মেণ্ট এবং মুসলমান শিক্ষামন্ত্রী যদি ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া হিন্দুদের শিক্ষার ব্যবস্থা যাহা আছে, তাহাও কমাইতে চান, তাহা হইলে হিংসুটে ও ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের তৃপ্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে দেশের বা কোনও সম্প্রদায়ের মঙ্গল হইবে না।

—

তৃতীয় তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠক

তৃতীয় তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠকের সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। যে-সব বৃত্তান্ত মোটামুটি আগেই খবরের কাগজে বাহির হইয়াছিল, তাহা বিস্তারিত ভাবে একত্র ঐ রিপোর্টে পাওয়া যায়। আগে হইতে যাহা জানা ছিল, উহা হইতে সেই সব কথাই জানা যায়। ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ-গবর্মেণ্ট স্বাধীন হইতে ত দিবেনই না, স্বশাসক ক্যানাডা প্রভৃতি উপনিবেশের সমান বা তাহার কাছাকাছি ক্ষমতাও দিবেন না। ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড আরুইনের এবং প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডন্যাল্ডের বহু বক্তৃতায় কিন্তু পরিষ্কারভাবে ইহাই বলা হইয়াছিল, যে, ভারতবর্ষ স্বশাসক ডোমীনিয়ান হইবে।

ভারতবর্ষের সৈনিক ও বৈদেশিক বিভাগ বড়লাটের হাতে থাকিবে। তা-ছাড়া আর যে-সব কাজের ভার তাঁহার উপর থাকিবে, তাহার ফর্দ্দ দিতেছি।

১। দেশের মধ্যে ভীষণ অশান্তি উপস্থিত হইলে বড়লাট তাহা নিবারণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। (ভীষণটা কতটা ভীষণ, তাহার বিচার-ভার অবশ্য তাঁহার হাতে থাকিবে, এবং সম্ভবতঃ এখনকার মত তিনি ভবিষ্যতেও সাধারণ আইনের জায়গায় অর্ডিন্যান্স জারি করিতে পারিবেন।)

২। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সকলের স্বার্থরক্ষার ভার। (ইহার দ্বারা জাতিগঠনের অন্তরায়গুলিও সংরক্ষিত থাকিবার সম্ভাবনা।)

৩। রাজকর্ম্মচারীদের অধিকার রক্ষার ভার। (অর্থাৎ বড় চাকরেদের সব চাকরি ও বেতনাদি যাহাতে যথাসম্ভব বজায় থাকে, এবং দেশী মন্ত্রীরা কর্ম্মচারীদের উপর কোন প্রকৃত কর্ত্তৃত্ব করিতে না পারেন, এতদ্দ্বারা তাহার ব্যবস্থা করা হইল।)

৪। সংরক্ষিত বিভাগের শাসন। (অর্থাৎ এখন যেমন প্রাদেশিক ডায়ার্কি বা দ্বৈরাজ্য আছে ও যাহাতে ফল ভাল হয় নাই, ভবিষ্যতে তেমনি ভারতীয় গবর্মেণ্টেও দ্বৈরাজ্য হইবে, এবং সংরক্ষিত বিভাগই রাজস্বের অধিকতর অংশ গ্রাস করিবে।)

৫। নৃপতিদের স্বার্থরক্ষা। (নৃপতিরা এখন যেমন স্বেচ্ছাকারী আছেন, তেমনই থাকিবেন!)

৬। বাণিজ্য বিষয়ে পক্ষপাত নিবারণ। (বর্ত্তমানে এবং ইংরেজ রাজত্বের গোড়া হইতে দেশী লোকদের চেয়ে বিলাতের ইংরেজ ও এদেশের ইংরেজরা পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ও ক্রয়বিক্রয় এবং ব্যাঙ্কিং আদিতে অধিক সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছেন। এই অধিক সুবিধাটা বজায় রাখা এই ষষ্ঠ দফাটির দ্বারা চলিবে। কোন স্বাধীন দেশেই বাণিজ্যাদি বিষয়ে দেশী লোকদের চেয়ে বিদেশীদের বাণিজ্যের সুবিধা বেশী নাই, বরং দেশীদের সুবিধাই বেশী আছে, এবং তাহাই স্বাভাবিক। ভারতবর্ষে বৈদেশিকদের অধিকতর সুবিধামূলক যে অসাম্য চলিয়া আসিতেছে, তাহা বজায় রাখার নাম পক্ষপাত নিবারণ।)

—

দীপালি সংঘের প্রদর্শনী বন্ধ

গত বাংলা বৎসরের মত এ-বৎসরও ঢাকার দীপালি-সংঘ একটি প্রদর্শনী খুলিবার আয়োজন করিয়াছিলেন। ইহা কিছু গোপনীয় ব্যাপার নয়, বৈপ্লবিক কিছুও নয়। প্রকাশ্যভাবে ইহার আয়োজন দুই মাসের অধিক কাল ধরিয়া চলিতেছিল। ইহার প্রকাশ্যভাবে বিতরিত ১৯৩২ সালের ১৯শে অক্টোবরের মুদ্রিত হ্যাণ্ডবিল আমরা দেখিয়াছি, ১৩ই নবেম্বরের মুদ্রিত হ্যাণ্ডবিলও দেখিয়াছি। ১৬ই নবেম্বর সংঘ আমোদ-ট্যাক্স রহিত করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে লিখিত দরখাস্ত করেন। ১৭ই ডিসেম্বর প্রদর্শনী খুলিবার তারিখ ছিল। কোথায় কে গোপনে খাতায় কি লেখে তাহাও যখন পুলিসের গোচর হয়, তখন প্রকাশ্যভাবে বিতরিত হ্যাণ্ডবিল খুব সম্ভব পুলিসের হাতে পড়িয়াছিল এবং তাহা হইতে পুলিসের কর্ত্তারা প্রদর্শনীর তারিখ প্রায় দু-মাস আগে জানিয়াছিলেন। কিন্তু সম্ভাবনার কথা ছাড়িয়া দিলেও ম্যাজিষ্ট্রেট উহার তারিখ উক্ত দরখাস্ত হইতে নিশ্চয়ই এক মাস তিন দিন আগে জানিয়াছিলেন। সুতরাং প্রদর্শনীটা ব্রিটিশ গবন্মেণ্টকে উন্টাইয়া দিবার একটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আয়োজন বলিয়া পুলিসের বা তাঁহার সন্দেহ হইয়া থাকিলে তিনি তাহা অবিলম্বে বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন, তাহাতে উদ্যোক্ত্রীদের এবং ষ্টলের ভাড়াটিয়াদের বেশী ক্ষতি হইত না। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি বন্ধ করিবার হুকুম দিলেন প্রদর্শনী খুলিবার আগেকার দিন ১৬ই ডিসেম্বর বেলা সাড়ে তিনটার সময়! তাহাতে আয়োজনে ব্যয়িত দীপালি-সংঘের নেত্রীদের অনেক টাকা ক্ষতি হইয়াছে, যাহা আয় হইতে পারিত তাহা হয় নাই, এবং ষ্টলরক্ষকদের আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে। সকল চেয়ে দুঃখের বিষয় এই, যে, অনেক দরিদ্র মহিলা সামান্য লাভের আশায় সারা বৎসরের পুঁজি ব্যয় করিয়া ষ্টল লইয়াছিলেন। তাঁহাদের লাভ না হইয়া লোকসান হইল। গত বৎসর প্রদর্শনীর দ্বিতীয় দিনে শ্রীযুক্তা লীলাবতী নাগ গ্রেপ্তার হন। কিন্তু তাহার পরও পাঁচ দিন ধরিয়া শেষ পর্য্যন্ত প্রদর্শনী যথারীতি খোলা ছিল। দীপালি-সংঘ সমস্ত বৎসর নিজেদের শিক্ষাদান, কুটীরশিল্পের উন্নতি ও বিস্তৃতি সাধন প্রভৃতি কাজ করিয়া আসিতেছেন। তাহাতে সরকারের কোন অসুবিধা বা ক্ষতি হয় নাই, সরকারী কর্ম্মচারীরাও সংঘের কাজে কোন বাধা বিঘ্ন অসুবিধা জন্মান নাই। তবে হঠাৎ এবার কেন প্রদর্শনী বন্ধ করা হইল? রাজকর্ম্মচারীরা সর্ব্বপ্রযত্নে রাজ্যরক্ষা করুন। কিন্তু এমন কোন অনাবশ্যক কাজ তাঁহাদের করা উচিত নয় যাহাতে অকস্মাৎ লোকের অকারণ অসুবিধা ও ক্ষতি হয়।

শুনিয়াছি, ম্যাজিষ্ট্রেট এ-বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করিবেন বলিয়াছেন। তাহা করিয়া প্রদর্শনী খুলিতে দিলে তাঁহার কর্ত্তব্য সাধিত হইবে।

—

ডিভ্যালেরার জিৎ

আইরিশ পার্লেমেণ্টের নির্ব্বাচনে দেশপতি ডিভ্যালেরার দলের সভ্যদের সংখ্যা অন্য সব দলের মোট সংখ্যার চেয়ে এক বেশী হইয়াছে, ইহার জোরেই হয় ত তিনি স্বদেশকে স্বাধীনতার পথে কতকটা অগ্রসর করিতে পারিবেন।

—

ফিলিপাইন স্বাধীনতা

আমেরিকার ব্যবস্থাপক সভা কংগ্রেসে একটি আইন পাস্ হইয়াছে, যাহার সর্ত্তগুলি গ্রহণ করিলে ফিলিপিনোরা দশ হইতে তের বৎসরে স্বাধীন হইতে পারিবে। সর্ত্তগুলি গ্রহণ করিলে আমেরিকার সহিত তাহাদের বাণিজ্য কতকটা সীমাবদ্ধ হইবে।



প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩২শ ভাগ, ২য় খণ্ড } চৈত্র, ১৩৩৯ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

উড়িষ্যায় বর্গীর প্রতিরোধ

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, এম-এ

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ ভারতের পক্ষে একটা দুঃস্বপ্নের মত চলিয়া গিয়াছে। তখন প্রবলপরাক্রমে ঘূর্ণিবায়ুর মত মহারাষ্ট্র-শক্তি ভারতের সকল প্রদেশ বিধ্বস্ত করিতেছিল। লোকে নিশ্চিন্ত মনে স্ত্রীপুত্র লইয়া বাস করিতে পারিত না; 'খোকা ঘুমোল পাড়া জুড়োল বর্গী এল দেশে,' ছেলে ভুলানো এই ছড়া সেদিনও পুরস্ত্রীদের কণ্ঠে শুনিতে পাওয়া যাইত। 'মারাঠা দস্যু আসিতেছে ঐ'—এই ধ্বনিতে চমকিত হইয়া নিরীহ পল্লীবাসী আত্মরক্ষায় অথবা পলায়নে তৎপর হইত। ধনীর পক্ষে ধনের বিনিময়ে খানিকটা শান্তি কিনিতে পারা সম্ভব ছিল বটে, কিন্তু একেবারে কি আর নিষ্কৃতি পাইত! তবু তখনকার লোকে আত্মরক্ষা করিতে জানিত, দায়ে পড়িয়া শিখিত, এবং এখনকার মত দস্যুতস্কর মাত্রের নিকট অসহায় বোধ করিত না। আমাদের ইতিহাসে বর্গীর হাঙ্গামার কথা উঠিলেই মনে হয়, লোকে বুঝি পড়িয়া পড়িয়া শুধু মারই খাইত; তাহা যে সত্য নয় সে কথা জানিতে পারিলে আমাদের কত আনন্দ হয়। উড়িষ্যায় বর্গীর হাঙ্গামার ইতিহাসের একপৃষ্ঠা বাঙালী পাঠকের সম্মুখে ধরিতেছি, ইহা হইতে দেশের লোকের আত্মরক্ষা করিবার শক্তি যে ছিল, দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্র সৈন্যও যে সময় সময় প্রতিরোধ করিতে পারিত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

বাংলা দেশে মহারাষ্ট্র লুণ্ঠনকারীর উপদ্রব যে কিরূপ ছিল তাহার সম্বন্ধে ইং ১৭৫০ সালে কবি গঙ্গারাম, ভাস্করের মৃত্যুর কথা বলিতে গিয়া মহারাষ্ট্র-পুরাণে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন :—

> তবে সব বরগি গ্রাম লুটিতে লাগিল।
> জত গ্রামের লোক সব পলাইল।
> ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পলাএ পুথির ভার লইয়া।
> সোণার বাইনা পলাএ কত নিক্তি হড়পি লইয়া।
> গন্ধবণিক পলাএ দোকান লইয়া জত।
> তামা পিতল লইয়া কাঁসারি পলাএ কত।

পলাশী-যুদ্ধের ছয় বৎসর পূর্ব্বে ১৭৫১ খ্রীঃ আলিবর্দ্দী খাঁ বর্গীর হস্তে উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের ভার প্রদান করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করেন। ১৭৫১ হইতে ১৮০৩ খ্রীঃ, এই ৫২ বৎসর উড়িষ্যা মহারাষ্ট্র-শাসনে ছিল। এই সময়ে উড়িষ্যাবাসী সর্ব্বদা শঙ্কিতচিত্তে থাকিত; সম্পন্ন গ্রাম মাত্রেরই চারিদিকে পরিখা দেখা যাইত, এবং সে সকল গ্রামের নাম 'গড়' দিয়া হইত; জাতিকে যে একসময়ে কতখানি সামরিক উপদ্রবের মধ্য দিয়া

করিতে হইবে, প্রজা না থাকিলে রাজা কাহাকে লইয়া রাজত্ব করিবেন? শত্রু হইতে প্রজার সমূহ উপদ্রব না হয়।'

এইরূপে নানা লোকের পরামর্শ শুনিয়া রাজা সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'তোমরা সকলে ঘুরিয়া ফিরিয়া একই কথা বলিতেছে, গড়ে থাকিতে চাই না, কিন্তু আমি পলাইব না, আমি দেখিব আমাকে কেমন করিয়া তাড়াইয়া দেয়। মানুষের জীবন ক্ষণভঙ্গুর, কিন্তু যশের বিনাশ নাই, দাতা ও বীর এই দুইজনের নাম লোকে চিরদিন মনে রাখিবে; মাটির টুকরা লইয়া বিবাদ নাই, যশ লইয়া বিবাদ। ভীমার্জ্জুন কর্ণদ্রোণ, ইঁহাদের মধ্যে কাহারও শরীর নাই, কিন্তু ইঁহাদের যশ রহিয়াছে। সাহসেই পৌরুষ; প্রভূত সম্পত্তি লইয়া যে সুখে বাস করিতেছে, রক্ত দেখিলে যার প্রাণ কাঁপে, সে হীন প্রাণী; তাহার ভোগ প্রকৃত ভোগ নয়, রোগেরই মত। মিথ্যা ভীরুতার বশে বর্গীর কথায় বিশ্বাস করিয়া গড় ছাড়িয়া চলিয়া যাই, আর সে আসিয়া গড় দখল করুক, তারপর আমরা বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াই, আর সে টাকার দাবী পুনরায় উপস্থিত করুক, এভাবে প্রতারিত হইতে আমি প্রস্তুত নই। কৃপাণ করে হরিবোল বলিয়া শত্রু-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িব, দুর্গ কিছুতেই ছাড়িব না।' এই বলিয়া রাজা সংবাদ পাঠাইলেন, পাত্রমন্ত্রী সরিয়া রহিল। কিন্তু চক্রীর চক্রান্তে রাজার এই সঙ্কল্প স্থির থাকিল না, তাঁহাকে বুঝান হইল,—বর্গী তো আর মাটি উঠাইয়া সঙ্গে লইয়া যাইবে না, দিন দুই বাহির হইয়া দেখা যাক্, খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য আবশ্যকীয় বস্তু আমরা সহজেই বাহির হইতে আমদানী বন্ধ করিতে পারিব।

কুমন্ত্রীর কুপরামর্শে রাজা গড় পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন।

তখন যে সকল ভূস্বামী বর্গীদের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল তাহারা সকলে তাঁহার পদানত হইল, নানা প্রকার যৌতুক তাঁহাকে উপঢৌকন পাঠাইয়া দিল। শুধু কেওঞ্ঝরের রাজা তাঁহার বিরোধী হইলেন, বিরোধী হইয়া বহু হস্তী অশ্ব হারাইলেন, তাহাতেও তিনি দমিলেন না: পলাশুনি গড়ে ভীষণ যুদ্ধ হইল, বহু তেলিঙ্গা সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইল, ঢেঙ্কানাল-রাজ কেওঞ্ঝরের গড় পোড়াইয়া ফেলিলেন; বারবার যুদ্ধ করিয়াও কেওঞ্ঝরের রাজা জয়লাভ করিতে পারিলেন না, হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার প্রজারা একেবারে অশান্তিসাগরে ভাসিতে থাকিল।

সপ্তম ও শেষ ছান্দে কবি ঢেঙ্কানাল-রাজ মহেন্দ্রবাহাদুরের বীরত্বের, তেজস্বিতার, শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন; নিজেরও পরিচয় দিয়াছেন; আটপুরুষ ধরিয়া তাঁহারা এই রাজপরিবারের সেবা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার কোনও বিশেষ গুণ নাই, মাঝে মাঝে একটু-আধটু কবিতা রচনা করেন,—

কেউঁ গীত সদোষ কেহ নির্দ্দোষ।
কে রসপূর কেবা হোএ নীরস হে।
কে গুরুস্থানে লঘু কে লঘু গুরু।
কে বর্ণ অযুক্তহিঁ কে পুণ চারু হে।
... ...
... ...
সংস্কৃত পরাকৃত খোরঠা বোলি।
নানা ভাষারে গীত কবিতা কলিছে।
বিবিধ চউপদী চউতিশাহিঁ।
বোলি ছান্দ প্রবন্ধ বোলিছি মুহিঁ হে।
সকার ছান্দ মাত্রা বৃত্তচূর্ণক।
কথাবর্ণনা নানাদি কউতুক হে।
চগচমালি মান চালক গীত।
ব্রজমোহন কেলিযুক্ত কবিত্ব হে।
তিনি কলমে পুণ করিছি শ্রম।
তালপত্রে কাগজে অক্ষরে কম হে।
রূপচিত্ররে নানা পট পুস্তক।
লেখা দেখি আনন্দ হঅন্তি লোক হে।

—কোন গীত দোষযুক্ত, কোনটি বা নির্দ্দোষ; কোনটি রসপূর্ণ, কোনটি বা নীরস; কোথাও গুরু স্থানে লঘু, লঘু স্থানে গুরু; কোন বর্ণ অনুচিত ভাবে প্রযুক্ত, কোনটি সুন্দর।...সংস্কৃত, হিন্দুস্থানী নানা ভাষায় গীত রচনা করিয়াছি। নানা চৌপদী, চৌতিশা, বোলি, ছান্দ, প্রবন্ধ, বলিয়াছি। কথা, গল্প, বৃত্তচূর্ণক, নানা কৌতুক কাহিনী, চগচমালি, গীত, ব্রজমোহনের কেলিগীত,—তালপাতায়; কাগজে, কম অক্ষরে—শ্রম করিয়াছি; বহু চিত্রও আঁকিয়াছি; লেখা দেখিয়া লোকের মনে আনন্দ হয়।

কবিতা লিখিয়া ব্রজনাথ পুরস্কার মন্দ লাভ করেন নাই; সমরতরঙ্গের জন্ত তাঁহাকে ব্রাহ্মণী নদীর তীরে নুআগাঁ নামক গ্রাম বংশানুক্রমে ভোগ দখল করিবার জন্ত দেওয়া হয়, এই সঙ্গে দুই শত টাকা এবং পট্টবস্ত্রও তিনি পাইয়াছিলেন।

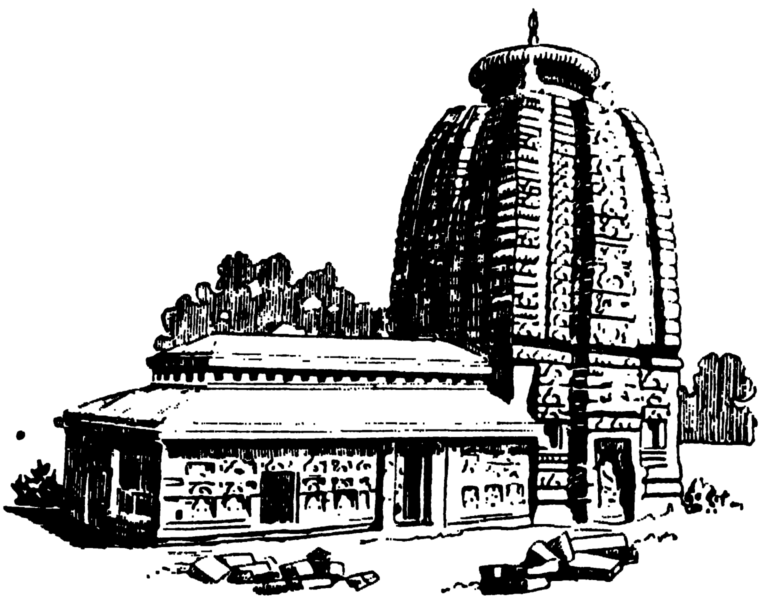
উড়িষ্যায় ঢেঙ্কানালরাজ এইরূপে দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্র-বাহিনীর প্রতিরোধ করিয়াছিলেন, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ইহার আর কোনও পরিচয়ই পাই না, বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তাহা কোথায় তলাইয়া গিয়াছে। হয়ত উড়িষ্যায় এইরূপ আরও কাহিনী আছে, অন্ত ভাষায় অন্ত প্রদেশে অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ বা বর্ণনা থাকাও অসম্ভব নয়। এই সকল লুপ্তপ্রায় কাহিনীর উদ্ঘাটন ভারতের ইতিহাসের এক অধ্যায়ের অতিশয় অস্পষ্ট রেখাকে দৃঢ় স্পষ্ট করিয়া জাতীয় কীর্ত্তি জিজ্ঞাসু ছাত্রের সম্মুখে ধরিবে।

সাত বৎসর পূর্ব্বে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে মহারাষ্ট্র ইতিহাসের প্রগতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে গিয়া নিষ্ঠাবান ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত গোবিন্দ সখারাম সরদেশাই বলিয়াছিলেন,—

We at present need representative scholars of each nationality, working in its own language and publishing their results through a common medium, which, for higher thought and interchange of ideas, is bound to be English for a pretty long time...... There are often traditions, anecdotes, gossips, reports, poems, or bardic songs, from which one has to cull whatever they can yield, always keeping an eye on truth and the human probabilities of events." *The Main Currents of Maratha History*, by Govind Sakharam Sardesai, p. 53.

—আমরা এখন প্রত্যেক জাতি হইতে পণ্ডিত চাই যাঁহারা নিজ নিজ মাতৃভাষায় কাজ করিয়া সাধারণ ভাষায় তাহা প্রকাশ করিবেন; বহুদিন ধরিয়া উন্নত চিন্তা ও ভাবের আদানপ্রদান বিষয়ে ইংরাজীই এই সাধারণ ভাষা থাকিবে।...অনেক সময় কিম্বদন্তী, গল্প, কাহিনী, বিবরণ, কাব্য, চারণদের গান হইতে যতটুকু পাওয়া যায় তাহা গ্রহণ করিতে হয়, তবে সর্ব্বদাই সত্য ও সম্ভব কিনা সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

'সমরতরঙ্গ'কে এইরূপ একটি কাব্য বা চারণ-গাথা বলা যাইতে পারে; উড়িষ্যায় মহারাষ্ট্র-প্রভাবের ইতিহাসের ইহা হয়ত এক পঙক্তি মাত্র, কিন্তু তাহারও মূল্য কম নয়।



দুলালের গল্প*

পরশুরাম

দুলাল নামে একটি ছেলে পটোলডাঙায় বাস,
গরম গরম পটোলভাজা খায় সে বারো মাস।
পটোলডাঙার চারদিকেতে পটোলগাছের বন,
ডাল ধরে তার নাড়লে পড়ে পটোল দু-দশ মণ।
পাড়তে পটোল ছিঁড়তে পটোল মোটেই বারণ নেই,
বারণ কেবল পটোল তোলা—আইন হচ্ছে এই।
অটল ঘোষের পিসির ননদ পটোল তুলেছিল,
ইস্কুলে তাই অটল ঘোষের নামটি কেটে দিল।
যাক্ সে কথা। বল্‌ছি এখন গল্প দুলালের;
মন দিয়ে খুব শোনো যদি, বুদ্ধি হবে ঢের।

দুলাল ব'লে একটি ছেলে পটোলডাঙায় ধাম,
বাপ হচ্ছেন যতীশচন্দ্র, গৌরী মায়ের নাম।
তিনকড়ি আর সাধনচন্দ্র দুলালের দুই চাচা,
আড়াই-হাতী খদ্দরেতে দেয় না তারা কাছা।
দুলালচাঁদের আছে আবার ফুট্‌ফুটে পাঁচ বোন—
বীণা, রাণু, বুলু, ডুলু—এই নিয়ে চার জন।
আর একটি বেরাল-ছানা—নামটা গেছি ভুলে—
দেখ্‌তে যেন মোমের পুতুল, গাল দুটো তুল্‌তুলে।
এ-সব ছাড়া দুলালচাঁদের আছে অনেক জন
জেঠ্‌তুতো আর মাস্‌তুতো আর পিস্‌তুতো ভাই-বোন।
থাক সে কথা। মন দিয়ে খুব শোনো এখন ভাই—
বলচেন যা দুলালচাঁদের ন-পিসে-মশাই।

দুলালচন্দ্র ছিল যখন সাত বছরের ছেলে,
একদিন সে লুচি দিয়ে পটোলভাজা খেলে।
পাকা পাকা পটোল তাতে ক্যাঁচর-ক্যাঁচর বিচি,
বিচি খেয়ে মুখ বেঁকিয়ে দুলাল বলে—"ছি ছি,
রইব না আর কোলকাতাতে পটোলডাঙার দেশে,
যাচ্ছি আমি পণ্ডিচেরি মাদ্রাজীদের মেসে।"
এই-না ব'লে টিকিট কিনে দুলাল তাড়াতাড়ি।
কটকেতে চ'লে গেল সেজ-পিসির বাড়ি।

ভাবেন তখন দুলালচাঁদের তিন নম্বর পিসে—
উড়ের দেশে এ ছেলেটির বিদ্যে হবে কিসে।
অনেক খুঁজে মাষ্টার পেলেন,—নামটি বাঞ্ছা ঘোষ,
নাকটা কিছু থ্যাবড়াপানা, এই যা একটু দোষ।
বললে দুলাল—"আপনার স্যার, নাকটা কেন খাঁদা?
আপনি যদি পড়ান আমার বুদ্ধি হবে হাঁদা।"
বাঞ্ছানিধি হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন ঘরে,
নাক-লম্বা গোবর্দ্ধন এলেন দু-দিন পরে।
দুলাল বলে—"আপনার স্যার খাঁড়ার মতন নাক,
নাকের খোঁচায় শেষে আমার বুদ্ধি ছিঁড়ে যাক্!"
গোবর্দ্ধন বরখাস্ত হলেন চাকরি থেকে,
পিসে তখন ব'লে দিলেন চাপরাসীকে ডেকে—
"জল্‌দি লে আও এসা মাষ্টার নাক নেই যার মোটে—
কটক পুরী দিল্লী লাহোর যেখান থেকে জোটে।"

চাপরাসীটা পাগড়ি বেঁধে বন্দুক কাঁধে ক'রে
দেশ-বিদেশে দেখলে খুঁজে একটি বছর ধরে।
তারপরে সে ফিরে এসে বল্‌লে—"হুজুর সেলাম!
নাক নেই যার এমন মানুষ কোথ্‌থাও না পেলাম।
কিন্তু অনেক চেষ্টা ক'রে দুলালবাবুর তরে
ধরেছি এই ওস্তাদকে মহানদীর চরে।
নাকের বালাই নেই, কিন্তু আওয়াজটি এঁর খাসা,
শিখিয়ে দিতে পারবেন খুব উর্দ্দু-ফার্সী ভাষা।"

চাপরাসী তার লাল বটুয়ার মুখ করলে ফাঁক,
অবাক হয়ে শুনলে সবাই গুরুগম্ভীর ডাক।

---

* শ্রীমান দুলাল শান্তিনিকেতনের ছাত্র। তার কাছে তার পিসে-মহাশয়ের এই কবিতাটি প্রচ্ছন্ন ছিল। এটি প্রকাশ করবার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না।—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল লম্বা দুটো ঠ্যাং,
বটুয়া থেকে লাফ দিলে এক মস্ত কোলা ব্যাং।

ব্যাং বললে—"আয় রে দুলাল, পড়বি আমার কাছে।"
কোথায় দুলাল ? লেপের ভিতর ঐ যে লুকিয়ে আছে !
দুলালচাঁদের রকম দেখে কষ্ট পেয়ে মনে
ব্যাং বেচারা পালিয়ে গেল খণ্ডগিরির বনে।
দুলাল তখন ইষ্টিশানে গিয়ে একেবারে
কোল্‌কাতাতে রওনা হ'ল পুরী-প্যাসেঞ্জারে।

পটোলডাঙায় দু-তিন বছর হয়ে গেল শেষ,
বিস্তর বই পড়লে দুলাল, বুদ্ধি হ'ল বেশ।
কিন্তু হঠাৎ একদিন তার খেয়াল হ'ল মনে—
"এখানে নয়, পড়ব আমি শান্তিনিকেতনে।"
ভালমানুষ হলেও দুলাল বড়ই জেদী লোক,
যা চাইবে করবেই তা, যেমন করেই হোক।

ছোটকাকার সঙ্গে দুলাল জিনিষপত্র নিয়ে
শান্তিনিকেতনের ক্লাসে ভর্ত্তি হ'ল গিয়ে।
ইংরেজী আর বাংলা কেতাব পড়লে একটি রাশ,
পাটীগণিত ব্যাকরণ আর ভূগোল ইতিহাস।
দিনু ঠাকুর শিখিয়ে দিলেন গানের অনেক সুর,
তাকাগাকি শিখিয়ে দিলেন কায়দা যুযুৎসুর।
নন্দলালের কাছে দুলাল আঁকতে শিখলে ছবি,
আর সমস্ত যা যা আছে শিখিয়ে দিলেন কবি।

অনেক রকম শিখলে দুলাল শান্তিনিকেতনে,
গায়ে হ'ল ভীষণ জোর আর অসীম সাহস মনে।
গোমড়া মুখো মাষ্টার—যাঁর সদাই হাতে বেত,
নাকে কথা বলেন যাঁরা—ভূত পেত্নী প্রেত,
পা-কাটা সেই কানকাটা যে থাকে খেজুরগাছে,
ছোট ছেলের কান ধ'রে যে যখন-তখন নাচে,
বাঘ ভালুক সাপ ব্যাং আর ভিমরুল আর বিচ্ছু—
এ-সব দেখে দুলালের আর ভয় করে না কিচ্ছু।
কারণ, দুলাল জানে ওরা সবাই জুয়োচ্চোর ;
আর, দুলালের বুদ্ধি আছে, গায়ে ভীষণ জোর।

তারপরেতে বোশেখ মাসের তেসরা রাববারে
ঠিক দুপ্‌পুর বেলা যখন ভূতে ঢেলা মারে,
সমস্ত দিক নিঝুম যখন রোদ্দুরে কাঠ ফাটে,
জুজুর খোঁজে গেল দুলাল তেপান্তরের মাঠে।
জুজু তখন ঘুমুচ্ছিল ভিজে গামছা প'রে ;
সাড়া পেয়ে বেরিয়ে এল ষাঁড়ের মূর্ত্তি ধ'রে।
কাঁধের ওপর মস্ত ঝুঁটি, শিং দুটো খুব লম্বা ;
দৌড়ে এসে ঘাড় বেঁকিয়ে ডাক ছাড়লে—হম্বা।
তেড়ে গিয়ে বললে দুলাল—"শোন্ রে জুজু হাঁদা,
চেহারা তোর ষাঁড়ের মতন, বুদ্ধিতে তুই গাধা।
যুযুৎসুতে শিক্ষা আমায় দিলেন তাকাগাকি,
জুজুর বুদ্ধি নিয়ে আমার সঙ্গে পারবি না কি ?
শিং ধরে তোর দুমড়ে দিয়ে লাগাই যদি চাড়,
হুমড়ি খেয়ে পড়বি তখন ওরে গর্দ্দভ ষাঁড় !
আমার সঙ্গে লড়তে এলি মুখ্‌খু কে তুই রে ?
জানিস্, আমি পটোলডাঙার দুলালচন্দ্র দে !"

ফটাস্ ক'রে ষাঁড়ের তখন পেটটা গেল ফেটে,
ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন মানুষ একটি বেঁটে।
পরনে তাঁর পেণ্টলুন হ্যাট কোট নেকটাই,
হাতে একটি মস্ত খাতা চামড়ার বাঁধাই।
বুকের ওপর দশটা মেডেল, ফাউণ্টেন পেন ছ-টা,
হাত ঘড়িতে কেবল দেখেন বাজল এখন ক-টা।

দুলাল জানে ভদ্রলোকের সঙ্গে ব্যবহার ;
দু-হাত তুলে বল্‌লে তাঁকে—"মশাই, নমস্কার।
মাপ করবেন—আপনাকে স্বাব্ গাল দিয়েছি যা—
ষাঁড়ের পেটে আপনি ছিলেন তা তো জানতুম না !"

ঘাড়টি নেড়ে জবাব দিলেন জুজু মহাশয়—
"ছেলেদের সব কাণ্ড দেখে বড়ই দুখ্‌খু হয়।
এই দুপুরে জিয়োমেট্রির অঙ্ক-কষা ফেলে
রোদ্দুরেতে টো-টো কর কেমন তুমি ছেলে ?
পরখ ক'রে দেখব তোমার বিদ্যে কতদূর।
এই চারটে কোশ্চেনের দাও দেখি উত্তর—

তিরিশ টাকায় ছ-মণ হ'লে আড়াই সেরের কি দাম ?
বল দেখি শাজাহানের চারটি ছেলের কি নাম ?
বল দেখি কোন্ দেশেতে আছে শহর মক্কা ?
বল দেখি সন্ধি কি হয়—'এতদ্' ছিল 'ঢক্কা' ?"

বল্‌লে দুলাল—"আড়াই সেরের পাঁচ আনা হয় দাম।
দারা শুজা আরংজেব আর মুরাদ—এই চার নাম।
সবাই জানে আরব দেশে আছে শহর মক্কা।
'এতদ্' ছিল 'ঢক্কা'—হবে সন্ধি—'এতড্ঢক্কা'।"

জুজু বলেন—"ভুল বেশী নেই তোমার জবাবেতে।
শিখতে যদি আমার কাছে, ফুল নম্বর পেতে।
মন দিয়ে খুব পড় খোকা, যাচ্ছি আমি আজ,
সেনেট-হলে আমার এখন আছে একটু কাজ।"

দুলাল বলে—"থামুন মশাই, অনেক সময় পাবেন।
এই গরমে দুপুর বেলায় রোদে কোথায় যাবেন ?
এই বারেতে আমার পালা, বলুন এখন স্যার্
এই চারটে কোশ্চেনের ঠিক্-ঠিক্ আন্‌সার—

রাবণ-রাজার দশমুণ্ড, নড়বড়ে বিশ হাত,
কেমন ক'রে বিছানাতে হতেন তিনি কাত ?
গঙ্গা-নদী মহাদেবের জটায় করেন ঘর,
ভিজে চুলে শিবের কেন হয় না সর্দ্দি-জ্বর ?
সে কোন্ ঘোড়া, ডিম পাড়ে যে বাচ্চার বদলে ?
ভূতের যিনি বাবা তাঁকে সক্কলে কি বলে ?"

ঘাড় চুলকে জুজু বলেন—"তাই তো খোকা তাই তো,
জান্‌তে তুমি চাচ্চ যে সব, আমার মনে নাই তো।
আচ্ছা তুমি দিন-আষ্টেক থাক চক্ষু বুঁজে,
বিস্তর বই আছে আমার, দেখব আমি খুঁজে।"

বল্‌লে দুলাল—"দুও মশাই, হেরে গেলেন দুও !
দরকারী যা সে-সব কথা জানেন না একটুও।
বল্‌চি শুনুন—টুকে নিন সার্ আপনার খাতাটিতে;
কাজে লাগবে ভবিষ্যতে সভায় স্পীচ দিতে—

রাবণ-রাজার পাগড়ি ঘিরে ন-টা সোলার মাথা,
আঠারোটা কাঠের হাত জামার সঙ্গে গাঁথা।
খুলে শুতেন পাগড়ি জামা নকল মুণ্ডু হাত,
অনায়াসে বিছানাতে রাবণ হতেন কাত।
মাথায় মেখে বেলের আঠা আর ঘুঁটের ছাই,
শিবের জটা ওয়াটার-প্রুফ, সর্দ্দির ভয় নাই।
পক্ষিরাজ ঘোটকের পক্ষিরাণী যিনি,
অন্য অন্য পাখীর মতন ডিম পাড়েন তিনি।
সকল ভূতের বাবা যিনি আবাগে তার নাম,
তাঁর শ্রাদ্ধে হয়ে থাকে খুবই ধুমধাম।"

জুজু মশাই বলেন তখন—"হার মানলুম খোকা,
তুমিই হ'লে বিদ্বান, আর আমি হচ্ছি বোকা।"
এই না ব'লে মাটির ওপর ছ-বার লাথি ঠুকে
জুজু-মশাই পালিয়ে গেলেন ষাঁড়ের পেটে ঢুকে।

এই সমাচার জান্‌তে পেরে সঙ্গীরা সব মিলে
দুলালচাঁদের পিঠ চাপড়ে খুব বাহবা দিলে।
জুজুর খবর রাষ্ট্র হ'ল পটোলডাঙা-ময়,
গোলদীঘিতে বল্‌লে সবাই—দুলালচাঁদের জয়।
দুলালচাঁদের কথা এখন সাঙ্গ হ'ল ভাই,
সকল গল্প সত্যি যেমন, এ গল্পটাও তাই।
ব'লে গেলুম তাড়াতাড়ি যা মনেতে এল,
বিশ্বাস যদি না করে কেউ, বড় বোয়েই গেল।
মিথ্যে যদি বলেই থাকি দোষটা তাতে কিসে ?—
আমি হলুম দুলালচাঁদের চার-নম্বর পিসে।

হার

শ্রীপারুল দেবী

ঘর সাজাইবার ঝোঁকটা ইন্দিরার একটু বেশীমাত্রায় আছে বলিয়াই সাধারণের মনে হয়। বীডন ষ্ট্রীটের গলির মধ্যে বাড়ি, তাহারই এঁদোপড়া ঘর তিনখানা লইয়াই এত বাড়াবাড়ি—না জানি বালিগঞ্জের দিকে ভাল বাড়ি হইলে কি কাণ্ডই করিত।. কাছাকাছি বড় ননদ উমাশশীও থাকেন, ছোটননদ রমাও থাকে। আসা-যাওয়া প্রায়ই চলে, কিন্তু সেটা ইন্দিরার নিকট বড়-একটা সুখের বলিয়া মনে হয় না। স্বামীকে এ-পাড়া ছাড়িয়া ভবানীপুরের দিকে বাড়ি লইবার জন্য বলিয়া বলিয়া ইন্দিরা হার মানিয়াছে; সে আর হইয়া উঠে নাই। বড় ননদ ত এ-ঘরে পা দিয়াই ইন্দিরার মেমিয়ানা ও অমিতব্যয়িতার ব্যাখা সুরু করেন। রমা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী বলিয়া তাহার চোখে বৌদির ফিট্‌ফাট্ ঘর কয়খানি অত্যন্ত ভাল লাগিলেও সেও দিদির দেখাদেখি দু-চার কথা শুনাইতে ছাড়ে না। ইন্দিরার ঘরে আসিয়া চাহিয়া চাহিয়া রমা দেখিয়া যায় ও জানালাটায় পরদার কাঠিটা বৌদি কিসের লাগাইয়াছে, সোনার মত চক্‌চক্ করে কেন? ও পিতলের—তা দিব্যি মানাইয়াছে ত! বাঃ, ও-কোণের টেবিলের উপরকার ফুলদানীটা আবার কবে আসিল—বেশ ত জিনিষটি। বড়বোনকে ঠেলিয়া রমা বলিল, "দিদি দেখছিস্ কি? বৌদি একেবারে দাদা-বেচারীকে ফতুর না ক'রে ছাড়বে না। যখনই আসি নতুন জিনিষে ঘর একেবারে ভর্ত্তি।...হ্যাঁ বৌদি, ও-ফুলদানীটা নতুন্ কিন্‌লি বুঝি? কত দাম নিলে?"

ইন্দিরার গা জ্বলিয়া যায়। মনে মনে অত্যন্ত রাগিয়া বলে, "চার টাকা?" আসলে কিন্তু দুই টাকার বেশী দিতে হয় নাই।

দিদি চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন, "ও বাব্বা, একটা পেতলের ফুলদানী, তার পেছনে চার-চারটে টাকা ঢাললে? হ্যাঁ বৌ তোমাকে বললে ত রাগ কর, কিন্তু আদিখ্যেতা দেখে বাবু না বললেও পারি নে। গেরস্থর সংসার, একটু বুঝে না চললে এর পর তোমরাই কষ্ট পাবে। তখন বলবে, হ্যাঁ, দিদি একদিন বলেছিল বটে। ফুলদানী কি-এমন দরকারী জিনিষ যে না হ'লে চলে না? আর ঘরে যে নেই এমনও নয়—এধার-ওধার ফুলদানী রে খেলনা রে, ঘরে ত যেন বাজার বসিয়েছ, তবু আবার একটা চাই?...বাব্বা!"

বড় ননদ বয়সে অনেক বড়, ইন্দিরার স্বামী কেশবের অপেক্ষাও বছর-আটেকের বড়। কাজেই তাঁহার কথা-গুলা যেমনই লাগুক উত্তরে কিছু বলিবার জো নাই, চুপ করিয়াই থাকিতে হয়। উমাশশী আবার বলিলেন, "এ মাসে যা কষ্ট গেল। কেশবকে বলেছিলুম পারিস ত গোটাকয়েক টাকা দিস্, ও-মাসে তখন দেব আবার —তা বললে হাতে এখন মোটে টাকা নেই। টাকা থাকবে কোথা থেকে? দু-হাতে টাকা ওড়ালে কুবিরের ভাণ্ডারই বলে থাকে না, তা এ ত ভারী টাকা! সবই তোমাদের কেবল ফ্যাশান করতেই যাবে তা কার আর কি উপ্‌গারটা করবে বল।"—বলিয়া তিনি আলমারীর কোণে ঠেসান-দেওয়া মাদুরখানা টানিয়া নিজেই বিছাইয়া শুইয়া পড়িয়া বলিলেন, "পান-টান আছে নাকি গো ছুটো, না মেমসায়েবের ঘরে তা-ও পাবার পিত্যেশ নেই?"

সম্ভব হইলে ইন্দিরা বোধ করি বলিত যে, পান পাইবার প্রত্যাশা নাই, কেন-না তাহার মোটেই ইচ্ছা ছিল না যে দিদি পান জল খাইয়া কায়েমী বন্দোবস্ত করিয়া সারা দুপুর এইখানেই শুইয়া খরচ, সাজ, মেমসাহেবী ইত্যাদি লইয়া ক্রমাগত তাহাকে কথা শুনাইতে থাকেন। কিন্তু তাহা হইল না, উঠিয়া গিয়া দুইটা পান সাজিয়া এক গ্লাস জল আনিয়া দিদির হাতে দিতে হইল।

উমাশশী জল পান করিয়া পান দুইটা মুখে দিতে যাইতেছিলেন হঠাৎ থামিয়া নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। দিদির মুখের ভাব দেখিয়া তাঁহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া ইন্দিরা ব্যাপারটা বুঝিল। দিদি বলিলেন, "হ্যা গা, জানলায় যে পরদা ঝুলছে ওটা কিসের ?"

ইন্দিরা গম্ভীরমুখে উত্তর দিল, "গরদের।"

"ও বাবা কালে কালে কতই হবে—শেষে জানলায় ঝুলতে লাগল গরদের পরদা! এবার এসে দেখব বোধ হয় যে, বেনারসীর টুকরো তোমার ন্যাতা হয়েছে। টাকাগুলো কি খোলামকুচি পেয়েছ না কি বৌ? এ যে দেখি দু-হাতে ওড়াচ্ছ।"

ইন্দিরার অত্যন্ত রাগ হইল, একটু ঝাঁঝের সহিত উত্তর দিল, "ওটা নতুন কিনে লাগাই নি দিদি, আপনার ভাবনা নেই। আমার গরদের শাড়ী একটা ছিঁড়ে গিয়েছিল, নেহাৎ সেটা ফেলে দেব তাই সেখানা কেটে পরদা করেছি, কটা জামাও করেছি খোকার। এতেও যদি দোষ হয় ত জানিনে বাপু।"

দিদি আর কিছু বলিলেন না; পাশ ফিরিয়া শুইয়া একটু নিদ্রার জোগাড় করিলেন। ঘরে তাঁহার আট-নয়টি সন্তান, দ্বিপ্রহরে যে একটু গড়াইবেন হতভাগা ছেলেমেয়েগুলোর উপদ্রবে বাড়িতে তাহার জো-টি নাই। তাহারা যেন সকল উপদ্রবগুলা ঐ দুপুরটুকুর জন্যই তুলিয়া রাখে। একবার যদি একটু চোখ বুজিয়াছেন অমনি মণি কাঁদিতে কাঁদিতে আসিল "মা, টুলু আমায় মেরেছে।" মণিকে দুইটা থাবড়া দিয়া মা বলিলেন, "কেন যাও ওর সঙ্গে খেলতে? মেরেছে? মেরেছে তা আমি কি করব? বলি না যে দু-জনে কখ্খনো একসঙ্গে থাকবে না—তা না ঠিক সেই ঘুরে ফিরে ক্রমাগত একজোট হবে। শো বলছ এখানে—উঠলে হাড় ভেঙে দেব।" মণি বোধ করি মায়ের নিকটে এরূপ অবিচার প্রত্যাশা করে নাই। সে তারস্বরে চীৎকার করিতে করিতে সেইখানে মায়ের আদেশ-মত শুইয়া পড়ে বটে, কিন্তু এত হাত পা ছুঁড়িতে থাকে যে, তাহাকে ঠিক শোওয়া বলা চলে না। যাহা হউক, মিনিট দশ-পনের পরে হাত-পা ছোঁড়ার বিক্রম কমিতে কমিতে শেষটা থামিয়া যায়—ক্লান্ত মণি উপর্য্যুপরি টুলু এবং মাতার চড় খাইবার পর ঘুমাইয়া পড়িয়া মায়ের হাড় জুড়ায়। কিন্তু তাই কি নিস্তার আছে? চোখে সবে আবার একটু ঘুম আসিয়াছে মেজমেয়ে চারুশশী আসিয়া বলিল, 'ও মা, হাবু কি ক'রে পা-টা কাটল একবার দেখ। রক্তে তোমার বালিশ একেবারে ভিজে গেছে।'

পা উহারা প্রায়ই কাটে—হাত-পা কাটিয়া কোন্ দিন যে একটা মরিবে তাহা তাহাদের মা ঠিক করিয়াই আছেন; তাই সে-সংবাদে বড় বিশেষ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিলেন না। চোখ খুলিয়া বলিলেন, "বালিশ আবার রক্তে ভিজল কি ক'রে? বালিশের মাথা খেতে ওটাকে আমার বিছানা থেকে নামিয়েছে কে শুনি? চারুশশী বলিল, 'হাবু ভাঁড়ার ঘর থেকে তোমার বঁটি বার ক'রে কাঁচা আম কাটছিল, দিদি একটু চাইলে, হেবো বললে দেব না। তাইতে দিদি রাগ ক'রে তাকে বালিশ ছুঁড়ে মারলে। হেবোর পা খুব কেটে গেছে মা, আর বালিশেও খুব রক্ত লেগেছে।'

উমাশশীকে নিদ্রার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বকিতে বকিতে উঠিয়া পড়িতে হয়। হাবুর পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধাটা বড়মেয়ের ঘাড়ে পড়ে—উমাশশী বালিশের ওয়াড়টা খুলিয়া লইয়া কলে গিয়া সেখানা সাবান দিয়া কাচিতে কাচিতে তাঁহার কপালে যে মোটে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ লেখা নাই তাহা ভগবান বাছিয়া বাছিয়া যখনই তাঁহার ঘাড়ে এই রাজ্যের অঘাটে-বঘাটে দস্যিদুরন্ত অবাধ্য ছেলেমেয়ের দল চাপাইয়াছেন তখনই তিনি জানেন—ইত্যাদি-রূপ বিলাপ করিতে থাকেন। মেজাজ ক্রমেই সপ্তমে চড়িতে থাকে—নিদ্রাদেবী ত দূরের কথা বাড়ির নিকট কাক চিলও আসিতে সাহস করে না।

কাজেই সুবিধা পাইলেই তিনি বড় ও মেজ মেয়ের উপর বাকিগুলির ভার চাপাইয়া দিয়া দুপুরে খানিকক্ষণের জন্য ভ্রাতৃজায়ার বাড়ি চলিয়া আসেন। ঘরগুলা ধোওয়া মোছা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—বাড়িতে একটা মাত্র ছেলে, তাও তাঁহার ছেলেগুলার মত অমন দুপুরে দাপাদাপি করিয়া বেড়ায় না, শান্ত হইয়া ঘুমাইয়া থাকে, কোনও

উপদ্রব নাই, দিব্য আরামে এখানে ঘণ্টাকয়েক ঘুমান যায়। বাড়িতে তাহারা কাটাকাটি মারামারি যাহা ইচ্ছা করুক—বারো মাস রাত্রিদিন ছেলেপিলের এত দৌরাত্ম্য আর সহ্য হয় না।

এই বাড়িটি একটি বিশ্রামের স্থান ; কোথায় ভ্রাতৃজায়ার উপর সেজন্য একটু কৃতজ্ঞ হইবার কথা, কিন্তু কেমন যে স্বভাব দু-কথা না শুনাইয়া মনের যেন তৃপ্তি হয় না। ইন্দিরা দিদির এ-বাড়ি আসিবার কারণ খুবই বোঝে এবং সেজন্যই তাঁহার বিদ্রূপের কথায় তাহার আরও বিরক্তি ধরে।

বাড়িতে বেচারী একটু বিশ্রাম পান না, বেশ ত, ইন্দিরার কাছে আসিয়া ঘুমান না সারা দুপুর। বয়স হইয়াছে, এতগুলি সন্তানের দৌরাত্ম্য রাতদিন সহ্য করিতে করিতে মেজাজও একটু খিটখিটে হইয়া পড়িয়াছে, তাহাও ইন্দিরা বোঝে এবং সেজন্য বড় ননদের উপর তাহার সময়ে সময়ে মায়াও হয়। ভাবে "আহা বলুন-গে' না হয়, আমি কেনই-বা রাগ করি, ও-রকম অবস্থায় পড়লে আমার ত মাথা খারাপই হয়ে যেত। দিদি ত তবু তার পক্ষে ভালই আছেন বলতে হবে।"

কিন্তু তবু বড় ননদ আসিয়া যেই তাহার ঘরের প্রতি সখের জিনিষটি লইয়া পড়িতেন অমনি ইন্দিরার সাধু-সঙ্কল্প টলিয়া যাইত ; ভাবিত "ভাগ্যে সাজিয়ে গুজিয়ে এরই মধ্যে ঘরটা একটু ভদ্দর লোকের মত ক'রে রেখেছি, তাই ত নিজের বাড়ির ঐ অবিলির মধ্যে থেকে ছুটে ছুটে এখানে বেরিয়ে এসে বাঁচেন। এই ত ঘরের শ্রী, এই ত টাকা-পয়সার ছড়াছড়ি, নেহাৎ আমি এত ক'রে গুছিয়ে রাখি বলেই এর তবু শ্রী বেরিয়েছে।"

রমার সংসারে শাশুড়ী আছেন, তাহা ছাড়া বিধবা ননদ ভাগ্নে ভাগ্নীতে বাড়ি ভরা—সে দিদির মত অমন যখন ইচ্ছা আসিতে পারে না। তবে দিদি যখন দ্বিপ্রহরে গলি দিয়া হাঁটিয়া চলিয়া আসেন তখন এক-আধ দিন রমার বাড়ি ঢুকিয়া তাহার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর অনুমতি লইয়া তাহাকেও সঙ্গে আনিয়া থাকেন। রমা মুখে বৌদির ঘর-সাজানর পরিপাটিত্ব লইয়া টিটকারী দিয়া গেলেও বাড়ি গিয়া স্বামী সন্তোষকে বলে, "আমাকে একটা বেশ বড় দেখে ফুলদানী আর একটু ভাল পরদার ছিট এনে দিও ত গো। আর থাম থাম, এই নমুনাটুকু নিয়ে যাও—বৌদি দেখলাম বেশ জামার কাপড়টি কিনেছে, আমাকেও গজখানেক এনে দিও।"

সন্তোষ হাসিয়া বলে, "এদিকে ত বৌ-ঠাক্‌রুণের নিন্দেয় দেখি পাড়া ফাটিয়ে দাও—আবার তাঁর দেখে দেখে বুঝি সব করাটুকুও চাই ?"

রমা রাগিয়া বলে, "দেখে দেখে করার কি এত দেখলে শুনি ?"

সন্তোষ উত্তর দিল, "সেই রকমই ত যেন মনে হচ্ছে। কিন্তু শুধু তাঁর বাড়ির পরদা দেখে এসে সে-রকম একখানা পরদা ঝুলিয়ে দিলেই ত হ'ল না, তাঁর মত অমনি যে জায়গায় যে জিনিষটি, সব সময়ে সেটি গুছিয়ে রাখতে পার ত বুঝি যে, হাঁ একটা জিনিষ শিখেছ। বেশ আছে কেশব। সেদিন গিয়ে দেখি খাটের ধবধবে বিছানার পাশে ছোট টেপাইটিতে রাত্রের জন্যে পান জল সন্ধ্যের আগে থেকেই গুছিয়ে রাখা। সুন্দর একটি মোমদানীতে মোমবাতি, আবার খাটের পাশে ফুলটুকুও বাদ পড়েনি—দেখতে ভারী সুন্দর লাগল। রাত্রে হয়ত কেশব পড়ে-টড়ে—একটি বইও দেখলাম রাখা রয়েছে। আমার বইটই ত দূরের কথা, গায়ের চাদর-খানা এই স্তূপাকার কাপড়-বোঝাই আলনাটা থেকে খুঁজে বার করতে রোজ খানিকটা ক'রে রক্ত ঘাম হয়ে বেরিয়ে যায়। দেখছ না তাই রোগা হয়ে যাচ্ছি দিন-দিন ?"

রমার স্বভাবটা অত্যন্ত ঢিলেঢালা অগোছাল, তাহা সে নিজেও জানে এবং সেইজন্য অপর কেহ, বিশেষ করিয়া স্বামী তাহার সেই দোষটার উল্লেখ করিলে তাহার রাগের সীমা থাকে না। অনেকবার সে চেষ্টা করিয়াছে যে বৌদির মত ঘরখানাকে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিবে—দু-এক দিন সম্মার্জ্জনী ও ঝাড়ন হস্তে গৃহসংস্কার আরম্ভ অবধি করিয়া দিয়াছে। কিন্তু সন্তোষ যেই আসিয়া বলিল, "এই যে বৌ-ঠাক্‌রুণের ছোঁয়াচ যে দিব্যি লেগেছে দেখছি। বেশ বেশ এখন টেঁকলে বাঁচি এ সুবুদ্ধিটা—" অমনি রমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠে। "ও,

বৌ-ঠাক্‌রুণকে যে সব কি চোখেই দেখেছ জানিনে। ওর সবই গুণ দেখ খালি। ঘরটা একটু পরিষ্কার করতে এলুম তাতে আবার বৌ ঠাক্‌রুণের ছোঁয়াচ কি দেখলে? আমার অমন নকল ক'রে ক'রে বেড়ান সাতজন্মে অভ্যেস নেই। রইল ঘর, থাক না পড়ে, আমার কি? তোমারই সুবিধের জন্যে করতে এলুম; তা আমার ভাল ত চোখে পড়ে না কিছু। এই যদি বৌদি করছে দেখে আসতে ত ইনিয়ে-বিনিয়ে কত ব্যাখ্যানা করতে দেখতাম।" অর্দ্ধসমাপ্ত গৃহসংস্কার ছাড়িয়া দিয়া দুমদুম্ শব্দে রমা চলিয়া যায়; শাশুড়ীকে গিয়া বলে, "মা, আপনার ভাঁড়ার ঘরটায় জিনিষপত্রগুলো বার ক'রে দিয়ে ঘরটা একবার ধুয়ে দিলে হয় না? বড্ড ময়লা হয়েছে।"

সেদিন বৈকালে কেশব যখন বাড়ি আসিল তখন দিদি বাড়ি চলিয়া গিয়াছেন, রমা রহিয়া গিয়াছে, সন্তোষ নাকি সন্ধ্যাবেলা আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবে। সারা দুপুরটা দিদির নিকট খোঁটা খাইয়া ইন্দিরার মেজাজ প্রসন্ন ছিল না। স্ত্রীর মুখ দেখিয়াই কেশব কারণটা ঠিক না বুঝিলেও মনের অবস্থাটা বুঝিল এবং 'কি রে রমা, কখন এলি' বলিয়া ঘরে ঢুকিয়া শুইবার ঘরের খাটের উপর কোট ও কামিজ এবং মেজেতে জুতা ও মোজা সশব্দে ফেলিয়া ধড়াস করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়া উদ্দেশে স্ত্রীকে বলিল, "এক পেয়ালা চা দেবে? আর কিছু খাব না আজ এখন।"

চা হাতে লইয়া কিছুক্ষণ পরে ইন্দিরা গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল ঘরের মধ্যে জুতা মোজা গড়াগড়ি যাই-তেছে। জুতা হইতে কাদাধূলা ছিটকাইয়া ঘরের মেঝেয় ছড়ান—কামিজটা মাটিতে পড়িয়া, কোটটা পড় পড় অবস্থায় খাটে ঝুলিতেছে। ইতিমধ্যে খোকা ঘুম হইতে উঠিয়া কখন হামাগুড়ি দিয়া এ ঘরে আসিয়া বাপের জুতার একখণ্ড লইয়া মহা আগ্রহে তাহার রসাস্বাদনে ব্যাপৃত। খাটে শুইয়া কেশব পার্শ্বে উপবিষ্টা ভগিনীর সহিত গল্প করিতেছে।

স্বামীর হাতে চা দিয়া ছেলেটাকে টানিয়া তুলিয়া ইন্দিরা বলিল, "কতদিন বলেছি যে, জুতোমোজাগুলো একটু হাত বাড়িয়ে ঐ বারান্দার তাকে দয়া করে তুলে রেখো—তা কি যে তোমাদের মাথা কাটা যায় আমার একটা কথা শুনলে তা তোমরাই জান।"

অন্য সময়ে কেশব এরূপ কথা প্রায়ই শুনিয়া থাকে এবং নিঃশব্দে গলাধঃকরণও করিয়া থাকে। কিন্তু এক ত বাড়ি আসিতেই আজ স্ত্রীর মুখের গম্ভীর ভাব দেখিয়া তাহারও মেজাজ খুব সুপ্রসন্ন ছিল না। তাহার উপর বয়ঃকনিষ্ঠ ভগিনীর সম্মুখে কর্ম্মক্লান্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরিয়া সারাদিনের পর স্ত্রীর নিকট হইতে এইরূপ সম্বোধন পাইয়া তাহার রাগ চড়িয়া গেল। উচ্চস্বরে বলিল, "না হয় তুমিই রাখলে তুলে—তাতেও কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।"

ইন্দিরা উত্তর দিল, "আমি ত রাখি রোজই। তোমার হাতে ঘর পরিষ্কার রাখবার কোনো কাজ ছেড়ে দিলে এ ইঁদুরের গর্ত্তয় আর টিকতে পারা যেত না, সেটা জেন। যাক্, নোংরামি ত তোমাদের ভাইবোনেদের মতে মস্ত একটা গুণেরই সামিল, সে-কথা নিয়ে আর নালিশ করে কি হবে—তবে ছেলেটা জুতোরধুলো খেয়ে বেড়াচ্ছে সেটা দেখেও ত জুতোটা তুলে রাখতে পারতে।"

বোনের সম্মুখে স্ত্রীর মুখে ভাইবোনের কথার উল্লেখে কেশব আরও চটিয়া বলিল, "ঘর-সাজানোর জাঁকেই গেলে। ভারী দুটো টেবিল চেয়ার ফুলদানী ঘরে রেখে তুমি ভাব যে তুমি যেমন সংসার করছ এমন আর কেউ করে না। সুখের চেয়ে আমাদের স্বস্তিই ভাল—তোমার ঘর পরিষ্কার রাখবার জালায় নিজের বাড়িতে আমার ত এখান থেকে ওখানে নড়ে বসবার জো নেই। তোমার টেবিল উলটে যাবে, সেখান থেকে আবার একটু নড়তে গেলে তোমার ঐ ছেঁড়া ন্যাকড়ার কার্পেট সরে যাবে। কাঠের পুতুলের মত সাজান ঘরে বসে থেকে যে কি সুখ তা তুমিই বোঝ, আমাদের ভাইবোনের আর বুঝে কাজ নেই।"

ইন্দিরা অত্যন্ত রাগিল। একে ত কাহারও সামনে স্বামীর সহিত বকাবকি তাহার একেবারেই পছন্দ নয়, তাহার উপর প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই এই গরিবের ঘর কয়টিকে সে যথাসাধ্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টা করে। বাড়িতে একটি

মাত্র চাকর। তাহাকে দিয়া বাজার আনাইবার পর তাহার উপর খোকার ভার দিয়া প্রথমে সে রান্নাবাড়ার কাজ সারিয়া লয়। তাহার পর স্বামী আপিস বাহির হইলে নিজের হাতে ঘর ক'খানিকে ধুইয়া মুছিয়া ঝাড়ন দিয়া জিনিষপত্র ঝাড়িয়া পিতলের ফুলদানী খেলনা যে কয়টি আছে মাজিয়া ঘসিয়া ঘরগুলির প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিতে বার-বার চাহিয়া চাহিয়া দেখে। মনে হয় এ পাড়ায় ত এত লোকের বাড়ি, কিন্তু এমন পরিপাটি ঘরটি ত আর কাহারও দেখিল না। তাহার দেখাদেখি আজকাল বরং গোটাকয়েক বাড়ির বৌরা এ-বিষয়ে একটু-আধটু দৃষ্টি দিয়াছে—সে এদিকে আসিবার পূর্ব্বে বোধ করি তাহাদের কোন ধারণাই ছিল না যে, থাকিবার ঘরটার সৌন্দর্য্যের প্রতি একটু লক্ষ্য রাখা আবার কাহারও প্রয়োজন হইতে পারে। সে মায়ের নিকট জন্মদিনে পাঁচটি করিয়া টাকা পায়, ছোট ভাইটি ম্যাট্রিক দিয়া এ বছর জলপানি পাইয়াছে, সেই টাকা হইতে প্রতি মাসে চারিটি করিয়া টাকা সে দিদির হাতে দিয়া যায়—তাহা ছাড়া সংসার হইতে যাহা-কিছু বাঁচাইতে পারে সেই টাকা দিয়া ইন্দিরা কোনও বার ছোট একটি কার্পেট, কোনও বার কাশ্মীরী কাঠের কিছু একটি কিনিয়া তাহার গৃহ-সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া থাকে। ইহাতে কেন যে তাহার ননদিনীদিগের গাত্রদাহ উপস্থিত হয়, এবং স্বামীই বা কেন ঐ সকল দ্রব্যের প্রয়োজন কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন না, তাহা ইন্দিরার বুদ্ধির অগম্য। পাড়ার লোকেরা বেড়াইতে আসিয়া কত সুখ্যাতি করিয়া যায়, কিন্তু ইহাদের মুখ হইতে কখনও একটা ভাল কথা শুনিবার জো নাই।

সে আর কথা বাড়াইল না। খোকাকে কোলে লইয়া জুতা মোজা প্রভৃতি স্বস্থানে তুলিয়া রাখিয়া দিল এবং একটা ভিজা কাপড়ের টুকরা আনিয়া মেজে হইতে ধূলাকাদা মুছিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

এমন সময়ে সন্তোষ বসিবার ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "বৌ-ঠাকরুণ, ভেতরে আসতে পারি?" সামলাইয়া লইয়া ইন্দিরা হাসিমুখে বলিল, "আসুন।"

সন্তোষ ঘরে পা দিয়া বলিল, "সত্যি বৌ-ঠাকরুণ, আপনার এই ঘরটিতে এসে বড় আনন্দ হয়। আপনার ক্ষমতাও যে অসাধারণ এ-কথা না মেনে আর উপায় নেই। এ-রকম ঘরকে যে হাতের গুণে এ-রকম ক'রে তোলা যায় তা চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হয় না। আমাদের বসবার ঘরটা বোধ করি এর চেয়ে লম্বা-চওড়ায় কিছু বড়ই হবে, কিন্তু তার দশাটা একবার গিয়ে দেখে আসবেন।"

সারাটা দিন তাহার অতি-মমতার ঘর সাজানর জন্য খোঁটা খাইয়া সন্তোষের এই কয়টি কথায় ইন্দিরার চোখে জল আসিয়া পড়িল। বলিল, "তবু ভাল যে, একজনেরও ভাল লাগে। আজ ত সকাল থেকে কেবলি লেকচার শুনছি যে, ঘর-দোর পরিষ্কার করা একটা রোগেরই সামিল। ক্রমাগত শুনে শুনে আমারও যেন মনে হচ্ছিল হবেই বা।"

সন্তোষ বুঝিল বৌ-ঠাকরুণের মনে আজ আঘাত লাগিয়াছে। কারণ বুঝিতেও দেরি হইল না—স্ত্রী এবং শ্যালিকা যখন আজ সারাদিন এ বাড়িতে ছিলেন তখন বৌ-ঠাকরুণের পক্ষে আজ যে সুপ্রভাত হইয়া রাত্রি ভোর হয় নাই তাহা বোঝা শক্ত নয়। সে অত্যন্ত উৎসাহের স্বরে বলিল, "কি জানেন বৌ-ঠাকরুণ, বেণাবনে মুক্তো ছড়ান ব'লে একটা কথা আছে না? এ হয়েছে আপনার তাই। ঘর পরিপাটি ক'রে সাজান যে কত বড় একটা আর্ট—এর জন্যে বিলেতে কত স্পেশ্যাল ট্রেণিং নেবার বন্দোবস্ত আছে—জাপানে ত ফুল সাজান রীতিমত একটা শিক্ষার বিষয়, তা কি আর এ পোড়া দেশে কেউ বুঝতে পারে? এদের কোনও রকমে নাকে মুখে চোখে ছুটো ডাল-ভাত গুঁজে কুণ্ডলী পাকিয়ে যেখানে সেখানে শুয়ে পড়তে পারলেই হ'ল। বর্ম্মা থেকে যে সাদা পাথরের বুদ্ধমূর্ত্তি এনে দিয়েছিলাম আপনার ঘরে দেখুন তার চেহারাই ফিরে গেছে। ফুল ধূপ কমণ্ডলু মোমবাতি পরিবেষ্টিত বুদ্ধদেব যেন সত্যিই ধ্যানে বসেছেন মনে হচ্ছে। আর আমার ঘরে গিয়ে একবার বুদ্ধদেবের চেহারাটা দেখে আসবেন। একটা হাত ত অনেক দিন হ'ল কোথায় উড়ে গেছে—বোধ হয় য়্যাক্সিডেণ্ট হয়েছিল কোনও দিন, যা গাড়ী ঘোড়ার ভিড় আজকাল! বুদ্ধদেবের

তখনকার আমলে ত এসব বালাই ছিল না, তাই পথ সামলে চলা অত অভ্যেস নেই আর কি। তারপর আজ আবার দেখলাম তিনি একেবারে সোজা দু-আধখানা হয়ে গেছেন—একটা অর্দ্ধেক ভাগ ত দেখি খাটের তলায় পড়ে আছে, আর বাকি আধখানা কলতলায় যে একটা তেলটেল রাখবার শেল্‌ফ্‌ আছে না তার উপর উঠেছে কি জানি কি ক'রে। সতীর দেহত্যাগের ব্যাপার আর কি!

সন্তোষের কথার ভঙ্গীতে ইন্দিরা হাসিল। ও-ঘর হইতে রমা বলিল, "খুব যে লেকচার দিচ্ছ শুনতে পাচ্ছি। এতই যদি ঘর ফিটফাট রাখার সখ ত নিজে করলেই পার। তোমার ত আর দাদার মত আপিসের খাটুনি নেই—খুব ত বন্ধুদের বাড়ি তাসপাশা খেলে বেড়াবার সময় থাকে। সেটা কমিয়ে এবার না-হয় ঝাঁটা ঝাড়ন হাতে মাঝে মাঝে ঘর-পরিষ্কারের কাজেই লেগে যেও। ঘর ত আর আমার একলার নয় যে সব-কিছু আমাকে একলাই করতে হবে।"

সন্তোষ হাসিয়া চুপি চুপি বলিল, "শুনছেন বৌ-ঠাকরুণ, নিজে ত করবেই না, আবার কেউ করলে তাকে ভাল বলবারও জো নেই।"

তাহার পর এ ঘরে ঢুকিয়া শ্যালককে বলিল, "কি হে, আপিস থেকে ফিরতে-না-ফিরতেই চা যে হাতের কাছে দেখছি। আছ বেশ ভায়া—কেবল ঐ আপিসটুকুতেই যা একটু খাটুনি—তারপর বাড়ি এলেই ত বৌ-ঠাকরুণের যত্নে দিব্যি নবাবী অবস্থা লাভ, কোনও ঝঞ্ঝাট নেই।"

কেশব রাগিয়াছিল। বলিল, "যত সহজ ভাবছ তত নয় হে। এ বাড়ি ঐ কেবল দেখতেই ঝক্‌ঝকে চকচকে, থাকতে আরাম নেই। নড়তে গেলে তোমার বৌ-ঠাকরুণের কোন্‌ পুতুলটি নড়িয়ে ফেলি এই ভয়ে নড়তে পারিনে। তোমরা দশ মিনিটের জন্যে বেড়াতে আস, ওর ড্রয়িংরুমের চেয়ারে কাঠের মত বসে খুব বাহবা বাহবা করে যাও—চব্বিশ ঘণ্টা থাকতে হ'লে বুঝতে পারতে। তাড়াতাড়ি ছিল পরদাটা সরিয়ে যেই বেরোতে গেছি, দেওয়ালে বুঝি কি ছবি ছিল পড়ে চুরমার। তারপর ঐ ওর ড্রয়িংরুমে ত টেবিল টেপাই ফুলদানীর ভিড়ে মানুষের পা ফেলবার জায়গা নেই। সেদিন তাড়াতাড়ি যেতে একটা টেপাই উলটে ফুলদানী পড়ে জল পড়ে কার্পেট ভিজে সে এক কাণ্ড। বাব্বা নিজের বাড়িতে একটু হাত পা মেলে থাকবার জো নেই—ভাল বিপদ হয়েছে।"

সন্তোষ শ্যালকের কথার ধাঁচে হাসিয়া বলিল, "একেবারে যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছ দেখছি। তাই ত, তাহলে কিছু দিন ঘর বদলাবে না কি? আমি রাজী আছি।"

কেশব উঠিয়া বসিয়া বলিল, "ওসব স্তুতিবাক্য রেখে দাও হে ভায়া, দু-দিন ঘর করলেই পালাই পালাই করতে হবে সেটি জেনে রেখো।...কই, চল্‌ রে রমা, তোদের পৌঁছে দিয়ে আসি।"

স্ত্রীর সহিত একা মুখোমুখী হইলেই একটা ঝগ্‌ড়া এখন অনিবার্য্য—যাহা হইয়া গিয়াছে ইহারই তাল সামলাইতে এখন ক'দিন যায় বলা যায় না। কাজেই বাড়ির বাহিরে থাকাই এখন নিরাপদ বুঝিয়া একটা পাঞ্জাবী গায়ে দিয়া কেশব ভগিনীর সহিত চলিয়া গেল ও তাহার বাড়িতে রাত দশটা অবধি কাটাইয়া বাড়ি ফিরিল। আসিয়া দেখিল খাইবার ঘরে ছোট টেবিলটির উপর তাহার খাবার ঢাকা, ইন্দিরা শুইয়া পড়িয়াছে। এরূপ ব্যবস্থা যদিও সম্পূর্ণ নূতন তথাপি নিঃশব্দে খাইয়া কেশব গিয়া শুইয়া পড়িল।

তাহার পরদিন আপিস হইতে বাহির হইয়া কেশব ভাবিতে ভাবিতে আসিল যে, ইন্দিরার রাগটা শান্ত করা প্রয়োজন, কিন্তু কি উপায়ে শান্ত করা যায় তাহা ভাবিয়া পাইল না। ঘরের পরদা ঠেলিয়া ভিতরে পা দিয়া ঘরের চেহারা দেখিয়া কেশব অবাক হইয়া গেল। প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্ত্তিটি তাঁহার কমণ্ডলু ফুলদানী মোমবাতি ইত্যাদি সহ কোথায় অদৃশ্য হইয়াছেন! ঘরের অতগুলা চেয়ার টেবিল যে সকালেও বর্ত্তমান ছিল, তাহার প্রায় সব কয়টাই কোথায় অন্তরালে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে বোঝা গেল না। শুধু তাহাদের দুই চারটা অত্যন্ত এলোমেলো ভাবে ঘরের এক কোণে ঠাসা। এক জায়গায় খোকাকে বোধ হয় দুধ খাওয়ান হইয়াছিল,

তাহারই অবশিষ্ট খানিকটা বাটীতে পড়িয়া আছে ও মাছিতে ঘরের সে জায়গাটা একেবারে ভরা। কেশব মনে করিল ঘরের জিনিষপত্র সরাইয়া নড়াইয়া ইন্দিরা বোধ হয় নূতন করিয়া ঘর সাজাইবার কোনও একটা প্ল্যান ঠিক করিয়াছে। তাহা হইলে তো ইন্দিরার রাগ পড়িয়া গিয়াছে! উৎফুল্ল মনে শয়নগৃহে যাইতে যাইতে কেশব ভাবিল, হয়ত এখনই ইন্দিরা আসিয়া বলিবে, "ওগো, ঐ কোণে দেখছি একটা ব্র্যাকেট দিলে বেশ মানাবে—আজ সন্ধ্যেবেলা একবার নিউ মার্কেটে গিয়ে কাশ্মীরের চেনার পাতা ডিজাইনের ব্র্যাকেট একটা এনে দেবে?" ঐ জিনিষটা একবার কিছুদিন আগে সে চাহিয়াছিল বটে কিন্তু কেশব এখন অবধি আনিয়া দেয় নাই। আজ চাহিলে আজই আনিয়া দিবে নিশ্চয়। আহা, বেচারীর এত সখ—আর এত খাটিতেও পারে এই লইয়া!

শুইবার ঘরে ঢুকিয়া কিন্তু মনটা বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল। খাটে অত্যন্ত ময়লা চাদর—মশারির ফ্রেমগুলা কে জানে কোথায় গিয়াছে—চার কোণে চারিটা পেরেক দেওয়ালে পোঁতা, তাহা হইতে অত্যন্ত বিশ্রী রকমের গেরো বাঁধা বাঁধা নানা রকমের পাড় জুড়িয়া মশারী টাঙান। খাটের তলায় বাজোর ময়লা কাপড়ের গাদা, ধোপা কি এ বাড়িতে মাসখানেক আসে নাই না-কি? এত ময়লা কাপড় জুটিল কোথা হইতে? খাটের উপর কতকগুলা খোকার জামা কাপড় ছড়ান—দুই একটা ভাঙা পুতুল ও পুরাণো কতকগুলা খবরের কাগজও রহিয়াছে। বিরক্ত হইয়া কেশব ডাকিল, "ইন্দিরা।"

খানিকক্ষণ কোনও উত্তর আসিল না। কেশব খাইবার ঘরে গিয়া দেখিল ইন্দিরা মাটিতে বসিয়া কুটনা কুটিতেছে—খোকা সেখানে জল ফেলিয়া চিনি ছড়াইয়া অত্যন্ত স্বাধীনভাবে খেলায় ব্যাপৃত, এবং মাছির উপদ্রবেরও অন্ত নাই। যে ইন্দিরা ঘরে একটা মাছি ঢুকিলে যতক্ষণ না তাহাকে মারিতে পারে ততক্ষণ তাহার সঙ্গ ছাড়ে না তাহার মাছির প্রতি এই ঔদাসীন্য দেখিয়া কেশব আশ্চর্য্য বোধ করিল। কিন্তু ব্যাপারটা বুঝিয়া কিছুই বলিল না। বলিল, "ডেকে ডেকে তো সাড়া পাবার জো নেই। চা কই? ছেলেটা যে মাছি মুখে পুরছে দেখছ না?"

উদাসীনভাবে ইন্দিরা উত্তর দিল, "পোরে পুরবে, তা আর আমি কি করব? মাছি ঘরে ঢুকল সেটাও কি আমার দোষ নাকি?"

কেশব বলিল, "দোষগুণের কথা তো কিছু হয় নি।... চা পাব, না দোকানে গিয়ে খাব?'

ইন্দিরা বলিল, "তেল নেই, সাধুকে তেল আনতে পাঠিয়েছি—আসুক, তবে তো ষ্টোভ জ্বালব। আসতে না আসতেই তৈরি চা কোথা থেকে পাব? কটা বেজে ক' মিনিটে বাড়িতে পা দেবে তা তো আমায় আগে থেকে বলে যাও নি!"

কেশব বলিল, "থাক, চা ক'রে কাজ নেই তোমার। আমি দিদির বাড়ি যাচ্ছি, সেখানেই খেয়ে নেব, তোমায় আর কষ্ট করতে হবে না।"

রাগিয়া কেশব কাপড়-চোপড় না বদলাইয়া যেমন ছিল তেমনি বাহির হইয়া গেল। স্ত্রীকে বলিল বটে যে দিদির বাড়ি চা খাইতে যাইতেছে কিন্তু গেল দোকানে। দিদির বাড়িতে চা চাহিলে কখনও যে এক ঘণ্টার আগে পাওয়া যায় না, তাহা কেশব ভাল করিয়াই জানে। সে-বাড়িতে চা কেহ খায় না। কেশব গিয়া চা চাহিলে চাকরকে ডাক পড়িবে, দু-পয়সার চা আনিবার জন্য। চাকরকে প্রায়ই চায়ের সময়ে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, অতএব বছর-আষ্টেকের হাবুকে দোকানে পাঠান হইবে। হাবু দোকানে গেলে প্রায়ই শীঘ্র ফেরে না—দোকানে বসিয়া দোকানী-দাদার সহিত ভাব করিয়া দুটো বাতাসা বা দুইটা জেম বিস্কুট আদায়ের পর তাহা মুখে পুরিয়া চিবাইতে চিবাইতে বাড়ি ফেরে; এবং যদি-বা কোনও দিন দোতলার বারান্দা হইতে দেখা যায় যে, হাবু দুই-চার মিনিটের মধ্যেই বাড়ির দিকে আসিতেছে তাহা হইলে শোনা যায় সে বাড়ি ঢুকিয়া নীচের দালান হইতে চীৎকার করিতেছে, "মা, কি আনতে হবে ভুলে গেলাম। দু-পয়সারই চা, না এক পয়সার চা, এক পয়সার চিনি?" তাহার পর যদি-বা চা আসে তখন দেখা যায় যে, ষ্টোভটা বিগড়াইয়া

সাত দিন ধরিয়া পড়িয়া আছে, মেরামত করিতে পাঠাইবার কথা কাহারও মনে ছিল না। দিদি বিলাপ করেন, "দেখলি তো ভাই? যেটি নিজে মনে ক'রে না করব সেটি কি এ-সংসারে কিছুতে হবে? ও যদি আমি মনে না ক'রে পাঠাই তো সাত বছর ও অমনি পড়ে থাকবে তবু মেরামত হবে না, তোরা দেখে নিস্।"

অতঃপর কেশবকেই সেই ষ্টোভ মেরামতে বসিয়া যাইতে হয়—কেন-না, উনান জ্বালাইয়া আগুন ধরাইতে আরও হাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা। ঠেকা-জোড়া দিয়া কোনও রকমে ষ্টোভ জ্বালিয়া যদি চা করিয়া খাইতে মি-কোয়াটার লাগে তো কেশবের ভাগ্য সেদিন সুপ্রসন্ন বলিতে হয়—কোন-কোন দিন দেড় ঘণ্টাও লাগিয়া যায়। আর কোন-কোন দিন বা বলিতে হয়, "থাক থাক দিদি, অত কষ্ট ক'রো না—এই তো কাছেই একটা দোকান আছে, বেশ পরিষ্কার চা ক'রে দেয়, আমি খেয়ে আসছি সেখান থেকে।"

আজ কেশব দোকানে চা খাইয়া সোজা একটা সিনেমায় গিয়া বসিয়া রহিল—বাড়ি আসিল যখন নটা বাজিয়া গিয়াছে। আসিয়া দেখিল ঘরদ্বারের অবস্থা যেরূপ দেখিয়া গিয়াছিল তাহার কিছুমাত্র নড়চড় হয় নাই, শুধু বিছানার ভিতরকার পুতুল ও খবরের কাগজগুলা মাটিতে আশ্রয় লাভ করিয়াছে এবং খাটের উপর মশারির মধ্যে ছেলে লইয়া ইন্দিরা নিদ্রামগ্না।

গৃহাদির এরূপ অভূতপূর্ব্ব অবস্থা দেখিয়া কেশব বুঝিল, তাহাকে জব্দ করিবার জন্যই ইন্দিরার এই কাণ্ড। আচ্ছা, সেও হটিবার পাত্র নয়, তাহার এ-সকলে কিছুই আসিয়া যায় না। কলেজে পড়িবার সময়ে মেসে থাকিতে কত রকম অবস্থায় দিন কাটাইয়াছে—তাহার অত বাবুয়ানার অভ্যাস কোন কালেই ছিল না।

খাবার ঘরে পূর্ব্বদিনের ন্যায় আজও তাহার রাত্রের আহার্য্য ঢাকা দেওয়া ছিল, খাইয়া আসিয়া জামাগুলা খুলিয়া ছুঁড়িয়া আলনার দিকে ফেলিয়া মশারিটা তুলিয়া অনাবশ্যক 'আঃ' বলিয়া একটা আরামসূচক শব্দ করিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু এদিক ওদিক পাশ ফিরিতে ফিরিতে রাত এগারটা বাজিয়া গেল। ঘুম আসে না। ছয়-সাত বৎসরের অভ্যাস, ফরসা বিছানা, নরম গদী, এ সবগুলা ইন্দিরা যেন একেবারে মজ্জাগত অভ্যাস করাইয়া ছাড়িয়াছে। আজ ময়লা চাদরট অত্যন্ত অস্বস্তিকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল—বিছানার তোষকগুলা কোথায় গিয়াছে কে জানে গদীর ছোবড়াগুলা যেন গায়ে বিঁধিতেছে। অনেকক্ষণ এ পাশ ওপাশ করিয়া অত্যন্ত বিরক্ত মনে কেশব উঠিয়া পড়িল। জানালাটা ভাল করিয়া খুলিয়া দিয়া ও-ঘর হইতে মাদুরটা আনিয়া মাটিতে বিছাইয়া জানালার নীচে শুইয়া পড়িল ও কিছুক্ষণ পরে ঘুমাইয়া পড়িল। ইন্দিরা বোধ করি গভীর ঘুমে অচেতন ছিল—কেশবের দুমদাম শব্দেও তাহার ঘুম ভাঙিল না।

পরদিন সকালেই আপিসের তাড়া। প্রতিদিন স্নানের পর আসিয়া চেয়ারের উপর তাহার ধুতি কামিজ কোট রুমাল, চেয়ারের নীচে জুতামোজা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় যাহা-কিছু সবই হাতের কাছে পাওয়া কেশবের অভ্যাস। আজ সাড়ে নটায় স্নান করিয়া আসিয়া দেখে কাল যে ফরসা কামিজটা পরিয়া বাহির হইয়াছিল, সেটা রাত্রে অত না দেখিয়া শুইবার সময়ে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়—আজ সেটার উপর খোকা কাদাধুলা মাখা পায়ে উঠিয়া বসিয়া আছে, সেটা আর পরিবার জো নাই। ঘরের চারিদিকেই রাশীকৃত ময়লা কাপড় ছড়ান, তাহার মধ্যে মোজা জোড়া যে কোথায় লুকাইয়াছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব বলিলেই চলে। ধুতি যে কি পরিবে কিছুই জানে না। ইন্দিরাই গুছাইয়া দেয় এবং নির্ব্বিচারে কেশব তাহাই পরিয়া যায়, কিন্তু আজ কাপড় কি পরিবে সে কথা ইন্দিরাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা করিতে লাগিল। একটা ময়লা ধুতির উপর একটা ফরসা পাঞ্জাবী চড়াইয়া সে যখন খাইতে আসিল তখন দশটা বাজিয়া গিয়াছে। আজ যে কত দেরিতে আপিস পৌঁছাইবে কে জানে। তাহার পর ভাতের জন্যও আজ আবার বসিয়া থাকিতে হইল—ইন্দিরা বলিল, "ছেলেটাকে সামলাব, না রাঁধব, কটা হাত আমার? চাকরটা তো কাল দেশের লোকের সঙ্গে দেখা করতে যাবে বলে ছুটি নিয়ে বেরোল, আজও

ফেরে নি। দু-মিনিট ব'স না, দিচ্ছি এখুনি। সমস্ত ক্ষণ ঘোড়ায় চড়ে থাকলে তো আর সংসার চলে না।"

চা কাল না খাইয়া চলিয়া গিয়াছিল কিন্তু আপিস যাইবার মুখে ভাত না খাইয়া তো আর চলিয়া যাওয়া যায় না, তা সে যত রাগই হউক না কেন। কাজেই চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া কেশব মনে মনে গুমরাইতে লাগিল। ভাত খাইয়া যখন আপিসে গিয়া পৌছাইল তখন এগারটা বাজিয়া গিয়াছে।

বিকালে দুর্গানাম জপ করিতে করিতে বাহির হইল, আজ যেন ইন্দিরার দুষ্টামির খেয়াল চুকিয়া গিয়া থাকে। কাল ঘর-দ্বারের অবস্থা যেরূপ দেখিয়াছে তাহা মনে করিয়া তাহার বাড়ি ফিরিবার ইচ্ছা যেন চলিয়া গিয়াছিল। বাড়ি পৌছাইয়া ভয়ে ভয়ে ঘরে উঁকি মারিয়া দেখে যে সন্তোষ আসিয়াছে—ইন্দিরা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহার সহিত কি একটা কথা লইয়া খুব হাসিতেছে—ঘরের অবস্থা পূর্ব্ববৎ। আজ কেশবের মনটা একটু নরম হইয়াছিল—তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে সে হয়ত আজ ইন্দিরার নিকট ক্ষমা চাহিতেও পারিত, বলিত তাহার প্রাণান্তকর পরিশ্রমে ঘর সাজান লইয়া অসন্তোষ প্রকাশ করা তাহার অন্যায় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাদের হাসাহাসি কানে যাইতেই মনের ভাবটা বদলাইয়া গেল। ঘরে ঢুকিয়া সন্তোষকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কি হে, এমন সময়ে যে?"

সন্তোষ হাসিয়া বলিল, "এই তুমি কি রকম হাত-পা মেলে আরামে আছ তাই দেখতে এলাম। আর তো ছবি-টবি উল্টোবার ভয় নেই—দিব্যি বন্দোবস্ত হয়েছে। বৌ-ঠাকরুণ, নতুন বন্দোবস্তের আরামে আপনার স্বামীঠাকুরের যে দেখছি দু-দিনেই বেশ চেহারার সাজপোষাকের বাহার খুলে গেছে, এ আর বদলাবেন না।"

পাছে চা নাই শুনিতে হয়, এই ভয়ে কেশব ভগ্নীপতির সামনে আর চায়ের নামোল্লেখ করিল না। বলিল, "চল না হে, ময়দানে একটু হাঁটতে যাবে? ঘরে বন্ধ হয়ে তাস খেলে কি হবে? চল, যাওয়া যাক—চা আমি খেয়ে এসেছি।"

সন্তোষ সমানে সঙ্গ ধরিয়া রহিল, ছাড়ে না, অতএব বৈকালিক চা আজ বাদ গেল,—আটটা বাজিতে না বাজিতে ক্ষুধার জ্বালায় কেশবের আর ময়দানে পায়চারী করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। বলিল, "চল হে, ফেরা যাক। ময়দানে বেড়ানটা কেমন হেলদি দেখেছ? অন্যদিন রাত দশটার আগে খিদেই হয় না, আজ এর মধ্যেই পেটের জালা ধরেছে।"

ভগ্নীপতি বলিল, "চল, কিন্তু ভায়া তোমার ভগ্নী যে রাত নটার আগে আমার খাবার তৈরি করে পথ চেয়ে বসে আছেন সে ভরসা করতে ভরসা পাই নে। তোমার কথা আলাদা—সবই সময়মত হাতের কাছে পাওয়া তোমার অভ্যাস, তুমি আর কি বুঝবে বল! তাড়াতাড়ি খাবার চাইলে তোমার বোনটি এমনি মুখনাড়া দিয়ে বলবেন, 'এদিকে তো বেলা দুটা বেজে যায় তবে রান্নাঘর থেকে বেরোতে পাই, আবার এদিকে যদি তোমাদের সব সন্ধ্যে রাত্তিরেই খেতে দিতে হয় তাহলে আর রান্নাঘর থেকে মোটে বেরিয়েই কাজ নেই বল'। কথাটা ঠিক—কাজেই চুপ ক'রে থাকতে হয়।"

নিজের বাড়িতেও হাতে হাতে সময়মত জিনিষ পাওয়া সম্বন্ধে দু-দিন হইতে কেশব একটু সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছিল, তাই কিছু উত্তর দিল না।

বাড়ি আসিয়া দেখে বিকালে খোকা মাছি খাইয়াছিল, না কি করিয়াছিল কে জানে—বার দুই-তিন বমি করিয়াছে। এতক্ষণ কাঁদিতেছিল, এইমাত্র ঘুমাইয়া পড়াতে ইন্দিরা এখন রাঁধিতে আসিয়াছে—খাবারের একটু দেরি আছে।

হতাশ হইয়া কেশব বারান্দায় আসিল, ইজিচেয়ারটায় একটু শুইয়া পড়িবে। কিন্তু বারান্দায় কোনও ইজিচেয়ার নাই, এদিক ওদিক খুঁজিয়াও সন্ধান পাওয়া গেল না। বিছানাটা মশারির ভিতর হইতে একবার উঁকি মারিয়া দেখিয়া লইল, কালিকার অপেক্ষাও যেন অপরিষ্কার দেখাইতেছে। কাল সারারাত মেজেতে মাদুর বিছাইয়া শুইবার ফলে গায়ে আজ যা ব্যথা হইয়াছে, আজ তো আর মেজেতে শোওয়া চলিবে না।

ঘণ্টাখানেক পরে ইন্দিরা খাইতে ডাকিলে ভালমানুষের মত চুপচাপ গিয়া খাইয়া সেই খাটের উপরেই আসিয়া কেশব শুইয়া পড়িল। কিন্তু যত ঘুমের চেষ্টা করে ঘুম যেন ততই আসিতে চায় না। গরম বোধ হয়, কি যেন সর্ব্বাঙ্গে কামড়াইতে থাকে, কোথা হইতে কি একটা দুর্গন্ধ নাকে আসে—অস্বস্তির একশেষ।

রাতটা প্রায় ছটফট করিতে করিতেই কাটিল। পরদিন সকালে আবার সেই পূর্ব্বদিনের পুনরাবৃত্তি মনে করিয়া ভোর হইতেই কেশবের যেন গায়ে জ্বর আসিল। উঠিয়া পড়িয়া ইন্দিরার কাছে গিয়া বলিল, "ওগো ঘাট হয়েছে। তোমার ছবির কাচ মাথায়ই ভেঙে পড়ুক, আর ফুলদানী উল্টে পা-ই ছেঁচে যাক, আর কখনও তোমার ঘর-সাজান নিয়ে কিচ্ছুটি বলব না। এসে আমার আপিসের কাপড়-চোপড়গুলো বার ক'রে দাও দেখি, কাল তো ভূত সেজে আপিস যেতে হয়েছিল।"

ইন্দিরা হাসিয়া বলিল, "কেন, তোমার বোনের আদর্শ সংসারের মত বুঝি আমারটা এখনও ক'রে তুলতে পারি নি, তাই পছন্দ হ'ল না? হাত-পা মেলে থাকই না দু-দিন।"

কেশবও হাসিয়া বলিল, "ঘাট মানলাম, আবার সেই কথা? চেয়ার-টেবিলগুলো সব গেল কোথা? ইজিচেয়ারটা অবধি কোথায় সরালে বল তো? আমার উপর রাগ ক'রে কি জিনিষপত্রগুলা একেবারে বেচে দিলে না-কি?"

ইন্দিরা বলিল, "পাশের বাড়ি পাঠিয়েছি আট আনা কুলীভাড়া দিয়ে। তোমাদের যেরকম চক্ষুঃশূল হয়েছিল সেগুলো, তাই বিদায় ক'রে দেখলুম দু-দিন ভাইবোনের যদি স্বস্তি হয় কিছু। তা দিদি তো সন্তোষবাবুর কাছে খবর পেয়েই হবে বোধ হয়, এ দুই দিন এদিকে পা-ও বাড়ান নি, তোমারও তো দেখছি এই অবস্থা—তাহ'লে আবার আট আনা কুলীভাড়া দিয়ে সেগুলো ফিরিয়ে আনাতেই হবে দেখছি।"

দুইটা টাকা আনিয়া ইন্দিরার হাতে দিয়া কেশব বলিল, "তোমার সংসার খরচ থেকে আর নগদ একটা টাকা খরচ ক'রে কাজ নেই—যা দিয়েছ এই সুদশুদ্ধ দিয়ে গেলাম, আনিয়ে নিও সেগুলো। আর এসো, কাপড়টা বার ক'রে দিয়ে তবে অন্য কাজে যাও।"

বিকালে বাড়ি ফিরিয়া কেশব দেখিল, ইন্দিরার ড্রয়িংরুম চেয়ারে টেবিলে ছবিতে কার্পেটে সাজান-গোছান ফিটফাট। শয়নগৃহে উঁকি মারিয়া দেখিল, কাল তাহার যে দুরবস্থা হইয়াছিল, আজ তাহার চিহ্ন মাত্র নাই।

হাতের মোড়কটি খুলিয়া একটি সুন্দর পিতলের 'ওঁ' লেখা ধূপদানী বাহির করিয়া ইন্দিরার হাতে দিয়া বলিল, "রাস্তার মোড়ে বিক্রী করছিল। বেশ দেখতে। ভাবলাম, তোমার পছন্দ হবে, তাই নিয়ে এলাম।"

ইন্দিরা হাসিয়া বলিল, "এ কি দু-দিন ধ'রে তোমার বোনেদের আদর্শ মতে সংসার করবার জন্য পুরস্কার না কি [illegible]।"

বাঙ্গালা টাইপ ও কেস

শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার

৩

আমার আগের দুইটি প্রবন্ধে ৪৭৪-টি স্বর ও ব্যঞ্জন প্রভৃতি অযুক্ত ও যুক্ত টাইপকে ৪১ দফায় ভাগ করিয়াছি। এই ৪১ দফার মধ্যে প্রথম ৫ দফার আলোচনা দ্বিতীয় প্রবন্ধে করিয়াছি। ৬ দফা হইতে এই প্রবন্ধ আরম্ভ করিতেছি।

৬ দফা—গ গ্ গী গু গূ গৃ গ্দ গ্ধ গ্ন গ্ব গ্ম গ্র গ্ল —১৩।

গ্—কেসে থাকা চাই; কেন-না সন্ধিসূত্রানুসারে স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ, কিংবা য্ র্ ল্ ব্ এবং হ্ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ক্-র স্থানে গ্ হয়। এমন অনেক খাঁটি সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয় যেগুলির শেষে ক্ থাকে এবং এই সূত্রানুসারে সন্ধি হইয়া গ্ হইয়া যায়, যেমন—দিগ্‌গজ, বাগ্‌জাল, বাগ্‌রোধ, সম্যগ্‌রূপে প্রভৃতি। আর এই ক্-কে গ্ করিয়া যুক্তাক্ষরে ব্যবহার করিবার জন্যই গ্দ, গ্ধ, গ্ব এবং গ্ল-য়ের সৃষ্টি হইয়াছে, যেমন—দিগ্দর্শন, বাগ্দেবী প্রভৃতি এবং বহুতর সংস্কৃত শব্দ যাহাদের বাঙ্গালায় প্রয়োগ নাই, যেমন—ধিগ্ধনম্, সম্যগ্বদতি, ধিগ্লোভিনম্ ইত্যাদি।

এখন অনায়াসে প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, বাঙ্গালায় যে সকল ব্যঞ্জনান্ত খাঁটি সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে এবং সাধারণতঃ যে শব্দগুলির প্রথমার একবচন বাঙ্গালায় মূল শব্দরূপে প্রচলিত আছে, সেই সকল শব্দ কি হসন্ত চিহ্ন দিয়া লেখা ও ছাপা হইবে, না হসন্ত বাদ দিয়া অকারান্তরূপে ব্যবহৃত হইবে? ব্যঞ্জনান্ত কয়েকটি শব্দের উদাহরণ দিতেছি।—উদক্, ঋক, ত্বক, দিক, প্রাক, বণিক্, বাক্, ভিষক্, সম্রাট্, উপনিষদ্, আপদ্, বিপদ্, সম্পদ্, সুহৃদ্, ভগবান্, বিদ্বান্ প্রভৃতি।

প্রথমেই বলিয়া রাখি, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই সকল শব্দে হসন্ত চিহ্ন দেন না,—অকারান্ত করিয়াই লেখেন এবং তাঁহার পুস্তকে সেইরূপ ভাবেই মুদ্রিত করান। কিন্তু তাঁহারই লিখিত প্রবন্ধ ও কবিতাদি যখন পাঠ্যপুস্তক-মধ্যে সংকলিত হইয়া মুদ্রিত হয়, তখন ঐ শব্দগুলি হসন্ত-যুক্ত হইয়াই ছাপা হয়। শুনিয়াছি, টেক্সট বুক কমিটির সভ্যগণ এই বিষয়ে শ্যেনদৃষ্টি। ভাষা ও ভাব যেমন-তেমন ও যা-তা হউক না কেন, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না, কিন্তু ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলি, বিশেষতঃ 'সমস্ত' পদ-গুলি, সংস্কৃত ব্যাকরণ-অনুযায়ী না হইলেই তাঁহারা বই বাতিল করিয়া দেন—তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্তলিকার মত তাঁহার 'বোধোদয়'ও হইয়া পড়ে অচল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং এ বিষয়ে অত্যন্ত সাবধানী ছিলেন। লিখিলাম 'সাবধানী' কিন্তু এই শব্দটি কোন টেক্সট বুক কমিটির সভ্যের দৃষ্টিগোচর হইলে এই প্রবন্ধ তিনি টুকরা-টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেন নিশ্চয়ই, কেন-না, সংস্কৃত ব্যাকরণ-অনুসারে লেখা উচিত ছিল 'সাবধান'—অবধান বা সতর্কতার সহিত, বিশেষণ। সাবধান স্বয়ং বিশেষণ, তাহার উপর ইন্-প্রত্যয় করিয়া ঈকার জুড়িয়া দিয়া পুনরায় বিশেষণ করায় মূর্খতা প্রকাশ পাইয়াছে এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা হইয়াছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন, আমরা অনবরত বলি, 'লোকটি খুবই সাবধানী,' 'সাবধানের বিনাশ নেই' ইত্যাদি; অর্থাৎ 'সাবধান' শব্দটিকে বিশেষ্যরূপে এবং 'সাবধানী' শব্দটিকে বিশেষণরূপে আমরা কথোপ-কথনের ভাষায় খুবই ব্যবহার করি এবং অনেক দিন হইতে লিখিত ভাষার মধ্যেও ইহারা চলিয়া আসিতেছে। এইরূপ তথাকথিত ব্যাকরণ-দুষ্ট শব্দ পাঠ্যপুস্তক-মধ্যে স্থানলাভ করিলেই গ্রন্থকারের মহাবিপদ,—তাঁহার বই ত অচল হইবেই, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকেও অন্নাভাবে অচল হইয়া স্থাণুবৎ জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে। বাঙ্গালার সাহিত্যিকগণের মধ্যে এইসব বিষয় বিচার করিবার কি কোন উপযুক্ত ব্যক্তি নাই?

হাঁ, বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত শব্দের খাঁটি রূপটিই বাঙ্গালায় ব্যবহার করিতেন; এমন কি, তাঁহার লিখিত পুস্তকের গোড়ার সংস্করণগুলিতে 'বয়স' 'বয়স্'রূপে মুদ্রিত দেখিয়াছি। সংস্কৃত 'বয়স্' শব্দের প্রথমার এক-বচনে 'বয়ঃ' হয়। সন্ধি ও সমাসে আমরা বাঙ্গালায় বিসর্গ বজায় রাখি, যেমন—বয়ঃক্রম, বয়ঃসন্ধি, বয়োজ্যেষ্ঠ, বয়ঃ-কনিষ্ঠ প্রভৃতি, কিন্তু যখন শুধু শব্দটি ব্যবহার করি, তখন পুরা বিসর্গ অথবা স্ বাদ না দিয়া কেবলমাত্র মূল শব্দের অন্তস্থিত হসন্ত চিহ্নটি পুঁছিয়া দিয়া শব্দটিকে অকারান্ত-রূপে প্রয়োগ করি, অর্থাৎ 'বয়' না লিখিয়া লিখি 'বয়স'। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত মূল শব্দটিকে বাঙ্গালায় মূল শব্দরূপেই ব্যবহার করিতেন। মজা দেখুন, শব্দটিকে আমরা খাঁটি সংস্কৃতের মতই উচ্চারণ করি, অর্থাৎ ব্যঞ্জনান্ত করিয়াই উচ্চারণ করি, কিন্তু হসন্ত চিহ্ন দিই না, দিলেই বর্ণাশুদ্ধি ঘটে! বাঙ্গালায় প্রচলিত অন্য কোন সংস্কৃত ব্যঞ্জনান্ত শব্দের বেলায় এইরূপ প্রথা আচরিত হয় না। ইহা একটা অদ্ভুত ও বিচিত্র ব্যাপার নয় কি?

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরবর্ত্তী বিখ্যাত লেখকগণের মধ্যে কালীপ্রসন্ন ঘোষ ভিন্ন অন্য সকলেই এই বিষয়ে তেমন অবহিত ছিলেন না; তাঁহারা কখন কখন কোন কোন শব্দে হসন্ত ব্যবহার করিতেন, কখন বা করিতেন না; আর রবীন্দ্রনাথের কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি উল্টা দিকে অতিশয় 'সাবধানী'—কখনও কোন ব্যঞ্জনান্ত শব্দে হসন্ত চিহ্ন দেন না। ফলে কি দাঁড়াইয়াছে জানেন? বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে অনেকগুলি (প্রায় শতাধিক) সংস্কৃত ব্যাকরণ-দুষ্ট পদ অবাধে চলিয়া গিয়াছে।

দেখিতেছি,—এখনকার ছেলেরা বয়সোচিত আচরণ ভুলিয়া গিয়া ভুল করিয়াও বয়োধিক্যের স্থলে মস্তক অবনত করেন না। অনেকে বলেন, বিদ্যুতালোকই তাঁহাদের অকাল চক্ষুরোগের অন্যতম কারণ। বিদ্বানগণ বলেন, হিন্দুর দশবিধ সংস্কারের মধ্য হইতে ষড়বিধ সংস্কার সমাজ হইতে লোপ পাইয়াছে বলিয়াই আজ আমাদের এই জাতীয় অধোপতন। কিন্তু বিজ্ঞজন শিরসঞ্চালন-পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে বলেন, ঐ সকল অপগণ্ডের উক্তি। এতদোপলক্ষে আন্দোলন করিলেও কোন ফলোদয় হইবে না, কারণ যাহারা জাগ্রতাবস্থায় দিবাস্বপ্ন দেখে তাহাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিলে ভয়ে হৃদকম্প উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে নিবোধ বলিব কিরূপে? তাঁহারা ঐ অর্ব্বাচীনগণের দুরবস্থা দেখিয়া অচিরে আয়ুরেখার বিচার করাইবার পরামর্শ দেন। ফলে উভয় পক্ষ-মধ্যে কথান্তর, মতান্তর এবং পরিশেষে মনান্তর সংঘটিত হয়।

বাঙ্গালা ভাষায় পদের শেষে বিসর্গ ব্যবহার না করায় এবং ব্যঞ্জনান্ত শব্দগুলিকে অকারান্ত করিয়া প্রয়োগ করার প্রথা বহুকাল হইতে অনুসৃত হওয়ায় ঐরূপ বহুতর অশুদ্ধ শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় চোচাপটে চলিতেছে। প ও ত (৫)-এর বিষয় আলোচনা করিবার সময়ে এই সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা আছে।

এইবার ভয়ে ভয়ে চুপি চুপি আমার নিজের মতটা প্রকাশ করিতেছি। যেগুলি খাঁটি সংস্কৃত শব্দ সেইগুলির খাঁটি সংস্কৃত রূপই (কখন মূল শব্দ, কখন প্রথমার এক-বচন আর কখন-বা বহুবচন) বাঙ্গালায় ব্যবহার করাই উচিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং কালীপ্রসন্ন ঘোষের ন্যায় বাকি লেখকগণ যদি সকলেই এই দিকে, এই সত্তর বৎসর ধরিয়া মনোযোগী থাকিতেন, তাহা হইলে কি শতাধিক অশুদ্ধ শব্দের ভারে আক্রান্ত হইয়া বঙ্গভাষা-জননীকে মনোকষ্টে কাল কাটাইতে হইত? না,—তাঁহার মনোকষ্টের কোন কারণ উপস্থিত ত হইতই না, পরন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সদাবিধবার জন্য বক্ষোপরি চক্ষুঃজল ফেলিতেও হইত না, আর বঙ্গের শ্রেষ্ঠ লেখকগণ এখনও 'জাগ্রৎ' না লিখিয়া 'জাগ্রত' লেখেন—এই কথার ইঙ্গিত করিয়া আমার মত ক্ষুদ্র কীট ফাঁকতালে যশোপার্জ্জন-প্রয়াসী হইতে সাহস করিত কি?

সুতরাং স্-টাইপ কেসে থাকা দরকার কি-না তাহা ঠিক করিতে পারা গেল না। বিদ্যাসাগর মহাশয় এমন ভাবে নূতন নূতন যুক্তাক্ষর টাইপ তৈয়ার করাইয়া ছিলেন, যাহাতে সংস্কৃত ভাষাও বাঙ্গালা টাইপের দ্বারা অনায়াসে ও সুষ্ঠুভাবে মুদ্রিত করা যায়। এক ঢিলে দুই পাখী-মারা বিদ্যার আমি কিন্তু ঘোর বিরোধী। আর এই একমাত্র কারণেই বাঙ্গালা টাইপ ও কেস এইরূপভাবে

ভবড়ঙ্গং ও গুরুভারাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে। কবে কোন্ শুভ মুহূর্তে একটি সংস্কৃত জটিল শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হইবে কি না-হইবে, অথবা হয়ত কচিৎ-কখন একটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার করিয়া বা উদ্ধৃত করিয়া প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য জাহির করিতে হইবে, এই কারণে সংস্কৃত ভাষায় বহুব্যবহৃত যুক্ত টাইপগুলি যে বাঙ্গালা কেস জোড়া করিয়া আজও বিরাজ করিতেছেন, ইহা মোটেই কাজের কথা নয়। আমার ইচ্ছা, বাঙ্গালা ভাষার জন্য কেবল বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত যুক্ত ও অযুক্ত টাইপগুলিকে লইয়া বাঙ্গালা কেস নূতন করিয়া সাজানো হউক এবং বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে সংস্কৃত শ্লোকাদি উদ্ধার করিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র ছোট কেসের প্রবর্তন হউক। মোটামুটি পঞ্চাশ ষাটটি টাইপ এই সংস্কৃতের কেসে রাখিয়া দিলেই বেশ সুশৃঙ্খলার সহিত কাজ চলিয়া যাইবে।

এই স্থলে একটি অবান্তর বিষয়ের অবতারণা করিতেছি। লক্ষ্য করিয়াছি, বঙ্কিম-যুগের খ্যাতনামা লেখকগণ সকলেই সংস্কৃত মূল শ্লোকাদি অথবা অন্য লোকের উক্তি নিজেদের লেখার মধ্যে 'উদ্ধার করিতেন।' কিন্তু এখন বিনাব্যতিক্রমে আমরা ছোটবড় সকল সাহিত্যিকই ঐ সকল বিষয় 'উদ্ধৃত করি'—'উদ্ধার করি' না। ব্যাপারটা আরও একটু খুলিয়াই বলি।

আমরা লিখি, 'পুস্তকখানি আদ্যন্ত পঠিত হইল,' কিংবা 'পুস্তকখানি আদ্যন্ত পাঠ করিলাম।' 'বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু কে বা কাহারা লুঠ করিয়াছে তাহা এখনও অজ্ঞাত।' 'আমাদের কেশ মুণ্ডিত হয়, কিন্তু আমরা কেশ মুণ্ডন করি।' 'শরীরে ব্যথা পাইলে সকলেই মনে মনে ব্যথিত হয়।' অর্থাৎ 'ক্ত'-প্রত্যয়ান্ত পদের সহিত বাঙ্গালা হ্-ধাতু-নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ, যেমন—হয়, হন, হই, হও, হইল, হইত ইত্যাদি এবং ঘঞ্, অল্, খল্, অন্ প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত বিশেষ্য পদের সহিত বাঙ্গালা কর্-ধাতু-নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ, যেমন—করে, করেন, করি, কর, করিল, করিত ইত্যাদি যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়। এইটিই বাঙ্গালার সাধারণ নিয়ম, আর এই নিয়মানুসারেই বঙ্কিম-যুগের লেখকেরা লিখিতেন—'নিম্নে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল,' অথবা 'নিম্নে দুইটি শ্লোক উদ্ধার করিতেছি।' কিন্তু আমরা সকলেই এইরূপে 'উদ্ধার' না করিয়া 'উদ্ধৃত' করি। অর্থাৎ চিরন্তন প্রথানুসারে 'ক্ত'-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার সহিত হ্-ধাতু ব্যবহার না করিয়া কর্-ধাতুর প্রয়োগ করি। কেন করি? কেন এই ব্যতিক্রম? আর ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ঐ সাধারণ সূত্রের এইটিই একমাত্র ব্যতিক্রম। আবার দেখুন, স্থলবিশেষে, যেমন অবলাকে 'উদ্ধার' করিবার সময়ে আমরা পশ্চাৎপদ হই না, তাহার বিপদে এতই মুহ্যমান হইয়া পড়ি যে তাহাকে 'উদ্ধৃত করিতে' সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাই। কোন্‌টি সাধু প্রয়োগ—'উদ্ধার করা,' না 'উদ্ধৃত করা'?

এখন বুঝা যাইতেছে যে, বাঙ্গালা টাইপের আমূল সংস্কার করিতে হইলে বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে প্রচলিত সংস্কৃত, তদ্ভব, দেশজ এবং বিদেশী যাবতীয় শব্দের বানান ঠিক করিয়া লইতে হইবে। বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত যাবতীয় শব্দের বানান ঠিক হইয়া গেলে তবে আমরা ঠিক করিয়া বলিতে পারিব যে, বাঙ্গালা কেসের মধ্যে কোন্ কোন্ টাইপগুলি থাকা দরকার, কোন্ কোন্ টাইপগুলি নূতন করিয়া বাড়ানো দরকার, আর কোন্ কোন্ টাইপগুলিকে একান্ত অপ্রয়োজনীয়-বোধে বাঙ্গালা কেস হইতে চিরদিনের তরে বিসর্জন দেওয়া দরকার।

মনে করুন, তিনটি 'স'-য়ের কোন্‌টি কি পরিমাণে ভাষার মধ্যে ব্যবহৃত হয়—ইহা স্থির করিতে গেলাম। মোটামুটি দেখা গেল, সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লাগে 'স', তারপর 'শ' এবং সর্ব্বাপেক্ষা কম লাগে 'ষ'। বেশ কথা। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই 'মোটামুটি' বা 'আজেমৌজে' লইয়া আর কাজ চালানো কোন মতেই উচিত নয়। নিখুঁতভাবে চুলচেরা হিসাব করিয়া গণনা করা খুবই দরকার যে, কোন্ 'স'-টি কি পরিমাণে লাগে। গোড়ার অক্ষরটি 'ষ'—এমন শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় কয়টি আছে, তাহা দুই-চারিখানি তথাকথিত বাঙ্গালা অভিধান দেখিলেই অনায়াসে ঠিক করিতে পারা যায়। কিন্তু শুধু গোড়ার অক্ষরটির দিকে দৃষ্টি দিলেই ত হইবে না, শব্দের গোড়ায়, মাঝে, শেষে—সকল স্থানেই ষ ভাষার মধ্যে কি পরিমাণে ব্যবহৃত হয় তাহা স্থিরনিশ্চয়রূপে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে

স্বাগতা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

একপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

বনবিহারীর বিপদ

সেই যে বনবিহারী গঙ্গাধরের সঙ্গে দেখা হইবার পর কিছু শঙ্কিত হইয়াছিল তাহার পর সে বড়-একটা কোথাও যাইত না। ত্রিলোচনও অসন্তুষ্ট, কিছু একটা নূতন সংবাদ না পাইলে তাঁহার সঙ্গে দেখা করা বিফল। বনবিহারী স্থির করিল, কিছু দিন চুপ করিয়া থাকিয়াই দেখা যাউক কি হয়।

এমন সময় বনবিহারীর নামে দুইখানি পত্র আসিল। একখানিতে কাহারও স্বাক্ষর নাই, খামের উপর সুবর্ণপুরের ডাকঘরের ছাপ। চিঠিতে লেখা ছিল, তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে, কিছু প্রয়োজন আছে। দ্বিতীয় পত্র গঙ্গাধরের। তাহার ভিতর দশ টাকার দুই খানা নোট ছিল। গঙ্গাধর লিখিয়াছিল, তোমার রাহা খরচ পাঠাইতেছি। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে তোমার আরও কিছু লাভ হইতে পারে।

বনবিহারী ভাবিল হঠাৎ দুই দিক হইতে তাহার ডাক পড়িল কেন? নিশ্চিত নূতন একটা কিছু ঘটিয়া থাকিবে। ত্রিলোচন সুবর্ণপুরে আর গঙ্গাধর কলিকাতায়। দুইজনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, দুই জনে একসঙ্গে বনবিহারীকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছে কেন? বনবিহারী অনুমান করিল ত্রিলোচনের আশঙ্কার কোন কারণ হইয়া থাকিবে এবং সে আশঙ্কা ক্ষেত্রনাথ ও কিশোরী-মোহন (যে নামে সে গঙ্গাধর ও হরিনাথকে জানিত) হইতে। বনবিহারী কোথায় প্রথমে যাইবে বিবেচনা করিতে লাগিল। ত্রিলোচন তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারেন না, কারণ বনবিহারীর বিপদ হইলে তাঁহারও বিপদ। অপর দুই ব্যক্তি হইতে আশঙ্কা হইতে পারে। ক্ষেত্রনাথ (গঙ্গাধর) মুখ ফুটিয়া কিছু না বলিলেও প্রকারান্তরে তাহাকে শাসাইয়াছিল। তবে কলিকাতায় গেলেই যে বিপদ আর কোথাও কোন বিপদ নাই তাহাও নয়। চিঠির বদলে যদি পুলিসের লোক আসিয়া বনবিহারীকে ধরিত? অতএব বনবিহারী নির্ভয়ে কলিকাতায় যাইতে পারে। কুড়িটা টাকা পাইয়া তাহার কিছু লোভ হইয়াছিল। ত্রিলোচনের নিকট অনেক টাকা পাইয়াছিল সে বহুকালের কথা। এ টাকাটা টাটকা আসিয়াছে। পত্রের উত্তরে দিন ও সময় স্থির করিয়া বনবিহারী কলিকাতায় উপস্থিত হইল।

কানাইয়ের বাড়িতে হরিনাথ ও গঙ্গাধর তাহার অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাদের বেশ দেখিয়া বনবিহারীর মনে একটু খটকা লাগিল। সে দেখিয়াছিল তাহারা সামান্য কর্মচারীর ন্যায় মোটা কাপড় ও ময়লা জামা পরিধান করিত, এখন সিমলার উত্তম কালাপেড়ে কোঁচান ধুতি, গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবী, বুকে বোতাম আঁটা। বনবিহারী কিছু সন্দিগ্ধভাবে কহিল—আমাকে ডেকে পাঠিয়েচ কেন?

হরিনাথ বলিল—চল আমাদের বাড়ি, সেইখানে কথাবার্ত্তা হবে।

—কেন, এখানে দোষ কি?

—সেখানেই ভাল। গাড়ি আছে, দেরি হবে না।

তাহারা বাড়ির বাহিরে আসিল। কিছু দূরে মোটর দাঁড়াইয়া ছিল, তখনি আসিল। হরিনাথ ও গঙ্গাধর পাশাপাশি বসিল, বনবিহারী তাহাদের সম্মুখে বসিল। সে মূকের ন্যায় চুপ করিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে হরিনাথের বাড়ির সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইল।

হরিনাথ ও গঙ্গাধর নামিয়া বনবিহারীকে বলিল—এস

বনবিহারী দেখিল সদর দরজায় দরোয়ান বসিয়া

আছে, বাবুদের দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বৈঠকখানায় গিয়া হরিনাথ বনবিহারীকে বসিতে বলিল।

বনবিহারী কলের মতন তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল। আদিষ্ট হইয়া একটু তফাতে বসিল। ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

গঙ্গাধর বলিল,—এখন আর কিছু লুকোবার আবশ্যক নেই। ইনি হরিনাথ রায়, রঘুনাথপুরের জমিদার। আমার নাম গঙ্গাধর মল্লিক, আমারও সেইখানে বাড়ি। আমরা যে সন্ধান খুঁজছিলাম তা পেয়েছি।

বনবিহারীর বিস্ময় ও মনের জড়তা তিরোহিত হইতেছিল। কহিল—তাহলে আমাকে কি আবশ্যক? বুঝলেন কি-না?

—বিনা আবশ্যকে তোমাকে ডাকব কেন? আমরা অনেক জেনেচি, তাহলেও তুমি ভিতরের কথা বলতে পার।

—কি কথা?

—ত্রিলোচন দেওয়ান তোমাকে আর শ্যামাচরণকে কি করতে বলেছিল?

বনবিহারী বলিল—আপনারা তা জানতে চান কেন?

—এ কথা জিজ্ঞাসা করতে পার, আমাদেরও বলতে কোন আপত্তি নেই। শ্যামাচরণ যে-সময় মোটরে ধাক্কা লাগিয়ে স্বর্ণপুরের চৌধুরাণী ঠাকরুণকে আর তাঁর জ্যাঠামশায়কে মেরে ফেলবার চেষ্টা করে আমরা তখন সেইখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। চৌধুরাণী ঠাকরুণের জ্যাঠামশায় পুড়ে যান, তাঁকে অজ্ঞান অবস্থায় আমরা একটা গ্রামে নিয়ে যাই। সে গ্রামে তুমিও তার পর গিয়েছিলে। চৌধুরাণী ঠাকরুণ এই বাড়িতে আছেন। পড়ে গিয়ে তাঁর মাথার একটু দোষ হয়েছিল, এখন সেরে উঠেছেন, সব তাঁর মনে পড়েচে। যারা ষড়যন্ত্র করেছিল তাদের আমরা ধরিয়ে দেব।

বনবিহারী বলিল—আমাকে এ সব কথা বলচেন কেন, আমি এর কিছু জানি নে, বুঝলেন কি-না?

—না জানলে তুমি ত্রিলোচনের কাছে যেতে কেন? তুমি সেখানে চাকরি কর না, তোমার সেখানে কি কাজ? আর শ্যামাচরণের কোন খবর রাখ?

—তার খবর আমি কি জানি? তার বিষয় আমি কিছু জানি নে, বুঝলেন কি-না?

—আমরা জানি। সে এখানে এক জনের মোটর চালাত। এক দিন চৌধুরাণী ঠাকরুণ তাকে দেখে চিনেছিলেন। শ্যামাচরণ মোটরে ক'রে পালিয়ে যাচ্ছিল, দমকলে ধাক্কা লেগে মোটর উল্টে পুড়ে মরেচে। আমরা সেখানে ছিলাম। শ্যামাচরণের পিছনে যারা ছিল এইবার তারা ধরা পড়বে।

বনবিহারীরও কতকটা ভয় ভাঙিল। শ্যামাচরণ জীবিত থাকিলে ও ধরা পড়িলে তাহার কিছু আশঙ্কা ছিল, এখন তাহা দূর হইয়াছে। বনবিহারী নিশ্চিন্ত ভাবে কহিল—পড়ে পড়বে, আমার তাতে কি? আমি কিছুই জানি নে, বুঝলেন কি-না?

হরিনাথ এইবার কথা কহিল, দৃঢ়স্বরে বলিল—শোন বনবিহারী, আমাদের নিতান্ত বোকা ঠাউরো না। এতদিন আমরা মিছামিছি টো-টো ক'রে বেড়াই নি। ত্রিলোচনই যে প্রধান অপরাধী তা আমরা বেশ জানি। বিষয়ের লোভে সে তোমাদের দিয়ে এই কাজ করিয়েচে। ভেবেছিল অন্য দেশে এ রকম ঘটনা হ'লে তার কোন ভয় নেই। মোটরের কথা চাপা দিয়ে জলে ডোবার কথা রটিয়ে সে মুস্কিলে পড়েচে। ত্রিলোচনের কাছ থেকে তুমি আর শ্যামাচরণ টাকা নিয়ে এই দুষ্কর্ম করেছিলে। তোমাদের দু-জনের কেউ স্বর্ণপুরের লোক নয়, সুতরাং সেখানে কেউ কিছু টের পায় নি। তোমাকে আমরা ডেকেচি টাকা দেবার জন্য নয়, তোমার প্রাণ রক্ষা করবার জন্য। শ্যামাচরণের শাস্তি যিনি দেবার তিনি দিয়েছেন, এখন বাকি তুমি আর ত্রিলোচন। তুমি যদি সত্য কথা বল, আর ত্রিলোচনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দাও তাহলে তুমি যাতে ছাড়ান পাও সে উপায় আমরা করব।

বনবিহারীর মনে হইল এখানে আসাই তাহার বকমারি হইয়াছিল। পরে যাহা হইবার হইবে এখন উপায়?

আপনাদের ভুল হয়েছে, বুঝলেন কি-না? তবু আপনারা।। বললেন আমি একবার ভেবে দেখব।

হরিনাথ বলিল—সেই ভাল কথা। যদি পালাবার চেষ্টা কর তখনি ধরা পড়বে, তার ব্যবস্থা আমরা ক'রে রেখেছি। আর একটা কথা তোমাকে ব'লে রাখি। ত্রিলোচন এখান থেকে চৌধুরাণী ঠাকরুণকে চুপি চুপি নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। সুবর্ণপুর থেকে একটা স্ত্রীলোককে সঙ্গে এনেছিল। ষ্টেশনে আমাদের দেখে ত্রিলোচন আর সেই স্ত্রীলোক পালিয়ে যায়। যে-মতলবে তোমাকে আর শ্যামাচরণকে নিযুক্ত করেছিল সেইজন্য ত্রিলোচন নিজে এসেছিল।

আর কোন কথা না কহিয়া বনবিহারী চলিয়া গেল।

দ্বিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

হত্যাকাণ্ড

বনবিহারী সোজা সুবর্ণপুরে গেল। সেখানে তাহার পঁহুছিতে রাত্রি হইল। রাত্রি দশটার সময় ত্রিলোচনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেল।

বনবিহারী আসিতেছে কার্ত্তিক দেখিতে পাইল। সে বনবিহারীর সম্মুখে গেল না, তাহার সহিত বাক্যালাপ করিল না, কিন্তু তাহাকে দেখিয়া কার্ত্তিকের মনে কেমন একটা শঙ্কা হইল। বনবিহারী কেন যে ত্রিলোচনের কাছে আসিত কার্ত্তিক তাহা কতক কতক বুঝিতে পারিয়াছিল। শ্যামাচরণের সঙ্গে বনবিহারী কোন প্রকারে লিপ্ত ছিল। করুণাময়ীকে দেখিয়া পর্য্যন্ত কার্ত্তিকের স্থিরবিশ্বাস হইয়াছিল যে, শীঘ্রই একটা বড় গোল বাধিবে এবং ত্রিলোচন বিপদে পড়িবেন। এমন সময় বনবিহারী আসে কেন?

বৈঠকখানায় বনবিহারী প্রবেশ করিতেই কার্ত্তিক সেই ঘরের পিছনে একটা জানালার গোড়ায় গিয়া দাঁড়াইল। জানালা ভেজান ছিল, একেবারে বন্ধ ছিল না। কার্ত্তিক হাত দিয়া জানালা ঈষৎ মুক্ত করিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল। সেখান হইতে ঘরের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়, কথাও শুনিতে পাওয়া যায়।

তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া ছিলেন। বনবিহারী তক্তপোষের পাশে বসিল। ত্রিলোচন বলিলেন—তুমি যে বড় এমন সময়ে এলে?

বনবিহারী রুক্ষভাবে কহিল—এখন আবার সময় অসময় কি? সব কথা ত প্রকাশ হয়ে পড়েছে। যখন আমাদের ধরবে তখন কি সময় বুঝে ধরবে, বুঝলেন কি-না।

—তুমি নিজের কথা বল। আমাদের কথা বলচ কেন? তোমার সঙ্গে আমার কি?

—বটে, মশায় কিছু জানেন না। শ্যামাচরণ আর আমার বড় মাথাব্যথা পড়েছিল, তাই আমরা এ কাজে হাত দিয়েছিলাম, কেমন? শ্যামাচরণ অক্কা পেয়েচে, বুঝলেন কি-না?

—তা জানি। তুমি কেমন ক'রে জানলে?

—কলকাতায় গিয়ে। এখানকার চৌধুরাণী কোথায় আছেন, জানেন? সে বড় শক্ত জায়গা, বুঝলেন কি-না?

—কোথায় শুনি?

—সে বাড়ি আপনি বিলক্ষণ জানেন, একজন মেয়েমানুষকে সঙ্গে ক'রে চৌধুরাণী ঠাকরুণকে লুকিয়ে আনতে গিয়েছিলেন। রঘুনাথপুরের হরিনাথ রায়ের নাম শুনেছেন? তার বাড়ি, বুঝলেন কি-না? তিনি নিজে সাত দেশ ঘুরে সব সন্ধান নিয়েচেন। দু-চার দিনের মধ্যেই হয়ত তারা এখানে আসবে।

বনবিহারীর কথা শুনিয়া ত্রিলোচনের অত্যন্ত সন্দেহ হইল। তাহার অসাধ্য কিছুই নাই, বিশেষ আত্মরক্ষার জন্য কে কি না করিতে পারে? বনবিহারীর মুখ একেবারে বন্ধ করিবার উপায় ত্রিলোচন চিন্তা করিতেছিলেন, তাঁহাকে ফাঁসাইয়া দিয়া বনবিহারী যে নিজে রক্ষা পাইবার উপায় করিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি? ত্রিলোচন বুঝিলেন, বিপদ একদিক দিয়া আসে না। জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি হরিনাথ রায়ের বাড়ি গিয়েছিলে?

—তা যেতে দোষ কি, বুঝলেন কি-না? শ্যামাচরণ নেই, সে কিছু ব'লেও যায় নি। আমায় কে কি করবে?

—আপনার কথা বলছিলেন। ধরা পড়লে আপনি পড়বেন, বুঝলেন কি-না?

—আর তুমি?

—আমি কি জানি? চৌধুরাণী আপনার মনিব, আপনি তাঁর বিষয় হাত করতে চান। তাঁর কোন অনিষ্ট ক'রে আমার কি লাভ, বুঝলেন কি-না?

ত্রিলোচন বনবিহারীকে চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার মনের ভাব হয়ত বনবিহারী বুঝিতে পারিয়াছিল, সেও তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল। ত্রিলোচন বলিলেন—আমাকে কি করতে বল?

—আপনার পক্ষে এখন গা ঢাকা দেওয়াই ভাল, বুঝলেন কি-না? আপনাকে না পেলে তারা কি করবে?

—তাহলে আমার দোষ নিজেই স্বীকার করা হয়। ঘরবাড়ি ফেলে আমি কোথায় পালাব?

—না পালালে আপনার নিস্তার নেই, বুঝলেন কি-না? ওরা আপনাকেই চায়।

—আমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই, আমাকে তেমন বোকা পাও নি। ধরবে তোমাকে।

—আপনি সেয়ানা আর আমি বড় বোকা, না? নিজের প্রাণের মায়া সকলেরই আছে, বুঝলেন কি-না? আমার রক্ষে পাবার পথ আমি পরিষ্কার ক'রে রেখেচি।

—পালিয়ে যাবে?

—আমি পালাতে গেলাম কেন? যা জানি তাই বলব। আদালতে ত আর মিথ্যা কথা বলা যায় না, বুঝলেন কি-না?

—তুমি সাক্ষ্য দিয়ে আমাকে জড়াবে? হরিনাথ রায়কে কি তাই বলেচ?

—ঐ রকম একটা কিছু। তবে এক কথায় আমি রাজি আছি। আমাকে ওরা খুঁজে না পেলে আমাকে সাক্ষী ডাকবে কেমন ক'রে? আমাকে পাওয়া ত চাই, বুঝলেন কি-না?

—বেশ ত তুমি সরে পড় না কেন?

—সেটা ত আর শুধু হাতে হয় না, বুঝলেন কি-না? পাঁচ হাজার টাকা আমাকে দিন, তার পর আমাকে আর কেউ দেখতে পাবে না।

—আমার কাছ থেকে এত টাকা নিয়েও তুমি আমার বিপক্ষে সাক্ষী দিতে তৈয়ার। এখন আমার কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে, হরিনাথ রায়ের কাছ থেকে আর কিছু টাকা খেয়ে আমাকে ধরিয়ে দেবে। এটুকু আমি আর বুঝতে পারি নে?

—আমাকে অবিশ্বাস করলে কোন ফল হবে না, বুঝলেন কি-না? হরিনাথ রায় আমাকে টাকা দেবে না, ভয় দেখিয়েচে।

—সে একই কথা। তোমার মুখ বন্ধ করা দরকার। শ্যামাচরণ আর কিছু বলবে না, তোমাকেও আর কিছু বলতে হবে না।

তাকিয়া ঠেসান ছাড়িয়া ত্রিলোচন উঠিয়া বসিয়াছিলেন। তাকিয়ার নীচে ভরা পিস্তল ছিল। ত্রিলোচন চকিতের ন্যায় পিস্তল বাহির করিলেন।

বনবিহারী ত্রিলোচনের অপেক্ষা বলবান ও ক্ষিপ্রহস্ত। সে এক লম্ফে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বামহস্ত দিয়া পিস্তলসুদ্ধ ত্রিলোচনের হস্ত মুচড়াইয়া ধরিল। সেই সঙ্গে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কটিদেশ হইতে ছুরি বাহির করিয়া ত্রিলোচনের বক্ষ বিদ্ধ করিল। ত্রিলোচনের মুখ দিয়া কোন শব্দ বাহির হইল না, হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইয়া তাকিয়ার উপর পড়িয়া গেলেন।

পলকের মধ্যে এই ঘটনা ঘটিল। কার্ত্তিক এক মুহূর্ত্ত বাক্যশূন্য হইল, তাহার পর চীৎকার করিয়া উঠিল, ওরে বাবাকে খুন করলে!

রক্তমাখা ছুরি হস্তে বনবিহারী বেগে বাহির হইয়া পলায়ন করিল। কার্ত্তিকের চীৎকার শুনিয়া দরোয়ানেরা লাঠি হাতে ছুটিয়া আসিল। বনবিহারীর পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া একজন তাহার হাতে লাঠির ঘা মারিল। ছুরি বনবিহারীর হাত হইতে পড়িয়া গেল। আর একজন তাহার পায়ে লাঠি মারিতেই সে পড়িয়া গেল। তখনি তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল।

ত্রিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

মিলন

বৈঠকখানার ঘরে বসিয়া গঙ্গাধর ও হরিনাথের কথোপকথন হইতেছিল। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, ঘরে

বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছে। হরিনাথ বসিয়া একখানা পুস্তকের পৃষ্ঠা উল্টাইতেছিল, তাহার নিকটে বসিয়া গঙ্গাধর তাহাকে দেখিতেছিল।

গঙ্গাধর বলিল—আমাদের ঘোরা সফল হয়েচে। স্বাগতা কে আমরা জানতে পেরেচি, সেও বেশ সেরে উঠেচে। এখন তুমি কি করবে?

হরিনাথ কিছু বিমর্ষ ভাবে বলিল—কি আর করব! ওঁকে সুবর্ণপুরে নিয়ে গিয়ে ওঁর সম্পত্তি ওঁকে দেওয়াব।

—সে ত সোজা কথা। ত্রিলোচন কিংবা আর কেউ কোন বাধা দেবে না। তোমার আর কোন অভিপ্রায় নেই?

ত্রিলোচনের মৃত্যুসংবাদ তখনও তাহারা পায় নাই। দুই এক দিনের মধ্যে সুবর্ণপুরে লোক পাঠাইবার কথা।

হরিনাথ বলিল—স্বাগতাকে যখন বিয়ে করতে চেয়েছিলাম ওর বিষয় কিছু জানতাম না। এখন লোকে বলবে ওর টাকার লোভে ওকে বিয়ে করচি।

স্মিতমুখে গঙ্গাধর বলিল—তুমি কি টাকার কাঙাল? তোমার ত নিজের যথেষ্ট সম্পত্তি আছে। লোকে কি বলে-না-বলে তাতে তোমার কি এসে যায়? আমি আপত্তি করেছিলাম স্বাগতার স্মৃতি লুপ্ত হয়েছিল ব'লে, আর ও সধবা কি বিধবা আমরা কিছুই জানতাম না। এখন আর কোন আপত্তি নেই। ও বিধবা, তোমারও পত্নী নেই, তোমাদের দুই জনের মত হ'লে বিবাহে আর কোন বাধা নেই।

—ওর মত আছে কি-না কি ক'রে জানা যাবে?

—মত আবার কেমন ক'রে জানা যায়, জিজ্ঞাসা ক'রে।

—আমার জিজ্ঞাসা করতে সঙ্কোচ বোধ হয়, কেন-না, স্বাগতা মনে করতে পারে আমি তার যৎসামান্য উপকার করেচি তারই প্রতিদান চাই।

—ওরূপ সংশয়ের কোন কারণ নেই। তুমি একবার বিবাহের প্রস্তাব করেছিলে তাতে ত স্বাগতা কোন আপত্তি করে নি।

—তখন তার মনের স্থিরতা ছিল না।

—এখন ত হয়েচে। এখন তার সব মনে পড়েচে। তুমি যা বলেছিলে তাও মনে পড়েচে।

—তুমি কেমন ক'রে জানলে?

—তাও বলতে হবে? তুমি না-হয় একবার জিজ্ঞাসা করে দেখ না?

হরিনাথ চুপ করিয়া রহিল। গঙ্গাধর বলিল—তোমার চোকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলে তুমি দেখতে পাও না? প্রভার সঙ্গে স্বাগতার কথা হয়েচে বুঝতে পারচ না?

গঙ্গাধর উঠিয়া গেল। আশা ও আনন্দে হরিনাথের হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। অল্পক্ষণ পরে হরিনাথ বাড়ির ভিতর গেল। একটা ঘরে স্বাগতা ও প্রভাবতী বসিয়াছিল। হরিনাথকে দেখিয়া প্রভাবতী উঠিয়া গেল। হরিনাথ স্বাগতার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

কিছুক্ষণ দুইজনে নীরবে রহিল। তাহার পর হরিনাথ কহিল—তোমাকে একটা কথা বলতে এসেচি।

প্রথম প্রথম হরিনাথ স্বাগতাকে 'তুমি' বলিয়া কথা কহিত। সে আরোগ্য লাভ করিলে পর 'আপনি' বলিত, এখন আবার 'তুমি' বলিয়া সম্ভাষণ করিল।

স্বাগতা মাথা তুলিয়া একবার হরিনাথকে দেখিল। আবার মস্তক নত করিয়া বলিল—কি কথা?

তুমি যখন এখানে প্রথম এসেছিলে, আগেকার কোন কথা মনে ছিল না তখন তোমাকে একটা কথা বলেছিলাম, তোমার মনে পড়ে?

প্রভাত-সূর্য্যের লোহিত রাগের ন্যায় স্বাগতার মুখ-মণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করিল। অতি ক্ষীণ নিঃশ্বাস-ত্যাগের ন্যায় মৃদু স্বরে কহিল—পড়ে।

হরিনাথ স্বাগতার পাশে বসিল। তাহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিল—আমার কথার কি উত্তর দেবে?

হরিনাথের হস্তের ভিতর স্বাগতার হস্ত কম্পিত হইতেছিল। কহিল—কি উত্তর দেব? আমার কপালে যা ছিল তা ত হয়ে গিয়েচে।

হরিনাথ স্বাগতার চিবুকে হাত দিয়া তাহার মুখ তুলিয়া ধরিল। মুখে সেই রক্তিম রাগ, সরোবরে পদ্মের ন্যায় চক্ষু ঢল ঢল করিতেছে। হরিনাথ কহিল—আমাদের বিবাহে কোন দোষ নেই, শুধু তোমার সম্মতির অপেক্ষা। লোকে বলতে পারে তোমার

সম্পত্তি পাবার জন্ত তোমাকে বিয়ে করেচি। তা বলে বলুক। আমি যখন তোমাকে বিয়ে করতে চাই সে সময় তোমার সম্পত্তির বিষয় কিছু জানতাম না।

স্বাগতা হরিনাথের হস্ত চাপিয়া ধরিল। কহিল—সম্পত্তি আমার চাইনে, যারা নিয়েচে তাদের থাক।

এই কয়টি কথায় স্বাগতা আত্মসমর্পণ করিল। হরিনাথ তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিল। স্বাগতা মৃণাল বাহু দ্বারা হরিনাথকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার কণ্ঠলগ্ন হইল।

কেহ আর কোন কথা কহিল না। কিছুক্ষণ অতীত হইলে স্বাগতা হরিনাথের বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হরিনাথ তাহার হাত ধরিয়া ঘরের বাহিরে আসিল।

বাহিরে দাঁড়াইয়া গঙ্গাধর ও প্রভাবতী। দুই জনের মুখে হাসি। প্রভাবতী বলিল—এইবার আমার ঘটকালির পাওনা!

স্বাগতা হরিনাথের হাত ছাড়িয়া দিয়া প্রভাবতীর বক্ষে মুখ লুকাইল।

চতুঃপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

আবার সুবর্ণপুরে

গঙ্গাধর সুবর্ণপুরে গিয়া সকল সংবাদ জানিল। কার্ত্তিক তাহার কাছে কাঁদিতে লাগিল। গঙ্গাধর তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া স্বাগতা ও হরিনাথকে সকল কথা বলিল। হরিনাথ বলিল—আমাদের আর কিছু করবার নেই। ত্রিলোচন, বনবিহারী ও শ্যামাচরণ, তাদের দুষ্কৃতির ফল পেয়েচে।

স্বাগতা বলিল—ত্রিলোচনের পরিবারের যাতে কষ্ট না হয় আমি তার উপায় করব।

স্বাগতার সম্পত্তি ফিরিয়া পাইতে বিলম্ব হইল না। তাহাকে দেখিয়াই শৈলবালা বিষয় ছাড়িয়া দিলেন। স্বাগতা বলিল—সুবালার ভাল বিয়ে দেবার আমি সব বন্দোবস্ত ক'রে দেব। অশ্রুমুখী রমাসুন্দরীকে বলিল—যা হয়ে গিয়েচে তার ত কোন উপায় নেই, তবে কার্ত্তিককে আমি নায়েব-দেওয়ান করে দেব, তোমাদের সাংসারিক কোন কষ্ট হবে না।

কামিনী প্রথমে বড় ভয় পাইয়াছিল, কিন্তু স্বাগতা কিছু করিল না দেখিয়া সে নিজের ঘরে বাস করিতে লাগিল।

স্বাগতার অনুরোধে হরিনাথ, গঙ্গাধর ও প্রভাবতী তিন জনই সুবর্ণপুরে আসিয়াছিল। প্রভাবতী দেখিল স্বাগতার অতুল সম্পত্তি, পুরুষানুক্রমে রাশি রাশি বহুমূল্য অলঙ্কার সঞ্চিত হইয়াছে। প্রভাবতীর কোন আপত্তি না শুনিয়া স্বাগতা তাহাকে আপাদমস্তক হীরামুক্তার অলঙ্কারে সাজাইয়া দিল। বলিল—এ গহনা তোমাকে আমি দিলাম। আমি তোমার বড় বোন, নিতে কোন দোষ নেই।

হরিনাথ ও গঙ্গাধর নানা আভরণধারিণী হর্ষলজ্জাবনত-মুখী প্রভাবতীকে দেখিল। গঙ্গাধর কৌতুক করিয়া প্রভাবতীকে বলিল—কেমন, ঘটকালি কেমন পেয়েচ? এর পর আর মাটিতে পা পড়বে না!

প্রভাবতী বড় মুখরা, বলিল—এ পাওনা কনের পক্ষ থেকে।

স্বাগতা প্রভাবতীর গালে ঠোনা মারিল। হরিনাথ বলিল—ঠিক কথা, বরের তরফ থেকেও একজুট গহনা পাবে।

স্বাগতা বলিল—গঙ্গাধরবাবু, আমার একটি কথা আপনাকে রাখতে হবে, আমি কোন ওজর শুনব না। আমার বিষয় দেখবার লোক নেই, আপনাকে সে ভার নিতে হবে।

হরিনাথ বলিল—দুই সম্পত্তি এখন এক হবে, গঙ্গাধরকে আমার জমিদারীও দেখতে হবে। কোন আপত্তি করলে আমাদের মুখ-দেখাদেখি বন্ধ হবে। গঙ্গাধরকে একঘরে করব, ওর ধোপা নাপিত বন্ধ করব। আমাদের বিয়েতে শুধু প্রভাবতীর নিমন্ত্রণ হবে, ওকে বাদ দেওয়া যাবে।

সকলে হাসিতে লাগিল। গঙ্গাধর বলিল—অত ক'রে শাসাতে হবে না, আমাকে যা হুকুম করবে তাই করব।

পঞ্চপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

সমাপ্তি

কলিকাতায় হরিনাথ ও স্বাগতার বিবাহ হইল। উভয়ের ইচ্ছানুরূপ বিবাহে কোন প্রকার সমারোহ হইল না, কাহাকেও নিমন্ত্রণ করা হইল না। বাড়ির লোকের মধ্যে গঙ্গাধর, প্রভাবতী ও সুলোচনা। স্বাগতা সুস্থ হইলে এবং তাহার বিবাহ স্থির হইলে সুলোচনা চলিয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু স্বাগতা তাহাকে ছাড়ে নাই। সম্পত্তি ফিরিয়া পাইয়া তাঁহার মাসোহারা করিয়া দিয়াছিল, সুবর্ণপুরে মেয়েদের স্কুল করিয়া তাঁহাকে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিবে স্থির করিয়াছিল।

দুইটা জমিদারীর ভার গ্রহণ করিয়া গঙ্গাধরকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতে হইত। কখনও সুবর্ণপুরে, কখনও হরিনাথের গ্রামে, কখনও জমিদারী-মহলে কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইত। হরিনাথ ও স্বাগতা কলিকাতাতেই অধিক সময় অতিবাহিত করিত, মাঝে মাঝে সুবর্ণপুরে ও হরিনাথের

বিবাহের তিন বৎসর পরে একদিন হরিনাথ ও স্বাগতা গঙ্গাধরের গৃহে গিয়াছে, সঙ্গে দুই বৎসরের পুত্র। ছেলের নাম হরিনাথ রাখিয়াছিল মহেশ্বর। মহেশ্বর দেখিতে মায়ের মতন, গৌরকান্তি নধর গড়ন। কচি মুখে সর্ব্বদাই হাসি, ছোট ছোট মুক্তার ন্যায় কয়েকটি দাঁত দেখা যায়।

হরিনাথ গঙ্গাধরের পাশে বসিল, প্রভাবতী স্বাগতার হাত ধরিয়া একটা চেয়ারে বসাইয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল। মহেশ্বর মাতার অঞ্চল ধরিয়া ছিল।

স্বাগতা জিজ্ঞাসা করিল—খোকা তুমি কার ছেলে?

মহেশ্বর মায়ের আঁচল ছাড়িয়া প্রভাবতীর কোলে উঠিল। কচি কচি গোলগাল হাত দুখানি দিয়া প্রভাবতীর কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া, তাহার স্কন্ধের পাশ হইতে উঁকি মারিয়া বলিল—আমি মাসীমার ছেলে।

সমাপ্ত

শবরীর প্রতীক্ষা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

পম্পাসরোবরতীরে সূর্য্যদেব অস্ত যান ধীরে,
বুলায়ে আরক্তকর ক্লান্ত তপ্ত ধরণীর শিরে
শান্তির আশীষে ভরা। ধূসর তরল অন্ধকারে
ছেয়ে আসে জল-স্থল-অন্তরীক্ষ অস্পষ্ট আকারে।
চাহিয়া ঈর্ষার দৃষ্টি স্ফুটমান কুমুদের পানে
পরিপাণ্ডু পদ্মদল মুদে আঁখি রুদ্ধ অভিমানে।
তীরাবৃত শৈবালের শ্যামায়িত স্বচ্ছ অবকাশে
হংসকারণ্ডবদলে বিশ্রামের সাড়া পড়ে' আসে
আতৃপ্ত গদ্গদকণ্ঠে, বিধুনিত সিক্ত পক্ষপুটে;
শষ্পগন্ধে ঝিল্লিছন্দে সন্ধ্যাকাশ পূর্ণ হয়ে উঠে।

মতঙ্গের তপোবনে সান্ধ্য হোম হয়ে এল শেষ
উদাত্ত গম্ভীর মন্ত্রে। ধীরে করি নয়ন উন্মেষ
উঠিলা তপস্বীবর মন্দ পদে ছাড়ি দর্ভাসন,
যেথা দ্বার-প্রান্তদেশে নতজানু মুদ্রিত নয়ন
বসিয়া শ্রমণীবালা যুক্তকরে মৃত্তিকার 'পর;
কহিলা উদার কণ্ঠে—বৎসে, আজি লব অবসর
এবারের জীবজন্মে, ত্যাজ' দেহ সমাধি-আসনে।
ইহজগতের চিন্তা কিছু আর নাহি আজ মনে
তোমার মঙ্গল ছাড়া; অনাথিনী শবরকুমারী
আশ্রিত আশ্রমে মোর, জানি তুমি সত্যের ভিখারী
(ঈষৎ থামিয়া)…কি ভাবিছ মৌন মুখে?

শবরী।…কি ভাবিব ? কিবা আছে আর ?
প্রভু, পিতা, এ জগতে কি আমার আছে বা চিন্তার !
সবই সুবিজ্ঞাত তব—চিন্তা, চেষ্টা, স্মরণ, মনন,—
যেদিন ও পাদপদ্মে পতিতেরে দিয়াছ শরণ
আপনার কন্যা বলি', ইষ্টমন্ত্র সঁপি, তার কাণে ;
আজন্ম দুর্ভাগা এই গৃহহীন অনাথা সন্তানে
পালিয়াছ শিষ্যারূপে পবিত্র এ তপোবনবাসে।
…এক প্রশ্ন, তবু দেব, আজ্ঞা কর, মনে যাহা আসে,
কোন্ অপরাধে, প্রভু, অপরাধী আজি ও চরণে,
হেন দুঃসহবাণী যার লাগি' শুনিনু শ্রবণে—
মৃত্যুসম গণি যাহা !

মতঙ্গ।…অপরাধ ? নহে অপরাধ !
শান্ত হও, বৎসে, তুমি। অনর্থক না গণ প্রমাদ
যথার্থ এ উক্তি শুনি'। চিত্ত তব পবিত্র নির্ম্মল
সর্ব্বদোষলেশহীন। তথাপি এ সঙ্কল্প নিশ্চল—
ত্যজিব এ দেহবাস আপনারই অভিপ্রায়ক্রমে।
বারম্বার বলিয়াছি,—মৃত্যুরে ভেব না শেষ ভ্রমে।
অনিত্য এ দেহমায়া। তোমারে জানাই আশীর্ব্বাদ—
পূর্ণ হোক্ ইষ্ট তব, সিদ্ধ হোক্ সাধনার সাধ।
সত্যের প্রতীক্ষা কর জীবনের অনুভূতিমাঝে
নিষ্ঠায় বাঁধিয়া বক্ষ।

শবরী।…পিতা, পিতা, কিছু জানি না যে !
কে দিবে আমারে স্থান ? কোথা যাব ছাড়ি' তপোবন ?

মতঙ্গ। বৎসে, এ আশ্রমভূমি তোমারে করিনু সমর্পণ ;
আজি হ'তে সর্ব্বকার্য্যে তোমারে সঁপিনু অধিকার,
যোগ্য হস্তে শুদ্ধচিত্তে যদি তুমি পাল এই ভার,
ধরি' তব সিদ্ধিরূপ মর্ত্তে যিনি মূর্ত্ত নারায়ণ,
সেই রামচন্দ্র তব আশ্রমে দিবেন দরশন :
স্পর্শে যাঁর সঞ্জীবিত অভিশপ্ত অহল্যার প্রাণ,
অস্পৃশ্য নিষাদে যিনি সখ্যে বাঁধি' বক্ষে দেন স্থান,
অরণ্যের শাখামৃগ যাঁর প্রেমে বন্ধু প্রিয়তম,—
সেই রামচন্দ্র হেথা আসিবেন, শুন বাক্য মম ;
প্রতীক্ষা করহ তাঁর। …শিবমস্তু, আসন্ন সময়।
(ধীরপদে অন্তর্দ্ধান)

শবরী। পিতা, পিতা !
(ভূমিতে অবলুণ্ঠিত প্রণাম ও উত্থান)
… … …রামচন্দ্র, রামচন্দ্র ! সেই দয়াময়
আসিবেন এ আশ্রমে ? হেন ভাগ্য কবে হবে তার ?
সাক্ষাৎ মিলিবে চক্ষে মর্ত্ত্যরূপে জগৎপিতার !
…শান্ত হ' সন্দিগ্ধ মন ! মিথ্যা নহে মতঙ্গের বাণী,
সত্যদ্রষ্টা ঋষিকণ্ঠ অসত্য না কহে কভু জানি।
—কি করিব ? কোথা যাব ? কি দিয়ে তুষিব দেবতারে ?
কোন্ পথে, কোথা হ'তে, কেমনে সাক্ষাৎ পাব তাঁরে ?
কি ফুলে গাঁথিব মালা ? কোন্ বর্ণ মানাইবে ভালো
নবদূর্ব্বাদল দেহে ? নিবে যদি দিবসের আলো,—
সন্ধ্যায় আসেন যদি ? হেরিতে সে বরমূর্ত্তিখানি
কোন দীপ জ্বালি' লব ? কালো হাতে কোন্ অর্ঘ্য আনি'
কোথায় বসাব তাঁরে ? কি বলিয়া করিব আহ্বান ?
পাদস্পর্শ করিব কি ? অস্পৃশ্যা যে ! তিনি ভগবান !
কি ফল লাগিবে মিষ্ট ঐ মুখে ? মহারাজ তিনি
ধরণীর শ্রেষ্ঠ বংশে,—ভোগ্য তাঁর চক্ষে নাহি চিনি !
—পিতা, পিতা, এ কি ভার দিয়ে গেলে অক্ষমার হাতে ?
আমি যে অযোগ্যা তার, কাঁপে চিত্ত সন্দেহ-দোলাতে !

দিনে-দিনে দিন যায়, দিন যায়, রাত্রি যায় চলি' ;
মাসে-মাসে বর্ষ যায়, বর্ষ যায় ; আশার অঞ্জলি
শুকাইয়া উঠে হাতে—বেদনায়, ব্যর্থ প্রতীক্ষায় !
কৈশোর যৌবন ক্রমে, ভরে দেহ পূর্ণ সুষমায়
অজ্ঞাতে অনবধানে। দিন যায় ! রঘুপতি রাম—
কই তিনি ? কোথা তিনি ? হায় দরিদ্রের মনস্কাম !

লতায় ফুটিল ফুল—স্তরে স্তরে, স্তবকে স্তবকে ;
পরিপুষ্ট তরুশাখা কদলে কাঞ্চনে কুরুবকে—
পূজার্থী প্রতিমা যেন। প্রতীক্ষায় কাটে দীর্ঘ দিন।
হৃদয়নয়নানন্দ কবে আসি' হবেন আসীন
অতর্কিত অবসরে ! অনাদরে যদি যান চলি',
মতঙ্গের তপোবনে অভ্যর্থনা মিলিল না বলি'—
অক্ষমার অপরাধে অবহেলা ভাবি' মনে মনে ;
ছি ছি ! মরি সে লজ্জায়, শিহরি সে ভ্রষ্ট আচরণে।

অপেক্ষার একাগ্রতা উগ্রতর করি' তাই চোখে
বনবীথিতলেতলে ফিরে বালা মুগ্ধ দিবালোকে
উচ্চকিত অনুক্ষণ ; তপস্যার কাল বয়ে যায় ;
আসিয়া থাকেন যদি অন্যপথে, ভাবিয়া ত্বরায়—
আবার আশ্রমে আসে ! শয্যা রচি' কুসুমে-পল্লবে
যাপে দীর্ঘ বিভাবরী পথ চেয়ে বাঞ্ছিত বল্লভে !
কোথায় সে সীতাপতি, মূর্ত্তিমান অখিলের স্বামী ?
অপেক্ষায় কাটে দিন ; অন্ধকার চক্ষে আসি নামি'।
রামচন্দ্রহীন রাত্রি ঘন হয়ে ঘিরে তপোবনে,
নিশি-জাগরণ-মসী আঁকি' ও কলঙ্কী নয়নে !

দিন যায়, রাত্রি যায় ; দিনে-রাত্রে মাস যায় ঘুরে',
মাসে-মাসে বর্ষ যায়, বর্ষে-বর্ষে যুগ আসে পূরে' ;—
রাঘবের নাহি দেখা, আশ্রমে সে পদ নাহি পড়ে ;
আবর্ত্তিত কালচক্র ! শিশিরে বসন্তকান্তি ঝরে !

পুষ্পহীন লতামঞ্চ, পক্বফলে আনত বিতান,
শিথিল বন্ধনমূল, শ্রীহীন মালঞ্চ ম্রিয়মাণ ;
খসে পড়ে জীর্ণ পত্র, বিগলিত লোল গ্রন্থিজাল,
বার্দ্ধক্যের নামাবলী সর্ব্বাঙ্গে পরায় মহাকাল !
ব্যর্থতায় ভগ্নদেহ, দীপ্ত দৃষ্টি আচ্ছন্ন নয়নে,
আশ্রম-কুটীরপ্রান্তে শবরী তথাপি একমনে,—
দৃষ্টি মেলি' পথপানে,—কখন সে আসিবেন রাম ;
জরায় চরণ পঙ্গু,—মুখে শুধু জপে তাই নাম !

সুসজ্জিত পাদ্য অর্ঘ্য, সুবিন্যস্ত ফলমূলথারি,
নারিকেলপাত্রপূর্ণ সমাহৃত সরোবর-বারি !

দিন রাত্রি, রাত্রি দিন—জাগরণে অথবা তন্দ্রায়—
কোন্ মুগ্ধক্ষণে যদি রামচন্দ্র এসে ফিরে' যায়
মন্দ পদে ! মন্ত্রদ্রষ্টা মতঙ্গের বাণী অতর্কিত,
শুভ আগমন তাঁর ঘটিবেই, জানি যে নিশ্চিত ;-
কিন্তু যদি প্রাণ যায় ! রাম, রাম, কৌশল্যানন্দন
দ্রুততর চলে জপ—এস এস থাকিতে জীবন
অবসন্ন দীর্ণ দেহ, অবশ অঙ্গুলি নাহি চলে,
রাত্রি ভোর হয়ে আসে, হাসে উষা উদয় অচলে।
সূর্য্যবংশ-অবতংশ এস এস সর্ব্বগুণাধার,
এস হে করুণ-কান্ত—এ পতিতে করহ উদ্ধার।

পম্পা সরোবরতীরে হাসে রবি কমললোচনে,
আপনারই গোত্রমাঝে প্রমূর্ত্ত হেরিয়া নারায়ণে।
—কার ঐ পদধ্বনি ? কে আসে রে ? আসে
নাকি রাম
চরণ চলিতে নারে,—ঘন ঘন জপে আরো না
নাসায় পশিছে গন্ধ—পদ্ম কি ফুটিল দূর্ব্বাদলে ?
—কই, কোথা প্রাণারাম ? রুদ্ধ দৃষ্টি নয়নের জলে !
রামচন্দ্র। (মন্দ পদে সম্মুখে আসিয়া)
এই তো এসেছি আমি ; কোথা তুমি শবরী সুন্দরী,-
কে বলে পতিতা তুমি ? তুমি মোর মর্ম্ম-সহচরী !
কৃতার্থ আজিকে আমি তোমার বাঞ্ছিত দরশনে ;
দৃষ্টি যার সত্যসন্ধী—তারেই তো খুঁজি ত্রিভুবনে

নামের আগে শ্রী লিখিবার নিয়ম

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, এম-এ

প্রাচীন ভারতের হিন্দু রাজারা কেহ কেহ পাথরের গায়ে অনুশাসন লেখাইতে গিয়া নিজেদের নাম গোত্র লিখিবার ভঙ্গীটিরও পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রিয়দর্শন অশোকের শিলালিপিই প্রাচীনতম। আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত তাঁহার কোন অনুশাসনেই তাঁহার নামের আগে 'শ্রী' লিখিবার নিদর্শন নাই। তার পরেই সমুদ্রগুপ্তের সংস্কৃত অনুশাসন উল্লেখযোগ্য। তাহাতেও অশেষ বিশেষণ-স্তূপের মধ্যেও রাজার নামোল্লেখের আগে 'শ্রী'র সন্ধান পাই না। ইহার আরও কিছুকাল পর মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে তাঁহার অধুনা-আবিষ্কৃত স্বাক্ষরের মধ্যে একটি 'শ্রী'র সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। তাহাতে আছে—"স্বহস্তো মম মহারাজাধিরাজ শ্রীহর্ষ।" কিন্তু মনে হয় ইহা মূল নামেরই অন্তর্ভুক্ত 'শ্রী', ; যেমন বাংলায় শ্রীকান্ত, শ্রীনাথ, শ্রীশ। রাজাদিগের নামের আগে তাহাদের অন্যান্য বিশেষণ থাকা সত্ত্বেও 'শ্রী'র অভাব দেখিয়া প্রথমদৃষ্টিতে মনে হইবে যে, এই রীতির উদ্ভব নিশ্চয়ই পরবর্ত্তী সময়ের, কিন্তু গুপ্ত-সম্রাটদিগেরই সমসাময়িক (৩২০-৫০০ খ্রীষ্টাব্দ) একটি শিলালিপির উল্লেখ করিব, তাহা হইতে তৎকালীন সম্ভ্রান্ত চরিত্রের নামোল্লেখের পূর্ব্বে 'শ্রী' ব্যবহার এক বিশেষ নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। শিলালিপিটি হাতিগুম্ফা বা খারবেলের শিলালিপি বলিয়া পরিচিত। ভুবনেশ্বরের নিকটবর্ত্তী উদয়গিরি নামক পাহাড়ের গায়ে ইহা পাওয়া গিয়াছে, কেহ কেহ ইহাকে মৌর্য্য-সম্রাটগণের আমলের বলিয়া মনে করেন। ইহা পুরাণ প্রাকৃত ভাষায় লেখা, সংস্কৃত অনুবাদ করিলে এই রকম দাঁড়াইবে,..."কলিঙ্গপতিনা শ্রীখারবেলেন।" এই গেল পূর্ব্ব-ভারতের কথা। পশ্চিম-ভারতের রাজপুতানায় কক্কুকের শিলালিপিতেও এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইহা যদিও কিছু পরবর্ত্তী কালের তথাপি শ্রী লেখার দৃষ্টান্তবাহুল্যে মনে হয় অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই প্রকার রীতি এদেশে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। কোন নামের পূর্ব্বে এই রীতির ব্যতিক্রম দেখি না, যথা, (অনূদিত)...শ্রী লক্ষ্মণ ইতি...শ্রীরাজ্যলঃ .. শ্রীভিল্লুকস্য...শ্রীকক্কঃ ইত্যাদি।

তারপর আমাদের বাংলার কথাই বলি। প্রাচীনতম বাংলা পুঁথিগুলিতে ভণিতায় কেহ শ্রী সহ নিজের নাম উল্লেখ করেন নাই। বাংলায় এই রীতি কোনদিনই ছিল না, কিন্তু পরে ইহা সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে। কারণ পাল-রাজগণের যে-সকল সংস্কৃত তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীবিগ্রহপাল, শ্রীদেবপাল এই প্রকার উল্লেখ দেখিতে পাই। বাংলায় সেন-রাজাদিগের আমলে সংস্কৃত ভাষার খুব চর্চ্চা ছিল। সেই সময়ে এই রীতি বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করে। বল্লালসেনের "দানসাগর" ও "অদ্ভুতসাগর" পুঁথিতে শ্রীবল্লাল এই প্রকার লিখিত আছে। লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেব গীতগোবিন্দের ভণিতা দিয়াছেন, "শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিত-মুদারম্।" কিংবা "শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি" ইত্যাদি। কিন্তু বাংলা ভাষার উপর সংস্কৃত প্রভাব বিশেষভাবে বিস্তৃত হইবার আগে কোন বাঙালী কবিই নিজের নামের আগে শ্রী লিখিয়া ভণিতা দেন নাই। তাঁহারা বড়-জোর নামের আগে জাতি বা পদবীটুকুর উল্লেখ করিতেন, যেমন, বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, দাস বৃন্দাবন, কবি কৃত্তিবাস, দ্বিজ ঘনরাম, ইত্যাদি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে মদ্ভাগবৎ পুরাণখানি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। তাহাতে প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত চরিত্রের পূর্ব্বে শ্রী এই সম্মানজ্ঞাপক উক্তিটি দেখিতে পাই; যেমন শ্রীশুক উবাচ ইত্যাদি। সেই হইতে বাংলার বৈষ্ণব-সাহিত্যে 'শ্রী' একটি বিশেষ সম্মান ও ভক্তিজ্ঞাপক পাঠ

ইয়া দাঁড়াইল। ইহা তখন আর শুধু ব্যক্তিজ্ঞাপক ছিল না, ক্রমে পবিত্র বস্তুজ্ঞাপক ও এমন কি বৈষ্ণবের ধর্মসংশ্লিষ্ট কতকগুলি স্থান-জ্ঞাপকও হইয়া উঠিল; যেমন, শ্রীনবদ্বীপ ধাম, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীপাট ইত্যাদি। বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থগুলিকেও শ্রী-শোভিত করিলেন, যেমন, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শ্রীমদ্ভাগবৎ, শ্রীগীতা; দেখাদেখি শাক্তরাও করিলেন শ্রীশ্রীচণ্ডী, শ্রীশ্রীমঙ্গলচণ্ডী ব্রতকথা, শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, শ্রীচণ্ডীমঙ্গল, ইত্যাদি। 'তৃণাদপি সুনীচেন" স্বভাব-বিনয়ী বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক কখনই নিজের নামের পূর্ব্বে শ্রী ব্যবহৃত হইত না। তাঁহারা সর্ব্বদা দাস কি দীন বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতেন, এবং মৃত কি জীবিত কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, বা কোন বস্তু, কি কোন স্থান প্রভৃতির নামের পূর্ব্বেই একমাত্র 'শ্রী' শব্দের ব্যবহার করিতেন; যেমন, চৈতন্য-চরিতামৃতের আধুনিক কোন সংস্করণে পাইতেছি, "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত · শ্রীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ (যদিচ তিনি বহুকাল পূর্ব্বেই স্বর্গীয় হইয়াছেন) গোস্বামী বিরচিত তারপর এই বৈষ্ণব ধর্ম্মগ্রন্থের ভূমিকাটি কতক তুলিয়া দেখাইতেছি, ইহা হইতেই শ্রী ব্যবহারের বৈষ্ণবী রীতি পাঠক কতক অনুমান করিতে পারিবেন,—যথা "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বৈষ্ণব-বৃন্দের···প্রাণের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর মধুর চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতেও শ্রীচৈতন্য-দেবের লোকপাবনী লীলা বিস্তৃত আছে বটে।··· এ যাবৎ এই শ্রীগ্রন্থের অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে···শ্রীমহাপ্রভুর ইচ্ছায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল······ইতি, শ্রীরথযাত্রা, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৯।" ইত্যাদি। এই ভাবে বৈষ্ণবগণ 'শ্রী'র ব্যবহার ক্রমশঃ বিস্তৃত করিয়া লইতে লাগিলেন। রাধা কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত চরিত্রের বর্ণনা-প্রসঙ্গে শ্রীমুখ, শ্রীপদ, শ্রীচরণকমল, শ্রীহস্ত, প্রভৃতিতে গৌরবে "শ্রী" ব্যবহৃত হইতে লাগিল। কিন্তু ইহার ব্যবহার আরও বিস্তৃত হইয়া ক্রমে দেবচরিত্রসম্পর্কশূন্য হইয়াও সম্ভ্রান্ত কোন বর্ণনা প্রসঙ্গে 'শ্রী' ব্যবহার আরম্ভ হইল। অর্থাৎ শ্রীমুখ বুঝাইতে তখন শুধু রাধাকৃষ্ণ কি চৈতন্যের মুখই বুঝাইত না, যে-কোন সুন্দরী রমণীর সুন্দর মুখও বুঝাইতে লাগিল। এই ভাব হইতেই শ্রীর ব্যবহারও ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত সমস্ত চরিত্রের নামের আগেই শ্রীর ব্যবহার দেখিয়া পরবর্ত্তী লেখকগণ মনে করিলেন যে, শ্রী ব্যতীত বুঝি কাহারও নামই সম্পূর্ণ নহে। বিনয়-অবিনয়ের প্রশ্ন তখন কাহারও মনেই আসে নাই, তাহা হইলে পরবর্ত্তী বাংলা সাহিত্যের অনেক লেখককেই শ্রীযুক্ত দেখিতাম না। কিন্তু মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী পর্য্যন্ত নিজেই ব্যবহার করিয়াছেন "শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে।" ইত্যাদি। অতএব বৈষ্ণব-সাহিত্যে শ্রী শব্দের বহুল ও পরবর্ত্তীকালে শিথিল প্রচার হইতে বৈষ্ণবপ্রভাবাচ্ছন্ন আধুনিক বাঙালার সমাজে নামের আগে 'শ্রী'র ব্যবহার একটা নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথমতঃ ইহা জীবিত ও মৃত ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে ব্যবহৃত হইত, কারণ বহু মৃত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উল্লেখেও বৈষ্ণবগণ ইহা ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু খুব অল্পকাল ধরিয়াই ইহা শুধু জীবিত ব্যক্তির জন্য সম্পূর্ণ পৃথকভাবে ব্যবহৃত হয়, ইহার কারণও খুবই সুস্পষ্ট।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও ইহার সাহিত্য যে-সমস্ত দেশে বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল, সেই দেশেই এই নিয়মের আজিও প্রচলন দেখিতে পাই। সেই জন্যই পশ্চিম-ভারতে এই নিয়মের তেমন প্রচার নাই। কিন্তু এই সম্পর্কে বাঙালীর প্রভাব আশেপাশের অনেক প্রদেশকেই মানিয়া লইতে হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ঔপন্যাসিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ই সর্ব্বপ্রথম নিজের স্বাক্ষর হইতে শ্রী উঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই বিষয়ে তাঁহার নিকট অনেক দিন আগে একবার জিজ্ঞাসু হইলে তিনি এই বিনয়-অবিনয়ের কথাই বলিলেন। রবীন্দ্রনাথও আজ এই যুক্তি হইতেই তাঁহার নাম স্বাক্ষর হইতে 'শ্রী'র ব্যবহার উঠাইয়া দিলেন। বস্তুতঃ নিজের নামের আগে নিজেই শ্রী লিখিয়া স্বজ্ঞানেই যে কেহ অবিনয় প্রকাশ করিতেন না তাহাও সত্য! আগেই বলিয়াছি যে, বৈষ্ণবী রীতির একটা

শিথিল প্রয়োগ হইতে দেশে এই একটা সংস্কার দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। আমরা গোড়ার সত্যটির সন্ধান পাইয়া আজ এক সংস্কারের মোহ হইতে বাঁচিলাম। ইহাতে কাহারও আপত্তির কোন কারণ থাকিতে পারে না। আর বিশেষ করিয়া বাঙালী মুসলমানগণ এই 'শ্রী'র বিড়ম্বনা হইতে বাঁচিয়া রক্ষাই পাইবেন; কারণ তাঁহাদের আরবী, পারসী নামের আগে শুদ্ধ সংস্কৃত 'শ্রী' কথাটি বড়ই বেমানান হইয়া দাঁড়ায়।

৮৫ নম্বরের বদ্‌লি

শ্রীনির্ম্মলকুমার রায়

আবার কাটিহার। কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে একদিন পরিপূর্ণ উৎসাহ লইয়া ছোটসাহেব রূপে আসিয়াছিলাম। তখন ষ্টেশন ছিল ছোট, অল্প কয়েকটি লাইনে ছোট গুটি-কয়েক ইঞ্জিন তীব্র চীৎকার করিয়া শাণ্টিং করিত; আর এবার দেখিলাম, বহু লাইন, বহু ইঞ্জিন, যাত্রীর অসম্ভব সমাগম।

ষ্টেশন ছাড়িয়া রাস্তা ধরিলাম, সেখানে কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই, সুর্‌কি ঢালা লাল রাস্তা বর্ষার জলে ভিজিয়া আরও লাল দেখাইতেছে। দেবদারু গাছে অপূর্ব্ব শ্যামলতা, কোণে কৃষ্ণচূড়া গাছটি ফুলন্ত মহিমায় উজ্জ্বল। বর্ষার আর্দ্রতার মধ্যে এই অগ্নিদীপ্তি কে সৃষ্টি করিল? ফাল্গুনের দিগন্তব্যাপী দাহে যখন চতুর্দ্দিক জ্বলিতে থাকে, শিমুল পলাশের তখন সার্থকতা আছে। কিন্তু আজ এই ভরপূর বর্ষায় সমস্ত প্রকৃতি শ্যামলতায় নবীন; সমস্ত দাহ, সমস্ত জ্বালা জুড়াইয়া গিয়াছে; ইহার মধ্যে এই লালের প্রাচুর্য্য কেন? বাংলোর অজনন্থিত কদম গাছ হইতে মদির গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। নিজস্ব রূপের মত বর্ষার একটি নিজস্ব গন্ধ আছে। কদম, কেয়া, বকুলে তাহার আত্মপ্রকাশ। এরা সকলেই যেন একটা আবেশের সৃষ্টি করে। ছিন্ন-কেশর কদমের মদির গন্ধ, ভূলুণ্ঠিত বকুলের মৃদু গন্ধ, লুক্কায়িত কেয়ার উগ্রগন্ধ আর্দ্রভূমি ও সরস তৃণপল্লবের গন্ধের সহিত মিলিয়া বর্ষার গন্ধ সৃষ্টি করে।

বর্ষার ম্লান অপরাহ্ণে যখন সমস্ত আকাশ সাদায় কালোয় মিলিয়া অসম্ভব গম্ভীর হইয়া থাকে, ধীর বাতাসে বৃক্ষের মৃদু পত্র সঞ্চালন শব্দ শোনা যায়, মন স্বভাবতই যাহা আছে তাহা ছাড়িয়া যাহা নাই তাহার জন্য আকুল হইয়া উঠে, এমন সময় কিছুতেই ক্লাবে বসিয়া ব্রিজ খেলিতে ইচ্ছা করে না; আবহাওয়ার খবরও আকাশে বাতাসে এত স্পষ্ট হইয়া থাকে যে সে আলোচনাও অনাবশ্যক মনে হয়; আর বড়সাহেবদের বদ্‌লির খবরও নীরস হইয়া উঠে।

ধীরে ধীরে সাহেবদের গোরস্থানের দিকে চলিলাম, এ স্থানটি আমার বড়ই প্রিয়। অনতিদূরের ষ্টেশনের অসংখ্য জনতা হইতে গোপন, নির্জ্জন স্থানটি মনোরম। ফটকের বাহিরে দুইটা প্রকাণ্ড ঝাউ গাছ; অল্প বাতাসেই শোঁ শোঁ শব্দ করিতেছে। জানি না ঝাউয়ের সঙ্গে গোরস্থানের কি সম্পর্ক; কিন্তু মৃদু বাতাস যখন কেশগুচ্ছসদৃশ পত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া শোঁ শোঁ শব্দের সৃষ্টি করে, দূর হইতে মনে হয় যেন কেহ বিলাপ করিতেছে। আমার আগের বারের বাংলোটি গোর-স্থানের কাছেই ছিল, কতদিন দ্বিপ্রহর নিশীথে উঠিয়া ঝাউয়ের এই করুণ আর্ত্তনাদ শুনিয়াছি, জীবিতের প্রতি মনোযোগ দিবার সময়ই আমাদের নাই, মৃত তো দূরের কথা।

ভিতরে পাতাবাহার ও বিলাতি ফার্ণ গাছের নীচে নীচে স্মৃতিফলক বহন করিয়া মৃতেরা শুইয়া আছে। কত জন্, কত স্মিথ, কত লুসি, কত অ্যাণ্ডি; কে

তাহাদের চেনে, বাঁয়ে সর্ব্বপ্রথম গার্ড রিজকুক। ৫২ বৎসর ৩ মাস ১৭ দিন বয়সে সে মারা গিয়াছে, বেচারীর ছেলেমেয়ে ছিল অনেকগুলি, তাহারা ও বিধবা স্ত্রী আশ্বাস দিয়াছে তাহারা তাহাকে ভুলে নাই। বুকের উপর যাহার অন্ততঃ এক টন মাটি, ছেলেমেয়ে আর বিধবা স্ত্রীর আশ্বাসে তাহার কি হইবে? তারপর পি. ডব্লিউ. আই. ডিউর স্ত্রী, প্রকাণ্ড ক্রশ এবং বেশ কারুকার্য্যশোভিত স্মৃতিফলক। ডিউ তাহাকে আশ্বাস দিতেছে, 'স্ত্রীকে ছাড়িয়া জীবন অন্ধকার মনে হইতেছে, তবে একমাত্র ভরসা যে স্বর্গলোকে গিয়া আবার তাহারা মিলিত হইবে'। আশা করি সেখানে বহু-বিবাহে বাধা নাই, কারণ ডিউকে জানি; সে এখন নূতন মিসেস ডিউকে লইয়া মহাসুখে আছে। একে একে সব দেখিতে লাগিলাম। ছোট, বড়, কাজ করা, শাদা—বহু রকম ফলক; কোনটি দামী মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত, সযত্নে বহু অক্ষর খোদাই করা; কোনটি-বা কোন সস্তা পাথরে করা, দু-চারটি অক্ষর, পড়া যায় না। ঘুরিতে ঘুরিতে নজর পড়িল,—

> "আমার একমাত্র কন্যা আইরিন্
> ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন
> বয়স ৬ বৎসর, ৭ মাস ৩ দিন।
> 'তুমিই দিয়াছিলে তুমিই নিলে'।"

ভগবান দিলই বা কেন আর নিলই বা কেন? বেচারী টিকিট কালেক্টরের কন্যা। ভগবানের ইচ্ছা তো পূর্ণ হইল, কিন্তু আঁতুড়ঘর, পেরাম্বুলেটর, ফুড, দুধ ইত্যাদির খরচ জোগায় কে? জামাকাপড়, চিকিৎসা এবং সর্ব্বশেষে এই মর্ম্মরফলকের ভারই-বা কে বহন করে?

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছিল, দেয়াল দিয়া ঘেরা গোরস্থান এখন প্রায় ভরিয়া উঠিয়াছে, খালি জায়গায়ও হয়ত অনেকে শুইয়া আছে; তাহাদের কবরের চিহ্ন নাই, জননী পৃথিবীর আয়তন নির্দ্দিষ্ট; বাড়াইবার উপায় নাই, কিন্তু সন্তান তাহার বাড়িতেছে, কত কোটি মরিয়াছে আরও কত কোটি মরিবে, কিন্তু মৃতদের জায়গা কোথায়? আজ জীবিতদেরই স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না, মারামারি কাটাকাটি করিয়া তাহারা মরিতেছে। এক একজন মরিয়াও যে অনন্তকাল ধরিয়া পাঁচ-সাত বর্গ ফুট জায়গা ভোগ করিবে তাহার উপায় কি? হয়ত আমাদের বংশধরেরা আমাদের কবর খুঁড়িয়া তাহাদের ইমারতের ভিৎ পত্তন করিবে। যত সুন্দর কফিনেই আমরা শয়ন করি, যত বিশিষ্ট মর্ম্মরফলকই আমাদের যশোগাথা ঘোষণা করুক, অনাগত শতাব্দীর সেই অশুভ মুহূর্ত্তে প্রতিবাদ করিবার জন্য কবরের নীচে হয়ত একখানি অস্থিও অবশিষ্ট থাকিবে না।

বাহির হইয়া আসিব এমন সময় এক বেচারী ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া লম্বা সেলাম করিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—কে? সে জানাইল, সে গোরস্থান চৌকিদার। তাহার কসুর এবারের মত মাপ করিতে হইবে; কেহ খবর দেয় নাই যে হুজুর সেখানে গিয়াছেন ইত্যাদি। তাহারই বা দোষ কি? এই সন্ধ্যায় যে বড়সাহেব গোরস্থানে বেড়াইবেন তাহা কে জানে; তবু তাহাকে হুকুম দিলাম, সে যেন পশ্চাতের দিকের রাস্তাটা পরিষ্কার করে।

উপর হইতে কড়া হুকুম আসিয়াছে, বিভাগের সমস্ত ঘুমটিওয়ালাদের পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে তাহারা কার্য্যতৎপর কি-না। এতদিন বহু একপদ ও একহস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি এই কাজে নিযুক্ত হইত, কিন্তু যেহেতু দেশে অত্যধিক মোটরের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে ঘুমটিওয়ালাদের দায়িত্ব বহুল পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে, সেজন্য এ সব অশক্ত লোক আর রাখা হইবে না। অতিবৃদ্ধ, দৃষ্টিশক্তিহীন যাহারা ছেলে ও স্ত্রীর সাহায্যে এতদিন চাকরি বজায় রাখিয়াছে তাহাদেরও বিদায় দিতে হইবে।

কাছেই মণিহারী লাইন। ভাবিলাম প্রথম দিন সেদিকটাই সারিয়া আসি। অতি প্রত্যূষে বাহির হইলাম। দক্ষিণদিকে সর্ব্বশেষে 'গুডস্ ইয়ার্ড', তারপর হাতের ডানদিকে বি-এন-ডব্লিউ লাইন বাহির হইয়া গিয়াছে, আর বামদিকে মণিহারী লাইন। বর্ষণক্লান্ত আকাশ পাংশুল। অদূরে কলের প্রকাণ্ড চিমনি, চালের কল ক্রমশ তেল, আটা ও চট্ তৈরি করিয়া অবশেষে ক্ষান্ত হইয়াছে। বহু বৎসর পূর্ব্বে কোন সাহেব কোম্পানী অনেক

টাকা খরচ করিয়া কারখানা স্থাপন করে, চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড তারের বেড়া দিয়া ঘিরিয়া বহু টিনের ফ্যাক্টরি ঘর নির্ম্মিত হয়। ম্যানেজারের বাংলোর চারিদিকে সুন্দর বাগান তৈরি হইয়াছিল, কিন্তু আজ তাহার চিহ্নমাত্র নাই। শুধু বর্ষার বারিসিঞ্চনে একদিনের সযত্ন-রক্ষিত দূর্ব্বা ঘাসের 'লন' এখনও আত্মপরিচয় দিতেছে।

মোটর ট্রলি আস্তে-আস্তেই চালাইতেছিলাম, সম্মুখের 'লেভেল-ক্রসিং'এ গরুর গাড়ীর ভিড় অতি প্রত্যুষেই আরম্ভ হয়। ভোরের বাতাসে কেমন শীত শীত বোধ হইতেছিল, দেখিতে দেখিতে ৮৫ নং ঘুমটি দৃষ্টিগোচর হইল। মাথায় একটি গোল গম্বুজ, ফুট দশেক চওড়া ও ফুট-দশেক লম্বা জানালাবিহীন একটি পাকা ঘর বহুদিনের সংস্কারের অভাবে জীর্ণ; বর্ষার জলে ভিজিয়া ভিজিয়া সমস্ত দেয়ালে দাগ ধরিয়াছে। দূর হইতে দেখিতে পাইলাম গেট খোলা রহিয়াছে। ট্রলির গতি আরও কমাইলাম। হঠাৎ দেখিলাম ঘুমটিওয়ালা বাহির হইয়া ফটকের দিকে ছুটিয়াছে, বেচারীর একটি পা নাই। কাঠের পা-টি কোনরূপে লাগাইয়া লাঠি লইয়া লাফাইতে লাফাইতে আসিতেছে। বর্ষার এই ভোরে যে কখনও বড়-সাহেব বাহির হইবে তাহা সে আশা করে নাই। একদিকে তাহার ফটক বন্ধ করিবার প্রবল চেষ্টা আর অপর-দিকে কাঠের পা-খানাকে সামাল দিবার করুণ ভঙ্গী মনে যুগপৎ হাসি ও করুণার উদ্রেক করিতেছিল। অবশেষে তাহার স্ত্রী আসিয়া সাহায্য করিল, ট্রলি আসিয়া থামিতেই সে লম্বা সেলাম ক'রল। চাহিয়া দেখিলাম লোকটার বয়স পঞ্চাশের উপর হইবে। বহুদিনের অপ্রচুর আহার ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় বাসজনিত মুখে একটা রুক্ষ কঠোরতা। একদিন লোকটা বেশ জোয়ান ছিল। চোখ দুটি ছোট কিন্তু উজ্জ্বল। গায়ে একটি নীল রঙের কোট, বহু পুরাতন। লোকটির ডান পা-খানা হাঁটুর নীচে নাই। সাধারণতঃ যে কাঠের পা লইয়া এক-পা-ওয়ালারা হাঁটাহাটি করে তাহাই একটি ব্যবহার করিতেছে। হাঁটুর নীচে একটি পুরাতন ন্যাকড়া, জানুর অগ্রভাগে চামড়ার আকুঞ্চন বহুদিন পূর্ব্বের অস্ত্রোপচারের পরিচয় দিতেছে। এখানে-সেখানে বীভৎস সাদা সাদা দাগ। আমি তাহার নামধাম টুকিয়া লইলাম। রেলে সে বিশ বৎসরের উপর কাজ করিতেছে এবং এই ঘুমটিতেই সতেরো বৎসর যাবৎ আছে। তাহাকে যথাসম্ভব মোলায়েম করিয়া বুঝাইয়া দিলাম যে, শীঘ্রই তাহাকে চাকরি হইতে জবাব দেওয়া হইবে। ঠক ঠক করিয়া দু-বার পদক্ষেপ করিয়া সে হঠাৎ আমার পা জড়াইয়া ধরিল, কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিল,—হুজুর এ দফা মাপ কিজীয়ে। আমি তাহাকে বুঝাইলাম যে, আজকার অপরাধের জন্য তাহাকে বিদায় দেওয়া হইবে না, উপর হইতে হুকুম আসিয়াছে আর এক-পা-ওয়ালা লোক রাখা হইবে না। করুণ-দৃষ্টিতে সে একবার নিজের পায়ের দিকে চাহিল এবং জানাইল, এখনও সে কর্ম্মক্ষম আছে, বিশেষতঃ চাকরি গেলে সে থাকিবেই বা কোথায়, খাইবেই বা কি? আমি তাহাকে বুঝাইলাম, একদিন তো তাহাকে রেলের চাকরি ছাড়িতেই হইবে, তখন কি হইবে। তাহার ছেলেমেয়ে কি কেহ নাই? সে কাতরভাবে জানাইল এ সংসারে এক স্ত্রী ভিন্ন আপনার বলিতে আর কেহ নাই।

তাহার সেই সহায়হীন মুখের দিকে চাহিলাম। আর চাহিলাম বিহারের এই দিগন্তব্যাপী অনাবৃত মাঠের দিকে যেখানে কোন শস্য হয় না। প্রকাণ্ড মাঠ অভ্রহীন বালুপরিপূর্ণ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাসে আবৃত। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাহে জ্বলিয়া পুড়িয়া মাঠ ধূসর বর্ণ হইয়া যায়। একদিক হইতে লু চলিতে থাকে, প্রচণ্ড রৌদ্র ঝাঁক বাঁধিয়া দূরে দরান্তরে ঝিলিমিলি করিতে থাকে। শুধু সকাল সন্ধ্যায় রাখালবালকেরা রাশি রাশি অপুষ্ট ক্ষীণ ও খর্ব্বকায় গরুবাছুর সমস্ত মাঠময় চরাইয়া বেড়ায়, এরা দুধও দেয় না হালও বহে না, এমন গোধনেরা বৎসর ভরিয়া অনুর্ব্বর মাঠের সামান্য তৃণ খাইয়া জীবনধারণ করে। বর্ষার জল খানিকটা শ্যামলতা আনে; কোন কোন ঘাস বড় হইয়া উঠে। কেহ-বা এখানে সেখানে ভুট্টা কলাই জন্মাইতে চেষ্টা করে। এই নিরন্ন অনুর্ব্বর দেশে আমার এই পঁচাশী নম্বর ঘুমটিওয়ালার মত একপদবিশিষ্ট লোক যে রেলের চাকরি গেলে না-খাইয়া মরিবে তাহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু কি করা যায়, উপরের হুকুম।

সমস্ত লাইন ট্রলি করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। মনটা তেমন প্রসন্ন ছিল না। আপিসে বসিয়া কাগজ দস্তখত করিতেছি; বাহিরে খট্‌ খট্‌ শব্দ শুনিতে পাইলাম। চাপরাশীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম সেই লোকটা আমার সঙ্গে দেখা করিতে চায়। ভাবিলাম ভাল বিপদ! লোকটাকে তখন না বলিলেই পারিতাম। এমন সময় কালীবাবু আসিয়া বলিল,—স্যর লোকটা কিছুতেই ছাড়িবে না। তাহাকে বহু প্রকারে বুঝাইয়াছি কিন্তু সে বলে আপনি নাকি তাহাকে কি সার্টিফিকেট দিয়াছেন। আপনাকে ছাড়া আর কাহাকেও দেখাইবে না। বলিলাম,—আচ্ছা, নিয়ে আসুন।

লোকটা ঘরে ঢুকিল, হঠাৎ যেন তাহাকে চিনি বলিয়া মনে হইল। কোমর হইতে খুলিয়া সযত্নে রক্ষিত একখানা কাগজ আমার হাতে দিল। আমারই হাতের লেখা, সতেরো বৎসর পূর্ব্বে যখন ছোটসাহেব হইয়া প্রথম কাটিহার আসি তখনকার লেখা—"ট্রলিওয়ালা নান্‌কু ১৯১৩ সনের বন্যার সময় নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া একখানি ট্রেনকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছে। তাহার কর্ত্তব্যপরায়ণতা এবং পরার্থপরতার অত্যধিক প্রশংসা করা যায় না।"

কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া চাহিলাম, নান্‌কু ততক্ষণে কাঠের পা-খানা দেয়ালে ঠেকাইয়া রাখিয়া আমার পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িয়াছে। ধীরে ধীরে স্মৃতিপটে বহুদিন পূর্ব্বের ঘটনা মনে হইল।

পার্ব্বতীপুর হইতে কাটিহার পর্য্যন্ত ই-বি-রেলওয়ের যে মিটার গেজ লাইন গিয়াছে তাহা বহু নদী অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। আত্রাই, কাকুড়াধার, পুর্ণভবা, টাঙ্গন, নাগর, মহানন্দা, কঙ্কর—এমন কত কি; বহু বৎসর পূর্ব্বে ইহারা বর্ষাকালে পরিপূর্ণ হইয়া প্রবাহিত হইত, কখনও প্রচণ্ড জলপ্লাবনে সমস্ত দেশ ভাসাইয়া বাড়িঘর ভাঙিয়া উদ্দাম বেগে ছুটিত, আবার শীতের প্রারম্ভে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চড়া ফেলিয়া নূতন স্থলভাগ সৃষ্টি করিত। এখন তাহাদের সে বিক্রম নাই, ক্ষুদ্রকায় বহুধাবিভক্ত বক্ররেখাকারে প্রবাহিত নদীগুলি কোন রূপে বাঁচিয়া আছে। এখানে সেখানে মজিয়া যাওয়া নদী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিল সৃষ্টি করিয়াছে। এসব বিল বহুবিধ জলজ গুল্মে পরিপূর্ণ। বৎসরের পর বৎসর এইসব বিলের বুকে তৃণগুল্ম পচিয়া জল ও বায়ুকে বিষাক্ত করে। চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামের লোকজন পশু এই জল পান করে এবং নানাবিধ মহামারীতে মারিতে থাকে। কখনও বা বর্ষার প্রচণ্ড প্লাবনে এই সব মরা নদীতে বান ডাকে, সুচিহ্নিত তীররেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ নদীতল বর্ষার সেই প্রবল জলোচ্ছ্বাস বহন করিতে পারে না, তীরবর্ত্তী দেশ প্লাবিত করিয়া এই সব বদ্ধ জলাশয়গুলিকে ভাসাইয়া নদী ছুটিতে থাকে। দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশ জলময় হইয়া উঠে; রেল লাইন বিপন্ন হইয়া পড়ে।

সে-বার বর্ষার বড় জোর। তিন দিন ধরিয়া কঙ্কর নদীতে বান ডাকিয়াছে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু জলবেগের মাপ জানাইয়া তার আসিতেছিল। অবশেষে সন্ধ্যার সময় বাহির হইতে হইল। ঝাউয়া ষ্টেশনে নামিয়া ট্রলি চাপিলাম।

বোধ হয় শুক্লপক্ষ হইবে; আকাশমণ্ডল অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে দ্যুতিমান। চতুর্দ্দিকের গাছপালা মাটি আর্দ্র; সম্মুখের বাতাসে অল্প অল্প শীত বোধ হইতেছিল। কঙ্কর নদীর পুলের উপর আসিলাম। খরস্রোতা নদী ফেনায়িত জলোচ্ছ্বাসে স্তম্ভের গায়ে লাগিয়া আবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়াছে। স্রোতবেগে প্রবাহিত বহুবিধ জলজ গুল্ম সেই ঘূর্ণাবর্ত্তে পাক খাইতেছে। ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলাম। লাইনের দুই ধারে ঘনসন্নিবিষ্ট জঙ্গলে সুদূরের দৃষ্টি প্রতিহত করিতেছিল। যতই যাইতেছিলাম দেখিতে পাইলাম, জল ক্রমশঃ বাঁধের সমান হইতে চলিতেছে। ৩০৯ মাইল হইতে যে প্রকাণ্ড গোলাই আরম্ভ হইয়াছে সেখানে পৌঁছিতেই দৃষ্টি দুই পাশে বহুদূরবিস্তৃত জলরাশির উপর প্রসারিত হইল। তীব্র পূর্ব্ব বাতাসে ছোট ছোট ঢেউ উঠিয়াছে। ঈষৎ আলো-অন্ধকারে নির্জ্জন রেল লাইন হইতে বিস্তৃত জলরাশিকে সাগরের মত দেখাইতেছিল। জল হয়ত বিশেষ গভীর নহে; কিন্তু বুঝিবার উপায় নাই।

সহসা দূরে অস্ফুট গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম। যতই

অগ্রসর হইতে লাগিলাম গর্জ্জন তত পরিস্ফুট হইল। অবশেষে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম সর্ব্বনাশ হইয়াছে, ১৭ নং পুলের মধ্য দিয়া প্রচণ্ডবেগে জল যাইতেছে। চারিটি 'গার্ডার' জলবেগে কোথায় ভাসিয়া চলিয়া গিয়াছে, পঞ্চমটি স্থানচ্যুত হইয়া জলপীড়ন সহ্য করিতেছে। রেল লাইন মাল্যাকারে ঝুলিতেছে। বাতাস জোরে বহিতেছিল; পুলের নিকট জলধারা প্রতিহত হইয়া থই থই করিয়া উঠিয়াছে, ঝাপটার পর ঝাপটা আসিয়া প্রবল বেগে অবশিষ্ট 'গার্ডার' ও লাইনের গায়ে আঘাত করিতেছে। দূরে গ্রামান্তরেখার উপরস্থিত আকাশ-মেখলা ক্রমশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। আসন্ন বৃষ্টি সূচিত হইতেছে। মানুষ কত চেষ্টা করিয়া পুল গাঁথে কিন্তু প্রকৃতির তাণ্ডব লীলার কাছে তাহা কিছুই নহে। এ দৃশ্য ভুলিবার নহে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিশাল ফেনায়িত জলরাশি আঘাতে আঘাতে মানবের সৃষ্টিকে চূর্ণবিচূর্ণ করিতে চাহিতেছে।

ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলাম ১১ নং আপ গাড়ীর সময় হইয়াছে। গাড়ীখানি পরবর্ত্তী ঝাউয়া ষ্টেশনে থামে না, অতএব এ জায়গাটার উপর দিয়া বেগেই যায়। অল্প সময়ের মধ্যে গাড়ী থামাইবার কোন বন্দোবস্ত না করিলে যে বিপদ হইবে তাহা ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। পাহারাওয়ালারা কেহ আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। ষ্টেশনে ফিরিয়া গিয়া তার দিয়া গাড়ী বন্ধ করিবার সময় নাই, অথচ ওপারে যাইবারও উপায় নাই। কিছু একটা করিতে হইবে; একজনের জীবন বিপন্ন করিয়া যদি ট্রেনখানাকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করা যায়, তাহা অবশ্যই করিতেই হইবে। গা হইতে বর্ষাতি খুলিয়া ফেলিলাম এবং নিজেই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে ট্রলিওয়ালা বলিল,—"হুজুর, আমি যাইব, যেমন করিয়া হোক গাড়ী থামাইব। আপনি ট্রলিতে বসুন।" তাহার সুগঠিত দেহাবয়বের দিকে চাহিলাম। সামান্য মানুষ কি করিয়া ঘটনার আবির্ভাবে সহসা মহিমান্বিত হইয়া উঠে ভাবিলাম। অপ্রত্যাশিতভাবে বহু বিপদে আপদে মানুষের এই মানুষকে বাঁচাইবার প্রবৃত্তি দেখিয়াছি এবং দেখিয়া শ্রদ্ধায় শির নত করিয়াছি।

নান্‌কু জামা ছাড়িয়া ফেলিল এবং বড় সন্তর্পণে দোদুল্যমান রেল লাইনের উপর দিয়া 'স্লিপার' ধরিয়া ধরিয়া যাইতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে জলের ঝাপটাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গেল। এক একটা 'গোসাই'র মাঝখানে তাহার অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে হইল। ঝাপটার পর ঝাপটা দেহের গায়ে লাগে আর সে কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করে। এক একবার মনে হইল তাহাকে এই বিপদের মুখে ঠেলিয়া দিয়া নিজে কাপুরুষের মত দাঁড়াইয়া আছি।

হঠাৎ দূরে একটি উজ্জ্বল আলো দেখা যাইতে লাগিল। এতক্ষণে সমস্ত আকাশ কালো মেঘে ভরিয়া গিয়াছে। দিগন্তব্যাপী অন্ধকারের নীচে শুধু বন্যাজলের অস্পষ্ট আভা। ক্রমশঃ আলো উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল। নান্‌কু প্রাণপণে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছিল। জলের গর্জ্জনের সঙ্গে গাড়ীর গর্জ্জন মিলিয়া একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করিল। হঠাৎ নান্‌কুকে আর দেখা গেল না, জলনাগিনী কি তাহার ফেনায়িত ফণা তুলিয়া তাহাকে গ্রাস করিল?

প্রচণ্ড আলোকচ্ছটায় লাইন সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সন্ধানী আলোর জ্যোতি অত্যন্ত অদ্ভুত। একটি কেন্দ্র হইতে পুচ্ছাকারে নিক্ষিপ্ত হইয়া বিষম আলোছায়ার সৃষ্টি করে। দুটি সুনির্দ্দিষ্ট রেখার বাহিরে ঘনান্ধকার আর তাহার ভিতরে অত্যুজ্জ্বল আলোকসম্পাতে যেন সমস্ত রেল লাইন বিশ্লেষিত হইয়া পড়ে। রেল, স্লিপার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছায়া নিক্ষেপ করিয়া স্পষ্ট হয়, আলোক-মণ্ডলে অসংখ্য কীটপতঙ্গ উড়িতে থাকে। গাঁড়ী পূর্ণ বেগে আসিতেছে, রাশি রাশি ধূমোদ্গীরণ করিয়া, লাইনকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আঘাত করিয়া করিয়া সমস্ত সৃষ্টিকে কাঁপাইয়া রুদ্ধবাষ্প প্রকাণ্ড লৌহপিণ্ড ছুটিয়া আসিতেছে। কাহার সাধ্য ইহার গতি রোধ করে? সমস্ত বাধাবন্ধ উড়াইয়া পার্শ্বস্থ বৃক্ষলতাকে ত্রস্ত করিয়া বায়ুপ্রবাহকে আকর্ষণ করিয়া ছুটিতেছে। আশঙ্কা বাড়িয়া উঠিল, মুহূর্ত্ত-মধ্যে সমস্ত ট্রেন জলগর্ভে আসিয়া পড়িবে, সাধ্য নাই যে

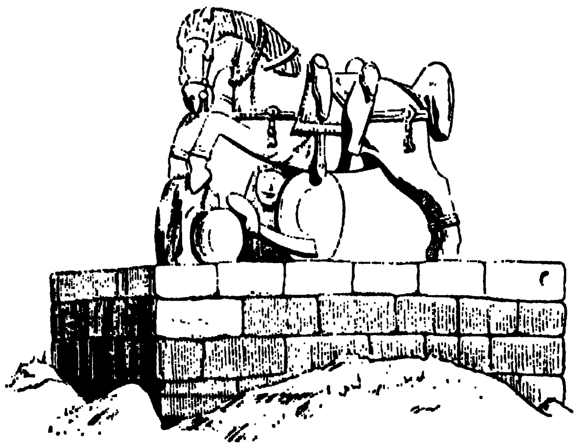
ড্রাইভার থামায়, 'গোলাই' থাকার জন্য গাড়ীর আলো তখনও পুলের উপর আসিয়া পড়ে নাই, সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

হঠাৎ দেখিতে পাইলাম নান্কু লাইনের উপর দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতেছে, তীব্র আলোকে তাহার কৃষ্ণবর্ণ দেহের অবয়ব রেখা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। গাড়ী আসিয়া পড়িল; নানকুকে পার হইয়া গেল। হঠাৎ কেমন হতচৈতন্য হইয়া গেলাম, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই নৈশঅন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া ইঞ্জিন তীব্র চীৎকার করিয়া উঠিল, প্রকাণ্ড মাঠের বুকে বিস্তৃত জলরাশিতে প্রতিহত হইয়া সমস্ত গঞ্জনকে ছাপাইয়া লৌহদানবের সেই চীৎকার প্রকট হইল, বুঝিলাম ড্রাইভার দেখিতে পাইয়াছে কিন্তু আর কি সময় আছে? গতিবেগকে রুদ্ধ করিতে করিতে গাড়ী প্রায় পুলের কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। পূর্ণ ভ্যাকুয়াম ব্রেকের চাপে অবশেষে আসন্ন চেতন অচেতন সমস্ত পদার্থকে ভীত ত্রস্ত করিয়া উহা থামিল, মনে হইল সমস্ত লাইন বুঝি রুদ্ধ গতি-বেগের তাড়নে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়।

পরের ঘটনা বেশী নয়। রাত্রি দ্বিপ্রহর হইলে কুলির দল ও পি-ডব্লিউ আই আসিয়া পৌঁছিল এবং জল কমিতে লাগিল। গাড়ী থামিবা মাত্রই ড্রাইভার পশ্চাৎ দিকে চলিয়া গিয়াছিল। তাহার কথাতে জানা গেল যে, তাহার মনে হইয়াছিল, লোকটা লাইনের উপর দিয়া হাত উঁচু করিয়া দৌড়াইতেছিল তাহাকে চাপা দিয়াছে। কিন্তু পরে ঘটনাস্থলে গিয়া দেখিতে পায়, লোকটা ভাগ্যক্রমে এঞ্জিন পৌঁছিবার পূর্ব্বেই পড়িয়া যায়। দৈবানুগ্রহে তাহার সমস্ত শরীর গাড়ীর নীচে না পড়িয়া একটি মাত্র পা কাটা যায়। হাঁটুর কাছে হাড়, মাংস সমস্ত পিষিয়া গিয়াছিল। ছিন্ন পা শুধু দু-একটি চর্ম্মখণ্ডে ঝুলিতেছিল। অবশেষে হাসপাতালে অস্ত্রোপচার হয় এবং বহুদিন পরে সে ভাল হয়।

* * *

পায়ের দিকে চাহিয়া দেখি নান্কু তেমনি বসিয়া আছে। কলম তুলিয়া হুকুম লিখিলাম,—পচাশী নম্বর ঘুমটিওয়ালাকে বদলি করিয়া গোরস্থান-চৌকিদার করা হইল। কালীবাবু তাহাকে হুকুম শুনাইতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখিলাম তাহার চোখ ভিজিয়া উঠিয়াছে। আমার দিকে একবার কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে চাহিল; তারপর সেলাম করিয়া কাঠের পা খট্ খট্ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল। সতেরো বৎসর পূর্ব্বে সে যেখানে এক পদ স্থাপন করিয়াছে, আজ এই বৃদ্ধ বয়সে সেখানে আর এক পা দিতে আপত্তি কি!



রংরেজিনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শঙ্করলাল দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত।
শাণিত তাঁর বুদ্ধি
শ্যেন পাখীর চঞ্চুর মতো,—
বিপক্ষের যুক্তির উপর পড়ে বিদ্যুদ্বেগে—
তার পক্ষ দেয় ছিন্ন ক'রে
ফেলে তাকে ধুলোয়।

রাজবাড়িতে নৈয়ায়িক এসেচে দ্রাবিড় থেকে।
বিচারে যার জয় হবে সে পাবে রাজার জয়পত্রী
আহ্বান স্বীকার করেচেন শঙ্কর
এমন সময় চোখে পড়ল্ল পাগড়ি তাঁর মলিন।
গেলেন রংরেজির ঘরে।

কুসুম ফুলের ক্ষেত, মেহেদি বেড়ায় ঘেরা।
প্রান্তে থাকে জসীম্ রংরেজি।
মেয়ে তার আমিনা, বয়স তার সতেরো।
সে গান গায় আর রং বাঁটে,
রঙের সঙ্গে রং মেলায়।
বেণীতে তার লাল সুতোর ঝালর,
চোলি তার বাদামী রঙের,
শাড়ি তার আসমানি।
বাপ কাপড় রাঙায়
রঙের বাটি জুগিয়ে দেয় আমিনা।

শঙ্কর বললেন, জসীম,
পাগড়ি রাঙিয়ে দাও জাফরাণী রঙে,
রাজসভায় ডাক পড়েচে।
কুলকুল করে জল আসে নালা বেয়ে
কুসুম ফুলের ক্ষেতে।
আমিনা পাগড়ি ধুতে গেল
নালার ধারে তুঁত গাছের ছায়ায় বসে

ফাগুনের রৌদ্র, ঝলক দেয় জলে,
ঘুঘু ডাকে দূরের আমবাগানে।
ধোওয়ার কাজ হ'ল, প্রহর গেল কেটে।
পাগড়ি যখন বিছিয়ে দিল ঘাসের 'পরে
রংরেজিনী দেখল তারি কোণে
লেখা আছে একটি শ্লোকের একটি চরণ,—
"তোমার শ্রীপদ মোর ললাটে বিরাজে।"
বসে বসে ভাবল অনেকক্ষণ,
ঘুঘু ডাকতে লাগল আমের ডালে
রঙীন সুতো ঘরের থেকে এনে
আরেক চরণ লিখে দিল—
—"পরশ পাইনে তাই হৃদয়ের মাঝে।"—

দু-দিন গেল কেটে।
শঙ্কর এল রংরেজির ঘরে।
শুধালো, পাগড়িতে কার হাতের লেখা?
জসীমের ভয় লাগল মনে।
সেলাম ক'রে বললে, "পণ্ডিতজি,
অবুঝ আমার মেয়ে,
মাপ করো ছেলেমানুষী।
চলে যাও রাজসভায়
সেখানে এ লেখা কেউ দেখবে না, কেউ বুঝবে না।"
শঙ্কর আমিনার দিকে চেয়ে বল্লে,
রংরেজিনী,
অহঙ্কারের পাকে-ঘেরা ললাট থেকে
নামিয়ে এনেচ
শ্রীচরণের স্পর্শখানি হৃদয়তলে
তোমার হাতের রাঙা রেখার পথে।
রাজবাড়ির পথ আমার হারিয়ে গেল,—
আর পাব না খুঁজে॥

১১ ডিসেম্বর
১৯৩২

পত্রধারা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১)

আমার স্বভাবের অনুবর্তন ক'রে এসেচি বলেই আমার দেশ আমাকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারচে না এই কথাই তোমার চিঠি থেকে বুঝতে পারি। পাঁচজনে আমাকে যে-রকমটি হতে বলে আমি যদি ঠিক সেই প্যাটার্নে নিজেকে গড়তে পারি তবেই তারা আমাকে ধন্য বলবে এ-কথাটা একদিক থেকে এতই সহজ যে আমি তা বুঝতে পারি, আর একদিক থেকে তা এতই কঠিন যে আমি তা মানতে পারি নে।

… আমাকে তোমরা তোমাদের পছন্দসই হতে বলেচ তাতে বকশিষ মিলবে। চেষ্টা হয় তো করতেও পারতুম যদি নিশ্চিত জানতুম তোমাদের পছন্দটা ট্যাকসই, তাতে আমাকে কোনদিন ঠকতে হবে না। কী ক'রে এত নিঃসংশয় হব বলো। অতএব নগদ বিদায়ের প্রত্যাশা ছেড়ে দিলুম। এমনি ক'রেই সত্তর বছর যদি কেটে গেল তা হলে বাকী ক'টা দিনও কাটবে। আমি যা দিতে পারি তাই দেশকে দেব, তারপরে রাগ করে যদি ভাঙা কুলোয় আমার নামটা তোমরা বিদায় করো মৃত্যুর পরে সে আমাকে বাজবে না। …

কাজের ক্ষতি ক'রেই তোমাকে এত বড়ো চিঠি লিখতে হোলো, কেন-না আমাকে ভুল বোঝা নিতান্তই সহজ। ইতি ৪ কার্ত্তিক ১৩৩৯

(২)

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, জোলো বাতাস বেগে বইচে পূবদিক থেকে। পাখীগুলো বিমর্ষ হয়ে আছে; সামনের ঐ শিউলি ও টগর গাছে টুনটুনি পাখীদের লীলা দেখি রোজ, আজ তারা অনুপস্থিত। আমার উত্তরদিকের জানলার বাইরে পরিপুষ্ট ভ্যারেণ্ডা গাছটার শাখায় শাখায় খুব দোলাদুলি চলচে, আর দোলা লেগেছে মালতী-বেষ্টিত শিমুলগাছে। হিমঝুরি গাছ থেকে শাদা শাদা ফুলগুলো ঝরে পড়চে রাস্তায়, আর টুপ্‌টাপ ক'রে পড়চে গোলকচাঁপা। আমার ঘরের সামনে অদূরে লালমাটির রাস্তা চলে গেছে বোলপুর শহরে—আজ রবিবার হাটবার; গোরুর গাড়ী চলেছে মন্থর গমনে, খড়ের আঁটি মাথায় নিয়ে চলেছে সাঁওতাল মেয়েরা। গোয়ালপাড়া গ্রামের দু'-চারজন গৃহস্থ মোটা চাদর গায়ে হাট করতে যাচ্চে, ছাতা হাতে। ঐ এল অকস্মাৎ এক পশলা বৃষ্টি, মর্ম্মরিত হয়ে উঠল আমার মধুমঞ্জরীর লতামণ্ডপ—বৃষ্টিটা দ্রুত চলে গেল সাদা শাড়িতে ঢাকা প্রোষিতনীর মতো মাঠের উপর দিয়ে পশ্চিম দিগন্তে। আজ প্রোফেসারি করবার দিন নয়—কিন্তু দায় চেপেছে ঘাড়ে—আজ কলমের ভার গুরুভার মনে হচ্চে, তবু টেনে চলতে হবে। আমার গান তোমার ভালো লাগে শুনে খুশী হয়েছি। আমার নিজের মন সব চেয়ে আনন্দ করে আমার গানগুলো নিয়ে। ইতি ২৭ কার্ত্তিক, ১৩৩৯।

(৩)

আমি কি আজ পর্য্যন্ত কাউকে ভিতর থেকে আলো দিতে পেরেছি? আমি কী রকম জানো, যেন সূর্য্যরশ্মিতে উদ্দীপ্ত অগ্নিবর্ণ সন্ধ্যাবেলাকার মেঘের মতো। সে আলো চোখে দেখতে পাবে, ভালো লাগবেও হয়তো,—কিন্তু রাত্রের অন্ধকার পথে চলবার জন্যে তার থেকে কেউ কি আলো সঞ্চয় করতে পারবে, কেউ কি জ্বালাতে পারবে আপন ঘরে প্রদীপ? বাহির থেকে দেখে মনে হতে পারে আমার কাছে চেয়ে নেবার জিনিষ কিছু আছে, যদি বা থাকে দেবার যোগ্যতা কই। যারা দেবার মানুষ তারা চুপ ক'রে থাকে না, তারা মানুষকে ডাক দিয়ে বলে, এসো আমার কাছে, নাও আমার হাত থেকে, না দিয়ে তাদের জো নেই। তারা সেই শ্রাবণের মেঘ, অজস্র

বর্ষণ ক'রেই যার মুক্তি। আমার চিন্তাও হয় তো তাদের মতো কখনো কখনো আকাশে সঞ্চরণ করে, কিন্তু সে যেন শরতের মেঘ, কখনো কখনো দিগন্তে করে আনাগোনা —নানা রঙ লাগে তাতে, সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্তকে সে অভিনন্দন করে নানা সমারোহে, কিন্তু চাতক যখন বলে জল দাও তখন সে লজ্জিত হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যায়। আমাকে আমার বিধাতা এই ফরমাসই করেচেন, তাঁর বিশ্বোৎসবে শোভাযাত্রায় সাজসজ্জার কাজে লাগব, শানাই বাজাব, পতাকা দোলাব, কখনো কখনো জগঝম্পও হয় তো বাজাতে পারি, কিন্তু দানদক্ষিণার ভার তাঁর যে-বিভাগে সেখানে আমার অনধিকার। আমার উজ্জ্বল তকমা দেখে লোকে হঠাৎ অনেক আশা ক'রে আসে, তারপরে যখন ফিরে যায় তখন তারা ভাবে আমি কৃপণ, গাল পাড়তে থাকে। আমি কৃপণ বলে দিইনে তা নয়, আমার হাতে তহবিল নেই বলে দেওয়া অসম্ভব। যারা দেয় তাদের চারদিকে দলবল থাকে, দলবলের অভাবে আমি সকল কাজে অকৃতার্থ। ডাকব তাদের কী দিয়ে, খোরাক দেব কোথা থেকে? যে রঙে চোখ ভোলে তাতে তো পেট ভরে না। এই জন্যেই আমার দেশে আমি প্রায় একাই কাটিয়ে দিলুম জীবনের শেষবেলা পর্য্যন্ত। আমার কাজ আমার হোলো বোঝা। তবু কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে।

একটা কথা বলি তোমার কাছে, সেটা আশ্চর্য্য ঠেকে। পাশ্চাত্য দেশে এমন কথা কারো কারো কাছে শুনেচি, আমার বাণীতে আমি কেবল যে তাদের খুশী করেছি তা নয়, তারা জীবনের অন্ন পেয়েছে তার থেকে, যাত্রাপথের পাথেয়রূপে তারা তার থেকে কিছু সংগ্রহ করেছে। এ কথা শুনে মনে হয়েছে আমার রচনার সাধনা সার্থক হোলো। সেই সঙ্গে এও ভেবেছি যে-ভাষায় দেশের লোককে কিছু পথ্য দিতে পারতুম সে ভাষা এবং উপযুক্ত ভঙ্গী আমার জানা নেই। মূককে বাচাল করে এমন শক্তি আছে, আবার বাচালকে মূক করে এমন বাধা আছে। আমার অনেক বাক্য আমার দেশে মূক হয়ে আছে আমার যে-ক্ষমতার অভাবে তার উপরে কি রাগ করা চলবে, সে কি আমার ইচ্ছাকৃত? তুমি অনেকবার আমাকে বলেচ, "তোমার নিজের মতো কথা না বলে আমাদের মতো কথা বলো তা হলে .দের পাবে।" চেষ্টা করতে গেলে আমার কথাও নষ্ট হোতো, তোমাদের কথাও। অতএব এ যাত্রায় বেশি আশা করব না। তোমার অন্তর যে শান্তি যে সান্ত্বনা চায় আমি কেমন ক'রে তা দিতে পারি? মনে বেদনা পাই, রোগী আত্মীয়কে দেখে আত্মীয় যেমন বেদনা পায়, কিন্তু হাতুড়ে হয়ে ডাক্তারি করব কোন্ সাহসে? তাই তোমাকে বলি আমার স্নেহ যদি গ্রহণযোগ্য হয় তো গ্রহণ কোরো, কিন্তু শিক্ষা যদি চাও তবে মূক আমি।—তোমার নিজের মধ্যেই কল্পনাশক্তি আছে। যে-গুরুকে ভৌতিক রাজ্য থেকে হারিয়েছ সেই গুরুকেই ভাবের রাজ্যে অমর ক'রে পাবে, সেইখানেই তোমার শান্তি। তর্ক ক'রে কি কখনো শান্তি দেওয়া যায়? ইতি ২৮ কার্ত্তিক ১৩৩৯।

(৪)

যে অনুভূতির মধ্যে কোনো একদিন তোমার আত্মা মগ্ন হয়েছিল, পরম আনন্দ পেয়েছিল, তার স্মৃতির প্রতি তোমার অশ্রদ্ধা জন্মাতে ইচ্ছাও করিনে। অহঙ্কারের যে-বন্ধনে আমরা নিজের ছোটো গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ থেকে সংসারের প্রত্যেক তুচ্ছ জিনিষকে বড়ো ক'রে তুলি, মানুষের স্তুতিনিন্দাকে একান্ত সত্য বলে কল্পনা করি তার থেকে যা তোমাকে নিষ্কৃতি দিতে পারে তাই তোমার পক্ষে শ্রেয়। অনেক সময় সংসার থেকে দূরে পালিয়ে গিয়ে নিজেকে ভোলাই যে নিষ্কৃতি পেয়েচি। সেই প্রমাদ যেন না ঘটে। সংসারের জাল থেকে মুক্তি পেয়েছি, তার একমাত্র প্রমাণ হতে পারে সংসারেই। বুদ্ধদেব যখন নির্ব্বাণের পথে উপদেশ দিয়েছিলেন তখন তিনি তার সত্যকে নির্দ্দেশ করেছিলেন বিশ্বপ্রেমে। চরম সত্য যদি থাকেন, সকলকে ব্যাপ্ত করে, তবে তাঁকে পাবার পন্থা সকলকে ত্যাগ ক'রে নয়। সেই সত্যে যথার্থ ই অগ্রসর হয়েছি কি-না একদিকে তার প্রমাণ মনের কলুষ কেটে যেতে থাকে যদি। আর দিকে প্রমাণ সকলের প্রতি প্রেম পূর্ণ হয়ে উঠল কি-না তাই জেনে। কলুষ কেটে যদি

থাকে তার প্রমাণ এই সংসারেই। আর প্রেম অহঙ্কারের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণ হয়ে উঠেচে তারও প্রমাণ এই সংসারে। কেন-না, মানুষের মধ্যে হাজার রকম বাধা আছে বলেই সেই বাধা এবং তার কঠোর আঘাতকে অতিক্রম করতে পারলেই প্রেমের সার্থকতা। এই প্রেমের আনুষঙ্গিক যে-সেবা, সংসারেই তার বিশুদ্ধতা প্রমাণ হয়। শুধু তাই নয় সেই সেবায় সংসারেরই প্রয়োজন, দেবতার নয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেচেন দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনং—দেবতা তো দরিদ্র নন, দরিদ্র যে মানুষ। মানুষকে সত্য বস্তু দিতে পারলেই দেবতা স্বয়ং তা আদরে গ্রহণ করেন। তাই তোমাকে আমি বলি, যে-সাধনায় তোমার চিত্তের পরিতৃপ্তি তাই তুমি একান্ত নিষ্ঠায় অনুসরণ কর—কিন্তু সেই সাধনার সার্থকতা যদি মানুষকে না দিতে পারো তা হলে তুমি যাই কল্পনা করো না, দেবতা তা গ্রহণ করেন না। পৃথিবীতে মহাপুরুষ যে-কেউ জন্মেচেন মানুষের কাছ থেকে দেবতা তাঁদের কেড়ে নেন নি—মানুষের কাছেই দেবতা তাঁদের প্রেরণ করেচেন। দেবতা আপন ভক্তদের পাঠান মানুষের কাছে। তাঁকে ভক্তি ক'রেই ভক্তি ফুরিয়ে যায় না, সেই ভক্তি যদি সত্য হয় তবে তা প্রেমে অফুরান হয়ে মানুষের সংসারে দেবতার কৃপা নিয়ে আসে। তা যদি না হয় তা হলে দেবতাকে নিন্দা করব কৃপণ বলে। তিনি মানুষের ধনকে একলা নিজেই ভোগ করবেন মানুষকে কিছুই দেবেন না, এতে তো তাঁর ঐশ্বর্য প্রমাণ হয় না। আমাদের কৃপণতা দেবতায় আরোপ ক'রে তাঁকে ছোটো করি কেন? ইতি

৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৯

বন্ধন দরকার

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

বামুন-গাঁ হইতে চরণ ঘোষের মেয়ে দেখিয়া বরাবর বহ্নরের খাল ধরিয়া নৌকাযোগে বাড়ি ফিরিতেছিলাম। সন্ধ্যার তখন অল্পই বিলম্ব ছিল। আমার নৌকার আগ্‌-বাড়াইয়া আর একখানি নৌকা চলিতেছিল। কিন্তু সে নৌকার আরোহী যে কে তাহা অপ্রয়োজন-বোধেই এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই। হঠাৎ আমার নৌকার মাঝি মাঝিদের রীতি পালন মানসেই হয়ত প্রশ্ন করিয়া বসিল—বাসী, নাও যাইব কই?

সম্মুখের নৌকার মাঝি উত্তরে বলিল—কল্‌মা।

সহসা কল্‌মা-গাঁয়ের নাম শুনিয়া একটু বিচলিত এবং আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলাম। আরোহীর নাম জানিবার জন্য একটা ঔৎসুক্য জাগিয়া উঠিল। আমার মাঝিকে বলিলাম—কল্‌মা কোন্ বাড়ি জিজ্ঞেস্ কর তো।

কিন্তু মাঝির জিজ্ঞাসাবাদের পূর্ব্বেই অপর নৌকার আরোহী সম্ভবতঃ আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া চিনিতে পারিয়াই বলিয়া উঠিল—আরে বিষ্টু-দা নাকি? তা'পর—কোত্থেকে ফেরা হচ্ছে?

—মনোহর, তুমি? আমি বলি কে না কে, তাই এতক্ষণ তত্ত্বতাল্লাস আর করিনি।...ওরে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ নৌক'র গায়ে গায়েই চল্, দুটো কথা কয়ে তো বাঁচি! তা'পর, বুঝলে মনোহর, বামুন-গাঁ চরণ ঘোষের মেয়ে দেখতে গিচলেম—ছেলেটার একটা বন্ধন দরকার—কি বল? কিন্তু মেয়ে দেখে আমার তো চক্ষু চড়কগাছ! বাবা, মেয়ে তো নয়—যেন মেয়ের মা এল। ঐ ধিঙ্গি তালগাছের সঙ্গে কি খোকনের বিয়ে দেওয়া চলে—খোকন বউ নিয়ে বাড়ি ফিরতে লজ্জায় মরে যাবে একেবারে। বরং তৃতীয়পক্ষ করা যদি আমার প্রয়োজন মনে করি তো সেদিন চরণ ঘোষকে একটা খবর দিলেই চলবে,—আর মানাবেও।

মনোহর হো হো করিয়া উচ্চ হাসিয়া বলিল—পছন্দ হ'ল না তাহ'লে ?

আমি কণ্ঠে আর এক পর্দ্দা গাম্ভীর্য্য চড়াইয়া বলিলাম—নিজের জন্যে নেহাৎ অপছন্দ হয়নি, কিন্তু নিজের জন্য তো আর দেখতে যাওয়া হয় নি।

মনোহর রসিক লোক। সে দরদীর সুরে বলিয়া উঠিল—তা এমন আর দোষের কি? ছেলের জন্যে অন্যত্র খোঁজ করলেই চলবে। তাকে তো আর বঞ্চিত করা তোমার উদ্দেশ্য নয় বিষ্টু-দা—তবে আর ভাবনার কি আছে? আর বেচারী চরণ ঘোষও কন্যাদায়ের প্রচণ্ড প্রকোপ থেকে তাহ'লে অব্যাহতি পেয়ে বেঁচে যেত। পরোপকার করা তোমার ধাতেও সয়।

মনোহরের রসিকতায় বাহিরে হাসিলাম বটে, কিন্তু অন্তরে হাসির পরিবর্ত্তে ব্যথা ঘনাইয়া উঠিয়াছিল। মনোহরের কথায় সহসা আমার চরণ ঘোষের একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহার কন্যাকে দেখিয়া, তাহাকে যখন জানাইলাম যে, এ মেয়ের সঙ্গে ছেলেকে আমার মোটেই মানাইবে না, তখন সে অতি সংকোচে ও ভয়ে ভয়েই বলিয়াছিল, আপনার ছেলের সঙ্গে না মানাক্, আপনার সঙ্গে তো—

এ যে কতবড় দুঃখের কথা এবং অরক্ষণীয়া কন্যার সহায়-সম্পদহীন গরিব পিতা হওয়া যে বাংলা দেশে কতবড় দুর্ভাগ্যের ও পরিতাপের বিষয় তাহা সে-মুহূর্ত্তে যেমন অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম এমন আর হয়ত কোনদিন করিতে পারিব না;—যেন তাহাই হয়।

বলিলাম—সে চেষ্টা কি আর চরণ ঘোষ একবার না ক'রেই ছেড়েচে, কিন্তু আমি কোন্ সাহসে তিন শত্তুর ঘরে এনে স্থান দি বল তো? দুটি যে আজও জলজ্যান্তো আছে একেবারে—একটি খসলেও না-হয় কথা ছিল,—অন্ততঃ আর পঁচিশটা বছর আগের মানুষ হ'লেও হ'ত। যে কাল পড়েচে ভায়া—ঐ ভবঘুরে স্বদেশী ছোঁড়াগুলোর ভাবনাও তো একটু ভাবতে হয়, কখন যে কোন্‌দিক থেকে এসে ওরা লাঠি চালাতে সুরু করবে তার কি কিছু ঠিক আছে ছাই!

মনোহর হতাশার ভঙ্গিমা করিয়া বলিল—তবে বৃথাই তোমার সেখানে যাওয়া হ'ল ?

বলিলাম—হুঁ, বৃথাই বইকি!

মনোহর আর একটু অনুসন্ধিৎসু হইয়া প্রশ্ন করিল—নৌক-ভাড়াটা কি নিজেরই পকেট থেকে খস্‌লো নাকি ?

খসিয়াছিল সত্য এবং খসাও উচিত, কিন্তু কেন জানি সত্য কথাটা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিলাম না, বলিলাম—তেমন কাঁচা ছেলে নই ভায়া। টাকা-পয়সার ব্যাপারে—

মনোহর আমাকে কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই বলিয়া উঠিল—না, না, চক্ষুলজ্জা কোন কাজের কথা না।

হাসিতে গিয়া থামিলাম। খালের দুই পার ছাইয়া সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছিল। আকাশ-বাতাস প্লাবিত করিয়া একটা ভারাতুর মনের ছায়া ধীরে ধীরে ঘনাইয়া উঠিতেছিল। কথা আর ভাল লাগিতেছিল না। নীরবে মানুষের সুখ-দুঃখের কথা মনে মনে আলোচনা করিতেই তখন ভাল লাগে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের দ্বারা হৃদয়-মনকে বিকৃত করিয়া লাভ নাই।

নিজের কথা লইয়াই এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলাম, কাজেই মনোহরের সম্বন্ধে কিছুই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় নাই। তাহা খেয়ালে আসামাত্রই জিজ্ঞাসা করিলাম—মনোহর, তুমি যে কোথা থেকে ফিরচ তা তো বললে না।

পাশের নৌকায় সহসা সুস্পষ্ট একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনিতে পাইলাম। বুঝিলাম, মনোহর এতক্ষণ এই প্রশ্নটাকেই এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না। প্রশ্ন করা হইয়া গিয়াছে।

মনোহর অতি অল্পকালমধ্যেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিতে লাগিল—আপাততঃ তারপাশা ষ্টীমার-ঘাট থেকে আসচি, কল্‌কাতা গিচলেম, চাটগাঁ যেলে ফিরলেম। কলকাতা যে গিচলেম তা শোননি বুঝি ?

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম—কই, না! কলকাতা আবার কবে গেলে ? আমরা তো জানি তুমি ফরিদপুর-টরিদপুর কোথাও গেচ। কিন্তু, কিন্তু,...তা'পর, তোমার ছেলের খবর কি মনোহর ? সেই যে-ছেলেটা বায়স্কোপে না কোথায় ঢুকেছিল যেন ?

মনোহর ব্যথিতকণ্ঠে উত্তরে বলিল—সেই তার খোঁজেই এতগুলো টাকা খরচ ক'রে কলকাতা যেতে হ'ল, কিন্তু—

মনোহর কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল—বলতে বাধা কিছু নেই সত্য, কিন্তু কেমন বেধে যায়। একেবারে গোল্লায় গেচে—এখন ওকে ফিরিয়ে আনা-না-আনা দুই-ই সমান। কলকাতা গিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করে ওর বাসার একটা হদিস্ পেলেম। ভাবলেম, হয়ত বা এখনও ছেলেটাকে ফেরাতে পারবো। দু-দিন ওর সে বাসায় গিয়ে ওর দেখা না পেয়ে ফিরে এলেম। ওর পাশের ঘরে যে মেয়েটা থাকে—কোন্ জাতের মেয়ে সে ভেঙে না বললেও চলবে বোধ হয় —সে বল্লে, 'সমর বাবুর সাক্ষাৎ পাওয়া আজকাল খুব শক্ত ব্যাপার। কখন যে কোথায় থাকেন কিছুই বলা যায় না। আপনি কোন্ ফিল্ম কোম্পানী থেকে আসচেন?' পরিচয় দিতে সাহস হ'ল না, বললেম—'হুঁ, ফিল্ম কোম্পানী থেকেই আসচি বটে। আমরা একটা নতুন কোম্পানী খুলেচি কিনা—কিছু লোকের দরকার।' মেয়েটি সহসা প্রায় আমাকে জড়িয়ে ধরবার উপক্রম ক'রে বললে, 'আমাকে একটা চান্স দিতে পারেন না? সমর বাবু এতদিন শুধু আমাকে ব্লাফ্ দিয়েই এসেচেন—এখন তা আমি বেশ বুঝতে পারচি। কতদিন ওর মদের দাম জুগিয়েচি পর্য্যন্ত, তা ছাড়াও—ক্রট!' ক্ষণিকের জন্য স্তম্ভিত থেকে বললাম, 'এখন আমাদের আর কোন মেয়ের প্রয়োজন নেই, ভবিষ্যতে প্রয়োজন হ'লে তোমাকেই প্রথম খবর দেব।' মেয়েটির চোখে যে কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠল তা আমার মত আনাড়ির চোখেও ধরা পড়ে গেল। সে আমাকে তার ঘরের একখানা চেয়ারে বসতে ব'লে বললে, 'আপনি দু-দিন ধরে এখানে এসে ফিরে যাচ্ছেন, আজ একটু বসে অপেক্ষা করলে হয়ত সমর বাবুর সঙ্গে দেখাটা হয়েও যেতে পারে। আপনার জন্যে এক কাপ চা আনাই—কেমন?' সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠলেম, 'না, না, চা আমি বেশী খেতে পারি না, থাক্, ওর কোন দরকার নেই। আর তা ছাড়া আমার বসবারও সময় এখন নেই। কথা শেষ ক'রে বিদায় নিতে যাব এমন সময় মেয়েটি চীৎকার করে উঠল, 'আর বসতেও হবে না, ঐ তো মোটরের হর্ণ শোনা গেল—ও হর্ণ আমি শুনলেই চিনতে পারি—যাদব ফিল্ম কোম্পানীর বাসের হর্ণ।' মেয়েটির কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখলেম ওধার কাঠের সিঁড়িতে দেখতে পেলেম, শ্রীমান সমরকে ফিল্ম কোম্পানীর দু-জন লিন্-টানিয়ে চাকর-টাকর হবে বোধ করি—দু-পাশ থেকে ধরে ওপরে তুলচে। শ্রীমান সমর মদ খেয়েচে প্রচুর—একেবারে চুর হয়ে আছে। ওপরে উঠে এসে আমাকে সামনে দেখেই একবার—চোখ টেনে ভাল ক'রে দেখলে, তারপরে চোখ বুজেই বলে চলল, 'কে বাবা, পরমারাধ্য পিতৃদেব নাকি?…বাস্।' ঐখানেই সব শেষ।

মনোহর নীরব হইয়া গেল। তখন খালের বুক অন্ধকারে চাপা পড়িয়া গেছে। মনোহরের নৌকা আমার নৌকার এত কাছে থাকা সত্ত্বেও মনোহরকে আমি ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছিলাম না। মনে মনে ভাবিলাম, এ বরং ভালই হইয়াছে। মনোহর নিঃসঙ্কোচে চোখের জল কাপড়ে মুছিয়া ফেলিতে পারিবে, আমারও সেদিকে কোন বাধা রহিল না।

কিছুক্ষণ পরে বলিলাম—মনোহর, যাই বল, বাপ হওয়ার চেয়ে বড় দুঃখ বোধ করি জগতে আর কিছু নেই। তোমার ও চরণ ঘোষের দুঃখের কথা ভাবলে কার না ব্যথা ঘনায় মনে, বল দেখি?

মনোহর উত্তর দিল না।

আমি আবার বলিলাম—দেখ মনোহর, চরণ ঘোষের মেয়েটি দেখতে বড় হ'লে কি হয়, মেয়েটি গুণী আছে হে। তা যাই বলো, পছন্দ করবার মতই—শুধু যা একটু বড়। তা হোক্‌গে, কাল দেব একখানা চিঠি লিখে চরণ ঘোষকে। ছেলেটার বন্ধন একটা দরকার হে—আর এ মেয়েই তার উপযুক্ত। সেই ভাল, সেই ভাল!

তারপরে কেন জানি না—হয়ত আকাশ বাতাসের গুরু-গাম্ভীর্য্য হাল্কা করিয়া তুলিবার মানসেই অট্টহাসি হাসিয়া উঠিলাম; কিন্তু মৌনী মনোহরকে তথাপি মুখর করিয়া তুলিতে পারিলাম না।

বহড়ু গ্রামের কয়েকটি পুরাতন ভিত্তিচিত্র

শ্রীকালিদাস দত্ত

বাংলা দেশের কোথাও অজন্তা, ইলোরা, ও বাঘগুহা প্রভৃতি স্থানের মত প্রাচীন ভিত্তিচিত্রের নিদর্শন বর্ত্তমান নাই। এদেশের জলবায়ু অত্যধিক আর্দ্র এবং মন্দির ও গৃহাদি ইষ্টক-নির্ম্মিত হওয়ায় ঐ প্রকার চিত্র সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এখানে যে-সকল পুরাতন ভিত্তিচিত্র বিদ্যমান আছে সেগুলি খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কালের। এই চিত্রগুলি বেশী পুরাতন না হইলেও বাংলা দেশের প্রাচীন ভিত্তি চিত্রাঙ্কন-প্রথার সহিত এক্ষণে আমাদের পরিচিত হইবার প্রধান অবলম্বন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেবলমাত্র বাঁকুড়া জেলা ব্যতীত এ-প্রদেশের অন্য কোন অংশের এই প্রকার চিত্রের বিবরণ ও প্রতিলিপি এ-পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।

কিছুদিন পূর্ব্বে ২৪-পরগণা জেলায় বহড়ু গ্রামে একটি রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে আমি কতকগুলি এই জাতীয় চিত্র দেখিয়াছি। এই প্রবন্ধে উহাদের বিবরণ প্রকাশিত হইল। এই বহড়ু গ্রামটি অধুনা আলিপুর মহকুমার অন্তর্গত জয়নগর থানার অধীন এবং কলিকাতার প্রায় ত্রিশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এখানকার উক্ত মন্দিরটি চুনারের প্রস্তর দ্বারা পশ্চিমদেশীয় গৃহের আদর্শে নির্ম্মিত এবং শ্যামসুন্দরের মন্দির নামে প্রসিদ্ধ। বহড়ুর জমিদার বসু বাবুদের বাটীর কাগজপত্রে দেখা যায় যে, সন ১২৩২ সালের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ নন্দকুমার বসু কর্ত্তৃক উহা নির্ম্মিত হয়।

এই মন্দিরের সম্মুখস্থ দরদালানের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের দেওয়ালে ও মন্দিরগৃহের প্রবেশপথগুলির উপরিভাগে উল্লিখিত চিত্রগুলি এক প্রকার ঘন লেপের উপর অঙ্কিত আছে। ঐ লেপ বাংলা দেশের পুরাতন পটের জমির মত গোবর মাটি দিয়া প্রস্তুত নহে, উহা খড়ির ন্যায় একপ্রকার দ্রব্যের দ্বারা প্রস্তুত। ভিত্তি-চিত্রাঙ্কনে এইরূপ আস্তর দেওয়ার প্রথাও যে প্রাচীনকালে বাংলা দেশে ছিল তাহা এই চিত্রগুলি দেখিলে বুঝা যায়। অজন্তা ও বাঘগুহার কতকগুলি চিত্রেও এই প্রকার সাদা রঙের জমি আছে (রামগড় ও বাঘগুহা, শ্রীঅসিত কুমার হালদার পৃঃ ৩৩); তবে এখানে ব্যবহৃত আস্তর অজন্তা ও বাঘের ভিত্তি-চিত্রাঙ্কনে ব্যবহৃত আস্তরের মত একই উপাদানে প্রস্তুত কি না তাহা বলা কঠিন।

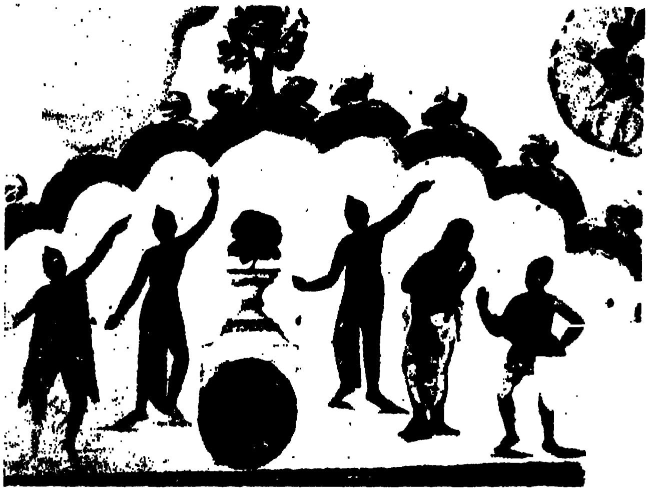
এই লেপের উপর একপ্রকার আঁটাল পদার্থের সংযোগে উক্ত চিত্রগুলি অঙ্কিত। উহাদের বর্ণবিন্যাস ও ধরণ (style) অনেকটা কালীঘাট প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন চিত্রাবলীর অনুরূপ। কিন্তু কালীঘাটের চিত্রে যেরূপ রেখার টানের বিশেষত্ব দেখা যায় ঐগুলিতে সেরূপ বিশেষত্ব নাই এবং কিছু আলো ও ছায়ার সমাবেশ আছে। এইরূপ অঙ্কন-রীতিও যে প্রাচীনকালে বাংলা দেশে ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ছিল এখন তাহার অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

প্রাচীন রীতি অনুসারে মন্দিরে দেবতা প্রত্যক্ষ করিবার পূর্ব্বে দেবলীলার সহিত দর্শকগণকে পরিচিত করাইয়া তাঁহাদের চিত্তকে রসার্দ্র করিবার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় ঐ চিত্রগুলি মন্দিরমধ্যে না দেখাইয়া দরদালানে অঙ্কিত হইয়াছিল। উহাদের মোট সংখ্যা আটাশটি, তন্মধ্যে দরদালানের পূর্ব্বদিকের দেওয়ালে তিন সারে তেরটি চিত্র আছে। এখানে উপরের সারে প্রথমেই দশ অবতারের মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে নবম অবতার বুদ্ধের পরিবর্ত্তে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের চিত্র অঙ্কিত আছে। তৎপার্শ্বে দ্বিতীয় চিত্রে বৈকুণ্ঠধামে সনক, সনন্দ ও দক্ষিণে সনাতন-সহ লক্ষ্মীনারায়ণের যুগলমূর্ত্তি ও তৎপরে তৃতীয় চিত্রে নারায়ণের অনন্তশয্যার দৃশ্য আছে। এই চিত্রগুলির নিম্নে, দ্বিতীয় সারে শ্রীচৈতন্যের ষড়ভুজ মূর্ত্তি, অষ্টসখীসহ রাধাকৃষ্ণের একটি বড় যুগলমূর্ত্তি, শ্রীরাধার

মানভঞ্জন, কৃষ্ণকালী ও হরিহর মূর্ত্তি যথাক্রমে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং সর্ব্বনিম্নে তৃতীয় সারে যশোদার শ্রীকৃষ্ণকে মাখনপ্রদান, যমলার্জ্জুনবধ, কৃষ্ণের মথুরায় গমন, বিশাখা কর্তৃক শ্রীরাধাকে চিত্র-প্রদর্শন ও কংসবধ অঙ্কিত আছে।

পশ্চিম দিকের দেওয়ালে বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ কুঞ্জসমূহের ও যমুনানদীর দৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। এই যমুনানদীর উপরেও কতক-গুলি কৃষ্ণলীলার চিত্র আছে। ইহাদের সংখ্যা প্রায় চল্লিশটি হইবে। এই দৃশ্যগুলির মধ্যস্থলে একটি চক্রের মধ্যে শ্রীরাধা ও অনৈক সখীসহ শ্রীকৃষ্ণের একটি বড় মূর্ত্তি আছে। চক্রের বেড়ের উপরও কৃষ্ণমূর্ত্তিসহ অষ্টসখীর চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সকল চক্রের নিম্নে বাংলা অক্ষরে চিত্রের নাম ও প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিও লিখিত আছে।

দরদালানের উত্তরে মন্দির-গৃহের পাঁচটি প্রবেশপথের উপরিভাগে নিম্নলিখিত চিত্র কয়েকটি অঙ্কিত আছে। ১। রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি, ২। চৈতন্য নিত্যানন্দ সংকীর্ত্তন, ৩। মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা নন্দকুমার বসুর পুত্র ও পুরোহিতের প্রতিকৃতিসহ গণেশ মূর্ত্তি, ৪। লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন



১। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ সংকীর্ত্তন

সহ রামসীতার মূর্ত্তি ও ৫। দুই পার্শ্বে নন্দী-ভৃঙ্গীসহ কৈলাসে বৃষোপরি উপবিষ্ট হরপার্ব্বতী-মূর্ত্তি।

বহুদিন পরিষ্কৃত না হওয়ায় এই চিত্রগুলি ক্রমশঃ ময়লা পড়িয়া অস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। শুনা যায়, বসুবাবুদের বাটীর পুরাতন কাগজে এগুলি দেশী উপায়ে পরিষ্কার করিবার পদ্ধতি লিখিত আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় উক্ত পদ্ধতি অনুসারে এ-পর্য্যন্ত কোন কাজ হয় নাই।



৩। বিশাখা কর্তৃক শ্রীরাধাকে চিত্র-প্রদর্শন

এই সকল চিত্রের মধ্যে তিন-খানি চিত্রের প্রতিলিপি ও বিস্তৃত পরিচয় এই প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত হইল।

প্রথমখানি মন্দিরের দ্বিতীয় প্রবেশপথের উপরিভাগে অঙ্কিত পূর্ব্বোক্ত চৈতন্য-নিত্যানন্দ সংকীর্ত্তনের

চিত্র। ইহাতে মহাপ্রভু সঙ্গিগণসহ মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন। ইহার বামদিকে যবন হরিদাস, তৎপরে নিত্যানন্দ, মধ্যে তুলসীমঞ্চ, তৎপার্শ্বে শ্রীচৈতন্য, অদ্বৈত ও অন্য একজন ভক্তের প্রতিকৃতি আছে। ভক্তগণ-



২। শ্রীচৈতন্যের ষড়ভুজ মূর্ত্তি

সহ মহাপ্রভুর এইরূপ উদ্দণ্ড নৃত্যের বর্ণনা চৈতন্য-ভাগবতের অনেক জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায়।

নিম্নে উক্ত পুস্তক হইতে এইরূপ একটি বর্ণনা উদ্ধৃত হইল। উহা হইতে এই চিত্রের মর্ম্ম অবগত হওয়া যাইবে।

উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
বিহ্বল হইয়া নৃত্য করে ভক্তগণ॥
ক্ষণেকে শ্রীগৌরচন্দ্র করিয়া হুঙ্কার।
উঠিয়া লাগিলা নৃত্য করিতে অপার॥
… … … … …
প্রভু করিয়াও কারো কিছু ভয় নাই।
প্রভু ভৃত্য সকলে নাচয়ে একঠাঁই।
প্রেমরসে মত্ত হই বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
নাচেন লইয়া সব প্রেম অনুচর॥

দ্বিতীয় চিত্রখানিও চৈতন্যলীলা-বিষয়ক। ইহা দরদালানের পূর্ব্বদিকের দেওয়ালের দ্বিতীয় সারে অঙ্কিত আছে। এই চিত্রখানিতে মহাপ্রভুর ষড়ভুজ মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। চৈতন্যভাগবতে দেখা যায়, পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত, পরমভক্ত, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে মহাপ্রভু ভাগবতের গূঢ়তত্ত্ব ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ষড়্ভুজ মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন। ভাগবতে উহার এইরূপ বর্ণনা আছে :—

ব্যাখ্যা শুনি সার্ব্বভৌম পরম বিস্মিত।
মনে গণে এই কিবা ঈশ্বর বিদিত।
শ্লোক ব্যাখ্যা করে প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
আত্মভাবে হইল ষড়ভুজ অবতার॥

অপূর্ব্ব ষড়ভুজ মূর্ত্তি কোটি সূর্য্যময়
দেখি মূর্চ্ছা গেল সার্ব্বভৌম মহাশয়॥
বিশাল করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন।
আনন্দে ষড়ভুজ গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥

এখানে চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবনদাস মহাপ্রভুর প্রতি ভক্তিবশতঃ তাঁহার মহিমা প্রচারার্থ তাঁহাকে খুব অপ্রাকৃতভাবে চিত্রিত করিলেও আমাদের দেশের চিত্রকর কিন্তু এই চিত্রে তাঁহাকে সে-ভাবে অঙ্কিত করেন নাই। তিনি ভাগবতের বর্ণনানুযায়ী মহাপ্রভুর ছয়টি হস্ত অঙ্কিত করিলেও, সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের মূর্চ্ছা হইবার মত হুঙ্কার ও গর্জ্জনে উন্মত্ত তাঁহার অতিপ্রাকৃত মূর্ত্তি না দেখাইয়া তাঁহাকে সুন্দর মানবরূপেই প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাঁহার এই প্রাকৃতিক মূর্ত্তির মধ্যেই দেবভাব ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন।*

ইহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের ছয় হস্তে যে-সমস্ত প্রহরণ দেখান হইয়াছে সেগুলির নরোত্তমের চৈতন্যমঙ্গলে বর্ণনার সহিত বেশ মিল আছে। নিম্নে চৈতন্যমঙ্গল হইতেও আমরা উক্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

হেনই সময়ে প্রভু ষড়ভুজ শরীর।
দেখি সার্ব্বভৌম হইল আনন্দে অস্থির।
ঊর্দ্ধ দুই হাতে ধরে ধনু আর শর।
মধ্য দুই হাতে ধরে মুরলী অধর।
নিম্ন দুই হাতে ধরে দণ্ড কমণ্ডলু।
দেখি সার্ব্বভৌম হইল আনন্দে বিহ্বল।

* অতিপ্রাকৃত মূর্ত্তিতেও এইরূপ মানবীয় ভাবের বিকাশ বাংলা দেশের শিল্পে খুব প্রাচীনকাল হইতেই দেখা যায়। এদেশে আবিষ্কৃত পালরাজত্বকালের বহু মুখ ও হস্তপদাদি যুক্ত বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর অতিপ্রাকৃত মূর্ত্তিগুলিই উহার চাক্ষুষ নিদর্শন।

তৃতীয় চিত্রখানি শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধীয়। ইহাও দরদালানের পূর্ব্বদিকের দেওয়ালে আছে। ইহাতে দেখা যায়, শ্রীরাধিকার অষ্টসখীর মধ্যে দ্বিতীয়া সখী বিশাখা তাঁহাকে দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণের চিত্র নিজে আঁকিয়া দেখাইয়াছেন এবং উহা দেখিয়া শ্রীরাধা কৃষ্ণবিরহে কাতরা হইয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহড়ু হাই স্কুলের জনৈক ছাত্র পেনসিল ঘষিয়া রাধার মুখখানি কাল ও বিকৃত করিয়া দিয়াছে। ঠোটের উপর ও মুখের চতুর্দ্দিকে পেন্‌সিলের কাল দাগ এত বেশী ছিল যে, আমরা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও উহা একেবারে উঠাইতে পারি নাই।

এই চিত্রখানির নিকটে পূর্ব্বোল্লিখিত অষ্টসখী সহ রাধাকৃষ্ণের বড় যুগলমূর্ত্তির নিম্নে বাংলা অক্ষরে লিখিত একছত্র একটি লিপি আছে। উহা পাঠে জানা যায় যে, দুর্গারাম ভাস্কর নামে জনৈক শিল্পী কর্ত্তৃক উক্ত চিত্রগুলি অঙ্কিত হয়। বাংলা দেশে পূর্ব্বে একদল চিত্রকরের এইরূপ ভাস্কর উপাধি ছিল। প্রবাদ, উহাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা প্রাচীনকালে ভাস্করের কাজ করিত, পরে ঐ ব্যবসা লোপ পাইলে পুরুষানুক্রমে ছবি আঁকিত। এখনও এ-প্রদেশে এই নামে পরিচিত কতকগুলি চিত্রকরকে প্রাচীন রীতিতে প্রতিমার চালচিত্র আঁকিতে দেখা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কয়েক বৎসর হইল ইউরোপ হইতে ছাপা চালচিত্রের আমদানী হওয়ায় ইহাদেরও ব্যবসা লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময় বহড়ুর উক্ত মন্দিরটি দেবোত্তর সম্পত্তিরূপে রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে আছে। এই মন্দির প্রতিষ্ঠাতা পূর্ব্বোল্লিখিত নন্দকুমার বসু ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলা দেশে যে-সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন তন্মধ্যে উক্ত নন্দকুমার বসুও একজন। তাঁহার পিতা রামচরণ বসু কাশিমবাজারের কান্তবাবুর ষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। নন্দকুমার প্রথমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মণ্ডলঘাটের রেশমকুঠীর আড়ং গোমস্তা-রূপে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। তৎপরে ঐ কার্য্যে উন্নতি দেখাইয়া ক্রমশঃ উক্ত কুঠীর দেওয়ান নিযুক্ত হন। ঐ সময় তাঁহার কার্য্যকুশলতায় সন্তুষ্ট হইয়া তৎকালীন ইংরেজ কোম্পানীর গভর্ণর-জেনারেল তাঁহাকে পাচ হাজার টাকা পারিতোষিক প্রদান করেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি কলিকাতার কাষ্টমস্ হাউসের দেওয়ানী পদে উন্নীত হন। সন ১২৪১ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি জীবনে বহু সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন। চুনার হইতে পাথর ও মিস্ত্রী আনাইয়া বহড়ুর মন্দিরটিও তিনি বহুব্যয়ে নির্ম্মাণ করান।

মাতৃ-ঋণ

শ্রীসীতা দেবী

১৮

জ্ঞানদা যখন যে কাজে একবার মাতিয়া উঠেন, তাহার চূড়ান্ত ব্যবস্থা না করিয়া থামেন না। সুরেশ্বরকে চা খাওয়াইবার ব্যাপারে তিনি এত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং স্বামীকে এত ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন, যে, মেয়ের বিবাহপক্ষেও সেটা অতিরিক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারিত। গৃহসজ্জা, আসবাব ড্রয়িংরুমের দেওয়ালের অবস্থা, মেঝের অবস্থা, চায়ের পেয়ালা, সব ক'টারই তাঁহার মতে সংস্কার প্রয়োজন। কিন্তু তাহাতে ত অত্যন্ত বেশী খরচ পড়িবে, তিনি হিসাবী গৃহিণী সে-কথাটাও ভাবেন।

নৃপেন্দ্রবাবু উত্যক্ত হইয়া শেষে বলিলেন, "দুই দিকই ত রাখা যায় না? হয় খরচ কর, না হয় যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাক, এর ভিতর মাঝামাঝি ব্যবস্থা হবার উপায় কি?"

জ্ঞানদা বলিলেন, "মাথা খাটালেই উপায় বার করা যায়। উপায় কি আর আকাশ থেকে পড়বে? আমি বল্‌ছি কি, সারাবাড়ি চুনকাম করবার দরকার কি? বাড়ির সামনেটা আর ড্রয়িংরুমটা করলেই ঢের হবে। এ ত আর মেয়েমানুষ নয় যে বেড়াতে এসে সারা বাড়ি চষে বেড়াবে। তাকে যেখানে বসাব সেইখানেই বসবে।"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আমি ত চুনকামের কোন দরকার দেখছি না, বাড়ি বেশ পরিষ্কারই আছে। সুরেশ্বরকে না হয় তুমি এক জায়গায় বসিয়ে রাখলে, তার ছোটভাইকে ত পারবে না, সে ত খোকার সঙ্গে সারাবাড়ি ঘুরবেই। তাকে ঠেকাবে কি করে? বাকি সব ঘরে তালা দিয়ে রাখবে?"

তাঁহাকে ঠাট্টা করার আভাস মাত্র পাইলেই জ্ঞানদা চটিয়া আগুন হইয়া যাইতেন। তিনি কড়া সুরে বলিলেন, "আচ্ছা, তালা দিই কি চাবি দিই সে আমি বুঝব। তোমাকে কোনো কথা বলতে যাওয়াই ঝকমারি। তোমায় কিছু করতে হবে না, যাও নিজের কাজে। আমি একলাই যা পারি করব। সব দায় আমার একলারই কি-না।"

নিজের কাজে যাইতে পারিলে নৃপেন্দ্রবাবু বর্তিয়া যান, পত্নীর বিলিব্যবস্থার অর্দ্ধেক তিনি বুঝিতেও পারেন না, এবং সে-সকল তাঁহার ভালও লাগে না। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে বাহির হইয়া চলিলেন। জ্ঞানদা পিছন হইতে বলিলেন, "একখানা চেক লিখে যেও এক-শ টাকার, আমি আনিয়ে নেব এখন।"

নৃপেন্দ্রবাবু মাঝপথে থামিয়া বলিলেন, "দুটো মানুষকে চা খাওয়াতে লাগবে এক-শ টাকা? তুমি আমায় অবাক করলে।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "দুপয়সা যে ব্যাঙ্কে জমেছে সেটা কার কল্যাণে শুনি? আমি বেটি যদি যক্ষির মত সব আগলে বসে না থাকতাম, তাহলে হ'ত তোমার টাকা আর হ'ত তোমার বাড়ি। যদি এক-শটা টাকা নিজের সখে খরচই করি, সেটা কি এমন অন্যায় হয়?"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "কিসের থেকে কি কথা যে তোমার মাথায় আসে তার ঠিকানা নেই। যা খুশী কর গিয়ে। লোক হাসাবার ব্যবস্থা একটা না ক'রে তুমি যখন ছাড়বে না, তখন আমি আর কি করব?" জ্ঞানদার উত্তর শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই তিনি দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

জ্ঞানদা চিরকাল সব ব্যবস্থা একলাই করিয়াছেন, এবারেও একলাই করিতে লাগিলেন। মিস্ত্রি ডাকিয়া ড্রয়িংরুম, ল্যাণ্ডিং ও বাড়ির বাহিরটা মেরামত ও চুনকাম হইয়া গেল। অন্য অংশগুলি ইহাতে আরও বেশী করিয়া শ্রীহীন দেখাইতে লাগিল, কিন্তু জ্ঞানদা সে-বিষয়ে কাহাকেও কোনো মন্তব্য করিতে দিলেন না

গৃহসজ্জা বা আসবাব বদল করা অতিশয় ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, সেটা আর হইয়া উঠিল না। বসিবার ঘরের মাঝখানে যে ছোট গোল টেবিলটা ছিল, তাহার জন্ম জরির কাজকরা একটা কাশ্মীরী টেবিলঢাকা কিনিয়া ও পুরাতন কার্পেটটাকে মেরামত ও নূতন করিয়া রং করাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত হইতে হইল। আগাগোড়া চায়ের বাসন নূতন করা গেল না, একটা ভাল সেট-এর ভগ্নাবশেষের সঙ্গে একটা রূপার প্লেটিং-করা টি-পট চিনি ও দুধের পাত্র জোড়া দিয়া একটা কাজ চালান সেট তৈয়ারী হইল। জ্ঞানদা মনকে প্রবোধ দিলেন যে, পাড়াগাঁয়ের জমিদারের ছেলে তাঁহার এ চালাকিটুকু বুঝিতে পারিবে না। তাহারা ত আর রোজ লাট-সাহেবের বাড়ি চা খায় না?

কি কি খাবার করা হইবে, কোন্‌টা বাড়িতে প্রস্তুত হইবে, কোন্‌টা বাহির হইতে কিনিয়া আনিতে হইবে, তাহার ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। এই দারুণ গ্রীষ্মে এই অল্প সময়ের মধ্যে এত কাণ্ড করিতে তাঁহাকে দারুণ পরিশ্রম করিতে হইল, কিন্তু সে-সব তিনি গায়েই রাখিলেন না। যাহা তিনি করিতে চান, তাহা যে কাহারও বিনা সাহায্যেই সম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারেন, তাহা প্রমাণ করিবার জন্ম তাঁহার জেদ চড়িয়া গিয়াছিল।

যাহার জন্ম এত কাণ্ড সেই যামিনী দেখিয়া শুনিয়া আরও যেন মনমারা হইয়া গেল। মা তাহাকে কোন কথা বলেন না, কাজেই সেও কোন কথা বলিবার সুযোগ পায় না। নিজে হইতে গিয়া এ বিষয়ে মায়ের সঙ্গে কথা বলা তাহার কোষ্ঠীতে লেখে নাই। জ্ঞানদার পরিশ্রমের বহর দেখিয়া সে মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু মায়ের মেজাজের অবস্থা দেখিয়া সে-বিষয়েও কিছু বলিতে সাহস করিল না।

শনিবার দেখিতে দেখিতে আসিয়া পড়িল। সকাল হইতে জ্ঞানদা একেবারে ঝি চাকর ছেলেমেয়ে সকলকে অস্থির করিয়া তুলিলেন। একমাত্র মিহিরের যা-ও একটু সহানুভূতি এ ব্যাপারটায় দেখা গেল, আর কোনো কারণে নয়, শিশির আসিবে বলিয়া। এবং শিশির যদি আসিয়া একবার তাহাদের বাড়ি চা খাইয়া যায়, তাহা হইলে ফিরিয়া একবার মিহিরকে খাওয়াইতে বাধ্যই হইবে, সে-কথাটাও মনে মনে ভাবিয়া লইল।

জ্ঞানদা অস্থির হইয়া বেড়াইতেছেন, একটা লোকের অভাবে। বাড়িতে চাকর মাত্র দু-জন, আয়া আছে অবশ্য, কিন্তু তাহাকে দিয়া বাহিরের কাজ বা রান্নাঘরের কাজ হইবার জো নাই। সে তাঁহার নির্দ্দেশমত বাড়ি-ঘর ঘষিয়া-মাজিয়া তকতকে-ঝকঝকে করিয়া তুলিতেছে। এদিকে আইসক্রীম্ জমাইবার যন্ত্রটা তাঁহার এক বন্ধুর বাড়ি হইতে নিতান্তই আনান দরকার। কাহাকেই বা পাঠান যায়? সহিস্ গিয়াছে নিউ মার্কেটে এবং কোচ্‌ম্যান লক্ষ্মীছাড়া এমনই হাঁদা যে তাহাকে দিয়া জগতের কোনো কাজই হয় না।

মিহির অবশেষে গোঁজ মুখ করিয়া আসিয়া বলিল, "আচ্ছা, চিঠি লিখে দাও, আমি যাচ্ছি।"

জ্ঞানদা আকাশ হইতে পড়িয়া বলিলেন, হঠাৎ তোমার এ-রকম সুমতি হল যে?

মিহির বলিল, "না গিয়ে আর করি কি? যা তুমি সুরু করেছ", বলিয়া চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া গট্ গট্ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

তখন বেলা সাড়ে দশটা বাজে। নৃপেন্দ্রবাবু আজ ট্রামে করিয়াই কর্ম্মস্থলে প্রস্থান করিলেন, কারণ গাড়ী আজ আর পাইবার উপায় নাই। জ্ঞানদা তাঁহার টাকা পয়সা, রুমাল মনিব্যাগ প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য হাতে হাতে গুছাইয়া দিয়া উপরে উঠিতে যাইবেন, এমন সময় মাথাটা তাঁহার বন্ বন্ করিয়া ঘুরিয়া উঠিল। "আয়া" বলিয়া চীৎকার করিয়া সিঁড়ির নীচের ধাপে তিনি বসিয়া পড়িলেন।

আয়া ড্রয়িংরুমের শার্সি খড়খড়ি পরিষ্কার করিতে ব্যস্ত ছিল, গৃহিণীর ডাক শুনিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। যামিনীও স্নান করিবার জন্ম চুল খুলিয়া তেল মাখিতেছিল, সেও মায়ের অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর শুনিয়া ছুটিয়া নামিয়া আসিল।

জ্ঞানদা তখন সিঁড়ির রেলিং ধরিয়া বসিয়া হাঁপাইতেছেন। তাঁহার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছে।

আয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ক্যা হুয়া মাজী? তবিয়ৎ খারাব মালুম হোতা?"

যামিনী ব্যস্ত হইয়া বলিল, "মা কি হয়েছে? মাথায় জল দেব?"

জ্ঞানদা ধরা-গলায় বলিলেন, "দাও। শরীর কেমন করছে যেন।"

আয়া তাড়াতাড়ি রান্নাঘর হইতে একখানা ভাঙা হাতপাখা আনিয়া তাঁহার মাথায় বাতাস করিতে লাগিল। যামিনী জল আনিয়া তাঁহার মাথায় দিতে লাগিল। ছোট্টুকে বরফ আনিতে দৌড় করাইয়া দিল। এত অসুস্থতার মধ্যেও জ্ঞানদার গৃহিণীপনা হার মানিতে চায় না। তিনি বলিলেন, "একেবারে আইসক্রীমের বরফেরও পয়সা ঐ সঙ্গে দিয়ে দে। এক জায়গায় মানুষ ক'বার যাবে? আর আয়া এ জায়গাটা ভাল ক'রে মুছে ফেল্‌বে, যেন সিঁড়ির গোড়াতেই একগাদা জল কাদা হয়ে থাকে না।"

যামিনী বলিল, "ও-সব ভাবনা এখন থাক মা। আগে সুস্থ হয়ে ওঠ, না হয় ওঁদের চা খাওয়া যেমন-তেমন করে হবে, তাই বলে তুমি কি মরবে? ডাক্তারবাবু তোমায় একেবারে বিশ্রাম করতে বলেছেন, আর তুমি কি কাণ্ড করছ বল দেখি? ফের যদি সেবারের মত হয়?" বলিতে বলিতে তাহার গলা ধরিয়া গেল, দুই চোখ জল ভরিয়া উঠিল। সেদিনকার কথায় কাহাকে তাহার বেশী করিয়াই মনে পড়িয়া গেল বা?

জ্ঞানদা বলিলেন, "ও-সব তোমরা বুঝবে না বাছা, ওসব কথায় আর কাজ কি? মেয়েমানুষ একবার সংসার মাথায় করলে, আর ছেলেপিলের মা হ'লে কখনও আর বিশ্রাম পায় না। এক মরলে তাদের বিশ্রাম। আমার যাই হোক, আজকের কাজ আমায় উপযুক্ত ক'রে করতে হবে। না হলে কারো কাছে কোনোদিন আর মুখ দেখাতে পারব না। তুমি আমায় একটু খাবার জল এনে দাও।"

মায়ের চেহারা তখনও আশঙ্কাজনক। যামিনী চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "না মা, কাজ নেই। তুমি আমায় বলে দাও, কি কি করতে হবে, আমি যেমন ক'রে পারি করব।"

জ্ঞানদার মনটা হঠাৎ যেন গলে গেল। বহুদিনের অব্যবহৃত আদরের নামে যামিনীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "তুই পারবি বুড়ু?"

যামিনী মন শক্ত করিয়া বলিল, "পারব মা, তুমি উপরে গিয়ে শোবে চল, তারপর আমাকে বলে দাও কি কি করতে হবে, আমি না হয় কাগজে লিখে রাখব।"

জ্ঞানদা মেয়ের হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে তাঁহার শয়নকক্ষে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। তাহার পর এক এক করিয়া মেয়েকে সব কাজ বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। পাছে ভুল হয় এই ভয়ে যামিনী সত্যই সব কাগজে লিখিয়া লইল।

কাগজে লেখা সত্ত্বেও সব কাজ তাহাকে দিয়া হইয়া উঠিত কি-না সন্দেহ, তবে নৃপেন্দ্রবাবু সকাল সকাল বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে খানিকটা বাঁচাইয়া দিলেন। স্ত্রীর অবস্থার কথা শুনিয়া বলিলেন, "এ-রকম যে হবে তা মনে মনে আশঙ্কাই করছিলাম, তোমার মা কারো কথা ত শুন্‌বেন না।"

জ্ঞানদা ইহারই ভিতর প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া দু-তিনবার উঠিয়াছেন, তবে নীচে নামিতে আর পারেন নাই। যামিনী ডাক্তারবাবুকে ডাকাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তিনি আসিয়া পাছে জ্ঞানদাকে একেবারে শয়নকক্ষে আটক করেন, এই ভয়ে জ্ঞানদা তাঁহাকে খবর দিতে রাজী হন নাই। আজকার ব্যাপার ভালয় ভালয় চুকিয়া যাক, তাহার পর যত খুশী ডাক্তার কবিরাজ ডাকিলেই চলিবে।

নৃপেন্দ্রবাবু কাপড় ছাড়িতে এবং পত্নীর খোঁজ করিতে উপরে উঠিয়া গেলেন। জ্ঞানদা তখন আর শুইয়া নাই, বালিশ ঠেশ দিয়া উঠিয়া বসিয়াছেন। নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "যা শরীরে সয় না, তা করতে যাওয়া কেন বল ত? এই সেদিন অমন দারুণ অসুখ থেকে উঠলে?"

জ্ঞানদা গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমার অসুখ ব'লে সংসারের সব কাজ আটকে থাকবে নাকি? আমার শরীর আর ভাল কবে?"

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের ঐতিহাসিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা তখন ছিল না। তিনি বলিলেন, "ভাল যখন নয়, তখন অনাবশ্যক হাঙ্গাম করতে যাও কেন? যা না হ'লে নয়, সেইটুকু করলেই হয়।"

জ্ঞানদা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কি যে না হ'লে নয়, সে-বিষয়ে তোমার আর আমার মতে মিল্‌বে না। যখন, তখন তা নিয়ে তর্ক করে আর হবে কি? তর্ক করবার মত শরীরের অবস্থাও আর আমার নেই। বরং মেয়েটাকে কাজে একটু সাহায্য কর গিয়ে। ছেলে-মানুষ হাবুডুবু খাচ্ছে একেবারে, কোন জন্মে এ সব ত তাকে করতে হয় নি?"

নৃপেন্দ্রবাবু আপিসের কাপড় ছাড়িয়া ধুতি পাঞ্জাবী পরিয়া বাহির হইয়া চলিলেন। জ্ঞানদা আবার তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ সাড়ে চারটায় ওদের আসবার কথা। অন্ততঃ সাড়ে তিনটায় যামিনীকে উপরে পাঠিয়ে দেবে, কাপড় পরতে, গা ধুতে। যাকে দেখতে আস্‌ছে, সে-ই যেন তাদের সামনে কালি ঝুলি মেখে, ভূত সেজে হাজির না হয়। তাহ'লে আমার এত পরিশ্রম সব মাটি হবে। আর দেখ, মাংসের সিঙাড়া তুমি নিজে একটা চেখে দেখবে, পুরটা তৈরি হলেই চেখে দেখবে, তাতে যেন একরাশ নুন দিয়ে না বসে। আইসক্রীমটাও দাঁড়িয়ে থেকে করাতে হবে যেন এক গাদা ভ্যানিলা ঢেলে অখাদ্য না ক'রে রাখে।"

স্ত্রীর কথা শেষ হইবার আগেই নৃপেন্দ্রবাবু নীচে পৌঁছিয়া গেলেন। যামিনী তখন ভাঁড়ারের আলমারী খুলিয়া পাচককে ঘি ময়দা, চিনি চা সব মাপিয়া বাহির করিয়া দিতেছে। নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "মা, এই আড়াইটে বেজেছে আমার ঘড়িতে দেখে রাখ। সাড়ে তিনটায় তোমার মা তোমাকে উপরে যেতে বলেছেন, কাপড় পরে তৈরি হবার জন্যে। দেরি যেন না হয়।. আর যা কাজ বাকি থাকবে তা আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে যেও, আমি করব।"

যামিনী বলিল, "আচ্ছা বাবা। সব কাজ প্রায় হয়ে এসেছে, বেশী বাকি নেই।"

কাজ একরকম করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল। জ্ঞানদার চোখ পড়িলে সব কিছুর ভিতরেই অসংখ্য খুঁৎ বাহির হইয়া পড়িত, কিন্তু সেগুলি অন্য কাহারও চোখে বিশেষ পড়িল না।

নৃপেন্দ্রবাবু স্ত্রীর আদেশমত সিঙাড়ার পুর চাখিয়া দেখা, আইসক্রীমের ভ্যানিলার পর্য্যবেক্ষণ করা, সবই করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ড্রয়িংরুমেও একবার উঁকি মারিয়া দেখিলেন। কয়েকটি দামী ফুলদানী জ্ঞানদা সচরাচর তুলিয়া রাখিতেন, আজ সেগুলি বাহির করিতে আদেশ দিয়াছেন, এক সেট বিলাতী মস্‌লিনের বাহারে পরদাও তোলা থাকিত আজ সেগুলিও বাহির হইয়াছে। যামিনী ফুলদানীতে ফুল সাজাইয়া এখানে-ওখানে রাখিতেছে। নৃপেন্দ্রবাবু মেয়েকে আবার মনে করাইয়া দিলেন, "মা সাড়ে তিনটে বাজে যে?"

যামিনী বলিল, "এই যাচ্ছি বাবা।" শেষ ফুলদানীটা পিয়ানোর মাথার উপর বসাইয়া দিয়া সে তাড়াতাড়ি উপরে চলিয়া গেল।

মনটার ভিতর তাহার যেন পাথরের মত ভার চাপিয়া আছে। তবু তাহাকে সাজিতে হইবে, হাসিয়া কথা বলিতে হইবে। না হইলে রুগ্না অসুস্থা মাতার অমঙ্গল ডাকিয়া আনা হইবে। তিনি যামিনীর বুকে শেলের আঘাত করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই, কিন্তু যামিনী ত প্রতিশোধ তুলিবার কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না। তাহার সবচেয়ে ভালবাসার নিধি যে ছিল, অকরুণ ভাগ্য তাহাকে ত কঠিন হাতে দূরে সরাইয়া দিল, যামিনীর জগৎ হইতে সে আজ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাতে যামিনীর মন আরও যেন দুর্ব্বল, আরও অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। মনের বল অতি সামান্যই তাহার ছিল, সেটুকুও যেন সে এখন হারাইয়া ফেলিয়াছে। প্রচণ্ড আঘাতে তাহার হৃদয় মন এত বিকল যে আরও আঘাত পাইবার সম্ভাবনামাত্রেই সে যেন শিহরিয়া ওঠে।

জ্ঞানদা পাশের ঘর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "কই কি কাপড় বার করলি, দেখি একবার।"

যামিনী অগত্যা কাপড় জামা উঠাইয়া লইয়া মাকে দেখাইতে আসিল। জ্ঞানদা বলিলেন, "এ কি? সুতী

কাপড় পরছিস কেন? একখানা রেশমের শাড়ী বার কর।"

যামিনী ক্ষীণ আপত্তি করিয়া বলিল, "বাড়িতেই ত, অত সেজে কি হবে?"

জ্ঞানদা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা না হয় একবার আমার কথাটাই শোনো না? সব বিষয়েই কি তোমরা আমার চেয়ে ভাল বোঝ?"

যামিনী আবার কাপড় লইয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল। রেশমের শাড়ী বাহির করিল, গহনা বাহির করিল, ভাল করিয়া সাজিয়া-গুজিয়া মাকে দেখাইতে আসিয়া দাঁড়াইল।

জ্ঞানদা খুশী হইয়া বলিল, "এবার বেশ হয়েছে। সারে চারটে ত বাজে। নীচে যাও এবার। খাবার-টাবার সব আনান গোছান হয়েছে ত?"

যামিনী বলিল, "সব ত গুছিয়ে এসেছি। দু-একটা বাকি ছিল, যাচ্ছি দেখতে ছোট্টু ঠিক করেছে কি-না।

জ্ঞানদা বলিলেন, "যাও, তোমার বাবা আবার হট করে বেরিয়ে না যান, সেদিকে খেয়াল রেখো। যা ভালকাণা মানুষ।"

যামিনী আস্তে আস্তে নামিয়া গেল। চারিদিকে চোখ বুলাইয়া দেখিল, কোথাও কোনো ত্রুটি আছে কি-না। তাহার চোখে ত কিছু ধরা পড়িল না। মহিলা অভ্যাগতা কেহ আসিতেছেন না, ইহাতে সে একটু খুশী হইল। তাঁহাদের চোখে কিছুই এড়ায় না আবার। সেদিক দিয়া পুরুষ জাতিটি বরং ভাল।

সুরেশ্বর রায় গোঁড়া হিন্দু পরিবারের ছেলে। পৈত্রিক জমিদারী ও ভদ্রাসন ছাড়িয়া তাহার এক পুরুষ আগে পর্য্যন্ত কেহ কোনোদিকে বাহির হয় নাই। এমন কি পড়াশুনা করিবার জন্যও কলিকাতায় আসা তাহাদের বংশের রীতি ছিল না। ঘরে বসিয়া মাষ্টারের সাহায্যে যেটুকু পড়া যায় ততটাই তাহাদের পড়া হইত। ইহাই যে তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট, এ-বিষয়ে কাহারও মতভেদ ছিল না।

ব্যতিক্রম হইল প্রথম সুরেশ্বরের বেলায়। তাহার মা এমন এক পরিবার হইতে আসিয়াছিলেন, যেখানে পুরুষদের অন্ততঃ লেখাপড়া ভাল করিয়া করাটা প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকৃত হইত। তাঁহার ছেলে যে একটাও পাস না করিয়া গেঁয়ো হইয়া থাকিবে, মামাতো ভাইদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে বার-বার হারিয়া যাইবে, ইহা তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। স্বামীর অনেক খোঁটা, অনেক বকুনি খাইয়াও তিনি হাল ছাড়েন নাই। অবশেষে নিতান্তই আর না পারিয়া উঠিয়া সুরেশ্বরের পিতা ছেলেদের কলিকাতায় পাঠাইয়া স্কুল-কলেজে পড়াইতে রাজী হইয়াছিলেন। এখানেও তাহারা যথাসম্ভব জমিদার-পুত্রের চাল বজায় রাখিয়া চলিত। বাড়ি ভাড়া করিয়া ঠাকুর চাকর ও পুরাতন আমলা রামদুলালকে লইয়া বাস করিত এবং বাড়ির গাড়ী চড়িয়া স্কুলে যাইত। প্রথম প্রথম এ লইয়া তাহাদের কোনো সঙ্কোচ ছিল না। কিন্তু স্কুলের ছেলেরা জগতের সর্ব্বপ্রধান সাধারণতন্ত্রী, তাহাদের উপহাস, বিদ্রূপ এবং মাঝে মাঝে তদপেক্ষা গুরুতর ব্যবহারগুলির কল্যাণে ক্রমে সুরেশ্বর বুঝিতে আরম্ভ করিল যে, তাহার পিতার জমিদারীকে কলিকাতায় বহন করিয়া আনিতে সে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়াছে। শিশির যখন বড় হইয়া কলিকাতায় আসিল, তখন দেখিল দাদা একেবারেই শহুরে-বাবু হইয়া গিয়াছে। ফিরিঙ্গীআনার দিকে ঝোঁক পুরাদস্তুর, সিগারেট খাইতে শিখিয়াছে এবং বাড়ি থাকিতে হিন্দুয়ানীর যা দু-একটা উপসর্গ তাহার ছিল, সেগুলি নিঃশেষে বিসর্জ্জন দিয়াছে।

মা বাবা অবিলম্বে খবর পাইলেন। পিতা তখন অত্যন্ত অসুস্থ, গৃহিণীকে একটু বাক্যবাণে জর্জ্জর করিয়াই তিনি নিরস্ত হইলেন। গৃহিণী কিছু বলিলেন না, কারণ বলিবার কিছু ছিল না। ইংরেজী লেখা-পড়াও শিখিবে, কলিকাতায় বাসও করিবে, আবার সম্পূর্ণ আচারনিষ্ঠ হিন্দুও থাকিবে, ইহা যে হইবার নয়, তাহা তিনি মনে মনে জানিতেন।

সুরেশ্বরের অহিন্দুয়ানী ক্রমে বাড়িয়া চলিল। তাহাদের বংশে সকলেই কুড়ি বৎসর বয়সের মধ্যে বিবাহ করিয়া পাকা গৃহী হইয়াছে, তাহার জন্য অর্দ্ধেক রাজত্ব ও রাজ-

কন্যার সন্ধান আরম্ভ হইবামাত্রই সে বাঁকিয়া বসিল। বাবার অসুখ, নিজের পরীক্ষা আসন্ন ইত্যাদি নানা বাজে ওজর দেখাইতে লাগিল। আসল কথা রাজকন্যাটির বয়স যে এগারো এবং গায়ের রঙটি কালো, ইংরেজী বর্ণমালার সহিতও পরিচয় নাই, সে খবর সে গোপনে পাইয়াছিল। বিবাহ সম্বন্ধে যে সে নিজের কল্পনাকে কত পথে বিপথে দৌড় করাইতেছে, তাহা সে নিজে ভিন্ন আর কেহ ভাল করিয়া জানিত না। বন্ধুবান্ধবরা খানিক আভাস পাইত বটে। তাহারা ঠাট্টা করিত "মুখে যাই বল বাপু, কাজের বেলা তুমিও বাপের সুপুত্তর হয়ে একটি চেলীর পুঁটলি আর একটি টাকার পুঁটলি ঘরে নিয়ে আসবে। মেমসাহেব বিয়ে করবার সখ সকলেরই হয় বটে, তবে ঐ সখ পর্য্যন্তই।"

সুরেশ্বর বলিত, "মেমসাহেব বিয়ে করব এ-রকম সখ তোমরা আমার কবে দেখলে? আমাদের দেশের মেয়েই কি বিদ্যাবুদ্ধিতে ওদের সমান হ'তে পারে না?" সঙ্গীরা বলিত, "সোনার পাথরবাটি জিনিষটাই সব চেয়ে দুষ্প্রাপ্য।"

এইভাবে বেশ কিছুদিন কাটিয়া গেল। পিতা মারা গেলেন এবং সুরেশ্বর জমিদার হইল। শিশির এখনও নিতান্তই নাবালক, কাজেই সুরেশ্বরই অখণ্ড প্রভুত্ব করিতে লাগিল। মাকে লইয়া একটু গোলমাল বাধিবে এ আশঙ্কা তাহার ছিল, কিন্তু মা যেন ছেলেদের মনের ভাব বুঝিয়াই পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। ছেলেরা দেশের সংসার একরকম ভুলিয়া দিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিল। নিতান্ত যে দুই-চারি জন দুস্থ আত্মীয়-আত্মীয়ার জগতে আর কোথাও যাইবার স্থান ছিল না, তাহারাই দেশের ভিটা আঁকড়াইয়া পড়িয়া রহিল। মা ছেলেদের সঙ্গে কলিকাতায় আসিলেন বটে, কিন্তু এখানে তাঁহার মন সারাক্ষণ অধীর হইয়া ছটফট করিতে লাগিল। এ কারাগারে তিনি থাকিতে পারিবেন না, হোক না সে কারাগার স্বর্ণের। মাস দুই ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি কাশী গিয়া থাকিবার প্রস্তাব তুলিলেন। সুরেশ্বর বিশেষ আপত্তি করিল না।

এখানে তাহাদের নিজের একখানা বাড়ি করিবার ইচ্ছা, তবে যতদিন না হয় ততদিনের জন্য ভাল দেখিয়া একটা বাড়ি সে ভাড়া করিল। সেটাকে সাজাইবার জন্য টাকা খরচ করিল যথেষ্ট, কিন্তু যা ব্যাপার দাঁড়াইল, তাহাতে সে খুশী হইল। চিরকাল একলা-একলা কাটাইয়াছে, পুরুষ সঙ্গী ভিন্ন কোনো নারীর সাহচর্য্য সে লাভ করে নাই, ভাড়াটে বাড়িকে কি ভাবে সুন্দর গৃহে পরিণত করিতে হয়, সে বিদ্যা তাহার জানা ছিল না। মা এ সবে একেবারে হাত দিলেন না। সংসার হইতে খসিয়া পড়িবার জন্য তিনি একেবারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বন্ধুরা পরামর্শ দিল, "মেমসাহেব জুটিয়ে আন, দেখতে দেখতে বাড়ির চেহারা বদলে যাবে।"

সুরেশ্বর বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিল না। বিবাহ করিতে চাহিলে এখনই তাহার পাঁচ শত সম্বন্ধ আসিয়া জুটিবে, কিন্তু সে যেমনটি চায় তেমন কোথায় পাওয়া যাইবে? শুধু যে ঘর সাজাইতে জানিবে তাহা নয়, তাহার নিজের পদার্পণেই ঘর সাজিয়া উঠিবে। এমন হইবে সে, যে, বন্ধুবান্ধবকে ডাকিয়া দেখাইতে সুরেশ্বরের বুক দশহাত হইয়া উঠিবে। শুধু হীরা জহরৎ, বেনারসী শাড়ীর স্তূপ নয়, ভিতরের জ্যোতি তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া বিচ্ছুরিত হইবে। সাহেব মেম কাহারও সামনে সে দমিবে না, সুরেশ্বরকেই বরং পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে। এমন কাহাকেও যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে সুরেশ্বর এখনই গলায় ফুলের ফাঁসি পরিতে প্রস্তুত।

নব্যপন্থীদের সমাজে সুরেশ্বরের পরিচয় ছিল না, সেখানে প্রবেশলাভ করিলে হয়ত তাহার মানসীর সন্ধান পাইলেও পাইতে পারে। সুরেশ্বর চেষ্টার ত্রুটি করিল না, এমন কি ছাত্রসমাজ, ব্রাহ্মসমাজেও নিয়মমত যাওয়া আসা সুরু করিয়া দিল। কিন্তু সেখানে বিশেষ কোনো সুবিধা দেখিল না। তবে ক্রমে ক্রমে দুই-চারিটি যুবকের সহিত পরিচয় হইল, তাহারা তাহাকে বাড়িতে নিমন্ত্রণাদিও করিতে লাগিল। অমূল্য তাহাদের মধ্যে একজন। তাহাদেরই বিবাহ উৎসবে সুরেশ্বরের চোখে পড়িল যামিনী। ঘটনাচক্রে তাহাকে অত্যন্ত নিকট

হইতে দেখিবার, তাহার হাতে ফুলের তোড়া তুলি। দিবার সৌভাগ্যও সুরেশ্বরের ঘটিয়া গেল।

প্রথম দর্শনেই সুরেশ্বরের চিত্ত মোহে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। কি সুন্দর, কি আশ্চর্য্য সুন্দর। প্রাণের দীপ্তি যেন ইহার দুই চোখে ফুটিয়া আছে, পবিত্র হৃদয়ের ভিতর পর্য্যন্ত যেন সরল দৃষ্টির ভিতর দিয়া দেখা যায়। এ কি শাপভ্রষ্টা দেবকন্যা। ইহাকে যে ঘরে লইয়া যাইবে, তাহার গৃহ ত তখনই দেবালয়ের সৌন্দর্য্য ও মহিমায় ভরিয়া উঠিবে। মাথায় অবগুণ্ঠন নাই, সুন্দর সীমন্তে সিন্দুর চিহ্ন নাই, তরুণীটিকে কুমারী বলিয়াই তাহার বিশ্বাস হইল।

অমূল্যের কাছে গোপনে সব খবর জানিয়া লইতে সে যথাসম্ভব কম বিলম্ব করিল। সুধার কাছে কথা পাড়িয়া বোঝা গেল, অপর পক্ষেও তাগিদ আছে, কন্যার না হোক, কন্যার মাতার। অতএব দুই পক্ষকে আলাপ পরিচয় করিবার যথাসম্ভব সুযোগ দিবার ব্যবস্থাও হইয়া গেল। প্রথম পরিচয়ের দিনেই নিমন্ত্রণ লাভ করিবে, এতটা সুরেশ্বর আশা করে নাই। বিধি তাহার প্রতি নিতান্তই সদয় দেখা গেল।

শনিবার আসিবার আগের কয়টা দিন সুরেশ্বরের যেন স্বপ্নের ঘোরে কাটিয়া গেল। কল্পনাকে সে এমন ভাবে লাগাম ছাড়িয়া দিল যে, বাস্তব-অবাস্তবের ভেদটুকুও প্রায় তাহার লুপ্ত হইয়া গেল। মাতার এ বিবাহে সম্মতি থাকিবে না তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল, সুতরাং সাহস করিয়া কথাটা মায়ের কাছে আর তুলিল না। কিন্তু একেবারে কাহাকেও না বলিয়া থাকিতে পারিল না, বন্ধুবান্ধবে একটু একটু আঁচ পাইল। আর পাইল শিশির। বড়ভাইয়ের সামনে বেশী কথা বলিতে সে কোনোদিনই ভরসা পাইত না। তবু কৌতূহলের আতিশয্যে ভয়টাও তাহার কাটিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "হ্যাঁ দাদা, মিহিরের দিদিকে কি তুমি বিয়ে করবে?"

এতখানি সোজাসুজি প্রশ্ন সুরেশ্বর প্রত্যাশা করে নাই, সে এক তাড়া দিয়া শিশিরকে বিদায় করিয়া দিল। কিন্তু নিজে একটু সাবধান হইয়া গেল, এতটা সবাইকার কাছে মনের ভাণ্ডার খুলিয়া দেখান কিছু নয়।

শনিবার আসিয়া পড়িল। দুপুরের খাওয়া-দাওয়া হইয়া যাইবামাত্র ঘড়ি দেখিতে দেখিতে সুরেশ্বর ত অস্থির হইয়া উঠিল। শিশির ব্যাপারটা আন্দাজে খানিক বুঝিল, তবে দাদাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা করিল না।

সুরেশ্বরের সাজগোজ শেষ করিতে প্রায় বিয়ের ক'নের সমান সময় কাটিয়া গেল। শিশিরও দেখাদেখি খানিকটা সাজিয়া লইল। মা তাহাদের রকম দেখিয়া একবার খোঁজ না করিয়া পারিলেন না, "হ্যাঁ রে, আজ যে বড় ঘটা দেখি দুই ভাইয়ের। যাওয়া হচ্ছে কোথা?"

শিশির বলিল, "সেই যে আমার বন্ধু মিহির, যাকে সেদিন তোমার কাছে নিয়ে এসেছিলাম, তাদের বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছি।"

মা বলিলেন, "নেমন্তন্ন তা এত বেলা থাকতে চল্লি কোথা?"

শিশির বলিল, "আহা, নেমন্তন্ন মানে চায়ের নেমন্তন্ন।"

মা আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না, দুই ভাইয়ে গাড়ী জোতাইয়া বাহির হইয়া গেল।

জ্ঞানদা অনেক চেষ্টা করিয়াও নীচে নামিতে সক্ষম হইলেন না, কাজেই অতিথিদের অভ্যর্থনা করিলেন নৃপেন্দ্রবাবুই। মিহির অবশ্য শিশিরের সম্পূর্ণ ভারই গ্রহণ করিল, এবং একতলা দোতলা, ছাদ, সর্ব্বত্রই তাহাকে নির্ব্বিচারে টানিয়া বেড়াইতে লাগিল। জ্ঞানদা অত্যন্তই চটিলেন, কিন্তু তাঁহার ত তখন আর কিছু করিবার উপায় ছিল না, সুতরাং চুপ করিয়াই রহিলেন।

যামিনী ড্রয়িং-রুমের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, সুরেশ্বর আসিতেই নমস্কার করিয়া তাহাকে বসিতে অনুরোধ করিল। পুরুষজাতির সঙ্গে মেলামেশা করা কোনোদিনই তাহার অভ্যাস নাই, বিশেষতঃ সুরেশ্বরকে কি উদ্দেশ্যে বাড়িতে ডাকা হইয়াছে, তাহা খানিকটা জানা থাকায়, সে আরও সঙ্কোচ অনুভব করিতেছিল।

ঘরের ভিতর সে বেশীক্ষণ বসিল না, এটা ওটা তদারক করিবার ছলে ক্রমাগত ঘর বাহির করিতে লাগিল। সুরেশ্বরকে বসিয়া বসিয়া নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের সমাজতত্ত্ব ও রাজনীতি চর্চ্চা শুনিতে হইতে লাগিল, তবে যামিনীকে চোখের উপর দেখিতে পাইতেছে বলিয়া সে পুরাপুরি চটিতে পারিল না।

চা খাইবার সময় অবশ্য যামিনী ঘরে আসিয়া বসিল। নিজের হাতে চা প্রস্তুত করিল, সুরেশ্বরকে খাবার সাজাইয়া দিল, এটা ওটা খাইতেও দু-একবার অনুরোধ করিল। নৃপেন্দ্রবাবু মিহির এবং শিশিরের সন্ধানে বাহির হইয়া যাইবামাত্র সুরেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার মা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন বুঝি? যা গরম পড়েছে মানুষের এর মধ্যে ভাল থাকাই অসম্ভব।"

যামিনী বলিল, "তিনি ত অসুস্থই ছিলেন, তবু জোর ক'রে ঘোরাঘুরি বড় বেশী করছিলেন। ডাক্তার তাঁকে এক বছর চেঞ্জে থাকতে বলেছিল।"

সুরেশ্বর বলিল, "দার্জ্জিলিঙটা এ সময় বেশ ভাল, না?"

যামিনী বলিল, "ভালই বটে, তবে বর্ষা পড়লে নানারকম অসুখ-বিসুখ সুরু হয়।"

সুরেশ্বর বলিল, "আপনারা এবার যাবেন সেখানে বলে মিহিরের কাছে শুন্‌ছিলাম?"

যামিনী বলিল, "ওর ঐরকম কথা। এখনও কিছু ঠিক হয়নি।"

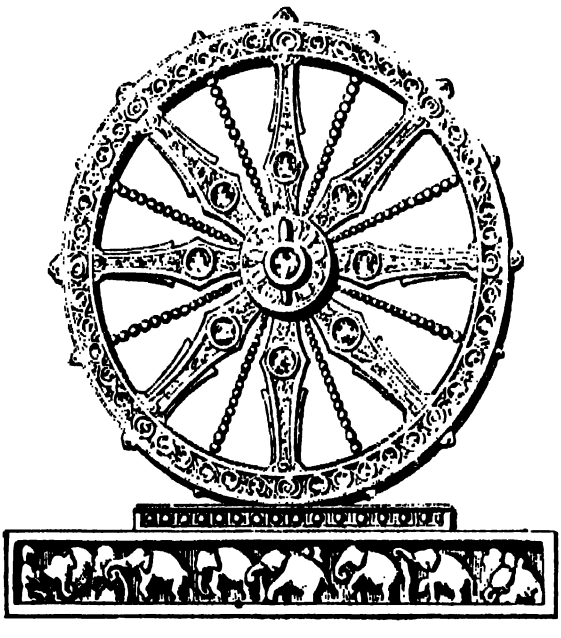
সুরেশ্বর আরও কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় শিশির ও মিহিরকে লইয়া নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিলেন। যামিনী তাহাদের চা জলখাবার পরিবেশন করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

চা খাওয়া, আইস্‌ক্রীম্ খাওয়া সব নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল। আরও ঘণ্টাখানিক কথাবার্ত্তা চলিল। সুরেশ্বর দার্জ্জিলিং যাওয়ার কথাটা বাড়ির কর্ত্তার কাছেও যাচাই করিয়া লইল। তিনিও বলিলেন, "কথা হচ্ছিল বটে, তবে এখনও কিছু ঠিক হয়নি।"

কতক্ষণ আর বসিয়া থাকা চলে? সুরেশ্বরকে অতৃপ্তচিত্তেই উঠিয়া পড়িতে হইল। যাইবার সময় যামিনীকে বলিয়া গেল, আজ আপনার ছবিটবি ত কই কিছু দেখা হল না, আর একদিন এসে দেখে যাব।"

যামিনীকে অগত্যা বলিতে হইল, "আচ্ছা।"

ক্রমশঃ



।৩।

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

১৮

অষ্টম অধ্যায় (অনুবৃত্তি)

৮।১৫ "পরম সিদ্ধি লাভ করিয়া মহাত্মাগণ আমাকে প্রাপ্ত হন এবং দুঃখের আলয়-স্বরূপ অনিত্য সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন না।" এখানে পুনর্জন্মের কথা বলায় পরের শ্লোকে অহোরাত্র বিদ্যার অবতারণায় সুযোগ হইল।

৮।১৬ "হে অর্জুন ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় লোক পুনরাবর্ত্তনশীল অর্থাৎ তাহাদের পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি বিনাশ আছে, কিন্তু হে কৌন্তেয়, আমাকে পাইলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

৮।১৭-১৯ "অহোরাত্রবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে, ব্রহ্মার দিন এক সহস্র যুগ স্থায়ী এবং ব্রহ্মার রাত্রিও এক সহস্র যুগ স্থায়ী। ব্রাহ্মদিবসের প্রারম্ভে অব্যক্ত হইতে সকল ব্যক্ত চরাচরের উৎপত্তি হয় এবং ব্রাহ্মরাত্রির আগমনে সেই অব্যক্তেই চরাচর বিলীন হইয়া যায়। হে পার্থ, এই ভূতগ্রাম বার-বার জন্মিয়া জন্মিয়া ব্রাহ্মরাত্রের আরম্ভে অবশ হইয়া প্রলীন হয় এবং পুনরায় ব্রাহ্মদিবাগমে উৎপত্তিলাভ করে।" শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য এই যে, ব্যক্ত চরাচর কালদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া বার-বার উৎপন্ন হয় ও বার-বার প্রলয়ে লীন হয়।

মহাভারতের যুগে অহোরাত্র বিদ্যা নামে এক বিশেষ বিদ্যা প্রচলিত ছিল। (পূর্ব্বপ্রকাশিত আলোচনা দ্রষ্টব্য—প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৩৯)। অহোরাত্র-বিদ্‌গণ সম্ভবত কালকেই চরম সত্তা মনে করিতেন; তাঁহাদের মতে ব্রাহ্মরাত্রিতে সমস্তই লয় পায়, কাল ব্যতীত কোন সত্তাই অবশিষ্ট থাকে না। অহোরাত্রবিদ্‌গণ ব্রহ্ম-সত্তা মানিতেন বলিয়া মনে হয় না। এই দোষ পরিহারের জন্য শ্রীকৃষ্ণ অহোরাত্রবিদের অব্যক্ত সত্তার আশ্রয় হিসাবে এক সনাতন ব্রহ্মসত্তা আছে বলিতেছেন।

৮।২০-২২ "কিন্তু সেই অব্যক্তের পরবর্ত্তী অন্য যে অব্যক্ত সনাতন ভাব বা সত্তা আছে তাহা সর্ব্বভূত বিনষ্ট হইলেও বিনষ্ট হয় না। সেই শেষোক্ত অব্যক্ত অক্ষর বা অবিনাশী বলিয়া উক্ত হন, তাঁহাকেই পরমাগতি বা পরম আশ্রয় বলে; তাহাই আমার পরমধাম এবং তাহা পাইলে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না। হে পার্থ, এই ভূতসমূহ যাঁহার অভ্যন্তরে স্থিত এবং যিনি এই সমস্তকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন সেই পরম পুরুষ অনন্যভক্তির দ্বারা লভ্য।" এখানে অক্ষর শব্দে পরম অক্ষর বা ব্রহ্ম উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

৮।২৩-২৫ "হে ভরতর্ষভ, যোগিগণ যে কালে প্রয়াণ করিলে অর্থাৎ দেহত্যাগ করিলে আর ফিরিয়া আসেন

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ ১৫

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১৬

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥ ১৭

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥ ১৮

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥ ১৯

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎসনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥ ২০

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ২১

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥ ২২

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥ ২৩

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥ ২৪

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥ ২৫

না অর্থাৎ পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না এবং যে কালে প্রয়াণ করিলে আবার ফিরিয়া আসেন অর্থাৎ পুনর্জন্ম লাভ করেন, সেই কাল সম্বন্ধে তোমাকে বলিতেছি। অগ্নি, জ্যোতি, দিন ও উজ্জ্বলতা সম্পন্ন ছয় মাস ব্যাপী উত্তরায়ণে মৃত্যু হইলে ব্রহ্মবিৎ মনুষ্যগণ ব্রহ্মলাভ করেন এবং ধূম, রাত্রি ও অন্ধকারময় ছয়মাসব্যাপী দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলে যোগী চন্দ্রের জ্যোতি লাভ করিয়া ফিরিয়া আসেন অর্থাৎ পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন।" বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার এই শ্লোকগুলির বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উত্তরায়ণে মৃত্যু হইলে এক প্রকার গতি এবং দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলে অন্য প্রকার গতি হইবে, এই মত অত্যন্ত অদ্ভুত। শঙ্কর বলেন, অগ্নি, জ্যোতি, অহঃ, ষণ্মাস, উত্তরায়ণ, ধূম, রাত্রি ইত্যাদি শব্দের দ্বারা তত্তৎ অভিমানী দেবতা বুঝাইতেছে। এই সকল দেবতা সগুণ ব্রহ্মোপাসনাপর যোগিগণকে কালক্রমে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান এবং যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকর্তা কর্ম্মপর যোগীকে চন্দ্রলোকোদ্ভব সুখ ভোগ করান। তিলক বলেন, ২৪-২৫ শ্লোকে যে দুই কালের বর্ণনা আছে তাহা উত্তরমেরু প্রদেশের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের বর্ণনা, কারণ একমাত্র মেরুপ্রদেশেই উত্তরায়ণের ছয়মাস শুক্ল-জ্যোতিসম্পন্ন এবং দক্ষিণায়নের ছয়মাস অন্ধকারময়। তিলকের মতে মেরুপ্রদেশই আর্য্যদের আদিম বাসভূমি এবং শুক্লকৃষ্ণগতিদ্বয়ে বিশ্বাস সেই আদিম সময় হইতে চলিয়া আসিয়াছে। কোন কোন ব্যাখ্যাকারের মতে শ্লোকগুলি রূপকমাত্র। "ধূমরূপ বাসনা-বিরহিত, নিশ্চল জ্যোতিস্বরূপ যে মন তাহাই অগ্নিজ্যোতি নামে অভিহিত। দিবস-সদৃশ প্রকাশময় যে জ্ঞানে নিরন্তর জাগৃতি তাহাই অহঃ শব্দদ্বারা আখ্যাত। শুক্লপক্ষীয় রাত্রির নির্ম্মল ও শান্ত চন্দ্রিকার ন্যায় মনের যে অবস্থা তাহাই এ স্থলে শুক্লপক্ষ। চিত্তের পূর্ণজ্ঞানময় অবস্থা এস্থলে ষণ্মাসা উত্তরায়ণ শব্দের দ্বারা উদ্দিষ্ট। ইহার বিপরীত বাসনা-বিশিষ্ট মনের অবস্থা ধূমসদৃশ। জ্ঞান-বিমুখ বলিয়া উহা মোহময় নিদ্রায় শায়িত থাকায় রাত্রির সহিত তুলনীয়। তমিস্রা রজনীর ন্যায় মনের যে অবস্থা তাহাই কৃষ্ণপক্ষ। অজ্ঞানরূপ অন্ধকারময় অবস্থায় শরীরত্যাগই ষণ্মাসা দক্ষিণায়ন সহ তুলনীয়।" অপর ব্যাখ্যাকারের মতে শ্লোকগুলির সোজাসুজি অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ উত্তরায়ণে ও দক্ষিণায়নে মৃত্যুর বিভিন্ন ফল স্বীকার করিতে হইবে এবং এই দুই পথের যে বিবরণ আছে তাহাও সত্য বলিয়া মানিতে হইবে, কারণ যোগবলের দ্বারা এই সত্য ঋষিরা জানিতে পারিয়াছেন। কেহ কেহ শুক্লকৃষ্ণগতিদ্বয়কে অন্ধবিশ্বাস, কষ্টকল্পনা বা কবিকল্পনা বলিয়া থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার মতের অযৌক্তিকতা ও অপূর্ণতা 'আত্মকথায়' (প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩৩৮, পৃ. ১৫-১৬) ও 'শুক্লকৃষ্ণগতি'র আলোচনাকালে ('প্রবাসী'—শ্রাবণ, ১৩৩৯) বিবৃত করিয়াছি এবং শ্লোকগুলির প্রকৃত ব্যাখ্যা দিবারও চেষ্টা করিয়াছি। তাহা দ্রষ্টব্য। এখানে সংক্ষেপে ব্যাখ্যার পুনরুল্লেখ করিতেছি। বহু পুরাকাল পূর্ব্বে আর্য্যেরা উত্তর-মেরু প্রদেশে বাস করিতেন (তিলক) এবং তখন এই প্রদেশকে ব্রহ্মলোক বলা হইত এবং তাহার অধিপতির নাম ছিল ব্রহ্মা। আধুনিক মঙ্গোলিয়াই স্বর্গলোক এবং তাহার অধিপতিকে ইন্দ্র বলা হইত। সেইরূপ চন্দ্রলোক প্রভৃতি সমস্তই এককালে ভৌম ছিল (উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন)। মঙ্গোলিয়া হইতে আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আসেন এজন্য মঙ্গোলিয়াকে পিতৃলোকও বলা হইত। পিতৃলোক ও ভারতবর্ষ হইতে অনেকে ব্রহ্মলোকে যাতায়াত করিতেন। যে-পথে তাঁহারা যাইতেন তাহা দেবযান পথ এবং যে-পথে পিতৃগণ ভারতবর্ষে আসিতেন তাহা পিতৃযান পথ। কালক্রমে ব্রহ্মলোক ও পিতৃলোকে গমনাগমন বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তাহার যথার্থ তত্ত্ব লোকে ভুলিয়া গেল ও ঋষিগণ ব্রহ্মলোকে যাওয়া ও ব্রহ্মপ্রাপ্তি সমার্থবাচক বলিয়া মনে করিলেন। ব্রহ্মলোকের পথ দুর্গম হওয়ায় সেখান হইতে কদাচিৎ কেহ ফিরিয়া আসিতেন, কিন্তু স্বর্গলোক বা পিতৃলোক হইতে অনেকেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন; ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইলে প্রত্যাবর্ত্তন হয় না এবং স্বর্গভোগের পর ফিরিয়া আসিতে হয়, এই বিশ্বাস মূলতঃ ভৌম ব্রহ্মলোক ও ভৌম স্বর্গলোক সম্বন্ধেই প্রচলিত ছিল।

মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম হয় একথা ঋষিরা বিশ্বাস করিতেন, কেবল ব্রহ্মবিদের আত্মা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলে আর প্রত্যাবর্ত্তন করে না। জীবাত্মা শরীর হইতে উৎক্রমণ করিলে অন্য আশ্রয় অবলম্বন করে অতএব ঋষিরা অনুমান করিলেন চিতাগ্নিতে দেহ ভস্মীভূত হইলে কোন কোন আত্মা চিতাগ্নির জ্যোতির আশ্রয়ে উর্দ্ধে গমন করে; এই সকল আত্মার প্রত্যাবর্ত্তন নাই; তাহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। অপর আত্মা চিতাগ্নির ধূম আশ্রয় করিয়া স্বর্গলোকে যায় এবং তথা হইতে বৃষ্টির সহিত পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে ও ব্রীহি যবাদিতে সংক্রমিত হইয়া পুরুষ-শরীরে প্রবেশ করে ও পরে স্ত্রীর গর্ভ হইতে সন্তানরূপে ভূমিষ্ঠ হয়। ভৌম ব্রহ্মলোকে ছয় মাস জ্যোতি ও ছয় মাস অন্ধকার। ব্রহ্মজ্ঞানীর আত্মা উত্তরায়ণে দেহত্যাগ করিলে তাহার জ্যোতির আশ্রয় নষ্ট হয় না এবং কর্ম্মীর আত্মা দক্ষিণায়নে দেহত্যাগ করে, কারণ তাহা ধূম ও অন্ধকার পথেই যায়। ধূম হইতে বৃষ্টি জন্মে এবং বৃষ্টির আশ্রয়ে আত্মা পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে।

শুক্ল ও কৃষ্ণ গতিদ্বয়ে বিশ্বাস থাকায় যাঁহারা ইচ্ছামৃত্যু অবলম্বন করিতেন তাঁহারা ভীষ্মের মত মৃত্যুর জন্য উত্তরায়ণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেন। পাছে দক্ষিণায়নে মৃত্যু হয় এজন্য অনেকে উদ্বিগ্ন থাকিতেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজে শুক্লকৃষ্ণগতিতে বিশ্বাস করিতেন বলিয়া মনে হয় না। এই বিশ্বাসকে তিনি শাশ্বত বা বহুকাল হইতে প্রচলিত বলিয়াছেন; এই দুই গতির কথা জানিয়াও যোগীর মৃত্যুকাল সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন থাকিবার কারণ নাই, কারণ যোগী বেদবিহিত সকলপ্রকার পাপ-পুণ্যের উর্দ্ধে; সর্ব্বদা যোগযুক্ত থাকিলে যে-কোন কালেই মৃত্যু হউক না কেন যোগী পরমস্থান প্রাপ্ত হন। শ্রীকৃষ্ণ অতিকৌশলে প্রচলিত মত এড়াইয়া গেলেন অথচ শুক্লকৃষ্ণ গতিতে বিশ্বাসী ব্যক্তির বিশ্বাস ভঙ্গ করিলেন না; সাধককে সর্ব্বদা যোগযুক্ত থাকিতে উপদেশ দেওয়ায় অন্ধবিশ্বাসের দোষ পরিত্যক্ত হইল। সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের ইহাই বিশিষ্টতা।

৮।২৬-২৮ "জগতের এই শুক্ল ও কৃষ্ণ গতি শাশ্বত বলিয়া সম্মত অর্থাৎ বহুকাল হইতে এই প্রকার বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে; একটির দ্বারা অনাবৃত্তি ও অপরটির দ্বারা পুনরাবর্ত্তন লাভ হয়। হে পার্থ, এই দুই গতির কথা জানিয়াও কোন যোগী মোহমান হন না, সেজন্য হে অর্জ্জুন, তুমি সর্ব্বকালে যোগযুক্ত হও। বেদে, যজ্ঞে, তপস্যায় এবং দানে যে পুণ্যফল কথিত হইয়াছে তাহা জানিয়াও যোগী এই সমুদায়কে অতিক্রম করেন এবং আদ্য পরমস্থান প্রাপ্ত হন।" ২৮ শ্লোকের অন্বয় এইরূপ করিয়াছি:—বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু দানেষু চ এব যৎ পুণ্যফলম্ প্রদিষ্টম তৎ বিদিত্বা যোগী সর্ব্বম্ ইদং অত্যেতি আদ্যং পরং স্থানং উপৈতি চ। অর্থাৎ যোগী শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পাপ-পুণ্য বা শুক্লকৃষ্ণ গতির ভাবনায় মোহমান হন না। তিনি এই সমুদায়কে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলাভ করেন। ইতি

অক্ষর ব্রহ্মযোগ নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

শুক্লকৃষ্ণেগতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতেমতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়া বর্ত্ততে পুনঃ। ২৬

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতিকশ্চন
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন। ২৭

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্। ২৮

অরিন্দমের মৃত্যু

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মরবে, তা ঠিক; একদিন-না-একদিন মরবেই,—কিন্তু কবে মরবে, তার চেয়ে কিসে কি ক'রে মরবে অরিন্দমের কাছে তাই হচ্ছে বড় রহস্য। এখন বয়েস তার প্রায় চল্লিশের কাছে, দেখতে তাগড়া জোয়ান, টন্‌কো শরীরে স্বাস্থ্যের মদিরা উছলে-উছলে পড়ছে। কয়লাঘাটা ষ্ট্রিটে ই-বি-আর-এর অ্যাকাউণ্টস্ আপিসে সে কাজ করে, একজনের পক্ষে মাইনে তার যথেষ্ট, সবটা সে মুঠো ক'রে ধ'রে রাখতে পারে না, আঙুলের ফাঁক দিয়ে দিকে-দিকে ছিটকে পড়তে থাকে, আর বেশীর ভাগ টাকা তার খরচ হয় এই শরীরচর্চ্চায়, শরীরের হীনতর অপচয়ের পথে নয়। যেমন রক্ত দিয়ে সে টাকা রোজগার করে, সেই টাকাও সে তেমনি ব্যয় ক'রে এসেছে এই রক্তের পুষ্টিতে, রক্তের পরিপূরণে। যত ব্যায়ামের সরঞ্জাম, পুষ্টিকর আহার্য্যের পারিপাট্য, পরিচ্ছন্নতার নানাজাতীয় প্রসাধন। শরীরের আধারে জীবনকে সসমারোহে বহন করবারই তার বিলাসিতা। সে-বিলাস তার পোষাকে পর্য্যবসিত নয়, সে-বিলাস তার মূর্ত্তিমান নীরোগ দেহ, বলদীপ্ত দুঃসহ স্বাস্থ্য, যখন যা খুশী করতে পারার শারীরিক স্বাধীনতা। মাংসপেশীকে দৃঢ়, পরিপাকশক্তিকে তীক্ষ্ণ ও ক্লান্ত হবার প্রবণতাকে স্বল্প করাই তার সাধনা। আর পৃথিবীতে একা, নির্ভার-নির্ভাবনায় থাকাই ছিল তার খেয়াল।

থাকে সে খোলা হাওয়ার রোদালো বাড়িতে, আহারে-বিহারে পরিমিতি তার ধ্রুবতারা; ঘড়ি ধ'রে রুটিন বেঁধে সে পথ চলে। কাজ বল, নেশা বল, সব তার এই মর্ত্ত্য মরদেহ! গুণীর হাতে যেমন বীণা, অরিন্দমের হাতে তার এই শরীর। পরিপার্শ্বের সমস্ত পঙ্কিলতা থেকে সে দূরে থাকে, হাওয়ায় বা ধূলোয় কোথা থেকে সূক্ষ্ম ও অলক্ষ্য কোন্ বীজাণু উড়ে আসে, তার জন্যে সমস্ত রোমকূপে তার খাড়া পাহারা। তার বিশালায়ত শরীরে দুর্গের সে দুর্ভেদ্যতা এনেছে—এই তার একমাত্র অহঙ্কার। কোন্‌দিন কবে তার কি অসুখ করেছিল অরিন্দম মনে করতে পারে না; যৌবনে শরীর সম্বন্ধে তার এই সজ্ঞান উপলব্ধির পর থেকে কোনদিন তার এক ফোঁটা ঘুমের ব্যাঘাত হয় নি, দাঁতের মাড়ি ফোলে নি বা গলা খুস্‌খুস্ করে নি। নিজের রক্ষণাবেক্ষণে চলে এসে অবধি স্বাস্থ্য তার আগাগোড়া মসৃণ ও নিটোল; শীত বা বর্ষার এতটুকু আঁচড়ও কোথাও লেগে নেই। জামার তলায় প্রায় সে প্রচ্ছন্ন হারকিউলিস্, কিন্তু তাই ব'লে মাস্‌ল ফুলিয়ে রভ বেঁকিয়ে ডিগবাজি খেয়ে সে তার বিজ্ঞাপন দিতে চায় না; সে যে প্রচুর বেঁচে আছে এই কথাটা নিজের কাছে নীরবে জাহির ক'রেই সে খুশী। অন্ধকারে সৃষ্টির এই বিরাট শোভাযাত্রায় সেও একজন মশালচী, হাতে তার এই জীবনের রঙীন মশাল!

কিন্তু হঠাৎ সেদিন এক্‌সারসাইজ ক'রে তোয়ালেতে বুকের ঘাম মুছতে সে তার আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। শরীর ক্রমশ আরও তেজীয়ান হ'য়ে উঠছে এই ভাবটা মনে দৃঢ় ক'রে আরোপ করবার জন্যে ব্যায়ামের সময় সামনে সে আয়না রাখে; শরীরের সঙ্গে-সঙ্গে মনেরও সক্রিয়তা চাই। মিনিটের কাঁটার সঙ্গে ঘণ্টার কাঁটার সম্বন্ধে বাঁধা এই শরীর আর মন, একসঙ্গে দুইয়ের চলমানতায় এই দেহযন্ত্র। কিন্তু সেদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার স্ফীত-স্ফার বুকের দিকে চেয়ে হঠাৎ তার মনে হ'ল: কেন কিসের এত আয়োজন? আজ যা দুর্দ্ধর্ষ, কালক্রমে তা জর ও জরায় জীর্ণ, হতশ্রী হ'য়ে যাবে। থাকবে না এই স্বাস্থ্যের উচ্ছ্বাস, এই রক্তের উদ্দামতা। চামড়া আসবে রেখায় কুঞ্চিত হ'য়ে, বয়সের ভারে মেরুদণ্ড পড়বে ভেঙে, তার কঙ্কাল হবে শুকনো অ্যানাটমির বিষয়ীভূত। এত স্বাস্থ্য, এত দীপ্তি, এত

অহঙ্কার সত্ত্বেও সে একদিন না-একদিন মরবে, নিশ্চিত মরবে, নিঃসংশয় মরবে—তার এই সাড়ম্বর জীবনধারণের তথ্যের চেয়েও তা বড় সত্য, অকাট্য সত্য। প্রাণপণে শত ঘাঁটি আগলেও মৃত্যুকে সে দাবাতে পারবে না; এই দেহ তার যত বলবান, যত সুন্দরই হোক না কেন, মৃত্যুর গ্রাস নিরন্তর তার ওপর মুখিয়ে আছে। জীবনকে যতই কেন না সে ভালবাসুক, সে বোধ হয় তার ক্ষণস্থায়িত্বের জন্যই। শরীরে সে হারকিউলিস্-এর সমকক্ষতা করতে পারে, কিন্তু তার মত সে অমর হ'তে আসে নি।

সে মরবে, পৃথিবীতে কেউই শেষ পর্য্যন্ত অমর নয়—এ দার্শনিক তত্ত্বকথাটা শিশুপাঠ্য বইয়ে পর্য্যন্ত লেখা আছে। দিননির্ব্বাহের ব্যস্ততায় লোকে তা আপাত-দৃষ্টিতে ভুলে থাকলেও মনের নির্জ্জন গোপনে তা স্বীকার করতে ভোলে না—নিজেকে সব সময় অপ্রস্তুত অবস্থায় ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে থাকে। যখন যা হবে তা হবে,—প্রতিবাদ করবারও সময় বা সামর্থ্য থাকবে না, মৃত্যুর কাছে জীবনের বশ্যতা সৃষ্টির প্রথম সূর্য্যোদয়ের মুহূর্ত্ত থেকেই অবধারিত—এ খবরটা যেন তাই শারীরিক কলঙ্কের মতই লোকে লুকিয়ে রাখে। তারপর তারা মরে; যারা মৃত্যু নিয়ে হৈ-চৈ বাধিয়ে জীবনকে বঞ্চিত, অসমাপ্ত রেখে মৃত্যুর মর্ম্মের খোঁজে বনবাসে যায় তাদেরও মৃত্যু ক্ষমা করে না। জীবনের না হোক, মৃত্যুর আছে এই উদার অপক্ষপাত সমদৃষ্টি: চাষার কাস্তে ও রাজার মুকুট একসঙ্গে পাশাপাশি ধুলোয় লুটোয়।

জানা কথা, স্বতঃসিদ্ধ কথা—একটি সরল রেখায় একটি সমতল ক্ষেত্র আবৃত করা যায় না এ-সত্যের চেয়েও প্রামাণিক সত্য, আইনষ্টাইনের সময় ও স্থানের পারিপার্শ্বিকতার ঊর্দ্ধে এ বিরাজমান—সমস্ত পূর্ব্বপুরুষের ইতিহাসে এ যুগে-যুগে প্রমাণিত হ'য়ে গেছে। অরিন্দম হতভম্ব হ'য়ে আয়নায় তার ছায়ার দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু সে মরবে, তার দেহময় এই চঞ্চল রক্তচলাচল বন্ধ হ'য়ে যাবে, চোখের সমুখ থেকে এত বড় আকাশ এক নিমেষে উবে যাবে,—তার এতদিনের এত আকাঙ্ক্ষা এত আনন্দ কোন-কিছুর আর চিহ্ন থাকবে না, মস্তিষ্কে থাকবে না এই জীবনযাপনের তীব্র, ধারালো অনুভূতি—কথাটা সে সহজে বিশ্বাস করতে পারল না। জোর ক'রে বিশ্বাস না করলে কি হবে—এই দেহের বৃদ্ধিই হচ্ছে তার বিনাশের প্রমাণ: আজ যা মাত্র মনের আড়ালে-আবডালে প্রচ্ছন্ন আছে, তা একদিন, নিশ্চিত একদিন এই দেহ দিয়েই প্রত্যক্ষ করতে হবে। কালক্রমে সূর্য্য নিস্তেজ হোক বা না হোক, কক্ষ থেকে ছুটে এসে ধূমকেতু পৃথিবীর সঙ্গে ধাক্কা লাগাক্ বা না লাগাক্, এ নিয়মের বিচ্যুতি নেই, মুখ চেয়ে কাউকে ক্ষমা করা নেই, ঘুষ খেয়ে ফিরে যাওয়া নেই। অত্যন্ত সাদাসিদে, মুখফোঁড়, কাঠখোট্টা—তলোয়ারের মত শাণিত, পরিচ্ছন্ন। মরতে তাকে হবেই।

ইংলণ্ডে রাজা আছেন বা পর্ত্তুগালের রাজধানীর নাম লিস্বন্—খবরটা সে এমনি ক'রেই জানত। কলেজে লজিকের ক্লাসে এই সর্ব্ববাদিসম্মত কথাটাই A বা Universal Affirmativo-এর উদাহরণ ব'লে ধরা হ'ত। অনেককেই তো সে মরতে দেখেছে, এবং অনেকেরই তো মরা উচিত। তাই বলে সে-ও মরবে, সে, অরিন্দম মিত্র, দেহে যার উজ্জ্বল উগ্র স্বাস্থ্য, সামনে যার অফুরন্ত পৃথিবীর পথ পড়ে আছে, মনে যার প্রকৃতির আয়ুর মতই অন্তহীন আশা, অনেক টাকা ইতিমধ্যে যার জমে উঠেছে ব্যাঙ্কে-সে, অরিন্দম মিত্র, সে-ও একদিন মরবে—ঘুণাক্ষরে এ মিথ্যা হবার নয়, তার বেলায় একচুল এদিক-ওদিক হবে না, এ কি ক'রে বিশ্বাস করা যায়। একটা পিচ্ছিল সরীসৃপের মত মৃত্যুর পঙ্কিল ছায়া যেন তার সমস্ত শরীরের উপর দিয়ে ঘুরে গেল: মৃত্যুকে সে একটা স্থূল, ভারী স্পর্শের মত অনুভব করলে। সন্দেহ নেই, সে-ও একদিন মরবে,—হ্যাঁ, সে এই অরিন্দম মিত্র। যতই সে শরীরানুশীলন করুক, মৃত্যুকে সে পরাস্ত করতে পারবে না। মরবে, মরবে সে, একদিন কোনো-না-কোনো অবস্থায় মরতে তাকে হবেই।

মাথার কেশাগ্র থেকে পায়ের নখাগ্র পর্য্যন্ত সমগ্র দেহ দিয়ে এই ভয়ঙ্কর সত্য কথাটা আয়ত্ত ক'রে অরিন্দম একেবারে ঠাণ্ডা, পাংশু হ'য়ে গেল। মৃত্যু যে কি তা

কেউ জানে না ; মরতে কেমন লাগে, মরলে পর কি হয়, কিছু হয়-ই বা কি না জীবিতলোকে কোথাও তার নির্দেশ নেই : সেই মৃত্যু সে জানবে, প্রত্যক্ষ ক'রে জানবে, পরিপূর্ণ ক'রে জানবে—শ্রুতিতে নয়, স্মৃতিতে নয়, জাজ্বল্যমান দর্শনে। মরতে কেমন লাগে সে-কথা আর কাউকে শিখিয়ে দিতে হবে না। মৃত্যুর সেই তীক্ষ্ণাগ্র মুহূর্ত্তটিতে দেহের বন্ধন ছেড়ে প্রাণের সেই সবেগে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাওয়ায় যে কি উন্মাদনা তার স্বাদ সে-ও একদিন পাবে : মরবার পর সেই অকূল অন্ধকারের রূপ সে-ও একদিন দেখবে, সে-ও আর তা বর্ণনা করতে পারবে না। তারপর মরবার আগে শরীরের সেই নিষ্ফল কাকুতি, সেই দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা—তারও হাত থেকে তার রেহাই নেই। সে না-জানি কি ভয়াবহ, কণ্ঠনালীর ওপর মৃত্যুর সেই নিষ্ঠুর নিষ্পেষণ না-জানি কি সাঙ্ঘাতিক ! 'না' বললে চলবে না, তাকেও সেই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে হবে : মৃত্যু তাকে জোর ক'রে ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেই অগ্নিকুণ্ডে টেনে নিয়ে যাবে, কোন যুক্তি কোন কাকুতিই সে শুনবে না। ভয়ে অরিন্দমের সমস্ত শরীর কাঠ হ'য়ে গেল। সে কি ভয়ঙ্কর সত্য, কি অপ্রতিরোধ্য অভিজ্ঞতা! থাকুক তখন আকাশ লাল, সমুদ্র সবুজ, আর পৃথিবী হলদে,—কোথাও কোনো সান্ত্বনা নেই : থাকুক বন্ধুর স্নেহ মার, শোক, প্রিয়ার কবিতা—কিছুরই কোনো দাম নেই, সে মরল,—এই দেহ তার ছাই হ'য়ে গেল—তারপরে তার কি যায়-আসে! কিন্তু তা তো মরবার পর ; মরবার সময়ে তো সে একেবারে একলা।

অরিন্দমের ভয় করতে লাগল। কি ক'রে না-জানি সে মরবে ! বাঙালী হ'য়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যে সে মরবে না তা সে জানে: সে-মৃত্যুতে দেশপ্রেমের যত বড়ই প্রেরণা থাক না কেন, সে বড় ভীষণ মৃত্যু ! তেমন মরার দু-একটা ছবি সে বায়স্কোপের পর্দ্দায় দেখেছে : উঃ, চোখ সে খুলে রাখতে পারে নি। শত্রু-সীমানার তারের বেড়ায় শরীর বিদ্ধ হ'য়ে রয়েছে, গায়ের উপর পড়ছে গুলির পর গুলি, নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এসেছে, তবু সে প্রাণপণে মুক্ত হবার চেষ্টা করছে, ক্ষুধার তাড়নায় নিজের নাড়িভুঁড়িই নিজের মুখে পুরছে—সে-কথা ভাবতে গেলেও তার সারা শরীরে কোটি-কোটি কাঁটা দিয়ে ওঠে। আর একেই বলে দেশের নামে আত্মবলি। না, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেওয়ার সম্ভাবনা নেই, তেমনি, ফাঁসিকাঠেও সে ঝুলবে না। একমাত্র খুন করলেই ফাঁসি হয়, তা-ও যে-খুন যড় ক'রে তোড়জোড় ক'রে, নাছোড়বান্দা হ'য়ে। খুন করবার পক্ষে এ-কাজ যে যথেষ্ট বা অবস্থানুসারে এতে যে খুন সম্ভব তা সম্পূর্ণ জেনে। অরিন্দম জানে তেমন কঠিন কাজ তার দ্বারা সম্ভব হবে না—তার মাঝে সেই বর্ব্বর, বন্য উৎসাহ নেই। পুরুষানুক্রমে রক্তে সে ক্রিমিন্যালিটির কোনো ঝাঁজ পায় নি ; ঐ মৃত্যুটাও সে তালিকা থেকে অনায়াসে বাদ দিতে পারে। কিন্তু তাই ব'লে তার নিজের খুন হ'তে বাধা আছে নাকি ? কে জানে, কোন্ শত্রুতার ওজুহাতে কে একদিন পেছন থেকে তার ঘাড়ে কোপ বসিয়ে দিলে ! ঘাড় ফেরাবার সে সময় পেলে না। ভয়ে অরিন্দমের মেরুদণ্ডে সির্ সির্ ক'রে একটা কাঁপুনি উঠে গেল। না, ভয় নেই, ভদ্রসমাজে সচরাচর এতটা আশা করা যায় না ; তা ছাড়া জামা-কাপড়ের বাইরে সে নিতান্ত নিরীহ গোবেচারা, পৃথিবীতে শত্রুসংখ্যা তার শূন্য বললেই চলে। এক, বহু বছর আগে কয়েকটা টাকা ধার নিয়ে ফিরিয়ে দিতে তার দেরি হয়েছিল ব'লে বরেন আঙুল তুলে খুব শাসিয়েছিল, তা, সেই টাকা সুদে-আসলে কবে সে তাকে শোধ ক'রে দিয়েছে।

মরবে সে এমনি—দীর্ঘ দিন রোগে ভুগে, স্তূপীকৃত বয়সের ভারে পঙ্গু, চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে—ফিট্‌ফাট্ বিছানার ওপর, আত্মীয়পরিবৃত হ'য়ে। সে-মৃত্যু শুনতে সহজ, স্বাভাবিক—মরতে যখন হবেই তখন বয়সের পরিপক্কতার ভারে বৃন্তচ্যুত হওয়াই বাঞ্ছনীয়, তবু—তবুও সে মৃত্যু, তবু সে-অবস্থায়ও নিঃশ্বাসের জন্য বাতাস উঠবে পাথর হ'য়ে, চোখের পাতায় আসবে অনিশ্চয়তার নিবিড় অন্ধকার ! শেষপর্য্যন্ত তাকেও সেই নিঃশ্বাসের জন্যে আপ্রাণ প্রয়াস করতে হবে—শেষপর্য্যন্ত সেই বৃদ্ধাবস্থায়ও তার দেহের প্রতি অসীম মমতা ! দেহ থেকে প্রাণমূল উৎপাটনের সময় তার সেই সমান অভিজ্ঞতা ! কিন্তু বয়সে বুড়ো

হয়েই সে মরবে এমন ভাগ্য তার না-ও হ'তে পারে। মরবে হয়ত কাল, কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনায়। সে-দুর্ঘটনাটা না-জানি কি!

হয়ত আপিস যাবার পথে সে একদিন মোটর চাপা পড়বে—মোটরের সামনের চাকা দুটো তার পেট থেঁৎলে মাটির সঙ্গে তাকে মিশিয়ে দিয়ে যাবে। এক মুহূর্ত্তেই সব শেষ। হোক্ এক মুহূর্ত্ত, তবু সময়ের সেই অণুতম ভগ্নাংশটিতেও সে সজ্ঞানে বুঝবে মৃত্যু কি, মরে যেতে মানুষের লাগে কেমন! উঃ, সেদিন সে স্বচক্ষে এক ভদ্রলোককে ট্র্যামের তলায় কাটা পড়তে দেখেছিল। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটেছে, তালগোল পাকিয়ে নিষ্পেষিত দেহটা চাকার তলায় আটকে রয়েছে—চারদিকে লোক-জনের ব্যস্ত ছোটাছুটি, ট্র্যাফিক্-কনেষ্টবলদের ভিড়, কিন্তু ট্র্যাম সরিয়ে সেই মৃতপ্রায় দেহটাকে মুক্ত করবার কোনো উপায়ই কোথাও নেই। চাকার নীচে ঝুঁকে পড়ে সবাই লোকটাকে দেখছে, এখনও বেঁচে আছে ব'লে বলাবলি করছে, হাসপাতালে নিতে পারলে এখনও নাকি তার বাঁচবার সময় ছিল! কতক্ষণে ক্রেন্ আসবে ঠিক নেই—অরিন্দম সেখানে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারে নি: এই মৃত্যুর স্মৃতিটা মন থেকে মুছে ফেলবার জন্যে সে তাড়াতাড়ি এক সিনেমায় ঢুকে পড়েছিল। না, ট্র্যাফিক-ল সম্বন্ধে সে খুব হুঁসিয়ার, কন্টিনেণ্ট বা নিউ-ইয়র্কে গিয়ে কি হবে বলা যায় না, অন্তত ভারতবর্ষে (বা বড়জোর ইংলণ্ড যেতে পারলেও) সে নিশ্চিন্ত, সব সময়েই সে বাঁয়ে রেখে চলেছে: চলন্ত গাড়িতে উঠবার সময় আগে ডান পা ও নামবার সময় বাঁ পা—এ তার মুখস্থ। তেমন কুৎসিত মৃত্যু তার নাও হ'তে পারে। বলতে গেলে সব মৃত্যুই কুৎসিত, ফুলের বিছানায় শুয়ে ফুলের গন্ধের মত ম্লান হ'য়ে মরে যাওয়া—শুনতে যত সুন্দর, আসলে ভোগ করতে তত নয়: সেখানেও সেই মৃত্যুর অনিবার্য্যতা, সেখানেও সেই দেহের পরাভব। সব ক্ষেত্রেই কণ্ঠনালীর উপর মৃত্যুর নিষ্ঠুর মুষ্টিপীড়ন, সবখানেই সেই অন্তিমতম মুহূর্ত্ত! অরিন্দম আবার নিজের ভাবনায় চলে এল। কল্‌কাতার পথ-চলায় সে না-হয় দুরস্ত হয়েছে, কিন্তু ট্রেন-সঙ্ঘর্ষ সে এড়াবে কি ক'রে? সেই তো সেদিন সে আমেদাবাদ থেকে ঘুরে এল—বে-লাইন হ'য়ে সে-ট্রেন যদি বেরিয়ে আসত, কিংবা টাইমিং ভুল ক'রে লাগত যদি কোন ডাউন-এঞ্জিনের সঙ্গে ধাক্কা! সে-মৃত্যুটাও বিশ্রী রকমের গোলমেলে—কেটে-ছিঁড়ে চেপটে-থেঁৎলে চেঁচিয়ে-গুঁড়িয়ে সে একটা কুৎসিত কেলেঙ্কারি—হামেশা তা ঘটে না। সচরাচর ঘটে না ব'লেই তার বেলায় ঘটবে না মৃত্যুর সঙ্গে এমন কোনো সে চুক্তি ক'রে আসে নি। তাই সে সাধারণত পেছনের দিকে কামরা নেয়, মনে-মনে একটু নিরাপদ হবার আশ্রয় খোঁজে।

কিন্তু ষ্টীমারে ক'রে নদীর উপর দিয়ে যাবার সময় সে ডুবেও যেতে পারে বা। কিন্তু ধরা যাক যখন সে একদিন ইংলণ্ড যাচ্ছে। তা ছাড়া চাঁদপুর তো তার প্রায়ই যেতে হয়। জলের মধ্যে হাতড়ে-হাতড়ে সে আশ্রয় খোঁজা—উপরে-নীচে দুই অসীম শূন্য, জন্মের আগের ও পরের মত দুই নীরন্ধ্র অন্ধকার—সে না-জানি কি ভয়াবহ মৃত্যু! শেলীর সেই সামুদ্রিক মৃত্যুকে কবিরা কত স্বপ্নের চোখে দেখেছে, কিন্তু অরিন্দমের একটি শিশু ভাইপো একবার কুয়োর মধ্যে পড়ে যায়—মৃত্যুর সেই অসহায় নিষ্ঠুর দৃষ্টান্তটা তার বুকে একটা স্থূল অস্ত্রাঘাতের মত বিঁধে আছে। চা-বাগানের একটা কাঁচা কুয়ো, বাগান থেকে দূরে একটা জঙ্গলের মধ্যে—সেখানে সে দড়িতে ঢিল বেঁধে ছিপ-বঁড়শি বানিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিল; ঝুঁকতে গিয়ে গেল পা ফস্কে, তলাকার জল শব্দ ক'রে চল্‌কে উঠল। শীতের সন্ধ্যে, ঠাণ্ডা কন্‌কনে জল, বদ্ধ কুয়ো—তার মধ্যে অসহায় একটি শিশুর ছোট-ছোট দুটি মুঠি তুলে আপ্রাণ জীবন-কামনা! ভাবতে পার একবার? সেই কুয়োয় বাঁশ ফেলে নামবার সুবিধে নেই—নামতে কেউ চাইলও না, যে নিশ্চিত মরেছে তাকে তুলতে গিয়ে আবার প্রাণ দিতে কেউ রাজি নয়। নীচেকার জল শান্ত হ'য়ে এল। না, সমুদ্রে ডুবে মরা হয়ত এর চেয়ে ভাল—তার মধ্যে অন্তত একটা বিস্তার আছে, একটা অবকাশ আছে: কিন্তু যাই বল সে-মুহূর্ত্তে সব মৃত্যুই সমান—আমার-তোমার ভাববিলাসের কম-

বেশীতে তো তার ভারি আসে যায়! না, ভয় নেই, কলকাতার চৌবাচ্চায় ডুব দেবার ব্যবস্থা নেই, যদিও সাঁতার সে ভাল জানে, বেরালের মত জলকে সে ভয় করে না। তবুও দেহ দিয়ে যখন মৃত্যুকে আয়ত্ত করতে হচ্ছে তখন জলীয় মৃত্যুতে তা'র সায় নেই, সে যেন আরও নীচে তলিয়ে যাওয়া, উপরে ওঠা নয়। উঃ, সে ভয়ানক।

না, আগুনের সঙ্গেও তার কারবার নেই। সে 'স্মোক্' পর্য্যন্ত করে না। চাকরে ষ্টোভ ধরায়, উনুনের সঙ্গে ঠাকুরের সম্পর্ক। একবার আগুনে-পোড়া মৃত্যুও সে দেখেছে, পাশের বাড়িতে। একটি মেয়ে। ছেলের জন্যে দুধ গরম করতে গিয়ে আঁচলের এক পাশে আগুন লেগে যায়, প্রথমে সে টেরই পায় নি, যখন পেল তখন আগুন দাউ-দাউ ক'রে উঠেছে। শাড়িতে-সেমিজে মেয়েটি এত সলজ্জা, নিজের দেহটাকে পর্য্যন্ত রক্ষা করতে পারল না। যে-দেহের জন্যে তার এত লজ্জা, স্বয়ং মৃত্যু এসে তাকে আরও বেশী লজ্জিত করলে। হয়ত আগুনে পুড়েও সে মরবে না। যদি কখনও পোড়ে, মরবার পরেই পুড়বে।

সত্যি, কি ক'রে না-জান সে মরবে! পৃথিবীতে সমস্ত জিজ্ঞাসার মধ্যে এটাতেই বেশী উত্তেজনা, বেশী কৌতূহল! মরবার পরে কি আছে বা না-আছে তা নিয়ে জীবদ্দশায় মাথা ঘামানো একেবারে নিছক পাগলামি, কেন-না নেহাৎই তা মরবার পর; ঈশ্বর আছে কি নেই, পরজন্ম সত্য না ভুয়ো, এ-সিদ্ধান্তটা একদিন সকলের পক্ষেই সমান হ'য়ে দাঁড়াবে, যে ঈশ্বর মানে ও যে ঈশ্বর মানে না—দু-জনের পক্ষেই। কিন্তু কি ক'রে মরবে,—মৃত্যুর এই রীতিটা প্রত্যেকের পক্ষে আলাদা, সেখানে কোনো একটা বিশ্বব্যাপক নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নেই, যার-যার মৃত্যু, নিতান্তই তার-তার আপনার জিনিস। অরিন্দমের মনে হয় সকল প্রশ্নের চাইতে এটাই মহত্তর প্রশ্ন, কেন-না ঈশ্বর আছে কি নেই এই প্রশ্নের চাইতেও এতে অনিশ্চয়তার মাত্রা অনেক, অনেক বেশী।

মৃত্যুকে সে মন দিয়ে ভয় করে না, কিন্তু তার প্রতি তার অগাধ শারীরিক আতঙ্ক। এবং মনকে ভাবের জারক রসে আচ্ছন্ন ক'রেই লোকে মৃত্যুকে নিয়ে কবিতা করে। তার শোকটা হয় তাই নিতান্তই একটা তুচ্ছ মানসিক বিলাসিতা। শোক করবার সময়েও শোকার্ত্ত তার শারীরিক প্রয়োজনকে ভুলতে পারে না, তার ঘুম পায়, খিদে পায়, কখনও বা সুখের স্বপ্ন দেখতে হয়। মৃত্যুর সঙ্গে শরীরটাই একান্ত সম্পর্কিত ব'লে সেটা নিতান্ত কুৎসিত, সে শরীরকে ক্ষতাক্ত করে, পচায়, দুর্গন্ধ ক'রে তোলে।

তার এই শরীর! শত বলসাধন ক'রেও মৃত্যুর উপদ্রব থেকে একে রক্ষা করা যাবে না। বিজ্ঞানের কৌশলে রোগের বীজাণু সে এড়াতে পারে, কিন্তু দুর্ঘটনা? হয়ত মাথার ওপর তার একদিন বাজ ভেঙে পড়ল, কিংবা পায়ের তলায় সাপ মারল ছোবল! মৃত্যু না-জানি তা'র কাছে কোন মূর্ত্তিতে দেখা দেবে—কি ছদ্মবেশে! হয়ত বা কোনো লুকোচুরির ধার ধারবে না, ভূমিকম্পে বাড়ি পড়বে ট'লে—ভগ্নস্তূপের মধ্যে সেও ধূলায় মিশে গেছে। তা'র পাহাড়ে-জঙ্গলে শিকারে যাবার বাই নেই, নইলে সে বাঘের মুখে বা হাতীর পায়ে পড়েছে কল্পনা করতে পারত। স্বপ্নে বোবায় ধরা তা'র অভ্যেস নেই, ব্লাড্-প্রেসারও তার নর্ম্যাল, নইলে ভাবতে পারত সে কোন্‌দিন হঠাৎ আল্‌গোছে হার্ট-ফেল ক'রে গেছে।

আজ হোক্, কাল হোক্, সেই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু একদিন তারও দুয়ারে এসে ঘা মারবে, কিন্তু সেদিন হয়ত সে আর প্রস্তুত হবার সময়ে পাবে না, দেখবে সামনে সেই বিস্তৃত গ্রাস, সেই নিষ্ঠুর শূন্যতা! কত তা'র রূপ ও রীতি অরিন্দম কোটি-কোটি মানব-ইতিহাসেও তা'র কূল পাবে না। সেদিন খবরের কাগজে পড়ল জলজ্যান্ত দুই ভাইকে একটা শকুন এসে পাখার বাড়ি ও পায়ের নখ দিয়ে আঁচড়ে-কামড়ে মেরে রেখে গেল। ছাত থেকে লাফালে কেমন হয় ভাবতে-ভাবতে সত্যি একজন লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে গুঁড়ো হয়ে গেল। তার বেলায় মৃত্যু কি পথ ছ'কে রেখেছে কে জানে! যে-দেহকে সে এত ভালবাসে তাকে মৃত্যু কেমন ক'রে যে পঙ্কিল ক'রে তুলবে তা'র কোনই আজ ইসারা নেই।

সেই আয়নায় সেদিন মুখ দেখার পর থেকে অরিন্দম ধারে-পাশে কেবল মৃত্যুর ছায়া দেখছে। কত দিকে যে তা'র জ'ন্‌লা খোলা, অসাবধানতার কোন্ ছিদ্রে যে সে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে দেয় ঠিক কি! দিনে-রাতে এই প্রশ্নই তাকে পেয়ে বসেছে। স্বাস্থ্যচর্চ্চা ক'রে যতদূর সম্ভব ব্যাধিকে সে দূরে রাখছে বটে, কিন্তু হয়ত হঠাৎ এমন এক দুর্ঘটনায় মরবে যাতে তার স্বাস্থ্যে আর কিছু কুলিয়ে উঠল না। তা'র শরীরে কোনো রোগের উপসর্গ নেই, এ-বিষয়ে হেরিডিটি তার জীবনের জমার ঘরে একটা প্রকাণ্ড সম্পত্তি, তার সমস্ত চাল-চলন একান্ত বিজ্ঞানসম্মত, এবং প্রকৃতির হাতে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করাই হচ্ছে নতুন স্বাস্থ্যনীতি। একদিকে যেমন ডিস্ইন্‌ফেক্‌টেন্ট ওষুধ, তেমনি আবার খটখটে রোদ আর উড়িয়ে-নেওয়া হাওয়া। তবু যেখানে যেটুকু অপচয় বা অনিয়ম হয়, তা সে নিজের রক্তের জোরে পরিপূরণ ক'রে নেয়। দাঁতের ফাঁকে যেমন তার কোন মুহূর্ত্তে ক্ষুদ্র খাদ্যকণা থাকে না, তেমনি তার ঘরে-দুয়ারে নেই এতটুকু একটি ধূলিকা। স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে সে ঝক্‌ঝক্ করছে।

কিন্তু কি ক'রে যে সত্যি মরবে এই চিন্তায় অরিন্দমের মন দিনে-দিনে ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। সেই শেষ মুহূর্ত্ত তার জন্যে কি মূর্ত্তিতে প্রতীক্ষা ক'রে আছে তার দুই চোখে আজ-কাল শুধু সেই সন্ধানের তীক্ষ্ণতা। বুকে তার যেন কিসের একটা ভার, অর্থহীন অবসাদের ভাব যেন তার মুখে। ন্যাকড়ার আগুন যেমন ছেড়েও ছাড়ে না, তেমনি এই চিন্তাটা তার মনের মধ্যে অনবরত ধোঁয়াচ্ছে। প্রতি পদে যেন সে আর কারও পদশব্দ শুনছে: প্রতি পদে তার সেই সাতঙ্ক, ত্রস্ত মন্থরতা। যেখানে সে যাচ্ছে, সঙ্গে-সঙ্গে সেই অদৃশ্যরূপিণী ছায়া, নিঃশব্দসঞ্চারিণী পদধ্বনি! কখন যে সে ঘোমটা খুলে ফেলে তার নগ্নতা উদ্‌ঘাটিত ক'রে বসে অরিন্দমের স্নায়ুতে শিরায় সর্ব্বদা সেই শীতার্ত্ত বিভীষিকা।

মনের এই অস্বাস্থ্য আস্তে-আস্তে তার শরীরেও সংক্রামিত হ'তে লাগল। আজকাল তার আর ভাল ক'রে খিদে পায় না, কাটা-কাটা ঘুমের মধ্যে সে আঁৎকে ওঠে, আয়নায় নিজের মুখে সে আজকাল যেন মৃত্যুরই প্রতিবিম্ব দেখতে পায়, মুখের মধ্যে কেমন একটা জ্বালার ভাব, রক্তে কেমন একটা নিস্তেজ নিরানন্দ ক্লান্তি, চোখের পাতায় গভীর ক'রে অবসাদের কালি পড়েছে। মৃত্যুকে সে ভয় করে না, যখন সে একান্ত আসবেই তখন মন থেকে আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে ভয় পর্য্যন্ত মিলিয়ে গেছে, কিন্তু কবে ও কিসে যে সে মরবে তার দেহে-মনে প্রতি-ক্ষণে কেবল এই ভয়ের ভার। প্রেমের মত মৃত্যুকেও সে নির্ব্বাচন করতে পারবে না, কখন যে তার আকস্মিক আবির্ভাব ঘটবে সর্ব্বাঙ্গে তার সেই অনিশ্চয়তার আতঙ্ক। এই অনিশ্চয়তার হাত থেকে তার মুক্তি নেই।

তার চেহারায় অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন দেখে সবাই তাকে জিগ্‌গেস করে: কি হয়েছে? সত্যি, কি যে তার হয়েছে নিজেই সে কিছু বুঝতে পারে না, কি-একটা আতঙ্ক তার সমস্ত জীবনীশক্তিকে কুরে-কুরে ঝাঁজরা ক'রে ফেলছে। ব্যায়াম ক'রে শরীরে আপাদমস্তক রক্তের একটা প্রবল উত্তেজনা এনে সে এই কলুষিত অবসাদকে দূর করতে চায়, কিন্তু ব্যায়ামের শেষে আয়নার কাছে এসে দাঁড়াতেই নিজের মুখ দেখে সে শিউরে ওঠে। শিটে চিম্‌সে মুখ, শিকারীর লক্ষ্যের সামনে হরিণের ক্ষিপ্র, অসহায় ত্রস্ততা। এক নিমেষে তার সমস্ত দৈহিক উৎসাহ আবার উবে যায়, মনের মধ্যে সেই মুখের ছাপ চন্দ্রের উপর রাহুর কলুষ-স্পর্শের মত লেগে থাকে।

তার পর একদিন আয়নায় এমনি মুখ দেখতে গিয়ে অরিন্দম দেখল তার জিভের উপর ঠিক মাঝখানে লাল-মতন গোলাকার একটা স্ফীতি, একটা বিন্দুর মতন চেহারা, কিন্তু কেমন-যেন অস্বাভাবিক রকমের দেখতে। প্রথম ভাবলে জিভের ময়লা থেকে কোনো অসতর্ক মুহূর্ত্তে একটা ফুস্কুরি উঠে থাকবে: কোনো একটা ডিস্ইন্‌ফেক্‌টেন্ট মাউথ-ওয়াশ বা গরম-গরম ঘি-ভাতেই এর বিনাশ। কিন্তু দিনের সঙ্গে-সঙ্গে সেই বিন্দুটা ক্রমশ বেশী ক'রে জায়গা জুড়তে সুরু করেছে, জিভটা কেমন ভারী, বিস্বাদ হয়ে উঠেছে, ঐ একটা বিন্দুতে কেমন যেন

শত সূচ্যগ্রের জ্বালা ; ঐ একটা বিন্দুর মধ্য দিয়ে তার সমস্ত প্রাণশক্তি যেন শুষে যাচ্ছে। খিদে নেই, হাঁ করতে কষ্ট হয়, মুখে দুর্গন্ধ, হয়ত একদিন কথাও যাবে বন্ধ হ'য়ে। অরিন্দম আর আয়না ছাড়ে না, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জিভ দেখে। মাত্র হাত পা বুক-পেটের ব্যায়াম ক'রে সে জিহ্বাকে সায়েস্তা করতে পারে না। খেতে ভীষণ লাগে ব'লে চেহারাও তার দু-দিনে ম্লান, নিষ্প্রভ হ'য়ে এল। নিজের বিদ্যে-বুদ্ধি দিয়ে যখন সে আর এঁটে উঠল না তখন সে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হ'য়ে চলল ডাক্তারের সন্ধানে। নিজের জন্যে প্রার্থী হয়ে পরের দ্বারস্থ হ'তে হবে এটা তার কাছে এতদিন একটা শারীরিক অপমানের বিষয় ছিল। কিন্তু উপায় নেই, আর দেরি করা যায় না।

পকেট ভরে নিল সে অনেক টাকা : প্রথমেই গেল সে শহরের বড় সাহেব-ডাক্তারের কাছে। জিভটা মেলে ধ'রে ভারি গলায় সে জিগ্‌গেস করলে : আমার এটা কি হয়েছে বলতে পারেন ?

সাহেব তার অভিজ্ঞ সন্ধিৎসু চক্ষু দিয়ে একটিবার মাত্র পরীক্ষা ক'রে বললেন,—ঘা, ক্যান্‌সারও হ'তে পারে।

অরিন্দম এক মুহূর্ত স্তব্ধ হ'য়ে রইল : এক মুহূর্ত। নির্লিপ্ত স্বরে বললে : হুঁ ! এই—এই আপনার ফি। ব'লে গোণা-গুন্‌তি নোট-টাকা তাঁর টেবিলের উপর রেখে আর বাক্যব্যয় না ক'রে সে বেরিয়ে গেল। এতগুলি টাকা দিয়ে সামান্য সে একটা ব্যবস্থা-পত্র পর্য্যন্ত নিয়ে গেল না।

তারপর গেল সে আর এক নামজাদা ডাক্তারের বাড়ি। অনেক রোগীর ভিড়—কতক্ষণে ডাক পড়ে ততক্ষণ অপেক্ষা করবার যেন তার সময় নেই। শহরের আরও অনেক বাড়ি তার ঘুরতে হবে।

তারপর যখন ডাক পড়ল, অরিন্দম ডাক্তারের মুখোমুখি হয়ে শুভ অভিবাদনের স্বরে প্রায় প্রসন্ন গলায় জিগ্‌গেস করলে : আমার জিভে এটা কি হয়েছে ব'লে আপনার মনে হয় ?

চোখে ম্যাগনিফাইং গ্লাস লাগিয়ে ডাক্তার বললেন,—বোধ হয় ক্যান্‌সার। দাঁড়ান্—পরীক্ষা করাতে হবে।

—না, আমার বেশী সময় নেই। অরিন্দম ঘুরে দাঁড়াল। পকেট হাতড়াতে-হাতড়াতে বললে,—এই আপনার ফি।

ডাক্তার ঘাবড়ে গিয়ে বললেন : কিন্তু, শুনুন, একটা প্রেস্‌ক্রপশান—

—অনেক, অনেক ধন্যবাদ। সামান্য নত ক'রে অরিন্দম বললে : গুড-বাই।

সাহেব-পাড়ায় আরও দু-জন বড় ডাক্তার আছেন। তাদের একজনের সে দেখা পেল।

—এই যে জিভে একটা কি হয়েছে, দেখুন তো ভাল ক'রে ? কি এটা ?

তাঁর মুখেও সেই একই কথা : বোধ হয় ক্যান্‌সার। কিংবা—

অরিন্দম প্রায় হেসে উঠল, জোর দিয়ে বললে : ক্যা ন্ সা র ! থ্যাঙ্ক।

ডাক্তার কাগজে কি-একটা খসখসিয়ে লিখতে-লিখতে বললেন : তোমার এখানে আর কে আছে ? কোথায় থাক ? কর কি ?

অরিন্দম তাড়াতাড়ি পকেট থেকে টাকা বা'র ক'রে বললে,—থামুন, এই আপনার ফি রইল।

তবু, এখনও অরিন্দম সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়নি। বাঙালী-পাড়াটা বাকি আছে। কিছু আজ বিকেলে সারবে, বাকিটা কাল ভোরে। টাকার মায়া ক'রে লাভ নেই। সবাই-ই তো ভাল হবার জন্যে দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করতে বলবে, কিন্তু অরিন্দমের অত সময় কই ? সে এখুনি ভাল হ'তে চায়, এই মুহূর্ত্তে ভাল হ'তে চায়। শরীরের এক ফোঁটা গ্লানি সে সজ্ঞানে সহ্য করতে পারছে না।

আপিস কামাই ক'রে সে দুপুরেই আবার বেরিয়ে পড়ল। মাঝারি কয়েকজন ডাক্তারও সে দেখালে। তাঁরা সবাই অনেক-সব অবান্তর কথা বলতে চান, সরাসরি মতামত প্রকাশ করতে সাহস পান না। বলেন : দেখুন না দু-চার দিন ওষুধটা ব্যবহার ক'রে—কি দাঁড়ায়।

অরিন্দম অসহিষ্ণু গলায় বলে : আমি চিকিৎসার জন্যে আসি নি, ব্যারামটা কি জানতে এসেছি।

—তা এক কথায় ঠিক কি বলা যায় বলুন। আপনি সম্প্রতি এই ওষুধটা নিয়ে যান্ না। এত ব্যস্ত কি!

—ভীষণ ব্যস্ত। অরিন্দম ফি-টা রেখে চম্পট দিলে।

এতদূর পর্য্যন্ত সে এড়িয়ে এসেছিল, কিন্তু বড় একজন বাঙালী ডাক্তারের কাছে যেতেই তিনি তাকে আটকে ফেললেন। বললেন: শুধু সন্দেহ ক'রে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি না, সেক্‌শান কেটে নিয়ে একটা মাইক্রস্‌কোপিক্ এক্‌জামিনেশান্ করতে হবে।

ম্লান হেসে অরিন্দম বললে: কি দরকার?

—বাঃ, দরকার নেই? ডাক্তার অভয় দেওয়ার সুরে বললেন,—আর্লি কেস্, ভালও হ'তে পারেন। দাঁড়ান্, খানিকটা সেক্‌শান আমিই কেটে নিচ্ছি। প্যাথলজিষ্ট-এর রিপোর্ট নিতে হবে।

অরিন্দম সমস্ত শরীর স্থির কঠিন ক'রে এক মুহূর্ত্ত কি ভাবলে। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হওয়াই ভাল। ডাক্তার নাছোড়বান্দা। ভুয়ো সন্দেহের ওপর তাঁর রায় দিতে তিনি কুণ্ঠিত। মন্দ কী: শরীরে-মনে নিশ্চিন্ত, নির্লিপ্ত হওয়া যায় তা হ'লে।

—তা হ'লে কাল সকালে আসব। রিপোর্ট তৈরি হ'বে তো ততক্ষণে? অরিন্দম টাকা গুণতে-গুণতে বললে।

—কাল হ'বে না, দু-দিন পরে আসবেন।

দুই রাত্রি অরিন্দম সমানে ঘুমুতে পারে নি, কিছু খেতে পারছে না, কথা কেমন তার আড়ষ্ট হ'য়ে আসছে। তবু, কোনো রকমে সেই অন্ধকার সে সাঁতরে পার হ'য়ে এল। নির্দ্দিষ্ট দিনে ডাক্তারের কাছে যখন সে এসে হাজির হ'ল তখন তাকে আর আগের মানুষ ব'লে চেনাই যায় না।

অরিন্দম পরিচয় দিলে ডাক্তার বললেন: ও! হ্যাঁ, রিপোর্ট পেয়েছি। ক্যান্‌সার।

বহুদূর হ'তে যেন উত্তর এল: ধন্যবাদ।

ডাক্তার বললেন,—রেডিয়াম-নিড্‌ল। সকাল-সকাল ধরা পড়েছে, সেরে যাবে। ভয় নেই। বসুন।

—না, ভয় নেই। অরিন্দম বেরিয়ে পড়ল।

উন্মত্তের মত রাস্তায় বেরিয়ে এসে সে নানা ফিকির-ফন্দি ক'রে বিষ কিনল। তার সমস্ত শরীরে তখন নেশা লেগে গেছে। বাড়ি যখন ফিরল তখন দুপুর: আকাশময় আগুনের শিখা। ঘরে ঢুকে ছোট টিপয়ের ওপর শিশিটা রেখে সে গা থেকে জামাটা খুলে ফেললে; আয়নায় তা'র বিস্তৃত বক্ষতট উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল। হাতে তুলে নিল সেই বিষের শিশি। ছিপিটা খুলতে যেতে আয়নায় নিজের চেহারা দেখে কি আবার সে একটু ভাবলে।

চেষ্টা ক'রে দেখা যেত, কিন্তু চেষ্টা করবার সহিষ্ণুতা সে সইতে পারবে না। এই তা'র বিধান, এই তা'র মৃত্যুর সঙ্গে মধুচন্দ্রিকা। প্রকাণ্ড একটা মূর্খতার মত হয়ত দেখাচ্ছে, কিন্তু মূর্খতা ছাড়া মৃত্যু আবার কি!

কিন্তু অনেক কিছু বন্দোবস্ত ক'রে যাবার ছিল। সে চলেই যদি গেল, তবে আবার কিসের বন্দোবস্ত! পৃথিবীতে যা-কিছু হোক্ না হোক্, তাতে তার কি! কিংবা গ্রামে আত্মীয়-স্বজনদের কাছে একটা চিঠি! সে চ'লে গেলে তার সঙ্গে আর সম্পর্ক কিসের! কিংবা পুলিসকে! না, তার এই দেহের জন্যে আর কোন মায়া নেই।

শিশির ছিপিটা সে খুলে ফেলল। এই বার—আর এক সেকেণ্ডের মধ্যে তা'র শরীরটা মেঝের ওপর ভেঙে পড়বে। হ্যাঁ, দেখা যাক্।

না, সে মরল না, সে নিজেকে মারল; নিজের ইচ্ছায় মৃত্যুকে সে তার পরম ঔদাসীন্য ও বিলম্বিত আলস্য থেকে উদ্ধার ক'রে আনল। এ মৃত্যুর জয় নয়, এ তার নিজের কীর্ত্তি, নিজের মৌলিক রচনা। এতে স্বয়ং মৃত্যু পর্য্যন্ত বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

অরিন্দম এখন কি বুঝছে, কি দেখছে, তা সে-ই বলতে পারে।

ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষ

শ্রীসুরুচিবালা রায়

ব্রহ্মদেশে সর্ব্বত্রই আজকাল ভারতীয় বিদ্বেষটা বিশেষভাবেই চোখে পড়ে। এতদিন উহা কেবল দেশের সাধারণ লোকদের ভিতরেই প্রকাশ পাইতেছিল, শিক্ষিত ভদ্রলোকদের ব্যবহারে কচিৎ কখনও উহা বাহিরে ফুটিয়া উঠিলেও এ-বিষয় লইয়া বিশেষ কোন আলোচনা প্রায়ই কেহ করেন নাই, কিন্তু এবারে নূতন ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচন উপলক্ষে যে-সকল সভা-সমিতি হইয়া গিয়াছে, তাহাতে অনেক শিক্ষিত নেতাই এই বিদ্বেষের ভাবটা পরিস্ফুট করিয়া জানাইয়াছেন।

কিন্তু এই বিদ্বেষের সৃষ্টি হইল কেন, কাহারও কাহারও মনে এ প্রশ্নও জাগে। দিনকতক আগে একজন বর্ম্মী বন্ধুর সঙ্গে এই বিষয় লইয়াই কথা হইতেছিল। তিনি বলিতেছিলেন, ভারতবর্ষের সঙ্গে নাড়ীর যোগ আমাদের বহু দিনের। ভারতের শিল্প, ভারতের সভ্যতা, জানিত বা অজানিত ভাবে, বহু দিক দিয়া আমাদের সমাজকে স্পর্শ করিয়া গিয়াছে; সর্ব্বোপরি ভারতেরই গৌতম বুদ্ধ আমাদের আরাধ্য দেবতা,বুদ্ধের ধর্ম্মেই আমরা বৌদ্ধ। বুদ্ধের সমাজগঠন এবং সমাজসেবার যে আদর্শ ছিল, আমরা আজিও তাহা ভুলি নাই,—বর্ত্তমানের এই পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের দিনেও আমাদের পল্লীগুলির গার্হস্থ্য জীবনে এবং ফুঙিচাউঙের (ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়) বালকগুলির প্রাথমিক শিক্ষায় তাহাই আমাদের একমাত্র আদর্শ। কালে কালে হয়ত তাহাতে নানা ভাবের বিকৃত রূপ আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু সেই মহান উচ্চ ভাবটি চক্ষের সম্মুখে আমাদের তেমনই উজ্জ্বল এবং জীবন্ত রহিয়াছে। ভারতের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতাও আমরা যথাসাধ্য প্রকাশ করিয়াছি। প্রতি বৎসর কত শত সহস্র ভারতীয় বর্ম্মা হইতে ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়া লইতে আসে, দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতবাসী এখানে আসিয়াই অন্ন পায়, আশ্রয় পায়, কিন্তু কোন প্রতিবাদের সুর ত পূর্ব্বে কখনও উঠে নাই, এখন কেন উঠিতেছে ?—গ্রামে, শহরে, সর্ব্বত্র কেন বর্ম্মাদের ভিতরে ভারতবাসীর প্রতি অসন্তোষ এমন তীব্র হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে ? ইহার কারণ কি ভারতীয়েরা কেহ কোনদিন অনুসন্ধান করিয়াছেন ?

কেন যে উঠিতেছে তাহা সত্যই ভারতবাসীর ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। বহু পূর্ব্বের খবর যতটুকু জানা যায় তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় ব্রহ্মদেশের সঙ্গে কেবলমাত্র অর্থের যোগ স্থাপন করিয়া ভারতবাসী তখন আপনাকে এরূপ হীন প্রতিপন্ন করে নাই। যুগযুগান্ত পূর্ব্বে এমন দিনও ছিল যেদিন প্রাণের সঙ্গে প্রাণের যোগ স্থাপন করিয়া ভারতেরই আর্য্য মহাপুরুষেরা এদেশে তাঁহাদের বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। আর্য্যেরা যে স্থানের অভাবে নানা দিকে নানা দেশে স্থান খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন, ইতিহাসপাঠকের তাহা অজানা নাই। স্থলপথে পাহাড়ে পর্ব্বতে চলিতে চলিতে এদেশেও যে তাঁহারা আসিয়া পঁহুছিয়াছিলেন এবং এক বিশাল রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার বহু প্রমাণ আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। মহারাজ অশোক যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য ধর্ম্মপ্রচারক এ দেশেও পাঠাইয়াছিলেন, এ-কথাও কাহারও অজ্ঞাত নাই।

ভূগোলে এখন যে দেশটিকে প্রোম বলে, অনেকের মতে আর্য্যদের প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল সেই দেশটিতেই। ব্রহ্মের উপাসক বলিয়া নিজেদের রাজধানীটির নামও রাখিলেন তাঁহারা 'ব্রহ্ম'। কালক্রমে এই নামটিই অপভ্রংশ হইয়া প্রথমে 'ব্রোম' এবং পরিশেষে 'প্রোম' নামে পরিচিত হইয়াছে। তালাইন বলিয়া একটি প্রাচীন জাতি এখনও প্রোমকে ব্রোম নামেই উচ্চারণ করিয়া থাকে। এই তালাইন জাতিটিও বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতেই ব্যবসায় উপলক্ষে ব্রহ্মে

আসিয়াছিল। কিন্তু দীর্ঘ কালের সংস্পর্শে, আচারে বিচারে, পোষাক পরিচ্ছদে, বা কোন কিছুতেই ইহারা এখন আর এদেশীয়দিগের হইতে পৃথক নহে।

প্রোমে প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হইবার পর ক্রমে ক্রমে তাঁহারা যে বিশাল সমতল ভূমিটিতে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিলেন, সেই সমগ্র দেশটিই ব্রহ্মদেশ নামে পরিচিত হইয়া পড়িল। রূপে এবং আকারে বহুপ্রকারে পরিবর্ত্তিত হইলেও আজিকার এই ব্রহ্মদেশ আমাদের প্রাচীন আর্য্য মহাপুরুষদেরই নাম দেওয়া সেই ব্রহ্মদেশ। পুরং, সারবতী, হংসবতী, মন্দালয় প্রভৃতি তাঁহাদের রাজত্বকালের প্রধান প্রধান সহরগুলি বর্ত্তমানে বিকৃতভাবে উচ্চারিত হইলেও এখনও তাঁহাদের দেওয়া সেই নামগুলিই আছে। আমরাপুরা, থারওয়ারদী, হাণ্ডাওয়াড়ী, ম্যাণ্ডালে নামগুলি এখনও সেই আর্য্যবাসিন্দাদের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

থাটনে তালাইন রাজবংশের বহু মন্দির এখনও ব্রহ্মে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতারই পরিচয় দেয়। মহারাজ অশোকের বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের পর এদেশের রাজা প্রজা যখন সকলেই বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, তখনও ব্রহ্মদেশীয় রাজারা যে ভারতবর্ষীয় হিন্দুরাজকন্যা-গণকে বিবাহ করিয়া স্বদেশে লইয়া আসিতেন, তাহারও বহু প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়। পাগান যখন রাজধানী ছিল, তখন হিন্দু রাজমহিষীর জন্য যে সকল হিন্দুমন্দির স্থাপিত হইয়াছিল, এখনও তাহার কতকগুলি অক্ষত দেহে বিদ্যমান থাকিয়া ভারতের সহিত ব্রহ্মের এক গভীর সম্পর্কের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

ইহার পর বহুদিন ধরিয়া ভারতের নানা ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতকে নিজগৃহ সংরক্ষণেই যখন সদাই ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইত, খুব সম্ভব তখনই বিদেশের সঙ্গে ভারতের প্রাণের এই প্রকারের যোগ দূরীভূত হইয়া গিয়াছিল; তথাপি ইহার পরের ইতিহাসেও জানা যায়, ভারত সম্পর্কত্যাগ করিলেও ব্রহ্মদেশ ভারতীয় আর্য্যধর্ম্মের সঙ্গে যোগ রাখিতে সর্ব্বদাই আগ্রহান্বিত ছিল। মণিপুর হইতে ব্রাহ্মণ আনিয়া ম্যাণ্ডালের রাজবংশীয়েরা রাজধানীতে অগণিত ব্রাহ্মণবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রাজবাড়ির ক্রিয়া-কর্ম্মে সর্ব্বদা তাঁহাদের মত গ্রহণ করা হইত। রাজ-বংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা এখন এদিকে-ওদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে রাজবাড়ি হইতে বৃত্তি পাইয়া সুখেস্বচ্ছন্দে তাহারা পরিবার প্রতিপালন করিত, এখন সৎ অসৎ নানা উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, নৃত্যগীত দ্বারা ইহাদের মেয়েরা অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। ইহারা এখানে 'পৌনা' নামে খ্যাত। নানা দিক দিয়া বহু আঘাত খাইতে খাইতে দীর্ঘদিন ধরিয়া অতি হীন সঙ্কীর্ণতার চাপে থাকিতে থাকিতে ভারত তাহার উদারতাটুকু হারাইয়া ফেলিয়াছে। মনের ভিতরের সকল সম্পদ হারাইয়া, আজি সে জাতি-সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িয়াছে। নিজের দেশে, নিজের চতুষ্পার্শ্বের সকলকেই ঘৃণা করে, সুতরাং পরদেশ হইতে আগত নিজের প্রতিবাসীকেও সে আর গ্রহণ করিতে পারে না। দরিদ্র দুঃখী 'পৌনা'দের তাই আজ দেশেও স্থান নাই। দিনে দিনে ক্রমে ক্রমে ইহারা বর্ম্মাদের সঙ্গেই মিলিয়া যাইবে।

সে যাহা হউক, কোন প্রকার ঐতিহাসিক বর্ণনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, আমরা শুধু ইহাই বলিতে চেষ্টা করিলাম, যে, ব্রহ্মদেশের সঙ্গে ভারতের এই একটা ভয়াবহ বিদ্বেষের ভাব চিরদিন ছিল না। বর্ত্তমান যুগের ইহা নূতন সৃষ্টি। অতিমাত্রায় ভেদবিচারের ফলেই এই ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। দিনে দিনে, ক্রমে ক্রমে ধূমায়িত হইয়া উঠিতে উঠিতে এখন যাহা জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহা নির্ব্বাপিত হইবার কোন উপায় কি আর আছে?

প্রায় অষ্টবিংশতি বৎসর ধরিয়া ব্রহ্মের সঙ্গে ভারতের যে নূতন যোগ স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে এইটাই বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে, যে, ভারত কেবল দুটি হস্ত প্রসারিত করিয়া গ্রহণ করিতেই ব্যস্ত। ভারতের দীন দুঃখী অনাথ কাঙাল হইতে আরম্ভ

করিয়া বড় বড় ব্যবসায়ীরা পর্য্যন্ত আপন আপন কাজের সুবিধার জন্যই এদেশে বসবাস করিয়া বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতেছে। এদেশের সকল প্রকার সুখ সুবিধা ভোগ করিবার কত উপায়ই ইহারা নিরন্তর খুঁজিতেছে, কিন্তু যাহাদের হস্ত হইতে সকল সুখ, সকল তৃপ্তি আসিতেছে, বিধর্ম্মী পাহাড়ী বলিয়া সর্ব্বদা ইহাদের তফাতে রাখিয়া, সর্ব্বদা ইহাদিগকে ঘৃণা করিয়াই উহারা চলিতেছে। উহারা ভারতীয়, সুতরাং সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে উহারা যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এইরূপ একটা ধারণা উহাদের কথাবার্ত্তা এবং ব্যবহারে সর্ব্বদাই পরিস্ফুট হইয়া থাকে।

কিন্তু তথাপি বহুদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মবাসী তাহাদের সহজ সরল আনন্দময় চরিত্রের গুণে এই অপমান এবং অবহেলা অগ্রাহ্য করিয়াই আসিয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমানে এই জাতীয় জাগরণের দিনে তাহাদেরও ভাবিয়া দেখার সময় আসিয়াছে। তাহারা যে কেবল দানই করিয়া আসিয়াছে, প্রতিদানে ঘৃণা ছাড়া আরও কিছু পাইয়াছে কি? অবশ্য ইহাদের দুঃখ এবং সকল প্রকার অভিযোগে সমবেদনা প্রকাশ করেন এমন ভারতীয়ও কেহ কেহ আছেন কিন্তু ইহাদের সংখ্যা খুবই কম।

প্রথম দৃষ্টিপাতেই দেখা যায় ব্রহ্মদেশের নূতন রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সরকারী চাকুরী ইত্যাদি সকল সুবিধাই ভোগ করিয়া আসিতেছে ভারতীয়েরা,—আরও একটু স্পষ্টভাবে বলিলে বলা চলে বাঙালীরা। নূতন রাজত্ব সংস্থাপনের সময় বাঙালীর সহায়তা যে রাজশক্তিকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল, এ-কথা হয়ত অনেকেরই জানা আছে। ইহার ফলে বাঙালী এদেশের সকল প্রধান কর্ম্মক্ষেত্রেই বিশেষ সুযোগ লাভ করিয়াছিল। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া এবং মনের ভিতরের ভেদাভেদ নীতিটুকু না রাখিয়া বাঙালী যদি এই দেশটিকে আপনার করিয়া লইতে পারিত, তবে ইহাদের অন্তরেও বাঙালী যে একটা বিশেষ স্থান লাভ করিয়া থাকিতে পারিত একথা আজ অনেকেরই মনে হয়।—

ওকালতী, ডাক্তারী, ছোটবড় সকল ব্যবসায়—বর্ম্মাদের প্রাধান্য আছে ইহাদের কোনটিতে? এমন কি কুলী মুটে বা খালাসী খানসামাগিরি কাজ করিয়াও ভারতীয়েরাই ব্রহ্মদেশে পালিত হইতেছে কিন্তু বর্ম্মাদের সঙ্গে অন্ততঃ। প্রকাশ্যেও ভাল ভাব দেখাইয়া উদারতা দেখানো ও উহারা প্রয়োজন মনে করে নাই। আজিকার এই বিদ্রোহবহ্নি যে তাই জ্বলিয়া উঠিয়াছে, একথা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

দেখা যায় দীর্ঘকাল প্রবাসবাসের সময় অনেক ভারতীয়ই এদেশীয় মেয়েদের এদেশীয় প্রথামতেই বিবাহ করিয়া অবশেষে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন কালে বহু সন্তান সহ ইহাদিগকে পথে ভাসাইয়া গোপনে পলায়ন করে। ইদানীং বড় বড় শহরগুলিতে সভাসমিতি করিয়া এদেশীয় ফুঙ্গিগণ (বৌদ্ধভিক্ষু) এরূপ বিবাহ বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

শুধু এই বিবাহ ব্যাপারেই নহে, সকল দিকেই ক্রমে ক্রমে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া ব্রহ্মবাসিগণ এই যে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, ব্রহ্মদেশে যে আজ ভারতীয়ের আশ্রয় ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, ইহাতে ব্রহ্মবাসীকেই শুধু রক্তলোলুপ, হিংস্র বলিয়া নিন্দা করিলে চলিবে না, ইহাদের অতিথিপরায়ণ সরল হৃদয়ে ভারতবাসীই একদিন যে বীজ রোপণ করিয়াছিল, আজ তাহাই একটি চারাগাছে পরিণত হইয়াছে মাত্র। অদূর ভবিষ্যতে এই বিদ্বেষ আরও কত ঘনীভূতভাবে বাড়িয়া উঠিবে কে জানে।

কষ্টিপাথর

বাঙ্গালী কোথায় গেল ?

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

...আজ ২৫ বৎসর যাবৎ আমি বাঙ্গালীর অর্থ-সমস্যা ও তাহার সমাধান সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। ৬২ বৎসর পূর্ব্বে (১৮৭০ খৃষ্টাব্দে) যখন আমি প্রথম কলিকাতায় আসি, তখন চাঁপাতলা গোলদীঘির ধারে ও অখিল মিস্ত্রী লেনের সম্মুখের বাড়িতে আমরা বাস করিতাম। তখন ইহা অবশ্য শ্রদ্ধানন্দ পার্ক নামে অভিহিত হয় নাই। পটলডাঙ্গার ন্যায় প্রকৃতপক্ষে এখানে দীঘি ছিল। এই অঞ্চলের পশ্চিমে ছুতারপাড়া অবস্থিত ছিল, এখনও ছুতারপাড়া লেন তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। এতদ্ভিন্ন অখিল মিস্ত্রীর গলির পূর্ব্বাঞ্চলেও অনেক ছুতারের বসতি ছিল; ছুতারপাড়া ও এ-সকল অঞ্চলে হিন্দু ছুতারগণ নানাবিধ কাঠের কাজে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিত এবং এই সকল স্থান সরগরম্ করিত। আজ কলিকাতায় হিন্দু ছুতার খুঁজিয়া পাওয়া দায়। যাহা বাঙ্গালী মুসলমান ছুতার আছে, তাহারাও সংখ্যায় দিন-দিন কমিয়া যাইতেছে। ইহারা হাওড়া আমতা অঞ্চলের অধিবাসী। কিন্তু তাহারা চীনা ছুতারগণের প্রতিযোগিতায় দিন-দিন হটিয়া যাইতেছে এবং সংখ্যায় কমিতেছে।

সেই সময় কলিকাতায় যাবতীয় গোয়ালা বাঙ্গালী হিন্দু ছিল। আমাদের যে দুধ যোগান দিত, সেও এই শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু 'তে হি নো দিবসা গতাঃ।" আজ বাঙ্গালী গোয়ালা কলিকাতায় সংখ্যায় কয় জন?

ষাট বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় যত বড় বড় কাঠের গোলা ছিল সে সমস্তই ছিল বাঙ্গালীর কারবার। প্রায়ই এইগুলি নিমতলায় অবস্থিত। চাঁপাতলা ও ইটালিতেও কিছু কিছু ছিল ও আছে। তাহার মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় ৺তারকনাথ প্রামাণিকের গোলাগুলি উল্লেখযোগ্য। আজ কলিকাতার যাবতীয় বড় বড় কাঠের গোলা মাড়োয়ারীগণের করায়ত্ত। কেবল ৺মহেশচন্দ্র কোলের পুত্রগণ ও অপর দুই চারি জন তাঁহাদের পৈতৃক ব্যবসায়ের মান রক্ষা করিতেছেন। আজ কলিকাতার যাবতীয় রজক পশ্চিমদেশীয়। বাঙ্গালী কোথায় গেল? আজ কলিকাতায় বাঙ্গালী নাপিতেরও সংখ্যা দিন-দিন হ্রাস পাইতেছে, পশ্চিমারা তাহাদের স্থান দখল করিতেছে। সে সময় কলিকাতায় যতগুলি বাজার ছিল, তখন তথায় বাঙ্গালী—হিন্দু ও মুসলমান-ব্যাপারী বিরাজ করিত। আজ যদি কেহ বাঙ্গালীটোলায়—এমন কি, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে যান ত দেখিবেন, পশ্চিমা হিন্দু ও মুসলমান ব্যাপারী তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া লইতেছে। বিশেষতঃ আলুর মহাজনী ব্যবসা মাড়োয়ারী ও পশ্চিমাগণের একচেটিয়া। নইনীতাল, দার্জ্জিলিং, শিলং প্রভৃতি অঞ্চলে যে প্রচুর পরিমাণে গোল আলু জন্মে, তাহা দাদন দিয়া এই শেষোক্ত অ-বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা করতলগত করিয়াছেন। তখন কলিকাতায় মুদী ও ময়রার দোকান সমস্ত বাঙ্গালীদিগের হাতে ছিল। আজ দেখা যায়, যত বৃহদায়তন মুদীখানা—যেখানে ঘি চিনি ময়দা খুচরা ও পাইকারী দরে বিক্রয় হয়, সমস্তই অ-বাঙ্গালীর দ্বারা অধিকৃত। আর দাল-কলাইয়ের ত কথা নাই। আহিরীটোলার পাইকারী ও বাঙ্গালীটোলার খুচরা সমস্তই অ-বাঙ্গালীর।

কলিকাতায় যত পাচক ও ভৃত্য আছে, তাহার শতকরা ৯৫ জন হয় পশ্চিমা না হয় উৎকলবাসী—ইহারা মফঃস্বল শহরে গিয়াও ঢুকিয়াছে। যত পাল্কির বেহারা সমস্তই হয় উড়িয়া না হয় পশ্চিমা। বড় বড় রেলওয়ে ষ্টেশনে ও ষ্টীমার-ঘাটায় যাবতীয় কুলি পশ্চিমা। গঙ্গার ঘাটে এমন কি নৈহাটী, শ্যামনগর প্রভৃতির ঘাটেও যত মাঝি-মাল্লা সমস্তই অ-বাঙ্গালী। বাঙ্গালায় এই প্রকার নানা ব্যবসায়ে ও রোজগারে প্রায় বাইশ লক্ষ অ-বাঙ্গালী। ফলকথা, আমার আত্মচরিতে হিসাব দিয়াছি যে, যাবতীয় অ-বাঙ্গালী বাঙ্গালা দেশ হইতে নিজ প্রদেশে প্রতি মাসে গড়ে ১০ কোটি এবং বৎসরে ১২০ কোটি টাকা প্রেরণ করে। ইহা শুনিলে অনেকে হয়ত স্তম্ভিত হইবেন, কিন্তু সত্য গোপন করিলে মন কি প্রবোধ মানিবে?

কলিকাতায় সমস্ত অলি-গলি ও বড় রাস্তার উপর পান বিড়ি প্রভৃতির দোকান—যাহা সংখ্যায় কয়েক সহস্র হইবে, তাহার দুই একটি ছাড়া সবই বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত নহে। এই পানের দোকান—যেগুলি প্রশস্ত রাস্তার ধারে, সেইগুলিতে বরফ লেমনেড ও সরবৎ গ্রীষ্মকালে প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হয়। ইহার এক একটি দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি, দোকানীরা প্রত্যহ এক সরবৎই বিক্রয় করে এক শত দেড় শত টাকার। এখন মাছের ব্যবসায়ে পর্য্যন্ত পশ্চিমা, উড়িয়া, মাড়োয়ারীরা নামিয়াছে। মাছ অবশ্য জেলেরা ধরিয়া আনে; কিন্তু ইহারা ধনী (capitalist) হিসাবে সেই সব মাছ পাইকারী দরে ক্রয় করিয়া রেলওয়ে ষ্টীমার ষ্টেশনে বরফ ভর্ত্তি করিয়া কলিকাতায় চালান দিতেছে।

ভবানীপুর অঞ্চলে পাঞ্জাবীগণের বড় বড় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে। ইহারা মোটর-পরিচালন ও মোটর মেরামতি করতলগত করিয়াছে। তা ছাড়া ইলেক্‌ট্রিক ফিটিংও পাঞ্জাবীগণের একচেটিয়া। এই কলিকাতায় পাঁচ-সাত হাজার পাঞ্জাবী এই প্রকার নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। ইহাদের হোটেলখানা ও ধোপা-নাপিত, মুদিখানা—সমস্তই পাঞ্জাবীর। এমন কি, শুনিতেছি ডাক্তারও পাঞ্জাবী। ইহারা বাঙ্গালীর কোন তোয়াক্কাই রাখে না। জল, ড্রেন, গ্যাস প্রভৃতি বিভাগে যাবতীয় মিস্ত্রী উড়িয়া—একটিও বাঙ্গালী নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বাঙ্গালীর কেরাণীগিরি অন্ততঃ একচেটিয়া ছিল, ইহাদিগের মুখের গ্রাস মান্দ্রাজীরা আসিয়া কাড়িয়া লইতেছে। একজন মান্দ্রাজী গ্রাজুয়েট অম্লানবদনে পঁচিশ-ত্রিশ টাকার কেরাণী—বিশেষতঃ টাইপ-রাইটারী হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর সঙ্গে পাইলে বাঁচিয়া যায়। কারণ, ইহাদের মাসিক খোরাক সাড়ে চার টাকার উপর হইবে না, একটু 'রসম'—মানে তেঁতুল-জল লবণ, ও পাতলা ঝোল অর্থাৎ হোমিও-প্যাথিক ডাইলিউসন হিসাবে তাহার অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয়। এখন কলিকাতায় অন্ততঃ পাঁচ-সাত হাজার মান্দ্রাজীর উপনিবেশ আছে। ইহাদিগের স্বতন্ত্র দোকানপাট, স্কুল পর্য্যন্ত আছে। কলিকাতা হাতীবাগান অঞ্চলের তেলের কলগুলিও বহুলাংশে অ-বাঙ্গালীর হাতে চলিয়া গিয়াছে।

ইহা ত হইল খুচরা ব্যাপারের কথা। ষাট বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার বড়বাজার অঞ্চল প্রধানতঃ বাঙ্গালীর সম্পত্তি ছিল এবং অনেক বড় বড় মহাজনী ব্যবসাও বাঙ্গালীর হাতে ছিল। তখনও বড় বড় হৌসের অনেকগুলি মুৎসুদ্দি পুরুষানুক্রমে বাঙ্গালীর আয়ত্ত ছিল। কিন্তু আজ সমস্ত বড়বাজার অঞ্চল—এমন কি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর হস্তচ্যুত। অধিক কি এ-সমস্ত জমির মালিকানী স্বত্বও বাঙ্গালীর হাত হইতে অ-বাঙ্গালীর হাতে চলিয়া গিয়াছে। আর এই অঞ্চলে বৎসরে যে কোটি কোটি টাকার আমদানী রপ্তানী হইতেছে, তাহার শতাংশের এক ভাগও বাঙ্গালীর আছে কি-না সন্দেহ।

এই ত গেল কলিকাতার কথা। সমস্ত বাঙ্গালা ও আসাম জুড়িয়া যত ধান, পাট, সরিষা ভূষিমাল—এমন কি, সমস্ত ক্ষেত্রজ ফসলের ব্যবসায়,—তাহা য়ুরোপীয় ও মাড়োয়ারীর একচেটিয়া। তা ছাড়া যত আমদানী মাল—যথা—বিদেশী ও বোম্বাইয়ের কাপড়, কেরোসিন তেল, লবণ, সোডা ইত্যাদি সমস্তই অ-বাঙ্গালীর হাত দিয়া চলে। কলিকাতার যাবতীয় ব্যাঙ্কে প্রত্যহ লাখ লাখ টাকার হুণ্ডী চেক ড্রাফট ইত্যাদির আদান-প্রদান হয়, তাহাও মূলতঃ বাঙ্গালীর হাত দিয়া নহে। বেল পাকিলে কাকের কি। হায়। হতভাগ্য বাঙ্গালী! ইহার শতকরা কয়েক অংশ তোমার, তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?

মাসিক বসুমতী—মাঘ, ১৩৩৯]

—

হিন্দু এবং আরবগণের মধ্যে সাহিত্য সম্বন্ধ

সৈয়দ সামসুদ্দিন আহম্মদ

হিজরী প্রথম শতাব্দীর মধ্য হইতেই আরবের মুসলমানগণ ভিন্নদেশীয় সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থাদি অনুবাদ আরম্ভ করেন। সিরিয়া তাঁহাদের অধিকারে থাকাকালীন তাঁহারা গ্রীক ও সিরীয় বহুসংখ্যক পুস্তক নিজ ভাষায় অনুবাদ করেন। পরে ইরাণ তাঁহাদের শাসনাধীনে আসিলে তাঁহারা ইরাণীয় ও সংস্কৃত ভাষায় বিভিন্ন প্রকারের পুস্তকসমূহ অনুবাদ করেন। খলিফা মনসুর অতীব বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার উক্ত সুখ্যাতি শুনিয়া সিন্ধু হইতে একটি deputation-এর সঙ্গে জনৈক গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রবিৎ হিন্দু পণ্ডিত একটি সংস্কৃত সিদ্ধান্তসহ বোগদাদে উপনীত হন। খলিফার আদেশানুসারে তিনি ইব্রাহিম ফাজারি নামে খলিফার দরবারস্থিত জনৈক বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদের সহায়তায় তাহা আরবীতে অনুবাদ করেন। ভারতের প্রতিভার সহিত আরববাসিগণের এই প্রথম পরিচয়। খলিফা হারুণ-র-রসিদের সময় যে সমস্ত ভারতীয় চিকিৎসক বোগদাদে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন তাঁহারা প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, ভারতীয় প্রতিভা অমূল্য। পরে বারমাকিদগণের উৎসাহে ও সাহচর্য্যে সাহিত্য, জ্যোতিষ, ফলিতজ্যোতিষ, চিকিৎসা ও নীতিশাস্ত্রের বহুবিধ পুস্তক সংস্কৃত হইতে অনূদিত হইয়াছিল।...

আরবের মুসলমানগণ বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, তাঁহারা এক হইতে নয় পর্য্যন্ত সংখ্যাগঠনপ্রণালী হিন্দুদের নিকট শিখিয়াছেন। উক্ত কারণেই তাঁহাদের সংখ্যাগুলির নামকরণে তাঁহারা ভারতের অনুকরণ করিয়াছেন। ইউরোপীয়গণ তাঁহাদের নিকট ঐ প্রথা শিখিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে "আরবী সংখ্যা" নাম দিয়াছেন। ঠিক কোন্ সময় আরবের মুসলমানগণ হিন্দুদের নিকট উক্ত প্রণালী শিখিয়াছেন তাহার প্রকৃত তথ্য গোপন রহিয়াছে। ১৫৬ হিজরীতে যে হিন্দুপণ্ডিত একটি সিদ্ধান্তসহ বোগদাদ গিয়াছিলেন তিনিই সম্ভবতঃ তাঁহাদিগকে এই প্রণালী শিখাইয়াছেন। আরবে প্রথমতঃ শব্দের সাহায্যে সংখ্যা লিখিত হইত। পরে তাহারা গ্রীক এবং য়িহুদিগণের ন্যায় অক্ষরে সংখ্যা লিখিতেন। সংক্ষিপ্ত এবং সুবিধাজনক বলিয়া আরবের ফলিত জ্যোতিষে এখনও ঐ প্রথা প্রচলিত আছে। যাহা হউক, মহাম্মদ-বিন-মুসা-অল-খাওয়ারাজমীই সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় সংখ্যাগুলিকে আরবী আকার প্রদান করেন। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটনিকার একাদশ সংস্করণের চতুর্দ্দশ খণ্ডে পূর্ব্ব ও পশ্চিম আরবের সংখ্যাসমূহ হস্তলিপি এবং inscription হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাতেই প্রতীয়মান হইবে কি করিয়া আরবে ভারতীয় সংখ্যাগুলির অনুকরণ করা হইয়াছিল। খলিফা মামুন-র-রসিদের দরবারস্থিত জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ বিখ্যাত পণ্ডিত অল্-খাওয়ারজমী উক্ত সংখ্যাগুলি সংশোধিত এবং সন্নিবেশিত করেন। এই সংখ্যাগুলিই আন্দালুসিয়া হইতে ইউরোপে গৃহীত হইয়াছে। ইউরোপের একটি বিশেষ অঙ্কশাস্ত্রকে লগারিথম্, অল্গরিথম, এগরিজম অথবা অল্গরিজম্ বলা হয়। এই সমস্তগুলিই অল-খাওয়ারাজমী নামের অপভ্রংশ। আন্দালুসিয়ার আরবগণ এই ভারতীয় সংখ্যাগুলিকে 'হিসাব-অল্ গুবার' বলেন। ভারতবর্ষের পণ্ডিতগণ গ্রাম্য পাঠশালায় মাটিতে কষিয়া অঙ্ক শিক্ষা দিতেন। সম্ভবতঃ এই প্রথা হইতেই উক্ত আরবী নামের উৎপত্তি হইয়াছে। উক্ত আকৃতির সংখ্যাগুলির উৎপত্তি স্থান যে আরব নয় ইহার একটি বিশেষ সিদ্ধ প্রমাণ এই যে আরবের অন্যান্য প্রকার লিখন প্রণালীর বিপরীত ইহাদিগকে বামদিক হইতে ডানদিকে লেখা হয়। আরবেরা কিন্তু ইহাদিগকে ডানদিক্ হইতে বামদিকে পড়ে। সিন্ধু হস্তাক্ষরের সহিত ইরাণ নাদিম এই সংখ্যাগুলির উল্লেখ করিয়াছেন এবং এক হইতে একহাজার পর্য্যন্ত লিখনপ্রণালী শিক্ষা দিয়াছেন। সিন্ধুবাসী পণ্ডিতগণের প্রচেষ্টাতেই উক্ত প্রথা আরবে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।...

আনুমানিক ১৫৪ হিজরী সনে জনৈক হিন্দুপণ্ডিত সিন্ধুদেশ হইতে একটি deputation-এর সঙ্গে একটি জ্যোতিষগ্রন্থসহ বোগদাদে গিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থের পূর্ণ সংস্কৃত নাম 'ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত'। আরবীতে সাধারণতঃ ইহাকে 'আস্-সিন্দ-হিন্দ' বলা হয়। অন্য একটি সংস্কৃত পুস্তক আরবীতে অনূদিত হইয়াছিল। ইহার সংস্কৃত উচ্চারণ 'আর্য্যভট্ট'। 'আহর্ব্বর বুয়ান' নামক সংস্কৃত পুস্তকটিও আরবীতে অনূদিত হইয়া 'আর্কন্দ' নামে বিখ্যাত হইয়াছে। উহার সংস্কৃত মৌলিক নাম 'খণ্ড খাদ্যক'। সর্ব্বপ্রথম সিদ্ধান্ত অনুবাদের সহায়ক হিন্দু পণ্ডিতের ইব্রাহিম ফাজারি এবং ইয়া কুব-বিন-তারিখ নামক দুইজন শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতে আরবীতে উক্ত গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন।

কালের যেরূপ বিভাগের উপর হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে 'কেলাপ' বলে। পৌরাণিক জাতি সমূহের ন্যায় হিন্দুরাও বিশ্বাস করিতেন যে, চন্দ্র সূর্য্য শনৈশ্চর প্রভৃতি গ্রহসমূহ নভোমণ্ডলে একই সময়ে vernal equinox-এ আবির্ভূত হয় এবং একই সময় আবর্ত্তন আরম্ভ করে। লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে এই সপ্তগ্রহ একই স্থানে মিলিত হইলে মহাপ্রলয় হইবে এবং পুনরায় বিশ্বের সৃষ্টি হইবে। আবার এই দুই অবস্থার মধ্যবর্ত্তী সৌরবৎসরগুলিকেও 'কেলাপ' বলা হয়। ব্রহ্মগুপ্তের মতে একটি 'কেলাপ' চারিশত বত্রিশ কোটি বৎসরের সমান। উক্ত নির্দ্ধারণ অনুসারেই দিবস গণনা করা হয়। আরবেরা এই 'কেলাপ'কে সানি-উস্-সিন্দ-হিন্দ বা সিদ্ধান্তের বৎসর এবং দিবসগুলিকে 'আয়া-মুস-সিন্দ-হিন্দ' বলেন। লক্ষ কোটি হিসাবে গণনা দুরূহ বলিয়া আর্য্যভট্ট পঞ্চম খৃষ্টাব্দের শেষভাগে গণনা সহজবোধ্য

করার নিমিত্ত 'কেলাপ'কে সহস্রভাগে বিভক্ত করেন এবং অংশগুলিকে 'যগ' 'মহাযগ' নাম প্রদান করেন। এই নীতি অনুযায়ী প্রণীত আর্য্যভট্টের গ্রন্থকে আরবগণ 'আরজভর' অথবা আরজভজ বলেন এবং যগ শব্দটিকে 'সনি আরজভজ' অথবা আর্য্যভট্টের যুগ বলেন। তাঁহারা 'আস্-সিন্ধ-হিন্দ' এবং আরজভজ শব্দদ্বয়ের ধাতুগত অর্থ ভুল করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, ইহা গণনার এবং নিয়ম 'আস-সিন্ধ-হিন্দ অর্থ আদ্-দাহর-উদ্ দাহির এবং আরজভজ অর্থ সহস্রতম অংশ। শেষোক্ত পুস্তকটি আবুল হাসান আত্ওয়াজি কর্ত্তৃক অনূদিত হইয়াছিল।

ইয়াকুব বিন্ তারিখ 'আর্কন্দ' অর্থাৎ 'খন্দ খাদেক'-এর নিয়মাবলী "সিদ্ধান্ত"-এর পণ্ডিত অথবা অন্য কোন পণ্ডিত হইতে লিখিয়াছিলেন। পুস্তকটির প্রণেতা ব্রহ্মগুপ্ত কিন্তু ইহার কতক নীতি সিদ্ধান্তের নীতি হইতে বিভিন্ন। এই পুস্তকত্রয় আরব জ্যোতির্বিদগণের মধ্যে সিদ্ধান্তের নীতিসমূহ প্রচলন করে।...

খলিফা হারুন-র-রসিদের রাজত্বকালে অল-খাওয়ারাজমী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কোষ্ঠীতে গ্রাস ও ইরাণীয় জ্যোতিষ নীতি গ্রহণ করা হইলেও উহার মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল হিন্দু জ্যোতিষ নীতির উপর। উক্ত কারণেই এই পুস্তককে 'আস্-সিন্ধ-হিন্দ-ই-সগির' অথবা ক্ষুদ্রতর সিদ্ধান্ত বলা হয়। হিজরীর তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম সনে হাসান-বিন-সাব্বাহ, হাসান-বিন-খাসিব, কজল-বিন-হাতিম তাবরিজী, আহামদ-বিন-আবদুল্লাহ মারওয়াজি, ইবন-অল-আদমী আবদুল্লা, আবু রায়হান-অল-বাইরুণী "সিদ্ধান্ত" সম্বন্ধে বহু গবেষণা করেন।... হিজরীর চতুর্থ শতাব্দীতে সিদ্ধান্তীয় নীতিসমূহ বোগদাদ হইতে স্পেনে গৃহীত হয়। মাদ্রিদ নিবাসী মুসলামা বিন্-আহামদ (মৃ ১০০৭ খৃঃ) অল-খাওয়ারাজমীর আস্-সিন্ধ হিন্দ-ইসগিরের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রস্তুত করেন। আবুল আস্‌বাগ (মৃঃ হিজরী ৪২৬) সিদ্ধান্তের নীতিতে একটি বৃহৎ কোষ্ঠী প্রস্তুত করেন। অতঃপর সিদ্ধান্তীয় প্রভাব সাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ইব্রাহিম জারকালী তাঁহার 'সাফাতুল জারকালীয়া' নামক পুস্তকে সিদ্ধান্তের নীতির উপর নির্ভর করিয়াছেন। স্পেনের আরবদের মধ্যবর্ত্তিতায় সিদ্ধান্তের নীতিসমূহ য়িহুদি এবং ইউরোপবাসিগণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। য়িহুদি পণ্ডিত এবরাহাম তাঁহার হিব্রু পুস্তকগুলিতে সিদ্ধান্তীয় প্রণালীতে কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়াছেন।

নিজস্ব গবেষণার বলে আরবী ফলিত জ্যোতিষ উন্নতির উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়াছিল। সংস্কৃতের একটি অপ্রচলিত এবং দুইটি প্রচলিত পারিভাষিক শব্দ এখনও আরবী ফলিত জ্যোতিষে প্রচলিত আছে। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, জ্যোতিষ শাস্ত্র ভারত হইতে আরবে গমন করিয়াছিল। 'সিদ্ধান্ত' নামটি ব্যতীত প্রাচীন আরবী জ্যোতিষে 'কর্দায়া' বলিয়া একটি সংস্কৃত পারিভাষিক নাম আছে। ইহার মূল সংস্কৃত নাম 'করমজিয়া'। পরে ইহার পারিভাষিক নাম 'কিত্তর মুস্তবী' হইয়াছে। "জেইব" শব্দটি এখনও আরবী অঙ্ক শাস্ত্রে এবং ত্রিকোণামিতিতে পাওয়া যায়। ইহার অর্থ "পকেট"। ইহার সংস্কৃত মৌলিক শব্দটি 'জিবা'। 'জেইব-উত্তামাম' প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ হইতেই 'জুইউবমান কুসা', 'কুইউব সবসুতা' মাইউব প্রভৃতি শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। অত্যন্ত কাটাচাঁটি করিয়া এইগুলি সংস্কৃত হইতে আরবীতে গৃহীত হইয়াছে। আজকাল কেহই বিশ্বাস করিবেন না এই সমস্তগুলিই মূলতঃ সংস্কৃত। সর্ব্বশেষ শব্দটি "আওজ"। জ্যোতিষে ইহার অর্থ 'শীর্ষস্থান'। আরবী, পারসী উর্দ্দুতে উহা এত প্রচলিত যে, কেহই বিশ্বাস করিবেন না ইহার উৎপত্তি সংস্কৃত হইতে। এই জন্যই উহার ধাতু আরবী dictionaryতে পাওয়া যায় না। আরও দুইটি শব্দের ধাতুগত অর্থ প্রণিধানযোগ্য। হিন্দু পণ্ডিতগণ গ্রহের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ কালে মধ্যন্দিন রেখা [meridian] নির্ণয় করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে এই রেখা সিংহলের উপর দিয়া অতিক্রম করিয়াছে।

ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র হইতে আরব জ্যোতির্বিদগণ যে সমস্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহারা দুইটি বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ অনুরূপ। ব্রহ্মগুপ্তের মতে এক বৎসরে ৩৬৫ দিবস ৬ ঘণ্টা ১২ মিনিট ৯ সেকেণ্ড। বর্ত্তমান জ্যোতিষ মতে এক বৎসরে ৩৬৫ দিবস ৬ ঘণ্টা ১২ মিনিট ৯·২৩ সেকেণ্ড। পৃথিবীর গতিবিধি সম্বন্ধেও ঐ কথা। আর্য্যভট্ট এবং তাঁহার শিষ্যগণ বিশ্বাস করিতেন যে, পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করে। ব্রহ্মগুপ্ত গবেষণা করিয়া এই মতকে দৃঢ় করিয়াছেন। বর্ত্তমান মতও এই।...

যে সমস্ত চিকিৎসা পুস্তক আরবীতে অনুবাদিত হইয়াছিল তন্মধ্যে প্রধান দুইটি। শাশারাত—ইহাকে আরবগণ সাস্রু বলেন। উহা দশ অধ্যায়ে বিভক্ত। উহাতে রোগের এবং রোগ-লক্ষণসমূহের বিস্তারিত আলোচনা আছে। ইয়াহ ইয়া বিন খালিদ অল-বারমাকির আদেশে মাঙ্কা ইহাকে আরবীতে অনুবাদ করেন। ইহাই guide রূপে বারমাকি চিকিৎসাগারে ব্যবহৃত হইত। চরক—ইহার প্রণেতা—ভারতবর্ষের জনৈক ঋষি ও বিখ্যাত চিকিৎসক। ইহা সংস্কৃত হইতে পারসীতে এবং পারসী হইতে আরবীতে অনূদিত হইয়াছিল। তৃতীয় পুস্তকটিকে ইবনে নাদিম 'সস্কিহান' এবং ইয়াকুবি 'সানজ্হান' বলিয়াছেন।...ইহাতে চারিশত চারিটি রোগের লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে এবং শুধু রোগের চিকিৎসার বিবরণই ইহাতে আছে। বিভিন্ন প্রকার ভেষজ দ্রব্য ও গাছ গাছড়ার নাম সংবলিত পুস্তকে মধ্যে মধ্যে একটি ভেষজ দ্রব্যের দশটি নামও পাওয়া যায়। সুলেইমান বিন ইসাকির ব্যবহারের জন্য মাঙ্কা উক্ত পুস্তকটি আরবীতে অনুবাদ করেন। গ্রীক এবং ভারতীয় ঔষধের শারীরিক কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে ব্যবস্থা এবং বৎসরকে ঋতুতে বিভাগের বিভিন্নতা সম্বন্ধে বহুবিধ আলোচনা সংযুক্ত অন্য একটি পুস্তক অনূদিত হইয়াছিল। ইবনে নাদিম 'আস্তানকার' নামক আর একটি পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার অনুবাদক ইবনে ধন্। নওকাশনাল নামক জনৈক বৈদ্যের দুইটি পুস্তক অনুবাদ করা হইয়াছিল। একটিতে একশত রোগ এবং একশত ঔষধের বর্ণনা আছে। অন্যটিতে রোগ নিরূপণ সম্বন্ধে ভ্রান্তি এবং উহার ফলাফলের বর্ণনা আছে। রাউয়া নামক জনৈক হিন্দু নারীর একটি চিকিৎসা পুস্তক অনুবাদ করা হইয়াছিল। তাহাতেও স্ত্রীরোগের বর্ণনা আছে। গর্ভিনা নারী সম্বন্ধে একটি ভেষজ দ্রব্য ও গাছগাছড়া বিষয়ে একটি এবং মত্ততা সম্বন্ধে একটি—এইরূপ তিনটি পুস্তক অনূদিত হইয়াছিল।

অনেক আরবী ঔষধের নাম সংস্কৃত। 'জানরাবিল' শব্দটি সংস্কৃত। ইহা হজরত মহম্মদের সময়ও ছিল, এমন কি পবিত্র কোরাণেও উহার উল্লেখ আছে। আরবীতে একটি ঔষধ এবং একটি খাদ্যের নাম বড় অদ্ভুত। আরবী 'ইতরিফল' ঔষধটির নাম প্রায় সবাই জানেন। অল-খাওয়ারাজমী এই সম্বন্ধে বলেন "ইহা সংস্কৃত ত্রিফল অথবা 'তিনটি ফল'। 'হলিনা', 'বালিলা,' এবং 'আম্লাহ' নামক তিনটি ফলের সংযোগে ইহা প্রস্তুত হয়। 'আমলাহ্ একটি ভারতীয় ফল। মধুর সহিত উহাকে মিশ্রিত করিয়া 'আন্‌বাবাত' প্রস্তুত হয়। ইহার আদি সংস্কৃত নাম 'জুয়ান বা' অথবা 'আমের আচার'। 'বাহতা' শব্দটি আরও অদ্ভুত। অল খাওয়ারাজমী ইহার এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন "ইহা একটি সিন্ধু শব্দ এবং রোগের একটি পথ্য,—ভাতের সহিত ঘি এবং

দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া ইহা রন্ধন করা হয়। ইহা সম্ভবতঃ ভারতীয় 'ভাত'। কিন্তু আরবদের পক্ষে ইহা লঘু পথ্য।"...

প্যারিসের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগে 'মুজ মাউল তাওয়ারিখ' নামক একটি পারসী পুস্তক আছে। তাহাতে মহাভারতের কতকগুলি কাহিনী আছে। ভূমিকায় আছে যে, আবু সলিহ্ বিন্ সুয়েব সংস্কৃত হইতে আরবীতে উহার অনুবাদ করেন। দেইলামার জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির লাইব্রেরীর সেক্রেটারী আবুল-হাসান আলী জাবালী পুনরায় উহাকে আরবীতে অনুবাদ করেন।...

রাজনীতি ও দৌত্য কর্ম্ম বিষয়ে দুইজন হিন্দু পণ্ডিতের পুস্তক সংস্কৃত কিংবা পালি হইতে আরবীতে অনূদিত হইয়াছিল। আরবগণ ইহাদের একজনকে "শানাখ" এবং অপরটিকে "বাখার" অথবা "বাজহার" নাম দিয়াছেন। প্রথমটি সম্ভবতঃ "চৌক" এবং দ্বিতীয়টি 'বয়াগর'। শানাখের আলোচ্য বিষয় যুদ্ধের ব্যবস্থা, রাজার লোকনির্ব্বাচন, সৈন্য সমাবেশ, খাদ্য এবং বিষ। "বয়াগ"রের পুস্তকে তলোয়ারের গুণাগুণ ও প্রতিকৃতি দেওয়া আছে। "আদাব-উল-মুলক" নামক আর একটি পুস্তক সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত হইয়াছিল। উহার অনুবাদক আবুসলিহ্ বিন্ সুয়েব।...

বিচিত্রা, ফাল্গুন, ১৩৩৯]

—

ভারতের রত্ন

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

ভারতভূমি রত্নগর্ভা, এ-কথা অনেকেই বলেছেন, অনেকেই লিখেছেন। কিন্তু রত্ন বলতে কেউ বোঝেন লেখক বা বক্তা কেউ বোঝেন কবি! রত্নের মূল অর্থে এই প্রবাদটির ব্যবহার বড় বেশী হয় না। হ'লেও গোলকুণ্ডার হীরকই একমাত্র উদাহরণ দেওয়া হয়। কিন্তু রত্ন অর্থে খনিজ-সম্পদের কথা বললে যে এই প্রবাদটি কতদূর সত্য, সে-কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন না।

প্রকৃত রত্নের মধ্যে ব্রহ্মদেশের নীলকান্তমণি ও পদ্মরাগ ভুবন-বিখ্যাত। কিন্তু সে রত্ন আহরণের একচেটিয়া অধিকার একমাত্র একটি ব্রিটিশ কোম্পানীর হাতে। অন্য রত্নের আকর এদেশে বিশেষ নাই, হীরক ও মরকত মাঝে মাঝে পাওয়া যায় মাত্র। অনেক উপরত্নই এদেশে এবং সিংহলে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেগুলির দাম বা চাহিদা কোনটিই বিশেষ নাই।

ধাতুর মধ্যে নিকেল ভিন্ন অন্য সকলগুলিই এদেশে অল্পবিস্তর পাওয়া যায়। কিন্তু লাভজনক খনি যে-কয়টি আছে সে সবই বিদেশীর হাতে, একমাত্র টাটা কোম্পানীর লোহার খনি ও কারখানা এদেশীয়দের অধিকারে আছে, কিন্তু তাহাও এখন বিদেশী বণিক-সঙ্ঘের পদানত। সোনার খনির মধ্যে মহীশূরের কোলার ক্ষেত্র প্রসিদ্ধ, সেখানে বৎসরে প্রায় ৪৫০ মণ সোনা ওঠে, কিন্তু সেটি সম্পূর্ণ বিদেশীর অধিকারে। তাম্রের খনি এদেশে একটি ও ব্রহ্মে আর একটি আছে, দুটিই ইংরেজের অধিকারে। টিন, সীসা, দস্তা, রৌপ্য, উলফ্রাম—এ কয়টির বিরাট আকর ব্রহ্মদেশে আছে এবং সব কয়টিই ইংরেজ কোম্পানীর হাতে।

এদেশের খনিজের মধ্যে ভারতীয় ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোম, ও অভ্র জগৎশ্রেষ্ঠ। এই তিনটির মধ্যে প্রথমটি এখন প্রায় সম্পূর্ণ ই বিদেশীর হাতে, দ্বিতীয়টির কিছু অংশ দেশীয়দের অধিকারে আছে, তৃতীয়টি (অভ্র) আট দশ বৎসর আগেও ভারতীয়দের অধিকারে ছিল, কিন্তু মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদিগের ভেজালের চোটে এখন সম্পূর্ণরূপে ইংরেজেরই আয়ত্ত হয়ে গেছে।

খনিজ তেল (কেরোসীন-জাতীয়) এখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খনিজসম্পদ ব'লে পরিচিত। আসামে, পঞ্জাবে, সিন্ধুদেশে, ব্রহ্মদেশে এ জিনিষ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে, কিন্তু দুই-একটি ছোট খনি বাদে এখন প্রায় সবই বিদেশীর অধিকারে।

কয়লার কথা প্রায় সকলেই জানেন। কিন্তু অনেকেই জানেন না যে, এদেশে কি রকম বিশাল কয়লার খনির ক্ষেত্র রয়েছে। কিন্তু এ ব্যবসায় এখন প্রায় সম্পূর্ণ ই বিদেশীর হাতে। শ্রেষ্ঠ খনিগুলির মধ্যে যে-কয়টি এদেশীয়দের হাতে ছিল সে-সবই এক এক ক'রে বিদেশীর হাতে যাচ্ছে। আরও বিপদের কথা এই যে, যে-সব বিরাট ক্ষেত্রে ভাল খনি হওয়া সম্ভব সেগুলিরও অধিকার ক্রমে ক্রমে ইংরেজের হাতেই যাচ্ছে।

চুন, সিমেণ্ট ইত্যাদির শ্রেষ্ঠ আকরগুলি এখন বিদেশীর করতলগত হয়ে গেছে। চীনামাটি, গিরিমাটি ইত্যাদিরও প্রায় সেই অবস্থা।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গত ছয়-সাত বৎসরের মধ্যে এই বিদেশী প্রভাবের বিস্তার প্রায় দশগুণ বেড়েছে। এর কারণ 'দেশনেতা'দিগের এই বিষয়ে অজ্ঞতা এবং এদেশের লোকের এ-বিষয়ে শিক্ষার অভাব।...

ছোটগল্প—ফাল্গুন, ১৩৩৯]



খেলার সাথী—শ্রীপঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এ, ফিজিক্যাল ডিরেক্টার মাদ্রাজ। প্রকাশক আশুতোষ লাইব্রেরী, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা, পৃষ্ঠা ১৪৪, দাম দেড় টাকা।

চারিটি ভাগে ছেলেদের জন্য প্রায় দেড় শত নূতন খেলার পরিচয় গ্রন্থকার দিয়াছেন। অধিকাংশ খেলাকে ছবির সাহায্যে বুঝাইয়া দেওয়াতে বইখানি বিশেষ মনোজ্ঞ হইয়াছে।

জগা খিঁচুড়ী—শ্রীআশুতোষ সান্যাল, প্রকাশক এম-সি সরকার এণ্ড সন্‌স্, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃষ্ঠা, ১৫০; দাম এক টাকা।

হাস্যরসাত্মক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। মামুলী ধরণের রসিকতার নিদর্শন মাঝে মাঝে থাকা সত্ত্বেও বইখানি পড়িয়া আনন্দ পাওয়া যায়; লেখকের ভূয়োদর্শনের পরিচয় গ্রন্থের অনেকস্থলে বিদ্যমান। ছাপা ও বাঁধাই উত্তম।

লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রকাশক—যুগান্তর বাণীভবন, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৮৩; দাম দেড় টাকা।

স্বামীজীর লণ্ডন প্রবাসকালের (খৃঃ ১৮৯৬) ঘটনাবলী অতি মনোরম ভাষায় লেখক বিবৃত করিয়াছেন। লেখক প্রত্যক্ষদর্শী ও স্বামীজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভুল হইবে বলিয়াই মনে করি। স্বামীজীর জীবনী সম্পর্কে যাঁহারা আলোচনা করিতেছেন এই বহিখানি তাঁহাদের বিশেষ প্রয়োজনে আসিবে।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

বিদ্যুৎ শিখা—শ্রীমতিলাল দাশ। বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ১৲ টাকা। পৃঃ ২১৫।

বারটি গল্পের সমষ্টি। প্রথম, প্রেমের মূল্য—চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, নরোত্তমদাস, কবীর, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির গান এবং মেঘদূত, Doll's House, ঘরে বাইরে প্রভৃতির ভাবসমষ্টিতে মোটের উপর ৬৭ পৃষ্ঠায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। লেখকের উদ্দেশ্য অতিশয় সাধু; ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য, বিবাহবিচ্ছেদের যুক্তিহীনতা, নব্য ও নব্যার অধোগতি, মায় সিন্দূর-মাহাত্ম্য—লেখার মধ্যে কিছুই বাদ পড়ে নাই। বাকী এগারটি গল্প অবশ্য আয়তনে ছোট, কিন্তু তা বলিয়া কোনটিই ছোটগল্প হয় নাই।

মলাটের ও বইয়ের ভিতরের রঙীন ছবি দুখানা না দিলে রুচিকর হইত। ইহা সত্ত্বেও ছাপা ও বাঁধাই মোটের উপর ভাল হইয়াছে।

বিলাত ভ্রমণ—শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী। ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কস্, ২০০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দুই টাকা। পৃষ্ঠা ৩০৪+।৶০।

ইতিমধ্যেই বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হইয়াছে, ইহাতে বিদেশের খবরাখবর জানিবার জন্য দেশের লোকের ঔৎসুক্য বোঝা যায়। লেখা ঝরঝরে—বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না। দ্বিতীয় সংস্করণে কয়েকটা অংশ নূতন লিখিত হইয়া বইখানি আরও সুন্দর হইয়াছে।

শ্রীমনোজ বসু

অন্নপূর্ণা—শ্রীরাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এম-সি সরকার এণ্ড সন্স, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১।০ টাকা পৃষ্ঠা ১৬৫।

বইখানা উপন্যাস। লেখা উদ্দেশ্যমূলক তাহা গোড়াতেই লেখক স্বীকার করিয়াছেন। সতীমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা হইয়াছে—তা ছাড়া আরও অনেক অনেক সাধু বিষয়ের অবতারণা আছে।

ক.

নুন্-ধাপসী খেলা বা শির্-গিজো খেলা—'নেবুতলা কপাটী ক্লাব পক্ষে এক্কেবি রচিত। আচার্য্য স্যার পি-সি, রায় মহাশয় লিখিত ভূমিকাসহ। প্রকাশক শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ চৌধুরী বি-এল, সম্পাদক, ৬ সার্পেন্টাইন্ লেন, কলিকাতা, দক্ষিণা ৵০ আনা।

কপাটী, নুন্-ধাপসী প্রভৃতি বিভিন্ন দেশীয় খেলার বিবরণ প্রচার-কার্য্যে ব্রতী হইয়া নেবুতলা কপাটী ক্লাব কেবল যে স্বাস্থ্য ও ব্যায়াম চর্চ্চায় রত ব্যক্তিদিগের এবং খেলোয়াড়দিগের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা নহে, দেশের সর্ব্ববিষয়ক আচার-ব্যবহারের ইতিহাস ও তুলনামূলক আলোচনায় অভিনিবিষ্ট শুভার্থী প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও নৃতত্ত্ববিদগণের প্রচুর মানসিক আহার সংগ্রহের উপায় করিয়া তাঁহাদেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে বিচ্ছিন্নভাবে নানা দেশীয় খেলার কিছু কিছু বিবরণ মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয় দেখিতে পাওয়া যায়। নেবুতলা ক্লাবের মত সমিতি সেগুলির সুসম্বদ্ধ বিবরণ স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিলে বাংলা সাহিত্য পুষ্ট হইবে—খেলোয়াড়েরা সন্তোষের সহিত অজ্ঞাত ও বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় খেলার আস্বাদ গ্রহণের সুযোগ পাইবেন এবং পণ্ডিতগণ তাহাদের সম্বন্ধে বিভিন্ন আলোচনা করিয়া পরিতোষ লাভ করিবেন। এইরূপে যুগপৎ বিভিন্ন সম্প্রদায়কে পরিতৃপ্ত করিবার সুযোগ অল্পই পাওয়া যায়। নেবুতলা ক্লাবকে আমরা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি।

বাংলার ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত অধুনা অজ্ঞাত-প্রায় এই নুন ধাপসী 'খেলার প্রাঞ্জল বিবরণ এই পুস্তিকায় প্রদত্ত হইয়াছে। খেলাটি দিন দিন অপ্রচলিত হইয়া প'ড়তেছে—তাই ইহার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রফুল্লচন্দ্র ভূমিকায় যে কথাগুলি বলিয়াছেন তাহার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তিনি সত্যই বলিয়াছেন, "অতি পরিশ্রমের সম্ভাবনা এতে নাই।......এর মধ্যে মানুষের দেহ-মনের উপযুক্ত পুষ্টিকর খোরাক পাওয়া যায়।"

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

দীপা (কাব্যগ্রন্থ)—শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম পাঁচ সিকা।

দীপাতে কবির ধ্যানলোকের এক স্নিগ্ধ পুণ্যোজ্জ্বল বর্ত্তিকা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সেই বর্ত্তিকালোকের পশ্চাতে কবি স্বয়ং যাত্রা করিয়াছেন এবং তাহার স্নিগ্ধজ্যোতিতে বিশ্বকে রঞ্জিত দেখিয়া পুলকিত হইতেছেন। 'দীপা'র দীপটি জ্বালিবার সময় কবি যে বোধনমন্ত্র পাঠ করিতেছেন তাহা এক মহিমময়ী নারীকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র নারীলোকের আরতির মহিমায় মণ্ডিত। যথা—

দুইটি রাত্রির যাত্রী—দীপ নিয়ে চল তুমি দীপা!
হোক্ রাত্রি,—তুমি র'বে সঙ্গে মোর মূর্ত্তিমতী দিবা।
তোমার দীপের আলো দিবে না তিমির শুধু দূরি
সাধারণ দীপালোক সম,—
আঁধারেরে তুলিবে সে অপরূপ বর্ণরূপে পূরি'
কেন্দ্র-উষা হেন মনোরম।

আবার অন্যস্থানে—

দীপা,—তুমি দীপ নিয়ে চল মোর আগে
দীপ্ত অনুরাগে,—
বেদনা রাঙিয়া উঠি' আত্মদান-ত্যাগে
আনন্দিত চেতনায় চিত্ত যেন জাগে।
তোমার পবিত্র স্পর্শে মৃত্যুর নিকষ,
উজলি জাগুক উৎস—সঞ্জীবনী-রস!

'লগ্নশেষ', 'যৌবনশেষ', 'বিরহিণী', 'প্রথমপত্র', 'দীপারতি' কবিতাগুলি সুন্দর। বাংলার কাব্যগগনের বিচিত্র আলোক-মহোৎসবের মধ্যে দাঁড়াইয়া কবির দীপার আলোক যে ম্লান হইবে না ইহা আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

কামাল পাসা ও নব্য তুর্কী—শ্রীতারানাথ রায় প্রণীত, এবং কলিকাতা, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, আর্য্য পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের 'পশ্চিমের সেই পীড়িত ব্যক্তিটি' কোন্ অমৃতের স্পর্শে সঞ্জীবিত হইয়া, শক্তিমান্ হইয়া আজ প্রতীচ্যের ভয় ও প্রাচ্যের বিস্ময় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা ভারতবর্ষের ভাবিবার কথা। মুস্তাফা কামাল পাসা শুধু তুর্কের রক্ষাকর্ত্তা নহেন, আজিকার তুর্কীর তিনি স্রষ্টা। বিগত এক শত বৎসর ইউরোপ এই প্রাচ্য প্রতিবেশীটির সম্বন্ধে কি নীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে, নানা বিপদ ও বিপ্লবের মধ্য দিয়া নব্য তুর্কী কিরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে, মহাযুদ্ধের পর বিপন্ন তুর্কীর নেতৃত্ব কেমন করিয়া আনোয়ার পাসার হাত হইতে মুস্তাফা কামালের হাতে গিয়া পড়িল, আজিকার তুর্কী কেন ধর্ম্মের অগ্রে দেশকে স্থাপন করিল, নব্য তুর্কীর আশা আকাঙ্ক্ষা কি,—বইখানিতে সেই-সব বিষয় অল্প কথায় প্রণালীবদ্ধভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

আহুতি—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী প্রণীত। মূল্য পাঁচ সিকা।

বইখানির পত্রসংখ্যা দুইশত, পাইকা অক্ষরে ছাপা। ছয়টি ছোট গল্পের সমষ্টি। 'সাহিত্য' ও 'সাধনা'য় ছোটগল্পের সুরু। বিগত চল্লিশ বৎসরে অসংখ্য ছোটগল্প রচিত হইয়াছে। তার কতকগুলি পাঠ্য, অনেকগুলি অপাঠ্য। কখনও মৌলিক, কখনও মামুলি পথ ধরিয়া বাংলার এই শ্রেণীর কথাসাহিত্য বিবর্ত্তিত হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ছাপ এই সাহিত্যে প্রগাঢ়। সেই ছাপের প্রভাব কাটাইয়া ছোটগল্পে ভিন্নতর রূপ দেওয়া কঠিন। সেই দুঃসাধ্য সাধনায় যিনি যতটা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহার গল্পে ততটা নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর 'চারইয়ারী কথা'য় সেই নবরূপের পরিচয় পাইয়া পাঠকসমাজ একদা সানন্দবিস্ময়ে সচকিত হইয়া উঠিয়াছিল। তারপর তিনি নানাধরণের গল্প লিখিয়াছেন। সেইগুলির মধ্যে ছয়টি লইয়া 'আহুতি' সম্পূর্ণ। ইহাতে তাঁহার বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট, কিন্তু পুনরাবৃত্তি নাই। যাহা লইয়া পুস্তকের নামকরণ সেই গল্পটিতে অশিক্ষিত, অর্থলুব্ধ, অন্ধবিশ্বাসে ভ্রষ্টবুদ্ধি, জেলার কাছারীর মোক্তার ধনঞ্জয় সরকার ও তাহার কন্যা রঙ্গিণী এবং লুপ্তপ্রায় জমিদার রায়বংশের তিন শত বৎসরের সঞ্চিত অহঙ্কারের উত্তরাধিকারিণী বিধবা রত্নময়ীর কথা, অপরিচিত কিন্তু অতিবাস্তব পারিপার্শ্বিকের ভিতর দিয়া একান্ত ট্র্যাজেডিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তুবড়ীতে আগুন দিলে ফুল ও ফিন্‌কি যেমন আগুনের ফোয়ারায় ছড়াইয়া পড়ে 'ফরমায়েসি গল্পে' তেমনি রস-রসিকতা বিস্ময়ের চমকে, অজস্র ধারায়, অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

তীর্থপথে—শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী প্রণীত ও শ্রীগুরু লাইব্রেরী ১২৩ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৷০ টাকা মাত্র।

'তীর্থপথে'র অধিকাংশ কবিতা কবির 'দীপান্বিতার' পূর্ব্বে রচিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মানবের দুঃখবেদনার অন্তরালে অবস্থিত মহিমান্বিত প্রাণশক্তিকে কবি সর্ব্বত্র আহ্বান করিয়া ফিরিয়াছেন এবং তাহারই বন্দনামুখর ধ্যানলোকের সন্ধানে তীর্থযাত্রীরূপে ছুটিয়া চলিয়াছেন।

তরুণ গরুড় জাগে মাতৃগর্ভে জন্মদিন চাহি
দূর স্বরলোক হ'তে অমৃতের মহাগান গাহি
তাহারে জাগিতে হবে, তাহারে উঠিতে হ'বে শেষে
বেদনার বন্ধ টুটি' সগৌরবে মহাবীরবেশে। (সখা)

জাগো জাগো হে প্রথম নর
প্রস্তরকঠিন হিয়া, রক্তচক্ষু, উলঙ্গ, প্রখর,
জাগো এইবার—
পাষাণী ধরার বক্ষ বিদারিয়া আনো ক্ষীরধার,
শিয়রে দক্ষিণ হস্তে রাখো শুধু অসীম নির্ভর। (পুরুষ)

একটি প্রাণের স্পর্শ চেয়েছিনু এই ধরণীতে...
একটি মানুষ চাহি নির্ব্বিকার জড়ে প্রাণ দিতে—
চলে যায় লক্ষ রাত্রিদিন...
কোথায় সে প্রাণবহ্নি? লব তা'রে এই ধরণীতে
হোক না সে দীনতম দীন।

(কাব্যালোকে)

মানবতা শাশ্বত মন্দিরে যে প্রাণবহ্নির শিখা ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে নিত্য লীলায়িত হইতেছে, তীর্থপথের অধিকাংশ কবিতায় তাহারই অপূর্ব্ব জ্যোতিঃসম্পাত দেখিয়া আশান্বিত হইয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণধন দে

এম্বুলেন্স শিবিরে দিন-কয়েক

শ্রীবসন্তকুমার ঘোষ

'বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে সিংহভূম জেলা। কেঁউঝর ষ্টেটের অধিকারভুক্ত ক্ষুদ্র চাম্পুয়া শহর এই জেলার অন্তর্গত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে স্থানটি অতীব রমণীয়।

সেণ্ট জন্ এম্বুলেন্স ব্রীগেডের অন্তর্ভুক্ত সেকেণ্ড ডিভিসনের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের মতানুসারে স্থির হইল যে চাম্পুয়াতেই এ-বৎসর ট্রেনিং ক্যাম্প বা শিক্ষাশিবির হইবে। তদনুসারে জোগাড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। ঠিক করিয়াছিলাম,এ বৎসর কলিকাতায় থাকিয়া বড়দিনের অবকাশের দিনগুলি নানাপ্রকার আমোদ-আহ্লাদে অতিবাহিত করিব। কিন্তু যাহা মনস্থ করা যায়, অনেক সময় তাহা কার্য্যে পরিণত করা যায় না। সুতরাং স্বেচ্ছায় না হইলেও কর্ম্মপদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিতে হইল। ধূলা, ধোঁয়া ও কোলাহলময় কলিকাতা নগরীর সুখ-সম্পদের পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় এবং অরণ্যানী-পরিবেষ্টিত নীরব ও নিস্তব্ধ চাম্পুয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনলাভের আগ্রহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। চাম্পুয়ার বিশুদ্ধ জল, বায়ু ও খাদ্যের প্রভাবে কর্ম্মক্লান্ত নিস্তেজ শরীর ও মনকে কতক পরিমাণে সতেজ করিবার অভিপ্রায়ে দিনের পর দিন গণনা করিতে লাগিলাম।

২৩শে ডিসেম্বরের (১৯৩১) গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ভবিষ্যৎ শীতের লক্ষণ প্রকাশ করিয়া দিল। অপরাহ্নে মাত্র ক্ষণকালের জন্য সূর্য্যদেব একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ মেঘের অন্তরাল হইতে উঁকি মারিয়া লুকাইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার পরাজিত হৃদয়ের বেদনাস্বরূপ কয়েক ফোঁটা জল সন্ধ্যার প্রাক্কালে আকাশ হইতে ঝরিয়া পড়িল। রাত্রি ৮॥ টার সময় হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, আমাদের সকলেই ইতিমধ্যে আসিয়া পৌছিয়াছে। অনেকেই প্লাটফর্ম্মের উপর ইতস্ততঃ পাদচারণা করিতে করিতে নাগপুর প্যাসেঞ্জারে নিরুপায় জনতার অসুবিধা নিরীক্ষণ করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে দুই একজন নবীন উৎসাহে উচ্চহাস্যদ্বারা বৃহৎ ষ্টেশনটিকে প্রতিধ্বনিত করিতেছিল। ৯টা বাজিবার ১০ মিনিট পূর্ব্বে আমাদের কমাণ্ডিং অফিসার মিঃ ওয়াই-জে, মিত্র মহাশয় আমাদিগকে ট্রেনে উঠিতে আদেশ দিলেন। রিজার্ভ করা সুপ্রশস্ত কামরায় উঠিয়া স্বচ্ছন্দে সকলে বসিয়া পড়িল এবং গাড়ী ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে আরম্ভ করিল, "বল বল বল সবে, শত বীণা বেণু রবে...... ।"

ঘাটশিলা ও টাটানগর পশ্চাতে রাখিয়া রাজ-খারসোয়ানে (হাওড়া হইতে ১৮২ মাইল) যখন গাড়ী থামিল, ষ্টেশনের নিষ্প্রভ আলোকগুলি তখনও যাত্রীদের পথ দেখাইতেছিল। পক্ষিকুল বৃক্ষশাখায় বসিয়া প্রভাত-সঙ্গীতে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিতেছিল। ওপাশে ব্রাঞ্চ লাইনের বি, এন্, আর, কোম্পানীর গুয়া সেক্সনের গাড়ীর ইঞ্জিন্‌খানা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে দৌড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। ক্রমে পূর্ব্বাকাশ লোহিতাকার ধারণ করিল। খাকি পোষাক দুর্জ্জয় শীতের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইল। মৃদুমন্দ প্রভাত সমীরণ সমস্ত শরীরে যেন সূচিকা বিদ্ধ করিতে লাগিল। হি-হি করিতে করিতে যথাসম্ভব তৎপরতার সহিত মালপত্র গুয়ার গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া প্রায় সকলেই ওভারকোট অথবা রাগ ঢাকিয়া কোণ ঘেঁষিয়া আশ্রয় লইবার চেষ্টা করিল। ছোট বড় গভীর অরণ্য ভেদ করিয়া পাহাড়গুলিকে পার্শ্বে সরাইয়া দিয়া আমাদের গাড়ীখানা যেন অতি সন্তর্পণে দৌড়াইতে লাগিল। দুইপার্শ্বে নানা প্রকার ফুল-ফল শোভিত শিশিরসিক্ত বনরাজি নতমস্তকে প্রকৃতিসুন্দরীর রূপরাশির মহিমা কীর্ত্তন করিতেছিল। সকলেই মুগ্ধনেত্রে বাহিরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

কেঁদপোসী ষ্টেশনে যখন নামিলাম, তখন ৭॥ টা

বাজিয়া গিয়াছে। নামিয়াই দেখিলাম উড়িষ্যা ষ্টেটস্ করেষ্ট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ এস্-কে, মুখুজ্যে মহাশয় লরী ও মোটরগাড়ী লইয়া আমাদের জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন। নমস্কার ও প্রতিনমস্কারের পরে অফিসারের আদেশানুসারে গাড়ীগুলিতে মাল-পত্র বোঝাই করিয়া সকলে উপরে উঠিয়া বসিল। দুই পার্শ্বে বৃক্ষসারিশোভিত পাকা রাস্তার উপর দিয়া চতুর্দ্দিক ধূলায় ধূসরিত করিয়া গাড়ীগুলি দ্রুতগতিতে দৌড়াইতে লাগিল। সকলে একবার আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল, কিন্তু প্রবল বাতাসের আঘাতে পিছনে হটিয়া গিয়া সে আনন্দধ্বনি শূন্যে মিলাইয়া গেল। কেহ কেহ বায়স্কোপে দৃষ্ট যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য বিভিন্ন বর্ণনা করিয়া অপর সকলকে চমৎকৃত করিতে লাগিল। কিন্তু বোধ হয় তাহাতে সকলের বক্ষ স্ফীত হইল না অথবা বাহুর মাংসপেশী দৃঢ়ভাব ধারণ করিল না; কারণ প্রকৃতপক্ষে আমরা ত বন্দুকধারী সৈনিকদল নই। ক্ষতবিক্ষত জনমানবের সেবা করাই যে আমাদের কার্য্য। যুদ্ধবিদ্যা ও কুচকাওয়াজের পরিবর্ত্তে ঔষধ এবং পথ্যদ্বারা রোগী ও আহত ব্যক্তির যথাবিধি শুশ্রূষা করাই যে আমাদের কর্ত্তব্য!

মধ্যপথে আমরা পুণ্যতোয়া বৈতরণী নদী পার হইলাম। প্রাচীন যুগের সেই সুপ্রশস্ত কলনাদিনী আজ আর নাই। ক্রমশঃ পলি জমাট বাঁধিয়া পার্শ্ববর্ত্তী উচ্চ ভূমির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। প্রাচীন নদীর উপরিস্থ প্রস্তরনির্ম্মিত সুবৃহৎ সেতুটি এখন অর্দ্ধভগ্ন অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিয়া কালের কুটিল ভ্রূকুটি লক্ষ্য করিতেছে। কালস্রোতের সহিত নদীর স্রোতও বক্রগামিনী হইয়া অন্যদিক দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমান অপ্রশস্ত বৈতরণীর উপর রেলওয়ে কোম্পানীর নির্ম্মিত লৌহসেতু। স্নান-তর্পণাদি দ্বারা পুণ্যসঞ্চয় অভিলাষে ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে অসংখ্য ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াও প্রতিবৎসর এই বৈতরণীর উপকূলে উপনীত হয়।

ষ্টেশন হইতে প্রায় বিশ মাইল দৌড়াইবার পর বেলা সাড়ে এগারটার সময় গাড়ীগুলি আমাদের গন্তব্যস্থানে অর্থাৎ 'ফরেষ্ট স্কুলে'র সন্নিকটে শিবিরের সম্মুখে দাঁড়াইতেই অফিসারের আদেশানুযায়ী চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করিয়া নীরদ মজুমদার বীগল বাজাইয়া সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইবার জন্ত সকলকে ইঙ্গিত করিল। আদেশ তখনই কার্য্যে পরিণত হইল।

শিবিরের নিয়মাবলী একটি একটি করিয়া ভালরূপে পড়িয়া সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া হইল। আরও স্মরণ



শিবিরের একাংশ

করাইয়া দেওয়া হইল যে, নিয়মাবলী যতই কঠিন এবং অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেই হইবে। নতুবা নিয়মানুসারে দণ্ডভোগ করিতে হইবে। শুনিয়া প্রায় সকলেই একটু প্রমাদ গণিল। 'বাঙালী দুলালে'র দল এত কঠিনভাবে নিয়মাধীন থাকিয়া কার্য্য করিতে পারিবে কি?

অফিসারের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সকলে তাঁবুতে গিয়া বিশ্রামের আশায় বসিয়া পড়িল। দৈনিক কার্য্যাবলীর কঠোরতা সকলকেই একটু চিন্তিত করিয়া তুলিল। হঠাৎ আদেশ হইল, তখনই বিছানা-পত্র ইত্যাদি নিয়মিতভাবে সাজাইয়া স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্ত প্রস্তুত হইতে হইবে। আদেশটি আমাদের ক্লান্ত শরীরকে শান্ত করিবার নিমিত্ত সত্য, তবুও আদৌ শ্রুতিমধুর হইল না; কিন্তু পালন করিতেই হইবে।

কাশিমবাজার চীনামাটির কারখানা দেখিতে যাইবার অজুহাতে মিঃ মুখুজ্যের অনুরোধে অপরাহ্ণে ছুটি পাইয়া

সকলে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। কৈঁদপোসী হইতে চাম্পুয়াতে যাইবার মধ্যপথ হইতে প্রায় দুই মাইল উত্তরদিকে কারখানাটি অবস্থিত। মিঃ মুখুজ্যের সহিত সকলে উপস্থিত হইলে কারখানার সহকারী ম্যানেজার মিঃ মজুমদার আমাদিগকে তথাকার কার্য্যপ্রণালী দেখাইবার



যাত্রাপথে

জন্য তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইলেন। হঠাৎ একদল বাঙালীর সহিত সাক্ষাৎ এবং কথোপকথনের সুযোগ লাভ করিয়া তাঁহার উৎসাহ শতগুণ বর্দ্ধিত হইল।

কারখানার কার্য্যসমূহ চীনদেশীয় সাধারণ নিয়মানুসারে হইয়া থাকে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিলে অধিকতর মূলধন আবশ্যক সত্য, কিন্তু ব্যবসায়ের দিক দিয়া বিশেষ সুবিধা হইত বলিয়া মনে হয়। পল্লীগ্রামে বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করিবার পদ্ধতি অনুযায়ী এখানেও স্ত্রী-পুরুষ সাঁওতাল কুলীর দল মৃত্তিকা বহন করিবার নিমিত্ত ঝুড়িমস্তকে কার্য্য করিতেছে। একদল নিম্নে থাকিয়া শুভ্র মৃত্তিকা কর্ত্তন করিয়া ঝুড়ি বোঝাই করিতেছে এবং অন্যদল পূর্ণঝুড়ি মস্তকে উপরে আনিয়া ট্রলী ভর্ত্তি করিতেছে। মৃত্তিকা-পরিপূর্ণ ট্রলীগুলিকে যথাসময়ে কুলীরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে ঠেলিয়া লইয়া যায়।

অদূরবর্ত্তী একস্থানে পাশাপাশি চারিটি বৃহৎ চৌবাচ্চার প্রথমটিকে চার্নিং ট্যাঙ্ক বা মন্থনের চৌবাচ্চা বলা হয়। ইহার পার্শ্বে ট্রলী আসিয়া দাঁড়াইলে সমস্ত মৃত্তিকা চৌবাচ্চায় ঢালিয়া দেওয়া হয় এবং দুই চারিজন কুলী লম্বা রেক্ লইয়া মৃত্তিকার সহিত প্রচুর পরিমাণে জল সংমিশ্রণ করিয়া দেয়। এতদ্দ্বারা কাঁকর, বালি ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত ভারী পদার্থসমূহ নিম্নে পতিত হয় ও আসল মৃত্তিকা দ্রবীভূত হইয়া যায়। এইরূপ তরল পদার্থের সহিত কিঞ্চিৎ নীল মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়।

প্রথম চৌবাচ্চায় দুইটি নল আছে। একটি উপরে এবং অপরটি কিঞ্চিৎ নিম্নে। উপরের নলদ্বারা জল আনয়ন করা হয় এবং নিম্নেরটি দ্বারা নীলমিশ্রিত তরল পদার্থ বহির্গত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী দ্বিতীয়, তৃতীয়, অথবা চতুর্থ চৌবাচ্চায় চলিয়া যায়। শেষোক্ত এই তিনটি চৌবাচ্চাকে 'সেটলিং ট্যাঙ্ক' বা থিতাইবার চৌবাচ্চা বলা হয়। প্রথম চৌবাচ্চার অনুরূপ কার্য্য বাষ্পচালিত একটি যন্ত্রের সাহায্যেও হইতেছে; অর্থাৎ বালি, কাঁকর ইত্যাদি পৃথক হইয়া কেবল মাত্র শুভ্র তরলাংশ কোন একটি থিতাইবার চৌবাচ্চায় আসিয়া পড়িতেছে।

থিতাইবার চৌবাচ্চাগুলিতে শুভ্র তরলাংশের সহিত কিঞ্চিৎ ফটকিরি মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। ইহা দ্বারা শুভ্র কর্দ্দমাংশ ক্রমশঃ নিম্নে জমিয়া যায় এবং জলীয়াংশ উপরে থাকে। তৎপরে উপরিস্থ সমস্ত জল বাহির করিয়া দিয়া নাতিকঠিন কর্দ্দমাংশ তুলিয়া লইয়া এক প্রকার চতুষ্কোণ উত্তপ্ত ছাঁচের মধ্যে দেওয়া হয়। ছাঁচের ভিতর দিকে ক্যাম্বিস্ লাগাইয়া রাখা হয়। এই প্রকারের ছাঁচ পাশাপাশি অনেকগুলি আছে। তারপর দুই পার্শ্ব হইতে সমভাবে চাপ দ্বারা জলীয়াংশ বহির্গত হইয়া যায় এবং উক্ত কর্দ্দমাংশ অধিকতর কঠিন ভাব ধারণ করে। মৃত্তিকাখণ্ডগুলি টালির আকারে ছাঁচ হইতে বহির্গত হইলে একটি বৃহৎ উত্তপ্ত পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক করিয়া লওয়া হয়। ইহাই আসল চীনামাটি।

শুষ্ক এবং শুভ্র চীনামাটির খণ্ডগুলি প্রধানতঃ টিটাগড়ের কাগজের কারখানায় সরবরাহ করা হয়। কাগজ মসৃণ এবং চিক্কণ করিবার নিমিত্ত এইরূপ চীনামাটির অত্যধিক প্রয়োজন হইয়া থাকে। শুভ্র ক্যাম্বিসের জুতার জন্য কেক্ বাজারে প্রচলন করিবার অভিপ্রায়ে সবেমাত্র সামান্য

প্রস্তুত করা হইয়াছে। আমরা প্রত্যেকে একখানি া কেক্ উপহার পাইলাম। পরে ব্যবহার করিয়া ায়াছি বাজারের সাধারণ কেক্ অপেক্ষা অনেকাংশে । মিঃ মজুমদারকে অশেষ ধন্যবাদ জানাইয়া তাঁবুতে াগমন করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল।

সন্ধ্যার পরমুহূর্ত্তে চাঁদ তাহার স্নিগ্ধ কিরণজালে দশ- উদ্ভাসিত করিয়া উদিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে চতুষ্পার্শ্বস্থ াড় ও কাননের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নির্ব্বাক মুখে ধুর হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে কি চমৎকার া!

শিবিরাবাসের নির্দ্দিষ্ট স্থানটি শহরের বাহিরে ্র্ণরূপে নির্জ্জন হইলেও বড়ই মনোরম। পার্শ্বেই বষ্ট স্কুল। বড়দিনের ছুটিতে স্কুল বন্ধ। সম্মুখভাগে জপুর যাইবার সুপ্রশস্ত রাস্তা। রাস্তার অপর পার্শ্বে ্রে ভল্লুকাদি পরিপূর্ণ গভীর অরণ্যমণ্ডিত শ্রেণীবদ্ধ হাড়। পশ্চাদ্দিকে শুষ্কপ্রায় বৈতরণী ঝির্ ঝির্ রিয়া বহিয়া যাইতেছে; যেন অস্ফুট স্বরে আপনার র্বগৌরবকাহিনী আপনাকেই শুনাইতেছে। নদীর পরপারে হস্তিযূথপূর্ণ ময়ূরভঞ্জ ষ্টেটের প্রসিদ্ধ ভীষণ জল। মিঃ এস্-কে, মুখুজ্যের শিকারী জীবনের ত্যাদ্ভুত সাহসের কাহিনী শুনিয়া এবং দুইটি রাইফেল্ াহার দুই হস্তে বজ্রমুষ্টিবদ্ধ দেখিয়া সকলেই বিশ্বাস রিতে বাধ্য হইল যে, এই স্থানে বাঘে মেষে একঘাটে ল খায়। বাস্তবিকই, সর্ব্বদা গুড়ুম গুড়ুম শব্দ স্থানীয় ন্তুজন্তুর প্রাণে এমনি আতঙ্ক আনয়ন করিয়াছে যে, তাহারা নাকি ভ্রমক্রমেও স্কুলের ত্রিসীমানার মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহস করে না। শুনিয়া সবাই একটু আশ্বস্ত হইল।

রাত্রি দশটার সময় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া করুণ স্বরে বীগল বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে শিবিরের সমস্ত আলোক নির্ব্বাপিত হইল এবং সকলে নিজ নিজ শয্যায় শয়ন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

অতি প্রত্যূষে সকলের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া সতর্ক করিবার নিমিত্ত বীগল বাজিবার পরে কেহ একবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া পুনর্ব্বার নিদ্রাভিভূত হইবার

... মার্জ্জনা করিতে করিতে প্রাতঃকৃত্য সমাপনের জন্য তাঁবু হইতে বহির্গত হইয়া গেল। আদেশ হইল,—"ফল্ ইন্"। গেঞ্জি এবং হাপ প্যাণ্ট পরিধান করিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পলকের মধ্যে সকলে দৌড়াইয়া আসিয়া ফিজিকাল্ ড্রিলের জন্য সার্জ্জেণ্টের



সম্মুখে সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। পুনর্ব্বার আদেশ হইল:—রাইট টার্ণ, ডবল মার্চ্চ। তৎক্ষণাৎ শীতের কুহেলী ভেদ করিয়া সোৎসাহী তরুণের দল লেফট রাইট্ করিতে করিতে তালে তালে পদক্ষেপণ করিয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়া চলিল।

সাড়ে আটটার সময় চা, হালুয়া এবং লুচি ভক্ষণ করিয়া নবীন যুবকের দল প্যারেড্ করিবার নিমিত্ত যথাস্থানে প্রস্থান করিল; কিন্তু সাড়ে এগারটার সময় প্যারেড সমাপনান্তে যখন ফিরিল তখন উদরাভ্যন্তরে দাবাগ্নির জ্বালা সকলেই অনুভব করিল। অনভ্যাস এবং অত্যধিক পরিশ্রমে অনেকেরই অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। স্ব-স্ব শয্যায় শ্রান্তক্লান্ত দেহটিকে সযত্নে স্থাপনপূর্ব্বক বন্ধুবান্ধবগণের শত উপদেশ-বাণী উপেক্ষা করিয়া শিবিরে আসিবার আশু ফলভোগের নিরানন্দে কেহ কেহ শিহরিয়া উঠিল।

স্নানান্তে আহারে উপবেশন করিয়া কিন্তু সকলেই প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে কোয়ার্টার-মাষ্টার রণেন গাঙ্গুলীকে বারম্বার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে লাগিল।

তাঁহার যত্ন এবং তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত ষোড়শোপচারে সুসজ্জিত নৈবেদ্য বাস্তবিকই সঞ্জীবনী সুধার কার্য্য করিল। হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পরে রসাস্বাদপূর্ণ অন্নব্যঞ্জন আকণ্ঠ ভোজন করিয়া সকলেই পরম তৃপ্তিলাভ করিল। দুই ঘণ্টাকাল প্রাথমিক প্রতিবিধান সম্বন্ধে মিঃ পি-পি, চাটুজ্যের (এম-এ, বি-এল্) সহজ অথচ



বৈতরণী-সেতুর ধ্বংসাবশেষ

বিশেষ কার্য্যকরী বক্তৃতা শ্রবণান্তে চা, কলা, নিম্‌কি ইত্যাদি উদরস্থ করিয়া মিঃ মুখুজ্যের সহিত সকলে সম্মুখবর্ত্তী অরণ্যাভিমুখে গমন করিল। বর্ম্মস্বরূপ রাইফেল্ দুইটিও সঙ্গে রহিল। প্রধান উদ্দেশ্য শিকার অন্বেষণ। শিকারের আশায় উৎসুক নেত্রে ইতস্ততঃ ভ্রমণের বিমল আনন্দ প্রকৃত শিকার অর্থাৎ হত্যাকাণ্ড হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও ইহা শিকার মাত্রেরই পরম উপভোগ্য। কিছুদিন পূর্ব্বে কোন এক করদ-রাজ্যের রাজা রীতিমত জয়ঢাক বাজাইয়া কয়েক দিন যাবৎ এইস্থানে শিকার-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। সেই অবধি না কি সমস্ত বন্যজন্তু প্রাণভয়ে ত্রস্ত। এক্ষণে তাহারা মুক্তভাবে বিচরণ করিতে অতীব শশঙ্কিত।

ভীষণ জঙ্গল ! লুকোচুরি খেলিবার অতি উত্তম স্থান। স্বচ্ছন্দে যথেচ্ছ চলাচল করিবার উপায় আদৌ নাই। মিঃ মুখুজ্যের পিছু পিছু একে একে সকলে অগ্রসর হইতে লাগিল। "আচ্ছা, এই রকম জঙ্গলেই কি রাজা দুষ্মন্ত পথ হারিয়েছিলেন ?"—সুধীর চক্রবর্ত্তীর এই কথা শেষ না হইতেই পিছন হইতে চন্দ্রমোহন দত্ত উত্তর দিল, "শকুন্তলার সন্ধানে আছ নাকি হে ?"—শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল।

চুপ !—বলিয়াই গণেশ দত্ত রাইফেল্ তুলিয়া লক্ষ্য স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইল। গুড়ুম—আওয়াজ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক নিরীহ পক্ষী প্রাণভয়ে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। কেবলমাত্র একটি অসহায় পক্ষী বৃন্তচ্যুত পুষ্পের ন্যায় ভূপতিত হইয়া চিরতরে চক্ষু মুদ্রিত করিল। তদ্দর্শনে সাফল্যমণ্ডিত গণেশ আনন্দে চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিল।

সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রায় সকলেই নিজ নিজ বেশভূষার পারিপাট্য লইয়া একটু ব্যস্ত হইল।

ক্রীষ্টমাস্ পর্ব্বোপলক্ষে মিঃ মুখুজ্যে আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় সকলে তাঁহাদের আনন্দোৎসবে যোগদান করিল। সুপ্রশস্ত হলের মধ্যস্থলে অবস্থিত সুসজ্জিত বৃক্ষের পার্শ্বে উপবেশন করিবার পরে চা, সিঙাড়া, সন্দেশ, কেক্ ইত্যাদি ভোজ্যবস্তুসমূহ আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে দক্ষিণ-হস্তের কার্য্যে ব্যাপৃত হইবার উদ্যোগ করিলে সার্জ্জেণ্ট ঘোষ বলিল, "থাম, হুকুমের অপেক্ষা কর।"

জলযোগ সমাপনান্তে নৃত্যগীত আরম্ভ হইল। সমবেত সকলেই মিঃ মুখুজ্যের পরিবারস্থ কয়েকটি বালকবালিকার আধুনিক নৃত্যগীত দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন। কোমল কণ্ঠের সহিত কোমল অঙ্গের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অভিনয় করা বাস্তবিকই প্রশংসার বিষয়। ইহা ব্যতীত প্রায় সমস্তটুকুই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ এবং এই জন্যই বোধ হয় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত অধ্যায়টি অতিশয় মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল। রাত্রে শিবিরে আসিয়া অনেকেই শয্যা গ্রহণ করিল। শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে পুনর্ব্বার ভোজন নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া অনেকেই তাঁবুর বাহির হইল না।

২৬শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে চাম্পুয়া শহর হইতে মেডিকেল অফিসার, ফরেষ্ট রেঞ্জার, মহকুমা হাকিম, প্রভৃতি কয়েকজন গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয় আমাদের উৎসাহিত করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ভিস্প্লের পরে সমবেত ভদ্রমণ্ডলী একবাক্যে আমাদের সুনিয়ন্ত্রিত কার্য্যকলাপের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। আহতের সেবার বিধিব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মেডিকেল অফিসার চমৎকৃত হইলেন।

আমাদের শিবিরের পার্শ্বে অদূরস্থিত ফরেষ্ট স্কুলের মিউজিয়াম্ দেখিবার জন্য সকলে অপরাহ্নে গমন করিল। সুরক্ষিত এবং অরক্ষিত বনানী সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য এখানে সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছে। বনজঙ্গল হইতে কোন্ কোন্ প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারা যায় এবং ঐ সকল দ্রব্য দ্বারা আয়ের পথ কত সুগম হইতে পারে তাহা সহজ ও সরলভাবে বুঝাইবার নিমিত্ত ইহা একটি উত্তম শিক্ষাকেন্দ্র। বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ হইতে কিরূপে বিভিন্ন প্রকারের কাষ্ঠ পাওয়া যায়; লতাগুল্ম হইতে কিরূপে দড়ি, মাদুর ও নানা প্রকার ঔষধ প্রস্তুত হয়; শালবৃক্ষ হইতে কিরূপে ধূনা এবং পাইন বৃক্ষের আঠা ও রস হইতে কিরূপে রজন্ ও তারপিন তৈল উৎপন্ন হয়; বন্য পশুপক্ষীর চর্ম্ম, শৃঙ্গ, অস্থি, লোম, পালক ইত্যাদি আমাদের কত উপকারে লাগিয়া থাকে; অরণ্যে কত রকমের প্রস্তর দৃষ্ট হয় ইত্যাদি আরও অনেক বিষয় শিক্ষা করিবার ইহা একটি উত্তম স্থান। ইহা ব্যতীত ভীষণ অরণ্যের মধ্যে অস্থায়িভাবে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া কিরূপে কার্য্য করিতে হয়, হিংস্র প্রাণীদিগের আক্রমণ হইতে কিরূপে নিজেদের রক্ষা করিতে হয়, কিরূপভাবে রাজা-মহারাজা প্রভৃতি বিলাসীগণের নিমিত্ত শিকারের আয়োজন করিতে হয় ইত্যাদি অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়।

নৈশভোজন সমাপনান্তে শিবিরের আগুন ঘিরিয়া আমোদ-প্রমোদ করিবার নিমিত্ত সকলে মিলিত হইল। নিমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয়গণ এবং আমাদের সকলে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডকে চক্রাকারে পরিবেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইলে আনন্দোৎসব আরম্ভ হইল। গান, আবৃত্তি, হাস্যকৌতুক ইত্যাদি শেষ হইলে সরলহৃদয় নরেন সেনের তৃতীয় বার্ষিক শোকসভা আরম্ভ হইল এবং সকলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে স্বয়ং নরেনই সভাপতির আসন গ্রহণ করিল। এমনি ভাবে বড়দিনের অবকাশের দিনগুলি কাটিতে লাগিল।

ক্রমেই আনন্দের দিন ফুরাইয়া আসিল। শেষদিন প্রত্যূষে মুক্তপতাকাতলে সম্মিলিত বাঙালী তরুণের দল পুরাতন বৎসরকে বিদায় এবং নূতন বৎসরকে আহ্বান করিয়া যেন নবজীবন লাভ করিল। মধ্যাহ্নভোজনের পর মালপত্র সজ্জিত করিয়া সকলে অতীব উৎসুকভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিল। ট্রেনের সময় প্রায় উত্তীর্ণ করিয়া লরী আসিয়া উপস্থিত হইল। মিঃ মুখুজ্যে ও ফরেষ্ট স্কুলের ছাত্রবৃন্দকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া সকলে উপরে উঠিয়া বসিলে গাড়ীগুলি ঊর্দ্ধশ্বাসে কেঁদপোসী ষ্টেশন অভিমুখে দৌড়াইতে লাগিল। তখন মহানন্দে সকলে গাহিল, "বহুদিন পরে হইব আবার আপন কুটীরবাসী।"

ষ্টেশনে আসিয়া শুনিলাম, ট্রেন প্রায় দেড় ঘণ্টা লেট্—শুনিয়া সকলে আশ্বস্ত হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইবার পর সকলে নমস্কার ও প্রতিনমস্কার কার্য্যে ব্যস্ত হইল। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিবার পর কক্ষচ্যুত গ্রহ উপগ্রহের ন্যায় বিচ্ছিন্নভাবে এক একজন এক একদিকে প্রস্থান করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। কেবলমাত্র একবার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে কে যেন অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল, বিদায়!



ভারতবর্ষ

এভারেষ্ট শৃঙ্গ আরোহণের চেষ্টা—

এভারেষ্ট শৃঙ্গ আরোহণের পুনরায় চেষ্টা হইতেছে। এবারের আরোহণে একটু নূতনত্ব আছে। আরোহিগণ এরোপ্লেনে চড়িয়া শৃঙ্গে যাইবেন।

এভারেষ্ট যে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শৃঙ্গ এক শত বৎসর পূর্ব্বেও লোকের ইহা জানা ছিল না। বৃহত্তর জরীপ বিভাগের লোকেরা উত্তরাঞ্চলের পাহাড়ে-পর্ব্বতে যাইতেন, যন্ত্রাদির সাহায্যে ঐ অঞ্চল জরীপ করিতেন। ১৮৫২ সনে কলিকাতায় বসিয়া জরীপের ফলাফল অঙ্ক কষিয়া জানা যায়। তখন রাধানাথ শিকদার জরীপ বিভাগের কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি অঙ্ক-শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এভারেষ্ট যে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শৃঙ্গ তিনিই তাহা সর্ব্বপ্রথম লোকের গোচরে আনেন।

আইন-অমান্য আন্দোলনে বন্দীর সংখ্যা—

১৯৩২ সন হইতে ১৯৩৩ সনের জানুয়ারীর শেষ পর্য্যন্ত আইন অমান্য আন্দোলনে মোট ৬৯,০৩৯ জন দণ্ডিত হইয়াছেন। জানুয়ারীর শেষ পর্য্যন্ত ১৩,৭৮৮ জন কারাগারে ছিলেন। বিভিন্ন প্রদেশের দণ্ডিতের সংখ্যা এইরূপ—যুক্ত প্রদেশ ১২,৩৯০, বোম্বাই ১৩,২৪০, বাংলা ১২,০৯১, বিহার ১৩,৭৬৯, উঃ পঃ সীমান্ত ৫,৮২৫, মাদ্রাজ ৩,২৩২, পঞ্জাব ১,৭১২।

জানুয়ারী মাসের শেষ পর্য্যন্ত কারাগারে ছিলেন—বোম্বাই ৩,৫৩২, যুক্তপ্রদেশ ২,৮২৪, বাংলা ১,৭০৪, বিহার ২,০৩৫, মাদ্রাজ ১,০৫১

হরিজনদের শিক্ষা—

হরিজনদের শিক্ষার ব্যবস্থা ও শিক্ষায় সাহায্য করা সকলেরই কর্ত্তব্য। এ-ভি-ঠাক্কর হরিজন সেবক-সমিতির (Servants of the Untouchables' Society) পক্ষ হইতে জানাইতেছেন যে, হরিজন ছাত্রদের পুস্তক ক্রয়ে, আবাসস্থল নির্দ্ধারণে, বৃত্তিপ্রদানে নিম্নলিখিত ভাবে প্রত্যেক প্রদেশে এ বৎসর ব্যয় করা হইবে—

আসাম ১,৮০০ টাকা, অন্ধ্র ২,৮৫০ টাকা, বাংলা ৬০০ টাকা, বেরার ১,২০০ টাকা, বিহার ৪,৮০০ টাকা, বোম্বাই (শহর ও শহরতলী) ৩,০০০ টাকা, সি·পি. হিন্দী ৩,৬০০ টাকা, সি. পি. মরাঠী ১,২০০ টাকা, দিল্লী ৯০০ টাকা, গুজরাট ৩০০ টাকা, মাদ্রাজ (শহর) ১,৫০০ টাকা, মহারাষ্ট্র ২,৪০০ টাকা, মালাবার ও দক্ষিণ কানাড়া প্রত্যেকে ৩০০ টাকা, উড়িষ্যা ২,৫৫০ টাকা, পঞ্জাব ৩০০ টাকা, রাজপুতানা ২,৭০০ টাকা, সিন্ধু ১,৫০০ টাকা, তামিল নাড়ু ৩,৬০০ টাকা, সর্ব্বসমেত ৫৩,৪০০ টাকা।

রামপুরের নবাবের দান—

রামপুরের নবাব কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে এক লক্ষ টাকা দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, রাসায়নিক-বিভাগের একজন অতিরিক্ত শিক্ষকের জন্য বার্ষিক ছয় হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

শিক্ষার অবস্থা—

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষার অবস্থা নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

ব্রহ্ম	হাজার করা	৩৮৬ জন	লেখাপড়া জানে
বাংলা	”	১১০ জন	” ”
মাদ্রাজ	”	১০৮ জন	” ”
বোম্বাই		১০৩ জন	
মধ্যপ্রদেশ		৬০ জন	
আসাম		৯১ জন	
পঞ্জাব		৫৯ জন	
যুক্তপ্রদেশ		৫৫ জন	
বিহার ও উড়িষ্যা		৫২ জন	

—

বাংলা

"বোধনা" সমিতি—

জড়বুদ্ধি ছেলেমেয়েদের জন্য মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে যে প্রতিষ্ঠানটির গৃহনির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার জন্য এই দানগুলি পাওয়া গিয়াছে :—

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	১০০ (একশত) টাকা
গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়	১০০ ” ”
জ্যোতিঃপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	১০০
বিপিনবিহারী বসু	১০০
যুগলকিশোর রুদ্র	১০০
প্রমথচন্দ্র কর	১০০ ” ”
বিমলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৲ (দশ টাকা)
আর্, এইচ্ পার্কার	২৫৲
ব্রহ্মানন্দ সেন	১৩৷০
ক্ষণপ্রভা সিংহ	৫৲
	মোট ৬৫৩৷০

নারীর কৃতিত্ব—

গত ২৬এ জানুয়ারী ইংলণ্ডে ছয়জন নারীকে ব্যারিষ্টারী করিতে অনুমতি দেওয়া হয়। তন্মধ্যে স্যার অতুল চাটুজ্যের পত্নী একজন। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বয়স্কের মধ্যে মিসেস ফ্লোরেন্স কয়েন। ৭০ বৎসর বয়সে তিনি ব্যারিষ্টার হইলেন।

ছাত্রের ধর্ম্ম শিক্ষা—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু ছাত্রগণের ধর্ম্মশিক্ষার জন্য ৫০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের উপর এই বিষয়ে বন্দোবস্ত করার ভার অর্পিত হইয়াছে। ডাঃ আর-সি মজুমদার, এম-এ, পি-এইচ-ডি, চেয়ারম্যান, ডাঃ জে-সি, ঘোষ, ডি-এস-সি, মিঃ শিরিশচন্দ্র পাকরাশি, পণ্ডিত বামাচরণ বিদ্যালঙ্কার, মিঃ ডি-সি, রায়, মিঃ পি-সি, ঘোষ।

—স্বায়ত্ত-শাসন

বাংলার শিল্পোন্নতি প্রচেষ্টায় দান—

বাংলার শিল্পের উন্নতির জন্য যতই চেষ্টা হয় দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। সম্প্রতি শিল্পোন্নতির জন্য সরকারী ভাবে চেষ্টা হইতেছে। নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ তাহাতে নিম্নানুরূপ দান করিয়াছেন—

খানবাহাদুর নবাব কে-জি-এম, ফারোকী	৫,০০০৲
মিঃ এস-সি, মিত্র (খনিজশিল্প ইঞ্জিনিয়ার)	১০,০০০৲
ডাঃ ইউ-এন, ব্রহ্মচারী	১০,০০০৲
স্যার হরিশঙ্কর পাল	৮,৫০০৲
খানসাহেব আজিজুদ্দীন	২,৫০০০৲
মিঃ জি-ডি বিরলা	২,০০৫৲
রায় বাহাদুর এ-এন দাস:	১,০০০৲

—

বিদেশ

চীন জাপানে লড়াই—

চীন-জাপানে লড়াই সম্প্রতি পুরাদস্তুর আরম্ভ হইয়াছে। গেল বৎসর জাপান মাঞ্চুরিয়ার উপর কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া সেখানে 'মাঞ্চুকুয়ো' নামে এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছে। জিহোল নামক একটি ছোট প্রদেশ মাঞ্চুকুয়োর পশ্চিম-দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা মাঞ্চুকুয়োর অংশবিশেষ বলিয়া জাপান অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। জাপানবাহিনী ক্রমশঃই দক্ষিণমুখী হইতেছে। এদিকে চীন জাপানী সৈন্যকে বাধা না দিয়া ক্রমশঃই পশ্চাৎ হটিয়া যাইতেছে। সকলেরই দৃষ্টি আজ চীনের দিকে।

কেন এই যুদ্ধ হইতেছে? জাপান চীনের অংশবিশেষ অধিকার করিয়া তথায় প্রভুত্ব স্থাপন করিবার জন্য এরূপ উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে কেন? ইহার জবাব আছে। জাপান আয়তনে ক্ষুদ্র। গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া জাপানের লোকসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। আধুনিক যন্ত্রীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া জাপান বিস্তর শিল্পী দ্রব্য উৎপাদন করিতেছে। কিন্তু বিশ্বের হাট এখন একরূপ বন্ধ। কি প্রাচ্যে কি প্রতীচ্যে প্রত্যেক দেশই কৃত্রিম শুল্ক-প্রাচীর গড়িয়া বিদেশের মাল কাটতির পথে অন্তরায় ঘটাইতেছে। যে-যে দেশে—, যথা, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, ভারতবর্ষ—জাপানী মাল কাটতি হইত, এই হেতু এখন আর তাহা সেরূপ কাটতি হইতে পাইতেছে না। অথচ জাপানের শিল্পসম্ভার দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। জাপান আজ তাই তাহার দুর্ব্বল প্রতিবেশী চীনকে অন্তত আংশিকভাবেও গ্রাস করিবার জন্য এত উদ্যোগী।

জাতিসংঘ (League of Nations) জাপানের পররাজ্য অধিকার-প্রচেষ্টা সমর্থন না করায় জাপান সম্প্রতি ইহা ত্যাগ করিয়াছে।

আয়ার্লণ্ডের স্বাধীনতা প্রচেষ্টা—

আয়ার্লণ্ড পুরাপুরি স্বাধীন হইতে চায়। ডি ভ্যালেরা এই স্বাধীনতা-প্রচেষ্টায় জীবন পণ করিয়াছেন। গত জানুয়ারী মাসের নির্ব্বাচনে ডি ভ্যালেরার দল সংখ্যাধিক্য লাভ করিয়াছেন। ডি ভ্যালেরা এবারেও আয়ার্লণ্ডের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি রাজানুগত্যের শপথ তুলিয়া দিতে বদ্ধপরিকর। আয়ার্লণ্ডের পার্লামেণ্টে এই প্রস্তাব এবারেও পাশ হইয়াছে। বিগত ১৯২১ সনে ইংলণ্ড ও আয়ার্লণ্ডের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইলে আয়ার্লণ্ড অনেকাংশে স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু তাহাকে রাজানুগত্য স্বীকার করিয়া লইতে হয়। তখনই ডি ভ্যালেরা ইহার বিরোধী হন এবং তাঁহার দলের অনেকে এই শপথ লইতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁহাদের চাকুরি যায়। সংপ্রতি আয়ার্লণ্ডের পার্লামেণ্টে একটি বিল পাস হইয়া গিয়াছে। সেই সময়ে রাজানুগত্যের শপথ লইতে অস্বীকৃত হওয়ায় যাহাদের চাকরী গিয়াছিল তাঁহারা এই আইনের বলে খেসারত পাইবেন।

ডি ভ্যালেরার দল আমেরিকাতেও আন্দোলন চালাইতেছেন। তথাকার আইরিশ-আমেরিকানরা তাহাদের প্রতিনিধির মারফত আমেরিকার কংগ্রেসে এই প্রস্তাব আনিবেন যে, আয়ার্লণ্ডের সঙ্গে ইংলণ্ডের সুমীমাংসা না হইলে আমেরিকাও ইংলণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ ঋণ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা স্থগিত রাখিবে। গত ১৯২১ সনে আয়ার্লণ্ড যে আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছিল তাহার মূলেও আমেরিকার জনমত বিস্তর সাহায্য করিয়াছিল।

জার্ম্মানীতে নব নির্ব্বাচন—

বিগত মহাযুদ্ধের ফলে, ততোধিক ভের্সাইয়ের সন্ধির ফলে, জার্ম্মানীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। জার্ম্মানীর সৈন্যসামন্ত যুদ্ধসম্ভার আর নাই। জগতের বিভিন্ন অঞ্চলের উপনিবেশগুলি ছাঁটিয়া ফেলা হইয়াছে। তাহার ব্যবসা-বাণিজ্য আজ একেবারে নির্ম্মূল। ইহার উপর, জার্ম্মানী প্রতি বৎসর বিজেতা শক্তিবর্গকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ শত শত কোটি দিতে বাধ্য হইতেছে। এই সকল কারণে জার্ম্মানীর অবস্থা দিন দিন খারাপ হইয়া পড়িতেছে। জার্ম্মানীর পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচন প্রায়ই নূতন করিয়া হইতেছে। নূতন নূতন কর্ণধার জার্ম্মানীকে এই বিপদ হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এ যাবৎ সে-চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ইদানীং জার্ম্মানীতে নাৎসিদল নামে এক রাজনৈতিক সম্প্রদায় দেখা দিয়াছে। হের হিট্লার এই দলের নেতা। এই দলের উদ্দেশ্য জার্ম্মানীর অন্তঃকোলাহল দূরীভূত করিয়া ইহাকে সবল করা। ভের্সাইয়ের সন্ধির নাগপাশ মুক্ত করিয়া দেশকে পূর্ব্ব গৌরবে মণ্ডিত করিয়া তুলিতে এই দল তৎপর হইয়াছেন। জার্ম্মানীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা হের হিট্লার দলের কার্য্যকলাপের মধ্যে তাঁহাদের মুক্তির ইঙ্গিত পাইয়াছেন। জার্ম্মানীর শেষ নির্ব্বাচনে হের হিট্লারের দল জয়লাভ করিয়াছেন। হের হিট্লার এখন জার্ম্মানীর সর্ব্বময়কর্ত্তা হইয়া দেশকে গৌরবময় করিতে পারিবেন বলিয়া সকলেই আশা করেন।

দেশে শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদীদের দমন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই সেখানে কয়েক শত সাম্যবাদী ধৃত হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রে স্বর্ণমান রহিত—

এই সেদিন ইংলণ্ডে স্বর্ণমান রহিত হইয়াছে। সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও স্বর্ণমান রহিত হইল। আমেরিকা হইতে বিস্তর পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য বাহিরে চালান হইতেছিল। তথাকার প্রেসিডেণ্ট রুসভেল্ট স্বর্ণ ও রৌপ্যের রপ্তানী বন্ধ করিবার জন্যই প্রধানতঃ স্বর্ণমান রহিত করিয়া দিলেন। ভারতবর্ষে গত বৎসরাধিক কাল যাবৎ কোটি কোটি টাকার স্বর্ণ বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু ভারত-সরকার এদিকে যেন মোটেই ভ্রূক্ষেপ করেন না। স্বাধীন ও পরাধীন দেশে এই পার্থক্য।

শৃঙ্খল

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

পরদিন ভোরে উঠিয়াই অজয় বীণাদের বাড়ী হাজির হইল। অনাহূত আসিল এবং অসময়ে আসিতেছে এই সংশয়কে মনে স্থান দিল না। আসিবার সময় বিমান তাহাকে নিজের ঘরে ডাকিয়া লইয়া বুরুশ করিয়া চুলগুলি ঠিক করিয়া দিয়াছিল, পথে আসিতে হাওয়ায় উড়িয়া, ঘনঘন অঙ্গুলিচালনায় বিপর্য্যস্ত হইয়া সেগুলি আবার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ক্ষীণ দেহটির উপর একরাশ এলোমেলো ঝাঁক্‌ড়া চুল। বুরুশ চালাইতে চালাইতে বিমান বলিয়াছিল, "তোমাকে দেখ্‌লে কি মনে হয় জানো? 'মপ্‌' বল্‌ব না, তা'তে তোমার কোমল প্রাণে আঘাত লাগ্‌বে। মনে হয় আর্টিষ্টের হাতের তুলি। কোন্‌দিন ভুলক্রমে তোমাকে রঙে ডুবিয়ে ছবি আঁক্‌তে ব'সে যাব সেই ভাবনায় রাত্রিতে আমার ঘুম হয় না।" ঘরে ঢুকিয়াই তাহার সেই ত্রস্ত চিন্তাকুল অনিদ্রাক্লান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া বীণা বলিয়া উঠিল, "কি ব্যাপার?"

অজয় আজ বীণাকেই দেখিতে আসিয়াছে। সমস্তরাত বীণার আহত পায়ের বেদনা তাহাকে ব্যথিত করিয়াছে। দেখিতে সে মপের মতনই হউক আর তুলির মতনই হউক, আসলে সে পুরুষ ত? বীণার পাশে থাকিয়াও কাল যে সে তাহার কোনও কাজে লাগে নাই, আজ যতটা সম্ভব সেই অক্ষমতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত সে করিবে। কণ্ঠস্বরে ব্যগ্রতা ভরিয়া কহিল, "কেমন আছেন আপনি?"

বীণা হাসিয়া কহিল, "ভালোই ত আছি মনে হচ্ছে। খারাপ থাক্‌তে কি কখনো আমাকে দেখেছেন?"

অজয় কহিল, "পা-টা সেরেছে?"

বীণা ঝুঁকিয়া বসিয়া তাহার বাসন্তীরঙের পরিধেয় প্রান্ত ঈষৎ একটু তুলিয়া ধরিল। লাল মখমলের চটির আবরণ মোচন করিয়া একটি স্নিগ্ধকান্তি সুকোমল পদ-পল্লব কার্পেটের ফুলপল্লবের উপর স্থাপন করিয়া কহিল, "সেরেই ত গিয়েছে মনে হচ্ছে।"

এত সুন্দর যে কাহারও পা হইতে পারে অজয় তাহা জানিত না। অকারণ মাধুর্য্যে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। মনে হইল, ঘুম ভাঙিয়াই ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে এতদূরে বালিগঞ্জে ছুটিয়া আসা সার্থক হইয়াছে।

পা-টিকে সম্মুখের দিকে অল্প একটু প্রসারিত করিয়া বার-কয়েক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া বীণা আবার কহিল, "এইদিকটায় একটু এখনও খচ্‌খচ্‌ ক'রে লাগছে, তা ওটুকু খানিক পরেই সেরে যাবে। আপনার সব খবর বলুন।"

অজয়ের মুখে কিছুক্ষণ কথা সরিল না। অমন সুন্দর পা-টিতে এখনও কোথাও ব্যথা বাজিতেছে এই চিন্তা তাহার বুকের মধ্যে রক্তস্রোতকে সহসা কেন এমন চঞ্চল করিয়া তুলিল কে জানে? কাল সমস্তরাত যে-বেদনা গুমটের মত মনে চাপ বাঁধিয়াছিল, আজ অকস্মাৎ বন্ধনমুক্ত হইয়া তাহা অজস্র হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, সেই অদৃশ্য ধারা-বর্ষণে ধোয়াইয়া বীণার আর্ত্ত পা-টিকে সে মুহূর্ত্তে নিরাময় করিয়া দিতে চায়। তাহা ছাড়া আর কিছু ত তাহার করিবার সাধ্য নাই। ঢোঁক গিলিয়া কহিল, "আমার আর নতুন কি খবর থাকবে?… কাল রাতটা মোটেই ভালো কাটল না।"

বীণা উৎকর্ণ হইয়া কহিল "কেন, আপনার কি হ'ল আবার?"

তাড়াতাড়ি নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া অজয় কহিল, "হয়নি বিশেষ কিছুই। শরীরটা কিছুদিন থেকে কেমন ভালো থাক্‌ছে না।"

বীণা নিরাশ হইল বটে কিন্তু ধরা দিল না, কহিল, "বাড়ীতে অমন একজন সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি থাক্‌তে আপনার আবার শরীরের জন্যে ভাবনা।"

অজয় কহিল, "শরীরটাকে নিয়ে ধন্বন্তরি তাঁর যথা-কর্ত্তব্য করছেন, কিন্তু মনের ভাবনা তিনি

সারাবেন কি করে ? সে যাক্, এখন মন্দিরা কেমন আছে বলুন।"

বীণা কহিল, "অনেকটাই ভালো। আপনি এসেছেন খবর পেয়েই ছুটে আস্‌ছিল, আয়া তাকে দুধ খাওয়াতে ধ'রে নিয়ে গিয়েছে। এখনি এসে পড়বে, ভাবনা নেই। বসুন আপনি।"

যেন মন্দিরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেই অজয় এবাড়ীতে আসিয়া থাকে।

ক্রমে মন্দিরাকে অবলম্বন করিয়াই বিশ্রম্ভালাপ জমিয়া উঠিল। নিত্যকার মতই বীণার কলহাসির বান ডাকিতে লাগিল। যেন কাল সন্ধ্যায় ডান পায়ে সামান্য একটু আঘাত লাগা ভিন্ন কোথাও আর কিছু ঘটে নাই। বীণার অকুণ্ঠিত ব্যবহারে অজয়েরও ব্যবহার সহজ হইয়া গেল, তাহার মনে ইহা লইয়া যে কি গভীর কৃতজ্ঞতা তাহা সে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না। বিমানের গল্প, সুভদ্রের গল্প, সুলতা, প্রিয়গোপাল, রমাপ্রসাদের গল্প, ক্লাবের এমন আরও অনেক মানুষের গল্প যাহাদের নামও অজয় মনে রাখে নাই। অজয় দেখিল, তাহাদের সকলেরই সম্বন্ধে বীণার কৌতূহল সমান সজাগ সচেতন। গভীর আন্তরিকতার দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি মানুষকে সে দেখিয়াছে, পরমাত্মীয়ের মত তাহাদের প্রত্যেকের কথা সে ভাবিয়াছে, প্রত্যেকটি মানুষের তুচ্ছতম সুখদুঃখের সংবাদ সাবহিত হইয়া সে রাখিয়াছে। মনে মনে কখন ঐন্দ্রিলার দূর-নিহিত রহস্য-গভীর দৃষ্টি,দেবতার মত দর্পিত দৃঢ় মুখশ্রীর সঙ্গে বীণার এই সদাহাস্যময় স্নিগ্ধ সহৃদয়তার সে তুলনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সতর্ক হইয়া চিন্তার রাশ টানিয়া ধরিল। আজ চিন্তা নয়, আজ কোনও সংশয় নয়, দ্বন্দ্ব নয়, আজ সে কার্পণ্য করিবে না, আজিকার এই মুহূর্ত-কয়টিকে পরিপূর্ণ করিয়াই বীণাকে সে নিবেদন করিয়া দিবে। বীণাকে তাহার ভাল লাগে, তাহার কাছে বসিতে, তাহার চোখে চোখে চাহিতে, তাহার কলকণ্ঠের বাধাহীন সুধাস্রোতে ক্লান্ত চেতনাকে অবগাহন করিতে দিতে তাহার ভাল লাগে, নিজের কাছে পরিপূর্ণ করিয়া একথা স্বীকার করিতে সে আজ লজ্জা বোধ করিবে না।

ইচ্ছা করিয়াই একথা সে তুলিল না, যে এই বাড়ীরই কোনও একটি কক্ষে, অনতিদূরে ঐন্দ্রিলা রহিয়াছে, তাহাকে ঘিরিয়া অজয়ের ধ্যান-কল্পনার ইন্দ্রলোক। এই ত ভাল হইয়াছে, সংশয়ের আবর্ত্তের একেবারে কেন্দ্রস্থানটিতে পঁহুছিয়া সংশয়কে সে অতিক্রম করিতেছে। বীণা যেমন করিয়া গৃহভিত্তিতে নিজের পদপল্লব স্থাপন করিয়াছিল, এই ত তাহার অন্তরের পূজাবেদীতে ঐন্দ্রিলারও চরণস্পর্শ তেমনই করিয়া সে লাভ করিতেছে। তবু বীণাকে তাহার ভাল লাগে না এই মিথ্যা কেমন করিয়া নিজেকে সে বলিবে। জীবনে শ্রেয় যাহা, প্রেয় যাহা, তাহার পায়ে চিরকাল অকুণ্ঠিতচিত্তে অন্তরের শ্রদ্ধা সে সমর্পণ করে, অকল্যাণকে অসুন্দরকে ক্ষমা করে না, ইহাই ত তাহার স্বভাবের সত্যনিষ্ঠা। নিজেকে এবং অপরকে প্রবঞ্চনা করিতে সে জানে না,ইহাই কি অবশেষে তাহার অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে ? বীণা-ঐন্দ্রিলার দ্বন্দ্ব মিটিয়া গেলে তাহার মনের উপর হইতে কতবড় একটা বোঝা নামিয়া যায় !

পুটি এবং ভবতোষ নামের একজোড়া মানুষের গল্প হইতেছিল। ক্লাবে যতক্ষণ থাকে, দুজনেরই ভিজে-বেরালের মূর্ত্তি, তাহাদের একসঙ্গে কাঁদিতে সুভদ্র বেচারা গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া গেল। এদিকে গোপনে গোপনে দুজনেরই কাছে দুজনের চিঠি স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে। পুঁটিদের হস্টেলের আশেপাশে সন্ধ্যার অন্ধকারে ভবতোষ গা-ঢাকা দিয়া ঘুর ঘুর করিয়া বেড়ায়। বীণা বলিতেছিল, এদেশের মানুষের এমনই অদ্ভুত মনোবৃত্তি, লুকাইয়া অন্ধকারে হাত না বাড়াইলে পাইয়াও তাহাদের পাওয়া হয় না। ইহাদের লইয়া ক্লাব করিবার চেষ্টা যে কত বড় পণ্ডশ্রম, সুভদ্রবাবু কোনওদিনই কি তাহা বুঝিবেন না ? অজয় কিছুই শুনিল না। সে তখন ভাবিতেছিল, মানুষকে মানুষ বলিয়া কোনওদিন আমি মনের কাছে ডাকিয়া লই নাই, তুমি আমাকে কাছে ডাকিয়াছ, কেমন করিয়া কাছে ডাকিতে হয় তোমার কাছে সেই শিক্ষা আমার পাওয়া। আমাকে মানুষ বলিয়াই তোমার ভাল লাগে, তোমার কাছে এই আমার ঋণ, এ ঋণ শোধ না করিতে পারি যদি, আমার মানুষ নামে কলঙ্ক থাকিবে।

সময় কোন্‌দিক্ দিয়া বহিয়া যাইতেছে, দুজনের কেহ

তাহা বুঝিতেছে না, এমন সময় দুতলার সিঁড়িতে ঐন্দ্রিলার চটির শব্দ শোনা গেল। এক মুহূর্ত উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়া অজয় দ্বিগুণতর অভিনিবেশ লইয়া বীণার কথা শুনিতে এবং তাহার প্রত্যেকটি কথার উত্তর দিতে বসিল।

দুইসার ঘরের মধ্যেকার পথ দ্রুত অতিক্রম করিয়া ঐন্দ্রিলা তাহার মামার মহলের দিকে চলিয়া যাইতেছে। তাহার পরিধেয় লাল শাড়ীতে একটুকরা রোদ পড়িয়া ঘরের মধ্যেটাকে একমুহূর্ত লোহিতাভ করিয়া তুলিল। সেই আলো অন্তর্হিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অজয়েরও মনের সমস্ত উৎসাহ যেন দপ করিয়া নিবিয়া গেল।

এত কাছের পথ দিয়া ঐন্দ্রিলা চলিয়া গেল, অথচ একবার ঘরের মধ্যে তাকাইয়া তাহার উপস্থিতিকে স্বীকার করিল না, এই চিন্তা অজয়ের মন হইতে আজিকার বিশ্রম্ভালাপের সমস্ত সুখ অপহরণ করিয়া লইল। মন্দিরা আসিয়াছিল, তাহাকে একটু আদর করিয়া ক্ষুব্ধ বীণার নিকট বিদায় লইয়া সে উঠিয়া পড়িল। কিন্তু অত্যন্ত অভাবিত ভাবে বাগানের পথে নতমুখী ঐন্দ্রিলার সঙ্গে তাহার আবার দেখা হইয়া গেল। হৃষীকেশের মহল হইতে সে ফিরিতেছে। মর্ম্মরের জীবন্ত দেবীপ্রতিমা। কম্পিতবক্ষে নমস্কার করিয়া অজয় কহিল, "ভালো আছেন?" ঐন্দ্রিলা চোখ তুলিল না, চিন্তাকুল মুখে একটু হাসি আনিয়া হাতদুটি জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইল, কহিল, "আপনি ভালো আছেন?" কথাটুকু শেষ হইতে না-হইতে অজয় তাহার পিছনে পড়িয়া গেল।

ট্রামের পথ ধরিয়া বিহ্বলের মত ছুটিতে ছুটিতে অজয় কেবলই ভাবিতে লাগিল, ঐন্দ্রিলা তাহার চোখে চোখে চাহে নাই, চোখে চোখে চাহে নাই। যদি চাহিতই, কি দেখিতে পাইত? দেখিত, অজয়ের দৃষ্টি অর্থহীন, উদাস। কিন্তু তাহা যে সে দেখিল না সেই বেদনায় অজয়ের সমস্ত ঔদাসিন্য অশ্রু হইয়া ফাটিয়া পড়িতে চাহিতেছে।

অনুভব করিল, ঐন্দ্রিলার পাশে বীণাকে চাহিয়া দেখা তাহার কত সহজ! বীণার কলহাসির মোহ-মদিরতা যেন পৃথিবীর ধূলিমাটি হইতে সবুজ তৃণপুঞ্জের মত পল্লবিত হইয়া উঠে, দৃষ্টিকে স্নিগ্ধ করে, চিত্তকে বিশ্রাম দেয়। তাহার দিকে চাহিয়া নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাওয়া চলে, এমন কি তাহাকেও বিশেষ করিয়া মনে না রাখিলে কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু ঐন্দ্রিলার সান্নিধ্য যেন কালবৈশাখীর ঝড়ের মত দিক্‌দিগন্তকে আবৃত করিয়া আসে, জীবনের সমস্ত ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে মুহূর্তে বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়। ইহার দিকে চাহিয়া অন্তর বিশ্রাম পায় না, কিন্তু ইহার দিক্ হইতে চোখ ফিরাইয়া থাকিয়াও শান্তি নাই। এক হয় দূরে পলাইতে হয়, নতুবা সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইয়া ইহার সঙ্গে ব্যবহার করা চলে, এবং দুইয়ের কোনওটিই সহজসাধ্য নহে।

মনে পড়িল, ঐন্দ্রিলার সঙ্গে যতবার তাহার দেখা হইয়াছে, বেদনার গুরুভার বহিয়া সে ফিরিয়াছে। ঐন্দ্রিলা তাহাকে আনন্দ দেয় নাই, কিন্তু আনন্দ না দিয়াই অজয়ের অন্তরের মধ্যে এক সুপ্ত জয়লিপ্সু পুরুষকে সে জাগ্রত করিয়াছে। আজও তাহার সমস্ত অস্তিত্ব ভরিয়া এই মন্ত্রই গুঞ্জিত হইতে লাগিল, আমি জয়ী হইব, জয়ী হইব, বৈরাগ্যের অহঙ্কার আমার মিথ্যা অহঙ্কার, আমি আর নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিব না। ইহাকে হার মানাইয়া, ইহার অটুট দৃপ্ততাকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া ইহাকে আমি লাভ করিব, সেজন্য প্রাণপাত করিতেও আমি কুণ্ঠিত হইব না। আমার জীবনে অন্য সংগ্রাম যাহা আছে তাহাকে এই সংগ্রামের ক্ষেত্রে আমি টানিয়া আনিব, এবং একই পরাজয় দ্বারা পরাজিত করিব। আমার মধ্যে দেবতার অন্য উদ্দেশ্য যাহা আছে, তাহাকেও এই একটি মাত্র উদ্দেশ্যের মধ্যে ধরিয়া আমি চরিতার্থতা দান করিব।

যাহাকে লইয়া এই ঘোর সমারোহের যুদ্ধের আয়োজন, সে তখন পিতার কাছ হইতে পাওয়া সেদিনকার ডাকের একটি চিঠি হাতের মুঠায় করিয়া বিছানায় উপুড় হইয়া শুইয়া আছে। তাহার দেহমনে যুদ্ধসজ্জার মত কিছু কোথাও চোখে পড়িতেছে না। নরেন্দ্রনারায়ণ এই প্রথম এবারে তাহাকে চিঠি লিখিয়াছেন:

'মা, তোমার কোনও খবর পাই না। কেমন আছ? পড়াশোনা কেমন করিতেছ? হয়ত শীঘ্রই একবার

তোমাকে দেখিতে যাইব, কবে যাইতে পারিব তাহা নিশ্চয় করিয়া এখনও বলিতে পারি না। কিন্তু তোমাকে দেখিতে মন ব্যাকুল হইয়াছে।'

উৎসাহিত হইয়া হৃষীকেশকে খবরটা দিতে গিয়াছিল, তিনি কর্ত্তব্য-বোধে একটুখানি হাসিয়া আবার তৎক্ষণাৎ নিজের কাজে মনোনিবেশ করিলেন। হেমবালার দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া সে ফিরিয়া আসিয়াছে। যে খবর লইয়া অধীর আনন্দে আজ তাহার সমস্ত বাড়ী কোলাহলে মুখর করিয়া তুলিবার কথা ছিল, মুখ ফুটিয়া কাহাকেও তাহা বলিবারও তাহার অধিকার নাই।

বাহিরে দাঁড়াইয়া হেমবালা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘরের দরজা অবধি গিয়ে কিছু না ব'লেই চ'লে এলি যে?"

ঐন্দ্রিলা বলিল, "অম্‌নি।"

মন্দিরা সোহাগ করিতে আসিয়াছিল, তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া জোরে জোরে পা ফেলিয়া হেমবালা ছাদে চলিয়া গেলেন, মন্দিরা কাঁদিল। যে-ঐন্দ্রিলাকে কোনও দুঃখ টলাইতে পারিত না, পিতার মুখ মনে করিয়া সেও আজ কাঁদিতেছে।

মন্দিরার খোঁজে আসিয়া বীণা বলিল, "এ কি কাণ্ড!"

তাড়াতাড়ি পিতার চিঠিটিকে লুকাইয়া আঁচলে মুখ মুছিয়া ঐন্দ্রিলা উঠিয়া বসিল। তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া বীণা কহিল, "অজয়বাবু আজ একলা এসেছিলেন, তাই?"

ঐন্দ্রিলা মুখটাকে একঝটকায় সরাইয়া লইয়া কহিল, "কি যে মাথামুণ্ডু বল তার ঠিক নেই।"

বীণা কহিল, "মাথামুণ্ডু কিছু না বুঝতে পারলে কি করব? তোর বয়সের মেয়েরা ত আর পেন্সিল হারিয়ে গেছে ব'লে কাঁদতে বসে না। আজ নিশ্চয় ক্লাবে আসিস্, সুভদ্রবাবু বার-বার ব'লে দিয়েছেন, তোকে নিয়ে যেতে। এখন ওঠ, কলেজে যাবার সময় হয়েছে সে খোঁজ রাখিস্?"

ঐন্দ্রিলা তাহার চোখে চোখে চাহে নাই, চোখে চোখে চাহে নাই, সেই দুঃখে অজয় তাহার পিতাকে চিঠি লিখিতেছে। লিখিল,

'এবার আপনার সঙ্গে যখন আমার শেষ সাক্ষাৎ হয়, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আমাকে বৎসরের পর বৎসর কলিকাতায় রাখিয়া, বহুক্লেশে আমার পড়া-খরচ জোগাইয়া তাহার পরিবর্ত্তে আপনি কি ফললাভের আশা করিয়াছিলেন। আপনি বলিয়াছিলেন, আমি লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইব,ইহাই আপনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। অর্থাৎ বাংলা দেশের অন্য অনেক পিতার মত আপনারও মনে ধারণা ছিল, যে, লেখাপড়া শিখিলেই মানুষ হওয়া যায়। আমার অতিবড় দুর্ভাগ্য, আজ আপনার সমস্ত স্বার্থত্যাগের মূল্যগ্রহণ যখন আমার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখনই আপনাকে আমার জানাইতে হইতেছে যে আমি মানুষ হই নাই। অন্ততঃ এমন-কিছু হই নাই যাহার জন্য এত বৎসর ধরিয়া আপনার এত দুঃখভোগ এবং স্বজন-পরিত্যক্ত অবস্থায় দূর-বিদেশে আমার দীর্ঘদিনের এত প্রাণপাত পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে।'

যদি সার্থক হইত, ঐন্দ্রিলা আজ তাহার চোখে চোখে চাহিত। কিন্তু পিতাকে সেকথা ত সে আর লিখিতে পারে না? তাই দীর্ঘ ছয়পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া, তাহার জীবনে মানুষের মত হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার যতপ্রকার সমস্যা তাহার প্রত্যেকটির দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়-লব্ধ শিক্ষাকে যাচাই করিয়া সে তাঁহাকে জানাইল, তাহার জীবনের সর্ব্বৈব বিফলতার জন্য পিতাকে সে একটুও দায়ী করিতে চাহে না, সে কেবল বলিতে চায়, আগামী আষাঢ়ে তাহার বয়স পঁচিশ পূর্ণ হইবে, এটা মাঘ। বাজে খরচ বলিয়া চব্বিশ বৎসর সাত মাসই হিসাবে তোলা থাকুক, বাকী পাঁচটা মাসকে সে কাজে লাগাইবে। সে তাই স্থির করিয়াছে, এম-এ পরীক্ষার্থী হইয়া উপস্থিত হইবে না। পিতা এই মনে করিয়া দুঃখ পাইবেন, এই দেড় বৎসর সে পড়া-খরচ বলিয়া যাহা লইয়াছে, অন্নের জন্য তাহার সবটাই নষ্ট হইল। তাহার জীবনের চব্বিশটা বৎসরই নষ্ট হইয়াছে, তাহাই ভাবিয়া দয়াপরবশ হইয়া তিনি যেন তাহাকে ক্ষমা করেন।

চিঠিটি সুভদ্র এবং বিমানকে পড়িয়া শোনাইল। অন্য সময় শোনাইত না, কিন্তু, মানুষকে মানুষ বলিয়া

মান্য করে না, বীণার এই তিরস্কার সম্প্রতি তাহার মনে লাগিয়াছে। সুভদ্রকে বলিল, "কি বল, কিছু অন্যায় লিখেছি ?"

সুভদ্র একমুহূর্ত্ত নীরবে চিন্তা করিয়া বলিল, "আমি কিছু বলতে চাই না, বলা উচিতও নয়। আমার ধারণা, তুমি নিজে জেনে বুঝে যেভাবে জীবনকে গড়তে চাচ্ছ, প্রত্যেক মানুষকেই কোনো-না-কোনোদিন তাই করতে হয়। পিতা বা শিক্ষক বা বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য কতকটা হয়ত তাকে করতে পারে, কিন্তু তার হয়ে তার পথ-নির্দ্দেশ করতে পারে না। ভালোমন্দ বুঝবার তোমার বয়স হয়েছে, তুমি যদি সত্যই অনুভব কর, তোমার সমস্ত জীবন ধ'রে এতদিন কেবল পণ্ডশ্রম তুমি ক'রে এসেছ, তোমার দিক থেকে সেকথা ভাববার এবং বলবার তোমার ষোল আনা অধিকার আছে। যখন একমাত্র নিজের ওপর নির্ভর করবার তোমার সময় এসেছে মনে করছ, এবং সেজন্যে প্রস্তুতও হয়েছ, তখন অন্যের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে তোমাকে আমি বলব না।"

বিমান হাসিয়া কহিল, "কিছু বলবে না সেই কথাটাই পাঁচ মিনিট ধ'রে এত দীর্ঘ ক'রে অজয়কে না শোনালেও কোনো ক্ষতি ছিল না। অবিশ্যি চব্বিশ বৎসর সাত মাসই যার বাজে খরচ হয়ে কেটেছে, এই পাঁচ মিনিটের ক্ষতিতে তার কিছু এসে যাবে না।"

সুভদ্রের সাধারণতঃ দুইপ্রকার রোগী জুটিত। এক যাহাদের এমন-কিছু হয় নাই যেজন্য সত্যসত্যই ডাক্তার ডাকা প্রয়োজন, আর যাহাদের এমন-কিছু হইয়াছে ডাক্তার ডাকিয়াও যাহার কোনও প্রতিকার হওয়ার আশা নাই। সম্প্রতি সেই-যে তাহাদের পুরান চাকরটা অসুস্থ হইয়া হাস্‌পাতালে গিয়াছিল, সে ছাড়া পাইয়া ফিরিয়া আসাতে সুভদ্রের একজন সত্যকারের রোগী জুটিয়াছে। কাজ করিবার মত অবস্থায় সে ব্যক্তি আর নাই, সহজেই তাহাকে হাঁকাইয়া দেওয়া যাইত, কিন্তু সুভদ্র তাহাকে ছাড়ে নাই। একটি বন্ধু-ডাক্তারের কাছে আজ তাহাকে এক্‌স্-রে পরীক্ষার জন্য লইয়া যাওয়ার কথা ছিল, কথার মাঝখানে উঠিয়া প'ড়িয়া সে বাহির হইয়া গেল।

সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইবার আগে অজয়ের ঘরে আসিয়া বসিয়া বিমান কহিল, "এরপর কি করবে ভেবেছ ?"

অজয় কহিল, "জানি না। সেইটে ভেবে ঠিক করাই এখন আমার সব-চেয়ে বড় কাজ, তাই করব ব'লেই আর সব দিক থেকে ছুটি ক'রে নিচ্ছি।"

বিমান কহিল, "এমনই কি ভাবনা যে দিনে তিনঘণ্টা কলেজ ক'রে সেটা ভাবা চলত না ?"

অজয় কহিল, "হয়ত চলত, কিন্তু চলা উচিত হত না। শ্রদ্ধা ক'রে যে-কাজ করা যায় না তা কারুরই করা উচিত নয়, একথা ত তুমিই উঠতে বসতে বল।"

বিমান কহিল, "তুমি ভুলে যাচ্ছ, তোমার আর আমার অবস্থাটা এক নয়। আমার কাজ বা অকাজ নিয়ে আমি পৃথিবীতে একেবারেই একলা পথের পথিক। তুমিও যে আর কারুর জন্যে কিছুমাত্র ভাবো তা নয়, কিন্তু তুমি আশা কর তারা তোমার জন্যে ভাবুক, অন্ততঃ সেইজন্যেই কেবলমাত্র নিজের দিক্ ভেবে কোনও-কিছুর বিচার করা তোমার উচিত হবে না। কি এরপর করতে পারো না পারো সে-সম্বন্ধে বীণা-ঐন্দ্রিলাদের সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে ?"

অজয় চঞ্চল হইয়া উঠিল, বলিল, "না, এ-সম্বন্ধে তাঁদের সঙ্গে হঠাৎ কেন আমি কথা বলতে যাব ?"

বিমান বলিল, "প্রয়োজন বোধ না করলে কেন বলতে যাবে ? কিন্তু বীণা-দেবী সম্বন্ধে এইটুকু তোমাকে আমি বলতে পারি, যে, তুমি তাঁকে যতটা জানো, তার চেয়ে ঢের বেশী তিনি প্র্যাকটিক্যাল। কথা যদি বলতেই, তাতে তোমার লাভ ছাড়া ক্ষতি হত না। তাছাড়া তোমার জীবনে এমন সময় হয়ত এসেছে, যখন সবদিক্ ভেবে তাঁকে সব কথা বলাই তোমার উচিত হত।"

অজয়ের বুকের মধ্যে হঠাৎ কেমন-একটা অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব সুখানুভূতি। একটি রূপসী তরুণীর জীবনের সঙ্গে বিমান তাহার অন্তরতম জীবনকে জড়াইয়া কথা বলিতেছে, সেইসূত্রে তাহার বুকে যেন কাহার সুখস্পর্শ। বাহিরে সে যথোপযুক্ত তীব্রভাবে বিমানের কথার প্রতিবাদ

করিল, কহিল, সে সময় তাহার জীবনে আদৌ এখনও আসে নাই, শীঘ্র আসিবার কোনও সম্ভাবনাও সে দেখিতে পাইতেছে না। বাঙালী মনোবৃত্তির এইদিক্‌টাকে কোনও দিনই সে বুঝিতে পারে না। দুইটি নিঃসম্পর্কিত তরুণ-তরুণীকে একসঙ্গে দেখিলেই কেন তাহারা মনে করে যে তাহাই লইয়া প্রণয় এবং পরিণয়ের দেবতাদের চোখে ঘুম নাই? মানুষ কি মানুষের সঙ্গে স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে সহজ বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে, সহৃদয়তার ক্ষেত্রে মিলিতে পারে না? ইত্যাদি।

বিমান একথায় মুখ টিপিয়া একটু কেবল হাসিল।

পাঁচদিন পরে অজয়ের চিঠির জবাব আসিল। তাহার পিতা লিখিয়াছেন:—'পুত্রকে ভালমন্দ বুঝিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে সাহায্য করা ছাড়া কোনও পিতার আর যে কিছু করিবার সাধ্য নাই কেবল তাহাই নহে, আর কিছু করা হয়ত কর্ত্তব্যও নহে। তোমার বিচার-বুদ্ধির উন্মেষ আরও কিছুদিন আগে হইলে আমি অবশ্যই সুখী হইতাম, কিন্তু সেকথা ভাবিয়া এখন দুঃখ পাওয়া নিরর্থক। নিজে ভালরূপ চিন্তা করিয়া যাহা শ্রেয় বিবেচনা করিয়াছ, তাহাই করিও, আমি কোনও জায়গায় বাধা হইব না। কিন্তু তোমার দিকে তোমাকে যেমন কর্ত্তব্য বিচার করিবার, স্থির করিবার স্বাধীনতা আমি দিতেছি, আমার নিজের দিক্ হইতেও আমার কর্ত্তব্য আমাকে করিতে হইবে। তোমার চিঠিটি পাইয়া অবধি আমি অনেক ভাবিয়াছি। বুঝিতেছি, তোমার জীবনের এই সঙ্কট সময়ে তোমার মনুষ্যত্ব-বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ তোমাকে আমার দেওয়া উচিত। সেজন্য, কেবল বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে নহে, অন্য সমস্ত দিকেও তোমার আত্মনির্ভরশীল হওয়া প্রয়োজন। আমি তাই স্থির করিতেছি, তোমাকে কোনও বাবদে এখান হইতে কোনও খরচের টাকা আমি আর পাঠাইব না। ফেব্রুয়ারী মাসের খরচের টাকা আজও পর্য্যন্ত যোগাড় হয় নাই বলিয়া পাঠাই নাই, তাহাও আর পাঠাইব না। তোমার পড়া-খরচের জন্য এ-পর্য্যন্ত যে-ঋণ আমাকে করিতে হইয়াছে, অনন্যকর্ম্মা হইয়া চেষ্টা করিলে বাকী জীবনে হয়ত তাহা পরিশোধ করিয়া যাইতে পারিব। অকারণে আমার এই ভার আরও বাড়াইতে তুমি নিশ্চয় আমাকে পরামর্শ দিবে না।'

অজয় শৈশবে মাতৃহীন। তাহার পিতা প্রায় প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হইয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, বিবাহে এই একটিমাত্র সন্তানলাভ তাঁহার ঘটিয়াছিল। শিশুপুত্রকে লইয়া বহুদিন একাধারে তাহার পিতা এবং মাতার স্থান পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে থাকিতে হইয়াছিল। দেশে পূর্ব্ব-পুরুষদের অমিতব্যয়িতার উদ্বৃত্ত জমিজমার সামান্য যাহা আয় ছিল, তাহা দ্বারা কায়ক্লেশে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইত, কিন্তু পুত্রকে কোনওদিন কোনও ক্লেশ তিনি অনুভব করিতে দেন নাই। নিজে শতছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, বড় প্রয়োজনের ছাতাটিকে নিজ হাতে তালির পর তালি দিয়া ঢাকিয়াছেন, তবু পুত্রকে ভাল পরিচ্ছদ, ভাল আহার্য্য, ভাল বইয়ের অভাব কোনওদিন বুঝিতে দেন নাই। অজয়ের মনে পড়িল, সে যতবার ছুটিতে বাড়ী গিয়াছে তাহার পিতা তাহার পরিত্যক্ত দুচারিটি কাপড়-জামা নিজের জন্য রাখিতে পাইয়া, পূজার দিনে নূতন পরিধেয় পাইলে শিশুরা যেমন খুসি হয়, তেমনই খুসির হাসিতে মুখ ভরিয়া তুলিয়াছেন। মনে পড়িল, এই সেদিনও বাড়ীর চাকরের অসুখ করিলে অজয়কে কোনও কাজে হাত দিতে না দিয়া, নিজে মশলা বাটিয়া, জল তুলিয়া, রান্না করিয়া তিনি তাহাকে খাওয়াইয়াছেন। অজয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় জলপানি পাইলে আনন্দে তাঁহার চোখে অবিরল অশ্রু ঝরিয়াছিল। জলপানি অতঃপর সে আর পায় নাই, এই কয়বৎসর প্রায় অর্দ্ধাশনে থাকিয়া, দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ধার করিয়া, কখনও বা জমিজমা বিক্রয় করিয়া পিতাকে তাহার কলেজের খরচ যোগাইতে হইয়াছে, কিছুতেই তিনি কাতরতা অনুভব করেন নাই। বলেন নাই, আমি কখন আছি কখন নাই তাহার ত কিছু ঠিক নাই, ঢের ত তোমার জন্য করিলাম, এবার তুমি আমার জন্য কিছু কর, মরিবার পূর্ব্বে দুদিনও তোমার উপার্জ্জিত অন্ন আহার করিয়া যাই।

সেই পিতা আজ তাহাকে এই চিঠি লিখিয়াছেন। কত বড় আশায় নিরাশ হইয়া, কি গভীর বেদনা পাইয়া

এই চিঠি তিনি তাহাকে লিখিতে পারিয়াছেন। অজয় আর বেশী ভাবিতে পারিল না, টেবিলে মাথা গুঁজিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল।

তারপর অপরিচিত অন্ধকার দুর্ভাগ্যের জগতে তাহার অপরিসীম মুক্তি। কোনওদিকে সম্প্রতি কিছু যে তাহার করিবার নাই, এই অভিনব উপলব্ধির মধ্যে কয়েকদিন সে বুক ভরিয়া নিঃশ্বাস লইল। চিরকাল ছোটবড় সমস্ত সংগ্রামের ক্ষেত্র হইতে সে পলায়ন করিত; আজও বুঝিল না, পিতা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন এই চিন্তাও তাহার একটা পলায়ন। পিতার সম্বন্ধে সমস্ত দায়িত্ব হইতে নিজেকে অতি সহজে সে নিষ্কৃতি দিল। কিন্তু ভাগ্য তাহাকে নিষ্কৃতি দিল না।

দুইদিন না যাইতেই অদূরবর্ত্তী ভবিষ্যতের ভাবনা তাহাকে ঘিরিয়া ভিড় করিয়া আসিল। চিরকাল বাংলা উপন্যাসের নায়কদের মত নিশ্চিন্তমনে তর্ক করিয়া, বক্তৃতা দিয়া, নানা মনোলোভন মরীচিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াই তাহার দিন কাটিয়া যাইবে, ইহাই হয়ত তাহার মনে ছিল। আজ জীবনের নগ্নতার রূপ, বিরূপতার রূপ, সহসা তাহার সেই নিশ্চিন্ততার একেবারে শয্যাপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। কোন্‌দিক্ দিয়া কি হইবে কিছুই সে বুঝিতেছিল না, অথচ হাতে বিশেষ কিছু আর অবশিষ্ট নাই; সুভদ্রের কাছে বাসা-খরচের ধার জমিতেছে এবং যেহেতু সুভদ্রের ধার দিবার ক্ষমতাও অফুরন্ত নয়, সেই ধার অন্যত্র সুভদ্রের হইয়া জমিতেছে।

বাংলাদেশের পনেরো আনা শিক্ষিত কর্ম্মপ্রার্থী যুবক যাহা করে, সেও অতঃপর তাহাই করিতে লাগিল। প্রথমতঃ নিজের যোগ্যতা-সম্বন্ধে নিজের আবাল্য-পোষিত অত্যুচ্চ ধারণা হইতে করিবার মত কোনও কাজ সে খুঁজিয়া পাইল না। তাহার পর এমন-সমস্ত স্থানে কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইতে লাগিল যেখানে টেবিলের ধুলা ঝাড়িবার জন্যও তাহার প্রবেশাধিকার নাই। নিদারুণ অভাবের তাড়নায় কিছুদিনের মধ্যেই কল্পনার আকাশকুসুম রচনা ছাড়িয়া দিয়া বাস্তবতার ধূলিমাটির জগতে নামিয়া আসিতে সে বাধ্য হইল, কিন্তু সেখানেও মানুষের ভিড়ে কেহ তাহার দিকে তাকাইল না। একমাস না কাটিতেই সে বুঝিতে পারিল, বিধাতার হাতের যেমন জয়টীকা ললাটে লইয়াই সে পৃথিবীতে আসিয়া থাকুক, আপাততঃ ত্রিশটাকা মাহিনার শিক্ষকতার কাজ পাওয়াও তাহার পক্ষে দুরূহ।

এমন অবস্থায় আর যাই করা চলুক, প্রেম করা চলে না। তাহার দর্পী মন নিজের এই পরাজয়-লাঞ্ছিত ধূলিধূসরিত মূর্ত্তিটাকে কিছুতেই ঐন্দ্রিলার চোখের সম্মুখে লইয়া গিয়া ধরিতে রাজি হইল না। নিজেকে বুঝাইল, যোগ্য হইয়া, মানুষের মত হইয়া প্রিয়ার সঙ্গে মিলিতে চাই বলিয়াই ত বিরহযাপনের এই তপস্যা আমার জীবনে, আমি ইহাতে কাতর হইব না। তাহার সম্বন্ধে ছোট ছোট লোভগুলিকে জয় করিয়া জীবনের সর্ব্বত্র বড় করিয়া তাহাকে লাভ করিব।

বীণার সম্বন্ধে মনকে এত সতর্ক হইয়া চারিদিক্ দিয়া বাঁধিতে হইত না। কর্ম্মহীন সন্ধ্যায় রহিয়া রহিয়া একটি দীপালোকিত কলহাস্যমুখর বিশ্রম্ভালাপের সভা মনে পড়িয়া তাহার বুকের মধ্যে হু হু করিতে থাকিত। ইতিমধ্যে বীণার নিকট হইতে একটি চিঠি পাইল। রাম একজন বেহারা সঙ্গে লইয়া চিঠিটি হাতে করিয়া আসিয়াছিল, বলিল, "বড়দি বলেছে, আপনাকে কখখনো আমি নিয়ে যেতে পারব না, যদি পারি আমাকে ফিরপোতে খাওয়াবে।"

অজয় বলিল, "আমাদের বৈকুণ্ঠ ডিম-রুটি দিয়ে এমন খাসা বষে টোষ্ট তৈরি করে, ফির্পোর কোনো বাবর্চ্চি তার কাছাকাছিও কিছু করতে পারে না। ও জগদীশ বোস, সার্ নীলরতন, রবিঠাকুর, এঁদের খানসামাগিরি ক'রে হাত পাকিয়েছে,—ফির্পোতে কেউ আছে যে ওঁদের তিনজন ছেড়ে একজনেরও খানসামা কোনোদিন ছিল? তুমি বোসো, বড়দির সঙ্গে বাজিতে হেরে গিয়েছ ব'লে একটুও তোমাকে দুঃখ করতে হবে না দেখো।"

বৈকুণ্ঠকে ডাকিয়া চায়ের জোগাড় করিতে বলিয়া বীণার সুন্দর হস্তাক্ষর সম্বলিত নীলরঙের খামটি সে খুলিয়া ফেলিল। চিঠির কাগজের পরিচিত অস্ফুট সৌরভ বীণা লিখিয়াছে,

'ইলু হঠাৎ ক্লাব নিয়ে খুব মেতেছে। সুভদ্রবাবুকে

য়েছে, ছেলেমেয়েদের জোর ক'রে মেলাতে গেলে রা কোনোজন্মেও মিল্‌বে না, মানুষের ধাতেই সেটা ই। তাদের একসঙ্গে কোনো একটা কাজে লাগিয়ে ল কাজের চাপে চটপট সব জোড় বেধে যাবে। মি শুনে যথারীতি খুব হেসেছিলাম, বলেছিলাম, া দিলে জিনিষ যে কেবল জোড় লাগে তা নয়, ঙেও। এই ধরুন না, ক্লাবটা কর্ম্মক্ষেত্র হ'য়ে ওঠবার দ সঙ্গে আমারই মন প্রায় ভাঙবার জোগাড় হয়েছে। দ্রবাবুর অবিশ্যি তাতে আসে যায় না কিছু। তাঁর ানকার ভাবটা এই, ঐন্দ্রিলা যা বলে তা ঠিক না য় যায় না। বেচারা সুভদ্রবাবু। ওঁরও অদৃষ্টে এই ল তা কে জান্‌ত? সে যাক্‌, শেষ অবধি আমার দ এই রফা হয়েছে, খুব মারাত্মক কোনো কাজে এখনই ত দেওয়া হবে না। সম্প্রতি একটা অভিনয় ক'রে বের জন্যে কিছু টাকা তুলবার ব্যবস্থা করা হবে। ুর কাট্‌তে যেতে হবে না জেনেই আমি খুব খুসি য়ছি, এবং গানের দিক্‌টার ভার নিয়েছি। আপনি আমার এই বিপৎকালে আমায় একটু সাহায্য াবেন না? আপনি না এলে একলা আমি কিছুই রে উঠতে পার্‌ব না। আজ বিকেলেই যদি আসেন, ানে একসঙ্গে ব'সে গোড়ার দিক্‌কার কাজের একটা ড়া তৈরি ক'রে ফেলি। উৎপাত সন্দেহ নেই, কিন্তু া সবটা আমার সৃষ্টি নয় তা বলেইছি।'

যে নিদারুণ অন্ধকার লইয়া অজয়ের এই কয়টা দিন টিয়াছে, তাহার মধ্যে বীণার এই সহৃদয়তা ভরা ছোট দর চিঠিটি যে কতখানি আলো, কত বড় প্রলোভন ইয়া লইয়া আসিল তাহা সে ছাড়া আর কেহ বুঝিল । কিন্তু নিজের প্রতি নির্ম্মম হইয়া এই প্রলোভনকে সে করিল। বীণার কথা ভাবিল না, ঐন্দ্রিলাকে ভাবিল। ার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া যদি ঐন্দ্রিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ য়া যায়, সে জানে কি গভীর মর্ম্মপীড়া লইয়া তাহাকে রিতে হইবে। এখনকার মনের অবস্থায় ততখানি দনা সহিবার ক্ষমতা একেবারেই যে তাহার নাই।

...ন্ত মন আজ এতটুকু মাধুর্য্যের স্পর্শের জন্য এমন ুখ যে, রাহুকেও তাহার ছাড়িতে ইচ্ছা করিতেছিল না। তাহাকে টানিয়া লইয়া সিনেমায় গেল। বেহারা-টাকে আগেই বিদায় করিয়া দিয়াছিল, সিনেমা যখন শেষ হইল রাত তখন প্রায় নয়টা। রাহু বিপদ্ বাধাইয়া বলিল, "এত রাত্রে আমি একলা যেতে পারব না, আপনিও চলুন।" অগত্যা অজয়কে রাজি হইতে হইল। স্থির করিল, রাহুকে তাহাদের বাড়ীর বাগানের ফটক ধরাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিবে।

পথে আসিতে মনের গায়ের অনেকগুলি আঁটাআঁটির বাঁধন আলগা হইয়া খসিয়া পড়িল। দেবতাকে ডাকিয়া কহিল, জানি না কোন্ কাম্যফলের সন্ধানে অন্ধকারের মহাসমুদ্রে এবার আমার ডুব দিবার পালা, অনেক দিন ত দেখা হইবে না, দেখিতে চাহিবও না, আজ শেষ একবার তোমার আলোর আশীর্ব্বাদ দুইচোখ ভরিয়া আমায় বহিয়া লইয়া যাইতে দাও। এতদূর আসিয়া পড়িয়াছি, একবার তাহাকে দেখিয়া যাই। দুর্দ্দমনীয় লোভ গলার কাছে অস্থির রক্তগতির সঙ্গে দাপাদাপি সুরু করিয়া দিল। ভাবিতে লাগিল, হয়ত বীণার সঙ্গে সঙ্গে ঐন্দ্রিলাও আজ তাহার পথ চাহিয়া আছে। তাহাকে সঙ্গে করিয়া রাহুর ফিরিতে দেরী হইতেছে দেখিয়া চিন্তিত হইয়াছে কিন্তু আশা ছাড়ে নাই। হয়ত আর একটু পরেই দেখিতে পাইবে, নিত্যকার মত তেতলার বারান্দায় রেলিঙে দুই বাহুর ভর রাখিয়া চিত্রার্পিতের মত সে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু মাঠের ওপারে আবছায়া অন্ধকারে শুভ্র বাড়ীটি স্বপ্নপুরীর মত জাগিয়া উঠিল, তিনতলার বারান্দায় স্বপ্নরূপিণী মানসী-প্রতিমার দেখা মিলিল না। রাহুকে গাড়ীবারান্দার নীচে অবধি পৌঁছাইয়া দিয়া সে বিদায় লইল। কিছুক্ষণ একাকী দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিয়াছিল, হয়ত রাহুর কাছে খবর পাইয়া বীণা এখনই ছুটিয়া আসিবে, তারপর ঐন্দ্রিলাও আসিবে। কিন্তু উপরের সিঁড়িতে রাহুর জুতার শব্দ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া মিলাইয়া গেল, হেমবালার গলা শোনা গেল, একটা দরজা খুলিল, বন্ধ হইল, তারপর সব নিস্তব্ধ। প্রলোভনেও ভুলিল, লোভও মিটিল না, এই তাহার যোগ্য শাস্তি হইয়াছে।

ভারাক্রান্ত মনে মাঠের পথটুকু পার হইয়া অন্ধকারে বড় রাস্তার মোড় ফিরিতেছে এমন সময় নিঃশব্দ মন্থর

গতিতে একটি মোটর তাহার প্রায় গা ঘেঁসিয়া চলিয়া গেল। চমকিয়া ফিরিয়া যাহাকে দেখিতে পাইল, সে ঐন্দ্রিলা। তাহার মুখ ভাল করিয়া চোখে পড়িল না, কিন্তু তাহার রূপজ্যোতিঃর চকিত শিখাখানি সেই একটি মুহূর্ত্তেই অজয়ের দুইচোখে যেন জ্বালা ধরাইয়া দিয়া গেল। ইন্দ্রাণীর উপযুক্ত এমন মনোহরণ রূপে ঐন্দ্রিলাকেও ইতিপূর্ব্বে সে আর কখনও দেখে নাই। আজ অজয়ের তাহাদের বাড়ী আসিবার কথা ছিল বলিয়াই কি বাড়ীর বাহিরে ঐন্দ্রিলার এই সমারোহের অভিযান? মনে পড়িল, বীণা লিখিয়াছে, ঐন্দ্রিলা ক্লাব লইয়া হঠাৎ খুব মাতিয়াছে। যতদিন ক্লাবে যাওয়া অজয়ের পক্ষে সম্ভব ছিল, ঐন্দ্রিলা ভুলেও সেদিক্ একবার মাড়ায় নাই। যেন ঐন্দ্রিলাকে লইয়া বেদনা পাওয়াটাই তাহার আসল প্রয়োজন এমনইভাবে নিজেকে নানা ছলনায় সে বিড়ম্বিত করিতে লাগিল। বহু রাত অবধি বাড়ী ফিরিয়া গেল না, ময়দানের নির্জ্জন এককোণে দুই জানুর মাঝখানে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া রহিল। তারপর অকস্মাৎ একবার ঊর্দ্ধাকাশে চাহিয়া দেবতাকে ডাকিয়া বলিল, তুমি অমন করিয়া বারবার বঞ্চিত করিয়া আঘাত করিয়া কি আমাকে বলিতে চাও তাহা আমি জানি, আলো আমার জন্ম নহে, সুখ আমার জন্ম নহে, প্রেম আমার জন্ম নহে। স্নেহপ্রীতি-হীন নিরানন্দ কোন্ অন্ধকারের মধ্যে তুমি আমাকে লইতে চাও? আমি হার মানিব না, ভয় করিব না, আমি প্রস্তুত।

বাড়ী ফিরিয়া রাহুর মুখে অজয়ের খবর শুনিয়া বীণা একপাশে গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। আজ কাহাকেও কিছু বলিবার নাই, রাহুর জন্ম আটটা অবধি অপেক্ষা করার পরও সে যখন ফিরিল না, বীণা নিজেই নিঃসন্দেহে ধরিয়া লইয়াছিল, অজয় তাহাকে লইয়া ক্লাবে গিয়াছে। ঐন্দ্রিলাকেও তাড়া দিয়া সে-ই আজ ক্লাবে লইয়া গিয়াছিল। এখন বারবার মনেমনে নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাকে সে ধিক্কার দিতে লাগিল। কিন্তু নির্ব্বুদ্ধিতাই বা কিসের? অজয়ের সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া স্বয়ং ঈশ্বর বিধাতাও বোধহয় কিছু বলিতে পারেন না, বীণা ত কোন্ ছার। তাহার পাশে বসিয়া তাহার একটি হাতকে নিজের কোলের উপর টানিয়া লইয়া ঐন্দ্রিলা ডাকিল, "দিদি!"

"কি?"

"কি এত ভাবছ?"

"তুই যা বলেছিলি ও মোটেই সেরকম নয়।"

"কি-রকম নয়?"

"ও মনে যা অনুভব করে, ব্যবহারে তা প্রকাশ করে না।"

"কিসে বুঝ্‌লে?"

"ওর আজকের এই ব্যবহারে তাই মনে হচ্ছে। কি একটা কথাকে ও মনে চাপা দিয়ে রেখেছে, নিজে ব্যথা পাচ্ছে, অন্যদেরও ব্যথা দিচ্ছে, একটাও ঠিক ইচ্ছে ক'রে করছে না। এত ক'রে আসতে লিখলাম, রাত সাড়ে নটায় রাহুকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে সাত-তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাবার কি দরকার ছিল?"

ঐন্দ্রিলা একটু ভাবিয়া বলিল, "মানুষের জীবনে কত সময় কত রকমের ঝড়-ঝাপ্‌টা আসে, ইচ্ছে থাকলেও সমান ব্যবহার সব-সময় সে করতে পারে কি?"

বীণা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "এমন যদি হয়, যে, ও আর কাউকে ভালোবাসে?"

যে-হাতটিতে বীণার হাতটিকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, ঐন্দ্রিলার সেই হাতটি অল্প একটু কাঁপিয়া গেল মাত্র। নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া স্থিরকণ্ঠে বলিল, "আমার কিন্তু তা মনে হয় না।"

অজয়কে এই ক'দিনেই তাহারও যে একটু ভাল লাগিয়াছে ঐন্দ্রিলা এখন নিজের কাছে তাহা আর অস্বীকার করে না। আজ অজয়ের সঙ্গে দেখা হইবে মনে করিয়া সে একটু বিশেষ যত্ন করিয়া সাজিয়াছিল। সাজগোজ দেখিলে বেচারা সত্যই যদি একটু খুসি হয় ত হোক না। ওকে দেখিলে সত্যই মনে হয়, অনেকখানি খুসি হইবার প্রয়োজন তাহার জীবনে আছে। তারপর ক্লাব হইতে ফিরিবার সময় অকারণেই "আজ" তাহার মনে হইতেছিল, আসর যেন ভাল করিয়া জমিল না, কোথায় যেন কি অভাব রহিয়া গেল। সন্ধ্যা হইতেই এ... সে যে সাজিল, চিরাভ্যস্ত আলস্য কাটাইয়া বাড়ীর বাহির

হইল, এ-সমস্তকেই পণ্ডশ্রম বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল। কিন্তু অজয়ের সঙ্গে দেখা না হওয়াতে সে যে কিছুমাত্র দুঃখিত হইয়াছে, মনেমনে একবারও সেকথা মানিতে চাহিল না।

রাত্রির আহারাদির পর বীণা শুইতে গেলে তেতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া ঐন্দ্রিলা ভাবিতে লাগিল, তাহার স্বভাবে কোনও মানুষকে ভালবাসা কোনওদিনই কি সম্ভব হইবে? সে বুঝিতেই পারে না, একজন মানুষের এমন অবস্থা কিরূপে হওয়া সম্ভব যখন আর-একজন বিশেষ মানুষকে না হইলে তাহার বাঁচিয়া থাকার কোনও অর্থ থাকে না। নিজের কাজকর্ম পড়িয়া থাকিবে, চোখে ঘুম থাকিবে না, আহারে রুচি চলিয়া যাইবে, দুদিন আগে পরিচয় ছিল না এমন একজন মানুষের জন্য ক্রমাগত হা-হুতাশ চলিতে থাকিবে, ভাবিতেই তাহার হাসি পায়। ভাল লাগার কথা আলাদা। পৃথিবীতে আরও কয়েকজন মানুষকে তাহার ভাল লাগে, অজয়কেও লাগে। কিন্তু বীণা তাহাকে লইয়া এমন সুরু করিয়াছে যেন অজয়ের মত মানুষ পৃথিবীতে ইতিপূর্ব্বে আর জন্মায় নাই। এই জিনিষটিকে সে বুঝিতে পারে না। যেদিক্ দিয়াই দেখা যাক্, অজয় ত অত্যন্তই সাধারণ মানুষ। বীণার জন্য ঐন্দ্রিলাকে কাল যদি কেহ একটি স্বয়ম্বর সভা ডাকিতে বলে, অজয়কে ডাকিবার কথা তাহার মনেই হইবে না। ঐ ত চেহারা, তাছাড়া এখনও কলেজের পড়াও তাহার শেষ হয় নাই, শেষ হইলেই যে কি করিয়া তাহার দিন চলিবে তাহার ঠিক নাই। বীণা উহার মধ্যে কি দেখিল? কিন্তু সেইসঙ্গে ঐন্দ্রিলা ইহাও ভুলিতে পারিতেছিল না, যে, একমাত্র এই মানুষটিই অত্যন্ত দূরের জায়গা হইতে দুইদিনের পরিচয়েই অলক্ষিতে তাহারও মনের অত্যন্ত কাছে আজ আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার কথায় প্রথমদিন হইতে যে-সুর বাজিয়া উঠিতেছে, তাহা যেন ঐন্দ্রিলারই অন্তরের কোন্ অন্তরতম অনুভূতির স্পন্দন লইয়া বাজিতেছে। উহার কণ্ঠের আবেগ কেন মনকে এমন করিয়া স্পর্শ করে কে জানে। কে জানে অজয়ের কণ্ঠস্বরে থাকিয়া থাকিয়া এমন চিরপরিচয়ের ছোঁয়া কোথা হইতে আসিয়া লাগে। আর তাহার ক্ষুধিত অগ্নিগর্ভ দুইটি চোখ। মনে হয় সে-দৃষ্টি মানুষের অন্তরের অন্তস্তল অবধি ভেদ করিতে পারে। কোনও আবরণ টানিয়া নিজেকে সে-দৃষ্টি হইতে আড়াল করা যায় না। সে-দৃষ্টিকেই বা ঐন্দ্রিলা কেন এত ভয় করে কে জানে? সব জড়াইয়া জীবনের বিশেষ কোন্ একটা রূপ, একটি কোন্ বিশেষ জীবন্ততা এই মানুষটির মধ্যে যেন প্রতিফলিত হইতেছে, কোথাও-না-কোথাও কোনও-না-কোনওরূপে সে বর্ত্তমান না থাকিলে জীবনের কোন্ একটা দিক্ একেবারেই যেন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

নীচে বসিবার ঘরের ঘড়িতে টং করিয়া শব্দ হইল। সাড়ে এগারো হইতে পারে কিংবা সাড়ে বারো, একটা হওয়াও বিচিত্র নয়। ভাবিল, এবারে গিয়া শুইবে, যদিও ঘুম আসিবে কিনা তাহার ঠিক নাই। হঠাৎ মনে হইল, জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে। যেন এত রাত্রিতে জনশূন্য শুষ্ক মাঠ পার হইয়া অজয় আসিতেছে। দূরে দেবদারু গাছগুলির ছায়া যেখানে নিবিড় হইয়া পড়িয়াছে, সেইখানে সে যেন হঠাৎ নিজেকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল। মনে হইল, ঐন্দ্রিলাকে দেখিতে পাইয়াই সে লুকাইল। ঐন্দ্রিলার বুকের মধ্যে ঢিপ্‌ঢিপ করিয়া বাজিতে লাগিল। আরও একদিনের কথা তাহার মনে পড়িল, সেদিনেরই মত আজও ভয়ের উত্তেজনায় তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু আজ সে পলাইল না, দূরে তরুচ্ছায়ার অন্ধকারে সোৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিল।

কতক্ষণ এভাবে কাটিল জানে না, মনে হইল বহুক্ষণ। তারপর সহসা আবার ছায়ান্ধকার নড়িয়া উঠিল। যে লুকাইয়াছিল, উর্দ্ধশ্বাসে সে ফিরিয়া চলিয়াছে। এবারে ঐন্দ্রিলার মনে কোনও সন্দেহই আর রহিল না, যে, সে অজয়। ক্রমে মৃদু জ্যোৎস্নার ধূসরতায় প্রেতমূর্ত্তির মত সে মিলাইয়া গেল।

ঐন্দ্রিলা এত ভয় কেন পাইল বুঝিল না, কিন্তু দ্রুতপদে গিয়া ঘুমন্ত বীণাকে দুই হাতে জড়াইয়া তাহার বুকে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া রহিল। সে-রাত্রিতে তাহার চোখে আর ঘুম আসিল না। পৃথিবীটাকে সে যেমন ভাবিয়াছিল,

মোটেই যেন সেটা তেমন নয়। সবকিছু কেমন ব্যাধিগ্রস্ত, অস্বাভাবিক। প্রেতলোকেরই মত ভয়াবহ। ঐন্দ্রিলা ছুটিয়া পলাইতে চায়, পারে না। অজয়ের চোখের ক্ষুধিত দৃষ্টি তাহার দিগন্ত জুড়িয়া জাগিয়া থাকে।

এদিকে ভোরে যথারীতি সুভদ্রের সর্ব্বসিদ্ধি রসায়ন। বাড়ীর সব-কয়টি মানুষকে ঘুম হইতে জাগাইয়া প্রথমেই এই তিক্ত পাঁচন পান না করাইয়া সে অন্য কাজে হাত দিত না। একমাত্র নন্দ যে-ক'টা দিন এবাড়ীতে ছিল, অত্যন্ত প্রসন্ন স্মিতহাস্যে মুখ ভরিয়া এই পাঁচন গিলিয়াছে। অজয় খায় নিজের অস্বাস্থ্যের প্রতিকার কামনায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যোদ্ধার মনোভাব লইয়া। বিমান রোজই এই সূত্রে একবার করিয়া সুভদ্রের সঙ্গে হাতাহাতির উপক্রম করে এবং শেষ পর্য্যন্ত যেন নিতান্ত জোরে হারিয়া গিয়াই এক নিঃশ্বাসে সবটুকু তিক্ততা গলাধঃ করিয়া তিক্ততর ভাষায় সুভদ্রকে গালাগালি করিতে থাকে।

কিন্তু সুভদ্র রসায়ন প্রস্তুত করিতে যেমন সিদ্ধহস্ত ছিল, চা তৈয়ারীতেও তাহার হাত ছিল কম নয়। তাহার হাতে পরিবেষণ করা সুরভি চায়ের পেয়ালাগুলি সম্মুখে করিয়া বসিয়া জীবনের ছোটখাট তিক্ততার আস্বাদ ভুলিয়া যাইতে কাহারও বেশী সময় লাগিত না। কিন্তু এইখানটাতেই প্রায়শঃ বাধা ঘটিয়া যাইত। ভোর না হইতেই সমস্ত সহরের ছেলেরা সুভদ্রের সন্ধানে আসিয়া নীচের ঘরে ভিড় করিত, নিকটতর পল্লীরও কেহ কেহ আসিত। আজ রসায়ন প্রস্তুত করা অবধিও ত্বর সহিল না, বৈকুণ্ঠ খবর দিল, নীচে জন-দুইতিন রোগীর শুভাগমন হইয়াছে। ব্যায়ামের আখড়া, দাতব্য-চিকিৎসালয়, খেলার ক্লাব, প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা বিষয়ে পরামর্শ করিতে যাহারা আসিত, তাহাদের বসাইয়া রাখা চলিত। চিকিৎসার্থী হইয়া কেহ আসিয়াছে জানিলে সুভদ্রকে আর ধরিয়া রাখা যাইত না।

সে নীচে চলিয়া গেলে বিমান কহিল, "সুভদ্রের অভিনয়ে তুমি নামছ?"

অজয় কহিল, "না, তুমি?"

বিমান কহিল, "আমাকে কেউ ডাকেওনি, তাছাড়া নামতে আমি চাইও না। নিজের পৌরুষ সম্বন্ধে এমনিতেই আমি যথেষ্ট সচেতন, সেজন্যে সুভদ্রের শরণাপন্ন হবার প্রয়োজন যেদিন হবে, সেদিন গলায় দড়ি দিয়ে মরব। তোমার অবস্থা কি প্রকার?"

অজয় কহিল, "বিশেষ ভালো কিছু নয়। বাবা জানিয়েছেন, টাকাকড়ি আর পাঠাবেন না। সংসার খুঁজে ত্রিশ টাকার একটা কাজ পাইনি। নিজের পৌরুষ নিয়ে গর্ব্বিত হবার কিম্বা অভিনয়ে নামবার সময় এটা নয়।"

বিমান কহিল, "ত্রিশটাকার কাজেরই যদি দরকার ছিল ত আর ক'টা মাস কলেজে গেলেই হত?"

অজয় কহিল, "না বিমান না, ত্রিশটা টাকার যে দরকার সেটা সাময়িক, তার জন্যে মিথ্যার সঙ্গে রফা ক'রে আমার চিরকালের ভবিষ্যৎকে আমায় নষ্ট করতে বোলো না। নাহয় অনাহারেই থাকব, কিম্বা ভিক্ষা করব, কিন্তু তুমি জানো না, আর সব ভুলে গিয়ে নিজেকে নিয়ে কতবেশী এখন আমার থাকা দরকার। মানুষ হতে হলে একেবারে ভিত থেকে নিজেকে আবার আমায় নতুন ক'রে গ'ড়ে তুলতে হবে, বাজে কাজে মনটাকে বিক্ষিপ্ত হতে দিলে এখন আমার চলবে না। এমন কি দেশের যে ইতিহাসকে বাইরের জিনিষ ব'লে এতদিন মনে করেছি, বাইরে থেকে যার চেহারাটা দেখতে চেষ্টা করেছি, পারিনি, এখন মনে হচ্ছে, আমার মধ্যে, দেশের প্রতি মানুষের মধ্যে তার একটা পরিপূর্ণ প্রকাশ যেন আছে। নিজেকে ভালো ক'রে জানতে পারলে সেই ইতিহাসের গোড়ার কথাটাও আমার জানা হবে। আমার মধ্যে আমার মনুষ্যত্বের যেগুলি অসম্পূর্ণতা, হয়ত তারই সমষ্টি আমার দেশের সমস্যা। সেগুলিকে জেনে প্রতিকারের ব্যবস্থা যেদিন করতে পারব দেশের বহুযুগব্যাপী দুর্ভাগ্যের অনেক রহস্য সেদিন আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে।"

বিমান কহিল, "আপাততঃ তোমার সমস্যাগুলি মিটলেই আমি খুসি হই। কিন্তু নিজেকে আদর্শ ক'রে নিয়ে এ সমস্যা তুমি মেটাতে পারবে না, কেনঃ

সমস্যাগুলি একলা তোমার মোটে নয়ই। সেইটে বুঝতে পারছ না ব'লেই গোলে পড়েছ।"

"সমস্যাটা তাহলে কি, তোমার মুখ থেকেই শুনি।"

"যা এক হিসেবে আমাদের প্রত্যেকেরই সমস্যা। যে কাজের যোগ্যতা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছ, সবদিক্ বজায় রেখে তা করতে পারছ না। এদেশে যাদের পুলিশ হওয়া উচিত তারা হয় ইস্কুল-মাষ্টার, যাদের দাদনের ব্যবসা করা উচিত তারা করে পুরুতগিরি, যাদের হাতিয়ার নিয়ে লড়াই করা উচিত তারা দলেদলে হয় সন্ন্যাসী। সম্ভবতঃ মনুর সময় থেকে এইরকম চ'লে আসছে, চট ক'রে অন্যরকম কিছু যে হবে তা ত মনে হয় না।"

"আমি যে কি কাজের যোগ্যতা নিয়ে এসেছি তা জানব কি ক'রে?"

"হয়ত কোনো কাজের যোগ্যতা নিয়েই আসনি, কিন্তু যেহেতু এটা বিধাতার পৃথিবী, দুই পায়ের উপর ভর রেখে দাঁড়াবার মতো একটু জায়গা তোমার জন্যেও কোথাও এখানে থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তা নেই। হিমালয়ে গিয়ে বহু সহস্র বৎসর তপস্যা করলেও এ দেশের মাটিতে সেইটুকু জায়গা তুমি নিজের জন্যে ক'রে নিতে পারবে না। এদেশের সমাজ-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রব্যবস্থায় সেখানে অনধিকারীর ভিড়, তোমার দুস্তর তপস্যালব্ধ অত্যন্ত সত্য অধিকারকেও কেউ এখানে মান্য করবে না। নিজেকে নিয়ে তুমি করবে কি, সে-চেষ্টা তোমার আগে কেউ আর এদেশে করেনি ভেবেছ? তার চেয়ে কোথাও কোনো আপিসের বড়-সাহেবের সুনজরে পড়তে পারো কি-না চেষ্টা ক'রে দেখো, তাতে সবদিক্ গিয়েও জীবনের একটা খুব মোটা দিক্ বজায় থাকবার সুবিধা হবে। হৃষীকেশবাবুর ত শুনেছি পাটের ব্যবসায়ের সূত্রে অনেক বড় বড় সাহেব-সুবোর সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে, একবার সেদিক্ দিয়ে চেষ্টা ক'রে দেখ না?"

অজয়ের সমস্ত শরীর দারুণ ঘৃণায় রিরি করিয়া উঠিল, কহিল, "থাক্ বিমান, আমার ভাবনা তোমাকে আর ভাবতে হবে না, চুপ কর তুমি।"

ঠোঁট টিপিয়া একটু হাসিয়া শূন্য চায়ের পেয়ালাটা ঠেলিয়া টেবিলের মাঝখানে সরাইয়া দিয়া বিমান উঠিয়া পড়িল। কহিল, "সেই ভালো, যে সমস্যাটা মিটবে না তাকে ভুলে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাতে আর যাই হোক, মনটা অন্ততঃ ভালো থাকে। তুমি ত ইতিহাস পড়েছ, আমাদের জাতের মত এমন আর একটা জাত কোথাও দেখেছ? আমরা যে কেবল অধঃপতিত পদানত দাসজাতি তা নয়, তদুপরি আমরা আবার বুদ্ধিমান্! নিজেদের এমন গুছিয়ে ফাঁকি দিতে পারি যে নিজেদের নিরুপায় দাসত্বের চেহারাটা সুদ্ধ আমাদের চোখে পড়ে না। সওদাগরী আপিসের বড়বাবু দেখেছ? পদসেবা ক'রে বাইরে বেরিয়ে এসে বড় সাহেবের মতো গলা ক'রে কথা কয়। তার বড়বাবুত্ব ঘোচাতে পারে এ-দেশের তেত্রিশ কোটী দেবতার মধ্যে সে-সাধ্য কারুর নেই।"

অজয় কোনও কথা কহিল না। খোলা জানালায় বাহিরে জ্যোতিঃপ্লাবিত আকাশের দিকে চাহিয়া মনে মনে দেবতাকে ডাকিয়া কহিল, সীমাহীন সৃষ্টি ভরিয়া অফুরন্ত তোমার ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার, তার কিছু দ্বার খোলা হইয়াছে, কত দ্বারই খোলা হয় নাই। অথচ সামান্য একটু অন্নের অংশ লইয়া, মাটির অধিকারের অংশ লইয়া মানুষে মানুষে কাড়াকাড়ি হানাহানি। এই ক্ষুদ্রতার ঘৃণিত আবেষ্টন হইতে তুমি আমাকে তুলিয়া ধরো প্রভু।

সুভদ্রের রোগী দেখা শেষ হইয়াছে। পাড়ার সে দরজীর কাছে অজয় কিছুদিন আগে জামা করাইয়াছিল, তাহার পাওনা টাকা-দশটা নিজের নিঃশেষিত-প্রায় পুঁজি হইতে লুকাইয়া সে শোধ করিয়া দিতেছে। (ক্রমশঃ)

ব্যাঙ্কিঙের কয়েকটি মূলতত্ত্ব

শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন, বি-এ (হারভার্ড)

বর্ত্তমান যুগে শিল্পবাণিজ্যের সহিত ব্যাঙ্কের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে ইহাদের গঠন এবং কার্য্যপ্রণালীর উপর প্রত্যেক দেশের আর্থিক উন্নতি অবনতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। যতদিন ব্যবসায় ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল ততদিন ব্যাঙ্কের বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যখন বাণিজ্য গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দেশ হইতে মহাদেশে পরিব্যাপ্ত হইল তখন ব্যক্তিগত মূলধন দ্বারা ব্যবসায় চালান অসম্ভব হইল। ইহাই হইল ব্যাঙ্কের উৎপত্তির মুখ্য কারণ।

প্রতিদেশেই এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা কোন প্রকার অনিশ্চিতের কিংবা দায়িত্বের বোঝা বহন করিতে প্রস্তুত নহেন। মূলধন সুরক্ষিত থাকিলে এবং কিছু সুদ পাইলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট; আবার আর একশ্রেণীর লোক আছেন যাঁহাদের মূলধন কম, অথচ তাঁহারা দায়িত্ব গ্রহণ করিতে এবং ঝুঁকি লইতে প্রস্তুত। ব্যাঙ্কের মুখ্য কাজ এই উভয় শ্রেণীর লোকের একত্র সমাবেশ করা, যাহাতে প্রথম শ্রেণীর লোক টাকা আমানত রাখিতে পারে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক উপযুক্ত জামিন দিয়া ব্যাঙ্ক হইতে ধার গ্রহণ করিতে পারে। যেহেতু আমানতকারীদের বিশেষ কোন ঝুঁকি নাই, সেই হেতু ব্যাঙ্ক তাহাদিগকে কম সুদ দেয়, কিন্তু ব্যাঙ্ক যে টাকা ধার দেয় উহার ঝুঁকির গুরুত্বের উপর সুদের হার নির্ভর করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কোম্পানীর কাগজের উপর ধারের সুদ কম, শেয়ারের উপর তদপেক্ষা বেশী এবং জমিজমার উপর তাহা হইতেও অধিক হয়। ব্যাঙ্ককে সর্ব্বদাই ইহা স্মরণ রাখিতে হয় যে, আমানতি টাকা নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে, অতএব ইহা এমন ভাবে লগ্নি করিতে হইবে যে, তাহা প্রয়োজন মত পাওয়া যায়। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে কোনও সময়ে আমানতকারিগণ একসঙ্গে ব্যাঙ্ক হইতে সব টাকা উঠায় না, যদি সেরূপ করিত তাহা হইলে কোন ব্যাঙ্কই টিকিতে পারিত না। আমানতের কত অংশ সর্ব্বদাই নগদ মজুত (liquid) রাখা উচিত তাহার কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই; দেশকালের আনুষঙ্গিক অবস্থার উপর উহা নির্ভর করে। তবে ইহা নিশ্চিত, যখন ব্যাঙ্ক চল্‌তি এবং স্থায়ী আমানত গ্রহণ করে তখন চল্‌তি আমানত যে-কোন সময় উঠাইয়া লওয়া যাইতে পারে ইহা ভাবিয়া এইরূপ ভাবে তাহা লগ্নি করা উচিত, যেন চাহিবামাত্রই উহা দেওয়া যায়। এ-দেশে প্রতিষ্ঠাবান প্রত্যেক ব্যাঙ্কই চল্‌তি আমানতের বেশীর ভাগ টাকাদ্বারা কোম্পানীর কাগজ খরিদ করে এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে সেগুলি বাঁধা রাখে, প্রয়োজনমত ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক তাহাদিগকে ধার দেয়, সেইরূপ ব্যাঙ্কের মূলধন এবং রিজার্ভ ফণ্ড দ্বারাও কোম্পানীর কাগজ খরিদ করা প্রয়োজন। প্রত্যেক ব্যাঙ্কের মূলধনের তুলনায় আমানত অনেক অধিক; ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠার উপর আমানত নির্ভর করে, কাজেই যে ব্যাঙ্কের সুনাম এবং প্রতিষ্ঠা যত বেশী তাহার আমানতও সেই পরিমাণে বেশী হইয়া থাকে। আমানত বেশী হইলে ব্যাঙ্ক অল্প সুদে ভাল জামিনে টাকা ধার দিতে পারে। অবশ্য ইহাতে দাদন-প্রতি সুদ কম হইলেও যথেষ্ট লাভ হইয়া থাকে। প্রত্যেক ব্যবসায়ই লাভের জন্য করা হয়, কিন্তু ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ সুনাম (ক্রেডিট) বজায় রাখা, যদি তাহা না থাকে তাহা হইলে ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কত্বই থাকে না। অন্যান্য দেশে ইহাকে স্বতঃসিদ্ধের মতই মানিয়া লওয়া হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বঙ্গদেশে লোন্ আপিসগুলির এরূপ ধারণা যে আমানতি টাকা যে-কোন সময় দিলেই হয়, চাহিলে না দিলেও বিশেষ অপযশ নাই। যতদিন দেশের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভাল ছিল ততদিন প্রায় কেহ আমানতি টাকা চাহিত না, আর চাহিলেও নূতন আমানত দ্বারা

তাহা পরিশোধ করা যাইত। কিন্তু উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর যাবৎ কাঁচা মালের দর অসম্ভব কমিয়া যাওয়াতে নূতন আমানত প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তদুপরি আর্থিক অসচ্ছলতার দরুণ অনেক পুরাতন আমানতও উঠাইয়া লওয়া হইতেছে। আমরা সকলেই জানি যে, জমিজমা বন্ধকের উপর এবং ব্যক্তিগত ধার সহজে আদায় হয় না, অথচ যে আমানত গ্রহণ করা হয় তাহা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য লওয়া হয়, কাজেই কোন কারণে আমানতি টাকা উঠাইয়া লইতে চাহিলে অনেকের পক্ষে তাহা দেওয়া একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে।

নগদ মজুত (liquid) এবং বন্ধকী (frozen) সম্পত্তির প্রভেদ বুঝিলে ব্যাঙ্ক-পরিচালনায় বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। এই ত গেল ব্যাঙ্কের কয়েকটি মূলসূত্র; কিন্তু ব্যাঙ্কের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত তাহাও বিবেচনা করা প্রয়োজন। অংশীদারদের উচ্চ লভ্যাংশ কিংবা আমানতকারীদিগকে সুদ দেওয়াই ব্যাঙ্কের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে পারে না। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, যাহারা ব্যাঙ্কের খাতক তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে কি-না; দ্বিতীয়তঃ, স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার হইয়াছে কি-না। যদি দেখিতে পাই যে খাতকের অবস্থা বৎসরের পর বৎসর হীন হইতে হীনতর হইতেছে, যদি দেখিতে পাই যে স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্যের কোন উন্নতি হয় নাই, তাহা হইলে বলিব ব্যাঙ্কের যে উচ্চ আদর্শ—জনসেবা—তাহা যথাযথ পালন করা হয় নাই। ব্যাঙ্ক এবং কুসীদজীবীর এই প্রভেদ যে শেষোক্তের কাজ খাতকদিগকে শোষণ করা, তাহাদের ভিটামাটি উচ্ছন্ন হইলেও তাহার কোন আক্ষেপ নাই, কিন্তু ব্যাঙ্কের এই প্রকার উদ্দেশ্য হইতেই পারে না, ব্যাঙ্কের লগ্নি টাকার সুদের হার যদি খুব উচ্চ হয় তাহা হইলে ব্যবসায়িগণ সেই টাকা খাটাইয়া লাভ করিতে পারে না, আর যদি কেবল বন্ধকী এবং ব্যক্তিগত ধার দেওয়াই ব্যাঙ্কের প্রথা হয় তাহা হইলে,নামে ব্যাঙ্ক হইলেও কার্য্যতঃ কুসীদজীবীর সহিত ব্যাঙ্কের বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না। প্রভেদ থাকিলেও তাহা এই যে শেষোক্তগণ নিজের মূলধনে ব্যবসায় করে, আর প্রথমোক্তগণ আমানতকারীদের অর্থদ্বারা খাতকের সর্ব্বনাশ করে। কেহ এরূপও বলেন ধার লইবার জন্য ব্যাঙ্ক কাহারও উপর জোর-জবরদস্তি করে না, যদি সুদের হার বেশীই হয় তবে ধার না লইলেই হয়। এরূপ যুক্তি সুদখোরের, ব্যাঙ্কের পক্ষে ইহা শোভা পায় না। লোকের অভাবের সুযোগ লইয়া, তাহাদের নিকট হইতে যতদূর সম্ভব কষিয়া সুদ আদায় করা—এই পন্থা যদি ব্যাঙ্কও অবলম্বন করে তবে আর ইহার প্রয়োজনীয়তা কি? এইরূপ হীন আদর্শের বশীভূত হইয়া ব্যাঙ্ক নামধেয় প্রতিষ্ঠানগুলি বঙ্গদেশের যে কি ক্ষতি করিতেছে তাহা যাঁহারা ইহাদের কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। ব্যবসায় নাই, বাণিজ্য নাই, যাহা আছে তাহাও সময়োচিত সাহায্য দ্বারা উন্নত করিবার প্রচেষ্টা নাই, অথচ কেবল বঙ্গদেশেই আট শত ব্যাঙ্কের ছড়াছড়ি। যেখানে ব্যবসায়-বাণিজ্যের পরিমাণ অনুসারে একটি ব্যাঙ্ক চলা দুষ্কর সেখানে কুড়ি-পঁচিশটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হইয়াছে। ব্যাঙ্কের মূলসূত্র সম্বন্ধে যথোচিত জ্ঞান, ইহার কার্য্যপ্রণালীর অভিজ্ঞতা, হিসাব-পদ্ধতির পরিচয়, উচ্চতর অর্থনীতি (higher finance) যাহার সহিত ব্যাঙ্কের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, এতদ্দেশীয় এবং বিদেশীয় শিল্পবাণিজ্যের ভিত্তি ও প্রতিষ্ঠা এবং সর্ব্বশেষে সরকারী মুদ্রানীতি ও ঋণনীতি, যাহা প্রত্যক্ষভাবে তাহাদের হিতাহিতের সহিত যুক্ত, এইগুলি সম্যকরূপে উপলব্ধি না করিতে পারিলে বর্ত্তমান যুগে ব্যাঙ্ক পরিচালনা করা কঠিন। ব্যবসায়-বাণিজ্য এখন আন্তর্জ্জাতিক রূপ গ্রহণ করিয়াছে। অন্যান্য দেশের সহিত আমাদের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে তদ্দেশে অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক কোন প্রকার পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইলে এদেশেও উহার প্রভাব বিস্তৃত হয়।

দেশ ও কাল ভেদে লোকের মতামত পরিবর্ত্তিত হয়। পূর্ব্বে যেমন ছিল এখনও তেমনি থাকিবে এরূপ আশা করা যায় না, অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। জগৎ স্থিতিশীল নহে, গতিশীল। মনে রাখিতে হইবে, আমরা প্রতিষ্ঠানের জন্য নহি, প্রতিষ্ঠানগুলিই আমাদের সুখসুবিধার জন্য

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অতএব সেগুলির জীর্ণোদ্ধার করিয়া আমাদের কালের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। কিছু দিন হইল ব্যাঙ্কিং ইন্‌কোয়ারী কমিটির রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। আমরা ভবিষ্যতে কোন্ পথে অগ্রসর হইব তাঁহারা তাহার দিক্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বলিতে গেলে সরকারী রিপোর্টের মধ্যে ইহাই প্রথম রিপোর্ট যাহা কতক পরিমাণে জাতীয় ভাবে প্রণোদিত হইয়া, জাতীয় উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া একটি সর্ব্বাঙ্গীন ব্যাঙ্কিং প্রণালী গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। তাঁহারা যে সম্পূর্ণ সফল হইয়াছেন এ-কথা বলা যায় না, তবে সরকারী কমিটির পক্ষে যতদূর করা সম্ভব ততদূর করিয়াছেন ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক দেশেরই ব্যাঙ্কিং-এর ভিত্তি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। কেবল ভারতবর্ষেই কোন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নাই, একমাত্র ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক কিয়ৎ পরিমাণে সেই কাজ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মুখ্য কাজ ব্যাঙ্ক-রেট নির্ণয় করা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য প্রয়োজনমতে চল্‌তি মুদ্রা কম-বেশী করা। মোটের উপর দেশের আর্থিক অবস্থা উন্নত করিবার জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন তাহা করা। তদুপরি ইহার আর একটি কাজ স্বদেশীয় অন্য ব্যাঙ্কগুলিকে সময়বিশেষে সাহায্য করা। সরকারী তহবিলের সমস্ত টাকা এই ব্যাঙ্কে আমানত থাকে এবং কোনও কারণে টাকার চাহিদা বাড়িলে, সরকার ইহাকে সাহায্য করে। যদি এরূপ না হইত তাহা হইলে প্রত্যেক ব্যাঙ্ককেই হয় আমানতের মোটা ভাগ নগদ টাকায়, নতুবা সহজেই নগদ টাকা পাওয়া যাইতে পারে এমন ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে হইত। এরূপ করিতে হইলে ব্যবসা-বাণিজ্যে ইহারা উপযুক্ত পরিমাণে ধার দিতে পারিত না।

কিরূপ জামিনের উপর ধার দেওয়া হইবে তৎসম্বন্ধেও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কতকগুলি ধরা-বাঁধা নিয়ম আছে। অন্যান্য দেশে বেশীর ভাগ ব্যাঙ্কই প্রথম শ্রেণীর ট্রেড বিল, অর্থাৎ মালপত্র বেচা-কেনায় ভবিষ্যতে যে মূল্য দিতে হইবে এমন সব দস্তাবেজের জামিনে ধার দিয়া থাকে। যে মাল বিক্রয় করে সে ক্রেতার উপর ত্রিশ দিন, ষাট দিন কিংবা নব্বই দিন অন্তর টাকা দিবে এইরূপ কড়ারে হুণ্ডি লেখে (draw), হুণ্ডির সহিত মালের তালিকা, মূল্য, রেল, ষ্টীমার কিংবা গুদামের রসিদ, এবং তৎসঙ্গে বীমা পলিসি থাকিলে ইহাকে দস্তাবেজী বিল বলা হয়। হুণ্ডি-লেখক অর্থাৎ এইস্থলে মাল-বিক্রেতা ক্রেতাকে হুণ্ডি দেখাইলেই (present), সে তাহা স্বীকার (accept) করিবে, অর্থাৎ টাকা পরিশোধের তারিখসহ হুণ্ডিতে নিজের নাম স্বাক্ষর করিবে। যদি বাস্তবিক মালের বেচাকেনায় হুণ্ডি লেখা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ক্রেতা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাল বিক্রয় করিয়া দেনা শোধ করিতে পারিবে। যদি মাল-বিক্রেতা এবং ক্রেতা উভয়েই অবস্থাপন্ন হয় তাহা হইলে যে-কোন ব্যাঙ্ক, বাট্টা (discount) কাটিয়া বিক্রেতাকে টাকা দেয়। ইংলণ্ডে অনেক বড় ব্যাঙ্কই হুণ্ডি স্বীকার করে; ইহার কারণ এই যে, স্বীকারকারী উঁচুদরের ব্যবসায়ী না হইলে হুণ্ডির বাট্টার দর বেশী পড়ে। যদিও ব্যাঙ্ক হুণ্ডি স্বীকারের জন্য কমিশন গ্রহণ করে তথাপি ইহা এত অল্প যে, ব্যবসায়ীর পক্ষে ইহা লাভজনক। যদি ব্যাঙ্কের স্বীকার (acceptance) থাকে তাহা হইলে ইহা প্রথম শ্রেণীর দস্তাবেজী বিল বলিয়া গণ্য হয় এবং যে-কোন ব্যাঙ্ক ইহা খরিদ করিতে দ্বিধা করে না। আমাদের দেশে এক ব্যাঙ্ক অন্য ব্যাঙ্কে বিল খরিদ বিক্রয় প্রায় করে না। কোম্পানীর কাগজ ভিন্ন অন্য কোন জামিনের উপর ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক হইতে অন্যান্য ব্যাঙ্ক অনেক সময় ধারও পায় না। ইহাতে ব্যবসা-বাণিজ্যের যে কতদূর ক্ষতি হয় তাহা বলাই বাহুল্য। বিলের লেনদেন প্রচলনের জন্য এখন চেষ্টা চলিতেছে এবং এদেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপনেরও প্রস্তাবনা চলিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল আইন-পরিষদে পেশ করা হইয়াছিল, কিন্তু সরকারী এবং বেসরকারী সভ্যদের মধ্যে মতবিরোধ হওয়ায় স্যর বেসিল্ ব্লাকেট উহা প্রত্যাহার করেন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মতভেদ নাই। আমরা চাই ইহার গঠন এইরূপ হইবে যাহাতে দেশের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে বজায় থাকে। গভর্ণমেণ্ট তখন চাহিয়াছিলেন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের উপর বিদেশীয়দের যেরূপ প্রতিপত্তি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপরও তাহাদের সেইরূপ প্রভাব

অক্ষুণ্ণ থাকে। ভারতের জনমত ইহা অনুমোদন না করায়, তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা স্থগিত রহিল। সভাপতির আপত্তির জন্য ব্যাঙ্কিং ইন্‌কোয়ারী কমিটি এই বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে পারেন নাই, কাজেই ভবিষ্যতে ইহার গঠনপ্রণালী কি হইবে তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। তৎসত্ত্বেও আমাদের অভিমত এই যে, এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানে যদি ভারতীয়দের পূর্ণ অধিকার না থাকে তাহা হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হওয়া-না-হওয়ায় আমাদের কোন লাভ-লোকসান নাই।

ইহা ছাড়া আরও অনেক প্রশ্ন আছে যাহার সমাধানের উপর ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভর করে। প্রথমতঃ, কোম্পানী আইন অনুসারে যে-ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় তাহাই বজায় থাকিবে, না বিশেষ আইন অনুসারে ইহারা স্থাপিত হইবে? ব্রিটেনে যে-পদ্ধতি প্রচলিত আছে ভারতবর্ষে সেই পদ্ধতি অনুসারে ব্যাঙ্কের কাজ হয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ব্রিটেনের শিক্ষাদীক্ষা এবং অভিজ্ঞতা এদেশের নাই, শতবর্ষব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে তাহারা যে ধারা অনুষ্ঠিত করিয়াছে তাহা হুবহু এদেশে চালাইতে গেলে চলিবে না। আমাদের এবং তাহাদের অর্থ নৈতিক অবস্থা এক নয়। ব্রিটেন শিল্পপ্রধান দেশ, আর আমরা কাঁচা মাল উৎপন্ন করি। সহজ বুদ্ধিতেই বুঝা যায় তাহাদের পক্ষে যে-প্রণালীতে ব্যাঙ্ক পরিচালনা করা প্রয়োজন সেই প্রণালীতে এদেশে ব্যাঙ্ক চলিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, অর্থনীতি বিষয়ে সে-দেশে সাধারণের জ্ঞান অনেক উন্নত, আর আমাদের দেশে খুব কম লোকই এই সব ব্যাপার বোঝেন। ফলে তাহাদের অনুকরণ করিতে গিয়া অনেক সময়ে সুফল অপেক্ষা কুফলই অধিক হয়।

ব্রিটেনে ব্যাঙ্কের জন্য বিশেষ কোন আইন নাই, কিন্তু অন্যান্য দেশে, যেমন আমেরিকা এবং জাপানে ব্যাঙ্ক-স্থাপনা এবং তাহাদের কার্য্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য যথেষ্ট বাধা-নিষেধ আছে। আমেরিকার ফেডারেল আইন অনুসারে কোন ব্যাঙ্ক ২৫,০০০ ডলারের কম মূলধনে গঠিত হইতে পারে না। তাহা ছাড়া ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কগুলিকে আমানতের শতকরা ৩৫৲ টাকা ভাগ স্বর্ণে রাখিতে হয়। জাপানে নূতন ব্যাঙ্ক আইন অনুসারে তোকিও এবং ওসাকার ব্যাঙ্কগুলির মূলধন দুই মিলিয়ন ইয়েন এবং অন্যান্য বড় শহরে এক মিলিয়ন ইয়েন রাখা হইয়াছে। আমেরিকার কন্‌ট্রোলার অফ্‌ কারেন্সি যে-কোন সময়ে ব্যাঙ্কের হিসাবনিকাশ চাহিতে পারেন এবং যদি তাঁহার বিবেচনায় ব্যাঙ্কের অবস্থা কাহিল মনে হয় তবে তিনি ইহার কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। সাধারণ কোম্পানীর সহিত ব্যাঙ্কের অনেক প্রভেদ আছে। প্রথমতঃ, ইহারা বিশ্বাসের উপর কাজ করে; বিশ্বাস উৎপন্ন করিয়া সহস্র সহস্র লোকের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করে। যদি ইহাদের উপর কোন প্রকার অঙ্কুশ না থাকে তাহা হইলে স্বেচ্ছাচার নীতি অবলম্বিত হইয়া অনেকের অনিষ্ট ঘটিতে পারে এবং ইহার ফলে ব্যাঙ্কের উপর সাধারণের আস্থা নষ্ট হইয়া অর্থনৈতিক সমস্যা উপস্থিত হইতে পারে। এই কারণে অনেক দেশে বিশেষ আইন দ্বারা ব্যাঙ্কের উপর অঙ্কুশ রাখা হইয়াছে। এদেশেও অনেকে মনে করেন এইরূপ আইনের একান্ত প্রয়োজন আছে। ন্যূনতম মূলধনের কোন পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট না থাকাতে দুই হাজার কিংবা তদপেক্ষা কম মূলধন লইয়াও ব্যাঙ্ক স্থাপনা করা হয়। একই স্থানে একাধিক ব্যাঙ্ক স্থাপনা করিয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত অনর্থক প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি অসুবিধা আছে। প্রতিষ্ঠান ছোট হইলে তাহাদের আয়ও কম হয়, সুতরাং ইহারা কার্য্যকুশল এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে উপযুক্ত বেতন দিয়া নিযুক্ত করিতে পারে না। পরিচালন-কুশলতার উপর সকল ব্যবসায়ের উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে। স্বল্প বেতনে অভিজ্ঞ ব্যক্তি পাওয়া যায় না, কাজেই অনভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায় প্রায়ই সফল হইতে পারে না। ব্যবসায়ী নিজের মূলধনে কাজ করে, অথবা উপযুক্ত জামিন দিয়া ধার গ্রহণ করে, তাহার অক্ষমতার ফল সে নিজে ভোগ করে। কিন্তু ব্যাঙ্কের পরিচালনায় যদি গলদ থাকে তাহার ফলভোগ করে আমানত-কারীরা। কেন-না, অধিকাংশ স্থলে ইহাদের মূলধন এত সামান্য যে, অংশীদারদিগের লোকসান আমানত-কারীদের

লোকসানের তুলনায় প্রায় কিছুই নহে আর এক কথা, এই সব ব্যাঙ্কের কার্য্যস্থল সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকায় দাদন ইত্যাদি সেই স্থলেই দেওয়া হয়। ধার দেওয়ার উপযুক্ত জমিন খুব কম থাকাতে অনেক সময় এমন ধার দেওয়া হয় যাহা আদায় করিতে প্রাণান্ত উপস্থিত হয়। ব্যাঙ্কের একটি মূলসূত্র, লগ্নির টাকা কোন একটি ব্যবসায়-বিশেষে আবদ্ধ না রাখা। কেন-না, যদি সে-ব্যবসায়ে লোক্‌সান হয় তাহা হইলে ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়। এইজন্যই অল্প অল্প করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ে টাকা খাটাইতে হয়। ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কের সে সুযোগ নাই। তাহাদের আমানত এত সামান্য যে, তদ্দ্বারা বিভিন্ন স্থানে লগ্নি করিবার সুবিধাও হয় না, তাহা ছাড়া দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের টাকার বাজারের খবর তাহারা রাখে না। কেন-না, পুঁথিগত বিদ্যা দ্বারা ইহা আয়ত্ত করা যায় না, সদাসর্ব্বদা দেশ-বিদেশের খবর এবং আমাদের কার্য্যের উপর ইহাদের কি প্রভাব তাহা চিন্তা করিতে হয়। হাতে-কলমে কাজ করিতে করিতে এ-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়।

সরকারী আর্থিক নীতি এবং ঋণনীতি ব্যবসা-বাণিজ্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। অনেক সময় আমরা দেখিতে পাই যে এমন নীতি অবলম্বন করা হয় যাহা আমাদের পক্ষে ইষ্ট না হইয়া অনিষ্টের কারণ হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, মুদ্রা বিনিময়ের হারের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সে-সময়ে আমাদের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও সরকার টাকার মূল্য ১ শিলিং ৬ পেনি হারে ধার্য্য করিলেন। এই হার বজায় রাখিতে প্রথমত চলতি মুদ্রার সংখ্যা কমান হইল (contraction of currency), দ্বিতীয়তঃ, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সুদের হার অন্যান্য দেশের তুলনায় উঁচু রাখা হইল, তৃতীয়তঃ, ট্রেজারী বিল বেশী সুদে বিক্রয় করিয়া টাকার বাজার গরম রাখা হইল। ট্রেজারি বিলের সুদের হার বেশী হওয়াতে কোম্পানীর কাগজের দর কমিয়া গেল, কোম্পানীর কাগজের দর কমিয়া যাওয়াতে বাধ্য হইয়া তৎকালীন নূতন সরকারী ঋণের সুদের হার বাড়াইতে হইল। ১৯৩১ সালে সরকার ৬॥০ সুদের ট্রেজারি বণ্ড বিক্রয় করিয়াছেন। পূর্ব্বে সরকারী ঋণ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অথবা কারেন্সী আপিসে ক্রয় করা হইত এবং তাহার পরিমাণ নির্ণয় করিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখ পর্য্যন্ত বিক্রয় করা হইত। ১৯৩১ সনে ট্রেজারী বণ্ডের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই এবং কোন্ তারিখে ইহার বিক্রয় বন্ধ হইবে ইহাও নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেটের মত যে-সকল পোষ্ট আপিস সেভিংস্ ব্যাঙ্কের কার্য্য করে তাহাদের মারফতে ইহা ক্রয় করা যাইতে পারিত। তদুপরি সরকারী বিজ্ঞাপনে ইহাও জানান হইয়াছিল যে, এই বণ্ড পোষ্ট আপিসে খরিদ করিলে এবং পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগের একাউণ্টেণ্ট-জেনারেলের নিকট গচ্ছিত রাখিলে ইহার উপর আয়কর লাগিবে না। সাধারণতঃ কলিকাতার বড় বড় ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানতের বার্ষিক সুদের হার শতকরা ৩॥০ বা ৪ টাকার অধিক নয়, মফস্বলে যদিও সুদের হার উচ্চ তথাপি শতকরা ৬ হইতে ৬॥০ টাকার বেশী নয়। ইহা নিশ্চিত যে, গভর্ণমেণ্টের তুলনায় কোন ব্যাঙ্কেরই স্থায়িত্ব সুদৃঢ় নয়। কাজেই যদি গভর্ণমেণ্টই ৬॥০ টাকা হারে সুদ দেয় তাহা হইলে লোকে ব্যাঙ্কে টাকা রাখিবে কেন? সরকার-পক্ষের লোকের বিশ্বাস যে, আমাদের দেশের আনাচে-কানাচে অর্থ ছড়াইয়া রহিয়াছে, এই-গুলি কুড়াইয়া লইতে পারিলে দেশের এবং সরকারের উভয়েরই মঙ্গল। এই বিষয়ে অনেক গবেষণাও হইতেছে এবং বিশেষজ্ঞগণ অঙ্ক কষিয়া দেখাইয়াছেন আমাদের গুপ্ত (hoarded) ধনের পরিমাণ কত। গুপ্তধন কুড়াইতে গিয়া ব্যাঙ্ক এবং সেই সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের কি ক্ষতি করা হইয়াছে তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। একে ত আয় কম, কাজেই সঞ্চয়ের পরিমাণ কম; স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের উপর দেশের আস্থার অভাব, তদুপরি ইহাদের সহিত সরকারের তীব্র প্রতিযোগিতা, এই-সব সংযোগের কারণে ব্যাঙ্কগুলি যাহা-কিছু আমানত পাইত তাহাও তখন প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। আমানতী টাকার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইতেই টাকাটা উঠাইয়া তদ্দ্বারা ট্রেজারী বণ্ড ক্রয় করা হইয়াছিল। এইরূপে যদি বেশীর ভাগ আমানতই উঠাইয়া লওয়া হয় তাহা হইলে ব্যাঙ্কের পক্ষে টিকিয়া থাকাই মুস্কিল। সরকারের সহিত প্রতিযোগিতা

করিতে হইলে আমানতের সুদের হার বাড়াইতে হয়, সেই অনুপাতে ঋণের সুদও বাড়ে। বর্ত্তমানে পৃথিবী-ব্যাপী মন্দার ফলে কেনাবেচা কমিয়া গিয়াছে, তদুপরি প্রতিযোগিতা বাড়িয়া মালের মূল্য অসম্ভব হ্রাস পাইয়াছে। এই অবস্থায় যদি আমাদের মাল উৎপন্নের খরচ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে অন্য দেশের সহিত আমরা প্রতিযোগিতা করিব কি করিয়া? সরকারের যদি এই উদ্দেশ্য হয় যে, টাকার বাজারে তাহারা অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের দাঁড়াইতে দিবেন না তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই সফল হইবেন। লোকসান করিয়া কেহ ব্যবসায় করে না, করিলেও বেশী দিন টিকিতে পারে না, কিন্তু সরকারের সে চিন্তা নাই, একদিকে সুদের হার অন্যদিকে করের ভার দুইটিই এক সঙ্গে বাড়িতে পারে।

বাজেট করিবার সময় আয়-ব্যয়ের যে অনুমান (estimate) করা হইয়াছিল, প্রকৃত আয়ের পরিমাণ তদপেক্ষা অনেক কম হইয়াছে। আমদানী পণ্য হ্রাস হওয়ায় আমদানী শুল্ক কমিয়াছে। রেলের আয় কমিয়াছে। এইরূপ সবদিকেই আয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে, অথচ সেই অনুপাতে ব্যয়ের হ্রাস হয় নাই, ব্যয়সঙ্কোচের জন্য কয়েকটি কমিটি বসিয়াছিল এবং তাঁহারা ব্যয়সঙ্কোচের জন্য কিছু কিছু পরামর্শও দিয়াছেন, কিন্তু আসলে যেখানে ব্যয়সংক্ষেপ কর্ত্তব্য সেখানে কিছুই করা হয় নাই। বড় চাকুরিয়া এবং ছোট চাকুরিয়া সকলেরই বেতন শতকরা দশ টাকা কমান হইয়াছিল, কেন-না, বড়দের খরচ বেশী, অতিরিক্ত কমাইলে চলিবে কেন? লি-কমিশন যে গোদের উপর বিষফোড়া বসাইয়া দিয়াছিল, তাহাও থাকিবে, নচেৎ ইংরেজদের উপর ঘোর অবিচার করা হইবে। সৈন্য-বিভাগের ব্যয় আর হ্রাস করা যায় না, তাহা হইলে শান্তি সুশৃঙ্খলার অসুবিধা হইবে, অর্থাৎ ব্যয় যাহা ছিল তাহা অল্প কাটছাঁট করিয়া পূর্ব্বে যাহা ছিল প্রায় তাহাই থাকিবে। এইরূপ হইলে বাজেটে আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য থাকিবে কি করিয়া? লাগে টাকা দিবে গৌরী সেন। ভারতে প্রজার উপর আরও কর চাপাও। কর-বৃদ্ধির পদ্ধতিও এইরূপ রাখিতে হইবে যে, তাহাতে বৃটিশ ব্যবসায়ীর হিত যথাসম্ভব বজায় থাকে। আমাদের কিছু বলা সে শুধু অরণ্যে রোদন। যদি আমরা আপত্তি করি কিংবা বিল পাস না করি তাহা হইলে ভাইসরয়ের সার্টিফাইং ক্ষমতা-রূপ ব্রহ্মাস্ত্র আছে। সরকারী আর্থিক নীতি,—কর নীতি যাহার একটি অঙ্গ তাহা আমরা দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেক ঘটনায় উপলব্ধি করি। শুল্কের হার বৃদ্ধি হইলে বিদেশজাত মালপত্র মহার্ঘ হয় এবং স্বল্প আয়ে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনিতে গিয়া আমাদের বেগ পাইতে হয়। ক্রয়-শক্তি হ্রাস হওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্য আরও মন্দা হয়, ব্যাঙ্কের আমানত কমিয়া যায় এবং অনেকস্থলে দেয় টাকা আদায় করা মুস্কিল হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে সরকারী মুদ্রা, অর্থ এবং ঋণ-নীতির উপর দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও তৎসঙ্গে ব্যাঙ্কের সফলতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। এইসব ব্যাপারে আমাদের হাত এখন নামমাত্র। ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে আমাদিগকে কতটা অধিকার দেওয়া হইবে গোলটেবিল বৈঠকে যে-সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহা দেখিয়া মনে হইতেছে, এ-বিষয়ে বেশী আশা করা দুরাশা মাত্র।

সে যাহা হউক, বর্ত্তমানে ব্যাঙ্কের যে-সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে সে-বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। বঙ্গদেশে বড় ব্যাঙ্ক বলিতে একটিও নাই। প্রত্যেক প্রদেশে একাধিক বৃহৎ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে এবং ইহারা শাখা খুলিয়া নিজেদের শ্রীবৃদ্ধি করিতেছে। বড়ই পরিতাপের বিষয়, আমাদের সেরূপ করিবার ইচ্ছা কিংবা চেষ্টা নাই। বিদেশী এবং অন্য প্রদেশীয় ব্যাঙ্কগুলি বাঙালীর অর্থে পুষ্ট, অথচ বাঙালী উপযুক্ত ধার পায় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শিল্পবাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যাঙ্ক ছাড়া চলে না। আজ যে মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনমরণের সমস্যায় পৌঁছিয়াছে, ইহার প্রতিবিধান করিতে হইলে ব্যবসায়-বাণিজ্য আমাদের হস্তগত করিতে হইবে। আমরা আত্মবিশ্বাস হারাইয়াছি, তাই বাঙালী মাত্রই আজ অবিশ্বাসের পাত্র। যাহাদের সম্বন্ধে এরূপ ধারণা তাহারা জীবনসংগ্রামে বাঁচিবে কিরূপে? আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যতে ছোট ব্যাঙ্কের পক্ষে টিকিয়া থাকা মুস্কিল হইবে। ইহাদের কতকগুলি ত্রুটি পূর্ব্বেই উল্লেখ করা

হইয়াছে। প্রথমতঃ, ইহাদের মূলধন ক্ষুদ্র; দ্বিতীয়তঃ, উপযুক্ত বেতনে অভিজ্ঞ ম্যানেজার রাখিবার অসামর্থ্য এবং তৃতীয়তঃ ব্যাঙ্কের উপযুক্ত নগদ-মজুত (liquid) সম্পত্তির অভাব। এই সমস্যা আমেরিকাতেও উপস্থিত হইয়াছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে সে-দেশে তের শতের অধিক ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে এবং গত বর্ষেও গড়পড়তা প্রতি মাসে একশটি করিয়া ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে। ইহাদের অধিকাংশ ব্যাঙ্ক জমি বন্ধকী রাখিয়া ধার দিত। কাঁচা মালের দর হ্রাস হওয়ায় জমির দরও অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং ক্রেতার অভাবে টাকা-আদায়ের কোন পন্থা নাই। সে-দেশে আইনের কড়াকড়ির জন্য আমানতি টাকা প্রত্যর্পণ করিতে না পারিলে ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ করিতে হয়। এ-দেশেও যদি সেইরূপ হইত তাহা হইলে অনেক ব্যাঙ্ককে সেই অবস্থায় পড়িতে হইত। দেখা গিয়াছে, স্বর্ণমান স্থগিত (suspend) করা সত্ত্বেও ইংলণ্ডে কোন ব্যাঙ্ক কার্য্য বন্ধ করে নাই। ইহার কারণ, সেখানে মাত্র কয়েকটা সুদৃঢ় বৃহৎ ব্যাঙ্ক আছে, তাহারা দেশের সর্ব্বত্র শাখা বিস্তার করিয়া শিল্প-বাণিজ্যের সাহায্য করিতেছে। ইহাদের কার্য্যপ্রণালী মূল আপিস হইতে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে মারাত্মক ভুল হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন স্থানে শাখা থাকাতে, কোন স্থানে বিশেষ লগ্নি না করিলেও চলে। এদেশে বোম্বাইয়ে তুলা, কলিকাতায় পাট, করাচীতে গম, মাদ্রাজে চীনাবাদাম এবং রেঙ্গুনে চাউল—ইহাদের মৌশুম ভিন্ন ভিন্ন, যে-সময় বোম্বাইয়ে টাকার বাজার গরম কলিকাতায় তখন নরম, সুতরাং যদি কোন ব্যাঙ্কের এই সব স্থলে শাখা থাকে তাহা হইলে যে-সময় যেখানে টাকার বেশী চাহিদা হইবে সেই স্থলে টাকা খাটাইতে পারে, ইহাতে একদিকে যেমন লাভও বেশী অন্যদিকে বিভিন্ন ব্যবসায়ে টাকা খাটাইবার জন্য লোকসানের আশঙ্কাও কম। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে, সব ডিম এক ঝুড়িতে রাখিবে না। ব্যাঙ্কের পরিচালন বিষয়েও ইহা একটি অমূল্য উপদেশ। দাদন যতটা ছড়াইয়া রাখা যায় ততই ব্যাঙ্কের পক্ষে মঙ্গল। যেমন এক ব্যক্তিকে বেশী ধার দেওয়া উচিত নয় তেমনি কোন একটি ব্যবসায়ে বা শিল্পে সব টাকা ধার দেওয়া নিরাপদ নয়। ক্ষুদ্র স্থানে ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কের ইহাই মুখ্য বিপদের কারণ। একে ত উপযুক্ত জামিনের অভাব তদুপরি নিঃশেষ করিয়া সমস্ত টাকা দাদন করিলে প্রয়োজনের সময় ইহাদিগকে সাহায্য করিবে কে? বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে যে-সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে সে-বিষয়ে চিন্তা এবং আলোচনা করিয়া আমাদের এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে ভবিষ্যতে এই জাতীয় ব্যাঙ্কের উন্নতির আশা কম। সুনাম ব্যাঙ্কের আসল মূলধন, তাহাই যদি নষ্ট হইল তাহা হইলে আর রহিল কি? যাহারা টাকা আমানত রাখিয়াছে তাহারা যদি সময়-মত তাহা না পায় এবং ভবিষ্যতে পাইবে কি-না সে-বিষয়েও সন্দিগ্ধ হয় তাহা হইলে পুনর্ব্বার আমানত পাইবার আশা থাকিবে কি? কাজেই এখনও যদি এ-সকল ব্যাঙ্ক সম্মিলিত হইয়া, মোটা মূলধন তুলিয়া কর্ম্মকুশল ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহা হইলে বঙ্গদেশে অনায়াসে পাঁচ-ছয়টি বড় ব্যাঙ্ক গঠিত হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রাধান্য এবং পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা ইহার প্রধান অন্তরায়।

প্রতি দেশেরই সমস্যা বিভিন্ন, তাহাদের প্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয় ভাবে, জাতীয় উন্নতিকল্পে গঠিত হইয়াছে। অন্যান্য দেশে যেমন হইয়াছে এখানেও তেমন হইবে, এ-কথা বলা চলে না। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় ভালমন্দ বাছিতে বাছিতে ইহারা বর্ত্তমান স্তরে আসিয়া পৌছিয়াছে। তাহাদের সভ্যতা, আদর্শ এক, আমাদের অন্য। জীবনসংগ্রামের ঘাত-প্রতিঘাতে প্রতিদিন ইহাদের পরিবর্ত্তন হইতেছে; গতিশীল সমাজের ইহাই ধারা, অন্য দেশের সঙ্গে তুলনাও আমাদের হয় না, কেন-না, তাহারা স্বাধীন, সমস্ত রাজকীয় শক্তি তাহাদের পশ্চাতে আছে। আমাদের অনেক সময় রাজাপ্রজায় বিরোধ, তাহাদের স্বার্থ ও আমাদের স্বার্থ ভিন্ন, ইহাই হইয়াছে গোড়ায় গলদ। এদেশে বিদেশীয় ব্যাঙ্কের প্রভাব প্রবল, শুধু ব্রিটিশ নয়, ফরাসী, ডচ, জাপানী, আমেরিকান ইহারাও নিজেদের ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপন করিয়া আমাদেরই আমানতে পুষ্ট হইয়া আমাদের

সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে। ইহাদিগকে এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক বলা হয়। ইহাদের একটি সমিতি আছে, তাহাতে ভারতীয় কোন ব্যাঙ্কই সভ্য নাই এবং সেইজন্ত এক্সচেঞ্জের কাজও আমাদের দেশীয় ব্যাঙ্ক বেশী করিতে পারে না। যদি আদর্শ ব্যাঙ্কিং প্রণালী গঠন করিতে হয় তাহা হইলে বিদেশীয়দের অধিকার খর্ব্ব করিতে হয়, কেন-না, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে বিদেশী ব্যাঙ্কের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে আমাদের ব্যবসায় উন্নত হইতে পারে না। ব্যাঙ্কিং ইনকোয়ারী কমিটিও এ-কথা বলিয়াছে, কিন্তু বৈদেশিক বিশেষজ্ঞগণ ইহাতে প্রবল আপত্তি করিয়াছেন। তাঁহাদের কথা এই যে, এতদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা যে সব সুখ-সুবিধা ভোগ করিয়াছেন তাহা পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিতে হইবে, সেগুলি ষোল আনা বজায় রাখিয়া যদি আমাদের ভাগে কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহাতে তাঁহাদের কোন আপত্তি নাই। শেষ কথা ইহাই দাঁড়ায় যে স্বায়ত্ত-শাসন ভিন্ন, শিল্প বল, বাণিজ্য বল, ব্যাঙ্ক বল, কিছুদূর অগ্রসর হইলেই আর রাস্তা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইংরেজ বণিক এবং রাজনৈতিকগণ একটা ধুয়া ধরিয়াছেন যে, স্বায়ত্তশাসন দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু ধাপে ধাপে, অর্থাৎ প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনের প্রধান যে লক্ষণ, যেমন অর্থনৈতিক অধিকার, শিল্পবাণিজ্য আমাদের হিতকল্পে আমাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কোন অধিকারই আমাদিগকে দেওয়া হইবে না। অধিকন্তু রক্ষাকবচের এমন সব বজ্র আঁট বাঁধিতে হইবে যাহাতে সুদূর ভবিষ্যতেও বিদেশীয়দের কোন অধিকার খর্ব্ব না হয়। তাহাদের অধিকার বজায় রাখিলে আমাদের অধিকার রহিল কোথায়? প্রকৃতপক্ষে বর্ত্তমানে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বই প্রধান। রাজনীতির কাজ অর্থনৈতিক সুবিধাগুলি নিজেদের করায়ত্ত করা। এই জন্ত ইংরেজরা আমাদের ভবিষ্যৎ শাসন-বিধিতে রক্ষা-কবচ বাঁধিতে এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা জানেন, এগুলি রাখিতে পারিলে প্রকৃতপক্ষে কিছুই দেওয়া হইল না। আমরাও তাহা বুঝি, তাই ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্ত প্রান্ত পর্য্যন্ত আন্দোলন চলিয়াছে যে আমরা ভুয়া স্বায়ত্তশাসনে সন্তুষ্ট হইব না, আমরা চাই স্বদেশের হিতের জন্ত যাহা অবশ্যপ্রয়োজনীয় সেই অধিকার লাভ। আর্থিক স্বাধীনতা স্বায়ত্তশাসনের মূল ভিত্তি। ভিত্তিহীন গৃহের স্থায়িত্ব কোথায়? আমাদিগকে কোণঠেসা, করিয়া রাখিলে, মুক্ত আলো-বাতাস হইতে বঞ্চিত করিলে আমরা কি সুস্থ শরীরে বদ্ধিত হইতে পারিব? ব্যাঙ্কিং ইন্‌কোয়ারী কমিটি বলিয়াছেন, তাঁহারা ব্যাঙ্ক-গঠনের জন্ত যে-সব প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা এই অনুমানে যে, ভবিষ্যতে প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টে আমাদের পূর্ণ অধিকার থাকিবে। যদি এই অনুমান মিথ্যা হয় তাহা হইলে তাঁহাদের প্রস্তাব মূল্যহীন হইয়া পড়ে। ভবিষ্যতের কথা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না, তবে আনুষঙ্গিক অবস্থা দেখিয়া মনে হয় প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসন এখনও বহু দূরে। তাহা হইলে ব্যাঙ্কের উন্নতিও কল্পনার রাজ্যেই থাকিবে। বাস্তবিক উন্নতি করিতে গেলে যে দিক্ দিয়াই যাই না কেন আমরা দেখিতে পাই প্রস্তর প্রাচীর দ্বারা আমাদের পথ অবরুদ্ধ। যতদিন পর্য্যন্ত এই প্রাচীর বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন আমাদের উন্নতির বিশেষ আশা নাই। যদিও স্বায়ত্তশাসনের উপর আমাদের প্রকৃত উন্নতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে, তথাপি ব্যাঙ্ক-পরিচালনায় যে-সব ত্রুটি চাক্ষুষ দেখা যাইতেছে সেগুলি দূর করা কিয়ৎপরিমাণে আমাদের হাতে। আমরা যদি বদ্ধপরিকর হইয়া এ-সকল ত্রুটি মোচনের চেষ্টা না করি তাহা হইলে স্বায়ত্তশাসন মিলিলেও আপনা আপনি সেগুলি শোধরাইবে না। এক হইতে পারে আইনের নিগড়ে বাঁধিয়া ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব লোপ করা, অন্ত উপায় ইহাদিগের গলদ দূর করিয়া সুদৃঢ় এবং শক্তিশালী করিয়া তোলা। মোটা মূলধন কিংবা আমানত বেশী হইলেই যে ব্যাঙ্ক ভাল হইবে এ-কথা বলা যায় না, কেন-না, ইতিপূর্ব্বে এদেশে এবং বিদেশে এরূপ অনেক ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে। শিল্পের সাহায্য করা ব্যাঙ্কের কর্ত্তব্য বলা যাইতে পারে; কিন্তু শক্তির অতিরিক্ত কাজ করিতে গিয়া উহার ভিত্তি শিথিল করিয়া ফেলিলে উভয়েরই সর্ব্বনাশ হয়। শিল্পে যে-অর্থ প্রয়োজন তাহা সাধারণতঃ অধিক সময়ের জন্ত, অথচ ব্যাঙ্কের আমানত স্বল্প সময়ের জন্ত লওয়া হয়। সেই জন্ত

অন্যান্য দেশে শিল্পবাণিজ্যের সাহায্যের জন্য ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হইয়াছে। এদেশে ব্যাঙ্ক শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে টাকা খাটায় না, এজন্য ইহাদিগকে দোষ দেওয়া অনুচিত। বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ব্যাপারে অনেকে হয়ত জানেন যে, উহা অনেক ছোট ছোট স্বদেশী শিল্পপ্রচেষ্টাকে সাহায্য করিতে গিয়া ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। যেখানে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক বেশী পরিমাণে শিল্প-প্রচেষ্টায় সাহায্য করিয়াছে সেখানেই অবশেষে তাহাদিগকে বেগ পাইতে হইয়াছে। জার্ম্মানীর এবং মধ্য-ইউরোপের ব্যাঙ্কগুলি কেবল যে শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে ধার প্রদান করে তাহা নহে, ইহারা তাহাদের লাভ লোকসানেরও অংশীদার।

ইহার ঐতিহাসিক কারণও আছে। যাহাকে শিল্প-বাণিজ্যের বিবর্ত্তন (industrial revolution) বলা হয়, তাহা সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ডেই ঘটে। সস্তায় এবং অল্প সময়ে প্রস্তুত বলিয়া কলকারখানা ক্রমে ক্রমে কুটীরশিল্পের স্থান অধিকার করিতে থাকে, ওয়াটের ষ্টীম ইঞ্জিন, বস্ত্র-বয়নের তাঁত ইত্যাদির উদ্ভাবনা হয়, ইহাতে ইংলণ্ড স্বল্পমূল্যে মাল বিক্রয় করিয়া লাভবান্ হয় এবং সে দেশের সাধারণ লোকের পুঁজি বাড়িতে থাকে, কাজেই ইংলণ্ডে কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠা হইলে মূলধনের জন্য বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই, শেয়ার বিক্রয় দ্বারাই মূলধন সংগৃহীত হইয়াছে। জার্ম্মানী এবং অন্যান্য দেশে যখন শিল্পপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হইল, তখন সর্ব্বসাধারণের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না হওয়ায় ব্যাঙ্কের সাহায্য ভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠা হইত না। কাজেই ব্যাঙ্ককে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া ইহাদের স্থাপনা করিতে হইল এবং পরিচালকবর্গের ভিতর ব্যাঙ্কের মনোনীত ব্যক্তিও রহিলেন। জার্ম্মানীর শিল্পের দ্রুত উন্নতির ইহাই প্রধান কারণ। আমাদের দেশে যে-সব শিল্পপ্রতিষ্ঠান আছে অধিকাংশ স্থলেই তাহাদের মূলধন কম। কলকারখানাতেই তাহার প্রায় সবটা খরচ হইয়া যায়, মালমশলা কিনিবার টাকা তাহাদের হাতে থাকে না। মূলধনের স্বল্পতার জন্য অনেক সময়েই ইহাদিগকে বেগ পাইতে হয় এবং যদি ব্যবসায় মন্দা হয় তাহা হইলে সহজে ব্যাঙ্কের পক্ষে টাকা পাওয়া মুস্কিল হয়। অনেক ভুক্তভোগী এইসব কারণে ব্যাঙ্কের পক্ষে শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠাকে দাদন দেওয়া নিরাপদ মনে করে না।

ইহা স্বীকার্য্য যে আমাদের দেশে ব্যাঙ্কের ধার দেওয়ার মত উপযুক্ত জামিনের (security) খুব অভাব, কিন্তু একেবারেই যে তাহা নাই তাহাও বলা যায় না। মফঃস্বলে সর্ব্বত্র কাঁচা মাল উৎপন্ন হয়, যেমন চাউল, ডাল ইত্যাদি কতকগুলি খাদ্যদ্রব্য। এগুলির চাহিদা সবস্থলেই আছে। যদি ব্যাঙ্ক নিজেদের গুদামে মাল রাখিয়া ১০০৲ টাকার মালের পরিবর্ত্তে ৫০৲ হইতে ৭৫৲ টাকা পর্য্যন্ত ধার দেয়, তাহা হইলে উহাদের ঝুঁকিও থাকে না অথচ বাণিজ্যের অনেক সাহায্য হয়। তাহা ছাড়া ধারে মাল বিক্রয় হইলে এবং অমুক একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্য দিবে এরূপ কড়ার থাকিলে অনায়াসে হুণ্ডি লিখিয়া, লেখক এবং স্বীক্রেতা উভয়েই অবস্থাপন্ন হইলে, ব্যাঙ্ক সেগুলি বাট্টা কাটিয়া ক্রয় করিতে পারে। শুধু আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ে যে দণ্ডাবেজী বিল হয় তাহা নহে, যেখানে ধারে কেনাবেচা সেখানেই এইরূপ বিল হইতে পারে, চেষ্টা করিলে মফঃস্বলেও ইহাদের প্রচলন করা দুঃসাধ্য নয়।

গতানুগতিক ভাবে যাহা চলিয়া আসিয়াছে সেই পন্থা অবলম্বন করিলে উন্নতির আশা কম। মফঃস্বলে liquid security নাই, এ কথার বেশী তাৎপর্য্য নাই, আমি দেখাইয়াছি যে security আছে এবং তাহা liquid করা দুষ্কর নয়, ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলে অনেক কিছু করা যায়, কিন্তু তাহা কোথায়? আমাদের একটা অভ্যাস, অন্য দেশ কিংবা প্রদেশের সহিত তুলনা করিয়া নিজেদের দোষ আলোচনা করা। আমাদের দোষ যথেষ্ট আছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই, যদি তাহা না থাকিত তাহা হইলে বাঙালীর বাণিজ্য অবাঙালীর হাতে যাইবে কেন? তাহাদের অধ্যবসায় আছে, ব্যবসায়ে সাধুতা আছে। লোক ঠকাইবার ফন্দী লইয়া ব্যবসায় চলে না। আমাদের দেশে ব্যাঙ্ক বিষয়ে যে স্বেচ্ছাচার নীতি চলিতেছে তাহার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন, এক ইংলণ্ড ছাড়া প্রায় প্রত্যেক সভ্য দেশেই ইহাদের জন্য বিশেষ অনুশাসন আছে। কিছু দিন হইল জার্ম্মানীতে ব্যাঙ্কের কার্য্য-

প্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য কতকগুলি নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার ফলে মিনিষ্টার অফ ইকনমিক্সের অধীনে একজন Reich Commissioner for Banking নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া রাইশ্ ব্যাঙ্কে একটি বোর্ড অফ্ কণ্ট্রোল গঠন করা হইয়াছে, যাহাতে ঐ ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট চেয়ারম্যান্ থাকিবেন, অর্থ এবং ইকনমিক্স বিভাগের সেক্রেটারিগণ, রাইশ্ ব্যাঙ্কের একজন ডিরেক্টর এবং ব্যাঙ্কিং কমিশনার ইহার সদস্য থাকিবেন। কমিশনার কি প্রণালীতে কাজ করিবেন তাহা বোর্ড অফ্ কণ্ট্রোল নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। তাঁহার মুখ্য কাজ হইয়াছে সদাসর্ব্বদা জার্ম্মান ব্যাঙ্কের ক্রেডিটের বিষয় খোঁজ রাখা, বিশেষতঃ অন্য দেশের সহিত উহাদের সম্বন্ধ এবং সাধারণভাবে ব্যাঙ্কিং প্রণালী (policy) এমন ভাবে চালিত করা যাহাতে সমগ্র দেশ আর্থিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। যে-কোন প্রয়োজনীয় তথ্য ব্যাঙ্কের নিকট চাহিতে, তাহাদের সাধারণ সভায় এবং ডিরেক্টরের সভায় উপস্থিত হইয়া আলোচনার ভাগ লইতে কমিশনারের অধিকার থাকিবে।

স্বেচ্ছাচার নীতির কুফল দেখিয়াই অন্যান্য দেশে ব্যাঙ্কের গঠন এবং কার্য্যপ্রণালীর উপর সরকারী অঙ্কুশ দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এদেশেও এরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা অনেকেই স্বীকার করেন। আমাদের ইহাই ভয় যে এইরূপ করিতে গিয়া পাছে আমাদিগকে আরও অসুবিধায় পড়িতে না হয়; আর এক কথা, শক্ত আইন হইলেই যে ব্যাঙ্ক ভাল চলিবে তাহা নহে। আমেরিকায় আইনের বন্ধন শক্ত হইলেও সে-দেশে এক বৎসরেই তের শতের অধিক ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে এবং গত বৎসরও গড়পড়তায় প্রতিমাসে ১০০ শত ব্যাঙ্ক দরজা বন্ধ করিয়াছে। শুধু আইনে ইহার প্রতিবিধান হইবে না। ব্যাঙ্ক পরিচালনায় যে-সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা গিয়াছে, সেগুলি দূর করিবার ভার অনেকটা আমাদের উপর। অন্যান্য দেশে ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে অতএব আমাদেরও পড়িতে হইবে, ইহার কোন তাৎপর্য্য নাই। যখন ভুল বুঝিতে পারিয়াছি তখন সেগুলি সংশোধন করা কি উচিত নয়? নামে ব্যাঙ্ক, অথচ কাজ করি মহাজনী; ভুলিয়া যাই যে মহাজন তাহার নিজের মূলধনে কাজ করে, যে-কোন সময়ে টাকা পাইলেও তাহার বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু ব্যাঙ্কের পক্ষে সে-কথা খাটে না, তাহারা পরের আমানতে কাজ করে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে অথবা চাহিবা মাত্র টাকা দিতে বাধ্য, যদি উহারা মহাজনী কারবার করে তাহা হইলে দাবি চুকাইতে পারে না। ব্যাঙ্কের উন্নতি নির্ভর করে চাহিবা মাত্র টাকা দেওয়ার ক্ষমতার উপর,—ভবিষ্যতে যে-কোন সময়ে টাকা দেওয়ার উপরে নহে। যাঁহারা এই দুটির পার্থক্য জানেন তাঁহারাই ব্যাঙ্কের মূলসূত্র জানেন। এই জন্যই প্রত্যেক ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত তাহাদের বেশীর ভাগ সম্পত্তি (assets) নগদ-মজুত (liquid) রাখা। বঙ্গদেশের ব্যাঙ্কগুলি যে কঠিন সমস্যায় পড়িয়াছে তাহার সমাধান যে কি ভাবে হইবে তাহা বলা শক্ত। তবে ইহা নিশ্চিত যে, এখনও যদি তাহারা অন্য ভাল ব্যাঙ্কের সহিত মিলিত হইয়া, মূলধন বৃদ্ধি করিয়া, উপযুক্ত পরিচালকের তত্ত্বাবধানে উন্নত প্রণালীতে কার্য্য না করে তাহা হইলে উহাদের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ নয়। ইহাদের দুরবস্থার মূল কারণ ব্যাঙ্কিং-পদ্ধতির অজ্ঞতা এবং তৎসঙ্গে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখা। আমাদের উদ্দেশ্য দোষ দেখান নহে, আমরা চাই যাহাতে বঙ্গদেশে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যাঙ্কিং পদ্ধতি গঠিত হয়। ইহার যে অন্তরায়, তাহা কতকটা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, চেষ্টা করিলে আমরা নিশ্চয়ই সফলকাম হইব। ব্যাঙ্ক ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি অসম্ভব, আর ব্যবসা-বাণিজ্য না হইলে বাঙালী বাঁচিবে কি করিয়া? ইহাদের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে ব্যাঙ্ককে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিতেই হইবে। যদি তাহা না করি তাহা হইলে ব্যবসা-বাণিজ্য কল্পনার রাজ্যেই থাকিবে এবং জীবন-সংগ্রামেও আমাদিগকে দিন-দিনই হটিয়া যাইতে হইবে।

পারস্য-ভ্রমণ

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

টেহেরানে কি দেখলাম? ময়ূরসিংহাসন, গোলেস্তাঁ প্রাসাদ, মর্ম্মরসিংহাসন, পারস্য-রাজকোষের রত্নরাজি,



টেহেরান। সেপাহ্ প্রাসাদের নিকট পথের দৃশ্য

প্রাসাদ, উদ্যান, মস্‌জিদ, বাজার, বস্তি, মহল্লা এই কি সব, না আরও কিছু? এই সকলই দেখেছিলাম—এবং প্রত্যেকটিই দেখবার ও বলবার মত—কিন্তু সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য যা দেখেছিলাম সেটি জাতিগঠনের ঐন্দ্রজালিক দৃশ্য। আগেও বলেছি, পারসীক জাতির এই অদ্ভুত রূপান্তর কি মন্ত্রবলে হয়েছে সেটা জানবার জন্য এদেশে আসা পর্য্যন্ত সমস্ত ক্ষণই মনটা উৎসুক ছিল। টেহেরানে এসে তার সমাধান হল।

যে-দেশ প্রায় দেড়শত বৎসর ইউরোপের দুই পরাক্রান্ত দেশের কুটিল রাজনীতির রঙ্গভূমি ছিল, তাদের ইচ্ছায়, তাদের কথায় এখানকার রাজা প্রজা মন্ত্রী অমাত্য সবাই নাচের পুতুলের মত উঠত বসত—যে-দেশের লোকের ভবিষ্যৎ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দেও লর্ড কর্জ্জন ভাগ্যনিয়ন্তা হিসাবে ঠিক করে দিয়েছিলেন, যে-দেশ ইউরোপের পররাষ্ট্রনীতির চক্রব্যূহে আবদ্ধ ব'লে ধারণা আমাদের মনে সামান্য দশ-বারো বৎসর আগেও দৃঢ় ছিল, সে-দেশ কি ইন্দ্রজালের গুণে এরূপ স্বাতন্ত্র্য অধিকার করল? ১৯২১ খৃষ্টাব্দে পারস্য ইংরেজের পদানত—১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ তেলের খনির ইজারার জন্য পারস্যের দরবারে প্রার্থী হিসাবে উপস্থিত! কি করে সম্ভব হল?

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্ত-



টেহেরান। নুতন প্রাসাদের নিকট পথের দৃশ্য

রাজ্যের ভয়ে জাপান কম্পমান। ঐ সময়ের এক ঘটনা এখন ইতিহাসের অংশবিশেষ। একবার কয়েকজন আমেরিকান নৌ-সৈনিক মাতাল অবস্থায় প্রকাশ্য এক উদ্যানে একটি সুন্দরী জাপানী ভদ্রমহিলার ধর্ম্মনাশে উদ্যত হয়েছিল। একজন উচ্চপদস্থ সামুরাই এ কাজে বাধা দেওয়ায় তাদা

বাধে, ফলে একজন আমেরিকান আহত হয়ে মারা যায়। স্বজাতির ধর্ম্মরক্ষার চেষ্টায় এ-প্রকার গর্হিত আচরণ করার দোষে আমেরিকান নৌ-সেনাপতির হুকুমে এই সামুরাই ইউরোপীয় এবং আমেরিকান সাক্ষীর সামনে "হারাকিরি" প্রথায় নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হন। সমস্ত জাপানী জাতি অসহায় অবস্থায় এই অত্যাচার সহ্য করতে বাধ্য হয়। আজ ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে জাপানের কার্য্য-কলাপের বিরুদ্ধাচরণ করতে কে সাহস পাচ্ছে?

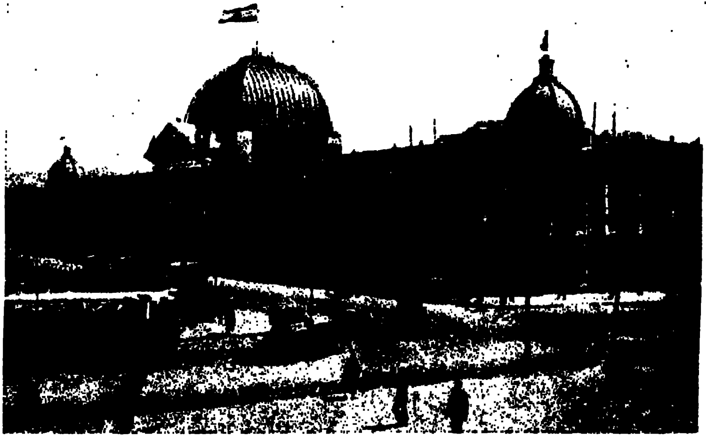
তুর্কী তো সেদিন পর্য্যন্ত "ইউ-রোপের পীড়িত ব্যক্তি" বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুনেছে। নগণ্য গ্রীক, বুলগার, সার্ব, সকলেই তাকে যুদ্ধে পরাস্ত করে নিজের ইচ্ছামত দেশ দখল করেছে, অথচ সংগ্রামক্ষেত্রে তুর্কী যোদ্ধার শৌর্য্য সাহস ও যুদ্ধপ্রবণতা জগদ্বিখ্যাত। সেই তুর্কী আজ শক্তিশালী দুর্দ্ধর্ব জাতি। এই বা সামান্য দশ-বারো বৎসরের মধ্যে কি করে সম্ভব হ'ল?

আজ পারস্যেরই বা এই নূতন শক্তির উদ্ভবের কারণ কি? দৈববলে, মন্ত্রবলে না কোন অলৌকিক প্রক্রিয়ার ফলে?

অন্য দেশের জাগরণ সম্বন্ধে চিন্তাশীল দর্শকের কথা শুনেছি, লেখাও পড়েছি। এবার পারস্যে স্বচক্ষে ও স্বকর্ণে এরূপ জাতিগঠনের পন্থার বিষয় দেখা ও শোনা গেল।



টেহেরান। আভিনিউ শাহাবাদ



টেহেরান। পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ সৌধ

যে সকল দেশের কথা বললাম, সকলেরই দুর্দ্দশার ও শক্তিহীনতার কারণ ছিল দৈববল ও অতি-প্রাচীন কীর্ত্তি ও উক্তির উপর অন্ধ ও দৃঢ় বিশ্বাস। ফলে যারা ঐ সকল কীর্ত্তি ও উক্তি কণ্ঠস্থ ক'রে তাদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করতে ও সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা দিতে পারতেন তাঁরাই ছিলেন দেশগুলির দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। দেশে ভেদ-বিচার, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও দলাদলি যতই বেশী হ'ত ততই ছিল তাঁদের আয়ের ও অবস্থার উন্নতি। দেশের বা জাতির উন্নতি করার মত না ছিল তাঁদের জ্ঞান, না ছিল তাঁদের চেষ্টা। জ্ঞান ছিল না তার কারণ বিংশ শতাব্দীর সমস্যা সম্বন্ধে দ্বাদশ শতাব্দীর অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ তস্য বৃদ্ধপ্রপিতামহ মহাশয়—যিনি মানুষই ছিলেন, অন্য কিছু নয়—কিছু বলে যেতে পারেন নি। চেষ্টা ছিল না তার কারণ, যদি গোটাকতক প্রাচীন কথা আওড়েই দিব্য সুখে স্বচ্ছন্দে থাকা যায় তবে ইতর-সাধারণের জন্যে ভেবে মরা

মূর্খতা মাত্র! বরং উন্নতির প্রতিকূলে ব্যবস্থা কোন-রকমে দিতে পারলে জ্ঞানী বলে খ্যাতি হয় এবং ভক্তি ভেট, দুই-ই অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জুটে যাওয়ার ফলে ঐহিক ব্যবস্থারও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী!

কিন্তু কালের প্রগতি অতি প্রচণ্ড শক্তি। তার আশ্রয় মাত্র, ধর্ম্মমহারথীরা কিছুই আটকাতে পারলেন না। পরে কামাল পাশার দল মরিয়া হয়ে যুদ্ধ ক'রে গ্রীক শত্রুকে হারিয়ে কিছুকালের মত অবসর পেলেন। সেই সময়ের মধ্যে তাঁরা অতীতকে যথাস্থানে পাঠিয়ে বর্ত্তমানের সমস্যা পূরণ করতে লেগে গেলেন।



টেহেরান। একটি উদ্যানাবাসের দৃশ্য

পারস্যেও ঠিক এই ব্যাপার, অন্য কিছুই নয়। এই সম্পর্কে আমাদের দেশের কথা কিছু না বলাই ভাল। পারস্য ও তুর্কীর তুলনায়—এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের তুলনায় ঐ সময়ের ভারতবর্ষ—এদেশ ধনে জনে শিক্ষায় সামর্থ্যে সকল বিষয়েই বহুগুণ ধনী। কিন্তু আমরা মানুষ নই, ছায়ামাত্র। আমাদের ব্যবস্থা যা-কিছু, সবই বহুপুরাকালে হয়ে গিয়েছে, বর্ত্তমানে কিছু নূতন ব্যবস্থা করার মত বুদ্ধি বিবেক ক্ষমতা কিছুই আমাদের নেই। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের বংশধরগণের মস্তিষ্কের এরকম অবনতির কারণ কি জানি নে।

প্রতিকূলে দাঁড়াবার ক্ষমতা কারও নেই। জাপান দেখলে যে "মার্কিণ ভূতে"র জাহাজী কামানের সামনে মন্ত্রতন্ত্র তুক্‌তাক্ সবই বিফল। পুরোহিত ও দৈবজ্ঞ মহাশয়রা অবশ্য আশ্বাস দিলেন যে পরকালে এর ব্যবস্থা হবে, কিন্তু ইহকালে মানসম্ভ্রম, বিত্ত-সম্পত্তি সব বিসর্জ্জন দিয়ে ভারবাহী পশু হয়ে থাকা ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা করতে তাঁরা পারলেন না। জাপান জাতিভেদ বিচার চূর্ণ করে, ধর্ম্মকে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে অগ্রমুখী হয়ে ফিরে দাঁড়াল।



টেহেরান। সূর্য্যসিংহাসন

এই ব্যাপার বুঝতে তুর্কীর আরও অর্দ্ধেক শতাব্দীর উপর লেগে গেল। তারপর নবীন তুর্কের দল লাগল দেশের অবস্থা বদলাবার চেষ্টায়। কিন্তু ভাঙন ধরেছিল ভয়ানক, ফলে মহাযুদ্ধে সব গিয়ে দাঁড়াল পর্ব্বতশিখরের

* * . * *

টেহেরান আধুনিক পারস্যের কেন্দ্র। সাফাবী নৃপতি-দের ইতিহাস এর আগেই বলেছি। শাহ্ আব্বাসের পর

শাহ্ ছুফি, দ্বিতীয় শাহ্ আব্বাস ও শাহ্ সলিমানের রাজত্বে দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধি দুই-ই হয়। পরে সুলতান হুসেনের আমলে পতনের পর্ব্ব সুরু হয়। এই ধর্ম্মান্ধ মূর্খের আমলে রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা পুরোহিত ও ক্রীতদাসদের হাতে সমর্পিত হওয়া। শিয়া ভিন্ন অন্য সকল মতাবলম্বীর উপর অত্যাচার। নানাপ্রকার অন্যায় ব্যবস্থার ফলে দেশে বিপ্লব আরম্ভ হয়। প্রথমে আফগান সর্দ্দার মির বয়েস্ কান্দাহার দখল ক'রে নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। তাঁর বংশধর মাহ্মুদ ১৭২২ খৃষ্টাব্দে পারস্য আক্রমণ করে হুসেনকে পরাজিত ক'রে ইস্ফাহান অবরোধ করেন। ইস্ফাহানের বিষম দুর্দ্দশা হবার পর সুলতান হুসেন সিংহাসন বিজেতাকে অর্পণ ক'রে উদ্ধার পান। ইনি প্রথমে সুব্যবস্থা করে দেশের অনেক উপকার করেন। পরে উন্মাদ হওয়ায় ইহার ভ্রাতা আশরাফ সিংহাসন অধিকার করে। আশ্রাফের অত্যাচার থেকে দেশকে উদ্ধার করেন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নাদির শাহ্। কিন্তু নাদির শাহের যুদ্ধ-প্রিয়তার ফলে দেশের অবস্থা ক্রমেই বিশৃঙ্খল হয় এবং তাঁকে হত্যা করার পর পারস্যে ভীষণ অরাজকতা উপস্থিত হয়। এই রাষ্ট্রবিপ্লব থেকে দেশকে উদ্ধার করেন করিম খাঁ জেন্দ, যাঁর বিষয় শিরাজের বিবরণে বলেছি। এঁর আমলে পারস্যে পুনর্ব্বার শান্তি স্থাপিত হয় এবং এঁর যুদ্ধকৌশলে অনেক প্রদেশ শত্রুর অধিকার থেকে উদ্ধার পায়। করিম খাঁর মৃত্যুর পর আবার সিংহাসন নিয়ে বিষম যুদ্ধবিগ্রহ, অত্যাচার আরম্ভ হয়। আলীমুরাদ, জাফর এবং লুৎফ আলী করিম খাঁর মসনদে বসেন। ঐ সময়ে পারস্যের উত্তরে মাজেন্দরান অঞ্চল আগা মহম্মদ নামে কাজার বংশীয় তুর্কোমান খোজার অধীনে স্বাধীন হয়। আগা মহম্মদ ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে লুৎফ আলীকে পরাজিত ক'রে পারস্যের সিংহাসন অধিকার করেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আগা মহম্মদের কাজার বংশ পারস্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল।



বামে মহামহিম রিজা শাহ্ পাহ্লবী—দক্ষিণে নৃপতি ফৈজল

আগা মহম্মদ পারস্য সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বদ্ধ-পরিকর ছিলেন এবং সে কারণে তিনি গুর্গিস্থান (জর্জ্জিয়া) ও খোরাসান আক্রমণ ও অধিকার করেন। গুর্গিস্থান রুষ

সম্রাটের সাহায্য ভিক্ষা করে, কিন্তু পারস্যরাজের ভীষণ আক্রমণে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। এই বিজয়ের পরেই গুপ্তঘাতকের হাতে আগা মহম্মদ নিহত হন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফাথ-আলী শাহ সাম্রাজ্য সুদৃঢ়ভাবে গঠিত করার পূর্ব্বেই ইউরোপের পররাষ্ট্র-নীতির চক্রান্তে রুষিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হ'ন। প্রথম যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে, ফ্রান্সের প্ররোচনায় দ্বিতীয়বার রুষের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। ফলে গুর্গিস্থান এবং আর্মেনিয়ার কিছু অংশ রুষ সাম্রাজ্য ভুক্ত হয় এবং কাশ্যপ সাগরের নৌচালনার অধিকারও রুষদের হাতে যায়। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় যুদ্ধের পর রুষসম্রাট সমস্ত আর্মেনিয়া দখল করেন এবং প্রায় তিন কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করেন। এই ক্ষতি-পূরণের টাকা সংগ্রহের অত্যাচারের ফলে দেশের লোকে ক্ষিপ্ত হয়ে সস্ত্রীক রুষদূত এবং তাঁর লোকজনকে হত্যা করে। ১৫০০ দাঙ্গাকারীর হস্তপদচ্ছেদ, অনেকের প্রাণদণ্ড এবং রুষকে অনেক বিষয়ে অধিকার ইত্যাদি দেওয়ার পর এবং অনেক অপমান সহ্য করার ফলে পুনরায় আর যুদ্ধ বাধেনি।



টেহেরান। গোলেস্তাঁ প্রাসাদ—প্রদর্শনী কক্ষ

এ-সময় থেকেই পারস্যদেশ ইউরোপের কূট রাজনীতির জালে আবদ্ধ হয়। ফাথ-আলীর নাতি মহম্মদ শাহ (১৮৩৪-৪৮) ইংরেজ ও রুষের সাহায্যে রাজমুকুট লাভ করেন। কিন্তু নিজ সাম্রাজ্য পুনঃসংস্থাপনের চেষ্টায় হিরাট আক্রমণ করাতে তিনি ইংরেজের কাছে সশস্ত্র বাধা পান। নাসর্-উদ্দিন শাহও (১৮৪৮-৯৬) হিরাট দখল করার চেষ্টা করায় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে। ফলে হিরাট, বেলুচিস্থান ইত্যাদি পারস্য সাম্রাজ্যের বাইরে চলে যায়।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে নাসর্-উদ্দীন গুপ্ত ঘাতকের হাতে প্রাণ হারান। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মোজাফের-উদ্দীন এবং তার পর তাঁর পুত্র মোহাম্মেদ আলী মীরজা (১৯০৭) সিংহাসন আরোহণ করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে দেশে বিষম আন্দোলনের ফলে পারস্যে প্রজার মতানুযায়ী শাসনতন্ত্র স্থাপিত হয়। কিন্তু ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে শাহ ঐ প্রথা লোপ করিয়ে অনেকগুলি দেশনেতাকে ফাঁসী দেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে আবার প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, শাহ পলায়ন করার পর তাঁর পুত্র সুলতান আহমদ শাহ হন।



টেহেরান। "খোরাসান" নগরতোরণ

ইতিমধ্যে ১৯০৭-এ সমস্ত দেশটি রুষ ও ইংরেজের

ক্ষমতাধীন হয়। রুষ উত্তর অঞ্চল থেকে ইস্পাহান ও ইয়েজদ্ পর্য্যন্ত এবং ইংরেজ বন্দর আব্বাস ও সমস্ত পারস্যোপসাগর নিজের আয়ত্তাধীন করেন। মহাযুদ্ধে পারস্য কোন পক্ষেই যোগদান করেনি, কিন্তু রুষ, তুর্ক ও ও ইংরেজ পারস্যে ইচ্ছামত লড়াই করেছিল। ১৯১৯-এ লর্ড কর্জ্জনের ব্যবস্থায় পারস্য প্রায় সম্পূর্ণভাবেই ইংরেজের আয়ত্তে আসে এবং ১৯২১ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ সৈন্য পারস্য দেশে ছিল।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে পারস্যের নব-জাগরণের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। ঐ বৎসর রিজা খাঁ নামে পারসীক কসাক সৈন্যের এক সেনাপতি রাষ্ট্র-নীতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করবার জন্য এক রাষ্ট্রবিপ্লব করেন। ইনি প্রথমে প্রধান সেনাপতি, পরে প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতি (১৯২৩) রূপে শাসন-



টেহেরান। সেপাহ্ সালার মস্‌জিদ



টেহেরান। শম্‌স্‌ল্ এমারা প্রাসাদ

ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করেন। ইঙ্গ-পারসীক সন্ধির সর্ত্তগুলি অন্যায় ও অবিচারমূলক বলে অগ্রাহ্য হবার পর সামরিক ও রাজস্ববিভাগ দুই-ই নূতন ভাবে গঠিত হয়, যাহাতে পারস্য ইংরেজ ও রুষ এই দুই শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। এদিকে শাহ বিদেশে মনের আনন্দে ব্যসনে দিন যাপন করছিলেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে দেশে এই প্রবাসী শাহের বিরুদ্ধে বিষম বিদ্বেষের সূচনা হয়, এবং ১৯২৫-এর অক্টোবরে মেজলিস শাহকে সিংহাসনচ্যুত করেন। গণতন্ত্র মুসলমান ধর্ম্মের বিরোধী, কুমের মুস্তাহিদ এই ব্যবস্থা দেওয়ার ফলে ১৯২৫-এর ডিসেম্বরে প্রধান অমাত্য রিজা শাহ্ পাহ্‌লবী নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। দরায়-বহুষের মুকুট এইরূপে পুনর্ব্বার ইরাণ-জাত আর্য্য-ইরাণীর শিরের শোভা বর্দ্ধন করে।

* * *

ইরাণের এই নূতন প্রাণ প্রতিষ্ঠার কার্য্যে আমেরিকার সাহায্যের কিছু উল্লেখ করা উচিত। মর্গ্যান শুষ্টার নামে একজন মার্কিণ অর্থনীতিবিদ প্রথমে পারস্যের রাজস্ববিভাগ ইংরেজ ও রুষের কবল থেকে উদ্ধার করায় চেষ্টা করেন। কিন্তু ঐ দুই প্রবল শক্তির প্রভাবে তাঁকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়। কিন্তু সেই সময় থেকে মার্কিণ মিশনরী, ডাক্তার, শিক্ষক ও অর্থনীতি-বিদগণ এ দেশকে ক্রমাগত সাহায্য ক'রে আসছেন।

টেহেরানের প্রধান বিদ্যালয় (এখন বিশ্ববিদ্যালয়) একজন আমেরিকান মিশনরী শিক্ষকের (ডক্টর জর্ডনের) অক্ষয় কীর্ত্তি। রিজা শাহ্ পাহলবী প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতিরূপে দেশের সামরিক এবং অন্যান্য বিভাগের



টেহেরান। মর্ম্মরসিংহাসন

যে এত উন্নতি করতে পেরেছিলেন তার একটি কারণ মিল্‌স্‌পে নামে আমেরিকান অর্থনীতিবিদের সহযোগিতা। এই মিল্‌স্‌পে রাজস্ব-বিভাগে নানা প্রকার নূতন ব্যবস্থা করার ফলে সৈন্য, পূর্ত্ত, চিকিৎসা ইত্যাদি নানা বিভাগের উন্নতি সম্ভব হয়।

অন্তদেশের কথা না বলাই ভাল। প্রত্যেকেই অর্থ-লোলুপ মহাজনের মত পারস্তের গলায় ঋণের ভার চাপাইতে এবং সাম্রাজ্যবৃদ্ধির জন্ত পারস্তকে হীনবল ও হৃতসর্ব্বস্ব করতেই ব্যস্ত ছিলেন। অন্ত অত্যাচার ও অনাচারের ত কথাই নাই। এখনও কোন দেশ ন্যায়-বিচার করতে বাধ্য না হলে করেন না। বলশেভিক রুষ সেদিন পর্য্যন্ত (১৯২৪) পারস্ত আক্রমণ ক'রে নিজের ক্ষমতা দেখিয়েছে এবং কাস্তপসাগরের মাছধরার এবং জাহাজ চালনার একচেটিয়া অধিকারের (এ সবই ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে অন্যায় ভাবে আদায় করা হয়) ব্যবস্থা এখনও ন্যায়সঙ্গত ভাবে করেনি। খনিজ তৈলের এক-চেটিয়া অধিকার নিয়ে এখনও ইংরেজের সঙ্গে গোলমাল চলেছে, বিচার কি প্রকার হয় তা পরে দেখা যাবে।

* * * *

টেহেরান দ্রুতবেগে ইউরোপীয় নগরীর আকৃতিতে পরিবর্ত্তিত হয়ে যাচ্ছে। রাস্তা-ঘাট, বুলভার, কাফে, বড় বড় সৌধের স্থাপত্য, নরনারীর বেশভূষা সবই এখন ইউরোপীয়। পথে মোটর মোটর-বাসের ত ছড়াছড়ি, তাছাড়া রুষ দেশের "দ্রুস্‌কা" (দুঘোড়ার ফিটন) খুবই চলে। শহরের কেন্দ্রের দোকান-পাট সমস্তই বিলাতী ধরণের, সেই বড় বড় কাচ দেওয়া জানালা, দোকানের ভিতরও বিদেশী ধরণে সাজান। কাফেগুলিতে গান-বাজনা নাচ, সমস্তই পূর্ব্ব ইউরোপ এবং ফ্রান্সের চালে হয়। কাফে "লালে জার" ও কাফে "লোঘান্তে" এই দুইটিই প্রসিদ্ধ নৈশ প্রমোদের আগার। কাফে লোঘান্তে ভূত-পূর্ব্ব নিজাম-উল-মুল্কের প্রাসাদে স্থাপিত, ছবি-আঁকা,



টেহেরান। দেমাবেন্দ পর্ব্বতচূড়া

নক্সা-কাটা, সুসজ্জিত, বিরাট দরবার কক্ষে এখন ইরাণী সুন্দরীরা বিদেশী বাদ্যের তালে কন্সার্ট করেন। নীচে প্রকাণ্ড মর্ম্মর ও রঙীন টালী-বাঁধান চৌবাচ্চার চারিধারে প্রমোদার্থীর দল পান-ভোজন করেন।

সিনেমারও খুব চলতি, বিশেষ সবাক চিত্রের।



টেহেরান। ময়ূরসিংহাসন

এখানে রুষ চিত্র ধীরে ধীরে জার্মান ও আমেরিকানকে হটিয়ে দিচ্ছে। থিয়েটার একটিমাত্র আছে, তার অভিনেতৃবর্গ এখনও বোম্বাইয়ের পার্শি থিয়েটারের আদর্শের উপর উঠতে পারেনি।

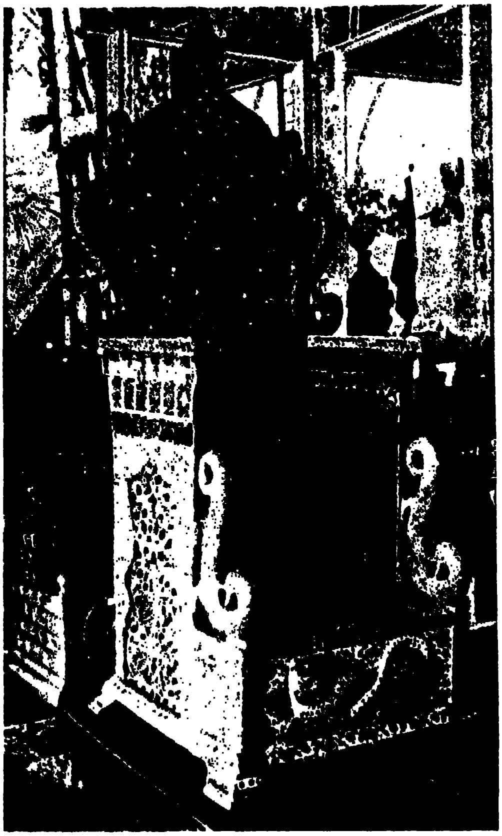
* * *

একদিন গোলেস্তাঁ প্রাসাদ দেখতে গেলাম। প্রসিদ্ধ ময়ূর সিংহাসন এখানেই রয়েছে। মুক্তার গালিচার উপর নিরেট সোনার উপর পায়রার ডিমের মত বড় থেকে সরষের সমান পর্য্যন্ত অসংখ্য ছোটবড় হীরা চুনি পান্না নীলমণি ইত্যাদির কাজ করা চার-পাঁচ হাত উঁচু সিংহাসন। বড় বড় হীরা চুণি পান্না প্রায় শ-দুই আছে, প্রত্যেকটি সম্রাটের মুকুটমণি হ'বার উপযুক্ত। লর্ড কর্জনের মতে এটি দিল্লীর ময়ূরসিংহাসন নয়। আমার দেখে মনে হল জিনিষটা ভারতীয় নয়, বিশেষতঃ শাহ জাহানের দরবারের ময়ূরসিংহাসনের ছবি যা দেখেছি সে-রকমও নয়, তবে সিংহগুলির পরিকল্পনা জয়পুরের ছাঁচের সঙ্গে মেলে।

সাফাবী নৃপতিদের সূর্য্যসিংহাসনও ঐখানেই রয়েছে। আরও প্রকাণ্ড, আরও বেশী হীরা মণি মুক্তার ছড়াছড়ি, সম্রাটের মাথার উপর সূর্য্যের চক্র রয়েছে। এই সিংহাসন ও ময়ূরসিংহাসন গোলেস্তাঁ প্রাসাদের দুতলার প্রদর্শনী কক্ষগুলিতে আছে, নীচে একতলায় প্রসিদ্ধ মর্ম্মরসিংহাসন আম দরবারে স্থাপিত আছে। মর্ম্মর সিংহাসনের পায়াগুলি মনুষ্যাকৃতি, (গ্রীক কারিয়াটিডসের মত)। আমাদের কথাসাহিত্যের দ্বাত্রিংশ-পুত্তলিকাযুক্ত সিংহাসনও বোধ হয় এই ধরণেরই কিছু ছিল।

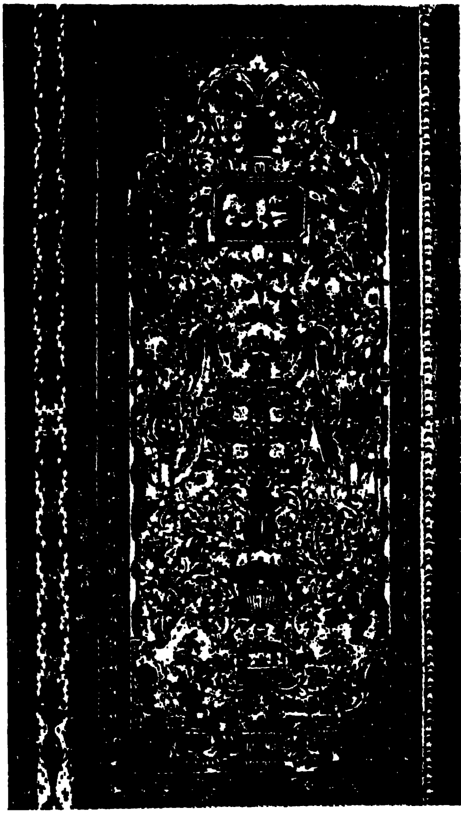
প্রদর্শনী কক্ষের দেওয়াল কাচের আলমারীতে ঢাকা। সেগুলিতে মহামূল্য মণিরত্নখচিত তৈজসপত্র বর্ম্ম-চর্ম্ম, ঢাল তলওয়ার ইত্যাদি থেকে নানা প্রকার দুষ্প্রাপ্য ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জিনিষ রক্ষিত আছে। মহামূল্য কার্পেটও দু-দশখানি রয়েছে, তবে সাঁ'দির কবরস্থানে ঐ জিনিষের যে প্রকার ছড়াছড়ি দেখেছিলাম, সে রকম এখানে নয়।

আর একদিন মস্‌জিদ সেপাহ্‌ সালারের পুস্তকাগার দেখতে গিয়েছিলাম। অনেক দুষ্প্রাপ্য পুঁথি এখানে আছে, তার মধ্যে আল্‌ বেরুনীর কতকগুলি অঙ্কশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যার পুঁথি দেখলাম। চিত্রিত পুঁথির মধ্যে এক-খানি নিজামী দেখলাম তাতে পঁচানব্বই খানি অতি সুন্দর চিত্র রয়েছে। শুন্‌লাম আমেরিকা থেকে এটির জন্যে দশ-বার লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত দামের হাঁক এসেছে এবং সেই জন্যে প্রতি পাতায় ও ছবিতে দরবারের শীলমোহর দেওয়া হয়েছে, পাছে কেউ ছিঁড়ে বিক্রী করে। একজন মোল্লার সঙ্গে দোভাষীর মারফৎ কথাবার্ত্তা হ'ল, আমি হিন্দু শুনে তিনি অতি আগ্রহ ক'রে জানতে চাইলেন আমি সূর্য্য-সিদ্ধান্ত ও ব্রহ্ম-সিদ্ধান্তের কূট সমস্যা কিছু



টেহেরান। ময়ূরসিংহাসন

পূরণ করতে পারি কি-না। আমি অসমর্থ শুনে তিনি একটু দুঃখিত হলেন এবং বললেন আল্‌ বেরুনীর বিভিন্ন পুঁথিতে কয়েক জায়গায় গরমিল আছে, সেগুলির মীমাংসা তিনি কিছুতেই করে উঠতে পারছেন না।



টেহেরান। মস্‌জিদ সেপাহ্‌ সালারের মোজাইক

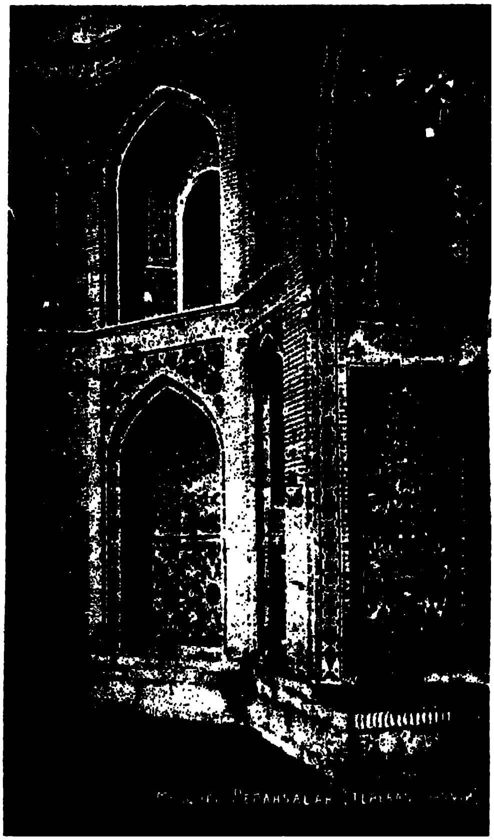
এঁর কথাবার্ত্তায় বুঝলাম যে, ইনি সত্যই জ্ঞানী লোক। এই সেপাহ্‌ সালার মস্‌জিদ পারস্যের শেষ তিনটি বিপ্লবের গুপ্ত কেন্দ্র ছিল। এখানকার মোল্লাদের জ্ঞান ও উদার-মতের প্রভাবেই সেগুলি সম্ভব হয়, অন্ধ গোঁড়ামী বা স্বার্থান্বেষণ এখানে খুব বেশী স্থান পায় না।

* * *

ময়ূরসিংহাসনের কথা বললাম, এখন তার বর্ত্তমান অধিকারীর কথা বলি।

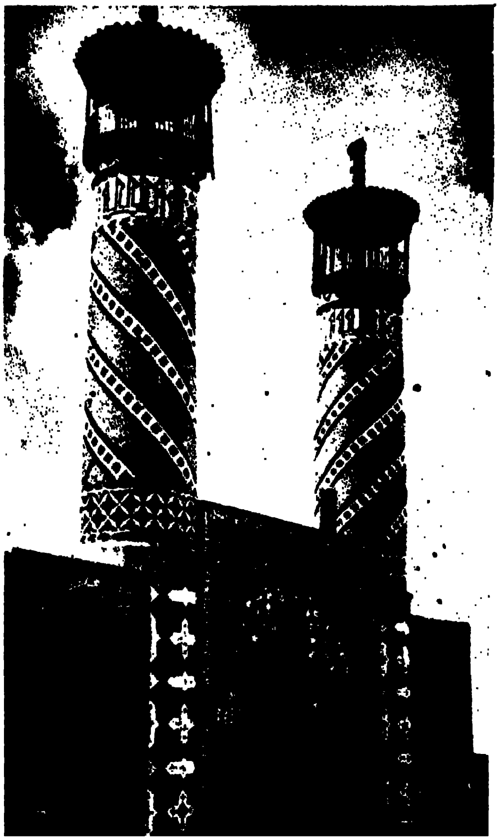
১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে উত্তর পারস্যের সাবাদকুহ্‌ অঞ্চলের আলষ্ট গ্রামে এই যোদ্ধানৃপতি জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পিতা আব্বাস আলি খাঁ ঐ অঞ্চলের সেনানায়ক ছিলেন। তাঁর পিতামহ মুরাদ আলি খাঁ ঐ অঞ্চলের সৈন্যের

উপনায়করূপে হিরাটের যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। কৈশোরে ইনি পিতা পিতামহের সেনাদলে প্রবেশ করেন। কিছুদিন পরে পদোন্নতি হওয়ায় ইনি পারসীক কসাক সৈন্যবিভাগে বদলি হন। ক্রমে হামাদানের সেনা ব্রিগেডের সেনাপতির পদ লাভ করেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রুষবিপ্লবের সময় ইনি রুষ সেনানায়কদের দেশ থেকে বিতাড়িত করেন। ১৯২০ সালে গিলান অঞ্চলের বিদ্রোহ-দমন, ১৯২১ সালে মাজেন্দরানে আমীর মোয়াজেদের বিপ্লবী দলের পরাজয়, আবার গিলানে মীরজা কুচেক খাঁকে পরাজয়, আজরবৈজানে ইস্মাইল আগা সেমিট্কুকে (সিম্‌কো নামে খ্যাত) দমন, খোরাসানে বিদ্রোহী



টেহেরান। মসজিদ সেপাহ্‌ সালারের ভিতরের দৃশ্য

মুহম্মদ তকি খাঁকে পরাজয়, লুরিস্তানে বিদ্রোহশান্তি ইত্যাদি ইনি প্রধান সেনাপতি হিসাবে করেন। এই সময় টেহেরানের দল এঁর ক্ষমতাবৃদ্ধি দেখে হিংসায় অনেক রকম কথাবার্তা আরম্ভ করেন। ইনি দুঃখিত হয়ে পদত্যাগ করায় জনসাধারণ বিশেষ অসন্তুষ্ট হয়ে



টেহেরান। মসজিদ সয়েদ ইস্মায়েল

আন্দোলন আরম্ভ করার দরুণ ইনি পুনর্ব্বার ঐ পদ গ্রহণ করেন। ১৯২৩ সালে ইনি প্রধান মন্ত্রীর পদও গ্রহণ করেন। ১৯২৫ সালে মেজ্‌লিশ (পারস্যের পার্লামেণ্ট) শাহ্‌কে সিংহাসনচ্যুত করে কিছুদিন পরে এঁকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন।

এই সৌম্যদর্শন স্থিরচিত্ত যোদ্ধানৃপতিকে দেখলে একদিকে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ও অন্যদিকে চিন্তাশীলতার বিশেষ আভাস পাওয়া যায়। ইনি দেশের রক্ষণাবেক্ষণ, পথঘাট, শিক্ষা ও সমরবিভাগের জন্য সামান্য ছয় সাত বৎসরে যে-প্রকার অসম্ভব সম্ভব করেছেন তা না দেখলে বিশ্বাস করা দুরূহ।

নিমন্ত্রণ রক্ষার পালা সাজ হয়ে গেল। এবার প্রত্যাবর্ত্তনের কথা। ঠিক হ'ল যে বাগদাদে গিয়ে কবি নৃপতি ফৈজলের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে দেশে ফিরবেন। সুতরাং ভিন্ন পথে ফেরা হবে। পারস্য দরবারও এই ব্যবস্থা সমর্থন করলেন, কেন-না এদিকের পথঘাট ঢের ভাল। পথের সঙ্গী পার্শীর দল (শ্রীযুক্ত ইরাণীর সঙ্গে) অন্য পথে মোহামেরায় জাহাজে উঠবেন ঠিক হ'ল। আমাদের বাগদাদ পৌঁছাবার জন্য শ্রীযুক্ত কৈহান পথের সাথী রক্ষী ও গাইড হিসাবে চল্লেন। ইনি না থাকলে পারস্য-ভ্রমণ ও প্রত্যাবর্ত্তন কি ক'রে সম্ভব হ'ত জানিনে।

পারস্যে কবির এইরূপ বিরাট সম্বর্দ্ধনা ও সম্মানের



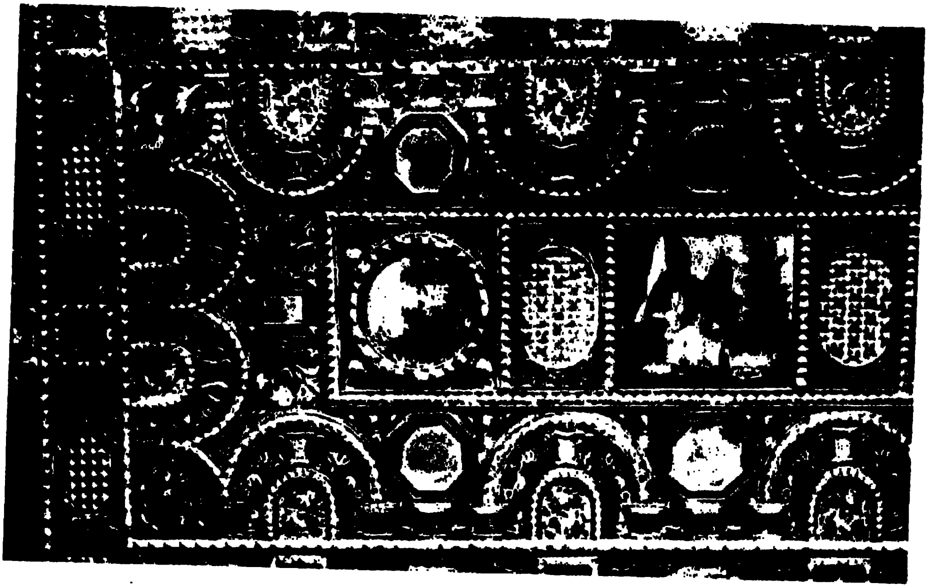
টেহেরান। গোলেস্তাঁ প্রাসাদ প্রাঙ্গন

রণ কি? কবি জগদ্বিখ্যাত এবং সাহিত্যে অমর কীর্ত্তি, কিন্তু তাঁহার রাজনৈতিক বা আর্থিক ক্ষমতা কি আছে যার জন্যে বিদেশে এত তাঁর সমাদর হ'ল? কারণ বোধ হয় প্রথমতঃ "আর্য্য ইরাণ"-মনোবৃত্তির বিকাশ। পারস্যে এখন প্যান মুস্লিম (মুস্লিম-সঙ্ঘের) আন্দোলন প্রায় নিবে গিয়েছে, তার জায়গায় আর্য্য-ইরাণ ভাবের



টেহেরান। মস্‌জিদ সেপাহ্‌ সালারের ছাদ

উদয় ও প্রকাশ হচ্ছে। সুতরাং ভারতীয় আর্য্যভ্রাতার গৌরবে পারস্য নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছে। দ্বিতীয়তঃ, ভারত ও ইরাণের পরস্পরের মধ্যে কৃষ্টি ও মনোভাবের বিনিময় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। প্রাচীনকালের কথা এখনও অতীতের গর্ভে লুকানো আছে, মাঝে মাঝে তার আভাস প্রত্নতত্ত্বের সাহায্যে পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু মধ্য-যুগের কথা এখনও দুই দেশের লোকেরই মনে আছে। দুই দেশেরই সমৃদ্ধি ও দুর্দ্দশা একই ভাবে ঐ সময় হয়েছিল এবং এখনও বোধ হয় হচ্ছে। কাজেই আর্য্যজাতির এই দুই শাখার ভবিষ্যৎ একই পথে চলেছে এ-কথাও হয়ত ইরাণের লোকের মনে আছে। তৃতীয়তঃ, এদেশের সঙ্গে



টেহেরান। কাজে লোথান্তের চিত্রিত ছাদ

সহানুভূতি যদিও সেটা চিন্তাশীল লোকের মনেই আছে, সাধারণের মনে—বিশেষতঃ দক্ষিণ অঞ্চলে—ব্রিটিশ ভারতীয় সেনার পারস্য অধিকারের ফলে এখনও ভারতীয়দের প্রতি বিদ্বেষই আছে। শেষ কারণ পারস্যের আতিথেয়তার প্রাচীন ও বর্ত্তমান আদর্শ। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য জগতের "বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে"ও আছে। এই সকল কারণ মিলে এত বড় ধুমধামের সঙ্গে অভ্যর্থনার সৃষ্টি হয়।

* * *

ইরাণ এখন প্রগতির পথে। গতির বেগ অত্যন্ত দ্রুত বলে হয় ত অনেক কিছু শোভন ও সুন্দরকে বিসর্জ্জন দিতে হচ্ছে। নব্য ইরাণ অগ্রসর হতে দৃঢ়সঙ্কল্প, রীতি-নীতি, শাস্ত্র-পুরাণ, সামাজিক আচারব্যবহার, কিছুই তার পথে বাধা বা বোঝা হিসাবে দাঁড়াতে পাচ্ছে না। প্রাচীনের ধারা হয়ত এতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, কিন্তু তার জন্ত হা-হুতাশ করার প্রয়োজন কি? দেশের যথার্থ উন্নতি এবং প্রাচীন কুসংস্কার ও অন্ত আবর্জ্জনা সম্পূর্ণ পরিষ্কার করার মূল্য হিসাবে যদি প্রাচীন রত্নাবলী বিসর্জ্জন দিতে হয়, ত তাতে দাম কিছুই বেশী দেওয়া হয় না। মধ্যযুগের সংস্কার ও অন্য সকল ব্যাপার ছাপার অক্ষরে পড়তে ভাল, কিন্তু কার্য্যতঃ পণ্ডিতবর্গের তর্কাতর্কির এবং তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর দ্বারা নিম্নতরদের উপর অত্যাচারের পন্থা ছাড়া আর বিশেষ কিছু দাম এর এখন নেই। যা-কিছু গুণ এর এখনও আছে সেগুলি এতটা দোষের মধ্যে চাপা পড়েছে যে, হয়ত সবশুদ্ধ পরিত্যাগ করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা।

তবে এটা সত্য যে, পারস্য যদি সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে, যদি তার জাতীয় মনোবৃত্তিও পাশ্চাত্যের ছাঁচে ঢালা হয়ে যায়, তবে সেটা বিশেষ দুঃখের বিষয় হবে। নূতন ইরাণ এখন ইউরোপেরই অনুকরণে তৈরি করা হচ্ছে। আশা করা যায় যে নব্য ইরাণী ধীরে ধীরে নিজের জাতীয় ভাবের অনুকূল পন্থা আবিষ্কার ক'রে নূতন জাতির গঠন সম্পূর্ণ করবেন।

সমাপ্ত

পঞ্চশস্য

কলের সাহায্যে জাহাজ চালান—

একটি কল আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা দ্বারা মানুষের সাহায্য ভিন্নও জাহাজ চালান সম্ভব হইয়াছে। ইহাতে জাহাজ কখন কোথায় আছে তাহা আপনা আপনিই চিহ্নিত হয়।

—

কাঠের ঘড়ি—

আমেরিকায় একজন ঘড়ি নির্ম্মাতা সম্পূর্ণ কাঠের দ্বারা কয়েকটি ঘড়ি তৈরী করিয়াছেন। এই ঘড়িগুলি ঠিক সময় রাখে।

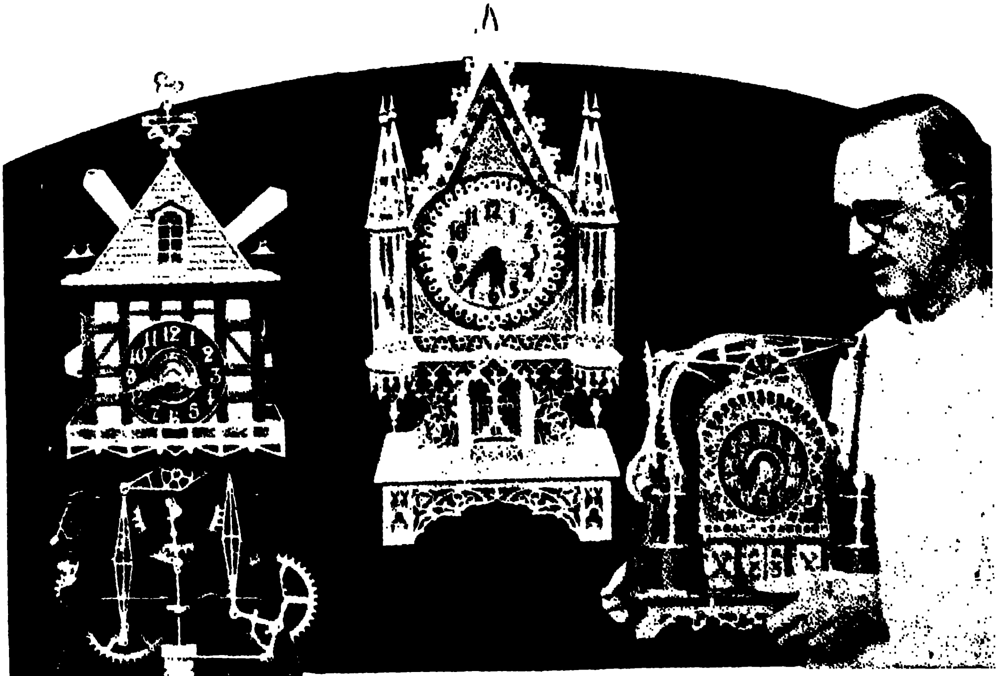
—

গ্যাস প্রতিষেধক শিক্ষা—

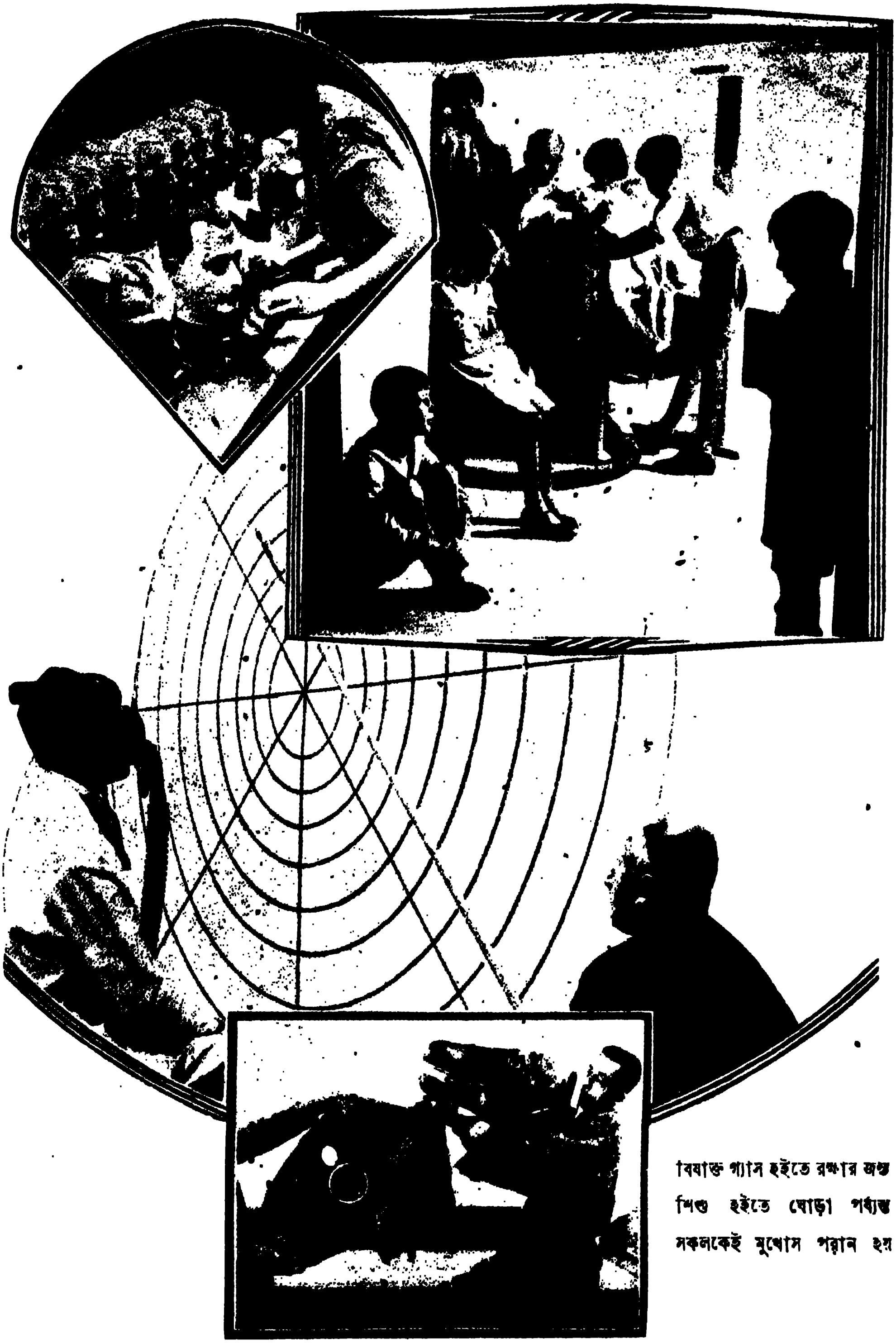
ভবিষ্যতের যুদ্ধে যে অতি বিস্তৃত ভাবে বিষাক্ত গ্যাসের ব্যবহার চলিবে তাহা সর্ব্বজন বিদিত। এই বিপদ হইতে ত্রাণের জন্য এখন হইতেই সকলকে গ্যাসের প্রতিষেধক শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। সঙ্গে এই বিষয়ে জার্ম্মাণীতে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার কয়েকটি চিত্র দেওয়া হইল।



জাহাজ চালাইবার কল

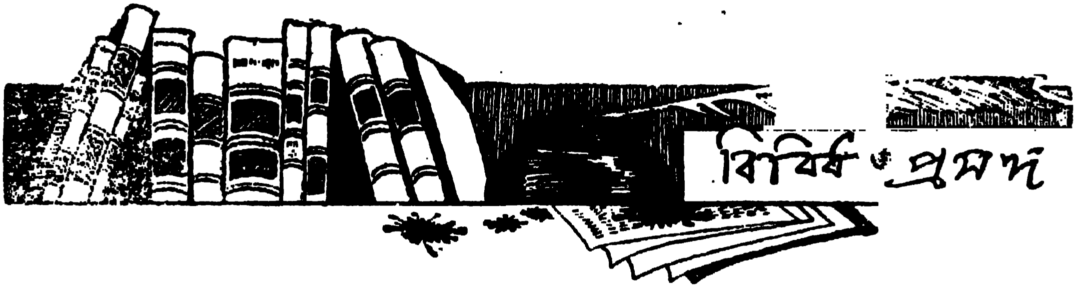


কাঠের ঘড়ি ও উহাদের নির্ম্মাতা



বিষাক্ত গ্যাস হইতে রক্ষার জন্য শিশু হইতে ঘোড়া পর্য্যন্ত সকলকেই মুখোস পরান হয়

জার্ম্মানীতে বিষাক্ত গ্যাসের প্রতিষেধক শিক্ষা



বঙ্গে কথিত নানা ভাষা

আমরা সবাই জানি বাংলা বাঙালীর মাতৃভাষা, বাংলা দেশে লোকে এই ভাষায় কথা বলে। কিন্তু বাংলা ছাড়া আরও যে ১৬৩টি ভাষায় অল্প বা অধিক সংখ্যক লোকে বঙ্গে কথা বলে, তাহা আমাদের কম লোকেরই জানা ছিল। বঙ্গের ১৯৩১ সালের সেন্সস রিপোর্ট হইতে ইহা জানা যায়।

১৬৩টি ভাষার কতকগুলি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত লোকেরা ব্যবহার করে, কতক—যেমন সাঁওতালী—বঙ্গেরই আদিমনিবাসী কোন কোন জাতির মাতৃভাষা, অপর কয়েকটি এশিয়া ও ইউরোপের নানাদেশ হইতে আগত বিদেশীদের মাতৃভাষা। এইরূপ কয়েকটি ভাষা ১৯৩১ সালের সেন্সস অনুসারে সমগ্র বঙ্গে কত লোকের এবং কোন্ জেলায় ও কোন্ কোন্ শহরে কত লোকের মাতৃভাষা তাহার তালিকা নীচে দিতেছি।

হিন্দুস্থানী—সমগ্র বাংলা ১৮৯১৩৩৭, বর্দ্ধমান ৯২৫৯৯, বীরভূম ২৩১৯৫, বাঁকুড়া ৪৬৯২, মেদিনীপুর ৯১৭৪১, হুগলী ৯৫৩৬১, হাবড়া ১২৯৭০৩, চব্বিশ-পরগণা ২৪২১৩৪, কলিকাতা ৪৩৬ ২৩, নদীয়া ১১৫৮৯, মুর্শিদাবাদ ৭৫৮২৬, যশোর ৫০০৬, খুলনা ৩৯৫১ রাজশাহী ৩৩২৬৫, দিনাজপুর ৬৭১৬৫, জলপাইগুড়ি ১২০৬৯৯, দার্জ্জিলিং ২৫০৯৩, রংপুর ৫৩৩৬২, বগুড়া ২৫১০৭, পাবনা ১৭২৯৭, মালদহ ২০১৭৩৫, ঢাকা ৩৫০২৫, মৈমনসিং ৪৯১৮৯, ফরিদপুর ৯৬৯০, বাখরগঞ্জ ৫৫০৬, ত্রিপুরা ৫২১৮, নোয়াখালি ২৮৫, চট্টগ্রাম ৫৬৬৮, চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চল ৪৫, কুচবেহার রাজ্য ১২ ৬৪, ত্রিপুরা রাজ্য ১২৮০৪, হাবড়া শহর ৯০৮৭৭, ঢাকা শহর ২৪৮৯৪।

নেপালী—সমগ্র বঙ্গ ১৩৪১৪৭, বর্দ্ধমান ৯৩৪, বীরভূম ১১, বাঁকুড়া ১১, মেদিনীপুর ৬৭৩, হুগলী ২৪২, হাবড়া ১৯০৪, চব্বিশ-পরগণা ৬৫৫, কলিকাতা ৩৬৯৩, নদীয়া ২৬, মুর্শিদাবাদ ৫২, যশোর ১৬, খুলনা ৩৫, রাজশাহী ৫২, দিনাজপুর ২৮২, জলপাইগুড়ি ২৮৮৭৮, দার্জ্জিলিং ৯২৯৭০, রংপুর ৪৯৫, বগুড়া ৬৫, পাবনা ৫৫, মালদহ ৭৭; ঢাকা ৬০৭, মৈমনসিং ৮৭, ফরিদপুর ৩০, বাখরগঞ্জ ১৯, ত্রিপুরা ৬, নোয়াখালি ১, চট্টগ্রাম ৭৮৪, চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চল ৪৯১, কুচবেহার রাজ্য ১২১, ত্রিপুরা রাজ্য ৮৭৫, হাবড়া শহর ১০২০, ঢাকা শহর ৫০৯।

ওড়িয়া—সমগ্র বঙ্গ ১৫৯৮৫৪, বর্দ্ধমান ১২৮২, বীরভূম ১১২, বাঁকুড়া ১৭০, মেদিনীপুর ৪৫১০১, হুগলী ৯২০৩, হাবড়া ১৮৩৫৮, চব্বিশ-পরগণা ২৭৮৩৩, কলিকাতা ৬৮১৩৫, নদীয়া ৯৩৫, মুর্শিদাবাদ ২৬৯, যশোর ১৭৬৬, খুলনা ১২১২, রাজশাহী ৪৯৮, দিনাজপুর ১৪৬, জলপাইগুড়ি ৪১৭৯, দার্জ্জিলিং ২৮০, রংপুর ৪৬৩, বগুড়া ৩৬৫, পাবনা ৪০১, মালদহ ৮৭, ঢাকা ১২১০, মৈমনসিং ৪৮৬, ফরিদপুর ৬২৭, বাখরগঞ্জ ৭০৬, ত্রিপুরা ১৯৭, নোয়াখালি ১১, চট্টগ্রাম ২৯৯, কুচবেহার রাজ্য ৬৬, ত্রিপুরা রাজ্য ৫৪৫৭, হাবড়া শহর ৫৫১৩, ঢাকা শহর ৯৮৩।

গুজরাটী—সমগ্র বঙ্গ ৬৫৯৪, বর্দ্ধমান ৩০৩, বীরভূম ৪০, বাঁকুড়া ৫২, মেদিনীপুর ৫৮৭, হুগলী ৬৬, হাবড়া ৪৯৪, চব্বিশ পরগণা ৪৯১, কলিকাতা ৩৮৮৩, নদীয়া ৩৭, মুর্শিদাবাদ ৪৪, যশোর ৪, খুলনা ৭, রাজশাহী ৪৬, দিনাজপুর ৩৭, দার্জ্জিলিং ৩১, রংপুর ২৬, বগুড়া ৫, পাবনা ৪৪, ঢাকা ১৯, মৈমনসিং ৭৭, ফরিদপুর ৯১, বাখরগঞ্জ ৫, ত্রিপুরা ৪, চট্টগ্রাম ১১২, কুচবেহার রাজ্য ২৪, ত্রিপুরা রাজ্য ৬৫, হাবড়া শহর ২৩৭, ঢাকা শহর ১৫।

মরাঠী—সমগ্র বঙ্গ ৩১৬১, বর্দ্ধমান ৬৫, বীরভূম ২৭, মেদিনীপুর ১৭২৯, হুগলী ১২, হাবড়া ৪১, চব্বিশ-পরগণা ৫৯, কলিকাতা ১০৩১, মুর্শিদাবাদ ২, রাজশাহী ৫,

দিনাজপুর ১৬, দার্জ্জিলিং ২৮; পাবনা ১, মালদহ ৭, ঢাকা ৪, মৈমনসিং ৩, ফরিদপুর ১৮, নোয়াখালী ১, চট্টগ্রাম ১১১, কুচবেহার রাজ্য ১, হাবড়া শহর ২৯।

পঞ্জাবী—সমগ্র বঙ্গ ১৪৫৫৫, বর্দ্ধমান ৯৫৬, বীরভূম ১৬, বাঁকুড়া ১২, মেদিনীপুর ১৬৪৫, হুগলী ৫৪, হাবড়া ৮৮৩, চব্বিশ-পরগণা ৮৬০, কলিকাতা ৯২০৯, নদীয়া ৪৩, মুর্শিদাবাদ ২৬, যশোর ৫, খুলনা ২৫, রাজসাহী ৫২, দিনাজপুর ১৭, জলপাইগুড়ি ১২৯, দার্জ্জিলিং ১২৩, রংপুর ৭৫, বগুড়া ৯, পাবনা ৩৫, মালদহ ৪৮, ঢাকা ১০, ফরিদপুর ১৭, বাখরগঞ্জ ৯, ত্রিপুরা ৬, চট্টগ্রাম ২৫২, কুচবেহার রাজ্য ২, ত্রিপুরা রাজ্য ২৭, হাবড়া শহর ৪৩৩, ঢাকা শহর ১০।

পশতো ("কাবুলীওয়ালা"দের ভাষা)—সমগ্র বঙ্গ ৪০৮৪, বর্দ্ধমান ২৮০, বীরভূম ১২৮, বাঁকুড়া ৫৪, মেদিনীপুর ১৬৪, হুগলী ২০৫, হাবড়া ২৪০, চব্বিশ-পরগণা ৩০৪, কলিকাতা ৭০০, নদীয়া ৯০, মুর্শিদাবাদ ৫৪, যশোর ৬০, খুলনা ৩৭, রাজশাহী ১৮৫, দিনাজপুর ৩২৬, জলপাইগুড়ি ১৩৬, দার্জ্জিলিং ২৩, রংপুর ৪১৩, বগুড়া ৮৭, পাবনা ৮৬, মালদহ ৮৫, ঢাকা ২৩, মৈমনসিং ৩৩, ফরিদপুর ১১১, বাখরগঞ্জ ৬০, ত্রিপুরা ২৮, নোয়াখালী ১৭, চট্টগ্রাম ১৭, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ২, কুচবেহার রাজ্য ৮৬, হাবড়া শহর ১৫, ঢাকা শহর ৭।

রাজস্থানী (প্রধানতঃ মাড়োয়ারী)—সমগ্র বঙ্গ ১৯৫৭৪, বর্দ্ধমান ১৪১, বীরভূম ৫২০, বাঁকুড়া ২২২, মেদিনীপুর ২২৫, হুগলী ৩০৫, হাবড়া ৮২, চব্বিশ-পরগণা ১২৫, কলিকাতা ৭২৯৭, নদীয়া ৩৭৮, মুর্শিদাবাদ ২১৩, যশোর ৩২, খুলনা ৪৪, রাজশাহী ৪৩৬, দিনাজপুর ৭৯৯, জলপাইগুড়ি ১০১১, দার্জ্জিলিং ১৪৭৫, রংপুর ২০১৯, বগুড়া ৬৪৩, পাবনা ৫০৪, মালদহ ৫৮০, ঢাকা ৫৩, মৈমনসিং ১০০, ফরিদপুর ৫, ত্রিপুরা ৫, কুচবেহার রাজ্য ৬৭৮, হাবড়া শহর ৮২।

তামিল—সমগ্র বঙ্গ ৫৮৫৫, বর্দ্ধমান ১১৪, বীরভূম ১১, বাঁকুড়া ২, মেদিনীপুর ১৫৩৭, হুগলী ৬৪৫, হাবড়া ২৪৮, চব্বিশ-পরগণা ২৬, কলিকাতা ২৫৫৪, নদীয়া ২৫, মুর্শিদাবাদ ১০, খুলনা ৬, রাজশাহী ২, দিনাজপুর ৭, জলপাইগুড়ি ৫৫৩, দার্জ্জিলিং ৪২, রংপুর ২, বগুড়া ২, পাবনা ৮, ঢাকা ২১, ফরিদপুর ৪, বাখরগঞ্জ ১, চট্টগ্রাম ৩৫, হাবড়া শহর ১৯০, ঢাকা শহর ২০।

তেলেগু—সমগ্র বঙ্গ ৩৩১২৫, বর্দ্ধমান ১০৬, বীরভূম ৬, বাঁকুড়া ২৮, মেদিনীপুর ১০৮৬৪, হুগলী ৩৫০৯, হাবড়া ৪৪২৩, চব্বিশ-পরগণা ৮১৭৪, কলিকাতা ৫৩৮৯, নদীয়া ২৬, মুর্শিদাবাদ ৩, যশোর ২, দিনাজপুর ৩, জলপাইগুড়ি ২৬০, দার্জ্জিলিং ৬৭, রংপুর ১৬, পাবনা ৩, ঢাকা ১৬, বাখরগঞ্জ ১, ত্রিপুরা ১৩, নোয়াখালী ১, চট্টগ্রাম ২৯৬, ত্রিপুরা রাজ্য ১৯১৮, কুচবেহার রাজ্য ১, হাবড়া শহর ২৬২২, ঢাকা শহর ৯।

বাংলা দেশে কথিত বঙ্গের বাহিরের আরও কয়েকটি ভাষা উল্লেখযোগ্য। সেগুলি যাঁহাদের মাতৃভাষা, কেবল সমগ্র বঙ্গে তাঁহাদের সংখ্যা দিতেছি। কানাড়ী ১০৯, কাশ্মীরী ৬৩, মলয়ালম ৩০৫ সিন্ধী ৫০৪, আরবী ১৫৪২, চীন ৪৬৪৩, ফারসী ১১১৬, ফরাসী ২২৯, ইতালীয় ২৮৬, পোর্ত্তুগীজ ১৩৮, শ্যাম ২, সুইস্-ফ্রেঞ্চ ৩৭, জাপানী ৫৪৭, সিংহলী ২৫, ডেনিশ ২, ডচ ৬৫, এস্থোনিয়ান ১ (বীরভূমে), ফিনিশ ১১, গেলিক ৯, আইরিশ ৯, জার্ম্মান ৭৪, গ্রীক ৬৩, হাঙ্গেরিয়ান ৩, নরুইজিয়ান ২, রাশিয়ান ৩৯, স্পেনিশ ৪৬, সুইডিশ ৯, ওয়েলশ ৮৭

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

নলহাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ৭১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ধর্ম্মবন্ধু, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভারতী, নব্যভারত, সাধনা, দাসী, প্রদীপ, প্রবাসী, বঙ্গদর্শন (নবপর্য্যায়), সজ্জনতোষিণী, জ্যোতিঃ প্রভৃতি মাসিকপত্রে ইঁহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইঁহাকে শান্তিনিকেতনের তত্ত্বাবধায়ক ও আচার্য্য পদে নিযুক্ত করেন। তখন সেখানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের উপদেশ অনুসারে তিনি "মেয়েলী ব্রত" নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। তাঁহার রচিত "ভক্তচরিতামৃত" (শ্রীমৎ রূপ সনাতন ও জীব গোস্বামীর জীবনবৃত্ত) "হরিদাস ঠাকুর" "রঘুনাথ গোস্বামীর জীবনী"

এবং "শ্রীনিবাস আচার্য্য চরিত" ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণের আদরণীয়। শেষ বয়সে নলহাটীতে বাসকালে তিনি



অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

তথাকার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, টোল বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

—

বঙ্গের অবাঙালী ও বঙ্গের বাহিরের বাঙালী

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে এবং ভারতবর্ষের বাহির হইতে যাহারা বাংলা দেশে আসে, তাহাদের অধিকাংশ বঙ্গে সপরিবারে বাস করে না। এই জন্য অধিকাংশ স্থলে তাহাদের মধ্যে পুরুষদের সংখ্যা বেশী। তাহারা যাহা উপার্জ্জন করে, তাহার অল্প অংশ তাহাদের জীবনধারণের নিমিত্ত বঙ্গে ব্যয়িত হয়; বাকী সঞ্চিত হয় বা বঙ্গের বাহিরে তাহাদের শহর বা গ্রামে প্রেরিত হয়।

বাংলা দেশে যে-সকল অবাঙালী সপরিবারে স্থায়ী ভাবে বাস করে, এখানে ঘরবাড়ি নির্ম্মাণ করে, তাহাদের শতকরা সংখ্যা কম। বঙ্গের বাহিরে যে-সব বাঙালী উপার্জ্জন করিতে গিয়াছিল বা যায়, তাহাদের মধ্যে যাহারা বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে, এবং মধ্যপ্রদেশের কোন কোন জেলায় গিয়াছিল বা যায়, তাহারা অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যায় সেই সব প্রদেশে স্থায়ী ভাবে বসবাস করিয়াছে ও করে। তাহাদের উপার্জ্জনের সমস্তটা বা অধিকতর অংশ বঙ্গের বাহিরে ব্যয়িত বা সঞ্চিত হয়।

বঙ্গের বাহিরের বাঙালী বাস্তবিক কাহারা, তাহা ভাল করিয়া বুঝা উচিত। গবন্মেণ্টের সুবিধার জন্য এমন কয়েকটি জেলা বিহার ও আসামের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে, যেগুলি বাস্তবিক বঙ্গেরই অংশ, কারণ তথাকার অধিকাংশ লোকের মাতৃভাষা বাংলা; যেমন শ্রীহট্ট, মানভূম, ইত্যাদি। এই সকল স্থানের বাঙালী-দিগকে বঙ্গের বাহিরের বাঙালী বলিতেছি না, বলা উচিত নয়। স্বাভাবিক বাংলা দেশ সরকারী বাংলা দেশের চেয়ে বড়।

অনেক অবাঙালীর এই রূপ ধারণা আছে, যে, বাঙালীরা তাহাদের প্রদেশগুলিতে গিয়া খুব বেশী উপার্জ্জন করে। ইহা ভ্রান্ত ধারণা। স্বাভাবিক বঙ্গের বাহিরে ভারতবর্ষের যে-কোন প্রদেশ লওয়া যাক্, দেখা যাইবে যে, তথায় যত বাঙালী রোজগার করে, বঙ্গে তার চেয়ে অনেক বেশী তথাকার লোক রোজগার করে। শুধু তাই নয়। বঙ্গের বাহিরের অল্পসংখ্যক বাঙালী জজিয়তী বা ওকালতীতে কিছু বেশী টাকা রোজগার করিয়াছে বটে; কিন্তু বঙ্গে তার চেয়ে অনেক বেশী উপার্জ্জন করে এক এক জন মাড়োয়ারী, গুজরাটী প্রভৃতি বণিক। বঙ্গের বাহিরে সাধারণ বাঙালী শিক্ষক ও কেরানীদের গড় আয় বঙ্গে পঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, বিহারী ও ওড়িয়া কারিগর, মোটর-চালক ও মজুরদের আয়ের চেয়ে বেশী নয়। বঙ্গে যে ১৮ লক্ষের উপর হিন্দুস্থানীভাষী লোক আছে, তাহাদের প্রত্যেকের গড় খাইখরচ মাসিক ছয় টাকা ধরিলে, তাহা নির্ব্বাহের জন্যই ত তাহাদের মাসিক এক কোটি টাকা বাংলা

দেশে রোজগার করা দরকার। তাহার উপর মাড়োয়ারী গুজরাটী পঞ্জাবী বণিকদের লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন আছে। বস্তুতঃ, বাঙালীরা সকলে মিলিয়া বঙ্গের বাহিরে যত রোজগার করে, অবাঙালীরা সকলে মিলিয়া বঙ্গে তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী রোজগার করে। অধিকন্তু বঙ্গের বাহিরের বাঙালীরা নিজ নিজ কর্ম্মস্থানে আয়ের যত অংশ ব্যয় করে, অবাঙালীরা তাহাদের আয়ের তত অংশ বঙ্গে ব্যয় করে না। কোন কোন অবাঙালী বঙ্গে রাজার হালে থাকে জানি। কিন্তু আমরা অধিকাংশের কথা বলিতেছি।

বঙ্গে অবাঙালীদের রোজগারের এবং বঙ্গের বাহিরে বাঙালীদের রোজগারের পথ ও উপায়ে পার্থক্য আছে। 'প্রবাসী' বাঙালীদের একটা বৃহৎ অংশ সরকারী চাকরির উপর নির্ভর করে, কেহ কেহ বেসরকারী চাকরির উপর নির্ভর করে। মানুষকে চাকরি হইতে বঞ্চিত করা বা তাড়ান অপেক্ষাকৃত সহজ। বঙ্গে উপার্জ্জক অধিকাংশ অবাঙালী শ্রমিক, কারিগর ও ব্যবসাদার। তাহাদের জীবিকা সরকারী চাকরির মত অনিশ্চিত নয়। তাহাদের রোজগারের পথ বন্ধ করা কঠিন। ইহা হইতে বুঝা যায়, শিক্ষিত বাঙালীরা বেশী সংখ্যায় চাকরিজীবী হইয়া ঠিক পথ ধরে নাই।



কিশোরীলাল ঘোষ

কিশোরীলাল ঘোষ

শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল ঘোষ অমৃত বাজার পত্রিকার অন্যতম সহকারী সম্পাদক এবং বঙ্গের শ্রমিকদের অন্যতম নেতা ছিলেন। মীরাট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁহার নাম ছিল। তিনি বেকসুর খালাস পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মুক্তি তাঁহার আত্মীয়-স্বজনদের এবং স্বদেশবাসীদিগের কাজে লাগিল না। দীর্ঘকালব্যাপী ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার সময় তাঁহার যে কঠিন পীড়ার সূত্রপাত হয়, পরিণামে তাহাই তাঁহার অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। ইহাতে সাংবাদিক জগতের ক্ষতি হইয়াছে, এবং শ্রমিকদেরও ক্ষতি হইয়াছে।

বঙ্গের অবাঙালীদের কার্য্য হইতে শিক্ষালাভ

কোন্ ভাষাভাষী কত লোক বঙ্গে, বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় এবং কয়েকটি শহরে আছে, তাহার সংখ্যা নিতান্ত নীরস জিনিষ। তথাপি তাহার তালিকা এই উদ্দেশ্যে দিয়াছি, যে, বাঙালীরা তাহা হইতে দেখিতে পাইবে, কত দূর জায়গা হইতে কত লোক আসিয়া এখানে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, এবং অনেকে ধনী হইতেছে; আর বাঙালীদের মধ্যে বেকার-সমস্যা ভীষণতর আকার ধারণ করিতেছে। প্রত্যেক জেলার লোক অনুসন্ধান করুন, তাঁহাদের জেলায় কোন্ প্রদেশ বা বিদেশ হইতে আগত অবাঙালীরা কি কি কাজ করেন, এবং স্থির করুন তথাকার বাঙালীরা কেন আগে সেই সেই রকমের

কাজ করিতে পারেন নাই বা এখন পারেন না। সমগ্র বঙ্গের বাঙালীরা সন্ধান লউন, অবাঙালীরা কি কি কাজ বঙ্গে করেন। এগুলির মধ্যে এমন কোন কাজ নাই যাহা বাঙালীরা করিতে পারেন না। অন্যদের ঘাড়ে দোষ চাপাইবার চেষ্টা করা বৃথা। নিজেদের দোষত্রুটি খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিলে তাহা অপেক্ষাকৃত অধিক ফলপ্রদ হইবে। অন্যদের ঘাড়ে দোষ চাপাইবার চেষ্টার এক কুফল হয় এই, যে, তাহাতে প্রাদেশিক ঈর্ষ্যাদ্বেষ বাড়ে। বঙ্গের ও অন্য সব দেশের অল্পবুদ্ধি লোকেরা ভাবে, বিদেশীদিগকে তাড়াইয়া দিলেই দেশীয়দের কাজ যুটিবে, শ্রীবৃদ্ধি হইবে। কল্যাণের পথ এত সোজা নয়।

পাঠকগণ দেখিবেন, এক এক ভাষাভাষী অবাঙালীরা সব জেলায় সমান ভাবে ছড়াইয়া পড়ে নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ মাড়োয়ারীদের কথা ধরুন। বর্দ্ধমান জেলার লোকসংখ্যা ১৫৭৫৬৯৯। সেখানে মাড়োয়ারী আছে ১৬৪১ জন। মেদিনীপুর জেলার লোকসংখ্যা ২৭৯৯০৯৩ —বর্দ্ধমানের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু মেদিনীপুরে মাড়োয়ারী আছে ২২৫। ঢাকার লোকসংখ্যা আরও বেশী, ৩৪৩২৫৭৭; অথচ সেখানে মাড়োয়ারী আছে মোটে ৫৩ জন। মৈমনসিংহের লোকসংখ্যা ৫১৩০২৬২, তথায় কিন্তু মাড়োয়ারী আছে ১০০ জন। ত্রিপুরার লোকসংখ্যা ও মাড়োয়ারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩১০৯৭৩৫ ও ৫। মাড়োয়ারীরা প্রধানতঃ ব্যবসাবাণিজ্য ও টাকা ধার দেওয়ার কাজ করে। যে-সব জেলায় মাড়োয়ারী কম, সম্ভবতঃ তথাকার স্থানীয় লোকে ব্যবসাবাণিজ্য ও তেজারতীতে দক্ষ বলিয়া মাড়োয়ারীরা সেখানে ঐরূপ কাজ করা সুবিধাজনক মনে করে নাই। এইরূপ, বঙ্গের যে সব জেলায় দৈহিক শ্রমে পটু লোক অনেক আছে, সেখানে দৈহিক শ্রমে পটু অবাঙালীরা বেশী সংখ্যায় যায় নাই।

—

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বাংলা দেশে আর একজন কর্ম্মীর মৃত্যু হইয়াছে। রংপুরের রবীন্দ্রনাথ মৈত্র কবি, সাংবাদিক, সহৃদয় গল্পলেখক এবং নাট্যকার রূপে পরিচিত ছিলেন। অনুন্নত জাতিসমূহের লোকদিগকে শিক্ষাদান



রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

দ্বারা সমাজে সম্মানিত স্থান দিবার জন্য তিনি প্রভূত পরিশ্রম করিতেন।

—

নোবেল প্রাইজ পাইবার আগে রবীন্দ্রনাথের আদর

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অধ্যাপক পাদরী এড্‌ওয়া[র্ড] টমসনের সঙ্গে আমার মধ্যে মধ্যে পত্রব্যবহার হইত। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাইবার পূর্ব্বে এদেশে তাঁহাকে লোকে বড় একটা পুঁছিত না, মিঃ টমসন তথ[ন] একবার এইরূপ মত প্রকাশ করায়, আমি তাঁহাকে জানাই যে, ঐ মত ভ্রান্ত। প্রমাণস্বরূপ আমি রবিবাবুর পঞ্চাশ ব[ৎসর] বয়স পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত উৎসব প্রভৃতির উল্লেখ করি[য়া] সেই উপলক্ষ্যে 'মডার্ণ রিভিউ' মাসিক পত্রে যাহা লিখি[য়া]

হইয়াছিল, তাহাও নকল করিয়া পাঠাই। তাহাতে মিঃ টমসন নিজের ভ্রম স্বীকার করেন। এই পঞ্চাশ বৎসর পূর্ত্তির উৎসব নোবেল প্রাইজ পাইবার পূর্ব্বে হইয়াছিল।

সম্প্রতি 'কলিকাতা রিভিউ' মাসিক পত্রের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় মিঃ কে সি সেন একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

"Dr. Tagore was not much thought of in his own country until the Nobel Prize was received by him. He personally complained of the shortcomings of his Indian neighbours when the latter hastened to honour him after the Swedish award."—*The Calcutta Review* for February 1933, p. 232.

তাৎপর্য্য। ডক্টর ট্যাগোর নোবেল প্রাইজ পাইবার পূর্ব্বে তাঁহার নিজের দেশে তাঁহার (কব্যাদিসমূহ) সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা ছিল না। সুইডেনের ঐ পুরস্কার ঘোষণার পর যখন তাঁহার ভারতীয় প্রতিবেশীরা তাঁহাকে সম্মান দেখাইবার জন্য ত্বরান্বিত হয়, তখন তিনি স্বয়ং তাহাদের ক্রটির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন।

প্রথমে লেখকের নিজের মন্তব্যের প্রতিবাদ করি। রবীন্দ্রনাথ যখন ৫০ বৎসর বয়স অতিক্রম করেন, তাহার কিছু পরে এবং নোবেল প্রাইজ পাইবার অনেক আগে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে কলিকাতার টাউন-হলে তাঁহাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা হয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ভবনেও তখন তাঁহার সম্বর্দ্ধনা হয়। এই সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে বিচারপতি স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক পূর্ব্বের এই স্বরচিত গানটি পাঠ করেন :—

উঠ বঙ্গভূমি মাতঃ ঘুমায়ে থেকো না আর।
অজ্ঞান তিমিরে তব সুপ্রভাত হলো হের।
উঠেছে নবীন রবি, নব জগতের ছবি,
নব 'বাল্মীকি প্রতিভা', দেখাইতে পুনর্ব্বার।
হের তাহে প্রাণভরে, সুখতৃষ্ণা যাবে দূরে,
ঘুচিবে মনের শ্রান্তি, পাবে শান্তি অনিবার।
'মণিময় ধূলিরাশি,' খোঁজ যাহা দিবানিশি,
ওভাবে মজিলে মন, খুঁজিতে চাবে না আর॥

কলিকাতা টাউন-হলে কবির যে সম্বর্দ্ধনা হয়, ১৩১৮ সালের ফাল্গুনের 'প্রবাসী' হইতে তাহার বর্ণনার কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।—

"বর্ত্তমান বৎসর বৈশাখ মাসে কবি রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশ বৎসর বয়স অতিক্রম করিয়া একান্ন বৎসরে পদার্পণ করেন। তদুপলক্ষ্যে বোলপুরে তাঁহার বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ সবান্ধবে তাঁহার জন্মোৎসব করেন এবং তাঁহাকে প্রীতি ও ভক্তির অঞ্জলি অর্পণ করেন। হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ সম্পদের এমন আদানপ্রদান আমরা কখনও দেখি নাই। তৎপরে গত ১৪ই মাঘ কলিকাতা টাউন-হলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে বাঙ্গালী জাতির এক সভায় কবির সম্বর্দ্ধনা হয়। টাউন হলে এই উপলক্ষ্যে এরূপ জনতা হইয়াছিল, যে, যাঁহারা অল্পমাত্র বিলম্বে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রবেশ করিতে না পারিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, কিম্বা ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। সভাস্থলে আবালবৃদ্ধবনিতা সর্ব্বশ্রেণীর লোক উপস্থিত ছিলেন। সাধুতা ও উন্নত চরিত্রের জন্য যাঁহারা সুপরিচিত, যাঁহারা জ্ঞানে ধর্ম্মে উন্নত, যাঁহারা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা সাহিত্যক্ষেত্রে যশস্বী, যাঁহারা চিত্রে সঙ্গীতে বাণীর বর লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা অধ্যয়ন অধ্যাপনা ও জ্ঞানানুশীলনে নিরত, যাঁহারা ব্রাহ্মণের প্রাচীন সংস্কৃত বিদ্যার প্রদীপ এখনও নিবিতে দেন নাই, যাঁহারা ব্যবহারাজীবের কার্য্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা রাজনীতিকুশল, যাঁহারা বিচারাসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন, যাঁহারা শিল্পবাণিজ্যে বঙ্গে নবযুগের প্রবর্ত্তক, যাঁহারা আভিজাত্যে ও ঐশ্বর্য্যে বঙ্গে অগ্রণী, তাঁহাদের স্ব-স্ব শ্রেণীর প্রতিনিধিকল্প বহু কৃতী পুরুষ ও মহিলা সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গমাতার কন্যাগণও কবিকে প্রীতিভক্তিকৃতজ্ঞতাপ্রদর্শনে পশ্চাৎপদ হন নাই। জাতীয় কবির সম্বর্দ্ধনা ধর্ম্মানুষ্ঠানেরই মত পবিত্র। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় যোগ দিয়াছিলেন বঙ্গের যুবকগণ। তাঁহাদের উৎসাহদীপ্ত মুখশ্রী হলের সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইতেছিল।"

"টাউন-হলের সভা ভিন্ন আরও একদিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ছাত্রসভ্যগণ, এবং একদিন সম্বর্দ্ধনা কমিটির সভ্যগণ সান্ধ্য সম্মিলনে রবীন্দ্রনাথকে প্রীতিশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।"

রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে চৌরঙ্গীর ফোটোগ্রাফার হপ সিং এণ্ড্ কোম্পানী "জগৎকবি-সভা"র

একটি ছবি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেই ছবির নীচে পরলোকগত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে রচিত এই দুই পংক্তি কবিতা লিখিত ছিল :—

"জগৎ-কবি-সভায় মোরা তোমার করি গর্ব্ব ;
বাঙালী আজি গানের রাজা, বাঙালী নহে খর্ব্ব।"

এই চিত্রে শেকস্‌পীয়র, টলষ্টয়, গাটে, ভিক্টর হিউগো, বার্ণস, ওয়াল্ট হুইটম্যান, ও মধ্যস্থলে রবীন্দ্রনাথের ছবি ছিল। এই চিত্রের প্রতিলিপি ১৩২০ সালের শ্রাবণের প্রবাসীর ৪৭৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছিল।

আমরা উপরে যাহা লিখিলাম, তাহা হইতে বুঝা যাইবে, যে, নোবেল প্রাইজ পাইবার পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশবাসীদের অবহেলা ও অনাদরের পাত্র ছিলেন না, পরন্তু তাহাদের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিন্দুক তখনও ছিল, এখনও আছে। তিনি নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর নিন্দুকদের প্রকাশ্য নিন্দা কমিয়াছে, এই প্রভেদ।

তিনি নোবেল প্রাইজ পাইবার পর যাঁহারা কলিকাতা হইতে স্পেশ্যাল ট্রেন করিয়া শান্তিনিকেতনে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে গিয়াছিলেন, কবি তাঁহাদের অভিনন্দনের উত্তরে কিছু স্পষ্ট কথা শুনাইয়াছিলেন বটে। আমরা এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটি ঘটিবার পর প্রকাশিত প্রবাসীর কোন সংখ্যায় উহার উল্লেখ করি নাই; সমালোচনা ত করিই নাই। এখন কলিকাতা রিভিউয়ের লেখকের কথার প্রতিবাদ উপলক্ষ্যে উহার উল্লেখ করিতে হইল। কিন্তু সমালোচনা এখনও করিব না। তাঁহার ভুল হইয়াছিল, আমাদের ধারণা এইরূপ।

—

বিহারীলাল মিত্র

বিহারীলাল মিত্র বাগবাজারের বিখ্যাত মিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলায় কয়েকখানি ভাল বহি লিখিয়াছিলেন এবং ইংরেজীতে যোগবাশিষ্ঠের অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। "দি রেফিউজ" নামে বৌবাজারে অসহায় চিররুগ্ন লোকদের যে আশ্রয়স্থান আছে,তাহার বাটী নির্ম্মাণের জন্য তিনি পঁচাত্তর হাজার টাকা দিয়াছিলেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান সভার জন্য তিনি এক লক্ষ টাকা দান করেন। তাঁহার উইলে তিনি নারী-শিক্ষার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বরাবর বার্ষিক আটচল্লিশ হাজার টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই দানটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা দেশে ছেলেদের শিক্ষার জন্য বড় দান কেহ কেহ করিয়াছেন, কিন্তু মেয়েদের শিক্ষার জন্য এরূপ দান এ-পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই। মেয়েদের শিক্ষার জন্য বড় দান বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে অনেকে করিয়াছেন।

—

ভারত-গবর্ন্মেণ্টের অতীত ও বর্ত্তমান বজেট

ভারত গবর্ন্মেণ্টের বজেটের বিস্তারিত সমালোচনা করিব না। দু-একটা কথা বলিব।

বাংলা-গবর্ন্মেণ্টের ব্যয়-হ্রাসের উপায় এবং দিঙ্-নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত উক্ত গবর্ন্মেণ্ট যে কমিটি নিযুক্ত করেন, সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত তাহার রিপোর্টে দেখিতে পাই, ১৯২১-২২ সালে ভারত-গবর্ন্মেণ্টের মোট রাজস্ব ছিল ৬৪,৫২,৬৬,০০০ টাকা। ভারত-গবর্ন্মেণ্টের রাজস্ব-সচিবের যে বজেট-বক্তৃতা গত ২৮শে ফেব্রুয়ারীর ইণ্ডিয়া গেজেটে বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখি ১৯৩১-৩২ সালে ভারত-গবর্ন্মেণ্টের রাজস্ব হইয়াছিল ১২১,৬৪,০০,০০০ টাকা। অর্থাৎ দশ বৎসরে ভারত-সরকারের রাজস্ব মোটামুটি ৬৪ কোটির জায়গায় ১২১ কোটি হইয়াছে। সরকার এই যে দ্বিগুণ রাজস্ব আদায় করিতেছেন, মোটের উপর তাহা ভারতবর্ষের লোকরাই দিতেছে। জিজ্ঞাস্য এই, আমরা কি দশ বৎসরে দ্বিগুণ ধনী হইয়াছি? ভারতীয় জনগণ দ্বিগুণ ধনী হওয়া দূরে থাক্, তাহারা দশ বৎসরে যে দরিদ্রতর হয় নাই, তাহাই অনেকে প্রমাণসাপেক্ষ মনে করেন। সে-প্রমাণের অনুসন্ধান না করিয়া একথা জোর করিয়া বলা যায়, ভারতীয় জনসাধারণ নিশ্চয়ই দ্বিগুণ ধনী হয় নাই। তাহা যখন হয় নাই, তখন তাহাদের নিকট হইতে নানা লক্ষিত ও অলক্ষিত উপায়ে দ্বিগুণ ট্যাক্স আদায় করা কি ন্যায়সঙ্গত? এই প্রকারে

তাহাদিগকে করভারপ্রপীড়িত করা কি তাহাদের নানাবিধ অকল্যাণের কারণ নহে ?

আমরা ১৯২১-২২ সালের রাজস্বের কথা বলিয়াছি। আরও দশ বৎসর আগে ১৯১১-১২ সালে,ভারত-গবর্ন্মেণ্টের সাধারণ (General) রাজস্ব ছিল ৩৩,৩১,০৫,০৭৭ টাকা। ইহা আমরা ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের স্টেটস্‌ম্যান্স ইয়্যার বুক (Statesman's Year Book) নামক বার্ষিক প্রামাণিক পুস্তক হইতে লইলাম। ১৯১১-১২ হইতে ১৯৩১-৩২ কুড়ি বৎসর। কুড়ি বৎসরে ভারত-সরকারের রাজস্ব প্রায় চারি গুণ বাড়িয়াছে! ভারতীয়েরা কি কুড়ি বৎসরে চারি গুণ ধনী হইয়াছে ? কখনই না।

১৯৩২-৩৩ সালে মোট রাজস্ব আনুমানিক ১২৭,১৩,০০,০০০ হইবে ধরা হইয়াছে। ১৯৩৩-৩৪ সালে আয় ১২৪,৫২,০০,০০০ টাকা হইবে অনুমান করা হইয়াছে।

রাজস্ব এত বেশী হওয়া সত্ত্বেও রাজস্ব-সচিব কোন ট্যাক্স কমাইবার প্রস্তাব করেন নাই, কিন্তু ভারত-সরকারের কর্ম্মচারীদের গত বৎসর যে শতকরা দশ টাকা বেতন হ্রাস করা হইয়াছিল, এ-বৎসর সেই হ্রাস শতকরা পাঁচ করা হইয়াছে। যেন, একমাত্র সরকারী কর্ম্মচারীরাই দারিদ্র্যপীড়িত, আর কাহারও বোঝা কমাইবার আবশ্যক নাই !

তিনি বলিয়াছেন, এবার কোন নূতন ট্যাক্স বসান হয় নাই। কিন্তু বস্তুতঃ প্রকারান্তরে একটি নূতন ট্যাক্স বসান হইয়াছে। ব্যাঙ্কের চেক্ দ্বারা টাকা লওয়া দেওয়ার সময় তাহাতে ষ্ট্যাম্প লাগাইয়া নাম সহি করিবার নিয়ম হইয়াছে। ইহা ত নূতন ট্যাক্স।

বঙ্গের বজেট

বাংলা দেশের ১৯৩২-৩৩ সালের সরকারী সংশোধিত আয়-ব্যয়—

আয়	৯,৪৫,৫৭,০০০ টাকা।
ব্যয়	১০,৮৩,০৬,০০০ ,,
ঘাটতি	১,৩৭,৪৯,০০০ ,,

১৯৩৩-৩৪ সালের আনুমানিক আয়ব্যয়—

আয়	৯,৪৮,৮৭,০০০ টাকা।
ব্যয়	১১,৩২,২৪,০০০ ,,
ঘাটতি	১,৮৩,৩৭,০০০ ,,

অতএব ১৯৩২-৩৩ অপেক্ষা ১৯৩৩-৩৪ সালে ঘাটতি বেশী হইবে। কারণ, বঙ্গে শাক্ত শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ার ফলে এরূপ শান্তি স্থাপিত হইয়াছে, যে, তজ্জন্য পুলিস জেল প্রভৃতি বিভাগে ব্যয় বাড়াইতে হইবে।

রাজস্ব সম্বন্ধে বাংলা দেশের প্রতি দীর্ঘ কাল ধরিয়া কিরূপ অবিচার হইতেছে, তাহা অনেক বার বলিয়াছি; আবার সংক্ষেপে বলিতেছি। ভারতবর্ষের যতগুলি বড় প্রদেশ আছে, তাহার মধ্যে বঙ্গের লোকসংখ্যা সব চেয়ে বেশী। অথচ এই সব বড় প্রদেশগুলির প্রত্যেকটি, অর্থাৎ পঞ্জাব, আগ্রা-অযোধ্যা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ বাংলার চেয়ে অনেক বেশী রাজস্ব প্রাদেশিক ব্যয়ের জন্য রাখিতে পায় দীর্ঘ কাল এইরূপ অন্যায় ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। আগ' ১৯৩৩-৩৪ সালেও তাহা চলিবে। তাহার একটা মাত্র ,, স্ত দিতেছি। ১৯৩৩-৩৪ সালে বঙ্গের ও বোম্বাইয়ের আনুমানিক আয়ব্যয় নীচের তালিকায় দিলাম।

প্রদেশ	লোক-সংখ্যা	টাকায় আয়	টাকায় ব্যয়
বঙ্গ	৫০১২২৫৫০	৯৪৮৮৭০০০	১১৩২২৪০০০
বোম্বাই	২২২৫৯৯৭৭	১৪৮৬০০০০০	১৫২১০০০০০

বঙ্গের লোকসংখ্যা বোম্বাইয়ের প্রায় আড়াই গুণ। অথচ বাংলা-সরকার খরচ করিতে পান বোম্বাই-সরকারের চেয়ে অনেক কম।

বাংলা-সরকার যে বোম্বাই-সরকারের চেয়ে অনেক কম রাজস্ব খরচ করিতে পান, তাহার কারণ এ নয়, যে, বঙ্গে রাজস্ব আদায় হয় কম; কারণ এই, যে, বঙ্গে সংগৃহীত রাজস্ব খুব বেশী পরিমাণে ভারত-সরকার শোষণ করেন। তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। বঙ্গীয় ব্যয়সংক্ষেপ কমিটির সরকারী রিপোর্টে আছে, ১৯২১-২২ সালে ভারত-সরকারের মোট রাজস্ব ৬৪,৫২,৬৬,০০০ টাকার মধ্যে একা বাংলা দেশকেই দিতে হইয়াছিল ২৩,১১,৯৮,০০০ টাকা! বঙ্গের রাজস্ব অতিরিক্তরূপে শোষণ ঐ বৎসরই হইয়াছিল বা ঐ বৎসরই শেষ হইয়াছে, এমন নয়। ১৯২৮-২৯ সালে ভারত-গবর্ন্মেণ্ট কোন্ প্রদেশ হইতে কত টাকা লইয়াছিলেন, নীচে তাহার তালিকা দিতেছি।

প্রদেশ।	ভারত-সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত টাকা।
মান্দ্রাজ	৭,১৪,০০,০০০
বোম্বাই	৫,৮৪,০০,০০০
আগ্রা-অযোধ্যা	৭,১৭,০০,০০০
পঞ্জাব	৩,৪৬,০০,০০০
বিহার-উড়িষ্যা	৫,৭৬,০০,০০০
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	২,২৫,০০,০০০
আসাম	১,২৭,০০,০০০
বঙ্গ	১৬,৫৯,০০,০০০

বাংলা দেশের নীচেই যে দুটি প্রদেশ হইতে ভারত-সরকার বেশী টাকা লইয়াছেন, তাহা আগ্রা-অযোধ্যা ও মান্দ্রাজ। কিন্তু এই দুই প্রদেশ হইতে গৃহীত টাকার সমষ্টি ১৪ কোটি ৩১ লক্ষ, আর একা বাংলাকেই দিতে হইয়াছে ১৬ কোটি ৫৯ লক্ষ! বঙ্গে "লাঠি-চার্জ"টা পড়ে অবশ্য অরাজভক্ত অসহযোগীদের ঘাড়ে, কিন্তু ভারত-সরকারের আর্থিক দাবির চার্জটা রাজভক্ত অরাজভক্ত নির্বিশেষে সকলের উপরই পড়ে।

বঙ্গের রাজস্ব-সচিব আশা দিয়াছেন, পাটের শুল্কের কতক অংশ পরে বাংলা রাখিতে পাইবে, এবং বঙ্গে আদায়িত ইন্‌কম্‌-ট্যাক্সও বাংলা কিছু পাইতে পারে। ভারত-সরকার এই দয়ার জন্য কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা রাখেন কিনা জানি না। কিন্তু আমরা ভুলিতে পারি না, যে, পাট বঙ্গের প্রায় একচেটিয়া উৎপন্ন দ্রব্য এবং এ-পর্য্যন্ত ভারত-গবন্মে‌ণ্ট পাট-শুল্ক হইতে ৪০ কোটি টাকার উপর পাইয়াছেন। বঙ্গের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার এরূপ খুচরা টুকরা-টাকরা দয়ার দ্বারা হইবে না, রাজস্বের কোন দফাটাকে প্রাদেশিক আর কোনটাকে কেন্দ্রীয় বা ভারতীয় নাম দিলেই অন্যায় ন্যায়ে পরিণত হইবে না—বাঙালী তাহাতে ভুলিবে না। বঙ্গের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার দ্বারা বাঙালীকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে, বাংলার লোকসংখ্যা যেমন অন্য সব প্রদেশের চেয়ে বেশী, বঙ্গে নানাবিধ রাজস্বের সমষ্টি যেরূপ বেশী, বাংলাকে নিজের ব্যায়ের জন্য সেই অনুপাতে বেশী টাকা রাখিতে দিতে হইবে।

বঙ্গের প্রতি আর্থিক অবিচার দীর্ঘ কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। কোম্পানীর আমলে বঙ্গের রাজস্ব ব্যয় করিয়া ইংরেজরা অন্য অনেক প্রদেশ জয় করিয়াছিল, বঙ্গের রাজস্ব হইতে অন্য অনেক প্রদেশের ঘাটতি পুরাইয়া দেওয়া হইত। বাংলা হইতে গৃহীত এই টাকা বাংলা দেশ কখনও ফিরিয়া পায় নাই। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়েও বাংলা দেশে সংগৃহীত রাজস্ব বাংলা-গবন্মে‌ণ্ট অপেক্ষা ভারত-সরকার বেশী পাইয়াছেন। ১৯১৫ সালের স্টেট্‌স্‌ম্যান্‌স্‌ ইয়ার বুকের ১৩৯ পৃষ্ঠায় এইরূপ একটা হিসাব আমাদের চোখে পড়িল। নীচের তালিকায় তাহা দিলাম। টাকার পরিমাণ লক্ষে দেওয়া হইল। ভারত-সরকারের গৃহীত টাকার পরিমাণ আমরা বসাইয়া দিয়াছি।

প্রদেশ।	মোট রাজস্ব।	প্রাদেশিক ব্যয়।	ভারতসরকার-গৃহীত।
বাংলা	১৭৮৪	৮০৯	৯৭৫
বিহার-উড়িষ্যা	৪৩০	৩৮১	৪৯
আগ্রা-অযোধ্যা	১১৪৩	৮৫৮	২৮৫
পঞ্জাব	৮৩৭	৬১৯	২১৮
মান্দ্রাজ	১৫৫২	৯০৫	৬৪৭
বোম্বাই	১৮৯৫	৯৯১	৯০৪

সে দিন বঙ্গের রাজস্ব-সচিব মিঃ উডহেড তাঁহার বজেট বক্তৃতায় আফসোস করিয়াছেন, যে, সরকারী আর্থিক দুরবস্থা যখন প্রত্যেক বিষয়ে মিতব্যয়িতার দাবি করিয়াছে, তখন অরাজকতার পুষ্টিসাধকেরা এই প্রদেশকে গত তিন বৎসরে এক কোটি সওয়া বাইশ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করাইয়াছে, ইহা দুর্ভাগ্য অপেক্ষাও অধিক কিছু। ইহা দুর্ভাগ্য বটে এবং দুঃখের বিষয়ও বটে। কিন্তু যখন বঙ্গে অরাজকতার পুষ্টিসাধকেরা ছিল না, তখনও বঙ্গের প্রাদেশিক আয়ব্যয়ের ব্যবস্থা কেন সন্তোষজনক ছিল না? তা ছাড়া, একটি সভ্যতম শাসক-সম্প্রদায়ের আমলে দেশে অরাজকতার জন্ম ও বিদ্যমানতার জন্য উচ্চবেতনভোগী রাজপুরুষদের কি কোন জবাবদিহি নাই? অরাজকতার পুষ্টিসাধন সাক্ষাৎ ভাবে হয়, পরোক্ষভাবেও হয়। উহার উচ্ছেদসাধন করিতে হইলে ঔষধপ্রয়োগ দুই দিকেই হওয়া চাই।

গত সেণ্ট এণ্ড্রু বাসরের ভোজে বঙ্গের গবর্ণর বলিয়াছিলেন, বাংলা দেশের গতি নিম্নাভিমুখ হইয়াছে। তাহা অনেকটা সত্য বটে। কিন্তু তাহার জন্য দায়ী শুধু বাঙালীরা নহে। বঙ্গের বাণিজ্য ও কারখানা আদির অধিক অংশ বাঙালীদের অধিকারবহির্ভূত হইয়াছে। তাহা

অনেকটা বাঙালীদের দোষে হইতে পারে, কিন্তু সবটা নয়। বঙ্গে সংগৃহীত রাজস্বের বেশী অংশ যে বঙ্গের জন্য ব্যয়িত না হইয়া ভারতবর্ষের অন্য কোন কোন অংশের সুবিধা ও লাভের জন্য ব্যয়িত হয়, তাহার জন্য বাঙালীরা দায়ী নহে। সমগ্রভারতের কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্টের যাহা ব্যয়, তাহার কিয়দংশ নির্ব্বাহ করা অবশ্যই বঙ্গেরও কর্ত্তব্য। কিন্তু বাংলা দেশকে অন্য যে-কোন প্রদেশ অপেক্ষা, অন্য যে-কোন দুইটি প্রদেশের সমষ্টি অপেক্ষা, ভারত-গবন্মেণ্টের বোঝা বহিতে বলা সাতিশয় অযৌক্তিক ও অন্যায়। বাংলাকে এইরূপ অতিরিক্ত ভার বহন করিতে হয় বলিয়া বঙ্গের শিক্ষা শিল্প বাণিজ্য কৃষি স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্য সামান্য অর্থই ব্যয়িত হয়। বঙ্গের নিম্নাভিমুখ গতির ইহা একটি প্রধান কারণ।

—

একখানি নূতন বাংলা অভিধান

শান্তিনিকেতনের পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক বৎসর ধরিয়া একখানি বৃহৎ বাংলা অভিধান রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। সম্প্রতি তিনি উহার মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ করিয়াছেন। হস্তলিখিত অবস্থায় উহা আমরা দেখিয়াছিলাম। মুদ্রিত একখণ্ডও দেখিলাম। উহার এক একটি পৃষ্ঠা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রবাসীর পৃষ্ঠা অপেক্ষা বড়। সম্পূর্ণ হইলে এইরূপ আকারের আনুমানিক ৪০০০ পৃষ্ঠা হইবে। সুতরাং ইহা বর্ত্তমান সব বাংলা অভিধান অপেক্ষা বড় হইবে। এই মূল্যবান গ্রন্থখানির দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চার বিশেষ সুবিধা হইবে এবং তদ্দ্বারা পরোক্ষভাবে আমাদের ভাষা ও সাহিত্য আরও সমৃদ্ধ হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এরূপ বহুব্যয়সাধ্য অভিধান প্রকাশের ভার বিশ্বভারতী কিংবা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা কোন বড় পুস্তকপ্রকাশক লইলে পণ্ডিত মহাশয়ের মত একজন সাধারণ গৃহস্থ নিরুদ্বেগ হইতে পারিতেন।

গ্রন্থখানি খণ্ডে খণ্ডে পাইবার মূল্যাদি সম্বন্ধে সমুদয় বৃত্তান্ত শান্তিনিকেতন ডাকঘরের ঠিকানায় পণ্ডিত মহাশয়কে চিঠি লিখিলে জানিতে পারা যাইবে।

—

"হরিজন" ছাত্রদের শিক্ষার সাহায্য

যাহাদিগকে আগে অস্পৃশ্য বলা হইত, মহাত্মা গান্ধী তাহাদের হরিজন নাম দিয়াছেন। নামটির মানে ভাল। কিন্তু ইহাতে এই প্রশ্ন উঠে, যে, অন্য সব মানুষেরা কি হরির সৃষ্ট বা আশ্রিত নহে? অধিকন্তু হরিজন কাহারা জিজ্ঞাসা করিলে ব্যাখ্যার জন্য অতি গর্হিত অস্পৃশ্যতা রীতির কথাই আসিয়া পড়ে। সুতরাং "হরিজন" নামটি দ্বারা অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের অবস্থার কোন উন্নতি হইয়াছে মনে হয় না।

ইহাদের উন্নতির একটি প্রধান উপায় শিক্ষা, স্থির করিয়া মহাত্মা গান্ধী ঠিক্ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অনুন্নত শ্রেণীসমূহের শিক্ষার চেষ্টা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন সমিতি বহু বৎসর আগে হইতেই করিতেছেন। বাংলা ও আসামে অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতিবিধায়িনী সমিতি কুড়ি বৎসরের অধিক কাল এই কাজ করিতেছেন। এই কার্য্যে এই সমিতির বার্ষিক ব্যয় আশী হাজার টাকার অধিক হইয়া থাকে। সম্প্রতি অস্পৃশ্যগণের সেবক সমিতির (Servants of the Untouchables Society) সাধারণ সম্পাদক খবরের কাগজের মারফতে জানাইয়াছেন, যে, সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী এই সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বিড়লা হরিজন ছাত্রদিগের শিক্ষার সাহায্যের জন্য মোট ৫৩৪০০ টাকা খরচ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। নূতন ছাত্রাবাস নির্ম্মাণ, বর্ত্তমান ছাত্রাবাসগুলিকে সাহায্য দান, খাইখরচ বা স্কুল ও কলেজের বেতন দানে সাহায্যার্থ বৃত্তিদান, পরীক্ষার ফী দিবার সাহায্য দান, পাঠ্যপুস্তক ক্রয় প্রভৃতির জন্য এই টাকা খরচ করা হইবে। সমিতির প্রাদেশিক বোর্ড বা উপসমিতিগুলি নিজ নিজ প্রদেশে বার্ষিক কত টাকা খরচ করিতে পারিবেন, তাহার তালিকা এইরূপ দেওয়া হইয়াছে:—

আসাম ১৮০০, অন্ধ্র ২৮৫০, বঙ্গ ৬০০, বেরার ১২০০, বিহার ৪৮০০, বোম্বাই শহর ও শহরতলী ৩০০০, হিন্দীভাষী মধ্যপ্রদেশ ৩০০০, মরাঠীভাষী মধ্যপ্রদেশ ১২০০, দিল্লী ৯০০, গুজরাট ৩০০, মান্দ্রাজ শহর ১৫০০, মহারাষ্ট্র ২৪০০, মালাবার ও দক্ষিণ কানাড়া প্রত্যেকে ৩০০, উড়িষ্যা ২৫৫০, পঞ্জাব ৩০০, রাজ-

পুতানা ২৭০০, সিন্ধু ১৫০০, তামিল নাড়ু ৩৫০০; মোট ৫৩৪০০।

ভারতবর্ষের মত বড় দেশের পক্ষে বার্ষিক ৫৩৪০০ টাকা বিশেষ কিছু নয়। তথাপি উদ্যোক্তারা যে এত টাকা সংগ্রহ ও ব্যয় করিতে পারিতেছেন, ইহা প্রশংসার বিষয়।

এক একটা প্রদেশ, জেলা, ও শহরের জন্য টাকার বরাদ্দ কি নীতি অনুসারে করা হইয়াছে, তাহা লিখিত না হওয়ায় আমরা বুঝিতে পারি নাই। বাংলা দেশের হরিজনদিগকে ব্যবস্থাপক সভায় সাধারণ অর্থাৎ প্রধানতঃ হিন্দুদের ৮০টি আসনের মধ্যে পুনা চুক্তি অনুসারে ৩০টি আসন দিতে হইবে। ইহা অপেক্ষা বেশী আসন তাহাদিগকে অন্য কোন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় দেওয়া হয় নাই। পুণা চুক্তি মহাত্মাজীর অনুমোদিত। অস্পৃশ্যসেবক সমিতিও তাঁহার অনুমোদিত। পুনা চুক্তি অনুসারে যে-বাংলা দেশের ৮০টি হিন্দু আসনের ৩০টি হরিজনদের প্রাপ্য, সেই দেশে নিশ্চয়ই খুব বেশী হরিজন থাকিবার কথা। অথচ সমিতি এত বড় দেশের জন্য বার্ষিক ৬০০ টাকা বরাদ্দ করিতেছেন, আর মান্দ্রাজ শহরটির জন্য ১৫০০ টাকা এবং বোম্বাই শহর ও শহরতলীর জন্য ৩০০০ টাকা বরাদ্দ করিতেছেন! পুনা চুক্তি অনুসারে বাংলা দেশে হরিজনদের সংখ্যা খুব বেশী, আবার অস্পৃশ্যসেবক সমিতির সভাপতির বরাদ্দ অনুসারে বঙ্গে হরিজনরা সংখ্যায় মান্দ্রাজ শহরের হরিজনদের চেয়েও কম এই দুই বিপরীত সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য করা যায় কি প্রকারে? কেহ বলিতে পারেন, বাংলা দেশের হরিজনরা এত অগ্রসর ও উন্নত, যে, তাহাদের শিক্ষার জন্য বেশী খরচ করা অনাবশ্যক। কিন্তু তাহারা যদি এতই অগ্রসর ও উন্নত, তাহা হইলে তাহাদের জন্য ৩০টা আসন আলাদা চিহ্নিত করিয়া রাখিবার কি দরকার ছিল? তাহারা ত অ-হরিজনদের সঙ্গে অবাধ প্রতিযোগিতার দ্বারাই ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে পারে? এ-পর্য্যন্ত অনেকে করিয়াছেও। অন্য কেহ হয়ত বলিবেন, বাংলা দেশের হরিজনদের শিক্ষাবিধায়ক অন্য লোকেরা আছেন বলিয়া বাংলা দেশকে সামান্য টাকা দেওয়া হইয়াছে। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থাপক সভার আসন বিলির সময় পুনাচুক্তিকারী অবাঙালীরা বাংলা দেশের উপর মুরুব্বিয়ানা না-করিলেই ভাল হইত। বাংলা দেশের আসন ভাগ পুনাচুক্তির সময়ে বাঙালীদের সহিত পরামর্শ করিয়া না হইয়া থাকিলেও অন্ততঃ এখন বাঙালীদের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহা করা উচিত। প্রকৃত মুরুব্বির সহৃদয়তা ও সহানুভূতির প্রমাণ প্রয়োজনের সময় দিতে না-পারিলে মুরুব্বিয়ানা না-করাই ভাল। বাংলা দেশের অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট টাকা আছে বা পাওয়া যায়, ইহা যে সত্য নহে, তাহা আমরা "অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতি-বিধায়িনী সমিতি"র অভিজ্ঞতা হইতে ভাল করিয়া জানি।

চীনের দশা

চীনের জন্য বড় দুঃখ হয়। পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের পরস্পর ঈর্ষাদ্বেষ থাকায় তাহারা চীনকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতে পারে নাই। অথচ চীনের মত জনবহুল সুবৃহৎ দেশ সুশৃঙ্খল ও প্রগতিশীল হইয়া উঠিলে এশিয়ায় যে-যে ইউরোপীয় জাতির সাম্রাজ্য আছে, তাহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। জাপানের বিরুদ্ধে চীনকে সাহায্য না করিবার ইহা একটা কারণ হইতে পারে। জাপানের মত শক্তিশালী জাতি ভয়ের কারণ বলিয়াও জাপানের বিরুদ্ধে চীনকে সাহায্য করিতে হয়ত ইউরোপীয় জাতিরা সাহস পায় না। অথবা জাপানের সঙ্গে তাহাদের অপ্রকাশ্য সন্ধি বা বুঝাপড়াও থাকিতে পারে।

কারণ যাহাই হউক, চীন বড় বিপন্ন হইয়াছে। প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক চীনেরা মরিয়া হইয়া লড়িতেছে। কিন্তু তাহাদের বিরুদ্ধে রহিয়াছে চীনের গৃহবিবাদ, গৃহশত্রু, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের আপেক্ষিক অল্পতা, সামরিক শিক্ষার আংশিক অভাব, জাপানের ভেদনীতি, জাপানের অধিকতর সামরিক সজ্জা, এবং জাপানের আধুনিকতম সামরিক শিক্ষা।

চীনের বিরুদ্ধে জাপান যে ভেদ-চা'ল চালিয়াছে, আগে কোন পাশ্চাত্য জাতি তাহার বিরুদ্ধে উহা প্রয়োগ করিতে

পারে নাই। মাঞ্চুরিয়াকে জাপান স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিয়া তাহার মাথায় সাক্ষীগোপালের মত ভূতপূর্ব্ব চীন-সম্রাটকে বসাইয়াছে। অথচ বাস্তবিক জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়াছে। ইহাই হইল নূতন চা'ল।

মূলতঃ চীনেরা ও মাঞ্চুরা আলাদা জাতি। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে মাঞ্চু জাতি চীন দখল করিয়া চীনের সিংহাসনে নিজেদের নৃপতিকে বসায়। পরে মাঞ্চু ও চীনেরা এক জাতি হইয়া যায়, বিজেতা বিজিতের ভেদ লুপ্ত হয়। শেষ চীন সম্রাট-বংশ ও শেষ চীন-সম্রাট ছিলেন মাঞ্চু-জাতীয়। চীন যখন সন্‌-ইয়াট-সনের চেষ্টার ফলে সাধারণতন্ত্রে পরিণত হয়, তখন মাঞ্চুজাতীয় এই শেষ চীন-সম্রাট পদচ্যুত হইয়া সাধারণ নাগরিকের মত চীনে বাস করিতে থাকেন। ইউরোপে সাধারণতঃ পদচ্যুত রাজা বা সম্রাটকে হয় নিহত নয় নির্ব্বাসিত করা হয়। সাধারণতন্ত্রস্থাপক চীননেতারা তাহা না করিয়া মানবিক সদ্‌গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন। এখন কিন্তু সেই পদচ্যুত চীন-সম্রাট জাপানের ক্রীড়াপুত্তল হইতে রাজী হইয়া চীন সাধারণতন্ত্রের অঙ্গচ্ছেদ ও দুর্ব্বলতা সাধনের উপায় স্বরূপ হইয়াছেন। মাঞ্চুরিয়া যদি বাস্তবিক স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হইত, তাহাতে আপত্তি করিবার বিশেষ কারণ থাকিত না, কেবল এই মাত্র কারণ থাকিত, যে, বড় একটা রাষ্ট্রকে যত টুকরা টুকরা করা যায়, তাহা ততই দুর্ব্বল হয়। তাহা হইলেও বাস্তবিক-স্বাধীন মাঞ্চুরিয়ার অস্তিত্বে চীনের আপত্তি করিবার ন্যায়সঙ্গত কারণ থাকিত না। কিন্তু মাঞ্চুরিয়া বাস্তবিক স্বাধীন হয় নাই, অধিকন্তু জাপানের করতলগত হইয়া চীনের সর্ব্বনাশে সাহায্য করিতেছে।

ব্যাপারটা কিরূপ, তাহা বুঝাইবার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে একটা কাল্পনিক দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্‌। আয়ার্ল্যাণ্ড যখন ইংলণ্ডের সম্পূর্ণ অধীন ছিল, তখন কোন সময়ে যদি ফ্রান্স ভেদনীতি প্রয়োগ দ্বারা উহা দখল করিয়া উহার স্বাধীনতা ঘোষণা করিত, তাহা হইলে ঐরূপ ব্যাপার জাপানের মাঞ্চুরিয়াকে স্বাধীনতা দিবার নামে উহা গ্রাস করিবার সমতুল্য ব্যাপার হইত।

অথবা যদি কল্পনা করা যায়, যে, যেহেতু ওয়েল্‌স্‌ এক সময় ইংলণ্ড কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল, সেইজন্য যদিও এখন ইংলণ্ড ও ওয়েলস এক দেশ এবং ঐ দুই ভূখণ্ডের লোক বিজেতা বিজিত নির্ব্বিশেষে এক জাতি, তথাপি জার্ম্যানী যদি ভবিষ্যতে ওয়েলস্‌কে স্বাধীন করিবার ছলে উহা দখল করে, তাহা হইলে জার্ম্যানীর এই কাল্পনিক কাজ জাপানের বাস্তবিক চা'লের সদৃশ হইবে।

—

মিঃ চার্চিল ও স্যর সামুয়েল হোর

আমাকে কয়েক দিন আগে মজঃফরপুরের গ্রিয়ার ভূমিহার ব্রাহ্মণ কলেজের বাঙালী ছাত্রদের সমিতির বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে ঐ শহরে যাইতে হইয়াছিল। উহা সরকারী কলেজ বলিয়া সেখানে আমাকে একটি যথাসম্ভব হাবিষ্যিক অর্থাৎ অরাজনৈতিক বক্তৃতাও দিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই অপ্রাসঙ্গিক কথা এইখানেই শেষ করি। মজঃফরপুর যাইতে হইলে মোকামায় ট্রেন বদলাইতে হয়। কিন্তু দানাপুর এক্সপ্রেস খুব বিলম্বে মোকামা পৌঁছায় সকালের ট্রেন ধরিতে না পারিয়া আমি দীর্ঘকাল মোকামা ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতে বাধ্য হই। একজন ইংরেজেরও সেই দশা ঘটে। ইংরেজরা সাধারণতঃ আপনা হইতে অন্যের সহিত—বিশেষতঃ ভারতীয়ের সহিত—কথাবার্ত্তা আরম্ভ করে না। এই লোকটি কিন্তু এই বলিয়া আমার সহিত কথা জুড়িয়া দিলেন—"আপনার স্যুটকেস্‌টি ত বেশ হাপরের মত সঙ্কোচন প্রসারণ করা যায়; কোথায় কিন্‌লেন?" আমি বলিলাম, "বার্লিনে।" তাহার পর নানা দেশের এবং ভারতবর্ষের নানা বিষয়ে কথা হইল। সমুদয় বলিবার দরকার নাই। লোকটির একটি কথা এইরূপ। "আপনাদের দেশে ভিন্ন ভিন্ন দলের নেতারা মতের অনৈক্যকে ব্যক্তিগত শত্রুতায় পরিণত করেন, ইংলণ্ডে মতের অনৈক্য এবং বিরোধ থাকিলেও নেতাদের ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব থাকিতে পারে। যেমন দেখুন না, মিঃ চার্চিল ও স্যর সামুয়েল হোরের মতভেদ খুব আছে, কিন্তু বন্ধুত্বও আছে।" আমি বলিলাম, "আমাদের দেশেও এরূপ দৃষ্টান্ত আছে," এবং কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলাম। তাহার

পর বলিলাম, "ইংলণ্ডের দলনায়কদের পার্লেমেণ্টে এবং সভাসমিতিতে তর্কবিতর্ক ও ঝগড়া এবং সামাজিক ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব—যেমন হোর ও চার্চিলের—রঙ্গমঞ্চে অভিনেতাদের যুদ্ধ এবং গ্রীন রুমে বা নেপথ্যে তাহাদের বন্ধুত্বের মত।" ইংরেজটি তাহাতে সায় দিলেন।

কিন্তু আমার কথাটার যে নিগূঢ় অর্থ আমি খুলিয়া বলি নাই, লোকটির তাহা সম্ভবতঃ বোধগম্য হয় নাই। আমার কথার মধ্যে এই পরিহাস প্রচ্ছন্ন ছিল, যে, পার্লেমেণ্ট-রঙ্গমঞ্চে হোর ভারতবন্ধু এবং চার্চিল ভারত-বিরোধী সাজিলেও পার্লেমেণ্ট-গৃহের বাহিরে উভয়েই ব্রিটেন-বন্ধু এবং ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে উভয়ের নীতি মূলতঃ ও কার্য্যতঃ এক।

বস্তুতঃ চার্চিল ও তাঁহার দলস্থ পুরুষ ও স্ত্রীলোকরা চীৎকার দ্বারা এবং হোর ও তাঁহার সমর্থকরা ঐ চীৎকারে বিরোধিতা দ্বারা আমাদিগকে যতই বুঝাইতে চেষ্টা করুন না, যে, ভারতবর্ষ একটা ভারী বৈপ্লবিক রকমের শাসনসংস্কার আইন পাইতে বসিয়াছে, ভারতবর্ষে এমন লোক অল্পই আছে যাহারা এরূপ চা'লে ভুলিবে। খাঁটি রাষ্ট্রীয় অধিকার আদায় করিয়া লইবার ক্ষমতা ভারতীয়দের না থাকিতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক বুদ্ধির বিকাশ কি একটুও তাহাদের হয় নাই?

জেলে প্রায়োপবেশন

ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রায়োপবেশনের খবর এখনও প্রায়ই পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে এমন লোক অবশ্য থাকিতে পারেন, যাঁহারা দুঃখবরণের বীরত্বের অধিকারী হইলেও হয়ত অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ। কিন্তু সাধারণতঃ মানুষ সামান্য কারণে প্রায়োপবেশন দ্বারা নিজের জীবনসংশয় ঘটায় না। প্রায়োপবেশনের কারণ সম্বন্ধে জেলের কর্ম্মচারীদের কথার উপর নির্ভর করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় সরকার পক্ষ হইতে যাহা বলা হয়, তাহাতে লোকের সন্দেহ দূর হয় না। এই জন্য সরকারী বেসরকারী অনুসন্ধান-কমিটির দ্বারা তদন্তের পর রিপোর্ট বাহির করিলে ভাল হয়।

কমিটির তদন্তে যে কখন কখন সত্য কথা বাহির হইয়া পড়ে, তাহার একটি দৃষ্টান্ত অমরাবতী জেল সম্বন্ধে নিম্নমুদ্রিত সংবাদটি হইতে পাওয়া যায়।

Nagpur, Feb. 22

The report of the Committee appointed to enquire into alleged ill-treatment of civil disobedience prisoners in Amraoti Jail in April. 1932, has just been published. Of the five non-official members three have signed the report with the Home Member.

The report says that civil disobedience prisoners were in a state of mutiny on the 21st April, 1932 and on the morning of 22nd April some of the prisoners were kept locked in their barracks and assaulted by warders, while others were not supplied food and water.

The report adds that the incident was a well-planned campaign against civil disobedience prisoners with a view to subjugate them.

It recommends that civil disobedience prisoners should be treated in a different way from ordinary criminals.—Associated Press.

কতকগুলি রাজনৈতিক বন্দীকে রক্ষীরা ঘরে তালাবদ্ধ করিয়া প্রহার করিয়াছিল এবং অন্য কতকগুলিকে খাদ্য ও জল দেয় নাই, এবং এরূপ ব্যবহার যে আগে হইতে তাহারা পরামর্শ করিয়া করিয়াছিল, ইহা রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে। রিপোর্টের স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে মধ্য-প্রদেশের স্বরাষ্ট্রসচিব একজন।

রিপোর্টে এই সুপারিশ করা হইয়াছে, যে, নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টা সম্পর্কে যাহারা জেলে গিয়াছে, তাহাদিগের প্রতি ব্যবহার সাধারণ কয়েদীদের হইতে পৃথক হওয়া উচিত।

বস্তুতঃ জেল পরিচালন সম্পর্কে এই মোটা কথাটা রাজপুরুষেরা বুঝিতে চান না। তাঁহারা জেল-কোড আঁকড়াইয়া আছেন, যদিও জেল-কোড অনুসারেও সব সময় কাজ হয় না। কিন্তু জেল-কোড প্রস্তুত হইয়াছিল প্রধানতঃ এরূপ কয়েদীদের জন্য যাহারা রিপুর বা প্রবৃত্তির তাড়নায় কিংবা স্বার্থসিদ্ধির জন্য নীতিবিরুদ্ধ কাজ করে। যখন জেল-কোড প্রস্তুত হইয়াছিল, তখন কেহ ভাবে নাই যে, নিরুপদ্রব আইন-লঙ্ঘন সম্পর্কে এরূপ ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারা তাহাদের বিবেচনায় স্বদেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতির জন্য জেলে যাইবে যাহারা সাধারণতঃ সুনীতির নিয়ম মানিয়া চলে।

বোধনা-সমিতির কাজ

জড়বুদ্ধি ছেলে-মেয়েদের জন্ম বোধনা-সমিতি মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে যে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহার জন্ম গৃহনির্মাণ আরম্ভ করা গিয়াছে। উহার ব্যয় মোটামুটি চারি হাজার টাকা এবং আনুষঙ্গিক আরও এক হাজার টাকা আবশ্যক হইবে। মাসিক ব্যয় যে কয়েক শত টাকা হইবে, তাহাও সংগ্রহ করিতে হইবে। এরূপ প্রতিষ্ঠান হইতে ও চলিতে পারে কি না, সন্দেহ প্রকাশ করিয়া অনেকে সাহায্য করিতে চান না। ভাল কাজে টাকা পাওয়া যাইবে, এই বিশ্বাসে বোধনা-সমিতি কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। এখন সকলে সাহায্য করিলে নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠানটি চলিবে। এ-পর্য্যন্ত যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় ৮২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। টাকাকড়ি ২।১ টাউনশেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, ঠিকানায় বোধনা-সমিতির কোষাধ্যক্ষ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে পাঠাইতে হইবে।

দু-একজন মনে করেন, বোধনা-সমিতি পাগলদের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান খুলিতেছেন। তাহা ভুল। জড়বুদ্ধি ছেলেমেয়েরা পাগল নয়।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর ইউরোপ যাত্রা

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে গবন্মেণ্ট বিনা বিচারে, তাঁহার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আছে তাহা পর্য্যন্ত প্রকাশ না করিয়া, অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্ম কারারুদ্ধ করেন। সেই অবস্থায় তাঁহার ক্ষয়রোগ জন্মে। অতএব তাঁহাকে স্বদেশে বা বিদেশে সরকারী ব্যয়ে যথোচিত চিকিৎসা দ্বারা রোগমুক্ত করিবার চেষ্টা করা গবন্মেণ্টের উচিত ছিল। গবন্মেণ্ট তাহা করেন নাই। এইরূপ মন্তব্য আমরা আগে প্রকাশ করিয়াছিলাম। সুভাস বাবুও ইউরোপ রওনা হইবার সময় এই রূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক, গবন্মেণ্ট যে তাঁহাকে অনেক বিলম্বে হইলেও, নিজ ব্যয়ে চিকিৎসার জন্ম ইউরোপ যাইতে দিয়াছেন, ইহাও সুবিবেচনা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তিনি নিরাময় হইয়া দেশে ফিরিয়া আসুন, ইহা আমাদের হৃদগত বাসনা।

গবন্মেণ্ট তাঁহার পীড়িত বৃদ্ধ পিতামাতার সহিত দেখা করিবার সুবিধা করিয়া দিলে সুবিবেচনার কাজ হইত। এরূপ বন্দোবস্ত করিবার ক্ষমতা ঐশ্বর্য্যশালী ও প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের ছিল। পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুবিধা হইলে সুভাষচন্দ্রের পলায়নের বা তাঁহাদের সহিত ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের বিরুদ্ধে কোন পরামর্শ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। এইজন্ম, যথেষ্ট পাহারা পরিবেষ্টিত ভাবে এরূপ সাক্ষাৎকার হইতে গবন্মেণ্টের কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা ছিল না। বরং তাহার দ্বারা সরকার বাহাদুরের আচরণে লোকের সন্তোষ জন্মিত।

বেথুন কলেজ সম্বন্ধে আলোচনা

দৈনিক কাগজে দেখিলাম, নমঃশূদ্র জাতীয় একজন সভ্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই বিষয়ে আলোচনা উত্থাপন করিবেন, যে, যখন ছাত্রীরা ছেলেদের অনেক কলেজে পড়িতেছে, তখন বেথুন কলেজ চালাইবার কি প্রয়োজন আছে। সভ্য মহাশয়ের জাতির উল্লেখের কারণ পরে বুঝা যাইবে।

মেয়েদের শিক্ষা দীর্ঘকাল ধরিয়া গবন্মেণ্ট এবং জনগণ কর্ত্তৃক অবহেলিত হইয়াছে। এখন এ-বিষয়ে আগেকার চেয়ে সামান্ত একটু বেশী দৃষ্টি পড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহা যথেষ্ট নহে। আগেকার অবহেলার ক্ষতি-পূরণের জন্ম এখন যদি সরকারী তহবিল হইতে ছেলেদের শিক্ষার চেয়ে মেয়েদের শিক্ষার জন্ম বেশী ব্যয় না-হউক অন্ততঃ সমান ব্যয় হয়, তাহা হইলে ন্যায্য ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এখনও ছাত্রদের চেয়ে ছাত্রীদের শিক্ষার জন্ম ব্যয় অনেক কম হইতেছে। কলেজের শিক্ষাই ধরা যাক্। বঙ্গে ছাত্রদের শিক্ষার জন্ম অনেকগুলি সরকারী কলেজ আছে। ছাত্রীদের শিক্ষার জন্ম আছে কেবল কলিকাতার বেথুন (বীটন্) কলেজ ও ঢাকার ইডেন কলেজ। কোনটিরই ব্যবস্থা ছাত্রদের শিক্ষার জন্ম অভিপ্রেত কোন সরকারী কলেজের ব্যবস্থার সহিত

তু.নীয় নহে। এরূপ অবস্থায়, ছাত্রীদের জন্য যে দুটি ছোট কলেজ আছে, তাহারই একটি উঠাইয়া দিবার কথা তোলা কখনই উচিত নয়।

ছাত্র ও ছাত্রীদের একত্র এক কলেজে সুনিয়মের অধীন থাকিয়া অধ্যয়নে আমরা দোষ দেখি না। কিন্তু এ-বিষয়ে পাশ্চাত্য অনেক দেশেও এখনও মতভেদ আছে; আমাদের দেশে ত আছেই। সুতরাং যাঁহারা ছাত্রীদের শিক্ষার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত চান, তাঁহাদের মত অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। ছাত্রীদের শিক্ষার স্বতন্ত্র বন্দোবস্তের কতকগুলি সুবিধাও আছে। যাঁহারা প্রাপ্তবয়স্ক নিঃসম্পর্ক ছাত্রছাত্রীদের বেশী মেলামেশা পছন্দ করেন না, তাঁহাদের মত অগ্রাহ্য করা উচিত নয়, আগেই বলিয়াছি। তাঁহাদের বাড়ির মেয়েদেরও উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাওয়া উচিত। কিন্তু অন্য কারণেও ছাত্রীদের শিক্ষার আলাদা ব্যবস্থা থাকিলে সুবিধা হইতে পারে। ছাত্রীদের শিক্ষিতব্য ও অধীতব্য বিষয় কোন কোন দিকে ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট বিষয় হইতে পৃথক বা অতিরিক্ত করা আবশ্যক বিবেচিত হইতে পারে। সেস্থলে, ছাত্রীদের জন্য পরিচালিত স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে এই রূপ ব্যবস্থা সহজসাধ্য হইতে পারে।

আমরা জানি, বেথুন কলেজের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ আছে। ইহাতে আরও নানা বিষয়ে আরও উৎকৃষ্ট শিক্ষার আয়োজন ও সরঞ্জাম থাকা উচিত। টাকা খরচ করিলেই তাহা হইতে পারে। পড়াইবার পড়িবার বসিবার ঘরের যথেষ্ট বন্দোবস্ত নাই। টাকা খরচ করিলেই সে বন্দোবস্ত হইতে পারে। আর একটি অভিযোগ অন্যবিধ। রাজনৈতিক কারণে বেথুন কলেজের ছাত্রীদের উপর যতটা হাকিমী ব্যবহার হয়, অন্যান্য কলেজের ছাত্রীদের উপর তাহা হয় না। কলেজটি উঠাইয়া না দিয়াও ইহার প্রতিকার করা যাইতে পারে।

বেথুন কলেজে হিন্দু ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টিয়ান ছাত্রীরা পড়ে। যে-কোন জাতির হিন্দু গৃহস্থের বাড়ির মেয়ে এখানে পড়িতে পারে। নমঃশূদ্র বা অন্য কোন তথাকথিত অনাচরণীয় জাতির মেয়েরা এখানে ভর্ত্তি হইতে পারিবে না বলিয়া কোন নিয়মের অস্তিত্ব আমরা অবগত নহি। সুতরাং কোন জাতির হিন্দুরই বেথুন কলেজের উপর বিরাগ থাকা উচিত নয়। শুনিয়াছি, এই কলেজে মুসলমান ছাত্রী নাই। কিন্তু কলেজে পড়িবার মত মুসলমান ছাত্রীই কম। কাগজে দেখিলাম, ১৯৩১ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত বৎসরের সদ্যঃ-প্রকাশিত সরকারী শিক্ষা-রিপোর্ট অনুসারে ঐ বৎসর মোট ৩৬৬টি কলেজ-ছাত্রীর মধ্যে মুসলমান ছাত্রী ছিল তিনটি। বেথুন কলেজে যখন খ্রীষ্টিয়ান ছাত্রী পড়ে, তখন মুসলমান বলিয়া কোন ছাত্রীর প্রবেশ নিষিদ্ধ হইতে পারে না। শুনিয়াছি, এই কলেজে হিন্দুবংশজাত গৃহস্থ বাড়ির ছাত্রী মাত্রেই পড়িবার অধিকারী। খ্রীষ্টিয়ান ভারতীয়েরা আপনাদিগকে হিন্দুবংশজাত বলিতে আপত্তি করেন না। মুসলমান ভারতীয়দের সকলের বা অনেকের তাহা বলিতে আপত্তি থাকিতে পারে। এ বিষয়ে ঠিক খবর আমরা অবগত নহি। যাহা হউক, যদি এরূপ নিয়ম থাকেও (যাহা আছে বলিয়া বিশ্বাস হয় না), যে মুসলমান ধর্ম্মের জন্যই কোন ছাত্রী এখানে পড়িতে পারিবে না, তাহা হইলেও, যখন বিশেষ করিয়া মুসলমানদের শিক্ষার জন্য যত সরকারী ব্যয় হয়, তাহা বিশেষ করিয়া হিন্দুদের শিক্ষার জন্য ব্যয়ের অন্ততঃ ১৫ গুণ, তখন শুধু হিন্দু খ্রীষ্টিয়ান ও ব্রাহ্মদের মেয়েদের শিক্ষার জন্য বেথুন কলেজটি থাকিলে তাহাতে আপত্তি করা অযৌক্তিক।

সর্ব্বশেষে, এই যুক্তির অবতারণা হইতে পারে, যে, মেয়েদের জন্য ত লোরেটো ও ডায়োসেসান কলেজ রহিয়াছে, অতএব বেথুন কলেজ রাখিবার কি দরকার? উত্তরে বলা যাইতে পারে, ছেলেদের জন্য ত সেণ্ট জেবিয়ার্স, স্কটিশ চার্চ এবং সেণ্ট পল্‌স্ রহিয়াছে; অতএব প্রেসিডেন্সী কলেজ রাখিবার কি প্রয়োজন? সেরূপ প্রশ্ন না করিয়া ইহা বলা যাইতে পারে, যে, অনেক অভিভাবকের লোরেটো ও ডায়োসেসান এই দুই খ্রীষ্টীয় কলেজে কন্যাদিগকে পাঠাইবার আপত্তি থাকিতে পারে।

—

সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে বেসরকারী করা

অনেক দিন হইতে এইরূপ একটি কথা উঠিয়াছে, যে, এখন বঙ্গে বেসরকারী ভাল স্কুল-কলেজ অনেক হইয়াছে; অতএব অনেক বেশী টাকা খরচ করিয়া কতকগুলি

সরকারী স্কুল-কলেজ চালাইবার প্রয়োজন নাই। সেগুলিকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত কমিটির হাতে দিয়া উদ্বৃত্ত টাকা সব প্রতিষ্ঠানে সমান অনুপাতে বাঁটিয়া দিলে শিক্ষার উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা হয়, এবং যে-সকল প্রতিষ্ঠান অর্থের অভাবে এখন যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারিতেছে না, তৎসমুদয়ের সমুচিত উন্নতি হয়।

গত মাসে কলিকাতার আলবার্ট হলে নিখিলবঙ্গীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষকদিগের সমিতির উদ্যোগে আহূত এক সভায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কয়েক জন প্রিন্সিপ্যাল ও অধ্যাপক এই প্রশ্নের আলোচনা করেন—যথা প্রিন্সিপ্যাল পি জি ব্রিজ, প্রিন্সিপ্যাল জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিন্সিপ্যাল রজনীকান্ত গুহ, ইত্যাদি। সব কলেজকে ন্যায্য অনুপাতে টাকা বাঁটিয়া দিলে মোটের উপর বঙ্গে উচ্চশিক্ষার ক্ষতি হইবে না, তাহা আমি বিশ্বাস করি। সরকারী কলেজের অধ্যাপকেরা গড়ে বেসরকারী কলেজের অধ্যাপকদের চেয়ে ভাল অধ্যাপনা করেন, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। কিন্তু আমি সভাস্থলে দুটি দিকে আশঙ্কা প্রকাশ করি। একটি এই, যে, সরকারী কলেজগুলিকে বেসরকারী করিয়া দিলে বা কোন কোনটিকে উঠাইয়া দিলে যে-টাকা বাঁচিবে, তাহার সমস্তটা উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্যয়িত না হইতে পারে। এই আর্থিক অনটনের দিনে গবন্মেণ্ট তাহা ব্যয়সংক্ষেপ বলিয়া আর কোন কাজে না লাগাইতে পারেন। কিংবা তাহার প্রভূত অংশ রাজনৈতিক আন্দোলক প্রভৃতির শিক্ষার জন্য পুলিস ও জেল বিভাগে ব্যয় করিতে পারেন—বাস্তবিক ইহাও ত এক প্রকার উচ্চতম "শিক্ষা"। বাকী অংশ কতক মুসলমানদের শিক্ষার জন্য এবং যৎকিঞ্চিৎ সকল সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইতে পারে। আমার দ্বিতীয় আশঙ্কার কথা বলিতেছি। সরকারী কলেজ-সকলের শিক্ষকদের চেয়ে বেসরকারী কলেজের শিক্ষকদের একটু স্বাধীনতা আছে। শেষোক্ত ব্যক্তিরা স্পষ্ট রাজনৈতিক এবং পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক বিষয়ে নির্লিপ্ত ও নির্ব্বাক থাকিতে বাধ্য নহেন। তাঁহাদের কলেজ-সকলকে গবন্মেণ্ট উদ্বৃত্ত টাকার কিয়দংশ নিয়মিতরূপে প্রতি বৎসর দিতে অঙ্গীকার করি- যদি এই সর্ত্তে আবদ্ধ করিতে চান, যে, তাঁহারা রাজনৈতিক ও আধা-রাজনৈতিক বিষয়সমূহ সম্বন্ধে সরকারী চাকরেদের মত নির্লিপ্ত ও নির্ব্বাক থাকিবেন, তাহা হইলে কি বেসরকারী কলেজওয়ালারা সেই সর্ত্তে সম্মতি দিবেন? বর্ত্তমানে তাঁহাদের যেটুকু স্বাধীনতা আছে, তাহার কি কোনই মূল্য নাই?

সুভাষচন্দ্র কি মুক্তি পান নাই ?

ভারত-সরকারের পক্ষ হইতে লিখিত একখানি চিঠিতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, যে, সুভাষবাবু যদি চিকিৎসার্থ নিজ ব্যয়ে ইউরোপে যাইবার বন্দোবস্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে গবন্মেণ্ট তাঁহাকে তাহা করিতে অনুমতি দিবেন এবং ৩ নং রেগুলেশ্যন অনুসারে তাঁহাকে বন্দী রাখিবার হুকুম প্রত্যাহার করা হইবে। কিন্তু আজ ২৭শে ফাল্গুন তারিখের দৈনিক লিবার্টিতে প্রকাশিত সুভাষবাবুর চিঠি হইতে দেখা যাইতেছে, তিনি এখনও এই মুক্তিপত্র পান নাই। তা ছাড়া, তাঁহাকে যে পাসপোর্ট বা ছাড়পত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার জার্মেনী ও ইংলণ্ড যাইবার অনুমতি নাই। অবশ্য অন্য কোন কোন লোককেও ইউরোপের সকল দেশে যাইবার অনুমতি দেওয়া হয় না। কিন্তু সুভাষবাবু তাঁহার বর্ত্তমান স্বাস্থ্যে জার্মেনীতে ও ইংলণ্ডে রাজনৈতিক আন্দোলন করিতে যাইবেন, মনে করা অসঙ্গত। চিকিৎসার জন্যই হয়ত এই উভয় দেশে বা তাহার কোনটিতে তাঁহার যাওয়া আবশ্যক হইতে পারে। তদ্ভিন্ন, তাঁহার রোগ-মুক্তির জন্য স্বাচ্ছন্দ্যের অনুভূতি আবশ্যক। সেই কারণে তাঁহাকে অনাবশ্যক সর্ব্ববিধ বাধাবিঘ্ন হইতে মুক্ত করা উচিত। তিনি যেখানেই যান বা থাকুন, ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের চরেরা তাঁহার উপর নজর রাখিবে। ইহা ইংলণ্ডে ত খুবই সোজা। এই সব কারণে তাঁহার ইংলণ্ড ও জার্মেনী যাওয়ার নিষেধ প্রত্যাহৃত হওয়া উচিত।

ইন্দুভূষণ সেন

সাতান্ন বৎসর বয়সে প্যারিসে শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেনের মৃত্যুর সংবাদ হঠাৎ আসিয়া তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবর্গকে স্তম্ভিত করিয়াছে। তিনি ব্রাহ্মসমাজে সুপরিচিত স্বর্গীয় ভুবনমোহন সেন মহাশয়ের অন্যতম পুত্র। ইন্দুভূষণ নিজের চেষ্টায় দেশে একটি শ্রদ্ধার স্থান করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি এম্ এ, বি এল, এবং ব্যারিষ্টার ছিলেন। এক সময়ে পেশকারী ও পরে ওকালতী করেন। ওকালতীতে বেশ পসার ছিল। তাহার পর ব্যারিষ্টার হন। তাহাতেও তাঁহার পশার ছিল। আইনের জ্ঞান ও সততার জন্য তাঁহার খ্যাতি ছিল। বঙ্গের রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি স্বাধীনচিত্ততার জন্য শেষে সকল দলের সহিত সংস্রব ত্যাগ করেন, কিন্তু কাহারও সহিত বিরোধ করেন নাই। তাঁহার সোশ্যালিজমের (সমাজতন্ত্র বাদ বা সামাজিক সাম্য বাদের) বিস্তৃত ও গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি পৃথিবীর ও ভারতবর্ষের শ্রমিক প্রচেষ্টার (লেবার মুভমেণ্টের) সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। কয়েকটি শ্রমিক ধর্ম্মঘটের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। শ্রমিক প্রচেষ্টার সহিত সংশ্লিষ্ট অনেক যুবকের তিনি প্রধান সহায় ছিলেন। তিনি কেবল আইনজ্ঞ ছিলেন না, সাহিত্যাদি নানাবিষয়ের তাঁহার বিস্তৃত ও প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তিনি চিত্রকলার রসজ্ঞ ছিলেন। বিশ্বভারতীর সহিত তাঁহার যোগ ছিল। তিনি বিবাহ করেন নাই।

নামযশের বা অন্য কোন প্রকার লাভের প্রত্যাশা না রাখিয়া যোগ্যতার সহিত দেশের সেবা করিবার সামর্থ্য ও ইচ্ছা তাঁহার ছিল। আগে একবার পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া এবং এবারও অনেক দেশ দেখিয়া তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় দ্বারা সেই যোগ্যতা বাড়াইতেছিলেন। ভারতবর্ষে তিনি ফিরিয়া আসিলে তাঁহার দ্বারা দেশ উপকৃত হইত। কিন্তু তাহা হইল না।

প্রবাসী সম্পাদকের দেশভ্রমণ

কিছুকাল হইতে আমাকে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যাইতে হইতেছে। তাহাতে আমার অভিজ্ঞতা বাড়ে। যেখানেই যাই, সেখানে যাহা দেখি শুনি সে-বিষয়ে অনেক লিখিবার আছে মনে হয়। কিন্তু সময়ের অভাবে এবং আমার বাংলা ও ইংরেজী মাসিক দুটিতে যথেষ্ট জায়গার অভাবে প্রায়ই এরূপ কিছু লেখা হয় না। আমার হাতে একখানা বাংলা ও একখানা ইংরেজী দৈনিক থাকিলে হয়ত অনেক কথা লেখা চলিত। গত কয়েক মাসের মধ্যে বোম্বাই পুনা মালদহ দিল্লী এলাহাবাদ (দুই বার) নাগপুর, রাজশাহী, কুমিল্লা (দুই বার), মৈমনসিং, ঢাকা, ঝাড়গ্রাম, কাশিমবাজার, ওয়াল্টেয়ার বিজাগাপাটম, মজঃফরপুর প্রভৃতি স্থানে যাইতে হইয়াছে। এইরূপ ভ্রমণের জন্য আমার একটি ক্রটি ঘটিয়াছে—আমাকে চিঠি লিখিয়া অনেকে যথাসময়ে উত্তর পান নাই—হয় বিলম্বে পাইয়াছেন কিংবা এখনও পান নাই। এই ক্রটির জন্য মার্জ্জনা চাহিতেছি।

ওয়াল্টেয়ারে বাঙালী

ওয়াল্টেয়ার ও বিজাগাপাটম একই শহরের দুটি অংশ বলিলেই চলে। উভয়ই সমুদ্রতটে অবস্থিত। এখানে বড় বড় জাহাজও যাহাতে আসিতে পারে, তাহার জন্য উৎকৃষ্ট বন্দর নির্ম্মিত হইতেছে।

এখানে অল্পসংখ্যক বাঙালী আছেন—বালকবালিকা সমেত জনা পঞ্চাশ হইবে। বন্দর হইলে যদি ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃতি উপলক্ষ্যে আরও বাঙালী সেখানে যান, তাহা হইলে বিশেষ সন্তোষের বিষয় হইবে। স্থানটি স্বাস্থ্যকর। যদি কেবল কেরানীগিরিতেও অনেকে যান, তাহাও আমি সম্পূর্ণ অবাঞ্ছনীয় মনে করি না।

একদিন এখানকার বাঙালীদের সহিত মিলিত হইবার সুযোগ হইয়াছিল। তাঁহাদের মুখে শুনিলাম, এমন এক সময় ছিল, যখন সঙ্গহীনতা বশতঃ হয়ত এক আধজন বাঙালী ট্রেন আসিবার সময় ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেন—যদি ভাগ্যক্রমে কোন বাঙালী যাত্রী থাকে তাহার সহিত বাংলা ভাষায় দুটা কথা বলিবার ও শুনিবার আশায়! বস্তুতঃ আমরা স্বদেশে থাকিয়া মাতৃভাষায় কথা কওয়া ও কথা শোনার আনন্দ ও প্রয়োজন ভুলিয়াই থাকি। ওয়াল্টেয়ারের বাঙালীদের একটি ক্লাব ও পুস্তকসংগ্রহ